অমৃত

* প্রধান কার্য্যালয়

১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৩
ফোন :—৫৫-৫২৩১

বিভিন্ন কার্য্যালয়

* মধ্য কলিকাতা

ভারত ভবন, ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩
ফোন :—২৩-২০৫৮

* বোম্বাই

শ্রীচারুব্রত দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটন ইনসুরেন্স হাউস,
দাদাভাই নওরোজি রোড,
বোম্বাই—১
ফোন :—২৬-২৮৫৩

* দিল্লী

শ্রীশংকর চক্রবর্তী
আই, ই, এন, এস বিল্ডিং
রফি মার্গ, নিউদিল্লী—১
ফোন—৩১৪৬৯

* মাদ্রাজ

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ
২৪, চন্দ্রবাগ এভেনিউ
মাদ্রাজ—৪

* বাঙ্গালোর

শ্রী এস, কে, শেষাদ্রি
২৪৩/১, সুইমিং পুল এক্সটেনশন,
৬, ক্রস, বাঙ্গালোর—৩
ফোন :—৭৪২৫৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 18th August, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ৪২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১ ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

মহাকাশ অভিযান

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিশ্বজয়ী সংগ্রাম দুর্বার গতিতে শীর্ষবিন্দু অভিগামী। সুদূর দিগন্তপ্রসারী যুগ-যুগবাহী কবিকল্পনাও যেন আজ পরাজিত। রূপ-কথার অলৌকিক জগৎ পর্যন্ত মর্তবাসী মানুষের নাগালের মধ্যে আসি-আসি প্রায়। পারমাণবিক শক্তিধর মানুষের মহাকাশবিজয়ী অভিযান একদিকে যেমন মানবেতিহাসের বৃহত্তম বিস্ময়, আবার আর একভাবে দেখলে মনে হয় বিজ্ঞানের বিশ্বজয়ী সাফল্যে সব বিস্ময়ের, রোমাঞ্চের অবসান; কল্পনাতীত যখন মানুষের সাধ্যায়ত্ত তখন আর নব নব বিস্ময়ের, সুদূর বিহারী কল্পনার অবকাশ থাকে কই? এ যুগের বিশ্বজয়ী বিজ্ঞানেই মানবিক কল্পনার শেষ কথা। শেষ অবশ্য কোথাও নেই; মহাসীমার বন্ধনমুক্ত যে মানুষ আকাশচারী, মহাকাশবিহারী, চন্দ্রলোকাভিসারী সে-ও জানে বিজ্ঞানবিশ্বের ফাঁকে ফাঁকে, অন্তরালে কল্পনার ভাঙাগড়া, আলো-আঁধারি লীলা চিরকাল চলতে থাকবে। বিজ্ঞানের মহাকাশবিহার, চন্দ্রলোকে যাত্রার প্রস্তুতি সেই মানবিক কল্পনারই সার্থক জয়যাত্রা।

মর্তবাসী মানুষের মহাকাশবিজয়ী অভিযানের প্রথম বিস্ময়ের চমক লেগে-ছিল বেশ কয়েক বৎসর আগে, যখন সোভিয়েট রাশিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক' ঊর্ধ্বাকাশে কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হয়। স্পুটনিকের পর লুনিক, তারপর মহাকাশে জীবন্ত প্রাণীদের প্রেরণ এবং তাদের নির্বিঘ্নে ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন। রাশিয়ার মত আমেরিকারও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনশক্তি মহাকাশ অভিযানে নিযুক্ত। গ্যাগারিন ও টিটভের মহাকাশ অভিযান ও বিশ্ব পরিক্রমার পর মার্কিন মহাকাশ-চারী কার্পেণ্টার তৃতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন। মহাকাশবিহার ও মহাশূন্য পথে বিশ্ব পরিক্রমায় অপূর্ব যান্ত্রিক কলা-কৌশল এখন মানুষের করায়ত্ত।

সোভিয়েট ও মার্কিন মহাকাশবিহারী অভিযান এখন যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে মহাকাশবিজ্ঞানের এই সাফল্যকে লোকে প্রায় ট্রেন চলাচলের মত স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নিচ্ছে। অজানাকে জানা, অসম্ভবকে সম্ভব করা হলে তখন আর বিস্ময়ের অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার অবকাশ থাকে না। এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই।

এরপর অবশ্য আছে মহাকাশপথে চন্দ্রলোকে অভিযান। রূপকথার চাঁদ, কল্পনার মায়াজালমণ্ডিত মানুষের দৃষ্টি সীমাভুক্ত হবুও অনাবিষ্কৃত, এখনও স্পর্শাতীত চন্দ্রলোকের অবগুণ্ঠন মোচনে মহাকাশবিজয়ী মানুষের সরাসরি অভিযান শুরু হয়নি, কিন্তু সে-অভিযানের জন্য সোভিয়েট ও মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্যোগ আয়োজন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গত বৎসর মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের মধ্যেই মানুষের চন্দ্রলোকবিহার এবং নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা সফল করার সংকল্প নিতে হবে। মার্কিন মহাকাশবিজ্ঞানীরা আশা করেন ১৯৬৮ সাল নাগাদ তাঁরা চন্দ্রলোকে অভিযাত্রী প্রেরণে সক্ষম হবেন। সোভিয়েট রাশিয়ার তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করা হয়নি, তবে যতদূর জানা যায়, রাশিয়ার মহাকাশচারীরা ১৯৬৪-৬৫ সাল নাগাদ চন্দ্রলোকে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই প্রস্তুতিপর্বের একটি ধাপ সম্প্রতি নিকোলায়েভ এবং পপোভিচের মহাকাশ যাত্রা এবং একযোগে পৃথিবী পরিক্রমা।

সোভিয়েট অথবা মার্কিন, কোন্ পক্ষের মহাকাশ অভিযাত্রীরা প্রথম চন্দ্র-লোকে অবতরণে সক্ষম হবেন সে-প্রশ্ন অবান্তর। মহাকাশ বিজয়ে দুই দেশের যান্ত্রিক নিপুণতা, কলাকৌশল এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ক্ষমতার মধ্যে প্রতি-যোগিতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সক্রিয় থাকা বিচিত্র নয়। তাহলেও মহাকাশ অভিযানে উভয় দেশের রাষ্ট্র-নেতাগণ ও বিজ্ঞানীরা পরস্পরের অগ্র-গতি এবং সাফল্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মহাকাশচারী নিকোলায়েভ ও পপোভিচের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা বর্তমানে স্থগিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সোভিয়েট ও মার্কিন মহাশক্তিধরগণ যদি মহাকাশ অভিযান এবং চন্দ্রলোক যাত্রা ব্যাপারে যৌথপ্রচেষ্টা পরিচালনায় উদ্যোগী হতে পারতেন, তাহলে পৃথিবীর অগণিত সাধারণ মানুষ অনেক বেশী স্বস্তি বোধ করত।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যে মানুষ সহজেই উল্লসিত হয়; মহাকাশচারণে রাশিয়া এবং আমেরিকার কৃতিত্বে সে কারণে অনায়াসে প্রশংসা অর্জন করে। মুশকিল এই যে, বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের আনন্দ এক্ষেত্রে অবিমিশ্র নয়; এর সঙ্গে মহাশক্তিধরদের পৃথিবী-জোড়া ক্ষমতা দ্বন্দ্বের খাদ মিশে আছে অনেকখানি। যে মহাকাশযান চন্দ্রলোকের সুধা-পিপাসী, অন্তরীক্ষে সেই মহাকাশযান থেকেই আবার অতর্কিতে নিক্ষিপ্ত হতে পারে পারমাণবিক বিষভাণ্ড। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত প্রখ্যাত একজন তরুণ ইংরেজ কবি তাই চন্দ্রকিরণস্নাত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে "মুন লাইট ও মার্ডারের" মর্মস্পর্শী বিষাদসংগীত রচনা করেছিলেন। এ-যুগের পারমাণবিক মহাবিনাশের বিভীষিকাগ্রস্ত মানুষও সেইরকম সংকট চেতনায় দোলায়মান। চন্দ্রলোকে অভিযান, না পারমাণবিক বিনাশের প্রস্তুতি, কোন্‌টা যে যথার্থ, সে প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

আরো চাই ?

তোষামোদ নীতি

তোষামোদ নীতি

তোষামোদ নীতি

চীন

মার্কিন দেশ অনুসন্ধানের পর জানিয়েছে যে গুড়ো ময়দায় বিষক্রিয়ার কারণ তারা জানে না।

তবে কি আণবিক বোমা পরীক্ষার আবর্জনাই এর কারণ ?

হিন্দী

তৃতীয় পরিকল্পনায় হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য বিপুল অর্থ মঞ্জুর হয়েছে।

উৎকৃষ্ট সার

Kutty

বৈদেশিকী

আগামী মাসে বিনোবাজী আসাম থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করবেন, এরূপ আশা করা যাচ্ছে। পাকিস্তানী সরকার বিনোবাজীকে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ ক'রে দিন দশেক থাকার অনুমতি দিয়েছেন। "পদযাত্রা" করে দশ দিনে যতটা পথ অতিক্রম করা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ততটা পথ চলার অনুমতি বিনোবাজী পেয়েছেন। তাতে মনে হয়, বিনোবাজী কেবলমাত্র রংপুরের জেলার এক অংশ মাড়িয়ে আসতে পারবেন। বিনোবাজী অবশ্য এত অল্প দিনের সীমাবদ্ধ যাত্রার কথা ভাবেন নি। আর কিছু না হোক, নোয়াখালি দর্শনের ইচ্ছা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। সম্প্রতি নোয়াখালিতে যে-সব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার বহু পূর্ব থেকে বিনোবাজীর পূর্ব-পাকিস্তানে যাবার ইচ্ছা জানিয়ে পাকিস্তানী সরকারের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা চলছিল। নোয়াখালিতে সম্প্রতি যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তার সংবাদ বিনোবাজী হয়ত জানেনই না। গান্ধীজীর নোয়াখালির কাজ স্মরণ করেই বিনোবাজীর নোয়াখালিতে যাবার আগ্রহ। কিন্তু দশ দিনের মেয়াদে পূর্ব-পাকিস্তানে গেলে বিনোবাজীর পক্ষে নোয়াখালি দর্শন সম্ভব নয়। পদযাত্রীর পক্ষে মাত্র দশ দিনের জন্য কোনো দেশ দর্শনে যাওয়াকে অনেকটা "প্রতীক" (সিম্বলিক) দর্শন বলা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও মূল্য আছে।

বিনোবাজী পাকিস্তানে যেতে চান বলে পাকিস্তানী সরকারকে অনেক দিন আগে জানানো হয়। কথাবার্তা ভারত সরকারের মারফত চলে। পাকিস্তানী সরকার প্রথমে "না" বলে দেন—অবশ্য এসব ক্ষেত্রে "না" বলার জন্য যেরকম কূটনৈতিক ভাষা ব্যবহারের রেওয়াজ আছে, সেই রকম ভাষায়। "বিনোবাজীকে পাকিস্তানে আসতে দিতে চাই না"—এরকম না বলে "এখন বিনোবাজীর আসার পক্ষে অসুবিধা আছে"—এইরকম বলা হয়। কিন্তু বিনোবাজী সেখানেই হাল ছেড়ে দিতে চাননি। করাচীস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানী কর্মচারীদের কথাকেই শেষ কথা বলে ধরে না নিয়ে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথা বললে ফল হতে পারে, এই ধারণা বিনোবাজীর হয়। সেই অনুসারে আবার চেষ্টা হয় এবং তার ফলে দশ দিনের মাত্র মেয়াদ হলেও বিনোবাজীর পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব হবে।

হয়ত পূর্বে যখন "না" বলা হয়, তখনও প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে জানিয়েই এবং তাঁর মত নিয়েই "না" বলা হয়েছিল। হয়ত ইতিমধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাতে আয়ুব খান সাহেব মনে করছেন যে, বিনোবাজীকে এখন অল্প কয়েক দিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে আসার অনুমতি দিলে তাঁর (আয়ুব খান সাহেবের) নিজের রাজনৈতিক কারবারের কোনো ক্ষতি হবে না, বরং কিছু লাভ হতে পারে। বিনোবাজী "পার্টির রাজনীতি" চান না, সুতরাং প্রকারান্তরে তাঁর মত পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের "বেসিক ডেমোক্রাসী"র অনুকূলে, এরূপ ধারণা আয়ুব খান সাহেবের আছে, তা মনে করার কোনো হেতু নেই। কারণ আয়ুব খান সাহেব নিশ্চয়ই জানেন যে, সর্বোদয়বাদীদের "পার্টিবিহীন ডেমোক্রাসী"র কল্পনা এবং তাঁর "বেসিক ডেমোক্রাসী" আদৌ এক জাতের জিনিস নয়। পাকিস্তানে গিয়ে বিনোবাজীর যদি রাজনীতির কথা বলার কোনো ইচ্ছা থাকত, তা হলে তিনি তাঁর কথা এমন করে বলতেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারত যে, বিনোবাজীর আদর্শ ও আয়ুব খান সাহেবের "বেসিক ডেমোক্রাসী"র মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাত। কিন্তু আসলে—এবং আয়ুব খান সাহেব তা ভালো করেই জানেন যে, বিনোবাজী পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়ে রাজনীতির কথা বলতে যা বুঝায়, সেরকম কথা আদৌ বলবেনই না। বস্তুত প্রচলিত অর্থের রাজনীতির কথা বিনোবাজী যে পাকিস্তানে গিয়ে বলবেন না, এটা একটা অলিখিত শর্ত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

প্রচলিত অর্থের রাজনীতিতে—যে-রাজনীতির অবসান বিনোবাজী চান, তাতে এক রাষ্ট্রের লাভ কখনো কখনো অপর রাষ্ট্রের ক্ষতির কারণ হতে পারে, কিন্তু বিনোবাজী যে কথা বলেন, তাতে এক রাষ্ট্রের যেখানে লাভ হবে, সেখানে অপর রাষ্ট্রেরও লাভ হবে। বিনোবাজী পাকিস্তানে গিয়ে যাই বলবেন, তাতে উভয় রাষ্ট্রের লাভ হবে, তাঁর কোনো কথায় এক রাষ্ট্রের লাভ এবং অপর রাষ্ট্রের ক্ষতি হওয়া সম্ভবই নয়। অবশ্য রাষ্ট্রের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল এবং রাজনৈতিক দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে বিরোধ হামেশাই ঘটছে। এমন কি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থও অনেক সময়ে এমনভাবে কল্পিত হয়, যাতে এক রাষ্ট্রের লাভ এবং অপর রাষ্ট্রের ক্ষতিকে সমার্থক বলে ধারণা জন্মে। বিনোবাজী ভারতীয়, পাকিস্তানে গিয়ে তিনি যাই বলবেন বা করবেন, তাতে ভারতের সুবিধা হবে এবং যাতে ভারতের সুবিধা হবে, তাতেই পাকিস্তানের অসুবিধা হবে—এই ধারণার ভিত্তিতে একদল কাগজ বিনোবাজীকে পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দানের

কেনেডি দ্য-গলকে টেলিফোনেঃ "না না জেনারেল, আপনি টেলিফোনে পোকার খেলতে পারেন না। তাছাড়া এক জোড়া ছোট্টো মেগাটন হাতে নিয়ে ৫০ লক্ষ ডলার জেতা যায় না।"

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেছে। তার মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানী সরকারকে অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা পর্যন্ত বলছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সাহেব একজন সমদর্শী, এক রাষ্ট্রের শুভ, অপর রাষ্ট্রের শুভের বিরোধী হতে পারে না বলে তিনি বিশ্বাস করেন—এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বিনোবাজী যে পূর্ব-পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানের ক্ষতিসাধন করবেন না, এইটুকু বুঝবার শক্তি তাঁর আছে।

বিনোবাজী "রাজনীতির" কথা না বললেও দীর্ঘদিন পাকিস্তানে তাঁর পদযাত্রা চললে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তার একটা পরোক্ষ অথচ মূলস্পর্শী প্রভাব পড়তে পারত। সেটা খান আবদুল গফফর খানের মতো লোকের কাম্য হতে পারত, কিন্তু আয়ুব খান সাহেবের পক্ষে বা পাকিস্তানের অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সেটা চাওয়া সহজ নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের এক কোণ দিয়ে দশ দিনের পদযাত্রায় সেরূপ কোনো ফল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিনোবাজীকে দশ দিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে আয়ুব খান সাহেব কিছু রাজনৈতিক মুনাফা তোলার আশা বোধ হয় রাখেন। আয়ুব খান সাহেব এবং পাকিস্তানের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে আয়ুব খান সাহেবের নীতি প্রতিক্রিয়াশীল এবং গণতান্ত্রিকতার বিরোধী বলে নিন্দিত। সেদিক দিয়ে, বিনোবাজীকে পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আয়ুব খান সাহেব তাঁর সমালোচকদের উপর একটি চাল চেলেছেন বলা যায়। আয়ুব খান সাহেবের বিরোধীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের উদার, প্রগতিশীল বলে মনে করেন বা জাহির করেন, তাঁরা পাকিস্তান সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত করতে বাধ্য। তার ফলে পাকিস্তানের অভ্যন্তর দ্বন্দ্বে আয়ুব খান সাহেবের নীতির বিরোধীদের মধ্যে এককাট্টা হবার যে একটা প্রয়াস চলছে, সেটা কিছুটা প্রতিহত হবে। তার চেয়েও বেশী লাভ আয়ুব খান সাহেব হয়ত আশা করছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বিনোবাজীকে পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে আয়ুব খান সাহেব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা সুনাম অর্জন করবেন এবং সাধু ব্যক্তি ভারতীয় হলেও তাঁর প্রতি পাকিস্তান সরকারের বিরাগ নেই, গঠনমূলক কাজে সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতীয়দের সহযোগিতা গ্রহণে পাকিস্তানের আগ্রহ আছে ইত্যাদি কথা বলার সুযোগ পাকিস্তানী সরকারী প্রচারকগণ পাবেন। অথচ এর মধ্যে রিস্ক কিছুই নেই, কারণ বিনোবাজীকে মাত্র দশ দিন পূর্ব-পাকিস্তানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যাতে কেবল পাকিস্তানের মানুষেরই নয়, পাকিস্তানী সরকারেরও লাভ হবার কথা, তার বিরুদ্ধে "ডন", "মর্নিং নিউজ" প্রভৃতি খবরের কাগজ আন্দোলন আরম্ভ করেছে। "মর্নিং নিউজ" বলছে, বিনোবাজীর পাকিস্তানে আসার কোনো দরকার নেই, ভারতেই তাঁর যথেষ্ট কাজ আছে, ভারতে মুসলমানদের "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রাক্ষসের" কবল থেকে তিনি বাঁচাবার চেষ্টা করুন, ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তবে আসামে মুসলমানদের ভিটে-ছাড়া করা চলছে, তা বন্ধ করার তিনি চেষ্টা করুন, ইত্যাদি। "ডন" বলছে, বিনোবাজীর পাকিস্তানে আসা উপলক্ষ্য করে পাকিস্তানের হিন্দুদের বিষয় নিয়ে ভারতীয় খবরের কাগজগুলি এবং পাকিস্তানবিরোধী বিদেশী কাগজের সংবাদদাতারা মিলে একটা বিরাট প্রোপাগাণ্ডার ঢেউ তুলবে। বিনোবাজীর পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়ার কথা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন যে, বিনোবাজীর পূর্ব-পাকিস্তান দর্শনের ফলে সেখানকার হিন্দুদের মনোবল একটু বৃদ্ধি হতে পারে। সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু-নির্যাতনের যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গেল, তারপর সেখানকার হিন্দুদের অবস্থার কথা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু ঐ আশা প্রকাশ করেন। "ডন" সেই কথা ধরে বলতে চায় যে, পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের আশ্বাস দেওয়া এবং তাদের অবস্থা নিয়ে একটা প্রোপাগাণ্ডা সৃষ্টি করাই হবে বিনোবাজীর পূর্ব-পাকিস্তান দর্শনের ফল। অতএব পাকিস্তান গবর্নমেণ্টের উচিত হবে অনুমতি প্রত্যাহার করা।

এইসব খবরের কাগজের বক্তব্য এবং বিনোবাজীর উদ্দেশ্য যে দুই সম্পূর্ণ আলাদা জগতের জিনিস, তার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এইসব কাগজের লেখায় যাদের মনোভাব প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য কী, সেটা লক্ষ করার বিষয়। পূর্ব-পাকিস্তানের অবশিষ্ট হিন্দু অধিবাসীরা যে অবস্থায় আছে, সেটা পৃথিবীর কাছ থেকে গোপন রাখা এবং অন্য দিকে যাতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি হতে পারে, তাতে বাধা দেওয়াই এদের লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীদের "মনোবল" বৃদ্ধির অর্থ কী? তার অর্থ হচ্ছে, অন্তত পণ্ডিত নেহরু এই অর্থেই কথাটা বলেছেন—হিন্দু যারা পূর্ব-পাকিস্তানে আছে, তারা যেন এখনো ধৈর্য ধরে থাকার চেষ্টা করে, চলে না আসে। এতে যাদের আপত্তি, বুঝতে হবে, তারা চায় অবশিষ্ট হিন্দুদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যেন-তেন-প্রকারেণ সরিয়ে দিতে। এরা কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী ভারত, কী পাকিস্তান, কারও মঙ্গল বোঝে না এবং চায় না।

বিনোবাজীর পূর্ব-পাকিস্তান দর্শনের ফলে যদি সেখানকার হিন্দুরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়, তবে তাতে ক্ষতি কার? তিনি বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য কিছু বলবেন কিনা সন্দেহ, যদি বলেনও তবে সেটা কী ধারার হবে, তা অনুমান করা সহজ। হিন্দুদের মধ্যে অভয়ের ভাব জাগাতে হলে সে অভয় প্রতিবেশী মুসলমানদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কের সহিত অভিন্ন হবে, এই কথাই বিনোবাজী বলবেন। যা ঘটেছে, তারপরে হিন্দুদের পক্ষে এটা সহজ কথা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু বিনোবাজীর কাছ থেকে হিন্দুরা সেই সহজ কথা শোনার আশা না করে। তিনি কঠিনসাধ্য মঙ্গলের কথাই বলেন এবং বলবেন।

১২।৮।৬২

কেন লেখা?

মৌলানা খাফী খাঁন

বড় কুণ্ঠা নিয়ে লিখছি। কারণ যা নিয়ে এ লেখা সেটিও একটি লেখা—শোকসরস এবং সমবেদনাপ্লুত। ও জিনিসের নীরস সমালোচনা অশাস্ত্রীয়।

লেখাটি "পূর্বপত্র" পর্যায়ে প্রকাশিত। পর্যায়ের প্রথম। বিষয়, শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সাহিত্যচর্চা। প্রবন্ধটির শেষে শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, তার উত্তরও দিয়েছেন। সেই উত্তরটির যাথাথ্য সম্বন্ধে সন্দেহই বর্তমান আলোচনার জনক।

প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করলে পাই এক জোড়া প্রশ্ন। এক লোকে লেখে কেন? দুই, লেখা বন্ধ করে কেন?

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির উৎপত্তি সম্পর্কে নরেশচন্দ্র একটি উক্তি করেছিলেন, বোধ হয় বর্তমান প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋষিরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়, অথচ মন্ত্রগুলির সৃষ্টির সঙ্গে বিভিন্ন ঋষির নাম জড়িত। নরেশচন্দ্র বলেন, মাঝে মাঝে এক একটা কথা ঋষিদের মনে এত প্রচণ্ড ধাক্কা দিত যে, তাঁদের ধারণা হত, যদিও কথাগুলি তাঁদেরই মুখ থেকে উচ্চারিত তাদের বাস্তবিক উৎপত্তি তাঁদের মনে নয়, অন্যত্র।

নরেশচন্দ্রের এ অনুমানের মূলে বোধ হয় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। নরেশচন্দ্র লিখেছেন অন্তরের তাড়নায়। তাতে যদি তাঁর খ্যাতিলাভ হয়ে থাকে, অর্থ আয় হয়ে থাকে তবে তা গৌণ। তিনি লিখেছেন বাধ্য হয়ে।

সুধীরঞ্জনবাবু মনে করেন, নরেশচন্দ্রের "রক্তের সঙ্গে—দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্তা মিশে যেতে পারে নি কারণ অর্থের জন্য কখনও লিখতে হয় নি তাঁকে—"

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মে সুধীবাবুর এ কথা মানতে বাধে। মাইকেল? অর্থাভাবে কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু লিখেছেন কি অর্থের জন্য? মাইকেল সেকেলে। একালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুনেছি অনেক লিখেছিলেন প্রকাশের কথা চিন্তা না করে; তাঁর প্রথম লেখাগুলো নাকি বন্ধুবান্ধব ছাপিয়েছিল তাঁর অমতে। নানা সাহিত্যবহির্ভূত কর্মে লিপ্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা কি সাহিত্য নয়? কিসের তাগিদে লিখতেন তিনি, অর্থের জন্য? বহু বর্তমান সাহিত্যিক লিখে অর্থ উপার্জন করেন। তাঁরা কি সকলেই অর্থের "জন্য" লেখেন? তাঁদের মধ্যে সবাই কি আত্মতৃপ্ত,' মহিমান্বিত?' সুভাষ মুখোপাধ্যায় কী বলেন? "সাগর থেকে ফেরার" প্রেরণা কি পুরস্কারে?

সুধীরঞ্জনবাবু লিখছেন্দ নরেশচন্দ্র "শুধু অবসর সময়ে কলম ধরেছেন।"

কথাটা কি সত্যি? নরেশচন্দ্র বলেছেন, তাঁর লেখার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে তখনই যখন তাঁর উপর কাজের চাপ পড়েছে বেশী। অবসর সময়ে এসেছে অবসাদ।

"দ্রুত কলম চালিয়ে পাঁচ-ছ দিনে উপন্যাস তাকে শেষ" করতে হয়েছে এই কারণে যে, যে ভাবের প্রচণ্ড পীড়নে তিনি লিখতে বাধ্য

হয়েছেন, তার উদ্ভব হয়েছে তাঁর "কর্ম-জীবনে'র মধ্য থেকেই। কর্মজীবন তাঁর লেখকজীবনের অন্তরায় হয় নি, বরং উত্তেজনাই যুগিয়েছে, প্ররোচিত করেছে তাঁকে লিখতে।

লেখকধর্মে নরেশচন্দ্র শৈব নন, শাক্ত।

"চব্বিশ ঘণ্টার লেখক" হওয়ার সপক্ষে একটা যুক্তি শুনেছিলাম বাংলার সর্বজন-পরিচিত এক লেখকের মুখে। তিনি বলেছিলেন, ক্রমাগত লেখার ফলে কলমের জড়তা কেটে যায়, লেখা বেরোয় সহজে এবং স্বচ্ছন্দে। আর পাঠকের মনে কিসে সাড়া জাগে তা বোঝা যায়। সুধীবাবু জানিয়েছেন, নরেশচন্দ্র ষাটখানা উপন্যাস লিখেছেন। এবং শুধু উপন্যাসই লেখেন নি। সুতরাং এ কথাও বোধ হয় সত্যি নয় যে, অনভ্যাসে তাঁর লেখনী কখনো আড়ষ্ট হয়ে থেকেছে, যদিও প্রেরণা ছিল প্রবল। প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি না লিখে থাকেন তবে তার কারণ অন্য। অশক্তি একটি কারণ, যেমন সামারসেট মমের ক্ষেত্রে। নরেশচন্দ্রের না লেখার আরেকটা হেতুও থাকতে পারে।

লেখক চায় পাঠক। সম্প্রদায়ভেদে কেউ কামনা করে সহস্র পাঠকের, কেউ সন্তুষ্ট থাকে মুষ্টিমেয় সুরসিক পাঠক পেয়েই। সুধীবাবুর "জাত-লেখক" যিনি "পাঠক-মহলে তাঁর আদর থাক বা না থাক লিখে যান জীবনের শেষ দিন অবধি", তিনিও পাঠকের জন্যই লেখেন। ধ্যানে তিনি হয়তো দেখেন, ভবিষ্যতের পাঠক, যারা তাঁর লেখার সমাদর করবে। কিংবা তিনি হয়তো লেখককুলের বৈদান্তিক, সোহম্ অনুভূতিতে নিজেই নিজের পাঠক।

মনে ভাব জাগে নিরবচ্ছিন্ন, জাগে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ভাবুকের প্রতীতি জন্মে যে, এমন একটি ভাব তার মনে জেগেছে যেটার রস শুধু সে নয় অন্যেও উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ভাবটিকে প্রকাশযোগ্য একটি রূপ দিতে—এমন রূপ যা স্বপ্রতিষ্ঠ, স্রষ্টার অঙ্গচ্যুত হয়েও ঋজুদেহে বর্তমান থাকতে পারে এবং যার আবেদন রূপের নিজ দেহেই পরিস্ফুট, স্রষ্টার ব্যাখ্যানিরপেক্ষ।

এই আগ্রহ লেখকের, গায়কের, ভাস্করের, নটের সৃষ্টির মূলে। বরজলালের প্রতাপ রায়কে প্রয়োজন, নচেৎ রসসাধনা হতে পারে, সিদ্ধি হয় না। তার অভাব কার "শিল্পী-সত্তা নিরাসক্তির অলৌকিক মহিমায়... অতিক্রম" করে যেতে পারে জানি না। জ্ঞানে নিরাসক্তি হয়তো হতে পারে; রসে যেটা হয় সেটা বোধ হয় নিরাসক্তি নয়, পরন্তু রস আর রূপে একাত্মবোধ।

বিশেষত সেই সম্প্রদায়ের লেখকদের মনে, নরেশচন্দ্র যাঁদের অন্তর্ভুক্ত। এ'রা সন্ন্যাসী নন, সংসারী, সামাজিক। লেখা এ'দের পেশা হতেও পারে, নাও হতে পারে, সেটা মুখ্য নয়। এ'রা লেখেন কিছু বলার প্রয়োজনে এবং বলেন সমাজকে। নিরুৎসাহ হন তার কোনো সাড়া সমাজের কাছ থেকে না পেলে। এ'রা তারকা, যদি সমাজ এ'দের মাথায় করে রাখে; হাউই, যদি এ'দের ভোলে। এ'দের কামনা, শুধু তাঁদের সৃষ্ট রূপের দেহলালিত্যের স্তুতিবাদ নয়। এ'দের লক্ষ্য, সমাজমনে সে রূপের অন্তর্নিহিত ভাবের উন্মেষ, এবং সম্যক জাগরণ। এক শ্রেণীর হাউই আছে তার ব্যবহার হয় যুদ্ধে। অগ্রগামী সৈনিক গভীর অন্ধকারে শত্রুব্যূহের বাধা অতিক্রম করে গিয়ে সে হাউই ছাড়ে। সেই সংকেতের আহ্বানে সহস্র সৈন্য অগ্রগামীর পথ অনুসরণ করে, জয় করে নতুন রাজ্য। সৈন্যদল হয়তো সে হাউই মাড়িয়েই চলে যায়। হাউই-এর মনে ক্ষোভ হতে পারে—সে শুধু তার পোড়া খোলসটাই। আর কিছু নয়। কিন্তু ইতিহাসের স্মৃতিতে সে তার জীর্ণ বাসটুকু নয়, সেখানে সে তারকা।

পুজো সংখ্যা উল্টোরথ-এ

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের

পরিচিতি জানাবেন

রবি বসু

পূর্বপত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

যাকে যত বেশি জানি, তার সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই, আশ্চর্য, অনেকবার ইতস্তত করতে হয়। ভাবনায়-ভাবনায় শ্লথ গতি কলম চলতে চায় না। আর, একে-একে সব কথা বলেও, মনে হয় কিছুই বলা হল না—আবার নতুন করে লিখলে কেমন হয়।

যাকে খুব বেশি চিনি, আজ থেকে নয়, কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে, প্রথম কৈশোরের উষ্ণ-মধুর আবেশের দৃষ্টিতে যাকে ভাল লেগেছিল, যদিও সেটা ভাল লাগারই বয়স, শুধু ভাল লাগার নয়, ভাল লাগাবারও—সব পরিচয় ছাড়িয়ে গোটা মানুষ হিসেবেই যাকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলাম—আজ এতদিন পর, আমার সেই ভাল-লাগা, সেই স্পষ্ট স্বাভাবিক বোধ, যদি ঝাপসা হয়ে আসে তাহলে আমি কেমন করে আরম্ভ করব! কোথায় থামব! তার চেয়ে, এখন ভাবছি, পূর্বপত্রে এড়িয়ে গেলেই হত মণিলালের নাম। যাঁদের কথা লিখে এলাম এতদিন—নরেশচন্দ্র, প্রেমাংকুর, হেমেন্দ্রকুমার-প্রভাবতী আর অসমঞ্জ—তাঁদের কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় নয়। দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে আমি হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয়েছি তাঁদের সামনে। প্রশ্ন করেছি। উত্তর পেয়েছি। আর বাড়ি-ফিরে ফলাও করে লিখেছি আমার একদিনের সাক্ষাৎকারের নাতিদীর্ঘ বিবরণ। আমার ভাবনা হয়নি, দ্বিধা জাগেনি। দ্রুতগতি কলম অবলীলায় হঠাৎ কখন পৌঁছে গেছে শেষ পাতায়!

কিন্তু মণিলাল? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ একবার নয়—বহুবার। দেশ পত্রিকার সীমিত পরিসরে এই অন্তরঙ্গ অগ্রজ সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের নিবিড় পরিচয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমি লিখব কেমন করে!

তবু, আশ্চর্য, আজ এত পরেও মণিলালের নাম মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, জটিলতার সব কাঁটা তারগুলো একে-একে যেন খসে যায় জীবন থেকে। আর, আমার বয়স স্মৃতির এক মধুর ঘ্রাণে পিছিয়ে-পিছিয়ে আমাকে ঠেলে নিয়ে আসে সেই কৈশোরের উষ্ণ-মধুর আবেশের জগতে—যেখানে মণিলালের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।

১৯৩৮—৩৯ সাল। কলেজে মন বসে না। সারা দুপুর কাটে পত্রিকা অফিসে-অফিসে। 'প্রবাসী' থেকে 'বিচিত্রা' সেখান থেকে 'দেশ-আনন্দবাজার'। তারপর বিষণ্ণ মুখ। সব পত্রিকার সম্পাদকের প্রায় এক উত্তর, এখনও পড়িনি। কিম্বা এই যে, লেখাটা ফেরৎ নিয়ে যান। কেউ-কেউ মাথা তুলে তাকাবারও দরকার মনে করতেন না। রূঢ় স্বরে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বলতেন, লেখা পাঠান কেন? আমরা নতুন লেখকের লেখা ছাপি না।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু তখন একদিন—দুটোর মধ্যে যেটা লেগে যায় এমন এক ভাব নিয়ে এক সঙ্গে 'ভারতবর্ষে' গল্প আর কবিতা দুই-ই পাঠিয়েছিলাম। আর সেই উত্তর শুনতে হবে জেনেও যথাসময় কলেজ পালিয়ে হানা দিয়েছিলাম সম্পাদকের দপ্তরে। বুক ঢিপ-ঢিপ করলেও সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে গিয়েছিলাম।

আমার পায়ের শব্দ পেয়েই মণিলাল মাথা তুললেন। এবং আমি কিছু বলবার আগেই মধুর হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাই?"

মনে আছে, একটা হঠাৎ-আসা আবেগের ভারে বুকের মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছিল সেদিন। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি। সম্পাদকের দপ্তরে এমন আন্তরিক ব্যবহার কোন নতুন লেখক আজও কি পায়!

একটা চেয়ার দেখিয়ে মণিলাল বললেন, "বস।"

অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলাম, "সম্পাদক মশাই আছেন?"

"না, ফণীবাবু আজ আসেন নি,", আমার মুখ দেখে তিনি বোধহয় মনের কথা বুঝে নিলেন, "লেখা এনেছ বুঝি? তা দিয়ে যাও না আমার কাছে?"

আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, "কিছুদিন আগে গল্প আর কবিতা পাঠিয়েছিলাম—

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কী নাম?"

মণিলালের প্রশ্ন শুনে ঠিক বুঝতে পারলাম না কী উত্তর দেব। উনি আমার নাম জানতে চাইলেন না গল্প-কবিতার নাম? কিন্তু হঠাৎ নিজের নামটাই মুখ থেকে

পরবর্তী সাক্ষাৎকার ১ সেপ্টেম্বরঃ
শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী

বেরিয়ে গেল। আর বলেই মনে মনে ঠিক করে নিলাম এ ভাবে পত্রিকা অফিসে আর যাব না। যদি কারুর কাছ থেকে এমন আন্তরিক ব্যবহার পাই এবং সেখান থেকে পরে অমনোনীত হওয়ার লজ্জা নিয়ে ফিরতে হয় তাহলে—

"ওহে, তুমি?" মণিলাল বললেন, "তোমার গল্পে বড় বেশি ইংরেজি কথা ছিল, আমি সব কেটে বাংলা করে দিয়েছি কিন্তু—"

মনে মনে ভাবলাম, তা তো দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা বাতিলও করে দিয়েছেন তো?

আবার বললেন, মণিলাল, "গল্পটা শিগগিরই ছাপা হবে।"

যদিও মণিলালের চেহারা সুন্দর। গৌরবর্ণ। দীপ্তিময় মুখ। প্রশস্ত ললাট এবং দীর্ঘ দেহ, তবুও হয়তো সেদিন তাঁকে আরও সুন্দর মনে হয়েছিল—আরও উদার। কিন্তু আনন্দ আর বিস্ময় আমাকে এত বিমূঢ় করেছিল যে, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু-চারটে কথাও আমি খুঁজে পাইনি।

আর একজন, এতক্ষণ তাঁকে লক্ষ্যই করিনি, যিনি মণিলালের পাশে—আমার পেছনে বসে লিখে যাচ্ছিলেন চুপচাপ—'ভারতবর্ষে'র আর একজন সহকারী সম্পাদক দেবনারায়ণ গুপ্ত, নাট্যকার বলে তখন পরিচিত হন নি, আমরা তাঁকে কবি বলেই জানতাম, হঠাৎ কথা বলে আমার উল্লাস আরও বাড়িয়ে দিলেন, "কবিতাটাও ছাপা হবে। ছন্দে একটু ত্রুটি ছিল, আমি সংশোধন করে দিয়েছি।"

আমি চমকে পিছন ফিরে তাঁকে দেখলাম। কিন্তু আর কোন কথা বললেন না দেবনারায়ণ। মুখ নামিয়ে চুপচাপ আবার আগের মতো কাজ করে যেতে লাগলেন। শুধু, লক্ষ্য করলাম দু-একবার চোখ ফিরিয়ে কৌশলে যেন আমাকে দেখলেন।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অল্প বয়স। মনের মধ্যে আনন্দের এক-একটা ঢেউ ফেনিয়ে-ফেনিয়ে উঠছে। আমার পক্ষে হঠাৎ একটা অতি নাটকীয় কিছু করে ফেলাও বিচিত্র নয়। তাই দুজনকে নমস্কার করে আস্তে আস্তে কবি আর গল্প লেখকের গতিতেই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই মণিলাল নাম ধরে ডাকলেন আমাকে, "একবার এস ভাই—" আর, সে ডাক শুনে হঠাৎ আমার শরীর যেন হিম হয়ে গেল। ফিরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তাঁর ডাকে সাড়া দেবার সাহস নেই। একটা আশঙ্কা, ব্যর্থ হওয়ার, অমনোনীত হওয়ার একটা ভয়-ভয় কল্পনা আমার মনের মধ্যে এতক্ষণ ফেনিয়ে ওঠা সব আনন্দ কেটে দিয়েছে—মুছে দিয়েছে। হয়তো ভুল করে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন মণিলাল। আমার গল্প যে মনোনীত হয়নি, এবার হাসি-মুখেই সে কথা আমাকে জানিয়ে দেবেন। তবু, আমাকে এক-পা এক-পা করে আবার বিষণ্ণ মুখে মণিলালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হল।

কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না। অনেকক্ষণ শুধু আমাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টির অর্থ বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর, তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করবারও সাহস নেই আমার। গলা থেকে স্বর বার হবে না এবার, আমাকে দেখতে-দেখতেই খুব জোরে কথা বলে উঠলেন মণিলাল যেন এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দে দিশাহারা হয়ে, "ঠিক বলছে দেবনারায়ণ—চলবে।"

বেশি কিছু বলার লোক নন দেবনারায়ণ গুপ্ত। মাথা তুলে এক মুহূর্ত আমাকে দেখেই আবার মুখ নামিয়ে লিখতে-লিখতে বললেন, "বলছি তো মণিদা, খুব চলবে।"

কিন্তু এই চলার মনে কী? আমার বুকের মধ্যে, পাঁজরে পাঁজরে ভীত প্রশ্নের সারি খোঁচা মেরে চলেছে একের পর এক, কী চলবে? একটু আগেই তো মণিলাল জানালেন গল্প ছাপা হবে, দেবনারায়ণ বললেন, কবিতাও। এখন একজন বলছেন, আর একজন সায় দিচ্ছেন। ব্যাপারটা কী আমি বুঝতে পারছিলাম না।

"এই যে," ড্রয়ার থেকে একটা বই বের করে আমার হাতে দিয়ে মণিলাল বললেন, "এই জায়গাটা বেশ জোরে-জোরে পড় তো শুনি—এই যে, তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর—"

কিছু না বুঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে বইটা নিলাম। কপালকুণ্ডলা। একটা ঘোরে মণিলালের কথা মতো জোরেই পড়লাম। আর পড়তে-পড়তে বুক কাঁপতে লাগল—গলাও। হঠাৎ যেন সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হল আমার কাছে। হতাশার তীব্র যন্ত্রণায় চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে এল। না, আমার গল্প কবিতা—কোনটাই ছাপা হবে না। এঁরা অত্যন্ত ভদ্র। তাই আমাকে প্রথমে আশা দিয়েছিলেন। এবার এক অভিনব কৌশল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর—অর্থাৎ, বাড়ি ফিরে যাও, 'ভারতবর্ষ' জয় করার তোমার কোন আশাই নেই।

কিন্তু মণিলাল আমার পিঠে আস্তে আঘাত করে বললেন, "তুমি পারবে। থিয়েটার করবে আমাদের সঙ্গে?"

"থিয়েটার?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সাহিত্যিকদের একটা থিয়েটার করবার কথা আছে। তা, তুমিও তো লেখ, একটা পার্ট করে দিলে খুবই ভাল হয়—"

মণিলালের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "নিশ্চয়ই করব—" তখন না লিখেই সাহিত্যিকের দলে অভিনয় করার, সৌভাগ্য লাভ করে আমার মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। কিন্তু সাহিত্যিক-দের সেই অভিনয় তখন আর হল না। হল পরে, অনেক পরে, তখন মণিলালের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নিবিড় হয়েছে।

একদিন কথায়-কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "নাটক করার ঝোঁক আপনার হল কেমন করে মণিদা?"

মণিলাল হেসে তখন তাঁর শৈশবের এক দীর্ঘ গল্প শুনিয়েছিলেন আমাকে, "বয়স যখন ৪।৫ বছর, তখনকার অনেক কথা এখনো মনে গেঁথে আছে। সে সময় পল্লী অঞ্চলে 'থিয়েটার' শব্দটাই অনেকের অজানা ছিল। যাত্রার সঙ্গেই ছেলে বুড়ো সকলের পরিচয়। কিন্তু বেশ মনে পড়ে ৪।৫ বছর যখন বয়স দেখি বড় বাড়ির বিশাল চত্বরে বড় বড় পরদা টাঙিয়ে তুলি দিয়ে নানা রঙের ছবি আঁকা হচ্ছে। লোকের মুখে শুনি 'সীন' তৈরী হচ্ছে।

থিয়েটারের। কাছেই দর্জি প্রধান অঞ্চল, ওস্তাগরদের বড় বড় চালা ঘিরে ওস্তাগরদের দর্জিখানা. তারাই বড় বাড়ি শখের থিয়েটারের জন্য সলমা চুমকি বসিয়ে পোশাক তৈরী করে বড় বাড়িতে এসে। এমনি তীর ধনুক. ঢাল-তলোয়ার, খাপ. বর্শা, ছুরি দেখে শিল্পীরা তৈরী করতে লেগে গেছে। সে বয়সে আমাদের আর অন্য খেলা ছিল না, এইসব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস দেখতাম, আমরাও খেলাঘরে ওদেরই অনুকরণে সিন আঁকতাম তীর ধনুক তলোয়ার তৈরী করতাম। দেখতাম. সন্ধ্যার পর চালা পাতা বৈঠকখানা লোকে ভরে গেছে. বড় বাড়ি ও পাড়ার গণ্যমান্য লোকে হাত নেড়ে ভঙ্গি করে কত কি কথা বলছে। সব বুঝতে না পারলেও বেশ মিষ্টি লাগত পরে জানতে পারি, অ্যাকটিং করছে, রিহার্সেল দিচ্ছে. এরপর বড় বাড়ির উঠান জুড়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে স্টেজ বেঁধে থিয়েটার হবে। শুনে কি আনন্দ আমাদের, বৈঠকখানায় আশ্রয় নিয়ে রিহার্সেল দেখা মস্ত একটা ঝোঁক হয়ে পড়ে. অভিভাবকরা জোর করে তাড়িয়ে দিলে কিম্বা ধরে নিয়ে গেলে. ফুরসত পেলেই আবার এসে জুটতাম। যেদিন স্টেজ বেঁধে নতুন পালা খোলা হল, কী উল্লাস! জোর করে ঘুমকে তাড়িয়ে দিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকি। কৌতূহলের আকর্ষণে চোখে পাতা পড়ে না। এরপর আমাদেরও খেলা হল ঐ ভাবে রাজা রানী সেজে থিয়েটার খেলা। আমার সাথী ছিলেন অনুজ চণ্ডীচরণ. যিনি পরে মিনার্ভার পরিচালক হন। আর ছিলেন সনৎ মামা; যিনি পরে স্বর্গীয় শিশির ভাদুড়ীর সহপাঠীরূপে তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে যোগ দেন ও তাঁর দলের 'কর্মসচিব' হন। সম্পর্কে আমাদের মাতুল হতেন। অতএব অনেকে এ দলে ছিলেন। আমাদের খেলাঘরের অভিনয় অনেকেই দেখতেন. আমাকেই নাটক তৈরী করতে হত, যেহেতু সবাই জানত, সেই বয়সেই আমি কত কি মন থেকে বানিয়ে বলি। বড়রা বলতেন ও ছোকরা একজন শিখিয়ে হলে, ভাল অ্যাকটিং করবে। শেষে সত্যিই একদিন পালে বাঘ এসে পড়ল।

সেবার বড় বাড়ির উঠানে স্টেজ বেঁধে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় হচ্ছে, দল বেঁধে আমরা সামনের দিকে জায়গা করে বসে গেছি থিয়েটার দেখতে। বিপুল আগ্রহে মন ভরপুর; এমন সময় আর এক মামা খুঁজে খুঁজে সেখানে হাজির! তারপর বলা নেই কওয়া নেই, ঝাঁ করে আমাকে আসর থেকে তুলে কোলে করে গ্রীন রুমে নিয়ে গিয়ে যিনি সকলকে সাজাচ্ছিলেন, তাঁকে বললেন রোহিতের ড্রেস পরিয়ে দাও। আমি ত অবাক; ফ্যাল

ফ্যাল করে চেয়ে থাকি, দেখতে দেখতে মুখখানা সাবান দিয়ে ধুয়ে মুখে গোলা রঙ মাখিয়ে দিল; আর একজন নীল ভেলভেটের উপর সল্‌মা চুমকি বসানো রাজপুত্র রোহিতাশ্বর ড্রেসটা পরিয়ে দিল, কোমরে বেল্ট এ'টে খাপে ভরা তলোয়ার ঝুলিয়ে দিল, গলায় দিল বড় বড় মুক্তোর মালা, মাথায় পালক দেওয়া জরির পাগড়ী দিল পাকিয়ে। এতক্ষণে রহস্যটা বুঝলাম। আকড়া অঞ্চলের যে ছেলেটির রাজপুত্র রোহিত সাজবার কথা, তার অসুখ করায় সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে এ'রা আমাকেই রোহিত সাজিয়ে নামাবেন ঠিক করেছেন। আমি শুনছি সব, কিন্তু বোবা হয়ে গেছে, মুখে কথা নেই—সত্যিকারের থিয়েটার করব আমি? মামা বললেন, শুধু গোটা কতক কথা তোমাকে বলতে হবে। তোমার মা আর কমলমাসীর কাছে বসে আছ এমন সময় একজন এসে কমল মাসীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি তখনি বলবে—"কি, কি, আমার কমলমাসীকে ধরে নিয়ে যায়—এতবড় আস্পর্ধা! আমি ওকে কেটে ফেলব।" বলেই খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ছুটে যাবে, তোমার মা তখনি তোমাকে ধরে ফেলবে।

এরপর ভঙ্গী করে মোসন দিয়ে তিনি কথাগুলো আমাকে আবার বলে, আমাকেও ঐ ভাবে বলতে বললেন। বার কয়েক শুনে শুনে বলার পর নিজে যখন না শুনেই বলে গেলাম, মামা তখন আনন্দে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—খাসা হচ্ছে স্টেজে এমনি করে বলে ক্ল্যাপ পেলে তোমাকে এক রেকাবী রসগোল্লা খাওয়াব। মনে মনে ভাবি, সে খাবারের লোভ দেখিয়ে এখানে এনেছ, এর চেয়ে ভালো খাবার আর আছে নাকি!

যাই হোক, অভিনয় আমার উতরে গেল—ভিলেন নাগেশ্বর হঠাৎ এসে যখন কমল-মাসীকে ধরে নিয়ে গেল, আমি তখন সত্যি সত্যিই রেগে উঠে আস্ফালন করে পার্টের কথাগুলো বলতে বলতে তলোয়ার-খানা খাপ থেকে খুলে এমনি বেগে যাই যে, উইংসের উপর পড়ি আর কি। রানী যিনি সেজেছিলেন, ছুটে গিয়ে ধরে ফেলেছিলেন তাই রক্ষে! কিন্তু যাঁরা অভিনয় দেখছিলেন, এক বাক্যে বা! বা! বলে ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন। আমার আনন্দ তখন দেখে কে!"

সেই সময় মণিলালের কাছ থেকে তাঁর সাহিত্য-চর্চা কেমন করে শুরু হয়, সে কথাও শুনেছিলাম।

মণিলাল বলেছিলেন, "আমাদের শৈশব অবস্থায় পড়াশোনার ব্যাপারে ইংরেজী হাই স্কুলে যাবার রেওয়াজ ছিল না—গ্রাম্য পাঠশালাগুলিতে শিক্ষা নিতে হত। নিম্ন প্রাইমারী, আপার প্রাইমারী ও ছাত্রবৃত্তি এই তিনটি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকত। নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা আলিপুর স্কুল ইনেস-পেক্টরের অফিস থেকে পরীক্ষক এসে পাঠশালায় পরীক্ষা নিতেন, আপার প্রাইমারী পরীক্ষা আলিপুরের গোপাল-নগরে দিতে হত, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য সেনেট হলে যেতে হত। নিম্ন প্রাথমিক ও/আপার প্রাইমারী পরীক্ষার পর যখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিই, তখন আমার বয়স তেরো বছর। এর অনেক আগে থেকেই লিখতে শুরু করি। ছেলেবেলা থেকেই ছিলাম অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ—এখনো যেটা আমার মজ্জাগত হয়ে আছে। আমাদের গ্রামে তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে নামে এক বিদ্বান ব্যক্তি 'সময়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনিও গ্রাম্য সম্পর্কে মামা হতেন। তখনো হিতবাদী, বঙ্গবাণী, বসুমতী জন্মগ্রহণ করে নি—'সময়'ই বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকরূপে পরিচিতি পায়। বিখ্যাত এটর্নী শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কৃতিপুত্র এডভোকেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম-এ, বি-এল ছিলেন সময়ের সম্পাদক, উইলিয়াম লেনে ছিল এ'দের প্রকাণ্ড কার্যালয়। তিনকড়িবাবু খবরের কাগজে লেখেন, এটা একটা মস্ত বিস্ময়ের বিষয় ছিল, সেই বয়সে তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাগজ পড়বার জন্য কি সাধাসাধিই না করতাম। তাঁর ধারণা ছিল, ঐ বয়সে খবরের কাগজ পড়ে কি বুঝব! কিন্তু যখন কাগজ একখানা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়ে তার মানে বুঝিয়ে দিলাম, তিনি খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বললেন, তুমি এসে কাগজ পড়ে যেও।

এইভাবে কাগজ পড়বার সুযোগ পেয়ে যেন বর্তে গেলাম। এর আরও আগে থেকে আমরা যাত্রা শুনতে অভ্যস্ত হই। আমাদের অঞ্চলে পালা-পার্বণে যাত্রা গানের ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া আকড়া বাজারের বারোয়ারীতে দশ-বারো দিন ধরে কলকাতার বড় বড় নামী দলগুলোকে পর পর বায়না করে আনা হত। আমরা আহার-নিদ্রা ভুলে যেতাম যাত্রার পালাগুলো শোনবার আগ্রহে। আমার আবার একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায় যে-সব পালায় যে-সব অংশ মনে লাগত না বা কিশোর মনে আনন্দ দিত না, সেগুলো বাদ দিয়ে নিজের মনের মত করে ছকতাম, আর কী আনন্দই পেতাম। তখনকার বাদামী রং বালির কাগজে খাতা বেঁধে এ কাজ চালাতাম, খাতার পর খাতা জমে যেত, সেগুলো লুকিয়ে রাখতাম পাছে কেউ দেখে—একমাত্র আমার লেখার ভক্ত শ্রোতা সনৎ মামাকে শোনাতাম।

খবরের কাগজও শুধু পড়েই ছাড়তাম না, যে-সব লেখা ভাল লাগত, কাগজে ছাপা লেখার অনুসরণ করে সেগুলিও ঐ পালার মত নিজে থেকে লিখতাম। এই ছিল আমার তখনকার খেলা। কাজ ছিল এই লেখা আর বই। মামা দাদা এ'রা সব কলকাতার স্কুলে

পড়তেন, বাড়ি যখন আসতেন—কত রকমের কত বই আনতেন। লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলো পড়ে তবে শান্তি পেতাম। এখানেও বই-এর গল্প নিজে থেকে নতুন করে লিখে আনন্দ পেতাম।

কাগজ কিছুদিন পড়ার পর মনে আশা জাগল ঐ কাগজে লেখবার। অনেক ভেবে-চিন্তে নিজের গ্রাম নিয়েই একটা লেখা শুরু করলাম। লেখাটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে তিনকড়ি মামার কাছে গিয়ে বললাম, 'আমরা যদি লিখি, কাগজে ছাপবে, মামা?' মামা ত অবাক! তোমরা লিখবে, তার মানে তুমি। কাগজ পড়ে বুঝি লেখার শখ হয়েছে? লিখেছ নাকি?

তারপর আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, লেখাটি তিনি অফিসে সকলকে দেখিয়ে বলবেন, বারো বছরের একটি ছেলে এটা লিখেছে। আর চেষ্টা করবেন যাতে কাগজে বেরোয়। পরের সপ্তাহে মামা বাড়ি এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল—মামা কি খবর দেবেন! যেতেই সেই সপ্তাহের একখানি পত্রিকা আমার হাতে দিয়ে বললেন—খুলে দেখ।

কাগজ খুলে কি করে পড়তে হয় সেটা অভ্যস্ত হওয়ায় লেখাটা খুঁজে বের করতে বিলম্ব হল না। চোখের উপর ভেসে উঠল লেখার নাম—গ্রামের কথা, তার নিচে নতুন লেখকের নাম—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর একটা বন্ধনীর মধ্যে সম্পাদকীয় মন্তব্য—দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক একটি পল্লী বালকের মৌলিক রচনা।

ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবনে যখন প্রবেশ করি, অভিভাবকদের মধ্যে সমস্যা ওঠে—কোন্ লাইনে যাব আমি? মামারা বললেন রেল অফিসে ঢুকিয়ে দাও, ওখানে সুপারিশের জোর আছে। কিন্তু আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ—চাকরী করব না, কেরানী হব না। কি করা হবে তবে?

খবরের কাগজে ঢুকবো, তিনকড়ি মামার মত, বই লিখব, সাহিত্যিক হব, সম্পাদক হব!

১৯।২০ বছর বয়স তখন। কিন্তু সেই বয়সে বিস্তর খবরের কাগজ পড়ে অনেক-কিছু জেনেছি। তখন সময় পত্রিকাকে দাবিয়ে আরো অনেক কাগজ বেরিয়েছে—সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সদ্য বেরিয়েছে বসুমতী—তারপর বড় বড় লেখকদের যতসব বই বেরিয়েছে সমস্ত পড়ে ফেলেছি। সে সময় ভুবন মুখুজ্যের হরিদাসের গুপ্তকথা, রঙ্গিণী, মোর প্রাইস প্রভৃতি বই-এর খুব কদর। এক-একখানা যেন একটা মুটের বোঝা, তখনকার দিনে চলতি ভাষায় তিনি এই সব বই লিখেছিলেন। অন্যান্য লেখকদের বইও পড়ে শেষ করেছি, এমন কি রবীন্দ্রনাথের টলি-সংস্করণের লালরংয়ে বাঁধানো টলির মত আয়তনের বই পর্যন্ত। পণ্ডিত

শ্যামাজীকৃষ্ণ নামে এক মারাঠী সাংবাদিক বিলেত থেকে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামে ইংরাজীতে একখানা কাগজ বের করতেন, আমি তারও গ্রাহক হয়েছিলাম। তিনটি বড় বড় যুদ্ধ আমরা সেই বয়সে দেখেছি—চীনে বক্সার বিপ্লব, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ার যুদ্ধ, আর ইয়োরোপে রুশ-জাপান যুদ্ধ। বুয়ার যুদ্ধে প্রথম দিকে ইংরেজদের পরাজয় ও ভাগ্য-বিপর্যয়ে কি আনন্দই না পেতাম, আবার লর্ড জেনারেল রবার্টস গিয়ে বুয়ারদের হারিয়ে দেয়। তখন কী মনোবেদনা। তবুও আমরা বুয়ারদের পক্ষ নিয়ে বলাবলি করতাম, রবার্টস ঘুষ দিয়ে অন্যায় করে যুদ্ধ জিতেছে, একে জয় বলে না, পরাজয়।

এরপর এশিয়ার জাপান যেই দোর্দণ্ড প্রতাপ রুশিয়াকে ক্রমাগত হারাতে থাকে—তখন আবার আমাদের তরুণ মনগুলো উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সেই সময় পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনি তখন 'জালিয়াৎ ক্লাইভ' লিখছেন। তিনিই আমার বই পড়ার প্রচণ্ড ঝোঁক দেখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সভ্য করে দিলেন। তখন হেয়ার স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে হেয়ার স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগস্থলে ছিল ঐ লাইব্রেরী। সেখানে গিয়ে নানারকম কাগজ ও কেতাব পড়তাম। মনে হঠাৎ ঝোঁক চাপল, রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস লেখবার। যেমন ইচ্ছা, অমনি কাজ আরম্ভ। মাস-খানেকের মধ্যে মুকডেনের যুদ্ধ রুশ জেনারেল কুরুপাটকিনের পরাজয় পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে প্রথম খণ্ড শেষ করে ফেললাম। বইত লিখলাম, ছাপা হবে কি করে? তখনো রুশ-জাপান যুদ্ধ চলেছে, সকলের মুখে যুদ্ধের কথা। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক প্রকাশকের নামে পরিচিত কোন গ্রন্থকারের এক চিঠি নিয়ে হাজির হলাম। এমন সময় রুশ-জাপান যুদ্ধ নিয়ে বই লিখে ফেলেছি দেখে প্রকাশকমশাই খুশি মনেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে দেখতে বসে গেলেন। এর আগেই আমাকে তাঁর সামনের কেদারায় বসিয়েছেন। আগাগোড়া পাণ্ডুলিপিখানা মোটামুটি প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বেশ লিখে আছে দেখছি—গল্পের মত করে লিখেছেন তবে কি জানেন—আপনার ত বইয়ের বাজারে নাম নেই, টাকা খরচ করে ছাপাও খুব রিস্কি ব্যাপার, তবে সাবজেক্টটা নতুন এই যা—কেউ এখনো হাত দেয় নি। যাক—যদি ছাপি আপনি কি নেবেন?' বুকটা দুলে উঠল শেষের কথা শুনে। তাহলে পছন্দ হয়েছে। বললাম, আমি কি বলব, তবে অনেক কষ্ট করে লিখেছি, বিবেচনা করে যা দেবেন। একটু থেমে মনে মনে কি ভেবে গলায় জোর দিয়ে বললেন—আমার এক কথা, কারও সঙ্গে দরাদরি করি না—একশ এক টাকা দেব, তবে কপিরাইট লিখে দিতে হবে। পরের পার্ট লেখা হলে আমাকেই দেবেন কিন্তু, যদি এই সাইজের হয় তার জন্যও এই টাকা পাবেন। বিকেলের দিকে এসে একটা করে প্রুফ দেখে দিতে হবে, তার জন্যে আটআনা করে দেব—আসা-যাওয়ার খরচা। আজ ৫১ টাকা দিচ্ছি, বাকিটা বই ছেপে বেরুলেই পাবেন। কি বলেন?' কি আর বলব আমার পক্ষে এ প্রস্তাব যে কল্পনাতীত, তখনি সম্মতি দিলাম। তিনি একখণ্ড কাগজ ও এক আনার স্ট্যাম্প দিয়ে কপিরাইট লিখিয়ে নিয়ে ৫ খানা দশ টাকার নোট আর একটি রুপোর টাকা দিলেন। কাগজের টাকা তখনো চালু হয় নি। বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পেলে তাতেই আকৃষ্ট হয়, আমি বুঝি কপিরাইট বিক্রীর মধুর স্বাদ পেয়ে তাকে পরম কার্য ভেবে শুরু থেকেই প্রলুব্ধ হই।

ছাত্রজীবনে 'প্রাইজে' নানা রকমের বই পেয়েছি, কিন্তু কর্মজীবনের প্রারম্ভে এই আমার প্রথম উপার্জন—চাকরী করে নয়, স্বাধীনভাবে ঘরে বসে বই লিখে। আত্মগর্বে উদ্দীপিত হয়ে ট্রামে উঠলাম শিয়ালদহ স্টেশনে যাবার জন্য। আমরা তখন মণিখালি কৃষ্ণনগর থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে দৌলতপুর-পাটখালী নামক এক কৃষিপ্রধান গ্রামের বাসিন্দা। আমার পিতৃদেব নিঃসন্তান মাতুলের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ায় আমরা সেখানেই বাস করি। তিনি ছিলেন গাঁতিদার, তিনখানা মৌজার মালিক, ৩২ বিঘা জমি জুড়ে ভদ্রাসন, বড় বড় পুকুর, চারদিকে ঝিল, ক্ষেত-খামার চাষের জমি, উঠানে ধানের গোলা, ঢেঁকিশালা, গোশালা—শহরবাসীর চোখে যেন কল্পনার বাস্তব-রূপ। পরে আমি যখন প্রতিষ্ঠাপন্ন, স্বনামখ্যাত বহু সুধী—সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যবিদ, মঞ্চপতি প্রাকৃতিক এই সম্পদ দেখে মুগ্ধ হন ও আমাকে বলেন তাঁর কল্পনার শক্তির উৎসস্বরূপ এই কৃষিপ্রধান অঞ্চল। বিখ্যাত মঞ্চপতি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এর আকর্ষণে বছরে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বার এখানে এসে শ্রান্ত দেহকে সুস্থ করে আনন্দ পেতেন।

এখন এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাটানগর, আমাদের বাসভূমি থেকে এক মাইল দূরে নুঙ্গী স্টেশনের উত্তরে আরো এক মাইল তফাতে। আর আমাদের গ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৌলতপুর মৌজাকে বিখ্যাত করে তুলেছেন এক অবধূত। হিন্দুর শিব ও মুসলমানের পীরকে একাসনে বসিয়ে একই ভগবানরূপে দীর্ঘ সাধনা করে তিনি সাধনালব্ধ শক্তিতে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার করে আলোড়ন তুলেছেন—প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর আশ্রমে জনস্রোত ভেঙে পড়ে নুঙ্গী স্টেশন থেকে।

এ অঞ্চলের শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই চাকুরীজীবি কেরানী, কোনরকমে প্রবেশিকার গণ্ডী পার হলেই যে-কোন অফিসে চাকরী একটা জুটে যায়ই। প্রবেশিকার পর যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহশীল—কেরানীদের মত তাঁরাও মাসিক টিকিট কিনে ডেলী-প্যাসেঞ্জারের শ্রেণীভুক্ত হন।

এখন আসল কথায় আসি—প্রথম উপার্জনের টাকা সেদিন মায়ের চরণতলে রেখে যখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলি—বই লিখে এই টাকা পেয়েছি মা, তখন আমি সকলের কাছে এক অসাধারণ হয়ে উঠেছি। এই সম্ভাবনা দেখে, চাকরীর জন্য আর আমাকে তাগিদ সইতে হয় নি।

এক মাসের মধ্যেই বইখানা ছেপে বের হয়, ডবল ক্রাউন ষোল পাতার দশ ফর্মা আকার, ১৬০ পাতার বই। দাম স্থির হয় আড়াই টাকা।—সুতরাং স্বীকার করতে হবে—সেই আমার লেখা প্রথম বই।

ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন বেশ জেঁকে ওঠায় এ অঞ্চলে আমি, আর আমার সহপাঠী

—আমারই মত প্রগতিধর্মী আর একটি ছেলে—নাম হরলাল হালদার, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি এই আন্দোলনে। হরলাল বজবজের বাসিন্দা, আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে। বজবজ তখন মিল আর তেলের ডিপোর জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছে—মিউনিসিপ্যালিটির আমল এসেছে। আমরা দুজনে তখন একযোগে বহু প্রগতিমূলক ব্যাপারে এগিয়ে পড়ি। উত্তরকালে আমি যেমন লেখক বলে প্রতিষ্ঠা পাই, হরলালও তেমনি ব্যবসায়সূত্রে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কলেজ স্কোয়ার ভবন থেকে তখন সঞ্জীবনী নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুত। শচীন্দ্রনাথ বসু নামে এক উৎসাহী যুবক ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র. আমাদেরই সমবয়স্ক তাঁরই প্রচেষ্টায় ঐ সোসাইটির সৃষ্টি হয়—বিভক্ত পূর্ববঙ্গের জবরদস্ত শাসক ল্যান্সট ফুলারের স্বদেশী আন্দোলন দমনমূলক এক ইস্তাহারের বিরুদ্ধে। শচীনের আগ্রহে আমি ঐ দলে যোগ দিই ও নানা স্থানে ওঁদের সঙ্গে বক্তৃতা করি। কৃষ্ণবাবুর কন্যা কুমুদিনী তখন বি-এ পড়ছেন, তিনিও ঐ বিপ্লবী সংস্থায় ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেন। পরে শচীনের সঙ্গে কুমুদিনীর বিয়ে হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সংশ্রবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, বিপিনচন্দ্র পাল, ললিতমোহন ঘোষাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত 'ডন' পত্রিকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত হই এবং এঁরা সকলেই আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। যদিও এঁদের মধ্যে মতগত বৈষম্যের জন্য মিল ছিল না, আমি কিন্তু প্রত্যেকের মন যুগিয়ে স্নেহাস্পদ হই।

তখনকার দিনে আজকালকার মত রিপোর্টার ছিল না। বিপিনবাবু একদিন আমাকে বলেন—মণিলাল, আমরা যখন বক্তৃতা করব, তুমি বক্তৃতামঞ্চ থেকে আমাদের বক্তব্যগুলি মোটামুটি টুকে নেবে, তারপর সেগুলো সাজিয়ে দেখিয়ে নেবে। তাহলে খবরের কাগজে পাঠাবার সুবিধা হয়।

অভিমান করে আমি তাতে বলি—তাহলে স্যার, আমার আর বক্তৃতা দেওয়া হবে না!

সস্নেহে পিঠ চাপড়ে তিনি বলতেন—কেন হবে না, আমাদের বক্তৃতার মাঝেই তোমাকে ডেকে নেব।

"তখনকার দিনে কার লেখা আপনার ভাল লাগত?"

"রীতিমতভাবে বিবিধ পত্রিকা পড়ে [illegible] ভাষাটাই আমাকে আকৃষ্ট করে। কাব্য বিশারদ, সমাজপতি ও পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায়ের—প্রত্যেকের স্টাইল আলাদা হলেও, তাঁদের লেখার ভক্ত হয়ে পড়ি। তবে তাঁদের কাউকে ঠিক অনুকরণ না করে ওঁদের লেখাকে আদর্শ করে—নিজস্ব একটা রীতিতে নিজের ভাষা ঠিক করে নিই। যেটা হয় সকলের পক্ষে সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল।

কি প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস বা নাটক—প্রতিটির বাহন হয় এই একই ভাষা। বক্তৃতা ব্যাপারে চলতি কথার আশ্রয় নিলেও, এই ভাষাকেই প্রাধান্য দিত।"

"আপনি কোন্ কাগজে প্রথম যোগ দেন?"

"স্বদেশী আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার ফলে যে সব নেতার স্নেহাস্পদ হই—তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় এক এক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বক্তাদের লেখার রিপোর্ট লিখে ও পত্রিকায় পাঠিয়ে নিজেও পত্রিকা-মহলে পরিচিত হই। বউবাজার গোকুল বড়াল লেন থেকে তখন 'দৈনিক চন্দ্রিকা' নামে একখানি দৈনিক ও 'হিন্দুস্থান' নামে সাপ্তাহিক বেরুত। সর্বপ্রথম সহ-সম্পাদক-হয়ে ওখানে যোগ দিই। দুখানা পত্রিকারই সম্পাদক স্বত্বাধিকারী ছিলেন হরিদাস দত্ত নামে এক চৌখস ব্যক্তি। আগে তিনি গেইটি থিয়েটার চালাতেন—রাজকৃষ্ণ রায়ের আমলের লোক। তাঁর বীণা থিয়েটার বন্ধ হলে সেই মঞ্চে বসে 'গেইটি' থিয়েটার। এখানে এসে বীণা ও গেইটি থিয়েটার সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আহরণ করি। এইটিই হয় বিশেষ লাভ এখানে এসে। কিন্তু কাগজ দুখানার রীতিনীতির সঙ্গে মনের যোগ হত না। দৈনিক চন্দ্রিকা প্রায় প্রাচীন সমাচার দর্পণের সমসাময়িক বলে প্রাচীনত্বের দাবিতে এদেশ ও বিদেশের এমন কতকগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন চড়াদরে চুক্তি করতে সমর্থ হন যে, সেগুলির মূল্য থেকে ছাপার খরচ উশুল হয়েও বেশ একটা মোটা অংক মালিকের তহবিলে যেত। পত্রিকা ছাপা হত মাত্র একশত, শহরে প্রচার বা বিক্রীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঐ পত্রিকায় ছাপা প্রবন্ধগুলি কাটছাঁট করে সাপ্তাহিক হিন্দুস্থানের খোরাক যোগানো হত। গ্রাহক ছাড়া বাজারে বিক্রীর ব্যবস্থা ছিল না—এর গ্রাহক ছিল প্রায় আটশো, হাজার ছেপে গ্রাহকদের সংখ্যা পাঠিয়ে বাকি পত্রিকাগুলি নমুনা হিসেবে পাঠিয়ে নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল। হরিদাসবাবু বলতেন, কাগজে বিজ্ঞাপনের সংখ্যা থাকবে বেশি, আর ছাপা হবে যত কম, কাগজ থেকে লাভ হবে তত বেশি। বিশেষ করে কলকাতায় তখন কোন বাংলা দৈনিক না থাকায়, আর এক সময় দৈনিক চন্দ্রিকা খুব নাম করায়, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে এর বেশ নাম ছিল। উন্নত ধরনের বাংলা পত্রিকাগুলির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক চন্দ্রিকা ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়।"

"নাটক লেখবার প্রেরণা কিভাবে পান এবং নাট্যশালার সঙ্গে কখন যোগাযোগ ঘটে, যার ফলে নাট্যমন্দির পত্রিকার ভার পান, নাটক লিখে নাট্যকার হন?"

"স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে যখন বক্তাস্থানীয় নেতৃবর্গের স্নেহাস্পদ হই, সেই সময় বিপিনচন্দ্র পাল আমাকে একদিন বললেন,—'ওহে মণিলাল, তোমার লেখার নাটকীয় ভঙ্গী দেখতে পাই; তুমি নাটক লেখ, নাম করবে। আর এক কথা—শহরতলী ও মফস্বলের বড় বড় গ্রামে এক-একটা শখের থিয়েটার খোলবার চেষ্টা কর—সেখানে দেশাত্মবোধমূলক নাটকই কেবল অভিনীত হবে। এটা মনে রেখো—আমাদের বক্তৃতার চেয়ে শখের দলের অভিনয় স্বদেশী-প্রচারে বেশি কার্যকরী হবে।

কথাটা মনে যেন দাগ কেটে বসে। সেই দিনই সহপাঠী ও সহকর্মী হরলালের কাছে কথাটা পাড়লাম। হরলাল তখনি সম্মতি দিয়ে বললেন, 'খুব ভাল কথা, তবে নতুন দল না করে কোন পুরোনো ভাল দলে যোগ দিয়ে আগে পরীক্ষা করা যাক।' চটা-মহেশতলায় কিছু পূর্বে এক শখের দল গড়ে উঠেছিল। আমাদের কয়েকজন সহপাঠী তাতে যুক্ত ছিলেন। আমরা তাতে যোগ দিয়ে ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য খুললাম। আমি তাতে শংকরের ভূমিকা নিই, প্রতাপের ভূমিকায় নামেন ডাঃ যতীন্দ্রনাথ। অভিনয় মন্দ হল না বটে, কিন্তু ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতার অভাব আমাদের নিরুৎসাহ করে। তখনকার শখের থিয়েটারে ঐ জিনিসটার খুব অভাব দেখা যেত, শুধু পল্লী অঞ্চলে নয়—কলকাতা শহরের শখের থিয়েটারগুলিতেও। নিমন্ত্রণ কার্ডে ছাপা থাকে, অভিনয় আরম্ভ হবে রাত ঠিক নয়টায়। কিন্তু তার অনেক আগে আগ্রহশীল দর্শকে আসর ভরে যায় আর তারা বিরক্তির সঙ্গে দেখে, তখনো স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা প্রতীক্ষা করতে থাকে, শেষে রাত এগারোটায় খবর আসে—রানী এসেছেন, আর দেরি নেই; অবশেষে ড্রপ ওঠে রাত। বারোটায়!

আমরা দুই বন্ধু স্থির করলাম, শখের থিয়েটারের এই অপবাদ ঘোচাতে হবে। আমরা শক্ত হয়ে ডিসিপ্লিন রক্ষা করব। নিজেরা নাটক লিখব, নির্দিষ্ট সময়ে ড্রপ তুলব—কোন দিকে কোন খুঁত রাখব না। এর পর আমরা বজবজ শহরে এক শখের সম্প্রদায় গড়ে তুললাম, নাম দিলাম—আর্য নাট্যসমাজ। হরলাল বললেন, তুমি নাটক লেখ, আমি বেছে বেছে লোক যোগাড় করব। এই সূত্রেই আমার প্রথম নাটক 'বাজীরাও'-এর পত্তন। বজবজে সর্বপ্রথম এই নাটক অভিনীত হয় এবং আমরা নিমন্ত্রণপত্রে লিখেছিলাম—রাত্রি ঠিক আটটা বিশ মিনিটে যবনিকা উঠবে। আমাদের এই ঘোষণা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক হয়। এখন ভাবি, হয়ত আমাদের দ্বারা শহরতলীতে নাট্য-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কলকাতায়ও এই সময় ডি এল রায়রে ইভনিং ক্লাব এবং ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব'

শৌখীন নাট্যজগতে আলোড়ন তোলে।

মজবজে বাজীরাও অভিনয়ের বছর দুই পরে স্বনামখ্যাত মঞ্চপতি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক এই 'বাজীরাও' তাঁর নাট্যশালায় অভিনীত হয়, সেটা ১৯১১ অব্দের ১৪ই জুলাইয়ের কথা। এই দিন মোহনবাগান প্রথম শীল্ড বিজয়ী হন, এবং বাজীরাও নাট্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায়।

"বিপিনচন্দ্র পাল ছাড়া রঙ্গ মঞ্চের কারুর কাছে কোন প্রেরণা পেয়েছিলেন কি?"

"হ্যাঁ, তাহলে প্রথমেই রসরাজ অমৃতলাল বসুর নাম করতে হয়। সে সময় বড়লোকের বৈঠকখানায় কিম্বা বাড়ির সামনে লম্বা রকে বসে পল্লীর মাতব্বররা নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। সেই রকম এক ধারাবাহিক আলোচনার বৈঠকে বসে গ্রে স্ট্রীটের বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে। ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে অপরাহ্ণ পাঁচটায় উপস্থিত হতেন রসরাজ অমৃতলাল কোঁচানো ধুতি পরনে, গায়ে লম্বা একটা বুকে খোলা শুভ্র আচকান বা আঙরাখা—দেখতে সেটা কতকটা সেকেলে যাত্রাদলের জুড়ী গায়কের মত, তবে তাদের চেয়ে অনেক শৌখীন, আচকানের বুকের বোতাম খোলা, সেখানে বুকজোড়া আর একটা সাদা বোতাম দেওয়া জামা, কতকটা ওয়েস্ট কোটের মত, তার ওপর একছড়া চেইন অর্ধচন্দ্রাকারে ঝুলছে। দুই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা সাদা স্টকিন, পায়ে সাদা পামসু, মাথায় কার্লিংকরা চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত দুলছে। হঠাৎ মানুষটিকে দেখলে নির্বাকদৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছা করে। এইটে ছিল তাঁর বাইরে বেরুবার পোশাক। এই সজ্জায় তিনি বসুমতীর বৈকালী আসরে বসে তাঁদের আমলের নাট্যশালার কথা ও কাহিনী বলতেন, আর আমরা সকলে তন্ময় হয়ে শুনতাম। বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই সে সময় কাঁচ দিয়ে ঘেরা সুদৃশ্য সম্পাদকীয় কক্ষ ছেড়ে সামনের দিকে সারি সারি কেদারা পাতা মজলিসে বসতেন রসরাজের মুখের কথা শোনবার আগ্রহে। বাইরে থেকেও বহু নামকরা সাহিত্যিক ও সম্পাদক আসতেন পুরাতন কথা শোনার আকর্ষণে। যেমন—নাট্যকার শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, বঙ্গবাণীর বিহারীলাল সরকার, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কি করে বঙ্গীয় নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, স্রষ্টাদের মধ্যে কে কিভাবে কাজ করেছেন, এঁদের আগে কলকাতার অভিজাতবর্গ যে সব থিয়েটার করেন, তাঁদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য, আদি অভিনেত্রীদের কথা, এমনি বহু বিষয় নিয়ে তিনি যখন গল্প বলার ভঙ্গীতে বলতেন, আমরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনতাম। একদিন কথায় কথায় বললেন, দুঃখ এই এ-সব কথা দেশবাসীকে জানাবার মত কোন কাগজ নেই। বড় বড় ঢাউস কাগজ ত কখানা বেরুচ্ছে দেখি, কিন্তু এঁরা কেউ থিয়েটারের কথা লেখেন না, পাছে সম্পাদকের মর্যাদা খর্ব হয় এই ভয়ে।

রসরাজের কথাটা সেই তরুণ বয়সেই মনের উপর একটা বুঝি আঁচড় কেটে দেয়। সেইদিনই বাড়ি ফিরে বন্ধু হরলালকে রসরাজের কথাগুলো বলে প্রশ্ন তুলি—আমরা যদি একখানা পত্রিকা বের করি, তাতে থাকবে নট-নাটক-নাট্যশালার কথা, কেমন হয়? হরলাল বলেন, হয়ত খুব ভাল, কিন্তু এ-কাজে টাকা চাই অনেক, তার কি হবে? আমরা দুজনে কি পেরে উঠব?

এর পর সুযোগ একটা এসে গেল। বসুমতী অফিসের কাছে কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রীট থেকে 'অবসর' ও 'অনুশীলন' নামে দুখানা পত্রিকা বেরোত, প্রথমখানা মাসিক, দ্বিতীয়খানা সাপ্তাহিক। এদের মালিক ছিলেন নবকুমার দত্ত। কম্পোজিটার থেকে তিনি এক বড়দরের প্রকাশক হন, শেষে পত্রিকা দুখানা বের করেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত লেখক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন এখানে প্রধান লেখক। তিনি বহু বই লিখে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন, এক-একখানা বইয়ের বিশ-পঁচিশটা সংস্করণ হত, তিনি কিন্তু প্রত্যেক বইখানির কপিরাইট বিক্রী করে খুশি থাকতেন। তাঁর বই-এর কপিরাইট মূল্য হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, প্রকাশকরা তাঁর বই পাবার আশায় সাধ্যসাধনা করতেন, কিন্তু তিনি নবকুমারবাবু ছাড়া আর কোন প্রকাশককে বড় একটা দিতেন না। তখনকার দিনের নামী গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই কপিরাইট বিক্রী করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কেবল এর ব্যতিক্রম ছিলেন—পাঁচকড়ি দে মশাই। নিজে ছাপাখানা খুলে তিনি তাঁর ডিটেকটিভ উপন্যাসগুলি ছেপে বিত্তবান হন।

নবকুমারবাবুর দুখানা পত্রিকায় নিয়মিত-

হয়ে গেছে তবু আজও নিজের শান্তির জগতে রোগ ও দারিদ্র্যের পীড়নে পূর্ণ আত্মতৃপ্তিতে বিরাজ করতে পারছেন বলে আমার বিশ্লেষণী মনও মণিলালকে ঈর্ষা করে এবং আর একবার, একটা পলায়নী মনোবৃত্তিতে উন্মুখ হয়ে, আমার সেই কৈশোরকেই ফিরে পেতে চাই—যখন মণিলাল আমার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' অফিসে নির্জন দুপুরে দিনের পর দিন তাঁর বলা প্রত্যেকটি কথা আমার মনে পড়ছে।

"আপনি কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ কাশীতে গিয়েছিলেন কেন? তখন তো আপনার খুব নাম—"

"না না, খুব নয়। কয়েকটা নাটক লিখে কিছু নাম হয়েছিল বটে কিন্তু তখনও 'স্বয়ংসিদ্ধা' লেখা হয় নি। ওটা আমি কাশীতেই লিখি।"

"ওখানে কিসের ব্যবসা ছিল আপনার?"

"কাপড়ের—বীণাপানি প্রতিষ্ঠান। আমার স্ত্রীর নাম বীণাপানি। তাঁরই ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে আমাকে কাশী যেতে হয়েছিল।"

"তারপর?"

"খুব ভাল চলছিল ব্যবসা—প্রচুর লাভ। কোন অভাবই আমার ছিল না। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের ওপর প্রতিষ্ঠানের সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

দীর্ঘ সতেরো বছর রাজসুখে কাশীতে কাটিয়ে নিঃস্ব রিক্ত মণিলাল আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। বীণাপাণি উইভিং ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে গেল তাঁরই কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায়। তাঁর সারল্যের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল তারা।

কয়েকদিন আগে, মণিলালের এই দারুণ দুঃসময়ের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করার ইচ্ছায় কলকাতায় তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও স্নেহের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে আমি যখন এখানে-সেখানে হানা দিচ্ছিলাম তখন মণিলালের বিশেষ স্নেহের পাত্রী লেখিকা বেলা দেবী আমাকে বলেছিলেন, "আশ্চর্য মনের মানুষ আমাদের শ্রদ্ধেয় মণিলাল! তাঁর বড় ছেলেও ছিল ঠিক তাঁরই মত—ভয়ংকর দারিদ্র্যেও এতটুকু বিচলিত হয় নি। বরং সে-সময় বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলত, বাবা, কোন চিন্তা নেই। আমি উইভিং-এক্সপার্ট, এখানে আবার ব্যবসা শুরু করব। তুমি লোক-লজ্জার কথা ভাবছ? এক গেলাস জল খেয়ে একটা পান মুখে দিলেই চলবে—তাহলে কেউ কিছু জানতে পারবে না বাবা। ...কিন্তু অল্প পরে তাঁর সেই ছেলে হঠাৎ অকালে মারা গেল। তবুও ভগবানের ওপর ভরসা করে বুক বাঁধলেন মণিলাল। বোধ হয় এই সময়, এমন মনের অবস্থায়, ভয়ংকর দারিদ্র্যেও তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন।"

সেকথা আমি জানি। জীবনে যত লিখেছেন মণিলাল, রাগিণী অগ্রগামী জাতিস্মর অপরাজিতা আধুনিকা কুমারী-সংসদ গোটা মানুষ-এর মতো দীর্ঘ-দীর্ঘ বই, বাজীরাও মাধবরাও অহল্যাবাঈ ব্রত-উদ্‌যাপন বারানসী বাসুদেব জাহাংগীর অন্নপূর্ণা মহামানব ঝাঁসীর রানীর মতো সে-যুগের সফল নাটক আর অসংখ্য গল্প কবিতা প্রবন্ধ, ছেলেদের নানা রচনা—সেগুলির চেয়ে, সব কীর্তির চেয়ে, তাঁর হৃদয় বড়—অনেক বড়। তাঁর সারা জীবনের কোন ক্ষেত্রে, কোন কাজে এতটুকু ফাঁকি নেই—কার্পণ্য নেই।

কিছুদিন আগে মণিলালের কাশীবাসের কারণ জানতে চেয়ে একটা চিঠি লিখে-

ছিলাম তাকে। আরও লিখেছিলাম, এখন কেমন আছেন? কী করছেন? কী কাজে আপনার সারাদিন কাটে?

যথাসময় উত্তর এল, "অনেকদিন পর তোমার আন্তরিক ভালবাসা-ভরা পত্রখানা পেয়ে খুবই আনন্দ পেলাম এই অসুস্থ অবস্থায়। কলকাতাতেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই এবং সেখান থেকে সুস্থ হয়ে বছর আড়াই আগে সস্ত্রীক কাশী আসি।

এখানেও সাহিত্য-চর্চার বিরাম নেই। কাশীদাসের মহাভারতের একটি অভিনব সংস্করণ সম্পাদনা সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হই কলকাতায়। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে কাশী-দাসের কল্পিত অংশগুলি সম্পাদকীয় নোটে ব্যক্ত করা খুব কঠিন কাজ—প্রায় সেরে এনেছি।

এর সঙ্গে নাট্যশালার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে গিরিশ লেকচারার মনোনীত করায়, গিরিশ-প্রতিভা সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিই, সেগুলি অবলম্বনে একখানা প্রামাণ্য বই, "All about Girishchandra", ধরেছি। এর উপর লেখবার সময় কই ভায়া, তাই পত্রিকায় লেখা হয় না।"

তবু, এখনও, এই সাতাত্তর বছর বয়সেও, সুখের কথা, মণিলাল ব্যস্ত তাঁর সাহিত্য-কর্ম নিয়ে—তিনি এখনও সক্ষম। ১১ই আগস্ট তাঁর জন্মদিন হয়ে গেল। মণিলালের জন্ম ১৮৮৬ সালে।

এবার মণিলালের এই জন্মদিনে, হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার চিঠিতে আবার নতুন করে যোগাযোগ হল বলে, আমি আবার আমার প্রথম বয়সকে, আমার কৈশোরকে, তাঁরই আলোয় নতুন করে অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। যতক্ষণ এত কথা লিখছিলাম তাঁর সম্পর্কে, আমি যেন ভুলেছিলাম বার্ধক্যের কথা, দৈন্যের কথা, আজকের জীবন থেকে, সাহিত্য থেকে আদর্শ-মুক্তির অতি নির্মম সত্য কথা!

একটা আশ্চর্য ঘোর ছিল আমার চোখে, আমার মনে। কিন্তু এখন, যতই পৌঁছবার চেষ্টা করছি শেষ পাতায়, ততই কলম এগিয়ে চলেছে, থামাতে পারছি না—থামাতে বাধছে। বারবার মনে হচ্ছে, থামলেই আমাকে ফিরতে হবে, আবার এসে দাঁড়াতে হবে যুক্তিতর্কের বেড়া-দেওয়া জটিল জীবনের সীমানায়। আর সেখানে, আজকের জগতে মণিলালকে তেমন করে দেখতে পারব না—চিনতে পারব না। যেখান থেকে একদিন শুরু করেছিলেন মণিলাল, হয়তো আজও চরিত্রগত আদর্শের আভিজাত্য নিয়ে সেখানেই স্থির হয়ে আছেন বলে আমার পক্ষে তাঁর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। তাই থামতেই হল।

যতবার টেনে আনো

অতীন্দ্র মজুমদার

যতবার টেনে আনো এই রুক্ষ পিঙ্গল মরুতে
বিস্বাদ বালুর সমারোহে,
এই তীক্ষ্ম জ্বালা আর প্রখর উত্তাপ দিয়ে ঘেরা
কঙ্কালের মত সাদা নিঃস্ব রূঢ় নির্বোধ নির্মোহে
যতবার তুমি টেনে আনো—
রৌদ্রের বিষাক্ত তীর যত তুমি নিপুণ কৌশলে
এই ক্লিষ্ট নগ্ন বুকে হানো,
আমি সেই জ্বালাকেই কাজল করেছি দুই চোখে,
স্নায়ুতে মজ্জায় সেই দাবদাহ প্রখর কৌতুকে
রেখেছি জ্বালিয়ে এই দেহকেই ইন্ধন বানিয়ে,
কেননা নিশ্চিত জানি, এ আগুনে জ্বলে জ্বলে আমি
একদিন মুক্তি পাবো, মুক্তির প্রদীপে আলো দেব—
বিশ্বাসী শিল্পীর কণ্ঠে উজ্জ্বল বলিষ্ঠ দীপ্ত
রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে॥

যতবার টেনে আনো এই কালো কুয়াশায় ঘেরা
যন্ত্রণার পারাবারে—অশ্রুর সমুদ্রে বারবার—
কটুস্বাদ লোনা ঝড় কঠিন নিষ্ঠুর চিৎকারে
টুকরো টুকরো করে দেয় যত শান্ত স্নিগ্ধ আকাঙ্ক্ষার
পবিত্র আশ্রয়গুলি—সেইখানে যতবার আনো,
হাহাকার দীর্ঘশ্বাস ভীতিময় শব্দের বন্যায়
আমাকে ডুবিয়ে দিতে, কান্নার চাবুক যত হানো
এই সিক্ত নগ্ন দেহে নিপুণ কৌশলে—
তবু আমি সে-আঘাতে দুলে দুলে দেহের নৌকায়
পার হব এ সমুদ্র, যন্ত্রণার এই কালো সমুদ্র বিপুল—
কেননা নিশ্চিত জানি এই পারাবার পার হয়ে
নির্মল সে দ্বীপ পাবো, যেখানে আকাশে অনিবার
ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলে প্রেম সখ্য প্রীতি ও করুণা
প্রসন্ন শিল্পীর কণ্ঠে উজ্জ্বল বলিষ্ঠ দীপ্ত
রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে॥

যে কোন নিশ্বাসে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কখনো গানের রূপে বৃক্ষ জাগে: কখনো ঘুমের
সাময়িক অবসান দ্বিতীয় নিশ্বাসে করে ম্লান যাওয়া আসা।
"দাও ভোর দয়া কর" হেঁকে ওঠে ঈশ্বরবিশ্বাসী মুখগুলি
যেখানে ফুলের আলো লেগে থাকে পাথরে মন্থর।
এখন নির্বোধ রক্তে ভেসে যায় কাঁটার মুকুট
নক্ষত্রের জয়ধ্বনি তার যতটুকু ধৈর্য আলোকিত করে
সব সেই পথরেখা, জলরেখাসন্ধানী বকুল।
তবু তুমি গান আনো, সূর্যের অলক্ষ্য দুঃখে যে সব সকাল
যখন রুটির ঘ্রাণ, কফির উষ্ণতা নিয়ে সংবাদপত্রের
দীপ্ত স্তম্ভগুলি জুড়ে দানবিক শব্দের আঁধার।

তোমাকে জাগাতে চাই প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা যে কোন নিশ্বাসে
বেঁচে আছি জানা যেত, জেগে আছি ভাবা যেত, যদি এ সঙ্গীত
নিসর্গের স্বাধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বী পেত,
—যেখানে ফুলের মুখে আলো হয়ে আছে মৃত্যু
প্রেমের সম্পদে॥

চিত্রপ্রদর্শনী

চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলায় বর্তমান ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে নীরোদ মজুমদার যে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করেন সেটা উপলব্ধি করা গেল গত ৩১শে জুলাই আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে উদ্বোধিত তাঁর ছবির নদিনব্যাপী একক প্রদর্শনী থেকে।

তিনটি শ্রেণীতে মোট যে একুশখানি ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল সেগুলিতে শিল্পীর গত দশ বছরের কাজের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর মধ্যে 'Images Eclose' পর্যায়ের বারোখানি এবং 'Wing of the End' পর্যায়ের পাঁচখানি ছবি যথাক্রমে ১৯৫৮ ও ১৯৬১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে দেখা যায়। তৃতীয় "Nine variations of Symbolic 9" পর্যায়ের চারখানি ছবিই এই প্রদর্শনীতে নতুন।

পাশ্চাত্যের বিমূর্ত ধারার সংগে ভারতীয় আলপনা ও পটের রেখা ও রঙে বিভিন্ন প্রতীকের সহায়তায় উপনিষদ ও পৌরাণিক আখ্যানবস্তুকে চিত্রায়িত করায় নীরোদ মজুমদার একটা নিজস্ব মৌলিক ধারার উদ্ভাবন করে নিয়েছেন। দীর্ঘ এগারো বৎসর প্যারীসে থেকে চিত্রাংকণ শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্যের ধারার প্রভাব এসে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু নীরোদ মজুমদার পাশ্চাত্যের চিত্রাংকন কৌশলটুকু কতকাংশে অবলম্বন করলেও ভাব, বিষয়বস্তু এবং রেখা ও রঙের প্রয়োগ বিষয়ে ভারতের নিজস্ব ধারাকেই মূর্ত্য করে তুলেছেন।

প্রথম পর্যায়ে বেহুলা-বিপুলা-লখিন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে চিত্রিত বারোখানি ছবির সহায়তায় একটা কেন্দ্র বৃত্ত থেকে সৃষ্টির যে রহস্য আধিবিদ্যায় পাওয়া যায় সেটিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এই পর্যায়ের মূল চিত্র হচ্ছে 'হৃদপুষ্কর' (হৃদয় পদ্ম) যা থেকে বৃত্তাকারে সকল সৃষ্টির উদ্ভব—জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের রহস্য পদ্মের পাপড়ির প্রতীকে অভিব্যক্ত। 'স্বর্গ', অগ্নি, ত্রিবেণী সংগম (নেতার ঘট), 'লখিন্দরের গোপন কোষ্ঠী প্রভৃতি ছবিগুলিতে অধিবিদ্যামূলক অভিব্যক্তি বৃত্তাকার ও ত্রিকোণ রেখার সাহায্যে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে গরুড়ের উপাখ্যান নিয়ে পাঁচখানি ছবি। এগুলিতে আলপনা ও পটের রীতি বেশী স্পষ্ট। এ ছবিগুলিতে শিল্পী অলংকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কয়েকখানি ছবির ক্ষেত্রে অলংকরণের জটিলতা ভেদ করে ছবির রূপ, ভাব ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে বেশ সময় লাগে।

শিল্পীর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তৃতীয় পর্যায়ের ছবি চারখানিতে। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নব রসের বিভিন্ন প্রকৃতি ও অর্থকে মূর্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই পর্যায়ের ছবিগুলি হচ্ছে "নবনারী কুঞ্জর", "নব-পত্রিকা", তান্ডব-লাস্য ও বিদ্যা-যন্ত্র। নটি নগ্ন মূর্তির নৃত্যের তাল থেকে একটি সুন্দর হস্তীর জন্মকে সহজ বক্র রেখা, কোথাও ভাঙা ভাঙা রেখা এবং সাদা, নীল, লাল ও সবুজ রঙের মাধ্যমে চমৎকার এক কাব্যিক ছন্দে অভিব্যক্ত "নবনারী-কুঞ্জর"। সবুজ পাতার সুন্দর নক্সার সাহায্যে পরিকল্পিত "নব-পত্রিকা" এই পর্যায়ের আর একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। তবে এই পর্যায়ের শিল্পকৃতিত্বে শ্রেষ্ঠ কীর্তি "তান্ডব লাস্য।" বিশদরেখায় সূক্ষ্ম বর্ণনা ও গাঢ় রঙের প্রয়োগে ভাবের গভীরত্বকে চমৎকারভাবে মূর্ত করে তুলেছেন।

নবপত্রিকা — শিল্পী : নীরোদ মজুমদার

নীরোদ মজুমদারের ছবির এই প্রদর্শনীটি এখনকার শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের কাছে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের নব রূপায়নের একটি উদ্দীপ্ত প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হবে। ছবিগুলি একটা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

— সাত —

সবে জমে এসেছে, হেন কালে যে ডর করা গিয়েছিল—ছেলে কেঁদে উঠল। সুধামুখী কাতর হয়ে বলে, ছুটি দিন একটুখানি রাজাবাহাদুর। ছেলের অসুখ, উঠে পড়েছে, ঘুম পাড়িয়ে আসি। এক্ষুণি এসে যাব।

রাজাবাহাদুর চোখ বড় বড় করে বলেন, কী বলিস, তুই আবার ছেলে পেটে ধরলি কবে রে! ও-মাসেও তো এসে গেছি। মিথ্যে বলবার জায়গা পেলিনে!

সুধামুখী বলে, পেটে না ধরলেও ছেলের কোন অভাব আছে? পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে ছেলে। আপনারা কত সব আছেন মস্ত মস্ত মানীলোক—উচ্ছিষ্ট যাদের চলে না। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে টাটকা জিনিস উচ্ছিষ্ট করে আসেন। ফল পুষ্ট হবার আগে কুঁড়ি অবস্থায় বেশির ভাগ নষ্ট করে দেন। যাদের সে সুবিধা হল না, তাক বুঝে রাতদুপুরে মা-গঙ্গায় নিবেদন করে দায় খালাস হয়ে আসে।

ছেলে চুপ করে গেছে, আর কাঁদে না। জেগে পড়েছিল, আপনাআপনি আবার ঘুমিয়ে গেছে। এক ছুটে দেখে গিয়ে সুধামুখী বসে পড়ল আবার। দুদিন যাচ্ছে, খদ্দেরের আপ্যায়নের তিলেক ত্রুটি না ঘটে। যেটুকু কামাই হল পুষিয়ে নেবার জন্য ডবল করে হাসতে লেগেছে। বলে, জানেন তো রাজাবাহাদুর, সেকালে মরাগুে পোয়াতিরা গঙ্গায় ছেলে ফেলে দিত, পরের বাচ্চাটা যাতে মায়ের কোল আলো করে বেঁচেবর্তে থাকে, শতেক পরমায়ু হয় তার। একালের মা-কুন্তীরাও পয়লা বাচ্চা গঙ্গায় দিয়ে মনে মনে বলে, গোড়ার ফলটা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি মাগো। ভাল ঘর-বর হয় যেন, সতীসাধ্বী হয়ে পাকা চুলে সিঁদুর পরে চিরদিন সংসারধর্ম করি।

যেড়ে বলেছিস রে! রাজাবাহাদুর হাসিতে ফেটে পড়লেন, দেখাদেখি সঙ্গীগুলোও হাসে। বলেন, হনুমান বুক ফেড়ে রামনাম দেখিয়েছিল—একালের অনেক সতীর বুকের তলা অমনি যদি কেউ ফেড়ে ফেলে, দেখা যাবে কত গণ্ডা নাম লেখা সেখানে।

হাসি থামিয়ে খানিকটা নড়ে চড়ে রাজাবাহাদুর আড় হয়ে পড়লেন পালঙ্কের বিছানায়। বললেন, তোর ঘরে কী জন্যে আসি বল দিকি?

সুধামুখী বলে, ভাগ্য আমার! আপনার মতো মানুষের নেকনজরে পড়েছি।

দূর, নজরই তো বন্ধ করে থাকি তোর কাছে। তুই হলি কোকিল—গলা কোকিলের, চেহারাখানাও তাই। চেহারা দেখতে গেলে গা ঘিনঘিন করে, গানে আর মজা থাকে না। দু-চক্ষু বন্ধ করে গান শুনে যাই। তোর কথার আবার বেশি বাহার গানের চেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে ঠিক তুই, ভাল ভাল কথাবার্তা শুনে পরিপক্ক হয়ে এসেছিস। বিদ্যেসাধ্যিও কিছু হয়তো আছে পেটে।

সুধামুখী দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয়। টাকাকড়ি না থাক, বাবা কিন্তু বিদ্যার বারিধি। বলেছিলেন, পড়াশুনো নিয়ে থাক সুধা, আমি দেখিয়েশুনিয়ে দেব, ঘরে পড়ে গ্রাজুয়েট হবি স্বচ্ছন্দে।

আগের কথার জের ধরে রাজাবাহাদুর বলেন, কাদের ঘরের কোন জাতের মেয়ে তুই, ঠিক করে বল আমায়।

সুধামুখী বলে, ছেলে যেমন গাঙে ভেসে এল, আমি একদিন ভাসতে ভাসতে কালীবাড়ির আঁস্তাকুড়ে এসে পড়েছি। জাতজন্ম নেই আমার, পিছন অন্ধকার। আমি একাই, বাবা আর বোনেদের উঁচু মাথা কেন হেঁট করতে যাব বলুন।

আরও অনেক কথা বলতে গিয়ে বলল না, চেপে গেল। পিছনে ঘনঘোর অন্ধকার, সামনেটাও তাই। কিন্তু মনের দুর্ভাবনা খন্দেরের কাছে বলা চলে না। বরঞ্চ ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে হয়। ব্যবসার নিয়মই তাই।

কোন খেয়ালে রাজাবাহাদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ঃ চল রে, তোর ছেলে দেখে আসি।

রান্নাঘরের সুঁড়িপথটা অতি সঙ্কীর্ণ। যে মোটা মানুষ—ভুঁড়ি বেধে আটকে যাবেন জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মতন। চালও বড় নিচু সেখানটা। লম্বা মানুষ রাজা-বাহাদুর, তায় রঙে রয়েছেন। কত বার মাথা ঠুকে যাবে ঠিক নেই, তখন মেজাজ বিগড়াবে।

সুধামুখী বলে, আপনি কি জন্যে যেতে যাবেন? বড্ড নোংরা ওদিকটা।

মাতালের রোখ চেপে গেছে। বললেন, তোর ঘরে এসে বসতে পারছি, এর চেয়ে নোংরা জায়গা ভবসংসারে কোথায় আছে

রে? নোংরা বলেই তো আসি. নোংরার জন্যে মন কেমন করে ওঠে এক এক সন্ধ্যাবেলা।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলেন, মানুষ জাতটা হল মহিষের রকমফের। সবুজ মাঠে চরে চরে সুখ হয়না। এঁদো ডোবার পচা পাঁকে গিয়ে পড়বে। পড়তেই হবে। এই আমারই দেখ না—ঘরে খাসা সুন্দরী বউ। একটা গেল তো তারও চেয়ে সুন্দরী দেখে দুই নম্বর বিয়ে করে আনলাম। ভালবাসাবাসিও দস্তুরমতো—সে ভালবাসে, আমিও। কিন্তু এটা হল ভিন্ন ব্যাপার। দশের মধ্যে সভা জমিয়ে সংপ্রসংগ করে এলে দুটো ময়লা কথার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ানো। ঐ মহিষের বৃত্তি।

উঠে কয়েক পা গিয়েছেনও রাজা-বাহাদুর। দেহ বিষম টলছে, গড়িয়ে পড়েন বুঝি বা। সুধামুখী তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, আপনি ছেলের মুখ দেখবেন, সে তো ছেলের বাপের ভাগ্যি, সাতপুরুষের ভাগ্যি। রংমহলে রোশনাই আলো ঘুরিয়ে আপনি দেখবেন, সে কি একটা কথার কথা হল? ফরমাস করুন, ঝাড়লণ্ঠনেরই নিচে গদির উপর এনে দেখিয়ে দিই।

নেশার উপরে হলেও রাজাবাহাদুর নিজের দৌড় বুঝে নিয়েছেন। পা টলছে বেয়াড়া রকম। হাসতে হাসতে ধপ করে চেয়ারখানায় বসে পড়লেন।

নিয়ে আয় এখানে, তোর নবাব তক-তাউশে তুলে দেখানোর অভিরুচি। বটেই তো, কত মানমর্যাদা আমার! আমি কেন যেতে যাব খারাপ মেয়েমানুষের ছেলে দেখতে? তুই এনে দেখা, বখশিস পাবি।

নিয়ে আসে সুধামুখী। রাজাবাহাদুরের চোখ ঠিকরে যায়। ইয়ারগুলো বকবক করছিল, তারাও চুপ হয়ে গেছেঃ অ্যাঁ, রাজপুত্তুর ছেলে যে!

বিশাল পালঙ্কের উপর বিঘতখানেক পুরু গদি। ধবধবে চাদর-বালিশ তার উপরে। রাজাবাহাদুর হাঁ-হাঁ করে ওঠেনঃ আরে দূর, কত মানুষ শুয়ে বসে গেছে, ওর উপর শোয়ায় কখনো! ভাল কিছু পেতে দে। তুই আর ভাল কী পাবি, নোংরার মধ্যে সবই তো ছোঁয়া-লেপা হয়ে আছে। রোস্—

বিচিত্র নক্সাদার সেকেলে জামিয়ারখানা কাঁধের উপর থেকে নিয়ে রাজাবাহাদুর শয্যার উপরে পেতে দিলেন। হেসে বলেন, এ ছেলে আমারও হতে পারে।

সুধামুখী বলে, আন্দাজি বলছেন কেন রাজাবাহাদুর? নিজের ছেলে হলে জানা থাকত না বুঝি আপনার?

কী করে থাকে? ঐ তো শুনলি, একবার উচ্ছিষ্ট হয়ে গেলে সে জিনিস বার-দিগর আমি ছুঁইনে। কত ঠাঁই চেখেচেখে ঘুরি—কার ঘর থেকে বাচ্চা বেরুল, অত কে হিসাব রেখে বেড়ায়!

একটু থেমে রাজাবাহাদুর আবার বললেন, আমার না-ও যদি হয়, আমারই মতন কোন শয়তান-বোম্বেটের তো বটে! হোক শয়তানের, তা হলেও বড় বাপের বেটা। খাতির-যত্ন করিস রে মাগি, হেঁড়া ঘরের ছেলে নয়, দস্তুরমতো বনেদ এক চামড়ার নিচে।

সুধামুখী জোর দিয়ে বলে ছেলে আপনারই। না বললে শুনি নে। অবিকল আপনার মতন চাউনি। ঝালুকলুলুক করে চোরা চাউনি দিচ্ছে ঐ দেখুন না।

রাজাবাহাদুর রাগের ভান করে বলেন বটে রে! চোরা চাউনি মেরে বেড়াই এই কলঙ্ক দিলি তুই আমায়? তা বেশ মেনেই নিলাম ছেলে আমার। এই ছেলের বাপ হতে যে-না সেই আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াবে। দু-দুটো বিয়ে করলাম বিয়ে-করা পরিবারে দিল না—ছেলে আলটপকা তোদের নরককুণ্ডের মধ্যে পেয়ে গেলাম।

চটে না সুধামুখী, চটলে কাজ হয় না। প্রগলভ সুরে বলে, ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই? দেখুন না, ঐ দেখুন ঠোঁট ফোলাচ্ছে ছেলে।

মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজাবাহাদুর হা-হা- করে হেসে উঠলেন। কী দেখতে পেলেন তিনিই জানেন, বললেন, আচ্ছা বিচেল ছেলে তো! হবে না—আমি লোকটা কী রকম! কচুর বেটা ঘেচু, বড় বাড়েন তো মান।

মেজাজ দিলদরিয়া এখন, মেজাজের গন্ধ ভকভক করে মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে নোটে টাকায় টাকা পনেরোর মতো বেরুল।

রাজা বাহাদুর অবাক হয়ে বলেন, মোটে এই? আরো তো ছিল। আরো অনেক থাকবার কথা। গেল কোথা টাকা?

সঙ্গীদের একটি বলে ওঠে, বলবেন না, বলবেন না, বড্ড পাজি জিনিস টাকা। পাখি খাঁচায় পুরে আটকানো যায়, টাকা কোনরকমে পোষ মানে না। উড়ে পালায় পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

রাজাবাহাদুর বলেন, রাজপুত্তুরকে বুঝিয়ে বল্ রে সুধা, আজকে নেই। সোনার টাকার মুখ দেখে যাব আর একদিন এসে।

এর পরে একটা জিনিস দেখা গেল, রাজাবাহাদুর পাড়ার মধ্যে ঢুকলেই সরাসরি সুধামুখীর ঘরে চলে আসেন। ডাকাডাকি করতে হয় না। একাই আসেন বেশি, সোজা এসে ছেলের কাছে বসে পড়েন। একদঙ্গল পারিষদ জুটিয়ে এনে হুল্লোড় করেন না আগেকার মতো। অসাধারণ রকমের ফর্সা রং বলে সাহেব-সাহেব করেন --সাহেব নাম চালু হয়ে গেল তাঁরই মুখ থেকে। সোনার টাকা দেন নি বটে, তা বলে খালি হাতেও আসেন না কখনো। কোনদিন বা জামা কোনদিন বা দুটো খেলনা—কিছু না কিছু আনবেনই। হিংসা এই নিয়ে বাড়ির অন্য মেয়েদের। এবং পাড়ার সকলেরও। কত বড় লোকটাকে গেঁথে ফেলেছে মাংসের দলা ঐ এতটুকু ছেলে দেখিয়ে।

প্রথম দিন জামিয়ারখানা পেতে দিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিয়ে যান নি। সাহেবেরই হয়ে গেল সেটা। দামি জিনিস —তবে অনেক দিনের পুরানো, পোকায় কাটা, ফেঁসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। বেচতে গেলে খদ্দের হবে না। সাহেব যখন দশ-বারো বছরের, শীতের ক'মাস সুধামুখী জিনিসটা দোভাঁজ করে বুকের উপর দিয়ে পিঠের উপর দিয়ে জড়িয়ে গিঁঠ বেঁধে দিত। গরম খুব, অথচ পাখির পালকের মতো হালকা। শাল গায়ে চড়িয়ে সাহেবের মেজাজ চড়ে যেত, সমবয়সী সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াত: আমার বাবার গায়ের জিনিস। দেখ্ কী সুন্দর! বাবার এমনি গাদাগাদা ছিল, যাকে তাকে দিয়ে দিত।

রাজাবাহাদুরের যাতায়াত তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষটা একেবারে ফোত। এ লাইনে হয়ে থাকে যেমন। রাজাবাহাদুরের চেহারাটাও সাহেবের ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু চালচলন মনমেজাজ সুধামুখীর কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে অনেক। তাই নিয়ে সমবয়সীদের কাছে দেমাক করে: বড়লোক আমার বাবা। গা থেকে খুলে আমার বিছানায় পেতে দিল। পকেটের টাকাপয়সা মুঠো মুঠো তুলে মুড়িমুড়কির মতো ছড়িয়ে দিত।

বালকের সামান্য কথায় নফরকেষ্টর বুক টনটন করে। অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে,

সেই বাপটা তোর বড়লোকই ছিল রে সাহেব। কিন্তু পোকায়-কাটা বড়লোক। গায়ের জামিয়ারখানা যেমন, মানুষটাও তাই।

সুধামুখী শুনতে পেয়ে ধমক দিয়েছিল নফরকে। কিন্তু মনে মনে সায় দেয়। এককালে অনেক ছিল রাজাবাহাদুরের—হাবে-ভাবে কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে। হেন মানুষটা গলিঘুঁজির পচা আবর্জনায় আনাগোনা করে, বুঝতে হবে ঘুণে-খাওয়া নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা তখন।

কিন্তু তাই বা কেমন করে? টাকার মানুষও যে আসে না, এমন নয়। কোন মানুষের কিসে স্ফূর্তি, বাঁধা নিয়মে তার হিসাব হয় না। একজন এসেছিল—টাকাকড়ি যেন খোলামকুচি তার কাছে, পকেটের ভারবোঝা। নিতান্ত গঙ্গার জলের ভিতরে না ফেলে গঙ্গার প্বাড়ে বস্তির ঘরে দু-হাতে ছড়াতে এসেছে। সকালবেলা, অসময়। বাজার করা স্নান করা রান্না করা—খাওয়াদাওয়া অন্তে হল বা কড়িখেলা তাসখেলা দু-এক হাত। শুয়ে পড়ে তারপরে বিশ্রাম। সময়টুকু একেবারে নিজস্ব মেয়েদের। দোকান যদি বলতে চাও তো পুরোপুরি ঝাঁপবন্ধ দোকান-ঘরের।

এ হেন সময় মানুষটা সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতা মসমস করে ঢুকে পড়ল। পারুলের ঘরটা আয়তনে বড় আর সাজসজ্জায় চমকদার—উঠানের শেষ প্রান্তে সেই ঘরে উঠল সোজা গিয়ে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে, আনকোরা নতুন মানুষ হলে ঠিক ঠিক ঘর চিনে যাবে কি করে? পারুল ভাগ্যধরী, গা তুলে নড়ে বসতে হয় না তার। সেই পারে অবেলার খদ্দের সামলাতে। লোকটা ঠিক ঘর বেছেছে।

ক্ষণপরে—ওমা, আরও দু-তিনটে মেয়ে পিলপিল করে যায় যে ওদিকে। সুধামুখীরও ডাক এল, পারুল ঝি পাঠিয়ে দিয়েছে। দূর, তোর দিদিমণির যেমন আক্কেল—আধবুড়ো মাগি বসছি গিয়ে আমি ওদের মধ্যে! বসলে কাজকর্ম করে দেবে কে আমার? ছেলে এই এক্ষুণি জেগে উঠবে, তাকে খাওয়ানো—

যাবে না তো পারুল নিজেই এসে পড়ল। সত্যিই ভালবাসে মেয়েটা, বড্ড টানে। বলে, চলে এস দিদি। টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে, ফাঁকতালে কিছু কুড়িয়ে নাও। সাহেব ঘুমুচ্ছে, থাকুক না একলা একটুখানি।

হাত ধরে টেনেটুনে নিয়ে বসাল। শতমুখে লোকটা নিজের চতুরতার কথা বলছে। বাড়ির মেয়েরা ঝেঁটিয়ে এসেছে পুজো দিতে। তিন-চারটে পাণ্ডা জুটে গেছে—যেমন আয়োজনের পুজো, সারা হতে আড়াইটে-তিনটে বাজবে। বলি, চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল-প্রামাণিক আমি বেটা কাঁহাতক ক্যা-ফ্যা করে বেড়াই। জায়গা খুঁজে বাঁসগে। খাস কলকাতার পাণ্ডাগুলো বহু বার সার্ভে হয়ে গেছে, দক্ষিণের এই-গুলো বাকি। দূর বলেই হয়ে ওঠেনি। নকুলেশ্বরতলায় যাই বলে ফুড়ুৎ করে ওদের কাছ থেকে সরে পড়লাম।

বেলেল্লা কাণ্ডবাণ্ড। সেই ব্যাপার, সেই যা বলতেন রাজাবাহাদুর—মহিষ দিন দুপুরে পচা ডোবায় গা ডোবাতে এসেছে। মানুষও ইতর জন্তু একটা, সদরে একে অন্যের সঙ্গে অভিনয় করে বেড়ায়—অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রের নিরাবরণ মূর্তি দেখে এই তত্ত্বে সন্দেহ থাকে না। এই জীবনে এসে কত কিছু চোখে দেখে, তারও বেশি কানে শুনে থাকে—তবু এই দিনের আলোর এতজনের ভিতর সর্বদেহ কুঁকড়ে ওঠে সুধামুখীর। ধমকানি দেয়ঃ যান, যান—চলে যান আপনি। ভদ্দরলোকের চেহারা তো আপনার—টাকার লোভে পেটের দায়ে আমরা যদিই বা নোংরা হই, আপনি লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেলেন কি করে! তেমন জায়গা নয় আমাদের, দু-পা গিয়ে ভাল ভাল লোকের বাড়ি। হালদার মশায়দের এলাকা, ছিটেফোঁটা কোনরকমে কানে উঠলে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে পাড়া-সুদ্ধ গঙ্গা পার করে দিয়ে আসবেন।

মানুষটা চলে গেলে পারুলকেও তারপর গালি দিয়েছিল : আর সকলে গিয়েছিল পেটের ধান্দায়—না গিয়ে তাদের উপায় নেই। দুর্জনের মনিব্যাগ থেকে বেরুলেও টাকার উপরে দাগ থাকে না, বাজারে চলে। সেই লোভে গিয়েছিল। কিন্তু তুই বোন এই নোংরামির কি জন্যে আস্কারা দিবি? তোর তো সে অবস্থা নয়।

পারুল একটুও লজ্জিত নয়, হাসিতে গলে গলে পড়ে। বলে, ছোটবেলায় রাস্তায় পাগল দেখলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখতাম। এ লোকটাও তাই—উদ্দণ্ড পাগল একটা। পাগল ক্ষেপে গিয়ে টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে। দুটো-চারটে করে আঁচলে বেঁধে যে-যার ঘরে ফিরল—তুমি বোকা মানুষ, ফরফরিয়ে বেরিয়ে এলে রাগ করে। সত্যি দিদি, দল-ছাড়া গোত্র-ছাড়া তুমি যেন আলাদা কি এক রকম।

অতি-বড় কলঙ্কভাগিনী—বংশের উপরে আর বাপের মনে দাগা দিয়ে জন্মের মতো বেরিয়ে এসেছে, সুধামুখী মানুষটা তবু সত্যিই ভিন্নগোত্রের। এক বাবু এসেছিল তার ঘরে কয়েকটা দিন—সাকুল্যে আট-দশ দিন মাত্র। এই মোটা লেন্সের চশমা চোখে, ছেঁড়া-খোড়া কাপড়-চোপড়—খবরের কাগজ হাতে করে এসেছিল, কাগজটা ফেলে চলে গেল। ঢাউস বাংলা কাগজ, অনেকগুলো পৃষ্ঠা। সুধামুখী পুরো দু-দিন ধরে কাগজখানা পড়ল—সকল অন্ধিসন্ধি, বিজ্ঞাপনের প্রতিটি লাইন। ঘরে দুয়োর দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ত। এমনই তো 'বিদ্যেবতী সরস্বতী' বলে অন্য মেয়েরা, কাগজ পড়তে দেখলে তারা রক্ষে রাখত না।

বস্তিবাড়ির বাইরে বৃহৎ একখানা জগৎ—বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলিতে তার আনা-গোনা ছিল, কিন্তু এ জায়গায় নেই। রূপ-কথার উড়ন্ত কার্পেটের মতো খবরের কাগজের উপর চেপে সেই জগৎ অনেক দিন

পরে সুধামুখীর ঘরের মধ্যে হাজির হল। নেশা ধরে গেল, বাজারের মাছ-শাক কিনতে কিনতে ঐ সংগে কাগজও একটা করে কিনে আনত। কদিন পরেই অবশ্য বন্ধ করতে হল পয়সার অভাবে। কোন দেশের এক রাজপুত্র আর তার বউকে মেরেছে, সেই ছুতোয় পৃথিবী জুড়ে দুরন্ত লড়াই। দুটো মানুষের বদলা হাজার লক্ষ মানুষ। যে লড়াই ডাঙায় আর সাগরের উপরে শুধু নয়—মানুষের পাখনা গজিয়েছে, আকাশে উড়ে উড়েও লড়াই। রামায়ণের ইন্দ্রজিতের যে কায়দা ছিল! সে খবর পড়তে-পড়তে সুধামুখীর মনটাও যেন আকাশ-মুখো রওনা হয়ে পড়ে খাপরায় ছাওয়া বস্তিবাড়ির অশ্লীল ইতর জীবন ফেলে মেঘের উপর গা ভাসিয়ে দিয়ে।

ঠাট্টা করে সেই বাবুর সকলে নাম দিয়েছিল ঠাণ্ডাবাবু। ঠাট্টার পাত্র তো বটেই। নিপাট ভালমানুষ জনও এখানে এলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ মাটির এমনি মহিমা। মত্ত মানুষই বা কেন, মত্ত মহিষ। এ'র অপরাধ, মানুষই থাকেন পুরোপুরি। শান্ত হয়ে বসে বসে মোটা চুরুট খান, বই হাতে থাকল তো বই পড়েন চুপচাপ। এক-একদিন কেমন গল্পে পেয়ে যায়। অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন বোধ হয়, খোঁচা দিলে রকমবেরকমের গল্প বেরিয়ে আসে। গল্পের আর অন্ত থাকে না।

না থাকতে পেরে সুধামুখী একদিন বলেছিল, আপনি গিয়েছেন বুঝি ঐ-সব জায়গায়?

ঠাণ্ডাবাবু হেসে বললেন, মিছে জিজ্ঞাসা কর কেন? চাপাচাপি করলে কতকগুলো বাজে উত্তর শুনবে। নিজের কথা তোমাদের কাছে কেউ বলতে আসে না, আমিও বলব না। নিজের ইচ্ছেয় যা বলি, সেইগুলো শুধু শুনে যাও। ভাল না লাগে কি অন্য খদ্দের ধরবার যদি তাড়া থাকে, খোলাখুলি বল, উঠে পড়ব এখনই।

সুধামুখী তাড়াতাড়ি বলে, উঠবেন না আপনি, মাথার দিব্যি। বলুন কি বলছিলেন—সারা রাত ধরে বলে যান। ভাল লাগে আমার।

বাবুটি নিজেই এক খবরের-কাগজ। কাইজারের নাম তখন লোকের মুখে মুখে—জর্মন দেশের রাজা কাইজার। লড়াইয়ে কাইজার হরদম জিতছে—পিটে পিটে তুলো-ধোনা করছে শত্রুদের। কাইজারের দেশে এক বনেদি শহরের গল্প—ছাপাখানা করে প্রথম যে জায়গায় বই ছাপা হল। নাম-করা এক পুরানো কফিখানা আছে, বাঘা বাঘা গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সেখানে যেতেন। মাটির উপরে আমরা একতলা দোতলা তেতলা দেখে থাকি, কফিখানার বাড়িতে মাটির নিচে ঠিক তেমনি তেতলা চারতলা পাঁচতলা নেমে গেছে। যত নিচে তত বেশি অন্ধকার—গুহার মতন কুঠুরিগুলো, আসবাবপত্র অতিশয় নোংরা। কফির দাম কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে দ্বিগুণ চারগুণ ছ-গুণ হয়ে যাচ্ছে, বস্তু যদিচ সর্বত্র এক। এইসব ঘরে এই সমস্ত চেয়ারে বসে সেকালের অনেক দিক্‌পাল খানাপিনা ও আমোদস্ফূর্তি করে গেছেন। নিশিরাত্রে চুপিচুপি এসে জুটতেন, প্রেমিকারা আসত, পাতালপুরীর বেলেল্লাপনা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মানুষের কানে বড়-একটা পৌঁছত না। পুরানো আমলের কিছু কিছু প্রেমপত্র কাচে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে ঐসব কুঠুরির দেয়ালে। একালের মানুষ যেখানে বসে নিতান্ত নিরামিষ একপাত্র কফি খেয়ে আসে। কিন্তু গুণীদের রাসমণ্ডপে বসে খেয়েছে, সেই বাবদে অতিরিক্ত মাশুল গুণে দিতে হল। কফির দামের উপরে মাশুল চেপে গিয়ে অঙ্কটা নিদারুণ।

গল্পের উপসংহারে নীতি-উপদেশ: বুঝে দেখ, আমরাই নতুন কিছু করিনে। এক রীতি সর্বদেশে আর সর্বকালে। হতেই হবে। এই তোমার ঘরে যতক্ষণ আছি, পুরোপুরি এখানকারই। অন্য যা-কিছু পরিচয়—গলির মোড়ে খুলে রেখে এসেছি। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সেটা গায়ে চড়িয়ে ভদ্র-সমাজে নেমে পড়ব। উঁকি দিতে যেও না সেদিকে, অনধিকার-চর্চা হবে।

রাজাবাহাদুরেরই সেই কথা! মহিষ পচা পাঁকে গা ডোবাতে এসেছে। গোয়ালটা কোথা, সে খবরে কি দরকার? তা বলে মন মানতে চায় না। যে সব লোক আসে তারা ঠিক জলে-ভেসে-আসা ঐ সাহেবেরই মতন। পিছনের নাম-গোত্র-পরিচয় নেই। একাকী এসে রাজাবাহাদুর বেহুঁশ হয়ে ঘুমুতেন কোন কোন দিন। সুধামুখী তখন জামার পকেট হাতড়েছে। আর দশটা মেয়ের মতো টাকা-পয়সা সাপ করা নয়, কোন একটা চিঠি

বেরিয়ে পড়ে যদি পকেট থেকে, অথবা এক টুকরো পরিচয়ের কাগজ। ছেলে-ছেলে করে ছুটে এসে পড়েন। স্নেহ-বুভুক্ষার কারণ যদি কিছু আবিষ্কার হয়। অথবা এই যে মানুষটি, ঠান্ডাবাবু বলে যার উপর অন্যেরা নাক সিঁটকায়। এমনও রটনা আছে, পুলিসের চর নাকি উনি—বোমা-পিস্তলের স্বদেশীদের ধরবার উদ্দেশ্যে চুপচাপ বসে বসে নজর রাখেন, মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকুনি দেন। আবার ঠিক উল্টো-টাই বলে কেউ কেউঃ উনিই স্বদেশী মানুষ—বিপদের গন্ধ পেয়ে এ পাড়ায় এসে ঠাঁই নিয়েছেন। সরকারের পুলিস সর্বত্র তোলপাড় করবে লুচ্চো-লম্পটের আড্ডা বলে পরিচিত এই রকমের বাড়িগুলো বাদ দিয়ে।

ঠান্ডাবাবুর সত্য পরিচয় কে বলবে?

একদিনের ব্যাপার, বাবুটি এসে সুধামুখীর দাওয়ায় উঠছেন। দাওয়ার নীচে পৈঠার উপর পা দিয়েছেন, একখানা ইট খুলে উল্টে পড়ল, উনিও পড়লেন। কিসের খোঁচায় পা কেটে গেল একটুখানি। অতিশয় ছোট ঘটনা। কত সব ভাল ভাল বড় বড় কথা বলতেন তিনি। সমস্ত তলিয়ে গিয়ে এই এক দিনের তুচ্ছ কথা ভুলল না সুধামুখী জীবনে।

পড়ে গেলেন তিনি পৈঠার ইট খসে। ইটের ফাঁকে আমের চারা। চারা বলা ঠিক হবে না। আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়েছিল, আঁটি ফেটে অংকুর বেরিয়েছে। ইটের তলে বাড়তে পারেনি—সেই অংকুর অবস্থায় রয়ে গেছে। সবুজ নয়, সাদা—মানুষ হলে রক্তহীন ফ্যাকাসে বলা চলত। আঘাত পেয়েছেন ঠান্ডাবাবু, কিন্তু সেটা কিছু নয়। কত বড় একটা আশ্চর্য জিনিস, এমনিভাবে সুধামুখীকে ডাকলেন ঃ দেখ দেখ, ক্ষমতাটা দেখে যাও এদিকে এসে। ইটের তলে পড়েও মরেনি ঐটুকু অংকুর। দুটো পাতা অবধি বের করে দিয়েছে শিশুর মুখে দু-খানা দুধে-দাঁতের মতন। আশাখানা বোঝ—দু-তিন ইঞ্চিও যদি মাথা বাড়াতে পারে, আলোর এলাকায় পড়ে যাবে। তখন ঐ পাতার মুখে আলো টেনে টেনে বেঁচে যাবে, বড় হবে, ডালে-পাতায় মহীরুহ হবে একদিন। বাঁচবার কত সাধ দেখ।

কী উল্লাস মানুষটির—উল্লাসের চোটে এক পাক নেচেই ফেলেন বুঝি বা। কাটা পায়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সুধামুখী ব্যস্ত হয়ে বলে, ইস রে, ঘরে আসুন, গাঁদাফুলের পাতা বেটে লাগিয়ে দিচ্ছি।

কানে নিতে বয়ে গেছে তাঁর। হাতের কাছে এক ভোঁতা কাটারি পেয়ে তাই নিয়ে মাটি খুঁড়ে অতি সন্তর্পণে চারাটা তুলছেন। বলে যাচ্ছেন যেন নিজেকেই শুনিয়ে ঃ কী মায়া পৃথিবীর মাটির! মরতে সবাই গররাজি। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সকলে। একটা জীবন নেওয়া বড় সোজা নয়। পারল এই এত বড় ইটখানা?

পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরে পাঁচিল। পাঁচিলের ধারে আমের চারা পুঁতে দিয়ে এলেন। বলেন, দিলাম একটু সাহায্য। মানুষের জন্য কিছু করতে পারিনে, এ-ও একটা জীব বটে তো! গরু-ছাগল পাঁচিলের ভিতর ঢুকতে পারবে না। কিন্তু মানুষে না উপড়ে ফেলে সেইটে নজর রেখ তোমরা।

কিছুদিন পরে এই ঠান্ডাবাবু উধাও হলেন।। নতুন কিছু নয়, কত এমন আসে যায়। চিড়িয়াখানায় কোন এক মরশুমে হঠাৎ যেমন বিচিত্র বর্ণের পাখি এসে ঝিলের জলে পড়ে, আবার একদিন উড়ে চলে যায়।

এ ব্যাপার নিয়ত চলছে। মানুষটি নেই, হাতের গাছটা দিব্যি বেঁচে উঠল। বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে ডালপালা বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে সাহেবও দেড় বছরেরটি। কথা ফুটছে এইবার।

পারুল আসে যখন-তখন। ছেলের কাছে বসে থাকে। কথা শেখায়। বলে, আমার কাকাতুয়াকে পড়িয়ে পড়িয়ে কত শিখিয়েছি, ছেলে শেখানো আর কি! জানো দিদি, ভোর না হতেই দাঁড়ের উপর পাখনা ঝটপট করে বলবে, হরি বল মন-রসনা। বোষ্টমঠাকুর যেন প্রভাতী গাইতে উঠোনের উপর এসেছেন। আবার রাতের বেলা অন্ধকার থেকে হঠাৎ বলে উঠবে, দেখছি—দেখতে পেয়েছি। শিখিয়েছি তাই আমি।

খিলখিল করে হেসে উঠল পারুল। বলে, বজ্জাত কী রকম বোঝ দিদি। যে মানুষটা থাকে, ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে ওঠে : কে, কে ওখানে? কী দেখল? অবিকল মানুষের গলা তো! তবু তো পাখি একটা—পাখি কতটুকুই শিখবে! এই ছেলেকে যা একখানা করে তুলব! লোকে এসে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শুনবে, কাছ ছেড়ে নড়বে না।

সাহেবের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে সুধামুখী তাড়া দিয়ে উঠল : না, আজেবাজে ফাজলামি শেখাতে পারবি নে, খবরদার!

পারুল সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলে, তা কেন, শেখাব শুধু ঠাকুরদেবতার কথা। রামায়ণ-মহাভারত, আর দেহতত্ত্বের ভাল ভাল উক্তি— কত আশা করে রে মানব দুই দিনের তরে আসিয়া, কাঁচামাটির দেহটি লইয়া অহংকারে মাতিয়া। এই সব।

চপল কণ্ঠ সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ছেলে চাইলাম তোমার কাছে, তুমি তো দিলে না। তারপরে—কাউকে বলবে না কিন্তু দিদি, মাথার দিব্যি রইল—কেমন এক ঝোঁক চেপে গেল আমার, তারপরে কতদিন ভোরে ভোরে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছি দিদি, যদি এসে পড়ে আবার অমনি একটি! ডাস্টবিন খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি। সে কি আর যার তার কপালে দেয় বিধাতাপুরুষ!

সুধামুখী হেসে বলে, আমি বুঝি জানি নে কিছু!

পারুল সচকিত হয়ে তাকায় চারিদিকে। বারবধূ—তবু একটুকু লজ্জার আভা যেন মুখের উপর। বলে, বাজে কথা। কোন রকম অসুখবিসুখ হয়তো। মিছে হয়ে যাবে অসুখ সেরে গিয়ে। কিন্তু কথাটা এরই মধ্যে রটে গেল—একগাদা মেয়েমানুষ এক জায়গায় থাকলে যা হয়। কতবারই তো রটল কত কথা!

সুধামুখী সত্যি সত্যি স্নেহ করে পারুলকে। তার সেই বোন তিনজন—শেষটা অবশ্য বিরূপ হয়েছিল, কিন্তু ছোট বয়সে কত ভাল ছিল তারা! তাদেরই একটি যেন পারুল। গভীর স্বরে বলে, না পারুল, এবারে মিছে নয়। গোপন করিস কেন? হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে এসেছিস, তা-ও জানি। বাচ্চা আসুক কোল জুড়ে। বাচ্চার বড্ড সাধ তোর। আমি না দিয়ে থাকি, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ দিচ্ছেন।

এবারের প্রত্যাশা মিছে হয়নি। মেয়ে এল পারুলের কোলে। রানী। বলাধিকারী যার কথা নিয়ে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানীকে চেন তুমি? নাকি ধনীর ঘরে বিয়ে হয়েছে সেই রানীর—সুধামুখীর চিঠিতে সেই কথা। সৎপাত্রে মেয়ে দেবে, পারুলের বড় ইচ্ছা। তাই বোধ হয় হয়েছে। ফণী আড্ডির ছোট ছেলেটা—ডাক-নাম ঝিঙে, ঘুরঘুর করত ঐ বয়স থেকেই। সে-ই বর হল কিনা কে জানে! রানীর নাম করে জগবন্ধু বলাধিকারী মুখ টিপে হাসলেন। অর্থাৎ রানীকে না পেয়ে প্রণয়ভঙ্গ হয়ে সাহেব বাউন্ডুলে হয়েছে, সেই অবস্থায় রেলের কামরায় তাদের ধরেছেন।

কিন্তু থাক এখন রানীর কথা।

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১ ॥

বেশ বুঝতে পারি—কারাংমেটা একটু ভাবনায় পড়েছে। রঙিলার প্রগল্‌ভতার জবাব দেয়নি চয়ন। কৌতুক-সংগীতের প্রতি যোগিতা থেকে সে নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে কিন্তু সসম্মানে। কারাংমেটা অনুভব করতে শুরু করেছে কোথায় যেন কাবোংগারই জিত শুরু হয়েছে। সে জয় বিজয় উৎসব করে ঘোষণা করতে হয় না—সে জয় মনে মনে অনুভব করা যায়। চৈত দাণ্ডার উৎসব শুধু ভোগের উৎসব নয়; শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারে অন্ধের মতো মাথা খোঁড়ার জন্য এ আনন্দ উৎসবের আয়োজন নয়। চৈত-দাণ্ডারে দেবতার স্তবগান করতে হয়। প্রকৃতির বন্দনা-গান গাইতে হয়। তাই হচ্ছে দেব লিংগো পেনের নির্দেশ। এ গাঁয়ের মানুষ ও গাঁয়ের মানুষ এক হয়ে প্রণাম জানাবে সেই বড়া-পেনকে, তাম্মুরমট্টাইকে জোড়ি-মাঈকে—যিনি তোমার-আমার আর সকলের কাছেই এক। আদিপুরুষ লিংগোপেন চৈত-দাণ্ডার উৎসবের প্রচলন কেন করেছিলেন জান? ভিনগাঁয়ের অচেনা-মেয়ের দেহের পেয়ালায় শুল্‌পী খেতে নয়, লালসা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে নয়। লিংগোপেন চেয়েছিলেন এইভাবে গাঁয়ে গাঁয়ে সমঝোতায় বেড়ে উঠুক। বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হক। ভাবের আদান-প্রদানে মুরিয়া সংহতির বনিয়াদ দৃঢ়তর হয়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমরা প্রকৃতিকে কি চোখে দেখেছি, বসন্ত সমাগমকে, বর্ষার ধারা-পতনকে, শীতের হিমেল হাওয়াকে কেমন-ভাবে বন্দনা জানিয়েছি, সে-কথাই আমরা শোনাব গানে গানে, বিনিময়ে তোমরাও জানাবে কেমন করে তোমরা ফসল বুনেছ, কেটেছ, শিকার করেছ। জীবনকে কেমনভাবে উপভোগ করেছ তাই না আমরা পরস্পরকে জানাব নাচে আর গানে—তাই না মিলিত হয়েছি চৈত-দাণ্ডারে?

এই কথাগুলিই যেন গানে গানে বুঝিয়ে দিল চয়ন শিরদার কারাংমেটার চঞ্চলমতি চেলিক-মোটিয়ারীদের।

রঙিলা উঠে দাঁড়াল। লাস্যময়ী পূর্ণ-যৌবনা নারী। চোখের কোণে তার শাণিত কটাক্ষ, দেহের স্তবকে স্তবকে তার মাদকতার হিন্দোল। চোখ দুটো জ্বলছে। কাব্যিক আবহাওয়াটাকে নিমেষে নস্যাৎ করে দিতে চাইল লালসা-দীপ্ত অংগভংগীতে। বেশ বুঝলাম রঙিলার মন বলছে গোপনে গোপনে হার শুরু হয়েছে তার। কারাংমেটার চেলিক-মোটিয়ারীদলের নায়িকা রঙিলা-বেলোসা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল এই শান্ত পরি-বেশটিকে। কাকচক্ষু হ্রদের জল যেমন ঘুলিয়ে তোলে মদমত্ত মাতংগ, শালবনের ধ্যানস্তিমিত গাম্ভীর্য যেমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে তোলে হঠাৎ-ওঠা কালবৈশাখী ঝড়। অশ্লীলতর অংগভংগী করে বেলোসা গান ধরল:

ও হো মায়না হো লালসাই, ধাঁয়ঠো ডাণ্ডা হো
ও হো কাহেন কি ডাণ্ডা হো লালসাই মায়না
কাহেন কি ডাণ্ডা হো তারি?
ইয়ে বাটে পাল্‌টু হো রাজা
মায়না হো লালসাই
ইয়ে বাটে পাল্‌টু হো!
ও হো চৈত-দাণ্ডার হো রাজা মায়না
হো লালসাই, হো তারি।
উঠ্‌, ডাকু হো রাজা লালসাই হো মায়না
হো তারি॥

কাবোংগা গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল উশ্‌-খুশ করে ওঠে। চয়ন উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকে। কি ভাবছে সে, তা সেই জানে। কিন্তু কাবোংগার অন্যান্য চেলিকদল তো আর চয়নের মতো অন্ধ নয়—তারা যে দু চোখ মেলে দেখেছে আগন্তুক মোটিয়ারীদের যৌবনপুষ্ট দেহ। রঙিলা-বেলোসা, ওদের মালকো, ওদের দুলোসা যেগানে গানে বলছে 'উঠ্‌, ডাকু হো রাজা লালসাই'—ওঠো রাজপুত্রের দল, লুটেরার মতো লুট করে নাও আমাদের উথ্‌লে-ওঠা যৌবন! ওদের রক্তের তালে তালে মান্দ্রিঢোলের দ্রিমিদ্রিমি বোল বাজতে থাকে।

কাবোংগার মোটিয়ারীরাও তো আর চয়নের মতো বধির নয়। তারা যে দুকান পেতে শুনেছে—কারাংমেটার ছেলের দল তাদের গানে গানে ডেকেছে, বলেছে—'ইয়ে বাটে পাল্টু হো রাজা ময়না হো তারি': ওগো আমার টুকটুকে ময়নার দল, এস আমাদের কোল ঘেঁষে দাঁড়াও—চৈত-পাণ্ডার উৎসবে পোষা ময়নার মতো আমাদের বাহু-বন্ধের খাঁচায় ধরা দাও। ওদের মনের তার কেক্‌রেঙ যন্ত্রের তারের মতো কাঁপতে থাকে সে গানের স্পর্শে।

চয়ন হঠাৎ মুখ তুলে তাকায়। কাকে যেন খুঁজতে থাকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে। লক্ষ্য করে দেখি রঙিলা-বেলোসা ঘরে নেই। শুধু রঙিলা নয়, মাল্‌কোও কখন বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেল ওরা? গেল কখন? চয়ন নিশ্চয় ওদের দুজনের মধ্যে একজনকে খুঁজছে। কিন্তু কাকে? একটু আগে কাবোংগার একটি ছেলে, কোতোয়ার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, লক্ষ্য করেছিলাম। এবার দেখলাম চয়নও উঠে বেরিয়ে গেল ঘটুল থেকে।

গুপ্তেজী ঘড়ি দেখে বললেন : রাত দশটা হল। চন্দন এবার ওঠা যাক। আর দেরি করলে নারায়ণপুরের কোন দোকান খোলা পাওয়া যাবে না। শোবার জায়গা পাওয়াও মুশ্‌কিল হবে।

কিন্তু নাটক সবে জমছে: এখন উঠে যাবার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। চয়ন-রঙিলা নাটকের মাঝখানে যবনিকা টেনে চলে যাওয়াটা কেমন পছন্দ হচ্ছিল না। তবু উঠতেই হল। গুপ্তেজী বললেন এরপর আমাদের থাকাটা আর বাঞ্ছনীয় নয়। সে কথা জানা ছিল না আমার।

এমনি উৎসব রজনীতে চোখে চোখে কথা হয় এদলে ওদলে। তারপর কোন ছুতোয় একজন উঠে যায় বাইরে। অপরজন সকলের অগোচরে তাকে অনুসরণ করে চুপিসারে। উৎসবমগ্ন ছেলেমেয়ের দল খেয়াল করে না। করলেও সে কথা গোপন করার রেওয়াজ আছে। নাচ-গান-খেলা-ধাঁধা চলতেই থাকে সমান তালে। তারপর আবার কখন পা টিপে টিপে ফিরে আসে ওরা। এক সাথে ফেরে না, আগে পিছে ফিরে এসে নিঃশব্দে মিশে যায় ভীড়ে। পরস্পরের দিকে আর তাকায় না। লক্ষ্য করলে হয়তো দেখা যাবে সেই মেয়েটির মাথায় উঠেছে একটা নতুন কাঁকুই, দৃষ্টি হয়েছে নত—সেই ছেলেটির ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসছে দুচোখ।

এসব কথা জানা ছিল না আমার। গুপ্তেজী লক্ষ্য করেছেন ঘর থেকে চারজন মানুষ বাইরে গেল একে একে। সুতরাং নাটকে আমাদের ভূমিকা খতম।

বিদায় নিয়ে এলাম না। নিঃশব্দে উঠে চলে এলাম দুজনে। ওদের উৎসব যেমন চলছে চলুক। বাইরে হরিতকী গাছের

তলায় দাঁড়িয়ে আছে কিমন্ত জীপটা। ড্রাইভার গড়িসড়ি মেরে ঘুমোচ্ছে তাঁর গর্ভে। আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে বসল। আমরাও উঠে বসলাম। কেলেঙ্কারী হল আড়ামোড়া ভেঙে জীপটা চোখ মেলতেই। যে অবাঞ্ছনীয় দৃশ্যটা এড়াবার জন্যে নিঃশব্দে পালিয়ে এলাম আমরা দুজন, সেই দৃশ্যটাই ফুটে উঠল হেড-লাইট জ্বলামাত্র। নিকষকালো অন্ধকারের যবনিকাটা খান্ খান্ করে ছিঁড়ে ফেলল জীপের আলোটা। দেখলাম নাটকের শেষ দৃশ্য কমেডি নয়, চরম ট্র্যাজেডি সেটা। ধড়মড় করে উঠে বসল দুজন গাছ-তলার ভূ-শয্যা ছেড়ে। রঙিলা-বেলোসা, আর না চয়ন নয়—কাবোঙ্গার কোতোয়ার। সর্ব-সমক্ষে টাঙ্গির কোপ মারার ভঙ্গি করলেও জনান্তিকে তাকেই বরণ করেছে আগুন-বরণ মেয়েটি। কাবোঙ্গার চয়ন-শিরদারকে নয়।

জীপটা ব্যাক করল। মোড় ঘোরার সময় আলোর ধূমকেতু সমস্ত তল্লাটটার উপর ঝাঁটা বুলিয়ে গেল যেন। সেই চকিত আলোয় দেখলাম তালাওয়ের ধারে সাবুগাছ তলায় বসে আছে চয়ন। একা। কাবোঙ্গার নিঃসঙ্গ নায়ক।

নারানপুরে যখন এসে পৌঁছলাম রাত তখন প্রায় এগারোটা। ভেবেছিলাম এত রাতে কোন দোকানপাট খোলা পাব না। ভুল ধারণা আমাদের। কাল মাড়াই বসবে। তারই তোড়জোড় চলেছে। হাটতলার পিছনেই সার্কাসের তাঁবু পড়েছে একটা। সেখানে সবাই জেগে আছে। দোকানপাটও খোলা আছে অনেকের। রাস্তার ধারে সেই মারবার-তনয়ের চায়ের দোকানটিও খোলা আছে। সেখানেই গিয়ে ওঠা গেল। দোকানদার ছোকরা বেশ চটপটে। দেখতেও বেশ সুপুরুষ, বছর বিশেক বয়স। আপ্যায়ন করে আমাদের বসাল, বললে : একটু বসে যান স্যার, গরম গরম পুরি ভাজিয়ে দিচ্ছি। মাংসও আছে, কিন্তু সে কি আপনারা খেতে পারবেন? তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বললে—ও মাংস ঐ জানোয়ারগুলোই গিলতে পারে, ও কি ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়? বরং আলু-কপির একটা তারতারিও চড়িয়ে দেই। দুটো উনুনেই আঁচ আছে, বিশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে।

গুপ্তেজী বললেন : বেশ, আমরা ততক্ষণ রাতে শোবার একটা ব্যবস্থা করে আসি। ডাকবাংলোতে কিম্বা ফরেস্ট রেস্ট-হাউসে সীট পাওয়া যায় কিনা দেখি।

ছোকরা বললে : বৃথা চেষ্টা স্যার। সব ভর্তি। হরেক রকমের মানুষ এই মওকায় নারানপুরে আসে মজা লুটতে। হুজুরের উচিত ছিল আগে থেকে ডাকবাংলো বুক করে রাখা।

গুপ্তেজী বললেন : তা তো ছিলই। কিন্তু আজ রাতে যে আমাদের কাবোঙ্গাতে থাকার কথা ছিল।

ছোকরা বলে : হুজুর যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা কথা বলতাম।

: বল।

: আপনাদের যদি নেহাৎ অসুবিধা না হয় তাহলে আমার গরীবখানাতেই আজ রাতটা কাটিয়ে যান। এ ঘরের পিছনেই আমার আড়ত। নেয়ারের খাটিয়া পেতে দিচ্ছি। এই রাতে কোথায় খুঁজতে যাবেন আশ্রয়?

ছোকরা আমাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। ও হরি, চায়ের দোকান এটা আদৌ নয়। ভিতরে ছোকরার ধানচালের আড়ত। একপাশে গাদা দেওয়া আছে ধানের বস্তা। তিসি, মশনে, সরষের স্তূপ। ও পাশে বিরাট ওজন-কাঁটা, বাটখারা, আর কুলুঙ্গিতে সিন্দুরচর্চিত সিদ্ধিদাতা গণপতি। কি নেই? চায়ের দোকানটা আসলে আড়তঘরের বারান্দা মাড়াই উপলক্ষে অস্থায়ী দোকান খুলেছে ছোকরা। ব্যবসায়ী বুদ্ধি ওর রক্তে। মেলার কদিনে যা পারে দু-পয়সা লুটে নিতে চায়।

গুপ্তেজীকে বলি : আর ইতস্তত করে লাভ নেই। এখানেই আতিথ্য নেওয়া যাক।

ছোকরা আমাকে দেখিয়ে গুপ্তেজীকে বললে : এ'কে তো চিনলাম না স্যার?

গুপ্তেজী প্রতিপ্রশ্ন করেন : আমাকে চেন?

: আপনাকে চিনব না স্যার? আদিবাসীদের মধ্যে কারবার ফেঁদেছি আপনাকে চিনব না?

গুপ্তেজী সংক্ষেপে আমার পরিচয়

দিলেম। ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। হিন্দি ছেড়ে এবার বাঙলায় বলে : হাঁ! আপনি বাঙলায় গপ্পো লিখেন? হামি বাঙলা ভি পড়তে পারি। কলকাতায় হামার চাচাজির আড়ত আছে। বড় বাজারে। আপনাদের বাঙলা গপ্পো হামার খুব ভালো লাগে। অনেক পাড়য়েছি। সবসে সেরা কহানিয়া হল মোহন। আপনি মোহনের কেচ্ছা পাড়য়েছেন?

গল্পেতজী জিজ্ঞাসা করলেন : মোহন কি কোন উদীয়মান বাঙালী কথা সাহিত্যিক।

সংক্ষেপে বলল, ম—না!

ছোকরা চাকরটা এসে খবর দিল খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

সে রাত্রে সেখানেই আতিথ্য নেওয়া গেল। এ কাহিনীতে এই দোকানদারটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নারাণপুর ছোট জায়গা। তাই দোকানদারটির প্রকৃত নামটা প্রকাশ করা উচিত হবে না। তার প্রিয় চরিত্রের নামটাই আপতত তার অভিধা হক। মোহন কিছুতেই খাবারের দাম নিল না।

বললে : রাতে আপনারা আমার অতিথি। কাল সকালে যা খাবেন তার দাম নেব। আজ রাত্রের জন্য আমাকে মাপ করতে হবে।

বুঝলাম, মোহন পাকা ব্যবসাদার। গুপ্তেজীকে হাতে রাখতে চায়। আমি বাঙলায় গল্প লিখি বলে নয়, গুপ্তেজীর দোস্ত হিসাবেই আমাকেও আহার আশ্রয় দিল সে। আদিবাসীদের সে নেহাৎ জানোয়ার মনে করে, কিন্তু আদিবাসী-অফিসারকে খাতির করতে পরাঙ্মুখ নয়।

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ একটু বেলা হল। গুপ্তেজী আগেই উঠেছেন। মোহনের সঙ্গে দেখা হতেই বললে : রাশিয়া আবার একঠো মেগাটন বোমা ফাটাইয়েসে।

বললাম : সে কি!

বললে : হাঁ! সকালের নিউস্ মে শুনলাম যে!

মোহনের একটি ব্যাটারি সেট রেডিও আছে।

হবেও বা। হয়তো সত্যিই সাইবেরিয়ার আকাশ এতক্ষণে ধোঁওয়ায় কালো হয়ে গেছে। নারানপুরে আকাশ বাতাসে তার চিহ্নমাত্র নেই। ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে। টাকা টাকা ছোপধরা রোদ্দুর। জেগে উঠেছে নারানপুরের হাটতলা। লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

মোহনের দোকানেই প্রাতরাশ সারা গেল। এবার দাম নিতে আর আপত্তি করল না। বিচিত্র দর্শন আদিবাসীরা দোকানের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আমরা বসেই আছি। একটু পরে মোহন এসে বললে : আপনাদের জন্যে ভিতরে আরাম কেদারা পেতে দিয়েছি। এখানে কেন কষ্ট করছেন, আসুন ভিতরে এসে আরাম করে বসুন।

খেয়াল হল। সাহেবি পোশাক পরা আমাদের দুজনকে দেখে ওর দোকানে খদ্দের আসছে না। অথচ আমাদের উঠে যেতেও বলতে পারে না বেচারি। তাই এই সুবন্দোবস্ত।

বললাম : এখন একটু বেরিয়ে আসি বরং। একাই ঘুরব একটু। গুপ্তেজী বললেন : ফটো যদি নিতে চান তাহলে একাই যান। দুজনে একসাথে গেলে ওদের 'ক্যান্‌ডিড' ছবি পাবেন না।

এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! ভয়ে ভয়ে বলি : ফটো তুলব? আপত্তি নেই তো কিছু?

হা-হা করে হেসে ওঠেন গুপ্তেজী : ও হরি! আপনি বুঝি তাই এতক্ষণ ক্যামেরাটাকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। কে বলেছে? মেহরা সাহেব বুঝি?

আমতা আমতা করে বলি : হাঁ, কে যেন সেদিন বলছিল আপনি মেহেরাজীর শালার ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছিলেন।

: ক্যামেরা নয়, এক্সপোসড স্পুলটা। তাকে রসিদও দিয়ে দিয়েছিলাম।

: আর তাকে নাকি বলেছিলেন তার জামাইবাবুর কোর্টে নালিশ করতে?

: ঠিক তাই।

: তাহলে আমাকে ফটো তুলতে দিচ্ছেন যে?

: সে আর এ?

শুনলাম ঘটনাটা। একদল আদিবাসী মেয়ে নাকি নদীতে স্নান করছিল। ওরা সাধারণত ঘাটে কাপড় ছেড়ে জলে নামে। মেহেরার শ্যালক ঝোপের আড়াল থেকে কয়েকটা স্ন্যাপ নেয়। মেয়েরা টের পায়নি, পেয়েছিলেন গুপ্তেজী। কেড়ে নিয়েছিলেন জোর করে ফিল্মটা। ছোকরা বলেছিল : আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন? ফটো তোলা কি সরকারী আইনে বারণ?

: সরকারী আইনে নয়, শালীনতার আইনে—বলেছিলেন গুপ্তেজী।

ছেলেটি বললেন : আপনি জানেন আমি কে? মিস্টার এল মেহরা আমার ভগ্নিপতি।

জবাবে গুপ্তেজী বলেছিলেন : তবে আর ভয় কি? তোমার জামাইবাবুর কোর্টে আমার নামে নালিশ কর। সাক্ষী সাবুদ লাগবে না, কাগজ দাও, আমি লিখে দিচ্ছি তোমার কাছ থেকে স্রেফ গায়ের জোরে তোমার একটা এক্সপোসড ফিল্ম কেড়ে নিয়েছি।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি : ডেভেলপ করিয়েছিলেন স্পুলটা?

: অত নোংরা মন আমার নয়!

একাই বেরিয়ে পড়লাম। হাটতলার পিছনে ফাঁকা মাঠটায় এসে বসেছে নিরাবরণ মাড়িয়ার দল। যাদের কোকামেটায় দেখেছি। কে জানে সেই 'মুয়ে আগুন' মেয়েটিও এসেছে কিনা। দেখলে তাকে নিশ্চয় চিনতে পারব; সেও পারবে আমাকে। রাস্তার উত্তর দিকে গাছের ছায়ায় ছায়ায় বসেছে মুরিয়ার দল। এক দলে পনের বিশজন। ওরা এই গাছতলাতেই ছিল কাল রাতে। নিবে যাওয়া ধুনি থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে এখনও।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম। হাটতলার গুঞ্জন ক্রমে কমে এল। হাটতলার দক্ষিণে বিরাট বড় তালাও। তার উঁচু পাড়ে গিয়ে উঠলাম। লালে লাল হয়ে আছে একটা পলাশ গাছ। ফিরতে হল সেখান থেকে। মেয়েরা স্নান করছে তালাওয়ে। ফেরার পথে দেখি দুজন লোক। আমার পিছু পিছুই আসছে তারা। অস্ফুটে কি যেন আলোচনা করছে। কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি না, তবে মনে হল আলোচ্য বস্তু বুঝি আমি নিজেই। কৌতূহল হল। গতি শ্লথ করলাম। দূরত্বটা কমে গেল। হাঁ, আমার সম্বন্ধেই ওরা কথা বলছে। হয় ওরা ছত্তিশগড়িয়া, না হলে রাজগোণ্ড। ওদের ভাষায় হিন্দী শব্দই বেশী। একটু কান করতেই দেখি ওদের কথাবার্তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

একজন বলছে : কিন্তু তাহলে লোকটা কে?

দ্বিতীয়জন বলছে : আমি যা বলছি তাই ঠিক—ও নিশ্চয় দণ্ডকারণ্যের লোক। মজা লুটতে এসেছে।

হা ঈশ্বর। আমি হলুম খাস কলকাত্তাইয়া। এমন স্যুটেড বুটেড হয়ে চালের মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর সেই আমি হলুম দণ্ডকারণ্যের মানুষ? কার চোখে? না, যারা খাস দণ্ডকারণ্যের অসভ্য অধিবাসী! একটু পরেই ভুলটা ভাঙলো। প্রথমজন বললে : কিন্তু দণ্ডকারণ্যের লোক হলে পায়ে হেঁটে বেড়াবে কেন? দণ্ড-কারণ্যের লোকেরা তো শুধু গাড়ি চড়ে।

তাই বল'। 'দণ্ডকারণ্যের লোক' মানে 'দণ্ডকারণ্য-উন্নয়ন-সংস্থার' রাজকর্মচারী।

দ্বিতীয়জন বললে : তুই একটা আকাট মুখ্যু। দণ্ডকারণ্যের সব লোকই কি গাড়ি চড়ে? এই তো আমাদের টুড়ু, সে তো দণ্ডকারণ্যে চাকরি পেয়েছে। পিয়ন হয়েছে। সে কি গাড়ি চড়ে? ও বোধহয় দণ্ডকারণ্যের উপরতলার লোক নয়। গাড়ি পায়নি এখনও।

আর সহ্য হল না। এরা ভেবেছে কি? আমাকে টুড়ুর সঙ্গে তুলনা করবে আর তাই মুখ বুজে সয়ে যাব? নাঃ। আলাপ করতে হবে ওদের সঙ্গে। ভালো করে আত্মপরিচয় দিতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। পিছন ফিরে দাঁড়াতেই লোক দুটি চোঁচা দৌড় মারলে। একবার ভাবলাম চেঁচিয়ে বলি : আমি দণ্ডকারণ্যের মানুষ বটে, তবে টুড়ু পিয়নের স্বগোত্র নই। তারপর ভাবলাম—যাক্ গে। ভয় পেয়ে পালিয়েই গেল যারা তাদের কাছে আত্মশ্লাঘা নাই বা জানালেম!

বেলা বারোটা নাগাদ একটা সোরগোল শুনলাম। কী ব্যাপার? না 'আঙ্গোপেন' আসছেন। আঙ্গোপেন? কে তিনি? উত্তর হল : কোথাকার ভূত এটা? আঙ্গোপেনকে চেনে না!

সাড়ম্বরে এসে পড়লেন আঙ্গোপেন। হাঁ চিনি বটে। সেই যাকে সোনপুরে বলেছিল কুরুংতুল্লা। শাল-কাঠের একটা চৌদোলা। কালো কুচকুচে রঙ। তেল মাখান তার গায়ে রুপালী পাতের চোখ আঁকা। চারজনে সেটা বয়ে নিয়ে আসছে। সঙ্গে অন্তত শ' পাঁচেক লোকের মিছিল। কেউ বয়ে নিয়ে চলেছে নিশান, কেউ আস্ত একটা গাছের ডাল। মাদকরসে সকলেই কম বেশী বেসামাল। পরে শুনলাম শুধু মাদকরসে নয়, ওদের উপর দেবতার ভর হয়েছে। তাই ওরা অমন করছে। আঙ্গোপেনকে যারা বয়ে নিয়ে চলেছে তাদের বাহ্যজ্ঞান আছে বলে মনে হল না। আঙ্গোপেন নাকি চলেছেন স্ব-ইচ্ছায়। বাহকরা তাঁর নির্দেশে কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে—কখনও বা পাশের ভীড় ঠেলে চলেছে পাশের দিকে। শেষ পর্যন্ত আঙ্গোপেন এসে পৌঁছালেন হাটতলায়। শিঙে বাজলো, টোরি বাজল, বাজল আরও কত বাদ্যযন্ত্র।

হুলুধ্বনি দিল মেয়েরা। খইয়ের মতো কি যেন ছড়িয়ে দিল বারে বারে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম, না খই নয়—ঐ রকম দেখতে কোন শস্য। আণ্ডেগাপেন হাটতলায় দাঁড়ালেন না কোথাও। যেমন হুড়মুড় করে ঢুকলেন একদিক দিয়ে তেমনিই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন আর একদিক দিয়ে। যাদের উপর দেবতার ভর হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ পড়ে রইল। কাটা মাছের মতো লাফাতে লাগলো। কেউ দু' ঘটি জল ঢাললো মাথায়, কেউ হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো। কোথায় কে জানে।

মেলার পুব দিকে একটা বড় জমায়েত। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। মোরগের লড়াই হচ্ছে। আর হচ্ছে রণপায়ের লড়াই। মোরগ-লড়াই আগেও দেখেছি রণপায়ের লড়াইটা নতুন। সেটাই দেখলাম খানিকক্ষণ। মনে পড়ল মুরভেন্দে দেখা রণপা-নাচ। মুরভেন্দে একটা ওয়ার্ক-সেন্টার তৈরী করার কাজ ছিল। মাঝে মাঝে যেতে হত সেখানে। সেখানেই দেখেছিলাম একবার রণপা-নাচ। রণপা কিছু নতুন জিনিস নয়। বাংলা দেশেও দেখেছি। গল্প শুনেছি সে যুগে ডাকাতেরা রণপা চড়ে রাতারাতি এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ডাকাতি করতে যেত। কিন্তু রণপার উপর চড়ে যে তালে তালে নাচা যায় এটা জানা ছিল না। সেবার তাই দেখেছিলাম মুরভেন্দে। এবার দেখলাম রণপায়ের লড়াই। দু-জনেই রণপায় চড়েছে—চেষ্টা করছে অপরজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে। কিন্তু দুজনেরই এমন ব্যালেন্স, পড়ি পড়ি করেও শেষ পর্যন্ত পড়ে না। সামলে নিয়ে আবার তেড়ে আসে।

হাটের পিছনে দুটো নাগর-দোলা খাটিয়েছে যেন কারা। প্রচন্ড ভীড় সেখানটায়। আদিবাসীদের খুব লোভ দেখলাম নাগর-দোলায় চড়তে। দল বেঁধে উঠছে আর হো হো করে হাসছে। কেউ কেউ আবার অনেক উৎসাহ নিয়ে উঠেই মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে বসে পড়ছে। মাথা ঘুরছে আর কি। কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম সেখানে। না দাঁড়ালেই বোধহয় ভালো করতাম। দূর থেকে এ আনন্দের উৎসাহটিকে একনজর দেখেই যদি চলে যেতাম তাহলে মনটা এমন বিষিয়ে উঠত না—কেন মরতে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলাম।

একটু দাঁড়াতেই নজরে পড়ল শুধু আদিবাসীরাই নয়, নাগর-দোলায় উঠছে একদল সভ্য জগতের মানুষও। স্থানীয় লোক নয়। চাকুরি সূত্রে যারা নারানপুরের কাছেপিঠে থাকে, তারা এসে জুটেছে মেলায়। তাদেরই একটা দল। কালরাত্রে মোহন* বলেছিল—'হরেক রকমের মানুষ এই মওকায় মেলায় আসে মজা লুটতে।' আজ সকালে সেই রাজগোন্ড লোকদুটিও কথা প্রসঙ্গে বলেছিল আমি মেলায় এসেছি—মজা লুটতে। 'মজা লোটা' বস্তুটায় অর্থ তখন বুঝিনি, এতক্ষণে দিব্যদৃষ্টি খুলেছে।

আওয়ারা বুশ্-সার্ট গায়ে গগল্স চোখে, সিগারেট ঠোঁটে ঐ কজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। নাগর-দোলার মালিক তা জানে। আদিবাসীদের কাছ থেকে সে নিচ্ছে এক পয়সা, আর আওয়ারা-বাবুদের কাছ থেকে নিচ্ছে চার আনা। তাই তার আপত্তি নেই। তাছাড়া দেখার মধ্যেও তে কিছুটা মজা আছে। সেটা তো মুফৎ। এক এক দোলনায় চারটি আসন। দুটি বা তিনটি মেয়ে কোন দোলনায় উঠলেই আওয়ারা দলের একজনের ডাক পড়ে। তারপর নাগর-দোলা যখন ঘুরতে থাকে তখন নাগর কি করেন কে আর দেখতে যাচ্ছে? নাগর-দোলা থামলে বিপর্যস্ত কাপড় চোপড় সামলে মেয়েগুলো পালাবার পথ খোঁজে আর আওয়ারাবাবু খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হাসতে হাসতে বন্ধুদের কাছে এসে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পূর্ববর্তী নাগরের চেয়ে যে তিনি আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছেন এটা প্রমাণ করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। মনে হল বাধা দেওয়া উচিত। মেলা অথরিটির কাছে গিয়ে কমপ্লেন করা উচিত। কিন্তু অনেক উচিত কাজ আমরা করি না নোংরামি এড়াবার জন্যেই। তবু কথা প্রসঙ্গে গুপ্তেজীকে বললাম। ভেবে দেখলাম, ব্যবস্থা যা করবার তা ওর মারফতেই হওয়া উচিত। শুনে গুপ্তেজী তো একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তৎক্ষণাৎ ছুটলেন নাগর-দোলা মুখো। আমি পিছু পিছু। একটা বিশ্রী সীন হবে মনে করে আমি যেখান থেকে সংকোচে সরে এসেছি, উনি বুনো-মোষের মতো ভীড় ঠেলে ছুটলেন সেদিকে। ভেবেছিলাম খুব কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করবেন উনি। কোথায় কি! উনি সোজা গিয়ে চেপে ধরলেন নাগর-দোলা মালিকের সার্টের কলার। লোকটা তো ভ্যাবাচাকা।

অপরাধটা কি তা বুঝবার আগেই ওর গলার বোতামটা ছিঁড়ল পট করে। অপরাধটা শুনে, স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে কিম্বা অস্বীকার করে বিচার চাইবে তা স্থির করার আগেই গালে পড়ল প্রচন্ড চড়! দেখলাম আওয়ারাবাবুর দল উর্ধশ্বাসে ছুটেছে যে যেদিকে পারে। শেষ পর্যন্ত নাগর-দোলার মালিক জড়িয়ে ধরল ও'র পা! রুদ্রনাটকের পড়ল যবনিকা!

মনে মনে বললুম—ছি ছি ছি! এই কি অফিসারোচিত ব্যবহার! অফিসার তো আমরাও। আমরা কি অভিযোগ পাই না? তদন্ত করি না? কিন্তু তার একটা নিয়ম তো আছে। অভিযোগ এলেই প্রথম কাজ হল—একটা নতুন ফাইল খোলা। তারপর এনকোয়ারি অফিসার নির্বাচন। তৃতীয়ত তাকে তদন্তের কতকগুলো ডেফিনিট পয়েন্ট-অফ-রেফারেন্স দেওয়া। চতুর্থ কাজ অধীন কর্মচারীর রিপোর্ট যতদিন টেবিলে 'পুট-আপ' না করা হচ্ছে ততদিন সে কথা স্রেফ ভুলে থাকা। আর এ ভদ্রলোক প্রথমেই বাঁ হাতে ধরলেন জামার কলার, দ্বিতীয়ত ডান হাতে চালালেন চড়! এ আবার কোন জাতের অফিসারি?

মনে হল ঠিকই বলেছিলেন ত্রিবেদী! এ লোক জংলীদের মধ্যে দিনরাত মেলামেশা করতে গিয়ে স্রেফ জংলী হয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

মস্কোর চিঠি

মস্কোতে যে বিশ্ব অস্ত্রবর্জন ও শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল তাতে নানা দেশের নানা লোক এসেছিলেন—লেখক, বৈজ্ঞানিক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিক, সমাজকর্মী প্রভৃতি। মূল সভা ছাড়াও তাঁরা নিজেদের আলাদা আলাদা দলে মিলিত হয়েছিলেন।

সাহিত্যিকরা মিলিত হয়েছিলেন 'লেখক ভবনে'। আজকের দুনিয়ায় যখন বাতাস ক্রমেই বিষিয়ে উঠছে তখন সাহিত্যিকরাও যে 'কিছু একটা করা চাই', বলে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন তখন শুধু শিল্পের কলাকৌশল নিয়ে মাথা ঘামাবার আর সময় কোথায়! তাই সভায় লেখকরা শান্তির জন্য তাঁদের আন্তরিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

বহুদেশের লেখকই এ বিষয়ে বলেছিলেন। কারো কারো বক্তৃতা অত্যন্ত গরম, স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট। তাঁদের বহুব্যবহার জীর্ণ বাঁধা লব্জ যখন ক্লান্তিকর ঠেকছিল তখন উঠেছিলেন জ'পল সার্ত্র। ছোটখাট্ট মানুষটি, বাঁ পা-টায় অল্প খুঁড়িয়ে চলেন। মোটা চশমার আড়ালে দুটি উজ্জ্বল চোখ। মুখের চামড়া কোঁচকান। নাকটা ছোট্ট হলেও তীক্ষ্ণ।

লেখা পড়ে সার্ত্রর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল—বিশ্লেষণপ্রবণ, কঠোর, কিছু পরিমাণে উদ্ধত—এই সভায় তা বদলে গেল। মনে হল বড় অসহায়, অত্যন্ত বিনয়ী। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঠেকেছিল তাঁর প্রসন্ন হাসিটি।

সার্ত্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পূব আর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ব্যবধান এবং বিরোধ ঘুচিয়ে তাদের মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে। সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে স্নায়ুযুদ্ধের কুপ্রভাব থেকে। মানুষের সংস্কৃতি আজ শুধু ভয়াবহ যুদ্ধের দ্বারাই নয়, বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের ফলেও বিপন্ন। এই বিচ্ছেদের কারণেই সাংস্কৃতিক কাজ বিশ্ব তাৎপর্য হারাচ্ছে। বিশ্ব সংস্কৃতির মিলন সাধন হল এ কালের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য। "সংস্কৃতিকে করতে হবে অস্ত্রমুক্ত, তাকে শান্তির উপকরণে পরিণত।"

সার্ত্রর পর অনেকেই ওঠেন বক্তৃতা মঞ্চে। এক তরুণ বৃটিশ সাহিত্যিক রোনাল্ড স্যামসন সোজাসুজি বলেন, একদিকে আইজায়া বের্লিন প্রমুখ সমালোচকদের ক্ষতিকর সাহিত্যাদর্শ, অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের পথ, আরেকদিকে মার্ক্স-লেনিনবাদের অন্ধ প্রয়োগ—এ দুটোই ত্যাগ করে সাহিত্যিকদের নিতে হবে এ দেশেরই মহান শান্তিকর্মী ও সাহিত্যিক তলস্তয়ের মুক্ত মানবদরদী আদর্শ।

প্রথম সারের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের একটি আসনে বসেছিলেন ইলিয়া এরেনবুর্গ। কয়েকদিন আগেই তাঁকে দূর থেকে দেখেছি বিশ্ব শান্তি ও অস্ত্রবর্জন সম্মেলনের মূল সভার প্রেসিডিয়ামে। সেখানে তাঁর সামনের সারিতে বসেছিলেন নিকলাই তিখনোভ দৃপ্তভঙ্গীতে। পিছনের আসনে এরেনবুর্গকে মনে হয়েছিল একটু সংকুচিত, দুর্বল ও বিব্রত। সবাই যখন সেখানে অন্যদের বক্তৃতা শুনে হাততালি দিচ্ছিলেন, এরেনবুর্গ তখন চুপ, এমনকি খ্রুশ্চেভের বক্তৃতার সময়েও।

এই সভায় দেখলাম বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়লেও এরেনবুর্গের মুখের ভাব অত্যন্ত সজীব। নাক থেকে ঠোঁট ও থুতনি—মুখের এই অংশটিতে কোথাও যেন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল আছে। চোখ দুটিতেও সে রকমই 'সব কিছুতেই মজা পাচ্ছি' এমন একটা ভাব। হাসিটিও অবনীন্দ্রনাথের মতোই সরল ও শিশুসুলভ। সভাপতি নাজিম হিকমেৎ এরেনবুর্গকে কিছু বলার অনুরোধ করতে সারা ঘর তাকে জোর হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

এরেনবুর্গ প্রথমেই বললেন, "আমার বন্ধু জ' পল সার্ত্রর বক্তৃতা শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু আমরা তো প্রস্তাব-লেখক নই, আমরা বইয়ের লেখক। এবং সেই বইগুলো অনেক সময়েই প্রস্তাবের চেয়ে বেশি দিন টিকে থাকে।"

এরেনবুর্গ বলেন, "একালে আমাদের আত্মিক জগৎ প্রযুক্তির জগতের অনেক পিছনে পড়ে গেছে। বিজ্ঞানের তুলনায় শিল্পের এই অনগ্রসরতা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে কোন কীর্তিই যে করেই হোক না কেন স্নায়ুযুদ্ধের অংশ হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন শেকসপীয়র কখনো সমরবন্দীদের হাতিয়ার হতে পারেন না।"

বক্তৃতা প্রসঙ্গে এরেনবুর্গ বলেন, "আমাদের দেশ এখন উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে অনেক উঁচু মানে উঠেছে। কিন্তু তবু আমাদের তলস্তয় বা পুশকিন নেই কেন? পশ্চিমেও তেমনি কেন নেই বালজাক, স্তাঁদাল, ডিকেন্স—আমি কেবল উনবিংশ শতাব্দীর কথাই বলছি। জনসমাজের মন গড়ে তুলতে পারেন এমন লেখক আমাদের নেই কেন?"

এরেনবুর্গ বলেন, "প্রস্তাব পাশ করে কোন লাভ হবে না। এমন ভাবে কাজ

জাঁ পল সার্ত্র ইলিয়া এরেনবুর্গকে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন

করতে হবে যাতে লেখকরা সমাজের নেতৃস্থানে অধিষ্ঠিত হন।"

এরেনবুর্গ আরো বলেন, "লেখকের দায়িত্ব আছে তাঁর পাঠকের প্রতি—এ কথা যে লেখক না বোঝেন তিনি হয় পেশকার নয় ভাড়া খাটিয়ে। শুধু যে নিজের লেখার প্রতিই লেখকের দায়িত্ব তা নয়। যা কিছু লেখা হয়েছে এবং বিশেষ করে যে সব বই লেখা হবে তাদের প্রতিও লেখকের দায়িত্ব আছে। সাহিত্যিকদের দায়িত্ব রয়েছে বিশ্বের শিশুদের প্রতি যাদের মধ্যে থাকতে পারেন ভাবী কালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্তাঁদাল, চেখভ।"

বক্তৃতার শেষে এরেনবুর্গ বলেন, "প্রয়োজন পৃথিবীর সব সাহিত্যিক মিলে একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করা।"

সভায় ভারতীয় সাহিত্যিকও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেনঃ নীলমণি ফুকন, গোপাল হালদার, মুলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর প্রভৃতি। ভারতীয়দের তরফ থেকে প্রথম বক্তৃতা দেন নীলমণি ফুকন। স্পেনের আনা মারোনার বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলে। কারণ মারোনার জীবনের ২৩টি বছর কাটে ফ্রাঙ্কোর জেলে। তাঁর দেশে সাহিত্যিকদের যে অবস্থা তাতে "আয়াসে বসে, সৃষ্টির কল্পনা রচার সময় তাঁদের নেই।" অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাক, বহু ঝড়ঝাপটা খাওয়া এই লেখককে দেখে মনে হচ্ছিল—আমাদের দেশে "কালচারাল ফ্রীডমের" নামে অনেককেই আন্দোলন করতে দেখি, লীদিয়া ইভিনস্কায়ার কারাবাসে নাকি আমাদের কোন কোন তরুণ সাহিত্যিকের রাগে 'গলা বুজে' আসে, কিন্তু স্পেনের এই লেখক যে ২৩ বছর জেল খাটলেন, আরো অনেক লেখক যে এখনো ফ্রাঙ্কোর জেলে পচছেন, কই এঁদের কথা তো তাঁরা কেউ বলেন না! নাকি, 'ফ্রীডম' জিনিসটা শুধু তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক শিবিরেই কাম্য, অন্য শিবিরে তার কল্পনাটাও দুরাশা!

সভার লেখকরা শুধু প্রস্তাব আলোচনাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। করিডরে দেখি সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের প্রধান সেদিন পাইপ মুখে এক কোণে বসে গল্প করছেন যুগোস্লাভিয়ার লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক ব্রাজে কনেচ্কির সঙ্গে। আলাপ করছেন কুবা থেকে আগত সাহিত্যিকরা আর পাবলো নেরুদা।

পরদিনই লেখকরা আবার মিলিত হন দুপুর তিনটে থেকে। সোভিয়েত লেখক সঙ্ঘের তরফ থেকে সেদিন তাঁদের আমন্ত্রণ জানান হয়। প্রবীণ নবীন বহু সাহিত্যিক সেদিন সমবেত হয়েছিলেন। ভিতরে ঢুকেই দেখি 'লেখক-ভবনের' ছোট্ট বইয়ের দোকানটিতে বিশেষ ভিড়, ইভতুশেংকোর সদ্য প্রকাশিত 'হাতনাড়া' বইটির জন্য। এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রথমে ছিল খানাপিনা। সরু অলিন্দ পেরিয়ে খাবার ঘরের দিকে যাবার সময় মনে পড়ছিল 'যুদ্ধ ও শান্তির' পিয়ের বেজুখভের অভিজ্ঞতা ফ্রি মেসনদের সমাজে। লেখক-ভবনের' পিছনদিকের কাঠের থাম, কাঠের সিলিং আর কাঠের মেঝেওয়ালা ঘরগুলোতেই ছিল তলস্তয় বর্ণিত ফ্রি মেসনদের ডেরা। পুরনো দিনের সেই রহস্য এখনো যেন দূর হয়নি। অনুষ্ঠান সূচীতে আর ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শন আর কবি-সম্মেলন। যে নতুন চলচ্চিত্রটি সেদিন দেখান হয় তার কথা একটু বলব। কারণ 'সূর্যের অনুসরণ' একটি অত্যাশ্চর্য ছবি। চার বছরের ঝগড়াঝাঁটির পর ছবিটি এখন প্রদর্শিত হচ্ছে। গল্প তাতে কিছুই নেই—একটি ছোট্ট ছেলে ঠিক করেছে সূর্যের পিছন পিছন সে যাবে। সেই অনুসরণের সময়েই সে জীবনের ছোটখাট অনেক ছবি দেখে। এমন একটি চিত্রকল্প সমৃদ্ধ প্রতীকী ছবি খুব কমই দেখা যায়। বোধ হয় আইজেনস্টাইনের পর এত ভাল ছবি এদেশে আর তোলা হয়নি। ছবিটি রঙিন। আলোকচিত্রশিল্পী নতুন আঙ্গিকে যে সব অপূর্ব দৃশ্য তুলেছেন তা শিল্পীর তুলিতে হার মানায়। এবং দর্শকরাও ঐ ছোট্ট ছেলেটির মতো সূর্যমাতাল হয়ে ওঠেন। ছবিটি অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত পেলব। সূর্য এখানে ভালোর প্রতীক, অন্ধকার মন্দের, কৃত্রিমতার। এমন ছবি দেখে নিজের মনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার নানা দৃশ্য স্মরণ করা যায়, তার রস ফিরে ফিরে আস্বাদন করা যায়।

লেখকদের সভায় ছবিটি দেখান খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল কারণ এই চলচ্চিত্রটিও আসলে একটি অতি সুন্দর কবিতা। এবং সোভিয়েত লেখকরাও যদি মলদাভিয়ার চলচ্চিত্রকর্মীদের এই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হন, নতুন ভাবে জীবনের অত্যন্ত মৌলিক প্রয়োজনের কথাগুলো বলেন তাহলে সাহিত্যও উপকৃত হবে।

শুভময় ঘোষ

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ২৭ ॥

ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, "চিনতে পারছি না তো ঠিক।"

"আমাকে আপনি একবার দেখেছিলেন কিন্তু।"

"কোথায় ?"

"এখানকার রেল লাইনের ধারে ডিসস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে। আমি সেদিন সন্ধ্যার পর সেখানে একটা ব্যাগ কুড়োতে গিয়েছিলাম—"

"ও, মনে পড়েছে।"

খুশীতে ঝলমল করে উঠল তাঁর মুখখানা। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা তুলে বললেন —"এই যে, স্মৃতি-চিহ্ন এখনও রয়েছে। তারপর, এখানে এখন কি মনে করে।"

"হালদার মশাইয়ের কাছে শুনেছিলাম, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। এতদিন সুযোগ হয়নি, আজ একটু সময় পেয়েছি।"

"বস। মাটিতেই বসবে? এখানে তো বসতে দেবার কিছু নেই। তোমার শাড়িখানা নষ্ট হ'য়ে না যায়।"

সুঠাম মুকুজ্জো একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজে মাটিতেই বসেছিলেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, কিন্তু ঝিনুকও যে তাই করবে, এটা তিনি প্রত্যাশা করতে পারছিলেন না।"

"আমি মাটিতেই বসছি—"

"তাহলে ওইখানে ওই দূর্বাঘাসগুলোর উপর বস।"

ঝিনুক বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কোথায় থাক ?"

"এখানে কুলচকে আমাদের একটা বাসা আছে। তবে [illegible] বেশীর ভাগ ডাক্তার ঘোষালের বাসাতেই থাকি। কাজ করি তাঁর বাড়িতে।"

"ও। এখানেই কি তোমাদের দেশ ?"

"না। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক।"

"রেফিউজি বুঝি ?"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে শাণিত হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ। ওই নামেই আপনারা আমাদের অভিহিত করেছেন। কিন্তু আমরা এই ভারতবর্ষেরই লোক, ভারতের বাইরে থেকে আসিনি। বিদেশী র‍্যাডক্লিফ সাহেব দেশের উপর একটা লাইন টেনে দিয়েছেন বলে' আর আমাদের তথাকথিত নেতারা সেটা মেনে নিয়েছেন বলে' আমরা পর হয়ে যাইনি। জোর করে' ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তারপর আমাদের রেফিউজি বলে' অনুকম্পা করবার রেওয়াজই হয়েছে আজকাল। এদেশের লোকেদের যদি ভদ্রতাবোধ থাকত, তাহলে তারা আমাদের রেফিউজি না বলে' অতিথি বলতেন এবং সেইভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন।"

সুঠাম মুকুজ্জো চমৎকৃত হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে' তিনি বললেন, "অতিথিও তো পর। উচিত ছিল আত্মীয়ের মত ব্যবহার করা। কিন্তু যা উচিত, তাতো সব সময় হয় না। শুধু এখানে নয়, পৃথিবীর কোথাও হয় না। যা পাওয়া যায়, সেইটেই যথালাভ, তাই নিয়েই সুখী হতে হয়।"

"যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তারা সব সময়ে সব জিনিস মেনে নিতে পারে না। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু প্রতি গ্রাসে অপমানের বালি কিচকিচ করছে। প্রতি মুহূর্তে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। রেফিউজি শব্দটা যোগরূঢ় শব্দের মতো আজকাল একটা বিশেষ অর্থ বহন করে, যার অর্থ ঘৃণ্য, কিন্তু কৃপার পাত্র। আপনার মুখ থেকে ও কথাটা শুনব আশা করিনি।"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। রোদে আর রাগে লাল হ'য়ে উঠেছে মুখটা। অনুভব করলেন, তপ্ত লোহায় হাত দিলে হাতে ছেঁকা লাগবে এখন। ও প্রসঙ্গ এখন চাপা দেওয়াই ভালো। কিন্তু ঠিক চাপা দিতেও পারলেন না।

বললেন, "তোমাকে রেফিউজি বললে তুমি কষ্ট পাবে, একথা জানলে ও কথা উচ্চারণ করতুম না। আমার কাছে কেউ ঘৃণ্য বা কৃপার পাত্র নয়। বিশ্বাস কর, তোমাদের কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হয়। কিন্তু কি করব? একটু তাকিয়ে দেখলেই বোঝা

যায়, পৃথিবীতে সুবাই কোন না কোন ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। দুঃখের বিরাট সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। তা সত্ত্বেও যারা হাসিমুখে সাঁতার কাটতে পারছে, সমুদ্রটাকে নিয়ে দিনরাত হা-হুতাশ করছে না, তারাই কতকটা সুখী।"

ঝিনুকের মুখে হাসির সামান্য আভা ফুটল।

"আমরাও সাহস করে' সাঁতার কেটে চলেছি। কিন্তু মুখে হাসি এখনও ফোটাতে পারিনি। জানি না, তা কবে ফুটবে। হয়তো ফুটবেই না।"

"ফুটবে বইকি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। অনিবার্য দুঃখের সঙ্গে ভাব করে' সে শেষকালে হাসে। শোক ভুলে যায়, দুর্ভাগ্য ভুলে যায়, ক্ষয়ক্ষতি সব ভুলে যায় সে। খাপ খাইয়ে নেওয়াই জীবনের ধর্ম।"

"তাই কি? আমার তো মনে হয়, সবচেয়ে নির্বিকার প্রাণহীন তো পাথর। সে-ই সব সময়ে সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তার উপর যত অত্যাচারই হোক, সে প্রতিবাদ করে না। যাদের প্রাণ আছে, তারাই প্রতিবাদ করে।"

"ঠিক বলেছ। প্রতিবাদ করাও জীবনের

লক্ষণ। খুব বড় লক্ষণ। কিন্তু প্রতিবাদেরও একটা সীমা আছে। নিষ্ফল প্রতিবাদ অর্থহীন। জীবনে এমন অনেক দুঃখ আছে, যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে' কোনও লাভ নেই। এই ধর না, গ্রীষ্মের, বর্ষার বা শীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে' ওদের নিবারণ করা যায় না। বড়লোকেরা এয়ার-কণ্ডিশনড্ (air-conditioned) বাড়িতে থাকতে পারেন, দার্জিলিং সিমলা যেতে পারেন, বর্ষাকালে বর্ষাতি গায়ে দিতে পারেন, শীতকালে আগুন জ্বালাতে পারেন, কিন্তু সব লোক তা পারে না। তারা কষ্ট পায় এবং শেষ পর্যন্ত সেটা মেনে নেয়। কষ্টের সঙ্গেই তারা তখন আপোস করে এবং আপোস করে সুখে থাকে তখন। ওই কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতাও তখন তাদের মধ্যে জাগে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে adaptibility বলে। অনিবার্য বিরুদ্ধ পরিবেশে সব প্রাণীই নিজেকে adapt করে' নেয়। এই adapt করবার শক্তি মানুষেরই সবচেয়ে বেশী। আফ্রিকার দারুন গরমে, হিমালয়ের হাড়-কাঁপানো শীতে, অরণ্যে, মরুভূমিতে, শহরে, গ্রামে, সর্বত্রই মানুষ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং অধিকাংশ লোকই সুখে আছে। অনেকে আবার দুঃখকেই সুখের চেয়ে বড় স্থান দিয়েছে। কুন্তীর কথা নিশ্চয় পড়েছ। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে বর দিতে চাইলেন, তিনি বললেন, আমাকে দুঃখ দাও। আমিও অনেক লোক দেখেছি, যারা দুঃখকেই পছন্দ করে, সুখের চেয়ে দুঃখই তাদের কাছে কাম্য। আর এটাও ঠিক কথা, বাইরের দুঃখকে মেনে নিলে মনের ঐশ্বর্য বাড়ে। সেটা পরম লাভ।"

ঝিনুক বলল, "আপনি যেসব কথা বললেন, তা খুবই জ্ঞানগর্ভ। কিন্তু দুঃখের তীব্র কশাঘাতে, অপমানের মর্মান্তিক জ্বালায়, অবিচারের নিষ্ঠুর পীড়নে যারা অহরহ ক্ষতবিক্ষত, আপনার ওসব কথায় তারা মোটেই সান্ত্বনা পাবে না। নিজেদের স্বার্থের তাড়নায় যে বেপরোয়া ড্রাইভার অসহায় পথিকদের চাপা দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে' দেয়—দুঃখের সৃষ্টিকর্তা বলে' তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবার বা তাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করবার প্রেরণা আর যেই পাক, সেই হতভাগ্য পথিকরা পাবে না। দুঃখের মহামূল্য রত্ন তাদের উপহার দিয়েছে বলে' সে ড্রাইভারের পূজোও তারা করবে না। আমরা যে রকম দুঃখে পড়েছি, আপনি যদি সে রকম দুঃখের মুখোমুখি হতেন, তাহলে হয়তো আপনার গলা দিয়ে অন্য সুর বেরুত। যাঁরা আরামে বিলাসের কোলে লালিত হন, যাঁরা চর্বচুষ্যলেহ্য পেয়ে, সব রকম খাবার খেয়ে, সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাখার তলায় আরাম কেদারায় শুয়ে থাকেন, তাঁরাই সাধারণত দুঃখের জয়-গান করেন, আপনি এখন যেমন করলেন। ওসব জ্ঞানগর্ভ কথা আমাদের কাছে অর্থহীন।"

ঝিনুকের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হ'তে লাগল।

ডাক্তার মুখার্জি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে চেয়ে রইলেন মাটির দিকে। তাঁর পায়ের কাছে যে দুর্বাঘাসগুলো ছিল, তাদের কাছেই তাঁর মন যেন আশ্রয় ভিক্ষা করতে লাগল।

তারপর একটু ইতস্তত করে' বললেন, "আমি খেয়ে পরে' সুখে থাকি, এটা আমার অপরাধ নয়। সুখে থাকি বলেই দুঃখ সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল, এটা মনে করলে আমার উপর সুবিচার করা হবে না। মানুষের দুঃখ নিয়ে সত্য চিন্তা করেছেন, এরকম অন্তত দুটি লোকের খবর আমি জানি, যাঁরা ধনীর সন্তান ছিলেন। একজন গৌতম বুদ্ধ, আর একজন কার্ল মার্কস। এঁরা ধনীর সন্তান ছিলেন বলে' এঁদের চিন্তাধারা অপাংক্তেয় হয়ে যায়নি। আমি অবশ্য ওঁদের মতো অত বড় নই, ওঁদের ধারে-কাছেও যেতে পারি না, আমি নতুন কথাও কিছু বলছি না, কিন্তু আমি খেতে পরতে পাই বলে' এবং আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে নয় বলে কি আমার চিন্তা করবারও অধিকার নেই? বিশ্বাস করবে কি না জানি না তোমাদের দুঃখ যে কি তা সত্যিই আমি বুঝতে পারি, যে চক্রান্তের ফলে তোমরা আজ বিপন্ন তারও স্বরূপ কিছু কিছু জানি, যতটা পারি তোমাদের সাহায্যও করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানি দুর্ভাগ্যকে সহ্য করবার কৌশল অর্জন করতে না পারলে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। বেশী লম্ফ ঝম্প করলে উত্তপ্ত কঠাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়ে' যাবারও ভয় থাকে। কথাটা উঠল বলেই যা আমি বিশ্বাস করি তাই তোমায় বললাম। আমার কথা না মানবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে। তর্ক করে' কাউকে স্বমতে আনবার আগ্রহও আমার নেই। আগে ছিল। এখন বুঝেছি ও চেষ্টা বৃথা। জবাকে অপরাজিতা করা যায় না। যাক্ ওসব কথা—তোমার সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় যে ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে ঘোঘা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। তিনি যে রেলওয়ে ড্রাইভার তা জানতাম না। তিনি কি এখানেই থাকেন? তাঁর কি খবর?"

"এখানে তাঁর একটা বাসা আছে শুনেছি। কিন্তু সেখানে শুনেছি তিনি প্রায় থাকেন না। আমার সঙ্গে হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁর ঠিক খবর আমি জানি না। তিনি ভব-ঘুরে লোক।"

ডাক্তার মুখার্জি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে। তারপর একটু থেমে বললেন, "সেদিন কেন জানি না মনে হয়েছিল লোকটির সঙ্গে তোমার ভাব আছে। আর তা মনে হওয়াতে সমস্ত মন এমন মাধুর্যে ভরে গিয়েছিল যে রিভলভারের গুলী খেয়েও তার রেশ কাটেনি।

তোমার সেই ভব-ঘ্রুরে বন্ধ্রটির সংগেও আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। তাকেও এন একদিন।"

ঝিন্রক আনতচক্ষে ম্রদ্রকণ্ঠে বলল, "স্রযোগ পাই তো আনব।"

তারপর বলল, "আমি কথায় কথায় বড় রেগে যাই। আপনাকে এখন যেসব কট্র কথা বললাম তার জন্যে আমায় মাপ কর্রন। আমি জানি আপনি মাপ করবেন। কিন্তু আমি—"

হঠাৎ ঝিন্রকের কণ্ঠ বাষ্পর্রদ্ধ হয়ে গেল, সে আর কিছ্র বলতে পারলে না। তার চোখ দিয়ে বোধ হয় জলও বেরিয়ে পড়ল একট্র।

"ছি, ছি, কি ছেলেমান্রষ তুমি"—শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার ম্রখার্জি। "তুমি যা বললে তাতে আমার একট্রও রাগ বা দ্রঃখ হয়নি। বরং আমি খ্রশী হয়েছি। অবশ্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম একট্র, কিন্তু চমকে গেছি তোমার কথা শ্রনে। মনে হচ্ছিল একটা খাঁটি হীরে যেন

ঝলমল করে' উঠল রোদের ঝলক লেগে। তুমি যদি মতের অমিল সত্ত্বেও আমার কথায় ক্রমাগত 'হাঁ' দিয়ে যেতে তাহলেই বরং খারাপ হত, যা দেখলাম তা দেখতে পেতাম না। তোমার অনন্যতার পরিচয় দিয়েছ এতে রাগ বা দুঃখ করব কেন?"

ঝিনুক কয়েক মুহূর্ত নতমুখে বসে রইল তবু। তারপর বলল, "আমি যেজন্য আপনার কাছে এসেছি সেইটেই বলা হয় নি এখনও।"

"সেটা আবার কি।"

ঝিনুক ব্লাউসের ভিতর থেকে তনিমার চিঠিটা বার করে দিলে, যে চিঠিটা সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে পেয়েছিল তেপায়ার উপর। হাসপাতাল যাওয়ার আগে চিঠিটা ডাক্তারবাবুকেই লিখে ছিল তনিমা।

"এই চিঠিটা আপনাকে দিতে এসেছি। এটা আপনারই চিঠি। তনিমা হাসপাতাল যাওয়ার আগে এটা লিখে রেখে গিয়েছিল।"

সুঠাম মুকুজ্যে চিঠিটা পড়ে' খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন।

"সে কি! তনিমা মারা গেছে!"

"না, মারা যায় নি। আপনি তাকে যে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি অতি বিচক্ষণ লোক। অপারেশন করে তিনি বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তনিমাকে। সে হাসপাতালে বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছিল। গায়ে একটু জোর পেয়েই কিন্তু সে হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে—"

"পালিয়েছে? বল কি! কোথায় গেছে খবর পেয়েছ কি-"

"ঠিক খবর পাই নি। তবে মনে হয় এদেশে নেই, ইয়োরোপে গেছে।"

তারপর একটু থেমে বললে, "আমি ভেবেছিলাম আপনাকে হয়তো জানিয়েছে কিছু।"

"আমাকে? না, কিছু জানায় নি। তাকে কলকাতা পাঠাবার পর তার আর কোনও খবর আমি জানি না। এ তো বড় অদ্ভুত হল। ইয়োরোপ গেছে কি করে' জানলে?"

"কোথা গেছে তা ঠিক জানি না। আমার বোন শামুক মিস্টার সেনের বাড়িতে চাকরি করত। সে-ও পালিয়েছে। আজ তার একটা ছোট চিঠি পেয়েছি লণ্ডন থেকে। এই যে—" আর একটা চিঠি সে বার করে' দিলে ডাক্তারবাবুকে।

ডাক্তারবাবু ভ্রুকুঞ্চিত করে পড়লেন :

শ্রীচরণেষু,

দিদি, শিকল কেটে আকাশে উড়েছি। বিরাট আকাশ। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। তনুদি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি যে লোকটির সঙ্গে এখানে এসেছেন তিনি অসাধারণ লোক। বড় ব্যাংকার একজন। অনেক রকম ব্যবসাও আছে তাঁর এদেশে। তিনি আমাকে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন আশ্বাস দিয়েছেন। ওরা বোধ হয় কিছুদিন পরেই ইয়োরোপে টুরে বেরবে। আনন্দে এবং সসম্মানে আছি। একটুও ভেব না তুমি। কাকাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তুমিও চলে এস এখানে। খোকনও আমার সঙ্গে এসেছে। তাকে এখানেই স্কুলে ভর্তি করবার চেষ্টা করছি। আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তনুদিই করেছেন। তুমিও এস। এখানেই ঘর বাঁধব আমরা। এদেশের অনেক দোষ আছে, কিন্তু এদের প্রধান গুণ এরা জীবন্ত। আর ভিতরে যা-ই থাক বাইরে খুব ভদ্র। আমাদের দেশের ইতিহাস পড়ে আশা হয়েছিল যে এমন মহিমময় যাদের ইতিহাস সে দেশে নিশ্চয়ই মানুষের মতো মানুষ আছে। কিন্তু বিপদে পড়ে এক ডাক্তার ঘোষাল ছাড়া আর জীবন্ত মানুষ চোখে পড়ল না। অধিকাংশই প্রেত, পিশাচ আর শয়তান। মরা ইতিহাসের শুকনো পাতার ভাষ্য করে আর ভণ্ডামির ধ্বজা উড়িয়ে সবাই নিজেদের মতলব হাসিল করবার তালে আছে। তনুদি তোমাদের ডাক্তার মুখার্জির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। বললেন তাঁকে চিঠি লিখবেন। তোমাকেও লিখবেন। তুমি ও কাকা আমার প্রণাম জেনো। ইতি

শামুক

চিঠি পড়া শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন, "কই আমি তার কোন চিঠি পাইনি তো।"

"আমিও পাইনি। আশা করে এসেছিলাম আপনার কাছে কিছু খবর পাব।"

"ভেব না। খবর আসবেই একটা।"

ঝিনুক ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

"আপনি এখানে এসে কি করছিলেন?"

"কিছুই করছিলাম না। নিজেকে নিয়ে ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এখানকার হলদে পাখিগুলোর সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া। কিন্তু তারাও বিশেষ আমল দিল না। শুনলাম একটা পাখি তার সঙ্গিনীকে বলল, 'ওগো শুনছ খিল খোল'। বলেই দুজনে উড়ে গেল। তারপরই তুমি এলে।"

"'ওগো শুনছ, খিল খোল' বললে পাখিটা?"

"হঠাৎ আজ আমার তাই মনে হল। এতদিন ওদের ডাক শুনেছি, আগে এ রকম মনে হয়নি। আজ যেন স্পষ্ট শুনলাম বলছে, 'ওগো শুনছ, খিল খোল'। মনে হল সবার অন্তরের এই আকুল প্রার্থনাটা হলদে পাখির কণ্ঠেও আজ শোনা গেল। বলতে পারি না, হয়তো ভুল শুনেছি।"

ডাক্তারবাবুর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এমন সময় গাছের উপর থেকে শব্দ হল, 'টিটি'। "হলদে পাখি এখনও আছে গাছে, পালায় নি। এই বটগাছটাকে খুব ভালবাসে ওরা। ওইখানেই ওদের আড্ডা।"

ঝিনুক উৎসুক দৃষ্টি তুলে বটগাছটার দিকে চাইতে লাগল।

"কই দেখতে পাচ্ছি না তো?"

"চট্ করে দেখা যাবে না। খুঁজে খুঁজে একটু কষ্ট করতে হবে। খুব দুষ্টু পাখি, প্রায়ই পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে, কাকের মতো 'ফরোয়ার্ড' নয়। দেখতে চাও তো ওঠ।"

"চলুন।"

ঝিনুককে নিয়ে বাইনকুলার গলায় ঝুলিয়ে সুঠাম মকুজো সোৎসাহে বটগাছটা প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

ভাগলপুরের একটা হোটেলে সুবেদার খাঁ বই পড়ছিলেন একা একটা ঘরে বসে। সুবেদার খাঁ এক ঠিকানায় বেশী দিন থাকেন না। অধিকাংশ সময়ে নানা হোটেলেই থাকেন তিনি। যে হোটেলে সিংগল সীটেড রুম পান সেই হোটেলেই যান। হোটেলের আভিজাত্য বা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাদ-বিচার নেই। তবে একা একটা ঘর পাওয়া চাই। সেদিন তাঁর সাহেবগঞ্জে থাকার কথা, কিন্তু সেখানে ডিউটির চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি চলে এসেছেন ভাগলপুরে। সাহেবগঞ্জের হোটেলে সিংগল সীটেড্ রুম সেদিন পান নি। তাই ভাগলপুরে এসেছেন। তাঁর পড়ার নেশা খুব প্রবল। নির্জন ঘরে একা বসে তিনি পড়তে ভালোবাসেন। উপন্যাস পড়েন না, ইতিহাসের বই পড়েন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বই। চারটে ভাষা জানা আছে—হিন্দী, উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজী—সুতরাং নানারকম বইও পান। দেশের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান দেশের ভবিষ্যৎ। এইটাই তাঁর অবসর-বিনোদনের প্রধান অবলম্বন। আর একটা অবলম্বন ঝিনুকের চিন্তা। ঝিনুককে তিনি যদি জীবনে পেতেন তাহলে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু তিনি জানেন, ঝিনুককে তিনি পাবেন না। তিনি মুসলমান একথা ঝিনুকের মর্মে রক্তের রঙে আঁকা আছে। এ রং কখনও উঠবে না। নিষ্ঠুরতার নির্মম তুলি দিয়ে এই রক্তের নিষেধ আঁকা হয়েছে বহু যুগ ধরে, সেই সোমনাথ লুণ্ঠনের সময় থেকে। থানেশ্বরের ভয়াবহ অত্যাচার, জহরব্রতের অগ্নিশিখা, সহস্র সহস্র সতীর আর্তনাদ, সহস্র সহস্র ছিন্নমুণ্ড রক্তাক্ত হিন্দুর অভিশাপ, জিজিয়া কর, কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড, কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন, নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড, পূর্ববঙ্গের ভীষণ অত্যাচার—এই স্তূপীকৃত নৃশংসতার হিমালয় উত্তুঙ্গ হয়ে আছে তাঁর আর ঝিনুকের মধ্যে। তিনি জানেন ঝিনুক এ হিমালয় পার হতে পারবে না, পার হতে চাইবে না। তিনি পার হতে পারেন, পার

হতে চান, কিন্তু তাঁর এই দুঃসাহসের একটি অর্থই ঝিনুক করবে—কামুকতা। কিন্তু এ কলঙ্ক তিনি নিজের ললাটে মাখতে চান না। তিনি যে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঝিনুককে চাইছেন না, তাকে জীবনের যোগ্য সঙ্গিনীরূপেই চাইছেন, একথা তিনি ঝিনুককে বোঝাতে পারবেন না বলেই ঝিনুককে পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছেন।

পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু ঝিনুকের সংস্রব ত্যাগ করতে পারছেন না। সে যাতে সুখে থাকে, সে যাতে তার জীবনের আদর্শ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। এই চেষ্টা করে তিনি তির্যকভাবে আনন্দ পেতে চান আর তা স্বার্থলেশহীন ভাবে পান বলে সেটা আরও মধুর, আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে। বস্তুত, ঝিনুককে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হচ্ছে এখন। তিনি জানেন ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের খুব অনুরক্ত, যদিও তাঁকে বিয়ে করেনি, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে ও যে কোথাও যাবে তা মনে হয় না। ডাক্তার ঘোষালের প্রতি ঝিনুকের পক্ষপাতের কারণ তিনি নাকি প্রাণ তুচ্ছ করে গুণ্ডাদের হাত থেকে ওদের বাঁচিয়েছিলেন। ব্যাপারটাকে বারবার বিশ্লেষণ করেছেন সুবেদার খাঁ। ওইটেই কি অনুরক্তির একমাত্র কারণ? তিনিও উদ্বাস্তুদের জন্য কম করেন নি, তিনি বারবার নিজের জীবন বিপন্ন করে টাকা যোগাড় করেছেন ওদের জন্য, এখনও করছেন। ঝিনুক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার ব্যবহারও খুব ভদ্র, কিন্তু যার জন্য তিনি মনে মনে উৎসুক তার আভাসমাত্রও পাননি কখনও। তাঁর মহত্ত্বকে ঝিনুক স্বীকার করেছে, কিন্তু তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে সে দ্বিধা করেনি। এর কারণ কি? এর কারণ ওই আমেদ শা, মহম্মদ ঘোরী, আলাউদ্দিন খিলজি আর আওরঙ্গজেবদের নিষ্ঠুর ইতিহাস। এ কালিমা কি কোনদিন ধুয়ে ফেলা যাবে না? কত চোখের জল লাগবে এজন্য? রাজপুত জাতির ইতিহাস পড়তে পড়তে এইসব কথাই ভাবছিলেন তিনি। রাজপুত জাতির ইতিহাস মুসলমানদের কলঙ্ক ধনমসীরেখায় আঁকা আছে। মুসলমান বাদশাহদের প্রতিপত্তি আজ নেই, হয়তো তাঁরা ভালো কাজও কিছু করেছিলেন, কিন্তু সেসব কথা আজ কারও মনে নেই। কেবল মনে আছে তাঁরা ছিলেন কামুক, লোভী পরস্ত্রী-লোলুপ, অমানুষ। বিচারসালায় আসামীর কাঠ গড়ায় যারা চিরকাল দাঁড়িয়ে আছে, চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা তাদের দলে। মাঝে মাঝে সুবেদার খাঁর মনে হচ্ছিল এসব ইতিহাস কি সত্য? মিথ্যা ইতিহাসও তো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে অনেক। অন্ধ কূপ হত্যার ইতিহাসটা যে মিথ্যা তাতো প্রমাণ করে দিয়েছেন অক্ষয় মৈত্রেয়। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা হল তাঁর, তিনি যদি ইনজিন ড্রাইভার না হয়ে ঐতিহাসিক হতেন, বিরাট গবেষণা করে যদি মুসলমান সম্রাটদের কলঙ্ক ক্ষালন করতে পারতেন, যদি তাঁর সেই নির্ভুল গবেষণা ঝিনুকের চোখে পড়ত, যদি সে একবারও মনে ভাবত, না আমি ভুল করেছিলাম......।

(ক্রমশ)

মায়াসভ্যতার পিঁপড়ে

কল্যানশ্রী চক্রবর্তী

নিত্যকার প্রথামত কাজগুলো আর ঘটল না : প্রথম কিছুক্ষণ নীরবে আলস্য উপভোগ করা—ঈষৎ পিঁচুটি জড়ানো চোখ আধো বুজে আধো মেলে, পাশবালিশটা আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরা, তারপর ব্রেকফাস্টের মুখে চা খাওয়া আর তৎসঙ্গে দৈনিক কাগজখানি মোটামুটি শেষ করে বিছানা ত্যাগ। এরপর বাথরুম...স্নান...আহার...কিন্তু হল না। প্রথাগত পথ ধরেই কাজগুলো এগোতে শুরু করেছিল; কিন্তু পারল না। কিছুটা এগিয়ে দৈনিক কাগজে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় অক্ষরগুলো সমস্ত কিছু রীতিবদ্ধতাকে ওলট-পালট করে দিল। সে স্তব্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কোন কিছু ভাবতে পারল না। ঐ কালো অক্ষরগুলো ছাপিয়ে আর এগোতে পারল না। এই মুহূর্তে সে-চেষ্টা করতেও ইচ্ছা করল না। কাগজের দিকে স্থির তারকায় তাকিয়ে নিশ্চল এক জড় বস্তুর মতো পড়ে রইল। তারপর এক সময় গলার নালী চিরে তার চীৎকার করে উঠে বসতে ইচ্ছে হল। উঠে বসল; কিন্তু গলার কোন স্বর বেরুল না। ব্যাপারটা যান্ত্রিকভাবে নিঃশব্দে ঘটে গেল যেন। তবু এটা যে একব্যক্তির ব্যর্থ বিপন্ন প্রয়াস, কারণ সে বসে বসে কাঁপতে লাগল। চোয়াল হাঁ হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বুজিয়ে ফেলল। এখন বসে সে কাঁপুনি উপলব্ধি করতে লাগল। আস্তে আস্তে সে কাঁপুনিও দেহে মিলিয়ে গেল। মোট ব্যাপারটি ঘটতে মিনিট দশেক লাগল। এরপর আবার সে পড়তে চেষ্টা করল। এগিয়ে যাবার ভয়ানক চেষ্টা করতে লাগল ঐ বড় বড় অক্ষরগুলো ছাপিয়ে। এগুলোও বটে : ওর চেয়ে ছোট, তার চেয়েও ছোট পর্যন্ত; কিন্তু তারপর ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো, সারিবদ্ধ বিষাক্ত ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো যেন

কিলবিল করতে লাগল। আর পারল না। আশা ছেড়ে দিল। হাত-পার জোড়গুলো যেন আলগা হয়ে আসছে। চারিদিক বুঝি বড় নিঃশব্দ! সে খরগোশের মতো কান উৎকর্ণ করল। না, কোথাও কোন শব্দ নেই, আশ্চর্য! যেন শীতের মাঝ রাতের নৈঃশব্দ্য। না, তখনো কিছু নিশি-পোকার ক্ষীণ কোলাহল থাকে। কিন্তু এখন তাও নেই। অদ্ভুত তো! সে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠল। শক্তি ফিরে পাচ্ছে, ভাবতে পারছে। মহাশূন্যের স্তব্ধতা কি এ রকম? চারিদিকে তাকাল সে। ভোরের রোদ স্বচ্ছ। অথচ দিনের কোলাহল? ঘর-কন্নার শব্দ? সে ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। সেই 'একটু ভাবনা' ধীরে ধীরে একটা শীর্ণ হাসিতে রূপ পেল। যেন এই প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মার বোঝাপড়া করে নিল। তারপর খাট ছেড়ে নামল। খালি পায় নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এ-ঘর সে-ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোতে লাগল।

ও দরজার দিকে পিঠ করে বুঝি আনাজ কুটছে। সে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল। এলো চুল পিঠে নিয়ে কাজ করছে। ওর এখনকার সমস্ত অবস্থিতি অজ্ঞতার একটা অদ্ভুত প্রশান্ত সমাহিতের ছবি। সে এই মুহূর্তে অবাক না হয়ে পারল না। এই অবাক হতে পেরে যেন খুশী হয়েছে মনে মনে। সব ছোট ঘটনার ভেতর মহাজিজ্ঞাসার উত্তর তা হলে থেকে যায়। সে আরো এগিয়ে গেল। দরজার দিকে না গিয়ে পাশের জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। ও এখনো আনাজ কুটছে। আর ওদিকে রাঁধুনী উনোনের ওপর ঝুঁকে। তার মুখ আরক্ত। নিরুদ্বেগ পাচিকা অন্ন-ব্যঞ্জন ব্যবস্থায় ব্যস্ত। কিন্তু আশ্চর্য, কোন শব্দ নেই কেন! এখানেও নেই কেন? ওরা কেমন শান্ত সমাহিত; কেমন স্তব্ধতার ভেতর কাজ করছে।

এ-কাজে ও-কাজে হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল পাচিকার। চোখ দুটো আয়ত ও স্থির হল তার। বিস্ময় আশ্রয় করল সেখানে। আর ভয়। যে-ভয় এতক্ষণ সবার চোখে দেখবে, স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল সে।" একটা অনড় পাথরের মতো এদিকে তাকিয়েই রইল। আর সেও নির্বোধের মতো বোধ-হীনভাবে চেয়ে থাকল। এদিকে ও পাচিকার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ফিরিয়ে অবাক। তারপর তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এদিকে তাকাল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ও-ও যেন সহসা আকাশ থেকে পড়ল। সেখান থেকে সে সরে এল। গোলমালটা এইভাবেই বাধবে, অনুমান করেছিল। বৃহত্তের পরিপ্রেক্ষিতে মিলে গেল তা হলে। কিন্তু আশ্চর্য, অধীর আশঙ্কায় নিজে সব কিছু কখন ভুলে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগল।

একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। বুঝতে পারল, ধারাল—আনাজ কাটার বেশ ধারাল বঁটিটা এবার কাত করে রাখা হল। এতক্ষণে এই যেন সে প্রথম শব্দ শুনল। দ্রুত এগোতে চাইল সামনে। কেননা সে জানে, একটা ভয়ঙ্কর অবরুদ্ধ ভাবনার মতো ও এতক্ষণে তীব্র বেগে অনুসরণ করতে শুরু করেছে। অজ্ঞান জ্ঞানের কৈফিয়ত চাইবে এসে। ভুল করেছে সে। ভুল করে ফেলেছে—জেনে-শুনে। এমনি করেই বুঝি সব ভ্রান্তিগুলো জমে জমে দানা বেঁধে শক্ত হয়ে উঠছে। তা হলে? ওর বুঝি মৃদু পায়ের শব্দ। জ্ঞান-অজ্ঞান কোন ভেদ থাকবে না। ও জিজ্ঞেস করলে কি বলা যায়?

দুশ্চিন্তা আসে বইকি। সব কিছু কেমন নীরবে ঘটে গেল! অতক্ষণ সত্যি কোন শব্দ-জগতের অস্তিত্ব ছিল না? সকলে—যারা অন্তত অজ্ঞানী নয়, তারা মিথ্যা স্তোকে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে চরম সমষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করছে। আর উপায় নেই। ও এসে গেল বুঝি। সকলের মতো সেও জেনেশুনে ভুল করে বসেছে।

আপন ঘরের মাঝখানে এসে সে নিঃস্বের মতো দাঁড়াল। এবং অবাক হয়ে ভাবতে পারল, আর তো করবার কিছু নেই, কিছু ভাবতে পারছে না। পথ-ভ্রান্ত বালকের মতো বর্তমানকে অসহায়ভাবে উপলব্ধি করতে লাগল। কিংবা লক্ষ্যহারা ঢিলের মতো সময়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল—বস্তুত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দিচ্ছিল। পঞ্চাশোর্ধের পক্ষে এতখানি তাড়াতাড়ি হাঁটা শক্তির অতিরিক্ত।

শেষ পর্যন্ত সে নির্বিকল্প হতে চাইল। এবং এই প্রয়াসের একটু পরে ওর উপস্থিতি বোধ করল। ও কাছে—গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। সে নড়ল না। তার বাহু স্পর্শ করল ও। তবু না। ও বলল, "অমন করে পালিয়ে এলে যে?"

সে কোন উত্তর দিল না। বা দিতে পারল না।

"কলেজে যাবে না?"

"........."

"কেন, শরীর খারাপ নাকি?"

"........."

"তবে? মুখহাত ধুয়েছ? এ কি চা এখনো খাওনি!" হঠাৎ যেন ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ও যুগপৎ বিস্মিত হল এবং বিপন্ন বোধ করল। কি করবে এই মুহূর্তে স্থির করতে না পেরে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর "দেখি" বলে সহসা ও হাতের পিঠ দিয়ে তার কপাল-বুক স্পর্শ করল। পরে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, "তাহলে কোন কিছু না সেরে হঠাৎ ওখানে গিয়েছিলে কেন?"

একটা পাঞ্চকল্প অবিশ্বাসের অঙ্কুর মাটি ভেদ করে যেন সহসা জল-আলো-হাওয়ার পোষকতা যাচ্ছা করল। আর ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি সে বলতে চাইল—কিন্তু পারল না—টেনে টেনে বলল, "কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে—তাই—"

"কলেজে যাবে না?"

"বললাম তো, ভাল লাগছে না।"

"থাক তবে গিয়ে কাজ নেই।" বলে একটা গুমোট অস্বস্তির আবহাওয়া ছড়িয়ে ও চলে গেল। সে বিছানার ওপর খবরের কাগজটার দিকে তাকাল।

•

সূর্য মধ্য গগনে। সে অনুভব করল। চারিদিকের স্তব্ধতাই তার সাক্ষ্য। দিবাকর এখন সর্বোচ্চে। সুনীল নভঃদেহ নিয়ে

তাই প্রবল বিক্রমে আঁকড়ে ধরেছে যেন চরাচরকে। তার ভাল লাগল না। এ ভাবনাটা সে মনে মনে একটা উপমা দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল : একটা প্রবল পরাক্রান্ত সিংহ তার অমিত শক্তিধর থাবা দিয়ে একটা করুণা-যোগ্য বুদ্ধিম্মন্য জীবকে চেপে ধরেছে। আর দীন জীবটি সকাতরে তার করুণা ভিক্ষা করছে, "আমাকে বাঁচতে দাও, আমার পথে আমাকে পুষ্ট হতে দাও, উপভোগ করতে দাও। আমি তো তোমার প্রতিস্বন্দ্বী নই।" ......এও তার মনঃপুত হল না। সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। অশান্ত অস্থির অথচ ধীরভাবে পায়চারি করতে লাগল। এ অস্থিরতা সেই সকাল থেকে। কেন যে এই অস্থিরতা! এ তো উতলা হবার জিনিস নয়ঃ ধীরে সুস্থে ভাববার—অনুধাবন করবার জিনিস। যদিও তাই সে চেষ্টা করছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল আগ্রহে পড়াশুনো করতে লাগল। সময়ের ক্রমধারা অনুসারে প্রমাণ সাজিয়ে সাজিয়ে নিজেকে প্রমাণসাপেক্ষ করে আসছিল। কিন্তু ধৈর্য থাকেনি: স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। অধীরভাবে বারে বারে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। কেন কে জানে। হয়তো এটা শান্তভাবে ভাববার বিষয় নয়, ভীষণ—ভীষণ অস্থির হওয়ার জিনিস। কারণ সমস্ত বিষয়টার সামগ্রিক রূপটা ভাবতে পারছে যে! ঘুরে ঘুরে ঘরে সুবিনাস্তভাবে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর সামনে আকুলভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বিশ্বের মহামানব সব। ওদের ছবির কাছে গিয়েই সে অশান্ত মনে দাঁড়িয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে তাদের। তাদের কাছে কোন অনুযোগ করেনি, মাথা অবনত করেনি, শুধু দেখেছে।

ভাবনাটা বহু বছর আগে হঠাৎ মাথায় আসতেই সে ভয়ানকভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। তাই ভাবনাটা মলিন না হয়ে যাতে ভাস্বর হয়ে থাকে অনুক্ষণ, তাই ধীরে ধীরে—একে একে এ ছবিগুলো টাঙিয়েছে। নিজের আচরণে মাঝে মাঝে লজ্জিত হয়ে ভেবেছে, "এটা ছেলেমানুষি হচ্ছে না তো?" যদিও এটা ক্ষণিকের বিভ্রান্তি। পরক্ষণই নিজেকে বিষয়টা গুরুতর বলে বুঝিয়েছে এবং বিশ্বাস করিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল, "আরো অনেক ছবি আনতে হবে তো।" সে চার দেয়াল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। "হ্যাঁ, আরো গোটা কতক ছবি কিনতে হবে।" সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দোতলায় উঠতে লাগল। সমস্ত বাড়িটা যেন মুমূর্ষু জন্তুর নিঃসাড়তায় স্তব্ধ। কেন যেন সে ভয়ে ভয়ে পা ফেলতে লাগল। বাইরে সূর্য, এরি মধ্যে সে চকিতে দেখতে পেল, স্বচ্ছ সোনালী অমৃতধারা। মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে মৃতের প্রাণ সঞ্জীবন। সে বিমর্ষ হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। তারপরই পা ফেলে ফেলে সাবধানে এগিয়ে চলল।

তাদের যৌথ ঘর। এর কাছে এসে

দাঁড়াল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চুপিচুপি সাবধানী সারসের মত ঘাড়টা ভেতরে বাড়িয়ে দিল। দেখল, ওদিকে মুখ করে ও আজকার কাগজখানা পড়ছে। অদ্ভুত আশ্চর্য হল সে। একটা উত্তেজনা বোধ করল। তাড়াতাড়ি অথচ নীরবে এগিয়ে গেল। খাটের কাছে—ওর পেছনটিতে সে নিঃশব্দে দাঁড়াল। ও পড়ে যাচ্ছিল। তার উপস্থিতি সম্বন্ধেও এখনো অজ্ঞান। সে শিকারী সারসের মতো গলা বাড়িয়ে পাঠ্য-মান অংশ পর্যবেক্ষণের প্রয়াস পেল। দেখে অবাক হল, ও সেই অংশ পড়ছে। সে উত্তেজনা বোধ করল। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। লক্ষ্য করতে লাগল, ওর মধ্যে কোন ভাবান্তর হচ্ছে কিনা। চারিদিকের নৈঃশব্দ্য যেন জোঁকের মতো চেপে ধরে সময়ের রক্ত শুষে খাচ্ছে।

টুকরো টুকরো মুহূর্তে পর পর সাজিয়ে সে ব্যর্থ অনেকটা সময় অপেক্ষা করল। না, কোন ভাবান্তর হল না ওর। পৃষ্ঠা ওল্টানো। সে মনে মনে কাঠ-কাঠ হাসল। 'তাই তো, সবার বোঝবার কথা নয়তো। কিন্তু ওর অজ্ঞতার মতো আমার উপস্থিতি তো সত্য! যদি আমি একটা হিংস্র জীব হতাম, তা হলে? ওর মৃত্যু এখন অবশ্যম্ভাবী ছিল। তা হলে ব্যাপারটা—ও কাগজটা পুরোপুরি মেলে ভাঁজ করতে গিয়ে টের পেল। পেয়ে ভয়ংকরভাবে চমকে উঠল। ফিরে তাকাল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। 'ঠিক এই রকম। কিন্তু তখন আর হাতে উপায় থাকবে না।' মনে মনে সে না বলে পারল না। আর ওদিকেও আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে সংযত করতে লাগল।

"অমন চোরের মতো চুপি চুপি এলে যে?" কণ্ঠস্বর তবু উষ্মায় ভরা ও কম্পিত।

"চোরের মতো কোথায়?" সে অপ্রস্তুতের মতো হাসল। "এ ঘরেও কি আমাকে জানিয়ে আসতে হবে?"

"একটু শব্দ-টব্দ করে এলে আর এমন ভয় পেতে হয় না।"

"তুমি ভয় পেয়েছ?" সে হাসবার চেষ্টা করল।

"এ রকম আচমকা কিছু করলে সবাই ভয় পায়। দেখ না বুকের ভেতর কেমন করছে।" ও কাগজখানা হাতে নিয়ে পড়বার ভঙ্গী করল। সে অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

"কলেজ থেকে যে এত তাড়াতাড়ি এলে?" কাগজের দিকে তাকিয়েই ও বলল।

"আজ কলেজে গেলাম কখন?"

"তাই তো!" বলে ও এদিকে তাকাল। "আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।" বলে হাসবার চেষ্টা করল। সকালের বিস্ময় ও শঙ্কার ভাবটা চোখে-মুখে ফিরে এল। বলল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"পড়ার ঘরে।"

"একেবারে টের পাইনি!" শুনে সে হাসল। ও বলল, "একটু চা খাবে এখন?"

"না। আমি এখন বেরোব। এ কথা বলতেই এসেছিলাম।"

"কোথায়?" চোখে সন্ত্রস্তের ভাব ফুটে উঠল।

"একটু কাজ আছে।"

"কখন ফিরবে?"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব।" সে হাসল। তারপর ঘরে দরজার দিকে শ্লথ গতিতে এগোতে লাগল। ও একটা সন্দেহে বিহ্বল হয়ে সহসা উদ্বিগ্নভাবে ঐ দিকে তাকিয়ে রইল।

ও অবাক হয়ে তাকে লক্ষ করতে লাগল। সে চার দেয়ালে ফাঁকে ফাঁকে আগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক আধখানা করে প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। এক মনে সে কাজ করে যাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল; অর্থাৎ উদ্বিগ্নতায় উৎকণ্ঠিত হচ্ছিল ক্রমশ। একরাশ দুর্ভাবনা নিয়ে কূল পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছিল। এবং তার ওপর হঠাৎ যেন ও আবিষ্কার করল এ ঘরের অদ্ভুত স্তব্ধতা তার পেরেক ঠোকার শব্দে করুণ ব্যর্থভাবে এই শব্দ সরব হবার চেষ্টা করে বীভৎস হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে তাই ওর নিজেকে

নিতান্ত অসহায় বলে মনে হল। তাই তাড়াতাড়ি বলল, "ও কি করছ?"

চমকে উঠল সে। হাত থেকে ছোট্ট হাতুড়ি প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ফিরে তাকিয়ে বলল, "ও, তুমি।" একটু হাসল। তারপর বলল, "এই দেখ কিরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমিই কত অপ্রস্তুত ছিলাম—অর্থাৎ অজ্ঞ। তোমার উপস্থিতিতে ভয় পেলাম।"

"তা নয় হল। করছিলে কি?"

সে বুঝি হাসল। "ছবি টাঙাচ্ছিলাম।"

"অনেক তো টাঙিয়েছ, আবার—"

"আবার টাঙাচ্ছি এ'রা বাদ গিয়েছিল বলে। জান তো এ'রা বিশ্বের—"

"পাগলামি।"

"তোমার কাছে মনে হতে পারে, আমার কাছে নয়। আর তা ছাড়া দুনিয়ায় পাগল সবাই। কেউ টাকার পাগল, কেউ যশের, প্রেমের কেউ, আমি না হয় একটা কিছু আবিষ্কারের।"

"হাতি। ছবির—নামজাদা লোকের ছবির। কলেজে যাবে না?"

"না।"

"কেন?"

সে ভাবল বলে, "খুশী।" কিন্তু বলল, "ছুটি নিয়েছি।"

"কেন?"

"পাওনা হয়েছে তাই।"

"শুধু শুধু এভাবে—। শরীর খারাপ নয় কিছু, নয়—। এভাবে ফাঁকি দেওয়া—"

"ফাঁকি নয়। যা হয়েছে তাই নিয়েছি। কোন দিন ফাঁকি দেইনি। প্রাপ্যকে নেওয়া ফাঁকি বলে না। আমি ছাত্র নই। ছাত্র জীবনেও আমি পড়াশুনো ছাড়া আর কিছু করিনি। দেখো গে তোমার ছেলেমেয়ে কলেজে গেছে কি না। পড়াশুনোর নামে অন্য কিছু করে কিনা।"

"তারা সৎ।"

"অর্থাৎ আমি অসৎ।"

"সে তুমি জান।" বলে ও পড়ার ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে এল।

স্তব্ধতা এতদিনে কোলাহলে আত্মসমর্পণ বা আশ্রয় করলে ভাল হত। সে অন্তত মুক্তি না হক সাময়িক স্বস্তি পেত। পাংশু প্রান্তরের মতো সে ক্লান্ত বোধ করছে। না ঠিক তা নয়। অসীম আয়াসে লক্ষ্যে পৌঁছে প্রচণ্ড শূন্যতা দেখে যে ক্লান্তি আসে ঠিক তাই। সে প্রমাণের শক্ত খুঁটি বেঁধে বেঁধে গোলক পথে মহাশূন্যের ইঙ্গিত দিয়ে যাবে। দুই আর দুই-এ চারের মতো যদিও এ জিনিস নতুন নয়। এ পথেই সে পেয়েছে। বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। এই স্তব্ধতায় এই স্তব্ধতার কথা বলতে হবে। বিশ্বের মতো বর্তমান এ বাড়িটাও নৈঃশব্দ্যের শবাধার। এই কৃত্রিম শবাধারের স্পর্শ অনুভব করে অনুভাবনের কথা বলতে

হবে। না হলে হবে না—কিছুতেই হবে না।......এইসব জগৎ তাকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে হয়েছে। এই পরিবেশ আচার-আচরণ মেঝে-দেওয়ালের নিরুচ্চারতা... সামনের 'লনের' দূর্বার সজীবতা......সব—সব কিছু তাকেই করতে হয়েছে। দূর্বায় পদক্ষেপ কি নিরুচ্চার—আঃ!, না না ভয়ংকরও। 'সে' সমস্ত জ্ঞানকে আপন বুকে লুকিয়ে রেখে কি ভীষণভাবে অজ্ঞান শৈত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ঐ তবে আজকার উত্তর।

"কে?" সে চমকে উঠল।—"আরে কি আশ্চর্য ডাক্তার যে! কি মনে করে? আবে এস এস. ভেতরে এস। বসো। তারপর হঠাৎ চুপিচুপি? কেমন আছ?"

ডাক্তারের পেছন পেছন ও ঢুকল: সে লক্ষ্য করল। ডাক্তার একটা চেয়ারে বসল। ও দাঁড়িয়ে রইল।

"বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তাই—। হাসলে যে?"

"হাসলাম অম্লান মিথ্যা বললে দেখে।"

"কি করে বুঝলে?"

"তুমিই ভেবে দ্যাখো।"

"কি করছিলে?"

"পড়াশুনো।"

"তুমি নাকি এ-ঘর থেকে মোটেই বেরোচ্ছ না?"

সে একটু হাসল।

"করছ কি সারাদিন?"

"বললাম তো, প্রমাণ সংগ্রহ করছি।" সে হাসল। বলল, "ভয় নেই পাগল-টাগল কিছু হইনি।"

"ও বলছিল—"

"জানি। এ ক'দিনের ব্যবহার কিছু অস্বাভাবিক হতে পারে। একটা আবিষ্কার করার আনন্দের মতো আমাকে পেয়ে বসেছিল। আর তার সংগে প্রবল অনুসন্ধিৎসা। আচ্ছা ডাক্তার তোমার কিছু মনে হচ্ছে না বর্তমান বিশ্ব সম্বন্ধে? কোন ধ্যান ধারণা?"

"কি সম্বন্ধে বলছ?"

সে হাসল। বলল, "বললে আর কি বুঝতে পারবে। বুঝলে আমার প্রশ্নতেই ধরতে পারতে।"

"তবু বলই না।"

"আচ্ছা ডাক্তার তোমার ঐ স্টেথস্কোপ দিয়ে রোগীর লাব-ডুব শোন।"

"............"

"যখন বুকে দিয়ে দ্যাখো কোন সাড় নেই শব্দ নেই, তখন—"

"ধরে নেই মরে গেছে।"

"আর যখন অতিরিক্ত স্পন্দন শব্দ বা অস্বাভাবিক একটা কিছু পাও, তখন?"

"ধরি অসুস্থ।"

"এই অসুস্থতা সুস্থ নাও হতে পারে। অর্থাৎ কিনা শব্দ দ্রুত হতে হতে চরমে পৌঁছে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।"

"পারে।"

"আমারও এই কথা।"

"তার আগে তোমার স্পন্দন" প্রেশার দেখি; ওঠো।"

"কিছু দরকার নেই ডাক্তার। আমি সুস্থ আছি, ভয় নেই। যদি সত্যিই কিছু হয়, খবর নিশ্চয় পাবে?"

"কলেজে যাচ্ছো না?"

"এবার যেতে হবে। ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।"

"কি বল, তাহলে আসি এখন।"

"আরে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বোসো। চা খাও। কই, ডাক্তারকে একটু চা করে দাও।"

"না না আমার সময় নেই—একেবারে সময় নেই; ভীষণ তাড়া আছে।" বলে

ডাক্তার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পেছন পেছন ও এবং সে এগ্রতে লাগল।

লনের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ডাক্তার। সে মোহ-গ্রস্তের মতো দেখতে লাগল।

"তুমি আবার এঘরে এসে ঢুকলে?"

"কি করব?"

"অন্তত এই সন্ধ্যাটা কোথাও ঘুরে এসো।"

"কেন?"

"তোমাকে এভাবে থাকতে দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে।" ও তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।—"তুমি কি এত ভাব বলত?" ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

"ভাবি একটা সময়ের কথা।" সে নিষ্প্রাণ হাসল। "একটা অদ্ভুত আক্রমণের কথা। জানো, ভাবতে তোমার মতো আমারও ভয় করে।"

ও চোখ আয়ত করে তাকাল।

"জানো, কোলাহল ও স্তব্ধতা বড় অশুভ।" ক্লান্তভাবে যেন বলতে লাগল। —"কোলাহলের পর স্তব্ধতা। স্তব্ধতার মাঝেই সৃষ্টি ও প্রলয়। এই পৃথিবীও সৃষ্টি হয়েছে বিপুল স্তব্ধতার মাঝে—বিপুল স্তব্ধতা। কোন শব্দ হয়নি, হয়নি কোন আড়ম্বর। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটু একটু করে যেন সব কিছুর অন্তরালে থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ব তথা মহা-বিশ্ব। যত নক্ষত্র সূর্য সব সৃষ্টি হয়েছে এইভাবেঃ সম্মিলিত তারকার চূর্ণ আর বাষ্পের মাধ্যাকর্ষণিক সংকোচনের ফলে। এভাবেই বিপুল বেগে ঘুরন্ত সবিতা থেকে কিছু কিছু পদার্থ বাইরে দূরে পড়তে লাগল। সেসব জমে জমে একদিন এই পৃথিবী সৃষ্টি হল। কি নিঃশব্দে হল এটা। আর পৃথিবীতে এমনি ভাবেই এক-দিন প্রাণ সঞ্চার হতে শুরু করল। সময়কে মেনে নিয়ে নানান জীব এল গেল। তারপর এল মানব। এক এক সভ্যতার স্রষ্টা হতে লাগল। আর ক্রান্তিকালের আক্রমণ একে একে নীরবে বিলীন করে দিল। মনে হচ্ছে বারবার, আর এক ক্রান্তিকাল দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।" সে বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়ল। তার গলা থরথর করে কাঁপতে লাগল। ও আরো তার ঘনিষ্ঠ হল।

"জানো, এখন আমরা বলতে শুরু করেছি, মায়া সভ্যতার মতো বিরাট সভ্যতা এক শ্রেণীর পিঁপড়ে ধ্বংস করেছে।" সে হাসবার ভান করল। —"মনে হচ্ছে কি জান, সব সভ্যতার ধ্বংসের মূলেই থাকে কোন না কোন শ্রেণীর পিঁপড়ে।" তার গলার স্বর থমথম করতে লাগল।

"এই সভ্যতা ক্রান্তিকালের আক্রমণ স্তব্ধতার মুখোমুখি এখন। দ্যাখো, ঐদিকে তাকাও।" সে আঙুল দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখাতে লাগল। ও তার মুখের দিকে তাকাল। সে ছবিগুলোর দিকে চেয়েই রইল। ভয়ে ভয়ে ও তাকে জড়িয়ে ধরল। ঘরখানা যেন ওঁ ব্রহ্মের ধ্যান করছে। আলোটা যেন অত্যুজ্জ্বল। —"ভাল করে চেয়ে দ্যাখো। এই—এই দ্যাখো, দ্যাখো চেয়ে। প্রত্যেকটা ছবির মধ্য দিয়ে—দ্যাখো দ্যাখো লাখো লাখো পিঁপড়ে কেমন এগিয়ে আসছে দ্যাখো; মহাশূন্যে বিজয়ী সভ্যতার বিরুদ্ধে জয়ী হতে। দ্যাখো। দেখতে পাচ্ছ না? পরিষ্কার যে দেখা যাচ্ছে!"

দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। আর মায়া সভ্যতার পিঁপড়ে সময়ের সংকেতকে মেনে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের ঘিরে ব্যূহ রচনার জন্য যেন এগিয়ে আসতে লাগল॥

বিশ্ববিচিত্রা

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃক্ষ

দশ কোটি বছরেরও আগে এশিয়া, ইওরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্দর, দীর্ঘ কনিফার জাতীয় গাছ ছিল প্রভূত। বরফস্তূপের বিরাট ধ্বংসের মুখে পড়ে পড়ে গাছগুলি ক্রমে উৎপাটিত হতে থাকে এবং শেষে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। কিছু-কাল আগে পর্যন্তও প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের এই ছিল বিশ্বাস।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ভিদ বিষয়ে একদল বিশেষজ্ঞ চীনের এক দুর্গম প্রদেশে ঐ গাছের কতকগুলি অবশিষ্ট বংশধর কিছুকাল আগে দেখতে পান।

"জীবন্ত ফসিল" নামে অভিহিত বহু সংখ্যক এই গাছ দক্ষিণ চীনের উষ্ণ স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে অনেকগুলি এখন উচ্চতায় দশ ফিটেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছগুলি এত দ্রুত গজিয়ে ওঠে যে ওর দ্বারা একটি চীনের "সবুজ প্রাচীর" গড়ে তোলার এবং চীনের ইতিহাসখ্যাত প্রাচীরের ফাঁকগুলি পূরণ করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে।

গাছগুলি মরুভূমি অঞ্চলে বালুকার হাওয়ায় ওড়া প্রতিরোধ করা ছাড়াও জল সংরক্ষণে সহায়ক হবে এবং কাঠকয়লাতে পরিণত করার উপযোগী কাঠের সরবরাহ করে যেতে পারবে।

হঠাৎ পাওয়া রত্ন

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার স্ট্রাথালবাইনে আঠারো বছর বয়সের রডনী হার্টউইগ এক গোচারণভূমিতে একটা ধাতুর ঢেলা কুড়িয়ে পায়। রডনি মনে করলে ওটা একটা গলিত ব্রোঞ্জের ঢেলা। ষ্ট্রাউজারে সেটা ঘষতেই ওর চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। ঢেলাটা বাইশ আউন্স ওজনের খাঁটি সোনা যার দাম প্রায় আড়াই হাজার টাকা! গত চল্লিশ বছরে অত বড় একটা সোনার ঢেলা আর দেখা যায়নি।

এমনি ধারা হঠাৎ পাওয়া সম্পদ বিবাদেরও সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে সেই বিবাদ যত দীর্ঘদিন ধরে চলে, ততো গুরুতর আকার ধারণ করে। এমনি ধরণেরই একটি বিবাদ বর্তমানে চলছে নিউ সাউথ ওয়েলসের মাডগীর এক স্থানে যেখানে একটি হোটেলের লাইসেন্সধারী এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে তার বারটি পুনঃসংস্কার করার ভার দেয়।

বারের মেঝে খুঁড়তে ঠিকাদারের শ্রমিকরা সোনা পেয়ে যায়। শ্রমিকরা "যে পায় তার অধিকার" বলে দাবি করেছে। কিন্তু লাইসেন্সধারী ডেভিড রজার্স সেটা মানতে রাজী নন। তিনি বলেন "ও সোনা আমার।"

ফলে পুনঃসংস্কারের কাজ এখন বন্ধ হয়ে রয়েছে। আর বারের মধ্যিখানে দশ ফিট গভীর একটা গর্ত হয়ে রয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত জার্মানীর একটি প্রথা হচ্ছে শিক্ষানবীশ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাপাখানার কম্পোজিটর পদে অভিষিক্ত হবার পূর্বে তাকে ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। জলের পিপেতে জোর করে বসিয়ে মাথায় ঠান্ডা জল ঢেলে 'নির্বুদ্ধিতা ধুয়ে ফেলার' এই প্রথাটি পালন করার সময় মধ্যযুগের পোশাকও ব্যবহার করা হয়

অস্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত রটনেস্ট দ্বীপের কাছে দুশ' কুড়ি ফিট জলের নিচে।

গভীর জলের ডুবুরি ছাব্বিশ বছর বয়সের ম্যাক্স শ জলের নিচে প্রবালের মধ্যে চমৎকার একটা শামুক দেখতে পায়।

ম্যাক্স অল্পদিন হল বিয়ে করেছে। তাই শামুকটা দেখে সেটির খোলায় স্ত্রীর জন্য সুন্দর একটা হারের পেন্ডান্ট হতে পারবে মনে করলো। কিন্তু সেটা তুলতে ডুব দিতেই তার শিরায় টান ধরলো। তা সত্ত্বেও সে শামুকটা আঁকড়ে ধরলে এবং ওপরে ভেসে উঠলো প্রায় অচৈতন্য অবস্থায়।

সেই শামুকটা দেখা গেল, আসলে একটি দুর্লভ কড়ি যা বিশেষজ্ঞরা গত পনের বছর ধরে খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাক্সের সেই কষ্টলব্ধ কড়িটি একটি মিউজিয়াম

কিনে নিয়েছে। আর বিক্রি করে সে যা টাকা পেয়েছে তাতে তার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ হওয়ার পরেও তার স্ত্রীর "হাবান্যে" পেন্ডেন্টও কেনা যাবে।

রাজহংস সমস্যা

বৃটেনের উনিশ হাজার রাজহংস এত দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে যে এই সুন্দর পক্ষীদল তাদের ক্ষেতের যে পরিমাণ ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতে কৃষকরা বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিনই নিকটবর্তী নদী থেকে ক্ষুধার্ত রাজহংস দল কৃষকদের গাভীর জন্য নির্দিষ্ট কাঁচ ঘাসের জমিতে এসে ঘাস খেয়ে জমি তচনচ করে যায়।

একটি গাভী যে পরিমাণ ঘাস খায় তিনটি

রাজহংস ঠিক সেই পরিমাণ ঘাস খায় এবং নষ্ট করে দেয়। একদিন একটি রাজহংসকে সারাদিনে তার দেহের ওজনের সমান পরিমাণ ঘাস খেতে দেখা যায়।

এ বছরের বসন্তকালে উইল্টশায়ারের একটি কৃষকের গোচারণভূমিতে প্রতিদিন রাজহংসের দল এসে ঘাস খেয়ে যেতে থাকে। কৃষকটি হিসেব করে দেখে যে তার গাভী-দলের জন্য বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থা করতে তাকে ছাব্বিশ শত টাকা খরচ করতে হয়েছে। সম্প্রতি এক কৃষক তার ক্ষেতের লাগোয়া নদীর তীরে প্রায় প্রতি একশত গজ অন্তর রাজহংসের বাসা লক্ষ্য করে।

ওদের মাথার ওপর বন্দুকের আওয়াজ করে রাজহংসদের তাড়াবার সে বৃথা চেষ্টা করে। ১৯৫৪ সালের পক্ষী রক্ষা আইনে রাজহংস হত্যা বা তাদের বাসা নষ্ট করা শাস্তির যোগ্য অপরাধ।

অন্যত্র, দক্ষিণ ইংলন্ডে দু-একজন কৃষক নিজেই নিজেকে আইনকর্তা ঠিক করে নিয়ে আক্রমণকারীদের গুলী করার অভিপ্রায়ে রাত্রে সশস্ত্র হয়ে বের হয়।

অস্ট্রেলিয়াতে এক সময়ে ক্ষেতের সবচেয়ে প্রবল শত্রু ছিল খরগোস যাদের লক্ষ লক্ষ সংখ্যাকে হত্যা করে সাবাড় করে ফেলতে হয়েছে।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে আজ অস্ট্রেলিয়া বাইরেকার খরগোসের চামড়ার চাহিদা মেটাতে অক্ষম, যদিও অস্ট্রেলিয়ায় এখন খরগোস পালন একটা শিল্পতে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার ব্যবসায়ীরা অস্ট্রেলিয়ার খরগোসের চামড়ার জন্য কোটি কোটি ডলার দিতে রাজি। বস্তুত নিউ ইয়র্কের ফার ব্যবসায়ীরা আগামী দশ বছরে অস্ট্রেলিয়ার যাবতীয় খরগোস উৎপাদন কিনে নেবার কথাবার্তা চালাচ্ছে।

আমেরিকা খরগোস-লুব্ধ তিনটি কারণে। ওদের দরকার দেশের ফার তৈরির কারখানা-গুলিকে চালু রাখার জন্য। খরগোসের মাংস আমেরিকার খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য যোগ করতে পারে। আর যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা-গারগুলিতে চিকিৎসা বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কাজের জন্য জীবন্ত খরগোস তাদের অত্যন্ত দরকার।

অস্ট্রেলিয়ার পশু-প্রেমিকরা বলেন, আমেরিকানদের উচিত হচ্ছে নিজেদের দেশে জাত খরগোস কাজে লাগান, কিংবা চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষার জন্য নিজের দেশের লোককে ব্যবহার করা।

ছেলেমেয়েরা মাথায় বাড়ছে কেন?

পাশ্চাত্যে মা-বাপদের আজকাল মহা-দুশ্চিন্তা হয়েছে কেননা ছেলেমেয়েরা বড় তাড়াতাড়ি মাথায় লম্বা হয়ে তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ছেলেমেয়েরা আগেকার তুলনায় ঢ্যাঙাই হচ্ছে, এমন কিছু অকালপক্ব হচ্ছে না, তাই ভাবনার কিছু নেই। বৈজ্ঞানিকরা এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বটে, তবে স্থির কোন সিদ্ধান্তে এখনও পৌঁছাতে পারেননি। শুধু যে বাপমায়েদের চিন্তা হচ্ছে তা নয়, স্কুল কর্তৃপক্ষরাও মহা ফাঁপরে পড়ে গেছেন। আগেকার ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি আর এখনকার ঢ্যাঙা ছাত্র-ছাত্রীদের কুলোচ্ছে না।

ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি বৃদ্ধির কারণ-স্বরূপ নানারকম বৈজ্ঞানিক মতবাদ বেরুচ্ছে। একদল বৈজ্ঞানিকের মত হচ্ছে গায়ে বেশি আলো লাগার ফলে ছেলেমেয়েরা দ্রুত মাথায় বাড়ছে কারণ তাঁদের মতে আলো নাকি বৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনদের প্রভাবান্বিত করে। অন্যদলের মতে বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য। বেশির ভাগ লোকের মতে এটিই যুক্তিসংগত কারণ। যুদ্ধের সময় যারা জন্মেছে তারা পুষ্টির অভাবে বেশি লম্বা হয়নি অথচ যুদ্ধের পর তাদের যেসব ভাইবোন জন্মেছে, তারা ভালো খেয়েদেয়ে চটপট মাথায় বেড়েছে। পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক টমাসের মতে বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে বর্তমান যুগে মানুষের বিচরণ-শীলতা। অবশ্য বৃদ্ধির বিকাশের সঙ্গে বৃদ্ধির গতি সংযুক্ত কিনা, প্রমাণ করা না গেলেও এটি দেখা গেছে যে, মনের উন্নতির দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকলে, শারীরিক উন্নতিও প্রায় ক্ষেত্রেই কম হয়। এছাড়া আধুনিক যানবাহনে নানাজাতের লোকজন এক সঙ্গে মিলেমিশে ভ্রমণ করার ফলে বিভিন্ন জন্মগত বংশকণার পারস্পরিক মিলনের হেতুও তরুণ সমাজের দ্রুত বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

একজন ফরাসী গবেষক এইদিকে এক নতুন আলোকপাত করেছেন। এটি অন্যান্য মতবাদ থেকে আলাদা। এই ফরাসী বৈজ্ঞানিকের মতে বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে কলুষিত জল। পানীয় জল ভালোভাবে পরিশ্রুত না হওয়ার ফলে, মানুষের পরিত্যক্ত বিপুল পরিমাণ হরমোন আবার মানুষ জলের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং দ্রুত বৃদ্ধির আশ্চর্য রহস্যের উদ্ঘাটন করবে কোন একদিন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা গবেষকের দল।

পুজো সংখ্যা উল্টোরথ-এ
চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের
পরিচিতি জানাবেন
কুশল চৌধুরী

ট্রামে বাসে

দুর্গাপুর প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় বলিয়া রাজ্য **বিধান সভায় বিরোধী** সদস্যগণ তীব্র **প্রতিবাদ জানান।** উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি **সি সেন** বলেন যে, দেশ গঠনের কাজে **বৈদেশিক** সাহায্য গ্রহণ পররাষ্ট্র নীতি **সম্মত।** বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—**"দেশ** ভঙ্গের কাজে বৈদেশিক সাহায্যের **ঐতিহাসিক নজীরের** কথাই হয়ত বিরোধী **সদস্য** মহোদয়গণের মনে ছিল—সুতরাং **দেশ গঠনের** কথাটা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে **গেছে।** ভুল মুনিদেরও হয়, ওরা ত বিধান-**সভার সদস্য মাত্র!!"**

এক সংবাদে শুনিলাম পশ্চিমবঙ্গের **কাছাকাছি** অঞ্চলে গত এক বৎসরের **মধ্যে** পাগলের সংখ্যা নাকি অনেক বাড়িয়া **গিয়াছে।**—"পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য ভালো যে **এখনও** ষোল আনা বাসিন্দে পাগল হয়ে **থামনি"**—বলে আমাদের শ্যামলাল।

রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান সাংবাদিকদের নিকট নাকি **বলিয়াছেন** যে আড়তদারগণ যে "ভদ্রলোকের **চুক্তি"** করিয়াছিলেন তাহা পালন করা **হইতেছে** না বলিয়াই মাছ-বাজারের অবস্থার **কোন উন্নতি** হইতেছে না। আমাদের জনৈক **সহযাত্রী** বলিলেন—"চুক্তির পরিণতি আমরা **গোড়াতেই আঁচ করেছিলাম।** আড়তদারদের **দিয়ে ভদ্রলোকের** চুক্তি যে অনেকটা **অব্যাপারেষু ব্যাপারং!!"**

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল জানাইয়াছেন যে সার ও নিউজ-প্রিণ্টের বিনিময়ে ভারত কানাডা ও জাপানে চিনি রপ্তানি করিবে।—"খুবই ভালো কথা। **কিন্তু** আমরা ভাবছি চিনির চেয়ে চুমো মিঠে কথাটা নেহাতই কথার কথা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতার লালদিঘি ভরাট করার প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"আমরা বলি তার চেয়ে ঢাকুরে লেক (পোশাকী নাম রবীন্দ্র-সরোবর) ভরাট করলে ভূমি সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যায়; গঙ্গার কথাটাও ভেবে দেখতে পারেন"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন—পশ্চিমবঙ্গের ভূগর্ভে হয়ত তৈল আছে।—"এই তৈলখনির গোপন উৎসটি হয়ত অনেকেরই জানা, কথাটা অবশ্য অনুমানের ওপরেই বলছি, তৈল মর্দনের বহর দেখে একথা না ভেবে উপায় নেই"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে শুনিলাম ব্রহ্মদেশ হইতে নাকি ভূত প্রেত তাড়াইবার তোড় জোড় চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"ব্রহ্মের চালের বিনিময়ে ভারত থেকে এই মওকায় সরষে রপ্তানি করা যায় কি না, কথাটা খাদ্য মন্ত্রণালয় ভেবে দেখবেন।"

এক সংবাদে প্রকাশ হৃদ রোগে মৃত্যুর নাকি একটি পরিসংখ্যান লওয়া হইয়াছে।—"কিন্তু এই পরিসংখ্যান নির্ভুল হতে পারে না। কোথায় কার দিল্ কোন একটি চোখের চাহনিতে মাত্র এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে সে খবর কে-ইবা কতটা রাখেন!"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বোম্বাইয়ের নূতন স্লোগান—"মহা-রাষ্ট্রের ঔষধ কেনো"—একটি সংবাদ শিরোনামা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কথাটা বুঝি প্রায় ডিস্টিল্‌ড **ওয়াটারবৎ** পরিষ্কার হব হব হচ্ছে!!"

ট্রামওয়ে কোম্পানি **যাত্রীদিগকে** তাড়া-তাড়ি রেজগি দেওয়ার **জন্য প্রচলিত** চামড়ার ব্যাগের পরিবর্তে **একটি যান্ত্রিক** বাক্সের প্রবর্তন করিয়াছেন।—**"মন্দই বা কী,** ট্রামের সার্ভিস যেখানে **মন্দগতি,** সেখানে রেজগি তাড়াতাড়ি পেলে আমরা অর্ধং ত্যাগ করে পন্ডিত হতে রাজি আছি"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি এখনও ছাত্র এবং মোটামুটি ভালো ছাত্র। —"ভালো বলেই ত টিকে আছেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ হলে আর ভর্তি হতে হত না।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে বলা হইয়াছে কলিকাতায় জঞ্জাল সাফের পরেই এই মাসের শেষ সপ্তাহে বলদ তাড়াও আন্দোলন শুরু হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু যত আন্দোলনই করুন, কলিকাতা শহরকে নির্বলদ করা চাট্টিখানি কথা নয়, এখানে বলদেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বললে খুব ভুল বলা হয় না!!"

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রী হইবার যোগ্যতা কী, সে সম্বন্ধে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন নাকি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রীর উপর যে-বিষয়ের ভার দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না, শুধু সাধারণ জ্ঞানের জোরে বিশেষজ্ঞদের উপরে মাতব্বরি করেন।—"শ্রী মেননের সত্য বলতে ভয় ডর নেই এই নূতন পরিচয় পাওয়া গেল"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

লণ্ডনের এক ছাত্র নাকি দুই মিনিট এগারো সেকেণ্ডে দুই ডজন ডিম খাইয়াছে।—"তাঁকে 'ডিম-লিট্' উপাধি দেওয়ার পরামর্শ কেউ দিয়েছেন কিনা শুনিনি"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পাক প্রাক্তন মন্ত্রী (খুড়ি উজীর) নাকি জেলখানায় থাকা কালে শর্ট-হ্যাণ্ড শিখিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"মন্দ কী, একটা যা হোক শিখে রাখা ভালো, যা দিন কাল পড়েছে, হুট করে চাকরি পেয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!!"

কুয়াশা

পারিজাত মল্লিক

“এই সংসারে এক-একজন মানুষ আছে যাদের দুঃখের অবধি নেই। তুমি বিশ্বাস কর নাই কর, এদের দেখলে মনে হবে দুর্ভাগ্য যেন শনির মত ওদের গ্রাস করে রয়েছে।” মজুমদারসাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন। তাঁর গলার স্বর গম্ভীর, বেশ যেন বিষণ্ণ, মনে হয় যার কথা তিনি আমাদের বলতে চলেছেন তার আজীবন দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করলে আজও তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন।

বসারঘরে আমরা ক'জনে বসেছিলাম, শীত যেন খেলাচ্ছলে যেটুকু পিছে ছুটে গিয়েছিল গত দু-তিন দিন, আজ তার চারগুণ এগিয়ে এসেছে। বাইরের সেই কনকনে শীতে কুয়াশা ঘন হয়ে নিজেকে বিস্তার করেছে। সন্ধ্যা ফুরিয়ে আসার পর পরই চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলোয় কুয়াশায় বাইরেটা ঝিমঝিম করছিল। আমরা অনুভব করতে পারছিলাম শীতের প্রাবল্যে বাইরেটা আজ এই প্রথম রাতেই কী নিস্তব্ধ।

“আমি আজ যার কথা বলছি একসময় লোকে তার মামলার কথা কাগজে রুদ্ধ-নিশ্বাসে পড়েছে। বোধ হয় এ-রকম ঘটনা কদাচিৎ এদেশে ঘটেছে।” মজুমদারসাহেব তাঁর স্বাভাবিক শান্ত গলায় গল্পটা বলতে শুরু করলেন।

“মহিলার নাম সরোজিনী। জীবনের শুরু থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েটিকে প্রতি পদে পদে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। সরোজিনীর বয়েস যখন পাঁচ, তখন

তার মা মারা যায়। যতদূর মনে হয় তার মা পাগল হয়ে গিয়েছিল। নয়ত তেতলার ছাদে উঠে দিন-দুপুরে কেউ লাফ মারে না। সরোজিনীর বাবা কারখানায় চাকরি করত। লোকটার স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল এমন কথা কেউ বলে নি। সে আবার বিয়ে করে। সরোজিনীর সহোদর দুই বড় ভাই ছিল। অল্প বয়েস থেকেই তারা বকে যায়। পরে দুটোই খুব নচ্ছার-গোছের ছেলে হয়ে ওঠে। একটা রীতিমত গুণ্ডার দলে ভিড়ে চুরি রাহাজানি করে বেড়াত, অন্যটা কলকাতার আরও বদ-সংসর্গে পড়ে গয়নার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জেল থেকে পালাতে গিয়ে সেন্ট্রির গুলীতে সে মারা যায়। অন্য ভাইটাও বেশী দিন বাঁচে নি, পাগল হয়ে গিয়েছিল, সেটাও আত্মহত্যা করে।

সরোজিনীর বাবা এবং সৎ-মা সরোজিনীর ওপর নজর রেখেছিল বলে মনে হয় না। তবু মেয়েটি নিজের চেষ্টায় কিছুটা লেখাপড়া শেখে। তারপর পনের-ষোল বছর বয়েসে একটা অনাথ আশ্রমে একটুখানি জায়গা করে নেয়। বছর আঠার বয়েসে সরোজিনীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর সরোজিনী চার-পাঁচটা বছর মোটামুটি সুখের মুখ দেখেছিল। তার স্বামী ছিল রেলের চাকুরে। ছোট এঞ্জিনের ড্রাইভার। বিয়ের পর হাওড়ার দিকে রেল-কোয়ার্টারে তারা থাকত। সরোজিনীর দুই ছেলে। একটার বয়েস যখন পাঁচ, অন্যটার তিন তখন তার স্বামী রেল অ্যাক্সিডেন্টেই মারা গেল। সংসারে সরোজিনীর এমন কেউ নেই যে তাকে একটু দেখাশুনা করে। তার সেই বাবা অনেক আগেই মারা গেছে, সৎ-মা আর সৎ-বোন অন্যের গলগ্রহ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এতবড় দুঃখের দিনেও সরোজিনী ভেঙে পড়ে নি। রেলে চাকরি করত বলে তার স্বামী কিছু পয়সাকড়ি রেখে গিয়েছিল, তাছাড়া ক্ষতিপূরণ হিসেবেও সামান্য টাকা পেয়েছিল বিধবা সরোজিনী।

সেই সঞ্চিত অর্থ সম্বল করে সরোজিনী তার বৈধব্যজীবন শুরু করল। দুটি ছেলেকেই যথাসাধ্য যত্নে সরোজিনী মানুষ করেছে। নিজে সেলাইয়ের কাজ করত, প্রয়োজনে কিছুদিন নার্সগিরিও করেছে, তবু অনাথ দুটি সন্তানকে লালনপালন করতে সে কখনও কাতর বা কুণ্ঠিত হয় নি।

এমনি করেই একদিন সরোজিনী চল্লিশের কোঠায় এসে দাঁড়াল। সারাজীবন যাকে মন্দ কপালের সংগে যুঝতে হয়েছে তার পক্ষে চল্লিশ বছর বয়েসটা কিছু কম নয়। ওই বয়েসেই সে বুড়িয়ে গিয়েছিল, চোখমুখ দেখলে মনে হত যেন তার বয়েস পঞ্চাশে এসেছে। মুখে মাংস প্রায় ছিল না। গালের চামড়া গুটিয়ে এসেছিল, চোখ ম্লান দেখাত। ওরা যে এলাকাটায় থাকত তার সংগে কলকাতা শহরের সম্পর্ক পাতাবার সিধে সড়ক ছিল না। ছোট মতন একটা দোকান দিয়েছিল সরোজিনী, টিনের চালা দেওয়া সে-বাড়ির সামনের দিকটা দোকান, পেছনের দিকটায় তাদের বাসাবাড়ি। দোকানটা মোটামুটি মন্দ চলত না। আধখানা টুকিটাকি মনিহারির দোকান, বাকি আধখানা দরজীর। সরোজিনী নিজেই দোকানটা চালাত। ছেলেরা বসত বটে তবে তাদের মতিগতি দোকান চালাবার মত ছিল না। বড় ছেলে জহর ইংরেজী স্কুলে নাইন ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ইলেকট্রিকের কাজকর্ম শিখেছিল কোন একটা কারখানায়। ফিটারী পাস করে সে ভাল জায়গায় চাকরি পেয়েছিল। ছোট ছেলে মোহরের বরাবরই ঝোঁক ছিল মোটরের যন্ত্রপাতির কাজ শিখবে। সরোজিনীর তাতে অনিচ্ছা ছিল না। মোহর কাছাকাছি মোটর কারখানায় কাজ শিখছিল।

ঘটনাটা ঘটে এক বর্ষার দিনে। জহর

হঠাৎ ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সরোজিনী তখন বাড়ি ছিল না। সন্ধ্যের দিকে বাড়ি ফিরে দেখে ছেলে অসহ্য যন্ত্রণায় পেটে হাত চাপা দিয়ে ছটফট করছে। মোহর তখনও বাড়ি ফেরে নি। কাছাকাছি কোন ডাক্তার নেই। মাইল দেড়েক দূরে একটি বুড়ো ডাক্তার থাকত. সরোজিনীদের সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়। ওই বৃষ্টির মধ্যেই সরোজিনী ডাকতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু কী কপাল সরোজিনীর, ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে যে-ডাক্তার তার ছেলেকে বাঁচাতে এল সেই ডাক্তার বাড়ির চৌকাঠে পা দেবার একটু আগেই জহর মারা গেছে।

অনেক সময় ভয়ংকর রকম হজমের গোলমাল থেকে এক ধরনের ডায়েরীয়া হয়। জহর যে এইরকম অ্যাকিউট ডায়েরীয়ায় সময় মতন কোন ওষুধপত্র না পেয়ে মারা গেছে, বুড়ো ডাক্তারের সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। জহরের ডেথ সার্টিফিকেটে ডাক্তার সেই কারণই দেখিয়েছিল।

বড় ছেলে মারা যাবার পর সরোজিনী কিছুকাল ঘর ছেড়ে আর বাইরে বেরোত না। বেচারীর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি না দেখাত এমন কেউ ও অঞ্চলে ছিল না। লোকে জানত সরোজিনীর ভাগ্য-রেখায় কু-গ্রহের প্রভাব আজন্ম। অনেকে আবার তাই নানা শুভ কাজে সরোজিনীকে এড়িয়ে চলার চেষ্টাও করত।" মজুমদারসাহেব থামলেন। তাঁকে এই মুহূর্তে আরও বিষণ্ণ ব্যথিত দেখাচ্ছিল।

আমরা সরোজিনীর কথা ভাবছিলাম। মানুষের ভাগ্য যে এমন মন্দ হয় এর আগে আমরা তা শুনি নি। সত্যি সরোজিনী মন্দভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল। আমরা সবাই এই আজন্ম দুঃখী মেয়েটার জন্য সমবেদনা অনুভব করছিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। মজুমদারসাহেব তাঁর হাতের চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়ার নেশায় ক্লান্তি কাটিয়ে নিচ্ছিলেন। আমরা এই কাহিনীর কোন পরিণতি অনুমান করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল সরোজিনীর কাহিনীর সঙ্গে তার নিয়তির যে ভীষণ সম্পর্ক ঈশ্বর স্থির করে দিয়েছিলেন হয়ত পরিণতিতে সেই নিয়তির চূড়ান্ত পরিহাসই আমরা দেখতে পাব।

অনেকক্ষণ পর ক্লান্তি কেটে গেলে মজুমদারসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন :

"বড় ছেলে মারা যাবার মাস ছয় পরে আবার সেই একই রকম ঘটনা ঘটল। তখন ঘোরতর শীত। মোহর কয়েকদিন ধরে ঠাণ্ডায় সর্দিকাশিতে ভুগছিল। শরীর ভাল না থাকায় কাজেকর্মে যাচ্ছিল না। এবারেও সরোজিনী যখন বাড়ি নেই মোহরের পেটের যন্ত্রণা শুরু হল। বাড়িতে এমন কেউ ছিল না ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে পারে। যাই হোক একটু দেরিতে লোক পাওয়া গেল। সে ডাক্তার ডেকে ফিরে আসার সময় সময় সরোজিনীও বাড়ি ফিরল। ডাক্তার এসে মোহরকে অবশ্য মৃত দেখে নি, কিন্তু তখন এমন কোন উপায় ছিল না যাতে মোহর বাঁচতে পারে। মোহর মারা গেল। এবারও সেই বুড়ো ডাক্তার। মৃত্যুর কারণটাও সেই পুরোনো।

এই ঘটনার পর সরোজিনী তার বাড়িতে একা একা নিঃসঙ্গ দিন কাটাত। তাকে আর বাইরে দেখা যেত না। প্রতিবেশীরা মাঝে

মাঝে আসত সান্ত্বনা ও সহানুভূতি জানাতে। সরোজিনী বলত, সে ছেলেদের স্মৃতি আগলেই জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেবে।

এমনি করেই তিনটে মাস কাটল। তারপর একদিন খুবই আচমকা সরোজিনীর সেই সৎ-বোন দিদির সঙ্গে দেখা করতে এল। নিঃসঙ্গ সরোজিনীর মনের শূন্যতা ও ফাঁকা ভাব একটু যাতে লাঘব হয় সেই আশায় তার বোন দিদির কাছেই কিছুদিনের জন্যে থেকে গেল। সরোজিনীর বোনের ততদিনেও বিয়ে হয় নি। বিয়ে হবার বয়সও আর ছিল না। দিদির আশ্রয় সে বরাবরের মতন পাবে হয়ত, মনে মনে এ আশাও করেছিল। ভগবান তার আশায় বাদ সাধলেন।

এবারে খুব বেশিদিন তফাতে নয়, মোহর মারা যাবার দু মাসের মধ্যেই একদিন সরোজিনীর বোন একই রকম অসুখে পড়ল। এবারও সরোজিনী বাড়িতে ছিল না। প্রতিবেশীরা কাছাকাছি ডাক্তারখানা থেকে এক নতুন ডাক্তারকে ডেকে আনল। নতুন ডাক্তার রোগী দেখতে এসে প্রথমেই সন্দেহ করল, এটা নিশ্চয়ই কোন ফুড পয়জনিংয়ের ব্যাপার। ওষুধ খাইয়ে পেট ধুইয়ে সে রোগীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। ভাগ্য সহায় ছিল, তাই সরোজিনীর বোন মরতে মরতে সে-যাত্রায় বেঁচে গেল। কিন্তু সেই প্রথম ধরা পড়ল সরোজিনীর বোন অনেকটা আর্সেনিক খেয়ে ফেলেছিল।"

আমরা একসঙ্গে শিউরে উঠলাম। কান্তি বলল, "আর্সেনিক—?"

"হাঁ, আর্সেনিক।"

"আর্সেনিক কোথায় পেল? খেতেই বা যাবে কেন?" অশ্বিনী জিজ্ঞেস করল।

"ঘোলের সরবতের সঙ্গে সরোজিনীর বোন এই বিষ খেয়ে ফেলেছিল।"

"কি করে?" বিজলী জানতে চাইল।

"বাড়িতে পাতা দুই-এর মধ্যে আর্সেনিক দেওয়া ছিল।"

আমরা স্তম্ভিত এবং নির্বাক হয়ে বসে থাকলাম। মনে হল, সরোজিনীদের পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে কোন নিষ্ঠুর ভাগ্য যেন এক এক করে নিজের স্বেচ্ছাচারের শিকার করে নিয়েছে।

"এ বিষ কি করে ওবাড়িতে এল? কেমন করেই বা দই-এর সঙ্গে মিশে গেল?"

মজুমদারসাহেব সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আমাদের কিছুক্ষণ অধীর এবং উদ্বিগ্ন রাখার পর তিনি বললেন, "এই ধাঁধার জবাব পেতে আমাদের কিছু সময় লেগেছিল। সরোজিনীকে আমরা অপরাধী স্থির করে তার বিরুদ্ধে মামলা সাজালাম। সরোজিনী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করল, সে তার দুই ছেলে এবং বোনকে বিষ দিয়েছে। এরা তিনজনে ঠিক একই ভাবে ঘোলের সরবত খাওয়ার পর পেটের যন্ত্রণা অনুভব করেছে। অবশ্য তিনটি ক্ষেত্রেই সরোজিনী নিজের হাতে কাউকে ঘোল তৈরি করে দেয় নি, যদিও সে দই-এর সঙ্গে বিষটা মিশিয়ে রেখেছিল।"

আমরা এমন বীভৎস কাহিনী জীবনে শুনি নি। আমাদের কখনই মনে হয় নি চিরদুঃখী সরোজিনী এতবড় নৃশংস হতে পারে।

মজুমদারসাহেব বললেন, "এই হত্যার মধ্যে সরোজিনীর কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না বা যে-উদ্দেশ্য ছিল তাকে উদ্দেশ্য বলা যায় না। যে-সরোজিনী আজীবন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পর পর লড়েছে, যে নিজের দুই অসহায় সন্তানকে সংসারের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে বড় করেছে সেই সরোজিনী শেষের দিকে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সে তার রক্তে বংশের উন্মাদ রোগ সংগ্রহ করেছে। এবং তার সন্তানরাও একসময়ে উন্মাদ হয়ে যাবে। এ এক অন্য-ধরনের ইনস্যানিটি। ভেতরে ভেতরে কখন যে সরোজিনীকে আক্রমণ করত, সরোজিনী নিজেই জানে না। বোধ হয় সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থাতেই সরোজিনী কাজটা করত, যখন সরোজিনী আর সরোজিনী থাকত না। সন্তানদের মৃত্যুর পরও সরোজিনী বুঝতে পারত না নিজের সন্তানের মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী।"

মজুমদারসাহেব অনেকক্ষণ নীরব থাকলেন, আমরাও কোন সাড়াশব্দ দিচ্ছিলাম না। খানিক পরে মজুমদারসাহেব আস্তে গলায় বললেন, "সরোজিনী আদালতে অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল; বলেছিল প্রতিবার বিষ দেবার আগে সে তার বাড়িতে তার মা এবং ভাইদের দেখতে পেত। তারা সরোজিনীকে কিছু বলত না, কিন্তু সরোজিনী বুঝতে পারত, ওরা কি চায়।

......আদালতের বিচারে জজসাহেব সরোজিনীকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেন। অবশ্য তার আগে পাগলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাবার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন।"

মজুমদারসাহেব তাঁর গল্প শেষ করলেন, আমরা অনেকক্ষণ আর নিশ্বাস নিতে পারলাম না।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

হেরমান হেস

জার্মানীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও কবি হেরমান হেস গত ৯ই আগস্ট পরলোক-গমন করেছেন। ১৮৭৭ সালে এঁর জন্ম। দীর্ঘ পঁচাশি বছরের এই জীবনের সাধনা অথবা সাফল্য বিবৃত করার যোগ্যতা আমার নেই। যতদূর জানি, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের তুলনায় হেস জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি, যদিও তাঁর খ্যাতি যতটা লোক-শ্রুতি-নির্ভর ততটা তাঁর সাহিত্য পাঠের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

হেস-এর পিতা এবং পিতামহ ছিলেন ধর্মজ্ঞ, পরিবারের সকলেই আশা করত হেসও পিতা পিতামহের পথ অনুসরণ করবেন। কিন্তু যৌবনেই তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি করতে শুরু করেন; একদা বইয়ের দোকানেও কাজ করেছেন। ১৮৯৯ সালে তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, অনতিকালের মধ্যে আরও কবিতা ও তাঁর প্রথম গল্পও প্রকাশ পায়। ১৯০৪ সালে হেরমান হেস-এর প্রথম উপন্যাস Peter Comenzind প্রকাশিত হবার পর হেস বিখ্যাত হয়ে পড়েন। অতঃপর সাহিত্যই তাঁর একমাত্র পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

হেস ছিলেন ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী। সামরিক কলরব ও জিগীরতোলা সমাজ তাঁর বরদাস্ত হয় নি। ১৯১২ সালে হেস জার্মানী ছেড়ে সুইজারল্যান্ডে চলে যান; ১৯২৩ সালে তিনি সুইজারল্যান্ডের নাগরিক-অধিকার অর্জন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সুইজারল্যান্ডেই বসবাস করেছেন।

সমালোচক বলে থাকেন, হেরমান হেস প্রথম যুদ্ধোত্তর জার্মানীর সাহিত্য-চিন্তায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন:

"His least restrained and most uneven work, is a contribution to the postwar vogue of psycho-analytical fiction."

হেস-এর সাহিত্য চরিত্র বিচার করে পণ্ডিতে মন্তব্য করেছেন যে, লিরিক লেখার মেজাজ নিয়ে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও ক্রমশ তাঁর মেজাজ এপিকের দিকে এগিয়ে গেছে; তিনি ব্যক্তিগত ভাবনার জগৎ থেকে নৈর্ব্যক্তিক জগতে এসে পৌঁছেছেন। দুই বিভিন্ন ও বিপরীত চিন্তাকে সমন্বয় করার সাধনাই যেন তাঁর সাহিত্যের মূল লক্ষ্য।

হেরমান হেস-এর বিখ্যাত গ্রন্থ একাধিক, তবে Magistar Ludi-র দু দণ্ড এবং Siddharta বোধ হয় সর্বাপেক্ষা পরিচিত গ্রন্থ। টমাস মান ও কাফকার সমগোত্রীয় গদ্য লেখক হিসেবে জার্মানীতে তিনি শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

হেরমান হেস
(১৮৭৭—১৯৬২)

এরেনবুর্গের ঘৃণা

"আমার চরিত্র এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে আমি ঊনিশ শতকের লোক। অস্ত্র তুলে নেবার চেয়ে মৌখিক বোঝাপড়া করার দিকে আমার ঝোঁক বরাবরই বেশী। কাউকে ঘৃণা করতে শেখা আমার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু এমন একটা যুগে আমাদের বাঁচতে হয়েছে, যে-যুগে সুছাঁদ মুখের যুবকরা ভেবে নিয়েছিল তারাই এ-জগতে বাঁচার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। এরা অন্যদের, যারা নির্বাচিত হয় নি, তাদের ধ্বংস করতে শুরু করে। আর তখনই প্রকৃতপক্ষে মানুষের এক গভীর ও প্রগাঢ় ঘৃণা জেগে ওঠে, যা ফ্যাসিজমকে প্রতিরোধ করার মতন শক্ত।"

ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর আজকের আত্ম-জীবনীতে কথাগুলো লিখেছেন। লিখে-ছেন, এই ঘৃণা তাঁকে শিক্ষা করতে হয়েছিল বলে তিনি দুঃখিত। শুধু ফ্যাসিজম নয়, যারা এই পাশবিক নীতি সমাজে সচল করাচ্ছিল তাদেরও তিনি ঘৃণা না করে পারেন নি।

এরেনবুর্গের স্মৃতিকথা এই ঘৃণার কারণও ব্যক্ত করেছে। ১৯৩৯-৪১ সালের যে কাহিনী তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় ব্যক্ত করে-ছেন তা চমকপ্রদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্বে এরেনবুর্গ যখন প্যারি প্রবাসী, তখন

তিনি সোভিয়েটের সরকারী কাগজ ইজভেস্তিয়ার সংবাদদাতা। ইটালী এবং জার্মানীর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অবিরাম অগ্ন্যুদ্গার করেছে. অকৃত্রিম সেই ঘৃণা। সেটা ১৯৩৮—৩৯ সালের কথা। এরেনবুর্গের লেখায় ফ্যাসিজম-এর তূর্যনিনাদ যে কী ভয়াবহরূপে ইউরোপে শোনা যাচ্ছে তার বিবরণ থাকত, থাকত আসন্ন বিপদের কথা, দেশদ্রোহীদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা মস্কোর ইজভেস্তিয়া তাঁর সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করত। তারপর হঠাৎ কি যেন ঘটে গেল, এরেনবুর্গের পাঠানো খবর ইজভেস্তিয়ায় আগের মতন প্রকাশ করা হয় না, হলেও অল্প স্বল্প। পরে তাঁর সংবাদ আর প্রকাশ করা হত না। একদা ইজভেস্তিয়া ইলিয়া এরেনবুর্গের প্রেরিত সংবাদ প্রকাশ করা বন্ধ করে দিল।

কিছুদিন পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিশেষ নির্দেশ এল, এরেনবুর্গ যথারীতি তাঁর মাইনে পাবেন তবে আর তাঁকে সংবাদ পাঠাতে হবে না। মস্কো সে-সময় জার্মান-বিরোধী সংবাদে আর উৎসাহিত নয়।

এরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় এর কারণ দেখিয়ে বলেছেন, মলোটভ আর রিবেনট্রপের চুক্তির ফলাফল স্বরূপ যে সোভিয়েট সরকার তার চাল বদলে ছিল; এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। যুক্তি হিসেবে ফ্যাসি-নিন্দার প্রচার তখন নিষিদ্ধ করার কারণ হৃদয়ঙ্গম করলেও তাঁর মন এই নীতি মেনে নিতে পারছিল না। তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সোভিয়েট নাগরিক হওয়াকে তখন তিনি লজ্জার বলে মনে করতেন। তখন তিনি এ দৃশ্যও দেখেছেন, সোভিয়েট দূতাবাস থেকে একদল পুলিস ফরাসী কমিউনিস্টদের রুল পেটা করে তাড়িয়ে দিচ্ছে—আর অল্পক্ষণ পরে সেই ভবনে রাজকীয় সম্মানে হিটলারের প্রতিনিধিকে সেই একই পুলিসরা অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

ইলিয়া এরেনবুর্গ

১৯৪০ সালে মস্কো ফিরে গিয়ে এরেনবুর্গ মলোটভের সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। কিন্তু মলোটভ নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে তাঁর ডেপুটিকে পাঠিয়ে দেন এরেনবুর্গের সঙ্গে দেখা করতে। এরেনবুর্গ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর অভিযোগ জানাচ্ছেন তখন ডেপুটি লোসভস্কি বেদনার হাসি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "কমরেড, তোমার কথা আমি সবই শুনলাম, কিন্তু তুমি জানো—আমরা এখন অন্য নীতি নিয়েছি।"

এরেনবুর্গের জীবনে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে স্টালিন যখন অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এরেনবুর্গের বাড়িতে স্টালিন টেলিফোন করেছেন, তাঁকে দেখা করতে ডাকছেন, মাত্র এই ঘটনাই এরেনবুর্গের লেখা প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। সোভিয়েট ইউনিয়নের আর কোথাও তাঁর লেখা প্রকাশে বাধা থাকল না। এটা ১৯৪১ সালের কথা।

এরেনবুর্গের এই ঘৃণার বিবরণ পড়ে আজ মনে হয় তাঁর এই ঘৃণা অত একপেশে কেন? আজ অনেক সমালোচক তাই প্রশ্ন করছেন :

"Why then, one has to ask him, why then did he not hate the unmotivated and treacherous murders of which he now writes, the murdering of his own friends and comrades, committed by other Communist comrades, why does he not hate all these crimes, too instead of trying to find rather lame explanations for them ?"

শরৎচন্দ্র অথবা শরচ্চন্দ্র!

সবিনয় নিবেদন,

৪০ সংখ্যা (২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) 'দেশ' সাহিত্য সংবাদ বিভাগে 'একই নাম : দুই লেখক' শিরোনামায় আলোচনা প্রসঙ্গে এক স্থানে 'বিদুর' বলেছেন, "যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'গৃহদাহ' লিখেছিলেন, তিনি যে 'গল্পলহরী' নামক পত্রিকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়, এ ভ্রম ভাঙতে সময় লেগেছিল।" উক্ত বিভ্রান্তির বিষয়বস্তু সর্বৈব সত্য। তবে আমাদের যতদূর স্মরণে পড়ে, 'গল্প-লহরী'র মানুষটি এবং 'হৃদয়ের চাঁদ' ইত্যাদি পুস্তক-প্রণেতা ছিলেন শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়। নামের ক্ষেত্রে বানানের তফাতটুকু, বোধ করি, বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করা সঙ্গত।

মদনমোহন শেঠ
চন্দননগর

[এ বিষয়ে বিদুরের মন্তব্য, পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে]

পুস্তক পরিচয়

প্রকৃতি ও মানবহৃদয় : একটি অসামান্য বড় গল্প

অন্য এক নাম—প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক: আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ২.০০।

প্রেমেন্দ্র মিত্রর সর্বাধুনিক কাহিনী 'অন্য এক নাম'। কাহিনীর সঙ্গে সমতা রেখে শিরোনামা স্থির করা আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'অন্য এক নাম' কিন্তু এ গ্রন্থের যথার্থ শিরোনাম। শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রর রচনার পক্ষেই নয়, সমগ্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেই এ কাহিনী একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। নতুনতর কোনো পরীক্ষার কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে এ কাহিনীতে লেখক এমন এক অপরিচিত পটভূমিতে অচেনা কয়েকটি নরনারীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন যা আজকের বহুবিচিত্রগামী কথাসাহিত্যেও অনাস্বাদিতপূর্ব।

ঘটনায় কিন্তু তেমন নতুনত্ব নেই, যা আছে তার কারুকার্যে। এখানেও সেই চিরন্তন ত্রিভুজ প্রেমই। অথচ যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার আদি-মধ্য-অন্ত সেই জংলী দেশের মেয়েটি আগাগোড়াই থেকে গেছে যবনিকার অন্তরালে। চিরাচরিত প্রথায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীও একে অন্যের মুখোমুখি হলো না। যে প্রাণ দিলো, কাহিনীর প্রাণকেন্দ্র হয়েও তার সঙ্গে এ প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। মোট কথা, একটি সামান্য ঘটনাকে এমন অসামান্য রূপে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাঠক বিস্মিত হয়ে লেখকের নতুন একটি রচনারীতিকেই এখানে আবিষ্কার করবেন।

তবু বলবো, ঘটনাটাই এখানে সব নয়। বোধ হয় এ কাহিনীর আসল কথা হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের সম্পর্ক। অজ্ঞাত এক জংগলে ঘেরা ছোট জায়গার দেওয়ান কুঠির শশধরের পক্ষে যেমন রুক্ষ কঠিন হওয়া স্বাভাবিক, শহরের ছেলে অবনীর পক্ষেও সেই জায়গাতেই উদাসীন স্বার্থ-ত্যাগী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। দুর্দান্ত ভাণ্ডারীরা তাই ভয়ংকর হয়েও প্রকৃতি-মায়ের কোলের শিশু। আদিবাসী এক বন্য মেয়ে একজনের অন্দরমহলে স্থান পেয়েও অত্যন্ত সহজেই আর একজনকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরণ্যের নিবিড়তায় তাকে হারিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া উপায় নেই। কেননা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। অজ্ঞাত জংগল সভ্যতার ছোঁয়ায় যখন নতুন হয়ে ওঠে তখন সেখানে টিঁকে থাকতে পারে না, শশধরের মত মানুষও। ভাণ্ডারীর মৃত্যু তো উপলক্ষ মাত্র। এবং দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসেও অবনী স্থান পায় শহর থেকে দূরে শশধরেরই আশ্রমে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কটি এ গ্রন্থে যেমনভাবে রূপময় হয়ে ফুটে উঠেছে তার সন্ধান আধুনিককালের কথাসাহিত্যে একান্তভাবেই বিরল।

অপার রহস্যময়তাই এ কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। বোধ হয় এইজন্যেই লেখককে এমন সংযত হতে হয়েছে। তবু দুঃখ হয় এইজন্যে যে, এমন একটি নিবিড় রহস্যঘন কাহিনীকে বিস্তৃত উপন্যাসের কাঠামো দিলেন না লেখক, একটি বড় গল্পের আধারেই তাকে ধরে রাখলেন।

৩৪৯।৬২

সংস্কৃতির সাধনা

সাংস্কৃতিকী (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মানুষের জীবনচর্যা যুগে যুগে রূপান্তরিত হতে থাকে। তার জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত কেবল বৃত্তাকারে আবর্তিত নয়; তা কালোপম, তা যুগানুগ হয়ে ওঠে। রূপ এবং রুচি, ঐতিহ্য এবং অভ্যাস নানা সামাজিক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে ক্রমাগত বদলাতে থাকে। তার এই জীবন সংস্কারের শিকড় কিন্তু অনেক গভীরে। সংস্কৃতি কথাটাকে আমরা ইদানীংকালে যে বারো-ইয়ারী অর্থে খাড়া করেছি, চাঁদার খাতার সঙ্গে সঙ্গে যা বহুদ্দেশ্য সাধকদের হাত থেকে হাতে বদল হচ্ছে—এবং শেষ পর্যন্ত জলসা শব্দটির সমপর্যায়ে উপনীত হয়েছে তা একই সঙ্গে ভ্রান্তিজনক এবং দুঃখজনক।

কিন্তু এই হুজুগের যুগে, যাঁরা সবার নেপথ্যে সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে নিযুক্ত রয়েছেন, শ্রীযুক্ত সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভাষা মানবজীবন বিকাশ ও প্রকাশের প্রথম প্রণালী। তারপর সাহিত্য শিল্প লোকাচার। এবং এরই সমবায়ে বিচ্ছুরিত জীবন জিজ্ঞাসা, জীবন দর্শন। সুনীতিবাবুর "সাংস্কৃতিকী"র প্রথম খণ্ডে বারোটি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃতি, যবদ্বীপের মহাভারত, রামায়ণ, কুরল্, কোলজাতির সংস্কৃতি, তাও, সূফী অনুভূতি ও দর্শন, অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত, দরাপ খাঁ গাজী, মণিপুর পুরাণ, শিল্পকলা, এবং রবীন্দ্র-নাথের জীবন দেবতা এই বারোটি প্রবন্ধের

নামকরণ থেকেই সাহিত্যপাঠক বুঝতে পারবেন যে, ইতস্তত প্রকীর্ণ রচনাবলী আলোচ্য গ্রন্থে একত্রিত করা হলেও তারা একই লক্ষ্যচারী। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপান্তর ও মৌল সাধনাকে আলোকিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

সুনীতিবাবুর রচনা বহিরঙ্গে রম্য হলেও বক্তব্যে ও সিদ্ধান্তে অভ্রান্ত ও গভীর। গবেষণামূলক এই রচনাগুলি তথ্যে ও উপাদানে নতুন চিন্তার বাহক। বিশেষ করে রামায়ণ, তাও, কুরল, অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত, দরাপ খাঁ গাজী এবং মণিপুর-পুরাণ মূল্যবান। একই সঙ্গে সাহিত্যিক ও বহুভাষাবিদ পণ্ডিতের মিলন ঘটেছে তাঁর বিশ্লেষণে ও রচনারীতিতে।

গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

১৮২।৬২

সাহিত্য প্রবন্ধ

The Poetry of W. B. Yeats—Bhabatosh Chatterjee. Orient Longmans Limited. — Rs. 9.00.

ইএট্সের কবিতা বিষয়ে এই গবেষণা-গ্রন্থ। বিষয়টি দুরূহ, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতোই ইএট্সের কবিতা আপাত-সহজ, অথচ রহস্যগ্রন্থিল। এই রহস্য উন্মোচনে ব্যক্তিগত জীবন অভিপ্সিত আলোকপাত করতে পারে, এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। অধ্যাপক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় ইএট্সের জীবনের আলোয় তাঁর কবিতা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হয়েছে, একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই।

ইএট্সের কবিতায় একটি দৃপ্ত প্রত্যক্ষতা রয়েছে। ফলত, Symbolism ব্যাপারটিকে সেই প্রত্যক্ষভঙ্গির সঙ্গে তিনি কিভাবে সমীকৃত ক'রে নিয়েছিলেন, সে বিষয়টি বুঝতে শ্রীভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা পর্যাপ্তভাবে পাঠককে সহায়তা করে।

বিদেশী সমালোচকদের যে-কোনো মন্তব্যকেই তিনি ঋষির মুখ থেকে নিঃসৃত বলে মনে করেন নি। Edmund Wilson বা C. Dey Lewis-এর প্রদত্ত ভাষ্যকেও তিনি বিচক্ষণ-রূপে প্রশ্ন করেছেন, দরকার মতো বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন।

ইএট্সের কবিতার অন্ত্যপর্বের উপযোগিতা আধুনিক পাঠকের কাছে অসীম। সেই পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের ধীশক্তি ও রসবোধ আশ্চর্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

কাব্যনাট্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা প্রত্যক্ষত এই থীসিসের অন্তর্ভুক্ত নয়, জানি। তবু সেগুলি সম্পর্কে, প্রাসঙ্গিকতা অটুট রেখেও আরো কিছু বলা কি সম্ভব ছিলো না? কারণ ইএট্সের কবিতা ও কাব্যনাট্যের একটি অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটেছে, একথা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু লেখকের কাছে যা পেয়েছি, তার মূল্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। বইটি গবেষণা-ভাষ্যের উদ্দেশ্য অতিক্রম ক'রেও সার্থক। বিদ্যালয়বহির্ভূত পাঠক-মণ্ডলীর কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে, এমন আশা অসমীচীন নয়। ১২৪।৬২

অভিধান

বিবিধার্থ অভিধান। শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। সাড়ে ছয় টাকা।

অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তার অর্থ সন্নিবিষ্ট করা একটা বড় কাজ। এর পিছনে অনেক পরিশ্রম ও যত্ন আছে—এর প্রমাণ অভিধানটির প্রায় প্রত্যেক পাতাতেই স্পষ্ট। অনেক ইডিয়ম ও ফ্রেজ আছে, যার ভিতরের মানে না বুঝেও আমরা তা ব্যবহার করে থাকি—কেননা, তার ব্যবহারিক অর্থ কেবল আমাদের জানা আছে। যথা—'পটল তোলা': এসবের উৎপত্তি হল কি ভাবে এর ব্যবহারিক অর্থটাই বা কি ভাবে পাওয়া গেল, সে সম্বন্ধে অনেক সময় আমাদের মনে কৌতূহল থাকে, অথচ সে কৌতূহল নিবারণ করা সম্ভব হয় না। 'বিবিধার্থ অভিধান' সেসব কথার অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দিলেন বলে অভিধান-প্রস্তুতকারক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সকলের ধন্যবাদভাজন হলেন।

প্রায় পঁচিশ হাজার শব্দ এই অভিধানে সংকলিত হয়েছে। বিশিষ্টার্থক শব্দ এবং বাক্যাংশ, প্রবাদ ও প্রবচন, দেব-দেবী নাম স্থান ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বিশিষ্টার্থক শব্দ ও প্রবাদ, বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ, বাংলায় প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ, বহুত্ববাচক ও ক্ষুদ্রবাচক শব্দ, সমষ্টিগত জিনিসের নাম, দ্বিত্বমূলক সহচর শব্দ, বিপরীতার্থক বা প্রতিচর শব্দ, উপচর বা বিকার শব্দ, বিপরীতার্থক যুগ্ম শব্দ, বীভৎস শব্দ আওয়াজ ডাক ইত্যাদি, রাজনৈতিক সাংবাদিক ইত্যাদি পরিভাষা, বাংলা শব্দের বিকৃত বা গ্রাম্য রূপ, যুদ্ধোত্তর নূতন বাংলা কথা, ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ বাংলা অশিষ্ট বা অপ শব্দ, বিবিধ বিষয়ের পরিভাষা শব্দ—অভিধানটির বিষয়সূচী মোটামুটি এই।

বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবী ফারসী ইংরেজী পোর্তুগীজ ফরাসী ওলন্দাজ লাটিন জাপানী চীনা বর্মী তিব্বতী তুর্কী গ্রীক ইত্যাদি শব্দ দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রত্যহ এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করি, সেগুলি বাংলা শব্দ মনে করেই, অবশ্যই এখন সেগুলি বাংলা শব্দেই পরিণত, কিন্তু তার উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে, তা আমাদের অনেকের হয়তো জানাও নেই। সেসব শব্দ এখানে সংকলিত হওয়ায় একত্রে সবগুলিকেই পাওয়া গেল। আমরা চা খাই, লিচু খাই—কিন্তু আমাদের খাদ্য দুটির নাম যে চীন দেশ থেকে এসেছে সে খেয়াল আমাদের সব সময় থাকে না। গণ্ডগ্রাম শব্দটা আমরা ব্যবহার করি অনেক সময়ই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বোঝাতে গিয়ে, কিন্তু গণ্ডগ্রাম শব্দটার অর্থ যে, বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম, অনেক সময় আমরা তা ভুলে যাই।

আরও, কিছু-কিছু প্রবাদের উল্লেখ বাদ পড়েছে দেখা গেল, যেমন—'কড়ায় কড়া কাহনে কানা' 'পুড়িলে নগর দেবালয় কি এড়ায়' এবং 'বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো'—এগুলি থাকলে অভিধানটির আঁটুনি আরও দৃঢ় হত।

২৪৬।৬২

বিবিধ

বিচিত্র মণিপুর—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য তিন টাকা।

মহাভারতের যুগ হইতেই মণিপুরের সঙ্গে ভারতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। চিত্রাঙ্গদার দেশ মণিপুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু মনের শিল্প ও বিবাহপদ্ধতি প্রভৃতির নিখুঁত আগ্রহও অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই আগ্রহ ও কৌতূহল আরও সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক জন-মনের এই উদগ্র আগ্রহ ও কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বল্প-পরিসরে মণিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ দেশের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, নৃত্যকলা, এবং নির্ভরযোগ্য চিত্র পরিবেশনে গ্রন্থকার নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের লিপিচাতুর্যের গুণে এই তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থখানি আরও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

১৪৭।৬২

* রুপজগতে *

কেন এমন হয় ?

মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যার সংবাদে সারা বিশ্বের চলচ্চিত্রানুরাগীরা স্তম্ভিত, বিষন্ন। শিল্পীর জীবনে এমনিভাবে কেন আসবে মৃত্যু? আত্মহননের বিকৃত বাসনা? চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জনে জনে আনন্দ বিতরণ করার মহৎ অধিকার অর্জন করেন শিল্পী। তাই তো তাঁর জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠবার কথা। তিনি কেন এমনিভাবে ব্যর্থ হবেন? জীবনের জটিল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যার পথ কেন তাঁকে বেছে নিতে হবে? এই প্রশ্ন আজ জেগেছে অনেকের মনে।

এ কি চলচ্চিত্রের অভিশাপ? চলচ্চিত্র-লোকে কি শান্তি নেই? একটি অশান্ত, অভিশপ্ত, বিড়ম্বিত জীবনের গ্লানিই কি চলচ্চিত্র দেয় শিল্পীকে? আর কিছুই নয়? শিল্পসৃষ্টির আনন্দ, সার্থকতা?

চলচ্চিত্রলোক যদি আজ বিষময় হয়ে ওঠে, যুগ-যন্ত্রণার কারাবাস হয়ে ওঠে তবে তার জন্য দায়ী কে? শিল্পী নিজে, না তাঁর পরিবেশ?

চলচ্চিত্র একটি জনপ্রিয় শিল্প। এই শিল্প উপভোগ করেন জনসাধারণ। কিন্তু চলচ্চিত্রলোক নিয়ে জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা নেই। এ জগৎটি যেন রহস্যময়। বাইরের সমাজের সংগে যেন এর কোন মানসিক যোগ নেই। এই জগতের বাসিন্দারা গ্রহান্তরের মানুষ। কিন্তু ওঁরা সুখী তো? নাকি শুধু দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণার অংশীদার? এই প্রশ্ন জাগে বাইরের মানুষের মনে। হঠাৎ করে হয়ত আবার কোন একজনের জীবনের নিদারুণ ট্র্যাজেডি সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে যায়। যেমন দিয়ে গেল মেরিলিন মনরোর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি। এবং সংগে সংগে ইংরেজ অভিনেত্রী প্যাট্রিশিয়া মারলো'র আত্মহত্যা। কিন্তু কেন এমন হয়?

প

বাণী দত্ত

ছায়াছবিতে শ্রুতির প্রতিশ্রুতি

"প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। তখনকার দিনের ছবিতে নায়ক-নায়িকারা নিজেই গান করতেন। "চন্ডীদাস" ছবিতে রামীর গান

আগামীবারে ছায়াছবিতে সংগীত সম্পর্কে বলবেন খ্যাতিমান সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়।

রেকর্ড করা হবে। গান হবে পুকুরপাড়ে। বিরাট পিয়ানো, অর্গ্যান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাওয়া হল। সারা দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর প্রচুর অর্থব্যয়ে গান রেকর্ড

তারকার আত্মহত্যা : জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা—(বাঁয়ে) বিবাহের পর ষোল বছর বয়সে মেরিলিন মনরো (ডাইনে) বেদনায় ম্লানমুখী মেরিলিন মনরো

তৃতীয় স্বামী আর্থার মিলারের সঙ্গে মেরিলিন মনরো (১৯৫৬)

করা হল, গান গাওয়ার দৃশ্য তোলা হল। এরই পাঁচ-ছয় বছর পর এল প্লে-ব্যাক পদ্ধতি। প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে গান স্টুডিওতে আগেই রেকর্ড করে নেওয়া হয়। পরে শব্দ-প্রক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে গানের ছবি তোলা হয়। অর্থাৎ অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীকে শুধু গানের সঙ্গে ঠোঁট নেড়ে যেতে হয়। প্লে-ব্যাক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় লাভ হচ্ছে এর ফলে সুগায়ক-গায়িকার গান ছবির শিল্পীর মুখে শোনা যায়। অভিনয়-শিল্পীর গান গাওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও কাজ চলে যায়। তা ছাড়া, প্লে-ব্যাক পদ্ধতির ফলে গান রেকর্ডিং এবং গানের দৃশ্য তোলার খরচও অনেকটা কম লাগে।"

কথাগুলি বললেন প্রখ্যাত শব্দযন্ত্রী বাণী দত্ত। "বাংলা ছবিতে বিগতকালের শব্দগ্রহণ ব্যবস্থা ও আজকের ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা?"—উত্তরে শ্রীদত্ত আরও বললেন, "পার্থক্য প্রচুর। এ দেশে সবাক যুগের প্রথম দিকে নির্বাক যুগের ক্যামেরা ব্যবহৃত হত। এইসব ক্যামেরা থেকে বিরক্তিকর ঘর্-ঘর্ আওয়াজ বের হত। ফলে শিল্পীদের অনেক উঁচু গলায় সংলাপ বলতে হত। এমন কি নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপও উঁচু স্বরে বলতে হত। তা বাদে তখনকার দিনে শব্দযন্ত্রের শক্তি কম থাকায় 'মাইক্রোফোন' শিল্পীর মুখের কাছে রাখতে হত। 'মাইক' থেকে মুখ সরানো বা ঘোরানো নিষিদ্ধ ছিল। শব্দ-গ্রহণের এইসব অসুবিধার ফলে চলচ্চিত্র অনেকটা মঞ্চঘেঁষা হয়ে উঠত। কিন্তু অল্পকাল পরেই দর্শকদের মঞ্চঘেঁষা ছবি দেখার শখ কমতে লাগল। তাঁরা নির্বাক যুগের বহির্দৃশ্য সংবলিত ছবির মত সবাক চলচ্চিত্র দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।"

"এর অল্পকাল পরেই শব্দহীন ক্যামেরা উদ্ভাবিত হল। নায়ক-নায়িকার চীৎকার করে প্রেমালাপ করার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। 'মাইক্রোফোন বুম' বা মাইক ঝুলোবার যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে শিল্পীর নড়ে-চড়ে অভিনয় করার সুযোগও বেড়ে গেল। "পোর্টেবল্ সাউন্ড রেকর্ডিং" যন্ত্রের সাহায্যে মাঠে-প্রান্তরে, পাহাড়ে, নদীতীরে শব্দগ্রহণ সম্ভব হল। বহির্দৃশ্যে শিল্পীর সংলাপের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির যেসব শব্দ মিশে যায় তা-ও ডাবিং পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব হল। সবাক যুগের প্রথম দিকে সুষ্ঠু শব্দগ্রহণের এত ব্যবস্থা ছিল না।"

"কলকাতার স্টুডিওতে বর্তমানে শব্দ-গ্রহণ-ব্যবস্থার কোন বিশেষ অসুবিধা রয়েছে কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বাণী দত্ত বলেন, "বোম্বাই ও মাদ্রাজ-এর স্টুডিওর তুলনায় কলকাতার স্টুডিওতে শব্দগ্রহণ ব্যবস্থার কোন বিশেষ অসুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না। এবং জোরের সঙ্গে বলতে পারি, সংলাপ রেকর্ডিং সেখানকার স্টুডিওর তুলনায় কলকাতার স্টুডিওতে অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। গান রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সুনাম অবশ্য বেশী। তবে আমাদের স্টুডিওতে একটি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শব্দগ্রহণ যন্ত্রের কোন অংশ বিকল হয়ে গেলে আমাদের তা মেরামত করে নিতে হয়। আমরা তা পালটিয়ে নিতে পারি না।"

"ছায়াছবিতে সুষ্ঠু শব্দগ্রহণের গুরুত্ব কতটুকু?" —এই প্রশ্নের উত্তরে শব্দযন্ত্রী বলেন, "চলচ্চিত্র মুখ্যত দৃষ্টি-শ্রুতি-বাহিত শিল্প। চলচ্চিত্রের শব্দ বিভাগে রয়েছে সংলাপ, গান, আবহ সংগীত ও ধ্বনি (এফেক্ট সাউন্ড বা মিউজিক)। বলা বাহুল্য, সমস্ত বিভাগের শব্দগ্রহণ যদি সুষ্ঠু না হয় এবং ছবির 'মুড্'টি প্রকাশ করতে না পারে তবে ছায়াছবি উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। ছবির ভাব বা 'মুড'টি বেশী ফুটিয়ে তোলে আবহ-সংগীত। আবহ-সংগীত যদি সুষ্ঠু-ভাবে গৃহীত না হয়, অর্থাৎ শব্দানুলেখনের কাজ যদি পরিচ্ছন্ন না হয় তবে ছবির নাটকীয় অথবা আবেগময় দৃশ্যের মর্ম-বাণীটিও দর্শকমনে সঞ্চারিত হতে পারে না। তেমনি ছবির 'মুড' রক্ষার জন্য 'এফেক্ট সাউন্ড'ও যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ, নির্জন রাত্রিতে ঝিঁঝিঁ'র শব্দ, কখনও বা বজ্রধ্বনি কেমনভাবে ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলে তা দর্শকরা প্রায়ই লক্ষ করে থাকেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীদত্তকে প্রশ্ন করা হ'ল, "চলচ্চিত্র সবাক হবার ফলে, অর্থাৎ ছায়া-ছবিতে শব্দ-যুগের প্রবর্তনের পর বাংলা ছবির ব্যবসায় প্রসারলাভ করেছে। সব দেশেই তা ঘটেছে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের এই প্রসারলাভের মূলে শব্দগ্রহণ-ব্যবস্থার দান কতটুকু?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রসার অনেক পরিমাণে শব্দগ্রহণ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। নির্বাক ছবির আবেদন ছিল সর্বজনীন। পূর্বে বিদেশী নির্বাক চিত্র সকল দেশের দর্শকরাই উপভোগ করতেন। এ দেশে ইংরেজী সবাক চিত্র যখন এল তখন শুধু ইংরেজী-

জানা শিক্ষিত দর্শকরাই ইংরেজী ছবি দেখবার জন্য ভিড় করতেন। ইতিমধ্যে আমাদের ছবিও সবাক হল, ভাষা পেল। ফলে যাঁরা আগে বিদেশী নির্বাক চিত্র দেখতে যেতেন তাঁদের অনেকেই (অর্থাৎ যাঁরা ইংরেজী বুঝতেন না) শুধু বাংলা ছবির দর্শক হলেন। ফলে বাংলা ছবি সমৃদ্ধির পথটি খুঁজে পেল। সংগে সংগে বাংলা ছবিতে শব্দগ্রহণের অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থার দিকে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা নজর দিলেন। একাধিক স্টুডিও গড়ে উঠল। নির্বাক যুগে একটি "মোশন পিকচার ক্যামেরা" ও কয়েকটি "রিফ্লেক্টর" থাকলেই ছবি তোলা যেত—যে-কোন মাঠে, বাগান-বাড়িতে অথবা নদীতীরে। সবাক যুগে প্রয়োজন হল স্টুডিও ফ্লোরের। যাতে বাইরের মোটরগাড়ির শব্দ, কারখানার বাঁশী, পাখির ডাক সংলাপ গ্রহণের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করতে পারে। এমনি করে স্টুডিওর সংখ্যাও বাড়ল, ছবি তৈরী হতে লাগল বেশী করে এবং বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পও ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে লাগল।"

অবশেষে কলাকুশলীদের জীবিকার সমস্যা প্রসংগে বাণী দত্ত বলেন, "নৈতিক অর্থে চলচ্চিত্রশিল্প ব্যবসায়ের সত্যিকারের অংশীদার হলেন চিত্রপ্রযোজক, কলাকুশলী (পরিচালক সহ), শিল্পী, চিত্রপরিবেশক ও চিত্রপ্রদর্শক। ছায়াছবি ব্যবসায়ের লভ্যাংশ এঁদের মধ্যে যতদিন ন্যায়সংগতভাবে বন্টন করা না হবে ততদিন কলাকুশলীদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। এঁদের মধ্যে অবশ্য সব চাইতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ব্যবসায় চালিয়ে যান চিত্রপ্রদর্শক। "হোল্ড ওভার", "হাউস প্রোটেকশন ফিগার", "মিনিমাম গ্যারান্টি" প্রভৃতির দৌলতে তাঁরা নিশ্চিত-লাভের পথেই ব্যবসা চালাতে পারেন। এই সৌভাগ্যের অধিকারী আর কেউ নন। কলাকুশলীদের দুরবস্থার কথা আর নাই বা তুললাম। তাঁরা কারোর উপেক্ষিত।"

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে একটি বাঙলা ও দুটি হিন্দী ছবি। বাঙলা ছবিটির নাম **মায়ার সংসার** (শিবানী ফিল্মস)। হিন্দী ছবি দুটি হলঃ **অনপড়** ও **রিপোর্টার রাজু**।

এক মহীয়সী নারীকে কেন্দ্র করে "মায়ার সংসার" ছবির আবেগধর্মী কাহিনী গঠিত। কনক মুখোপাধ্যায় ছবির প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। ছবি বিশ্বাস, সন্ধ্যারানী, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণকুমার ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

মোহন সায়গল প্রযোজিত "অনপড়" (পরিচালকঃ মোহনকুমার) ছবিটির বিষয়-বস্তু বক্তব্যাশ্রয়ী। নারীশিক্ষার আদর্শ ছবিটিতে তুলে ধরা হয়েছে। মালা সিংহ, বলরাজ সাহনী, ধরমেন্দ্র প্রমুখ ছবির প্রধান শিল্পী। মদনমোহন ছবির সুরকার।

"রিপোর্টার রাজু" একটি রহস্যচিত্র। হোমি ওয়াদিয়ার এই ছবির নায়ক-নায়িকা হলেন ফিরোজ খান ও চিত্রা। দ্বারকা খোসলা ছবিটি পরিচালনা করেছেন। এস মহিন্দর সংগীত পরিচালনা করেছেন।

হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নির্মীয়মান "শেষ অংক" (কল্পনা মুভীজ) ছবির সেটে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল ও শর্মিলা ঠাকুর

যন্ত্র বড় ? না, মানুষ ?

কাজল একটি মেয়ের নাম। সে যাকে ভালবাসে, তার নাম অরুণ। "কাজল" (বি এ পি প্রোডাকশন্স) ছবির এঁরাই নায়ক-নায়িকা।

সাময়িক বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন—প্রণয়ের এই দুই অবশ্যম্ভাবী পর্বের ভেতর দিয়ে কাজল ও অরুণ কীভাবে মিলিত হল, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে ছবির প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু প্রেমই ছবির একমাত্র উপজীব্য নয়। অন্য একটি বক্তব্যও আছে। যন্ত্র বড়?

না, মানুষ? ছবির উপপাদ্য হলঃ যন্ত্র মানুষকে ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্য দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে হরণ করে নেয় তার মনের শান্তি। যন্ত্রের রাহুগ্রাসে দিগ্‌ভ্রান্ত এই যুগের তরুণ বিশ্বকর্মার দল। যন্ত্রই তাদের কাছে বড়, মানুষ ও তার মন তুচ্ছ। অরুণের মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই বিভ্রান্তিতে লালিত। তাই মনের শান্তি সে নিজেও হারাল। এবং কীভাবে একদিন তা আবার ফিরে পেল তার মধ্যেই ছবির বক্তব্য বিধৃত।

চিত্রকাহিনীতে এ বাদে রূপ নিয়েছে একাধিক মামুলী আখ্যান-উপকরণ। যেমন

মডেল হিসাবে মেরিলিন মনরোর এই ছবি প্রথম জনসাধারণের সামনে প্রচার করা হয়

পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে অতিনাটকীয় মেলোড্রামা এবং প্রণয়ী-যুগলের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ এক খলপুরুষের আবির্ভাব।

বহু উপকরণ সংবলিত এই চিত্রকাহিনী (কাহিনীকার : সুরেন্দ্রনাথ মিত্র) ছবিতে বারবার যেন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছে। প্রধান ও অপ্রধান এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় নানা ঘটনার মধ্যে এই কাহিনীর বিস্তার। কাহিনীর প্রণয়োপাখ্যানে নতুনত্ব নেই। নায়কের স্বপ্ন ও উচ্চাশাকে ঘিরে ছবিতে যে বক্তব্য স্থান পেয়েছে তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এই বক্তব্য বা ভাবাদর্শকে ছবিতে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে মাত্র। নাট্য-ঘটনার বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে এই বক্তব্যকে আরও ভাবগ্রাহ্য করে তোলা যেত।

ছবিতে আরও এমন সব ঘটনা রয়েছে যা শুধু শুধু হয়েছে, শেষ হয়নি। ছবির বহু ঘটনা যে সুপরিণতি পায়নি তার কারণ হয়ত এই, দীর্ঘকাল ধরে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ছবিটি তৈরী হয়েছে। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে চিত্রগ্রহণের বিশদ কর্মসূচী হয়ত অনুসরণ করতে পারেননি চিত্র-পরিচালক।

তা সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই, এই ছবিতে প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনার কাজে সুনীল

বন্দ্যোপাধ্যায়, বহু ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ছবির কয়েকটি প্রণয় ও নাট্যমুহূর্ত যেভাবে মরমী করে তুলেছেন তা রসবোধ ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। আবেগ-মুহূর্তে রচনায় তাঁর পরিমিতিবোধ প্রশংসনীয়। বিরাট কারখানার পটভূমি-বিন্যাস ও শিল্পশোভন দৃশ্যগঠনেও তিনি দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অসীমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। "কিছুক্ষণ" ছবির পর অসীমকুমার এই ছবিতে আবার প্রমাণ করলেন, যোগ্য ভূমিকায় যথাযথ নির্দেশ পেলে তিনি সুন্দর অভিনয় করতে পারেন। নায়ক-চরিত্রে শিল্পী যে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সুপ্রিয়া চৌধুরীর কাজল প্রণয়ে মধুর, আত্মমর্যাদায় ব্যক্তিত্বসম্পন্না। নাট্যমুহূর্তে তাঁর অভিনয় সংবেদনশীল।

ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী ও কুমার রায়। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও কমলা মুখোপাধ্যায়।

ছবির সংগীত-পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আবহ-সংগীত মন স্পর্শ করে, ছবির গান শুনতে ভাল লাগে।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে প্রশংসার দাবি রাখে সম্পাদনা (কালী রাহা) এবং শব্দধারণ (বাণী দত্ত), জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ ও জে ডি ইরানী)।

গ্রীণ ইজ গোল্ড

"গ্রীন ইজ গোল্ড" নামে ঈস্টম্যান কালারে একটি অল্প দৈর্ঘ্যের সুন্দর তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন টী বোর্ড (ইণ্ডিয়া)। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অসিত সেন।

ভারতের চা-শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও বহির্বাণিজ্য-বিস্তারের পরিচয়টি তুলে ধরা হয়েছে এই তথ্যচিত্রে। এবং এই সঙ্গে ভারতের প্রধান চা-উৎপাদন কেন্দ্রের (পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ ভারত) কর্মধারার তথ্যবহুল বিবরণও এই ছবিতে সন্নিবিষ্ট।

প্রামাণিক তথ্যের সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্যের যে স্বচ্ছন্দ সমন্বয় ঘটতে পারে, এই ছবিতে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রামাণিক তথ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পটভূমি নির্বাচনে এবং দৃশ্যগঠনে পরিচালক ছবিটিকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন। তবে ছবিতে আবহ-সংগীতের ব্যবহার (সংগীত-পরিচালক—হেমন্তকুমার) অপরিমিত। অজয় মিত্রর চিত্রগ্রহণ ছবির এক বিশিষ্ট সম্পদ।

দ্বিতীয় স্বামী জো ডি ম্যাগিওর সঙ্গে মেরিলিন মনরো (১৯৫৪)

* ছবির পর ছবি *

বর্ণচোরা

শিল্পভারতী প্রোডাকশন্স-এর "বর্ণচোরা" ছবিটির কাজ এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি এন্‌ টি স্টুডিওতে ছবির একটি জলসার দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। জলসার প্রধান আকর্ষণ নায়িকা সন্ধ্যা রায়ের নাচ। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। বনফুল-এর "কাঞ্চি" নাটকের ভিত্তিতে এই ছবির কাহিনী গঠিত। ছবির নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন অনুপকুমার, জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিশেষ ঘোষণা

(১) চলচ্চিত্র আপনার ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে কি কখনও অনুভব করেছেন? জীবনের কোন বিশেষ সমস্যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোন ছবির কোন বক্তব্য বা ভূমিকা আপনার সহায় হয়েছে কি? উদাহরণ দিতে পারেন?

(২) কী ধরনের ছবি আপনি ভালবাসেন?

বাংলা ছবি সম্পর্কেই উপরোক্ত প্রশ্ন দুটি প্রযোজ্য। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর এক শত শব্দ এবং দ্বিতীয়টির উত্তর পঞ্চাশ শব্দের অধিক হলে চলবে না। প্রতি এক সপ্তাহ অন্তর পাঠক-পাঠিকার সুলিখিত উত্তর "দর্শকের রায়" নামে একটি নতুন বিভাগে ছাপা হবে।

"নির্জন সৈকতে" ছবির সেটে গিয়েছিলেন ভারত সফরে আগত ফরাসী ছাত্র দল। বিদেশী ছাত্রদের সংগে ছবির পরিচালক তপন সিংহ এবং শিল্পী অনিল চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতাকে দেখা যাচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই উপলক্ষে স্টার রঙ্গশালার স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র ডঃ বিধানচন্দ্র স্মৃতি তহবিলে এক হাজার এক টাকা দান করবেন। তা ছাড়া, উৎসব উপলক্ষে নাট্যকার কাহিনীকার, শিল্পী, কলাকুশলী ও সকল বিভাগের নেপথ্য-কর্মীদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

পথিক

রূপম নাট্যসংস্থা গত ২৫শে জুলাই বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে তুলসী লাহিড়ীর "পথিক" মঞ্চস্থ করেন। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন রাজলক্ষ্মী দেবী, দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায়, কে কে রায়চৌধুরী, বরদা গুহ, প্রাণেন সেন, অংশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী।

* পাঠকের চোখে *

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

মহাশয়,

আমি "দেশ"-এর নিয়মিত পাঠক। "দেশ"-এ প্রকাশিত বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট সম্পর্কিত লেখাগুলি আমি বিশেষ আগ্রহের সংগে পাঠ করি।

সম্প্রতি "দেশ"-এ প্রকাশিত "বাংলা ছবির সংকটমোচনের অভিনব প্রয়াস" শীর্ষক সংবাদটি খুবই ভাল লাগল। এম-জি-এম-এর মত বাংলার চলচ্চিত্র সংস্থা যদি বাংলার বাইরেও শুধু বাংলা ছবি প্রদর্শনের জন্য চিত্রগৃহ নির্মাণ করতে পারেন তা হলে বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা এবং বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

ছ' বছর যাবৎ আমি দিল্লিতে আছি। এখানে বাংলা ছবির জন্য ভিড় লেগেই আছে। রবিবারে বাংলা ছবির প্রাতঃকালীন প্রদর্শন শুরু হয় সাড়ে ন'টায়। সময়টা শীত অথবা গ্রীষ্ম কোন সময়েই ছবি দেখার পক্ষে অনুকূল নয়। তদুপরি শুধু প্রাতঃকালীন প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় আমাদের টিকিট কিনতে গিয়ে হতাশ হতে হয়।

অথচ বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা এখন খুবই বেড়েছে। বিশেষত সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলির পর। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও এখন বাংলা ছবির প্রতি অনুরাগী। প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি চলার সময়ে অনেক অবাঙ্গালী ও বিদেশী মুখও দেখা যায়।

অবাঙ্গালী বন্ধুরা যদি জিজ্ঞেস করেন অমুক ছবিটা কেমন, তখন আমাদের "দেশ"-এর সমালোচনার ওপরই নির্ভর করতে হয়। কারণ সাধারণত নতুন বাংলা ছবি এখানে আসে না।

ইংরেজী ও হিন্দী সাবটাইটেল সহ বাংলা ছবি যদি কলকাতার সংগে সংগে এখানেও মুক্তিলাভ করে তবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প আর্থিক দিক থেকেও নিশ্চয়ই লাভবান হবে। বাংলা চলচ্চিত্রসেবীদের এই বিষয় ভেবে দেখবার জন্য অনুরোধ করি।

ইতি—
রণজিৎ ভট্টাচার্য
নয়াদিল্লি

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীরাসবিহারী সরকার পরিষদের বিভিন্ন কর্মধারা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীরের সংগে সম্প্রতি আলোচনা করেন। সংবাদে প্রকাশ, শ্রীসরকার পরিষদের বিভিন্ন নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। যাত্রা-উৎসব, গবেষণা-মঞ্চ, মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চ, গিরিশ গ্রন্থাগার, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস রচনা—পরিষদের এই সব পরিকল্পনার কাজে শ্রীকবীর যথাসম্ভব সরকারী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা গেল। তা-ছাড়া সংগীত-নাটক আকাদমিতে পেশোদারী মঞ্চের প্রতিনিধিত্ব, ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক পরিষদকে স্বীকৃতিদান, প্যারিসে আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের যোগদান এবং আকাদমি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নাটকের জন্য পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও শ্রীসরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকবীরের সংগে আলোচনা করেন এবং সর্ববিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস পান।

প্রযোজক-অভিনেতা সুনীল দত্ত নতুন ধরনের গল্প নিয়ে একটি ছবি তৈরির আয়োজন করছেন। বারোজন দুঃসাহসী ভারতীয় যুবক ভারত-চীন সীমান্তে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দুশ্চর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছে—এমনি ধরনের একটি কাহিনীর রূপ দিতে চান সুনীল দত্ত তাঁর আগামী ছবিতে। ভারত সরকারের অনুমতি পেলে ভারত-চীন সীমান্তের পটভূমিতে তিনি ছবির দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু করে দেবেন।

আলোচনা

হিসাবের গোলমাল

সম্পাদক দেশ সমীপেষু,

২৮শে জুলাই 'দেশ'-এর ১২৭৮ পৃষ্ঠার তিনবার মিলিমিটার শব্দটা ছাপা হয়েছে জলের আয়তন মাপবার মানদণ্ড হিসাবে। মিলিমিটার দিয়ে আয়তন মাপা যায় না, সেটা দৈর্ঘ্য মাপবার মাপকাঠি। তাই মনে ভাবলুম, তিনবারই ছাপাখানার ভূত "লিটার" ছাপতে "মিটার" ছেপেছে। কিন্তু তাতেও তো অঙ্ক মিলছে না। আমার হিসাবে এক চামচ জলের আয়তন প্রায় সাড়ে তিন মিলিলিটার; সাড়ে চার মিলিলিটার নয়।

দ্বিতীয়ত, ২১শে জুলাই সংখ্যায় ১১৭৯ পৃষ্ঠায় 'রক্ষাকবচ' গল্পে শ্রদ্ধেয় শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কোন একটি মেয়ে-কলেজে পুরুষ প্রফেসর সাতজন এবং তা হচ্ছে ২১·৫ শতাংশ। নর-নারীর মাঝামাঝি—অথবা নর ও নারী ভিন্ন অন্য কিছু কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন এমন নজির নেই। আমি ধরে নিয়ে ভুল করিনি নিশ্চয় যে, বাকি ৭৮·৫ শতাংশ নারী-অধ্যাপক। অঙ্কশাস্ত্র বলছে, হিসাবে মহিলা অধ্যাপকের সংখ্যা ২৫½ জন প্রায়। এখানেও আমার জিজ্ঞাস্য আধখানা-অধ্যাপক কি বস্তু?

নমস্কারান্তে

ভবদীয়

বিকর্ণ

হিন্দী ও বাংলা

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় ২৮ জুলাই তারিখে প্রকাশিত "হিন্দী ও বাংলা" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। দেশপ্রেমিক বাঙালী মাত্রেই যে আপনাদের সহিত একমত হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য প্রয়োজন লেখক এবং প্রকাশকদের সম্মিলিত প্রয়াস। শুনিয়াছি, মনন এবং গবেষণামূলক গ্রন্থাদির নাকি প্রকাশক পাওয়া যায় না। বাংলা দেশে ধনী পুস্তক প্রকাশকের অভাব নাই। এইসকল ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা পুস্তক প্রকাশনাকে কেবলমাত্র লাভের ব্যবসা হিসাবে গণ্য করেন না—তাঁহারা যদি মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিদেশী পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা-পুস্তক প্রভৃতির অনুবাদ এবং বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক পুস্তক প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হন তাহা হইলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। 'বিশ্বকোষ' রচনায় পুস্তক প্রকাশকগণও অগ্রণী হইতে পারেন। বাংলা ভাষায় An Outline of Modern Knowledge-এর ন্যায় এমন কোন পুস্তক নাই যাহাতে একটি খণ্ডের মধ্যে জ্ঞানরাজ্যের বহু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ এইরূপ পুস্তক প্রণয়ন খুব কষ্টসাধ্য নয়।

যেসকল বিষয়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত সংখ্যক অথবা আদৌ কোন পুস্তক নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সেইসকল বিষয়ে মৌলিক পুস্তক রচনা এবং অন্য ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য একটি সংস্থা গঠন করিয়া কার্যে অগ্রসর হন তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয়। এখনই যাহা করা সম্ভব তাহা হইতেছে, বাংলা দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকাসমূহে অন্যান্য রচনার সহিত এইসকল বিষয়ের রচনাদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা। ভবিষ্যতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায়। 'দেশ' পত্রিকা এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারে।

নমস্কারান্তে

সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস

মহাশয়,

১৯শে শ্রাবণ (১৩৬৯ সাল) প্রকাশিত সংখ্যায় "রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধে 'করুণা' উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখকের '১২৮৫ বঙ্গাব্দের পর থেকে গ্রন্থখানি আর কোথাও পুনর্মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়নি'—এই বক্তব্যটি ভুল। কারণ, 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল (বৈশাখ সংখ্যা—১৩৬৮ সাল)।

ইতি—।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী

পূর্বপত্র

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা আগস্ট তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'পূর্বপত্র' শিরোনামায় শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আমার সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যে-সমস্ত কথা লিখেছেন, তা যথাযথ ও সুন্দর হয়েছে, এবং সুন্দরতর হয়েছে—তাঁর লেখনীর মুখে, তাঁর শিল্পী-মনের মনোহর প্রকাশে। এজন্যে তাঁকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই সূত্রে একটা কথা আমার বলবার আছে।

চিরকালই আমার মন সৌন্দর্য-উপাসক। আমি সুন্দরের পূজারী, সুন্দরকে ভালোবাসি। পাঁক সর্বত্রই আছে। পাঁক দেখলে আমি পিছিয়ে আসি, কিন্তু পাঁকের মধ্যে ফুল ফুটলে তা আমার মনকে আকৃষ্ট করে। সুন্দর-অসুন্দরের ব্যাপারে আহত-অনাহত, লাঞ্ছিত-অলাঞ্ছিত, পতিতা-অপতিতার কোন কথা নেই। ফুল—সর্বদা সর্বস্থলেই ফুল। ঘেঁটুফুল যতক্ষণ গাছে থাকে, ততক্ষণই সে ঘেঁটুফুল; গাছ থেকে তুলে আনার পর সে আর ঘেঁটু থাকে না; সে তখন ফুল—গোষ্ঠী-বিমুক্ত; তখন আমার ফুলদানিতে তাকে আমি সাদরে ও সানন্দে স্থান দান করি।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

খেলাধুলো

একলব্য

স্থান—দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম; কাল—অপরাহ্ন; তারিখ—৬ই আগস্ট, সোমবার; অনুষ্ঠান—জাকর্তা এসিয়ান গেমে নির্বাচিত ভারতীয় অ্যাথলীটদের অনুশীলন।

দর্শক আসনে ক্রীড়ামোদীর অভাব নেই। তার মধ্যে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং এবং হাঙ্গেরী থেকে আগত অ্যাথলেটিক 'কোচ' জোসেফ কোভাকসের বিশিষ্ট স্থান।

সবাই সমবেত হয়েছিলেন খ্যাতনামা অ্যাথলীটদের অনুশীলন দেখতে। দিল্লির সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন নৈপুণ্য পরখ করতে। কারও নাটক দেখবার বাসনা ছিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এক 'নাটকেরই' অভিনয় হয়ে গেল!

জাকর্তাগামী ভারতীয় অ্যাথলীট দলের অধিনায়ক কীর্তিমান মিলখা সিং এবং সামরিক বিভাগের আর দুজন নির্বাচিত অ্যাথলীট ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীভারনন রামকে মারধোর করতে আরম্ভ করলেন। শান্তিকামীদের হস্তক্ষেপের ফলে 'নাটক' অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনীত হয়ে গেল। কিন্তু ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের খেলাধুলোর ইতিহাসে রেখে গেল এক কলঙ্কমলিন স্মৃতি।

জাকর্তা এসিয়ান গেমে যাত্রার আগে ক্রীড়াক্ষেত্রের এই কলঙ্কজনক ঘটনা ভারতীয় ক্রীড়ামোদী মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এই সংবাদ পরিবেশন করেননি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রের ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীভারনন রামের স্বলিখিত বিবৃতি থেকে এই ঘটনা জানা গেছে আর জানা গেছে সংবাদপত্রে প্রেরিত কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর চিঠি থেকে। বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক এ এফ এস তলায়ারখানও 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এই ঘটনার উল্লেখ করে উচ্ছৃঙ্খল অ্যাথলীটদের বিরুদ্ধে যথাকর্তব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্রীতলায়ারখান এ-ও বলেছেন যে, ঘটনা যদি সত্য হয় তবে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, ভারত সরকার এবং ভারতবাসীর উচিত অপরাধী অ্যাথলীটদের কাছ থেকে এসিয়ান গেমের ব্লেজার ফিরিয়ে আনা আর বিদেশে এবং ভারতের মাটিতে যাতে তারা কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

* * *

ঘটনাটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে নিয়মনিষ্ঠা, ন্যায়নীতি এবং শালীনতা রক্ষার দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলার মাঠ শুধু খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ করার অঙ্গন নয়। খেলার মাঠ সৌহার্দ্য এবং প্রীতি বিনিময়ের মিলনক্ষেত্র, খেলার মাঠ সদাচার এবং নিয়মনিষ্ঠার পবিত্র অঙ্গন। সেই খেলার মাঠে যদি এ-জাতীয় ঘটনা ঘটে এবং খেলোয়াড়েরাই সেই ঘটনায় নাটের গুরু হন তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

খেলার সময় সংঘর্ষের ফলে খেলোয়াড়ের উত্তেজনার কারণ থাকে। যদিও অন্যায় তবু সেটাকে দৈবদুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু প্ররোচনার কারণ ব্যতিরেকে একজন স্পোর্টসম্যানের উত্তেজনার কারণ সত্যিই দুর্বোধ্য। এবং সে স্পোর্টসম্যান কে? না, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট, বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি এবং এসিয়ান গেমে অ্যাথলীট দলের নির্বাচিত অধিনায়ক কীর্তিমান মিলখা সিং। আর

জাকার্তায় এশিয়ান গেমের জন্য নির্মিত স্টেডিয়াম

কার উপর নিগ্রহ? না, একজন ক্রীড়া-সাংবাদিকের উপর, খেলার খবর প্রচার, খেলাধূলায় দেশের যুবকদের উৎসাহ দেওয়া, খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের প্রশংসা করা যার প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য ক্রীড়াসাংবাদিকদের অনেক সময় ক্রীড়াপরিচালক এবং খেলোয়াড়দের কাজের অপ্রিয় সমালোচনা করতে হয়, বিচারবুদ্ধিমত্ত ভুল পথ পরিত্যাগের পরামর্শ দিতে হয়, অবিচার এবং অন্যায়ের উপর আলোকপাত করতে হয়। ক্রীড়াসাংবাদিকের কোন কোন সমালোচনা কারও অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তাই বলে সেই ক্রীড়াসাংবাদিকের উপর হামলা করে তাকে মারধোর করতে হবে, এ কেমন কথা? এ কি মগের মুল্লুক? দেশ থেকে ন্যায়-নীতি, আইন-শৃংখলা কি উঠে গেছে?

শ্রীভারনন রাম একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্রীড়াসাংবাদিক। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সদা তৎপর। কিন্তু যে ঘটনার জন্য ভারনন রামের উপর হামলা হয়েছে বলে শ্রীরাম উল্লেখ করেছেন তা নিতান্ত মামুলী ধরনের এক মন্তব্য।

বর্তমানে পাঞ্জাব সরকারের খেলাধূলা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর কীর্তিমান অ্যাথলীট মিলখা সিং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরনের জন্য এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন এবং এসিয়ান গেমের অ্যাথলেটিক ক্যাম্পের সময়ই এই সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্যাম্পের অন্যান্য অ্যাথলীটরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভারনন রামের অপরাধ তিনি 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রে তাঁর "রিংসাইড সিট" স্তম্ভে এই সংবর্ধনার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিনা অনুমতিতে ক্যাম্পে অবস্থানকালে অ্যাথলীটদের এভাবে সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রণ অন্যায়।

ভারনন রামের মন্তব্য মোটেই অযৌক্তিক নয়। রাজ্য সরকারের কোন কর্মচারী, তিনি যে পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সংবর্ধনা সভার আয়োজন করতে পারেন কিনা এটাও একটা বড় প্রশ্ন। কিন্তু শ্রীরাম সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেন নি, তিনি শুধু অ্যাথলীটদের আমন্ত্রণ এবং যোগদান সম্বন্ধেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এর ফলে মিলখা সিং-এর মত অ্যাথলীটের যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তবে সাধারণের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি?

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দর সিং-এর উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটে গেছে—অথচ আজ পর্যন্ত তিনি এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি। হয়তো তিনি ভেবেছেন, এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করলে

মিলখা সিং-এর জাকর্তা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে আমরা একটি স্বর্ণপদক হারাব। কিন্তু একটি স্বর্ণপদকের মূল্যই কি বেশী? এ-জাতীয় কলংকজনক ঘটনার বিনিময়ে যদি একটি স্বর্ণপদক কিনতে হয়—তবে সে স্বর্ণপদক ভারতে না আসাই কাম্য। ভারতের জনমত তেমন স্বর্ণপদক নিশ্চয়ই কামনা করে না।

• • •

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারতের খেলোয়াড় অ্যাথলীটদের অন্যায় ও উচ্ছৃংখল আচরণের অনেক নজীর আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তির শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা হয়েছে। অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশের মাটিতে যে ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য যেন কারওই মাথা ব্যথা নেই।

শুধু ক্রীড়াসাংবাদিকের নিগ্রহ নয়—ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক পত্রলেখক জানিয়েছেন, সেদিন সামরিক বিভাগের কয়েকজন অ্যাথলীট ক্যাপ্টিনের এক কর্মীর সংগেও হামলা করতে কসুর করেননি। মিলখা সিং-এর ঘটনার সংগেও সমমর্যাদার দু'জন সামরিক অ্যাথলীট জড়িত ছিলেন। সামরিক বিভাগের কর্মীদের এই উচ্ছৃংখল আচরণ দেশের পক্ষেই ক্ষতিকর। যারা ন্যায়নিষ্ঠার পূজারী, তাদের নীতিগর্হিত কাজ আইন-রক্ষকের দ্বারা আইন লংঘনের শামিল।

অনুমান করতে পারছি, মিলখা সিং এবং সামরিক বিভাগের অ্যাথলীটরা যে সম্প্রদায়-ভুক্ত, ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে সেই সম্প্রদায়ের আজ প্রচণ্ড প্রভাব। সরকারের উপরও তাদের প্রভাব যথেষ্ট। তাই এত বড় একটা কলংক-জনক ঘটনার কোন উচ্চবাচ্য নেই। কিন্তু সরকারেরও একটা কর্তব্য আছে। আজ কোন ক্রীড়া-প্রতিনিধির বিদেশ যাওয়া না যাওয়া সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বড় কথা, ভারত সরকার ক্রীড়া-কীর্তির জন্য যাকে "পদ্মশ্রী" খেতাবে ভূষিত করেছেন তার পক্ষে এই বিশ্রী আচরণ গভীর পরিতাপের বিষয়।

• • •

এসিয়ান গেমে যোগ দেবার জন্য ভারতীয় হকি দল ইতিমধ্যেই জাকর্তায় গিয়ে পৌঁছেছে। ফুটবল এবং অন্যান্য অংশগ্রহণ-কারী দলের ১৫ই আগস্ট জাকর্তা অভিমুখে রওনা হবার কথা।

বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য প্রতিবারই বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে খেলোয়াড়দের সংখ্যা নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া আরম্ভ হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফুটবল দলকেই এসিয়ান গেমে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বাদ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। হয়তো কথা উঠেছিল ভারতের ফুটবল মান আশানুরূপ নয়, কিংবা ১৬ জন ফুটবল খেলোয়াড় যেখানে যাবে মাত্র একটি পদকের জন্য, সেখানে অন্যান্য বিভাগে বেশী প্রতিনিধি পাঠালে বেশী পদক ঘরে আসার সম্ভাবনা। কথা মিথ্যে নয়। আবার এ কথাও সত্যি, ফুটবলের মান যাই থাক, ফুটবলই ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং ফুটবলকে কেন্দ্র করেই এসিয়ান গেমের প্রধান আকর্ষণ। তবু ফুটবলের প্রতি ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তথা সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ! এইবারই প্রথম নয়, ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে অংশ গ্রহণের সময়ও ফুটবল ফেডারেশনের উপর মোটা টাকার দাবি জানিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল: অবিলম্বে টাকা দাও, না হলে দল বাদ যাবে। কারণ হয়তো এক। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের যাঁরা কর্ণধার, ফুটবলের প্রতি তাঁদের প্রীতি কম।

অথচ ফুটবল বা হকি দলের মাধ্যমেই কিছু কিছু বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান হতে পারে। অন্য কোন দলের দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। এবারকার এসিয়ান গেমের কথাই ধরা যাক। ফুটবল টীমের জন্য এবার ভারতের

জলের নীচ দিয়ে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রমকারী দ্বিতীয় সাঁতারু সাইসন প্যাটারসন ডোভার উপকূলের মাটি স্পর্শ করবার পর হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন। জলের তল দিয়ে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম সাঁতারু বলডারের চ্যানেল অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ১৮ ঘন্টা এক মিনিট। প্যাটারসন ১৩ ঘন্টা ৫০ মিনিটে ক্যালে থেকে ডোভারে পেঁছেছেন

৪ হাজার টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। আর ফুটবল টীম বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করবে ১৪ হাজার টাকার। সুতরাং লাভ ১০ হাজার বৈদেশিক মুদ্রা। এই সহজ কথাটা কেউ তলিয়ে না দেখেই ফুটবল টীমকে দল থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, আই এফ এ-র সভাপতি এবং লোকসভার সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রচেষ্টায় ফুটবল দলের জাকর্তা যাবার বাধা অপসারিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কাছে কথাটা পেড়ে তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এসিয়ান গেমে ভারতের খেলার ফলাফল অবশ্য উৎসাহব্যঞ্জক নয়। দিল্লিতে প্রথম এসিয়ান গেমে ভারত অবশ্য বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সালে ম্যানিলায় দ্বিতীয় এসিয়ান গেমে এবং ১৯৫৮ সালে টোকিওর তৃতীয় এসিয়ান গেমে ভারত মোটেই ভাল খেলতে পারেনি।

টোকিওর ফুটবল প্রতিযোগিতায় এসিয়ার ১৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ম্যানিলা গেমের বিজয়ী চীন ফাইন্যালে কোরিয়াকে ৩—২ গোলে হারিয়ে উপর্যুপরি দুবার এসিয়ান ফুটবলে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

১৩টি দেশকে ৪ ভাগে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় গ্রুপের খেলা পরিচালনা করা হয়। পরে নক আউট প্রথায় পরিচালিত হয় কোয়ার্টার ফাইন্যাল, সেমিফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা।

বি গ্রুপের তিনটি দলের মধ্যে ভারত বর্মাকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে, কিন্তু দ্বিতীয় খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে পরাজিত হয় ২—১ গোলে। তবু গ্রুপের তিনটি দলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান, ফলে কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার সুযোগ। কোয়ার্টার ফাইন্যালে হংকংকে ৫—২ গোলে হারিয়ে ভারতীয় ফুটবল টীম সেমি-ফাইন্যালে ওঠে। কিন্তু সেমি-ফাইন্যালে কোরিয়ার কাছে ৩—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয় ভারতকে। প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্য সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত দুটি দলের পারস্পরিক খেলাতেও ভারত ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪—১ গোলে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করে। ফলে টোকিও এসিয়ান গেমের ফুটবলে ভারতের স্থান হয় চতুর্থ।

১৯৫৮ সালের তুলনায় এবারের ফুটবল দল শক্তিশালী এ কথা কোনভাবেই আমি স্বীকার করব না। অন্যান্য দলের শক্তি সম্বন্ধেও আমার ধারণা পরিষ্কার নয়। তাই প্রথম এসিয়ান গেমের বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দল এবার তাদের নষ্ট প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি-না এ বিষয়ে আমার মন্তব্য মূল্যহীন।

হকি সম্বন্ধেও আমার একই কথা। টোকিওর এসিয়ান গেম থেকেই ভারতীয় হকির সুনাম নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। গ্রুপ প্রথার খেলায় সম-পয়েন্টের অধিকারী হয়েও গোল 'অ্যাভারেজে' ভারত হকির দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল টোকিওতে। পাকিস্থান পেয়েছিল প্রথম স্থান। রোম অলিম্পিকেও সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি। জাকর্তায় আবার পরীক্ষা।

ফুটবল এবং হকি ছাড়া অন্যান্য খেলাধূলায়ও টোকিওতে ভারতের প্রতিনিধিরা সুবিধা করতে পারেননি—এক অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ছাড়া। অ্যাথলেটিকসে ভারত পেয়েছিল পাঁচটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক।

হকির রৌপ্য পদকের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে আর একটি রৌপ্য পদক এবং ভলিবলে একটি ব্রোঞ্জ পদক আসায় ভারত তৃতীয় এসিয়ান গেমে পেয়েছিল মোট ৫টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক। নীচে তৃতীয় এসিয়ান গেমে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের পদক প্রাপ্তির হিসাব দেওয়া হল:—

তৃতীয় এসিয়ান গেমে পদকের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৬৭	৪১	৩০
ফিলিপাইন	৮	১৯	৩১
দঃ কোরিয়া	৮	৭	১২
ইরান	৭	১৪	১১
চীন	৬	১১	১৭
পাকিস্তান	৬	১১	৯
ভারত	৫	৪	৩
ভিয়েৎনাম	২	০	৪
বর্মা	১	২	১
সিংগাপুর	১	১	১
সিংহল	১	০	১
তাইল্যান্ড	০	১	৩
হংকং	০	১	১
ইন্দোনেশিয়া	০	০	৩
মালয়	০	০	৩
ইসরাইল	০	০	২

(আফগানিস্থান, কম্বোডিয়া, নেপাল ও **উত্তর বোর্নিও কোন পদক পায় নি।)**

দেশী সংবাদ

৬ই আগস্ট—অদ্য দ্বিপ্রহরে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগী দেখিতে গিয়া তিনজন চিকিৎসক ওয়ার্ডের মধ্যেই আক্রান্ত ও ছুরিকাহত হন। ইহা ছাড়া জনৈক আগন্তুকও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ছুরির আঘাত পান।

ভারত সরকারের গুদামে চাউলের মজুদ বহুল পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে—মজুদের পরিমাণ অবিলম্বে বৃদ্ধি না করিলে দেশব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে বলিয়া ব্যবসায়ী মহল আশঙ্কিত হইয়াছেন।

৭ই আগস্ট—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘমেয়াদী বন্দী শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত এবং অপর ২৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। আগামী ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই ২৫ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনকে বিকেন্দ্রীকরণের এক প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করিতেছেন। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সর্দার উজ্জল সিং অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানান।

৮ই আগস্ট—আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৫০ খানি লরী ভাড়া করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী ১৭ই আগস্ট হইতে ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত ঐ ভাড়া-লরীর সাহায্যে কাজ করা হইবে। ইহার জন্য কর্পোরেশনের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান অদ্য সাংবাদিকদের বলেন, মাছের দাম বাড়ায় সরকার উদ্বিগ্ন। আড়তদারেরা যে 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করিয়াছিলেন, তাহা আর পালন করা হইতেছে না। এক শ্রেণীর আড়তদারের অতিরিক্ত মুনাফা প্রীতি যদি বন্ধ না হয়, তাহা হইলে সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

৯ই আগস্ট—মালদহে পক্ষাঘাতের মূলে ময়দা নয়, সরিষার তেল—অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের তদন্ত রিপোর্টের রায় ইহাই। ট্রাইক্রেজিল ফসফেট মিশ্রণে বিষাক্ত সরিষার তেল নাকি ঐ বহুবিতর্কিত পক্ষাঘাতের কারণ।

কলিকাতা মহানগরীর "পানীয় জল" কতটা পানীয়? শতকরা ত্রিশটি ক্ষেত্রে জলের গুণ সন্তোষজনক নহে। সম্প্রতি কর্পোরেশনের চীফ অ্যানালিস্টের এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গিয়াছে।

১০ই আগস্ট—ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তিবলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের নিজস্ব প্রকল্পগুলির প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ধরনের ও মানের কয়লা উৎপাদন করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য আজ সংসদের উভয় সভায় এই চুক্তির নকল পেশ করেন।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে দমদম রেল জংশনের কাছে একটি মালবাহী রেল ইঞ্জিন হঠাৎ পুলের উপর দিয়া গড়াইয়া সদর রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। ইঞ্জিন চালকের সামান্য আঘাত লাগে। ইঞ্জিনটি দমদম রোডের মাঝ বরাবর আসিয়া পড়ে।

১১ই আগস্ট—আসামের দক্ষিণাংশে "স্বাধীন মিজোভূমি" গঠনে উৎসাহী এক দুঃসাহসী মিজো যুবক গত কয়দিন যাবৎ কলিকাতা শহরের বুকেই এক চক্রান্তের মহলা চালাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন মিজোও আছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার পরিচালনায় শ্রমিকদের প্রতিনিধি লওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিংশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে হিন্দুস্থান স্টীল সংস্থার চেয়ারম্যান এই সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে রাজী হন।

১২ই আগস্ট—আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দেশ, সমাজ এবং সংবাদপত্র সাহিত্যের সেবায় তাঁহার নিরলস নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার কথা অদ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

গরীবের জন্য 'আইনের' সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে : আজ নয়াদিল্লিতে তৃতীয় সারা ভারত আইন সম্মেলনে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী বি পি সিংহ ও অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী এম সি শীতলবাদ বিশেষ জোর দিয়া একথা বলেন।

বিদেশী সংবাদ

৬ই আগস্ট—চীন ভারতের নিকট এক পত্রে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে "যতদূর সম্ভব শীঘ্র" পুনরায় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার প্রস্তাব করিয়াছে।

গতকাল মধ্যরাত্রে জামাইকা স্বাধীন হইয়াছে। বৃটিশ কমনওয়েলথের নূতন সদস্যরূপে (কৃষ্ণবর্ণ, স্বর্ণাভ এবং সবুজ) ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা প্রথম উড্ডীন করা হইয়াছে। ৩০৭ বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবসানের নিদর্শন স্বরূপ ইউনিয়ন জ্যাক অপসারণ করিয়া নূতন পতাকা উত্তোলন করা হয়।

৭ই আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী বেন ইয়সুফ বেন খেদা আজ অকস্মাৎ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বেন বেল্লার হস্তে আলজিরিয়ার সকল ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইলেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের খবরে প্রকাশ, ভারত বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে ও পৃথিবীর চৌম্বিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে উহার রকেট উৎক্ষেপক কেন্দ্র ভারতে স্থাপনের অনুরোধ জানাইয়াছে।

৮ই আগস্ট—বিশ্বস্তসূত্রের সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার নেপালের পশ্চিম তরাই জেলার থোরিতে রাজকীয় সেনাদল ও বিদ্রোহীদের মধ্যে এক নূতন সংঘর্ষে প্রচণ্ড গুলী বিনিময়ের ফলে ১৪ জন নিহত ও ৩৬ জন আহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে ৬ জন রাজকীয় সেনাদলের লোক।

বুদাপেস্টের ট্রেড ইউনিয়ন সংবাদপত্র 'নেপ-সেজ্বা' জানাইয়াছেন, চলতি বৎসরের প্রথম তিন মাসে হাঙ্গারীতে পঞ্চাশ সহস্রাধিক গর্ভপাত ঘটানো হইয়াছে। এ সময়ের মধ্যে মাত্র ৩৩ হাজারটি ক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারিয়াছে।

৯ই আগস্ট—পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য পাশ্চাত্ত্যগোষ্ঠীর আধুনিকতম প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রস্তাবটি সম্পর্কে সোভিয়েট মন্ত্রী শ্রীজোরিন বলেন যে, উহা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পুরাতন মার্কিন বক্তব্যেরই নূতন রূপ।

সোভিয়েট সংবাদপত্র "প্রাভদায়" প্রকাশ, ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম এবং মাসের পর মাস জলের নীচে কাটাইতে পারে, আণবিক শক্তি চালিত এমন একখানা সোভিয়েট সাবমেরিন "বিশেষ কার্য" সম্পাদন করিয়া ঘাটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

১০ই আগস্ট—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বগুড়ার শ্রীমহম্মদ আলী আজ লাহোরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা দ্বারা কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসার জন্য আবার নূতনভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু বলেন নাই।

'তাইপে'র ২৯শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, ফরমোজায় ১৪ জন নিদ্রারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মোট ৩৫ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ১৪ জনই শিশু।

১১ই আগস্ট—গার্ডিয়ান পত্রিকা সংবাদ দিয়াছে যে, বিদ্রোহী নেতা কাইটোর নেতৃত্বে চারজন পলাতক নাগা বিদ্রোহীর একটি দল আগামী দশ দিনের মধ্যে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই দলটি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট তাহাদের বক্তব্য পেশের জন্য নিউ ইয়র্ক যাইবে।

রয়টার ও এ পি মারফত মস্কোর এক খবরে জানা গেল : অদ্য বেলা দুইটার সময় মেজর আন্দ্রেই নিকোলায়েভ মহাকাশ পরিক্রমায় যাত্রা করিয়াছেন। ইনি রাশিয়ার তৃতীয় মহাকাশচারী। প্রথম—গাগারিন, দ্বিতীয়—তিতফ।

১২ই আগস্ট—মানুষের চন্দ্রলোক অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি-পর্বে রাশিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আর একজন মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করিয়াছে। চার নম্বর ভোস্টকের আরোহীর নাম কর্নেল পাভেল পপোভিচ। দুইখানা সোভিয়েট মহাকাশ-যান একই কক্ষপথে পরস্পরের খুব কাছাকাছি কয়েক মাইলের মধ্যে থাকিয়া বিশ্ব প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং মহাকাশ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া দুইজন মহাকাশচারী পরস্পরের মধ্যে বার্তা-বিনিময়ও করিয়াছেন।

সম্পাদক- শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দেশ

DESH 40 Naye Paise
SATURDAY, AUG. 25, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ৪৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ৮ ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

জাতীয় সংহতি

ভারতবর্ষের ভাবগত ঐক্য সম্পর্কে নতুন ভাবনা শুরু হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বকালে, ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে সংগ্রামের যুগে ভারতের একাত্মতাকে আমরা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম যে, বহুভাষী, বহুজাতিক এবং নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়বিশিষ্ট হলেও ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তা এক এবং অবিভাজ্য। কখনও যে সংশয় ঘটেনি তা নয়, প্রাদেশিক অথবা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও মনোমালিন্য কখনও কখনও জাতীয় ঐক্য চেতনা খণ্ডিত করেছে। তবুও প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে, যখন আমাদের জনচিত্ত জাতীয় সংগ্রামের আদর্শ প্রেরণায় ভরপুর, তখন বিভেদ বিরোধের এইসব লক্ষণকে আমরা উপেক্ষা করেছি, ধরে নিয়েছি যে, এগুলি সাময়িক বিকার কিম্বা ব্যতিক্রম এবং এর জন্য দায়ী করেছি প্রধানত বিদেশী শাসনকে। কিন্তু তারপর? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত পনের বৎসরে আমরা ঠেকে ঠেকে শিখছি যে, জাতীয় সংহতি, ভাবনৈতিক একাত্মবোধ ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত বচন নানারকম ঘোষণায়, বিবৃতি ও বক্তৃতায় এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদে মানানসই হলেও সর্বভারতীয় একাত্মবোধ এখনও কথার কথামাত্র।

ভাষার প্রাধান্য নিয়ে লড়াই, আঞ্চলিক স্বার্থের বিশেষ দাবি, সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মীয় গোঁড়ামি, তপশীলী এবং উপজাতীয়দের আলাদা আলাদা হিস্যা, এই-সব রকমারি বিভেদমূলক প্রকল্প ও প্রয়াসের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের জাতীয় ঐক্যচেতনার সামঞ্জস্য স্থাপন করা খুবই কঠিন। এককালে আমরা ভেবেছি, বিশ্বাস করেছি যে, বহুর মধ্যে এক, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই হল ভারতীয় ইতিহাসের শাশ্বত সত্য। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রিক ভাবনা ও সাধনা এই শাশ্বত সত্যের অনুশীলনে একান্তভাবে ব্যাপৃত ছিল। ভারতের জাতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রধানত বাংলা ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তার মানস-ফল। ভাগ্যের পরিহাসে আজ বাংলা ও বাঙ্গালীকেই কঠিন মূল্য দিতে হচ্ছে ভাষামোহান্ধতা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ-সম্প্রসারণবাদের কাছে। বাঙ্গালী একাধারে প্রতারিত এবং আত্মপ্রতারিত। জাতীয় একাত্মবোধের জন্মসূত্র বাঙ্গালীর রচিত হলেও আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খণ্ডিত বাংলা অবহেলিতপ্রায়, বৈষয়িক উন্নয়ন এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর অধিকার সঙ্কুচিত। ভারতীয় ঐক্য এবং জাতীয় সংহতির সুযোগ-সুবিধা যদি কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে শুদ্ধ কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করে জাতীয় ঐক্যচেতনা দেশের সর্বত্র জনজীবনের সকল স্তরে বিস্তৃত করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না।

জাতীয় সংহতি কেন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, সে-বিষয়ে জাতীয় নেতারা কতকগুলি আনুষঙ্গিক এবং গৌণ ব্যাপারকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে। তাঁদের অনেকের ধারণা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করতে পারলেই এই বহুভাষী দেশের জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে। অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হিন্দীর প্রাধান্য-লিপ্সার ফলে বিরোধ এবং অনৈক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তপশীলী এবং উপজাতীয়দের বিশেষ সুখসুবিধা ভোগের প্রতিশ্রুতি দানও নতুন নতুন অনৈক্য সৃষ্টি করছে। জাতি, ভাষা, সম্প্রদায় এবং অঞ্চল, এই চাররকম স্বাতন্ত্র্যের দাবি কেবল ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্যকে দুর্বল করছে না, এই চারটির প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা ধূয়ো ধরে সুযোগসন্ধানীরা সুবিধামত প্রচার করছে যে, তারা ভারতবর্ষে থেকেও আর পাঁচজন থেকে তারা আলাদা। অবস্থা দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, একমাত্র প্রশাসনিক ঐক্য তথা ডাক, তার, রেলপথ ইত্যাদির যোগসূত্র ছাড়া জাতীয় সংহতি বলতে আশ্বস্তবোধ করার মত আর কিছুই আমাদের নেই।

জাতীয় সংহতি শক্তিশালী করা প্রয়োজন, একথা সকলেই প্রায় একবাক্যে মানেন। কিন্তু কী উপায়ে? মন্ত্রপাঠ গোছের কতকগুলি আনুষ্ঠানিক কলা-কৌশল প্রয়োগ করে বিশেষ সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না। অথচ কংগ্রেসের জাতীয় সংহতি কমিটি যে পাঁচ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তার ব্যবহারিক মূল্য নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। আন্তঃরাজ্য সংগীত, নৃত্য ও নাটক উৎসবের অনুষ্ঠান বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানে সহায়তা করতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতীয় অনৈক্যের এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত সংগীত, নৃত্য ও নাটক পরিবেশন দ্বারা রোধ করা সম্ভব কি? উত্তর ভারতে তামিল প্রভৃতি দাক্ষিণী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, জাতীয় ইতিহাস, বিশেষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকাদি রচনা ও প্রচার এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য শপথ আন্দোলন, এ-সব অতি উত্তম প্রস্তাব বটে, কিন্তু জাতীয় সংহতির মূল বাধাগুলি দূরীকরণের চেষ্টায় এই ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রচার এবং প্রকল্প খুব বেশী কার্যকর হবে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন রাজ্য এবং অঞ্চল সম্পর্কে, রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার গত পনের বৎসর যে একদেশদেশী নীতি অনুসরণ করছেন, তার ফলেই জাতীয় ঐক্যচেতনা সবচেয়ে বেশী খণ্ডিত হয়েছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার নামে সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মীয় গোঁড়ামিকেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রশ্রয় দিয়েছেন। মনগড়া প্রস্তাব এবং প্রচারধর্মী অনুষ্ঠান দ্বারা দেশের ভাব-নৈতিক সংহতি সুদৃঢ় করা যায় না। সেজন্য সর্বাগ্রে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের বাস্তবনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও কার্যকরী নীতি নির্দেশ।

প্রফুল্ল দা!
তা বলে কি প্রেম দেব না?

রুশি ভাই

আয়ুব খাঁ চাইছেন পাকিস্তানে
নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হোক।

ব্যাঙের ছাতা বড়ই প্রিয়

রেলমন্ত্রী শরণ সিং বলেছেন যে অন্যান্য
দেশের তুলনায় ভারতে রেল দুর্ঘটনার
হার খুবই কম।

আশাকরি এ-বিষয়ে
তিনি ভারতকে
আন্তর্জাতিক মর্যাদা
দেবার চেষ্টা
করবেন না।

Kutty

বৈদেশিকী

লাদাকের পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৩ই এবং ১৪ই আগস্ট লোকসভায় যে আলোচনা হয়ে গেল, তা থেকে প্রকৃত অবস্থাটা কী, ভারতীয় সরকার কী করবেন, কী করতে চান কোনোটার সম্বন্ধেই সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। পণ্ডিতজীর বক্তৃতায় গরম কথার ফাঁকে ফাঁকে এমন সব বিপরীত ইঙ্গিতের কারুকার্য থাকে যে, কোনটার কতটুকু মূল্য বুঝা কঠিন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হতে পারে যে, গরম কথাগুলি বিশেষ করে দেশবাসীদের শুনাবার জন্যই বলা এবং তার বিপরীত ইঙ্গিতের কারুকার্যগুলি চীনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য।

গত কয়েক বছরের ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যে, চীনাদের সঙ্গে ঝগড়ার সম্পর্কে ভারত সরকার দেশবাসীদের কাছ থেকে অনেক সময়ে সত্য গোপন করে রেখেছেন বা পুরো সত্য তাদের জানতে দেননি। দেশবাসীদের আশ্বস্থ করার জন্য অথবা নিজেদের মুখ বাঁচানোর জন্য সরকারী কর্তারা এমন অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রতিপালিত হয়নি। "বিনাযুদ্ধে চীনাদের আর এক ইঞ্চিও এগুতে দেওয়া হবে না"—এই ঘোষণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে চীনারা লাদাকে আরো অনেকখানি এগিয়েছে। হয়ত ভারতীয় সৈন্যেরা হুঁশিয়ার না হলে এবং ভারতীয় আরক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি না হলে চীনারা আরো এগুতে পারত, কিন্তু তাদের এগুনো একেবারে বন্ধ করা যায় নি এবং যেখানে যেখানে তারা এগিয়েছে, সেখানে সেখানে বিনাযুদ্ধেই এগুতে পেরেছে, বাধা পায়নি।

চীনারা ভারতভূমিতে যেখানে জবরদখল করে বসেছে, সেখান থেকে তাদের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নিষ্পত্তির আলোচনা চলতে পারে না—ভারত সরকার এরূপ ঘোষণা করেছিলেন, অন্ততপক্ষে ভারতবাসীরা তাই বুঝেছিল। (আসলে পণ্ডিজীর প্রস্তাব ছিল এই যে, উভয়পক্ষ পরস্পর দাবিকৃত অঞ্চল থেকে সরে আসবে। এ প্রস্তাব পূর্বাঞ্চলে প্রযোজ্য নয়, কারণ ভারত সরকার ধরে নিয়েছিল, উক্ত অঞ্চলে "ম্যাকমোহন লাইন"কেই সীমানা বলে চীনা সরকার মেনে নিয়েছেন। লাদাকে এই প্রস্তাব প্রয়োগকালে চীনাদের বেশি জায়গা থেকে সরে যেতে হয়। তবে পণ্ডিত নেহরু যখন এই প্রস্তাব করেন, তখন হয়ত ১৯৫৬ সালের চীনা ম্যাপে চীনাদের দাবিকৃত অঞ্চলের কথাই তাঁর মনে ছিল; কারণ শ্রী চৌ এন-লাই পর্যন্ত সেই ম্যাপের ভিত্তিতেই কথা বলেছিলেন। কিন্তু চীনারা তার পরেও আর একটা নতুন ম্যাপ বার করেছে, তাতে সীমান্ত আরো ভারতের মধ্যে ঠেলে দেখানো হয়েছে। চীনাদের নিজেদের ১৯৫৬ সালের ম্যাপে যে-সীমানা দেখানো আছে, চীনারা বর্তমানে তাও ছাড়িয়ে এসেছে।) এখন পণ্ডিতজী যে-ধরনের কথা বলেছেন, তাতে এই শর্তের উপর ভারত সরকার আর জোর দেবেন কিনা বুঝা যাচ্ছে না, দেবেন না বলেই মনে হচ্ছে।

লাদাকে দুইপক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বোধ হয় বেঁধে যায়, এই রকম যে একটা ভাব হয়েছে, সেই ভাবটা সেই "টেন্‌শন্‌" কমাবার প্রয়োজনের উপরই পণ্ডিতজী এখন জোর দিচ্ছেন। কী করলে "টেন্‌শন্‌" কমতে পারে, সে বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ভারত সরকার রাজী আছেন, তার জন্য আগে চীনাদের সরে যেতে হবে, এমন শর্ত আরোপ করা হচ্ছে না। "টেন্‌শন্‌" কমানোর আলোচনা এবং সীমান্ত সম্পর্কে নিষ্পত্তির আলোচনা "নেগোশিয়েশন"—এই দুয়ের মধ্যে একটা কল্পিত ভেদরেখার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তার বিশেষ কিছু মূল্য আছে বলে মনে হয় না, বিশেষত চীনা পররাষ্ট্র সচিব ৩রা আগস্ট তারিখের বেতার বক্তৃতার পরে।

জেনেভা থেকে চীনা পররাষ্ট্র সচিব যে বেতার বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, চীনারা যে-জায়গা নিজেদের বলে মনে করে, সেখান থেকে চীনা সৈন্যেরা কিছুতেই সরবে না, কারণ সেটা চীনের সাড়ে পঁয়ষট্টি কোটি মানুষের ইচ্ছার বিরোধী কাজ হবে, তেমন কাজ করতে চীনাদের বাধ্য করতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই ইত্যাদি। চীনা মন্ত্রীর এই বক্তৃতা নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলে অভিহিত করেও পণ্ডিত নেহরু যে-সব কথা বলেছেন, তাতে চীনাদের এরূপ আশা হবে যে, তাদের সরে যাবার কথা যে বলা হচ্ছে, সেটা তারা না মানলেও ভারত সরকার নিষ্পত্তির আলোচনা "নেগোশিয়েশন"—আবার আরম্ভ করতে রাজী হবেন।

চীনা পররাষ্ট্র সচিবের ৩রা আগস্টের বেতার বক্তৃতার উল্লেখ করতে গিয়ে পণ্ডিতজী একটি কথা বলেছেন যাতে চীনারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে। পণ্ডিতজী বলেছেন যে, তিনি জানেন যে মন্ত্রীরা প্রকাশ্য বক্তৃতায় অনেক সময়ে খুব গরম জোরদার ভাষায় তাঁদের দাবির কথা বলেন, সেরূপ অতিশয়োক্তির জন্য বাদসাদ দিয়ে ধরলেও চীনা পররাষ্ট্র সচিবের ঘোষণা আলাপ-আলোচনা চালাবার পথে বাধাস্বরূপ। পণ্ডিতজীর এই উক্তি থেকে চীনারা এবং ভারতবাসীরাও বুঝবে যে ভারতীয় মন্ত্রীরাও তাঁদের প্রকাশ্য বক্তৃতায় মাঝে মাঝে যে-সব গরম গরম কথা বলেন সেগুলোর অর্থ অনেকটা বাদসাদ দিয়েই করতে হবে।

ভারত-চীন বিবাদ সম্পর্কে ভারত

সরকারের নীতি ভারতবাসীদের নিকট অনেক সময়ে কেন দুর্বোধ্য লাগে, কেন সরকারী কথা ও কাজের মধ্যে সব সময়ে মিল পাওয়া যায় না, তার কিছু হদিস পণ্ডিতজীর কাছ থেকেই পাওয়া গেল। মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে যা বলেন, দেশবাসীরা মন্ত্রীদের বক্তৃতা শুনে যা মনে করে তার সঙ্গে কর্তাদের মনের কথা এবং কাজের মিল হবেই এরূপ আশা না করা উচিত। মন্ত্রীরা যখন গরম কথা বলেন, সাধারণ লোকে ভাবে সেইটাই বুঝি সরকারী নীতির স্বরূপ। কিন্তু আসলে ফাঁকা গরম বুলির দ্বারা বিদেশী বিরোধী পক্ষের চেয়ে নিজেদের দেশের লোকদের বেশী বিভ্রান্ত করা হয়। আমাদের সরকারী বক্তৃতার কোনটার কতটুকু সার সেটা চীনা সরকারের পক্ষে বুঝে নেওয়া ততটা কঠিন নয়, যতটা কঠিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে। আমাদের মন্ত্রীদের প্রতি বিশেষ করে পণ্ডিত নেহরুর প্রতি দেশবাসীদের যে গভীর শ্রদ্ধা আছে তার দরুন তাঁদের কথা সর্বদা আক্ষরিকভাবে সত্য বলে মেনে নিতে সাধারণ মানুষের মন চায়। পণ্ডিত নেহরু এবার নিজেই বলে দিয়েছেন যে, মন্ত্রীদের কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

চীনাদের সঙ্গে আপোস নিষ্পত্তির আলোচনার যুক্তিযুক্ততার প্রশ্ন উঠলে যাঁরাই সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেন তাঁদের সম্বন্ধেই পণ্ডিতজী একটা অসহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ করেন। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে কথা বলাটাই একটা অন্যায় কাজ—সতর্ককারীদের প্রতি এই মনোভাব আরোপ করে পণ্ডিতজী বলতে থাকেন যে, তিনি এরকম "অস্পৃশ্যতায়" বিশ্বাস করেন না। আসলে সরকারী নীতির সমালোচক, যাঁরা সরকারকে সতর্ক করে দিতে চান, তাঁরাও বা তাঁদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিতজীর মতই এরূপ "অস্পৃশ্যতায়" বিশ্বাস করেন না। শুধু প্রশ্ন হচ্ছে আলোচনা কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে কী "কনটেক্স্ট"-এ হবে। কারণ যে কোনো ব্যাপারেই হোক "কনটেক্স্ট"এর উপর আলোচনা বা "নেগোশিয়েশনের" ধারা এবং ফলাফল নির্ভর করে। চীনারা যেখানে এসে বসেছে সেখান থেকে আগে তাদের একটু না নড়িয়ে আপোস নিষ্পত্তির আলোচনা আরম্ভ করার ফল হবে ভারতবর্ষের দিক থেকে নিশ্চিত স্বার্থহানি এবং পরাজয়।

চীনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার "কনটেক্স্ট" কী রকম হবে সে সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু পার্লামেন্টের কোনো নির্দিষ্ট অনুজ্ঞা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ "স্বাধীনতা" থাকা চাই। ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিতজীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে ভারতবর্ষ অভ্যস্ত। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর নামে যে "স্বাধীনতা" চাওয়া হচ্ছে তার পূর্ণ ব্যবহার পণ্ডিতজীরই দ্বারা হচ্ছে কিংবা হবে কিনা সেটা আজ দেশবাসীর পক্ষে একটা চিন্তার বিষয় হয়েছে। পণ্ডিতজীর আন্তরিকতা সন্দেহের অতীত হতে পারে, কিন্তু তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সে কথা হয়ত আর বলা চলে না। ভারত সরকারের তিনিই সর্বেসর্বা, এই কথাটা বাইরে চালু থাকতে থাকতেই ভিতরে ক্ষমতার বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সম্ভবত ঘটছে।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে পণ্ডিত নেহরুর বয়স প'চাত্তর হতে চলল। সম্প্রতি যে গুরুতর পীড়া থেকে তিনি ভুগে উঠলেন তার পরে তাঁর দেহের আর সেই পূর্বের বল থাকা সম্ভব নয়। তাঁর হাতের মুঠো একটু একটু করে আলগা হতে থাকবেই। তাঁর দেহ

ও মনের ভারবহনের শক্তি ক্রমশ কমতে বাধ্য। সুতরাং ধীরে ধীরে তাঁকে অপরের উপর অনেক কিছু ছেড়ে দিতে হচ্ছে যদিও জনসাধারণের নিকট তিনিই সবকিছুর কর্তা বলে জাহির থাকছে।

নেতা বৃদ্ধ হলে কর্তৃত্বের আসন ছাড়ার আগেও অন্যের উপর কিছু কিছু ভারার্পণ করা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরঞ্চ সেইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু যে তাঁর দায়িত্বের অংশ কাউকে দিচ্ছেন বা দিতে পারেন সেটা স্বীকার করাই বিপদ। কিন্তু স্বীকার না করে জনসাধারণের কাছ থেকে অবস্থাটা গোপন রাখা দেশের পক্ষে আরো বিপজ্জনক। পণ্ডিত নেহরুর

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যায় 'শব্দকল্পদ্রুম'তে মুদ্রাকর প্রমাদবশত একটি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। ৩৩৭ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষাংশের পর তৃতীয় কলমের শেষাংশ ও তার পর ৩৩৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথম ১১ লাইন ও পরে ৩৩৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের প্রথম অংশ পড়িতে হইবে।

স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাতে সব কিছু আর নিজের মুঠোর মধ্যে রাখা সম্ভব নয়। পূর্বে তাঁর যে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা ছিল কার্যত তার কিছু কিছু হস্তান্তরিত নিশ্চয়ই হচ্ছে। আইনত "ডেলিগেশন" না হলেও কার্যত ক্ষমতা অন্যের হাতে গিয়ে পড়ছে। পররাষ্ট্র সচিবের উপদেষ্টার পদে যাঁরা ছিলেন বা পররাষ্ট্রসচিব কর্তৃক নির্দিষ্ট নীতি কার্যে পরিণত করার ভার যাঁদের উপর ছিল তাঁরা এখন পররাষ্ট্রসচিবের নামে নিজেরা কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাচ্ছেন বা করে নিচ্ছেন।

পূর্বে যখন পণ্ডিতজীর দেহমনের সামর্থ সম্বন্ধে কোনো আশংকা ছিল না তখন তাঁর উপদেষ্টা বা কর্মকারক কারা তা নিয়ে তত চিন্তা ছিল না। কিন্তু এখন সেটা একটা ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। চীন-ভারত বিবাদ সম্পর্কে কী করা না করা সে সম্বন্ধে পণ্ডিতজীকে "স্বাধীনতা" দেওয়া এক কথা আর যদি এরূপ আশংকার কারণ থাকে যে বস্তুত সেই "স্বাধীনতা"র ব্যবহার তিনি একক করবেন না, তাতে তাঁর অন্য অংশীদার থাকবেন, তাহলে সেটা একটা অন্য ব্যাপার হয়ে উঠে। এখানে সেই আশংকাই দেখা দিয়েছে। সুতরাং কেবল পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই চলবে না, তাঁর পিছনে অর্থাৎ পররাষ্ট্রসচিবের দপ্তরের ভিতরে বা আশেপাশে কোন্ শক্তিধররা বিরাজ করছেন তাঁদের প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আরো কিছু বলবার থাকল।

১১-৮-৬২

রজতজয়ন্তী স্মারকলিপি

ঃ তারাপদ রায়

আমিও ছিলাম, ছিলাম আমি হে একদা,
বেলা অবেলায় খেয়াল খুশিতে মত্ত
রোদ-বৃষ্টিতে পথে পথে ঘোরা দুপুরে,
দুপুর-রাত্রে নির্জন মায়া-নগরী—
ঘরে ফিরবার সকল দরজা বন্ধ।

সিকি শতাব্দী তুড়ি দিয়ে পাড়ি দিয়েছি,
মলিন পোশাকে, তিন তালি দেওয়া চটিতে
বিশাল বিশ্ব বিজয় করার গর্বে
আমিও ছিলাম; রাজার নিমন্ত্রণের
মর্যাদা আমি হেলায় তুচ্ছ করেছি।

অসম্ভবের কল্পবৃক্ষে ফুল্ল
কুসুমিত শাখা মহিমান্বিত চৈত্রে
আমারই ফোটানো সে কুসুমগুলি একদা
খরুরৌদ্রের প্রতিবাদময় আকাশে
বিশাল গ্রীষ্মে আকুল সমীরে সমীরে।

সে কুসুম কবে কার কবরীতে জড়ানো:
স্খলিত চরণে তারই অলিন্দ সমীপে
বহু আনাগোনা, বহু দিবসের রৌদ্রে,
জ্যোৎস্নায়, জলে সে ভালোবাসার বাসনা
কোথায় হারালো, কোন্ আঁকাবাঁকা গলিতে।

আমিও ছিলাম, ছিলাম আমি হে একদা,
আঁকাবাঁকা পথ অন্ধগলির নগরে
ভুলে যাওয়া নাম স্মৃতিতে প্রতিধ্বনিত
বিগত বাসনা বিস্মৃত কোন্ দুরাশা
শিথিল শিরায় শোণিতে এখনো প্লাবিত।।

হঠাৎ জ্যোৎস্নার ছলে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

গতকাল রাত্রে তারা এসেছিলো আমার বাগানে।
নিজস্ব পোশাকে খুব শান্ত মৃদু পায়ে গতকাল
শব্দহীনভাবে তারা পায়চারি করেছে এখানে:
তারা সব বন্ধু ছিলো—বড়ো প্রিয় বন্ধু ছিলো কাল।

সে-সকল কিছু নাই, পড়ে নাই আজ এই প্রাতে
কাল ভাসিয়াছে জলে—প্রেত, যোনি...জ্যোৎস্নার প্রপাতে
তাহাদের মৃতরেখা—পতনের মৃতরেখাগুলি...
দীর্ঘ বনে বনান্তরে...মনে-মনে, বনে-উপবনে:
ঝরে গেছে ঠান্ডা লঘু তাহাদের কোমল অঙ্গুলি
হঠাৎ জ্যোৎস্নার ছলে পরস্পর আত্মীয়হননে।

আজ ভোরে হেমন্তের ডাক শুনি পুরানো বাগানে।
বাগানে? অথবা মর্গে—পাতাগুলি ভাসিছে পুকুরে,
তাদের বিনষ্ট গন্ধে হেমন্তের যেখানে-সেখানে:

হায় ফুল্ল মালা মোর, কী ফুটাও জানি না অদূরে!

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

বিবিধ ভাষায় রবীন্দ্র সঙ্গীত

কবিগুরুর একবিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিবিধ ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীতের যে অনুষ্ঠান আকাশবাণীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে বিশেষ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরকম একটি অনুষ্ঠান গত বৎসর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেটি শোনবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলাম।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অপর ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত বাংলার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য শতকরা শতভাগ অধিকার করতে সমর্থ হবে না কিন্তু অপর ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের পরিচয়কে মূলানুগ রীতিতে প্রদর্শন করবার এর চেয়ে যোগ্যতর প্রচেষ্টা আর কী হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত হত যে, এমন সার্থক প্রচেষ্টা সম্ভব। এই এক একটি লিরিকের ভাষান্তর যে কত কঠিন তা যাঁরা এবম্বিধ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন। আসলে এও একরকমের অনুবাদ, কিন্তু এই অনুবাদের সঙ্গে সাহিত্যিক অনুবাদের পার্থক্য বিপুল। কোন সাহিত্য সন্দর্ভ যখন এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদ করা যায় তখন আমাদের লক্ষ্য থাকে যাতে বিষয়-বস্তুর বৈলক্ষণ্য না ঘটে সেই দিকে। একাজটা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাপারটা অবজেক-টিভ; অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে একটা আখ্যায়িকা বা বর্ণনা রয়েছে যা ভাষান্তর সত্ত্বেও একই থাকবে। সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সাব-জেক্‌টিভ কেননা বিষয়টা মনোগত উচ্ছ্বাস নিয়ে। অত্যন্ত কৌশলী না হলে সেণ্টি-মেণ্টের এই রকম লেনাদেনঘটিত ব্যাপারে সার্থক হওয়া খুবই কঠিন। ভাষার দিক দিয়ে অনুবাদ করলেই এখানে কাজ সম্পূর্ণ হয় না, ভাষান্তরিত শব্দ যতক্ষণ না মূল সুরের সঙ্গে মিলছে ততক্ষণ অব্যাহতি নেই। অতএব, এই প্রস্তুতির পরিশ্রমকে বিশেষ সাধুবাদ দিতে হয়।

এই প্রচার উপলক্ষে আকাশবাণী বলছেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিন সহস্র গান এতকাল বাংলাভাষী শ্রোতাদের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ ছিল; আকাশবাণী অপরভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই দায়িত্ব পালনে তাঁরা শৈথিল্য প্রকাশ করেন নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা সুন্দর পরিচয় এই ভাষান্তরিত গানগুলির মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই অনেকের বিশ্বাস। এই পরিচয়ের আভাস কেমনভাবে পাওয়া সম্ভব হয় সেটা একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট

হবে। গীটারে আমরা যখন রবীন্দ্রসংগীতের সুর শুনি তখন রবীন্দ্রসংগীতের একটা নিখুঁত ধ্বনিচিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের তখন বুঝতে একটুও অসুবিধা হয় না যে আমরা যা শুনছি তা রবীন্দ্রসংগীতেরই ধ্বনিরূপ। একে আরও প্রত্যক্ষ করে তোলা যায় যদি তার সংগে অপর ভাষার শব্দগুলি শোভনভাবে সংযোজিত হয়। অপর ভাষায় আমরা যে রবীন্দ্রসংগীত শুনেছি তাতে এই অনুভূতিই জাগ্রত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রমানসও অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। এইভাবে এই পরীক্ষা-মূলক কাজটি সুসম্পূর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতের এই যে পরিচয় অন্যান্য দেশবাসীরা পেলেন এর প্রভাব তাঁদের সংগীতে কতখানি বিস্তৃত হবে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এই প্রচেষ্টায় একটি মনের সংগে অপর মনের যে যোগ স্থাপন হল তার মূল্য কম নয়। তাঁদের সংগীতেও বৈচিত্র্যের এক দিক খুলে যাওয়া সম্ভব এবং রবীন্দ্র সংগীতের অলংকরণ রীতি হয়ত তাঁদের অলংকরণেও নূতনত্ব সম্পাদনের প্রেরণা এনে দেবে। কোনো কোনো শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি তাঁরা এই ভাষান্তরিত গান-গুলি গেয়ে গভীর আনন্দ পেয়েছেন—রবীন্দ্র-সংগীত প্রকাশের সরল অথচ নিপুণভংগী তাঁদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। প্রত্যেকের কণ্ঠেই একটা বিশিষ্ট আবেগ লক্ষ্য করেছি—আন্তরিক প্রীতি ও সহৃদয়তা না থাকলে এই আবেগ সঞ্চারিত হতে পারে না।

নানা ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের নিপুণ রূপায়ণে এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় হল যে, রবীন্দ্রসংগীতে ঘরোয়ানা স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বিবিধভাষায় এই যে শিল্পীরা গেয়ে গেলেন এতে এমন ধারণার অবকাশ হয় নি যে, বিশেষ গায়নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হলে রবীন্দ্রসংগীত বৈশিষ্ট্য-সহকারে সম্পাদন করা অসম্ভব। এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেকেই অপরভাষাতে রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন। মান্না দে গাইলেন হিন্দীতে কিন্তু তাঁর সুললিত সংগীত আমাকে অভিভূত করেছিল; মুজাম্মিদদ্ নিয়াজী উর্দুতে গাইলেন, কিন্তু সে গানে বাংলাভাষায় সম্পাদিত রবীন্দ্র-সংগীতের মতই তৃপ্তি পেয়েছি। অপরাপর ভাষার গানও সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কণ্ঠ যদি গ্রহণে সক্ষম হয় তাহলে শিক্ষার সহায়তায় সবরকম গানই উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রকাশ করতে পারে। রবীন্দ্রসংগীত সবাইকার জন্য নয় এধারণা তাঁদের যাঁরা নিজেরা সবরকম গানে প্রবেশ করতে পারেন নি কেবল রবীন্দ্র-সংগীতেই নিজেদের নিবন্ধ রেখেছেন। বরঞ্চ যাঁরা বিভিন্ন সংগীতে অভিজ্ঞ তাঁদের পক্ষে কোন বিশেষ সংগীতের বিশেষত্ব অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা তাঁদের অভিজ্ঞতাই এই বিষয়ে সাহায্য করে। অতএব যেটা মূলত প্রয়োজন সেটা শিক্ষার ব্যাপকতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঔদার্যের স্বীকৃতি। আমরা আশা করি আকাশবাণী কোন ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেবেন না—আর্টিস্টের কাছে আর্ট একটা সম্পূর্ণ বস্তু। বহুতর শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও এই অখণ্ডতার পরিকল্পনাকে ব্যাহত করা সংগত নয়।

এই প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের দু একটি বিষয় সম্বন্ধে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। অধিকাংশ শিল্পীই রবীন্দ্রসংগীতের ট্র্যাডিসন অনুযায়ী গলা ছেড়ে গান করেন নি—ফলে সংগীতে কৃত্রিমতা এসে গেছে। আমার ধারণা ছিল বাঙালী শিল্পীদের মধ্যেই এই-রকম কণ্ঠকে সংকুচিত করবার চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু দেখা গেল এটা সাধারণভাবেই শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। অনাবশ্যক চিৎকার করাটা ভাল নয়; সেই উপদেশও কেউ দেবে না কিন্তু অনাবশ্যক কণ্ঠকে খাটো করাটাও অস্বাভাবিক কেননা তা সংগীতের ব্যাপ্তিকে রুদ্ধ করে। এ সম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্ত্য সংগীতকে অনুসরণ করতে পারি। খোলা গলাকে কিভাবে শাসনে রাখতে হবে তার উত্তম প্রচেষ্টা পাশ্চাত্ত্য সংগীতে দেখা যায়। তাঁরাও তো বেতার মারফৎ মাইক্রো-ফোনের সামনেই গান করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাইক্লোস্টাইল করা যে গানগুলি উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হল, তাতে অপরভাষার অনুবাদ-গুলি ছিল না। বাঙালীর কাছে এর বিশেষ সার্থকতা নেই। এর পরিবর্তে মুদ্রিত পুস্তিকায় মূল গানের সংগে ভাষান্তরিত গানগুলি গ্রথিত হলে সবশ্রেণীর শ্রোতার কাজে লাগত। আকাশবাণীর পক্ষে এটা করা কঠিন ছিল না।

এই অনুষ্ঠানে কতিপয় শিল্পীর হাওয়াই শার্ট আর ট্রাউজার আমাদের অশোভন মনে হয়েছে। তাঁদের মনোভাব এইরকম অনুষ্ঠানে কি করে এই পরিচ্ছদ সমর্থন করে বুঝি না।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্-এর অডিটোরিয়াম-এর ব্যবস্থাদি আরামপ্রদ নয়। এটি কি আদৌ সম্পূর্ণ হয়েছে? তা সত্ত্বেও এর অবস্থিতি খুবই সুবিধাজনক। তবে, হাওয়ার ব্যবস্থা আরো ভাল না হলে এখানে বসে সংগীত উপভোগ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

পরিশেষে প্রযোজক এবং শিল্পীবৃন্দকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করছি। সর্বসমেত পঁচিশটি গান আমরা শুনেছি ৯ই আগস্টের অনুষ্ঠানে। বাংলা ছাড়া অপর ভাষাগুলি হচ্ছে—হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী, উর্দু, মালয়ালাম, মারাঠী, তামিল, ওড়িসী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, কানাড়ী এবং কাশ্মিরী।

-Sexy slick and yet phony wholesome a creation in the spirit of a reversible Cornflake that can also serve as a sequine.

রোলস রয়েস বনাম চুইংগাম

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজ দেশটা ছেড়ে গেলেও ইংরেজিয়ানার অনেক খোলস রয়ে গেছে। যারা ছিল নির্ঝঞ্ঝাটে বংশপরম্পরা গাঙ্গুলী, ইংরাজ আমলের ঝঞ্ঝাটে পড়ে তাদের অনেকে হল গাংগুউলি। অনেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরিণতি বনার্জিতে। অন্ততঃ এমনি এক-জন বনার্জির কথা জানি যাকে বিদেশের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করতে আপ্রাণ সংগ্রাম করে প্রমাণ করতে হয়েছিল বন্দ্যোপাধ্যায় আর বনার্জি একই চীজ। আর একজনের বাবা সাধ করে ছেলের নাম রেখেছিলেন ব্রজহরি ব্রহ্মচারী। বিদেশে গিয়ে সে তার নিজের নাম শুনে ভিরমি খেয়েছিল—কালক্রমে ব্রজ হল ব্রয়গা, বিহারী বাহারি ও তার চেয়ে চমৎকার ব্রহ্মচারী হল ব্রমহাক্যারী। এতে দোষ দেবার কিছু নেই। যে নিয়মে পি ইউ টি

ব্রয়গাবাহারি ব্রমহাক্যারী

যেখানে পুট হয় আর বি ইউ টি বাট সেখানে ষাট ষাট ছাড়া আর কি বলা যায়। ইংরাজী উচ্চারণে এই রীতি।

তা না হলে আমাদের সীতাভোগ মিহি-দানার দেশ বর্ধমানকে কিনা দুমড়ে মুচড়ে করা হয় বার্ডওয়ান। ইংরাজী উচ্চারণে দিনকে রাত, রাতকে দিন করার এমন ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে। ইংরাজদের জিভের আদিখ্যেতা কত। বানান আর উচ্চারণের মধ্যে টাগ অফ ওয়ারটির আরও অনেক জবর নিদর্শন আছে। Duncan Sandysর স্যান্ডিস্ উচ্চারণের বেলায় সানডস, ল্যানডের মত বলতে হবে। কেন না এমনি নিয়ম। লেখবার সময় Gillinghan কিন্তু বলবার সময় বলতে হবে Jillingan। তেমনি Marlborough লিখবার সময় যেমন উচ্চারণ করার সময় কিন্তু Mawlbra। Hambro বলবার সময় Ham-bora—একটি সিলেবল বেশী করে বলতে হয়। সবচেয়ে মজার হল Homeকে হোম বলা চলে না—বলতে হবে হিউম; Fumeএর মত করে। এই নাম বিকৃতি করার পিছনে একটা গল্প আছে। ১৫১০ সালে থার্ড আর্ল অব হোম যুদ্ধ করছেন ফ্লোডিন-এর প্রান্তরে। সেখানে নিজের সৈন্য-সামন্তদের উৎসাহিত করে যুদ্ধে আরও ঘোরতরভাবে মাতিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে আর্ল নিজের নাম 'হোম-হোম' করে চিৎকার করছিলেন। ফল হল বিপরীত। যুদ্ধের মাঝে সৈন্যরা ভাবল home—সুইট হোম বলে ফিরে যাবার ডাক পড়েছে—অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে রেখে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে বাড়িমুখো ধাওয়া করল। সেই থেকে কেউ হোম-এর উচ্চারণ আর করতে চাইলো না—হোম হয়ে দাঁড়াল হিউম।

শুধু এমন গোলা বারুদের লড়াই নয়—কথার লড়াই-এ ইংরেজী তোপ বর্ষণ হয়ে থাকে। ইংরেজী এখন কে না বলছে। ফলে ইংরেজীর রকম ফেরও হয়েছে দেশ ভেদে হাজার রকম। যে যার নিজের মত করে ইংরেজী কইছে। মাদ্রাজী বলছে, জাপানী

বলছে, ফরাসীরা বলছে, বলছে স্প্যানিয়ার্ডরাও। বলার গুণে ইংরেজী কোথাও কোথাও 'ইনজুরি'তে পর্যবসিত হচ্ছে। আমেরিকার এখন বেস্পতির দশা যাচ্ছে—কোথাও কাউকে ভ্রূক্ষেপ করবার তাদের প্রয়োজন নেই। কারণ সব বিষয়ে আমেরিকানরা সবাইকে পিছনে ফেলে রেখে আগে আগে ছুটছে। কিন্তু এক বিষয় দেখে মনে হয় আমেরিকানদের মনে মনে ইংরেজী কৌলিন্যের প্রতি শ্রদ্ধা অশেষ, খাঁটি ইংরেজের মত করে ইংরেজী কইবার অশেষ দুর্বলতা ওদের আছে।

আমেরিকায় ইংরেজী চলে কিন্তু তা কতখানি ইংরেজের ইংরেজী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বার্নাড শ' বলেছিলেন ইংরেজ ও আমেরিকান এক ভাষার দ্বারা বিভক্ত দুটি জাত। আজ থেকে বিশ বাইশ

একি বাবু আমেরিকান বানান পেয়েছ

বছর আগে স্কুলে কেউ বানান ভুল করলে মুকুন্দবাবু ধমকে বলতেন—এ কি বাপু আমেরিকান বানান পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে। সেই থেকে ধারণা আমেরিকান বানানে যা ইচ্ছা তাই করা যায় এবং করলেও কেউ কিছু বলে না। কথাটা অতিরঞ্জিত হলেও যখন আমেরিকান ইংরেজীর সঙ্গে জানা জানি হল তখন মুকুন্দবাবুর কথা প্রায়ই মনে হয়। আমেরিকান সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে যে সব শিরোনামা দেখতুম সেগুলিতে কি অর্থ হয় তা উদ্ধার করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হত। হরফটা ইংরেজী নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার অর্থটা বার করতে চোস্ত মার্কিনী বুঝদার হওয়া চাই। আমেরিকানরা এদিকে উদার। তারা নূতন শব্দ চয়ন করে—কেউ বাধা দেয় না। কিছু দিনের মধ্যে নূতন

আমেরিকান তরুণীদের কাছে ইংরাজ তরুণীরা ধারে-কাছে আসে না ঠাটে ঠমকে

শব্দটি ভাষার রাস্তায় এসে সবার মুখে মুখে তরতর করে চলে হেঁটে বেড়াতে থাকে। আগে কি কখনও শুনেছেন Gobbledgook? মানে কি? মানে Babblegab। তার মানে বাংলায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া। এমন নতুন শব্দ মাথা খাটিয়ে বার করা হয়েছে লোকে তা গ্রহণ করেছে এবং অকাতরে ব্যবহার করছে। টেকো লোক বুঝতে আমেরিকানদের বহুপ্রচলিত শব্দটি ইদানীং খুব চলে—Egghead। Check শব্দটির অর্থ বহুরকমের। হোটেলে ঢুকবার সময় হল Check in। টাকা মিটিয়ে চলে যাওয়ার সময় Check out। অতটার সময় তোমার খবর নেব— Check on you। মুদ্রাদোষ কি না জানি না—বহু আমেরিকানকে বলতে শুনা যায়—do not know nothing।

আর একটি বিচিত্র উদাহরণ—O-Kay, you have to ante-up the payment। এখানে ante-up বললে বুঝতে হবে অনিচ্ছায়। Your sari cost as much again as mine did মানে দ্বিগুণ বুঝাচ্ছে। কোন একটি বই-এর সমালোচনা পড়েছিলাম কোন একটি চরিত্র সম্বন্ধে—

Sexy slick and yet phony wholesome a creation in the spirit of a reversible cornflake that can also serve as a sequin!

এর অর্থ উদ্ধার করা চারটিখানি কথা নয়।

আরও দু' চারটি উদাহরণ দেবার প্রয়োজন আছে। যেমন Jazz মানে ত্বরান্বিত করা। ১৯০০ সালে দক্ষিণের নিগ্রোরা অবশ্য এর অর্থে Sex বুঝতো। Girlকে বলে Gal। Meeting লেখা হয় Miting— night—nite। Cheque—Check, Plough—plou। Fotog মানে ফটোগ্রাফার Photo না লিখে লেখে Foto। Advertiser মানে বুঝি। Badvertiser মানে কি? খারাপ বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি দুজন পণ্ডিত lexicographer হ্যারল্ড ওয়েন্টওয়ার্থ ও স্টুয়ার্ট বার্জ ফ্লেক্সনার Dictionary of American slang নামে এক উত্তম গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

ভাগ্যচক্রে দেখা যায় আমেরিকার বহু অফিসের বড়বাবু রোলস রয়েস উচ্চারণকে নিজেদের চুইংগাম উচ্চারণের চেয়ে বেশী সম্মান দিচ্ছেন। ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলা যাক। সম্প্রতি নিউইয়র্ক ও আমেরিকার আরও কটি প্রসিদ্ধ শহরে ইংলণ্ড থেকে বহু মেয়ে সেক্রেটারীর কাজ নিয়ে এসেছে ও আরও আসছে। হঠাৎ আমেরিকান 'বস'রা ইংরেজ সেক্রেটারী রাখার দিকে ঝুঁকেছেন। তলিয়ে দেখলে দেখা যায় আসলে তারা ইংরাজ মহিলাদের ইংরেজী বলার কায়দায় প্রলুব্ধ। ওই কাটাছোলা পরিষ্কার ইংরেজী শুনে বড়বাবুদের পিলে চমকে উঠেছে। আমেরিকান তরুণীদের কাছে ইংরেজ তরুণীরা ধারে কাছে আসে না ঠাটে ঠমকে। চেহারার জেল্লস চটকদার বেশভূষায়, ক্ষিপ্রতা, পরিচ্ছন্নতা এ-সব কাজে মার্কিন মেয়েরা কারোর কাছে নতি স্বীকার করার নয়। কাল হয়েছে ওই কান। না দেখে শুধু শুনেই 'বস'রা রোলস রয়েস উচ্চারণ চাইছেন। বসদের ধারণা ব্যবসা ক্ষেত্রে অমন খানদানি ইংরেজী ঢঙে যখন মৃদু কণ্ঠে টেলিফোনে ঘোষিত হবে good-ahf-teh—noon, তা শুনলে অফিসের ইজ্জত বেড়ে যাবে। এমন মধুর কণ্ঠে ঠিক ঠিক ইংরেজের মত ইংরেজী শুনলে বিশেষ করে প্রতিপক্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 'বস'রও টনক নড়বে। যার ফলে টেলিফোনেই ইংরেজী সেক্রেটারীর গলায় এমন নিখুঁত ইংরেজী শুনে তাকে দুগুণ মাইনেতে অন্য কোম্পানীতে বহাল করবার নিমন্ত্রণ জানান হয় টেলিফোন মারফত। এমন প্রস্তাব পেয়ে ইংরাজ মহিলারা আমতা আমতা করে বলছেন—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো পরিচয় হয় নি, তা সত্ত্বেও এমন সহৃদয়তা দেখাতে যাচ্ছেন? যে সব আমেরিকান বসের কাছে ইংরেজ সেক্রেটারী কাজ করেন, তিনি নিজে, তার মিসেস এবং আরও পাঁচজন সবাই এই খানদানি ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে ইংরেজী বকবকম শুনতে পেলে লাফিয়ে ওঠেন। ধরায় চাঁদ কুড়িয়ে পেয়েছেন মনে করেন।

কোন কোন আমেরিকানরা বিলিতী. সাহেব হবার ভান করছেন। তাঁদের কারও

কারও কানে ইংরেজ মহিলার কণ্ঠ এত শ্রুতি-মধুর লাগার কোন সংগত কারণ নেই, এই কথাটা প্রমাণ করতে মার্কিনী সেক্রেটারীদের পক্ষ অবলম্বন করে রাশি রাশি প্রবন্ধ বার হল। গুণপনায় কে শিখরে যায়, কার ক্ষিপ্রতা বেশী, কে মিশুকে বেশী, কার কর্মশক্তি বিচার-বিবেচনা বেশী, তার ফিরিস্তি দেখে মনে হয় আমেরিকান পুরুষরা নিজেদের মেয়েদের নেটিভ বলে মনে করে নিজেদের ছোট করছেন।

এই টানা-পোড়েনে পড়ে ইংরেজ সেক্রেটারীরা আমেরিকান 'বস'দের সম্পর্কে যা বলছে তাও বিচার্য— দেশে ইংরাজ

Good - ahf - teh - noon,

শুনলে অফিসের ইজ্জত বেড়ে যাবে

বসদের চেয়ে আমেরিকান বসদের ইংরাজী অনেক বেশী মেরামত করে দিতে হয়। দেশের তাঁরা এখানকার বসদের মত এত ভাবপ্রবণ নন। এঁরা অনেক বেশী মিশুকে। তাঁরা মরে গেলেও সেক্রেটারীকে কখনও নিজের স্ত্রীর মুখে মাখবার পাউডার দোকান থেকে কিনে আনবার কথা বলবেন না। এঁরা অবলীলাক্রমে আমাদের নিয়ে আসতে ফরমাস করেন। নিজের স্ত্রীর সাজ-সজ্জা উপকরণ নেহাতই ব্যক্তিগত সামগ্রী—পাঁচজনকে বলা ইংরেজ সমাজে অচল।

যখন বাক্-বিতণ্ডার এমন ঝড় উঠেছে, তখন এক জায়গায় একটি মন্তব্য পড়েছিলুম সেক্রেটারীদের যথার্থ ভূমিকা সম্বন্ধে। সেখানে বলা হয়েছিল আমেরিকার কর্মজীবনে সেক্রেটারীর ভূমিকা অশেষ। এরাই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের তরণী চালান, 'বস'কে পরামর্শ দেন ও লোককে খাতির আপ্যায়ন করেন। আদর্শ মহিলার মত আদর্শ সেক্রেটারী খোঁজাও মরীচিকা অন্বেষণ করা। মার্কিনী মহিলাদের মুখপাত্রীরা বলছেন যে, তাঁদের মেয়েদের মধ্যে সেক্রেটারীর যথার্থ মহিমা খুঁজে না পেলে সারা ইংলণ্ড তোলপাড় করলেও তার হদিস সেখানেও মিলবে না। বসদের কানে তালা লেগেছে, চোখে ধাঁধা লেগেছে।

ট্রামে বাসে

স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন যে জনগণের প্রধান প্রয়োজন হইল—খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"জনগণ তা জানে এবং জানে বলেই তার ব্যবস্থাও একটা করেছে;—খাদ্য তিন্তিড়ী-পত্র (উদরাময় হলেও থ্রম্বসিসের ভয় নেই), বস্ত্র কোপীন (ভাগ্যবন্তদের একমাত্র পোশাক), আশ্রয় বৃক্ষতল (ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যু হলেও ডিক্রি-নীলাম নেই) সুতরাং মাভৈঃ!!"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেন বলিয়াছেন যে, সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মাছের দর কমান খুব কঠিন। —"কাদা মাখা সার হল প্রাণ, মাছ-ধরা আর হল না", শ্যামলাল একটি বহুদিন বিস্মৃত গানের কলি গেয়ে শোনাল।

প্রসঙ্গত একটি সাম্প্রতিক সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। সংবাদে বলা হইয়াছে, কলের জল বাহিয়া কলিকাতার কোন এক গৃহে (গৃহস্বামী ভাগ্যবান) একটি মাছ প্রবেশ করিয়াছে। —"জনগণের অকুণ্ঠ প্রশংসাধন্য পৌরপিতাদের কালজয়ী অবদান"—সিনেমার বিজ্ঞাপনের ভাষায় মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

সম্প্রতি কোন এক ভদ্রলোক নাকি কয়েকটি রঙীন মাছ ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ি গিয়া দেখিলেন, সেই-গুলি লাল নীল মাছ নয়, নেহাতই কয়টি পুঁটি আর মৌরলা। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"যদ্দুর জানি, মাছের এই ধরনের ভেজাল নূতন। কিন্তু মানে না করে উপায় নেই যে, মানুষের মধ্যেও কত শফরী শুধু প্রসাধনের জলুসে ফরফর করে বেড়াচ্ছে!!"

শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে উভয় পক্ষের ধ্বংস অনিবার্য। —"কিন্তু শেখান স্থিরত্বম ইচ্ছন্তি—এ আশ্চর্য তো চিরকালের"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কংগ্রেস সভাপতি নাকি মন্তব্য করিয়াছেন, মন্ত্রীদের মনে করা উচিত যে, তাঁহারা একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তি। বিশুখুড়ো বলিলেন—"মনে করেন কিনা বলতে পারব না, কিন্তু ভাগের মা যে গঙ্গা পাচ্ছেন না, তাত দেখতেই পাচ্ছি!!"

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আইন সম্মেলনে অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রীশীতলবাদ নাকি বলিয়াছেন যে, গরীবের জন্য আইনের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। —"তাতে দুই নম্বর ঠকে দেওয়ার সুবিধেই হয়ত হবে, গরীবের উপকার বড় একটা হবে না" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পাখী প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, পাখীর সংহার এবং বিদেশে পাখী চালান এই দুই ব্যাপারে যথেষ্ট বিধিনিষেধ ও সতর্কতার প্রয়োজন। —"বিশেষ করে রামপাখীর ব্যাপারে কথাটা খুবই খাটে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কংগ্রেস সংসদীয় দল নাকি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, আকাশবাণীর হিন্দী সরল হওয়া উচিত।—"না হলে, অন্তত একখানা, সরল অভিধান থাকা খুবই প্রয়োজন, কণ্ঠ লেঙ্গটি জাতীয় ভাষা যে দেবাঃ ন জানন্তি" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

বঙ্গীয় সঙ্গীত কলেজের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে শ্রীহুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন, মনের বিকাশের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গীত চর্চা করা উচিত। —"কিন্তু শুধু চর্চাতেই মনের বিকাশ সব সময় হয় না, সঙ্গীতে সা-রে-গা যেমন আছে, তেমনি মা-রে-গাও আছে"—বলেন বিশুখুড়ো।

ভারতের মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইতেছে এই অজুহাতে করাচীর কোন এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাকি এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, ভারতের সঙ্গে ব্যবসা পাতান অসম্ভব। —"কোন চুক্তিপত্র সই না করে যে ব্যবসা চলে অর্থাৎ পাচার তা অবশ্য অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকবে"—বলে শ্যামলাল।

আচার্য বিনোবা ভাবের পাকিস্তান ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, অবশ্য ভূ-দানের প্রশ্নই উঠে না, মাটি সেখানে মোটে নাই। খুড়ো বলিলেন—"পা পর্যন্ত যেখানে মাটিতে পড়ে না, সেখানে মাটি দান আর কী করে সম্ভব!!"

মালদহের পক্ষাঘাত রোগের জন্য কী দায়ী, ময়দা না তেল? ইহা মীমাংসার জন্য আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"তৈলাধারে পাত্র, না পাত্রাধারে তৈল। মীমাংসার আলোচনাচক্রের কথায় মনে পড়ল, হয়ত অকারণেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ এশিয়ান, আফ্রিকান ও মিশ্র জাতির লোকেরা জীবনে এই প্রথম "শ্বেত জাতির পানীয়" ক্রয়ের সুযোগ পাইবে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের কল্যাণে যদি এবারে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের বিদ্বেষ ঘোচে।"

নাগাভূমির পরে এবারে শুনিলাম মিজো-ভূমির দাবির কথা।— "ফলং বৃদ্ধি ভূমিতে ভূমিতে ধূলে পরিমাণ, শুভংকর আর কে-ই বা পড়েছে"—বলেন বিশুখুড়ো।

মা-ও সে তুং-এর এক ভূতপূর্ব সঙ্গী ১২ মাইল সাঁতার কাটিয়া বৃটিশ উপনিবেশ হংকং-এ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি নাকি মাও-ও সে তুং-এর সঙ্গেই নদী সাঁতার কাটিয়া পার হইয়াছিলেন। —"সেটা হয়ত ছিল চিৎ সাঁতার। ডুব সাঁতারে আর পাল্লা দেওয়া চলল না" —বলে শ্যামলাল।

রাশিয়া হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আর তিন চার বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রলোকে গমন সম্ভব হইবে। খুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো কথা, অভিযানটা তারকা-লোকমুখী না হলেই হয়!!"

চাঁদের রং

পারিজাত মল্লিক

আমরা যে-শহরে থাকি তার ভোগোলিক আকর্ষণ কিছু ছিল না। তবে জায়গাটা ভাল ; ফাঁকা, মাঠ-ঘাট-জঙ্গলে ভরা। জলে ধাতুগঠিত স্বাস্থ্যকর উপাদান থাকার জন্যে টাইমটেবলের পাতায় নামটা ঈষৎ বড় করে লেখা থাকত, মেল ট্রেন থামত, কখনো সখনো ভূতত্ত্ববিদরা দূরের জঙ্গলে ক্যাম্প ফেলে কোনো গুপ্ত সম্পদের অনুসন্ধান করতে আসত।

এ-ছাড়া দু-একটা দর্শনীয় বস্তু যা ছিল—অতি পরিচয়ের ফলে তার প্রতি তেমন আকর্ষণ আমাদের ছিল না। সেদিন যখন কথায় কথায় স্নেহাদ্রিদি উষ্ণ-কুন্ডর কথা তুললেন, আমরা সমবেতভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ওটা কিছু নয়—নিতান্ত একটা গরম জলের কুন্ড, তেরো-

চৌদ্দ মাইল পথ ঠেঙিয়ে সেখানে যাবার কোনো মানে হয় না।

স্নেহদিদি খুব রাগ করলেন আমাদের ওপর। পোষ মাসের শেষ এখন, কুণ্ডে মেলা বসেছে, কত লোক আসছে রোজ ট্রেনে করে মেলা দেখতে, রোড বাস ছুটছে—তবু আমাদের কোনো গরজ নেই।

মজুমদারসাহেব বললেন, "দেখ বাপু, রোজ দফায় দফায় চা খাবে, সিঙাড়া-কচুরি ওড়াবে, আর তোমাদের স্নেহদিদিকে একদিন কুণ্ড-র মেলা দেখাতে নিয়ে যাবে না—তা কি করে হয়।"

"রঙ্গ রাখো—" স্নেহদিদি স্বামীকে তর্জন করলেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাজে গপ্প করে সময় কাটাবে, তবু বাড়ির কাছে সম্বৎসরের একটা মেলা দেখতে যাবে না। তোমরা যে কী—!"

আমরা হাসলাম। অশ্বিনী বলল, "মেলায় যেতে পারি, কিন্তু ওখানে গেলে আপনি যে কুণ্ডর জল মুখে দিতে চাইবেন।"

"দিলামই না হয়। তাতে কোন ক্ষতিটা হয় গো, ছেলে—?" স্নেহদিদি এমন মুখ করে বললেন যা স্নেহসূচক কলহের; তিরস্কারের মতনই প্রায়।

অশ্বিনী হাসছিল। চক্ষু বিস্ফারিত করে জবাব দিল, "সেই জলে কি হয় জানেন?"

"থাক। জেনে আমার দরকার নেই।"

অশ্বিনী নাছোড়বান্দা। সে জানাবেই। ঠাট্টা করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলল, "ওই জলে কোলা ব্যাঙ সাপ আরও কত কি যে সেদ্ধ হচ্ছে!" বলে অশ্বিনী বমির ভাব করল মুখে-চোখে।

স্নেহদিদি কথাটা কানেই তুললেন না। "তোমরা সব ঘরকুনো ছেলে। হাত-পা নাড়ার কষ্টটুকুও করবে না।"

মজুমদারসাহেব ঠাট্টা করে স্নেহদিদিকে আশ্বাস দিলেন। বললেন, "ঠিক আছে স্নেহ, আমিই তোমায় নিয়ে যাব। আমি থাকতে তোমার ভাবনা কি!"

স্বামীর পরিহাস স্নেহদিদির খুব পছন্দ হল না। ভরসাও পেলেন বলে মনে হল না। "তুমি যে কত নিয়ে যাবে জানি। তার চেয়ে আমি আর বউমা চাকরটাকে সঙ্গে নিয়েই একদিন ঘুরে আসব।"

অশ্বিনী এবার লজ্জা পেল। বলল, "আপনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলেন আমরা নিয়ে যাব না! চলুন, কবে যাবেন বলুন? কাল—, পরশু?"

স্নেহদিদিকে অকারণ রাগাবার আর মানে হয় না। আমি বললাম, "শনিবার চলুন, দিদি; সুবিধে হবে। আমরা বরং একটা গাড়ির ব্যবস্থা করি।"

কান্তি এবং বিজলীও আশ্বাস দিল, এই শনিবার আমরা তাঁকে কুণ্ড দেখাতে নিয়ে যাব। আমাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে স্নেহদিদি চলে গেলেন।

মজুমদারসাহেব বললেন, "তোমাদের ওটা হটস্প্রিং?"

"হ্যাঁ।...ঠিক ওই রকম জায়গায় হট্ স্প্রিং ভাবতেই কেমন লাগে।" কান্তি বলল।

"জায়গাটা বেশ জংগল, পাথরের কয়েকটা বড় বড় চাঁই—তার একপাশে একটা বাঁধানো কুণ্ড।"

"কত বড়?"

"একটা চৌবাচ্চার মতন।"

"খুব গরম জল?"

"ঈষদুষ্ণ।"

মজুমদারসাহেব চুরুট টানতে টানতে কি যেন ভাবলেন। "এই মেলাটা কিসের?"

"তা জানি না। এখানকার দেহাতীরা কুণ্ডটাকে পীঠস্থান মনে করে।" বিজলী বলল।

মজুমদারসাহেব অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। একটা গাড়ি শনিবারের জন্যে কিভাবে জোটানো যায় সে-বিষয়ে পরামর্শ হচ্ছিল। বিজলীর সংগে এখানকার এক বড় ব্যবসাদারের ছেলের বিলক্ষণ বন্ধুত্ব আছে, তাদের গাড়িও আছে তিনটে—লরি, জিপ আর একটা ফোর্ড। ধরলে করলে সে জিপ গাড়িটা অন্তত দিতে পারে।

মজুমদারসাহেব যেন কি বললেন। আমরা তাঁর দিকে তাকালাম। "তোমাদের কুণ্ডর কথা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ছে," উনি বললেন।

ওঁর কি মনে পড়ছে আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। হয়ত প্রকৃতির কোনো খেয়ালিপনা উনিও দেখেছেন, সে-কথাই বলছেন।

বিজলী খক্ খক্ করে কাশল ক'বার। বিজলীর খুব কাশি হয়েছে। গলায় মোটা করে মাফলার জড়িয়েছে। গরম শালের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে কান্তি। অশ্বিনী আর আমি মজুমদারসাহেবের মুখোমুখি বসে আছি।

দাঁতের চাপ থেকে চুরুটটা সরিয়ে মজুমদারসাহেব বাতির দিকে অন্যমনস্ক চোখে কয়েক পলক চেয়ে থাকলেন, তারপর বললেন—"একবার আমাদের কপালে একটা গুহা জুটেছিল।"

"গুহা?" কান্তি সচকিত হয়ে বলল। আমরা অবাক হয়ে মজুমদারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

গল্পটা বেশ আকর্ষণীয়ভাবে শুরু হয়েছিল। স্বভাবতই আমরা আকর্ষণ বোধ করছিলাম।

"তখন যুদ্ধের সময়—" মজুমদারসাহেব তাঁর গল্প শুরু করলেন, "কলকাতা প্রায় ফাঁকা, প্রাণের ভয়ে লোক পালাচ্ছে; ইস্ট বেংগলের দিকেও বড় শহর-টহরে বড় একটা কেউ সাহস করে থাকছে না—পালিয়ে যাচ্ছে। ভয়ংকর প্যানিক তখন। জাপানী বোমার ভয়ে মানুষের আহার নিদ্রা ঘুচে যাবার জোগাড়।...এই রকম সময়, এক খুনের তদন্ত করতে আমাদের একটা ছোটখাটো দলকেই একজায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।"

সামান্য ভেবে নিয়ে, দেশলাই কাঠির ডগা দিয়ে চুরুটের ছাই সমান করে ফেলে দিতে দিতে উনি বললেন, "তখন বাঙলা দেশের ত বটেই, বাঙলা দেশের উপকণ্ঠে বিহার টিহারের গা-লাগা ছোটখাটো জায়গাগুলোও লোকে ভরতি হয়ে গেছে। লোকে যতটা পারছে দূর জায়গা ও অখ্যাত জায়গাকে নিরাপদ ভেবে নিচ্ছে। তার ফলে বাঙলা দেশের সেই সব জায়গা যা বাঁশবন আর পুকুরে অন্ধকার হয়ে ছিল—ম্যালেরিয়া আর মশায়, সাপে, শিয়ালে মানুষের অগম্য ছিল তাও লোকের বসবাসের জায়গা হয়ে উঠেছে।

এই রকম একটা জায়গা, একপাশে হাত বাড়ালে উড়িষ্যা, অন্য পাশে বিহার—ইণ্ডিয়ান আর্মির ছোট একটা আস্তানা ছিল। একদিকে কাঁচা মিলিটারি ব্যারাক, অন্য দিকে মাইল দেড়েক তফাতে আধা-মফস্বল শহর। জায়গাটা একেবারেই নগণ্য এবং মনুষ্য-বর্জিত ছিল, কিন্তু মিলিটারীর দৌলতে পথ-ঘাট ট্রেনের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় অনেকে ওদিকে পালিয়ে গিয়েছিল।

জায়গাটার সুবিধেও কিছু ছিল; ফাঁকা জায়গা, জল-বাতাস ভাল, যুদ্ধের ওই ডামাডোলেও দুধটা মাংসটা সস্তা।...এই সব দেখে-শুনে কলকাতার কিছু ধনী পরিবারও ওদিকে ভিড় করেছিল।

যে ছোট মিলিটারী ব্যারাকটার কথা বললাম, সেটা একটা ট্রেনিং সেন্টার। কিসের ট্রেনিং জানো? ক্যামোফ্লেজ ট্রেনিং। আগে বুঝি কখনও শোনো নি...? না শোনাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের শাস্ত্র বড় জটিল, তার হাজার রকম শিক্ষা।...যাক সে কথা; যা বলছিলাম—, ওই শত্রু ঠকানো ব্যাপারটার হাতে খড়ি দেওয়ানো হত সেখানে। সোজা কথায় ঠকানো-বিদ্যে শেখানো হত। জংগল, ছোট ছোট পাহাড়ী টিলা, একটা শাখা নদীর মুখ—নানা কারণে জায়গাটা ক্যামোফ্লেজ ট্রেনিংয়ের উপযুক্তই ছিল।

এই চমৎকার জায়গায় একটা খুন হয়ে

গেল। যিনি মারা গেলেন তিনি একজন রিটায়ার্ড সিভিল সার্জেন, ডাক্তার নিয়োগী। অন্য যে ঘটনাটি ঘটল সেটাও আশ্চর্যের, ক্যামাফ্লেজ ট্রেনারদের একজন ক্যাম্প থেকে বেপাত্তা হয়ে গেল। তার রুমাল ও একপাটি জুতো নদীর দিকটায় পাওয়া গিয়েছিল, ফলে লোকের ধারণা হল সেও খুন হয়েছে। তার মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেওয়ায় সেটা ভাসতে ভাসতে কোথাও চলে গেছে।" মজুমদার-সাহেব থামলেন।

আমাদের চা এসেছিল, চায়ের সঙ্গে কড়াইশুঁটির উপাদেয় ঘুগনি। স্নেহদিদি নিজের হাতে আমাদের ঘুগনি আর চা দিলেন। মজুমদারসাহেব রসিকতা করে স্নেহদিদিকে একটু খেপালেন। বললেন, "স্নেহ, তুমি ওদের এত সহজে বিশ্বাস করলে! শনিবার দিন ওরা অন্য ছুতো দেখাবে।"

আমরা সমস্বরে হাসলাম। স্নেহদিদিও হেসে ফেললেন। পরে বললেন, "আজ কোন পালা গাওয়া হচ্ছে?"

"সেইটে গো, গুহা..."

"সেই অলক্ষুণে জায়গাটা—" স্নেহদিদি আমাদের দিকে তাকালেন, "জান, তোমাদের পুলিসসাহেব ওখানে গিয়ে গুলী খেয়েছিলেন। কাঁধ গর্ত করে গুলী ঢুকে গিয়েছিল।" কথাটা বলার সময় স্নেহদিদির মুখে একটি কাতরতার ভাব ফুটে উঠল এতকাল পরেও।

"তা ঠিক। বড়জোর জখম হয়েছিলাম।" মজুমদারসাহেব বললেন, "আর একটু অসাবধান হলে গুলীটা মাথায় ঢুকত। রাখে হরি মারে কে! কপালে আয়ু ছিল বেঁচে গেছি।"

স্নেহদিদি চলে গেলেন। আমরা উৎকর্ণ হয়ে গল্পটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মজুমদারসাহেব আরাম করে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন। শেষে আবার আরম্ভ করলেনঃ

"ব্যাপারটা যখন আমাদের হাতে এল, তখন অবস্থাটা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। মিলিটারী অথরিটি সিক্রেট নোট দিয়েছে, ওখানে কোনো ফিফথ কলমিস্ট-এর আড্ডা হয়েছে বলে তাদের ধারণা। যে লোকটিকে পাওয়া যাচ্ছে না সম্ভবত তাকে ওরা খুন করেছে।

আর লোকাল পুলিস বলছে, তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্দেহজনক কোনো মানুষকে ওদিকে দেখতে পায়নি। জঙ্গলের পশ্চিম দিকে একদল আদিবাসী থাকে—তাদের ছোট একটি গ্রাম আছে। ওদের মধ্যে কেউ ফিফথ কলমিস্ট নয়, খুনেও নয়।

কলকাতা থেকে আমরা চার ধুরন্ধর ঘটনাস্থলে তদন্ত করতে যাত্রা করলাম। আমাদের কর্তাদের ঘুম ছুটে গেছে। এ বাবা মিলিটারীর ব্যাপার। তাদের নোট্ পেয়েই হুকুম, অবিলম্বে এই রহস্য উদ্ধার কর।

রহস্যটা কি? না, ওই যে জঙ্গল আর পাহাড়ী অসমতল ভূমি, টিলার মতন জায়গাটা, একটুখানি অংশ নদীর খাঁড়ির মতন—ওই গোটা এলাকা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে ওখানে এমন কোন রহস্য লুকিয়ে আছে যাতে ডাক্তার নিয়োগী মারা গেল আর সেই ট্রেনার অদৃশ্য হল।"

"কিভাবে নিয়োগী মারা গেল?" বিজলী জিজ্ঞেস করল।

"বন্দুকের গুলীতে।" মজুমদারসাহেব বললেন, "ট্রেনারও নিহত বলে ওরা সন্দেহ করছিল।"

"একই সঙ্গে?"

"না। আগে নিয়োগী, পরে ট্রেনার।"

"কত দিন পর পর?"

"পাঁচ দিন।"

"হঠাৎ তাদের গুলী করল কে? কেন?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

মজুমদারসাহেব হাসলেন। "সমস্যা ত সেটাই। কেন যে এই খুন, কি কারণে—, কেউ তা জানে না। আমরা কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"জায়গাটা আমরা আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে শুরু করলাম। তোমাদের আগেই বলেছি, ওটা জঙ্গল। খুব ঘন বা গভীর নয়, বা আগাগোড়া শুধু গাছগাছড়ায় ভরতি নয়। কিছুটা বুনো গাছপালা, তারপর হয়ত ফাঁকা কিছুটা, আবার দু চারটে পাহাড়ী টিলা, সমতল আবার—এই রকম আর কি। অর্থাৎ সামনা সামনি না এসে আশে-পাশে লুকিয়ে বন্দুক নিশানা করে কাউকে মারা যায়।

এই রহস্যের কোনো মীমাংসা আমরা করতে পারছিলাম না। ডাক্তার নিয়োগীর ওখানে কোনো শত্রু ছিল না। ভদ্রলোক সকালে মর্নিং-ওয়াক করতে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকেই যেতেন। মারা যাবার দিন তিনি অভ্যাস মতন জঙ্গলের দিকেই বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখানেই মারা যান।...উনি সকালের দিকে মারা যান। আর ট্রেনার অদৃশ্য হয়েছিল বিকেলের দিকে।"

"ট্রেনার ওদিকে কেন গিয়েছিল?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"কেন তা বলা মুশকিল। তবে অনুমান করা চলে, ট্রেনার লোকটি ওপাশে কোনো ট্রেনিং দেবার জায়গা খুঁজছিল। এ-রকম অনুমান করাই স্বাভাবিক। কেননা জঙ্গলের শুরুর দিকটায় ক্যামাফ্লেজ ট্রেনিংয়ের মহড়া ও ট্রেনিং চলত।"

আমরা নীরবে চা খেতে খেতে মজুমদারসাহেবের গল্প শুনছিলাম।

ওঁর চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। পেয়ালা নামিয়ে রেখে চুরুট ধরালেন, নতুন চুরুট। বললেন, "ওই জঙ্গলের চারদিক শিকারী কুকুরের মতন আমরা যখন চষে বেড়াচ্ছি তখন নদীর দিকে বেশ ঘন গাছপালার আড়ালে—একটা খাদ মতন জায়গায় ওই গুহাটা দেখতে

পেলাম। ছোট গুহা, চারপাশে লতা আর বুনো গাছ।

আমাদের সঙ্গে ওখানকার পুলিসের লোক ছিল। বলল, ওই জায়গাটা ওই রকমই। তারাও যখন জঙ্গল তল্লাসী করছিল তখনও গুহাটা দেখেছে।

প্রায় তিন চারটে দিন তন্ন তন্ন করে সমস্ত খুঁজে আমরা যখন হায়রান তখন একদিন ওই জঙ্গলে একটা লিপস্টিক কুড়িয়ে পেলাম। অমন জায়গায় সভ্য শহুরে লিপস্টিক পাওয়ার কথা নয়। কি করে এল এটা? কোথা থেকে এল?

লিপস্টিকটা ব্যবহার করা। লিপস্টিক পেয়ে উৎসাহ দ্বিগুণ হল। একটা দ্বিতীয় সূত্রই বা কেন পাব না? পুলিসের চোখ ছুঁচ খোঁজার মতন করে সব খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে এবার পাওয়া গেল মেয়েলী জুতোর একটা চামড়ার ফিতে। নতুন উদ্যমে আমরা এই জঙ্গলের সেই অদৃশ্য মানুষটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম যে পর পরে ধরে নাও, দুটি মানুষই খুন করেছে।"

মজুমদারসাহেব অল্প সময় বিশ্রাম নিলেন। আমরা প্রত্যাশাই করি নি, শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকে ওই পটভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে।

"ওখানে কি কোনো মেয়ে যাওয়া আসা করত?" আমি অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, একটি মহিলা আসা-যাওয়া করত।" মজুমদারসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, "অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে জানা গেল, একটি সুন্দরী শহুরে মেয়ে ওই জঙ্গলে মাঝে মাঝে যাতায়াত করত। আর সেটা লক্ষ্য করেছে একটি আদিবাসী বাচ্চা মেয়ে।"

"আশ্চর্য!" কান্তি বলল।

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা অবাক হবার মতনই।...... আরও অবাক হবে, যদি শোনো ওই মেয়েটি ডাক্তার নিয়োগীর ভাগ্নী।"

আমরা অস্ফুটস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

মজুমদারসাহেব বললেন, "লিপস্টিকটা ওখানকারই এক মনিহারী দোকান থেকে কেনা। লিপস্টিক দেখামাত্র দোকানী বলে দিল কার হতে পারে।"

"তা কি করে সম্ভব?" অশ্বিনী বিস্মিত হয়ে বলল।

"তোমরা কি সেই জায়গাটাকে কলকাতা শহর ভাবছ! ইভ্যাকুইরা গিয়ে জায়গাটার লোক সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু আসলে ওসব জায়গায় কটা আর বড় মনিহারী দোকান থাকবে, শখ শৌখিনতা করার লোক ক'জন পারে! তা ছাড়া সে সময়ে লিপস্টিক ব্যবহার করে ক'জন বাঙালী মেয়ে!...ওখানে বড় মনিহারী দোকান ছিল একটাই মাত্র। তার দোকানেই লিপস্টিক পাওয়া যেত। দু তিন ঘরের মেয়েরা মাঝে মাঝে তার কাছে লিপস্টিক কিনত। তবে এই লিপস্টিক এক-

জনই কিনত, তারই অর্ডার মতন আনানো, জিনিসটা বিলিতী—স্টিকের রঙ পাকা ধেদানার দানার মতন।"

"সে মেয়েটি কে?" আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

"নিয়োগীর ভাগ্নী।"

আমরা স্তম্ভিত ও নির্বাক হয়ে বসে থাকলাম। নিয়োগীর ভাগ্নী জঙ্গলে যেত? তারই লিপস্টিক? ওখানে কি ভাবে পড়ে থাকল?

"তারপর—" বিজলী জিজ্ঞেস করল।

"অন্ধকারে সামান্য আলো পাওয়া গেল।" মজুমদারসাহেব বললেন, "নিয়োগীর বাড়ি গিয়ে তার ভাগ্নীকে ধরলাম। চেহারা দেখেই মনে হল, মেয়ে বড় সুবিধের নয়; কলকাতার যে-সমাজটা ঠোঁটে রঙ দিয়ে ভুরু কামিয়ে আই-ব্রাউ এঁকে ঘুরে বেড়ায় এ সেই দলের মেয়ে।..."

"স্বীকার করল মেয়েটি—"? কান্তি ধৈর্য রাখতে পারছিল না।

"সহজে কি আর করে! বলে, তাদের বাড়িতে বিরাট চুরি হয়ে গেছে মামা মারা যাবার আগে। গয়নাপত্র কত কি নিয়ে গেছে চোরে। সে-সব জিনিসের মধ্যে তার হ্যাণ্ড-ব্যাগটাও ছিল। হয়ত তার থেকেই লিপ-স্টিকটা পড়ে গেছে।"

"সত্যি সত্যি চুরি হয়েছিল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হয়েছিল।" মজুমদারসাহেব মাথা নাড়লেন। "এই ঘটনা ঘটবার আগে—ওখান-কার দুই ধনীর বাড়িতে বড় রকম চুরি হয়েছিল। গয়না গাটি খোওয়া গিয়েছিল প্রায় হাজার বিশেক টাকার।"

"তারপর—" বিজলী পরবর্তী অংশ জানতে চাইল।

"নিয়োগীর ভাগ্নী বোকা। সে লিপস্টিক খোওয়া যাবার একটা কৈফিয়ৎ দিল, কিন্তু হঠাৎ যখন আমরা তার জুতো রাখার জায়গাটা দেখতে চাইলাম সে বুঝতে পারে নি যে, আমাদের কাছে তার মেয়েলী জুতোর একপাটির ফিতেও পড়ে আছে। ...জুতো দেখাতে নিয়ে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেল।...আর কোনো কৈফিয়ত পেল না।"

"সে জঙ্গলে যেত কেন, কি বলল?" অশ্বিনী জানতে চাইল।

"যা বলল তার মর্মার্থ হচ্ছে, মিলিটারী ট্রেনিং সেন্টারের একজন ট্রেনারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। পরিচয় থেকে প্রেম। মামা এ-সব পছন্দ করত না। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে তারা দেখা-সাক্ষাৎ করত।"

"এই ট্রেনার কি সেই মিসিং ম্যান?" কান্তি চেয়ার থেকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ হে, সেই মিসিং ম্যান।" মজুমদার-সাহেব বললেন, "লোকটা প্রচণ্ড রকম ধোকা দিয়ে ওই জঙ্গলে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার

সানার গয়না লুকিয়ে রেখেছিল।"

"কোথায়?"

ওই গুহায়। ওটা গুহাই নয়। পাহাড়ী টিলার দিকে বড় বড় পাথর আর বুনো ঝোপ ছিল। লোকটা ক্যামোফ্লেজ জানার তো, কি রকম ভেলকি লাগিয়ে এমন একটা ভ্রম তৈরী করতে পেরেছিল যাতে ওটা গুহার মুখ বলে মনে হত। আসলে একটা বড় পাথরের আড়াল।"

"স্ট্রেঞ্জ!" আমরা বিস্ময়ে শব্দ করলাম।

"ডাক্তার নিয়োগী এটা সন্দেহ করে-ছিলেন। তিনি মর্নিং ওয়াকের নাম করে ওই দিকে তাঁর খোওয়া জিনিস খুঁজতে যেতেন। একদিন বোধ হয় পেয়েছিলেন আসামীকে। পাছে তিনি ফিরে এসে পুলিসে খবর দেন, লোকটা তাঁকে গুলী করেছিল।"

"লোকটাকে আপনারা কোথায় পেলেন?"

"ওই জঙ্গলের মধ্যেই। আমরা যখন গুহা থেকে চোরাই মাল উদ্ধার করতে যাচ্ছি, সে-বেটা গুলী চালায়। আমি আর একটু হলেই মরতাম। বেঁচে গেছি কপাল জোরে।"

"লোকটা থাকত কোথায়?"

"ওই শহরের একদম শেষ প্রান্তে, একটা পুরানো পোড়ো কাঠগোলায়।"

আমরা চমকে উঠলাম।

মজুমদারসাহেব বললেন, "নিয়োগীর বাড়ির পেছন দিকে অনেকটা দূরে, একটা পুরানো কাঠগোলা ছিল। লোকটা সেখানে লুকিয়ে থাকত। চোরাই মাল রেখেছিল নকল গুহার আড়ালে। মালগুলো নিয়ে সে পালাতে পারছিল না বলে অপেক্ষা করছিল। নয়ত কবে পালিয়ে যেত।"

"নিয়োগীর ভাগ্নী এ-সব কথা জানত না?"

"জানত। মামা মারা যাবার পর খারাপও লেগেছে।...কিন্তু, তখন আর লোকটাকে ছেড়ে দেবার উপায় নেই।"

"কেন?"

"ওই চোরাই গয়না।...কিন্তু কপালে সইল না বেচারীর। সেই নকল গুহা থেকে আমরা চোরাই মাল সমস্তই উদ্ধার করেছিলাম। লোকটাও ধরা পড়েছিল।"

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ আট ॥

সন্ধ্যার মুখে সাজগোজ সারা হয়েছে, থাবা দিয়ে দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ানো এবার। ঘুম এসে গেছে, বজ্জাত ছেলে তবু নরম হবে না। চোখ বুজল একবার, মিটমিটি তখনই আবার তাকিয়ে পড়ে। ঘুমো, ঘুমো —বড্ড দেরি হয়ে গেল. ওরা সব গিয়ে পড়েছে এতক্ষণে গলির মুখে।

এরই মধ্যে সুধামুখীর হঠাৎ কি রকম হল—ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি বুলি শেখাচ্ছে। বল্ রে খোকা—মা। সোনামণি লক্ষ্মীধন, বল—মা, মা, মা—। চারিদিকে তাকিয়ে নিল একবার: আমি তোর মা হই রে, আমারই জন্যে ভেসে ভেসে এসেছিস—

জল নেমে আসে দু-চোখ ছাপিয়ে। বিগত-যৌবন কালোকুৎসিত নারী—কেউ না দেখতে পায়—চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে। আয়না তুলে নিয়ে সভয়ে দেখে, রং ধুয়ে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল বুঝি। রাজাবাহাদুর যাকে বলেন কোকিলের চেহারা। মানুষ তবে তো থু-থু করে সরে যাবে, রূপ দেখার পরে নাগর হতে কেউ এগুবে না।

সকালে উঠে নফরকেষ্ট বেরিয়ে যায়। তার অনেক আগে রাত্রি থাকতেই ছেলে জেগে ওঠে। হাত-পা ছোঁড়ে, অ'-অ' করে। যেন পাখির কাকলি। কথা বলছে শিশু যেন কার সঙ্গে। পাতলা ঘুমে নফরকেষ্টর চমক লাগল একদিন। মা-কালী বেরিয়ে এসেছেন মন্দির ছেড়ে, এসে যেন এই মাটকোঠার বন্ধ দরজা ভেদ করে শিশুর পাশে দাঁড়িয়েছেন হাসি-হাসি মুখ করে। শিশু অবোধ্য দেব-ভাষায় কত কি বলছে তাঁকে। চোখ বুজে বুজে নফরকেষ্ট সেইসব কথার মানে ধরবার চেষ্টা করে। বলছে কি দুঃখকষ্টের কথা এই সংসারের? দুধ জোটে না, বার্লির জল খাওয়ায়। তাতেও একটুখানি মিষ্টি দেয় না। জগজ্জননীর কাছে নালিশ করছে? ঘুমের ভারে চোখ আচ্ছন্ন. চোখ মেলা যেন বিস্তর খাটুনির ব্যাপার—কান দুটোয় শুনে যাচ্ছে। চোখ মেলতে পারলে দেখা যেত ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি: মা দাঁড়িয়ে আছেন, নৃমুণ্ডমালা খুলে রেখে সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়, খড়্গ-খর্পর ফেলে এক হাতে ধরেছেন ঝিনুক আর হাতে দুধের বাটি। সে বাটিতে দুধই বটে, জল-বার্লি নয়। ভোররাত্রে চুপিসারে ক্ষুধার্ত শিশুকে দুধ খাইয়ে বাতাস হয়ে এখনই মিলিয়ে যাবেন। চোখ মেললে দেখতে পাওয়া যায়,—কিন্তু পাতা যেন আঠা দিয়ে এঁটে রেখেছে, চোখে দেখা নফরার আর ঘটে উঠল না।

সকালবেলা পাখপাখালি ডাকতে সুধা-মুখী বাইরে গেছে। চোখ মুছে নফরকেষ্টও উঠে পড়ল। ছেলে ড্যাব-ড্যাব করে এক-নজরে কি দেখছে ঘরের চালের দিকে। তারপরে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে তক্তপোষের উপর দুম-দুম পা ছুঁড়ছে, আর সেই অ'-অ'-অ'—

নফরকেষ্ট শিক্ষা দিচ্ছে: অ'-অ' নয় রে বোকারাম। মা—মা, মা-জননী—

সুধামুখী এসে পড়েছে। বলে, তবু ভাল, মা ডাক বেরোয় আজও তোমার মুখ দিয়ে।

নফর বলে, সে মা কি আর নরলোকের পাঁচি-খেঁদি মা! যা দু-চার পয়সা রোজগার, কার, সবই সেই মায়ের দয়ায়। মা দক্ষিণা-কালী। জননী স্বয়ং এসেছিলেন তোমার ঘরে। চোখ খুলতে পারলাম না, তাই দর্শন হল না। বুঝে দেখ, যোগী-ঋষি ধেয়ানে পায় না—তাই আমার হতে যাচ্ছিল। ঘুমের ঝোঁকে নষ্ট করে ফেললাম।

স্বপন ছাড়া কি—পুরো স্বপন না হোক, আধাআধি গোছের। বলল সমস্ত নফরকেষ্ট। সুধামুখী উড়িয়ে দেয় না। বলে, দেবী যদি হন, উনি মা-কালী নন, মা-ষষ্ঠী। এসব ষষ্ঠীঠাকরুনের কাজ—বাচ্চা যেখানে, ষষ্ঠীও সেখানে। বাচ্চা কতবার আছাড় খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে—বড় ছেলে হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টে পড়ত। ওদের কিছুই লাগে না, ষষ্ঠীঠাকরুন কোল পেতে ধরেন। বাচ্চার গায়ে মাছিটা বসলে আঁচল নেড়ে তাড়িয়ে দেন। কালকেউটে ফণা তুলেছে, সে ফণার আর ছোবল দিতে পারে না ষষ্ঠীঠাকরুনের হুকুমে, দাঁড়িয়েই থাকে বাচ্চার উপরে ফণার ছত্র ধরে। হ্যাঁচড়ামি ফেরেববাজি কাজ তো তোমার—কোন ঠাকুরের কি মাহাত্ম্য, শিখলে আর কোথায় তুমি!

নফরকেষ্ট ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, যা দেখেছি, এখন বুঝলাম মা-কালী নয় মা-ষষ্ঠীও নয়। দেবদেবীর হাতে ঝিনুক-বাটি, কোন পটে দেখিনি, পুঁথিতেও শোনা নেই—

সুধামুখীর খোশামুদি করে এই রকম মাঝে মাঝে, মিষ্টি কথার বন্যা বইয়ে দেয়। বলে, দেবতা-টেবতা নয় গো, মনে মনে তখন তোমাকেই দেখেছি। এই যেমনভাবে তুমি এসেছ, রোজ সকালবেলা যেমন আস। একটা রক্তের ডেলাকে গড়েপিটে মানুষ করা কী সোজা ব্যাপার! ছেলেকে আমি শেখাচ্ছিলাম, বুলি ধরে সকলের আগে তোমায় ডাকবে—মা!

মেঝের উপর সুধামুখী ছেলে নিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। খাওয়াচ্ছে। বলে, আমি শেখাব—বাবা। মা নয় রে খোকামণি, বাবা বলা শিখে নে তাড়াতাড়ি। বাবা, বাবা, বাবা—! ঐ হল আসল।

নফরকেষ্ট গদ-গদ হয়ে উঠেছে। মুখে হাসির ছটা। বল কি গো, বাবা ডাকবে আগে! আমি কি-ই বা করলাম! একটা দুটো টাকা—সে তো বরাবর দিয়ে থাকি। ছেলে এসে বেশি কি দিতে পেরেছি, ক্ষমতা কতটুকু আমার!

নফরার হাসি সুধামুখী নিমেষে ঘুচিয়ে দেয়, ফুৎকারে আলো নেভানোর মতো। বলে, শখ দেখে বাঁচিনে! কালোভূতো উৎকট এক বুনো-হাতি—তোমায় বাবা ডাকতে বয়ে গেছে। সেই জন্যই বেন কষ্ট করে শেখাচ্ছি! বাবা ডাকবার মানুষ আমার বাছাই-করা আছে। ডাক এক-একখানা ছাড়বে, আর টুং টাং করে টাকা এসে পড়বে। বাবা ডাক মাংনা হয় না।

সেই বাছাই-করা মানুষ—একজন তো দেখা যাচ্ছে—রাজাবাহাদুর। বাছাইয়ে ভুল হয়নি। তিনি এলেই সুধামুখী ছেলে বসিয়ে দেয় সামনাসামনি। তারপর খানিকটা পিছু হঠে রাজাবাহাদুরের পিছন দিকে গিয়ে ইসারা করে। পারুলের পোষা কাকাতুয়া যেমন—সঙ্গে সঙ্গে ইসারা বুঝে নিয়ে সাহেব ডেকে ওঠে, বাবা! নতুন বুলি বলতে গিয়ে চাঁপার কলির মতো ঠোঁট দুখানা একত্র করে আনে। হাসি-হাসি মুখ। সেই সময়টা পলকহীন চোখে তাকিয়ে না থেকে উপায় নেই।

সাহেব ডাকেঃ বাবা, বা-আ-ব্বা—। রাজা-বাহাদুর গলে গেছেন একেবারে। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে অনেকবার শুনতে চান, শুনে শুনে আশ মেটে না। জিনিসপত্র যা হাতে করে এসেছেন, গোড়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে। এক সময়ে উঠে জামার পকেটের ব্যাগ বের করে একগাদা পয়সা-দুয়ানি-সিকি সাহেবের সামনে রাখেন। খেলা করুক ছেলে যেমন ইচ্ছে ফেলে-ছড়িয়ে। মেজাজি মানুষ—যা বের করে দিয়েছেন, পকেটে আর ফিরে তোলেন না।

সুধামুখীর দিনকাল খারাপ। কপাল ভাল থাকলে কোনদিন কেউ এল, কোনদিন একেবারেই না। ঐ যা রাজাবাহাদুর—ছেলের ফাঁদ পেতে যাঁকে আটকেছে। ঘরের মানুষ নফরকেষ্টরও দুর্দিন—একটা দুটো টাকা দিত আগে, তাও আর পেরে ওঠে না।

দুঃখে এক-একদিন নফরকেষ্ট ভেঙে পড়ে। সরল মানুষটা মনের কথা চাপতে পারে না, সুধামুখীকে খুলে বলে। মানুষটা ভাল হতে পারবে না তো টাকার মানুষ হবে, সেই ধান্দায় অহরহ ঘুরে বেড়ায়। টাকা রোজগারের সবচেয়ে ইতর পথটা বেছে নিয়েছে, ঘটিচোর বাটিচোর বলে ঠাট্টাতামাসা চলে—সকলের অধম ছিঁচকে মানুষ, পথে-ঘাটে যারা হাতের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। চোর-ডাকাতের যে সমাজ, তার মধ্যে অন্ত্যজ। অথচ শিক্ষা চাই এই কর্মে—পুরোদস্তুর ম্যাজিক দেখানো শতেক জনের চোখের উপর। পাকা হাত হলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা হাত নিয়ে নফরকেষ্ট করতে পারে বটে দেমাক!

একদিন হল কি—পকেট থেকে নোটের তাড়া তুলে নিয়েছে। স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ—পুরো একটা দল যাচ্ছিল নতুন-বাজারে কেনাকাটা করতে। নফরার সঙ্গেও জন তিনেক। এমনটা হবার কথা নয়, তবু কি গতিকে মক্কেলদের একজনের নজরে পড়ে নফরার হাত এঁটে ধরেছে। অন্যদেরও ঘিরে ফেলেছে সবাই, সরে পড়তে দেয় নি। এই মারে তো মারে। মেরে আধমরা করে তারপর পুলিস ডাকবে, পথের কাজের যে রকম দস্তুর। নফরা নিরীহভাবে দু-হাত উঁচু করে তুলেছেঃ বাজে কথা বললে তো হবে না, তল্লাস করে দেখে তারপরে বলুন। অতএব তল্লাসই চলল—একা একজন নয়, দলসুদ্ধ মিলে। নেই কোথাও। অপর তিনজনকেও দেখে। নেই, নেই। নফরা এবার জোর পেয়ে গেছে : দেখলেন তবে তো? খুশি হলেন? নিজেরা কোথায় ফেলেছেন। কিম্বা আনেন নি হয় তো একেবারেই। পথের মানুষ ধরে টানা-টানি। দল হয়ে যাচ্ছেন, যা ইচ্ছে করলেই হল।

পাবে কোথায় সে বস্তু? যে মানুষটা নফরাকে চেপে ধরেছে, নফরা তারই পকেটে ফেলে দিয়েছে টুক করে। দুনিয়া জুড়ে তল্লাস করবে, নিজের পকেটে কখনো নয়। সরাবার অতএব সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

বিষম বেকুব হয়ে গেছে তারা। দাঁত মেলে হাসির মতো ভাব করে নফরকেষ্ট নমস্কার করেঃ খুশি হয়েছেন—আসতে পারি তো এবার? এমন আর করবেন না।

ভদ্রতা মাফিক বিদায় নিয়ে এল। ডেরায় চলে এসেছে। কই, বের কর দিকি, গোনা-গুনতি হোক।

সেই নোট নিয়েই ফিরেছে। নফরকেষ্ট নয় অন্য একজনের কাছ থেকে বেরুল। নমস্কার করে বিদায় নিয়ে আসার সময় সেই

মানুষটার গা ঘেঁষে পুনশ্চ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। গচ্ছিত-রাখা জিনিসটা ফেরত আনার মতো।

এমনি কত। যা সমস্ত নফরকেষ্ট বলে, বাড়িয়ে বলে ঠিকই—খানিকটা তবু সত্যি। নফরকেষ্ট না-ও যদি করে থাকে কেউ না কেউ করেছে এমনি। দিনকাল তারপরে খারাপ হতে লাগল। মক্কেলরা সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। পয়সাকড়ির অভাব, মানুষজন প্রায়ই খালি পকেটে বেরোয়। নফরকেষ্ট ট্রামে যেত আগে ফার্স্টক্লাসে। খুব একজন বাবুলোকের পাশে গিয়ে বসল। একটা পকেটে বাবুর হাত ঢোকানো। তার মানে নিজেই দেখিয়ে দিচ্ছে মাল আছে এইখানটা। নফরকেষ্টর হাতে ঘড়ি—বাজে বাতিল জিনিস, দেখতে চকচকে ঝকঝকে কিন্তু চলে না। নফরা বলে, চলবার জন্যে তো ঘড়ি নয় পরবার জন্যে, কাজের সাজপোশাকের ভিতর পড়ে ওটা। সেই ঘড়িসুদ্ধ হাত কানের কাছে এনে ধরে : কী মুশকিল, এখন আটটা? দম দেওয়া নেই, বন্ধ হয়ে আছে। বলুন তো ক'টা বেজেছে। পাশের ভদ্রলোক পকেটের হাত তুলে ঘড়ি দেখে সময় বললেন। হাত সঙ্গে সঙ্গেই যথাস্থানে ঢুকেছে। হাসি ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়, হাত ঢুকিয়ে কি সামলাচ্ছ এখন মাণিক? সে বস্তু কি আছে, ডিম ফেটে পাখি হয়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে পকেট থেকে। নফরই আবার ভদ্রলোকের নজরে এনে দেয় : ব্যাগ পড়ে গেছে আপনার। শশব্যস্তে ভদ্রলোক তুলে নিলেন। হাসি আসে আবার নফরকেষ্টর মুখে—ব্যাগ-ভরা কতই যেন ধন-সম্পত্তি! তবু যদি পরীক্ষা করে না দেখতাম। দু-তিন আনা ছিল হয়তো গোড়ায়, ফার্স্ট ক্লাস ট্রামের টিকিট কাটতে খরচা হয়ে গেছে। একেবারে শূন্য ব্যাগ।

সেই থেকে নফরকেষ্ট ফার্স্টক্লাস ছেড়ে সেকেন্ডক্লাস ধরল। তাতে বরঞ্চ মেলে কিছু কিছু। এই শিক্ষা হল, ভাল মক্কেল উঁচু ক্লাসে চড়ে না। এক জায়গায় একই সময়ে গাড়ি পৌঁছচ্ছে, বুদ্ধিমান হিসাবি লোক ফার্স্ট-ক্লাসের অতিরিক্ত একটা-দুইটা পয়সা দিতে যাবে কেন? দেয় যারা বেপরোয়া উড়নচণ্ডী—বাইরে কোঁচার পত্তন, পকেটে ছুঁচোর কেত্তন।

এসব আগের দিনের কথা, এই ক'টা বছরে বাজার পুড়েজ্বলে গেছে একেবারে। বয়সের সঙ্গে বেঢপ মোটা হচ্ছে নফরকেষ্ট, গায়ের রং আরও ঘন হচ্ছে দিনকে দিন—যা নিয়ে সুধামুখী কথায় কথায় খোঁটা দেয়। বড় বড় রাঙা চোখ—আয়নায় চেহারা দেখে নিজেরই ভয় করে। নিরীহ পকেটের কারবারির কে বলবে, খুনি দাঙ্গাবাজগুলোই হয় এ রকম। তার যে পেশা, সর্বদা সেজন্য মানুষের কাছাকাছি হতে৹হয়—কাছ ঘেঁসে গায়ে গা ঠেকিয়ে তবেই তো হাতের খেলা। কিন্তু চোখে দেখেই মক্কেল যদি ছিটকে পড়ে, কাজ হবে কেমন করে?

তার উপরে হাল আমলের ব্যবস্থাও সব নতুন। কাজের এলাকা ভাগ হয়ে গেছে। রাজার যেমন রাজ্যসীমা থাকে। ভিন্ন এলাকায় ঢুঁ মারতে গিয়েছ কি মেরে তক্তাপেটা করবে। পুলিসে নয়, যারা একই কাজের কাজি তারাই। এই কালীঘাটে সে আমলে মফস্বলের সরলপ্রাণ ভক্ত মেয়েপুরুষরা আসত। আসে এখনও গাঁ-গ্রাম থেকে, কিন্তু বিষম ধড়িবাজ—শহুরে মানুষের কান কেটে দেয় তারা। সমস্ত দিন ঘুরেও ভক্তিবিহ্বল আপন-ভোলা মানুষের মতো মানুষ একটি মেলে না। মায়ের নামে পকেটে নিয়ে এসেছে তো সর্বসাকুল্যে গণ্ডা পাঁচ-সাত পয়সা—চলেছে কিন্তু লক্ষপতির মেজাজে। ছত্রিশ-গড়ের রাজা কি ছত্রির নবাববাহাদুর। পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়লে মাল ঠেকবে ঠিকই—সে মাল রুপোর টাকা কি সোনার মোহর কি তামার পয়সা বাইরে থেকে কেমন করে বোঝে? এসব কাজ-কারবার একলা একজন দিয়ে হয় না, মক্কেল সাব্যস্ত হয়ে গেলে দুটো-তিনটে ডেপুটি অর্থাৎ সহকারী লাগে—কাজ অন্তে সকলের বখরা। সেই বখরা বিলির সময় ধুন্দুমার লেগে যায়—তামার পয়সা তারা মুখে ছুঁড়ে মারে। নফরকেষ্টর গলায় গামছা দিয়ে টানে : ওসব জানি নে, লোক যখন ফেলা হয়েছে খাটনির উপযুক্ত মজুরি চাই। কর কেন ভুয়ো-মক্কেল বাছাই—

ধরে ফেললে মারগুতোন কি কম করে দিত পাবলিক? কোর্টে কেস উঠলে ছ-মাসের সাজা কি ছ-দিন দিত? হয় মজুরি দেবে, নয়তো তোমায় মেরে হাতের সুখ করব।

এই ছ্যাঁচড়া কাজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা উৎকৃষ্ট এক খোঁজদার জুটিয়ে নেওয়া। আদি অবস্থায় সেই খোঁজদার গড়োপটে গোছগাছ করে দেবে. তারপর নফরকেষ্ট দ্রুত গিয়ে কাজ হাসিল করে এল। নফরা আর সেই লোক—আজে-বাজে ডেপুটি ডাকবে না।

আরও এক নতুন উপদ্রব—থানা-পুলিস। এতকাল যাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল না। থানায় সদাশয় পুরুষরা ছিলেন, পাকা বন্দোবস্ত ছিল। তাঁরা রোজগার করতে এসেছেন, তোমরাও এসেছ—কেউ কারও প্রতিযোগী নয়। মাঝে মাঝে তাঁদের ন্যায্য পাওনাগন্ডা চুকিয়ে দিয়ে নিজ রাজ্যে অবাধে চরে খাও—থানা তাকিয়েও দেখবে না। এখন এক হাড়বজ্জাত এসে বসেছে সেই থানার চুড়োয়।

মোক্তার মশায়রা আছেন, অতিশয় দক্ষ ও বিচক্ষণ। আদালতের লিস্টে তাঁদের নাম হয়তো রয়েছে, কিন্তু প্রাকটিশ থানার উপর এবং থানার আশেপাশে। যাবতীয় বন্দোবস্ত এঁরাই মধ্যবর্তী—নাম সেইজন্য পুলিসের মোক্তার। যেমন একজন বসন্ত মোক্তার। দু-হাতে রোজগার, কিন্তু একদিনও আদালত মুখো হন না। পথ চিনে আদালতে হয়তো পৌঁছতেই পারবেন না, না যেতে যেতে ভুলে গেছেন।

বসন্ত মোক্তার গেলেন নফরকেষ্টর হয়ে। প্রবীণ মানুষটা চোখ-মুখ রাঙা করে ফিরলেন: নচ্ছার ফাজিল ছোঁড়া একটা, মানীর মান রাখে না। ইংরাজি শিখে পুলিস-লাইনে ঢুকেছে কিনা, বিদ্যের দেমাকে ফেটে মরছে। কাজের একটু আঁচ দিতে গড়গড় করে ইংরাজি ছাড়তে লাগল—সাপ না ব্যাং মানে কিছু বুঝিনে। জুত হবে না, এইটুকু বেশ ভাল করে বুঝে এলাম।

বলেন, চিরকেলে মক্কেল তুমি, ফাঁকি-জুকি দেব না। একটা টাকা ফী দিয়ে দিও।

নফরকেষ্ট বলে, কাজ হল না, তবু ফী?

সেই জন্যেই তো ষোলআনা। কাজ হলে ষোল টাকাতেও কি পার পেতে? টাকা আজকেই যে দিতে হবে তার মানে নেই। হাতে যখন আসবে, সেইসময় দিও।

বসন্ত সেকেলে বাংলা মোক্তার। তাঁর ক্ষমতায় হল না তো নফরকেষ্ট ইংরাজিনবিশ রাজমোহন সেনকে গিয়ে ধরে। বিস্তর অসাধ্যসাধন করেছেন ইতিপূর্বে। গেলেনও তিনি দু-তিন দিন, কিন্তু মুখ ভোঁতা করে ফেরেন। বললেন, গুচ্ছের বুকনি শুনে এলাম, আর কিছু নয়। অন্তরে বিবেক, মাথার উপর ভগবান—সৎপথে সাধুভাবে কাজকর্ম করে যাবে। সরকার যথাযোগ্য বেতন দিয়ে পুষছেন, সেই বেতনের উপরে একটি আধেলা গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত। সংসার না চললে বরঞ্চ দু-বেলার জায়গায় একবেলা খাবে, অধর্মের পথে তবু পা বাড়াবে না।

সৎপথের পথিক হয়ে ছোকরা দারোগার কোন মোক্ষ লাভ হল, নফরকেষ্ট জানে না। এর অনেক পরে আর এক সাধু-দারোগা জগবন্ধু বলাধিকারীর পরিণাম শুনে ছিল সে। বলতে বলতে বলাধিকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন: ধর্ম না কচু! মুকুন্দ মাস্টারের মতো অপদার্থ যারা, গাল-ভরা এসব বলে তারা দশের কাছে মান বাড়ায়, নিজের মনে সান্ত্বনা আনে। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়—ওটা নিতান্তই কথার কথা। কিছু হয়তো সেকালে চলত, এখন চলে উল্টোটাই। পাপ নামটাই ভুল—পাপের পথ নয়, প্রয়োজনের পথ। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাকলে প্রয়োজনের পথই আঁকড়ে ধরবে লোকে। নিরানব্বুই পার্সেন্ট যা করছে তাই বাতিল করে এক পার্সেন্ট পাগলের কথায় নাচানাচি করা আহাম্মুকি ছাড়া কিছু নয়।

এমনি কত কি। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারীর অনেক কথাই নফরকেষ্টর মাথায় ঢুকত না। বলতেন তিনি নফরকেষ্টকে উদ্দেশ করেও নয়। সাহেব

থাকত, দলবলের অনেকেই থাকত। কিন্তু বেটুকু যা-ই বুঝুক, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হত তাঁর এই নতুন ধরনের কথায়। একটা প্রতিহিংসার ভাবও যেন কালীঘাটের সেই ছোকরা-দারোগার উপর। বেঁচে থাকে তো দিব্য-জ্ঞান পেয়ে সে-ও এমনিধারা উল্টো কথা বলে নিশ্চয়।

কিন্তু বলাধিকারীর সঙ্গে পরিচয়—হল অনেক পরের ব্যাপার। থানা থেকে অপদস্থ হয়ে ফিরে রাজমোহন সেনের ব্রহ্মতালু অবধি দাউ দাউ করে জ্বলছে। খিঁচিয়ে ওঠেন অলক্ষ্য দারোগার উদ্দেশে: কসাইখানায় বসে বেটা ব্রহ্মার ঘৃতপায়েস চড়িয়েছে। সাধু হয়েছিস তো বল্কল পরে বনে যা, থানার উপর কেন?

নফরকেষ্টরও মনের কথা তাই। বাবুমশায়রা, ভগবান অঢেল দিয়েছেন, ধর্মপথে থেকে জপতপ হোমযজ্ঞি নামগানে লেগে থাকুন গে। কিন্তু অহরহ ছুটোছুটি করে অন্ন জোটাতে হয়, মাথার উপরে পঞ্চাশমণি এক ভগবান চাপানো থাকলে আমাদের দিন চলবে কেমন করে?

মনের দুঃখে নফরকেষ্ট সেই কথা বলছিল, কাজ-কারবার শিকেয় উঠে গেল। সদর রাস্তায় নিপাট ভালমানুষ হয়ে বেড়ালেও ধরবে। শহরের খুরে দণ্ডবৎ রে বাবা, ঘর-বাড়ি রয়েছে সেখানে গিয়ে উঠিগে।

সুধামুখী আহা-ওহো করে না, উল্টে খিলখিল করে হাসে: বাড়িঘরে তুমি যাবে না, যেতে পারো না। কেন মিছে ভয় দেখাচ্ছ?

চটে গিয়ে নফরকেষ্ট বলে, হাসির কী হল শুনি? বাড়ি আমার নেই বুঝি? সে বাড়িতে নেই কোন জিনিস! এক-গোয়াল গরু, আউড়ি-ভরা ধান। ভাইরা আছে বোন আছে—ভাই-বোনে পোঁণে দু-গণ্ডা। ভরভরন্ত সংসার—তার মধ্যে আমিই কেবল হতচ্ছাড়া।

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, সমস্ত আছে, নেই শুধু বউটা।

আছে আলবৎ। দরবার-গুলজার বউ আমার। এই কালীঘাটের মোড়ে এনে যদি দাঁড় করিয়ে দিই, তীর্থিধর্ম চুলোয় দিয়ে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে আমার বউয়ের পানে। তুমি তার পাশে দাঁড়ালে চরণের দাসী ছাড়া কেউ ভাবতে পারবে না।

এত বড় কথার উপরেও সুধামুখী রাগ করে না, হাসিমুখে টিপ্পনী কাটে: বউ নিজের বাড়িতেই নিতে পার না, কালীঘাটে আনবে কী করে? বাড়ি গিয়েও তো চার ছড়ানো আর টোপ-গাঁথার ব্যাপার। লম্ফঝম্প যতই কর, কোনখানে তোমার নড়বার জো নেই। এই দাসীবাঁদী পোড়ামুখির ঘাড়েই

এ'টে থাকবে জোঁকের মতো। খদ্দির না আবার গাঁট ভারী হচ্ছে।

মর্মভেদী অনেকগুলো কথা বলে শেষটা বোধকরি করুণা হল মানুষটার উপর। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এত যাই-যাই করবার কি হল শুনি? পড়তা খারাপ—তোমার রোজগার নেই। আমারও না। তা ছেলে কামাইদার হয়েছে, তার পয়সাই খেতে লাগি এখন।

পুলকের আতিশয্যে সুধামুখী বালিশ সরিয়ে বের করে ধরে। রাজাবাহাদুর এই আজকের দিনেই বাচ্চাকে যা খেলতে দিয়ে গেছেন। রুমালে বেঁধে সেগুলো বালিশের তলে রেখেছিল, রুমাল খুলে গুণে দেখল। বলে, দেখ একদিনের রোজগার। তোমার কথা জানি নে, কিন্তু আমায় এতগুলো কেউ এখন দেয় না। রাজাবাহাদুর হপ্তায় দু-তিন বার আসছেন—ভাবনা কিসের, উপোসী থাকব না আমরা।

নফরকেষ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে। এত হাসিখুশি সুধামুখী রোজগেরে ছেলের মা বলেই। কঠিন কথাও সেই দেমাকে গায়ে মাখল না। নফরকেষ্ট শতকণ্ঠে তারিফ করছে: বাহাদুর ছেলে বটে, ভাল করে কথা না ফুটতেই রোজগারে নেমেছে। ভাগ্যিস তখন পারুলকে দিয়ে দাও নি। এখনই এই, বড় হলে ছেলে তো বস্তা বস্তা টাকা আনবে।

ফোঁস করে গভীর নিশ্বাস ছাড়ল: আমার সেই হারামজাদী বউকে একটা দিনও ঘরে আনা গেল না। ছেলে থাকার কত গুণ এ জন্মে বুঝল না।

চার দিনের মাথায় রাজাবাহাদুর আবার এসেছেন। ইদানীং বেশি ঘনিষ্ঠতা—তিনি এলে সুধামুখী এটা-ওটা খাওয়ায়। আজকে পিঠে হচ্ছে, পিঠে ভাজতে সে রান্নাঘরে ছিল। ঘরে এসে দেখে, সাহেব একাই বকবক করছে, রাজাবাহাদুর উঠে আলনায় টাঙানো জামার পকেট উদ্বিগ্নভাবে উল্টে-পাল্টে খুঁজছেন।

সুধামুখী বলে, কি হল?

রাজাবাহাদুর বলেন, মণিব্যাগ পাচ্ছি নে। ট্রামে আসতে হয় তোর বাড়ি, সহিস-কোচোয়ান জেনে ফেলবে বলে নিজের গাড়িতে আসতে পারি নে। পকেট মেরে দিল না কি হল—খোঁজ করতে গিয়ে দেখছি নেই।

সুধামুখী গম্ভীর হল: ছিল কত ব্যাগে?

তাই আমি গুণে দেখেছি নাকি? নিতান্ত খারাপ ছিল না। দশ-বিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে—

সুধামুখী বলে, এক-শ?

হতে পারে। পাঁচ-শ হলেও অবাক হব না। খাজাঞ্চিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

হেসে বললেন, সমস্ত গেছে, ফিরতি ভাড়াটাও রেখে যায় নি। যাবার সময় গোটা দুই টাকা দিস তো সুধা। ছেলেটার হাতে দুটো-চারটে করে পয়সা দিই। অভ্যাস হয়ে গেছে ওর, হাত পাতে। আজ আমি ভাহা বেকুব হলাম ছেলের কাছে।

মুশকিল, আজকেই একটু আগে সুধামুখী ঘরভাড়া চুকিয়ে দিল। হাত শূন্য। নিশ্চিন্ত ছিল, রাজাবাহাদুরের আসবার তারিখ। আবার নফরকেষ্ট বলেছে, ডেপুটি হয়ে কোন এক স্যাঙাতের কাজ করে দিয়েছে, আজ বখরা পাবে। দেবে কিছু রাত্রিবেলা। দুটো মাত্র টাকাও তো ঘরে নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। ঘর খোলা পারুলের—সন্ধ্যার মুখে বন্ধু কেউ এসে থাকে তো বিদায় হয়ে চলে গেছে। মেজাজি মেয়ে পারুল—স্বয়ং লাটসাহেব এলেও তার মন-মেজাজ বুঝে চলতে হবে। যখন বলব, তন্দণ্ডেই বেরুতে হবে। না পোষায় তো এসো না। কে খোশামুদি করতে যাচ্ছে! সময় ভাল পড়লে এইরকমই হয়, খদ্দের পায়ে পায়ে ঘোরে।

নিরিবিলি ঘরে পারুল এখন মেয়ে নিয়ে আছে। সোহাগি মেয়ে—হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তো ঝরে। মেয়ের চোখে কাজল, কপালে কাচপোকার টিপ, গায়ে রংবেরঙের জামা। পাউডার বুলিয়েছে মুখে—সমস্ত হয়ে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট পা-দুখানা কোলের উপর তুলে তুলি দিয়ে আলতা পরাচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে নিশ্বাস চেপে নেয়। বলে, দুটো টাকা হাওলাত চাচ্ছে সাহেবের বাপ।

পারুল তাকিয়ে পড়তে মৃদু হেসে বলে, সেই যে রাজাবাহাদুর বাপটা। ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছে না। আবার যেদিন আসবে, দিয়ে দেবে।

উঠে গিয়ে টাকা বের করতে করতে পারুল কলকণ্ঠে বলল, পাঁজি দেখিয়ে এনেছি দিদি, বিষ্যুৎবারে আমার রানীর মুখে-ভাত। পুজোআচ্চা আর কি—মায়ের মন্দিরে নিয়ে প্রসাদ খাইয়ে আনব। বন্ধুমানুষ ক'জনকে বলছি, আর এ-বাড়ির যারা আছে। বেশি জড়াতে গেলে পারব না, কে ব্যবস্থা করে দেয় বল। তোমার নফরকেষ্ট অবিশ্যি খুব পুলক দিচ্ছে, কিন্তু আমি সাহস করি নে।

সুধামুখী সভয়ে বলে, নফরার হাতে টাকাকড়ি দিস নি তো রে?

পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল। রাণাঘাটে কে ওর আপন লোক আছে, সেখান থেকে পান্তুয়া আনবে। তার বায়না।

সুধামুখী হতাশ ভাবে বলে, রাণাঘাটের পান্তুয়ার আশায় থাকিসনে পারুল। মিষ্টির অন্য ব্যবস্থা করে ফেল। নফরা দেশে ঘরে চলে গেল।

পারুল অবাক হয়ে বলে, বল কি! এই তো, এই মাত্তর এসে টাকা নিয়ে গেল।

এসেছিল, সে আমি টের পেয়েছি। নয় তো রাজাবাহাদুরের ব্যাগ গেল কোথায়? আমায় দেখা দেয় নি—দেখা হলে হাঙ্গামায় পড়ত। ধরে নে, ঐ পাঁচ টাকাও হাওলাত নিয়ে গেছে।

একটু হেসে বলে, সাহেবের বাবাগুলো আজ মহাজন পাকড়েছে তোকে। দু-জনে পর পর। ফিরে এসে শোধও করবে ঠিক। ফিরছে কবে, সেই হল কথা! তোর হল পাঁচ টাকা; আর রাজাবাহাদুর বলছেন তাঁর দশ হতে পারে পাঁচ-শ'ও হতে পারে—

বিড়বিড় করে নিজের মনেই যেন হিসাব করে দেখছে : পাঁচ আর দশ একুনে পনের। তা হলে দিন-দশেকের বেশি নয়। পাঁচ-শ যদি হয় ধরে নাও বছর খানেক। বউ ধরার টোপ ফেলতে যাওয়া—খরচের ব্যাপার—টাকা একদিন ফুরোবেই। সেদিন না এসে যাবে কোথা? কেউ যদি একনাগাড়ে টাকা জুগিয়ে যেত, তবে আর নফরকেষ্ট বাড়ি ছেড়ে ফিরত না।

কথাবার্তায় কেমন এক রহস্যের ছোঁওয়া। কৌতূহলী পারুল বলে, দাঁড়িয়ে কেন দিদি, বোসোই না শুনি। সাহেবের বাপ সাহেবকে নিয়ে আছে, তোমায় তার কোন গরজ নেই।

বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে সুধামুখী বলে, বাড়ি গিয়ে নফরা চাকরে সাজে। বাবু নফরকেষ্ট পাল—কলকাতার বড় চাকরে বাবু। মানুষটা এমনি ভাল তো—এক-একদিন বলে ফেলে অন্তরের কথা। বলে আর চোখ মোছে। চাকরে মানুষের মতো দু-হাতে রমারম খরচ করতে হয়। নয়তো সন্দেহ করবে, খাতিরযত্ন উপে যাবে, হেনস্তা হবে। বউ থাকে বাপের বাড়ি—টাকা দেখিয়ে তাকে খপ্পরে এনে ফেলতে চায়। বউটাও তেমনি ঘড়েল আবার—

পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকার বউ তো আমরাই সব। শালগ্রাম সাক্ষী রেখে মন্তোর পড়ে যাকে বিয়ে-করা—

জানিস নে পারুল, বিয়ের বউয়েরই বেশি খরচা। বউ পোষা আর হাতি পোষা। তা-ও তো সে বউ কাছে পেল না একদিন, লোভে লোভেই ঘুরছে। সম্বল ফুরোলে বাড়িতে তারপর লহমাও দাঁড়াবে না। আসতে হবে এই চুলোয়, আমার কাছে। এত আবদার আর কেউ সইবে না। থাকলে দেবে এক টাকা কি দু-টাকা—না থাকলে লবডঙ্কা। রাত-দুপুরে আপাদমস্তক ক্ষিধে নিয়ে রাক্ষস হয়ে এল, তার জন্য ভাত রেঁধে রাখতে হবে। গোগ্রাসে পুরো একপেট গিলে তার পরে কথা। বকাঝকা কর, ধরে পিটুনি দাও, তখন আর কিছুতে নড়বে না। আমি বলি জোঁক—জোঁক যেমন দু-মুখ আটকে গায়ে লেপটে থাকে, কিছুতে ছাড়ান নেই।

বলে, ক'দিন থেকে বাড়ি-বাড়ি করছে। রূপসী বউয়ের টান ধরেছে। আমারই ভুল, রাজাবাহাদুরকে সাবধান করে দিই নি। জানলার কাছে জামা রেখেছেন, বাইরে থেকে ব্যাগ তুলে নিয়েছে। গায়ে থাকলেই বা কি হত—মন্তোর-পড়া হাত ওর, চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেও ধরা যায় না।

টাকা নিয়ে সুধামুখী উঠে পড়ল। দু-পা গিয়ে কি ভেবে দাঁড়ায় : তোরা বলিস, নফরা দিদির ভালবাসার মানুষ। হাসিতামাসা করিস। মিছেও নয়। কিন্তু সেই ভালবাসা নিয়ে সদাসর্বদা সামাল-সামাল। টাকা হাতে পড়েছে বুঝতে পারলে ঝগড়া করে ভাব করে চুরিচামারি করে, যেমন করে হোক টাকাটা গাপ করে নিতে হবে। রক্তে পেটমোটা হলে জোঁক তখন আর গায়ে থাকে না, খসে পড়বে। আমাদের ভালবাসা জিইয়ে রাখতে কী কষ্ট রে পারুল!

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সুধামুখী বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

"কাটুম-কুটুম"

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী হিসেবে, মানুষ হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখবার ও বোঝবার যে সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, তেমনটি আর কেউ পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। পরলোকগমনের সামান্য কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী রানী চন্দের লেখা "ঘরোয়া" বইটির ভূমিকায় যে কথাগুলি লিখেছিলেন, এখানে তা আদ্যন্ত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি, সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে, তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন নিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলা দেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়-ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলা দেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।"

অবনীন্দ্রনাথের বহুমুখী শিল্প-প্রতিভার বিশদ বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় অন্যতম কারণে যে, স্বল্পপরিসর একটি প্রবন্ধে সে চেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা। প্রতিভা যে স্বভাবতই বহুগামিনী—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যা আক্ষরিকভাবে সত্য ছিল—তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবার অসামান্য সৌভাগ্য বাঙালীদের যেমন হয়েছে, তেমনটি বুঝি আর কারও হয়নি। সে সৌভাগ্যের সব কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেলবার নয়; সম্ভবও নয়। এত বিপুল সেই দান যে, তার অতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এক-একবারের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী প্রতিভা আমাদের চোখের উপর এতই জাজ্বল্যমান ছিল যে, সে বিষয়ে অবহিত হতে আমাদের কোনই প্রয়াসের প্রয়োজন হয়নি। সেখানে নিত্যই যে নব-নব দিগন্ত তিনি উন্মোচন করেছেন, অপরিসীম বিস্ময়ে আমরা তা স্বীকার করেছি; মনে কোন সংশয়ের প্রশ্ন কখনও ওঠবার অবকাশ পায়নি। সেখানে সম্রাটের মহিমায় তাঁকে অহরহ রাজ্য জয় করতে দেখেছি আমরা। কিন্তু আরও নানান অজ্ঞাত বা অল্প-জ্ঞাত খাতে যে তাঁর বিচিত্র প্রতিভা প্রবাহিত হয়েছিল, সে খবর আমরা নিতে শুরু করেছি সম্প্রতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর লেখার কথাই ধরা যাক।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের একবার খেয়াল গেল, ছোটদের স্কুল করতে হবে। নিজেই ছেলেদের উপযোগী বই লিখলেন; অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েও লেখালেন। উপরোধে পড়ে লেখা হলেও "ক্ষীরের পুতুল" ও "শকুন্তলা" অবনীন্দ্রনাথের এই সময়কার আশ্চর্য সাহিত্য-কীর্তি। "ক্ষীরের পুতুল" যে বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মানের আসন পেতে পারে, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। আর "শকুন্তলা"?

তাঁর রবিকাকার তাগিদে লেখা এই অনাদর-প্রসূত বইটিতেও অবনীন্দ্রনাথ অতি

আদিবাসী রণনৃত্য

ঘোড়-সওয়ার

অনাড়ম্বর ভাষায় যে সকল আশ্চর্য ছবি এঁকেছেন, আজকের বহুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যেও তার তুলনা বিরল। দু-একটি উদ্ধৃতিতেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে মনে করি।

"এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত। আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মত। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া। নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক সারা দিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখি, কত টিয়া-পাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ-শিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।"

অথবা, "শকুন্তলার দুই সখী প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে। এ ছাড়া আর কি কাজ ছিল?—হরিণ-শিশুর মত নির্ভয়ে এ বনে সে বনে খেলা করা, ভ্রমরের মত লতা বিতানে গুন-গুন গল্প করা, নয়তো মরালীর মত মালিনীর হিম-জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মত তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।"

অথবা, "রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রংগভরে অংগের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মত চিকন আঁচল জলের সংগে মিশে গেল, ঢেউ-এর সংগে গড়িয়ে গেল।"

এরকম চিত্রকল্প, এরকম অনায়াসে-ফোটানো ছবি পাতায় পাতায়। অবনীন্দ্র-নাথের স্বীকৃতি অনুসারে "শকুন্তলা" উপরোধে পড়ে লেখা হলেও তিনি তাঁর শিল্পিসত্তাকে, লেখার ক্ষেত্রেও, বর্জন করতে পারেননি। এ সেই লেখকের লেখা যিনি মূলত শিল্পী; দৃশ্য ও চিন্তনীয় সব কিছু যাঁর মনে ছবির রূপে বাসা বাঁধে আবার ছবির আকারেই উত্তীর্ণ হয় লেখার পাতায়। মূলত শিল্পী বলেই অবনীন্দ্রনাথ সেই বিরল লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম যাঁদের হাতে তুলির টান আর কালির আঁচড় একই সুরে গান গেয়ে ওঠে। রঙে রঙে ছবি আঁকে যে মন, সেই মনই যে আবার কথার পাশে কথা সাজিয়ে প্রায় একই উৎকর্ষের ছবি অনায়াসে আঁকতে পারে, অবনীন্দ্রনাথকে জানবার আগে সে কথা কে জানত! এ সেই "ওবিন ঠাকুর" যে শুধু লেখেই না—যে ছবি লেখে।

আমাদের অসীম দুর্ভাগ্য যে, অবনীন্দ্র-নাথের এ বইগুলি যখন লেখা হয়েছিল, তার পরে বহুকাল অবধি এগুলির বিশেষ প্রচার হয়নি। অন্তত, সেই পরিমাণ হয়নি যা হওয়া খুবই উচিত ছিল। হয়েছে সম্প্রতি, মাত্র গত দশ বার বছরের মধ্যে। এ যুক্তির অবতারণা করে কিছু আত্মতৃপ্তির অনু-সন্ধান হয়ত করা যেতে পারে যে, অবনীন্দ্র-নাথের যুগান্তকারী শিল্পপ্রতিভাতেই আমরা এত বিমোহিত ছিলাম যে, তাঁর বিস্ময়কর সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না। কথাটা খুব বেশী হলে—আংশিকভাবে সত্য মাত্র। দেশবাসীর অনাদরে এই অপূর্ব সাহিত্য-কৃতিগুলি যে শেষ অবধি অবহেলিত থেকে যায়নি, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

*

আরও একটি বিশেষ দিকে যে বহু-গামিনী অবনীন্দ্র-প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সামান্যই খবর

রাখি। সেই আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের অজুহাত।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে, পরিণত বয়সে অবনীন্দ্রনাথ কাঠকুটো, এটা-সেটা দিয়ে নানা রকমের পুতুল তৈরি করতে খু ভালবাসতেন। এই শখের পিছনে ত অনেক সময় ব্যয় হত। কত তন্ময়তার সং তিনি যে এই খেলায় মেতেছিলেন তার এ রমণীয় উপাখ্যান শ্রীমতী চন্দ তাঁর "ঘরোয়া বইটিতে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

একদিন দেখা গেল, ভোরবেলা অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ির নীচের বাগানে কি যেন খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করতেই বললেন—"একটা ইঁদুর জ্যান্ত হয়ে আমার হাত থেকে লাফিয়ে কোথায় যে পালাল! ও ঠিক গর্তে ঢুকে বসে আছে। কাল বিকেলে একটা ইঁদুর করলুম, কাঠের, এই এতটুকু, বেড়ে ইঁদুরটি হয়েছিল, কেবল লেজটুকু জুড়ে দেওয়া বাকি। ভাবলুম এটা শেষ করেই আজ উঠব। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না—চৌকিটা বারান্দার রেলিঙের পাশে টেনে নিয়ে ওই যেটুকু আলো পাচ্ছি তাইতেই কোনোরকমে তারের একটি লেজ যেই না ইঁদুরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটা মোচড় দিয়েছি—টক করে হাত থেকে লেজসমেত ইঁদুরটি লাফিয়ে পড়ল। কোথায় গেল, এদিকে খ‍ুঁজি ওদিকে খ‍ুঁজি, বাদশাকে বললুম, আলোটা আন্ তো, একটু খ‍ুঁজে দেখি কোথায় পালাল। না, সে কোথাও নেই। রাত্রে ভালো ঘুম হল না, ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লুম, ভাবলুম, যদি নীচে বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু আমার ইঁদুরের আর সন্ধান মিলল না। ও জ্যান্ত হয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে বসে মজা দেখছে। কী আর করা যাবে, চলো যাই।..."

এ সেই আত্মভোলা শিল্পীর কাহিনী যিনি নিজের সৃষ্টির সঙ্গে সহজাতভাবেই একাত্ম হতে পারতেন। হিসেবী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা একে অবশ্যই পাগলামি বলবেন। কিন্তু এ-জাতীয় "পাগলামি" বোধ করি তন্মাতচিত্ত সৃজনকর্মের একটা আবশ্যিক অংগ।

অবনীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি। তিনি বলতেন—"আর্টের তিনটে স্তর, তিনটে মহল আছে—একতলা, দোতলা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাসদাসী, তারা সব জিনিস তৈরি করে। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। ভালো ভালো জিনিস, যা তৈরি হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলায় বৈঠকখানায় সেসব সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার। তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিশুকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত। ইচ্ছেমত শিশু-শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে।......

আমার এই যে এখনকার পুতুল গড়া, এও হচ্ছে ওই অন্দরমহলেরই ব্যাপার। আমি তাই এক-এক সময়ে ভাবি, আগে যে যন্ত্র নিয়ে ছবি আঁকতুম, এখন আমি সেই যন্ত্র নিয়েই পুতুল গড়ছি, সাজাচ্ছি, তাকে বসাচ্ছি কত সাবধানে।......ছেলেবেলায় যখন প্রথম মায়ের কোলে এসেছিলুম, তখন এই ইট, কাঠ, ঢেলা নিয়েই খেলেছি, আবার ওই মায়ের কোলেই শেষে ফিরে যাবার বয়স হয়েছে কিনা, তাই আবার সেই ইট, কাঠ, ঢেলা নিয়েই খেলা করছি।......"

খরগোশ? শিঙ-বাগানো ভেড়া?

বিদায়ের সুরের আভাসে জীবন-সায়াহ্নের এ কথাগুলি হয়ত বা একটু ম্লান, একটু করুণ শোনাবে। কিন্তু এই সময়কার গড়া অবনীন্দ্রনাথের খেলনাগুলি রূপে, রসে ভরপুর; সেগুলিতে কোন অবসাদের ছায়া নেই। কেননা, সেই যন্ত্র নিয়েই তিনি এই পুতুলখেলা খেলেছেন, যে যন্ত্রে একদা এঁকেছিলেন তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত চিত্রগুলি।

কাঠকুটো থেকে নিজের হাতে এরকম খেলনা তৈরি করা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ প্রায়

মন্থরগতি কুমীর

একই রকম উপভোগ্য আর-এক শ্রেণীর সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন, যে গুলির তারই দেওয়া আদরের নাম ছিল "কাটুম-কুটুম"। "কাটুম-কুটুমে"র ব্যাকরণগত অর্থ হয়ত কিছুই নেই; কি করেই বা এই বিশেষ নামটি তাঁর মনে পড়েছিল, সে কথাও বোধ করি আর জানা যাবে না। তবে, এ নামের ধ্বনির ব্যঞ্জনা থেকে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে, এ খেলনাগুলি তাঁর বড় প্রিয়, বড় অন্তরমহলের জিনিস ছিল।

শিল্পীর চোখ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যা কিছুই দেখেছেন, তাতেই একটা রূপ, একটা রস অনুভব করবার সহজাত অভ্যাস তাঁর ছিল। শরতের নির্মল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় নিশ্চয়ই তাঁর মন উধাও হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে বায়ু-চালিত পরিবর্তন-শীল মেঘের নানান্ আকৃতির আবিষ্কারে। তাঁর চারিদিকের গাছপালা, লতাপাতা, ঘাসে তিনি যে কত রূপ কল্পনা করেছেন স্বকীয় দৃষ্টিতে, তা চিরদিনের মত অলিখিত রয়ে গেল। তবু, একটু প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর এই রূপ-পিপাসু সন্ধানী দৃষ্টির। সেগুলি তাঁর এই "কাটুম-কুটুম"। বিশ্বভারতীর কলাভবনের মিউজিয়মে এদের কয়েকটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে রক্ষিত আছে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পিসত্তার, তাঁর রূপচিন্তাধারার সেগুলি অমূল্য দলিল।

অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, প্রকৃতির খেয়ালে গাছের ডালপালা এমন আকার নেয় যে, কোন পশুপাখি বা অন্য কিছুর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য সহজেই মনে আসে। এই সাদৃশ্য আবিষ্কারের জন্য, সেই "জ্যান্ত" কাঠের ইঁদুর খোঁজার তন্ময়তা নিয়ে, অবনীন্দ্রনাথ যে বনে-বাদাড়ে কত ঘুরে বেড়িয়েছেন, সে কথা কে আজ আর বলবে! আশ্চর্য রূপের সন্ধান পেয়েছেন এক-এক সময়ে। আর অমনি, সমস্ত পরিশ্রম ভুলে এই বৃদ্ধ শিল্পীর মন যে বিমল আনন্দে ভরে উঠেছে, তার তীব্রতা আমরা শুধু অনুমান করতে পারি, লিখে প্রকাশ কররাব মতো ভাষা কোথায়!

কখনও কখনও, কপালগুণে, অবনীন্দ্রনাথ এমন আশ্চর্য আকৃতির ডালপালার সন্ধান পেয়েছেন, যেগুলির ওপর তাঁকে আর কারিকুরি করতে হয়নি; প্রকৃতিই তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে একেবারে পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে পাঠিয়েছে। কোথায় কোন্ অরণ্যের গভীরে, ঘন পাতার আড়ালে প্রকৃতির নিজের হাতের এই খেলাকে আবিষ্কার করলেন রূপের নেশায় বিভোর মর্ত্যের এক শিল্পী, আর অসীম অধ্যবসায়ে সেগুলিকে সংগ্রহ করে রেখে গেলেন আমাদের চিরদিনের আনন্দের জন্য! এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত "কুমীর" ও "ঘোড়-সওয়ার" এই ছবি দুটি থেকে সহজেই বোঝা যাবে, কত নিপুণতার সঙ্গে প্রকৃতি কখনও কখনও সামান্য ডালপালার উপকরণে জীবজন্তুর সাদৃশ্য সৃষ্টি করতে পারে।

আবার, কখনও কখনও, এই "কাটুম-কুমুম"দের রূপ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করবার জন্য সামান্য অঙ্গসজ্জার আশ্রয় নিতে হয়েছে অবনীন্দ্রনাথকে। বলা বাহুল্য, এই আরোপিত সজ্জা তিনি সর্বদা ততটুকুই করেছেন, যতটুকু অত্যাবশ্যক; প্রকৃতি-সৃষ্ট মূল রূপের তাতে কোনই ক্ষতি হয়নি। প্রবন্ধে ব্যবহৃত "খরগোশ" ও "আদিবাসী রণ-নৃত্য" ছবি দুটি থেকে দেখা যাবে যে, খরগোশের সামনের দুটি পা ও নর্তকের মাথার পেছনে কয়েকটি সরু শরকাঠি ছাড়া তাঁকে আর নতুন কিছুই ব্যবহার করতে হয়নি।

•

রবীন্দ্রনাথের শেষ-বয়সের ছবি আঁকার মতো জীবন-সায়াহ্নে সংগৃহীত অবনীন্দ্র-নাথের এই "কাটুম-কুমুমে"রা একদা কবিগুরুর মনোহরণ করেছিল। শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁর "ঘরোয়া" বইটির ভূমিকায় লিখেছেন যে, গুরুদেব বলতেন—"অবনের খেলনাগুলো দু-তিনজন করে না দেখিয়ে একটা পবলিক একজিবিশন করতে বলিস। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শিখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয়, দেখ্। ছবি আঁকত, তার পরে এটা থেকে, ওটা থেকে এখন খেলনা করতে শুরু করেছে; তবুও থামতে পারছে না, আমার লেখার মতো। না, সত্যিই অবনের সৃজনশক্তি অদ্ভুত।"

এই সৃজনশক্তির বহুমুখী প্রবাহ আজ থেমে গেছে। কিন্তু থেমে যাবার আগে যে অপরিমেয় সম্পদ রেখে গেছে পরবর্তী কালের জন্য, তা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যের ফল।

প্রবন্ধের সহিত ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি বিশ্বভারতী কলাভবনের সৌজন্যে লেখক কর্তৃক গৃহীত।

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১০ ॥

বিকাল বেলা ঘুরতে ঘুরতে দেখি, কারাং-মেটার দলও এসে গেছে। মেলাতলার পূর্বদিকে আসর জমিয়ে বসেছে ওরা। আমাকে দেখে জোহার করল সবাই। আমিও প্রতি-জোহার করলুম।

সন্ধ্যাবেলায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু শুনলাম, রাত্রে নাচ হবে। কাল রবিবার। নেহাত আমার অনুরোধেই গুপ্তেজী আর-একটা রাত থেকে যেতে রাজী হলেন। মোহন এ বেলায় মাংস খাওয়ালো। মুরগীর মাংস আর পরোটা। শীতের আমেজটা কাটেনি, তবু মোহন দেখছি এবেলা গায়ে চড়িয়েছে ঘিয়ে রঙের ফিনফিনে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি। সাজগোজও বেশ একটু করেছে মনে হল। স্বাভাবিক। এবেলায় সাহেব-সুবোদের আসবার কথা। মেমসাহেব আর মিশিবাবার দলও আসতে শুরু করেছেন মেলা দেখতে। আজ একটু পাউডার, একটু সেন্ট চাই বইকি। জেলার বড়কর্তারা অনেকেই এসেছেন। কোকামেটার মতো দুর্গম নয় নারানপুর। মেলাতলার সামনে সারি সারি মটোর গাড়ি। তার চৌদ্দ আনা সরকারি। মহিলারাও অনেকে এসেছেন কর্তাদের সঙ্গে। আলাপ ছিল দু-একজনের সঙ্গে। তাঁদেরই একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল হঠাৎ। দেখা হতে ঘাড় কাত করে 'নড্' করলেন, বললেন : এট্ টু ব্রুটাস।

বুঝলাম জগদলপুর থেকে জঙ্গলে এসে ও'র আর-এক ধাপ উন্নতি হয়েছে। ইংরাজী ছেড়ে এবার ল্যাটিন ফ্রেঞ্চ শুরু করবেন। ভদ্রমহিলার মাতৃভূমি ভারতবর্ষেই, মাতৃভাষা হিন্দী। এতদিন ধারণা ছিল, উনি বুঝি মৌলানা আজাদ সাহেবের উল্টো প্রতিজ্ঞাটা করে রেখেছেন। বরাবর হিন্দীতে প্রশ্ন করে ইংরাজিতে জবাব পেয়েছি। এই প্রথম ও'র মুখে ইংরাজি ছাড়া অন্য ভাষা শুনলাম।

বললুম : এ কথা কেন?

: আপনার কিছু রুচিজ্ঞান আছে মনে হয়েছিল। এ-নরকে শেষ পর্যন্ত আপনিও এসে জুটেছেন?

এটা যে নরক, এই মতামতটাকে মেনে নিয়ে সায় দিয়ে যাওয়াই বোধ করি ভদ্রতা। কিন্তু দুদিন গুপ্তেজীর সঙ্গে মেশামেশির পাপে ফস্ করে বলে বসলুম : ঠিক ঐ কথা যে আমি বলতে যাচ্ছিলুম।

ভদ্রমহিলা অপ্রতিভ হলেন না একতিল। বললেন : এসেছি কি সাধে? জয়দীপকে তো জানেন? যা ঝোঁক ধরবে, তাই করবে। ধরে নিয়ে এসেছে জোর করে। অফিসিয়াল টুরে বউ সাথে নিয়ে যাওয়া জি-ও করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

কিছু ভাষ্য প্রয়োজন। প্রথমত জয়দীপ মেহ্‌রা ও'র স্বামী, দ্বিতীয়ত, 'জি-ও' অর্থে গভর্নমেন্ট অর্ডার। সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলেন, এ'রাও সেই ভাষাটা নকল করতে চান। প্রমাণ দিতে চান, সহধর্মিণী কথাটার অর্থ কত ব্যাপক। মাসের শেষ সপ্তাহে যখন দেখেন মাস-কাবারি টাকা ফুঁকে দেওয়া গেছে, দৈনিক-বাজারের টাকায় ঘাটতি পড়েছে, তখন কর্তার কাছে হাত-পাতাকে বলেন, রিভাইসড বাজেট-ডিমান্ড! শাশুড়ি ঠাকরুণ যখন পত্রযোগে অভিযোগ করেন—'তোমাদের এ আগেও দু-দুখানা চিঠি লিখে জবাব পাইনি কেমন আছ জানিয়ে বুড়ো-বুড়িকে নিশ্চিন্ত কর', তখন সে পত্রকে বলেন, 'থার্ড-রিমাইন্ডার'; এবং যতদিন ক্লাব-পার্টি-স্যোসালের ফাঁকে তার জবাব না লিখে উঠতে পারেন, ততদিন সে পত্রখানির অভিধা 'পি ইউ ডি'! এ'রা চলনে অফিসারনী, বলনে আই-এ-এসনী!

বললাম ঃ জোর করে যখন ধরে এনেছেন, তখন গাড়িতেই বসে থাকুন। নামবেন না। যা ধুলো!

নিরীহের মতো বললেও এটা যে বক্রোক্তি, তা অনুমান করেছেন উনি। বলেনঃ কিন্তু আপনাকে তো কেউ ধরে আনেনি, আপনি এ-নরকে মরতে এসেছেন কেন?

মনে ভাবি রমানাথনের যুক্তিটা এক্ষেত্রে প্রয়োগ না করাই বিধেয়। 'মানবিকতার উৎস-সন্ধানে এসেছি'—এ কথা আর যাকে হক ঐ নাইলনভূষিতাকে বলার আগে, হে ঈশ্বর, তুমি আমার বাকরোধ কর। বলিঃ এসেছি গুপ্তেজীর পাল্লায় পড়ে। মিস্টার মেহরার চেয়ে কম নাছোড়বান্দা নন উনি!

ভাগ্য ভালো। দেখলাম উনিও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। বলেনঃ তা আর নয়! বদ্ধ পাগল আপনাদের ঐ গুপ্তে। না হলে তহশীলদারের চাকরি ছেড়ে এই চাকরির জন্যে অফসান্ দেয়? তহশীলদার হলে তবু দু পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারত। ড্রইং ডিস্বার্সিং-এর ক্ষমতা থাকত। অবশ্য

ট্রাইবাল ওয়েল-ফেয়ারেও অনেক টাকা বাজেট-প্রভিসন্স আছে এবার।

নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে সাড়া দিলামঃ যা—ই!

কেউ ডাকেনি। ভদ্রমহিলাকে বলিঃ গুপ্তেজী ডাকছেন, পাগল মানুষ তো। যাই শুনে আসি।

হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই ও'র উদ্দেশ্যে একটা গোঁজামিল-নমস্কার ছুঁড়ে দিয়ে যবনিকা টানলাম এ-আলাপের। নেপথ্যের যেদিক থেকে কাল্পনিক আহ্বান শুনে সাড়া দিয়েছিলাম, সেদিকে রওনা হয়ে পড়ি দ্রুতপদে।

অদ্ভুত জীব এ'রা মাড়াই দেখতে এসেছেন হাত-পা-মুখ-ঘাড় চুনকাম করে। বাচনভঙ্গি যদিও ষোড়শীসুলভ, কিন্তু খাটো ব্লাউসের অবরোহে প্রকাশমান উদর-ঊর্মিমালা দেখে মনে হয়, অন্তত বছর ত্রিশেক ঘি-দুধ দিয়ে যত্ন না নিলে খাঁজে খাঁজে এত 'স্নেহের' লহরী সঞ্চিত হত না। হাটতলায় কার্পেটপাতা নেই, এ কথা অনুমান করা শক্ত নয়। তাহলে ঐ সোনালী-কাজ করা ভেলভেটের চপ্পল পরে মাড়াই দেখতে আসার অর্থ? আমার অনেক অর্থ, দু-এক জোড়া নষ্ট হলে ভ্রূক্ষেপ করি না, এটা প্রমাণ করা? দেখবার এত জিনিস থাকতে মাড়াইয়ে এসে উনি দেখলেন, মিস্ মেয়োর মতো শুধু নরকটাকেই। আলাপ করবার এত বিষয় থাকতে উনি এনে ফেললেন সরকারী চাকুরিয়াদের ধ্যান-জ্ঞান-মোক্ষের প্রসঙ্গকে—চাকুরির সুবিধা ও উন্নতি! আর কী নগ্ন, কী অশ্লীল! নাইলনের স্বচ্ছতায় অ্যাম্বিসাস মেইডেন-ফর্মের ঔদ্ধত্য সুপ্রকট—যেন আবরণ নয়, উন্ঘাটনই ও'র সাজের বীজমন্ত্র! মেলা-তলার হাজারটা নিরাবরণ মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায়—ও'র ঐ আন্ডারলাইন-করা সাজের দিকে তাকালেই দৃষ্টি নত হয়ে আসে। তবু যেন ও'র তৃপ্তি নেই; আদিবাসী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনেক টাকার ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে—এ কথা বলার মধ্যে দেহ নয়, ও'র মনের যে নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তারপর কাল্পনিক আহ্বান শোনা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না।

সন্ধ্যার পর কোথায় মেলাটা জমবে, তা নয় ঝিমিয়ে এল। ব্যাপার কি? শুনলাম আদিবাসীরা যে-যার দলে চলে গেছে। রান্নাবান্না করছে, আহারাদি সারছে। ঘুরেফিরে আবার এসে বসলাম মোহনের দোকানে। মোহন নেই, ওর ছোকরা চাকর চা দিয়ে গেল—সেই অনবদ্য স্পেশ্যাল চা। গুপ্তেজীর বড়কর্তা এসেছেন। তিনি ব্যস্ত। একাই ঘুরতে থাকি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। অন্ধকার হয়ে গেছে। মেলাতলায় তবু আলো আছে। হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্স, কারবাইড—বাইরে অন্ধকার। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। রান্না হচ্ছে। কেউ কেউ আহারে বসেছে। ছেলেমেয়েদের মিলিত দল হৈ-হুল্লোড় করছে। কান্নাংমেটা দলের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। আট-দশজন ছেলেমেয়ে হাত-ধরাধরি করে চলেছে। পা টলছে অনেকের। নেশা হয়েছে আর কি। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, আমাকে ঘেরাও করে ফেললে। সবাই একসাথে হাত পেতে কি যেন চাইছে। কি আবার চাইবে, পয়সা নিশ্চয়। খুচরা পয়সা কিছু দিলাম ওদের শিরদারের হাতে। রীতিমতো নেশা হয়েছে তার। ইঙ্গিত করে বললাম ঃ ভাগ করে নাও সকলে।

নিল না। আমার বুক পকেটেই পয়সাগুলো ফেলে দিল ফের। বুঝতে পারি, এত অল্প পয়সায় ওরা খুশি নয়। একটা টাকা দেব কিনা ভাবছি, হঠাৎ একটি ছেলে ফস্ করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিল জ্বলন্ত সিগারেটটা। হুস হুস করে টানতে শুরু করে। বাকি ক'জন রইল হাত পেতে। এবার বুঝলাম। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতেই ফুঁয়ে উড়ে গেল যেন। ওরা জোহার করে বিদায় নিল। ঠেকে শিখছি ক্রমশ। এবার সস্তা সিগারেট কিছু কিনে পকেটে রাখলাম ভবিষ্যতের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ শুরু হল নাচের আসর। মাঠের এখানে-ওখানে বাজছে বাদ্য-যন্ত্র—কিন্তু নিরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। নাচ জমল না। মনে হল বৃথাই থেকে গেলাম রাতটা। সন্ধ্যাবেলা ফিরে গেলেই ভাল করতাম। গাছতলায় ঝোপে-ঝাড়ে অনেকে জোড়ায় জোড়ায় গল্প করছে, হাসি-মস্করা করছে। শাণিত কণ্ঠের চিৎকার শোনা যাচ্ছে এ-ঝোপে ও-ঝোপে—খিলখিল হাসি। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। অধিকাংশ ঢেলিকই গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়েছে প্রিয় মোটিয়ারীদের। কোথাও বা নিরালায় শয্যা পেতেছে কেউ কেউ। টর্চের আলোয় পথ দেখে নেবার সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। অতর্কিতে আলো ফেলে কোন কপোত-কপোতীকে না বিব্রত করে ফেলি।

মনে হল, এভাবে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। তার চেয়ে গুপ্তে সাহেবকে ডেকে নিয়ে ফেরার আয়োজন করা যাক। এখন রওনা দিলে রাত বারোটা নাগাদ জগদলপুর পৌঁছানো যাবে।

গুপ্তেজী আছেন তাঁর বড়কর্তার কাছে। ডাকবাংলোতে। মেলাতলা থেকে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে-চলা সর্টকাট পথ আছে ডাকবাংলোতে যাবার। পথটা নির্জন। সেই পায়ে-চলা পথ ধরেই এগিয়ে চললাম টর্চের আলোয় সাবধানে পথ দেখে। শীতের শেষ। সাপের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে মেলাতলার কলগুঞ্জন স্তিমিত হয়ে এল। সার্কাসের তাঁবুর সামনে খাটানো মাইকটার কর্কশ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। কখনও গান্ডি, কখনও

হাঁকবি, কখনও বা মাড়িয়া ভাষায় ঘোষিত হচ্ছে : চলে আসন্‌ন, এক্ষুনি খেলা শুরু হবে আমাদের। বাঁদরের খেলা, ঘোড়ার খেলা, এক মানুষের দুটো মাথা। এই শেষ হয়ে গেল। চলে আসুন।

ক্রমে সে শব্দও ক্ষীণ হয়ে এল। অন্য-মনস্কের মত পথ চলছি আর ভাবছি, আজকের সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

হঠাৎ পাশের জঙ্গলের মধ্যে থেকে যেন একটা গোঙানি শুনলাম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। হ্যাঁ, শুধু গোঙানি নয়, একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ। টর্চ ফেললাম সেদিকে। না, কিছু দেখা যায় না। কিন্তু না, একটা কিছু হচ্ছে ঝোপের পিছনটায়। কুড়িয়ে নিলাম একটা ভারী পাথর। একটু জঙ্গলের ভিতর এগিয়ে যেতেই বুঝলাম, মানুষ আছে ওখানে। সাদা বাঙলায় বললাম : কে ওখানে?

থেমে গেল ধস্তাধস্তিটা।

সেদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা মারল আমাকে। আক্রমণের জন্য ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক ছিল, না হলে উল্টে পড়ে যেতাম সে অতর্কিত ধাক্কায়। শুধু হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ল। পর পর দুটো লোক ছুটে বেরিয়ে গেল আমার গায়ের উপর দিয়ে। ওরা কোন জানোয়ার নয়। মেলার এত কাছাকাছি কোন বন্য জন্তু আসবে না। আমার ডান হাতে আছে তখনও সেই ভারী পাথরটা। অন্ধকারের মধ্যেই ছুঁড়ে মারলাম সেটা। লাগলো না। দু-জোড়া পদধ্বনি মিলিয়ে গেল বন-বাদার ভেঙে মেলাতলার দিকে। টর্চটা তুলে নিলাম। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। নিজের পথ ধরব, হঠাৎ কানে গেল ঝোপের ভিতর কে যেন কাঁদছে। সেদিকে আলো ফেলতেই দেখতে পেলাম একটা বীভৎস দৃশ্য। সম্পূর্ণ নিরাবরণ একটি মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াচ্ছে—খুঁজছে তার পরিধেয় বস্ত্র।

আলোটা নিভিয়ে দিলাম। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে আবার বাতি জ্বালতে দেখি মেয়েটি সামলে নিয়েছে নিজেকে। কাপড়টা পরেছে। একটু আগে সে কাঁদছিল, চোখের কোলে চিক্ চিক্ করছে জল। এই মুহূর্তটিতে কিন্তু আর সে কাঁদছে না। একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত হয়ে। দু হাতে দুটি পাথর। চোখ দুটো জ্বলছে তার বাঘিনীর মতো। বুঝলাম, আমাকে সে প্রতিপক্ষ মনে করেছে। আমার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে সে মুহূর্ত গুণছে।

দূরে সরে এলাম। টর্চের আলো দিয়ে ইঙ্গিত করলাম আমাকে অনুসরণ করতে। আমার পিছু পিছু সে টলতে টলতে বেরিয়ে এল জঙ্গল ছেড়ে পায়ে-চলা পথে। সেখানে দাঁড়ালাম চুপ করে। মেয়েটি নিজের পথ চিনে নিল—আমি শুধু আলো জেবলে ওকে অনুসরণ করব। মেলাতলায় পেঁছে দেব। ইঙ্গিত করলাম ওকে আগে যেতে। আমি দাঁড়িয়ে পড়তেই ও থমকে দাঁড়ালো। আবার সেই কঠিন ভঙ্গিতে গাছের গায়ে সেঁটে গেল। আমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ার কদর্থ করেছে মেয়েটি। ভাষা জানি না, কেমন করে ওকে বোঝাবো যে, আমাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। বাঙলা দেশের পল্লীবালা সে নয়। পুরুষ মানুষের সঙ্গে সে মিশতে অভ্যস্ত। তাহলে আমাকে এতটা ভয় পাচ্ছে কেন? নির্জনতার জন্যে? অন্ধকারের জন্য? নাকি আমার ভদ্রপোশাকের জন্যে? আমি বিজাতীয় বলে? অথবা যারা ওকে এই জঙ্গলে ধরে এনেছিল, যারা ছুটে পালিয়ে গেল, তাদের অত্যাচারে ওর মন এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। আবার টর্চের আলোয় ইঙ্গিত করলাম ওকে আগে যেতে। মেয়েটি কি ভাবছে, তা অনুমান করবার জন্য আলো ফেললাম ওর মুখে। আরে, এ যে রঙিলা। কারাংমেটার বেলেসো! যন্ত্রণায় সুন্দর মুখটা বিকৃত!

জোর আলোয় চোখ মুদেছিল মেয়েটি। নাম ধরে ডাকতেই সম্বিত ফিরে পেল যেন। সোজা বাঙলায় বললুম : ভয় নেই, তুমি আগে আগে যাও। তোমাকে পৌঁছে দেব মেলায়।

মানুষে মানুষে একটা অন্তরের যোগ আছে। রঙিলা চিনতে পারল আমাকে। ম্লান হাসলে। এগিয়ে গেল আমাকে অতিক্রম করে। অনুসরণ করলাম আমি। দু-এক পা চলতেই দেখি, বিপরীত দিক থেকে কে যেন আসছে। আমাকে ধাক্কা মেরে যারা চলে গিয়েছিল, তাদেরই একজন বোধহয়। আমি সতর্ক হই! প্রয়োজন ছিল না। যে ফিরে এল, সে কারাংমেটার শিরদার। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রঙিলা তাকে কি যেন বলল। আমার পরিচয় দিল বোধ হয়। শিরদার নিশ্চিন্ত হল। আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রঙিলাকে টেনে নিল বুকে।

টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী। ভাবছিলাম ওদের কথাই। আমার সম্মুখেই ও যে রঙিলাকে অসংকোচে বুকে টেনে নিল তার অর্থ কি? বিপদমুক্ত প্রেমিকযুগলের মিলনানন্দের প্লাবনে আমার উপস্থিতির সংকোচ কি ভেসে গেল? নাকি ওরা অপরের উপস্থিতিতে এরকম আচরণ করতে অভ্যস্ত? সে যাই হক, ওর আলিঙ্গনের ভঙ্গিটা দেখে মনে হল, মানুষের হৃদয়-বৃত্তির প্রকাশভঙ্গি দেশ-কাল, শিক্ষা-সভ্যতার অতিরিক্ত একটা কিছু। শিরদারের দুই বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে আসা আর বেলোসার পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে আশ্রয় খোঁজার মধ্যে যে মিলনের দৃশ্যটি ফুটে উঠল, তা সর্বদেশের সর্বকালের জিনিস। তা এত নিখুঁত যে, দুনিয়ার সবচেয়ে খুঁতখুঁতে পরিচালকও এ-দৃশ্য দেখলে বলতেন : ফাইন্যাল সট্! নো রিটেকিং!

একটু আগে বেলোসাকে সাদা বাঙলায় শুনিয়েছিলাম অভয়বাণী—অনায়াসে বুঝে নিয়েছিল মেয়েটি। আর্ত, ভীত কাউকে অভয় দেওয়ার যে ভঙ্গি, তাও তাহলে সার্বজনীন। মনে পড়ল মুরেভেন্দে দেখা একটি মায়ের মূর্তি। হাটতলার প্রান্তে তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। কোলে নয়, একফালি ন্যাকড়া দিয়ে বাচ্ছাটিকে বেঁধে নিয়েছে বুকের সঙ্গে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে স্তনাপানরত শিশুর। সে মূর্তির মধ্যে যে মাতৃস্নেহের ব্যঞ্জনা দেখেছিলাম, তার সঙ্গে যশোদামাতা, মেরীমাতার প্রভেদ কোথায়? মানুষের যে আদিম বৃত্তি, তা নিশ্চয় দেশকালের সীমারেখাকে মেনে চলে না।

একটু অপেক্ষা করে ফের আলো জ্বাললাম। নির্লজ্জ। ওরা তখনও আলিঙ্গনবদ্ধ। শিরদার মেয়েটির গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর বেলেসো কি যেন বলছে উত্তেজিতভাবে। বুঝলাম এর পর আমি অনাবশ্যক। শিরদারও হাতের ইঙ্গিতে আমাকে চলে যেতে বললে। অন্ধকারের মধ্যেই ওরা মিলিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

কিন্তু এ কি? আমার বাঁ হাতে এটা কি?

একটুকরো ন্যাকড়া! এতক্ষণে মনে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে আমি অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমার বাঁ হাতটা, টর্চটা হস্তচ্যুত হতেই। হ্যাঁ, কিছু একটা ধরেও-ছিলাম, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। এতক্ষণে টর্চের আলোয় দেখি সেটা একটা সিল্কের টুকরো। ঘিয়ে রঙের দামী সিল্কের একটা ছেঁড়া টুকরো।

ফিরে চললাম মেলাতলায়। মোহনের দোকানে গিয়ে দেখি, মোহন নেই। ছোকরা চাকরটাকে প্রশ্ন করলাম : মোহনবাবু কোথায়?

বললে—ভিতরে।

: ডেকে দাও। বল আমি ডাকছি।

ছোকরা ভিতরে গেল। ফিরে এসে বললে : বাবুর তবিয়ৎ খারাপ। এখন দেখা হবে না।

খুন চেপে গেল আমার মাথায়। বললাম : আমিই ভিতরে যাব। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল আমাকে।

ছোকরা কিন্তু রাজী হল না। সে আবার ভিতরে গেল প্রভুকে সে কথা জানাতে। একটু পরেই বেরিয়ে এল মোহন। তার পরিধানে একটা হাফসার্ট। ভ্রূকুটি করে কঠিন কণ্ঠে

মোহন কঠিনতর স্বরে বললে : ঠিক মনে নেই।

: সেই পাঞ্জাবিটা একবার নিয়ে আসবে?

মোহনের মুখ থেকে একটা মুখোশ খুলে পড়ল এবার। নিম্নস্বরে বললে : বাবুজী, মেলায় মজা লুটতে এসেছেন, পরের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। যদি নিজের মঙ্গল চান, তাহলে চুপচাপ সরে পড়ুন।

বুঝলাম, এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলে কোন

চয়ণ শিরদার—কাবোঙ্গা।

বললেনঃ কি চাই?

সিল্কের টুকরোটা তার চোখের সামনে মেলে ধরে বললামঃ এই কোয়ালিটির সিল্ক কোথায় পাওয়া যায় জান?

মোহন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। মনে হল তার চোখ দুটো জ্বলছে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেঃ জগদলপুরে পেতে পারেন।

ঃ তোমাকে এই রঙের একটা পাঞ্জাবি পরতে দেখেছিলাম বিকালে, সেটা তুমি কোথায় কিনেছিলে?

ফল হবে না। অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন। মোহন এখানকার বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। আর তাছাড়া একা মোহনই কি এসেছে 'মজা লুটতে? সভ্যজগতের আমরা অনেকেই তো এসেছি এইসব অসভ্য মারিয়া-মুরিয়া-ভাত্রা-পরজাদের সভ্য করে তুলতে।

বললামঃ বেশ চলেই যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা। ঐ ক্যালেণ্ডারখানা রাখার কোন অধিকার তোমার নেই। ওটা আমি নিয়ে যাব।

মোহন প্রতিবাদ করল না।

ওর দেওয়াল থেকে দেওয়াল-পঞ্জিটাকে আমি নামিয়ে নিলাম।

ফেরার পথে গুপ্তেজী বলেনঃ কিন্তু ব্যাপারটা কি হল বলুন তো। আর-একটা রাত মোহনের আড়তে কাটিয়ে এলে কি ক্ষতি হত?

আমি গম্ভীর হয়ে বলিঃ ক্ষতি হত। সে কথা জগদলপুরে ফিরে বলব।

গাড়িতে আর কোন কথা হয়নি। গাড়ির দোলানিতে দিব্যি ঘুমিয়ে নিলেন গুপ্তে সাহেব; আমার কিন্তু ঘুম এল না। চোখ বুজলেই চোখের উপর ভেসে উঠছিল সম্পূর্ণ নিরাবরণ সেই মেয়েটির অসহায় মূর্তি—অন্ধকারের মধ্যে তার পরিধেয় বস্ত্রের উদ্দেশ্যে আর্ত অন্বেষণ। আমরা, সভ্যজগতের মানুষেরা সাধুর ভেক ধরে ওদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছি; হোয়াইট মেনস্ বার্ডেনের নবতম সংস্করণ! বিদেশী ইংরাজ-ফরাসী-পর্তুগীজরা একদিন যেমন অসীম ত্যাগ স্বীকার করে সভ্যতার আলোকবর্তিকা হাতে এসেছিল, এ ভারত-অরণ্যে—আমাদের শিশু-বিবাহ, আমাদের সতীদাহ প্রথা, আমাদের ঠগীর হাত থেকে ত্রাণ করতে—আজ তেমনি পাঞ্জাবি-বিহারী-গুজরাতি-বাঙালীর দল জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা হাতে আসছে দণ্ডকারণ্যে! আমরা ওদের সুসভ্য করে তুলবার ব্রত নিয়েছি! কোন্ দুর্মুখ বলে আমরা কেড়ে নিতে এসেছি ওদের সুখ-শান্তি, ওদের অভাব-বোধের অভাব, আর ওদের মেয়েদের কটিদেশের স্বল্পতম পরিধেয় বস্ত্র!

জগদলপুরে পৌঁছে গুপ্তে সাহেব বললেনঃ রাত্রে আপনি থাকবেন কোথায়?

ঃ ধরমপুরা কলোনীতে—আমাদের সার্কিট হাউসে।

: কিন্তু রাত যে এদিকে দেড়টা। যদি সব ঘর ভর্তি থাকে?

আমি জবাব দেবার আগেই ফের বলেন: তার চেয়ে এক কাজ করুন। চলুন আমার সাথে। আমার ঘরেই রাতের বাকি ক' ঘণ্টা কাটিয়ে দেবেন।

গুপ্তেজী ব্যাচিলার। কনফার্মড ব্যাচিলার বলা চলে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। ছোট্ট বাড়ি। দু কামরার। বাইরের ঘরে খানকয়েক ফটো। আদিবাসী জীবনের। কয়েকটি মুখোশ রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো। কাঁসা-পিতলের কয়েকটি মূর্তি টেবিলে সাজানো। সবই আদিবাসীদের। মায় দেওয়ালের পেরেক থেকে ঝুলছে মারিয়া ধনুক।

বাড়তি খাটিয়া ছিল। ঘুম-ঘুম-চোখে চাকরে পেতে দিল সেটা। গুপ্তেজী আমাকে হাত লাগাতে দিলেন না। চাকরের সঙ্গে ধরাধরি করে তার উপর আমার বিছানাটা পাততে থাকেন। আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম দেওয়ালের ফটোগুলিকে। হংস-মধ্যে-বকো-যথা এক আলখাল্লাধারী সাহেবের ফটো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এটি কার?

চাদরটা বিছানায় পাততে পাততে চোখ তুলে দেখে গুপ্তেজী বলেন: রেভারেণ্ট আর্নেস্ট স্টোনের। তারপর বললেন—এই দণ্ডকারণ্যেই আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতেন। ছোট্ট একটি হাসপাতাল ছিল, চার্চ ছিল, আর ছিল রেভারেণ্ট সাহেবের খড়ো-চাল ঘর। উনিশ শ চল্লিশে চুরাশী বছরের বৃদ্ধ মারা গেছেন।

বললাম: বিশ বছর আগে মারা গেছেন? আপনি তাহলে তাঁর ফটো কোথায় পেলেন? আর তাঁর ছবিই বা টাঙিয়ে রেখেছেন কেন?

একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। তারপর বলেন: আদিবাসী উন্নয়নের কাজে উনি হচ্ছেন আমাদের পূর্বসূরী; কিন্তু সেকথা যাক। আপনার প্রতিশ্রুতিটা কি কাল সকালে পালন করবেন?

: কোন্ প্রতিশ্রুতি? ও সেই কেন অমন করে চলে এলাম?

: হ্যাঁ। যদি না খুব ক্লান্ত বোধ করেন।

বললুম: না। বরং ঘটনাটা বলে মনটা হাল্কা করে ফেলতে পারলেই বোধহয় ঘুমটা আসবে।

: বলুন তাহলে।

আনুপূর্বিক বলে গেলাম মোহন-বেলোসা উপাখ্যান। টেবিলের উপর রাখলাম রবীন্দ্রনাথের ক্যালেণ্ডারখানা। বললাম আর কিছু করতে পারিনি, এই ছবিখানা শুধু আমি কেড়ে নিয়ে এসেছি ওর ঘর থেকে। বলেছি, এটা রাখার অধিকার তোমার নেই।

গল্প শেষ হতেই খাট থেকে উঠে পড়েছিলেন উনি। নিঃশব্দে পায়চারি করছিলেন খাটিয়ার পিছনের সংকীর্ণ ফালিটুকুতে। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, চোয়ালের হনুটা উঁচু হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে পায়চারি করছেন ক্রমাগত। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন: কিন্তু তখন আমাকে বললেন না কেন?

: বললে আপনি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন তখনই। নাগর-দোলার ব্যাপার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

: না-হয় বাধতোই কুরুক্ষেত্র। সে-দায়িত্ব তো আমার।

কী জবাব দেব? একরোখা মানুষ গুপ্তেজী। সোজা পথে চলেন বলে লোকে তাঁকে পাগল বলে। তহশীলদারের চাকরির অনেক সুবিধা, অনেক সম্মান সত্ত্বেও শখ করে আদিবাসীদের স্পেশ্যাল-অফিসার না ওয়েল-ফেয়ার অফিসার, কি যেন হয়েছেন। শুভানুধ্যায়ীরা বারণ করেছিল—কর্ণপাত করেন নি। এই একরোখা স্বভাবের জন্য অফিসার মহলে ও'র বদনাম আছে। তাই ও'র কোন বন্ধু নেই। বস্তুত সেই ভয়েই আমি ও'কে নারানপুরে কিছু বলিনি। বললে, সেই মধ্যরাত্রে থানা-পুলিস হই-হাঙ্গামা শুরু করে দিতেন উনি। যার অনিবার্য ফল মামলা-মোকদ্দমা, কোর্ট-কাছারি। নারী-ধর্ষণের মামলার সাক্ষী দিতে হত। আসামী পক্ষের উকিল হয়তো অপমানকর প্রশ্নবান নিক্ষেপ করে বিব্রত করে তুলতো আমাকে। জঙ্গলের ভিতর নির্জনে একটি নিরাবরণ মেয়েকে দেখতে পেয়ে আমি কি করেছি না করেছি, তার হাজারো জেরা করে জেরবার করে দিত আমাকে।

কিন্তু এমন কথা সিধে-মানুষ গুপ্তেজীকে বলে লাভ নেই। তাই ঘুরিয়ে বললাম: মহাভারতের আদর্শ চরিত্র হচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম। দুর্যোধনের আশ্রয় আর অন্ন গ্রহণ করায় তিনি অন্যায়ের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করছিল, তখন চোখ বুজে ছিলেন তিনি। আমরাও মোহনের বাড়িতে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কাটখোট্টা মানুষটি বললেন: এইজন্যেই আপনাদের হিন্দু ধর্মটা গোল্লায় যেতে বসেছে।

আমি হেসে বলি: আমাদের হিন্দু ধর্ম বলছেন কেন? আপনিও তো হিন্দু।

: নো আয়াম নট। ধমকে ওঠেন উনি, —আর হিন্দুধর্মের যে আদর্শ শোনালেন, তারপর বলব—সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

আমি অবাক হয়ে বলি: আপনি হিন্দু নন? তবে আপনি কি?

সে কথায় কর্ণপাত করলেন না গুপ্তেজী। চোখ দুটো জ্বলছে তাঁর। বলেন: আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন খবরটা আমার কাছে গোপন করে।

একরোখা জেদী মানুষটা কি করে বসে ঠিক কি? আমি শান্তিপ্রিয় জীব। অভিযোগটা মেনে নিয়ে বলি: অপরাধ স্বীকার করছি। এবার শুয়ে পড়ুন। ঘুম পাচ্ছে, বাতিটা নিভিয়ে দিন।

গুপ্তেজী হাসলেন। বিচিত্র সে হাসি। তারপর গোটানো ক্যালেণ্ডারখানা খুলতে খুলতে বললেন: তা দিচ্ছি। এ-ছবিখানা কেড়ে এনে আপনি ঠিকই করেছেন। মোহনের ঘরে এটা আর রাখা চলে না; কিন্তু মাপ করবেন এঞ্জিনীয়ার সাহেব—এটা কি আপনার পক্ষে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে? অন্যায়ের প্রতি এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ-চিত্র? এটা বরং এখানেই থাক!

দেওয়ালের হুকে ক্যালেণ্ডারখানা টাঙিয়ে দিলেন। মর্মান্তিক লজ্জায় মাথাটা আর তুলতে পারিনি। তুললেও ক্ষতি ছিল না। চাবুকটা চালানোর পরমুহূর্তেই বাতিটা নিবিয়ে দিয়েছিলেন উনি! (ক্রমশ)

প্যারিসের চিঠি

প্যারিস
শনিবার, ৪ঠা আগস্ট, ১৯৬২

শনিবারের বিকেল। বেশ গরম পড়েছে—একটা গুমোট আবহাওয়া। বৃষ্টি হবে হয়ত। রেডিওতে (ফ্রাঁস ৩) ভিয়েনা থেকে রিলে করা ক্লাসিকাল অর্কেস্ট্রা শুনতে শুনতে এই চিঠি লিখছি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখি প্যারিসে কলকাতার মতই কয়েকটি তরঙ্গ থেকে প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। তবে এখানে নামকরণ করা হয়েছে এরকম : ফ্রাঁস ১, ফ্রাঁস ২, ফ্রাঁস ৩, ফ্রাঁস ৪, Paris Inter। বেশ নিশ্চিন্ত আরামে হাল্কা মনেই বজনা শুনছিলাম। ব্রাম্‌স্‌, মোজার্ট, মেনডেলশনের অর্কেস্ট্রা হল। প্রোগ্রামের শেষ অংশে এখন পশ্চিমী সংগীতের মহাগুরু বেথোভেনের পঞ্চম সিম্ফনির গুরু-গম্ভীর বাজনা বাজছে। পৃথিবীর সমস্ত সুর, সমস্ত রস একত্র হয়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আজ সন্ধ্যেবেলার এই নিশ্চিন্ত আরামে বাজনা শোনার প্রধান কারণ হল আজ থেকে সরকারীভাবে বাৎসরিক ছুটি শুরু হল। আমি নিজে অথবা আমার মত অনেক ফরাসী এখন ছুটি না নিলেও আজ থেকেই ছুটি শুরু। তিন-চার সপ্তাহ এখন শুধু বিশ্রাম, আরাম, দেশভ্রমণ ইত্যাদি। সারা বছর আকুল প্রতীক্ষার পর আজ এই ছুটি এসেছে—এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে হবে। একটুও অপচয় করা চলবে না। সারা বছর ধরে কত প্ল্যান, কত প্রোগ্রাম করা হয়েছে এবার কোথায় যাওয়া হবে, কি করা হবে, আরও কত কি কল্পনা! বেশ কিছু-দিন থেকেই মেট্রো, বাস, রাস্তাঘাটে, অফিসে সব ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ির মুখেই এক কথা শুনেছি : জ্য স্যুই ফাতিগে—অর্থাৎ "আমি ক্লান্ত"। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পেষণে, নিয়মের কঠোর মাপে চলতে চলতে মানুষ শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি অনুভব করছে। সবাই ক্লান্ত। আর এই ক্লান্তি দূর করে জীবনকে সতেজ করার জন্যেই বাৎসরিক ছুটি। ছুটি শুধু ছাত্রদের জন্যেই নয়; ফরাসী আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ফরাসী বা বিদেশী চাকুরেরও এই ছুটি প্রাপ্য। ফলে শুধু স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়, অফিস আদালত, কারখানাই নয়। সমস্ত দোকানপাট, কাফে, রেস্তোরাঁ, এমনকি সিনেমা, থিয়েটার, অপেরা, কাবারে সব বন্ধ। শুনে অবাক হবেন না, রুটি, মাংস, অন্যান্য খাবারের দোকান, স্টেশনারীর দোকান, এমনকি জুতো সেলাইর দোকান, সেলুন সব বন্ধ ১ মাস। ভাবছেন, তাহলে তো সাধারণ জীবনই স্তব্ধ হয়ে যাবে। না, প্রত্যেক পাড়ার দোকানীরা পালা করে দোকান বন্ধ করে, যাতে সব দোকান এক-সঙ্গে বন্ধ না হয়ে যায়। জরুরী সংস্থা অথবা সওদাগরী অফিসগুলি পুরো বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। তাই এইসব সংস্থা বা অফিসে পালা করে সবাই ছুটি নেন যাতে অফিস একেবারে বন্ধ না করতে হয়। কিন্তু বিশ্রাম পায় সবাই। ফরাসী শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেককে ১লা জুন থেকে বৎসর শেষ হওয়ার আগে ৩ কী ৪ সপ্তাহ ছুটি নিতেই হবে, অবশ্য এর জন্য পুরো বেতনই পাবে সবাই। বেতনের মাসিক হার অনুযায়ী ৩ সপ্তাহ কি ৪ সপ্তাহ ছুটি ঠিক হয়। ছাত্রদের অবশ্য আড়াই মাস ছুটি। কারখানাগুলোতে ছুটির সময়টায় খুব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র ছাড়া সব মেশিনই বন্ধ করে সাফ করা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা, মেরামতির কাজ হয়।

আগস্ট মাসে প্যারিস শহরের তাই এক ভিন্ন রূপ। প্যারিসবাসী আজ দলে দলে আনন্দ কলরোলে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় নিষ্পেষিত জীবন থেকে কিছুদিনের জন্যে মুক্তিলাভ করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা ভুলতে চলেছে রেলপথে, মোটর পথে, আকাশ পথে ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন কোণে দূর দূরান্তরে; বনে, পাহাড়ে, পর্বতে, সমুদ্রতীরে। ঠিক সেই সময়ই আবার বিদেশী ট্যুরিস্টের দল এসে দখল করেছে প্যারিস শহর। দেখতে এসেছে চিরদিনের কৌতূহল, রহস্যময়ী প্যারিস মহানগরী। পথে-ঘাটে, কাফে রেস্তোরাঁয় তাই কেবল কাঁধে ক্যামেরা ও হাতে শহরের গাইড সহ ট্যুরিস্ট। মুখে ইংরেজী জার্মান, স্প্যানিশ, আরও কত কি ভাষা! আর এসেছে ফরাসী দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে ফরাসী পরিবার তাঁদের প্রিয় রাজধানী দেখতে। জীবন ভরে শুধু প্যারিসের কথা শুনেই এসেছেন, আজ পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়নি। দলে দলে এঁরাও এসেছেন বিশ্বের কৌতূহল তাঁদের গর্ব প্যারিসকে দেখতে। দেখবেন 'লুভ্‌র', 'রদাঁ' মিউজিয়ম (ভাস্কর্যের বিখ্যাত সংগ্রহশালা) 'তুর এফেল্‌', আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফ, "সাঁ-জ-এলিজে"র বিখ্যাত অ্যাভে-নিউ, দেখবেন "তুইএলরি" বাগান, "নোতর্‌ দাম্‌" গীর্জা। হ্যাঁ, দেখতে যাবেন বইকি "কার্তিয়েঁ লাত্যাঁ" বা ল্যাটিন কোয়ার্টার, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, "সরবন্‌" বা কলেজ দ্য ফ্রান্স—বিভিন্ন "চেয়ারের" অধিকারী বিখ্যাত প্রফেসরদের সম্মিলন। দেখবেন পান্থেয়ঁ এবং নেপো-লিয়নের সমাধি স্থল "এ্যাঁভালিদ" তারপর যাবেন দেখতে মঁমার্ত। সব কি আর দেখা সম্ভব—তবু যতটা পারা যায়।

ভের্সাই-এর বাগানে ফোয়ারা

আটলাণ্টিকের ধারে ল্য বোলে'—পিক নিক ও খেলাধ্লোর মনোরম স্থান

প্যারিসের সাতটা রেলওয়ে স্টেশনেই এবং দ্টো এরোড্রোমেই অসম্ভব ভিড় আজ। রেল কর্তৃপক্ষও কয়েকশত স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের দেশে প্জোর সময় হাওড়া স্টেশনে যে রকম ভিড় হয় ঠিক সেই রকম। তবে এখানে অনেক বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অনেক বেশী স্ষ্ঠ্ ব্যবস্থা। প্যারিস থেকে বাইরে বেরোবার সবগ্লি ন্যাশনাল হাইওয়েতেও হাজার হাজার গাড়ির ভিড়। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে বলে রাখি। ফ্রান্সে প্রত্যেক চাকুরে (ফরাসী বা বিদেশী) যারা বাধ্যতাম্লক সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কীমে অংশ গ্রহণ করেন—ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বৎসরে একবার ভ্রমণের জন্য রেলের ভাড়ার শতকরা তিরিশ টাকা কনসেশন পান। কনসেশনের টাকাটা সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ দিয়ে দেন রেল কর্তৃপক্ষকে। উপার্জনকারী যেসব লোক সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কীমের আওতায় পড়েন না তাঁরাও পেতে পারেন এই কনসেশন যদি তাঁরা ২ হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করেন। আবার যেসব পরিবারে অনেক ছেলেমেয়ে (ফরাসীতে এইসব পরিবারকে বলা হয় Famille Nombreuse), তাদের প্রত্যেকেই রেল ভ্রমণ বা মেট্রোতে ও বাসে যাতায়াতের জন্য বিশেষ কনসেশন রেটে টিকেট পান।

ছ্টি ছ্টি ছ্টি! স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সারা বছর সবাই পয়সা জমিয়েছে একট্ একট্ করে আজকের দিনের জন্যে। কত দ্শ্চিন্তা! কোথায় যাবে তোমরা? পাহাড়ে না সম্দ্রতীরে? ফ্রান্সেই থাকবে না বিদেশে যাবে? কেউ বলেছে (বিশেষ করে মেয়েরা): 'ব্ঝতে পারছ না, একট্ "ব্রঁজে" মানে তামাটে হওয়া চাই। বড্ড ফ্যাকাশে সাদা রঙ আমার গায়ের। স্র্যের আলো চাই, গরম হাওয়া চাই। তারপর সারা বছর ত ঠাণ্ডা, বরফ আর বৃষ্টি আছেই।' স্র্য সাধনায় তাই চলেছে মান্ষ কাতারে কাতারে সম্দ্রতীরে, বাল্চরে। উত্তাল সম্দ্রে স্নান করে খালি গায়ে গরম বাল্চরে শ্য়ে থেকে 'ব্রঁজে' হবে। ফার্মেসীগ্লির কিন্তু নেট লাভ। ব্রঁজে হওয়ার লোশন বিক্রি করে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে। এই লোশন সারা গায়ে ম্খে মেখে মেয়েরা গরম রোদে বাল্চরে শ্য়ে থেকে 'ব্রঁজে' হবে। ছ্টির পর প্যারিসে ফিরে এসে পরস্পরের রঙের তুলনা করবে কে কতটা বেশী ব্রঁজে হয়েছে। তারপর কয়েকদিন স্নান করার পর সব তামাটে রঙই ধ্য়ে ম্ছে সাফ। আমাকে অনেকে হিংসে করে বলেছেঃ 'তোমার রঙটা কিন্তু ধ্য়ে যায় না, কি মাখ তুমি? আমাদের সঙ্গে বদলাবদলি কর।' ওদের বলেছি—'আমার লোশনটা ভগবানের কারখানায় তৈরী, ওখানে কারচুপি নেই।'

আর এক দল ফরাসী আছে—ওদের কাছে সম্দ্র অত্যন্ত এক ঘেয়ে। ওরা পছন্দ করে পাহাড় বন আর ব্নো জীবন।

তারপর কোথায় থাকা যায়? সে এক সমস্যা। হোটেল ত আছে প্রচুর, কিন্তু সব অনেক আগে থাকতেই রিজার্ভ হয়ে যায়। তাছাড়া আছে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট কুটীর ও বাঙ্গালো। অনেকে আবার ক্যাম্পিং খ্ব পছন্দ করেন। সম্দ্র বা নদীতীরে বিভিন্ন জায়গায় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট জায়গায় বহ্ লোক তাঁব্ খাটিয়ে বাস করেন। সারি সারি বহ্ তাঁব্ পড়ে যায় বিভিন্ন পরিবারের। তারপর আছে কারাভান মোটরের ট্রেইলারে স্ন্দর একটি ছোট্ট ১ কামরা বিশিষ্ট সাজানো গাড়ি। সেখানেই বনে বা নদীর ধারে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। আমার এক বন্ধ্ সহকর্মী আবার এক নতুন আইডিয়া বার করেছে। তার কয়েকটি বন্ধ্-বান্ধবীকে নিয়ে তাদের ক্লাবে গত কয়েক মাস ধরে খ্ব শক্ত প্ল্যাস্টিকের এক বিরাট নৌকো তৈরী করেছে। তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভ্রমণের উপয্ক্ত করেছে। সেই নৌকোয় নদীপথে তাঁরা কয়েকজন বেরোবে ভ্রমণে। কয়েকশত কিলোমিটার যাবে। যেখানে ইচ্ছে হবে অথবা রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে সেখানে নৌকো থামিয়ে নদীর ধারে তাঁব্ খাটিয়ে খাওয়া দাওয়া করবে, ঘ্মোবে। এখানে ভ্রমণের উপযোগী হাল্কা ও ছোট টেবিল চেয়ার, বাসন কোশনের কোন অভাব নেই।

আসলে এদেশে লোকের ভ্রমণের স্পৃহা অদম্য। ফরাসীরা নিজেরা বলে ওরা নিজেদের দেশের সীমান্ত পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে পা দিতে ইচ্ছুক নয়। কথাটা

সর্বাংশে ঠিক নয়। হাতে পয়সা থাকলে বিদেশে যেতে ওদের খুবই আগ্রহ। বিশেষ করে অনেককেই ত দেখছি প্রতিবেশী দেশগুলি—স্পেন, জার্মেনী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালীতে যাচ্ছেন।

যাঁরা ছুটিতে ফ্রান্সেই ভ্রমণ করছেন তাঁদের আবার চিন্তা কি করে ছুটিটা একটু উপভোগ করা যায়। শুধু ত বসে থেকে গাল গল্প করে সময় নষ্ট করা আর যায় না। মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী, গীর্জা, ঐতিহাসিক মনুমেণ্ট, বাগান ইত্যাদি দেখতে ত হবেই, তাছাড়া আছে খেলাধুলোয়, "স্কীনটিক", সাঁতার, নৌকা বাইচ, সমুদ্রে ও নদীতে মাছ ধরা, গান বাজনা, নাচ, লোক উৎসব আরও কত কি!

শহর থেকে বাইরে ছুটিতে বেরোবার বন্দোবস্তও বেশ মজার। যদি নিজেরা দল বেঁধে বা একা গাড়িতে ট্রেনে বেরিয়ে গেল তো কোন সমস্যা নেই। নয়ত, ছুটিটা বেশ আনন্দে কাটাবার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। শুধু ভ্রমণ বা থাকা খাওয়ার খরচটা দিয়ে দিলেই হল। তারপর সব ব্যবস্থা এই সংস্থাগুলিই করেন। ছাত্রদের জন্যে রয়েছে সংযুক্ত ছাত্র সংঘ যারা ছাত্রদের দল বেঁধে বেড়াবার ব্যবস্থা করেন। তারপর আছে অন্যান্য সংস্থা : যেমন "ক্লাব ফ্রাঁসে দ্য ত্যুরিসম" "ক্লাব মেঁদিতেরানে" ইত্যাদি ইত্যাদি...।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে রয়েছে "কলোনি দে ভাকান্স"। চার থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধ ভ্রমণের ব্যবস্থা হল "কলোনি দে ভাকান্স"। বড় বড় অফিস, শিল্প সংস্থা তাদের কর্মচারীদের (পদমর্যাদানির্বিশেষে) ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করে কলোনীর। শুধু অফিস বা শিল্প সংস্থাই নয়, যেসব ছেলেমেয়ের ভার গীর্জা ও সমাজ-রক্ষা সংস্থা গ্রহণ করেছেন, তাদের কর্তৃপক্ষও কলোনীর ব্যবস্থা করেন। পাহাড়ে বা কোন দূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয় এবং সেখানে উপযুক্ত খাওয়া, খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে। সরকার থেকে ইন্সপেক্টর এসে কলোনী পরিদর্শন করে যান সব ঠিক ঠিক আইনমত ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। কলোনীতে ছেলেমেয়েদের দেখা-শোনা করার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত মনিটর, মনিট্রিস নিযুক্ত করা হয়। তারপর রয়েছেন ডিরেক্টর বা ডিরেক্ট্রিস ও চিকিৎসক এবং নার্স। কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেও ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ, খেলাধুলো, আমোদ-আহ্লাদ করে। কলোনীর খরচের একটা অংশ বহন করেন উদ্যোগকারী কর্তৃপক্ষ ও বাকীটা ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরা। শুধু যেসব ছেলেমেয়ের ভার সমাজ-রক্ষা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তাদের কলোনীর খরচ সবটাই রাষ্ট্র বহন করেন।

'সেন' নদীতে "স্কীনটিক"

অনেকদিন আগে প্যারিস থেকে বহুদূরে পাহাড়, বনঘেরা সুন্দর ছোট্ট একটি গ্রামে এরকম একটা কলোনী পরিদর্শন করে-ছিলাম। আমি তখন একটি ফরাসী পরিবারের সঙ্গে এই অঞ্চলে আমার ছুটি কাটাচ্ছিলাম। কলোনীর ডিরেক্ট্রিস পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আমাকেও কলোনী পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা ছটায় ছেলেমেয়েদের খাবারের সময় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সবাই। খাবার ঘরে ঢুকতেই মনিট্রিসের নির্দেশে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো আমাদের। সব ঘুরে ঘুরে দেখে কলোনীর ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। খাবার, শোবার, খেলাধুলোর বাগানের ছবি আঁকার, সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। সব দেখে দেখে আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী "মৌমাছি"র আনন্দমেলার প্রচেষ্টার কথাই মনে হয়েছিল সেদিন। ফিরে আসার সময় বেশ একটু কৌতুকের অবতারণা হয়েছিল। ছোট্ট একটি মেয়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কি ভেবে জিজ্ঞেস করল: 'তুমি হিন্দু? (ভারতবর্ষের লোক মানেই "Hindou")। তোমার দেশে বাঘ পাওয়া যায়?' একটু হেসে বলেছিলাম। 'হ্যাঁ, ছোট্ট মেয়ে, আমাদের দেশে ইয়া বড় বড় বাঘ পাওয়া যায়, তোমাকে এনে দেব একটা।' খুব খুশী মেয়েটি। অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীদের দিকে একটু তাচ্ছিল্য-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভাবখানা : একজন হিন্দুকে সে বন্ধু করতে পেরেছে তো! চাট্টি খানি কথা নয়! ওকে কে বলেছিস, এখানে একজন 'হিন্দু' এসেছে।

অজিতকুমার দাম

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ২৮ ॥

...হঠাৎ সুবেদার খাঁর কল্পনা-জাল ছিন্ন হ'য়ে গেল। তাঁর ঘরের বন্ধদ্বারে কে যেন টুক্‌টুক্ ক'রে টোকা দিতে লাগল। খুলে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা বাঁদর! কপাট খোলা পেয়েই বাঁদরটা টপ ক'রে তাঁর ঘরে ঢুকে তড়াক ক'রে টেবিলে লাফিয়ে উঠল। রাত্রে খাবেন ব'লে একটা আপেল কিনেছিলেন সুবেদার খাঁ, সেইটে তুলে নিয়ে টপ ক'রে বেরিয়ে গেল আবার। সুবেদার তার পিছু পিছু গিয়ে দেখলেন, কিছু দূরে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সে। বিস্মিত হ'য়ে তিনিও দ্রুতপদে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন, ঘরের মধ্যে একটি ভদ্রলোক রয়েছেন। বাঁদরটা টেবিলের উপর আপেলটা রেখে দিয়েছে আর চেয়ারে ব'সে মিটিমিটি চাইছে ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক মৃদু হেসে তার দিকে চেয়ে বলছেন, গুড্, গুড্, ভেরি গুড্। অবাক হয়ে গেলেন সুবেদার খাঁ।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন—"

ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন তাঁর দিকে।

"কে আপনি? কি চান?"

ভদ্রলোক দেখতে সুন্দর। পাতলা ছিপ-ছিপে চেহারা। মুখে সুচালো ফ্রেঞ্চকাট কাটা দাড়ি, চঞ্চল চোখ দুটি নীলাভ। পরনে ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, ঢিলে পায়জামা, মখমলের চটি। মাথায় গোল টুপিটিও মখমলের। বাঁ হাতে খুব লম্বা সাদা সিগারেট হোল্ডারে কালো ইজিপ্‌শিয়ান সিগারেট। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিন্তু চমকে উঠলেন সুবেদার খাঁ। তাঁর মনে হল একটা নেকড়ে যেন মনুষ্যমূর্তি ধরেছে। সিগারেটে খুব সন্তর্পণে একটি টান দিয়ে তিনি আবার বললেন, "কি চান আপনি?"

সুবেদার খাঁ তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতা-বশতঃ বললেন, "আদাব। ওই বাঁদরটা কি আপনার পোষা? ও আমার ঘর থেকে আপেলটা নিয়ে এসেছে এখুনি।"

ভদ্রলোক একটু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। আর একবার টান দিলেন সিগারেটে। তারপর বাঁদরটাকে লক্ষ করে বললেন, "মংকু, অন্যায় করেছ। এঁর মুখের গ্রাস কেড়ে এনেছ তুমি। দুঃখিত হয়েছেন ভদ্রলোক। যাও, দিয়ে এস ওটা ওঁর ঘরে।"

বাঁদরটা টপ ক'রে চেয়ার থেকে নেমে আপেলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, "ও আপনার ঘরে গিয়ে ঠিক রেখে আসবে। বসুন।"

সুবেদার খাঁ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসলেন।

"আপনার পোষা বাঁদর?"

"ও আমার ছেলে। ওর মা ওকে প্রসব করেই মারা যায়। আমিই ওকে মানুষ করেছি।"

"এ কি ক'রে সম্ভব হল?"

"আমি সার্কাসে animal trainer ছিলাম, পশুদের শিক্ষা দিতাম। তখনই ওকে মানুষ করেছিলাম। তারপর থেকেই ও বরাবর সঙ্গে আছে। ওর মা-ও আমাকে খুব ভালবাসত।"

"ও আপনার সব কথা শোনে?"

"সমস্ত। নিজের ছেলে হলে এত বাধ্য হত না।"

"বলেন কি! আপনি এখনও সার্কাসে চাকরি করেন?"

"অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। মংকুই এখন রোজগার করে খাওয়ায় আমাকে।"

বলতে বলতেই মংকু ঘরে এসে ঢুকল, তার বগলে একটা পাঁউরুটি।

"ওই দেখুন। এটা সরিয়ে রাখা যাক। পাঁউরুটির মালিক যদি এসে হাজির হয় তা হলে আজ রাত্রে উপবাস করতে হবে।"

মংকুর হাত থেকে পাউরুটিটি নিয়ে তিনি তাঁর স্যুটকেসে পুরে রাখলেন এবং সুবেদার খাঁর দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

"মংকু অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে রোজগার করে। মানুষের অসাবধানতার সুযোগ নেয় ও। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ীরাও তাই করে।"

সন্তর্পণে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। কোথায় যেন একটা ঘড়িতে বারোটা বাজল। "এবারে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। আপনার খাওয়া হয়েছে? না হ'য়ে থাকে তো আমার সঙ্গে খেতে পারেন। মংকু আজ মন্দ রোজগার করেনি—"

"আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে। আপনার বাড়ি কোথায়? বাংলা দেশে?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "আমি world citizen; আমার নাম পৃথিবী নন্দন। অন্য কোন পরিচয় এ যুগে অচল।"

মুচকি মুচকি ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠল মুখে। সুবেদার খাঁর বিস্ময়ের ঘোর কেটে গিয়েছিল, তিনি এই অদ্ভুত লোকটির কথা-

বার্তায় কৌতুক অনুভব করছিলেন, লোকটির প্রতি আকর্ষণও অনুভব করছিলেন একটা। অপূর্ব ব্যঙ্গরসের চমক ভদ্রলোকের চোখে-মুখে, কথাবার্তায়। তাঁর কথা আরও শোনবার জন্যে তাই প্রশ্ন করলেন, "অচল? কি রকম?"

"অচল নয়? আপনি অতি সেকেলে লোক মনে হচ্ছে। এখনও অবশ্য আমরা যথেষ্ট উদার হ'তে পারি নি। এখনও নারকেল গাছে যে ফল ফলে তাকে আমরা নারকেলই বলি, কিন্তু বাংলা দেশে যে জন্মেছে সে নিজের পরিচয় বাঙালী বলে দিলেই আধুনিক উন্নত সমাজ, বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক সমাজ, নাক সিঁটকে ছ্যা ছ্যা করে। তাকে প্রাদেশিক বলে গালাগালিও দেয়। তাই আমিও ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিয়েছি, তাই আমি পৃথিবী-নন্দন। আপনি কি বসবেন?"

"আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

"কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তা হলে দাঁড়ান, কপাটটা ভেজিয়ে দিই। ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে হবে। মংকুও অনেকক্ষণ কিছু খায় নি।"

পৃথিবীনন্দন ঘরের কপাট বন্ধ করে বাক্স খুলে খাবার বের করলেন। একটি গোটা পাঁউরুটি, গোটা দুই কাটলেট, একটা সিদ্ধ ডিম, একটা পেয়ারা আর কয়েকটা কলা।

সুবেদার খাঁর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "সব মংকু রোজগার করেছে—"। তিনি দুটি কলা, পেয়ারাটা আর আধখানা পাঁউরুটি মংকুকে দিলেন।

"মংকু মাংস খায় না। মনুষ্য সমাজেও অনেকে মংকুর আদর্শ অনুসরণ করছে। ধাড়িবাজ, বদমায়েসরা আর দুশ্চরিত্রা স্ত্রী-লোকেরা প্রায় দেখবেন নিরামিষাশী। মংকু খাও—"

মংকু আদেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। "খাও" বলতেই খাওয়া শুরু করে দিল।

সুবেদার খাঁ বললেন, "যদি একটা অনুরোধ করি, রাখবেন?"

"কি বলুন, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই রাখব।"

"আমার আপেলটা এনে দি। আপনি আর মংকু খান। খেলে সত্যিই আমি খুশী হব।"

পৃথিবীনন্দন স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "তা হলে তো মস্ত বড় একটা ঝুঁকি নিতে হয়।"

"কিসের ঝুঁকি?"

"বন্ধুত্বের। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয় তা হলে। অচেনা লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, অচেনা লোকের কাছ থেকে "চেক" নেওয়ার মতো অনেকটা। প্রায়ই দেখেছি dishonoured হয়, ধোপে টেঁকে না। ভুয়ো চেক আর ভুয়ো বন্ধুত্বর আজকাল ছড়াছড়ি। আমার মংকু যখন আপেলটা এনেছিল তখন সেটা ছিল তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি। তখন তাতে আমার দাবি ছিল। এখন আপনার কাছ থেকে যদি ওটা নিই তা হলে হয় দাম দিতে হবে, না হয় প্রতিদানে কিছু একটা করতে হবে। হৃদয় ছাড়া এখন আমার দেবার আর কিছু নেই। সে হৃদয়ও ভগ্ন-হৃদয়। নেবেন কি সেটা? বিনিময়ে কি আপনারটাও পাব?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"আপনারটা আশা করি গোটা আছে।"

"না। চিড় খেয়েছে।"

"তা হলে মিলবে ভালো। আনুন আপেল।"

সুবেদার খাঁ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে আপেলটি নিয়ে এলেন। পৃথিবী-নন্দন সমান তিন ভাগে ভাগ করলেন সেটি। একটি সুবেদার খাঁকে দিলেন. "আসুন, আপনাকে একেবারে বঞ্চিত করব না", তারপর একটি মংকুকে দিয়ে তৃতীয় টুকরোটি নিজে খেলেন।

আহারাদি শেষ হলে পৃথিবী-নন্দন তাঁর লম্বা সিগারেট হোলডারে আর একটি ইজিপশিয়ান সিগারেট পরিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে ধরালেন সেটি। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "দেখুন মশাই, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই যখন হ'ল তখন প্রথমেই আপনাকে প্রাণের একটি মর্মস্পর্শী গোপন কথা নিবেদন করি। আশা করি সে অধিকার আমি অর্জন করেছি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কি কথা বলুন।"

"আমি এখন কপর্দকশূন্য। আপনার কাছে কিছু অর্থসাহায্য চাই। মংকু আমার খাবারটা যোগাড় ক'রে এনে দেয় বটে, মাঝে মাঝে টাকা-কড়িও এনে দেয়, কিন্তু ও এখনও expert pick-pocket হ'য়ে উঠতে পারে নি। আজ ভোরেই আমাকে এ হোটেল ছাড়তে হবে। অথচ পকেটে পয়সা নেই। হোটেল চার্জ পাঁচ টাকা। তা ছাড়া কিছু ট্রেন ভাড়া—"

সুবেদার খাঁ আবার অবাক হলেন। ভদ্র-

লোকের পকেটে পয়সা নেই, অথচ হোটেলে এসে উঠেছেন। বললেন, "আমার কাছে কিছু আছে, দেব আপনাকে। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে—"

"বলুন। অকপটে বলুন। আপনি আমার বন্ধু—"

"আপনি কপর্দকশূন্য কিন্তু হোটেলে এসে উঠলেন কেন? আমার সঙ্গে যদি দেখা না হ'ত?"

"আর কারও সঙ্গে হ'ত। কিংবা আজ যাওয়া হ'ত না, অপেক্ষা করতে হ'ত, মংকুই হয়তো কোনও ফাঁকে হোটেল ম্যানেজারের টাকার থলিটা এনে দিত আমাকে, কিংবা আরও অপ্রত্যাশিত রকম কিছু হ'ত। মোটকথা কিছু একটা হ'ত।"

তারপর মৃদু হেসে বললেন, "জীবনে কোথাও আটকাই নি।"

হাসিমুখেই চেয়ে রইলেন তিনি সুবেদার খাঁর দিকে। সুবেদার খাঁ সবিস্ময়ে দেখলেন মুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই।

পৃথিবী-নন্দন বললেন, "ঘৃণা হচ্ছে? বইয়ে পড়েছি এ দেশে আগে একরকম সাধু ছিলেন তাঁরা রোজগার করতেন না, ভিক্ষা করতেন না, রাস্তায় যখন যা পেতেন তাই কুড়িয়ে নিতেন। তাতেই তাঁদের চলে যেত। তাঁদের নাম ছিল উঞ্ছবৃত্তিধারী। সাধু-সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব খাতির ছিল তাঁদের। আমিও অনেকটা সেই ধাঁচের লোক, রাস্তা থেকে যখন যা পাই তা কুড়িয়ে নিই। কিন্তু যুগ বদলেছে, ভদ্রলোক নেই, উদার লোক নেই, রাস্তায় আজকাল বড় একটা কিছু পড়ে থাকে না, তাই আমাকেও একটু বদলাতে হয়েছে। আপনার কাছে যে টাকাটা নিচ্ছি সেটা ধার নিচ্ছি না, ভিক্ষাও নয়, ওটা নিচ্ছি বন্ধুত্বের দাবিতে। এতে যদি আপনি রাজী না থাকেন, দেবেন না।"

"না, না, বন্ধুত্বের দাবিতেই দিচ্ছি এটা, ধার বা ভিক্ষা নয়। আপনার মতো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে খুবই আনন্দিত হয়েছি, আপনার মতো লোক আমি দেখি নি।"

ব্যাগ থেকে দশটি টাকা বার করে দিলেন তাঁকে। "আর একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ান?"

"না। একটা উদ্দেশ্য আছে বইকি, কিন্তু সেটা এখন বলা যাবে না। আর একটা উদ্দেশ্য আছে—ফোটো তোলা। অনেক অচেনা লোকের ফোটো তুলি আমি। দেবেন আপনার একটা ফোটো তুলতে?"

"আমার ফোটো? বেশ তুলুন।"

পৃথিবীনন্দন সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যামেরা বার করে ফ্ল্যাশ-লাইটে একটা ফোটো তুলে ফেললেন সুবেদার খাঁর।

তারপর হেসে বললেন—"আপনার স্মৃতি রইল একটা আমার কাছে। কিন্তু আপনার পরিচয় তো কিছু পেলাম না, যদিও আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম।"

"আমার নাম সুবেদার খাঁ। সামান্য লোক আমি। ইনজিন ড্রাইভার। রেলগাড়ি চালাই।"

"মুসলমান?"

সহসা পৃথিবী-নন্দনের মুখের নেকড়ে-ভাবটা আরও প্রখর হ'য়ে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "রেলের ইনজিন ড্রাইভার? তা হলে তো মস্ত লোক আপনি! কখন ডিউটি আপনার?"

"চব্বিশ ঘণ্টা পরে। সাহেবগঞ্জ থেকে আমি ডিউটিতে জয়েন করব।"

"ও। আমি তো একটু পরেই চ'লে যাব। আবার দেখা হবে। পৃথিবী গোল। আমি সার্কাস-ওলা আর ভবঘুরে। এখন প্রেয়সীর কণ্ঠহারের সন্ধানে ঘুরছি!"

"কি রকম?"

"সব কথা এখন বলা যাবে না। আর

আধ ঘণ্টা পরে আমার ট্রেন। আসুন।"

হাত বাড়িয়ে দিলেন পৃথিবী-নন্দন। সোচ্ছ্বাসে করমর্দন করলেন।

"মংকু, তুমিও স্যালিউট্ কর।"

মংকুও মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করল। তারপর পৃথিবী-নন্দন আর একবার অভিবাদন ক'রে স্যুটকেসটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মংকুও লাফাতে লাফাতে তার পিছু পিছু চলে গেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুবেদার খাঁ। এরকম অদ্ভুত লোক তিনি দেখেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে হল—লোকটা আমার ফোটো তুললে কেন?

•

কিছুদিন পরে গণেশ হালদারও খুব অবাক হলেন। একদিন স্থানীয় একটা ছাপাখানা থেকে একটা কুলি প্রকাণ্ড একটা প্যাকেট নিয়ে এসে হাজির হল। কুলির হাতে একটি চিঠিও ছিল। ছাপাখানার ম্যানেজার লিখেছেন—"ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির নির্দেশে এগুলি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। দশ হাজার কপি আছে। প্রেসের বিল ডাক্তার মুখার্জি চুকিয়ে দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে প্রাপ্তি সংবাদ দেবেন।"

"কিসের কপি?"

যে ছোকরাটি সঙ্গে এসেছিল সে বলল, "ডাক্তার মুখার্জি একটা প্যামফ্লেট ছাপতে দিয়েছিলেন।"

প্যাকেট নামিয়ে একটা প্যামফ্লেট বার করেও দিল সে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন গণেশ হালদার। প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন, যেটি কাগজে ছাপা হয় নি, ফেরত এসেছিল, সেইটি এমন সুন্দর করে ছাপিয়ে দিয়েছেন তিনি। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি প্রেসের ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি একটা প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে প্যামফ্লেটের প্যাকেটটা নিয়ে ছুটলেন ডাক্তারবাবুর কাছে।

ডাক্তারবাবু তখন বিজয়কে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বিজয়ের নামে তার পিসতুতো বোন পাকিয়া নালিশ করেছে। মাইজি যখন পুজোর ঘরে পুজো করছিলেন তখন বিজয় নাকি মুরগির ডিম নিয়ে সেখানে ঢুকে মাইজিকে বিরক্ত করেছিল। বিজয় বলছে, সে পুজোর ঘরে ঢুকেছিল বটে, কিন্তু মাইজিকে বিরক্ত করেনি; ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছে, ডিমটা কোথায় রাখবে। এতে মাইজি বিরক্ত হন নি। পাকিয়ার নামেও বিজয় পাল্টা নালিশ রুজু করেছে একটা। পাড়ার দরজীর দোকানে যে পোষা বাঁদরীটা বসে থাকে, পাকিয়া বলছে বিজয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে, বাঁদরীটা নাকি বিজয়কে রোজ ডাকছে। এ খবরে ডাক্তারবাবু বেশ উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন।

বললেন, ভালোই তো, বিয়ের সময় বিজয়কে তিনি লাল মখমলের টুপি, মখমলের কোট আর মখমলের প্যান্ট করিয়ে

দেবেন। আর বাঁদরীটাকে দেবেন একটা বেনারসীর ঘাগরা।

বিজয় চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, "হম্‌ ওকরা পাস নেই যাম্‌।" (আমি ওর কাছে যাব না।)

"কেন যাবি না? পাত্রী তো ভালো।"

"ওকরা বড়া বড়া 'ন' ছে।" (ওর বড় বড় নথ আছে।)

"সে বৈজু নাপিতকে ডেকে কাটিয়ে নিলেই হবে।"

"আংমে লম্বা লম্বা রোঁয়া ছে।" (গায়ে বড় বড় লোম আছে।)

"সে-ও বৈজু কেটে দেবে।"

"নেই, হম্‌ নেই যাম্‌। ওকরা পূছড়ি ছে।" (না, আমি যাব না, ওর ল্যাজ আছে।)

"ভালোই তো। তোকেও আমি একটা চামড়ার ল্যাজ বানিয়ে দেব। প্যাণ্টের বেল্ট থেকে ঝুলবে। বেশ ভালো হবে। দুজনেই পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খাবি। উঁচু ডাল থেকে তোকে পাকা পাকা পেয়ারা পেড়ে দেবে। তুই তো উঁচুতে উঠতে পারিস না।"

"উ আপনে গবর গবর খাইতে।" (ও নিজেই গব গব খেয়ে ফেলবে।)

"না, না, তা কি হয়! তোকে দেবে—"

প্যাকিয়া ফোড়ন দিলে—"দরজীকে উ আম দেইছে। চল না, আপনা আঁখ সে দেখবি।" (দরজীকে আম দেয়। চল না, নিজের চোখেই দেখবি।)

"হম্‌ নেই যাম্‌। উ কাটাহা ছে।" (আমি যাব না। ও কামড়ায়।)

এমন সময় রকেট আর ভুটান ছুটোছুটি করতে করতে এসে হাজির হল। রকেট যথারীতি ভুটানের কান কামড়াচ্ছিল, আর ভুটান খ্যাঁক খ্যাঁক করে বকছিল তাকে। রকেট ভুটানের সংগে খেলা করতে চায়, কিন্তু ভুটান কিছুতেই রাজী হয় না। হয় না, কারণ এই বেমানান বক্রক্রীড়ায় ভুটান বেচারা সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়ে। রকেট তার সমস্ত মুণ্ডটাই মুখের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলে, কখনও ল্যাজটা ধরে দোলায়। এতটা ভুটানের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। বিজয় ভুটানের দুঃখ বোঝে, রকেট তার হাতটাও মাঝে মাঝে মুখে ঢুকিয়ে আলতোভাবে কামড়ে রাখে। বিজয় এগিয়ে গিয়ে রকেটকে ধমক দিয়ে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল।

"নো, নো, কাম হিয়াল, কাম হিয়াল।"

রকেট কোন আপত্তি করল না, ঘাড় নীচু করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিজয়ের সংগে গেল।

"ছিট ডাউন।"

রকেট সামনের থাবা দুটোর উপর মুখ রেখে বসল। এরকম বসার মানে, এরা একটু অন্যমনস্ক হলেই ও উঠে পালাবে।

ঠিক এই সময় প্যামফ্লেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে মাস্টার মশাই এলেন।

"আসুন মাস্টার মশাই, কি খবর? হাতে ওটা কি?"

"আপনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে এসেছি, এ কি করেছেন আপনি?"

ডাক্তারবাবু প্যামফ্লেটটা দেখে হেসে বললেন, "ও, ওটা বুঝি ছেপে দিয়ে গেছে। আমার মনেই ছিল না। ভালো ছেপেছে তো?"

উল্টেপাল্টে দেখলেন।

"ভালোই ছেপেছে। ব্যস, আরকি। এবার বিতরণ করুন। আপনার বক্তব্য পাঁচজনকে জানানোই তো আপনার উদ্দেশ্য—"

"আপনি হঠাৎ ছাপতে দিলেন কেন?" কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গণেশ হালদার।

"প্রবন্ধটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। যদিও অনেক জায়গায় আপনার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু প্রবন্ধটা আপনি লিখেছেন ভালো। আপনার বক্তব্যটা বেশ জোরালোভাবে ফোটাতে পেরেছেন তাই ভাবলাম ছাপিয়ে দিই—"

কিন্তু আসল কথাটা ডাক্তার মুখার্জি বললেন না। প্রবন্ধটা কাগজে ছাপেনি, ফেরত দিয়েছে, এই কথাটা যখন গণেশ হালদার বলেছিলেন সেদিন, তখন তাঁর মুখে যে কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছিল তা বড়ই বাথা দিয়েছিল ডাক্তার মুখার্জিকে। তিনি তখনই ঠিক করেছিলেন ছাপিয়ে দেবেন প্রবন্ধটাকে। কতই বা খরচ!

"এতগুলো নিয়ে আমি এখন কি করব!"

"ওই যে বললাম। বিতরণ করুন। গণতন্ত্রে সবারই নিজের নিজের মত আইনত প্রচার করবার অধিকার আছে। কাগজওয়ালারা ভয়ে যখন আপনার মত ছাপতে চাইছে না, তখন আসুন আমরাই ছাপি। প্রবন্ধটাতে অনেক সত্য কথা বলেছেন আপনি।"

"স্কুলে বিতরণ করব?"

"ক্ষতি কি। এক কাজ করুন। একটা লোক বাহাল করুন। সে স্টেশনে গিয়ে প্রতি ট্রেনে ট্রেনে কিছু বিলি করে আসুক। আপনার বন্ধুবান্ধবদেরও দিন কিছু কিছু। এই দুর্গা, তোর ভাইটা আজকাল কি করছে?"

"ঘর মে বৈঠলো ছে।" (ঘরে বসে আছে।)

"ওকে তা হলে ডেকে নিয়ে আয়। ও রোজ বাবুর কাছ থেকে বই নিয়ে স্টেশনে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের দিয়ে আসবে। মজুরি যা চায় আমি দিয়ে দেব।"

গণেশ হালদারের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হল একটু।

"না, না, মজুরি আপনি দেবেন কেন? আপনি যা ঠিক করে দেবেন তা আমিই দিয়ে দেব। সব বিষয়ে আপনার উপর দাবি করাটা কি ভালো দেখায়? আপনি আমার জন্যে যা করছেন—"

গণেশ হালদার আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল এসে পড়ল।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বললেন, "বেশ, আপনার যা ইচ্ছে। এর থেকে একটা কথা কিন্তু বেশ বোঝা গেল।"

উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন গণেশ হালদার।

"এতদিনেও আমি আপনাকে আপনার লোক করতে পারি নি। পারলে এসব কথা আপনার মনে জাগত না। আমার মতো উদ্বাস্তুদের এইটেই ট্র্যাজিডি। আমরা জোর গলায় কিছু দাবি করতে পারি না, কিন্তু মনে মনে আকাঙ্ক্ষা, আশপাশের সকলকে আপন করি। কিন্তু পারি না। দৃশ্য এবং অদৃশ্য নানারকম বাধা এসে হাজির হয়। নানা রকম সংস্কার এসে দুর্লঙ্ঘ্য দেওয়াল খাড়া করে।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "আপনি আপনার পথে চলে সুখী হোন এইটেই চাই। কোন বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করা আমার স্বভাব নয়।"

গণেশ হালদার অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "আমার স্কুলের সময় হয়েছে, এবার আমি যাই।"

"আমাকেও উঠতে হবে। স্কুলেও আপনার প্যামফ্লেট কিছু বিলি করবেন। আমাকেও খান কয়েক দিন, ল্যাবরেটরিতে রেখে দেব। শিক্ষিত রোগী এলে দেব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

গণেশ হালদার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এবং এক গোছা প্যামফ্লেট এনে ডাক্তারবাবুর মোটরে রেখে দিলেন।

(ক্রমশ)

কারমা ওয়াঙচু

গৌরকিশোর ঘোষ

কারমা ওয়াঙচুর বয়েস উনিশ বছর পেরিয়েছিল কিনা, আমি ঠিক জানিনে। তবে এটা জানি, বেঁচে থাকলে, এককালে শেরপা দলের শিরোমণি সে হয়ে উঠত। তার আচার-আচরণ, কর্মক্ষমতায় সে লক্ষণ ছিল, আমরা তার পরিচয় পেয়েছিলাম নানা অভিযানে।

কারমা ইহজগতে নেই। সম্প্রতি তার বাবা, সর্দার আজীবার চিঠিতে জানতে পেরেছি, দু মাস আগে কুলু উপত্যকায় এক পাহাড়ে চড়তে গিয়ে, এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটেছে।

এখন মনে হচ্ছে, সংবাদটা কাগজে দেখেছিলাম বটে। একটা সামরিক পর্বতারোহীর দল কুলু উপত্যকায় অভিযান চালিয়েছিল। দলের নেতা দুজন সদস্যের সঙ্গে তুষার ধসে নিহত হয়েছিলেন। তিনজন একই দড়িতে বাঁধা ছিলেন। তার মধ্যে কারমাও ছিল, এই এখন জানলাম।

গত বছর নানা অভিযানে কারমা আমাদের দলে যোগ দিয়েছিল। আজীবা লিখেছিল, এবার একটা নতুন ছেলেকে তোমরা দলে নেবে কি? সর্দার আঙ শেরিং ওর নাম শুনে প্রশংসা করেছিল। আমরা কারমাকে দলে নিয়েছিলাম।

ওরা কলকাতায় আসবার পর, কারমাকে আমি প্রথম দেখি রঙমহল থিয়েটারে, এক সম্বর্ধনা সভায়।

হঠাৎ ও আমাকে চমকে দিল, "নমস্তে মোটা সাব।"

চেয়ে দেখি এক তরুণ শেরপা আমার দিকে মিট্‌মিট্ করে হাসছে। পরিচ্ছন্ন তাজা চেহারা। ওর মুখ প্রসন্ন উজ্জ্বল।

"তুম কৌন হো?"

হাসতে হাসতে জবাব দিল, "কারমা ওয়াঙচু।"

বুঝলাম, এই সেই নতুন ছেলেটা। বেশ ভাল লেগে গেল।

বললাম, "কি দেখে চিনলে, আমার তো দাড়ি নেই।"

কারমা জবাব দিয়েছিল, "দাড়ি না থাকলে কি হবে, ভুঁড়িটা আছে যে। মোটা সাবকে চেনার পক্ষে ঐ এক নিশানাই যথেষ্ট।"

তখনই বুঝেছিলাম, কারমা ওর বাবার মতই রসিক। সেই মুহূর্ত থেকেই আমরা বন্ধু হয়ে উঠলাম।

কারমা প্রথম থেকেই এবার বীরেনদার (আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার বীরেন সিংহ) তল্পিবাহক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর ক্যামেরার লটবহর অধিকাংশ সময়ই কারমাই সামলিয়েছে। বোঝা বইতেও সে এই বয়সে পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ শিবিরে সে বারবার বোঝা তুলে দিয়েছে। বীরেনদার মুখেই শুনেছি, কারমা ছিল বলেই তাঁর পক্ষে ২১ হাজার ফুট ওপরে চতুর্থ শিবিরে উঠে (৫১ বছর বয়সের আর কোন ফটোগ্রাফার পর্বতারোহী এই উচ্চতায় কখনও উঠেছেন বলে জানি না। পর্বতারোহণে এই রেকর্ড নিঃসন্দেহে নতুন) ছবি তোলা সহজতর হয়েছিল।

আরও একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল কারমা। বেস ক্যাম্প থেকে চতুর্থ শিবিরে জরুরী এক বার্তা পাঠানো হয়েছিল ওর মারফৎ। দেড় দিনের ভিতর সে সেই বার্তা দলের নেতার হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐ পথ অতিক্রম করতে সাধারণত চার দিন সময় লাগে।

পাহাড়ী হরিণই একমাত্র ওর তুলনা।

কারমা ওয়াঙচু

হরিণ শিশুর মতই সে ছিল সদা চনমনে, তেমনই ফূর্তিবাজও।

কারমা এক অসাধ্য সাধনও করেছিল। আমাদের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক দলটি নানা

পাহাড়ে গিয়েছিলেন, সেই দলের নেতা শ্রীশরদিন্দু বসুকে কারমা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

শ্রী বসু সকালে তৃতীয় শিবির থেকে বেরিয়েছিলেন। তৃতীয় আর চতুর্থ শিবিরের মাঝামাঝি এক জায়গায় হিমবাহের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নানা মাপ-জোকের অংক মিলিয়ে দেখছিলেন। পর্বতারোহণে অনভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উপযুক্ত জুতো পরে আসেননি। সঙ্গী সাথীও ধারে-কাছে কেউ ছিল না। এ-ও তিনি বুঝতে পারেন নি, ভাল জুতো না থাকায়, এতক্ষণ ধরে নড়াচড়া না করায় শীতল মৃত্যু অতর্কিতে এসে তাকে স্পর্শ করেছে। অগোচরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। তাঁর দুটি পা-ই হিম হয়ে এসেছে। হাঁটু পর্যন্ত অনড় হয়ে গেছে।

অকস্মাৎ শ্রী বসুর মনে হল, তাঁর পায়ের ভিতর, মেরুদণ্ডের ভিতর, প্রতিটি হাড়ের ভিতর তীব্রবেগে শীতল স্রোত বইছে। সর্ব শরীরে ঠকঠক করে নিদারুণ কাঁপুনি। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শ্রী বসু তাড়াতাড়ি তৃতীয় শিবিরের দিকে নামতে গিয়ে দেখেন সর্বনাশ! পা দুটোয় কোন সাড় নেই। জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। একচুল নড়বার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি সহায় সম্বলহীন সেই তুষার প্রান্তরে নিরুপায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এমন সময় সেখানে কারমার আবির্ভাব। চতুর্থ শিবির থেকে সে গুরুতরভাবে আহত সর্দার আঙ শেরিংকে বেস ক্যাম্পে নামিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কাঁধে দুজনের বোঝা—তার আর সর্দারের। তার উপর আহত সর্দারের ভার।

তবু তারা শ্রী বসুকে সেই অবস্থায় দেখে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। শ্রী বসু পরে বলেছিলেন, কারমার পক্ষে সেই অবস্থায় আমাকে তৃতীয় শিবিরে বয়ে আনা আমার কাছে একটা মিরাকল্। ছেলেটি এতগুলি বোঝা বইল কি করে, আজও ভেবে আমি দিশাহারা হয়ে যাই।

অকাল-মৃত্যু শোকাবহ, সন্দেহ নেই। প্রিয়জনের মৃত্যু সর্বদাই দুঃখের। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব শয্যায়। পর্বতের কোলে অতি সামান্য লোকেরই মৃত্যু হয়। কারমা সেই অতি-বিরল-সংখ্যকদেরই একজন। কারমার এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই গভীরভাবে দুঃখিত। কিন্তু বিছানায় শুয়ে কারমা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলেই কি আমাদের দুঃখের লাঘব হত?

আমার ধারণা, সেটা কারমাকে মানাত না। কারমা শেরপা—পাহাড়ের গায়ে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় মৃত্যু—তাকে চেনার এই নিশানাই যথেষ্ট।

জলছবি

প্রফুল্ল গুপ্ত

ছুঁচোর মতো বিঁধছে বালিগুলো। চোখে মুখে। চেয়ে দেখার ভরসা নেই। হুহু করে হাওয়ার এক একটা ঝাপটা। ক্রমেই সমুদ্রের ঘোলাটে জলের দিকে ঠেলা মারছে। নিয়ে যাচ্ছে ঠেলে।

শাড়ির উত্তর কোণ উড়ছে হাওয়ায়। এলো চুল যেন মাথার শেকড় ছিঁড়ে উপড়ে আসছে। পাক খেয়ে পড়ে গেল কৃষ্ণা। অনেক বালির অনেক কণায় ঢাকা পড়েছে ইতিমধ্যে। সফেন সমুদ্র আছাড় খেয়ে পড়ছে তার পায়ে। ক্ষমার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে সাদা ফেনায়।

ঝড় থেমেছে। শিউলির ডাল ধরে নাড়া দেওয়ার মতো বৃষ্টি এলো ঝরঝর করে। ওদিকে পাতলা ধোঁয়ার মতো আবছা খড়ের চালগুলো ঢাকা পড়েছে।

নোনা জলে অন্ধকার। ফ্লাগ স্টাফের পিঙ্গল আলোয় তীরের ইশারা নেই। টিম-টিমে লণ্ঠনের ভারে কিশোরী রায়ের ঋজু দেহটা নুয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ডানার মতো গলাটা কাঁপছে। ডাকছে। প্রৌঢ় কিশোরী রায় ডাকছে: কিষণ—কিষণ—! সমুদ্রের হাওয়ায় বিলুপ্ত হচ্ছে প্রৌঢ় রায়ের ডাক।

ভূতের মতো কয়েকটা ডোঙা। শুয়ে আছে পাশাপাশি। শুয়োর-মুখো ডোঙাগুলো অনেকদিনের চেনা। অনেকবার দেখেছে কিশোরী রায় আসতে যেতে। বোবা বোবা ডোঙাগুলো আজ যেন সবাক হয়ে উঠেছে। কথা বলছে এ ওর সঙ্গে। ফিসফিস করে। স্পষ্ট শুনেছে সে।

লণ্ঠনের চোখ-বসে-যাওয়া-আলোয় কী যেন খুঁজে ফিরছে প্রৌঢ়। সমুদ্রের ফোঁস ফোঁস শব্দ। ডোঙাগুলোর পাশে। লণ্ঠনটা নীচু করেই চমকে উঠেছে প্রৌঢ়! কৃষ্ণার ঠাণ্ডা দেহে উত্তাপ নিশ্চিহ্ন!

—ডিংলু! ডিংলু !

চিৎকার করে ওঠে কিশোরী রায়।

সকাল হতেই সরমা এসে হাজির। কিশোরী রায় গড়গড়ার নল ঘুরিয়ে বললেঃ ও মুখপুড়ীকে কী এখন পাবি! দেখগে যা, হয়তো নুলেপাড়ায় মাতব্বরী করছে। কোন কান্ডজ্ঞান তো আর নেই। আবার ঝড়ে পড়েছিল কাল, জানিস? সরমা চুপ করে থাকে। —কতদিন বলেছি। দিনকাল খারাপ। ও-পথে আর বিকেলের দিকে আসিস না। কে কার কথা শোনে! আফসোস করে প্রৌঢ়।

দেহের প্রতি পংক্তিকে যৌবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। লাল শাড়িতে পাক খেয়ে যখন সমুদ্র বেলায় ঘুরে বেড়ায় কৃষ্ণা সহজিয়া ঢঙে, তখন আশ্চর্য, একটিবারের জন্যে মনে হয় না কোন পুরুষের কৃষ্ণাকে প্রয়োজন নেই তার জীবনে।

নুলেপাড়ার মোহ এখনও কাটেনি কৃষ্ণার। নুলেপাড়ায় এত ঘোরাঘুরি নিয়ে সেদিনও বকাবকি করেছে কিশোরী রায়। কিশোরী রায়ের শাসনে আর কিছু না হক ডিংলুর ডোঙায় চেপে মাঝ দরিয়ায় যাওয়াটা ঘুচেছে। ঘোচেনি আজও স্নান করতে গিয়ে ঢেউ-গুলোকে পর পর টপকে শান্ত জলে খানিক থই নেওয়া মাঝে মাঝে।

চমক লাগে অনেকের। সরমার, মঞ্জুর, গৌরীর। অবাক চোখে দেখেছিল গৌরী। কিন্তু অবাক হয় না নুলিয়ারা? বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকে না ডিংলু। অনেক দেখেছে সে। একই সংগে শেখা সব কায়দা। আকাশ ছোঁয়া ঢেউ এলে কেমন করে ডুব দিয়ে কাটাতে হয় বিপদ। কেমন করে 'গর্ত' হলে পেছনে টান রেখে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারা যায়। কীভাবে ঢেউ-এর সংগে তাল রেখে ভাঙা ভাঙা ঢেউগুলো সহজেই পার হওয়া চলে। তারপর শান্ত জলে থই দিয়ে এক মুঠো বালি হাতে ওপরে উঠে আসা 'এক থেকে পঞ্চাশ' গুনতে না গুনতে।

আলোর বাড়িতে দেখা মিলল কৃষ্ণার।

—এখানে জমেছে বুঝি? ওদিকে দাদু যে চারদিকে লোক লাগিয়েছে।

—কেন রে? দৃষ্টিতে কৌতুক নিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করে কৃষ্ণা।

—ধরে আনতে! বললে সরমা। হেসে ওঠে সকলে।

বেলা বেড়েছে। মাথার ওপরে সূর্য। ফিরছিল সরমা আর কৃষ্ণা। আলোর বাড়ি থেকে। কঠিন অসুখে পা দুটো পড়ে গেছে আলোর। প্রায় বছর ঘুরতে চলল। এসেছে ওরা। রোজ বিকেলে নিয়ে আসে আলোকে চড়ায়। আর কয়েক কোদাল বালি সরিয়ে কোমর পর্যন্ত পুঁতে দেয় তাকে। এমন চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল আজও মেলেনি। তবু হাল ছাড়েনি আলোর মা। আলোর বাবা।

ফিরছিল সরমা আর কৃষ্ণা। রাস্তার ধারে কাসুন্দি গাছ। একটা ডাল ভেঙে নিলে কৃষ্ণা। পথে একটা ছাগলের পিঠে- সপাং করে বসিয়ে দিলে এক ঘা। মোড়টা ঘুরেই চমকে উঠল দুজনে।

—সুন্দর!...সুন্দর! এই যে, সুন্দরকে দেখেছিস? ওদের দেখে এগিয়ে আসে প্রবীণা।

—ওদিকে হাতটা উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয় কৃষ্ণা।

—উঁহু। হল না। ওদিকে না। জানিস না। রাজবাড়িতে তাকে আটকে রেখেছে ওরা। চল আমার সংগে দেখিয়ে দেবো। খিল-খিল করে হেসে ওঠে। প্রবীণা সরমাকে বলেঃ এই ছুঁড়ি কোথায় কোথায় ঘুরে মরছিস। পারিস না আমার মতন সুন্দরকে খুঁজতে? কেঁদে ওঠে প্রবীণা আফসোসে।

সরমারা এসেছে আজ ক' মাস। 'পাষাণী'র পেছন দিকে। ভাড়াটে হয়ে। ওকে আর ওর বাবাকে মোটে দেখতে পারে না ওর মা। এখনো সুন্দরের খোঁজ ওরা দিতে পারেনি তাই। 'সুন্দর'! কে যে সুন্দর তা ওরা জানে না। আজো না। অথচ বিশ্বাস সরমার মায়ের অটুট। ওরা নাকি ইচ্ছে করেই রাজবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনছে না সুন্দরকে।

নতুন বৃষ্টিতে উঁকি মারা ঘাসের ওপর পর্যন্ত রোদ্দুর। মিষ্টি লাগছে বিকেলের হাওয়া। সূর্য ডোবে ডোবে। গালচে আলোর তুলির কাজ শুরু হয়েছে। পাষাণীর পুরোন ভিতে। বালিয়াড়িতে। মেঘলা পশ্চিম আকাশের এক এক জায়গায় আলোর ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো যাই যাই করছে।

আলো ছাড়া আর সবাই এসে জুটেছে পাষাণীতে। বেচারা আলো। আলোর

ওখানেই যাওয়ার কথা সকলের। এ কদিন জমছে ওরা আলোর বাড়িতে। কিন্তু পাষাণী কৃষ্ণার নেই দেখা।

হুঁশ নেই কৃষ্ণার। নুলেপাড়ায় ভরা দুপুরে সেই যে পালিয়েছে। ডিংলুর কার যেন বিয়ে। বাসন্তী রঙের ছয়লাপ। ব্যাগ পাইপে বাজনার বিরতি নেই। এ পাড়ায় আর আসে না বড় একটা কৃষ্ণা আগের মতন।

আগের মত আর আসে না কৃষ্ণা এখানে। কিশোর বয়সের বন্ধু ডিংলুর কাছে। কিশোর বয়সে ডিংলু এসেছিল পাষাণীতে কৃষ্ণার খেলার সাথী হয়ে। ডিংলু আজো আছে। কৈশোর নেই। কৈশোরের উপান্তে তাই তফাতের নির্ঘণ্ট। কৃষ্ণা তাই মেতে উঠেছে স্বাভাবিক কারণে মেয়েমহলে। ডিংলু হয়ে উঠেছে বিচক্ষণ মৎস্য শিকারী।

অন্ধকার হয়ে এল। বাড়ি ফেরার মন বুঝি এল। টোকা মাথায় সামনের সরু রাস্তা দিয়ে কে যেন গেল। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে। আঁশটে গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছে না কৃষ্ণার? বৃষ্টি শুরু হয়েছে অল্পক্ষণ। নেবুতলায় অনেক জোনাকির ভিড় মিলিয়ে গেছে। বৃষ্টি ঝরা ভিজে ভিজে অন্ধকার। টোকা নিয়ে এলো ডিংলু। বললে—চল্‌।

পাতাঝরা দিনগুলোর পরে ডানার মতো খুলে গেল হোটেলগুলোর দরজা। দলে দলে আসছে নানা লোক, নানা-আচারের। ভিড় করে চলে। কেউ রাস্তায়। কেউ বা চড়ায়। একা কিংবা জোড়ায়। জোয়ান ছেলেরা চোখ ফিরে বেড়ায় এদিক সেদিক। যুবতীর লাজুক চোখ ভিড়ের মধ্যে কী যেন কী খোঁজে।

রোদ থাকতেই খেলা জমে উঠেছিল চড়ায়। আলো পোঁতা আছে বালিতে। বসে বসে ঝিনুক কুড়োচ্ছে হাত বাড়িয়ে। আর মাঝে মাঝে ঝাঁকুনিতে টনক নড়ছে।

বুড়ি হয়েছে আলো। যেমন হয় রোজ। চোর চোর খেলছে সবাই। কৃষ্ণা, সরমা, গৌরী, মঞ্জু বেলার দল বড় হয়েছে। অনেক নবাগতার আগমনে। দিনের দিন তাই দলের কৌলীন্য বেড়ে চলেছে। অনেকের হিংসে হয় দলটার ওপর। লজ্জা বোধ যাদের উগ্র বঞ্চিত হয় নিজেরাই। দলের মধ্যমণি কৃষ্ণা। গৌরী তার বিশ্বস্ত সংগঠক। সভ্য হওয়ার নিয়ম নেই। নেই কোন বাধা।

আসে যায়। যারা আজ আছে, কাল থাকবে না। চলে যাবে। ফিরে যাবে নিজের দেশে, কিংবা অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। দল তবু বেঁচে থাকে। নতুন প্রাণী এসে পড়ে ঝাঁকে। নতুন বছরে।

হাল্কা হয়ে গেছে গৌরী-কৃষ্ণার মেলা। আসন্ন সন্ধ্যার অনুসারে। চুর্ণিসারে কেটে পড়েছে বেলা। কোন চেনা পুরুষের ইশারায়। গৌরী আর কৃষ্ণা বসল গিয়ে বালিয়াড়িতে। পাশেই পুরোন একটা মন্দিরের ভগ্নাংশ মাথা উঁচিয়ে জেগে আছে।

—কোথায় গিছলি রে কাল? জিগোস করে গৌরী।

হাসলো কৃষ্ণা, বললে—কোথাও না তো।

—অলোকদাকে কেমন লাগে রে তোর? অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গৌরী কৃষ্ণার দিকে।

—ভাল, কেন বল তো?

আলোর দাদা অলোক। দুপুরে এসেছিল পাষাণীতে। কথা বলছিল খুশ মেজাজে। কিশোরী রায়ের সংগে। কৃষ্ণাকে দেখেই বললেঃ বেলা তো পড়ে এল, যাবে নাকি কৃষ্ণা?

অসময়ে এ প্রস্তাব ভাল লাগে না কৃষ্ণার? ভুরু দুটো কুঁচকে অনিচ্ছাকে প্রকাশ করে কৃষ্ণা। কিন্তু অলোক আবার বলে—যাবে?

—কোথায়?

—রাজবাড়ি।

হেসে ফেললে কৃষ্ণা।

কিশোরী রায় বলে উঠল ঃ যা না দিদি, একটু ঘুরেই আয় না। অলোককে বেশ ভাল নজরেই দেখছে আজ কাল কিশোরী রায়। ছেলেটি ভাল। গুণে আর চেহারায়।

রাস্তায় লোকজন নেই বিশেষ। দুপুরে গা ঢেলে দিয়েছে ঘুমে অনেকে। ওঠেনি সব। গরম রাস্তা এখনও ঠান্ডা হয়নি।

—তোমার বেড়াতে বেশ ভাল লাগে না? জিগ্যেস করলে অলোক কৃষ্ণার গা ঘেঁষে।

—কার না ভাল লাগে?

—হ্যাঁ, আমারও ভাল লাগে খুব। তোমার সংগে আরও ভাল লাগে?

—কার সংগে?

—তোমার।

—আচ্ছা অলোকদা—

কথাটা কেড়ে নিয়ে জিগ্যেস করলে অলোকঃ তোমার কার সংগে বেশি ভাল লাগে কৃষ্ণা—

—ডিংলুর সংগে।

রক্তবর্ণ চক্ষু নিয়ে একটি ষাঁড় পায়চারি করছিল। পাশ কাটিয়ে ওরা চলে এল এদিকে। তখন ছায়া পড়েছে চাতালে। বসল ওরা পাশাপাশি।

—অলোকদা এবার চলো। ওরা আবার সব এসে পড়বে?

—কারা? ডিংলু?

বোকার মতো চেয়ে থাকে কৃষ্ণা অলোকের দিকে।

হলুদ চাঁদের ঝিমঝিমে আলো। বালিয়াড়ির বালিকে আরো হলুদে করে তুলেছে। গৌরী ফিরে গেছে কিছুক্ষণ। খেলা আজ হয়নি বিকেলে। বসে আছে কৃষ্ণা বালিয়াড়িতে।

অদূরে অন্ধকারের মত চেহারা নিয়ে কে যেন ডোঙাটা টেনে তুলছে চড়ায়। ঠেলছে আর ডোঙাটাও খানিক উঠছে ওপরে। মোটা কাছি ঘুরিয়ে কাঁধে ফেলে চলতে শুরু করেছে ভারী ভারী পায়ে।

—ডিংলু—চেঁচিয়ে ডাক দেয় কৃষ্ণা।

এক পা চলেই থেমে পড়ে ডিংলু। যত দূরেই থাকুক ঠিক চিনতে পারে ওরা পরস্পরকে।

—কি আনলি রে দেখি।

—তোর জন্যেই এনেছি। দেখ!

শাঁখের একটা খোলস। অদ্ভুত গঠনের। কৃষ্ণার হাতে তুলে দিলে ডিংলু। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বার করে হাসছে। তখনো গা থেকে জল ঝরেনি। চাঁদের আলোয় চিক-চিক করছে। চওড়া বুকটা নিঃশ্বাস নেওয়ার সংগে সংগে ফুলে উঠছে। পেশীবহুল বাহু। একটা খণ্ড পাথর কেটে খোদাই করা যেন।

চাঁদটা আরও বড় হয়েছে ইতিমধ্যে। খোলসটা বার কয়েক দেখে বাড়ির দিকে পা বাড়াল কৃষ্ণা।

বিরাট এক কই-ভেটকি ধড়াস করে ফেললে ডিংলু পাষাণীর উঠনে। কুয়ো থেকে জল তুলছিল ব্রজদাসী। ঘাড়টা ফিরিয়েই দেখে ডিংলু।

—কী রে সমুদ্দুরের পো! অ্যাদ্দিন আসিসনি কেন রে? ঝগড়া হয়েছে বুঝি কৃষ্ণার সংগে? হাসতে থাকে ডিংলু, ব্রজ-দাসীর কথা শুনে। কিশোরী রায় বেরিয়েই চশমাটা তুলে বললে, বাঃ, বাঃ, চমৎকার। কে মেরেছে? তুই? তাহলে তুই-ই কিষণের বিয়েতে মাছ দিবি, বুঝলি? হাসতে থাকে ডিংলু, কিশোরী রায়-এর কথা শুনে।

বেরিয়েই কৃষ্ণার সংগে দেখা। লঙ্কা আম খাচ্ছে মজা করে।

—বাবুর এদ্দিনে দেখা মিললো। এক পশলা হাসি খেলে গেল ডিংলুর চোখে।

—চান করতে যাচ্ছি! যাবি? বললে কৃষ্ণা। চোখ দুটো চকচক করে ওঠে ডিংলুর। ছুটে চলে গেল ডিংলু। পেশী বহুল তামাটে শরীরে ভাস্কর্যের টুকরো টুকরো অন্ধকার তুলে।

ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেল ডিংলুর। কৃষ্ণা নেমে পড়েছে জলে। চান করছে সুখ-সাগরে। একদল জুটেছে। সরমা গৌরী, মঞ্জু, বেলা সব। প্রায় ছুটে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ডিংলু। অলোককে টেনে নিয়ে চলেছে কৃষ্ণা বেশি জলে। দু-হাতে টানছে কৃষ্ণা। প্রকান্ড একটা ঢেউ অলোকের হাতটা ছিনিয়ে নিলে। আর তারই টানে ঘুরপাক খেতে খেতে ডাঙগায় এসে পড়লো অলোক। হেসে ওঠে সকলে। ভারি মজা। কৃষ্ণার হাসি তো আর থামেই না। ডাঙায় দৃষ্টি পড়তেই দেখে ডিংলু। হাত-ছানি দিয়ে ডাক দেয় কৃষ্ণা ওকে।

ডিংলু নেমে পড়েছে জলে। আকাশ ছোঁয়া ঢেউ। ঢেউ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে কাটিয়ে নিচ্ছে অনায়াসে। পর পর ঢেউ টপকে চলে গেছে ডিংলু দূরে। ডাক দিচ্ছে কৃষ্ণাকে ওখান থেকে।

বালি খুঁড়ে জমা করছে অলোক। আঁক কাটছে নরম বালিতে।

চড়ার বালি তেতে আগুন। বাড়ি আসতেই ব্রজদাসী ধমকে উঠল। জ্বালাতন পোড়াতন করে মারলে। সত্যি, বিয়ে থা হয়ে গেলে বাঁচি।

গড়গড়ায় টান দিচ্ছে কিশোরী রায়। দাদুর খাটে শুয়ে কাগজে ছবির পাতা ওল্টাচ্ছে কৃষ্ণা।

—ঘুরে ঘুরে চেহারাটা কেমন হয়েছে, দেখছ দিদিভাই! এবার থেকে আমার সঙ্গে যেও, কেমন?

—তোমার সঙ্গে যে ভাল লাগে না দাদু!

—কেন, আমি আজকাল অনেক—

ছবির পাতায় কঠিন মন কৃষ্ণার। দাদুর কথায় আর কান নেই। ঘুমিয়ে পড়েছে সে দাদুর খাটে। মাথায় হাতটা ঝুলিয়ে আর্ম চেয়ারে তন্দ্রায় ঢলে পড়ে প্রৌঢ়।

ধাপসা খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল। অদূরে আলো বসে আছে বালিতে। রেখা ঝিনুক কুড়োচ্ছে তার নতুন সঙ্গী নিয়ে।

—সুন্দর! সুন্দর! দেখেছিস তোরা!

মাকে দেখেই সরমা গা' ঢাকা দিয়েছে। গৌরী বললেঃ হ্যাঁ। দেখে এলাম। রাজবাড়িতে।

—দেখেছিস! তবে আমায় নিয়ে চল্। গৌরী প্রমাদ গোনে। খেলাটা ভেঙে যায় যায়। বেশ জমে উঠেছিল। এমন সময় অলোক এসে উপস্থিত। ডাকে কৃষ্ণাকে।

—কি?

সকলেই মুখ টিপে হাসে। এ-ওর দিকে চেয়ে। কথাটা অজানা নেই। দিন প্রায় এক রকম ঠিকই হয়ে আছে।

বিয়েটা আসছে মাসে চুকে গেলেই হয়। ব্রজদাসী রোজই বলে। প্রৌঢ় শুধু বলেঃ সময়টা দেখে—

সময় কিন্তু বালুচরে পায়ের ছাপ রেখে এগিয়ে চলে। রেগে যায় ব্রজদাসী। কথাটা তাই আজ পাকাপাকি করেই এসেছে কিশোরী রায়। অলোকদের বাড়ি থেকে।

সমুদ্রতীরে ভিনদেশীর ভিড় দিনের পর দিন কমে আসে। অনেকে ফিরে গেছে। যাবে অনেকে। বেলা, রেখা, মঞ্জুরা চলে গেছে কয়েকদিন আগে। ইলা, ঊষারা যাবে চিল্কা। যাবার সময়ে বলে গেল বেলাঃ কলকাতা গেলে যাস্ ভাই! কী আমোদেই কাটল না? চুপ করে থাকে কৃষ্ণা। প্রতিবারের মত। যারা আসে যায়, বলে যায় অনেক কথা। সব কথা মনে থাকে না। আবার নতুন কথার ঝাঁক এসে পড়ে।

আসন্ন বর্ষার পূর্বাভাস মেঘলা দিনের খেয়ায়। পাষাণীর পাথুরে দেওয়ালে এবারে শ্যাওলা জমবে পুরু হয়ে। উড়ন্ত বালির কণা একাকার করে দেবে না আর ঘরদোর।

অলোক আর কৃষ্ণা। বসে আছে ঘরে। পাষাণীর কোণের ঘরে। পূর্বদিকের খোলা জানলা। জানলার সামনে দুটো চেয়ারে বসেছে ওরা। প্রহর শেষে আলোয় আকাশ আর সাগর একাকার হয়ে যাচ্ছে ওদের সামনে।

—আচ্ছা অলোকদা, তোমাদের ওখানে সমুদ্র নেই?

—না। উত্তর দেয় অলোক কৃষ্ণার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে।

—সেখান থেকে সমুদ্র কতদূর?

—অনেক—অনেকদূর!

হাতটা ফিরিয়ে নেয় কৃষ্ণা। সন্ধ্যার একক তারাটি জ্বলে ওঠে। রাতের তারা অসংখ্যের মাঝে মুখ লুকায়। সন্ধ্যাতারা তাই দিন-ফুরোন'র কথা বলে।

আজ কৃষ্ণার চুল বাঁধতে বসেছে ব্রজদাসী। জানলা দিয়ে হেমন্তের ঝিরঝিরে বাতাস লাগছে মুখে-চোখে। এলো চুল খোঁপায় খানিক জটিল হল।

গৌরী আজ আর আসবে না। সরমা আজ আর আসবে না। ভাবছিল কৃষ্ণা। বিকেলের দিকে নুলে পাড়ায় ঘুরে আসার কথাটা। বেশ খানিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদ ওঠার তাড়া নেই। উঠতে পারে শেষ রাতে। জানলার গরাদ ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছিল কৃষ্ণা।

হাজার জোনাকির আলো সাগরের ঢেউ-এ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছে কৃষ্ণা। কোথা থেকে যে উঠে আসছে সেই আলোর গুঁড়ো! ক্লান্তি নেই সে দেখায়। শ্রান্তি নেই সাগরের সে গান শোনায়। এর কোন শেষ নেই। মন জুড়ে একটি কান্না কথা কয়ে যায়। যার কোন শেষ নেই।

সাত সমুদ্দুর পার হ'য়ে ছুটে চলে তার মন। ছুটে চলে রহস্যভরা অতলান্তের পাথুরে পুরীতে। সাতটা ঘোড়ার লাগাম ধরে। সাত রাজার ধন ছড়িয়ে আছে গুহায় গুহায়। যার সন্ধান শুধু দিতে পারে ডিংলু।

ওই দূরে। যেখানে আকাশ, সমুদ্র হারিয়ে গেছে। যেখানে সাতরঙা ধনুকের ছিলার টানে উঠে আসে সন্ধ্যারাতের তারা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণা, মনে নেই।

রাতের তারারা কখন কথা বলা-বলি শুরু করেছে জানা নেই।

সরমার মায়ের বাড়াবাড়ি যাচ্ছে আজ ক'দিন। কৃষ্ণা আজ আর বাড়ি ফেরেনি রাতে। ডাক্তার পট্টনায়ক জবাব দিয়ে গেছে। ঘুম-হারা চোখ আর না-খাওয়া পেট। কতদিন আর টানবে। ক্লান্তি তাই ঝরে পড়ছে ঘামের মতো।

চৌকির কাছে সরে আসে কৃষ্ণা আরও। সারা দুপুরেই গেছে সরমাকে সামলাতে। সরমার মা প্রহরান্তে ডেকেছে কয়েকবার: সুন্দর! ক্ষীণস্বর ঘরের ও-দেয়ালে পৌঁছতে পারেনি। দুপুরে কৃষ্ণাকে কাছে ডেকে বলেছিল: রাজবাড়িতে বলিস। অনেক পরে আবার বলেছিল—মরে গেছি।

হয়তো মরে যাবে সরমার মা। মৃত্যু কিছু নতুন খবর নয়। আগের বছরে শীলা মারা গেল। তাতে ও কেঁদেছিল। শীলার বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল এখানে আসার অনেক পরে। কিন্তু সুন্দর কে?

হেমন্তের নতুন সকাল। শিশির হয়ে পড়ছে কুয়াশা টুপটুপ করে। ঘাসের ওপর আর কলতলার টিনের গা ঘেমেছে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে।

বৃষ্টি এখন পড়ে না। পড়েনি অনেক-দিন। কিশোরী রায়ের শরীরটা সেরেছে। বাতের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে প্রৌঢ় কিছু-কাল আগে পর্যন্ত।

ব্রজদাসীর ইচ্ছা মত কৃষ্ণার বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা যায়নি। গড়িয়ে গড়িয়ে কয়েক মাস গেল। অলোক অবশ্য ছুটি নিয়ে ফিরেছে দিন কয়েক। এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা চুকে গেলে বাঁচে ব্রজদাসী। বাঁচে। মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। সেই যে মাগীটা ম'ল, একটা ছোঁড়ার নাম করতে করতে! তারপর থেকেই।

দলছাড়া একটা সমুদ্রপাখি উড়ে গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল কৃষ্ণা বালির চড়ায় বসে। রোদ উঠেছে। মিষ্টি লাগছে রোদ্দুরটা। ঠিক এমনি একটা পাখি ডিংলু দিয়েছিল ওকে একবার। বরফের মতো সাদা। তুষার গুঁড়োর মতো নরম। পাখিটা মরা ছিল।

কৃষ্ণা বলেছিল—কেন মেরেছিস? ডিংলু বড় বড় চোখ দুটোকে আরও বড় করে তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণার দিকে।

কৃষ্ণা বলেছিল—মারবি না।

ডিংলু বলেছিল—মারব না।

কখন যে ডিংলু পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল ছিল না কৃষ্ণার। ডিংলুর প্রকাণ্ড ছায়াটা কাঁপছে।

কখন এলি?

উঠে পড়ে কৃষ্ণা। ডিংলুকে ডেকে নেয় সঙ্গে। কাঁকড়ার গর্তে গোড়ালি ঘুরিয়ে চারা কাঁকড়া ধরছে। আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে জলে।

ঝিনুক পুড়িয়ে চুন হচ্ছে ডাঙায়। কড়াই-গুলো ঢুকে গেছে বালিতে। জোয়ারের জল এসে জমবে। জমে নুন হবে। তারই পাশে বসল ওরা।

—তোর বিয়েতে ইয়া বড় একটা মাছ ধরব। বলল ডিংলু। তামাটে কালো মুখ থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্র ফেনার মতো দাঁত। চুপ করে রইল কৃষ্ণা।

—আচ্ছা ডিংলু! তুই কখন উলুপী দেখেছিস?

বোকার মতো চেয়ে থাকে ডিংলু। আর ঘাড় নাড়ে। আর চেয়ে থাকে।

—সমুন্দুরের মেয়ে। ওরা সব 'সেই পুরীতে থাকে!'

অসহায়ের মত মাথা নাড়ে ডিংলু। সে দেখেনি কোন সমুদ্রকন্যা। রোদ এসে পড়েছে ডিংলুর গায়ে। পেশীর খাঁজে খাঁজে ঢেউ-এর মতো টুকরো টুকরো অন্ধকার। চওড়া বুক সূর্যের আলোয় চক-চক করছে। সূর্যটা অনেক ওপরে।

সাদা রাত। সাদা বিছানায় ছড়িয়ে পড়েছে কালো চুলের রাশি। কৃষ্ণাও এলিয়ে দিয়েছে শরীরটা। ক্লান্ত চুলের মত।

বাড়ির হট্টগোল থেমেছে। অনেকেই এসেছে আজ সকালে। কাল সন্ধ্যায় লগ্ন। ঘুম আসে না। ঘুমোতে পারে না কৃষ্ণা। ক'দিনই। চোখের কোলে ঘুম হারানোর কাজল।

ঘুম আসে না। নিশি ডাকার মতো ডাকে একটা গান। একটা শব্দ। সুর। চেনা কথা। চেনা সুর।

কাল সন্ধ্যায় লগ্ন। ঘুম নেই রাতের চোখে। বিছানায় ছটফট করছে কৃষ্ণা। মেঝেয় শুয়ে ব্রজদাসী। অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

সাদা রাত আরও সফেন হয়েছে। গভীর রাত আরও নিদ্রালু হয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে কৃষ্ণার।

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে কৃষ্ণা। চলে আসে খোলা জানলার ধারে। না-তো! সরমার মা তো মারা গেছে অনেকদিন। তবে? ভীষণ গুমোট লাগে ঘরটা। বেরিয়ে আসে কৃষ্ণা বাইরে।

সমুদ্রের ঢেউ-এ চেনা কথার সুর! অসীম সমুদ্র। নীল পৃথিবী, সাদা রাত আর কৃষ্ণা একাকার হয়ে যাচ্ছে। সব একাকার হয়ে যাচ্ছে আজ রাতে। দাদু, অলোক, 'সুন্দর', সমুদ্র সব, সব।

কখন ছাদে এসে পড়েছে জানে না কৃষ্ণা। পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়েছে কনুইয়ে ভর দিয়ে। রাতের পাখি ডেকে গেল। ছোট ছেলের কান্নার মত। ঝিরঝিরে বাতাসে শেষ প্রহরের শব্দ। শিশির পড়ছে শব্দহীন। দূরে কে যেন যায়। ছায়ার মত কালো। কুচকুচে শরীরটা। কে যেন টানে ডোঙাটা। জলের দিকে। হ্যাঁ। ঠেলছে। ঠেলছে। বুকের মধ্যে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কৃষ্ণা। কালো লোকটা আর একটু পরে কালচে জলে মিলিয়ে যাবে।

ছায়ার মত ত্বরিতে নড়ছে শরীরটা।

পাঁচিলের ওপরে উঠে পড়েছে কৃষ্ণা। লাফিয়ে পড়েছে বালিয়াড়িতে। গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো চড়ায়। একটা কুকুর ডেকে উঠলো। বুকের আঁচল খসে বালিতে লুটোচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণা। ডোঙাটা এগিয়ে গেছে। জলের আরও কাছে। কালো লোকটা আর একটু পরে কালচে জলে মিলিয়ে যাবে। গুঁড়ো-করা কথার টুকরো ছড়িয়ে দেয় কৃষ্ণা সমুদ্রের হাওয়ায়।

চিৎকার করে ছুটে যায় কৃষ্ণা: ডিংলু—!

বিশ্ববিচিত্রা

যমজ রহস্য

ফ্রান্সের ছোট্ট একটি গ্রাম, যেখানে মোট বাড়ির সংখ্যা মাত্র একুশটি, কিন্তু পঁচিশ বছরে সে-গ্রামে বারো জোড়া যমজ শিশু জন্মগ্রহণ করে। ফলে স্থানটির নামই হয়ে দাঁড়ায় যমজ গ্রাম। ঐ গ্রামের এক অধিবাসী বলে যে চিকিৎসকরা এর কোন কারণ বলতে পারেন না; কাছাকাছি কোন গ্রামে কোন যমজ জন্মায়ওনি।

হিসেব থেকে কিন্তু দেখা যায় যে, পৃথিবীতে যমজ সন্তানের জন্মের হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যমজরা লোকের কাছে প্রিয়ও হয় এবং অধিকসংখ্যক মায়েরা তা কামনাও করেন, যদিও এই ঝোঁকটা সভ্য জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বহু দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যমজ-ভীতি দেখা যায়, কারণ তাদের বিশ্বাস যমজরা দুর্ভাগ্য আনে।

যমজ বৃদ্ধির কারণ কি? একজন প্রজননশাস্ত্রবিদের মতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং উন্নততর জীবনই এর জন্য দায়ী। অথচ চিকিৎসকেরা এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে রীতিমতো স্তম্ভিত।

বৃটেনে ১৯৪৭ সালের তুলনায় বর্তমানে প্রতি আশীজন মায়ের মধ্যে একজন যমজ সন্তানের জন্মদান করেন। দশ বছর ধরে তিন হাজার বৃটিশ যমজের বিবরণ সংকলন করে দেখা গিয়েছে যে, আটটি সন্তানসন্ততির পরিবারে আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলাদের মধ্যেই যমজ সন্তান জন্ম দানের সম্ভাবনা বেশী। এর পরই বেশী সম্ভাবনা সাতটি সন্তানের জননী সমবয়স্কা মহিলাদের, তারপর ছটি সন্তানের জননীদের এই আবিষ্কার হচ্ছে কেবলমাত্র সমধর্মী যমজের ক্ষেত্রে—হয় দুটিই পুত্র, দুটি কন্যা অথবা একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

একই রকম চেহারার যমজদের ব্যাপার কি? এরা সব সময়েই হয় দুটিই ছেলে অথবা দুটিই মেয়ে। প্রতি তিন জোড়া যমজের ক্ষেত্রে একজোড়া হয় একই চেহারার এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, যে কোন বয়সের মায়ের ক্ষেত্রেই এরূপ জন্মদান সম্ভব হতে পারে।

তবে একসঙ্গে দুটি বা ততোধিক সংখ্যক সন্তান কেন জন্মায় সেটা সঠিকভাবে কেউই বলতে পারে না। তবে এটা দেখা গিয়েছে যে, সমধর্মী যমজরা আকৃতি, স্বভাব এবং চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু

২৬ বছর আগে পশ্চিম জার্মানীর নুরেমবুর্গ শহরে হের কুপনার নামে এক দরজীর একই সংগে এই ৪টি কন্যার জন্ম হয়েছিল। জন্মের সময় এদের ওজন ছিল সাড়ে তিন পাউণ্ড থেকে চার পাউণ্ডের ভিতর। এর আগে ৪ জন একসংগে যতগুলি শিশুর জন্ম হয়েছিল, তারা কেউই এত বয়স পর্যন্ত বাঁচে নি। এদের জন্ম কিছুটা সোরগোল তুলেছিল এবং পশ্চিম জার্মানীর চিকিৎসকগণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগে এদের জীবনরক্ষা করেছিলেন। ছবিতে ৪টি বোনকে একত্রে দেখা যাচ্ছে। উপরের বাঁ দিক থেকে এরকা, মার্গা এবং নিচে হেনী ও মারিয়ানে

একই চেহারার যমজরা স্বভাব ও প্রকৃতিতে একই হয়।

যমজ সম্পর্কে কুসংস্কার অতি দ্রুত অপসৃত হতে থাকলেও এখনো বৃটেনের মতো সভ্য দেশেও তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এবারডীনশায়ারের কোন কোন অঞ্চলে আজো এই কুসংস্কার আছে যে, যমজরা বিয়ে করলে তাদের একজনের সন্তান জন্মাবে এবং একজন হবে নিঃসন্তান।

নর্দাম্পটনের কিংসথরপে "যমজের ছোট্ট রাস্তা" নামে পরিচিত স্থানে মায়েরা 'ডবল দেখে' বলে কথিত আছে। দশ মাসে সেখানে তিন জোড়া যমজ জন্মগ্রহণ করে।

কাউণ্টি ডাউনের এক আইরীশ মহিলা চল্লিশ বছর বয়সে পঞ্চম জোড়া যমজ সন্তান প্রসব করে প্রায় পৃথিবীর রেকর্ডে পৌঁছেছিলেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একই মায়ের সর্বাধিক সংখ্যক যমজ জন্মানোর রেকর্ড হচ্ছে এগারোটি। মহিলা সিসিলির অধিবাসী এবং তাঁর শেষ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে ১৯৪৭ সালে।

যমজরা দীর্ঘায়ু হয় কি-না সে বিষয়ে দেখা গিয়েছে, ওদের অধিকাংশই অল্প বয়সেই মারা যায়। তবে ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান শহরে দুটি যমজ কন্যার শতবর্ষ জন্মদিবস উদ্‌যাপনের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১৯৩১ সালে জাত একজোড়া বৃটিশ যমজ সন্তান ভিন্নভাবে খ্যাতি অর্জন করে। একজন ভূমিষ্ঠ হয় ডারহামে, আর অপরজন নর্দাম্বারল্যাণ্ডে। ১৯১৮ সালে ট্রেনে যাত্রী থাকাকালে এক মহিলার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্রে এবং অপরটি কানাডায়।

কানাডায় চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক মহিলার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করার চারদিন পর দ্বিতীয় কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথম কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হবার পর চিকিৎসকরা দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। চারবার সূর্যোদয় এবং চারবার সূর্যাস্তের পর দ্বিতীয় কন্যার আবির্ভাব ঘটে। একজন চিকিৎসকের মতে অপ্রত্যাশিত জটিলতা ব্যতিরেকে এই ধরনের বিলম্ব ঘটে শিশুদের ওজনের তারতম্য হেতু।

একই চেহারার যমজদের মধ্যে অনেক সময়ে অদ্ভুত যোগসূত্র থাকতে দেখা যায়। শত শত মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও এক জোড়া যমজ ভাই একই দিনে মারা যায়।

যমজদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তির সংখ্যা কেন কম মনোবিজ্ঞানীরা তার ব্যাখ্যা কঠিন বলে মনে করেন। তাঁদের একজন বলেন, সম্ভবত যমজরা পরস্পরের ওপর এতটা নির্ভরশীল হয়ে ওঠে যে, তারা উদ্যমী হয়ে উঠতে পারে না।

বহু যমজ ভাই একত্রে খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করে। বিখ্যাত গুটেরিজ যমজ ভাই দুজন তাদের সময়ে ভাল বক্সার বলে নাম করেছিল। ১৯১৬ সালে সোম্মের যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা দুজনে একই দিনে আহত হয়।

কাম্বারল্যাণ্ডের দুই যমজ ভাইয়ের চেহারা এমন অবিকল এক রকমের ছিল যে, ওরা দুজনে কেলস্ ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের হয়ে খেলতে মাঠে নামলে ওদের বাপ-মাও চিনতে পারতো না। একবার একটি ম্যাচ খেলায় রেফারি ওদের একজনকে তিনবার 'ওয়ার্নিং' দিয়ে—চতুর্থবার সে বেআইনি কাজ করেছে বলে অপর ভাইকে মাঠ থেকে বের করে দেয়।

মাঠের বিখ্যাত যমজ ক্রিকেট খেলোয়াড়-দ্বয় এলেক ও এরিক বেডসার চেহারায় এমনি অবিকল একরকম ছিলেন যে, ১৯৪৬ সালে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ওভালে খেলা দেখতে এলে ওরা মনে করেছিল যে তিনি ওদের চিনতে পারবেন না।

কিন্তু ষষ্ঠ জর্জ চিনতে ভুল করেন নি। পরে জানা যায় যে, তিনি খেলা দেখতে যাবার আগে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঐ দুই ভাইয়ের ফটো দেখে নিয়েছিলেন।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

নতুন বইয়ে পুরনো লেখা

সাহিত্য সংবাদ-এর জনৈক পাঠক প্রশ্ন করেছেন, 'প্রকাশক ও লেখকের যুক্ত সহযোগিতায় একই গল্পের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু-তিনটি পুরাতন উপন্যাসের একত্রিত সংকলন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়ে যুগপৎ পাঠক ও ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করছে, এ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি?'

কোনো মন্তব্য করার আগে বিষয়টি নিয়ে আমি সামান্য আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, স্বীকার করছি, 'দু-তিনটি পুরাতন উপন্যাসের একত্রিত সংকলন' চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, একমাত্র গ্রন্থাবলীতে ছাড়া। ভিন্ন নাম দিয়ে একই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আমার তেমন জানা নেই। তবে অনেক সময়, সাহিত্যের বেপাড়ায় চোরাগলিতে এরকম হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আমার বন্ধুজনোচিত উপদেশ, 'কিনিবার পূর্বে দেখিয়া লইবেন।'

বাঙলা উপন্যাসের সাধারণ অবস্থা এখন ভাল। কিছুকাল আগে, দশ-পনের বছর আগেও এ-অবস্থা ছিল না। আমি দু-চারটি এমন ঘটনা জানি, বেশ পুরনো উপন্যাস, যা একদা স্বল্প বিক্রি হয়েছে, যা বছর বছর ধরে উঁইয়ে কেটেছে, তেমন বই ইদানীং কেউ কেউ সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ করেছেন, হয়ত নামও পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু লেখক তাঁর বইয়ের প্রারম্ভে এ-স্বীকারোক্তিও করেছেন যে, এই উপন্যাসটি পূর্বে অমুক নামে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে তা সংশোধিত ও পরিমার্জিত করা হয়েছে।

বইয়ের নাম বদলানো উচিত কি অনুচিত, সে-প্রশ্ন এখানে বিবেচনা করার অবকাশ আমার নেই। কিন্তু, যদি এমন দেখি, নাম পরিবর্তন করার ব্যাপারটা লেখক গোড়ায় কবুল করে নিচ্ছেন, আমি তাঁকে সমন জারী করতে পারব না। কেননা, পাঠক বা ক্রেতা ত অন্ধ নন, বইয়ের পাতা উলটে নিশ্চয়, তিনি বই কিনবেন। অবশ্য, এই কবুল-পত্র না থাকলে নিশ্চয় লেখকের নামে সমন জারী করা যায়।

ছোট গল্পের বইয়ে নতুন ও পুরনো গল্পের মিশেল থাকে বলে পত্রলেখক যে আপত্তি জানিয়েছেন, সে-বিষয়েও আমি ভেবে দেখেছি। বাংলা ছোট গল্পের বই খুব একটা কাটে না। একবার একটি ছোট গল্পের বই বেরুলে এবং তা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর প্রকাশক তা ছাপতে চান না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মাত্র কয়েকজন অতিখ্যাত লেখকের এবং মাত্র কয়েকটি প্রচারিত গল্প-গ্রন্থেরই পুনর্মুদ্রণ ঘটে থাকে। সাধারণত নামকরা গল্প লেখকেরও একদা প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয় না।

আমি যতদূর জানি, বহু লেখকই মনে করেন, তাঁর পুরোনো গল্পের বই, যা ইদানীং আর পাওয়া যায় না, যা আর ছাপা হবে না, তার থেকে লেখকের পছন্দ মত দু-চরটি গল্প তুলে নেওয়া দরকার। দরকার এই কারণে যে, ওই গল্পগুলি নচেৎ চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে, নতুন পাঠক সমাজের চোখে পড়বে না। বস্তুত, এর মধ্যে কোনো অসাধু উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি না। বিদেশেও একই লেখকের একটি গল্প সংকলন থেকে কয়েকটি গল্প এবং তাঁরই অন্য আর-একটি সংকলন থেকে কিছু গল্প নিয়ে নতুন একটি গল্প-গ্রন্থ করা হয়ে থাকে। যেমন মোপাসাঁ বা লরেন্স-এর কত রকম গল্প সংকলন, কত নামে, কত বিচিত্র প্রকাশকের হাত দিয়েই না বেরুচ্ছে।

সব সময় আমরা ভেবে নিই, লেখক অর্থলাভের উদ্দেশ্যে উক্তরূপে 'প্রবীণ-নবীনের মিলন ঘটিয়ে থাকেন। হয়ত এক-আধটি ক্ষেত্রে তা সত্য, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়।

বই মেলা : একটি চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ছাব্বিশে শ্রাবণ সংখ্যার পত্রিকায় 'সাহিত্য-সংবাদ' বিভাগে শ্রদ্ধেয় বিদুর

মহাশয় পরিবেশিত 'চার গজ বই : একটি ভূমিকা' শীর্ষক রচনাটি সবটাই—বিশেষ করে প্রারম্ভিক 'প্যারাগ্রাফ' দুটি সত্যই স্থির-মস্তিষ্কে ভেবে দেখবার মত। কেননা, আমিও অনেকগুলি সংস্কৃতিমণ্ডপে ঢুকে দেখেছি, বইয়ের আরো অধিকসংখ্যক পাঠক প্রস্তুত করার মানসে সেখানে অন্যান্য হরেকরকম মনোহারী দোকানের মাঝখানে বই মেলার বা বই বিক্রীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা যে, পাশের সামনের প্রত্যেকটি স্টলের শতাংশের একাংশ দর্শক বা ক্রেতা তার ভাগ্যে জোটে নি। যদিবা জুটেছে, সেখানেও সত্যকার পুস্তক প্রেমিক আগন্তুক কজন, কজনই বা নেহাৎ শৌখিন কৌতূহল বশে এসেছেন সেটাও অনুসন্ধানযোগ্য।

এমত অবস্থায় কোন রসজ্ঞ পাঠকই নিশ্চয় ভুলেও বলবেন না যে, ওরকমভাবে বইয়ের মেলা বা প্রদর্শনী বসিয়ে সরস্বতী ঠাকুরনকে সর্বসাধারণের নিকট করুণার পাত্রী হতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাব, এবংবিধ বইমেলা বন্ধের দাবি উঠুক। তা সে শহরেই হোক, শহরতলীতেই হোক, আর দূর মফস্বলেই হোক না কেন। তবে যেখানে রথের মেলার কোনোরূপ সম্ভাবনা থাকবে না, সেখানে অবশ্য বই মেলার আপত্তিরও কারণ দেখি না। বিনীত।

কাশীনাথ চিন্যা, কলকাতা

শরৎচন্দ্র অথবা শরচ্চন্দ্র

গত সংখ্যায় শ্রীমদনমোহন শেঠ 'গৃহদাহ'-র শরৎচন্দ্র আর 'গল্পলহরী'র শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—"উক্ত বিভ্রান্তির বিষয়বস্তু সর্বৈব সত্য। তবে আমার যতদূর স্মরণে পড়ে, 'গল্পলহরী'র মানুষটি এবং 'হৃদয়ের চাঁদ' ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা ছিলেন শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়। নামের ক্ষেত্রে বানানের তফাতটুকু, বোধ করি, বর্তমান আলোচনায় উল্লেখ করা সংগত।"

'গল্পলহরী' পত্রিকা আমি কিশোর বয়সে দেখেছি—সম্ভবত ১৯৩৪-৩৫-এ। আমার স্মরণে শরৎচন্দ্র-ই ছিল শরচ্চন্দ্র নয়। তবে এই দীর্ঘ ব্যবধানে ভুল হ'তে পারে। সম্প্রতি শেঠ মশাইয়ের চিঠির পর আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে খবর নিয়েছি। সেখানে 'গল্প-লহরী' পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা নেই। তবে ১৯৩৯-এ প্রকাশিত শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চাঁদমুখ' বলে একটি বই আছে। অনুমান করি, শেঠ মশাই যাকে 'হৃদয়ের চাঁদ' বলছেন সেটি 'চাঁদমুখ'। নাও হতে পারে, কেননা জোর করে বলার মতন কোনো প্রমাণ আপাতত আর পাচ্ছি না। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীসাগরময় ঘোষের 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থটির ১৯ পরিচ্ছেদটি দেখতে বলি। ওই পরিচ্ছেদে (১৮৫-১৯৩ পৃঃ) শরৎচন্দ্রের নাম বিভ্রাট বিষয়ে দীর্ঘ করে লেখা আছে। এবং তাতে আমাদের আদি শরৎচন্দ্র, 'চাঁদমুখ' 'হীরক দুল' 'শুভলগ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক ও 'গল্পলহরী' পত্রিকার সম্পাদক শরৎচন্দ্রের বিষয়ে কেমন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর অনুরাগীরা কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা আছে। তার একাংশে এইরূপ লেখা আছে : "এই ঘটনার মাসখানেক বাদেই চাঁদমুখের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হল, "কনকাঞ্জলি"। টাইটেল-পেজ-এর সামনে আর্ট পেপারে পূর্ণ পৃষ্ঠা ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। তলায় লেখা আছে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (জুনিয়ার)। সেই সপ্তাহেই বাতায়ন পত্রিকায় আর্ট পেপারে শরৎচন্দ্রের ছবি ছাপা হল, তলায় লেখা ছিল "চরিত্রহীন" উপন্যাসের লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শেঠ মশাইকে আমার প্রশ্ন, যদি গল্প-লহরীর সম্পাদক তাঁর নাম "শরচ্চন্দ্র" লিখবেন তবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে কেন? উনি নিজেই স্বীকার করেছেন, বিভ্রান্তির বিষয়বস্তু সর্বৈব সত্য। আমার মনে হয়, ১৯৩৯-এ প্রকাশিত "চাঁদমুখ"-এর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের নামের সঙ্গে সহজে সন্ধি করে নেন নি। যা করলেও পরে করেছেন—নাম-গণ্ডগোলের সময় নয়। ইতি।

[illegible]

তিন নারী : সুখপাঠ্য তিনটি বড় গল্প

স্ত্রী—শ্রীবিমল মিত্র। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো কলিকাতা—৯। মূল্য—চার টাকা।

স্ত্রীচরিত্র দেবতাদেরও অজ্ঞাত, মানুষের তো কথাই নেই। বিমল মিত্র বুঝি তা সহজে মেনে নিতে রাজী নন। অন্তত তাঁর "স্ত্রী" নামক বইটি পড়লে এ-কথাই মনে হবে।

গ্রন্থটিতে তিনটি গল্প আছে: "স্ত্রী", "স্ত্রীজাতক" ও "স্ত্রীলোক"। বলা বাহুল্য গল্প তিনটির নামকরণের মধ্যেই স্ত্রী-চরিত্রের বৈচিত্র্যের আভাসটি তুলে ধরেছেন লেখক। তিনটি গল্পকে ইংরেজীতে এক কথায় বলা যেতে পারে, "Three faces of Eve"। বিমল মিত্র নারীর তিনটি রূপ যেন এ'কেছেন তাঁর তিনটি গল্পে। তিনটি গল্পের মধ্যেই রয়েছে নারীচরিত্র-রহস্যের উদ্ঘাটন।

প্রথম গল্পটির যিনি নায়িকা—অর্থাৎ যিনি "স্ত্রী"—তিনি বড়বাড়ির কুলবধূ। দত্তবাড়ির বউরানী। অসূর্যম্পশ্যার মতই তাঁরা বন্দিনী হয়ে থাকেন বড়বাড়ির অন্দরমহলে। বউরানীর ঘরে কর্তাবাবু শোবেন, এমন ঘটনা শুনলে সবাই তাজ্জব হয়ে যায়। কর্তাবাবুদের রাত কাটে গণিকা আর রক্ষিতাদের নিয়ে। কিন্তু বিলাস ও বৈভবের নাগপাশে নারীর জীবন-বাসনাকে কি বেঁধে রাখা যায়? বউরানী মারা যাবার কয়েক বছর পর, একমাত্র ছেলের বিয়ের দিন বাড়ির কর্তাবাবু জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্বৈরিণী। জানতে পারলেন দত্তবাড়ির একমাত্র কুলতিলক তাঁর নিজের সন্তান নয়।

"স্ত্রীজাতক" গল্পের নায়িকা এমন এক নারী, যার মুখ দিয়ে কদাচ কোনো অসাধারণের কথা বেরোবে না। —সমাজে প্রতিষ্ঠালাভই এই নারীর একমাত্র কাম্য, আত্মসুখই তার একমাত্র স্বপ্ন। বুদ্ধি খাটিয়ে আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের "ফ্লার্ট" করে স্বামীর পদোন্নতি ঘটালেন এই নারী, সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। আধুনিককালে "সোসাইটি বাটারফ্লাই" যাদের বলা হয় এই নারী তারই এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

"স্ত্রীলোক"-এর নায়িকার চরিত্র অন্য-রূপ। ব্যক্তিত্ব, মায়া, মমতা, স্নেহ দিয়ে গড়া তার চরিত্র। এক নেটিভ স্টেট-এর রাজমাতা ইনি, সবাই ডাকে মা-সাহেবা বলে। মা-সাহেবার অনুপস্থিতিতে রাজ্যে ফাঁসি-ঘর তৈরী হল। ফাঁসিঘরে প্রথম ফাঁসি হবে এক আসামীর। ফাঁসি হতে আর দু' ঘণ্টা বাকী। শেষ মুহূর্তে নারীর অনুকম্পার কাছে হার মানল মানুষের গড়া আইন, আর শাস্তির বিধান।

গল্প তিনটির ঘটনা ও পরিবেশের বৈচিত্র্য পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে রাখবে। গল্প বলার এক সহজ-সরল ও অন্তরঙ্গ কৌশল বিমল মিত্র'র করায়ত্ত। তাই তাঁর গল্প শুরু থেকে পাঠকের কৌতূহলকে উজ্জীবিত করে রাখে। আলোচ্য গ্রন্থের গল্প তিনটিও এই গুণে সমৃদ্ধ এবং সুখপাঠ্য।

৪৪।৬১

পুস্তক পরিচয়

প্রেমের উপাখ্যান : উপন্যাস

অতন্দ্রী—প্রবোধবন্ধু অধিকারী। বসু-চৌধুরী, ৬৭।এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

উপন্যাস সাহিত্যে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইদানীং বাংলা সাহিত্যের মর্জি ফিরেছে। কেবলমাত্র পটভূমি আর বিষয়-বস্তু নয়, হরফও বদল হয়েছে। উপন্যাস

একদিন সাহিত্যের অপরাপর শাখাকে গ্রাস করবে এমন দুঃস্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম। বিশেষ করে উপন্যাস যার ওপর ভর করে আছে সেই গল্পকে, অর্থাৎ ছোটগল্পকে। আজ আমরা সেই সঙ্গমে পৌঁছেছি যেখানে কবিতা-নাটক-ছোটগল্প সবই উপন্যাসের জঙ্গমবৃত্তির অন্তঃশায়ী হয়েছে। বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান, তার ক্রিয়াকলাপে কলাপ বিস্তার করেছে। সেই কারণেই এই চতুরঙ্গ-চেতন শিল্পকর্মের সমালোচনা সাবধানে করতে হয়। আকস্মিক হতাশা এখানে ভ্রান্তির কারণ হতে পারে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধবন্ধু অধিকারীর নবতম উপন্যাস অতসী পড়লাম। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি তরুণ এবং প্রতিষ্ঠিত-প্রায়। অতসী বহিরঙ্গে উপন্যাস হলেও স্বভাবত ছোটগল্প। অন্তত ছোটগল্পের মূর্চ্ছনাএর চরিত্রে। উপাখ্যানটি প্রেমের। বাংলা সাহিত্যের সেই বহুশ্রুত বাল্যপ্রণয়। কিন্তু আধুনিক বাতাবরণে ধরা। বর্তমান কালের মন মনন এবং যৌবনে তার বিশ্লেষণ। অতসী যেন আতস কাঁচ। বাল্য-প্রণয় এবং কৈশোরকে বৃহত্তর এবং জীবন-প্রান্তিক করে দেখার। ব্যর্থ প্রেম চিরকালই আত্মভুক, কখনো কখনো আত্মহন্তা। গল্পের নায়ক মণিশংকর তাঁর অসফল প্রেমে নিজেকে নিঃস্ব এবং ধ্বংস হয়ে যেতে দেখলেন।

কিন্তু মনিশংকর গৃহস্থ হয়েছিলেন, সন্তানও জন্মেছিল। তাঁর স্ত্রী আশা, তাঁর পুত্র জীবন। একদিক থেকে একালের জীবন স্বৈরণ-জীবন, কারণ আমরা কর্মের মধ্যে দিয়ে বাঁচি না, আশায় বাঁচি। এবং এই আশা আমাদের জীবনের উত্তরাধিকার দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সেই জীবনকে বাঁচানো, তাকে নিজের বক্ষের উত্তাপে ও আশ্রয়ে লালন-পালন করার দায়িত্ব অতি কঠোর। অতসী সেই কথাই বলেছিল। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজে আমরা বংশ পরম্পরাগতভাবে তা দেখেছি।

তবু বলতে হবে মণিশংকরের প্রেম এবং এই উপন্যাসের জীবন-পটভূমি বিশাল হতে পারেনি। ব্যর্থ প্রেমের দাহ তত তীব্র হয়ে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। আশার উপ-আখ্যান অতসীর প্রতি মণিশংকরের মানস-সর্বস্বতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। অথবা এযুগেরই ট্র্যাজেডি এই রকম। কোথাও স্থিতি নেই।

গল্প কথনের পাশাপাশি আধুনিকরীতি-সুলভ স্বতশ্চল আত্মচৈতন্যের মগ্নধারাটিকে প্রবাহিত রাখা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে নায়কের মানসিক জটিলতা ও সংঘাত ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই বুননের কাজে প্রবোধ-বাবু আর একটু সতর্ক হলে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিতেন। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। ২১৩।৬২

নাটকের কথা

নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ। ডঃ সাধন-কুমার ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নাটক বিচার এখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ছাত্রের অধীত এলাকা নয়, দর্শক এবং পাঠকের ক্রম-জাগ্রত আগ্রহ এবং অনুরাগ নাট্যতত্ত্বের দিকে প্রধাবিত। অবহেলিত রঙ্গমঞ্চে আবার নবনাট্য আন্দোলন, নাটকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা দিয়েছে। শখের এবং বেশখের অভিনয়ের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব অনুভব করা যায়।

ডঃ সাধনকুমার অনেক কাল থেকেই অধ্যাপনা প্রসঙ্গে নাট্য-সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব নিয়ে চর্চা-আলোচনা করে আসছেন। ইদানীং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ততটা মনোযোগ না রেখে পাঠ্য এলাকার বাহিরে, নাটকের যে স্বাধীন সাবালক স্ফূর্তি সম্প্রতিকালে দেখা দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

নাট্য উপস্থাপনা, আন্দোলন, প্রয়োগরীতি, আধুনিক শিল্পী ও শিল্প, গণতন্ত্রে নাট্য-শিল্পের ভবিষ্যৎ, বর্তমান দিকদর্শন, একাংক নাটিকা প্রভৃতি বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিডি ও কমেডির পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানি সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে বলে আশা করি। ১৭০।৬০

অভিযান কাহিনী

গঙ্গানদীর উৎসে—ভোলা চট্টোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দু' টাকা।

ভারত-সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য ধারার বহমান প্রবাহরূপে গঙ্গানদী তার বিচিত্র গতিপথের এবং ভারতীয় জীবন বিকাশের মাধ্যমে ভারতমানসে এক রমণীয় অতীত থেকে বিশিষ্ট ভূমিকা অধিকার করে রয়েছে। লেখক শ্রীযুক্ত ভোলা চট্টোপাধ্যায় গঙ্গা-প্রবাহের গতিপথ অনুসরণ করে তার উৎসে, গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তে পৌঁছোবার শ্রমসাধ্য পরিশ্রমের মধ্যে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিসর্গদর্শনের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছেন তা বর্তমান গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

বর্তমান অভিযাত্রী গ্রন্থটি নাতিদীর্ঘ, কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাষায়, 'মহাদেবের জটা হইতে' যে নদীর উৎপত্তি সেই চিরন্তন রহস্যময় উৎসধারা ও পরম-রমণীয় পরিবেশের রূপঘন বর্ণনা লেখকের অভিজ্ঞতা আশ্চর্য আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোমুখ সম্পর্কে অভিযানাগ্রন্থ

পাঠক ও ভ্রমণকারীদের অদম্য কৌতূহল বর্তমান—বর্তমান লেখক গোমুখের সন্ধানে যে ভাবে পরিভ্রমণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর। আজকাল অভিযাত্রী শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব নেই, কিন্তু অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই তা যাত্রাপথের নিছক বিবরণমাত্র; পরিবেশনার ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতার আলোকে হৃদয়ের একান্ত উত্তাপ অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে। সুখের কথা, 'গঙ্গা-নদীর উৎসে' সেদিক থেকে ব্যতিক্রম।

কিশোর সাহিত্য

কেমন করে এল এরা—ইন্দিরা দেবী। ৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

এই পুস্তিকাখানিতে আগুন, টিক্ টক্ টিক্ (ঘড়ি), কাগজ, চা, কাঁচ, লোহা, যানবাহন ও কয়লা—এই আটটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল তাহা অতি সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে ছোটদের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ছোটদের জন্য এরূপ পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশন অত্যাবশ্যক। ২৪৯।৬২

ঘুম-ভাঙানী ছড়া—সুকমল দাশগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীরমেশ সোম। ৭০এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা—১৪। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে গ্রন্থকার বিশেষভাবে পরিচিত। আলোচ্য পুস্তিকায় ছড়া ও ছবির মাধ্যমে সরকারী পরিকল্পনার শক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছোটদের জন্য রচিত ছড়াগুলি আরও একটু প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইলে সহজবোধ্য হইত। ছবিগুলি ছোটদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। ১৮৪।৬২

কুটুস—শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ। ক্যালকাটা বুক এজেন্সি, ৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। শোভন সংস্করণ এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কুটুস—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী মুখরোচক একটি ছোট গল্পের বই। কুটুসকে লক্ষ করিয়াই এই পুস্তিকাখানি রচিত হইয়াছে। এই গল্পটির বিষয়বস্তু উপদেশাত্মক না হইলেও নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। অসংখ্য ছবি পুস্তিকাখানির বিশেষ আকর্ষণ।

বিবিধ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস; ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশ্ববিশ্রুত রসায়নবিদ্, দেশহিতব্রতী, দরিদ্রবৎসল, কর্মযোগী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী জীবনেতিহাসের সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থকার ভূতপূর্ব রাজনৈতিক কর্মী এবং তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্রের মহান চরিত্রের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত নিখুঁতভাবে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক কর্মবীর প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মজীবনের যাবতীয় ঘটনাবলী যেভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জাতীয় জীবনীগ্রন্থের প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়। ৩৪।৬২

* রঙ্গজগৎ *

জাতীয় ট্র্যাজেডি

ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলছে। এমনি সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের যদি অবনতি ঘটে তবে তা "জাতীয় ট্র্যাজেডি"রই সমতুল্য হবে—সম্প্রতি কলকাতায় বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের জয়েণ্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী এই মন্তব্য করেন। শ্রীরেড্ডী এই প্রসংগে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলা ছবির নেতৃত্ব ও শিল্প-উৎকর্ষের কথাও বলেন। বলা বাহুল্য, বাংলা ছবি অনুরাগী মাত্রই শ্রীরেড্ডীর ভাষণে সন্তোষ প্রকাশ করবেন। বাংলা ছবির সংকটমোচনে শ্রীরেড্ডী কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাও বাংলা চলচ্চিত্রসেবীদের মনে আশার সঞ্চার করবে।

বাংলা ছবির বর্তমান সংকটের কারণ নির্ণয়ের জন্য শ্রীরেড্ডী রাজ্য সরকারকে একটি তদন্ত কমিটি স্থাপনের যে অনুরোধ জানিয়েছেন, আমরা সে প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্গতিমোচনের পথটি খুঁজে পাবেন। শ্রীরেড্ডী রাজ্য সরকারকে একটি ফিল্ম অ্যাডভাইসার কমিটি স্থাপনের প্রস্তাবও জানিয়েছেন। এই কমিটি যেন চলচ্চিত্রব্যবসায়ী ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষকে মফস্বল এলাকায় অধিক সংখ্যায় চিত্রগৃহ নির্মাণের কাজে উৎসাহিত করেন, শ্রীরেড্ডী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি, রাজ্য সরকার শ্রীরেড্ডীর সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলি অনতিবিলম্বে কার্যে পরিণত করবেন। কারণ, বাংলা চলচ্চিত্রমহলে আজ যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছে তা যদি অবিলম্বে দূর না হয় তবে চলচ্চিত্রসেবীরা দুরবস্থার সংগে সংগ্রাম করার উৎসাহ ও শক্তিও হয়ত হারিয়ে ফেলবেন। চলচ্চিত্রসেবীরা যদি দেখেন যে, বাংলা ছবির সংকটমোচনে রাজ্য সরকার তাঁদের সহায় হয়েছেন তবে নিরাশার মধ্যেও তাঁরা আশার আলো দেখতে পাবেন।

বিভূতি চক্রবর্তী পরিচালিত চিত্রসংসার-এর "শেষ চিহ্ন" ছবিতে কমল মিত্র ও সন্ধ্যা রায়

অভিযাত্রিক প্রযোজিত সত্যজিৎ রায়ের আগামী চিত্রোপহার "অভিযান"-এর (হিন্দী ও বাংলা) নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান ফটো—দেশ

ভারতীয় চলচ্চিত্র-সমীক্ষা

প্রেম ভারতীয় ছায়াছবির মূল আখ্যান-উপজীব্য।

ইউনেস্কো এবং ইণ্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ভারতীয় ছবি ও চিত্রতারকা সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিশদ গবেষণা কার্য সম্পন্ন হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে তৈরী মোট ৩০টি ভারতীয় ছবি নিয়ে গবেষণা করা হয়। এবং গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রেমই ভারতীয় ছবির প্রধান বিষয়বস্তু।

গবেষকরা ৩০টি ছবি বিশ্লেষণ করে দেখেন, এই ছবিগুলির ১১১টি প্রধান চরিত্রের মধ্যে ৬৩টি পুরুষ চরিত্র এবং ৪৮টি স্ত্রী চরিত্র। এবং এই সব চরিত্রের শিল্পীদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে।

প্রণয়-ভূমিকার সব শিল্পী সুশ্রী বলে গবেষকরা মন্তব্য করেন। এবং অভিনীত চরিত্রের আচরণ ব্যবহার ভদ্রোচিত বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, ৩০টি ছবির কোনটিতেই সমাজের বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী জীবন রূপ নেয়নি। শুধু কোন এক পরিবারের পটভূমিতেই চিত্রকাহিনী রূপায়িত হয়েছে।

ছবিগুলির পুরুষ চরিত্ররাজির তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, এদের অধিকাংশই অবিবাহিত এবং নায়িকাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল। পারস্পরিক

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত টাস ফিল্মস-এর "অভিসারিকা" (পরিচালনা : কমল মজুমদার) ছবির নায়ক-নায়িকা নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

আকর্ষণের ভিত্তিতেই ভারতীয় ছবির প্রণয় গড়ে ওঠে বলে গবেষকরা মনে করেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, ছবির নায়কের রাজনীতিক বিশ্বাস বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলনে আগ্রহান্বিত এমন কোন চরিত্রকে নায়করূপে দেখা যায়নি।

পরীক্ষিত ৩০টি ছবির মধ্যে ২৮টি ছবি শেষ হয়েছে নায়ক-নায়িকার সুখমিলনে। এবং এই মিলন ভাগ্যের বিধানেই ঘটেছে। ব্যতিক্রমের মধ্যে দেখা গেছে যে, একাধিক সচ্চরিত্র নায়ক কাহিনীর পরিণতিতে সুখী হয়নি। কিন্তু অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে মৃত্যুতেই তাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, খল-চরিত্ররা ছবিতে যথারীতি শাস্তি পেয়েছে। ৩০টি ছবিতে পাঁচজন খলচরিত্রের মৃত্যু দেখা গেছে।

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে একটি বাংলা ও একটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবিটি হল : **শেষ চিহ্ন** (চিত্রসংসার) এবং হিন্দী চিত্রটির নাম **প্যার কি জিত**।

বিভূতি চক্রবর্তী পরিচালিত "শেষ চিহ্ন" ছবিটিতে একটি নাট্যাবেগমণ্ডিত সামাজিক কাহিনী রূপায়িত। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, লিলি চক্রবর্তী, রেণুকা রায় ও তুলসী চক্রবর্তী ছবির প্রধান শিল্পী। রথীন ঘোষ ছবির সুরকার।

"প্যার কি জিত"-এর বিষয়বস্তুর পরিচয় ছবিটির নামরণেই প্রকাশ পাচ্ছে। মহীপাল, ইন্দিরা, হীরালাল, মোহন চটি ও নবাগতা কল্পনা ছবির মুখ্য শিল্পী।

* চিত্র-সমালোচনা *

দর্শকের চিত্তবিনোদন ছায়াছবির প্রধান লক্ষ্য। বিচারের বস্তু হল শুধু লক্ষ্যভেদের উপায়। কোন্ ছবি কী উপায়ে আমাদের শর্ত পূর্ণ করল তার ওপরই ছায়াচিত্রের কৌলীন্য নির্ভর করে। এমন একদিন ছিল যখন নাট্যধর্মী ছবিই কুলীনশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। এ ধরনের ছবির আবেদন আজকের যুগেও তিরোহিত নয়। আজকের দিনেও এমন দর্শক আছেন—হয়ত তাঁদের সংখ্যাই অধিক—যাঁরা ছায়াছবিতে নাট্যাবেগের স্পর্শটুকু পেলেই সন্তুষ্ট। শিবানী ফিল্মস-এর "মায়ার সংসার" এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক-শ্রেণীর মনোরঞ্জনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

অজয় করের পরিচালনায় নির্মীয়মান আর ডি বি অ্যান্ড কোং-এর "সাত পাকে বাঁধা" ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, এ ছবির কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় হৃদয়বৃত্তিতে বিশ্বাসী, বুদ্ধি-বৃত্তিতে নয়। তাই হৃদয়ানুভূতিই এ ছবির প্রধান উপজীব্য। এমন কি, ছবিতে হৃদয়ের দাবির কাছে বুদ্ধি এবং যুক্তি একাধিকবার নতি স্বীকার করেছে। যে-হেতু সাময়িক চিত্তপ্রসাদ আর সব অভাব ভুলিয়ে দেয়, ঠিক এই কারণে এ ছবিও যুক্তিবাদীর মনের প্রতিবাদ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে রাখে।

ছবির নায়িকার নাম মায়া। সচ্চরিত্র ও সুগায়ক স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে গড়ে উঠেছে মায়ার সুখের সংসার। এক খল-চরিত্রের নির্মম প্রতিহিংসাপরায়ণতার ফলে মায়ার সংসারে কীভাবে দুঃখের কালো ছায়া নেমে এল, মায়া কী করে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর-কাল স্বামীবিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করল ও পরে কেমনভাবে তাদের পুনর্মিলন ঘটল এবং মায়ার সংসার আবার কানায় কানায় সুখে ও শান্তিতে ভরে উঠল তা নিয়েই চিত্র-কাহিনীর বিস্তার। মায়ার বড় ছেলে কীভাবে পিতামাতার স্বপ্ন ও সাধ পূর্ণ করে সুগায়করূপে প্রতিষ্ঠা পেল, প্রণয় ও পরিণয়ে তার জীবন কী করে মধুময় হয়ে উঠল এবং অন্য দিকে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত-মানসে স্ত্রীর আত্মহনন কেমনভাবে খলচরিত্রের জীবনে নৈতিক রূপান্তরসাধন করল তা নিয়ে ছবির দুটি প্রধান উপকাহিনী গঠিত।

ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করে কাহিনীকার-পরি-চালক মুখোপাধ্যায় যে চিত্র-নাটকটি ছবিতে উপস্থিত করেছেন তার নাট্যগুণ অনস্বীকার্য। যে কাহিনী ছবিতে চিত্রায়িত তা আসলে একটি নাটক। এবং নাট্য-চমকের প্রয়োজন অগ্রাধিকার পেয়েছে বলেই বুঝি ছবিতে সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্নটি এত সহজে উপেক্ষিত। তবে কাহিনীকার-পরিচালক যে তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হন নি, প্রেক্ষাগৃহের পুলকিত, অভিভূত দর্শকরাই তার প্রমাণ। এ ছবিতে সুখাবেগ, করুণ রস, প্রণয়, রোমাঞ্চ, কৌতুক, গান প্রভৃতি বহুবিধ আমোদ-উপকরণ সুগ্রথিত বিন্যাসে সন্নিবিষ্ট। এই উপকরণরাজি ছবির প্রমোদ-আবেদন বাড়িয়েছে।

পরিচালক হিসাবে কনক মুখোপাধ্যায়

ছবিটিতে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরের দৈনন্দিন ছোটখাটো ঘটনার ভেতর দিয়ে মরমী ও মানবিক রসসঞ্চারের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রয়োগ-কর্মে দু-একটি সুন্দর ব্যঞ্জনার পরিচয় মেলে। "সদা সৎপথে চলিবে" লেখাটির ওপর পা দিয়ে খলপুরুষের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। চিত্র-নাট্যকাররূপে তিনি ছবির অপ্রধান উপাখ্যানের বাহুল্য-বিস্তার বর্জন করেছেন। ফলে মূল কাহিনী কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে নি। ছবির কয়েকটি সংলাপ মনে রাখার মত। অতিনাটকীয়তায় আস্থাশীল হয়েও পরিচালক ছবিতে কয়েকটি নাট্যদ্বন্দ্ব-মুহূর্ত সৃষ্টির নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তবে নাটক সব ক্ষেত্রে আতিশয্য ও কৃত্রিমতা এড়িয়ে চলতে পারে না। এ ছবিতেও তা সম্ভব হয় নি। তাই ছবির কিছু ঘটনা ও একাধিক চরিত্র-রূপ কষ্টকল্পনার দোষে দুষ্ট।

ছবিতে যাঁদের অভিনয় দর্শককে প্রশংসা-মুখর করে তোলে তাঁরা হলেন অসিতবরন, বিকাশ রায় ও সন্ধ্যারানী। মায়া ও তার স্বামীর ভূমিকায় যথাক্রমে সন্ধ্যারানী ও অসিতবরন তাঁদের সংবেদনশীল ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শকমনকে অতি সহজেই আবিষ্ট করে রাখেন। বিকাশ রায় খলচরিত্রের অভিনয়ে যে তুলনারহিত তা এ ছবিতে আবার প্রমাণিত হল। এই শক্তিমান নট তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের আরও প্রমাণ দিয়েছেন ছবিটিতে। পূর্ব পাপকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় নায়ককে চিৎকার করে ডেকে নিজের অপরাধ-ক্ষালনের সদিচ্ছা জানানোর সময় তাঁর অভিনয় দর্শকের চক্ষু অশ্রুসজল করে তোলে।

ছবি বিশ্বাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন এক স্নেহশীল উদার বৃদ্ধের চরিত্রে।

ছবির দুই কণ্ঠশিল্পী ও রোমাণ্টিক নায়ক-নায়িকার চরিত্রে যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী স্বচ্ছন্দ ও চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। খলচরিত্রের স্ত্রীর ভূমিকায় দীপ্তি রায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। ছবির অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, নবগোপাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, শিখা বাগ, তিলক ও মালা বাগ। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, রথীন ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সুধীর রায়চৌধুরী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়।

রবীন চট্টোপাধ্যায় আবহ-সংগীত রচনায় ছবির নাট্যমুহূর্তের রসটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গানের সুরারোপেও শ্রী চট্টোপাধ্যায় অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখেন। ছবির গানগুলি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুগীত এবং সুখশ্রাব্য।

কলাকৌশলের সকল বিভাগ পরিচ্ছন্ন। এর মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংসনীয় আলোক-চিত্রগ্রহণ (দেওজীভাই), সম্পাদনা (অমিয় মুখোপাধ্যায়), শব্দগ্রহণ (সত্যেন চট্টোপাধ্যায়) এবং শব্দপুনঃযোজনা (শ্যামসুন্দর ঘোষ)।

সম্প্রতি মাস থিয়েটার্স অভিনীত "গভর্নমেণ্ট ইনস্পেক্টার" নাটকের একটি দৃশ্যে কল্যাণী অধিকারী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলী চক্রবর্তী

দর্শকের রায়

বাংলা ছবি ও আমি

"সিকিউরিটি"র চেয়ে প্রেম বড়

কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু এসে বলেছিল—জানিস, মেয়েদের ভালবাসা বাজে কথা। ওরা কেবল চায় অর্থ আর প্রতিষ্ঠা। তাই প্রেমিকের মনের চেয়ে মানের দামটা ওদের কাছে অনেক বেশী। জানতাম, বন্ধুর প্রেমিকা কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে অন্য একজনকে, তাই বন্ধুর মনের এই প্রতিক্রিয়া। এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারি নি সেদিন। কিন্তু এই প্রশ্নের আশ্চর্য সমাধান খুঁজে পেলাম "কাঞ্চনজঙ্ঘা" দেখে। অলকানন্দা রায়কে দিয়ে এন বিশ্বনাথনের "সিকিউরিটি"কে উপেক্ষা করালেন সত্যজিৎ

বসুশ্রীতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে দ্বৈত-সংগীতে কণ্ঠদান করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার ফটো—দেশ

রায়। প্রেম জয়ী হল। অবশ্য এর জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘার মত মহান পরিবেশ হয়ত অনেকটা সাহায্য করেছে। কলকাতায় এই "সিকিউরিটি"র প্রশন উঠলে রায়বাহাদুরের মেয়ে হয়ত তা গ্রহণ করতেন। তবুও আমার ধারণা হয়েছে—প্রেমের সঙ্গে "সিকিউরিটি"র প্রশন কিছুটা জড়িয়ে থাকলেও, প্রেমই হবে জয়ী।

অশোক কুণ্ডু
কলকাতা-৬

একজনকে মুক্তি দিতে পেরেছি

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" আমাকে অনেক "হিউম্যান" ও "প্র্যাকটিক্যাল" করেছে। বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের জীবনের সেই সমস্যার সমাধান আমার জীবনেও কার্যকর হয়েছে। আমিও সহজভাবে একজনকে মুক্তি দিতে পেরেছি। "কাঞ্চনজঙ্ঘা" না দেখলে সেটা সম্ভব হ'ত না।

দেবব্রত সেনগুপ্ত
চুঁচুড়া

না পাওয়ার বেদনায় শান্তি

যা পেয়েছি তাতে মন তৃপ্ত হয় না। সে আরও পেতে চায়। এবং এই পাওয়ার আশায় সে অস্থির হয়ে ওঠে। চন্দ্রনাথের ("আগুন" ছবিতে) অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণপ্রাচুর্যের উদ্‌ভ্রান্ত গতিবেগ—যা তার জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছিল—মনের সেই না-পাওয়ার বেদনাকে কিছুটা শান্ত করে দেয়।

মায়া রায়
কলিকাতা-৩৩

যে ছবি ভালবাসি

সুঅভিনীত, সুরুচিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী-সম্বলিত ছায়াছবি আমি পছন্দ করি। এমন বাংলা ছবিও তৈরি হয় যা আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য—যেমন "কাঞ্চন-জঙ্ঘা"। কিন্তু "কাঁচের স্বর্গ", "ক্ষুধিত পাষাণ", "সপ্তপদী" ইত্যাদি ছবি উঁচুদরের হলেও উপভোগ্য।

অমলকান্তি বিশ্বাস
সাহিবগঞ্জ, সাঁতাল পরগনা

আমি সেই ধরনের ছবি দেখতে ভালবাসি—যা দেখে মনে হয় এটি শুধু ছবিই নয়, সত্যিকারের এক ঘটনা। সত্যজিৎ রায়ের "কাঞ্চনজঙ্ঘা" তাই এ পর্যন্ত আমার দেখা ছবিগুলির মধ্যে সব চাইতে প্রিয় ছবি। দুটি ঘণ্টার কাহিনী দুটি ঘণ্টাতেই সিনেমায় দেখানো হয়েছে—হল থেকে বেরিয়ে মনে হল যেন সত্যিকারের এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম।

গিরিজাশংকর চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৯

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ চতুর্থ আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একমাসব্যাপী উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে।

গত শুক্রবার আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে পর্ষদের

সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত তথ্যটি প্রকাশ করেন। উৎসবের প্রচার শাখা সমিতির সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার, পর্ষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য এবং পর্ষদের অন্যতম সভ্য শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এই বৎসরের উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিশু প্রতিনিধি দল যোগদান করবে বলে পর্ষদের কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন। তাঁরা আরও জানান যে, এবারের উৎসবের প্রধান আকর্ষণরূপে আন্তর্জাতিক শিশুমেলা ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। ৪৩টি দেশ এ-বছরের উৎসবে অংশগ্রহণ করবে বলে পর্ষদের কর্তৃপক্ষ আশা করেন। উৎসবে এই সব দেশের দুই শতাধিক শিশুচিত্র প্রদর্শিত হবে।

এবারকার উৎসবে লক্ষাধিক শিশু যোগদান করতে পারবে বলে পর্ষৎ ঘোষণা করেন। উৎসব-সর্মসূচীতে যে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে বিশেষ করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য ভারতে শিশু চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক, আঙ্গিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত সমস্যাবলী আলোচিত হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পর্ষদের মুখপাত্র জানান যে শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য তাঁরা সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেননি। তবে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্ষদকে অন্যভাবে সাহায্য করছেন। প্রায় একশত যুবক স্বেচ্ছাসেবকরূপে উৎসবের কাজে সাহায্য করবেন বলে তাঁরা জানান। **উৎসবের কর্মসূচী:** ১লা সেপ্টেম্বর—লাইটহাউস প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধনী উৎসব। ২রা থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর—কলকাতার প্রেক্ষাগৃহসমূহে শিশুদের জন্য নিয়মিত প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী। কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের শিশুবিভাগ ও শিশু সংশোধনাগারে মুক্ত অঙ্গনে সান্ধ্যকালীন প্রদর্শনী। ৭ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর—কলকাতায় প্রাপ্তবয়স্ক সভ্য, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকুশলী ও অতিথিদের জন্য বিশেষ সান্ধ্য প্রদর্শনী। ১১ই থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর—জেলাসমূহের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রাতঃকালীন প্রদর্শনী। ১৪ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর—কলকাতায় শিশু চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা-চক্র। ২৩শে সেপ্টেম্বর—রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক শিশুমেলা, ক্রীড়া, বিচিত্রানুষ্ঠান, পুতুল ও চিত্রপ্রদর্শনী এবং মৈত্রী পতাকা বিনিময়। ৩০শে সেপ্টেম্বর—কলকাতায় সমাপ্তি উৎসব।

শিল্পভারতী প্রোডাকশন্স-এর "বর্ণচোরা" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবির নৃত্যপটিয়সী নায়িকা সন্ধ্যা রায়

ফটো—দেশ

* পাঠকের চোখে *

"এই লজ্জা!"

মহাশয়,

গত ১১ই আগস্ট তারিখের "দেশ"-এর "রঙ্গজগৎ" বিভাগে "এই লজ্জা" শীর্ষক প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। চিত্র-ব্যবসায়ীর "স্টার সিস্টেম"-এর প্রতি মোহ থাকে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই "স্টার-ক্রেজ" সর্বদলের সর্বকালের দর্শক-সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে বলে ব্যবসায়ীরাও এই মোহের বন্ধন থেকে মুক্তি-লাভ করতে পারেন না। "স্টার সিস্টেম" বাদ দিয়ে সব সময় যে ছবি তৈরি করা সম্ভব নয় এ নজির সত্যজিৎ রায় সম্পর্কেও দেওয়া যায়। মাত্র দু-একটি ক্ষেত্রে "স্টার সিস্টেম" বাদ দেওয়া ছবির বক্স-অফিস সাফল্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি।

বাংলা চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের সকলের সম্বন্ধেই এই প্রসঙ্গে আপনারা অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গত "স্টার সিস্টেম" বিহীন যে "কাঁচের স্বর্গ" ছবির নাম উল্লেখ করেছেন সে ছবিটি সম্পূর্ণভাবে এক বাঙালী চিত্র-ব্যবসায়ীর অবদান। সত্যজিৎ রায়ের প্রত্যেকটি "স্টার সিস্টেম"-বিহীন ছবি বাংলার চিত্র-ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় নির্মিত হয়েছে।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের আগামী হিন্দী ছবি 'প্রেমপত্র'র নায়িকা সাধনা

সুতরাং "স্টার সিস্টেম"-বিহীন ছবি তৈরি সম্বন্ধে বাংলার সকল চিত্র-ব্যবসায়ী নিরুৎসাহ বা সংকোচ করেন, এ অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে সত্যের অপলাপ করা হয়।

যাত্রিক গোষ্ঠী "পলাতক" ছবিটির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করবার পূর্বে হতেই ভি শান্তারামের হ'য়ে একখানি বাংলা ছবি তৈরি করবার তোড়জোড় করছিলেন, এ সংবাদ আমরা জানি। আর এও জানি যে, বোম্বাই-এ গিয়ে শান্তারামের ছবি তৈরির কাজ শুরু করবার পূর্বেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে "পলাতক" ছবিটি তাঁরা (বাংলা দেশে) শেষ করে যেতে মনস্থ করেছিলেন।

মধ্যবর্তী এই দু-তিন মাসের মধ্যে ছবিটি তৈরি করার ব্যাপারে যে দুই-একটি চিত্র-ব্যবসায়ী উৎসাহিত বোধ করেছিলেন, তাঁদের একজনের সংগে অনুপকুমারের নির্বাচন সম্বন্ধে মতবিরোধ ঘটায় যাত্রিক গোষ্ঠী উল্লিখিত গল্পটি ভি শান্তারামের নিকট চিত্র নির্মাণের জন্য পেশ করেন।

আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, "পলাতক" ছবিটি যদি বাংলা দেশে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে থাকত এবং পরে যাত্রিক গোষ্ঠী বোম্বাই-এ গিয়ে ভি শান্তারামের হয়ে একটি ছবি (বাংলা) তৈরি করতেন, তা হলে সে ছবির সাফল্য (আপনাদের মতানুযায়ী) বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সমান দুর্ভাগ্যেরই কারণ হ'ত। ইতি—

অমর নান
(মিতালী ফিল্মস প্রাইঃ লিঃ-এর পক্ষে)
কলিকাতা-১৩

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির নতুন পরিকল্পনা

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি এতকাল উৎকৃষ্ট বিদেশী চিত্র-প্রদর্শনের আয়োজন করে এসেছেন। কিন্তু দেশী ছবির প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা তাঁদের ছিল না। বিশ্ব-চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির সংগে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা বিদেশী চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থায় এতকাল অগ্রণী ছিলেন। সম্প্রতি সোসায়েটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনের আয়োজন করছেন। তাঁদের নতুন পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এই সপ্তাহে। "ধরতি কে লাল", "কল্পনা" ও "গোপীনাথ"—এই তিনটি বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন সোসায়েটি। "ধরতি কে লাল" গত ২৩শে আগস্ট দেখানো হয়েছে একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে। আগামী ২৬শে আগস্ট ও ২রা সেপ্টেম্বর ম্যাজেস্টিক চিত্রগৃহে যথাক্রমে সকাল দশটায় দেখানো হবে "কল্পনা" ও "গোপীনাথ"।

বোম্বাই সমাচার

বিদেশ-সফর শেষ করে বোম্বাই ফিরে এসে দিলীপকুমার এক সাংবাদিক-সাক্ষাৎকারে বলেন, **সত্যজিৎ রায়** বিশ্ব-চলচ্চিত্রের মানচিত্রে ভারতীয় ছবির স্থানটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এবং তিনি নিজেই যে বিদেশে সুনাম অর্জন করেছেন তা নয়, ভারতীয় ছবির সম্মানও তিনি বাড়িয়েছেন। ভারতীয় ছবির কদর বৃদ্ধির যে ক্ষেত্রটি সত্যজিৎ রায় বিদেশে তৈরী করেছেন, আমাদের প্রযোজকদের তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। দিলীপকুমার আরও বলেন, আমেরিকায় ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। অবশ্য আমরা যদি সেখানে ভাল ছবি পাঠাতে পারি তবেই এই সম্ভাবনার সুফল দেখা দেবে।

"জংলী"র পর সুবোধ মুখার্জি **এপ্রিল ফুল** নামে যে ছবিটি তৈরী করছেন তার নায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন সায়রা বানু। শংকর-জয়কিষণ ছবির সুরকার। অনতিবিলম্বেই ছবির কাজ শুরু হবে।

প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারামের আগামী নিবেদন **"সেহরা"** ছবিটির কাজ গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা ও নবাগত প্রশান্ত ছবিটির নায়ক-নায়িকা।

সংগীত-পরিচালক অনিল বিশ্বাসের সুযোগ্য সহকারী শংকর গাংগুলী গৌরী ফিল্মস-এর "শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ" ছবিটির সুরকাররূপে আত্মপ্রকাশ করছেন। গত সপ্তাহে শ্রীগাংগুলীর পরিচালনায় মান্না দে'র কণ্ঠে ছবির একটি গান রেকর্ড করা হয়। ত্রিলোক কাপুর ও নিরুপা রায় ছবির নায়ক-নায়িকা। দাদা গুঞ্জেলাল ছবির পরিচালক।

প্যার কা বন্ধন (এন এস ফিল্মস) ছবিতে রাজকুমার এক টাঙ্গাওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবির নায়িকা হলেন নিশি। জনি ওয়াকারকে ছবিতে একজন পকেটমার রূপে দেখা যাবে। নাজ, ধুমল, জগদীশ রাজ ছবির অন্যান্য প্রধান শিল্পী। নরেশ সায়গল ছবিটি পরিচালনা করছেন। রবি ছবির সংগীত-পরিচালক।

তুমি কোন কাননের ফুল

শর্মিলা ঠাকুর

ফটো—দেশ

তুমি কোন গগনের তারা

মুক্তিপ্রতীক্ষিত "মেরি বহেন" (মাদ্রাজ সিনে ল্যাবোরেটরি) ছবির নায়িকা পদ্মিনী

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা **শিবাজী গণেশন** সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি তৈরি করবেন। তিনি আরও জানান যে, বিপ্লবীর ভূমিকায় তিনি নিজেই অভিনয় করবেন। এই প্রসঙ্গে শিল্পী তাঁর পিতার বিপ্লবী জীবনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পিতৃস্মৃতিই তাঁকে বিপ্লবী ভগৎ তখন তাঁর পিতা তাঁর (শিবাজী গণেশনের) জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে একটি বৃটিশ সংস্থার গৃহে বোমা নিক্ষেপ করেন। শিবাজী গণেশন বলেন, পিতৃস্মৃতিস তাঁকে বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর জীবনী নিয়ে ছবি তৈরির প্রেরণা দিয়েছে।

মুকেশ বোম্বাই-এর নেপথ্য কণ্ঠ-শিল্পীদের অ্যাসোসিয়েশন-এর নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। লতা মঙ্গেশকার ও মান্না দে অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদকের পদটি পেয়েছেন তালাত মামুদ। কার্যনির্বাহক সমিতিতে রয়েছেন আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, মহেন্দ্র কাপুর, মিনু পুরুষোত্তম, ঊষা মঙ্গেশকার, হেমন্তকুমার, চিত্রগুপ্ত ও এস ডি বাতিশ।

সুনীল দত্ত ও ওয়াহীদা রেহমানকে দেখা যাবে নটরাজ প্রোডাকশন্স-এর পরবর্তী সংগীতমুখর ছবি **গজল**-এ। বেদ ও মদন ছবির প্রযোজক-পরিচালক।

গোয়েল সিনে কর্পোরেশন-এর **"দূর কি আওয়াজ"** ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন জয় মুখার্জি ও সায়রা বানু। দেবেন্দ্র গোয়েল ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক। রবি ছবির সংগীত-পরিচালক।

বোম্বাই-এর ফেমাস স্টুডিওতে **বিন বাদল বরসাত** ছবির কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ ছবির নায়ক-নায়িকা। পরিচালক জ্যোতিস্বরূপ এই দুই শিল্পীকে ছবির কয়েকটি রোমাণ্টিক দৃশ্য তুলেছেন। হেমন্তকুমার ছবির সংগীত-পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত **নটি বয়** ছবিতে একটি নতুন গানের দৃশ্য যোগ করেছেন। গানটি গেয়েছেন নায়ক কিশোরকুমার এবং নায়িকা কল্পনার মুখে আশা ভোঁসলে। শচীন দেব বর্মণ ছবির সুরকার।

বৈজ্ঞানিক রূপকাহিনী নিয়ে তৈরী **রকেট গার্ল** ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নানাভাই ভাট ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির রকেটটি তৈরী করতে খরচ পড়েছে পনেরো হাজার টাকা। স্বদেশকুমার ও নাজ ছবির নায়ক-নায়িকা।

বোম্বাই-এর প্রকাশ স্টুডিওতে গুরু দত্ত, মীনাকুমারী ও প্রীতিবালা গত সপ্তাহ থেকে **"সাঁঝ ঔর সবেরা"** ছবিতে অভিনয় করছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। শঙ্কর জয়কিষণ ছবির সংগীত-পরিচালক।

দিলীপকুমার ও ওয়াহীদা রেহমানকে একসঙ্গে সর্বপ্রথম দেখা যাবে পরিচালক এ আর কারদারের পরবর্তী ছবিতে। ছবির নামকরণ হয় নি এখনো। সংগীতবহুল এই রোমাণ্টিক হিন্দী চিত্রের সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন নৌশাদ।

রাশিয়ায় "হেড মাস্টার"

রাশিয়ায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শনের জন্য সোভেক্সপোর্ট ফিল্ম কিছুকাল আগে অগ্রগামী পরিচালিত "হেডমাস্টার" ছবিটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেন। রুশ ভাষায় ছবিটি 'ডাব' করা হয়েছে এবং ছবির নামকরণ হয়েছে "দি ফাইন্যাল পোস্ট"। বর্তমান মাসে মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং রাশিয়ার অন্যান্য প্রধান শহরে "হেডমাস্টার" ছবির রুশীয় চিত্ররূপ মুক্তিলাভ করবে বলে জানা গেল। পরে ছবিটি টেলিভিসন-এ প্রদর্শিত হবে।

"কলকে সিতারে"

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস" সম্প্রতি আটখানি চিরপরিচিত গান "কলকে সিতারে" নামক এক নতুন সিরিজের রেকর্ডের প্রথম কিস্তি জুলাই মাসে বের করেছেন। এই গানগুলি এক সময়ে চলচ্চিত্রের গান হিসাবে খুব জনপ্রিয় ছিল। গানগুলির বিবরণ দেওয়া হল:—

এন এ এস ১০০১ "তুমহিনে মুঝকো প্রেম শিখায়া"—অম্বরকুমার ও সুরিতার কণ্ঠে দ্বৈত সঙ্গীত।

"না জানে কীধর মেরি নাও চলি রে"—অম্বরকুমারের একক সঙ্গীত।

এন এ এস ১০০২ঃ "নাচো নাচো প্যারে মন কে মোর"—রাজেন্দ্রের কণ্ঠে একক সঙ্গীত।

"পূজারী মোরে মন্দির মে আও"—মীনা ও রাজেন্দ্রের দ্বৈত গীত।

এন এ এস ১০০৩ঃ "চল চল রে নওজওয়ান"—শেফালীরানী ও তরুণকুমারের চমৎকার দ্বৈতগীতি।

"মায় বন কে চিড়িয়া বনকে"—ঐ শিল্পীযুগলের দ্বৈতগীতি।

এন এ এস ১০০৪ঃ "অব তেরে সিওয়া"—সুজাতার কণ্ঠে একক ভজন।

"আঁখিয়া মিলাকে পিয়া ঘরমাকে"—রত্না শর্মার একক গান।

এশিয়ান গেমে ভারতের ফুটবল দল। বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে—এথিরাষ, চন্দ্রশেখর, ইউসুফ খাঁ, থঙ্গরাজ, পি বর্মন, পি কে ব্যানার্জি, এস এ রহিম (কোচ), চুনী গোস্বামী (অধিনায়ক), অরুণ ঘোষ ও জার্নেল সিং; বাঁ দিক থেকে বসে—ত্রিলোক সিং, আফজল, রামবাহাদুর, অরুময়, পি সিংহ, ফ্রাঙ্কো ও বলরাম

খেলার মাঠে

একলব্য

আগস্টের ২৪ তারিখ থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্তায় চতুর্থ এসিয়ান গেমের খেলাধুলো আরম্ভ হচ্ছে। এসিয়ান গেমকে কেন্দ্র করে সারা এসিয়ার খেলোয়াড়কুলের মধ্যে উদ্যোগ আয়োজন ও প্রস্তুতির শেষ নেই। জাকর্তায় দ্বাদশ দিনব্যাপী খেলাধুলোর উপর যবনিকা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে ক্রীড়াবিদদের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। তারপর আরম্ভ হবে আবার প্রস্তুতি। এবার বিশ্ব অলিম্পিকের জন্য, লক্ষ্য টোকিওর অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন।

এসিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মৈত্রীর বাঁধন দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে এসিয়ান গেমের পরিকল্পনা এই ভারতেই প্রথম দানা বেঁধেছিল এবং এই ভারতের মাটিতেই ১৯৫১ সালে প্রথম এসিয়ান গেমের আসর বসেছিল।

যদিও এর আগে এসিয়ার খেলোয়াড়দের জন্য আরও দুই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছিল তবু দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান এসিয়ান গেমের প্রতিষ্ঠার মূলে একজন ভারতীয় ক্রীড়া পরিচালকের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ইনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে ভারতের প্রতিনিধি শ্রী জি ডি সোন্ধী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার জন্যই দূরপ্রাচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান বন্ধ থাকে। যুদ্ধক্লান্ত বিশ্বে মরণ আলিঙ্গনের পর মানুষ আবার যখন বন্ধুত্বের আলিঙ্গনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে, ১৯৪৭ সালে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে যখন বসে এসীয় মহাসম্মেলন তখন সেই সম্মেলনেই শ্রীসোন্ধি এসিয়ার খেলোয়াড়কুলের জন্য এসিয়ান গেম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর অনুমোদন লাভ করে। তারপর ১৯৪৮ সালে লন্ডনের বিশ্ব অলিম্পিকের সময় এসিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে প্রস্তাবটি বাস্তব রূপ নেয়। গঠিত হয় এসিয়ান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন, যার পরিবর্তিত রূপ হয়েছে এসিয়ান গেমস ফেডারেশন।

একজনের পরিকল্পনা, একজনের রূপ দান। এসিয়ান গেমের পরিকল্পনা করেছিলেন শ্রী জি ডি সোন্ধী। তা রূপ দেন পরলোকগত অ্যান্টনী ডি'মেলো। বলা বাহুল্য, ডি'মেলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা, ভারত সরকারের সাহায্য এবং এসিয়ার নওজোয়ানদের অংশ গ্রহণের ফলেই ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে নয়াদিল্লির নবগঠিত ন্যাশন্যাল স্টেডিয়ামে প্রথম এসিয়ান গেমের আসর। তারপর ১৯৫৪ সালে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় দ্বিতীয় এসিয়ান গেমের আসর বসেছে। ১৯৫৮ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে তৃতীয় এসিয়ান গেম। এই হচ্ছে এসিয়ান গেমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

•

এসিয়ার নওজোয়ানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ় করা যেমন ছিল এসিয়ান গেমের একটি উদ্দেশ্য, তেমন আর

এশিয়ান গেমে ভারতের একমাত্র মেয়ে, বর্শা ছুঁড়িয়ে এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট

একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খেলাধুলোয় অনগ্রসর এসিয়ার মানুষকে খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়া, তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই ৪ বছরের ব্যবধানে এবং বিশ্ব অলিম্পিকের মধ্যবর্তী কালে এর আয়োজন।

উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতি অনুষ্ঠানেই যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বাড়ছে, নতুন নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তার সঙ্গেই তাল রেখে বাড়ানো হচ্ছে প্রতিযোগিতার বিষয়ের সংখ্যা।

প্রথম এশিয়ান গেমে যেখানে ছয় রকমের খেলাধুলোর ব্যবস্থা হয়েছিল, দ্বিতীয় এশিয়ান গেমে সেখানে আট রকমের খেলাধুলোর ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় অনুষ্ঠানে হয় ১৪ রকমের খেলাধুলো। এবার ১৬ রকমের খেলাধুলোর আয়োজন করা হয়েছে। নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জুডো ও ধনুর্বিদ্যা। আর বিষয়গুলি হচ্ছে অ্যাথলেটিকস, জলক্রীড়া (সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটারপোলো), ফুটবল, হকি, ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, টেবল টেনিস, সাইকেল চালনা, রাইফেল সুটিং, ভারোত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ। এশিয়ার ১৮টি দেশের প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী এইসব খেলাধুলোয় প্রতিযোগিতা করছে।

এবারকার যোগদানকারী দেশের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, সিংহল, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়, উত্তর বোর্নিও, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সারোয়াক, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, তাইওয়ান চীন ও ইস্রাইল। এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে তাইওয়ান ও ইস্রাইলের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন অনিশ্চিত।

এশিয়ান গেমে এশিয়ার ক্রীড়াবিদদের ক্রমোন্নতির পরিচয় সুস্পষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতের অগ্রগতির নিদর্শন সুস্পষ্ট নয়। প্রথম এশিয়ান গেমে ভারত পেয়েছিল ১৫টি স্বর্ণপদক, অ্যাথলেটিকসে ১০টি, সাঁতারে ৪টি ও ফুটবলে একটি। দ্বিতীয় এশিয়ান গেমে ভারত পাঁচটির বেশী স্বর্ণপদক পায়নি। অ্যাথলেটিকসেই এই পাঁচটি পদক লাভ। তৃতীয় এশিয়ানেও একই ফল। অর্থাৎ ৪ জন অ্যাথলীটের পাঁচটি স্বর্ণপদক। তবে উল্লেখযোগ্য, গতবার চারজনই পাঁচটি বিষয়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড করেছিলেন।

এবার ভারত অ্যাথলেটিকস, ফুটবল, হকি, ভলিবল, ভারোত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও রাইফেল সুটিং-এর প্রতিযোগিতা করছে।

যাঁরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন, নিচে তাঁদের নাম দেওয়া হল ঃ

অ্যাথলেটিকস—পুরুষ বিভাগ

শত মিটার—পি রাজশেখরন (মাদ্রাজ) ও এন ফেরাও (মহারাষ্ট্র)। **চারশত মিটার**—মিলখা সিং (পাঞ্জাব) ও মাখন সিং (সেনাদল)। **আটশত মিটার**—দলজিৎ সিং ও মহিন্দর সিং (সেনাদল)। **১৫ শত মিটার**—অমৃত পাল ও প্রিতম সিং (সেনাদল)। **পাঁচ ও দশ হাজার মিটার**—তারলোক সিং (সেনাদল)। **চারশত মিটার রিলে**—মিলখা সিং, মাখন সিং, দলজিৎ সিং (সেনাদল) এবং

এসিয়ান গেমে ভারতের হকি অধিনায়ক গুরুদেব সিং

এশিয়ান গেমে ভারতের অ্যাথলেটিক অধিনায়ক মিলখা সিং

জগদীশ সিং (দিল্লী)। **ডেকাথলন**—গুরবচন সিং (দিল্লী) ও শোভিন্দর সিং (সেনাদল)। **শটপুট**—দিনশা ইরানী (মহারাষ্ট্র) এবং যোগিন্দর সিং (সেনাদল)। **ডিসকাস**—পরদুমন সিং এবং বলকার সিং (সেনাদল)।

মহিলা বিভাগ

বর্শা নিক্ষেপ—এলিজাবেথ ডেভনপোর্ট (রাজস্থান)।

হকি দল

গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব)—অধিনায়ক, যোগিন্দর সিং (বাংলা), শঙ্কর লক্ষ্মণ (সেনাদল), পৃথ্বীপাল সিং (পাঞ্জাব), ঝমনলাল শর্মা (উত্তরপ্রদেশ), পিয়ারা সিং (সেনাদল), দেশমুখ (সেনাদল), অ্যান্টিক (রেলওয়ে), চরঞ্জিৎ সিং (পাঞ্জাব), নিমল (রেলওয়ে), গুরমিত সিং (পাঞ্জাব), মদনমোহন সিং (পাঞ্জাব), দর্শন সিং (পাঞ্জাব), বান্দু প্যাটেল (সেনাদল), হামিদ (রেলওয়ে) এবং সেবাস্টিয়ান আরমন (রেলওয়ে)।

ফুটবল দল

চুনী গোস্বামী (বাংলা)—অধিনায়ক, পি কে ব্যানার্জী, পি সিংহ ও পি বর্মণ (রেলওয়ে), পি থঙ্গরাজ, অরুণ ঘোষ, জার্নাইল সিং, রামবাহাদুর, বলরাম এবং অরুময়ানিয়গম (বাঙ্গলা) ও চন্দ্রশেখরন এবং এফ এ ফ্রাঙ্কো (বোম্বাই), ত্রিলোক সিং এবং

ড ই এথিরাজ (সেনাদল), ইউসুফ খাঁ এবং মাফজল (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

কোচ—এস এ রহিম।

ভলিবল দল

টি পি নায়ার (রেলওয়ে)—অধিনায়ক; মোলাল ও পালানিস্বামী (রেলওয়ে), পোজিৎ সিং, দেশরাজ এবং যশোবন্ত সিং পাঞ্জাব), জোসেফ (কেরালা), গোপাল, লিদ এবং জয়করন (হায়দরাবাদ)।

মল্লবীর দল

মালওয়া (পাঞ্জাব), নারায়ণ ঘুনে, মারুতি ানে এবং জি আন্দলকর (মহারাষ্ট্র), উদয়-াঁদ, এল কে পাণ্ডে ও সজ্জন সিং সেনাদল)।

ভারোত্তোলন দল

ঈশ্বর রাও (অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং সি আর

এশিয়ান গেমে ভারতের ভারোত্তোলনের প্রতিনিধি সি আর শেঠি (বাঁদিকে) ও ঈশ্বর রাও (ডানদিকে)

সেটি (রেলওয়ে)। **ম্যানেজার—কালী** গাঙ্গুলী।

মুষ্টিযুদ্ধ দল

বাডি ডি'সুজা (রেলওয়ে), পদম বাহাদুর মল্ল ও এন সরকার (সেনাদল)।

রাইফেল স্যুটিং—হরিচরণ শা (বাংলা)।

*

অলিম্পিকের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা ও রাশিয়া। কোন্ দেশ ক'টি সোনার মেডেল পেল তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা, উৎসাহ উদ্দীপনা। কিন্তু এশিয়ান গেমে জাপানের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ক্রীড়া-মানে তার কাছাকাছি অন্য দেশ নেই। প্রতি গেমেই তাঁদের ক্রমোন্নতি এবং পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। প্রথম এশিয়ান গেমে জাপান পেয়েছিল ২৪টি স্বর্ণপদক, দ্বিতীয় এশিয়ান গেমে ৩৮টি, টোকিওতে নিজেদের মাটিতে জাপান পেয়েছে ৬৭টি স্বর্ণপদক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১৩৮টি। পদক প্রাপ্তির খতিয়ানে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ফিলিপাইন পেয়েছিল মোট ২১টি। এর থেকেই জাপানের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় মেলে। অন্যান্য খেলাধুলায়, এমন কি অ্যাথলেটিকসেও জাপানের সঙ্গে পাল্লা টানবার মত প্রতিযোগী আছে। কিন্তু সাঁতারে জাপানের কাছাকাছি কেউ পৌঁছুতে

এসিয়ান গেমে ভারতের ভলিবল দলের অধিনায়ক টি পি নায়ার

পারেনি। টোকিওতে পুরুষ ও মেয়েদের সাঁতারের ২৬টির মধ্যে ২৫টি স্বর্ণপদক গিয়েছিল জাপানের ঘরে। শুধু একটি পেয়েছিল ফিলিপাইন তাও জাপানেরই ভুলে। মেয়েদের ৪×১০০ মিটার রিলেতে জাপান প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

জাপানের কয়েকজন সাঁতারু বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে এশিয়ান গেমে

এশিয়ান গেমে ভারতের রাইফেলস্যুটার হরিচরণ শা

জাপান নাকি এবার তাদের শ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের পাঠায়নি। তবু কর্তৃপক্ষ আশা রাখেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সাঁতারুরাই প্রায় সমস্ত বিজয়ীর সম্মান ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

এশিয়ান গেমে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান, কাম্বোডিয়া, হংকং মালয়, উত্তর বোর্নিও, সারাওয়াক ও থাইল্যান্ড এ পর্যন্ত কোন স্বর্ণপদক পায়নি। এবার ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়ার স্বর্ণপদক লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এই বছর এশিয়ার ক্ষিপ্রতম দৌড়বীর জেগাথেশাম মালয়ে সর্বপ্রথম স্বর্ণ-পদক আনলেও আনতে পারেন। জেগাথেশাম একশ মিটার দৌড়িয়েছেন ১০·৪ সেকেন্ডে,

ঝমনলাল **এন্টিক**

যা এ বছর এশিয়ার আর কেউই দৌড়তে পারেননি।

ফিলিপাইনই একমাত্র দেশ বাস্কেটবলের স্বর্ণপদক যাঁদের হাতছাড়া হয়নি। দিল্লিতে, ম্যানিলায় এবং টোকিওতে তাঁরা বাস্কেটবলে বিজয়ী হয়েছেন, এবারও তাঁদের জয়লাভের সম্ভাবনা।

ম্যানিলা ও টোকিওর ফুটবল বিজয়ী চীন এবারও বিজয়ী হবে বলে আশা রাখে। টোকিওর এসিয়ান গেমেই পাকিস্তানের কাছে ভারতের বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সে সম্মান ভারত আবার ফিরে পাবে কিনা এটা এক মস্ত প্রশ্ন।

অ্যাথলেটিকসে মিলখা সিংহ ভারতের প্রধান আশা ভরসা। তবে মিলখার ফর্ম যেমন পড়তির দিকে তেমনি মিলখার সঙ্গে কিছুটা দুর্ভাগ্যও জড়িয়ে আছে। রোমে অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েও তিনি কোন পদক পাননি। তা ছাড়া জাকর্তা যাত্রার আগে স্বদেশে এক সাংবাদিকের সঙ্গে তার হামলা করার ব্যাপারে মনের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে কিনা কে জানে!

অলিম্পিক বা এসিয়ান গেমে অ্যাথ-লেটিকসের স্থান অন্যান্য খেলাধুলোর অনেক উপরে এবং অ্যাথলেটিকসকে কেন্দ্র করেই যত জল্পনা-কল্পনা। এখানে অ্যাথলেটিকসে এসিয়ান ও অলিম্পিক রেকর্ডের এক তুলনামূলক

এসিয়ান গেমে ভারতের তিনজন মুষ্টিযোদ্ধা পদম বাহাদুর মল (বাঁ দিকে), এস বাডি ডিসুজা (মধ্যে) ও এস এন সরকার (ডান দিকে)

হিসাব দেওয়া হল:—

এসিয়ান রেকর্ডের খতিয়ান

পুরুষ

১০০ **মিটার দৌড়**—আব্দুল খালিক (পাকিস্তান) ১০·৬ সেকেন্ড: **অলিম্পিক রেকর্ড**—আর্মিন হ্যারী (জার্মানী) ১০·২ সেকেন্ড।

২০০ **মিটার দৌড়**—মিলখা সিং (ভারত) ২১·৬ সেকেন্ড; **অলিম্পিক রেকর্ড**—এল বেরুটি (ইটালী) ২০·৫ সেঃ।

৪০০ **মিটার দৌড়**—মিলখা সিং (ভারত) ৪৬·৬ সেকেন্ড; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ও টি ডেভিস (ইউ এস এ) ও কাউফম্যান (জার্মানী) ৪৪·৯ সেঃ।

৮০০ **মিটার দৌড়**—যোশিতাকা মুরোয়া (জাপান) ১ মিঃ ৫২·১ সেকেন্ড; **অলিম্পিক রেকর্ড**—পিটার স্নেল (নিউজিল্যান্ড) ১ মিঃ ৪৬·৩ সেঃ।

১৫০০ **মিটার দৌড়**—খালিগ মহম্মদ (পাকিস্তান) ৩ মিঃ ৪৭·৬ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—হার্ব ইলিয়ট (অস্ট্রেলিয়া) ৩ মিঃ ৩৫·৬ সেঃ।

৩০০০ **মিটার স্টিপলচেজ**—মুবারক শাহ (পাকিস্তান) ৯ মিঃ ৩ সেঃ, **অলিম্পিক রেকর্ড**—ক্রিজাসকোয়াক (পোল্যান্ড) ৮ মিঃ ৩৪·২ সেঃ।

৫০০০ **মিটার দৌড়**—ওসামু ইনো (জাপান) ১৪ মিঃ ৩৯·৪ সেঃ, **অলিম্পিক রেকর্ড**—কুটস (রাশিয়া) ১৩ মিঃ ৩৯·৬ সেঃ।

১০০০০ **মিটার দৌড়**—তাকাশি বাবা (জাপান) ৩০ মিঃ ৪৮·৪ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—পি বলোটনিকভ (রাশিয়া) ২৮ মিঃ ৩২·২ সেঃ।

১১০ **মিটার হার্ডলস**—জি রাজিক (পাকিস্তান) ১৪·৪ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—এল ক্যালহাউন (ইউ এস এ) ও জে ডেভিস (ইউ এস এ) ১৩·৫ সেঃ।

৪০০ **মিটার হার্ডলস**—মাই চেং ফু (তাইওয়ান) ৫২·৪ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—গ্লেন ডেভিস (ইউ এস এ) ৪৯·৩ সেঃ।

৪×১০০ **মিটার রিলে**—ফিলিপাইন ৪১·৪ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ইউ এস এ ৩৯·৫ সেঃ।

৪×৪০০ **মিটার রিলে**—জাপান ৩ মিঃ ১৩·৯ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ইউ এস এ ৩ মিঃ ২·২ সেঃ।

হাই জাম্প—এন এথির বীরসিংহম (সিংহল) ৬ ফুঃ ৭¾ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—আর স্যাভলাকাডজে (রাশিয়া) ৭ ফুঃ ১ ইঞ্চি।

ব্রডজাম্প—সু ইয়ং জু (কোরিয়া) ২৪ ফুট ১০ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—আর বোস্টন (ইউ এস এ) ২৬ ফুঃ ৭¾ ইঞ্চি।

হপ স্টেপ ও জাম্প—মহীন্দার সিং (ভারত) ৫১ ফুঃ ২¾ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—জে স্মিড (পোল্যান্ড) ৫৫ ফুঃ ১¾ ইঞ্চি।

পোল ভল্ট—নোরিয়াকি ইয়াসুদা (জাপান) ১৩ ফুঃ ৯¾ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ডন ব্র্যাগ (ইউ এস এ) ১৫ ফুঃ ৫ ইঞ্চি।

বর্শা ছোঁড়া—মহম্মদ নওয়াজ (পাকিস্তান) ২২৭ ফুঃ ৮¾ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ই ডেনিয়েলসন (নরওয়ে) ২৮১ ফুঃ ২¼ ইঞ্চি।

ডিসকাস ছোঁড়া—বলাকার সিং (ভারত) ১৫৬ ফুঃ ৪½ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—এ ওয়েটার (ইউ এস এ) ১৯৪ ফুঃ ...ইঞ্চি।

লোহার বল ছোঁড়া—পারদুমন সিং (ভারত) ৪৯ ফুঃ ৪ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—বিল নাইডোর (ইউ এস এ) ৬৪ ফুঃ ৬¾ ইঞ্চি।

যোগীন্দর সিং

লক্ষ্মণ

হাতুড়ি ছোঁড়া—মহম্মদ ইকবাল (পাকিস্তান) ২০০ ফুঃ ½ ইঞ্চি; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ভি রুডেনকভ (রাশিয়া) ২২০ ফুঃ ১½ ইঞ্চি।

ম্যারাথন দৌড়—লী চ্যাং হুন (কোরিয়া) ২ ঘঃ ৩২ মিঃ ৫৫ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—বিকিলা আবেবে (ইথিওপিয়া) ২ ঘঃ ১৫ মিঃ ১৬·২ সেঃ।

ডেকাথলন—**ইয়াং** (চীন) ৭১০১ পয়েন্ট; **অলিম্পিক রেকর্ড**—রাকের জনসন (ইউ এস এ) ৮৩৯২ পয়েন্ট।

৫০ **কিলোমিটার ভ্রমণ**—বাক্তোয়ার সিং (ভারত) ৫ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭·৪ সেঃ।

১০০০০ **মিটার ভ্রমণ**—মহাবীর প্রসাদ (ভারত) ৩২ মিঃ ৩১·৪ সেঃ।

৫০০০০ **মিটার ভ্রমণ**—বাক্তোয়ার সিং (ভারত) ৫ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭·৪ সেঃ।

[মহিলা]

১০০ **মিটার দৌড়**—ইনোসোনসিয়া সোলিস্ (ফিলিপাইন) ও আৎসুকো নাম্বু (জাপান) ১২·৫ সেকেন্ড; **অলিম্পিক রেকর্ড**—উইলমা রুডলফ (ইউ এস এ) ১১ সেঃ।

২০০ **মিটার দৌড়**—ইউকো কোবায়াসি (জাপান) ২৫·৯ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—উইলমা রুডলফ (ইউ এস এ) ২৩·২ সেঃ।

৮০ **মিটার হার্ডল**—মিচিকো ইয়ামোটো (জাপান) ১১·৬ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ইরিনা প্রেস (রাশিয়া) ১০·৬ সেঃ।

৪×১০০ **মিটার রিলে**—জাপান ৪৮·৬ সেঃ; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ইউ এস এ ৪৪·৪ সেঃ।

হাই জাম্প—এমিকো কামিয়া (জাপান) ১·৫৮ মিটার; **অলিম্পিক রেকর্ড**—আই বালাস (রুমানিয়া) ৬ ফুট ¾ ইঞ্চি (১·৮৫ মিটার)।

লং জাম্প—ভি বাদানা (ফিলিপাইন) ৫·৬৪ মিটার; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ভি ক্রেপাকিনা (রাশিয়া) ১০ ফুট ১০¼ ইঞ্চি (৬·৩৭ মিটার)।

বর্শা ছোঁড়া—ওয়াই সিদা (জাপান) ৪৭·১৫ মিটার; **অলিম্পিক রেকর্ড**—ই ও জোলিনা (রাশিয়া) ১৮৩ ফুঃ ৮ ইঞ্চি (৫৫·১০ মিটার)।

ডিসকাস ছোঁড়া—হিরোকো উচিদা (জাপান) ৪·৯০ মিটার; **অলিম্পিক রেকর্ড**—নীনা পলোমারেভা (রাশিয়া) ১৮০ ফুঃ ৯½ ইঞ্চি; (৫৫·৯৮ মিটার)।

লোহার বল ছোঁড়া—সেইকো ওবোনাই (জাপান) ১৩½২৬ মিটার; **অলিম্পিক রেকর্ড**—তামারা প্রেস (রাসিয়া) ৫৬ ফুঃ ১০ ইঞ্চি (১৭·৩২ মিটার)।

১ মিটার=৩৯·৩৭ ইঞ্চি
১ ফুট=০·৩০৪৮ মিটার

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

মঞ্জু ব্যানার্জি

এখন আর দৌড়তে পারেন না। এখনও দৌড়ের প্রতিযোগিতা দেখলে মনটা আনচান করে ওঠে। গতির আবেগে সারা মন ভরে যায়। কিন্তু স্কুল-জীবনে দৌড়তে গিয়ে পড়ে সেই যে পা'টা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, তারপর তা আর ভাল হল না। এমনি স্বাভাবিক। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। তবে ঐ দৌড়তে গেলেই পায়ে টান ধরে। অসহ্য যন্ত্রণা হয়। স্কুল-জীবনে চ্যাম্পিয়ন হওয়া মেয়ে মঞ্জু ব্যানার্জী তাই দৌড়নো ছেড়ে দিয়েছেন।

তবে দৌড় ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতা তো আছে। এককালের চ্যাম্পিয়ন হওয়া মেয়ে নীরব দর্শক থাকেন কি করে? গতির নেশা যাঁর মনে, যতির বাঁধন বড় অসহনীয় তাঁর কাছে।

ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস-এ জ্যাভেলিন থ্রোতেই নাম লেখালেন মঞ্জু। সেই প্রথমবার প্রেসিডেন্সী কলেজের মেয়েরা যোগ দিলেন এই প্রতিযোগিতায়। তিনজন মেয়েকে নিয়ে টিম। কিন্তু কলেজের মেয়েদের মান রাখলেন মঞ্জু ব্যানার্জী। তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। তাঁর জ্যাভেলিন গিয়ে পৌঁছল ৭১ ফুট দূরে। একটুর জন্যে প্রথম নয়। তবু সেই প্রথমবারের মত মান তো রক্ষা হল!

১৯৫৭ সালে স্পোর্টসে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন মঞ্জু ব্যানার্জী। টেনিকয়েট থ্রোতে শুধু যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম পুরস্কার পেলেন।

তারপর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। পরের বছর ডায়াসেসনের 'লিলি হাউস' চ্যাম্পিয়নশিপ শীল্ড পেল। পেল মঞ্জু ব্যানার্জীর জন্যে। সেবার চার চারটে আইটেমে যোগ দিয়েছিলেন মঞ্জু—ফ্ল্যাট রেস, অবস্টাকল রেস, জ্যাভেলিন থ্রো, আর টেনিকয়েট থ্রো। চারটেতেই প্রথম পুরস্কার। লিলি হাউসের মেয়েরা জড়িয়ে ধরল মঞ্জুকে। 'ইয়ু ডিড স্পেলেনডিড!

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়

'অথচ জানেন', বললেন মঞ্জু ব্যানার্জী, 'ক্লাস সেভেনে ওঠার আগে স্পোর্টসে নামবার মত আত্মবিশ্বাস ছিল না। এমনি মাঠে দৌড়তাম। দৌড়নো আমার হবি ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড়তাম। কিছুমাত্র টায়ার্ড হতাম না। কিন্তু স্পোর্টসে নাম দেওয়া—ওরে বাবাঃ! একদিন আমার এক বন্ধু এক-রকম জোর করেই আমার নাম দিল স্পোর্টসে। সেই প্রথম। সে যদি অমন জোর না করত, তা হলে কে জানে আমি কোনদিন স্পোর্টসে যোগ দিতাম কিনা!

প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মঞ্জু ব্যানার্জীর জন্ম উত্তর প্রদেশে। শহরের নাম শাহাজানপুর। বাবা ওখানকার মিলিটারি অফিসার। তারপর শৈশবের কিছুটা কাটল আসামে। কারণ, বাবার বদলির চাকুরি। মঞ্জু এসে পরে ভর্তি হলেন কলকাতার ডায়াসেসনে। এইখানেই কেটেছে মঞ্জুর স্কুল-জীবন।

মঞ্জু ব্যানার্জী পড়েন ভূগোল, কুশলতা খেলাধুলোয়, প্রবণতা ফাইন আর্টসে। খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন। এ'কেছেনও। ডায়াসেসনের ছাত্রী মঞ্জু ইংরাজীতে কবিতা লেখেন, অদ্ভুত ভাল গীটার আর মাউথ অর্গ্যান বাজান।

এই সঙ্গে গানের চর্চা করেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। একটু হেসে মঞ্জু ব্যানার্জী জবাব দিয়েছিলেন, না। কিন্তু কথাটা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারিনি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৩ই আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কলিকাতায় এক দোকানে হানা দিয়া মহারাষ্ট্রে প্রস্তুত পেটেণ্ট ঔষধের কিছু নমুনা হস্তগত করিয়াছে। মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে তৈরী নিম্নমানের ঔষধ কলিকাতার বাজারে চলিতেছে বলিয়া ঐ দপ্তরে অভিযোগ আসিয়াছে।

গতকাল সন্ধ্যায় বেলগাছিয়া অঞ্চলে একটি লরীর ধাক্কায় এবং চাপায় শ্রীমতী তুলসী সাহা নামে একজন বৃদ্ধা নিহত ও সাতজন আহত হন। আহতদের একজনের রাত্রে হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ইহা ছাড়া একটি ট্যাক্সি বিধ্বস্ত এবং দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির একখানি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৪ই আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন লাইর সহিত তাঁহার বৈঠকের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি এইরূপ কোন বৈঠকের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেন।

মালদহের পক্ষাঘাতগ্রস্ত চারি শতাধিক রোগীর আরোগ্যের আশা কম। রাজ্য সরকার তাহাদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে এ পর্যন্ত বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

সোমবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মতিলাল থানদার নামে ১৩০ বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রী থানদারের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার রায়না থানার রাসপুকুর গ্রামে।

১৬ই আগস্ট—সমগ্র ভারতের সঙ্গে কলিকাতা, হাওড়া ও শহরতলির শিল্পাঞ্চলসহ পশ্চিমবঙ্গের শহর এবং গ্রামে (১৫ই আগস্ট) স্বাধীনতার পঞ্চদশ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

গতকাল সকাল সওয়া সাতটার সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ ২৫ জন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

উত্তর সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ফ্রান্সের সুদাভিয়াসিও নামক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অবিলম্বে ২০ খানি আলুয়েড—৩ হেলিকপ্টার ক্রয় করিতেছেন।

গতকাল সকালে পানাগড়ের নিকট জি টি রোডের উপর এক শোচনীয় জীপ দুর্ঘটনায় একজন মহিলা ঘটনাস্থলে নিহত এবং আরও ছয়জন আহত হন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সাংঘাতিক।

লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী এ এম টমাস বলেন, অস্ট্রেলিয়া হইতে গমের সঙ্গে আনীত পাইরিডিনের একটি ড্রামে ছিদ্র থাকায় ১১০৮ টন গম দূষিত হইয়াছে।

১৭ই আগস্ট—লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী রেলমন্ত্রী শ্রী এস ভি রামস্বামী জানান যে, এই বছর জানুয়ারী হইতে জুলাই মাসের মধ্যে ভারতীয় রেলওয়েতে মোট ১১০০টি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের যাতায়াতের ব্যাপারে ভিসা ব্যবস্থার কড়াকড়ি হ্রাস করা সম্পর্কে কখন আলোচনা করিতে পারেন, তৎসম্পর্কে পাকিস্তান সরকার এখনও কোনরূপ আভাস দেন নাই।

১৮ই আগস্ট—কিছুদিন চুপচাপ থাকিবার পর কামেং সীমান্ত বিভাগের উত্তর সীমান্তে ম্যাকমেহন সীমারেখায় আবার চীনা সৈন্য চলাচল এবং কামানের সমাবেশ দেখা যাইতেছে। নির্ভরযোগ্যসূত্রে আরও জানা যায় যে, নেফা সীমান্তে বেআইনীভাবে চীনারা যে এলাকা অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, সেখানেও চীনা সৈন্য বেশ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সংলগ্ন পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সীমান্ত অঞ্চলে পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর আরও সৈন্যদলকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

১৯শে আগস্ট—কয়েকটি উঁচু জায়গা ছাড়া সমগ্র ডিব্রুগড় শহর জলমগ্ন হইয়াছে। স্টেশন রোড, ডিস্ট্রিক্ট অফিস কম্পাউণ্ড, শান্তিপাড়া, আমলাপট্টি, কংগ্রেস ভবন, মিউনিসিপ্যাল অফিস সমস্তই হাঁটু জলের নীচে। আজ ব্রহ্মপুত্রে যে বন্যা হইয়াছে, স্মরণকালের মধ্যে তাহার নজীর নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি কার্যসূচীর মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন মোট ২৬৪ কোটি টাকার সংস্থান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই আগস্ট—বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ আজ এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুইটি মহাকাশযানকে পরস্পরের খুব কাছাকাছি একই কক্ষপথে স্থাপন করায় মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতি সূচিত হইতেছে।

টোকিওর এক সংবাদে বলা হয় যে, চার নম্বর "ভোস্টক"কে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—পৃথিবী হইতে মহাকাশে প্রেরিত এই বেতার নির্দেশ তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। কিন্তু মস্কো হইতে এই সংবাদ এখনও সমর্থিত হয় নাই।

১৪ই আগস্ট—সুইডেনের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগীয় গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক মহাশূন্য বিশেষজ্ঞ বলেন যে, সোভিয়েট মহাশূন্যযান দুইখানি পৃথিবী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং আজই সকালে যান দুইখানি পৃথিবীতে অবতরণ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাশিয়ার খ্যাতনামা মহাকাশ-বিজ্ঞানী ব্ল্যাগানোরোভ অদ্য এক বেতার ভাষণে বলেন, নিকোলায়েফ ও পপোভিচ এক একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর মহাকাশের অনন্ত রহস্যের উপর হইতে এক একটি যবনিকা উত্তোলিত হইতেছে—এ এক দুরূহ সাধনা।

১৬ই আগস্ট—সোভিয়েট মহাকাশচারিদ্বয়—মেজর নিকোলায়েফ ও লেঃ কর্নেল পপোভিচ গতকাল নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, গ্রহান্তর যাত্রার দিন আর দূরে নাই।

১৯৬৩ সালের ১লা মে তারিখের পর কোন এক সময়ে পশ্চিম ইরিয়ানের শাসন কর্তৃত্ব নেদারল্যাণ্ডের হাত হইতে পর্যায়ক্রমে ইন্দোনেশিয়ার নিকট হস্তান্তর সম্পর্কে গতরাত্রে নেদারল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১৭ই আগস্ট—ইরাকী জেট বিমান গতকাল তুরস্কের একটি গ্রামের উপর আক্রমণ চালাইলে তুর্কী জেট বিমান হইতে পাল্টা গুলী চালানো হয়। দুইখানা ইরাকী জেট বিমান তুর্কী এলাকার আকাশে আবির্ভূত হইলে উহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়।

ঢাকা হইতে প্রচারিত এক প্রেসনোটে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ৪৫ দিন পূর্বে চৌমুহনীর এক ঘটনার সংবাদ সমর্থন করেন। এই ঘটনায় কতিপয় সশস্ত্র লোকের হাতে আহত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চারজনের মৃত্যু হয়। প্রেসনোটে এই ঘটনাকে 'দুর্বৃত্ত দলের গুণ্ডামী' বলিয়া অভিহিত করিয়া বলা হইয়াছে, ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সংশ্রব নাই।

১৮ই আগস্ট—১০ লক্ষেরও অধিক রাশিয়ান আজ রেড স্কোয়ারে শ্রীক্রুশ্চফের নেতৃত্বে শ্রীআন্দ্রিয়ান নিকোলায়েফ ও শ্রীপ্যাভেল পপোভিচ—রাশিয়ার এই দুই মহাকাশচারীকে অদ্ভুত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

রাশিয়া আজ আরও একখানা মহাকাশ যান ঊর্ধ্বলোকে প্রেরণ করিয়াছে—উহাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাতে কোন মানব-আরোহী নাই।

১৯শে আগস্ট—পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী এইচ এস সুরাবর্দী আজ সন্ধ্যায় ছাড়া পাইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে তিনি ছয় মাস তিন সপ্তাহ আটক ছিলেন।

বৃটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর চারজন নেতৃস্থানীয় নাগাকে সম্প্রতি বৃটেনে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই চারজন নাগা বর্তমানে পাকিস্তানে রহিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল—ফিজোর নিউ ইয়র্ক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর লণ্ডনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সলাপরামর্শ করিবেন।

"সানডে টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় প্রকাশ, মহাকাশে ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বৃটিশ বাহিনীকে সজ্জিত করার এক বৃহৎ সামরিক কার্যসূচীর জন্য অর্থ ব্যয় করিতে বৃটিশ সরকার সম্প্রতি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

"বর্ষা গেল শরৎ এলো, এলো আনন্দের দিন"
সৌখিন সম্প্রদায় যাঁরা এবারের শারদ উৎসবে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করছেন তাঁরা যেন শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি অভিনয় করতে ভুলবেন না।

১৯৬১—৬২ সালের শ্রেষ্ঠ নাটক
বৈশাখী অভিনীত
লবণাক্ত পৃথ্বীশ সরকার

১৯৫৪ সালের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক
অন্তরীপ জোছন দস্তিদার

১৯৬১—৬২ সালের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক
আষাঢ়ে ঝঞ্ঝাট কল্লোল মজুমদার

১৯৬১—৬২ সালের শ্রেষ্ঠ রহস্য নাটক
দায় শুদ্ধসত্ত্ব বসু

"আজকের দিনে যে নাটকের প্রয়োজন"
কয়েকটি একাঙ্ক নাটক
- শাশ্বতিক ● কে থাকে কে যায়
- স্টান্ট ● ঋতুর শেষ নাম বসন্ত
- অলামিত ● নির্বাক প্রহরী
- সরীসৃপ ● একটি চায়ের কাপ

এ নাটকগুলি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের লেখা

পরিবেশক:
অমর লাইব্রেরী । কঙ্কি—বারো।

(সি-১২৮৩)

দুইটি প্রামাণ্য অভিধান
অভিধান-সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ. সংকলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ., পি-এইচ. ডি. সংশোধিত। অভিধানটির বৈশিষ্ট্য: যথাযোগ্য বিচারসহ শব্দচয়ন, ইংরেজী ও বাঙলাভাষায় শব্দের উচ্চারণ, প্রাধান্য ও প্রচলন অনুযায়ী শব্দার্থবিন্যাস ও শব্দসংকেত, শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা সংযোজন। ১৬৭২ পৃষ্ঠা। [১২·৫০ ন. প.]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ. সংকলিত ও ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি. সংশোধিত। ৪৩ হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা ও ষোল শত'র উপর বিশিষ্টার্থ প্রকাশক শব্দসমষ্টির শব্দবিন্যাস, শব্দের পদপরিচয়, সমাস, ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা সমন্বিত। ৯২২ পৃষ্ঠা। [৮·৫০ ন. প.]

অভিধান দুইটিরই কাগজ ছাপা ও বাঁধাই অতুলনীয়
অতি উচ্চ প্রশংসিত
সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০
আলান ক্যাম্বেল জনসনের ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	৭·৫০
আর জে মিনির চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০
প্রফুল্লকুমার সরকারের জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২·৫০
অ না গ ত	২·০০
ভ্র ষ্ট ল গ্ন	২·৫০
সরলাবালা সরকারের অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)	৩·০০
ত্রৈলোক্য মহারাজের গীতায় স্বরাজ	৩·০০
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

উপন্যাস লিখছেন
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ও
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠির জবাব দিচ্ছেন শাম্মি কাপুর

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপকুমার দাস

এবার পূজায় গৃহশোভা বর্ধনে
বাড়ীর গিন্নীর পরিকল্পনার সামগ্রী

● প্রেসার কুকার ● প্রভাকর স্টোভ
● স্টেনলেস্ স্টীলের থালা-বাটী-
গ্লাস ● এলিউমিনিয়াম ● মগ ● জাগ
● এভারহট লাঞ্চবক্স ●

নেপাল শঙ্কর এণ্ড কোং

গৃহস্থালির সৌখিন তৈজসপত্র
উপহার সামগ্রী বিক্রেতা

● গ্রন্থাগারে অপরিহার্য

বারীন্দ্রনাথ দাশের বহু-প্রশংসিত উপন্যাস
বাহাদুর শা'র সমাধি ৫·০০

পুষ্পবসন্ত বসুর চিত্তদ্রাবী উপন্যাস
আড়ালে (বাস্ত প্লট বাংলায় প্রথম) ২·৫০

নীলকণ্ঠের দুঃসাহসী উপন্যাস
নব-বৃন্দাবন ৫·০০

নীলকণ্ঠের তীক্ষ্ণ-তিক্ত রস-রচনা
আসামী কারা ৩·৫০

নারায়ণ সান্যালের মধুর উপন্যাস
ব্রাত্য (মানব-হৃদয়ের বিচিত্রতা) ৩·৫০

সুকো ঠাকুরের রসালো ভ্রমণোপন্যাস
সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা ৪·০০

জ্যোতির্ময়ী দেবীর মরমী কথাগুচ্ছ
ব্যাণ্ডমাষ্টারের মা ২·০০

দীপেন্দ্রকুমার সান্যালের অগ্নিঝরা ভাষায়
সুভাষচন্দ্র (জীবনোপন্যাস) ২·০০

প্রবোধ সরকারের উপন্যাসে শহরের ইতিকথা
শ্রীকৈলাশের ক'লকাতা দর্শন
(ছোট-বড় সকলকার জন্য) ২.০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রাজাবাগান স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

জনপ্রিয় তিনখানি গ্রন্থ

রূপবতী

মনোজ বসু

রূপ ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কিন্তু এই আশীর্বাদই অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে নায়িকা রাধারানীর জীবনে, ধূলিসাৎ করেছে স্বামী-সন্তানময় একটি সংসারে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করার তার সামান্যতম আশা। জীবনদেবতার পবিত্র প্রসাদ আকাঙ্ক্ষিণী রাধারানীকে বারবার কলঙ্কের পাঁকে নিমজ্জিত করেছে তার পরম প্রিয় অথচ পরম শত্রু দেহসৌন্দর্য। "রূপবতী" গ্রন্থে প্রবীণ সাহিত্যিক মনোজ বসুর শিল্পীসুলভ আন্তরিকতা মূর্ত করে তুলেছে এমনই একটি বিড়ম্বিতা রূপময়ীর জীবনের চরম ট্র্যাজেডিকে।

দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিতপ্রায় । দাম ৩·০০

তিন দিন তিন রাত্রি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম উচ্চারণ মাত্রই বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা, অভিজ্ঞতার আশ্চর্য আলোকে অবক্ষয়ী একটি সমাজের বিচিত্র জটিল জীবনপ্রবাহের রূপায়ণের কথা স্মরণে আসে; এই বিশেষ একটি সমাজ, বিশেষ একটি বিষয়কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিচার করবার প্রয়াস নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ, সুখ, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা ও সংগ্রামমুখর জীবন তাঁর লেখাতেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। "তিন দিন তিন রাত্রি"তে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন; জীবনের সমস্যা, জীবনধারণের সমস্যার সমান্তরালবর্তী প্রেমের সমস্যাকেও তিনি এক নতুন ভাবনায় রূপায়িত করেছেন।

দ্বিতীয় মুদ্রণ । দাম ৫·০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ছোটদের উপযোগী করে লেখা স্বামিজীর গল্পোপম এই জীবন-কাহিনীটি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত স্বামিজীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিকতম জীবনচরিত "বিবেকানন্দ চরিত"-এর সংক্ষিপ্তসার নয়—এটি একটি স্বতন্ত্র এবং এই ধরনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ছোটরা ছাড়াও যাঁরা অল্পায়াসে স্বামিজীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তাঁদের পক্ষে এটি সর্বোত্তম পুস্তক। যুগপুরুষ বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে এই গ্রন্থটি বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য-পাঠ্য।

পঞ্চম মুদ্রণ । দাম ১·২৫

আ
আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 1st September 1962

২৯ বর্ষ ॥ ৪৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৫ ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প

কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের উদ্যোগে এককালে বাংলাদেশই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল—অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধীজির চরকা ও খাদি প্রচারের অনেক আগে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। অথচ আজ পশ্চিমবঙ্গেই কুটির শিল্প সবচেয়ে বেশী সংকটাপন্ন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি খাদি-কর্মী সম্মেলনে একটি ভাষণে বলেছেন, খাদির কাজ এই রাজ্যে ১৯২১ সাল থেকে শুরু হলেও খদ্দরের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি; ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খদ্দর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় নি। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে পশ্চিমবাংলায় খদ্দরের চাহিদা পূরণের জন্য অন্যান্য রাজ্য থেকে খদ্দর আমদানী করা হয়। স্বদেশী-যুগে বিদেশী বস্ত্র-বর্জন আন্দোলনের সুযোগ পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে গড়ে উঠেছিল বোম্বাই, আমেদাবাদের মিল-জাত কাপড়ের ব্যবসায়, স্বদেশী বস্ত্র-শিল্প-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েও বাংলাদেশ বোম্বাই, আমেদাবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছু হটেছে। এখন খাদি ও কুটির শিল্পেও ঠিক সেই অবস্থা। দক্ষিণ-ভারতের তাঁতের কাপড়ের চাহিদা এই পশ্চিমবঙ্গেও প্রচুর, আর পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্প সেখানে বিশীর্ণ, ক্ষীণজীবি, ক্ষয়োন্মুখ। বিচিত্র নয় যে, খাদি উৎপাদনেও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ।

কুটির শিল্প প্রসারে পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় ব্যর্থতার পরিণাম কী তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য নয়। শুধু বৃহৎ শিল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের কর্ম-সংস্থান এবং দারিদ্র্য মোচন সম্ভব নয়, এ কথা সকলেই মানেন। কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার এককালে আমাদের জাতীয় সংকল্পের পুরোভাগে স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় অর্থনীতিতে খাদি ও কুটির শিল্পের স্থান এখনও কাগজেপত্রে স্বীকৃত বটে, কিন্তু দেশ-ব্যাপী শিল্পায়নের যে বিরাট উদ্যোগ বর্তমানে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে তাতে যন্ত্রশিল্প তথা বৃহৎ শিল্পেরই সর্বাধিক প্রাধান্য। আমাদের দেশে বৃহদায়তন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার জরুরী প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু গ্রামীণ জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি লাঘবের জন্য কুটির শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারও কম জরুরী মনে করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের জীবন-ধারণ সমস্যাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা যেতে পারে। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা এক কোটি তেইশ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কল-কারখানায় জীবিকা অর্জনের সুযোগ ঠিক সেই হারে বাড়ছে না। স্বাধীনতার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ সত্তর হাজার, সেখানে পনের বৎসর পর কর্মীর সংখ্যা এখন মাত্র সাত লক্ষ কুড়ি হাজার। এর থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা কী পরিমাণ ভয়াবহ। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন তাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, বৃহৎ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা আরও জটিল। যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি নিশ্চয়ই রোধ করা যেতে পারে না; পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন যে ধারায় এগিয়ে চলেছে তাতে বেকার সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব না হলেও বহু লোকের জীবিকা অর্জনের সুযোগ নিশ্চয়ই বাড়ছে। এরই পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে কুটির শিল্পকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারাই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। গভর্নমেণ্ট অবশ্য নীতিগত-ভাবে কুটির শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য সাহায্য দিতে আগ্রহী। কিন্তু গভর্নমেণ্টের নীতিগত পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও কুটির শিল্প স্বয়ংনির্ভর হতে পারছে না, যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। কুটির শিল্পের এই স্থায়ী সংকট মোচনের উপায় কী সেটি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

খাদি উৎপাদনের সংকট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চরকাও অচল-প্রায় গণ্য হচ্ছে; অম্বর চরকা প্রচলনের ফলে খাদি উৎপাদনের বিশেষ উন্নতি হয়নি। অন্যান্য কুটির শিল্পেরও প্রায় সেই অবস্থা। ধান কল, তেল কল, ময়দা কলের সঙ্গে ঢেঁকি, ঘানি এবং জাঁতা প্রতিযোগিতায় অক্ষম। গুড় শিল্প, বাসন শিল্প ইত্যাদি গ্রামীণ অর্থনীতির উপার্জনক্ষম উদ্যোগগুলির কোনটাই যন্ত্রশিল্পের পাশে দাঁড়াতে পারছে না। খাদি ও কুটির শিল্প কর্মীদের অভিযোগ, সরকারী শিল্পনীতিই এক্ষেত্রে কুটির শিল্পের দুরবস্থার জন্য দায়ী। সমস্যা এই যে, বর্তমান যুগে কোনও গভর্নমেণ্টের পক্ষে যন্ত্রশিল্পের প্রসার রোধ করার চেষ্টাও অসম্ভব। গ্রামীণ অঞ্চলে কুটির শিল্পকে স্বয়ং-নির্ভর করার জন্য অবশ্য গভর্নমেণ্ট কতকগুলি বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে আরও উদ্যোগী হতে পারেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে খাদি শিল্পের একটি অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অন্য অনেক রাজ্য-সরকার খাদি-দ্রব্যকে বিক্রয়-কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে রেশমী, পশমী ও সুতী খাদির উপর বিক্রয়কর ধার্য থাকায় এই রাজ্যে খাদির বিকাশ কিছু পরিমাণ ব্যাহত হচ্ছে সন্দেহ নাই। তবে খাদির উপর বিক্রয়কর রহিত করা হলেই পশ্চিমবঙ্গে খাদি ও কুটির-শিল্পের উন্নতি হবে মনে করা যায় না। খাদি উৎপাদনে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ রয়েছে, এটা আমাদের কুটিরশিল্পীদের উদ্যোগ-হীনতার হতাশাজনক নিদর্শন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাইকেল চালিয়ে নিজেকে চালু রাখছেন।

ভারসাম্য রক্ষার কৃতিত্ব

বিধানসভার কংগ্রেসদল

কংগ্রেস সংগঠন

মোরারজী দেশাই ব্যক্তিগত স্বর্ণ সঞ্চয়কে জাতীয় উন্নতির কাজে লাগানোর উপায় ভাবছেন।

সোনার দাঁতিয়াল, সাবধান

সংবাদে প্রকাশ আগামী বৎসরের প্রারম্ভে ভারতীয় জাতীয় মহাশূন্য গবেষণা কমিটি ত্রিবান্দ্রামের কাছে মহাশূন্যে রকেট নিক্ষেপ করবেন।

কেরালা কংগ্রেস পার্টির ইচ্ছা প্রজাসমাজতন্ত্রী মুখ্য মন্ত্রীকে কোনো একটি রকেটে মহাশূন্যে পাঠানো।

Kutty

বৈদেশিকী

লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও লাদাকের পরিস্থিতি এবং ভারত সরকারের চীনা নীতি নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হয়ে গেল। পার্লামেণ্টে এইসব বিতর্কের আর বিশেষ কোনো ফল আছে কিনা সন্দেহ। সরকারী নীতিকে প্রভাবান্বিত করা অথবা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা—এই দুই উদ্দেশ্যের কোনোটাই এইসব বিতর্কের দ্বারা সাধিত হয় বলে মনে হয় না। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা কিছু যে স্পষ্টতর হয় তাও না। আর সরকারী নীতিকে প্রভাবান্বিত করার কথা যদি তোলা যায় তবে দেখা যাবে তর্কাতর্কির শেষ ফল সববারই এক—সরকারী নীতিতে পার্লামেণ্টের প্রতি আস্থা ঘোষণা, নিরাসক্ত-ভাবে ভেবে দেখলে, এর মতো কৌতুককর ব্যাপারের নজির 'পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসি'র ইতিহাসে বিরল। কারণ গত পনেরো বছরের ভারত-চীন সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এরূপ পদে পদে ভুল করার, ভুল করে ঠকার এবং ঠকেও না শেখার দৃষ্টান্ত বড়ো মেলে না। তা সত্ত্বেও সেই একই সরকারের হাতে নীতিপরিচালনার ভার রয়ে গেছে এবং তোতাপাখীর মতো পার্লামেণ্ট সেই সরকারী নীতির প্রতি আস্থার বুলি আউড়ে যাচ্ছে।

তিব্বতের স্বাধীনতা ধ্বংস করা থেকে আরম্ভ করে হিমালয়ের উপরে ভারতভূমিতে প্রবেশ করে সহস্র সহস্র বর্গমাইল চীনারা দখল করেছে—এতে ভারত সরকারের নীতি কখনো নির্বুদ্ধিতা, কখনো ধর্মজ্ঞানহীনতা এবং কখনো কাপুরুষতা দেখিয়ে চীনাদের সাহায্য করেছে। তার জন্য কিন্তু ভারত সরকারের নীতির যাঁরা পরিচালক তাঁদের কারোর কোনো শাস্তি পেতে হয় নি। উপরন্তু পার্লামেণ্ট তাঁদের প্রতি ক্রমাগত আস্থা জানিয়ে এসেছে।

অবশ্য "পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসির" এরূপ বিসদৃশ আচরণের মূলে রয়েছে ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতীয় রাজনীতির বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত, পার্টি-গুলির রিলেটিং শক্তি, ইত্যাদির প্রশ্ন। সে-সব প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। যে-অবস্থায় বিফলতার জাজ্বল্য প্রমাণের সামনেও ক্রমাগত পার্লামেণ্টের আস্থার ভোট-মেলা সম্ভব সে-অবস্থার এখনি পরি-বর্তন হচ্ছে না। তিব্বতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের বিনাশের ভিত্তির উপর ভারত সরকার চীনের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের সৌধ রচনা করতে গিয়ে-ছিলেন, তাতেও ভারত সরকারের নীতিতে পার্লামেণ্টের আস্থা ছিল। সেই সৌধ যখন চীনাদের পদাঘাতে ধূলিসাৎ হয়েছে তখনও ভারত সরকারের নীতিতে পার্লামেণ্টের আস্থা দূর হয় নি। তিব্বত থেকে ভারতীয় বণিকরা বিতাড়িত হয়েছে, ভারতবাসীর পক্ষে কৈলাস তীর্থযাত্রা এখন চীনাদের দয়ার উপর নির্ভর করে, তা সত্ত্বেও ভারত সরকারের নীতিতে পার্লামেণ্টের আস্থা অবিচলিত আছে। লাদাকের এক বৃহৎ অংশ চীনাদের দ্বারা কবলিত হয়েছে, তাতেও পার্লামেণ্টের আস্থা যায় নি। বদরীনাথ চীনারা দখল করবে এরূপ আশংকা অবশ্য এখন নেই কিন্তু তাও যদি চীনারা করত তখনও ভারত সরকারের নীতিতে আমাদের পার্লামেণ্টের আস্থা বোধ হয় নষ্ট হতো না। অবশ্য তাহলে এই সরকার এবং এই পার্লামেণ্ট উভয়ের পক্ষেই অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হতো কারণ ভারতবর্ষেরও বোধ হয় সহ্যের একটা সীমা আছে। কিন্তু আপাতত সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আপাতত এই "আস্থার" পরিপ্রেক্ষিতেই অবস্থার বিচার করে চলতে হবে। এবং তাতে যতটা সামলে চলা যায় তাই করতে হবে।

একদিক দিয়ে পার্লামেণ্টারী ডেমো-ক্রাসিতে এই ধরনের ব্যাপারে পার্লামেণ্টের পক্ষে গবর্নমেণ্টের উপর আস্থা রেখে তাঁদের হাতেই অনেকখানি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কখন কী করতে হবে কোন্ সময়ে বিরোধী বিদেশী শক্তির সঙ্গে কী আলোচনা করতে হবে সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু "স্বাধীনতা" দাবি করেন, এরূপ দাবি করাটা অর্থাৎ যে-সরকারের উপর পার্লা-মেণ্টের আস্থা আছে সেই সরকারের পক্ষে এরূপ দাবি করাটা অযৌক্তিক নয়, কারণ এই ধরনের ব্যাপারে নীতি পরিচালনার স্বাধীনতা গবর্নমেণ্ট অর্থাৎ এক্‌জিকিউটিভ্ গবর্নমেণ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আসল প্রশ্নটা গিয়ে দাঁড়ায় যে এক্‌জিকিউটিভ গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদের উপর পার্লা-মেণ্টের বিশ্বাস আছে কি না। ভারত সরকারের চীনা নীতি যে-ভাবে গত পনেরো বছর পরিচালিত হয়েছে তা কখনই সম্ভব হতো না যদি ভারত একটি পুরাতন, প্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘদিনের পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সচেতন রাষ্ট্র হতো। তাই যদি হতো তাহলে ঐ ধরনের চীনা নীতি চালিয়ে যে-ফল পাওয়া গেছে তার পরে এই সরকারের ক্ষমতায় আসীন থাকা কখনই সম্ভব হতো না। সরকারের অদলবদল হতোই।

তা যে হয় নি তার কারণ ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং পরিস্থিতি যেখানে সরকারী নীতির এরূপ লজ্জাকর ব্যর্থতা সত্ত্বেও সরকার অপরি-বর্তিত থাকে। এখানে পার্লামেণ্টে আস্থার

স্বরূপটা অন্য রকমের, এখানে পার্লামেণ্টের আস্থা ঘোষণার পরেও দুশ্চিন্তা যায় না, কারণ অনাস্থার পক্ষে সর্ববিধ যুক্তি থাকলেও পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনাস্থা প্রকাশ এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পার্টি-বিন্যাসের দরুন সম্ভব নয়। সেইজন্য পার্লামেণ্টারী বিধির স্বারা এখানে জনগণের স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হবে এরূপ আশা করা উচিত নয়, এমন কি আশা করা বিপজ্জনক। সেইজন্যই সরকারের চীনা নীতির প্রতি পার্লামেণ্ট কর্তৃক আস্থা জ্ঞাপনের পরও যথেষ্ট ভাববার বিষয় আছে।

পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে "স্বাধীনতা" দাবি করা এবং তাঁকে "স্বাধীনতা" দেওয়া রীতির দিক থেকে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কথাটাই অবান্তর, কারণ এই "স্বাধীনতা" বরাবরই ছিল, বরাবরই সেটা কাজে খাটানো হয়েছে এবং এসব ব্যাপারে একজিকিউটিব গভর্নমেণ্টকে "স্বাধীনতা" দেওয়া ছাড়া পথও নেই। কিন্তু এখানে মুশকিল এই যে, এক্ষেত্রে এই "স্বাধীনতার" শর্ত অযোগ্য ব্যবহার হলেও, স্পষ্ট অপব্যবহার হলেও এই পার্লামেণ্টের স্বারা তার জন্য কোনো শাস্তিবিধান সম্ভব নয়। সেই জন্য পণ্ডিত নেহরুকে যে স্বাধীনতা দেওয়া আছে কার্যত তার ব্যবহার কীভাবে হচ্ছে, এতে পণ্ডিত নেহরু কারো স্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন কিনা, তাঁর বেনামীতে অপরে কেউ এই "স্বাধীনতা"র অংশীদার হয়েছেন কিনা, এ সব বিষয়ে চিন্তা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। বিশেষত যখন পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য আর পূর্বের মতো নেই এবং অনেক বিষয়ে তিনি অন্যের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভারতের বৈদেশিক নীতির পরিচালনার ব্যাপারে কারো কারো অনুচিত প্রভাবের অস্তিত্ব অনুভব করে অনেকদিন থেকেই অনেকে অস্বস্তি বোধ করেছেন। এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কালে পূর্বে পণ্ডিতজীর উত্তর ছিল যে, সব কিছুতেই তাঁরই কর্তৃত্ব, তাঁর ইচ্ছা এবং সম্মতি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারেন না, সরকারী নীতি সর্বাংশে তাঁর ইচ্ছা মতোই চলছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ মেননের কোনো কথা বা কাজ সম্বন্ধে যদি কোনো সমালোচনা হয় তবে পণ্ডিতজী এখনো বলবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মেনন তাঁর ইচ্ছা এবং সম্মতি ছাড়া কিছু করেন না। শ্রীকৃষ্ণ মেননের সমস্ত কথা ও কাজের জন্য পণ্ডিতজী দায়িত্ব স্বীকার করলেও এই সব ব্যাপারে পণ্ডিতজীর কর্তৃত্বই পুরোপুরি কাজ করছে অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবই পণ্ডিতজীর পলিসি অনুসারে হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ মেনন প্রভৃতি কেবল পণ্ডিতজীর নির্দেশ পালন করছেন—এ বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ কোনোদিনই পণ্ডিতজীর কথাতেও দূর হয়নি। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের অবনতির পরে লোকের কাছে পণ্ডিতজীর এরূপ সাফাই-এর জোর আরো কমে যাবে।

বৈদেশিক দপ্তরের ভিতরে কাদের হাতে ক্ষমতা এখন সে সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া আবশ্যক হয়েছে। যা কিছু সব পণ্ডিতজী করছেন বা পণ্ডিতজীই করাচ্ছেন এই রকম ভেবে নিশ্চিন্ত থাকা আগের চেয়েও এখন অনেক বিপজ্জনক।

বৈদেশিক দপ্তরের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেলের পদে শ্রী আর কে নেহরুর নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই এ বিষয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আরো একটু বিশেষভাবে বেড়েছে। বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পদের উপযুক্ত পাত্র শ্রী আর কে নেহরুকে মনে করা কিছুতেই যায় না। এই ভদ্রলোক যখন পিকিংএ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন তিনি চীনাদের পলিসি ও কাজকর্ম সম্বন্ধে ভারত সরকারকে যে-সব খবরাখবর দিয়েছেন সেগুলি ভারত সরকারের পক্ষে বিভ্রান্তিকর হয়েছিল। হয় তিনি নির্বোধ অথবা চীনারা কোনো উপায়ে তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। তাঁর সেই মোহ পরেও কেটেছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরঞ্চ চীনাদের সম্বন্ধে তাঁর পূর্বেকার মোহ এখনো যথেষ্ট আছে এবং সেই মোহের প্রভাব পণ্ডিতজীর উপরও বিস্তারের চেষ্টা চলছে এরূপ সন্দেহ করলে হয়ত ভুল করা হবে না।

১৯৫৯ সালে শ্রী আর কে নেহরু যখন কায়রোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন এক ব্যক্তির সংগে ঘরোয়া আলোচনায় তিনি যে একটা দিক আছে, পিকিং সরকারকেও চীনা জনমতের অপেক্ষা যে করতে হয় সে কে নেহরু কী ভাবছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতে চীনাদের কার্যের যাঁরা সমালোচনা করছিলেন তিনি কেবল তাঁদেরই গালাগাল করলেন এবং চীনা সরকারেরও যে একটা দিক আছে, পিকিং সরকারকে চীনা জনমতের অপেক্ষাও যে করতে হয় সে কথা ভারতবাসীদের মনে রাখার জন্য উপদেশ বর্ষণ করলেন। মনে রাখা দরকার যে, এই কথোপকথনের সময় হচ্ছে ১৯৫৯ সালের মে মাস। সেই সময়ে শ্রী আর কে নেহরু চীনা সরকারের ভারতীয় সমালোচকদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করছেন, চীনা সরকারের হয়ে ওকালতি করছেন!

এই ব্যক্তি এখন ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেল অর্থাৎ সরকারী হিসাবে বৈদেশিক ব্যাপারে চীনাদের সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা। কেবল চীনাদের প্রতি অস্বাভাবিক দরদের নয়, শ্রী আর কে নেহরুর অনাবিধ অসতর্ক স্বভাবের অন্য যেসব প্রমাণ আছে তাতে তাঁর মতো ব্যক্তিকে বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেলের পদে এই সময়ে রাখা মোটেই নিরাপদ বলে মনে হয় না। সম্প্রতি বৈদেশিক দপ্তরের মধ্যে কিছু ওলট পালট, কিছু লোককে এক পদ থেকে আর এক পদে সরানো বা স্থানান্তরিত করার যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে শ্রী আর কে নেহরুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের অস্বস্তিবোধ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ আছে। শ্রী আর কে নেহরু নিজে যে খুব একটা সক্ষম শক্তিমান ব্যক্তি তা নয়, বরঞ্চ কোনো কোনো বিষয়ে তার উল্টোটাই বলা চলে কিন্তু চীন সম্পর্কে ভারতের নীতি দুর্বলতর করার পক্ষে গভর্নমেণ্টের মধ্যেই একটা দলের অস্তিত্বের আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে; এই রকম দলের ক্রীড়নক হওয়ার দিকে শ্রী আর কে নেহরুর একটা প্রবণতা থাকা খুবই সম্ভব।

২৪।৮।৬২

আলোচনা

পূর্বপত্র প্রসঙ্গে

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার ৪২ সংখ্যায় মৌলনা খাফী খান তাঁর "কেন লেখা" আলোচনায় পূর্বপত্র বিভাগে প্রকাশিত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পর্কে আমার মতামতের বিরুদ্ধে দু-চার কথা সবিনয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। তাঁর সরল এবং স্বতঃস্ফূর্ত উক্তির জন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু যে কথা আমি একমাত্র নরেশচন্দ্র সম্পর্কে বলেছি—তাঁর কথা শুনতে-শুনতে একটি বিশেষ 'মুডে' আমার যে কথা মনে হয়েছে—খাঁ সাহেব কেমন করে ধরে নিলেন যে প্রত্যেক লেখক সম্পর্কে আমার মতামত ওই এক?

এ অতি পুরাতন সত্য কথা যে, কোন লেখকই টাকার জন্যে লেখেন না কিন্তু যখন মূল্য পান তখন এই উপার্জনের ওপর তাঁরা অনেকখানি নির্ভর করেন। প্রত্যেক লেখকই, যাঁদের জীবিকা উপার্জনের পেশা ভিন্ন, তাঁরা অনুযোগ করেন, অভিযোগ করেন, নীরস কাজে সময়ের অপচয় হয় বলে গ্লানিও অনুভব করেন। নরেশচন্দ্র ব্যতিক্রম বলেই আমার মনে হয়েছিল, অনুশীলনে আরও বেশী সময় ব্যয় করতে পারলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি বাংলা সাহিত্য থেকে তাঁর প্রভাব অপসারিত হত না।

মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি নীরব থাকাই সমীচীন মনে করি। শুধু একটি কথা, তাঁরা কি কাজের চাপেও ভাবের প্রচণ্ড পীড়নে লিখেছেন, না লেখার জন্যে অনেক কাজ পণ্ড করেছেন?

আর সুধীন্দ্রনাথের মতো গুণীজন নিশ্চয়ই জানতেন যে কবিতার কাঞ্চনমূল্যে রাসেল স্ট্রীটে বাস করা যায় না। কিন্তু খাঁ সাহেব হয়তো জানেন না যে, তিনি শুধু অন্তরের তাড়নায়ও লেখেননি। 'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে, সাহিত্য সৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্য-পক্ষে মানতে চাইনি, তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলাম অভিজ্ঞতাকে। যে অসামান্য বিন্যাসে সেই চিরপরিচিত উপকরণসমূহে আমাদের বিস্ময় জাগায় তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সঙ্কল্পে। উক্ত সমীকরণ একা প্রতিভার কর্ম নয়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রযত্নের পুরস্কার।"

হয়তো অতুলচন্দ্র গুপ্ত এ মত মানতেন বলেই, পেশার পীড়নে 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র পর তিনি প্রায় নীরব। শুধু ভাবের প্রচণ্ড পীড়নে আরও একশোখানা বই লিখলে, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর জীবন এত দীর্ঘ হত কি?

আমাদের সমসাময়িক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নামও খাঁ সাহেব উল্লেখ করেছেন দেখলাম। আমার মনে হয়, এ নামোল্লেখ অবান্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু মানিক কি শুধু ভাবের ঘোরে লিখেছেন? আর আমি তো জানি, জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি সাহিত্যের উপার্জিত অর্থের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন।

তারপর প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'প্রথমা' ও

'সম্রাট' ও 'ফেরারী ফৌজে'র কবি কিসের পীড়নে যে 'সাগর থেকে ফেরা'র মতো কাব্য-গ্রন্থ লিখলেন তা আমার কাছে আজও একটা রহস্য হয়েই রইল।

কিন্তু সম্পাদক মশাই, এসব কথা আপাতত থাক। পূর্বপত্র বিভাগ শুরু হবার সময়, আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন, দেশ পত্রিকার মাধ্যমে বিগত যুগের প্রসিদ্ধ জীবিত লেখক-লেখিকাদের আপনি শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান। তাঁদের সাহিত্যের বিশ্লেষণ এই বিভাগে মুখ্য নয়। এখন আমাদের অকারণ বিদ্যাজাহিরে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন না বরং আঘাত পেতে পারেন। ইতি—

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গবাণী বনাম বঙ্গবাসী

গত ১লা ভাদ্রের দেশে শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্য-চর্চা, অভিনয় প্রসঙ্গে সেকালের সংবাদপত্র, রঙ্গ-মঞ্চ ও স্বদেশী-আন্দোলনের বিস্মৃতপ্রায় অনেক কথা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এজন্য তিনি অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাঁর আলোচনায় তথ্যগত একটি ভুলের কথা না ব'লে পারছি না। তিনি সেকালের সাপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রকে বার বার তিনবার "বঙ্গবাণী" নামে অভিহিত ক'রেছেন। যথা পৃঃ ২১২, কলম ৩ পৃঃ ২১৩, কঃ ১ পৃঃ ২১৭ কঃ ১। কাজেই ভুলটি ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপাবার উপায় নেই।

প্রসঙ্গত বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বিহারীলাল সরকার সম্পাদিত "বঙ্গবাসী" সাপ্তাহিকের বহু পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনরায় বাহাদুরের যুগ্ম-সম্পাদনায় ভবানীপুর থেকে "বঙ্গবাণী" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বের হয় সম্ভবত ১৩২২।২৩ সালে। যতদূর মনে পড়ছে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে "বঙ্গবাণী" নামে একখানা বাংলা দৈনিকও বের করেন। ইতি—

শ্রীরাধাচরণ রায়, সাহিত্যরত্ন
মালদহ

দণ্ডক শবরী

মহাশয়,

গত ২৬শে শ্রাবণ তারিখের দেশ পত্রিকায় আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত শ্রীতেজেন্দ্রলাল মজুমদার তিনটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। সে-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানালাম। (১) মজুমদারমশাই বাস্তার, রায়পুর, দুর্গ এবং উড়িষ্যার সুন্দরগড় সম্বলপুর প্রভৃতি এলাকায় প্রচলিত "মিতানীর" প্রসঙ্গ এনে বলতে চেয়েছেন বোণ্ডাদের 'মহাপ্রসাদ'-বন্ধুত্বও ঐ ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত। বোণ্ডারা এতদূর আত্ম-কেন্দ্রিক যে সে কথা মেনে নেওয়া শক্ত। তিনি লিখেছেন "যদি ধরেও নেওয়া যায় বোণ্ডা-আদিবাসীদের কেউ কখনও পুরী তীর্থ করতে যায়নি—" এ থেকেই অনুমান করছি বোণ্ডাদের শব্দকবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা নেই। পুলিস ভ্যানে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ছাড়া কোনও বোণ্ডা স্বজ্ঞানে কখনও তাদের জেলা সদর কোরাপুটে পদার্পণ করার কথাই কল্পনা করতে পারে না। নিকটতম শহর জয়পুরের হাটেও তারা কখনও আসেনি। পাহাড়ের মাথায় ওরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা, আমি লিখেছিলাম "তাই আমার বিশ্বাস করতে মন চেয়েছে, যে শুধু শ্রীরামচন্দ্রই নন, প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিও পড়েছিল এই দণ্ড-কারণ্যের প্রত্যন্ত দেশে।" মনের উপর হাত নেই যে:—বিশ্বাসের জোর থাকলে লিখতুম —'আমি মানি, তাই জানি'।

(২) "মাড়াই হচ্ছে আদিবাসীদের বাৎসরিক মিলন উৎসব"—এ কথায় আপত্তি জানিয়েছেন তিনি। কারণ "রাউত জাতির মাড়াই দেখতে বিশেষ জনসমাবেশ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য রাউতরা আবার আদি-বাসী নয়।" আদিবাসীদের অনুকরণে আদিবাসী-নয় এমন কোন কোন জাতি এ উৎসব পালন করলেও মূলত এটি আদিবাসী উৎসব। আমরাও বড়দিনের উৎসব করি, বাঙলার বাইরে অবাঙালীরাও দুএক স্থানে শারদীয় উৎসব করেন—তবু বড়দিন খৃষ্টানদের উৎসব, দুর্গোৎসব বাঙালীর।

(৩)। 'বাস্তার' বানানটিতেও তাঁর আপত্তি। কারণ "হিন্দীতে সরকারী কাগজপত্রে এবং অন্যান্য স্থানে যে বানানটি লেখা হয়, তাতে ব-য়ের পিছনে আকার নেই।" সরকারী নথীপত্রের হিন্দী বানান বাঙলায় লিখতে হলে "পটনা, মদ্রাস, বম্বই" লিখতে হয়। তেজেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই এ বানানগুলি লেখেন না। বাস্তার জেলার বাঙালীরা শব্দটিকে "বাস্তার" উচ্চারণ করেন—বাঙলা রচনায় সেটিই গ্রাহ্য। প্রসঙ্গত লক্ষনীয় তেজেন্দ্রবাবু আমার এ নীতি অন্যত্র মেনে নিয়েছেন তাঁর চিঠিতে "বোণ্ডা" শব্দটি লিখে। ও অঞ্চলের বাঙালীরা ওদের "বোণ্ডা"ই বলেন। সরকারী কাগজপত্রে, নৃতত্ত্ব বিভাগের যাবতীয় রিপোর্টে যে বানানটি লেখা হয়, তাতে ড-য়ের পিছনেও আকার নেই, আছে 'ও'-কার। শব্দটি Bondo।

ইতি ভবদীয়
বিকর্ণ

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮ই আগস্ট দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত "হিন্দী ও বাংলা" শীর্ষক আলোচনা-পত্রে মুদ্রণ প্রমাদবশত শ্রীসুবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্থলে সুধীরকুমার ছাপা হইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক দেশ

পূর্বপত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আজ, যা কিছু আছে গিরিবালার চোখের সামনে, তার মধ্যে অনেক, প্রায় সবই কৃত্রিম। এই বাড়ি, সন্ধ্যায় সাদার্ন অ্যাভিনিউএ নিওনের আলো, পাখা, রাস্তায় দ্রুতগতি এক-একটা ছোট বড় গাড়ি আর গ্রীষ্মের রোদপড়া হলুদ বিকেলে পাশাপাশি চলা অন্তরঙ্গ ছেলেমেয়ের অস্থির প্রেম, গিরিবালার মনে হয়, তাও কৃত্রিম। তাতে উত্তাপ আছে, দীপ্তি নেই। ঔজ্জ্বল্য আছে উজ্জীবন নেই। এখনকার টুকরো আকাশ, মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলক, শীর্ণ লেকের জল—এত অল্পে মন ভরে না গিরিবালার—তিনি খুশী থাকতে পারেন না। অনেক দেখেছেন গিরিবালা—অনেক পেয়েছেন। এসব কিছু না।

শৈশব থেকে কৈশোর, কতটুকুই বা কাল। গিরিবালা দেখেছেন নদী, আঁকাবাঁকা, রুপোলী মেখলার মতো। আকাশ—এত বিশাল যে, তাকে আকাশই বলা যায়। গাছ ফুল ফল পাখি, এত বেশি আর এত রকম, এখন বলা যায় না, বোঝানো যায় না। এখনও এই সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে সকাল-বিকেল সেইসব দিন, সেইসব স্মৃতি মনে আসে। কিন্তু কিছু নেই। কেউ নেই।

কথা বলতে বলতে গলা ধরে আসে গিরিবালার। চোখ ভিজে ওঠে। মনে হয়, তাঁর চোখের সামনে, মনের মধ্যে এখন, এই মুহূর্তে আবার ফুটে ওঠে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই হারানো প্রকৃতি, অতীত, পাবনার সেই সবুজ শ্যামল নাকালিয়া গ্রাম, "একটি ভাই ছিল আমার। রইল না। মা-বাবা ভাবলেন, আমিও থাকব না। ভাই-এর মতো চলে যাব—মরে যাব। ওঁরা আমাকে দিলেন আদর, স্নেহ। একদিন বকলেন না, কখনও শাসন করলেন না। কোন কাজ শেখালেন না সংসারের, কোন দায় চাপালেন না। আমাকে ছেড়ে দিলেন খুশিমতো ছুটোছুটি করবার জন্যে, খেলে বেড়াবার জন্যে—"

"তারপর?"

"আমি ছুটে বেড়াতাম প্রজাপতির পিছন-পিছন, ছিপ নিয়ে বসে থাকতাম নদীতে। গাছে উঠতাম। জামরুল পেড়ে-পেড়ে হাত ব্যথা হয়ে যেত, দাঁত টকে যেত কুল খেয়ে-খেয়ে—"

"থামবেন না। বলুন?"

কিন্তু চুপ করে থাকেন গিরিবালা। আঁচলে চোখ মুছে নেন। অল্প পরে, যেন মনের মধ্যে হঠাৎ ফেনিয়ে ওঠা শোক সামলে নিয়ে আবার হাসি-হাসি মুখে বলেন, "কুল গাছে চড়ে কুল খাচ্ছিলাম একদিন, কাঁচা-পাকা নানারকম কুল, সঙ্গে নুন নিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে আমাকে কেউ দেখবার নেই।

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী

কিন্তু আমি দেখছিলাম সব—অবারিত মাঠ, পাতার ভিড়, পাখি আর একমনে কুল খেতে-খেতে শুনছিলাম মিষ্টি ডাক—এত পাখি ডাকে কোন গাছে! বোধহয় পাখি খোঁজবার জন্যেই আমি নেমেছিলাম গাছ থেকে। কুল খেতে খেতে তাকাচ্ছিলাম এদিক-ওদিক—"

দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে গিরিবালা বলেন, "পাখি না, দেখলাম একটা মস্তবড় পাল্কি আসছে, খুব বড় লোকের পাল্কি। আমি পালিয়ে গেলাম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কুল গাছতলায়। কে যায়, দেখি। কিন্তু আমার কাছাকাছি এসে পাল্কি থেমে গেল। পাল্কিতে ছিলেন আমাদের পাশের হাটুলিয়া গ্রামের বিরাট জমিদার উমেশচন্দ্র রায়," অল্প হাসেন গিরিবালা, "আমার শ্বশুর। কুল গাছতলায় সেই প্রথম তিনি আমাকে দেখলেন। কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবার নাম কী মা?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, দীননাথ শাস্ত্রী—

তিনি বললেন, আয়ুর্বেদ পণ্ডিত দীননাথ শাস্ত্রী?

হ্যাঁ।

তারপর কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল! বারো বছর বয়সে আমি শ্বশুরবাড়ি এলাম।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার ১৫ সেপ্টেম্বর
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বড়লোক—খুব বড়লোক। আদবকায়দা, ধরন-ধারণ, চাল-চলন, সব কিছুতেই জমিদারী দম্ভের ছাপ—আভিজাত্যের ছাপ। আমার ভয়-ভয় করতে লাগল। সংসারের কিছু জানি না, মা-বাবা কিছু শেখাননি, শিখতে দেননি, এখন কী করতে কী করি, কী বলতে কী বলি, কী ভুল হয়ে যায়—সব সময় সেই ভয়।"

গিরিবালার সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ড্রয়িং রুমে একসঙ্গে দুটো পাখা ঘুরছে। মেঘলা দিন। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছি। আমার সামনে গিরিবালা। চোখেমুখে সারল্যের দীপ্তি। ওঁকে দেখতে দেখতে আমার সেকালের মহীয়সী নারীর কথা মনে হয়। আমি চুপচাপ গিরিবালাকে দেখি। পাশে বসে আছেন তাঁর তৃতীয় সন্তান আমাদের সমসাময়িক লেখিকা বাণী রায়। কয়েক বছর আগে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। অতীতের কথা বলতে বলতে তাই গিরিবালা মাঝে মাঝে থেমে যান। স্বামীর কথা মনে হয়। সুখ-স্মৃতির পীড়নে তাঁর চোখ ভিজে ওঠে।

গিরিবালা চুপ করে আছেন। ভাবছেন। তাঁকে কথা বলাবার জন্যে এবার আমি জিজ্ঞেস করি, "এর মধ্যে, শ্বশুরবাড়ি আসবার আগে, কিম্বা পরে, প্রথম কখন লেখার কথা আপনার মনে হয়?"

"প্রথম কখন?—"

"না না", আমি হেসে উঠি, "দিনক্ষণের হিসেব রাখা সম্ভব নয়, আমি, মানে, শুধু

।ইটুকুই জানতে চাই যে, আপনার লেখার মূলে কোন বেদনা কি আঘাত কিম্বা—"

বাণী রায় বলে ওঠেন, "একমাত্র বাবার মৃত্যু ছাড়া মার জীবনে আর কোন দুঃখ নেই। আর, কখনও কোন আঘাত পাননি বলেই তাঁর সৃষ্টিও শেষ হয়ে গেছে—"

আমি হেসে মৃদু তিরস্কারের সুরে বাণী রায়কে বলি, "আপনার কথা শুনতে আসিনি। ও'কেই বলতে দিন—"

লজ্জা পেয়ে বাণী রায় উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি আপনার চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—"

"খুবই ভাল কথা", গিরিবালাকে বলি, "বলুন?"

খুব আস্তে কথা বলেন গিরিবালা, "স্বামীর মৃত্যুর চেয়ে কোন বড় আঘাত আমার জীবনে নেই, সেকথা ঠিক। কিন্তু আমি কেঁদেছি সেই নদীর জন্যে, গাছের জন্যে, আকাশের জন্যে—অনেক দিন। সবই ছিল আমার কাছাকাছি, আমিও ছিলাম প্রকৃতির সেই অবারিত সৌন্দর্যের মধ্যেই—কিন্তু এতো আমার বাপের বাড়ি নয়, শ্বশুর বাড়ি। বয়স অল্প হলেও তেমন করে আর তো আমি ছুটোছুটি করতে পারব না রোদে বৃষ্টিতে, খোলা হাওয়ায়—ছিপ হাতে নদীর ধারে বসে থাকতে পারব না অনেকক্ষণ—"

আবেশের দীপ্তিতে হঠাৎ অপরূপ হয়ে ওঠে গিরিবালার চোখ, "যখন শুধু বাহির ছিল আমার বড় আপন, তখন কখনও কখনও নদীতে ছিপের ছায়া দেখতে-দেখতে, নিজের ছায়া দেখতে-দেখতে, বাঁশবনের মিষ্টি শব্দে, ধানের খুশীতে আমার মনে হত, আমি ছিলাম, এখানেই ছিলাম যেন, আরও অনেকবার। আর বোধ হয়, তখন প্রথম অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত কাঁপত মনের মধ্যে, প্রকৃতির সঙ্গে আমার এই নিবিড় পরিচয়ের কথাটা প্রকাশ করবার ইচ্ছে জাগত—"

"কিছু লিখেছিলেন তখন?"

"না না", মাথা নেড়ে গিরিবালা বলেন, "ও কিছু নয়, শুধু একটা ক্ষীণ তাগিদ, একটা স্পর্শ—লিখব কেমন করে? লেখাপড়া যে একেবারেই জানতাম না তখন।"

"কখন শিখলেন?"

"বিয়ের পর। আমার স্বামী আন্তরিক স্নেহে প্রচুর যত্ন নিয়ে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তিনিও লিখতেন, ইংরেজি-বাংলায়, গদ্য-পদ্য, দুই-ই।"

"কিন্তু রক্ষণশীল জমিদার বাড়ির বউ আপনি—এ নিয়ে কোন কথা ওঠেনি?"

"না", গিরিবালা হেসে বলেন, "কেউ জানতেই পারতেন না। আর জানলেও হয়তো বাধা দিতেন না—শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনেই আমাকে ভালবাসতেন, আমার মা-বাবার মতোই। আমার স্বামীর বয়সও তখন খুবই কম। কত হবে, বোধ হয় আঠারো-উনিশ। কলকাতায় থেকে কলেজে পড়তেন। ছুটিতে-ছুটিতে গ্রামে আসতেন। আমাকে পাঠ দিতেন। তিনি ছুটির পর আবার কলকাতায় ফিরে গেলেও আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে তাঁর কথামতো কাজ করতাম—লেখাপড়া করতাম।

তখন একমনে এ-বই ও-বই পড়তে-পড়তে, হাতের লেখা লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে যেতাম। চুপচাপ বসে থাকতাম। ভাবতাম। আর, বোধ হয় লিখতেও চাইতাম—"

"কী লিখতে চাইতেন?"

"আমার গ্রামের বর্ণনা, এ বাড়ির বিলাস-আভিজাত্যের কথা, স্বামীর স্নেহ—এইসব আর কী। মাঝে মাঝে গান-কবিতা লিখতাম, গদ্যও। বেশি বিদ্যা নেই, হয়তো কোন মানেও হত না। তবু লিখতাম।"

"লেখাপড়া করতে আপনার ভাল লাগত?"

"খুব ভাল লাগত—" গিরিবালা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, "এই যে বাণী, এখানে রাখ—"

শুধু চা নয়, অসময় হলেও বাণী রায় ফিরে এলেন একটা বড় ট্রেতে নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে, "খান"।

ধন্যবাদ জানাবার কথা আমার মনে হয়

না। আমি হালকা স্বরে বলি, "আপনি ওঁর 'মুড' নষ্ট করে দিলেন—"

বাণী রায় হেসে বলেন, "খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে মা অনেকবার আমারও 'মুড' নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি খেতে-খেতেই তাঁর কথা শুনুন।"

আমি গিরিবালাকে প্রশ্ন করি, "আপনারা কলকাতায় এলেন কবে?"

"আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে। বাণীর বাবা ল' পাশ করে এখানেই প্র্যাকটিস শুরু করলেন। নারকেলডাঙ্গায় একটা বাড়ি নেওয়া হল। ক্ষীরোদ আর সুরেশ দুই দেওর, আমি আর উনি এসে উঠলাম সেখানে। বাণীর কাকারা, একজন প্রায় আমার সমবয়সী, তখন কলেজে পড়ে।"

বাণী রায়কে জিজ্ঞেস করি, "আপনার বাবার নাম—"

"পূর্ণচন্দ্র রায়।"

গিরিবালা বলেন, "যদিও এবার আমার সংসার—আমিই গৃহিণী, কিন্তু ভাল লাগত না, বড় অসহায় মনে হত—"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি, "শহর বোধ হয় আপনার ভাল লাগত না—গ্রামের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যেত?"

"না। নারকেলডাঙা তখন গ্রামের মতোই ছিল। চারপাশে বড় বড় গাছ, হু-হু হাওয়া, ফাঁকা মাঠ, আমি যেন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে এলাম—"

"তাহলে?"

"নিজের সংসারে একা-একা হাঁপিয়ে উঠতাম, দিশা হারাতাম। কত বড় সংসার ছিল আমাদের—কত লোকজন! সকলের কথা মনে পড়ত! শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্যে মন কাঁদত—"

"লেখা শুরু করলেন কখন?"

"তখন নারকেলডাঙা ছেড়ে ঠনঠনে কালী-বাড়ির কাছাকাছি বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে আমরা আর এক বাড়িতে উঠে এসেছি। উনি কোর্টে বেরিয়ে যান, বাণীর কাকারা কলেজে যায়, সংসারের কাজ সেরে একা-একা আমি শুধু ভাবতাম—নানা ভাবনা। একদিন, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি, রাস্তায় একটা পাগলী, বয়স কম। 'হরি বোল' বললেই সে ক্ষেপে ওঠে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা আসছে তার পিছনে-পিছনে। 'হরিবোল' বলে-বলে তাকে ক্ষেপিয়ে মজা করছে। আমি সে-দৃশ্য দেখলাম। অনেকক্ষণ।

ওরা চলে গেল। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা কথা, ভাসা-ভাসা ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট ঝাপসা কল্পনা মাথায় আসে, কেন পাগলী ক্ষেপে যায়, 'হরি বোল' বললে! ওরও বোধ হয় ছিল স্নেহময় স্বামী, সুখের সংসার। কিন্তু সুখ সইল না ওর কপালে। সংসার ভাঙল। একটি ধ্বনি, ওর কানে মাথায়, যে-ধ্বনি ওর স্বামীর নিস্পন্দ দেহকে নিয়ে গেল ঘর থেকে, 'বল হরি, হরি বোল'

বাজতে লাগল—ও থাকতে পারল না ঘরে, পথে বেরিয়ে এল, পাগলী।

আমার প্রথম ছোট গল্প 'ভাগ্যহীনা' সেই পাগলীকে নিয়ে। ওটা প্রকাশিত হয় দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকায়। দ্বিতীয় গল্প 'ছলনা' মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় লিখি। তারপর অনেক, প্রায় পাঁচ-ছ শো গল্প লিখেছি আমি।"

"কোন কোন পত্রিকায় লিখতেন আপনি?"

"সাহিত্য, সুপ্রভাত, ভারতবর্ষ, সচিত্র শিশির, তবে বসুমতী আর মানসী ও মর্ম-বাণীতে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি লিখেছি।"

"পারিশ্রমিক পেতেন?"

"অনেকেই পাঠাতেন। কিন্তু লিখে টাকা নিতে সম্ভ্রমে বাধত। আমার স্বামী খুব অসন্তুষ্ট হতেন। পত্রিকা থেকে যখন দশ-পনেরো টাকা আসত, আমি হয় তা ফেরৎ পাঠাতাম, নয় কোন অনাথ আশ্রমে সাহায্য পাঠাতাম।"

"আর বই-এর বেলা? প্রকাশকদের কাছ থেকেও কি আপনি পারিশ্রমিক নিতেন না?"

"না। তবে, মাঝে মাঝে আমার দেওর, বাণীর কাকা বলত, তুমি না নাও, আমি নিচ্ছি। আর, পারিশ্রমিক না নেয়ার জন্যে বাড়ির কোন ‘——’-অনুষ্ঠানে কোন-কোন সম্পাদক আসতেন দামী উপহার হাতে নিয়ে।"

"অনেক লিখেছেন, না?"

"খুব বেশি আর লেখা হল কোথায়! এই গোটা পনেরো-কুড়ি বই।"

"আমি ছেলেবেলায় আপনার উপন্যাস পড়েছি। খুব ভাল লাগত, 'রূপহীনা', 'দান-প্রতিদান'—"

"আরও আছে", গিরিবালা বলেন, "খণ্ড মেঘ, হিন্দুর মেয়ে, কুড়ান মাণিক, মুকুটমণি আর ছোট গল্পের বই তৃণগুচ্ছ—"

"কোনটি সবচেয়ে ভাল বলে আপনার নিজের মনে হয়?"

গিরিবালা হঠাৎ উত্তর দিতে পারেন না। আর একবার অনুরোধ করায় অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বলেন, "বোধ হয় 'দান-প্রতিদান'—"

বইখানা অনেকদিন পর আবার তাঁর কাছে নতুন করে দেখি। আর একবার পড়তেও ইচ্ছে করে। এখন সে-বই দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যাই। চারশো পঁচিশ পাতার দীর্ঘ উপন্যাস। বিলিতি অ্যান্টিক কাগজে ছাপা ডবল ক্রাউন বই। ১৩৪৪ সালে বরেন্দ্র লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত। দাম মোটে আড়াই টাকা।

"আপনি লেখা বন্ধ করলেন কেন?"

"আমার স্বামী উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে লেখা শুরু করেছিলাম। একসময় উনিই বললেন, আর নতুন কিছু লিখতে পারছ না, এবার লেখা ছেড়ে দাও—"

"নতুন কিছু মানে?"

"কথাটা উনি ঠিকই বলেছিলেন। সেই গ্রাম আর শহর আর সেই একই সমস্যা—আমারও লিখতে ভাল লাগত না।"

"নতুন-নতুন বিষয় নিয়ে লেখবার চেষ্টাই বা করলেন না কেন?" আমি যেন অভিযোগ করি, "আপনার কালের মহিলা সমাজ কিম্বা—"

গিরিবালা বাধা দিয়ে বলেন, "দেখবার সুযোগ পাইনি। বাইরের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, "সে কী?"

"আমার স্বামী পছন্দ করতেন না বলে বাইরে যেতে আমার একেবারে ইচ্ছে করত না", খুব সহজ স্বরে কথা বলেন গিরিবালা।

"কোন লেখক-লেখিকার সঙ্গেও আপনার আলাপ হয়নি?"

"না, তখন কাউকেই আমি জানতাম না।"

"কার-কার লেখা আপনার ভাল লাগত?"

"রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের লেখা তো ভাল লাগতই। তা ছাড়া, প্রভাত মুখার্জি, কাঞ্চনমালা দেবী, নিরুপমা—"

"তারপরের যুগের কার লেখা আপনার ভাল লাগে?"

"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়." এ নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালা যেন

সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে হঠাৎ উৎসাহী হয়ে ওঠেন, "বিচিত্রার পথের পাঁচালী পড়তে-পড়তে চমকে উঠি। একটা বড় চেনা মিষ্টি গন্ধ যেন নাকে এসে লাগে। আমার গ্রামকে —সেখানকার মানুষকে আমি বুঝি এমন করেই আঁকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি —বিভূতিভূষণই বোধ হয় প্রথম লেখক, যাঁকে দেখতে চাইলাম, যাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলাম!"

"হয়েছিল আলাপ?"

"হ্যাঁ, খুব", গিরিবালা বলেন, "একটি ছেলে রেবতী আসত আমাদের বাড়িতে। তার সঙ্গে তখন একই মেসে বিভূতিভূষণ থাকতেন। সেই তাঁকে আমাদের বাড়িতে প্রথম নিয়ে আসে।"

এবার বাণী রায় বলেন, "ঘাটশিলায় একটা বাড়ি আছে আমাদের। বাড়ির নাম, গিরি-নির্ঝর। ঘাটশীলায় বিভূতিভূষণের সঙ্গে মার আলাপ আরও বেশি হয়।"

গিরিবালা বলেন, "বিভূতিভূষণ সেখানে তাঁর অনেক লেখা আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন।"

"আর কার লেখা আপনার ভাল লাগে?"

"মানিকের পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা খুবই ভাল লেগেছিল। তারাশংকরের লেখা ভাল তো লাগেই—"

হঠাৎ জিজ্ঞেস করি, "আপনার মেয়ের লেখা কেমন লাগে?"

বাণী রায় বাধা দেবার আগেই গিরিবালা বলে ওঠেন, "ওর লেখা আমি নাকি বুঝতেই পারি না—"

আমি হেসে উঠি, "আপনার মেয়ের সমসাময়িক আর কোন্ কোন্ লেখকের লেখা আপনার ভাল লাগে?"

এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না গিরিবালা। বিব্রত বোধ করেন। অসহায়ের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলেন, "তোমার লেখা—"

আমি হাসিমুখে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলি "থাক থাক, বুঝতে পেরেছি।"

গিরিবালা অধীর হয়ে বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পড়ি। তোমাদের সকলের লেখা আমার ভাল লাগে—"

বাণী রায় বলেন, "সত্যি, মা এখনও ভীষণ পড়েন।"

"হ্যাঁ পড়ি", বিষাদের একটা ছায়া নামে গিরিবালার মুখে, "লেখাপড়া করবার সুযোগ তো পাইনি ছেলেবেলায়, তাই অনেকের আপত্তি থাকলেও বাণীকে পড়িয়েছিলাম অনেক দূর, আমার অপূর্ণ সব সাধ ও-ই পূর্ণ করুক—"

বাণী রায় বাধা দেন, "আঃ, মা থাম!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো খুবই ভাল ছাত্রী ছিলেন", একটু থেমে একবার মার আর একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, আর একটি প্রশ্ন—"

"বল, বল?"

"প্রেম সম্পর্কে আপনার মতামত কী?"

গিরিবালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "এ কালের ছেলেমেয়েদের প্রেমে আমার খুব বেশি আস্থা নেই।"

"কেন?"

"বড্ড চুলচেরা হিসেব-নিকেশ। দেনা-পাওনা নিয়ে তর্ক। তারপর ঝগড়া-বিবাদ। সম্পর্ক যেন দুদিনের। আমাদের কালের মতো এ কালের প্রেম-ভালবাসা যেন গভীর নয়।"

আমি হেসে বলি, "প্রেম তো দু-দিনেরই!"

"হোক। কিন্তু আরও একটা স্তর, প্রেমের পর যা আসে, এখনকার ছেলেমেয়েরা সেখানে যেন পৌঁছতে পারে না, তার আগেই সব ভেঙেচুরে যায়। ধৈর্য নেই। প্রতীক্ষা নেই—"

বাধা দিয়ে বলি, "আপনার স্বামী যদি আপনার প্রেমের অমর্যাদা করতেন, তাহলে কী করতেন আপনি? মুখ বুজে ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন অপমান সহ্য করতেন—প্রতীক্ষা করতেন?"

দৃঢ়স্বরে গিরিবালা বলেন, "কখনই নয়। আমি তাঁর সংগে থাকতে পারতাম না—তাঁকে ছেড়ে চলে যেতাম।"

"কোথায়?"

"বোধ হয় কোন আশ্রমে।"

"আর কোথাও আপনি যেতেন না, যদি আপনার বয়স কম হত?" স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ না করলেও, প্রশ্ন করি, জীবনের দাবীকে, প্রেমকে তিনি কি একেবারেই অস্বীকার করতেন।

"প্রেম!" গিরিবালা অবাক হয়ে বলেন, "আমি আমার সব কিছু তো স্বামীকেই দিয়েছি আর কোথায় পাব! তিনি যেমনই হোন, প্রতিদান না পেলেও, যা দেবার ছিল, আমি একজনকেই দিয়েছি। যদি তিনি ফিরে আসেন, অনুতাপ করেন, আমি তাঁর সব অপরাধ ভুলে যাব—তাঁকেই আবার গ্রহণ করব।"

"আর যদি তিনি ফিরে না আসেন?"

"আশ্রমেই জীবন কাটাব", গিরিবালার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, "মানুষ একদিন ক্লান্ত হয়, অনুতাপ করে—করেই। একটা গল্প শুনবে?"

"বলুন?"

"আমাদের গ্রামে ছেলেবেলায় একটি মেয়ের সংগে আমার ভাব ছিল। নীচু ঘরের মেয়ে। নাম প্রেমদা। বয়স হবার সংগে সংগে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে, শুধু বাইরে মন। তারপর এক-একদিন এক-একজনের সংগে সে থাকে—অধঃপাতে যায়—"

"তারপর?"

"তারপর আবার সে ভাল হয়, সংজীবন কাটাতে চায়। তখন আমার সংসারের কাজ করবার জন্যে আমি তাকে কলকাতায় নিয়ে আসি", গিরিবালা বলে যান, "আমার স্বামী রাগারাগি করতেন, বলতেন, অমন মেয়েকে কেন সংসারে ঢোকালে? কিন্তু কই, আমার তো তাকে আর খারাপ বলে মনে হয় নি। অনুতাপ করে কেউ যদি আবার ফিরে আসে, ভাল হতে চায়, তাকে ক্ষমা না করলে, তার অন্যায় না ভুললে চলবে কেন!"

"আপনি লিখুন, আবার নতুন করে লিখুন!"

"দেখি", দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিরিবালা বলেন, "কিছুদিন আগে প্রবাসীর জন্যে একটা লেখা লিখেছি। মাঝে মাঝে অনেকের আগ্রহে লিখতেই হয়।"

কথায় কথায় সময়ের খেয়াল ছিল না।

অনেক বেলা হল। দুপুর আড়াইটা। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি তো অনেক খেলাম। কিন্তু এ'রা? বাড়ির আর সব লোক? আর দেরি না করে গেট ঠেলে রাস্তায় আসি।

আসবার সময় গিরিবালার কাছ থেকে প্রায় তাঁর সব কটি বই আর একবার পড়বার জন্যে চেয়ে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলেবেলায় পড়লেও, তাঁর সম্পর্কে লেখবার আগে, দেখি, পুরানো দিনের লেখা আজ—এত পরে, আবার কেমন লাগে। যদিও ভয় ছিল—ভাল না লাগার ভয়। কিন্তু—

"যিনি আজ আসিলেন, আমি জীবনে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার নাম পর্যন্ত শুনি নাই; কিন্তু আমার নিষ্কলংক শুভ্র হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে বহুদিন পূর্বেই আমার ভাবী দয়িতের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শৈশবের পুতুল খেলা কৈশোর সুখ কল্পনার শ্রদ্ধা দিয়া যাহা অংকুরিত হইয়াছিল, আজ যৌবনের প্রারম্ভে সেই অংকুর শাখা-প্রশাখায় বর্ধিত হইয়াছে।......"

কিংবা—

"আকাশে নববর্ষার শুভ্রস্ফীত মেঘ বাতাসে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল। অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক বৃক্ষশিরে শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীর জলে বর্ষাস্নাত প্রকৃতির অঙ্গে ঝিকমিক করিতে লাগিল। কৃষকদের আউশ ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে; ক্ষেত হইতে তাহাদের ক্লান্ত সকরুণ স্বরের গ্রাম্য সংগীত রহিয়া রহিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই অতি ম্লান অতি স্নিগ্ধালোকে সেই আপনভোলা খেয়ালি সুর আমার প্রাণে কিসের ব্যথা যেন জাগাইয়া তুলিতেছিল। সে যে কিসের ব্যথা তাহা আমি জানি না, সে ব্যথা প্রকাশাতীত, অব্যক্ত! আমি ক্ষণকালের জন্য হাতের কাজ বন্ধ করিয়া ছায়াচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে স্বর্ণবর্ণ ক্ষেতটির পানে চাহিয়া রহিলাম।"

তা ছাড়া আরও—

"ক্রুদ্ধ স্বামীর প্রতি অনলবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, তুমি এখনও এখানে? এখান থেকে যেতে পারনি, যাও নি?......

পত্নীর রূক্ষতায় জয়ন্তর পতিত্ব সজাগ হইয়া উঠিল। জয়ন্ত বিদ্রূপের স্বরে কহিল, আমি যাব কেন? নিজের বাড়ী, ঘর ছেড়ে—দেশ ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

কোথায় যাবে জানি না, তবু তোমাকে যেতেই হবে। তোমার আমার জায়গা এক নয়, আমি তোমাকে সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে দিয়ে ভূষণডাঙা ভিক্ষা চাইছি। তুমি যাও, এখুনি যাও। আর এসো না।

তোমারি আদেশে আমাকে যেতে হবে নাকি? কেন, কি অপরাধে নির্বাসন-দণ্ড? তুমি কি আমার কর্তা যে, তোমারই হুকুমে

আমার যাওয়া-আসা করতে হবে? জয়ন্ত রায় কারুর গোলাম নয়, তার প্রভু সে নিজে, সেটা মনে রেখে কথা বল। আমাকে হুকুম করবার তোমার কি অধিকার আছে?

আছে বৈকি। লোকত ধর্মত আমার অধিকার তোমার অস্বীকার করবার উপায় নেই। অধিকার আছে বলেই তোমার মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। না করলে তোমায় রাখতে পারব না। ধর্মে পতিত হব। তুমি যে পাতক করেছ, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাদের দূরে থাকতে হবে।"

গিরিবালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেমন আমার সময়ের খেয়াল থাকে না, তেমনি তাঁর লেখা পড়তে গিয়েও দেখি, সব ভুলে যাই। ভেবেছিলাম দু-চার পাতায় ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেই আমার কাজ চুকে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, এত পড়েও এখন আবার গিরিবালাকে আমার যেন ভাল লেগে যায়—এত ভাল যে শেষ পাতায় মা পৌঁছে তাঁর 'দান-প্রতিদান' আর 'রূপহীনা' আমি ছাড়তে পারি না।

আর পরে, অল্প পরেই, রাত-জাগা এক-এক মুহূর্ত এই লেখিকার ভাবনায় কেটে যায়। সীমিত গিরিবালার পরিধি—তাঁর পৃথিবী। পূর্ণ তাঁর জীবন—ধন্য। তিনি তৃপ্ত স্বামীর প্রেমে, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহে, পুত্রকন্যায় আশাতীত সাফল্যে। কোন দুঃখ নেই তাঁর। কোন গ্লানি নেই। অভাবের কোন ছায়াই নেই সংসারে।

এরই মাঝে, এই সোনার শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে গিরিবালাকে ভাবতে হয়েছে—লিখতে হয়েছে। এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যুক্তির কিংবা যন্ত্রণার অন্য কোন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। পারবার কথাও নয়।

তবু তাঁর নায়ক-নায়িকারা মাঝে মাঝে গ্রহণ করেছে বেদনার স্বাদ। সে বেদনা একান্ত গিরিবালারই কল্পনা। কী সে বেদনা? আর, কেমন করে তার অবসান?

কুরূপা স্ত্রী। তাই স্বামী উদাসীন। নির্মম, কঠোর। মেয়েটি প্রতীক্ষা করে অসীম ধৈর্যে। রূপে নয়, গুণ দিয়ে সে একদিন হঠাৎ-ঘটে যাওয়া ঘটনাচক্রে প্রমাণ করে নিজের বিশেষত্ব। এবং এতদিনের বিমুখ স্বামী তার অনুগত হয়ে ওঠে। জ্বালা জুড়োয়। গড়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীর শান্তির নীড়।

গড়ে উঠবেই। কেননা এই শান্তির নীড়েই গিরিবালা সম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে নারীসুলভ ট্র্যাজিক উপদানে, কাহিনী দীর্ঘ এবং রসঘন করে তোলবার জন্যে নীড় নাড়িয়ে দেন গিরিবালা। কিন্তু তা ক্ষণকালের। স্বামীকে ফিরতেই হবে স্ত্রীর কাছে—আর স্ত্রীকে স্বামীর কাছে। অসুখে-বিসুখে, সেবায়, ত্যাগে মহত্ত্বে, অলৌকিক ঘটনায়—যেমন করেই হোক। শান্তি! শান্তি! শান্তি! নীড়-ভাঙা মানুষ, পাগল, পাগলী।

কিন্তু নীড়-ভাঙা মানুষের জন্যে কি নতুন নীড় নেই? পৃথিবী নেই? ব্যাপক জীবনের কোন গান নেই? দৈব আদর্শ ধর্ম অলৌকিক ঘটনা বাদ দিয়ে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আর কোন যুক্তিই কি নেই গিরিবালার? এত সহজে সব সমস্যার সমাধান করে দিলে ভবিষ্যৎ পাঠকের ভাবনার ভূমিতে কী বীজ রোপণ করে গেলেন লেখিকা?

রাতের অন্ধকারে, ঘুম-চোখে, ঘুমের আগে, আমার ভাল লাগে গিরিবালার গজ-দন্ত মিনারে নির্ভয় নিশ্চিন্ত আত্মগোপন। যেখানে ক্ষুধা কান্না বেদনা সবই আছে আর আছে সে সবের অবসান। যেখানে প্রশ্নের চেয়ে উত্তর অনেক বড়, সমস্যার জটিলতার চেয়ে সমাধান আরও মধুর—আরও আবেগ-ময়।

কিন্তু দিনের আলোয় বাইরে বেরিয়ে প্রশ্ন আর যন্ত্রণায় অস্থির বিমূঢ় বিভ্রান্ত যুগের পাঠক-পাঠিকার ভিড়ে আর কী আমার গিরিবালার কথা মনে থাকে—

> "অন্য এক আকাশের মত চোখ নিয়ে
> আমরা হেসেছি,
> আমরা খেলেছি;
> স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
> একদিন ভালোবেসে গেছি।—
> সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মত তবু
> তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।"

ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন

সুবোধকুমার মজুমদার

গত ২১শে জুলাই ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ন পরলোকগমন করেছেন। এ যুগের শ্রুতকীর্তি ইতিহাসবিদ্‌গণের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে সম্ভবত তাঁর স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ইংলণ্ডের ইতিহাস-চর্চার পুরোভাগে থেকে সার্থক অধ্যাপনা ও মূল্যবান গবেষণার সহযোগে ইতিহাস-সাধনাকে তিনি সহস্র গুণ সমৃদ্ধ করে গেলেন। অ্যাক্টন ও ফিশার বহু পূর্বেই দেহরক্ষা করেছেন; এবার ভিক্টোরীয় যুগের ইতিহাস-সাধনার শেষ প্রতিনিধি, লিবারাল ঐতিহ্যের ধারক ট্রেভেলিয়ন পরলোকগমন করলেন। একটি যুগেরও পরিসমাপ্তি ঘটল সেই সঙ্গে।

শুধু একজন ঐতিহাসিক হিসাবে নয়, ট্রেভেলিয়নকে আমরা স্মরণ করব এক সুমহান জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে। উনবিংশ শতকের এক শুভ লগ্নে তাঁর জন্ম। ইংলণ্ডে তিনি মানুষ হয়েছিলেন অখণ্ড শান্তি আর ক্রম-প্রসারমাণ বাণিজ্যের যুগে। পৃথিবীর সর্বত্রই তখন জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছিল আর সুখী ও সচ্ছল ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের জয় ও নিরংকুশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্পর্কে স্বপ্ন দেখে চলেছিল। সসাগরা পৃথিবীর শাসনভার পেয়েছিলেন ইংলণ্ডের মহারানী। উদারনীতির চেয়ে অধিকতর প্রগতিশীল আর কোন আন্দোলনই ছিল না সে যুগে। ধর্মের অনুশাসন, অন্ধপ্রথার অত্যাচার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসাম্য সাধ্যমত দূর করে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে সেদিন নানা কল্যাণকামী পরিকল্পনায় মুক্তি দিয়েছিল এই উদারনীতি। অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে সৃষ্টি করেছিল জগৎজোড়া বাজার, পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শে ভেঙেছিল ধর্মের অচলায়তন, দূর করেছিল কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। উদারনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হুইগ ঐতিহাসিক মেকলে ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি পাতায় লক্ষ্য করেছিলেন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নিশ্চিন্ত অগ্রগতি। ১৮৭০ সালের পর থেকে এই মূল হুইগ আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হল একটি র‍্যাডিকাল ধারা। নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচুর ধনাগমের সম্ভাবনা থাকলেও সমাজ-জীবনে নানা বৈষম্য ও অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল। সেইসব কুফল দূর করে সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে শুরু করলেন লিবারাল দার্শনিকগণ।

উদারনীতির উভয় ধারার পূত-সলিলে অবগাহন করেছিলেন ট্রেভেলিয়ন; সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী ইতিহাস-সাধনায় এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রেখেছিলেন অটুট। পারিবারিক পরিবেশ ও বাল্যশিক্ষা উদারনীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়কে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোলে, যার ফলে এই নীতির মূল সূত্রগুলি বেদমন্ত্রের মত নিরন্তর ধ্বনিত হতে থাকে তাঁর কানে। লর্ড মেকলের উত্তরসূরী, বংশগত সম্পর্কে তিনি ছিলেন সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিকের পৌত্র। তাঁর নিজের পিতামহ ভারতে এসেছিলেন প্রতিষ্ঠাপন্ন সিভিলিয়ন রূপে। তাঁর পুত্র অর্থাৎ ট্রেভেলিয়নের পিতা স্যার জর্জ অটো ট্রেভেলিয়ন সে যুগের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন, যিনি মেকলের জীবনী লিখে যশস্বী হন। এঁরা সকলেই ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ট্রেভেলিয়নের মা এসেছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারের এমন এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবার থেকে, যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ন

ও অবাধ বাণিজ্যনীতিতে প্রগাঢ় বিশ্ব
করতেন। ট্রেভেলিয়ন পরিবারের সঙ্গে
যুগের লিবারাল চিন্তাবীরদের ভাবে
আদান-প্রদান চলত। কবডেন ও ব্রাইট এঁদে
অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, গ্ল্যাডস্টোন ছিলে
মন্ত্রগুরু। বেন্থামের হিতবাদ, মিলে
স্বাধীনতা সুসমাচার, ডারুইনের বিবর্ত
বাদ এঁদের বৈঠকে নিত্য আলোচনা
বিতর্কের বিষয় ছিল। ট্রেভেলিয়নের পি
শিক্ষার অংগ হিসাবে ইতিহাস পা

প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পিতার কাছেই ইতিহাস-চর্চায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। বাল্যশিক্ষার কথা স্মরণ করে ট্রেভেলিয়ন লিখেছেন যে, পিতৃআদেশে অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে তাঁকে নিয়মিত বাইবেল পড়তে হত। বাইবেলের মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রাচীনতম তিনটি জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি অবহিত হয়ে ওঠেন। এ যুগের বিজ্ঞান-সচেতন শিক্ষিত মানুষ বাইবেল পড়ে না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ট্রেভেলিয়ন।

সে যুগের অভিজাত বংশীয় অন্যান্য ছেলেদের মতই গৃহশিক্ষা-শেষে ট্রেভেলিয়নকেও ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ পাবলিক স্কুল হ্যারোতে পাঠানো হয়। এখানে তিনি দুজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথমজন জর্জ সমারভেল ভাল ইংরেজী কি-ভাবে লিখতে হয়, ট্রেভেলিয়নকে তাই তিনি শিখিয়েছিলেন। অপরজন ছিলেন টাউনসেন্ড ওয়ারনার, যিনি ভাবীকালের এই ঐতিহাসিকপ্রবরকে শিখিয়েছিলেন ঐতিহাসিক গবেষণার কলাকৌশল। হ্যারোর পাঠ শেষ করে ট্রেভেলিয়ন প্রবেশ করেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে এখানেই তাঁর মননশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মহারথী অ্যা মেইটল্যান্ড ও কানিংহাম দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য লর্ড অ্যাক্টন সে যুগে ইংলন্ডের সুধীসমাজে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, মধ্যযুগের আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন মেইটল্যান্ড আর কানিংহাম ছিলেন কেম্ব্রিজে অর্থনৈতিক ইতিহাস-চর্চার পথিকৃৎ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে ১৮৯৯ সালে ট্রেভেলিয়ন তাঁর প্রথম গবেষণা-গ্রন্থ "England in the age of Wycliffe" প্রকাশিত করেন। বিষয়বস্তুর নির্বাচনেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট। লর্ড

আন্দোলন ট্রেভেলিয়নের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। কারণ, এই আন্দোলনের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতির প্রথম বিদ্রোহ—সংস্কার ও গোঁড়ামির বেড়াজাল ভেঙে আধ্যাত্মিক সম্পদলাভের প্রেরণা। ললার্ড আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'ফেলো' নিযুক্ত হলেন। ১৯০২ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বেচ্ছায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার কাজে অধিক সময় ও উদ্যম ব্যয়িত হচ্ছিল, মৌলিক গবেষণার কাজে দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না; এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত পদ ছেড়ে তিনি ফিরে এলেন নরদামবারল্যাণ্ডে নিজের 'কান্ট্রি হাউসে'। শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে গ্রামাঞ্চলের শান্ত নিভৃত পরিবেশে শুরু হল তাঁর নিরলস ইতিহাস-সাধনা।

ট্রেভেলিয়নের কেম্ব্রিজ ছেড়ে আসার পিছনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সেটি হচ্ছে আদর্শগত সংঘাত। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ইতিহাসের স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়। মেকলে ও কার্লাইল কল্পনাশ্রয়ী ও কাব্যধর্মী ইতিহাস রচনা করে ইংলণ্ডে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইতিহাসকে সাহিত্যেরই শাখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। মেকলের বাসনা ছিল তিনি এমন ইতিহাস লিখবেন, যা হাতে পেলে সৌখীন মহিলারা বাজারের বহুলপ্রচারিত উপন্যাসও আর পড়তে চাইবে না। এ ধরনের চমকপ্রদ ও সুখপাঠ্য ইতিহাস রচনার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন কেম্ব্রিজের দু'জন খ্যাতনামা পণ্ডিত—সিলী ও বিউরী। ইতিহাস-চর্চায় এ'রা চেয়েছিলেন ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ভাবগাম্ভীর্য, নির্মোহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞানী-সমুচিত সত্যানুসন্ধান। কেননা, "History is Science, no more no less" ট্রেভেলিয়ন কোনদিনই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদের এই দাবি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর সংগে এ'দের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ ক্রমশই বাড়তে থাকে। ট্রেভেলিয়ন তাঁর আত্মচরিতে ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা তাঁর তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ট্রেভেলিয়ন যখন কেম্ব্রিজে প্রবেশ করেন, অধ্যাপক সিলী তখনও জীবিত। নবাগত ছাত্রদের সংগে বৃদ্ধ অধ্যাপক আলাপ পরিচয় করতে ভালবাসতেন। ট্রেভেলিয়ন বলেন যে, প্রথম দিনের সাক্ষাতেই সিলী তাঁকে ইতিহাস-শাস্ত্রের গুরুত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শোনান, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, জনপ্রিয় লেখক মেকলে ও কার্লাইল ইতিহাসকে পুরোমাত্রায় সাহিত্যগন্ধী করে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন এবং এ'রা দুজনেই হলেন Charlatans of history (ইতিহাসের হাতুড়ে)। ট্রেভেলিয়ন মেকলের বংশধর; পূর্বসূরীর অনুকরণে এই প্রতিভাবান তরুণ ছাত্রটিও তখন সাহিত্যধর্মী ইতিহাস লেখার স্বপ্ন দেখছেন। তাই, বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথাগুলি তাঁর কাছে শ্রুতিমধুর হয়নি। কেম্ব্রিজ থেকে বিদায় নিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে ট্রেভেলিয়ন "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিভিউ"তে Clio, a Muse নামক একটি প্রবন্ধ ছাপান, যার মধ্যে বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিকদের দাবিকে তিনি অসার প্রতিপন্ন করেন। ইতিহাস তাঁর মতে বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিক যে নিয়মে গবেষণাগারে জড়পদার্থের পরীক্ষা চালান, ঐতিহাসিক ঠিক সেই নিয়মে অতীত অনুসন্ধান করতে পারেন না। অতীতের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার কোন সহজ যান্ত্রিক উপায় নেই। যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তর্গূঢ় ভাবোচ্ছ্বাস বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, অথচ সমাজ-

জীবনের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, তার সন্ধান ঐতিহাসিক পাবেন কি করে? মানুষের যথাযথ বর্ণনা দিতে পারেন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক করতে পারেন নীতি ও তত্ত্ববিচার, কিন্তু মানুষের ধ্যান-ধারণা, মনন-চিন্তন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত রূপটি জানতে হলে চাই শিল্পীর দরদ।

ঐতিহাসিককে তাই বৈজ্ঞানিক হলেই চলবে না—তাঁকে হতে হবে একাধারে শিল্পী ও দার্শনিক। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম রস-বোধ ও সংবেদনশীল মন যেমন সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা যোগায়, তেমনি ইতিহাস রচনাতেও সৃষ্টির উৎসমুখ দেয় খুলে। শিল্পিসুলভ দরদী ও কল্পনাধর্মী মন না থাকলে ঐতিহাসিক সমগ্রভাবে ঘটনাকে বিচার করতে পারেন না—'ফ্যাক্টের' অরণ্যে পথ হারিয়ে কেবল কতগুলি বৃক্ষই দেখেন, গভীর অরণ্যানীর নিবিড় শোভা তাঁর চোখে পড়ে না। অর্থনীতিবিদ্যায় কল্পনাশক্তির কার্যকারিতা সম্বন্ধে মার্শাল এক জায়গায় বলেছেন, "অন্তঃশীল ও পরোক্ষ কারণসূত্রে ঘটনাকে গেঁথে নেবার জন্য অর্থনীতিবিদের প্রয়োজন কল্পনা-শক্তিকে কাজে লাগানো।" ইতিহাস শাস্ত্র সম্বন্ধে এই উক্তি কি আরও প্রযোজ্য নয়? কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের কল্পনা বাস্তবতা-বিরুদ্ধ নয়। কল্পনার ইন্দ্রধনু-রঙে রঞ্জিত হলেও ইতিহাসের ফ্যাক্ট স্বপ্নলোকের মোহাবেশ সৃষ্টি করে না। ট্রেভেলিয়ন বলেছেন, ইতিহাসের কবিত্ব উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় নয়, তার কবিত্ব তথ্য-নিষ্ঠায়।

"The poetry of history does not consist of imagination roaming at large, but imagination pursuing the fact and fastening upon it."

সাহিত্য-বিজ্ঞানের কলহ নিরসন করেছেন ট্রেভেলিয়ন একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে। তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিকের দ্বৈত সত্তা তিনি বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী। পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও শিল্পী-প্রতিভার সমন্বয়ে যথার্থ ইতিহাস রচিত হয়। উপাদান সংগ্রহ ও তথ্যের মূল্য বিচারের সময় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি হবে বৈজ্ঞানিকের মত নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু তথ্যের ব্যাখ্যা ও তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের সময় তিনি হবেন কবি ও দার্শনিক। ইতিহাসের ইমারত গড়তে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মালমসলার উপাদান। তখন ঐতিহাসিক হবেন বৈজ্ঞানিক। সংগ্রহের পর আসবে সৃজনকলা, মূল কাঠামো গড়ে তোলার পর যেমন আসে কারুকার্য। তখন ঐতিহাসিক হবেন শিল্পী, যিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে অতি সাধারণ নিষ্প্রাণ বস্তুকে প্রাণময় করে তোলেন, অসুন্দরকে করেন সুন্দর, সুন্দরকে সুন্দরতর।

কেম্ব্রিজের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার বাইরে এসে 'কাণ্ট্রি হাউসের' শান্ত নির্জন পরিবেশে ট্রেভেলিয়ন নিজেকে ইতিহাস রচনার কাজে উৎসর্গ করলেন। বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ইতিহাসের নব নব দিগন্ত তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হতে থাকল। প্রথম যে বইটি এই সময়ে তিনি লেখেন, তার নাম "England under the Stuarts"। এই অপূর্ব বইটি আজকের দিনে 'ক্ল্যাসিক্সের' সম্মান পেয়েছে। স্টুয়ার্টদের সম্বন্ধে লেখা অসংখ্য বই যখন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে, তখনও কিন্তু ট্রেভেলিয়নের এই বই পৃথিবীর পাঠকসমাজ পড়বে এবং পড়ে আনন্দ পাবে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সপ্তদশ শতক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুগে

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সংগে পার্লামেন্টের যে সংঘাত বাধে, তাতে পার্লামেন্টই হয় বিজয়ী। মেকলে এই সংঘাতকে স্বাধীনতা বনাম স্বেচ্ছাচারের বিরোধ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রথম চার্লস ("A tyrant, a traitor, a murderer and a pulbic enemy.") স্বৈরাচারের প্রতীক এবং স্বাধীনতার রক্ষক পার্লামেন্ট। স্বাধীনতার বীর সৈনিকরা হল কমন্স সভার পিউরিটান সদস্যবৃন্দ। যে গৌরবময় বিপ্লবের মধ্যে এই বিরোধের পরিসমাপ্তি, তার মধ্যে মেকলে দেখলেন ইংরেজদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার চরম পরাকাষ্ঠা। উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালেন এই বিপ্লবকে, কেননা তা অহিংস, ফরাসী বিপ্লবের মত ধ্বংসাত্মক নয়।

মেকলের এই হুইগ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ট্রেভেলিয়নের সময়ে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। হুইগদের প্রত্যুত্তরে একটা টোরী মতও খাড়া হল। টোরী ঐতিহাসিক প্রমাণ করলেন, মেকলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করেছেন। সেইজন্য দীর্ঘকাল ধরে স্টুয়ার্ট রাজারা কেবল নিন্দাভাজনই হয়ে এসেছেন। চার্লসের বিরুদ্ধে মেকলের বিষোদ্গার নেহাত অহেতুক ও অনৈতিহাসিক। তাঁরা পাল্টা আক্রমণ চালালেন পার্লামেন্টের নায়ক অলিভার ক্রমওয়েলের উপর, যাঁকে গণতন্ত্রবিরোধী ফ্যাসিস্ট নায়করূপে চিত্রিত করার চেষ্টা চলল।

ট্রেভেলিয়ন এ'দের কোন পক্ষকেই সমর্থন করেননি। কোন পূর্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী না হয়ে স্টুয়ার্ট যুগের যথার্থ চিত্রটি তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যদিও পার্লামেন্টের দিকেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখা গেছে, তা হলেও কোন ক্ষেত্রেই তা উদগ্র baisএ পরিণত হয়নি। এইজন্য দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করতে পেরেছে তাঁর ইতিহাস এবং আজও পাঠকসমাজে তা সমান সমাদর পাচ্ছে। হাল আমলের নানা লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্টুয়ার্ট যুগকে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ট্রেভেলিয়নের সেই সাবেকী ছবি আজও অম্লান হয়ে আছে। ট্রেভেলিয়নের সাফল্যে পেশাদারী ঐতিহাসিকরা সুখী হতে পারেননি। "হিস্টরিকাল রিভিউ"-এ সংক্ষিপ্ত দশ লাইন সমালোচনায় তাঁদের অনুদার মত প্রকাশ পেল। অবশ্য বলা বাহুল্য, ট্রেভেলিয়ন তাতে হতোদ্যম হননি।

এই পুস্তক প্রকাশের অল্পকাল পরেই ট্রেভেলিয়ন জ্যানেট পেনরোজকে বিবাহ করেন। জ্যানেটকে জীবনসহচরীরূপে পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। পারিবারিক জীবনে সুখশান্তি ছিল অব্যাহত, তাই সারা জীবনব্যাপী এমন একাগ্র চিত্তে সরস্বতীর আরাধনা তিনি করতে পেরেছিলেন। বিবাহে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে যেসব উপহার এসেছিল, তার মধ্যে ছিল ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পর্কে কয়েকটি বই। এই বইগুলি পড়তে পড়তে একটি বিশেষ উপাখ্যান—গ্যারিবল্ডীর দেশপ্রেম ও বীরত্ব তাঁর মনে সাড়া জাগায়। পরবর্তী রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে তাই এই কাহিনী তিনি বেছে নেন, যার বর্ণনায় তাঁর সৃজনধর্মী শিল্পিমনের হল প্রথম পূর্ণ প্রকাশ।

১৯০৭ সালে "Garibaldi and the defence of the Roman Republic" প্রকাশিত হয়। ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিটি ইংরাজ দেশপ্রেমিক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত যে, ইংরেজদের নৈতিক সমর্থনেই ইটালীর পরাধীনতার শৃংখল ঘুচেছে। ইটালীর জয়ের মধ্য দিয়েই ইংরেজ উদারনীতি ও গণতন্ত্রের জয় ঘোষিত হয়েছে। স্বাধীনতামন্ত্রের চরম চরিতার্থতা ঘটেছে বীর গ্যারিবল্ডীর জীবনে। বীর রসের সংগে মিশ্রিত হয়েছে মধুর রস। বিয়েত্রিচ-দান্তে, আবেলার্ড-হেলয়, নেপোলিয়ন-যোশেফিনের প্রেমকাহিনীর সংগে যুক্ত হয়েছে গ্যারিবল্ডী-অ্যানিটার কাহিনী। সে কাহিনী অশ্রুসজল ও বিয়োগবিধুর—তাই গভীরতরভাবে হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দেয়।

এই বইটি অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পাঠকসমাজের উৎসাহ-আতি-

শবোই ট্রেভেলিয়ন স্বাধীনতা আন্দোলনের অসমাপ্ত অংশটুকু পরবর্তী চার বছরের মধ্যে "Garibaldi and the thousand" এবং "Garibaldi and the making of Italy" বই দুইটিতে লিখে শেষ করেন।

সমসাময়িক পাঠকবর্গ সম্মোহিত হলেও গ্যারিবল্ডী কাহিনীর অনেক দুর্বলতা এখন ধরা পড়েছে। ট্রেভেলিয়ন তাঁর 'লিবারাল' দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাকে কোন প্রকারেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ উদারনীতির গৌরবময় ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এত বদ্ধমূল ছিল যে, তিনি কখনই ভাবতে পারেননি, ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থই ইংরেজ সমর্থনের মূল প্রেরণা যুগিয়েছিল। ইংরেজ জাতির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সহজাত শুভবুদ্ধির প্রতি তাঁর যে গভীর আস্থা ছিল, তা আজ অনেকের কাছেই অলীক ও অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হবে। তা ছাড়া ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার কোন বিশদ আলোচনা যেমন তিনি করেননি, তেমনি অপর দিকে ফরাসী শক্তি ও তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তাঁর অনুদার মনোভাব সর্বত্র তথ্যসমর্থিত হয়নি। কিন্তু এইসব দোষত্রুটি স্বীকার করেও নিঃসংশয়ে এ কথা বলা যায় যে, ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের এমন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আর কোন ভাষাতেই নেই। ফরাসী অথবা ইটালীয়নরা এমন ধরনের বই লেখেনি। ট্রেভেলিয়নের তুল্য এমন কোন প্রতিভাবান লেখক তাদের মধ্যে পাওয়া যায়নি, যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র চিত্রটি পাঠকের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত হয়, John Brightএর জীবনী এবং যুদ্ধশেষে "Lord Grey of the Reform Bill" পূর্ব-প্রকাশিত বইগুলির তুলনায় এগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনা। 'লিবারাল' আদর্শে সমাচ্ছন্ন তাঁর দৃষ্টি ব্রাইট ও লর্ড গ্রের প্রতিপক্ষদের প্রতি সুবিচার করেনি। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'History of England'এ ট্রেভেলিয়ন ইংলণ্ডের ইতিহাসের সমগ্র ধারাকে এক খণ্ডে গেঁথে ফেলার দুরূহ সাধনায় উত্তীর্ণ হলেন। এই বইটি ব্যাপ্তি, প্রসার ও গভীরতার দিক থেকে ফিশারের ইউরোপের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বইটি যে দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, তার পরিচয় পাওয়া যাবে তার মুখবন্ধে; সেখানে ট্রেভেলিয়ন বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ জাতির ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি এবং প্রগতিশীল ভূমিকা সম্ভব হ'য়েছে তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে—" Executive efficiency, popular control and personal freedom."

১৯২৮ সালে প্রধানমন্ত্রী বলডুইনের আমন্ত্রণে ট্রেভেলিয়ন কেম্ব্রিজের Regius Professorএর পদ গ্রহণ করেন। দু' বছর পর তাঁকে Order meritএ ভূষিত করা হয়। একজন ঐতিহাসিকের জীবনে তা কম সম্মানের কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের একটি বড় দায়িত্ব ছিল—ছাত্রদের গবেষণা-কাজের তত্ত্বাবধান করা। বর্তমানে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক J H Plumb কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে ট্রেভেলিয়নের ছাত্র ছিলেন। তাঁর খুব বড় সৌভাগ্য যে, হাতে-কলমে ইতিহাস-গবেষণার কলাকৌশল তিনি ট্রেভেলিয়নের কাছ থেকে শিখতে পেরেছিলেন। গুরুর কাছে কিভাবে পড়াশুনো চলত, তার একটি সুন্দর বিবরণ Plumb-এর কাছ থেকে পাওয়া যায়—"ওয়েস্ট রোডের গার্ডেন-কর্নার বাড়িতে আমার লেখা নিয়ে হাজির হ'তাম তাঁর পড়ার ঘরে। নিকেলের ফ্রেম-আঁটা চশমার ভিতর দিয়ে আমার লেখার উপর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে চলতেন। কিছুক্ষণ বাদেই মনে হত, আমার দুর্বল রচনা পড়ে তিনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন, সেটা প্রকাশ পেত তাঁর অস্থির পদসঞ্চালনের মধ্যে। হঠাৎ দেখতাম, চেয়ার ছেড়ে প্রকাণ্ড একটা 'ডেস্কের' সামনে এসে বসেছেন আর নির্মমভাবে আমার লেখার উপর কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশেষণ বাদ দিয়ে, নূতন করে কমা-ফুলস্টপ বসিয়ে, জায়গায় জায়গায় নূতন শব্দ জুড়ে দিয়ে, আমার সব লেখাটিকে আগাগোড়া ঢেলে সাজিয়ে দিতেন তিনি। যে মনের ভাব আমি হাজার চেষ্টা করেও ঠিকমত প্রকাশ করতে পারিনি—এবার যেন তাকেই পেতাম খুঁজে। আনন্দিত মনে ফিরে আসতাম আমার লেখা নিয়ে—যে লেখার অনেকখানি তাঁরই রচনা—অথচ ভাল লাগত নিজের বলে মনে করতে।"

Regius Professor নিযুক্ত হবার পর ট্রেভেলিয়ন "The Reign of Queen Anne" সম্বন্ধে তিন খণ্ডে পুস্তক প্রকাশ। এগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে পড়ে না। গৌরবময় বিপ্লবশেষে ইংলণ্ড বহির্বিশ্বে অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করেছিল—যা রানী এনের শাসনকালকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। এই সময়কার যে চিত্র ট্রেভেলিয়ন আঁকলেন, পণ্ডিতমহলে তা সার্থক বিবেচিত হয়নি। এই একই বিষয়ে লিখতে গিয়ে চার্চিল বোধ হয় অনেক বেশী দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাঁর "Marlborough and his times" গ্রন্থে।

১৯৪৪ সালে ট্রেভেলিয়নের ঐতিহাসিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—"Social History" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ছ' শতাব্দীব্যাপী ইংলণ্ডের সমাজজীবনের একটি মনোজ্ঞ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী তুলে ধরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের প্রাক্কালে "ইংলণ্ডের ইতিহাসে" ইংরেজ জাতির সনাতন আদর্শ ও উদারনৈতিক ঐতিহ্যের কথা জগৎকে শুনিয়েছিলেন ট্রেভেলিয়ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে তাঁর "Social History" প্রকাশিত

হল। যে আদর্শ ও মূল্যবোধ এই মহাযুদ্ধে ইংরেজ জাতির জয়লাভের প্রেরণা যোগাল তার ভিত্তিমূল কোথায়—এবার তিনি তারই সন্ধান দিলেন। যুদ্ধের সময় সমস্ত দেশপ্রেমী ইংরেজ নাগরিকদের মনে এই ধারণা জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি হিটলারী আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই তারা অস্ত্রধারণ করেছে। চার্চিল তাঁর যুদ্ধকালীন বক্তৃতায় ইংরেজ জাতির এই নৈতিক দায়িত্বকেই জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ট্রেভেলিয়নের বই এবার সাধারণ পাঠককে জানাল, ইংরেজ জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কেনই বা তাকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। এক অতীত যুগের সাধারণ মানুষের কথা ট্রেভেলিয়ন শুনিয়েছেন এ যুগের সাধারণ মানুষকে। এই কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও শিল্পি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কত গভীর জ্ঞান থাকলে বিষয়বস্তু এমন সুবিন্যস্ত এবং রচনা-কৌশল এমন সজীব ও চিত্রধর্মী হয়, ট্রেভেলিয়নের "Social History" তারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বিশেষজ্ঞরা এই বইয়ের অনেক ত্রুটি দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে, ট্রেভেলিয়ন একজন উ‘চুদরের কথাশিল্পী—তাই তিনি সাহিত্যের নজিরের উপর বেশী নির্ভর করেছেন। সমসাময়িক অর্থনৈতিক দলিল-গুলি ভালভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। মার্কসবাদী পণ্ডিত ট্রেভেলিয়নের লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রেণী-সংঘাতকে ট্রেভেলিয়ন অস্বীকার করেননি। কিন্তু ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তিত করার অমোঘ শক্তি শ্রেণী-সংঘাতের আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হয়েছেন তিনি। এখানেই মার্কস-বাদীদের ঘোরতর আপত্তি। তাঁদের মতে, ঐতিহাসিক ভাববাদ ট্রেভেলিয়নের দৃষ্টিকে ক্রমশই আচ্ছন্ন করেছে এবং যতই তিনি আধুনিক কালের দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই তাঁর মধ্যে নানা সংশয় ও আপাত-বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, তিনি Chartist আন্দোলন ও শ্রমিক-সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় নীরবই থেকে গেছেন।

এ ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও ট্রেভেলিয়নের ঐতিহাসিক খ্যাতি এতটুকু ম্লান হয়নি। যে বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, সেই অতীতের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও মনন-চিন্তনের কথা গভীর অনুভূতির সঙ্গে শুনিয়েছেন আমাদের। সমস্ত রচনাটিতে অস্তায়মান সূর্যের ম্লান রশ্মি-আভা এসে পড়েছে। অ্যাটম্ বোমার আঘাতে যে যুগের অন্তিম মুহূর্ত ঘোষিত হ'ল, যে মূল্যবোধ ও আদর্শ হল ধূলিসাৎ, যে জগৎ রইল পিছনে পড়ে, তারই দিকে জীবন-সায়াহ্নে বিষাদভারাক্রান্ত মনে তাকিয়ে দেখলেন ঐতিহাসিক—তারই উদ্দেশে নিবেদন করে গেলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অতীত অনুসন্ধানের মধ্যে যিনি কাব্যের রস আস্বাদন করতেন, ভাষার ইন্দ্রজালে যিনি অতীতের মৃত ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলতে জানতেন, জীবন ও ইতিহাসের মধ্যে যিনি একটি সেতু রচনা করতে পেরেছিলেন এমন ঐতিহাসিককে আমরা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি-ঐতিহাসিক আখ্যা দিতে পারি। ট্রেভেলিয়ন ইতিহাসের ধারায় কোন গভীর দর্শনের সন্ধান পাননি। মানুষ নানা দৃষ্টি-কোণ থেকে ইতিহাস পড়ে, তার গুণাগুণ বিচার করে—ইতিহাসের তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে বর্তমানের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত খোঁজে। ট্রেভেলিয়ন তেমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস পড়েননি। তাঁর কাছে ইতিহাস-পাঠের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—কাব্যরস আস্বাদন করা। ইতিহাস তাঁর কাছে মহাকাব্যের সুষমা বহন করে এনেছে। কোন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে তিনি অতীত ঘটনার মধ্যে কাব্যের অফুরন্ত উৎস-ধারার সন্ধান পেয়েছেন। আত্মচরিতে নিজস্ব ঐতিহাসিক মতামত ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"I take delight in history even in its most prosaic details, because they become poetical as they recede into the past. The poetry of history lies in the quasi-miraculous fact that once in this earth, once in this familiar plot of ground, walked other men and women, as actual as we are today, thinking their own thoughts swayed by their own passions, but now all gone, one generation vanishing after another, gone as utterly as we ourselves shall shortly be gone, like ghosts at cock-crow."

চী ৎ কা র

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত পল্লা পলিমাটি ছিলো ব'লে গাছ বেড়েছিলো।
এখন বজ্রের মতো চূড়া ফেটে রাঙা জল, আগুন, শিকড়
সমস্ত সমেত এলো নাগলতা, সব ছিঁড়ে গেলো :
গাছ, ঘর, অবসর, উড্ডীন নদীর মতো শিখা,
ঘৃণা, ভালোবাসা, রক্ত—সব নিয়ে মুহুর্মুহু খেলা।
কেননা যখন শনি আতশী কাচের আংটি হাতে
দরজার কুলুপ খুলে বের হয় তান্ত্রিক তিমিরে,
তখন স্বজন, বন্ধু, শত্রুমিত্র, খাদ্য বা খাদক
সবাই বিহ্বল দেখে এমনকি সূর্য নিতে আসে
ক্ষমাহীন করাতের দাঁত কাটে অশ্বত্থের ডাল :
সাহস, সঞ্চয়, চেষ্টা, গ্লানি, খেদ সব অর্থহীন—
কেননা অমোঘ হাত সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে গেলো।

সিঁদুর পরিয়ে দিলো? তবে সব নিরর্থক? তবে
কিছুই থাকে না? কিছু? ভবিষ্যৎ কিংবা স্মৃতি? কিছু?
চিৎপুরের পথে ঘোরে নিষ্ঠুর-কাঙাল শেষ হাওয়া :

অন্তত একটা-কিছু থেকে যাক, যা কিছুতে ভাঙে না,
ছেঁড়ে না;
সকালে কি অপরাহ্ণে চিরদিন যা থাকে অম্লান;
অপরিবর্তন যার সারসত্য; স্তব্ধ, স্থাণু, পরম্পরাহীন,
সম্পূর্ণ, ইন্দ্রিয়াতীত, নতুবা ধাতুর মূর্তি কোনো;
চোরাবালি যার কাছে হার মানে; রোদ, বৃষ্টি, তাতার দস্যুরা
কানাকড়ি কিংবা কোনো মেধাবী ঘড়ির ধূর্ত হাত
ছিনিয়ে নেয় না যাকে; বলাৎকার, লুণ্ঠন, তামাশা
যার কাছে অসহায়, কেননা সে অর্ধ-ছায়া, দূর;—
বন্দরে, জলপাই-বনে, বালুচরে কিংবা কোনো দারুণ
দূরবীনে
মিলন লগ্নের মতো বসনভূষণহীন, নগ্ন, কৃশ, একান্ত,
ভীষণ;
যার স্তম্ভ অফুরন্ত জ্যোৎস্নার উৎসব—অন্তত তেমন........
অন্তত তেমন-কিছু থেকে যাক : এই ব'লে চাঁদের চীৎকারে
গলা দিয়ে উড়ে গেলো মধ্য রাতে একটি রূপোর মতো কাক :
কিছু থাক, কোনো-কিছু, অন্তত একটা-কিছু : অবিরাম
নৃশংস গর্জন......

কী থাকে, কে ব'লে দেবে এই ধ্বস্ত শনির সময়ে?
সে কি জল, যার স্রোতে ভেসে গেলো মালা, ভেলা, খেলার
তরণী........
নাকি সে আকাশ, যাকে উন্মুখ ডালপালা দিয়ে বাঁধে
বুকের ভিতর ছিঁড়ে বেড়ে-ওঠা তীব্র বটগাছ......
নয় মাটি, তাপ, তুমি, রিরংসা, পাথর, কোনো-কিছু......
থাকে নাকি? থাকে না? থাকে না? এমনকি বাতাসটি কি
নয়?......
তবে কি শয়তান সুন্ধ ভয় পায় সপ্তম নিনাদ?
সে যদি বাতাস হয়, তবে যেন কেঁপে ওঠে সব—
টেলিফোনে গলা, কিংবা ব্যাবিলনে ঝোলানো উদ্যান,
ছায়া, আলো, ক্যারাভান, এস্প্লানেডে আপিসের বেলা!

চীৎকার, চীৎকার শুধু...অবিরাম...নিষ্ঠুর কাঙাল চিৎপুরে...

এখন বজ্রের মতো চূড়া ফেটে এলো, হায়, শেষ সোমরাজ!

নি র্বা স ন

নিখিলকুমার নন্দী

মূর্ছার আবেগে বুঝি বায়ুভার থরোথরো কাঁপে
সুদূর বৃষ্টির বিন্দু অলক্ষ্য অক্ষয়পত্রে প্রাণপরিমাপে
ঘনিয়েছে চারিদিকে আলোমেঘে সুনিবিড় অমা :
আষাঢ়ী সপ্তাহ শেষ, তবু যেন আষাঢ়ী প্রথমা।

ভিজে খোয়া লাল পথ ঘাসে ঘাসে যতদূর যায়
মনে হয় এই দিন আরো বহু পথকে ভাসায়
এক পথে এক স্রোতে, চলমান মন বলে, কত দূরে অলকার রমা :
আষাঢ়ী সপ্তাহ শেষ, তবু যেন আষাঢ়ী প্রথমা।

চিরায়ত মেঘে মেঘে সাদাকালো হিমবাহ আঁকা
গানে দানে ভরে দেবে মাঠঘাট বনানী বলাকা।
সময়ের অক্ষমায় অভিশাপে জাগে যদি
স্মিতহাস্য সাবলীল ক্ষমা :
আষাঢ়ী সপ্তাহ শেষ, তবু যেন আষাঢ়ী প্রথমা।

শীর্ণ যক্ষ শুধু হাতে খুলেছে কি সোনার বলয়
দীর্ণ বক্ষে ধ্বনি জাগে, সোনার প্রতিমা তার একলার নয়।
নিখিল-নিরিখে বাধা, পুরস্ত্রী সুন্দরী যেন পরস্ত্রী পরমা :
আষাঢ়ী সপ্তাহ শেষ, তবু যেন আষাঢ়ী প্রথমা।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

— নয় —

অনেক দিন—অনেক বছর পরে। সাহেব বড় হয়েছে। সেই এক বড় সমস্যা। বাচ্চা বয়সে রান্নাঘরে জোড়া-পিঁড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রাখত, কুণ্ডলী পাকিয়ে ছেলে পড়ে পড়ে ঘুমুত। এখন আর সেটা চলে না। শোয়াতে পুরো মাপের মাদুর দরকার। এবং মাদুর পাতবার উপযুক্ত পরিমাণ জায়গা। সন্ধ্যারাত্রে ঘুমাবেই তো না। ঘরেও রাখা চলে না ও-সময়—দিনরাত্রির মধ্যে কাজ-কারবারের ঐ সময়টুকু। বস্তিবাড়িতে তখন মানুষজনের হুল্লোড়—বড়সড় ছেলের কাছে মুখ দেখাতে অনিচ্ছুক সেই সব মানুষ। চিনে ফেলে হয়তো বাইরের লোকসমাজে পরিচয়ের কথা বলে বসবে। ছোটখাট আলাদা একটু থাকবার জায়গা পেত ছেলের জন্যে!

সাহেবের চোখ-কান ফুটেছে, জায়গা খুঁজে-পেতে নিল নিজেই। কিছু না হোক, শোওয়ার সুখ বড্ড এই পাড়াটায়। বড় বড় লোকেরা গঙ্গার কূলে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মার্বেল পাথরে নাম খোদাই-করা—একের পুণ্য অন্যের হিসাবে ভুলক্রমে জমা পড়ে না যায়। খিলান-করা মণ্ডপ ঘাটের উপরে, বৃষ্টির সময়ের আশ্রয়। সেই সব ঘাটের উপর কোন একখানে পড় শুয়ে। সিমেণ্ট-বাঁধানো মসৃণ চাতাল, ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া। সীতারামের সুখ যাকে বলে। শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখ, তারা দেখ। মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, চাঁদ-তারা ঢেকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এক ঘুমে রাত কাবার।

মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই বোধ করি এমনি ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়ায় চাঁদ-তারা দেখতে দেখতে একদিন সাহেব ঘাটে ভেসে এসেছিল। উজান স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে সেই মা-বাপ আত্মীয়জনদের একটিবার যদি দেখে আসা যায়!

ঘাটে সে এমনি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। কাজকর্ম মিটিয়ে সুধামুখী নিশিরাত্রে এক সময় ঘরে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে সাহেব আরও খানিকটা বড় হয়ে যাবার পর সেটাও আর ঘটে ওঠে না। মাঝরাত্রে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হেঁটে হেঁ.. বাড়ি অবধি যেতে বড় নারাজ সাহেব। ঐ ভয়ে শেষটা পালাতে লাগল। ঘাটের তো অবধি নেই—আজ এ-ঘাটে থাকে তো কাল ও-ঘাটে। সুধামুখী খুঁজে পায় না। বেশি খোঁজাখুঁজি হলে দূরে—অনেক দূরে হয়তো চলে যাবে। এ তবু পাড়ার ভিতরে—বাইরে বেপাড়ায় গিয়ে কবে কোন বিপদ ঘটে না জানি। ভেবেচিন্তে সুধামুখী বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে না। মা-গঙ্গার উদ্দেশে বলে, তোমার পাশে পড়ে থাকে মা-জননী, দেখো আমার ছেলেকে। হেরিকেন-লণ্ঠন হাতে গভীর রাত্রে ঘাটের উপর ঘুমন্ত সাহেবকে দেখে চলে যায়। মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে গেল কোনদিন হয়তো।

এমন স্ফূর্তির ঘুমানোয় মুশকিলও কিছু আছে, সেইটে বড় বিশ্রী লাগে। উষাকালে পুণ্যার্থীরা সব গঙ্গাস্নানে আসেন: আরে মোলো, ঘাট জুড়ে পড়ে রয়েছে। উঠে যা ছোঁড়া, সরে যা। চানের পর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে মরি শেষকালে।

চোখে ঘুম এঁটে আছে, হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে সাহেব। পুণ্যবানের পথ আটকে থাকতে যাবে কেন? দেবেই বা কেন তারা থাকতে? হাতে লাঠি থাকে কোন কোন বুড়োমানুষের। গঙ্গাজল নিয়ে যাবার কলসি থাকে পুণ্যবতীদের কাঁখে। বলা

যার না—লাঠি মারল হয়তো পিঠে, কলসি ভাঙল হয়তো-বা তার মাথায়।

সাহেবের এই রকম। সেই রাজাবাহাদুর বাপও অদৃশ্য হয়েছেন অনেক কাল আগে। বয়স আরও তো বেড়েছে—এ পাড়ায় আসেন না তিনি। কোন পাড়ায় যান কে বলবে। হয়তো কোনখানেই নয়। বৃদ্ধ হয়ে মতিগতি বদলেছে, পূজা-আহ্নিক ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছেন। কিম্বা মরেই গেছেন হয়তো। সুধামুখী আজকাল খবরের কাগজ পড়ে না—সংসারের দশ রকম খরচা এবং ছেলের খরচা কুলিয়ে তার উপরে আর কাগজের বিলাসিতা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই জানে না, কোন সকালবেলা হয়তো-বা কাগজে রাজাবাহাদুরের ছবি বেরিয়ে গেছে। অসংখ্য গুণাবলীর মালিক পূতচরিত্র এ রকম মানুষ হয় না, তাঁর বিয়োগে হাহাকার চতুর্দিকে। অসম্ভব কিছু নয়। নিয়তই ঘটছে তো এমনি। সেই ঠান্ডাবাবু বলত জর্মনির কোন লাইপজিগ শহরের কফিখানার গল্প। কফিখানার পাতালতলে যে মেয়েরা নিশিরাত্রে এসে প্রেমলীলা চালাত, তাদের কাছে দিকপাল মানুষদের খুব সম্ভব একটি মাত্র পরিচয়—লম্পট নটবর। মানুষ মাত্রেই অভিনেতা, বলতেন ঠান্ডাবাবু। নকল সাজগোজ নিয়ে এ ওর কাছে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়—সাজ ফেললে ভণ্ড বীভৎস রূপ। এই সংগে গবেষক ব্যারিস্টার সাহেবের কথাও মনে আসে—সুধামুখীর বাপ যাঁর লাইব্রেরিতে কাজকর্ম করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশবিশ্রুত নাম—লাইব্রেরির সংগ্রহ যেমন বিপুল তেমনি মূল্যবান। কিন্তু আরও এক নিগূঢ় সংগ্রহ আছে, বাইরের লোকের মধ্যে জেনেছিলেন একমাত্র সুধামুখীর বাপ। ধার্মিক মানুষ বাবা পরম বেদনায় গুরুদেবকে বলছিলেন মানুষের রুচিবিকৃতি ও পাপলিপ্সার কথা। প্রতি-রোধের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাপণ্ডিত ব্যারিস্টার সাহেবের কথা তুললেন। কথাবার্তার একটুকু সুধামুখীর হঠাৎ কানে পড়ে গেল, জানলার বাইরে কান পেতে সে শুনেছিল। লাইব্রেরির ভিতর একটা লোহার আলমারি সর্বক্ষণ তালাবন্ধ থাকে, তার মধ্যে দেশ-বিদেশের যত অশ্লীল বই আর ছবি। অতি গোপনে বিস্তর দামে এ সব বিক্রি হয়, পুলিশে টের পেলে টানতে টানতে শ্রীঘরে তুলবে। এক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জলের মতন অর্থব্যয় করে বছরের পর বছর ব্যারিস্টার সাহেব সংগ্রহ জমিয়ে তুলে-ছেন। রাত্রে নিরিবিলি আলমারি খুলে দরজায় খিল এ'টে এই সমস্ত নাড়াচাড়া করেন। ছেলেপুলে সবাই জানে গভীর গবেষণায় ডুবে রয়েছেন, পা টিপেটিপে চলাচল করে তারা, শব্দসাড়া হয়ে পাঠে কোনরকমে ব্যাঘাত না ঘটে। এ ব্যাধি থেকে কবে মুক্ত হবে মানুষ? হবে কি কোনদিন?

কিন্তু পরের কথা থাকুক এখন। দিনকাল আরও খারাপ। সুধামুখী চোখে অন্ধকার দেখে—কী হবে, ভবিষ্যতের কোন্ উপায়? রাজা বাহাদুর ফৌত, তার উপর নফর-কেষ্টরও বিপদ। ধরা পড়েছে সে, ধরে নিয়ে আটকে ফেলেছে। এ সমস্ত নফরারই মুখের কথা, আগে আগে বলত সে এইরকম। বড়গংগার ওপারে হাওড়ায় ভাইয়ের বাসায় থাকে, অবরেসবরে চলে আসে সেখান থেকে। আসে দিনমানে, ছুটিছাটার দিনে। জেলখানার সংগে তুলনা দিয়ে সে বলত। কয়েদিরা ছোবড়া পেটে ঘানি টানে সতরঞ্চি বোনে। সে হল আরামের কাজ। এখানে কারখানার ভিতর হাজার চিতার গনগনে আগুন—হরিশ্চন্দ্র পালার চণ্ডালের মতন সর্বক্ষণ সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ। জেল হলে মেয়াদ অন্তে কোন একদিন ছাড়াও হয়ে যায়।

ভাইয়ের বাসার গোলকধাঁধা থেকে কোনকালই বেরতে দেবে না, শবশরবাড়ি থেকে বউটাকে এনে ফেলে ভাল করে আটঘাট বন্ধ করবে, শনতে পাচ্ছি। টাকা পড়ে মরক, একটি পরো সিকিও মঠোয় রাখতে দেয় না। মাসের মাইনে হাত পেতে নিয়েছি কি ভাই অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের পকেটে পরে ফেলবে।

হেসে বলে, আমার কাছে টাকা দেখলে কারও প্রাণে জল থাকে না সধামখী। টাকার গরমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি না ফানস হয়ে আকাশে উড়ি কেউ যেন সাব্যস্ত করে উঠতে পারে না। কেড়ে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। সে আমি তোমার বেলাতেও দেখেছি।

আগে আগে ইনিয়ে বিনিয়ে বলত এমনি সব। কেমন করে গ্রেপ্তার হল তা-ও বলেছে। নফরের ঠিক পরের ভাই নিমাই-কেল্ট। নিমাইয়ের শবশর হাওড়ার এক ঢালাই কারখানার ম্যানেজার। তিনিই জামাইয়ের চাকরি জটিয়ে পাড়াগাঁ থেকে মেয়েজামাই উদ্ধার করে আনলেন। কারখানা থেকে ঘর দিয়েছে, বাসা সেইখানে। কিন্তু নিজের ভাল নিয়েই নিমাইকেল্ট খশি নয়—বড়ভাইটা কত বছর আগে শহরে এসে উঠেছে, তার খোঁজ নিচ্ছে তন্নতন্ন করে। কোথায় থাকে সে, কি কাজ করে, রোজগারের টাকাকড়ি যায় কোথায়—

সধামখীর কাছে হাত ঘরিয়ে নফরকেল্ট ভাইয়ের ব্যাখ্যান করেঃ কলিযগের লক্ষ্মণ-সম ভাই। খোঁজ করে করে ঠিক গিয়ে ধরেছে। নিমাই কেন যে কারখানার কাজে গেল, টিকটিকি-পলিশের লাইন হল ওর, অঢেল উন্নতি করত।

একটা গোপন ডেরা আছে নফরাদের, এতকালের ঘনিষ্ঠতায় সধামখী পর্যন্ত তার ঠিকানা জানে না। কেমন করে গলির গলি তস্য গলি ঘরে পনের-বিশটা নর্দমা লাফিয়ে পার হয়ে আঁস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে নিমাইকেল্ট সেখানে গিয়ে হাজির।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে ভাইয়ের অবস্থার মোটামটি আন্দাজ নিয়ে নিল। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসাঃ চাকরিটা কোথায় তোমার দাদা?

থতমত খেলে সন্দেহ করবে। যেমন যেমন মখে আসে, নফরকেল্ট চাকরিস্থলের ঠিকানা বলে দেয়।

নিমাইকেল্ট মেনে নিয়ে চুপচাপ চলে গেল। পরদিন আবার এসেছে। থমথমে মখ। নফর প্রমাদ গণে।

গিয়েছিলাম দাদা তোমার আপিসে। বিস্তর লোকের বড় আপিস বললে—দেখলাম বিস্তরই বটে। লোক নয়, গর আর মহিষ। জাবনা খাচ্ছে। চাকরিটা কী তোমার—খাটালের গর-মহিষের জাবনা মাখা?

নফরকেল্ট তাড়াতাড়ি বলে, বাড়ির নম্বরের হেরফের হয়েছে, ওর পাশের বাড়িটা—দুনম্বর নম্বর'

সেইরকম ভেবে আমিও দু-পাশের বাড়ি দুটোর খোঁজ করেছি। একটায় চুল কাটার সেলুন—চুল ছাঁটে দাড়ি কামায়। আর একটি মেসবাড়ি—দি গ্রান্ড প্যারাডাইস লজ।

নিমাইকেষ্ট মুখে কথা বলে, আর দু-হাতে ভাইয়ের জিনিষপত্র কুড়োয়। এইদিক দিয়ে বড় সুবিধা, একটা বোঁচকায় সমস্ত ধরে গেল। বোঁচকা বড়ও নয় এমন কিছু। হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ডাকেঃ চল—কোথায় রে?

বাসা হয়েছে হাওড়ায়, তোমার বউমা এসেছে। বাড়ির বউ মজুত থাকতে ভাসুর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে—ছি ছি করবে লোকে জানতে পারলে।

ফলাও করে নফরকেষ্ট বাসায় নিয়ে তোলার কাহিনীটা বলত। বড় সহজে সেটা হয়নি, পাকছাট মেরেছে সে বিস্তর। নিমাই-কেষ্ট তখন হাত চেপে ধরল। সে আরো বেশি পালোয়ান। গায়ের জোরে হিড়হিড় করে ট্রামে তুলে এবং অবশেষে বাসায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে সে হাতের কাব্জ ছাড়ে।

জেলখানায় ঢোকানো বলছে কেন আর তবে!

বাড়িয়ে বলত নিঃসন্দেহ, এতদূর কখনও হতে পারে না। সুধামুখীর কাছে ভাল-মানুষি দেখানো—বুঝতে সেটা আটকায় না। বয়স হয়ে গিয়ে পুরানো কাজকর্মে জুত করতে পারছে না। থানার শনির দৃষ্টি তদুপরি। বাউণ্ডুলেপনা ছেড়ে নফরা তাই ঘরসংসারে চেপে পড়ল।

ছোট ভাই নিমাইটা সত্যি সত্যি তাই করে ছেড়েছে। বাসায় তুলে ক্ষান্ত হয় নি, শ্বশুরকে ধরে কারখানায় একটা কাজও জুটিয়ে দিল। হায়রে কপাল, নফরকেষ্ট পাল চাকরে মানুষ রীতিমত। চাকরি করে বলে আগে যে লোকের কাছে ধাপ্পা দিত—কিন্তু কথা তো ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায়, অন্তরীক্ষের ভগবান বলে দিলেন, তথাস্তু—চাকরির গুঁতোয় প্রাণান্ত এবারে দিনের পর দিন। আটটায় ভোঁ বাজলে হন্ত-দন্ত হয়ে কারখানায় ছোট। গলিত লোহা—লোহা কে বলবে, তপ্ত তরল আগুন—সেই আগুন বালতি বালতি এনে ঢালছে ছাঁচের মধ্যে। ঢালছে অবিরত, লহমার জিরান নেই—কলেই সমস্ত করে। নফরকেষ্টকে খাড়া দাঁড়িয়ে নজর রাখতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, তাপে তারও দেহ এইবারে বুঝি গলে টগবগ করে ফুটবে। পিঠ চুলকাতে কিংবা গায়ের ঘাম মুছতে ভয় করে—হাতের চাপে সুসিদ্ধ হাড়-মাস-চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে খাবলা খাবলা উঠে আসবে হাতের সঙ্গে। সন্ধ্যা বেলা টলতে টলতে বাসায় এসে পড়ে, তারপরে আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। ছুটির দিনে যে একটু-আধটু জিরোয়, ভাইবউ সেটা পণ্ড করবার জন্য আগেভাগে একশ গণ্ডা কাজের ফরমাস দিয়ে রাখে। আর বাসায় ফিরে ঘরে পা ঠেকানো মাত্র ছোট ভাইয়েরও হাজার গণ্ডা। বল তা হলে, জেল-খানার বাকি থাকল কিসে?

গোড়ার আমলে নফরকেষ্ট এমনি সব বলত। ইদানীং আর বলে না, ধাতস্থ হয়ে এসেছে। বলে, ভাল মানুষ না হয়ে আমি টাকার মানুষ হতে গিয়েছিলাম, টাকায় সব কিনব। কিন্তু টাকা হল না, হবার ভরসাও নেই। এবারে মানুষ ভাল হয়ে দেখি। সংসারের বাজারটা আমি করে দিই। নিমাই-এর বউ মান্যগণ্য করে বেশ, পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সাজিয়ে এনে দেয়। সন্ধ্যের পর পাড়ার ক্লাবে গিয়ে কোন দিন বা তাসে বসে যাই, কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়, শুনি তাই বসে বসে। মাইনেও ফি বছর দু-তিন টাকা করে বেড়ে যাচ্ছে।

তবে আর কি! সংসার পোষ মানিয়ে ফেলেছে। এখন হয়তো মাসে একবার আসে এর পর ছ-মাসেও আসবে না। টাকা-পয়সার প্রত্যাশী ছাড়, মানুষটারই চোখের দেখা মিলবে না। হয়তো বা সারা জীবনের মধ্যে নয়—রাজা বাহাদুরের মতো। ভাল হয়ে গেছে নফর, বলবার কিছু নেই। প্রশংসারই ব্যাপার।

সুধামুখী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, বউ এল বাসায়?

উঁহু, আসেনি এখনও। আসার বেশ খানিকটা ভাব হয়েছে। আমার এক খুড়তুত বোনের বিয়ে হল শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে—বোনকে নাকি আমার চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলে, আছি আমি লেগে-পড়ে। আসতেই হবে—না এসে যাবে কোথায় হারামজাদি। আজ না হয়তো কাল। বয়স তারও বাড়ছে, রূপের গুমোর আর বেশী দিন নয়। পাড়ার ছোঁড়ারা, আগে তো শুনতে পাই, ঘরের চারদিকে ঘুরঘুর করত, শিয়াল তাড়ানোর মত হাঁকডাক করতে হত রাত্রে। এখন একটাবার বেড়ায় ঘা পড়ে না, নাক ডেকে ঘুমোয়। আমারও ইদিকে বছর বছর মাইনে বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মপত্নী হয়তো ঠিক একদিন এসে উঠবে।

পারুল ছোট বোনের মতো, সুধামুখীর ও সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গে।

ভাঙা আসর কোন দিন আর জমবে না পারুল। থুতু ফেলতেও কেউ আসে না। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা এবার থেকে।

ফোঁস করে পারুল নিশ্বাস ছাড়ে। মেয়ে

হওয়ার পর থেকে তাকেও ভয়ে ধরেছে। বলে, ত্রিভুবনে আমাদের আপন-কেউ নেই। সবাই সুখের পায়রা, সুখের দিনে ঘরে এসে বকবকম করে চলে যায়। শ্বশুরবাড়ি যদি পড়ে থাকতাম, ঝমাঝম টাকাকড়ি আসত না, গয়নাগাটি গায়ে উঠত না। কিন্তু গয়না-টাকায় মন ভরে না দিদি, সুখ আসে না।

পারুলের বয়স আছে, যৌবন আছে। তার আসর অন্ধকার হতে অনেক দেরি। লোকের সামনে কত ঠাটঠমক ! সর্বাঙ্গে দোলন দিয়ে দিয়ে হাসে—খিক-খিক খুক-খুক। কিন্তু আড়ালে-আবডালে এমনি হয়ে যায়। আলাদা মানুষ—আমোদস্ফূর্তির মুখোসখানা ঘরের তাকে খুলে রেখে যেন সুধামুখীর কাছে এসে বসেছে, সন্ধ্যাবেলা আবার পরবে।

বলে, মেয়েটা বড় হচ্ছে, ওর দিকে তাকিয়ে প্রাণে জল থাকে না দিদি। বিয়েথাওয়া দিতে পারব না, সারা জীবন শতেক হেনস্তা সয়ে বেড়াবে।

সুধামুখী সান্ত্বনা দেয় : এমন ফর্সা মেয়ে, বিয়ে হবে না কে বলল ! বয়সকালে আরও কী রকম শ্রী-ছাঁদ খুলবে দেখিস।

ম্লান হেসে পারুল বলে, এই মায়ের মেয়ে কে ঘরে নিতে যাবে বল। মায়ের পাপে মেয়ের খোয়ার। আমার মেয়েও যে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো, এ কথা কেউ বুঝে দেখবে না।

খপ করে সুধামুখীর হাত চেপে ধরল : তুমি যদি বউ করে নাও সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। বড় ভাব দুটিতে, এক সঙ্গে বেড়ায়—

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুধামুখী হেসে বলে, চখাচখী—যেমনধারা পদ্যে লিখে থাকে। এক রত্তি ছেলে আর এক ফোঁটা মেয়ে, সমবয়সী খেলার সাথী—তুই একেবারে প্রেমিক প্রেমিকা ধরে নিলি রে ! বিয়ে না হলে মেয়ে অন্নত্যাগ করবে, ছেলে দেশান্তরী হবে—উঁ ?

পারুল বলে, এড়িয়ে গেলে শুনব না দিদি। এখনই কে বলছে, কথাবার্তা হয়ে থাক আমাদের। সাহেবকে আমি নিতে চেয়েছিলাম, দাওনি সেদিন। এবার আমার রানীকে দিতে চাচ্ছি, নিয়ে নাও।

সুধামুখী ধমক দিয়ে ওঠে : আস্ত পাগল তুই একটা। মায়ের দুধের গন্ধ এখনও মুখে—সেই মেয়ের বিয়ের ভাবনা লেগে গেল। বিয়ে না দিলে অরক্ষণীয়া মেয়ে ঘর ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় হতে দে, তখন দেখবি সাহেব তো সাহেব—কত ভাল ভাল সম্বন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সাহেবের কথা উঠলে তুই-ই হয়তো তখন নাকচ করে দিবি।

হত তাই দিদি, না হবার কিছু ছিল না, আমি কালামুখী যদি ওর মা না হতাম। পণ দিয়ে দানসামগ্রী সাজিয়ে আমার ঐ একটা মেয়ের বর খরিদ করে আনতাম। বড় বড় বাড়িতে যেমন নিয়ে আসে। কিন্তু আমার টাকা কলঙ্কের টাকা। বরের বাপের মনে মনে ইচ্ছে হলেও সমাজের ভয়ে পেরে উঠবে না।

চোখে আঁচল-ঢাকা দিল পারুল। কিন্তু পারুলের সঙ্গে যতই ভাবসাব থাক, সুধামুখী কথা দিতে পারে না। ছেলে নিয়ে তার সমস্ত আশা। রূপে যেমন গুণেও একদিন সাহেব সকলের সেরা হবে। সকলের মান্য হবে। এখনই বোঝা যায়, ছেলের কত টান তার উপরে। কিসে একটু সাশ্রয় হবে সেজন্য আঁকুপাকু করে ঐটুকু ছেলে। বিয়ে সাহেবের কি এই ঘরের ঐ রানীর মতো মেয়ের সঙ্গে ! কত সুন্দর বউ নিয়ে আসবে, সে মতলব মনে মনে সুধামুখীর ছকা রয়েছে।

চোখ মুছে পারুল বলে, কী দুর্বুদ্ধি হল, কেন যে এসেছিলাম মরতে? মেয়েটার একটু সাজতেগুজতে সাধ, তা আমি একটা ভাল কাপড় পরতে দিইনে—নোংরা জায়গার দশ শয়তানে রংতামাশা করবে তাই নিয়ে। এর চেয়ে সমাজের মধ্যে শ্বশুরের ভিটেয় নুন-ভাত খেয়ে যদি থাকতাম, সে ছিল ভাল। মানসম্ভ্রম ছিল তাতে। দায়-বেদায়ে পাড়াপড়শিরা ছিল। বড্ড অনুতাপ হয় দিদি।

আমার হয় না।

কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে পারুল তার মুখে তাকায়। সজোরে ঘাড় নেড়ে সুধামুখী বলে, কোনদিন আমার হয়নি। কিসের অনুতাপ! কলঙ্ক চাপা দিয়ে ঘরে থাকার মতো যন্ত্রণা নেই। সর্বদা আতঙ্ক, কখন কি ঘটে, কে কখন কি বলে বসে। মানুষও সুযোগও নিয়েছে ভয় দেখিয়ে। আজকে ঢাকাঢাকি নেই। আমি সত্যি সত্যি যে-মানুষ, তারই প্রকাশ। অনেক সোয়াস্তি এতে, অনেক আরাম।

পারুল প্রতিবাদ করে বলে, এ তোমার মুখের অহংকার, ছোট বোনের কাছে মিথ্যে বলছ তুমি। কতদিন কাঁদতে দেখেছি তোমায়। আমায় দেখে চোখের জল মুছেছ।

দূর পাগলি, সে বুঝি অনুতাপে! আমার পয়লা নম্বর প্রেমিকটার কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। "জীবনে মরণে তোমার" কেমন মিষ্টি করে বলত। প্রেমের কথা কতই তো শুনেছি, কিন্তু অমন মিঠে গলা কারো পেলাম না। পাগল হয়ে যেতাম, বুকের মধ্যে তোলপাড় করত। সারাক্ষণ তার পথ চেয়ে থাকতাম।

একটু থেমে ম্লান হেসে সুধামুখী বলে, তারপরে সেই বিপদের লক্ষণ দেখা দিল। আঁচটুকু পাওয়ামাত্র "জীবনে-মরণে" সুড়ুৎ করে সরে পড়ল। পুরুষমানুষের সুবিধে আছে—"না" বলে ঝেড়ে ফেলে দিলেই পার পেয়ে যায়। প্রমাণ হবে কিসে? মেয়েদের দুটো রাস্তা—হয় নিজের মরণ, নয়তো সেই বিপদের মরণ। বিপদ কাটিয়ে এসে দিব্যি আবার জমিয়ে আছি। সেই মানুষের দেখা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করি। পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি, এতজনে ঘোরাফেরা করছে সে একটিবার আসে না!

পারুল গভীর কণ্ঠে বলে, আজও তাকে ভুলতে পার নি?

ভুলি কেমন করে? হাত নিশপিশ করে, সামনে পেলে খ্যাংরার বাড়ি মারি ঘা কতক। কিন্তু আসবে না সে। হয়তো কোন লাট-বেলাট এখন! কোন দেশ-নেতা। এমনি তো আকছার হচ্ছে।

পারুল চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। সহসা নিশ্বাস ফেলে বলে, মানুষ খুন করলে তো ফাঁসি হয়। আমাদেরও খুন করেছে। খুনেই শোধ যায় নি, মজা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে খুনেরা এসে। এতে আরও বেশী করে ফাঁসি হবার কথা।

সুধামুখী বলে, ফাঁসি দেয় ওরা সাদা-মাঠা মানুষ মারলে। খুন করে আবার সুখ্যাতিও হয়। খুব বেশী খুন করলে ইতিহাসে জায়গা দিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো। কদিন মাত্র এসে কত রকম ভাবনাই দিয়ে গেছেন। খবরের-কাগজের পাতা ভরা লড়াইয়ের কথা—মানুষ মারার খবর। তখন আর মানুষ নয় তারা—শত্রু। একজন-দুজন কিম্বা পাঁচজন-দশজন নয়—রেজিমেন্ট। শত্রু মারবার কত রকম কলকৌশল, বৈজ্ঞানিকেরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তাই নিয়ে গবেষণা করছে—

পারুলের পোষা কাকাতুয়া সহসা ও-ঘর থেকে বলে ওঠে, হরি বলো মন-রসনা—

হেসে ফেলে সুধামুখী: ঠিক একেবারে মানুষের সুরে বলে উঠল। তুই যা শিখিয়েছিস, সেই বাঁধা বুলি বলছে। সমস্ত কিন্তু বলতে পারে ওরা। হ্যাঁ, সত্যি। আগেকার দিনে বলত—রূপকথায় পুরাণো পুঁথিপত্রে রয়েছে। এখনও পারে ঠিক তেমনি। এই কাকাতুয়া বলে নয়, সমস্ত জীবজন্তু পারে। বলে না কেন জানিস?

পারুলের মুখের উপর মুখ তুলে তীব্র স্বরে বলে, ঘেন্না করে ওরা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে। মানুষের উপরে মানুষ যেমন নৃশংস, কোন ইতর জানোয়ার সে রকম নয়।

(ক্রমশ)

প্রতিভার মৃত্যু : টমাস চ্যাটার্টন

শৈলানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজ কবি টমাস চ্যাটার্টনের সংগে আমাদের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে। ভানুসিংহের পদাবলীর রচয়িতা 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন যে তিনিও এক সময় 'দ্বিতীয় চ্যাটার্টন' হতে চেয়েছিলেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুর'—রবীন্দ্রনাথের এই ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনে ছিলেন টমাস চ্যাটার্টন। চ্যাটার্টনের মানস-কবি টমাস রাউলি ভানুসিংহ ঠাকুরেরই পূর্বসূরী। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই অক্ষয় চৌধুরীর কাছে বালক কবি চ্যাটার্টনের কথা শুনেছিলেন। চ্যাটার্টনের কাব্যের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হলেও, তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে যে নাটকিয়ানা ছিল রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করে লিখেছেন—"তাহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল"। টমাস রাউলির ছদ্ম-নামে প্রাচীন ইংরেজী ভাষার অনুকরণ করে কাব্য লেখার ফলে প্রচন্ড যশলালসা কবি চ্যাটার্টনকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল —আত্মহত্যায় ঘটেছিল তাঁর জীবনের পরি-সমাপ্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত" হয়েছিলেন। বালক বয়সেই তাঁর সংগে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয় ঘটেছিল—এই পদাবলী সাহিত্যের প্রতি তাঁর এক সহজাত কৌতূহলও ছিল। বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরাগ ও চ্যাটার্টনের অনুপ্রেরণার ফলেই আবির্ভাব হল ভানু-সিংহ ঠাকুরের—এই ছদ্মনামে ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে ভানুসিংহের কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। 'জীবন স্মৃতি'র পাঠক মাত্রেই হয়ত ভানু-সিংহের পদাবলী প্রকাশকালের ঘটনাবলীর সংগে সুপরিচিত। কবিতাবলী প্রকাশের দু বছর পর ১২৮৬ সালে 'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'চ্যাটার্টন-বালককবি' এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। চ্যাটার্টনের কাহিনী তাঁর কল্পনাকে কতটা সরগরম করে তুলেছিল তারই প্রমাণ এই প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথের মনে চ্যাটার্টনের জীবনের ব্যর্থতা যে বেদনার সৃষ্টি করেছিল এই প্রবন্ধে তারই প্রকাশ।

সকলেই প্রতিভাবান ন'ন—কেউ কেউ মাত্র সেই দৈবশক্তির অধিকারী হন। এ জগতে বরণীয় তাঁরা—স্মরণীয় তাঁরা। তবে প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মহৎ প্রতিভার বিকাশও সময় সাপেক্ষ। কবি প্রতিভাও যথাসময়ে স্ফুরণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু অপেক্ষা করার মত ধৈর্য আর স্থিরতা যাঁর চরিত্রে নেই—তাঁর ভাগ্যে যে প্রবঞ্চনা ঘটে তার তুলনা কোথায়। এমনিভাবেই রাউলি-কবিতাগুচ্ছের স্রষ্টা টমাস চ্যাটার্টনের ভাগ্যে ঘটেছিল অপমৃত্যু। আঠার বছরের বিকাশোন্মুখ এক উজ্জ্বল অথচ বিড়ম্বিত প্রতিভার তাই হল বিষাদময় পরিণতি।

টমাস চ্যাটার্টন

চ্যাটার্টনের সংক্ষিপ্ত জীবনের সূচনা হয় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর ব্রিস্টল শহরে। জন্ম থেকেই কবি পিতৃহারা। পিতা ছিলেন ব্রিস্টলের গির্জার কর্মচারী ও অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পুত্রের জন্মের তিনমাস আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাই কবির শৈশব কাটে মা, ধর্মমা মিসেস এডকিন্স আর দু' বছরের বড় বোনের সংগে। মা ইতিমধ্যে এক মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই চ্যাটার্টনের স্বভাব আর পাঁচজন সাধারণ শিশুর মত হল না—কেমন যেন খাপছাড়া আর খামখেয়ালী ধরনের—ফলে দেরি হল না তাঁর 'পাগল' আখ্যা পেতে। এমন কি মায়ের কাছেও তাঁর ব্যবহার পাগলামিরই এক রূপান্তর বলে মনে হয়। সেই বালক বয়সেই চ্যাটার্টন কখনো কখনো চুপচাপ বসে কি সব ভাবতে থাকেন—অপরের কাছে অর্থহীন সেই সব ভাবনা। আবার ভাবনার বেদনায় কখনো কখনো চোখে জল আসে। ছেলের এই স্বভাবে মায়ের মন আহত পায়—বিরক্ত হয় আর সকলে। মিসেস এডকিন্স তো বালককে শাসন করেন যখন তখন—ধমকের সুরে বলেন—"তোমার বাবা থাকলে সোজা করতেন তোমাকে।" পিতৃ-স্নেহ-বঞ্চিত চ্যাটার্টনের বিষণ্ণ হৃদয়ের এক অভাবনীয় দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তো ঐ

রচনাগুলি শোনার পর। তিনি বলতেন—"হায়! তাই যদি হত।"

স্কুলের প্রতি বালকের বীতরাগ প্রকাশ হল অল্পদিনের মধ্যেই। শিক্ষক মশায়রাও তাঁকে অবাঞ্ছিত ছাত্ররূপেই দেখতেন—তাঁরা সকলেই কবির বুদ্ধির উপমা দিতেন জগৎ-বিখ্যাত বিশেষ এক বুদ্ধিহীন জন্তুর সঙ্গে। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রতি কবির আকর্ষণ না থাকলেও বিদ্যার্জনের প্রতি আগ্রহ তাঁর কম ছিল না। তাই বাড়িতে যেদিন খেয়াল চাপতো সেদিন বিছানা থেকে উঠেই সেই যে বই নিয়ে বসতেন—তারপর তাঁকে আর ওঠায় কে। অনেক সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও তাঁর সেই ধ্যানভঙ্গ হত না। শেষ পর্যন্ত ধর্ম-মা গিয়ে কবির বাল্যসঙ্গিনী Miss Sukey Will-এর নাম করে তাঁকে সেই তপস্যা থেকে বিরত করতেন।

কিন্তু মানুষের মন চায় মানুষেরই মন। চ্যাটার্টনের মনকে সকলেই ভুল বোঝেন—ঘরে-বাইরে তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ নেই। সাত-আট বছরের সঙ্গীহীন বালক তখন আশ্রয় পেলেন ব্রিস্টলের রেডক্লিফ গির্জায়। বংশানুক্রমে এই গির্জার সঙ্গে নানাভাবে তাঁদের যোগ—কবির পিতার মত পিতৃব্যও এই গির্জার কর্মচারী। তাই সেখানেই প্রাচীন পাষাণমূর্তিগুলির সঙ্গে চ্যাটার্টনের সারাদিন কাটে—এখন থেকে ঐ মূর্তিগুলিই হয়ে উঠল তাঁর আত্মীয় বন্ধু। সেখানেই তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তি। এবার যেন তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সেই শৈশব রচনাগুলি শোনাবার উপযুক্ত নীরব শ্রোতা। এতদিন তাঁর সেই অসংখ্য কবিতাগুলি, নিন্দা-প্রশংসা তো দূরের কথা—কারো মনে সামান্যমাত্র আগ্রহও পর্যন্ত সৃষ্টি করতে অসমর্থ হয়েছে। অভিমানী বালক তাই এখন পাষাণ মূর্তির দলকেই কবিতা শুনিয়ে আনন্দ পান—রচনা সার্থক মনে করেন। এ সময়ে তাঁর কবিতা-গুলির বিষয়বস্তুও কবির মনের যথার্থ পরিচয়সূচক। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রহার ও অপমান করে বালকের মনকে বেদনা দিয়েছেন—তাই তাঁর উপর ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা লিখে শোধ তোলার চেষ্টা করেছেন। আবার পাড়ার দোকানদারও হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। দশ বছর বয়সে যীশু-খৃষ্টের পৃথিবী অবতরণ সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতার কিছু অংশ অনুবাদ করেছেন। সেই অনুবাদ ও কবিতাটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করলাম। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,—"আসলে এ কবিতাটির মূল্য তেমন কিছুই নহে, এ সম্বন্ধে তিনি স্কুলে যাহা পড়িয়াছেন তাহাই ছন্দে গাঁথিয়াছেন মাত্র, তথাপি দশ বৎসরের বালকের কবিতার নমুনা পাঠকদের হয়ত দেখিতে কৌতূহল হইবে। অনুবাদ অবিকল রাখিবার মানসে অমিত্রাক্ষরে লিখিলাম :

—উপর হইতে দেখ আসিছেন মেঘে
বিচারক, বিভূষিত মহিমা ও প্রেমে।
আলোকের রাজ্য দিয়া আনিবারে তারে
দ্বিধা হয়ে গেল দেখ শূন্যে একেবারে
বদন ঢাকিয়া তা......ফেলিল তপন
যিশুর উজ্জ্বলতর হেরিয়া কিরণ
চন্দ্রতারা চেয়ে থাকে বিস্ময়ে মগন!
ভীষণ বিদ্যুৎ হানে, গরজে অশনি
কাঁপে জলধির তীর কাঁপিল অবনী।
স্বর্গের আদেশ—শৃঙ্গ বাজিল অমনি
জলস্থল ভেদি তার উচ্ছ্বাসিল ধ্বনি!
মৃতেরা শুনিতে পেলে আদেশের স্বর
পুণ্যবান হাসে, পাপী কাঁপে থর থর
ভীষণ সময় কাছে এসেছে এখন
উঠিবেক কবরের অধিবাসীগণ
অনন্ত আদেশ তাঁর করিতে গ্রহণ।—"

এই সময়েই তাঁর কবিতা ছাপার অক্ষরে বেরতে শুরু করেছে। স্থানীয় পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা ছাপানো হয় আর ১৭৬৪ সালে যখন তাঁর বয়স ১২ বছর তখন বেরয় তাঁর অন্যতম রচনা Apostate Will। এই বছরেই যে ঘটনা দ্বারা তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়েছেন তার সূচনা হয়—তিনি রাউলি-কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন।

রেডক্লিফ গির্জার একটি ঘরে কাঠের সিন্দুকে বহু পুরোনো কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ভরা ছিল। সেগুলির ভাষা ও অক্ষর দুইই বেশ পুরোনো। তাই তাদের আদর-যত্নেরও ছিল অভাব। চ্যাটার্টনের পিতার আমলে এগুলি তাঁর বাড়ির রান্নাঘরে বাসনপত্র পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু যা কিছু প্রাচীন তার প্রতিই ছিল বালক চ্যাটার্টনের অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য রকমের শ্রদ্ধা ও মোহ। তাই সেই কাঠের সিন্দুক তাঁকে আকর্ষণ করল। বাড়িতে পড়ার ঘরে নিয়ে যেতে লাগলেন ঐ সব পুরোনো কাগজপত্রগুলি। সেখানে দরজা বন্ধ করে শুরু করলেন তাদের পুরোনো ভাষা ও অক্ষর শিখতে ও নকল করতে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অভিসন্ধিও পূর্ণ হল। আরম্ভ হল প্রাচীন কবিদের অনুকরণে কবিতা রচনার পালা। প্রায় সারাদিনই কাটান সেই বন্ধ ঘরে—সঙ্গে থাকে কিছু রঙ আর কয়লার গুঁড়ো। বাড়ির লোকজনের তো এই বালকের কাজকর্মের প্রতি ভ্রুক্ষেপই ছিল না। খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যেই যার দিন কাটে, তাঁর জন্যে কেই বা ভাবনা-চিন্তা করে। এমনিভাবে কয়েকদিন কাটানোর পর চ্যাটার্টন একদিন ঘোষণা করলেন তাঁর আবিষ্কৃত কবি টমাস রাউলি ও তাঁর কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপির কথা। জানালেন তাঁর কাল্পনিক কবি রাউলির পরিচয়। বললেন টমাস রাউলি পনের শতকে ব্রিস্টলের গির্জার অধ্যক্ষ ও ঐতিহাসিকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন আর ছিল তাঁর কবিখ্যাতি। পুরোনো কাগজপত্রের সঙ্গে চ্যাটার্টনের ঘনিষ্ঠতার কথা কারো অজানা ছিল না। ফলে তাঁর এই আবিষ্কার অভিনন্দিতও হ'ল। এবার তিনি সুযোগ পেলেন স্বরচিত কবিতা রাউলির নামে পাঠক সমাজকে উপহার দিতে আর যেহেতু প্রাচীন কবির নামে প্রকাশিত তাই সহজেই সেই কবিতাগুলি তাঁদের কাছে সমাদৃতও হ'ল। রাউলি-কবিতা তাঁদের মুগ্ধ করল—সম্মোহিত করল।

এখন বেনামীতে কবিতা রচনা করে আনন্দে বিভোর কিশোর কবি চ্যাটার্টন। স্থানীয় দুজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ব্যারেট আর ক্যাটকট রাউলি-কবিতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। তাঁদের প্ররোচনায় চ্যাটার্টন দিনের পর দিন কাব্যামোদী মানুষকে রাউলি কবিতা জুগিয়ে চলেছেন। টাউন এণ্ড কাণ্ট্রি ম্যাগাজিনে তাঁর বিখ্যাত গাঁথা কবিতা 'এলিনোর ও জুগা' প্রকাশিত হ'ল। রুডবোর্ন নদীর তীরে এলিনোর ও জুগা তাদের যুদ্ধনিহিত প্রণয়ীদের শোকে কাতর হয়ে যে বিলাপ শুরু করেছে তারই বর্ণনা।

"আয় বোন, করি মোরা হেথায় বিলাপ,
এই ফুলময়তীরে, বিষাদ যথায়
রোয়েছে তাহার দুটি পাখা ছড়াইয়া
উষার শিশির আর সায়াহ্নের হিমে
এইখানে বসি বসি ভিজিব দুজনে!
বজ্র-দগ্ধ, শুষ্ক দুই পাদপ যেমন
উভয়ের পরে রহে উভয়ে ঝুঁকিয়া।
কিম্বা জনশূন্য যথা ভগ্ন নাট্যশালা
হৃদয়ে পুষিয়া রাখে বিভীষিকা শত,
অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পেঁচা জাগায় নিশিরে।
বংশীরবে উষা আর উঠিবে না জাগি
নৃত্যগীত বাদ্য আদি হবে নাকো আর।

এলিনোর

ঘোটকের পদশব্দ শৃঙ্গের গর্জনে
অরণ্যে প্রাণীরা আর উঠিবে না কাঁপি!
সারা দীর্ঘদিন আমি ভ্রমিব গহনে
সারারাত্রি গোরস্থানে করিব যাপন
প্রেতাত্মারে কব যত দুখের কাহিনী।"

(রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ অবিকল রাখা হয়েছে)

যে প্রশংসা, যশ ও খ্যাতি চ্যাটার্টনের কামনার পরমবস্তু—এতদিনে তিনি যেন তাদের সন্ধান পেলেন—তাদের সঙ্গে ঘটল সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক পরিচয়। তাঁর প্রশংসা-তৃষ্ণা ছোটবেলা থেকেই যে কত তীব্র তার পরিচয় পাই সেই সময়কারই এক ঘটনায়। মায়ের কুম্ভকার বন্ধু কবিকে একটি মাটির পাত্র উপহার দিতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর কাছে জানতে চান সেই পাত্রের উপর কিসের ছবি এঁকে দেবেন। অহঙ্কারী বালক উত্তর দিয়েছিলেন "এক দেবতার মূর্তি এঁকে তার মুখে একটি শিঙা দিন—যেন সেই শিঙা পৃথিবীময় আমার যশ কীর্তন করে।"

যাহোক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের বাসনা তো পূর্ণ হয়েছে—এখন বই আকারে কবিতাগুলিকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাই কবি একগুচ্ছ সুনির্বাচিত কবিতা পাঠালেন Dodsley নামে এক প্রকাশকের কাছে। কিন্তু সেই প্রকাশক কবিতাগুলির কোনো মূল্যই দিলেন না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে অনন্যোপায় কবি চিঠি লিখলেন হোরেস ওয়ালপোলকে—পুরাতত্ত্বের প্রতি যাঁর দরদ ও সহানুভূতির কথা সুপরিচিত। চ্যাটার্টনের ও তাঁর রাউলি-কবিতা তাই সহজেই ওয়ালপোলের হৃদয় জয় করল। এই ঘটনাকালে কবির বয়স মাত্র ষোল বছর চার মাস—এ-হল ১৭৬৯-এর মার্চের কথা। ওয়ালপোলকে তিনি এবার পাঠালেন রাউলি রচিত ইংলণ্ডের শিল্পকলার জাগরণ — পুরোনো ই ং রে জি তে ওয়ালপোল তো এই প্রাচীন রচনাটি পেয়ে অভিনন্দনের মালা পাঠিয়ে চিঠি লিখলেন চ্যাটার্টনকে। এবার চ্যাটার্টন পাঠালেন কতকগুলি রাউলি-কবিতা—এগুলি ওয়ালপোলকে প্রবঞ্চিত করলেও গ্রে, মেসন প্রমুখ প্রখ্যাত কবিদের কাছে চ্যাটার্টনের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাঁরা রাউলি'র প্রকৃত স্রষ্টাকে ধাপ্পাবাজ বলেই ঘোষণা করলেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল ব্রিস্টল ত্যাগ করে চ্যাটার্টন লন্ডনের দিকে যাত্রা করলেন। কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভই ছিল তাঁর বাসনা। আশা ছিল লন্ডনের বিদগ্ধ সাহিত্যিক সমাজেই তাঁর যথার্থ সমাদর হবে। লন্ডনে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর সঙ্গে একগুচ্ছ কবিতা আর মাত্র পাঁচটি গিনি। প্রথমে শোরডিচে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর কবি বাসা পরিবর্তন করলেন। নির্জনতাপ্রিয় কবি ব্রুকস্ট্রীটের এক বাড়িতে পৃথকভাবেই বাস শুরু করলেন। লন্ডনবাসের প্রথম দু-এক মাসই চ্যাটার্টনের জীবনে সোনার ফসলের যুগ। কবির কাছে দেবতাস্বরূপ যিনি সেই ওয়ালপোলের সান্নিধ্যলাভে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আর তারই ফলে কয়েকজন প্রকৃত কাব্যামোদীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। কবিতা লেখা ছাড়া নানাধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপসূচক রচনা, গল্প, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, প্রহসন ইত্যাদি-ও তিনি লিখতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কৌতুকনাট্য "রিভেঞ্জ" সকলের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সময়ের কৃপায় দু মাসের মধ্যে এগারো গিনি আয় করে নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করছেন কবি। সেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাড়িতে চিঠি লিখেছেন—উপহার পাঠিয়েছেন মা আর বোনকে।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার দাক্ষিণ মুখের প্রসন্নতা তাঁর জন্য নয়। তাই বোধ হয় তাঁকে দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা আবার ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এতদিন তিনি রাউলি-কবিতার মধ্য দিয়ে অগণিত পাঠক মনকে ছলনা করেছেন—প্রবঞ্চিত করেছেন। আত্মগোপনের ছলে নিজেকেই প্রকাশ করে যেমন কৌতুক করেছেন পাঠকদের সঙ্গে—এবার তেমনি ভাগ্যও তাঁর সঙ্গে শুরু করল কৌতুকলীলা—শোধ তুলল সেই প্রবঞ্চনার সেই ছলনার। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক টমাস ওয়ারস্টানের সমালোচনায় তাঁর জুয়াচুরি দিনের পর দিন প্রকাশ হয়ে পড়ল। গ্রে প্রমুখ কবিরা তো আগে থেকেই অপ্রসন্ন ছিলেন। ফলে চ্যাটার্টনকে ওয়ালপোলের সান্নিধ্য ও আনুকূল্য হারাতে হল আর সেই সঙ্গে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর প্রীতি। এতকাল প্রাচীন কবির নামে প্রকাশিত কবিতাগুলির সৌন্দর্যে ও রসাস্বাদনে তাঁরা মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু যখনই জানতে পারলেন কবিতাগুলির প্রকৃত রচয়িতা কে তখনই তাঁরা চ্যাটার্টনের প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ করতে শুরু করলেন। প্রকাশক ও কাগজের সম্পাদকেরা একযোগে ত্যাগ করলেন কবিকে। কবিখ্যাতি অর্জনের আশা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র বাঁচবার বাসনায় চিকিৎসা-শাস্ত্রে মনোনিবেশ করতে চাইলেন চ্যাটার্টন কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই চলেছে দিন রাত্রি। জনৈক বন্ধু তাঁর কবিতাগুলি বই আকারে প্রকাশ করার অনুরোধ জানালে কবি অত্যন্ত অভিমানের সঙ্গে বললেন যে পুরনো কাপড় কেনার জন্যে কিংবা ঘর সাজাবার জন্যে তিনি কোন কবিতা লেখেননি। পৃথিবী যদি কবির সঙ্গে ভাল রকম ব্যবহার না করে—তাহলে সেই পৃথিবী তাঁর কবিতার একছত্রও দেখতে পাবে না—এই হল চ্যাটার্টনের মনের কথা। এই অভিমান আর অহঙ্কার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। যে বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকেন—সেই বাড়ির কর্ত্রী আঠার বছরের ছেলেকে অনাহারে দিন কাটাতে দেখে নিজে থেকেই কিছু খাবার দিতে গেলে কবি তা ফিরিয়ে দিলেন—দয়ার অন্নে অরুচি তাঁর আজন্ম। এই ঘটনার পরদিন ব্রিস্টল ছাড়ার ঠিক চার মাস পরে ২৪শে আগস্ট রাত্রিতে ব্রুক স্ট্রীটের সেই বাড়িতেই আর্সেনিক বিষ পান করে বালক-কবি চ্যাটার্টন আত্মহত্যা করলেন।

চ্যাটার্টনের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে তাঁর রচনা নিয়ে নানা আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ঘটে গেছে। জুয়াচুরির জন্যে তিনি নিন্দিত হলেও তাঁর মধ্যে যে মহৎ প্রতিভার লক্ষণ ছিল তা পরবর্তী যুগের সকল বিদগ্ধ ব্যক্তিই স্বীকার করেছেন। এমন কি ১৭৭০ সালে তাঁর দুঃখপূর্ণ জীবনাবসানে যে পৃথিবী তাঁর জন্যে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি, ১৮৪০ সালে সেই পৃথিবীই কবির সম্মানে প্রস্তর স্তম্ভ নির্মাণ করে পূর্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। চ্যাটার্টনের প্রতিভা উত্তরকালে ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে—তাঁরা অকুণ্ঠিতভাবে বালককবির অপরিণত প্রতিভাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জানিয়েছেন। অথচ এই প্রশংসা ও যশ-লালসাই হল চ্যাটার্টনের মৃত্যুর কারণ। কবি কোলরিজ তাঁর কবিতায় চ্যাটার্টনের পুনর্জন্ম চেয়ে লিখেছেন :

O Chatterton ! that thou wert yet alive !

কীটসের 'এন্ডিমিয়ন' তো চ্যাটার্টনকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসর্গীত। নিজের বেদনাতুর জীবনে চ্যাটার্টনের বিড়ম্বিত জীবনের ছায়া যেন কীটস দেখতে পেয়েছিলেন। সেই হৃদয়-যন্ত্রণা রূপ নিয়েছে চ্যাটার্টনের উপর লেখা তাঁর সনেটটিতে—যার শুরুতেই আছে

"O, Chatterton! how very sad thy fate."

আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর রিজোলিউশেন এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সে লিখছেন—

"The Marvellous Boy
The sleepless soul that perished
in his pride."

সাহিত্য সমালোচকগণও এই বালকের প্রতিভার বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। সমালোচক Malone এবং আরো কেউ কেউ তাঁকে শেক্সপীয়রের পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী বলে সম্মানিত করেছেন।

". . . . he must rank as a universal genius, above Dryden, and perhaps only second to Shakespeare."

অন্য একটি মন্তব্য—

". . . . the greatest genius that England has produced since the days of Shakespeare."

কিন্তু সবচেয়ে সম্মান বোধহয় চ্যাটার্টন পেয়েছেন ডক্টর জনসনের উক্তিটিতে—তিনি বসওয়েলকে বলেছিলেন—

"This is the most extra-ordinary young man that has encountered my knowledge. It is wonderful how the whelp has written such things."

ত্রি-বর্ণ

বনফুল

॥ ২৯ ॥

রেস-কোর্সের মাঠে পীরবাবার সমাধির চারপাশে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেখানে গিয়েই বসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জি। দূর্বা ঘাসে ছেয়ে গিয়েছিল জায়গাটা। প্রথমে গিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল, পুরাতন বন্ধুরা যেন ভিড় করেছে এসে। অহেতুক-ভাবে মনে হয়েছিল কাছে গেলেই সোল্লাসে সম্বর্ধনা জানাবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন, কিছুই হল না। তিনি কাছে এলেন বলে একটুও শিহরন জাগল না দূর্বা দলের আস্তরণে। আগেও তিনি বারবার অনুভব করেছেন, সেদিনও আবার করলেন, প্রকৃতিকে আপন করা যায় না। তার কাছে যাওয়া যায়। খুব কাছে যাওয়া যায়, কিন্তু সে কখনও আপন হয় না। মাঠের ঘাস আর আকাশের মেঘ, একটা খুব কাছে, আর একটা খুব দূরে, কিন্তু দুইই সমান নাগালের বাইরে। সমান উদাসীন। কেউ অন্তরঙ্গভাবে ধরা দেয় না। এই যে আশপাশে রোজ এত জিনিস দেখেন, ওই যে নীলকণ্ঠ পাখিরা চতুর্দিক সচকিত করে প্রেয়সী-বন্দনা করছে—ওদের তিনি কখনও আপন করতে পারবেন না। খাঁচায় বন্ধ করেও না। ওই যে অত কাছে শালিকগুলো চরছে, তারা কি কখনও আপন হবে? দেখা হলে আপনা থেকে কাছে আসবে? কখনও না। ওদের খাবার দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছেন, ওরা নাগালের বাইরে থেকে খাবারটি খেয়ে যায়, কিন্তু ধরা দেয় না। তাঁর মনে হল এই বোধ হয় কবি-কল্পিত অধরা। কাছাকাছি আছে, কিন্তু ধরা যায় না। চুপ করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর পকেট থেকে খাবারের ঠোঙা বার করলেন। পাখিদের জন্য খাবার এনেছিলেন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলেন। শালিকগুলো উড়ে উড়ে পালাল। তিনি একটু দূরে গিয়ে বসলেন। তিনি জানেন কাছে থাকলে ওরা আসবে না। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসে রইলেন। একটু পরে ঘুরে দেখলেন শালিকগুলো পালিয়েছে, কাকেরা এসে খাচ্ছে খাবারগুলো। মুচকি হাসলেন একটু। কাকেরা শত্রু নয় তাঁর, কিন্তু ওদের মধ্যে তিনি বাংলা প্রবচনের ধূর্ত নেপোদের যেন প্রত্যক্ষ করলেন। একটা কথা মনে হল, পক্ষী জগতে ওরা বোধ হয় রাজনীতিবিদ। বিষ্ণুশর্মার সাহিত্যে ওদের বেশ একটা বড় স্থান আছে।...হঠাৎ মনে পড়ল গণেশ হালদারের জন্য কিছু লিখতে হবে। দেখলেন রেল-লাইনের ওপারে মাঠের মধ্যে সেই পাথরটা রয়েছে এখনও। মানুষে না সরালে পাথর সরে না। পাথরটার চারদিকে গজিয়েছে সবুজ ভুট্টার ফসল। শ্যাম শোভায় পাথরের রুক্ষকান্তি প্রায় ঢেকে গেছে। সেই দিকেই গেলেন সুঠাম মুখুজ্যে। গিয়ে একটি নতুন জিনিসও দেখতে পেলেন। পাতার একটি ছোট কুঁড়েও রয়েছে ক্ষেতের মধ্যে। এক ক্ষুদে পাহারাদারও বসে আছে সেখানে। তাকে গিয়ে বললেন "আমি এখানে বসে লিখতে চাই। কোথা বসি বলতো।"

সে তৎক্ষণাৎ তার খড়ের ছোট্ট বিছানাটি দেখিয়ে বললে—"এইখানেই বসুন না!"

"তুমি কোথা বসবে?"

"আমি এধার ওধার ঘুরব।"

"তুমি খেয়ে এসেছ?"

"না। আমার মা রোজ খাবার দিয়ে যায়। আজ মায়ের কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। এমনিই কাটিয়ে দেব দিনটা।"

"ক্ষিধে পাবে না?"

"ক্ষিধে পেলে পেয়ারা খাব। ওই যে একটা গাছে রয়েছে—"

এক মুখ দাঁত বার করে হাসলে। গাছটা একটু দূরে ছিল। পাছে তিনি অন্য কিছু মনে করেন এই ভেবে ছেলেটি বললে—

"গাছটাও এই ক্ষেতের মালিকের। তিনি আমাকে পেয়ারা খেতে বলেছেন।"

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন যদিও ছেলেটি

এদেশের ভাষায় কথা বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কথায় পূর্ববঙ্গের টান রয়েছে। বোধ হয় রেফিউজি।

ডাক্তারবাবু বললেন—"শুধু পেয়ারা খেয়েই থাকবে? তার চেয়ে এক কাজ কর না। আমি দুটো টাকা আর তোমার মায়ের জ্বরের জন্য একটা প্রেসক্রুপশন লিখে দিচ্ছি। তুমি ওষুধ নিয়ে মায়ের কাছে চলে যাও। মাকে দেখে খাবার খেয়ে চলে এস। আমি ততক্ষণ তোমার ক্ষেত পাহারা দিচ্ছি।"

"ওষুধ কোথায় পাব?"

"ওষুধের দোকানে। ও, আচ্ছা দাঁড়াও—"

পকেট থেকে হুইস্‌ল বার করে বাজালেন ডাক্তারবাবু।

ছেলেটা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার মোটর আসছে। তাতে চড়ে তুমি চলে যাও। ড্রাইভার তোমাকে ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর তোমার খাওয়া হ'য়ে গেলে নিয়ে আসবে।"

বেচু এসে পড়ল।

ছেলেটার মুখ দেখে মনে হ'ল ও যেন স্বপন দেখছে। বিস্ময়ে আনন্দে নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিল সে। তার দাঁত আর ঢাকছিল না।

"আমি যাব? ওই মোটরে!"

"হ্যাঁ, আমি বেচুকে বলে দিচ্ছি। আমার ড্রাইভারের নাম বেচু।"

ডাক্তারবাবু বেচুকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলে দিলেন। একটা প্রেসকৃপশন আর দুটো টাকাও দিয়ে দিলেন তাকে। ছেলেটাকে নিয়ে চল গেল বেচু।

ডাক্তারবাবু তন্ময় হ'য়ে লিখছিলেন।

"একটা সিদ্ধান্তে পে'ৗছেছি মনে হচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে আমি এখন বিহার করছি সেখানে অনুভূতিই প্রমাণ, উপলব্ধিই শেষ কথা। আপনাকে কাজ দিতে হবে বলেই এটা লিখছি, তা না হলে লিখতুম না। প্রমাণের তখনই দরকার যখন সেটা বাইরের লোকের স্বীকৃতির ছাপ চায়। এখন যা মনে হচ্ছে তাতে বাইরের লোকের স্বীকৃতির প্রয়োজনই নেই। একটু আগেই মনে ক্ষোভ জাগছিল—জীবনে কাউকে আপন করতে পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে জীবনে কাউকে আপন করা যায় না, যদি যেত তাহলে ভগবানের সৃষ্টি এক-রঙা হ'য়ে যেত। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের (এমন কি এক যমজ ভাইয়ের সঙ্গে আর এক যমজ ভাইয়েরও) কিছু-না-কিছু পার্থক্য আছে বলেই সৃষ্টি এত মনোহর, এত বিচিত্র, এত বিস্ময়ের আধার। আর এই পার্থক্যের জন্যই প্রত্যেকের এত স্বাতন্ত্র্য। একটা স্বাতন্ত্র্য আর একটা স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পুরোপুরি মিলতে পারে না। তাই কেউ কারো আপনার হয় না। আপনার হতে হলে নিজের সত্তাকে অপরের সত্তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে। এইটেই আমাদের কামনা—ইংরেজীতে বললে বলতে হয় wishful thinking; কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে জীবজগতে একটা রঙ আর একটা রঙের সঙ্গে মিলতে চায় না, মিলতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্যের দুর্গে বন্দী হয়ে আছে, সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই। ছবির জগতে মানুষ-চিত্রকরেরা, অনেক সময় প্রকৃতিও, একটা রঙের সঙ্গে আর একটা রঙ মেলায়। যখন সত্যি মিলে যায় তখন দুটো রঙের একটারও অস্তিত্ব থাকে না, তৃতীয় রঙের জন্ম হয়। ছবির জগতে এসব হয়, কিন্তু প্রাণীর জগতে হতে দেখি নি। প্রাণীর জগতে স্বাতন্ত্র্যের দুর্গ দুর্ভেদ্য। হরি-হর-আত্মা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু আসলে হরির সঙ্গে হরের মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। একজন আকাশ-বিহারী গরুড়-বাহন, আর একজন হিমালয়-বিহারী ষণ্ড-বাহন। দু'জনে দু'লোকে বাস করেন। প্রাণী-জগতে কেউ কারও আপন হয় না, তার আর একটা কারণও আছে। একজন প্রাণী আর একজন প্রাণীকে খেয়ে তবে বাঁচে। বাঁচবার জন্যে জীব-হিংসা প্রত্যেক প্রাণীর মজ্জাগত স্বভাব। যাদের পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তারা কি পরস্পরের আপন হতে পারে? মানুষ এককালে সব জানোয়ারই খেয়ে দেখেছে, এখন হয়তো সে কাকে খাবে সেটা নির্বাচন করে ফেলেছে, কিন্তু সকলেরই অবচেতনলোকে ভয়টা প্রচ্ছন্ন হয়ে এখনও আছে। সবাই সবাইকে প্রচ্ছন্ন শত্রু মনে করে। হয়তো গাছেরাও আমাদের শত্রু মনে করে (জানি না মস্তিষ্ক জাতীয় কোনও যন্ত্র গাছেদের মধ্যে নেপথ্যে লীন হয়ে আছে কি না)—কিন্তু তারা পালাতে পারে না, তাদের ভাষাও আমরা বুঝি না, তাই তাদের বন্ধু মনে করি। গাছেরা নিজেরা কিন্তু সর্বগ্রাসী, সকলকে খেয়ে বেঁচে থাকে তারা। মাটির শরীর মরে মাটিতে মিশায় তখনই গাছ তার থেকে রস আহরণ করে পুষ্ট হয়ে ওঠে। তবু ওদের শত্রু বলে মনে হয় না, কারণ ওদের এই আহরণ বা শোষণটা প্রত্যক্ষ নয়, গোপন। বাঘের হরিণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো, অথবা অন্তরীক্ষ থেকে বোমা-নিক্ষেপ করে শত শত লোককে হনন করার মতো বীভৎস নয়। তাই বোধ হয় গাছকে আমরা বন্ধু ভাবি। গাছ অবশ্য আমাদের অনেক উপকারও করে। গাছকেও আমরা খাই—কেটে কুঁচিয়ে সিদ্ধ করে ভেজে পুড়িয়ে—নানা রকম করে খাই। গাছেরা আপত্তি করে না, তাদের চিৎকার বা আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই না। এই কারণেই সম্ভবত অনেক নিরামিষাশী লোক নিজেদের অহিংস-পন্থী মনে করেন। বাছুরের মুখ থেকে মাতৃদুগ্ধ কেড়ে খেয়েও নিজেদের অহিংস মনে করতে বাধে

না তাঁদের! কিন্তু পরমাণু-বিজ্ঞানের যে-রকম দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে মনে হয় অনেক অসম্ভবই হয়তো সম্ভব হবে, হয়তো এমন এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে যার সাহায্যে আমরা শত শত গাছের আর্তনাদ আর হাহাকার শুনতে পাব। উঠোনের লাউ কুমড়ো শশা-গাছের আকুল রোদন যদি কর্ণগোচর হয় কোনদিন তাহলে 'কিচেন গার্ডেন'কেও কশাইখানার মতো শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। এখন গাছ মূক, মৌন নীরব। আমাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে না। বোবার শত্রু নেই বলেই আমরা গাছের বন্ধু। গাছকে বড় ভালো মনে করি, কবিতাও রচনা করি তাকে নিয়ে। কিন্তু গাছেদের একটা অদৃশ্য দিক আছে সেটা অনেকের জানা নেই। বিজ্ঞানীরাই শুধু জানে সেটা। আমাদের অধিকাংশ অসুখের কারণ যে ব্যাক্‌টিরিয়া, তারাও উদ্ভিদ। উদ্ভিদ-বংশের তারাই আদিম জীব, কিন্তু তারা দুর্দ্ধর্ষ, প্রবল, আমাদের ঘোর শত্রু। এদের কথা ভাবলে, উদ্ভিদদের কি আপন লোক ভাবা যায়? কিন্তু যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম কথায় কথায় তার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমার কথাটা ছিল, পৃথিবীতে কাউকে আপনজন করা যায় না যতক্ষণ নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু অসম্ভব কি? মনে হয় অসম্ভবও নয়। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়েছেন পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন। যে মহা-উৎস থেকে নিখিল জগতের এত বৈচিত্র্য নিত্য উৎসারিত হচ্ছে সেই উৎসের সংগে নিজেকে মেলাতে পারলেই সকলের সংগে মেলা যায়, সবাইকে আপন-করা সহজ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সেই মহা-উৎসটা কি? ভগবান? প্রকৃতি? এর উত্তর আমার জানা নেই। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বহু-বিস্তৃত তবু ওই উত্তরটুকু এখনও অজানা রয়ে গেছে। যাঁরা সবজান্তা, তাঁরা হয়তো অবজ্ঞার হাসি হাসবেন (এ হাসি হাসাটা খুবই সোজা!) কিন্তু এই কথাটা এখন প্রবলভাবে মনে হচ্ছে সেই অজানাকে জানতে পারলেই সব বিরোধের অবসান ঘটবে। সবাই তখন হয়ে যাবে আপন লোক। সিংহের সংগে জেব্রার, পূর্ববংগের সংগে পশ্চিমবংগের, শাসিতের সংগে শাসকের, বস্তুত সকলের সংগে সকলের মিল হয়ে যাবে তখন। এই কথাটা এখন মনে হচ্ছে, পরে হয়তো আবার অন্য রকম মনে হবে। মনের তো কোনও মতিস্থির নেই, যখন যেটা পায় তখনই সেটাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে। ধ্রুবলোক থেকে অনেক দূরে আছি তো!..."

ডাক্তারবাবু আরও হয়তো লিখতেন খানিকটা। বসে বসে ভাবছিলেন। এইটুকু লিখতেই তাঁর এক ঘণ্টার বেশী লেগে গিয়েছিল, টের পান নি। মোটরটা ফিরতেই ঘড়িটা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আরও

অবাক হলেন মোটরে সেই ছেলেটার সংগে ঝিনুককে দেখে।

ঝিনুক নেমে এসে প্রণাম করল।

"তুমি কি করে এলে!"

"আপনার গাড়ি যখন গেল তখন আমি মনুদের বাড়িতে ছিলাম। মনুর মায়ের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম তাঁকে। ও'রা আমাদের দেশেরই লোক তো। প্রায়ই আমি যাই ও'দের বাড়ি।"

"ও, এর নামই বুঝি মনু।"

"হ্যাঁ, ওরা সদ্‌ব্রাহ্মণ। ওর বাবা পুরোহিত ছিলেন। রায়টের সময় মুসলমানেরা ও'কে কেটে ফেলে। ওর মা এখানে এসে গভর্ন-মেন্টের দাক্ষিণ্যপ্রার্থী হয়ে আছেন। মিস্টার সেনের দয়ায় একখানা থাকবার ঘর পেয়েছেন।"

ঝিনুক চুপ করল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। তারপর সসংকোচে ঝিনুক বলল, "একটা কথা যদি বলি রাগ করবেন না তো।"

"কি কথা?"

"মনুর মা আপনার টাকা আর প্রেসক্রুপশন ফেরত পাঠিয়েছেন। ডাক্তার ঘোষাল তাঁকে সকালেই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই—"

ঝিনুক সসংকোচে টাকা দুটো আর প্রেসক্রুপশনটা রেখে দিলে ডাক্তার মুখার্জির সামনে।

"ও, ডাক্তার ঘোষাল ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝি। তা বেশ।"

হাসবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার মুখার্জি।

"টাকা দুটো ফেরত দিচ্ছ কেন? ও টাকা তো মনুকে দিয়েছি।"

"না, মনু টাকা নেবে না। বাঙালী রেফিউজিদের বদনাম রটেছে তারা না কি ভিখারী। তাই আমাদের চেনা-শোনা কাউকে আমরা ভিক্ষা করতে দিই না। সবাইকে রোজকার করেই খেতে হবে। ডাক্তার ঘোষাল ওকে এই ক্ষেত পাহারার কাজটা জুটিয়ে দিয়েছেন। ও ভিক্ষে নেবে কেন।"

এ শুনে ডাক্তার মুখার্জির মুখভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখের অপ্রস্তুত ভাব দেখে ঝিনুকেরও কষ্ট হ'ল। এমন একটা ভালো লোকের মনে আঘাত করে অনুতপ্ত হল সে মনে মনে। তিনি যে এতটা আঘাত পাবেন সে ভাবে নি। তাছাড়া, শুধু টাকা ফিরিয়ে দিতেই সে আসে নি। ডাক্তার মুখার্জির কাছে তার আর একটা দরকারও ছিল। আইন-সংগতভাবে আজকাল বিলাত যাওয়ার পথ বহু কণ্টকাকীর্ণ। কর্তৃপক্ষ সহজে অনুমতি দিতে চান না। ঝিনুক খবর পেয়েছিল দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বা এ-দেশে অলভ্য উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য আবেদন নাকি সহজে মঞ্জুর হয়। দুরারোগ্য অসুখের জন্য একজন বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। ডাক্তার মুখার্জি কি তাকে একখানা সার্টিফিকেট দিতে পারেন না? ঝিনুক শুনেছে তাঁর বড় বিলাতী ডিগ্রী আছে। কর্তৃপক্ষদের কাছে এখনও বিলাতী ডিগ্রীর কদর অনেক বেশী। সাব-অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষাল সেখানে কলকে পাবেন না।

সুমিষ্ট হেসে ঝিনুক বলল, "আপনি রাগ করলেন না তো? কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নেওয়া কি ভালো? এমনিই তো আমরা চরম দুর্দশায় পড়েছি, অনেক বদনাম রটেছে আমাদের নামে, অনেক বদনাম সত্ত্বেও তাই আমরা একটা নীতির আদর্শ খাড়া করেছি। আপনি তাতে সাহায্য করুন।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "আমি তো ঠিক ভিক্ষে দিই নি। মানে, আমি ওই ছেলেটির ঘরটা দখল করে এসে বসলাম কি না—তাই মানে—"

নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে না পেরে আবার থেমে গেলেন ডাক্তার মুখার্জি। তারপর হঠাৎ একটু জোর করে হেসে বললেন, "না, আমি রাগ করি নি, কিছু মনেও করি নি।"

হাসির আভায় ঝলমল করতে লাগল ঝিনুকের দৃষ্টি। তারপর চোখ নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, "আমি জানতুম আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাদের মতো উদার লোকেই তো আমাদের ভরসা"—তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল কথাটা—"আপনি কিন্তু আমার একটা সত্যিকারের উপকার করতে পারেন। করবেন?"

"কি বল।"

কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে গেল ঝিনুক।

"আমার একটা চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি

না। ডাক্তার ঘোষালের চিকিৎসায় কিছু হয় নি। উনি বলছেন জর্মনীতে না কি এ ব্যায়রামের চিকিৎসা হয়। আমি যাবার টাকা জোগাড় করেছি। কিন্তু পাসপোর্ট পেতে হলে একজন বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তার ঘোষালের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। ইচ্ছা আছে ডাক্তার ঘোষালকেও নিয়ে যাব, সঙ্গী হিসেবে। আপনি একটা সার্টি-ফিকেট দেবেন?"

"আমি কি বড় ডাক্তার? না তো।"

ব্যঙ্গের মৃদু হাসি ফুটে উঠল ডাক্তার মুখার্জির মুখে।

"আপনার চেয়ে বড় ডাক্তার এ শহরে আর কে আছে! আপনার কত বড় বিলিতী ডিগ্রী!"

চুপ করে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি।

তারপর বললেন, "ডিগ্রী থাকলেই সর-কারের দপ্তরে সেটা গ্রাহ্য হবে?"

"শুনেছি, হবে। আপনার ডিগ্রী তো লণ্ডনের?"

"হ্যাঁ।"

তারপর ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন। চোখের সম্বন্ধেই তাঁর বার্লিনেরও যে একটা বড় ডিগ্রী আছে একথা আর বললেন না।

"দেবেন একটা সার্টিফিকেট?"

"সেটা চোখ না দেখে বলতে পারছি না। এস একদিন আমার ক্লিনিকে। চোখটা আগে দেখি।"

"আমি কলকাতায় একজন বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম, তিনি কোনও দোষ দেখতে পান নি। আমি কিন্তু বাঁ-চোখে ক্রমশই বেশী ঝাপসা দেখছি।"

বলা বাহুল্য, কথাটা নির্জলা মিথ্যে। ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি এত ভালো যে রাতের অন্ধকারেও সে বেশ দেখতে পায়।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আচ্ছা, তুমি আমার ক্লিনিকে একদিন সন্ধ্যার পর এসো। আমি ভাল করে দেখব।"

বেচু মৃদুকণ্ঠে বলল, গাড়িটা কি এখানেই থাকবে? না, সরিয়ে রেখে দেব?"

"না, চল এবার যাই।"

তারপর ঝিনুকের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি কোথা যাবে এখন—"

"বাড়ি যাব।"

"কোথায় তোমার বাড়ি? চল, আমি পেঁাছে দি—"

"ডাক্তার ঘোষালের বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। আপনার অসুবিধা হবে না তো।"

"না, না, কিছুমাত্র না। চল তোমাকে নাবিয়ে দি। রাস্তাতেই তো পড়বে।"

"চলুন।"

কাউ যে পল্লীতে আড্ডা গেড়েছিল তা ভদ্রপল্লী নয়, তার ঠিকানাও ভদ্র রাস্তার ঠিকানা নয়। বড় রাস্তা থেকে গলির গলি তস্য গলি পার হ'য়ে সেখানে পেঁাছতে হয়। ছোটলোকদের বস্তি। এক-একটা খোলার ঘরে চার-পাঁচটা করে পরিবার বাস করে সেখানে একটা উঠোনকে কেন্দ্র করে। এখানে ভিড় করেছে সমাজের অতি-নিম্নস্তরের লোকেরা। এদের দেখলে মনে হয় আমরা যে সভ্যতার গর্ব করি তা নিতান্তই ভুয়ো, অসার, অর্থহীন। যে সভ্যতা একদল নর-নারীকে পঙ্ককুণ্ডে ঠেলে দিয়ে তাদের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে তা সভ্যতা নয়, তা ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা। এখানে কত রকম লোকই যে আছে! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে মানুষ এমন হ'তে পারে। নুলো, খোঁড়া, অন্ধ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত একদল ভিখারী এখানে থাকে। আরও থাকে অনেক রকম লোক। তাড়কা রাক্ষসীর মতো মেয়ে আছে, নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সুশ্রী মুখেরও অভাব নেই, মূর্তিমান শয়তানের মতো একদল গুন্ডারও আড্ডা এখানে। কারও মুখ কুড়ুলের মতো, কারও মুখ ঘোড়ার মতো, কারও বা ঢালের মতো। প্রেতের মতো জরাজীর্ণ রোগীও এখানে কম নয়। কারো হাঁপানি, কারও যক্ষ্মা, কারও উদরাময়। প্রত্যেক ঘরে কিল-বিল করছে শিশুর দল। মানুষ নয়, যেন পোকা। কেউ জারজ, কারো মা আছে বাপ নেই, কারও বাপ আছে মা নেই, কারো বা কেউ নেই। বেঁচে আছে সকলের দাক্ষিণ্যে। বেঁচে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। শুধু রোগের নির্যাতন নয়, মানুষের হাতেও নির্যাতন। চড়-চাপড়, ঝাঁটা-লাথি, ছোট ছেলেদেরও মারছে সবাই নিষ্ঠুরভাবে। পশুকেও লোকে বোধ হয় অত মারে না। সর্বদাই আর্তরোল চারিদিকে। সব বয়সের লোক আছে এখানে। কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, নানা চেহারার, নানা আকারের। সবারই মুখে একটা হিংস্র ভাব। ভোরে বেরিয়ে যায় সবাই রোজকারের চেষ্টায়। কেউ মুটে, কেউ গাড়োয়ান, কেউ কশাই, কেউ গুন্ডা, কেউ চোর, কেউ দোকানদার, কেউ পকেটমার, কেউ ফিরিওলা, কেউ রিক্‌শা টানে, কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। মোটর ড্রাইভারও আছে। মেয়েরাও কাজ করে নানারকম। অধিকাংশই ঠিকে ঝি। বেশ্যাবৃত্তিও করে কেউ কেউ। এদেরই কারো কারো জন্যে ঘোড়ার গাড়ি, এমন কি মোটর-গাড়িও দাঁড়ায় বড় রাস্তায় গভীর রাত্রে। কোন কোন যুবতী মেয়ে সেজেগুজে গিয়ে ওঠে তাতে। ভোরবেলা ফিরে আসে টাকা রোজকার করে। এসব নিয়ে অনেক মন কষা-কষি, হিংসা-দ্বেষ, এমন কি খুন-জখম পর্যন্ত হয়। পুলিস আসে, নির্যাতন করে কিছু লোককে, হইহই পড়ে যায়, আবার থেমে যায় সব। আবার যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে। মানব-সমাজের মরা-আধমরা বিগলিত বিকৃত অংশ নিয়ে এই সমাজ। কিন্তু আশ্চর্যরকম সজীব এরা। মরেও মরতে চায় না। অদ্ভুত জীবনীশক্তি। গাছ-পালা মরে গিয়ে যেমন সার হয়, আর সেই সার থেকে যেমন প্রাণপ্রাচুর্যে জীবন্ত নতুন গাছপালা আবার জন্মগ্রহণ করে, এদের অবস্থাও অনেকটা তেমনি। মৃত্যু আর জীবন এখানে পাশাপাশি বাস করছে। এই সমাজের গুন্ডা আর যুবতী মেয়েদের স্বাস্থ্য দেখলে অবাক হতে হয়, ভাবাই যায় না যে ওদের চারিপাশে প্রত্যক্ষ মৃত্যু করাল ছায়া বিস্তার করে ওত পেতে বসে আছে। জীবন-মৃত্যুর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব অহরহ চলছে এই সমাজে। এরা জীবনের উচ্চ-আদর্শের কথা শুনেছে কিন্তু এদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে বাঁচবার আগ্রহ, যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিচিত্রা

মিটারের কাহিনী

ভারতে অতি সম্প্রতি মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। আমরা আজকাল যখন কাপড় কিনতে যাই তখন আমরা গজ হিসেবে কিনি না, মিটার হিসেবে কিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন মিটারের কাহিনী জানি?

আমাদের মধ্যে যাঁরা খুব বেশী খবরা-খবর রাখেন তাঁরা হয়তো জানেন যে, প্যারিসে সংরক্ষিত একটি প্ল্যাটিনামের তৈরি রডকে সমগ্র বিশ্বে মিটারের মান ব'লে ধরা হ'ত। কিন্তু প্যারিসের এই বিখ্যাত মিটার রডেরও দিন শেষ হয়েছে। ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কিত একাদশ আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্মেলনের এক প্রস্তাব অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট অপছায়াত্মক (স্পেকট্রাল) বিকীরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা বিশেষ গুণিতককে এখন থেকে মিটারের দৈর্ঘ্য ধরা হবে। এই নতুন সঠিক মাপের মান স্থির করার জন্য এখন আর কোন ধাতুর রড ঢালাই করতে হবে না। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় বিকীরণ নিয়ে নিলেই হবে। একটি আলো এই নিখুঁত পরিমাপ দিতে পারবে। পশ্চিম জার্মানীর বার্নস-উইকস্থিত ফেডারেল ফিজিক্যাল ও টেক-নিক্যাল লেবরেটরীর বিজ্ঞানিগণ এই রকম একটি আলো উদ্ভাবন করেছেন এবং তা এখন বিশ্বে দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট মান হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় পরিমাপের একক হিসেবে মিটারের সৃষ্টি হয়। মিটারকে প্যারিসের বিষুব রেখার এক-চতুর্থাংশের দশ লক্ষ ভাগের ১ ভাগের এক-দশমাংশ বলে ধরা হ'ত। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত আস্তে আস্তে মিটারের প্রচলন হয় এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলি এখনও ফুট-ইঞ্চিতে দৈর্ঘ্য মাপে যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা মেট্রিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে। ১৮৬৭ সালে বার্লিনে সার্ভেয়ারগণের একটি আন্ত-র্জাতিক সম্মেলন সমগ্র বিশ্বে দৈর্ঘ্যের পরিমাপক হিসেবে মিটার ব্যবহার করা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে আন্তর্জাতিক মিটার-রীতি স্বাক্ষরিত হয় এবং বর্তমানে ৩৮টি জাতি এই চুক্তির সদস্য। ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কিত আন্ত-র্জাতিক সাধারণ সম্মেলন ঐ স্বাক্ষরকারিদের অন্যতম সংস্থা। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ষষ্ঠ বছরে এই সংস্থার অধিবেশন হয় এবং তাঁরা অন্যান্য সদস্যগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী মিটারের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিভূটি প্যারিসে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়াম ধাতুর মিশ্রণে তৈরি এটি ছিলো একটি রড। কয়েক বছর পর লণ্ডনের একটি ধাতুর কারখানা উন্নত ধরনের একটি মিশ্রিত ধাতু দিয়ে এর ত্রিশটি নকল তৈরি করে এবং লটারী করে সেগুলি সদস্য দেশগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রতিভূ রডটিতে হীরা দিয়ে দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এক মিটারের দৈর্ঘ্য প্রকৃতপক্ষে কতখানি তা যদি কেউ জানতে চান তাহলে তাঁকে তাঁর দেশে সংরক্ষিত মিটারের নকলটির কাছে তীর্থযাত্রা করতে হ'ত। পদার্থবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারগণ কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই দেখতে পেলেন যে, প্রতিভূ রডেরও কতগুলি অসুবিধে আছে। মিটারের মধ্যে দৈর্ঘ্যসূচক যে চিহ্নগুলি দেওয়া আছে খালি চোখে তা অত্যন্ত ছোট দেখায় আবার অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সেগুলি অত্যন্ত বিরাট, মোটা ও অসমান দেখায় এবং বর্তমানে যে সূক্ষ্ম সঠিকতা অত্যন্ত প্রয়োজন তার পক্ষে এই চিহ্নগুলি কার্যকরী নয়। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি অথবা অন্য কোন কারণে যাতে দৈর্ঘ্যের তারতম্য না হয় সেইজন্য এই প্রতিভূ মিটারগুলি বিশেষ সাবধানে রাখা হয়, তবুও, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুরও পরিবর্তন হয় বলে এই পবিত্র রডটির

জার্মানীর ম্যুনেস্টারের এক খেলার মাঠে ইঞ্জিন চালকরূপে ভ্রমণে ছোটদের কল্পনাকে বাস্তব করে তোলার একটা ব্যবস্থা রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে যেসব ইঞ্জিন গাড়ি ছাড়া হয়েছিল সেগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে যাতে ছোটরা খেলনার চেয়ে সত্যিকারের কলকব্জা দেখে ও নাড়াচাড়া করে তাদের জ্ঞান বাড়াতে পারে। পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য খেলার মাঠেও খেলনার বদলে পরিত্যক্ত সত্যিকারের ট্রাম ও মোটর গাড়ি রেখে দেওয়া হয়েছে ছোটদের কৌতূহল এবং অভিযান স্পৃহা বাড়িয়ে তুলতে

দৈর্ঘ্যেরও পরিবর্তন হয়। এর অণু-পরমাণুগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আভ্যন্তরীণ গঠনেও পরিবর্তন হয়। ফলে একে আর প্রকৃত প্রতিভূ বলা যায় না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিভূতেও দশ লক্ষের এক ভাগ ত্রুটি থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন সামান্য মনে হলেও, বর্তমান যুগে যেখানে উৎপাদকগণ কোন নির্দিষ্ট আকারে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত ত্রুটি সহ্য করতে চান না সেই ক্ষেত্রে এই ত্রুটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আশী বছর আগে এই নির্দিষ্ট মাপের রডটি শিল্পপতিগণের কাছে অত্যাশ্চর্য থাকলেও বর্তমান যুগের শিল্পে এই সামান্য অনিশ্চয়তাও বড় আকার নিয়ে দেখা দেয়।

একমাত্র অবস্তু কোন মিটার দৈর্ঘ্য, বস্তুর সবরকম পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আলোর একটা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এইরকম একটা অবস্তু মান এবং একটা সন্তোষজনক আলো উৎস থেকে তা সঠিকভাবে পাওয়া যেতে পারে। এইরকম একটা আলোর উৎস তৈরি করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী প্রকৃতিবিদ বেবিনেট এবং পদার্থবিদ ম্যাক্সওয়েল মাইকেলসন এবং মোরলের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানিগণ উনবিংশ শতাব্দীতেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯২৭ সালে সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, ক্যাডমিয়াম ধাতুর লাল অপচ্ছায়াত্মক রেখাটিকে আন্তর্জাতিক মিটারের দৈর্ঘ্যের মান হিসেবে সাময়িকভাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পূর্বে এ'রা পারদের অপচ্ছায়াত্মক লাইনগুলিকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুপারিশ করেন কিন্তু এগুলির কোনটির সাহায্যেই নির্ভর-যোগ্য উপায়ে নির্ভুল মাপ পাওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানে আমরা জানি যে প্রকৃতিতে প্রায় সমস্ত বস্তুই বিভিন্ন আণবিক ওজনে আইসোটোপ বা পরমাণুর আকারে রয়েছে। কোন পরমাণুর আণবিক ওজন হল বস্তু-সংখ্যার সমষ্টি। কাজেই যুগ্ম বস্তুসংখ্যার কোন অণুর অপচ্ছায়াত্মক বিকীরণে যুগ্ম-সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকবে। অযুগ্ম সংখ্যার অণুর তুলনায় যুগ্ম সংখ্যার অণু অনেক ভালো। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানিগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্রিপটনের ছাব্বিশ অণু নির্দিষ্ট মানের মিটারের জন্য খুব চমৎকার জিনিস। এই গ্যাস বাতাসে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

ব্রানসউইক আলো থেকে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারগণ এক মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত সঠিক দৈর্ঘ্য স্থির করতে পারেন এবং তা হ'ল শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ দৈর্ঘ্যের চাইতেও ১০০০ গুণ বেশী সঠিক।

চাঁদে যাবার মার্কিন রকেট যান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একুশটি স্যাটার্ন জাতীয় রকেট নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। এদের প্রত্যেকটির ধাক্কার পরিমাণ হবে পনের লক্ষ পাউন্ড। এ ধরনের রকেটের সাহায্যে চাঁদে মানুষ প্রেরণের চেষ্টা করা হবে। এই ধরনের প্রথম রকেটটি নির্মিত হবে ১৯৬৪ সালের প্রথমভাগে এবং এর সাহায্যে ১৯৬৫ সালের মধ্যে তিনজন মহাকাশযাত্রীসহ এপোলো নামে মহাশূন্যযানকে চন্দ্রে যাওয়ার পথে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। বর্তমানে যে-সকল রকেট আছে তাদের তুলনায় স্যাটার্ন রকেট পাঁচগুণ অধিক শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-সকল রকেটের সাহায্যে ১৯৭০ সাল নাগাদ চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারবেন বলে আশা করছেন। এপোলো মহাকাশ যানে যে তিনজন মার্কিন মহাকাশযাত্রী চন্দ্রে যাত্রা করবেন, সেখানে পৌঁছবার পর তাঁরা যাতে চলাফেরা করতে পারেন সেজন্য একটি গাড়ি তৈরিরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। যে সকল সাজ-সরঞ্জাম ঐ মহাকাশযানে প্রেরণ করা যাবে না, সেগুলি ঐ "স্পেস ট্রাকে" প্রেরণ করা যায় কি না সে-সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

দুটি উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের পরি-কল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ পরিবাহী একটি মহাকাশ-যান নির্মাণ করা যায় কি না সে-বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। এটিও স্যাটার্ন রকেটের সাহায্যেই মহাকাশে প্রেরিত হবে।

দ্বিতীয়ত এপোলো মহাকাশযানের যাত্রীরা যাতে দীর্ঘকাল চন্দ্র উপগ্রহে অবস্থান করতে পারেন সেজন্য জীবনধারণের উপযোগী কি ধরনের উপকরণ, অবাধে চলাফেরা করার জন্য কি ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার এবং চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যোগা-যোগ স্থাপন ও চাঁদে শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কি ধরনের উপকরণের প্রয়োজন সে-সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১১ ॥

প্রায় বছর খানেক পরের কথা। ইতিমধ্যে বদলি হয়েছি মধ্যপ্রদেশ থেকে উড়িষ্যায়। শৈলনগরী কোরাপুটে গিয়ে ডেরা-ডাণ্ডা গেড়েছি। কোরাপুটও জেলা সদর। সার্কিট হাউস আছে, ডি এম-এর বাংলো আছে, ট্রেজারী আছে, আছে জেল-খানা, পার্ক, ক্রিকেট খেলার মাঠ। নেই কলেজ, নেই সিনেমা হাউস। পাহাড়ের উপর ছবির গ্যালারির মত থাকে থাকে সাজান বাড়ি। টিনের, টালির, খাপরার। অনেক বাড়ির চালে আবার মাটি ছড়িয়ে ফুলের গাছ লাগানো আছে। প্রাচীন ব্যাবিলনের সঙ্গে এ সূত্রে কোরাপুটের কিছু আত্মীয়তা আছে। জয়পুর থেকে কোরাপুট ন্যাশনাল হাইওয়ের এই চৌদ্দ মাইলের পথের দৃশ্য ভুলবার নয়। জয়পুরে ছেলেমেয়েদের কলেজ আছে, সিনেমা হাউসও আছে। জয়পুর থেকে রওনা হলেই ডানহাতি ছোট টিলার গায়ে দেখতে পাবেন সারি সারি খাটো গাছ। কৌতূহলী হয়ে আপনি গাড়ি থামিয়ে নেমে যান, ওর একটা শুকনো ডাল তুলে নিয়ে হয়তো দেখতে চান অচেনা গাছটাকে সনাক্ত করা যায় কিনা। হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসবে প্রহরী। আপনি অবাক হয়ে যাবেন; ফল পাড়েন নি, ফুল তোলেন নি—তবে এমনভাবে তেড়ে আসবার মানে? মানে আছে; ঐ শুকনো ডালটাই শুঁকে দেখুন। মানেটা বুঝতে পারবেন। দণ্ডকবন মর্ত্যের নন্দন বন কিনা জানি না, তবে চন্দন বন আছে এর ভিতর। শ্বেত চন্দনের বন ওটা। অত্যন্ত দামী গাছ।

চন্দনবনকে ডাইনে রেখে একটু এগিয়ে গেলেই দেখবেন পাহাড়ের গায়ে রাস্তাটা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে উপরে, যেন রাজা রামমোহনের আমলের পাগড়ি। আবার কতকগুলি অচেনা গাছ নজরে পড়ল আপনার। অনেকটা ঘেঁটু ফুলের মতো পাতা, ফুলগুলি কুঁড়ি অবস্থায় ধবধপে সাদা, ফুটলে খয়েরি আভা দেখা যায়; ক্রমে হয় জমাটরক্তের মতো কালচে লাল। এ গাছগুলিকেও আপনি চেনেন না। যদিও আপনার বাড়ির প্রতিটি উৎসবে আপনি ওর সাহায্য নিয়েছেন। আপনার বাড়ির দৈনন্দিন সাদা-ভাতের আয়োজনকে উৎসব-রজনীতে ঐ গাছই করে তুলেছে রঙিন পোলাও। জাফরান গাছ ওগুলো।

দিনের বেলা যদি এপথে আসেন তাহলে পাকদণ্ডী ঘুরে উঠবার সময় সমতলের অপূর্ব দৃশ্যে অভিভূত হয়ে যাবেন আপনি। ছোট ছোট আদিবাসী গ্রামগুলিকে মনে হবে খেলাঘরের আয়োজন। ধানের গোলা, চাষের ক্ষেত, খুদে পিঁপড়ের মতো মানুষজন গরু মোষ। আর যদি রাতের বেলা আসেন এ পথে চোখদুটো মেলে রাখবেন সামনের দিকে। বাঁকের মুখে হঠাৎ দেখা পেয়ে যেতে পারেন অরণ্যচারীদের। ডানদিকের পাহাড় থেকে নেমে বড়রাস্তা পার হয়ে বাঁ-দিকের খাদে জল খেতে যায় বনজন্তুর দল। বার দুই বাঘ আর একবার ভালুকের দেখা পেয়েছিলাম আমি। হরিণ আর খরগোস তো বহুবার।

গাড়ির ভিতর বসে ও'দের দেখার মধ্যে বেশ একটা থ্রিল আছে; কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে এ'দের সংগে মোলাকাত করা ভিন্ন জিনিস। কোটা-মালকানগিরি সড়কে আমার একটি জনমজুরের অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসংগে মনে পড়ছে।

মাত্তিলিতে একটা হাসপাতাল তৈরীর কাজ তদারক করতে গেছি। সন্ধ্যা হব হব। একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল সাত মাইল আগে রাস্তার ধারে একজন মজুরকে ভালুকে আক্রমণ করেছে। জীপ

নিয়ে বেরিয়ে গেলাম তখনই। অদ্ভুত লোকটার ক্ষমতা। রাস্তার দিকে মুখ করে পাথর ভাঙছিল সে আপন মনে। পিছন থেকে আচমকা ভালুক আক্রমণ করে তাকে। লোকটা আত্মরক্ষার প্রেরণায় বাঁ হাতটা ঠেসে দেয় ওর মুখে। আর ডান হাতে ক্রমাগত চালিয়ে যায় হাতুড়ির বাড়ি ভালুকের মাথায়। যতই শক্ত হক, গ্র্যানাইট পাথরের চেয়ে তো আর শক্ত নয় ভালুকের মাথার খুলি! শেষ পর্যন্ত ভালুকটা নেতিয়ে পড়ে। এতক্ষণে লোকটা তাকিয়ে দেখে ভালুকও ছেড়ে কথা বলেনি। আধ-চিবানর মত বাঁ-হাতটাকে চিবিয়েছে এতক্ষণ চরম আক্রোশে। অদ্ভুত মনের জোর লোকটার। সে বুঝতে পেরেছিল ঐ বাঁ-হাতখানাই তাকে রেখেছে ভালুকের আলিঙ্গন থেকে নিরাপদ দূরত্বে। যন্ত্রণায় যদি সে এক লহমার জন্যও হাতটা টেনে নিত অমনি ভালুকটা নাগাল পেত তার চোখ-মুখ-নাড়ি-ভুঁড়ির! তাই মরণান্তিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে বাঁ হাতটা টেনে নেয়নি।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন তার জ্ঞান নেই। শকে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কনুই থেকে বাঁ হাতখানার কয়েক টুকরা চর্বিত অংশ ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তায়।

লোকটাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। গরুড়ের উপর দেবরাজ ইন্দ্র একবার নাকি রাগ করে বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন। নারায়ণ তখন গরুড়কে বলেছিলেন বজ্রের আঘাত সহ্য করবার শক্তি তোমার আছে জানি, কিন্তু একেবারে ব্যর্থ হলে বজ্রের অপমান হয়। শুনে গরুড় তাঁর একটি পালক খুলে দিয়েছিলেন—বজ্র সেই পালকটিকে দগ্ধ করে ফিরে গিয়েছিল ইন্দ্রের তূণে। দশাসই চেহারার এ মানুষটাকে দেখে মনে হল হাতুড়ি-পেটা করে ভালুককে বধ করলে পাছে অরণ্য রাজ্যে ভালুকের অপমান হয় তাই বাঁ-হাতখানা সে খুলে দিয়েছিল শুধু! প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল লোকটা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে, আদিবাসী বলেই।

যাক যা বলছিলাম। ছোট্ট শহর কোরাপুটে বদলি হয়ে এসেছি। কোরাপুটের একটি নাম "পুয়োর ম্যানস উটি"। অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের যেসব মানুষের উটা-কামান্ড বেড়াতে যাবার সামর্থ নেই তারা অবসর যাপন করতে আসে কোরাপুটে। উটি দুধ হলে কোরাপুট—ঘোল।

মৌলানা সাহেব এসেছিলেন কোরাপুটে। অর্থ উপদেস্টা। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সুলেখক আর সুরসিকই শুধু নন, সজ্জন। বললেন: ও পাড়ায় যাবেন নাকি? পারালকোটে যাচ্ছি দিন তিনেকের জন্য।

বললাম : আলবৎ যাব। পিল্লাইসাহেবের নিমন্ত্রণ তামাদি হবার উপক্রম করছে। গত এক বছর ধরে তালই ঠুকছি শুধু।

: পিল্লাই? ডাক্তার আর পিল্লাই? সে তো এখন আর পারালকোটে নেই। নারানপুরের মোবাইল য়ুনিটে আছে।

বললাম : যাই হোক। নারানপুর তো পারলকোটের পথেই পড়বে। দেখা করে যাব।

: দেখা করে শুধু নয়; রাত্রিবাস করে। একদিনে তো আর অতটা যাওয়া যাবে না। একরাত কোথাও হল্ট করতে হবেই।

: সে তো আরও ভাল।

যে কথা সেই কাজ। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় মৌলানা সাহেবের গাড়িতে হাজির হলাম নারানপুরে। ডাক্তার পিল্লাই তো আমাদের পেয়ে খুব খুশী। নারানপুর শহরের একান্তে তাঁবু খাটিয়েছেন। তাঁবুর সামনে একটা বেতের আরাম কেদারায় বসে তিনদিনের বাসী খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পায়ে চপ্পল, খালি গা, পরিধানে লুঙ্গির মতো করে পরা পাটভাঙ্গা ধুতি। আমাদের দেখে উঠে এলেন অভ্যর্থনা করতে। চাকর-জাতীয় একজন লোক খানকয় ক্যাম্পচেয়ার এনে পেতে দিল, ক্যাম্প টেবিলও। যাঁরা ক্যাম্পে থাকেন তাঁদের সরকার থেকে ক্যাম্প ফার্নিচার দেওয়া হয়। পিল্লাই সাহেব

ভাবুর প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অন্দরমুখী হয়ে হাঁক পাড়েন : কই গো, তোমার দ্যাশের লোকরা সব এসেছেন যে!

সেই 'কই গো' ডাক আর 'দ্যাশের লোকের টান শুনে বুঝলাম ডাক্তার পিল্লাই শুধু বাঙলা ভাষাটাকেই শেখেননি, উনি একেবারে বাঙ্গালী হয়ে গেছেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন মিসেস পিল্লাই। সাদা খোল লালপাড় একখানা শাড়ি ড্রেস করে পরা। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা—শুধু কানে যে জড়োয়া দুলটা পরেছেন ওটা বোধকরি শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সুন্দরীই বলা চলে। আঁচল ধরে পিছু পিছু এল একটি ফুটফুটে মেয়ে—বছর চারেক বয়স।

বললাম : আরে আরে এর কথা তো জানি না।

কোলে তুলে নিলাম বাচ্চাটাকে : কি নাম তোমার?

: খুকু।

মা বললেন : ছি, ভাল নাম বলতে হয়, বল......

মেয়েটি মুখ নিচু করে বললে : শরবরী পিললাই।

বললাম : এটা অন্যায় করেছেন ডাক্তার সাহেব। মেয়ে আপনার রঙ পায়নি, পেয়েছে মায়ের রঙ। বিয়ের বাজারে পাত্রপক্ষকে মিথ্যা আশংকায় ভোগাবেন অহেতুক। শর্বরী ও নয়।

মৌলানা বলেন : ওদের যুগে বাপ মায়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবে না। আগে পরিচয়, তারপর প্রণয় এবং সব শেষে পরিণয়!

মিসেস্ পিল্লাই বলেন : শর্বরী মানেই অমাবস্যা রাত্রি ধরে নিচ্ছেন কেন আপনি? জ্যোৎস্নামুখরিত রাত্রিকেও তো শর্বরীই বলব?

আমি বললুম : তা হতে পারে। গোলাপ বললে যেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স ব্যতিক্রমের কথা মনে পড়ে না, শর্বরী বললেও তেমনি মনে পড়ে না জ্যোৎস্নার কথা। না কি বলেন মৌলানা সাহেব?

মৌলানা বলেন : হতে পারে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? পাত্রপক্ষের কাছে সেটা হবে কন্‌জিউমার্স সারপ্লাস!

আমি আর রমানাথন এক সঙ্গে বলে উঠি : তার মানে?

: তার মানে বোঝাতে গেলে আপনাদের ইকনমিক্স শেখাতে হয়। একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ডাক্তার—অর্থশাস্ত্রের এ গূঢ় সূত্র বোঝাই কাকে?

রমানাথন বলেন : শর্মিলাকে বোঝাতে পারেন—বি-এ'তে ওর ইকনমিক্স ছিল।

মৌলানা ব্যাখ্যা করেন : একটা বিজনেস্ ডীলে যখন কোন ক্রেতা কোন একটা কিছু পূর্বস্বীকৃত মূল্যে কিনতে রাজি হয়, এবং ট্রানজাকশান শেষ হলে যদি সে দেখে যে সে হিসাবের বাইরে বেশি কিছু পেয়েছে, তখন সেই অপ্রত্যাশিত মুনাফাটাকে বলি কনজিউমার্স সারপ্লাস। যে ছেলেটির বাবা শর্বরীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করবে সে ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়াবে একটি কালো-কনের প্রত্যাশায়। শুভদৃষ্টির সময় সে চমকে উঠবে! ঐ চমকটুকু হবে খুকুর বরের পক্ষে কনজিউমার্স সারপ্লাস!

সবাই হেসে ওঠে। মায় খুকুও!

আমি বললুম : তা যেন হল, কিন্তু নামটা দিয়েছে কে? মেয়ের বাবা না মা?

ডাক্তার পিল্লাই বলেন : দুজনেই।

: সে আবার কি?

: নয় কেন? একটা মানুষকে সৃষ্টি করতে যদি দুটো ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজন হয়, তখন একটা নামকে দুজনে মিলে সৃষ্টি করবে এতে আবার অবাক হবার কি আছে?

বললুম : ওয়ার্ড-মেকিং খেলার মতো?

বললেন : প্রায় তাই। নামের কাঠামোটা

মাড়িয়া ও মুরিয়া শিল্প

১, ২ ও ৩—উৎসবে ব্যবহৃত মুখোশ ৪— কাঠের স্মারকস্তম্ভের (menhir) শীর্ষ। মৃতের চিতাপার্শ্বে বৃষকাষ্ঠের মতো রক্ষিত হয়। ৫—ঘটুলের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কণ ৬—কাঠের পুতুল

আমিই তৈরি করেছি। শর্মিলা নিজের নামের মাথার রেফের মুকুটটা খুলে পরিয়েছে মেয়ের মাথায়।

শর্মিলা দেবী বলেন : উনি মেয়ের নাম রেখেছিলেন শবরী। ও'র দণ্ডকারণ্যে চাকরির অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার যেদিন এল তার ক'দিন পরেই হল খুকুর অন্নপ্রাশন। তাই দণ্ডকবনের এই নামটি পছন্দ করলেন উনি। আমার কিন্তু সে নাম পছন্দ হয়নি। আমি সেটাকে করেছি শর্বরী। ভাল করিনি?

ডাক্তার পিল্লাই বলেন : বেশ আপনিই বলুন। একটা দীর্ঘদিনের তর্কের মীমাংসা হক। আপনাকেই সালিশ মানছি। বলুন রেফ্ দেওয়াতে কি ভাল হয়েছে?

বিব্রত বোধ করি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই রায় শুনতে উন্মুখ।

বাঁচিয়ে দিলেন মৌলানা সাহেব : পয়েণ্ট অফ রেফারেন্স ইজ্ নট সাবজেক্ট টু আর্বিট্রেশান!

: তার মানে?

: আহ্! একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার। আইনের ধারা বোঝাই কাকে? ইণ্ডিয়ান আর্বিট্রেশান এ্যাক্ট অফ নাইণ্টিন ফর্টি খুলে দেখবেন, আর্বিট্রেটারকে কোন স্কোপ দেওয়া হয়নি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে,—দাম্পত্য মতান্তরের ক্ষেত্রে। ল অফ কণ্ট্রাক্টের পথ ক্ষুরস্য ধারা—একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই!

: তাহলে আমাদের তর্কের মীমাংসা?

: সেটা এ কোর্টের এক্তিয়ারের বাইরে। ও তর্কের মীমাংসা কোর্টের কাঠগড়ায় হয় না—ওর মিটমাট সম্ভব মশারি-ফেলা জনান্তিকে!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার।

খাওয়াদাওয়া মিটতে বেশ রাত হয়ে গেল। তারপর যে-যার তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ডাকবাংলোতে একটি মাত্র সীট পাওয়া গেছে। মৌলানা সাহেবকে সেখানে পাঠান হল, যদিও পাকাবাড়ির চেয়ে তাঁবুই তাঁর বেশি পছন্দ। সেই ভাল। মৌলানা সাহেবের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে হল না এটাও নগদ লাভ। মৌলানা খাফী খান সংযত-জিহ্ব ব্যক্তি। সকাল দশটা থেকে লাঞ্চ ইস্তক আবার দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত নাগাড় তাঁকে মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে দেখেছি, নির্বাক, নিশ্চুপ। কেউ যদি মিটিং শেষে তাঁকে প্রশ্ন করে : কই স্যার, আপনি তো কোন কথাই বললেন না? মৌলানা নির্ঘাৎ প্রতিপ্রশ্ন করে বসবেন : কেন, তাতে বাগাড়ম্বরের কিছু কমতি হয়েছে? জিহ্বা জাগ্রত মৌলানার হুকুমে চলে বটে, কিন্তু নাসিকা নিদ্রিত মৌলানাকে চালায়। আর সেই আধিদৈবিক শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে ঋক্ষ-নিনাদের সাদৃশ্য এত বেশি যে ভল্লুক-সমাকীর্ণ এ অরণ্যে সে বিভীষিকাকে উপেক্ষা করে পাশের খাটিয়ায় ঘুমাতে পারি—এত বড় বীর আমি নই। তাঁর সঙ্গে ডাকবাংলোয় ঘুমাতে যেতে হল না বলে আমি খুশি। যাক, ঘুমটা তাহলে হবে।

কিন্তু নাসিকা-গর্জনের মতো নিদ্রাও কারও হাতধরা নয়। ঘুম এল না কিছুতেই। এ-পাশ ও-পাশ করতে থাকি প্রহরের পর প্রহর। ও-পাশের খাটিয়ায় ডাক্তার পিল্লাইও উশখুশ করছেন মনে হল। ডাক্তার সাহেবের কম্পাউণ্ডারবাবু সদরে গেছেন কয়েকটা ওষুধের প্যাকিং কেস্ আনতে। কম্পাউণ্ডার-গৃহিণী একা তাঁবুতে রাত্রিবাস করতে সাহসী হননি। তিনি আছেন পাশের তাঁবুতে মিসেস্ পিল্লায়ের সঙ্গে। সন্ধ্যা থেকেই অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে। বৃষ্টিটা যদি তাড়াতাড়ি না থামে তাহলে পারলকোট যাবার পথ হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। টেণ্টের উপর একটানা বৃষ্টির শব্দ। গাছের ছায়ায় টেণ্ট খাটান। গাছের জল ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ ডাকছে একনাগাড়ে বাঙলা দেশের মতই। অকালবর্ষণে তাদের উল্লাসটা আর চেপে রাখতে পারছে না। লণ্ঠনটা কমান আছে। ডবল-ফ্লাই তাঁবুর চন্দ্রাতপে চিমনির কালো একটা গোলাকৃতি ভূতুড়ে ছায়া। হাতঘড়িটা মাথার কাছে টেবিলে ছিল—দেখলাম রাত সাড়ে এগারটা।

ডাক্তার পিল্লাই বললেন : আপনারও ঘুম আসছে না বুঝি?

বললুম : কই আর আসছে? এমন একটা অদ্ভুত রাত কি ঘুমিয়ে কাটাবার?

ডাক্তারবাবু কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : সে কি? এমন রাত বুঝি জেগে কাটাতে হয়? কিন্তু কি ভাবে নিশি ভোর হবে রাতি জাগিয়া?

হেসে বললুম : সে কথা কি মুখে বলবার? বুঝে লোক যে জান সন্ধান!

ডাক্তারবাবুও হেসে বললেন : তা বটে! কিন্তু এ অরণ্যে উপযুক্ত অনুপান জোগান দিই কেমন করে বলুন?

বলি : শাস্ত্র বলেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে মধু-র অভাবে গুড়ও চলতে পারে। অভাবপক্ষে নিদেন প্রেমের গল্পই শোনান বরং একটা—

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে বসেন: বলেন কি মশাই? আমি শোনাব প্রেমের গল্প? আমি? নারানপুরের মোবাইল ডাক্তার পিল্লাই? এ তল্লাটে ও বস্তু পাবেন কোথায়? একি আপনাদের কলকাতা শহর? অলিতে-গলিতে, এ বাড়ির রোয়াকে ও-বাড়ির জানালায় প্রেমের ফাঁস জড়ান!

: বেশ, একটা ভূতের গল্পই শোনান তাহলে। এ অরণ্য প্রেমের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা হলেও ভূতের পক্ষে নয় নিশ্চয়। প্রেম বিচিত্রগতি, কিন্তু ভূতের গতি সর্বত্র। শাস্ত্র যদিচ বলেন নি, তবু নলেনগুড়ের বদলে ক্ষেত্রবিশেষে না হয় ভেলিগুড়ই চলুক। এমন ঘনঘোর বর্ষণরাত্রে ভূতের গল্পও মন্দ জমবে না।

ডাক্তারসাহেব বলেন : আমাদের শাস্ত্র কিন্তু অন্য কথা বলে।

: কি বলে?

: বলে, আপনাকে দু চামচে অ্যাকোয়া টাইকটিস্ খাওয়াতে। মুর্গীটা হজম হয়নি আপনার।

আমি বললাম : শেষরক্ষার গদাইও মনে হচ্ছে প্রেমরোগের এবম্বিধ একটা প্রেস্-কৃপশন বাতলেছিল।

পিল্লাই বলেন : স্বাভাবিক। গদাইও ছিল চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র। হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থান যে ঠিক পাকযন্ত্রের উপরেই, এ তত্ত্বটা আপনাদের মত কবিরা না মানলেও আমাদের মত কবিরাজরা মেনে থাকে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গল্পই শোনাতে হল ওঁকে। আমি জানতাম এ ভদ্রলোক দীর্ঘদিন এই মাড়িয়া-মুরিয়াদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা করেছেন। দরদী লোক। ওঁর ঝুলি ঝাড়লে নিশ্চয় কিছু রসদের সন্ধান পাওয়া যাবে। উনিও জানতেন শুধু স্থপতিবিদ্যার প্রয়োগ করতেই আমি এ অরণ্যে আসিনি—এসেছি এ অরণ্যপর্বতের পথে-প্রান্তরে কিছু মণিমুক্তোর সন্ধানে। ফলে ডাক্তারবাবুকে শোনাতে হল ওঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি বাস্তব গল্প। তবে উনি প্রথমেই একটা রফা করে নিলেন। ভূত নয়, যে গল্পটা উনি শোনাবেন সেটা পেত্নীর। আমি তাতেই রাজি।

জানি, নারানপুরের সেই বর্ষণমুখর রাত্রে টেন্টের নিচে আধ-অন্ধকারে যে গল্পটি শুনেছিলাম সেটি হুবহু শোনাবার ক্ষমতা আমার নেই। সে গল্পের পূর্ণ রসাস্বাদন করতে হলে আপনাদের কষ্ট করে যেতে হবে সেই বিরলবসতি অরণ্যের একান্তে—মহুয়া-গাছতলার সেই ডবল্-ফ্লাই তাঁবুর আশ্রয়ে। বেছে নিতে হবে ঝড়ো-হাওয়ার ক্যাপামিতে বিধ্বস্ত তেমনি একটি ধারাক্লান্ত রাত্রি, খুঁজে নিতে হবে ডাক্তার পিল্লাইয়ের মত একজন দরদী কথক, যিনি গোষ্ঠি আর হাল্‌বি শব্দের সুচয়িত প্রয়োগে এ গল্পের একটা মেজাজ আপনিই গড়ে তুলতে পারেন।

আর একটা কথা। রসিকতা করে রমানাথন বলেছিলেন তিনি পেত্নীর গল্প শোনাচ্ছেন। আসলে কিন্তু এটি একটি প্রেমেরই গল্প। বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে ওঠা নারী-পুরুষের বিচিত্রতম হৃদয়-বৃত্তি। ওদের পূর্বরাগের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ঘটুলের অদ্ভুত আইন-কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘটুলঘরের আধো-অন্ধকারে প্রেম-বিরহ, ঈর্ষা-আত্মত্যাগের অদ্ভুত ইতিকথা। আমাদের অতিপরিচিত ড্রইং-রুম—পূর্বরাগের মার্জিত-রুচি সে কাহিনীতে আশা করা অন্যায়, কিন্তু তাতে আদিম হৃদয়াবেগের অভাব দেখিনি। ডাক্তারবাবুর নায়ক হয়তো সংস্কৃত-কাব্যের নায়কের সংজ্ঞা মেনে চলেনি, দুটি নায়িকা প্রেম-নাটকের আইন-কানুন অমান্য করে বিচিত্র পথে আনাগোনা করেছে নায়কের চরিত্রটি ঘিরে, তবু এক অখ্যাত-পল্লীর তিনটি অজ্ঞাত চরিত্র যেন মূর্ত হয়ে উঠল আমার চোখের সামনে। অন্তত সেদিন তাই মনে হয়েছিল আমার।

আজ ভুলটা বুঝতে পারি। ডাক্তারবাবুর গল্পের নায়ক সেই সুদর্শন মুরিয়া তরুণটি

নয়। এ কাহিনীর নায়ককে সেদিন চিনতে পারিনি। আজ পারি। এ কাহিনীর নায়ক স্বয়ং ডাক্তার রমানাথন পিল্লাই! সভ্যজগত থেকে বহু দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এ নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন এক-জন সভ্যজগতের প্রতিনিধিই। জীবনের প্রতিষ্ঠা, ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার, বৈজ্ঞানিক জগতের মৌলিক গবেষণার সম্ভাবনাকে ভাসিয়ে দিয়ে এ গল্পের নায়ক নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন একটি মুরিয়ার প্রেমে অন্ধ হয়ে। সে কথা সেদিন ডাক্তার পিল্লাই গোপন করতে চেয়েছিলেন। আজ তিনি ধরা পড়ে গেছেন আমার কাছে!

গল্প শুনতে শুনতে শেষ হয়ে এল রাত। ক্রমে ভোরের আলো ফুটে উঠল পূব আকাশে। তবু শেষ হল না গল্প। ডাক্তার-বাবুর জবানিতেই গল্পটি বলার চেষ্টা করছি :

প্রায় মাস দুয়েক আগের কথা। সবে বদলি হয়ে এসেছি নারানপুরে। সেদিন ডিস্‌পেন্সারীতে বসে একটি রোগীকে ড্রেস করে দিচ্ছি, হঠাৎ বাইরে কেমন একটা সোর-গোল উঠল। সকাল বেলা। রোগীর ভিড় বেশ আছে। ওরা সচরাচর বাইরের গাছতলায় গোল হয়ে বসে থাকে। কম্পাউন্ডার বিনোদ-বাবু একটি-একটি করে রোগীকে ভিতরে ঢোকার ছাড়পত্র দেয়। একে একে ওরা আসে, রোগের বর্ণনা দেয়। আমি পরীক্ষা করি, প্রেস্‌ক্রিপশান লিখে দিই। পাশের ঘর থেকে ওষুধ নিয়ে ওরা চলে যায়। চেঁচামেচি সোর-গোল ওদের ধাতে নেই। আগে দেখাবার জন্যে, আগে ওষুধ নেবার জন্যে কোন হুড়ো-হুড়ি নেই। তাই সোরগোলটা শুনে এগিয়ে গেলাম জানালার কাছে। দেখলাম বাইরে বেশ একটা জনতা। সবাই মুরিয়া গোণ্ড। আর জনতার কেন্দ্রস্থলে দেখলাম দুজন জোয়ান মানুষ শক্ত করে ধরে রেখেছে একটি ছেলের দুই বাহু। একনজর দেখেই কিন্তু মোহিত হয়ে গেলাম আমি। ছেলেটির বয়স বছর-কুড়ি হতে পারে। খালি গা, মালকোঁচা-সাঁটা ফর্সা একটা ধুতি। গলায় একসার লাল-সাদা-নীল পুঁথির মালা। পাগড়িতেও একছড়া পুঁথির মালা, তার উপর ময়ূরের একটা পালক। দু হাতে দুটি ভারি দস্তার বালা। কিন্তু সাজপোশাকের চেয়ে মানুষটাই মনকে আকৃষ্ট করে বেশি। আপনার তো স্কেচ আঁকার বাতিক আছে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, ওকে দেখলে আপনি রাজ্যের কাজ ফেলে রঙ-তুলি নিয়ে বসবেন। প্রশস্ত বক্ষ-কপাট, পেশল বাহুসন্ধি, ক্ষীণ কটি। অপ্রচুর বস্ত্রের প্রান্ত থেকে বের হয়ে এসেছে মাংসল দুটি জঙ্ঘা—পৌরুষের মূর্তপ্রতীক যেন সে। মনে হল, মানুষ নয়—গ্রানাইটে-গড়া অ্যাপোলোর একটি মর্মর মূর্তি চাইনিজ্‌-ইংকের চৌবাচ্চায় চুপিয়ে কেউ এনে খাড়া করেছে আমার সামনে!

ফিরে এলাম জানালা থেকে। আমাকে জানালার ধারে উঠে যেতে দেখেই ওদের সোরগোলটা থেমে গিয়েছিল। কম্পাউন্ডারকে বললাম : ব্যাপার কি? ওকে এভাবে ধরে এনেছে কেন?

বিনোদ বললে : কি জানি কেন। বোধহয় অপরের শুয়োর জোর করে কেটে খেয়েছে। তাই আপনার কাছে ধরে এনেছে বিচারের আশায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম : চুরি-চামারি করে থাকে, তাহলে আমার কাছে কেন? থানায় যেতে বল। দেখ তো ব্যাপারটা কি।

একটু পরেই ফিরে এল কম্পাউন্ডার। চোর নয়, ছেলেটি পাগল। চিকিৎসা করাতে এনেছে। পাগল? বিধাতার এমন একটি আশ্চর্য সৃষ্টি একটিমাত্র শব্দে এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল?

দুজনে দুদিক থেকে ধরে ওকে নিয়ে এল আমার কাছে। বন্দী বীরের মতই মাথা উঁচু করে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। যেন চন্দ্র-গুপ্তকে ধরে আনা হয়েছে সেকেন্দারের তাঁবুতে। আমার দিকে চাইল না কিছু। দৃষ্টি তার আমার খোলা জানালা দিয়ে চলে

গেছে বহু দূরে—রুক্ষ পাহাড়ে দৃশ্যপটের ওপারে পাণ্ডুর দিগন্তে—ধূসর আকাশে যেখানে পাক খাচ্ছে কি একটা নাম-না-জানা পাখি। কপালে জেগেছে কুঞ্চন। যেন পরিস্থিতিটা ঠিকমতো বরদাস্ত হচ্ছে না ওর। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল একটা বুড়ী। ছেলেটার মা। বললে : তোকে জোড়া শুয়োর দেব। তুই ভাল করে দে আমার চয়নকে।

: চয়ন!—চম্‌কে উঠি আমি।

: হ্যাঁ চয়ন। চয়ন শিরদার। মুরিয়া সন্তান। কাবোঙ্গা গাঁয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল ছেলে।—বললেন ডাক্তারবাবু!

আমি চুপ করে গেলাম। গল্পের এ অংশে বাধা দিলাম না। বললাম না, ছেলেটিকে আমি ভাল করেই চিনি। কিন্তু আমার মনের পর্দায় ফ্লাশব্যাকে ভেসে উঠল কয়েকটা ছবি। সিনেমায় মন্টাজ এফেক্টে যেমন দেখা যায়। গীতাঞ্জলি হাতে চয়ন, বাদল-ধারার গানে বিহ্বল চয়ন, রাঙলার বিদ্রূপে বিপর্যস্ত চয়ন—আর তালাওয়ের ধারে সাবুগাছতলায় বসে-থাকা উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ নায়ক চয়ন শিরদার!

ডাক্তারবাবু আমার সে ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নি। আপন মনে তিনি গল্পের জাল বুনে চলেন : হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সবাই। ধরে তুলল বুড়ীকে। জোড়া শুয়োরের লোভে নয়, নিজের গরজেই খুঁটিয়ে শুনলাম কেস-হিস্ট্রিটা। চয়ন হচ্ছে কাবোঙ্গা ঘটুলের মধ্যমণি। কী তীর ছোঁড়া, কী শিকার—কী নাচগান হৈ-হল্লা, সেই ছিল কাবোঙ্গার প্রাণ। গাঁয়ের ছেলেমেয়ের দল ওকেই করেছিল ঘটুলের শিরদার, অর্থাৎ প্রধান দলপতি। কোন চেলিক অন্যায় করলে চয়ন তার বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করত। কোন মোটিয়ারী অন্যায় করলে শাস্তি দিত। সকলে মাথা পেতে মেনে নিত সে আদেশ। ওদের গাঁয়ের ঘটুলে শিরদার ছিল বটে, কিন্তু বেলোসা ছিল না। অর্থাৎ রাজ্যে রাজা আছে, রানী নেই। বস্তুত চয়নের পাশে দাঁড়াবার মত উপযুক্ত মেয়েই ছিল না কাবোঙ্গায়। তা ছাড়া চয়ন ছিল মেয়েদের বিষয়ে জন্ম-উদাসীন। মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবকাশই সে পায়নি কোনদিন। ঘটুলের সব ব্যবস্থাপনা তাকে করতে হয়, সেই দলপতি। তারই নির্দেশে ছেলেরা মাঠে ধান রুইতে যায়, কাঠ কাটতে ছোটে; মেয়েরা ধান ভাঙে, গান গায়, ঘর নিকায়, ঘটুলের প্রাঙ্গণ মার্জনা করে। ধনুক, তীর, টাঙ্গি আর নারানপুরের হাট থেকে কেনা একটা বাঁশের বাঁশীতেই ছিল ওর প্রাণ। কিন্তু চয়ন উদাসীন হলে কি হবে—কাবোঙ্গা গাঁয়ের উদ্ভিন্ন-যৌবনা মোটিয়ারীর দল তো আর অন্ধ নয়। তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওর কাণ্ড, কানাকানি করে। শিকারের সময় তীর-বিদ্ধ হরিণের উপর যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ে শিকারী চেলিকের দল তখন দেখা যায় চয়নের কড়ি-বাঁধা তীরটাই বিঁধে আছে তার বক্ষদেশে। যখন ওরা শিকারের পিছনে ছোটে দলবেঁধে তখন সকলের নাগাল ছাড়িয়ে সবার আগে ছুটত চয়ন, তাঁর বাঁশ-পাতার মত লঘুছন্দ হাল্‌কা দেহখানি নিয়ে। আবার জ্যোৎস্নারাত্রে ঘটুলপ্রাঙ্গণে যখন সুরেলা-ছন্দের মোহ-বিস্তার করে তালে তালে নাচতে থাকে চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন চয়ন হয়ত বেরিয়ে পড়ে একা। শাল-মহুয়ার বনভূমির ভিতর থেকে ছোপধরা জ্যোৎস্নার টুক্‌রোর মত ভেসে আসে বাঁশীর আর্ত কান্না। থেমে যায় ঘটুলের বিড়িয়া-ঢোল সে সুরের মূর্ছনায়, তাল কাটে মোটিয়ারীদের নূপুর-নন্দিত চরণ!

তবু ওরা কোনদিন চয়নের নাগাল পায় নি। কোন মেয়েকেই ওরা বেলোসা করতে সাহসী হয় নি। বরং বলা যায় কোন মেয়েই বেলোসা হতে স্বীকৃত হয় নি। ঘটুলের নিয়ম অনুযায়ী চয়নকে শুতে হত তিনদিন অন্তর নতুন মোটিয়ারীকে নিয়ে। নিরন্ধ্র অন্ধকারের সুযোগে আর সবাই যখন যৌবরাজ্যের তোরণদ্বারের চাবি খুঁজতে ব্যস্ত, চয়ন তখন তার কণ্ঠলগ্না মোটিয়ারীর মাথায় হাত বুলাত ধীরে ধীরে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের মেয়েরা জানত শিরদার হচ্ছে ওদের সকলের বড়াভাই—বড়দাদা। তাই সে স্পর্শের মধ্যে তারা খুঁজে পেত প্রীতির একটা ব্যঞ্জনা, স্নেহের একটা আর্তি—তার বেশীকিছু নয়। মোটিয়ারীর দল নিজেদের মধ্যে কানাকানি

করত—চয়ন এমন আলাদা জাতের কেন, এমন খাপছাড়া কেন? চয়ন যে রাত্রে যাকে নিয়ে শোয় তার পর দিন তাকে সহস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন হাজার রকমের হতে পারে—জবাব হত একই। চয়নের ব্যবহারে, তার স্পর্শে বড়ভাইয়ের স্নেহ-প্রীতির বেশী আর কিছু পায় নি কেউ। শেষে ওদের কৌতূহলেরও অবসান হল ক্রমে। ওরা মেনে নিয়েছিল শিরদারের তথা-কথিত যৌবন কোনদিনই আসবে না। বুঝে নিয়েছিল, দেব বড়াপেন চয়নের সুগঠিত তনুর স্তরে স্তরে যৌবনের উপাদান এত ঢেলেছেন যে মন তৈরী করবার সময় আর কিছু বাকি ছিল না তাঁর ঝোলায়। চয়নকে এমন একটি সম্মানের উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়েছিল ওরা যে এই সহজ সরল প্রশ্নটা তাকে করতে কেউ ভরসা পায় নি—এমনকি ওর সমবয়সী বন্ধু কোতোয়ার পর্যন্ত নয়। কাবোংগা ঘটুল মেনে নিয়েছিল চয়ন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম, ছন্নছাড়া উদ্‌ভুটে জীব।

(ক্রমশ)

রঙের পুতুল

নৃপেন্দ্র সান্যাল

অনেকখানি সময় আচ্ছন্ন আলস্যে কাটিয়ে দেবার পর সুমিতা সত্যি সত্যি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেমন করে যেন সে জেগে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এতক্ষণে ঘুম ভাঙল তার। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ খুলতে পারেনি। কিছু অবসাদ. সেই সঙ্গে জড়িয়ে খানিক আশ্চর্য স্মৃতির ভার সুমিতার চোখের পাতা দুটো জড়িয়ে রেখেছিল। একটু পর চোখ খুলেই সে দেখতে পায় ঘরের দেয়ালে বিচিত্র অসংখ্য ছায়ার মিছিল। বাইরের বাতাবী গাছটা নানা আকৃতির অসংখ্য ছায়া এঁকেছে তার ঘরের দেয়ালে। এক একটি ছায়া বাতাসে কেঁপে কেঁপে এক সময় দেয়ালের ওপর স্থির হয়। তারপর আবার দৃশ্যান্তর। নতুন ছায়ার অবতারণা। ঘুম ভাঙার প্রথম রেশটুকু উত্তীর্ণ হবার পর আবার এক অসহ্য শূন্যতায় সুমিতা ডুবে যায়। ভোর হয়েছে। অন্য অন্য বাড়ি, সামনের বস্তির চাপা কল ঘিরে কাজ করার শব্দ। বাইরের আলো তখন ঘরে। সেই আলোর সবকিছু স্পষ্ট হয়ে সুমিতার মনে আসে। ততক্ষণে সিঁড়িতে দু'একজনের পায়ের শব্দ। জুতোর শব্দ একটু একটু করে শিবেনের ঘরের সামনে গিয়ে মিলিয়ে যায়।

সুমিতা বুঝতে পারে এই সবে আরম্ভ। বেলা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের বাড়িতে আরো অনেক লোকের সমাগম হবে। যারা শিবেনকে জানে, এবং এরকম পরিচিতের সংখ্যা অগণ্য, তারা সকলেই একে একে আসবে। কেউ দুঃখ প্রকাশ করবে, কেউ আশ্চর্য হবে। এ ছাড়া তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মানুষ যারা, যাদের সঙ্গে মাত্র তিন চারদিন আগেও শিবেনের দেখা হয়েছে, তারা শিবেনের বাবা এবং সুমিতার কাছে এসে বলবে, স্ট্রেঞ্জ!

সত্যি সকলেই অবাক হয়েছে। শিবেনের বাবা, মা। শিবেনের ছোট বোন সুস্মিতা। তার অনেক ভক্ত এবং বন্ধু। সকলেই। এরা সকলেই প্রথমে বজ্রাহতের মত। এদের কারো মুখ প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সহজে বন্ধ হয়নি। তারপর মনে মনে এরা সকলেই এক একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে অথই জলে ছুঁড়ে মেরেছে। যেন এমন করেই জলের গভীরতা পরিমাপ সম্ভব। প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র, বুঝি কেউ কোনো এক নিষ্করুণ যোগসূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। অতঃপর তা' থেকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে। কিন্তু কারো ভাবনাই আর এগোয় না। যেন হোঁচট খেয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলে। শিবেন এক দুর্ভেদ্য রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

সকলেরই চোখে মুখে এক প্রশ্নঃ এ কেমন করে সম্ভব হলো?

চোখ থেকে সুমিতার ঘুম এখন সম্পূর্ণ অপসৃত। একটু পর সূর্যের আলো আরো প্রখর হবে। গতকালের ঘটনা একে একে, বেশ পরিষ্কার ভাবে এখন সে মনে করতে পারে।

হঠাৎ সন্ধ্যায় কাল শিবেন বাড়ি ফিরে-

ছিল। গত কয়েকদিন ধরেই সে এমন করছিল। এত আগে সে কখনই ফেরে না। কিন্তু এ কদিন যেন ওর কি হয়েছে। হাতে নানারকম ওষুধের শিশি। সুমিতা কদিনই লক্ষ্য করেছে, আয়নার দিকে নিবিষ্ট হয়ে তার দাদা তাকিয়ে। সুমিতা মনে মনে হেসেছিল। ভেবেছিল তার দাদা বোকা। সুধাদির চোখেও কি সে নিজেকে দেখতে পায় না?

কাল বাড়ি ফিরেই সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গিয়েছিল। মধ্য কলকাতার তিন কামরার ছোট দোতলা বাড়িটা তখনও ওদের দখলে। তার কারণ, ও-বাড়িতে ওদের প্রথম পদার্পণ প্রায় পঁচিশ বছর আগে। সুমিত্রার তখন বয়স মাত্র দুই। তারপর ধাপে ধাপে ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েও তা এখনও পঞ্চাশ টাকার ওপরে উঠতে পারেনি। সেই স্বর্গের ছায়া, স্যাঁত স্যাঁতে অন্ধকার, জীর্ণ দেয়াল ওদের পরিবারকে এক নিশ্চিত আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু শিবেন সে দেয়ালে লবণ ছড়িয়ে দিয়েছে। এবার যেন এই সুখের স্বর্গ ধসে পড়বে ওদের সকলের চাপা নিঃশ্বাসে।

কাল ঘরে ঢুকেই সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। অনেক ডেকেও তাকে নীচে নামানো যায়নি। খাবার দেওয়া যায়নি।

বেশ কয়েকদিন ধরেই এ-বাড়ির মানুষগুলো শিবেনের ব্যবহারে ব্যতিক্রম লক্ষ করছিল। তেমন কারো সংগে কথা বলে না সে। এমন কি সুমিতা, বাড়ি ফিরে, জামা খুলতে খুলতে অন্তত আধ ঘণ্টা যার সংগে সে কথা বলতই, সেই সুমিতাও নয়।

শিবেন যেন নিজেকে একটু দূরে নিয়ে গেছে। যেন একটু আড়াল করে রেখেছে নিজেকে। সুমিতার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কিছু বলেনি। কারণ তার মনে হয়েছিল, শেষবারের মত যখন সুধাদি তাদের বাড়ি থেকে চলে যান তখন, একদিন না একদিন শিবেন তার পূর্বকীর্তিকে উপহাস করবে। নিজেই হয়ত নিজের দিকে তাকিয়ে বলবে, সে পরিবারের সকলের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, কেবলমাত্র অপরের চোখে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করতেই। আসলে তার কোনো মহত্ব ছিল না। মহৎ সে নয়। কারণ মহৎ হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। শিবেন নিজেকে চিনতে পেরেছিল। সে দুর্বল। সে অত্যন্ত অক্ষম তাই তাকে এমন মহৎ হতে হয়েছিল। নিজেকে অনন্য স্বার্থত্যাগের নিদর্শন হিসেবে প্রমাণ করতেই সে চেষ্টা করেছিল।

অনেক বেশী বয়সে সুমিতা কলেজে এসেছিল। সে সময় সে শিবেনকে বলেছিল—সরকারী দুধের দোকানে চাকরি নেওয়ার কথা। শিবেন অবাক হয়েছিল। দাদার মনে এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায় সুমিতা নিজে লজ্জিত বোধ করেছিল। শিবেনের মন স্বাভাবিক হবার পর সে শুধু প্রশ্ন করেছিল—সুমিতার কি অসুবিধা হচ্ছে।

সুমিতা আর কিছু বলেনি। একেবারেই আর পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর মত কলেজে গিয়েছে। পাশ করেছে। এইবার, শুধু এই একবার সে দাদার মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বি-এ পাশ করার পর আর সে পড়তে যায়নি। একটা চাকরি নিয়েছে সরকারী অফিসে। চাকরি পেয়ে সুমিতা সুধাদিকে খবর দিয়েছিল। সুধাদি এসেও ছিলেন। কিন্তু অন্য অন্য বারের মত অনেকক্ষণ থাকেন নি। শিবেনের সংগে খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর চোখ মুছতে মুছতে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এমন কি সুমিতা, যার চিঠি পেয়ে তিনি এসেছিলেন, তার সংগে কথা না বলেই চলে গেলেন। শিবেনের মার সংগে পর্যন্ত তিনি দেখা করেন নি।

ততক্ষণে সকাল অনেক স্পষ্ট। আরো উজ্জ্বল। সুমিতার প্রত্যাশা পূরণ করতে একে একে অনেকে এসে জমা হয়েছে। শিবেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যোতিষ এসেছে অনেক আগে। এতক্ষণ পুলিসের সংগে কথাবার্তা বলছিল। এই কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মুখের রেখাগুলি শক্ত। অনেক কষ্টে শিবেনের বাবা তাকে ওপর থেকে নীচে নামিয়ে এনেছেন। ওপরের ঘরের পুলিস তখন আর কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। একতলায়—পাশের ঘরে, সুমিতার মা বাবা যে-ঘরে থাকেন, ভিড়টা তখন সেখানে। অনেক অনুরোধ, উপরোধের পর জ্যোতিষ, নারায়ণবাবু এবং সুধাদির ছোট ভাই হাতে চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

এ-ঘরে তখনও শুয়ে সুমিতা। তার মা কাল শেষ রাত্রেই বাইরে থেকে তার ঘরে শিকল দিয়ে গেছেন। পাশের ঘরে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। সুমিতা উৎকর্ণ। এ-ঘরে শুয়ে ক্লোরফর্ম দেওয়া রোগীর মত সে যেন এক দুই গুনছে। জোর করে চোখ খুলতে পারছে না। চোখ খুললেই সে বুঝতে পারবে তার চারপাশে কি অন্ধকার ছড়িয়ে। সুমিতার উপস্থিতি এখন এ-বাড়ি থেকে মুছে গেছে। তাকে কেউ আর ডাকবে না। তার খোঁজ করবে না কেউ।

পাশের ঘরে তখনও সেই মর্গের স্তব্ধতা। একটু পর এক এক করে সম্ভবত সকলেই শিবেনকে কেটে কেটে দেখার চেষ্টা করবে।

কথা বলল প্রথমে জ্যোতিষ। শিবেনের বাবার মুখের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। ভয়, বুঝি বা এক ক্ষুব্ধ তিরস্কারের দৃষ্টির সে চোখাচোখি হবে। অবশ্যই এ-তিরস্কার তার প্রাপ্য। শিবেনের আবাল্য বন্ধু জ্যোতিষ কেন বুঝতে পারে নি, মনে মনে শিবেন নিজেকে এত দুঃসহ বোধ করছিল। আগের কথা আলাদা। শিবেনকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংসার চালাতে হত। তখন অনেক সময় জ্যোতিষের কাছ থেকে সে টাকা নিয়েছে। এবং প্রত্যেকবার টাকা নেবার সময় চাপা অভিমানের সঙ্গে জ্যোতিষকে বলেছে—তবু তো তোরা অবাক আমি বিয়ে করি না দেখে। বিয়ে করা ভাল, সাধারণ মানুষের মত সংসার করা, আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে মিলিয়ে থাকা উচিত—এ বোধ একমাত্র তোদেরই আছে।

জ্যোতিষ প্রথম প্রথম বোঝাবার চেষ্টা করত। ইদানীং তা-ও পরিত্যাগ করেছিল। বিশেষ করে সুমিতার চাকরি নেওয়ার পরও শিবেনের মন পরিবর্তিত হতে না দেখে। শিবেনের সংসার এখন সচ্ছল। এমন কি শিবেন সুমিতাকে বলেছে, মাসে মাসে কিছু টাকা যেন সে তার বিয়ের জন্য সঞ্চয় করে।

মাস দুই আগে, জ্যোতিষ শেষবারের মত প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিল। শিবেনের সেদিন-কার ব্যবহারের স্মৃতি আজও এখনও জ্যোতিষকে অবাক করে। শিবেনের অনেক-দিনের জমা ক্ষোভ সেদিন আছাড় খেয়ে পড়ে-ছিল জ্যোতিষের ওপর। জ্যোতিষের কথা শোনার পর অকস্মাৎ শিবেনের চোয়াল শক্ত হল। দাঁতের পাটি দৃঢ় নিবদ্ধ। মুখের পেশী কদর্য আকার নিল। একটু একটু করে তা শিথিল হওয়ার পর এক রোগাক্রান্ত জন্তুর মত চিৎকার করে উঠেছিল শিবেন। জ্যোতিষের বিস্মিত হাত দুটো প্রচণ্ড শক্তিতে ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিল—তোর পায়ে ধরি, সুধার কথা তুই আর বলিস না। আমার মনটা নোঙরা হয়ে গেছে। আমার শরীরটা পচে গেছে। আমি—আমি এখন একটা মুখ চাপা গারবেজ বিনের মত। ওপর থেকে দেখতে আমাকে পরিষ্কার।

কথাগুলো শুনে জ্যোতিষের আশ্চর্য বোধ হয়েছিল। মনে মনে ব্যঙ্গ। ভেবেছিল শিবেনের কথায় অদ্ভুত বিশেষণের ব্যবহার কখনও শেষ হবে না। চাইল্ড, শিবেন একটা চাইল্ড।

জ্যোতিষ জানত না, সেই প্রথমবার শিবেন নিজের জালের বাইরে এসেছিল। সত্যি সে এক অন্ধকারে তখন ডুবে। সেই কটু অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়েছে।

পরে জ্যোতিষের মনে হয়েছিল, শিবেন

কি শুধু অপরিণত বলেই তার কাছে অমন পাগলামো করেছে? এখনও সে-কথার উত্তর সে খুঁজে পায়নি। এখনও না। শিবেনের বাবার সামনে বসে এক ঝাপটা হাওয়ার মত কথাগুলো তার মনে এসে মিলিয়ে গেল। এই ঘটনা মনে আসায় প্রায় ফিসফিস করে আর অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে বার হল!

এমন কি ঘটল যে শিবেনের আত্মহত্যা করতে হবে?

ফুটো বেলুনের মত আবার চুপসে গেল জ্যোতিষ!

হাঁ, কাল শেষ রাত্রে শিবেন পাখার-ক্লাম্পের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আর অদ্ভুত, মুখটা একটা বালিশের ওয়াড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মৃত্যুর আগেও তার সেই লোকলজ্জা। বুঝি আত্মহত্যা করার মত মহাপাপের জন্য অপরাধ বোধ।

দৃশ্যটা প্রথমে সুমিতার মা দেখে চিৎকার করে উঠেছিলেন। তার একটু পর সুমিতার বাবা। দ্রুত পায়ে ওপরে উঠেই তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর আশ্রিত ভীত এক নিঃসাড় কুকুরের মত কাতরাতে কাতরাতে নীচে নেমে এসেছেন। ওপরে এই দৃশ্য দেখতে সুমিতাকে যেতে দেওয়া হয়নি। তার মা তার দরজায় শিকল তুলে দিয়েছিলেন।

কান্নার তীক্ষ্ণতায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সুমিতার। বুকে তার অস্থির আতঙ্ক। পাকে পাকে এসে গলার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়াল। উঠে যে চিৎকার করে মা-কে কিছু বলবে সে-শক্তিও তার ছিল না।

বাকী রাতটুকু যেন এক আর্তনাদের মত পার হয়ে গেল। সকাল থেকে খবর পেয়ে একে একে লোক আসছে। প্রথমে এসেছিল পুলিস। তারপর পুলিসের চেষ্টায় অন্য সকলে।

সুমিতা ততক্ষণে শুনতে পেল, পাশের ঘরের শীতল স্তব্ধতা ভেঙেছে। জ্যোতিষ কথা বলছে। বুঝি নাটকের কোনো দৃশ্যে তার স্বগতোক্তি!

আমি বুঝতেই পারছি না, কি এমন ঘটল যাতে শিবেনকে এমন এক ভয়াবহ পথ বেছে নিতে হল। আমরা সকলে ওকে সব থেকে বুদ্ধিমান, স্থির এবং ধীর বলে জানি। হঠাৎ খেয়ালে কিছু একটা করে বসার মত মানুষ সে নয়। ওর মত কর্তব্য-নিষ্ঠ, সৎ এবং সচ্চরিত্র আমাদের মধ্যে ক'জন আছে?

শিবেনের বাবার দিকে তাকাল এবার জ্যোতিষ। তারপর তার মাথা নুয়ে পড়ল তক্তাপোশের ওপর। আবার সেই মৃদু সংলাপ।

বাড়ি ভাড়া আপনাদের কম ঠিকই। কিন্তু সংসার খরচ তো কম নয়। তার ওপর আপনার চিকিৎসা, সুমিতার পড়াশুনা। অথচ এমন একটা দিন দেখিনি যখন তাকে ক্লান্ত মনে হয়েছে। পৃথিবীতে কারো বিরুদ্ধে ওর কোনো অভিযোগ আছে মনে হয়নি। না হেসে কখনও সে কথার জবাব দিত না। আমাদের বাড়ির সকলে ওকে বলত, 'অনন্ত আনন্দের আধার'। ওর স্বভাবে, ওর ব্যবহারে মাত্র দিনকয়েক আগের এক অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়া, কখনও কোনো ব্যতিক্রম দেখিনি। ওকে জোর করেও আমরা কোনো সিনেমায় অথবা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে পারিনি। বলত, বাড়ির উঠোনে পোঁতা যজ্ঞের একটি গাছ ও। ওর ছায়ায় যারা আছে তাদের সঙ্গে ও একাত্ম। তাই সব কিছুই সে এক সঙ্গে করতে চায়। যেখানে এবং যেদিন ওদের সকলের একত্রে যাবার সঙ্গতি হবে, সেখানেই সে সেদিন যাবে। শিবেনের এসব কথা বলতে কি—

জ্যোতিষ আবার শিবেনের বাবার দিকে তাকাল:

—সব সময়ে আমার ভাল লাগেনি। আমি ওকে এ নিয়ে অনেকবার মহাভারতের নায়ক বলে ঠাট্টা করেছি। তাতে শিবেনের মুখের একটি রেখারও ব্যতিক্রম হয়নি। সামান্য হেসে ও আমার কথা ফিরিয়ে দিয়েছে। অথচ আমরা তো জানতাম, মনে মনে ওর ক্ষোভ থাকার কথা। কারণ, কারণ ও তো এই সংসারের পাছে অসুবিধা হয়, এই ভেবে বিয়ে পর্যন্ত করল না।

এবার জ্যোতিষ অনেকক্ষণের জন্য থামল। তারপর যেন আবার জলে হাল্কা হাওয়ার ঢেউ।

—আমরা জানতাম, বিপদকে ও ভয় করে না। তার অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঘটল যে, ও আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতে ভয় পেল। ওর অসুবিধার কথা না জানিয়ে এমন একটা কাণ্ড করে বসল। ওকে আমরা শুধু ভাল-বাসতাম না। শ্রদ্ধা করতাম। ওর সুবিধা অসুবিধার ভাগ আমরা নিতে চেয়েছি। ও তা' কখনও নিতে দেয়নি। ওর সব কথা, অসংকোচে আমাদের জানাল না কেন? আমি ভাবতে পারি না, জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ও এমন ভেঙে পড়বে। সাহস হারাবে!

জ্যোতিষ থামল। যেন প্রচণ্ড ক্লান্তির পর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

"আমাদের মত এমন শত্রু পুষতে গিয়ে কি ওর অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিল?

পাওনাদারের তাগাদায় অসহ্য হয়ে কি শিব্‌......"শিবেনের বাবা তাঁর কথা শেষ করতে পারেন না।

জ্যোতিষের প্রতিবাদ তাঁকে থামিয়ে দেয়। জ্যোতিষ বলেঃ

—না, না। ধারের কথা একেবারেই ওঠে না। ধার করার মত মানুষ ও নয়। একান্ত প্রয়োজন হলে ও আমার কাছেই বলেছে। এমন কাউকে জানি না যে ওর কাছে টাকা পায়। ওর লোকভয় প্রচণ্ড। প্রশংসার যে প্রাসাদ ও তৈরী করেছে আপনাদের সকলের দায়িত্ব গ্রহণ করে, পরীক্ষায় ভাল ফল করে, বহুদিনের চেষ্টায়, আলাপে কথায় যে অসাধারণ বিনয় অভ্যাস করেছে তার সবটুকু মূল্যই ও যথার্থ পেতে চায়। এ-সব পরিখা দিয়ে ঘেরা আত্মপ্রসাদের দুর্গ থেকে নির্বাসিত হতে চায় না। লোকে তাকে ভাল বলুক, সচ্চরিত্র—তাই বুঝি ওর মোক্ষ।

শেষের কথাগুলি যেন জ্যোতিষ নিজের কাছেই বলছিল। সহসা তার স্বরভঙ্গ হলঃ

—না, না। আমার মাথায় আসছে না, কেন শিবেন এমন কাজ করল। কি হয়েছিল। কি হতে পারে।

থরথর করে বার কয় জ্যোতিষের ঠোঁট কাঁপল।

আবার সকলে চুপ। আবার মর্গের সেই শীতল শ্রান্তি। শিবেনের একটি প্রত্যঙ্গ কেটে ছিঁড়ে জ্যোতিষ অনেক কিছুই দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই সে খুঁজে পেল না।

এতক্ষণে সুমিতা উঠে বসেছে। ঘরের আলো তখনও জ্বালা। কাল সারারাত ওর ঘরের আলো জ্বালা ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, তার অন্ধকার ঘরের চেয়ারটার পায়ে সাদা একটি বিস্তৃত রেখায় অসংখ্য উই পোকার বাসা। ওদিক থেকে সে তার চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর একটু একটু করে সুমিতার মনে পড়ে এবার যখন সুধাদি এসেছিলেন, তখনকার ঘটনা।

মাস দেড়েক আগে এক সন্ধ্যায় সুধাদি এসে উপস্থিত। শিবেনও সেদিন খুব তাড়াতাড়ি প্রায় সন্ধ্যারই কোল ছুঁয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সুমিতার সঙ্গে দু একটি হাল্কা কথা বলে তিনি শিবেনের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুমিতার তখন কেন যেন ঘুড়ি লাটাইয়ের উপমা মনে পড়ল। কি এক কদর্য কৌতূহলে সেদিন সুমিতাও তার ঘর ছেড়ে উপরে উঠে গিয়েছিল। ঘরের ভেতর থেকে দরজা ভেজানো। কিন্তু সুমিতা শিবেনের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল।

তুমি আমার বিছানার ওপর আজ হঠাৎ বসতে চাও কেন সুধা। চেয়ারটায় বস। শিবেনের গলায় কি এক ভীত স্বর।

খানিক পর, অদ্ভুত ক্লান্ত গলায় সুধাদি বলেছিলেন, যদি না উঠি। না বসি চেয়ারে?

বড় নোংরা মনে হয়েছিল সুধাদিকে সেদিন সুমিতার। একটুও লজ্জা নেই সুধাদির? এমন করে কি কেউ আত্মসমর্পণ করে?

তোমার ভালর জনাই বলছি। অদ্ভুত থমথমে ঘরের আবহাওয়া।

তীক্ষ্ন ধারাল এক অসি যেন হঠাৎ খাপের মধ্য থেকে উন্মুক্ত হল।

অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে শিবেন। আমার ভাল আর তোমাকে ভাবতে হবে না। এই বারো বছর ধরে তো অনেক ভেবেছ। আর নাই বা ভাবলে। আমাকে তুমি শেষ করে দাও। আমার সমস্ত শরীর যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। আমি আর পারি না।

একসঙ্গে অনেক কথা যেন ঝড়ের মত বলে গেলেন সুধাদি। তারপর তাঁর গলায় আলস্য। থেমে থেমে বলেছিলেনঃ

আমি জানি কিছুই আমি তোমাকে দিতে

পারব না। দুঃখ ছাড়া। দায়িত্ব ছাড়া। এমন কি আমার উপার্জনের সমস্ত টাকাটাও বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। না হ'লে আমার মা, ছোট ভাই-বোনেরা না খেয়ে মরবে। আমি বুঝতে পারি শিবেন কেন তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না। আমি তো জঞ্জালের মত কোনো কাজেই আসব না। তাই এমন করে তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

এবার সুধাদির চোখে জল। গলা ভারী। শিবেনের একেবারে বুকের কাছে এসে বললেন, আমি কি তোমার উপার্জনের সবখানিই গ্রাস করে ফেলব? তাই তোমার ভয়?

সুমিতার সব মনে পড়ে।

ঘায়ে-পাগল কুকুরের মত শিবেন সেদিন চিৎকার করে উঠেছিল। দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে বলেছিল। যাও, তুমি চলে যাও। আর এসো না।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। কান্নায় ভারী সুধাদির চোখ। দ্রুত তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। এমনকি সুমিতা, তখনও রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, তার দিকেও একবার তাকান নি। সুধাদি চলে যাবার প্রায় সংগে সংগে আবার শিবেন আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ সুমিতার চোখে পড়ে। শিবেনের মুখে অনেকগুলো কি ফুস্কুড়ি বেরিয়েছে।

তারপর সুধাদি আর আসেননি।

এক সন্দেহের ছায়া এবার সুমিতাকে জড়িয়ে ধরল। আর কাউকে ভালবাসে শিবেন? কিন্তু সে ছায়া একটু পরেই সরে যায়। সুমিতা জানে, শিবেনের পক্ষে অন্য আর কোনো মেয়েকে ভালবাসাও সম্ভব নয়। যে-লোক কাছে গেলেও জড়িয়ে ধরতে পারে না, সে ভালবাসবে কেমন করে! আর ভালবেসে আত্মহত্যা করবে, সে ধাতু দিয়ে শিবেন তৈরি নয়।

আবার পাশের ঘরের স্তব্ধতা ভাংগল। এবার নারায়ণবাবুর গলা। একটু থেমে থেমে তিনি কথা বলেন। তার গলায় তত উত্তেজনা নেই। শিবেনের তিনি সহকর্মী। একই কলেজে ওরা পড়াতেন।

আমারও ভারী আশ্চর্য লাগছে।

একবার তিনি শিবেনের বাবার দিকে তাকালেন। তারপর জ্যোতিষের দিকে। তারপর তিনি তাঁর কথার সংগে কথা যোগ করলেন।

আপনাদের কারো পুত্রবিয়োগ, কারো বন্ধুবিয়োগ ঘটেছে। কিন্তু আমি একজন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী, ছাত্রবৎসল সহকর্মী হারালাম। আমার শুধু নিজের কাছে প্রশ্নঃ এমন কি হল, যাতে শিবেনবাবু এমন এক ভয়াবহ, গর্হিত কাজ করে বসলেন।

নারায়ণবাবুর দৃষ্টি ভারী কাঁচের চশমা পার হয়ে জানালার বাইরে। একবার শুধু দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করলেন।

এই সামান্য অবসরে শিবেনের বাবা কথা বললেন।

আচ্ছা জ্যোতিষ, শিবেন ইন্সিওর কি করেছিল, না করে নি, তা কি তুমি জান?

তারপর তাঁর এক অপ্রস্তুত ভঙ্গি।

অবশ্য এখনই কিছু খোঁজ করতে হবে না। অন্তত এই তিনটে দিনতো কাটুক। অপঘাত, আত্মহত্যার তিন দিনের বেশি অশৌচ থাকে না।

এ কথার সংগে সংগে দু জোড়া চোখের বিস্মিত দৃষ্টি শিবেনের বাবার ওপর ন্যস্ত হল।

এক অসস্তির মধ্যে শিবেনের বাবা মাথা নিচু করলেন।

বাইরে আর একবার গাড়ি থামার শব্দ। একটু পর চৌকাঠ পার হয়ে ভারী জুতোর আওয়াজ সুমিতাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

সেই শব্দ ওপরে শিবেনের ঘরের সামনে এসে থামার প্রায় সংগে সংগে সুমিতার ঘরের শিকল খুলল। সুমিতার মা সুমিতাকে এবার ওপরে যেতে বললেন। আর একটু পর মৃতদেহ পুলিস নিয়ে যাবে। পরীক্ষার জন্য।

জ্যোতিষ, নারায়ণবাবু, শিবেনের বাবার এবং মার পিছু পিছু সুমিতাও ওপরে উঠে এল। শিবেনের ঘর খোলা।

চারিপাশে দেয়ালে ছবিগুলি তখনও ঠিক আছে। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ছবির নীচে ধুপদানিতে পোড়া ধুপের কাঠি। ফটোর ওপর একটি রজনীগন্ধার মালা শুকিয়ে বিবর্ণ। তার সামনেই মুখোমুখি ঝুলছে শিবেনের দেহ।

লাসটা নামিয়ে পুলিসের লোক বালিশের খোলটা সরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শিবেনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর ঢাকাটা আবার যথাস্থানে দিয়ে ঘরের বাইরে অধীর প্রতীক্ষমান মানুষগুলোর দিকে ঘাড় ফেরাল।

আপনারা বলছিলেন, ভদ্রলোকের বিয়ে হয়নি—তাই না? কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

সূক্ষ্ম কারুকার্য করা গোঁফের নীচে জোঁকের মত হাসির একটা ঝিলিক ভদ্রলোকের মুখে এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গেল।

মুখটা ঢাকা দেবার অবসরে সুমিতা হঠাৎ লক্ষ্য করল শিবেনের মুখময় অসংখ্য ফুস্কুড়ি। নীচের ঠোঁটের কোণে কোন একটা ঘা!

সময় সাহিত্য সমালোচনাঃ পাঠকের চোখে

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৮শে জুলাই তারিখের দেশ পত্রিকায় "সময় সাহিত্য সমালোচনা : পাঠকের চোখে" শীর্ষক পাতায় দেখলাম, বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকাগণ আধুনিক ছোট গল্পের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনায় চিঠি লিখেছেন।

এ'দের মধ্যে শ্রীবিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্যের চিঠির বক্তব্য আমিও সমর্থন করি। আধুনিক ছোট গল্পের গতিপথ, "জটিলতার, আর অতিরিক্ত ভাবালুতার কুয়াশায় আবৃত।" আমিও এই কথাই বলব। গল্পকারগণ যদি সমাজের জটিলতার রূপটি গল্পের মধ্যেও জটিলতায় রূপায়িত করেন, তবে সাধারণ পাঠকগণ সমাজের আসল রূপটিও অস্পষ্ট-ভাবে গ্রহণ করবে। ফলে ছোট গল্প বড় নদী দিয়ে সাগরেই প্রবেশ করবে। ছোট নদী-নালা দিয়ে আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে না। সমাজের জটিল সমস্যার রূপটি ভেঙে আবর্জনা মুক্ত করে, আসল বস্তুকে সাধারণের দরজায় পৌঁছানই কি সাহিত্যের প্রকৃত ধর্ম নয় ? যে গল্পের ভাব-ধারা সাধারণের কাছে অস্পষ্ট, সে গল্প যতই ভাবাবেশে এবং সূক্ষ্ম মননশীলতার বিচিত্র রূপের বাস্তব পরিণতি হোক না কেন, তা কি দীর্ঘস্থায়ী হবে ? অনেক ভাবুক পাঠক এবং সমালোচক হয়তো বলতে পারেন, "যাহা যতই অস্পষ্ট, তাহা কি ততই গভীর নয় ?" তার উত্তরে, "ডোবার জলও তো অস্পষ্ট, তাই বলে ডোবা কি গভীর ?"

গভীর অরণ্য এবং পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই কি নদীর পূর্ণ সার্থকতা ? না যেখানে সমতলে শত শত শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে, প্রশস্ত বুকে বয়ে যায় এবং সহস্র মানুষের প্রাণে এনে দেয় সঞ্জীবনীর প্রাণধারা।

মনে হয়, ছোট গল্প যদি এমনি সহজ সরল ও প্রশস্ত উদার হৃদয়ে আসে, এবং সাধারণ মানুষ যখন অক্লেশে অবগাহন করতে পারবে, তখনই হবে সাহিত্যের চরম সার্থকতা এবং স্থায়িত্বের পরম পরিণতি। ইতি

রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী,
পশ্চিম দিনাজপুর

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার দশই আগস্ট '৬২র সংখ্যায় শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সাম্প্রতিক ছোট গল্পের সমস্যা সম্পর্কে তিনি একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করেছেন। পাঠক হিসেবে এই উজ্জ্বল নূতনত্বের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে আমার ক'টি জিজ্ঞাসা রাখছি। যেহেতু এটা আলোচনারই আসর, সুতরাং, আশা করি অগ্রাহ্য হব না।

যদি বুঝতে ভুল হয়ে থাকে তাহলে মনে হয়, মানবেন্দ্রবাবু বলেছেন মূলত দুটি কথা; প্রথম, বর্তমান ছোট গল্পের মাধ্যমে মৃত্যুলক্ষণ ফুটে উঠেছে, তার কারণ অন্তত একটা মহাযুদ্ধোত্তর মনোভাব। এই মনোভাব অর্থে—পূর্ববর্তী বিশ্বাস ও মূল্যবোধে সর্বাত্মক অবিশ্বাস। দ্বিতীয়, বর্তমান লেখকের পূর্ববর্তী সাহিত্যিক মহাজনরা প্রকাশভঙ্গির নানারূপ আবিষ্কার ও ব্যবহার করে তাদের একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা, সর্বযুগে সকল সাহিত্যিকের যে চিরন্তন সমস্যা,—কী লিখব ? এবং কীভাবে লিখব ?—সেই সমস্যাই বর্তমান ছোট গল্পলেখকদের সম্মুখীন।

এই সমস্যার সমাধান, মানবেন্দ্রবাবুর মতে সাম্প্রতিক লেখকরা করেছেন এই বলে যে, তারা কিছুই লিখবেন না। কারণ, তাঁরা কী লিখবেন ? একটা সুষ্ঠু কাহিনী গড়ে ওঠে যেসব মূল্যবোধকে আশ্রয় করলে, তাতেই নেই বিশ্বাস, সুতরাং, কী করে সম্ভব কাহিনী লেখা ? তাই, "রিয়্যালিটি

বস্তব কাকে ?” এই বলে তাঁরা ছোটগল্পকেই ফ্যান্টাসীতে পরিণত করলেন, অর্থাৎ ফ্যান্টাসী তার বিষয়বস্তু নয়, সে তার অস্তিত্ব দিয়ে নিজেই তাই হল। অর্থাৎ, এইভাবেই সে সমাধান করল তার সমস্যার, কি লিখব? এবং কীভাবে লিখব?

কিন্তু আমার প্রশ্নও এইখানে। মানবেন্দ্রবাবু ছোটগল্পের অস্তিত্বের পিছনে রয়েছে যে অনেক জটিল কারণের সংমিশ্রণ, তাকে নিজের মতবাদের প্রয়োজনে একটু সরল করে ফেলেননি কী? যদি মেনে নিতে পারতাম, বর্তমান ছোটগল্প কিছু বলছে না, সে ফ্যান্টাসীতেই পরিণত হয়ে গেছে— তাহলে অবশ্য জিজ্ঞাসা উঠত না। কিন্তু তাই কী? বাংলা সাহিত্যের কথাই ধরি। আমার পড়ার মধ্যে এমনমাত্র দুটি গল্পের সন্ধান জানি, যাকে অপাতত ফ্যান্টাসী বলে মনে হতে পারে। তাদের লেখক, দেবেশ রায় ও শীর্বেন্দু মুখোপাধ্যায়। আর এমন একটা গল্পও পাইনি যেখানে লেখক কিছুই বলতে চাননি। বরং তাঁরা নিজেরা যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে বোধ হয় যে, বর্তমান যুগের জীবন যন্ত্রণাই তাঁদের বিষয়বস্তু। আর মানবেন্দ্রবাবুও স্বীকার করেছেন, বর্তমান ছোট গল্পের পিছনে একটা যুগকেই আত্মপ্রকাশার্থে ছট্‌ফট্ করতে দেখা যায়। আসলে মুশকিল হয়েছে, কারণ তিনি ধরে নিয়েছেন এটা সাম্প্রতিক ছোট গল্পের মৃত্যু লক্ষণ। তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, কিন্তু রূপকথার পাখির মত পুনর্জন্মলাভে বিশ্বাসটা সত্যিই খুব রোম্যান্টিক।

আমার সে বিশ্বাস নেই, অগত্যা, তিনি যেটাকে মৃত্যু লক্ষণ বলেছেন, সেটাকেই আমার মনে হচ্ছে, নবজন্মের যন্ত্রণা। আমার মনে হচ্ছে পূর্ববর্তীরা প্রকাশভঙ্গীকে নিঃশেষ করেছেন বলে নয়, পূর্ববর্তীর প্রকাশভঙ্গী দিয়ে সে আর নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না বলেই, অর্থাৎ যা সে প্রকাশ করতে চায় তারই প্রয়োজনে তার প্রকাশভঙ্গী বিশৃংখল, বক্তব্য অসংলগ্ন, দেহে এবং মনে অস্থিরতা। অর্থাৎ তাঁরা "কিছু লিখবেন" এবং সেটা তাদের এই বিশেষ যুগেরই জীবন যন্ত্রণা এবং যা লিখবেন পুরাতন প্রকাশভঙ্গী তার পক্ষে অনুপযুক্ত।

আর একটি কথা। ছোট গল্প নিজের কাছে চলে আসছে, বাইরের ভার ফেলে দিচ্ছে —এর অর্থ কী? ছোটগল্প ছোট গল্পের জন্যই? বরং তার সর্বাংগ ও মন দিয়ে বর্তমান জীবনের সন্নিকট হচ্ছে বলেই কী তার এই সাম্প্রতিক অবস্থা নয়? যে কবিত্ব দ্বারা সে আক্রান্ত হচ্ছে—সেই কবিতাগুলি কী এই জীবনের একেবারে কাছাকাছি আসার ফলেই বর্তমানে, তথাকথিত সমালোচকেরা যাকে বলেন উচ্ছৃংখল, তাই নয়? যদি অনুমান করি—এদের আত্মীয়তা এই কারণেই তবে কী ভুল ঘটবে? নমস্কারান্তে

ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী,
কলিকাতা

॥ ৩ ॥

সবিনয় নিবেদন,

আগামী কালের বাংলা সাহিত্য গবেষকের নিকট "বর্তমান দশক" ছোটগল্পের "ঘাতক" হিসেবে পরিচিত থাকবে, এরকম একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে এই দশকের (গল্প লেখক নয়) কথাকার-কাম-সমালোচকদের বক্তব্যে; ছোট গল্প আর ছোট গল্প থাকতে চাইছে না, প্রকৃতির রাজ্যে যেহেতু শূন্যতা বলে কিছু নেই, কোন কোন দলীয়-সমর্থক-এর মতে ছোট গল্পের আসন্ন মৃত্যুতে আসন দখল করে নিতে চলেছে কবিতা, অতএব অনুমান করে নেওয়া যায়, কবিতা—একাধারে প্রিয়া ও জায়া—কাব্যরস পরিবেশনের সাথে সাথে গল্পরসেরও যোগান দেবে।

লেখকগণ পাঠকবর্গের মুখাপেক্ষী, না সাহিত্য সৃষ্টিতে অ-পারগম—এক বিশাল জনতা চাতক-আশায় সাহিত্য রথীদের নিকট

আশাপ্রার্থী; এর কোন একটাই সার কথা নয়। লেখকের অন্যান্য দায়িত্বের মত পাঠকেরও কিছু বক্তব্য বর্তমান।

চিন্তার জগতে পরিবর্তন, বিবর্তন শিল্পের আঙিনায় প্রক্ষিপ্ত হয়ে একমুখীন গতিপ্রকৃতির সর্বস্বতার বিরুদ্ধে শিল্প-প্রণেতাগণের আনকোরা সৃষ্টির প্রয়াস, নিজেদের পথিকৃত করে তোলার প্রচেষ্টা—ঐতিহাসিক ব্যাপার।

সত্যি কথা, এই দশকের লেখকগণের সঙ্গে পাঠক নিশ্চিত হতে পারছেন না, সংকটময় অবস্থা নিঃসন্দেহ, তবু ভাবতে ভালো লাগে (ভাবনা বিলাস নয়) ছোট গল্পের "মৃত্যু" সত্যিই কি ঘটতে চলেছে, যে রীতিতে ছোট গল্প সুর তুলছে তা কি কেবল "মুভমেন্ট" নয়। বাংলা দেশের পাঠক সনাতন-পন্থী নয়, সবাই স্বীকার করবেন, "ইমপ্রুভমেন্ট" হলে পাঠকের আপত্তি থাকার কথাও নয়; তা সত্ত্বেও লেখক-পাঠকের অহিনকুল সম্বন্ধ কেন? পত্র পত্রান্তরে এত গোলযোগ কেন? এই দশকের কথাকারদের মতে "নতুন রীতি"র অনুপ্রবেশ ঘটেছে কালের নিয়মে। যুগটা যন্ত্রণা ও আত্মহননের।

যেহেতু "প্লট" নয়, "থিম"-ই নতুন রীতির আশ্রয়স্থল, সেই হেতু আঙ্গিক-বিন্যাসে, অভিধানবর্জিত বিশেষণের পৌনঃ-পুনিকতায়, শব্দের উদ্ভট ব্যঞ্জনায় এবং কি বলছি বড় কথা নয়, কেমন করে বলছি—ধাঁচের "ব্লক" মুদ্রণের অ-পরিপক্কতায় 'নতুন রীতি'র লেবেল দিয়ে যে সব গল্প আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে, দলীয় সমর্থনের আশায় একে "মুভমেন্ট" বলাই উচিত।

বিংশ শতাব্দীর জটিলতা যেমন যন্ত্রণা-দায়ক, ব্যক্তিসচেতনার বিকাশ ও প্রচেষ্টা তেমনি উল্লেখযোগ্য। আমরা দুটো বিশ্ব-যুদ্ধের পরোক্ষ ফলাফলে (য়ুনিভার্সাল লিটারেচারের খাতিরে) আজ সুনিশ্চিত যে, মানুষের আত্মিক ও সামাজিক জগতে কো-অপারেশন-এর অর্থটা লুপ্তপ্রায়। এ যেন ট্রেনযাত্রীর টিকিট কাটার ব্যস্ততা। লাইনে না দাঁড়িয়ে হুড়োহুড়ি। ব্যক্তি আপন প্রকাশ ও বিকাশের পথে একক যাত্রী। যন্ত্রণা তাই এত বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। এবং অর্থনৈতিক বিপন্নতা ভবিষ্যতকে গুহায়িত করে মানুষের গতিকে বার বার ব্যাহত করছে। আজকের মানুষ নীরবে কেবলই মার খাচ্ছে আর্থিক সংকটের নিকট, বিকল্পে ভাগ্য।

সাহিত্যে তারই প্রতিফলন ঘটবে, এ আশা অমূলক নয়। অকর্মণ্য চিন্তাবিলাস নিজেকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। জীবন জটিল, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়।

তাই যদি হয়, বর্তমান শতকের (নিরাপদ দশক) জর্জরিত মানুষের অবকাশ যাপনের গ্লানিময় স্মৃতিচারণেই বা দুর্বোধ্যতা থাকবে কেন? গল্পে, চরিত্রের ভাব-ভাবনা সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারছে না, "নতুন রীতি" গল্পের "স্মৃতিচারণ" এবং "আমি"র অক্ষম ব্যবহার করুণার উদ্রেক করে।

বাংলা ছোট গল্পের "নতুন রীতি" প্রচারে কথায় কথায় ইউরোপীয় মগ্নচৈতন্যের পথিকৃতদের উদাহরণ পাণ্ডিত্যের ও আত্মদোষ স্খালনের পরিচায়ক এবং বাংলা সাম্প্রতিক গল্পে এর ব্যবহার কতটুকু যোগ্য, চিন্তার বিষয়। বাংলা ছোট গল্প, পাশ্চাত্যের নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য ধারায় ভয়াবহ সমাজ সভ্যতার যুগতটের সন্ধিক্ষণে যা দেখছে, তাই রাতারাতি গ্রহণে এত ব্যস্ত। "নতুন রীতি"র কথাগুচ্ছ যতটা না গল্প-পদবাচ্য হতে চাইছে (বুঝা গেল, ছোট গল্পের "মৃত্যু"র কারণ) তার থেকেও বেশী, অনেক বেশী শিল্পগুণ অন্বেষায় দূরগামী। গল্পে ব্যবহৃত কোলকাতার পরিচিত সরণী বাদ দিলে, পাত্রপাত্রীদের চিনতে পারার অক্ষমতা পাঠকের মর্মপীড়ার কারণ।

'নতুন রীতি' চাষ করা পত্রিকায় মাঝে মাঝে এমন ফসলও নজরে পড়ে, যার ভাষার ব্যবহার, বাক্যের দীর্ঘতা এবং অর্থের জটিলতায় প্রবন্ধ পাঠকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষা সাহিত্যের বাহন। গল্পের ভাষা কদাপি, কুত্রাপি প্রবন্ধের নয়।

এমনকি দু'একটা "সম্ভাবনাময়" (সমালোচকের ভাষা) লেখকের লেখা নজরে পড়ে, যা মোটেই কাহিনী-বর্জিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রচনার সমাপ্তিতে কাহিনীর 'স্টার্ট' (তথাপি নতুন রীতি) থাকা সত্ত্বেও

(সি ১৪৫)

আন্দোলনের 'ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে' স্থান পেয়েছে। উদাহরণ নিষ্ফল।

রসগ্রাহিতা সাহিত্যের তুলাদণ্ড ও সার্বজনীন।

ছোট গল্পের 'নতুন রীতি'কে অভিনন্দন জানাতে কেউ কুণ্ঠিত হবেন না—যদি তা রসনিস্পন্ন হয়।

সাহিত্যের দর্পণে প্রতিটি পাঠক যুগমানসের প্রতিফলন দেখতে চায়; প্রয়োজন স্বচ্ছ, মসৃণ এবং উজ্জ্বল দর্পণের। ইতি—

রাত্রি সরকার,
ত্রিবেণী (হুগলী)

॥ ৪ ॥

সবিনয় নিবেদন,

সময় সাহিত্য সমালোচনা বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সমসাময়িক ছোট গল্পের একটা মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল, আর সেই আলোচনায় পাঠকদের মতামত জানতে চেয়ে 'দেশ' কর্তৃপক্ষ যথার্থ সাহিত্য সেবার পরিচয় দিয়েছেন। তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

রুচিশীল সাহিত্য-রস পিপাসু বহুজনই বর্তমান ছোট গল্পের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন, এসব বিশ্লেষণ দেখে মনে হচ্ছে কেউ কেউ সাম্প্রতিক রচনা-রীতিতে যথেষ্ট আশ্বাম্বিত হয়েছেন এবং যুগোপযোগী বলে সমর্থনও করেছেন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে। আজকের দিনে আমাদের জীবন জটিল হয়েছে, সমাজ জটিল হয়েছে আর সাহিত্যের দর্পণে তার প্রতিফলন যে জটিল হবে এতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়। যুগ পাল্টাবার সংগে সংগে সাহিত্যে আর বাঁধাধরা কোন সংজ্ঞাও থাকছে না। গল্পের বিষয়বস্তু পাল্টে যাচ্ছে আর তার সংগে সংগে ভাষার নতুনত্ব, শব্দের কারণ ও ক্রিয়া আর গল্প কথনের নতুন ভংগীর প্রয়োজন হয়েছে।

সবাই এই মতবাদ সমর্থন করতে পারছেন না। নতুনত্বের নামে দুর্বোধ্যতা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আনা হচ্ছে, তাদের মতে। সহজ সরলভাবে যে কথাটা বলা যায়, সে কথাটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার মধ্যে যেন বর্তমানের লেখকদের অস্বাভাবিক ঝোঁক আছে। পীড়িত বিক্ষিপ্ত যন্ত্রণাযুগের মানুষের কামনা বাসনা, অসংলগ্ন চিন্তা-ধারা, সামাজিক রাজনৈতিক, দৈনন্দিন অস্তিত্বের সমস্যা ও মধ্যবিত্ত জীবনের সামগ্রিক অবক্ষয়ের যে মননশীল বিশ্লেষণ ইংগিত, প্রতীক, সংকেত প্রভৃতি অভিনব আংগিকের মাধ্যমে গল্পে প্রতিফলিত তাতে যেন অবশেষে ভাব বা বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ অস্পষ্টই থেকে যায়। চেনতাপ্রবাহের সে ছবির মধ্যে চিরন্তন মানুষটা ঐ সব টেকনিকের চাকচিক্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে। জীবন অন্বেষণ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে পাঠকদের ভূমিকা নিতে হবে, তাদের "এগিয়ে আসতে হবে।" এ মন্তব্যও যুক্তিহীন নয়। তবে এও বলা অসংগত হবে না। আশা করি যে, পাঠকদের এগিয়ে নিয়ে আসবার দায়িত্ব ঐ লেখকদেরই সব থেকে বেশি। গল্পের অগ্রগতির সংগে সংগে পাঠকবর্গও সেই গল্পের পশ্চাতে কাহিনীকারের মানসিক অবস্থার সংগে একাকার হয়ে একই ছন্দে এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে। ঘটনা পরম্পরা কাহিনীর উপস্থাপনা, নায়ক নায়িকা ও তাদের পারিপার্শ্বিকের চিত্রায়ণ লেখকের সৃজনী শক্তির বিশিষ্টতা নিয়ে এমনই রূপ পরিগ্রহণ করবে যে পাঠকের একাগ্রতাকে সে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে ও গল্পের শেষে লেখকের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সহজেই ধরা দেয়।

সাহিত্য যুক্তিগ্রাহ্য, তার অর্থের সম্যক উদ্ঘাটনে চিন্তাশক্তির গভীরতা প্রয়োজন। তবে সাধারণ পাঠকদের উপর তার একটা মাপকাঠি লেখকরা করে নিলে ভাল হয়। সাহিত্য নিশ্চয়ই অল্প কয়েকজন ইন্টেলেক-চুয়াল-এর মনোতুষ্টির জন্য নয়, সাধারণের মনোরঞ্জনই তার বৃহৎ উদ্দেশ্য।

বর্তমানে তরুণতর লেখকরাই আলো-চনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে সব উদীয়মান লেখকরাই যে বিরূপ সমালোচিত হচ্ছেন তা নয়। নবীনদের মধ্যেও সার্থক, সুন্দর ও সম্পন্ন শক্তিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

এ যুগটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ এবং সাহিত্যে তার প্রভাব ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। সজীব সাহিত্যের পক্ষে অপরি-হার্য এটা, আর এরই মধ্য দিয়ে আমরা নতুনত্বের সন্ধান পাব। তবে সাহিত্যের রসপিপাসুরা এইটেই কামনা করবে যে, রচনা যেন দরদী হয়, সে যেন মনের কথাকে সহজভাবে বলতে পারে, কারণ মনের কথা বা অন্তরের কথা কখনও জটিল নয়।। ইতি

নিমাই দত্ত,
কলিকাতা-৩১।

॥ ৫ ॥

সবিনয় নিবেদন,

২৮শে জুলাইয়ের 'দেশে' সময় সাহিত্য আলোচনায় আমার ১৪ই জুলাইয়ের মতামত সম্পর্কে যে প্রতিবাদ পত্রটি প্রকাশ হয়েছে, তার একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

তরুণদের লেখা ছোট গল্প বেশীক্ষণ পড়লে মাথা ধরে যায়—প্রতিবাদপত্রে এই ব্যাঙ্গোক্তির অন্য মানে করা হয়েছে। আমি বলতে চেয়েছি সেই সব তরুণদের কথা, যাঁরা গল্পকে ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল করেন। কুয়াশাবৃত প্রতীক যাঁদের গল্পকে দুর্বোধ করে তোলে। যেমন—'গাছের পাতা কাঁপছে। কাঁপছে। কাঁপছে।' অথবা 'অন্ধকারটা যেন এখন মা হয়ে গেল' কিংবা 'এই মুহূর্তে ও পাখি হয়ে গেল।' এ-কথাগুলি বুঝতে চেয়ে পাঠক এগিয়ে গিয়েও বলা বাহুল্য হতাশ হয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন সহৃদয় মন থাকা সত্ত্বেও।

একথা ভুললে চলবে না, ছোট গল্প আসলে একটি গল্পই। এবং তার জন্য উপাদানের প্রয়োজন। সেটির একান্ত অভাব আজকের বেশীর ভাগ তরুণদের লেখায়।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়,
কদমতলা-হাওড়া।

[সময় সাহিত্য সমালোচনা পর্যায়ের ছোট গল্প সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।]

সিঁড়ির শেষ

পারিজাত মল্লিক

আজ সন্ধ্যার আসর খুব ছোট। আমি আর কান্তি। বিজলী পোকা-ধরা দাঁত ভুলিয়ে বিছানায় পড়ে আছে। অশ্বিনী ছোট বোনকে পৌঁছে দিতে বাঁশড়ি গিয়েছে।

মজুমদারসাহেবের যে বাড়িটা তৈরী হচ্ছে আমরা তার কথা বলাবলি করছিলাম। বাড়ির কাজ অর্ধেকেরও বেশী হয়ে গেছে। সকালের দিকে এবং বিকেলে প্রায়ই মজুমদারসাহেব নিজে গিয়ে কাজকর্ম দেখে আসেন। আমরাও কখনো সখনো তাঁর সঙ্গে গিয়েছি দেখতে।

বাড়িটার প্ল্যান কলকাতা থেকে এক বন্ধুকে দিয়েই করিয়ে আনিয়েছিলেন মজুমদারসাহেব। নিজে প্রয়োজন মতন সামান্য অদল বদল করে নিয়েছেন। বাড়িটা ছোট, ধাঁচটা বাংলো প্যাটার্নের। তবে দোতলায় খান দুয়েক ঘর করিয়েছেন। কথা হচ্ছিল, একটা সিঁড়ি বাইরে দিয়ে কি ভাবে করা যায়।

কান্তি লোহার ঘোরানো সিঁড়ির কথা বলল। দেখতে ভাল, তা ছাড়া বেশ মজবুত।

মজুমদারসাহেব বললেন, "মন্দ বল নি। তবে লোহার সিঁড়িগুলো বড় বড় বাড়িতেই মানায়।"

"বাইরে থেকে আর কি সিঁড়িই বা দেবেন তা হলে?" কান্তি বলল।

"আমি ত সিঁড়িই বাদ দিতে চাই। আমার গিন্নী যে তাতে রাজী নয়।"

"কেন?" আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম।

"জানি না। খেয়াল বলতে পার।" মজুমদারসাহেব আমার চোখে চোখ রেখে বললেন। "বাইরের সিঁড়ি মেথর জমাদারদের জন্যে—আমার দোতলায় আপাতত কোনো বাথরুম হচ্ছে না। তোমাদের স্নেহদিদি কি তা বুঝবে। বলে, যা করার একসঙ্গে করিয়ে নাও।"

কথাটা স্নেহদিদি মন্দ বলেছেন বলে আমার মনে হল না। করতে যখন হবেই করিয়ে নেওয়া ভাল।

"কাঠের সিঁড়ি মন্দ না। তবে ওই অসুবিধে—সাইড ভাঙবে, ধাপের তক্তা খুলে যাবে, তা ছাড়া সামান্য জল হলেই পেছল হয়ে যায়।" কান্তি কাঠের সিঁড়ির গুণাগুণ বর্ণনা করছিল।

মজুমদারসাহেব অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, "দেখ হে, বাইরের সিঁড়ি সে লোহাই হোক—কাঠই হোক, দুই খারাপ। চোর ছ্যাঁচড়ের সুবিধে হয়।"

"দেখতে কিন্তু ভাল লাগে—" কান্তি বলল আবার। লোহার ঘোরানো সিঁড়ির ওপর যেন তার কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছিল।

মজুমদারসাহেব সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকলেন। কিছু ভাবছিলেন। কান্তির দিকে

তাকিয়ে শেষে বললেন, "লোহার সিঁড়ির একটা গল্প শুনবে?"

আমরা গল্প শুনতে সদাই প্রস্তুত। দু জনেই মাথা নাড়লাম, নিশ্চয় শুনব।

মজুমদারসাহেব বললেন, "কলকাতায় পার্ক স্ট্রীট ল্যান্সডাউন ওই সব অঞ্চলের পুরোনো বাড়িগুলো দেখেছ?"

"দেখেছি, তবে অত খেয়াল করি না।" আমি বললাম।

"খেয়াল করলে দেখতে পেতে যে-সব বাড়ি আদ্যিকালের তার বেশীর ভাগ বাড়িতেই ওই লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। সোজা বাড়ির পেছন দিকে লতার মতন বেয়ে বেয়ে উঠে গেছে। আর সিঁড়ির গা ঘেঁষে ল্যাটরিন অ্যান্ড বাথ।"

আমরা আমাদের শহরে এ-রকম বাড়ি না দেখলেও কাছাকাছি বড় বড় রেল কলোনীতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায় এমন বাড়ি অনেক দেখেছি। মজুমদারসাহেবের কথা শুনে মনে মনে ছবিটা মিলিয়ে নিলাম।

উনি বললেন, "একবার ল্যান্সডাউন পাড়ার আমায় একটা খুনের তদন্ত করতে হয়। ঘটনাটা ছোট করে বলি।...একদিন, সেটা জুলাই মাস, মানে ঘোর বর্ষা তখন, অফিসে বসে বসে কাজ করছি, বাইরে এক দফা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে, প্রায় ছ'টা তখন, বাদলার জন্যে ঘরে বাতি জ্বালা— হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

ব্যাপার নতুন কিছু নয়। পঞ্চান্ন না পঁচাত্তর নম্বর বাড়িতে খানিক আগে একটি মহিলা খুন হয়েছে, অবিলম্বে যাত্রা কর।

ভাই, কী বিশ্রী আবহাওয়া যে কি বলব। বাইরে বেরিয়ে দেখি, একবার সর্বাঙ্গ স্নান করে কলকাতা শহর আবার স্নানের জন্যে তৈরী হচ্ছে। আকাশটা কালো—মেঘে মেঘে থমথমে। পথঘাট জলে ভরতি।

আমার সঙ্গে লাহিড়ী ছিল। রসিকতা করে বলল, এত বৃষ্টিতে রেনকোট গায়ে না চাপিয়ে কেউ খুন করতে আসতে পারে না, বুঝলে মজুমদার। পালাবার সময় যদি বেটা রেনকোটটা ফেলে পালায় তবে তোমার খুব সুবিধে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আসামী ধরে ফেলতে পারছ।

লাহিড়ীর রসিকতা তখন আমার ভাল লাগে নি। এমন দিনে কোথায় একটু আরাম-আলস্য করব, তা নয় খুনের তদন্ত করে বেড়াও।

আমাদের পুলিসের গাড়ি ল্যান্সডাউন পাড়ায় একটা তেতলা বাড়ির কাছে এসে থামল। পাশাপাশি অনেকগুলো দোতলা তেতলা বাড়ি, বেশীর ভাগই পুরোনো, গায়ের রঙ ছাই ছাই হয়ে গেছে, শ্যাওলা ধরেছে; সামান্য গাছপালা সব বাড়িতেই। আর লোহার ঘুরোনো সিঁড়ি প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির গায়ে লতার মতন এক পাশে ঝুলছে।

ওখানকার থানার লোকজন অনেকটা

আগেই এসেছিল। আমাদের যথাস্থানে নিয়ে যাবার সময় সঙ্গের পুলিস-ছোকরা বলল, স্যার—একটা ওয়াটারপ্রুফ ইনসিডেন্টের জায়গায় পাওয়া গেছে।

আমরা অবাক। মানে এত অবাক যে দাঁড়িয়ে পড়েছি। লাহিড়ী আমার মুখের দিকে চায়, আমি লাহিড়ীর। শেষে লাহিড়ী নিজেকে সামলে নিয়ে হাসল। বলল, দেখলে ত মজুমদার, হাত গুনতে পারি।

অনেক সময় এ-রকম হয়। রেনকোট সঙ্গে নিয়ে যে আসে সে যাবার সময় ফেলে যায়। কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ধোঁকা দেবার জন্যে সাধারণত ক্রিমিন্যালরা এ-রকম করে থাকে।... রেনকোট ফেলে গেছে শুনেই আমার মনে হল, আসামী যে হোক তাকে নিশ্চয় এখানকার লোক চেনে, আর খুব সম্ভব সে আসার সময় রেনকোট গায়ে দিয়ে এসেছিল, বৃষ্টির মধ্যেই।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলাম—সে এক বিশ্রী দৃশ্য। বাড়িটা তেতলা। তেতলার পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাটে, বাথরুমের খোলা দরজার ওপর এক মহিলা পড়ে আছে, মৃত, তখনও তার হাত পা বাঁধা, মুখের কাছে একটা কাপড়ের টুকরো ঝুলছে, মাটিতে পুরোনো মোজা পড়ে আছে দুটো।"

মজুমদারসাহেব অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। সেই অবসরে ঘটনাটাও পরিষ্কার করে ভেবে সাজিয়ে নিলেন বোধ হয়। তারপর বললেন ঃ

"ঘটনাটা এই। বেলা পৌনে চারটে নাগাদ, যখন তেতলার ফ্ল্যাটে পুরুষ লোক কেউ নেই, তখন একটা অপরিচিত লোক এসে খোলা দরজা দিয়ে সটান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাড়ির গিন্নী তখন শোবার ঘরের টুকটাক কাজ সারছিল। গিন্নীর সঙ্গে থাকত এক ঝি। ঝি বললাম বটে, কিন্তু এ সেই রকম দাসী যাকে অনেক বাড়িতেই নিজের ঘরের লোকের মতনই আমরা পালন করে থাকি। তার নাম আমার মনে নেই, ধরে নাও নামটা যমুনা। যমুনাই প্রথমে লোকটাকে দেখতে পায়। অচেনা লোককে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। লোকটাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই সে দিদিমণির কথা জিজ্ঞেস করে। কি করছে তার দিদিমণি, কোন ঘরে আছে, ইত্যাদি। যমুনা ভেবেছিল হয়ত লোকটা দিদিমণির চেনা। সে দিদিমণিকে ডেকে দেবে কি না ভাবছিল। তার দ্বিধা দেখে লোকটা ডাকল, বলল, একটু কাগজে সে তার নাম ঠিকানা লিখে দিচ্ছে, এটা দেখালেই হবে। এই বলে লোকটা পকেট থেকে নোট বই বের করে ফাউন্টেনপেন দিয়ে কি লিখল, লিখে পাতা ছিঁড়ে যমুনাকে নিয়ে যেতে ডাকল।

সরল মনে যমুনা চিরকুটটা নিতে এগিয়ে যেতেই লোকটা তার হাত ধরে ফেলে সঙ্গে এমন করে মুচড়ে পিছন ফিরিয়ে দিল যে যমুনা কাতরে উঠেছিল। কিন্তু তার আগেই লোকটা যমুনার মুখ অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরেছে।

লোকটা যমুনাকে খুন করে ফেলার ভয় দেখিয়ে চুপ করে থাকতে বলল। আর এত তার গায়ের শক্তি যে যমুনাকে এক টানে এই পাশে নিয়ে গিয়ে যেখানে যা কাপড় পরদা পেল সব দিয়ে তার মুখ হাত-পা বেঁধে ফেলল।

যমুনা ভেবেছিল এই হুটোপাটির মধ্যে দিদিমণি এসে পড়বে। দিদিমণিকে আসতে না দেখে তার মনে হল দিদিমণি তবে বাথরুমে গেছে। যমুনার চিৎকার করে দিদিমণিকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছে করছিল যেন তিনি আর বাইরে না আসেন। কিন্তু তার মুখ বাঁধা, হাত পাও বাঁধা—যমুনা কিছু করতে পারছিল না।...লোকটা যে ফ্ল্যাটের সদরও বন্ধ করে দিয়েছে যমুনা বুঝতে পারল। কাঠের পার্টিশনের আড়ালে সে সদর বন্ধ দেখল।

যমুনাকে ফেলে রেখে এবং শাসিয়ে লোকটা পাশের ঘরে চলে গেল।"

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কান্তি বলল, "তারপর?"

মজুমদারসাহেব বললেন, "তারপর কি ঘটেছে যমুনা জানে না। তবে সে পাশের ঘরে লোকটাকে জিনিসপত্র টানাটানি করতে শুনেছে।"

"সেই মহিলা তখন কোথায় ছিলেন? বাথরুমে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, স্বভাবতই তাই। মহিলার নাম কি ছিল আমার মনে নেই, তাঁকে মিসেস গুহ বলব। মিসেস গুহ বাথরুমে ছিলেন তখন। লোকটা ঘরের মধ্যে নানা জিনিস হাতড়েছে। আলমারির চাবি পায়নি। সে মিসেস গুহর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।"

"বাথরুমের দরজার পাশে?"

"বোধ হয়। মিসেস গুহ বাথরুম থেকে

[illegible]ও পেয়ে থাকবেন। বেরিয়ে আসতেই লোকটা মুখ চাপা দিয়ে ধরল। তারপর যমুনার মতন করেই সর্বাঙ্গে বাঁধল।"

"আলমারির চাবি কোথায় ছিল?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"মিসেস গুহর শাড়ির আঁচলে বাঁধা।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি! মিসেস গুহর কাছ থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে যাবতীয় অলঙ্কারপত্র চুরি করে লোকটা পালায়।"

"আপনি যে বললেন মিসেস গুহকে খুন করা হয়েছিল!"

"হ্যাঁ, মিসেস গুহ মারা গিয়েছিল। ইংরেজীতে যাকে বলে "গ্যাগ"—মানে শ্বাস-রোধ, তাই আর কি! যে মোজাগুলো দলা পাকিয়ে মিসেস গুহর মুখে ঠেসে দেওয়া হয়েছিল—তাতেই মহিলা মারা যায়, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে।"

মজুমদারসাহেব এবার তাঁর চুরুটটি ধরালেন। কিছুটা সময় আর কথাবার্তা হল না। বাইরে মাঘের হু হু বাতাস বইছে, এই শীতে হাড় কাঁপানো সেই বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে না এই যা।

খানিক বিরতির পর মজুমদারসাহেব বললেন, "লোকটা চলে যাবার পরে যমুনা অনুমান করতে পারে—কিছু একটা ঘটেছে। সে শরীর রগড়াতে রগড়াতে কোনো রকমে বাথরুমের দিকে যায়। গিয়ে দেখে তার দিদিমণি তারই মতন অবস্থায় পড়ে আছে। যমুনা বুঝতে পারে নি, মহিলা ততক্ষণে মারা গেছে। সে মিসেস গুহর পাশে এসে তার দিদিমণিকে কোনো রকমে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে উলটে দেয়। কোনো সাড় নেই। যমুনার ধারণা হয় দিদিমণি অজ্ঞান হয়ে গেছে।...সেই অবস্থায় অনেক চেষ্টার পর যমুনার মুখের বাঁধন আলগা হলে সে চেঁচাতে শুরু করে। বাথরুমের দিকে ঘটনাটা ঘটেছিল বলে, বাড়ির সেটা পিছন দিক বলেও যমুনার গলার শব্দ কেউ শুনতে পায় নি। অনেক পরে শুনেছে। শুনেও সামনে দিয়ে ঢুকতে পারে নি। পেছনের লোহার সিঁড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

ঢুকে এই দৃশ্য। যমুনার বাঁধন প্রতিবেশী খুলে দিয়েছিল। তারপর থানায় খবর দিতেই পুলিস এসে পড়ে।

"এত কাণ্ড ঘটল, মিসেস গুহর স্বামী কোথায় তখন?" কান্তি কৌতূহল অনুভব করে প্রশ্ন করল।

"মিসেস গুহর স্বামী একজন ডেনটিস্ট। তিনি বিকেল চারটের পর তাঁর পার্ক স্ট্রীটের চেম্বারে যান। সেদিন খানিক আগে বেরিয়েছিলেন।"

"তাঁকে কেউ খবর দেয় নি?"

"দিয়েছিল। কিন্তু তিনি চেম্বারে ছিলেন না। ছ-টা নাগাদও ফোন করে জানা যায়, ডাক্তার গুহ তখনও চেম্বারে পৌঁছোন নি।"

"সে কি!" আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"তেমন কিছু নয়। ডেনটিস্টদের নিজেদের কী একটা অ্যাসোসিয়েসন আছে। ডাক্তার গুহ তার একজন কর্মকর্তা। সেই কাজে ভদ্রলোক আটকা পড়েছিলেন। তারপর বৃষ্টি বাদলায় আর চেম্বারে পৌঁছতে পারছিলেন না।"

"কখন পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত?"

"আমরা যাবার সামান্য পরে।"

অল্প সময় আমরা কেউ আর কথা বললাম না। দৃশ্যটা মোটামুটি কল্পনা করে নিতে পারছিলাম। কলকাতার এক ফ্ল্যাট বাড়ির বাথরুমের দরজার কাছে পড়ে আছে মিসেস গুহ, তার দাসী যমুনা তখনও বিহ্বল নিজের ভোগ ভোগান্তির পরও এই ভয়ঙ্কর অবস্থা তাকে সহ্য করতে হচ্ছে, বাড়িতে পুলিসের নানা কর্মচারী, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোকজন, ডাক্তার গুহ চেম্বার থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখছেন, স্ত্রী নিহত।

মজুমদার সাহেব বললেন, "তদন্তর কাজ শুরু করার আগে আমরা যমুনাকে ভাল করে দেখলাম। নানা বিষয়ে তাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলাম।...যমুনার বয়স মাঝারি, মোটা-মুটি সুন্দরী, আচার আচরণও ভদ্রঘরের মেয়ের মতন। শুনলাম গত দু বছর ও এই বাড়িতে আছে।"

"মিসেস গুহর বয়স কত? কেমন দেখতে?" কান্তি প্রশ্ন করল।

"তার বয়সও বেশী নয়, বছর বত্রিশ। চেহারাটা রোগা। মুখে শ্বেতীর মতন কিছু দাগ ছিল।"

"ছেলেপুলে নেই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না; সন্তানাদি নেই। ডাক্তার গুহ বেশী বয়সে বয়স্কা মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছে ও'দের। কথাবার্তায় মনে হল, মিসেস গুহ বেশ ধনীর মেয়েই ছিল। পাটনায় এক বড় উকিলের মেয়ে। এখন পিতৃকুলে এক ভাই আছে, বম্বেতে থাকে। বিয়ের আগে মহিলা শখ করে ছবি আঁকত, আর মেয়ে স্কুলে পড়াত সময় কাটাবার জন্যে।"

আমরা রেনকোটটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল। কান্তি বলল, "সেই ওআটারপ্রুফটার কি হল?"

"বসার ঘরেই ছিল। তখনও অল্প ভেজা।"

"কোটটা থেকে কিছু উদ্ধার হল?"

"না। কোটটা ধর্মতলার কোনো আজে-বাজে দোকান থেকে পুরোনো অবস্থায় কেনা। মনে হল, ইচ্ছে করেই যেন লোকটা ওই কোট গায়ে চাপিয়ে এসেছিল। আসার সময় লোকের চোখ বাঁচিয়েছিল এবং কোটটা ফেলে যাবে স্থির করেই এসেছিল।"

"লোকটা কি চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল?"

"সেই রকম লক্ষণই ছিল চারপাশে। মিসেস গুহর অলঙ্কারপত্র প্রায় হাজার পনের টাকার। সমস্তই চুরি গিয়েছিল।"

এই দুঃসাহসী এবং চতুর চোর কে হতে পারে? কে বা মিসেস গুহকে অমন করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল? হঠাৎ আমার মনে হল, এমন হতে পারে, লোকটা মিসেস গুহকে মারতে চায় নি; তার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। কিন্তু ওই যে চুরি করতে গিয়ে বাড়ির লোকদের হাত মুখ বেঁধেছে—তাতেই একজন মারা গেছে।

সন্দেহের গলায় আমি মজুমদারসাহেবকে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, মিসেস গুহর মৃত্যু কি লোকটার অনিচ্ছাকৃত নয়?"

"অনিচ্ছাকৃত হলেই প্রমাণ হয় এই ঘটনার সঙ্গে আর যেই হোক ডাক্তার গুহ জড়িত নন।" মজুমদার সাহেব চোখে চোখ রেখে বললেন।

"কেন?" কান্তি প্রশ্ন করল।

"কেন কি, এটা ত খুব সাধারণ ব্যাপার। ডাক্তার গুহ যদি স্ত্রীর গয়না চুরির উদ্দেশ্য নিয়েই চোর সেজে এসে থাকেন—তবে কি

স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখবেন? জলজ্যান্ত স্থায়ী সাক্ষীকে কেউ ওভাবে বাঁচিয়ে রাখে!"

"ডাক্তার গুহর প্রশ্নই আসে না।" আমি বললাম। "তা হলে যমুনাই ত তাকে চিনতে পারবে।"

"কিন্তু যদি এমন হয়, যমুনা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। তার সমস্ত কথাই বানানো। তার হাত পা মুখ বাঁধার ব্যাপারটা লোক দেখানো—তবে?"

কান্তি অবিশ্বাসের কেমন একটা শব্দ করল। এ কি সম্ভব! কি স্বার্থে যমুনা ডাক্তার গুহর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করবে?

"যমুনার স্বার্থ কি? চুরির অংশ পাবে?" কান্তি বলল।

"তারও বেশী হতে পারে। গহনা পাবে কিছু, সেই সঙ্গে গুহর স্ত্রী হতে পারবে।"

আমরা চমকে উঠলাম। তাহলে বুঝতে হবে যমুনার সঙ্গে গুহর একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

মজুমদারসাহেব আমাদের খানিকক্ষণ অধীর কৌতূহলের মধ্যে রেখে শেষে কেমন যেন একটু হেসে বললেন, "এই সমস্যার সমাধান করছিল ওআটারপ্রুফ নয় হে, সেই ঘোরানো সিঁড়ি।"

আমরা ভীষণ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। মনে হল তিনি যেন পরিহাস করছেন।

মজুমদারসাহেব বললেন, "ঘোরানো সিঁড়িটা বেশ বড় বলে ওঠা নামা করার সময় খুব দুলত। বাড়িঅলার অযত্নের জন্যে সিঁড়িটা তেমন মজবুত ছিল না আর। তার শেষ চারটে ধাপ কেমন করে যেন খুলে ভেঙে গিয়েছিল। একটা অপরিচিত অনভ্যস্ত লোক যদি সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায় তাড়াতাড়ি, হয় পা পিছলে পড়বে, না হয় তাকে লাফ মারতে হবে। লাফ মারলে তার পায়ের ছাপ নীচে মাটিতে বেশ জোরের সঙ্গেই পড়বে, কেন না মাটি তখন ভিজে। অথচ আমরা মাটি অথবা কোথাও তেমন কোনো ছাপ পাই নি। সিঁড়ির তলায় বাঁ দিকে তিন চার হাত তফাতে ঘাস। ঘাস সামান্য দলা ছিল। আর ঘাসের ওপর একটা কলম পাওয়া গিয়েছিল। দোতলার যে প্রতিবেশী লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে প্রথম মিসেস গুহদের দেখতে পায়, সে তেতলায় উঠে ফ্ল্যাটের সদর খুলে দিয়েছিল। কাজেই প্রতিবেশীরা সামনে দিয়েই ওপরে গেছে, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নয়।"

কয়েক মুহূর্ত থেমে মজুমদারসাহেব এবার বললেন, "আমি ডাক্তার গুহকে সামনে নিয়ে কথা বলতে বলতে ঘুরোনো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছিলাম। গুহকে যতদূর সম্ভব অন্যমনস্ক রাখাই আমার একমাত্র হবে। গুহ লোহার রেলিঙ ধরে বাঁ পা

আমি বললাম, চন্দন, নীচেটা দেখতে হবে। গুহ লোহার রেলিঙ ধরে বাঁ পা বাড়িয়ে এমনভাবে টপকে নীচের ঘাসে গিয়ে পড়ল যে আমার মনে হল এই অভ্যেসটা তার অনেক দিনের।...সেই ঘাসের ওপর আগেই গুহর কলম আমরা পেয়েছিলাম। সম্ভবত আগের বার লাফিয়ে পালাবার সময় পড়ে গিয়েছিল। লাহিড়ী সেটি সযত্নে আগে সরিয়েছে। গুহ জানত না যে, তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ আমরা আগেই সংগ্রহ করেছি।"

আমরা নীরবে বসে থাকলাম। গুহকে আমরা এমনভাবে কল্পনা করিনি।

কান্তি বলল, "যমুনার সঙ্গে তবে ষড়ই করেছিল গুহ?"

"হ্যাঁ। খুব পাকা ষড়যন্ত্র।......তবে এ-কথাও ঠিক গুহদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। সে স্ত্রীকে মারতেই চেয়েছিল। অবশ্য মারার উপায়টা একটু আলাদা।" মজুমদারসাহেব উঠলেন, "গুহর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, যমুনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।"

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

রোমাণ্টিক উপন্যাস

একটি লেখা পড়লাম। সাম্প্রতিক সাহিত্যে রোমাণ্টিক উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনৈকা লেখিকা সুপারিশ করেছেন অত্যন্ত আবেগভরে। লেখিকার নাম আলেক্স স্টুআর্ট। তিনি নিজে একাধিক উপন্যাসের রচয়িত্রী—যার মধ্যে 'স্টার অফ আউধ' (Star of Oudh) খুব নাম করা বই। ইনি বিলেতে 'রোমাণ্টিক নভেলিস্ট অ্যাসোসিয়েসন'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। সম্প্রতি তিনি ন্যাশনাল বুক লীগ-এর এক সভায় একটি বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল, সাম্প্রতিক সাহিত্যে রোমাণ্টিক উপন্যাসের স্থান আছে কি নেই। কুমারী অ্যালেক্স স্টুআর্ট-এর বক্তৃতায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলেই ও-দেশী এক সাহিত্যপত্রিকা তাঁর বক্তব্য বিষয়ের সারমর্ম পাঠকসমাজে পেশ করেছেন। যদিও এ-ব্যাপারটি বিদেশী তবু আমাদের বাংলা সাহিত্যে কিছুকাল যাবত রোমাণ্টিক উপন্যাস-এর আবার চল হচ্ছে; এই বিবেচনায় আমি অ্যালেক্স স্টুআর্ট-এর বক্তব্য পাঠকসমীপে সংক্ষেপে নিবেদন করছি।

কুমারী অ্যালেক্স স্টুআর্ট বলেছেন, আজ-কাল সমালোচকরা রোমাণ্টিক উপন্যাসকে সাহিত্য বলে স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বলেন, সে অধিকারই রোমাণ্টিক উপন্যাসের নেই। যদি বা এমন হয়, রোমাণ্টিক উপন্যাস কোনো কারণে 'লিটারেচার' হয়ে গেছে তবে সেটা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার।

রোমাণ্টিক উপন্যাস-এর বিরুদ্ধে সমা-লোচকদের অভিযোগ কি? না, এই ধরনের উপন্যাস পলাতক মনোবৃত্তির ফসল; এর কারুকর্ম বাঁধাধরা ছককাটা; এর মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ থাকে না। অধঃপতনের পথে যেতে এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে অচিরে এর প্রকাশ আর অভিজাত পংক্তায় হবে না।

কুমারী অ্যালেক্স স্টুআর্ট বলছেন : আমি সমালোচকদের অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু এবার আমার যুক্তি নিবেদন করি। আমার ধারণা, সাম্প্রতিক

অ্যালেক্স স্টুআর্ট

উপন্যাসের জগতে রোমাণ্টিক উপন্যাসের স্থান আছে। কেননা, আজকাল গল্প উপন্যাসের নাম করে যে পাপ ও পংকের শিল্পচর্চা চলছে—তার প্রতিষেধক হিসেবে রোমাণ্টিক উপন্যাস-এর প্রয়োজন। রোমাণ্টিক উপন্যাস সাধারণত আশাবাদের কথা বলে, অস্বাস্থ্যকর যৌন-মোহ থেকে এ-ধরনের উপন্যাস মুক্ত, মুক্ত নৃশংসতা দুরাচার ও বিকৃতবোধ থেকে। পাঠককে আনন্দ দেব, মাত্র এই উদ্দেশ্যে রচিত বলেই এ-ধরনের উপন্যাস উপরোক্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। ডক্টর জনসন-এর একটি অমূল্য উক্তি স্মরণ করুন— "A book should teach us to enjoy life...or to endure it"। রোমাণ্টিক উপন্যাসকে যাঁরা 'পলাতক' মনো-বৃত্তির রচনা বলেন তাঁরা অনুগ্রহ করে ভেবে দেখলে হয়ত বুঝবেন, ওটা পলায়নের ভঙ্গী নয়, মানুষকে তার দিনান্ত পরিশ্রমের পর সজীব ও তৃপ্ত করার জন্যে এক ধরনের সঞ্জীবনী। এ-কথা আমরা কেন স্বীকার করব না, মানুষ যখন কর্মহীন তখন একটা উপন্যাস খুলে পড়তে বসে মনকে ভাল লাগানোর জন্যে।

ছক বেঁধে রোমাণ্টিক উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে, এ-কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু লেখক যে সে-ছক বদলান না তাও নয়। আমরা বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর জন্যে লিখি। কাজেই আমাদের পাঠকের চাওয়া না-চাওয়ার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যারা 'এনটারটেনার' তাদের অন্তত এ-কথা জানতেই হবে, কি জিনিস তার শ্রোতা অথবা দর্শক অথবা পাঠক পছন্দ করে, কোন্‌টা বা করে না।

'রোমাণ্টিক উপন্যাস' এই শব্দটার অর্থ এবার পরিষ্কার করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। সত্যি কথা বলতে কি, এর অর্থ লেখকের কাছে এক, প্রকাশকদের কাছে অন্য, সমালোচকদের কাছেও আবার আলাদা। আমি নিজে রোমাণ্টিক উপন্যাসের লেখিকা, তবু আমাকে এর অর্থ স্পষ্ট করে বলতে হলে বিপদে পড়ব।

'রোমান্স' এই শব্দটা আমরা বইয়ের গায়ে লেবেল হিসেবে নানাভাবে লাগিয়ে দি। যেমন বলা হয়ে থাকে, সাসপেন্স-রোমান্স, হিস্টোরিক্যাল রোমান্স, রোমাণ্টিক-অ্যাড-ভেঞ্চার, ইত্যাদি।

অতঃপর লেখিকা বলছেন :

আজকাল মানুষের মতিগতি অন্য রকম। কোনো সাদামাটা জিনিস থেকে গুণ খুঁজে বের করা সময় নষ্ট বলে মনে হয়। লোকের ধারণা—, বিবাহিত জীবন যদি সুখেরই হল, কিংবা স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসীই হল তবে বুঝতে হবে এরা নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধ।

পণ্ডিতে বলেছেন, ঔপন্যাসিকের কাজ হল জীবনের মুখের সমানে একটি দর্পণ তুলে ধরা। লোকের সাধারণত বিশ্বাস, রোমাণ্টিক উপন্যাসের লেখকদের হাতে যে আয়নাটি আছে তা গোলাপী রঙের। এই

আয়নার প্রতিফলন দিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে রঙে ভরে দেন, যা সৃষ্টি করেন তা কেবল নয়ন-মনোহর, অতিশোয়াক্তিতে ভরা।

আমার ধারণা, সমস্ত কাহিনী-মূলক লেখাই প্রধানত কাল্পনিক। কাল্পনিক লেখার কিছু স্বভাবগত অসুবিধে থাকবেই। বাস্তবের চরিত্র নিয়ে লেখা শুরু করা যেতে পারে—কিন্তু সেই চরিত্রকে লেখকের চোখ ধরে ধরে যেতে হয়। লেখক যেমন করে কাহিনী তৈরী করেন, ঘটনা সাজিয়ে রাখেন, চরিত্র সাধ্য কি তার বাইরে দিয়ে পালিয়ে যায়। নাচের দড়ি লেখকের হাতেই, পুতুলকে সেই দড়ির টানে নাচতে হয়।

রোমান্টিক উপন্যাসের লেখকদের চোখ নাকি জলে-ভেজা, তারা শুনি ভয়ংকর ভাব-প্রবণ। আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না। দীর্ঘ-দিন আমি সমালোচনার কাজ করছি, রোমান্টিক উপন্যাসের সমালোচনা করা আমার পেশা। বহু লেখককে আমি চিনি। মজার কথা এই, এঁদের অধিকাংশই যে শুধু পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান তা নয়, অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে যে বেদনা ও দুঃখ সহ্য করেছেন, যে জটিলতার মধ্যে লালিত হয়েছেন, যত ঘটনা তাঁদের জীবনে ঘটেছে তার কিছুই তথাকথিত রাগী ছোকরার দল অনুভব করে নি। রাগী ছোকরারা যা শুধু কল্পনা করে, আমার সহকর্মীদের অনেকেই জীবনে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অথচ এঁরা লেখার বেলায় রাগী ছোকরা হন নি। তার কারণ এঁদের বিশ্বাস আজও ভাঙে নি, সমস্ত দুর্ভোগ দুঃখ জটিলতার অভিজ্ঞতা এঁদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় করেছে, সহন-শক্তি দিয়েছে। এঁরা শেষ পর্যন্ত জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পেরেছেন। "They believe in the fundamental goodness of human nature।"

রান্নাঘরের নরদমা নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লেখেন তাঁরা তাঁদের পাঠককে খুশী করেন আঘাত দিয়ে, কষ্ট দিয়ে, যা সাধারণত খারাপ তাকে গ্রহণ করা উচিত—এই বিষ মনে ঢুকিয়ে দিয়ে। আর যারা রোমান্টিক উপন্যাস লেখেন তাঁরা পাঠকের আনন্দের জন্যে হয়ত বই শেষ করেন নায়ক-নায়িকার বিয়ে দিয়ে। এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় প্রথম পক্ষের আয়না দ্বিতীয় পক্ষের চেয়েও বিশ্বস্ত?

আজকাল দেখতে পাচ্ছি, মানুষ আশার কথা বললে তা উপহাসের বিষয় হয়। **"In my books, I offer hope when the fashion is to spread gloom and despondency."**

তবে আশার কথা, ভিক্টোরিয়া হোলট্-এর 'মিসট্রেস অফ মেলিন'-এর সুখ্যাতি এবং অকল্পনীয় সাফল্যের পর দেখা যাচ্ছে কি আমেরিকায় কি ইংলণ্ডে প্রথম-শ্রেণীর রোমান্টিক উপন্যাসের কদর বেড়েছে। 'রেবেকা'র পর এমন ভাল রোমান্টিক উপন্যাসও যেমন লেখা হয় নি, সাফল্যও তেমন কেউ লাভ করে নি। ঘড়ির দোলক এখন যেভাবে এ-পাশে হেলে আসছে তাতে মনে হয় রিয়্যালিজমের পালা শেষ হয়ে এল, রোমান্টিক লেখার কদর মানুষ আবার বুঝবে।

কুমারী অ্যালেক্স স্টুআর্ট-এর লেখা সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই। কারণ, সাহিত্যকে আমি ওভালটিন জাতীয় পদার্থ ভাবি না, যার একমাত্র কাজ হল ক্লান্তি হরণ করা ও সুখ নিদ্রার ব্যবস্থা করা। তবে আমার ভাবনায় কিছু আসে যায় না। বাংলা সাহিত্যের পাঠক, আমার ধারণা, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, আমাদের বহু লেখকই এখন মরমে এ-কথা বুঝে নিয়েছেন যে, অতঃপর উপকথাই তাঁদের ভরসা। আর ঘড়ির দোলক এখানেও সে-দিকে হেলে আসছে।

শরৎচন্দ্র অথবা শরচ্চন্দ্র

"বিদুর" সমীপেষু,

আমার কাছে ১৩৩৮ সালের বাঁধানো গল্পলহরী রয়েছে। তাতে সম্পাদকের নাম, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র নয়।

ওই সালেরই বৈশাখ সংখ্যায় একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, গল্পটির নাম "চোর"। ফুটনোট থেকে জানা যায়, গল্পটি টলস্টয় অবলম্বনে রচিত। লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আশা করা যায়, গল্পটির লেখক আদৌ শরৎচন্দ্র নন, কারণ বিদেশী অবলম্বনে রচিত তাঁর কোন গল্প কোথাও পড়েছি বলে মনে করতে পারছি না। এখানেও গল্প-লেখকের নাম শরৎচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র নয়।

বিনীত
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

(২)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্প্রতি 'গল্পলহরী' পত্রিকার 'শরৎচন্দ্র' নামের বানান বিভ্রাট লইয়া কিছু লেখালেখি হইতেছে দেখিলাম। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে ১৩৩৮ সালের গল্পলহরী পত্রিকার দুইটি সংখ্যা আছে। তাহাতে সর্বত্রই 'শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' এই নামটিই (এইরূপ বানানেই) নামাবলীর মত জড়াইয়া আছে। শ্রীমদনমোহন শেঠ মহাশয় বর্ণিত 'শরচ্চন্দ্র' অপর কেহ ছিলেন অথবা আছেন কিনা তাহা জানি না—তবে গল্পলহরীর 'শরৎচন্দ্র' কদাপি 'শরচ্চন্দ্র' নহেন—অন্তত পুরাতন গল্পলহরীর ১৩৩৮-এর বৈশাখ ও পৌষ সংখ্যা তাহাই সাক্ষ্য দেয়। বিনীত

শ্রীতারাকালী বসু।
সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

[অতঃপর এ-সম্পর্কে আর কোনো পত্র প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।]

পুস্তক পরিচয়

সাম্প্রতিক বাংলা নাটক : পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্যরচনা

সংঘাত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক, সাহিত্যায়ন। ৮-এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য ২ টাকা।

তুলসী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাটক। প্রকাশক, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংঘাত' নামক পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটকটির প্রকাশকাল ১৩৬৯। এটি তাঁর কোনো গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ কিনা, তার কোনো ঘোষণা গ্রন্থটিতে নেই, তবু পাঠক লক্ষ্য করবেন, তাঁর সাম্প্রতিক রচনা এই নাটকটিতে তিনি তাঁর পূর্বকথিত কোনো কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন এবং পূর্ব-বর্ণিত কয়েকটি চরিত্রকে পুনর্জীবনদানের চেষ্টা করেছেন।

বিপ্রনান্দী গ্রামের ন্যায়রত্ন ঠাকুর সমাজের শিরোমণি—নানা ধর্মীয় বিধান দিয়ে থাকেন। তাঁর পুত্র শশিশেখর শাস্ত্রীও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু সংস্কারমুক্ত পিতার বিরুদ্ধেই একাদশীর দিন বিধবাকে জল পান করান, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে ঘোষণা করেন এবং বিধবা বিবাহে পৌরোহিত্যও করেন। ফলে পিতাপুত্রে বিরোধ বা সংঘাত—অনেকটা প্রচলিত সংস্কারের অচলায়তনের সঙ্গে নূতন মানবিক মূল্যবোধের। এই বিরোধের মীমাংসা সহজে হয়নি—তার জন্য নাটকের কুশীলবদের বিশ-পঁচিশ বছর অপেক্ষা এবং অনুসন্ধান করতে হয়েছে, নানা সংশয় ও আঘাতের ভিতর দিয়ে অবশেষে দাঙ্গা, দেশবিভাগের পটভূমিকায় ন্যায়রত্নের নতুন উপলব্ধি এবং সর্বাত্মক মিলনে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে শশিশেখরের দেশত্যাগ, গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মথুরানাথের আবির্ভাব, বিধবা সুষমার বিবাহ শশিশেখরের পুত্র চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সুষমার কন্যা এণাক্ষীর প্রেম ইত্যাদি বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কাহিনীর কালগত বিস্তার অনেকটা চরিত্র-সংখ্যাও বহু—কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্যের অভাব রয়েছে। কুশীলবদের সংলাপে বিকারের ঘোরের মতো উত্তেজনা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় —তবু তা কখনো সংকটকে বাস্তবানুগ বা প্রত্যক্ষবৎ করেনি। নাট্যকারের অনবধানতায় তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বেতার ঘোষণায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ রয়ে গেছে। তবু বলা যায়, বাংলা নাটকের ধারাবাহিক দুর্দিনে হয়তো এ-নাটকটি অভিনয়ে সাফল্যলাভ করবে, কিন্তু 'দুই পুরুষ' বা 'কালিন্দী'র একদা-জনপ্রিয় নাট্যকারের সুনাম বা খ্যাতি বৃদ্ধি করবে বলে আমাদের মনে হয় না।

নাটক একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম, উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপদানেই নাটক রচনার দায়িত্ব শেষ হয় না। পৃথিবীর অনেক সফল ঔপন্যাসিক বা গল্পকার স্বেচ্ছায় নাটককে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই মাধ্যমটির শক্তি ও ব্যাপ্তি উপলব্ধির চেষ্টা করছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিণত সাহিত্য-জীবনে মৌলিক নাটক রচনায় ব্রতী হলে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের পক্ষে তা অত্যন্ত আশার কথা। উপরন্তু নিজের রচনাকে অনুসরণ করা বা পুনরাবৃত্তি করা সাহিত্যিকের প্রতিভার ক্লান্তি সূচনা করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন মূলত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার, তুলসী লাহিড়ীও সেইরকম মূলত অভিনেতা ও পরিচালক। অভিনয়ের ভিতর দিয়েই তিনি নাটক রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কিন্তু নাটকের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন—অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি এই মাধ্যমটিকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁর রচনা পড়লে নাট্যকারের নিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। বাস্তবিক রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক নিবিড়, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা থাকা স্বাভাবিক। আলোচ্য সংকলনটিতে তাঁর সেই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা নাটকের বিচারে স্বর্গত লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমাদের এখনো আরো কিছুকাল স্মরণে রাখতে হবে, কারণ, এই

নামটির সংগে যুক্ত হয়ে আছে পথিক, দুঃখীর ইমান, ছেঁড়া তারের মতো নাটক। এই সব রচনার ভিতর দিয়েই নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আলোচ্য সংকলনটির কোনো কোনো রচনার সংগেও আমরা পূর্বপরিচিত, যেমন নববর্ষ, চৌর্যানন্দ ইত্যাদি রচনা। সত্যের সংগে অসত্যের, লোভের সংগে সংবুদ্ধির যে অবিরাম দ্বন্দ্ব মানুষের সমাজে চলেছে, তাঁর সমস্ত নাটকে তারই অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই। বিষয়বস্তুর সন্ধানে তিনি সমাজের সর্বশ্রেণীতে বিচরণ করেছেন বলেই—বৈচিত্র্য তাঁর নাটকের বিশেষ গুণ। সংলাপে আঞ্চলিক প্রবণতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতায় তা প্রায়ই বাস্তবানুগ ও আবেদনময়।

স্বীকার করা ভাল যে, এই সংকলনের কয়েকটি রচনায় কুশীলবদের ক্ষোভ, ক্ষোভ, হতাশা, তিক্ততা সংলাপে যতটা প্রচারিত হয়েছে, নাটকীয় ঘটনায় ততটা প্রমাণিত হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে নাটক সুষ্ঠুভাবে বিস্তারলাভ করেনি এবং এমন কি, ঘটনা-সৃষ্টিতে কষ্টকল্পনার ছাপ রয়ে গেছে (যেমন মণিকাঞ্চন, ওলটপালট), তবু রচনাগুলিতে বর্তমান সমাজের চাক্ষুস অভিজ্ঞতাকে সংবেদনশীলতার সংগে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা প্রশংসনীয়। নাট্যকার, নববর্ষ, নায়ক, গ্রীষ্মরুম, ওলট-পালট, মণিকাঞ্চন ও চৌর্যানন্দ—মোট এই সাতটি একাঙ্কিকার এই সংকলনটি প্রচার-লাভ করলে আমরা আন্তরিক খুশী হব।

৩৪৪।৬২, ৩৪১।৬২

ছোট গল্প

বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ৩·০০ টাকা।

সোনা নয় রূপো নয়—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। প্রকাশক—আর এন চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং, ২৩ নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—২·৫০ নঃ পঃ।

ছোট গল্প রচনায় অচিন্ত্যকুমার সিদ্ধহস্ত। তাঁর অধুনাতন গল্পগ্রন্থ বরবর্ণিনীতে স্থান পেয়েছে সাম্প্রতিক কালের লেখা আটটি ছোট গল্প। মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে একটি নিটোল কাহিনীকে গড়ে তোলা সহজ ব্যাপার, কিন্তু তারই মধ্যে লেখক তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যকে যখন ফুটিয়ে তুলতে চান তখন যে তা সত্যিই সহজ নয়, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এ গ্রন্থের সব কয়টি রচনাতেই। 'অঙ্গুলি' থেকে 'দিন' পর্যন্ত প্রত্যেকটি গল্পই যে একমাত্র অচিন্ত্যকুমারের হাত থেকেই বেরুতে পারে তা তাদের রচনাভঙ্গিতেই প্রমাণ। শুধু ভঙ্গিই নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনেও এ লেখক বিশিষ্ট। একেবারে ফেলানো-ছড়ানো ঘটনা থেকেও যে সম্পূর্ণ একটি গল্পের অবয়বকে খুঁজে পাওয়া যায়, 'তপ্ত ইক্ষু' ও 'আর্দালি নেই' গল্প দুটো তার সাক্ষী। অন্যপক্ষে নিতান্তই গল্প রচনা যে অচিন্ত্যকুমারের পক্ষে কিছু নয়, তার পরিচয় আছে 'হাউস-বোট' আর 'কুমারীতে'। কিন্তু আশ্চর্য গল্প তাঁর 'অঙ্গুলি', 'তিন সাহেব' আর 'দিন'। এখানে অচিন্ত্যকুমার হৃদয়বান সাহিত্যিক। রক্তক্ষরা বেদনা নিয়ে মানুষের দুর্দশাকে তিনি অনুভব করেছেন এখানে। তবু ভাবতে আজ কষ্ট হয়, এমন স্বভাবসিদ্ধ কুশলী লেখকও শব্দের জাদুতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শুধু এই শব্দের অধীন হওয়ার ফলে বিভিন্ন গল্পের বিভিন্ন চরিত্র তাদের চারিত্র্য হারিয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে বারবার।

দুটি বড় গল্পকে একত্র করে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'সোনা নয় রূপো নয়'। প্রথম গল্পটিতে লেখিকা নিঃসন্দেহে তাঁর সংবেদনশীল মনটিকে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। যদিও গতানুগতিক কাহিনী-রচনার দিকেই ঝোঁকটা একটু বেশী তা

হলেও তারই মধ্যে বাদল এবং প্রতিমা তাদের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু দ্বিতীয় গল্প শৈবাল লতা নিতান্তই একটি কাহিনী। সেখানে ঘটনার স্রোত বারবার ব্যাহত হয়েছে বলেই নয়, খণ্ড-খণ্ড দৃশ্যে অতি নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়ে লেখিকা পাঠকের মনোযোগও বিঘ্নিত করেছেন। শিউলি দুঃখী হয়েও পাঠক মনের অনুভূতিকে জাগাতে অক্ষম।

২৫।১।৬২

হাস্যরস

হসন্তী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

বহুমুখী কথাটা আমার প্রিয় নয়; তবুও শরদিন্দুবাবুর এই বইটি পড়ে এবং তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির পরিচয় মনে রেখে তাঁর প্রতিভাকে আর কীভাবে বর্ণনা করবো বুঝতে পারছি না। ক্রিকেটের কথা মাথায় রেখে বলা যায়, সাহিত্যের ইডেন উদ্যানে শরদিন্দুবাবুকে আমরা একজন অল-রাউণ্ডার হিসেবে পেয়েছি। তিনি ঐতিহাসিক কাহিনীতে অপরাজেয়, রহস্য-কাহিনীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সরস গল্পের জীবিত লেখকগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তবুও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গড়পড়তা রান এবং উইকেটের সংখ্যা অনুযায়ী তাঁর নাম আমাদের তালিকার যেখানে থাকা উচিত ছিল, যে কারণে হোক, সেখানে তা আজও লেখা হয়নি। তার অন্যতম কারণ বোধ হয়, তিনি নিজেই। কারণ লেখক হিসেবে শরদিন্দু সহজ, এবং সর্বজনবোধ্য এবং প্রিয়। যাঁকে আমরা ভালবাসি, তাঁর সঙ্গে আমরা আড্ডা দিতে রাজী আছি, কিন্তু আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার আসনটি 'জীবন-যন্ত্রণা' কাতর শিল্পীদের জন্য সংরক্ষিত। গুণী এবং গুণের এই অসমাদরের ফলে আমাদের সাহিত্যে আজ ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কয়েক বিষয়ে আমরা যেমন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছি, তেমনি আমাদের অন্য কয়েক অঙ্গ রিকেট-রোগগ্রস্ত রোগীর মতো শীর্ণ। সাহিত্যের এই অবহেলার মর্মান্তিক নিদর্শন সরস গল্প। ব্যঙ্গ-রচনায় সিদ্ধহস্তদের তবুও আমরা গলায় মালা দিয়েছি, কিন্তু সরসতার দায়িত্ব আদ্যিকালের গোপাল-ভাঁড়ের উপর চাপিয়েই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণত প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে 'আদিম নৃত্য', 'আরব্য সাগরের রসিকতা, কর্তার কীর্তি', কুতুব শীর্ষে', ভেনডেটা'—এই পাঁচটি গল্প অন্তত আমার স্মৃতিতে বহুদিন অম্লান হয়ে থাকবে। না, আর-একটি গল্পকেও বাদ দেবার উপায় নেই। 'বহু বিঘ্ন্যানি'। এমন স্নিগ্ধ অথচ দুঃসাহসী গল্প বহুবার পড়েও যেন মন ভরতে চায় না।

'হসন্তী'র লেখক সাধুভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। হাস্যরস সৃষ্টিতে সাধুভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে এক-এক সময় সন্দেহ হয়, চলতি ভাষায় এই ধরনের রসিকতা আদৌ সম্ভব কিনা।

সাধুভাষা সম্পূর্ণ ত্যাগ করবার আগে এই প্রয়োজনীয় দিক সম্বন্ধে লেখক, পাঠক, সকলেই হয়তো কিছুটা চিন্তা করবার সুযোগ পাবেন।

বড় গল্প

এই দেহ অন্য মুখ। বিমল কর। বর্তিক; ১/৩২ এফ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬। মূল্য : তিন টাকা।

বিবাহিত দুটি নরনারীর জীবনকে কেন্দ্র করে শ্রীযুক্ত বিমল কর হৃদয় এবং বুদ্ধির সংমিশ্রণে অতিবাস্তবতার জীবন-ভূমিতে চেতন অবচেতন ও অতিসচেতন মনকে আবিষ্কার উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ করেছেন। দেহ ও মুখ, মধ্যিখানে মন—এদের বিপরীত লীলা কী বিচিত্র। জিজ্ঞাসামুখর 'এই দেহ অন্য মুখ'-এর আঙ্গিকও অভিনব। তিনটি পৃথক পরিবেশে দুটি নর-নারীর চলিষ্ণু জীবনরূপ যেন তিন-অংকে বিধৃত। মালতী ও শশাঙ্কর ফুলশয্যার রাত্রি যেন প্রথমাঙ্কের পাদপ্রদীপে সলজ্জ অবগুণ্ঠন নিয়ে নিহিত সত্যকে নির্মমভাবে প্রকাশ করছে। পারস্পরিক তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণা, মানসিক অধৈর্য ও ভদ্রতার আবরণে মিলিত হ'ল দুটি নরনারী। তবু এখানেই শেষ নয়। বড় গল্পের পরিণতি ও পরিণাম ভিন্নতর। তাই ক্ষোভ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও বৈষয়িক মানুষ জানতে চায়—তবে বিবাহ কেন? বিবাহটা পরিণতি না প্রয়োজনের জন্য? সামাজিক দায় সেখানে কতখানি? শ্রীযুক্ত কর সাহিত্যিক সহানুভূতি, স্বচ্ছদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সেই বক্তব্যের সুচারু বিচার করেছেন এবং মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন। বিবাহের বৎসরান্তেও সেই বাহ্যিক মিলনানন্দ এবং মানসিক ক্ষোভ রয়েছে। মানসিক গ্লানিও তাই কম নয়। শিক্ষয়িত্রী মালতী শশাঙ্ককে তৃপ্ত করে না। তবু শশাঙ্কর কাছে তার ব্যবহারিক প্রয়োজন অপরিহার্য! মালতী শশাঙ্কর বাড়িতে অর্থ সাহায্য করে। শশাঙ্ককে নিয়ে সেও ঘর করে, কিন্তু তারও মনে হয় 'সে একটা ধুতি গেঞ্জি পরা ইতর জীবের কাছে শুয়ে আছে।' এইভাবে দুটি গতিশীল জীবন বৎসরের পর পর বৎসর বসবাস করে একই সংসারে। ওরা চেঞ্জে যায়। তখন টুলু নামক একটি সন্তানও হয়েছে। মালতী হেড মিস্ট্রেস। নিকটেই ইস্কুল সেক্রেটারীর বাড়ি। তাই মালতী ও সেক্রেটারীকে নিয়ে শশাঙ্কর মনে চাপা সন্দেহ। আবার শশাঙ্কর সঙ্গে রেণুর সম্পর্ক নিয়েও মালতী নিঃশংসয় নয়। মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সামঞ্জস্যবিধানের পথ। এখানেই শ্রীযুক্ত কর শুধু সামাজিক বোধেরই নয়, জীবনের মৌলধর্মের প্রতি সুবিচার করেছেন। 'এই

দেহ অন্য মুখে' অধিকাংশ গৌণ চরিত্রই নেপথ্যে। তবু তারা সকলেই ক্রিয়াশীল। অভাব-অভিযোগে সংসারের যথাযথ ছবিটিই ফুটে উঠেছে। ভাষায় যেমন রূঢ় বাস্তবতা, তেমনি আলংকারিক গুণও লক্ষ্যণীয়।

১৬০।৬২

পদাবলী

বৈষ্ণব পদরত্নাবলী। সম্পাদক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন। কলিকাতা-২০। দাম পাঁচ টাকা।

বইয়ের বহিরঙ্গ-সজ্জা ভিতরের মণ্ডন-শিল্প, সম্পাদকীয় ভূমিকাকে হাতের লেখা লাইনের মতো সজ্জিত করার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি দেখে মনে হয় এ বইয়ের উদ্দেশ্য বিবাহের উপহারোপযোগী হওয়া। পাঠকের চোখ ভোলানোই এর উদ্দেশ্য। মন ভোলানোও অনুদ্দিষ্ট নয়, তবে সে মন অধ্যয়নপিপাসুর মন নয়। সুতরাং সম্পাদকীয় বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর এই বক্তব্যও কোনো জ্ঞানলাভেচ্ছুকে অথবা বৈষ্ণব ভক্তকে তৃপ্ত করতে পারবে না। ভূমিকার নাম 'বৈষ্ণব কবিতা : পট ও পটভূমি'। সম্পাদক বলতে চেয়েছেন বৈষ্ণব পদকর্তা প্রচলিত আবেষ্টনীর হাত থেকে আবেগের মুক্তিসাধনে প্রয়াসী। মানবীয়তাই এর প্রধান লক্ষণ। ক্রুবাদুর, প্রাকৃত কবিতা এবং 'রাখালিয়া গীতি'র ('কোন গুলি ?') সঙ্গে নানা মিলের উল্লেখ আছে। সম্পাদকের এই কথাগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা সন্দেহজনক।

তিনি বলছেন, আধুনিক মনের উপযোগী করে পালাগানের কথা মনে রেখে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের 'ব্যাপার'টিকে একটি কাহিনীর সূত্রে তিনি গ্রথিত করতে চেয়েছেন। মনে হয় নিপুণ উকিলের মতো তিনি বিভিন্ন সাক্ষ্য সংগ্রহ করে মামলা সাজাচ্ছেন যা আসল কাহিনী থেকে পৃথক। আকরগ্রন্থের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকলে বৈষ্ণব পদাবলীর এমন ব্যাখ্যা তিনি দিতেন কিনা সন্দেহ।

৫৭৮।৬১

প্রবন্ধ

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড)—নেপাল মজুমদার। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লক্ষ্য-পরিধি দূরদর্শী। কিন্তু লেখক এক আশ্চর্য নম্র নিষ্ঠার সঙ্গে সেই লক্ষ্যস্থল অধিকার করেছেন। তিনি তথ্যবুদ্ধি নিয়ে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসত্তার অভ্যন্তরে একটি স্বদেশচৈতন্য জাগরূক ছিল। পরিবেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই আত্মিক যোগ উদ্‌ঘাটন করে শ্রীনেপাল মজুমদার আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী'র লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও প্রভাতকুমারের মতো তন্ময় (objective)। একদিকে যেমন তিনি কালানুক্রমিক উপায়ে রবীন্দ্র-জীবন পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন, তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারেও তাঁর অকুণ্ঠ উদ্দীপনা, স্বাভাবিক নৈপুণ্য।

বইটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসত্তার যে মূর্তি চোখের সামনে ফুটে উঠল, তা এতদিন যেন অনাবিষ্কৃত ছিল। এই গ্রন্থের বহুল সমাদর কামনা করি। ৬২৪।৬১

বিবিধ

দর্শক (স্থাপত্য-শিল্প বিশেষ সংখ্যা)—সম্পাদক সর্বশ্রী রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৫ নয়া পয়সা।

শিল্পকলার এক-একটি বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে 'দর্শক' শিল্পরসিকদের বহু তথ্য পরিবেশন করে আসছে তিন বছর আগে পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হওয়া থেকেই। কেবলমাত্র শিল্প-কলা বিষয়ে সাময়িক পত্রিকা বলতে একমাত্র এই প্রকাশনটি নিজের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যা-খানিতে পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও জাপানের বর্তমান স্থাপত্য-শিল্পের ধারা ও প্রগতি সম্পর্কে যে সচিত্র আলোচনা প্রকাশ করা হয়েছে, শিল্পরসিক, এবং বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষী পাঠকদের তা তুষ্ট করবে।

* রঙ্গজগৎ *

চলচ্চিত্রে শিল্পকলা ও ব্যবসায়-সংকট

শিল্পকলা ও ব্যবসায়—চলচ্চিত্রের এই দুটি দিকের সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসায়ে যখন সংকট দেখা দেয় তখন শিল্পকলারও বুঝি অপঘাত-মৃত্যু ঘটতে শুরু করে। কারণ, চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরা টিকিট-ঘরের আনুকূল্য লাভের জন্য এমন সব ছবি উপহার দিতে শুরু করেন, শিল্পমানের দিক থেকে যেসব ছবি মোটেই উ'চুদরের নয়। আর, এই ধরনের ছবি যদি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে তবে চিত্রব্যবসায়ীরাও সহজেই তাঁদের কর্তব্য স্থির করে ফেলেন। অর্থাৎ তাঁরা এ ধরনের ছবি তৈরিতেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

এই পরিস্থিতির উদ্ভব যখন ঘটে তখন শুরু হয় শিল্পকলার সংকট। কারণ, চলচ্চিত্রনির্মাতারা তখন ভাবতে আরম্ভ করেন—কী দরকার উ'চুদরের শিল্প-কলার, যার মধ্যে আর্থিক সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নেই? ফলে, শিল্পরুচিবর্জিত হাল্কা আমুদে অথবা স্থূল মেলোড্রামার ছবিই প্রসার লাভ করতে থাকে। এই ধরনের ছবি সাময়িকভাবে হয়ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পথটি প্রশস্ত করে। চলচ্চিত্র-শিল্পব্যবসায়ও হয়ত এতে লাভবান হয়। অবশ্য যতদিন দর্শকের রুচির পালা-বদল না ঘটে।

কিন্তু মহৎ শিল্প? সুন্দর সুচারু শিল্প? সংকট রয়েছে বলে তার শর্ত কি উপেক্ষিতই থেকে যাবে? এই প্রশ্ন আজ জেগেছে বাংলা ছবির নতুন যুগের চলচ্চিত্র-রূপকারদের মনে। তাঁরা ভাবছেন, বাংলা ছবির সংকট কি চলচ্চিত্র-শিল্পকলার আদিম যুগেই আবার দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? সংকট-সমস্যা ও প্রগতির ভাবনার মধ্যে এমনিভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বে কোন কোন শিল্পী হয়ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, তাঁদের গোত্রান্তর ঘটে। আবার কেউ হয়ত দ্বিগুণ নিষ্ঠায় নিজের আদর্শকে আঁকড়ে ধরেন। বাংলা চলচ্চিত্রে আজ বিপরীতমুখী মূল্যবোধের এই সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করব, নতুন যুগের কল্যাণকৃৎরা এই সংঘাতের মধ্যেই বাংলা ছবির ব্যবসায়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও শিল্পকৌলীন্যের ধ্রুব পথটি দেখাবেন।

রবীন চট্টোপাধ্যায়

ছায়াছবিতে সংগীতের ভূমিকা

"ফিল্ম মিউজিক যেন অনেকটা অ্যাপ্লায়েড মিউজিক। একে ফলিত সংগীত বলতে পারি।"— বললেন খ্যাতিমান সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। গত দুই

আগামীবারে ছায়াছবিতে চিত্রনাট্য সম্পর্কে বলবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রকাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

দশককাল যাবৎ বাংলা ছায়াছবির সংগীত-পরিচালনার কাজে তিনি প্রচুর যশ অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য। প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করা হল : "ফিল্ম মিউজিক বলতে কি

কমল মজুমদার পরিচালিত টার ফিল্মস-এর "অভিসারিকা"র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী (বাঁয়ে) ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নায়ক নির্মলকুমার

বোঝায়? এর কোন আলাদা সংজ্ঞা আছে কি?" উত্তরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বললেন, "শিল্পী সুরসৃষ্টি করেন নিজের অন্তরের প্রেরণায়, মনের আনন্দে। তাঁর এই আনন্দ ও সৃষ্টি নিঃশর্ত। কোন শর্ত তাঁকে পালন করতে হয় না। কিন্তু শিল্পী যখন ছায়াছবির সংগীত-পরিচালক হন, এখন তাঁর ভূমিকা হয়ে ওঠে ভিন্নতর। শর্তহীন শিল্পসৃষ্টি আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। নাটকের মর্মরস, কয়েকটি আবেগ-মুহূর্ত এবং বিশেষ ভাব-পরিমণ্ডল ও পরিবেশকে সুরসৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করার দায়টি তখন তাঁকে নিতে হয়। সংগীতের একটি ফলিত রূপ ও রস তখন তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়। এই ফলিত সংগীতকে আমরা 'ফিল্ম মিউজিক' বলতে পারি।"

"সুরসৃষ্টি যখন এমনিভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখন সংগীতের অনন্ত সম্ভাবনা অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়ে না কি? বিশেষ করে সুরসৃষ্টির লক্ষ্য যখন নাটক ও জন-মনোরঞ্জনের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে?" এই প্রশ্নের উত্তরে সংগীত-পরিচালক বলেন, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে। অর্থাৎ পূর্ণ থেকে পূর্ণকে বিচ্ছিন্ন করলেও তা পূর্ণই থাকে। পূর্ণ বা অনন্তের ক্ষয় নেই। অনন্তের কণিকামাত্রও অনন্ত। সংগীত যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে তোলে তখন শুধু তা ফলিত শিল্পেই পরিণত হল। তার পূর্ণরূপ এতে খণ্ডিত হল না।

"তবে সাধনায়ও পদস্খলন ঘটে, সুন্দরেরও বিকৃতি ঘটে। অসুস্থ জনরুচিকে তুষ্ট করার জন্য যদি কোন ছবিতে সংগীতের অপমৃত্যু ঘটে তবে তার জন্য দায়ী সুরকারের মানসিকতা। সুর মানুষের মনের রঙ। যার মনের যেমন বাসনা তিনি তেমন সুরই রচনা করেন। বাসনা যদি বিশুদ্ধ হয় তবে সংগীতের পবিত্রতাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

"গোত্রপরিচয়ে ছায়াছবি শিল্প হলেও এর বাণিজ্যিক দিকটি অস্বীকার করা চলে না। বাণিজ্যের কলুষস্পর্শ থেকে ছায়াছবির নির্মাতারা যেমন অনেক সময় মুক্ত হতে পারেন না তেমনি সংগীত-পরিচালকরাও অনেক সময় পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ থেকে মুক্তি পান না। তাই তো অনেক সময়ে সুন্দরের বিকৃতি ঘটে। তবে সত্যিকারের সংগীত-পরিচালক তিনি, যিনি বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনকে শিল্পের প্রেরণায় পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন, পেশার দাবিকে শিল্পের আনন্দে সার্থক করে নিতে পারেন।"

"আজকাল ছায়াছবিতে আধুনিক সংগীতের নামে সংগীত-কলার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে রসজ্ঞ ব্যক্তিদের যে অভিযোগ শোনা যায়, সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, "দেখুন, সিম্‌ফনির দেশেও তো "রক এন' রল" ও "জাজ"-এর দাপট শুরু হয়েছে। সে দেশেও এর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু "রক এন' রল" ও "জাজ"কে সভ্যদেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া এখন সম্ভব হয়নি। আসল কথা কী জানেন, সব দেশেই হঠাৎ করে এক ধরনের কালধর্মের সূচনা দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে সমাজ-জীবনের বিকৃত রুচি থেকেই এই কাল-ধর্মের উদ্ভব ঘটে। আমাদের আধুনিক সংগীতে যদি আজ এই বিকৃতি দেখা দিয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী অসুস্থ জনরুচি এবং যাঁরা এই রুচিকে পোষণ করে যাচ্ছেন।"

"আমি বলি", দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন সুরকার শ্রী চট্টোপাধ্যায়, "আধুনিক সংগীত খুব সহজ জিনিস নয়। শাস্ত্রীয় সংগীত, বিভিন্ন লোকসংগীত ও বিবিধ সুর-রীতি থেকেই আধুনিক সংগীতের উদ্ভব ঘটেছে।

এই সব কিছুরই সমন্বয় আধুনিক সংগীত। রাগপ্রধান গান কি আধুনিক গান নয়? ঠুংরি আধুনিক গান নয়? আমি নিজে অনুভব করেছি, গবেষণা করে দেখেছি, আধুনিক গানের ব্যাকরণে কত রাগ-রাগিণী, কত বিভিন্ন সংগীত-ধারার প্রভাব এসে পড়ে ও অনুপ্রবেশ ঘটে। আধুনিক সংগীত যদি শাশ্বত সংগীতের অববাহিকা না হত তবে তা রসিকজনের মন এমনভাবে নাড়া দিত না।"

"আজকালকার বাংলা ছায়াছবি থেকে বাংলার নিজস্ব সংগীত-ধারা—যেমন টপ্পা, পুরাতনী, বাউল, কীর্তন ও বিভিন্ন লোক-সংগীত প্রভৃতি—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে সংগীত পরিচালক বলেন, "আগেই বলেছি, সুররচনায় সুকৃতি ও বিকৃতি—সব কিছুই নির্ভর করে সংগীত-পরিচালকের ব্যক্তিগত মানসিকতার ওপর। হাল্কা পাশ্চাত্ত্য গানের সুরে যখন শ্রোতার মনে দোলা দেওয়া যায় তখন অনেকে তাই চেষ্টা করেন। বাংলার নিজস্ব সংগীত-সম্পদকে ছায়াছবির গানে কীভাবে প্রতি-ফলিত করা যায় তা নিয়ে আমি আমার সুরকার-জীবনের শুরু থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছি। কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচার করবেন বিদগ্ধ রসিকজন। আমার তৃপ্তি এই, আমি কখনও অসুস্থ রুচির সঙ্গে আপস করিনি। "নিরুদ্দেশ" ছবিতে আমি ধ্রুপদ ও খেয়াল পরিবেশন করেছিলাম। আধুনিক গানের সুররচনায় রাগ-রাগিণীকে চিরকালই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। ওই তো সেদিন "কেরী সাহেবের মুন্সী" ছবির গানের সুরারোপেও আমি পুরাতনী, ঠুংরি ও লোকসংগীতকেই নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছি।"

"একালে বাংলা ছায়াছবির জন্য যেসব গান লেখা হয় তার কথা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় কৃত্রিম ও ভাবশূন্য। এসব গানের সুররচনায় আপনাদের প্রেরণা অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে না কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে রবীনবাবু বলেন, "স্তিমিত হয়ে পড়ে বইকি। এমন গানও আমাদের সামনে এনে ফেলে দেওয়া হয় যার কথা ও ভাব দেখে সুরের প্রেরণাই অনেক সময় হারিয়ে ফেলি।" প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "অজয় ভট্টাচার্যের গানে সুর দেওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম "অশোক" ও "পরিণীতা" ছবিতে। "অভয়ের বিয়ে" ও "সমাধান" ছবিতে আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রর গানে সুর দিয়েছি। তাঁদের লেখা গান যেন মনে এক বিশেষ প্রেরণা যোগাত। পরবর্তী কালে যাঁর লেখা গানে আমি সব চাইতে বেশী আনন্দের সঙ্গে সুর দিয়েছি তিনি হলেন শৈলেন রায়। প্রণব রায়ের লেখা গানও আমি খুব ভালবাসি।"

"সংগীত-পরিচালনার কাজে আপনাদের সাধারণত কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, "যে ছবিতে সুরসৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের নিতে হয় তার স্ক্রিপ্ট মাত্র একবার আমাদের পড়ে শোনানো হয়। পরি-চালক বলে দেন, এই এই জায়গায় গান চাই। এর পর আমাদের কাজ শুরু হয়। গানের সুর দেওয়া হয়ে গেলে তা নিয়ে ভাববার কোন অধিকার আর আমাদের থাকে না। কীভাবে সে গান ছবিতে প্রযুক্ত হবে তা নিয়েও কোন কথা বলবার অধিকারী আমরা নই। প্রয়োগের দোষে গান যদি শ্রোতার মনে রেখাপাত না করে তবে নিন্দা সইতে হয় আমাদেরই। তা ছাড়া গানের সুরারোপ ও আবহ-সুরসৃষ্টির কাজেও আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীন মত, কল্পনা ও পরিকল্পনা অনেকাংশে বিসর্জন দিয়ে চলতে হয়। অনভিজ্ঞের নির্দেশও যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মেনে নিতে হয় না তা নয়।"

"এর প্রতিকার কী?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমার মতে ছবির কাজ শুরু হওয়ার আগে সংগীত-পরিচালকের হাতে স্ক্রিপ্টটি দিয়ে কোথায় কী ধরনের গান থাকবে তা ঠিক করার ভারটি তাঁর ওপরই

চিত্রযুগ-এর দ্বিতীয় নিবেদন "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ" (পরিচালক : গুরু বাগচী) ছবির একটি নৃত্য-দৃশ্যে নায়িকা সন্ধ্যা রায় ও নায়ক নিরঞ্জন রায় ফটো—দেশ

ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য ছবিতে ক'টি গান থাকবে, কী ধরনের গান থাকবে, এ বিষয়ে চিত্রপরিচালকের পরামর্শ ও নির্দেশের সংগে একমত হয়েই সংগীত-পরিচালক তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। আমি আরও মনে করি, ছবির গানের দৃশ্যগ্রহণের সময়ে সংগীত-পরিচালকের উপস্থিতি অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এসব দৃশ্যে সংগীত-পরিচালকের নির্দেশের ওপরই চিত্রপরিচালকের নির্ভর করা উচিত। কারণ, প্লে-ব্যাক গানের সংগে শিল্পীর ওষ্ঠ-সঞ্চালন এবং তার মুখের অভিব্যক্তি ও হাব-ভাব কীরূপ হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে সংগীত-পরিচালকই সুষ্ঠু নির্দেশ দিতে পারেন। ছবিতে গানের প্রয়োগ সম্বন্ধেও সংগীত-পরিচালকের মতামতকে সর্বাগ্রে মূল্য দেওয়া উচিত।"

আবহ-সংগীত রচনার জন্য সংগীত-পরিচালককে যে সামান্য সময় দেওয়া হয় (এমন কি অনেক ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে তাঁকে এ কাজ শেষ করে দিতে হয়), সে সম্পর্কে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, "এতে সুষ্ঠু ও উচ্চাংগের সুরসৃষ্টি কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।"

পরিশেষে চিত্রসমালোচকরা ছায়াছবির সংগীত-পরিচালনার যে সমালোচনা করে থাকেন, সে প্রসংগে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, "চিত্রসমালোচনায় ছবির সংগীত-পরিচালনাকে অবহেলা করা হয়ে থাকে। সমালোচকরা ছবির সংগীতাংশকে শুধু 'ভাল', না হয় 'মন্দ' বলেই নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। কেন "ভাল" হল, "মন্দ"ই বা হল কেন তার কোন বিশদ ও গঠন-মূলক আলোচনা থাকে না চিত্র-সমালোচনায়। এর ফলে সংগীত-পরিচালকরা যেমন তাঁদের নিজস্ব কাজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন না, তেমনি পাঠকরাও এ বিষয়ে যথাযথ মতামত গঠন করতে পারেন না। সংগীত যে ছায়া-ছবির একটি অন্যতম প্রধান অংগ এই সত্যটি অনুধাবন করার জন্য চিত্রসমালোচকদের অনুরোধ জানাই।"

* শুভমুক্তি *

বর্তমান সপ্তাহে একটি বাংলা ছবি ও তিনটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবিটি হল **অভিসারিকা** (টাস ফিল্মস)। হিন্দী ছবি তিনটির নাম: **বানারসী ঠগ** (জুবিলী পিকচার্স), **খোলা ঔর শবনম্** (পারিজাত পিকচার্স) ও **তুফানী টার্জন** (নবশক্তি ফিল্মস)।

কমল মজুমদার পরিচালিত 'অভিসারিকা' ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন হরি-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রিয়া চৌধুরী, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, ভারতী দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ ও রাজলক্ষ্মী এই ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

'বানারসী ঠগ' (পরিচালনা: লেখরাজ ভাকরি) ছবিটির কাহিনী সহজেই অনুমেয়। মনোজ ও বিজয়া চৌধুরী ছবির নায়ক-নায়িকা। ইকবাল কুরেশী ছবির সংগীত পরিচালক।

'খোলা ঔর শবনম্' (পরিচালনা: রমেশ সায়গল) ছবিটি প্রণয়মূলক। তরলা, ধর-মিন্দার ও অভী ভট্টাচার্য ছবির মুখ্য শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন খৈয়াম।

আজাদ ও শান্তাকুমারী অভিনীত 'তুফানী টার্জন' ছবির উপজীব্য হল: টার্জনের বিক্রম ও প্রণয়। এ আর জমিন্দার ও ইকবাল যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক।

* চিত্র-সমালোচনা *

দ্বন্দ্বহীন ত্রিভুজ প্রণয়

দুই নারী ও এক পুরুষ—কোন ছবির প্রণয়োপাখ্যানে এই তিন চরিত্রের সমাবেশ ঘটলে দর্শকরা সাধারণত জটিল নাট্যদ্বন্দ্বের আশা পোষণ করেন। 'শেষ চিহ্ন' (চিত্র-সংসার নিবেদিত) ছবিতে ওই তিন চরিত্র আছে, প্রণয়ও আছে—নেই শুধু দ্বন্দ্ব।

ছবিতে গল্পলেখিকা ও চিত্রনাট্যকার লীনা দেবী এমন এক নায়ক-চরিত্র এনে উপস্থিত করেছেন যার অন্তর-বাসনার স্বরূপটি অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। দুই তরুণীর প্রতিই যেন নায়কের সমান অনুরাগ। বিদেশ থেকে সে দুজনের কাছে একই ধরনের পত্র লেখে। এবং সে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুজনের কারোরই যেন বিয়ে না হয়—ওটাই তার কাম্য।

দেশে ফিরে নায়ক শিবনাথ দেখে যে, এক নায়িকার বিয়ে হয়ে গেছে। যার বিয়ে হয়েছে তার নাম মিনতি, যার হয়নি তার নাম লতা। মিনতি এবং লতা—এরা উভয়েই যে শিবনাথের প্রতি প্রণয়াসক্ত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মিনতির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় শিবনাথকে মর্মাহত দেখা গেল। লতার বিয়ে হয়ে গেলেও সে বোধ হয় অমনিভাবেই মর্ম-বেদনা অনুভব করত।

যা হোক, মিনতির বিয়ের ঘটনায় নায়ক খুবই মনোবেদনা পেয়েছে। কারণ, তার বাল্যপ্রণয় ছিল মিনতির সংগে। পাশাপাশি বাড়িতে ওরা বড় হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় অবস্থায় সে লতাদের বাড়িতে আশ্রয় পায়। বাল্যকালে লতার সংগে তার প্রণয় ছিল এমন কোন আভাস নেই ছবিতে। তবে বয়োবৃদ্ধির পর লতার প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ পায়নি এমন কথা হলপ করে বলা মুশকিল।

বিদেশে যাওয়ার আগে শিবনাথ মিনতির বাবার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেয় যে, সে না ফেরা পর্যন্ত তিনি কন্যার বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হবেন না। কিন্তু প্রবাসী নায়কের সংগে সদা যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও মিনতির বাবা কেন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করলেন না এবং কী অবস্থায় বাধ্য হয়ে অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলেন, তা দর্শকদের জানবার সুযোগ ঘটেনি।

শিবনাথ প্রথমে মর্মাহত হলেও পরে সহজভাবেই মিনতির বিয়ের ঘটনাটি মেনে নিল। এবং অল্পকালের মধ্যেই ওদের মধ্যে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। অপর দিকে পিতা ও ভ্রাতার প্রশ্রয়ে এবং জননীর বিরোধিতায় (নায়কের প্রতি যিনি সদা অসহিষ্ণু) শিবনাথ ও লতার প্রণয়-সম্পর্ক দিনে দিনে গভীর হল এবং একদিন সকল বাধার অবসানে তাদের শুভ-মিলন ঘটল।

ইতিমধ্যে মিনতি বিধবা হয়েছে, তার পিতা পরলোকগমন করেছেন। মিনতির রুগ্ন সন্তানকে শিবনাথ (বলা হয়নি, বিদেশ থেকে সে বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে) সারিয়ে তুলেছে। তারপর শিবনাথ ও লতার বিয়ের রাত্রেই মিনতি মারা গেছে। মিনতির শেষ চিহ্নস্বরূপ তার সন্তানকে কোলে তুলে নিল লতা।

এই অপরিণত কাহিনীতে দুই প্রণয়িনী ও এক প্রণয়ীর প্রয়োজন কী ছিল এই প্রশ্নই সর্বাগ্রে দর্শকের মনে জাগবে। কারণ, প্রণয়ের ত্রিধারায় নাট্যমুহূর্তের আবর্ত নেই, কোন জটিলতা নেই, কোন সংঘাত নেই। শিবনাথ-লতার প্রণয় সহজ, স্বচ্ছন্দ পথেই সুপরিণতিতে এসে ঠেকেছে। মিনতিকে ঈর্ষাকাতর, আত্মসুখপরায়ণরূপে চিত্রিত করার ইচ্ছা হয়ত লেখিকার ছিল না। তাই বলে ত্রিকোণ প্রণয়ে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত কেন থাকবে না? শিবনাথ ও মিনতির মিলন ঘটলে যে লতার মনে কোন প্রতি-ক্রিয়া দেখা যেত তাও নয়। তাই নায়কের দুই পাশে দুই নারীকে এনে দাঁড় করাবার কী প্রয়োজন ছিল? অন্য দিকে কোন নারীর প্রতিই নায়কের প্রেমের একনিষ্ঠতা বোঝা গেল না।

'শেষ চিহ্ন' একটি মামুলী প্রেমের কাহিনী। এই গল্পের শিবনাথ ও লতার প্রণয় সরলরেখায় সুখপরিণতিতে এসে পৌঁছেছে। লতার জননীর বিরোধিতা (যে চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় দীর্ঘকালের) শুধু প্রণয়ী-যুগলের গোপন প্রেমলীলার সহায়ক হয়েছে।

নবাগত চিত্রপরিচালক বিভূতি চক্রবর্তী —যিনি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ছবির আলোক-চিত্র গ্রহণের কাজ সম্পাদন করেছেন—এই প্রেমোপাখ্যানকে রসবোধমণ্ডিত ও সচেতন প্রয়োগ-কর্ম দিয়ে যথাসম্ভব উপভোগ্য করে তুলেছেন। চিত্রপরিচালক হিসাবে তাঁর এই প্রথম স্বাধীন প্রয়াস সম্ভাবনাপূর্ণ।

অনিল চট্টোপাধ্যায় (নায়ক) ও সন্ধ্যা রায়ের (লতা) অভিনয় ছবির আবেদন বাড়িয়েছে। কষ্টকল্পিত চরিত্রে শ্রীচট্টো-পাধ্যায়ের অভিনয়-দক্ষতা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব লক্ষণীয়। সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় প্রাণবন্ত, তাঁর প্রণয়ের অভিব্যক্তি মধুর। লিলি চক্রবর্তী (মিনতি) সুষ্ঠুভাবে চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন কমল মিত্র, অনুপকুমার, রসরাজ চক্রবর্তী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায় ও তুলসী চক্রবর্তী।

গানের সুরারোপে এবং আবহ-সুররচনায় সংগীত-পরিচালক রথীন ঘোষ আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। আবহ-সুর নাট্যমুহূর্তের ভাবপ্রকাশে অক্ষম। গানের সুরে কীর্তনের ঢঙ ও হিন্দী ছবির হাল্কা গানের মেজাজের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন জে ডি ইরানী (শব্দগ্রহণ), বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (শব্দ-পুনর্যোজনা)।

পরলোকে শ্রীরণেন রায়

গত ১৫ই আগস্ট বুধবার শ্রীরণেন রায়ের (তাঁর কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের বাসভবনে) হৃদরোগে জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হ'য়েছিল। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদৌহিত্র ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ডাঃ গোপালচন্দ্র রায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই-এম-এস। শ্রীরণেন রায়ের নানা বিষয়ে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু তাঁর আজীবন সাধনা ছিল নাটক ও রঙ্গমঞ্চ। তিনি সুবিখ্যাত লিট্‌ল থিয়েটার সম্প্রদায়ের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লিট্‌ল থিয়েটার প্রযোজিত শেক্সপিয়রের নাটকগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা শ্রী রণেন রায়ের অসাধারণ অভিনয়-দক্ষতা ও মার্জিত রুচির পরিচয় পেয়েছেন।

শ্রীরণেন রায়

১৯৫১ সালে শ্রীরণেন রায় ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে ৮ বৎসর তাঁর নানা কাজের মধ্যে তিনি অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে গভীর পড়াশুনা ও চর্চা করেন। এই কয়বৎসরে তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেন এবং তাঁর প্রযোজিত "রক্তকরবী" লণ্ডনের রসজ্ঞ দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। তাঁহার প্রযোজিত ও অভিনীত ইংরাজী নাটকগুলির মধ্যে "ওথেলোর" রূপায়ন স্মরণীয়। তিনি বি-বি-সি টেলিভিসনেও নিয়মিত অভিনয় করতেন।

দেশে ফেরবার পর তাঁর স্বাস্থ্যহানি সত্ত্বেও শ্রীরণেন রায় নিরলসভাবে কাজ করে যান। তিনি থিয়েটার সেন্টারের পরিচালিত "স্কুল অফ ড্রামাটিক্স"-এর অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করে অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান শিক্ষকতার কার্যে নিয়োজিত করেন।

বক্তা, সুলেখক, শিক্ষক, প্রযোজক, অভিনেতা—শ্রীরণেন রায়ের পরিচয় বহুবিধ। কিন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের কাছে শ্রীরণেন রায়ের যে দিকটি সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে, তা হ'ল তাঁর প্রাণোচ্ছল, আনন্দোজ্জ্বল, সরল ব্যক্তিত্ব। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা শ্রীরণেন রায়কে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারেন নি এবং তাঁরা তাঁকে কোনদিনই ভুলতে পারবেন না।

ছবির পর ছবি

অভিযান

সত্যজিৎ রায় চিতোরে 'অভিযান' ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ সমাপ্ত করে গত সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বর্তমানে ছবির সম্পাদনার কাজ চলছে। এ-সপ্তাহে 'অভিযান'এর আবহসংগীত রচনার কাজ শেষ করেছেন সত্যজিৎ রায়। আগামী মাসে ছবিটি কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে। অভি-যাত্রিক' প্রযোজিত এই ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওয়াহীদা রেহমান, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির কাহিনী-কার।

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

চিত্রযুগ-এর দ্বিতীয় নিবেদন 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'এর চিত্রগ্রহণের কাজ গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন গুরু বাগচী। রমাপদ চৌধুরীর বহুপঠিত কাহিনী এই চিত্রপ্রয়াসের অবলম্বন। সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, অমিত দে, শিপ্রা সেন প্রমুখ শিল্পীরা ছবির মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন। সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরারোপে কয়েকটি গান সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে। গানে যাঁরা কণ্ঠদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

জীবনের কোন একটি
ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি
পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার
মাটির কৌটার
একটি তিলক আমার কপালে

এবারকার স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পাহাড়ী সান্যালকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

ফটো—দেশ

স্টার-এ অনুষ্ঠিত "শেষাগ্নি" নাটকের শততম অভিনয়-রজনীর স্মারক উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন (বাঁ-দিক থেকে) কমল মিত্র, অপর্ণা দেবী, গীতা দে ও বাসবী নন্দী ফটো—দেশ

পাদপ্রদীপের আলোয়

"শেষাগ্নি"র শত অভিনয়

গত শনিবার সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে 'শেষাগ্নি' নাটকের শততম অভিনয়-রজনী পূর্তির স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। উৎসব উপলক্ষে রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিল-কুমার মিত্র ডাঃ বিধানচন্দ্র স্মৃতি তহবিলে ১০০১ টাকা দান করেন। তা ছাড়া 'শেষাগ্নি'র সাফল্যে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ নাট্যকার, কাহিনীকার, শিল্পী, কলাকুশলী ও রঙ্গালয়ের সকল কর্মীকে সোনার বিভিন্ন দ্রব্য উপহার দেন। উৎসবে 'শেষাগ্নি'র অধিকতর সাফল্য কামনা করে সময়োচিত ভাষণ দেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমতী রাধা-রানী দেব, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। অনুষ্ঠান শেষে রঙ্গালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

মুখোশ-এর নব-পরিকল্পনা

দক্ষিণ কলকাতার স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার সেণ্টার-এর পরিচালক মুখোশ-গোষ্ঠী তাঁদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠান-সূচী ঘোষণা করেছেন। গত দেড় বছরে তাঁরা ধনঞ্জয় বৈরাগীর "আর হবে না দেরী", "রজনীগন্ধা", "এক পেয়ালা কফি" এবং সেই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন "অলীকবাবু" মঞ্চস্থ করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রবিবার ও ছুটির দিন চলবে দিলীপকুমার রায়ের ভক্তিমূলক নাটক "অঘটন আজো ঘটে"। এই নাটক সগৌরবে দেড় শত অভিনয়-রজনী অতিক্রম করেছে। জনসাধারণের অনুরোধে বৃহস্পতি ও শনিবার মাত্র ছয় রজনীর জন্য মঞ্চস্থ হবে "রজনীগন্ধা"।

রঙ্গমঞ্চের পরবর্তী মধ্যসাপ্তাহিক নাট্য-নিবেদন হল প্রেমেন্দ্র মিত্রর প্রহসন "ওরা থাকে ওধারে"। নাটকটি পরিচালনা করবেন পিকলু নিয়োগী। নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনায় থাকবেন তরুণ রায়। আবহ-সংগীত রচনার দায়িত্ব সম্পাদন করবেন তরুণপ্রসাদ।

মুখোশ-সম্প্রদায় ইতিমধ্যে আরও দুটি নাটকের মহলা শুরু করে দিয়েছেন। নাটক দুটি হল ঃ শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" (দ্বিজেন্দ্র শত বার্ষিকীর জন্য)।

যেসব শিল্পীর পক্ষে পেশাদার মঞ্চে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার অভিনয় করা সম্ভব নয়, অথচ যাঁরা অভিনয় করতে ইচ্ছুক তাঁদের সুযোগ দেবার জন্য মুখোশ-গোষ্ঠী কিছুসংখ্যক সভ্য নিচ্ছেন। বার্ষিক দশ টাকা চাঁদার বিনিময়ে তাঁরা মুখোশ-এর ছয়টি নাটক বিনামূল্যে দেখতে পাবেন এবং মুখোশ আয়োজিত নাটকে অভিনয় করতে পারবেন। সভ্যদের নাম হবে "মুখোশ-বন্ধু"।

কে লালের "মায়াজাল"

গত সপ্তাহে নিউ এম্পায়ারে জাদুকর কে লালের 'মায়াজাল'-এর প্রদর্শনী শুরু হয়। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী 'মায়াজাল'-এ জাদুকর কে লাল প্রায় তিরিশটি খেলা প্রদর্শন করেন। খেলাগুলি নতুন নয়। কিন্তু পরিবেশনের গুণে এবং চিত্তাকর্ষক মঞ্চসজ্জার সহায়তায় সব কটি খেলাই যেন নতুনত্বের আস্বাদ নিয়ে এসেছে। কৌতুক ও আবহসংগীত এই জাদু-খেলার আকর্ষণ বাড়িয়েছে। 'গ্রোথ অব ফ্লাওয়ার্স', 'মোটরকার ভ্যানিশেজ', 'ফাইন্ড দি লেডি', 'চাইনিজ পানিশমেণ্ট' প্রভৃতি খেলাগুলি চমকপ্রদ।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া

এই সংস্থার নাম চিত্রামোদীদের অজানা নয়। চলচ্চিত্রশিল্পের অনুশীলন ও সমাদর বৃদ্ধিকল্পে ভারতে এবং বিশেষত কলকাতায় ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন প্রসারলাভ করেছে সম্প্রতিকালে। ভারতের বিভিন্ন ফিল্ম সোসায়েটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিচালক সংস্থারূপে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া গত ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে স্থাপিত হয়। বিদেশের মত এ-দেশেও যাতে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলন প্রসার লাভ করতে পারে মুখ্যত সে-উদ্দেশ্যেই এবং এদেশের বিভিন্ন সোসায়েটির কর্মধারার সহায়তার জন্য এই সংস্থা গঠিত হয়। সত্যজিৎ রায় এই সংস্থার সভাপতি।

"ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার" নামে চলচ্চিত্র-বিষয়ক একটি মূল্যবান ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এই সংস্থা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি বিদগ্ধ চলচ্চিত্রানুরাগীদের সন্তুষ্ট করবে। এই সংখ্যায় চিন্তাশীল লেখক-লেখিকাদের কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। এ'দের মধ্যে মারী সিটন, বি ভি গর্গ, কবিতা সরকার, ভি ইভানভ, সিনক্লেয়ার রোড প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট, দেশবিদেশের নামকরা চিত্রের অনেক ছবি এবং সুন্দর ছাপার গুণে পত্রিকাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। বি-৫ ভারত-ভবন, (৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ) থেকে প্রকাশিত ওই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র এক টাকা।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ফুটবল লীগের উপর যবনিকা পড়েছে। আরম্ভ হয়েছে আই এফ এ শীল্ডের খেলা। অবশ্য চতুর্থ এশিয়ান গেমের জন্য আমাদের দৃষ্টি এখন জাকর্তার দিকে। আই এফ এ শীল্ডের প্রথম দিকের দুখিনী মার্কা খেলায় কারো

চুনী গোস্বামী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি

উৎসাহ নেই। এশিয়ান গেম থেকে ভারতীয় দল ফিরে আসবার পর শীল্ডের খেলা জমে উঠবে। ফুটবলের মরা গাঙে আবার বান ডাকবে।

এবার প্রথম ডিভিশন লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে মোহনবাগান। শুধু চ্যাম্পিয়নশিপই পায়নি—মোট দশবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে লীগ জয়ের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কলকাতার ফুটবল লীগের ইতিহাসে এ পর্যন্ত আর কোন ক্লাব দশবার লীগ বিজয়ী হতে পারেনি। অবশ্য সামরিক দলকে বাদ দিলে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের গৌরব মাত্র ৬টি ক্লাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মোহনবাগান দশবার, মহমেডান স্পোর্টিং নয় বার, ক্যালকাটা আটবার, ইস্টবেঙ্গল সাতবার, ডালহৌসী চারবার, আর ইস্টার্ন রেল একবার লীগ জয় করেছে।

আটবারের লীগ বিজয়ী ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা আজ ধুলোয় মলিন। বহুদিন আগে থেকেই তারা নিতান্ত শক্তিহীন দল হিসাবে পরিগণিত। এবার ক্যালকাটাকে তৃতীয় ডিভিশনে নেমে যেতে হয়েছে। ডালহৌসী ক্লাবেরও সুনাম নষ্ট হয়েছে বহুদিন। কলকাতার ফুটবলে কোন সাহেবী দল আর প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে সে সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং লীগের বর্তমান প্রতিযোগিতা ভারতীয় দলের মধ্যে। সেই ভারতীয় দলের মধ্যে যারা লীগ জয়ের কৃতিত্বে অপর ক্লাবের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে তাদের কৃতিত্ব আছে বই কি!

তবে এই কৃতিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নাম এসে পড়ে। ভারতীয় দল হিসাবে সর্বপ্রথম লীগ জয় যেমন তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর তেমন ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৯ বার লীগ জয় তাদের ফুটবল ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের যে গৌরব অর্জনে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং তার চেয়েও বেশী গৌরব অর্জন করেছে। কালের বিধানে সেই মহমেডান দলের লীগ কোঠায় এবার দশম স্থান!

• • •

লীগের চক্র বক্রগতিতে আবর্তিত হয় বলে একটা কথা আছে। খেলা আরম্ভের পর এক এক সময় এক একটি দল থাকে শীর্ষস্থানে। যদিও দুটি কি তিনটি ক্লাবের মধ্যেই এই চক্রের আবর্তন। কিন্তু এবার লীগের চাকা বেশী ঘোরেনি। প্রথম দিকে এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। এক সময়ে মনে হয়েছিল কারো পক্ষেই আর তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। শেষ দিকে ইস্টবেঙ্গলকে পেছনে ফেলে মোহনবাগান এগিয়ে যায় এবং চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের

এ ব্যানার্জি এ রহমান

মুখে এসে পৌঁছয়। কিন্তু আবার বিপর্যয়। শেষ মুখে নাটক জমে ওঠে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান, দুই দলই

লীগ বিজয়ীর পুরস্কার-সহ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় মোহনবাগানের অধিনায়ক কেম্পিয়া

সমান সমান পয়েন্টে লীগের খেলা শেষ করে।

কলকাতা ফুটবল লীগের ইতিহাসে এটা অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। এর আগে আরও ৪ বার এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবার অর্থাৎ ১৯১০ সালে ডালহৌসী ও কাস্টমস লীগ কোঠার শীর্ষে ২০ পয়েন্ট করে অর্জন করে। গোল অ্যাভারেজে ডালহৌসী লাভ করে চ্যাম্পিয়নশিপ। দ্বিতীয়বার ১৯২৪ সালে ক্যামেরন, সাউথ ওয়েলস বর্ডার ও ডালহৌসী, তিনটি ক্লাবের শীর্ষস্থানে সমান পয়েন্ট থাকায় গোল অ্যাভারেজে ক্যামেরন চ্যাম্পিয়নশিপ পায়। দুই বছর পরে আবার নর্থ স্ট্যাফোর্ড ও ক্যালকাটা শীর্ষস্থানে সমান পয়েন্ট। এবার গোল

পি সরখেল

বি চ্যাটার্জি

অ্যাভারেজে চ্যাম্পিয়নশিপ ঘোষণা করার বিধান উঠিয়ে দিয়ে দুই দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এই খেলায় নর্থ স্ট্যাফোর্ড ৩—১ গোলে ক্যালকাটাকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়। ঠিক একই অবস্থার মধ্যে ১৯৩৮ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় কাস্টমসকে পরাজিত করে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। মহমেডান দলের সেটা ছিল উপর্যুপরি লীগ জয়ের পঞ্চম বছর।

দীর্ঘ ২৩ বছর পরে এবার একই অবস্থার মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়েছে। মীমাংসাসূচক অতিরিক্ত খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান লাভ করেছে চ্যাম্পিয়নশিপ। মোহনবাগানের এ

নারসিয়া

বি মজুমদার

জয় যোগ্যের যোগ্য সম্মান লাভ। কারণ প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের সঙ্গে খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। মোহনবাগানের খেলাও যে খুব উন্নত হয়েছে, একথা স্বীকার করতে পারছি না। ইস্টবেঙ্গলের খারাপ খেলার সঙ্গে একটু দুর্ভাগ্যও জড়িত ছিল। তবু তুলনামূলক বিচারে ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে মোহনবাগান অনেক ভাল খেলে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে

পরস্পরের চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্য আশা করা বৃথা। কারণ এটা শুধু ফুটবল মাঠের যুদ্ধ নয়—স্নায়ুযুদ্ধ। কোন দলই কোনদিন স্বাভাবিক ও সুসমঞ্জস ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারে না, খেলা দেখে দর্শকদেরও মনে ভরে না।

এবারকার চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা দেখে মন না ভরার দ্বিতীয় কারণ দুই দলেই খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি। এশিয়ান গেমের জন্য তাঁরা রয়েছেন জাকর্তায়। তাই এই বিশেষ খেলাটিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় তেমন সাড়া জাগেনি। খেলার আগে মজুতদারদের যেভাবে টিকিট বিক্রীর জন্য কাকুতি মিনতি করতে দেখেছি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

• • •

ফুটবল একজনের খেলা নয়। দলগত খেলা। দলের সামগ্রিক সাফল্যের ক্ষেত্রে সবারই কিছু না কিছু দান থাকে। তাই মোহনবাগানের লীগ বিজয়ে দলের সমস্ত খেলোয়াড়েরই কৃতিত্ব স্বীকার্য। তবু এই কৃতিত্বের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রথমে যাদের নাম মনে আসে তাদের মধ্যে অধিনায়ক চুনী গোস্বামী, সেণ্টার ফরোয়ার্ড মঙ্গল

শেখ আলী

দীপু দাস

পুরকায়স্থ, লেফট আউট অরুময়ের নাম উল্লেখ করার মত। চুনী ও অরুময় অবশ্য শেষ দিকের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তবু লীগ জয়ের পথে তারা যে ক্লাবকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আর মঙ্গল পুরকায়স্থ? সুযোগ সন্ধানী মঙ্গলের জন্যই চ্যাম্পিয়নশিপের নির্ণায়ক খেলায় মোহনবাগানের জয় সহজলভ্য হয়েছে। দুটি গোলই করেছেন তিনি একা। প্রথম গোলের ক্ষেত্রে ভাগ্যের সহায়তা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় গোল তাঁর চাতুর্য ও তৎপরতার ফল। চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় দুটি গোল নিয়ে মঙ্গল পুরকায়স্থ মোট ১৫টি গোলে এ বছরের

এম পুরকায়স্থ

অরুময়

সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন।

নীচে বে-সামরিক দলের লীগ জয়ের হিসাব, মোহনবাগানের সাফল্যের খতিয়ান ও গোলদাতার নাম এবং চারটি ডিভিশনের লীগ টেবল দেওয়া হল:—

লীগ জয়

মোহনবাগান—১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬২ সাল (১০ বার)

মহঃ স্পোর্টিং—১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪৮ ও ১৯৫৭ সাল (৯ বার)

ক্যালকাটা—১৮৯৮, ১৯০৭, ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২২, ১৯২৩ ও ১৯২৫ সাল (৮ বার)

ইস্টবেঙ্গল—১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৬১ সাল (৭ বার)

ডালহৌসী—১৯১০, ১৯২১, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সাল (৪ বার)

ইস্টার্ন রেল—১৯৫৮ সাল (১ বার)

মোহনবাগানের ২৮টি খেলার ফলাফল

পরাজিত করে—বাটাকে ৩—১, পুলিসকে ৫—০, বালী প্রতিভাকে ২—১, রাজস্থানকে ৩—১, স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৪—২, খিদিরপুরকে ৪—০ ও ২—০, বি এন আরকে ২—১ ও ২—০, হাওড়া ইউনিয়নকে ১—০ ও ১—০, মহঃ স্পোর্টিংকে ১—০ ও ১—০, এরিয়ানকে ৫—০, ইস্টার্ন রেলকে ২—১ ও উয়াড়ীকে ২—০ গোলে।

ড্র হয়—বাটার সঙ্গে ১—১, পুলিসের সঙ্গে ০—০, বালী প্রতিভার সঙ্গে ২—২, রাজস্থানের সঙ্গে ১—১, স্পোর্টিং ইউ-নিয়নের সঙ্গে ২—২, এরিয়ানের সঙ্গে ০—০, ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে ০—০ ও উয়াড়ীর সঙ্গে ০—০ গোলে।

পরাজিত হয়—জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে ০—১ ও ১—২, উয়াড়ীর কাছে ০—১ ও ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০—১ গোলে।

মোহনবাগানের গোলদাতা

এম পুরকায়স্থ—১৫, চুনী গোস্বামী—১৩, শেখ আলী—৭, অরুময়—৫, দীপু দাশ—৩, এ চ্যাটার্জি—২, এ দাস—১, নারসিয়া—১, এ চক্রবর্তী—১ ও বি চ্যাটার্জি—১।

প্রথম ডিভিশন

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পঃ
* ইস্টবেঙ্গল	২৮	১৪	১২	২	২৬	৭	৪০
* মোহনবাগান	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
হাওড়া ইউঃ	২৮	১২	৭	৯	২৭	২১	৩১
জর্জ টেলিঃ	২৮	১১	৮	৯	২৪	১৭	৩০
বাটা	২৮	১০	১০	৮	৩০	২২	৩০
ইস্টার্ন রেল	২৮	৯	৯	১০	২০	১৬	২৭
উয়াড়ী	২৮	৬	১৫	৭	২১	২৬	২৭
বি এন আর	২৮	৮	১০	১০	২২	২৫	২৬
রাজস্থান	২৮	৯	৮	১১	২১	২৬	২৬
মহঃ স্পোর্টিং	২৮	৬	১৩	৯	১৮	১৩	২৫
এরিয়ান	২৮	৮	৯	১১	২৭	৩২	২৫
স্পোর্টিং ইউঃ	২৮	৭	১১	১০	২৪	৩৪	২৫
পুলিস	২৮	৫	১৪	৯	২১	৩৩	২৪
বালী প্রতিভা	২৮	৬	১২	১০	২৮	৩৮	২৪
খিদিরপুর	২৮	৫	১০	১৩	১৪	৩২	২০

এ চক্রবর্তী এ চ্যাটার্জি

* [ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমান পয়েণ্ট অর্জন করায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে বিজয়ী হ'য়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে।]

দ্বিতীয় ডিভিশন

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পোর্ট কমিশনার্স	১৬	১০	৫	১	১৫	২	২৫
জাঃ এইচ এ সি	১৬	৮	৬	২	২০	৯	২২
অরোরা	১৬	৮	৫	৩	১৭	৭	২১
সালকিয়া ফ্রেণ্ডস	১৬	৫	৯	২	১২	৭	১৯
জোড়াবাগান	১৬	৮	৩	৫	১৯	১৬	১৯
বেনেটোলা	১৬	৫	৮	৩	৯	৬	১৮
কালীঘাট	১৬	৬	৫	৫	১৫	১১	১৭
ই এ সি	১৬	৪	৯	৩	১৯	১৪	১৭
ওঃ বেঃ পুলিস	১৬	৬	৪	৬	১৯	১২	১৬
ইণ্টার ন্যাশন্যাল	১৬	৩	১০	৩	১০	১০	১৬
ভবানীপুর	১৬	৫	৪	৭	১৫	১৯	১৪
ক্যালকাটা জিমখানা	১৬	৩	৭	৬	১১	১৬	১৩
সুবার্বন	১৬	৪	৫	৭	১৬	২৪	১৩
ডালহৌসী	১৬	৩	৬	৭	৭	১৬	১২
ইয়ং বেঙ্গল	১৬	৪	৪	৮	১২	২১	১২
গ্রীয়ার	১৬	৩	৫	৮	৮	১৪	১১
ক্যালকাটা	১৬	২	৩	১১	১৪	৩৪	৭

কেম্পিয়া অজয় দাস

তৃতীয় ডিভিশন

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পঃ
রেঞ্জার্স	১৬	১২	৩	১	৩১	৫	২৭
মিলন সমিতি	১৬	৮	৬	২	১৮	১২	২২
সি টি এ সি	১৬	৬	৭	৩	১২	১০	১৯
এলবার্ট	১৬	৬	৬	৪	১৬	১২	২৮
মৌরী স্পোর্টিং	১৬	৬	৬	৪	১১	১০	১৮
বেহালা	১৬	৬	৫	৫	১২	১৪	১৭
বাঁতরা	১৬	৫	৬	৫	১১	১৩	১৬
টাউন	১৬	৫	৬	৫	১৩	১৭	১৬
উত্তরপাড়া	১৬	৫	৫	৬	১১	৭	১৫
তালতলা	১৬	৫	৫	৬	১৬	১৭	১৫
কুমারটুলী	১৬	৩	৯	৪	১৩	২৪	১৫
ঐক্য সম্মেলনী	১৬	৫	৪	৭	১৭	১৬	১৪
বেলেঘাটা	১৬	৫	৪	৭	৯	১৪	১৪
বৌবাজার ওয়াই এম ইউঃ	১৬	১	১২	৩	৫	১০	১৪
বেনেপুকুর	১৬	২	৯	৫	৮	১১	১৩
ভিক্টোরিয়া	১৬	৪	৪	৮	১২	১৬	১২
কাস্টমস	১৬	১	৫	১০	৫	১৫	৭

চতুর্থ ডিভিশন

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পঃ
শ্যামবাজার ইউঃ	১৬	১১	৪	১	২১	৮	২৬
এম এম এসোঃ	১৬	৯	৫	২	২৮	১৩	২৩
মেকং	১৬	৯	৪	৩	২৩	১০	২২
শ্যামবাজার ক্লাব	১৬	৮	৪	৪	১৪	৯	২০
বাণী নিকেতন	১৬	৭	৫	৪	২৬	১৯	১৯
গার্ডেন রিচ	১৬	৮	৩	৫	২১	১৯	১৯
ওয়াই এম সি এ	১৬	৭	৪	৫	২০	১৩	১৮
ইউনিয়ন স্পোর্টিং	১৬	৭	৪	৫	২৪	১৭	১৮
আলীপুর	১৬	৬	৪	৬	১৫	১২	১৬
বুদ্ধিষ্ট	১৬	৩	৯	৪	১৭	১৮	১৫
ইউনাইটেড স্টুডেণ্টস	১৬	৪	৬	৬	১৬	২৪	১৪
ক্যালঃ পুলিস	১৬	৩	৭	৬	১৩	১৫	১৩
তালতলা দীপ্তি	১৬	৫	৩	৮	১১	১৮	১৩
আই বি এ সি	১৬	৩	৫	৮	১৪	২১	১১
রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং	১৬	৪	২	১০	১২	২০	১০
এক্সসেলসিয়র্স	১৬	৩	২	১১	১৭	৩৭	৯
মেসারার্স	১৬	২	৩	১১	১৩	২৬	৭

জাকর্তার এশিয়ান গেমে আগত ভারত ও পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধি

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

তপতী ভট্টাচার্য (মুখার্জি)

দেশ বিভাগের আগের ঘটনা। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ত তাণ্ডব। আজ এখানে লুঠতরাজ, কাল ওখানে অগ্নি-সংযোগ, পরশু আর এক যায়গায় খুনো-খুনি : মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই। জীবনের বদলে জীবনের বদলা নিতে সবাই মরিয়া। নরমুণ্ড নিয়ে পৈশাচিক খেলার নেশায় সবাই মাতাল। সারা শহরে অরাজকতার বিভীষিকা। কার সাধ্য ঘর থেকে বেরোয়? তার উপর কারফু, সান্ধ্য-আইন ও ১৪৪ ধারার বেড়াজাল। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রাণ রাখতে সদাই প্রাণান্ত। ঘরের মধ্যে প্রাণ নিয়ে টিকে থাকাই দায়। বাইরে বেরোবার সাহস কোথায়?

কিন্তু ওই অবস্থার মধ্যেই একটি মেয়েকে অনেকবার ঘর থেকে বাইরে বেরুতে হয়েছে। কখনো স্বামীর খোঁজে, কখনো অন্য কাজে, কখনো বা বিপদের সংকেত পেয়ে। কোন সময় সাইকেলে, কোন সময় পায় হেঁটে। উপায় ছিল না। এই খুনোখুনির মধ্যে স্বামীর খোঁজ না পেলে কোন্ স্ত্রী চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারে? কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদই কি তপতীর দুঃসাহসী হবার প্রধান অনুপ্রেরণা? না আর কিছু। আপদ-বিপদে বাংলার কত মেয়েই তো অসহায়ের মত মার খেয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। কিন্তু তপতী?

না, সে উপাদানে গঠিত হয়নি তপতী ভট্টাচার্য। কলকাতার স্পোর্টস করা মেয়ে। খেলার মাঠেই তার সাহসী মন তৈরী হয়েছে। স্পোর্টস জীবনে প্রতিপক্ষকেই ওর কাছে মার খেতে হয়েছে বেশী। নিজের পরাজয় কম। দাঙ্গাবাজদের ভয়ে ভীত হতে ওর মন কখনো সাড়া দেয়নি। বিপদ এসেছে। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিপদ উপেক্ষা করেছে বহুবার।

স্পোর্টস-পটু আর পাঁচটা মেয়ের মত শুধু দৌড়-ঝাঁপ করলে তপতী ভট্টাচার্যের মানসিক গঠন এমন শক্ত হত কিনা বলা শক্ত। একটি বিশেষ ধরনের স্পোর্টসই ওর মনের মধ্যে এমন সাহস এনে দিয়েছে। সে স্পোর্টসে বাঙ্গালী মেয়ে কেন—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাও আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি।

আমি বলছি মুষ্টিযুদ্ধের কথা। ক'টা বাঙ্গালী মেয়ে আজ পর্যন্ত হাতে গ্লাভস পরে মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলন করেছে। তপতী মুষ্টিযুদ্ধ শিখেছিল তার স্পোর্টসের শিক্ষাগুরু মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের কাছ থেকে।

অনেকের মতে মুষ্টিযুদ্ধ আসুরিক স্পোর্টস। রক্তের নেশাই নাকি মুষ্টিযুদ্ধের মূল কথা। রক্তাক্ত কলেবরে প্রতিপক্ষকে ভূতলশায়ী করার মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিকের আনন্দ ও সার্থকতা। সে যা-ই হোক, মুষ্টিযুদ্ধ আসুরিক স্পোর্টসই হক আর বিজ্ঞানসম্মত কলা-চাতুর্যের স্পোর্টসই হক, এ স্পোর্টস মানুষকে যতখানি সাহসী করে তুলতে সাহায্য করে অন্য স্পোর্টস ততখানি সাহসী করতে পারে না। বিপদের মাঝে বিভ্রান্ত না হবার এক আদর্শ শিক্ষাও রয়েছে এর মধ্যে।

তপতী ভট্টাচার্য অবশ্য মুষ্টিযুদ্ধে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি, তার ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল না। তবু যেটুকু শিক্ষা পেয়েছিল সেটুকুই তার মানসিক গঠনের পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো এই শিক্ষার ফলেই বিপদকে কোনদিন বিপদ বলে গ্রাহ্য করেনি তপতী।

আর অন্যান্য খেলাধুলো? সেখানে তপতীর সুনাম সত্যিই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। খেলা-ধুলার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপের বাঙ্গালী মেয়েদের অন্যতমা তপতী।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের ফাইল ঘাটতে গিয়ে দেখছি সমস্ত স্পোর্টসে এর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ফলাফলের মাঝে মাঝে তপতীর নাম, তপতীর ছবি। বাঙ্গালী-প্রধান স্পোর্টসে তো কথাই নেই—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও একাধিক স্পোর্টসে ওর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের মেয়ে হিসাবে ১৯৩৭ সালে ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৯৪১ সালে ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের ক্ষিপ্রতম মেয়ে। একশ ও দুশো মিটারে প্রথম স্থান। আশুতোষ কলেজের ব্যাক্তিগত চ্যাম্পিয়ন। উপর্যুপরি ৪ বছর। আই এস-সি ও বি এস-সি পড়বার সময় তপতী ছিল আশুতোষ কলেজের স্পোর্টস পটু মেয়ে।

এ ছাড়া সিটি এ সি স্পোর্টস, মোহন-বাগান স্পোর্টস, আনন্দ মেলা, বেহালা স্পোর্টস, কালীঘাট স্পোর্টস, লিলুয়া স্পোর্টস প্রভৃতি স্পোর্টস অঙ্গন থেকে তপতী যে কত প্রাইজ পেয়েছে আজ তার সঠিক হিসাব সম্ভব নয়।

বাঙ্গালী মেয়েরা ধীরে ধীরে স্পোর্টস অঙ্গনে প্রবেশ করছে। পিছু হটছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা। তাই নিয়ে তখন কত উৎসাহ উদ্দীপনা। ওয়াণ্ডারার্স, রেঞ্জার্স, ব্লু ট্রাঙ্গেল, জিউইস প্রভৃতি ক্লাব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইণ্ডিয়ান অ্যাথলেটিক ক্যাম্পের। তপতী ইণ্ডিয়ান অ্যাথলেটিক ক্যাম্পের নামকরা মেয়ে। স্পোর্টস পটিয়সীর অবয়ব। দেহের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। সারা দেহে শক্তির জ্যোতি। তাই আই এ ক্যাম্পের প্রধান পরিচালক বলাই চ্যাটার্জী শুধু দৌড়ের মধ্যে বেঁধে রাখেননি মেয়েটিকে। হাই জাম্প, সটপাট প্রভৃতি নানা রকমের স্পোর্টসে পটু করে তুলেছিলেন। হাই জাম্প ও সট পাটে সম্ভবত তপতীই প্রতিনিধিমূলক স্পোর্টসের প্রথম বাঙ্গালী মেয়ে।

শুধু প্রতিনিধিমূলক স্পোর্টস কেন, বেঙ্গল অলিম্পিকেও হাই জাম্প ও সট-পাটের প্রথম বাঙ্গালী মেয়ে তপতী ভট্টাচার্য।

আই এ ক্যাম্পে যোগ দেবার পর স্পোর্টসে তপতীর সমধিক প্রতিষ্ঠা। সবার মুখে মুখে তার নাম। কাগজে কাগজে তার ছবি। কিন্তু তপতীর খেলাধুলোয় খ্যাতি অর্জনের প্রথম পাঠ গ্রহণ মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের কাছ থেকে। বাগবাজার নন্দ-লাল বসুর বাড়ির মাঠে প্রথম ছোটাছুটি। তারপর ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে যোগদান। দেশবন্ধু পার্কে নিয়মিত অনুশীলন। এই সময়ই খেলাঘর স্পোর্টসে ওর বেস্ট গার্লের

তপতী ভট্টাচার্য (মুখার্জি)

পুরস্কার লাভ। স্পোর্টসের সংগে সাঁতারেও সুপটু হয়ে ওঠে মেয়েটি। আরম্ভ হয় মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলন। স্পোর্টসের উঠতি মেয়ে হিসাবে নাম হতেই জার্মানীতে তৈরী ক্যামেরা 'আইকোফ্লেক্স'-এর বিজ্ঞাপনের সংগে তপতীর ছবি ছাপা হয়। অর্থাৎ এই ক্যামেরা দিয়েই এমন সুন্দর স্পোর্টসের ছবি ছাপা হয়েছে।

তপতীর খেলাধুলার উন্নতির মূলে তার জেঠতুতো ভাই রাম ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সুসাহিত্যিক ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের পুত্র এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান দলের গোলরক্ষক (পরে মোহনবাগানের গোলরক্ষক) রাম ভট্টাচার্য ও তপতী ভট্টাচার্য এক সংগেই খেলাধুলা করেছে দেশবন্ধু পার্কে। শরীর গঠনের প্রয়োজনে ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য এদের খেলাধুলায় উৎসাহ তো দিয়েছেনই, তপতীর বাবা বর্তমানে 'এন্ডেয়ার ডট' কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্যও কম উৎসাহ দেননি। মোটের উপর বাগবাজারের ১২ নম্বর হরলাল মিত্র স্ট্রীটের বাড়িটি ছিল স্পোর্টসের পূজারী। সেই বাড়িরই মেয়ে রাম ভট্টাচার্য ও তপতী ভট্টাচার্য।

খেলাধুলার ক্ষেত্রে জীবনে বহু কৃতী পুরুষের উৎসাহ পেয়েছে তপতী। প্রাইজ নিয়েছে বহু রাজপুরুষের হাত থেকে। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পরলোকগত এ কে ফজলুল হক আন্তঃকলেজ স্পোর্টসের পুরস্কার বিতরণের সময় তপতীকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছিলেন কয়েকজন স্পোর্টস পরিচালকের আজও সে কথা মনে আছে। তপতীকে লক্ষ্য করে ফজলুল হক বলেছিলেন—'এরাই তো আমাকে হারিয়ে দিল'। শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল হকের কথার মর্ম ছিলঃ এদের জন্যই সরকারী কলেজ 'বেথুন' ও 'লেডী ব্রাবোর্নের' মেয়েরা প্রথম হতে পারেনি।

তপতী সম্বন্ধে কিছু লেখার খোঁজ-খবরের জন্য অধুনালুপ্ত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি ওর নামের একটু ইতিহাস আছে। এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে গর্বও জড়িত।

বাংলার খেলাপটু মেয়ে তপতীর নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' পত্রিকায় দেখছি—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের কাছে শান্তিনিকেতন থেকে কবির লেখা এক পত্রের প্রতিলিপি—। তাতে রয়েছেঃ কল্যাণীয়েষু তোমার মিষ্টান্নের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টবাক্য পাঠাব তোমার দূতটি সে অবকাশ দেয়নি—সুতরাং বাগবাজারের রসগোল্লাগুলি নিঃশব্দে পরিপাক করেচি। তোমার নবজাতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর কল্যাণ কামনা করি। আমার কাছে তার নাম চেয়েচ? অদিতির কন্যার নাম তপতী রাখতে পার। শীঘ্রই কলকাতায় যেতে হবে। ইতি ২৩ ভাদ্র, ১৩২৯।

কবির নাম রাখা কলকাতার খেলাপটু মেয়ে এই সেই 'তপতী'। গিরিজাবাবুর স্ত্রীর নাম অদিতি।

তপতী এখন তিন সন্তানের জননী। স্বামীর নাম তুলসীদাস মুখার্জী। লণ্ডনের পি এইচ ডি। এখন জোড়হাটে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের পোস্টসাইড অফিসার। প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল লখনৌ। পরে ঢাকা। ঢাকা থাকার সময়েই তপতীর মাথার উপর দিয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা পার হয়ে গিয়েছে। এখন শান্তির জীবন। স্বামীর অফিসের স্পোর্টসে লখনৌতেও দৌড়-ঝাঁপ করেছে। এখনো মাঠের ডাকে সাড়া আছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে আগস্ট—আজ লোকসভায় ভেজাল ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা কালে সকল দলের পক্ষ হইতেই এই ব্যাপারে সরকারী অপদার্থতার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত-কারীদের প্রকাশ্যে বেত মারো, ফাঁসি দাও, তাহাদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লও—সরকারের নিকট ইহাই হইল লোকসভা সদস্যদের দাবি।

ভারত সরকার রাজস্থানের কোটার নিকটে রাণা প্রতাপ সাগরের কাছাকাছি একটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন দ্বিতীয় আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২১শে আগস্ট—বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের পরীক্ষা সংস্কার কমিটি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান পঠনপাঠন এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা আদৌ অনুকূল বলিয়া মনে করেন না। কমিটির রিপোর্টে ছাত্রভর্তি, অধ্যাপনা, পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ঢালিয়া সাজাইবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অর্থ দপ্তরের সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটিকে নাকি বলিয়াছেন যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য তিনি দেশের মজুত সোনা টানিয়া বাহির করিতে চান।

২২শে আগস্ট—আসাম সরকার রাজ্যের বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণকার্য, বিশেষত জল বেষ্টিত স্থানে আটক লোকদের উদ্ধার এবং বিমান হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিক্ষেপের জন্য সেনাদলের সাহায্য তলব করিয়াছেন। আজ সরকারীভাবে এই সংবাদ জানান হইয়াছে।

আজ লোকসভায় ভাষাগত সংখ্যালঘু কমি-শনারের রিপোর্টের উপর আলোচনাকালে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সীমানা বিরোধ ও হিন্দীকে একমাত্র জাতীয় ভাষা করিবার দাবিই প্রাধান্য লাভ করে।

২৩শে আগস্ট—বর্তমান আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে আসামের সমতল অঞ্চলের ছয়টি জেলায় ব্রহ্মপুত্র ও উহার শাখানদীসমূহে অস্বাভাবিক জলস্ফীতির ফলে বহুস্থানে যান-বাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে মাছের অভাব, কিন্তু রাজ্য সরকার মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য হাতে টাকা পাইয়াও কিছুতেই তাহা খরচ করিতে পারিতেছেন না। ১৯৬১-৬২ সনে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মৎস্য উন্নয়ন ও পশু-পালন প্রকল্পের জন্য মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ ও সাহায্য দিতে রাজি হইয়াছিলেন। রাজ্য সরকার তাহার ৫৪ লক্ষ টাকাও খরচ করিতে পারেন নাই।

২৪শে আগস্ট—পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-দ্বীপ মাজুলী, বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান এবং সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থ রহিয়াছে যে মাজুলীতে—বন্যার প্রলয়ঙ্কর গ্রাসে সেই মাজুলী আসামের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে।

আগামী রাজ্য কৃষিমন্ত্রী সম্মেলনে পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষ হইতে বাড়তি অর্থ সাহায্যের কোন দাবি করা হইবে না। কারণ, টাকার অভাব নয়, হাতের টাকা খরচই পশ্চিমবঙ্গ কৃষি দপ্তরের বড় সমস্যা।

২৫শে আগস্ট—আজ লোকসভায় তৃতীয় যোজনার সাফল্য সম্পর্কে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীনন্দের ঘোষণা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্য পরিকল্পনার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার সামর্থ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন।

কলিকাতা হইতে দুর্গাপুর পর্যন্ত এক্সপ্রেস হাইওয়ে নির্মাণের প্রস্তাবটি আপাতত স্থগিত রাখা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের বক্তব্য হইতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

২৬শে আগস্ট—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য কংগ্রেস ভবনে এক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন নগরীর জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট বিস্তৃত পরিকল্পনা পেশ করিলে উহা রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার ৫ বছরে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

হিমালয় অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকায় তিস্তা নদী পরিস্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তিস্তার বন্যার তোড়ে জলপাইগুড়ি জেলার পাহাড়পুর এলাকায় প্রায় আধ মাইল লম্বা ও এক হাজার ফুট চওড়া জমি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে আগস্ট—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ৯ই জুলাই ঊর্ধ্বাকাশে যে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকে এক নূতন এবং সম্ভবত, অধিকতর বিপজ্জনক বিকিরণ—বলয় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানের সহিত গত সপ্তাহে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে সেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পাকিস্তানকে এক হাজার সৈন্য সরবরাহ করিতে বলা হইয়াছে। পশ্চিম ইরিয়ানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ পাকিস্তানকে এই সমুদয় সৈন্য প্রেরণের নির্দেশ দিয়াছেন।

২১শে আগস্ট—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, ইয়েমেনের ইমাম ১৬ জন ছাত্রকে গুলি করিয়া মারার এবং বাকীদের মাথা কাটিয়া ফেলার হুকুম দিয়াছেন। ছাত্রদের অপরাধ—গত শুক্রবার তাহারা ইয়েমেনের বিভিন্ন শহরে ইমামের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইয়াছিল।

সোভিয়েট মহাকাশ-অভিযাত্রী নিকোলায়েফ ও পপোভিচ কিভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া-ছিলেন সে রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁহারা বলেন, 'মহাকাশ-যান' ত্যাগ করিয়া আমরা দুই জনেই প্যারাসুটযোগে পৃথিবীতে লাফাইয়া পড়ি—ভোস্টক দুইখানা পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থামত রাশিয়ার অন্যস্থানে অবতরণ করে।'

২২শে আগস্ট—আর্জেণ্টাইন সেনাবাহিনীর নবনিযুক্ত প্রধান সেনাপতি জেনারেল কার্পোস মারিস টুরোলোকে নিয়োগের আট দিন পরই গতকাল ঐ পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তরুণ অফিসাররা জেনারেল টুরোলোর কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

গত রাত্রে গুয়ানাবারা উপসাগরে যে ব্রাজি-লিয়ান যাত্রিবাহী বিমানটি ভাঙিয়া পড়ে, তাহার মধ্যে আরও কয়েকটি মৃতদেহ রহিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ঐ বিমানে মোট ১০৪ জন যাত্রী ছিল। উহাদের মধ্যে ৮৫ জন রক্ষা পাইয়াছে। ১৪ জন নিহত ও ৫ জন নিখোঁজ হইয়াছে।

২৩শে আগস্ট—প্রেসিডেণ্ট কেনেডী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, মহাকাশ জয়ের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেক পিছনে রহিয়াছে। তবে তিনি এই বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, ১৯৭০ সালের পূর্বেই আমেরিকাই এ ব্যাপারে আগাইয়া যাইবে।

ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পরিকল্পনাকে সমর্থন করিয়া প্রেসিডেণ্ট কেনেডী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ভারত যদি কম্যুনিস্ট হইয়া যায় তাহা হইলে সমগ্র অনগ্রসর জগতে স্বাধীনতার আদর্শ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হইবে।

২৪শে আগস্ট—বার্লিন শহরে উত্তেজনা হ্রাসের জন্য সম্ভব হইলে বার্লিনেই চতুঃশক্তির বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা আজ সোভিয়েট ইউনিয়নকে পত্র দিয়াছে।

সোভিয়েট মহাকাশচারী আদ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও পাভেল পোপোভিচ আজ বলেন যে, মানুষে যাহাতে চন্দ্রে ও প্রতিবেশী গ্রহগুলিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশেই তাঁহারা গত সপ্তাহে মহাকাশ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলেন।

২৫শে আগস্ট—গেরিলা কর্নেলদের এক বিদ্রোহী চক্রের চাপে বেন বেলার পলিটিক্যাল ব্যুরো আজ ক্ষমতাচ্যুত হয়। পরিণামে আল-জেরিয়ার সম্মুখে নূতন করিয়া সংকট দেখা দিয়াছে। এ সঙ্কট পূর্বাপেক্ষাও মারাত্মক।

সশস্ত্র জাহাজ হইতে গতরাত্রে হাভানার উপকূলে গোলা বর্ষণ করা হয়। কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ কাস্ত্রোর অভিযোগ—"নূতন ও কাপুরুষোচিত" এই আক্রমণের জন্য দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২৬শে আগস্ট—কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিরিল আদুলা গত রাত্রিতে বলেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট কঙ্গো বিরোধের সমাধান করিয়া ফেডারেল ধরনের সংবিধান রচনা করিতে চাহিতেছেন এবং ইহার সঙ্গে তিনি একমত।

শুক্রবার রাত্রে সশস্ত্র জাহাজ হইতে হাভানার উপকূলে যে গোলা বর্ষণ করা হয় কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ কস্ত্রো সে জন্য মার্কিন সরকারকে দায়ী করেন, কিন্তু কিউবার ছাত্র-বিপ্লবী দলের ডিরেক্টর শ্রীজুয়ান ম্যানুয়াল স্যালডাণ্ট আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁহারাই নেতৃত্বে ঐ গোলা বর্ষিত হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার | সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মডেল ০৭২৪
৬-ভাল্‌ভ · অল-ওয়েভ · ৮-ব্যাণ্ড
সম্পূর্ণ ব্যাণ্ড স্প্রেড
এ সি বা এ সি/ডি সি (দুই মডেল)
মূল্য—৪৭৫, টাকা
অন্তঃশুল্ক ঃ ৭৫, টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

মডেল ০৪৫২
৬-ভাল্‌ভ—৯ ফাংশন সহ
অল-ওয়েভ · ৩-ব্যাণ্ড
পিয়ানো-কী সুইচ ঃ এ সি বা
এ সি/ডি সি
[illegible]—[illegible]৩০, টাকা
অন্তঃশুল্ক ঃ ৩০, টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

মডেল ০২৯৮
৩-ব্যাণ্ড এ সি/ডি সি
অল-ওয়েভ · ৫-ভাল্‌ভ
এবং মডেল ০২৯৯
(ড্রাই ব্যাটারী)
৪-ভাল্‌ভ
মূল্য—২০০, টাকা
অন্তঃশুল্ক—১৫, টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

murphy radio....

Delights the home!

মডেল ০৩৭৪
৬-ভাল্‌ভ—৯ ফাংশন সহ
· অল-ওয়েভ · ৪-ব্যাণ্ড
পিয়ানো-কী সুইচ
এ সি বা এ সি/ডি সি
(দুই মডেল)
মূল্য—৩৭৫, টাকা
অন্তঃশুল্ক—৩০, টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

মডেল ০৭০৪
৪ ভাল্‌ভ · অল-ওয়েভ · ২-ব্যাণ্ড
এ সি/ডি সি
মূল্য—১২৫, টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

মডেল ০৭৫২
৫-ভাল্‌ভ · অল-ওয়েভ
৩-ব্যাণ্ড · এ সি বা
এ সি/ডি সি
(দুই মডেল)
এবং মডেল ০৭৫১ ঃ
৫-ভাল্‌ভ
মূল্য—২৫০, টাকা
অন্তঃশুল্ক ঃ ১৫, টাকা
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

Mr. G 186

মার্ফি গৃহকে আনন্দমুখর করে

সূচীপত্র

সচিত্র

শ্রীমতী

একটি নিখুঁত ঘরোয়া মাসিকপত্র

যাঁরা লিখছেন :

- প্রতিভা বসু
- নরেন মিত্র
- আশাপূর্ণাদেবী
- জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
- মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
- কার্তিক মজুমদার
- বাণী রায়
- হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এবং যশস্বী আরও অনেকে

নিয়মিত বিভাগে রয়েছে :

● ফ্যাশান ● রূপ-চর্চা ● রান্না
● সিনেমা ● আইন ● স্বাস্থ্য
● মনস্তত্ত্ব ● গৃহসজ্জা ● জ্যোতিষ
● চিঠিপত্র ● কার্টুন ● খবর

প্রতি সংখ্যা—১, (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)
বার্ষিক—১২, (সডাক)

জি পি ও বক্স : ২৬০৬
১২৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ কলিঃ-২৯

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	৭·৫০

আর জে মিনির

চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২·৫০
অ না গ ত	২·০০
ভ্র ষ্ট ল গ্ন	২·৫০

সরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)	৩·০০

ত্রৈলোক্য মহারাজের

গীতায় স্বরাজ	৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

॥ আনন্দ - পাবলিশার্স - প্রকাশন ॥

উপন্যাস

তিন দিন তিন রাত্রি (২য় মুঃ)	৫·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
পঞ্চশর	৩·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রচ্ছদপট	৩·৫০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রতিধ্বনি ফেরে	৪·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
বনপলাশির পদাবলী	৮·৫০	রমাপদ চৌধুরী
বহু যুগের ওপার হতে (২য় মুঃ)	২·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মনের মানুষ	৩·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
মানুষ দেবতা হবে না	৩·০০	রবি গুহ মজুমদার
যে যাই বলুক	৬·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রং বদলায়	৩·৫০	বিমল মিত্র
রূপবতী (২য় মুঃ)	৩·০০	মনোজ বসু
রূপসী রাত্রি (২য় মুঃ)	৫·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শতকিয়া (২য় মুঃ)	৮·০০	সুবোধ ঘোষ
সারা রাত (২য় মুঃ যন্ত্রস্থ)	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গল্প-সংগ্রহ

কহেন কবি কালিদাস (২য় মুঃ)	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
গল্প-সংগ্রহ	৫·০০	সরলাবালা সরকার
তিন শূন্য	৩·৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রেমের গল্প	৪·০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেমের গল্প	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ভারত প্রেমকথা (১০ম মুঃ যন্ত্রস্থ)	৬·০০	সুবোধ ঘোষ
ময়ূরী	৩·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অন্যান্য

চণক-সংহিতা	৩·৫০	কালিদাস রায়
চিন্ময় বঙ্গ (৩য় মুঃ)	৪·০০	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন
নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি	৫·০০	গৌরীকিশোর ঘোষ
বিবেকানন্দ চরিত (১০ম মুঃ)	৬·০০	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
রবীন্দ্র মানসের উৎস-সন্ধানে	৩·৫০	শচীন্দ্রনাথ অধিকারী
রহস্যময় রূপকুণ্ড	৩·৫০	বীরেন্দ্রনাথ সরকার

কিশোর-সাহিত্য

ছেলেদের বিবেকানন্দ (৫ম মুঃ)	১·২৫	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
পিনকুর ডায়েরি	২·০০	সরলাবালা সরকার
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন	২·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 8th September 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ৪৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

শিক্ষার সম্প্রসারণ

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে লেখাপড়া শেখা সম্ভব নয়, আমাদের অভ্যস্ত ধারণা এই-রকম। লেখাপড়া মানে অবশ্য এখানে অনুমোদিত পাঠক্রম, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যার বিস্তৃতি এবং যার অন্ত্যফল হল নির্দিষ্ট পরীক্ষা-পর্ব অতিক্রম করে অনুমোদিত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট লাভ। অবশ্য এমন প্রতিভাধর অথবা কুশলী ব্যক্তির অভাব নেই যাঁরা প্রচলিত পদ্ধতিতে লেখাপড়া না শিখে, কোনও পরীক্ষা না দিয়ে এবং কোন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটের অনুমোদন না নিয়েও বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানে গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁদের কথা আলাদা, সব দেশে এবং সবকালে। তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম। অনুমোদিত শিক্ষাব্যবস্থাটা আর সকলের জন্য। এই শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাতে হয়। পাঠ নিতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাও দিতে হয়। প্রাচীনকালের মত গুরুশিষ্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এখন আর নেই, কিন্তু ওরই রূপান্তরিত সংস্করণ এখনকার কালের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ এবং ক্লাশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনতি-ঘনিষ্ঠ পরস্পর সম্পর্ক। এখন বোধকরি সেটুকু সম্পর্কও শিক্ষায়তনে বজায় রাখা সর্বত্র এবং সর্বদা অবশ্য প্রয়োজনীয় গণ্য করা হচ্ছে না। উক্তিটা আক্ষেপ-সূচক নয়, শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রচলিত ধারার পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য আকর্ষণ করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ-দেশে ডাকযোগে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন। ডাকযোগে শিক্ষা ব্যাপারটা এদেশে এখনও প্রায় অপরি-চিত। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে ডাকযোগে নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের যেসব লোভনীয় সুযোগ বর্ণিত হয় সে-গুলি অধিকাংশই ছলনামূলক। সরকারীভাবে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা কোন শিক্ষায়তনের মারফত ডাকযোগে শিক্ষাদানের উদ্যোগ এ-দেশে একেবারে নতুন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল অভ্যস্ত আমাদের মনে এই নূতন ধরণের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে নানারকম সংশয় জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়-গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিও ডাকযোগে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও খুব নিশ্চিত নন। তাঁরা বলেছেন, আমাদের দেশে এই পদ্ধতি একেবারে নতুন এবং সে-কারণে প্রথমত পরীক্ষা-মূলকভাবে খুব সাবধানে এই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত।

শিক্ষায় উন্নত অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার নজীর অবশ্য দেওয়া যায়। আমাদের দেশে নতুন হলেও য়ুরোপ আমেরিকার অনেক দেশে ডাকযোগে শিক্ষাদান ব্যবস্থা বহুকাল প্রচলিত। এর সার্থকতাও স্বীকৃত। কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিয়মিত কোর্সে পড়ার সুযোগ সকলেই পায় না: অর্থসামর্থ্যের অভাব সময়ের অভাব ঘটে অনেকেরই। ব্রিটেনের মত দেশে শতকরা আশীজন ছাত্রছাত্রী স্কুলের পাঠ শেষ করে জীবিকা অর্জনে লেগে যায়। আমাদের দেশে যোগ্য অযোগ্য নির্বিচারে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যে ভিড় করে তার কারণ জীবিকা অর্জনের সুযোগটা এখানে অনেকের কাছে সহজ-লভ্য নয়। সে যাই হোক, হায়ার সেকেণ্ডারী বা ইণ্টারমিডিয়েট পাসের পর যারা নানারকম কাজ কর্ম করে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়া-শোনার সুযোগ পায় না, তাদের নানা বিষয়ে যোগ্যতা এবং জ্ঞান অর্জনের পথ খোলা রাখা উচিত। কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সান্ধ্য ক্লাশের ব্যবস্থা এককালে ছিল না, এমন কি শিক্ষাকর্তারা এ-ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য বিবেচনা করেন নি। প্রয়োজনের তাগিদে এখন সে-ব্যবস্থাও পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশোনা না করেও 'প্রাইভেট' শিক্ষার্থী হিসাবে অনুমোদিত পরীক্ষা দিতে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সম্প্র-সারিত করে ডাকযোগে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া বর্তমান অবস্থায় খুবই সঙ্গত মনে করা যায়।

তবুও কিছু সংশয় থাকে। ডাকযোগে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-নীতি ব্যবস্থাপকগণ ঠিকমত উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি? বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে আপাতত বি এ এবং বি কম কোর্স ডাকযোগে শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ক কোর্সও অবশ্য এইধরণে প্রবর্তিত হবে কিছুকাল পর। কথা হল, বি এ ডিগ্রীর জন্য ডাকযোগে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের সার্থকতা কী? কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত কোর্সে পড়া-শোনা করে যারা বি এ ডিগ্রী লাভ করছে তাদের সংখ্যাই প্রচুর। এমন নয় যে, বহু যোগ্য শিক্ষার্থীরা কলেজে স্থানাভাবে বি এ ডিগ্রী কোর্সে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। সুযোগের অভাব বিজ্ঞান, কারিগরী এবং বিবিধ বৃত্তিকরী যোগ্যতা ও জ্ঞান অর্জনের। শিক্ষায় উন্নত দেশ যাকে বলে "ফার্দার এডুকেশন" তার আয়ো-জনটা বেশীর ভাগ কারিগরী, বৃত্তিকারী এবং বিবিধ বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য "ফার্দার এডুকেশন" বা "করেসপণ্ডেন্স কোর্সের" লক্ষ্য কেতাবী বিদ্যায় ডিগ্রী বিতরণ নয়। কলকারখানায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে যারা নানা কাজে নিযুক্ত তাদের যোগ্যতা এবং জ্ঞান উন্নততর করার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে এই ধরণের শিক্ষাদান ব্যবস্থা সংকল্প এবং প্রয়াস। আমাদের গোড়াতে মারাত্মক ভুল হবে যদি ডিগ্রী লাভের সনাতন পদ্ধতিটাই সামান্য অদলবদল করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাকযোগে শিক্ষা-দান ব্যবস্থায় জুড়ে বসতে দেওয়া হয়। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জ[illegible] ডাকযোগে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত[illegible] নিঃসন্দেহে সময়োচিত: কিন্তু সে সুযো[illegible] যাতে যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, এ[illegible] আধুনিক যুগের উপযোগী যথ[illegible] উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় তার [illegible] সুচিন্তিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

বৈদেশিকী

ঘানায় নানাভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছে, সরকার কোনো বিরোধী পক্ষের অস্তিত্বই বরদাস্ত করতে রাজী নন, প্রেসিডেন্ট নক্রুমার এবং নক্রুমার-উপাসকদের কোনো কাজ বা কথার মৃদুতম সমালোচনা করাও বিপজ্জনক—এই ধরনের অভিযোগ অনেকদিন থেকেই শুনা যাচ্ছে। অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্যসাবুদ দলিলপত্র কিছু নেই তাও নয়। তা সত্ত্বেও নক্রুমা সরকারের জবরদস্ত নীতির সোজাসুজি নিন্দা অনেকেই করতে চান নি এবং এখনো করতে চান না। বিনা বিচারে ঘানায় বহু লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এর জন্য যাঁরা দুঃখিত তাঁরাও অনেকে নক্রুমা সরকারকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করতে ইতস্তত করেন। তার কারণও আছে।

শ্রীনক্রুমাকে যে-ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটা যে কেবল পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসির আইনসম্মত বিরোধিতা তা নয়। শ্রীনক্রুমাকে এমন বিরোধীদের সম্মুখীন হতে হয়েছে যারা ঘানার ঐক্যকেই নষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। তাদের বিরোধিতা গণতান্ত্রিক বিরোধিতা ছিল না, তাদের বিরোধিতা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল ছিল। অথবা বলা চলে যে সেই বিরোধিতা সবলে সংযত করতে না পারলে স্বাধীন ঘানা-রাষ্ট্র গঠন করাই যেত না বা তা অংকুরেই বিনষ্ট হতো।

সেই বিপদ যে সম্পূর্ণ কেটে গেছে তাই বা জোর করে কে বলতে পারে? ঘানার অধিবাসীরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত, সকল উপজাতি সমান অগ্রসর নয়, কোনো কোনো উপজাতীয় "চীফ"রা নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করতে, এমন কি কেন্দ্রকে অস্বীকার করে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। কংগোর ভিতরে যে-বিবাদ চলছে, কেনিয়াতেও আফ্রিকানদের মধ্যে যে-ঝগড়াঝাঁটি দেখা দিয়েছে তার পিছনেও অল্পবিস্তর সেই একই কারণ কাজ করছে। অর্থাৎ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একাত্মভাব, রাষ্ট্রীয় একতার বোধ জন্মাতে দেরি হচ্ছে।

একতা সহজে আসছে না বলে মারামারি এড়াবার জন্য একটা আলগা আলগা রকমের ফেডারেশন বানিয়ে সমস্যা সমাধানের যুক্তি কেউ কেউ দেন। কিন্তু তাহলে কোনোদিনই একরাষ্ট্র দানা বাঁধবে না এবং টুকরোগুলির কী রাজনৈতিক, কী অর্থনৈতিক, কী সামাজিক কোনোরকম উন্নতিই ঠিকমতো হবে না। সুতরাং সর্বত্রই প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদীদের চেষ্টা হচ্ছে কীভাবে উপজাতীয় স্বতন্ত্রতার ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্রের ঐক্য সৃষ্টি ও রক্ষা করা যায়। তার জন্য বলপ্রয়োগ করতেও তারা পিছপাও নন। অবশ্য বৃহত্তর ভিত্তিতে ঐক্য সাধনের যাঁরা বিরোধী, যাঁরা আলাদা হয়ে যেতে চান তাঁরাও যে অহিংস উপায়ে বিশ্বাসী তা নয়, তাঁরাও মারামারি করে আলাদা হয়ে থাকতে বা আলাদা হয়ে যেতে চান। একাধিকবার প্রেসিডেন্ট নক্রুমার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে, তাই থেকেই বুঝা যায় যে, ঘানায় সরকারের বিরোধীরা কেবল অহিংস পার্লামেন্টারী উপায় অবলম্বন করেই সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নন। যারা ক্ষমতায় আসীন তাঁরা এই ধরনের বিরোধকে সংযত করার জন্য কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করবেন, জোর-জুলুম কিছু করবেন না—এরূপ আশা করা যায় না। এই কারণে নক্রুমা সরকারের অনেক কাজ গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত না হলেও অনেকে সেগুলিকে আদরণীয় না হলেও ক্ষমার্হ বলে মনে করেছেন।

কিন্তু নক্রুমা সরকারের পক্ষে যাই বলার থাক না কেন অনেকক্ষেত্রে যে খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং হচ্ছে সেটা ঘানার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও বোধ না করে পারছেন না। কিছুটা জোরজবরদস্তি, কিছু লোককে বিনা বিচারে আটকে রাখায়

প্রয়োজন হয়তো বুঝা যায়, কিন্তু বিনা-বিচারে বন্দীর সংখ্যা যেরকম বেড়েই চলেছে তাতে নক্রুমা সরকার আর কোনোদিন গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন কিনা তাই সন্দেহ হয়। তার উপর শ্রীনক্রুমাকে নিয়ে অত্যুগ্র রকম ব্যক্তিপূজার রেওয়াজ হয়েছে। নবজাগ্রত কোনো জাতির পক্ষে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কোনো মহৎ নেতার মধ্যে মূর্ত দেখার একটা প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। সেটা সাময়িকভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে, তাদের মধ্যে উৎসাহ এবং ঐক্যবোধ জাগ্রত করার পক্ষে সহায়ক হতে পারে কিন্তু পরিমিত মাত্রায় যা মঙ্গলকর এবং উন্নতির সহায়ক তার আতিশয্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হতে পারে। কোনো একজন ব্যক্তিকে যদি একান্তভাবে কোনো জাতির প্রতীকরূপে খাড়া করা হয় তবে কোনো অবস্থায় সেই প্রতীক আহত হলে বা বিপর্যস্ত হলে সারা জাতিটা অসহায় হয়ে পড়ে, দিশেহারা হয়ে যায়। সেইজন্য যেখানে কোনো ব্যক্তিকে এইরকম জাতির উপাস্য প্রতীকে পরিণত করা হয়েছে সেখানে যদি সেই প্রতীকের উপর কোনো আঘাতের চেষ্টা হয় তবে প্রত্যাঘাতের মাত্রা বা রূপ সংযত থাকবে এরূপ আশা করা যায় না।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নক্রুমার প্রাণনাশের যে-চেষ্টা হয়েছে তার পরে যে খুব একচোট ধরপাকড় হবে সেটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু যেটা সহজবোধ্য নয় সেটা হচ্ছে এই যে, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নক্রুমার দুজন বেশ উঁচুদরের মন্ত্রী আছেন—পররাষ্ট্রসচিব এবং তথ্য (ইনফরমেশন) মন্ত্রী। তাছাড়া, শ্রীনক্রুমার পার্টির—কনভেনশন পিপলস্ পার্টির কর্মকর্তা—সেক্রেটারীকেও আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এঁরাও কি প্রেসিডেন্ট নক্রুমার প্রাণনাশের চেষ্টার সঙ্গে জড়িত? তাই যদি হয় তবে তো একথা বলা চলবে না যে রাষ্ট্রের ঐক্যবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরাই কেবল শ্রীনক্রুমার বিরোধী এবং কেবল তাদের শায়েস্তা করার

ন্যই শ্রীনক্রুমাকে অগণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে। শ্রীনক্রুমার মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যেই যদি তাঁর বিনাশাকাঙ্ক্ষী লোক থেকে থাকে তাহলে নক্রুমা সরকারের স্বাস্থ্য এবং শক্তি সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তা হয়ে পারে না।

কেউ কেউ মনে করেন যে, যে-সব কাজের জন্য নক্রুমা সরকার গণতান্ত্রিক সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছেন সেগুলি সব যে শ্রীনক্রুমার ইচ্ছায় হয়েছে বা হচ্ছে তা নয়। এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা মনে করেন যে, শ্রীনক্রুমার পার্শ্বচরদের মধ্যে একদল আছে যারা জোরজুলুম, অগণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং তাদেরই প্রভাবে ঐ সবের এতো বাড়াবাড়ি চলেছে। এ'দের মতে শ্রীনক্রুমা নিজে এতটা জোরজুলুমের পক্ষপাতী নন কিন্তু তিনি উগ্রপন্থীদের সংযত করে রাখতে পারেন নি। যাই হোক দুইজন মন্ত্রী এবং পার্টির সেক্রেটারীর গ্রেপ্তার হওয়াতে ভিতরে যে দুই দল আছে এবং তারা যে ঘোরতররূপে পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠেছিল এটা বুঝা যাচ্ছে। অতঃপর সরকারী নীতি, কিরূপ নেয় তাই থেকেই বুঝা যাবে যে শ্রীনক্রুমাই স্বেচ্ছায় ডিকটেটরী চালে চলতে শুরু করেছিলেন অথবা তিনি সেইদিকে অন্যের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন।

* * *

পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে যে-চুক্তি হয়েছে তাতে পশ্চিম ইরিয়ানের শাসনভার এই অকটোবর মাস থেকে ইউ এন হাতে নেবে এবং আগামী বছরের মে মাসে ইন্দোনেশিয়ার হাতে দেবে। এই ক'মাসে পশ্চিম ইরিয়ানে ইউ-এনের শাসনকালে শান্তিরক্ষার জন্য এক হাজার সৈন্য দেবার জন্য ইউ এনের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট পাকিস্তানকে অনুরোধ করেছেন। ব্রিগেডিয়ার রিখিয়ে ইউ থাণ্টের বিশেষ সামরিক উপদেষ্টা সুতরাং ইউ থাণ্ট তাঁকে পশ্চিম ইরিয়ানে পাঠিয়েছেন অবস্থা দেখবার জন্য এবং ইউ এন-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা সৈন্য যখন পশ্চিম ইরিয়ানে যাবে তখন তারা সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ সামরিক উপদেষ্টার পরামর্শানুযায়ী চলবে, এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানেই বেধেছে মুশকিল। পাকিস্তানী সরকার সৈন্য পাঠাতে খুবই রাজি কিন্তু কোনো ভারতীয় অফিসারের উপদেশ বা নির্দেশে পাকিস্তানী সৈন্যদের চলতে হবে এটা বরদাস্ত হচ্ছে না। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার রিখিয়ে যতদিন ইউ এন-এর কাজ করছেন ততদিন তিনি ইউ এন'র লোক, ততদিন তিনি 'ভারতীয়' বলে তাঁর সম্বন্ধে সোজাসুজি আপত্তি করা অশোভন হবে। সুতরাং পাকিস্তান কথাটা ঘুরিয়ে বলছে—যখন পশ্চিম ইরিয়ানে কেবলমাত্র পাকিস্তানী সৈন্যেরাই যাবে তখন পাকিস্তানী সৈন্যদের একজন অ-পাকিস্তানী ইউ এন সেনাপতির অধীনে কাজ করতে বলার প্রয়োজন কী? তার চেয়ে তাদের একজন পাকিস্তানী সেনাপতির অধীনে রাখা হোক অর্থাৎ পশ্চিম ইরিরিয়ানে ইউ এন সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ সামরিক উপদেষ্টার যদি কোনো কাজ থাকে তবে সে কাজ ব্রিগেডিয়ার রিখিয়ের স্থলে একজন পাকিস্তানী জেনারেলকে দেওয়া হোক। দেখা যাক ইউ থাণ্ট এই সমস্যার কী সমাধান করেন।

৩০-৮-৬২

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের কথা মনে পড়ে—"পাগলকে যে পাগল ভাবে—এখন সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল একদিন সেটা বোঝা যাবে।"

আমরা যে শিল্প বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছি তার মস্ত বড় প্রমাণ লিপিবদ্ধ চিন্তা। একদা বেদকে শ্রুতি দ্বারা ধরে রাখা হত। ক্রমে তা সম্ভব হয়নি। শ্রুতিগত চিন্তা বিরাটকায় বেদে সংকলিত হল এবং তার থেকে আরও কত বিষয়ের উৎপত্তি হয়েছে, কত আলোচনা হয়েছে। সব বিদ্যাই এইভাবে বেড়ে উঠেছে, সংগীতের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সাংগীতিক ক্রিয়া, আলোচনা বা অধ্যাপনা করতে করতে বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে এবং এই বিচার-বিশ্লেষণের ফলগুলি লিপিবদ্ধ করবার আবশ্যকতাও গভীরভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। পরের যুগে যাঁরা সংগীত-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা এই-সমস্ত পুঁথির ওপর নির্ভর করেছেন, প্রচলিত মৌখিক আলোচনার ওপর সব সময় আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। যেখানে মৌখিক আলোচনা কাজে লেগেছে, তাকে যথেষ্ট যুক্তি সহ লিখিত রূপ দিয়ে গেছেন। বলবার মধ্যে কোনও দায়িত্ব নেই কিন্তু লেখবার মধ্যে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। একটা

আমাদের সম্বন্ধে কারুর কারুর অভিযোগ, আমরা নাকি পুঁথিগত আলোচনা কিছু অধিক পরিমাণে করে থাকি। এ কথা ঠিক যে, সংগীতের ক্ষেত্রে "শতং বদ মা লিখ"-র পক্ষপাতী আমরা নই; কেননা, তাতে লাভ হয়নি। আমাদের ধারণা, পুঁথিগত অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক আলোচনায় এমন কিছু পাওয়া যায়, যা নির্দিষ্ট, যা মূল্যায়ণলব্ধ। আসলে শত শত বৎসর ধরে শত শত কথাই তো বলা হয়েছে সংগীত সম্বন্ধে, লেখা আর কতটুকু হয়েছে? আর যা লেখা হয়েছে তার কতটুকুই বা ছাপা হয়েছে এবং যা ছাপা হয়েছে তারই বা কতটুকু আলোচনা হয়েছে? প্রাচীন বাংলায় সংগীত সম্বন্ধীয় রচনা অতি সামান্য—সেও বাংলার কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। উত্তর ভারতের কয়েকটি মাত্র মূল্যবান গ্রন্থ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে এবং সেগুলিরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দুর্লভ। পুঁথিগত আলোচনাকে দীর্ঘকাল পরিহার করবার ফলে আমাদের সাংগীতিক জ্ঞান বলতে বোঝায় রাগ-রাগিণীর নাম, বাদী-সংবাদী আর কয়েকটি বিশেষ তান বা পকড় সম্বন্ধে পরিচয়—বাকিটা অর্থাৎ বিলম্বিত, দ্রুত ইত্যাদি অভ্যাস দ্বারা লাভ করা সহজসাধ্য। তাও বাদী-সংবাদীর ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। অল্পই আছেন, যাঁরা গেয়ে বাজিয়ে বাদী-সংবাদীকে যথার্থভাবে স্থাপন করতে পারেন। অর্থাৎ সমগ্র সংগীত চিন্তাটা আমাদের কাছে অস্পষ্ট; আমাদের অনেকেই এ যাবৎ মুখস্থ করে এসেছি। বহু প্রশ্নের সদুত্তর আমরা দিতে পারি না, তার বদলে গুরুর দোহাই পাড়ি। সংগীতের নামে যেটা করা হচ্ছে তা একই মন্ত্র আর একই পাঁচালী পড়ে গান-বাজনার যজমানি। আর এই যজমানিতে মোটা দক্ষিণে, চালকলা, ব্রাহ্মণভোজন যে প্রচুর পরিমাণে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

সংগীত যে প্রধানত ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যাপার তা সকলেই মানবেন; কিন্তু ক্রিয়ার পিছনে পরিকল্পনা আছে সেটাও সমানভাবেই মানতে হবে। এই পরিকল্পনার মূলে আছে চিন্তা। এই চিন্তাকেই ধরে রাখা হয় গ্রন্থাদিতে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং, এগ্রিকালচার—এসবই ক্রিয়াসিদ্ধ ব্যাপার; কিন্তু এই ক্রিয়াগুলি যে চিন্তা দ্বারা পরি-চালিত হচ্ছে তা মোটা মোটা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলি যদি এইভাবে গ্রথিত না হত তা হলে চিরকাল নাপিতরাই ফোড়া কাটত, মিস্ত্রীরাই কলকব্জা তৈরি করে যেত আর চাষীরা তালকাঠের লাঙল সম্বল করে পড়ে থাকত। কিন্তু এইসব বিজ্ঞানের বেলায় পুঁথিগত আলোচনার বিরুদ্ধে যারা বলতে উঠবে তাদের পাগল ছাড়া আর কোনও আখ্যাই দেওয়া যাবে না। অথচ সংগীতের পুঁথিগত আলোচনায় যারা আগ্রহ দেখায় তারাই পাগল। দেখে শুনে

কিছু লিখতে গেলে যথেষ্ট ভাবতে হয়—চিন্তাগুলিকে সাজাতে হয়, ক্রম হিসাবে বিন্যস্ত করতে হয়। এইভাবে প্রস্তুত যে বস্তু আমরা পাচ্ছি তার মধ্যে ফাঁকি নেই। তাতে ভুল থাকতে পারে কিন্তু তা এলোমেলো কথাবার্তার ভুল নয়। এই ভুলকেই আবার ভবিষ্যতের চিন্তাশীল ব্যক্তি সংশোধন করে নেন। এইখানে পুঁথিগত আলোচনার মূল্য।

রাজা মানসিং মস্ত বড় সংগীতবেত্তা ছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর কালে যেসব সাংগীতিক কীর্তি সাধিত হয়েছে তা না লিখিয়ে রাখলেও পারতেন। কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি সেগুলি লিখিয়ে রেখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, যত বিস্তারিতভাবে লিখলে পরের যুগে বহু বিষয় স্পষ্ট হত তত বিস্তারিত দূরের কথা—সামান্যই তিনি লিখিয়েছিলেন। তবু সেটুকুই তার পরের যুগে অনেক কাজে লেগেছিল। তাঁর আহ্বানে বড় বড় নায়কেরা জমা হয়ে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। রাজা মান ভেবে দেখলেন যে, এইরকম আলোচনা অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ এইগুলি লিখিত থাকলে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। অতএব যতটা পারা যায় লিখিয়ে রাখাই তিনি সংগত মনে করেছিলেন। এরই ফলে "মানকুতূহল" রচিত হল—যার সমাদর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুলভাবে হয়েছে।

এই ধরনের লেখা এক জিনিস আর অসমর্থিত জনশ্রুতির প্রশ্রয় দেওয়া আর এক জিনিস। এতে শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না; অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ওস্তাদদের কাছ থেকে আমরা যেটা নেব সেটা হাতে-কলমের জিনিস অর্থাৎ প্রযুক্ত বিদ্যা। তাও অনেকে লিখে রাখা সঙ্গত মনে করেছিলেন; যেমন—ভাতখণ্ডে। অনেক বিদ্রূপ উক্ত ভদ্রলোককেও সহ্য করতে হয়েছিল। কেতাবী আসক্তির জন্য উপহাস তাঁর কপালেও কম জোটেনি; কিন্তু তাঁর স্বরলিপিগুলি এখন অনেকেরই প্রধান সম্বল। ওস্তাদপরম্পরা আমরা যাঁরা তানসেন, সুরদাস প্রভৃতি সুরকারের অনেক কথাই শুনে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তাতে ইতিহাস গঠিত হয়েছে কতটুকু? এর বদলে যদি নির্ভরযোগ্য তথ্য কিছুটাও লিখিত থাকত তা হলে তাতে আমাদের অনেক উপকার হত।

আজকাল ঘরোয়ানা কথাটা খুব শোনা যায়। নানান ঘরের গাইয়ে-বাজিয়ের কাছ থেকে অনেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এসব সংবাদের কিছু যে সত্য নয় এমন কথা বলি না; তবে সবই ভাল করে যাচাই করে নেওয়া উচিত। যাচাই করতে গেলে দেখা যাবে, অনেক কিছুই সমর্থনের যোগ্য নয়। ঘরোয়ানার প্রবল ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও দেখা যায়, তানসেন রহস্য আজও রহস্যই রয়ে গেছে। এর কারণ, ঘর যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি ঘরের জিনিসও অনেক ছড়িয়ে পড়েছে। তানসেনের আমল থেকে বাকি মোগল যুগের নির্ভরযোগ্য সাংগীতিক ইতিবৃত্ত যদি অনুশীলন করা যায়, তা হলে এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় যে, তানসেন নিজে খুব কম ব্যক্তিকেই সংগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন—সম্ভবত আদৌ দেননি। অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই তিনি পুত্র বিলাস খাঁর কাছে পাঠাতেন এবং তাঁদের অনেকে আবার বিলাস খাঁর তত্ত্বাবধানে শিখতেন। লাল খান যিনি বাল্যকাল থেকে তানসেনের সঙ্গে থাকতেন এবং পরে তাঁর নাতজামাই হন, তিনিও সাক্ষাৎ তানসেনের শিষ্যত্ব অর্জন করেননি। বোধ হয় জামাতা হবার পর বিলাস খাঁ নিজে তাঁকে কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকবেন। এইভাবে গোড়া থেকেই একজনের জিনিস সাক্ষাৎভাবে আর একজন পাননি, শোনা কথা এবং শুনে শেখা থেকেই এই ঘরোয়ানার ট্রাডিশন চলে এসেছে। খুশহাল খান ছিলেন শেষ ওস্তাদ, যিনি ঐভাবে পাওয়া তানসেনের ঘরের কিছু পুঁজিপাটা নিজের আয়ত্তে রেখেছিলেন; তাঁকেও আওরাংজীব সংগীত থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এঁর প্রতি আওরাংজীবের বিশেষ অনুরাগ ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড ধর্মমত তাঁকে সংগীতানুশীলনে বাধা দেয়। এই সময় থেকেই বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েরা বাদশাহী দরবার থেকে অন্যান্য ছোটখাটো দরবারে আশ্রয় নিতে থাকেন এবং বর্তমান ঘরোয়ানার এইটাই সূত্রপাত। অতএব দেখা যাচ্ছে, আসল জিনিস যেভাবে হস্তান্তরিত হলে আসলত্ব বজায় থাকত সেভাবে হস্তান্তরিত হয়নি—এ ক্ষেত্রে তথাকথিত ঘরোয়ানার ওপর প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে আস্থা স্থাপন করা কঠিন।

অনেকে খেয়াল-টপ্পার ঐতিহ্যকেও গোয়ালিয়রের ওপর আরোপ করে সন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু আসল ব্যাপার অন্যরূপ। মূলত গোয়ালিয়রে ধ্রুপদের চর্চা হয়েছিল। খেয়ালের সূত্রপাত এবং সংগঠনে গোয়ালিয়রের শিল্পীরা উৎসাহ দেখান নি; কারণ, আকবর খেয়াল-এর অনুরাগী ছিলেন না এবং অধিকাংশ গোয়ালিয়র-শিল্পী আকবরের আশ্রয়ে জীবন কাটিয়েছেন। সাজাহানের সময় যখন খেয়ালের চর্চা বেড়ে উঠল তখন গোয়ালিয়রের শিল্পীরা খেয়াল সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহী হয়ে উঠলেন। টপ্পাও তাঁরা এই সময়েই শিখতে আরম্ভ করেন। গুণী গাইয়েদের দখলে এসে খেয়াল-টপ্পা আর একরকম মনোহারিত্ব অর্জন করল এবং বিশিষ্ট ঘরোয়ানার অন্তর্ভুক্ত হল। কিন্তু মূল জিনিসটা তাঁদের ছিল না। জৌনপুর-দিল্লীর ওস্তাদরা পেছিয়ে পড়েছিলেন—এ সম্পর্কে তাঁদের অবদানের কথা আর আমরা ভাবি না।

এই ঘরোয়ানার উৎসাহীবৃন্দ যদি সে সময় থেকে স্বরলিপির কথা ভাবতেন এবং তাঁদের অধিকৃত বস্তুগুলিকে ঐতিহাসিক রীতিতে লিখে রেখে যাবার চেষ্টা করতেন তা হলে সে যুগের সত্য কিছুটা অবিকৃত থাকত। লিখতে গেলেই তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কলম এগোয় না এবং তখনই তাঁদের মনে ঐতিহাসিক সত্যের প্রশ্ন উঠত। সত্য কতখানি বিকৃত হয়েছে তা যাঁরা সত্যের সন্ধানী তাঁরাই জানেন। যিনি সত্যান্বেষী তাঁকে লিখিত তত্ত্বের প্রতিই প্রধানত নির্ভর করতে হবে; কেননা, লিখিত সূত্র থেকেই সত্যমিথ্যা যাচাই করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা ভাষা

বিজয়া দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলাভাষার স্রষ্টা বলা যায়। এই ভাষা গঠনের জন্য তিনি নানাভাবে ভাষার বিভিন্ন অংগের সংস্কার সাধন করেছেন। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম যেমন ভেঙেছেন, তেমনি অনেকাংশে তাকে রক্ষাও করেছেন; কারণ তাঁর বানানপদ্ধতি সর্বতোভাবে উচ্চারণভিত্তিক। ব্যাকরণের নিয়মভাঙা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, উচ্চারণের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা বানানকে তিনি অনাবশ্যক জটিলতার কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষা ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় তাঁর বিশেষ উৎসাহের পরিচয় নানা জায়গায় পাওয়া যায়। ১৩০৮ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—"সংস্কৃতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে, সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক।...বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হইবে কেন? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশি বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে। বাংলাভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাৎ ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন? তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক নতুবা আমরা ঠিকপথে চলিতে পারিব না।" —(রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খন্ড)। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর কেটেছে। ইতিমধ্যেই তাঁর ব্যাকরণের নিয়মশিথিলতার সুযোগটি গ্রহণ করে' বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমরা যে অনিয়মের উৎসব শুরু করেছি, তার স্বরূপটি কীরকম, আলোচনা ক'রে দেখা ভালো।

সংস্কৃত ভাষার আত্মজ হ'লেও বর্তমানকালে বাংলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা একথার অর্থ যদি এই হয় যে, কোনোক্ষেত্রে বাংলা সংস্কৃত ভাষার নিয়ম মানতে বাধ্য নয় অতএব উভয়ের সর্বাঙ্গীণ বিরোধ অভিনন্দনযোগ্য—তাহলে অবশ্য বিচারের অবকাশ থাকে না। অন্যথা স্বীকার করতেই হয় যে, বাংলাভাষার পক্ষে তার জন্ম সম্বন্ধের চিহ্নকে স্ব-অংগ থেকে বিলুপ্ত করা কখনো সম্ভব নয়। যেখানে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ সেখানে আমরা গতানুগতিক নিয়মকে ভাঙতে দুঃসাহসী হই না। যেমন, যদিও বাংলায় শ-ষ-স এর উচ্চারণে কোনো তফাৎ নেই, তথাপি 'বিশেষ' শব্দটিকে 'বিশেশ' অথবা সন্ধ্যাকে শন্ধ্যা লিখবার ধৃষ্টতা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে ধারণা অনচ্ছ, সেখানে আমরা অবলীলাক্রমে দুঃসাহসী হয়ে উঠি; উদাহরণ, বাংলায় প্রত্যয়ের ব্যবহার। 'সংবুগোতি খলু দোষমজ্ঞতা'-র দোহাই দিলেও এক্ষেত্রে দোষ কাটে না, যেহেতু এই অজ্ঞতার পেছনে আমাদের প্রশ্রয় রয়েছে। শুধু তাই নয়, পক্ষ সমর্থন করতে আমরা কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথকেও টেনে আনি। যে কোনো দৈনিক বা সাময়িক পত্রিকা থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। এক সাময়িক পত্রের নিয়মিত বিভাগের প্রবন্ধে দেখি—"......খ্যাতিতে আমরা অনেকখানি পশ্চাদপদ।" এই বৎসর প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্রে 'অশুদ্ধি থাকিলে সংশোধন কর'—এই প্রশ্নে 'পশ্চাদ্পদ' শব্দটি ছিল। দৈবাৎ যদি কোনো ছাত্র উক্ত প্রবন্ধের ওই কথাটি স্মরণ ক'রে পশ্চাদ্পদ শব্দটি শুদ্ধ ব'লে রায় দিয়ে বসে, তাহলে কি তাকে আমরা সত্যিই অভিযুক্ত করতে পারি? আর একটি সুপরিচিত পত্রিকার এক প্রবন্ধে দেখা গেল—"এ দুটি দেশে ক্যালিগ্রাফির আদর্শ ও উৎকর্ষ নিরূপিত হয়..."।

কিছুকাল যাবৎ একাধিক লেখায় 'উৎকর্ষতা' দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছি. কিন্তু তখনও 'ঔৎকর্ষে'র কথা জানা ছিল না। সৌজন্যতার তা-অংশ অতিরিক্ত, মণীষা ও মনবিদের ভুল মনস্ শব্দের ন-য়ে স-য়ে অমনোযোগের জন্য, সংক্ষিপ্ত বোঝাতে চাইলে সংক্ষেপিত বলা উচিত নয়, বি পূর্বক অঞ্জ্ ধাতু ক্ত প্রত্যয়ে ব্যাঞ্জিত হয় না, ব্যংগ্য হয়—একথা যাঁদের বোঝা দরকার তাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধ। অতএব পাদ-টীকায় পরিচয় উল্লেখ অসংগত হবে মনে করি। সম্প্রতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনো অধ্যাপিকা 'প্রসারতা' শব্দটিকে শুধু-মাত্র বহু প্রয়োগের যুক্তিতে শুদ্ধ ব'লে রায় দিয়েছেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সত্য।

আধুনিক বাংলা ভাষার প্রধান সমস্যা বানান। রবীন্দ্রনাথের লেখায় বানানের যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম চোখে পড়ে, সেটি হ'ল অনাবশ্যক য-ফলার বর্জন। বীরের ভাব এই অর্থে বীর শব্দের সঙ্গে য প্রত্যয় (সংস্কৃতে ষ্যঞ্) যুক্ত হয়ে বীরবিশেষণপদ থেকে বীর্যবিশেষ্যপদ উৎপন্ন হ'ল। এক্ষেত্রে বীর্য্য লিখে অতিরিক্ত য-কারটি আনবার কোনো সংগত কারণ নেই। কার্য তাৎপর্য সৌন্দর্য প্রাচুর্য ধৈর্য ইত্যাদি সমপর্যায়ের সমস্ত শব্দের বেলায় এই কথা খাটে। মনে রাখা ভালো সংস্কৃতেও উল্লিখিত শব্দের এই বানান, যদিও বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত ভাষায় অনেক সময় আচার্য্য সূর্য্য ইত্যাদি লেখা হয়। পৃথিবী অর্থে মর্ত ও মর্ত্য দুই-ই হতে পারে, কিন্তু পার্থিব অর্থে শুধু মর্ত্য। রবীন্দ্রনাথ কখনো নৈঃশব্দ লেখেন নি, কারণ উচ্চারণের দিক থেকে এখানে য-এর প্রয়োজন না থাকলেও তার অর্থগত দাবিকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তার চাইতেও বড় কথা এবং মূলকথা এই যে, তৎসম শব্দে ব্যাকরণের নিয়মকে অগ্রাহ্য করা চলে না। এই জন্য আমরা কখনো তাৎপর্যের নজিরে দারিদ্র লিখতে পারি না, মতির নজিরে শ্রীমতি নয়, তৎসম শব্দ ব'লেই বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য স্বাতন্ত্র্য য-এর অনিবার্য উপস্থিতি। কীর্তি শব্দে ত-এর দ্বিত্ব বর্জনীয় কিন্তু কার্ত্তিকে কোনোমতে নয়। কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিকের উৎপত্তি, যুগ্ম ত কার্ত্তিকে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানে 'কার্তিক' দেখা যায়। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব নিষেধের নিয়মের আওতায় যে কার্ত্তিক পড়ে না, নিয়মকর্তা বোধহয় একথা স্মরণ-যোগ্য মনে করেন নি।

অনুনাসিক বর্ণ বাংলা বানানের সরলী-করণের পথে আর এক নিদারুণ বাধা। এরা উচ্চারণের পার্থক্য দেখিয়ে সাহায্য করে না, অথচ আপন অধিকার ছাড়তেও নারাজ। ঙ বর্ণ ও অনুস্বারের বাংলা উচ্চারণ সমান; কাজেই বাংলা-বাঙলা, রং-রঙ এই দুরকম বানানই চলতে পারে। [illegible]

লিখিত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের আগে ছিল না। বাংলা ভাষা পরিচয়ে তিনি বলেছেন— "ঙ" বর্গের অনুনাসিক ঙ সাধুভাষায় যুক্তবর্ণে ছাড়া অন্যত্র আপন গৌরবে স্থান পায় নি। যেখানে রসনায় তার উচ্চারণকে স্বীকার করেছে, সেখানে লেখায় উপেক্ষা করেছে তার স্বরূপকে...বানানজগতে আমিই বোধহয় সব প্রথমে ঙ-র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।" উদাহরণস্বরূপ রাঙ্গা ও ভাঙা শব্দ যথাক্রমে প্রয়োগ করেছেন। উচ্চারণ ক'রে দেখলে বোঝা যাবে, 'বাঙ্গলা' বা 'বাঙ্গালা'য় গ-এর উচ্চারণ যদি বা আসে, 'রাঙ্গা'তে কিছুতেই নয়। রাঙা, ভাঙন, আঙিনা ইত্যাদির এক-জাতীয় উচ্চারণ। ক বর্গের পূর্ববর্তী পদান্ত হস্‌যুক্ত ম (ম্‌) অনুস্বারে রূপান্তরিত হয়, যেমন—সংগীত, সংকোচ, সংখ্যা, সংঘর্ষ, সংঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে এস্থলে ঙ-এর ব্যবহারও বিহিত; কারণ অন্যান্য বর্গ অনুরূপ অবস্থায় আপন অনুনাসিককেই গ্রহণ করে, যেমন, সঞ্চয়, খণ্ডন, সন্তাপ, সম্পর্ক। কিন্তু সংগীত বা সংগ্রামের অনুকরণে অংকন পংকিল বা বংকিম লেখা চলবে না, এদের অনুনাসিকতা ঙ-কারীয়।

উচ্চারণভিত্তিক বানানের আর এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ক্ষ-এর ক্ষেত্রে খ-এর ব্যবহার। ক ও ষ-এর মিশ্রণে ক্ষ বর্ণটির উৎপত্তি। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ মূলানুগ, কিন্তু বাংলায় এটি যুক্ত খ-ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, যেমন অক্ষম, পরীক্ষা, রক্ষে। কিন্তু তদ্ভব শব্দে শব্দের প্রথম বর্ণ ক্ষ হলে তার উচ্চারণ হয় বিশুদ্ধ খ-র মতো। অতএব রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—কোন্ 'খেপা' শ্রাবণ ছুটে এল, ধানের 'খেতে' রৌদ্রছায়ায়, 'সতখন' তুমি আমায় বসিয়ে রাখ (অখণ্ড গীতবিতান), উঠেছে অধীর হয়ে 'খেপে' (জন্মদিনে, ২০ সংখ্যক কবিতা)। কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের দু' একজন লেখক ছাড়া বেশির ভাগই পুরাতন ক্ষ-য়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বাংলায় দীর্ঘ ঈকারের উচ্চারণ নেই অতএব পাখি, বাঁশি, দিঘি, তৈরি, বেশি সহজেই লেখা চলে। ন ও ণ-এর ভেদাভেদ-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলেছেন, বাংলা ভাষায় বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। অতএব রানী, সোনা, কান, পরান, রিবন লিখে সামঞ্জস্য আনা হ'ল। কিন্তু রানীর কারণে বানী, ভারতীর খাতিরে আরতী এবং হয়তো দীপাবলীর অনুকরণে শ্রদ্ধাঞ্জলী মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ উ-এর ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত নিয়ম অর্থাৎ পূর্ব—পুব, নূতন—নতুন, ধূলি অথচ ধুলো বা ধুলো। রবীন্দ্রনাথের লেখায় উষা এবং ঊর্মি দুই-ই পাওয়া যায়, সম্ভবত এদের মধ্যে উচ্চারণের সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি রক্ষা করেছেন। ঙ ও অনুস্বারের বৈকল্পিক ব্যবহার ছাড়া একই

শব্দের দুই বানান তাঁর লেখায় দু-একটি পাওয়া যায়, যেমন সীঁথি—সিঁথি, তুলি—তূলি।

বাংলা বানানের আর এক বিভীষিকা ঋকার। ঋ যে স্বরবর্ণ তা আমরা প্রায়ই ভুলে থাকি। অমৃত শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে হলে ঋ-কে ম-এর সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করতে হবে যাতে ওই মৃ ধ্বনিতে একটি স্বরবর্ণ ও একটিমাত্র ম আছে একথা উচ্চারণ শুনেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা যেভাবে এর উচ্চারণ ক'রে থাকি, তার অবিকল রূপটি দেখাতে গেলে লিখতে হয় অম্‌মৃত বা অম্রিত। অর্থাৎ হয় ম-এর দ্বিত্ব নয়তো ম ও র-এ হ্রস্ব ইকার। এর সমজাতীয় শব্দ আবৃত্তির উচ্চারণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরস মন্তব্য মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

উচ্চারণ সর্বদাই বাংলা বানানের নিয়ামক নয়, তার উদাহরণ আত্মা, মাহাত্ম্য। কিন্তু এমন একাধিক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা বাংলা বর্ণানুগ উচ্চারণে আত্মা, আত্মিক ব্যবহার করেন। তাঁদের অবশ্যই ভ্রান্ত বলা চলে না, কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলার কালে যদি আত্মার ত-এর দ্বিত্ব হয় এবং ম চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়, তাহলে বোধহয় খুব বেশি নিয়মভঙ্গ হয় না, ভাষাটিও যথাসাধ্য বাংলা থাকে। জ্ঞান, যজ্ঞ এদের ক্ষেত্রে এই বিকল্প ব্যবস্থা চলে না, ক্ষ-এর ধরণে জ্ঞ-এর উচ্চারণ হয়, ধ্বনি যুগ্ম বর্ণের। ঙ এবং ঞ পদমর্যাদায় সমান হলেও ঙ রবীন্দ্রনাথের করুণাধন্য, কিন্তু 'নঞর্থক' ছাড়া আর কোথাও ঞকে স্বরযুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায় না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আটপৌরে বাংলায় কথা বলা হয়, তাদের কিছু প্রভাব সাহিত্যের পোশাকি বাংলায় পড়লেও তারা শেষোক্তের খুব বেশি মানহানি করেনি। পূর্ব-বাংলায় চন্দ্রবিন্দু যতই দুর্লভ হোক না কেন, লিখবার সময় চাঁদকে চাদ লেখা চলে না, কারণ তাহলে আঁক শাঁখ, আঁচল, বাঁধন-এর পশ্চাতে যে-সব অনুনাসিক বর্ণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাদের সকলকে একযোগে অস্বীকার করতে হয়।

স্বত্বজাতীয় শব্দের বানানে ইদানীং একাধিক অসত্যের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ভাব বোঝাতে যে দুটি প্রত্যয়ের সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে, তারা হল ত্ব এবং তা। অতএব নিজের ভাব বোঝাতে স্বত্ব ও স্বতা দুই-ই হতে পারে, যদিও দ্বিতীয়টির ব্যবহার বাংলায় দেখা যায় না। সৎ শব্দ অস্ত্যর্থক। এর সঙ্গে ওই দুটি প্রত্যয় যোগ করলে পাওয়া যাবে সত্ত্ব আর সত্তা। প্রথমটির অর্থ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রাণী অর্থে এর ব্যবহার হয়। বাংলায় এর ব্যবহার অল্প হলেও আছে, যেমন

অন্তঃসত্ত্বা। সত্তা বহুব্যবহৃত শব্দ। অস্তিত্ব কাবিত্বের সঙ্গে তত্ত্ব মহত্ত্বের বানানে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ এদের প্রাতিপদিক ও প্রত্যয়কে আলাদা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

বাংলায় স্ত্রী-প্রত্যয় ব্যবহারের নিয়ম খুব কড়া নয়। মনে হয় সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—"বাংলায় ঘুড়ি কোনদিন উড্ডীয়মানা হবে না কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লায় শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না।" এ ছাড়া বিদেশী শব্দকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বদ্ধ না ক'রে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের রীতি অনুসারে ব্যবহার করা হোক,— একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন। —"'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই প্রত্যয় আছে, সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্ ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্‌দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক মুসলমানিনী কায়দা বা ইংরেজিনী রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন, এমন আশঙ্কা থেকে যায়।" শুধু দেশজ বা বিদেশী শব্দই নয়, বাংলায় তৎসম শব্দও সর্বদা স্ত্রী-প্রত্যয়ের দাসত্ব করে না। 'মেয়েটি সুখী হয়নি' অথবা 'আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন'—এ ধরনের কথায় সুখিনী বা অসুস্থা ব্যবহার করলে নিতান্ত অরুচিকর ঠেকবে।

পরিভাষা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হলেও এই প্রসঙ্গে তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ বোধহয় অবান্তর হবে না। রবীন্দ্রনাথ বহু সার্থক পারিভাষিক শব্দ রচনা করেছেন। ১৯০৬ সালে সাহিত্য পরিষদ থেকে পরিভাষা সংকলনের যে প্রচেষ্টা হয়, তাতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাঙলা বানানের নিয়মের সঙ্গে ওই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাঙলা বানানের মূলনীতির বিশেষ কোনো গরমিল দেখা যায় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিভাষিক শব্দাবলীতে বর্তমান তালিকায় এমন অজস্র শব্দ চোখে পড়ে, যাদের প্রবর্তনার কোনো সার্থকতা আছে কি না, সে বিষয়ে মনে সংশয় জাগে। রবীন্দ্রনাথ অ্যাবস্ট্রাকটকে করেছেন নির্বস্তুক, অ্যাভেন্যুকে বীথি। কিন্তু অ্যাক্‌সিডেণ্টকে আপতন, কম্প্যারেটিভকে তৌলনিক অথবা কমিশনকে দস্তুরি বা আয়োগরূপে ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল কি? Penny wise pound foolish-কে তিনি অনুবাদ করে 'পেনিতে জ্ঞানী, পাউণ্ডে বোকা' বলেন নি, বলেছেন, 'কাহনে কানা, কড়ায় কড়া।' কোন্‌টি ইদানীং যথার্থ বলে গ্রাহ্য হবে, বলা মুশকিল। ইনটুইশনকে স্বজ্ঞা বললে আপত্তি করব না এইজন্য যে, ওটি সর্বদা ব্যবহারের কথা নয়, অতএব তার গম্ভীর চেহারা সহনীয়। কিন্তু অফিসকে অফিস বা আপিশ বললে চলিত ভাষার সঙ্গে তাকে যখন দিব্যি মানিয়ে যায়, তখন তাকে করণ বলতে গিয়ে হোঁচট খাব কেন। বাংলা ভাষা টেবিলে চেয়ারে আনারসে আপেলে বহুকাল ধরে জাত হারিয়েছে, পরিলেখ বা গূঢ়ৈষায় গঙ্গাজলে তার সামগ্রিক প্রায়শ্চিত্তের আশা কম।

চিত্রপ্রদর্শনী

ছবি আঁকায় নতুন ব্রতীদের রেখা ও রঙের প্রয়োগ বিষয়ে দক্ষতার অভাব যতোই ফুটে উঠুক, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এবং ভাবের দিক থেকে নতুনত্ব দেখতে পাওয়া যাবে বলেই আশা জাগে। কিন্তু গত ৩০শে সেপ্টেম্বর আকাদামি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারিতে ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটির সভ্যদের ছবির যে প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয়, সেদিক থেকে নিরাশই করবে। ষোলজন শিল্পীর আঁকা মোট যে আটচল্লিশখানি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, তার মধ্যে তেলরঙ, জলরঙ, রঙখড়ি, কাঠকয়লা এবং কালি-কলমের কাজ রয়েছে। একই শিল্পির বিভিন্ন মাধ্যমের কাজও দেখা গেল। কিন্তু রেখা, রঙের প্রয়োগ বা বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে কোন একখানি ছবির মধ্যেও নতুন চিন্তা বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল না। শিল্পীদের মধ্যে সকলেই কিশোর বা তরুণ বয়সের, তাই অন্যান্য বিষয়ে না হোক, অন্তত বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তাঁদের একটা নিজস্ব দৃষ্টি ও রুচির পরিচয় পাওয়া যাবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল, তা পূরণ হতে পারেনি। এঁদের সকলকেই নামকরা শিল্পীদের অনুসরণকারী বলেই মনে হলো, আর তাও খুব দক্ষতার সঙ্গে অনুসরণ নয়। স্টুডিও গ্রুপের আগের একটি প্রদর্শনীতে নগ্ন মডেলের যে-সব স্কেচ দেখা গিয়েছিল, তারও অনেকগুলি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। বস্তুত প্রদর্শিত ছবিগুলির মোট সংখ্যার মধ্যে পনেরখানি হচ্ছে নগ্ন দেহের স্কেচ। এই সব স্কেচের মডেলগুলিই এমনি যে, তাদের নিয়ে আঁকা ছবি একটা শিল্প-মহিমা ফুটিয়ে তোলার স্থলে দৃষ্টিতে একটা কদর্য রূপই উদ্ভাসিত করে তোলে।

কম্পোজিসন — শিল্পী : অনিমেষ নন্দী

যে ক'জনের কাজে উজ্জ্বল সম্ভাবনা পরিচয় পাওয়া গেল, তাঁদের মধ্যে অনিমে নন্দীর তেলরঙের দুটো কাজ—'কম্পোজিশন (১) ও 'কম্পোজিশন' (২); মানবে বড়ুয়ার 'এক যুবতীর আত্মোপলব্ধি' এব উজ্জ্বল সেনগুপ্তের "পোষ্য" উল্লেখযোগ্য অচিন্ত্য দেব মিত্রের তেলরঙের কা "নির্মাতা" এবং স্কেচ "তিন মূর্তি" শিল্পীর সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্বের পচিয় দেয়

ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি শিল্পকমে দক্ষতা লাভের দিক থেকে এখনও এক প্রভাবশালী সংস্থা হয়ে উঠতে পারেনি সেজন্যে শিল্পীরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশ করে তোলায় যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করা পারছেন বলে মনে হয় না। তবে সংগঠন নতুন এবং এঁদের উৎসাহেরও অভাব নে তাই আশা করা যায়, এঁরা শিল্পীদে প্রত্যেকর নিজস্ব ধারার উদ্ভাবনে সহা হবে।

নৌকার সারি — শিল্পী : ধ্রুব মজুমদার

একচক্ষু

পারিজাত মল্লিক

বিজলী একটা গল্প বলছিল। দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে সে যখন বিছানায় পড়ে তখন শুয়ে শুয়ে খান কয়েক গোয়েন্দা বই পড়েছে। তারই একটা গল্প সে শোনাচ্ছিল। গল্পটা, ডিটেকটিভ গল্প যেমন হয়ে থাকে, শখের গোয়েন্দার কারিকুরিতে ভরা। যে খুনী তার কীর্তিও কম নয়, সে গাড়ির পেছন দিকে ধোঁয়া বেরুনো পাইপ দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে এক বিষাক্ত গ্যাস মিশিয়ে লোক মারত।"

বিজলীর গল্প শেষ হলে মজুমদার-সাহেব হেসে বললেন, "আমায় একটা কথা বলবে, বিজলী?"

বিজলী ওঁর দিকে তাকাল।

"পৃথিবীতে অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা কত?" উনি জিজ্ঞেস করলেন।

প্রশ্নটা এমন বেয়াড়া যে বিজলী কেমন হকচকিয়ে গেল; আমরাও। ইতস্তত করে সে বলল, "খুব বেশী নয়।"

উনি বললেন, "পৃথিবীতে দশজনের মধ্যে যদি দু জন অসামান্য বুদ্ধিমান লোক হয়, তবে দেখছি তাঁদের একজনকে খুনী হতে হবে, অন্য জনকে শখের গোয়েন্দা। এরপর অন্য বুদ্ধির কাজগুলো করার আর লোক পাওয়া যাবে না।"

অর্থটা এতক্ষণে যেন হৃদয়ঙ্গম হল। বিজলী বেশ লজ্জা গেল। বলল, "গল্প গল্পই।"

মজুমদারসাহেব হাসলেন শান্ত ভাবে। বললেন, "আমি সেটা বুঝি। কিন্তু গল্প বলেই সব গরু গাছে ওঠানো যায় না। যদি মানুষের মনের দুর্বলতা লোভ হঠকারিতা এ-সবের পরিচয় পেতে হয় তা হলে হয়ত যারা অপরাধ করে তাদের কথা শুনতে পার, কিন্তু সেগুলোকে গল্প করে নিলে ওটা গল্পই থাকবে, তার বেশী কিছু হবে না।"

আমরা মনে মনে এ-কথা স্বীকার না করে পারি না। ডিটেকটিভ গল্পের খুন তা যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন তাতে আমরা মজা পাই, রহস্য পাই, কিন্তু বাস্তবে কোনো হত্যার কথা শুনলে, খবরের কাগজে তেমন কোনো হত্যার কথা পড়লে আমরা

শিহরিত হই, বেদনা পাই। এই দুয়ের তফাত থেকেই বোঝা যায়, একটার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিছক মজা পাবার, অন্যটার সঙ্গে সম্পর্ক হৃদয়ের।

আমরা নীরব ছিলাম। মজুমদারসাহেব ধীরে ধীরে বললেন, "কোনো খুনীই অসাধারণ নয়, কেউই হায়ার ম্যাথামেটিক্স বা সাইন্সের মহাপণ্ডিত নয়। তারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, খুন তাদের প্রফেশান নয়। কেউ হঠকারিতা করে, কেউ আর কোনো উপায় না পেয়ে, কেউ বা রাগের মাথায়, লোভে লালসায় এ রকম কর্ম করে ফেলে। তারা একশোটা প্রমাণ রেখেই সাধারণত অপরাধ করে। তবে ওই যে কথায় বলে একটা ফোঁড় খুললে দশটা ফোঁড় খুলে যায়—সেই রকম। আমরা একটা সূত্র নিয়ে শুরু করি—ক্রমে দশটা সূত্র হাতে পাই।..."

মজুমদারসাহেব থামলে বিজলী বলল, "এক প্রমাণে শুনেছি খুনের বিচার হয় না।"

"সন্দেহজনক কোনো প্রমাণেই খুনের বিচার হয় না।"

কিছুক্ষণ আর আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। মজুমদারসাহেব কি ভাবছিলেন, হঠাৎ বললেন, "খুনের যে কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত উদ্দেশ্য হয়, তাও তোমরা জান না। আজ তোমাদের সেই রকম একটা ঘটনা বলি।"

আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মজুমদারসাহেব যে-সব কথা তুলেছিলেন অল্প আগে তা চিন্তার বিষয় হলেও এখন এই আড্ডায় তা নিয়ে মাথা ঘামানো যায় না। তিনি যে সে-প্রসঙ্গ বাদ দিলেন এতে আমরা খুশী হলাম।

মজুমদারসাহেব বললেন, "ঘটনাটা ধরে নাও গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যের আগে আগে ঘটছে। স্থান কলকাতার কাছাকাছি কোনো জায়গা। শহরের মধ্যে নয়, আবার খুব দূরেও নয়। দমদম গিয়েছ কখনও? ওদিকটাতেই।...বড় রাস্তা, পিচ বাঁধানো. পাথের দু ধারেই গাছপালা, আর আগের দিনের সব পড়ো বাগানবাড়ি। এই রকম একটা বাগানবাড়ির কাছে ঘটনাটা ঘটেছিল তবে অন্য বাগানবাড়ির সঙ্গে এর তফাত—এই বাড়িটা পোড়ো নয়; খুব পুরোনোও নয়। বড় রাস্তার গায়ে বাগান বাড়ির গেট গেটের পর পঁচিশ ত্রিশ গজ জায়গা। বাগান ফুলের বাগান। পেছনে পাশে অন্য সব গাছপালা। একদিকে একটা কালো পাথরের সিংহ মূর্তি, মুখ হাঁ করে আছে।

যে বাগানবাড়িটার কথা বলছি সেটা দোতলা। খুব উঁচু ভিতের ওপর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ি, বাড়িটার চেহারা থার্ড ব্র্যাকেটের মতন, মানে রাস্তার দিকে মুখ করে যদি ব্র্যাকেটটা বসিয়ে দাও তার দু মাথার লম্বাটে হাত দুটো রাস্তার দিকে থাকবে। মধ্যে বাড়ি, চারপাশে বাগান সিংহের মূর্তিটা বাড়ির ডান দিকে।

এই বাড়িতে তিনটি পরিবার থাকত। একটি পরিবার বড়, একটি মাঝারি, অন্যটি ছোট। আর থাকত বাড়ির মালিক—একটি ছেলে আর তার এক সম্পর্কের মামা।

একতলায় ছিল বড় পরিবারটি। ভদ্রলোকের নাম মনে কর মিস্টার দত্ত। টিম্বার মার্চেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রাক্টর। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। খুবই ভাল স্বাস্থ্য। স্ত্রী, বোন এবং বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তাঁর সংসার।

নীচের তলায়ই আর-এক দিকে থাকত মাঝারি পরিবারটি। স্বামী স্ত্রী এবং একটি বাচ্চা নিয়ে এদের সংসার। ভদ্রলোক একজন রেডিও এঞ্জিনিয়ার, সরকারী কাজ করেন।

ওপরে ছিল বাড়িওলা ছেলেটি এবং তার প্রায় সমবয়সী দূর সম্পর্কের এক মামা। ছেলেটির নাম ধরে নাও দিনেশ, তার মামার নাম অমূল্য।

দোতলায়ই আর-এক পাশে থাকত ছোট একটি পরিবার। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সের এক বুড়ো আর তার নাতনি। বুড়ো রিটায়ার্ড মিলিটারী ম্যান, নাতনি—বসুধা—পাশ করা নার্স।

মোটামুটি এই পরিচয় যথেষ্ট।...এরপরের গল্প যেখানে শুরু সেখানে যাই।

দিনেশের বয়স প্রায় তিরিশ। সে একটা রবারের কারখানা খুলেছে কিছুদিন আগে, মোটামুটি ব্যবসাটা চলছে। দিনেশের কারখানার যে ভদ্রলোক এঞ্জিনিয়ার তার মেয়ে বীথিকে দিনেশ ভালবাসতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে দিনেশ তার ছোট পুরনো গাড়িটা করে বীথিকে নিয়ে বেড়াতে যেত। এটা অনেকে দেখেছে, অনেকেই জানে।

ঘটনার দিন দিনেশ কারখানা থেকে ফেরার সময় বীথিকে তাদের বাড়ি থেকে সংগে নি— নিজেদের বাড়িতে এসেছিল। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে বীথিকে নিয়ে নীচে নামে।

আমি আগেই বলেছি, সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, এবং ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসার আগে আগে। তখনও আলো ছিল, সামান্য আলো, গোধূলির বেলায় যেমন থাকে।...দিনেশ আর বীথি নীচে নামার পর, দিনেশ গাড়ির এঞ্জিনের মুখটার দিকে দাঁড়িয়ে এঞ্জিনের ঢাকনাটা তুলে দিয়ে কোনো কলকব্জার গণ্ডগোল দেখছিল। বীথি গাড়ির সামনের দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হল আর বীথি কিছু বোঝার আগেই দিনেশ কেমন চিৎকার করে উঠল।

শব্দটা গুলীর। বেঁচে গেলেও বীথি থেকে দেড় দু হাত তফাতে দাঁড়ানো দিনেশের চোখের পাশ দিয়ে গুলীটা গাড়ির এঞ্জিনে গিয়ে লাগে। দিনেশের ডান চোখ সামান্য আহত হয়, কিন্তু চোখ বলেই ওইটুকু আঘাতে সে খুব ছটফট করছিল।

ঘটনাটা ঘটে যাবার সামান্য পরেই দিনেশের বাড়ি থেকে বীথির চিৎকারে লোকজন এসে পড়ে। টিম্বার মার্চেণ্ট দত্ত, রেডিও এঞ্জিনিয়ার মুখার্জি, দিনেশের মামা অমূল্য, এবং চাকর বাকররাও। বসুধাও নেমে এসেছিল। একমাত্র মানুষ সেই পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ, বসুধার দাদুই সংগে সংগে আসতে পারেন নি। কারণ ভদ্রলোক বেশ কালা। গোলমালটা তিনি শুনতে পান নি। পরে গেটের কাছে ভিড় দেখে তিনি নেমে আসেন।

কোনো লুকোচুরি না করে বলি, ইট ওয়াজ এ শট, গান শট। বুলেটও পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ির লোক প্রথমে শব্দ শুনে ভেবেছিল কোনো মোটার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে টায়ার ফাটিয়ে ফেলেছে। বীথিরও তাই মনে হয়েছিল শব্দটা কানে যেতেই। দিনেশকে চিৎকার করে উঠতে শুনেও সে কিছু বুঝতে পারে নি।... ব্যাপারটায় সকলেই বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ওটা যে গুলী করার ঘটনা এটা দিনেশই প্রথমে বলে। মোটর গাড়ির এঞ্জিনে বুলেটও পাওয়া যায়। অবশ্য সেটা পুলিস উদ্ধার করে।" মজুমদারসাহেব তাঁর কথা শেষ করে একবার আমাদের দিকে ভাল করে তাকালেন, সকলকে লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন,

"আপাততঃ ধরে নাও আমি দিনেশ এবং পুলিসের লোক দুইই। অর্থাৎ আমার ডবল পার্ট। তোমরা এই রহস্য উদ্ধার কর। আমায় যা জিজ্ঞেস করবে আমি দিনেশের তরফের হয়ে এবং পুলিসের পক্ষ থেকে তার যথাসাধ্য জবাব দেব।..." বলে মজুমদারসাহেব বিজলীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, "বিজলীবাবু, তুমি ত সর্বজ্ঞ শখের গোয়েন্দা, তোমায় হাতেই এই রহস্য উদ্ধারের ভার দেওয়া গেল—তুমিই শুরু কর।"

উনি নীরব হলেন। আমরা যেন হঠাৎ একটা সমস্যায় পড়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, মজুমদারসাহেব আমাদের বোধ বুদ্ধির পরীক্ষা করছেন।

বিজলী মাথা চুলকে বলল, "আমিই শুরু করব?"

"হ্যাঁ, করো। তুমি শুরু করলে ওরাও যোগ দেবে।" উনি আমাদের দিকে আঙুল দেখালেন।

ভেবে চিন্তে বিজলীই শুরু করল। বলল, "ঘটনাটা কি সত্যিই খুনের?"

"খুন করার উদ্দেশ্য ছিল। কেউ খুন হয় নি।"

"উদ্দেশ্য ছিল তার প্রমাণ কি?"

"বুলেট।"

"কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?"

"গাড়ির এঞ্জিনের মধ্যে। তোমাদের আগেই বলেছি, দিনেশ এঞ্জিনের ঢাকনা খুলে কিছু দেখছিল।"

বিজলী চুপ করে ভাবতে লাগল।

"আমার কিছু প্রশ্ন আছে।" কান্তি বলল।

"বল।" মজুমদারসাহেব বললেন।

"দিনেশকে প্রশ্ন করেছি কিন্তু।"

উনি হাসলেন।

"কেউ তাকে গুলী করছে এটা দিনেশই কি প্রথম সন্দেহ করে?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে?"

"শব্দ এবং ফিলিং থেকে। গুলী বন্দুকের ব্যাপারে দিনেশ অজ্ঞ ছিল না।"

"অন্য কারণেও তার চোখের কাছে লাগতে পারত।"

"তেমন কারণ কি থাকতে পারে!"

কান্তি যেন কি ভাবতে লাগল।

"ওখানে আশে পাশে আর বাড়ি ছিল না?" অশ্বিনী জিজ্ঞেস করল।

"না। ত্রিশ গজের মধ্যে অন্য কোনো বাড়ি ছিল না।"

"সে সময় রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি যায় নি?"

"না। সামান্য সময়টুকুর মধ্যে কোনো গাড়ি গেছে বলে দিনেশ বা বীথি মনে করতে পারে না।"

"তাদের ভুলও হতে পারে।"

"তা পারে। কিন্তু গাড়িটা গেটের পাশ ঘেঁষে রাখা ছিল। গুলীটা উত্তর দিক

থেকে এসেছে। কোনো গাড়ি—পথ চলতি গাড়ি থেকে—গুলী করতে হলে সেই গুলী দক্ষিণ দিক থেকে করতে হবে।"

"গুলী তা হলে বাড়ির দিক থেকেই এসেছে?"

"হ্যাঁ, বাড়ির দিক থেকে; এবং উঁচু থেকে।"

"মানে, বাড়ির দোতলা থেকে বা ছাদ থেকে বলছেন?"

"অবশ্যই তাই।"

অশ্বিনী চুপ করল, ভাবতে লাগল।

আমি বললাম, "এইগুলির লক্ষ্য কে ছিল? বীথি না দিনেশ?"

"জানি না। তবে বীথিও হতে পারে। হয়ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় দিনেশ আহত হয়েছিল।"

"দিনেশের কাকে সন্দেহ হয়?"

"কাউকেই নয়।"

"কিন্তু এই গুলীর পর ত সে কাউকে না কাউকে সন্দেহ করবে।"

"করা স্বাভাবিক। দিনেশও করেছিল পরে, বাধ্য হয়ে।" মজুমদারসাহেব বললেন। "যেমন ধরো টিম্বার মার্চেণ্ট দত্ত একবার হাজার পাঁচেক টাকা ধার চেয়েছিল, দিনেশ দেয় নি। রেডিও এঞ্জিনিয়ার মুখার্জির সঙ্গে কিছুদিন আগে দিনেশের এক চোট জোর ঝগড়া হয়েছিল, দিনেশ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে বলেছিল। মামা অমূল্য দিনেশের সমবয়সী, বীথির ওপর অমূল্যর একটা চাপা লোভ ছিল।"

"বসুধা আর বুড়ো বাদে তা হলে আর সকলকেই দিনেশ সন্দেহ করছে?"

"বসুধাকেও ঠিক বাদ দেওয়া যায় না। বসুধা খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। এমনও হতে পারে বসুধা মনে মনে দিনেশকে ভালবাসত। বীথিকে হয়ত সে সহ্য করতে পারছিল না।"

ঘটনাটা ভীষণ জটিল হয়ে এসেছিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম না, বন্দুকের লক্ষ্য কে ছিল, বীথি না দিনেশ!

বিজলী এবার বলল, "দিনেশদের বাড়িতে কি বন্দুক ছিল?"

"ছিল। দিনেশের নিজেরই বন্দুক ছিল। ওই বন্দুক নিয়ে সে মাঝে মাঝে পাখিটাখি শিকার করতে যেত।"

"বন্দুকটা থাকত কোথায়?"

"দিনেশের ঘরে; বন্দুকের খাপে ঢোকানো। দেওয়ালের কোণের দিকে একটা বেতের বাক্সর ওপর ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো থাকত।"

"ও বাড়ির কে কে বন্দুক ছুঁড়তে জানত।"

"পুরুষেরা সকলেই, মেয়েরা কেউই নয়।"

বিজলী যেন একটা গিঁট প্রায় খুলে আনতে পেরেছে ভেবে উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। শেষ কথায় কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

কান্তি বলল, "ঘটনার পর বন্দুকটা কি ঠিক জায়গায় ছিল?"

"হ্যাঁ। ঘটনার সময় অমূল্য বাথরুমে স্নান করছিল। স্নান করতে করতে সে নীচে চেঁচামেচি শোনে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সে প্রথমে দিনেশের ঘর দিয়েই ব্যালকনির দিকে যায়, সেখান থেকে নীচে রাস্তায় তাকিয়ে দেখে। তারপর আবার ছুটে দিনেশের ঘর দিয়ে বেরিয়ে নীচে নেমে যায়।"

"তাড়াহুড়োর সময় নিশ্চয় সে বন্দুকের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। তাছাড়া তখন নিশ্চয় অমূল্যর মনে বন্দুকের চিন্তাও অযথা আসে নি।"

"ঠিক কথা। অমূল্য তখন অকারণে বন্দুকের দিকে নজর দেবে কেন? তবে হ্যাঁ, দিনেশকে নিয়ে ফিরে আসার পর দিনেশের কথা শুনে তারা বন্দুকের দিকে নজর করে। খাপ সমেত ঠিক সেই জায়গায় বন্দুক দাঁড় করানো ছিল।" মজুমদারসাহেব সব জিনিস গুছিয়ে পরিষ্কার করে যেন বলে দিলেন।

কান্তি কি যেন ভাবল সামান্য। বলল, "ও-বাড়িতে একটি বন্দুক?"

"একটিই।"

"বন্দুকের গায় হাতের ছাপ পান নি?"

"পেয়েছিলাম। কোনো ছাপই তেমন স্পষ্ট নয়। তবে, দিনেশের বন্দুকে তার হাতের ছাপ থাকা যেমন আশ্চর্যের নয়, তেমনি অমূল্য, সেই বুড়ো ভদ্রলোক, টিম্বার মার্চেণ্ট দত্ত—এদের হাতের ছাপ পাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কারণ, দিনেশ ঘরে আসার পর যখন গুলী করার কথাটা খুব উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছিল সকলে, তখন তারা কৌতূহলবশত এবং উত্তেজনার মাথায় খাপ থেকে বন্দুক বের করে সকলেই দেখছিল সত্যি ব্যাপারটা কি। এই বোকামির ফলে ওরা স্পষ্ট ছাপ নষ্ট করে ফেলেছিল।"

কান্তিও যেন অনেকটা এগিয়ে এসে এবার হাল ছেড়ে দিল।

অশ্বিনী একবার শেষ চেষ্টা করার ভাব নিয়ে বলল, "দিনেশের সঙ্গে পাখি শিকারে কি ওরা সকলেই যেত?"

"না। দু-চারবার হয়ত গেছে সকলে। কিন্তু এই শিকারের ব্যাপারে বুড়ো, মানে বসুধার দাদুই ছিল দিনেশের বড় সঙ্গী।"

"ওই বুড়োর অত শিকারের ঝোঁক?"

"বুড়ো রিটায়ার্ড মিলিটারী লোক, শিকার-টিকারের নেশা এক সময় খুবই বেশী ছিল। দিনেশ ওঁকে খুবই পছন্দ করত, উনিও দিনেশকে ভালবাসতেন। দুজনে বেশ ভাবসাব ছিল। শিকারে যেতে পারলে বুড়ো খুশী হত বলে দিনেশ নিয়ে যেত। আসলে ওই একটা বেড়ানোর ব্যাপার আর কি!"

মন দিয়ে অশ্বিনী সব শুনছিল। এবার বলল, "অমূল্য যে ঘটনার সময় বাথরুমে স্নান করছিল এর প্রমাণ কি?"

"বসুধা।"

"বসুধা তাকে বাথরুমে দেখেছে?"

"হ্যাঁ। বসুধা যখন গোলমাল শুনে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে—তখন অমূল্যকে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।"

"বসুধা তখন কোথায় ছিল?"

"বারান্দায়।"

"দিনেশের বাথরুম কি আলাদা?"

"আলাদা।"

"সেখান থেকে গেটের সামনে গুলী করা যায় না?"

"না।"

অশ্বিনীও থেমে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল সে গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে।

ঘাড় চুলকে এবার আমি গোয়েন্দাগিরিতে নামলাম। বললাম, "নীচের তলার দু ভাড়াটে—টিম্বার মার্চেন্ট দত্ত আর রেডিও এঞ্জিনিয়ার মুখার্জীকে আমরা বাদ দিতে পারি। আপনি বলছেন গুলীটা ওপর থেকে হয়েছিল। তার মানে, হয় দোতলা থেকে না হয় ছাদ থেকে।"

"দত্ত বা মুখার্জি যে দোতলায় আসে নি, বা ছাদে ওঠে নি তার প্রমাণ কি?"

"উঠলেও তাদের পক্ষে দিনেশের ঘরে গিয়ে বন্দুক আর বন্দুকের গুলী—দুটি জিনিস যোগাড় করা মুশকিল।"

"দিনেশের ঘর খোলা পড়েছিল, তার বন্দুক লুকোনো জায়গায় ছিল না।"

"কিন্তু গুলী?"

"শিকার করার গুলী কেনা কি খুব অসুবিধের?"

"দিনেশের বন্দুকে কোন্ গুলী লাগবে তা না জানলে—"

"ওরা কি তা জানত না!...আমি আগেই

বলেছি, দিনেশের সংগে দু চারবার করে ওরা সকলেই শিকারে গেছে।"

সমস্ত ব্যাপারটা দুরূহ অঙ্কের মতন মনে হচ্ছিল। আমি আর যুক্তি পেলাম না। বললাম, "আমার ধারণা, এ-কাজ অমূল্য করেছিল। অমূল্যর পক্ষেই সব রকম সুবিধে যত, অত অন্য কারও পক্ষে নয়।"

"তুমি তা হলে বলছ অমূল্য দিনেশকে গুলী করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"বীথিকে নয়।"

"না। বীথির জন্যেই ত দিনেশকে গুলী করা।"

"বসুধার কথা তা হলে মিথ্যে?"

"হ্যাঁ। বসুধা মিথ্যে কথা বলছে।"......

"কেন? বসুধা অকারণে অমূল্যর জন্যে কেন মিথ্যে কথা বলবে?"

কথাটা খুবই সংগত। বসুধা কেন বলবে! তবে কি বসুধা অমূল্যকে ভালবাসত! অমূল্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল!

"আমার মনে হয় বসুধা অমূল্যকেই ভালবাসত।"

"তুমি নিজেই একটু আগে বললে, অমূল্য বীথির জন্যে দিনেশকে গুলী করেছে। যদি তাই হয়, তবে বসুধা কেন অমূল্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে? বসুধার কি স্বার্থ?"

আমি কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। মজুমদারসাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এই অদ্ভুত ধাঁধার কোনো রহস্য উদ্ধার আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

বিজলী হার স্বীকার করে বলল, "আমাদের দ্বারা হল না।"

মজুমদারসাহেব হেসে বললেন, "সে কি! শখের গোয়েন্দারা মাত্র এতেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ।......তোমরা না সব সময় ভয়ংকর ইণ্টারেস্টিং কাহিনী শুনতে চাও। এই ঘটনাটা ত বাপু, খুব বাজে নয়। প্রবলেমটা মোক্ষম।"

এই ঠাট্টা আমরা নীরবে সহ্য করলাম। বিজলী যে কোথা থেকে এক গাঁজাখুরি গল্প শুরু করেছিল, তার এই পরিণতি।

কান্তি বলল, "আমাদের সাধ্যে কুলোবে না। আপনিই বলুন।"

মজুমদারসাহেব অনেকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। কিছু যেন ভাবছিলেন। শেষে সামান্য হেসে বললেন, "ধরো, গুলীটা বসুধার দাদুই করেছিল।"

"বসুধার দাদু—সেই বুড়ো ভদ্রলোক?"

"হ্যাঁ। বুড়ো একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী ম্যান। বন্দুক ছুঁড়তে তার হাত কাঁপার কথা নয়।"

"তিনি কেন গুলী করবেন?"

"নাতনির জন্যে। এমন ত হতে পারে, বসুধা যে দিনেশকে ভালবাসে তিনি

জানতেন। তিনি হয়ত এটাও চাইতেন দিনেশ-বসুধার বিয়ে হোক। বীথি এসে সে পথে কাঁটা হচ্ছিল।"

"তা হলে বীথিই তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ, বীথিই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দোতলায় নিজের ঘর আর ব্যালকনির আড়াল থেকে লুকিয়ে গুলী করার সময় আসন্ন সন্ধ্যার মুখে তাঁর নিশানা ভুল হয়েছিল। গুলীটা বীথির গায়ে না লেগে—দিনেশের মুখের পাশ ঘেঁষে মোটরের এঞ্জিনে গিয়ে লাগে।"

"তা হলে বলতে হবে বন্দুকটা তিনিই দিনেশের ঘর থেকে এনেছিলেন?"

"নিশ্চয়। তিনি বন্দুক এনেছিলেন। তিনি শিকারে যেতেন মাঝে মাঝে দিনেশের সঙ্গে—কাজেই একটা দুটো গুলী রাখা বা কিনে আনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।"

"গুলী করার পর বন্দুকটা তিনি আবার দিনেশের ঘরে রেখে আসেন?"

"হয়ত গুলী করার পর তিনি এই হঠকারিতার জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। বসুধা ঘরে ঢুকে দাদুকে ওই অবস্থায় দেখতে পায়। সে জানলার কাছে এসে নীচে রাস্তার দিকে তাকাবার পর ব্যাপারটা বুঝতেও পারে।"

"তারপর?"

"সমূহ বিপদ বুঝে বসুধা বন্দুকটা সরাবার চেষ্টা করে।"

"তার মানে সে দাদুর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে দিনেশের ঘরের দিকে যায়।"

"না, কেড়ে নিয়েই সে বন্দুক রাখতে যায় নি। টাওয়েল দিয়ে রগড়ে সে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দাগ মুছে ফেলে। বারান্দায় বেরিয়ে দেখে নিচ্ছিল দিনেশের ঘর ফাঁকা কি না। সেই সময় অমূল্যকে বাথরুম থেকে বেরুতে, দিনেশের ঘরে যেতে, আবার একটু পরেই নীচে চলে যেতে দেখে। ঘর ফাঁকা হলেই বসুধা বন্দুক নিয়ে গিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়।"

"কিন্তু অমূল্য কি কিছুই সন্দেহ করতে পারল না?" কান্তি বলল।

"কি করে করবে? ধরো যদি এমনও হয় যে, অমূল্য যখন ছুটে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় তখন তার কানে নীচে থেকে গুলী বা বন্দুকের সম্পর্কে কোনো কথা গিয়েছিল (যদিও তার সম্ভাবনা নেই), তবু ঘর দিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাবার সময় সে চোখ তুলে বন্দুকের দিকে তাকালে ঠিক জায়গাতেই বন্দুকের খাপটা দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া দেখত। তার মধ্যে বন্দুক আছে কি না তা সে কি করে জানবে!"

"স্ট্রেঞ্জ! ......তারপর?"

"তারপর আর কি, অমূল্য নীচে নেমে গেলে বসুধা বন্দুকটা দিনেশের ঘরে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে এল।"

আমরা নীরব। বিজলী বড় করে নিশ্বাস ফেলল। বলল, "আপনারা সেই বুড়োকে সন্দেহ করলেন কি করে?"

"আমরা সন্দেহ করি নি।...ঘটনার প্রায় দিন তিনেক পরে যখন আমরা সমানে মাথা ঘামাচ্ছি, তখন উনি নিজেই কনফেস করলেন। নাতনির ওপর তার মায়ামমতা ভালবাসা যতই হোক, তবু এক অদ্ভুত আক্রোশে এ-রকম একটা কাজ করার পর তাঁর শান্তি হচ্ছিল না।......নিজের অপরাধ তিনি নিজেই লিখিতভাবে স্বীকার করেন।"

"আদালতে তাঁর..."

"আদালত! না, আদালতে তাঁকে যেতে হয়নি ...স্বীকারোক্তি লিখে, একসঙ্গে দশ-বারোটা ঘুমের বড়ি খেয়ে তিনি সেই যে রাত্রে ঘরে খিল দিয়েছিলেন, আর চোখ খোলেন নি।"

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

—দশ—

রানীর বস্ত বাহার খুলেছে দু-কানে দুই মাকড়ি পরে। বলে দেয়, ইহুদি-মাকড়ি এর নাম। সাহেব হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কথায় কথায় ঘাড় দোলানো রানীর অভ্যাস, মনের খুশিতে আজ বেশি করে দোলাচ্ছে। ঘাড় দোলানির সঙ্গে মাকড়ি দুটো দোলে, আর যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কী সুন্দর—মরি, কত সুন্দর হয়েছে রানী নতুন গয়না পরে। হঠাৎ যেন বড়সড় হয়ে উঠেছে। বয়সে দু-বছরের ছোট, তবু যেন সাহেবের চেয়ে সে অনেকখানি বড়। চালচলনে বড়দের ভাব। মেয়েছেলে কেমন আগে আগে বড় হয়ে যায়। বস্ত কড়া মা পারুল, ফ্রক পরা বন্ধ করে দিয়েছে—নাকি আরু থাকে না ফ্রকে, বিশ্রী দেখায়। শাড়ি পরে রানী, শাড়ি পরেই বড় হয়ে পড়ল। রানী যেন আলাদা মানুষ আজকাল।

ভ্রূভঙ্গ করে সাহেব বলে, সাতস বলিহারি তোর রানী। কানে গয়না ঝুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিল।

রানী অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারছিস নে?

রানী বলে, গয়না পরব না, তবে মা টাক খরচা করে কিনে দিল কেন?

কত টাকা রে?

রানী ঘাড় দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, তা দশ টাকা হবে। নয়তো পঁচিশ টাকা। সোনা, হীরে, মুক্তো বসানো কিনা।

রানীর কানের পিঠে হাত রেখে হাতের উপর সাহেব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাকড়ি দেখল। হীরে এই বস্তু! কোহিনুর হীরকের কথা পড়া আছে—জিনিস আলাদা হোক, জাত সেই একই বটে! বুকের মধ্যে জ্বালা করে ওঠে।

চাট্টি মুড়ি খেয়ে আছে সাহেব, সুধামুখীর তা-ও নয়। সন্ধ্যার মুখে কাল সুধামুখী বলল, সর্দি জমে বুকের মধ্যে পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে, উপোস দিলে টেনে যাবে। উপোস প্রায়ই দেয় আজকাল। রাতের পর রাত। কিন্তু ঐ সর্দি কিছুতেই টানে না। এ সমস্ত বাইরের কাউকে জানতে দেবে না সুধামুখী, পারুলকেও না। কথায় আছে, নিত্যি মরায় কাঁদবে কে? তোমার বাড়ি নিত্যিদিন যদি মরতে থাকে, শেষটা কাঁদবার লোক পাওয়া যাবে না আর। তাই হয়েছে, দুঃখের কাঁদুনি লোকের কাছে গাইতে লজ্জা লাগে।

কিন্তু সুধামুখীর না হয় সর্দিজ্বর, ছেলেমানুষ সাহেবের কি? তার যে খিধে লাগে, ভাত না খেলে পেটই ভরে না। সুধামুখী বলে, জ্বরে কাঁপুনি ধরেছে, রাঁধতে যেতে পারছি নে বাবা। রাতটুকু মুড়ি খেয়ে কোনরকমে কাটিয়ে দে। সকালে উঠেই ফ্যানসা ভাত রেঁধে দেব। গরম গরম ভাত, আলু-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

মুড়িও এত ক'টি মাত্র ঠোঙায়। কলাইয়ের বাটিতে সেগুলো ঢেলে দিয়ে জ্বরাক্রান্ত সুধামুখী লেপ-কাঁথার নীচে গেল না। ভাদ্র মাসের টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘ গলিটা শেষ করে বড় রাস্তার মোড় অবধি গিয়ে দাঁড়াল। সাহেব দেখে সমস্ত। দোমহলা-তেমহলার বাবু-ছেলেপুলের মতো ভ্যাবা-গঙ্গারাম নয় এরা। সেই মোড় থেকে পথচারী কাউকে নিয়ে আসবে ঘরে। সাহেব মুড়ি ক'টা চিবিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে ততক্ষণে ঘাটে চলে গিয়েছে। রানীকেও নিয়ে বসে কখনোসখনো, কিন্তু মেয়েটা ভালমন্দ খেয়ে তো ঢেকুর তুলছে, তাকে ডাকতে আজ ভাল লাগল না। ঘাটের পাকা পৈঠার উপর একলা বসে নৌকো দেখে। তারপরে চোখে ঘুম ধরলে জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাস্তার মোড়ে সুধামুখী তখন আর একটা মেয়ের গলা ধরে হাসিতে গলে গলে পড়ছে। হাসে আর সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখে, চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল কিনা কেউ। তা যদি হল, বাড়ির দিকে ফিরবে এবার। এক-পা দু-পা চলে, আর আড়চোখে তাকায়। মানুষটা পিছন ধরল কিনা। একা একা ঘরে ফিরতে হলে কাল সকালে ফ্যানসা-ভাতের লোভ দেখিয়েছে,—সেই বস্তু হয়ে উঠবে না। জ্বর আরও বাড়বে, জ্বরের তাড়সে মাথা ছিঁড়ে পড়বে : মাথা একেবারে তুলতে পারছিনে সাহেব, কেমন করে রাঁধতে বসি বল্ তুই।

কাল রাত্রে সাহেব মুড়ি চিবিয়ে আছে আর হীরে-মুক্তোর মাকড়ি দুলিয়ে বেড়াচ্ছে

রানী। চোখ জ্বালা করে—অসহ্য চোখ মেলে গয়নার বাহার দেখা। সাহেব বলে, কানের মাকড়ি খুলে রাখ রানী। দেমাক দেখিয়ে বেড়ানো ভাল নয়।

সাধ করে রানী দেখাতে এসেছে, সাহেবের কথায় মর্মাহত হল। রাগ হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে জেদ করে বলে, না—। মাকড়ি দুলে ওঠে।

তোর ভালর জন্যেই বলি। মজা টের পাবি কানের লেতি ছিঁড়ে নিয়ে যাবে যখন।

রানী সবিস্ময়ে বলে, মাকড়ি আমার—কে নিতে যাবে? এত টাকা দিয়ে মা কিনে দিয়েছে—

নেয় না? গেরোনের দিনে কি হল সেবার—পাথরপটির ভিতরে একজনের গলা থেকে মবচেন নিয়ে নিল না? তুইও তো ছিলি সেখানে।

ঠিক বটে। রানীর মনে পড়ে গেল। কত লোক জমে গিয়েছিল, কত হৈ-চৈ!

সাহেব বলে, কত দিকে কত সব চোর জুয়োচোর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একটানে ছিঁড়ে নেবে। লেতি ছিঁড়ে ফাঁক করে ফেলবে, রক্ত বেরুবে গলগল করে। কানে আর কোন দিন গয়না পরতে হবে না।

রক্ত বেরোক, আর লেতি কেন গোটা কানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক, রানী তাতে বিচলিত নয়। কিন্তু সারা জীবনে যে কানের গয়না পরা হবে না, তার চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে রানী সেই কথা বলল, সাহেব-দা আজ বড্ড ভয় দেখিয়েছে, কান ছিঁড়ে মাকড়ি নিয়ে নেবে নাকি।

কথাটা ভাল করে শুনে পারুলও ঘাবড়ে যায়। খাঁটি কথা বলেছে। এতখানি তার মনে আসে নি, অথচ আশ্চর্য দেখ ছেলে-মানুষটার হুঁশজ্ঞান। বলে, গয়না গেলে গয়না হবে। একখানার জায়গায় পাঁচখানাও হতে পারে। তার জন্য ভাবিনে। কিন্তু একটা অঙ্গের খুঁত হয়ে থাকলে সেটা বড় লজ্জার কথা। যেমন কুসুমের নাম হয়ে গিয়েছিল আঙুল-কাটা কুসি। ডাব কাটতে গিয়ে দায়ের কোপ আঙুলে মেরে বসেছিল। যদ্দিন না মরণ হল, আঙুল-কাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেল কুসির। আমার কাছেই কেঁদেছে কত।

মাকড়ি নিজেই খুলল মেয়ের কান থেকে। বলে, রেখে দে তুই, আর পরিস নে। কানফুল কিনে দেব, নাকছাবি কিনে দেব, যে গয়না ছিঁড়ে নিতে পারে না। মাকড়ি যায়, সেটা এমন কিছু নয়। কান ছিঁড়ে যাবে, লোকে কান-কাটা কান-কাটা করবে—কান-কাটা রানী। সর্বনেশে কথা। বিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠাকুরদেবতারা একটা খুঁতো পাঁঠা বলি নিতে চান না, খুঁতো কনে কোন বর নিতে যাবে?

তালপুজো আবার সেইদিনটা। অমাবস্যা তিথি, তার উপর মঙ্গলবার পড়েছে, ভাদ্রমাস তো আছেই। মা-কালীর ডালির সঙ্গে একটা করে তাল দিতে হয়, তাল পেয়ে

দেবী মহাতুষ্ট হন। এতগুলো যোগাযোগ প্রতি বছর ঘটে না, মন্দিরে তাই বড় মচ্ছব। দূর-দূরান্তর থেকেও মানুষ এসে ভিড় করেছে—লোকারণ্য। বাহারের সাজপোশাকে ধাঁধা লাগে চোখে।

সুধামুখীর জ্বর ও মাথাধরা তেমনি চলছে। শুয়ে ছিল, সন্ধ্যার মুখে উঠে পড়ল। সাহেবকে বলে, ভরা অমাবস্যা, তায় ভাদ্দরমাস। তার উপরে এত বড় পরব। পুরোদস্তুর নিশিপালন আজ বুঝলি রে সাহেব? তেষ্টার জলটুকু ছাড়া কিছু নয়।

আরও কি কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিল, গলা আটকে আসে, হাহাকারের মতন একটা আওয়াজ বেরোয়। জলের ঘটিটা নিয়ে সুধামুখী দ্রুতপায়ে বাইরে চলে যায়। জল থাবড়াল খানিকটা মাথায়, ভিজা চুলে তেল দিল। চুল আঁচড়াচ্ছে, রঙিন শাড়ি বের করেছে। এতক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, মাকে আজ একমনে ডাকতে হয়—মাগো, ভাত-কাপড় দাও, সুখ-শান্তি দাও। উপোসি থেকে খুব ভক্তিভাবে বল্ দিকি—ছেলে-মানুষের কথা আজকের দিনে মা ফেলবেন না, যা চাইবি ঠিক তাই ফলে যাবে।

কাল চাট্টি মুড়ি হয়েছিল, অদৃষ্টে আজ তা-ও নেই বোঝা যাচ্ছে। নিরম্বু উপোস। সাহেব ক্ষেপে গেল : মিছে কথা তোমার, খেতে না দেবার ছুতো। কাল অমাবস্যা ছিল না, কাল কেন তবে মুড়ি খেতে হয়েছে? ভাত আমি চাই। ভাত রেঁধে দেবে, নয়তো রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে তছনছ করব। পারুল-মাসি নিতে চেয়েছিল, আমি জানি সমস্ত। কত যত্ন করত। রানীকে কত কি কিনে দেয়, আমাকেও দিত। কেন দাওনি তখন?

সুধামুখী বলে, মা হয়ে ছেলে পোষানি দেব?

মা না হাতি। চালাকি করে মা হয়ে আছ। শুনতে আমার বাকি নেই। পরের বাচ্চা গঙ্গা থেকে কুড়িয়ে এনে মা। চোরাই মা তুমি।

সুধামুখী আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে : এত বড় কথা বললি তুই সাহেব—পারলি বলতে?

নিঃশব্দে সুধামুখী কাঁদতে লাগল। কথা-কাটাকাটি করে না, এই কলহের একটি কথাও বাইরে চলে না যায়। বাড়িটা এমনি, মজার গন্ধ পেয়ে ভিড় হয়ে যাবে, কাজকর্ম ফেলে মেয়েরা এসে জুটবে। রসাল জিজ্ঞাসা নানা রকম। সাহেবের দিকে সবাই, শতমুখে সুধামুখীর নিন্দা করবে : আক্কেল দেখ না। আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নাদুসনুদুস সোনা হেন ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে সলতে করে তুলেছে।

সাহেব রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি ভাঙতে যায় না, সুধামুখীর দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। চুপচাপ ঘাটের উপর গিয়ে বসে। মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই ভাসতে ভাসতে একদিন যে ঘাটে এসে লেগেছিল। বন্ধু জুটেছে সমবয়সি কয়েকটা ছোঁড়া, ঘাটের বাঁধানো সমতলের উপরে একটু গর্ত খুঁড়ে নিয়ে গুলি খেলে সকলে মিলে। ঘাটের মণ্ডপের ছাতে কলেকৌশলে উঠে গিয়ে ঘুড়ি উড়ায়—হঠাৎ এক সময় তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে ঘুড়ি ধরতে ছোটে। নৌকোঘাটা ঠিক পাশে বলে মাঝিমাল্লাদের এই ঘাটের উপর দিয়ে গতায়াত। সাহেব তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে গল্প শোনার লোভে। ফুটফুটে ছেলেটা দেখে তারাও কাছে ডাকে। ডেকে কত সময় নৌকোর উপর নিয়ে যায়। গল্প শোনা সাহেবের এক নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কত কত গহিন নদী, কত অজানা দেশভুঁই। মালপত্র খালি করে নৌকো আবার ভেসে ভেসে চলে যায়। অমনি করে তারও নতুন নতুন জায়গায় ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

ঝিঙে হল ছোঁড়াদের সর্দার। এই বস্তির মালিক ফণী আড্ডির ছোট ছেলে। ফণীর ছেলে একটা-দুটো নয়। দুনিয়ায় আসা যেমন করে হোক, দুটো পয়সা রোজগারের জন্য, ভগবান সেই জন্য নরজন্ম দিয়ে পাঠান—ফণী আড্ডি হামেশাই এই কথা বলেন। এবং ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্য অহরহ লেগে পড়ে আছেন। ছেলে কোনটা কোথায় পড়ে রইল, খোঁজ নেবার সময় পান না। বাড়িওয়ালার ছেলে—সেই খাতিরে, এবং নিজের গুণপনার জন্যে ঝিঙে সকলের মাতব্বর।

সে এসে ডাকে, কালীবাড়ি চল সাহেব। আমরা যাচ্ছি।

না।

কত লোক এসেছে দেখতে পাবি। কত মজা।

ভাল লাগছে না। জ্বর হয়েছে আমার, শুয়ে পড়ব।

পারুলও বাড়ি থেকে বেরুল। বড়

রাস্তার মোড় অবধি এসে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে—মা-কালী করুন, পারুলের তেমন দশা কোন দিন যেন না ঘটে। মোড় ছেড়ে হেঁটে হেঁটে সে মন্দির অবধি চলে এসেছে। আলো দেখছে, দোকানপাট দেখছে,—কত রকমের মানুষ এসে আড়ম্বরের পুজো দিচ্ছে—উঁকিঝুঁকি দিয়ে তা-ও দেখল কয়েকবার। যেখানে মানুষের ভিড়, সেইখানে পারুল। ভিড়ের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে সেই ব্যবস্থা আজ অঢেল রকম সে করে এসেছে। সারা বেলাস্ত খেটেছে দেহটা নিয়ে। খাটুনি মিছা হয় নি, পায়ে পায়ে সেটা বুঝতে পারে। এই রকম এক-একটা বিশেষ দিনে পারুল বেরিয়ে পড়ে। স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ—ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বেড়ায়। মানুষ টানবার ক্ষমতা বেড়েছে না কমে গেছে গত বছরের তুলনায়, তারও বুঝি একটা পরীক্ষা করে দেখে। একটা-দুটো লোক যেন খিমচি কেটে তুলে নিয়ে আসে জমাট ভিড়ের গা থেকে। খেয়ালি মেয়ে-মানুষ। লোক পিছনে তো ইচ্ছে করেই পারুল উল্টো-পাল্টা এদিক-সেদিক নিয়ে দুনো তেদুনো পথ ঘুরিয়ে মারে। কষ্ট হোক বেশি, কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না। ছিটকে পড়ে কিনা দেখাই যাক। একবার-বা পিছনে ফিরে, বন্ধন ইতিমধ্যে কিছু ঢিলে হয়ে থাকে তো, চোখের নজরে মুচকি হাসিতে আঁটসাট করে নেয় সেটা। ঢুকল এসে গলিতে, পৌঁছল বাড়ির দরজায়। হঠাৎ তখন মারমুখি হয়ে পড়ে: পথের জঞ্জাল আদাড়-আঁস্তাকুড় বাড়ি ঢুকবার শখ তোমার! বেরো, বেরো—। পরখ যা করবার, হয়ে গেছে। অথবা মনে ধরল তো মোলায়েম কণ্ঠ: আসুন না ভালবাসা, মন্দ বাসায় ঢুকে পড়ুন। টেনে নিয়ে তুলল সাজানো ঘরে—ঘরের খাটের বিছানায়। কত খেলায় এমনি! দূরের কত সব অঞ্চলের আনকোরা নতুন পুরুষ। নতুন রাজ্যে দিগ্বিজয়ের আনন্দ।

রানীও মায়ের সঙ্গে। শাসন যতই হোক, মচ্ছবের দিনে মেয়েটি মুখ চুন করে একলা বাড়ি পড়ে থাকবে, সেটা হয় না। কোন প্রাণে পারুল মানা করতে যাবে। কেউ যদি পিছন ধরে তো রানীকে বলে দিতে হবে না, আপনা থেকেই ভিন্ন পথে এগিয়ে চলে যাবে। যেন মা-মেয়ে নয়—নিতান্তই পথের পথিক, কোন রকম জানাশুনো নেই দুইয়ের মধ্যে। কোন অবস্থায় কেমন ভাব দেখাতে হবে, ছেলেমেয়েদের এখানে হাতে ধরে শেখাতে হয় না।

মন্দিরে যাবার ইচ্ছা সুধামুখীরও। কিন্তু থেকে থেকে বৃষ্টির পশলা, গায়ে জ্বর, আপাদমস্তক দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে একেবারে। হেন অবস্থায় ভয় হল অতদূরে হাঁটতে। তার চেয়েও বড় ভয়—হাতে-মুখে রং মেখে সজ্জা করেছে, উজ্জ্বল আলোয় কারসাজি সমস্ত ধরা পড়ে যাবে। গলির মুখে প্রতিদিনের সন্ধ্যাবেলার আলো-আঁধারি জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড় কিছু পাড়ার মধ্যেও ছিটকে এসে পড়েছে। পুজোআচ্চা ও ডালি দেওয়া ছাড়াও বাজে লোক কত এসেছে! সেই একদিন দুপুরে পারুলের ঘরে যেমন ঢুকেছিল। মা-কালীর উদ্দেশে জোড় হাতে সুধামুখী বারম্বার কান্নাকাটি করে: পার্বণ শুধু তোমার মন্দিরে কেন মা, আমার ঘরেও যেন ছিটে-ফোঁটা এসে পড়ে। আমার সাহেবের মুখে চাট্টি চাল ফুটিয়ে ধরতে পারি যেন মা।

সাহেব গঙ্গার ঘাটে। সুড়ুৎ করে এক সময় বস্তিবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সব ঘরের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, দরজায় দরজায় শিকল তোলা। গিয়েছে বেশির ভাগ কালী-বাড়িতে, দু-চারজন মোড়ের উপর। এজমালি ভৃত্য মহাবীর—ভৃত্য বটে আবার খানিকটা অভিভাবকও বটে। সে লোকটাকেও দেখা যায় না, গিয়ে মচ্ছবে জমে পড়েছে ঠিক। সন্ধ্যাবেলাটা এখন পাহারা দেবার কিছু নেই, মানুষজন আসতে লাগে নি যে এটা-ওটার ফাই-ফরমাস হবে। নির্ভাবনার কোন-খানে গিয়ে সে আড্ডা জমাচ্ছে।

অবিকল এমনিটাই ভেবে রেখেছে সাহেব। নিশ্চিন্ত। কাজও সাব্যস্ত হয়ে আছে—লাইনের সর্বশেষে পারুল-আসির ঘরে। দেখেশুনে রেখেছে, তবু ঠিক কাজের মুখটায় সতর্কভাবে আর একবার দেখে নেওয়া উচিত। ঘরের ওপাশে ফাঁকা জায়গাটুকুতে কয়েকটা গাঁদা দোপাটি ও পাতাবাহারের গাছ। ঠাণ্ডাবাবু সেই আম-চারা পুঁততে গিয়েছিলেন, বিস্তর ঝড়ঝাপটা খেয়েছে—সেবারের আশ্বিনের ঝড় ঝড়ে পুরানো পাঁচিলের খানিকটা ভেঙে পড়েছিল চারা গাছের উপর—সামলে উঠে ডালপালা মেলে দিব্যি এখন তেজীয়ান হয়েছে। সেই

গাছের উপর চড়ে সাহেব উ'কিঝ'ুকি দেয়—এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে দেখতে পাওয়া যায় কি না, দেখছে কি না কোন লোক। নিঃসংশয় হয়ে এবার বারান্ডায় উঠে পড়ল।

ওরে বাবা, কত বড় তালা ঝুলিয়ে গেছে দেখ দরজায়। আদিগঙ্গার ওপারে লক্ষপতি মহাজনদের বড় বড় আড়ত, তারা কখনো এইরকম আধমনি তালা ঝুলোয় না। কী করা যায়, কী করা যায়! ঝিঙেটা বাহাদুরি করে, সে নাকি হামেশাই এই সমস্ত করে। আর সাহেব, ধরতে গেলে, নিজের ঘরেই কাজ করতে এসে হার স্বীকার করে ফিরে যাবে?

খোঁজাখুজি করে পেয়ে গেল করলা-ভাঙা ভারী লোহাখানা। ঠিক হয়েছে। দু হাতে তুলে তালার উপর দেবে মোক্ষম বাড়ি। একের বেশী দুটো বাড়ি লাগবে না। কাছে-পিঠে মানুষ নেই যে শব্দ শুনে রে-রে—করে আসবে। আসে যদি, তারও উপায় ঠিক আছে। আমগাছ বেয়ে উঠে দেবে লাফ পাঁচিলের ওপারে। পাঁচিল টপকানো ব্যাপারটা সাহেবের খুব রপ্ত। সাধারণ যাতায়াতের ব্যাপারেও এই পথ বেশী পছন্দ তার। দরজার ছোট্ট খোপ গলে আর দশটা মানুষের মত চলাচল সে কালেভদ্রে করে থাকে।

লোহাটা তুলে নিয়ে চতুর্দিক আরও একবার দেখে নেয়। মালকোঁচা সেঁটে নিল তাড়া খেয়ে দ্রুত যদি পাঁচিলে উঠতে হয় ঢলঢলে কাপড় বেধে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। হাতিয়ারপত্র সহ রীতিমত বীরমূর্তি' তালাটা হাতে ধরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, ' ঠিক জায়গায় বাড়িটা যাতে লাগে—

হরি, হরি! হাতে ছু'তে না ছু'তে তালা হাঁ হয়ে পড়ে। পুরানো বাতিল বস্তু কোনগতিকে একটুখানি চেপে দিয়ে চলে গেছে। তালার সাইজ দেখেই চোর আঁৎকে উঠে সরে পড়বে—ক্ষেতের মধ্যে যেমন খড়ের মানুষ দাঁড় করিয়ে কাক-পক্ষী তাড়ায়। সাহেব খলখল করে হাসে : পায়ুল-মা

দশ টাকা কিম্বা পাঁচিশ টাকা দিয়ে হীরে-মুক্তোর মাকড়ি কিনে দিয়েছে, দরজার জন্য চার গণ্ডা পয়সারও একটা তালা কিনতে পারে না।

বড় হয়ে এই দিনের ঘটনা নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা নিজেদের মধ্যে। সাহেব বলত, তালা ঠিকই ছিল, তালোম্ঘাটিনী মন্ত্রে খুলে গেল। এখন সেটা বুঝতে পারি, সেদিন অবাক হয়েছিলাম। তালোম্ঘাটিনী অতি প্রাচীন মন্ত্র—বলাধিকারী মশায় বলেন, বেদের আমলেও এই পদ্ধতি চলত। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে তার। নাকি মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালা আপনি খুলে পড়বে। এ লাইনের ভাল ভাল মুরুব্বিদেরও, ঠিক এই বস্তু না হোক, তালা খোলার নানা রকম তুকতাক জানা। এক রকম পাতার রস তালার ছিদ্রে ঢেলে দিলে তালা খুলে পড়ে। এক রকম শিকড়ও আছে, বুলিয়ে দিতে হয়। সমরাদিত্য-সংক্ষেপ নামে পুঁথিতে গল্প আছে—গুরু শিষ্যকে তালা ভাঙার মন্ত্র দিচ্ছেন, কিন্তু চুক্তি হচ্ছে কদাপি সে মিথ্যা বলতে পারবে না। কথা রাখতে পারল না শিষ্য, দৈবাৎ মিথ্যা বলে ফেলেছে। ফল অমনি হাতে হাতে। তালা ভেঙে যেইমাত্র ঢোকা, গৃহস্থ ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে। মোটের উপর এই একটা কথা। রীতিমতো নিষ্ঠাবান হতে হবে তোমায়, নইলে চোরের দেবতা কার্তিকেয়র অভিশাপ লাগবে, যত সতর্কই হও নিশ্চিত ধরে ফেলবে ঘরের ভিতর।

সাহেব তাই বড়াই করে বলে, আমার কি রকম নিষ্ঠা দেখ ভেবে। রানীর সঙ্গে এত ভাবসাব, আমাদের দুজনের জুড়ি দেখে সবাই বর-বউ বলত। আদর্শ বউয়ের যেমনটি হতে হয়—রানীর সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সব কথা আমার সঙ্গে। তবু দেখ তারই ঘরে কাজের বউনি আমার। অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকে গেলাম। পারুল-মাসির সাজানো বড় ঘরের পাশে ছোট্ট ঘরখানা—পোষা কাকাতুয়া, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় ও পানের সরঞ্জাম থাকে। সন্ধ্যাবেলাটা বড় ঘর ছেড়ে রানী এসে আস্তানা নেয়, তার ধনসম্পত্তি যাবতীয় সেখানে।

পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রানী মাকড়ি রেখেছে, সমস্ত জানা। চুরি করে দেখে গেছে। ঘরে ঢোকা, গয়না নিয়ে বেরুনো এবং তালা যেমন ছিল তেমনিভাবে লাগিয়ে রাখা—পলক ফেলতে না ফেলতে হয়ে গেল। পাঁচিল টপকে সাহেব সাঁ করে সরে পড়ল। ডুবে গেল তালপুকুর মজ্জবে। একবারও যে বাড়ি ঢুকেছিল, কেউ তা জানতে পারবে না।

পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত সাহেব-চোর—ডাঙায় হোক, জলে হোক পরিচ্ছন্ন নিখুঁত একখানা কাজ দেখলেই লোকে বলত নিশিরাত্রে সাহেব-কুটুম্ব এসে গেছে নিশ্চয়। ভাঁটি অঞ্চলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সন্ধ্যাবেলা সুর করে যার নামে ছড়া কাটত—

কচ্ছপের খোলা দুয়োরে—
সাহেব চলল শহরে।
কুচে-কচ্ছপ-কাঁকড়া
সাহেব পলায় আগরা।
শিং-নড়বড়ে বোকা দাড়ি
চৌকি দেচ্ছেন আমার বাড়ি।
আম-শিমের অম্বল
কাঠ-শিমের ঝোল
সাহেব-চোর যায় পলায়ে
বুড়ি-ভদ্রার কোল।

সেই সাহেবের পয়লা দিনের কাজ এই। রানীর সাধের মাকড়িজোড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরছে। যায় কোথা এখন, মাল সামলাবার উপায়টা কি?

(ক্রমশ)

আবৃত্তি-কথা

গোপাল সামন্ত

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা দেশময় অসংখ্য অনুষ্ঠান ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আবৃত্তির বহুল চর্চা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীরা জনসাধারণের সামনে ও বিচারকদের সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পাঠকুশলতার নজীর দিয়েছেন। এমনই কিছু ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন যে জনসাধারণের ও বিচারকদের দেওয়া রায়ে একই প্রতিযোগী বা অংশগ্রহণকারী বিভিন্নরূপে উৎরে যাচ্ছেন বা আটকে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারটিকে যদি স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলেই আমাদের এমন একটি মাপকাঠি খুঁজতে হয় যাতে মাপলে পঠনকার্যের ভালমন্দ বিচার করা চলতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা উত্থাপন করা হচ্ছে।

অন্যান্য কলাবিদ্যায় ভালমন্দ বিচারের একটা মাপকঠি আছে যাতে গুণীনির্গুণের বিচার চলে আর তাতে সেই বিদ্যার ও বিদ্যার্থীদেরও উন্নতি সাধন হয়েছে। কিন্তু সোচ্চারপঠন ও আবৃত্তির ক্ষেত্রে সেই মানদণ্ডের অভাবের জন্যই সম্ভবত উৎকর্ষ ও আদরের যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে। অন্য সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের চিনতেও জনসাধারণের কোনো অসুবিধা নেই, আর সেই ব্যক্তিবৃন্দেরও অর্জিত বিদ্যাকে অর্থকরী করে নেবারও বিশেষ বাধা নেই।

য়ুরোপীয় দেশসমূহে পেশাদার আবৃত্তিকারকগণের অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহে কোন টিকিট না কিনতে পেরে যে হতাশ শ্রোতাগণ ফিরে যান এ ঘটনা নিশ্চয়ই অনেকের জানা। অন্য সব কলাবিদ্যার মত আবৃত্তিরও সেই রকম সমাদর যদি আমাদের দেশেও আশা করতে হয় তাহলে এই বিষয়ে একটা রীতিমত চর্চা, বিচারের পন্থা ও যোগ্য লোকের সন্ধান চলা অপরিহার্য; কারণ আমার বাড়ীর ছোট মেয়েটি সারগম সাধলেই লোকে তাকে গাইয়ে বলে সমাদর করবে না—এ তো জানা কথা।

সর্বজনস্বীকৃত এক পন্থার কথা ভাবতে গেলে আমাদের শুরু করতে হয় আবৃত্তির উদ্দেশ্য কি সেই প্রসঙ্গের আলোচনায়। অপর এক লেখক বা কবির লেখা আমি পড়ে দিলাম—আমি আবৃত্তি করলাম। আমি এখানে আমার বা দেশের কোন কাজটা এগিয়ে দিলাম? আমি তো বাড়ীতে আমার ঘরে বসেই পড়তে পারতাম, তাঁরাও পারতেন। তবে খামোকা একটা প্যাণ্ডাল বা হলের খরচ করিয়ে সেটা করলাম কেন? শুধু পড়ে দেওয়াই যদি কাজ হয় তাহলে এই ব্যয় ও আড়ম্বরের তো কোন দরকার ছিল না! কাজেই ব্যাপারটার উদ্দেশ্য শুধু অতটুকু মাত্র নিশ্চয়ই নয়। আমি যদি পড়ে শ্রোতাদের কোন সুবিধা করে দিয়ে থাকি তবে সেটাই নিশ্চয় ওই আড়ম্বর বা ব্যয়ের কৈফিয়ত হতে পারে। শ্রোতাদের যে সুবিধা আমি করতে পারি সেটা নিশ্চয়ই—বোধের। আমাদের পঠনকার্যে যদি শ্রোতাদের মনে বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার ও রসোপলব্ধির কিছুমাত্র সুবিধা হয় তবেই আমি তাঁদের জন্য কিছু কাজ করেছি, আর লেখক ও কবির জন্যও কিছু করেছি মনে করতে পারব এবং সেই করতে পাবার গভীর আনন্দ থাকবে আমার নিজের জন্য।

এই বোঝার কথাই হচ্ছে পাঠের প্রথম-কথা। পাঠের বিষয়বস্তু শ্রোতার বোধগম্য করবার জন্য অবশ্য আমাদের বহু ছোট-বড়ো উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য যতি ও বিরতির একটা প্রাথমিক আভাস কমা সেমিকোলন দাঁড়ি জিজ্ঞাসার চিহ্ন ইত্যাদিতে লেখকই দিয়ে রাখেন। তবু এই প্রাথমিক ব্যাপারটিতেও আমাদের অনেক পাঠকারীর, এমন কি সাধারণ অভিনেতাদের মধ্যেও, কিছু কিছু গোলমাল লক্ষ্য করা যায়।

এর পরের কথা হচ্ছে পাঠ করবার সময় পাঠ্যবস্তুর অর্থ প্রকাশ করবার জন্য কতকগুলি শব্দের উপর জোর বা ঝোঁক দেওয়া হয়ে থাকে, সেই জোর দিয়ে বলা বা ঝোঁকের সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের এই পাঠ করবার কথা বলতে আমরা সাধারণ পাঠ, আবৃত্তি, এমন কি অভিনয়ের সোচ্চারপাঠকে ধরে নিয়েছি।

অনেক সূক্ষ্ম প্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গিমাকে বাদ দিয়েও শুধুমাত্র ঝোঁক দেবার ফলে অর্থের তারতম্য ঘটে যায়। সব পাঠকই অবশ্য শব্দের ওপর ঝোঁক প্রয়োগ করেন এবং এই ঝোঁকের ফলেই পাঠ্যবস্তু শ্রবণের দ্বারে সাধারণভাবে অর্থের উদ্ঘাটন করে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে সচেতনতা ও ত্রুটিহীনতার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়; এমন কি, কয়েকজন নামজাদা অভিনেতার অভিনয়ের সময়েও আমরা এমন দু' একটি ত্রুটি দেখি যাতে যে কোনো দর্শকের মনেই কিছু খট্‌কা লেগে যায়। অভিনেতাদের মধ্যে অবশ্য এমন গুণী ব্যক্তি কিছু আছেন যাঁদের এইরকম ভুল হয় না। সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে অসাধারণ ক্ষমতায় বলীয়ান তাঁদের কাছে এই ঝোঁক হয়তো অত্যন্ত সহজ ও সহজাতভাবে এসে যায় এবং তাঁদের প্রকাশের নির্ভুলতায় আমরা চমৎকৃত হয়ে প্রতিভার সামনাসামনি দাঁড়ানোর আনন্দ উপভোগ করি।

এর পর উচ্চারণ ও ছন্দের তালের কথা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা ভাষাভাষীর বহু প্রকার উচ্চারণের টানের কথা সকলেই জানেন—তা নিয়ে

বেশী আলোচনা এখানে অবান্তর; তবে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন তা' হচ্ছে, যদিও আমাদের বাংলা ভাষার উচ্চারণে ইংরাজীর 'স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ'এর মত একটা মানদণ্ড নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা আজও হয়নি, ওদেশের মত ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত স্পষ্ট উচ্চারণের রেকর্ড করে পাকাপাকি ব্যবস্থাও যদিও হয়নি তবু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন সচেতনভাবে নিজেদের গ্রাম্য চলিত টান বাদ দিয়ে পরিষ্কার উচ্চারণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা শব্দোচ্চারণ করেন তখন তার মধ্যেই মোটামুটি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণের উদাহরণ মেলে। স্পষ্টোচ্চারণের 'স্পষ্ট' কথাটাকে উচ্চারণ করতে যে স্পষ্টতার আভাস মেলে সেই সুস্পষ্টতাই উচ্চারণ আমাদের কাম্য। পঠনকার্যের উৎকর্ষের জন্য এই স্পষ্টতাকে একটু সযত্ন সচেতনতার সংগে অভ্যাস করা প্রয়োজন।

এ কথা বলবার সংগে সংগে উল্টোদিকে আর একটা অশুভ সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে যায়। স্পষ্ট উচ্চারণের স্পষ্টতা আবার তলোয়ারের ফলার মত তীক্ষ্ণও হ'তে পারে, যা কানের পর্দায় এসে ধ্বনির তরংগ সৃষ্টি না ক'রে তাকে শুধু বিদ্ধ ও আহত করবে। সেইরকম কৃত্রিম স্পষ্টতাও কামনা করতে আমরা ভয় পাচ্ছি, কারণ প্রাণের মায়ার মত কাণের মায়াও আমাদের জন্মলব্ধ। উচ্চারণ ব্যাপারে অস্পষ্টতাকে বর্জন করে যে স্পষ্টতা শ্রোতার কর্ণবিদারণের পক্ষে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভোঁতা সেই উচ্চারণই বোধ্য ও শ্রুতিমধুর, এটুকু স্মরণ রাখলে আমরা বিবদমান দুই রাষ্ট্রসাধিকৃত ভূমির সীমান্ত-মধ্যের নো ম্যানস্ ল্যান্ডের পথে নির্ভয়ে চলতে পারব। সেটাই আমাদের স্বর্ণময় মধ্যপথ।

এর আগে আমরা শব্দের ওপর ঝোঁক বা জোরের কথা বলেছি, তার ও সদ্য-আলোচিত শব্দের উচ্চারণের প্রসংগে একটা কথা বলে রেখে প্রসংগান্তরে যাওয়া ভাল। কবিতা-আবৃত্তির ক্ষেত্রে ঝোঁক ও উচ্চারণ ছন্দের কাঠামোর মধ্যে চলতে বাধ্য। ছন্দের গতির মধ্যে কোন অতিপ্রকাশের ব্যাঘাত এসে কালাপাহাড়ী হাতুড়ী না চালায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে এর মধ্যে বিশেষ ভয়াবহ কিছু ব্যাপার নেই, কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সাধারণ আবৃত্তি-কারকগণ ছন্দের কাঠামোর মধ্যে সব কিছু সীমিত রাখতে সক্ষম। ছন্দপতনের দোষ আবৃত্তিক্ষেত্রে কমই নজরে আসে। তবে ছন্দ সর্বদাই বজায় রাখতে হবে।

আমরা একথা পূর্বেই উত্থাপন করে-ছিলাম যে, পাঠ বা আবৃত্তির মধ্যে অর্থপ্রকাশই মূল উদ্দেশ্য। আমাদের পাঠ্য-বস্তু অপরের বুদ্ধি ও মনের দরজায় পোঁছোনোর বাহন হলো আমাদের কণ্ঠ-স্বরের উত্থান-পতন, ঝোঁক ও আবেগযুক্ত পঠনভঙ্গী। এখানে আবৃত্তিকারের সংগে অভিনেতার কিঞ্চিৎ তুলনা নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না। অভিনেতাকেও তাঁর কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে হয় তাঁর বক্তব্য সঠিকভাবে দর্শক-শ্রোতার মনের দরজায় পোঁছোনোর জন্য; কিন্তু তবু চিত্র ও মঞ্চাভিনয়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে শ্রোতা না বলে দর্শক বলা হয়—তার মূল কারণ এই যে, তাঁর অভিনয়ে চরিত্রস্ফুটনে ঘটনাপ্রকাশের যত-গুলি হাতিয়ার আছে তার মধ্যে প্রধানতম অংশ তাঁর কণ্ঠস্বরকে দেওয়া যায় না। অভিয়ের পূর্বে চরিত্র ও নামের তালিকা থেকে আরম্ভ করে দৃশ্য ও অংকবিভাগে, দৃশ্যসজ্জায় ও আলোকসম্পাতে, ঘটনা ও চরিত্রাবলীর পারস্পরিকতায়, অজস্র ঘটনা-বলীর সংস্পর্শে ও সংঘাতে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে সেখানে অভিনেতা তাঁর কণ্ঠস্বরকে গৌণ করেও তাঁর বক্তব্য অপরকে সঠিক অনুধাবন করাতে পারেন। কণ্ঠস্বরকে একেবারে বাদ দিয়েও তাঁদের যে কাজ চলতে পারে তার নজীর মিলবে মূক অভিনেতাদের অভিনয়ে। কথা না বলেও তাঁদের বক্তব্য তাঁরা দর্শকদের মনের কাছে পোঁছে দেন। এর মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে সন্দেহ নেই, তবু এটা সম্ভব এজন্যেই যে, কণ্ঠস্বর অভিনয়ের সর্বপ্রধান বাহন নয়।

এখানে আমাদের বেতার-অভিনেতাদের কথা একটু বলে নেওয়া ভাল। তাঁরাও শুধুমাত্র কাণের মাধ্যমে আমাদের কাছে ঘটনাবলী ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন। মঞ্চ বা চিত্র অভিনেতাদের চেয়ে কণ্ঠস্বর ব্যবহারে তাঁদের অধিকতর পারদর্শিতার প্রয়োজন হয়, একথা মেনে নিয়েও আমরা বলতে পারি যে, কবিতা আবৃত্তির অভিব্যক্তি ও নাটকের ঘটনা ও চরিত্রাবলীর পারস্পরিক সম্বন্ধজনিত অভিব্যক্তি এক নয়। নাটকের

মধ্যে যে গল্পাংশ আছে অধিকাংশ কবিতার মধ্যে তা' নেই। কাজেই কবিতা আবৃত্তি-কারকের কণ্ঠস্বরের ব্যবহারের প্রয়োজন আরও কিছু নিষ্করুণ।

কবিতা ও নাটকের মূল. বক্তব্যতে যে কিছু প্রভেদ আছে সে প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে না করেও বলা চলে যে, কবিতা আবৃত্তি করার মধ্যে কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবৃত্তিকারককে শুধুমাত্র ধ্বনির আশ্রয় নিয়ে শ্রোতার কাণের দরজা দিয়ে হৃদয়ে পেঁাছোতে হবে; আর সেই ব্যাপারে অভিনেতা অন্য বহু দরজা দিয়ে যথাস্থানে পেঁাছোতে পারেন। চোখের দরজাকে তার মধ্যে সদর দরজাও বলা চলে।

আমরা এখানে অভিনেতার কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনকে খাটো করে বোঝাতে চাইছি না এবং তাঁর নিজ বিভাগে কুশলতার দুরূহ দায়িত্ব সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ সচেতন আছি। একথা বেশী করে বলবার দরকার নেই যে, তাঁকে তাঁর অঙ্গভঙ্গী, মুখচোখের মধ্যে ভঙ্গী ও ভাবের প্রকাশ ও সঠিক কণ্ঠস্বরের চর্চা ছাড়াও মঞ্চ বা চলচ্চিত্রের বহু টেকনিকের সঙ্গে সুপরিচিত হতে হয় আর তা'ছাড়া অভিনয়ের সবচেয়ে বড় কথা যে চরিত্রস্ফুটন, তার মধ্যে নিজ সত্তাকে আর একটা চরিত্রের সত্তার মধ্যে বিলুপ্ত করে দেওয়া বা সেই দু'টি সত্তার সফল সমন্বয় ঘটানোর মধ্যে যে প্রচেষ্টা ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা' নিশ্চয়ই যত্র-তত্র ছড়াছড়ি যাচ্ছে না।

এখানে এক শ্রেণীর আবৃত্তির কথা মনে পড়ছে যা' শুনলে মনে হয় যে, পাঠকারী পাঠ শুরু করবার আগেই এক ভাববিহ্বলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, কাজেই তাঁর স্বর ভাবে গদগদ; অবস্থাতেই তিনি পাঠ শুরু করলেন এবং সেই আদি ভাব-স্রোতের বেগ সম্ভবত এতই প্রবল যে, সেখানে আর কোন নূতন স্রোতের জন্য স্থায়ী 'প্রবেশ নিষেধ' টাঙানো; সেই স্রোত এতই প্রবলবেগে যেন বয়ে যেতে বাধ্য যেখানে নতুন কোন তরঙ্গ সৃষ্টি হবে না কোন ভাব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে, যেখানে কোনো ঘন-ছায়াও পড়তে গিয়ে ঠিকরে যাবে: যেখানে কোন সূর্যালোক, গোধূলির কোন রক্তিমাভাও খেলতে গিয়ে ভয়ে তফাতে সরে থাকবে। তাঁদের সেই নিজের-কাছেই-বোধ্য ভাবের ঢুলু ঢুলু একস্রোতা আবৃত্তির মধ্যে কবির ভাষায় ফুটে ওঠা আনন্দ-বেদনার ছবি—যাতে জীবনের আনন্দ, না-পাওয়ার বেদনা, প্রকৃতির আলোছায়ায় মোহময় ভাবের খেলা, কিছুই ফুটে ওঠবার কোন স্থান নেই।

এই সচরাচরিত শ্রেণীর সঙ্গে আরও এক শ্রেণীর কথা বলে নিতে হয়, তা' হচ্ছে সহজ, সাবলীল, অতিশয়-প্রকাশ-বর্জিত অভিব্যক্তিই যদিও আমাদের কাম্য বা প্রাপ্ত তবু থিয়েটারী ঢং বলতে পাঠকসাধারণ এমন একটা ঢংয়ের কথা সহজেই ধরতে পারছেন, যেটা যোগ্যতম অভিনেতাগণ বর্জন করারই পক্ষপাতী। আমাদের এই নামটা ব্যবহার করতে হলো এই কারণে যে, সুকান্ত নামের কোনো ছেলেকে সুকান্ত বলে না ডাকলে তাকে চেনানো যায় না; কান্তি তার কু কি সু সেটা সম্বন্ধে মতামত আমাদের দায়িত্বের বাইরে, কারণ তার নামকরণ তিথিতেও আমরা কোন দায়িত্বপূর্ণ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলাম না।

এই ধারায় আবৃত্তিতে সর্বক্ষেত্রেই প্রথম থেকেই অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠস্বর সহযোগে কবিতার কোন কোন অভাবনীয় ভাবকে যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে লোফালুফি করা হয়, যাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে অবস্থিতির জন্যই হয়তো মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলেও হৃদয়ের কূলে কবির আভাস-দেওয়া কোন ভাবের ঢেউ জাগে না। এ'রা হয়তো ছোট ঢেউয়ের কারবার করতেই লজ্জিত হন, কারণ এ'দের লক্ষ্য অন্য দিকেই পড়ে আছে, যেখানে ঢেউ সর্বদাই—

> লুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
> প্রশান্ত সূর্যাস্তপানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
> উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
> ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
> মূঢ়সম।

যে আবৃত্তির মধ্যে হাওয়ায় কাঁপন-ধরা জলের মধ্যে পাড়ের কলমি-শাকের, শালুক-ফুলের বাধার ঘায়ে কোন ছোট ক্ষীণ ঢেউ কোনদিনই জাগবে না তাকে আমরা সঙ্গীতের উপমায় বড়জোর সেনাদলের ব্যাণ্ডের পর্যায়ে স্থান দিতে পারি; যে সঙ্গীত মানুষের মনকে চার দেওয়ালের বাইরের মুক্ত পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে উধাও করে দেয়, মানুষের প্রাণের দরজায় যে অসীমের করধ্বনি জাগায়; যা মানুষকে অনন্তকালের আনন্দ-বেদনার সন্ধান এনে দেয় সেই আসরে কোনদিন এর পাওনা মিলবে না।

এই দুই শ্রেণীর বাইরে আরও একটি ঢংয়ের ইদানীং প্রচলন চলছে। আগের বলা দুই শ্রেণীর মধ্যেই শ্রুতিমধুর ও শ্রুতি-কটু দুটো সাধারণ সুরের প্রকাশ প্রায় সব সময়ই মেলে, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের সুরহীনতার নিশানা থেকেই তাঁদের সহজে চেনা যাবে। এ'দের বিশেষত্ব হচ্ছে এ'রা কবিতার কোন ভাবের

আবেগেই কিছুমাত্র টলতে রাজী নন। এক সুগম্ভীর অবিচলিত ভঙ্গীমায় স্পষ্টভাষীর মত এ'রা কবিতাটা পড়ে যাবেন কিন্তু ছন্দের তাল বজায় রেখে আর বিশেষ কোন কোন স্থানে দু'একটা নিজস্ব টান দেবার মত ক্ষেত্র পেলে তাঁরা সেখানে একটা চেষ্টারও মোচড় দেবেন, যার মধ্যে দিয়ে কবিতার আবৃত্তিতে তাদের একটা নিজস্ব বিশেষত্ব ফুটে উঠবে। কবি সেখানে কোথায় আছেন কবিতাই বা কোথায় আছে, সে খবরে তাঁদের প্রয়োজন কম। কিছু কিছু সুপরিচিত আবৃত্তিকারককে এ-দলেই ফেলতে হয়। এ'দের মধ্যে কুলীনদের উচ্চারণটা অবশ্য লক্ষ্য করবার মত ভাল।

প্রধানত এই কয়েকটি ধারার কথা আমরা উল্লেখ করলেও আরও অনেক ছোটখাটো ধারার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা সর্বক্ষেত্রেই পাই। তবু সেগুলি সম্বন্ধে আলাদা করে বলা কিছু কঠিন, কারণ সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থল—উপরোক্ত তিনটি ধারার এক পারমুটেশন-কম্বিনেশনে সৃষ্ট বহুবিধ তাদের অভিব্যক্তি। এই সর্বপন্থার সম্মিলিত পন্থাতে তবু এক স্বর্ণময় মধ্যপন্থা যে সৃষ্ট হচ্ছে না, তার কারণ এই যে, এর প্রায় সবগুলির মধ্যেই কাঠামো আছে, মাটি নেই; মাটি আছে তো রং নেই, আবার রংচং সাজসজ্জা পরানো থাকলেও তা' মাটির মূর্তিই রয়ে গেছে, কারণ সে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়নি। প্রাণহীন দেহ যত সুন্দরেরই হোক না কেন, হৃদয়হীন মন যত বুদ্ধিবেত্তারই হোক না কেন, তা' দেখে ও তার সান্নিধ্যে এসে হৃদয় যে আনন্দাবেগে উদ্বেলিত হয় না; এ যদি আমাদের হৃদয়ের দোষ হয় তাহলে আমরা সে দোষ মেনে নিতে রাজি আছি।

আবার ভাবের আবেগ পেলেই যে আমরা খুশী হচ্ছি না একথাও বিশেষ করে বলবার। এটা একটা ধাঁধাঁ সৃষ্টি করার জন্য বলা হোল না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আমরা সেই ভাবকেই গ্রহণ করতে ও তার স্ফুটন দেখতে প্রস্তুত যার হদিস কবি তাঁর লেখার মধ্যে রেখে গেছেন। যে ভাবের বিকাশ কবিতা শ্রবণের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা হবে তার বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য একটা বিশ্লেষণ থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

কবিগুরুর 'শাজাহান' কবিতার মধ্যে—

তব পুর-সুন্দরীর নূপুরনিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার-গগন

-এর মধ্যে ভাঙা প্রাসাদের কোণে হারিয়ে যাওয়া অতীতকালের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে কেউ অনন্তকালের মানুষের বেদনার শাশ্বত ক্রন্দনের আভাস পেয়ে সেই বেদনার গভীরতায় আত্মহারা হতে পারেন, কেউবা আবার তার মধ্যে 'পায়ে চলার পথে'র অনন্তকালের রাত্রির নিশ্ছিদ্র ব্যাপ্তির অন্ধকারে গভীর-ভয়ংকর নিয়মিত রূপে ভীত-বিমুগ্ধ হ'তে পারেন—এ অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে, তাঁর এ অধিকারের সচেতনতা ও তার প্রয়োগের সন্ধান পেলেই আমরা তাঁর জন্য জয়মাল্য তুলে ধরব। অবশ্য আবৃত্তিক্ষেত্রে ভাবের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ও আত্মহারা হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আছে, কারণ আবৃত্তিকারক ডুবে যেতে চাইলেও ছন্দের ভেলা তাকে অচিরে ভাসিয়ে তুলে ধরবে আর আত্মহারা হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকলে হয় যবনিকা ফেলে দিয়ে না হয় মঞ্চের আলো নিভিয়ে দিয়ে তাঁর আত্মাকে খুঁজে বস্তুজগতে ফিরিয়ে আনা হবে।

আবৃত্তির সাধারণ সুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। সব পাঠেরই—এমন কি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠেরও একটা সুর আছে। গল্প ইত্যাদি পাঠের মধ্যে নিবিড় কোন অনুভূতির প্রকাশক্ষেত্রগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ ঘটনাবলী প্রকাশের ক্ষেত্র-গুলিতেও প্রায় সেই একই সুর, একই তাল চলতে থাকে। এক ধরনের আবৃত্তিকারক অনেকটা সেই সুরেই (অবশ্য ছন্দসমন্বিত) পছন্দ করেন—আবৃত্তির এক ধারার কথা বলতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয়ও করানো হয়ে গেছে। আরও একদল যাঁরা অতিশয় ভাবাবেগে আবৃত্তি করতে পছন্দ করেন, তাঁদের কথাও বলেছি। এ'দেরই মধ্যে একদল আবার অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আবৃত্তি করে থাকেন সব টান-গুলিই দীর্ঘতর করে। এ'দের সকলেই মনে করেন যে, তাঁদের পন্থাই সঠিক পন্থা। এখানে আমরা ভাবের কথা বাদ দিয়ে শুধু-মাত্র সুরের হ্রস্ব-দীর্ঘতার কথা আলোচনা করছি বলেই ভাবতে হচ্ছে কাদের কতখানি

ঠিক কি বেঠিক। সোচ্চারপাঠ ব্যাপারে অনুভূতির নিবিড়তা ও প্রবলতার ভেদ অনুসারে পঠনসুরের তারতম্য হ'তে বাধ্য। নিবিড় এক অনুভূতির প্রকাশে স্বরে কাঁপন আসাই স্বাভাবিক ও কাম্য, কিন্তু 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় যেখানে 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে' ইত্যাদি প্রথম কয়েকটি পঙক্তিতে ঘটনা বলা হচ্ছে সেখানে ভাবাবেগে ঢুলু-ঢুলু এক সুরের কোন স্থানই থাকতে পারে না, ছন্দের সাধারণ উত্থান-পতনজনিত তাল বজায় রাখা ছাড়া। আবার যেখানে 'এক-দিকে যায় দেখা অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা'—আছে সেখানে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার মত অদীর্ঘিত সুরে আবৃত্তি করলে সেই দূর বনপ্রান্তের নীল বনরেখার দূরত্ব-বোধ এবং সেই দূরত্বজনিত নিমজ্জনোন্মুখ তরীর যাত্রিগণের ভীতিমিশ্রিত হতাশার মধ্যেও সেই নীল বনরেখার অবিচলিত সৌন্দর্য কিছুই ফুটবে না। কাজেই সেখানে অনারূপ গতির আশ্রয় নিতে হবে। এখানে সুর দীর্ঘিত করলেই অবস্থার প্রকাশের পক্ষে অনুকূল হবে মনে হয়। আবার যেখানে মা'র বুক হতে রাখালকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে জলে বিসর্জন দেওয়ার পরে তার 'মাসি, মাসি, মাসি' ডাকে কুসংস্কারমুক্ত বিপ্র 'রাখ্, রাখ্, রাখ্' করে চীৎকার করে ওঠেন সেখানে অত্যন্ত দ্রুত সুরের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই দ্রুত ঘটনশীল প্রলয়ংকর অবস্থার কোন পরিস্ফুটনই সম্ভব নয়। তেমনি আবার 'পৃথিবী' কবিতায় যেখানে বৈশাখের কালো শ্যেনপাখীর মত ঝড়, হাওয়ার মুখে ছুটিয়ে নিয়ে গেল ভাঙা কুঁড়ের চালকে সেখানেও কয়েদী শিকল-ছেঁড়া ডাকাতের মতো ঝড়ের প্রবলতাকে ও অসহায় ভাঙা কুঁড়ের চাল উড়ে যাওয়াকে প্রকাশ করতে গেলেও এক তীব্র প্রবল দ্রুততম সুরের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। আবার সেই কবিতায়ই যেখানে জড়ের ঔদ্ধত্য অভিভূত হবার পরে 'জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে' সেখানে জীবধাত্রীর সযত্নসৃষ্ট ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় জীবনকে লালিত করে পৃথিবীর মাটিতে শ্যামল তৃণ-বৃক্ষকে উজ্জীবিত করে সেই আস্তরণের ওপরে তাঁর বসার কথাটির মধ্যে যে নিবিড়ানুভূতি, যে উদার কোমল ও সুষমাময় ভাবটি আছে তার পরিস্ফুটন বৈশাখের ঝড়ের সুরের আশ্রয়ে সম্ভব হওয়ার কোন কল্পনা করা সঙ্গত নয়। কবিতা আবৃত্তির কালে কিছুটা আবেগময় একটা সুরের অবলম্বন করে আমাদের চলতেই হয়, কারণ একটা আবেগ ছাড়া কবিতার জন্মই হয় না।

এতক্ষণ ধরে আমাদের আলোচনায় পাঠ্য-বস্তুর ভাবের কথা আমাদের আভাসে উল্লেখ করতে হয়েছে। তবু ভাবের যথোপযুক্ত আলোচনা না করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই। সকল কলাবিদ্যা, সব সাহিত্যসৃষ্টিরই মূল কথা ভাব। সন্তানস্নেহে সকল পিতারই একাত্মতার ভাবটুকু বোঝাবার জন্য 'কাবুলিওয়ালা' উপাখ্যান, প্রকৃতির অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কাছে মানুষের সোনাদানা তুচ্ছ এটা বোঝাবার জন্যই 'গুপ্তধন', 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' বোঝাবার জন্য টলস্টয়ের 'হাউ মাচ ল্যান্ড এ ম্যান নীডস্', মানুষের বিবেকের সংশোধনী শক্তির তুলনায় আইনের শাস্তির পন্থা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধিসম্ভূত এটা বোঝাবার জন্যও' হেনরীর 'কপ্ অ্যান্ড দি অ্যানথেম'।

মোদ্দা কথা ভাষা তৈরী হয়েছে ভাবের বাহন হিসাবে—ভাব ভাষার বাহন নয়। ভাষার শব্দচয়নও সেজন্য এক একটি ভাবকে সঠিক প্রকাশ করার জন্য। একই মূল ভাবের বিভিন্ন তারতম্য বোঝাবার জন্য আবার বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার। নরম, কোমল, পেলব এ শব্দগুলি মোটামুটি একই অর্থ হলেও এগুলি একটি বিশিষ্ট ভাবকে বহন করে। এগুলির ভাব বজায় রেখে উচ্চারণ করে বলবার চেষ্টা করে দেখা যাক্, একটা বিশেষ টান দিতে হচ্ছে ভাবের তারতম্যের খাতিরেই শুধু। সেই বিশেষ টানগুলিই হচ্ছে ওই ভাবের শ্রুতির বাহন। সঠিক রং ও তুলি না পেলে যেমন চিত্রকরের ভাবটি ক্যানভাসে ফুটে ওঠে না, সঠিক শব্দ না পেলে যেমন লেখকের মনের ভাব পাঠকের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, তেমনি সঠিক সুরের টানটুকু খুঁজে না পেলে পাঠকারীর ভাব-টুকু শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হয় না। কবি-গুরুর 'পৃথিবী' কবিতার আবৃত্তিতে 'স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য-নবীনা' বলবার সময় স্নিগ্ধ ও হিংস্র এই দুই শব্দ নিশ্চয়ই একইভাবে প্রকাশিত হবে না, আর পুরাতনী ও নিত্যনবীনা বলবার সময় এই দুইটি শব্দের বিপরীত ভাবের প্রকাশ অবশ্যই করতে হবে। যে কবিতার আবৃত্তিতে এইরকম ভাবের দ্রুত পরিবর্তন করতে হয় তা' কণ্ঠস্বরের প্রকাশের ক্ষমতার মধ্যে আনতে যথেষ্ট চর্চার প্রয়োজন। তবু এটা যে সম্ভবপর তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাঁরা সভায়-মণ্ডপে যা খুশী করে বেড়াচ্ছেন তাঁরা একটু নিজেদের দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনা করতে থাকুন আমরা ইতি-মধ্যে আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত প্রতিভাবান বৃদ্ধ গায়কের কথা বলি। এক সভামণ্ডপে সেদিন তাঁর সদ্য বিদেশ-প্রত্যাগত শিষ্যের বাদ্য শেষ হবার পর তিনি সভামধ্যেই শিষ্যকে প্রশ্ন করলেন—'কতটা রেওয়াজ করলে আজকাল?'—'এই ঘণ্টা কয়েকের মতো।' 'এদের হাততালিতে খুব আনন্দ হচ্ছে, না? মনে রেখো, এটা তোমার বাজনার জন্যে হাততালি নয়। এটা ইউরোপ ঘোরার হাততালি। এদের তো বেশ ঠকাজে দেখলাম, কিন্তু এও তো ঠিক একদিন তোমায় খোদাতালার সামনে

গিয়ে দাঁড়াতে হবে। খোদা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, আচ্ছা তোমাকে তো দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলাম, ওখানে তুমি এতদিন করলে কি? তুমি জবাব দেবে জানি, 'গান-বাজনা নিয়ে ছিলাম—সেতার বাজিয়েছি আমি দুনিয়াতে সভায় সভায়; তখন খোদা যখন বলবেন আচ্ছা বাজাও তো সেতার, আমি একটু শুনি! তখন সেখানে এই বাজনা বাজাবে নাকি?'

শিষ্য লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসেছিলেন কোন জবাব না দিয়ে।

এই সাধনা লাগে সংগীতে। আবৃত্তিতে আমরা যা কিছু পাগলামি বাহাদুরের মত করে আসি তার সবই ঠিক মনে করি।

আবৃত্তি একটা করে গেলেই হলো না। আগে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে নিতে হবে; তার ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে পরিবেশন করবার উপযুক্ত অভ্যাস করে তারপরে তা' উচ্চারিত করতে হবে শ্রোতাদের জন্য।

এই ভাবের ক্ষেত্র যেমন আবৃত্তির অপরিহার্য হৃৎস্পন্দন, কণ্ঠস্বরের সর্বকলা প্রয়োগে এর প্রকাশের যেমন সন্দেহাতীত প্রয়োজন, তেমনই এর বিকাশও আবৃত্তি-কারকের প্রতিভার উন্মেষ ও নিদর্শনের সুবিপুল ক্ষেত্র। এখানে ছন্দের কাঠামোয় কাব্যের মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত করে, সর্ব-কলা প্রয়োগে তাকে প্রসাধিত করে তার মধ্যে রূপের আমেজ ফোটাতে ও সেই মানসী মূর্তির মধ্যে স্বপ্নের ছবি দেখে শ্রোতার মনেও সেই চিত্র প্রতিফলিত এবং উজ্জীবিত করতে প্রতিভার প্রয়োগের অপরিসীম ক্ষেত্র রয়েছে। সেখানে আবৃত্তি-কারকদের পঠনভঙ্গীমার পরিমার্জনার কোন শেষ নেই; উন্নত হ'তে উন্নততর নজীর তিনি সর্বদাই রাখতে পারেন। এর মধ্যে যে আনন্দের সন্ধান তিনি পাবেন তাতে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ও অভ্যাসের কঠিন শ্রম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হবে।

আবৃত্তি আমাদের দেশে এমনই একটা বস্তু বলে চলে আসছে, যেখানে যে যা কিছুই ভেলকিবাজী দেখাবেন—হাততালি তাঁর বাঁধা পাওনা। আবৃত্তি-বিচারের মানদণ্ড যা কিছু আছে তা প্রত্যেকের নিজের কাছে—তার বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন তোলাই যেন গর্হিত কার্য, কারণ তাঁরা সবাই নিজের পদ্ধতিকে নির্ভুল ও চরম পদ্ধতি বলে মনে করে অটল আছেন।

চিত্রকলা প্রদর্শনীতে বিচারক হবার জন্য কোন অচিত্রকরকে অনুরোধ করলে বা সংগীত প্রতিযোগিতায় বিচারক হ'তে বললে কোন সংগীত-অপারদর্শী সেই আসনে বসতে সাহস পাবেন না, কারণ ওই কলার বিচারের মানদণ্ড তাঁদের জানা নেই, কিন্তু আবৃত্তি-বিষয়ে প্রতিযোগিতায় যে কোন ব্যক্তিকে বিচারক হ'তে বললে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী, কারণ তিনি এই কলা সম্বন্ধে অবহিত বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস আছে। সেটা যদি না হত তাহলে বিচারক নির্বাচনেও যথেষ্ট সতর্কতা দেখা যেত, আর যাঁরা মঞ্চে-মণ্ডপে আবৃত্তি করছেন, তাঁরাও অনেকে বাদ পড়তেন।

আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার বিচারকদের সম্বন্ধে কিছু না বললে দেশের আবৃত্তির ধারার উন্নতি-অবনতির সম্বন্ধে অনেকটাই না-বলা থেকে যায়। এঁদের কলমে বসানো নম্বরেই ভাল-মন্দর বিচার চলছে; সেই বিচারের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কারও-বা আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়ে সারাজীবনের মত মাথা বিগড়ে যাচ্ছে এবং কারও বা হতাশায় চেষ্টা-চর্চার অবসান ঘটছে নিজ পদ্ধতির উপরে বিশ্বাস হারানোর ফলে। এই প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তদের সগর্বিত পদ্ধতি আবার উত্তরকালে তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও তাঁদের কাছে শিক্ষার্থীরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যাচ্ছেন। সেজন্যেই এটা অধিকতর দুঃখের কারণ যে, যাঁরা বিচারক হয়ে আসন গ্রহণ করেন তাঁরা সব সময় নিজেদের কর্তব্যের প্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন তবু নিজে-দের বিচারক হবার যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।

আত্মবিশ্বাস একটি উত্তম বস্তু এটা আমরা মানি, কিন্তু এটাও আমাদের ধারণা যে, সে আত্মবিশ্বাস শিক্ষা ও চর্চার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা ও অপরের ভাগ্যের নিয়ন্তা হওয়ার মধ্যে গুরুত্বের ও দায়িত্বের অনেক প্রভেদ।

যে যে-যোগ্যতা থাকলে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার বিচারক হবার জন্য কেউ অনুরুদ্ধ হয়ে থাকেন তা' হচ্ছে—অভিনেতা হওয়া চাই, (চিত্রাভিনেতা হলেই সবচেয়ে ভাল হয়), কবি বা লেখক হওয়া চাই, অধ্যাপক হওয়া চাই,—সংবাদপত্রসেবী হ'লেও কাজ চলবে।

একটি কলাবিদ্যার বিচারে যে আমরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের শরণাপন্ন হব এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, আর উপরে যে যে শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা হোল তাঁদের আবৃত্তির সমঝদার হবার পক্ষে যথেষ্ট সম্ভাবনাই রয়েছে এটা মেনে নেবার পরেও একটা আফশোষ থেকে যায় যে যে-কোন বিচারকেরই আবৃত্তি বিচার করবার মত চর্চাসাপেক্ষ ব্যক্তিগত ক্ষমতা—পেশাগত নয়—কিছু আছে কি না তা'র সন্ধান নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আবৃত্তির মত দুরূহ কার্যে,—যা যথেষ্ট চেষ্টা, কল্পনা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ—এই রকম বিচারক্ষমতার বিচার-হীনতার থেকে এ কথা মনে করবার কারণ ঘটে যে, এই কলার উন্নততর মানদণ্ড তৈরী হ'তে এখনও অনেক সময় লাগবে। এই কলার যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তার স্বীকৃতিই হবে এর উন্নতির প্রথম পর্যায়।

আবৃত্তি ও সোচ্চারপঠনকার্য যে একটি বিশেষ কলা তার স্বীকৃতির অভাবের আরও একটি নজীর আমরা পাই মঞ্চে-মণ্ডপে আবৃত্তিকার্যে অভিনেতাদের অন্বেষণ করার মধ্যে। অভিনয়ের মত সোচ্চারপঠনকার্যও যে একটি বিশেষ ও পৃথক কলা তা' স্বীকৃত হ'লে এই মিশ্রণের মধ্যে কিছু বাধার উদ্ভব হবে। এখানে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন যে নাটকের অভিনয় ব্যাপারে নাট্যকার তাঁর নাটক লেখার পরে সুযোগ্য অভিনেতা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে মূর্ত করলে তিনি সুখী হ'ন—সেই কার্যে অভিনেতারূপে বিশেষ শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করে নেন। গীতিকারগণও তাঁদের রচিত গীত রচনার পরে সুযোগ্য সুরকারের সৃষ্ট সুরে যোগ্য গায়কের দ্বারা তা' পরিবেশন করাতে চান। অভিনয় ও সংগীত তাদের নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এগুলি পরিবেশন করবার জন্য একটি পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেকথা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বলা চলে না।

আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি তার কারণ এই—প্রচলিত ধারণার কিছু পরিবর্তন হ'য়ে আবৃত্তি বা সোচ্চারপঠনকার্য তার নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটি পৃথক কলা বলে স্বীকৃত হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত চর্চা হতে পারবে। যোগ্য আবৃত্তি-কারী 'আরও কবিতা পড়ুন' আন্দোলনের কাজ স্লোগান ব্যতিরেকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, কারণ সোচ্চারপাঠে কবিতার অর্থ উদ্ঘাটন হওয়ায় শ্রোতাদের মনে কবিতার প্রতি প্রচলিত ভীতিও অনেক হ্রাস পাবে; কবিতার কদর ও আদর বাড়বে। সাহিত্যের অন্যবস্তু পাঠ, এমনকি গল্প-পাঠের মধ্যেও, শ্রোতাদের মনে অনেক মধুর ও গভীর ছাপ লাগবে যার অবদান তাঁরা সারাজীবনের লাভের মধ্যে খুঁজে পাবেন।

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩০ ॥

কাউ এই বস্তিতে এসে হোটেল খুলেছিল। তার মাও ছিল এই বস্তিরই মেয়ে। তারও ছেলে-বেলাটা এই বস্তিতেই কেটেছিল। এখানকার অনেকেই তার চেনা। সে যখন এখানে ফিরে এল তখন সকলের আন্তরিক সংবর্ধনা তো পেলই, বাল্যবন্ধুও পেয়ে গেল কয়েকজন। ভানুনা, বিঠু, কাটরা, রমেশ, ঝাবরা এবং আরও অনেকে সোৎসাহে ডেকে নিল তাকে নিজেদের মধ্যে। এরা কেউ কোচোয়ান, কেউ ফেরিওলা, কেউ ফ্যাক্‌টরির কুলি, কেউ ট্রাক চালায়, কেউ বা আর কিছু, কিন্তু সকলেই আসলে গুণ্ডা। সুবিধা পেলেই বে-পরোয়া লুঠ-তরাজ করে। জনশ্রুতি, রমেশ, কাটরা আর ঝাবরা প্রত্যেকে নাকি খুনও করেছে। এই রমেশকে যতীশবাবু দেখে গিয়েছিলেন। এদেরই সাহচর্যে বাস করছিল কাউ। এদের সঙ্গে সে গোপনে গোপনে একটা চক্রান্তও করছিল। যতীশবাবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন নি। যে পরিবেশে কাউ অভ্যস্ত সে পরিবেশ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এদের দেখে তাঁর ভয় করছিল। দম আটকে আসছিল যেন। তিনি তার পরদিনই চলে এলেন নিজের বাসায়। সেখানে রাঁধুনী ছিল; রাঁধুনীর কাছে যে ঝিনুক বাজারের পয়সা দিয়ে গেছে যতীনবাবু তা জানতেন। তাঁর মনে হল, কেবল খাওয়া-দাওয়ার জন্যে কাউয়ের ওই নরক-কুণ্ডে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। তিনি কিছু টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন, সে চেষ্টা যখন সফল হল না তখন অন্য উপায়ে আবার চেষ্টা করতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, হাল ছেড়ে দেবার লোক তিনি নন। এবং সে চেষ্টা ঝিনুকের বাসায় থেকেই করতে হবে। ঝিনুকের হাতে যে টাকা আছে এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল। ঝিনুকের চালচলন যেন রাজরানীর মতো, যখন খুশি কলকাতায় চলে যাচ্ছে। টাকা না থাকলে এসব পারে কেউ? কলকাতা যাবার আগে রাঁধুনীর হাতে সে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গিয়েছিল বাজার খরচের জন্য, তাঁকেও হাত-খরচের জন্য দশ টাকা দিয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই টাকা বেশ খরচ হয়, সেখানে প্রতি পদক্ষেপেই তো খরচ! এখানে চায়ের দোকানের সব ধার শোধ করে দিয়েছে। এতো টাকা ও পাচ্ছে কোথায়! টাকা নিশ্চয় আছে ওর হাতে। ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকলে সে টাকা পাওয়ার আশা থাকবে না। শামুকটা তো নাগালের বাইরে চলে গেল। মিস্টার সেনের কাছ থেকে ও অনেক টাকা কামিয়েছে নিশ্চয়। এমন অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম মেয়ে, তাঁকে একটি পয়সা দিয়ে গেল না। তিনি কি তার কাকা নন? তিনি কি ছেলেবেলায় তাকে কোলে করেন নি? বাচ্ খেলা দেখতে নিয়ে যান নি? গ্রামে গণেশ অপেরায় যাত্রা হচ্ছিল যেবার, দাদা শামুককে যেতে দিতে চান নি। ঝিনুক কলকাতায় ছিল। দাদা ঘুমোবার পর তিনিই কি লুকিয়ে শামুককে যাত্রা দেখিয়ে আনেন নি? কি করে মানুষ সব ভুলে যায়, আশ্চর্য। ওরা হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে অথচ তাঁকে দেশে ফেরবার মতো টাকাটা দেবে না! কিছু টাকা পেলে এখনও সেখানে মাছের ফলাও ব্যবসা করতে পারেন তিনি। অনেক মুসলমান জেলে এখনও তাঁকে খাতির করে। চিঠিও লিখেছে। এই ঘটিদের দেশে পড়ে থেকে কি হবে? এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? ঝিনুক শামুক কি মানুষের জীবনযাপন করছে? পশুদের সংস্রবে এসে ওরাও পশু হয়েছে। ওই কু-চক্রী মতলববাজ ডাক্তার ঘোষালের পাল্লায় পড়ে ব্যভিচারিণীর জীবনযাপন করছে এরা। ব্যভিচারই যদি করতে হয় তা হলে ও দেশেই তো করা যেতে পারত। তার জন্যে পদ্মার এ পারে আসবার দরকারটা কি?

এই ধরনের নানা চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে যতীশ বাড়ি ফিরলেন।

ফিরে দেখলেন, বারান্দায় ঝিনুক দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কোথা গিয়েছিলে, কাকা? আমি

খুঁজে খুঁজে হয়রান চারিদিকে। ও কি, তোমার মাথায় কি হ'ল?"

"তোমার বাবু মেরেছে।"

"আমার বাবু! আমার বাবু আবার কে!"

"বাবু না বল, কর্তা বল, মালিক বল, যা খুশি বল—ওই ডাক্তার ঘোষাল—"

হু হু করে কেঁদে ফেললেন যতীশবাবু। কান্নার অভিনয় চমৎকার হ'ল।

"তাই নাকি! তুমি ডাক্তার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলে কেন?"

"তুমি চলে গেলে, শামুক চলে গেল, আমি কাকে নিয়ে থাকব! এ দেশে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই, সেই কথাই ও'কে বলতে গিয়েছিলাম—"

যতীশবাবু এলোপাথাড়ি মিথ্যে কথা বলেন। যখন বলেন তখন হুঁশ থাকে না, মিথ্যে কথাটা অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। সামনের বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট। মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গিয়ে যদি নূতন বিপদ সৃষ্টি হয় তখন দেখা যাবে—এই তাঁর মনোভাব। ঝিনুক কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

"এই কথা বলতে ডাক্তার ঘোষাল তোমাকে মারলেন?"

"হ্যাঁ। আমি কি মিছে কথা বলছি? উনি মানুষ নন, মহিষ। তুমি যে কি দেখেছ ও'র মধ্যে তা তুমিই জান।"

"তুমি এসব কথা ও'কে বলতেই বা গিয়েছিলে কেন! তুমি নিতান্তই যদি এখানে থাকতে না চাও, দেশে ফিরে যাও। ভিসা-পাসপোর্টের ব্যবস্থা আমি করে দেব। ডাক্তার ঘোষালকে বলতে গেলে কেন, উনি কি করবেন?"

"ও'র কথাতেই আমরা এ দেশে এসে-ছিলাম, ও'কে বলব না তো কাকে বলব!"

"ও'র কথাতে আমরা এদেশে আসিনি। আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, উনি সাহায্য করেছিলেন মাত্র। যাই হোক, তুমি ও'কে আর এ বিষয়ে কিছু বলতে যেও না। দেশে ফেরবার ব্যবস্থা আমিই করতে পারব। ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাবার দরকার নেই।"

"দেশে কিন্তু আমি খালি হাতে ফিরতে পারব না। সেখানে গিয়ে আমি মাছের ব্যবসা করব, আবার ঘর বাঁধব।"

"বেশ তাই হবে। আমি ডাক্তার ঘোষালের কাছে যাচ্ছি। এখানে রান্না হয়ে গেছে, তুমি স্নান করে খেয়ে নাও। কোথা ছিলে তুমি?"

কাউ তাঁকে মানা করে দিয়েছিল, তার ঠিকানাটা ঝিনুককে যেন জানানো না হয়।

যতীশবাবু বললেন, "কোথায় আবার যাব! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিলাম।"

"বেশ, এখন স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম কর। আমি চললাম।"

ঝিনুকের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে যতীশবাবু বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝিনুক তাঁর দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, তাঁর সঙ্গে টাকাও দিয়ে দেবে, এ সংবাদ পেয়ে কি তিনি পুলকিত হলেন? তাঁর মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হল না। বরং মনে হল, রেসে হেরে গিয়ে তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

ঝিনুক যখন ডাক্তার ঘোষালের বাড়ি পেঁৗছল তখন ডাক্তার ঘোষাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে বেরুচ্ছেন। কাউয়ের জায়গায় হরসুন্দরই কাজ করছিল। লোকটি ভালো। উপকৃত বলে কাজকর্ম আরও নিখুঁত। ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোথাও নেই। ঝিনুক ডাক্তার ঘোষালের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে দিয়ে এক ফাঁকে বাড়ি গিয়েছিল যতীশবাবু ফিরেছেন কিনা দেখবার জন্য। তাঁর সহসা অন্তর্ধানে সত্যিই সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর কপালের কাটা দাগটা চাবুকের মতো আঘাত করেছিল তাকে। তার কাকার অনেক দোষ আছে সে জানে। তার কাকা অবুঝ, লোভী, ভীতু, স্বার্থপর— সবই ঠিক। কিন্তু এও ঠিক যে, তিনি বড় বংশের ছেলে, সারা জীবন সসম্মান সুখে জীবন কাটিয়েছেন দেশে। রাজনৈতিক পাশা খেলার চক্রান্তেই আজ তিনি বিতাড়িত, অবহেলিত, অপমানিত। আজ ডাক্তার ঘোষাল মেরে তাঁর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছেন? দুরদৃষ্টের ঝড়ে যে লোকটা মুখ থুবড়ে মাটির উপর পড়ে গেছে তারও মুখের উপর পদাঘাত? ঝিনুকের সর্বাঙ্গ রি রি করছিল।

বেরুবার মুখেই ঝিনুককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার ঘোষাল। বললেন, "আজ খানিকটা ভেড়ার মাংস দিয়ে গেছে রসুল। তুমি নিজে রান্না করো ওটা। হরসুন্দরের হাতে পড়লে ভেড়া কাঁচকলা হয়ে যাবে।"

"বেশ, রাঁধব। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

ঝিনুকের ভাব-ভঙ্গী দেখে ঘোষাল বুঝলেন গতিক সুবিধার নয়। কিছু একটা হয়েছে।

"কর।"

"বাড়ি গিয়ে দেখলাম, কাকা ফিরেছেন। তাঁর কপালে একটা ঘা দগদগ করছে। কাকা বললেন, আপনি তাকে মেরেছেন। সত্যি?"

"সত্যি। মেরেছি, কিন্তু কম মেরেছি। আরও মারা উচিত ছিল।"

"কেন? তাঁর অপরাধ?"

"তিনি এসে একঘর রুগীর সামনে বলে-ছিলেন, আমি তোমাকে মাথায় মণি করে রেখেছি, সুতরাং তাঁকে টাকা দিতে হবে।

এর উত্তরে আমি তাঁকে মাত্র একটি চড় মেরেছি। আরও মারা উচিত ছিল।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

তারপর বলল, "একটা কথা ভুলে যাবেন না, উনি এ দেশে বড় কষ্টেই আছেন। ও'র মাথার ঠিক নেই। তা ছাড়া এটাও তো ঠিক, উনি যা বলেছেন তা নিতান্ত মিছে কথাও নয়। ভিতরে যাই থাক, বাইরে সবাই জানে আমিই আপনার বাড়ির কর্ত্রী। যাক সে কথা, উনি দেশে ফিরে যেতে চাইছেন সেই ব্যবস্থা করে দিন তা হলে।"

"দেখ। মিস্টার সেনকে বলতে হবে। এখন চলি।" বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল। ঝিনুক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার ঘোষাল একটা দূরের কলে বেরিয়ে গেছেন রাত্রেই। কখন ফিরবেন স্থিরতা নেই। ঝিনুক ভাবল, এই ফাঁকে ডাক্তার মুখার্জির ক্লিনিকে গিয়ে চোখটা পরীক্ষা করানো যাক। তার চোখে যে কিছু হয়নি তা সে ভাল করেই জানে, তবু সে ভাবছিল, যদি ফাঁকি দিয়ে একটা সার্টিফিকেট আদায় করা যায়। সবাই বিলেত চলে গেছে, এইবার তাকে যেতে হবে। সুবেদার খাঁর চেনা ক্যাপ্টেন সাহেব বলে' দিয়েছেন, লুকিয়ে-চুরিয়ে আর নিয়ে যাওয়া চলবে না। চারিদিকে বড়ই কড়াকড়ি। সুতরাং আইন-সম্মত উপায়ে পাসপোর্ট একটা যোগাড় করতেই হবে। এজন্যে যদি দুটো মিছে কথা বলতে হয়, তা সে বলতে পিছপা নয়। এজন্যে তার অন্তরে বা বিবেকে বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই। সে জানে, এসব পুজোর এই মন্ত্র।

একটা রিকশায় চড়ে গেল সে ডাক্তার মুখার্জির ক্লিনিকে।

ডাক্তার মুখার্জি একটা রোগী দেখছিলেন তখন। ঝিনুককে দেখে বললেন, "ও, তুমি এসেছ! পাশের ঘরটায় গিয়ে ব'সো। আমি এই কেসটা শেষ করে তোমার চোখ দেখব।"

তারপর তাঁর ড্রাইভার বেচুকে ডেকে বললেন, "হাসপাতাল থেকে একজন নার্সকে ডেকে নিয়ে এস তো। এই চিঠিটা নিয়ে যাও।"

হাসপাতালের ডাক্তারের নামে একটা চিঠি দিয়ে দিলেন। বেচু গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

মেয়েদের বসবার যে ঘরটায় ঝিনুক গিয়ে ঢুকল সেখানে আর কেউ ছিল না। কয়েকটা মাসিকপত্র ছিল টেবিলের উপর। সেই-গুলোই ওল্টাতে লাগল সে বসে বসে।

হঠাৎ তার কানে গেল, ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীটিকে বলছেন, "আপনাকে যে পথ্য লিখে দিলাম, তাই আগে মাসখানেক খেয়ে দেখুন। তাতে যদি উপকার না হয় তা হলে এই ওষুধগুলো কিনবেন। আমার মনে হয়, খাদ্যাভাবেই আপনার শরীরটা খারাপ হচ্ছে।"

"আমি তো মাছ মাংস ঘি দুধ প্রচুর খাই।"

"ফলও খেতে হবে।"

"বেদানা, পেস্তা, কিসমিস—এইসব ?"

"না। শশা, কলা, বেল, লেবু, তরমুজ, পেয়ারা—এইসব। আমি সব লিখে দিয়েছি—"

"ওষুধ এখন কিছুই খাব না ?"

লোকটা যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না, ঝিনুকের মনে হল।

"না। যেসব খাবার লিখে দিলাম তা খেয়ে যদি ফল না হয় তা হলে ওষুধ খাবেন—এক মাস পরেই।"

"ও, আচ্ছা—"

লোকটা যেন অনিচ্ছাভরে উঠে গেল।

"তুমি এবার এই ঘরে এস।"

ঝিনুক ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বললেন, "একটু ব'সো। নার্সটা এসে পড়লেই তোমার চোখটা দেখব।"

"নার্স কেন ?"

"ওটা আমাদের এটিকেট। রক্ষা-কবচও বলতে পার। কোন স্ত্রীলোককে নির্জন ঘরে একা পরীক্ষা করা আমাদের শাস্ত্রে মানা। বিশেষত, তোমার চোখটা ডার্ক রুমে নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে ভালো করে।"

কথাটা খুবই সংগত। কিন্তু এতে যেন ঝিনুকের মনে ঘা লাগল একটু। তার নিজের আত্মসম্মান সে নিজে বাঁচাতে পারবে না? তার জন্যে একজন ভাড়া-করা নার্স চাই!

ব্যাঙের হাসি হেসে বললে, "আপনাদের শাস্ত্র আমাদের এত ঠুনকো মনে করে?"

"হয়তো আমাদেরই ঠুনকো মনে করে। তা ছাড়া অনেক মেয়ে রোগী নানারকম দুরভিসন্ধি নিয়ে অনেক সময় আসে আমাদের কাছে। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেও এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর না। এখানে বসে বসেই ওই দেয়ালের টাঙানো অক্ষরগুলো পড়বার চেষ্টা কর।"

ঝিনুক সবগুলোই পড়তে পারছিল।

কিন্তু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, "তৃতীয় লাইন পর্যন্ত বেশ পড়তে পারছি, তারপর সব ঝাপসা।"

ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ খুলে দু ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলেন ঝিনুকের চোখে।

"একটু পরে আবার দেখব। ততক্ষণে নার্সটাও এসে পড়বে—"

একটু ইতস্তত করে ঝিনুক অবশেষে বলেই ফেললে কথাটা—"আপনার ফি কত?"

"আমি ষোল টাকা নি। তোমার কাছ থেকে নেব না কিছু।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে এল। ঝিনুক মাথা হেঁট করে বললে, "সেদিন তো আপনাকে বলেছি, কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নেব না এইটে আমাদের নীতি।"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, "তোমাদের নীতি আছে, আমারও তেমনি নীতি আছে একটা। আমি সবাইয়ের কাছ থেকে ফি নিই না। কার কাছে নেব, কার কাছে নেব না সেটা আমিই ঠিক করি। আমার এ অধিকারে আজ পর্যন্ত কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দিই নি, তোমাকেও দেব না। ফি না নিলে তুমি যদি চোখ পরীক্ষা করাতে না চাও তা হলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাও। এখানে ডাক্তার মিত্র ভালো চোখের ডাক্তার। সেখানে যেতে পার।"

ঝিনুকের চোখের অসুখ হয়নি, তার দরকার একখানা সার্টিফিকেট। ডাক্তার মুখার্জির বিলাতী এবং জর্মন ডিগ্রী আছে, সুতরাং গভর্নমেণ্টের দপ্তরে যে তাঁর সার্টিফিকেট বেশী জোরালো হবে এ কথা ঝিনুকের অবিদিত নেই। কথাটা শুনে সে একটু মুশকিলে পড়ে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনার এতটা সময় নষ্ট হবে, আপনি যদি ফি না নেন—"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "চলতি ভাষায় যাকে সময় নষ্ট করা বলে, তাই করেই আমি বেশী আনন্দ পাই। মাঠে-ঘাটে গিয়ে বসে থাকি, সেখানে তো ফি পাই না। আমার একটা 'থিয়োরি' আছে, সময় নষ্ট হয় না, সে কোন-না-কোন কাজ করিয়েই নেয় মানুষকে দিয়ে, তারও রূপান্তর আছে। জল জমে বরফ হয়, বর্তমান রূপান্তরিত হয় অতীতে, স্মৃতিতে নষ্ট হয় না। বর্তমানকে যদি নির্দোষ আনন্দে উপভোগ করা যায় তা হলে স্মৃতির রূপান্তরে তা অপরূপ হ'য়ে ওঠে। নষ্ট হয় না।"

"তা হলে কারো কাছেই ফি না নিলে পারেন।"

"সব রোগী সমান হয় না। অনেকের আত্মসম্মান খুব প্রবল। তোমার যেমন। অনেকে ফি ফাঁকি দিতে চায়, তাদের কাছে আমি শাইলক। আবার এমন অনেক রোগী আছে যাদের কাছে ফি নিলে বিবেকে বাধে তাদের কাছে নিই না। আবার এমন অনেক রোগী আছে বিনা ফি-য়ে যাদের চিকিৎসা করলে আনন্দ পাই, তাদের কাছ থেকেও নিই না। আমার নিজের মনের মধ্যে একটা মাপকাঠি আছে তাই দিয়ে ওটা আমি ঠিক করি।"

"আমাকে কোন পর্যায়ে ফেললেন?" হেসে জিজ্ঞেস করলে ঝিনুক।

"তা আর না-ই শুনলে।"

"কিছুতেই ফি নেবেন না?"

ডাক্তার মুখার্জি মাথা নেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

"এ অন্যায়। আমি বউদিকে গিয়ে দিয়ে আসব। বউদির সঙ্গে একদিন আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। কখন গেলে সুবিধা হয় বলুন তো।"

"সে কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় না।"

"ও মা, কেন!"

"তার মনে একটা অদ্ভুত কমপ্লেক্স হয়েছে। জটিল একটা মনস্তত্ত্বের প্যাঁচে পড়েছে সে।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ।"

"কি করেন?"

"পুজোর ঘরে খিল দিয়ে অধিকাংশ সময় বসে থাকে।"

ঝিনুক ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। ব্যাপারটার ভিতর প্রবেশ করবার চেষ্টা করল।

"রান্নাবান্না করেন না?"

"তা রোজই করে দু-একটা তরকারি। কিন্তু সর্বদাই কেমন যেন বিমর্ষ, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে।"

"এর কোন চিকিৎসা করছেন না?"

"আমার বিশ্বাস, চিকিৎসা করতে গেলে আরও খারাপ হবে। মনে হয় সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অপেক্ষা করছি—"

শেষের কথাটা বড় করুণ ঠেকল ঝিনুকের কাছে। ঝিনুক কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না। হাসপাতাল থেকে নার্সকে নিয়ে বেছু ফিরে এল।

একটু পরে ঝিনুকের চোখ পরীক্ষা করে ডার্ক রুম থেকে ডাক্তার মুখার্জি বেরুলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। নার্সটি চলে গেল। ঝিনুক তাঁর সামনে এসে বসল চেয়ারে।

"কি দেখলেন?"

"কোন দোষ তো দেখতে পেলাম না। এতো ভালো নর্মাল চোখ বহুকাল দেখি নি।"

"তা হলে আমি ঝাপসা দেখছি কেন?"

"ঝাপসা দেখা তো উচিত নয়। তবে দুটো কারণ হতে পারে যার জন্যে ঝাপসা দেখছ। একটা কারণ হতে পারে হিস্টিরিয়া গোছের কোনও কম্‌প্লেক্স। দেখবার যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে, তোমার মনে হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ না। আর একটা কারণ—"

বলেই থেমে গেলেন ডাক্তার মুখার্জি। মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

ঝিনুক উৎসুক হয়ে উঠেছিল, বলল—"আর একটা কারণ কি? বলতে বলতে থেমে গেলেন যে—"

"সেটা তোমার মুখের সামনে বলা উচিত হবে না। ভদ্রমহিলাদের অপমান করতে নেই—"

"আমার কিছু অপমান হবে না। বলুন আপনি, দ্বিতীয় কারণ কি হতে পারে।"

"দ্বিতীয় কারণ তুমি হয়তো মিথ্যে কথা বলছ। দেখতে পেয়েও বলছ দেখতে পাচ্ছি না।"

ঝিনুকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে—"আমার সার্টিফিকেটের তা হলে কি হবে? দেবেন না?"

"দেব কি করে। চোখে কোনও দোষ দেখতে পেলুম না যে। মিছে কথা তো লিখতে পারি না।"

"মিছে কথা লিখলে আমার যদি একটা উপকার হয়—"

"কি উপকার হবে! চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কোথাও যাবার দরকার নেই। চোখ তোমার ঠিক আছে। এত ভালো চোখ সাধারণত দেখা যায় না। চমৎকার চোখ।"

ঝিনুক লজ্জায় আনত করলে চোখের দৃষ্টি। তারপর বলল, "আসল কথা, আমি বিলেত যেতে চাই। চোখের অসুখ ছুতো। কোনও শক্ত অসুখের চিকিৎসার ওজুহাত দেখালে সহজে পাসপোর্ট পাওয়া যায়।"

"তুমি বিলেত যেতে চাইছ কেন?"

"ওই দেশেই বাস করতে চাই। এ দেশে আমাদের স্থান নেই এটা বুঝেছি। বাঙালীর ছেলেমেয়েদের এখন নূতন দেশে নূতন দিগ্বিজয়ের আশায় বেরুতে হবে। এ দেশে ভোটের জোরে যারা রাজত্ব করছে, আদর্শকে বলি দিয়ে যারা দেশ-ভাগ করেছে, ভোটাধিক্য হয়ে যাওয়ার আশংকায় পূর্ব-বংগ ভাগ করেও exchange of population করে নি, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখা। তাদের জুতোর টিপুনির তলা থেকে আমরা পালাতে চাই। অন্য দেশে গিয়েও হয়তো আমরা বাঁচব না। তবু এ দেশে আর নয়।"

"আমি বলছিলাম—"

"আপনি কি বলবেন তা আমি জানি। অনেক ভালো ভালো কথা বলবেন, adaptibility-র উপদেশ দেবেন, কিন্তু—"

"না, সে কথা বলব না। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমরাও কি এ দেশের লোকের সংগে ভদ্র ব্যবহার করেছ? তোমরা কি জবরদস্তি করে এ দেশের লোকের ঘর-বাড়ি জমি দখল কর নি?"

"দেখুন, একটা গাছে অসংখ্য পাখি সুখে বাসা বেঁধে ছিল, সেই গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে। সেই গাছের পাখিগুলি যদি এখন আপনাদের ইমারতের কার্নিসে এসে আশ্রয় নেয়, কিংবা আপনাদের বাগানের গাছে বাসা খোঁজে, সেটা কি খুব দোষের? আপনাদের দিক থেকে কি কোনও সহানুভূতি পেয়েছি আমরা? শিয়ালদহ স্টেশনে কখনও গিয়েছিলেন? নিতান্ত পেটের দায়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যেসব ভদ্রঘরের মেয়েরা দেহ বিক্রি করছে দেখেছেন তাদের?"

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল ঝিনুকের।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিচিত্রা

যেমন নাম তেমনি টিকিট

ওয়েলসের ছোট্ট একটি শহর। কিন্তু আটান্ন অক্ষরবিশিষ্ট ওর স্টেশনের নামের জন্য স্থানটি জগদ্বিখ্যাত। ওখানে যারা বেড়াতে আসে তাদের অনুরোধে বৃটিশ রেলওয়েজ ছ'ইঞ্চি লম্বা এবং দু ইঞ্চি চওড়া একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট চালু করেছে। অবশ্য কেবলমাত্র ঐ স্টেশনটির জন্যই।

ভ্রমণকারির দল এবং কোন জায়গার অস্বাভাবিক নামের সংগ্রাহকরা এই স্টেশনটির নামেতেই বিহ্বল হয়ে যায় এবং উচ্চারণ করতে তাদের অধিকাংশরেই জিভ জড়িয়ে যায়। নামটি হচ্ছে : Llanfairpwllgywngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

স্টেশনের মুটেরা নামটা ছোট করে নিয়ে বলে লানফেয়ার।

নতুন প্ল্যাটফর্ম টিকিটে পুরো নামটা লম্বালম্বিভাবে ছাপানো এবং ওর দাম তিন পেনি। সাধারণ প্ল্যাটফর্ম টিকিটে শুধু লেখা থাকে Llanfair P G এবং তার দাম এক পেনি কম।

পুরো নামটির মর্ম হচ্ছে: "একটা দুরন্ত ঘূর্ণীর নিকটবর্তী শাদা হেজেল গাছের কোটর অন্তর্গত সেন্ট মেরীর গির্জা এবং একটি লাল গুহার নিকটস্থ সেন্ট টাইসিলিওর গির্জাভিমুখে।"

মানুষের স্বপ্ন সত্যে পরিণত

মহাকাশ ভ্রমণ ও পারমাণবিক বিজ্ঞানের খবর মাঝে মাঝে মানুষের মনে চমক লাগালেও বিশ্বের বৈজ্ঞানিক প্রগতির দীর্ঘ, দুর্বার পথে সেসব সাফল্য তত জরুরী নয়। আজ অন্য এক দল বিজ্ঞানী তারচেয়ে জরুরী কাজ নিয়ে নীরবে সাধনা করে চলেছেন যাতে মানুষের জীবন সুখময় হয় অথবা তার চেয়ে বড় কথা মানুষের বাঁচা একান্ত সম্ভব হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্তমানে তিনশো কোটি মানুষের আহার যোগাড় করা যখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ভবিষ্যতের হাজার কোটি মানুষের পুষ্টির প্রশ্নের সমাধান নিশ্চয়ই একটি বিরাট প্রশ্ন। মিউনিখের দুজন বৈজ্ঞানিক ডাঃ স্ট্রেল ও ডাঃ কালোইয়ানফ কৃত্রিম উপায়ে ক্লোরোফিল উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। জল, বাতাস ও সূর্যের আলো থেকে উদ্ভিদ-জগৎ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর জৈব জীবনের পক্ষে পরম অপরিহার্য এই মৌলিক কার্বোহাইড্রেট পদার্থটি উৎপাদন করে এসেছে। আশা করা যাচ্ছে প্রকৃতির অফুরন্ত উপাদান থেকে প্রস্তুত কৃত্রিম ক্লোরোফিল থেকে মানুষের পুষ্টির জন্য প্রচুর খাদ্য কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করা অদূর ভবিষ্যতেই সম্ভব হবে।

অন্যভাবেও খাদ্যসমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। পৃথিবীতে জলের অভাব নেই বটে কিন্তু তার ৯০ ভাগ লবণাক্ত হওয়ার পানীয় ও সেচের পক্ষে সেই জল অযোগ্য। জার্মান বিজ্ঞানীরা মানুষের কিডনীর ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে একটি বিরাট কৃত্রিম কিডনী তৈরী করার কথা চিন্তা করছেন! এটি সম্ভব হলে, সেই কিডনীর সাহায্যে সমুদ্রের জল থেকে অতিরিক্ত লবণের ভাগ শোধন করে নিয়ে তাকে পানীয় ও সেচের জলের উপযুক্ত করে তোলা সম্ভব। তখন সেই জল দিয়ে উষর মরুভূমিকেও শস্যশ্যামল করে তোলা সম্ভব। তখন হাজার কোটি মানুষেরও খাদ্যের অভাব ঘটবে না।

অন্য দিকে বিজ্ঞানীরা মানুষের বিভিন্ন বিকল দেহযন্ত্রের বিকল্প কৃত্রিম দেহযন্ত্র তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। বিখ্যাত জার্মান সার্জন অধ্যাপক শোয়েমবাখ হৃৎপিণ্ডের কিছু অংশ প্লাস্টিকের কৃত্রিম অংশ দিয়ে পাল্টে দিয়েছেন; এমন কি তিনি কৃত্রিম শিরা ও কৃত্রিম কিডনী ব্যবহার করেছেন। এছাড়া আজকাল হার্ট-লাঙ যন্ত্র তৈরী হয়েছে এবং অন্যান্য ব্যবস্থা হয়েছে যার সাহায্যে স্থায়ী অথবা সাময়িকভাবে মানুষের বিকল দেহযন্ত্র বদলানো যায়।

দেহবিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত মিউনিখের ম্যাক্স-প্লাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, বিশেষ হরমোনের সাহায্যে মানুষের দেহকোষে বিশেষ বংশকণার পরিবর্তন করে বহু বংশগত রোগের উচ্ছেদ সম্ভব।

বিভিন্ন পেশার ইষ্টদেবতা

আমাদের দেশে যেমন ব্যবসা ক্ষেত্রে গণেশকে ইষ্টদেবতা মেনে নেওয়া হয়, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের নানা দেশে বিভিন্ন পেশার

গুয়াতেমালার তিকালেতে আবিষ্কৃত মায়া সভ্যতা যুগের শিল্পকার্যের নিদর্শন—খৃষ্টপূর্ব ২২১ সনে তৈরি যসম (Jade) পাথরের এই মুখোসটির সঙ্গে প্রাপ্ত অন্যান্য সামগ্রী প্রাচীন মায়া জাতির শিল্প বিষয়ে অতি উঁচুদরের জ্ঞান ও কুশলতার পরিচায়ক

ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবতা নির্দিষ্ট করে নেওয়ার প্রথা দেখা যায়।

ইউরোপে এয়ার-হোস্টেসরা তাদের ইষ্টদেবী ঠিক করেছেন সেণ্ট বোনাকে। এই সেণ্ট বোনা দ্বাদশ শতাব্দীতে তীর্থযাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবনপাত করেন।

বছর কতক আগে ফরাসী মোটর চালকরা সেণ্ট খৃস্টোফারকে তাদের ইষ্টদেবতা নির্বাচন করে। তার কারণ, কিম্বদন্তী অনুসারে সেণ্ট খৃস্টোফার একদা অবিশ্বাস্য রকম স্বল্প সময়ে প্রভু যীশুকে একটি নদী পার করিয়ে দেন।

ফরাসী টাইপিস্টরা বহুদিন আগেই সেণ্ট জেনেকে তাদের ইষ্টদেবতা করে নিয়েছে। প্রত্যেক বছর অগাস্ট মাসে শত সহস্র টাইপিস্ট আর্লের বার্ষিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। সেখানেই সেণ্ট জেনের জন্ম ও মৃত্যু হয়।

১৯৫১ সালে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফকারিরা দেবদূত গেব্রিয়ালকে ইষ্টদেবতা করে নেয়। সেণ্ট সেসিলিয়া হচ্ছেন সঙ্গীতবিদদের ইষ্টদেবী এবং নার্সদের ইষ্টদেবী সেণ্ট আগাথা।

১৯৫৮ সালে ইতালির পুলিসদের জন্যও এক ইষ্টদেবতা নির্দিষ্ট করা হয়—২৮৮ সালে তীরের আঘাতে নিহত বলে কথিত এক রোমান শহীদ, সেণ্ট সেবাস্টিয়ান।

মালিদের ইষ্টদেবতা হচ্ছে সেণ্ট ফিয়াকর এবং এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, তার স্মৃতি-দিবস, ৩০ অগাস্ট, স্ট্রবেরীর চারা পুঁতলে প্রচুর ফল লাভ করা যায়।

এমনি দাঁতের যন্ত্রণায় যারা ভোগে তাদেরও একজন ইষ্টদেবী আছেন। ইনি হচ্ছেন সেণ্ট এপোলোনিয়া যিনি ২৫০ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে শহীদ হন। তাঁর প্রতিমূর্তি হচ্ছে—হাতে একটা সাঁড়াশীতে তোলা দাঁত।

কোকোর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা

বর্তমান সময়ের মতো পৃথিবী ব্যাপি কোকোর জনপ্রিয়তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এ বছর সমগ্র পৃথিবীতে এগারো লক্ষ তিন হাজার টন কোকো খাওয়া হবে বলে একটা হিসেব প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু আজ যেভাবে কোকো খাওয়া হয় সেটা পৃথিবীর প্রথম কোকোপায়ী সাড়ে চারশো বছর আগের মেক্সিকোর আজটেকদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সে যুগে চিনি উদ্ভাবিত না হওয়ায় আজটেকেরা ভ্যানিলা মিশিয়ে সুগন্ধযুক্ত করে মশলা দিয়ে ঝোলের মতো করে নিয়ে পান করতো।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনের অভিযাত্রীরা কোকোর শুঁটি এবং তা থেকে পানীয় প্রস্তুতের পদ্ধতিটি ইউরোপে আমদানী করে।

অল্প দিনের মধ্যেই কোকো স্পেন দেশের ধনীদের একটি প্রিয় পানীয় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু স্পেনীয়রা এই পানীয় তৈরীর পদ্ধতিটি ইওরোপের অন্যান্য দেশে যাতে প্রচারিত হতে না পারে সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে।

তা সত্ত্বেও কালক্রমে কোকো তৈরীর গোপন পদ্ধতিটি ফ্রান্সে ফাঁস হয়ে যায় এবং সেখান থেকে তারপর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ক্রমে সমগ্র পৃথিবীর লোকই জেনে ফেলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইংলণ্ডের শহরগুলিতে কোকোখানা একটা ফ্যাশনের স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে সেগুলি কুখ্যাত জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয় যেখানে উত্তেজিত জুয়াড়িরা মগে করে কোকো পান করে স্নায়ুকে শান্ত করতো।

কোকো গাছের আদি স্থান হচ্ছে আমেরিকার গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল। এখন অবশ্য অন্যান্য গ্রীষ্ম প্রধান ও আর্দ্র দেশেও কোকোর চাষ হচ্ছে। পৃথিবীর মোট প্রয়োজনের অর্ধেকেরও বেশী উৎপাদিত হয় পশ্চিম আফ্রিকায়।

কাকাও গাছে সারা বছর ধরেই শুঁটি ফলে কিন্তু তাহলেও উৎপাদকদের বহু সহস্র গাছের প্রয়োজন হয়। তার কারণ গড়পড়তা প্রতি গাছ থেকে পাওয়া যায় মাত্র দু পাউণ্ড কোকো।

আগুনের প্রথম উদ্ভব

আদি মানব একদা ঘুম ভেঙে তার শয্যা প্রজ্জ্বলিত দেখা থেকেই প্রথম অগ্নির সঙ্গে পরিচিত হয়।

চীনে পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বের অধিবাসী পিথেক্যানথ্রোপাস জাতীয় আদি মানুষ আগুনের ব্যবহার যারা জানতো তারা সম্ভবত শুকনো ঘাস বিছিয়ে তাদের শয্যা রচনা করতো। রোদে সদ্যশুষ্ক ঘাস ওপরে বিছিয়ে দিতে নীচেকার স্তূপের উপাদানের জীবানুঘটিত পচন কিছুটা তাপের সৃষ্টি করে।

এইভাবে আগুন লাগা মিশ্রিত সারের স্তূপ বা খড়ের গাদায় আগুন লাগা ব্যাপার সম্পর্কে সুপরিচিত। ইংলণ্ডে ডারহামের বিড কলেজের ডি সি আর্নল্ড বিশ্বাস করেন যে, ঐভাবে উৎপাদিত তাপেই তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে।

আর্নল্ড মনে করেন যে পৌরাণিক কাহিনী এবং আদি মানবের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীতে যেসব কথা বলা হয়ে থাকে যে, মানুষ আগ্নেয়গিরি, দাবানল, বিদ্যুৎ, পাথরে পাথরে বা শুকনো গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণ থেকে আগুন পায়, সেটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। ছোট ছোট ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দল কর্তৃক ঘর্ষণ-জনিত অগ্ন্যোদ্গম দেখা এতো দুর্লভ যে তাদের পক্ষে সে অভিজ্ঞতা লাভ অনিশ্চিত।

এই প্রতিপাদ্য ধরলে অগ্নি উৎপাদনের অন্যান্য উপায়, বহু পরে প্রাকৃতিক ঘটনা লক্ষ্য করে, অথবা অস্ত্রাদি নির্মাণের সময়ে ধাতব দ্রব্যের পরস্পরের ঘর্ষণের ফলে আগুনের যে ফুলকি বের হয় তাই দেখেই হয়তো আগুন সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১২ ॥

একটু দম নিয়ে ডাক্তারবাবু ফের শুরু করেন :

এ তো গেল পটভূমি। রোগের ইতিহাসটা শুনলাম ক্রমে। গত বছর ফাগুন মাসের কথা। কারাংমেটা থেকে ওরা দলবেঁধে গিয়েছিল কাবোঙ্গা ঘটুলে। চৈত-দাণ্ডার উৎসবে। এমন উৎসবরাত্রে সবাই একটু বাঁধন-ছেঁড়া হয়ে পড়ে। সচরাচর সঙ্গীও বদল হয়। দু-পক্ষই একটু মুখ বদলাবার সুযোগ খোঁজে। আগন্তুক চেলিকদল বেছে নেয় স্থানীয় মোটিয়ারীদের: আগন্তুক মোটিয়ারীর দল ধরা দেয় স্থানীয় চেলিকের বাহুবন্ধনে। সে রাত্রেও নিয়মমতো সবই হল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলল খেলা-ধাঁধা-নাচ-গান। তারপর ঘটুলঘরের অন্ধকারে মহুয়ার নেশায় মাতোয়ারা ছেলেমেয়ের দল কে কার মাসানিতে রাত কাটালো কে তার হিসাব রাখে? কী যে ঘটল সে রাত্রে কেউ তা জানে না। শুধু পরদিন সকালে দেখা গেল চয়নের চোখে লেগেছে যৌবনের মোহাঞ্জন। ধ্যান ভেঙেছে নিঃসঙ্গ নায়কের। চয়নের মন অবশেষে বাঁধা পড়ল কারাংমেটার একটি মেয়ের আঁচলে।

চয়নের বাপ-মা খুশি হল এতে। কারাংমেটার গাইতা আয়েতু-গোণ্ড হচ্ছে চয়নদের পালুটি-ঘর। আকোমামা শ্রেণীর। বিবাহে বাধা নাই কিছু। স্থির হল চয়ন আয়েতুর বাড়িতে লামহাদা খাটতে যাবে।

আমি বাধা দিয়ে বলি : 'লামহাদা' বস্তুটা কি?

: ও, আপনি তাও জানেন না বুঝি। মুরিয়াদের মধ্যে কয়েক রকমের বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একই ঘটুলের ছেলেমেয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। আবার যে-কোন ছেলে অন্য কোন ঘটুল থেকেও পাত্রী সংগ্রহ করে আনতে পারে। শুধু দেখতে হবে কনে যেন বরের 'দাদাভাই' গোত্রের না হয়। আকোমামা হলেই হল। কোন কোন ক্ষেত্রে বরের বাপ হয়তো প্রতিশ্রুত 'মার্না' বা কন্যাপণ দিয়ে উঠতে পারে না। ছ-মাস, একবছর, দু-বছর পাত্রকে সে-ক্ষেত্রে হবু শ্বশুর-বাড়িতে থাকতে হয়—মজুর হিসাবে খাটতে হয় হবু-শ্বশুরের ক্ষেতে। দুই-তিন বছর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মার্না শোধ দিতে হয়। তখন বাজে মাদ্রি ঢোল, ধুংগীর আর কেকরেং। চেলিক-মোটিয়ারীদের ডাক পড়ে। বিয়ের বসে বর-কনে। এই জাতীয় হবু-জামাইকে বলে 'লামহাদা'। খাওয়া-পরা ছাড়া লামহাদা হবু-শ্বশুরের কাছে আর যদি কিছু প্রত্যাশা করে তা হচ্ছে কোন ভবিষ্যত-দিনে তার কন্যাটিকে। কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে আর কোন মজুরী সে পায় না। তবে হ্যাঁ, লামহাদা যদি খাটতে খাটতে হঠাৎ খবর পায় পাত্রী অপর কারও সাথে ভেগে পড়েছে তখন সে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। পাত্র যদি ভিনগাঁ থেকে লামহাদা খাটতে আসে, তখন তাকে এ গাঁয়ের ঘটুলের সভ্য করে নেওয়া হয়। প্রাক্তন ঘটুলের পদমর্যাদা অনুযায়ী এখানেও কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে তাকে অভিষিক্ত করে নেওয়া হয়। রাত্রে লামহাদা ঘটুলেই নিদ্রা যায়, আর পাঁচটা অবিবাহিত চেলিকের মতো। ঘটুলের অন্যান্য চেলিকের সঙ্গে তার অধিকারগত প্রভেদ কিছু নেই— একটিমাত্র বিষয় ছাড়া। সে ঘটুল যদি জোড়িদার ঘটুল হয় তাহলে সে একটি মোটিয়ারীর সঙ্গে স্থায়ী-ভাবে জোড় বাঁধে—যতদিন না তার বিয়ে হয়। প্রশ্ন হতে পারে ভাবী বধূও যখন সেই একই ঘটুলের মোটিয়ারী তখন লামহাদা তো তাকেও শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পেতে পারে। এখানেই মজা! তা সে পারে না। অন্যান্য চেলিকের থেকে এইটুকুই তার অধিকারগত পার্থক্য। ভাবী বধূ তার লামহাদার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। লামহাদা যেন হবু-বউয়ের ভাশুর-ঠাকুর। লামহাদার সঙ্গে তার ভাবী বধূর কোন গোপন সম্পর্ক যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অবাধ কোর্টশীপের রাজ্য ঘটুলঘরে একটি-মাত্র নিষেধের বেড়া আছে। —'এনগেজমেন্ট' ঘোষিত হবার পর আর ওটি চলবে না!

অথচ একই ঘটুল-ঘরে ভাবী বধূ হয়তো অন্য কোন চেলিকের বাহুবন্ধনে রাত্রিযাপন করে লামহাদার মাদুর থেকে কয়েক হাত দূরে।*

চয়ন এল কারাংমেটা গাঁয়ে আয়েতু-গোণ্ডের বাড়ি লামহাদা খাটতে। এমনিতেই চয়ন ছিল অত্যন্ত কর্মঠ, বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী। তার উপর শ্বশুরের কাছ থেকে আশু অনুমতি পাবার আশায় সে প্রাণ দিয়ে খাটতে শুরু করে আয়েতুর খামারে। আয়েতু গাঁয়ের সর্দার। বয়েস হয়েছে। ছেলে নেই। সংসারে আছে বউ আখালি, বুড়ি পিসিমা কিরিংগো, আর দুই মেয়ে। ফুলের মতো নিষ্পাপ সুন্দরী মাল্‌কো আর আগুনের মতো উজ্জ্বল রূপসী রঙিলা! রঙিলা বড় বোন।

আমি বললুম ঃ কার জন্যে লামহাদা খাটতে এল চয়ন?

ডাক্তারবাবু আমার প্রশ্নটা কানেই তুললেন না। আপনমনে বলে চলেন ঃ বছরখানেক লামহাদা খাটবার পর যেদিন আয়েতু রাজি হল কন্যা সম্প্রদানে সেদিনই ঘটল দুর্ঘটনাটা। অবশ্য ঘটনা যে কি ঘটেছিল তা ওরা কেউ ঠিকমতো বলতে পারলে না। তবে ঐদিনই যে কিছু একটা ঘটেছিল এ কথা নিশ্চিত। কারণ পরদিন থেকেই চয়নের ভাবান্তর দেখা গেল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাগলামির প্রচ্ছন্ন লক্ষণ প্রকট হল। আয়েতু খবর পাঠাল কাবোংগায়। চয়নের বাপ কোণ্ডা এল ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তারপর থেকে সে কাবোংগাতেই আছে। এখন সে বদ্ধ পাগল।

পাগলামির লক্ষণগুলি জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারবাবু জানতে পারেন চয়ন নাকি কারও সঙ্গে কথা বলে না। খায় না, ঘুমায় না। সারাদিন শুধু পায়চারি করে আর বিড়বিড় করে বকে আপন মনে। হাতে পায়ের গাঁটে গাঁটে ওর বেদনা বোধ হয়। কেউ জোর করে খাওয়াতে এলে তাকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কদিন হল পাগলামির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওকে ন্যাকি বেঁধে রাখতে হয়েছিল!

যে ভাষায় ওরা কথা বলছিল সেই গোণ্ডিই হচ্ছে চয়নের মাতৃভাষা। ডাক্তার-

---

* এইখানে ডাক্তার পিল্লাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু কথোপকথন হয়েছিল যা গল্পের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হলেও কৌতূহলী পাঠকের খাতিরে তা লিপিবদ্ধ করলাম ঃ

আমি বললুম ঃ আচ্ছা ঘটুলের খেলাঘরে যারা বরকনে সাজে তাদের মধ্যেই কি বেশী বিয়ে হয়?

ডাক্তার সাহেব বললেন ঃ এ সম্বন্ধে, যতদূর জানি, সাম্প্রতিককালে কোন গবেষণা হয়নি। তবে দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সাগরপারের কোন কোন মানুষ এদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। ভেরিয়ার এলুইন সাহেবের একটা পরিসংখ্যান আছে এ বিষয়ে। তিনি দুই হাজারটি মুরিয়া বিয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেটাই একমাত্র রেকর্ড।

কৌতূহল প্রবল। বললুম ঃ কাল সকালে সেটা খুঁজে বার করবেন তো, দেখব।

ঃ মনে আছে আমার। খুঁজতে হবে না। শুনুন। দুই হাজারটি বিয়ের হিসাব হল ঃ

বাপ-মায়ের ব্যবস্থাপনায় তাঁদের নির্বাচিত পাত্রীকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিয়ে করেছে ... ১৮৮৪ জন অর্থাৎ ৯৪·২০%

বাপমায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক বিয়ে... ১১৬ জন অর্থাৎ ৫·৮০%

এই একশ ষোলোটি অস্বাভাবিক বিয়ের হিসাব ঃ

ঘটুল-সঙ্গিনীকে ভালবেসে পরে অনুমতি নিয়ে ... ... ৭৭টি

ঘটুল-সঙ্গিনী গর্ভবতী হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে ... ... ২৬টি

ঘটুল-সঙ্গিনীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ... ... ১৩টি

একুনে ১১৬টি

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক ডাক্তার, আদিবাসী উন্নয়ন অফিসার নন। তাহলে এভাবে এত সংখ্যাতত্ত্ব মুখস্ত রেখেছেন কেমন করে? সে কথা না বলে শুধু বললুম ঃ কিন্তু এর মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব কোথায়? আমি জানতে চাইছি ওরা ঘটুল সঙ্গিনীকে বেশী বিয়ে করে, না বাইরের কোন মেয়েকে।

ঃ বলতে দিন মশাই সবটা—ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারসাহেব। ভেরিয়ার সাহেবের পরীক্ষিত দুই হাজারটি বিয়ের মধ্যে একই ঘটুলের চেলিক-মোটিয়ারীর বিয়ে আছে মাত্র ৭৬৫টি; আর অপর ঘটুল থেকে অজানা পাত্রীকে সংগ্রহ করে এনেছে বাকি ১২৩৫ জন চেলিক। এর মধ্যে ১১৩টি ছিল 'লামহাদা' বিয়ে।

আমি বললুম ঃ আশ্চর্য তো। এমন রোমান্টিক নাইট-ক্লাবে তো এরকমটি হওয়ার কথা নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন ঃ আমার তো মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক। একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েরা যেমন একই সঙ্গে বেড়ে ওঠার সময় পরস্পরের প্রীতি ততটা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে না—এদেরও অবস্থা তেমনি।

আমি বললুম ঃ আচ্ছা বিবাহের ফলাফলের কোন পরিসংখ্যান আছে?

উনি বললেন ঃ ঠিক কি জানতে চাইছেন বলুন।

ঃ আমি জানতে চাইছি এদের মধ্যে সুখী দম্পতি বেশী আছে কোন দলে? দু হাজার বিয়ের মধ্যে মাত্র ১১৬টি হচ্ছে লাভ-ম্যারেজ। কোন দলে কজন সুখী হয়েছে?

ডাক্তারসাহেব হেসে বলেন ঃ আমি যদি প্রতিপ্রশ্ন করি—সুখী দম্পতির সংজ্ঞা কি? আপনাদের সহস্রাব্দীর সংস্কৃতির উপর গড়ে-ওঠা সমাজ দম্পতির সুখের কোন মানদণ্ড আবিষ্কার করতে পেরেছে কি?

কোণঠাসা হয়ে বলি ঃ সুখের না হলেও অসুখের একটা মাপকাঠি আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ দাম্পত্য-থার্মোমিটারের নিম্ন-সীমান্ত, ফ্রিজিং পয়েন্ট।

ডাক্তারবাবু বলেন ঃ তাহলে অবশ্য একটা হিসাব দাখিল করতে পারি। পিতৃ-আদেশে যে ১৮৮৪ জন বিয়ে করেছিল তাদের মধ্যে ৪৯ জন পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের শরণাপন্ন হয়, অর্থাৎ ২·৬ জন। অপরপক্ষে যারা নিজে পছন্দ করে বা ভালবেসে বিয়ে করেছিল সেই ১১৬ জনের মধ্যে ১৬ জন বিচ্ছেদ চায়; অর্থাৎ ৮·৬ শতাংশ। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদকেই যদি দাম্পত্য-উত্তাপের ফ্রিজিং-পয়েন্ট বলেন, তাহলে আমি বলব...

আমি বাধা দিয়ে বলি ঃ বুঝলাম! এবার পরিসংখ্যান ছেড়ে গল্পটা বলুন। চয়ন এল কারাংমেটার লামহাদা খাটতে। তারপর?

সাহেব কেস্ হিস্ট্রিটা শুনছিলেন কান দিয়ে, কিন্তু তাঁর নজর ছিল চয়নের উপর। আশ্চর্য, সে যেন বধির। এ কাহিনীর বিন্দুমাত্র যে তার বোধগম্য হয়েছিল তা মনে হয়নি ডাক্তারবাবুর—ওর ভাবলেশহীন মূর্তি দেখে। দু একটা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। চয়ন নির্বাক। সে যে ডাক্তারবাবুর প্রশ্নগুলি শুনেছে, তার অর্থ বুঝেছে তাও মনে হয়নি। শুধু মূক নয়, সে যেন বধিরও। জানালা দিয়ে তাপবন্ধ দিগন্তের পাণ্ডুর ধূসরতার দিকে নিষ্প্রাণ দুটি চোখ মেলে দাঁড়িয়ে ছিল চয়ন—যেন এক পাথরের মূর্তি।

ডাক্তারবাবু ওর বাঁধন খুলে দিতে বললেন। ওরা প্রথমটা রাজি হয়নি। শেষে ডাক্তারবাবুর পীড়াপীড়িতে চয়নের বাঁধনটা ওরা খুলে দিল। ভয়ত্রস্ত দৃষ্টিতে জনতা লক্ষ্য করতে থাকে চয়ন এবার কি করে! কিছুই করল না চয়ন—ট্রবু হয়ে বসল সে, মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু বাঁধন খুলে দেবার সময় সে একবার ডাক্তারবাবুর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল। ক্ষণিকের দৃষ্টি।

ডাক্তারবাবু আমার কাছে সে দৃষ্টির বিশ্লেষণ করে বললেন ঃ বিদ্যুত চমকের মতো আমার মনে হল—চয়ন কখনও সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়নি। ওর চোখে আমি কৃতজ্ঞতার একটা আভাস দেখেছি। ও বুঝতে পেরেছে—আমার আদেশেই ওর বাঁধনটা খুলে দেওয়া হয়েছে। তাই ওর সেই চকিত দৃষ্টির কৃতজ্ঞতা। তাই যদি হবে—তাহলে সে উন্মাদ কখনই নয়!

ওদের সকলকে ঘর থেকে বিদায় করে ডাক্তারবাবু জনান্তিকে দাঁড়িয়েছিলেন চয়নের মুখোমুখি। প্রশ্ন করেছিলেন ঃ চয়ন! তোমার কি হয়েছে?

পূর্ণদৃষ্টিতে চয়ন একবার তাকায় ওঁর দিকে। পরমুহূর্তেই নত হয় তার দৃষ্টি। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ঃ ওরা বলছে তুমি পাগল। আমার বিশ্বাস ওরা ভুল বলছে, নয়?

জবাব নেই। চয়ন নিষ্প্রাণ পাথরের মতোই ভাবলেশহীন।

ঃ ওরা তোমাকে অকারণে কষ্ট দেয়, বেঁধে রাখে, তাই নয়? ওরা তোমার মনের কথা বুঝতে পারে না, আমি জানি। আমাকে বলবে সব কথা?

চয়ন এবারও নিরুত্তর।

ঃ ওরা মিছামিছি তোমাকে ভয় পায়। আমি তো তোমাকে ভয় পাই না। আমি তো তোমাকে পাগল মনে করি না। তুমি আমাকে বল তোমার কি কষ্ট, তুমি কি চাও—আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আবার আগের মতো হয়ে যাবে তুমি। বলবে আমাকে সব কথা?

আবার চোখ তুলে তাকাল চয়ন। ডাক্তারবাবুর মনে হল ওর চোখের তারায় একটা প্রত্যাশা যেন কাঁপছে, ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশপাতার মতো। ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে সে যেন শুনতে পেয়েছে সুস্থ-সবল প্রাণময় পৃথিবীর আহ্বান, যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে যৌবন-উচ্ছল ঐ অরণ্যচারী মানুষটা তারুণ্যের দুর্বার প্রেরণায় ছুটে বেড়াতো বন থেকে বনান্তরে। সে দৃষ্টি যে দেখেছে সে হলপ করে বলতে পারে চয়ন কখনও সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়নি। উন্মাদের ঘোলাটে চোখে আশা-আকাঙ্খা ও-ভাবে দোল খেতে পারে না। ডাক্তারবাবুর মনে হল চয়ন তাঁর কথা বুঝতে পারছে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। আত্মীয়-বন্ধু মায় গোটা দুনিয়ার প্রতি তার অভিমান। কাউকে ও বিশ্বাস করে না। পাগল নয়, তবু সে পাগল সেজে আছে! ডাক্তারবাবু ওকে বললেন ঃ আমাকে তুমি সব কথা খুলে বলতে পার না? আমি কাউকে কোন কথা বলব না। আমাকে যদি সব কথা খুলে বলতে না পার, তাহলে বল, কাকে তোমার মনের কথা বলতে পারবে?

ডাক্তার পিল্লাই প্রশ্নটা নিক্ষেপ করে ওকে লক্ষ্য করতে থাকেন। ওঁর মনে হল চয়ন যেন তিলে তিলে ওঁর অন্তরের কাছে সরে আসছে। ওঁকে বিশ্বাস করতে, ওঁর কাছে ধরা দিতে চেষ্টা করছে। মনের মধ্যে একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলেছে চয়নের। ধীরে ধীরে ওর চোখের উপর থেকে পাগলামির আচ্ছন্নতার একটা পর্দা যেন উপরে উঠে যাচ্ছে—যেমন করে ভোরবেলাকার কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্য ওঠে।

ডাক্তারবাবু বলেন ঃ মালকোকে ডাকব? রাঙিলাকে?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল চয়ন ঃ না-না-না!

থপ করে বসে পড়ল ফের মাটিতে। আর সেই চিৎকারে ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে আবার ওরা ঢুকে পড়ল ঘরে।

ভুল, ভুল, মর্মান্তিক ভুল করে বসেছেন ডাক্তার পিল্লাই। এত সহজ কথাটা তাঁর খেয়াল করা উচিত ছিল। অনুমান করা উচিত ছিল, বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে-আসা বরের

মারিয়া ও মুরিয়া নারীর অলঙ্কার ঃ
(১) কাণ্ড থেকে তৈরি সাধারণ কাঁকুই, (২) (৩) কাঠের কাঁকুই, (৪) ধাতব কর্ণাভরণ, (৫) (৬) পুঁথির মালা, ৫ক ৬ক —ঐ বিস্তারিত, (৭) চুলের কাঁটা।

মনের গভীরে যদি কোন কাঁটা বি'ধে থাকে—তা হলে তা হচ্ছে তার হলেও-হতে-পারত কনের কাঁটা! আর উনি নির্বোধের মতো চয়নের সেই বেদনার জায়গাটাই মাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে ওর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছে! বুঝতে অসুবিধা হয়নি পিল্লাই সাহেবের যে পরীক্ষা কার্যের আপাতত ঐখানেই যবনিকা!

ডাক্তারসাহেবের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল ছেলেটি উন্মাদ নয়। ঈশ্বরের এমন একটি অপূর্ব সৃষ্টি কি এভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে? এ নিশ্চয় একটা কঠিন সাইকলজিক্যাল কেস। ও'র মনে হয়েছিল চয়নের চিকিৎসার মাধ্যমেই আদিবাসীমনের একটা অনুদ্ঘাটিত মহাদেশ হয়তো আবিষ্কার করতে পারবেন। যতটা ওদের আগ্রহ ছিল তার চেয়ে ডাক্তারবাবুর উৎসাহই যেন বেশী। একটা কথা ডাক্তারবাবু কিছুতেই ভুলতে পারেননি—কাবোংগা গাঁয়ের ঐ অসভ্য লোকগুলি সাত মাইল পথ ঠেঙিয়ে তাঁর কাছেই এসেছে, গুণিয়ার কাছে যায়নি। ঝাড়-ফুক মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারস্থ হয়নি। পরে অবশ্য তিনি জানতে পারেন যে ঝাড়-ফুকের রাজ্য অতিক্রম করেই ওরা এসেছিল তাঁর

কাছে। তা হোক, তবু চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে নেমে তিনি নিজের দায়িত্বের কথা ভোলেন নি। উনি লক্ষ্য করেছেন ঐ নেংটিসার মানুষগুলো কেমন তিল তিল করে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে শিখছে। সভ্য জগতের মানুষের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলছে। তার অনিবার্য ফলস্বরূপ একদল ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্র-তন্ত্র-ওয়ালাদের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর একটা সংঘাত পাকিয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে। নারান-পুরে কাজে যোগ দেবার পর থেকেই সেটা তিনি অনুভব করেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গুণিয়া ইতিপূর্বেই নিদান হেঁকেছিল—চয়ন ভুগছে অপদেবতার অভিশাপে। 'পাংনাহিন নিহানী ধুরবান!' মন্ত্রবিলাসিনী ডাইনীর নিক্ষিপ্ত মারণমন্ত্র। একমাত্র নাকি সেই ডাইনীই পারে আবার চয়নকে স্বাভাবিক মানুষ করে তুলতে। আর কারও সে ক্ষমতা নেই। তাই ডাক্তারবাবু যখন কেসটা হাতে নিয়ে চয়নের আত্মীয়-স্বজনকে ভরসা দিতে গেলেন তখন খল্ খল্ করে হেসে উঠেছিল লোকটা।

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিলেন : হাসছ কেন তুমি?

লোকটা ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে : হাসব না? তুই কেন মিছিমিছি এদের বলছিস যে চয়ন আবার ভাল হয়ে যাবে?

ডাক্তারবাবু বলেন : মিছে কথা আমি বলি না, চয়ন সত্যিই সেরে উঠবে। আমি তাকে সারিয়ে তুলব।

লোকটা অবজ্ঞার হাসি হেসেছিল।

ওর সে হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল ডাক্তারবাবুর। গুণিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন উনি। যেমন করে হক চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে—এই হল ওঁর পণ। চয়নকে নিজ হেপাজতে রাখলেন। কথা হল, রোজ বিকালে ওদের গ্রাম থেকে কেউ না কেউ এসে চয়নকে দেখে যাবে।

গুনিয়া যাবার সময় উপদেশ দেবার ছলে বললে : এ কিন্তু তুই ভাল করলি না। শুধু শুধু তুই বিপদ ডেকে আনছিস।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন : সে আমি বুঝব। আর শোন, তুমি আর আসবে না এখানে।

লোকটা রুখে উঠে বলে : কেন? আসব না কেন?

: না। তুমি এলে আমার চিকিৎসার ফল হবে না। তুমি তো তোমার মন্ত্রতন্ত্র সবই খাটিয়েছ,—তখন তো আমি বাধা দিতে যাই নি। এবার আমার চিকিৎসা যখন চলবে তখন তুমিও আসবে না বাধা দিতে।

: বাধা দিতে যাব কেন? কর না তুই কি করতে চাস।—বললে লোকটা।

: না! তুমি আসবে না। আমি বারণ করছি!

হঠাৎ ক্ষেপে গেল মানুষটা। ধ্বক করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। চিৎকার করে উঠল : তোরও ঐ অবস্থা হবে!

কোন্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার উপর, মুখে হাত চাপা দেয় : সর্বনাশ করিস না গুনিয়া! ডাক্তারসাহেবের উপর ধুরবান ছুঁড়িস না!

হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় কোন্ডাকে সরিয়ে দিল লোকটা। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাতের আঙ্গুলগুলো মটকালো, বললে : মোটিয়ারী হয়ে যাবি! আসকালোনে পড়ে থাকবি মাসের পর মাস! ভেড়ী হয়ে যাবি তুই।

ডাক্তারবাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন লোক-গুলোকে।

নারানপুরে ডাক্তারবাবুর মোবাইল ডিসপেন্সারীর ব্যবস্থা। এখানে হাসপাতাল নেই। তবু ও'র আউট-ডোরে খান দুই খাটিয়া পেতে নিজ দায়িত্বে দুই এমার্জেন্সি বেডের ব্যবস্থা রেখেছেন উনি। সে দুটি নাকি ভর্তি ছিল। চয়নকে নিয়ে এসে তুললেন নিজের তাঁবুতে। কিন্তু চয়ন কিছুতেই রাজি হল না। জঙ্গল কেটে এনে পরদিনই একটা ছোট ছাপরা মতো বানিয়ে ফেলল মহুয়া গাছ তলায়। কাঠের একটা আলপানাজি (মাচাঙ) বানিয়ে নিল। ভাব জমিয়ে ফেলল ডাক্তারসাহেবের আল-সেশিয়ানটার সঙ্গে। পাগলামির বিশেষ কোন লক্ষণ প্রথমটা নজরে পড়েনি, শুধু তাঁর একটা অনীহা জগতের সব কিছুর উপর। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কারও সঙ্গে কোন বন্ধন স্বীকার করে না। আপন-মনে বসে থাকে তার পাতায়-ছাওয়া ঘরে, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল। ডাক্তারবাবু নিজে যা খেতেন তাই খেতে দেওয়া হত ওকে। লোকজনের সামনে সে কিছু খেত না। ডাক্তারবাবুর মেডিক্যাল-ভ্যানের ক্লিনার ছোকরাও মুরিয়া—সেই খাবারটা দিয়ে আসত ওর ছাপরায়। তার সঙ্গেও কোনদিন কথা বলেনি চয়ন; তবে খাবারটা খেত। বোঝা যায়, খুব তৃপ্তি পায় না খেয়ে। খায় যতটা, ছড়ায় তার চেয়ে বেশী। পাগলের খাওয়ার ধরন আর কি। প্রতিদিনই ওদের গ্রাম থেকে কেউ না কেউ আসত ওর সঙ্গে দেখা করতে। ওর বাপ কোন্ডা, গাঁয়ের গাইতা গান্দরু, বন্ধু কোতোয়ার, ওর কাকা—চয়নের মাও আসত মাঝে মাঝে ছোট একটি ভাইকে কোলে নিয়ে। চয়ন খুশী হয় না তাদের দেখে। ওরা এলেই সে উঠে গিয়ে বসত তার ছাপরার ভিতর। কাবোঙ্গা গাঁয়ের চেলিক-মোটিয়ারীর দলও মাঝে মাঝে আসত তাদের প্রাক্তন শিরদারের সংবাদ নিতে। চয়ন তখন একেবারে শম্বুক-বৃত্তি অবলম্বন করত;—চুপচাপ বসে থাকত ঘরের ভিতর, দু-হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বক্তব্যের চেয়ে বক্তাই আমার কাছে বড় হয়ে

উঠছিল। গভীর রাত। বাইরে একটানা ছিপ্‌ছিপ্ বৃষ্টির শব্দ। লণ্ঠনের ভূতুরে ছায়া তাঁবুর চন্দ্রাতপে। ডাক্তারবাবু খাটিয়ার উপর বসে গল্প বলছেন। বুকের তলায় বালিশ গোজা। গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। মামুলী একটা রোগীর চিকিৎসার গল্প। অখ্যাত এক অরণ্য-পল্লীর অজ্ঞাত এক যুবকের মস্তিষ্ক বিকৃতির কাহিনী। কিন্তু বক্তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার গহন অরণ্যে স্বর্ণখনির সন্ধানে ফেরার গল্প বলছেন উনি।

বললুম : আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সে সময় আপনার কি ধারণা হয়েছিল? হঠাৎ কেন পাগল হয়ে গেল ছেলেটা?

: ওর ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল সে যেন কোন অপরাধ-বোধে ভারাক্রান্ত। গিল্ট-কন্সাসের মতো সে তার মুখখানা লুকাতে চায় শুধু। তাই সে পাগলামির চাদর মুড়ি দিয়ে দুনিয়ার একান্তে আত্মগোপন করতে চায়। দুনিয়াকে সে উপেক্ষা করতে চায়, অস্বীকার করতে চায়, পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে সে উন্মুখ—নির্বাক উদাসীনতায়। তাই সকলকে বারণ করে দিলাম। কারও আসার দরকার নেই। ওর পরিচিত কেউ যেন ওর কাছে না যায়। থাকুক ও আপন মনে। দেখি তার ফলাফলটা। ক্রমশ কাজের চাপে ওর কথা ভুলেই গেলাম আমি। চয়ন সুখেই আছে, অন্তত স্বচ্ছন্দে আছে। যে কোন কারণেই হক, নির্জনতাটাকেই ওর পছন্দ। দিনসাতেক পরে আবার একদিন চেষ্টা করলাম ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু না, চয়ন আর কোন সাড়াশব্দ দিল না। স্থির করলাম ওকে কোনভাবে বিরক্ত করব না। ও যা চায় তা অনুমান করে সরবরাহ করতে হবে। রোগীর মনটা প্রফুল্ল রাখার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। চয়ন যে কোন কারণেই হক সবচেয়ে বেশী করে চাইছে নির্জনতাকে—তাই ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম। ওকে যে নজরে নজরে রেখেছি তাও যেন ও বুঝতে না পারে।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু আমাকে বলেন : একটা মজার কথা শুনবেন? চয়ন শর্মিলাকে একেবারেই সইতে পারে না। শর্মিলাকে দেখলেই সে ক্ষেপে যায়। তার পাগলামির মাত্রাটা বেড়ে যায়! কারণটা আন্দাজ করতে পারেন?

আমি বললুম : পারি। শর্মিলা দেবী মেয়েমানুষ বলে। মেয়েমানুষ জাতটার উপরেই ও ক্ষেপে গিয়েছিল।

: শুধু তাই নয়। আরও একটা কারণ ছিল—

: জানি! শর্মিলাদেবীর গায়ের রঙ কালো নয় বলে!

ডাক্তারবাবু [illegible]

বলেন : আশ্চর্য! আপনি কেমন করে তা আন্দাজ করলেন?

আমি হেসে বলি : ডাক্তারসাহেব, আপনি যদিও বলেননি, তবু আমি আন্দাজ করেছি চয়ন আয়েতুর বাড়ি লামহাদা খাটতে গিয়েছিল ছোটবোনের জন্যে নয়—রঙিলা-বেলোসার পাণিপ্রার্থী হয়ে। মুরিয়ার ঘরে রঙিলা এক আশ্চর্য বিস্ময়। রঙিলাই ওকে পাগল করেছে। আর সেই রঙিলা সাধারণ মুরিয়া মেয়ের মতো কালো নয়, সে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রঙিলা—আগুনবরণ ফর্সা মেয়ে!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তার পিল্লাই বলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ আগুনবরণ;...কিন্তু, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানলেন?

ট্রাম্প কার্ডটাতো এখনও আমি এক্সপোস করিনি!

আমি হেসে বললুম : তাস খেলার ঐ তো মজা! লুকোবার চেষ্টা করলেও হার্টসের বিবিকে আমি আপনার হাতে ঠিকই প্লেস করেছি!

ডাক্তারবাবু বলেন : সারেন্ডার করলুম। বলুন এবার কেমন করে আন্দাজ করলেন সেটা?

: আন্দাজ নয়। রঙিলাকে আমি দেখেছি।

: দেখেছেন? কোথায়? কেমন করে?

বললুম : কারাংমেটার দল যেদিন কাবোঙ্গায় আসে সে রাত্রে আমিও ছিলাম কাবোঙ্গা ঘটুলে।

কোথাও কিছু নেই ডাক্তারসাহেব লাফ দিয়ে পড়েন আমার খাটিয়ার উপর। আমার হাত দুটি ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলেন : ছিলেন! ছিলেন! হাউ স্ট্রেঞ্জ! আপনি সে রাত্রে ছিলেন কাবোঙ্গায়! বলুন তাহলে কি দেখেছিলেন—সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করুন!

আমি তো হতভম্ব!

ডাক্তারসাহেব এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যে পাশের ঘরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শর্মিলা দেবীর। তিনিও দ্বারপ্রান্তে উঠে এসেছেন লণ্ঠন হাতে : কি হয়েছে?

ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু : কিছু হয়নি! ডোণ্ট বি সিলি! যাও শোও-গে যাও।

আমি মরমে মরে গেলাম এ কথায়! মিসেস পিল্লাইয়ের সঙ্গে মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে পরিচয় হয়েছে। ডাক্তার পিল্লাইয়ের মতো শিক্ষিত সজ্জন যে আমার মতো অর্ধপরিচিতের সামনে মধ্যরাত্রিতে এভাবে স্ত্রীকে ধমক দিতে পারেন তা ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর। অপ্রস্তুতের একশেষ। মিসেস পিল্লাই নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে। পিল্লাইসাহেব আবার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন : কই কি দেখেছিলেন বলুন?

ভাবলাম,—পাগল কে? চয়ন, আমি না ডাক্তার পিল্লাই?

গল্প শোনা মাথায় উঠল। গল্প বলে চলি এরপর। কাবোঙ্গা পৌঁছানো থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত। জীপের হেড লাইটে দেখা সাধুগাছতলায় চয়নের নিঃসঙ্গ মূর্তি পর্যন্ত। নারানপুরের ঘটনাটা আর বললাম না। সেটা চয়নের কাহিনীতে অপ্রাসঙ্গিক। সেটা বেলোসার উপাখ্যান। তাই বলিনি।

আজ বুঝতে পারি বেলোসার কাহিনীটা অনুল্লেখ করার পিছনে আমার নিজের একটা অপরাধবোধ ছিল। গুপ্তেজীর কাছে ধমক খেয়ে বুঝেছি সেদিন ওভাবে মোহনকে ছেড়ে দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল। সেই ভীরুতার লজ্জা গোপন

করতেই ও-কাহিনী উহ্য রেখেছিলাম ডাক্তার সাহেবের কাছে। সেদিন যদি রঙিলার উপাখ্যান ডাক্তারবাবুকে বলে ফেলতে পারতাম, আজ বুঝতে পারি, তাহলে এ গল্প হয়তো অন্য খাতে বইত।

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন ঃ ধরেছি ঠিকই। এনি পোর্ট ইন দ স্টর্ম। ঝড়ের মুখে জাহাজের অবস্থা। নির্দিষ্ট বন্দরে যদি পেঁাছাতে না পার, তাহলে যেখানে পার নোঙর গাড়।

যেন একটা মহা আবিষ্কার করেছেন। হা-হা করে হাসলেন খানিক। এ মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ধরতে পারিনি। বললুম ঃ তারপর?

ডাক্তারসাহেবের মেজাজ তখন খুশ। বলেন ঃ তারপর? তারপর 'কর্কুসনা পোহার!'

ঃ অস্যার্থ?

ঃ অস্যার্থ-কোঁকর কোঁ, ভেলায়ে বিহান। ঐ শুনুন মোরগ ডাকছে। রাত শেষ।

(ক্রমশ)

ভদ্রতার সংকট

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়—

লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনা করাটাই এতদিন রীতিসম্মত ব্যাপার ছিল। নিমন্ত্রিতরা জানেন, চিঠির এই অংশটুকু অতিরিক্ত হলেও অবান্তর নয়; কেননা, যেমন

'আহাহা—এসব কি করছেন—'

তাঁদের হাতে করে কিছু উপহার-সামগ্রী না নিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখায় না, তেমনি গৃহস্বামীরও আহা-হা-হা এসব কি করেছেন ইত্যাদি বলে অতিশয় অপ্রস্তুত ভাব না দেখালে অশোভন দেখায়। কোনো পক্ষই যে ভদ্রতা প্রকাশে কম যান না এইটে বিশেষ করে জানানোই আসল কথা। ইনি যদি বলেন আপনি আগে চলুন, তবে উনি তৎক্ষণাৎ লজ্জায় অধোবদন হয়ে বলবেন, সে কি করে হয়—অধম আপনার অনুগমন করবে। অনুরোধ উপরোধ চলতে চলতে হয়তো ট্রেনই ছেড়ে দিল, দুজনের কারোই গন্তব্য-স্থলে যাওয়া ঘটে উঠল না। অসুবিধা কিংবা ক্ষতির চিন্তাটা নেহাত তুচ্ছ—তার চেয়ে মহৎ প্রশ্ন হল, ভদ্রতায় কেউ যেন শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার না করেন, তার জন্য প্রাণ যায় যাক।

সেরকম প্রাণঘাতী সৌজন্যকে অবশ্য আজ-কাল মধ্যযুগীয় বলে উপহাস করা হয়ে থাকে। যুগের ধর্ম সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন মনে হয়, স্যর ফিলিপ সিডনি হয়তো জলের পাত্র নিয়ে আহত সৈনিকের সঙ্গে ভদ্রতা করার চেষ্টা না করলে পৃথিবীতে আরো কিছু অবদান রেখে যেতে পারতেন। তিনি অনায়াসে বলতে পারতেন, না হে, অন্তিমকালে এক ফোঁটা জলের জন্যে শেষে প্রাণটি হারাব নাকি? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। আধুনিক গৃহস্থ যেমন মনে মনে এবং অনেক সময়ে প্রকাশ্যে বলে থাকেন, মাসের শেষে লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এ কি ফ্যাসাদে ফেলা, মশায়! ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর হয়ে উঠছে যে!

এই সমস্যাটা সম্পর্কে সকলেই অল্পবিস্তর অবহিত আছেন। ভদ্রতাকে যাঁরা বাহুল্য মনে করেন, ভদ্রতা বাদ দিয়ে অপরের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য জীবনযাপন অনায়াসে সম্ভব মনে করেন, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। রবিনসন ক্রুসো হয়ে যদি কেউ থাকতে চান তবে তিনি সৃষ্টির আদিম যুগে ফিরে যেতে চাইছেন—যখন মানুষ রেষারেষি করে রসদ যোগাড় করত, অপরের প্রতি সদা সতর্ক সন্দিগ্ধ মনোভাব পোষণ করাটাই ছিল যখনকার দস্তুর। অন্যরা, যাঁরা মানুষকে সামাজিক জীব-বলে স্বীকার করেন, অবশ্যই জানেন, ভদ্রতার চিন্তাটাই কৃত্রিম, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয় এবং এর আগাগোড়াই আতিশয্যে পরিপূর্ণ। আমরা চেষ্টা করে ভদ্রতার অবলম্বন করে থাকি এবং কেউ যদি দক্ষতার সঙ্গে এই ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকতে পারেন তাঁকে সম্মান করে বলি ভদ্রলোক। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এই ছদ্মবেশ ক্রমে স্বভাবে পরিণত হয়। মুখোশের থেকে মুখকে তখন আলাদা করে চেনা যায় না। ভদ্রতার সবটাই আসলে ভঙ্গী এবং চোখ-ভোলানো ব্যাপার। কৃত্রিম বলেই অবশ্য এটা মিথ্যা নয়। আমাদের সত্যকারের যা স্বরূপ ভদ্রসমাজে তার থেকে অনেক ভালো দেখায়। এই আরো ভালো দেখবার চেষ্টাটাই একটা মহৎ প্রয়াস। ভদ্রতার আসল উদ্দেশ্য একটা সদাশয় মনো-

সদা-সতর্ক সন্দিগ্ধ মনোভাব

বৃত্তি তৈরি করতে সাহায্য করা, অবশ্য যাঁর সহজাত ভদ্রতাবোধ আছে তাঁকে নতুন করে কিছু শেখানো নিষ্প্রয়োজন।

ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন ষোড়শ

শতাব্দীতে দিল্লির এক আমীর। মোগল ইতিহাসের বিবরণে এ'র উল্লেখ নেই বলে অনেকে হয়তো এ'র নাম না-ও শুনে থাকতে পারেন। এই ব্যক্তি আকবরের সভায় নিত্য উপস্থিত হতেন। আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে একাসনে বসলেও ইনি ছিলেন অতিশয় দরিদ্র আমীর, প্রত্যহ খাবার জুটত কিনা সন্দেহ। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে তাঁর দৈন্যদশা যাতে প্রকাশ হয়ে না পড়ে সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁর একমাত্র ভৃত্য একদিন দ্বিপ্রহরে বাদশাহের সভায় ব্যস্ত-

জানে দো—জানে দো
কিত্‌না মহল আতা—কিত্‌না মহল জাতা

সমস্ত হয়ে উপস্থিত। কি সমাচার? ভৃত্য নিবেদন করলেন—

ঃ হুজুর, কুঁচমহল তো লুঠ গয়া!

(গভীর অর্থ হল, আজকের জন্য যে কুঁচমাছটুকু রান্না হয়েছিল সেটি খোয়া গেছে।)

প্রভু ঃ কিসনে লুটা?

ভৃত্য ঃ বিল্লড় খাঁ নে লুটা।

(বেড়াল খেয়ে গেছে।)

প্রভু ঃ শিকন্দর সিং ক'হা থে?

(কেন, শিকেয় তুলে রাখতে পারোনি?)

ভৃত্য ঃ শিকন্দর সিং তো থে, লেকিন উথৎ খাঁ নে বিগড় দিয়া।

(শিকেয় কি আর রাখিনি! কিন্তু তাকে উঠেই তো বেড়ালটা সর্বনাশ করলে।)

প্রভু ঃ জানে দো, জানে দো, কিতনা মহল আতা, কিতনা মহল জাতা। অব মসুর খাঁ কো বুলাকর ইনতাজাম করো।

(যাক গে, যা হবার হয়েছে—এখন দুটি মসুর ডাল চড়াও গিয়ে।)

বাদশাহ থেকে আরম্ভ করে সভাস্থ সকলে নির্বাক বিস্ময়ে প্রভু-ভৃত্যের এই কথোপকথন শুনছিলেন। কি এই মহানহৃদয় আমীর, যাঁর একটি মহল বেহাত হয়ে গেলেও নির্বিকার চিত্তে বলেন, যাক গে, যেতে, দাও! যাঁর শিকন্দর সিং, মসুর খাঁ প্রমুখ দুর্ধর্ষ সেনাপতিরা বিল্লড় খাঁ নামক পরাক্রমশালী শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে সর্বদা প্রস্তুত! কে এই রহস্যময় বিল্লড় খাঁ? তাঁর সৈন্যসংখ্যাই বা কত?

বাদশাহ বিচক্ষণ ব্যক্তি, সবই বুঝলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই দিলদরিয়া আমীরকে কিছু মহল, জায়গা-জমি উপঢৌকন দেবার আদেশ করলেন এবং আশা প্রকাশ করলেন, হয়তো ভবিষ্যতে বিল্লড় খাঁর আক্রমণে তাঁর ভৃত্যকে আর বিপর্যস্ত হতে হবে না।

দুঃখের বিষয়, এইজাতীয় শিষ্টাচারের সমঝদারেরা পৃথিবী থেকে বহুদিন বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, এক ভিন্ন সভ্যতার দূত। একালে যখন আমরা সরবে আশীর্বাদের বদলে লৌকিকতা করতে নিজেদের অসামর্থ্যের কথা লোকসমক্ষে আলোচনা করছি, তাঁদের লোকান্তরিত আত্মারা হয়তা সেই শুনে লজ্জায় ক্ষোভে আবার ধরণীগর্ভে প্রবেশ করতে চাইছেন। উপযুক্ত গল্পটি চক্ষুলজ্জার উদাহরণ বলেও মনে করা যেতে পারে, তবে চক্ষুলজ্জা ভদ্রতারই অপভ্রংশ এবং সময় বিশেষে ভদ্রতার খাতিরে ঐটুকু বাহুল্যেরও প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে প্রচলিত আরশোলা ঘটিত কাহিনীকে ভদ্রতার একটি বিরল শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা এক ধরনের পরোপকার।

পরোপকার ও মহানুভবতা ভদ্রলোকের কাছাকাছি বিচরণ করে। প্রকৃত ভদ্রলোক নানা গুণের অধিকারী। তবে তাঁর সম্পূর্ণ সংজ্ঞা কি, এক কথায় বলা কঠিন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা ভদ্রলোকের একটি লক্ষণ। অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্রলোক হলেন তিনি, যিনি সেকালে মহিলাদের সামনে দেখলে অদৃশ্য জ্ঞান করতেন এবং একালে তাদের গাড়ির দরজা খুলে দিতে তৎপর; যিনি যথাস্থানে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের কায়দাগুলি মোটামুটি আয়ত্তে এনেছেন, নিজের প্রকৃত মতামত গোপন রেখে, আত্মীয়স্বজন বা আধিব্যাধির অত্যধিক উল্লেখ না করে, অতিথির আপত্তিজনক প্রসঙ্গ সাবধানে এড়িয়ে, অপরকে অযথা খোশামোদ না করে তার সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রাখবার কৌশলগুলি সম্বন্ধে অবহিত। ভদ্রতা প্রকাশের আনুষ্ঠানিক চিহ্নগুলি, যাকে বলা হয় আদর-আপ্যায়ন, যথা অতিথিকে অসময়ে কচুরি-সিঙাড়া খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা ইত্যাদি, কখন ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তার বিচার অবশ্য প্রত্যেকে নিজ নিজ মানদণ্ডে করবেন। অতিথি যদি হন যথার্থ চা-রসিক, অর্থাৎ মনের মত ধূমায়িত পেয়ালাটির উপর যাঁর সুখ-শান্তি নির্ভরশীল, তাঁকে যদি ভদ্রতা করে এক কাপ জলবৎ চা গলাধঃকরণ করতে হয়, তবে আর যাই হোক, তিনি যে খুব প্রসন্ন হবেন না,

বচনে ভদ্র—হৃদয়ে নয়

এ অতি স্বাভাবিক। তবে তাঁর আনন্দবিধান হবে কি উপায়ে? অতএব ভদ্রলোকের গুণাবলীর মধ্যে আরো একটি যোগ হল। তিনি হাত দেখতে না জেনেও বুঝে নিতে পারেন, কখন কার, কিসে বিরক্তি।

ভদ্রলোক শব্দ নানার্থক। বৈশম্পায়ন বলেছিলেন, যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন তাঁহারাই বাবু। বাবু শব্দের এই সংজ্ঞা আপত্তিজনক হলেও তথাকথিত ভদ্রলোকদের প্রতি কিয়দংশে প্রযোজ্য। আবার সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁরা শারীরিক পরিশ্রমে অক্ষম, ইংরাজী পড়িতে সক্ষম, তাঁরাই আজকাল ভদ্রলোক বলে খ্যাত। আপাতদৃষ্টিতে যাঁরা ভদ্রলোক বলে প্রতীয়মান হন তাঁরা কায়মনোবাক্যে ভদ্রতার সাধনা করেন কিনা অথবা যিনি হৃদয়ে ভদ্র বচনে নয় এবং যিনি বচনে ভদ্র হৃদয়ে নয়, এঁদের মধ্যে কারা ভদ্রলোক পদবাচ্য এসব জটিল প্রশ্নের সম্ভবত কোনো সদুত্তর নেই।

মস্কোর চিঠি

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আজ এ-দেশী ও বিদেশী বহু গাড়ির ভিড়। বিরাট সভা-ঘরে তিলধারণ-স্থান নেই। এক পশ্চিমী সাংবাদিক মহারুষ্ট। সামনে নানা দূতাবাসের লোকেদের জায়গা, তাঁর সেখানে আসন হয়নি। যে মহিলা বসার ব্যবস্থা করছিলেন তাঁকে সাংবাদিকটি ইংরিজীতে রেগে বললেন, "দুনিয়ার আর কোথাও প্রেস কনফারেন্সে ডিপ্লোমেটিক কোরের লোকেদের ডাকা হয় না।" মহিলা ভদ্রভাবে বললেন, "ও'রাও যে আজকের সভায় আসতে উৎসুক। দুনিয়ার ইতিহাসে আর কখনো তো এমন প্রেস কনফারেন্স হয়নি।" পশ্চিমী সাংবাদিকটি নিরুত্তর হয়ে আরো রুষ্ট হলেন।

আজ আন্দ্রিয়ান নিকলায়েভ আর পাভেল পপোভিচের প্রেস কনফারেন্স। সভামঞ্চে একসঙ্গে ঢুকলেন চার মহাকাশ-চারী। কেউই লম্বাচওড়া নন। মাঝারি আকার। প্রত্যেকের চেহারায় স্বাতন্ত্র্য অনেক কিন্তু তবু মিলও কম নয়। হয়ত সেটা দীর্ঘকাল একসঙ্গে একই কাজে ব্যস্ত থাকার ফল। কাগজে দেখেছি মহাকাশচারী-দের ট্রেনিং কেন্দ্রের একটি সুগঠিত বড় বাড়ির এক একটি ফ্ল্যাটে থাকেন এই মহাকাশচারীরা। ফ্ল্যাটগুলোর কোনটার নাম "মঙ্গলগ্রহ", কোনটার "চন্দ্র", কোনটার বা "বৃহস্পতি"। প্রতিদিন তাঁদের বাড়িতে এইরকম সব সংবাদ ঘোষিত হয়—"বৃহস্পতি, কাল সকাল সাতটায় অমুক ঘরে তালিম", "মঙ্গল, আপনি অমুকের সঙ্গে এখনই দেখা করুন।" অন্য রকমের ঘোষণাও থাকে, "শুক্র-গিন্নীর আজ জন্মদিবস, অন্য গ্রহনক্ষত্রদের আজ তাই শুক্রগ্রহে নেমন্তন্ন।"

প্রেস কনফারেন্সে পপোভিচকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, "অনেক মার্কিন পত্রিকা বলছে, সোভিয়েত মহাকাশচারীদের যাত্রার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তাঁরা নিজেরা যে কমিউনিস্ট—এর কোনই সম্পর্ক নেই। আপনি কি মনে করেন এই যাত্রার পেছনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন ফল নেই?"

পাভেল পপোভিচ বলেন, "অক্টোবর বিপ্লবের আগেও এ দেশে অনেক প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ছিলেন : ৎসিওলকভস্কি, কিবাল্চিচ প্রভৃতি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে কাজে রূপ দিতে পারেন নি। একমাত্র অক্টোবর বিপ্লবই আমাদের জনগণের প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব করেছে। আমি আজ মহাকাশচারী-বৈমানিক। আমার বাবা কিন্তু একজন সাধারণ মজুর, স্টোকার। তাই বলছি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব এ ক্ষেত্রে খুবই বেশী। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হল যাত্রাক্ষেত্র, যেখান থেকে আমাদের অত্যাশ্চর্য মহাজাগতিক জাহাজগুলি আমরা মহাকাশে পাঠিয়েছি।"

পপোভিচের কথার সঙ্গে সবাই একমত হবেন কিনা জানি না, তবে এটা ঠিক যে, যে চারজন মহাকাশচারী সামনে বসে আছেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। তিতভ বাদে অন্যেরা গরীব মজুর বা চাষীর ছেলে। বিশেষ বিস্ময়কর হল আন্দ্রিয়ান নিকলায়েভের কৃতিত্ব। বিপ্লব-পূর্বের অনুন্নত দীন-দরিদ্র চুভাশ জাতির সন্তানের পক্ষে মহাজাগতিক জাহাজের বৈমানিকের আসন গ্রহণ মহাজাগতিক যাত্রার মতোই আশ্চর্য ঘটনা। মহাজাগতিক জাহাজের বৈমানিকদের এক সাংবাদিক "বিশ্বকোষ" বলছেন। কারণ, শুধু শারীরিক সাফল্যই নয়, পাণ্ডিত্যেরও প্রয়োজন হয় এই কাজে। বলবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, দুরূহ গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীর ও জীববিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান থাকা চাই। নিকলায়েভ এক দরিদ্র চাষী পরিবারে জন্মান ১৯২৯ সালে। পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে মাঠে বাপ-মাকে সাহায্য করতে হয়; কারণ যুদ্ধের সময় ক্ষেতে কাজ করার লোকের অভাব। এমন সময় বাবাও মারা গেলেন। নিক-লায়েভের পড়া অবশ্য বন্ধ হল না। এক হেমন্তে এক বস্তা আলু কাঁধে তুলে নিয়ে কাদা পথ মাড়িয়ে ছোট্ট নিকলায়েভ রওনা হলেন আঞ্চলিক সদরে। পড়াশুনো অনেকটা শেষ করে নিকলায়েভ ভেবেছিলেন, ডাক্তারি পড়বেন। এমন সময়ে এল তাঁর দাদার চিঠি। "আমাদের দলে এস। টিম্বারিং ইন্ডাস্ট্রিতে দুজনেই যোগ দেব।" তাঁর সঙ্গে গেলেন

[illegible] সোভিয়েট মহাকাশচারী নিকোলায়েভ (বামে) এবং পপোভিচকে [illegible]

গ্রহ উপগ্রহের দল : "দেখ্ দেখ্, পৃথিবীটাও তার চারদিকে কেমন শনিগ্রহের মতো বলয় সৃষ্টি করেছে!"। "আরে দূর ওটা বলয় নয়। ওটা সোভিয়েট মহাকাশচারীদের গতি পথ!"

টিম্বারিং আর ফরেস্ট্রির কাজে।

সেনাবাহিনীর আবশ্যিক তালিমের সময়ে নিকলায়েভ ঢোকেন বিমানবাহিনীতে। তাতেই শেষ পর্যন্ত টি‍ঁকে যান। অবশেষে একদিন তাঁর ডাক পড়ল কম্যান্ডিং অফিসারের ঘরে। কম্যান্ডিং অফিসার তাঁকে বললেন, "নতুন ধরনের জাহাজে উড়তে চান? যদি চান তা হলে মস্কোয় যেতে হবে, সেখানেই সব জানতে পারবেন।" সেদিনই নিকলায়েভ মস্কো রওনা হন।

দীর্ঘ কঠোর তালিমের পর এল যাত্রার সময়। যাত্রার আগের দিন সকাল বেলা। মহাকাশচারীরা তাঁদের ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এসেছেন। নিকলায়েভও আছেন তাঁদের দলে। এজেন্সিয়ায় এক সাংবাদিক কস্‌মোড্রোম থেকে তাঁর রিপোর্টে লিখছেন—নিকলায়েভের পরনে হাল্কা চেকশার্ট আর স্ল্যাক্‌স। একটু চিন্তিত কি? কড়া মেজাজ? না, তা নয়; হাসিঠাট্টায় নিকলায়েভ বেশ উৎসাহী। ঘন কালো ভুরু আর ছোট চেরা চোখ বলেই মনে হয় বুঝি ক্ষুব্ধ।

সাংবাদিক লিখছেন—রকেট ছাড়ার জায়গায় যাবার সময় হয়ে এল। কিলোমিটারগুলো পেরতে পেরতে দেখলাম দূরে দিগন্তে একটা আবছায়া স্তম্ভ। রকেট। গাড়ি থামল সেই ধূসর দৈত্যের দশ কিলোমিটার দূরে। রকেটটার গায়ে নানারকম সব গার্ডার। কোনটা মোটা ভারী, কোনটা যেন সরু নলের জালিকাজ। চীফ ডিজাইনার শান্তকণ্ঠে নানারকম নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। নিকলায়েভ আর তাঁর বদলী দুপুরের খাবার আগে ঢুকলেন যাত্রাপূর্বের শেষ ২৪ ঘণ্টার ঘরে। এটা মহাকাশচারীদের যাত্রার একটা ঐতিহ্য। সে ঘরের একটি বিছানার মাথায় ঝুলছে গাগারিনের ছবি। আর একটির মাথায় তিতভের। তাঁরাও তাঁদের যাত্রাপূর্বের শেষ ২৪টি ঘণ্টা কাটান এই ঘরে। নীল ওয়াল-পেপারে ঢাকা ঘরটা। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তাতে ফুল আর লের্মন্তভের কবিতার বই। একটা ছোট ডেস্কে দাবার সরঞ্জাম, কতগুলো টেপরেকর্ড।

পরদিন ভোরবেলা বসল স্টেট কমিশনের সভা। রকেটটার ঠিক কাছেই একটা বাড়িতে। নানা কাজের শাখার প্রধান এ'রা একে একে সংক্ষেপে বললেন—প্রস্তুত, প্রস্তুত, প্রস্তুত! সবাই 'প্রস্তুত' জানালে পর স্টেট কমিশনের প্রস্তুতিপত্রে সই দিলেন।

নিকলায়েভকে নিয়ে একটা বাস এগিয়ে গেল রকেটের সামনের চত্বরটায়। দরজা খুলে

লাফিয়ে নামলেন তিতভ। গাগারিনও উপস্থিত। কমলা রং স্পেস-স্যুট আর ধূসর স্পেস-হেলমেট পরে নিকলায়েভ থপথপ করে হে'টে পার হলেন চত্বরটা। স্টেট কমিশনের সভাপতি, চীফ ডিজাইনার আর অ্যাসট্রনটিক্‌সের তত্ত্ববিৎ চুমু খেলেন তাঁকে। তারপর শোনা গেল লিফ্‌ট থেকে, "দাস্‌ভিদানিয়া তাওয়ারিশি!" (আবার দেখা হবে কমরেডরা)।

প্রায় চার দিনের মহাকাশযাত্রায় "বাজ-পাখি" (রেডিও-সংযোগে নিকলায়েভের সংকেত-নাম) চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রতিদিন তাঁর জাহাজের ভেতর ঘণ্টাখানেক উড়ে বেড়িয়েছেন। চেয়ারে ফিরেছেন দেয়ালে আঙুলের একটু ঠেলা দিয়ে ভেসে ভেসে। তা ছাড়া যন্ত্রপাতি পরিচালনা, পৃথিবীর সঙ্গে কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো (মহাকাশে ঘুমটা নাকি অনেক ভাল হয়, দুজনেই বলেছেন প্রেস কনফারেন্সে), ব্যায়াম, চাঁদের ছবি তোলা মুভি ক্যামেরায়, ফুটবল ম্যাচের খবর নেওয়া—অনেক কিছুই করেছেন। মহাকাশে তাঁর সঙ্গী পপোভিচের সঙ্গে কী তারা দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রপাতি কেমন কাজ করছে—এসব নিয়ে আলোচনা, "সুপ্রভাত, শুভ-রাত্রি" জানানো, গলা মিলিয়ে গান গাওয়া তো আছেই। প্রেস কনফারেন্সে পপোভিচকে সে গান গাইতে বলতে তিনি বলেন, "উপযুক্ত সঙ্গৎ নেই এখানে। ওখানে তারারা সঙ্গৎ করেছিল।"

পাভেল পপোভিচ তাঁর যাত্রার সময় রকেটের কাছে আসেন গান গাইতে গাইতে। জন্ম তাঁর ১৯৩০ সালে। ইস্কুলের চারটে ক্লাস শেষ করতে না করতেই জার্মান ট্যাংক সার বে'ধে এগিয়ে এসে গোলা আর কালো ধোঁয়ায় মিলিয়ে দেয় চাষীদের সাদা-সাদা বাড়িগুলো। জার্মান অধিকৃত এলাকায় আটকা পড়ে পপোভিচ পরিবার। একবার পাভেলের চোখের সামনেই লাল তারা আঁকা বিমান ভেঙে পড়ে ইস্কুল বাড়িটায়। সবাই ছুটে গিয়ে মৃত সোভিয়েত বৈমানিকের দেহটা বের করার সঙ্গে সঙ্গে বিমানে ঘটে বিস্ফোরণ। তার আগুনের ঝলকে অন্ধ হয়ে যান পাভেলের বাবা। জার্মানদের চোখের আড়ালে সমাধিস্থ করা হয় সেই বৈমানিককে।

যুদ্ধের পর ষষ্ঠ শ্রেণী শেষ করে পাভেলকে কাজ নিতে হয় বাপেরই কাজের জায়গা সেই চিনির কলে, মাল ওজনের। রাত্রে মাল ওজন করেন, তারপর একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সকালে চলে যান ইস্কুলে। ইস্কুল শেষ করে ট্রেড ইস্কুল। তারপর মাগনিতাগস্কে টেকনিক্যাল স্কুল। সেখানে তিনি গানের দলেও যোগ দেন। ভর্তি হন এক বিমান ক্লাবে। '৫১ সালে বিমানবাহিনীর ইস্কুলে ঢোকেন। কয়েক মাস পরেই নভোসিবির্স্ক বিমান ক্লাবে ক্যাডেটদের এক জলসায় পপোভিচ একটি উক্রেনীয় গান করেন, "আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, কেন আমি বাজপাখি নই, কেন আমি উড়ি না?" পরে পপোভিচ বাজপাখি নয়, একেবারে স্বর্ণ-ঈগলই হয়েছিলেন, যুগ্ম মহাকাশ-যাত্রায় তাঁর সংকেতনাম ছিল "স্বর্ণ-ঈগল"। তখন কিন্তু তাঁর ঐ গানকে সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছিল স্থানীয় বিমান ক্লাবের সভ্যা একটি মেয়ে। নাম তার মারিয়া। সেই গানের সূত্রেই পাভেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়। যার পরিণতি ঘটে প্রথমে প্রেমে, শেষে বিবাহে। মারিয়াও দক্ষ বৈমানিক। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত বিমানদিবসের উৎসবে পপোভিচ অন্য মহাকাশচারীদের সঙ্গে বসে তাঁর স্ত্রীর বিমানচালনার খুবই তারিফ করেন।

হাত বাড়ালেই চাঁদ

মহাকাশচারীদের কর্মব্যস্ত দিনে সেণ্ট্রি-ফিউগাল যন্ত্র, ভাইব্রো-স্ট্যান্ড, 'রোটার' প্রভৃতির কষ্টকর তালিমের ফাঁকে ফাঁকেও পাভেল গান গাইতে ভোলেন না। গণিত বা পদার্থবিদ্যার দুরূহ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর সাহিত্যচর্চা। তাঁর প্রিয় লেখকদের তালিকায় আছেন তলস্তয়, বালজাক, শেক-স্পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, গ্যেটে, শিলার, সের্ভান্তেস। আরো আছেন মায়াকভস্কি, ও' হেনরি, শ, গলসওয়ার্দি, লর্কা, লুসুন, শলোখভ, গর্কি, আর তাঁর নিজের ভাষার শেভচেংকো, ইভান ফ্র্যাংকো প্রভৃতি। মহাকাশচারী - কমিউনিস্টদের পার্টি ব্যুরোর সেক্রেটারি পপোভিচ। তাঁর যাত্রার সময় সেক্রেটারির পদে তাঁর বদলী হন গাগারিন।

পপোভিচের ইস্কুলের এক শিক্ষিকা বলেছেন, "পাভেল ইস্কুলে ছিল পারার মতো সজীব চঞ্চল।" এখনো তাই। দীর্ঘকাল একা থাকার তালিমের সময় একলা ঘরে বন্দী পাভেল একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে বহু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়েছিলেন, আওড়েছিলেন ইয়েসিন আর মায়াকভস্কির কবিতা। ডাক্তাররা গুপ্ত পোর্টহোলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাঁর নাচ দেখেছিলেন। একলা থাকার দীর্ঘ পর্বশেষের মুখে যখন একগাল দাড়ি নিয়ে পাভেল ভাবছেন, বেরলে পর মেয়ে-বউ তাঁকে চিনতে পারবে কিনা। তখন শোনা যায় এক ঘোষণা, "আপনার পরীক্ষার নির্দিষ্ট পালা শেষ হয়েছে।...কিন্তু আরো কিছুকাল এই পরীক্ষা চালাতে চাই। রাজী আছেন?" পপোভিচ তা শুনে দাড়িতে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, রাজী!" পপোভিচ যাত্রার অনেক আগেই বলেছিলেন, "মহাকাশে আমি যাব মায়াকভস্কির আর জ্যাক লণ্ডনের মন নিয়ে।" বলেছিলেন, "পাখির গান, বাতাসের গর্জন, ব্যাঙের ডাক শুনতে আমার ভারী ভাল লাগে। স্মৃতিতে করে এইসব পার্থিব ধ্বনি আমি নিয়ে যাব মহাকাশে।" এমন জীবনরসিকের পক্ষে মহাকাশে তিন দিন কাটানো কঠিন নয়।

শুভময় ঘোষ

ট্রামে বাসে

কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 'স্বাধীনভাবে' কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া নাকি আশ্বাস দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন।—"স্বাধীন অবশ্য তাঁরা বরাবরই ছিলেন। তবু এই নবলব্ধ স্বাধীনতার স্মারক হিসাবে তাঁরা বছরে বছরে স্বাধীনতা দিবস পালন করুন এবং একদিন পুরো ছুটি উপভোগ করুন। একেই বলে লোক"—বলিয়া বিশুখুড়ো তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন।

এক সংবাদে শুনিলাম বৃহত্তর কলিকাতায় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে।—"কলের জল বেয়ে মাছ আসার পথটি যেন সুগম করা হয়। তাতে নাকের বদলে নরুন ত অন্তত মিলবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অতিরিক্ত লাভের লোভে মাছের বাজার চড়াইবার জন্য যারা কলকাঠি নাড়েন তাহাদের নাকি হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"হুঁশিয়ারির ঢাকের কাঠিটা অবশ্য এখন একরকম নিত্যিতিরিশ দিনই বাজছে" বলেন জনৈক সহযাত্রী!

মৎস্য উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন তার অর্ধেক টাকাও নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার খরচ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।—"মাছের পেছনে টাকা খরচ মানেই টাকা জলে ফেলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটি না করে বুদ্ধিমান রামধনের পরিচয় দিয়েছেন"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

কলিকাতা যাদুঘরের জন্য নাকি ৪২টি পদ মঞ্জুর করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও কোন লোক নিয়োগ করা হয় নাই। শ্যামলাল বলিল—"এক সাপের পাঁচ পা ছাড়া হয়ত অন্য কারু পদ বৃদ্ধিতে তাঁদের বিশ্বাস নেই!!"

জনৈক পত্র প্রেরকের প্রশ্ন—কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের দাবির ভিত্তি কি?—"বাড়ি একতলা হলেও ভিতটা হয়ত সাততলারই হবে, সপ্তম স্বর্গ তো"—বলেন বিশু খুড়ো।

ভারতে পাক হাই কমিশনার শ্রীহিলালী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।—"দরবারটা দেওয়ানী আম এ হয়নি, হয়েছে দেওয়ানী খাসে, সুতরাং সাধারণের পক্ষে বিস্তৃত খবর জানার সম্ভাবনা নেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দেওয়ানী আমে ভীড়ের বহর আর ফরিয়াদের রকমারিত্ব দেখিয়া অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"দেওয়ানী আমের আম পাকার আগেই বুঝি চড়কদা মেরে যায়!!"

কলিকাতার ভূগর্ভস্থ রেল জাপানী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমীক্ষার প্রস্তাব চলিতেছে।—"জাপানী প্রথায় চাষ-আবাদ হলে যাতায়াতটাও জাপানী প্রথায় হওয়াই ভালো। কিন্তু এমন দিন কি হবে মা তারা"—শ্যামলাল গান গাহিয়াই তার বক্তব্য শেষ করে।

দেশের স্বর্ণ সম্পদ কীভাবে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যায় কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সেই বিষয় চিন্তা করিতেছেন।—"তা করুন। আমরা ত এতদিন গিন্নী আর বেয়ানদের আব্দার মেটাতেই সোনা সোনা করে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হয়েছি"—বলেন বিশু খুড়ো।

প্রসঙ্গত এশিয়ান গেমসের কথা আসিয়া পড়িল। শুনিলাম জাপান নাকি এ পর্যন্ত একুশটি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"নিশ্চয়ই জাপান সরকার সোনা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন না, তাই হয়ত স্বর্ণপদক লাভে জাপানীদের এত উৎসাহ!!"

এক সংবাদে শুনিলাম, কালীঘাট মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কর্মীদের কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কর্মীরা সরকারী শ্রমদপ্তরকে মীমাংসার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রমদপ্তর নাকি মন্তব্য করেন যে ধর্ম-মন্দির শিল্প প্রতিষ্ঠান নহে অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাঁহাদের কোন করণীয় নেই।—"হয়ত কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তবু মনে না করে উপায় নেই যে মা কালীর সিঁদুর লেপা ডবল হিসেবের খাতা না হলেও যে শিল্প অচল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

আমাদের খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—সুষমখাদ্য, পুষ্টিকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত সুলভ খাদ্য কাহাকে বলে তাহার নাম, রন্ধনের প্রক্রিয়া প্রভৃতি প্রকাশে সরকারের কি কোন অসুবিধা আছে?—বিশু খুড়ো বলিলেন—আছে বই কি। ট্রেড সিক্রেট ত আর যেখানে সেখানে প্রকাশ করা যায় না!!"

মৎস্য দপ্তরের দুইজন অফিসারের একজনকে বিহার ও অন্যজনকে মধ্য প্রদেশে পাঠানো হইয়াছে মাছের খোঁজে।—"সঙ্গে ওঁরা অবশ্য জাল নিয়ে যাননি, গেছেন ফাইল নিয়ে। দেখা যাক ফাইল প্রথায় কোথায় কী মাছ ধরা পড়ে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের দেওয়ানী আমে জনৈক সিনেমা অভিনেতা নাকি অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।—"সংবাদটা মিসিং স্কোয়াড কর্তৃপক্ষ রেফারেন্স হিসেবে বাঁধিয়ে রাখতে পারেন" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কলিকাতা হইতে ষণ্ড বিতাড়নের প্রসঙ্গে শ্রীচাণক্য লিখিয়াছেন—যারা এ শহরের বাসিন্দা তারা কিন্তু ষাঁড়গুলো সব শহর ছাড়া হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।—"কিন্তু চাণক্য হয়ত জানেন না যে, যাঁরা ফাটকা বাজারে যাতায়াত করেন, তাঁদের পক্ষে ষণ্ডের পুচ্ছ স্পর্শ একটি অপরিহার্য নিত্যকর্ম পদ্ধতি"—বলেন বিশুখুড়ো।

এক ঋতু

দিব্যেন্দু পালিত

পাঁচটা কুড়ি, অথচ সুমিত্রা এলো না। সুনীল ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল।

'কি ব্যাপার, তুই?'

'তুই!'

'হ্যাঁ, অপেক্ষায়।'

পার্বতী হাসল।

'দেখছিলুম। বুঝলি, কেমন হ্যাবিটে দাঁড়িয়ে গেছে। সুন্দরী মেয়ে দেখলে আজকাল বুকে বেশ কষ্ট হয়।'

দাঁতে রঙ ধরেছে; বোধ হয় পান বেশী খায়।

'তারপর, তুই স্কুলে পড়াছিস না কেন? যৌবন গেল ব'লে...'

সুনীল ঘড়ি দেখল। ডবল ডেকারটা চ'লে যাচ্ছে; সুমিত্রা আসেনি।

'সিগারেট আছে তোর কাছে?'

সুনীল প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল। নিজে জ্বালালো আবার।

পার্বতীর হাত কাঁপছে। পর পর দুটো কাঠি নষ্ট ক'রে বোকার মতো হাসে।

'বোধ হয় ভুল বললাম। যৌবন যায় না, যাবে না। তবু স্মৃতি ব'লে একটা জিনিস আছে তো, এই আর কি।...যাক, তোকে দেখে ভালোই লাগছে।'

সুনীলের খারাপ লাগল। এ-সময় পার্বতীর সঙ্গে দেখা না হ'লেই ভালো হ'তো। কতোক্ষণ জ্বালাবে কে জানে! মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠছিল সুনীল।

পাঁচটায় সময় দিয়েছিল সুমিত্রা, এখন সাড়ে পাঁচটা হ'য়ে গেল। আধ ঘণ্টারও বেশী সময় সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একই ভাবে; অসহিষ্ণু ভাবটা কাটাবার

জন্য পর পর গোটা তিনেক সিগারেট পুড়িয়েছে। সুমিত্রা এলো না।

সামনের বইয়ের দোকানের যুবকটি কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে তাকে। অল্প হেসে পাশের লোকটিকে কি বলল যেন একবার। আর এইরকম সময়ে যা হ'য়ে থাকে, নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠল সুনীল।

'চুপচাপ যে! বোধহয় আমাকে সহ্য করতে পারছিস না। আচ্ছা, আজ চলি...'

'আর একদিন...'

'দেখা হবে।...' পার্বতী হাসল।

পাঁচটা প'য়ত্রিশ। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চ'লে যাবে কি না ভাবছে, হঠাৎ দেখল, ডবল ডেকারের ভিড় ঠেলে শাড়ির আঁচল গুছোতে গুছোতে দ্রুত এগিয়ে আসছে সুমিত্রা।

'কতোক্ষণ এসেছ?' রুমালে কপাল মুছে স্বাভাবিক হাসল সুমিত্রা।

অন্যান্য অনেক কিছুর মতো সুমিত্রার হাসির এই বিশেষ ধরনটিও নিজস্ব; রক্তের ভিতর কেমন একটা আকর্ষণ ঘন ক'রে তোলে। অন্য সময় হ'লে সুনীল উপভোগ করতো। এখন বলল, 'থাক।'

সুমিত্রা স্বাভাবিক। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুনীল বলল, 'কথায় কথায় তোমার ওই হাসি সহ্য হয় না। দেরি করেছ, সেজন্য তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'

'কি করব! দেরি হ'য়ে গেল।' সুমিত্রা বলল, 'ইচ্ছে ক'রে কি করেছি!'

'সেটা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। এত দেরি হবে জানলে সাত তাড়াতাড়ি আমি ছুটে আসতুম না। আমারও কাজ ছিল। ইনক্রিমেণ্টের সময়; জরুরী কাজ ফেলে চ'লে আসায় কাল আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

'না এলেই পারতে।' সুমিত্রা স্পষ্টই ক্ষুণ্ণ হ'লো। 'তোমায় কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে আসতে বলে নি। সামান্য দেরির জন্য অত অজুহাত দেখাও কেন! আমার জন্যে যদি তোমার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়, তাহ'লে তোমার এসে কাজ নেই আর। আর কোনো-দিন তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না।'

'অপেক্ষা করাটা কিছু নয়।' সুনীল বলল, 'কিন্তু দেরি তুমি প্রায়ই করো। এই তো সেদিন...'

কথার মাঝখানে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিত্রা।

'আশ্চর্য! তুমি কি এখন ফিরিস্তি বের করবে? চাকরি তুমিও করো, আমিও করি। সবটাই যে আমার ইচ্ছের ওপর, মর্জির ওপর নির্ভর করে না, সেটুকুও কি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে! দ্যাখো, আমার মন বিশেষ ভালো নেই...'

'থাক, হয়েছে।' সুনীল হাসতে বাধ্য হ'লো। 'যা হবার হয়েছে। রাস্তায় মাঝ-

খানে এখন আর একটা সীন ক্রিয়েট ক'রো না।'

নিরুত্তর থেকে সুমিত্রা হাঁটতে লাগল, পাশাপাশি। এতক্ষণ সন্ধ্যা ছিল না, ছায়া ছিল, অন্ধকার ক্রমশ ঘন হ'য়ে আসছিল। চতুর্দিকে আলো জ্বলে উঠেছে অনেক আগেই; আগুনের বলের মতো লাল সূর্যটা এইবার গড়ের পিছনে অস্ত গেলে, শীতের প্রবল হাওয়া ছুটে এলো চতুর্দিক থেকে।

মনে মনে অনুতপ্ত হ'লো সুনীল। ঠিক এইভাবে কথাগুলো বলা উচিত হয়নি। সেও কি চেয়েছিল? বোধের ভিতরে থেকেও কখনো কখনো এমন ভুল হ'য়ে যায়! বস্তুত সুমিত্রার কি দোষ! সদাগরি অফিসের মেজ কেরানী, আসলে নির্বিষ সাপ।

'কি নাম বলেছিলে যেন, চৌধুরী না?'

'হ্যাঁ।'

'হাত ধরতে চায়?'

'শুধু হাত কেন, সব সময়ে গদগদ ভাব। দেখলে গা জ্বলে যায়।'

তার উপর অফিস শেষের ভিড়ে একটি মেয়ের পক্ষে দ্রুত হওয়া সম্ভব নয়।

'কতোদূর যাবে? ওদিকে?'

'না, মন খারাপ করে।'

'তাহ'লে চল ওই রেস্টুরেণ্টে ঢুকি। আমারও খিদে পেয়েছে।'

না বললেও যেত। অফিসের রুটিন, ছুটির ভিড় আর অপেক্ষার মতো প্রতিদিনের এই পথ, আর কতো! তবু এই মুহূর্তে আর-কোনো কথা না-পেয়ে ওই কথাটিই বলল সুনীল। সুমিত্রা হাসছে দেখে স্বস্তি পেল।

রেস্তোরাঁটি ছোটো। ভিতরের ম্লান আলোয় কাউণ্টারের প্রৌঢ় লোকটি—'মালিক না ম্যানেজার?'—নড়েচড়ে বসে। 'দেখে মনে হয় না রাত্রে নোট ছাপায়?' তর্জনের ভঙ্গীতে ভুরু কোঁচকালো সুমিত্রা। টেবিল পরিষ্কার করতে করতে হাসল হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেলেটি। না দেখে, পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকল দুজনে।

'আধঘণ্টা বোকার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে কিছু খেয়ে নিলেই তো পারতে। নাকি সেটাও ইনক্রিমেণ্টের ভয়ে পার নি?'

'ইনক্রিমেণ্টের কথাটা তুমি ভোলনি দেখছি।' সহজ হবার চেষ্টা করল সুনীল। 'তাহ'লে সত্যি কথাটা বলি, এবার এক সঙ্গে দুটো ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছি। আজ অফিসে গিয়েই খবরটা পেয়েছি।'

একটু থেমে বলল, 'তুমি বোধ হয় আজ মাইনে পেয়েছ। মাইনে না-পেলে তো তোমার মেজাজ চড়ে না! এবার একটা ভালো সিগারেট খাওয়াও। আমি বয়টাকে ডাকি।'

পর্দা সরিয়ে বয়কে ডাকতে যাচ্ছিল সুনীল; বাধা দিল সুমিত্রা।

'অত হ্যাংলাপনার কি আছে! তোমাকে যেন কিছু দিই না কখনো!' ব'লে, ব্যাগ খুলে হলুদ রঙের নতুন সিগারেটের একটা

প্যাকেট বের ক'রে এগিয়ে দিল স্মিত্রা। 'তুমি না বললেও আমার মনে থাকে।'

'বাব্বা, না চাইতেই বৃষ্টি!' প্যাকেটটা দ্রুত খুলে ফেলে, সিগারেট জ্বালিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল সুনীল। বয় আসতে স্মিত্রা ওমলেটের অর্ডার দিল; সুনীল চা বলল।

কথাহীন, শব্দহীন, একঘেয়ে পথের শব্দ। সুনীল একটা দার্শনিকের ভাব আয়ত্ত করছিল। ভারি গলায় বলল, 'দেওয়ার কথা ব'লে তুমি নিজেকেই ছোটো করছ, সুমিত্রা। সামান্য বস্তু দিয়ে কি তার বিচার করা চলে! তার চেয়ে বড় জিনিস আমি পেয়েছি।'

'থাক, তোমায় আর বক্তৃতা দিতে হবে না, ও-কথা অনেকবার শুনেছি।' সুমিত্রা ঘড়ি দ্যাখে। 'আজকে আমাদের তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সাড়ে আটটার মধ্যে যে করে হোক মল্লিকাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। আজকাল বেশী রাত্তির হ'লে বাবা নানারকম সন্দেহ করে। কাল রাত্রে এই নিয়ে মা-বাবা বিশ্রী ঝগড়া করেছে।'

'হঠাৎ?'

'দোষটা কিন্তু আমার নয়।' সুমিত্রা বলল, 'অফিসে মায়া একটা ট্যুইশনের কাটিং দিয়েছিল। ছুটির পর গিয়েছিলুম সেই বাড়িতে। সেখানেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো। প্রথমে তো বাড়িই খুঁজে পাইনি। ফিরতে ফিরতে সাড়ে আটটা। বাবা চ'টে গেছল। আমাকে অবশ্য কিছু বলেনি, কিন্তু মার সঙ্গে এই নিয়ে চেঁচামেচি।'

ওমলেটের প্লেটটা সুমিত্রার দিকে এগিয়ে দিল সুনীল।

'ট্যুইশনটা পেয়েছ?'

'না। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী কিছু বলতে পারলেন না। শেষে বললেন কাল পরশু নাগাদ আর একবার দেখা করতে। বোধহয় হ'য়ে যাবে।'

'হ'লেই ভালো।' সুনীল বলল, 'কিন্তু অফিসের খাটুনির পর আবার একটা কিছু না করলেই কি চলত না! সামান্য ক'টা টাকার জন্যে অত পরিশ্রমের কি দরকার?'

'টাকাটা সামান্য নয়, মাসে পঞ্চাশ। এতক্ষণ যখন পারছি, তখন আরো দেড় দু' ঘণ্টায় তেমন কিছু ক্ষতি হবে না আমার। তা ছাড়া...'

চামচ দিয়ে লঙ্কার টুকরো আলাদা করতে করতে সুমিত্রা বলল, 'টাকাটা পেলে সত্যিই কাজে লাগবে। চিত্রার পরীক্ষা সামনে। মার অসুখের পর থেকে সংসারের সব কাজকর্মই ওকে করতে হয়। বিকেলে আবার একটা মেয়েকে পড়ায়। নিজে পড়বে কখন? কাজটা পেলে চিত্রা কিছুটা হাল্কা হলে।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো ব'লে চুপ ক'রে গেল সুমিত্রা। হঠাৎ খাদ্যের প্রতি মনোযোগ দিল। যেন দ্রুত শেষ না করলে আর কেউ তাতে ভাগ বসাবে।

সুনীলের খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপে অল্প ধোঁয়া উড়ছে। বোধহয় নতুন খদ্দের এসেছে, বাইরের ঈষৎ কলরব শুনে সুনীল অনুমান করে। ও লক্ষ্য করছিল সুমিত্রাকে। সুমিত্রার খাওয়ার এই ধরনটি তার হাস্যকর মনে হয়। এ-নিয়ে অনেকদিন ঠাট্টাও করেছে; আজ করুণা হ'লো। ইদানীং ও ভালোবাসার কথা বলে না, আলোচনা সীমাবদ্ধ হ'য়ে এসেছে চাকরি আর সংসারে। আগে আগে যখন বিয়ের কথা বলত, সে-সব কথায় সুমিত্রার চোখে মুখে দপ ক'রে যেন একটা শিস জ্বলে

উঠত। এখন সুমিত্রাকে অত্যন্ত নিস্তাপ বোধ হয়; সান্নিধ্য, স্পর্শ ইত্যাদি প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ-সবে আর কোনো উৎসাহ পায় না সুমিত্রা। দেখতে-দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল, আজ মনে হয় সারা জীবন কেটে যাবে।

এখন সুমিত্রাকে হাসতে দেখে সুনীল ঘন হ'য়ে বসল। ওর এলানো, করুণ হাতটি মুঠোয় নিয়ে বলল, 'বাড়ির কথা তো সারাক্ষণই ভাবছ, সুমিত্রা। নিজের কথা ভাবো? নিজের জন্যে তুমি কি করেছ? বাবা, মা, সংসার। আমার মনে হয় তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছ। বিয়ের কথা ভাবো কখনো?'

বিয়ের কথায় সুমিত্রা চোখ নীচু করল। আগে আরক্ত হ'তো।

'ভাবলে কষ্ট হয়, তাই ভাবি না। তোমার অবস্থা ভালো হ'লেও না হয় কথা ছিল। তোমার ভারও নেহাত কম নয়। দ্যাখো, আমার কলেজের বন্ধুদের সকলেরই একে একে বিয়ে হ'য়ে গেল; মল্লিকার বাকি ছিল, আজ ওরও বিয়ে। সত্যি, মানুষ ভাগ্য নিয়ে আসে! বড়দি'র বিয়ে হ'লো, তখন খুব নেচেছিলুম। তখন জানতুম না, আমার কোনো আশাই নেই।'

হাতের মুঠোর ভিতর, সুনীল স্পষ্ট অনুভব করল, সুমিত্রা কাঁপছে। কি বলা যায়! ভাগ্য এবং পরিবেশ, এ দুটো কথাকে ও নিজেও ইদানীং বিশ্বাস করছে। তবু, সুমিত্রা...। সান্ত্বনার স্বরে ও বলল, 'আশ্চর্য! তুমি কি সত্যিই সত্যিই হতাশ হ'য়ে পড়েছ!'

'না, তা নয়।' সুমিত্রাকে স্বাভাবিক মনে হ'লো। 'হতাশ হ'লে আমি ম'রে যাবো। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। আমি তো নিজের জন্যে কিছুই করি না; কিন্তু যাদের জন্যে করি, তারা কই আমার অবস্থাটা বোঝে না! এতো করি, তবু কারো মন পাই না! মাঝে মাঝে ভাবি আমার কি দায়? ওরা মরুক, আমি বাঁচি। নিজে তো সুখী হই। পারি না। পারলে আমার কবেই বিয়ে হ'য়ে যেত। হ'তো না? তুমিই বলো?'

'সুমিত্রা, তোমার মন নেই!' শব্দ ক'রে হাসল সুনীল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুমিত্রা বলল, 'কাল রাত্রে একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে, জানো। চিত্রা আর আমি এক বিছানায় শুই; ও আবার আমাকে খুব ভালোবাসে। বাবা-মা'র অমন ঝগড়ার পর আমার খুব মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। চিত্রা বলল, ছোড়দি, দুঃখ করছিস কেন! আর তো ক'টা দিন, তারপর তুই ছুটি পাবি। মন্ত্র প'ড়ে বিয়ে না হোক, একটা ঘর একটা বর তো তোর আছেই; যে-কোনোদিন বেরিয়ে যেতে পারবি। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ। এখনো একটা প্রেমিক জুটল না। এদিকে বাবা ক্রমশ স্বার্থপর হ'য়ে উঠছে। বাপি, বিজু ওরা এখনো ছোটো। তুই চ'লে যাবি, তারপর আমার শুরু হবে। কতোদিন চলবে কে জানে। ভাবলে জ্বর আসে।'

'তুমি কি বললে?'

'কি আর বলব!' ম্লান হাসল সুমিত্রা। 'বললুম, তোকে অত ভাবতে হবে না। আমার বিয়ে হোক না হোক, তোর বিয়ে আগে দেবো। বিয়ের জন্যে তোর ঘুম হ'চ্ছে না যখন।'

'তোমার হয়? তুমিও কি ঘুমোতে পারো?'

সুমিত্রা বলল, 'আহা। আমার ঠিকই ঘুম হয়।'

বয় এসেছিল। চকিতে হাতটা টেনে নিল সুমিত্রা।

'আমার কেন মনে হয়, তুমি ভালো মা হ'তে পারবে।'

সুমিত্রা কথা বলল না।

বিল চুকিয়ে আবার রাস্তায় নামল দু'জনে।

শীতের দিনগুলোয় সুমিত্রার খুব কষ্ট হয়। একটি মাত্র স্কার্ফে কিছুই হয় না; মজ্জার ভিতরের সব পদার্থ যেন জল হ'য়ে যায়। এতোক্ষণ সান্নিধ্য ও উত্তাপের মধ্যে ক্রমশ উষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল; বাইরের তীক্ষ্ণ বাতাসে আবার জর্জরিত হ'লো। শীতের জন্যই সম্ভবত এ-দিকটা জনবিরল। বড় রাস্তায় তবু কিছু লোকজন, ব্যস্ততা চোখে পড়ে।

ট্রাম স্টপে পৌঁছে সুমিত্রা বলল, 'তোমাকে সাবধান ক'রে দিই। বাড়ি যাচ্ছ, কিন্তু বাবার সামনে বেশী মুখ খুলো না। শেষে কি বলতে কি ব'লে ফেলবেন, বুড়ো মানুষ তো! তোমার যা অপমান বোধ, পরে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে।'

'বাবাকে তোমার খুব ভয় দেখছি!' সুনীল বলল, 'ভয় নেই, তিনি আমাকে খেয়ে ফেলবেন না। আমাকে নতুন দেখছেন না তো।'

একটা ট্রাম আসছিল। ভিড় দেখে সুমিত্রা বলল, 'থাক, পরেরটায় যাবো। এটায় পাশাপাশি বসা যাবে না।'

'এভাবে আর কতোদিন?'

সুমিত্রা উত্তর দিল না।

পরের ট্রামেও দু'জনের জায়গা হ'লো না। অধৈর্শী চোখে সুমিত্রা তাকাতে, সুনীল বলল, 'তুমি বসো। আমার অভ্যাস আছে।'

ট্রামে সারাক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকল সুমিত্রা। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে সুনীল ওর ঘাড়ের লাবণ্য দেখল। পঁচিশ বয়সেও সুমিত্রা যুবতী; মুখে ক্লান্তি জমলেও প্রায় সুন্দরী। প্রথম দিকে সুমিত্রা একটু সাজগোজ করত, অফিসের পরে মুখে হাল্কা পাউডার বুলিয়ে আসত। এখন আর প্রসাধনে মন নেই। দিনে দিনে কতো পরিবর্তনই তো হ'লো! একটু একটু ক'রে সহজ হয়েছে সুমিত্রা, একটু একটু ক'রে অন্তরঙ্গ হয়েছে দু'জনে। সুনীল হঠাৎ অনুভব করল, তার বয়স বাড়ছে।

'সুন্দরী মেয়ে দেখলে বুকে এত কষ্ট হয়!'

পার্বতীকে জিজ্ঞেস করা হ'লো না কেমন আছে, কোথায়! মনে পড়ল ঃ

'বৃষ্টিপাত, শব্দ হোক, ভালো-
বাসে না কোথায় কেউ জেনে,
হৃদয়ের গর্হিত উৎসার।
কে আমায় অন্তহীন জ্বালো—
ধ্বংসের ভিতর টেনে এনে!' লিখেছিল পার্বতী।

তখন গান ভালো লাগত, লাইব্রেরীর বাগানে সদ্যোজাত গোলাপ। এখন মাঠ দেখলে স্নায়ু সংকুচিত হয়।

নামবার সময় হয়েছে। পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা চেপে ধরল সুনীল।

ট্রাম লাইন থেকে সুমিত্রাদের বাড়ি বেশী দূরে নয়। গলি দিয়ে ঢুকে একটু এগোতে হয়। তিনতলা ফ্ল্যাটের নিচের তলা। সদরের দরজাটা ভেজানো ছিল; ঠেলতেই খুলে গেল। খবরের কাগজ পড়ছিলেন বিনোদবাবু, সুমিত্রার বাবা। ওদের দেখে সতর্ক হ'লেন।

অনেকটা এই রকমই আন্দাজ করেছিল সুনীল।

সুমিত্রা ভিতরে চ'লে গেলে বিনোদবাবু বললেন, 'এই যে, বসো। তুমি অনেকদিন পরে এলে।'

সুনীল তাঁর শরীরের খবর নিল। বিনোদবাবুর সামনে এলেই সে অস্বস্তি বোধ করে।

'সেই অফিসেই আছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কি রকম পাচ্ছ এখন? শ' চারেক?'

'ওই কাছাকাছি আর কি...'

'তোমাদের ওই দোষ। কিছু মনে করো না, 'কাছাকাছি' কথাটির অর্থ কি? লুকোতে চাইছ তো, মানে বলতে লজ্জা?'

'না, সে-রকম কিছু নয়...'

বিনোদবাবু হাসলেন। 'তোমাদের সেণ্টিমেণ্ট আমরাও বুঝি হে। কিন্তু ধরো, মাইনে বাড়ানোর জন্যে তুমি কি করো? বছরে ক'দিন ওভারটাইম করো? করো না তো! কিন্তু ধরো, তোমাদের বিয়ে করার ইচ্ছে আছে। কেরিয়ার তৈরী হোক না হোক, বিয়েটা তোমাদের কাছে একটা প্রব্লেম। আমাদের সময় ছিল অন্যরকম।'

দম নেবার জন্য চুপ করলেন বিনোদবাবু। সুনীল তাঁকে বুঝতে পারে। এ-ঘটনা নতুন নয়। ভবিষ্যৎ? কষ্ট হয় সুমিত্রার জন্যে। রাত্রে শুতে যাবার আগে ও কি ভাবে? সারা রাত? বিছানায়? এমন যদি হয় ঃ সুমিত্রা বিয়ে করল হঠাৎ; তারপর তারা আলাদা হ'য়ে গেল...

হবে না, হয় না। নিঃশ্বাস চাপল সুনীল। এখন সুমিত্রা ফিরলে বাঁচে। সেই সময় চা হাতে চিত্রাকে ঢুকতে দেখে হাঁফ ছাড়ল সুনীল।

চিত্রা বলল, 'বাবা, তুমি ভিতরে যাও। তোমার চা ভিতরেই দেওয়া হয়েছে।'

'কেন, এখানে দিলেই পারতিস?' বিনোদবাবু অনিচ্ছা জানালেন।

সুমিত্রার মতো চিত্রা অত শান্ত নয়; বেশ সপ্রতিভ। বলল, 'তুমি ভিতরেই যাও। মা ডাকছে।'

বিনোদবাবু চ'লে যাওয়ায় সুনীল খুশী হ'লো।

সদরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, বাবার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় ব'সে চিত্রা বলল, 'অমন ভয়ের ভাব করছেন কেন! চা-টা কি খুব তে'তো লাগছে?'

সুনীল হেসে বলল, 'না। তোমার দিদি করলে সে ভয় ছিল। বরং মিষ্টিটা যেন একটু বেশীই হয়েছে।'

'মিথ্যে বলবেন না।' নড়েচড়ে বসল চিত্রা। 'আপনাকে খুব চিনি। আজকাল তো এদিকে আসেনই না!'

'তা ঠিক'। সুনীল বলল, 'তবে তোমাকেও আজ আশা করিনি। আজ বুঝি তুমি পড়াতে যাওনি?'

যেন খুব অবাক হয়েছে, চিত্রা বলল, 'আমি পড়াতে যাই তা আপনি জানলেন কি ক'রে! ছোড়দি বলেছে নিশ্চয়। এমন খারাপ স্বভাব! ঘরের সব কথা বাইরে বলা চাই!'

এক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না সুনীল। তারপর বলল, 'চিত্রা, তুমি বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমাকে যে পর ভাবো, তা জানতুম না।'

চিত্রা অপ্রতিভ হ'লো। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, শেষে সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'কিছু মনে করবেন না; মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনাকে পর ভাবি না।'

সুনীল হাসল।

'তোমার খবর বল? কেমন আছ?'

'আমার কথা থাক, আপনার খবর বলুন। আচ্ছা সুনীলদা, ছোড়দি'কে আপনি তাড়াতাড়ি বিয়ে করছেন না কেন? বাবা নিজে থেকে কোনোদিন ছোড়দি'র বিয়ে দেবে না। ও কি সারা জীবন চাকরিই করবে?'

রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলছিল চিত্রা। হঠাৎ ঘরে ঢুকে সুমিত্রা বলল, 'কি হয়েছে! অত চেঁচামেচি করছিস কেন?'

চিত্রা হেসে বলল, 'ছোড়দি, এত সেজেছিস! যেন তোরই বিয়ে।'

'চুপ কর, ফাজিল মেয়ে।' বোনকে ধমক দিল বটে; কিন্তু নিজেকে লুকোতে পারল না সুমিত্রা। কিছুক্ষণ আগেকার সুমিত্রার সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেল না।

গর্ব হয়, পাশাপাশি রক্তের তাপ। দেখে মুগ্ধ হ'লো।

সুমিত্রা বলল, 'তুমি কি বসবে, না যাবে?'

উঠে দাঁড়িয়ে সুনীল বলল, 'চিত্রা, আজ চলি। আর একদিন আসবো।'

দরজার কাছে এসে চিত্রা বলল, 'আসবেন। কিন্তু দু'জনে যদি আর না আসতেন, তাহ'লে আরো খুশি হতাম।'

দরজাটা বন্ধ হয়েছে কি না দেখে সুমিত্রা পাশে এলো, গা ঘেঁষে। অনেকক্ষণ কথা বলল না। হাঁটছিল মন্থর গতিতে। শরীরটাকে এখন কেমন ভারি বোধ হ'চ্ছে, খুব লজ্জা পেলে যেমন হয়। সম্ভবত চিত্রার কথাগুলো মনে মনে ভাবছে ও। যতোক্ষণ পারে, ভাবুক। ভাগ্য! আবার মনে পড়ল সুনীলের।

বড় রাস্তায় পেঁাছে সুমিত্রা বলল, 'শোনো, এখনও তো হাতে কিছু সময় আছে। ভাবছিলাম, সেই ট্যুইশনটা একবার খোঁজ ক'রে গেলে হয় না?'

মুহূর্তের জন্য সুনীলের মাথার ভিতর আগুন জ্ব'লে উঠল। 'কতো ছোটো তুমি, সুমিত্রা', চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করছিল, 'অভাব, সংকীর্ণতা থেকে কখনো কি নিজেকে মুক্ত করতে পারো না!' পর মুহূর্তেই চোখের ভিতর যন্ত্রণা অনুভব করল সুনীল। ট্রামের সুমিত্রাকে মনে পড়ল।

'বেশ তো, চলো। ট্যাক্সি ডাকবো?'

'না, না, ট্যাক্সি কেন?'

'ভয়!'

'এতোদিন পরে? আমি খরচের কথা ভাবছিলাম।'

এরপর নিজেকে দরিদ্র মনে হয়।

আবার বাস। আবার পথ। যেতে-যেতে সুমিত্রা বলল, 'যাচ্ছি তো, কি হবে জানি না।'

সুনীল বলল, 'তুমি বড্ড পেশিমিস্ট। ভালো ভাবতে পারো না কখনো।'

সুমিত্রা হেসে বলল, 'কি করব! আজকাল সব ব্যাপারেই কেমন সন্দেহ হয়।'

বাড়িটা আগেই দেখে গিয়েছিল। কাছে এসে সুমিত্রা বলল, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি দেরি করব না।'

সুনীল সিগারেট ধরালো। সুমিত্রা গেল। ফিরে এলো মিনিট কয়েকের মধ্যে।

সুনীল একটা কিছু আশঙ্কা করছিল। কাছে আসতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হ'লো?'

'কিছু হয়নি। চলো।'

কথা বলার ধরনে সুনীল বুঝল, হয়নি। সুমিত্রার কব্জিটা শক্ত ক'রে চেপে ধরল ও। চোখ তুলে সুমিত্রা বলল, 'লোক নেওয়া হ'য়ে গেছে।'

'কেন তুমি এমন করো! শুধু শুধু সময় নষ্ট করা, মন খারাপ করা! তোমার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় পৃথিবীতে অনেক লোক আছে। তারাও বেঁচে আছে। সব

সময় নিজেকে ছোটো করার কি অর্থ বুঝি না।'

সুমিত্রা নিরুত্তর, হাঁটতে লাগল মুখ নিচু ক'রে।

'টাকার দরকার থাকলে আমাকে ব'লো, আমি দেবো। কিন্তু তোমার ওই হা-পিত্যেশ ক'রে ঘুরে বেড়ানো আমার সহ্য হয় না।'

'তুমি কি রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে উঠেছ? নাকি লটারি পেলে?' কষ্টে হাসল সুমিত্রা।

'সে তোমায় ভাবতে হবে না।'

হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকল সুনীল। বলল, 'এসো।'

সুমিত্রা উঠল আগে, পরে সুনীল। গদিটা বড্ড নরম, কেমন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

সুমিত্রার ভয় করছিল। আরাম পেলে দেহটা কেমন উন্মুখ হ'য়ে ওঠে, আরো কিছু পেতে ইচ্ছে করে। বিশেষভাবে, ঘন হ'য়ে। আচ্ছা, যদি আমার বিয়ে হ'য়ে যেত এতো-দিনে, যদি...

প্রায় সম্মোহিতের মতো মাথাটা সুনীলের কাঁধে নামিয়ে রাখল ও। যদি একটু আড়াল পাওয়া যেত : একটি ঘর, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও? একটা আগুনের শিখা যেন ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'য়ে ওর দেহটাকে পেঁচিয়ে ধরছিল। ভয় করে, বড্ড ভয় করে। সুমিত্রা চোখ বন্ধ করল।

'কি হ'লো তোমার?' জানুমূলে সুনীলের হাতের স্পর্শে চেতনা ফিরলো।

'আচ্ছা, আজ যদি না যাই?'

'তারপর?'

সুমিত্রা ওর হাত ধরল।

'সেইখানে যাবে? ব্রীজের উপর?'

'যা সারাক্ষণ জিইয়ে রাখতে পারো না, তাকে ধরবার চেষ্টা করো কেন!'

'...'

'আর একদিন যাবো।' পরে বলল, 'সুমিত্রা, তুমি আজকাল গান গাও না?'

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'কোনদিকে?'

সুমিত্রা বলল, 'চলো, নামি।'

'থাক, আমিই দিচ্ছি।...সুমিত্রা, কেউ কেউ দুঃখ পেতে ভালোবাসে; তুমিও।'

'এখন ভাবছি, না এলেই ভালো হ'তো। তোমার কি, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে। আজকাল সবাই ঠাট্টা করে।'

'তোমার কি যায় আসে?'

'আমি মানুষ নই!'

বাতাসের শব্দ এইবার ধ্বনি হ'য়ে উঠল। আলোয় ঢুকে স'রে গেল সুমিত্রা, খোঁপা ঠিক করল।

সুনীল হেসে বলল, 'তবু সানাই বাজে, তোমাকেও আসতে হয়।'

মল্লিকার ভাই বাইরে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে বলল, 'আসুন, সুমিত্রাদি। দিদি আপনাদের জন্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আপনিই কি সুনীলবাবু? আসুন, আসুন।'

সুমিত্রা বলল, 'বাবলু, ধুতি পাঞ্জাবি পরে কি তোমার বয়স বেড়ে গেছে? এতো কথা তো তুমি বলো না!'

'কি করব! দায়ে পড়লে সবারই মুখে কথা ফোটে। কিন্তু আপনারা আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দিদি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'চলো।'

আলোকসজ্জা, চীৎকার ও ভিড়ের মধ্য দিয়ে বাবলু ওদের দোতলায় নিয়ে গেল।

কনের সাজে মল্লিকা, এবং আরো দু' তিনটি মেয়ে বসেছিল। সুমিত্রা ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

উপহারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে সুনীল বলল, 'সুন্দর মানিয়েছে আপনাকে। আনন্দের কথা।'

'আমার কিন্তু আপনাকে দেখে মোটেই আনন্দ হচ্ছে না।' মল্লিকা বলল, 'সুনীলবাবু, এবার কিছু একটা করুন। আমার চেয়ে সুমিত্রাকে অনেক সুন্দর মানাবে।'

অপ্রতিভ কণ্ঠে সুনীল বলল, 'দেখা যাক, কি করা যায়।'

মল্লিকা তার দাদার সঙ্গে সুনীলের পরিচয় করিয়ে দিল। ভদ্রলোক আলাপী, সপ্রাণ। সুনীলকে সঙ্গী করে নিলেন।

সুনীল বলল, 'সুমিত্রা, দেরি ক'রো না। যাবার সময় আমাকে ডেকে নিও।'

'সে ও ঠিক নেবে। আপনাকে ভাবতে হবে না।'

বাইরে এসে মল্লিকার দাদা বললেন, 'বিয়ে করলে আপনি মশায় স্ত্রৈণ হ'য়ে পড়বেন।'

'আপনি বুঝতে পারেন?'

'নিশ্চয়। স্ত্রী সুন্দরী হলে, মানে......এটা সকলেই জানে।'

সুনীলের ভালো লাগল না।

সুনীলের দম বন্ধ আসছিল। বিয়ে, উৎসব; আজকাল সব কেমন অশ্লীল বোধ হয়। রিরংসা, বঙ্কিম আহ্লাদ নক্ষত্রের বেগে গড়িয়ে যাচ্ছে। 'যে বাঁচে সে বাঁচে, আমি বাঁচি নাকো। আমার অসুখ......' অসুখ চেয়েছিল পার্বতী; বোঝেনি, কতো শ্রমসাধ্য। পার্বতী ভালোবেসেছিল। নাকি সে ঈর্ষা করে? সুমিত্রার ইচ্ছে না থাকলে আজ আসত না।

অনেক পরে দেখা হ'লে বলল, 'কি, যাবে? নাকি বাসর জাগবে।'

সিঁড়িপথে সুমিত্রা বলল, 'অন্যের বিয়ের বাসর জেগে লাভ কি?'

'অভ্যেস ক'রে রাখো।' সুনীল বলল, 'না হ'লে নিজের বাসরে হয়তো প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবে।'

হাসল না। অন্যরকম গলায় সুমিত্রা বলল, 'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ?'

সুনীলের মনে হ'লো সুমিত্রা খুব ক্লান্ত। বলল, 'চলো।'

তাড়াতাড়ি ক'রেও কিছু লাভ হয়নি। দশটা বেজে গেছে। আলো আড়াল ক'রে অন্ধকারে নেমে এলো দু'জনে।

নির্জন পথ। একটা কুকুর অনেক দূরে চীৎকার করছে কোথাও, তার শব্দ এতো দূরে। কুয়াশায় চতুর্দিক অস্পষ্ট। শীতের কনকনে হাওয়া পাঁজর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দু'জনে হাঁটছিল, নিঃশব্দে।

সামনে কঠিন কংক্রিটের পথ, বহু দূরে পর্যন্ত। সুমিত্রা হঠাৎ খুব কাছে স'রে এলো।

'ভয় করছে?'

সুমিত্রা ওর একটা হাত জড়িয়ে ধরল।

'না গো, বড্ড শীত।'

সুনীল এতোটা ভাবেনি। একটি মাত্র স্কার্ফে শীত আটকায় না। এদিকের বাসও বোধহয় বন্ধ হ'য়ে গেছে। বলল, 'তাহ'লে একটা রিক্‌শা বা ট্যাক্সি ডাকি। শালটা নেবে?'

সুমিত্রা না করল।

কিছু দূরে গিয়ে একটা রিক্‌শা পেল। উঠে বসল দু'জনে। সুমিত্রা, ক্লান্ত ভাবে, রিক্‌শার পিছনে মাথা এলিয়ে দিল। কথা বলছে না; এমন কি, স্পন্দনও নেই। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর অবাক হ'লো সুনীল।

'কথা বলছ না কেন?'

নিরুত্তর দেখে, হাত বাড়িয়ে সুনীল ওর মুখ স্পর্শ করল; আঙুলে ভিজলো। চকিতে হাতটা সরিয়ে নিল সুনীল।

'সুমিত্রা, তুমি কাঁদছ!'

সুমিত্রা উত্তর দিল না।

আরো কিছুক্ষণ। আরো দূরে গেলে বাস কিংবা একটা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। সুনীল কি বলবে ভেবে পেল না।

শীতের হাওয়া ক্রমশ প্রবল হ'য়ে উঠছে। আত্মরক্ষা করা দায়। গলায় সুমিত্রার করুণ নিঃশ্বাস অনুভব করতে করতে সুনীল বলল, 'রিক্‌শাওয়ালা, একটু জোরে চলো।'

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

গল্প লহরী-র শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র অথবা শরচ্চন্দ্র—এই বিষয়ের আলোচনা গত সংখ্যায় শেষ করে দিয়েছি। যে-সূত্রে উক্ত আলোচনার উদ্ভব হয়েছিল তার সুমীমাংসা গত সংখ্যার দুটি পত্রই করে দিয়েছে। কিন্তু 'গল্প লহরী'র সম্পাদক ও 'চাঁদ মুখ' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র কে ছিলেন, কি তাঁর সাহিত্য কর্ম এ-বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে ভেবে নীচের পত্রটি প্রকাশ করছি। পত্রটি 'গল্প লহরী' পত্রিকার সম্পাদক শরৎচন্দ্রের জনৈক আত্মীয়ের।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

আমার এ পত্রখানি প্রয়োজন বোধে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

আসল শরৎচন্দ্র ও নকল শরৎচন্দ্র লইয়া ইতিপূর্বে অনেক কাগজে অনেক রঞ্জিত অতিরঞ্জিত বিদ্রূপাত্মক এমনকি হীন কুৎসা প্রচারিত হইয়াছে, কোনদিন এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি নাই—উপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছি। বহুদিন পর সাগরময় ঘোষের সাহিত্যিকজনোচিত দৃষ্টি-ভঙ্গির এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচনা দেখিয়া প্রীতি অনুভব করিয়াছিলাম। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে দেশের পাঠকের একটি প্রশ্নে এবং বিদুরের দরদী অনুসন্ধিৎসু প্রচেষ্টা দেখিয়া মনে হইল এ সম্বন্ধে কিছু বলার হয়ত আবশ্যকতা আছে—সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় হয়ত ইহার প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। তাই এই পত্রের অবতারণা।

'গল্প লহরী' পত্রিকার শরৎচন্দ্রের জন্ম—১২৮৯ সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১৩৫২ সাল ১৯শে বৈশাখ। ইনি খানাপাড়া শিবপুর চট্টোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। অত্যন্ত শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি কলিকাতা মাতুলালয়ে বাস করিতেন এবং এইখানেই অকৃতদার অবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

আমি তখন অত্যন্ত শিশু, কাজেই তাঁহার মুখের শোনা কথায় বলিতেছি। তাঁহার যৌবনের উন্মেষেই ইনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং কিছুদিন উঁহাদের সহিত যুক্ত থাকেন। কিন্তু এ দলের আকর্ষণ তাঁহাকে বেশীদিন টানিয়া রাখিতে পারে নাই, তিনি শীঘ্রই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সে সংস্রব ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ মঠের অনুরাগী হন এবং স্বামী সারদানন্দর ভক্ত শিষ্যরূপে পরিচিত হন। স্বামীজির নির্দেশেই তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। বাল্যকালে দেখিয়াছি গঙ্গাধারের একটি শিবমন্দিরে তাঁহার বৈঠক বসিত সকাল সন্ধ্যায়। দলে দলে ছাত্র যুবক এবং বৃদ্ধেরা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন।

তাঁহার জীবন ছিল কর্মময়। অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ ছিল অদম্য। ঋষি টলস্টয়ের তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ধর্মপুস্তক তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

সাহিত্যচর্চা তাঁহার বাল্যকালেই আরম্ভ হয়। সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের নাম যখন প্রচারিত নয়, তখন তিনি কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। প্রহসন রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার একটি নক্শা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু যখন অভিনীত হইল তখন দেখা গেল তাঁহার নামের পরিবর্তে অন্য একজনের নামে তাহা বাহির হইয়াছে। সে সময় এটা রঙ্গজগতে প্রায়ই ঘটিত—ইহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

তারপর দীর্ঘদিন তিনি সাহিত্যচর্চা বন্ধ রাখিয়াছিলেন—বহুকাল পর আমারই অনুরোধে তিনি আবার সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় "সওগাত" নামক মাসিক পত্রে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস বাহির হয় 'মাধুরী' নামক একখানি মাসিক পত্রের উপহার হিসাবে—তাহার কোন মূল্য ছিল না। তিনি সেই 'স্নেহের বাঁধন' নামক বইখানিতে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন—"আমার কাঁচা হাতের লেখা যেমন পাঠক চক্ষে দেখিবে'......ইত্যাদি।" দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হীরকদুল' প্রকাশ পায় সতীশচন্দ্র মিত্রের লক্ষ্মীবিলাস পাবলিশিং হাউস হইতে। তাহাতেও তিনি একজন নতুন লেখক এ কথা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন। তৃতীয় গ্রন্থ 'চাঁদমুখ' লইয়াই বিভ্রাট বাধে।

সে সময় একটি প্রতিষ্ঠান পুস্তক প্রকাশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল—তাঁহারা প্রতিমাসে একটি উপন্যাস প্রকাশ করিতেন। বাংলার সব লেখক এমনকি বিখ্যাত শরৎচন্দ্র পর্যন্ত এখানকার লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি 'চাঁদমুখ' লইয়া দেখা করিলে তাঁহারা বইখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। বইটি প্রকাশিত হইলে দেখা গেল—সেই প্রকাশক তাঁহাদের নামে প্রকাশ করেন নাই। প্রশ্ন

'গল্প লহরী' পত্রিকার সম্পাদক 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করিয়া জানিতে পারিলাম—শরৎচন্দ্র তাহা হইলে লেখা দিবেন না—এ কারণে তাঁহারা নাম প্রকাশে সাহসী হইতেছেন না। এ সংশয় বাস্তবে পরিণত হয়, শরৎচন্দ্র সত্যই লেখা দেন নাই। এই প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ক্ষমতা প্রচুর ছিল এবং এই বইখানিও বাজারে যথেষ্ট চলিয়াছিল। লেখক যে আসল শরৎচন্দ্র নহেন এ সন্দেহ পাঠকের মনে উদিত হয় নাই—পাঠক মহলে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ভক্তের দল শরৎচন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন আত্মভোলা, খামখেয়ালী মানুষ। ভক্তদের কথায় তিনি অধৈর্য হইলেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কাগজে আক্রমণের পর আক্রমণ আরম্ভ হইল। অনেকে বলিলেন লেখক চোর—মিথ্যা নাম দিয়া পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করিতেছেন—কেহ বা আর এক পর্দা উঠাইয়া বলিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রত্যেক বিজ্ঞাপনে লিখিতে লাগিলেন 'চাঁদমুখ' ও 'হীরক দুল' তাঁহার লেখা নহে। এতদ্‌সত্ত্বেও 'চাঁদ মুখে'র প্রায় ১৫,২০টি সংস্করণ হয়।

মৎ-বর্ণিত শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সত্যধর্মী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন—এ ধরনের সম্ভাবনার কল্পনা থাকিলে কখনই তিনি কলম ধরিতেন না। অসাধু প্রকাশকের জন্য এতবড় একটা গর্হিত কাজে তিনি অনুতপ্ত হইয়া উক্ত প্রকাশককে (অন্য একখানি বই দিবার কথা ছিল), বই বন্ধ করিয়া দিলেন। মনস্থ করিলেন পরে লিখিলে চুরির প্রশ্রয় দিব না। তাঁহারই ইচ্ছায় আমার পিতার এবং তাঁহার মাতুলের নামানুসারে 'নারায়ণ সাহিত্য মন্দির' প্রকাশ বিভাগ খোলা হয়। এবং তিনি তাহার পর যতগুলি বই লেখেন সবগুলি এই প্রকাশ মন্দির হইতে প্রকাশিত হয়। এখন হইতে তিনি যে আসল শরৎচন্দ্র নন এ কথা বইগুলিতে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন।

ইনি প্রথমটা নাম পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অমৃতলাল বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্য বিদ্যাভূষণ এবং অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণ বলেন, বাপপিতামহের নামে একবার যখন লেখা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বন্ধ করা উচিত নয়। দীনেশবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'শুভলগ্ন' নামক বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দেন। অমূল্যবাবুও অমৃতলালের নামে শরৎচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে উৎসর্গ করিলে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বিবেকে এমনই আঘাত করিয়াছিল যে, শরৎচন্দ্র সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তাঁহারই এক ছাত্র এবং রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়পাত্রের সহায়তায় রবীন্দ্রসমীপে গমন করেন। রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু এ বিতণ্ডায় অংশ গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না, বলিলেন রবি আজ অস্তমিত। তবে তাঁহারই নির্দেশে পরবর্তী পুস্তকে শরৎচন্দ্রের ছবি ছাপানোর বন্দোবস্ত হইল।

শরৎচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে পৃথক করার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। সাহিত্যসম্রাট সাহিত্য প্রভৃতি পত্রে শরচ্চন্দ্র লিখিতেন। ইনিও মাঝে মাঝে শরচ্চন্দ্র লিখিয়াছেন। এই সময় শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে আমি সাহিত্য সম্রাটের সহিত পরামর্শের জন্য তাঁহার শিবপুরের বাড়ী গিয়াছিলাম। শরৎবাবুর সেদিনের আসরে সম্ভবত অক্ষয় সরকার উপস্থিত ছিলেন—কিন্তু শরৎবাবু এমন অধৈর্য হইয়া পড়েন যে, সেদিন তাঁহার সহিত কোন আলোচনা সম্ভব হয় নাই। পরে অবশ্য শরৎচন্দ্র নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং পরবর্তীকালের সাক্ষাতে শরৎচন্দ্রের কুশল সংবাদ লইতে ভোলেন নাই। বাগবাজার বসু পাড়ার এক সাহিত্য সভার অনুষ্ঠানে দুই শরৎচন্দ্র পাশাপাশি বসিয়া আলাপ পরিচয় করেন, এবং খ্যাতিমান শরৎচন্দ্র অপর শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যচর্চায় যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন।

এত কথা লিখিলাম এ কারণে যে, অকারণে অন্যের দোষে কতকটা ঘটনা বিপাকে একজন সাহিত্যিককে যে নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল—তাহার জন্য সত্যকার তিনি ততটা দায়ী ছিলেন না। সাগরময়বাবু ঠিক লিখিয়াছেন—তিনি একজন জাত লেখক ছিলেন। জনসমর্থন পাইলে, সুধীজন তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে হয়ত তাঁহার লেখা আরও উন্নত হইত। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় নানা উপেক্ষার মধ্যেই তাঁহার সাহিত্য জীবন বিলুপ্ত হইল।

নিম্নে তাঁহার গ্রন্থতালিকা দেওয়া হইল: 'স্নেহের বাঁধন,' 'হীরক দুল' 'চাঁদমুখ 'মুখরক্ষা', 'শান্তিজল', 'সুপ্রভাত', 'পথের সন্ধানে', 'শুভলগ্ন', 'কনকাঞ্জলি', 'ভাবের পূজা' (প্রবন্ধ গ্রন্থ)

পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস:

'ভবঘুরে' (বাসন্তী), 'ধ্রুবজ্যোতি' (গল্প লহরী), 'বন্দ' (গল্প লহরী), 'বিধাতার আলপনা (গল্প লহরী), 'মাধবী' (মেঘবাহন বর্মা নামে গল্প লহরীতে প্রকাশিত), দুইখানি প্রকাশিত বারোয়ারী উপন্যাস 'এম এল ওয়েড' এবং 'মধুচক্রে' তিনি প্রথম ও শেষ পর্যায়ের লেখক ছিলেন।

সম্পাদনা—

ইনি: ১৩৩৭ সাল হইতে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত 'গল্পলহরী' সম্পাদনা করেন।

বিনীত
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা।

বাংলার সমাজ চিত্র : প্রাচীন পত্রিকার রচনা সংকলন

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। প্রথম খণ্ড। (সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার রচনা সংকলন।) বিনয় ঘোষ। বেংগল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২। মূল্য ১২·৫০ নঃ পঃ।

এই শ্রমসাধ্য কাজটি আরম্ভ করেছিলেন স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঊনত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি যখন সমাচার দর্পণ থেকে সংবাদ সংকলন করেন তখন বাংলার গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল বলা চলে। ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত বাংলার সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রধানতম উপকরণ আমাদের সহজলভ্য হয়েছিল। এতদিন পর শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ১৮৪০ থেকে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সংকলন করে পরবর্তী যুগের পরিক্রমণ সহজসাধ্য করে দিলেন। বর্তমান অবস্থায় এই শ্রেণীর কাজই একমাত্র দরকার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর গবেষণাত্মক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও গবেষণার মান যে এত নীচু তার একটি কারণ অবশ্যই মূল দলিলের সংগে পরিচয়ের অভাব। দলিলগুলি সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার মতো বাঞ্ছনীয় কাজ আর কিছুই নেই।

দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উপযুক্ত সংস্থা পাঁচালী অথবা মধ্যযুগীয় অন্যান্য অর্থহীন রচনা নিয়ে যত আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন এই মুদ্রিত অথচ লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংকলন সম্পাদন অথবা ফটোস্টাট করবার বিষয়ে তার কিঞ্চিৎ মাত্র আগ্রহ দেখান না। এই কাজের জন্য যে অর্থ এবং কর্মক্ষমতা দরকার তা একমাত্র এরাই দিতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁদের চেতনার অভাবে ব্যক্তি বিশেষকেই এ কাজে অগ্রসর হয়ে আসতে হয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, মুষ্টিমেয় হলেও এ রকম অধ্যবসায়ী উৎসাহী কর্মী এখনও এ-কাজে আছেন। বিনয় ঘোষ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ব্রজেনবাবুর আরব্ধ কাজ তিনি তুলে নিয়েছেন। 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি সংবাদ প্রভাকরের; দ্বিতীয় খণ্ডটি হবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার; তৃতীয় খণ্ডটি বেংগল স্পেক্টেটর বিদ্যাদর্শন সম্বাদভাস্কর সর্বশুভকরীর এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডটি সোমপ্রকাশ পত্রিকার রচনা সংকলন।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা ১৮৩১ এ প্রথম প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় ১৮৩১ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত সংবাদপ্রভাকরের ফাইল (১৮৪০এর একটি দুটি সংখ্যা ছাড়া) পাওয়া যায় না। প্রথম যুগের সংবাদপ্রভাকরের কিছু কিছু রচনা সমাচারদর্পণে উৎকলিত হয়েছিল অতএব সেই সূত্রে ব্রজেনবাবুর বইতে স্থান পেয়েছে। বিশেষত বর্তমান গ্রন্থের পরিক্রান্ত যুগ পূর্ববর্তী গ্রন্থের পরবর্তী। প্রথম দশ বৎসর প্রচণ্ড সমাজ-বিপ্লবের যুগ। এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় হত। কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে কিছু নেই। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো'। এই কবিব্যক্তিটিকে গদ্যরচনায় অন্যরূপে পাই। কবিতায় মনে হয় কবি

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল। গদ্য পড়লে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে ধারণা জন্মে তিনি যথেষ্ট উদারপন্থী প্রগতিকামী। কবিতার ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা ধরব কবিওয়ালাদের ব্যংগাত্মক শিল্পরীতির অনুগামী, সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তকে ধরব যুক্তিবাদী ও যুগ-সচেতন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে এই নতুন মূল্যবিচার ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সত্য, কিন্তু একমাত্র কবিজীবনী বিষয়ক রচনাগুলি ছাড়া তাঁর অন্যান্য গদ্য-

রচনা সংকলিত হয়নি। ঈশ্বর গুপ্তের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত গদ্যরচনা সংকলন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। বর্তমান গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকীয় অন্যান্য সংবাদ-রচনাগুলি সংকলিত হওয়ায় আশা করা যায় ঈশ্বর গুপ্তকে নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

বিনয়বাবু রচনাগুলি অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, বিবিধ—এই কয়ভাগে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক ভাগে দিনগত সংবাদের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে পরের উপবিভাগে রচনার যথাযথ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। রচনা নির্বাচনের সূত্র সম্বন্ধে বিনয়বাবু কিছু বলেন নি। যা নেওয়া হয়েছে তা কি সংবাদপ্রভাকরের সম্পূর্ণ রচনা ধরে সংকলন করা হয়েছে? ঈশ্বর গুপ্ত মাস পয়লায় যে রচনাগুলি লিখতেন, সেগুলি এখানে নেই। অবশ্য তাতে 'সমাজচিত্র' হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বর গুপ্তকে জানা যায়। এই সঙ্গে সেগুলি থাকলে গুপ্ত কবির সম্পর্কে উপকরণ-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হত। বিশেষত সম্পাদক দীর্ঘ সুবিন্যস্ত ভূমিকায় গুপ্ত কবিরই আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় ১লা চৈত্র ১২৬০ সালে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের একটি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক রচনা এতে নেই। ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর জনৈক বাল্যসখা একটি তথ্যবহুল স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেটি পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। সেই রচনাটি এখানে নেই কেন? সেই সংখ্যাটি কি পাওয়া যায় না? সংবাদপ্রভাকরের কোন্ কোন্ সংখ্যা পাওয়া যায় এবং কোথায় পাওয়া যায় তার একটি তালিকা আবশ্যক ছিল। এই রকম সংকলনগ্রন্থে সেই বিবরণ দেওয়া হত সাধু গবেষণার রীতিসম্মত। ব্রজেনবাবু 'দেশীয় সাময়িক পত্রে' (১ম সং) কোথায় কোন্ পত্রিকা কোন্ সংখ্যা পাওয়া যায় তার একটা মূল্যবান তালিকা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মূল্যবান রচনা কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী বর্তমান সংকলনে সংগত কারণেই নেই। কারণ এগুলি গ্রন্থাকারে কিছুদিন পূর্বে বেরিয়েছে।

বিনয়বাবুর দীর্ঘ ভূমিকাটি সুলিখিত। ঈশ্বর গুপ্তের একটি সম্পূর্ণ চেহারা এতে পাওয়া যায়। ১৮৩১এ সংবাদপ্রভাকর আরম্ভ করার সময় ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন রক্ষণশীল কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়। বিনয়বাবু দেখিয়েছেন সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া আর সব বিষয়েই তাঁর মতামত ছিল মধ্যপন্থী। সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গে তাঁর মতামত 'ঘোলাটে' হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মনে হয়, এখানেও তিনি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বিস্তৃত নতুন সিদ্ধান্ত করে বিনয়বাবু আমাদের নতুনভাবে দেখবার সুবিধা করে দিলেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তকে জানতে গেলে পরোক্ষ প্রমাণের সহায়তা নিতে হয়। বিনয়বাবু এইভাবে অনুমান করছেন ১৮৩৯-৪০ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মতামত বদলে যেতে থাকে। কিন্তু তারও আগে থেকে যে নয় তার কি কোনো প্রমাণ আছে? যোগেন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে ১৮৩১এ তিনি পত্রিকা বের করেছিলেন, কিন্তু যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর তিন মাস পূর্বেই প্রভাকরের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন কেন?

এ বিষয়ে সংশয় নেই যে 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গবেষণার ক্ষেত্রে বইটি স্তম্ভস্বরূপে বিরাজিত থাকবে। (৩৫৭।৬২)

বড় গল্প

বরণীয় তুমি—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন। ৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য—২·৫০।

সোনার হরিণ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নিউ বুক কোম্পানী। ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—দুই টাকা।

অল্পে যাদের রুচি হয় না, অতি ভোজনে যাদের আনন্দ, যারা আয়তনের উপাসক—উৎকর্ষের নয়—তাদের চাহিদা মেটাবার জন্যে (এবং পাঠকদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশী) আজকাল লেখক এবং প্রকাশকরা ছোটো গল্প এবং উপন্যাসের মধ্যের শিল্প-গত মৌলিক পার্থক্য ভুলে গিয়ে ছোটো গল্পকে টেনে-হেঁচড়ে বড়ো এবং ছাপার কৌশলে তাকে আরো কিছুটা বড়ো ক'রে উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত করছেন। দুয়ের পার্থক্য আকৃতি গত না হয়ে একেবারে প্রকৃতিগত হওয়ার দরুন লেখাটা না হচ্ছে ছোটো গল্প, না হচ্ছে উপন্যাস। ছোটো গল্প আলোর এক ফালি ঝলকানি-পর্দার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা একটি কোমল বাহুর অংশ বিশেষ—শাড়ির প্রান্তধারার রঙিণমাটুকু। কিন্তু উপন্যাস একটি সম্পূর্ণ পৃথিবী—চরিত্র-গুলি এক-একটি আলোতে-ছায়াতে পূর্ণ মানুষ।

"বরণীয় তুমি" একটি বড়ো-করে-লেখা ছোটো গল্প। ছেলেটির নাম নরেন, মেয়েটির নাম লুসি। দু'জনেই ক্রিশ্চিয়ান। রেভারেন্ড ব্যানার্জির পালিত পুত্র নরেন, আর মুরারী মণ্ডলের মেয়ে লুসি। পিতার আদর্শ এবং লুসির বাধা বন্ধহীন প্রেম, এই দুয়ের দ্বন্দ্বে নরেনের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত। কিন্তু যুবক নরেন উপলব্ধি করল যে লুসিকে বিয়ে করেও যীশুর আদর্শ মেনে চলা সম্ভব। সুতরাং লুসির বাবা হঠাৎ অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় অবশ্যম্ভাবী বিরহ। পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে লুসির জীবনে পরিবর্তন। একাধিক যুবকের সংগে প্রণয়-লীলা। ধনী যুবক নিরঞ্জনের সংগে বিবাহ এবং নরেনের সংগে বিচ্ছেদ। বিরহী নরেনের বিদেশ যাত্রা এবং ডাক্তার হয়ে আসা। নরেন জানতে পারে লুসির বহু বিবাহের কথা, তার পিতার সংগে বিচ্ছেদের কথা এবং ঘটনা-বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে অবশেষে হাসপাতাল থেকে কোথায় চ'লে যাওয়ার কথা। এরপরে আরম্ভ হয় সিভিল সার্জন নরেনের এক বিরাট জরাজীর্ণ ভূতুড়ে বাড়িতে নিঃসংগ জীবনযাত্রা। ভূতুড়ে বাড়ির কাণ্ড। ঠাকুর চাকর এবং দুই একটি গ্রাম্য চরিত্র। ভৃত্য সদানন্দর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী আরতির প্রতি দুর্বার আসক্তি এবং তাকে ভুলবার মর্মান্তিক প্রচেষ্টা। চেতন এবং অবচেতন মনে আরতি আর লুসির স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নরেনের আরতির মৃতদেহে অস্ত্রচালনা এবং সেই অপ্রকৃতিস্থ-তার মধ্যে অনবধানবশত বিষাক্ত অস্ত্রাঘাতেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের মধ্যে নরেনের ব্যর্থ জীবনের শেষ পরিণাম।

বিদেশ থেকে ডাক্তার হয়ে ফিরে এসে সিভিল সার্জন নরেনের এই ভূতুড়ে বাড়িতে বাস করা থেকে আরম্ভ করে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত এই করুণ বেদনা ঘন কাহিনীই নতুন নাম পেয়েছে "সোনার হরিণ"! "বরনীয় তুমি" আখ্যায়িকার এই দ্বিতীয় অংশই "সোনার হরিণ"এ তুলে দেওয়া হয়েছে। পার্থক্যের মধ্যে সদানন্দর নাম রামপদ, গোবিন্দর নাম গোপাল, ললিতের নাম অজিত আর আরতির নাম মিনতি। আর একটু পার্থক্য এই যে, "সোনার হরিণে" ডাক্তারের কাছে দুই ব্যক্তির মুখ দিয়ে দুইটি গল্প—মূল গল্পের সঙ্গে সম্বন্ধহীন কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ—বলানো হয়েছে। "বরণীয় তুমির" দ্বিতীয় অংশ এবং কথাচ্ছলে কৌশলে বলা দুইটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কাহিনী, এই তিনটি গল্পকে

বিভিন্ন নামে তিনটি ছোটো গল্পের রূপ দেবার শক্তি নিশ্চয়ই শৈলজানন্দে ছিল।

উপন্যাস

মাটির গন্ধ। শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

লেখক ইতিপূর্বে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কথাসাহিত্যে তাঁহার লেখনী দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামের চিত্র এই পুস্তকে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাষীদের সরল অন্ধ-বিশ্বাস, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে জীবনের দ্বন্দ্ব, কুৎসা রটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বন্যার বিপর্যয় পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ইহার মধ্যে আছে। আছে মোড়ল, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবী এবং আরো অনেকে। সকলেই ওই গ্রামে পড়িয়া আছে। মৃত্তিকার আকর্ষণে, যাহা অস্বীকার করিয়া কাহারও চলিয়া যাইবার উপায় নাই।

রামপদবাবুর রচনাশৈলীতে আধুনিকতার জলুস না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক সুমিষ্ট রচনাকৌশল পাঠকের মন হরণ করে। চিত্ত অজ্ঞাতে তাঁহার সঙ্গী হইয়া গ্রাম্যপথে ওইসব বিচিত্র নরনারীদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ৪৪৫।৬১

৪৪৫।৬১

সীমারেখা। অজিতকুমার। প্রকাশনায় : শ্রীমতী নীতি চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি এড্। প্রাপ্তিস্থান, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, কিন্তু ভাষাজ্ঞান ও উপন্যাসজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। উপন্যাস রচনার একটি বিশেষ আঙ্গিক আছে, তাহা কেবল কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি মাত্র নহে। লেখক অবশ্য দেখাইতে চাহিয়াছেন নায়ক নরেশের চরিত্রে নিস্পৃহ অতিভদ্রতার অভিশাপ। তাহার জন্যই অন্যতমা নায়িকা গায়ত্রী অপরকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল এবং শিবানী তাহার যৌবনবেদনা উপসম করিতে গৃহত্যাগ করিল একটি অর্বাচীন যুবকের সহিত। শেষ পর্যন্ত সেই পরিত্যক্তা শিবানীকেই গ্রহণ করিতে হইল নরেশকে। শান্তা ও ডাক্তার ব্যানার্জির ব্যাপারটি অনাবশ্যকভাবে অতিরিক্ত। ঘটনাস্রোত একমুখী হইয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, সেইজন্য লিখনভঙ্গী স্বচ্ছন্দ হইয়াও পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। আশা করি লেখক তাঁহার পরবর্তী পুস্তকে এ-সম্পর্কে অবহিত হইবেন।

৬৫৬।৬১

রঙ্গজগৎ

কেন এই দুর্গতি?

বাংলা ছবির সংকট নিয়ে আজ আলোচনার বিরাম নেই। চিত্রামোদী ও চিত্র-ব্যবসায়ীদের মুখে আজ একই কথা, একই প্রসঙ্গ। সংকটমোচনের উপায় উদ্ভাবনে চলচ্চিত্র-শিল্পমহল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ একযোগে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই কর্মতৎপরতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল : বাংলা ছবির সংকটের মূল কারণগুলি আমরা খুঁজে বের করতে পেরেছি কি? যদি না পেরে থাকি, তবে সংকটমোচনের প্রকৃত উপায়গুলিও আমরা কোনদিনই আবিষ্কার করতে পারব না। আমরা আজ চিত্র-প্রদর্শকের সমালোচনা করতে পারি। চিত্র-ব্যবসায়ের ধারা দ্রুত পরিবর্তনশীল। এমন পরিস্থিতিও আবার দেখা দিতে পারে যখন হয়ত চিত্র-প্রদর্শকরাই হবেন বেশী উপেক্ষিত এবং তাঁদের কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ গ্রহণের জন্য চিত্র-প্রযোজক-পরিবেশকরাই হয়ে উঠবেন সদা সচেষ্ট। ভারতের অন্য দুই প্রধান চলচ্চিত্র-ব্যবসায় অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ-ভারতে, অনেকটা এই পরিস্থিতিই বিরাজমান।

বাংলা ছবির সংকট প্রতিরোধের জন্য আমরা অধিকসংখ্যক চিত্রগৃহ নির্মাণ করতে পারি, কলকাতায় হিন্দীচিত্র প্রযোজনা করতে পারি, সরকারী ঋণ-লাভের সুযোগও হয়ত পেতে পারি। কিন্তু এতেই কি সংকট ঘুচবে?

চিত্রগৃহ তো আমাদের আছে, বাংলা ছবিও মুক্তিলাভ করছে। কিন্তু দর্শকের ভিড় হচ্ছে না কেন? বাংলা ছবির শিল্পমান তো আজ সারা ভারতের বিস্ময় এবং বিদেশের অভিনন্দন কুড়িয়ে চলেছে। তবে কেন এই দুর্গতি?

এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়ত অযৌক্তিক হবে না, রহস্যময় কারণে বড় বাংলা ছবির কাজ বন্ধ হয়েছে এমন নজিরও বিরল নয়। "এণ্টনি ফিরিঙ্গি", "গোরা" (পুনঃ সংস্করণ), "জীবিত ও মৃত" এবং এমন কি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় "দেবী চৌধুরানী"র মত ছবি তৈরীর প্রয়াস যে চলচ্চিত্রশিল্পে অংকুরে বিনষ্ট হয়ে যায় তার সংকট যে গভীর তা সহজেই অনুমেয়। এমন অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রতিকারের কাজেও চলচ্চিত্রসেবীদের অগ্রণী হওয়া উচিত।

"লোলিটা"র পরিচালক স্ট্যানলে কুব্রিক ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে স্যু লায়নকে নির্দেশ দিচ্ছেন

লোলিটার রূপসজ্জায় স্যু লায়ন

লোলিটা—আমার পাপ, আমার আত্মা

লোলিটা এখনো কিশোরী। কিন্তু তার সৌন্দর্যে আছে একটা বিপর্যয় ঘটানো আকর্ষণ। তার জন্যে দায়ী ওর কৈশোরের নিষ্পাপ নির্লজ্জতা আর অতি সাধারণ গুণগুলি। ঘটনাচক্রে সে চোখে পড়ে গেল প্রৌঢ় হামবার্টের, যিনি ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এসে বেশ কিছুকাল হল বসবাস করছেন। লোলিটাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসে ফেলেন। তাকে পাবার জন্যে, তিনি তার মার বাড়ির এক অংশ ভাড়া নেন, পরে এই বিধবা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। হামবার্ট লোলিটাকে নিয়ে এক হোটেলে উঠে আসেন, রাত্রে তাকে ঘুমের ট্যাবলেটও খাওয়ানো হয়। কিন্তু তার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিবেকের দংশনে। কিন্তু ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে লোলিটা নিজেই হামবার্টকে প্রলোভিত করে অবৈধ কার্যে লিপ্ত হয়। তারপর শুরু হয় এই সৎপিতা আর লোলিটার মধ্যে একটানা গোপন পাপের প্রবাহ। ফলে তাদের আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, লোলিটা হামবার্টকে পছন্দ করছে না, প্রতি মুহূর্তে ছলনা করছে, অন্য কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করছে। কেননা, এখন সে ক্লেয়ার কুইলটি বলে আর এক

ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্স-এর প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ "হাসি শুধু হাসি নয়" (পরিচালনা: নবগোষ্ঠী) ছবির একটি বহির্দৃশ্যে কল্যাণী ঘোষ ও বিশ্বজিৎ। ফটো—দেশ

প্রৌঢ় কুচক্রীর শিকার। তাই একদিন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে লোলিটা উধাও। বহুদিন বাদে হামবার্ট যখন লোলিটার চিঠি পেলেন, তখন সে অন্তসত্ত্বা, একটি অল্পবয়স্ক যুবকের সাথে ঘর করছে। কিন্তু এর জন্যে যে দায়ী, সেই কুইলটিকে হত্যা করে অধ্যাপক হামবার্ট প্রতিশোধ গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত হামবার্টকে জেলেই জীবন কাটাতে হয়। "লোলিটা আমার জীবনের আলো আর আগুন। আমার পাপ, আমার আত্মা, লো-লি-টা",—এই কথাগুলির মধ্য দিয়েই নবোকভ তাঁর বহু-আলোচিত উপন্যাস "লোলিটা" শুরু করেন। এই বই নিয়ে সারা পৃথিবীতে কী ঝড় বয়ে গেছে, তা পাঠকদের জানা আছে। পর্নোগ্রাফিতে ভরা এই বইটির ছবি তোলার সময়ও খুব আলোড়ন হয়েছে।

"লোলিটা" ছবি নিয়ে কিন্তু এতটা আলোড়ন হচ্ছে না। কারণ, পাঠকরা যে কৌতূহল নিয়ে এই বই দেখতে গিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা হতাশ হয়েছেন। দর্শকদের প্রশ্ন, বইটার যেখানে আবেদন, ভাল হোক মন্দ হোক, তার সব কিছু বাদ দিয়ে, বারো তেরো বছরের মেয়ের স্থানে ষোল সতেরো বছরের একটি যুবতীকে ঢুকিয়ে দিয়ে এই ধরনের একটি মামুলী ছবি তোলার কী অর্থ? একটি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ছবির জন্যে পৃথিবী-জোড়া হৈচৈ-এর কোন কারণ ছিল না। লোলিটার ভূমিকায় সু লায়নের অনবদ্য অভিনয় বাদ দিলে বইটাতে আর কী আছে? না কোন চমৎকার পরিচালনা, না গল্পের বাঁধুনি। অবশ্য হামবার্টের ভূমিকায় জেমস ম্যাসনের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। তবে পরিচালক স্ট্যানলে কুব্রিক এমন একটা বইকে যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে যে রূপ দিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইটাতে নোংরামি ঢোকাবার কোন প্রকার চেষ্টাই করা হয়নি। তবু বলবো, এতগুলো বিয়োগান্ত ঘটনার পরেও আমাদের মনে এই ছবি কোন স্পর্শই রেখে যেতে পারেনি। না লোলিটার মা, না হামবার্ট, না কুইলটি, না লোলিটা। ছবিটা আরো মানবিক হয়ে উঠতে পারত; পরিচালক সেদিকে নজর দেননি।

জানি না, "লোলিটা" ভারতবর্ষে ঢোকবার ছাড়পত্র পাবে কিনা। তবে ছাড়পত্র না পাবার মত এমন কোন দৃশ্য বইটাতে নেই। আমাদের চৌরঙ্গী পাড়ায় বরং এর চাইতে অনেক অনেক অশ্লীল ছবি দেখানো হয়।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম,
হারবিগস্ট্রাস, পশ্চিম জার্মানী

* শুভমুক্তি *

এ-সপ্তাহে বাংলা ছবি একটিও মুক্তিলাভ করছে না। দুটি নতুন হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবি দুটি হল: **মেরী বহেন** (মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরি) ও **টাওয়ার হাউস** (দিশ প্রোডাকসন্স)।

পদ্মিনী অভিনীত "মেরী বহেন"-এর প্রধান আকর্ষণ: অসিযুদ্ধ, প্রণয় ও নৃত্য-গীত।

"টাওয়ার হাউস" (পরিচালনা: এন এ আনসারী) একটি ক্রাইম ছবি। অজিত ও শকীলা ছবির নায়ক-নায়িকা। রবি ছবির সঙ্গীত-পরিচালক।

* চিত্র-সমালোচনা *

আধুনিকার অভিসার

এক দিকে কুল, অন্য দিকে শ্যাম—আজকের যুগের প্রেমিকাকেও এই দোটানায় পড়তে হয়। এবং শ্যামের জন্য কুল ছাড়ার ব্যাপারে এ যুগের প্রণয়িনী যেন পুরাকালের প্রেমিকার চেয়েও অধিকতর তৎপর। অন্তত ছায়াছবিতে তারই প্রমাণ মেলে। "অভিসারিকা" (টাস ফিল্মস) এ-কালের এমনি এক আধুনিকার প্রেমাভিসারের কাহিনী নিয়ে তৈরী।

এই ছবির অভিসারিকা বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে দয়িতের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে শেষ

পর্যন্ত জানতে পারে, যার জন্য সে কুল-মান-ধন সব কিছু ছেড়ে এসেছে, সে শঠ, প্রবঞ্চক। তবে এক দিক থেকে তার প্রণয়াভিসার ব্যর্থ হয়নি। ঘটনাচক্রে যে সচ্চরিত্র ও পরোপকারী যুবক তার অভিসার-পথের সাথী হয়েছে এবং যার সংগে কখনও স্ত্রী, কখনও বা নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা সম্পর্কের ছদ্মপরিচয়ে তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে এবং এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তার কাছেই অভিসারিকার হৃদয় যথানির্দিষ্ট মুহূর্তে বাঁধা পড়ল। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল, এবং বাড়িতে আবার বিয়ের শানাই বেজে উঠল।

ছবির কাহিনী লিখেছেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। এই ধরনের কাহিনী বাংলা ছবিতে নতুন নয়। ভ্রাম্যমাণ নিঃসম্পর্কিত তরুণ-তরুণীর ছদ্মপরিচয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং পরিশেষে তাদের মিলন—বাংলা ছবিতে এই ঘটনা একবার নয়, একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছেন দর্শকরা। এবং প্রেমোপাখ্যান হিসাবেও এই কাহিনী নিতান্ত মামুলী ও কষ্টকল্পিত।

চিত্রপরিচালক কমল মজুমদার বহুব্যবহৃত উপাদান সংবলিত এই কাহিনী বিন্যাসে অবান্তর ঘটনা যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। এমন কি নায়িকার প্রথম প্রণয়ীকেও—যার জন্য সে ঘর ছাড়ল—তিনি ছবিতে উপস্থিত করেন নি। কিন্তু তাই বলে ছবিতে তার অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করে নিতে অসুবিধা হয় না দর্শকদের। শ্রীমজুমদারের সুষ্ঠু প্রয়োগকর্মের গুণে ছবিটি স্বচ্ছন্দগতি। এবং চিত্রনাট্যের গতির বাঁকে বাঁকে কৌতুক-উপাদান (বিশেষ করে ঘরছাড়া তরুণ-তরুণীর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়কে কেন্দ্র করে গঠিত) সুন্দরভাবে ছবিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন পরিচালক। প্রেমে প্রবঞ্চিতা নায়িকার মনে আত্মহত্যার বাসনা জাগার সময় পরিচালক মোটর ও রেল গাড়ির আওয়াজের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাধর্মী প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সুপরিচালিত এই ছবির প্রণয়-মুহূর্ত পরিমিত আবেগের মধ্য দিয়ে রচিত।

ছবির নায়ক-চরিত্রে নির্মলকুমারের অভিনয় মনোজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য। চরিত্রটিকে প্রাণোচ্ছল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ করে তোলার কৃতিত্বও তিনি অর্জন করেছেন। নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরীকে এই ছবিতে খুব সুন্দর দেখিয়েছে, অভিনয়ও তিনি করেছেন সুন্দর। প্রণয়ে মাধুর্য ও বিরহে দুঃখের ভাবটি তিনি স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করেছেন।

ছবির অন্য তিনটি প্রধান চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ ও ভারতী দেবীর অভিনয় খুবই মনোগ্রাহী। দুই হোটেল-মালিকের চরিত্রে জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতুকাভিনয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

অন্যান্য চরিত্রে অল্প অবকাশে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মিণ্টু দাশগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, তপতী ঘোষ, হরিমোহন বসু, সমরকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী ও অমর মল্লিক।

সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় আবহ-সুর রচনায় ছবিটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ছবির দুটি গান (হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গীত) সুশ্রাব্য।

দীনেন গুপ্তের আলোকচিত্র গ্রহণ ছবির এক বিশেষ সম্পদ। রাত্রির দৃশ্য গ্রহণে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির সম্পাদনা (কমল গাঙ্গুলী), শিল্পনির্দেশ (সুনীতি মিত্র) ও শব্দগ্রহণ (অতুল চট্টোপাধ্যায় ও শচীন চক্রবর্তী) পরিচ্ছন্ন।

পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশে "অভিযান" ছবির আবহ-সংগীত গ্রহণের দৃশ্য। ফটো—দেশ

হাসি শুধু হাসি নয়

ইন্দ্রাণী প্রোডাকশন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" ছবির কাজ এতদিন অনিবার্য কারণে বন্ধ ছিল। গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী

* ছবির পর ছবি *

অকালবসন্ত

সমরেশ বসুর "অকালবসন্ত" তিন বোনের গল্প—যারা এক ট্রাক ড্রাইভারকে ভালবাসে। সুমনা ভট্টাচার্য ও চিনু মুখোপাধ্যায় "অকালবসন্ত"র চিত্ররূপ প্রযোজনার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন। সম্প্রতি চিত্রপ্রযোজকরা বোম্বাই-এর দুই শিল্পী ঊষা কিরণ ও অসীমকুমারকে এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, এবং চুক্তিপত্রের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁরা এখনো বোম্বাই-এ আছেন। বোম্বাই-এর পরিচালক দুলাল গুহ ছবিটি পরিচালনা করবেন। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

স্টুডিওতে ছবিটির কাজ আবার শুরু হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন নব-গোষ্ঠী। বিশ্বজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন জহর রায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, বনানী চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী, জয়শ্রী সেন, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী প্রমুখ শিল্পী। জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ এই ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। শ্যামল মিত্র ছবির সংগীত-পরিচালক।

শুভ-মুহূর্তে অনুষ্ঠান

সম্প্রতি তিনটি বাংলা ছবির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ছবি তিনটি হলঃ **পরিণাম** (সৃজনী ফিল্মস), **আকাশ-প্রদীপ** (রাজীব পিকচার্স) এবং **সম্ভবামি যুগে যুগে** (মহাজাতি কথাচিত্রম)।

হাই হিল

রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির অন্যতম। এই কমেডি ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ মিত্র। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় এবং ছবি বিশ্বাস ছবির তিন প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

বিশ সাল বাদ

হেমন্তকুমার প্রযোজিত গীতাঞ্জলী পিকচার্স-এর "বিশ সাল বাদ" ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। বীরেন নাগ ছবিটি পরিচালনা করেছেন, এবং এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও ওয়াহীদা রেহমান। প্রযোজক হেমন্তকুমারই ছবির সঙ্গীত-পরিচালক।

দর্শকের রায়

বাংলা ছবি ও আমি

গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে

এখনো পর্যন্ত ছাত্র-জীবনের গণ্ডি পেরোইনি। কাজেই জীবনের এই স্বল্প গতিপথে কতটুকুই বা জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি! তবু এমন কতগুলি বাংলা ছবির নাম করবো, যা আমার চিন্তা-স্রোতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। প্রথমেই বলি সত্যজিৎ রায়ের "কাঞ্চনজঙ্ঘা" ছবির কথা। "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র নরনারীর জীবনের যে বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ আছে, তা তো প্রতি-নিয়তই আমাদের আজকের সমাজ-জীবনে অনুভব করছি।

অনিল অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু তবু তাদের সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। কারণ, সে তাদের সঙ্গটুকুই শুধু পেয়েছে, মন পায়নি। তাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে মায়ামৃগের পেছনে ছুটে চলেছে। লাবণ্যও তার দাম্পত্যজীবনে একে একে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা অণিমা বিয়ের পরেও তার পূর্ব-প্রণয়ীকে ভুলতে পারেনি। মনীষাকেও আজকের সামাজিক কাঠামোয় কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে দেখেছি—বিয়েটাকে শুধু একটা সিকিউরিটি হিসেবে ধরে নিতে চায়নি সে, অথচ প্রতিবাদও করতে পারছে না। সব মিলিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায় দেখেছি, একরাশ বিপর্যস্ত

নরনারীর ছবি—তারা জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ পাচ্ছে না। এ বিপর্যয় শুধু অনিল, লাবণ্য, অণিমা বা মনীষার নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এর অসংখ্য নজির দেখেছি। তাই ছবির শেষে যে সমাধানের ইংগিত আছে তা আমাদের সমাজ-জীবনে খুবই অর্থবহ বলে মনে হ'ল। এ ছাড়া 'মেঘে ঢাকা তারা' বা 'পুনশ্চ'র মতো ছবিতেও প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের নানা অর্থনৈতিক সমস্যার কথা, যা হয়তো কোনো রাজনীতিকের বক্তৃতাতেও এতো স্পষ্ট হত না। 'একদিন রাত্রে'র শিল্প-মূল্য যাই হোক, ছবিটিতে আমরা দেখেছি, একদল মুখোশ-পরা মানুষের কীর্তিকলাপ। দিনের আলোয় এরা হয়তো সমাজের উঁচুতলার মানুষ, অথচ মুখোশের আড়ালে তাদের বীভৎস রূপ দেখলে শিউরে উঠতে হয়। এ ছাড়া আরো অনেক উদাহরণ আছে, কিন্তু সে সবের উল্লেখ না করেও বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অনেকখানি।

ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, ভুবনেশ্বর

মেয়েকে শান্তি দিতে পেরেছি

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" দেখার পর আমার মেয়েকে নিজের মতে চলার অধিকার দিতে পেরেছি। মনীষার (ছবির নায়িকা) জীবনে যা ঘটেছিল, আমার মেয়ের জীবনেও তাই ঘটেছে। "কাঞ্চনজঙ্ঘা" না দেখলে আমার মেয়েকে শান্তি দিতে পারতাম না।

পূর্ণিমা রায়,
কলিকাতা-১২

নীরস আমি সরস হ'লাম

রবীন্দ্র-সংগীত ছিল আমার চোখের বালি। মনে হত ইনিয়ে-বিনিয়ে নাকী কান্নার এক ব্যর্থ সমারোহ। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখার পর মনে হল যে, চরম দুঃখের দিনে মানুষকে ভোলাতে পারে গান। প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইল অশান্ত, অসহায় হাহাকার ভোলবার জন্যে। কান্নার তারে, অব্যক্ত বেদনায়, সে সুর তুলল—"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি"। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী গীতভাব-সম্পদ-সমৃদ্ধ গানখানি আমার নীরস মনের ভিত্তিমূলে স্পন্দিত করেছে। শ্রদ্ধায় ও লজ্জায় মাথা নীচু করেছি আমি। তাই আজও রবীন্দ্র-সংগীত শুনলে দাঁড়িয়ে পড়ি, শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে।

[illegible]কুমার পাল
দুর্গাপুর-৪

রবীন্দ্র-কাননে যাত্রা-উৎসবের উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন; পাশে দাঁড়িয়ে রাসবিহারী সরকার (ডাইনে) উৎসবের প্রথম দিনের যাত্রা "লোহার জাল"-এর একটি দৃশ্য।
ফটো—দেশ

যে ছবি ভালবাসি

অভিনয়-জগতের অপর নাম শিল্প-জগৎ। তাই ছবি মাত্রেই থাকা চাই শিল্পীমনের উজ্জ্বল পরিচয়। রূঢ় বাস্তবকে যথাযথভাবে মেলে ধরাই শিল্পী-মনের পরিচয় নয়। ছবি হবে আদর্শমণ্ডিত এবং অশ্লীলতাবর্জিত। যাতে থাকবে সত্যম্, শিবম্, এবং সুন্দরমের প্রকাশ। 'কাবুলিওয়ালা' ও 'নীল আকাশের নীচে' উপযুক্ত এবং সার্থক ছায়াছবি।

—তপতী বসু, বিহার (দুমকা)।

যে ছবি চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে ('অযান্ত্রিক', 'অপরাজিত', 'দেবী'), সত্য বা বাস্তব থেকে বিচ্যুত না হয়ে সাধারণ মানুষকে ঔদার্যে, বীরত্বে, সংগ্রামে, অনুরাগে ও সহমর্মিতায় উদ্ভাসিত করে দেখায় ('কানাল', 'রোড টু হোপ', 'ব্যালাড অফ এ সোলজার'), কিংবা গতানুগতিকতা বর্জন করে কয়েকটি অপরূপ ব্যঞ্জনা, সৌন্দর্য সুষমা মণ্ডিত দুর্লভ মুহূর্ত সৃষ্টি করে ('কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'মেঘেঢাকা তারা', 'কোমল-গান্ধার') সেই ছবিই আমি দেখতে ভালবাসি।

—নির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর,

মানবিকতা, ব্যক্তিত্ববোধ ও হৃদয়ানুভূতির ছবি আমি পছন্দ করি। অসংযত এবং যৌন উত্তেজক ছবি আমার অসহ্য লাগে। নোংরামি ও ক্যাবলামি দেখিয়ে ছবিতে যে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় সেটাকে বিকৃত ও অসুস্থ রুচি বলে মনে হয় এবং এই ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা মানব-কল্যাণকর হতে পারে না।

কমলা দেবী
কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র-কাননে যাত্রা উৎসব

রবীন্দ্র-কাননে (বিডন স্কোয়ার) গত ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত তিন সপ্তাহব্যাপী যাত্রা-উৎসব শুরু হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

গত সপ্তাহে উৎসব শুরু হওয়ার আগে পরিষদ রবীন্দ্র-কাননে নির্মিত যাত্রা-মণ্ডপে এক সাংবাদিক-সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার সাংবাদিকদের জানান যে, যাত্রা-উৎসবে মাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে মাইক ব্যবহার করা বা না করা প্রতি যাত্রা-দলের ইচ্ছাধীন। উৎসবে মোট ২২টি দলের অভিনয়ে ৩৩টি নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে শ্রী সরকার সাংবাদিকদের জানান। তিনি আরও বলেন, ওই ৩৩টি নাটকের মধ্যে ২৫টি পেশাদার সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হবে। রবীন্দ্র-কাননের মণ্ডপে দর্শকদের জন্য মোট ৪৩০০টি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে অভিনয়-মঞ্চ স্থাপন

রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-তে মেগাফোন কোম্পানীর নিজস্ব "রেকর্ডিং রুম"-এর উদ্বোধন-উৎসবে গান গাইছেন যশস্বী শিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছেন রাধাকান্ত নন্দী।

করা হয়েছে। মঞ্চের সকল দিক ঘিরে দর্শকদের আসন পাতা হয়েছে। যাত্রা-উৎসবে আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীতাপস সেন। আলোকসম্পাত যাতে সুষ্ঠু যাত্রাভিনয়ের সহায়ক হয়, সেদিকে শ্রী সেন বিশেষ নজর রাখবেন বলে সাংবাদিকদের জানান। **জালিয়াৎ** (তরুণ অপেরা), **ধর্মের জয়** (জনতা অপেরা), **পরিচয়** (নিউ গণেশ অপেরা), **কবি চন্দ্রাবতী** (নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা), **কবরের কান্না** (আর্য অপেরা), **আগুন** (নিউ গণেশ অপেরা), **শ্রীনিমাই সন্ন্যাস** (শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট), **দোষী কে?** (জনতা অপেরা), **বীর অভিমন্যু** (নিউ রয়েল বীণাপাণি), **বর্গী এল দেশে** (নবরঞ্জন অপেরা), **মগের দেশে** (নাট্যভারতী), **সতীর ঘাট** (অম্বিকা নাট্য কোম্পানী), **জন্মের অভিশাপ** (নবরঞ্জন), **অতীতের কথা** (আর্য), **দ্বিতীয় পানিপথ** (সত্যম্বর অপেরা), **শয়তানের চর** (অম্বিকা), **রাজা দেবিদাস** (সাঁঝের আসর), **সোনাই দীঘি** সত্যম্বর), **নবাব সিরাজদ্দৌলা** (নাট্যভারতী) এবং **পতিতের ভগবান** (নট্ট কোম্পানী) প্রভৃতি যাত্রা-নাটক উৎসবের আগামী আকর্ষণ।

পাদপ্রদীপের আলোয়

র‍্যাপসডির "শ্যামা"

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "শ্যামা" ইতিপূর্বে বহু-শৌখিন সংস্থা কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়েছে। তবু এর আবেদন যেন ফুরোয় না। গত রবিবার নিউ এম্পায়ারে দক্ষিণ কলকাতার সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা র‍্যাপসডি নিবেদিত "শ্যামা" তাই বুঝি নতুন করে আবার দর্শকদের ভাল লাগল।

র‍্যাপসডির শিল্পিবৃন্দ অভিনীত "শ্যামা" দর্শকদের আরও বিশেষ করে তৃপ্তি দিয়েছে সুপরিকল্পিত একক ও সমবেত নৃত্যাংশের গুণে। সবিতা বসু (শ্যামা), হিমাংশু গোস্বামী (বজ্রসেন), ভানু দে (উত্তীয়) ও শক্তি নাগ (কোটাল) তাঁদের মার্জিত ও চিত্তাকর্ষক নৃত্যে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। শক্তি নাগের নৃত্য-পরিচালনা এ কারণে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরা অভিনয়-অভিব্যক্তিতেও নিজস্ব চরিত্রের আনন্দ ও বেদনাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অভিনয়-কুশলতায় সবিতা বসু আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গান (উত্তীয়র চরিত্রে) শ্রোতাদের অভিভূত করেছে। কানাই মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানও (বজ্রসেনের চরিত্রে) সুখশ্রাব্য হয়েছে।

র‍্যাপসডি অর্কেস্ট্রা পরিচালিত যন্ত্রসংগীত এই নৃত্যনাট্যের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। আলোকসম্পাত ও রূপসজ্জায় যথাক্রমে সুশীল দাস ও মদন পাঠক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

খেলাঘর অভিনীত "মালঞ্চ"

খেলাঘর সম্প্রদায় গত বছর "চোখের বালি"র নাট্যরূপ পরিবেশনে যে সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁদের সাম্প্রতিক নাট্য-প্রয়াস তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এবারেও তাঁরা একটি রবীন্দ্র-কাহিনীর নাট্যরূপ উপহার দিলেন। "মালঞ্চ"। গত ১২ই আগস্ট নিউ এম্পায়ারে এটি অভিনীত হয়।

রেজাক চৌধুরী কৃত নাট্যরূপ মূল কাহিনীকে অনুসরণ করেছে। কুশীলবের সংলাপে রবীন্দ্রনাথের ভাষাই শোনা গেছে। পাঁচটি দৃশ্যে কাহিনীটি উপস্থাপিত। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 'মালঞ্চ'র মর্মবস্তু সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিক্ততা, সংশয় আর জ্বালার মধ্যে অসুস্থ, অসহায় নীরজার সত্যোপলব্ধি; কোন্ পথ শ্রেয় জানবার পর সেই পথে উপনীত হবার জন্য নিজের সঙ্গে নীরজার সকরুণ সংগ্রাম; সেই সংগ্রামে তার অন্তিম ব্যর্থতা—নীরজার এই ট্র্যাজেডি শ্রীমতী বনানী চৌধুরীর সংবেদনশীল অভিনয়ে সুপরিস্ফুট। আদিত্যের ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায় একটি সহৃদয়, মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের সরলা স্বল্পবাক্—দ্বন্দ্বক্লিষ্ট, তবু স্থিরচিত্ত। অন্যান্য ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (হলা মালী), নবকুমার (রমেন) ও তারা ভাদুড়ি (রোশনি)।

মঞ্চপরিকল্পনা ও মঞ্চসজ্জা সুন্দর। আবহসংগীত পরিবেশানুগ। নাট্যপরিচালনার কৃতিত্ব শ্রীমতী চৌধুরীর।

বোম্বাই সমাচার

প্রযোজক-সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী হিন্দী ছবির নাম **শার্মিলা**। "জেন আয়ার"-এর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। এই ছবি সম্পর্কে বড় খবর হ'ল: এতে নায়ক-

লোলিটার গল্প

বাড়ির বাগানে বসে লোলিটা। এখানেই তাকে প্রথম দেখলেন হামবার্ট। এতক্ষণ যে বাড়ি তার পছন্দ হচ্ছিল না, সে বাড়িই তিনি নেবেন বলে হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন। "আমার বাগানটা দেখেই কি বাড়ি পছন্দ হল?—জিজ্ঞাসা করলেন লোলিটার মা শারলোটে

একজনের মা ও অন্যজনের সদ্য-বিবাহিত স্ত্রী শারলোটের অনুপস্থিতিতে লোলিটা ও হামবার্ট-এর মধ্যে বিরাজ করতে থাকে এক অব্যক্ত মধুর অনুভূতি

হামবার্ট-এর মনে নানা সন্দেহ। তাই তিনি লোলিটাকে নানাভাবে জেরা করে জানতে চাইছেন—পিয়ানোর ক্লাশ করতে যাচ্ছি বলে সে কোথায় গিয়েছিল

স্কুলের কোন নাটকে অভিনয় করার পর দর্শকের হাততালি গ্রহণ করছে লোলিটা। পাশে দাঁড়িয়ে কুইলটি—হামবার্টকে ছেড়ে যার সংগে সে পালিয়েছিল

লোলিটার পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে ওর সংগে হামবার্ট-এর কলহের একটি দৃশ্য

চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। হিন্দী চিত্রে তাঁর এই প্রথম অবতরণ। ওয়াহিদা রেহ্‌মান ছবির নায়িকা-চরিত্রের রূপ দেবেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন বীরেন নাগ। প্রযোজক হেমন্তকুমার ছবির সংগীত-পরিচালক।

উত্তমকুমার বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল, জনপ্রিয় বাংলা ছবি "অগ্নিপরীক্ষা"র যে হিন্দী চিত্ররূপটি তিনি আলোছায়া প্রোডাকশন্স-এর পতাকাতলে নিবেদন করবেন তার নায়িকা-চরিত্রের জন্য বৈজয়ন্তীমালাকে চুক্তিবদ্ধ করার জন্যই তিনি বোম্বাই-এ গিয়েছিলেন। উত্তমকুমার নিজেই ছবিতে নায়কের রূপসজ্জায় অবতরণ করবেন। নৌশাদ ছবির সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করবেন বলেও জানা গেল। নীতীন বসু ছবিটি পরিচালনা করবেন।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বিচারে "বেন-হুর" গত বছরের শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের সম্মান লাভ করে। অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্মানপত্র হাতে "বেন-হুর"-এর পরিচালক উইলিয়াম ওয়াইলার

এ মাসের মাঝামাঝি চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারাম-এর স্টুডিওতে যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় পলাতক ছবিটির কাজ শুরু হচ্ছে। এই বাংলা ছবির প্রযোজক ভি শান্তারাম নিজে। অনুপকুমার (নায়ক), সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ছবি বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় ও জহর রায় ছবির কয়েকজন প্রধান শিল্পী। যাত্রিক গোষ্ঠী যে কয়েকজন কলাকুশলীকে এ ছবিতে কাজ করার জন্য বোম্বাই-এ নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সৌম্যেন্দু রায় (আলোকচিত্রশিল্পী), দুলাল দত্ত (চিত্রসম্পাদক) ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত (শিল্প নির্দেশক)।

শংকর-দম্পতির বিদেশ যাত্রা

নৃত্যশিল্পী-দম্পতি উদয়শংকর ও অমলাশংকর তেইশজন সহশিল্পীকে নিয়ে গত ৩রা সেপ্টেম্বর আমেরিকা যাত্রা করেছেন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় শিল্পিদল এই বিদেশ-সফরে রওয়ানা হয়েছেন। শংকর-দম্পতি ও তাঁদের সম্প্রদায় আট সপ্তাহ ধরে আমেরিকা ও কানাডায় নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। বিখ্যাত আমোদ-অনুষ্ঠান ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। অন্যান্য নৃত্যাংশের সঙ্গে উদয়শংকর-অমলাশংকর বিদেশে রবীন্দ্রনাথের "সামান্য ক্ষতি" নৃত্যনাট্যটি নিবেদন করবেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ভারত সরকারের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়া সমেত য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

কথায় বলে, 'স্পোর্টস অ্যান্ড পলিটিক্স ডফার্স'। অর্থাৎ খেলাধুলার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে? কার্যক্ষেত্রে সত্যিই কি খেলাধুলা রাজনীতির প্রভাবমুক্ত? না, খেলাধুলার মধ্যেও রাজনীতির কূট-খেলার অঢেল আয়োজন?

পরেরটাই বোধ করি সত্যি। তাই দেখতে পাই, উৎকট বর্ণবিদ্বেষের জন্য দক্ষিণ

১৫০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ী মহীন্দার সিং

আফ্রিকার ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে ঠাঁই নেই; প্রায় পঞ্চাশ কোটি অধিবাসী-অধ্যুষিত লাল চীনের স্থান অলিম্পিক অঙ্গনের বাইরে; ইসরাইল ও তাইওয়ান চীন চতুর্থ এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান ও জার্মানী ঠাঁই পায়নি ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে।

রাজনৈতিক কারণে বড় বড় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা এবং না করার আরও নজির আছে। কিন্তু এবার জাকর্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমে ইসরাইল ও তাইওয়ান চীনের যোগদানে বাধার ফলে এমন এক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, যা এর আগে কোন ক্রীড়ানুষ্ঠানে দেখা যায়নি। জল অনেক ঘোলা হয়েছে এবং সেই ঘোলা জলে এশিয়ান গেমসও ডুবতে বসেছে। এখন অবশ্য ভেসে আছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন এশিয়ান গেমস থেকে তাঁদের অনুমোদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ওয়েট-লিফটিং ফেডারেশনের হুমকিতে ভারোত্তোলনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে গেছে। এক, চতুর্থ এশিয়ান গেমসের আয়োজনকারী দেশ ইন্দোনেশিয়া ছাড়া আর কোন দেশই ভারোত্তোলনে অংশ গ্রহণ করেনি, ফলে প্রতিযোগিতাও স্থগিত হয়ে গেছে। অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন প্রত্যাহারের ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অংশ গ্রহণ করেনি ট্রাক ও ফিল্ড ইভেণ্টে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—মত-বিরোধ আরম্ভ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং ইসরাইল ও তাইওয়ান চীনের অংশ গ্রহণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কোন্দল আরও কিছুটা দানা বেঁধে উঠতে পারে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সংস্থাও নতুন নতুন ফতোয়া জারি করতে পারেন। যার ফলে ভবিষ্যতে এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠানে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

•

এশিয়ান গেমস পরিচালনার জন্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ক্রীড়া-পরিচালকদের নিয়ে গঠিত 'এশিয়ান গেমস ফেডারেশন' একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রীড়া-সংস্থা। কিন্তু আঞ্চলিক খেলাধুলা পরিচালনার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সংস্থাগুলির অনুশাসন মানতে এঁরা বাধ্য। তা না হলে কোন সংস্থাই টিকতে পারে না, তার গুরুত্ব এবং জলুসও ম্লান হয়ে যায়। তা ছাড়া এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের 'চার্টার' বা অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হিসাবে খেলাধুলার আয়োজনকারী দেশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশকে আমন্ত্রণ করতে এবং তাঁদের দেশে প্রবেশের 'ভিসা' দিতে বাধ্য। স্বীকার করতে বাধা নেই, ইন্দোনেশিয়া এই 'চার্টার' অমান্য করে ইসরাইল ও তাইওয়ান চীনকে চতুর্থ এশিয়ান গেমে অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তারই ফলে যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এশিয়ার ক্ষিপ্রতমা মেয়ে—ফিলিপাইনের মোনা সুলেমান

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এশিয়ান গেমসে অংশ গ্রহণকারী ইসরাইল ও তাইওয়ান

দশ হাজার মিটার দৌড়ের বিজয়ী তারলোক সিং

চীনের কাছে যথারীতি অংশ গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। আর ১৭টি দেশের মত তারাও চতুর্থ এশিয়ান গেমে অংশ গ্রহণে আগ্রহী ছিল। কিন্তু তারা অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। তাইওয়ান ও ইসরাইলের অভিযোগ — ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশের জন্য তাদের 'ভিসা' বা 'অভিজ্ঞান-পত্র' পাঠানো হয়নি। বারবার আবেদন-নিবেদন করেও তারা ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছে।

এদিকে চতুর্থ এশিয়ান গেমসের পরিচালক সমিতি বলেছেন, 'ভিসা' পাঠানো হয়েছে। কার কথা সত্যি? হয়তো দু' পক্ষেরই। ভিসা পাঠানো হলেও সে 'ভিসা' যে নির্বিঘ্নে সরকারী শাসনযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বিরোধী রাষ্ট্রে পৌঁছবে, এমন কি কথা আছে? এখানে স্মরণ রাখা দরকার—ইসরাইল ও তাইওয়ান চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, আর এশিয়ান গেমসের পরিচালক সমিতি আর ইন্দোনেশীয় সরকারও অভিন্ন নয়। তাই তাইওয়ান চীন এবং ইসরাইলের

'ভিসা' না পাবার কারণ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। গূঢ় উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাখ্যা চলে না। চতুর্থ এশিয়ান গেমসের পরিচালকবর্গও ইসরাইল ও তাইওয়ান চীনের 'ভিসা' না পাবার কারণের কোন ব্যাখ্যা করেননি। শুধু বলেছেন, 'ভিসা' পাঠানো হয়েছে।

এদিকে ইসরাইল ও তাইওয়ান ছাড়বার পাত্র নয়। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সংস্থার কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করে চতুর্থ এশিয়ান গেমসকে নাকচ করবার দাবি জানিয়েছে। ফলে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সংস্থা তাদের অনুমোদন প্রত্যাহার করেছে।

'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে'—অর্থাৎ খেলাধূলো যথারীতি চলে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করা না হয়—এই উদ্দেশ্যে চতুর্থ এশিয়ান গেমসের নাম পরিবর্তনের কথা উঠেছিল। পরে এশিয়ান গেমসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রী জি ডি সোন্ধী চতুর্থ এশিয়ান গেমস থেকে 'চতুর্থ' কথাটি বাদ দেবার প্রস্তাব তুলেছিলেন। কোন প্রস্তাবই পাস হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষ শ্রী সোন্ধীর বিরুদ্ধে নানা কটু-কাটব্য মন্তব্য করে তাঁকে ইন্দোনেশীয়-বিরোধী বলতেও দ্বিধা করেননি। এবং যেহেতু শ্রী সোন্ধী ভারতের অধিবাসী, সেহেতু ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রী ভারতের সঙ্গে কোন নতুন বাণিজ্য-চুক্তি করতে সরকারী দপ্তরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রেসিডেন্ট সুকর্ন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট রাখার সংকল্প জানিয়েছেন। শ্রী সোন্ধীর প্রস্তাবও এক রকম খারিজ হয়ে গেছে।

তবে শ্রীসোন্ধীর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীসুহার্তো যেভাবে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধের কথা টেনেছেন, একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে তা আশা করা যায় নি। জাকর্তায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী এ পি পন্থ শ্রীসুহার্তোর বিবৃতিকে বিস্ময়কর ও মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করে বলেছেন শ্রীসোন্ধী ভারত সরকার বা ভারতের প্রতিনিধি নন; এমন কি একজন ভারতীয় হিসাবেও তিনি ইন্দো-নেশিয়ায় আসেন নি। তিনি এখানে এসেছেন এশিয়ান গেমস-এর একজন কর্মকর্তা হিসাবে।

সত্যিই তাই। শ্রী জি ডি সোন্ধী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে কোন প্রস্তাব উত্থাপনও করেন নি। এশিয়ান গেমস-এর প্রধান প্রবর্তক এবং গেমস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রী সোন্ধী ভবিষ্যৎ ভেবেই প্রস্তাবটা তুলেছিলেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবেও তাঁর একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা শ্রীসোন্ধীর দায়িত্বের কথা বুঝতে পারেন নি। যেমন সাধারণে বুঝতে পারে নি ইসরাইল ও তাইওয়ান চীনকে ইন্দোনেশিয়ার 'ভিসা' দেবার অসুবিধার কথা। তবু নীতিগতভাবে ইন্দোনেশিয়া তাইওয়ান চীন ও ইসরাইলকে চতুর্থ গেমসে অংশ গ্রহণের জন্য 'ছাড়পত্র' মঞ্জুর করতে বাধ্য।

বারো দিনব্যাপী এশিয়ান গেমসের খেলা-ধূলোর পর্যালোচনা করা সময়সাপেক্ষ। এই

সপ্তাহের লেখা শেষ করার সময় পর্যন্ত সমস্ত ফলাফলও হাতে এসে পৌঁছয় নি। তাই আজ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ফলাফল নিয়েই দুই একটি কথা আলোচনা করছি।

অ্যাথলেটিকসের ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন্টে পুরুষ ও মেয়েদের ৩২টি বিষয়ের মধ্যে ২২টি বিষয়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহু বিষয়ে দুইজন, তিনজন, এমন কি চারজনও পুরনো রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। এ কৃতিত্ব এশিয়ার অ্যাথলীটদের অগ্রগতির চিহ্ন। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস মানের তুলনায় এশিয়ার অ্যাথলীটদের স্থান কোথায়? সব বিষয়েই তারা বিশ্বমানের অনেক পেছনে।

জাপান নিঃসন্দেহে খেলাধুলোয় এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। অ্যাথলেটিকসে এবার তারা ১১টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করে ১৮টি স্বর্ণপদক পেয়েছে। তবু জাপান বিশ্বমানের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি।

১৯৫৮ সালের টোকিও এশিয়ান গেমস-এর তুলনায় ভারতের ফলাফল এবার সন্তোষজনক। ভারতের অ্যাথলীটরা পাঁচটি স্বর্ণ, পাঁচটি রৌপ্য এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। নতুন রেকর্ড করেছেন চারটি বিষয়ে।

এবার অ্যাথলেটিকসে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ফিলিপাইনের উঠতি মেয়ে মোনা সুলেম্যান। সুলেম্যান তিনটি স্বর্ণ এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। এশিয়ার ক্ষিপ্রতম মেয়ে হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন এক শো ও দু শো মিটারে রেকর্ড সময়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইন্দোনেশিয়ার মহম্মদ সারেঙ্গাৎ এবং পাকিস্তানের মোবারক শাহর কৃতিত্বও উল্লেখের দাবি রাখে। একক কৃতিত্বে এঁরা পেয়েছেন দুটি করে স্বর্ণপদক।

'দেশ'-এর ৪৩শ সংখ্যায় এশিয়ান ও অলিম্পিক রেকর্ডের একটা তুলনামূলক 'চার্ট' প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এ সপ্তাহে শুধু এশিয়ান গেমসের অ্যাথলেটিকসের ফলাফল প্রকাশ করা হল। পরের সংখ্যায় অন্যান্য খেলাধুলা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যাবে।

[পুরুষ]

১০০ **মিটার** দৌড়—১ম—মহম্মদ সারেঙ্গাৎ (ইন্দোনেশিয়া) সময় ১০·৫ সেঃ (হিট ১০·৪ সেকেণ্ড—নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—এম জেগাথেসাম (মালয়), ৩য় আর ওনোয়ে (ফিলিপাইন);

২০০ **মিটার দৌড়**—১ম—এম জেগাথেসাম (মালয়) সময়—২১·৩ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—এম ইজিমা (জাপান), ৩য়—মহম্মদ সারেঙ্গাৎ (ইন্দোনেশিয়া);

৪০০ **মিটার দৌড়**—১ম—মিলখা সিং (ভারত) সময়—৪৬·৯ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—মাখন সিং (ভারত), ৩য়—কিমিতাদা (জাপান);

ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন গুরুবচন সিং

৮০০ **মিটার দৌড়**—১ম—এম মরিমটো (জাপান) সময়—১মিঃ ৫২·৬ সেকেণ্ড, ২য়—দলজিৎ সিং (ভারত), ৩য়—অমৃত পাল (ভারত);

১৫০০ **মিটার দৌড়**—১ম—মহীন্দার সিং (ভারত) সময়—৩ মিঃ ৪৮·৬ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—অমৃত পাল (ভারত), ৩য়—সাতসুয়ো ইয়াসিতা (জাপান);

৫০০০ **মিটার দৌড়**—১ম—মোবারক শাহ (পাকিস্তান) সময়—১৪ মিঃ ২৭·২ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—সাবুরো ওকোমিজো (জাপান), ৩য়—তারলোক সিং (ভারত);

১০০০০ **মিটার দৌড়**—১ম—তারলোক সিং (ভারত) সময়—৩০ মিঃ ২১·৪ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—ওয়েরুয়ো ফুনাই (জাপান), ৩য়—গুরনাম সিং (ইন্দোনেশিয়া);

৩০০০ **মিটার স্টিপল চেজ**—১ম—মুবারক শাহ (পাকিস্তান) সময়—৮ মিঃ ৫৭·৮ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—সাবুরো ওকোমিজো (জাপান), ৩য়—জেনজি ওকুজাওয়া (জাপান);

১১০ **মিটার হার্ডলস**—১ম—মহম্মদ সারেঙ্গাৎ (ইন্দোনেশিয়া) সময়—১৪·৩ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—গোলাম রাজিক (পাকিস্তান), ৩য়—হিরোকাজু ইয়াসুদা (জাপান);

৪০০ **মিটার হার্ডলস**—কেইজ জাউ ইয়াঁ (জাপান) **সময়—৫২·২ সেকেণ্ড**—(নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—কেইকি জিমা (জাপান), ৩য়—কে সেলভারমন (মালয়);

৪×১০০ **মিটার রিলে—১ম—ফিলিপাইন, সময়—৪১·৩ সেকেণ্ড, ২য়—জাপান, সময়—৪১·৫ সেকেণ্ড, ৩য়—মালয়, সময় ৪১·৫ সেকেণ্ড;**

৪×৪০০ **মিটার রিলে**—১ম—ভারত (মাখন সিং, দলজিৎ সিং, জগদীশ সিং ও মিলখা সিং) সময়—৩ মিঃ ১০·২ সেকেণ্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—মালয়, সময়—৩ মিঃ ১৩·৮ সেকেণ্ড, ৩য়—জাপান, সময় —৩ মিঃ ১৪·৬ সেকেণ্ড;

হাই জাম্প—১ম—কুইয়োসি গুসিওকা (জাপান) উচ্চতা—২·০৮ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—এন এথিরবীরসিংহম (সিংহল), ৩য়—সি বারোত্তা (ফিলিপাইন);

লং জাম্প—১ম—তাকুয়াকি ওয়াজাকি (জাপান) দূরত্ব ৭·৪১ মিটার, ২য়—কাইহি ওডা (জাপান), ৩য়—আওয়া; পাপিলাজা (ইন্দোনেশিয়া);

হপ স্টেপ ও জাম্প—১ম—কোজি সাকুরাই (জাপান), দূরত্ব ১৫·৫৭ মিটার, ২য়—টোমিও ওটা (জাপান), ৩য়—আওয়াং পাপিলাজা (ইন্দোনেশিয়া);

পোল ভল্ট—১ম—হিসাও মোরিতা—(জাপান) উচ্চতা—৪·৪০ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—কুনিয়াকি ইয়ামাজাকি (জাপান), ৩য়—আল্লাদিত্তা (পাকিস্তান);

বর্শা ছোঁড়া—১ম—তাকাশিমাকি (জাপান) দূরত্ব—৭৪·৫৬ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—মহম্মদ নওয়াজ (পাকিস্তান), ৩য়—হিদেতো কানাই (জাপান);

ডিসকাস ছোঁড়া—১ম সোজো ইয়ানাগাওয়া (জাপান) দূরত্ব ৪৭·০১ মিটার; ২য়

—পারদমন সিং (ভারত), ৩য়—সুহেই কানেকো (জাপান);

লোহার গোলা ছোড়া—১ম—তেরুয়া ইটোকাওয়া (জাপান), দূরত্ব ১৫·৫৭ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—দীনশা ইরানী (ভারত), ৩য়—যোগীন্দার সিং (ভারত);

হাতুড়ি ছোড়া—১ম নোবোরু ওকামটো (জাপান), দূরত্ব—৬৩·৮৮ মিটার; (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—তাকিও গৃঘারা (জাপান), ৩য়—মহম্মদ ইকবাল (পাকিস্তান);

ডেকাথলন—১ম—গুরবচন সিং (ভারত) ৬৭৩৫ পয়েন্ট; ২য়—সোজুকি সুজাকি (জাপান) ৬১৯৫ পয়েন্ট, ৩য়—সিরিল পেরেরা (মালয়) ৫৫৭৫ পয়েন্ট;

ম্যারাথন দৌড়—১ম—মাকুকি নাসাতা (জাপান) সময় ২ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৫৪·২ সেকেন্ড, ২য়—মহম্মদ ইউসুফ (পাকিস্তান), ৩য়—মাইতুং নাওয়া (বার্মা)।

[মহিলা]

১০০ মিটার দৌড়—১ম—মোনা সুলেম্যান (ফিলিপাইন), সময়—১১·৮ সেকেন্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—ইকোকু যোদা (জাপান), ৩য়—তাকুকো ইনোকুচি (জাপান);

২০০ মিটার দৌড়—১ম—মোনা সুলেম্যান (ফিলিপাইন), সময়—২৪·৫ সেকেন্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—হারুকো ওয়ামাসিকি (জাপান), ৩য়—নিমল ডিমানায়ক (সিংহল);

৮০০ মিটার দৌড়—১ম—চিজুকি তানাকা (জাপান), সময়—২ মিঃ ১৮·২ সেকেন্ড (এসিয়ান গেমের নতুন বিষয়), ২য়—ওয়াই রাইউকো হিরানো (জাপান), ৩য়—সোয়েওয়ার্তিনি (ইন্দোনেশিয়া);

৮০ মিটার হার্ডলস—১ম—ইকুকো সোদা (জাপান), সময়—১১·৬ সেকেন্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—ফ্রান্সিসকা সানোপল (ফিলিপাইন), ৩য়—কিৎকায়ো সাইমাদা (জাপান);

৪×১০০ মিটার রিলে—১ম—ফিলিপাইন, সময়—৪৮·৬ সেকেন্ড (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—জাপান, সময় ৪৮·৬ সেকেন্ড, ৩য়—ইন্দোনেশিয়া ৫০·৬ সেকেন্ড;

হাই জাম্প—১ম—কিনুয়ো সুৎসুমি (জাপান), উচ্চতা ১·৬০ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—টি পারাপান লিনাশেয়ান (তাইল্যান্ড), ৩য়—সোয়েকেস্ট পোয়েদজোনারজোনো (জাপান);

লং জাম্প—১ম—সাচিকো কিসিমটো (জাপান), দূরত্ব ৫·৭৫ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—এফ ইটো (জাপান), ৩য়—মৌরিন অ্যার্নালি (মালয়);

বর্শা ছোড়া—১ম—হিরোকো সাটো (জাপান), দূরত্ব—৪৮·১৫ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—ফুজি আবা (জাপান), ৩য়—এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট (ভারত);

ডিসকাস ছোড়া—১ম—কিইকো মোরাসে (জাপান), দূরত্ব—৪৫·৯০ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—সাইকো ওবোনাই (জাপান), ৩য়—জোসেপাইন ডি লা ভিনা (ফিলিপাইন);

লোহার গোলা ছোড়া—১ম—সাইকো ওবোনাই (জাপান), দূরত্ব—১৪·০৪ মিটার (নতুন এসিয়ান রেকর্ড), ২য়—ইয়াসুকো মাৎসুদা (জাপান), ৩য়—মোনা সুলেম্যান (ফিলিপাইন)।

খেলাধূলায় মহিলা

মুকুল

রেণুকা সাহা

সাঁতারের উঠতি মেয়ে। বড় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে করাঘাত শোনা যাচ্ছে, সম্মান এখনো হাতে আসেনি।

বয়স কেবল পনেরো। আদি মহাকালী পাঠশালার ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। আজাদ হিন্দ বাগের সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা।

লোকে বলে সাঁতারে সাবলীলা। কিন্তু রেণুকা সাহার শিক্ষাগুরু গোঁসাইদা বলেন —এখনো অনেক দেরি। খুঁৎ কোথায়? না লেগ কিক শ্যালো, পুল-ও পুশ-এ পারফেকশন আসেনি।

—'তার মানে?'

'মানে রেণুকা যখন সাঁতার কাটার সময় পা দিয়ে জল ঠেলে, তখন পা জলের গভীরে প্রবেশ করে না। জলের উপর ভাসা-ভাসা পায়ে জল ঠেলতে চেষ্টা করে। ওতে সাঁতারের ফোর্স বাড়ে না। গতিবেগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না সুসমঞ্জস ছন্দ।

—'আর পুল ও পুশ-এর পারফেকশন কি?'

—'পুল, অর্থাৎ হাত দিয়ে জল টেনে আবার সেই হাতেই জল ঠেলা। বাড়বার মুখে হাত দিয়ে জল টেনে সেই জলে ধাক্কা মেরে এগিয়ে যাবার সময় হাতের যে কৌশলটুকুর প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে দেহের গতিবেগ লুকিয়ে থাকে। যার পুল ও পুশ যত ভাল, জলের উপর তার গতি তত সাবলীল।

গোঁসাইদা, অর্থাৎ সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সাঁতারের কোচ শ্যামাপদ গোস্বামীর মতে রেণুকার বোয়েন্সি ভাল। জলের উপর ভাসমান দেহের সব সময়ই একটা সতেজ ভাব। যেন স্ফূর্তির ফোয়ারা।

সবচেয়ে যা নিয়ে ছাত্রীর কৃতিত্বে শিক্ষাগুরুর গর্ব, সেটা হচ্ছে অতি অল্প সময়ে ওর উন্নতি।

বেশী দিনের কথা নয়, ১৯৫৯ সালে বঙ্কেশ্বর সাহা মেয়ে রেণুকাকে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে ভরতি করে দিয়েছিলেন সাঁতার শেখার জন্য। সাঁতারের নভিস, অর্থাৎ আনাড়ী মেয়ে হিসেবে অনিল সরকারের কাছে সাঁতার শিখতে আরম্ভ করে মাত্র দু' মাসের মধ্যে ও সাঁতারুর মর্যাদা পায়। গোঁসাইদার শিক্ষার ফলে পরের বছর বৌবাজার, ওয়াই এম সি এ, সেণ্ট্রাল, খিদিরপুর, ন্যাশনাল প্রভৃতি ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ফ্রি-স্টাইল ও ব্যাক-স্ট্রোকের প্রায় সমস্ত প্রথম পুরস্কার রেণুকার হাতে আসে। ঐ বছরই অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমস-এর ট্রায়ালে ওর ডাক পড়ে। এবং বাঙলা দলে নির্বাচিত হয়ে ইন্দোর থেকে একটি পুরস্কার নিয়ে ফিরে আসে। রেণুকা ছিল রিলে রেসে বিজয়ী বাঙলা দলের অন্যতমা।

ইন্দোর থেকে ফিরে আসবার পর ঢাকুরে লেকে ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় রেণুকা ফার্স্ট। শুধু ফার্স্টই নয় ওখানে নামকরা সাঁতার পটীয়সীদের মধ্যে যারা প্রথম হয়েছে—সন্ধ্যা চন্দ্র, মীরা কারিয়াপ্পা, গীতা দে, শিবানী দত্ত, সবার চেয়ে রেণুকার সময় ভাল।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৬১ সালে কলকাতার সমস্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় একশো মিটার ফ্রি-স্টাইল ও ব্যাক-স্ট্রোকের প্রথম পুরস্কার রেণুকার হাতে। বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপেও দুই বিষয়ে প্রথম স্থান। আজাদ হিন্দ বাগে অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমসের সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধি হিসাবে একশো ও দুশো মিটার ফ্রি-স্টাইল এবং একশো মিটার ব্যাক-স্ট্রোকের বিজয়িনী। স্কুল-ছাত্রীদের সাঁতারে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা হিসাবে সুনাম অর্জন।

এবার রেণুকা সাহার সিনিয়র সাঁতারুর মর্যাদা। আইনমতে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে প্রাইজ পাবার পরই জুনিয়রের ছাপ লোপ পেয়ে যায়।

সাঁতারে বাঙলার শীর্ষস্থানীয়দের সঙ্গে রেণুকার অবশ্য তুলনা চলে না। সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, মীরা কারিয়াপ্পা, অনুরাধা গুহঠাকুরতার সুনাম ভারতব্যাপী। তবে বাঙলার উঠতি মেয়েদের মধ্যে রেণুকা সাহা এখন একটি বিশেষ নাম।

রেণুকা সাহার সাঁতারের ভঙ্গি

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৭শে আগস্ট—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ দেশের মজুতদার, ফাটকাবাজ ও মুনাফা শিকারীদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, সমাজ বিরোধীদের সম্বন্ধে যে ব্যবহার করা হয় তাহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম বিভিন্ন রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে সংসদের উভয় সভায় বিবৃতি প্রসঙ্গে আজ বলেন যে, সাম্প্রতিক বন্যায় ৭টি রাজ্যে ৯০ জনের প্রাণহানি ও ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার একরের অধিক জমির ফসল বিনষ্ট হইয়াছে।

২৮শে আগস্ট—লোকসভায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ৩৯৩—৫ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত হয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ১৬শ রাজ্যরূপে নাগাভূমির সৃষ্টির জন্য এই বিল পেশ করা হইয়াছিল। ইহা সংবিধানের ১৩শ সংশোধন।

আজ রাজ্যসভায় তৃতীয় যোজনার অগ্রগতি সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ককালে মুষ্টিমেয়ের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কৃষি-পণ্যের মালিকানা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিরোধী ও কংগ্রেস দলের অনেক সদস্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, দুইটি যোজনার ফলে ধনী আরও ধনী হইয়াছে এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইয়াছে।

২৯শে আগস্ট—আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তর কালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া যায় তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে দুই তিন দিনের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হইবে।

অদ্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের নাকি জানাইয়াছেন যে ১৯৬৩ সালের মার্চ হইতে বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতনের দায়িত্ব রাজ্য সরকার বহন করিবেন।

৩০শে আগস্ট—আজ লোকসভায় ক্ষুব্ধ সদস্যগণ সরকার পক্ষের বক্তব্যে জানিতে পারেন, পাকিস্তানী হানাদারগণ গত ১লা আগস্ট ত্রিপুরা জেলার পুরান রাজবাড়ি থানার অন্তর্গত রাম-দাসনগর গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুইজন ভারতীয়কে অপহরণ করে, তাহাদিগকে হত্যা করে এবং তাহাদের মুণ্ডহীন দেহ দুইটি ত্রিপুরার মধ্যেই এক জঙ্গলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যায়।

পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ রাজ্যসভায় এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সরকার জিনিসপত্রের দর আর বৃদ্ধি পাইতে দিবেন না। দরবৃদ্ধি রোধের জন্য সরকার কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সব ব্যবস্থা কার্যকর করা খুবই কঠিন। কিন্তু ঐ কঠিন কাজ করিতে সরকার দৃঢ়সঙ্কল্প।

৩১শে আগস্ট—কলিকাতা পৌরসভার কমি-শনারকে সাহায্যের জন্য এক বা একাধিক [illegible] ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

লোকসভায় আজ তুমুল উত্তেজনা। সংসদের ইতিহাসে আজই প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চীৎকার করিয়া থামাইয়া দেওয়া হয়। অধ্যক্ষকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং অবশেষে সোস্যালিস্ট সদস্য শ্রীরামসেবক যাদব এক সপ্তাহের জন্য সভা হইতে বহিষ্কৃত হন।

১লা সেপ্টেম্বর—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার প্রথম বছর (১৯৬১-৬২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশুপালন খাতে বরাদ্দ টাকার প্রায় অর্ধেকই খরচ করিতে পারেন নাই। মোট বরাদ্দ ছিল ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। খরচ হইয়াছে ২৮ লক্ষের সামান্য বেশী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নজির আরও খারাপ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনজন সরকারী অফিসার নিয়োগের প্রশ্ন লইয়া গত কয়েকদিন ধরিয়া একশ্রেণীর কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের মধ্যে যে ভয় ও সন্দেহের ঘোলাটে আবহাওয়া দেখা দিয়াছিল—রাজ্য সর-কারের অর্ডিন্যান্স জারির পর তাহা অনেকটা দূর হইয়া যায়।

২রা সেপ্টেম্বর—ব্যাপকভাবে 'ভুয়া' সদস্য গ্রহণ করায় কংগ্রেসের শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কিত সাতজন সদস্যবিশিষ্ট এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি আজ বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন।

বর্তমান ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে স্পেশ্যাল পুলিস সংস্থা যে সকল মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহার ফলে ১০৭ জন সরকারী কর্মচারী (ইহাদের মধ্যে ১৬ জন গেজেটেড অফিসার) বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তদন্ত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে আগস্ট—জলের নীচে, আবহ মণ্ডলে ও মহাকাশে আণবিক বোমার পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার এক চুক্তিতে রাজী হওয়ার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডী রাশিয়ার প্রতি মিলিতভাবে যে আহ্বান জানাইয়াছেন, রাশিয়া আজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভায় অদ্য বর্তমান এশিয়ান গেমস-এর নাম বাতিল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাইওয়ান চীন ও ইস্রাইলের যোগদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির ফলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৮শে আগস্ট—সরকারী মধ্যপ্রাচ্য নিউজ এজেন্সী আজ বলেন যে, আরব লীগ পরিষদ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপমান ও মিথ্যার অভিযান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না লইলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র আরব লীগ পরিত্যাগ করিবে।

আজ জেনেভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। উহাতে রাশিয়া বলে যে, আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য এমন কোন চুক্তি বিবেচনা করিতে সে রাজি নয়, যে চুক্তিতে ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটাইবার অনুমতি দেওয়া থাকিবে।

২৯শে আগস্ট—রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্থায়ী সেক্রে-টারী জেনারেল উ থাণ্ট গতকাল রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মুখে যে সমস্ত বড় সমস্যা আছে সেই সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

রাশিয়া কর্তৃক ভারতের নিকট প্রস্তাবিত মিগ-২১ জেট জঙ্গী বিমান বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট চীন সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট তীব্র আপত্তি জানাইয়াছে।

৩০শে আগস্ট—প্রেসিডেণ্ট কেনেডী গতকাল তাঁহার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, আগামী ১লা জানুয়ারী পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার তারিখ ধার্য করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে।

৩১শে আগস্ট—ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুহার্তো আজ বলেন, এশিয়ান গেমস সম্পর্কে 'তিক্ত বিরোধের' মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের সহিত নূতন কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা হইবে না।

গতকাল রাত্রিতে ত্রিনিদাদ ও টোবাগো দ্বীপের অধিবাসীগণ বাদ্যভাণ্ড সহকারে নৃত্যগীত করিয়া ১৬৫ বৎসরব্যাপী বৃটিশ শাসনের অব-সান ঘোষণা করিয়াছে।

হ্যানোভারের একটি প্রতিষ্ঠান, 'ক্লিনিকস্টার" নামক একটি অস্ত্রোপচার কক্ষ তৈয়ার করিয়াছেন যেটি আকাশপথে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নিয়া যাওয়া যায়।

১লা সেপ্টেম্বর—পূর্ববঙ্গে বন্যায় এ যাবৎ প্রায় একশত লোক মারা গিয়াছে। এই বন্যায় গত সপ্তাহে ৯টি জেলার ৮ হাজার বর্গমাইল পরিমিত জমি জলমগ্ন হওয়ায় সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় ২০ হাজার গবাদি পশু মারা গিয়াছে। সরকারীভাবে বলা হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ দুইশত কোটি টাকারও বেশী।

আজ কাঠমাণ্ডুতে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, নেপাল সরকারের এয়ারলাইন কর্পোরেশনের নিখোঁজ বিমানটি ২৬শে আগস্ট ধ্বংস হইয়াছে। বিমানের ছয়জন আরোহীই নিহত হইয়াছেন।

২রা সেপ্টেম্বর—ইরানের ইতিহাসের সর্বাধিক বিপর্যয়কর ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে। আজ রাত্রিতে তেহরান বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, গার্জভিনের নিকটে একটি গ্রামেই তিন হাজার লোক মারা গিয়াছে।

সোভিয়েট সরকার কিউবাকে সমরাস্ত্র সর-বরাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 'তাস' প্রচারিত এক সংবাদে বলা হয় যে, পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীদের দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া কিউবা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট সমরাস্ত্র চাহিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক ২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

(সি-২০৫৪)

সূচীপত্র

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 15th September 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ৪৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

উপদ্রবের উৎস

আইরিশম্যানদের সম্পর্কে এক সময় একটা কথা চলিত ছিল যে, তারা সর্বদাই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে। ফরাসীদের সম্পর্কেও কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। যে-সব দেশের জনসাধারণ বহুকাল বিদেশী শাসন কিংবা স্বৈরাচারী শাসনের অধীন থেকেছে সে-সব দেশের জনচিত্তে ও চরিত্রে এইরকম একটা সংস্কার অভ্যাসবশত দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত প্রায়। আমাদের দেশেও জনসাধারণের মেজাজ কি তাই সব সময় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উঁচু তারে বাঁধা? কলকাতায় সম্প্রতি সামান্য একটা কারণে যে হাঙ্গামা ঘটল তার জন্য অবশ্য জনসাধারণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী কিন্তু এরকম হাঙ্গামা বারবারই ঘটছে এবং কেবল কলকাতায় নয়; ভারতবর্ষের নানা স্থানে। অখ্যাতি কলকাতারই সব-চেয়ে বেশী, তার একটা কারণ এই মহানগরীর উপর দিয়ে ১৯৪৫ সাল থেকে দাঙ্গাহাঙ্গামা, প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভের ঝড় বয়ে গেছে বহুবার, নাগরিক জীবনধারা কখনও কখনও এমন প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে যে অনেকে কলকাতার নিরাপদ অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হয়েছেন। কিন্তু আবার এমনও ঘটেছে যখন কলকাতার জনসাধারণ সংযতভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কিন্তু কোথায়ও সামান্যতম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারেনি। আসামের ঘটনাবলীর প্রতিবাদে কলকাতার বেদনা প্রকাশ সেই সুস্থ ঐতিহ্যের স্মরণীয় নিদর্শন।

কলকাতার 'সাম্প্রতিক হাঙ্গামা'র অতর্কিত বিস্ফোরণ যেমন ক্ষতিকর তেমনি লজ্জাজনক। সামান্য কিছুসংখ্যক অসহিষ্ণু উগ্রমনোভাবাপন্ন লোক সামান্য একটা অজুহাতে কলকাতার একটি অঞ্চলকে লড়াই-এর ময়দানে পরিণত করল, ট্রাম-বাস পুড়ল, কর্মব্যস্ত মহানগরীর যানবাহন চলাচল বন্ধ হল, হাজার হাজার লোকের দুর্গতির একশেষ—এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেবল কলকাতার অখ্যাতিসূচক নয়, সমাজদেহের অভ্যন্তরে সংগুপ্ত একটা গুরুতর ব্যাধির লক্ষণ। সে-লক্ষণ কলকাতায় যতখানি প্রকট অন্য কোথাও হয়ত ততখানি নয়। কিন্তু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার ব্যাধিটা বলতে গেলে ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে ছাত্ররা গত কয়েক বৎসরে কম হাঙ্গামা সৃষ্টি করেনি। ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে নানা রকম সমাজবিরোধী লোক নিজেদের স্বার্থে এই সব হাঙ্গামায় হাত লাগিয়েছে। কলকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামাতেও ঠিক তাই ঘটেছে। অন্যত্র যে হাঙ্গামা অল্পেই শেষ হয় বা শেষ হতে পারে কলকাতায় হয় না, কেন না এই মহানগরীর আনাচে-কানাচে নানা শ্রেণীর সর্বভারতীয় এবং এমন কী, বিদেশী দুর্বৃত্ত ও সুযোগসন্ধানীদের ভিড়। কাজেই কলকাতার অখ্যাতিটা একলা কলকাতার প্রাপ্য নয়। কলকাতার জন-সাধারণের বৃহত্তম অংশ হাঙ্গামা সৃষ্টির বিরুদ্ধে, সে-বিষয়ে এখন অন্তত বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

সর্বত্রই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কতকগুলি বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক। জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন থাকে না বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, হাঙ্গামা সম্পর্কে জনসাধারণ উদাসীন। ট্রাম, বাস, ট্রেন ইত্যাদি সাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পত্তি হাঙ্গামাকারীরা যখন ধ্বংস করে তখনও জনসাধারণের তরফ থেকে প্রতিবাদ বড় একটা হয় না। আবার হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য পুলিস কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন যদি করে তখন অনেকেই পুলিসীব্যবস্থার প্রতি রুষ্ট কিংবা ক্ষুব্ধ হন। এ-কেবল কলকাতায় নয়, ভারতের সর্বত্র। কাজেই বলতে হয় বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলার ব্যাধিটা সমাজদেহে এবং জন-মানসেই কোন না কোনভাবে পরিপুষ্ট হচ্ছে। গভর্নমেণ্টের কোনও একটা নীতি কিংবা কাজের সমালোচনা করার অধিকার গণতন্ত্রীরাষ্ট্রে সকলেরই আছে। কিন্তু গভর্নমেণ্ট যা কিছু করে সবই খারাপ, এমন কী সেজন্য রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিও নির্বিচারে জনসাধারণের আক্রোশস্থল, এমন একটা বিকৃত ধারণা কেন এখনও সংগোপনে লালিত হচ্ছে, সেটাই গভীরভাবে ভাববার বিষয়।

জনসাধারণের অ ভা ব-অ ভি যো গ অসুবিধা বিস্তর সন্দেহ নাই। মজা এই যে সেজন্য আবার গভর্নমেণ্টের কাছে আমাদের বহুবিধ প্রত্যাশারও সীমা নেই। ট্রেন চাই, ট্রেন আরও নিয়মিতভাবে চলা চাই; কলকাতার রাজপথে আরও ট্রাম, আরও বাসের দাবিও অন্যায্য নয়। এ-গুলি না পাওয়ায় অসুবিধা অনেক, অসন্তোষও প্রচুর। কিন্তু তা বলে সেই অসন্তোষই কি যে কোনও সামান্য সূত্রে অভিযোগের প্রতিকারের বিধিসঙ্গত পথ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ল ণ্ড ভ ণ্ড কা ণ্ড সৃষ্টিতে নিযুক্ত হবে? গণতন্ত্রীরাষ্ট্রে ন্যায্য অভিযোগের প্রতিকারের বিধি-সঙ্গত পথ সর্বদাই খোলা আছে। সে-পথ ছেড়ে যত্রতত্র বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে স্বাভাবিক জীবনধারা বারবার বিপর্যস্ত করা হবে কেন?

ধরা যাক, রেলকর্তৃপক্ষ জনসাধারণের অনেক অভিযোগের প্রতিকারে অক্ষম অথবা উদাসীন। কিন্তু তার প্রতিকার কি যেখানে সেখানে খুসীমত ট্রেন থামিয়ে, রেলকর্মীদের উপর হামলা করে আরও বেশী দুর্ভোগ সৃষ্টি করায়? ইংরেজীতে একটা কথা আছে, দুটো অন্যায় যোগ করলে একটা ন্যায্য কাজ হয় না। ট্রেনে ভিড়, রেলকর্তৃপক্ষ অমনোযোগী কিংবা সহানুভূতিহীন: অতএব বিনা টিকিটে যাতায়াত, নিচু ক্লাশের টিকিটে উপর ক্লাশে ভ্রমণ, খুসীমত ট্রেন থামানো, কর্তব্যরত রেল ও পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধানো, এ সবই তা হলে ন্যায়সঙ্গত নাগরিক অধিকার! রেল, ট্রাম, বাস, হাটবাজার, স্কুলকলেজ এবং অফিস, সর্বত্রই যদি এই রকম নিয়ম-বন্ধনবিরোধী বেপরোয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চলতে থাকে তা হলে কোন গভর্নমেণ্টের অথবা জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নাই জনগণের মঙ্গলবিধানের জন্য কিছু কাজ করার। বিশৃঙ্খলা এবং উপদ্রব যেখানে যাঁরাই সৃষ্টি করুক তাতে জনসাধারণেরই সমূহ ক্ষতি। জনমানসের সর্বস্তরে এই সুস্থ চিন্তা যাতে দৃঢ়মূল হয় সেজন্য সতত চেষ্টিত হওয়া দরকার।

প্রধানমন্ত্রী চান যে,
বিধান-স্মৃতি-ভাণ্ডারে যেন
৬০ লক্ষ টাকা ওঠে।

তিনি জানেন যে,
সম্রাট মিডাসের পক্ষে
সে-টাকা তুলে দেওয়া
মোটেই অসম্ভব নয়।

৩৫ লক্ষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত
সপ্তাহে দিল্লি গিয়েছিলেন।

আম দরবার সেখানেও
বসেছিল।

চীন নাকি শিগগিরিই আনবিক
বোমা ফাটাবে।

যদি ফাটায়, তাহলে
তখনকার শ্লোগান হবে
'রুশী-মার্কিন ভাই-ভাই'।

Kutty

বৈদেশিকী

অন্য দেশ বা অন্য জাতির চরিত্র এবং গুণাগুণ সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনতার অনুশীলন বোধ হয় ভালো নয়। বিদেশ সম্বন্ধে কিছুটা ঝাপসা ধারণা থাকা মন্দ নয়। যাঁরা সরকারের বৈদেশিক নীতির পরিচালনা করেন তাঁদের পক্ষে অবশ্য একথা প্রযোজ্য নয়, আমরা সাধারণ মানুষের কথা বলছি। কারণ সাধারণ মানুষ নিজের মাপকাটি দিয়েই বিদেশীকে বিচার করতে যাবে অর্থাৎ নিজের ভালোমন্দ বিচারের মাপ কাঠি দিয়ে বিদেশীকে বিচার করবে। সেরূপ বিচার অনেক সময়ে অনুচিত বিচার হতে পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অপরকে বিচার করার সময়ে তার সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অতীত ইতিহাস এবং তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত তার বর্তমানকে যথাযথ-ভাবে হিসাবের মধ্যে এনে বিচার করতে পারি না। সুতরাং অপরের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি না যদি এই ভাবটা মনে থাকে তবে তার কোনো কর্ম সম্বন্ধে অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত হওয়া বা তাতে আহত বোধ করার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু মুশকিল এই যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিদেশ সম্বন্ধে এরূপ আপেক্ষিক উদাসীনতা বা অজ্ঞানতার চেতনা রক্ষার উপায় নেই। বর্তমানকালে তার প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছেন স্বদেশের সরকার সরকারী নীতিতে যখন যে-দেশ মিত্র বলে বিবেচিত হয় তখন সেই দেশের গুণ ছাড়া আর অন্য সব কিছুর থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি সরিয়ে আনাই সরকারী প্রচার নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে এবং বেসরকারী প্রচারের মাধ্যমগুলিও মোটের উপর সরকারের অনুসরণ করে চলতে থাকে। যদি বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রকে এর অন্যথা করতে দেখা যায় তবে প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে এরূপ অন্যথা করার পিছনেও সত্য প্রচারের উৎসাহ নেই, আছে কোনো বিশেষ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্ররোচনা।

সরকারী দৃষ্টিতে কোনো দেশ মানেই সেই দেশের গবর্নমেন্ট। কোনো দেশকে অর্থাৎ দেশের মানুষকে সেই দেশের গবর্নমেন্টের থেকে আলাদা করে দেখা সরকারী দৃষ্টির রীতি নয় যদি না সেই দেশের গবর্নমেন্টের উচ্ছেদ সাধনের সক্রিয় নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। এক দেশের গবর্নমেন্টের দ্বারা অন্য দেশে বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা কখনো হয় না যে তা নয়। কিন্তু সেটা সচরাচর ঘটে না, সেটা স্বাভাবিক অবস্থার ঘটনা নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো সরকার যখন অন্য রাষ্ট্রকে শত্রু

...াপন্ন বলে মনে করেন, তখন যা করা হয় সেটা হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের দোষগুলি নিরন্তর বড়ো করে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং গুণ যদি কিছু থাকে তবে যথাসম্ভব সেগুলিকে উপেক্ষা করা। অর্থাৎ সরকারী দৃষ্টিতে কোনো দেশ যখন "বন্ধু" তখনও সে দেশ সম্বন্ধে সরকারী প্রচারের ধারা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিভ্রান্তিকর এবং যখন সরকারী দৃষ্টিতে কোনো দেশ "শত্রু" তখনও সেই দেশের সম্বন্ধে সরকারী প্রচারের ধারা প্রকৃত সত্য জানার পক্ষে নির্ভরযোগ্য নয়। সেই জন্য দেশবিদেশ সম্বন্ধে তথ্যপরিবেশন যেখানে কেবলমাত্র অথবা মুখ্যত সরকারের উপর নির্ভর করে এবং বেসরকারী পরিবেশক থাকলেও তারা অতিমাত্রায় সরকারী নীতির মুখাপেক্ষী সেখানে জনসাধারণের মন মাঝে মাঝে ধাক্কা খেতে বাধ্য।

সম্প্রতি তথাকথিত "এশিয়ান গেম্স্" নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জ্যাকার্তায় যে-সব কাণ্ড ঘটল তাতে অনেক ভারতবাসীরই কেবল রাগ ও দুঃখ হয় নি, অনেকে বিষম আশ্চর্যবোধও করেছেন। তবে কারণ এই যে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা, তার রাজনীতি এবং এমন কি তার প্রধান নেতার সম্বন্ধে যে-সব কথা সাধারণভাবে এদেশের লোকের জানা উচিত ছিল সেগুলো তাদের জানবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইন্দোনেশিয়া আমাদের বন্ধু। অতএব ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে যে-সব তথ্য তেমন রুচিকর নয় সেগুলোর উপর যথাসম্ভব নীরবতা অথবা অস্পষ্টতার আবরণ বিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তর অবস্থা সম্পর্কে অত্যুৎসোক্য বা সেই দেশের নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র ও ব্যবহারের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে প্রগল্‌ভতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা লোকদের যাতে হতে পারে সেটুকু দেখা অবশ্যই কর্তব্য।

ইন্দোনেশিয়ার কর্তাদের পক্ষে এশিয়ান গেমস্ "যে খেলা মাত্র নয়", বস্তুত এটা গুরুতর রকমের রাজনীতি—সেটা এইরকম গালে চড় না খেয়েও ভারতবাসীরা বুঝতে পারত যদি ইন্দোনেশিয়ার গত কয়েক বছরের ইতিহাস ভারতবাসীর কাছে এতো অস্পষ্ট করে রাখা না হতো। আমরা শ্রীআয়ুব খানের "বেসিক ডেমোক্রাসির" গুণাগুণ সম্বন্ধে যতটা সচেতন তার শতাংশের এক অংশও আমরা শ্রীসুকর্নের "গাইডেড ডেমোক্রাসি"র গুণাগুণ সম্বন্ধে নই। ভারতের মতো ইন্দোনেশিয়াও দীর্ঘকাল বিদেশীর অধীনে ছিল সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ান নেতারা যাই দাবি করুণ তাই সমর্থন করার দিকে আমাদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে এবং তাই আমরা করেও আসছি প্রায় বিনাবিচারেই। জ্যাকার্তার সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষ যদি জড়িত না হতো, যদি ইন্দোনেশিয়ানরা অন্য কোনো রাষ্ট্রদূতের অফিস বিধ্বস্ত করত, অন্য কোনো রাষ্ট্রের পতাকার অবমাননা করার চেষ্টা করত তাহলে ভারতের সরকারী বা বেসরকারী মহলে কণামাত্র উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যেত কিনা সন্দেহ। অথচ ইন্দো-

রাষ্ট্রেরই, বিশেষ করে যারা নিরপেক্ষ বলে বড়াই করে তাদের উদ্বিগ্ন বোধ করা উচিত। ভারত সরকারের গায়ে লেগেছে তাই তাঁদের কিছু বলতে হচ্ছে, তা না হলে তাঁরাও "বন্ধুত্বের" খাতিরে একেবারে চুপ করে থাকতেন।

বিদেশী সাহায্যের টাকা দিয়ে শ্রীসুকর্ন এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম তৈরী করিয়েছেন, সেটা কেবল খেলা দেখাবার জন্য নয়, ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতির সঙ্গে ঐ স্টেডিয়াম এবং তত্র অনুষ্ঠিত "এশিয়ান গেমস্"-এর সম্পর্কের কথা আমাদের সরকারী কর্তারা নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু ভারতের সাধারণ লোকের নিকট শ্রীসুকর্ন ও ইন্দোনেশিয়ানদের ক্রীড়া-প্রীতির কথাটাই খ্যাত ছিল। ইন্দোনেশিয়ায় যখন ঘটনাগুলি ঘটতে আরম্ভ করেছে তখনও ভারত সরকার ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষের ক্রীড়া-ভিত্তিক রাজনৈতিক কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে আশ্চর্যভাব মাত্র প্রকাশ করছেন। তার দোষাবহতা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি।

এশিয়ান গেমস্ ফেডারেশনের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হচ্ছে যে, রাজনৈতিক কারণে কোনো বৈষম্য করা চলবে না। এর আগে এশিয়ান গেমস্-এর তিনটি অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। তার প্রত্যেকটিতে অন্যান্য দেশের মধ্যে ইজরাইল এবং কুমিংটাং শাসিত তাইওয়ানের (ফরমোজা) খেলোয়াড়রাও যথারীতি যোগদান করেছে। কিন্তু এবার আগে থেকেই তাইওয়ান এবং ইজরাইলের খেলোয়াড়দের মনে কী রকম সন্দেহ জাগে যে, ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠানে তাদের যোগদানের পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এই সন্দেহ এশিয়ান গেমস্ ফেডারেশনের গোচরীভূত হলে তাঁরা বারবার আশ্বাস দেন যে, কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না এবং ইন্দোনেশিয়া থেকেও আশ্বাস পাওয়া যায় যে, তাইওয়ান এবং ইজরাইলের খেলোয়াড়দের ইন্দোনেশিয়ায় আসার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হবে না। ইজরাইল ও তাইওয়ানে নিমন্ত্রণও পাঠানো হয়, এমন কি খেলোয়াড়দের "আইডেনটিটি কার্ড"ও পাঠানো হয়। তবে মজা এই যে, সেগুলো খালি ছিল, সুতরাং অকেজো। যখন এই ছল ধরা পড়ল তখন আর সংশোধনের সময় ছিল না। ইজরাইল ও তাইওয়ান থেকে এশিয়ান গেম্স্ ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ এলো। ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ ইজরাইল ও তাইওয়ানের খেলোয়াড়দের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হলো। ফেডারেশনের পক্ষে এই অবস্থা চুপ করে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আরো একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হলো। সেটা হচ্ছে যে সব খেলোয়াড় জ্যাকার্তার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। বৈষম্য-

মূলক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য অলিম্পিকের কর্তারা তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিল। জ্যাকার্তার অনুষ্ঠানের "এশিয়ান গেমস্" নামটা পরিবর্তন করলে সেই সমস্যার নাকি সমাধান হতে পারত। যাই হোক যে-ভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাইওয়ান এবং ইজরাইলের খেলোয়াড়দের ইন্দোনেশিয়ায় আসতে না দিয়ে কার্যত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তার তীব্র প্রতিবাদ এশিয়ান গেমস্ ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী জি ডি সোন্ধি করলেন এবং জ্যাকার্তার অনুষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হোল।

ক্রীড়া-সংস্থার আদর্শের দিক থেকে শ্রীসোন্ধি কিছুই অন্যায় করেন নি এবং প্রতিশ্রুতিভঙ্গের সঙ্গে যে-রকম ছলচাতুরী যুক্ত ছিল তাতে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা তীব্র হয়ে থাকলে সেটাও কিছু অন্যায় হয় নি। শ্রীসোন্ধির উক্তিতে যাদের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল এবং কী করে ভদ্রভাবে ব্যাপারটার এখন নিষ্পত্তি করা যায় তার জন্য এশিয়ান গেমস্ ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসা উচিত ছিল তারা উল্টো পথ নিল। তারা নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্য ক্রোধের আশ্রয় নিল।

শ্রীসোন্ধি ভারতীয়, অতএব ক্রোধের আক্রমণটা কেবল ব্যক্তিগতভাবে শ্রীসোন্ধির উপর নয়, ভারতের উপরও চালিয়ে দেওয়া হলো। ইন্দোনেশিয়ার এক মন্ত্রী ঘোষণা করলেন, শ্রীসোন্ধি যা করেছেন তাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো নূতন চুক্তি এখন করা হবে না। এতে ইন্দোনেশিয়াস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত যে বিবৃতি দিলেন এবং নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরের পক্ষ থেকে যা বলা হল তাতে আইনের কথাটা ঠিকই ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে খোশামুদী যোগ করার কী সার্থকতা ছিল বুঝা গেল না। শ্রীসোন্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সেই প্রতিষ্ঠানের উপর ভারত সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই, শ্রীসোন্ধি ভারত সরকারের প্রতিনিধি নন। সুতরাং তাঁর কোনো কথা বা কাজের জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করার কোনো মানে হয় না, এটা আইন সম্মত কথা এবং এই পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত চাটুবাক্যের ফোয়ারা ছোটালেন কেন এবং শ্রীসোন্ধির বিবৃতি ভারতীয় সরকারের মতেও নিন্দার্হ এরূপ আভাষ পররাষ্ট্রদপ্তরের মুখপাত্রের উক্তির মধ্যে থাকার কী কারণ ছিল?

পা চেটে ইন্দোনেশিয়ানদের শান্ত করার কথা যদি কেউ ভেবে থাকেন, তবে তিনি ভুল করেছেন। ঐরকম পা-চাটার ভাবটা না দেখালে পরের দিনের বীভৎস কান্ডটা ঘটত কিনা কে জানে। হয়ত ঘটত না। ইন্দোনেশিয়ানদের যারা উস্কেছে তারা বুঝেছিল যে, ভারতের সরকারী কর্তারা যে-রকম কাঁচুমাচু হয়ে কথা বলছেন তাতে একটা ভারী রকমের লাথি দিয়েও দেখা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ দেখলে আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই। অবস্থা বিশেষে অনেকে কর্তাই অল্পাধিকস্তর এই কাজটি করেছেন। তবে ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তর রাজনৈতিক অবস্থার দিক থেকে এই খেলায় কর্তারা বোধ হয় বড়ো বেশি বাজি রেখেছেন, সেই জন্যই ক্ষতির সম্ভাবনায় প্রতিক্রিয়াটা এতো বেশি তীব্র হয়েছে। বোধ হয় ইজরাইল এবং তাইওয়ানের খেলোয়াড়দের আসতে না দেওয়ার কৌশল যারা ইন্দোনেশিয়ানদের বাতলে দিয়েছে তারাই ইন্দোনেশিয়ানদের ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে তাদের দিয়ে এই রকম জঘন্য কান্ড করিয়েছে। চীনাদের তো কথাই নেই। পাকিস্তানী, এমন কি সিংহলীরাও নাকি স্বস্ব সাধ্যানুসারে ইন্ধন জুগিয়েছে বলে শুনা যায়। আহা, আমাদের সরকারের বৈদেশিক নীতির সফলতার কী উজ্জ্বল চিত্র!

৫।৯।৬২

পূর্বপত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তখন রাত জাগার বয়স না, তখন এক-বার, আমার মনে পড়ে, বাড়ির সব শাসন অগ্রাহ্য করে আমি জেগেছিলাম অনেকক্ষণ। চারপাশ চুপচাপ। মাঝে মাঝে গাড়ীর দমকা আওয়াজ। তীক্ষ্ম হর্নের শব্দ। দূরে কুকুরের ক্লান্তিকর ডাক।

কিন্তু কোনদিকে আমার কান নেই। চোখ নেই। শীতকাল। শরীরের অর্ধেক পুরু লেপের তলায়। অস্থির হাত ঘন ঘন শুধু উল্টে যাচ্ছে পাতার পর পাতা। কৌতূহলের উত্তাপে লেপটা কখন ঠেলা খেতে-খেতে পায়ের কাছে পৌঁছে গেছে খেয়াল নেই।

আমার বয়সী একটি কিশোরের সঙ্গে আমিও যেন কখনও কখনও রহস্যের জালে

পরবর্তী সাক্ষাৎকার : ২০ অক্টোবর
শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

জড়িয়ে পড়ে দিশা হারাই। কখনও দিদির স্নেহে গলে যাই। কখনও গুন্ডার পিছন-পিছন ধাওয়া করে দুঃসাহসী হয়ে উঠি।

সেই কিশোর নায়কের নাম, আজও আমার মনে আছে, শশাঙ্ক। আজও আমার মনে আছে যখন 'লালকুঠি'র শেষ পাতায় পৌঁছলাম, তখন আমাদের বাড়ির পুরনো দেয়াল-ঘড়িতে শুধু টং করে একটা শব্দ হল। বুঝতে পারিনি, একটা দেড়টা না আড়াইটা—কটা বেজেছিল তখন।

কাহিনীর চেয়ে বড় করে লেখকের নাম মনে ধরে রাখার বয়স না তখন। কিন্তু এমন আরও বই পড়বার একটা ব্যাকুল আগ্রহে 'লালকুঠি'র প্রথম পাতায় অনেকক্ষণ চোখ রেখে, যে লেখক আমাকে প্রথম রাত জাগাতে শিখিয়েছিলেন, আমি দেখেছিলাম তাঁর নাম শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আর তারপর, বোধ হয় পরদিনই, আমি সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম, পাঠান মুলুকে, মা কালীর খাঁড়া, ছায়াদানব—আমি 'মৌচাকে' খুঁজে পেলাম ব্যোমদাসের মাদুলী—আমি পড়লাম সেই প্রথম রাত-জাগা কৌতূহলেই, চালিয়াৎ চন্দর।

এরপর নিশ্চয়ই ছোটদের জন্যে আরও অনেক বই লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহন, কিন্তু আমার বয়স বেড়ে গেছে তখন। আমি দেখি সৌরীন্দ্রমোহনের নাম মাসিক পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের শেষে, সাপ্তাহিকের পাতায়, নব প্রকাশিত বই-এর বিজ্ঞাপনের তালিকায়—সর্বত্র।

সৌরীন্দ্রমোহনের কালে হঠাৎ একখানি বই লিখে রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। এত পত্রিকা ছিল না তখন—এত প্রকাশকও নয়। তখন ছিলেন প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-সূর্য মধ্য

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গগনে তখন। শরৎচন্দ্র অপরাজেয় কথা-শিল্পী। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। অনু-রূপাও সক্রিয়। আর তাছাড়া, সৌরীন্দ্র-মোহনের পাশাপাশি ছিলেন নরেশচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর এবং আরও কত প্রতিভাবান জীবনশিল্পী।

এত ভিড়ে, এমন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পাদক-প্রকাশকের কাছ থেকে যখন উত্তপ্ত আমন্ত্রণ পাওয়া এবং নিজের—একান্ত নিজেরই, একটি বিশেষ স্থান সাহিত্যক্ষেত্রে করে নেয়া যে কত কঠিন, সেকথা তো সহজেই বোঝা যায়।

প্রথম কৈশোরে যাঁকে ভাল লেগেছিল, প্রথম যৌবনেও দেখি তাঁকে তেমনি ভাল লাগে। এখনও এক সৌরীন্দ্রমোহন—একই তাঁর রচনাশৈলী, প্রসাদগুণ, কৌতূহল রস আর কাহিনীর নিপুণ বিন্যাস। প্রেম, বিরহ-মিলন, আদর্শবাদের মৃদু আমেজ, মানবতার ভাসা-ভাসা ইঙ্গিত যেন চঞ্চল যৌবনকে তৃপ্ত করেও নির্দেশ দেয় একটা সুস্থ পরি-গতির। সৌরীন্দ্রমোহন আমার প্রিয় লেখক—প্রিয় আপামর জনসাধারণের।

কেন? মৃদু পদসঞ্চারে পাঠকের কাছে, খুব কাছে এগিয়ে আসার কৌশল জানেন সৌরীন্দ্রমোহন। তাঁর প্রকাশভঙ্গি সহজ। ভাষা, রচনারীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষ-পাতী তিনি নন। তিনি কাহিনীর ঘনঘটায় বিশ্বাসী বলেই হয়তো চরিত্র চিত্রণে উদাসীন। এবং বহু সৃষ্টির ভক্ত বলেই বিশ্লেষণে বেশি সময় ব্যয় করতে তিনি রাজি নন।

তাই সৌরীন্দ্রমোহনকে ভাল লাগে কৈশোরে—ভাল লাগে প্রথম যৌবনে। কাহিনীর গতি যে-বয়সে মনকে টানে, সে-বয়সই সৌরীন্দ্রমোহনের জন্যে। তখন রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে পড়েছিলাম, আঁধি, বাবলা পিয়ারী—তখন ভাল লেগে ছিল, কাজরী, অস্বীকার, রাঙামাটির পথ, গৃহ ও গ্রহ আর কত ছোট গল্প! শেফালি, নির্ঝর, সচকিতা গৃহিণী, যৌবরাজ্য, রঙের টেক্কা, খাট্টা ও খোট্টা—প্রায় আড়াই শো বই লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহন।

কিন্তু আজ? আজ তিনি এত দূরের লেখক কেন? আজ যেন তাঁকে চিনি না—খুঁজে পাই না। আমার কথা নয়, আমি না-হয় পার হয়ে এসেছি কৈশোর আর যৌবন অনেক দিন — কিন্তু এখন কি কিশোর - কিশোরী নেই? যুবক-যুবতী নেই? তারাও কেন পায় না সৌরীন্দ্রমোহনকে? কেন তিনি তাদের রাত-জাগাতে পারেন না, আমাকে যেমন জাগিয়ে রেখেছিলেন তেমন?

প্রথম শরতের সবুজ-সবুজ বিকেলে কলকাতায় সৌরীন্দ্রমোহনের বেণী নন্দন স্ট্রীটের বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে এত কথা আমার মনে হয় আর এই প্রশ্নই মনে জাগে প্রথম। তাঁকে দেখতে-দেখতে আরও একটা কথা মনে হয়।

মাঝে মাঝে শোনা যায়, বিজ্ঞানের প্রসারে সমুদ্র শাসনের নতুন প্রক্রিয়ায় আজকাল যদিও খুবই কম—এক-একটা বড় বড় জাহাজ, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা ভাসমান অট্টালিকা, হঠাৎ একদিন ক্যাপ্টেনের সামান্য ত্রুটির জন্যে কিম্বা প্রবহমান অশান্ত সমুদ্রের অন্ধকারের লেলিহান গর্জনে, ডুবে যায়—নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর হারিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে, মন থেকে, পৃথিবী থেকে।

কিন্তু যারা ছিল সেই জাহাজের যাত্রী

একদিন, যারা আজও আছে, তারা হয়তো কখনও কখনও স্মৃতির আলোড়নে সে-জাহাজই খোঁজে। আর যখন খুঁজে খুঁজে পায় না কোথাও, তখন তাদেরও মনে হয়, কেন অল্পে-অল্পে অন্ধকার সমুদ্রে নিঃশব্দে হঠাৎ একদিন তলিয়ে গেল সেই জাহাজ! কেন!

এর উত্তর আমি সৌরীন্দ্রমোহনের মুখ থেকে শুনব বলে তাঁকেই প্রশ্ন করি প্রথম, "কেন আস্তে আস্তে আপনি দূরে সরে গেলেন? কী এর কারণ?"

সৌরীন্দ্রমোহন অসংকোচে বলেন, "কারণ এ যুগের সংগে আমার মত মেলে না। সরে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই। এখন সব কিছুই একেবারে অন্য-রকম।"

"কী রকম?"

"তোমরা ভাবতে পার, একজন লেখক যার সম্ভাবনা আছে, নিজের ক্ষতি করে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা?" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সৌরীন্দ্রমোহন বলে চলেন, "আমরা পরের জন্যে অনেক কিছুই করতে পারতাম। তোমরা পার না। আমাদের আদর্শ ছিল, তোমরা চেষ্টা কর আদর্শ থেকে মুক্ত হতে—"

"হ্যাঁ, যুক্তিতেই আমাদের আস্থা বেশি।"

"আমি জানি," অসুস্থ সৌরীন্দ্রমোহন হাত নেড়ে বলেন, "আমরাও যুক্তিকে একে-বারে অস্বীকার করতাম না, কিন্তু আমাদের হৃদয় ছিল যুক্তির চেয়ে বড়।"

"সেই কারণেই", আমি আস্তে আস্তে বলি, "উচ্ছ্বাসে কিম্বা ভাবপ্রবণতায় আপনারা জীবনের দাবীকেও অস্বীকার করতেন—"

মাথা নেড়ে অকপট সত্য স্বীকার করেন সৌরীন্দ্রমোহন, "করতাম। কারণ জীবনের দাবীর চেহারাটাই আমাদের কাছে ছিল অন্যরকম—আমাদের আদর্শ ছিল। জান, আর একটু হলেই হয়তো আমার এক লাইনও লেখা হত না?"

"কেন?"

"তখন ঘোর স্বদেশী আমল। সবে বি-এ পাশ করেছি। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। দেখা করলাম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সংগে। আমার এক বন্ধু সুধীর ব্যানার্জি তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি যে একটু-আধটু লিখি, সেকথা শুনলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন লেখ? কাদের কথা লিখতে চাও? আমি বললাম, আমাদের সমাজে মেয়েরা বড় অসহায়। আমি তাদের কথা বেশি করে লিখতে চাই, তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই পুরুষদের সংগে সমান অধিকারে—

বাস, ওইটুকু শুনেই উপাধ্যায় মশাই আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, দেশ সেবার কাজে আমি তোমাকে নেব না।

তোমাকে লিখতে হবে। যেমন বললে আমাকে ঠিক তেমন লেখ—"

"প্রথম লেখা আরম্ভ করলেন কবে?"

সৌরীন্দ্রমোহন হাসেন, "সে কবে! খুব ছেলেবেলায়। কবিতা দিয়েই শুরু করেছিলাম। ব্যাপারটা কী জান, আমার শৈশব কাটে ইছাপুরে। সেখানেই আমার জন্ম ১৮৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে। বাবার ব্যবসা ছিল ইছাপুরে—"

"আপনার বাবার নাম কী?"

"হরিদাস মুখোপাধ্যায়। আমার সাত বছর বয়সেই তিনি মারা যান। তখন আমরা কলকাতায় চলে আসি—ভবানীপুরে। আমি সাউথ সুবার্বন ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম।" একটু থেমে সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, "যাক, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে কথকতা হত। আমার খুব ভাল লাগত শুনতে। আমি শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতাম। তখনই প্রথম কবিতা লেখার কথা মনে হয়।"

"কিন্তু পত্রিকায় লিখলেন কখন?"

"সে অনেক পরে। আমাদের ছেলেবেলায় তো বেশি পত্রিকা ছিল না। তখন শুধু 'সাহিত্য' পত্রিকা ছিল। আমি 'সাহিত্যে' কখনও লিখিনি। অনেক পরে 'ভারতী' প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' আমাদেরই কাগজ ছিল। কিন্তু সে তো অনেক পরে! ছেলেবেলায় শুধু লিখেই যেতাম, ছাপাবার কথা মনেই আসত না। তখনই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম।"

অসুস্থ সৌরীন্দ্রমোহন। সম্প্রতি তাঁর দেহে এক অস্ত্রোপচার হয়েছে। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু অতীতের কথা শোনাবার আগ্রহে তিনি যেন কালের গণ্ডি অবলীলায় পার হয়ে যান। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সৌরীন্দ্রমোহনকে দেখতে দেখতে মনে হয়, এত কথা জমা আছে তাঁর মনে, এত স্মৃতি, এত ঘটনা যা বলবার জন্যে তিনি ব্যাকুল—কিন্তু একটা গোটা কালের কথা কি একদিনে বলা যায়!

তবু থেমে থেমে কথা বলেন সৌরীন্দ্রমোহন, "আমার মাসতুতো বোন অনুরূপা দেবী। একদিন আমার কবিতার খাতা দেখে তিনি বললেন, এসব রবীন্দ্রনাথকে দেখাও। আমি স্বর্ণকুমারী দেবীকে বলব এবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে এলে আমাকে খবর দিতে। তখন আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

তারপর একদিন স্বর্ণকুমারী দেবী সত্যিই খবর দিলেন, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তখন থাকতেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। অনুরূপা আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়ালাম সেই কবিতার খাতা হাতে নিয়ে। আমার বয়স তখন বারো।"

"তারপর?"

"রবীন্দ্রনাথ বললেন, পড়। আমি গড়গড় করে পড়ে গেলাম। কোন ভয় নেই আমার। একটা কবিতা যখন জোরে-জোরে পড়ছিলাম,

তখন স্বর্ণকুমারী দেবী হাসছিলেন। কবিতার ভাবটা আজও মনে আছে, ভগবানকে উদ্দেশ করেই লেখা। লিখেছিলাম এই পৃথিবী আছে বলেই আমরা তোমাকে চিনি—এ পৃথিবী না থাকলে, কে তোমাকে চিনত ভগবান!

রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবীর দিকে ফিরে বললেন, না না, ও ঠিকই লিখেছে। সত্যিই তো, পৃথিবী না থাকলে কে ভাবত ভগবানের কথা! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তুমি এবার তর্জমা শুরু কর। যে-যে বিদেশী কবির লেখা তোমার ভাল লাগবে, তাঁদের অনুবাদ কর বাংলায়। আমি তা-ও করেছিলাম। আর তারপর তো গদ্য নিয়েই মেতে উঠলাম।"

"রবীন্দ্রনাথের সংগে আর আপনার দেখা হয়নি?"

"কত বার!" উৎসাহের প্রবল ঝোঁকে কথা বলে যান সৌরীন্দ্রমোহন, "ও'র 'বিচিত্রা' আসরে আমি বহুবার গেছি। আমার সংগে থাকত ভারতী সম্পাদক মণিলাল গংগোপাধ্যায়। মণিলাল আমার পাড়ার ছেলে। আমরা একই ইস্কুলে পড়তাম। ছেলেবেলা থেকেই তার সংগে আমার খুব ভাব—"

'বিচিত্রা' আসরের কথা প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, এ আসর বোধ হয় উপেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকা সংক্রান্ত। তাই প্রশ্ন করি, "কিন্তু তখন কি 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল?"

"আরে না না, তখন কোথায় এই 'বিচিত্রা'! আমি ১৯১০-১১ সালের কথা বলছি। জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে, যখন শান্তিনিকেতন থেকে তিনি কলকাতায় আসতেন, বিচিত্রা আসর বসত—শিল্পের আসর। বহু গুণীজন আসতেন সেখানে", কথা বলতে-বলতে হঠাৎ হাসি ফুটে ওঠে সৌরীন্দ্রমোহনের মুখে, "একদিনের কথা শোন। ল' পাশ করেছি। পুলিশ-কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করি। কিন্তু বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাতে ইচ্ছে হয় না। আর ধরাচুড়ো পরে বিচিত্রায়ও যেতে মন চায় না। এ বেশে রবীন্দ্রনাথের সামনে যাব কী! কী করলাম জান?"

"কী?"

"মণিলাল তখন অবনীন্দ্রনাথের জামাই—জোড়াসাঁকোতেই থাকে। আমি তার ঘরে গিয়ে বেশ বদলে মণিলালের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়াই।...কিন্তু সব শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ও বেশে আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা হয় কেন সৌরীন! রাজদ্বারে আছ, দোষীকে দণ্ড দাও, নির্দোষকে দাও মুক্তি। ও তো তোমার সেই রাজদ্বারের বেশ—"

হাসতে-হাসতে সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, "এর অল্প পরেই একটা মজার ঘটনা ঘটে। একদিন জোড়াসাঁকোয় গেছি। কিন্তু হাসি নেই রবীন্দ্রনাথের মুখে। তিনি বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, আমার আর লেখায় তোমরা গোটা রবীন্দ্রনাথকে পাবে না সৌরীন—এবার থেকে তোমরা পাবে অর্ধেক রবীন্দ্রনাথকে। আমার সাধের ঝর্না-কলম চুরি হয়ে গেছে। মন দিয়ে আমি আর হয়তো লিখতেই পারব না।"

কৌতূহল প্রকাশ করে এবার আমি

জিজ্ঞেস করি, "কবেকার কথা? রবীন্দ্রনাথ কি তখন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকে পৃথিবী চেনে তখন। তারপর শোন না কী হল। কোর্টে বসে আছি একদিন, রবীন্দ্রনাথের সরকার—বোধ হয় গোপালবাবু নাম, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, কোর্ট থেকে চিঠি গেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। কলম পাওয়া গেছে। চোর ধরা পড়েছে। জোড়াসাঁকোরই এক দাগী চোর। তার বাড়ি সার্চ করে এই কলম পাওয়া যায়। পুলিসের জেরায় সে স্বীকার করে, এটা সে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি থেকেই চুরি করেছে। পুলিস অফিসার যখন এই কলম রবীন্দ্রনাথকে দেখায়, তখন তিনি বলেন, এটা তাঁরই।

এখন সেই কলম সনাক্ত করবার জন্যে পুলিস কোর্টে আসতে হবে রবীন্দ্রনাথকে। দেখ কান্ড! গোপালবাবুর হাত থেকে চিঠি নিয়ে আমি পড়লাম। সই করেছেন আমাদের থার্ড প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট আনিস-উজ-জামান খাঁ। তিনি ছিলেন সাহিত্যরসিক। সেই চিঠি তাঁকে দেখিয়ে আমি বললাম, করেছেন কী খাঁ সাহেব! রবীন্দ্রনাথকে কোর্টে তলব করেছেন? লজ্জায় কাঠ হয়ে গেলেন খাঁ সাহেব। বললেন, আরে ছি ছি, আমি শুধু সই করেছি—আমি কি আর নাম দেখেছি!

যাক, সব ব্যবস্থা পাকা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে খাঁ সাহেবের দুঃখ প্রকাশ করার কথা জানালাম। সব শুনে রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, একদিন বলেছিলাম না সৌরীন, রাজদ্বারে আছ...তুমি রাজদ্বারে না থাকলে কী হত আমার!"

"কিন্তু", এবার আমি প্রশ্ন করি, "এই রাজদ্বারে থাকার জন্যে সাহিত্যচর্চার ক্ষতি হত না আপনার?"

"হত না?" দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, "ভীষণ ক্ষতি হত! ওকালতিতে কি আর মন দিতে পেরেছিলাম! সমসাময়িক উকিলরা কত মক্কেল ভাগিয়ে নিয়েছে আমার। ভ্যাংচি দিয়ে বলেছে, উনি তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন। লেখা নিয়ে হঠাৎ এমন মেতে যাবেন যে, তোমাদের কথা ও'র মনেও থাকবে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সৌরীন্দ্রমোহন আবার বলেন, "বন্ধুদের কথা মিথ্যে নয়—ঠিকই। 'ভারতী'র ভাবনা ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু ছিল না তখন। শুধু কেমন করে 'ভারতী'র উন্নতি হয়, সেই এক চিন্তা।"

"'ভারতী' পত্রিকার অফিস কোথায় ছিল তখন?"

"সুকিয়া স্ট্রীটে। আমি কোর্ট থেকে সোজা সেখানে চলে যেতাম। অনেক রাত অবধি থাকতাম। মক্কেলদেরও বলা থাকত আমার সঙ্গে দেখা করতে তারা যেন সেখানে যায়।"

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করি,

"কাজে যে ভাল করে মন দিতে পারতেন না—সেই কারণে, আমি বলছিলাম, আপনার সংসারে টাকা-পয়সার অভাব হত না?"

"হত—মাঝে মাঝে খুব অসুবিধা হত। লিখে কী-ই বা পাওয়া যেত তখন! কিন্তু সবই সহ্য করতাম হৃদয়ের উত্তাপে—প্রাণের তাগিদ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল না।"

আরও বেশিক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করি সৌরীন্দ্রমোহনকে, "কিন্তু আপনার স্ত্রী? তিনি কোন অনুযোগ করতেন না?"

"কখনও না। তিনি আমাকে উৎসাহ দিতেন, প্রেরণা দিতেন সব সময়—সংসারে যতই অসুবিধা হোক না কেন! তার অবশ্য আর একটা কারণও ছিল—"

"কী?"

"তিনি নিজেও ভাল গান গাইতেন কি-না—"

আমি বাধা দিয়ে বলি, "আপনার মেয়ে সুচিত্রা মিত্র প্রথমে বোধ হয় ও'র কাছ থেকেই গান শিখেছিলেন?"

সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, "হ্যাঁ। শুধু সুচিত্রা নয়, আমার তিন মেয়েই, সুজাতা, সুপ্রিয়া, সুচিত্রা—সকলেই ওদের মার কাছে গান শেখে", সৌরীন্দ্রমোহন হাসেন, "কিন্তু সুচিত্রার কণ্ঠ শুনে সুজাতা আর সুপ্রিয়া আর বেশি গানের চর্চা করতে বোধ হয় সাহস পেল না। ওরা থেমেই গেল।"

"আপনার স্ত্রীর শরীর এখন কেমন?"

"বিশেষ ভাল না। ও'র জন্যেই আমাদের পরিবারে গানের চর্চা ছিল। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের দিয়ে উনি অভিনয়ও করাতেন। একবার নিজে উৎসাহী হয়ে আশুতোষ কলেজ হলে ওদের দিয়েই 'চিত্রাঙ্গদা' করিয়েছিলেন। সুচিত্রাই চিত্রাঙ্গদা হয়েছিল।"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে আমি বলি, "আপনি নিজেও তো অনেক নাটক লিখেছেন, স্টেজের সঙ্গে আপনার যোগা-যোগ কেমন করে হল?"

আমার প্রশ্নে সোজা হয়ে বসেন সৌরীন্দ্র-মোহন। শরীর অসুস্থ হলেও এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখমুখ, "ঠিক, খুব ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছ তুমি...আর এক কাপ চা খাবে?"

"না না, এই তো খেলাম—"

"আহা, খাও না আর একবার, মিষ্টি তো একটাও খেলে না—" সৌরীন্দ্রমোহনের কথা শেষ হবার আগেই তাঁর বড় ছেলে 'প্রিয়-বান্ধবী'র চিত্র পরিচালক সৌম্যেন্দ্রমোহন, যাঁর ডাক নাম রোমী, আসরে এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে এক ছোকরা, তার হাতে চায়ের কাপ।

শুধু একটি কথা আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলেন সৌম্যেন্দ্রমোহন "খান।" তারপর যেমন নিঃশব্দে আসরে প্রবেশ করে-ছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে আবার প্রস্থান করেন।

আর আমি তখন হেসে উঠে বলি সৌরীন্দ্রমোহনকে, "রোমীবাবুর প্রবেশ ও প্রস্থান লক্ষ্য করেছেন? কাটা সৈনিকের মতো হলেও ঠিক সময় একটা ড্রামা-ড্রামা অ্যাট-মোসফিয়ার সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন যেন?"

সৌরীন্দ্রমোহন হেসে বলেন, "আশেপাশে কোথাও ছিল। আমাদের সব কথা বোধ হয় শুনেছে।"

"যাক, এবার আপনার স্টেজের কথা খুব ভাল জমবে—বলুন?"

সৌরীন্দ্রমোহন বলতে শুরু করেন, "রস-রাজ অমৃতলাল ছিলেন আমার দাদামশাই-এর বিশেষ বন্ধু। আমার দাদামশাই-এর নাম নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। আমি জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান। কিন্তু রসরাজ প্রায়ই আসতেন আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে। আমার মাকে তিনি আদর করে ডাকতেন পুর-মা বলে। আমার মার নাম পুরসুন্দরী দেবী।"

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে সৌরীন্দ্রমোহন আবার বলতে শুরু করেন, "ছেলেবেলায়, খুব ছেলেবেলায় একবার স্টার থিয়েটারে মার সঙ্গে চন্দ্রশেখর নাটক দেখতে গিয়ে-

ছিলাম। সেই বয়সে, নাটক দেখতে-দেখতে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটা কথাই মনে হচ্ছিল তখন, আরে, এ আবার কী! নবাবের দেখছি বেগমও আছে—নাচে, গান গায়! ইস্কুলের ইতিহাসের বই-এ বেগমের কথা তো কিছু লেখা নেই। নবাবরা তো জানি শুধু সিংহাসনে বসে আর মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধই করে—কেমন স্বর্গের মতো, স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল চন্দ্রশেখরের দৃশ্যপট...ভাল লেগেছিল—খুব ভাল লেগেছিল—"

"কিন্তু আপনি নাটক লিখলেন কখন? খুব অল্প বয়সে?"

"না না, আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে, অনেক পরে লিখলাম 'যৎকিঞ্চিৎ'। এটাই আমার প্রকাশিত প্রথম বই। রসরাজ অমৃতলাল এ নাটক মঞ্চস্থ করান স্টার থিয়েটারে।"

"তারপর?"

"দরিয়া রুমেলা লিখেছি। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়'-এর নাট্যরূপ আমিই দিয়েছি। সে-নাটকের নাম 'দশচক্র'। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'দশচক্র' খুবই ভাল লেগেছিল।"

"প্রভাত মুখোপাধ্যায়-এর লেখা আপনারও তো খুব ভাল লাগত?"

"বিশেষ না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কারুর লেখাই আমার তেমন ভাল লাগেনি," এক মুহূর্ত কী ভেবে হাসিমুখে সৌরীন্দ্রমোহন বললেন, "তবে আমার লেখা প্রভাতকুমারের খুবই ভাল লাগত। একবার, তখন তিনি গয়ায় থাকতেন, সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়, তিনি আমাকে বললেন, তাঁর 'বলবান জামাতা'র নাট্যরূপ দিতে। দিয়েওছিলাম। 'গ্রহের ফের' নামে সে-নাটক বোধ হয় ১৯১৩ সালে কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত হয়।"

"প্রভাতকুমারের অসমাপ্ত উপন্যাস 'বিদায়-বাণী'র শেষাংশে তাঁর মৃত্যুর পর তো আপনিই লিখেছিলেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে, মহা মুশকিলে পড়েছিলাম তখন। প্রভাতকুমারের ছেলের ইচ্ছে, তাঁর বাবা আমার লেখা ভালবাসতেন বলে 'বিদায়-বাণী' আমিই শেষ করি। ওটা বসুমতীতে প্রকাশিত হচ্ছিল, বসুমতীর সম্পাদক সতীশবাবু আমাকে এসে ধরলেন। আরে, বিলেতের ব্যাপার। আমি বিলেত না গিয়ে সে-বই শেষ করব কেমন করে। যাক, যখন শেষ করতেই হবে, আমি বিলেত সম্পর্কে অসংখ্য বই আর পত্রিকা পড়ে ও-দেশের একটা স্পষ্ট ছবি এঁকে নিলাম মনের মধ্যে। হাইড পার্ক, পিকাডিলি, বিলেতের প্রকৃতি—আমি যেন সব চিনি—সব জানি। 'বিদায়-বাণী' শেষ করলাম," এবার হাল্কা স্বরে সৌরীন্দ্রমোহন বলেন, "আর তখন লোকে ভাবল আমি বোধ হয় চুপেচাপে এর মধ্যে বিলেত ঘুরে এলাম।"

কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞেস করি,

"ওদেশে যাবার ইচ্ছে কখনও হয়নি আপনার?"

"হয়নি যে তা নয়, তবে সাহিত্যের আকর্ষণ এত প্রবল তখন যে, অন্য কোন ইচ্ছাকে বেশি প্রশ্রয় দেবার সুযোগ হত না। তা ছাড়া, দেশে এত আকর্ষণ ছিল তখন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা—একদিন বোসপাড়ায় সিস্টার নিবেদিতার বাড়ি গিয়ে উঠেছিলাম। তিনি তখন পাড়ার মেয়েদের নিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিলেন। ভীষণ ভাল লেগেছিল তাঁকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী ধরনের বই পড়লে মানুষ হব বলুন? সিস্টার নিবেদিতা হেসে বলেছিলেন, শুধু রামায়ণ আর মহাভারত পড়—তাহলেই সব হবে। আজ এতদিন পর, এত পড়ে, এত লিখেও মনে হয়, তিনি যেন ঠিক কথাই বলেছিলেন," আবার একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলেন সৌরীন্দ্রমোহন, "বিবেকানন্দর তিরোধানের পর, ১৯০২ সালে সাউথ সুবার্বন ইস্কুলে একটা সভার আয়োজন করেছিলাম আমরা। সে-সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার যতদূর মনে আছে, পতিত বঞ্চিত নিপীড়িতের জন্যে বিবেকানন্দের যে-আদর্শ, তা অভ্রান্ত, সে-আদর্শ আমাদের গ্রহণ করা উচিত।"

"আপনার আদর্শ কি এখনও আগের মতোই আছে?"

"হ্যাঁ। তাই তো সরে যেতে হয়েছে। এ-যুগ আমাকে স্বীকার করবে না আমি জানি। আর আমিও যুক্তির চাপে হৃদয় পিষে ফেলে তোমাদের স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করতে পারব না। তবে জান, একটা কথা আমার মনে হয়, আমার বিশ্বাস, আমার সব সৃষ্টি বোধ হয় লুপ্ত হয়ে যবে না। কিছু থাকবে—"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "নিশ্চয়ই। কিছু এখনও আছে বলেই তো আমি এসেছি আপনার কাছে", বিদায় নিয়ে নিচে নেমে আসি। রাত হল। এখন সোজা বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু রাস্তায় নেমে চলার গতি হঠাৎ হ্রাস হয়ে যায় আমার। আমি ভয় পাই। হয়তো তারই ভয় যে অল্প-অল্প করে আমাকে, আমাদের সকলকে ঠেলে দিচ্ছে বিস্মৃতির সমুদ্রের অন্ধকারে। কী কারণ? এমন করে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কী কারণ! শুনি অকারণে এ পৃথিবীতে ঘটে না কিছুই।

অনেক তো লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহন। গান কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস ভ্রমণ। কিন্তু প্রবন্ধ? না, একেবারেই না। আর তাই, হয়তো নিজেকেও বিশ্লেষণ করবার সুযোগ তিনি পাননি। এবং আমার মনে হয়, সেই কারণেই এই যুগের জন্যে তাঁর যন্ত্রণা নেই—শুধু অভিমান আছে।

যন্ত্রণা লেখককে মুখর করে, অভিমান করে নীরব। শুধু বুদ্ধি দিয়ে যেমন গোটা জীবনকে পাওয়া যায় না, তেমনি শুধু হৃদয় দিয়েও সব কি পাওয়া যায়! বুদ্ধি যেমন শুধু জীবনের দাবীকেই মুখ্য করে তোলে, আদর্শও কি তেমনি অনেক দাবীকে একেবারেই ঘুম পাড়িয়ে রাখে না!

অভিমানের ঠাণ্ডা প্রাচীর তুলে যদি এমন করে নিজের আড়াল সৌরীন্দ্রমোহন রচনা না করতেন, বিশ্লেষণের রেখায়, যুক্তির আলোয় হৃদয়কে করতে পারতেন আরও ব্যাপক—আরও সহনশীল—এ যুগকে স্বীকার করতে না পারলেও, অস্বীকারের যন্ত্রণায় যদি অস্থির হয়ে উঠতে পারতেন, তাহলে একটা জাহাজ এত তাড়াতাড়ি এমন করে হয়তো হারিয়ে যেত না সমুদ্রের অতলে—আজও অসংখ্য যাত্রী নিয়ে দূর-দূরান্তে সহজেই পাড়ি দিতে পারতেন সৌরীন্দ্রমোহন।

আসক্তি

পারিজাত মল্লিক

বেড়াতে বেড়াতে আমরা অনেক-দূরে চলে এসেছিলাম। রেল-লাইন ধরে আর এগ্‌বার উপায় নেই, সামনেই সাঁকো। সাঁকোর ওপর কাঠের স্লিপার, তার ওপর রেলের লাইন পাতা। আলো কমে এসেছে। সূর্য অস্ত গেল এইমাত্র। শীতের আসন্ন সন্ধ্যায় আর এগিয়ে যাওয়া উচিত না, সাঁকো পেরিয়ে। অগত্যা ফেরার কথা তুলল কান্তি।

মজুমদারসাহেব সায় দিলেন; বললেন, 'না, এই বুড়ো বয়সে রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। ফেরার সময় অন্ধকারে ঠিক মতন দেখতে পাব না, সাঁকোর ফাঁক দিয়ে গলে যাব হে; চলো অ্যাবাউট টার্ন করা যাক।'

বড়দিনের ছুটি চলছিল। আমরা আজ তিন দিন এই সবই করছি, ভোজন ও ভ্রমণ। আজকের বৈকালিক ভ্রমণের সময়ও আয়োজন কিছু কম ছিল না। বিজলীর কাঁধে বড় ফ্লাস্কে অপরিমিত চা, অশ্বিনীর কাঁধে ঝোলানো থলিতে কেক বিস্কিট লেবু, কান্তির গলায় জলের ফ্লাস্ক। আর আমার হাতে একটা ক্যামেরা।

কম করেও চার মাইল পথ আমরা এগিয়ে এসেছি। এবার ফিরব। চারপাশ নিরিবিলি। আদিগন্ত মাঠ শুধু, মাঝে মাঝে দলবদ্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জাম অথবা কাঁঠালের গাছ। সূর্যাস্তে মেঘের বুকের লালটুকু মিলিয়ে চারপাশ কালো হয়ে আসতে লাগল।

রেল-লাইনের গা বেয়ে, সিগন্যালের তার ধরে ধরে পায়ে চলা সরু পথ। আমরা সেই পথ ধরে লাইন বেঁধে ফিরে চললাম।

আধ মাইলটাক এইভাবে আসার পর মেঠো পথ পাওয়া গেল। পাশেই একটা টিলা মতন। টিলায় বসে আমরা দ্বিতীয়বার চা ও খাদ্য খেয়ে কিছুটা ক্লান্তি কাটালাম। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এল প্রায়।

এবার মেঠো পথ, পাশাপাশি হাঁটা যায়। হাঁটতে হাঁটতে বিজলী বলল, 'এখন একটা গল্প হলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।'

অশ্বিনী বিজলীর পিঠ চাপড়ে দিল। আমরাও সায় দিলাম।

সিগার ফুরিয়েছে, কাজেই সিগারেট টানছিলেন মজুমদারসাহেব। হেসে বললেন, 'মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমার গলা কি তোমরা শুনতে পাবে! যা বাতাস!'

একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটলে গলার স্বর শোনার কোনো অসুবিধে নেই। কান্তি বলল, 'আপনি শুরু করুন, আমরা ঠিক শুনতে পাব।'

বিশ-পঁচিশ গজ নীরবে হেঁটে গিয়ে মজুমদারসাহেব গল্প শুরু করলেন :

"এ-গল্পের খানিকটা ভূতুড়ে। মানে ভূত দিয়ে গল্পটা শুরু।...পুরোনো টালিগঞ্জ—গল্ফ ক্লাব-রোডের দিকে এক সময়ে একটা ছোট কটেজ ছিল। পুরোনো বটে, কিন্তু সুন্দর দেখতে; ওই কটেজটার নাম ছিল 'হ্যাপি নেস্ট'—অর্থাৎ সুখের নীড়। সেই বাড়িতে সুখ কত ছিল সেটা পথ-চলতি লোক জানুক আর না জানুক, যেতে যেতে দেখতে পেত বাড়ির ছোট পাঁচিলের ওপাশে নানা রকম ফুলের বাগান। ফুলে আর নানা বাহারের পাতায় থই থই করত বাগানটা। কটেজটা ছিল বাগানের শেষ প্রান্তে।...

পেছনে—মানে কটেজের পেছনে গোটা দুয়েক ঘাড়ভাঙা বাড়ি।"

"ঘাড় ভাঙা বাড়ি—!" বিজলী হেসে উঠল।

"হ্যাঁ গো, ঘাড় ভাঙা বাড়ি।" মজুমদার-সাহেব রসিকতা করে বললেন, "এক সময় ওগুলো পুরো বাড়ি ছিল, পরে অযত্নে এবং বয়সে তাদের শরীর ভেঙে গিয়েছে।...যাক্, কথা হচ্ছে সুখ-নীড়কে নিয়ে। তার গল্প শোনো।...এই যে সুখনীড়, এই নীড়ে থাকত এক দম্পতি। স্বামী যিনি তাঁর বয়স কিছু বেশী পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে; স্ত্রী যিনি তিনি একেবারে সদ্য প্রস্ফুটিত—" মজুমদারসাহেব পরিহাসের গলায় বললেন এবং হাসলেন।

কান্তি সঙ্গে সঙ্গে ওই কাল্পনিক দম্পতির নামকরণ করে দিল। বলল, "ভদ্র-লোকের নাম থাক মণিমোহন, আর মেয়েটির

নাম হোক শিখা।" বলে কান্তি আপন খেয়ালেই হাসল।

"নামটা তুমি অজান্তেই দিয়েছ, কান্তি: কিন্তু লাগসই হয়ে গেছে। মণিমোহনের বাস্তবিকই কিছু মণিমোহ ছিল। তা ছাড়া অমন রূপসী মেয়ের স্বামীরা স্ত্রীকেও অবশ্য একটা মহার্ঘ্য মণি হিসেবে ভাবে। মণিমোহন শিখাকে নিশ্চয় তার ভাগ্যে জুটে যাওয়া একটা অতিরিক্ত বহুমূল্য রত্ন হিসেবেই ভাবত।

এই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন কেমন কেউ জানত না, কেউ চাক্ষুস করে নি। কিন্তু বাড়ির নাম, অমন ফুলের বাগান, আর মাঝে মাঝে যখন ছোট একটা হিলম্যান টু-সিটারে ওরা দু-জন বাইরে বেরুত—তখন মেয়েটির প্রসাধিত সেই সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে অনেকেরই মনে হত, মেয়েটি অগ্নিশিখা আর স্বামীটি অশেষ সৌভাগ্যবান।"

গল্পটা বেশ জমে আসছিল। আমরা মজুমদারসাহেবের কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম। বাতাস ঝাপটা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

"এমন সুখের নীড় একদিন অভিশাপের নীড় হয়ে দেখা দিল। একেবারে আচমকা। মণিমোহন তার টু-সিটার গাড়িটা নিয়ে পাগলের মতন টালিগঞ্জ থানায় গিয়ে হাজির। তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। অগ্রহায়ণ মাস। আমি অফিসের কাজে টালিগঞ্জ পুলিস স্টেশনে এসেছি, ফেরার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলছি, ব্যানার্জি ছিল ও সি, আমার বিশেষ বন্ধু। মণিমোহনের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা হন্তদন্ত ভাব। ব্যাপারটা কি? মণিমোহন বললে, বি কুইক স্যার, আমার স্ত্রী বোধ হয় মারা গেছে, বোধ হয় স্যুসাইড করেছে।

স্যুসাইড্ কি রে, বাবা? হঠাৎ? মণিমোহন ব্যানার্জির হাত ধরে ফেলল, প্লিজ বি হারি।...আমি বললাম, কতক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটেছে? মণিমোহন বললে, তা ঠিক বলতে পারব না। ঘণ্টাখানেক হবে কি তারও বেশী হতে পারে।

ব্যানার্জির সঙ্গে আমাকেও যেতে হল। ব্যানার্জি বলল, চল মজুমদার। মণিমোহনের টু-সিটারেই আমরা তিনজনে ঠাসাঠাসি করে বসলাম। পুলিসের গাড়ি থাকল পিছনে।

ভদ্রলোককে উদ্‌ভ্রান্ত দেখে ব্যানার্জি নিজেই গাড়ির স্টিয়ারিং ধরতে যাচ্ছিল। আমি ইশারায় নিষেধ করলাম। কখনও কখনও বিপদের সময় নার্ভ ঠিক রাখার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া।

মণিমোহনই গাড়ি চালাতে লাগল। গাড়িতে কথাবার্তা শুরু করলাম আমি। বললাম, থানায় আসার আগে আপনি কি কোনো ডাক্তারকে খবর দিয়েছেন?... ও বললে, চাকরকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছে।

মণিমোহনের কাছে যা শোনা গেল, তা এই রকম। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ চা খেয়ে শিখা তার স্বামীকে বলে, স্নানের জল করে দিতে। কথাটা তোমাদের কানে খুব বেখাপ্পা শোনাল, না—? আমাদেরও কানে লেগেছিল। কিন্তু পরে বিস্তারিত শুনলাম। শিখা বিকেলের দিকে রোজ—মানে প্রায়ই মেডিকেটেড্ বাথ নিত। তার অর্থ এই, শিখার শরীরে একটা বাতের মতন ব্যথা ছিল, আর গায়ের চামড়া ক্রমশ কর্কশ হয়ে যাচ্ছিল। তার ডাক্তার তাকে বলেছিল, রোজ ঘণ্টাখানেক মেডিকেটেড্ বাথ নিতে। নানা রকম সল্ট্, ওষুধ ও লোশান মেশানো উষ্ণ জলে কাঁধ পর্যন্ত ডুবিয়ে বাথ-টাবের মধ্যে বসে থাকতে হত শিখাকে। এই স্নানপর্ব যদিও শিখার তবু তার স্বামী মণিমোহন বাথ-টাবের জল ঠিক মতন উষ্ণ করে, ওষুধ-পত্র সল্ট মিশিয়ে ঠিক করে দিত, আর শিখা তার স্বামীর এই সেবা ও প্রেম অত্যন্ত সুখের সঙ্গে গ্রহণ করত।

আজ যথারীতি শিখা তার স্বামীকে স্নানের জল তৈরী করে দিতে বলে। সাধারণত এই স্নান শিখা বিকেলের দিকে নিত। কারণ তাতে শরীর তাজা হয়ে উঠত, বাইরে বেড়াতে বেরুবার আগে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারত; ভাল ঘুম হত রাত্রে।"

মজুমদারসাহেব থামলেন। রেল লাইন থেকে যদিও আমরা অনেকটা দূরে তবু লাইনের সমান্তরালে হেঁটে যাচ্ছিলাম। একটা মালগাড়ি চলে এসেছিল। তার শব্দ এই নির্জনে প্রকম্পিত হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারপাশ বেশ অন্ধকার। মাঠের পথটাও প্রশস্ত হয়েছে, গরুর গাড়ির চাকায় খোঁদল হওয়া মেঠো পথ ধরে আমরা চলেছি।

নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মজুমদারসাহেব বললেন, "মণিমোহন ব্যাপারটা ক্রমে খুলে বলল। শিখা স্নান করতে যাবার পর ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ওদের একটা সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা। মণিমোহন টুকটাক কাজ সেরে নিজে তৈরি হয়ে গাড়িটাড়ি বের করে রাখল। শিখা আর বেরোয় না। বাথরুমের দরজায় গিয়ে টোকা দিল মণিমোহন; কোনো সাড়া শব্দ নেই। ডাকল নাম ধরে, সাড়া নেই। দরজা ঠেলল, বন্ধই রয়েছে। ব্যাপার কি! বাথ-রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে আলোও দেখা যাচ্ছে না। এসময় বাথরুমের ভেতরটা বেশ ঝাপসা হয়ে যায়, আলো জ্বলা উচিত।... চিন্তিত হয়ে, মণিমোহন বাইরে দিয়ে—মানে পিছন দিয়ে বাথরুমের জানলার কাছে গেল। হালকা অন্ধকারে শিখাকে বাথটাবের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখল। সর্বাঙ্গ জলের তলায়, মাথাটা টাবের কানার ওপর টলে পড়ে আছে।...ওই দেখেই ভয়ে মণিমোহনের

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সে পিছনের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, সেই দরজাটাও বন্ধ। তখন হতবুদ্ধি হয়ে মণিমোহন চাকরকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে নিজে থানায় ছুটে এসেছে।

মণিমোহনের কথা শেষ হবার সময় সময় আমরা তার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম।

আমি মণিমোহনকে জিজ্ঞেস করলাম, তা স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখে হঠাৎ তার আত্মহত্যার কথা মনে পড়ল কেন? এমনও ত হতে পারে মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মণিমোহন বলল, কে জানে। ভাল কিছু যদি হয় তার জন্যে আপসোস করতে হবে না, কিন্তু খারাপ হলেই চিরজীবনের আপসোস। মানুষ খারাপটাই আগে মনে করে।

সোজা কথা, মণিমোহন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া তার স্ত্রী বড় সেণ্টিমেণ্টাল। সত্যি কথা বলতে কি, কাল রাত থেকে ওদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হয়েছে। মণিমোহন আজ সকাল এবং দুপুরে তার স্ত্রীকে যথেষ্ট তোওয়াজ করেছে, তবু পুরোপুরি মেঘ কাটাতে পারেনি।

ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করল, মনোমালিন্য কি জন্যে?

মণিমোহন জবাবে বলল, কিছু সিরিআস ব্যাপারে নয়। এমনি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংসারিক ঝগড়া।

হ্যাপি নেস্টএর মধ্যে গাড়ি ঢুকল। বারান্দায় দু' চারজন লোক দাঁড়িয়ে, চাকরটাও রয়েছে।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই চাকরটা কী যেন বলল।

তারপরই এগিয়ে এল ডাক্তার। বলল, 'কি ব্যাপার মিস্টার চৌধুরী, আপনার স্ত্রী কোথায়?'

মণিমোহন অবাক। কেন, শিখা বাথরুমে, বাথরুমে পড়ে আছে।

ডাক্তার বলল, বাথরুমে কেউ নেই। ঘরটা অন্ধকার।

মণিমোহন পাগলের মতন বাথরুমের দিকে ছুটল।"

আমরা মজুমদারসাহেবের পাশ ঘেঁষে এলাম। এতক্ষণে পথ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। কনকনে বাতাস বইছিল। মাঠের গন্ধ। আকাশে তারা ফুটে উঠেছে।

বিজলী অবাক হয়ে বলল, "তার মানে মণিমোহনের স্ত্রী শিখা উধাও?"

"একেবারে অদৃশ্য।" মজুমদারসাহেব জবাব দিলেন।

"সে কি!" কান্তি পথে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

মজুমদারসাহেব বললেন, "বাথরুমে

ঢুকে আমরা কি দেখলাম জানো!...পিছনের দরজা খোলা, ঘরের ইলেকট্রিক বাতিটা জ্বলছে না। জানলার কাঁচ একদিকে ভাঙা, জানলা খোলা।"

"জানলাও ভাঙা?"

"জানলাটা অবশ্য ডাক্তার ভেঙেছিল। অত ত সে বোঝেনি। চাকর গিয়ে বলেছে, সে বেচারী এসে শুনেছে বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, মিসেস চৌধুরী বাথরুমের মধ্যে, কাজেই কাঁচের জানলার শার্সি ভেঙে ছিটকিনিতে হাত পেয়ে সে জানলা খুলে ভেতরে ঢুকেছে। ঢুকে দেখে বাথরুমে কেউ নেই। পরে সন্দেহ হওয়ায় বাইরের দরজায় হাত দিয়ে দেখে দরজাটা খোলা।"

"তার মানে, ওই সময়ে শিখা সরে পড়েছে।" বিজলী বলল।

"কোন সময়ে?"

"মণিমোহন যখন থানায় ছুটেছে, চাকর গেছে ডাক্তার ডাকতে, তখন—।"

"হ্যাঁ।"

"চাকরটা বিশেষ—" আমি বলতে যাচ্ছিলাম।

"চাকরের কি দোষ! তাকে মণিমোহন চেঁচামেচি করে হন্তদন্ত হয়ে যা বলেছে। সে ভেবেছে সত্যিই বুঝি বাথরুমের সব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, কাজেই ডাক্তারকেও সে ওই একই কথা বলেছে।"

"যাক গে, তারপর—?" অশ্বিনী আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না।

মজুমদারসাহেব বললেন, "বাতির ব্যবস্থা করে আমরা বাথরুমটা ভাল করে দেখলাম। বাথটাব ঠিক নয়—লোহার চাদরে তৈরি বেশ বড় উঁচু গামলা একটা। এরকম টাব এককালে চলতি ছিল। টাব ভরতি জল, ওষুধপত্রে সন্টে জলে কেমন একটা রঙ হয়ে আছে। টাবের পাশে মাথার দিকে একটা দেওয়ালে ওআটার হীটার ঝুলছে; তলায় ছোট একটা র‍্যাক, র‍্যাকের ওপর টুকিটাকি জিনিস, প্রসাধনের কিছু, কিছু বোধ হয় ওষুধ, একটি চটি ইংরিজী উপন্যাস, আর-একটা ইলেকট্রিক সুইচ—বেড সুইচের মতন, তার গা দিয়ে ইলেকট্রিক তার গিয়ে বাথরুমের মাথার আলোর সঙ্গে জয়েন হয়েছে। দেওয়ালে এমনি সুইচও ছিল। এটা এক্সট্রা। অর্থাৎ স্নান করতে করতে শিখা খুশিমতন বাতি জ্বালাত, নেবাত, বই পড়ত।"

"মানে মহিলা খুব শৌখিনী ভাবে বাথ নিতেন?" বিজলী বলল।

"স্বাভাবিক। ঘণ্টাখানেক চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবে থাকতে হলে একটা কিছু ত করতেই হবে, সে বইই পড় বা গানই শোনো।...বাথরুমের বাতিও ছিল দুটো, একটা এমনি সাধাসিধে, অন্যটা অল্প পাওয়ারের ব্লু আলো।"

এবার আমরা মেঠো পথ ছেড়ে ভাল রাস্তায় উঠলাম।

হাঁটতে হাঁটতে মজুমদারসাহেব বললেন, "ব্যাপারটা বেশ ভুতুড়ে। মণিমোহন দেখে গেছে তার স্ত্রী বাথটাবের মধ্যে পড়ে আছে, মাথা টলে রয়েছে; ডাক্তার এসে দেখছে বাথরুম ফাঁকা কেউ নেই, বাথরুমের পিছনের দরজা বন্ধ নয়, ভেজানো। রহস্যটা তাহলে কি?

মণিমোহনকে প্রথমত ব্যানার্জি তার কনস্টেবলের হেপাজতে রেখে বাথরুমের পিছন দিকের দরজা দিয়ে টর্চের আলোয় খানিকটা এগিয়ে গেল, বাগান গাছপালার মধ্যে দিয়ে পথটা বাড়ির পিছনদিককার পাঁচিলে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা পিয়ারা গাছ, পিয়ারা গাছের তলায় আলোয় মেয়েদের মাথার চুলের জাল নজরে পড়ল। জালটা

আমি উঠিয়ে নিলাম। পিয়ারা গাছের নিচু ডাল, ডালে পা রেখে উঠে দাঁড়াতেই স্পষ্ট বোঝা গেল শিখা এই পথ দিয়ে পাঁচিল টপকে—ঘাড়-ভাঙা বাড়িগুলোর দিকে চলে গেছে। এই বাড়ির কোথাও সে রয়েছে।

আমরা সেই বাড়ির কাছে গেলাম। পুরোনো, জীর্ণ; ইঁট বেরকরা বাড়ি। বাতি জ্বলছে।

ডাকাডাকি করতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। পুলিস দেখেই বলল, 'শিখাদিকে খুঁজছেন?'

বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে; কিংবা শিখা এখানে আশ্রয় নিয়ে থাকতেও পারে।

বললাম, হ্যাঁ। তিনি কোথায়?

অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন। শুনছি ও-বাড়িতে যেন কি হয়েছে।

বাড়িটার ডান দিক দিয়ে ছোট রাস্তা। রাস্তাটা ঘুরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তবে কি শিখা ওদিকে কোথাও গেছে? কোথায়? কেন?

মেয়েটি মিথ্যে বলছে আমাদের মনে হল না। আমরা সেই ডান দিকের রাস্তা ধরে ঘুরে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। সামনেই একটা চা পান বিড়ির খোলার চালের দোকান।

দোকানদার বলল, হ্যাঁ—ওই বাহাত্তর নম্বর বাড়ির মা এই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ, তারপর একটা ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে বসলেন, শহরের দিকে চলে গেলেন।

হ্যাপি ভিলায় আবার ফিরে এলাম আমরা। এসে দেখি টালিগঞ্জ পুলিস স্টেশন থেকে ছোটবাবু শিখাকে নিয়ে হাজির হয়েছে।"

"তা হলে শিখা থানায় গিয়েছিল?" কান্তি বলল।

"হ্যাঁ। থানায়।"

"কি বলল সে?" বিজলী আর অপেক্ষা করতে পারছে না।

"বলল যা, তা আমরা খানিকটা অনুমান করতে পেরেছিলাম।..." মজুমদারসাহেব কেমন করে যেন হাসলেন একটু, "মণিমোহনই বোকার মতন এই কাণ্ডটা করেছে। ...শিখার কিছু দামী পাথর ছিল, দামী এই অর্থে যে, সেগুলো নাকি তার বাবা রাজপুতনার কোন মরুভূমি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পাথরগুলো দেখতে যত সুন্দর, তত কিন্তু দামী নয়। অথচ শিখারা সব সময় ওটাকে খুব দামী জিনিস বলত। মণিমোহনেরও ধারণা হয়েছিল, পাথরগুলো খুব দামী। সে অনেকবার পাথরগুলো স্ত্রীর কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে, পারেনি। কিছুদিন ধরে স্বামীর মতিগতি দেখে শিখার মনে হয়, একটা কোনো

দুষ্কর্ম করবার চেষ্টা করছে তার স্বামী। শিখা খুব সতর্ক হয়ে থাকে।

ঘটনার দিন বিকেলে চা-খাবার পর মণিমোহন বলে, স্নান করে নাও, সিনেমায় যাব।...শিখার শরীর ভাল ছিল না। সে যেতে চাইছিল না। মণিমোহন কোনো কিছু কানে তুলল না। বাথরুমে গেল, জল তৈরী করল। ফিরে এসে বলল, জল করে দিয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি নাও।

সেদিন, মানে ঘটনার দিন, শিখা লক্ষ্য করে দেখেছিল, মণিমোহন বারে বারে বাথরুম যাচ্ছে। একবার তার হাতে খানিকটা ইলেকট্রিক তারও সে দেখেছিল। শিখার সন্দেহ হয়, মণিমোহনের উদ্দেশ্য ভাল নয়। সে বাথরুম যাবার সময় শাড়ির তলায় তার পাথর-রাখা ছোট কৌটোটা নিয়ে গিয়েছিল। তখনও সে বোঝেনি স্নান করার সময় সর্বাঙ্গ ভিজে অবস্থায় লোহার টাবে শুয়ে শুয়ে' যখন সে কোনো কারণে আলোর জন্যে হাত বাড়িয়ে র‍্যাকের ওপর রাখা বেড সুইচটা টিপবে, তখন ফাটা চিড়-খাওয়া সুইচের পাশ দিয়ে বের করা ইলেকট্রিক ওআর তার আঙুলে বা মুঠোয় ছুঁয়ে গিয়ে তাকে শেষ করে দেবে। কারণ বিদ্যুতকে মণিমোহন বেঁধে রেখে দেয় নি, সাপের মত ফনা তুলিয়ে রেখেছিল, দংশনের জন্যে। মণিমোহন খুব চতুরভাবে এই বৈদ্যুতিক কারিগরী করেছিল। ওটা এ সি লাইন।

ভগবান তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। জলের টাবে নামবার আগে সে পাথর-রাখা কৌটোটা র‍্যাকের ওপর রাখছিল। তার হাত থেকে কৌটোটা হঠাৎ পড়ে যায়, একেবারে সুইচের ওপর। ফাটা চিড় খাওয়া সুইচ জোড়াতালি মেরে রেখেছিল মণিমোহন। কৌটোটা পড়ে যেতেই সুইচটার দু চার টুকরো খোলা খসে গেল। শিখার সন্দেহ হল, সুইচটা না আজই মণিমোহন বদলেছে বলেছিল। তা ত নয়। তা ছাড়া সুইচটা বদলাবারও কোনো কারণ ছিল না, অথবা মণিমোহন কেন বদলাতে যাবে! ...শিখার মন খুঁত খুঁত করে উঠল। ও নজর করে দেখল, ওই সুইচের দিকটায় কেমন যেন একটা গোলমাল করা রয়েছে। দেওয়ালের সুইচ অন্ করা, অথচ বাতি জ্বলছে না। তার মানে একটা খারাপ বালব রেখে মণিমোহন মাথার বাতি অন্ করে রেখেছে। আর সেই তারের সঙ্গে র‍্যাকের সুইচের কানেকসান করেছে। বু বাতিটা মাথার দিকে। তারও সেই হাল।

শিখা বাথ টাবের মধ্যে নামল। অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পরে মণিমোহনের টোকা শুনল দরজায়। বুঝল লোকটা দেখতে এসেছে শিখা মরল কি না। মণিমোহন যখন জানলায়, তখন চোখের পাতা একটু ফাঁক করে শিখা তার স্বামীকে দেখেছে। মণিমোহন যখন চাকরকে ডাকছিল, চেঁচাচ্ছিল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল —বাথরুমের জানলা সামান্য ফাঁক করে শিখা কান পেতে সব শোনার চেষ্টা করেছে।... তারপর সে বুঝেছে বাড়ি ফাঁকা। তাড়াতাড়ি কাপড় গায়ে জড়িয়ে—পাথরের কৌটোটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। অবশ্য, তার আগেই দেওয়ালের সুইচ অফ করে দিয়েছিল।"

গল্পটা শেষ হলে আমরা একসঙ্গে বললাম, "লোকটা যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে থানায় গিয়ে আগেই তার স্ত্রীর স্যুসাইডের কথা বলল, তাতেই ওকে সন্দেহ হয়, পাকা বদমাশ।"

আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অপরাধ-মূলক কাহিনীগুচ্ছের (গোয়েন্দা কাহিনী নয়) এগারোটি গল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। আপাতত এই পর্যায়ের রচনার সমাপ্তি ঘটিল। শেষ কাহিনীটি মৌলিক, অপর কাহিনীগুলির ভিত্তি নরম্যান অ্যাটে লিখিত সত্য ঘটনা।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

এগার

সাহেব-চোরের পয়লা দিনের কাজ। জীবনের পাপ বল, দোষ-ত্রুটি বল, এই তার সর্বপ্রথম। অনেক কাল পরে বলাধিকারীকে একবার বলেছিল রানীর মাকড়ি-চুরির কাহিনী। আনুপূর্বিক শুনে তো হো-হো করে হেসে ওঠা উচিত। কিন্তু না হেসে তিনি সবিস্ময়ে তাকালেনঃ আদর্শ মাতৃভক্তি—মায়ের কথা ভেবেই ভালবাসার জনের মনে দুঃখ দিতে সঙ্কোচ হয়নি। তুলনা করা ঠিক হবে না—তবু আমার বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা মনে পড়ল। আরও বিস্তর বড় বড় লোকের কথা। মায়ের আশীর্বাদে তাঁরা সব বড় হয়েছেন। তুমিও খুব বড় হবে সাহেব, এই আমি বলে দিলাম।

এত বলেও বলাধিকারীর উচ্ছ্বাস থামে না। আবার বললেন, মহৎ মানুষের ভাল ভাল কাজকর্মের কথাই পুঁথিপত্রে লেখে। চুরির কথা কে লিখতে যাবে? পুণ্যের বড় মান, পাপ হোক খানখান—গালি দিয়ে, থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলে সকলে সামাজিক কর্তব্য সেরে যায়। ভালমানুষ হয় অন্যের কাছে। মানুষের ভিতর অবধি তলিয়ে দেখবার চোখ আছে ক-জনার?

কৌতুক-চোখে সাহেব পিছনের এইসব দিনের পানে তাকিয়ে এসেছে। বহুদর্শী সজ্জন মানুষ বলাধিকারী, তাঁর কথা ফলেছে ষোলআনা। সত্যি সত্যি সাহেব একসময় খুব বড় হল, নামডাক হল প্রচুর। সাহেব-চোর বলতে একডাকে চিনে ফেলত ভাটি অঞ্চলের মানুষ। পয়লা কাজে মাতৃ-আশীর্বাদ পেয়েছিল, তারই ফলে বোধ হয়। সুধামুখীর চোখ ফেটে জল এসেছিল, ন-বছুরে বালক তালপুজোর রাত্রে চাল-ডাল কিনে এনে যখন তার হাতে দিল। সাহেবের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি বলল খানিক। কিন্তু সুধামুখীকে মা-ই যদি বলতে হয় তো চোরাই-মা। সেই মায়ের আশীর্বাদে সন্তান বড় জ্ঞানী, বড় মানী, বড় গুণী হয় না—হয় মস্তবড় চোর। সাচ্চা মা হলে সাহেবও সাচ্চা মানুষ হত—যাঁদের নামে লোকে ধন্য-ধন্য করে। তাঁদের পাশাপাশি না হোক, পায়ের নিচে বসবার ঠাঁই পেত।

সেইদিন আরও এক মাতৃভক্তির গল্প করলেন বলাধিকারী। সুবিখ্যাত কাপ্তেন কেনা মল্লিক, তার বড় ভাই বেচারামের। মহামান্য সরকারের বিচারে ফাঁসি হয়েছিল তার। আঙুল ফুলে কলাগাছ বলে—এই বেচা মল্লিক শালগাছ হয়েছিল। কাজের শুরুতে চোরও নয়, চোরাই মাল বয়ে আনার মুটে মাত্র। চোরেদের সঙ্গে গিয়ে পদ্ধতিটা তীক্ষ্ণ নজরে দেখত। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরে সেই মানুষটা কালক্রমে এমন ধুরন্ধর হয়ে উঠল, জলের পুলিস, ডাঙার পুলিস ঘোল খাইয়ে বেড়িয়েছে একাদিক্রমে সাত-আট বছর। এমনি সময় তার উপর রোমহর্ষক এক খুনের চার্জ এল। খুন করা নিয়ম নয় এদের। মহাপাপ—সমাজে অপাংক্তেয় হতে হয় ইচ্ছায় হোক দৈবক্রমে হোক মানুষ খুন হয়ে গেলে। তার উপরে মেয়ে খুন। মেয়েমানুষের উপর তিল পরিমাণ অত্যাচার ঘটলে ওস্তাদের অভিশাপ লাগে, সর্বনাশ ঘটে যায়। সমস্ত জেনে বুঝে বেচারাম মুক্তাময়ী নামে ধনী ঘরের রূপসী

মেয়েটাকে খুন করেছে—সেই মেয়ে বেচারামের জন্য পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল। সরকার বাহাদুর মাথার মূল্য ধরে দিলেন হাজার টাকা। জীবিত হোক মৃত হোক, জুটিয়ে এনে দেবে তার এই লভ্য। বুঝুন রে। যে লোক সিঁধেল চোরের পিছু পিছু ঘুরে বমাল মাথায় বয়ে সমস্ত রাত্রে আটআনা রোজগার করেছে, সেই মাথাটারই আজ এই দাম উঠে গেল। কাপ্তেন কেনারাম আজকে এতগুলো দলের মাথা হয়ে দেশ-দেশান্তর দিগ্বিজয় করে বেড়ায়—বলতে গেলে তার বাহাদুরি এমন-কিছু নেই। বেচারামই গোড়াপত্তন করে গেল, সেই বস্তুটাই বাড়িয়ে গুছিয়ে শৃঙ্খলায় পরিপাটি করে নিয়েছে। মূলধনও ঐ বেচারামের সঞ্চয়ের টাকা।

পাঁকাল মাছের মতো বিস্তর কাল পিছলে পিছলে বেড়িয়ে অবশেষে একদিন বেচারাম ধরা পড়ল। সরকারের সবচেয়ে মোটা যে পদ্ধতি তারই প্রয়োগে এ হেন প্রতিভাধরের মর্যাদার ব্যবস্থা হল। ফাঁসি। ফাঁসিতে

মুলিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তুমি দম আটকে মারা যাও—রায়ের বাঁধুনিটা এই প্রকার।

আঁতুড়ঘরে বেচারামের মা মারা গিয়েছিল। মানুষ করেছে সংমা—যার গর্ভে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের জন্ম। ফাঁসির আগে সেই বিধবা সংমা দেখতে এল। এমন শক্ত মানুষ বেচারাম, শোনা যায় খুনটা নিজ হাতেই করেছে, কিন্তু আজ সে হাপুসনয়নে কাঁদছে। সংমায়ের পায়ের কাছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেঃ বড় অভাগা আমি মা। বুকের দুধ কত খাইয়েছ, একধার দুধের ঋণ শোধ করে যেতে পারলাম না।

সে এমন, জেলখানার মানুষ যারা পাহারায় ছিল, তারা অবধি চোখের জল ঠেকাতে পারে না। বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার কথা বলে, ছোটবেলা ওর ছায়ায় কত খেলা করেছে। বড় টান ঐ গাছের উপর। বলে, ফাঁসির পর মড়া তোমাদের দিয়ে দেবে মা। তেঁতুল-কাঠে পোড়ায় যেন আমায়। গোড়াসুদ্ধ গাছটা উপড়ে ফেলবে, চিহ্ন না থাকে। পোড়াতে যা লাগে, বাদ বাকি সমস্ত গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবে। মাটির উপর ঐ গাছ থাকতে আমার মুক্তি নেই, অপদেবতা হয়ে ডালে বাসা করতে হবে। গাছ থাকলে তোমারও তো যখন তখন আমার কথা মনে আসবে। কাঁদবে নিরালায়।

শেষ ইচ্ছা তেঁতুলগাছ উপড়ে ফেলা, তেঁতুল-কাঠে দাহ করা। উপড়াতে গিয়ে আসল মতলব পাওয়া গেল। তেঁতুলের শিকড়বাকড়ের মধ্যে ঘটিভরা মোহর। বেচারাম পুঁতে রেখেছে। মায়ের দুধের ঋণ শোধ দিয়ে গেল, মৃত্যুর সামনে মায়ের কথাই যে ভেবেছে।

কিন্তু থাক এসব পরের বৃত্তান্ত। পিছনের কথা আগে বলা হয়ে যাচ্ছে।

মাকড়িজোড়া সাহেবের হাতের মুঠোয়। যায় কোথা এখন, মালের কোন ব্যবস্থা করে?

বেশ খানিকটা গিয়ে আদিগঙ্গার কিনারে রেলের পুলের পাশে প্রাচীন এক শিবমন্দির, এবং আনুষঙ্গিক বাগানে দু-পাঁচটা ফলসা গাছ। সাহেব ঐ খানে পেয়ারা খেতে আসে। বাগানের ধারে স্বরু গলির সংকীর্ণ অন্ধকার ঘরে এক খুনখুনে বুড়ো স্যাকরা দিনমানেও প্রদীপ জেবলে ঠুকঠুক করে সোনারুপোর গয়না গড়ে। সে বুড়োর যেন খাওয়া নেই, ঘুম নেই—সাহেব যখনই যায়, কাজ করছে সে একই ভাবে। কাজ করে একাকী—এতদিনের মধ্যে একবার মাত্র সেই ঘরে একটি দ্বিতীয় মানুষ দেখেছে।

বড়রাস্তার ভিড়ের দোকানে যেতে ভরসা পায় না, ভেবেচিন্তে ছুটল সেই স্যাকরার কাছে। এমন পার্বণের দিনে ধর্মকর্মে বুড়োমানুষেরই বেশি করে যাওয়ার কথা। সন্দেহ ছিল পাওয়া যাবে কি না যাবে। কিন্তু স্যাকরামশায় ঠিক তার কাজে—মেজের মাটির উপর নিচু হয়ে পড়ে মুচির [illegible] প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছে।

পিছন ফিরে ছিল। চৌকাঠে সাহেব যেইমাত্র পা ঠেকিয়েছে, গুটানো সাপ যেমন করে ফণা তুলে ওঠে, স্যাকরামশায় চক্ষের পলকে তেমনি খাড়া হয়ে মুখ ফেরাল সাহেবের দিকে।

কে তুমি? কি নাম? কোথায় থাক? কেন এসেছ, এখানে কী দরকার বল।

সাহেবের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে যায়। বলে, বস তুমি। মালটাল এনেছ নাকি, না এমনি জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?

বাঁচা গেল রে বাবা! সাহেবকে কোন [illegible] বলে, [illegible] মাকড়ি নিয়ে এসেছি। নেন যদি আপনি।

কার মাকড়ি?

আমার মায়।

এ ছাড়া অন্য কি বলা যায়। ঢোক গি[illegible] নিয়ে বলে, মায়ের বড্ড অসুখ, ওষুধপা[illegible] হচ্ছে না। মা-ই তখন বের করে দিল—

ছোট ছেলের মুখে এত বড় দুঃখের ক[illegible] শুনেও স্যাকরা ভুসড়ো দাঁত মেলে ফ্যা-ফ[illegible] করে হাসেঃ বটেই তো! দায়েবেদায়ে কা[illegible] লাগবে বলেই তো গয়না গড়িয়ে লোকে টা[illegible] লগ্নি করে রাখে। অসময়ে বের করে দেয়[illegible] তা বস তুমি, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসে কা[illegible] হয় না। মাদুরটা টেনে নিয়ে বসে পড়।

ফুঁ পাড়া বন্ধ করে দু-হাত ঝেড়েঝুড়ে এবারে ভাল হয়ে ঘুরে বসল বুড়ো : দাও কি জিনিষ, দেখি—

হাতের নিয়েই ভ্রূ কুঁচকে তাকায় : তোমার মায়ের বয়স কত বাপধন?

অ্যাঁ—

এই যখন মায়ের গয়না, মা আর বেটা এক-বয়সি তোমরা। কোন কারিগর গয়না গড়িয়েছে, তার নামটা বল দিকি।

মুচকি হাসছিল এতক্ষণ, এইবারে সে দুলে দুলে হাসতে লাগল। সাহেব রাগ করে বলে এত খবরাখবর কিসের জন্য? পছন্দ হলে উচিত দামে নিয়ে নেবেন। না হলে তো তা-ও বলুন।

হাসি থামিয়ে স্যাকরা বলে, জিনিষটা হাতে করে এসেছ, পরখ করে দেখিয়ে দিই। মনে আর সন্দ থাকে কেন?

কষ্টিপাথর বের করে মাকড়ির একটা কিনারে ঘষল বার কয়েক। পাথরখানা সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে। সগর্বে বলল, দেখতে পাচ্ছ? পাথর ঠুকে বলতে হয় না, চোখের নজরেই বলে দিতে পারি। জিনিস সোনা নয় বাপধন, পিতল। এই কর্ম করে করে বয়স চার কুড়ি বছর পার হয়েছে, বিরাশিতে পা দিয়েছি। জোচ্চুরি করে পিতল গছাতে এসেছ—বুড়োমানুষটা ধরতে পারবে না, উঁ?

সাহেব আগুন হয়ে বলে, জোচ্চোর আমি নই। কখনো না। না বুঝতে পেরে এসেছি, আমাদেরই ঠকিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিন ওটা, চলে যাই।

স্যাকরা বলে, চটে যাচ্ছ তুমি বাপধন। বুঝতে পেরেছি। কাঁচা বয়সে মানুষ হয় এমনি রগচটা।

কাঠের হাতবাক্স থেকে দুটো টাকা দিল সাহেবকে : নিয়ে যাও—

পাথরের দাগ দেখে সাহেব কিছু বোঝে নি, সোনা চিনবার বয়স নয় তার। এবার ভাবছে, বুড়োরই ভাঁওতা। বলে, শুধু যদি পিতলই হয়, দাম তবে কিসের?

টাকার সঙ্গে স্যাকরা মাকড়ি দুটোও দিয়ে দিল। বলে, ষোলআনা পিতল—সোনা এক-রতিও নেই। এ জিনিস আর কোথাও বেচতে যেও না। জোচ্চোর ভাববে, গণ্ডগোলে পড়তে পার। নিতান্ত দায়ে পড়েছ বলেই আমার কাছে এসে উঠেছ। সেটা বুঝি বাপধন। শুধু-হাতে ফেরানো যায় না, সেই জন্যে, এই সামান্য কিছু। একেবারে দিচ্ছিনে কিন্তু। দান আমার কুষ্ঠিতে নেই, কারবার তাহলে লাটে উঠবে। সময় হলে শোধ দিয়ে যেও। কেমন?

শুনে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। সুধামুখী বলেছিল, মা-কালীকে ডাকবি আজ এই পার্বণের রাতে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সত্যিই তো সেই ব্যাপার। ক্ষিধের চোটে ব্যাকুল হয়ে ঠাকরুনের কাছে খেতে চেয়েছিল। মা-কালী তাই স্যাকরা বুড়োর উপর ভর করে তাদের

দাম দিয়ে দিচ্ছেন। নইলে চেনা নেই জানা নেই, কে এমন লোক টাকা দেয়! টাকা একটা নয়, দু-দুটো।

বলে, টাকা শোধ দিয়ে যেতে বলছেন—না-ই যদি দিই? নাম একবারটি জিজ্ঞাসা করলেন, তারও তো জবাব নিলেন না।

বুড়ো বলে, জবাব নিয়ে কি করব? নাম একটা বলতে, সেটা বানানো নাম। পয়সা দিন অজানা লোকের কাছে সত্যি নাম-ঠিকানা কেউ বলে না। নিতান্ত হাঁদারাম হলে বলে হয়তো। তোমায় না-ই জানলাম, আমার আস্তানা তো জানা রইল তোমার। শোধ দেবার অবস্থা হলে এইখানে এসে দিয়ে যেও।

হাসতে হাসতে আবার বলে, সত্যি কথাই বলেছ, জোচ্চোর নও তুমি—চোর। হ্যাঁ বাপধন, চোখে দেখেই ধরতে পারি, মুখে কিছু বলতে হয় না। যেমন ঐ মাকড়ি পাথরে ঠোকার আগেই বলে দিলাম, মেকি জিনিস। নিতান্ত কাঁচা চোর, নতুন কাজে নেমেছ। মাল সরাতে শিখেছ, কিন্তু হাত বুলিয়ে সোনা-পিতলের তফাত ধরতে পার না এখনো। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কত ছেলে দেখলাম—আজকে আনাড়ি, দুটো দিন যেতে না যেতে পুরো লায়েক। লাইনে যখন এসেছ, আমাদের সঙ্গে কারবার রাখতে হবে। আমার কাছে না এসো, অন্য কোথাও যাবে। টাকা দুটো তোমায় শোধ করে যেতে হবে না। ঋণ নয়, ধরো ওটা দাদন দিয়ে রাখলাম। মাল দিয়ে রমারম টাকা গুণে নেবে, তাই থেকে দুটো টাকা কেটে নেব আমি তখন। তা সে বিশ-পঁচিশ দিনে হোক, আর বিশ-পঁচিশ বছরেই হোক।

চাল কিনেছে, তার উপর আলাদা এক ঠোঙায় ডাল একপোয়া। সেই রাজসূয় আয়োজন হাতে করে সাহেব বাড়ি এল। সুধামুখী ফেরে নি। অর্থাৎ অবস্থা আশাপ্রদ নয়, মানুষ পাকড়ানো এখন অবধি ঘটে ওঠে নি। নতুন কিছু নয়, এমন প্রায়ই হচ্ছে ইদানীং। সাহেব পাঁচিল টপকে বেরিয়েছিল, ঢুকেছেও সেই পথে। বড় রাস্তার মোড় হয়ে আসবার উপায় নেই। মা-মাসিরা রয়েছে, ছেলে-মানুষের যাওয়ায় বাধা আছে এখন। কাঠ-কাঠ উপোসের কথা হচ্ছিল—সেই জায়গায় চাল ফুটিয়ে ভাত বানিয়ে ভরপেট খাওয়া, সঙ্গে আবার ডাল। কিন্তু যে-মানুষটি চাল ফোটাবে সর্দিজ্বর নিয়ে বৃষ্টিজলের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে—এই তো কয়েক পা মাত্র দূরে। গিয়ে যে হাত ধরে টানবে : এস মা, আজ-কাল-পরশু তিন দিনের যোগাড় হয়ে গেছে, তিনটে দিন জিরেন নিয়ে অসুখটা সেরে ফেল, রান্নাঘরে এসে নিশ্চিন্তমনে উনুন ধরাও ...কিন্তু হবার জো নেই।

একসময় সুধামুখী ফিরে এল। একাই ফিরেছে, অবসন্নভাবে থপথপ করে আসছে।

সাহেব ডাকে, মাগো, শুনে গেলে হবে না। দেখসে এসে—ডাল-চাল এনেছি। রান্না চাপাও এখন—আমি খাব, তুমি খাবে।

ঘরে না গিয়ে সুধা রান্নাঘরের দিকে এল।

সাহেব উচ্ছ্বাস ভরে বলে, সেই যে তুমি বললে, মা-কালীকে তার পর খুব করে ডাকতে লাগলাম : কত মানুষ এসে তোমায় কত কি ভোগ দিয়ে যাচ্ছে, আজকের দিনটা নিশিপালন করিও না। ঠিক কথাই বলেছিলে মা, পালাপার্বনের দিন ঠাকুর খুব জাগ্রত থাকেন — ডালা-নৈবিদ্য-টাকাপয়সা বিস্তর পড়ে তো! আমার দরবার কানে পৌঁছে গেল —চাল আর ডাল দিয়েছেন এই দেখ।

কী রকমটা হল সুধামুখীর—সাহেবের মাথায় হাতখানা রেখে চোখ বোজে। ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করে বলছে কি যেন।

সামলে গিয়ে তারপর বলে, কে দিল এসব?

বললাম তো, মা-কালী দিয়ে দিলেন। বুড়োথুথুড়ে একজনের হাত দিয়ে। মানুষটার নাম জানি নে, দেখে থাকি মাঝে মাঝে। আমায় সে কাছে ডাকল—

দিব্যি তো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে। নিজের ক্ষমতা দেখে সাহেব অবাক।

মানুষটা কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, মুখ শুকনো তোমার, খাওয়া হয় নি বুঝি? হাত ধরে হিড়হিড় করে দোকানে নিয়ে চাল কিনে দিল। আর খাঁড়ি মুসুরির ডাল। তার মধ্যে ঠিক ঠাকুর ভর করেছিলেন, মানুষে তো এমন করে না। কি বল মা?

খাওয়াদাওয়া বেশ হল মা-কালীর দয়ায়। চালই যখন জুটেছে, ভান্দুরে অমাবস্যায় উপোসি থেকে পুণ্যার্জনের কথা আর ওঠে না।

খেয়েদেয়ে সাহেব গঙ্গার ঘাটে চলল। বাইরে বাইরে ঘোরে এ-সময়টা—ঘাটে যায়, রানী ঘুমিয়ে না পড়লে যায় সেখানেও। অনেক রাত্রি অবধি ঘোরাঘুরি করে তারপরে একসময় শুয়ে পড়ে।

আজ সুধামুখী মানা করল: যাসনে কোথাও সাহেব। ঘর খালি, কী দরকার! শরীরটা বড্ড খারাপ, মরে যাব মনে হচ্ছে। সকাল সকাল আমার পাশে আজ শুয়ে পড়।

মা-কালী এমনি যদি দয়া করে যান আর কয়েকটা বছর। নিত্যিদিন মা আর ছেলে সন্ধ্যারাত্রে শুয়ে পড়বে। সাহেব বড় হয়ে গেলে তখন তো মজা—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছেলের রোজগার খাবে। খাওয়াচ্ছে ছেলে সেই তো ক'দিন বয়স থেকে। অল্পবয়সে বিয়ে দেবে সাহেবের—টুকটুকে বউ আনবে, ঘুরঘুর করে বউ বাড়িময় বেড়াবে...

শুয়ে পড়েছে সাহেব বড় খাটের একপাশে।

মাকড়িজোড়া গাঁটে, পাশ ফিরতে বারবার গায়ে ফুটছে। ঝুটো গয়না গাঁটে কেন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাই ভাবে। গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলেই আপদের শান্তি।

সুধামুখীকে বলে, রানী ঐ যে গয়না পরে বেড়ায়, ও কি সোনার গয়না?

সোনা ছাড়া কি—

উঁহু, সোনা নয়। ওরা সব বলছে পিতল।

ওরা কারা, সে প্রশ্ন সুধামুখী করে না। এক বাড়িতে এতগুলো মেয়ে—পরের সাচ্চা গিনিসোনাও ঠোঁট উলটে পিতল বলে দেয়। নিজের ভাবনায় সে ব্যস্ত, নিস্পৃহভাবে বলে, হতে পারে—

পরে তো পিতল, তবে তার অত দেমাক কেন?

পিতল হলেও বুঝবে কেমন করে সেটা? ছোট মেয়ের গায়ে সোনা দেবেই বা কেন? ওরা কি যত্ন জানে? হারাবে, হয়তো বা ধোকা দিয়ে নিয়ে নেবে কেউ। গয়না পরেছে না গয়না পরেছে—ছেলেমানুষের মন ভুলানো। তুই কিছু বলতে যাবি নে কিন্তু সাহেব। রানী কষ্ট পাবে, পারুলও রাগ করবে।

বলে দাম নাকি দশটাকা-পঁচিশটাকা। দশ-পঁচিশ খেলে তো, লম্বা লম্বা অঙ্ক তাই শিখে ফেলেছে।

বলতে বলতে সাহেব হঠাৎ অন্য কথায় চলে যায়: ফলা-বানান রপ্ত হয়েছে মা. গড়-গড় করে পড়ে যেতে পারি। অঙ্ক শিখব আমি এবারে, কাল থেকেই—উঁ?

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, আচ্ছা। সায় না দিলে ভ্যানর-ভ্যানর করবে, ঘুমুবে না।

তখন সাহেব ভাবছে, ভাল করেছি মাকড়ি গঙ্গায় না ফেলে। গয়না ঝুটো কি সাচ্চা, রানী সেটা জানে না। কোনদিন জানবে না। এক ফাঁকে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে মাকড়ি-জোড়া রেখে আসব। আগে যেমনধারা ছিল।

সকালেও সাহেব পারুলের ঘরের দিকে যায় নি। ঘাটে একাকী বসে। ওপারে বড় বড় আড়ত। লগি বেয়ে দূরদেশের ভারী ভারী নৌকো। হেলতে দুলতে গজেন্দ্রগতিতে আড়তের সামনের ঘাটে লাগে। দালাল-পাইকারের ভিড় জমে যায় সঙ্গে সঙ্গে। নৌকোর খোল থেকে বস্তা টেনে টেনে গলুয়ের উপর ফেলছে। চালের বস্তা ডাল-কলাইয়ের বস্তা লংকা-হলুদের বস্তা। খচ খচ করে বস্তায় বোমা মেরে চাল-কলাইয়ের নমুনা বের করে দেখে। সুচাল-আগা লোহার শলাকা, নালার মতন টানা-গর্ত শলাকার উপরে—এই হল বোমাযন্ত্র। মেরে দাও বোমা বস্তার উপর—নালা বেয়ে ঝুরঝুর করে কিছু মাল বেরিয়ে আসবে। বারম্বার এদিক-সেদিক মেরে পরখ করে দেখে, সর্বত্র একই মাল কি না। নমুনা হাতে নিয়ে আড়তের দালাল দরদাম করে: কত? ফাঁকাফুকো বলো না ভাই—

আঠারো সিকে—

আঁতকে ওঠে দালাল লোকটা: অ্যাঁ, মুখ দিয়ে বেরুল কেমন করে ব্যাপারি? আঠারো সিকে মণের চাল কেন খাবে লোকে—সোনা খাবে, রুপো খাবে। বাজে বলে কি হবে, পুরোপুরি চার। যাকগে থাক, আর দু-গণ্ডা পয়সা ধরে দেব। খুন করলেও আর নয়।

দরে বনল তো মুটেরা মাথায় তুলে ওপারের রাস্তাটুকু পার হয়ে গিয়ে বস্তা ধপাধপ ফেলছে আড়তের গুদামে।

সাহেব বসে বসে দেখছে। রানীর কাছে যায় নি, রানীই দেখি ঘাটে এসে দাঁড়াল। হাসি নেই মুখে, মন-মরা ভাব। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব জানে সমস্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে রানী?

রানী ঘাড় নেড়ে বলে, কিছু না—

হয়েছে বই কি! তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি। লুকোলে শুনব না।

রানী ঝংকার দিয়ে ওঠে: হবে আবার কি! সর্দারি করতে তোকে কে ডাকছে?

তারই জন্যে রানীর মনোকষ্ট, সাহেব পুড়ে যাচ্ছে মনে মনে। দুটো-চারটে ভাল ভাল কথা বলে প্রবোধ দেবে, কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা শুনতে হয় তো রানীর মুখে। নয়তো আজামোজা কিসের উপর বলে। রানী যতবার ঝেড়ে ফেলে দেয়, সাহেব তত আরও খোশামুদি করছে।

বল্ না, বল্ আমায়। কাউকে বলব না। যে দিব্যি করতে বলবি করছি।

রানী নরম হয়ে ছলছল চোখে বলে, মাকড়িজোড়া পাচ্ছি নে। তাকের উপর পুতুলের বাক্সে রেখেছিলাম।

রাখলি তো গেল কোথা! তোদের কাকাতুয়া নয় যে উড়ে পালাবে। মনের ভুলে অন্য কোথায় রেখেছিস, দেখ্ ভেবে।

পুতুলের বাক্সে রেখেছিল, রানীর স্পষ্ট মনে আছে। সাহেবের কথায় তবু দ্বিধা এসে যায়। রাখতেও পারে অন্য কোথাও, আর এখন

মনে পড়ছে না। মা যদি জানতে পারে গয়না পাওয়া যাচ্ছে না, কেটে আমায় চাক-চাক করবে। এই সেদিন একগাদা টাকায় কিনে দিয়েছে।

কচু! সাহেবের মুখে এসে পড়েছিল আর কি—বিস্তর কষ্টে সামলে নেয়। মেনেই নিল রানীর কথা, একগাদা টাকায় কেনা ঐ বস্তু।

বিপদের বন্ধু ভেবে রানী সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইছে: কী করি বল্ তো সাহেব, বুদ্ধি বাতলে দে। কখন মা খোঁজ করে বসবে, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

সাহেব একটুখানি ভাবনার ভান করে বলে, ঠাকুরকে একমনে ডাক্।

কে ঠাকুর?

বোকার মতন কথায় সাহেব খুব একচোট হেসে নেয়: আরে আরে, ঠাকুর জানিস নে? ঈশ্বর ভগবান মা-কালী মহাদেব কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী গরুড় ঘণ্টাকর্ণ—দু-দশজন নয়, তেত্রিশ কোটি ঠাকুর, ক'টা নাম করি! যে নামে ইচ্ছা নাছোড়বান্দা হয়ে পড়: ঠাকুর, মাকড়ি পাচ্ছি নে, খুঁজে-পেতে এনে দাও। কালীঘাটে মা-কালীর এলাকা—তাঁকেই বরঞ্চ ধর্ চেপে।

রানী বলে, মা-কালী খুঁজে দেবেন?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, আলবৎ। ভক্ত যদি ঠিক মতো ধরতে পারে, আবদার রাখতেই হবে মাকে। আমার কি হল—রাত্রে চাল খাঁড়ি-মুসুরি ডালের কথা বললাম মা-কালীকে। ঠিক অমনি জুটিয়ে দিলেন। রান্নাটা শুধু করে নিতে হল মাকে। ডেকেই দেখ না মনপ্রাণ দিয়ে। ফল না পাস তো বলিস।

ফলটা ঠিক হাতে-নাতে নয়, সন্ধ্যা অবধি সবুর করতে হল। বড় ঘরের পাশে ছোট্ট একটু ঘর, তার মধ্যে পারুলের বাক্স-পেঁটরা—কাকাতুয়ার দাঁড়, পানের সরঞ্জাম, হাঁড়ি-কলসি, গুচ্ছের আজেবাজে জিনিস। সন্ধ্যার পর এ-বাড়ির অন্য সকলের মতো পারুলও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রানী গিয়ে জোটে তখন ঐ ঘরে। ঘরের দেয়ালে মা-কালীর পটের উপর মাথা ঠুকছে—জোর তাগাদা, গড়িমসি করলে ভক্তির চোটে পটের অধিকক্ষণ আস্ত থাকার কথা নয়। সেই শঙ্কাতেই বুঝি জানলা দিয়ে মা টুক করে ফেলে দিলেন, রানী ছুটে গিয়ে কুড়াল জিনিসটা—তাই তো রে, সেই মাকড়ি।

কী আহ্লাদ রানীর! জাগ্রত ঠাকুরের কাজ-কারবার দেখে অবাক হয়ে গেছে। খবরটা সাহেবকে জানাতে হয়, না জানানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। কোথায় এখন পাওয়া যায় সাহেবকে?

সেই গঙ্গার ঘাটেই। বড় এক সাঙড়নৌকা ভাঁটার সময় মাঝগঙ্গার কাদায় আটকে আছে। মাঝি বাজারহাট করতে নেমে পড়েছিল, সওদা করে ফিরল এবার। কাদা ভাঙতে নারাজ। জোয়ারের জল তোড়ে এসে ঢুকছে, নৌকো এক্ষুনি ভেসে উঠবে, পাড়ে এসে লাগবে। মাঝি ততক্ষণ ঘাটের উপর অপেক্ষা করছে। সাহেব কেমন করে বুঝে পাকড়াও করেছে তাকে: গল্প বল। মাঝিমাল্লারা দূর-দূরান্তর ঘোরে, দেশবিদেশের মজার মজার গল্প শোনা যায় তাদের কাছে। হতে হতে রাজা দুয়োরানী শুয়োরানী রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্র ব্যঙ্গমাবঙ্গমীদের রূপকথা। রানীও এসে পড়ে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে।

জোয়ারে নৌকো ভেসে ইতিমধ্যে ঘাটে এসে যায়। গল্প থামিয়ে মাঝি এক লাফে কাদা ডিঙিয়ে উঠে পড়ল।

রানী এইবার সুখবর জানায়: মাকড়ি পাওয়া গেছে সাহেব। কানে পরে এসেছি দেখ্ সেই মাকড়ি।

খুশিতে ঘাড় নেড়ে মাকড়ি দুলিয়ে দেখাল। বলে, মোক্ষম বুদ্ধি বাতলে দিলি তুই। যেমন যেমন বলেছিলি ঠিক সেই কায়দায় চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। আর একটা জিনিস চেয়ে দেখব। মার কাছে কদ্দিন থেকে চাচ্ছি, দেয় না। ভাবছি, মাকে না বলে যা-কিছু দরকার মা-কালীকে বলব এবার থেকে।

সভয়ে সাহেব বলে, একবার হল সে-ই ঢের। ঠাকুর-দেবতাকে বার বার কষ্ট দিতে নেই।

মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে রানী সাহেবের আপত্তি উড়িয়ে দেয়: ও'দের আবার কি কষ্ট? নড়তেও হবে না জায়গা থেকে। ইচ্ছাময়ী মা—ইচ্ছে করলেই অমনি এসে পড়বে। বেশি কিছু চাচ্ছিনে তো, চুলের ভেলভেট-ফিতে এক গজ।

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

১৩

সকাল সাতটার মধ্যেই এসে পড়লেন মৌলানা সাহেবঃ একি, আপনি এখনও তৈরী হয়ে নেননি?

সবিনয়ে নিবেদন করিঃ আজ্ঞে না। এ-যাত্রায় আমি আর পারলকোট যাচ্ছি না। আপনি ফেরার পথে আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবেন।

ঃ রাত্রের মধ্যেই মত বদলালেন যে?

ঃ যা বৃষ্টি হয়েছে, তাতে আপনিও যে পারালকোট পেঁছিতে পারবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে আমার: কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। কাল রাত্রে একটা গল্প আধখানা শুনেছি, বাকিটা না শুনে পাদমেকং ন গচ্ছামি!

ঃ বুঝেছি। হাসলেন মৌলানা: —বেশ সেই কথাই রইল। আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব। দেখবেন, একাধিক সহস্র রজনীর গল্প না-হয় শেষ পর্যন্ত।

মৌলানাকে বিদায় করে আমরা এসে বসলাম। প্রাতরাশের পর বলিঃ কই মশাই, আপনার গল্পের শেষটুকু বলুন।

ডাক্তার সাহেব হাসেন ঃ শেষটুকু তো বলতে পারব না। তবে আরও কয়েকটি চ্যাপটার শোনাতে পারি।

ঃ শেষটা শুনব কবে?

ঃ মহাকাল যেদিন লিখবেন শেষ চ্যাপটার। চয়ন এখনও আমার হেপাজতেই আছে। এখনও সে ভাল হয়ে ওঠেনি।

ঃ বেশ তাহলে যতটা মহাকাল লিখেছেন, ততটাই বলুন।

ঃ তারও সবটা শোনাতে পারব না। এতো আপনাদের সাপ্তাহিক-মাসিকে প্রকাশিত ধারাবাহিক গল্প নয়। এর উপাদান আমাকে রীতিমতো খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়েছে। একবার ছুটেছি কাবোঙ্গা, একবার ছুটেছি কারাংমেটা। এর জবানীতে, ওর জবানীতে শুনেছি এক-একটা খন্ড কাহিনী। জোড়াতালি দিয়ে গোটা গল্পটা কেমনভাবে খাড়া করব বুঝে উঠতে পারছি না। আমার কাছে সংবাদগুলো যেমনভাবে এসেছিল। সেই কালানুক্রমিকভাবেই বলে যাইঃ

দিন কয়েক পরের কথা। দুপুর বেলা। হাতে কাজ ছিল না। বসে বসে একটা

এসে বলল—সর্বনাশ হয়েছে। চয়নের ঘরে কে একটা মেয়ে উঁকি দিচ্ছিল, চয়ন তাকে এমন ধাক্কা মেরেছে যে, মেয়েটি উল্টে পড়ে গেছে। মাথাটা কেটে গেছে তার। রক্তারক্তি কাণ্ড।

ছুটে গেলাম চয়নের ছাপরায়। কম্পাউন্ডারটাও নেই। দুপুর বেলা। জন-মানব নেই ধারে কাছে। ওর ঘরের সামনে গাছতলায় মুখ-থুবড়ে পড়ে আছে মেয়েটি। মাথার পিছনের দিকে আঘাত লেগেছে। তখনও জ্ঞান ফেরেনি। চাকরটা একটা জলের ঘটি নিয়ে এসেছিল। মুখে বার দুই ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। সামলে উঠল অল্পক্ষণেই।

বছর সতেরো আঠারো বয়স। মুরিয়া ঘরের মেয়ে। নিটোল স্বাস্থ্য, শান্ত মুখশ্রী —বেশ একটু বিষণ্ণ। বিহ্বলভাবে চারিদিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসল একটা গাছে ঠেস দিয়ে। তাকে চাকরটার জিম্মায় রেখে চয়নের ঘরে গেলাম গুম মেরে বসে আছে এক কোণায়। আমি ধমক দিয়ে উঠলাম ঃ ওকে মেরেছ কেন?

কোন জবাব নেই।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ওর কাঁধ দুটি ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বললাম ঃ তোমার পাগল সেজে থাকা বার করছি আমি! কেন মেরেছিস ওকে, বল্! উত্তর দে!

চয়ন উঠে দাঁড়াল। ঘোলাটে চোখ দুটো হঠাৎ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। বললেঃ ছেড়ে দে!

গলার স্বর চড়িয়ে বললুমঃ না! কেন মেরেছিস ওকে, বল!

ও-ও চটে উঠে বললেঃ বেশ করেছি, মেরেছি!

আমার মাথার মধ্যে যেন দাবানল জ্বলে উঠল। ঠাস্ করে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলাম ওর গালেঃ বদমায়েস, শয়তান

কোথাকার! খনে করে ফেললি মেয়েটাকে!

রাগের মাথায় চড়টা মেরেই বুঝলাম ভুল করেছি। চয়ন আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয়তো ও সত্যিই পাগল। আমাকে যদি এ নির্জন ঘরে ও আক্রমণ করে বসে তাহলে সর্বনাশ। কিন্তু সে-সব কিছুই করল না। চড়টা খেয়ে কেমন যেন সম্বিত ফিরে এল তার, বোকার মতো বললেঃ খনে! কে খনে হয়েছে? মাল্‌কো?

মেয়েটির পরিচয় পেলাম ওর প্রশ্নের ভিতর থেকে। এই তাহলে আয়েতু গোণ্ডের মেয়ে মাল্‌কো? কিন্তু আমি কোন জবাব দেবার আগেই আমাকে ও একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। আমি উল্টে পড়লাম। নক্ষত্র-বেগে ও ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছিল, তবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। হাতের কাছে পড়েছিল চয়নের কুঠারখানা। তুলে নিলাম ক্ষিপ্রগতিতে। চয়ন ক্ষেপে গেছে। ঘরের বাইরেই রয়েছে মাল্‌কো—তখনও দুর্বল। তাকে আক্রমণ করতেই গেল বোধহয়। বুঝলাম প্রচণ্ড ভুল

করেছি ওকে এভাবে মেরে বসায়। পাগলটা এখন কি করবে কে জানে। ওর পাগলামি প্রতিহত করতে গিয়ে কুঠারটাকে যে কোন-মতেই ব্যবহার করা যাবে না—তাতে যে একটা বীভৎস রক্তারক্তি কান্ড ঘটে যেতে পারে, সেকথাও তখন খেয়াল ছিল না আমার। শুধু প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। কুঠারটা হাতে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে এলাম ওর পিছনে পিছনে।

বাইরে এসে দেখি চয়ন উপুড় হয়ে পড়েছে মালকোর বুকের ওপর। চাকরটা বাধা দেবার চেষ্টা করছে বৃথাই। না ভয় নেই কিছু; চয়ন ওকে আক্রমণ করেনি। এ শুধু অনুশোচনার আবেগে উচ্ছ্বসিত বিলাপ। চাকরটা লোকজন ডাকতে ছুটেছিল বোধহয়। বাধা দিলাম তাকে। চয়নের বাহুমূল ধরে বললাম : ওকে ছেড়ে দাও চয়ন। ওর মাথায় আঘাত লেগেছে। ওকে বিশ্রাম নিতে দাও।

চয়ন স্থির হল। ছেড়ে দিল ভূলুণ্ঠিতা মেয়েটিকে। দ্রুতপদে উঠে গেল ঘরে। তার-পর উবুড় হয়ে পড়ল ভূ-শয্যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মতো।

মালকোকে নিয়ে এলাম আমার তাঁবুতে। একটু ব্র্যান্ডি-মেশানো গরম দুধ খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল মেয়েটি। ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। রহস্যের যখন কোন কিনারাই করতে পারছিলাম না, তখন নূতন একটা আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল মালকোর জবানবন্দীতে।

আদিবাসীদের মধ্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছি, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, রোগীর কি কষ্ট, তা ওরা ঠিকমতো বুঝিয়ে বলতে পারে না। আর সবচেয়ে সুবিধা এই যে, লজ্জায়, সংকোচে কোন কথা ওরা গোপন করে না। সভ্যজগতের মানুষ যেটা লজ্জা-জনক মনে করে, সেই তথাকথিত গোপন কথাও ওরা অকপটে বলতে দ্বিধা করে না। মালকো তার পূর্বরাগের যে বিবৃতি দিল, তাতে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এল। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, অমন অকপট স্বীকারোক্তি কোন শিক্ষিতা আধুনিকমনা অনূঢ়ার কাছে আমি আশা করি না।

মালকো হচ্ছে কারাংমেটা গাঁয়ের গাইতা আয়েতু গোণ্ডের ছোট মেয়ে। কারাংমেটা ঘটুলের মালকো। ঘটুলে সে এসেছিল মাত্র ছয় বছর বয়সে। রঙিলার হাত ধরে। রঙিলা তখনও বেলোসা হয়নি। ঘটুলের প্রত্যেকটি কোণা তার অতি পরিচিত, গাঁয়ের সবকয়টি চেলিক-মোটিয়ারীকেই সে খুব ভালভাবে জানে। ওর সতের বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকাংশ সন্ধ্যাই কেটেছে এই ঘটুল-ঘরে। সবাই ভালবাসতো মালকোকে তার মিষ্টি লাজুক স্বভাবের জন্যে। আর মালকো সবচেয়ে ভালবাসতো তার দিদি রঙিলাকে। [illegible] ছোট। তাই

(১) 'গুজ'—কাঠের তামাক কোটা, (২) 'কারিণ'—তীরের ফলা, (৩) 'বান্ডাল'—সৌখিন, পাগড়িতে গুঁজে রাখা যায়, (৫) 'মাকানু'—টাঙ্গির ফলা, (৬) 'আঙ্গো-পেন'—স্থানভেদে 'কুরুং তুল্লা'—শালকাঠের দেবমূর্তি।

দু' বোনের সম্পর্কটা প্রায় সখীত্বের পর্যায়ে পড়ে। তবে রঙিলার সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশী, চালাক-চতুর সে—মালকো সরলা। দিদির কাছেই মালকো নিয়েছে জীবনের প্রথম পাঠ। মনের মধ্যে যখন যা প্রশ্ন জেগেছে, তার সমাধান জানতে ছুটে গেছে দিদির কাছে। রঙিলার চোখের তারা নীল, আর গায়ের রঙ সুচিক্কণ নিকষ কালো নয় বলে কেউ যদি তাকে ঠাট্টা করত, বিদ্রূপ করত, অমনি ফোঁস করে রুখে দাঁড়াতো মালকো। কারাংমেটা ঘটুলের সবাই ওদের দুজনকে তখন ঠাট্টা করে বলত মানিক-জোড়। রঙিলা যদি বনের মধ্যে খুঁজে পেত একটি কন্দমূল, তাহলে সেটা নিয়ে এসে দিত মালকোর হাতে। মালকো তাতে এক-কামড় মেরে আধখানা আবার ফিরিয়ে দিত দিদিকেই। মালকো যদি খুঁজে পেত নারাঙ্গীর ধারে নতুন ধরনের ঘষা-পাথর—তাহলে এক কোঁচড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনে তার অর্ধেক দিয়ে দিত রঙিলাকে। দিদির সঙ্গে তার প্রথম বিবাদ বাধল এই দান-প্রতিদান নিয়েই। কতই বা তখন বয়স ওদের? মালকো দশের কোঠায়—রঙিলা ত্রয়োদশী। পর পর দু রাত্রে দুটি কাঁকুই পেয়ে সে দিদির কাছে ছুটে এল : দিদি! একটা তুই নে!

কোথাও কিছু নেই, ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসল রঙিলা। কাঁকুইয়ের মূল্য বুঝবার বয়স তখন হয়েছে রঙিলার। ততদিনে সে বেলোসা হয়েছে। অভিমানী মালকো গিয়ে লাগালো মায়ের কাছে। আখ্যানী শুনে হাসল না। গম্ভীর হয়ে গেল। সে জানতো, সুন্দর রঙ নেই বলে অর্থাৎ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ নয় বলে, বেলোসাকে কারও নজরে ধরে না। বেলোসার একখানিও কাঁকুই জোটেনি তখনও।

সেদিন থেকে মালকো সামলে নিয় নিজেকে। সব কথা সেও বুঝতে পারেনি সে বয়সে; কিন্তু নারীর সহজাত প্রবৃত্তি থেকে এটুকু বুঝল যে, কোথায় কি যেন একটা ঘটেছে। রঙিলার রূপহীনতায় প্রতি চেলিক দল উদাসীন—টকটকে সাদা রঙ নীল চোখ, পিঙ্গল কোকড়ানো চুল দেখে ওরা সরে যায়—কিন্তু নেতৃত্ব দেওয়া

ক্ষমতাটা যেন রঙিলার রক্তে। তাই সঙ্গী না জুটলেও অল্প বয়সে সে হয়ে উঠলো ঘটুলের বেলোসা। যতই পদোন্নতি হতে থাকে রঙিলার, যতই দু বোন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে যৌব-রাজ্যের তোরণ-দ্বারের দিকে, ততই দু বোনের মিতালীটা হয়ে আসে ক্ষীণ—সম্পর্কটা হয়ে ওঠে প্রতি-দ্বন্দ্বীর। শেষ পর্যন্ত ঐ নীলনয়না পিঙ্গলকেশা মেয়েটিকে রীতিমতো ভয় করতে লাগলো মালকো। শুধু মালকো নয়, মনে মনে সবাই তাকে ভয় করে। শুধু গ্রামের গাইতার প্রতাপে কথাটা প্রকাশ্য রূপ নেয়নি। নাহলে সকলেই মনে মনে জানে, রঙিলা অপার্থিব ক্ষমতার অধিকারী—অনেক মন্ত্রতন্ত্র, ঝাঁড়ফুঁক জানে সে। কে জানে, সে হয়তো ডাইনিই! পাংনাহিন!

মালকো লক্ষ্য করেছে, দিনে দিনে ওর দিদির স্বভাব যাচ্ছে বদলে। ক্রমশ রুক্ষ বদমেজাজী হয়ে উঠছে যেন। আখালীও তাকে শাসন করতে সাহস পায় না। কথায় কথায় রঙিলা ছোট বোনের ত্রুটি ধরে। কঠিন শাস্তি দেয়। শুধু দিদি হিসাবে নয়, ঘটুলের বেলোসা হিসাবে। সে আদেশ অমোঘ। মালকোর নিকট-বান্ধবীরা সহানু-ভূতি জানায়, কিন্তু বেলোসার আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা নেই কারও। মালকো শাস্তি ভোগ করে আর ওরা নেচে চলে "রেলো রেলো" নাচ! দিদি যে কেন এমন বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে তাকে দেখতে শুরু করেছে, তা এতদিনে অনুমান করতে পারছে মালকো—সে-ও বড় হয়ে উঠেছে।

একদিন সবাই দেখল রঙিলার মাথায় উঠেছে একটা নতুন কাঠের চিরুনী! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো মালকোর। যাক তাহলে দিদির একটা হিল্লে হল। শুধু মালকো নয়, সকলেরই কৌতূহল হল জানতে, কে দিয়েছে ওটা। বেলোসাকে এ-প্রশ্নটা করতে কারও সাহসে কুলালো না। কুলাবে না জানতো রঙিলা, আর তাই সে সাহস করে পরেছিল সেটা। জাতে উঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অপর সম্ভাবনাটা সে ভেবে দেখেনি। ওরা বেলোসার সামনে আসার সাহস সঞ্চয় করতে না পারলেও পিছনে মিলিত হয়েছিল। সব ক'টি চেলিক যখন টাঙিগ স্পর্শ করে লিঙ্গোপেনের নামে শপথ নিয়ে বলল যে, কেউ-ই সেটা দেয়নি বেলোসাকে, তখন রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেল জনান্তিকে! গোপন হাসির বন্যা বয়ে গেল সেদিন রঙিলার অনুপস্থিতিতে। সে-হাসি রঙিলা শুনতে পায়নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েটি আন্দাজ করল ঠিক। লজ্জায়, অনুশোচনায় সে ফেলে দিয়ে এল কাকুইটা নারাঙ্গীর জলে!

বেলোসার প্রতাপ তা বলে ক্ষুণ্ণ হল না একতিল। সবাইকে সে হুকুম করে, চালায়। কে কার সাথে শোবে, তা সেই ঠিক করে দেয়। কোতোয়ার শুধু সায় দিয়ে যায় ভয়ে

ভয়ে। কোন মেয়ে ঘটুলে আসতে দেরি করলে, অপরিষ্কার থাকলে, ঘটুলের রীতি-নীতি না মানলে কঠোর শাস্তি দেয় সে। সবাই তাকে ভয় করে চলে।

কিন্তু রঙিলা বুঝতে শিখেছে—জীবনে এমন কিছু আছে, যা ঠিক হুকুম দিয়ে পাওয়া যায় না। ঘটুলে সকলেরই সমান অধিকার; কিন্তু অধিকার তোমাকে কতটুকু দেয়? এমন জিনিস আছে দুনিয়ায়, যা দাবি করে আদায় করা চলে না—যা স্বতঃস্ফূর্ত। রঙিলা সব পেয়েছে, পায়নি শুধু ঐ স্বতঃস্ফূর্ত জিনিসটা। রঙিলা দেখেছে চেলিক-মোটিয়ারীর দল তাকে দেখলেই কেমন যেন সংযত হয়ে ওঠে। উদ্দাম হাসির উৎস হঠাৎ ঊষর হয়ে যায় সে ঘটুলে এলেই। রঙিলা দু চোখ মেলে দেখেছে মোটিয়ারীদের বাহুবন্ধনে বেঁধে চেলিকের দল কেমন করে মাতোয়ারা হয়ে যায়। সে অভিজ্ঞতাটা ওর হয়নি। ও আসার আগে তারা ফিসফিস করে কথা বলে, অশ্লীল হাসি-মস্করা করে মুখ লুকিয়ে হাসে—অথচ আশ্চর্য, রঙিলা এসে পড়তেই সবাই সংযত হয়ে যায়। এমনকি শিরদার পর্যন্ত তাকে সমীহ করে চলে। ঘটুলের নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করে না: যেদিন যার মাসানিতে বেলোসার আসন নির্দিষ্ট হয়, সেদিন সেই তাকে নিয়ে শোয়: আপত্তি করে না। আলগোছে একটা হাতও ফেলে রাখে ওর পিঠে, আর বোধহয় ভাবে, ভাবে রঙিলা, কখন ভোর হবে রাত!

আরও লক্ষ্য করল রঙিলা, ওর ছোট বোন মালকো যদিও সাধারণ মোটিয়ারী, তবু তাকেই শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার লোভে সব ক'টা চেলিকের চোখের তারা যেন নাচতে থাকে। কোতোয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে বেলোসাই তিন দিন অন্তর স্থির করে মালকো কার সাথে জোড় বাঁধবে। শিরদার হয়তো বলে : জানকি তাহলে আজ শুচ্ছে আখার সাথে, দুলোসা কোতোয়ারের সঙ্গে, আর মালকো? মালকো কার মাসানিতে শোবে?

রঙিলা লক্ষ্য করে, সব কয়টি চেলিকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমনকি, স্বয়ং শিরদারের চোখেও ফুটে উঠেছে একটা মুগ্ধ-লোলুপতা।

কোতোয়ার হয়তো বলে : মালকোর কথা ঠিক করিনি—ও নিজেই বেছে নিক।

বাকি সব ক'টা চেলিক একসাথে চেঁচিয়ে ওঠে : মালকো, আমি! আমি!

মালকো লাজনম্র মুখটা তুলতে পারে না। বুকটা ঢিপঢিপ করে।

রঙিলা গম্ভীর হয়ে বলে : না, মালকোর আজ শরীর খারাপ—ও বাড়ি যাবে।

শিরদার বলে : কেন? আসকালোন?

রঙিলা ধমক দিয়ে ওঠে : সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মালকো [illegible] বাড়িতেই ফিরে যায়।

[illegible]তোয়ার বলে ঃ আর তুমি? [illegible]লোসা? আ[illegible]দের রানী কোথায় শোবে?

রঙিলা চোখ তুলে তাকায়। দেখে সব ক'টা ঢোলক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এ-[illegible] [illegible] [illegible] চড়ে বসে! শিরদারও মাথা নিচু করে মাটিতে কি একটা খ‍ুঁজছে।

চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে রঙিলার। চায় না, কেউ চায় না তাকে! কেন? তার গায়ের রঙ আর পাঁচটা মোটিয়ারীর মতো নিকষ কালো নয় বলে? সে কি সত্যিই ডাইনী?

রঙিলা দাঁতে দাঁত চেপে বলেঃ আমারও শরীরটা খারাপ—আমিও আজ বাড়ি গিয়েই শোব!

এমনিভাবেই চলছিল নগণ্য কারাংমেটা গাঁয়ের ঘটুলের জীবনযাত্রা। নাটকটা মোড় ফিরল গত বছর, ওরা দল বেঁধে যখন গেল কাবোগ্গায়-নারানপুরে মেলায় যাওয়ার পথে।

সেখানে কি ঘটেছিল, আপনি তার প্রত্যক্ষদর্শী, সুতরাং সে-সব কথা বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মালকোর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কয়েকটা কথা বলতে হবে, যা নাকি আপনার অজানা। মালকো তার জবানবন্দীতে সে-কথা স্বীকার করেছিল অকপটে।

কাবোঙ্গা ঘটুলের ছেলেমেয়েদের পরিচয় দিতে উঠে দাঁড়াবার আগেই চয়নকে চিনতে পেরেছিল মালকো। চিনতে পেরেছিল স্থানীয় দলের শিরদার বলে। এমন ছেলে ঘটুলে থাকতে আর কারও পক্ষে শিরদার হওয়া সম্ভব নয়। এমন রূপ আগে মালকো কখনও কোন চেলিকের দেখেনি। নিজের গাঁয়ে তো নয়ই, এমনকি, নারানপুর কিম্বা কোকামেটার মাড়াইতে—যেখানে দশ-বিশ গাঁয়ের শত শত চেলিক জমায়েত হয়, সেখানেও নয়। লিঙ্গোপেনের গল্প শোনা ছিল। লোকগাথা বলে, লিঙ্গোপেনকে যে দেখেছে, সেই ভালবেসেছে। এমনকি, দেবী তাল্লুর-মুট্টাই পর্যন্ত একসময়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন দেব লিঙ্গোপেনের রূপে। মালকো মনে মনে লিঙ্গোপেনের ছবি আঁকতো—কি রকম দেখতে ছিলেন তিনি? সারা দুনিয়ার যত মোটিয়ারী যাঁকে দেখবামাত্র 'গীর্জা আতোরের' জ্বালা অনুভব করে? আজ এই ছেলেটিকে দেখে সে কৌতূহল চরিতার্থ হল যেন।

আচমকা রাঙলা যখন তাকে ঠেলে দিলে আর চয়ন লুফে নিল তাকে, তখন কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল মালকো। ওর বুকে ক্ষণিক আশ্রয় নেবার অনুভূতিটা আজও সে ভুলতে পারেনি। চয়ন প্রশ্ন করেছিল: লাগলো নাকি?

মালকোর সারা শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে।

রাঙলার প্রগলভতা তার সহ্য হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিল ঐ দরাজ-বুক মানুষটার দেহে যত শক্তিই থাক খরজিহ্ব রাঙলার তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যবান প্রতিহত করবার ক্ষমতা তার নেই। আর সে জন্যই মনে মনে ফুঁসছিল সে।

কথা ছিল কারাংমেটার দল প্রথম নাচবে 'বান্দা রোলা পুঙ্গার ও আয়া।' এই নাচ প্রথম নাচা হবে বলে দিনের পর দিন মহড়া দিয়ে এসেছিল যাত্রার আগে। ভারি মিষ্টি সে গান। পুষ্প আহরণের গান:

দিঘি-কালো জলে কমল ফুটেছে ঐ।

দেব চুলে ফুল তুলে আন ওলো সই।

কিন্তু রাঙলা সমস্ত পূর্বনির্দেশ অগ্রাহ্য করে হঠাৎ ধরে বসল নতুন গানের ধুয়ো: 'বাদাং সারপাত্তে উঁদিতন সায়দার!' শুধু মালকো নয় দলের সবাই বুঝতে পেরেছিল রাঙলার নেশা হয়েছে। পর পর কয়েক পাত্র মহুয়া-রস পান করেই সে মাতাল হয়নি। সে যেন আরও কিসের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। ঐ প্রাথরে-কোঁদা কবাটবক্ষ মানুষটিকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করবার নিষ্ঠুর খেলায় সে যেন মেতে উঠেছে। লড়াইটা যেন কাবোঙ্গা আর কারাংমেটার নয়, চয়ন আর রাঙলার। মালকোর মনে হল রাঙলার বঞ্চিত নারীত্ব যেন পৌরুষের প্রতীক ঐ ছেলেটির উপর প্রতিশোধ নিতেই উদগ্র হয়ে উঠেছে আজ। তাই মহড়ার সব নির্দেশ ধূলিসাৎ করে সে গেয়ে উঠল ব্যঙ্গের গান, আঘাত করার গান।

তবু সে সহ্য করেছিল বেলোসার এ অত্যাচার। ভিন গাঁয়ের সামনে কেউই আপত্তি করেনি। নেচেছিল অনভ্যস্ত নাচ বেলোসার খেয়ালখুশীর মূল্য মেটাতে। কিন্তু এক অপরাধ কতবার সহ্য করা যায়? কাবোঙ্গার দল যখন গাইল বর্ষা-মঙ্গল, তখনও বেলোসা নির্ধারিত কর্মসূচী মেনে চলেনি। হঠাৎ শুরু করল আবার এক নতুন গান 'ও হো ময়না হো লালসাই, বায়ঠো ডান্ডা হো!' এবার আর সহ্য হয়নি মালকোর। চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এর আগে বহুবার সে গেয়েছে ঐ গান, নেচেছে ঐ নাচ। পরিচিত অপরিচিত চেলিকদের সুরের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে—'উঠ্ ডাকু হো রাজা লালসাই।' কিন্তু সে গান ছিল নেহাৎ গান—চৈতডান্ডার উৎসবের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত। তার আভিধানিক অর্থ হয়তো একটা ছিল, কিন্তু তার কোন বিশেষ নেই। আজ কিন্তু ঐ কথাগুলি সত্যি সত্যিই সে বলতে চাইছে। মালকোর অন্তরাত্মা ঐ চেলিকদলের বিশেষ একজনকে সত্যিই বলতে চায় 'ওঠো রাজপুত্র, নিষ্ঠুর লুঠেরার মতো লুট করে নাও আমার জীবন-যৌবন।' আজ তাই কিছুতেই সে পারলে না নৈর্বাক্তিক উদাসীনতার ঐ কথাকয়টা গানে গানে উচ্চারণ করতে। নিঃশব্দে পালিয়ে

এল নাচের মাঝখানেই। বেরিয়ে গেল বাইরে, তারায় ভরা অন্ধকারের আশ্রয়ে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি রঙিলার নজরকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেনি। কারাংমেটার বেলোসা সে—সবদিকেই তার কড়াদৃষ্টি। নাচ সমে ফিরে এলে রঙিলাও বেরিয়ে এল বাইরে। কোথায় গেল দুর্বিনীত মেয়েটা, খুঁজে বার করতে হবে। বেশী খুঁজতে হল না অবশ্য। শুক্লা অষ্টমীর ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল ঘটুলের অদূরে তাম্বুর-মুট্টাই মন্দির সংলগ্ন মহুয়া গাছতলায় একা বসে আছে মাল্‌কো। রঙিলা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। আন্দাজ করলে ব্যাপারটা। ডাকলেঃ মাল্‌কো, উঠে আয়!

মাল্‌কোকে যেন ভূতে পেয়েছে। যে রঙিলাকে সে বাঘিনীর মতো ভয় করে তাকে মুখের উপর বললেঃ না, যাব না!

খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল রঙিলা : ও! তাই বল্‌! গীর্জা আতোর! পীরিত।

ধম্‌কে উঠল মালকোঃ চুপ কর্‌! লজ্জা করে না তোর!

রঙিলা তখনও হাসছে : গীর্জা আতোর হয়েছে তোর, আর লজ্জা পাব আমি?

মাল্‌কো বললে : ডাইনি!

একটা সাধারণ গালাগাল! কথার মাত্রা। কিন্তু রঙিলার কাছে ঐ কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। এ গাল এর আগে কেউ তাকে দেয়নি। এর চেয়ে অশ্লীলতর গাল দিয়েছে। যা নাকি অম্লানবদনে ওরা বলে সর্বসমক্ষে, অথচ যা ছাপার হরফে লেখা বেআইনি! কিন্তু কেউ কখনও তাকে ডাইনি বলেনি! চোখ দুটো জ্বলে উঠল রঙিলার : তুই নিয়ম ভেঙেছিস। নাচের মাঝখানে চলে এসেছিস। ফিরে চল ঘটুলে! তোকে কী শাস্তি দিই দেখ্‌! তোর পীরিতের মানুষ দাঁড়িয়ে দেখবে শুধু, কিছু বলতে পারবে না!

মুখটা শুকিয়ে যায় মাল্‌কোর। সুরটা বদলে যায়। ভয়ে ভয়ে বলেঃ বা রে! তুই তো নিয়ম আগে ভাঙলি। এ নাচ নাচলি কেন? আমার অভ্যাস ছিল না তাই উঠে এসেছি!

রঙিলা শুধু বললে : উঠে আয় ওখান থেকে!

মাল্‌কোর মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে উঠল। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বললে : না, আমি যাব না!

:যাবি না?—রঙিলার হাতে ছিল চৈত-দান্ডার! বসিয়ে দিলে এক ঘা!—আয় বল্‌ছি!

বন্যজন্তুর মতো আর্তনাদ করে উঠল মালকো : না, না, না!

:এখনও না!—খুন চেপে গেছে রঙিলার! দ্বিগুণ বেগে উদ্যত করে তার হাতের লাঠি! শিউরে ওঠে মাল্‌কো! আর্ত চিৎকার করে ওঠে! কিন্তু সে নিষ্ঠুর আঘাত প্রতিহত হল মাঝখানে। পিছন থেকে কে যেন চেপে ধরেছে রঙিলার উদ্যত মুষ্ঠি!

চম্‌কে ওঠে ওরা দুজনেই। কখন অতর্কিতে রঙিলার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষটা। চয়ন শিরদার।

রঙিলা বললেঃ হাত ছাড়!

: ছাড়ছি, কিন্তু কথা দাও ওকে মারবে না আর!

রঙিলা বলে : শিরদার, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি ভিনগাঁয়ের বেলেসা! আমার ঘটুলের মোটিয়ারীকে শাসন করবার অধিকার আমারই। তোমার মোড়লি করবার ইচ্ছে থাকে নিজের দলে যাও!

চয়ন হাসলে। হাতখানা সে ছাড়েনি কিন্তু। বললে : বেলেসা, তোমার চেহারা মুরিয়া মেয়ের মতো নয়; কিন্তু একটা ঘটুলের বেলেসা হয়েও ঘটুলের কানুন তুমি শেখনি?

আহত সর্পিনীর মতো রঙিলা বললেঃ এত বড় কথা বললে তুমি?

ঃ বলতে বাধ্য করলে যে! তুমি কি জান না আজকে একরাতের জন্য তোমার দলের সব কয়টি ম্যোটিয়ারীর উপর তুমি অধিকার হারিয়েছ? এরা আজ এক রাতের জন্য আমার সম্পত্তি! রাত পোহালে তুমি তোমার অধিকার ফিরে পাবে।

রঙিলা চুপ করে থাকে। যুক্তিটা অকাট্য। চয়ন ছেড়ে দেয় ওর হাত।

বাঁ-হাতে মাল্‌কোকে টেনে নেয় বুকে। ডান হাতখানা প্রসারিত করে দেয় ঘটুলঘরের দিকে। মুহূর্তপূর্বেকার রঙিলার কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠেঃ বেলেসা! ঘটুলে ফিরে যাও!

রঙিলার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেছে। কিন্তু না, সংযম সে হারায়নি। দ্রুতপদে নিঃশব্দেই ফিরে যায় একা। কলকণ্ঠে হেসে ওঠে চয়ন। তারপর তার খেয়াল হয়—ওর বাহুবন্ধে নির্জীবের মতো পড়ে আছে মাল্‌কো, যেন অজ্ঞান হয়ে গেছে সে!

ঃ মাল্‌কো! মাল্‌কো!

না, অজ্ঞান সে হয়নি। আবেশে মুদে এসেছে তার দুটি কাজলকালো চোখ। ওর তনুদেহের প্রতিটি জীবকোষ অপ্রত্যাশিত মিলন সুখে নিস্পন্দ! উল্কি-আঁকা মুখটা তুলে ধরে সে প্রতীক্ষা করে একটা প্রত্যাশিত স্পর্শ। 'পোড়ো ভূমের' দিকে মুখ তুলে যেমন ফুটে ওঠে স্থলপথ! কাবোঙ্গা গাঁয়ের নিঃসঙ্গ নায়কের হিসাবে কেমন যেন ভুল হয়ে যায়। যা কোনদিন করেনি, যার প্রেরণা কোনদিন জাগেনি অন্তরে, তাই করে বসে হঠাৎ। তার কবাট-বক্ষে মাদ্রি-ঢোলের দ্রুত বোল—সে কার বুকের স্পন্দন? নত হয়ে আসে চয়নের মুখ, দিকচক্রবালের দিকে বর্ষণক্লান্ত বৈকালে যেমন বেঁকে নেমে আসে সপ্তবর্ণা 'ভীমুল-উইল'!

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠি ঃ কিন্তু একটা কথা ডাক্তারসাহেব। সে রাত্রে এমন কি ঘটেছিল যাতে ধ্যান ভাঙলো কাবোঙ্গার নিঃসঙ্গ নায়কের? পূর্ণযৌবনা নারীকে বাহুবন্ধে বাঁধবার অভিজ্ঞতা তো এর আগেও হয়েছিল তার।

ডাক্তারসাহেব বলেন ঃ আমার মনে হয় বেলেসাকে দেখেই ওর ধ্যান ভেঙেছিল। চয়ন সৃষ্টি ছাড়া জীব। রঙিলার রূপটাও সৃষ্টিছাড়া, মুরিয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যে কোন কারণেই হক রঙিলার ঐ অদ্ভুত চেহারায় মুগ্ধ হয়েছিল চয়ন। ধ্যান ভেঙেছিল তার। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে বেলেসা ধরা দিল না, সে হল প্রতিপক্ষ। চয়নের অন্তরে তখন ঝড়ের সংকেত—তাই এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্মের আইনে মাল্‌কোর বন্দরে নোঙর গাড়ল চয়ন।

আমি বলি ঃ তাহলেও প্রশ্ন থাকে। এক্ষুনি যে গ্রুটতেই বর্ণনা দিলেন আপনি, সেটা কি [illegible] কাবোঙ্গা ত্যাগ করার আগের ঘটনা, না পরের? আমি যে স্পষ্ট দেখেছিলাম একা বসে আছে চয়ন তালাওয়ের ধারে, সাবু গাছ তলায়।

ডাক্তার পিল্লাই বলেন ঃ তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রঙিলার প্রতি চয়ন আকৃষ্ট হয়েছিল কেন? শুধু তার অদ্ভুত চেহারার জন্যই? রঙিলাই বা তাকে প্রত্যাখ্যান করে কোতোয়ারকে বরণ করে নিল কেন? কিন্তু সে মীমাংসা আপাতত বন্ধ থাক। নটা বাজলো। আমাকে এবার বের হতে হবে। যাব পাশের একটা গাঁয়ে ভ্যান নিয়ে। যাবেন?

ঃ কাবোঙ্গা অথবা কারাংমেটায়?

ডাক্তারসাহেব হেসে বলেন ঃ না অন্য একটা গাঁয়ে।

বললুম ঃ তবে একাই যান। কালরাত্রে ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নিই।

ডাক্তারবাবু টেবিল থেকে একখানা বই এগিয়ে দিয়ে বলেন ঃ ঘুম না এলে এ বইখানা পড়তে পারেন। বেশ ইণ্টারেস্টিং।

বইখানার নাম 'সাইকোলজিক্যাল এ্যাবনর্মালিটিস্ এ্যামংস্ট এ্যাবরিজিনালস্'।

(ক্রমশঃ)

বাদশার অখণ্ড প্রতাপ। তিনি দ্যুনিয়ার শাহনশা, যেমন বেহেস্তে খোদাতাল্লা। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের প্রতিভূ কাজী—মূর্তিমান ন্যায়। তিনি বিচারসভায় বসেছেন। আসামী হাজির। কি অপরাধ? নগর কোটাল জানায়—এ গোলা থেকে এক কুনকে ধান চুরি করেছে।

—ফসল তছরুফ? কি সাংঘাতিক কথা! বেহদ্দ কসুর। ওই শস্য না পেলে বীজ বপন করা হবে না। বীজ বপন না করতে পারলে আগামী বছর খাদ্যাভাব হবে, এমনকি দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।

—কি সাজা হবে, খোদাবক্স।

—আসামীর গর্দান নেওয়া হোক।

আসামী আর্জি পেশ করতে চায় হুজুরের কাছে। অধমের একটা কাতর নিবেদন আছে। পারিষদ পরামর্শ দেয়, তবু গর্দান। তাহলে হাতে মাথা কাটা যাবে।

বিলেতের পটভূমিকায় তেমনি নাটকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। কি? শপলিফটিং! এ গুরুতর অপরাধ। প্রতি বছর ব্যবসাদারদেয় লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। এ অপরাধের কঠোর শাস্তিবিধান হওয়া উচিত—বলেছেন বিলেতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হেনরী ব্রুক।

মানুষ মারলেই এদেশে ফাঁসি হয় না। তবে পুলিসকে খুন করলে বা ডাকাতি করতে গিয়ে কাউকে মারলে সেগুলো capital murder, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। সেটাও তুলে দেবার জন্যে আন্দোলন চলেছে।

লণ্ডনের চিঠি

আমি ভাবছিলাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক কাজ করলে পারেন, শপলিফটিং করলেই ফাঁসি এই ধরনের একটা আইন পাশ করিয়ে নিন। কন্সারভেটিভ মেজরিটি যা ইচ্ছে ভোটে দিলেই পাস।

অবশ্য এই ধরনের আইন একটা পাস হয়েছে। সেটা ইমিগ্রেশন বিলের দ্বিতীয় পর্ব। বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইনের অন্য এক দিক।

বিলের প্রথম ছ'সপ্তাহে ১৫৭জনের উপর তল্পিতাল্পা বেঁধে এদেশ থেকে চলে যাবার হুকুম হয়েছে। 'বেণীর সঙ্গে মাথা' হিসেবে মানমর্যাদাটাও খুইয়ে যেতে হচ্ছে। যে ঘটনা নিয়ে এত হইচই, পার্লামেণ্ট ও খবরের কাগজ সরগরম হয়ে উঠেছে সেটা বলোন।

মিস কারম্যান ব্রাইন জামাইকার মেয়ে। বয়েস ২২ বছর। ১৯৬০ সালে বিলেতে আসে। একটা ওয়েলডিং ফ্যাকট্রিতে কাজ করে। হঠাৎ অসুখে পড়ল। অস্ত্রোপচারও করতে হয়। সুস্থ হয়, কিন্তু আগের মত সবল হয় না। শারীরিক অক্ষমতার জন্যে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অন্য কাজ খুঁজতে থাকে যাতে অল্প পরিশ্রম। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানে ভালো নয়। মিস ব্রাইন গায়ে গতরে তেমন খাটতে পারবে না—রঙটা সাদা হলে সুব্যবস্থা একটা হতই। কিন্তু তাও মিশ কালো। সুতরাং চাকরি আর মেলে না। এদেশে অনেক বড় বড় self service দোকান আছে। জিনিসপত্র সাজান, নিজের ইচ্ছে মত বেছে তুলে নাও। মেয়েটি সেখান থেকে ২ পাউণ্ডের জিনিস তুলে নেয়। দাম না দিয়ে পথে পা বাড়ায়। মন্দভাগ্য, ধরা পড়ে। ১২ই জুন লণ্ডনের প্যাডিংটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তার বিচার হয়। সে অপরাধ স্বীকার করে।

প্রথম অপরাধ তাই বিচারক তাকে শর্তাধীনে 'মুক্তি' দেন। সেই সঙ্গে আরও সুপারিশ করেন তাকে দেশে ফেরত পাঠাবার। সাধু বিচারপতি। মহানুভব ইংরেজ সরকার। জরিমানা মকুফ সেই সঙ্গে প্লেনে চড়িয়ে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু সেই আদেশ কার্যকরী করার জন্যে সোজা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হলওয়ে জেলে। তাহলে বিচারপতির দেওয়া 'মুক্তি'টা কি বস্তু!

চার সপ্তাহের মধ্যে কাকপক্ষীতে এ কথা জানতে পারে না। জামাইকান হাই-কমিশনারের চিঠি মেয়েটার হাতে দেওয়া হয় না। পাঠক হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন, মুক্তি পেয়েও এতদিন জেলে পচছে কেন?

ঝটপট করে ইমিগ্রেশন আইন পাশ করা হয়েছে, তার বলে বলীয়ান হয়ে ছোটকোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটও সিংহনাদ ছাড়ছেন। কিন্তু বিধি ব্যবস্থা পুরো হয়নি, তাই এতো দেরি। মেয়েটা জানতে চেয়েছিল, legal aid পাবে কিনা। তার উত্তরে জেল কর্তৃপক্ষ জানায় 'না'। এও বলে, আপীল করলে জেল হয়ে যাবে।

জেলে পচে কারম্যান ব্রাইনের মন ভেঙে পড়ে—সে জানে না কী তার পরিণতি, কবে তার মুক্তি। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে, তাকে যদি অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি দেশে পাঠান হয়, চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। এদিকে সে বাক্‌দত্তা। ওয়েলডিং ফ্যাকট্রিতে কাজ করার সময় খুঁজে পেয়েছে তার মনের মত সাথী। দুদিন আগেও তার সঙ্গে ঘর বেঁধে এদেশে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। এহেন সময় ইমিগ্রেশন আইনের বজ্রাঘাত।

লেবার পার্টির সদস্য মিঃ এরিক ফ্রেচার প্রসঙ্গটা তুললেন পার্লামেন্টে। ভাষা জোরালো, শ্লেষের সুরে ন্যায়ের দাবি। মিঃ ব্রুক উত্তর দিলেন—শপলিফটিং সামান্য অপরাধ নয়। তার উপর সে নিজে আমাকে জানিয়েছে যে, দেশে ফেরার জন্যে সে উদগ্রীব। আমি তার দেশে ফেরার প্রতিবন্ধক হতে চাই না। তখন বলা হল—সে যদি দেশে ফিরে যেতে চায়, তবে আর ডিপোর্ট করার কি প্রয়োজন?

অন্য প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ব্রুক আরও বলেন। পার্লামেন্টে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ তিনি নাকচ করেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই খোঁজ রাখেন না তাঁর দপ্তর সম্বন্ধে কি আলোচনা হয়। অবশ্য এ বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনার কালে মিঃ বাটলার ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এবং তিনিই সই করেন মিস ব্রাইনের বহিষ্কার দণ্ডাদেশ।

ডিপোর্টেশন আইন বলে—যে অপরাধে জেল হতে পারে সেই অপরাধেই ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দেশ থেকে বের করে দেবার সুপারিশ করতে পারেন। যাঁরা সাধারণত ১০ শিলিং থেকে ১০ পাউণ্ড জরিমানার হুকুম দেন যাঁদের ক্ষমতার আপার লিমিট ৬ মাস জেল দেওয়া, আজ তাঁরা মহামহিম—কমনওয়েলথের অপরাধী পেলেই রায় দেন করো ডিপোর্ট।

কিন্তু পার্লামেন্টে আলোচনা কালে এক সংশোধনী প্রস্তাবের উত্তরে এটর্নি জেনারেল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—

"It does not advance the case one way or another to draw attention to offences of a trivial character which, in certain circumstances, could be followed by a sentence of imprisonment, because I do not believe that any Court anywhere in the country would ever consider deporting some one for offence of that character."

তিনি আরও বলেছিলেন—

"I cannot think that there is any prospect of any Court ever being asked to consider a recommendation unless it is a serious case by a man of bad character."

অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটদের যে পার্লামেন্টের বিবরণ পড়তে হবে এমন কোন বাধাবাধকতা নেই। মিঃ ব্রুকের শেষ কথা—তিনি এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে নারাজ। তবে পার্লামেন্টের আলোড়নে বিচলিত হয়ে টোরি পার্লামেন্টারী দলের নেতা মিঃ ম্যাভলিং জানালেন তিনি ভেবে দেখবেন বিষয়টা এবং আশা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বিবেচনা করবেন।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা মুক্তি পান। কিন্তু ভয়ের কথা মিঃ ব্রুকের বক্তব্যটা। তিনি বলেছেন, মিস ব্রাইন ৬ সপ্তাহ জেল খেটেছে সেইটেই যথেষ্ট শাস্তি। সুতরাং তাকে আর দেশ থেকে তাড়ান হল না। ভালো কথা। ভদ্রমহিলার মুক্তিতে সবাই খুশী। কিন্তু মন্ত্রীবরের বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায়—কলাটা মুলোটা চুরির অপরাধে ভবিষ্যতে যে কোন লোককে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেটা এদেশের আইনসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গতও বটে। অর্থাৎ আমাদের নিরাপত্তা

পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত। লাঠ্যৌষধি দিয়ে তাড়ান আর কলমের একটা খোঁচায় ডিপোর্ট করা এর মধ্যে সভ্যতা বা ভব্যতার হয়ত অনেক হের ফের আছে তবে ভুক্তভোগীর দুর্দশা সমান। সে বিশ্লেষণে কঙ্গো আর বিলেতের মধ্যে তফাতটা কোথায়।

এই প্রসঙ্গে আর দু-চারটে কথা এসে পড়ে। পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আছে। তারা বলবে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বধর্মকে বেশী মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয়। তেমনি ইংরেজ বোধ হয় বলতে পারে, হোক না মোট কালো লোকের সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম, তাদের ওপর আমরা এককালে প্রভুত্ব করেছি। তাদের পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের বেশী আশা করা অন্যায়।

ইমিগ্রেশন বিলের আদি এবং অকৃত্রিম জনক ফ্যাসিস্ট নেতা স্যার মোসলে। তবে ফ্যাসিস্ট বলে তাঁকে দাবিয়ে রাখা গিয়েছিল, তারপর টোরি পার্টির সিরিল ওসবর্ণ এ-আন্দোলনকে জাতে তুলে দিলেন। তাঁর স্যার উপাধি পাওয়া সমসাময়িক। জানি না, স্যার উপাধি জানিয়ে তাঁকে এবিষয়ে পরোক্ষে প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল কি না। আবার স্যার মোসলে আসরে নেমেছেন দেশকে মুক্ত করার জন্যে। এই নিয়ে মারামারি, হই-হট্টগোল চলেছে। বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে মারামারিও হয়ে গেছে ডাডলে শহরে। দু-চারজন লোক বলছে জাতিবিদ্বেষ প্রচার বেআইনী করা হক। অমনি তারস্বরে চিৎকার উঠছে। Freedom of Speech-কে নিয়ে ছেলেখেলা চলবে না। সুশিক্ষিত জাত, জানি না, এরা স্বাধীনতার মানে কি বোঝে। স্বাধীনতা কি সংযমশূন্য—যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা? রাঘব-বোয়াল যদি অবাধ স্বাধীনতা চায়, তাতে যে ন্যায়বিচারের নমুনা মেলে, তার নাম মাৎস্য-ন্যায়।

লেবার পার্টি এই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ভাবছি, লেবার পার্টি যদি আগামী সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতা হাতে পায়, তাহলে কি এই কালো আইনগুলো রদ হবে? আবার সব ভাই ভাই? আমার মনে পড়ে প্রমথ চৌধুরীর রস-রচনার কথা আমরা আর তোমরা। পূর্ব আর পশ্চিম, সাদা আর কালো এরা জল আর তেল। মিশ খাবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

ব্যক্তিগত কথা বলি। এদেশে গাড়ির দাম ও উপার্জনের পরিমাণ এমন যে, যে-কোন মধ্যবিত্ত গাড়ি কিনতে পারে। বীমা না করলে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন হয় না। ইংরেজ গাড়ি কিনলে, ইন্সিওরেন্স কভার হয়ে যায় কয়েক ঘন্টায়। আমি ঘুরে বেড়াই। কেউ বলে বৃটিশ ছাড়া করি না, কেউ-বা একগাদা [illegible]

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটিতে আমি পরিচিত। এজেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। ফোন করতেই বলল, আজই সন্ধ্যে-বেলা এসে কভার দিয়ে দেবে। ক্রমে যোগ হয় হেড অফিসের অনুমতি চাই। দক্ষিণাও সামান্য বেশী লাগবে—শতকরা দশ। তথাস্তু! মোগলের হাতে পড়লে খানা খেতে হয়। ইংরেজের সংস্পর্শে আছি কিছু গুরুদক্ষিণা লাগবে বইকি? শেষ রফা ২০ পারসেণ্ট অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিয়ে। দশ পারসেণ্ট আমার ভারতীয় নাগরিকতার অপরাধে, আরও দশ এদেশে দশ বছর পোরেনি বলে।

ওদের খোদ কর্তাকে চিঠি দিয়েছিলাম—ভারতের ইতিহাসে পড়েছি, মুঘল রাজত্বে মুসলমান না হলেই ট্যাক্স দিতে হত—সেটা কুখ্যাত জিজিয়া কর। এদেশটা সুসভ্য ইংলণ্ড। যুগটা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। তোমরা পতিতপাবন খৃষ্টের পরম ভক্ত বলে গৌরব বোধ কর এবং গলাবাজি করে তা প্রচার কর। বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তোমরা কর্ণধার। আর যেহেতু আমার গায়ের রঙ তোমাদের মত সাদা নয়, অমনি জিজিয়া কর বসিয়ে দেবে।

এই প্রসঙ্গে বলে নিই, কো-অপারেটিভ সোসাইটি এদেশের লেবার পার্টির শাখা। "রেনল্ডস নিউস" নামে কো-অপারেটিভ ও লেবার পার্টির তরফ থেকে রবিবারের কাগজ বেরোয়। "Second class Law" এই শিরোনামে ইমিগ্রেশন আইনের বিরুদ্ধে এরা সম্পাদকীয় লেখে। আমি চিঠি লিখলাম, আপনাদের প্রতিষ্ঠানেই দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন আছে। সম্পাদক মহাশয় চেষ্টা করলে এটাকে নিশ্চয় রদ করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, বিনয়ের প্রাচুর্য পেয়েছি, তবে সদুত্তর পাইনি, কোন সুরাহা হয়নি।

টাইমস পত্রিকায় মাঝে এই নিয়ে কোন খবর ছাপা হয়। ইন্সিওরেন্স অ্যাসো-সিয়েশনের সেক্রেটারী জানান। ওদের রঙে কিছু নেই, তবে অনেকে ভালো ইংরিজী জানে না, কেউ-বা এদেশের ধোঁয়াটে আর অন্ধকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত নয়, রিস্ক বেশী, প্রিমিয়ামও বেশী দিতে হয়।

আমার গাড়ি চালানোর হাতেখড়ি এদেশে। ডিসেম্বরের এক দুর্যোগ-ভরা দিনে ড্রাইভিং টেস্টে পাস করি। পাঠালাম প্রতিবাদ। টাইমস কর্তৃপক্ষ আমার চিঠি পেয়ে বোধ হয় সংশয়শূন্য হতে চাইছিলেন। নাম দেখে ডিরেকটরী থেকে ফোন নম্বর বের করে। চিঠির জন্যে অভিবাদন জানায়। হায় তবু চিঠিটা ছাপা হল না। উত্তর এলো, চিঠিটা ছাপাবার জন্যে রাখা ছিল। শেষ পর্যন্ত জায়গা পাওয়া যায়নি।

সেইত মজা কাগজের। যারা দলে ভারী, যাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত: যাদের ভয়ে কোন গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় লোক জুজু হয়ে বসে আছে, কাগজের ছত্রে ছত্রে তাদের রাগেই বা কাজও রে ছাপা হচ্ছে অসহায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ। নির্বিবাদে মিথ্যে কলঙ্ক আর অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে।

যারা ভুক্তভোগী, অপবাদটাও নির্বিবাদে মাথা পেতে নিচ্ছে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করবে কোন্ সুবাদে। যদি-বা কেউ সাহস করে এগিয়ে এল—এস্পার-ওস্পার যা-হয় একটা হক। তার কথা কেউ জানতে পেল না। কাগজের কর্তৃপক্ষ তখন সুর ভাঁজছেন—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী।

অনেকে হয়ত ভাবে, এই সমস্ত আইনের কড়াকড়ি আফ্রিকানদের জন্যে। ভারতবাসী-দের ওরা আর তেমন কালো ভাবে না। না ভাবলেই ভালো। হয়ত বলবে, জীবনের বহু পদক্ষেপে ঘা খেতে হয়। নিজের দেশেও খায়—আত্মীয়স্বজনের হাতেও দুর্ভোগ ভোগে। ইংরেজরাও হয়ত ইংরেজের হাতে নাস্তানাবুদ হয়। তবে আমরা নিজেদের রঙ সম্বন্ধে সব সময়ে সচেতন। আমাদের সহজাত প্রতিকূল ধারণা আছে। তামাটে রঙের চশমা পরে সব কিছু বিশ্লেষণ করতে চাই। তাই এই ভুল ধারণা। তাই হক, ভুল প্রমাণিত হলেই বেশী খুশী হব।

ইমিগ্রেশন বিল বাদ দিয়েই এদেশে

ভারতীয়দের অবস্থা কি দেখা যাক। মানে লেখাপড়া জানা ভারতীয়। যাদের উচ্চশিক্ষিত বলা যায়। চাকরি পায়, খেয়ে পরে বাঁচতে পারে, তবে বড় হবার কথা ভাবা অলীক স্বপ্ন। মোটামুটিভাবে দুটো পেশায় ভারতীয়দের পক্ষে একটু সম্মানের চাকরি মেলে, তা হল ডাক্তারি আর ইঞ্জিনীয়ারিং। তবে অধিকাংশ ডাক্তার হয় হাউস সার্জেন। যে মাইনেতে এ দেশের কোন ডাক্তার কাজ করতে চায় না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—রেজিস্ট্রারগিরি। তা-ও হয়ত পাগলা গারদে বা বুড়োদের হাসপাতালে। দু-একজন কনসালটেন্ট যে নেই তা নয়, তবে তা দু-একজনই। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারদের বরাতে জোটে ডিজাইনার ডিটেলারের কাজ—ডিজাইন থেকে ডিটেল বেশী করতে হয়। বড় জোর ডিজাইনার, তার ওপর নয়। তা-ও দুরকম স্কেল। ইংরেজদের এক মাইনে, ভারতীদের অন্য। মাইনেও রফায় ঠিক হয়, বলার কি আছে।

সরকারী অফিসে মাইনে বাঁধা। সেখানে দেখেছি, ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস-সি পাশ সবচেয়ে নীচু গ্রেডে চাকরি করে। এ দেশের কোন বি এস-সি ইঞ্জিনীয়ার ও-পদে চাকরি করতে অস্বীকার করবে।

গত সপ্তাহের একটা ঘটনা বলিঃ এ দেশে সবার মাইনে বাড়ে, কারণ জিনিসের দাম বাড়ছে। কিন্তু লুটনের এক প্ল্যাস্টিক ফ্যাক্টরীর কোন শাখায় সবার মাইনে কমে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই বিভাগে জনা-পঞ্চাশেক ভারতীয় ও পাকিস্তানী কাজ করে। ইংরেজরা ৪০ ঘণ্টা খেটে যে মাইনে পায়, ভারতীয়দের তা উপায় করতে ৫২ ঘণ্টা খাটতে হবে।

কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এতে রঙের কোন গন্ধ নেই। ওই বিভাগে ইংরেজ কাজ করে না। করলে ঠিক কমত।

টাইমস পত্রিকায় শেখ আবদুল্লার বিচারের খবর সগৌরবে ছাপা হচ্ছে। আজকের বিবরণের শেষটা চমকপ্রদ। তাতে লিখেছে সরকার পক্ষের উকিল মন্তব্য করেছে—"We played upon the British love for the rule of law."

ডিফেন্স কাউন্সিল চটপট জবাব দিয়েছে—"It seems there is no such love in India now."

নিশ্চয় অনুমান করতে পারি, শেষের মন্তব্যটা করেছেন মিঃ ডিংগল ফুট। এমন শূন্যগর্ভ আত্মম্মন্যতা ইংরেজ ছাড়া আর কার হবে। যার নিজের দেশে দু-দল লোকের জন্যে দুরকম আইন, তাদের পক্ষেই শোভা পায় rule of law'র বড়াই করা।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩১ ॥

ডাক্তার মুখার্জি তার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটু স-সঙ্কোচে বললেন, "পাঞ্জাবী রেফিউজিরাও তো এদেশে এসেছে, তারা তো—"

"তারা আমাদের মতো নিঃস্ব হয়ে কেউ আসেনি। এক্সচেঞ্জ অব্ পপুলেশন (Exchange of population) ওদেশে হয়েছিল, তাই আমাদের মতো দুরবস্থায় কেউ পড়েনি। তাছাড়া এদেশের পাঞ্জাবী সমাজ ওদের দূর-ছাই করেনি, যাতে ওরা ভদ্রভাবে বসবাস করতে পারে তার চেষ্টা সমবেতভাবে করেছে। আর-একটা কারণও আছে। ওরা দেশে যে পরিবেশে যে-সব কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল, এদেশে এসেও ওরা সেই পরিবেশ, সেই সব কাজই পেয়েছে। কিন্তু আমরা যে পরিবেশে যে-সব কাজ করতাম, সে পরিবেশে সে-সব কাজ আমরা পাচ্ছি না। আমরা যা পাচ্ছি, তা ভিক্ষের আকাঁড়া চাল আর অর্থহীন সদুপদেশ—"

ঝিনুক আবার থেমে গেল। তার গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ডাক্তার মুখার্জি ভেবে পেলেন না, কি বলবেন। এ নিয়ে আর কোনও আলোচনা করা সমীচীন মনে হলো না তাঁর। তিনি চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর অন্য কথা পাড়লেন।

"তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?"

"আমি বি-এ পাশ করেছি। ইকনমিক্সে অনার্স ছিল।"

"কোন্ ক্লাস পেয়েছিলে?"

"ফার্স্ট ক্লাস।"

"তাহলে এক কাজ কর না। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পড়বার জন্যে দরখাস্ত করে' দাও। আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি। লণ্ডনে আর দিল্লিতে দু জায়গাতেই আমার চেনা লোক আছে। তাঁদের অনুরোধ করলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে।"

আগ্রহে জ্বলজ্বল করে উঠল ঝিনুকের চোখ দুটো।

"আপনি পারবেন?"

"পারতে পারি। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে একটা বিষয়ে মনস্থির করতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে তোমার এত রাগ, সে-রাগটা কমাতে হবে। এখন যাঁরা দেশের শাসন-কর্তা, তাঁরা যে তোমার শত্রু নন হিতৈষী, এটা স্বীকার না করলে তাঁদের সহানুভূতি পাবে না। আর তাঁদের সহানুভূতি না থাকলে বিলেত যাওয়ার অনুমতি পাওয়া শক্ত।"

ঝিনুকের চোখের দৃষ্টির রং বদলে গেল। "আপনি নিজে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিলেন না, আর আমাকে মিথ্যাচার করতে বলছেন?"

ডাক্তার মুখার্জি এ-উত্তর প্রত্যাশা করেননি। একটু চুপ করে' থেকে বললেন, "এটাকে যদি মিথ্যাচার মনে কর, কোরো না।"

"আপনি কি সত্যিই মনে করেন, ওরা আমাদের হিতৈষী?"

"ওদের মনের কথা আমি জানি না, তাই তোমার কথার ঠিক উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু একটা কথা জানি, হিতৈষী হলেই সব সময়ে উপকার করা যায় না। বাইরের অনেক রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাধার সৃষ্টি করে। ওরা হয়তো তোমাদের ভাল করতে চায়, কিন্তু পারছে না।"

"আমি তাহলে উঠি এবার।"

ঝিনুক উঠে দাঁড়াল। তার ছোট ব্যাগ খুলে ষোলটি টাকা বার করে' টেবিলের উপর রেখে বলল, "আপনার ফি রেখে যাচ্ছি। যদি নিতে না চান ফেলে দেবেন।"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

ডাক্তার মুখার্জি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। তারপর একটা চিঠি লিখলেন ডাক্তার ঘোষালকে।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, শ্রীমতী ঝিনুক একটু আগে আমার কাছে চোখ পরীক্ষা করাতে এসেছিল। আমি তার চোখে কোনও দোষ দেখতে পেলাম না। আমি তার কাছে ফি নিতে চাইনি, তবু সে জোর করে' ষোলটা টাকা রেখে গেল। আমি তার কাছে ফি নেব না। টাকাটা তাই আপনার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি। শুনেছি সে আপনার ওখানে কাজ করে। আপনি বুঝিয়ে সুজিয়ে এটা তাকে দিয়ে দেবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসুঠাম মুখোপাধ্যায়।

গণেশ হালদার ভেবেছিলেন, তাঁর ছাপা পুস্তিকাটি বিতরিত হলে হয়তো জনসাধারণের মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দেবে। হয়তো কেউ তাঁকে উৎসাহিত করবে তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং স্পষ্ট উক্তির জন্যে। হয়তো বাইরে থেকে দু'-একখানা চিঠিও আসবে। কিন্তু তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এবিষয়ে কেউ উচ্চবাচ্যই করলে না। স্কুলে তাঁর সহকর্মীদের প্রত্যেককেই তিনি এক কপি করে' পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মুখভাব দেখে মনে হল না যে, তাঁরা সেটি পড়েছেন। দু'-একজন তাঁকে দেখে মুচকি হেসেছিলেন একটু,—বাস্, ওই পর্যন্ত। তিনি দেশের জন্য যে চিন্তা করছেন, সে চিন্তায় কেউ প্রভাবিত হয়েছে, এর সামান্যতম প্রমাণ পাবার জন্য তিনি উৎসুক হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রমাণ তিনি পেলেন না। স্টেশনের প্রতি ট্রেনে গিয়ে তাঁর লোক পুস্তিকা বিতরণ করেছিল। সে বললে, ভদ্রলোক দেখে দেখেই সে দিয়েছে। কিন্তু কই কোথা থেকেও তো সাড়া পাওয়া গেল না কোন। আমাদের দেশের বাঙালী সমাজ তাহলে কি মৃত? যারা ফরসা জামা-কাপড় পরে' দে'তো হাসি হেসে গাল-গল্প করে, যারা আপিসে যায়, বাজার করে, সিনেমা দেখে, বংশবৃদ্ধি করে, যারা পাড়া-প্রতিবেশীর নিন্দায় পঞ্চমুখ, নিজেদের বৈঠকখানায় বা ক্লাবে বসে' যারা রাজা-উজির মেরে নেতাদের নিন্দায় ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে ওঠে, তারা কি আসলে তাহলে প্রাণহীন শব? তাদের এই সব উল্লাস বা আক্ষেপ কি মৃতদেহ-নিঃসৃত বাষ্প মাত্র? গণেশ হালদার লজ্জায় ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে দেখা করেননি। সকলের এই ঔদাসীন্যে তাঁর নিজেরই যেন লজ্জায় মাথা-কাটা যাচ্ছিল। দেখা হলেই তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কই মশাই কি হল? আপনার ডাকে কেউ সাড়া দিলে কি? তখন তিনি কি বলবেন?

একদিন কিন্তু তাঁকে ডাক্তার মুখার্জির কাছে যেতে হলই। গল্পের একচক্ষু হরিণ যেমন আশা করেনি যে, অপ্রত্যাশিত দিক থেকে আততায়ী এসে মৃত্যুবাণ হানবে, তেমনি তিনিও প্রত্যাশা করেননি যে, তাঁর স্কুল কমিটির সভ্যরা তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এমন একটা চিঠি লিখবেন। হঠাৎ একদিন স্কুলের পিওন পিওন-বুকে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির হল সেক্রেটারির কাছ থেকে। সেই চিঠির মর্ম এই:

"আপনি সম্প্রতি প্রাদেশিকতা নিয়ে যে প্রবন্ধটি ছাপিয়ে বিতরণ করেছেন,

আমাদের স্কুল কমিটির বিচারে তাতে বর্তমান উদার গভর্নমেণ্টকে, সংবিধানের নিয়মাবলীকে এবং আমাদের দেশের মহামান্য নেতাদের এবং শিক্ষক-সমাজকে অপমান করা হয়েছে। আপনি গভর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের বেতনভোগী শিক্ষক। আপনার এই দুর্মতি ও স্পর্ধা দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করছি। অদ্য মিটিংয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে আপনার এই আচরণকে অত্যন্ত অশোভন এবং গর্হিত বলে' নিন্দা করেছেন। তাঁদের সর্বসম্মতিক্রমে তাই আপনাকে আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যদি আপনার আচরণে এরূপ গভর্নমেণ্টবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়, তাহলে আপনাকে আমরা স্কুলের শিক্ষক-রূপে আর রাখতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানাচ্ছি যে, অবিলম্বে আপনাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আপনি ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ কার্য করবেন না। এ-প্রতিশ্রুতি যদি না দিতে চান, তাহলে আমার এই চিঠিকে নোটিসস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এক মাস পরে আপনার স্থানে আমরা নূতন লোক বাহাল করব।"

চিঠিখানির দিকে বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইলেন গণেশ হালদার। কিছুক্ষণের জন্য স্থিরই করতে পারলেন না, এ অবস্থায় কি করা উচিত।

শেষে ডাক্তারবাবুর কাছেই গেলেন তিনি।

ডাক্তারবাবু যথারীতি তাঁর কুকুর আর গরু-বাছুর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেদিন ব্যস্ত ছিলেন তাঁর ভেড়াটাকে নিয়ে। ভেটুকের ক্ষুরে ঘা হয়েছিল। দুর্গাকে দিয়ে ঘা পরিষ্কার করিয়ে ফিনাইল দেওয়াচ্ছিলেন তিনি। তাকে ঘিরে রকেট, জাম্বু, ভুটান আর মুর্গিগুলোও দাঁড়িয়েছিল, যেন তারাও ব্যাপারটা তদারক করতে এসেছে। সকলেরই মুখে একটা চিন্তিত ভাব। কি হল ভেটুকের!

গণেশ হালদারকে দেখে ডাক্তারবাবু সহাস্যে সম্বর্ধনা জানালেন।

"আসুন মাস্টার মশাই, কি খবর?"

মাস্টার মশাই সেক্রেটারির চিঠিটা তাঁকে দিলেন।

চিঠিটা পড়ে' ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন ডাক্তারবাবু কয়েক মুহূর্ত। সেক্রেটারী তুলসী বাগচীর মুখটা তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। ধার্মিক লোক, ত্রিসন্ধ্যা করেন। কিছুদিন আগে তাঁর কাছে এসে ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী যে মজঃফরপুরে গিয়ে ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানান নি, এজন্যে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তাঁর এই চিঠি! অনেকক্ষণ চিঠিখানার দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর

বললেন, "আমি হলে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিতাম।"

গণেশ হালদার বললেন, "আমিও তাই ঠিক করেছি। আমার যথেষ্ট টাকা থাকলে আমি আর-একটা কাজও করতাম, কিন্তু টাকা নেই বলে' সাহস পাচ্ছি না।"

"কি সেটা?"

"ওয়ার্কিং কমিটির নামে নালিশ করতাম। আমার আইনসংগত স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে কি না, আদালতের মারফত জেনে নিতাম সেটা। কিন্তু তা করতে গেলে যত টাকার দরকার, তত টাকা আমার কাছে নেই।"

ডাক্তারবাবু প্রথমে মৃদু হাসলেন। তারপর হো-হো করে' হেসে উঠলেন।

"আপনি দেখছি ক্রোধ-পর্বতের তুঙ্গে আরোহণ করে' বসে আছেন। চলুন ওদিকে গিয়ে বসা যাক্। দুর্গা, তুই ফিনাইল জল দিয়ে ধুয়ে ক্ষতটা ভাল করে' ব্যাণ্ডেজ করে দে। মাছি না বসে। অন্য ক্ষতগুলোও ধুয়ে দিস।"

মাঠেই চেয়ার ছিল কয়েকটা। সেইখানে গিয়েই বসলেন দু'জনে। রকেট আর ভুটান তাঁদের সংগে এসে দু' পাশে থাবার উপর মুখ রেখে বসল, যেন তারাও এই আলোচনায় অংশ নেবে। জাম্বু কিন্তু বসে' রইল অসুস্থ ভেটুকের কাছে।

কথাবার্তা আরম্ভ হবার আগেই উত্তেজিত বিজয় ছুটে এল একটা নালিশ নিয়ে।

"বাবু, বাবু, রকট গোবল খাইলা ছে—" (বাবু, বাবু, রকেট গোবর খেয়েছে)

রকেট থাবা থেকে মুখ তুলে চাইলে বিজয়ের দিকে। ডাক্তারবাবু কিন্তু তখন এ-ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব আরোপ না করে বললেন, "আচ্ছা এখন তুই যা—এ-বিচার পরে হবে। এখন গোলমাল করিস না।"

বিজয় তখন ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে সলজ্জ মুচকি হেসে বলল—"আমলুক খাইবি? একটো পাক্কা আমলুক ছে গাছো পল। তাড়িও"

পেয়ারা খাবে? গাছে একটা পাকা পেয়ারা আছে। পেড়ে আনি?)

"না, এখন থাক। পেড়ে রাখ, পরে খাব।"

বিজয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে' আরও হল রকেটের দিকে চেয়ে। রকেটের মুখে একটা ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠেছিল। ভাবটা যেন, কেমন হল তো? ভারী যে নালিশ করতে এসেছিলে।

ডাক্তারবাবু মাস্টার মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "চাকরিটা আপনি ছেড়ে দিন, মোকদ্দমা করবেন না। ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। মোকদ্দমা করবার টাকা আমি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু কি হবে মোকদ্দমা করে'? ওরাও তো পতিত, যদিও ওরা সেটা নিজেরা জানে না, সেই জন্যে অবস্থাটা আরও করুণ, আরও শোচনীয়। কি লাভ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে?"

গণেশ হালদার চুপ করে' রইলেন।

ডাক্তার মুখার্জি মুচকি হেসে বললেন, "মোকদ্দমা করলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখবেন সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকে। আদালতের বিচারও সব সময়ে ন্যায়নিষ্ঠ হয় কি? আইন এমন একটা জিনিস যে, তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নানারকম করা যায়।"

গণেশ হালদার চুপ করেই রইলেন।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেশ তাই হবে। আজই আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।"

"সেই ভালো।"

"কিন্তু—"

ইতস্তত করতে লাগলেন হালদার মশাই। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডাক্তার মুখার্জি তাঁর মুখের দিকে।

"কালই তাহলে এখান থেকে চলে যাব আমি। এখানে যখন চাকরি রইল না, তখন এখানে থাকব কি নিয়ে, অন্যত্র চাকরির সন্ধান করতে হবে। আপনার সংগে স্নেহের যে বন্ধনে—"

আর বলতে পারলেন না তিনি। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

ডাক্তার মুখার্জি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আপনি যাবেন কেন! আপনি চাকরির সূত্রে এসেছিলেন বটে, কিন্তু অন্য আর-একটা সূত্রে যে বাঁধা পড়েছেন। সে-সূত্র তো কোনও পলিটিক্যাল খড়্গে ছিন্ন হবে না। আপনি এখন কি করবেন, কি করা উচিত, সে ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

গণেশ হালদার এই ধরনেরই কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন।

তবু বললেন, "যখন এখানে চাকরিই থাকবে না—"

"তবু আপনি থাকবেন। আমারই দরকার আপনাকে—"

হেসে বললেন সঠাম মুকুজ্যে। 'আপনি' কথাটার উপর জোর দিলেন। তারপর আর-একটু হেসে বললেন, "আমার এখানেও তো আপনি একটা চাকরি নিয়েছেন, আমার আবোল-তাবোল টোকার। সে চাকরি তো আপনার যায় নি। আমি যতদিন থাকব সে চাকরি আপনার যাবেও না—"

এর উত্তরে গণেশ হালদার কি বলবেন ভেবে পেলেন না। প্রত্যেক মানুষের

জীবনেই এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন ভাষা দিয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না। গণেশ হালদার নীরব হয়ে রইলেন। ডাক্তার মুখার্জিও কয়েক মুহূর্ত কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হল তিনি কি একটা যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না।

গণেশ হালদার বললেন, "কিন্তু আমার সময় কাটবে কি করে। আপনি রোজ যা লেখেন সেটুকু টুকতে আমার এক ঘণ্টার বেশী কোন-দিন লাগে নি। বাকি সময়টা আমি কি করব?"

"আপনাকে কাজ দেব। আমি প্রতি মাসে নানারকম বই কিনি, কিন্তু সেগুলো আমার লাইব্রেরিতে এলোমেলো অগোছালো হয়ে পড়ে থাকে। আমি গোছাতে পারি না। আপনি সেটার ভার নিন। আমার অবসরও কম। সব বই পড়বারও সময় পাই না, কেনবার নেশায় কিনে ফেলি। আপনি সে সব বই পড়ে ভালো ভালো অংশগুলো যদি আমাকে সন্ধ্যের পর শোনান, তা হলে ভারি উপকার হবে আমার। এর জন্যে—"

আবার থেমে গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। তারপর যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেললেন কথাটা।

"এর জন্যে আপনি স্কুলে যা পেতেন তাই আমি দেব। টাকাটা বাহুল্য, আসল কথা আপনাকে আত্মীয় করে নিতে চাই। আপনার সঙ্গে কোন-কালেই আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হবে না এটা গোড়াতেই বলে রাখছি। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। সত্যিই আমি বড় একা—"

চুপ করে গেলেন সুঠাম মুকুজ্যে। গণেশ হালদারও চুপ করে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর গণেশ হালদার বললেন, "আপনি যা বললেন, যা দিলেন তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কিন্তু তবু একটা কথা না বলে পারছি না। এভাবে আপনার মহত্ত্বের উপর দাবি করবার সত্যিকার কোন অধিকার আমার আছে কি? হয়তো দয়ার বশবর্তী হয়ে আপনি—"

ডাক্তার মুখার্জি থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"আপনিই আমার উপর দয়া করুন। আমার উপর আপনার সত্যিকার কোনও অধিকার আছে কি না এর জবাব আর এক-দিন দেব। আমার লেখার মধ্যেই পাবেন সেটা। সেটা হয়তো আপনি মানবেন। সে কথা কিন্তু এখন বলবার সময় হয় নি। সামনাসামনি বলাও যাবে না। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় অধিকারে আমি আপনার সাহচর্য কামনা করছি তার নাম ভালবাসা। এর সঙ্গে দয়া, অনুকম্পা বা সহানুভূতির কোন সম্পর্ক নেই। প্রয়োজনটা আমার। সঙ্গী হিসাবে মনের মতো লোক পাওয়া যায় না। পয়সা খরচ করলে চাটুকার পাওয়া যায়, কিন্তু বন্ধু পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়ে গেছি। আপনাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আপনি মনে কোনও গ্লানি না রেখে যেমন আছেন, তেমনি থাকুন। আপনার টাকা-কড়ির যখন যা প্রয়োজন হবে অসংকোচে আমাকে বলবেন। আজই আপনাকে আমার লাইব্রেরি ঘরের চাবি দিয়ে দেব। আপনি ইচ্ছে করলে থীসিসের একটা খসড়াও করতে পারেন। সে দিন D. H. Lawrence-এর একটা প্রবন্ধে দেখলাম তিনি গলস্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'কে (Forsyte Saga) খুব গালাগালি দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছিল গালাগালিটা ঈর্ষাপ্রসূত, আপনি পড়ে দেখুন না। সম্ভব হলে প্রবন্ধও লিখুন ও নিয়ে। সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা যখন পরস্পরের নিন্দা-প্রশংসা করেন তা অধিকাংশ সময়েই যে নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না, ওই প্রবন্ধটা তার প্রমাণ। কীটস আজ ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবিখ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু

অনেকে সন্দেহ করেন যে, Blackwood Magazine-এর কঠোর সমালোচনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এ দেশেও ওরকম হচ্ছে। লিখুন আপনি ওসব নিয়ে। আমার মতে ফরসাইট সাগা প্রথম শ্রেণীর বই।"

গণেশ হালদার স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন। সহসা তিনি হেঁট হয়ে ডাক্তার মুখার্জিকে প্রণাম করলেন।

ডাক্তার ঘোষাল ভুরু কুঁচকে সুঠাম মুকুজ্যের চিঠিখানা আবার পড়ছিলেন। একটু আগেই বেচু তাকে চিঠি আর ষোলটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক বাড়িতে ছিল না। সে গিয়েছিল মিস্টার সেনের কাছে তার কাকার দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

ডাক্তার ঘোষাল নাকের লম্বা চুলগুলো টানতে লাগলেন, তারপর শুরু হল হাঁটুর দোলানি। ভিতর থেকে মসলা পেষার আওয়াজ আসছিল।

"হরসুন্দর—"

নব-নিযুক্ত সেই ছেলে চাকরটি বেরিয়ে এল।

"ঝিনুক কখন ফিরবে তা বলে গেছে?"

"আজ্ঞে না। তিনি সেন সাহেবের বাসা থেকে বাজারে যাবেন। সেখান থেকে আপনার জন্যে মাংস আনবেন। আমাকে বলে গেছেন মসলা ঠিক করে রাখতে। উনি নিজেই এসে রান্না করবেন।"

তারপর একটু সান্ত্বনার সুরে বলল, "বেশী দেরি হবে না, ফিরলেন বলে।"

হরসুন্দরের ওইটুকুই বৈশিষ্ট্য। যখন দেখে কোনও কারণে কেউ কষ্ট পাচ্ছে বা চিন্তিত হয়েছে তখন আর কিছু না পারুক, সে সান্ত্বনা দেয়।

"আচ্ছা, যাও।"

হরসুন্দর আবার ভিতরে গিয়ে মসলা বাটতে লাগল। ডাক্তার ঘোষালের মনে হতে লাগল তাঁর বুকের উপরই যেন মসলাটা বাটা হচ্ছে। তাঁর অজ্ঞাতসারেই একটা আর্ত অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। গাড়িটা থাকলে তিনি ডিসপেন্সারি চলে যেতেন। কিন্তু ঝিনুক গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। বলে গিয়েছিল, এখুনি আসছি। কিন্তু এক ঘণ্টা হয়ে গেল এখনও তার পাত্তা নেই। ডাক্তার মুখার্জির কাছে সে চোখ দেখাতে গিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে মনে হচ্ছিল তার। ঝিনুকের চোখের যে কোনও অসুখ আছে তা তো তিনি কখনও শোনেন নি। ঝিনুককে দেখেও এ সন্দেহ হয় নি তাঁর, ঝিনুক তাঁকে বলেও নি। তিনি জানেন ঝিনুকের চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের দৃষ্টির চেয়েও প্রখর। অন্ধকারেও সে দেখতে পায়। সুঠাম মুকুজ্যের কাছে কি দিয়ে ও চোখ দেখাতে গিয়েছিল কেন তবে? সুঠাম মুকুজ্যেও চোখে কোনও দোষ পান নি। তিনি খবর পেয়েছিলেন ও লোকটি এফ আর সি এস এবং এম আর সি পি। তা ছাড়া চোখের বিষয়েও একজন বিশেষজ্ঞ। জার্মানীর একটা ডিগ্রী আছে নাকি। তিনি যখন চোখের কোনও দোষ দেখতে পান নি, তখন দোষ নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ঝিনুক গিয়েছিল কেন? ও ঘুজ্‌ঘুজ্‌ করে গণেশ হালদারের কাছেও যায় মাঝে মাঝে। এখন সুঠাম ডাক্তারের কাছেও টোপ ফেলতে আরম্ভ করেছে নাকি। নাক মুখ কুঁচকে মুখের বীভৎস একটা চেহারা করে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।...

হঠাৎ দেখতে পেলেন গণেশ হালদার আসছে।

"আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। I was just thinking of you. বদন অমন প্রসন্ন কেন?"

"স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলাম!"

"তাই নাকি! হঠাৎ?"

"আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। সেটাতে গভর্নমেন্টের সমালোচনা ছিল। ছাপা প্যামফ্লেট তো আপনাকে একটা পাঠিয়েছিলাম। পান নি?"

"পেয়েছি। কিন্তু এখনও পড়া হয় নি। ডিসপেন্সারির টেবিলেই পড়ে আছে সেটা। কি লিখেছিলেন?"

"আমাদের উপর যে সব অত্যাচার অবিচার হচ্ছে তাই নিয়ে লিখেছিলাম। মুখে এঁরা বক্তৃতা দিচ্ছেন প্রাদেশিকতা উঠিয়ে দাও, কিন্তু কাজের বেলায় দেখছি প্রাদেশিকতারই ছড়াছড়ি। এ দেশের বাঙালী আর উর্দু-ভাষী ছেলেমেয়েদের জোর করে হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করছে! অথচ বক্তৃতা শুনুন—"

"আপনারও যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ভীমরুলের চাকে খোঁচা মারতে গেছেন! চোরা কি ধর্মের কাহিনী শোনে? Thieves have their own Logic and own religion! এর জন্যেই চাকরিটা গেল?"

"স্কুলের সেক্রেটারি তুলসীবাবু আমার প্রবন্ধ পড়ে আমাকে ধমকে চিঠি লিখেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে আমি ওরকম প্রবন্ধ না লিখি। আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম।"

"ফট্‌ করে ছেড়ে দিলেন? এখন করবেন কি?"

"সুঠামবাবু আমাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি করে বাহাল করে নিয়েছেন। আমার কোনও অসুবিধা হয় নি। ওঁর মতো মহৎ লোক আমি আর দেখি নি।"

ডাক্তার ঘোষালের মুখটা ঈষৎ ব্যাদিত হয়ে গেল। তিনি নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন গণেশ হালদারের মুখের দিকে।

(ক্রমশ)

অতি সহজেই ব্লামাঞ্জ তৈরী করতে

ব্রাউন এণ্ড পলসনের ফ্লেবার্ড কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করুন।

ব্রাউন এণ্ড পলসনের ফ্লেবার্ড কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে তৈরী সুস্বাদু ব্লামাঞ্জ বাড়ির সবাইকে খেতে দিন। মুখের মধ্যে এ চমৎকার মিলিয়ে যায়। সহজেই, সবসময়ে সুন্দর তৈরী হয়। হাল্কা, নরম, পুষ্টিকর, সুবাসিত ব্লামাঞ্জ প্রতিবার তৈরী হবে একই সাফল্য নিয়ে। ব্রাউন এণ্ড পলসনের ফ্লেবার্ড কর্নফ্লাওয়ারে তৈরী ব্লামাঞ্জ এমনিও চমৎকার, ফল বা জ্যামের সঙ্গেও খাওয়া যায়। পাঁচটি লোভনীয় সুগন্ধ থেকে বেছে নিতে পারেন···ষ্ট্রবেরী, র‍্যাশবেরী, পাইনাপেল, ভ্যানিলা, ক্যারামেল। প্রতি বাক্সে ৫ পাইণ্ট প্যাকেট থাকে।

Brown & Polson FLAVOURED CORNFLOUR for BLANCMANGE

কর্ণ প্রোডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

বিনামূল্যেঃ কুপনটি ভর্তী করুন আর ব্রাউন এণ্ড পলসনের ফ্লেবার্ড কর্নফ্লাওয়ার বা ক্যারাটিটি কাষ্টার্ড পাউডারের প্যাকেটের ভেতরকার পাঁচটি ব্যাগ পাঠিয়ে দিন। প্রস্তুত প্রণালী একটি অপূর্ব পুস্তিকা ইংরিজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, মালায়ালম, উর্দু, বাংলা বা মারাঠি যে কোনো ভাষায় পেতে পারবেন। (যে ভাষার দরকার নেই তা কেটে দিন)

শ্রী/শ্রীমতি ....

....

ঠিকানা ....

....

ডিপার্টমেন্ট নম্বর DSH-16

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

পোঃ বক্স ৯৯৪, বোম্বাই—১

কেবলমাত্র ভারতের মধ্যেই এ ঘোষণা কার্যকরী।

বধ

অসিত গুপ্ত

দীননাথ এবার বড়-ছেলেকে দেখতে বাড়ি যাবেই। যেতেই হবে তাকে। বাড়ির জন্যে প্রাণটা তার বড় আনচান করে। এত কাছে ধুবুলিয়া, তবু বছর তিনেক যাওয়া হয় নি। তাজ মহম্মদই যেতে দেয় নি তাকে। বলেছে, 'অবে তু ক্যা ভেড়ুয়া হৈ, বিবি-বাচ্চাকে পিছে অপ্‌না কাম ঔর জিন্দ্‌গী বরবাদ করেগা? কাম করো, রুপেয়া কামাও, পিও, মজেমে রহো। ছোড়ো উহ্‌ সব ধান্ধা।'

দীননাথ একবারের বেশী দু'বার আর বলতে পারে নি। চটাতে সাহস করে নি মনিবকে। বউ-ছেলের জন্যে হয়ত উসখুস করেছে, মন, তবু চিঠি লিখে খোঁজ নেওয়া ছাড়া, কলকাতা ছেড়ে, তাজ মহম্মদের গোলামী ছেড়ে যাওয়া হয়নি তার। কিন্তু এবার সে যাবে।

পাকিস্তান থেকে আসার পর দীননাথ কিছুদিন বাচ্চা সিং-এর মোটর গ্যারেজে 'ক্লীনারের' কাজ করেছিল। তারপর গ্যারেজটা উঠে যায়। তখন একটা কাজের জন্যে আতান্তরে পড়েছিল দীননাথ। বাচ্চা সিং-ই একদিন তাকে শেয়ালদার মোড়ে তাজ মহম্মদের সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, লোকটা সৎ, পারলে একটা কাজ-টাজ দিও।

ছ' ফুট লম্বা, কালো, ধুনো মোষের মত চেহারা তাজ মহম্মদের। চওড়া, ঢালু কাঁধ, শক্ত লোমশ হাতের ভেতর শিরাগুলো রবারের নলের মতো ঠেলে বেরুনো। বড় বড় চোখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি মরা-মরা। কঠিন মুখ, বাঁ ভুরুর ওপরেই একটা গভীর ক্ষতের দাগ। কপালের মাঝখানটায় দুটো স্থায়ী ভাঁজ। গোঁফ আছে, সেটা ধমকের ভঙ্গীতে পাকানো থাকে।

কলকাতার দু-তিনটে বাজারে মাংসের দোকান আছে তাজ মহম্মদের। তা ছাড়া, আরো কয়েকটা বাজারে সে পাঁঠা, খাসী কেটে সরবরাহ করে থাকে। রাজাবাজারের কাছে তার আস্তানা। সে-ও থাকে, তার জীবজন্তুরাও থাকে।

আর থাকে দীননাথ এবং রহিম বলে একটা লোক! ওরা দুজনই তাজ মহম্মদের কর্মচারী। ভেড়া, খাসী কাটে, ছাল ছাড়ায়, বাজারে বাজারে পেঁৗছে দিয়ে আসে।

কাজটা নেবার আগে দীননাথ ভেবেছিল। অনেক ভেবেছিল। আকাশ-পাতাল ভেবেছিল। বাঙালীর ছেলে হয়ে পাঁঠা-কাটা জল্লাদের কাজ করবে? কিন্তু না-করেই বা উপায় কি! আর চাকরি কোথায়! শেয়ালদা স্টেশনে তাঁবু খাটিয়ে, সরকারী ডোল-এর ভরসায় বেঁচে থাকতে ইচ্ছে ছিল না তার। তিন রাত্তির ধরে ভাবতে ভাবতে চতুর্থ দিন সকালে দীননাথ তার মুখভর্তি কালো দাড়ির মাঝে বেশ কয়েকটা সাদা দাড়ি আবিষ্কার করেছিল।

কাউকে কিছু না-জানিয়ে সেদিনই সে কাজটা চুপিচুপি নিয়ে নেয়। তারপর বউ আর ছেলে-মেয়েকে রেখে আসে ধুবুলিয়ায়, তার পিসতুতো ভাই নিরাপদ'র আশ্রয়ে। মাস-মাস টাকা পাঠাত আর বড় বড় করে, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে বউকে চিঠি লিখত, 'ঠিকমত থাকবা। আমি এইবার আইয়া পড়ত্যাছি।' কিন্তু দীননাথের যাওয়া হয়নি।

তাজমহম্মদের কাছে যখনি সে তার আর্জি পেশ করেছে তখনি লোকটা খুশিতে বসে তার সেই অস্বস্তিকর, নির্বোধ দৃষ্টি দিয়ে লেহন করেছে দীননাথকে। তার হাঁটু-কাটা লুঙ্গিটা থাই পর্যন্ত গোটানো। গোড়ালির ওপর থেকে উন্মোচিত অংশ অবধি কালো লোমে ঠাসা। দীননাথের অনেক সময় মনে হয়েছে ওই রোমশ আশ্রয়ে বড় বড় পোকা-মাকড় বেশ নির্বিঘ্নেই প্রতিপালিত হতে পারে।

কথাটা ভাবতেই হাসি পেয়েছে তার। সে মুখ ঘুরিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাজ মহম্মদের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। মরা-মরা চোখটা থেকেই তখন একটা

চাপা আস্ফালন ফুটে বেরিয়েছে। চাঁছা-পোঁছা গলায় চিৎকার করে বলেছে, 'ক্যা বে তু হম্ পর হ'সী উড়াতা হৈ? মারুংগা এক ঝাঁপড়—' বলেই তার বাঁ হাতটা উল্টো করে একবার শূন্যে ঘুরিয়ে এনেছে।

তখন দীননাথ দ্বিতীয়বার বাড়ি যাবার নাম উচ্চারণ করতে পারে নি। তার শীর্ণ পাকানো শরীরটা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেঁচেছে সে।

কখনো মন ভাল থাকলে প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে তার পান-খাওয়া বড় বড় কালো দাঁত বার করে হেসেছে তাজ মহম্মদ, বলেছে, 'জায়েগা, জায়েগা, জরুর জায়েগা। আগ্‌লে সাল জায়েগা। হম্ তুমকো রুপেয়া দুংগা, জরুকে লিয়ে জোসন লে জায়েগা।' বলেই খড়মে খট্ খট্ শব্দ তুলে কয়েকটা পাঠার পেছনে তেড়ে গেছে, 'হুর-র্, আঃ, আঃ'!

প্রথম প্রথম কাজ করতে খুব কষ্ট হতো দীননাথের। ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত দম ফেলবার সময় পেত না যেন। দারুণ ঘেন্না করত। গন্ধে টেঁকা যেত না। নাড়ীর ভেতর পাক ধরে বমি উঠে আসতে চাইত।

একদিন তো তাজ মহম্মদের গায়েই বমি করে ফেলেছিল আর কি! ফাটা উঠোনের লাগোয়া টিনের ঘর থেকে পাঠাগুলোকে বার করে গুনতে বলেছিল তাজ মহম্মদ। নিজে পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

দীননাথ গুনছিল। কাঠের বাতা-দেওয়া লোহার জাল-লাগানো দরজাটাকে আধ-ভেজানো রেখে ছটফটে জন্তুগুলোকে এক এক করে গুনছিল আর ছুরি দিয়ে দিয়ে গায়ের খানিক লোম তুলে চিহ্ন করছিল।

একটা বোট্‌কা গন্ধ এসে ঢুকছিল নাকে। প্রথমে তার বোধটা অল্প। তারপর সেটা বাড়তে বাড়তে দীননাথের সামনের বায়ু-স্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। দীননাথের মনে হলো, জন্মের পর থেকেই যেন সে এই গন্ধ পেয়ে আসছে। এটাই স্বাভাবিক গন্ধ পৃথিবীর। পেটের ভেতর খামচাতে থাকল, পাক লাগল নাড়ীতে নাড়ীতে। একটা রুদ্ধ ঘৃণা এবং অভক্তি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বুক দিয়ে ঠেলে গলার কাছ-পানে উঠতে লাগল।

দীননাথ বার দুয়েক বমি সামলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফল হলো না। বমির বেগটা থামলেও খানিকটা টক্-টক্ জল জিবের গোড়ায় এসে পড়েছিল। দীন-নাথ 'থুঃ-থুঃ' করে থুথু ফেলল। সেই থুথু গিয়ে পড়ল তাজ মহম্মদের বাঁ হাতে। মাখামাখি হয়ে গেল হাতময়, হাতের কালো কালো লোমে আটকে রইল সাবানের ফেনার মতো।

তাজ মহম্মদ 'য়েঃ য়েঃ' বলে চোখ-মুখ কুঁচকে সরে গেল তফাতে। আর দীননাথ নির্বোধ পশুর মতো তাকিয়ে রইল। যেন ওই ভয়চকিত দৃষ্টিক্ষেপ ছাড়া জগতের কোন আয়োজনেই অধিকার নেই তার।

'শালা বেতমিজ' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল তাজ মহম্মদ।

দীননাথ তবু দাঁড়িয়েই রইল। নির্বাক করুণাপ্রার্থীর মতো।

'আঁখ ফাড়কে ক্যা দেখ্‌তা হৈ বে, লা পানী লা।' আবার ধমকালো তাজ মহম্মদ।

দীননাথ গুটিগুটি প্রহৃত জন্তুর মতো নিজের শরীরটাকে চৌবাচ্চা অবধি বহন করে নিয়ে গেল। ছোট্ট একটা বালতি করে জল নিয়ে তাজ মহম্মদের কাছে এসে থামল, কিন্তু সাহস করে তার চোখে চোখ রাখতে পারল না।

'লাগা পানী লাগা' দীননাথের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল তাজ মহম্মদ। দীননাথ ভয় পেয়ে কয়েক পা হটে গেল, তারপর আস্তে আস্তে ওর বাঁ হাতের উপর জল

চালাতে লাগল। সে দেখল, জলের শক্তিতে তাজ মহম্মদের হাতের ব্যগ্র লোমগুলো একটি কামনার পরিতৃপ্তির মতো ওর সংগে শুয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

'আইন্দা অ্যায়সা করে গা তো তেরে জবান খিঁচ লুংগা।' নিচু হয়ে হাত ধুতে ধুতে অনেকটা আত্মগতভাবে বলল তাজ মহম্মদ। নিজেই বুঝল, তার বাক্যে উপযুক্ত জোর রইল না, যেন প্রাচীন বাড়ির নোনা-ধরা দেওয়াল থেকে বালি খসে পড়ল খানিকটা।

ক্রমে ক্রমে সব সহ্য হয়ে গেছে। দীননাথ রাত থাকতে উঠে জন্তুগুলির সেবায় লাগত। চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে তুলে তাদের চান করাতো, তাদের মল-মূত্র ঝাঁটা দিয়ে সাফ করত তারপর যে-পাঁঠাগুলোকে কাটা হবে সেগুলোকে আলাদা করে বেছে খোঁটায় দাঁড় দিয়ে বেঁধে রাখত। সাতটা বাজলে তাজ মহম্মদ চোখ-ভর্তি পিঁচুটি নিয়ে খুরশিতে এসে বসত। মোড়ের দোকানটা থেকে হাফ-প্যান্ট-পরা একটা হলদেটে ছোকরা এসে এক গেলাস চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুট রেখে যেত ওর পাশে।

কোনদিন রহিম কাটত আর দীননাথ ছাল ছাড়াত। কোনদিন এর উল্টোটা। প্রথম যেদিন ফিনকি দিয়ে খানিক গরম রক্ত এসে ছিটকে পড়েছিল দীননাথের মুখে, কপালে সেদিন সে ভয় পেয়েছিল। ভীষণ ভয়। একটা গভীর অপরাধবোধ ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ধুপ-ধুপ শব্দে দুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাত্রিবেলা খোলা বারান্দায়, খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে দীননাথ আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সাদা তারা আর জ্যোতির্ময় চাঁদের দিকে। তাকাতে তাকাতে নিজেকে খুব ক্ষুদ্র এবং ক্ষমতাহীন মনে হয়েছিল তার। আস্তে আস্তে গোপন প্রার্থনার ভংগীতে সে বলেছিল, 'দোহাই ভগবান, তুমি আমার দোষ দিবা না, আমি ছোট ছাওয়ালের মতই অক্ষম। আমি গুলাম। আমাগোর মনিবের দাস।'

তারপর থেকে দীননাথের আর কোন বোধ ছিল না। আর কোন বোধ ছিল না।

শীতকালে দীননাথ বারান্দায় শুতে পারত না। খাটিয়া নিয়ে ওই টিনের ঘরে, ছাগল-পাঁঠাদের সংগেই শুত। তাতে গরম হতো বেশ, গায়ে কিছু না-দিলেও চলত। একটু গন্ধ আসত নাকে, তা হোক, তবু নিশ্চিন্তে শোওয়া যেত। তাজ মহম্মদের উপদ্রবে ঘুম ভেঙে যাবার আশংকা ছিল না।

শীতকাল হলেই তাজ মহম্মদের চেহারা বদলে যেত যেন। রাত্তির দশটার পর থেকেই মদ খেতে শুরু করত সে। ঘরের বিজলী আলো নিবিয়ে দিয়ে একটা বড় মোমবাতি জ্বালাত। রহিম পুরো দুটো বাংলা মদের বোতল রেখে আসত আর একটা অ্যালুমিনিয়াম-এর ডিশ-এ কিছু শামী কাবাব, শিক কাবাব আর গোটা গোটা খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ কয়েকটা। তারপরই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিত তাজ মহম্মদ। প্রথমে একটা বিড়ি ধরিয়ে চোখ বুজে পর পর টানত আর একটু একটু করে মদ ঢালত গলায়।

মদের নেশাটা খানিক চারিয়ে গেলে মাদুর ছেড়ে উঠে পড়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াত। গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলত একটা একটা করে। তারপর সারারাত ধরে উলঙ্গ হয়ে পায়চারি করত আর বোতল থেকে মদ ঢালত গলায়। থেকে থেকে চীৎকার করে উঠত আর অ্যালুমিনিয়াম-এর ডিশ থেকে

খাবারগুলো খেত পৈশাচিক তৃপ্তিতে। ভোরের দিকে আপনা থেকেই ক্লান্তি আসত তখন শুয়ে পড়ত মাদুরে। তেমনি উলঙ্গ ভাবেই।

জানলার দুটো বড় খোলা ছিল। ভোর হলে রহিম সেই জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে ওর শরীরে লুঙ্গিটা জড়িয়ে দিত আর মেজেতে গড়াগড়ি-যাওয়া খালি মদের বোতল, শূন্য খাবারের পাত্র, পেঁয়াজের টুকরো তুলে নিয়ে আসত।

শীতকালে দশটার সময় ঘুম থেকে উঠত তাজ মহম্মদ। তখন মেজাজটা খুব প্রসন্ন থাকত। সমস্ত পৃথিবীটাকে দেখত যেন পিতৃতুল্য উদারতায়। সন্তানকে অবাধ প্রশ্রয় দেওয়ার মতো, মানুষ থেকে ছাগল, ভেড়ার ওপর তার সহাস্য স্নেহধারা বিগলিত হতে চাইত।

'ক্যা বে দীনুয়া, তুহার মিজাজ কৈসা ছে?' খামখা একটা অনাবশ্যক প্রশ্ন করে খকখক করে হাসত।

চায়ের দোকানের হাফ-প্যান্ট পরা হলদেটে ছোকরাটা চা নিয়ে এলেই তার হাত ধরে রসিকতা করত তাজ মহম্মদ। দীননাথের মনে হতো যেন একটা কাকলাস একটা পতঙ্গকে ধরে ফেলে মজা পাচ্ছে। ছেলেটা ছটফট করে উঠত, তারপর নিজেকে তার বেষ্টন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগাল দিতে দিতে চলে যেত। তাজ মহম্মদ হাসত অপরিমিত কৌতুকে।

দীননাথ একদিন ছুটি চাইল। এই শীতকালের এক সকালে। তাজ মহম্মদের প্রসন্নতার সুযোগে।

শুনে তাজ মহম্মদ কিছুক্ষণ ভুরু পাকিয়ে তাকিয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ পিতৃতুল্য হাসি হেসে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা যাও। ঘরকে লিয়ে তুমহারা দিল বহুত বেচৈন হুয়া হৈ—যাও, যাও' বলেই শেষে মুখ দিয়ে চুক্-চুক্ করে একটা শব্দ করল। জন্তুদের আদর করবার মতো করে।

'লেকিন জলদি ওয়াপস আ-না, দো-তিন রোজকে অন্দর'। দীননাথ নির্বোধ চোখ মেলে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল। তারপর তাজ মহম্মদ লুঙ্গির টাঁক থেকে কতকগুলো দলা-পাকানো, দোমড়ানো নোট বার করে তার থেকে গুণে গুণে আটটা টাকা তুলে দিল দীননাথের হাতে।

'বাচ্চেলোগকে লিয়ে মিঠাই লে জায়েগা—ঠিক হৈ?' দীননাথ বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু একটু কৃতার্থের হাসি হাসল।

তারপর শেয়ালদা থেকে বিকেল পাঁচটার ট্রেনে চাপল দীননাথ। স্টেশনের ভীড়, গোলমাল কাটিয়ে ট্রেনটা যখন শীতের বিকেলের ঝাপসা আলোয় উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হু হু করে ছুটতে আরম্ভ করল, তখন থার্ড ক্লাস কামরার এক কোণে, একটা জানলার ধারে বসে বসে দীননাথ ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মনে হলো, বাইরের এই নিশ্চুপ প্রকৃতি তার ভেতরের সব ইচ্ছেকে শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে একটা গাঢ় ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতার আবরণে ঢেকে নিচ্ছে তাকে। বেলা পড়ে এলে আলোর উৎসাহকে যেমন করে ঢেকে দেয় অন্ধকার।

দীননাথের কাছে এই অনুভূতিটা নতুন ঠেকল। তার কাছে তখন আর কিছুই সত্যি ঠেকল না। তাজ মহম্মদের গুলামীও না, স্ত্রী-পুত্র-ঘরের আকর্ষণও না। মনটা তার একখণ্ড বাতাসের মতো ভাসতে লাগল।

দীননাথ যখন স্টেশনে পা দিল, তখন আকাশের তারাগুলো জড়সড় হয়ে ঘোলাটে চোখ করে তাকিয়ে রয়েছে। স্টেশনের বাতি-গুলো লাল-চোখে ঝিমুচ্ছে যেন। আর মানুষগুলো শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে প্রায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ফিসফাস করে এদিক-ওদিক [illegible]

নেই, উত্তেজনা নেই, অস্থিরতা নেই—আশ্চর্য এক মৌনতা যেন সমস্ত চরাচরকে ঘিরে স্নেহের মতো ছড়িয়ে হয়েছে,—মনে হলো দীননাথের।

কোথায় পেঁৗছল সে, আহা, কোথায় পেঁৗছল! এখানে তার শরীরের রক্তে রক্তে জ্বালা ধরছে না। দপদপ করছে না শিরা। কোন উত্তেজনা বুকের মাঝে অনবরত চিনচিন করছে না। তার সকল বোধকে ঘিরে এক অনাস্বাদিত স্থির শীতলতা আবৃত হয়ে রয়েছে।

দীননাথ বাইরের ঠাণ্ডাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে গায়ের চাদরটাকে মাথার ওপর দিয়ে ঘোমটার মতো করে ঢেকে দিল। তারপর ডান হাত দিয়ে টিনের স্যুটকেসটাকে আঁকড়ে ধরে স্টেশনকে পেছনে ফেলে আস্তে আস্তে অন্ধকারময় পথের দিকে এগোতে থাকল। যেখানে বড় বড় গাছগুলো এখন কোন অচেনা রাজ্যের প্রবেশ পথে যেন প্রহরীর মতো নিঃসাড়ে জেগে রয়েছে।

দীননাথ একবার হাত তুলল। পাঁঠা জবাই করার সময় যেমন করে হাতটাকে শূন্যে তোলে। কিন্তু কি আশ্চর্য হাল্কা তার হাত! ফুরফুরে হাওয়ার মতো হালকা!

কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল তার।

অবশেষে দীননাথ পেঁৗছে গেল তার গৃহে। গৃহ! কথাটা ভাবতেই যে পুলক-সঞ্চার হবে ভেবেছিল, তা হলো না। অথচ গত তিন বছর ধরে এই গৃহের কথায় মন তার কত টাটিয়েছে।

দীননাথ বন্ধ দরজার সামনে এসে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল। জানলার ফাঁক দিয়ে একটুকরো আলো যেন অবাধ্য ছেলের মতো বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছে।

দীননাথ স্যুটকেসটা নামিয়ে আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিল। এত আস্তে যেন কেউ দরজা না-খুললেও তার কোন আফশোস থাকবে না।

তবু দরজাটা খুলে গেল। নিরাপদই খুলল। আনন্দে আটখানা হয়ে সে শোরগোল তুলল। তখন তাকে ঘিরে কয়েকটি প্রাণী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন সে অন্য কোন জগতের মানুষ, অন্য জাতের।

দীননাথ বউয়ের দিকে তাকিয়ে ম্লান করে হাসল।

'শ্যাষমেষ আইয়াই পড়লা!' রুগ্ন বউটি একটু মুগ্ধ গলায় বলল।

দীননাথ উত্তর দিল না। হাসল।

ছেলে-মেয়ে দুটো প্রথমে তার কাছে ঘেঁষছিল না। দীননাথ স্যুটকেস খুলে শেয়ালদার বাজার থেকে কেনা দুটো সস্তা, গোলাপী রঙের খেলনা আর মিষ্টি তাদের হাতে তুলে দিল। তারা সেগুলো নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে 'বাবার আইছে, বাবার আইছে' বলে কলরব করতে লাগল। কলরব-টুকু দীননাথের ভাল লাগছিল।

দশটার মধ্যে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল দীননাথ। নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীননাথ ভাবতে লাগল কিসের যেন একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো তার বুকে খচ্‌খচ করে বাজছে। ঘরটা অন্ধকার এবং অস্বাভাবিকরকম শান্ত। ওপাশের বিছানায় মশারির ভেতর থেকে নিরাপদ আর তার বউয়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। বাইরে কখনো কখনো কুকুর ডেকে যাচ্ছে। না, ট্রাম, বাস, গাড়ি এবং নিশাচর মানুষদের কোন আওয়াজ আসছে না। দীননাথ প্রায় অজ্ঞাতসারে তার সম্মুখবর্তী বায়ুস্তরকে লক্ষ্য করে নাক টানল। কিন্তু কোনই গন্ধ এল না।

একটু পরে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দীননাথের স্ত্রী শুতে এল তার পাশে। মশারিটা তুলে ঢুকে তার গা-ঘেঁষেই শুয়ে পড়ল প্রায়। দীননাথের শরীরে তার শরীরটা কখনো কখনো ছুঁয়ে রইল।

দীননাথ আরেকবার নাক টানল, তার বউয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। একটা ভ্যাপসা এবং জুরো-জুরো গন্ধ তার ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিত হয়ে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। দীননাথ মনে করতে চেষ্টা করল, এমন গন্ধ সে আগে কোথায় পেয়েছে। তার মনে পড়ল, অনেক আগে যখন সে এদেশে আসে নি, যখন তাজ মহম্মদের চাকরি সে করত না, তখন তার মার কাপড়ে, খালি বুকের মাঝখানটায় এরকম গন্ধ ভাসত। আহা, এরকম গন্ধ ভাসত!

দীননাথ তার পুরনো অবস্থাকে আয়ত্ত করতে পেরেছে এই ভেবে স্বস্তি পেতে চাইল। কিন্তু তবু তার বুকের অস্থিরতা এতটুকু কম না। একবার করে সেটা হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে যায়, তারপর দ্বিগুণ শক্তিতে ফিরে এসে দুপদাপ শব্দে হেঁটে বেড়ায়। দীননাথ বিছানায় ছটফট করতে থাকে। নিজেকে তার এখানে আগন্তুক মনে হয়, অনধিকারী আগন্তুক।

একটু পরে দীননাথের বউ কোনও অভিলাষে তার কাছ-ঘেঁষে আসে আরেকটু। ফিসফিস করে বলে, 'কিগো, কথা কও না ক্যান?'

'ভাবত্যাছি।' উত্তর করে দীননাথ।

'এতদিন পরে আইয়াও কি ভাব অত?'

দীননাথ জবাব দেয় না।

'শরীর মন্দ কয় না কি?' আবার জিগ্যেস করে দীননাথের বউ।

'হ। পরানডা ক্যামন যেন অস্থির-অস্থির করত্যাছে।'

'খাওয়াড়া জুতের হয় নাই বোধ হয়।'

দীননাথ আর কোন কথা বলে না। অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে চুপ করে জেগে থাকে। তার বউ অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা আশায় আশায় জেগে রইল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

অনেক [illegible] দীননাথ তার বউকে ঠেলে ডাকল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে।

'কি হইছে?'

'আমি একবার কলঘরে যামু।'

দীননাথ নীরবে বউয়ের পিছু পিছু বিছানা ছেড়ে ওঠে। অপেক্ষমান অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা ভেদ করে বাইরে, উঠোনে নেমে আসে। বাইরের ঠান্ডা তাকে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে। মাথার ওপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। তখনো গুটিসুটি মেরে রয়েছে তারাগুলো। চাঁদকে দেখাচ্ছে শীর্ণ এবং হীনপ্রভ।

দীননাথ চটের ছেঁড়া পর্দাটা ঠেলে কলতলায় ঢোকে। তার বউয়ের ঘুম-জড়ানো চোখে রাজ্যের বিস্ময়। দীননাথ নর্দমাটার সামনে দাঁড়ায়। কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করে। তারপর শরীরটাকে খানিক ঝুঁকিয়ে, দু-হাঁটুর ওপর দু' হাত রেখে হড়হড় করে বমি করতে থাকে।

চিত্রপ্রদর্শনী

কল্পনা এবং তাকে মূর্ত করে তোলায় রঙ, রেখা ও বিন্যাসে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য শিল্পদক্ষতা ফুটিয়ে মনের ওপর একটা স্থায়ী ছাপ ধরিয়ে দেবার মতো কাজ ইদানীং বড়ো কমে আসছে। আর তাই গত ৫ই সেপ্টেম্বর আলিয়াঁস ফ্রাঁসে দ কালকুতায় উদ্বোধিত চারজন চিত্রশিল্পী এবং একজন ভাস্কর্যের কাজের প্রদর্শনীটি কতকাংশে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পড়ে।

চিত্রকর চারজন হচ্ছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, সজল রায় ও যোগেন চৌধুরী এবং ভাস্কর সুবলচন্দ্র সাহা। এ'রা সকলেই কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে পাস করা কৃতি ছাত্র এবং এ'দের কাজের প্রদর্শনী ইতি-পূর্বেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচজনেই ফাইন আর্ট আকাদমি অন্তর্ভুক্ত স্টুডিও গ্রুপের সদস্য এবং একসঙ্গে কাজ করে গেলেও প্রত্যেকেই একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী রক্ষা ও সম্পূর্ণ করে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ছখানি ছবির প্রত্যেকখানিরই বিষয়বস্তু আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত দৃশ্য। ধোপিখানা, স্কিপিং, ঘুড়ি নির্মাণ, শহরের এক অংশ প্রভৃতি সাধারণ দৃশ্যও তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও বিন্যাস-গুণে দর্শকদৃষ্টিতে একটা ভিন্নতর বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত করে তোলে। রেখা ও রঙের প্রয়োগে তিনি কতকাংশে পটের ধারা অনুসরণ করেও তার মধ্যে একটা নিজস্বতাকে পরিস্ফুট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'মানুষ ও তার বাইরের চেহারা' ছবিখানিতে শিল্পী চিন্তাকে গভীরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। মুখ্যত সবুজ, হলদে এবং নীল রঙের প্রয়োগে শিল্পী তাঁর ছবি-গুলির বক্তব্যকে নিবিড় করে তুলেছেন।

সুবীর সেনের দুখানি ছবিতে বিমূর্ত ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করা গেল। বিষয়বস্তু অনুসারে সরল, বক্র ও গোলাকার রেখার সমাবেশে আঁকা ছবিগুলির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য প্রথমদৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। কিছুক্ষণ দেখার পর তবে তার একটা অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। রঙের দিক থেকেও নির্বাচন ও প্রয়োগে অতিমাত্রায় উজ্জ্বল ক'রে তোলার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

সজল রায়ের সাতখানি ছবির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর শিল্পমেজাজের রকমারিতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর আঁকা 'জীবন সংগ্রাম', 'আমি মরতে চাইনা', 'সংকল্প', 'চাঁদ ও বিধবা নারী' ছবি কখানি বাস্তব জীবনে যে সব ঘটনা আমাদের মনকে আবেগে ভরিয়ে দেয় তারই প্রতিচ্ছবি রঙে ও রেখায় বিভূষিত করে তিনি উপস্থিত করেছেন। রঙ ও রেখার দিক থেকে তিনি কোন বিশেষ একটি ধারার অনুসরণের যে পক্ষপাতী নন সেটা স্পষ্ট-ভাবে বোঝা গেল। এখনও তিনি পরীক্ষা করেই চলেছেন। ছবিগুলির অধিকাংশে একটা অতি-নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস সত্ত্বেও শিল্পীর বলিষ্ঠ চিন্তার সঙ্গে বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রতিভার ছাপ দেয়।

বিমূর্ত ধারার ছবির দিক থেকে যোগেন চৌধুরীর ছখানি ছবিতে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণ বিশেষভাবে দৃষ্টিতে পড়ে। তাঁর 'ঘোড়া ও সওয়ার;' 'আঁধার প্রকোষ্ঠের রাজা',

অবতল ও উত্তল   শিল্পী : সুবল সাহা

জীবনের বাইরে জীবন   শিল্পী : সুবীর সেন

চাঁদ ও বিধবা   শিল্পী : সজল রায়

'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি ছবিগুলির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর নির্বাচনেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবুও তুলির টান এবং রঙের প্রয়োগে মনে ছাপ দেবার শিল্পদক্ষতার তিনি অধিকারি। বিশেষভাবে কয়েকখানি স্কেচে তাঁর কৃতিত্ব দেখা যায়।

সুবলচন্দ্র সাহার আটটি ভাস্কর্যের কাজ শিল্পরসিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাথরে খোদাই ছাড়া পোড়ামাটির মূর্তি গড়ার কাজেও তাঁর সমান দক্ষতা। 'খেলা,' 'গালগল্প,' 'কুম্ভসহনারী,' 'বেহালা বাদক' 'ও টুটু'র মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্য ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেও তিনি একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। 'অবতল ও উত্তল-...১' এবং 'অবতল ও উত্তল-২' কাজ দুটিতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিমূর্ত ধারার প্রভাব দেখা যায়। তবে সরলভাবে ভাবময় প্রতিমূর্তি গড়ে তোলায় শিল্পীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

*

ইন্ডো কণ্টিনেণ্টাল আর্টিস্ট-এর উদ্যোগে তিনজন শিল্পীর একটি প্রদর্শনী গত ২রা সেপ্টেম্বর উদ্বোধিত হয় সাকুলার রোডস্থ পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের ইনফরমেশন সেণ্টার হলে। সপ্তাহব্যাপি প্রদর্শনীটিতে মোট তিরাশীখানি ছবি একটা ভিড় বিশেষ বলেই মনে হয়। খুঁটিয়ে দেখা বেশ ক্লান্তিকর।

শিল্পী তিনজনের মধ্যে শশাঙ্ক শেঠ ও চন্দন মালাকার সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সন্তোষ দাশগুপ্ত পেশায় বৈজ্ঞানিক কিন্তু শিল্পচর্চা তাঁর একটি নেশা।

চন্দন মালাকারের ছবির একটি একক প্রদর্শনী কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে তাঁর যে আঠারোটি কাজ অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবনের কাজ থাকলেও ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হয়নি এমন ছবিই সবকখানি। পেন্সিল ও কালি-কলমে স্কেচ এবং তেলরঙ ও জলরঙের নানা বিষয়-বস্তু অবলম্বন করেছেন তিনি। সেদিক থেকে বৈচিত্র্য আছে। তবে শিল্পচিন্তার দিক থেকে এবং কৃতিত্বের বিচারে এখনও শিক্ষার্থী পর্যায়েই তিনি রয়েছেন। অবশ্য এটা অনুভব করা যায় যে নিজস্ব একটা শিল্পভঙ্গী আয়ত্বে আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছেন। 'স্কেচ'-এ এ'র হাত বেশ ভাল।

শশাঙ্ক শেঠের তেত্রিশখানি ছবির মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে রকমারিতা যেমন আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন মাধ্যমের প্রয়োগ। তাঁর তেলরঙা, জলরঙা ছবি ও স্কেচে 'ওরিয়েণ্টাল' ধারার অনুসরণ যেমন দেখা যায় তেমনি অনেকগুলি কাজে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধারার প্রভাবও পরিস্ফুট দেখা যায়। আঁকার হাতটি এ'র ভাল। তেলরঙে 'নগ্ন' ছবিখানি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেয়। "ফুল ও মেয়ে," "মেয়ে ও পাখি," "মা ও সন্তান," "প্রেমপত্র" প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলায় একটা যত্ন চেষ্টা ও মেজাজ পাওয়া যায়।

সন্তোষ দাশগুপ্তের ছবি হচ্ছে না-এ'কে কাঁচির সাহায্যে কাগজ কেটে কালো জমির ওপর সেঁটে তৈরী এক একটি বিশেষ ভঙ্গীর মূর্তি। এই রীতিতে তৈরী তাঁর তেইশটি কাজে বেশ কৃতিত্ব দেখা যায় যা এই ধরণের না-আঁকা চিত্রসৃষ্টিতে অনেককে অনুপ্রাণিত করবে। জলরঙে আঁকা তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দশখানিতে কিন্তু ছাত্র পর্যায়ের বেশী কৃতিত্ব পাওয়া গেল না।

ইন্ডো-কন্টিনেন্টাল আর্টিস্ট সংস্থার এই উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। শিক্ষার্থী পর্যায়ের শিল্পীদের অনুশীলন ও পরীক্ষার দৃষ্টান্ত দেখার সুযোগ এতে পাওয়া গেল।

বিশ্ববিচিত্রা

মোরগ লড়াইয়ের প্রতি ঝোঁক

আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই গ্রাম্য মেলায় মোরগ-লড়াই দেখা যায়। এই নিয়ে বাজি ধরাও হয়। শুধু আমাদের দেশই নয়, পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই মোরগ-লড়াই একটা আমোদ অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত। আবার আমেরিকার মতো এমন দেশও আছে যেখানে মোরগ-লড়াই অবৈধ।

অবৈধ হলেও উত্তেজনা-প্রিয় লোকের অভাব হয় না এবং তারা অবৈধ গোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যও প্রচুর প্রবেশমূল্য দিতেও পিছপা নন। নিউ ইয়র্কে, উত্তেজনাপ্রিয় ধনী মহিলারা অবৈধ মোরগ-লড়াই দেখার জন্য তিনশত টাকা প্রবেশমূল্য দিতেও এতটুকু ইতস্তত করেন না। এই সব মোরগ-লড়াইয়ের উদ্যোক্তা হচ্ছে কিউবার অধিবাসীরা। তার কারণ, কিউবাতে মোরগ-লড়াই একটা জাতীয় প্রমোদ বলে পরিগণিত। নিউ ইয়র্কের বিলাসপ্রিয় অধিবাসীদের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে অত্যন্ত গোপনে এইসব লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। ঘরের মেঝের ওপর থেকে কার্পেট গুটিয়ে করাতগুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় আর দর্শকদের দাঁড়াবার প্রতি ইঞ্চি স্থান প্রভূত মূল্যে বিক্রী করা হয়।

প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে বাজি ধরার জন্য সকলে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে। একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যক্তিগতভাবে চার হাজার টাকা পর্যন্তও বাজি ধরতে দেখা যায়। সোসাইটি মেয়েদের অনেকে তাদের পরিচ্ছদ পর্যন্ত বাজি ধরে। বাজিতে অধিকাংশ পরিচ্ছদ হেরে গিয়ে শেষে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য তাদের কোন দয়ালু গাড়ির মালিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই নতুন প্রমোদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি দেখে আমেরিকার পশু-ক্লেশ নিবারণী সমিতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

কোন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিস ব্রুকলীন শহরে একটি ফ্ল্যাট ঘেরাও করে বত্রিশটি মোরগ পাখি এবং মোরগ-লড়াইয়ের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অপরাধে বিরাশীজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

ওদেশে একটা চ্যাম্পিয়ন মোরগের দাম দু' হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। কিন্তু সত্যি-কারের যোদ্ধা মোরগ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার রেকর্ড যার ভাল তার দাম ওর দ্বিগুণও ওঠে।

জার্মানীর অগস্বুর্গের এক উদ্ভাবক একটি 'ব্রিফ কেস বিছানা' নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন যেটি লাগেজ র‍্যাকে আটকে আরামে নিদ্রার ব্যবস্থা করা যায়। এই 'ব্রিফ কেস বিছানা' ট্রেনে যেতে ঘুমাবার জন্য বার্থ রিজার্ভের সমস্যা দূর করে দেবে—যাত্রীরা কেমন আরামে ঘুমিয়ে নিতে পারে ছবিখানি দেখলেই তা বোঝা যায়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যেও মোরগ-লড়াই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ইংলণ্ডেও ছ শতাব্দী ধরে এই প্রমোদ প্রভূত জনপ্রিয় হয়। গ্রেজ ইনে মোরগ লড়াইয়ের মঞ্চকে বৃত্তাকারে ঘেরা দর্শকদের বসার বেঞ্চ থাকতো। দুবার, ১৩৬৫ ও ১৬৫৪ সালে, এই লড়াই বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং শেষে ১৮৪৯ সালে একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলেও আজো মাঝে মাঝে পুলিসকে মোরগ-লড়াইয়ের গোপন আস্তায় হামলা করার খবর শোনা যায়।

শিরার মধ্যে দিয়ে বুলেটের যাত্রা

বাহান্ন বছর বয়স্ক আইভান মালি-নোওয়াস্কি কিছুদিন আগে তার মুদীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ একটা বুলেট এসে ওর পায়ে লাগে। দোকানের ক্যাশ লুট করার মতলবে কোন দুর্বৃত্তের কাণ্ড। বুলেটটা ওর ডান পায়ের জানুর ভিতর দিকে বিদ্ধ হয়। প্রথমেই একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধ করার পর তিনি একটা পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা অনুভব করেন যা সারাদেহে যেন চরে বেড়াতে থাকে।

ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি হবার দুদিন পর ডাক্তাররা বুলেটটিকে ওর হৃদপিণ্ডে অবস্থান করতে দেখেন। সেটি বের করার জন্য অস্ত্রোপচার করা হয় এবং এখন মালিনোওয়াস্কী সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তারদের অভিমত হচ্ছে মালিনোওয়াস্কীর হৃদপিণ্ডে বুলেটটির পৌঁছানোর মতো ঘটনা অত্যন্ত দুর্লভ।

মালিনোওয়াস্কী যে জ্বালা অনুভব করেন, ডাক্তাররা বলেন, "সেটা ঘটে বুলেটটি ওর শিরার মধ্যে দিয়ে হৃদপিণ্ডে পৌঁছানোর দরুণ।"

প্রথমে মালিনোওয়াস্কীর জানুতে অস্ত্রোপচার করা হয়, কিন্তু বুলেট পাওয়া যায়নি। শেষে ডাক্তাররা ওর বুকের এক্স-রে নিতে হৃদপিণ্ডের ডানদিকের রন্ধ্রে অবস্থান করতে দেখা যায়।

বুলেটটি জানুতে লেগে শিরায় প্রবিষ্ট হয় এবং তারপর রক্তের গতির সঙ্গে ওপর দিকে ঠেলে ওঠে। শেষে হৃদপিণ্ডে পৌঁছে প্রকোষ্ঠে থেকে যায়।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে হৃদপিণ্ডে অবস্থান-হেতু বা জানু থেকে হৃদপিণ্ডে পৌঁছতে কোন ক্ষতি ঘটায়নি।

ট্রামে বাসে

সেইদিন ট্রামে চড়িয়াই কলিকাতা ছাত্র-পুলিসের খণ্ডযুদ্ধে ট্রাম পোড়ানোর কথা মনে পড়িল। শুনিলাম ট্রামের ক্ষতি হইয়াছে আট লক্ষ টাকার মত। ক্ষতিটা কোম্পানির। আমাদের শুধু নাক কাটা গেল। তা যাক, অন্যের যাত্রাভঙ্গে নিজের নাক কাটার ঐতিহ্য আমাদের বহুদিনের। খুড়ো মনে করাইয়া দিলেন, রামায়ণের একটি প্রচলিত গল্প—"লংকা দহনের আগুন যখন আর নিবছে না, তখন নিরুপায় হয়ে হনুমান ল্যাজের আগুন মুখে পুরে দিল। আগুন নিবল বটে, কিন্তু হনুমান মুখপোড়া হয়ে রইলেন!!" খুড়োর মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। বক্তব্য একরকম অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

যে সামান্য ঘটনার সূত্র ধরিয়া এত বড় লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল এবং যিনি ছাত্র বলিয়া—'গেল রাজ্য গেল মান' রব উঠিল, তিনি নাকি ছাত্রই নহেন। তিনি কোন এক রেডিওর দোকানের কর্মী এবং নাম তাঁর জহর মান্না। —"কিন্তু জহুরিরা জহরকে চিনে ফেলেছে ছাত্র বলেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতা আপাতত শান্ত। কিন্তু মফস্বলে জোর মিছিল চলিতেছে। তাঁহারা ধ্বনি তুলিয়াছেন—প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করব, টিকিট দেবো না।—"শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের কিম্ভূত প্রয়াস"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

কলিকাতার সাম্প্রতিক গোলমালে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"কাজে কাজেই: চ্যাংড়া চলচ্চিত্রের আউটডোর শুটিং তখন জোর-কদমে পথে পথে চলছিল কিনা তাই!!"

ব্যাপকভাবে ভুয়া সদস্য গ্রহণ করায় বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে। —"এর সঙ্গে অবশ্য বিহারের বেনো জলের কোন সম্বন্ধ নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

জিনিসপত্রের দর আর বৃদ্ধি পাইতে দিবেন না বলিয়া রাজ্যসভায় ঘোষণা করিয়াছেন শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। বিশু-খুড়ো হঠাৎ গান ধরিলেন—"নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ!!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আইনের সাহায্যে মৎস্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। আমাদের সহযাত্রী গান ধরিলেন না বটে, তবে কবিতা আবৃত্তি করিলেন—"যা কর ভাই আস্তে ধীরে, ঘা কর কেন খুঁচিয়ে!"

রেলের সমস্ত শহরতলির শাখায় বৈদ্যুতীকরণ পরিকল্পনা রূপায়ণ শেষ হইলে ভারত সরকার কলিকাতায় সার্কুলার রেলওয়ের প্রস্তাব পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। —"আমরা বলি, ন' মন ঘিয়ের আগে রাধার নৃত্য-পর্বটা শেষ হলে হত না? —প্রশ্ন করেন অন্য এক সহযাত্রী।

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী জানাইয়াছেন যে, দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। শ্যামলাল বলিল—"তাই ভালো, একসঙ্গে গাঁ উজোড় করে লাভ কী!!"

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি নারী সম্মেলনে শ্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, মূল্য রোধ করিতে হইলে সমবায় ভাণ্ডার গঠন করা উচিত। —"কিন্তু তার আগে মা-লক্ষ্মীদের বাড়ির ভাঁড়ারটা আগলাবার উপদেশ দিলেই ছাপোষারা উপকৃত হতেন" —বলেন বিশু খুড়ো।

ফুটবলে ভারত কোরিয়াকে পরাজিত করিয়াছে। সংবাদে জানা গেল, ভারত জিতলেও লক্ষাধিক দর্শক খেলোয়াড়দের টিটকারি দিয়াছে। —"কিন্তু তারা সবাই মাথা ঠাণ্ডা করে খেলেছে—এবং আমরা যে বলেছিলাম, খেলাটা যেন 'গোস্বামী মতে' হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে"—বলেন খুড়ো।

অল্প বয়সে প্রেমে পড়া বন্ধ করতে হবে"—বলিয়াছেন পিকিং মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ইয়ে কুঃ সাও।—"একটু বেশি ইয়ে হয়ে গেল নাকি"—সংক্ষেপে বলেন জনৈক কিশোর সহযাত্রী।

ধাপার হাঙ্গামার ফলে আবর্জনা ফেলা কাজ ব্যাহত হইয়াছে। —"সুতরা আশংকা, ধাপার জের অচিরেই পা-ধা-নি-স গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে এবং কাজে কাজে তুমি যে জঞ্জাল, তুমি সে জঞ্জালে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পৌরসভা একাধিক সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অর্ডিন্যান্স জার করিয়াছেন, তাহা কার্যকর করার ব্যাপা এক শ্রেণীর কাউন্সিলার মহলে নাকি এখ অন্তরালের খেলা শুরু হইয়াছে। —"প্রকাশ মাঠে খেলা দেখার জন্য অগ্রিম সীট বু করে রাখুন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

জাকর্তায় এশিয়ান গেমস-এর না পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়া ছিলেন সন্ধি (সোন্ধি)। —"তাই যথাসম স্বন্দ্ব সমাসে পরিণত হয়েছে"—বলেন অন এক ক্রীড়ারসিক।

জাকর্তায় ভারতীয় দূতাবাসে উচ্ছৃঙ্খল জনতার তাণ্ডবের উল্লেখ করিয় বিশু খুড়ো বলিলেন—"এশিয়ান গেমে জনতা স্বর্ণ, রৌপ্য বা ব্রোঞ্জ মেডেল ন পেলেও একটি স্টোন মেডেল (প্রস্তর যু থেকে সংগৃহীত) পাওয়ার যোগ্যতা তা নিশ্চয়ই অর্জন করেছেন!!"

জাকর্তায় হকি খেলায় ভারত পাকি স্তানের কাছে পরাজিত হইয়াছে —"রাজনৈতিক খেলায় ভারতের এলাকা পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশ নিয়ে হইচই-অন্ত নেই; কিন্তু হকিতে পাকিস্তানীদে এই অনুপ্রবেশ নিয়ে কেউ কোন ক বলেননি, এবং একদিন হকিতে পাকিস্তা যে কায়েমী হয়ে বসবে, তার লক্ষ সুস্পষ্ট। বলে শ্যামলাল।

মফস্বলের বই ক্রেতা

নতুন নামে পুরোনো লেখা নিয়ে পূর্বে কিছু লিখেছি। জনৈক পাঠক এই বিষয়ে বিদুরকে কিছু আলোচনা করতে বলেছিলেন। আমার সেই আলোচনার পর উক্ত পাঠক আবার একটি পত্রে তাঁর অভিযোগের বিস্তারিত তালিকা সপ্রমাণ পেশ করেছেন। বিখ্যাত ও প্রবীণ কয়েকজন বাঙালী লেখকের বই, (যা নতুন নামে বেরিয়েছে—অথচ তার মধ্যের লেখা পুরোনো) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত লেখা ও উক্ত বিষয় সম্পর্কে আরও তথ্য জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "আমার বক্তব্য বিশেষ করে মফস্বলের ক্রেতা এবং পাঠকদের অসুবিধাকে লক্ষ্য করে কেন্দ্রীভূত ছিল. বিষয়টির বিচার সে দৃষ্টিকোণে আপনি করেন নি। মফস্বলের ক্রেতার বইয়ের দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ পোস্টাল এবং রেলওয়ে পার্শেল মারফত। কাজে কাজেই, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাপন নির্ভর। সে হিসেবে তাঁরা চোখ থাকতেও অন্ধ বইকি!"

মফস্বলের বই-ক্রেতাদের বিষয়টি আমি ভেবে দেখি নি, আমার অন্তত তা মনে হয় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমার ধারণা ছিল সৎ-প্রকাশক মাত্রেই তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপনে বইটির অন্তর্গত-বিষয় স্পষ্ট করেন। যেমন, 'পঞ্চকাহিনী' বলে যদি কোনো লেখকের কোনো পুরোনো পাঁচটি বড় লেখা একত্রিত হয়ে বেরোয় তাতে লেখকের দোষ নেই. প্রকাশকেরও নয়। তবে দোষ কোথায়? দোষ অন্যত্র, বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনের ভাষা যদি পাঠকের সঙ্গে লুকোচুরি না করতে চায়, তবে এই পাঁচটি পুরাতন কাহিনীর নাম বিজ্ঞাপনই স্পষ্ট করে ঘোষণা করবে। করা উচিত। আর যদি প্রকাশক মনে করেন চোখে ধুলো দেব, হয়ত কিছু ধুলো দেওয়া যেতেও পারে। আমি স্বীকার করি, এই ধুলো মফস্বলের পাঠকের চোখকেই বেশী ঝাপসা করবে।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। পাঠকের প্রতি নজর রেখে স্পষ্টাক্ষরে এই ধরনের বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলে প্রতারণার অভিযোগ কেউ আর করতে পারবেন না। মফস্বলের পাঠকও নন।

রোমান্টিক উপন্যাস

জনৈক পাঠকের একটি পত্র:

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ৪৪ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় সাহিত্য সংবাদ শিরোনামায় রোমান্টিক উপন্যাস ও সেই সম্পর্কে কুমারী অ্যালেক্স স্টুয়ার্ট-এর মতামত সম্বন্ধে 'বিদুর' পাঠকবর্গের কাছে যে খবরটি জানিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু উপসংহারে তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপর কিঞ্চিৎ দায়িত্ব দিয়েছেন সাহিত্যে রোমান্টিক উপন্যাসের স্থান নির্দেশ করার, তাই এই লেখা। যদিও 'বিদুর' বলেছেন "আমার ভাবনায় কিছু আসে যায় না", তাহলেও তাঁর ভাবনাটি যখন মন্তব্যের আকারে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকার একটি বিশেষ শিরোনামায় অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কিছু আসে যায়।

সাহিত্যে রোমান্টিক উপন্যাসের স্থান বিচারের প্রসঙ্গে ওভালটিনের উপমা ব্যবহার করে রোমান্টিক সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে 'বিদুর' সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমিও বলি না গোটা সাহিত্য জগতটা রোমান্টিক রসে ভরপুর হয়ে চিরদিনের মতো তাঁর উপমা অনুযায়ী 'ওভালটিন' হয়ে থাকুক।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে আমরা আজ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে জীবনকে নানাভাবে দেখবার, বুঝবার এবং ভোগ করবার সুযোগ আমাদের হচ্ছে। তাতে সুবিধা এই হয়েছে যে, বিবর্তনের সিঁড়ির ধাপগুলি আর তত কঠিন মনে হয় না, কিন্তু জীবন অনেক বেশী জটিল হওয়ায় অসুবিধার মাত্রা অন্যদিকে বহুগুণে বেড়েছে। আমরা টাটকা ফলের রস, খাঁটি দুধ হারিয়েছি; ওভালটিন, চা পানীয় হিসাবে পেয়েছি। সেই গ্রামের জীবন, পল্লীগীত, কথকতা, যাত্রা, কবির লড়াই হারিয়েছি, যেগুলি আগেকার গ্রাম্যজীবনে চিত্তবিনোদন এবং মানসিক পুষ্টি সাধনে সাহায্য করত; পেয়েছি নাগরিক জীবন, রোমান্টিক সাহিত্য, সিনেমা, রেডিয়ো। হারিয়েছি স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গ মুখের ভাষা, পাচ্ছি কলে ছাটা ছকে ফেলা গল্প, কবিতা, উপন্যাস। এই অবস্থায় রোমান্টিক উপন্যাস যদি সাহিত্যে স্বীকৃতি পায় বা পাবার চেষ্টা করে, তবে তাকে দুধই বলুন আর ওভালটিনই, তার মূল্য অনেক। আর রোমান্টিক উপন্যাস যদি ওভালটিনের মত চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শান্তি ও পুষ্টি লাভে সাহায্য করে তবে তো আরও ভালো।

তবে একথা ভুললে চলবে না যে রোমান্টিক সাহিত্যেও মান-এর তারতম্য

আছে। উঁচুমানের রোমান্টিক সাহিত্যের প্রয়োজন ও রচনার সংখ্যা বাড়লে বুঝতে হবে, আমাদের সংস্কৃতির কাঠামো আরও দৃঢ় হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষকেই চিন্তা জগতে বাঁচবার জন্য একটা ছোট আলাদা মনের জগত নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়, যেখানে সে নিজে রাজা, যেখানে সে তার কুবেরের ভাণ্ডার সাজিয়ে রেখেছে তার নিজে বাছাই করা নানারকম সম্পদে।

রোমান্টিক উপন্যাস সম্বন্ধে কুমারী অ্যালেক্স স্টুআর্ট-এর যুক্তি খুবই স্বাভাবিক, স্পষ্ট এবং যথার্থ। প্রায় এক যুগ আগে নিউ ইয়র্কের 'টাইমস্' পত্রিকায় ইংরাজী সাহিত্য সমালোচক আইভর ব্রাউন একই কথা বলেছিলেন। তবে তাঁর যুক্তিটা আর জোরালো।

সাহিত্যের মাপকাঠি দরদী মনের স্পন্দনে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়।

'বিদুর' অভিযোগ করেছেন, "বাংলা সাহিত্যের পাঠক, আমার ধারণা, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন আমাদের বহু লেখকই এখন মরমে এ-কথা বুঝে নিয়েছেন যে, অতঃপর উকথাই তাঁদের ভরসা।" এতে কিঞ্চিৎ শ্লেষের আভাস আছে: আতঙ্কও কম মনে হচ্ছে না। এই অভিযোগ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অন্তত পরিসংখ্যান বলে না আজকের দিনে আগের চেয়ে বেশী হারে লোকে রোমান্টিক উপন্যাসে আগ্রহী হয়েছে। রোমান্টিক উপন্যাসের পাঠকের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে, তবে যে-হারে বাড়া উচিত ছিল সে হারে বাড়েনি।

বিদুরের নিবেদন

উপরোক্ত প্রত্রটি অতি দীর্ঘ। আমি সামান্যমাত্র উদ্ধার করে লেখকের মূল বক্তব্য পাঠকসমীপে নিবেদন করলাম।

অ্যালেক্স স্টুআর্ট-এর লেখা সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করি নি। প্রসংগত যে উক্তিটি করেছি, তাকে মন্তব্য হিসেবে ধরে নিলে আমার কোনো উপায় থাকে না।

অ্যালেক্স স্টুআর্ট-এর লেখা বা বক্তব্য আমার কাছে খুব সুসংগত এবং মর্যাদা-সূচক মনে হয় নি। তিনি তাঁদের সংঘের সভাপতি হিসেবে, পাঠকের সংগে একটা রফা করার মন নিয়ে ভোজসভায় বক্তৃতাটি দিয়েছেন বলেই আমার মনে হয়েছিল। আরও সরল করে বললে এই দাঁড়ায়, রোমান্টিক উপন্যাস যে সাহিত্য তার সপক্ষে সাহিত্যগত যুক্তি তাঁর ভাষণে অত্যন্ত দুর্বল ভাবে উপস্থিত ছিল। প্রধানত যা ছিল তা নিজেদের জনপ্রিয়তাকে সাক্ষ্য রেখে সাহিত্য জগতে স্থান করে নেওয়ার দাবী। এ-দাবী ভিখারীর।

অথচ, এ-কথা সাহিত্য-পাঠকমাত্রেই জানেন রোমান্টিক সাহিত্যের সপক্ষে শিল্পের যুক্তি না থাকলে পৃথিবীর বহু নমস্য লেখকই বাতিল হয়ে যান। অ্যালেক্স স্টুআর্ট যদি তাঁর স্বদেশের সাহিত্য ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরাতেন সেখানে রিচার্ডসন ও মহারথী স্কটকে দেখতে পেতেন। স্কট-এর সাহিত্যকে ইংরেজী সাহিত্যে কি ভিখারীর মত দাঁড়াতে হয়? নিশ্চয় হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আমাদের যুক্তি হ'তে পারত। বঙ্কিমের 'রোমান্স'কে যেমন করে আমরা মাথায় তুলে নি—তেমন করে (মাথায় না হোক মনেই) এখন কি কোনো রাজ-কুমার বাদশা অথবা রাজকুমারীর গল্প তুলে নিতে পারি! পারি না। কারণ মন-ভোলানো গল্পই রোমান্স নয়, রোমান্সেরও শিল্পগত আকার, সজ্জা ও সুষমা আছে, যা শিল্পীর বোধ ও ধারণায় শিল্পের কারণেই থাকা উচিত।

স্টুআর্ট বলতে পারতেন—রোমান্টিক উপন্যাসের তিনটি আদি গুণ আছে যা শিল্পসম্মত। এই তিনটি গুণ—(ক) উচ্চাংগ কল্পনা (খ) বিশ্ব সপর্কে একটি শৃংখলার ধারণা (গ) ব্যক্তিগত শিল্পজগত গঠনের অধিকার।

দুঃখ, কুমারী স্টুআর্ট এ-পথে পা বাড়ান নি।

[এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ সম্ভব নয়।]

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবন ঃ প্রবন্ধ সঙ্কলন

রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির সশ্রদ্ধ নিবেদন। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমান গ্রন্থটি তাদের অন্যতম। গ্রন্থটি অধ্যাপক সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত। বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই এতে লিখেছেন। যে দেশে অধ্যাপকের রচনাকে লোকে ভীতির চোখে দেখে সেদেশে রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে এতগুলি অধ্যাপককে সম্মিলিত করা সংসাহসের পরিচয় বটে। কিন্তু লেখকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এঁরাই যথার্থ আলোচনা এতদিন করে এসেছেন। এঁরা না লিখলে রবীন্দ্রনাথ এতদিনে সাহিত্যিকদের স্মৃতির পাতায় স্থান লাভ করতেন মাত্র। এঁদের মধ্যে কারো কারো লেখার ভঙ্গী হয়তো কিছু নীরস কিন্তু সেটাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা অসঙ্গত হবে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন (ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ), শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী (জগৎ দেখিতে হইব বাহির), শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু (হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুটে) প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবীণ লেখকদের আলোচনা বিষয়বস্তু ও লেখনভঙ্গী দুই দিক দিয়েই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এঁরা ছাড়া আরও অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনা এতে সংকলিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা' তত্ত্বঘেঁষা রচনা, সুধীরচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ'ও তাই। কিন্তু দুটি প্রবন্ধই তথ্যপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার সম্পর্কে প্রবাসজীবন চৌধুরী এবং উমা দেবীর বিশেষত প্রথমোক্ত জনের রচনাটি উৎকৃষ্ট। কয়েকটি রচনা আংশিকতাগ্রস্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি', বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি মন্ত্র', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'নৈবেদ্য ও প্রান্তিক', শিশির চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্যাস', সুধীর চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংগীতপাঠান্তর'—প্রবন্ধগুলিতে বক্তব্য আছে এবং সে বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু প্রায় সবগুলি অসম্পূর্ণ বলে মনে হল। তবে এই সংকলনের লেখাগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে লেখকরা মৌলিক হবার চেষ্টা করেছেন এবং সে দিক থেকে বর্তমান সংকলনটি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। প্রিয়তোষ মৈত্রেয়র 'রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতিক চিন্তা', দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'চরিতসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ', সরোজকুমার দাসের 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন' আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য বিচার', বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রম্যরচনা ও রবীন্দ্রনাথ' উৎকৃষ্ট রচনা। আর একটি সুলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ রচনা নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা'।

দেবীপদ ভট্টাচার্য এতগুলি সুন্দর সুলিখিত রচনার সমাহার ঘটাতে পেরেছেন

এতে সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। লাইনোতে ছাপা হওয়ায় সহজপাঠ্য হয়েছে।
৮০।৬২

উপন্যাস

স্বপ্ন সম্ভার—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তিক, ১।৩২ এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলিকাতা—২৬ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থভারত, ৪১-বি, রাসবিহারী এভেন্যু। কলিকাতা—২৬। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন পরিবেশে অভিনব বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার জন্যেই সমধিক পরিচিত। উপর্যুক্ত উপন্যাসটি প্রমোদ সরকারকে (স্কুলের শিক্ষক যাকে বলতেন প্রমোদ নয়, প্রমাদ) কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সাহিত্যতত্ত্বের মানদণ্ডে তাকে নায়ক বলা অনুচিত। কিন্তু প্রমোদ সরকারই এ উপন্যাসের মেরুদণ্ড। তার জীবন বৃত্ত এই যে, সে পুলিসের চাকরি নিতে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বিধবা মায়ের পছন্দসই বাড়ির পাশের মেয়ে রাধিকে। দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করে তার বেশি যাবার উপায় নেই যেন। তাই মেয়ে-কয়েদী পুতুলকে নিয়েই মানসিক যে আলোড়নে উপন্যাস সুরু ও শেষ হয়েছে তা অতুলনীয়। পুতুলের জীবনছন্দের বারবার পতন হয়েছে। প্রচণ্ড দারিদ্র্য-দশা, বিমাতার অনাদর, প্রাক যৌবন পর্বে চৌর্যাপবাদ—তার পরবর্তী জীবনকে বঞ্চনায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। বিবাহিত স্বামীর কাছে শুধু চোর নয়, সে যে তার স্ত্রী তাও প্রমাণিত হয়নি। দুই আশ্রয়ে সে মুখ্যভাবে ধরা দিয়েছে। এক জেল-জীবন, অন্য আলি-সাহেবের আশ্রয়। জেল-জীবনেই পুলিস প্রমোদের সঙ্গে তার পরিচয়। বৃদ্ধ আলি সাহেব না থাকলে তার জীবনটাই অবান্তর হয়ে যেত। কারাবাসের পর প্রমোদের ইচ্ছানুযায়ী পুলিসেরই লোক মহাবীরের সঙ্গে সামাজিক চল-অনুযায়ী পুতুলের বিয়ে হলো। কিন্তু জীবনে যার চিরন্তন ঝড়, তার ক্ষণিক শান্তিই বা কোথায়? হয়তো প্রমোদকে স্বামী হিসেবে পেলেই সে সুখী হতে পারতো। তাও সম্ভব হলো না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্দেহপরায়ণ মহাবীরকে পেয়েও সে মানিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু মহাবীরই সে সুযোগ দিল কই। নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনলো। পাগল হলো পুতুল। পাগলের এমন পরিণতি অবশ্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয়, তবে মনে হয়

লেখক সামাজিক দূরবস্থাকে প্রকট করার জন্যেই তার অমন পরিণতি ঘটিয়েছেন। পুতুলের প্রথম স্বামীর মানসিক পরিবর্তন ও আত্মহত্যা লেখক কৃতিত্বের সংগে উদ্ঘাটিত করেছেন। আলি সাহেবের চরিত্রে এক অনিন্দিত মহাপুরুষের আশ্চর্য স্পর্শ পাওয়া যায়। উপন্যাসের নাম স্বপ্ন সঞ্চার। স্বপ্ন স্বপ্নই; তা আর সঞ্চারিত হলো কই? কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে এটাও কম বড় কথা নয়। ১৬।১।৬২

ছোট গল্প

সোনালী সন্ধ্যা। আশাপূর্ণা দেবী। ন্যাশনাল বুক হাউস, ১৬, শিবপুর রোড, হাওড়া। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অতলান্তিক। আশাপূর্ণা দেবী। এডুকেশানাল এণ্টার প্রাইজার্স, ১৬এ, ফার্ন রোড, কলিকাতা—১৯। দাম পাঁচ টাকা।

দুইখানি আলোচ্য গ্রন্থই ছোটো গল্পের সংকলন। বর্তমান কালের ছোটোগল্প লেখকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মহিলা লেখিকা-দের মধ্যে তাঁর আসন শ্রেষ্ঠ কিনা সে বিষয়ে মতের অমিল থাকতে পারে কিন্তু তিনি যে আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প লিখিয়ে সে-বিষয়ে আশা করি মতভেদ নেই। তাঁর গল্পগুলো আকারে ছোটো এবং প্রকৃতিতে গল্প!

"সোনালী সন্ধ্যা"য় সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। সন্দেহ এবং অকারণ ঈর্ষায় দাম্পত্য জীবন কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে তারই করুণ আলেখ্য প্রথম গল্প 'প্রথম ও শেষ'। বিয়ে এবং স্বামী এবং প্রেমের চেয়ে কি পাঞ্চালীর কাছে ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজটাই বড়ো হল?

শিবাজী পাঞ্চালীকে ভুল বুঝল। পুরুষ মাত্রই এই ভুল করে। স্ত্রী আর সন্তানের মা হওয়া ছাড়াও যে নারী-জীবনের অন্য অর্থ কিংবা সার্থকতা থাকতে পারে অনেক পুরুষ এবং নারীও তা ভাবতে পারে না। মানব মনের এই দিকটা চমৎকার ফুটে উঠেছে "নির্মোক" গল্পে। "সর্পিল পন্থায়" ধনী কন্যার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা নরনাথের চরিত্র অতিশয় বাস্তব, করুণ এবং মধুর। ধনী সন্তানের কাছে দরিদ্র-বৃদ্ধ-সেকেলে পিতার কোনও প্রয়োজন নেই। 'বাপের প্রয়োজনীয়তাটা আবার অনুভব করানো যায় না সরযুকে'? কী করুণ—মর্মান্তিক ইচ্ছা পিতৃ হৃদয়ের। এমনি প্রত্যেকটি গল্প। পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নেয় এবং মনকে নাড়া দেয়।

"অতলান্তিক"ও চৌদ্দশটি ছোটো গল্পের সংকলন। অতলান্তিক নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া না গেলেও প্রত্যেকটি গল্পই আকৃতিতে ছোটো এবং প্রকৃতিতে গল্প। গল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম—মধ্যবিত্ত জীবনে সাধারণ মানুষের হৃদয় দৌর্বল্যের ফাঁকে ফাঁকে সহজ সরলতার ঝলকানি; যেমন, 'অতলান্তিক', 'সাবিত্রী', 'পার্থক্য', 'বয়স মাহাত্ম্য' ইত্যাদি। দ্বিতীয়—অবচেতন মনের বিরুদ্ধে বাসনার আপাত বিরুদ্ধ আত্মপ্রকাশ; যেমন, 'স্বপ্নলীনা', 'ছদ্মবেশী', 'ওরা ভুল করেছিল', 'ভঙ্গুরে' ইত্যাদি। তৃতীয়—অনাবিল হাস্যরসের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার চলমান চিত্র; যেমন, 'মহুয়া মাদল', 'তাহলে', 'চুলোয় যাক', 'অবস্থা বুঝে', 'মুখ রক্ষা', 'বিনামা', 'আত্মবিস্মৃতে', 'এতো কম', 'ঢাকা' ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে লেখিকা এই হালকা হাসির গল্পগুলোর মধ্যে তুচ্ছ একটু ইচ্ছা অনিচ্ছা, তুচ্ছ একটু পছন্দ অপছন্দ, হাস্যকর একটু অভ্যাসের দাসত্বের আর অর্থহীন কৌলিন্যের ব্যর্থ প্রকাশ প্রচেষ্টার শব্দচিত্র সহজ অবস্থার পটভূমিতে সরল ভাষায় অঙ্কিত করতে পেরেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন গল্পই মানব-হৃদয়ের গভীরতম সত্তার নিবিড়তম উপলব্ধির বর্ণাঢ্য আলেখ্য নয়, যা পাঠ শেষ হবার পরে পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে বেদনা-সিক্ত আনন্দময় আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিটি গল্পই গল্প—সহজ আর সুখপাঠ্য। এ যেন পথ চলতে চলতে দেখা পথের দু'পাশের ছোটো-ছোটো রং-বেরঙের ঘাসের ফুল। যত সময় পথ চলা ততো সময় দেখা, ততোক্ষণ ভালো-লাগা।

প্রত্যেকটি গল্পই পাঠককে মুহূর্তের জন্যও আনন্দ দেবে। এবং এইখানেই লেখিকার শিল্পশৈলী। যে-কোনও সাধারণ ঘটনাকে গল্পের রূপ দেবার কৌশল লেখিকার জানা আছে। ৩৮৪,৩৮৭।৬২

রঙ্গজগতে

সংকট মোচনের শুভ প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সহানুভূতির সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট দূর করার কাজে অগ্রণী হয়েছেন তাতে চলচ্চিত্রসেবী মাত্রই সন্তোষ প্রকাশ করবেন। গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে এই শিল্পের বর্তমান সমস্যাবলীর আলোচনা ও তার প্রতিকারের উপায় নির্ণয়ের জন্য চলচ্চিত্রশিল্প-মহলের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের যে সভা আহ্বান করেছিলেন তা অভূতপূর্ব। এই সময়োচিত শুভবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের জন্য রাজ্য সরকার চলচ্চিত্রসেবীদের ধন্যবাদার্হ হলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্রসেবীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যদি কার্যে পরিণত হয় তবে সরকার বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের দরদী অভিভাবকরূপেই সম্মানিত হবেন।

বাংলা ছবির সংকটের কারণ নির্ণয়ের জন্য রাজ্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এই কমিটির ওপর যেন জনসাধারণ ও চলচ্চিত্রশিল্প-মহলের আস্থা থাকে। অর্থাৎ কমিটিতে এমন সদস্যই নেওয়া উচিত যাঁদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও সততা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন সংশয় থাকবে না। আমরা মনে করি, বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগী বিদগ্ধ ব্যক্তিরও স্থান থাকা উচিত এই কমিটিতে। চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যাঁরা ব্যবসাগত ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শুধু তাঁদের নিয়েই যেন এই কমিটি গঠিত না হয়। কারণ নিরপেক্ষ ও স্বার্থবুদ্ধিহীন তথ্যানুসন্ধানই হবে এই কমিটির একমাত্র কাজ। এই কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলেই রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত "বেনারসী" (ফিল্ম ক্র্যাফট প্রাইভেট লিঃ প্রযোজিত,)
নাম-ভূমিকায় রমা গুহঠাকুরতা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ছায়াছবিতে চিত্রনাট্য

"চরম আনন্দের অধিকারী নয় চিত্রনাট্যকার। সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করার সৌভাগ্য থেকে চিত্রনাট্যকার বঞ্চিত।"—কথাগুলি বললেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রকাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথার মধ্যে যেন বেদনার সুর। কিন্তু নিজেকে অসার্থক ভেবেও কথাগুলি তিনি বলেননি। সাহিত্য তাঁর জীবনের প্রথম প্রেম। তিনি সাহিত্যিক। তারপর একদিন ডাক এল চিত্রজগতের। সব্যসাচীর মত এক হাতে ধরে রাখলেন সাহিত্যকে, অন্য হাতে তুলে নিলেন চিত্রনাট্য। দুইটি সত্তায় তিনি দ্বিধাবিভক্ত হলেন না, দুই রূপে যেন তিনি বিকশিত হয়ে উঠলেন।

"সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার—এই দুই সত্তার মধ্যে তবুও কি কখনও কোন বিরোধই দেখা দেয় না? কোন অনিবার্য সংঘাত?"—প্রশ্ন করলাম শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে।

তারই উত্তরে বললেন তিনি, "সৃষ্টির আনন্দে চিত্রনাট্যকারের অধিকার নেই। তবে সাহিত্যের ভাষ্যকার হওয়ার তৃপ্তি তিনি অনুভব করতে পারেন। সাহিত্য সৃষ্টির পরম নির্বিকল্প আনন্দভূমি থেকে চিত্রনাট্যকারকে অনেক নীচে থাকতে হয়। সাহিত্যিকের মতনই চিত্রকারকে তার পরিভাষার সাহায্যে আনন্দ-মুহূর্তের সৃষ্টি করতে হয়, কিন্তু এই দুই সৃষ্টির মধ্যে তফাত অনেকখানি। সাহিত্যিক তার রচনার মধ্যে যে আনন্দ-মুহূর্ত সৃষ্টি করেন বা যে অপরূপ কথার ফুল ফুটিয়ে তোলেন, সে আনন্দ-সৃষ্টির মধ্যে তার কোন অংশীদার নেই; কিন্তু চিত্রনাট্যকার যা কিছু সৃষ্টি করেন, তার প্রকাশ নির্ভর করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর। চিত্রনাট্যকার

যত বড় আনন্দ-মুহূর্ত সৃষ্টি করুন না, তার প্রকাশ নির্ভর করছে অভিনেতার ওপর, প্রযোজকের ওপর; ছায়াছবির শিল্পে চিত্রনাট্যকারের যতখানি প্রয়োজনীয়তাই থাক, নিজস্ব বলে সে কিছুই দাবি করতে পারে না। এ শিল্পে অভিনেতা-অভিনেত্রী হলো উত্তমপুরুষ; কারণ, তাঁদের অংগকে আশ্রয় করে, তাঁদের বাচনকে আশ্রয় করে, তাঁদের ভংগীকে আশ্রয় করেই আনন্দবেদনা-ঘন মুহূর্তগুলির প্রকাশ ঘটে। চিত্রনাট্যকার এই আনন্দ-যজ্ঞে নেপথ্য-বিধানের লোক। আনন্দ-বিগ্রহের সে বেশকার। সুসজ্জিত বিগ্রহকে দেখে দর্শকরা যখন মুগ্ধ হন, তখন বেশকারের কাজ আর চোখে পড়ে না। যদি চোখে পড়ে, বুঝতে হবে বেশকারের কাজে ত্রুটি হয়েছে; কারণ, বেশকারের একমাত্র কাজ হলো বিগ্রহকে প্রাণবন্ত করে তোলা। তার নিজের চেষ্টাকে নিপুণভাবে লুকিয়ে বিগ্রহকেই সামনে তুলে ধরতে হয়, এই তার কাজ।"

তবু প্রশ্ন করি, এই নিপুণতার একটা তৃপ্তি আছে তো?

তাঁর কণ্ঠ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে; তিনি বলেন, "তৃপ্তি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ তৃপ্তিকে সৃজনের আনন্দ বলা যায় না। চিত্রনাট্যকারকে সাহিত্য-কর্মই করতে হয়, কিন্তু এই সাহিত্য-কর্মের রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্য-স্রষ্টার কাছে যে জিনিস ধর্ম, চিত্রনাট্যকারের কাছে তা অধর্ম। সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁর রচনার সংগে একাত্ম হয়ে যান, কিন্তু চিত্রনাট্যকারকে সব সময় নির্লিপ্ত থাকতে হয়। সাহিত্য-স্রষ্টার তন্ময়তা তাঁর জন্যে নয়। তাঁর প্রয়োজন, সমস্ত রস-বোধ সত্ত্বেও একটা নির্লিপ্ত যান্ত্রিক নিপুণতা। কারণ, তাঁকে সব সময় ভাঙতে গড়তে হয়, টুকরো টুকরো অংশকে নিয়ে জোড়া দিতে হয়, ওজন করে কথা বলাতে হয়, পা মেপে চলাতে হয়। সাহিত্যিকের মতন অফুরন্ত সময় তাঁর হাতে নেই, তাঁকে একটা মাপা সময়ের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করতে হয়। যেসব সাহিত্যিকদের কাহিনী ভেংগে তাঁকে চিত্রনাট্য রচনা করতে হয়, দেখেছি বহু ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা চিত্রনাট্যকারের ওপর ক্ষুণ্ণ হন। ক্ষুণ্ণ হন—কারণ, তাঁরা চিত্রনাট্যকারের বৃত্তি-ধর্ম ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন না।

"ভালই করেছেন এ কথা উত্থাপন করে; কারণ, এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। প্রশ্নটা হলো, মহৎ ও চিরায়ত সাহিত্যকে অবলম্বন করে যখন চিত্রনাট্য রচনা করতে হয়, তখন চিত্রনাট্যকার মূল কাহিনীর অদলবদলের কাজে কি পরিমাণ স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন বা নিতে পারেন?"

শ্রীচট্টোপাধ্যায় হেসে বলেন, "চিরায়ত সাহিত্যই হোক অথবা ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যই হোক, একটা কথা প্রথমেই বোঝা দরকার, সাহিত্যের ভাষা থেকে ছবির ভাষায় এই যে রূপান্তর, এটা অনুবাদ-কার্য নয়। যে চিত্রনাট্যকার সাহিত্যের কাহিনীকে ছবির ভাষায় শুধু অনুবাদ করতে যাবেন তিনি ভুল করবেন। এ হলো হিন্দু বিয়ের মতন গোত্রান্তরের ব্যাপার। এক শিল্পের গোত্র থেকে সম্পূর্ণ নতুন শিল্পের গোত্রে নিয়ে আসা এবং এই গোত্রান্তরের কাজ সার্থকভাবে করতে গেলে আপনা থেকেই রূপান্তর ঘটবে, সে রূপান্তর ঘটাবার নির্ভীক নিপুণতা চিত্রনাট্যকারের থাকা প্রয়োজন, না থাকলে তিনি কোনদিন কৃতী চিত্রনাট্যকার হতে পারবেন না। সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধায় বা সাহিত্যিকের প্রতি অবজ্ঞায় চিত্রনাট্যকার এই রূপান্তর ঘটান না, এই রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা চিত্রনাট্য রচনার মধ্যেই ওতপ্রোত। তবে আমার

বিশ্বাস, সত্যিকারের সাহিত্যিক সচেতনতা না থাকলে চিত্রনাট্যকার হয় শুধু অনুবাদ করতে গিয়ে নিজের স্বাধীনতাকে খর্ব করবেন, নতুবা কাহিনীকারের ওপর অত্যাচার করবেন। কোন বড় লেখকের উপন্যাস বা ছোটগল্পকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করতে হলে সেই লেখকের রচনার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে চিত্রনাট্য-কারকে গভীরভাবে পরিচিত হতে হবে এবং যা কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হবে তা সেই লেখকের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেই করতে হবে; এমন কি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের বাচন-ভঙ্গী পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বজায় রাখতে হবে। লেখকের বিনা অনু-মতিতে তাঁর গল্পের বা তাঁর তৈরী চরিত্রের ছাঁচ বদলাবার কোন স্বাধীনতা কোন চিত্র-নাট্যকারের নেই। যদি কখনো সেইরকম কোন পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করে তা করা বিধেয়।

—চিত্রনাট্যকারের বিশেষ দায়িত্ব কি?

"এক কথায় যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, আমি বলবো, চিত্রনাট্যকারের প্রধান দায়িত্ব হলো, ছবির পরিচালককে প্রেরণা দেওয়া। দর্শকেরা ছবি দেখে কি বলবে সে তো অনেক দূরের কথা; আসল কথা হলো যিনি ছবিটিকে গড়ে তুলবেন, সেই পরি-চালকের সঙ্গেই চিত্রনাট্যকারের বোঝাপড়া। এবং এইখানেই চিত্রনাট্যকারের আসল শক্তির পরীক্ষা এবং তাঁর শিল্প-কর্মের সুকঠিন দায়িত্ব। সুকঠিন—কেননা, প্রত্যেক বিশিষ্ট পরিচালকের ছবি তোলার একটা বিশিষ্ট ধরন আছে এবং চিত্রনাট্য রচনা করা অঙ্ক-কষা নয়, তার নির্দিষ্ট কোন একটা ফরমুলা নেই। সেইজন্যে চিত্রনাট্যরচয়িতাকে সেই-সব বিশিষ্ট পরিচালকদের পরিচালনা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও বিশেষভাবে পরিচিত হতে হয়। এক দিকে থাকেন মূল কাহিনী-কার, অপর দিকে থাকেন ছবির পরিচালক, এই দুই ব্যক্তিত্বের দাবিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে চিত্রনাট্যকারকে নিজের দায়িত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। এটা প্রায় সার্কাসে ঝোলা দড়ির ওপর সাইকেল চালানোর মতন অতি কঠিন ব্যালান্সের ব্যাপার!"

প্রশ্ন করি, অনেক সময় এই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ তো বাধে?

আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলেন, "উভয় পক্ষে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে এ সংঘর্ষে ভাল ফলই হয়। পরিচালককে শুধু সমর্থন করে যাওয়া চিত্রনাট্যকারের কাজ নয়; তাঁর কাজ হলো চিত্র গঠনে চিত্রপরি-চালককে সাহায্য করা এবং চিত্রনাট্য-রচয়িতাই সবচেয়ে বেশী সাহায্য তাঁকে করতে পারেন। এমন কি, গোড়াতে যে কথা বলেছি, চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব হলো পরি-চালককে প্রেরণা দেওয়া। ছবির কাহিনী পরিচালকের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু সে কাহিনী যতক্ষণ না চিত্রনাট্যে গতিশীল হচ্ছে, কাহিনীর চরিত্রগুলো যতক্ষণ না নিজেদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অর্জন করছে, যতক্ষণ না সেইসব কল্পিত চরিত্র জীবন্ত হয়ে প্রাণবন্ত কথা বলছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিচালক ঠিক প্রেরণা পান না এবং পরি-চালক নিজে প্রেরণা না পেলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও প্রেরণা দিতে পারেন না। যখন এই সমগ্র টিমটি প্রেরণা পেয়ে কাজ করে, তখনই ঠিক ছবির কাজের পরিবেশ গঠিত হয়। সেই চিত্রনাট্য সার্থক যা পরিচালক এবং অভিনেতাদের প্রেরণা দিতে পারে এবং সেই প্রেরণা সৃষ্টির মধ্যেই চিত্রনাট্যকারের চরম সার্থকতা ও চরম পুরস্কার।"

"ছবি ভাল চলা বা না চলা কি চিত্রনাট্যের দোষগুণের ওপরই নির্ভর করে?"—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার বলেন, "ছায়াছবিতে চিত্রনাট্যের ভূমিকা অনেক বড় সন্দেহ নেই, এবং ছবির সার্থকতা বহুলাংশে চিত্রনাট্যের কৃতিত্বের ওপর নির্ভর করে; তবে ছবির সার্থক রূপ নির্ভর করে পরিচালনার কৃতিত্বে এবং অভিনেতাদের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যে। এবং সেই দুটি ব্যাপারও আরো অনেক বিভাগের যোগ্য সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। নইলে চিত্রনাট্য মরা কাগজ।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "ছবি চলা না-চলার ব্যাপারে অনেকেই 'ভাগ্য' বা এক বিশেষ "বক্স-অফিস রহস্যের" কথা বলে থাকেন। আমি

ধীরেন নাগ পরিচালিত এবং হেমন্তকুমার প্রযোজিত "বিশ সাল বাদ" ছবির একটি দৃশ্যে নায়ক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান

এম-জি-এম'এর "কিং অব কিংস" ছবিতে যীশুর কৃপাধন্যা জেরুজালেমের পতিতা রমণী মেরী ম্যাগডালিনের রূপসজ্জায় কারমেন সেভিলা

চিত্রবাহারের "মউঝুরি" (পরিচালক : শিব ভট্টাচার্য) ছবির একটি দৃশ্যে দীপিকা দাশ ও ধীরাজ দাশ

এ ধরনের কোন রহস্যময় কারণের আধিপত্য মেনে নিতে রাজী নই। আমি বিশ্বাস করি না, যে ছবির পেছনে এতজনের বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সক্রিয় থাকে সে ছবির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে দুর্বোধ্য কোন রহস্য। ছবি তৈরির পেছনে যাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি খাটাচ্ছেন তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যদি কোন ভ্রান্তি না থাকে, যাঁরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন তাঁদের আন্তরিকতার মধ্যে যদি কোন ফাঁকি না থাকে তবে ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করবেই। যদি না করে তবে বুঝতে হবে, কোথাও কোন গলদ রয়ে গেছে। ভাগ্যের হাতে ছবির সাফল্য-অসাফল্যের দায় ছেড়ে দিয়ে আমরা শুধু নিজেকেই প্রবঞ্চনা করি।"

একটু থেমে বললেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়, "নিউ থিয়েটার্স-এর "কাশীনাথ" ছবিতেই আমার চিত্রনাট্যরচনার কাজের হাতেখড়ি। তখনকার দিনে দেখতাম, চিত্রনাট্যকারকে মোটেই আমল দিতেন না চিত্রপরিচালক। চিত্রনাট্যের কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হত। ছবিতে চিত্রনাট্য বলে কোন কিছুর উল্লেখ থাকত না। লেখা থাকত শুধু "সংলাপ"। একালেও দেখছি, চিত্রনাট্যকারদের সম্বন্ধে সেই প্রাচীন মনোভাবই বলবৎ আছে। ব্যতিক্রম-সাপেক্ষেই বলছি, আজকের দিনেও চিত্রনাট্যকারকে অবান্তর না ভাবলেও অপরিহার্য অনেকেই মনে করেন না। বর্তমান বাংলা ছবিতে চিত্রনাট্যকার বলতে আছেন কজনই বা। তাঁদের সংখ্যা এক আঙ্গুলেই গুনে শেষ করা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চিত্রপরিচালকরাই চিত্রনাট্যরচনার দায়িত্বটি গ্রহণ করে থাকেন। বড়-ছোট অনেক চিত্রপরিচালকই মনে করেন, চিত্রনাট্য রচনার কাজটি পরিচালকের দ্বারা সম্পন্ন না হলে সুসম্পন্ন হবার আর উপায় নেই। ছবির কাজে অভিজ্ঞ চিত্রনাট্যকারের স্বতন্ত্র প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। একান্ত দুঃখের বিষয়, এই ধারণার জন্যে যে মূল্য দিতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কৃতী পরিচালকেরা আজও অবহিত নন। চিত্রপরিচালক প্রধানত প্রয়োগকার। তিনি যদি সাহিত্যিকও হন তবুও তাঁর পক্ষে নিজের হাতে চিত্রনাট্যরচনার কাজটি নেওয়া উচিত নয়। কারণ, নিজের চিত্রনাট্য যখন তিনি নিজে প্রয়োগ করতে যাবেন তখন তিনি শুধু নিজেকেই অনুসরণ করবেন। নিজের মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ভ্রান্তিকেও তিনি প্রতিফলিত করবেন তাঁর ছবিতে। ছবির নির্মাণপর্বে তাঁর কাজের দ্রষ্টা আর কেউ থাকেন না। যাঁরা থাকেন তাঁদের কেউ চিত্রনাট্যকার নন। তাই চিত্র-পরিচালক বুঝতে পারেন না তাঁর আত্ম-কেন্দ্রিক সৃষ্টিতে কোথায় গলদ থেকে যাচ্ছে। এ কারণেই পরিচালকের সহায়-স্বরূপ একটা দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার। এই আত্মানুসরণ বহু পরিচালকের ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে উঠেছে, এই শিল্পের বহু অকারণ ক্ষতি করেছে এবং উদাহরণ দিয়ে তা বলা যায়। সবাই চার্লি চ্যাপলিন নন। চার্লির বহুমুখী প্রতিভা হয়ত কোন কোন পরিচালকের থাকতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভুললে চলবে না, চার্লির আর একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁর তৈরী ছবি তাঁর মনোমত না হলে তিনি সমস্তটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তুলতে পারতেন, অর্থাৎ তার জন্যে যে অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন তা একমাত্র তাঁরই ছিল। নির্দিষ্ট সময় ও বাজেটের মধ্যে যাঁদের ছবি তুলতে হয়, তাঁদের পক্ষে চার্লি সাজা মারাত্মক বিলাস।"

আজকাল ছায়াছবি থেকে নাটক বিসর্জন দেওয়ার যে নতুন শিল্প-প্রত্যয়ের উদ্ভব ঘটেছে, সে সম্পর্কে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বললেন, "ছায়াছবি যদি জীবনের চলচ্চিত্র হয় তবে তাতে নাটকের স্থান চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। মানুষের জীবনে আবেগ আছে, সুখ-দুঃখ আছে। বাসনা ও বিভ্রমে তার জীবন কখনও দ্বন্দ্বাক্রান্ত, প্রেমে ও শান্তিতে কখনও বা শান্তমধুর। জীবনের এই কড়িকোমল রূপটিই যদি চলচ্চিত্রের উপজীব্য হয় এবং চলচ্চিত্র যদি পরিবেশ-প্রধান প্রামাণিক ছায়াছবি না হয়, তবে বি-নাটকীয়তার প্রশ্ন ওঠেই না। যে জীবনে দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, সে জীবনে কারুর আকর্ষণ থাকে না। এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘাতই নাটক। তবে এই সংঘাতের প্রকাশ-মাত্রার একটা তারতম্য আছে এবং প্রকাশ-ভঙ্গীরও তারতম্য আছে। এইখানে চিত্র-সমালোচকেরা একটি মারাত্মক কথা আমদানি করেছেন—সে কথাটি হলো মেলো-ড্রামা। আমার এই স্বল্প-পরিসর সময়ের মধ্যে এই 'মেলো'র ঝড় তুলতে চাই না। তবে আমি দেখেছি, যাঁরা সমালোচনায় এই কথাটা ব্যবহার করেন, তার সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁদের অনেকেরই সঠিক কোন ধারণা নেই। এই কথাটা এসেছে সাহিত্য সমালোচনায়

দেশ থেকে। সিনেমার দেশে এসে তার পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে। সাহিত্যের রস-বিচারের সূত্র দিয়ে যদি কেউ ছায়াছবির রস-বিচার করতে যান, তিনি শুধু ভুল করবেন তা নয়, তিনি অন্যায় করবেন। সাহিত্যে যা মেলোড্রামা বলে নিন্দিত হতে পারে, এমন বহু জিনিস হলো ছায়াছবির দৈনন্দিন ঘটনা। সাহিত্যে বা কথাশিল্পে যে সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করা সম্ভব, চলচ্চিত্রে সে সূক্ষ্মতা আশা করা অন্যায়। সুর যা মানুষকে দিতে পারে, কাব্য তা দিতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তো সুর আর ছন্দের সীমারেখা নিয়ে কোন বিরোধ নেই! তবে আইজেনস্টিন 'মন্তাজ' সাহায্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, চলচ্চিত্রের ভাষাও সূক্ষ্ম হতে পারে। চিত্র-নাট্যকারের কর্তব্য হলো, নতুন নতুন উদ্ভাবনী কৌশলের সাহায্যে আনন্দ-পরিবেশনের সুস্থতর, সুন্দরতর, নিবিড়তর পথ আবিষ্কার করা।"

সবশেষে শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করি, সাহিত্যিক যেমনভাবে সমাজ-চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন, চিত্রনাট্যকারের তেমন কোন সামাজিক দায়িত্ব আছে? উত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীচট্টোপাধ্যায় বললেন, "নিশ্চয়ই আছে। পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রেখে চিত্র-নাট্যকারকে রচনা করতে হবে তাঁর চিত্রনাট্য। যে ভবিষ্যৎ জীবন আসছে, যে আগামী মুক্ত জীবন বিবর্তনের ধারায় অবশ্যম্ভাবী, তার ছায়া যে চিত্রনাট্যে প্রতিফলিত হবে, তাই নিঃসন্দেহে সাদরে গ্রহণ করবেন। সাহিত্যিকদের মতই চিত্রনাট্যকার এখানে আগামী জীবনের অগ্রদূত। দীর্ঘকাল ধরে চিত্রনাট্যরচনার কাজে ব্যাপৃত থেকে এই অভিজ্ঞতাই আমি অর্জন করেছি।"

* শুভমুক্তি *

দুটি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ছবি দুটির নাম **বিশ সাল বাদ** (গীতাঞ্জলি পিকচার্স) ও **মেহেন্দী লাগী মেরে হাত** (লাইমলাইট)।

হেমন্তকুমার প্রযোজিত "বিশ সাল বাদ"-এর কাহিনী রহস্য, রোমাঞ্চ ও প্রণয়ের উপাদানে গঠিত। বীরেন নাগ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। ওয়াহিদা রেহমান ও বিশ্বজিৎ ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে শিল্পী। প্রযোজক হেমন্তকুমার নিজেই ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন।

"মেহেন্দী লাগী মেরে হাত" ছবিটির প্রধান উপজীব্য প্রেম। অশোককুমার, নন্দা ও শশী কাপুর ছবির প্রধান শিল্পী। সুরজ প্রকাশ ও কল্যাণজী আনন্দজী যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক।

পরিমল ঘোষ ও অনিল বরের পরিচালনায় নির্মীয়মান "মেঘমুক্তি"র (শ্রীকৃষ্ণ পিকচার্স) একটি দৃশ্যে দীপক মুখোপাধ্যায় ও কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

* ছবির পর ছবি *

বেনারসী

আগামী সপ্তাহে আসছে বহুপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবি "বেনারসী" (ত্রিবেণী ক্রাফট প্রাইভেট লিঃ প্রযোজিত)। বিমল মিত্রের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এ ছবি পরিচালনা করেছেন অরূপ গুহ-ঠাকুরতা। ছবির নামভূমিকার শিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, মমতাজ আহমেদ, সীতা দেবী, মেনকা দেবী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সুরুচি সেনগুপ্তা। ওস্তাদ আলী আকবর খান ছবির সুরকার।

শুভদৃষ্টি

এস সি প্রোডাকশন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন 'শুভ দৃষ্টি' আগামী মাসের প্রথম দিকে মুক্তিলাভ করবে। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যারানী, কালী বন্দোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দীপিকা দাস, জহর গাঙ্গুলী, গীতা দে, মমতাজ আহমেদ ও ছবি বিশ্বাস। চিত্ত বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

বাংলা ছবির সংকট

তদন্ত কমিটি নিয়োগ

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে সংকট কেন, এবং সংকট মোচনের উপায় কী?—এ সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গত শুক্রবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প মহলের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে। সভায় পৌরোহিত্য করেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। এই সভাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

সভায় বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক, প্রদর্শক, পরিচালক, পরিবেশক, শিল্পী, কলাকুশলী এবং চিত্র-

সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে। তিনি বাংলা ছবির সংকটমোচনে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

চলচ্চিত্রশিল্প মহলের পক্ষ থেকে প্রথমেই ভাষণ দেন ই-আই-এম-পি-এ' এর (পূর্বের বি-এম-পি-এ) সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ। শ্রীঘোষ বলেন, ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পে সংকটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। চলচ্চিত্রশিল্পের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দপ্তরের অর্থনীতি বিষয়ের পরামর্শদাতা শ্রী কে এম পুরকায়স্থকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যথাকালে শ্রী পুরকায়স্থ তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। শ্রীঘোষ আরও বলেন, সেই সময়ে পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের সংস্থা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট দূর করার জন্য যেসব প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, আমরা সেসব প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাই।

ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সংকট মোচনের প্রয়াসে চলচ্চিত্রসেবীরা যেন ঐক্যবদ্ধ হন—এই আবেদন জানিয়ে শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় চলচ্চিত্রশিল্পের সংকটের কারণ নির্ণয়ের জন্য সরকারকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের পরামর্শ দেন। শ্রীমতী কানন দেবী বলেন, বাংলা ছবিকে বাঁচতে হলে বর্তমান সংকটের অবসান চাই, এবং রাজ্য সরকারের পরিপূর্ণ সহানুভূতি থাকলেই এই সংকট দূর হতে পারে। সভায় আর যাঁরা বক্তৃতা দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদেবকীকুমার বসু, শ্রীশ্যামলাল জালান, শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই বাংলা ছবির নানাবিধ সংকটের কথা উল্লেখ করেন।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ বলেন, চলচ্চিত্রশিল্পে বাংলা দেশ সারা ভারতের পথপ্রদর্শক ছিল। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সেই লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার কাজে রাজ্য সরকার সদা সচেষ্ট থাকবেন।

সংকট-নিবারণের উপায়

নানা সংস্থার নানা মত

ই-আই-এম-পি-এ : ১৯৬০ সালের এপ্রিলে এই সংস্থা বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের দুর্গতিমোচনের উদ্দেশ্যে পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়ের নিকট যেসব প্রস্তাব পেশ করেন তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল :

(১) আবগারী শুল্কের ভার লাঘব।

(২) নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের লাইসেন্স।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপন।

(৪) ফিল্ম প্রোডিউসার্স কো-অপারেটিভ স্থাপন।

(৫) বাংলা ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্র প্রসারের সুবিধাদান।

(৬) সিনেমা-টিকিটের মূল্যের পুনর্বিবেচনা।

(৭) রাষ্ট্রীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং শিক্ষামূলক ও উন্নত মানের ছবির ক্ষেত্রে আমোদ-কর রদ।

(৮) নানাবিধ সরকারী বিভাগের কর্তৃত্ব-জনিত দুর্ভোগের হাত থেকে চিত্রপ্রদর্শকদের মুক্তি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীকৃত লাইসেন্স সংস্থার প্রতিষ্ঠা।

(৯) চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে "মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট" ও "বেঙ্গল শপস্ অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট"-এর সংশোধন সম্পর্কে সুবিবেচনা।

(১০) চলচ্চিত্র শিল্পের নানা সমস্যার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ।

জয়েন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি : পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পের এই নবগঠিত সংস্থা গত ৫ই সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন। সংস্থার দুই অন্যতম মুখপাত্র শ্রীমধু বসু ও শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈঠকে সাংবাদিকগণকে জানান যে, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট নিবারণের উদ্দেশ্যে তাঁরা রাজ্য সরকারের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছেন। প্রধান প্রস্তাব কয়টি হল :

(১) চিত্রগৃহের "হাউস-প্রোটেকশন" ও "হোল্ড-ওভার" রদ।

(২) অধিক সংখ্যক চিত্রগৃহ নির্মাণ।

(৩) নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতি চিত্রগৃহে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা চিত্রের প্রদর্শন।

(৪) রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের বাংলা ছবি নির্মাণ।

(৫) ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়ে এবং তার সঙ্গে আমোদকর বাবদ গৃহীত (পশ্চিমবঙ্গে) অর্থের কিছু পরিমাণ যোগ দিয়ে চলচ্চিত্রশিল্প এবং এর কর্মী, কলাকুশলী ও শিল্পীদের সাহায্যার্থে ওয়েলফেয়ার ফান্ড তৈরি।

সি-টি-এ-বি : এই সংস্থা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট যে প্রস্তাবগুলি পেশ করেছেন তার কয়েকটি হল :

(১) ছবির টিকিট বিক্রির মোট আয়ের ন্যায্য বণ্টন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজে বাংলা ছবির কলাকুশলী নিয়োগ।

(৩) কো-অপারেটিভ পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ।

আজ ছবি, কাল ছায়াছবি

(উপরের সারি, বাঁদিক থেকে) "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ"-এর সেটে নায়িকা সন্ধ্যা রায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক গুরু বাগচী; "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ"-এর গানে কণ্ঠদান করছেন শ্যামল মিত্র; "নির্জন সৈকতে" ছবির রবীন্দ্র-সংগীত গাইছেন বন্দনা সিংহ ও রুমা গুহঠাকুরতা—পাশে দাঁড়িয়ে চিত্রপরিচালক তপন সিংহ। (নীচের সারিতে, বাঁ দিক থেকে) "অবশেষে"-র সেটে পরিচালক মৃণাল সেন ও নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়; "নারদ-নারদ"-এর সেটে আশীষকুমার ও অপর্ণা দেবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী; "দুই বাড়ি"র সেটে নিতা চট্টোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণের সঙ্গে আলাপরত পরিচালক অসীম পাল।

ফটো—দেশ

ফ্লোরের দিকে যাচ্ছেন (বাঁ দিক থেকে) রুমা গুহঠাকুরতা, বিশ্বজিৎ ও এন বিশ্বনাথন, সুলতা চৌধুরী।

বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে "বিশ্বরূপা পুরস্কার" অনুষ্ঠানে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে মাল্যভূষিত করছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ফটো: দেশ

(৪) সাধারণ হাসপাতাল ও যক্ষ্মা হাসপাতালে কলাকুশলীর জন্য দুটি শয্যার ব্যবস্থা।

(৫) ন্যূনতম বেতন চালু করার উপযুক্ত ব্যবস্থা।

বিশ্বরূপা পুরস্কার

গত শনিবার বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে ১৯৬২ সালের "বিশ্বরূপা পুরস্কার" দেওয়া হয় নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে। শ্রীচৌধুরীই প্রথম এই পুরস্কারে সম্মানিত হলেন।

নাট্য-কলার বিভিন্ন দিকের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য প্রতি বছর একজন গুণী শিল্পীকে "বিশ্বরূপা পুরস্কার" দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বরূপা রংগালয়ের কর্তৃপক্ষ। তাঁরা আরও জানিয়েছিলেন যে, বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের বিবেচনায় যোগ্যতম শিল্পীকেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পরিষদের সভ্যরা একমত হয়ে প্রথম "বিশ্বরূপা পুরস্কার" লাভের যোগ্যতম শিল্পীরূপে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকেই নির্বাচন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও নটগুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে মাল্যভূষিত করেন এবং "বিশ্বরূপা পুরস্কার" স্বরূপ একটি বহুমূল্যের স্বর্ণপদক শিল্পীর হাতে তুলে দেন। শ্রীচৌধুরী ভাষণদানকালে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, অতীতের এবং আমার সমসাময়িক যে গুণী শিল্পীরা আজ ইহজগতে নেই, তাঁদের হয়ে আমি এই সম্মান গ্রহণ করছি। অভূতপূর্ব এই পুরস্কার-দানের আয়োজনকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীচৌধুরী বলেন, "বিশ্বরূপা পুরস্কার" নাট্যকলাসেবীদের নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বর্তমান বাংলা নাট্য আন্দোলনে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ ও বিশ্বরূপা রংগালয়ের কর্তৃপক্ষের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করে "বিশ্বরূপা পুরস্কার" পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের অপর দুই মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বরূপা রংগালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীরাসবিহারী সরকার।

* পাঠকের চোখে *

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

মহাশয়,

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "বাংলা ছবির দুর্গতি" শীর্ষক সংবাদে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংকটে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি বাংলা চিত্র-ব্যবসায়িগণের মনে নিঃসন্দেহে আশার সঞ্চার করবে।

বাংলা ছবির দুর্গতির অন্যতম কারণ বাংলা ছবি প্রদর্শনের সীমাবদ্ধ এলাকা। দেশবিভাগের পরে যা আরও সংকুচিত হয়েছে। বাংলার বাইরে বাংলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেই। অবশ্য বাংলার বাইরে ছোটখাট শহর বা মফস্বলে বাংলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী চললে হয়ত দর্শকের অভাব হতে পারে। কিন্তু দিল্লী, বোম্বাই, বা মাদ্রাজের মত বড় বড় শহরে যেখানে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ সেখানে যদি কলকাতার সংগে একযোগে নতুন বাংলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় তবে দর্শকের অভাব হবে না বলে আমার বিশ্বাস। তার প্রমাণ গত বছরে দিল্লীতে সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা"র নিয়মিত প্রদর্শন এবং সম্প্রতি "ভগিনী নিবেদিতা"র নিয়মিত প্রদর্শনের জনপ্রিয়তা।

রবিবারের প্রাতঃকালীন শো ছবি দেখার পক্ষে মোটেই অনুকূল সময় নয়। তাও পুরোনো ছবি। এখন বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা অবাঙালীদের মধ্যেও বেড়েছে। বিশেষ করে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলি এইসব অঞ্চলে প্রদর্শিত হবার পর। বিশ্বের দরবারে বাংলা ছবির উৎকর্ষ প্রমাণিত হবার পর কিছু সংখ্যক বিদেশীর কাছেও বাংলা ছবির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ইংরাজী সাব-টাইটেল সহ বাংলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে রাজধানী দিল্লী শহরে অন্তত দর্শকের অভাব হবে না। "তিন কন্যা"র নিয়মিত প্রদর্শনীর সাফল্যের পর আমরা দিল্লীতে "কাঞ্চনজঙ্ঘা"রও নিয়মিত প্রদর্শনীর আশা করেছিলাম কলকাতার সংগে একযোগে।

বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ যদি এই প্রচেষ্টায় তৎপর হন তবে বাংলা ছবির আর্থিক দুর্গতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাবে বলে আমার বিশ্বাস। ইতি

সুবোধ পাল
নতুন দিল্লী-১৪

জাকর্তায় চতুর্থ এসিয়ান গেমের শেষ ক্রীড়ানুষ্ঠানে স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের আনন্দোচ্ছ্বাস

খেলাধুলা

একলব্য

চতুর্থ এসিয়ান গেমসের খেলাধুলোর জন্য এসিয়ার সতেরোটি দেশের নওজোয়ানরাই শুধু জাকর্তার ক্রীড়াংগনে মাতামাতি করেননি, রাজনৈতিক রংগমঞ্চেও যথেষ্ট মাতামাতি হয়েছে। বস্তুত দেশবিদেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, রাজনৈতিক নেতাদের মুখে মুখে, ক্রীড়াপরিচালকদের কথাবার্তায় ক'দিন ধরে এসিয়ান গেমসের কথা যেভাবে আলোচিত হয়েছে, বোধ করি বিশ্বের কোন ক্রীড়ানুষ্ঠানই এর আগে এমন আলোচনার বিষয় হয়নি। জাকর্তায় ভারতীয় দূতাবাসে ইন্দোনেশিয়ার বিশ হাজার বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার উচ্ছৃংখল আচরণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী স্বয়ং নেহরুকেও পার্লামেন্টে বিবৃতি দিতে হয়েছে। একটা বড়রকমের অশুভ আশংকার ইংগিত পেয়ে এসিয়ান গেমস ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং এসিয়ান গেমসের প্রধান প্রবর্তক জি ডি সোন্ধীকে গেমস শেষ হবার আগেই ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছে। তবু ভারতের ক্রীড়া-প্রতিনিধিরা ইন্দোনেশীয় দর্শকদের শ্লেষ ও বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পায়নি। খেলাধুলোর শেষ অনুষ্ঠানের স্বর্ণ-পদক বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলকে দর্শকদের ধিক্কার-ধ্বনির মধ্যে মাথা নীচু করে ক্রীড়াংগন থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। সব চেয়ে পরিতাপের কথা, ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকাকেও লাঞ্ছিত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। খেলাধুলোর একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন সভ্য দেশের বিশ হাজার বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতা একটি মিত্ররাষ্ট্রের দূতাবাসে হামলা চালিয়ে সেখানকার জিনিসপত্র তচনচ করে দিতে পারে, অভ্যাগত ক্রীড়া-প্রতিনিধিদের ধিক্কার দিতে পারে, জাতীয় পতাকার লাঞ্ছনা করতে পারে—এ কথা এতদিন আমাদের জানা ছিল না।

প্রতিবেশী দেশের নওজোয়ানদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং মৈত্রীর বাঁধন দৃঢ় করাই ছিল এসিয়ান গেমসের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এই স্বপ্ন সম্মুখে রেখে, আর অনগ্রসর এসিয়াকে খেলাধুলায় খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর শ্রী জি ডি সোন্ধী এসিয়ান গেমসের প্রস্তাব করে-ছিলেন। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে সেই সোন্ধীই ইন্দোনেশিয়ার চোখে সবচেয়ে 'দুর্জন' ব্যক্তি।

জাকর্তায় এশিয়ান গেমের একজন কর্মকর্তা ফুটবলের বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক চুনী গোস্বামীর গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন। পদকের ডালি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক ইন্দোনেশীয় তরুণী

জাকর্তা গেমসের ঘটনার পর আজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ সংগত কিনা? খেলাধুলার একটা বিশেষ মূল্য আছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের সাফল্যে দেশেরও সম্মান বাড়ে। স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের সময় পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও বলেছেন—'দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী এই সব খেলোয়াড়দের সংগে মিলিত হয়ে আমি গর্ব বোধ করছি।' কিন্তু কথা হচ্ছে, কয়েকটা সোনা, রূপো বা ব্রোঞ্জের মেডেলের জন্য দেশের সম্মান যদি

ভারতীয় প্রতিনিধিদের কৃতিত্বের খতিয়ান

স্বর্ণপদক

(১) ফুটবল টীম
(২) গুরবচন সিং—ডেকাথলন
(৩) তারলোক সিং—১০০০০ মিটার দৌড়
(৪) মহীন্দর সিং—১৫০০ মিটার দৌড়
(৫) মিলখা সিং—৪০০ মিটার দৌড়
(৬) রিলে টীম (৪×৪০০ মি)
(৭) পদম বাহাদুর মল—লাইট ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা
(৮) পদম বাহাদুর মল—(শ্রেষ্ঠ) মুষ্টিযোদ্ধা
(৯) মালোয়া—ফ্লাই ওয়েট মল্লযোদ্ধা (গ্রীকো রোম্যান স্টাইল)
(১০) জি আন্দাসকার—হেভি ওয়েট মল্লযোদ্ধা (গ্রীকো রোম্যান স্টাইল)
(১১) মারুতি মানে—লাইট হেভি ওয়েট মল্লযোদ্ধা (ফ্রি স্টাইল)

রৌপ্যপদক

(১) হকি টীম
(২) ভলিবল টীম
(৩) পারদুমন সিং—ডিসকাস ছোঁড়া
(৪) মাখন সিং—৪০০ মিটার দৌড়
(৫) অমৃত পাল—১৫০০ মিটার দৌড়
(৬) দীনশা ইরানী—শট পাট
(৭) দলজিৎ সিং—৮০০ মিটার দৌড়
(৮) সজ্জন সিং—মিডল ওয়েট মল্লযোদ্ধা (গ্রীকো রোম্যান স্টাইল)
(৯) সজ্জন সিং—(ফ্রি স্টাইল)
(১০) উদয় চাঁদ—লাইট ওয়েট মল্লযোদ্ধা (ফ্রি স্টাইল)
(১১) উদয় চাঁদ—(গ্রীকো রোম্যান স্টাইল)
(১২) মারুতি মানে—লাইট হেভি ওয়েট মল্লযোদ্ধা (গ্রীকো রোম্যান স্টাইল)
(১৩) মারুতি মানে—(ফ্রি স্টাইল)

ব্রোঞ্জপদক

(১) তারলোক সিং—৫০০০ মিটার দৌড়
(২) মিস ডেভেনপোর্ট—বর্শা ছোঁড়া
(৩) যোগীন্দার সিং—শট পাট
(৪) অমৃত পাল—৮০০ মিটার দৌড়
(৫) নারায়ণ মুলে—ব্যান্টাম ওয়েট মল্লযোদ্ধা (গ্রীকো রোম্যান স্টাইল)
(৬) মালোয়া—ফ্লাই ওয়েট মল্লযোদ্ধা (ফ্রি স্টাইল)
(৭) লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে—ওয়েল্টার ওয়েট মল্লযোদ্ধা (ফ্রি স্টাইল)
(৮) "বার্ডি" ডিসুজা—লাইট মিডল ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা
(৯) সুরেন্দ্রনাথ সরকার—মিডল ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা
(১০) হরিচরণ সাহা—স্মল বোর রাইফেল শুটিং

লাঞ্ছিত হয়, সে সোনা, রূপো বা ব্রোঞ্জের মেডেলের মূল্য কি?

কারোই অজানা নেই, রাজনীতির ফলেই জাকর্তায় ভারতের সম্মান নষ্টের চেষ্টা হয়েছে এবং পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট

ভাষায় বলেছেন, এর মূলে ভারতের বৈরী-ভাবাপন্ন দেশের প্ররোচনা আছে। আজ এসিয়ান গেমসের পরিচালকদের এ কথা স্মরণ রেখেই ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। রাজনীতি থেকে ক্রীড়াঙ্গনকে বাঁচাতে হলে। এসিয়ান গেমসের মত এমন একটা বড় জিনিস এবং সারা এসিয়ার এমন আনন্দমেলাকে কোনভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।

শ্রী জি ডি সোন্ধী সেই চেষ্টা করেই পুচকীদের কুখ্যাতি পেয়েছেন কিন্তু সারা বিশ্ব তাঁকে সাধুবাদ জানাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

*

এখন খেলার কথা। এসিয়ার খেলাধূলোয় জাপানের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের কথা কারো অজানা নয়। আগের তিনটি এসিয়ান গেমস থেকে জাপান সব চেয়ে বেশী স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে গেছে. এবারও তার

চতুর্থ এসিয়ান গেমসের পদকের খতিয়ান

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৩	৫৬	২৩
ইন্দোনেশিয়া	১১	১২	২৭
ভারত	১১	১৩	১০
পাকিস্তান	৮	১১	৯
ফিলিপাইনস	৭	৭	২৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৪	৮	১০
মালয়	২	৪	১০
থাইল্যান্ড	২	৫	৪
বর্মা	২	১	৫
সিংগাপুর	১	০	২
সিংহল	০	২	৩
হংকং	০	২	০
কম্বোডিয়া	০	০	১
দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ...	০	০	১
আফগানিস্তান	০	০	১

উত্তর বোর্নিও ও সারাওয়াক কোন পদক পায়নি।

ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং জাপানের এবারকার সাফল্য আরও উজ্জ্বলো জ্জবলতর। বাকি ১৬টি দেশ, যেখানে মোট ৪৮টি স্বর্ণপদক পেয়েছে সেখানে জাপান একাই পেয়েছে ৭৩টি স্বর্ণ-পদক। রৌপ্যপদকেও তাদের সিংহভাগ। তবু সাঁতারে জাপান তাদের প্রথম শ্রেণীর সাঁতারুদের পাঠায়নি। ভারোত্তোলন প্রতি-যোগিতা নাকচ হওয়ায় আরও কয়েকটি পদক থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। মোটের উপর খেলাধূলোর সমস্ত বিষয়েই উদিত সূর্যের দেশ উন্নতির পরিচয় দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার অগ্রগতিও উল্লেখের দাবি রাখে। গতবার টোকিওর এসিয়ান গেমে ইন্দোনেশিয়া পেয়েছিল মাত্র তিনটি ব্রোঞ্জ পদক। কিন্তু এবার নিজেদের মাটিতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে তাদের পদকের সংখ্যা পঞ্চাশ, পদক প্রাপ্তির তালিকায় দ্বিতীয় স্থান।

এসিয়ার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিক হিসাবে সম্মানিত ভারতের লাইটওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা পদম বাহাদুর মলের (ডান দিকে) মুষ্টিযুদ্ধের দৃশ্য

ম্যানিলা বা টোকিওর এসিয়ান গেমসের তুলনায় ভারতের ফলাফল এবার সন্তোষ-জনক। টোকিও থেকে ভারতের প্রতি-নিধিরা এনেছিলেন পাঁচটি স্বর্ণ, চারিটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক। কিন্তু জাকর্তা থেকে ১১টি স্বর্ণ, ১৩টি রৌপ্য ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদক ভারতের ক্রীড়া-প্রতিনিধিরা ঘরে নিয়ে ফিরেছেন। এ সম্বন্ধে সামগ্রিক পর্যালোচনা স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্যে সম্ভব নয়। ভারতীয় প্রতিনিধিদের পদক প্রাপ্তির খতিয়ান থেকে তাদের সাফল্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে। তবুও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

সব চেয়ে কৃতিত্ব এবার ভারতের মুষ্টি-যোদ্ধা ও মল্লবীরদের। এঁদের কেউই খালি হাতে ফেরেননি। উপরন্তু লাইট ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা পদম বাহাদুর মল এসিয়ার শ্রেষ্ঠ মুষ্টিকের সম্মান পেয়েছেন। রাইফেলের একমাত্র প্রতিনিধি হরিচরণ সাহাও এনেছেন একটি পদক। ইন্টার-ন্যাশনাল প্রধান খেলায় ভারতীয় ভলিবল টীমের রৌপ্য পদকলাভ প্রশংসার যোগ্য। আর সাধুবাদ প্রাপ্য স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের। সব চেয়ে দুঃখ-জনক হকির ফাইন্যাল খেলায় পাকিস্তানের কাছে ভারতের আবার পরাজয় স্বীকার।

বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা ভারত সর্ব-প্রথম টোকিও এসিয়ান গেমে পাকিস্তানের কাছে পরাভব স্বীকার করে লীগ প্রথার খেলায় গোল অ্যাভারেজের বিচারে। তারপর রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছেই হার স্বীকার করে বিশ্ব হকির বিজয়ীর সম্মান ভারতের হাতছাড়া হয়ে যায়। তারপরও সন্দেহ ছিল হকিতে কোনটি বিশ্বের এক নম্বর দেশ? ভারত, না পাকিস্তান? এবার সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে, যদিও জাকর্তায় ভাগ্যদেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না।

প্রথম এসিয়ান গেমের ফুটবল বিজয়ী ভারত দীর্ঘ ১১ বছর পরে আবার বিজয়ী হয়ে এসিয়ার ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছে। ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল ও হকির বিশদ পর্যালোচনা পাঠক-গণ নিশ্চয়ই আশা করেন। কিন্তু সেটা পরের সপ্তাহে।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

ঝর্ণা ভড়

অপর্ণা, সুপর্ণা, ঝর্ণা, শ্রীপর্ণা—চার বোনকে নিয়েই একটি রিলে টীম হতে পারে। দাদা তারক ভড়কে ওদের সঙ্গে জুড়ে দিলে ভাগেযোগে ওরা নাম দিতে পারে পেণ্টাথলন ইভেণ্টে। অবশ্য সাঁতারে যদি পেণ্টাথলনের ব্যবস্থা হয়।

আর যদি খেলাধুলোর পাঁচটি বিষয় নিয়ে কোন নতুন পেণ্টাথলনের ব্যবস্থা থাকত তবে ঝর্ণা একাই হতে পারত তার প্রতিযোগী। সাঁতার, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, বাস্কেটবল, ব্যাডমিণ্টন ও টেবল টেনিস—পাঁচরকমের খেলাধুলাতেই ঝর্ণার দখল।

ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে আহরিত শ'খানেক কাপ মেডেল ও খানপঞ্চাশেক প্রশংসাপত্রের মধ্যেই এইসব খেলাধুলোয় ওর কৃতিত্বের পরিচয় মেলে।

যখন স্কুলে পড়েছে তখন ঝর্ণাকে নিয়ে গর্ব করেছে 'সেণ্ট মার্গারেটের' মেয়েরা। খেলাধুলোয় তাদের বেস্ট গার্ল। যখন কলেজের ছাত্রী তখন গর্ব স্কটিশ চার্চ কলেজের। খেলাধুলোয় কলেজের সর্ববিদ্যা বিশারদ মেয়ে। যখন ন্যাশন্যাল সুইমিং ক্লাবে তখন তাদের সাঁতারের সেরা মেয়ে। যখন জাতীয় যুব সঙ্ঘে তখন ঝর্ণা দৌড়-ঝাঁপে সঙ্ঘের প্রধান প্রতিযোগিনী।

১৯৫৬ সালের আন্তঃকলেজ খেলাধুলোর চৌকস মেয়ে ঝর্ণা ভড়

১৯৫৬ সালের আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে বর্শা ছোড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করছেন ঝর্ণা ভড়

ঝর্ণা ভড়ের প্রথম অনুরাগ সাঁতারে। পরে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে। শেষে আর আর খেলাধুলোয়। দাদা তারক ভড় ন্যাশন্যাল সুইমিং ক্লাবের সাঁতারু ও ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে প্রতিনিধিত্ব করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। দিদি অপর্ণা এবং সুপর্ণা সাঁতারে সুপটু। ঝর্ণা কেন পিছিয়ে থাকবে? দাদা এবং দিদিদের মত ও-ও ভর্তি হল ন্যাশন্যাল সুইমিং ক্লাবে মাত্র ৮ বছর বয়সে। হেদোর জলে সাঁতার কাটে। জলের পাড়ে জাতীয় যুব সঙ্ঘের মাঠে করে দৌড় ঝাঁপ। বাবা রাজেন্দ্রনাথ ভড় উৎসাহ দেন। অনেক সময় নিজেই ওদের ক্লাবে নিয়ে যান। হেদোর কাছেই বাড়ি। ১২৫-এ মানিকতলা স্ট্রীট থেকে হাঁটা পথে হেদোর দূরত্ব দু'মিনিটের বেশি নয়।

লম্বা গড়নের পাতলা মেয়ে। অল্প দিনেই সাঁতার ও দৌড়ে ঝর্ণার কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। লম্বা লম্বা হাতে জল টেনে তরতর করে হেদোর বুকে ভেসে বেড়ায়। লম্বা পায়ে স্টেপিংয়ে দৌড়ের পাল্লায় সমবয়সীদের পেছনে ফেলে। ফলে ছোট ছোট স্পোর্টস আর সাঁতারের জুনিয়র ইভেণ্টে ঝর্ণার প্রথম স্থান থাকে বাঁধা। ইণ্টার স্কুলের ক্রীড়ানুষ্ঠানেও দুই বিষয়ে ওর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঝর্ণার যখন সিনিয়র সাঁতারুর মর্যাদা আরতি সাহা তখন বাঙলার সাঁতার ক্ষেত্রের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। আরতির সঙ্গে পাল্লায় কোনদিনই পেরে ওঠেনি ঝর্ণা। তবে ভারতী সাহা সাঁতারে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আগে পর্যন্ত সেণ্ট্রাল, ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল অ্যামেচার প্রভৃতি সাঁতারের প্রতিযোগিতায় ঝর্ণা ছিল বাঙলার দুই নম্বর মেয়ে।

সাঁতারের চেয়ে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসেই ঝর্ণার প্রতিষ্ঠা বেশী। সেণ্ট মার্গারেট থেকে ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার পর স্কটিশে ভর্তি এবং স্পোর্টস অঙ্গন থেকে দুহাত ভরে পুরস্কার আহরণ।

স্কটিশের গেম টিচার বললেন কেবল জলে এবং স্থলে কৃতিত্ব দেখালে চলবে না, অন্তরীক্ষেও অসাধারণ হতে হবে। সুতরাং আরম্ভ হল অনুশীলন। বি টি কলেজের মাঠে হাইজাম্পের প্র্যাকটিসের সময় হাঁটুতে চোট লাগল, হাইজাম্প আর করা হল না। তবু অন্তরীক্ষের কলা কৌশলে এগিয়ে গেল ঝর্ণা ভড়। ডিসকাস, জ্যাভেলিন ও শটপাটে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠলো। বাস্কেটবল, ব্যাডমিণ্টন এবং টেবল টেনিসেরও অনেক পুরস্কার হাতে এল। বেশীর ভাগই কলেজের খেলাধূলোর।

১৯৫৪, ৫৫ ও ৫৬, পর পর তিন বছর ইণ্টার কলেজ অ্যাথলেটিকসে চ্যাম্পিয়ন-শিপের গৌরব একটুর জন্য ঝর্ণার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে ১৯৫৬ সাল ওর ক্রীড়াজীবনের গর্বের বছর। ঐ বছর স্কটিশ চার্চ কলেজের নানা খেলাধূলোর নানা পুরস্কার তো পেয়েছেই, ছাত্রীদের মধ্যে অলরাউণ্ড বেস্ট এথেলিটের কলেজ কলার্সও ঝর্ণার হাতে এসেছে। সঙ্গে ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের জ্যাভেলিন ও ডিসকাস ছোড়ার দুটি প্রথম পুরস্কার। উইমেনস স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত রাজ্যের মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের কলেজ ইভেণ্টে জ্যাভেলিন ও ডিসকাসের প্রথম পুরস্কারের সঙ্গে শটপাটের দ্বিতীয় পুরস্কার। ক্রুশের কাজ ও আলোকচিত্রের জন্য সব পেয়েছির আসর থেকে আহরিত কয়েকখানা প্রশংসাপত্র এবং আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার জন্য আরও তিন চারখানা সার্টিফিকেটও ১৯৫৬ সালের সংগ্রহ। গ্রীন সার্কেল ক্লাবের হয়ে এলাহাবাদে বাস্কেটবল খেলতে যাওয়াও এই বছরের ঘটনা।

এরপর খেলাধূলোয় আর তেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই। ১৯৫৮ সালে বি এ পাস করবার পর খেলাধূলোয় একরকম ছেদ পড়েছে। তবে ল' কলেজের বার্ষিক স্পোর্টসে ছাত্রীদের দৌড়ে যে একটি মাত্র বিষয় ছিল ১৯৫৯ সালে তার ফার্স্ট প্রাইজ ঝর্ণারই হাতে এসেছে। কর্মপ্রতিষ্ঠান সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের বার্ষিক স্পোর্টসেও মেয়েদের বিষয়ের কোন ফার্স্ট প্রাইজ ঝর্ণার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

ঝর্ণা এই বছরই (১৯৬২) ল'য়ের ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। ক্রীড়াজীবনে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে মেয়েটি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে কর্মজীবনে আইনের আঙিনায়ও সে কৃতিত্ব দেখাতে চায়।

দেশী সংবাদ

৩রা সেপ্টেম্বর—পূজোর বাজার পুরোদমে শুরু হইতে না হইতেই ধুতি শাড়ির দর মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে শালিমার রেল ইয়ার্ডে কাপড়ের পাহাড় গড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়ার্ডে নয় ওয়াগন এবং গুদামে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার গাঁট কাপড় জমা হইয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল ডেপুটি কমিশনার পদে তিনজন সরকারী অফিসার নিয়োগের জন্য কমিশনার স্ট্যাডিং ফিন্যান্স কমিটির নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের অর্ডিন্যান্সবলে আপাতত ৩ বছরের জন্য ঐ নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—অদ্য সকালে তৃতীয় শ্রেণীর মাসিক টিকেটধারী জনৈক ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার অপরাধে শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনে ধরা পড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শিয়ালদহ অঞ্চলে ছাত্র-পুলিসে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সমাজবিরোধী শ্রেণী সক্রিয় ভূমিকায় অবতরণ করে। ইহার ফলে ১৩খানি ট্রাম, ১টি পুলিস ভ্যান ভস্মীভূত, ১টি বাস গুমটি দগ্ধ, ২০০জন গ্রেপ্তার, ২২০জন অল্প বিস্তর আহত (তার মধ্যে ৬০জন পুলিস) এবং কয়েকজন হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। ঐ অঞ্চলে একটি দোকান লুটেরও সংবাদ পাওয়া যায়।

৫ই সেপ্টেম্বর—মঙ্গলবারের হাঙ্গামায় "পুলিসের নির্মম অত্যাচারের" প্রতিবাদে আজ দুপুরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ট্রাম পোড়ানোর ঘটনাকে "অবাঞ্ছনীয়" আখ্যা দিয়া "পুলিসী অত্যাচারের পূর্ণ বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তিবিধান" এবং অবিলম্বে ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবি করা হয়।

গতকাল মধ্য রাত্রিতে ডোমজুড় থানার বেগড়ী ইউনিয়নের শাখারিদহ গ্রামের এক বাড়িতে তিনজনকে টাঙ্গি দ্বারা কোপাইয়া নৃশংসভাবে হত্যা এবং গৃহস্বামী সহ আরও তিনজনকে গুরুতররূপে আহত করিয়া ২০।২৫ জনের এক ডাকাত দল নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় সাত হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয় বলিয়া এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর—অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের এক সভায় অভিযোগ করা হয় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের দেওয়া ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে নূতন গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজগুলি বিঘ্নিত হইয়াছে।

৭ই সেপ্টেম্বর—আজ নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, পশ্চিম বাংলার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মূলে যে-সব সমস্যা রহিয়াছে তন্মধ্যে জনসংখ্যার চাপ, জমির অভাব, বেকার সমস্যা, আংশিকভাবে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের সমস্যা, কলিকাতা শহরের সমস্যা এবং বন্দরের

সাপ্তাহিক সংবাদ

শোচনীয় অবস্থা প্রধান।

কলিকাতা কর্পোরেশনে একাধিক সরকারী কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে গতকাল পৌরসভার অধিবেশনে আলোচনা হয়। বিরোধী দলের সদস্যগণ ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন—ইহা গণতন্ত্রবিরোধী।

৮ই সেপ্টেম্বর—অদ্য কাঁকিনাড়া স্টেশনে দুপুর বেলা কয়েকজন দুর্বৃত্ত এ এস এম-এর নিকট হইতে দুইটি টাকার থলি ছিনাইয়া লয়। থলি দুইটিতে নগদ ও রেলের ক্রেডিট নোটে প্রায় ২৫ হাজার টাকা ছিল। নিমেষের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে।

১৯৬১ সালে যে দশখানি সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা এক লক্ষ বা তদধিক ছিল বলিয়া প্রেস রেজিস্ট্রার তাঁহার রিপোর্টে ঘোষণা করিয়াছেন তন্মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ১০২০০৬।

৯ই সেপ্টেম্বর—শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই অদ্য পশ্চিমবঙ্গের নতুন অর্থ ও পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারকালে বলেন, "গত কয়েক বছরে রাজ্যে জমি এবং ফসলের দাম কয়েক গুণ বাড়িয়াছে; অথচ গত কয়েক যুগের মধ্যে ভূমি রাজস্বের হার এক পয়সাও বাড়ে নাই। এ ব্যাপারটা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।"

ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পত্নী শ্রীমতী রাজবংশী দেবী আজ পাটনায় তাঁহার ছাজুবাগস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

৩রা সেপ্টেম্বর—এশীয় ক্রীড়া সংঘের দুই সদস্য জাতীয়তাবাদী চীন ও ইজরায়েলকে চতুর্থ এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এশীয়ান গেমসের নাম পরিবর্তনের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসোন্ধির প্রস্তাব সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় জনগণের বিক্ষোভ আজ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। কয়েক হাজার লোকের একটি উচ্ছৃঙ্খল জনতা জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাসে হানা দিয়া মূল্যবান শিল্প সামগ্রী, আসবাব, বাগান ইত্যাদি ধ্বংস করে।

পারস্যের প্রধানমন্ত্রী ডঃ আসাদুল্লা আলম আজ রাত্রিতে দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, পশ্চিম ইরানে ভূমিকম্পের ফলে হতাহতের সংখ্যা ২০ হাজারেরও বেশী হইবে বলিয়া ত্রাণকার্যে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী জানাইয়াছেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—গত সন্ধ্যায় ঢাকার নিকটস্থ টঙ্গীতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিস গুলী চালায়। উহার ফলে একজন মিল-শ্রমিক নিহত ও বহু লোক আহত হয়।

আজ জাপানের একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাসে হাঙ্গামার জন্য ইন্দোনেশীয় সরকারকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। ইন্দোনেশিয়ান পুলিস ও টহলদারী গাড়িসমূহ দূতাবাস আক্রমণের সময় আক্রমণকারীদের পুরোভাগে থাকায় এই হাঙ্গামা আরও "জঘন্য" হয় বলিয়া উক্ত সংবাদপত্র বলে।

৫ই সেপ্টেম্বর—সর্বোদয় নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে শ্রীআশা দেবী আর্যনায়কম ও তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচর্যাকারীদের মধ্যে চারজনকে সঙ্গে লইয়া ভোর ৫টা ৩৭ মিনিটের সময় পাকিস্তানে পদার্পণ করেন।

গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত এবং আমেরিকা হইতে পলাতক ডঃ রবার্ট সোবলেনকে কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অস্বীকার করিয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার আউংগী বলেন যে, মূলধন না লইয়া যে সকল বিদেশী ব্রহ্মদেশে আসিয়াছেন, অর্থ সঙ্গে নিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে ফিরিতে দেওয়া হইবে না।

রাজনৈতিক ব্যুরোর সেক্রেটারী জেনারেল মঃ মহম্মদ খিদার আজ আলজিয়ার্সে ঘোষণা করেন যে, সকলের সম্মতিক্রমে আলজিরিয়ার সমস্যার একটি চূড়ান্ত সমাধানে উপনীত হওয়া গিয়াছে।

৭ই সেপ্টেম্বর—কিউবায় কমুনিস্ট সামরিক শক্তি সমাবেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য বিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় প্রেসিডেন্ট কেনেডী আজ দেড় লক্ষ রিজার্ভ সেনাকে কার্যক্ষেত্রে হাজির থাকিবার নির্দেশদানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

লাওস চীনের কমুনিস্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় কুয়োমিন্টাং চীন আজ লাওসের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটাইয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লণ্ডনে বলেন যে, বৃটেন ইউরোপের সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে—বিশেষ করিয়া ইহা যদি কোনওরূপ রাজনৈতিক সংঘে পরিণত হয়, তাহা হইলে কমনওয়েলথ দুর্বল হইয়া পড়িবে।

চলতি সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল, খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলায় ছাত্র আন্দোলনকারীদের উপর পুলিস কয়েকবার লাঠি চালায়। ফলে এই তিনটি জেলায় কয়েক শত ছাত্র আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৯ই সেপ্টেম্বর—কুওমিন্টাং চীনের আমেরিকায় নির্মিত একটি ইউ—২ বিমান আজ পূর্ব চীনের আকাশে অবৈধভাবে উড়িয়া আসিলে গণমুক্তি ফৌজের বিমান বাহিনীর একটি ইউনিট উহাকে ভূপাতিত করে।

ম্যাকমিলান সরকার যে সব শর্তে বৃটেনের কমন মার্কেটে যোগদানে রাজী হইয়াছেন—বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা শ্রীহিউ গেটস্কেল গত রাত্রে সেগুলি সরাসরি খারিজ করিয়া দেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও এই ব্যাপারে শ্রীগেটস্কেলের সহিত পুরাপুরি একমত।

সম্পাদক—**শ্রীঅশোককুমার সরকার** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

Kish

145 Rash Behari Avenue,
Calcutta-29

বৈজ্ঞানিকদের জীবনী

এলবার্ট আইনস্টাইন ... ২·০০

(অধ্যাপক সত্যেন বসুর ভূমিকাসহ)

নিকোলা টেসলা ২·০০

(A. C. বিদ্যুৎ-এর আবিষ্কারক)

রবার্ট ফুলটন ১·৫০

(বাষ্পীয় পোত আবিষ্কর্তা)

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
,৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

শা র দী য়

গন্ধর্ব

মহালয়ার পূর্বে বের হচ্ছে
াম : আড়াই টাকা ● ডাকে তিন টাকা
৫টি পূর্ণাঙ্গ ১টি একাঙ্ক ছাড়া
ন্দু মিত্র (নবনাট্য আন্দোলনের সম্পর্কে), ীন্দ্রনাথ রায় (নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী), র্গন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আমেরিকার নাটক), জর পাঠক (যাত্রার ইতিবৃত্ত), সৌম্যেন্দ্র াঙ্গোপাধ্যায় (স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা নাটক), নৃপেন্দ্র সাহা (নবনাট্যর স্বরূপ ন্ধান), সোমেন্দ্র নন্দী (স্লিপ্ডবার্গ), জের. হেস্ট (বার্লিনার আঁসেম্বল) প্রভৃতি।
পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদশিল্প। একরঙা ও রঙীন আলোকচিত্র। স্কেচ কার্টুন।

গন্ধর্ব। ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট। কলি ১২
স্থানীয় পরিবেশক :
পারিজা ব্রাদার্স (কলেজ স্ট্রীট জং)
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ

(সি-২২৯৭)

নিশাচরের

রুদ্ধ-নিশ্বাসে পড়বার মতো রহস্য-উপন্যাস

সদানন্দের উইল ৩॥

রা য় বা ড়ি সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৲

কু ন্তী বা ঈ তৃতীয় মূদ্রণ ৪॥

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

অনন্য

শারদীয় সংখ্যার সূচী

প্রবন্ধ : অন্নদাশংকর রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিতাভ চৌধুরী, ক্ষিতিমোহন সেন ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

রম্যরচনা : সুবোধ ঘোষ

গল্প : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, কমলকুমার মজুমদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, বিমল মিত্র, রূপদর্শী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সমরেশ বসু ও সন্তোষকুমার ঘোষ

দু টি উ প ন্যা স

ভ্রান্তিবিলাস । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
ফর হুম দি বেল টোলস্ । আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

বিভাগীয় রচনা : কৌতুক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন, কাচের স্বর্গ, সেণ্টিমেণ্ট, কাঁটা দিয়ে কাঁটা, কৌতুককণা, দেবীচাঁদের প্রতিহিংসা, জব চার্ণক, পশুপালির মায়া নেকড়ে, (ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন) চিন্তার বদলে অধ্যয়ন ও সোফিয়া লরেন (পেজেন্ট), সমুদ্রের বিস্ময় (লাইফ), পরিপূর্ণ বিকাশের পথ (ইয়োর লাইফ), দেহবিন্যাস ও খাদ্য গ্রহণ (করোনেট), অরণ্যের চাবি (রীডার্স ডাইজেস্ট) ও মরা হাতির দাম বাড়ছে (ইংলিশ ডাইজেস্ট) ইত্যাদি।

এ-ছাড়া বহু ছবি, কার্টুন, আলোকচিত্র এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ
সে প্টে ম্ব রে র শে ষ স প্তা হে প্র কা শি ত হ বে
আড়াই শো পৃষ্ঠার লাইনো টাইপে মুদ্রিত বই। মূল্য : ২·০০

৭৯/৫বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা ১৪ । ফোন : ২৪-৫৭৮২

সূচীপত্র

রূপমতী নগরী

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"এক অঙ্গে এত রূপ"। একমাত্র ভারতে যে রূপ আছে, যে বৈচিত্র্য যে ঐশ্বর্য আছে, যে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার প্রাচুর্য আছে—পৃথিবীর অন্য কোথাও তা নেই।

হৃদয়বান লেখক অমিয়কুমার ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ও মন্দিরের সেই রূপ উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনী রূপমতী নগরী-তে।

এ-বই শুধু কাহিনী নয়, এ-বই এক অপূর্ব সুন্দর ছবি। ৩২টি আর্ট প্লেটের সাহায্যে লেখক কাহিনীগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন—পাঠকের মনে পুস্তকবর্ণিত স্থানগুলিকে দেখার ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছেন।

শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন :

"......অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়ের তোলা আলোকচিত্রের প্রতিচিত্র অজস্র দেখেছি। ভারতবর্ষের অসংখ্য স্থানে তিনি গেছেন ও সকলের চোখে সচরাচর যা পড়ে না তাঁর ক্যামেরার সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাকে ধরেছে।......প্রধানত ও প্রথমত তিনি আলোকচিত্রী।......তিনি বাংলা পত্রিকায় সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী লিখতেও পটু।......এইসব রচনার চিত্রমূল্য তো আছেই, সাহিত্য-মূল্যও কম নয়।......সুন্দর হয়েছে সেইসব লেখনীচিত্র। আমি উপভোগ করেছি।......তাঁর মতো যুগলকলাবিদ্ বিরল।"

অনিন্দসুন্দর প্রচ্ছদ শোভিত এই ভ্রমণ কাহিনীর দাম : ৪·৫০

'আনন্দধারা প্রকাশন' ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অতিরিক্ত বিক্রয় কেন্দ্র : সান্যাল এন্ড কোম্পানী, ১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

প্রতিভাবালা বর্ধন প্রণীত

আলিম্পন

লোককলা আলপনা শিল্প অনুশীলন-কারীদের পক্ষে অপরিহার্য সচিত্র পুস্তক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি. পি. আই. কর্তৃক প্রাইজ বই ও লাইব্রেরী বই হিসাবে অনুমোদিত। অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী, দেবপ্রসাদ ঘোষ নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত অজিত মুখার্জী মহোদয়গণের আশীর্বাদ-প্রাপ্ত এবং আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত-বাজার, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, যুগবাণী, অমৃত, প্রবর্তক, জনসেবক প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

মূল্য—রাজ সংস্করণ ২·৫০ নঃ পঃ
সুলভ সংস্করণ ১·৫০ নঃ পঃ

প্রাপ্তিস্থান :

সেন ব্রাদার্স এন্ড কোং

১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পূজার শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন

মোহন সিরিজ

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মাণী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন ইত্যাদি। ২০৬ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ২

পূজার অবসর সুখময় করতে পড়ুন

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রনাথের গল্প

ও বাংলার সমাজ

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমুদয় গল্পের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে বাঙলা তথা বিশ্বের মানব মনের শাশ্বত বৈচিত্র্য আপনার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ন্যায় ফুটে উঠবে। মূল্য ৬

৪২-বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত

পূজা সংখ্যা—সচিত্র শিশির

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ—

বহু খ্যাতনামা লেখকের গল্প, কবিতা, রচনা ও চিত্রাবলী। এতদ্ব্যতীত পড়ুন—

কল্যাণ সেন রচিত

'পুণ্য পথের যাত্রী' (সম্পূর্ণ)

রোমাণ্টিক ও রোমাঞ্চকর রম্যরচনা।

মূল্য ১·২৫ টাকা মাত্র।

এজেন্টগণ কত কপি দরকার জানিয়ে অবিলম্বে অর্ডার সহ টাকা পাঠান— নতুবা বিলম্বে হয়তো কাগজ স্টকে নাও থাকতে পারে।

সাধারণ পাঠকেরা অনূন দশ টাকার বই একসঙ্গে নিলে ডাকব্যয় লাগবে না।

শি শি র পা ব লি শিং হা উ স

২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 22nd September 1962

২৯ বর্ষ ॥ ৪৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া প
শনিবার, ৫ আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গ

আশ্বিনের শুরু। আকাশে বাতাসে শারদীয় উৎসবের আনন্দময় আভাস। বর্ষার পালা যাই-যাই করে যদিও এখনও একেবারে শেষ হয়নি, ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি-ধোয়া আকাশে তবুও শরতের উজ্জ্বল নীল নয়নাভিরাম দৃশ্যপটখানি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। এর পর পরিপূর্ণ শরতের অরুণ আলোর অঞ্জলি দিয়ে আগমনী-বন্দনা। বর্ষে বর্ষে প্রকৃতির পট-পরিবর্তনের, ঋতুবদলের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের জাগরণও যেন এক তারে, এক সুরে বাঁধা। শরতের রোদের সোনা কেবল দিকদিগন্তে ছড়ানো নয়, মানুষের মনও সেই সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে ওঠে নবীন আনন্দে। আশ্চর্য নয়, শরৎ-প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ পরমরমণীয় পরিবেশে যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে বাংলা ও বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ-উৎসবে যেমন জগজ্জননীর আরাধনায় লক্ষ লক্ষ ভক্তহৃদয় নিয়োজিত, তেমনি পরস্পর স্নেহ-প্রীতি মমতা ও সামাজিক সৌভ্রাত্রবোধের অনাবিল প্রকাশমাধুর্যেও বাঙ্গালীর শারদীয় উৎসবের সমতুল বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোনও উৎসব অনুষ্ঠানই নয়।

প্রতিবৎসরের মত এবারও ভাদ্রের শেষ ও আশ্বিনের শুরু থেকে শারদীয় উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। শহর ও মফঃস্বল সর্বত্রই ঘরে ঘরে, অফিসে কলকারখানায়, রাজপথে সকলের মুখে এক কথা—পুজো আসন্ন। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব, দীর্ঘতম কর্মাবকাশ। পুজোর বাঁশী ও ছুটির বাঁশীর আগমনীতান নীল আকাশ ছাপিয়ে, দিগন্ত ছুঁয়ে, ঘরে ঘরে ছোট বড়, উচ্চ নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলের মনে জাগিয়ে তুলছে উৎসবের সাড়া; পথের মোড়ে মোড়ে ঘোষিত হচ্ছে শারদীয় উৎসবের আনন্দময় আমন্ত্রণ।

পুজোর মরশুম

রাজপথে ভিড়; দোকানে, বাজারে আলোকসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদের লোভনীয় সমাবেশ। পুজোর বাজার; জিনিসপত্রের দাম যাই হোক, অর্থসামর্থ্য যার যাই থাকুক, বৎসরের এই সময়টিতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কিছু কেনাকাটার উদ্যোগ চাই-ই চাই। আবহমান কাল ধরে পালিত হচ্ছে এই সামাজিক রীতি। মাতৃপুজোর প্রেরণা যেমন সর্বজনীন, ঘরে ঘরে, প্রতিটি পরিবারে শারদীয় উৎসবানন্দের আয়োজনে সাধ্যমত অংশ-গ্রহণের তাগিদও তেমনি সকলেরই।

কথা এই যে, বাঙ্গালীর বহুবিড়ম্বিত জীবনে স্বচ্ছন্দে সাধ্যমত উৎসব উপভোগের প্রয়াসও একটা বিড়ম্বনা। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র একেই দুর্মূল্য, তারপর পুজোর মরশুমে বাজার আরও গরম। প্রতিবৎসরই এই হয়। ক্রেতারা নিরুপায়; পুজোর বাজারে কিছু কেনা-কাটা না করলেই নয়। ছোট ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক-আশাক, মেয়েদের শাড়ি, পুরুষদের ধুতি ইত্যাদি—এমন কিছু শৌখিন বিলাস-সামগ্রী নয়। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক পরিবারেই এ-সব কেনা হয় সারা বৎসরের প্রয়োজনে পুজোর সময়। পুজোর বাজারে কেনাকাটায় গড়পড়তা বাঙ্গালী পরিবারে যা খরচ হয়, তার শতকরা আশী-নব্বুই ভাগই জামাকাপড় বাবদ। মরশুমের মওকা বুঝে ব্যবসায়ীরা যদি জামাকাপড়ের দাম চড়িয়ে দেন, তাহলে স্বল্পবিত্ত পরিবারের পক্ষে উৎসবযাপনটা হয়ে পড়ে একটা বিষম বোঝা। এবারও তাই হচ্ছে। কলকাতার এবং শিল্পাঞ্চলের কর্মরত নাগরিকদের হাতে তবুও পুজোর সময় 'বোনাস' ইত্যাদি নানাসূত্রে কিছু বাড়তি টাকা আসে; তাঁরাই অনেকে যখন এবার পুজোর বাজারে পারিবারিক ও সামাজি[ক] দায় মিটাতে হিমসিম, তখন মফঃস্বলে[র] গ্রামাঞ্চলের স্বল্পবিত্তদের উৎসব-সং[...] কী পরিমাণ ক্লেশকর হতে পারে[...] সহজেই অনুমান করা যায়।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎস[...] উদ্যোগ-পর্বে প্রতিবারই কেন এ[...] বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়, সে-প্রশ্নের সদু[...] কোন তরফ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে [...] খুচরা কাপড়ের ব্যবসায়ীদের অভিযো[...] তাঁরা পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থে[...] পর্যাপ্ত পরিমাণে ধুতি-শাড়ি ইত্য[...] পাচ্ছেন না। পাইকারী ব্যবসায়ী[...] নালিশ কখনও গভর্নমেণ্টের এ[...] রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, কখনও আ[...] মিলওয়ালাদের বিরুদ্ধে। গলদ যেখ[...] এবং যারই হোক, তার ফল ভোগ ক[...] পুজোর বাজারে স্বল্প-সম্বল ক্রেতা[...] ধুতি-শাড়ি ইত্যাদির দর জোড়াপ্র[...] গড়ে এক টাকা মত বেড়েছে; আ[...] বাড়লে কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দে[...] ছাড়া ক্রেতাদের অন্য কোনও উপায় নে[...] গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে বলা হ[...] দর বৃদ্ধির সঙ্গত কারণ নেই, কি[...] গভর্নমেণ্টেরও এ-বিষয়ে বিশেষ কি[...] করবার নেই। কাপড়ের দাম গভর্নমে[...] বেঁধে দিয়েছেন এবং নির্ধারিত ম[...] কাপড়ের গায়ে ছাপারও নির্দে[...] দিয়েছেন—সুতরাং এর পরও যদি ছ[...] দামে কাপড় না মেলে কিম্বা মি[...] ওয়ালারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাপড়ে উৎ[...] কাপড়ের দাম ছাপ মেরে বাজারে ছ[...] তাহলে গভর্নমেণ্ট নিরুপায়। সরক[...] মহল থেকে যথারীতি পরামর্শ দে[...] হয়েছে, বেশী দামে কেনাকাটা বন্ধ [...] জন্য ক্রেতারা সংঘবদ্ধ হোন। পর[...] ভালো, কিন্তু বারবার ঠেকে ঠেকে [...] গেছে এতে কাজ হয় না। কেনাকাটা[...] করলে আর যাই হোক, উৎসব সমারো[...] উদ্যোগ সংকটমুক্ত হবে না।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন ক্রেতাদের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার উপদেশ দিয়েছেন।

ক্রেতারা শ্রীসেন-এর নৈতিক সমর্থনের মূল্য দিতে পারে।

দ্রব্যমূল্য

ক্রেতা

প্রাইভেট সেক্টর

ডিফেন্স প্রডাকশন

সম্প্রতি 'সুব্রত' ঝড়ের মুখে পড়েছিল।

কিন্তু এরকম ঝড়ের আক্রমণে সে অভ্যস্ত।

কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রব্যমূল্যনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে।

অবশেষে ডিম ফুটলো কিন্তু বাচ্চা কোথায় ?

কেন্দ্রীয় মূল্যনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

Kutty

বৈদেশিকী

গতবারের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যে প্রসঙ্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি হই-চই সৃষ্টি হয়, সেটা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পৈশাচিক বর্ণবৈষম্যের নীতির প্রতি কমনওয়েলথ-এর অন্য সদস্যদের—বিশেষ করে অ্যাফ্রো-এশীয় সদস্যদের—তিরস্কার ডঃ ভেরউর্ড বরদাস্ত করতে রাজী না হয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। যে-কমনওয়েলথ-এ কালা সদস্যদের সংখ্যাই বেশি হয়েছে এবং আরো হবে, সে-কমনওয়েলথ-এর সংস্পর্শ ত্যাগ করতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান শাসকগণ নিজেরাই আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। কমনওয়েলথ-এর বাইরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রয় উইলেন্স্কি প্রভৃতি শ্বেত প্রাধান্য রক্ষায় ধ্বজাধারীদের কুকর্মের সহযোগিতা করা আরো সহজ হয়েছে। কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্তব অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। বর্ণবৈষম্য নীতির দরুণ কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার লেনদেন অনেক আগেই সংকোচিত বা একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর যাদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার লেনদেন ছিল, তাদের সঙ্গে প্রায় আগের মতোই আছে, যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে বৃটিশ সহযোগিতা কার্যত একটুও কমেনি। কোনো কোনো বিষয়ে আইনের কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে মাত্র।

কমনওয়েলথ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা বেরিয়েই গিয়ে থাক অথবা তাকে বার করেই দেওয়া হয়ে থাকুক, কমনওয়েলথ-এর অন্য সদস্যেরা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কে কিরূপ ব্যবহার করবে, সেবিষয়ে কিছু বলা বা করার উপায় নেই। বস্তুত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধে "কমনেস্" বা এক-রূপতা ছিল না; যেটুকু ছিল, তাও ক্রমশ কমে আসছে। একমাত্র বৃটেন কতকগুলি বিষয়ে অন্য কমনওয়েলথ দেশগুলির সঙ্গে মোটামুটি এক রকম সম্বন্ধ রক্ষা করে আসছিল। তারও ব্যতিক্রম আরম্ভ হয়েছে। বৃটেনে অবাধ প্রবেশের যে-রীতি এতকাল প্রচলিত ছিল, সেটা আইনের দ্বারা সংকুচিত হয়েছে। এই আইনে অবশ্য আক্ষরিকভাবে বা স্পষ্টভাবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কিছু করা হয়নি, কিন্তু কার্যত এই আইন যে বিশেষ করে কালাদেরই বৃটেনে প্রবেশ ও বসবাসের সুযোগ হরণ করেছে বা একান্তভাবে সংকুচিত, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৃটেনের দিক থেকে কমনওয়েলথ-এর বৈশিষ্ট্য রক্ষার কথা তুললে এই আইনকে নিশ্চয়ই প্রতিকূল বলতে হবে, তাও ছাড়া বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ তো করাই যায়।

যাই হোক, এখন এর চেয়েও একটা বড়ো সমস্যা কমনওয়েলথ-এর সামনে উপস্থিত। এবারকার কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী

সম্মেলনের সেইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল। সেটা হচ্ছে বৃটেনের "ইউরোপীয়ান্ কমন মার্কেটে" যোগদানের প্রশ্ন। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড এবং লুকসেমবুর্গ—এই ছ'টি রাষ্ট্র নিয়ে আপাতত ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট। এই কমন মার্কেটের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য অবাধ—শুল্কের বেড়া নেই। এই কমন মার্কেটের বহির্ভূত জগতের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে শুল্কাদির ব্যবস্থা কী হবে, সেটা এই ছয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কথায় গঠিত সংস্থার দ্বারা স্থির হয়। বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রশ্নাদির সঙ্গে শিল্প সম্পর্কিত সমস্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অবশ্য নিজের নিজের বাণিজ্য ও শিল্পনীতি আছে, কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে কমন মার্কেটের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলিকে কতকগুলি বিষয়ে সম্মিলিত-ভাবে এক নীতি মেনে নিতে হয়। যেমন শিল্পের সঙ্গে শ্রমিক বেতন, মূলধনের সুদের হার ইত্যাদি বিষয়ক নীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কমন মার্কেটের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই সব বিষয়ে পরিচালিত নীতিতে মোটামুটি একটা ঐক্য এবং সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক।

কিন্তু এই সব অর্থনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক রয়েছে। বাণিজ্যে এবং শিল্পে এক নীতি অনুসরণ করলে মোটা-মুটিভাবে রাজনৈতিক আদর্শ ও ব্যবহারেও একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য গড়ে তুলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক আছে, সেটা এখনো খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তার রেখা টানা হয়েছে। কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্যিক ব্যাপারে স্ব স্ব সার্বভৌমত্ব কিছুটা ত্যাগ করেছে, বর্তমানে যেটা একটা আংশিক অর্থনৈতিক ইউনিয়ন, ভবিষ্যতে সেটা পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক ইউনিয়নে পরিণত হবে, অর্থাৎ এই সব রাষ্ট্র মিলে একটা পুরোপুরি ফেডারেল রাষ্ট্র বা ইউনিয়ন হয়ে উঠবে—এই কল্পনা অনেকের সামনে রয়েছে। এই কল্পনা অনুযায়ী একটা রাজনৈতিক সংস্থারও ভিতপত্তন হয়েছে, কিন্তু সেটাতে এখনো কোনো শক্তিসঞ্চার হয়নি। তবে ঐদিকে একটা আন্দোলন চলেছে এবং "এক ইউরোপের" আদর্শের প্রতি বহু লোকের মন যে আকৃষ্ট হচ্ছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃটেন যদি "ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে" যোগ দেয়, তবে ক্রমে ক্রমে "এক ইউরোপের" রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবও তাকে মেনে নিতে হবে।

বৃটেন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগদানের জন্য আবেদন জানিয়েছে এবং কী শর্তে বৃটেন কমন মার্কেটে যোগদান করবে, সেবিষয়ে কয়েক মাস ধরে আলাপ-আলোচনা চলছে। বৃটেনের ইউরোপীয়ান

কমন মার্কেটে যোগদানের বিরুদ্ধে কয়েক রকমের লোক আছে। সাধারণভাবে রাজনৈতিক মতবাদে যারা পরস্পরবিরোধী, এমন দুই শ্রেণীর লোককে এবিষয়ে বিরুদ্ধতা করতে দেখা যাচ্ছে। একদল গোঁড়া দক্ষিণপন্থীর আপত্তিকারীর যুক্তি, বৃটেন যদি ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দেয়, তবে বৃটেনের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলবে। এরা মনে করে যে, ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের ভিতর জার্মানী এবং ফ্রান্স এক-জোট হয়ে বৃটেনকে নিষ্প্রভ করে দেবে। এরা বৃটেনের সাম্রাজ্যিক মহিমার স্মৃতি ভুলতে পারছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কায়া গেলেও তার ছায়া এরা কমনওয়েলথ-এর মধ্যে দেখে এবং বৃটেন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দিলে কমনওয়েলথ-এর দেশগুলির সংগে বৃটেনের যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সেটা শিথিল হয়ে যাবে এবং বৃটেনের পক্ষে কমনওয়েলথ-এর উপর বিশেষ আর-কোনো প্রভাব রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

মজা এই যে, গোঁড়া দক্ষিণপন্থী বৃটিশ সাম্রাজ্যপ্রেমিকদের মতো কয়েক রকমের গোঁড়া বামপন্থীও বৃটেনের ইউরোপে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগদানের বিরোধী; এঁদেরও অবচেতন মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মায়া কাজ করছে কিনা, কে জানে। এঁরা এঁদের সচেতন মনের নির্দেশ অনুযায়ী যে যুক্তি দেন, সেটা সাম্রাজ্য-প্রেমিকদের কথা নয়। এঁরাও কমনওয়েলথ রক্ষা করতে চান, কারণ এঁদের বিশ্বাস যে, কমনওয়েলথ-এর প্রভাব প্রগতি এবং মানবকল্যাণের অনুকূল। বিশেষ করে কমন-ওয়েলথ-এর ভিতর শ্বেত ও অশ্বেত জাতি থাকাতে এঁদের চোখে মানবতার দিক থেকে কমনওয়েলথ-এর বিশেষ একটা মূল্য আছে। সুতরাং যাতে কমনওয়েলথ দুর্বল হয়ে যাবে, তাতে এঁদের আপত্তি। কিন্তু তার চেয়েও এঁদের বড়ো আপত্তি হচ্ছে, এই কারণে যে, ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দিলে বৃটেনের অর্থনীতিতে জার্মানী এবং ফ্রান্সের মতো ক্যাপিটালিস্ট প্রভাব প্রবলতর হবে, বৃটেনের "ওয়েলফেয়ার স্টেটে" যে পরিমাণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা বিপন্ন হবে—বৃটিশ ক্যাপিটালিস্টরা নিজেরা যা করতে পারত না, ইউরোপের ক্যাপিটালিস্টদের সহযোগিতায় সেটা করতে পারবে। বৃটেন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দিলে বৃটিশ প্রভাব ইউরোপের উপর কাজ করে সেখানকার আবহাওয়াকে কিছুটা প্রগতির অনুকূল করতে পারবে—এ-যুক্তি এঁরা আদৌ আমল দিতে চান না। বিগত সাম্রাজ্যের মায়াবদ্ধ গোঁড়া দক্ষিণপন্থীদের মতো এই বামপন্থীরাও মনে করেন যে, বৃটেন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দিলে সে জার্মানী ও ফ্রান্সের লেজুড় হয়ে যাবে।

কম্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্টঘেঁষাদের অবশ্য বৃটেনের ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগদানে আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের ঘোরতর বিরোধী। সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মতে, সামরিক সংস্থা "ন্যাটো"র অর্থনৈতিক দিকটাই হচ্ছে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট। সুতরাং ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের পরিধি বা শক্তি বাড়ে, সেটা সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কখনই কাম্য হতে পারে না।

কমনওয়েলথএ-এর দেশগুলির অধিকাংশই বৃটেনের ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগদানের প্রস্তাবে শংকিত হয়ে পড়েছে, কারণ বিনা শুল্কে বা অল্প শুল্কে কমন-ওয়েলথ দেশগুলির বহু মাল এখন বৃটেনের বাজারে প্রবেশ করেত পারছে, বৃটেন ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দিলে সেটা আর চলবে না, তবে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে বিদেশী পণ্যের উপর যে-সব শুল্ক ধার্য থাকবে, সেইগুলো সহন করতে হবে। অনেক মাল যেগুলি বর্তমানে বৃটেনে বিনা শুল্কে বা অল্প শুল্কে প্রবেশ করতে পারে, সেগুলির সম্বন্ধে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে বেশি শুল্ক ধার্য আছে। এই-সব ক্ষেত্রে যদি ইউরোপীয়ান মার্কেটের কর্তৃপক্ষ বর্তমান শুল্ক-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে রাজী না হন, তাহলে ঐসব মালের রপ্তানিকারী দেশগুলির পক্ষে খুবই মুশকিল হবে। সেই জন্য এই বিষয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা চালিয়ে আসছেন। তাছাড়া যে-সব দেশের মুশকিল হবে, তাদের তরফ থেকে সরাসরিও ব্রুসেল-এ ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চালানো হচ্ছে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে-সব শর্ত আদায় করতে পেরেছেন, তাতে ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতির আশংকা দূর হচ্ছে না। কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রী সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু এবং আরো কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী বৃটেনের ইউরোপীয়ান সমালোচনা করেছেন।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের সমালোচনা প্রস্তাবের বৃটিশ বিরুদ্ধবাদীদের শক্তি কিছুটা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। লেবার পার্টির নেতা শ্রীগেটস্কেল সাধারণ নির্বাচন দাবি করেছেন, কারণ তিনি বলছেন যে, বৃটিশ জনসাধারণের সুস্পষ্ট স্বার্থে সাক্ষ্য দ্বারা বৃটেনকে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটের সংগে অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার বর্তমান গভর্নমেণ্টের নেই। কিন্তু শ্রী গেটস্কেলও যে পুরোপুরি বিরুদ্ধে, তা বলা যায় না, কারণ তিনি কতকগুলি শর্ত উল্লেখ করেছেন, যেগুলি পূরণ হলে যোগদান তাঁর মতে, আপত্তিকর হবে বলে বোধ হয় না। বৃটেনের ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগদানের মূল সিদ্ধান্তে পরিবর্তন হবে না। বৃটেনকে ইউরোপীয়ান কমন মার্কেটে যোগ দিতে না বলা ভারতের পক্ষে সম্মানজনক বলে মনে হয় না।
১৭-৯-৬২

রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" ...য়াছিল, আর ম্যালথসের ভূত ...চাপিয়াছিল, আজিও তাহাকে ...পারিলাম না। বলা বাহুল্য ভূতে ...বিশ্বাস নাই। তবু যে ম্যালথসকে ...য়া আছি তাহার কারণ দিনে দিনে ...মর্মে বুঝিয়াছি যে তিনি আর যাহাই ...য়া থাকুন ভূতের ভয় দেখান নাই। ...বলিব, ভূতটা ভল্লুক হইয়া আপনার, ...য় ও প্রত্যেকের দ্বারে দণ্ডায়মান। কবি ...রা অভিযোগ করিয়াছিলেন যে বঙ্গমাতা, ...জননী, সাত কোটি সন্তানেরে ...ঙালী করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ করেন ...। তারপর বাঙলার দুই-তৃতীয়াংশ ...দেশ হইয়া গিয়াছে অথচ স্বদেশের ...ন্তানসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাড়ে তিন ...োটিতে। ইঁহারা সকলেই মনুষ্য কিনা ...হা সহৃদয় পাঠকের বিচারের উপরেই ...ড়িয়া দিলাম।

অতিপ্রসবিনী বঙ্গমাতার দুর্দিনে সংগত ...লাপে দেখিতেছি কতিপয় বঙ্গসন্তান ...তিশয় রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ...ব্যের যে যৎসামান্য বুঝিতে পারি তাহা ...ই যে, দোষটা অতিজননের নহে, অপ্রচুর ...ৎপাদনের বা বিনয়-সরকারী ভাষায়, ...র্থনীতিক বাড়তির। এই সকল প্রবক্ত-...ণের তূণে পরিসংখ্যানরূপী তীরের ...ভাব নাই। তাঁহারা জাপানের দৃষ্টান্ত ...খান, বলেন যে জাপানীরা একরপ্রতি যে ...ন্য উৎপাদন করে তাহা ভারতীয় হারের ...চ বা সাতগুণ। অতএব, ইঁহারা বলেন, ...গমাতার বন্ধ্যা হইবার প্রয়োজন নাই; ...ল বাড়াইলেই হইবে।

•

এক কালে ভূতের সঙ্গে বিস্তর লড়াই ...রিয়াছি। জন্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ...রাজেস্তগণ বিজ্ঞ সুরে সমস্বরে

দ্বিতীয় মত

রঞ্জন

বলিতেন : উহা ভগবানের হাত, মা ষষ্ঠীর কৃপা, প্রাণ দিয়াছেন যিনি অন্ন দিবেন তিনি। একটি দম্পতিকে বলিয়াছিলাম, "আপনারা কিয়ৎকাল আলাহিদা বাস করুন, দাদা কলিকাতায় আর তদীয় পত্নী বারাণসী বা কাঠমাণ্ডুতে, দেখি ত ভগবান কী করিয়া দান করেন বা মা ষষ্ঠী কৃপা করেন!" অদ্যাবধি সেই দম্পতি অধমের সহিত বাক্যালাপ করেন না। বিগত বিশ বৎসরে উহাদের বংশবৃদ্ধি কম হয় নাই, সেই হারে হ্রাস পাইয়াছে সাচ্ছল্য।

পুরাতন সংস্কারের স্থানে অন্য অভিষিক্ত হইয়াছে নব্য কুসংস্কার। উহার নাম পরিসংখ্যান বিজ্ঞান। যাদুও বলিতে পারেন। যাদুকর পি সি সরকার নহেন; মহাশয়ের নাম পি সি সেন। সাকরেদেরও অপ্রাচুর্য নাই। তাঁহাদের সকলেরই ধুয়া এই যে পরিবার পরিকল্পনার জিগীর তুলিয়াছেন ধনী পশ্চিমী ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের চিরকাল দরিদ্র করিয়া রাখিবার দুরভিসন্ধি লইয়া। দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ্য করিয়াছি, আপন দুর্ভাগ্যের জন্য অপর কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিবার সুযোগ আমরা কদাচ হারাই। স্বীয় দায়িত্বের সম্মুখীন হইবার দায় তখন আর থাকে না। এক্ষণে এই মোহ আবার ঝুটা বিজ্ঞানের সমর্থন পাইয়াছে। আমাদের আর পায় কে?

•

সংখ্যাধুরন্ধরদিগের সহিত আমার বিবাদ মেকী পাণ্ডিত্যের মেঘজালে অদৃশ্য হইতে দিব না। এমনকি "পরিবার পরিকল্পনার" মত পোশাকী পরিভাষায়ও আমার প্রয়োজন নাই। কই, "দেশ" পত্রিকায় ত কোনও শিশু-বিভাগ নাই। তবে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? শুনিতে পাই, আধুনিক গল্প উপন্যাসে আদিরসের বন্যা বহিতেছে; জনৈক নিবন্ধ লেখক ত মাসারম্ভে একবার নিয়মিতভাবে নবীন ও প্রবীণ নানা ঔপন্যাসিকের কারাদণ্ড বা তদপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি দাবি করিতেছেন। গম্ভীর আলোচনার বেলায় কেন তবে এত অতিকৃত শালীনতাবোধ যাহাতে সত্যই চাপা পড়িয়া যায়? আমাদের সমাজ যখন বলিষ্ঠ ছিল তখন স্পষ্টভাষণ এমন বিরল ছিল না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামে কালিদাসের শকুন্তলার বয়স সম্পর্কিত যে সরস মন্তব্যটি শুনিয়াছি তাহার মুদ্রিত উল্লেখে আজ বোধ করি অনেকেরই কর্ণদ্বয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে।

আমাদের আলোচ্য দ্বিজেন্দ্রলাল যাহাকে বলিয়াছেন পুত্রকন্যার বন্যা। এই বন্যার উৎস লইয়াও গোপনতা অনাবশ্যক। কোনও পাখি শিশুগুলিকে পোঁছাইয়া দেয় না; বাঁধাকপির তলা হইতেও তাহাদের কুড়াইয়া আনা হয় না। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারী সবিশেষ অবগত আছেন যে তাঁহাদের ঠিক কোন্ ক্রিয়ার জন্য তাঁহাদের একজনকে সময়ে শিশুসদনে যাইতে হয়। জৈব কারণে ক্রিয়াটি অধিকাংশের পক্ষে কখনও কখনও অপরিহার্য। সুখের বিষয়, বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন ভীষ্মদেব না হইলেও বৃহৎ পরিবারের অভিশাপ অবশ্যম্ভাবী নহে। পদ্ধতি জানা না থাকিলে বিনামূল্যে উপদেশ পাওয়া যায় বহু হাসপাতালে। আদমসুমারীর ভয়াবহ ফল প্রকাশের পরে প্রত্যেক ভারতীয়ের অবশ্যকরণীয়ের চুম্বক ইহাই।

•

বলা হইবে, কেন? স্বদেশী সরকার যদি অর্থোন্নতি যথেষ্ট গতিতে উদ্দাম না করিতে পারেন তজ্জন্য মদীয় উল্লাস কেন তিলমাত্র ব্যাহত হইবে? ভারত কিছু দরিদ্র দেশ নহে; সম্ভাব্য সমৃদ্ধির পরি-প্রেক্ষিতে ভারতের জনসংখ্যা বর্তমান পর্যন্ত দুর্বিষহ নহে। আমার নিবেদন এই যে, সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ আমি কাহারও হইতে কম করি নাই গত দশবারো বৎসরে। সরকারের অক্ষমতা সমর্থন করিবার অভিলাষ আমার আদৌ নাই। কিন্তু চোরের উপর গোসা করিয়া মাটিতে ভাত খাইবার অভিরুচিও আমার নাই। স্বীয় শৈথিল্যের কারণে আমার গৃহে যদি ছয়টি অরক্ষণীয়া কন্যা আর সাতটি বেকার পুত্র থাকে তাহা হইলে, দোষটা যাহাতেই বর্তাক, দুর্ভোগ ত আমার ব্যতীত আর কাহারও নহে। সমৃদ্ধিটা সম্ভাব্য, কিন্তু পরিবারের বৃহত্ত্ব ত ইতিমধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছে! আর কেহ কী কী কার্য করিলে আমার কন্যারা অপরিণীতা আর আমার পুত্ররা কর্মহীন থাকিত না তাহা লইয়া তর্ক চলে, পেট চলে না।

যদি বল যে সমৃদ্ধির সঙ্গে জনসংখ্যার প্রশ্নটা সংযুক্ত করাই অবৈজ্ঞানিক তবে বলিব, আমি বিজ্ঞান বুঝি না এবং বুঝিতে চাহি না। আগে আমাকে দেখাও যে পর্যাপ্ত লোক নাই বলিয়া দেশের উন্নতি ঠেকিয়া আছে, পরে আমি দেশকে শতেক পুত্র উপহার দিব। আগে কাজ সৃষ্টি কর, লোকের অভাব হইবে না। আগে খাদ্য উৎপাদন কর, খাদকের অভাব হইবে না। অদ্যাবধি এমন ত কেহ বলেন নাই যে অধিকতর কর্ম ও খাদ্য দেশে সৃষ্ট হইতে পারিতেছে না কেননা দেশে যথেষ্ট লোক নাই।

খাদ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

ক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ

দেশদেশান্তরের আহারবিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতির বিভিন্নতা কোন বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির খেয়াল নহে—উহা প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কাজেই কোন এক দেশের আহার্য, পরিধেয় বা রীতিনীতি অন্য এক দেশের পক্ষে অনিবার্য হইতে পারে না, যদি না শেষোক্ত দেশ তাহার স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া প্রাণহীন, বৈচিত্র্যহীন দাসত্ব বরণ করিতে চায়। ঐক্যের আদর্শ এক বিরাট আদর্শ কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত করিয়া যেখানে ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়, সেখানে উহা অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায়। কেননা বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রকৃতির সত্তার স্বার্থকতা; যত বৈচিত্র্য ততই জগতের সম্পদ ও সৌন্দর্য।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর, স্বাধীনতা লাভের এক যুগ পরেও আমাদের 'শিক্ষিত' সমাজে আমাদের বেশভূষা, আমাদের ভাষা, আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতির যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে দাসসুলভ পরানুকরণের মনোবৃত্তিই প্রকাশ পায়। প্রতীচীর কাঁটা, চামচ, ডিশ, সুপ, স্যালাড স্যাণ্ডুইচ স্টিক পুডিং, পাই প্রভৃতিও যেন আমাদের বাসনপত্র ও আহার্য সামগ্রীর তুলনায় শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। এইভাবে প্রতীচীর জীবন-যাত্রার উচ্চমানের মোহ আমাদের কোথায় লইয়া চলিয়াছে জানি না—হয়ত জানিতেও চাহি না।

সম্প্রতি একটি দৈনিক সংবাদপত্রে 'পাঁউ-রুটি' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমাদের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে যে সব কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা খুবই চিন্তনীয়। উহাতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাধান্যের ফলে যে সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, আমাদের সমাজকেও উহা প্রকারান্তরে পরিগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলা যায়। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে "ভারতের কৃষি-কেন্দ্রিক সমাজজীবন ক্রমশ শিল্প-কেন্দ্রিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হইতেছে এবং গতি-প্রধান যন্ত্রযুগ সকল মন্থরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমাদের সনাতন রান্নাঘরেও এই বিপ্লবের রূপ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নারীদের দশটা-পাঁচটা স্কুলে, কলেজে, অফিসে বা কাজে বাহির হইতে হইতেছে, সুতরাং রান্নার কাজে কে কত সময় দিতে পারে?" এইরূপ আরও অনেক কিছু কথার নির্গলিতার্থ এই যে পাকশালার সমস্যা সমাধানের জন্য পাঁউরুটি ও পাঁউ-রুটির কারখানা অনিবার্য।

ভারতবর্ষ এমনেই বেকার সমস্যায় জর্জরিত। কেন্দ্রীভূত যান্ত্রিক শিল্পের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যবস্থার ফলে বেকার অবস্থা দিন দিন অবশ্যম্ভাবীরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। তদুপরি এদেশের বড় কর্তারা কেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্প প্রসারের দিকে যেরূপ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন তাহাতে বেকার সমস্যা আরও ভয়াবহই হইবে। এই অবস্থায় এ জনবহুল দেশে যে ভবিষ্যতে কোনদিন নর বা নারীর জন্য কর্মসংস্থানের প্রাচুর্য দেখা দিবে তাহাই বা কি করিয়া আশা করা যায়?

যে "গতিপ্রধান যন্ত্রযুগ" এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ দুইটি মহাধ্বংসী যুদ্ধ পৃথিবীর উপর সংঘটিত হইয়া গেল তাহার বাখান হতবুদ্ধি করিয়া দেয়। যন্ত্র তাড়াতাড়ি কাজ করিবার শক্তি দেয় বটে, কিন্তু গতিবেগ তো জীবনের আদর্শ হইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যের কথা লিখিতে গিয়া পণ্ডিত হ্যাভলক এলিস এক জায়গায় লিখিয়াছেন: "Our ideal to-day is speed, not art." তাহা ছাড়া, যে সমাজে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানেই সামাজিক বিঘ্ন ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর যাহাই হউক, একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবন যদি আমরা বজায় রাখিতে চাই তবে রান্নাঘরকে একটি বাজে 'ঝামেলা'র পীঠস্থান মনে করা চলিবে না। কারণ রান্নাঘর আমাদের পারিবারিক জীবনের অনেকখানি

জড়িয়া থাকে। গৃহস্থ বধূ যদি রান্নাঘর ছাড়িয়া "পাউরুটি, টোস্ট ইত্যাদি এবং দোকানের খাবার"-এর দিকে ঝোঁকেন, তবে আমাদের রান্নার স্বকীয় নৈপুণ্য ও আদর্শ তো লোপ পাইবেই গার্হস্থ্য জীবনের ভিত্তিমূলও শিথিল হইয়া যাইবে। আমাদের আদর্শ অনুসারে পরিবারই সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে সমাজ-সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে।

চরম বস্তুতান্ত্রিকতার পরিণামস্বরূপ পাশ্চাত্য সমাজে কত অশুভ সৃষ্টি হইয়াছে, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাদের উন্নতির চেষ্টার গোড়ায়ই না ভুল হয়! বস্তুহীন ভারতের পক্ষে বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু বস্তুতন্ত্রের সমস্যা ও গ্লানিগুলি আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের ধ্বংসের প্রতি পরিচালিত না করে, তজ্জন্য সতর্কতা আবশ্যক। আমাদের সমাজে গলদ খুবই আছে, বিদেশ হইতে নূতন আমদানী দ্বারা বোঝাভারী করায় লাভ নাই।

তারপর বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজনমত ধান্য শস্য উৎপাদন অনিশ্চিত, বিদেশ হইতে গম-সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য, আর গমজাত আটা ও ময়দা হইতে রুটি বানান সময় ও কষ্ট সাপেক্ষ সুতরাং পাউরুটি প্রচলন বাঞ্ছনীয় এবং তজ্জন্য বহুতর উন্নত ধরনের পাউরুটি তৈরীর কারখানা স্থাপন ও তদুদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

এইভাবে ওয়াশিংটন হইতে রয়টারের খবরে প্রচারিত একটি আন্তর্জাতিক হুইট বা গম কমিশনের প্রস্তাবকে অভিনন্দন করা হইয়াছে। যাহা হউক এইরূপ চিন্তাধারা যে জাতীয় সত্তার বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সহিত অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা জড়িত। পাউরুটির গুণকীর্তন, আমরা অদূর ভবিষ্যতে কোনদিনই খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হইতে পারিব না, এই পরবশতামূলক মনোভাবেরই ইংগিত।

আমেরিকা অত্যধিক যান্ত্রিক কৃষির সাহায্যে তাহার প্রয়োজনের বেশী খাদ্য উৎপাদন করিতেছে। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য তাহার একটি সমস্যাও। ভারতের পক্ষে আজ আমেরিকার গম পাওয়া কঠিন নয়। পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল ব্যাপিয়া ধান্যশস্য উৎপন্ন হয়। তত্রত্য উৎপাদকদের ব্যবসায় ভাঙিবার উদ্দেশ্য যে আন্তর্জাতিক গম কমিশনের নাই, এই কথা কি জোর করিয়া বলা চলে? আমাদের প্রয়োজনের সময় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের ধান্য উৎপাদক অঞ্চলগুলি কি কোন দিন উদ্বৃত্ত ধান্য বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে না? আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আজিকার ঠাণ্ডাযুদ্ধে খাদ্যশস্যের বিশেষ রাজনৈতিক [illegible]

আছে এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তনে যে কোন দিন আমাদের ভয়াবহ বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে, এমন হইতে পারে। তদুপরি আমরা চিরকাল বিদেশাগত খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব—এইরূপ চিন্তাধারা জাতীয় জাড্যের ও শৈথিল্যের পরিচায়ক।

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থাই একটি বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধানখাদ্য নির্ধারিত করিয়া দেয়—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে ভারতের কতিপয় প্রদেশবাসী অন্নভোজী হয় নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, পৃথিবীর একটি বিশাল অংশ জুড়িয়া অন্নভোজী জাতির বসতি। চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশের লোক প্রচুর পরিমাণে ভাত খায়। ইহাতে তো তাহাদের স্বাস্থ্যে, বিক্রমে, শ্রমশীলতায় সভ্যতার অবদানে কোন অন্যেতর জাতির সমকক্ষ হইতে অসুবিধা হয় নাই।

পক্ষান্তরে আমেরিকা হইতে গম আসিবে, সেই আমেরিকা হইতে যান্ত্রিক উপায়ে রুটি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষজ্ঞের আমদানী হইবে, আমাদের দেশে রুটি তৈরীর কারখানা স্থাপনে সাহায্য করিতে। এবম্বিধ উপায়ে আহরিত ও প্রস্তুত রুটি একটি জাতির ক্ষুধা নিবারণ করিবে। এইরূপ চিন্তা যে কতদূর জাতীয় মনীষার দৈন্য সূচিত করে, তাহা ভাবিতে গেলে আতঙ্কিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ এবং আমরা আশা করি চিরকালই থাকিবে। এখন আমাদের দেশে হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ইহা চরম লজ্জার। দেশের লোককে যদি তাহাদের মৌলিক প্রয়োজনের জন্যই অন্য দেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, তবে সে দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। অপর দিকে ইংলণ্ডের ন্যায় অতিরিক্ত মাত্রায় বৃহৎ-শিল্প-নির্ভর দেশও বুঝিয়াছে স্বাধীন থাকিতে হইলে খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকা কত বিপজ্জনক। ইহা বুঝিয়া খাদ্যে নির্ভরতা ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিভূমি সংক্রান্ত নূতন কার্যক্রম শুরু করিয়া দিয়াছে। আজ ইংলণ্ডের মাঠে ঘাটে, যেখানেই একটু কর্ষণযোগ্য জমি, সেখানেই সব্জি-বাগানের ছোট-বড় ক্ষেত। ইহা ছাড়া তাহারা হাজার হাজার একর নূতন জমিতে আবাদ করিবার আশা লইয়া কাজ করিতেছে। ১৯৪৭ সালের কথা, জোসেফ্ কর্নেলিয়স কুমারাপ্পা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া যে রিপোর্ট দেন তাহা এই:—কৃষিমন্ত্রী টম উইলিয়মস্ বলেন, "মাংস, ডিম, গম, বার্লি প্রভৃতি

উৎপাদনের পুনঃপ্রবর্তন ও বৃদ্ধি করা এবং অন্তত ৪০০০০০ (চার লক্ষ) একর নূতন জমিতে তিসির আবাদ করাই সরকারী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তাঁহারা আশা করেন, আগামী বৎসরে গমের আবাদ ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) একর বাড়াইতে পারিবেন।" বৃহৎ শিল্পের ব্যাপারে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের তুলনা করা চলে না। অথচ বৃহৎ শিল্পের যে সামান্য প্রসার এদেশে হইয়াছে, এইটুকুতেই আমাদের আমদানি করা খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। শিল্পের প্রয়োজনে (আখ, পাট প্রভৃতি) অর্থকরী পণ্যশস্যের চাষ হ্রাস বা বন্ধ করিয়া দিয়া কারখানার মুনাফা যোগাইবার জন্য আটক রাখা এই সব জমিগুলিকে সর্বাগ্রে খাদ্যশস্যের চাষে লাগান যায় না কি?

এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রসঙ্গে আবার বলা হইয়াছে যে, খাদ্যোৎপাদনের সম্ভাবনা অনুযায়ী জনসংখ্যাও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি অতি জটিল ও অনিশ্চিত সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়। বিশেষজ্ঞরা আজও আদৌ একমত নহেন। "দি জিওগ্রাফী অভ হাংগার" নামক গ্রন্থে জসুই দ্যাকাস্ত্রো ক্ষুধাতুর মানবজাতির সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন ও বণ্টন পূর্ণগতিতে চলিলে প্রজাবৃদ্ধির আধিক্য তিরোহিত হইবে। এই প্রসঙ্গে লেখক উদাহরণস্বরূপ চীন, ভারত ও জাপানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই সকল দেশের ক্ষুধার তাড়না যত বৃদ্ধি পাইতেছে দেশের লোকসংখ্যা তত বৃদ্ধি পাইতেছে।" আরও তথ্যাদি দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, "যে সব অবনত শ্রেণী ক্ষুধার তাড়নায় নিত্য বিব্রত, তাহাদের সন্তানবৃদ্ধি অধিক হইয়া থাকে।......প্রজাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষুধার পীড়া লোকসমাজ হইতে বহিষ্কার করা অসম্ভব। পরন্তু ইহার বিপরীত সূত্রে সমাজে অনশনের তাড়নার উচ্ছেদ করিয়া প্রজাবৃদ্ধি সংযত করা খুবই সম্ভব (পৃঃ ৩১)। লেখক দেখাইয়াছেন যে, ক্ষুধা ও অনশন দূরীভূত করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। অর্থাৎ প্রকৃতি আমাদের যে সম্পদ দিয়াছেন তাহার সুপ্রয়োগ করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করিয়া লওয়া যায়। কোন কোন অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা উৎপাদন চালিত হইলে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার সীমার নিচে চলিয়া যায়। এই প্রকারের অর্থশোষণ চলিতে দিলে আমাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় মানবসভ্যতা জর্জরিত থাকিবে।

সর্বশেষ, ভারত সরকারকে পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত শিক্ষার জন্য কারখানা স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক নির্মাতাদের সকলপ্রকার উপাদান

সরবরাহের পরামর্শদানও করা হইয়াছে। উহা নাকি খাদ্যসমস্যা ও পুষ্টিসমস্যা সমাধানের বহুল পরিমাণে সহায়ক হইবে। এই সম্বন্ধে আর দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া পাঁউরুটি পুষ্টি সম্বন্ধে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ম্যান দি আননউন'-এর গ্রন্থকার ডাঃ এলিক্সিস ক্যারেল (প্রাণী-বিদ্যাবিৎ) ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পাঁউরুটি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা মনোযোগের সহিত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন:

"আমাদের জীবন ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন দ্বারা অত্যধিক মাত্রায় প্রভাবিত। এইরূপ প্রচারকার্য তো ক্রেতাদের স্বার্থে হয় না, হয় বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেওয়া হয় যে, সাদা পাঁউরুটি লাল পাঁউরুটি (ব্রাউন ব্রেডের) চেয়ে উৎকৃষ্ট। ফলে ময়দাকে ক্রমশ চালিতে চালিতে পূর্ণমাত্রায় সাদা করিয়া ফেলা হয় এবং সেইভাবে উহাকে উহার অতিশয় প্রয়োজনীয় উপাদান হইতে বর্জিত করা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াজাত ময়দায় রুটি প্রস্তুতের কাজ সহজসাধ্য হয় এবং রুটিও দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখা সম্ভব হয়। মিলের মালিক ও রুটি কারখানাওয়ালাদের অধিক অর্থোপার্জন হয় বটে, কিন্তু ক্রেতা উৎকৃষ্ট খাদ্য খাল মনে করিয়া নিকৃষ্ট জিনিসই খাইয়া থাকে। আর যে-সব দেশে পাঁউরুটি প্রধান খাদ্য সেসব দেশে জনসংখ্যা অধোগতিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রচারের জন্য নষ্ট হয় প্রচুর অর্থ। পরিণামস্বরূপ নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক খাদ্য ও ভেষজ দ্রব্য শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথচ খুব কম করিয়া বলিলেও এই সব জিনিস অনর্থক এবং অনেক সময়ই ক্ষতিকারক।"

ভারতের ধর্ম, নীতি ও আদর্শ প্রতীচীর ধর্ম, নীতি ও আদর্শ হইতে ভিন্ন। ভারতীয় ধর্ম ও সাধনা প্রতীচীর ধর্ম ও সাধনা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা একদিকে আমাদের ধর্ম, নীতি ও আদর্শ রক্ষা করিতে চাই, অপরদিকে আর্থিক উন্নতিও চাই। আর্থিক উন্নতির জন্য প্রতীচীর নিকট হইতে আমাদের বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি অনেক কিছু অবনত-মস্তক হইয়া শিক্ষা করিবার আছে। কিন্তু উপরোক্ত দুই দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের দেখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্ত্য সামাজিক ও আর্থিক আদর্শগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা একমত নহেন, এমত অবস্থায় আমাদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া নির্বিবাদে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া উহার অমঙ্গলটাকে বরণ করিয়া না লই।

বিশ্ববিচিত্রা

কাচের অলংকার

বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার যে অঞ্চলকে সুডেটেন বলা হয় সেই জার্মান অধ্যুষিত স্থানটিকে ১৯৪৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সুডেটেনের একটি ছোট্ট শহরের নাম গ্যাবলোনৎস্। যুগ যুগ ধরে জার্মান ও চেকরা এখানে বন্ধুর মত বসবাস করে এসেছে। এখানকার বেশীরভাগ লোকই কাচের কারিগর; এই অঞ্চলেই ৫০০ বছর আগে সেই ঐতিহ্যবাহী কাচশিল্পের পত্তন হয়েছিল। তখন থেকেই গ্যাবলোনৎস্ শহরের নামডাক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ "গ্যাবলোনৎস্ বিজুতেরি" নামে কাটাকাচের অমূল্য রঙীন অলংকার এখানেই সৃষ্টি হতো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত এই সম্পদশালী নগরে প্রায় ত্রিশ হাজার কাচশিল্পী তাদের শিল্পধারা এখানে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল কিন্তু ১৯৪৫ সালে শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই প্রায় বিতাড়িত হয়। আর তার সংগে সংগে শেষ হয় বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত অলংকারশিল্প।

সব হারিয়ে এই বাস্তুহারার দল এসে আশ্রয় নেয় পশ্চিম জার্মানীতে। তাদের ভাবনা তারা কি করবে; কি করে তাদের ভাঙ্গা জীবন জোড়া লাগবে? কিন্তু উপায় হল। তৎকালীন ব্যাভেরিয়ার অর্থমন্ত্রী ও বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থসচিব অধ্যাপক লুডভিক এরাহার্ড দক্ষিণ জার্মানীর কাউফবয়রেনে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন।

প্রথমে পাঁচটি পরিবার মোট সতেরজন লোক নিয়ে এখানে বসবাস করতে আসে, আর আসে তাদের সংগে বাইশ জন অবিবাহিত ওস্তাদ কারিগর। কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে কারখানা খাড়া করে তারা কাজ শুরু করে দেয়। প্রায় সংগে সংগে গ্যাবলোনৎস্ শহরের কথা ছড়িয়ে পড়ে ও দলে দলে কাচের কারিগর এখানে এসে জমতে শুরু করে দেয়। কিছুদিন হল পশ্চিম জার্মানীর শরণার্থী শিবিরে নয়া তরুণদের হাতেকলমে কাচের কাজ শেখাবার উদ্দেশ্যে এখানে একটি কারিগরি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বিক্রিরও বন্দোবস্ত হয়েছে। স্বদেশ ও বিদেশের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানকার কাচশিল্প গড়ে উঠেছে।

প্রথম কিছুদিন কষ্টেসৃষ্টে চলবার পর এখন তাদের জীবনে সাফল্য এসেছে। আজ দেশ-বিদেশ থেকে কদরদামী গ্যাবলোনৎস্

জড়োয়া, কাঁচের বোতাম ও ঝাড়বাতির জন্যে বহু অর্ডার আসতে শুরু করেছে এবং তার ফলে কাঁচশিল্পীরা আবার বেশ দু-পয়সা রোজগার করছে। আজ কাউফবয়রেন শহরের আশেপাশে প্রায় এক হাজার প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ বিশ হাজার লোক এই কাজে তাদের রুজি রোজগার করছে। নয়া গ্যাবলোনংস্ শহরে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল, তারা সবাই জার্মান। ওদিকে পুরোনো গ্যাবলোনংস্ শহরে চেক কাঁচের কারিগররাও বসে নেই। দু' জায়গায় কারিগরদের মধ্যে ব্যবসার রেষারেষি শুরু হয়েছে। দুদেশেরই লক্ষ্য কি করে কম খরচে সুন্দর গয়না তৈরী করে দেশ-বিদেশের বাজার দখল করা যায়।

ঝড়ের গতিবেগ হ্রাস করার অভিনব পদ্ধতি

ঝড়ের গতিবেগ হ্রাস করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিন বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মার্কিন নৌবাহিনী এবং আবহাওয়া বিভাগ এই পরিকল্পনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপদান করবেন। বিমানবাহিনীর নূতন ধরনের জেট বিমানের সাহায্যে ঝড়ের ক্ষেত্রে কেলাসিত সিলভার আয়োডাইড ছিটিয়ে দিয়ে ঝড়ের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করা হবে। গত বৎসর এই ব্যবস্থায় ঝড়ের গতিবেগ শতকরা দশ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছিল।

রাডারের সাহায্যে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করে যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে জানা যায় ঝড়ের কেন্দ্রস্থলে সিলভার আয়োডাইড প্রয়োগের ফলে, ঐ এলাকা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়—ফলে ঝড়ের শক্তি পার্শ্বদেশে ছড়িয়ে পড়ে ও গতি হ্রাস পায়।

কলেরা রোগের টিকা

জাপান এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এক প্রকার কলেরার টিকা আবিষ্কার করেছেন এবং কিছুসংখ্যক ব্যক্তির উপরে এই টিকা সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগও করা হয়েছে।

তবে আরো পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে এই টিকার কার্যকারিতা এবং এটা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ ক্ষতিকারক নয় তা প্রমাণিত হলেই পৃথিবীর যে সকল অঞ্চল কলেরায় পর্যুদস্ত হয়ে থাকে সে সকল অঞ্চল এই টিকা প্রয়োগের ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ এ সম্পর্কে আরও গবেষণার জন্য টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেণ্টারকে এক কোটি চার লক্ষ তের হাজার আটশত আঠাশ টাকা দান করেছেন। টোকিওর কিতাসাতো ইনস্টিটিউটের ডাঃ যোশিকাজু ওয়াটানাবে এবং টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ডাঃ ডব্লিউ এফ ভেরওয়েরের তিন বছরের গবেষণার ফলে এলটর ভাইব্রিয়ো (ELTOR VIBRIO) নামে বীজাণু থেকে এই টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এলটর ভাইব্রিও নামে বীজাণুর জন্য সম্প্রতি হংকং, পাকিস্তান এবং থাইল্যাণ্ডে কলেরার মত গুরুতর ব্যাধি দেখা দেয়। গতবছর এই সংক্রামক রোগে ফিলিপাইনস্-এ দেড় হাজারেরও বেশী লোকের মৃত্যু ঘটে—ঐ অঞ্চল বহু বৎসর ছিল কলেরা থেকে মুক্ত।

গবেষণাগারে ইঁদুর নিয়ে এ-সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা হয় এবং ওই দুজন বিজ্ঞানী-সহ নজন ব্যক্তিকে এই নূতন ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়। এই টিকা দেওয়ার তাদের রক্তে এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জন্মায় এবং তাদের দেহে একজনও কোন বিষক্রিয়া দেখা দেয় নি। ডাঃ জে. সক ই সেডেল জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা বা ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের একজন কলেরা রোগ বিশেষজ্ঞ। ইনি বলেছেন যে, ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বে এই টিকার ক্রিয়া সম্পর্কে আরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

যদিও পাগল নই

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছি—পরের উপকার আর কোন দিন করব না। একবার করতে গিয়েই আজ আমার এই হাল। এই যে লোকে আমার আজ "পাগলা কানাই" ছাড়া আর কোন গুরুতর দ্রব্য বলেই ভাবে না, তার কারণ ঐ পরোপকার-বৃত্তি।

আর যদি ভুলে পরোপকারের মতিভ্রম আমায় আবার কোন দিন ধরেই, তবে শত্রুর উপকারও বরং করব, কিন্তু মরে গেলেও বন্ধুর উপকার করব না।

তবে আমি আবার একটু আবেগপ্রবণ। আবেগ চাগিয়ে উঠলে বাগিয়ে তার রাশ ধরতে পারি না। সে রকম কোন আ-বাগি বেগের মুহূর্তে আমি কোন্ দিকে ছুটব—আদালত না উন্মাদালয়, অথবা কী করে বসব—নৃত্য না হত্যা, তা আমি এবং আমার ঊনপঞ্চাশ পুরুষের কারো কাছেই সুপরিজ্ঞাত নয়। এই সব মুহূর্তের জন্যে আগে থাকতেই বলে রাখি যে, যদি কোন বন্ধুর উপকার হঠাৎ আবেগবশে করেও ফেলি ঐ বন্ধু-কুল-কুলাঙ্গার বিশ্বাসহন্তা পশু-সদৃশ হরেনের জন্যে আমি কিছুই করব না।

না। কিছু করব না—নয়। করব। কিছু করব। অপকার করব। পাক্কাটিক্ত অপকার।

আমি জানি, আপনারা ভাল মানুষটির মত বোকা বোকা মুখ করে বলবেন,—কেন, হরেন তোমার কী করেছে!

কী করেছে! গায়ে মারলে দু দিন বাদে চোট শুকোয়, টাকা মারলে নতুন রোজগার করা যায়, কিন্তু ও আমায় যা করেছে,—নাঃ, সে আপনারা বুঝবেন না। যত লোককে বলেছি, তারা হেসে বলেছে, "পাগল! পাগলা কানাই বলে যেড়ে—।" বিশ্বাস করুন, বেড়ে বলবার জন্যে, লোককে মজা দেবার জন্যে আমার কোন ইচ্ছে ছিল না। আমি—নাঃ, আপনারা তা বুঝবেন না।

তবু—আপনারা না বুঝলেও—আমি বলব। যাকে দেখব, তাকেই বলব। হরেন যে কী জঘন্য চরিত্রের লোক তা জগতের কাছে প্রকাশ করবার জন্যেই আমায় বলতে হবে। হাটে মাঠে ঘাটে বাটে যেখানে-সেখানে যখন-তখন এই কথা আমি বলে বেড়াব। আমায় "পাগল" বললেও সত্যকে উদ্ঘাটিত করব।

জানেন, ঐ বীভৎস ছুঁচোটা আমায় পাগল বানিয়েছে।

আপনারা বলবেন—পাগল আবার "বানায়" কী করে, পাগল তো প্রেমের মত কবিতার মত "হয়"।

হ্যাঁ, ঠিকই। কিন্তু পাগল আছে দু-রকম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এক, যারে নিজে থেকেই পাগল হওয়ার মত অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে—ঐ প্রতিভার মত। আর এক, যার পাগল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু রাম বা শ্যাম তাকে পাগল বানায়। প্রথম রকমের পাগলামি সারে না। দ্বিতীয় রকমটা সারে—যদি সে ঐ রাম বা শ্যামকে জ্যান্ত খুন করে ফেলতে পারে। আঃ, আমি যদি হরেন রাস্কেলটাকে খুন করে ফেলতে পারতাম!

ঐ রাস্কেলটা আমার ছোট বেলার বন্ধু। এখন আমি অবশ্য ওকে নীচ একটি শত্রু ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। তখন ওর আসল পরিচয় আমার জানা ছিল না।

ওর মাথায় ছেলেবেলা থেকেই ছিট ছিল। খাঁটি ছিট। জিনিসটা খাঁটি ছিল বলেই বয়স বাড়বার পরও ওটা কমল না, বরং বাড়ল। হরেন একটা জবরদস্ত রকমের ছিটগ্রস্ত লোক হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ বদ্ধ পাগল। ওকে অবশ্য মুক্তই রাখা হয়েছিল।

ওকে বদ্ধ না রাখার কারণ ছিল, ও বেশীর ভাগ সময় স্বাভাবিক থাকত। হঠাৎ এক এক সময় কিছুক্ষণের জন্যে ওর মাথার সব নাট-বল্টু বিনা নোটিসে ঢলঢলে হয়ে যেত। আবার খানিকটা বাদে নাট-বল্টু বিলকুল টাইট্ হয়ে যেত। দড়াদড়ি যোগাড় করে আনতে আনতে ও ষোলো আনা ফিট্ হয়ে যেত।

শেষে একদিন হরেনের ঠাকুমা আমায় বললেন, "বাবা কানাই, হরেনকে একটু ডাক্তার দেখা।"

আমি তখন পরোপকারের আবেগে টগবগ করছি। তায় হরেন আবার বন্ধু। ঝাঁটা মারো অমন বন্ধুর মুখে।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলুম।

ডাক্তার শর্মা ঘরে ঢুকে আমাদের দুজনের

নাক দুটোয় সুড়সুড়ি, ঘ'ষি, মোচড় প্রভৃতি জাতীয় কয়েকটা পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন

দিকে খুব অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি মুখ খোলার চেষ্টা করতেই উনি ওঁর ঠোঁটের ওপর তর্জনী নিক্ষেপ করে আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ একটি জোরালো সার্চলাইটের ফলার মত একবার আমায় একবার হরেনকে বিঁধতে লাগল। ডাক্তার শর্মার চেহারাটা এমনিতে নরম-কাদা-পোরা একটি ফুটবলের মত—কোথাও তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু চোখ দুটো কঠিন, পাগলের উপর শান দিয়ে দিয়ে—

"আমি আমার নতুন গবেষণায় সফল হয়ে বর্তমানে লোককে একবার সামান্য দেখেই বলে দিতে পারি যে কে পাগল।" সেই সরু ও চোখা দুটো দৃষ্টির ঘর্ষণে যেন কিছু শব্দ নির্গত হলো।

"কি করে?" কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"নাক দেখে। স্রেফ নাকের ডগা এবং নাকের দুটো ফুটো।"

এই বলে ডাক্তার শর্মা আমার ও হরেনের নাক দুটোয় সুড়সুড়ি, ঘ'ষি, মোচড় প্রভৃতি জাতীয় কয়েকটা পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও হাঁচি রোধ করতে পারলাম না। ডাক্তার বিরক্ত হলেন। কি করব! আমার মনে হচ্ছিল সেই সরু চোখা দুটো দৃষ্টি আঙুলের ছদ্মবেশে আমার নাকের ফুটোর মধ্য দিয়ে দ্রুত ইঁদুরের মত চলা-ফেরা করছে।

পরীক্ষান্তে আমার পাঁজরের ওপর চোখা ও সরু আঙুল ঠুকে বললেন, "তুমি।"

"না, না। ও।" আতঙ্কে উঠে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলাম।

"ও! কি করে বুঝলে।"

"বোঝা খুব সহজ। ও নাচে, গায়, হাসে। কাঁদে। তাছাড়া ওর নাকের ডগা—"

"থামো। তুমি নাকের ডগার কি বোঝো হে ছোকরা? আর ঐ বাকী ক্রিয়াগুলো তুমি কর না?"

"করি। মাঝে—মাঝে—"

"তবে—?" তাৎপর্য ঝিকিয়ে উঠল সেই চোখে।

"কিন্তু ও—মানে হরেন—"

"থামো।"

মানুষকে পাগল প্রমাণ করা কী শক্ত—ভেবেছিলাম তখন। আর এখন ভাবি—পাগল নয় এটা প্রমাণ করা কী অসম্ভব।

ডাক্তার বলে যাচ্ছিলেন, "পাগল হওয়া মস্ত সুখ হে। খুব সৌভাগ্যবান লোক ছাড়া পাগল হয় না। আমি কত চেষ্টা করি। কত পাগল হওয়ার বই এনে পড়ি। কত পাগল হওয়ার ওষুধ খাই। কিন্তু উঁহু—লবডংকা। গুনগুন করে গান ধরলেন, "দে মা আমায় পাগল করে।"

"আমি উঠি।"

"যদি পাগল হওয়ার ওষুধটা আবিষ্কার করতে পারি, তবে একদিন এসে খেয়ে যেও, নেমন্তন্ন রইল। আমার মনে হয় স্বর্গে যে অমৃত খেতো দেবতারা, সেটা এই জাতীয় কোন ওষুধ। দে মা আমায় পাগল করে।"

ফিরে এলাম।

হরেনের ঠাকুমা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন "সে কি! কিছু হোলো না! আর চিকিৎসাও চলবে না! ডাক্তারও জবাব দিয়ে দিলেন!

ওগো, আমার কি হবে গো! ওরে কানাই রে!"

"কাঁদবেন না।"

"না, কাঁদব না! তুই ওর বন্ধু না ছাই। ওর এই বিপদে তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস! বুঝিচি, সুসময়ের বন্ধু, অসময়ের কেউ নয়।"

"আর কী করব?"

"তুই ওকে একবার পাগলা-গারদে নিয়ে যা।"

"তাহলে আটকে রেখে দেবে।"

"দিক। তবু দু দিন বাদে সারবে তো।"

"কিন্তু ডাক্তার যে বলল—ও পাগল নয়।"

"তুই বিশ্বাস করিস ঐ পাগলা ডাক্তারের কথা? চেয়ে দ্যাখ ওর চোখের দিকে—কেমন কটমট করে চাইছে। ওরে আমার কি হবে রে!"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। নিয়ে যাচ্ছি পাগলা-গারদে। আপনি আবার কেঁদে-ভেবে পাগল হবেন না।"

হরেনকে নিয়ে এলাম পাগলা-গারদে। ওঃ, সেই ঘরটা যেন বিভীষিকার মত আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা পাখা, আলো, ভনভন শব্দ। পাখার অথবা মাথার—কে জানে। আমি আর হরেন বসে। হরেনের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করতে লাগল। কটমট করে ও ভয়ংকরভাবে তাকিয়ে আছে।

ভয় করল, কিন্তু আনন্দও হলো। ওর মাঝে মাঝে পাগলামি দেখা দেয়। সেই সময়ের এটা একটা। অতএব এবার অন্তত ওর পাগলামি প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না।

অপেক্ষা করছি পাগলা-গারদের "সুপার"-এর জন্য। করছি তো করছি। বিরক্ত হচ্ছি, হচ্ছি তো হচ্ছি। রাগছি। রাগছি তো রাগছি। নাঃ, এখানে বসে থাকলে লোকে এমনিতেই পাগল হয়ে যাবে। আমি আবার একটা পাগল নিয়ে বসে আছি। একটা পচা আমের সংস্পর্শে থাকলে একটা ভাল আমও পচে যায়। আর আমি পাগলের সংস্পর্শে কতক্ষণ আছি। ওঃ ভগবান। আমার মনে হলো, আমিও এখন হরেনের মতই কটমটে লালচে ভয়ংকর চোখে তাকাচ্ছি।

এমন সময় ঢুকলেন পাগলা-গারদের সুপার।

আমি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললুম, "নমস্কার।"

সুপার আমাদের দুজনের দিকেই তাকালেন। বিভ্রান্ত হলেন যেন একটু। প্রশ্ন করলেন, "কে?"

বরাবরের নিঃশব্দ হরেন হঠাৎ ফস করে আমাকে দেখিয়ে বললে, "এ।"

মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটে গেল। কে-এ, কে-এ—আমার মাথায় কে যেন হাতুড়ি পিটছে। কিন্তু তখনও আমার একটু সংবিৎ আছে। আমি হরেনকে দেখিয়ে চীৎকার করে বললুম, "এ।"

হরেন শুধু সুপারের কানে মন্ত্রপড়ার মত মুখ এনে বললে, "এই-ই ওর রোগ। যাকে দেখবে তাকেই বলবে—পাগল।"

"বুঝেছি।" হেসে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললেন সুপার।

"না, কিছুই বোঝেন নি।" প্রাণপণে চীৎকার করলাম আমি। "ও পাগল। ঐ হরেন।"

হরেন সুপারের কানের কাছে বললে, "এইটেই ওর—"

"বুঝেছি। রাম সিং উনকো অন্দর লে যাও।"

"আমি যাব না। ও পাগল—হরেন।" আমি রীতিমত একটা হল্লা লাগিয়ে দিলাম।

রাম সিং বলপ্রয়োগে আমায় ভেতরে নিয়ে গেল। আমি রাম সিংকে গালাগাল করলাম, থু থু ছিটোলাম, আঁচড়ালাম, কামড়ালাম।

হরেন শুধু সুপারের কানে মন্ত্রপড়ার মত করে বলতে লাগলো: "দেখছেন! দেখছেন! খুব খাঁটি সত্যি!"

আমি পাগলা গারদে রইলাম। হরেন হাসতে হাসতে চলে গেল।

বেশ কিছু দিন আমি আটক রইলুম। ডাক্তাররা নানা পরীক্ষা করলেন। কিন্তু পাগল নই এটা তাঁরা কিছুতে বুঝতে পারছেন না। যত আমার সুস্থ মনে হচ্ছে, তত ওঁরা ভাবছেন, "রোগটা শক্ত।"

এমনিভাবে কয়েক মাস কাটবার পর আমি মুক্তি পেলাম।

রাস্তায় লোকে আমায় দেখে একটু দূরে সরে গিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ হাসল। ছেলেরা দলবেঁধে আমার পেছন পেছন চলল। ছড়া কেটে এবং ইঁট মেরে আমায় খেপিয়ে তুলল।

তখন আমি রাগের চোটে হরেনের নামে এক মামলা রুজু করলাম—ষড়যন্ত্র ও আটকের অভিযোগে।

আদালতে সব সত্যি কথাই বললাম। হরেন একটি কথারও প্রতিবাদ করলে না। আমার বলা শেষ হলে ও বললে, "হুজুর, কানাই যা বললে সব সত্যি হতে পারে। আমি হয়ত এমনি বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন হুজুর, আমার কিছু মনে নেই। আপনি কানাইয়ের কাছেই শুনেছেন যে, আমি মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যাই। আমি হয়তো ঐ সময়টা পাগল হয়েছিলুম সাময়িকভাবে। কানাইও বলেছে যে সুপার আসবার আগে আমার চোখে ও পাগলের লক্ষণ দেখেছে।"

পাগলের সুযোগে হরেন বেকসুর খালাস পেল। আর পাগল এলো আমার জীবনে দুর্যোগের মত। হরেন পেল মুক্তি, আর আমি সংসারের বৃহৎ পাগলা-গারদে আটক পড়লাম।

এখন শুধু এক প্রতিজ্ঞা আমার—পরোপকার করব না। লোকের ক্ষতি করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।

আর আপনারা এই হরেনকে চিনে রাখুন।

গানের আসর

নারদেব

নাটকের গান

নাটকের আর সেদিন নেই, যেদিন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ পাল্টে যেত খ্যাত-নামা গায়কগায়িকার একটি গানে। এক সময় গান ছিল নাটকের একটি মুখ্য অংগ। কত ভেবে-চিন্তেই না নাটকে গান সংযোগ করা হত, তার জন্য কত ঘটনা সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টা হত। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা গানের জন্য বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে; দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে গানের খ্যাতির কথা বলবার প্রয়োজন নেই। গিরিশ ঘোষের কত নাট্যসংগীত একদা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। আলিবাবার গান এখনও অনেকে মজা করে শোনেন। সীতা নাটকে কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের গান দর্শকদের মাতিয়ে দিত। এমন আরো কত উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু নাটকের সেই পরিস্থিতিই আজ পাল্টে গেছে। সে যুগের মত সেভাবে নাটকে আর গান সংযোগ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। এখনকার নাটকে গান প্রযুক্ত না হবার কোন কারণ নেই। মাঝে মাঝে গান শোনাও যায়, কিন্তু গান আর নাটকের মুখ্য বস্তু নয়। কালধর্মে নাটকে গানের আর তেমন স্বীকৃতি নেই।

নাটক ছেড়ে যাত্রার কথা ধরুন। সেখানে তো গানেরই আধিপত্য। অনেকে তো যাত্রা শব্দটার বদলে "গান" শব্দটাই ব্যবহার করে থাকেন। যাত্রার মাধ্যমে অনেক রকমের সংগীত আমাদের দেশে রচিত হয়েছে, যার ধরনধারণ সম্বন্ধে আজ আমাদের পরিচয় নেই। যাত্রার গাইয়েরা তালে অসামান্য দক্ষ হতেন। চৌতাল, সুরফাকতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা তাল; সম, বিষম—নানা রকমের তালে শুধু গানই হত না, তার সংগে নাচও হত। যাত্রা সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যে তেমন আলোচনা হয়নি। যাত্রায় উঁচুদরের সাহিত্য রচিত হয়নি এটা ঠিক, কিন্তু যাত্রার একটা সাহিত্যিক এবং সামাজিক মূল্য ছিল যার পরিমাপ হওয়া দরকার। প্রাচীন যাত্রার বহু বই আজকাল আর পাওয়া যায় না। অনেক পুরোনো পাঁজির পাতা যদি উল্টে পাল্টে দেখা যায়, তাহলে সুপ্রাচীন যাত্রার বিবিধ বই-এর উল্লেখ পাওয়া যাবে, কিন্তু বাজারে খোঁজ করলে সেসব বই এখন আর পাওয়া যাবে না। গোপাল উড়ের যাত্রার নাম আমরা অনেকে জানি, কিন্তু তার টেকসট সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। এই যাত্রার গান আমাদের পরবর্তী সংগীতে বিপুল প্রভাব সঞ্চার

করেছে অথচ সেসব গানের নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি একসঙ্গে পাওয়া দূরের কথা, একটি আধটি সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার গানগুলিও এমনি দুষ্প্রাপ্য। নাটকের দিক থেকে আলিবাবার গানের স্বরলিপির বই বেরিয়েছিল, এখনও দু-একটা কপি প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে বিক্রীর অপেক্ষায় রয়েছে দেখি। এগুলি আবার ছাপা হবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না, কেননা এখন এর অ্যাকাডেমিক মূল্য ছাড়া আর কোনো মূল্যই তো নেই।

নাট্যসংগীতের প্রাচীন যুগ চলে গেছে। এখন আমরা সেই যুগের দিকে তাকিয়ে তার অবস্থা নির্ণয় করতে পারি, ভালমন্দ বিচার করতে পারি অর্থাৎ নাট্যসংগীতের মূল্যায়ন করতে পারি। অতএব এইটাই প্রকৃষ্ট সময় যখন একাজে হাত দেওয়া যায়। নাট্যসংগীতের অনেকগুলি দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে তার টেকনিকের দিক—গানের বন্দেশ কিরকম ছিল, কোন শ্রেণীর গান

বেশি রচিত হয়েছে; ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা পর্যায়ের কত বিভিন্ন শ্রেণীর গানের প্রয়োগ বৈচিত্র্য আমাদের সঙ্গীতকে কিভাবে সংগঠিত করেছে—এই সব। আর একটা দিক হচ্ছে সেন্টিমেন্টের দিক অর্থাৎ মানবমনে এইসব গানের কী আবেদন সঞ্চারিত হয়েছে এবং কোন কারণে আমাদের আকর্ষণ করেছে। যেমন আড়খেমটায় রচিত গানগুলি দর্শকদের মনে পুলকের উত্তেজনা সঞ্চার করেছে, আবার কখনো কখনো করুণভাব বিস্তার করেছে। গোবিন্দ অধিকারীর একটা গান ছিল "দে গো বৃন্দে আমায় দে যোগী সাজায়ে"-এর যে একটা কারুণ্য, ঔদাসীন্য সুরে তা অপরূপভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এর সুরেই এমন যে, নাট্য পরিস্থিতিতে দর্শককে বিহ্বল করে তোলে। "তোরা বাসনে বাসনে বাসনে দূতী" এরকম আর একটি বিখ্যাত গান। ভজন, স্তব, স্তোত্র—বাংলায় যা রচিত হয়েছে, তার বড় একটা অংশ নাট্যসংগীতে পাওয়া যায়। ভক্তি সংগীতের নানাবিধ বিকাশ গিরিশ ঘোষের যুগে বিশেষ প্রাধান্য-লাভ করে। আলিবাবার গানকে অনেকে চটুল আখ্যা দেবেন, কিন্তু সে চটুলতার মধ্যে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা ছিল। সমস্ত লঘুতা সত্ত্বেও আলিবাবা নাট্যসংগীতের একটি উৎকৃষ্ট আর্ট, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। পৌরাণিক অভিনয়গুলিতে বাংলার নিজস্ব সংগীতের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। বাংলার বিভাস সেকালের অনেক নাটকের গানে শুনতে পাওয়া যেত। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার গানে বাংলায় প্রচলিত সুরটমল্লারের পরিচয় মেলে। এইরকম বাংলা গানের বহু বৈশিষ্ট্য সেকালকার নাট্য-সংগীতে পাওয়া যায়।

নাটকের প্রেরণা না থাকলে আমাদের দেশে কাব্যসংগীতের এত চর্চা হত না, সুরের এত বৈচিত্র্য এবং দেশী সঙ্গীতের এত উৎকর্ষও দেখা যেত না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই বিপুল নাট্যসংগীতকে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে যদি দেখা যায় এবং সাজানো যায়, তাহলে দেখা যাবে কতদিকে নাট্যসংগীতের বিস্তৃতি ঘটেছিল। যাত্রা এবং থিয়েটারের গানে রাগসঙ্গীতের সংখ্যাধিক্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। নাটকীয় চমৎকারিত্বের প্রয়োজনে তাল বৈচিত্র্যও কম নয়। বৃন্দগায়ন, যন্ত্রসংগীত প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও যথেষ্ট হয়েছে। নাটকের উদ্যোগেই বেহালা, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। আমাদের সঙ্গীত সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে নাট্যসংগীতে বহু বৎসর ধরে যে প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে বল সঞ্চয় করেছে, আমরা ধারাবাহিকভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করবার কোনো আগ্রহই আজ পর্যন্ত দেখাইনি। কেবলমাত্র নাট্যসঙ্গীতের একটি সুবৃহৎ সংকলন বিশেষ প্রয়োজন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নাট্যসংগীতের স্বরলিপি একত্র করতে পারলে সাঙ্গীতিক ইতিহাস নির্ণয়ে অসামান্য সুবিধা হবে। একসময়ে আমাদের সাঙ্গীতিক চিন্তা যে কতদিকে গিয়েছিল, তার একটা উৎকৃষ্ট পরিচয় আমরা পেতে সক্ষম হব, যদি এই বিরাট কার্য সাধিত হয়। এমনিতে কোনো প্রতিষ্ঠান এই কাজে এগিয়ে আসবেন কিনা জানিনে, তবে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁরা এই ধরনের কাজে হাত দিতে পারেন। আজকাল সংগীত নিয়ে থিসিস লেখা হচ্ছে শুনতে পাই, কেউ কেউ ইতিমধ্যে ডিগ্রীও অর্জন করেছেন জেনেছি। অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেকে এদিকে অগ্রসর হবেন, তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। অতএব ডিগ্রীর প্রয়োজনেও অগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এসব কাজে হাত দেন, তাহলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

আসলে নাট্যসংগীতের একটা বিরাট ঐতিহ্য ভারতবর্ষে রয়েছে। আমাদের রাগ-সংগীতের শ্রীবৃদ্ধিও নাটকের মাধ্যমে ঘটেছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, সব গ্রামরাগই নাটকে প্রযুক্ত হত। কোন পরিস্থিতিতে, কোন রসে সেসব গান প্রযোজ্য ছিল, তারও নির্দেশ পাওয়া যায়। স্পষ্ট করে বলতে গেলে যাকে আমরা মার্গসংগীত বলি, আসলে সেটা নাটকেরই সংগীত। ব্রহ্মার উপদেশে মহাদেব এবং অপরাপর দেবগণের সম্মুখে ভরত মুনি যে সংগীত প্রয়োগ করেছিলেন, তা নাটকের মাধ্যমেই প্রদর্শিত হয়েছিল। আমাদের রাগসংগীতও নাটকের সহায়তায় জনমনোরঞ্জন করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বোধ করি, এই কারণেই বলা হয়েছে—রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ।

ট্রামে বাসে

কলিকাতার নাগরিক কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেন মহাশয়ের সম্বর্ধনা সভায় (বেতার কেন্দ্রের ভাষণে—ভোজ-সভায়!) মন্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালীর মান রক্ষার জন্য সর্বসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি আহ্বান করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"মান রক্ষার প্রশ্ন অবশ্যই আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগে প্রাণ। কেন না আপনি বাঁচলে ত বাপের নাম!!"

সংবাদে দেখিলাম (দেখিলাম, যেহেতু ট্রাম-বাস যাত্রীরা বেতার বর্ণিত "ভোজ সভায়" নেহাতই রবাহূত!) মুখ্য-মন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত জনগণের নিকট করজোড়ে আবেদন জানাইয়াছেন।—"আর সেই দিনের সংবাদেই প্রকাশ অর্থমন্ত্রী মহাশয় জোর করের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি নাকি বলেছেন গ্রাম বাংলায় 'বিরাট' আর্থিক উন্নতি হয়েছে, তাহারা 'অনায়াসে' আরও করভার বহন করতে পারে। হতে পারে, কেন না, কে নাকি কোথায় বলেছিল সে মার খেতে পারে না। কিন্তু যখন বলা হল—বেঁধে মারলে? উত্তরে সে বলেছিল—যত খুশি"—কথাগুলি বলে আমাদের শ্যামলাল।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতায় নবারুণ ট্যাক্সি সমবায়-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হইয়া গেল এবং ট্যাক্সির সংখ্যা আরও ১১টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। "পথচারী ডাক দিলে আর ট্যাক্সি থামবে কিনা তেমন কোন সংবাদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়নি"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেন মহাশয় কলিকাতায় অত্যধিক ভিড়ের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এইসব কারণের মধ্যে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার কথাটা উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু এটা একটা মোক্ষম কারণ। বহুদিন আগে অবশ্য চিড়িয়াখানার আকর্ষণে অনেকেই কলকাতা আসতেন।" সহযাত্রী জনৈক চিড়িয়াখানা দর্শকের সপ্রশংস গান শুনাইলেন—"উল্লুকের কী আমদানি, মহারানী, ধন্য তোমার জমিদারি!!"

এক সংবাদে শুনিলাম—ক্রমাগত পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে সহস্র বৎসর পর্যন্ত মানব জাতির সমূহ ক্ষতি হইবে। শ্যামলাল বলিল—"পরোয়া নেই। মাত্র হাজার বছর ত। তারপরে আমাদের মারে কে, তখন দেখে লোবো!"

দ্রব্য মূল্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার আলোচনার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে উদ্যোক্তাগণ নাকি ১৮টি শর্ত পূরণের জন্য দাবি উত্থাপন করিয়াছেন।—"১৮টি শর্তের কথা শুনে কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের কথা মনে না করে উপায় নেই"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

এক সংবাদে শুনিলাম পান খাইলে নাকি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ হয়। —"কিন্তু যখন গান শুনি—'একটি কথা কও-বা-না কও পান খেয়ে যাও, ঘাটে ডিঙা লাগাইয়া, বন্ধু'—তখন ক্যানসার,—ফুঃ!" পান চিবাইতে চিবাইতে মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

ভারতে পুরুষের তুলনায় নাকি নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। —"ট্রাম-বাসের সীটের দিকে তাকিয়ে একথাটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া শক্ত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিদেশ যাত্রা সম্পর্কে পালাম বিমান বন্দরে জনৈক সাংবাদিক অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে প্রশ্ন করেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কী পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দিয়াছেন। উত্তরে মোরারজী নাকি বলেন—তাঁর যতটা প্রয়োজন ততটাই দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া নেহরুজী পরিমাণের বেশী কখনো নেন না। শ্যামলাল বলিল, "ওটাই ত নেহরুজীর ভুল। অধিকন্তু ন দোষায় শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞান!!"

সুইডেনের দুইটি তরুণ-তরুণী নাকি হাওয়াই জাহাজে শূন্যে চড়িয়া বিবাহ করিয়াছেন। —"আশীর্বাদ করি উদ্বাহ বন্ধনটা হাওয়াই জাহাজে হয়েছে বলেই তা গন্ উইথ্ দি উইন্ড হবে না"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলিকাতা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে বিজয়ী ভারতীয় দলের সম্বর্ধনা উৎসবে আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, সরকার যদি শীঘ্র স্টেডিয়াম তৈরি করিতে না পারেন বা তৈয়ার করিতে যদি সরকারের কোন অসুবিধা থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের হাতে এই ভার ছাড়িয়া দিলে মানুষের পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি স্টেডিয়াম গড়িয়া তুলিব।—"ঘোষ মশাই সারা জীবন রাজনীতি করেছেন, ক্রীড়া নীতি জানেন না এবং সেই জন্যেই এটা তাঁর জানা নেই যে, কলকাতার মাটি স্টেডিয়াম নির্মাণের পক্ষে উপযোগী নয়। বিশ্বাস না করেন, মুখ্য-মন্ত্রীর দেওয়ানী আমে স্টেডিয়াম নিয়ে দরবার করে দেখতে পারেন"—বলেন জনৈক ক্রীড়া রসিক সহযাত্রী।

এই প্রসঙ্গেই অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"তবে হ্যাঁ, আই এফ এ-র খেলার মরসুমে স্টেডিয়ামের কথাটা একবার না পাড়লে অনুষ্ঠানে ত্রুটি থেকে যায়। সেদিক থেকে অতুল্যবাবু আই এফ এ-র ঐতিহ্য অটুট রেখেছেন!!"

সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়াস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীপন্থ প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কী বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন কথা সাংবাদিকদের নিকট বলিতে পন্থজী অস্বীকার করেন। তিনি শুধু বলেন যে, তাঁহারা মহাভারতের কাহিনী আলোচনা করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"ভারতের ফুটবল খেলার সময়ে গ্যালারি থেকে হাউ-মাউ-কাউ শব্দ শুনে সাংবাদিকদের কিন্তু রামায়ণের আলোচনার কথাই মনে পড়েছে!!"

রাশিয়া হইতে প্রেসিডেন্ট কেনেডির জন্য মদ্য প্রেরণ করা হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া জনৈক সহযাত্রী গান ধরিলেন —পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে!!"

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

বারো

ভাটার সময় আদিগঙ্গায় জল থাকে না। সেই সময় ঝিঙে ও আর তিন-চারটের সঙ্গে সাহেবও কাদা ভেঙে ওপার গিয়ে ওঠে। পুরুষোত্তম সা'র চালের আড়ত, মস্তবড় টিনের ঘর। গাঙের খোলের নৌকো থেকে বস্তা বস্তা চাল মাথায় মুটেরা গুদামে নিয়ে ফেলছে। মাঝখানের রাস্তাটা পার হয়ে যায়। চলেছে তো চলেইছে—পিঁপড়ের সারির মতো বওয়ার আর শেষ নেই। বস্তায় বস্তায় গুদামঘরের ছাত অবধি ঠেকে যায়। ওরে বাবা, কারা খাবে না জানি গুদোম ভর্তি এত চাল!

পুরুষোত্তমবাবুকে দেখা যায় রাস্তা থেকে। ঢুকবার দরজার ঠিক পাশে জোড়া তক্তাপোশ—কাঠের হাতবাক্স সামনে নিয়ে তিনি তার উপরে বসেন। ডাইনে বাঁয়ে আর দু'-জন—ঘাড় গুঁজে বসে তারা খাতা লেখে। বিশাল ভুঁড়ি, মাথায় টাক—খালি গায়ে থাকেন পুরুষোত্তম প্রায়ই, খুব বেশী তো হাত-কাটা ফতুয়া একটা। গলায় সোনার মোটা চেন, ডান হাতে চৌকো সোনার চাকতি এবং তামা লোহা ও রুপোর একগাদা মাদুলি। হাত নাড়তে গেলে খড়বড় আওয়াজ ওঠে। নাড়তেই হয় সেই হাত অনবরত। হাতবাক্স খুলে নোটে টাকায় এই এক কাঁড়ি মাঝিদের দিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই পাইকারদের কাছ থেকে টাকা-নোটের গাদা গুণে নিয়ে হাতবাক্সে ঢোকাচ্ছেন। গাঙের জোয়ার-ভাটার মতো সারা দিনমান এই কাণ্ড চলে। ওরে বাবা, এত টাকা এক সঙ্গে এক বাক্সের ভিতর মানুষে জমিয়ে রাখে!

চাল খুঁটতে আসে সাহেবরা। নৌকো থেকে গুদামে উঠবার সময় বস্তা গলে দু-চারটে চালের দানা পড়ে। কাঁচাচোখের ছোঁড়াগুলো পথের ধুলো থেকে একটা একটা করে খুঁটে কোঁচড়ে তোলে। পাখি যেমন করে ঠোঁট দিয়ে তুলে তুলে নিয়ে খায়। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটিও প্রচণ্ড। সকলের বড় বজ্জাত ঝিঙেটা—

ফণী আড্ডির বেটা তুই কেন এসব ছ্যাঁচড়া কাজে আসিস?

এ রকম প্রশ্নে ফণী হি-হি করে হাসেঃ বাবার সংসারে শুধু খাওয়া-পরার বরাদ্দ। এই যা হল, নিজের রোজগার। বিড়িটা-আসটার খরচা কোথা থেকে আসে? শুধু বিড়িতে শোধ যায় না, মুখের গন্ধ মারতে এলাচ-দানা চিবুই। সংমা বেটি মুকিয়ে থাকে—হাঁ কর্ তো দেখি। মুখ শুঁকে কিছু পেলে বাবাকে অমনি বলে দেবে। ভাতের বদলে সেদিন মার—

খরচা বেশি বলে ঝিঙের প্রতাপটাও বেশি। একটা দানা দেখল তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে অন্যের সামনে থেকে। অন্য কারো কিছু হতে দেবে না, রাস্তাটুকুর উপর সর্বক্ষণ যেন নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

কথা হল, জায়গার বাটোয়ারা হয়ে যাক তবে। একটা ডাল ভেঙে নিয়ে রাস্তার উপরে দাগ দিয়ে নেয়—এখান থেকে এই অবধি ঝিঙের সীমানা। এই অবধি সাহেবের, এই অবধি অমুকের—। যার কপালে যা পড়ে, এলাকার বাইরে কেউ যাবে না।

বলিহারি সাহেবের কপালজোর! ভাগা-ভাগির পর প্রায় তখনই একটা বস্তার ছিদ্র খুলে তার লাইনের ভিতরে ঝুরঝুর করে মাল পড়ে। মুটে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য হাত চাপা দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা পড়েছে, সে-ও এক পর্বত—পুরো মুঠোর কাছাকাছি। ঝিঙে তড়াক করে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, অন্যগুলোও সঙ্গে আছে। সাহেব যা তুলে ফেলেছিল, কোঁচড়ে হেঁচকা টান দিয়ে সমস্ত ছড়িয়ে দেয়।

এ কি, আপোস-বন্দোবস্ত এই যে হয়ে গেল—

সে হল ছিটেফোঁটার বন্দোবস্ত। এখন যদি হুড়মুড় করে স্বর্ণবৃষ্টি হয়, সে-ও তুই একলা কুড়োবি নাকি?

শয়তান মিথ্যেবাদী, মরে গিয়ে কালী-ঘাটের কুকুর হবি তোরা—। কিন্তু মৃত্যুর পরের ভাবনা নিয়ে আপাতত কারো মাথাব্যথা নেই, মাটিতে পড়া সাহেবের চাল তাড়াতাড়ি খুঁটে তুলে নিচ্ছে। সাহেব পাগলের মতো গিয়ে পড়ে তো ধাক্কা দিল তাকে।

চেঁচামেচিতে গদির উপর পুরুষোত্তমবাবুর নজর পড়েছে। এই, শুনে যা—। বাঁহাতের আঙুল নেড়ে ডাকলেন।

আছে মোট পাঁচজন, দুঃসাহসী ঝিণ্ডে এগিয়ে যায়। পুরুষোত্তম খিঁচিয়ে ওঠেন: আগ বাড়িয়ে এলি, তোকে কে ডাকে রে হাঁড়ির তলা? ঐ যে, ঐ ধবধবে ছেলেটা—ওকে ডাকছি।

সাহেবকে ডাকেন। ঘোর কালো বলে ঝিণ্ডেকে বললেন হাঁড়ির তলা। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে এমন তাকান পুরুষোত্তম, বুকের ভিতর গুরগুর করে। সাহেবের

ডাক হল তো দিয়েছে সে চোঁচা-দৌড়—

পরের দিন কাজে আছে, পিছন দিক থেকে কে এসে চটিসুদ্ধ পা তুলে দিল সাহেবের পিঠের উপর : এই ছোঁড়া—

মুখ ফিরিয়ে দেখে পুরুষোত্তম। সর্বনাশ, বাবু নিজে বেরিয়ে পড়েছেন।

ছোঁড়া তোকে কাল ডাকলাম, গেলি নে কি জন্যে?

সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। পুরুষোত্তম অন্যদের দিকে ফিরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : বড্ড ফুর্তি বেধেছে। আমার চাল পড়ে যায়, সেই সমস্ত তোরা নিয়ে পালাস। পালা, পালা—নয় তো পুলিসে দেব।

অপমানিত জ্ঞান করল ঝিঙে—কাল বলেছে হাঁড়ির তলা, এখন এই। ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়ায় : চেঁচামেচি করেন কেন মশায়? সরকারি রাস্তা—পড়ে পেলাম খুঁটে নিলাম। আপনার গুদোম থেকে যদি নিতাম, কথা ছিল।

সরকারি রাস্তা—বটে! মুখে মুখে চোপরা করিস, এত বড় আস্পর্ধা!

দরজার ধারে লাঠি হাতে দরোয়ান বসে থাকে, রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। পুরুষোত্তম তাকে বললেন, তেড়ি দেখেছ এইটুকু ছেলের! লাঠি পিটে পিণ্ডি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে। বলছে সরকারি রাস্তা। সরকার বাবা ওদের—ঠেকাক এসে সেই সরকার।

দু-হাতে লাঠি তুলে দরোয়ান লম্ফ দিয়ে পড়ে। দৌড়, দৌড়। আর তিনজন উধাও, বেপরোয়া ঝিঙে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে চেঁচাচ্ছে : দেখে নেব। পাড়ায় পাবো না কোনদিন? ইট মেরে তোমার টাক ভাঙব।

দারোয়ান তেড়ে যেতে একেবারে অদৃশ্য। পুরুষোত্তম গর্জন করেন : উঃ, ছেলেবয়সে এখনই হাপ-গুণ্ডা। দেখতে পেলে ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দেবে, পাকা হুকুম আমার।

সাহেবও পালাবে, উঠে পড়েছিল। হাত এঁটে ধরে আছেন পুরুষোত্তম। ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কেঁদে পড়ল সাহেব : আর কক্ষণো আসব না, কোনদিনও না। কান মলছি বাবু, নাক মলছি। ছেড়ে দিন।

পুরুষোত্তম হেসে ফেলেন : আসবি নে কি রে? তোর জন্যেই তো তাড়ালাম ওগুলো। এটা তোর রাজ্যপাট। দেখি, কতগুলো হল আজ।

কোঁচড় নেড়ে চালের পরিমাণ দেখলেন। হতাশ সুরে বলেন, এই? রোদে তেতেপুড়ে মুখ যে টকটক করছে—এত কষ্টের এই লভ্য? চিল-কাকগুলোকে এই জন্যে তাড়ালাম, এখন তুই একেশ্বর। হ্যাঁরে, থাকিস কোথা তুই! কে কে আছে?

আঙুল তুলে সাহেব ওপারে দেখায়। পুরুষোত্তম ঘাড় বাঁকিয়ে নিরিখ করে দেখলেন : [illegible] রে? ঐ তো বস্তী আড্ডির বস্তিবাড়ি—আড্ডির বস্তিতে থাকিস বুঝি? নতুন এসেছিস?

নিশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলেন, কত ঘোরাঘুরি ছিল। ব্যবসা জেঁকে ওঠার পর ইস্তফা পড়ে গেছে। দূর দূর, টাকার নিকুচি করেছে, রসকষ কিছু আর থাকে না জীবনে। কত আসছে কত যাচ্ছে—চোখ তুলে দেখেছ কি বারো শত্তুর অমনি ফুসুর-ফুসুর করবে : শামশায় তাকাচ্ছেন।

একটা আধুলি হাতে গুঁজে দিলেন পুরুষোত্তম। বলেন, কাল থেকে একলা হলি, পুষিয়ে যাবে। অন্য কেউ ঢুঁ মারতে এলে দরোয়ানকে বলবি, লাঠিপেটা করে করে পোল পার করে দিয়ে আসবে। হুকুম দেওয়া আছে আমার।

বড় ভাল লোক, বড্ড দয়া। সাহেবের মনে এলো, বাপ হতে পারেও এই মানুষটা। নয়তো এত টান কিসের? আদিগঙ্গার উপর বাসা—পুঁটলি বেঁধে ছেলে ভাসানো কাজটা অতি সহজে এরা পারে। কিন্তু বাপ যদি হয়, এই দয়ার মানুষ প্রাণ ধরে কখনো পারেনি—মা সর্বনাশী করেছিল।

গাঙে এখন ভরা জোয়ার, পোল ঘুরে যেতে হচ্ছে। পোলের মুখে দেখে ঝিঙেরা চারজন। পুরুষোত্তমকে কবে পায় না পায়—উপস্থিত তাঁর পেয়ারের মানুষ সাহেবের উপরেই কিছু শোধ তুলবে বোধ হয়। কোন কায়দায় সরে পড়া যায়, সাহেব এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঝিঙে বলল, ঘরে ঢুকিয়ে মারধোর দিল বুঝি তোকে? তাই দাঁড়িয়ে আছি।

সর্বরক্ষে রে বাবা! নাক ফোঁত-ফোঁত করে হাঁ বলে দিলেই চুকে যায়, সম্পূর্ণ

নিরাপদ। কিন্তু সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায় ফস করে। এই বড় মুশকিল সাহেবের, সামান্য মিথ্যে কথা বলতেও পারে না—বিস্তর কসরতের পর তবে হয়তো একটা বেরুল। তার জন্যে নানান রকমে মহলা দিতে হয় মনে মনে। বাপ-মা ঠিক সত্যবাদী ছিল—ছেলে বাপের মায়ের মতন হয়, সেই জন্য এই বিপত্তি।

সাহেব সত্যি কথাই বলল, ও রাস্তায় একলা আমি চাল খুঁটেব, ডেকে নিয়ে তাই বলে দিল।

বলেই ভয় হয়েছে। ভয়ে ভয়ে আজকের সমস্ত চাল কোঁচড় থেকে ঢেলে দেয়। চাল ঘুস দিয়ে ভাব জমাচ্ছে। বলে, তোদের তো ভালই রে, সারা বেলাস্ত রোদ-পোড়া হতে হবে না। নিত্যিদিন এইখানটা এসে আমি ন্যায্য ভাগ দিয়ে যাব। সকলে মিলে আশাসুখে রোজগারে আসি—পুরুষোত্তম-বাবু একচোখো, তা বলে আমরা কেন তার মতন হতে যাই?

ঝিঙে তবু প্রবোধ মানে না। নজরে পড়ে ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। ঐরকম ডাকাত ছেলে, ভ্যাক করে কেঁদে পড়ল সহসা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, চেহারার গুণে তোর আদর। হাঁড়ির তলা বলে হেনস্থা করল—ঐ পুরুষোত্তম শালাও তো কালো। আমি যদি ওর ছেলে হতাম, এমন কথা বলত কখনো!

চালগুলো দিয়েথুয়ে সাহেব বাসায় ফেরে। ভাগ করে নিয়ে নিক ওরা। আধুলিটা তার আছে। ভাগের ভাগ যে চাল পেত, আধুলি তার অনেক উপর দিয়ে যায়।

কিন্তু সে আধুলিও বুঝি রাখা যায় না। বাসায় পা দিতেই রানী এসে ডাকল, শোন সাহেব একটা কথা। শিগগির শুনে যাও।

রানী ঝগড়া করে: ফাঁকি কথা বললে কেন সাহেব? মা-কালী কিছু নয়, একেবারে বাজে। ভেলভেট-ফিতের কথা বলছি, শখ হল জিনিসটার উপর। কত আর দাম শুনি? এদ্দিনের মধ্যে দিতে পারলেন না।

বিপদের কথাই বটে! মেয়েটার কালী-পদে মতি নেওয়াচ্ছে, সে কালীরই পশার থাকে না। সাহেবের নিজেরও পশার নষ্ট। এর পর কোন কথা বললে রানী কি আর মানতে চাইবে?

সমস্যায় পড়ে গিয়ে আপাতত সামাল দেওয়ার কথা বলে, দুর, তাই হয় নাকি রে! এত বড় পৃথিবী সৃজন-পালন করছেন, এক গজ ফিতে দিতে পারেন না তিনি! তোরই দোষ, একমনে তেমন ভাবে ডাকতে পারিস নে।

রানী তর্ক করে, পারি যে তো সেদিন মাকড়িজোড়া আমার [illegible] করে? সেদিন যে [illegible]

ইতিমধ্যে সাহেব অজুহাত খ‍ুঁজে পেয়েছে। বলে, মাকড়ি যা বললে হয়, ফিতে তাতে কেন হবে? মানে তফাৎ রয়েছে না? বলি, কার্তিকপ‍ুজোর যে মন্তোর লক্ষ্মীপ‍ুজোর কি তাই? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, পার‍ুল-মাসিকে দেখ জিজ্ঞাসা করে।

জিনিসটা এতই সরল যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। রানী সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল: তবে কি হবে? ফিতের জন্যে কোন কায়দা করতে হবে, বলে দাও আমায়।

বারম্বার চাচ্ছিস তো, তোয়াজটা বাড়িয়ে করাই ভাল। কথাবার্তা নয়, মন্তোর। সে মন্তোর আমার কাছে আছে।

সাহেব ছ‍ুটে গিয়ে নিজের ভাণ্ডার থেকে মন্ত্র নিয়ে আসে। এক রকমের সিগারেট বাজারে খ‍ুব চাল‍ু—কালী সিগারেট। প‍ুর‍ুষোত্তমবাব‍ু খ‍ুব খান। শেষ হয়ে গেলে বাক্স ছ‍ুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে। সাহেব কয়েকটা কুড়িয়ে এনেছে। মা-কালীর ছবি বাক্সের উপর। হাতে খাঁড়া আর কাটা-ম‍ুণ্ড গলায়, ম‍ুণ্ডমালা, মাথার চুল সমস্ত পিঠময় কালো করে পদতল অবধি নেমে এসেছে। শিবঠাকুরের ব‍ুকের উপর—লজ্জায় সেজন্য টকটকে জিভ কেটে আছেন। ঠিক যেমনটি হতে হয়, একেবারে সত্যিকার মা-কালী। ছবি ছিঁড়ে সাহেব সেঁটে দিয়েছে ঘরের দেয়ালে। পরে লক্ষ্য হল, ছবি ছাড়াও স্তব ছাপা রয়েছে বাক্সের ওদিকটায়। ভারি চমৎকার। স‍ুধাম‍ুখীকে দিয়ে কয়েকবার পড়িয়ে নিল, এখন সাহেবের আধ-ম‍ুখস্থ। বস্তুটা সামনে রেখে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। রানীকে তাই শোনাচ্ছে:

করালবদনা কালী কল্যাণকারিনী
কাতরে কর‍ুণা দান করেন জননী।
বঙ্গবাসী জনে দেখি সিগারেটে রত
শ্বাসকাস আদি ক্লেশে ভোগে অবিরত।
ব্যথিত হ‍ৃদয়ে মাথা দয়া প্রকাশিল
সিগারেট র‍ুপে এবে স‍ুধা বিতরিল।

রানী সন্দেহ ভরে বলে, এ তো সিগারেটের মন্তর। ফিতের কথা কই?

সিগারেট পালটে ফিতে বললেই হল। চানটান করে শ‍ুদ্ধ কাপড়ে শ‍ুদ্ধ মনে দেখ না বলে। না খাটে তো তখন বলিস।

পরের দিন চুলে ফিতে পরে বাহার করে রানী মন্তের ফল দেখাতে এল।

ডাকাব‍ুকো মন্তোর গো সাহেব। বেড়ে জিনিস শিখিয়েছ, আমি ম‍ুখস্থ করে নিয়েছি। আজকে আমি একপাতা সেফটি-পিন চাইব। সিগারেট পালটে ফিতে বললে হল, ফিতে পালটে সেফটিপিন বললেই বা কেন হবে না?

যুক্তি অকাট্য। এবং এক পয়সার একপাতা সেফটিপিন জোগানো মা-কালীর পক্ষে কঠিন [illegible]। কিন্তু একনাগাড়ে এমনি যদি [illegible] ঠিক

তাই। সেফটিপিন হল তো মাথার কাঁটা চিরদিন গায়ে-মাখা সাবান। যা গতিক, কালী ঠাকর‍ুনকে প‍ুরো এক মনোহারি দোকান খ‍ুলতে হয় রানীর জিনিস যোগান দেবার জন্যে।

(মায়া-অঞ্জনের খবরটা জানা থাকত যদি! পরবর্তীকালে সকৌতুকে সাহেব কত সময় ভেবেছে। রানীর আবদার চক্ষের পলকে তাহলে মেটানো যেত। এই কাজল চোখে দিয়ে চোর অদ‍ৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কেউ দেখে না, সে কিন্তু দেখতে পায় সকলকে। সেকালের প‍ুঁথিপত্রে অঞ্জনের গ‍ুণপণার অগন্য কাহিনী—গ‍ুর‍ুকে বিস্তর সেবা করলে তবে তিনি এই বস্তু দিতেন। মক্কেল মালপত্র রেখেছে—মাটির নিচে হোক, বাক্স-পেঁটরার ভিতরে হোক, অঞ্জনের গ‍ুণে স্পষ্ট নজরে আসবে। নেওয়ারি ভাষায় এক প‍ুরানো প‍ুঁথি—পণ্ডিতেরা বলেন, হাজার বছরের মতো বয়স—ষণ্ম‍ুখকল্প। ছয় ম‍ুখ-ওয়ালা কার্তিক হলেন চোরের দেবতা—তাঁর নামের প‍ুঁথি। মায়া-অঞ্জন তৈরির পদ্ধতিও তার মধ্যে। বলাধিকারী চোরশাস্ত্র নিয়ে পড়েছেন তো আদ্যন্ত না দেখে ছাড়বেন না। খবর পেয়ে বিস্তর কষ্টে পাঠোদ্ধার করে যাবতীয় মন্ত্র লিখে নিয়ে এলেন। অশ‍ুদ্ধ ভাষা হলেও মন্ত্রের পাঠে তিল পরিমাণ হেরফের চলবে না। মায়া-

অঞ্জনের মন্ত্রঃ ওঁ চন্দ্রসূচ্যময়ন্দৃষ্টি দেব-নির্মিতং হর হর সময় পুরয়ঃ হুং স্বাহা। উপকরণও এমন-কিছু দুর্লভ নয়। উলুক অর্থাৎ পেঁচার বসা, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ আতপ চাল, এবং কপিলাঘৃত। কপিলাঘৃত বস্তুটা জানা নেই। সমস্ত একত্র করে জ্বালিয়ে তেল বানাবেন। পদ্মসূত্রের সলতেয় নর-কপালে ঐ তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে কাজল পাড়ান, আর মন্ত্রটা এক-শ বার জপ করে ফেলুন। মায়া-অঞ্জন তৈরি হল—চোখে দিয়ে দেখুন মজাটা এবার। যা দিনকাল পড়েছে, গুণীরা দেখুন না পরীক্ষা করে।)

ধৈর্য হারিয়ে সাহেব একদিন বলে, কত আর চাইবি কালীর কাছে? ইতি দে এবারে। যখন তখন মাকে মুশকিলে ফেলবিনে।

ভ্রূভঙ্গি করে রানী বলে, মা-কালী তো আমাদের মতন নন। সিকি পয়সা খরচা নেই মায়ের—ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করলেই এসে যায়। তাঁর আবার মুশকিলটা কি?

সাহেব আমতা-আমতা করে: তা হলেও

ভাববেন, মেয়েটা বড্ড হ্যাংলা। বিরক্ত হয়ে পেন্নাটা দেওয়া একেবারে বন্ধ করলেন দেখে নিস।

এতদূরে রানী তলিয়ে দেখেনি। মা-কালীর কাছে বদনাম হয়ে যাচ্ছে বটে। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, এবারে চটি জুতোর আবদার করে বসেছি সাহেব। দিয়ে দিন একজোড়া। তার পরে আর মা-কালীর নামটাও মুখে আনছি নে। ইহজন্মে নয়। কী দরকার! মা হয়তো ভেবে বসবেন, আমার কোন মতলব আছে মনে মনে। নয়তো ডাকে কেন?

ঘাড় দুলিয়ে জোর দিয়ে বলল, এই আমার শেষ চাওয়া। টুকটুকে লাল চটি, মাখনের মতো নরম। বড়লোকের ঘরের ভাল ভাল মেয়ে-বউরা এই চটি পরে আসে। নাটমণ্ডপের নিচে খুলে রেখে মন্দিরে ঢোকে। দেখে এসো একদিন সাহেব কী সুন্দর!

দেখতে যেতে হয় অতএব সাহেবকে। জুতো চুরির ভয়ে ভক্তেরা সবসুদ্ধ মন্দিরে ঢোকে না, একজনকে রেখে যায় জুতোর পাহারায়। ব্যাপার বুঝুন। এক-বাড়ি মানুষে ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, মন্দিরে ঢুকে সবাই ঠাকুর দর্শন করছে—তার মধ্যে একজনই কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে তাক করে আছে সকলের পায়ের জুতোয়। সে যেমন কপাল করে আসে!

অবশেষে চটিজুতোও দিয়ে দিলেন মা-কালী। রানীর পায়ে ঢলঢলে হয়, জিনিসটা তবু পছন্দসই।

হল কি সাহেব, চুরি সে একের পর এক চলল। পয়লা বার সুধামুখীর কণ্ঠ দেখে, তারপরে রানীর আবদারে। যে রানীকে সাহেবের বউ বলে সকলে ক্ষেপায়, রানীও বউয়ের মতন সলজ্জ ভাব দেখায় লোকের সামনে। মায়ের জন্য চুরি, আর বউয়ের আবদার রাখতে চুরি। এই সব ছেলেমি কাজের বৃত্তান্ত শুনে বলাধিকারী মশায় কৌতুক করতেন। পাকা পাকা জাঁদরেল কারিগরেরও তো এই রীত। শখ করে কেউ সিঁধকাটি ধরে বেরোয় না—মা-বাপের জন্যে বউয়ের জন্যে কাচ্চাবাচ্চা আপনজনের জন্যে। এত বড় যে কাপ্তেন কেনা মল্লিক—তার কাজকারবারেরই বা কতটুকু আত্মভোগে লাগে!

ঠিক দুপুরে সাহেব চাল খুঁটছে আড়তের সামনের রাস্তায়। একেশ্বর এখন—তাড়াহুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে খুঁটে খুঁটে তুলে নেওয়া। জুতো মসমস করে বাবু একজন এল। কতই তো আসে পুরুষোত্তমবাবুর কাছে কাজকর্ম নিয়ে। সাহেব আপন মনে চাল কুড়িয়ে যাচ্ছে।

কে রে, সাহেব না তুই?

বাদার জঙ্গলে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাঝিদের কাছে সাহেব গল্প শুনেছে। তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবুলোকটা সাহেবের চুলের মুঠি ধরে। তাকিয়ে দেখে, অন্য কেউ নয়—নফরকেষ্ট। এত কাল পরে এই রাস্তার উপরে হঠাৎ উদয়। চুল এঁটে ধরে প্রকাণ্ড চড় উঁচিয়েছে—

চেহারায় নফরকেষ্ট সত্যি সত্যি বাঘ। অথবা বুড়ো হাতী। ছেলেমানুষ সাহেব বলে নয়, বড়রাও আঁতকে ওঠে। কিন্তু রাগে অপমানে জ্ঞান হারিয়েছে সাহেব। তড়াক করে উঠে ক্ষীণ হাত দু-খানায় বিশালদেহ নফরাকে এঁটে ধরেছে। খিমচি কাটে, কোঁৎকেঁৎ অনর্থ করে: কেন মারলে আমায় তুমি—কেন? কেন?

নফরকেষ্টর হুংকার সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে যায়। চড়ের তাত নেমে গেছে অনেকক্ষণ। মিনমিন করে বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে? ভাবলাম আমি এখন, মিথ্যে বলবি নে। কী চেহারা হয়েছে, দেখ দিকি। না, দেখবি কি করে এখন—ঘরে গিয়ে আয়না ধরে দেখিস। ভাদরের এই চড়া রোদে রক্ত যা ছিল সমস্তই মাথায় এসে গেছে।

সাহেব বলে, তোমার কি?

সে তো বটেই, আমার কী! কথায় তোর বড্ড ধার হয়েছে সাহেব। পথে বসে বসে চাল কুড়োস—তুই কি কাঙালি-ভিখারি, হালদার-পাড়ার রাস্তায় যারা সারবন্দী গামছা পেতে বসে থাকে?

মুহূর্তকাল চুপ থেকে নফরকেষ্ট বলে, এই যে উঞ্ছবৃত্তি করিস, সুধামুখী জানে?

কেন জানবে না। চাল কোন দিন কম হয়ে গেলে সন্ধ্যার আগে আবার পাঠিয়ে দেয়।

চল তো দেখি।

সাহেবের হাত ধরল নফরা। বলে, রাগ করিসনে সাহেব। তোর দশা দেখে মনে দুঃখ হল কিনা। অনেক দিন তো ছিলাম না—তার মধ্যে এই হাল হয়েছে, আমি বুঝতে পারি নি।

তৃতীয় ব্যক্তি কেউ উপস্থিত থাকলে মনে ভাবত, গৃহকর্তা প্রবাস থেকে ফিরে গিন্নির

সম্পর্কে বকাবকি করছে। এবং ছেলের হাত ধরে কৈফিয়ত নিতে চলল যেন বাড়িতে।

বড়লোকি সাজপোশাক ও ভাবভঙ্গি দেখে সাহেব হাত ছাড়িয়ে নেয় না। শুধু বলল, চালগুলো সব পড়ে গেছে। দাঁড়াও, তুলে নিই।

নফরকেষ্ট তাচ্ছিল্য করে বলে, থাক না পড়ে। যাদের অভাব-অনটন, তারা এসে তুলবে। ওদিকে তাকাতে হবে না। চাল আমরা দোকান থেকে নেব। একেবারে পাঁচ-দশ সের কিনে নিয়ে যাব।

হল তাই। রাস্তার চাল অভাবগ্রস্তদের তুলে নেবার সুযোগ দিয়ে নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল। চিরকালের সে লোকটা নয়—ধবধবে ডবলব্রেস্ট কামিজ পরেছে. পায়ের জুতো মসমস করছে, চলেছেন শ্রীযুক্ত বাবু নফরকেষ্ট পাল। কিম্বা তারও বড়—জমিদার রাজা কি নবাব-বাদশা কেউ একজন।

চালের ঠোঙা নিয়েছে হাতে। আর কি নেওয়া যায় সাহেব? মিষ্টান্নের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়: কিছু মিষ্টি নেওয়া যাক। খুব বড় বড় রাজভোগ বের করো তো হে। ফুটবলের মতো—

চালের ঠোঙা ও রসগোল্লার হাঁড়ি বারান্দায় নামিয়ে রাখল। সুধামুখীর সাড়া নেয়: রাস্তা থেকে ছেলে ধরে আনলাম সুধামুখী। কী চেহারা হয়েছে দেখ।

বহুদিন পরে নফরকেষ্টর গলা পেয়ে সুধামুখী ছুটে আসে। নফরকেষ্ট নালিশ করছে: সাত ভিখারীর এক ভিখারী হয়ে এই রোদ্দুরে রাস্তায় চাল খুঁটছিল। আসবে না কিছুতে। আবার কথার কী তেজ!

সুধামুখী স্নেহস্বরে বলে, পেটের দায়ে করতে হয়, নইলে সেই বয়স কি ওর!

গামছা ভিজিয়ে এনে সাহেবের মুখ মুছে দেয়। তালপাতার পাখা নিয়ে এসেছে—

দূর! বলে সাহেব হেসে সেই পাখা কেড়ে নিল। অন্যে এসে পাখার বাতাস করবে—এতখানি আদর সে সহ্য করতে পারে না। আরও লজ্জা, বাইরের একজন—নফর-কেষ্টর সামনে ঘটতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। বেরিয়ে পড়ল। ঘাটে যাবার সেই সংক্ষিপ্ত পথ—আমের ডালে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠে ধপ করে ওদিকে এক লাফ।

টসটস করে হঠাৎ জল পড়ে সুধামুখীর চোখে। বলে, সাহেবকে আমি কিছু বলতে যাইনি, চাল কুড়ানোর বুদ্ধিটা নিজে থেকে মাথায় এনেছে। কী করে দুটো পয়সা সংসারে এনে দেবে, তার জন্য আঁকুপাঁকু করে। কত মায়াদয়া ঐ একফোঁটা ছেলের!

আর চাল খুঁটে বেড়াতে হবে না। চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৈন্যদশা ঠাহর করে দেখল। সুধামুখী বাড়িতে থাকতে না।

আমার। পাঁচ সের এই নিয়ে এসেছি, ফুরোলে আবার এনে দেব।

আসবে তো ছমাস পরে। তদ্দিন বেঁচে থাকলে তবে তো?

আসব রোজই সুধামুখী, ঠিক আগেকার মতো। গাঢ় স্বরে নফরকেষ্ট বলে, কোনদিন কোথাও আর যেতে চাইনে। আসবার পথে পুরোনো ডেরাটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। নিমাইকেষ্টকে সব দেখিয়েছি, শুধু কাজের সরঞ্জামগুলো গোপন ছিল। সেগুলো গোছগাছ করে রেখে এলাম। পুরোনো কাজকর্ম—এইখানে আগের মতন তোমায় বেড় দিয়ে। তোমার ঝাঁটা-লাথি খাব, আর রাঁধা-ভাতও খাব। টাকাপয়সা কিছু আমি হাতে তুলে দেব, বাকিটা তুমি কেড়ে-কুড়ে নেবে। যেমন বরাবর হয়ে এসেছে।

সুধামুখী সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। নফরকেষ্ট বলতে লাগল, তাঁতের মাকু দেখেছ? একবার ডাইনে ছুটছে, একবার বাঁয়ে। আমারও তাই। গোড়ায় ঠিক করলাম, ভাল মানুষ নয়—টাকার মানুষই হব। দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা। টাকা হল না, কিছুই হল না—বয়সটা হল আর দেহের মেদ হল। ভাই এসে সুবুদ্ধি দিল। ভাবলাম, বাসায় উঠে ভাল মানুষই হইগে তবে। চাকরিবাকরি-করা বাবুমানুষ, ঘরগৃহস্থালী-করা মানুষ। তা-ও হল না, তিতবিরক্ত হয়ে ফিরেছি। কাজ নেই বাবা। ঘেঁটুফুলে পুজোআচ্চা হয় না, ও-জিনিস বনেবাদাড়ে ভাল।

সুধামুখী সন্দেহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, বউ এলো না কিছুতে? এত রকমে টোপ ফেলেও গাঁথতে পারলে না?

আসবে না মানে? বাসায় এসে রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে রীতিমত ডাল-চচ্চড়ি রাঁধতে লেগেছে। ধর্মপত্নী যখন, না এসে যাবে কোথায়?

সুধামুখীর দৃষ্টিতে তবু বুঝি অবিশ্বাস। চটেমটে পকেট থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে নফরকেষ্ট বলে, বউ আসে নি, এটা তবে কি?

রুমালের মতো বস্তুটা চোখের উপর মেলে ধরল।

কৌতূহলী সুধামুখী প্রশ্ন করে, কি ওটা?

বউয়ের শাড়ির আঁচল। কেটে এনেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সুধামুখীর মনের গুমট কেটে গেছে, নফরার ভঙ্গি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে: তুমি যে আর এক শাজাহান বাদশা হলে নফরকালী।

নফরকেষ্ট বলে, শাজাহান বাদশা কি করল?

বউকে ভুলতে না পেরে তার নামে তাজ-মহল গড়ল। দুনিয়ার মানুষ দেখতে আসে, শাজাহানকে ধন্য-ধন্য করে। তোমারও সেই গতিক। বউ সঙ্গে নেই তো শাড়ির টুকরো পকেটে নিয়ে ঘুরছ। ভুলতে পার না।

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, ভুলবার জিনিস নাকি? পকেটে কি বলছ—আমি বাদশা হলে মাথায় যে মুকুট থাকত নিশানের মতো তার উপর এই জিনিস উড়িয়ে দিতাম। গাইয়ে-বাজিয়েরা গলায় মেডেল ঝুলিয়ে আসরে নামে তো—আমায় যদি কখনো আসরে ডাকে, ঐ কাটা-আঁচল আমি গলায় ঝুলিয়ে যাব। কাঁচ ধরার কাজে নেমেছি যখন আমি ঐ সাহেবেরই বয়সি, এই তো অর্ধেক-বুড়ো হতে চললাম। সত্যি বলছি সুধামুখী, এত বড় বাহাদুরির কাজ আমি করিনি আর কখনো।

(ক্রমশঃ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১৪ ॥

বইটা নিয়ে সবে শুরু করতে যাব, ঘরে এলেন মিসেস পিল্লাই। রান্নাঘর থেকে সরাসরি আসছেন বোঝা যায়। হাতে তাঁর স্টেনলেস স্টিলের একটা হাতা। কালরাত্রের ব্যাপারে কেমন যেন সংকোচ বোধ করছিলাম। মিসেস পিল্লাই কিন্তু সেদিক দিয়েই গেলেন না। হাসি মুখেই বললেন: কি? থার্ড এডিসন এক কাপ হবে নাকি এবার?

আমি ক্যাম্প চেয়ারটা ও'র দিকে ঠেলে দিয়ে কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বলি: থার্ড এডিসন? আমি তো প্রথম সংস্করণের জন্য একটা আবেদন পেশ করব ভাবছিলাম।

শর্মিলা দেবীর তরফে বিস্ময় প্রকাশের মধ্যে কপটতা ছিল না। বলেন: আপনি তো সাংঘাতিক লোক। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক কাপ, ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এককাপ—একুনে দু-কাপ ইতিপূর্বেই শেষ করেননি?

: আমি যখন নিবস্ত্র, আর আপনার হাতে হাতিয়ার তখন আপনার যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

: মানে? আপনি বলতে চান সকাল থেকে দু-কাপ কফি খান নি?

: ও হরি! আপনি কফির কথা বলছেন। আমি দুঃখিত। আমি চায়ের কথা ভাবছিলাম। সকাল থেকে চায়ের নেশাটা ছোটেনি কিনা!

: সে কথা বললেই হত। আপনি তো আর শর্বরীর জন্যে গামছাদা খাটতে আসেননি। তাহলে নতুন জামাইয়ের মতো অত লজ্জা কেন? চায়ের তেষ্টায় কফি গিলে মরছেন কি জন্যে?

বুঝলাম কালরাত্রের গল্প তাহলে আরও একজন শুনেছেন। সে কথার কিন্তু ইঙ্গিত দিলাম না। বলি: মাদ্রাজী বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা আছে কিনা সেটাই যে বুঝে উঠতে পারছিলাম না এতক্ষণ।

: আপনি ভুলে গেছেন এটা গোটা মাদ্রাজী বাড়ি নয়। অর্ধেক তার রচিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী! আপনি লক্ষ্য করে দেখেননি। আপনাদের সঙ্গেই আমি যে পানীয়টি গ্রহণ করেছি তার রঙ মালকোর মতো নয়, রঙিলা বেলোসার মতো।

একই প্রসঙ্গ দ্বিতীয়বার উত্থাপন করায় বুঝলাম মিসেস পিল্লাই চাইছেন কালরাত্রের গল্পটার বিষয়ে আলাপটা মোড় ফিরুক। কারণটা আন্দাজ করতে পারি না। আমার অনুমান সত্য কিনা বুঝবার জন্যে সে পথেই একপা বাড়িয়ে দিয়ে বলি: না, তা অবশ্য লক্ষ্য করিনি। আমি বুঝতে পারিনি আপনিও চয়ন শিরদারের দলে: কফি-কালো মালকোকে ছেড়ে সোনালী বেলোসার জন্যে লামহাদা খাটতে ছুটবেন।

শর্মিলা দেবী বলেন: সেখানেও ভুল হল আপনার। চয়ন শিরদারকে ভুল বুঝেছেন আপনি।

: ভুল বুঝেছি? কেমন করে?

: বলছি; কিন্তু তার আগে চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে আসি।

চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে উনি যখন ফিরে এলেন তখন আমি কোন প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসু নেত্রে শুধু তাকালাম ও'র দিকে। বললেন: আমি কিন্তু এই সুযোগে আপনাকে অন্য একটা কথা বলে নিতে চাই।

: বলুন।

: সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা আপনাকে বলা শোভন হবে কিনা তাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

চুপ করেন উনি। হয়তো জবাবের প্রত্যাশায়। কিন্তু কি বলি? সে কথাই বললুম: আপনি কি বিষয়ে কথা বলতে চান সঙ্কোচই বা কিসের তা না জেনে কেমন করে বলি?

: বিষয়টা আপনার বন্ধুর সম্বন্ধে আর সঙ্কোচটা স্বল্প পরিচয়ের।

আমার দুটো প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন উনি এক নিঃশ্বাসে। তবু আমার কথা ফুটলো না। সঙ্কোচটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেন: ভাবছিলাম আপনার পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক এত অল্প পরিচয়ে এত ঘনিষ্ট কথা কেন বলতে চাইছি আমি। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, যে সমস্যার মধ্যে আমি পড়েছি তার সম্বন্ধে আলোচনা করার মতো মানুষ আমার কাছে পিঠে নেই। আপনি বাঙালী, ডাক্তারবাবুর ঘনিষ্ঠ না হলেও বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী—তাই মনে হচ্ছে আপনার পরামর্শ নিতে সঙ্কোচ করা আমার পক্ষে বোকামিই হবে।

আমি গাঢ়স্বরে বলি: শর্মিলা দেবী

আপনি আমাকে অসঙ্কোচে সব কথা বলতে পারেন। আমার ছোটবোন থাকলে তাকে যেভাবে পরামর্শ দিতাম, আপনাকেও তাই দেব।

শর্মিলা দেবী একটু ভেবে নিয়ে বলেন: আপনি কি ডাক্তারবাবুর পূর্বকথা সব জানেন?

: ও'র বাবা একজন বড় সার্জেন ছিলেন, আপনার শ্বাশুড়ী বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে, ডাক্তারসাহেব প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়েন এটুকুই মাত্র জানি।

: আমাদের বিয়েতে ও'র বাবার সম্মতি ছিল না, তা জানতেন না?

: না।

: তাহলে একটু গোড়া থেকে বলতে হবে।

ডাক্তার পিল্লাইয়ের সঙ্গে শর্মিলা দেবীর প্রথম আলাপ শান্তিনিকেতনে। শর্মিলা আর্টসের ছাত্রী, পিল্লাই বিজ্ঞানের। তবু ইণ্টারমিডিয়েটে বাঙলা-ইংরাজির যুক্ত ক্লাসে ও'রা একসাথে লেকচার শুনেছেন। গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব। পিল্লাই আই এস-সি পাশ করে কলকাতায় এলেন—শর্মিলা রয়ে গেলেন সেখানেই। ছাড়াছাড়ি হওয়াতেই প্রথমে দুজনে উপলব্ধি করতে পারলেন যে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝা যায় তার চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হয়েছেন ও'রা। ডাক-বিভাগের আয় বাড়ল। কাটলো আরও দু-বছর। বি এ পাশ করে শর্মিলা এলেন কলকাতায়। দেখা হত কফি হাউসে। তারপর যা হয়ে থাকে। দুজনেই অনুভব করলেন কফি হাউসে বড় ভীড়। রমানাথন বলতেন: কোন নিরালা চায়ের দোকানে যাওয়া যাক বরং। শর্মিলা জবাব দিতেন: তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে চল, কফিই খাওয়াব তোমাকে। কিন্তু আসলে তো ও'রা কফি-চায়ের প্রত্যাশী নন—তাই সমাধান হত না সমস্যার। আসলে ও'রা যে খুঁজছেন একটি দুর্লভ জিনিস—নির্জনতা। নাগরিক সভ্যতায় যা নাকি দুষ্প্রাপ্য। প্রায় একই সঙ্গে দুজনে আবিষ্কার করলেন একটা সত্য—'ভীড়ের' এ্যাণ্টোনিম হচ্ছে 'নীড়'! একটা নীড় না বাঁধতে পারলে এ ভীড়ের হাত থেকে মুক্তি নেই। রমানাথন শর্মিলার মায়ের কাছে প্রস্তাবটি পেশ করলেন। শর্মিলার বাবা নেই। মা সম্মতি দিলেন, কিন্তু গোল বাধল সার্জেন সাহেবকে নিয়ে। তিনি আপত্তি করলেন শর্মিলা বাঙ্গালী বলে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও যুক্তিটা প্রবল। তিনি নিজেও একটি বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, ভালবেসে। কিন্তু তাঁর দাম্পত্য-জীবন নাকি সুখের হয়নি। আর সার্জেন-সাহেবের মত তাঁদের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার কারণ রমানাথনের মা মাদ্রাজী নন! যে ভুল তিনি করেছেন, সেই ভুল ছেলেকে করতে দেবেন না। এই তাঁর পণ।

বাপের অমতেই বিবাহ করলেন রমানাথন। থিসিস পেপার প্রায় তৈরি। ডক্টরেট নিয়ে বিলেত যাবেন, সব ঠিক। সব ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। যা হয় একটা রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে। শর্মিলা দেবী বারে বারে আপত্তি করেছিলেন। সংসারের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন যতদিন না থিসিসটা তৈরি হয়।

কিন্তু রমানাথন কর্ণপাত করেননি। চাকরি নিয়ে চলে এলেন দণ্ডকারণ্যে। এই পট-ভূমিকা সংক্ষেপে সেরে শর্মিলা দেবী বললেনঃ ও'র যিনি অধ্যাপক, যাঁর তত্ত্বাবধানে উনি রিসার্চ করছিলেন, তাঁর ধারণা ও'র অসমাপ্ত গবেষণার প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে। শুধু ডিগ্রি নয়, একটা মৌলিক গবেষণার অধিকারী হতে পারতেন পিল্লাই। গত চার বছর ধরে তিনি ক্রমাগত লিখছেন ও'কে ফিরে যেতে। অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে। গত সপ্তাহে তিনি লিখেছেন, দাঁড়ান দেখাই আপনাকে—

চিঠিখানি নিয়ে এলেন। তার প্রতি ছত্রে ছাত্রের প্রতি অধ্যাপকের অন্ধ আবেগ অনুভব করা যায়। বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্যক্তিগত পত্রে শেষ বারের মতো অনুরোধ করেছেন। লিখেছেন, তিনি বে-আইনী কাজ করেছেন, জ্ঞাতসারে। রমানাথনের অসমাপ্ত কাগজ চার বছর ধরে গোপন রাখার কোন অধিকার তাঁর নেই। তবু তিনি প্রাণ ধরে সে কাগজ কোন উত্তরসূরীকেও দিতে পারেননি। লিখেছেন, তাঁর নিজের চাকরির মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছে। তিনি যাবার আগে দেখে যেতে চান রমানাথন আবার ফিরে গেছে তার আরব্ধ কাজ শেষ করতে। রমানাথনের রেকর্ড মার্ক তাকে সাহায্য করবে এ স্কলার-সিপ দ্বিতীয়বার লাভ করতে। তিনি সে ব্যবস্থা করবেন। রমানাথনের মুখ চেয়ে যে কাগজ এতদিন লুকিয়ে রেখেছেন তিনি, এই শেষ সুযোগ যদি সে না নেয়, তাহলে বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে তা অন্য কোন রিসার্চ-স্কলারকে দেওয়ার সময় হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে ফেরত দিলাম শর্মিলা দেবীর হাতে, বলিঃ ডাক্তারসাহেব কি বলেন?

: ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ও যখন যা ধরে তার মধ্যেই ডুবে যায়। আর কোন কিছুর কথা তখন ওর খেয়াল থাকে না। একদিন এই রিসার্চের কাগজগুলো বাঁচাতে ও নিজের একখানা হাত কেটে ফেলতে পারত। যে মুহূর্তে স্থির করল আমাকে নিয়ে করবে সেই মুহূর্তেই ওর সারা মন অধিকার করলাম আমি। কাগজ-গুলো তখন ছেঁড়া-কাগজের ঝুলিতেই গেল, না ওজনদরে বিক্রি করে দেওয়া হল তার খোঁজও করেনি। তখন পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছে রোজগারের সন্ধানে। এখন ওর আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। দণ্ডকারণ্যে ইচ্ছে থাকলেও টাকা খরচ করা যায় না। চার বছরে যা জমেছে তাতে অনায়াসে এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রিসার্চ-ওয়ার্কে যোগ দিতে পারে এখন।

: তাহলে আর আপত্তি কি?

: ঐ যে বললাম। ওর মাথায় ঢুকেছে এখন অন্য এক চিন্তা। এখন ও রিসার্চের কথাও ভাবে না, আমার কথাও নয়, ও ডুবে আছে নতুন নেশায়।

ঃ কি সেটা?

ঃ চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে। চয়নের বিয়ে দিতে হবে উইচ-ক্রাফট ভার্সেস চিকিৎসা-বিজ্ঞান। লড়াইয়ে নেমেছে ও। আর কোন কিছু ওর সামনে নেই।

অবাক হয়ে গেলাম শুনে, বলিঃ বলেন কি? এতদূর?

ঃ দেখলেন না কালরাত্রে? চয়নের সমস্যার বিষয়ে একটা নূতন ক্লু পাওয়ামাত্র আমাকে কেমন ধমকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে?

শর্মিলা দেবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি বৃথাই লজ্জা পেয়েছি কালরাত্রে। স্বামীর রূঢ় ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হননি মিসেস পিল্লাই। বরং, হ্যাঁ ঠিকই বলছি, কেমন যেন গর্ববোধ করেছেন তিনি।

শিল্পী, সাধক, লেখক, বৈজ্ঞানিকদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যারা সাবধানী পথিক তারা তাদের ভালবেসেই ক্ষান্ত হয়, তাদের সঙ্গে নীড় রচনা করে না। কিন্তু একজাতের মেয়ে আছে যারা আবার ওদের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে নেবার দুঃসাহসী খেলায় বেপরোয়া। ওরা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত বলেই তাদের গর্ব। শর্মিলা দেবী হচ্ছেন সেই জাতের মেয়ে। তাঁর স্বামী যে একজন একনিষ্ঠ সাধক এটাই ও'র আত্মতৃপ্তির মূলধন। সে একনিষ্ঠ সাধনার মূল্য মেটাতে যদি খেয়ালী মানুষটা স্বল্পপরিচিতের সামনে স্ত্রীকে অপমান করেই বসে তবে সে অপমানও কি গৌরবের নয়?

বললুমঃ কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?

ঃ ওকে বোঝাতে হবে, ওকে রাজি করাতে হবে—এসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে ও যাতে ফিরে যায়। ওর রিসার্চ-ওয়ার্কে যাতে আবার যোগ দেয়।

একটু চুপ করে ভাবি। তারপর বলিঃ দেখুন শর্মিলা দেবী, আপনি আমার চেয়ে ডাক্তারসাহেবকে বেশী ভাল করে চেনেন। স্বল্প পরিচয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি সেটুকু আপনার অন্তত বোঝা উচিত। আমার বিশ্বাস আমার মৌখিক অনুরোধে কোন কাজ হবে না। ছেলেমানুষিই বলুন, আর পাগলামিই বলুন, চয়নের একটা এসপার-ওসপার না দেখে তিনি মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে দাঁড়াতে রাজি হবেন না।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস পিল্লাইয়ের। হাসলেন অদ্ভুত ভাবে। সে হাসি বেদনার, সে হাসি সার্থকতার। শর্মিলা দেবী যে রমানাথনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সে রমানাথন স্বাভাবিক নয়। সে ব্যতিক্রম। আর ঐ ব্যতিক্রমটুকুকেই তিনি ভালবাসেন। মনে হল শর্মিলা দেবীর মধ্যে দুটি ব্যক্তি-সত্তা যেন একসঙ্গে রয়েছে। এক শর্মিলা প্র্যা গ ম্যা টি ক—সে শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির প্রত্যাশী, সে স্বল্প-পরিচিত স্বামীর বন্ধুর কাছে ছুটে আসে সাহায্য চাইতে—কেমন করে স্বামীকে সাধারণ স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসা যায়। আর এক শর্মিলা আইডিয়ালিস্ট—সে তার প্রেমিকের সাধনার মূল্য মেটাতে

সব বঞ্চনা সহ্য করতে রাজি। ত্যাগের মহিমায় সে মহান হবার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে।

ঃ চয়ন কি কোনদিন ভাল হয়ে উঠবে? মুক্তি পাবেন উনি?

ঃ তা আমি কেমন করে বলব বলুন।

ঃ আচ্ছা পাগলরা অনেকদিন বাঁচে, নয়?

হেসে বলিঃ চয়নের মৃত্যু কামনা করছেন আপনি?

কোন সংকোচ নেই এ কথাতেও। অম্লান-বদনে উনি স্বীকার করেনঃ করছি। সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি আমি চয়নের মৃত্যু কামনা করি। পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়? চয়নও মরে বাঁচে, ডাক্তারসাহেবও মুক্তি পান। আর বাঁচি আমরাও। আমি আর থুকু!

মনে মনে হাসি। মানুষ কী স্বার্থপর। মিসেস পিল্লাই জীবনে প্রতিষ্ঠা চান—তাই তিনি মৃত্যু কামনা করছেন নগণ্য চয়ন শিরদারের, যে চয়ন শিরদারের জীবনের বিনিময়ে তার মা অম্লানবদনে প্রাণ-হরণ করতে চেয়েছিল নগণ্যতর দুটো শুয়োর ছানার!

পরের দিন ফিরে এলাম নারানপুর থেকে। মৌলানাসাহেব পারলাকোট থেকে ফেরার পথে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে। এই দুটো দিন সময় ও সুযোগমত শুধু চয়ন শিরদারের কথা শুনেছি। চয়ন শিরদার, মালকো, রঙিলা আর আধারী কোন্ডার জগতে বিচরণ করেছি। শুধু ডাক্তার পিল্লাইয়ের হাত ধরে নয়; মিসেস পিল্লাইয়ের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছি অনেক খণ্ড কাহিনী। রহস্যের কিনারা করা যায়নি। দেখলাম ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই মেতে আছেন এ নিয়ে। যদিও অস্বীকার করলেন ঊর্মিলা দেবী এ অভিযোগ। গল্পটার কোন অংশ কখন কার কাছে শুনেছি আজ আর তা মনে নেই। এবার তাই নিজের ভাষাতেই শুরু করতে হচ্ছেঃ

চৈতদান্ডার উৎসবের মাসখানেক পরের কথা। কাবোঙ্গা গাঁয়ের কোন্ডা সদলবলে বার হল 'পুংগার মিছানায়'। কোন্ডা হচ্ছে চয়নের বাপ। ওরা যাবে কারাংমেটার গাইতা আয়েতু গোন্ডের বাড়ি। চৈত-দান্ডার উৎসবের পরেই চয়ন তার মাকে বলেছে আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। চয়নের মা বলেছে কোন্ডাকে। বুড়ো-বুড়ি দুজনেই খুশী হয়েছিল চয়নের এ প্রস্তাবে। আয়েতু ওদের আকোমামা শ্রেণীর, সে একটা গাঁয়ের সর্দার। এ বিবাহ সর্বদিক থেকেই কাম্য। কোন্ডা কথাটা প্রথমে গিয়ে জানালো নিজ গ্রামের গাইতার কাছে, গাদরুর কাছে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের গাইতা গুণিয়া আর কোন্ডা তিনজনে পরামর্শ করল। সবার আগে সিয়াড়ি পাতার ঠোঙায় করে একপাত্র মহুক নিবেদন আরও এক সুকল্পকেবলের উদ্দেশ্যে। সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকে। না মহুয়ার ঠোঙাটা হাওয়ায় উল্টে গেল না। তিল তিল করে ঠোঙা থেকে মধুকরস বেরিয়ে এল মাটিতে। মাতা ধরিত্রী—মাটি-মাল—শোষণ করে নিলেন অর্ঘ্য। অর্থাৎ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন পূর্ব-পুরুষগণ। বিবাহে কোন বাধা নেই। ফলে, তখন তেঁতুল গাছের মগডালে বসে একটা টুলীর পাখী 'টুইং টুইং' করে ডাকছিল। পাখীটা ছিল পথের বাঁদিকে। ফলে যাত্রা শুভ!

বেলা দ্বিপ্রহরে ওরা এসে পৌঁছালো কারাংমেটায়। আয়েতু বাড়ি ছিল না। আয়েতুর মেয়ে রঙিলা ছিল বাড়িতে।

'গোড় এণ্ডানা'—বাইসন হর্ন মাড়িয়া নৃত্য
[সাধারণতন্ত্র দিবসে ১৯৬০ সালে নয়াদিল্লীতে শ্রেষ্ঠ লোকনৃত্য হিসাবে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]

এক চৈতালী প্রভাতে গাদরু, গুণিয়া আর বিন্ডোকে সংগে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল কোন্ডা। বিন্ডো হচ্ছে চয়নের বন্ধু, কাবোঙ্গার কোতোয়ার। ঘটুলের বাইরে গুরুজনদের কাছে তার পরিচয় বিন্ডো—কোতোয়ার নয়। যেমন ঘটুল-বন্ধুরা ওকে ভুলেও 'বিন্ডো' নামে ডাকবে না; তাদের কাছে সে কোতোয়ার। ওরা চারজনে কারাং-মেটায় চলেছে পুংগার মিছানায়। 'পুংগার' মানে ফুল, আর 'মিছানা' শব্দের অর্থ চয়ন, আহরণ। সুতরাং 'পুংগার মিছানা' মানে পুষ্প আহরণ। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হওয়া পুষ্প চয়নের প্রয়াস ছাড়া আর কি?

ওদের ভাগ্য ভাল। যাত্রাপথে অমঙ্গল-সূচক কিছু নজরে পড়ল না। কাক, সাপ, ময়ূর, গিরগিটির দল ত্রিসীমানায় নেই। মনে মনে আশ্বস্ত হল কোন্ডা। বিবাহ সুখের হবে নিশ্চিত। পূর্বপুরুষেরা পথ থেকে সব কিছু অযাত্রাকে সরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোন্ডা লক্ষ্য করেছে ওরা যখন গাঁয়ের বাইরের তেঁতুলতলা দিয়ে আসছিল

আপ্যায়ন করে বসতে দিল অতিথিদের। ঘরের ভিতর থেকে বার করে আনল 'কাটুল।' বনালতায় বোনা চারপায়া জলচৌকি। কোন্ডা

: কি সেটা?

: চয়নকে ভাল করে তুলতে হবে। চয়নের বিয়ে দিতে হবে উইচ-ক্রাফট ভার্সেস চিকিৎসা-বিজ্ঞান। লড়াইয়ে নেমেছে ও। আর কোন কিছু ওর সামনে নেই।

অবাক হয়ে গেলাম শুনে, বলি: বলেন কি? এতদূর?

: দেখলেন না কালরাত্রে? চয়নের সমস্যার বিষয়ে একটা নূতন ক্লু পাওয়ামাত্র আমাকে কেমন ধমকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে?

শর্মিলা দেবীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি বৃথাই লজ্জা পেয়েছি কালরাত্রে। স্বামীর রূঢ় ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হননি মিসেস পিল্লাই। বরং, হ্যাঁ ঠিকই বলছি, কেমন যেন গর্ববোধ করেছেন তিনি।

শিল্পী, সাধক, লেখক, বৈজ্ঞানিকদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যারা সাবধানী পথিক তারা তাদের ভালবেসেই ক্ষান্ত হয়, তাদের সঙ্গে নীড় রচনা করে না। কিন্তু একজাতের মেয়ে আছে যারা আবার ওদের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে নেবার দুঃসাহসী খেলায় বেপরোয়া। ওরা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত বলেই তাদের গর্ব। শর্মিলা দেবী হচ্ছেন সেই জাতের মেয়ে। তাঁর স্বামী যে একজন একনিষ্ঠ সাধক এটাই ও'র আত্মতৃপ্তির মূলধন। সে একনিষ্ঠ সাধনার মূল্য মেটাতে যদি খেয়ালী মানুষটা স্বল্পপরিচিতের সামনে স্ত্রীকে অপমান করেই বসে তবে সে অপমানও কি গৌরবের নয়?

বললুম: কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?

: ওকে বোঝাতে হবে, ওকে রাজি করাতে হবে—এসব ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে ও যাতে ফিরে যায়। ওর রিসার্চ-ওয়ার্কে যাতে আবার যোগ দেয়।

একটু চুপ করে ভাবি। তারপর বলি: দেখুন শর্মিলা দেবী, আপনি আমার চেয়ে ডাক্তারসাহেবকে বেশী ভাল করে চেনেন। স্বল্প পরিচয়ে আমি যেটুকু বুঝেছি সেটুকু আপনার অন্তত বোঝা উচিত। আমার বিশ্বাস আমার মৌখিক অনুরোধে কোন কাজ হবে না। ছেলেমানুষিই বলুন, আর পাগলামিই বলুন, চয়নের একটা এসপার-ওসপার না দেখে তিনি মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে দাঁড়াতে রাজি হবেন না।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস পিল্লাইয়ের। হাসলেন অদ্ভুত ভাবে। সে হাসি বেদনার, সে হাসি সার্থকতার। শর্মিলা দেবী যে রমানাথনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সে রমানাথন স্বাভাবিক নয়। সে ব্যতিক্রম। আর ঐ ব্যতিক্রমটুকুকেই তিনি ভালবাসেন। মনে হল শর্মিলা দেবীর মধ্যে দুটি ব্যক্তি-সত্তা যেন একসঙ্গে রয়েছে। এক শর্মিলা প্র্যা গ ম্যা টি ক—সে শাড়ি-গাড়ি-বাড়ির প্রত্যাশী, সে স্বল্প-পরিচিত স্বামীর বন্ধুর কাছে ছুটে আসে সাহায্য চাইতে—কেমন করে স্বামীকে সাধারণ স্বাভাবিক পথে নিয়ে আসা যায়। আর এক শর্মিলা আইডিয়ালিস্ট—সে তার প্রেমিকের সাধনার মূল্য মেটাতে

সব বঞ্চনা সহ্য করতে রাজি। ত্যাগের মহিমায় সে মহান হবার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে।

ঃ চয়ন কি কোনদিন ভাল হয়ে উঠবে? মুক্তি পাবেন উনি?

ঃ তা আমি কেমন করে বলব বলুন।

ঃ আচ্ছা পাগলরা অনেকদিন বাঁচে, নয়?

হেসে বলি: চয়নের মৃত্যু কামনা করছেন আপনি?

কোন সংকোচ নেই এ কথাতেও। অম্লান-বদনে উনি স্বীকার করেন: করছি। সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি আমি চয়নের মৃত্যু কামনা করি। পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়? চয়নও মরে বাঁচে, ডাক্তারসাহেবও মুক্তি পান। আর বাঁচি আমরাও। আমি আর খুকু!

মনে মনে হাসি। মানুষ কী স্বার্থপর। মিসেস পিল্লাই জীবনে প্রতিষ্ঠা চান—তাই তিনি মৃত্যু কামনা করছেন নগণ্য চয়ন শিরদারের, যে চয়ন শিরদারের জীবনের বিনিময়ে তার মা অম্লানবদনে প্রাণ-হরণ করতে চেয়েছিল নগণ্যতর দুটো শুয়োর ছানার!

পরের দিন ফিরে এলাম নারানপুর থেকে। মৌলানাসাহেব পারলকোট থেকে ফেরার পথে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে। এই দুটো দিন সময় ও সুযোগমত শুধু চয়ন শিরদারের কথা শুনেছি। চয়ন শিরদার, মঙ্গলো, রঙিলা আর খাশ্রী কোন্ডার জীবনে বিচরণ করেছি। শুধু ডাক্তার পিল্লাইয়ের হাত ধরে নয়; মিসেস পিল্লাইয়ের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছি অনেক খণ্ড কাহিনী। রহস্যের কিনারা করা যায়নি। দেখলাম ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই মেতে আছেন এ নিয়ে। যদিও অস্বীকার করলেন দর্মিলা দেবী এ অভিযোগ। গল্পটার কোন অংশ কখন কার কাছে শুনেছি আজ আর তা মনে নেই। এবার তাই নিজের ভাষাতেই শুরু করতে হচ্ছে:

চৈতদাণ্ডার উৎসবের মাসখানেক পরের কথা। কাবোঙগা গাঁয়ের কোন্ডা সদলবলে বার হল 'পুংগার মিছানায়'। কোন্ডা হচ্ছে চয়নের বাপ। ওরা যাবে কারাংমেটার গাইতা আয়েতু গোণ্ডের বাড়ি। চৈত-দাণ্ডার উৎসবের পরেই চয়ন তার মাকে বলেছে আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। চয়নের মা বলেছে কোন্ডাকে। বুড়ো-বুড়ি দুজনেই খুশী হয়েছিল চয়নের এ প্রস্তাবে। আয়েতু ওদের আকোমামা শ্রেণীর, সে একটা গাঁয়ের সর্দার। এ বিবাহ সবদিক থেকেই কাম্য। কোন্ডা কথাটা প্রথমে গিয়ে জানালো নিজ গ্রামের গাইতার কাছে, গাদরুর কাছে। কাবোঙগা গাঁয়ের গাইতা গুণিয়া আর কোন্ডা তিনজনে পরামর্শ করল। সবার আগে সিয়ারি পাতার ঠোঙার করে একপাত্র মধুকে নিবেদন করা হল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে। সকলে সাগ্রহে লক্ষ্য করতে থাকে। না মহুয়ার ঠোঙাটা হাওয়ায় উল্টে গেল না। তিল তিল করে ঠোঙা থেকে মধুরস বেরিয়ে এল মাটিতে। মাতা ধরিত্রী—মাটি-মাস—শোষণ করে নিলেন অর্ঘ্য। অর্থাৎ এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন পূর্ব-পুরুষগণ। বিবাহে কোন বাধা নেই। ফলে, তখন তেঁতুল গাছের মগডালে বসে একটা উশীর পাখী 'উইং উইং' করে ডাকছিল। পাখীটা ছিল পথের বাঁদিকে। ফলে যাত্রা শুভ!

বেলা দ্বিপ্রহরে ওরা এসে পৌঁছালো কারাংমেটায়। আয়েতু বাড়ি ছিল না। আয়েতুর মেয়ে রঙিলা ছিল বাড়িতে।

'গোণ্ড এণ্ডানা'—বাহমন জর্ন আড়িয়া নৃত্য
[সাধারণতন্ত্র দিবসে ১৯৬০ সালে নয়াদিল্লীতে শ্রেষ্ঠ লোকনৃত্য হিসাবে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]

এক চৈতালী প্রভাতে গাদরু, গুণিয়া আর বিণ্ডোকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল কোন্ডা। বিণ্ডো হচ্ছে চয়নের বন্ধু, কাবোঙগার কোতোয়ার। ঘটুলের বাইরে পুরুজনদের কাছে ওর পরিচয় বিণ্ডো—কোতোয়ার নয়। যেমন ঘটুল-বন্ধুরা ওকে ভুলেও 'বিণ্ডো' নামে ডাকবে না; তাদের কাছে সে কোতোয়ার। ওরা চারজনে কারাং-মেটায় চলেছে পুংগার মিছানায়। 'পুংগার' মানে ফুল, আর 'মিছানা' শব্দের অর্থ চয়ন, আহরণ। সুতরাং 'পুংগার মিছানা' মানে পুষ্প আহরণ। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কন্যাপক্ষের দ্বারস্থ হওয়া পুষ্প চয়নের প্রয়াস ছাড়া আর কি?

ওদের ভাগ্য ভাল। যাত্রাপথে অমঙ্গল-সূচক কিছু নজরে পড়ল না। কাক, সাপ, ময়ূর, গিরগিটির দল ত্রিসীমানায় নেই। মনে মনে আশ্বস্ত হল কোন্ডা। বিবাহ সুখের হবে নিশ্চিত। পূর্বপুরুষেরা পথ থেকে সব কিছু অযাত্রাকে সরিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোন্ডা লক্ষ্য করেছে ওরা যখন গাঁয়ের বাইরের তেঁতুলতলা দিয়ে আসছিল আপ্যায়ন করে বসতে দিল অতিথিদের। ঘরের ভিতর থেকে বার করে আনল 'কাটুল।' বনাজাতায় বোনা চারপায়া জলচৌকি। কোন্ডা

গাদরু আর গুণিয়া বসল জুত করে। বিণ্ডো বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারে না। ডিনগাঁয়ে এসে তাকে কাবোঙ্গার শিষ্টাচারের পরিচয় দিতে হবে। দাওয়ার উপর ছিল একখানা মাড়াং ঘাসের বোনা মাসনি। তাই পেতে বসল সে।

কোণ্ডা বলে: তুই আয়েতুর বেটি?

মেয়েটি সলজ্জে মাথা নেড়ে বললে: হ্যাঁ।

অবাক হয়ে গেল কোণ্ডা। এমন মেয়ে মুরিয়া মায়ের কোলে আসে নাকি? শহর থেকে মাড়াই দেখতে আসে যেসব সাহেব তাদের ঘরের মেয়েদের মতো দেখতে! গায়ের রঙ সাদা, মাথার চুলও, কটা, চোখের তারা বেড়ালের মতো! গা-টা ছমছম করে ওঠে কোণ্ডার। এ কেমন মেয়ে? এমন মেয়েকে পছন্দ করে বসেছে তার চয়ন? যে চয়ন কখনও কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় না? মেয়েটি 'ইয়ে' নয়তো? ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে 'পাংনাহিন' কথাটা মনে মনেও সে ভাবতে পারলে না।

অবাক হয়েছিল বিণ্ডোও। দিনের আলোয় মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল—আশ্চর্য, কেমন করে ঐ মেয়েটিকে আলিঙ্গন-পাশে বন্ধ করেছিল সেদিন। রাত্রের অন্ধকারে পূর্ণযৌবনা একটি নারীর যৌবন ছাড়া আর কিছু নজরে পড়েনি বলেই?

গাদরু বলে: তোর নাম কি?

: রঙিলা।

: তোর বাপকে খবর দে। বল কাবোঙ্গা থেকে গাইতা আর গুণিয়া এসেছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেল। কোণ্ডা তখন বিণ্ডোর দিকে ফিরে চুপি চুপি বলে: এই মেয়েই তো?

চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে বিণ্ডো বলে: হ্যাঁ!

আড়ালে অপেক্ষা করছিল মাল্‌কো আর তার মা আথালী। আর আয়েতুর বুড়ি পিসি—কিরিংগো। বুড়ি ফিস্ ফিস্ করে বলে: ওরা কি পুঙ্গার মিছানায় এসেছে নাকি রে নাতিন?

ঠোঁট উল্‌টিয়ে রঙিলা বলে: আমি কি জানি? টাম্পিকে ওরা ডাকছে।

কিরিংগো রঙিলার থুতনিতে নাড়া দিয়ে একটা অশ্লীল গালাগাল ছাড়ে। গালটা আদরের, যদিও কানে আঙ্গুল দিতে হয়! বলে: ওলো আর ন্যাকা সাজিস না। বুঝেছিস ঠিকই। তোর জন্যে ওরা মিছানায় এসেছে আর তুই জানিস না?

কিন্তু কে ওরা? আসছে কোথা থেকে?

: কাবোঙ্গা থেকে। কাবোঙ্গার গুণিয়া আর গাইতা ওরা।

কাবোঙ্গা! নামটা শুনেই চমকে ওঠে মাল্‌কো। ওরা কাবোঙ্গা থেকে আসছে? সেখানেই তো বাস করে সেই আশ্চর্য ছেলেটি যে বেরিয়ে এসেছিল ঘটুল থেকে। এরা নিশ্চয় চয়নকে চেনে। একই গাঁয়ের লোক, চিনবে না? জিজ্ঞাসা করলে ওরা বলতে পারেনা—চয়ন কেমন আছে, সে এখন কি করে, কি ভাবে—ডিন গাঁয়ের একটি মেয়ের কথা তার এখনও মনে আছে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক তো— কোণায় বসে আছে সেই ছেলেটি যে "মাক্‌সু'র ধাঁধাটা জিজ্ঞাসা করেছিল। শুধু তাই নয়—রঙিলাকে ঐ ছেলেটির কণ্ঠলগ্নাও হতে দেখেছিল সে রাত্রে। ঐ ছেলেটিই তাহলে পাত্র। কিন্তু কী নির্লজ্জ ছেলেটা। নিজেই এসেছে পুঙ্গার-মিছানায়! এ তো নিয়ম নয়। তা সে যাই হোক ঐ ছেলেটির সঙ্গে একবার নির্জনে দেখা করা যায়না? জানা যায়না ওর কাছ থেকে চয়নের কথা?

মাল্‌কোর চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। বুড়ি কিড়িংগো ওকে ঠেলা মারছে: যা যা,

---

শিশ্পির ডেকে নিয়ে আয় তোর টাম্পিকে।

মাল্‌কো ছুটলো মাঠপানে। দিদির একটা হিল্লে হল তাহলে!

আয়েতু এলে দুপক্ষের সৌজন্য বিনিময় হল। কোণ্ডা যে মধুকের পাত্রটা এনেছিল উপহারস্বরূপে সেটা দিল আয়েতুর হাতে। আয়েতু আন্দাজ করেছে ব্যাপারটা। তবু অনাসক্তের ভাব দেখিয়ে বলেঃ তারপর এদিকে কি মনে করে?

কোণ্ডা বললেঃ বিশেষ কিছুই নয়, এ পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ তোমার ঘর থেকে মিষ্টি ফুলের একটা গন্ধ পেলাম পথ থেকে। ভাবছি ফুলটা তুলে নিয়ে গেলে কেমন হয়।

আয়েতু মুখ টিপে হেসে বলেঃ আমিও সেই রকম আন্দাজ করেছি। এই তো দুনিয়ার নিয়ম ভাই। একজন ফুলগাছ পোঁতে, জল দেয়, সেবা যত্ন করে—আর যেই সে গাছে কুঁড়ি দেখা দেয় অমনি ছুটে আসে প্রতিবেশী। ফুল তুলে নিয়ে চলে যায়।

কোণ্ডা বললেঃ দুনিয়াদারির এ দস্তুরীর মধ্যে নতুন কথা কি আছে? তুমি তো আমাদের অচেনা [illegible]। তোমার ঘরনীটি কি একদিন আমাদের গোত্রেই ফুল হয়ে ফোটেনি? লুটেরার মতো তাকে লুট করে আন নি আমাদের গোত্র থেকে? এ শিক্ষা যে তোমার কাছেই শিখেছি ভাই।

মুখের মতো জবাব। হাহা করে হেসে ওঠে সবাই। এ আলাপচারি শুনে মনে হতে পারে দুজনেই শিক্ষিত, ভাষার উপর দুই বৈবাহিকেরই যথেষ্ট দখল আছে। আসলে তা কিন্তু নয়। পুণ্যার মিস্কানের এ বাঁধি গৎ বহুদিন থেকেই চলে আসছে। নতুন জামাইদের হাতে মাকু দিয়ে তাকে তাঁতবিশেষের স্বর অনুকরণ করতে যিনি অনুরোধ করেন তিনি কবি-প্রতিভাশালিনী না হলেও যেমন ছড়া কাটেন এবাও তেমনি অনায়াসে বাঁধি-গৎ গেয়ে গেল। অবশ্য স্বীকার করতে হবে আদি রচয়িতার নিশ্চয় ছিল কাব্যজ্ঞান।*

যাই হোক আয়েতু এবার কাব্য ছেড়ে কাজের কথায় নামে। আগন্তুকদল যথারীতি পূর্বপুরুষদের সিয়ারি পাতায় মধুক উৎসর্গ করেছে কিনা—তার ফলাফল কি হয়েছে—পথে কি কি সুলক্ষণ অথবা দুর্লক্ষণ দেখা গেছে তার সন্ধান-সুলুক জেনে নেয়। সব শুনে সে রাজি হয়, বলে
: আমার মেয়েকে দেখেছ তো?

: দেখেছি বই কি। সেই তো কাটুল পেতে বসতে দিল আমাদের। কিন্তু একটা কথা গাইতা, তোমার গায়ের রঙ তো ভুঁইষের মতো, তোমার গৃহিনীটিও আমাদের গোত্রের, তাহলে...

বাধা দিয়ে আয়েতু বললেঃ হ্যাঁ, সব কথাই খুলে বলা দরকার। আমার মেয়েকে তোমরা আদর করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছ। তাই সব কথা তোমাদের জানাতে হবে। সব শুনে, সব জেনে যদি আমার মেয়েকে ঘরে নিতে চাও তবেই আমি সম্মতি দেব।

ঘরের ভিতর দিকের দেওয়ালে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে রাঙিলা, মাল্‌কো, তাদের মা আর বুড়ি কিরিংগো। রাঙিলার জন্ম-বৃত্তান্ত আজ ওরা নতুন শুনছে না। সে কাহিনী ওদের জানা। রাঙিলা নিজেও জানতো যে সে আয়েতুর নিজের মেয়ে নয়, পালিতা কন্যা। ওরা শুধু জানতে চায় সব কথা শুনে পাত্রপক্ষ কি বলে।

আদ্যপ্রান্ত সব কথা শুনে কোণ্ডা বললঃ এত কথা আমি জানতাম না। চেত-পাণ্ডবে তোমাদের গ্রাম এবার এসেছিল আমাদের ঘটুলে। সেখানেই আমার ছেলে তোমার মেয়েকে প্রথম দেখে। পরে তার মাকে বলে তাকে সে বিয়ে করতে চায়। তাই আমি এসেছিলাম। এখন যা শুনছি তাতে...

কারাংগোর গাইতা গাদরু বাধা দিয়ে বলে ওঠেঃ কিন্তু এখন যা শুনছ তাতেই বা তোমার মত বদলাচ্ছে কেন? তোমার ছেলে এ মেয়েকে দেখেছে, পছন্দ হয়েছে তার। রাঙিলা আয়েতুর নিজের মেয়ে না হলেও সে তাকে কন্যার মতো পালন করেছে। কারাং-গোর মুরিয়া সমাজ তাকে মেনে নিয়েছে আয়েতুর মেয়ে বলেই। রাঙিলা শুনেছি এ ঘটুলের বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিতা। তাহলে তোমার ভাবনা করার কি আছে?

কোণ্ডা বলেঃ বারে! ভাবনা করার নেই? আমাদের সমাজপতিদের জিজ্ঞাসা করতে হবেনা? ও তো আসলে মুরিয়া নয়। মুরিয়ার রক্ত তো ওর দেহে নেই।

---

* মনে আছে এখানেও আমার সঙ্গে ডাক্তার-সাহেবের কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়েছিল।

আমি বললুমঃ আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওদের ভাষায় "আপনি-তুমি"র ভেদ আছে?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেনঃ না নেই। কিন্তু বঙ্গানুবাদের সময় সে ভেদ রেখেই বলছি আমি ইংরাজী ভাষায় মাস্টার ছাত্রকে বলে "যু", ছাত্রও শিক্ষককে বলে "যু"। আমরা অনুবাদ করবার সময় একটাকে তুমি, আর একটাকে আপনি বলি। মুরিয়াদের ভাষায় মধ্যম-পুরুষে "তুই"টাই বহুল প্রচলিত—কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বাচন-ভঙ্গিতে যে শ্রদ্ধা সম্মান প্রকাশ পায় তাতে সে "তুই"কে বাঙলায় কখনও "তুমি" কখনও "আপনি" বলতে ইচ্ছে করে।

: কিন্তু ওদের ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করলেই গল্পের মেজাজটা ঠিক ফুটে উঠবে না কি?

: আক্ষরিক অনুবাদ করলে আপনি কানে আঙ্গুল দিয়ে উঠে পড়বেন। প্রতি কথার মাত্রায় ওরা যে খিস্তির লেজুর জোড়ে তার কাছে বাঙলার 'শ-কার', 'ব-কার' পুজোর মন্ত্র! মানুষের দেহের অংগবিশেষের কথা, যৌনিক ব্যাপারের কথা এমন ভাষায় ওরা উল্লেখ করে যার বঙ্গানুবাদ চলে না। সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল।

ঃ ও মুরিয়াই! —দৃঢ়স্বরে বললে গাদরু!

ঃ কিন্তু সমাজ? কাবোণ্গার পঞ্চায়েত?

গাদরুর অভিমানে লাগল। বললেঃ আমিই সমাজ। আমিই পঞ্চায়েত! তবে শোন বলি। অনেক বছর আগের কথা। আল্‌হোর গাঁয়ের নাম শুনেছ? আল্‌হোর ঘটুলে কুহ্‌রামি গোত্রের একটি চেলিকের সঙ্গে সগোত্র একটি মোটিয়ারীর গাঁদা-আতোর হয়। ওরা দুজনেই কুহ্‌রামি। দাদাভাই গোত্রের। বিবাহ অসম্ভব। ঘটুলের শিরদার ওদের দুজনকে বারে বারে সাবধান করে দিল, তবু তোমরা জান 'আতোরে' পড়লে মানুষ ছুঁচোর মতো কানা হয়ে যায়। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করতে থাকে। শেষে শিরদার নিরুপায় হয়ে আল্‌হোরের গাইতার কাছে অভিযোগ আনল। পঞ্চায়েতের বিচার সভা বসল। ডেকে পাঠানো হল অপরাধী দুটি তরুণ-তরুণীকে। কিন্তু কোথায় তারা? খবর পেয়ে ওরা দুজনে ভেগে পড়েছে। খোঁজ খোঁজ। শেষে সন্ধান পাওয়া গেল হির্‌রি গাঁয়ে গিয়ে ওরা ঘর বেঁধেছে। হির্‌রির সমাজপতিরা সব শুনে ওদের একঘরে করল। গাঁয়ের বাইরে একটা ছাপরা তুলে ওরা দুজনে থাকত। মুরিয়া সমাজ তাদের বিবাহ স্বীকার করে নেয়নি। কোন মুরিয়া ওদের সাথে একসঙ্গে বসে খায়নি। গাঁয়ে শুয়োর-বলি হলে ওদের প্রসাদী মাংস পাঠানো হয়নি। কোন উৎসবে ওদের নাচতে দেওয়া হয়নি। কালে ওদের একটি 'ভুলা-হুয়া' হয়েছিল। মেয়ে নয় ছেলে। ওরা দুজনে যখন মারা যায়, কোন মুরিয়া ওদের পোড়ায়নি। সেই ভুলা-হুয়া একাই বাপ-মায়ের সংকার করেছিল। কিন্তু সেই ভুলা-হুয়াকে সমাজ ত্যাগ করেনি। যদিও সে আইন মাফিক অবৈধ সন্তান তবু তাকে স্বীকার করে নিয়েছিল সমাজ। যদিও তার বাপ-মা দুজনেই কুহ্‌রামি গোত্রের তবু তাকেও কুহ্‌রামি গোত্রের বলে ধরা হল। সে ছিল হির্‌রি গাঁয়ের ঘটুলের কোতোয়ার। মুরিয়া সমাজে সে বিয়েও করেছিল।

কোণ্ডা বলেঃ কিন্তু তা কেমন করে হল?

গাদরু গম্ভীর হয়ে বলেঃ হল এইজন্যে যে আমরা শহুরে হিন্দুদের মতো অসভ্য নই। বাপ-মায়ের অপরাধে আমরা বাপ-মাকেই শাস্তি দিই। সন্তান তো কোন পাপ করেনি। তাকে শাস্তি দেব কেন?

আয়েতু বললেঃ ন্যায্য কথা। আমরা শহুরেদের মত অসভ্য নই!

কোণ্ডার মনের সংশয়ও কেটে গেল এতে। বললেঃ বেশ আমি রাজি!

অস্ফুটে একটা গুঞ্জন উঠল ভিতর-মহলে। বুড়ি কিরিংগো রঙিলার গালটা টিপে দিয়ে বললেঃ কি গো মেয়ে? এত ফুর্তি কিসের?—বলেই একটা অশ্লীল রসিকতা যোগ করল সাথে।

রঙিলা একছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। মাল্‌কো হি হি করে হেসে ওঠেঃ দিদিটা লজ্জা পেয়েছে!

আয়েতু বললেঃ তা হলে তোমার ছেলেকে একবার দেখতে হয়। শিকার করতে শিখেছে? তীর ছুঁড়তে?

হাহা করে হেসে ওঠে কোণ্ডা। বলেঃ আমার ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন ছেলে এ তল্লাটে নেই।

আয়েতু বললেঃ বটে? কি নাম তোমার ছেলের?

পুত্রগর্বে গম্ভীর হয়ে কোণ্ডা বললেঃ আমার ছেলে সাধারণ চেলিক নয়, সে হচ্ছে কাবোণ্গা ঘটুলের শিরদার। চয়ন শিরদার।

গাদরু ধমক দিয়ে ওঠেঃ কোণ্ডা!

সন্তান ঘটুলে কোন পদে অধিষ্ঠিত বাপ-মায়ের তা জানার কথা নয়। অর্থাৎ না-জানাটাই নিয়ম। অবশ্য অধিকাংশ লোকেই তা জানে—স্বীকার করেনা প্রকাশ্যে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সেই কথাটাই বলে ফেলেছে কোণ্ডা। তাই ধমক দিয়ে ওঠে গাদরু।

কিন্তু ঘরের মধ্যে ওটা কিসের শব্দ? আয়েতু উঠে গেল ভিতর বাড়িতে। মাল্‌কোকে বুঝি কিছুতে কামড়েছে। দরজার ফাঁকে কান পেতে সে শুনেছিল এতক্ষণ পুংপার-মিছানার কথোপকথন। হঠাৎ বসে পড়েছে মাথা ঘুরে। দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে উবুড় হয়ে পড়েছে। দেওয়ালের কাটলে সাপ-বিছে কিছু ছিল না কি?

(ক্রমশঃ)

প্যারিসের চিঠি

প্যারিস ২ সেপ্টেম্বর, ৬২

বিশ্বাস করুন, প্যারিস সুন্দরীর প্রসাধন চলছে কিছুদিন থেকে। সুন্দরের পূজারী ফরাসী জাতি তাদের প্রিয় রাজধানী পৃথিবীর অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নগরী প্যারিসকে জলসাবান দিয়ে স্নান করিয়ে সদা প্রস্ফুট ফুলের মত ফুটফুটে করে তুলছে। শরতের সোনালী রোদও তার গায়ে অপরূপ মাধুরী ছড়িয়ে দিয়েছে।

কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। প্যারিসের বিভিন্ন কোণে ও কেন্দ্রস্থলে অনেক বিখ্যাত সৌধ রয়েছে। ইতিহাসের কোন সন্ধিক্ষণে কোন সম্রাট বা নেতা হয়ত তৈরি করেছিলেন আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফ, "মাদলেন" গির্জা, প্লাস দ্য লা রেপুবলিকের স্তম্ভ, কি পান্থেয়ঁ, অথবা এ্যানভ্যালিদ্দ দ্য ক্রুস, লুভর, অপেরা বা পালে রয়্যাল অথবা এরকম কিছু একটা। বছরের পর বছর জল কালি ধুলোয় বাড়ি-গুলির পাথরের রঙ মিশমিশে কালো হয়ে গেছে। অন্যান্য বহু সরকারী ও বেসরকারী বাড়িরই এই অবস্থা। কালো রঙের জন্য তাদের মৌলিক কারুকার্যের সৌন্দর্য পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। তাই ফরাসী সরকারের নির্দেশে এই সব বাড়ি ও সৌধ জল সাবান দিয়ে ধুয়ে তাদের প্রাচীন সাদা রঙ ও কারুকার্যের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। সৌধশীর্ষে যেখানে সোনালী কি অন্য রঙ ছিল সেখানে আবার তাদের পুরনো রঙ নতুন করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু বাড়িই নয়, অনেক রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলিও ধোয়ামোছা ও রঙ দেওয়া চলছে।

সাধারণভাবে ফরাসীদের সৌন্দর্যজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করতে হয়। ঘর-বাড়ি, পার্ক, বাগানকে কি করে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে হয়, একটু স্বপ্নময় করতে হয়, ফরাসীরা তা বেশ ভালো করেই জানে ও প্রকাশ করে। যদিও আমি বলব না যে প্যারিসে সব রাস্তাই আয়নার মত ঝকঝকে, কিন্তু প্যারিসে বা ফ্রান্সের যে কোন শহরেই যান, সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় দেখতে পাবেন সবুজ মখমলের মত ঘাস, অপূর্ব রঙ-বেরঙের ফুলের কেয়ারি ও সবুজ পাতায় ভরা গাছের সারি। এখানে সবুজ ঘাসের উপর কেউ ফুটবল খেলে না, বাচ্চারাও নয়। বিভিন্ন জায়গায় শুধু আইনের নিষেধজ্ঞাপক নোটিসই নয়, মানবিক আবেদনও রয়েছে : ঘাসদের একটু দয়া করুন। সুন্দর পরিবেশ থেকে মানুষের মনও অনেক উঁচুতে উঠে যায়—কারই বা ইচ্ছে করে শিল্পীর ছোঁয়া অপূর্ব পটকে কলঙ্কিত করতে? এখানেই শেষ নয়। প্রায় সব বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাসাদ, গির্জা, স্তম্ভে ও রাস্তার মধ্যিখানে ফোয়ারাতে আলো ত দেওয়া হয়ই (চোখ ধাঁধানো আলো নয়, বেশ একটা স্নিগ্ধ আলো), তা ছাড়া ছোট পার্কের সবুজ ঝোপে, কি নদীর ধারে যেখানে পার্কের রেলিঙের গা বেয়ে গাছের লতাগুলো নেমে গিয়ে জল ছুঁয়েছে সেখানে

মঁ স্যাঁ মিশেল — পাথরের উপর রচিত একটি কবিতা।

কোন অদৃশ্য জায়গা থেকে একটু স্নিগ্ধ আলো দিয়ে অপূর্ব আলো আঁধারির মায়াবন সৃষ্টি করা হয়েছে। এরকম রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করা শিল্পীর দেশ, Alfred De Musset, Lamartime প্রভৃতি রোমাণ্টিক কবির দেশ ফ্রান্সে খুবই স্বাভাবিক।

বিশেষ কিছু কিন্তু করা যাবে না ওই "তুর এফেল"কে—ইংরেজী ভাষায় যার উচ্চারণ আইফেল টাওয়ার। যন্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতির প্রতীক ওই "তুর"কেও আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। ফরাসীরা বলবে : কতটুকু সৌন্দর্য আছে ওই "তুর এফেলের" গায়ে? নীরস, কঠিন এক লৌহ-পিণ্ড উদ্ধত গর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার গুস্তাভ এফেল আইফেল টাওয়ারের নির্মাণ শুরু করেন এক বিশ্ব-প্রদর্শনী উপলক্ষে "সেন" নদীর ধারে প্রাচীন শাঁ দা মার্স-এ (আমাদের গড়ের মাঠ আর কি! আজকে এখানে তৈরি হয়েছে সুন্দর এক পার্ক ও পার্ক ঘিরে প্যারিস শহরের অন্যতম শৌখিন পল্লী)। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখে আইফেল টাওয়ারের নির্মাণ শেষ হয়। একে তৈরি করতে লেগেছিল ১২000 ইস্পাতের টুকরো ও তাদের জুড়তে লেগেছিল ৪৫০ টন ওজনের আড়াই লক্ষ নাট-বল্টু। ফলে আইফেল টাওয়ারের ওজন হয়েছে ৭000 টন। চার কোণে ২৬ মিটার চৌকো ও ১৪ মিটার পরিধির চারটি কংক্রীটের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে তিনতলা বিশিষ্ট ৩০০ মিটার উঁচু এই স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষে আজ স্থাপিত হয়েছে রেডিও ও টেলিভিশনের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ক্ষেপণ যন্ত্র।

সুন্দর বাড়ি, ঘর, প্রাসাদ-এর কথায় মনে হল এক ইংরেজ ঐতিহাসিক তাজমহল সম্বন্ধে বলেছিলেন—এটি হল মার্বেলের তৈরী একটি স্বপ্ন। ফরাসীরাও "ম' স্যাঁ মিশেল" সম্বন্ধে বলে, এটি হল পাথরের উপরে একটি কবিতা। আমি শুধু কবিতাই বলব না। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক—অপূর্ব ট্রাজেডি। সত্যি, আজ পর্যন্ত ফ্রান্সের বহু প্রাচীন দুর্গ, সৌধ, প্রাসাদ, গির্জা দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। আমার নিজের মতে ও বহু ফরাসীর মতেই ম' স্যাঁ মিশেল অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয়।

আজ থেকে সাত বছর আগের কথা। কলকাতায় আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের ফরাসী ক্লাসে সহপাঠীদের সঙ্গে ভিক্টর হিউগোর এক রোমাঞ্চকর বিবরণ পড়তে পড়তে শিউরে উঠেছিলাম। সেই থেকে মনে একটা বিরাট কৌতূহল জন্মেছিল ম' স্যাঁ মিশেল দেখার জন্যে। কানে ভেসে আসত হতভাগ্যের আর্তনাদ। বাঁচাও, বাঁচাও গো, কে কোথায় আছ! চোখের সামনে ভেসে উঠত এক অসহায়ের মুখ—ম' স্যাঁ মিশেলের চারদিকের চোরাবালির মহাসমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। যতই বাইরে আসার চেষ্টা করছে, হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে লোকের সাহায্য প্রার্থনা করছে ততই বালির ভেতর পা, কোমর, বুক, গলা পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার, বুকফাটা চেষ্টা। শেষ চেষ্টা। হে ভগবান! মানুষের জীবন্ত সমাধি। কোথায় ছিল সেদিন আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, কোথায় ছিল নিষ্ঠুর ভগবান! দেখেছিল সমস্ত প্রকৃতি হতভাগ্যের এই নিষ্ঠুর জীবন-বলি। বহু দূরে গৃহকোণে পড়েছিল এক ফোঁটা চোখের জল। আর দেখেছিল ম' স্যাঁ মিশেলের অন্ধকার ছোট্ট কারাকক্ষের ঘুল-ঘুলির ভিতর দিয়ে দীর্ঘ দিনের বন্দী। সাদা ঘোলাটে চোখ, উস্কখুস্ক চুল। হেসেছিল বুক-জল-করা হাসি হা-হা-হা। পাগল। মহা-মনীষী রাজকোপে পড়ে বছরের পর বছর লোহার খাঁচায় বন্দিদশা কাটিয়ে পাগল হয়ে গেছে। তার পর? তারপর ম' স্যাঁ মিশেলের

মাটিতে শুধু হাড় কখানা রেখে চলে গেছে —কোন দিনই আর শোনা যাবে না তার গলার স্বর।

দাঁড়িয়ে আছে শুধু আজও বালির মহা-সমুদ্রের মধ্যিখানে ম' স্যাঁ মিশেল, দূর-থেকে দেখা ছোট্ট বিন্দুর মত অটল, অনড়। প্যারিস থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটারের পথ। ফরাসী দেশের উত্তর পশ্চিম উপকূল থেকে একটু দূরে ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপটিকে প্রধান ফরাসী ভূমির সংগে সংযুক্ত করেছে একটি উঁচু রাস্তা। কিছুদিন আগেও ছিল না এই রাস্তাটি। জোয়ারের সময় উত্তাল সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির বিরাট বিরাট ঢেউ অবিশ্বাস্য প্রচণ্ড গতিতে এসে ম' স্যাঁ মিশেলকে ঘিরে ফেলত ও প্রধান ফরাসীভূমির সংগে সমস্ত যোগাযোগই ছিন্ন করে দিত। আবার ভাঁটার সময় সব জল নেমে গিয়ে শুধু বালি, বালি আর বালি। একটু দূরেই অবশ্য সমুদ্র তৈরি হয়েই থাকে এই লুকোচুরি খেলার জন্যে। আজকের এই রাস্তা তৈরি হওয়ার জন্যে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয় না, তবে সতর্কতামূলক সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়। বলা যায় না ত কি হয়!

আসল ম' স্যাঁ মিশেল হল ৯০০ মিটার পরিধি বিশিষ্ট প্রায় গোলাকার দ্বীপের মধ্যে গ্রানাইটের পাহাড়। মাটি থেকে প্রায় একটি কোণের মত করে ১৫২ মিটার পর্যন্ত উঁচুতে উঠে গেছে। পাহাড়ের শীর্ষে আছে প্রাচীন সন্ন্যাসীদের মঠ। মঠের সবচেয়ে ওপর তলায় আছে বিরাট গির্জা, তার নীচের তলায় রয়েছে সন্ন্যাসীদের বিরাট খাবার ঘর ও অতিথিশালা, পড়াশুনোর ঘর, সবচেয়ে নীচের তলায় রয়েছে বিশাল রান্নাঘর।

আজকের ম' স্যাঁ মিশেল একটি খুব ছোট্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। এখানে আছে একটি মাত্র রাস্তা। রাস্তাটি সমুদ্রতীরে প্রধান

মাইকেল টাওয়ার

দরজা থেকে উপর দিকে উঠে গেছে: রাস্তার শেষ প্রান্তে অনেকগুলো ধাপের সিঁড়ি বেয়ে মঠের প্রধান তোরণ পর্যন্ত পৌঁছন যায়। গ্রামে আছে ২৫০ জন অধিবাসী। রাস্তার দুই দিকে আছে গায়ে গায়ে লাগানো অনেক বাড়ি, দোকান এবং কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁ। থানা, পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস, ট্যুরিস্ট অফিস, গির্জা, মিউজিয়াম কিছুই বাদ নেই। প্রচলিত আছে—বহুদিন আগে কয়েকজন জেলে দুপুরবেলা কাজ সেরে খেতে আসত মাদাম পুলার্দ-এর বাড়িতে। জানি না, ভদ্রমহিলা ওদের ওমলেট করে খাওয়াতেন কিনা, কিন্তু সেই থেকে চলে এসেছে এখানকার বিখ্যাত ওমলেটের নাম— "ওমলেট আ লা পুলার্দ"। অনুবাদ করলে দাঁড়াবে পুলার্দি কায়দায় ওমলেট। সত্যি করে বলতে কি আজ পর্যন্ত এত সুস্বাদু ওমলেট আর কোথাও খাইনি। এখানকার একটা বিখ্যাত হোটেলেরও নাম দেওয়া হয়েছে "হোটেল পুলার্দ"।

তিন কি চার ঘন্টার মধ্যে সমস্তটা ম' স্যাঁ মিশেল-এর সব কিছু দেখা হয়ে যায়। তবে রাত্রিবেলা সেখানে থাকলে দূর দিগন্তে সমুদ্রে ধীরে ধীরে অস্তমিত সূর্যের রক্তরাগ অথবা ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় দাঁড়িয়ে দিকচক্রবালে সূর্যের স্বর্ণরথের ধীর আবির্ভাব সত্যিই দেখার মত। তার চেয়েও হয়ত অনেক বেশী রোমাণ্টিক লাগবে ম' স্যাঁ মিশেলের মাঝামাঝি উঁচুতে উঠে মঠের ঠিক পাদদেশে জলের ঠিক উপরে সবুজ লতাঘেরা বনে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত সমুদ্র ও সমুদ্রঘেরা এই "ম'"-এর দৃশ্য। সত্যিই পাথরের ওপর সৃষ্ট কবিতা একটি। কিন্তু এখানকার গদ্যের ইতিহাস অন্যত্র।

ম' স্যাঁ মিশেলের প্রথম নাম ছিল "ম' তমব"। এরকম অদ্ভুত নামের কারণ সেলটিক উপাখ্যান অনুযায়ী মৃতের আত্মাদের এক অদৃশ্য নৌকোয় করে এখানে নিয়ে আসা হত তাদের শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত রাখার জন্যে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সন্ত মিশেলের নির্দেশে সন্ত ওবেয়ার "ম' তমব"-এর নীচের দিকে একটি ছোট্ট মন্দির স্থাপন করেন। দশম শতাব্দীতে এখানে CAROLIN GIENNE গির্জার ভিত্তি স্থাপিত হয়। তারপর দ্বীপটির নাম "স্যাঁ মিশেল আঁ তমব", "স্যাঁ মিশেল আঁ ম্যার", "স্যাঁ মিশেল ও পেরিল দ্য লা ম্যার", "স্যাঁ মিশেল দু ম'" ও সর্বশেষে ছোট্ট করে "ম' স্যাঁ মিশেল"।

সন্ত ওবেয়ার তাঁর ছোট্ট মন্দিরে কয়েকজন পুরোহিত নিয়োগ করলেন এবং শীগ্গিরই জায়গাটি হয়ে উঠল তীর্থক্ষেত্র। নরমান বিজয়ের সময় পাহাড়টি সুরক্ষিত করা হয়েছিল বলেই জায়গাটি ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। বিদেশী শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে বহু লোক এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল—সেই থেকে একটা বেশ সুন্দর গ্রাম গড়ে ওঠে। ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নরমাণ্ডির ডিউক প্রথম রিচার্ড এখানে Fontenelle থেকে আনা বেনেডিকটিন সাধুদের আশ্রয় দেন তীর্থযাত্রীদের সেবা করার জন্যে। সেই সময়ই এখানে একটি বিশাল মঠ গড়ে ওঠে।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে নরমাণ্ডির ডিউক ও ফরাসী সম্রাট অভিযান করেন ম' স্যাঁ মিশেল দখল করার জন্যে, কিন্তু মঠ বেয়ে উঠে তার সেনাবাহিনী মঠ দখল করতে না পেরে মঠে আগুন ধরিয়ে দেয়—ফলে অর্ধেকটা মঠ পুড়ে

ধ্বংসে হয়ে যায়। এর পর ফিলিপ অগাস্ত সন্ন্যাসীদের উদার হস্তে দান করে মঠের পুনঃসংস্কার করেন। এবং গড়ে তোলেন আজকের বিস্ময় ফরাসীতে যাকে বলে "মেরভেই"। কয়েক বছর পর এখানে এক সুরক্ষিত দুর্গ তৈরি করে ফ্রান্সের সম্রাট সেনাবাহিনী রাখেন।

শতবর্ষের যুদ্ধের দ্বিতীয়ভাগে ইংরেজরা এই সুরক্ষিত দুর্গ দখল করার চেষ্টা করে। এখান থেকে কিছু দূরে "তমবলেন" দ্বীপ দখল করে ম' স্যাঁ মিশেল দখল করার চেষ্টা করে বারে বারে ইংরেজরা—কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। বহু ইংরেজ অশ্বারোহী ম' স্যাঁ মিশেলকে ঘিরে যে চোরা বালির সমুদ্র রয়েছে তাতে পড়ে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হয়। ১৪৩৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজবাহিনী শেষ বারের মত চেষ্টা করে ম' দখল করার জন্যে, কিন্তু লুই দেস্তনুতভিলের নেতৃত্বে ছোট্ট বিধ্বস্ত ফরাসী বাহিনী জনসাধারণ ও সন্ন্যাসীদের সহযোগিতায় বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজকে হটিয়ে দেয়।

ধর্মযুদ্ধের সময়ও ম' স্যাঁ মিশেল বহু ঝাপটা সহ্য করেছে। ধীরে ধীরে এখানে সন্ন্যাসীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে—তার প্রধান কারণ জীবন ছিল এখানে আধা-সামরিক। এর পর "সেন্ট মোর" এসে সম্পূর্ণ নতুন করে সন্ন্যাসীদের পুনর্গঠন করেন, কিন্তু সে সময় বহু মনীষী তাঁদের অবিনশ্বর বাণীর জন্যে সম্রাটের কোপে পড়ে বছরের পর বছর অন্ধকার কারাকক্ষের লোহার খাঁচায় থেকে হয় পাগল হয়ে গেছে, নয় মরে গেছে, আর নয়ত পালাবার চেষ্টা করে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আজও তাঁদের পরিত্যক্ত শূন্য খাঁচা ও অন্ধ বিগত দিনের বিভীষিকার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ফরাসী বিপ্লবের পরও ১৮১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ম' স্যাঁ মিশেল কারাগারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে এখানকার মঠ ও আশপাশের জায়গা ও বাড়ি ঐতিহাসিক বাড়ির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং তাদের নতুন করে গড়ে তোলার ভার নেন স্থপতি করইআর, পাতিগ্নী প্রভৃতি। ১৮৯৮ সালে থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ম' পুনর্নির্মাণ করেন পল গু এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দ থেকে পিয়ের পাকে। ম' স্যাঁ মিশেলে বিশেষ করে দেখার মত হল মঠের মাঝামাঝি একটা তলায় ছোট্ট চত্বর ঘিরে ২৫ মিটার লম্বা ও ১৪ মিটার চওড়া একটা চৌকো বারান্দা। সোনালী গ্রানাইটের তৈরী চারটি গ্যালারী ২২৭টি থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই বারান্দারই এক পাশে ৫৯টি জানালা বিশিষ্ট সন্ন্যাসীদের বিরাট খাবার ঘর। মঠের সবচেয়ে উপর তলায় গির্জাটি ১৯২২ সালে রোমান স্টাইলে তৈরি শুরু হয় ও ১৯৩৫ সালে তৈরি শেষ হয়। গির্জার ভিতরে খুব সুন্দর কয়েকটি রিলিফ রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হল বুগোনি-এর গোলাপী গ্রানাইটের ওপর ব্রোঞ্জ-এর রিলিফ, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে "দেবদূতদের কনসার্ট", "আদম ও ইভের নন্দন কানন থেকে বিদায়", "নরকে খৃস্টের আগমন" (নামগুলি অবশ্য আমি ফরাসী থেকে অনুবাদ করে দিচ্ছি)। অপূর্ব এই গির্জার চূড়োয় রয়েছে আড়াই মিটার উঁচু স্বর্ণাভ স্যাঁ মিশেলের একটি মূর্তি ও একটি তীর।

ম' স্যাঁ মিশেলে দেখার মত দুটি খুব সুন্দর ঐতিহাসিক যাদুঘর আছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার জিনিস হল প্রাচীনকালের কোন এক ফরাসী ইঞ্জিনীয়ারের তৈরী দুটি পেরিস্কোপ। পেরিস্কোপ দুটি পাহাড়ের উপর দিকে মঠের ধারে দুটি ছোট অন্ধকার গোল ঘরে স্থাপন করা হয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটি শ্বেতপাথরের টেবিল আছে। পেরিস্কোপের টিউব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্তটা ম' স্যাঁ মিশেলের চারদিকে ও ভিতরে এমনকি হোটেলের ঘরে, রেস্তরাঁর বারান্দায় বা মঠের নীচের দিকে পাহাড়ের গায়ে পার্কের ভিতরে কি হচ্ছে সব দেখা যায় টেবিলের উপর প্রতিফলিত। আরও আশ্চর্য হতে হয় শুধু ছবি দেখে নয়—লোক, জন্তুজানোয়ার, তাদের চলাফেরা, জামাকাপড়ের আসল রঙ, গাছপালার আসল রঙ সব ফুটে ওঠে টেবিলের ওপর।

ম' স্যাঁ মিশেল থেকে পাওরস' রেলস্টেশনের দিকে যাবার পথে পিছন দিকে তাকিয়ে নিলাম আর একবার; দূরে অপূর্ব ছবির মত ছোট্ট পাহাড়ের উপর মঠ ও তার চারদিকের বাড়ি, পার্ক, গাছপালা। কালকের উত্তাল সমুদ্রের জল অনেকটা দূরে সরে গেছে আবার কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছে হঠাৎ এসে আবার ঘিরে ফেলবে ম' স্যাঁ মিশেলকে সাদর আলিঙ্গনে।

আজ এখানেই শেষ করি। নমস্কার জানবেন।

অজিতকুমার দাম

পুনঃ। আমার এই লেখার সঙ্গে ম' স্যাঁ মিশেলের যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি আমাকে দিয়েছেন একটি ফরাসী সাংবাদিক এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র LE FIGARO-এর কলামনিস্ট শ্রীযুক্ত ANDRE-E BRAIVE। এর জন্যে আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩২ ॥

ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ডাক্তার ঘোষালের। হঠাৎ সুঠাম মুকুজ্যে একটা মাস্টারকে বাহাল করতে গেল কেন! তাঁর তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই যে পড়াবে।

"কি করতে হবে আপনাকে?"

"তাঁর লাইব্রেরির ভারটা নিতে হবে। রোজ ঘণ্টা দুই কাজ করলেই যথেষ্ট। ও কাজ করেও আমার হাতে প্রচুর সময় থাকবে। তাই আপনার কাছে এসেছি একটা পরামর্শ করবার জন্যে। এখানে যদি রেফিউজি ছেলেমেয়েদের জন্যে অবৈতনিক স্কুল করি কেমন হয়?"

"অবৈতনিক স্কুল? ছাত্রের অভাব হবে না। ভাত ছড়ালে প্রচুর কাক জুটবে। আমাকে কি করতে বলছেন?"

"হরিহর মোক্তারের একটা বাড়ি খালি আছে, শুনেছি আপনার সঙ্গে তার খুব ভাব, সে বাড়িটা আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন? ভাড়া দেব।"

ডাক্তার ঘোষাল এমন একটা মুখ-ভাব করে' চেয়ে রইলেন, যেন তিনি কোনও কিছুর থই পাচ্ছেন না। "দেবেন যোগাড় করে'? মাসে পঞ্চাশ টাকা করে' ভাড়া আমি দিতে পারব। শুনেছি এর আগের ভাড়াটে ওই ভাড়াই দিত।"

ডাক্তার ঘোষালের মুখ দিয়ে এবার কথা ফুটল। "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার আয়োজন কেন করছেন বলুন তো। It is no good running after wild buffaloes: ওসব করতে গিয়ে আবার একটা বিপদে পড়বেন। রেফিউজি ছেলে-মেয়ে কি একটা-আধটা? শ' দুই-তিন ছেলে-মেয়েকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন? যাকে 'না' বলবেন সে-ই আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

"তা ঠিক। একা ম্যানেজ করা কঠিন। আমি আর একটা কথাও ভেবেছি। ঝিনুক বি-এ পাশ শুনেছি। সে-ও যদি পড়ায়—"

লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তার ঘোষাল। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"না, না, না, ঝিনুক পড়াবে না। Do you understand, ঝিনুক আর আপনা-দের সংস্রবে যাবে না—I shall see that she does not। আপনার আসল মতলব এতক্ষণে বুঝেছি। আপনি ধূর্ত শৃগাল, but you are no match for a tiger!"

থতমত খেয়ে গেলেন গণেশ হালদার। তারপর একটু সামলে বললেন, "বেশ না পড়ান, না পড়াবেন। কিন্তু আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন!"

"উত্তেজিত হচ্ছি, কারণ I have smelled a rat—ছুঁচোর গন্ধ পেয়েছি। একটা দুরভিসন্ধির আঁচ পেয়েছি। ঝিনুক মিছিমিছি সুঠাম ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাতে গিয়েছিল জানেন? চোখের কোনও অসুখ নেই, তবু চোখ দেখাতে যাবার মানে? চোখটা ছুতো, আসল উদ্দেশ্য যাওয়া, shoulder rubbing! আমি কি কচি খোকা যে একটা ধাপ্পার মোয়া হাতে দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেবেন?"

এ আলোচনা কতদূর পর্যন্ত গড়াতো তা বলা যায় না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনায় থেমে গেল সব। একটা বাঁদর লাফাতে লাফাতে এসে ঘরে ঢুকল এবং ঘোষালের খাবার ঘরে যে পাঁউরুটি ছিল সেটা বগল-দাবা করে' বেরিয়ে গেল সটান। হরসুন্দর হইহই করে' তেড়ে গেল।

ঘোষালও তড়াক করে' সরে' দাঁড়ালেন একধারে। "বাঁদর? মংকি? এ অঞ্চলে তো দেখিনি কখনও" তারপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল পৃথিবী-নন্দনের দিকে। তিনি মাঠের

আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে চেয়ে ছিলেন ডাক্তার ঘোষালের দিকে। তারপর হঠাৎ একটা ছোট ক্যামেরা বার করে' ক্লিক করে' একটা ফোটো তুলে নিলেন ডাক্তার ঘোষালের।

হন হন করে' এগিয়ে গেলেন ডাক্তার ঘোষাল তাঁর দিকে। তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে ধরলেন তাঁকে।

"কে মশাই আপনি? আমার ফোটো তুললেন কেন?"

"আপনার ফোটো তুলিনি। আপনার পিছনে ওই পেয়ারা গাছে ল্যাজ ঝোলা পাখি বসেছিল তারই ফোটো তুলেছি। আমি একজন বার্ড ফোটোগ্রাফার। চিড়িয়া দেখলেই ফোটো তুলি। আচ্ছা চলি, টা—টা—"

বাঁ হাতটা তুলে মৃদু হেসে চলে গেলেন পৃথিবী-নন্দন। একটু পরেই বাঁদরটি তাঁর অপেক্ষায় একটি ডালে বসেছিল। দেখেই নেমে এল। পৃথিবী-নন্দন তার হাত থেকে পাউরুটিটি নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেললেন।

ডাক্তার ঘোষাল আর গণেশ হালদার দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"কত রকম আজব চিজই যে আছে সংসারে" ডাক্তার ঘোষালের মুখ দিয়েই প্রথম কথা বেরুল।

গণেশ হালদার বললেন, "এ লোকটা শুধু আজব নয়, একটু সন্দেহজনক।"

"কি রকম?"

"ও পাখির ছবি তোলে নি, আপনারই ছবি তুললো। কেন, তা জানি না।"

দুজনেই চুপ করে' রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গণেশ হালদার বললেন, "আমি এখন যাই তাহলে। ওই বাড়িটা যদি ঠিক করে' দিতে পারেন উপকৃত হব। কাছে-পিঠে অন্য কোন বাড়ি পাচ্ছি না। আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে ঝিনুক ওখানে পড়াবে কেন? এসব কথা আপনার মনে উদয় হয় কেন তা-ও বুঝতে পারি না। ঝিনুক আমাদের গ্রামের মেয়ে, আমার ছোট বোনের মতো।"

"ছোট বোনদেরও সর্বনাশ করেছে এ রকম লোক আমি দেখেছি। যুগটা যে খারাপ। আমি খারাপ। I am also a bad man—তাই কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।"

"বেশ ঝিনুক তাহলে পড়াবে না ওখানে। আমি একাই যতটা পারি পড়াব। বাড়িটা আপনি যোগাড় করে' দিন।"

"চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, চলি তাহলে।"

নমস্কার করে' গণেশ হালদার চলে গেলেন।

একটু পরেই ঝিনুক ঢুকল।

মোটর থেকে নেবেই সে সহাস্য মুখে এগিয়ে এল।

"কাকার দেশে ফেরবার একটা ব্যবস্থা করে' এলাম। প্রথমে সেন সাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি কেমন যেন বাঁকা ধরনের কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মনে হল কিছু করতে চান না, অথচ সেটা বলতে পারছেন না। আমি তখন সোজা চলে' গেলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন একটা ব্যবস্থা করে' দেবেন।"

ঝিনুককে দেখেই ডাক্তার ঘোষালের রাগ জল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বেশ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমার কাকাকে দেশেই পাঠাবে ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? সেটা কি সুবুদ্ধির কাজ হবে?"

"উনি এখানে আপনাদের জুতো লাথি খেয়ে আর পড়ে' থাকতে চান না। আমারও সেটা আত্মসম্মানে লাগে। ও'র কপালের কাটা দাগটা আমাকে রোজ যেন চাবুক মারছে। উনি এখানে নগণ্য হতে পারেন কিন্তু আমাদের গাঁয়ে সবাই ও'কে মান্য করত। এখনও এক ডাকে সবাই ও'কে চিনবে। উনি সব জেনে শুনে যখন সেখানে ফিরে যেতে চাইছেন, তাই যান। অনেকে তো ফিরে যাচ্ছে। আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় সেখানে ঘর-বাড়ি বেঁধে বসবাস করছেন আবার। উনি তার কাছেই থাকবেন।"

"কিন্তু শুনেছি উনি যাবার সময় বেশ কিছু নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছেন। অত টাকা কোথা পাব এখন?"

"আমি কি আপনার কাছে চেয়েছি এক পয়সাও?" ঝিনুকের চোখ বাঘিনীর চোখের মতো দপ করে জ্বলে উঠল। ডাক্তার ঘোষাল অনুভব করলেন যে তিনি চাল ভুল করে' ফেলেছেন। যতীশবাবু দেশে চলে' গেলে যে একটা আপদ বিদায় হবে এ তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে একটা আশঙ্কাও জেগে ছিল, যতীশবাবুর পিছনে পিছনে ঝিনুকও না চলে' যায় শেষে। ডাক্তার ঘোষাল দেখলেন এখন এ নিয়ে কোনও আলোচনা করা সমীচীন নয়।

বললেন, "বেশ, যা ভাল বোঝ কর। আমি এখন ডিসপেন্সারি চললাম।"

ডাক্তার ঘোষাল সোজা গিয়ে মোটরে উঠলেন এবং আর কোন কথা না বলে' বেরিয়ে গেলেন সবেগে।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে রইল মোটরটার দিকে চেয়ে। তারপর তার মুখে অতি সুমিষ্ট হাসি ফুটল একটি। হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় পিওন এসে দু'খানি চিঠি দিয়ে গেল। একখানি চিঠি লণ্ডন থেকে এসেছে এয়ার মেলে। মনে হল তনিমার চিঠি। ভ্রূ কুঞ্চিত করে' চেয়ে রইল ঝিনুক

...র দিকে। দ্বিতীয় চিঠিখানি মনে ... সুবেদার খাঁর। টাইপ-করা ইংরেজী ...। তিনি যখনই চিঠি লেখেন (খুব ... লেখেন যদিও) তখন টাইপ করে' লেখেন। চিঠির নীচে নামও সই করেন ...। ঝিনুককে তিনি বলেই দিয়েছিলেন যে যদি কখনও তিনি চিঠি লেখেন এই রকমভাবেই লিখবেন। ঝিনুক চিঠি দুটি ব্লাউজের মধ্যে পুরে ভিতরে চলে' গেল। এখন চিঠি পড়ার অবসর নেই, মাংসটা আগে রাঁধতে হবে।

সুবেদার খাঁর চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত।

I shall take one jack fruit for you. Please attend Down Upper India Express on July, 25.

তোমার জন্য একটি কাঁঠাল নিয়ে যাব। ২৫শে জুলাই ডাউন আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে এসো।

ঝিনুক বুঝতে পারল কাঁঠালের ভিতর কাঁঠালের কোয়া ছাড়াও অন্য মাল নিশ্চয়

থাকবে। পঁচিশে জুলাইয়ের এখনও দেরি আছে। ট্রেনটা আসে প্রায় একটা নাগাদ। সে সময় কাঠালটা নিয়ে কি করবে সে? কোথায় লুকিয়ে রাখবে? ডাক্তার ঘোষালকে কথাটা এখনই বলা উচিত কি? এইসব চিন্তায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর ঠিক করল সুবেদার খাঁ যেমন বলবেন তেমনি করা যাবে।

তনিমার চিঠি পড়ে' কিন্তু সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ল। এ যে কল্পনাতীত!

তনিমা লিখেছেঃ

ভাই ঝিনুক দি,

না জানি তোমরা আমার সম্বন্ধে কত কি ভাবছ! হাসপাতাল-পালানো চরিত্র-হীনা মেয়েটার মুণ্ডপাত করছ নিশ্চয়। আমি কিন্তু যা করেছি তা খুব বেশী নিন্দনীয় নয়, যে সুযোগ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে এসেছিল সে সুযোগ আমি অবহেলা করিনি। এটা নিশ্চয় খুব গুরুতর অপরাধ নয়। যে চরিত্র আমি হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না। কাচের যে ফুলদানিটা ফেটে গেছে, তাকে ফাটার কলঙ্ক সারাজীবন বহন করতে হয়। আমাদের সমাজে ফাটা ফুলদানিকে কেউ সম্মানের আসন দেয় না। হয় ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, নয় লুকিয়ে সরিয়ে চোখের আড়ালে রাখে। একমাত্র ডাক্তার সুঠাম মুকুজ্যেই আমার সব কথা শুনেও স্নেহের চক্ষে দেখে-ছিলেন, আমার সত্যিকার ভালো করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমার পেটের সেই হতভাগা সন্তান যদি বাঁচত তাহলে তারও হয়তো একটা ভালো ব্যবস্থা উনি করে' দিতেন। ওঁর মতো মহৎ লোক আমি আর দেখিনি। শাম্বুকের চিঠি হয়তো পেয়েছ। সে এখানে আমার কাছে আছে। সে কি আমার সব কথা তোমাকে লিখেছে? ও কাজের মেয়ে কাজের কথা ছাড়া আর কিছু লেখেনি বোধহয়। ও সব কথা জানেও না। যে নূতন জীবন এখন আমি যাপন করছি, তার সূত্রপাত কে করেছিল জানো? তুমি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে তুমি আমাকে দশ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙাবার জন্যে বড়বাজারের একটি লোকের কাছে পাঠিয়েছিলে একদিন রাত্রে। ঝোলাগুড়ে মাছি পড়লে যে অবস্থা হয় আমাকে দেখে লোকটিরও সেই অবস্থা হ'ল। আমি সত্যিই ঝোলা-গুড়, কিন্তু তার চক্ষে হয়ে গেলাম দুর্লভ পদ্মমধু। লোকটিকে মাছি বলছি বটে কিন্তু সাধারণ মাছি নয় মৌ-মাছি, কিন্তু আসলে সে হিপোপটেমাস। হিপোপটেমাস রূপে নয়, টাকার দিক দিয়ে। রূপে কন্দর্পকান্তি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাঁর ব্যবসা আছে, কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনি-মিনি খেলেন। এ হেন লোক

আমার রূপের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে' পাখা দুটি পুড়িয়ে বসল। তুমি বলেছিলে চেকটা ভাঙাতে হলে এক হাজার টাকা বাটা লাগবে। আমাকে দেখে উনি বললেন, আমাকে ও টাকা দিতে হবে না। আপনাকেই আমি দিলাম ওটা। তারপর আমাকে খাওয়ালেন খুব, শুধু খাবার নয়, ভাল মদও। অমন ভাল মদ আমি জীবনে কখনও খাইনি। এরপর যা ঘটল তাও অবিশ্বাস্য। অনেকটা আরব্য-উপন্যাসের গল্পের মতো। কথাবার্তায় যেই বেরিয়ে পড়ল যে আমার এখনও বিয়ে হয়নি এবং আমি সাবালিকা (অর্থাৎ বিয়ের জন্য বাবা-মায়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই) তখুনি তিনি বিয়ের প্রস্তাব করে' বসলেন। লোকটি অকপট। বললেন, জীবনে অনেক মেয়েমানুষ ঘেঁটেছি, কিন্তু জীবন সঙ্গিনী করতে পারি এমন কাউকে পাইনি এখনও। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করতে পারবে। তোমার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তবু, কেন জানি না মনে হচ্ছে তোমার মধ্যেই আমি আমার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছি। আমার সামনে হাঁটু গেড়ে আমার হাত দুটি ধরে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। সত্যি বলছি ঝিনুকদি, রূপসী বলে' সেদিন আমার একটু গর্ব হয়েছিল। আমিও তখন আমার জীবনের সব কথা অকপটে খুলে বললাম তাঁকে। বললাম, আমি কুমারী বটে কিন্তু নিষ্কলঙ্ক নই। এ সব জেনেও যদি—। উনি উত্তরে কি বললেন জানো? বললেন, আগুনে অসংখ্য পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়বে এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু তার জন্যে আগুন কখনও অপবিত্র হয় কি? আগুনকে কেউ কখনও কলঙ্কিত করতে পারেনি। তুমি যে এ সব কথা অসঙ্কোচে বললে, বলতে পারলে, এইটেই প্রমাণ যে তুমি অপবিত্র হও নি। এরপর কি আর থাকা যায়? আমি আত্মসমর্পণ করলুম তাঁর কাছে। তিনি বললেন মাসখানেক পরে তিনি বিলেত যাবেন। তার আগেই আমাকে বিয়ে করতে চান। বিয়ে করে' আমাকেও নিয়ে যাবেন বিলেতে। আমি যেন যত-শীঘ্র সম্ভব তাঁর কাছে ফিরে আসি। তিনি আমার অপেক্ষায় থাকবেন। বললেন, কাল আমি বম্বে যাব। ওই এক হাজার টাকা ছাড়াও আরও এক হাজার টাকা তুমি রেখে দাও। দিন সাতেক পরে বম্বে থেকে ফিরে তোমাকে যেন পাই। সেদিন রাত্রে ফিরেই যে রক্তারক্তি কান্ড হয়ে গেল, তাতো তুমি জানই। তুমি জোর করে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে আমাকে। দিয়ে ভালই করেছিলে। না দিলে হয়তো আমি মরেই যেতাম। যে সুখ এখন ভোগ করছি তা আর ভোগ করা হত না। তারপর নার্সিং হোমে

কদিন থেকে যেদিন একটু জোর পেলাম সেদিন দেখি সেদিনই ওঁর বম্বে থেকে আসবার তারিখ। যদিও একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল, তবু আমি বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতাল থেকে। গিয়ে দেখি তিনি আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। বললুম, আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছি। কেন হাসপাতালে গিয়েছিলাম তাও বললাম। উনি হেসে বললেন, ঠিক আছে। ভালই হল, তোমার জীবনের অতীতটা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। আমারও মুছে গেছে। তার দুদিন পরে বিয়ে হয়ে গেল। উনি আবার বম্বে গেলেন, সেখানেই বিয়ে হল। সেখান থেকেই বিলেতে চলে এসেছি। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করার যে আরাম সে আরাম এখন আমাকে ঘিরে আছে। আমি কিন্তু তোমাদের ভুলি নি ঝিনুকদি। তোমাদের জন্যে ব্যবস্থাও করেছি কিছু। তোমার মুখে শুনেছিলাম তুমি বিদেশে চলে আসতে চাও। স্বদেশের স্বাধীনতার আবহাওয়ায় স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারছ না, একদিন বলেছিলে আমাকে। না পারবারই কথা। যেখানে আমার বাবার মতো পাষণ্ড তোমাদের রক্ষাকর্তা সেখানে ভগবানও বোধ হয় কলকে পান না সব সময়ে। ওদেশ থেকে এদেশে আসবার পথেও নানা রকম আইনের পাহারা বসিয়েছেন কর্তারা। খুবই কড়াকড়ি। অন্যায়-অবিচার-অপমান-পক্ষপাতের খাঁচায় বন্দী করে রাখতে চান তোমাদের। পাসপোর্ট-ভিসা পাওয়া খুবই শক্ত। আমি একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার স্বামীর এখানে আপিস আছে। বেশ বড় আপিস। তাঁর ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতেও ব্যবসা আছে। ইউরোপের কাজকর্ম লণ্ডন আপিস থেকেই হয়। আমেরিকায় নিউ-ইয়র্কে আপিস আছে। অস্ট্রেলিয়ায় আর জাপানেও আপিস খোলবার কথা হচ্ছে। লণ্ডন আপিসে কয়েকজন লোক নেওয়া হবে। আমার অনুরোধে আমার স্বামী তোমাকে আর শামুককে তাঁর আপিসে বহাল করেছেন। শামুককে আর তোমার ভাইপোকে আসবার জন্যে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিসা-পাসপোর্টের ব্যবস্থাও এখান থেকে হয়ে গেছে। তারা এসে পৌঁছেও গেছে এখানে। এবার তুমিও চলে এস। এখানে আপিসের কাজ কেরানীগিরি। মাইনে যা পাবে তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। জর্মন আর ফরাসী ভাষা যদি শিখতে পার তাহলে মাইনে অনেক বেশী পাবে। ওসব দেশে যাবারও সুযোগ মিলবে। তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে দুটো ভাষা আয়ত্ত করা মোটেই শক্ত হবে না। আমার আর একটা কথাও মনে হয়েছে। জানি না, তুমি রাগ করবে না। মনে হয়েছে, ডাক্তার ঘোষালকে ছেড়ে তুমি বোধ হয় আসতে পারবে না। তাই তাঁর জন্যেও একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গরীবদের

নার্সিং হোম করবার জন্যে উনি অনেক টাকা দিয়েছেন। সেখানে ডাক্তার ঘোষালকে উনি কাজ দিতে পারবেন বললেন। আমি এই সঙ্গে তোমার ও ডাক্তার ঘোষালের (নিয়োগ-পত্র) পাঠালাম। এই দুটো দেখালে ওখানে পাসপোর্ট পাওয়া সহজ হবে। তোমরা যদি না পার উনি ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন। খামুকে আর তোমার ভাইপোর ব্যবস্থা উনিই করেছিলেন। টাকার জোরে সব হয় ঝিনুকদি। যাই হোক, তুমি চলে এস এখানে। উনি বাঙালী নন, কিন্তু বাঙালীদের উপর ওঁর শ্রদ্ধা খুব বেশী। ওঁর হংকংয়ে যে আপিস আছে, সে আপিসের চার্জে যিনি আছেন তিনি বাঙালী। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি লণ্ডনেও বাঙালী অনেক। সব রকম বাঙালী খাবার পাওয়া যায়। সেদিন একজন বাঙালী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি দেখলাম দুক্তো আর তিতার ডাল করেছেন। খুব ভালো লাগল। আর একটা কথা। যদিও আমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছি, তবু তোমাকে গোপনে বলছি, তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি তাঁর একটু খবর নিও। যদি তাঁর টাকার দরকার হয় আমাকে জানিও আমি তার ব্যবস্থা করব। টাকার আমার অভাব নেই এখন। আমাদের বড়বাজারের আপিস থেকেই টাকার ব্যবস্থা করতে পারব। চিঠির উত্তর দিতে দেরি করো না। আমার অনেক অনেক ভালবাসা জেন। তোমার ঋণ জন্মে শোধ করতে পারব না ঝিনুকদি। তুমি না থাকলে সেদিন আমি মরেই যেতাম। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়? আলাপ আছে? যদি সম্ভব হয় ওঁকেও আমার খবরটা দিও। আর আমার শতকোটি প্রণাম জানিও তাঁর পায়ে। ইতি—

তনিমা

চিঠিখানার সঙ্গে দুটো নিয়োগপত্রও ছিল। ঝিনুক নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। হারুণ-অল-রসিদের প্রাসাদে নীত আবু-হোসেনও বোধ হয় এত বিস্মিত হয়নি। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকবার পর অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া হল তার মনে। সে হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, ছেলেবেলায় ঠাকুর ঘরে প্রণাম করেছে, শিবপুজোও করেছে। কিন্তু তারপর কলেজ-জীবনে আর ভগবানের কথা বড় একটা ভাবেনি সে। তারপর নিদারুণ নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে, এদেশে অন্যায়, অবিচার আর স্বার্থপরতার নিরঙ্কুশ মূর্তি দেখে, ভগবানের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সম্ভবত তার অবচেতন-লোকে এ ধারণাও হয়েছিল—ভগবান নেই, ওটা একটা মিথ্যা সংস্কারমাত্র। তনিমার চিঠিটা পেয়ে কিন্তু সব মেঘ যেন সহসা কেটে গেল। সে দুহাত জোড় করে প্রণাম করতে লাগল। তার মুদিত চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই বিষ্ণুমূর্তির ছবিটা যেটাকে তার মা রোজ সকাল সন্ধ্যা প্রণাম করতেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে স্থির করে ফেলল ডাক্তার ঘোষালকে এখন কিছু বলবে না। যে রকম খাম-খেয়ালী মানুষ বিলেত যেতে রাজি হবেন কি হঠাৎ? কথাটা তাঁকে সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। একথা ভাবতে গিয়ে ঝিনুকের আর একটা কথাও মনে হল। এত স্পষ্ট করে একথাটা এতদিন তার মনে হয় না। ঘোষাল যদি বিলেত যেতে না চান তাহলে তাঁকে ফেলে সে কি যেতে পারবে? যে লোকটা প্রাণ তুচ্ছ করে তাদের বাঁচিয়েছে, এতকাল সমস্ত বিপদে আপদে নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জোরে তাদের রক্ষা করেছে, তাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত, ছেড়ে যাওয়া কি সহজ? এসব ছাড়াও তাঁর আর একটা যে পরিচয় সে পেয়েছে, ওই দুর্ধর্ষ লোকটার অনাবৃত যে রূপ সে দেখেছে, তা মুগ্ধ করেছে তার সেই মাতৃ-হৃদয়কে যা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রত্যেক নারীর মধ্যেই। দুর্দান্ত দামাল উদ্দাম বলিষ্ঠ শিশু, যে অনিবার্য আকর্ষণে টানে প্রত্যেক নারীকে সে আকর্ষণের প্রভাব ঝিনুকও এড়াতে পারে নি। সে এটাও অনুভব করতে লাগল—সে যদি আজ ডাক্তার ঘোষালকে ফেলে চলে যায় তাহলে উনি নোঙর-বিহীন নৌকোর মতো তলিয়ে যাবেন। ওঁর টাকা লোটবার লোভে লোক অনেক জুটবে, কিন্তু সত্যিকার দরদ দিয়ে রক্ষা করবার লোক জুটবে কি? সারা জীবন উনি এরকম লোক খুঁজেছেন কিন্তু পাননি। সহসা ঝিনুক ঠিক করে ফেলল ডাক্তার ঘোষালকে সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। যেমন করে হোক রাজি করাতেই হবে ওঁকে। এই সিদ্ধান্তে এসে হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠল সে।

হঠাৎ মনে পড়ল মাংসটা এখনও চড়ানো হয়নি। ত্বরিতপদে ভিতরে চলে গেল।

(ক্রমশ)

তুফানের রেখা

নিখিল সরকার

"হ" গো মাঝিদা, আইজ্ঞ লোকা ছাড়ব না ?"

বুড়ো মাঝি ঘুরে নিতাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। মুহূর্তে মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটার জবাব দিল, "না—। চোক দুটা কি ঘরে রাখিআ আসচু ? তোর ঘর কাইরে বায়া ?" কথাটা শেষ করে মাঝি আর একবার চোখ দুটোকে কুঁচকে নিতাইয়ের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল। পরে কি ভেবে আর দাঁড়াল না সেখানে।

মাঝির সঙ্গে আরও একটা লোক ছিল। এমন দিনে কেউ নদীর ওপাশে যেতে চাইবে, এরকম একটা নির্বোধ প্রশ্নে সে যেন খানিকটা মজা পেয়েছে। সঙ্গের লোকটা নিতাইয়ের অপ্রস্তুত সলজ্জ চোখে চোখ রেখে সামান্য ঠাট্টার সুরে বলল, "তুই যে বড় লবাবপুত্র আসসুরে, দেখতে পাউঠুনি, ঝড় বাদলা ছুটে ?"

মাঝিদার জবাবে নিতাই সামান্য লজ্জা পেয়েছিল। এদিনে ইজারাদার ঘাটের নোকা বন্ধ করে দেয়, এটা ওর অজ্ঞাত নয়। তা ছাড়া এ সময়টায় বাতাসের হাড় ভেঙে গেলেও মাঝে মাঝে তার বল্গা বাড়ে। তবু কোন কোন সময় দু-একটা নৌকো যে না ছাড়ে এমন নয়। আর ওই ভেবেই সে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল। ও ত শুধু একাই আসে নি এখানে। আরও বহুজনের হাট বসেছে। এখনও ছোট ছোট ঘরগুলোতে তারা অপেক্ষা করছে। যদি দিনের মেজাজটা কোন রকমে কমে! কিন্তু মাঝিদার জবাবটা যে এরকম হবে, এটা সে আশা করে নি। প্রথমে লজ্জা পেলেও পরে বিরক্ত হয়েছে। তার ওপর মাঝিদার সঙ্গের লোকটা যখন এভাবে কথা বলল, তখন স্বাভাবিকভাবেই নিতাই ক্ষুব্ধ, আহত কিছুটা উত্তেজিত হল। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রূঢ় দুর্বিনীত স্বরে বলল, "তোকে কে কথা কইতে কঠে ?"

"তোর যে বড় লম্বা কথা রে ? তুই কার

"কার বেটা , তোকে কইব কেনি, তুই বেটা ?"

কে ?"—নিতাইয়ের গলার সুরে উগ্রতা ও তপ্ততা ছিল।

জলের ছাট আসছিল। নিতাই আরও একটু উঠে এল। জামা থেকে তখনও জল পড়ছিল। এমন সময় পেছন থেকে একজন বলল, "এ যে দেখিঠি, আমাদের লিতাই গো।"

"কে লিতাই ?"

"আরে নিরঞ্জন দাসের পো, অকে দেখুনি ? ভাল পাট কইতে পারে।"

গলার স্বর শুনেই বুঝতে পারল নিতাই এ হরিখুড়ো। পেছন ফিরতেই হরিখুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "হ" রে বাপু, তোর কি একটু বুদ্ধি নাই, আইজ্ঞ বারিতে আছে ?"

'খুড়া, আইজ্ঞ গাঙের সেপাশে একটা ভাল দল আসছে; শুনলি তুমি ?"

'হু', কাল ত হাটে হাঁড়ি পিট্‌আ পিট্‌আ কইচে, কিন্তু সব্ কির্‌কম?'

'তাইলে দেখি কি করা যায়।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল নিতাই, 'তুমি জাউঠ ক্যাই?'

'মকদ্দমার দিন আছে।'

আরও জোরে ছাট আসছিল। নীচের মাটিটাও বড় পেছল হয়ে গেছে। আর ভেতরে ঢুকলে ওর গায়ের জল লাগবে অপরের কাপড় জামায়। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও আর ভাল লাগছিল না নিতাইয়ের। তখনও জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। বাতাস গোঙাচ্ছিল। এ অবস্থায় ভিজতে ভিজতে নদীর কিনারে, উঁচু জায়গাটায় এসে দাঁড়াল নিতাই। সামনের দুরন্ত নদীটার ওপর দৃষ্টি ফেলল। আজ সাগরঘূর্ণি বাতাস। মাঝে মাঝে দিক পরিবর্তন করছে। বাতাসের বেগ তখনও বেশ প্রবল। হয়ত ওকে তীর থেকে টেনে নীচে ফেলে দেবে।

বিরাট বিরাট ঢেউগুলো তীব্র এক যন্ত্রণায় কেবলই ফুঁসছে। যেখানটায় এসে নিতাই দাঁড়িয়েছে, সেখানে একটা বহু বছরের পুরনো তেঁতুল গাছ। প্রায় পড় পড়। নীচের মাটিটা প্রতিবছর একটু একটু করে ক্ষয় হচ্ছে। গত বছরও শীতের আগে অনেকখানি জায়গা থাবা দিয়ে তুলে নিয়েছে খ্যাপা নদীটা। গাছটা এখন যেন কোন বলির পশুর মতন ভীতার্ত হয়ে এবারের আতংকিত প্রতীক্ষায় আছে। কয়েক বছর আগেও নিতাই দেখেছে, এই গাছটা থেকে দু তিন শ হাত এগিয়ে, পুবে নদীর পাড় ছিল। আস্তে আস্তে গ্রাস করতে করতে নদীটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। হঠাৎ কি একটা প্রচণ্ড শব্দে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে আনতে আনতে এক সময় বেলাভূমিতে নিশ্চল রেখে নিতাই লক্ষ করল, দক্ষিণ পাশে তীরের অনেকখানি মাটি ধসে পড়েছে। আরও দেখল, গোঙানির শব্দ তুলে শ্বেতবর্ণ ঢেউগুলো কিনারে এসে ভেঙে শতধা হয়ে, ফটফটে সাদা বরফের কুচির মতন রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। নিতাই সমান্যক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে নদীর অকৃপণ অনাবৃত সাজ দেখল।

বৃষ্টির ফোঁটা কাঁটার মতন এসে শরীরে বিঁধছিল। মাঝে মাঝে এলোমেলো ঝাপটা। খানিকক্ষণ পর এক সময়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিটাকে ফিরিয়ে এনে বিস্তৃত নদীর ওপর স্থির করল। এমনভাবে বাতাস বৃষ্টির কণাগুলোকে নিয়ে মাতাল খেলায় মেতেছে, যে দেখলে মনে হবে, কে যেন নদীটার ওপর একটা শঙ্খ-শুভ্র উজ্জ্বল ব্যাপ্ত চর রচনা করে চলেছে। নিতাই সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ অবোধ্য দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকল। নদীটা যেন আজ ভীষণ ক্ষেপেছে।

গোটা শরীর থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছিল নিতাইয়ের। মনে কেমন যেন

একটা চাপা বিষণ্ণতার ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। কাল বিকেলে যখন হাটে গিয়েছিল নিতাই, তখনই একটা লোককে কাঁধে ঢোল নিয়ে চীৎকার করে করে বলতে শুনেছিল কথাটা। সেই থেকেই সে মনে মনে আর একবার সংকল্পটা ঠিক করে নিয়েছিল। শহর থেকে দল আসছে। নাম করা দল। হরিখুড়োর কাছে দলটার নাম বহুদিন সে শুনেছে। খুব ভিড় হবে। চাষের কাজও এখন কম। একটু বেশী দামের টিকিট কেটে সামনে না বসলে ভাল শোনা যায় না। ভাল পার্ট করতে হলে ভাল ভাল দলের অভিনয় দেখতে হয়। মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিতে হয়। এরকম একটা বোধ সে গতদিন উপলব্ধি করেছিল। ইতিমধ্যে ওরও বেশ কিছুটা নাম হয়েছে। এসব ভাবনায় সে কিঞ্চিৎ সুখ তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করে। এজন্যে কিছু পয়সাও সে সংগ্রহ করে রেখেছে।

কাল একাদশী। খুব সকালে জোয়ার। ভোর-খেয়াতেই সে ওপারে যাবে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবে। কাল আর অন্যের দোরে কাজ করতে যাবে না। গতকাল শুয়ে শুয়ে নিতাই এতসব ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। শোয়ার আগে একবার বাইরে এসে ধূসর মেঘের ছোপধরা পিঙ্গল আকাশটার দিকে তাকিয়ে থেকে বৃষ্টি না হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে।

ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল নিতাই কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ঘুম আসছিল না। খুব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। অন্য একটা গাঁয়ে কি যেন একটা পালা শুনতে গিয়েছিল। এখনও চোখ বুজলে দু-একটা দৃশ্য স্পষ্ট ভেসে উঠে। ধূপ, বাজনা দেখতে দেখতে সব কেমন যেন স্তব্ধ বর্ণহীন একাকার হয়ে গিয়েছিল। ওর ছোট প্রাণটা ভয়ে ভাবনায় উদ্বেলতায় অবশ অসাড় হৃতশ্বাস হয়ে আসছিল। তারপর অনেককাল সে নিজেকে ভাবনাকাঙ্ক্ষী মনে করে এক অপরিসীম গর্ব বোধ করত। এর পরও বহুবার দূরে দূরে গ্রামে গেছে যাত্রা শুনতে। মাঝে মাঝে এজন্যে মারও খেয়েছে। তবু এটা যেন ওর কাছে একটা নেশার মতন ছিল।

গতকাল শুয়ে শুয়ে নিজেকে বিভিন্ন চরিত্রে ফেলে ভাবতে ভাল লাগছিল নিতাইয়ের। কখন এক সময় অলক্ষ্যে ওই ভাবনার প্রান্তসীমা ধরে ঘুম ওকে স্পর্শ করেছিল, তা টের পায়নি। কিন্তু আচমকা ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। দরজায় কে যেন মন্থরভাবে টোকা দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরও স্বল্পক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকল নিতাই। এতক্ষণ সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। কার সঙ্গে যেন যুদ্ধ করছে। বড় গরম লাগছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। শরীরে বিন্দু বিন্দু

স্বেদকণা ভারী হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আবার দরজায় শব্দ হল। এবার কে যেন অস্পষ্ট জড়িত স্বরে কথা বলছে। মুহূর্তের মধ্যে একটা হাত ওর বাবার বিছানাটায় রাখল। যা ভেবেছে তাই। আজও বাবা তাড়ি খেয়েছে। নির্ঘাত খেয়েছে। মনটা কেন যেন অকস্মাৎ বেদনায়, ভয়ে এবং বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। তারপর অন্ধকারেই পা পা করে এগিয়ে গিয়ে খিলটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা বে-টাল পায়ে এসে ঘরের মেঝেয় পড়ল। নিতাই অস্বচ্ছ মিহি আলোয় তা দেখল। কিন্তু কিছুই করল না। চুপ করে একপাশে সামান্য সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

নিরঞ্জন পতনটাকে একটু সামলে নিয়ে নিতাইকে উদ্দেশ্য করে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'দাঁড়ি আছু কেনি রে? তখনও লম্ফরটা জ্বালুলুনি, সন্ধ্যাবালা নু কি কয়ুঠু?'

'শেলাই নাই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিতাই বলল।

'না-ই-, না-ই কে-নি?'

'পইসা থাইল নি।'

'তখন যে তোকে দিলি, তা তুই কি কয়ুলুয়ে হারামজাদা।'

'হারি যাইছে।'

'হারি পেকিচু, মিথ্যুক কাইকোরিয়ার, শুয়ার।'

'গাল দিস নি কইঠি।' নিতাই উত্তেজিত কর্কশ স্বরে উত্তর দিল। এত রাতে এসব কথা ভাল লাগছিল না ওর।

'একশবার দুবো, হারামজাদা, আবার কথা কোঠু, ধরলে গাড়িআ দুবো জানু।'

'কাই দেনা দেখি, তাইলে তুই কিরকম বাপ আমি দেখিআ লুব।' রুক্ষ শক্ত গলায় জবাব দিল নিতাই।

নিরঞ্জন উঠে দুর্বল শিথিল কাঁপা পা ফেলে নিতাইয়ের কাছে আন্দাজে এগিয়ে এসে একটা চড় মারল ওর গালে। বলল, 'এই ত দিলি, কি করবু?'

একবার ভেবেছিল নিতাই, একটা ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। টেনে ঘরের বাইরে এনে দরজায় খিল এঁটে দেয়, অনেক জ্বালা তাকে দিয়েছে। রাগে শরীরটা কাঁপছিল ওর। কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল। কিছু না করে বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশের দিকে তাকাল। কয়েকটা তারা তখন উঁকি দিয়েছে মেঘের পাশ দিয়ে। কিছুক্ষণ আগে যে উত্তেজনা, উত্তাপ সে অনুভব করেছিল, এখন তা যেন ধীরে ধীরে শান্ত প্রশমিত হয়ে আসছে। আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে চোখ ফেলে নিতাই কিছুটা বিস্মিত হল। কালিয়া তারাটা অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে, কুমিড়াটা অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে। নির্ঘাত নিকট বৃষ্টি। এবং সবিস্ময়ে আরও প্রত্যক্ষ করল নিতাই, আকাশের পূব দক্ষিণ কোণটা কাল মেঘে ছেয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে এসে এক সময় দরজা বন্ধ করল ও। ওর বাবা ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। শুনতে পেল ওর বাবা তখনও বিড় বিড় করছে। বলছে, 'শালীর বেটী শালী, তুই যাবু ত যাবু, টকাটাকে রাখিয়ালু কে নি? আকে নিয়ালে কি তোর সাঙাৎ চটিত?'

নিতাই সেই অন্ধকারের মধ্যে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শুনল, ওর বাবা কথাগুলো কাকে লক্ষ করে বলছে।

আস্তে আস্তে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। শুধু তীব্র দুঃসহ এক যাতনা অনুভব করছিল। যাকে ভুলে গিয়েছিল, যার কথা ভেবে অনেকদিন আড়ালে চোখের জল মুছেছিল, তার কথা মনে করে এই মুহূর্তে কেন যেন কাতর হল। একটা নরম স্পর্শ পাচ্ছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিতাই। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে এখন কেন যেন চোখের জ্বালা অনুভব করল। ভাল ঘুম হয়নি কাল। এমন সময় হরিখুড়ো একটা ঘরের দাওয়া থেকে হাঁক দিল, 'ও নিতাই দাড়ি দাড়ি ভিজনুটু কেনি?'

নিতাই ডাকটা শুনল। কিন্তু কোন সাড়া দিল না। পাগলা জলের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আত্মস্থ হচ্ছিল। একসময় দৃষ্টিটাকে আরও দূরে মেলে ধরে দেখল, দূরে নদীর জলের ওপারে, আকাশটা যেখানে মিশেছে সেখানে একটা ঘন ভারী কৃষ্ণমূর্তি মেঘ যেন জলের তল থেকে উঠে এসে সমস্ত আকাশটাকে ঢেকে দিতে ছুটে আসছে। মুহূর্তে আকাশের রঙ পরিবর্তিত হচ্ছে। কে একজন ওর পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় কথাটাকে ছেড়ে দিয়ে গেল, 'পালি আয়রে টক্কা, মরবু যে!'

নিতাই তবু দাঁড়িয়ে থাকল। ওর মধ্যে আজ যেন কী একটা বেপরোয়াভাব। দুর্জয় সাহস। ঝড়টা আবার নতুন করে উঠেছে। বাতাসের গোঙানি শুনতে পাচ্ছে নিতাই। চার পাঁচজন দাঁড়ি মাঝি এই বৃষ্টির মধ্যেই নীচে নেমে তাদের নৌকো-গুলোকে টেনে আরও ওপরে তুলে আন-ছিল। দেখল, মাঝিরা এখন দৌড়ে উঠে আসছে। বৃষ্টির ফোটাগুলো ছুটতে ছুটতে এতক্ষণে নিতাইকে স্পর্শ করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ও বুঝতে পারল, কে যেন ওর সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। পা দুটো অবশ অসাড়। কে যেন ওকে মাটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিয়ে গেছে। এমন সময় একটা ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এসে ওর হাত ধরে টান দিল। বলল, 'এই, তোকে ডাকেঠে রে।'

'কে?'

'হায় সেটি বসি আচে।' আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখাল ছেলেটা।

নিতাই ঠিক বুঝতে পারল না, কে ডাকছে। হরিখুড়া? ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কে ডাকেঠে, তুই কইবু ত!'

'আগু তুই দেকবু আয় না।'—বলে ছেলেটা একরকম জোর করেই ওর হাত ধরে টান দিল। বৃষ্টি ততক্ষণে আরো প্রবলবেগে বর্ষণের আয়োজনে মেতেছে।

একটা আচ্ছাদনের নীচে এসে দাঁড়াল ওরা। আজ সকাল থেকে নিতাই জলে ভিজছে। কপালের দুপাশের নীল রগ দুটোও বেদনায় দপ দপ করছে। চোখ-দুটোও খুব কর কর করছে। অল্প অল্প জ্বালা কিছু একটা পড়লে যেমন জ্বালা করে, অনেকটা সেরকম।

এখানটায় বেশ লোক জমা হয়েছে। নিতাই দেখল, কে একজন মেয়েলোক এক কোণে বসে আছে। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেল না, কে এই স্ত্রীলোক। আর তাকেই বা কেন ডাকবে! তবু বুকের তলায় হঠাৎ কেন যেন সামান্য একটু চঞ্চলতা দ্রুততা অনুভব করল। ছেলেটার দিকে চেয়ে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "কে ডাকেঠেরে?"

"এই মাইয়াটা।"

"আমাকে ডাকেঠে?"

"হু হু তোকে।"

নিতাই কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে এক পাশে সরে দাঁড়াল। ভেবে পেল না, এখন কি বলবে। ওদিক থেকেও কোন প্রশ্ন আসছিল না। অনেক চিন্তা করেও সে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। ডাকল অথচ মুখটা

ঘোমটায় ঢাকা। বরং আরও এক পাশে সরে গেল। কিন্তু কেন?

"কিরে চিনতে পারছু আমাকে।"—বহু দূরে থেকে কথা বলার মতন মৃদু অথচ স্পষ্ট করে এই প্রথম কথা বলল মেয়েলোকটি। পরে আরও ক'পা এগিয়ে এসে নিতাইয়ের একটা হাত ধরে মৃদু টান দিল। এবং ঘোমটার আড়াল সরিয়ে ওর চোখের দিকে বিষণ্ণ কাতর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

নিতাই স্তম্ভিত হতবাক। মুহূর্তের মধ্যে কোন অদৃশ্য শক্তি যেন ওকে চেতনা, বোধবুদ্ধির জগত থেকে বিচ্ছিন্ন,. বিচ্যুত করে লুপ্তচেতন এক মৃতের পৃথিবীতে ঠেলে দিল। মানুষ যেমন করে অপ্রত্যাশিত-ভাবে, বহু আকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুর মুখো-মুখি হয়, তখন সে যেমন নিমেষে হতচেতন ও নির্বাক হয়ে সেই দুর্লভ প্রার্থিত সত্যকে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে, নিতাইও অনেকটা সে রকমভাবে সম্মুখের মানুষটাকে দেখছিল। ঝড় জল, বাতাসের বৃষ্টি-পীড়ন আর্তনাদ, নদীর মাতলামি, আশপাশের লোকজনের গল্পগুজব, কলহ সব যেন ওর কাছে মৃত মনে হল। কে যেন তাকে ক্রমশ অবশ শক্তিহীন করে ফেলছে। ঠিক সেই ডুবন্ত মুহূর্তে স্ত্রীলোকটি আর একবার নিতাইয়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। আস্তে করে আবার জিজ্ঞেস করল, "কি রে এখনও চিনতে পারলুনি?"

নিতাই শুধু নিজের অজ্ঞাতে যন্ত্র-চালিতের মতন একবার আস্তে করে মাথা নাড়ল। আর ঠোঁট দুটো ঈষৎ কাঁপিয়ে অস্ফুটে বলল, "তু—ই—!"

নিতাইয়ের শরীর থেকে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ মেয়েলোকটি আরও কাছে সরে এসে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিল নিতাইকে। স্নেহসিক্ত গলায় বলল, "এখনও দাঁড় করিআ ভিজুঠু? চটপট করিআ জামাটা খুলিআ পেকা। শেষকালে যে অসুক হবে।"

নিতাই কিছু বলল না। আগের মতনই দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে যেন ওর ঘোর লাগা স্থবির চিন্তার কুয়াশা একটু একটু করে অপসারিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা চোরা ক্রোধ ওর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ধরনের অভিমান সেই ক্রোধের সীমা ছুঁয়ে ওর তপ্ত শুষ্ক অন্তরটাকে ভিজিয়ে শীতল করে দিল। হৃদয়ের গুপ্ত গুহা থেকে যেন দুঃসহ এক সঞ্চিত বেদনা এই মুহূর্তে অবারিত হয়ে ক্ষরিত হতে চাইছে।

জলের ছাট লাগছিল শরীরে। হঠাৎ কি মনে করে জামাটা গা থেকে খুলে ফেলল নিতাই। নিংড়ে জামাটা দিয়ে মাথা শরীর মুছল। তারপর একটা ঘন ভারী নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আকাশটার ওপর বিহ্বল করুণ দৃষ্টি ফেলে নিতাই দেখল, জমাট কালো মেঘগুলো অসংখ্য জলকণা মাটির বুকে অকৃপণভাবে ঢেলে দিচ্ছে।

"কি রে রাগ করিআ কি আর বুসবু নি?" গলার স্বরে মমতা ও সহানুভূতি।

আরও একবার টান দিল হাত ধরে। নিতাই এক রকম জোর করে, রাগে অভিমানে দুঃখে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। অন্যদিকে তাকাতে গিয়েও, পর মুহূর্তে বিষণ্ণ অন্যমনস্ক চোখে একবার ওর মার মুখের দিকে তাকাল। ওর মায়ের চোখ দুটোও জল-ভারে ছলছল করছিল যেন। এভাবে হাতটা সরিয়ে দেওয়ায় ব্যথাটা যেন আরও গভীর হয়ে লেগেছে। মায়ের মুখটা এখন নিষ্প্রভ, ম্লান, ভিজে ভিজে লাগছিল নিতাইয়ের। স্বল্পক্ষণ সেদিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থেকে চোখ নত করল নিতাই।

এতক্ষণে স্পষ্ট একটা যন্ত্রণা যেন অনুভব করতে পারছে নিতাই। বুকের তলা থেকে একটা বেদনা কান্না যেন এই মুহূর্তে উঠে এসে ওর কণ্ঠরোধ করছে। এই সংসারে নিতাই অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত উপেক্ষিত। বাবা তাকে এখনও সময় সময় মারধর করে। মা তাকে সর্বহৃত নিঃস্ব করেছে। কি তার অপরাধ? এই বোধ এখন, তার বহুক্ষণের পুঞ্জিত অভিমান এবং দুঃখকে দ্রব করে বেদনার্ত করে তুলছে। একটা আবেগ উচ্ছ্বাস ওর ভেতরে আলোড়ন তুলেছে। ঠোঁটের ডগাটা অনুভবের তীব্রতায় থরথর করে কাঁপছিল। আর এই কষ্টকর যন্ত্রণা দমাবার আশায় নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল নিতাই। তারপর এই অবস্থায়ও আর একবার সে চাইল মার দিকে। ওর মার চোখ দুটোও বড় নরম কোমল দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিগত দিনের একটা ছবি ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

নিতাই তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। কি একটা কারণে একদিন স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল। বাড়ি এসে দেখল ওর মা, কেষ্ট-মামার সঙ্গে কথা বলছে। কি একটা খুশীর কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ছিল ওর মা। নিতাইয়ের প্রথম দিন থেকেই লোকটাকে ভাল লাগে নি। হরিখুড়োর কুটুম। এ পাড়ায় থাকে না কেষ্টমামারা। এখানে থেকে ও পড়াশুনো করে। অথচ কেষ্টমামা ওকে আদর করত। এর আগেও কতদিন সে দেখেছে মা আর কেষ্টমামা কথা বলছে পাশাপাশি বসে, হেসে। কিন্তু আজ প্রথম মনটা বিষাদে ও বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল। কেননা, কিছুদিন আগে একদিন গভীর রাতে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অন্ধকারে চোখ খোলা রেখে শুনেছিল, ওর বাবা মাকে বকাবকি করছে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করছিল, "কিষ্টা অত ঘন ঘন এ বাড়ি আইসে কেনি? কিরে মুক বুজি আছু কেনি, কথা কইতে পারনি?"

মাও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ ঝাড়া দিল, "কেনি আইসে তাকে জিগ্যসিব।"

"অকে কি জিগাসিব, তোকে ত জিগাসাইঠি, তুই ক না; অত মাতামাতি কিসের?"

"অত খ্যারাপ কথা কোঠু কেনি?"

"খ্যারাপ করতে পারু, আর আমি কইতে পারবনি?" একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার ওর মাকে লক্ষ্য করে বলল, "তোকে বার বার ধরিআ কইচি, কিষ্টার ভাবগতিক খ্যারাপ, অকে অত কাছে আসতে দুবুনি, তুই আমার কথা শুনচু?"

"তুমি ত সব করিআ অকে লিয়া আসচল।"

"হুঁ হুঁ আমি লেসথ্যি, আর তুই জুটিয়াল, না, যদি ভাল চাউ তাইলে অকে শেষ কথা কইয়া দে, ও যেন এঠি নাই আইসে।"

"আমি কইতে পারবনি।"

"পারবুনি?"

"না।"

"না..." বলেই অন্ধকারে কটা চড় মারল। নিতাই ওর মার সব কথার অর্থ বোঝেনি হৃদপিণ্ডটা খুব ধুক ধুক করছিল তার। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটাও যেন সে শুনতে পাচ্ছিল। আর টের পেল ওর বাবা দরজা খুলে বাইরের দাওয়াতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বাবা একটা বিড়ি ধরাল। ওর মা তখন চাপা সুরে কাঁদছিল। অন্ধকারে ভাল করে সব দেখা যাচ্ছিল না। চালের টুই চুইয়ে চুইয়ে ক্ষীণ চাঁদের আলো পড়ছিল ঘরে। সেই অস্পষ্ট মিহি নরম আলোয় নিতাই দেখল, ওর মা উঠে বসেছে। বিড়ির আগুনটাকে অন্ধকারে এখন কেমন যেন ভয়ের বলে মনে হচ্ছিল নিতাইয়ের কাছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনল, মাও ওর বাবাকে বকচে। "তোর নিজের স্বভাব যে খ্যারাপ, সেটা ত দেখতে পাউঠুনি, আর বউকে ধরিআ ত মারু। এদিগে ত মাগ-

পোর ভাত কাপড় জোগাড় করতে পারুনি। তবু তাড়ি খাউ, রাঁড়-বাঁড় যাউ; কিছু আমি কি জানিনি।"

নিতাই ওর মার সব কথার অর্থ বুঝেনি সেদিন। তবু মার জন্যে গভীর দুঃখ অনুভব করেছিল। সত্যই বাবা মাকে প্রায়ই মারপিট করে। কি যেন খায় ওর বাবা। তখন চেনাই যায় না। কিন্তু শেষের কথাটার অর্থ সে ধরতে পারেনি। পরের দিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং খুব ধমক খেয়েছিল।

ওর বাবা যে কেষ্টমামাকে পছন্দ করে না তা সে বুঝেছিল। স্কুল থেকে ফিরে যখন কেষ্টমামাকে এখানে মার সঙ্গে গল্প করতে দেখল, তখন সর্বাঙ্গে নিতাই যেন কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ও জ্বালা অনুভব করেছিল। মার ওপর রাগ হচ্ছিল। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মার চোখের দিকে চেয়ে একটু কর্কশ সুরে বলল, "ভোগ লাগচে।"

"অত তাড়াতাড়ি ভোগ লাগচে কি রে?"

"হ' লাগচে, ক খাইতে দুবু নাকি?"

"সে ঘরে ভুজা টিন নু, বার কি খা না, দেকতে পাউনি কথা কইঠি?"

"না, আমি লিতে পারবনি।"—জিদের সঙ্গে জবাব দিল নিতাই।

"তেবে এ ঠিনু যা, অতবো খাইতে পাবুনি" শাসনের সুরে বলল ওর মা।

রুষ্ট, বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার কেষ্টমামার চোখের দিকে তাকিয়ে আর অপেক্ষা করল না নিতাই। একটু আড়ালে সরে এসে দুঃখে অভিমানে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলেছিল। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। তারপর বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে গেল।

পথে ওর বাবার সঙ্গে দেখা হল নিতাইয়ের। ওকে একা একা এ সময় নদীর পথে যেতে দেখে নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "অতবা কাই জাউঠুরে তুই?"

একটু তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল নিতাই। কোন কথা বলল না। নিরঞ্জন ওর গায়ে একটা হাত রেখে স্নেহভেজা গলায় বলল, "মুকটা ও-রকম রাকচু কেনি? কে বকুচে রে?" মনে মনে এতক্ষণ নিতাই বেশ কিছুটা আহত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এবার বাপের কথা ওর পুঞ্জিত উত্তাপটুকু অন্তর্হিত করে দিল। কেঁদে ফেলে বলল, "মা আমাকে খাইতে দেয় নি।"

"কেনি?"

"কিষ্টামামুর সঙ্গে কথা কইথুলে।" কথাটা ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। সে বলতে চায়নি। বলেই নিতাই শঙ্কিত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বাপের মুখের দিকে তাকাল। দেখল, ওর বাবার মুখটা মুহূর্তের মধ্যে কেমন শক্ত রুক্ষ হয়ে উঠেছে। বাবাকে এখন বড় রূঢ় অপরিচিত বলে মনে হল ওর। একটু আগে কণ্ঠস্বরে যে মমতা, প্রগাঢ় স্নেহ ভালবাসা ছিল, এখন মনে হল নিতাইয়ের, তা যেন ওর বাবার নয়।

বাড়ি ঢুকল নিরঞ্জন। পেছনে ভয়ে দুরুদুরু

পা ফেলছে নিতাই। দাওয়ায় মা দাঁড়ান। এ সময় এভাবে ওদের বাড়ি ঢুকতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হল নিতাইয়ের মা। নিতাই আর গেল না। উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাকে দেখছিল। ওর মাও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরে গেল ওর বাবা। পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে ওর মার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোর কোন নাঙের সঙ্গে কথা কইথলুরে শালী, টকাটা যে দুটো ভুজ্জা মাগুথল, সেটা দুবার তোর অবসর হইচোনি?".

নিতাই দেখল ওর বাবার চোখ দুটো যেন দপদপ করে জ্বলছে। মুখটায় হিংস্রতার কুটিল রেখা ফুটে উঠেছে। আর কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে একটা হেঁচকা টান মেরে উঠোনে এনে ফেলল ওর মাকে। আর হাতে যে লাঠিটা ছিল সেটা দিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পিটতে লাগল। দেখতে দেখতে নিতাইয়ের সমগ্র চেতনা যেন লোপ পাচ্ছিল। ওর মা চীৎকার করছে, "আমি মইর‍্যালিরে, গুলাম আমাকে মার‍্যা পেলিলরে, কে কাই আছু, ধর্মের বাপমনে, ছুটিআ আইস গো।"

"চুপ কর, চুপ...পাটটাঁটি ফাটিতে পারবু নি; শালী বার ভাতারী, তোকে না কইথলি, কিষ্টার সাথে মিশবুনি, কেনি তুই তার সাথে কথা কইথলু? দেক, শালী, শেষবারের মত কইআ দিলি, যদি এবার দেকি তাইলে তোর রক্তের নদীতে গা ধুবে।" আর দাঁড়াল না নিরঞ্জন। অস্ফুটে আরও কি বকতে বকতে চলে গেল। আর নিতাইয়ের কেন যেন মনে হল ওর বাবা আজ আর আসবে না।

ওর মাও তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "গুলাম রে, তোর কি এথে ভাল হবে রে, গুলামের ঢেমনীর জ্বালা উটুচে, তাই গুলাস দিন নাই, রাত নাই, আমাকে যখন পারবু, মারবু, গুলামের অখন জেবনের জ্বালা উটুচে গো, তোর ভর জোয়ানে মাটি পরু, তোর হাতে কুষ্টরোগ হউ। যেদিকে দুচোক যায় আমি চল্যাযাব, দেখি তুই, কি করবু আমার? আমি যখন পইলা আইসি, তোর সংসারের হাড় জিরজির করুথল, নাই খায়্যা, নাই দায়্যা এঠির কুটাটি সেঠি পর্যন্ত হইতে দিচিনি, আর আইজ ত তুই আমাকে মারবু, আমি কি তোর ঢেমনী?" বলতে বলতে নিতাইয়ের দিকে তাকাল ওর মা। নিতাইকে লক্ষ করে এবার বলল, "পুড়ামুয়া তার বাপের গুণ পাইচে, যা পুড়ামুয়া, তোর বাপ যে ঢেমনীর কাচকে যাইচে, তাকু মা ক যা। আমি চল্যালে, তোর কোন্ মা তোকে দেকে, দেকিআ লুব না একবার!"

আবার ওর মা নিতাইয়ের হাত ধরল। এত সময়ের আচ্ছন্ন ভাবটা যেন এখন অপসৃত হল। মার মুখের দিকে আর একবার স্বাভাবিক অথচ ব্যথিত চোখে তাকাল নিতাই। টিনের বাক্স থেকে একটা শাড়ি বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে ওর মা কাতর আহত গলায় বলল, "অ্যাটা পরিআ পেকা, ভিজা পেন্টুনে থাইস নি, জ্বর হবে।"

নিতাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। পরে শান্ত ম্লান চোখ দুটো ওর মার নরম ভেজা চোখে রাখল। সামান্যক্ষণ কোন কথা বলল না। শুধু মনে মনে একান্ত দুঃখীর মতন বলল, আচ্ছা মা, আমি নাহলে একটা ভুল করথিলি, রাগিআ বাবার কাচে কথাটা কইয়া দিথিলি। তার উত্তরে তুই আমার সাথে গটেও কথা কইলুনি, আর আইজ কিনা কেঠু, জ্বর হবে! ভাবতে ভাবতে বেদনার জলকণায় বুকটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চোখ দুটো সীসের মতন ভারী হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে দৃষ্টিটাকে গুটিয়ে নিল।

নিতাই কাপড়টা নিল না। দৃষ্টিটাকে আবার অন্যদিকে প্রসারিত করল। ওর মা একটা নিশ্বাস ফেলল। পরে অনেকটা মৃদু অনুচ্চ সহানুভূতি-মেশানো গলায় বলল, "বস না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "কতবা খাইতুল, ভোগ লাগে নি?"

ক্ষিদের কথায় নিতাই অর্ধ-আনত চোখে তাকাল মার দিকে। এতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। ঝিঁ-ঝিঁ ধরা বেদনা অনুভব করল এখন। বসে পা দুটোকে টান করে ছড়িয়ে দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওর মা ওকে আবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, "হাঁরে, তোর বাপ অখনও নেশা করে?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "হুঁ।" নিতাই মাথা হেলিয়ে জবাব দিল।

নিতাইয়ের মার চোখ দুটোতে কেমন উদাস বৈরাগ্য দৃষ্টি ফুটল। "অখনও পিটে তোকে।"

"নেশাটেশা খাইলে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিতাই বলল।

কিছু সময় দুজনেই নীরব থাকল। তারপর ওর মা-ই আবার কথা বলল, "হাঁরে, অখন ইস্কুল যাউনি?"

"না।"

"কি করু তাইলে?"

"পরের দোরে কাজ করি।" বলতে বলতে ঠোঁটটা সামান্য কাঁপল। কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

"আমার সাথে যাবু?" অনেকক্ষণ পর ভেবে কথাটা বলল ওর মা।

নিতাই মা-র চোখে চোখে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে এর কোন জবাব দিতে পারল না সে। একটা আবেগ যেন এত সময় ধরে ওকে জোয়ারের জলের মত অস্থির চঞ্চল করে তুলছিল। এখন তা পূর্ণ হল।

"কি রে যাবু?" কথার মধ্যে মমতা স্নেহের উত্তাপ অনুভব করতে পারছিল

নিতাই। কিছুটা আবেগকাতর গলায় বলল, "কাইকে :"

"আমি জেঠি যাই।"

নিতাই আর কোন কথা বলল না। বলতে পারল না। এই অপ্রত্যাশিত আশ্বাস তাকে যেন এখন অন্য এক জগতের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

"কি রে কথা কৌনি কেনি? যাবু? সেঠি তুই পড়বু, খাবু, ভালভাবে রইবু, তোর কুন কষ্ট হবে নি।"

নিতাই অনেক কিছু বলতে চাইল। কিন্তু পারছে না। ওর মা নিতাইয়ের শরীরে একটা হাত রাখল। শান্তি ও স্বস্তির একটা উষ্ণ স্পর্শ পাচ্ছিল এখন নিতাই। একটু পরে কপালের চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে ওর মা বলল, "তুই বড় রোগা হইচুরে, হাড়টার বারি পড়চে। আমার সাথে চ. কইঠি তোর কুন কষ্ট হবে নি। কি, বিশ্বাস হুটে নি?"

নিতাই মা-র চোখে, ওর চোখ দুটোকে সামান্যক্ষণ স্থির রেখে কি যেন খুঁজল। পরে নামিয়ে নিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশটার এক কোণ থেকে একটা শব্দ উঠে সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

নিতাই ওর মাকে লক্ষ্য করে গভীর বেদনার্ত ও অনুযোগের সুরে মনে মনে বলল, মা এতদিন ত তুই আমার খুঁজ লৌনি, আর আইজ কিনা কৌঠু, চল কষ্ট হবে নি! ভাগ্যো দেকা হইথল!

কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল নিতাই। কথাটা আর বলতে পারল না। তার আগেই শুনল, বাচ্ছুরমারির নৌকো ছাড়ছে। এই নৌকোতেই ওর মা যাবে। ওর মাও নিদারুণ সত্যের মতন কথাটা শুনল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা, বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘখণ্ডগুলো হালকাভাবে সাঁতার কাটছে। আকাশের বিমর্ষ ভাবটা এখন আর নেই। মেঘের কালো গা বেয়ে সূর্য কিরণ গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর ওপর। এতক্ষণ যেন সূর্য-দেব পিঙ্গল মেঘের শয্যা পেতেছিল, এখন জেগে উঠে শয্যা গুটিয়ে, কাঞ্চনদীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

লোকজন উঠে যাচ্ছে নৌকোয়। কিছু সময়ের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল নিতাইয়ের মা। নৌকোর দিকে দৃষ্টি ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পর বাইরের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে এনে যখন নিতাইয়ের ওপর ফেলতে যাবে, তখন বিস্ময়, বেদনার সঙ্গে দেখল, নিতাই নেই। আরও খানিকক্ষণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে ওকে খুঁজল। এখন আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। চোখ ফেটে জল এল। আঁচল দিয়েও অশ্রুর বন্যাকে আটকাতে পারল না। সেই ঝাপসা দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে নৌকোয় গিয়ে উঠল।

নিতাই কোন রকমে উঠে পড়ে তেঁতুল গাছটার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে অতি সন্তর্পণে লোভীর মতন মাকে দেখছিল ও। ওর সমস্ত ক্ষোভ যন্ত্রণা অভিমান যেন এই মুহূর্তে গলে গলে ঝরতে চাইল। দেখতে দেখতে নৌকো ছেড়ে দিল। ওর মা তখনও এক কোণে বসে তীরের দিকে চেয়ে আছে। ক্রমশ নৌকোটা একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। পালে তখন হাওয়া লেগেছে। কিছু-ক্ষণের মধ্যে আরও একটা নৌকো ছাড়ল ওপাশে যাওয়ার। কিন্তু নিতাই গেল না। কেমন যেন আচ্ছন্ন মানুষের মতন নদীর দিকে চেয়ে থাকল। জলের কান্না শুনল। খেয়াঘাট এখন শূন্য নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিতাই এই নির্জন নিঃসঙ্গপুরীতে অভিভূতের মতন একাকী বসে থাকল।

বহুক্ষণ পর আচ্ছন্নতার ঘোর কাটলে নিতাই অনুভব করল, অনেকদিনের একটা পুরনো ক্ষত ছিল তার। দীর্ঘ সময়ে একদা তার কষ্টকে সে ভুলেছিল। কিন্তু আজ এতকাল পর আবার, অতি পরিচিত কে যেন একজন এসে সেই সুপ্ত ক্ষতের পাতলা আবরণটা সরিয়ে দিয়ে গেল। এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্তে নতুন করে এর দহন সে অনুভব করবে। ভাবতে ভাবতে আর একবার আহত করুণ দৃষ্টিতে নিতাই চারদিকে তাকাল। দেখল ক্ষীণ অনুজ্জ্বল আলোর কণায় দেহ আবৃত করে ক্রমশ অন্ধকার বিস্তৃত হচ্ছে চরাচরে। অকস্মাৎ ঘরের কথা মনে পড়ল তার। আর তা মনে হতেই সেই আসন্ন অন্ধকারের ঘ্রাণ নিতে নিতে নিঃশেষিত অতি দুঃখীর মতন নিতাই ঘরের পথে পা বাড়াল।

প্রেস ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল উদ্যোগত "কর্মবীর বিধানচন্দ্রের জীবনী" আলোকচিত্র প্রদর্শনীর একাংশ

চিত্রপ্রদর্শনী

স্বর্গত নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দেশের জীবনের সংগে যে কতটা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন তার একটা সম্যক পরিচয় পাওয়া গেল প্রেস ফোটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অনুষ্ঠিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী থেকে। মোট দু'শ তেইশখানি আলোকচিত্রের সহায়তায় একাধারে চিকিৎসক, রাজনীতিক, সমাজসেবী, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং মানুষ ও কর্মবীর বিধানচন্দ্রকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে দেখবার এবং চেনবার সুযোগ করে দেওয়ার দিক থেকে প্রদর্শনীটি অত্যন্ত কাজের হয়েছে। এই সঙ্গে একথাও বলা যায়, প্রেস ফোটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এই প্রদর্শনী করে কোন জননায়কের জীবনীকে আলোকচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করার দিক থেকে ভবিষ্যতে অনুকরণযোগ্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

৮ই থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের ইনফরমেশন সেণ্টার হলে প্রদর্শিত ছবিগুলি বিধানচন্দ্রের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ থেকে তিরোধান পর্যন্ত তাঁর কর্মময় জীবনের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার স্বাক্ষর হিসেবে পরিগণিত হবে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন সূত্রে, হিজলী জেলে গুলী বর্ষণের প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথের পাশে; সি এফ এণ্ড্রুজের শয্যাপার্শ্বে, চিকিৎসক, মেয়র, ভাইস চ্যান্সেলর, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য; মুর্শিদাবাদে বন্যার সময় পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে হেলিকপ্টারে; গানের আসরে, বাউলের সংগে আলাপে, উন্নততর কলিকাতার পরিকল্পনায়, রোগীদের চিকিৎসায়, খেলোয়াড়দের সংগে; পোল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের নেতা ও সাধারণ শ্রমিকদের সংগে ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেশে ও বিদেশে বিধানচন্দ্র

যে কি ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে ছিলেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল হিসেবে প্রদর্শনীটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রদর্শিত এই সংবাদ চিত্রগুলি সরবরাহ করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, জনসেবক, হিন্দু, ভারত গভর্নমেণ্টের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগ, ইউ এস আই এস, পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ বিভাগ, কলিকাতা কর্পোরেশনের মুখপত্র 'মিউনিসিপাল গেজেট', প্রভৃতি। এছাড়া উদ্যোক্তা এসোসিয়েশনের সভ্যদের তোলা এবং বাইরেরও অনেকের তোলা ছবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কলকাতার পর

বংশী বাদক — শিল্পী : শৈলেন্দ্র মিত্র

প্রদর্শনীটি মফঃস্বল শহরগুলিতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে কর্মবীর ও মানুষ ডাঃ বিধানচন্দ্রকে দেশের লোকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার একটা সুযোগ লাভ করতে পারে। প্রেস ফোটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের প্রচার বিভাগ উদ্যোগী হলে এটা হওয়া অসম্ভব নয়।

*

সপ্তাহ কয়েক বিরতির পর সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টের উদ্যোগে তাঁদের অন্যতম এক সদস্যের একটি সপ্তাহ-ব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় গত ১৪ই সেপ্টেম্বর। এবারের প্রদর্শনীটি হচ্ছে শৈলেন্দ্র মিত্রের দশখানি তৈলচিত্রের। বছর তিনেক আর্ট কলেজে শিক্ষা লাভের পর শিল্পী শ্রীমিত্র নিজের চেষ্টা ও অনুশীলনের জোরে সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

প্রদর্শিত ছবি দশখানিতে ইম্প্রেসানিস্টিক ধারার অনুসরণ যেমন দেখা যায় তেমনি বিমূর্ত ধারার প্রতিও অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। উজ্জ্বল রঙের সংগে সরল ও বৃত্তাকার রেখার প্রয়োগে শিল্পী এমন একটা নিজস্ব ভংগী আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন যা দর্শকের তাঁর ছবির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট করে। "পাখির সংগে মহিলা", বংশী হাতে মানুষ", "দৈশ বিদ্যালয়", "লাল চৌখুপি" ও "মানুষ ও মাছ" ছবি কখানি বেশ একটা ভাবময় পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে। "সবুজ পাহাড়", "লাল গোলাপের জন্ম", "চৈত্র" ও "শ্রাবণ"-এর দৃশ্যগুলি মনকে এক অতিপ্রাকৃতিক জগতের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিষয়-বস্তু, ভাব ও পরিবেশ অনুযায়ী রঙের প্রয়োগ বৈচিত্র্যের আস্বাদও এনে দেয়। তবুও কতক ছবির ক্ষেত্রে রেখার আধিক্য দৃষ্টিতে একটা জটিল দৃশ্য তুলে ধরে যা দর্শককে বিমূঢ় করে তোলে।

অসকার ওআইল্ড-এর পত্রগুচ্ছ

আমি নিজে ফুলের উপমা পছন্দ করি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার এমন কোনো ফুলের নাম মনে আসছে না, যার গন্ধ সুন্দর অথচ যা দেখতে অসুন্দর। কিন্তু এমন ফুল অবশ্যই আছে যা নয়ন-হর, তবু গন্ধহীন। বোধ হয়, প্রকৃতির নিয়মই এই, স্বাভাবিকতার মধ্যে একটি দুটি অপ্রত্যাশিতকে নিয়ম ভঙ্গের জন্যে রেখে দেওয়া। এমন দুর্ঘটনা একটি দুটি বাদ দিলে তেমন ফুলও বস্তুত পাওয়া যাবে না যার রূপ আছে গন্ধ নেই।

অসকার ওআইল্ড

এসব সত্ত্বেও আমি ফলের উপমা দিয়েই বলি কথাটা। ফলের পরিচয় স্বাদে, চেহারায় নয়। কাঁঠাল নামক ফলটির যাঁরা ভক্ত তাঁরা মাথা নেড়ে শতবার বলবেন, খাঁটি কথা; স্বাদই আসল, চেহারায় কি আসে যায়।

ঠিক এই রকমই শিল্পের বেলায়। আমি অনেককেই বলতে শুনেছি, আর্ট আর আর্টিস্ট এক জিনিস নয়। শিল্পের পরিচয় শিল্পকর্মে শিল্পীর জীবনে নয়। লেখকের পরিচয় লেখায়, জীবন অবান্তর। কবিকে নাকি কাব্যের মধ্যে খোঁজা নিষেধ।

ফলের উপমা এখানে খাটে। অর্থাৎ লেখার স্বাদ নাও, তার বেশীতে তোমার দরকার নেই। কিন্তু ফুলের উপমা খাটে না এ-কথাও সত্য নয়। আমরা যতই বলি না কেন, লেখার মধ্যেই আমার প্রত্যাশা মেটে, বস্তুত তা সর্বাংশে মেটে না। প্রত্যাশা থাকে। অবশ্য তেমন লেখার বেলায়।

আমার নিজের ধারণা, লেখক দু-জাতের। এক দল আছেন, যাঁরা সর্ব-অর্থেই সাহিত্যিক; অন্য দল লেখক। যাঁরা সাহিত্যিক তাঁদের রচিত সাহিত্যই যে

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

সুধার ভাণ্ডার হয়ে পড়ে থাকে তা নয়, তাঁদের জীবনও সেই সাহিত্যের তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা হিসেবে থেকে যায়। তার অর্থ এই, 'তাঁর শিল্প তাঁরই জীবন অন্বেষণ'। কথাটি ভুল অর্থে ধরলে মনে হবে, আমি যেন আত্মজীবনীকে সাহিত্য বলছি, তা কিন্তু নয়। উপলব্ধি ও জীবন অন্বেষণকেই আমি বড় সাহিত্যের লক্ষণ বলছি। দ্বিতীয় জাতের লেখক, কেবলই লেখক, শুধুমাত্র লেখকই। জীবনের সঙ্গে, অর্থাৎ নিজের জীবনকে লেখার সঙ্গে জড়াতে রাজী না।

এ-রকম ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, সাহিত্যিকের জীবন তাঁর রচিত সাহিত্যকে আরও তাৎপর্যময় করে, স্পষ্ট ও সুগম করে। বলতে দোষ নেই, ফুলের উপমা এখানে দেওয়া যায়। দেওয়া যায় এই কারণে যে, এখানে যেন জীবন ও সাহিত্য একে অন্যকে অনুষঙ্গের মতন জড়িয়ে রয়েছে।

ওদেশে যে জীবনীর এত চল, পত্র-সাহিত্যের এত কদর, আত্মজীবনীর প্রতি পাঠকের অনুরাগ তার কারণ এই, মানুষ যেমন একটি সৃষ্টিকে দেখতে তেমনি সৃষ্টি কর্তাকেও দেখতে চায়। আমি আমার একাধিক বন্ধুকে দেখেছি, জীবনী জানার পর কোনো কোনো লেখক সম্পর্কে তাঁরা উৎসাহী হয়েছেন। অনেক সময় এই জীবনীটি হয় ভূমিকা, কখনও বা অতিরিক্ত প্রাপ্য। এতে কি কোনো দোষ আছে? কোনো ক্ষতি?

সম্প্রতি দেখলাম অসকার ওআইল্ডের একটি পত্র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। হাজার পাতার এই বই সম্বন্ধে আমার যত উৎসাহই থাক, কোনো নিকট ভবিষ্যতে বইটির চেহারা দেখতে পাব বলে আশা করি না। কিন্তু গ্রন্থটি কয়েকটি কারণে খুবই উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত অসকার ওআইল্ড-এর পত্রগুচ্ছের এমন সুবৃহৎ সংকলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনি নি। পত্রের সংখ্যা প্রায় তেরোশো। প্রায় তিনশ' লোককে এই সব চিঠি লেখা হয়েছিল। জগতের বিভিন্ন দেশে তাঁদের বাস, তাঁদের কেউ ছোকরা ওআইল্ড-এর বন্ধু, কেউ বা ওআইল্ড-এর শেষের দুঃখময় দিনগুলির সুহৃৎ।

১৯৫৪ সাল থেকে রুপার্ট হার্ট-ডেভিস এই পত্র সঙ্কলনের কাজ আরম্ভ করেন এবং সাত আট বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সঙ্কলন শেষ করেছেন।

এই গ্রন্থে ১৮৮১ সালের অসকার ওআইল্ডকে দেখা যায়, যিনি রবার্ট ব্রাউনিংকে চিঠি লিখছেন এই বলে: আপনি কি আমার প্রথম কাব্য গ্রন্থটি পড়ে দেখবেন? বাল্যকাল থেকে আপনার কাব্য আমায় অশেষ আনন্দ দিয়েছে।

এই ধরনের আর একটি চিঠি আছে ম্যাথু আর্ণল্ডকে লেখা।

কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা অন্যত্র। যে অ্যালফ্রেড ডগলাস অসকার ওআইল্ড-এর জীবনে 'in some sense his inspiration and in every sense his evil genius' তাঁকে লেখা ওআইল্ড-এর সমস্ত চিঠিই পূর্ণাংশে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা হয়ত অনেকেই জানি না, জেলখানা থেকে ওআইল্ড ডগলাসকে যেসব চিঠি লিখে-ছিলেন, তার অংশ বিশেষ সংগ্রহ করে ১৯০৫ সালে De Profoundis নামে ওআইল্ড-র অন্যতম প্রধান গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছিল। রবার্ট রস এই সংগ্রহ ও সম্পাদনা কার্য করেছিলেন। ডি প্রফাউন্ডিস

গ্রন্থে কোথাও আলফ্রেড ডগলাসের উল্লেখ না থাকায় উভয়ের সম্পর্কের স্বচ্ছ বিশ্লেষণও অসাধ্য ছিল।

১৯০৯ সালে সম্পাদক রস এই পত্রগুচ্ছের পাণ্ডুলিপিগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দিয়ে যান। তাঁর শর্ত ছিল, ৫০ বছরের আগে কেউ এই পাণ্ডুলিপি দেখতে পাবে না। ১৯৫৯ সালের পর সেই শর্তের আয়ু শেষ হওয়ায় পত্রগুচ্ছের সম্পাদক রুপার্ট তাঁর গ্রন্থে এই পত্রের সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে পেরেছেন।

এই গ্রন্থে ওআইল্ড-এর শেষ দিকের একটি চিঠিতে (১৯০০ সালের ২০শে নভেম্বরে লেখা) ওআইল্ড ফ্রাংক হ্যারিসকে লিখেছেন, "তোমার কাছে আমি ১৫০ পাউন্ড পাই, আশা করি তুমি আমার পাওনা পাঠিয়ে দেবে।"

কাঁটার মুকুট না পরলে ওআইল্ডকে যেন মানাত না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অধঃপতন ও দুর্দশা লেখক ওআইল্ডকে কি কিছু কম চেনায়।

পুস্তক পরিচয়

বাংলা দেশের জেলা : হুগলীর ইতিহাস

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ : পরিবর্ধিত সংস্করণ : প্রথম খণ্ড : সুধীরকুমার মিত্র। মিত্রাণী প্রকাশন, কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

বাংলাদেশে জেলার ইতিহাস লেখার একটা ধারা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। কয়েকটি সুপরিচিত ইতিহাসও আছে বিভিন্ন জেলার, তার মধ্যে সুলিখিত হল যশোহর-খুলনার ইতিহাস, বিক্রমপুরের ইতিহাস, ঢাকার ইতিহাস, নদীয়ার ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, মেদিনীপুরের ইতিহাস ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকখানি বই আজ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু সেগুলির ইতিহাসমূল্য যাই থাকুক, শুধু উপকরণ-মূল্যের জন্য পুনর্মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হুগলী জেলারও ইতিহাস নিয়ে একাধিক বাংলা ও ইংরেজী বই রচিত হয়েছিল যা এখন পাওয়া যায় না। শ্রীসুধীরকুমার মিত্র তাঁর বইখানির দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত) সময়োপযোগী কাজ করেছেন এবং হুগলী জেলার ইতিহাসকে নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

'হুগলী জেলার ইতিহাস' বইখানির বিষয়বস্তু দেখলে ওম্যালির 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' ও শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত 'ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক'-এর কথা মনে পড়ে। অবশ্য 'গেজেটিয়ার' ও 'হ্যান্ডবুকের' তথ্য ও রচনা আরও অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও সুসংবদ্ধ। গেজেটিয়ার ও হ্যান্ডবুকের অনুরূপ পরিকল্পনায় বইখানির বিষয়বস্তু কিছুটা বিন্যস্ত। কিন্তু 'হ্যান্ডবুকের' মূল্য অত্যধিক এবং ওম্যালির গেজেটিয়ার দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া, এগুলি ইংরেজী ভাষায় লেখা। এইদিক থেকে বিচার করলে সুধীরবাবুর বই-এর উপযোগিতা আছে। বাংলা ভাষায় লেখা এইরকম একটি উপকরণবহুল হুগলী জেলার বিবরণের প্রয়োজন ছিল। কেবল হুগলীর কেন, আরও অন্যান্য জেলার অনুরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হলে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হবেন বলে মনে হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়গুলির বিন্যাস ও বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে : প্রথমে 'প্রাচীন রাঢ়দেশ' নাম দিয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে সাম্প্রতিক তথ্যপরিচয় দেওয়া হয়েছে—যেমন মিউনিসিপ্যালিটি লোকসংখ্যা, খালবিল, নদনদী, পথঘাট, জেলা পর্ষদের রাস্তা ইত্যাদি। রাঢ় অঞ্চলের ইতিহাস ভূতাত্ত্বিককাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছেও তা কম রোমাঞ্চকর নয়। এই ইতিহাসটুকু সবিস্তারে আলোচনা করার মতো উপকরণও আজ গবেষণার ফলে সহজলভ্য। হুগলী অঞ্চল যখন রাঢ়ের মর্মস্থলস্বরূপ তখন লেখক এ বিষয়ের আলোচনায় আরও একটু উদার হলে ভাল হত। আর "যাতায়াত ব্যবস্থা" নামে যখন একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় বইতে দেওয়া হয়েছে তখন "প্রাচীন রাঢ়দেশ" অধ্যায়ে জেলা পর্ষদের রাস্তার দীর্ঘ তালিকা পর্যন্ত সংযোজন করা অপ্রাসঙ্গিক তো বটেই, বেমানানও হয়েছে। এরকম বিসদৃশ প্রসঙ্গ-সমাবেশ 'প্রকৃতি পরিচয়', 'ভৌগোলিক অবস্থান', 'সামাজিক বিবরণ', 'শিক্ষা ব্যবস্থা', 'ব্যবসা-বাণিজ্য' প্রভৃতি অধ্যায়েও ঘটেছে। আর রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে কৃষিজাত ফসল, পণ্যদ্রব্য, স্কুল-কলেজ, বিখ্যাত লোকের নামধাম ইত্যাদির তালিকার স্তূপের তলায় প্রকৃত ইতিহাস-সংক্রান্ত বক্তব্য সাধারণ পাঠকের কাছে চাপা পড়ার

সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের তালিকা 'ইয়ারবুক' বা 'অ্যালমানাক' বা 'গাইডবুক'-এর পক্ষে ভাল, কিন্তু ইতিহাসগ্রন্থে এদের স্থান কোথায়?

'সামাজিক বিবরণ', 'শিক্ষা ব্যবস্থা' ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' অধ্যায় তিনটিতে লেখক সতীদাহ সম্বন্ধে স্থানীয় তথ্য, দাসত্বপ্রথার দৃষ্টান্ত ও দলিল, শ্রীরামপুরে ছাপা 'ধর্ম-পুস্তক' গ্রন্থের মুদ্রণকাল ইত্যাদি বিষয় কিছু কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন। পরিবেশনকালে বারংবার 'আবিষ্কার' কথাটির ব্যবহার শ্রুতিকটু লাগে। সামাজিক বিবরণের মধ্যে যে সব দেবদেবী ও উৎসব-পার্বণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা হুগলী জেলার পক্ষেও পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না। যেমন আরামবাগ অঞ্চলেই এমন সব বিচিত্র 'সিনি' দেবতা, বনদেবতা ও লোকদেবতা আছেন যাঁদের পরিচয় বা আলোচনা এ বইতে নেই, অথচ বাংলার লোকসংস্কৃতির মূল্যায়নে তার আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। আরামবাগ প্রসঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, রাঢ়দেশের ইতিহাসে আরামবাগ অঞ্চল সাংস্কৃতিক বিস্ময়, কিন্তু এই অঞ্চলের জনকৃতির আসল কোন পরিচয় আলোচ্য বইতে নেই। হুগলী জেলার 'শিক্ষা ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে লেখক প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে (বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি) যে আলোচনা করেছেন তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তার পরেই বিভিন্ন স্কুল-কলেজের তালিকা ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তা না করে অ্যাডাম মহেশ ন্যায়রত্নের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও টোল-চতুষ্পাঠীর রিপোর্ট থেকে যদি লেখক তথ্য সংগ্রহ করে দিতেন তাহলেও এদেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর অনেক বেশী আলোকপাত করা সম্ভব হত। 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' অধ্যায়টিতে হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত বহু পত্রিকার বিবরণ আছে, লেখকের নিজের সম্পাদিত পত্রিকারও। কিন্তু হুগলী জেলার ছড়া লোক-সংগীত ইত্যাদি নিয়ে যে বিপুল লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার রয়েছে সাহিত্যের বিবরণের মধ্যে তার অন্তত কিঞ্চিৎ পরিচয় যদি সংকলক দিতেন তাহলে ভাল হত।

অবশ্য এই ধরনের একটি খণ্ড বইতে যে-কোন একটি জেলার যাবতীয় বৃত্তান্ত ও তথ্য সংকলিত করা সম্ভব বলে মনে হয় না, এবং তা কোন একজন লেখকের পক্ষে বাস্তবিকই দুরূহ কাজ। লেখকের তথ্য-সংকলনের রীতি কতদূর 'ইতিহাস' পদবাচ্য তা নিয়ে বিলক্ষণ মতভেদেরও অবকাশ আছে। তা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর বিবরণপ্রধান জেলা-পরিচয়েরও পশ্চিমবঙ্গে আজ নানা কারণে প্রয়োজন আছে। লেখক সেই প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং তা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। ২৮৫।৬২

ধর্ম ও দর্শন

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন। প্রকাশক : শ্রীরাইমোহন আচার্য। সি-আই-টি বিল্ডিংস, ব্লক নং ৩, ফ্ল্যাট নং ৩২, কলিকাতা-১০। মূল্য তিনটাকা।

'দেশ' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক পরমভক্ত ও ধার্মিক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় ১৩৫৬ সালের ৫ই আষাঢ় আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের নিকটেই ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া যান এবং তাঁহার পা ট্রামের চাকার তলায় চলিয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর তাঁহার ডান পায়ের উপর পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কিন্তু এই শোকাবহ ঘটনার পরমাশ্চর্য বার্তা হইতেছে এই যে উক্ত সময়ে ও তাহার পরে তিনি বিশেষ কোন কষ্ট ভোগ করেন নি, বরং আনন্দে বিভোর হইয়া ছিলেন। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিস্থলে তাঁহার যে অনুভূতি হইয়াছিল তাহা তিনি এই পুস্তকে

বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহার জীবনে ধর্মের আদর্শকেও অতি আন্তরিক সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিয়াছেন।

দুর্ঘটনার সময়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, "ট্রাম হইতে পড়িয়া যাইবার পর দেখিতে পাই, চারিদিকে যেন একটা জ্যোতির তরঙ্গ খেলিতেছে: হঠাৎ অপূর্ব আলোক চতুর্দিকে ঝকমক করিয়া উঠিল এবং সেই আলোকের স্পর্শে আমার দেহ-মন যেন গোটা একটা পদ্ম-ফুলের মত দল মেলিয়া দিল। * * এই জ্যোতিঃ নৈর্ব্যক্তিক নহে, ইহাতে বর্ণে-গন্ধে ছন্দোময় বিগ্রহমূর্তির অভিব্যক্তি ছিল। জ্যোতিঃ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম সকলেই ভগবানের নাম-কীর্তন করিতেছে।"

এই অনুভূতি তাঁহার মূর্চ্ছার মধ্যে ঘটে নাই। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ চেতনা ছিল। তিনি লাইনের ধারে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। বহুলোক আসিয়া যে তাঁহার পা'টা ট্রামের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পায়ে হাত দিয়া দেখিয়াছিলেন, ডান পায়ের পাতাটি দু-ফাঁক হইয়া গিয়াছে। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে খবর দিতেও বলিয়াছিলেন।

ব্যাপারটি তাঁহার নিজের কাছেও বিস্ময়ের বস্তু। তিনি লিখিয়াছেন যে দুর্ঘটনাটি ঘটিবার সময় তাঁহার মনের মূলে বিপুল একটা আবর্ত উঠে এবং সেই আলোড়নের ভিতর দিয়া অপূর্ব জ্যোতির উন্মেষ হয়। ইহার পরবর্তী অবস্থাটি আরও আশ্চর্যজনক। "রূপের মধ্যে মূর্তির স্ফূর্তি অনুভব করিলাম, দেখিলাম সেই মূর্তির মধ্যে সবই রূপময়। অঙ্গের বিভঙ্গিতে রসের তরঙ্গে প্রাণধারা ছুটিতেছে এবং সেই প্রাণক্রিয়া বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নাই এবং কোন ক্রিয়া সে লীলা-রসের সম্পর্ক বিবর্জিত নহে। * * এসব অনুভূতিকে ছাড়াইয়া একটা ঝঙ্কার চারিদিকে বাজিতেছিল।"

সাধনপথে বঙ্কিমবাবু ভক্তি ও নাম-এ বিশ্বাসী। অনাড়ম্বর জীবনে সরল ঐকান্তিকতার সঙ্গে তিনি এই দুইটিতে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন।

ভূমিকায় শ্রীদিলীপকুমার রায় বলিয়াছেন, "প্রার্থনা করি সেনমহাশয় যেন তাঁর ধন্য জীবনের পুণ্য স্পর্শে বহু অধন্যকে দীক্ষা দিয়ে এ নাস্তিক্যের যুগে আস্তিক্যের পরম বাণী ঝংকারিত করে তুলতে পারেন তাঁর ভক্তি-প্রেমের কীর্তন মাধুর্যে।"

এই ভক্তি ও নামগানের ভিতর দিয়া লেখক কিভাবে তাঁহার সত্তাকে দিব্য করিয়া তুলিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিবরণ আছে আলোচ্য পুস্তকটিতে। অধ্যাত্ম-সন্ধানীরা যে পুস্তকটি পাঠ করিয়া শুধু আনন্দ নয়, পথেরও সন্ধান পাইবেন এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। পুস্তকটিতে পাণ্ডিত্যের দম্ভ ও আড়ম্বর নাই, জন-চিত্তের কাছে এক ভক্তচিত্তের নিজ অনুভূতি আর বিশ্বাসের নিবেদন প্রাণের সহজ ভাষায়। এ নিবেদন সূর্যালোকের মতই সকলের চিত্ত আলোকিত করিয়া তুলিবে।

১।৬২

রঙ্গজগৎ

অন্যতম সংকট

অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়—এমন ঘটনা তো ঘটেই। প্রতি বছরেই কয়েকটি করে ঘটে। কিন্তু অর্থের অভাব নেই, চিত্রপরিবেশকের দাক্ষিণ্যও বিদ্যমান অথচ ছবির কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং তা'ও ছোট-খাটো সাধারণ ছবি নয়, বড় ছবি—এমন অঘটন সম্প্রতিকালে বাংলা ছায়াছবির জগতে ঘটতে শুরু করেছে। একটি বড় ছবির পরিকল্পনা রূপ নিতে চলেছে এবং চিত্রামোদীরাও বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন—ঠিক এমনি সময়েই জানা গেল যে অনিবার্য কারণে ছবির কাজ বন্ধ আছে। এ রকম দুঃসংবাদে একালের চিত্রামোদীরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

যেসব উল্লেখযোগ্য চিত্রপ্রয়াস এই ভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়, সেগুলি বাস্তব রূপ নিলে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প হয়ত লাভবান হত, বাংলা ছবির মান বাড়ত। কিন্তু এই সৌভাগ্য থেকে ইদানীংকালে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প কয়েকবারই বঞ্চিত হয়েছে। এই ক্ষতি ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র চলচ্চিত্রশিল্পের।

অর্থ বা উৎসাহের অভাব যেখানে নেই, ছবির কাজ সেক্ষেত্রে কেন বন্ধ হয় তা কৌতূহলের উদ্রেক করে বৈকি। এবং অনিবার্য কারণে ছবির কাজ বন্ধ হয়েছে কি না তা নিয়েও সংশয় জাগে। এই অনুকূল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ করে কীভাবে যে প্রতিকূল ঘটনার উদ্ভব ঘটে তা জানার উপায় নেই। কারণটি রহস্যাবৃত হয়েই থাকে।

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের কল্যাণের জন্য এই রহস্যের উদ্ঘাটন এবং অবসান প্রয়োজন। বাংলা ছবির এক অন্যতম সংকট এই রহস্য। এর জন্য শিল্পগত ও ব্যবসায়গতভাবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ছবির সংকটের কারণ নির্ণয়ের জন্য যে তদন্ত কমিটি স্থাপনের আয়োজন করছেন, সে কমিটি এই রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারেও সচেষ্ট হবেন বলে আমরা আশা করি। কেন এমনিভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ চিত্রপ্রয়াস অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং এর প্রতিকারের উপায় কী, তা নিয়ে বিশদভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এমকেজি'র "রক্তপলাশ" ছবিতে শিশুশিল্পী বাসুদেব

বাস্তবের তিক্ত অভিজ্ঞতা

[নতুন যাঁরা ছবি তৈরী করতে আসেন তাঁদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এবং সেই সঙ্গে তাঁরা অর্জন করেন বিচিত্র অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা। নবাগত চিত্র-পরিচালকের এই সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথাই বলছেন অজিত লাহিড়ী। তরুণ কলাকুশলী শ্রীলাহিড়ী "চিত্ররথ" গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য—যাঁরা সম্প্রতি ফিল্ম এজ প্রযোজিত "কুমারী মন" ছবিটি পরিচালনা করেছেন।]

অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে একদিন আর সে উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছি না। ভবিষ্যতে আর ছবি তৈরি করব কি না তাও বলতে পারছি না।

"আমরা সহকর্মীরা মিলে গড়ে তুলেছিলাম চিত্ররথ গোষ্ঠী। পীযূষ গঙ্গো-

অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত ফিল্ম ক্র্যাফট প্রাইভেট লিঃ-এর 'বেনারসী' ছবির নাম-ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অভিযাত্রিক-এর "অভিযান" ছবির একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রায়

পাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, রমেশ সেন ও দীলিপ মুখোপাধ্যায় (আলোকচিত্রশিল্পী) এই গোষ্ঠীভুক্ত। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বের ভার পীযূষবাবুর ওপর ন্যস্ত। আমরা বিশ্বাস করি, চলচ্চিত্রের সব বিভাগের কাজ সম্পর্কে চিত্রপরিচালকের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার সহকর্মীরা বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ। অভিজ্ঞ কলাকুশলীগোষ্ঠীকে পেলে চিত্র-ব্যবসায়ীরাও ছবি তৈরির কাজে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আমাদের ওপর তাই আস্থা রেখেছিলেন মিতালী ফিল্মস পরিবেশক-সংস্থা।

কিন্তু অনেক সময় ভেবেছি, শিল্পীদের পরিপূর্ণ আস্থা বোধ হয় আমরা অর্জন করতে পারিনি। শিল্পীদের পুরোপুরি সহযোগিতা যদি না পেতাম তবে হয়ত আমরা ছবি শেষ করতে পারতাম না। এ-সত্যটি আমাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত। কিন্তু চিত্রপরিচালকের ওপর শিল্পীদের যে বিশ্বাস রাখা উচিত এবং যে বিশ্বাস না থাকলে তাঁদের ছবিতে কাজ করতে আসা উচিত নয়, সে বিশ্বাসও মনে হয় আমরা শেষ পর্যন্ত অর্জন করতে পারিনি। সুন্দরবন অঞ্চলে, ঝড়ে-বৃষ্টিতে, জলে-জঙ্গলে বিপদ তুচ্ছ করে অভিনয় করতে যাঁদের দেখেছি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পরে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি। জীবনে প্রথম স্বাধীনভাবে ছবি তৈরির কাজটি আমাদের কাছে ছিল জীবন-মরণ-সংগ্রামের মত। এই সংগ্রামে যাঁদের ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলাম তাঁরাই যখন পিছিয়ে পড়তে চাইলেন তখন স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতাবশত তাঁদের প্রতি রূক্ষ্ম ব্যবহার করেছি। পরে জনে জনে তাঁদের কাছে গিয়ে বলেছি, হ্যাঁ আমরাই হেরে গেলাম। আপনাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি। তাঁরা তো শিল্পীর মত বলতে পারলেন না, আমরাও হেরে গেছি। পরিচালকের ওপর আস্থা রাখতে পারিনি।

"ছবি তৈরী করতে এসে অসুন্দরকে দেখেছি দু চোখ মেলে। দুঃখ পেয়েছি, লজ্জিত হয়েছি যখন দেখলাম আমাদের যাঁরা পূর্বসূরী—চিত্রপরিচালনার কাজে যাঁরা সুপরিচিত—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের আন্তরিক পরিশ্রমকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখছেন, বাঁকা চোখে আমাদের কাজের সমালোচনা করছেন। কেননা, আমরা যে নবাগত।

"ছবি তৈরী হওয়ার আগেই জনৈক চিত্র-সাংবাদিকের অন্যায় আক্রমণ আমাদের সইতে হয়েছে। ছবি তৈরীর কাজে নাকি অনভিজ্ঞ আমরা। আমরা নাকি কাজ পন্ড করতেই জানি। কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকদের আমি শ্রদ্ধা করি। ভিন্ন-ধর্মী, "এক্সপেরিমেন্টাল" ছবিকে তাঁরা বরাবর ওপরে স্থান দিয়েছেন। "অযান্ত্রিক"-এর মত এক্সপেরিমেন্টাল ছবিকে (আমার ব্যক্তিগত মতে যা প্রথম বাংলা এক্সপেরিমেন্টাল ছবি) তাঁরা প্রাণ খুলে প্রশংসা করেছেন। আবার যখন দেখেছি, শুনেছি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিত্রনির্মাতাদের অসম্মান-জনক অনুরোধ তাঁরা অনেক সময় উপেক্ষা করতে পারেননি তখন দুঃখ পেয়েছি। চিত্রসাংবাদিকরা চলচ্চিত্রশিল্পকে কল্যাণের পথে চালাবেন—এই বিশ্বাসই আমি রাখি। তাঁরা এই নেতৃত্বের অধিকারী

"ছবির জগতে এসে দেখেছি এক ধরনের সামন্ত-মানসিকতার আধিপত্য। বিশেষ কোন সুবিধা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ ব্যক্তির যেন বিধিদত্ত অধিকার। আউট-ডোরে যাবার সময় কেউ যাচ্ছেন ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় চড়ে কেউ বা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। স্টুডিওতে লাঞ্চে কারো জন্য হয়ত চৌরঙ্গীর বড় হোটেল থেকে খাবার এসেছে, আবার কারোর জন্য বরাদ্দ রয়েছে স্টুডিওর ক্যান্টিনের শুকনো বাসি রুটি।

"স্টার-সিস্টেমকে আমরা নিন্দা করি। স্টার মোটা অংকের পারিশ্রমিক নেন। কিন্তু আমি তো দেখেছি, একজন বড় চিত্রপরিচালক এবং তাঁর সহকারী ও অন্যান্য কলাকুশলী-দের পারিশ্রমিকের অংকের মধ্যে কত পার্থক্য। শুধু কি স্টারই ব্ল্যাকে টাকা নেন, আর কেউ নয়?

"ছবি তৈরীর প্রথম অভিজ্ঞতা এমনি-ভাবেই আমাকে নিরাশ করেছে। আমি জানি, অপরিচিত আরও এমন প্রতিভাবান তরুণ কলাকুশলী রয়েছেন আমাদের মধ্যে যাঁরা আত্মবিকাশের পথ খুঁজছেন, সহজে পাচ্ছেন না। তাঁরা এই জগতে এসে কী পাবেন যদি এই প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটে?

"বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প এখন সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত সংকট যে কোথায় তা হয়ত আমরা আজও বুঝতে পারিনি। চিত্রজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনুষ্যত্বের যে অপচয় দিনে দিনে তিলে তিলে জমা হয়ে উঠেছে তার জগদ্দল বোঝার চাপে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প আজ নিষ্পিষ্ট। সংকট মোচনের সাধনা তাই প্রথমে শুরু হওয়া উচিত ভেতরের জগতে, বাইরে নয়।

"চিত্রজগতে এসে যা পেয়েছি তার মধ্যে মাধুর্যের ছোঁওয়া কিছুমাত্র নেই তা বলব না। দরদী, সৎলোক আজও আছেন এ

জগতে। তাঁদের কাছে সহানুভূতি পেয়েছি, সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু সবাই কেন তাঁদের মত হয় না? তা হলে তো কোন সংকট থাকত না। জানি সবাই একরকম হয় না। কিন্তু সুন্দর একটি চিত্রজগত গড়ে তোলার প্রচেষ্টাই বা কই?

"এমন এক চিত্রজগতের স্বপ্ন আমি দেখি যেখনে প্রত্যেক শিল্পী অথবা কলাকুশলী আত্মবিকাশের পথটি খুঁজে পাবেন। মানুষের লোভ ও স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে দমিয়ে রাখবে না। সুন্দরের সৃষ্টিই শিল্পের লক্ষ্য। এই শিল্প যে পরিবেশে জন্ম নেবে তাও সুন্দর হবে।

"কলাকুশলীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা আমি জানি। নতুন যাঁরা ছবি করতে আসেন তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তো এই বললাম। এই সব কিছু দূর করতে হলে চাই এমন এক সংস্থা যার মধ্যে থাকবেন কলাকুশলী শিল্পী ও চিত্র-সাংবাদিক। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত এই সংস্থা (সকল দল এসে যার মধ্যে মিশবে) চলচ্চিত্রশিল্প জগতকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে পরিচালনা করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এমনি ধরনের এক সংস্থার (যা হবে সত্যিকারের "জয়েন্ট ওয়েলফেয়ার" সংস্থা) নিঃস্বার্থ সংগ্রামের ভেতর দিয়েই আসবে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব—যা ঘুণধরা এই চিত্রজগতকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করে তুলবে। এই নতুন চিত্রজগতের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

* শুভমুক্তি *

ফিল্ম ক্র্যাফট (প্রাঃ) লিঃ প্রযোজিত বেনারসী ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। সত্যজিৎ রায়ের প্রাক্তন সহকারী অরূপ গুহ-ঠাকুরতা ছবিটি পরিচালনা করেছেন। বিমল মিত্রের একটি ভিন্নধর্মী কাহিনী এই ছবির আখ্যান-অবলম্বন। রুমা গুহ-ঠাকুরতা ছবির নাম-ভূমিকার শিল্পী। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনা এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ। আলী আকবর খান ছবির সংগীত-পরিচালক।

তুফানী টার্জন (নবশক্তি ফিল্মস) নামে একটি হিন্দী ছবি এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। আজাদ ও শান্তাকুমারী ছবির নায়ক-নায়িকা। এ আর জমিন্দার ছবির পরিচালক। সংগীত-পরিচালনা করেছেন কেবাল।

চিত্ররথ পরিচালিত ফিল্ম এজ'এর "কুমারী মন" ছবির একটি বহির্দৃশ্য ফটো—দেশ

* চিত্র-সমালোচনা *

ক্রাইম ছবিতে প্রণয়-প্রাধান্য

"বিশ সাল বাদ" (গীতাঞ্জলি পিকচার্স) চিত্রপ্রযোজক হেমন্তকুমারের দ্বিতীয় চিত্রোপহার। তাঁর প্রথম ছবি "নীল আকাশের নীচে" তৈরি হয়েছিল কলকাতায়। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সংকটমোচনের জন্য যখন কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরির উদ্যোগ-আয়োজন চলছে তখন হেমন্তকুমার কেন "বিশ সাল বাদ" তৈরি করার জন্য বোম্বাই ছুটলেন তা-নিয়ে এখানকার চলচ্চিত্রসেবী-দের মনে অভিমান ও অভিযোগের সুর বেজে উঠতে পারে। "বিশ সাল বাদ" অনায়াসেই কলকাতায় তৈরি হতে পারত। ছবির নায়ক ও পরিচালক বাঙালী—তাঁরা বাংলারই শিল্পী ও কলাকুশলী। ছবির অবাঙালী নায়িকা অল্পদিন আগেও এখানে এসে একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করে গেছেন। এখানকার চিত্রপরিবেশকের আনুকূল্যও পেয়েছেন চিত্রপ্রযোজক হেমন্তকুমার। বাংলা চিত্রজগত হেমন্তকুমারের প্রধান কর্মক্ষেত্র (বিশেষ করে সংগীত-পরিচালক এবং নেপথ্যকণ্ঠশিল্পী হিসাবে)। তবে কেন এই অকারণ বোম্বাই-মোহ? হেমন্তকুমার তাঁর পরবর্তী হিন্দী ছবি কলকাতায় তৈরী করবেন আমরা এই আশা করি।

তা-ছাড়া "বিশ সাল বাদ" জনপ্রিয় বাংলা ক্রাইম ছবি "জিঘাংসা" অবলম্বনে তৈরি। "জিঘাংসা" আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে কলকাতায় তৈরী হয়েছিল। "জিঘাংসা"র স্মৃতি বাঙালী দর্শকদের মন থেকে আজও মুছে যায়নি। "জিঘাংসা" যাঁরা দেখেছেন, ক্রাইম ছবি হিসাবে "বিশ সাল বাদ" তাঁদের তৃপ্তি দিতে অক্ষম। বোম্বাই-এর চাকচিক্য ও আড়ম্বর ছবিটিকে এই ব্যর্থতা থেকে বাঁচাতে পারেনি।

একটি ইংরেজী ক্রাইম-কাহিনী থেকে "জিঘাংসা"র উপাখ্যান আহরণ করা হয়েছিল। "বিশ সাল বাদ"-এ এই কাহিনীরই রূপান্তর ঘটেছে। রূপান্তরের পথে যা হারিয়ে গেছে তা হলঃ কাহিনীর রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ ও রহস্য। রোমাঞ্চ ও রহস্যের যে উপাদান ছবিটিতে রয়েছে তা দর্শকদের মনকে সত্রাস কৌতূহলে আবিষ্ট করে রাখতে পারে না। এই অক্ষমতার মূল কারণঃ "রোমান্টিক ড্রামা"কে এই ছবিতে অতিমাত্রায়

প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং হিন্দী ছবিতে রোমান্স-এর যে রূপ ও রসটি সাধারণত অনুসরণ করা হয়ে থাকে, এই ছবিতে তা নিখুঁতভাবে বিদ্যমান। নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা ও উভয়ের মনে পূর্বরাগ সঞ্চারের জন্য হিন্দীচিত্রে যে উদ্ভট ঘটনার প্রয়োজন হয়, এই ছবিতে তা সযত্নে সন্নিবিষ্ট। তারপর অনুরাগের পর্বে অঙ্গভঙ্গি-সহকারে নায়ক-নায়িকার গান ও এই নৃত্য-গীতের পরমুহূর্তেই জল-প্রপাত ও সারি সারি ফুল গাছের দৃশ্য, এবং নাট্য-উপাদান হিসাবে উভয়ের মিলনের পথে একপক্ষের অভিভাবকের (এ-ছবিতে নায়িকার) বাধা ও নায়িকার অশ্রু বিসর্জনের পর বাধার অবসান—ইত্যাদি গতানুগতিক পারিস্থিতি ছবিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে। ফলে ছবির ক্রাইম উপাদান হয়ে পড়েছে গৌণ। যে রহস্যময়ী নারীমূর্তি ও তার অন্ধকার রাত্রির গানকে কেন্দ্র করে মূল ক্রাইম-কাহিনীর "সাসপেন্স" দানা বেঁধে ওঠবার কথা, এই ছবিতে সে নারীমূর্তি অতিমাত্রায় শরীরী, এবং দর্শকের মনে রহস্যবোধের সঞ্চার করে না। পরে জানা যায়, এই নারী নায়কেরই প্রেমিকা। যে প্রেমিকা তার প্রিয়তমের প্রাণনাশের আশঙ্কায় সদা ম্রিয়মান, সে কেন রাতের অন্ধকারে করুণস্বরে গান গেয়ে তার প্রেমিককে রহস্যময় বিপদসঙ্কুল জলার কাছে টেনে নিয়ে আসে তার সপক্ষে ছবির যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। চিত্রকাহিনীর যুক্তি হল: রাত সাড়ে ন'টায় নায়ক যাতে জলার কাছে না যায় সে কারণেই নায়িকা গান গাইত, নায়ককে পথ ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু গান শুনে নায়ককে বার বার জলার কাছেই যেতে দেখা গেছে এবং সেখানে একবার তাকে হত্যা করার চেষ্টাও করা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে অন্যালোক নিহত হয়েছে। এর পরেও নায়িকা কেন এই বিপজ্জনক গান গাইবে?

আসল কথা, রোমাণ্টিক নাটককে প্রাধান্য দিতে গিয়েই চিত্রকার এই গোলযোগে পড়েছেন। সাসপেন্স-এর প্রয়োজনে জলার রহস্যময়ী গীতরতা নারীমূর্তিও রাখা চাই। আবার তাকে মূল কাহিনী অনুযায়ী দুর্বৃত্তের বন্দিনী নারী হিসাবেও ছবিতে রাখা চলবে না। রোমাণ্টিক নাটকের প্রয়োজনে তাকে নায়কের প্রেয়সী হতে হবে এবং ক্রাইম নাটকের সাসপেন্স-এর প্রয়োজনে তাকে গিয়ে জলার কাছে গান গাইতে হবে। এই উভয়-সংকট দেখা দিয়েছে বলেই ছবিতে গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এমনি অবিশ্বাস্য ঘটনা ও পরিস্থিতি ছবিতে আরও একাধিক রয়েছে। এবং ছবিতে একজন ক্লাউনসদৃশ ডিটেকটিভ-এর কৌতুক বার বার পীড়া দিয়েছে।

তবে রোমাণ্টিক ছবি হিসাবে "বিশ সাল বাদ" উপভোগ্য। হিন্দী ছবির যাঁরা নিয়মিত দর্শক, তাঁদের কাছে এই ছবির আবেদন অনস্বীকার্য। আমোদ-উপকরণ ছবিতে অনেক রয়েছে—অবশ্য ছবির রোমাণ্টিক অংশে। পরিচালক বীরেন নাগ হিন্দী ছবির সর্বভারতীয় দর্শকদের মানসিকতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে পরিচ্ছন্ন প্রয়োগ-কর্মের পরিচয় দিয়েছেন ছবিতে। ছবিটিকে আঙ্গিক সৌষ্ঠবে বিশিষ্ট করে তোলার কাজেও তিনি শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কৃতকার্যতার প্রমাণ আরও পাওয়া গেছে কয়েকটি আমুদে রোমাণ্টিক মুহূর্ত রচনায়।

ছবির প্রধান আকর্ষণ প্রযোজক হেমন্ত-কুমারের মনমাতানো সুরসৃষ্টি। ছবির গানগুলি সুরের মাধুর্যে মনে দোলা দেয়। পরিবেশানুগ আবহ-সুরসৃষ্টিতেও সুরকার কল্পনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

নায়িকার চরিত্রে ওয়াহীদা রেহমানের প্রাণোজ্জ্বল ও সংবেদনশীল অভিনয় ছবিটিকে খুবই চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। তাঁর প্রণয়ের অভিব্যক্তি মধুর।

নায়কের ভূমিকায় বিশ্বজিতের অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও চরিত্রোচিত। হাবে-ভাবে ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে হিন্দী ছবির বাঞ্ছিত নায়কের মতই তিনি এ-ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর হিন্দী উচ্চারণ প্রায় নিখুঁত।

ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মনোমোহন, কৃষ, সজ্জন, মদনপুরী, দেবীকিষণ ও অসিত সেন।

রাত্রির দৃশ্যে রহস্যময় পরিবেশ রচনায় এ-ছবির আলোকচিত্রগ্রহণ আরও সুষ্ঠু হতে পারত। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ—বিশেষত সম্পাদনা খুবই সন্তোষজনক।

* ছবির পর ছবি *

অভিযান

বহুজনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী সপ্তাহে আসছে সত্যজিৎ রায়ের "অভিযান" (অভিযাত্রিক প্রযোজিত)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী এই ছবির অবলম্বন।

ভিন্নধর্মী পরিবেশে বিচিত্র অথচ বাস্তব কয়েকটি চরিত্রকে সত্যজিৎ রায় এবার নিয়ে আসছেন তাঁর এই ছবিতে। তাদের জীবনের বাসনা ও বিভ্রম, প্রেম ও প্রতারণা সত্যজিৎ রায় রচিত চিত্রনাট্যের মূলে উপজীব্য। ওয়াহীদা রেহমান ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন রুমা গুহঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চারুপ্রকাশ ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পী। ছবির সুরসৃষ্টির দায়িত্ব সত্যজিৎ রায় নিজেই সম্পাদন করেছেন।

কুমারী মন

ফিল্ম এক্স'এর "কুমারী মন" ছবিটি অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করছে। চিত্ররথ-গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। কণিকা মজুমদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ছবির প্রধান শিল্পী। ছবিটির বেশীর ভাগ দৃশ্য সুন্দরবন অঞ্চলে গৃহীত। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছবির সংগীত পরিচালক। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী ছবির আখ্যান অবলম্বন।

এস সি প্রোডাকসন-এর "শুভদৃষ্টি" (পরিচালনা: চিত্ত বসু) ছবির একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়

দর্শকের রায়

বাংলা ছবি ও আমি

আশ্রমবাসিনী হলাম

চলচ্চিত্র আমার জীবনের মোড়টাই ফিরিয়ে দিয়েছে, আর তা এমন একদিকে যা চলচ্চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। অর্থাৎ আশ্রম। কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে বলি।

আমার বিয়ের পর প্রথম স্বামীর সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম প্রিয় তারকা অড্রে হেপবার্নের "দি নানস স্টোরি"।

তারপর একদিন আমার জীবনে এল বিপর্যয়। অনিবার্যকে মেনে নিয়ে সেদিন আমি সমাজ, সম্পদ, স্বামী, সুখ সবকিছু পরিত্যাগ করে চলে গেলাম পণ্ডিচেরীতে, শ্রীমার আশীর্বাদ নিয়ে তারপর এই আশ্রমে। ভুললাম আজন্মের শত অভ্যাস সহস্র স্বাচ্ছন্দ্য। এমন এক জীবন যাপন করতে লাগলাম যা পূর্বাশ্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত বললেও হয়। মাঝে মাঝে ভাবি যখন অবাক হয়ে যাই, জীবনে বিপর্যয় এসেই থাকে, কিন্তু সবার আগে এই জীবনটাই আমার চোখে পড়ল কেন, আশ্রমিক জীবন যাপন করতে সংকল্প ক'রে বসলাম কেন? আরও তো কত পথ ছিল।

আমার বিশ্বাস, আমার ব্যক্তিগত জীবনের এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী সেই ব্যক্তিটি, যিনি "দি নানস স্টোরি"র "নান" আর আমার প্রিয় তারকা। তাঁরই অলক্ষ্য নির্দেশের অদৃশ্য প্রভাবে এই পরিবর্তন আমার জীবন ঘনিয়ে এল। আজ দীর্ঘ তেরো মাস একটি ছবিও দেখতে যাইনি। এতে সিনেমার কতখানি ক্ষতি হয়েছে বলতে পারব না। আমার কিন্তু লাভ হয়েছে। জীবনে একক স্বার্থকে বহুতে ছড়িয়ে দিয়ে আমি সত্যই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি।

রত্না রায়
অভয় আশ্রম
মেদিনীপুর।

অসীম পালের পরিচালনায় নির্মীয়মান "দুই বাড়ি" (চিত্রালয়) ছবির একটি দৃশ্যে তন্দ্রা বর্মণ ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

পথ খুঁজে পেয়েছি

পড়াশুনা শেষ করার পর কি বৃত্তি আমি গ্রহণ করবো এই নিয়ে আমার মধ্যে একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমি যখন এই রকম একটা মানসিক অস্বস্তিতে রয়েছি ঠিক সেই সময়ে 'হেডমাস্টার' ছবিটি আমি দেখি এবং বলা বাহুল্য অভিভূত হই। হেডমাস্টার তাঁর ছোট ছোট ছাত্রগুলিকে পড়াতে বসেছেন এবং লণ্ঠনে তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় স্ত্রীকে বলছেন তেল দিতে। হেড-মাস্টারের স্ত্রী বিরক্তি সহকারে বলছেন যে রোজ রোজ তিনি তেল যোগাতে পারবেন না। তখন হেডমাস্টার মৃদু হেসে বলছেন —'আরে আজ তেল যোগালে তবে তো কাল আলো পাবে। আমরা যদি তেল না যোগাই তবে ভবিষ্যতে এরা আলো দেবে কি করে?' আমার পথ খুঁজে পেতে আর অসুবিধা হয়নি। আমি শিক্ষকতাকে বৃত্তি এবং ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমার সাধ্যমত ভবিষ্যতের আলোর আশায় তেল যুগিয়ে চলেছি।

অমিত রায়
রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম
রহড়া।

"বধূ" আত্মহত্যা করতে দেয়নি

প্রথমে আমার বিশ্বাস ছিল যে যারা অশিক্ষিতা, কালো, যাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্যতা নেই, তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। সমাজে শুধু তারা আবর্জনাস্বরূপ। এই ভেবে আত্মহত্যা করবো বলে ঠিক করেছিলুম, কিন্তু "বধূ" চিত্র আমাকে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে এবং বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মধ্যমগ্রাম, বর্ধমান

দিদিকে জানতে পারলাম

রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকলেও সে আমার দিদি। অত্যন্ত স্বার্থপরের মত তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। বাঁধা পড়েছিলাম তাঁর স্নেহের নাগপাশে। ভালো লাগতো কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে তাঁর বৈধব্যের আচার অনুষ্ঠান। সহসা আমাদের মাঝখানে এল একজন নতুন মানুষ। আমার মনে হতো আমাকে পড়ানোটা ভদ্রলোকের ছল। অল্পক্ষণের জন্য হলেও দিদির সঙ্গলাভই তার উদ্দেশ্য।...ক্ষুন্ন হলাম। দুঃখ পেলাম। অসহ্য লাগছিলো। এড়িয়ে চলতে লাগলাম দিদিকে। কোন এক সন্ধ্যায় কোন এক চিত্রগৃহে।...পেরাম্বু-লেটারে একমাত্র অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে চলেছেন তার বিধবা মা। নিয়ে চলেছেন তাঁর প্রথম জীবনের দয়িতের কাছে।... তাঁর প্রেমাস্পদ তখন ডাক্তার।...শুরু হল কঠিন সাধনা।...অনুভূতির গভীরতায় উভয়েই মূক...অন্তরে তাঁদের মুখরতা। গভীর বেদনার গভীরতর অভিব্যক্তি। প্রেমের তুলনাহীন সংযত প্রকাশ। "ক্ষণিকের অতিথি" এই-ভাবে আমাকে স্পর্শ করলো। মনটা ভরে গেল এক অদ্ভুত সহানুভূতি আর মমতায়।... আমার সংকীর্ণতা আমাকে লজ্জা দিল। ...ঘরে ফিরে প্রণাম করলাম দিদিকে॥

সুব্রতা বন্দ্যোপাধ্যায়
হায়দরাবাদ—২৮।

যে ছবি ভালবাসি

বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে প্রোজ্জ্বল, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত ছবি আমার ভালো লাগে। কাহিনীকে মুখ্য মনে করিনা। বরঞ্চ তা কীভাবে পরিবেশন করা হলো, তাছাড়া স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয় অভিনয়কে আমি গুরুত্ব দিই। সামান্য একটি ঘটনাও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে, কি অভিনয়গুণে আমাকে মুগ্ধ রাখে। সুষ্ঠু পরিণতিতে আস্থাশীল আমি। পরিণতি স্পষ্ট কি প্রচ্ছন্ন এতে কিছু যায় আসেনা॥

শঙ্করকুমার দত্ত
বিশ্রামগঞ্জ, ত্রিপুরা।

যে ছবি বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত, যে ছবি শৈল্পিক রূপেও বিষয়বস্তুতে সর্বতো-ভাবে আধুনিক, যা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যাকে মূর্ত করার প্রচেষ্টায় রচিত এবং যা আশাবাদী পরিণতিতে সমাপ্ত সে সব ছবি দেখতে আমার ভাল লাগে।

সুনীত সেনগুপ্ত
কলকাতা—২৯।

যে গল্পে কবিতার সুর আছে তেমন গল্প নিয়ে ছায়াচিত্র হলে দেখতে খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে গ্রাম্য পরিবেশে তোলা গাঁয়ের মানুষের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কাহিনী নিয়ে গড়া তিনকন্যা, পথের পাঁচালী, দেবী, নতুন ফসল, ডাকহরকরার মতন ভাল লেখকের ভাল গল্পের সুরুচি-পূর্ণ ছায়াচিত্র আমি পছন্দ করি।

অজিতেন্দ্র সিংহ
নিউদিল্লী—৩।

* সাংস্কৃতিকী *

ওস্তাদ এনায়েত খাঁ-সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ ইমরাত খাঁ একটি নতুন সেতার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই শিক্ষায়তনের নাম রাখা হয়েছে : সিতার একাডেমি অব মিউজিক (২৫।১, মেহের আলি লেন)। গত ৪ই সেপ্টেম্বর এই

নৃত্যের বশে
সুন্দর হল

শিল্প-ভারতী প্রোডাকসন-এর "বর্ণচোরা" (পরিচালনায়: অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

সরকার প্রোডাকসন্স-নিউ থিয়েটার্স এক্জিবিটার্স-এর "নির্জন সৈকতে" (পরিচালনাঃ তপন সিংহ) ছবির নায়ক-নায়িকা অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর।
ফটো—দেশ

শিক্ষায়তনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন যথাক্রমে তানসেন পাণ্ডে ও মুস্তাক আলি খাঁ। সংগীতের আসরে অংশ নিয়েছিলেন রাধিকামোহন মৈত্র, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইমরাত খাঁ।

কলিকাতার উদয় শিল্পী সংস্থার শিল্পীরা গত ৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি-ভবনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ৭৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে আটখানি ভক্তি-মূলক রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শশাঙ্ক সোম, অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নীলিমা মুখোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধা চক্রবর্তী প্রভৃতি।

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আশুতোষ কলেজ হলে দক্ষিণীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে ভাষণ দেবেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার। শ্রীসুনীলকুমার রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্র-সংগীতের একটি অনুষ্ঠান উৎসবে পরিবেশিত হবে।

বোম্বাই সমাচার

প্রযোজক পরিচালক সুবোধ মুখার্জি'র এপ্রিল ফুল ছবিটির কাজ শুরু হয়েছে গত সপ্তাহে। বিশ্বজিৎ ও সায়রা বানু ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন। শঙ্কর-জয়কিষণ এই ছবির সংগীত-পরিচালক।

ফিল্ম ফ্রেণ্ডস-এর দ্বিতীয় ছবিটির পরিচালকরূপে ফণী মজুমদার চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। [illegible] ছবির কাজ আরম্ভ হবে।

প্রযোজক-পরিচালক সদাশিব রাও কবির বেগানা ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য সুপ্রিয়া চৌধুরী সম্প্রতি বোম্বাই গিয়েছিলেন। কিশোরকুমারের "দূর গগন কি ছাঁও মে" ছবিটিতেও শ্রীমতী চৌধুরী নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন।

রোম, ভেনিস, জেনিভা, প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি শহরে সঙ্গম ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে প্রযোজক-পরিচালক রাজ কাপুর তাঁর ইউনিট সহ গত সপ্তাহে বোম্বাই ফিরে এসেছেন। সংবাদে প্রকাশ, বিদেশীরা ছবির দৃশ্য গ্রহণের সময় রাজপথে ভিড় করে এসে দাঁড়াতেন। বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্রকুমার এবং রাজকাপুর ওই সব দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেন। শুটিং চলাকালে সাদা শাড়ি পরিহিতা বৈজয়ন্তীমালা বিদেশীদের কৌতূহলের উদ্রেক করেন বলে প্রকাশ। বোম্বাই-এ ফিরে রাজকাপুর বলেছেন, চিত্রনির্মাতা হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। বিদেশে "সঙ্গম" ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে বলে রাজকাপুর আশা প্রকাশ করেন।

পৃথ্বীরাজ কাপুরকে অনেকদিন পর একটি ঐতিহাসিক ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটির নাম "জায়েঙ্গে কাহা।" গত সপ্তাহে ছবিটির কাজ শুরু হয়েছে। মালা সিংহ ভারতভূষণ ও শশীকলা ছবির অন্য তিন প্রধান শিল্পী। বিনোদ ছবিটির পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করছেন মদনমোহন।

"সাঁঝ ঔর সবেরা" ছবির সেটে চিত্র-পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে এই বলে আনন্দ প্রকাশ করেন যে, তিনি এ পর্যন্ত হিন্দী চিত্রের সব ক'জন জনপ্রিয় নায়কের সঙ্গেই কাজ করেছেন। দিলীপকুমার ("মুসাফির"), রাজ কাপুর ও কিশোরকুমার ("আনাড়ী" ও "আশিক"), দেবানন্দ ("আসলি-নকলি"), সুনীল দত্ত ("ছায়া") প্রমুখ শিল্পীরা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ছবিতে কাজ করেছেন। বর্তমান ছবি "সাঁঝ ঔর সবেরা"র নায়ক হলেন গুরু দত্ত। মীনাকুমারী ছবির নায়িকা। প্রকাশ স্টুডিওতে ছবিটির কাজ এগিয়ে চলেছে।

* পাঠকের চোখে *

বাংলা ছবিতে কেরানী

মহাশয়,

বাংলা ছায়াছবিতে কোন অফিসের দৃশ্য দেখাতে হলেই কেরানীদের একটা বিকৃত রুচিসম্পন্ন অদ্ভুত ধরনের জীব হিসাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে হয়। তার সর্বশেষ নিদর্শন সেদিন দেখে এলাম জনপ্রিয় পরিচালক শ্রীরাজেন তরফদার পরিচালিত 'অগ্নিশিখা' চিত্রে। নায়িকা অফিসে পদার্পণ করা মাত্র বৃদ্ধ-যুবক-নির্বিশেষে প্রতিটি কেরানীর যে ভাবভঙ্গী শুরু হল, তা সুরুচির পরিচায়ক নয়। দেখে মনে হল, ওঁরা যেন এর আগে কখনও স্ত্রীলোক দেখেননি।

হয়তো একটা 'রস' পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই পরিচালক মহাশয় এই দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি, প্রত্যেক রুচিবান দর্শকের কাছে এটা পীড়াদায়ক বলেই মনে হবে।

আমরা, অর্থাৎ কেরানীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে ঢোকিতেই জীবনযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। চরম পরাজয়ের হাত এড়াতে কলম-পেশা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছি। হয়তো সেই অপরাধেই বর্তমান সমাজে আমাদের স্থান খুব উঁচুতে উঠতে পারেনি।

সবশেষে বলতে চাই, কম্পমান অর্থনীতির চাপ আমাদের মেরুদণ্ডকে ক্রমেই বেঁকিয়ে দিচ্ছে। এই দুর্বল মুহূর্তে আমাদের অহেতুক হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে? পরিচালক মহাশয়দের এ ধরনের ছবি তোলার আগে যে-কোনও অফিসে এসে একবার দেখে যেতে অনুরোধ করি। বাংলা দেশের প্রগতিশীল, পরিচালকদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁরা বিনা অপরাধে কেরানীদের আজব জেব করে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবেন না। ইতি—

পরিমল রায়চৌধুরী,
দুর্গাপুর-৩

খেলাধুলো

একলব্য

প্রথম এসিয়ান গেমের ফুটবল বিজয়ী ভারত দীর্ঘ ১১ বছর পরে আবার এসিয়ান ফুটবল খেলায় শ্রেষ্ঠ দেশ বলে পরিগণিত হয়েছে। মাঝের দুটি এসিয়ান গেমের ফুটবলে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবারকার সাফল্য নিশ্চয়ই গৌরবজনক। অথচ এবার যাঁরা ইন্দোনেশিয়ায় খেলতে গিয়েছিলেন, দলগত শক্তিতে তাঁরা আগের চেয়ে শক্তিশালী এ কথা স্বীকার করা যায় না।

১৯৫১ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে যেবার প্রথম এসিয়ান গেমের আসর বসে সেবার ভারতীয় দলে ছিলেন:—গোলে ভরদ্বাজ ও এন্টনী; ব্যাকে এস মান্না (অধিনায়ক), আজিজ, প্যাপেন ও এস চ্যাটার্জি; হাফব্যাকে লতিফ, চন্দন সিং, সম্মুখম, নুর ও অভয় ঘোষ; ফরোয়ার্ডে ভেঙ্কটেশ, আর গুহঠাকুরতা, মেওয়ালাল, বচন, সত্তার, আমেদ, সালে, এস নন্দী, লোকনাথন, জোন্স ও লারেক।

বলা বাহুল্য, দলটি ছিল খুবই শক্তিশালী। সুতরাং প্রথম খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে ৩—০ গোলে, সেমি-ফাইন্যালে আফগানিস্থানকে একই ফলাফলে এবং ফাইন্যালে ইরানকে ১—০ গোলে হারিয়ে ভারত সহজেই প্রথম এসিয়ান গেমের ফুটবল স্বর্ণপদক পায়।

১৯৫৪ সালে ম্যানিলার দ্বিতীয় এসিয়ান গেমেও ভারতের টিম দুর্বল ছিল না। এবার দলে পড়েছিলেন—এস শেঠ ও সঞ্জীব গোল; এস মান্না (অধিনায়ক), আজিজ, প্যাপেন ও মুথু—ব্যাক; গোকুল, চন্দন সিং, অমল দত্ত, প্যাট্রিক ও নুর—হাফব্যাক; ভেঙ্কটেশ, আমেদ, রাগাপ্পা, থঙ্গরাজ, কিট্টু, মঈন, ডি'সা ও জয়রামন—ফরোয়ার্ডে।

ম্যানিলায় প্রথম খেলায় ভারত ৩—২ গোলে জাপানকে কোনভাবে পরাজিত করে, কিন্তু পরের খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪—০ গোলে শোচনীয় হার স্বীকার করে দ্বিতীয় এসিয়ান গেম থেকে ভারতকে বিদায় নিতে হয়। রাত্রির আলোকমালায় খেলতে অনভ্যস্ত ভারতের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল রাত্রিকালীন ফুটবল। তবু ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪—০ গোলে পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দ্বিতীয় এসিয়ান গেমে ভারত ষষ্ঠ স্থানও পায়নি।

১৯৫৪ সালের পর মেলবোর্ন অলিম্পিকের ফুটবলে ভারতের চতুর্থ স্থান লাভ কল্পনাতীত সাফল্যের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু দুই বছর পরে ১৯৫৮ সালের টোকিও এসিয়ান গেমে আবার বিপর্যয় দেখা যায়। টোকিওর জন্য দলে পড়েন—থঙ্গরাজ ও নারায়ণ—গোল; আজিজ (অধিনায়ক), রহমান ও লতিফ—ব্যাক; সালাম, আমেদ হোসেন, নুর, এন নন্দী ও কেম্পিয়া—হাফব্যাক; পি কে ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, কানন, বলরাম, রহমতুল্লা ও পবিত্তন।

কোনই সন্দেহ নেই, থঙ্গরাম, পি কে, চুনী, বলরাম যাঁরা এবার জাকর্তায় খেলেছেন ১৯৫৮ সালে তাঁরা ছিলেন গৌরবের উচ্চ শিখরে। দলের আর সব খেলোয়াড়েরও খ্যাতি কম ছিল না। কিন্তু টোকিওতে খেলার সময় ব্যর্থতার পরিচয়। প্রথম খেলায় কোনভাবে বার্মার বিরুদ্ধে ৩—২ গোলে জয়লাভ। দ্বিতীয় খেলায় ইন্দোনেশিয়ার কাছে ২—১ গোলে পরাজয়। তবু বি গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নয়ন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে হংকংয়ের বিরুদ্ধে ৫—২ গোলে জয়লাভ। সেমি-ফাইন্যালে কোরিয়ার কাছে ৩—১ গোলে হার স্বীকার। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় আবার পরাজয় ইন্দোনেশিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে ৪—১ গোলে।

এবার জাকর্তার খেলার জন্য যাঁদের নিয়ে দল গড়া হয়েছিল তাঁরা হলেন—পি বর্মন ও থঙ্গরাজ—গোল; চন্দ্রশেখর, ত্রিলোক সিং, অরুণ ঘোষ ও জার্নেল সিং—ব্যাক; ফ্রাঙ্কো, রামবাহাদুর ও পি সিংহ—হাফব্যাক, পি কে ব্যানার্জি, ইউসুফ খাঁ, এথিরাজ, আফজল, চুনী গোস্বামী (অধিনায়ক), বলরাম ও অরুময়।

সবারই জানা আছে, গত দুটি এসিয়ান গেমের ফুটবলের স্বর্ণপদক বিজয়ী তাইওয়ান চীন এবং ইসরাইল এবারকার এসিয়ান গেমে যোগদান করতে পারেনি। দুটি দেশই ফুটবলে শক্তিশালী। এ'রা যোগ দিলে ফলাফল কি হত বলা শক্ত। তবু যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে এটুকুও বড় লাভ। আটটি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে এবার প্রথমে লীগ প্রথায় পরে সেমি-ফাইন্যাল থেকে নক আউট প্রথায় খেলা পরিচালনা করা হয়। এ গ্রুপে থাকে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয় ও ফিলিপাইন। তাইল্যান্ড, জাপান, ভারত ও কোরিয়াকে নিয়ে বি গ্রুপ গড়া হয়। প্রথম খেলায় ভারত কোরিয়ার কাছে ২—০ গোলে হার স্বীকার করলেও গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে সেমিফাইন্যালে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ফাইন্যালে কোরিয়াকেই ২—১ গোলে পরাজিত করে লাভ করে ফুটবলের স্বর্ণপদক। দুটি খেলার ফলাফল এখনো পাওয়া যায়নি। বাকী সমস্ত খেলার ফলাফল—ইন্দোনেশিয়া (১) : ভিয়েৎনাম (০); জাপান (৩) : তাইল্যান্ড (১); দক্ষিণ কোরিয়া (২) : ভারত (০); মালয় (১৫) : ফিলিপাইন (১); ইন্দোনেশিয়া (৬) :

ইস্টবেঙ্গল ও সিলেক্টেড ইস্টার্ন কম্যান্ড দলের আই এফ এ শীল্ডের খেলায় ইস্টার্ন কম্যান্ডের গোলকিপার একটি নিশ্চিত গোল বাঁচাচ্ছেন

ফিলিপাইন (০); ভারত (৪) ঃ থাইল্যাণ্ড (১); ভারত (২) ঃ জাপান (০) ভিয়েৎনাম (৩) ঃ মালয় (০); ভিয়েৎনাম (৬) ঃ ফিলিপাইন (০); দক্ষিণ কোরিয়া (১) ঃ জাপান (১); (সেমি-ফাইন্যাল)—ভারত (৩) ঃ ভিয়েৎনাম (২); দক্ষিণ কোরিয়া (২) ঃ মালয় (১); (ফাইন্যাল)—ভারত (২) ঃ দক্ষিণ কোরিয়া (১); (তৃতীয় স্থানের খেলা) —মালয় (৩) ঃ ভিয়েৎনাম (১)।

গ্রুপের খেলায় থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে গোল করেন পি কে ব্যানার্জি দুটি ও চুনী গোস্বামী ও বলরাম একটি করে। জাপানের বিরুদ্ধে দুটি গোল করেন পি কে ব্যানার্জি ও বলরাম। সেমি-ফাইনালে ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে গোল করেন অধিনায়ক চুনী গোস্বামী দুটি ও জার্নেল সিং একটি। ফাইন্যালে কোরিয়ার বিরুদ্ধেও চুনী গোস্বামী ও জার্নেল একটি করে গোল করেন।

চারটি এসিয়ান গেমে এই হচ্ছে ফুটবলে ভারতের খেলার ফলাফল।

কানু রায়

এবারকার সাফল্যের মূলে দলগত সংহতি তো আছেই তার চেয়েও বেশী আছে কোচ রহিমের ব্রেন। স্টপার জারনেল সিংয়ের যে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলার যোগ্যতা আছে এবং সবার চেয়ে বেশী যোগ্যতা আছে এটা রহিমেরই আবিষ্কার। তাছাড়া অন্যান্য খেলোয়াড়দের স্থান অদল বদল করিয়ে খেলিয়ে 'কোচ' রহিম যেভাবে ভারতীয় দলকে জয়যুক্ত করে ফিরিয়ে এনেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তাই বলে খেলোয়াড়দের যোগ্যতা আমি কোন ভাবেই খাটো করছি না। আমি আবারও বলছি—অন্যান্য বারের তুলনায় এবারকার দল অপেক্ষাকৃত হীন বল। সেই দলের স্বর্ণ পদক লাভ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

• • •

জাকর্তায় ফুটবলের সাফল্যের পাশে হকির ব্যর্থতা মনকে আরও বেশী করে নাড়া দিয়েছে এবং সেনাজান স্টেডিয়ামেই ভালভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে হকিতে ভারত এখন বিশ্বের দুই নম্বর দেশ।

প্রথম ও দ্বিতীয় এসিয়ান গেমে হকি খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। টোকিও থেকেই এসিয়াডে হকির অন্তর্ভুক্তি এবং লীগ প্রথার খেলায় পাকিস্তানের পরে ভারতের স্থান। অর্থাৎ গোল অ্যাভারেজে টোকিওতে ভারত পেয়েছিল দ্বিতীয় স্থান। এখানে বলা প্রয়োজন ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকের ফাইন্যালেই প্রমাণ হয়েছিল ভারতের হকিমান নিম্নমুখী। মেলবোর্নে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে বিজয়ী ভারতের বিশ্বজয়ীর সম্মান অবশ্য অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু ক্রীড়ানৈপুণ্যে পাকিস্তান প্রশংসা পেয়েছিল। তারপর টোকিওতে পাকিস্তানের উন্নতি আর ভারতের অবনতির পরিচয় মেলে। রোম অলিম্পিকে অবনতির হয় চরম প্রকাশ। ভারতের বিশ্বজয়ীর সম্মান হাতছাড়া হয়ে খেলায় সত্যিই ভারতের উপরে কি না! এবার তারই প্রমাণ হয়ে গেছে। যদিও জাকর্তার ফাইন্যালে পাকিস্তানের কাছে ভারতের ২—০ গোলে পরাজয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবীর বঞ্চনা আছে। সেণ্টার হাফ-ব্যাকের মত পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত সময় সমকক্ষ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিড়ম্বনা সহজেই অনুমেয়। সেণ্টার হাফ চরণজিত খেলা আরম্ভের পর ৬ মিনিটের সময় মুখে আঘাত পেয়ে মাঠ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, আর খেলায় যোগ দিতে পারেন না। তাছাড়া পাকিস্তানের দৈহিক শক্তি প্রযুক্ত খেলার বিরুদ্ধেও ভারতের খেলা কার্যকরী হয় না। ফলে ফাইন্যালে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু পরাজয়ের ক্ষেত্রে কাঁদুনি গেয়ে লাভ নেই। ভারত যে জাকর্তায় ভাল খেলতে পারেনি, অকপটে সেটা স্বীকার করাই ভাল। পাকিস্তান যেখানে সাবলীল আক্রমণধারায় বিভিন্ন খেলায় একটির পর একটি গোল করেছে সেখানে ভারতের বেশীরভাগ গোল হয়েছে শর্টকর্ণার থেকে। প্রায় প্রতি খেলায় পুরোভাগে সংহতির অভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রায় ৩২ বছর ধরে ভারত ছিল বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা। পৃথিবীর ক্রীড়া ইতিহাসে এটা অনন্য সম্মান। চিরদিন কারো শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে না, এটা ঠিক কথা। কিন্তু বিশ্বজয়ীর সম্মান এভাবে হাতছাড়া হতে দেওয়াও উচিত নয়। হকি খেলায় ভারতের মান যে নেমে যাচ্ছে এর কারণ কি? অনেকের মতে ভারতের খেলোয়াড়রা সূক্ষ্ম কলাকৌশলের বদলে দৈহিক শক্তি প্রযুক্ত খেলার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছেন, পরিচালকরাও তাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। তাছাড়া ভারতের ক্রীড়াধারা সবারই জানা হয়ে গেছে, পাকিস্তানের তো আগেই জানা ছিল। ভারতের খেলার ধারা বদলাতে হবে। দৈহিক শক্তির উপরে কলানৈপুণ্যের স্থান দিতে হবে। তবেই আবার হকি খেলায় আগের দিনের স্বর্ণ-দ্যুতি ফিরে আসবে।

খবরে প্রকাশ জাকর্তায় এসিয়ান গেমের প্রস্তুতির জন্য এক হকিতেই খরচ করা হয়েছে ছয় লাখ টাকা। গলদ কোথায় তার মূল সন্ধান না করে এভাবে অর্থব্যয় অপব্যয়েরই সামিল।

টোকিও অলিম্পিকের আর বেশী দেরি নেই। ভারতের হকি পরিচালকদের এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। যেখান থেকে আমাদের পতন আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকেই পুনরুত্থানের জন্য এখন থেকে তোড়জোড় করতে হবে। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা যাবে।

জাকর্তায় পাকিস্তান ও ভারতের খেলার

পাকিস্তানের ফলাফল—জাপানকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন মুনির দার দুটি, জাকাউদ্দিন, ওয়াহিদ ও নাসির বুন্দা একটি করে), সিংহলকে ৯—১ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন ওয়াহিদ পাঁচটি, নুর আলম, বুন্দা, মুনির দার ও মোতিউল্লা একটি করে), সিঙ্গাপুরকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন নাসির বুন্দা দুটি, ওয়াহিদ ও মুনির দার একটি করে), ইন্দোনেশিয়াকে ৮—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন ওয়াহিদ ৬টি ও হায়াৎ মহম্মদ ২টি)।

সেমিফাইন্যালে মালয়কে পরাজিত করে ৫—০ গোলে (গোল করেন ওয়াহিদ তিনটি ও বুন্দা দুটি), ফাইন্যালে ভারতকে ২—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন আতিক ও ওয়াহিদ)।

ভারতের খেলার ফলাফল—মালয়কে ৩—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন গুরুদেব সিং, বান্দু, পাতিল ও আরম্যান)। হংকংকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন আরম্যান একটি ও পৃথিপাল হ্যাটট্রিকসহ তিনটি)। দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন পৃথিপাল সিং তিনটি এবং আরম্যান ও গুরুদেব সিং একটি করে)। সেমিফাইন্যালে জাপানকে ৭—০ গোলে পরাজিত করে (গোল করেন আরম্যান তিনটি, বান্দু পাতিল ও পৃথিপাল সিং দুটি করে)।

● ● ●

একে একে নিবিছে দেউটি। মোহনবাগানের যে একাদশ মহারথী ১৯১১ সালে সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড জয় করে ভারতীয় ফুটবলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের এক একজন করে পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছেন। গত বছর হাবুল সরকারের মৃত্যুর পর যে তিনজন জীবিত ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে কানু রায় সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। বাকি রইলেন মাত্র দুজন গোলকিপার হীরালাল মুখার্জি আর ব্যাক রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জি।

কাগজে কলমে নাম ছিল জে এন রায়। কিন্তু কানু বাবু নামেই তিনি ক্রীড়া সমাজে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন বাঙালী জীবনের ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এদের মৃত্যু যেন এক একটি অধ্যায়ের অপসরণ। প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি বলতে যা বোঝায় আজীবন সেই মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়ে গেছেন কানু রায়। খেলাধুলায় তিনি যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তেমন চাকুরি জীবনেও অর্জন করেছিলেন প্রতিষ্ঠা। পুলিসের চাকুরিতে যেটা দুর্লভ।

কুমিল্লায় ১৮৯০ সালে জন্মগ্রহণ করলেও কানু রায়ের লেখাপড়া ও খেলাধুলো আরম্ভ হয় ঢাকায়। ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবে খেলে তিনি প্রথম সুনাম অর্জন করেন। ১৯০৯ সালে কুচবিহারের মহারাজার পরামর্শে যোগ দেন মোহনবাগান ক্লাবে। সেই বছর থেকেই মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আরম্ভ করে। ১৯১১ সালে লাভ করে আই এফ এ শীল্ড। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগানে খেললেও আই এফ এ শীল্ডের খেলায় তাঁর সর্বশেষ যোগদান ১৯২১ সালে। সে বছর তিনি পুরনো ক্লাব উয়াড়ীর পক্ষে খেলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে বিজয়সূচক গোল করেন।

শুধু খেলা নয়,—লেখা-পড়াতেও কানুবাবু মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯০৭ সালে স্থানীয় স্কলারশিপ নিয়ে ঢাকা থেকে তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন। মোহনবাগানে খেলবার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ১৯১২ সালে বি এ পাস করেন ঢাকা কলেজ থেকে। পরে একসঙ্গে এম-এ ও ল' পড়তে আরম্ভ করেন। ১৯১৭ থেকে তাঁর চাকুরি জীবনের সূচনা। প্রথমে ডি-এস-পি, পরে এস-পি হিসাবে নানা জেলার দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত ডি-আই-জি'র পদে উন্নতি। দেশ বিভাগের সময় তিনিই ছিলেন সিনিয়র পুলিশ অফিসার এবং স্বাধীনতা পাবার পর তাঁকেই ইন্‌সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের পদ দেবার কথা উঠেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ২৩শে আগস্ট অবসর গ্রহণ করায় সে পদ লাভ করতে পারেননি। কর্তব্য কর্মের নিষ্ঠায় তিনি পুলিশ পদক পেয়েছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কারো কাছে মাথা নত করেননি।

খেলাধুলোর মধ্যে দলাদলি ও রাজনীতিকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন আর ব্যথা পেতেন ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি দেখে। বড় বড় খেলার সময় মাঠে আসতেন বটে, কিন্তু আলাপ করলেই বোঝা যেত একটা অভিমান নিয়ে তিনি ক্রীড়া কোলাহল থেকে দূরে সরে আছেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে তিনি একখানা বই লিখে গেছেন। সে বই এখনো প্রকাশ হয়নি। খেলাধুলোর উন্নতির স্বার্থেই সে বই প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

অরুণা বসু

জয়নগর-মজিলপুরের দত্ত বাড়ির মেয়ে। ৪৯ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বসু বাড়ির বৌ। দুই বাড়িতেই রাইফেল রিভলবারের ছড়াছড়ি। বাবা সত্যগোপাল দত্তর শিকারের শখ। ভাইদেরও ওই নেশা। বিলেত ফেরত কৃতী স্বামী ডাঃ গোপেন বসু সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নামকরা রাইফেল চালক। পিতৃকুলের সঙ্গে শ্বশুরকুলের এই মণিকাঞ্চন সংযোগই অরুণা বসুর হারানো দিনের কথা বেশী করে মনে পড়ে।

ছোট বেলায় বাগবাজার বোসপাড়া ক্লাবে লাঠি ছোরা খেলেছেন। দৌড়ঝাঁপও করেছেন কিছু কিছু। মন ছিল মুক্ত। খোলা মাঠের খেলাধুলো হাতছানি দিয়ে ডাকত। তারপরই বন্ধন। রক্ষণশীল পরিবারের পুরনারী হয়ে একরকম বন্দীর জীবন।

সবই আছে। অর্থের প্রাচুর্য, আরামের উপকরণ, শাশুড়ীর স্নেহ, সব। স্বামী ডাক্তার। ছোট সংসারে কাজকর্মের ঝামেলা কম। শান্তির সংসার তবু যেন কিসের অভাব। খাওয়ার পর শোওয়া, শোওয়ার পর খাওয়া, রোজকার জীবনধারা যেন এক চাকাতেই বাঁধা। এভাবে ক'দিন চলে? মন যে হাঁপিয়ে ওঠে। পুরুষ জাতির উপর হিংসে হয়, স্বামীর উপর আসে অভিমান। ডাক্তারীর এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তার মধ্যেও শুটিং রেঞ্জে যাবার কামাই নেই। আট নয় বছরের একমাত্র ছেলেও ওই পথের পথিক হয়েছে। কিন্তু তার কোন কাজ নেই, তবু ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হবে। না মেয়েদের জীবনে স্বাধীনতা নেই, অন্তঃপুরে বন্দী থাকবার জন্যই তাদের জীবন।

অরুণা বসুর মনে যখন এই প্রশ্নের ওঠা পড়া তখন একদিন স্বামীর ডাক এলো—

—'যাবে আমার সঙ্গে শুটিং রেঞ্জে। আজ আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন'।

মন নেচে উঠলেও মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'না'। শাশুড়ী কি ভাববেন। আর সবাই কি মনে করবে, এই সংকোচ। শেষ পর্যন্ত স্বামীর কথায় সায় দিতে হল। অরুণা বসু প্রথম গেলেন শুটিং রেঞ্জে। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যখন ভিজিটার্স' রেসের জন্য উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দের ডাক পড়েছিল তখনই হাত নিশপিস করে উঠেছিল, কিন্তু সংকোচের বাঁধ ভেঙ্গে সেদিন আর গুলী ছোড়া হয়নি। তারপর প্রতি মাসেই দু'একবার করে ক্লাবে আনা-গোনা। ১৯৫৪ সাল থেকে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবই হয়ে উঠল ওদের রবিবারের আস্তানা। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র সবাই ক্লাবের সভ্য। অরুণা বসু যেন কুমারী জীবনের মুক্তির স্বাদ ফিরে পেলেন। রাইফেলে নেশা ধরে গেল। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় উঠেই গেল ওই নেশায়। আর রাইফেলের কি যত্ন। বৌমার সোনার গয়নার চেয়ে লোহার নলের উপর দরদ বেশী দেখে শাশুড়ী অবাক হয়ে যান।

স্বামীর কাছ থেকেই রাইফেল চালনার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন অরুণা বসু। তারপর ট্রেনার হন বিশ্বনাথ দে। ১৯৫৫ সালের দিল্লির ন্যাশনাল এবং অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনের দুটি পুরস্কার হাতে আসে অরুণা বসুর। পয়েন্ট টু-টু বোরের ২৫ মিটার প্রোনে অরুণা বসু সেকেণ্ড, আসান-সোলের অনিন্দিতা মুন্সী ফার্স্ট। এ গ্রুপের ওপেনের ২৫ মিটার প্রোনেও সেকেণ্ড, ফার্স্ট অরুণা বসুর পুত্র তপেন বসু। মা ও ছেলের এক সঙ্গে প্রতি-যোগিতা। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ।

১৯৫৬ সালে কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া রাইফেল শুটিংয়ে ওঁর দখলে যায় তিনটি পদক। প্রোনের ২৫ মিটারে তৃতীয়, ৫০ মিটারে দ্বিতীয় আর শতকরা ৯৪ পয়েন্ট করায় এগ্রিগেটেও তৃতীয়। মোট ৭০০ মধ্যে অরুণা বসু পেয়েছিলেন ৬৬১। এ ছাড়া ১৯৫৭ এবং ৫৮ সালেও অল ইণ্ডিয়া থেকে দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ক্লাবের প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন বহু পুরস্কার। এর মধ্যে ১৯৫৬ সালে মার গরীব সাহা মেমোরিয়াল ট্রফি এবং ছেলের চণ্ডীচরণ নায়ক ট্রফি লাভ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমটি লেডিস চ্যাম্পিয়নশিপ এবং দ্বিতীয়টি জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে প্রখ্যাতা রাইফেল চালিকা সবিতা চ্যাটার্জির পরই ছিল অরুণা বসুর স্থান।

রাইফেল চালনায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ হতে হলে

রাইফেল পরিবার—বাঁ-দিকে স্বামী পরলোকগত ডাঃ গোপেন বসু, মাঝে স্ত্রী অরুণা বসু, ডান দিকে পুত্র তপেন বসু

অরুণা বসু রিভলবার ছুড়ছেন সুটিং প্রতিযোগিতায়

চাই স্থির লক্ষ্য আর গভীর মনঃসংযোগ। আগ্নেয় অস্ত্রের খেলায় আরও এগিয়ে যাবার জন্য অরুণা বসু যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখনই এক দৈব দুর্ঘটনার প্রচণ্ড আঘাতে উনি ভেঙে পড়েন। নিষ্ঠুর নিয়তি রাইফেল পরিবারের প্রধানকেই ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। ১৯৫৮ সালের সেই আঘাত ওর জীবনে একটা ওলট পালট এনে দেয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল এসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী এবং প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক ডাঃ গোপেন বসু জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্যই পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন লালবাজারে তৎকালীন পুলিস কমিশনারের সঙ্গে। আলোচনার পর বাড়ি ফেরবার মুখে ট্রামে উঠতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। আর জ্ঞান ফেরে না। ১৬ ঘণ্টার মধ্যে ডাঃ বসুর মৃত্যু হয়। দৈব দুর্ঘটনার উপর মানুষের হাত নেই। কিন্তু অরুণা বসুর ধারণা জন্মে রাইফেলের জন্যই ওঁর জীবন গিয়েছে। তাই রাইফেলের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই রাইফেল চালনা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ওপেন সাইট বি এস এ, মার্টিনী ইণ্টার-ন্যাশনাল, ওয়ালথার, পিস্তল, রিভলবার প্রভৃতি ওর আগ্নেয় অস্ত্রগুলো এতদিন অকেজো হয়ে পড়েছিল। হাতেও বল ছিল না। ঐ হাতে আর আগুন ছুড়তে পারবেন এ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু রাইফেল এসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয়দের অনুরোধে এবং ওর মধ্যেই স্বামীর স্মৃতি জীইয়ে রাখবার বাসনায় আবার অরুণা বসু রাইফেল ছুড়তে আরম্ভ করেছেন। ১৯৬২ সালে অর্থাৎ এই বছর টালীগঞ্জ পুলিস রেঞ্জে অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশন থেকে সংগ্রহ করেছেন তিনটি পদক। আরও বলবার মত ঘটনা-এতদিন অরুণা বসু শুধু প্রোনেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এবার থেকে প্রোন, নীলিং ও স্ট্যাণ্ডিং তিন পজিশনেই পারদর্শী হয়ে উঠছেন।

এবারকার ফলাফল: পয়েন্ট টু-টু-র স্ট্যাণ্ডিংয়ে ফার্স্ট গীতা রায়, অরুণা বসু সেকেণ্ড, শোভিতা চ্যাটার্জি থার্ড। প্রোনে ফার্স্ট শোভিতা চ্যাটার্জি, সেকেণ্ড গীতা রায়, থার্ড অরণা বসু। নীলিংয়ে অরুণা বসু স্থান পাননি। তবে এগ্রিগেটে ব্রোঞ্জ পদক হাতে এসেছে।

দেশী সংবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর—আজ সেন্সাস কমিশনার শ্রীঅশোক মিত্র সাংবাদিক সম্মেলনে যে চূড়ান্ত হিসাব দেন, তাহাতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৪০ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮২ জন—৪৪ কোটির সামান্যই কম। চীনের জন-সংখ্যা ৫৮ কোটির মত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দুর্নীতি ধরিতে "চুনোপুঁটি"দের পিছনে অযথা সময় ব্যয় না করিয়া "রুই-কাতলা" ধরিবার দিকে বেশী করিয়া নজর দেওয়ার জন্য পুলিসকে পরামর্শ দেন।

১১ই সেপ্টেম্বর—সোমবার গভীর রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পেট্রাপোল সীমান্তে মোটর আরোহী এক বিদেশী ভদ্রলোক স্থল শুল্ক কর্মচারীদের হাতে ধরা পড়েন। শুল্ক বিভাগের কর্মীরা গাড়িটির ভিতরের নানা ফাঁকে ফোকরে কায়দায় তৈরী "সিন্দুক" হইতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মণ সোনার বাট উদ্ধার করেন। যাহার আনুমানিক মূল্য বিশ লক্ষ টাকা।

১২ই সেপ্টেম্বর—পূর্ব ভারতের ভারত-তিব্বত সীমান্তে চীন হামলা করিয়াছে। সীমান্তের একটি ভারতীয় ঘাটিকে চীনা সৈন্যরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঘাটিটি ভারত, ভুটান ও তিব্বতের মধ্যে নেফার কামেং সীমান্তের উত্তরে এবং সন্দেহাতীতভাবে ভারতীয় অঞ্চলেরই অন্তর্গত।

দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভারত সরকার ন্যায্য-মূল্যের দোকান মারফত বিক্রয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ গম ও চিনি বাজারে ছাড়িবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ক্রমবর্ধমান মূল্যরোধের উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সরকার আরও অধিক সংখ্যায় ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিবেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর—ম্যাকমেহন লাইন বরাবর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে চীনারা বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সমরাস্ত্রের সমাবেশ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও ভুটান সীমান্তে তাহাদের সৈন্য অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে এবং সেখানেও তাহাদের সামরিক তৎপরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—ভারত, চীন ও ভুটানের ত্রিসংযোগস্থলে অবস্থিত অবরুদ্ধ ভারতীয় চৌকিটি উদ্ধারের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু চৌকিটি এখনও আক্রমণ-কারী চীনা সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে কোন সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ডাক ও তার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনার্থে প্রয়ো-জনীয় সাজসরঞ্জাম বিদেশ হইতে ক্রয়ের জন্য ভারত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতির নিকট হইতে বিনা সুদে ৫০ বৎসরের জন্য ৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার বা প্রায় ২০ কোটি টাকা ঋণ-স্বরূপ পাইয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—আসামের বাঙলা ভাষী জন-গণের পক্ষ হইতে এগার জনের এক প্রতিনিধি-দল আজ রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির নিকট দাবি জানান।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় তিন বৎসরের ডিগ্রিকোর্সে নন-কলেজিয়েট ও বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে বলিয়া ঠিক হয়। ইহা ছাড়া তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স পাস করার পর স্পেশাল অনার্স পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হইবে বলিয়াও সিদ্ধান্ত হয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসের রিসার্চ অফিসার শ্রী পি এস শর্মা এক রিপোর্টে বলিয়াছেন, ১৯৫১-৫২ সনে পশ্চিমবঙ্গে মাথা পিছু গড় খাদ্যশস্যের বরাদ্দ ১০০ সূচক সংখ্যা ধরিলে ১৯৫৯-৬০ সনে তাহার বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬৬। দিনের দিন তাহার পরিমাণও অস্বাভাবিক হারে কমিতেছে।

জাতীয় সংহতি এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে সরকারী নীতি সমূহ ঠিকমত কার্যে পরিণত হইতেছে কি না, তাহা তদারক করিবার জন্য পূর্বাঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

বিদেশী সংবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর—আজ লণ্ডনে গ্রীনউইচ সময় বেলা ২-৩০ মিনিটে কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রী সম্মিলন আরম্ভ হয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ সুবান্দ্রিও আজ বলেন যে, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য তিনি নয়াদিল্লিস্থ ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্র-দূতকে নির্দেশ দিয়াছেন।

১১ই সেপ্টেম্বর—অদ্য কমনওয়েলথ সম্মেলনের অধিবেশনে কানাডা, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রধানমন্ত্রিগণ প্রায় একবাক্যে বলেন যে, বৃটেন বাণিজ্য জোটে যোগ দিলে কমনওয়েলথ দুর্বল হইয়া পড়িবে, উপনিবেশবাদের পথ প্রশস্ত হইবে।

কিউবার উপর আক্রমণ যুদ্ধের সূত্রপাত করিবে এবং পরিণামে উহা বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে বলিয়া আজ সোভিয়েট সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়া দেন।

১২ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আলি রাওয়ালপিণ্ডিতে সাংবাদিক-গণকে বলেন যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হইতে যেরূপ ব্যাপকভাবে মুসলমানদিগকে উচ্ছেদ করা হইতেছে, তাহা এইভাবে চলিতে থাকিলে পাকিস্তানকে এবং ... পরিষদের গোচরে আনিতে হইবে।

ব্রিটেনের ইউরোপীয় বাণিজ্য জোটে যোগদা[ন] প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ দেশগুলির ... হইতে যেভাবে তীব্র সমালোচনা এবং ... আসিয়াছে—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভার ... বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর—আজ পিকিং-এ ... ঘোষণায় এই অভিযোগ করা হইয়াছে ... ভারতীয় সৈনারা ম্যাকমেহন লাইন অতি[ক্রম] করিয়াছে এবং তাহারা তিব্বতে এ[কটি] "আক্রমণাত্মক ঘাটি" স্থাপন করিয়াছে।

বাণিজ্য জোটে বৃটেনের যোগদানের ব্যাপা[রে] কমনওয়েলথ সম্মেলনের তীব্র বিরোধিতা ... করিয়া শ্রীম্যাকমিলান এখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ... অন্য পথ ধরিয়াছেন—অদ্য তিনি কমনওয়েল[থ] বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথাব[ার্তা] বলেন এবং আলাপিলা করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর—বৃটেনের প্রভাবশা[লী] সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে ... অথচ ধারাবাহিকভাবে নেহরু-বিরোধী প্রচ[ার] অভিযান চলিয়াছে। বৃটিশ সরকারই এই প্রচ[ার] কার্যের কলকাঠি নাড়াইতেছেন কিনা ... জানা যায় নাই। তবে এটা খুবই স্পষ্ট ... প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সহিত একযোগে ভারত ... প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় বাণিজ্যিক জো[ট] সাম্রাজ্যবাদীসুলভ দুরভিসন্ধি ফাঁস ক[রিয়া] দেওয়ার পরই এই প্রচার জোরদার হইয়াছে।

কমনওয়েলথ নেতৃবর্গের মধ্যে এখন যে ... শলা-পরামর্শ চলিয়াছে, তাহাতে পাকিস্তা[নের] প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখান কমনওয়েলথ ও ইউরো[পীয়] বাণিজ্য জোটের মধ্যে সম্ভব হইলে শীর্ষ পর্যায়ে এক বৈঠক বসাইবার পরামর্শ দিয়া কমনওয়ে[লথ] সম্মেলনে সম্পূর্ণ নূতন এক বিষয়ে[র] অবতারণা করিয়াছেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—পর্তুগালের পররাষ্ট্র[মন্ত্রী] ফ্রাংকো নোগিরা বলেন যে, পর্তুগাল রাষ্ট্র[সংঘ] সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে ... সঙ্গে গোয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করিবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুবখান ক[মন]ওয়েলথ ও ইউরোপীয় বাণিজ্য জোটের অন্ত[র্ভুক্ত] দেশসমূহের যুক্ত শীর্ষ সম্মেলনের যে অভি[প্রায়] প্রস্তাব করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে তাহ[াতে] বিশেষ কেহ আমল দেন নাই। ... কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ; বৃটেন ও ... ইউরোপীয় বাণিজ্য জোটভুক্ত মহলের কেহই ... বিশেষ সমর্থন করে নাই।

১৬ই সেপ্টেম্বর—কমনওয়েলথ দেশগু[লির] প্রধানমন্ত্রীরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন ... বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করার সিদ্ধা[ন্ত] করিয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহারা নিজ নি[জ] দেশের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের ক[থা] চিন্তা করিতেছেন।

পিকিং বেতারের এক খবরে বলা হইয়াছে ... ভারতীয় ফৌজ কারাকোরাম অঞ্চলে লোলক এলাকা[য়] আক্রমণ চালাইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যগণ ... রাউণ্ডের বেশী রাইফেল হইতে গুলিবর্ষণ ক[রে]।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ১৫·০০

আত্ম-চরিত ১০·০০

আল্যান ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউন্টব্যাটেন ৭·৫০

আর জে মিনির

চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০

অ না গ ত ২·০০

ভ্র ষ্ট ল গ্ন ২·৫০

সরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০

ত্রৈলোক্য মহারাজের

গীতায় স্বরাজ ৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নান্দনিক কৌতূহল রচয়িতা

গন্ধর্ব

নব্য নাট্য-সাহিত্য ও রীতির একমাত্র ত্রিমাসিক

শারদীয়া সংখ্যা মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হলো

মঞ্চ ও সাহিত্যের সম্প্রতিক যুগল শিল্প উপলব্ধির পরিণত ফসল

বিমল কর : ঘাতক। উৎপল দত্ত : মানুষের অধিকারে। অমর গঙ্গোপাধ্যায় : নায়িকার নাম নিয়তি। মনোজ মিত্র : মহাত্মা। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী : জনক। এবং ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় : এ জন্মের উত্তরাধিকার॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ॥ অপ্রতিষ্ঠিত নাটক   মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বিচ্ছেদ

রথীন্দ্রনাথ রায় (নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী), দিলীপ বন্দ্যো, সোমেন্দ্র নন্দী প্রভৃতি চার খানি অংকিত একটি উল্লেখযোগ্য কার্টুন

দাম : আড়াই টাকা। ডাকে তিন টাকা। রেজেস্ট্রী ডাকে ৩·৫৬

পাঁচ টাকা দিয়ে এই সংখ্যা থেকে গ্রাহক হোন

গন্ধর্ব । ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট । কলকাতা ১২

নানক ফ্যামিলি ওয়্যারে

ফ্যাশান সৃষ্টি

আমাদের দোকানে পূজোর সওদা করুন। বেশ সস্তা দরে সব রকমের হাল ফ্যাশানের রেডিমেড পোষাক পাবেন।

Nanak FAMILY WEAR

বড়বাজার গুরুদ্বার,

১৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নবজীবন

সম্পাদক

সুকুমার দত্ত

পুরাতনী

শ্রীঅরবিন্দ (ভবানীমন্দির), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (সন্ধ্যা : দুষ্প্রাপ্য অনুলিপি সহ), ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বাংলা চিঠি), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দুখানি চিঠি), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রসরচনা) ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (রম্যরচনা), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (গল্প), গোকুল নাগ (গল্প)

বিশেষ রচনা

নজরুল ও হুগলী বিদ্যামন্দির মহানাদ (পুরাতাত্ত্বিক তথ্য), হুগলী জেলা:র মন্দির। অভিনয় ও নাট্যকলা ও খেলাধূলা সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ

উপন্যাস — প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী

গল্প — বনফুল, বিমল মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ

প্রবন্ধ — প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শিশিরকুমার মিত্র

কবিতা — প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, শরৎ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দত্ত ইত্যাদি

বহু চিত্র সম্বলিত বৎসরের সর্বোৎকৃষ্ট সুরুচিসম্পন্ন বার্ষিকী

দাম—তিন টাকা

মেট্রো পাবলিশার্স

৫১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট—৬

পাত্রিরাজ এন্ড কোং

৮৯, হ্যারিসন রোড—৯

নবজীবন কার্যালয়

১০, ক্লাইভ রো—১

স্বদেশী পথে

ক্রসীপণে

বিষয় লেখক

অব্যর্থ !

প্রগতিশীল লেখক-লেখিকা দ্বারা পরিচালিত মাসিক পত্রিকা "অব্যর্থ" মহালয়ার দিন প্রকাশিত হইবে।

পাঠক পাঠিকাদের মনে রেখাপাত করার মত সমস্ত রকম গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য-রচনা, কৌতুকী ও সিনেমার যাবতীয় খবরাখবর "অব্যর্থে" প্রকাশিত হইবে। "অব্যর্থ" পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি কামনা করে।

কমল দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীগোবিন্দ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত। জলপাইগুড়ি।

পূজা সংখ্যা : ১·৫০ নঃ পঃ

সাধারণ সংখ্যা : ·৭৫ নঃ পঃ

(সি-২৫১৯)

শিল্প ও সাহিত্যের ত্রৈমাসিক

মহেঞ্জোদারো

কার্যালয়।
৫৫/৪ নটবর পাল রোড। হাওড়া

॥ দ্বিতীয় বিশেষ সংকলন ॥

প্রবন্ধ ॥ বার্নিক রায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দু রক্ষিত। স্নিগ্ধা পাল।

গল্প ॥ দেবেশ রায়

নাটক ॥ পার্থপ্রতিম চৌধুরী

কবিতা ॥ হরপ্রসাদ মিত্র। আল্লা আখ্মাতোভা। উৎপল বসু। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মণিভূষণ ভট্টাচার্য। দিলীপ সেন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। রঞ্জিত রায়চৌধুরী। রেবন্ত চট্টোপাধ্যায়। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। শ্যামল গুহ। শংকর দে। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। নবেন্দু সেন। সুকুমার ঘোষ।

৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে বিবেক সাহার আঙুলের স্কেচের প্রদর্শনী দেখুন।

আলোচনা ॥ সুবীর রায়চৌধুরী। নিতাই বসু। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। অনিমেষ পাল। আজারুদ্দীন খান্। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। শেখর বসু।

আর্ট প্লেট ॥ দেবকুমার রায় চৌধুরী। রথীন্দ্র মৈত্র। হরেন দাস। সুবল সাহা। বিবেক সাহা। দেবব্রত চক্রবর্তী। সুনীল পাল। সান্ত্বনাকুমার গোস্বামী।

কলেজ স্ট্রীটে পারিজা ব্রাদার্সের স্টলে পাওয়া যায়। সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। নমুনা সংখ্যা ভি. পি. করা হয়। গ্রাহক চাঁদা বছরে সডাক আড়াই টাকা।

অঙ্গসজ্জা ॥ অমিতা পাল। বিশ্বরঞ্জন দে। রত্নভূষণ মাল।

॥ দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

সম্পাদক—সমীর রায়

(সি-২৪১৪)

॥ গান্ধীজীর অমৃত কথা ॥

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

মহাত্মা গান্ধী রচিত

আমার ধ্যানের ভারত ৩৲

ছাত্রদের প্রতি ৪৷৷

ডাঃ সুধাংশু ভট্টাচার্য ও আশা ভট্টাচার্য সংকলিত

মহামানবের চোখে মহাত্মা গান্ধী ১৲

জাতীয় নেতাদের মহান বাণী সংকলন

ভারতবাণী ২৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশিত হয়েছে !

সৈনিক জীবনের পাঁচালী 'রঙরুট' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বরেন বসুর লেখা এই বইটি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৫৮ সালের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন নটি ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদ তার প্রমাণ।

দীর্ঘ দিন পরে

এই বরেন বসুই অন্তরঙ্গ-র শারদীয় সংখ্যায় জীবন্ত কাহিনী লিখছেন

যুদ্ধের আগুনে

এ ছাড়া থাকছে আর একটি মনোরম উপন্যাস 'আলোর পৃথিবী'। এর লেখক "তীর্থংকর" বিখ্যাত নন অবশ্যই। কিন্তু রচনায় প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর আছে।

নানা রসের গল্প লিখেছেন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত চৌধুরী, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও মানস গুহ।

দুটি সচিত্র আকর্ষণীয় রচনা লিখছেন
ডক্টর নীরেন চৌধুরী ও বিজন দত্ত

প্রবন্ধ ঃ তারাকুমার মুখোপাধ্যায় (অপ্রকাশিত রচনা) ও অশোক ভট্টাচার্য

কবিতা ঃ রাম বসু, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অরুণাচল বসু, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

স্কেচ ঃ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্র দুগার, দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

মঞ্চ ও চিত্রজগতের বহু তথ্য ও অজস্র ছবি সম্বলিত প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার এই শারদীয় সংখ্যাটির দাম মাত্র দু' টাকা।

অন্তরঙ্গ

৩৭/এ, বাদুড় বাগান স্ট্রীট। কলিকাতা—৯

অন্তরীপথে

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

ছোটগল্প

মহালয়ায় প্রকাশিত হবে

শারদীয়ার লেখকসূচী

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবেশ রায়
দিব্যেন্দু পালিত
শংকর চট্টোপাধ্যায়
লালমোহন দাস
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ
মলয় রায় চৌধুরী

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা
১৯।৪ নেতাজী দত্ত স্ট্রীট,
কলিকাতা — ছয়

(সি ২৪৭৯)

কথাশিল্প প্রকাশ-এর | **অবিস্মরণীয় প্রকাশ**

বাঙলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি
কমলকুমার মজুমদার প্রণীত

অন্তর্জলী যাত্রা

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন।
এই উক্তির মধ্যে যাঁহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, যাঁহার স্মরণ মননে
নব্য-বাঙলা সৃষ্ট; যিনি মানুষকে, প্রাকৃতজনকে, আপনার জাগ্রত
অবস্থার খানিক অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন,
—"মানুষ কি কম গা!"
এই গল্প সেই গল্প, ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প॥
॥ মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

● দুটি বিখ্যাত উপন্যাস ●
॥ অসীম রায় : **রক্তের হাওয়া** ৫·০০ ॥
॥ বিজন ভট্টাচার্য : **সোনালী মাছ** ৫·৫০ ॥

● ছোটদের মনের মত বই ●
॥ শিবশংকর মিত্র : **সুন্দরবন** ৩·৫০ ॥
॥ শৈলেন্দু ঘোষ : **ছিটোপদেশ** ৪·০০ ॥

কথাশিল্প প্রকাশ ॥ কলিকাতা-বারো

নাটক ?

প্রমথনাথ বিশীর

ভূতপূর্ব স্বামী ২৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি ২, বিংশ শতাব্দী ২॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আদর্শ হিন্দু হোটেল ২,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বিধিলিপি ২,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

চক্র ৩, উল্কা ২॥

মায়ামৃগ ২॥

সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের

শরৎ নাট্যসম্ভার ৮,

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হ'ল

কথাসাহিত্যে সাগরময় ঘোষের প্রথম সফল প্রয়াস—
দণ্ডকারণ্যের পটভূমিকায় ছোটদের জন্য লেখা কিন্তু বড়দেরও
সমান উপভোগ্য সচিত্র উপন্যাস

দণ্ডকারণ্যের বাঘ সাগরময় ঘোষ

**বিলাতী আর্ট পেপার'এর প্রচ্ছদচিত্র এবং প্রায়
প্রতিটি পাতা রঙীন চিত্রে শোভিত। দাম—৩·০০**

— বাংলা ভাষায় ভৌতিক গল্পের একমাত্র সংকলন —

অন্যভুবন দাম—১০·০০

● রবীন্দ্রনাথ থেকে সমরেশ বসু পর্যন্ত ৩৮ জন বিশিষ্ট লেখকের চিত্র সম্বলিত রচনাসমৃদ্ধ।
●● প্রতিটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার অকুণ্ঠ প্রশংসাধন্য।
●●● কাপড়ে বাঁধাই ও বিলাতি আর্ট পেপার জ্যাকেটে সমৃদ্ধ।

রূপদর্শী : **ব্রজবুলি** (২য় মুদ্রণ)	... ৩·৫০
প্রমথ চৌধুরী : **রবীন্দ্রনাথ**	... ২·০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : **যখন যেখানে**	... ২·৭৫
আনন্দকিশোর মুন্সী : **পরম লগনে**	... ৪·৫০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো : **স্বপ্ন সঞ্চার**	... ৩·৫০
বিমল কর : **এই দেহ অন্য মুখ**	... ৩·০০

মহাপ্রস্থ :

রূপদর্শী	● চেনামুখ (২য় সং) ●
শরদিন্দু বন্দ্যোঃ	● **কুমারসম্ভবের কবি** ●
সমরেশ বসু	● **ছায়াচারিণী** ●

কথাশিল্প : প্রাপ্তিস্থান : **গ্রন্থভারত**
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ | ৪১-বি রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা-২৬। ৪৬-৭৫২৯

ঋত্বিক

১।৩২-এফ প্রিন্স গোলাম মহঃ রোড, কলি-২৬

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 29th September, 1962

২৯ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১২ আশ্বিন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

গান্ধী-জন্মতিথি

দোসরা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিবস। এক সময় তাঁর জীবনকালেই গান্ধীজন্মতিথি পালনের রীতিটি প্রবর্তিত হয়েছিল দেশ-সেবার একটি অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে। দেশ এবং গান্ধীজি ছিলেন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে একসূত্রে গাঁথা, একাত্মবোধক। "জাতির জনক" বিশেষণটি সে-কারণেই সার্থক। গান্ধীজির জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজভাবনা একালের বস্তুনিষ্ঠ লাভলোকসানের সাবধানী বিচারে অবাস্তব কিম্বা অকেজো গণ্য হতে পারে—বর্তমানে সম্ভবত তাই-ই হচ্ছে—, কিন্তু তাঁর জীবনসাধনার বিপুলতা, গতিবেগ এবং অতুলনীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য কোনক্রমেই বিস্মৃত হওয়া যায় না।

আজ স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত; স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পনের বৎসরে গান্ধীজির সংকল্প ও সাধনার অনেক অংশ ইতিহাসের চিরন্তন নিয়মেই পুরনো হয়েছে। বাস্তববিচারে এখন কূটকৌশলী রাজনীতিবিদের যুগ; গান্ধীজির মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল সংগ্রামের যুগে, দেশাত্মবোধের উদ্বোধনকার্যে। গান্ধীবাদের সঙ্গে জনচিত্তের এবং আমাদের রাষ্ট্রভাবনার যোগসূত্র এখনকার কালে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হলেও শিথিলপ্রায়। কিন্তু "জাতির জনকের" আবির্ভাব এবং আমাদের রাষ্ট্রনীতিক জীবনে তাঁর যুগান্তকারী প্রভাব কোনকালেই বিস্মৃত হওয়ার যোগ্য নয়।

"বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজী ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজী ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক গ্লাডস্টোন ম্যাটসীনি গারিবাল্ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এই জন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেন না, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে? আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল।...সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা দেখেছি...... মহাত্মা তাঁর সত্য প্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যে ক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কংগ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি......কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারিনে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।"

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রণাম জানিয়েছেন গান্ধীজির সুদুর্লভ সত্যানুসন্ধানী প্রতিভাকে, বিবৃত করেছেন গান্ধীজির যুগান্তকারী ভূমিকা। গান্ধীজির অর্থশাস্ত্রের অসঙ্গতি কোথায়, তাঁর অহিংসাধর্ম বাস্তবক্ষেত্রে কোথায় কতখানি প্রয়োগযোগ্য, এ সমস্ত তত্ত্ব ও নীতিগত প্রশ্নের আলোচনা থেকে গান্ধীজির জীবনসাধনার অসাধারণ প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় বলে মনে হয় না। সব মিলিয়ে তিনি এমন একটি মানুষ যাঁর শুভ আবির্ভাব পরাধীন ভারতের প্রাণসত্তাকে নবীন বিশ্বাসে, ব্যাকুলতায় উজ্জীবিত করেছে। উইনস্টন চার্চিলের "উলঙ্গ ফকির" পার্থিব সম্পদে সত্যিই ছিলেন নিঃস্ব; পরাধীন দরিদ্র দেশের অধিনায়ক, স্বাধীনতা যজ্ঞের ঋত্বিক শুধু তাঁর বিপুল আত্মপ্রত্যয়ের প্রেরণা বলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে রাজভয়, মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছেন। গান্ধীজির প্রতি বিরূপ, সংশয়বাদী অনেকে তাঁকে বলেছেন যে, তিনি মহাত্মা ব্যক্তি, রাজনীতিবিদের কলাকৌশল প্রয়োগে তিনি অক্ষম। গান্ধীজি এর জবাবে বলেছেন, তিনি আসলে রাজনীতিবিদই, তবে মহত্ত্ব অনুশীলনে আগ্রহী।

গান্ধীজির এই দ্বৈতরূপ—'সেইন্ট' ও পলিটিশ্যান, মহাত্মা এবং রাজনীতিবিদ, এর মধ্যে কোনটি বাস্তবক্ষেত্রে বলিষ্ঠতর রূপে প্রকাশিত সে বিচার ইতিহাসের এবং সে বিচার যে এখনও তীব্র বিতর্কমূলক তা বলা বাহুল্য। চূড়ান্ত বিচারে তিনি 'সেইন্ট' অথবা পলিটিশ্যান যাই হোন, গান্ধীজিকে বাদ দিলে, উপেক্ষা করলে, আধুনিক ভারতেতিহাসের মর্মোদ্ধার অসম্ভব। ইতিহাসের তাৎপর্য ছাড়াও "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ", এ-কথা পৃথিবীর কয়েকটি মাত্র মহামানব সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় এবং গান্ধীজি তাঁদের অন্যতম। তিনি খৃষ্টোপম, মৃত্যুপণে তাঁর মহাজীবনের বাণী অমর মহিমায় ভাস্বর। গান্ধীজির সামগ্রিক উত্তরাধিকারিত্ব অর্জন হয়তো আমাদের যুগে সকলেরই সাধ্যাতীত। তাঁর জীবনসাধনা আমাদের বস্তুসুখসন্ধানী নিত্যকার পৃথিবীতে এক মহা বিস্ময়, দুরধিগম্য রহস্য। সে সাধনায় আমরা অপারগ হতে পারি, সে-রহস্য উদ্ঘাটনে আমরা নিরুৎসাহ হতে পারি। কিন্তু যে মহাজীবনের দীপবর্তিকায় আমাদের যুগযুগান্তের অন্ধকার নিঃশেষে অপসারিত, তাঁর শুভ জন্মদিবসে প্রণতি জানানোয় আমরা যেন অনবহিত না হই।

কলিকাতার জন্য প্রস্তাবিত নূতন মন্ত্রীর কী- কী গুণ থাকা দরকার সে বিষয়ে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আলোচনা করেছেন।

বোধহয় বলতে ভুলে গেছেন যে ষাঁড়কে ঘায়েল করবার জন্য তাঁকে 'মাতাদর'-ও হতে হবে।

সদ্য প্রকাশিত

কমনওয়েলথের মৃত্যু

ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং

পূজা স্পেশাল

ম্যাকমিলান— "আমার প্রিয় শিকার হচ্ছে স্কটল্যাণ্ডের পাখি মারা।"

আয়ুব— "আমার হচ্ছে পুব-পাকিস্তানের ছাত্র মারা।"

Kutty

জাকর্তায় যা ঘটেছে ভারত স্বাধীন হবার পরে ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সেরূপ অপমানজনক ঘটনা এপর্যন্ত আর কোথাও ঘটেনি। চীনারা তিব্বত থেকে ভারতীয় প্রভাবের সমস্ত চিহ্ন উচ্ছেদ করেছে, তারপর তিব্বত পেরিয়ে ভারতীয় সীমানার মধ্যেই কয়েক সহস্র বর্গমাইল ভূমি দখল করে বসে আছে। ভারত সরকারের বোধশক্তির ত্রুটি এবং অন্যাবিধ দৌর্বল্য চীনাদের সহায়ক হয়েছে। কেবল বোধশক্তির ত্রুটি নয়, ন্যায়বুদ্ধির ত্রুটিও ভারত সরকারের কাজে দেখা গেছে। চীনারা তিব্বতের স্বাধীনতা ধ্বংস করল, সেটা ঠেকাবার শক্তি ভারতের ছিল কি ছিল না সেটা একটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ছিল না তাহলেও কিন্তু একথা বলা যায় না যে চীনাদের দুষ্কৃতির উপর "পঞ্চশীলের" ছাপ দিয়ে তাকে স্বীকৃতিদান করা ছাড়া ভারত সরকারের গত্যন্তর ছিল না। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভারতকে করতে হচ্ছে এবং আরো করতে হবে। কিন্তু সে যাই হোক, ভারত ও চীনের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের কারণ আছে। পাকিস্তানের সম্বন্ধেও "অ্যাগ্রেশনের" অভিযোগ করা যায়; করাচীতে ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের প্রতি দুর্ব্যবহারেরও নজির আছে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানী মনকষাকষির পরিপ্রেক্ষিতে সে-সব ঘটনা খুব আশ্চর্যকর নয় বা দুঃখজনক হলেও ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে তেমন অপমানকর বলে লোকের মনে হয় নি। কিন্তু জাকর্তার ঘটনা ভারতবাসীর পক্ষে যেমন তেমনি আশ্চর্যজনক অপমানকর। কারণ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের কোনো স্বার্থসংঘাত নেই, এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ভারত সরকার নিরবচ্ছিন্ন সহযোগ এবং সমর্থনের নীতি অনুসরণ করেই এসেছেন। তারপর এই কান্ড।

কেবল ভারতের সাধারণ মানুষ নয়, শুনো যাচ্ছে নূতন দিল্লীর কর্তারাও নাকি স্তম্ভিত হয়েছেন। তার অর্থ—ভারতের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার যে এরূপ একটা বিদ্বেষের ভাব জমে উঠেছে তার খবর আমাদের সরকারেরও জানা ছিল না। "এশিয়ান গেমস্" সম্পর্কিত বিতর্কে শ্রীসোন্ধির উক্তি উপলক্ষ্য করে যে-কান্ড করা হোল তার পিছনে ইন্দোনেশিয় সরকারের সমর্থন ও আনুকূল্য দুইই ছিল এটা স্বতঃসিদ্ধ এবং তার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের কূটনীতিকদের উস্কানী এবং সহযোগিতাও যে ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার অর্থ জাকর্তায় একটি ভারতবিদ্বেষী চক্র গড়ে উঠেছে। এরূপ কেন হোল সেটাও যেমন একটা জিজ্ঞাসা তেমনি এই অবস্থা সম্বন্ধে কর্তারা এতদিন অচেতন কেন ছিলেন সে প্রশ্নও দেশবাসী করতে পারে।

বৈদেশিকী

জাকর্তাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, তিনি দিল্লীতে এসেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ভারত সম্পর্কে কী ধরণের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পিছনে কী শক্তি কাজ করছে সে বিষয়ে তিনি এতোদিন ভারত সরকারকে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করেছেন কিনা তার অনুসন্ধান ও বিচার আবশ্যক। অবশ্য ত্রুটি যে কেবল রাষ্ট্রদূতের দিক থেকেই হয়েছে বা হতে পারে তা নয়। দিল্লী থেকে কর্তারা যে-চোখ দিয়ে দেখতে চান অনেক সময়েই রাষ্ট্রদূতদের নিজেদের চোখের চেয়ে দিল্লীর চোখ দিয়ে স্থানীয় অবস্থা দেখার অভ্যাস হয়ে যায়। দিল্লীতে যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরা যা-শুনলে খুসী হবেন সেইরকম খবর দেওয়ার দিকেই বেশি ঝোঁক হয়, দিল্লীর কর্তাদের থিওরি বা ব্যক্তিগত মানসিক টানের বিরুদ্ধে যে-সব খবর যায় সেগুলিকে চাপা দেওয়া হয় অথবা যথা সম্ভব কমসম করে জানানো হয়। ফলে প্রকৃত অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় না। অথবা যে-চিত্র পাওয়া যায় তারও বিকৃত ব্যাখ্যা দিল্লীর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা করতে পারেন স্ব স্ব থিওরি বা মানসিক ঝোঁক অনুসারে। চীন সম্পর্কে এই রকম দোতরফা গোলমাল হয়েছে অর্থাৎ চীনে অবস্থিত ভারতীয় প্রতিনিধিরা এবং দিল্লীর কর্তারা উভয়েই অনেক ব্যাপারে দেখেও দেখেন নি, অথবা যথাসময়ে দেখেন নি অথবা দেখলেও তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন নি বা করতে চান নি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের প্রভাব যে ক্রমশ কমে আসছে এরূপ আশংকা অনেকদিন থেকেই অনেকে অনুভব করেছেন কিন্তু "বৈদেশিক নীতির সাফল্যের" সরকারী ঢক্কানিনাদ সাধারণ মানুষকে গুলিয়ে দিয়েছে। "বৈদেশিক নীতি"র কথা বলতে ভারত সরকার কিরকমভাবে মার্কিন ও সোভিয়েট শক্তিজোটে থেকে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলেছেন কেবল তারই গুণগান শুনানো হয় এবং যথারীতি পার্লামেন্টে সরকার বাহবা পান। কিন্তু গায়ে-লাগা চীন? পাকিস্তান? যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এসের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারী বৈদেশিক নীতি কী সাফল্য লাভ করেছে? ক্ষুদ্র সিংহল, এমনকি যার সঙ্গে কোনো জাতিগত পার্থক্যই নেই সেই নেপালকে পর্যন্ত ভারত আপন করতে পারল না। বর্মায় ভারতের প্রতিষ্ঠা আজ কতটুকু? আর ইন্দোনেশিয়ায় কী অবস্থা তাতো দেখাই গেল।

শ্রীসোন্ধির কথাবার্তার দোষগুণ নিয়ে তর্ক চলতে পারে কিন্তু তিনি যে এই চাপা আগুনের বাইরে বেরিয়ে পড়ার উপলক্ষ সৃষ্টি করলেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কারণ তা না হলে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ আরো কতদিন অচেতন থাকত বলা যায় না এবং হয়ত আরো অনেক বেশি গুরুতর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আরো অনেক বেশি বিপজ্জনকভাবে এই আগুন বেরিয়ে পড়ত। এখনো হয়ত প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে যদি ভারত সরকার আত্মপ্রতারণা এবং কাপুরুষতার পথ ত্যাগ করেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, অর্থাৎ ভারতবর্ষ পৃথিবীর যে-অঞ্চলের অংশ, সেই অঞ্চলে ভারতের প্রতিষ্ঠা যে ক্ষীয়মাণ, এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করা এবং কেন এরূপ হোল তার কারণ বিশ্লেষণ করে কর্তব্য স্থির করা আবশ্যক। এর জন্য ভারত সরকারের নীতিগত ত্রুটি কতটা দায়ী, কতটা বা অন্য-বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ার ফলে, সেটা সুস্থচিত্তে বিচার করে দেখতে হবে। সকল বিষয়েই চীনকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিন্তা করে চলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না, কিন্তু যেখানে চীনা সরকার নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টিত, সেখানে চোখ বুজে বসে থাকাও কর্তব্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী অভিধানে যাকে বলে "স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স" নিজের দেশের বাইরে সেরূপ একটা "স্ফিয়ার" তৈরী করা বর্তমান যুগে কোনো রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, চীন সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঠিক সেই লক্ষ্য অনুসরণ করেই চলেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নূতন স্বাধীন দেশগুলি কারো "দাদাগিরি" পছন্দ করে না, সেইজন্যই ঐসব দেশে ভারতের মর্যাদা কমে যাচ্ছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাবও দেখা যাচ্ছে—একথা বলা ঠিক হবে না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, ভারতবর্ষকে যেখানে খাটো করা হচ্ছে সেখানে চীনাদের প্রভাব বাড়ছে। হতে পারে চীনাদের প্রতিও ঐসব দেশে ভিতরে ভিতরে একটা বিরোধী-ভাব ক্রমশ জমতে থাকবে, কিন্তু আপাতত যা দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে চীনের প্রভাব বিস্তার। তাতে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন আছে; যদিও চীন যে-ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে এবং চেষ্টা করে মোটামুটি সাফল্যও লাভ করেছে, সেই ধরনের প্রভাব বিস্তার ভারতবর্ষের লক্ষ্য না হতে পারে, লক্ষ্য না হওয়াই উচিত।

"দাদাগিরি" করার চেষ্টার কথা উঠেই না। আসলে চড় দেবার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা যেখানে থাকে, সেখানেই দাদাগিরি চলে, সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক। কিন্তু যেখানে

চড় দেবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই নেই, সেখানে দাদাগিরি ভাব দেখানোর মতো আহাম্মুকি আর কিছু হতে পারে না। ভারত সরকারের নীতি না হলেও সেই রকম আহাম্মুকি করার চেষ্টা কখনো কখনো আমাদের রাজপুরুষেরা হয়ত করে থাকবেন। কিন্তু এ-ত্রুটির সংশোধন সহজসাধ্য, কারণ দাদাগিরি যাদের উপর ফলাবার চেষ্টা করা হয়, তারা যদি না মানে, বরঞ্চ উল্টে মুখ-ভ্যাংচায়, তাহলে এ-রোগ অচিরেই সারতে বাধ্য। ভয় হচ্ছে এর উল্টোদিকটা নিয়ে। সেটা হচ্ছে ভয়, কাপুরুষের ভাব, অপমানিত হয়ে মাথা হেঁট করে থাকা এবং সেটাকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার লক্ষণ বলে জাহির করা।

ইন্দোনেশিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রকে অপমান করেছে, ইন্দোনেশীয় সরকার তার জন্য উপযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। তার জন্য কাটান্ ছাড়ান্ বা মার্-মার্, কাট্-কাট্ রব তোলার দরকার নেই। কিন্তু যারা পা দিয়ে লাথি মেরেছে, তাদের সঙ্গে কর-মর্দনের আগ্রহ দেখানোরও আবশ্যকতা নেই। ভারতবর্ষ যে বিরক্ত হয়েছে, সেটা কার্যত ভদ্রভাবে প্রকাশ করাও আবশ্যক। প্রেসিডেন্ট সুকর্ন একটি দ্বিতীয় বান্দুং কনফারেন্স করার উদ্যোগ করছেন। এই উদ্যোগের প্রতি ভারত সরকারের বিশেষ সহানুভূতি বা আগ্রহ নেই। প্রথম বান্দুং কনফারেন্সে যাদের সবচেয়ে লাভ হয়েছিল, সে হচ্ছে চীন। কিন্তু অনাগ্রহ সত্ত্বেও ভারত সরকার প্রস্তাবিত কনফারেন্সের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। ভারত সরকারের এখন কর্তব্য সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা।

এর জন্য সাহস দরকার। এক সময় ছিল, যখন ভারত সরকার দূরে থাকলে এই রকম কনফারেন্স করার উদ্যোগ অংকুরেই বিনষ্ট হত। ভারত সরকারের মনে যদি আজ সে-বিশ্বাস না থাকে, তবে বুঝতে হবে যে সরকারের বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাঁরাও সচেতন হয়েছেন। আজ হয়ত ভারত সরকার ভাবছেন যে ভারতবর্ষ সরে থাকলেও শ্রীসুকর্ণ বান্দুং কনফারেন্স করতে পারবেন, ভারতবর্ষ যোগ না দিলেও আর সকলে যোগ দেবে। হয়ত ভারত-বর্ষকে "একলা" করে দেবার জন্য চীনা সরকার শ্রীসুকর্ণকে ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে কনফারেন্স করার জন্যই উৎসাহিত করবেন। তাহলেও "একলা" প্রতিপন্ন হবার আশংকা থাকলেও—ভারত সরকারের উচিত শ্রীসুকর্ণের দ্বিতীয় বান্দুং কন-ফারেন্সের উদ্যোগ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা। কোনো এক সময়ে "একলা" হওয়ার জন্য জাতি মরবে না, কিন্তু আত্মসম্মান খোয়ালে তার জীবন সংশয় হবে।

২১।৯।৬২

দ্বিতীয় মত

রঞ্জন

বিগত সপ্তাহে তথাকথিত সাধু ভাষায় "দ্বিতীয় মত" লিখিবার জন্য কেহ কেহ বিস্মিত, এমন কি রুষ্ট, হইয়াছেন। যাঁহারা পুলকিত হইতেন তাঁহারা সকলেই স্বর্গে বা নরকে বিচরণ করিতেছেন, এমন বিশ্বাস করিতে হৃদয় বিদ্রোহ করে। অধিকাংশ লেখকই হয়ত চলতি ভাষার চলমান স্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত; আমিও কিছু "সাধু ভাষার" পদপ্রান্তে সর্বকালীন আত্ম-সমর্পণ করি নাই। তবু সহসা সন্দেহ জন্মিয়াছে, সাধুভাষাটাকে সত্যই কি চিরনির্বাসনে প্রেরণ করিতে হইবে? উহার কি আর কোনই প্রয়োজন নাই? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অধিকার আমার আছে কেননা একদা আমি একটি সংরক্ষণ-শীল দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের সংরক্ষিত দুর্গে পর্যন্ত আক্রমণ চালাইয়া-ছিলাম। চলতি ভাষায় লঘু সম্পাদকীয় লিখিয়াছিলাম। চলে নাই। সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রচণ্ড প্রতিপত্তি সত্ত্বেও দৈনিক সাংবাদিকতায় উহা এখনও নির্বাসিত বা শূদ্র। আমার নিরীক্ষা সার্থক হয় নাই। আমি সেই পত্রিকার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিবার পরমুহূর্তেই পরীক্ষাটি ত্যক্ত হয়। এখন সেখানে ব্যক্তিগত স্তম্ভে বা হাল্কা খবরে চলতি ভাষার সন্ধান হয়ত মাঝে মাঝে মিলিবে; কিন্তু সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় নৈব নৈব চ।

স্বীকার করিতে লজ্জা নাই, স্বীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় সেদিন সামান্য হৃদয়বিদীর্ণ হইয়াছিল। দৈনিক সাংবাদিকতা যদি প্রাত্যহিক বাক্যালাপের ভাষা পরিহার করিয়া কৃত্রিম রচনারীতির আশ্রয় লয় তাহা হইলে সংবাদপত্রের সঙ্গে সাধারণের সংযোগ কতখানি? পাঠক-সাধারণ যদি বলে, "তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি" তাহা হইলে দৈনিক কাগজ এত বিক্রয় হয় কেন? মদীয় বর্তমান সিদ্ধান্ত এই যে সাধুভাষা অধিকাংশের পক্ষে চলতি ভাষা অপেক্ষা সহজতর। আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহা আমার কাছে সহজ তাহা সর্বক্ষেত্রে অপরের কাছে সহজ নহে, যে যাহা আমার কাছে দুরূহ তাহা অপরের কাছে একান্তই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। ভাষার বেলায় ইহা হয়ত দ্বিগুণ সত্য; এবং এই সংরক্ষণশীলতাকে প্রতিক্রিয়াশীল পাপাচার বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ দেখি না।

*

স্পষ্টই বলি, অনেক কিছু যেমন শুধু সাধুভাষায়ই বলা যায়, এমন অনেক বক্তব্যও আছে যাহা চলতি ভাষায়ই ঠিক বলা হয়। কবির ভাষায়, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" আমি আরও এক ধাপ আগাইয়া যাইব। কথাটা সহজ হউক বা না হউক, চলতি ভাষাটা আসলে সহজ ভাষা নহে। না পাঠকের পক্ষে, না লেখকের। প্রমথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমি যে অরণি হইতে চাহি না তাহা ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই প্রকট হইয়াছে—না, আমি "ইতোমধ্যে" লিখিব না। মোদ্দা কথা এই যে, সাধুভাষা অনেকের কাছে আজিও অনেক বেশী সহজবোধ্য। স্মরণ রাখিতে হইবে, কেবল কলিকাতা বা নদীয়াই বাঙলা দেশ নহে।

সাধুভাষার এই স্থিতিক্ষমতা কিয়দংশে হিন্দু ধর্মের অবিনাশের সহিত তুলনীয়। প্রায় নয় শত বৎসর দেশটা শাসিত হইল মুসলমানদের দ্বারা; তারপর দুই শত বৎসর খৃষ্টানদের দ্বারা। তবু ভারত কীরূপে হিন্দু রহিয়া গেল? এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে দ্বিতীয় নাই। বাঙলা সাধু-ভাষাও কি অনুরূপ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে? তবে তাহা কোথা হইতে? বাঙলা সাহিত্য কি তবে ঊর্ধ্বমূল আর সাংবাদিকতা অবাঙশাখ? অসম্ভব নয়।

*

এমনিতেই ভাষাবিরোধের অন্ত নাই। হিন্দোৎসাহীরা ত জীবন প্রায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন না হিন্দিকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা না করিয়া, যদিও উহাদেরই এই ফলস্বরূপ ভারতরাষ্ট্র হয়ত এক থাকিবে না। তবু বাঙলাদেশ ত ভাগ হইয়াই গিয়াছে; এখন আবার কেন নূতন ভাষাবিতর্ক, যাহার ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামি "সবুজপত্রের" সঙ্গেই ঝরিয়া গিয়াছিল? কারণটা মূলত ভাষাগত নহে; চিন্তাগত। যখন শুধুই শুদ্ধভাষা লিখা হইত তখনও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন অভিযোগ করিয়াছিলেন যে বাঙলা গদ্য বড়ই ঢালাঢিলা; ইহার গঠন দৃঢ় নহে, ইহাতে ঋজুতা দুর্লভ।

পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও চলতি ভাষার দলে নাম লিখাইলেন, শেষ পর্যন্ত বোধ করি শরৎচন্দ্রও। মুহূর্তেকের জন্যও অস্বীকার করিব না যে বাঙলা গদ্য তাহাতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু স্বল্পক্ষম হস্তে যুগপৎ চিন্তা ও ভাষার ক্ষেত্রে ঢিলেমি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সংক্ষেপণে রুচি নাই। আতিশয্যে অরুচি নাই। শৈথিল্য প্রায় সর্বব্যাপ্ত। আমি শিক্ষিত বৈয়াকরণ নহি; কিন্তু ব্যাকরণ কিছু সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছি; লিখিবার সময় অন্ততঃ একটি অভিধান কাছাকাছি রাখি। তদ্যপি যদি ভ্রান্তি আমার রচনায় প্রায়শই প্রকট হয় তাহা অন্ততঃ প্রয়াসের অভাবের জন্য নহে। একান্তই অজ্ঞতার জন্য। যদি বলি অন্যান্য বহু লেখকে অনুরূপ প্রয়াস বহুলাংশে অনুপস্থিত তবে তাহা আমার আত্মম্ভরি-তার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত নহে।

*

সন্দেহ নাই যে রচনাধারা প্রধানতঃ চিন্তা-ধারাই সন্ততি। যেমন ভাবিবে, তেমন লিখিবে। সম্প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, উল্টাটাও সমান সত্য হইতে পারে। তোমার ভাষা যদি শিথিল ও অক্ষম হয় তাহা হইলে তোমার চিন্তাও হয়ত যদৃচ্ছ ঘোড়া না ছুটাইতে পারে। বাঙলা শুদ্ধ ও চলতি ভাষার মধ্যে কোনটা উত্তম আর কোনটা অধম তাহা নির্ণয় করিবার কোনও সর্বজন-গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি বা তৌলদণ্ড নাই। সাদামাটা নিয়মটা এই : যার কাজ যারে সাজে। অথবা যে কাজের যে যন্ত্র, যে পূজার যে মন্ত্র। হয়ত আমার বয়স বাড়িতেছে আর আমি প্রাচীনপন্থী হইতেছি; কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে লক্ষ্য করিলাম, শুদ্ধভাষার আকর্ষণ আমার কর্ণে অন্তত চিরতরে কর্পূরের মত উবিয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "গল্প-গুচ্ছে" আমার বক্তব্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে; অনেক অংশ চলতি ভাষায় লিখাই চলিত না।

আবার বলি, আমি পুরাতন ভাষায় পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তন আদৌ চাহি না। আমি নিজেই হয়ত পরবর্তী নিবন্ধ, তাহা যবেই লিখি, লিখিব অন্যতর গদ্যে। আমার বক্তব্য শুধু এই যে বাঙলা গদ্যের বিবর্তন সম্বন্ধে আমাদিগের সকলের অধিকতর সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতিমধ্যেই ইহা অনেক ভাবের বাহন; সকল চিন্তার নহে। বিজ্ঞানের কথাই ধরা যাউক; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু বা জগদানন্দ রায় আজিও আমরা উৎপাদন করি নাই। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন বা ভূদেব মুখো-পাধ্যায়ের মত লেখক আজ কোথায়? হইতে পারে যে আদর্শবাদের সেই আদিম আগ্রাসিতা আর নাই; হইতে পারে যে বাঙালী যে আজ আর শূন্য বাগবিভূতিতে বিমোহিত হয় না তাহা প্রগতিরই লক্ষণ। তথাপি ভাবিয়া দেখিতে হইবে আজিকার চিন্তকসম্প্রদায় তাঁহাদের বাহন ক্ষমতা হারাইয়াছেন কি না। তাঁহারা কি এমন ভাষায় কহিতে বা লিখিতে পারেন যাহা সর্বজনবোধগম্য? বাঙলা গদ্যের অধুনাতন শারীর ব্যাপকতায় আমার আপত্তি সামান্য। কিন্তু বিশল্যকরণী না থাকিলে গন্ধমাদনের মূল্য কী?

নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট

—শিবরাম চক্রবর্তী

সুঁড়িপথ দিয়েই পাকিস্তানে এলাম এবার। সুঁড়িপথ, মানে কিন্তু সুঁড়ির পথ নয়। চোলাই কারবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এ পথের। চোলাই না বলে চোরাই বললেও বলা যায় বরং। চোরা কারবারের সুরঙ্গই এটা।

এই সুঁড়িপথের কোন মাতাল সাক্ষী নেই। পাক ভারতের পাকা লোকরাই এর খবর রাখে। সুঁড়ি না বলে ঘুসুরির পথও বলা যায়। দুধারের সীমান্তরক্ষীদের দরাজ হাতে ঘুষ দিয়ে মালের আর যাত্রীর যাতায়াত।

হাওড়ার এলাকায় যেমন ঘুসুরি আছে এই পথেও তেমনি ঘুসুরির এলাকা দিয়ে হাওয়া।

সদর পথে যেতে গিয়ে যা নাকাল হয়েছিলাম এর আগে। পাকিস্তান থেকে পশ্চিম বাংলায় ফিরছিলাম তখন।

ট্রেনের কামরায় এক পাকিস্তানীর সঙ্গে আলাপ। সাধু ভদ্রলোক বাঙালী—সজ্জন অমায়িক।

কথায় কথায় তিনি শুধালেন, 'খাসা হাতঘড়িটা ত আপনার। পেলেন কোথায়?'

'আপনাদের পাকিস্তানেই পেয়েছি। আমেরিকান ঘড়ি। দামও খুব বেশী নয়।' আমি জানালাম।

'এতো খুব নামী ঘড়ি দেখছি। দামীও বটে। কত দিতে হয়েছে?'

'মাত্র পঞ্চাশ টাকা। খুব আশ্চর্য না?'

'স্মাগলড জিনিস, তাই এত সস্তা। যাহোক, আমাকে জানিয়ে ভালোই করলেন। আমি সি আই ডি'র লোক।'

'অ্যাঁ?' শুনেই আমি চমকে গেছি। সাধারণ একটা সুটকেস পাশে নিয়ে এতক্ষণ ধরে যে ভদ্রলোক আমার সামনে বসে সদালাপে আছেন তিনি যে......আমি তা ভাবতেই পারিনি।

'আপনি আমার দোস্ত যখন, আপনার কোন ভয় নেই। তবে ঘড়িটা আপনি হাতে না রেখে ট্যাঁকে গুঁজে ফেলুন। লুকিয়ে রাখাই ভালো।'

'কেন বলুন তো?' সন্ত্রস্ত কণ্ঠে শুধালাম।

'সামনের স্টেশন বেনাপোলে কাস্টমস্ চেকিং হবে কিনা, সেইজন্যে বলছিলাম।'

ভদ্রলোককে ভালোই বলতে হয়। ঘড়িটাকে ট্যাঁকস্থ করা গেল।

একটু বাদেই বেনারপোল এসে পড়ল। সুরু হল কাস্টমস্ চেকিং। আমাদের কামরায় একজন কাস্টমের কর্মচারী উঠতেই আমার সঙ্গীটি তার কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন গুজ গুজ করলেন।

লোকটা তারপর আর কোনদিকে না তাকিয়ে সটান আমার কাছে চলে এল।

'দেখি আপনার ট্যাঁক?' ট্যাঁক ট্যাঁক করল লোকটা।

তারপর আমার ট্যাঁক থেকে ঘড়িটা বার করেই না নিজের পকেটে পুরল বেমালুম। দ্বিতীয় কোন বাক্যব্যয় না করে অন্য দিকের চেকিং-এ চলে গেল সে। বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল ঘড়িটা।

সীমান্ত পার হয়ে আসবার পর মুখ খুলল আমার সঙ্গীটি, 'ডোনট ক্রাই দোস্তে! কতো ঘড়ি চাই আপনার?'

না আমি কাঁদিনি, অন্ততে প্রকাশ্যে নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম—'কেঁদে আর কী হবে? তবে অমন ঘড়িটা হাতছাড়া হয়ে গেল! আপনাকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছে।'

ট্যাঁক ট্যাঁক করল লোকটা

'না না। অমন কথা বলবেন না।'

'তা ছাড়া, আপনার কথায় ঘড়িটা আমার ট্যাঁকে রাখাটাই ভুল হয়েছিল। অমন করে লুকিয়ে না রাখলে, হাতে থাকলে বোধহয় এই হাঙ্গাম হত না। কব্জিতে রাখলে ওর কবজার মধ্যে পড়তে হত না আমায়।'

'কিন্তু আপনার দৌলতে আমার বিলকুল মাল যে বেঁচে গেল মশাই!'

'অমন ঘড়ি কি আর কোথাও পাবো! অন্তত আমাদের বাংলা মুলুকে ত নয়!' আবার আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

'কতো ঘড়ি চাই আপনার?' বলেই তিনি তাঁর সুটকেসটি ফাঁক করলেন—'আপনার পছন্দমত বেছে নিন এর থেকে।'

সুটকেস ভর্তি হাতঘড়ি। নানা মেকের, নানা সাইজের। নামী নামী দামী দামী ঘড়ি সব।

'আপনাকে ধরিয়ে না দিলে এগুলি আমার ধরা পড়ত যে! নিন, আপনার পছন্দসই যে-কোন একটা বেছে নিন।'

নামজাদা, দাম-জেয়াদা এমন একটা ঘড়ি আমি বেছে নিলাম। তারপরে তিনি আরেকটা ঘড়ি, সেটা লেডিজ, আমার হাতে তুলে দিলেন—'এটা আপনাকে আমি উপহার দিচ্ছি ফর্ মিসেস......মিসেস কী......?'

'মিসেস চকরবর্তি......কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এখনো জন্মাননি।'

'তাহলে এটা আপনার বান্ধবীর জন্য।'

নিতেই হল ঘড়িটা।

এবার আর সেই ঝামেলার মধ্যে না পড়ে সুঁড়ি পথ ধরেই এলাম।

ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যে এসে পড়েছি......

প্রায় সীমান্ত ঘেঁষেই বিক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশ জমেছিল। 'জঙ্গীশাহী নিপাত যাক', 'আয়ুব খান মুর্দাবাদ' ইত্যাদি মার্কা-মারা বড় বড় নিশানা উড়ছিল হাওয়ায়।

ধ্বজা তুলে ধরলাম

ছাত্ররা চৌমাথার উপরেই জেনারল আয়ুবের প্রতিকৃতি পোড়াবার আয়োজনে উদ্যোগী ছিল এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম......

'ভাইসব', উদাত্ত কণ্ঠে আমি বললাম: 'এ কী হচ্ছে তোমাদের? ইসলামবিরুদ্ধ এ কী করছ তোমরা? দাহকার্য হচ্ছে কাফের হিন্দুর। আমাদের পবিত্র ঐশ্লামিক মতে কবর দেওয়াই কি নিয়ম নয়?

আয়ুব খানকে লেলিহান অগ্নিশিখার সামনে থেকে সরিয়ে নিলাম। আগুনের আঁচ থেকে বাঁচিয়ে তুলে ধরলাম ওটাকে।

হাত তুলে বলল ওরা—'তাহলে এই ফোটো নিয়ে আমরা কী করব?'

'আর যাই করো, ভাইসব, কিছুতেই ওঁর সংকার কোরো না। তাহলে গোড়াতেই যে গলদ হবে। তার চেয়ে জনাবকে না হয় গোরেই দাও। সেই ভালো।'

'কিন্তু সেত এক হাঙ্গাম।' তারা বললে: 'দেদার মাটি খুঁড়তে হবে এখন।'

'খান সাহেবকে খান খান করে ফেললে কেমন হয়?' জানতে চাইলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—বিনাবাক্যব্যয়ে। বিনাবাক্য ব্যয়ে নয় ঠিক, হৈ হৈ রবেই বলা উচিত। চক্ষের নিমেষে জেনারেল আয়ুব টুকরো টুকরো হয়ে গেলেন।

'কিন্তু ভাইসব, এটাও তোমাদের ঠিক হল না। আমাদের মনে রাখতে হবে জেনারল আয়ুব না থাকলে আজ আমাদের কী দশা হত। তাঁর বিরাট অবদানের কথাও ভুললে আমাদের চলবে না। দুষমন ভারতের হাত থেকে কে আমাদের বাঁচিয়েছে? কে বাঁচাচ্ছে এখনও? ঐ জেনারল আয়ুব খাঁই'...আমি বলতে থাকি......

হ্যাঁ, আমিই! অবাক হবার কিছু নেই; আমরা বাঙালীরা ভয়ানক বিশ্বপ্রেমিক। যখন যে দেশে থাকি, যেখানেই দাঁড়াই, সেখানকার হয়ে লড়ি। আমরা প্রাদেশিক নই, প্রাদেশিক বলে কেউ আমাদের গাল দিতে পারবে না। এমনকি স্বাদেশিক বললেও ভুল হবে। আমরা সর্বদেশিক।

বাঙালীর এই ধারা। আমরা ভারী ভাবপ্রবণ। অভাবে পড়ে একটু মুষড়ে থাকলেও, ভাবের ঘোরে আমরা কী না করতে পারি! (ভাবের বশে এমুলুকেও কি আমরা প্রায় দুশো বিঘে জমি ভূদান করে বসিনি? তাহলেই বুঝুন!) আমাদের যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যাই সেখানে তাই। মার্কিন মদতের ঢের আগেই কি একদা আমাদের সুরেশ বিশ্বাস (প্রথম বাঙালী কর্ণেল) আমেরিকার হয়ে লড়েনি? লাল মদ চাখবার আগেই কি বাংলার দুলালরা রুশের ধ্বজা ধরেনি?

কাজেই কাউকে না পেয়ে, তখন আমাকেই, একা আমাকেই আয়ুব খানের হয়ে দাঁড়াতে হল। পাকিস্তানের ধ্বজা তুলে ধরলাম।

আর বলব কি, এমন যে বাচাল আমি যে কিনা বক্তৃতা দিতে হলেই মূক হয়ে যায় সেই আমিই কেমন মুখর হয়ে উঠলাম। কবি বলেছেন মিছে না, তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে শকতি!

'জেনারল আয়ুব না থাকলে আমাদের পাকিস্তান কি এতদিন থাকত?...' আস্ত থাকত অ্যাদ্দিন? আমার পতাকা পতপত করে উড়তে থাকে; 'কবে ভারতের খর্পরে চলে যেত। পাকিস্তানের ল্যাজা মুড়ো দু-টুকরোই হিন্দুস্থানের গর্ভে গিয়ে এক হয়ে যেত কবে......।'

'কক্ষনো না!' জনৈক মুসলিম ছাত্র তাঁর প্রতিবাদ জানায়: 'ভারত সেরকম পররাজ্য-লোলুপ নয়। কোনোদিন না।'

'কে বললে? ভাইসব, একবার কাশ্মীরের দিকে তাকাও দেখি। একবার গোয়ার

ডিসাতেই তাদের আটকাবে

দশ্যটা দ্যাখো। তাহলেই বুঝবে, মুসলমান ভারত কদ্দুর গোঁয়ার হতে পারে. ..'

কারো মুখে আর কথাটি নেই।

'হায়দরাবাদের কথা ভাবো তোমরা একবার। অত বড় নিজামশাহী, অমন যে রাজাকার বাহিনী, ভারতীয় ফৌজ গিয়ে হানা দিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব ফৌত! তারপর গোয়া। তার পিছনে তামাম দুনিয়া, ন্যাটো, সিয়াটো, স্পেন, ইংলণ্ড, মায় মার্কিন পর্যন্ত। ঘাটিতে ঘাটিতে সুসজ্জিত সশস্ত্র পর্তুগীজ বাহিনী, কিন্তু কি হল? এত করেও গোয়া খোয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে দখল করে নিল গোয়া.....'

আমার তুবড়ি ফুটতে থাকে, বোমা ফাটতে থাকে......

'আজ যদি ভারত তার হাজার হাজার ট্যাঙ্ক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ি, রণতরী বিমানবহর আর লাখ লাখ সৈন্য নিয়ে পাকিস্তানে এসে হানা দেয় তাহলে আমরা কি তাদের রুখতে পারব? মানে, আয়ুব খাঁর জঙ্গীশাহী বাদ দিয়ে কি তা রোখা যাবে? আজ যদি জেনারেল আয়ুব তিত বিরক্ত হয়ে তাঁর পাঠান সৈন্যদের নিয়ে এখান থেকে সরে পড়েন তো ভারতের হাত থেকে কে আমাদের বাঁচাবে? কে ঠেকাবে তাদের?...

দারুণ প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়ে আমি একটু দম নিই।

আমজনতার প্রান্ত থেকে একটি গ্রাম্য লোক উঠে দাঁড়ায়, মিহি গলায় বলে:

'জনাব আমাদের কাস্টমসের খবর রাখেন না। ডিসাতেই তাদের আটকাবে।'

পৃথিবী

অজিত দত্ত

আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনেছি,
এই পৃথিবী আমার।

এই পৃথিবীর মাটি জল আর পাথর
হিংসা আর ভালবাসা,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর ভয়,
সব সমেত এই পৃথিবীর জন্য
আমি যথেষ্ট দাম দিয়েছি,
খুব চড়া দাম দিয়েছি,
কত বড় দাম দিয়েছি
তা তোমরা জান না।

পৃথিবী আমার ক্রীতদাসী,
পৃথিবী আমার ভোগসঙ্গিনী,
পৃথিবী আমার নিত্যকিংকরী,
একে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

কারণ, পৃথিবীকে আমি কিনেছি,
আমি অনেক দাম দিয়ে কিনেছি,
কত বেশি দাম দিয়েছি,
কত বড় দাম দিয়েছি
তা তোমরা জান না॥

শব্দের পাথরে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জলের উপরে ঘুরে ঘুরে
জলের উপরে ঘুরে ঘুরে
ছোঁ মেরে মাছরাঙা ফের ফিরে গেল বৃক্ষের শাখায়।
ঠোঁটের ভিতরে তার ছোট্ট একটা মাছ ছিল।
কে জানে মাছরাঙা খুব সুখী কিনা।

রোদ্দুরে ভীষণ পুড়ে পুড়ে
রোদ্দুরে ভীষণ পুড়ে পুড়ে
সন্ধ্যায় অনন্তলাল ফিরেছে অভ্যস্ত বিছানায়।
মস্তিষ্কে তখনও তার রূপকথার গাছ ছিল;
গাছের উপরে ছিল হিরামন পাখি।
কে জানে অনন্তলাল সুখী কিনা।

শব্দের পাথরে মাথা খুঁড়ে
শব্দের পাথরে মাথা খুঁড়ে
কেউ কি কখনও মাছ, বৃক্ষ কিংবা পাখির কঙ্কাল পেয়ে যায়?

ভাবতেই ভীষণ হাসি পাচ্ছিল।

শারদীয়া দুর্গা পূজায় লোকায়ত ধর্মের প্রভাব

অমিতা রায়

আশ্বিন-কার্তিক মাসে বাংলাদেশের সর্বত্র যে মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গার বন্দনা করা হয় তার পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যা নিয়ে এই পর্যন্ত অনেক আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি হয়েছে। কিন্তু দুর্গার বৈদিক বা পৌরাণিক ব্যাখ্যা তার সবটুকু পরিচয় বহন করে না। কারণ, এইসব পূজাচারের অন্তরালে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের প্রধানতম ও আদিমতম ভাবনা কল্পনা ও আদিমানবের অনেক ভয়ভক্তি বিশ্বাস, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি আত্ম-গোপন করে আছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর অনুশাসন সত্ত্বেও বৈদিক ও পৌরাণিক দুর্গা সেই সব অবৈদিক অব্রাহ্মণ্য পরিচয় একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। কাজেই শুধুমাত্র পৌরাণিক বা বৈদিক পরিচয় দেবীর খণ্ডিত রূপ মাত্র। বস্তুত প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্ম গত জীবনেতিহাস রচনা করা খুব সহজ নয়। কারণ, যে ধর্ম, কর্ম, ভয়, ভাবনা সংস্কারকে উৎস করে ধর্মজীবনের সুদীর্ঘ ইতিহাস রচিত হয়েছে তা কোনো একটি বিশেষ শ্রেণী-নির্ভর নয়। বাঙালীর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিবর্তন থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আর্যেতর ধর্মসংস্কৃতি বাংলাদেশে কখনো এককভাবে প্রবাহিত হতে পারেনি। একই খাতে প্রবাহিত অবৈদিক প্রাত্যধর্মের স্রোত ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানে পুষ্ট দেবদেবীর রূপ কল্পনায় ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অনেক পরিবর্তন এনেছে। বস্তুত বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই আর্য-অনার্য সমন্বয় ক্রিয়া খুবই গভীরে বিস্তৃত। আমাদের শারদীয়া দুর্গা পূজা ধর্মকর্মগত জীবনের এই জটিল সমন্বয়ের সুস্পষ্ট একটি রূপ। কাজেই শ্রেণীগত, কৌমগত বিশ্বাস ও চেতনা বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের প্রবল বাধা বিরোধ সত্ত্বেও শারদীয়া দুর্গা পূজায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কালক্রমে এই সব আচারানুষ্ঠান কোথাও বিবর্তিত, কোথাও বা অবিকৃতভাবে মূল ধর্ম স্রোতের অংগীভূত হয়ে যায়। সময় সময় এমন বিবর্তন তাদের ঘটে যে, কোথায় এবং কিভাবে এই বিবর্তন ঘটেছিল সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা করা সম্ভব হয় না। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধ্যানে পুষ্ট মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা আদিম মানবের ভয়, ভীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও আচারানু-ষ্ঠানের সংগে গভীর আত্মীয়তায় আবদ্ধ। কাজেই শারদীয়া দুর্গোৎসবে লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা বাঙালীর ধর্মসংস্কৃতির জীবনেতিহাস রচনায় কিছু নূতন আলোকপাত করতে সাহায্য করবে। বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠানে লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সাধারণত দুটি স্রোত ধারায় এসে মেশে—একটি কৃষিনির্ভর জীবনের কামনা বাসনা কেন্দ্র করে, অন্যটি আদিমতম বিশ্বাস ভয়, ভীতি, সংস্কারকে আশ্রয় করে।

দেবী পূজায় শারদোৎসবের স্থান খুব প্রাচীন নয়, যদিও শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রাচীনত্ব আলোচনায় ঐতিহাসিক প্রমাণ সর্বত্র সুলভ ও সহজসাধ্য নয়। কারণ মাটিতে যার তৈরী মাটিতেই তার শেষ; প্রত্নতাত্ত্বিক সেখানে নীরব। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক থেকে উত্তর ভারতের নানা জায়গায় মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার প্রচুর প্রত্নানদর্শন সুলভ। কিন্তু তারও বহু আগে থেকে দুর্গার উল্লেখ দুর্লভ নয় অবশ্য অন্য নামে ও রূপে। তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে এবং বাজসনেয় সংহিতায় যে অম্বিকার উল্লেখ আছে সে অম্বিকা বোধ হয় পূজিতা হতেন, অন্তত তার ঋতু আশ্রয় ছিল শরৎ ঋতু, কারণ কাঠক সংহিতায় তাঁকে স্পষ্টত বলা হয়েছে "শরদৈব অম্বিকা", মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী গ্রন্থে 'ক্ষণিক' মৃন্ময়ী মূর্তি চণ্ডীর উল্লেখ ও তার পূজার কথা বর্ণনা করা

হয়েছে। এই গ্রন্থের মতে শরৎ কালেই সুরথ ও সমাধি মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর পুজো ক'রেছিলেন। বাংলাদেশের প্রবাদ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর যে বোধন পুজো করেছিলেন তা অকাল বোধন ও পুজো। যথার্থ পুজোর কাল বসন্তকাল। এখন বাসন্তী পুজোই প্রকৃত দেবী পুজো। দুর্গা পুজোর মন্ত্রেও আছে—"রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।" কৃত্তিবাসও বলেছেন—"শ্রীরাম আপনি কয় বসন্ত শুদ্ধ সময় শরৎ অকাল এ পুজোর।" কৃত্তিবাসের আগে থেকে বাংলাদেশে শরৎকালে দুর্গা পুজোর প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ বালক, জীকন ও জিমূতবাহন থেকে আরম্ভ করে রঘুনন্দন পর্যন্ত বাংলার প্রায় সমস্ত স্মৃতিকারই শরৎকালে বাঙ্গালীর দুর্গা পুজোর কথা বলে গেছেন, কিন্তু দেবীভাগবতে শরৎ ও বসন্তকাল উভয়কালের পুজোই প্রসিদ্ধ বলা হয়েছে।

কেন এবং কি উপায়ে বাসন্তী পুজোর প্রচলন ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে শারদোৎসব বাঙ্গালী জাতির মূল উৎসবের কেন্দ্র হয়ে উঠল? তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের জানা নেই। তবে গ্রাম্য কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সকল উৎসবানন্দই কৃষিজীবনের ঐশ্বর্য্যাড়ম্বের এবং কৃষিজীবি সমাজের অবসরের সঙ্গে জড়িত। শরৎকাল থেকেই বাংলাদেশে শস্য ঋতুর আরম্ভ এবং সেই ঋতুর শেষ প্রকৃতপক্ষে বসন্তের শেষে, আষাঢ়-শ্রাবণের ঘনবর্ষায় ক্ষেত শস্য ধারণ করবার জন্য যখন প্রস্তুত হয় বাঙ্গালী কৃষকের দিন তখন কাটে মাঠে মাঠে, তাদের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের প্রথম ফসল দেখা দেয় আশ্বিন কার্তিক মাসে, শরতের সোনার রোদে সেই ঐশ্বর্য সম্ভারের সম্ভাবনা ধানের শিষে উঁকি দেয়। কৃষিনির্ভর জীবনে তখন কিছুকালের বিরতি: এই বিরতি একেবারে অগ্রহায়ণ, পৌষ নাগাদ। এই বিরতির সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য কৃষিকেন্দ্রিক জীবন নানারকম আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়। সেই উপলক্ষে কোনো এক সময় দুর্গা পুজো বাঙ্গালীর শারদোৎসবে রূপায়িত হয়েছে তাতে সন্দেহ কি? শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় দুর্গা পুজোকে প্রধানতই উৎসবরূপে দেখেছেন, তিনি মনে করেন সবটুকুই শরৎকালীন নববর্ষের উৎসব। তাঁর মতে শরৎ ঋতু এক সময় বৎসরের প্রথম ঋতু ছিল। কারণ যাই হোক বাঙ্গালীর দুর্গা পুজোর মূলে উৎসব প্রকৃতি যে অনেকখানি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত এই সব পুজোচারকে কেন্দ্র করেই কৃষিজীবি সমাজের সকল উৎসব। তাছাড়া দেবী কল্পনার শস্য কল্পনার যোগ তো খুবই নিবিড়: কাজেই শস্য ঋতুর সূচনাতে শস্য লক্ষ্মীর পুজো আরম্ভ হওয়াই তো স্বাভাবিক। সেই কারণেই বোধ করি শরৎ থেকে বসন্ত পর্যন্ত বাংলাদেশে দেবীপুজোর কাল; অম্বিকা থেকে আরম্ভ হয়ে অন্নপূর্ণা পুজোয় তার শেষ।—কাজেই শারদীয়া দুর্গার বৈদিক বা পৌরাণিক যত পরিচয়ই থাকুক না কেন, মূলত দেবী কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের একান্ত আপনজন—কখনো মাতৃরূপিণী, কখনো বা স্নেহের দুলালী কন্যারূপিণী। আজও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দেবীর আগমনকে কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করা হয় "উমা আইল—উমা আইল পড়ে গেল সাড়া" কিন্তু কন্যা, প্রিয়া, জননী রূপে যেখানে দেবীর পরিচয়, শ্বশুর গৃহ থেকে দেবীর সপরিবারে পিতৃগৃহে আসা যেখানে মূল গল্পের উদ্দেশ্য,—সেখানে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অসুরনাশিনী চণ্ডীর রূপ কিছুটা আকস্মিক বলে মনে হয়। বস্তুত বাংলাদেশের শারদোৎসবে দেবীর মহিষাসুরমর্দিনীর রূপটি গৃহীত হবার পিছনে

কারণ যাই থাক ব্রাহ্মণ্য ধ্যানপুষ্ট দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনীর আদি ও অকৃত্রিম রূপটি মার্কণ্ডেয় পুরাণে ধরা পড়েছে—

"ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।"

প্রাণধারক দেবী শাকম্ভরী সমগ্র জগতের ক্ষুধা নিবারণ করেন শাকের সাহায্যে; শাক অর্থ এখানে শস্য। দেবীর আর এক নাম তাই অন্নপূর্ণা। কাজেই দেবী শক্তির মূলে সার্থকতা কৃষি জীবনের শস্যলক্ষ্মী রূপে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। শারদোৎসবের শস্যলক্ষ্মী দেবীর পরিচয় লৌকিক ধর্মাচারের মধ্যে নানাভাবে নিহিত আছে।

নবপত্রিকা পূজা দুর্গা পূজোর প্রারম্ভিক ক্রিয়া। একটি সপত্র কলা গাছের কাঁচ চাবার অঙ্গে কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান বেঁধে দিয়ে লাল পাড় শাড়ি পরান হয়। বেল গাছের নীচে তার আবাহন হয়। সিঁদুরে চর্চিত এই কলা-বউটিকে গণেশ-স্ত্রী বলে মনে করার বিধি কোথাও কোথাও প্রচলিত। মনে হয় নবপত্রিকার সঙ্গে ব্যান্তের দেবতা গণেশের সম্পর্ক আকস্মিক নয়। কৃষিজীবনের কামনা-বাসনা কেন্দ্র করেই এই সব ক্রিয়া কর্মের উদ্ভব। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ নবপত্রিকাকে দুর্গার বৃক্ষ অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপের পরিচায়ক বলে মনে করেন ("ওঁ হ্রীং নবপত্রিকা বাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ")। ব্রাহ্মণ্য দেবী দুর্গারূপিণীর বৃক্ষরূপে কল্পনা আদিমতম বৃক্ষপূজোর নামান্তর এবং তা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বীকৃতির সীমানায়। অন্য অর্থে এমন কথাও মনে করার কারণ আছে যে, কলা, হলুদ, বেল, দাড়িম, অশোক, ধান ফলপ্রসূ বৃক্ষ, কলাবউ পূজো সুশস্য কামনায় প্রজনন শক্তির পূজো—। কাজেই নবপত্রিকা পূজোচারের মধ্যে কৃষি প্রধান সমাজে অনুষ্ঠিত ধর্মাচারের আদি ও অকৃত্রিম রূপটি খুঁজে পাওয়া যায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে গণেশ-চতুর্থী ব্রতের কলাবউর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কলাবউর গৌরীরূপে আবির্ভাব একান্তই শস্য প্রাচুর্যের ও সমৃদ্ধির দেবী রূপে। বাংলার গ্রামীণ জীবনে নারী সমাজে শস্য-বধূর পূজোর বিধি আজও অব্যাহত। পরবর্তীকালে দুর্গাপূজোবিধিতে নবপত্রিকার বিভিন্ন পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে, যেমন রম্ভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী, কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা ইত্যাদি। শস্য বধূর শস্যসমূহের সঙ্গে দুর্গার পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ্য রূপের সংমিশ্রণে, আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে আদিমকৃষি কেন্দ্রিক ধর্মের সমন্বয়ের একটা সচেতন চেষ্টা দেখা যায়। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর সমাজে শস্য দেবী আদি মাতা

দুর্গা আদি মাতারই অন্যরূপ। নব পত্রিকা ছাড়া শুভানুষ্ঠানের সূচনায় পঞ্চপল্লব, ধান্য, দূর্বা, দধি, আতপ চাল প্রভৃতি সহকারে দেবী ঘট স্থাপনা ও ঘটের উপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন ও আলপনা প্রভৃতি মূলত গ্রামীণ কৃষিজীবি সমাজের ধর্মানুষ্ঠান, বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে শারদীয়া দুর্গাপুজোয় গ্রামীণ কৃষি-জীবি সমাজের ভয় বিশ্বাস অত্যন্ত সক্রিয়। কিন্তু শুধুমাত্র কৃষি নির্ভর আচার অনুষ্ঠানই নয়, এইসব পূজোচারের অন্তরালে আদি মানবের ভয়, ভাবনা বিশ্বাস, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠানের স্মৃতি বিদ্যমান।

ধর্মীয় ইতিহাস বিবর্তনের কিছু মূল নিয়ম আছে। যেমন হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির ইতিহাসে আমরা দেখি প্রাক বিভক্ত আদিম ধর্মের সংগে যখন আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাত ঘটে, তখন খানিকটা জৈবিক কারণে এই দুই ভিন্ন স্রোতকে সংহত ও সমন্বিত করার চেষ্টা চলে এবং এই সমন্বয়ের ফলে নূতন দেবদেবীর সৃষ্টি ও রূপ কল্পনার এবং কিছু কিছু নূতন ক্রিয়া কর্মের উদ্ভব ঘটে। যেমন গাছ, পাথর, জন্তু পূজো, নানারকম মাতৃতন্ত্রীয় দেবীর পূজো প্রাক বৈদিক আদিবাসীদের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। কালক্রমে কিছুটা বিবর্তিত রূপে এইসব পূজোচার পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত হয়। মহাভারতের পরিশিষ্ট-রূপে পরিগণিত খিল হরিবংশে যে দেবী দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ তখন পর্যন্ত মদ্য মাংসবলিপ্রিয়া দেবী শবর, পুলিন্দ, বর্বর প্রভৃতি আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত হতেন। পর্বত কন্দরে, নদীর ধারে, ঘন জঙ্গলে, শবর পুলিন্দদের বাস। তারা অপর্ণার পূজো করে। এই অপর্ণা ভীষণা যৌবনবতী নারী, সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী। তিনিই আবার অন্যত্র পর্ণশবরী। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, অপূর্ব যৌবন মন্ডিতা, বৃক্ষ সজ্জায় সজ্জিতা শবরআরাধ্যা পর্ণশবরী রোগ, শোক, মারী সংহারিকা। কালক্রমে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে তার স্থান হয় "সর্ব শবরানাম ভগবতী" রূপে। কালিকা পুরাণে ও কালবিবেক গ্রন্থে শাবরোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। শারদীয়া দশমী তিথিতে অর্ধ উলঙ্গ নরনারী সর্বাঙ্গে কাদা মেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী সহকারে যৌনলীলা কীর্তনে মত্ত হন। শাবরোৎসবে মত্ত নরনারীর দৃঢ় ধারণা এর অন্যথায় দেবী ক্রুদ্ধা হন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ভগিনী ও মাতৃ স্থানীয়া বা শাক্তধর্মে অদীক্ষিতা নারীদের সম্মুখে এই উৎসব করার স্পষ্ট নিষেধ আছে। বাংলাদেশের গ্রামে শারদীয়া বিজয়া তিথিতে দেবী বিসর্জনের পরে কাদা খেলা, অশ্লীল গীতের প্রচলন কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল। এখনও সমস্ত ভারতবর্ষে দশহরা ও বিসর্জন উৎসব উপলক্ষ করে কামোত্তেজক অঙ্গভঙ্গী সহকারে গীত বাদ্যের মধ্য দিয়ে যে ধরনের মিছিল যাত্রার ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে শাবরোৎসবে মত্ত নরনারীর ছায়া সুস্পষ্ট। তাছাড়া পূর্ব বাংলার কোথাও কোথাও বিসর্জনের শেষে নদীর ধার থেকে ঘাস বা জলীয় গুল্ম ইত্যাদি তুলে আনবার বিধি প্রচলিত। শ্বেত অপরাজিতা ফুলের লতায় সেই গুল্ম হরিদ্রাসিঞ্চিত সুতোয় হাতের বাজুতে সবাই বেঁধে নেয়; সাধারণ বিশ্বাস এই যে, এতে ভগবতী তুষ্টা হন। এই সমস্ত লোকাচারের সংগে শাবরোৎসবের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাই স্বাভাবিক। মাতৃতন্ত্রীয় সমাজের মনন কল্পনায় পুষ্ট পর্ণশবরী,

অপর্ণা, গিরিকান্তারময়ী বিন্ধ্যবাসিনী, শাকম্ভরী প্রভৃতি নারীশক্তি আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিভিন্ন শক্তিরূপিণীতে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীহট্ট জেলার একটি গ্রামে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গাপূজায় দেবীর চিরুনি ও গন্ধদ্রব্য সমন্বিত মাথাঘষা দ্রব্যাদির সঙ্গে পাখির পালকে তৈরী একটি সুদৃশ্য শিরোস্ত্রাণ উৎসর্গ করার বিধি প্রচলিত। পাখির পালকে তৈরী এই শিরোস্ত্রাণের প্রকৃত অর্থ বোধ করি দেবীর বরাহ পুরাণে উল্লেখিত 'কিরাতিনী' নামের মধ্যে পাওয়া যায়। এই কিরাতিনীর সঙ্গে যদি কিরাত জাতির যোগাযোগ থাকে, তবে দেবীকে পাখির পালকে সজ্জিত করার কারণ বোঝা সহজ।

এই স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার স্বরূপ বুঝবার জন্য আরো দুচারটে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে দেবী চরিত্রে অসুর হত্যাকারিণী মূর্তির আবির্ভাব যে রকম আকস্মিক বলে মনে হয়, আদিম অনার্য ধর্ম সংস্কৃতির ইতিহাস জানা থাকলে দেবী-র এই রূপের অর্থ এত আকস্মিক মনে হবে না। বিষ্ণু ধর্মোত্তরম মহিষাসুর মর্দিনীর বর্ণনায় বলেছেন, দেবী দশহাতে শূল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, বাণ, শক্তি; বজ্র; অভয়, ডমরু, নাগপাশ, খেটক, পরশু; অঙ্কুশ, ধনু, ঘণ্টা, ধ্বজা, গদা; আয়না মুদ্গর ধরে আছেন। পায়ের নীচে ছিন্নমস্তক মহিষাসুর, এই মহিষরূপ অসুরকে? দেবগণের দেহের তেজে তৈরী জ্যোতির্ময়ী মহাদেবী মহিষাসুরমর্দিনীর এত আয়োজন কাকে হত্যা করার জন্যে? তবে কি মহিষ অনার্য ধর্ম প্রতীক? তবে কি দেবীর এই রূপ কল্পনা টটেম কেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধ ঘোষণা করে? দেবীর যুদ্ধ যাত্রা কি তবে সেই-সব আদি মানুষের বিরুদ্ধে যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতির বাইরে মহিষরূপে টটেমের পূজক? প্রাক্-আর্য আদিবাসীরা যে বিনা বাধায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মকর্মের আদর্শ গ্রহণ করেনি এবং চলমান আর্য প্রবাহে নিজেদের ধারা মিলাবার আগে প্রবল একটা সংঘর্ষের ইতিহাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপে বোধ করি তারই প্রতীকরূপ। বাংলাদেশে খৃষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে আর্য ধর্ম প্রবাহ প্রবল হয়; মহিষাসুর মর্দিনী পূজার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সেই সময় থেকেই সহজলভ্য হয়েছে।

সিংহবাহিনী দেবীর বাহন সিংহের সঙ্গে আদিম সমাজে অনুষ্ঠিত জটিল ও সুপ্রাচীন ধর্মকর্মময়, সংস্কৃতি ও পূজাচারের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মানুষ্ঠানে পশু বা পক্ষী লাঞ্ছিত ধ্বজাপূজা প্রচলিত ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত এইসব পশুশক্তি পূজায় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি খুব শ্রদ্ধিতচিত্ত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুচ্ছ তাড়নায় এইসব পূজাচার আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেও পৌরাণিক দেবদেবীর রূপ কল্পনায় তাদের উপস্থিতি একেবারে অস্বীকৃত হয়নি। ফলে ব্রাহ্মণ্য দেবী দুর্গার কাছে পশুরূপী দেবতা সিংহ। পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলেও দেবীর সঙ্গে সঙ্গে দেবীর বাহনও আর্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পূজা লাভ করে আসছে।

কাজেই কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচারের জন্যই হোক বা আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও অনার্য ধর্ম সমন্বয়ের জন্যই হোক, বৈদিক-পৌরাণিক ধ্যানে পুষ্ট দুর্গোৎসবে নানারকম লৌকিক স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে। এর সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ করা এখন সম্ভব নয়, দু চারটে উদাহরণ দিয়ে এর অন্তর্নিহিত অর্থটুকু ধরার চেষ্টা করা গেল মাত্র।

ট্রামে বাসে

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি সি সেন নাকি বলিয়াছেন যে, পূজার পরেই তিনি কলিকাতার জন্য একজন নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে—'তিনি আমার চোখ-কানের কাজ করবেন।' বিশু-খুড়ো বলিলেন—"মুখ্যমন্ত্রী মশাই অন্যত্র বলেছেন—'গণ-সংযোগে আমার চোখ খুলে গেছে।' নূতন রাষ্ট্রমন্ত্রী কি সেন মশাইর চোখে কলকাতা দেখতে পাবেন? বাজারে রটনা, মন্ত্রীদের চোখে নাকি সহজেই ছানি পড়ে; আর লোকে বলে, যা রটে, তা খানিক ত বটেই। তাই সেন মশাইর সদিচ্ছা সত্ত্বেও কলকাতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হতে পারছিনে।"

কোন কোন মহলে অভিযোগ করা হইতেছে যে, বিরোধীরা নাকি মুখ্যমন্ত্রীর আম-দরবার বানচাল করার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য নাকি প্রচার করিতেছেন—আম-দরবারে গেলেই নগদ টাকা পাওয়া যায়, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়, হাসপাতালে সীট মিলে— —। —"শুধু গরু হারালে যে গরু খুঁজে পাওয়া যায়, এই কথাটাই তাঁরা চেপে গেছেন"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

বুয়েনস্ আয়ার্সে শুনিলাম, বাতিল ট্রাম গাড়িগুলিকে ট্রাম-বাড়িতে রূপান্তরিত করা হইতেছে—বসবাসের বাড়ি, ইস্কুল বাড়ি ইত্যাদি। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কলকাতায় এই ব্যবস্থা চালু হলে আমরা বিশুখুড়োর জন্য একখানা ট্রাম-বাড়ির ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু তা কি আর এখানে হবার গো? পুড়েটুড়ে কি আর ট্রাম একখানাও থাকবে?"

কলিকাতার কলের জলে সাপ বাহির হইয়াছে বলিয়া সংবাদ বাহির হয়। পরে শোনা গেল সাপ নয়, কেঁচো অর্থাৎ সাপ খুঁড়িতে কেঁচো! এখন আবার শুনিতেছি ওটা কেঁচো নয়, সাপ। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বিতর্ক আর না বাড়িয়ে, ওটার নাম 'সাকেঁচো' (হাঁস জারুর মতো) রাখা যায় না?"

পূজার প্রাক্কালে নাকি এক হাজার-সমাজবিরোধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"বোনাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও যাঁরা শাড়ি-ব্লাউজের ফর্দ নিয়ে মাতামাতি করেন এবং কিছু বলতে গেলে 'আমার মরণ নেই' বলে চোখের জলের হাইড্রোজেন বম্ ছেড়ে জীবনযাত্রা বিপন্ন করেন, তাঁরা সমাজ-বিরোধী কি না সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা দরকার!"

বিশু খুড়ো বলিলেন যে, তিনি বিগত কয়দিন "কমন মার্কেট" লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বুঝাইয়া বলিলেন—"না, এর সঙ্গে বিলেতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার আলোচ্য কমন মার্কেট নয়, এখানে কমন মার্কেট মানে পুজো বাজার। তবে হ্যাঁ, মন্ত্রিদের হাত এখানেও আছে, গৃহিণীদের ত সচিব আখ্যা আমরাই দিয়েছি।"

মাছের বাজারে আবার শুনিলাম 'ভদ্রলোকের চুক্তির কথা উঠিয়াছে।

—"উঠতেই হবে। আমরা জানি ভদ্রলোকের এক কথা" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

মাছের প্রসঙ্গেই অন্য সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি বিদেশে মৎস্য রপ্তানির একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।—"একেই বলে, আপনি ঠাকুর খেতে পায় না, শংকরাকে ডাকে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ভাত কম খাইয়া, বেশি-বেশি মাছ খাওয়ার উপদেশ দিয়াছেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল।—"কিন্তু মাছ-বাড়ন্ত পাতিল ঠকঠকিয়ে আর কী হবে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মফস্বলের কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে মারধর করা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—যিনি বা যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁরা বোধ হয়—স্পেয়ার দি রড অ্যান্ড স্পয়েল ইওর টিচার—নীতিতে বিশ্বাস করেন!!"

এক পরিসংখ্যান সংবাদে জানা গেল বাংলায় মহিলা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির পথে।—"হেঁশেল অঞ্চলকে আর বুঝি সংরক্ষিত এলাকা করে রাখা গেল না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রতি বৎসরেই ভর্তি সমস্যার প্রতিবাদে ১৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার স্নাতকোত্তর ছাত্রগণ ক্লাসে যোগদান করেন নাই। —"আশা করা যায় ঐ দিনে মোহনবাগানের সেমি-ফাইনাল খেলা দেখার প্রশ্ন এই অনুপস্থিতির সঙ্গে জড়িত ছিল না"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

চীনের কোন এক অঞ্চলে সহস্রায়ু বনস্পতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"এই সব গাছের ইতিহাস আমরা জানি না। তবে শুনেছি নিজের হাতে বপন-করা বিষবৃক্ষ নাকি নিজের হাতেও কাটা যায় না। সেদিক থেকে চীন বুঝি লক্ষায়ু বনস্পতির ব্যবস্থাই হালে করছেন!!"

পরিসংখ্যানে প্রকাশ, পৃথিবীতে গণ-চীনের লোকসংখ্যা সর্বাধিক—প্রায় ৭১ কোটি ৭০ লক্ষ।—"শত পুষ্পের বদলে যদি ৭১ কোটি ৭০ লক্ষ পুষ্প বিকশিত হয় তা হলে আর চীনকে পায় কে," বলেন বিশু খুড়ো।

কমনওয়েলথ গেমস-এর জন্য এবার টিকিটের রেকর্ড-সেল হইয়াছে—একটি সংবাদ। শ্যামলাল বুঝাইয়া বলিল —"এটা খেলার মাঠেরই খবর, বিলেতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ "গেমস" নয়!!"

সম্প্রতি একদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন নাকি হঠাৎ কোথায় গায়েব হইয়া গিয়াছিলেন।—"ঘটনা যেদিন ঘটে, তার পরের দিনেই ছিল ইস্টবেঙ্গল-হায়দারা-বাদের সেমি-ফাইনাল। যদি শুনি মুখ্যমন্ত্রী টিকিট সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে-ছিলেন তা হলে আশ্চর্য হব না, দেব দুর্লভ টিকিট, উনিও মন্ত্রী মাত্র!!"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা ভাষা

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

শ্রীযুক্তা বিজয়া দাশগুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা ভাষা' প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকার ২২শে ভাদ্র সংখ্যায় পড়ে অশেষ উপকৃত হয়েছি, এবং অনেকেই যে উপকৃত হবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের বানান সম্বন্ধে আমার মনে একটি ধোঁকা আছে। শ্রীযুক্তা দাশগুপ্ত যখন এবিষয় নিয়ে অনেক পরিশ্রম ও চিন্তা করেছেন তখন তাঁর পক্ষে আমার সমস্যাটি সমাধান করে দেওয়া কঠিন নাও হতে পারে।

বিশেষ কারণ বশতঃ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত কবির 'পূরবী' কাব্যের পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়েছিল। তখন লক্ষ করি রবীন্দ্রনাথ 'হ্ন' এবং 'হ্ণ'-এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি।

যেমন 'পূরবী'র	'না পাওয়া'	কবিতার	নবম ছত্রে আছে	সায়াহ্ণ,
,, ,,	'স্বপ্ন'	,,	শেষ স্তবকের সপ্তম ছত্রে আছে	চিহ্ণ,
,, ,,	'সমুদ্র'	,,	নবম ছত্রে পুনরায় আছে	চিহ্ন,
,, ঐ	কবিতাতেই	,,	বিংশতি ছত্রে আছে	বহ্ণি,
,, ,,	'মুক্তি'	,,	চতুর্থ স্তবকের সপ্তম ছত্রে আছে	মধ্যাহ্ণ

অবশ্য পুস্তকে ছাপবার সময় ছাপাখানা বা সম্পাদক এসব জায়গায় 'হ্ন' করে দিয়েছেন।

আরেকটি উদাহরণ দিই।

'সঞ্চয়িতার' ১৩৫৪ মুদ্রণের ৭৭০ পৃষ্ঠায় 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের' কবিতাটি কবির হস্তাক্ষরের মূল ব্লক করে ছাপানো হয়েছে। তার চতুর্থ ছত্রে কবির হাতে লেখা আছে 'পথচিহ্ণহীন শূন্যে'। তার পাশের পাতায়ই (৭৭১) ছাপাতে আছে 'পথচিহ্নহীন'।

'হ্ণ' এবং 'হ্ন'-এর পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ জানতেন না—এ অবিশ্বাস্য। তবে তিনি পার্থক্য রাখলেন না কেন? শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তও লিখেছেন (আমারও সেই মত), 'তৎসম শব্দে ব্যাকরণের নিয়মকে অগ্রাহ্য করা চলে না।' 'হ্ণ', 'হ্ন' ছাড়া অন্য কোথাও কি রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ম অগ্রাহ্য করেছেন?

সৈয়দ মুজতবা আলী

"প্রতিভার মৃত্যু : টমাস চ্যাটার্টন"

"দেশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ২৯ বর্ষ সংখ্যা ৪৪ "দেশ"-এ শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা "প্রতিভার মৃত্যু : টমাস চ্যাটার্টন" সাগ্রহে পড়লাম। চ্যাটার্টন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম এবং সর্বতোভাবে আলোচনার যোগ্য। উক্ত সুলিখিত আলোচনাটির জন্য লেখককে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

চ্যাটার্টনের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই আরেকটি নাম আমাদের মনে আসে—জেমস্ ম্যাকফার্সন। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরা দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা। চ্যাটার্টন সম্পর্কে আলোচনা কালে ম্যাকফার্সন সম্বন্ধে দু-চার কথা বললে পূর্ণানন্দবাবুর আলোচনাটি সম্পূর্ণ হত বলে আমার মনে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি সাহিত্যিক জালিয়াতির (literary forgery) ঘটনা অবিস্মরণীয়। একটি ম্যাকফার্সনের ওসিয়ান (Ossian) এবং অপরটি চ্যাটার্টনের রাউলি পোয়েমস্।

১৭৬২ সালে ম্যাকফার্সন Fingal নামে এক মহাকাব্য প্রকাশ করেন। তিনি প্রচার করলেন যে, এটি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের Gaelic কবি Ossian-এর লেখা থেকে অনুবাদ। Fingal-এর অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ম্যাকফার্সন আরেকটি মহাকাব্য Temora (১৭৬২-৬৩) প্রকাশ করলেন। সাধারণ পাঠকের চোখে ধূলি দেওয়া কঠিন ছিল না কিন্তু ডক্টর জনসন প্রমুখ সুধী ব্যক্তিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাঁরা Ossianic poems-এর মূল পাণ্ডুলিপি দেখতে চান। বলা বাহুল্য ম্যাকফার্সনের পক্ষে তা দেখানো সম্ভব হয়নি কারণ ঐরূপ কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বই ছিল না। Ossianic poems জালিয়াতি বলে ঘোষিত হল। এঁরা দুজন যে কাজ করেছেন তাকে সাদা কথায় জালিয়াতিই বলতে হবে, কিন্তু কৌতুকের কথা এই যে, এই জালিয়াতির মধ্য দিয়েই তাঁদের অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে (অবশ্য দৈনন্দিন জীবনে যে সব জাল-জালিয়াতি আমরা হামেশা দেখছি তাতে প্রতিভার প্রয়োজন হয় না এমন কথা আমি বলছি না।) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমান্টিক ধারার পুনঃপ্রবর্তন হয় তাতে ম্যাকফার্সন এবং চ্যাটার্টনের দান অসামান্য। তাঁদের জাল কাব্য পাঠকের মনে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছিল।

ম্যাকফার্সন এবং চ্যাটার্টনের কাহিনী শিক্ষিত সমাজে অবিদিত নয়। এ'দের সম্পর্কে আলোচনাও প্রচুর হয়েছে। কিন্তু এ'দের এই কাজের পশ্চাতে যে মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার সন্ধান কেউ দিতে পারেননি। এ'রা এমন করে নিজেকে গোপন করতে গেলেন কেন? কোন কোন সাহিত্যিক ছদ্মনামে লিখে থাকেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আত্মগোপন নয়, আত্মপ্রচার। বেশী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই নকল নাম দিয়ে আসল নামটাকে আড়াল করে রাখা। কিন্তু এ'রা করেছেন উল্টো। পাছে লোকে ভাবে জিনিসটা এ'দের লেখা তাই গোড়াতেই বলে নিচ্ছেন—এ আমার জিনিস নয়, অপরের লেখা। এর মনস্তত্ত্বটা কি? এ কি নিজের উপরে আস্থার অভাব? চ্যাটার্টন না হয় নিতান্ত নাবালক ছিলেন কিন্তু ম্যাকফার্সন? তাঁর তো আস্থার অভাব ছিল বলে মনে হয় না। কারণ স্বয়ং ডক্টর জনসনের সঙ্গেও তিনি এই নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাহলে এই আত্মবিলোপের চেষ্টা কেন? এই রহস্যের সমাধান কে করবে? নমস্কারান্তে

হীরকজ্যোতি দত্ত
শান্তিনিকেতন

আবৃত্তি-কথা

সবিনয় নিবেদন,

গত আটই সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীগোপাল সামন্ত লিখিত 'আবৃত্তি কথা' শীর্ষক সময়োচিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করলাম।

লেখক আবৃত্তি বিচারকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "যারা বিচারক হয়ে আসন গ্রহণ করেন তাঁরা সব সময়ে নিজেদের কর্তব্যের প্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন, তবু নিজেদের বিচারক হবার যোগ্যতায় তাঁদের আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।" লেখকের এই মন্তব্যের সঙ্গে সব সুধী পাঠকই একমত হবেন। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় যারা আবৃত্তি করে, তাদের অনেকের কাছেই এই অভিযোগ শোনা যায় যে, ভালো আবৃত্তি করা সত্ত্বেও তারা পুরস্কার পায় না। তাদের মতে, 'আবৃত্তির বিচারকেরা ঠিক মত বিচার করতে পারেন না।' এই অভিযোগ সব সময়ে সত্যি না হলেও, প্রায় দেখা যায় যে, যারা আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় বিচারক হয়েছেন, তাঁরা শুধু নামের বা পদের জোরেই বিচারক সেজে বসেছেন। এই সমস্ত বিচারকেরা হয়তো জীবনে কোনোদিন আবৃত্তি করেন নি কিংবা কবিতা পাঠে তাঁদের বিন্দু মাত্র উৎসাহ নেই। সুতরাং, তাঁরাই যখন বিচারের মানদণ্ডে প্রতিযোগীদের আবৃত্তি বিচার করেন, তখন

তাঁদের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া সাধারণত সম্ভব নয়।

আজকাল শুধু বাংলা দেশেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতা কিংবা 'কবিতা' পাঠ সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই বাঙালীর উদ্যোগে কোনো অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে, সেখানেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে থাকে। সুতরাং প্রবন্ধ লেখকের ন্যায় আমরাও আশা করব যে 'প্রচলিত ধারণার কিছু পরিবর্তন হয়ে আবৃত্তি বা সোচ্চার পঠনকার্য তার নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে একটি পৃথক কলা বলে স্বীকৃত হবে এবং কবিতার কদর ও আদর বাড়বে।'

নমস্কারান্তে

সুশান্ত লাহিড়ী
নতুন দিল্লি-৩

আবর্জনা নগরী

মহাশয়েষু,

গত ২১শে জুলাই তারিখের 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'আবর্জনা নগরী' এই বিষয়ে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত সময়োপোযোগী। আমি ভারতের নাগরিক তথা কলিকাতা নগরীর একজন স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে এই প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বোধ করছি। ইউরোপের কিছু কিছু বড় শহর ইতিমধ্যে আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলির মধ্যে কলিকাতার স্থানও খুব একটা নগণ্য নয়। কিন্তু এইসব দেশের সাধারণ শহরগুলি দেখে 'কলিকাতা নগরীকে' আরও কঙ্কালসার, পঙ্গু, পূতি-গন্ধময় বীভৎস মনে হচ্ছে। যা কলিকাতায় থাকাকালীন হয়ত অভ্যস্ততা হেতু এতটা উপলব্ধি করিনি। কলিকাতার এই দুরবস্থার জন্যে আমাদের সুবিখ্যাত পৌরপ্রতিষ্ঠান, সরকার এবং কলিকাতার বাসিন্দারাও কম-বেশি সকলেই দায়ী বলা যেতে পারে।

বর্তমানে আমি জার্মানীতে আছি। এখানকার প্রায় সকল লোকই ভারতবাসীদের প্রতি এবং ওখানকার বিশেষ বিশেষ শহর-গুলি সম্বন্ধে জানবার জন্যে বিশেষভাবে আগ্রহশীল। সত্যিকথা বলতে কি, এরা ভারতের শহরগুলির মধ্যে 'কলিকাতাকে' বিশেষভাবে জানে। এবং যতটুকু জানে তা আমাদের কাছে খুবই লজ্জাকর। ইতিমধ্যে এখানে কতকগুলি ভারতের উপর তোলা "ডকুমেণ্টারী ফিল্ম" বা তথ্যচিত্র টেলিভিশন মারফত এখানকার জনসাধারণের নিকট পরিবেশিত হয়েছে এবং এতে কিছু অংশ ছিল যা কলিকাতা নগরীর উপর তোলা। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, এ থেকে এরা আরও ভালভাবে কলিকাতা নগরীর আসল স্বরূপ দেখবার সুযোগ পেয়েছে। অথচ শোনা যায়, এই শহর শিক্ষা, সংস্কৃতি,

রাজনীতি ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার সমস্ত উপকরণে সমৃদ্ধ। এ দেশে বসে টেলিভিশনে এখানকার এবং বিশেষ করে কলিকাতা নগরীর সেই সব নোংরা দৃশ্যগুলি দেখছিলাম তা যে কি ভীষণ লজ্জাকর লেগেছিল তা স্ব-চক্ষে না দেখলে বোঝানো যায় না। এই সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কয়েকজন পাঠক 'দেশ' পত্রিকায় মাধ্যমে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যতদিন না কলিকাতা নগরীর সত্যিকারের চেহারার কিছু পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন আমাদের এখানে বসে এইসব ছবি দেখেই যেতে হবে! এই ছবিগুলিতে কলিকাতার কালিঘাট, গঙ্গারঘাট এবং নোংরা পথঘাটের যেসব ছবি তুলে এনেছেন তার সবগুলিই বাস্তব। এ ছাড়া এখানকার পত্রপত্রিকায় যেসব ছবি পরিবেশিত হয় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাস্তার মোড়ে ষাঁড় অথবা গরুর নির্লিপ্তভাবে অবস্থানের দৃশ্যগুলি। এ ধরনের ছবির এখানকার জন-সাধারণ অত্যন্ত রসগ্রাহী। এদের ধারণা

গয়, আমাদের ভগবান তাই তার অবাধ গতিবিধি। এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা দৃশ্যের অগুনতি ছবি পাতা উল্টালেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ষাঁড়ের লেজ ছুঁয়ে ফটকা বাজারে যাওয়া অথবা বড় রাস্তার উপর বাড়ির অথবা প্রাচীরের গায়ে ঘুটে দেবার ছবি এখনও চোখে পড়েনি। এদের ফটো-গ্রাফারদের চোখে হয়ত পড়েছিল কিন্তু ভেবেছেন ওটা বোধ হয় এক ধরনের 'ডেকরেশন'। কিন্তু তাই বলে এদের সম্পূর্ণভাবে দোষারোপ করাও আমাদের পক্ষে সমীচীন বলে মনে হয় না। কারণ কোনও ছবিকেই অস্বীকার করবার আমাদের উপায় নেই। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই ছবিগুলির বেশির ভাগই কলিকাতা মহানগরীর উপর তোলা। সেইজন্য 'আবর্জনা নগরী কলিকাতা' ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে এখানকার জন-সাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে এবং এই সঙ্গে আমাদের এখানকার আমাদের সকল নাগরিকের (অর্থাৎ যাঁরা সংস্কৃতি এবং অন্যান্য গৌরবের সামগ্রী ঐ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। তাই কলিকাতা মানেই 'আবর্জনা নগরী।'

যাই হোক কলিকাতার এই রুগ্ন, দুর্গন্ধময় শরীরকে সুস্থ, সবল এবং সৌন্দর্যময় করে গড়ে তুলতে হলে যেমন কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্ব আছে তেমনি আমাদের সাধারণ নাগরিকদেরও কর্তব্য বিশেষভাবে আছে। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে রুচিবোধকে সজাগ করে তুলতে হবে। যার অভাব আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কি এই নগরীকে অযথা-ভাবে নোংরামীর দ্বারা বিষভাণ্ডে পরিণত করবার মূলে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভূমিকাও কম নয়।

যাই হোক প্রথমত এরজন্যে প্রয়োজন আমাদের সকল নাগরিকদের (অর্থাৎ যাঁরা সত্যিই এ বিষয়ে উৎসাহী) নিয়ে একটা সংস্থা গঠন করা এবং যে সংস্থার কাজ হবে শহরকে সুন্দর ও পরিষ্কার রাখার জন্যে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করা এবং উপদেশ দেওয়া।

এই সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অতিসাধারণ কয়েকটি মতামত দিলাম। (ক) আমার মনে হয় প্রতি রাস্তার কিছু কিছু দূরত্বে একটি করে 'পেপার বাস্কেট' ল্যাম্পপোস্ট অথবা সুবিধামত জায়গায় স্থাপন করলে ভাল হয়। (খ) রাস্তার যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপান মারা বিশেষভাবে বন্ধ করতে হবে। বিজ্ঞাপনের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া বিজ্ঞাপন মারা চলবে না। (গ) ছোটদের জন্যে শহরের মাঝে মাঝে পার্কের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেগুলি ছোটদের উপযোগী আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এ ছাড়া

সাধারণ পার্কগুলির সংস্কার সাধনও দরকার। (ঘ) পথঘাট থেকে বে-ওয়ারিশ কুকুর, গরু ইত্যাদির অপসারণ করতে হবে। (ঙ) জনসাধারণকে এ-বিষয়ে সচেতন করবার জন্যে আছে। ইত্যাদি...।

পরিশেষে 'আবর্জনা নগরী'-র উপসংহারের সঙ্গে একমত হয়ে বলব বর্তমানে কলিকাতার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও পরিচ্ছন্নতার জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে দেখা দিয়েছে।

সুনীলকুমার দাশগুপ্ত
পশ্চিম জার্মেনী

মস্কোর চিঠি

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে বিদেশের নানা জ্ঞাতব্য সংবাদ পরিবেশন করে পত্রলেখকেরা প্রত্যেকেই 'দেশ' পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। সুলিখিত "মস্কোর চিঠির" জন্যে শ্রীযুক্ত শুভময় ঘোষও সকলের সপ্রশংস ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু, ১৮ই অগস্ট তারিখে প্রকাশিত মস্কোর চিঠিতে শুভময়বাবুর উক্তি-বিশেষ মনে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি করেছে। ফ্রাঙ্কোর জেলে স্পেনের আনা বারোনার ২৩ বছর কাটানোর উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি ইভিনস্কায়ার কারাবাসের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের "কালচারাল ফ্রীডম্" সমর্থকদের প্রতিবাদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এ দেশ কালচারাল ফ্রীডম্ আন্দোলনের আমিও অন্যতম সমর্থক এবং শ্রীমতি ইভিনস্কায়ার কারাবাসের বিরুদ্ধে "স্টেট্সম্যান" ও "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড"-এর চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত চিঠির মাধ্যমে আমার মত নগণ্য লোকের ক্ষীণ কণ্ঠেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

শিল্পী সাহিত্যিকের ওপর নির্যাতন 'পূর্ব' বা 'পশ্চিম' যে দেশেই হোক না কেন সমপরিমাণ নিন্দনীয়। এ প্রশ্নে কালচারাল ফ্রীডম্' সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে বাহ্যত কোনও মত পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয় না।

স্পেনের অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-চরিত্র সম্পর্কে পৃথিবীর কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ফ্রাঙ্কো নিজে ভুলেও কখনো গণতন্ত্রের প্রতি মৌলিক সমর্থন প্রকাশ করেন নি। সুতরাং জনমতে শ্রদ্ধাহীন স্বৈরতান্ত্রিক ডিক্টেটর শাসিত দেশে সৃজনধর্মী শিল্পী সাহিত্যিকের ওপর উৎপীড়ন মোটেই অভাবিত নয়—বরং না হওয়াটাই বিস্ময়কর। আর, ডিক্টেটরের অস্তিত্বই যেখানে সর্বজন ঘৃণা ধিক্কৃত, তার প্রতিটি একক কাজের প্রতিবাদ করা না করার পার্থক্য কতটুকুই বা হতে পারে?

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সুকৌশল প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে যে দেশের শাসক সম্প্রদায় নিজেদের একমাত্র খাঁটি গণতন্ত্রী বলে জাহির করতে বদ্ধপরিকর, যাঁদের প্রতিটি কাজের পেছনে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের দোহাই থাকে, তাঁদের দেশেই যখন মায়াকোভস্কীকে আত্মহত্যা করতে হয়, আখ্মাটোভার কণ্ঠ হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়, বিশ্বজন শ্রদ্ধা অভিষিক্ত পাস্তারনাকের প্রতিও অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত থাকে বা ইভিনস্কায়াকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠানো হয় তখন তার বিরুদ্ধে সকল স্তরের স্বাধীনতা সমর্থকদের প্রতিবাদ অধিকতর মুখর হওয়াই কি সংগত নয়? শুভময়বাবুর চিঠিতে এরেনবুর্গের সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। যখন দেখি নিজ দেশে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্ববিশ্রুত এরেনবুর্গের কণ্ঠও নীরব থাকে তখন তাঁর অতীত ও বর্তমান উক্তির আন্তরিকতা বা তাঁর দেশে সাহিত্যিকদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির রাষ্ট্রস্বীকৃতি বিষয়ে মনে সংশয় জাগা কি অস্বাভাবিক?

উৎপল চৌধুরী

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

= তেরো =

বারান্দায় জলচৌকির উপর বসে নফর-কেষ্ট রসগোল্লা খাচ্ছে।

সুধামুখী বলে, বউয়ের রূপের ব্যাখ্যান চিরকাল ধরে করে এসেছ। ধরবার জন্যে কত ফন্দি-ফিকির। সেই বউ খপ্পরে এসে গেল, আর তুমি পালিয়ে চলে এলে?

বউয়ের রূপের কথায় নফরা আহার ভুলে শতমুখ হয়ে উঠল। বলে, মাগীর বয়স হয়েছে, সেটা কুষ্ঠী-বিচার করে বলতে হয়। চোখে দেখে ধরতে পারবে না। সাজতে জানে বটে! গয়না পরে সেজেগুজে সব সময় একখানা পটের বিবি। উনুনে ফুঁ পাড়ছে, তখনো পরা আছে নীলাম্বরী শাড়ি।

সুধামুখী সামনে একটি পিঁড়ি পেতে বসে শুনছে। তার দিকে চেয়ে তুলনা এসে যায়। বলে, আর এই তুমি একজন মা-গোঁসাই এখানে। ছাই মেখে বনে গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তিরিশ বছরের আধ-বুড়ি আমার বউ—পনের বছরের ছুঁড়ি বলে এখনো আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়। গেরস্ত-বউ হয়েও সাজের গুণে বাইরের মানুষ টেনে ধরে—শ্বশুরবাড়ি রাত দুপুরে বেড়ায় ঘা পড়ত, বেড়া বেঁধে বেঁধে শালা-মশায়রা নাজেহাল। আর তুমি বাইরের মেয়েমানুষ হয়ে ঘরের লোক কটাকেও টেনে রাখতে পার না। রাজা-বাহাদুর গেল, সেই ঠাণ্ডাবাবু বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়ভুড়ানি কেটে আবার কোন্ দিকে ভেসে চলে গেল। আমি যে এমন নফরকেষ্ট, ত্রিভুবনে সবাই দূর-দূর করে—আমি পর্যন্ত পাক-ছাট মেরে ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে পড়ি।

মিষ্টি নিয়ে এসেছে নফরকেষ্ট, তাই থেকে কয়েকটা তাকে খেতে দিয়েছে। রসগোল্লা আর-একটা গলায় ফেলে কোঁৎ করে গিলে নফরকেষ্ট বলে, পুরনো বন্ধু হয়ে বলছি, সাজগোজ বেশি করে লাগাও। এখনো যা আছে, সাজিয়েগুছিয়ে লোকের চোখে তুলে ধর। রূপ ভগবান দেন মানি, আবার মানষেও দিয়ে থাকে। কবিরাজি মলমের মতো কোটোয় কোটোয় আজকাল রূপের মসলা। সেই মসলা হাতে-মুখে, এখানে-ওখানে লাগাও, যতখানি কাপড়ের বাইরে থাকে। আবার ওদিকে স্যাকরা মশায়রা ভেবে ভেবে খেটে-খুটে বছর-বছর এ-প্যাটার্নের ও-প্যাটার্নের গয়না গড়াচ্ছেন, যতগুলো পার গায়ের উপর চাপিয়ে দাও। ব্যস, আলাদা মূর্তি হয়ে গেলে। আয়না ধরে অবাক হবেঃ বাঃ রে, আমিই সেই সুধামুখী নাকি? বউয়ের কাছে-পিঠে থেকে রূপের কারসাজি এবার ভাল করে বুঝে এসেছি।

একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে—সুধামুখী বিব্রত হয়ে ওঠেঃ তাই তো বলছি, সাজগোজের সেই রূপসী বউ ছেড়ে চলে এলে কেন?

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, রূপসী বলে রূপসী! যে দেখে সে-ই দেবচক্ষু হয়ে যায়। এক রবিবারে কারখানার একজন গিয়েছিল আমার কাছে। বউ দেখে কানে কানে বলল, সাত জন্ম তপস্যা করলে তবে এমন চিড়িয়া মেলে। বুকের মধ্যে নেচে উঠল শুনে।

তবে?

সে দেখা তো দিনমানের—দিনদুপুরের। রাতের বেলা আলো নিভিয়ে রূপ দেখা যায় না। তখন তুমি সুধামুখী যা, সে-বউও তাই। তখন শুনতে হয় কথা। বউয়ের মুখে কথা তো নয়, আগুন। আগুনের ছেঁকায় সর্বদেহ জ্বলে পুড়ে যায়। বুঝে দেখ সুধামুখী, সারাটা দিন ফার্নেসের পাশে কাজ—রাত্রে একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরোব, পাশে সেই সময়টা বউ এসে পড়ে। দিনরাত্রি আগুনের পাশে বাঁচব কেমন করে? চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি, বাসা থেকেও পালিয়েছি। বউটা যদি না এসে পড়ত, ভাইয়ের বাসায় যে কটা দিন বাঁচি টিকে থাকতে পারতাম।

নিঃশব্দে নফরকেষ্ট আর কয়েকটা মিঠাই

গঙ্গাধঃকরণ করে। ঢকঢক করে জল খেয়ে নিয়ে আবার বলে, তার উপরে এক কাণ্ড! আগুনে কেরোসিন পড়ল একেবারে। নিমাই-কেষ্টর শ্বশুর বাসায় এসেছে মেয়ে দেখতে। আমার বউ যেন আর-এক মেয়ে—'বাবা', 'বাবা' বলে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে, ফাঁক বুঝে তারপর মোক্ষম খবর জিজ্ঞাসা করেঃ কত মাইনে দেন আপনারা এ-বাড়ির বড়জনকে। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে যার সঙ্গে দেখা, মাইনেটা বরাবর ফাঁপিয়ে বলে এসেছি। নিমাইকেষ্টকেও সামাল করা আছে—মায়ের পেটের ভাই হয়ে সে ফাঁস করবে না। কিন্তু আমরা বেড়াই ডালে ডালে, বউ-মাগী বেড়ায় পাতায় পাতায়। কুটুম্ব মানুষকে ধরে বসেছে। বুড়ো অত শত জানবে কি করে, বলে দিয়েছে সত্যি কথা। রাত্রে বউ দেখি একেবারে চুপচাপ। এমন তো হবার কথা নয়—ভয়ে আমার গা কাঁপছে। বোমা ফাটবে বুঝতে পারছি—আজ হোক, আর একদিন-দুদিন পরে হোক। হলও তাই ঠিক—

খাওয়া সমাপ্ত করে নফরকেষ্টর এইবার সাহেবের কথা মনে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ছোঁড়াটার নাম করে মিষ্টি-মিঠাই আনলাম, সে খেয়েছে?

দু-হাতে দুটো নিয়ে ঐ যে বেরিয়ে গেল। স্থির হয়ে দু-দণ্ড বাড়ি বসে থাকবার জো আছে?

অভিভাবক জনের মতো বিরক্ত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, এই রোদ্দুরে অবেলায় গেল কোথা?

সুধামুখী বলে, কোথায় আবার! ঘাটে গিয়ে বসে আছে।

ঘাটে কী এখন?

ঘাট ওর শোবার ঘর, ঘাটেই বৈঠকখানা। দেখ, পয়সাকড়ি জোটে না। নইলে কত সময় ভাবি, দরজার পাশে ঐ জায়গাটুকুর উপর ছাউনি করে দিলে রাতের বেলা সাহেব দিব্যি পড়ে থাকতে পারে। ঘাটের সিঁড়িতে যা করে ঘুমোয়।

নফরকেষ্ট লুফে নিয়ে বলে, বটেই তো! ঘাটে শোবে কেন ছোটলোকের মতন? ওসব হবে না, কালই চালা তোলার ব্যবস্থা করছি।

সুধামুখী প্রীত হয়ে বলে, ভাত চাপিয়ে এসেছি, এতক্ষণে ফুটে উঠল। গিয়ে ফ্যান গালব। তোমার কথা শেষ করে ফেল, শুনে যাই। তার পরে কি হল, কি করল বউ?

নফরকেষ্ট বলে, যা ভেবেছি, বোমাই ফাটল। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড একেবারে। পরের দিনটা মাইনের তারিখ। দু-ভাই বাড়ি এসে সেই দাঁড়িয়েছি, বউ নিমাইর সামনে হাত পাতল: ওর মাইনেটা আমার কাছে দাও। টাকা-আনা-পয়সায় ঠিক-ঠিক বলে দিল। আমরা থ।

টাকাকড়ি আঁচলে বেঁধে ঘরের দুয়োর-জানলা এঁটে নিশিরাত্রে তারপর নিজমূর্তি ধরে। মিথ্যুক, অকর্মার ঢেঁকি—ভদ্রলোকের মেয়ের মুখের সেই সব বাছা বাছা জোরদার কথা বলতে আমার লজ্জা করছে। গাদা গাদা সৈন্য নিয়ে এই যে জার্মান-ইংরেজে এত বড় লড়াইটা হয়ে গেল—আমি ভাবি, বউকে যদি নিয়ে যেত কামান-বন্দুক, গুলিগোলা কিছু লাগত না, কথার তোড়েই শত্রু খতম হয়ে যেত।

আঁচল মুখে দিয়ে সুধামুখী হাসছে। নফরকেষ্ট বলে, হাসবে বইকি! পরের কষ্টে লোকের মনে বড় সুখ হয় তা জানি। একটা কথা আমার নামে বারবার বলছিল, কোন কাজের ক্ষমতা নেই। ছড়া কাটছিল: কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন। মনে মনে তক্ষুনি কিরে করে বসলাম: চলে তো যাবই—তার আগে গুণের কিছু নমুনা ছেড়ে যাব। চিরকাল যেটা মনে রাখবে। হয়েছেও তাই। তবু তো সরঞ্জাম কিছু পেলাম না, ওরই কাঁথার ডালার ভোঁতা একটা কাঁচি—

সুধামুখী গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, আমার কি হবে! শেষটা নিজের বউয়ের পকেট কাটলে!

মেয়েমানষের পকেট কোথায়? আঁচল। টাকার নামে মূর্চ্ছা যায়। বাপের বাড়ি থেকে নোট গেঁথে গেঁথে নিয়ে এসেছে। তার উপরে আমার পুরো মাসের মাইনে। ঘরে স্বামীরত্ন ঘুরছে তাই বোধহয় বাক্স-পেঁটরায় ভরসা পায় না, আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। বলি, রোসো রূপসী, হাতের খেলা দেখাই একখানা। ঘুটে ধরিয়ে উনুনের উপর কয়লা চাপাচ্ছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার। সেয়ানা বেশি কিনা—নোট-বাঁধা আঁচলের মুড়ো ফেরতা দিয়ে কোমরে গুঁজেছে। আমি বসেছি গিয়ে পাশে, কোমর থেকে আঁচল টেনে বের করেছি। কিছু জানে না। ভোঁতা কাঁচির পোঁচে পোঁচে কাপড় কেটেছি, মরি-বাঁচি তখনো উনুনে পাখা করে যাচ্ছে।

হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল নফরকেষ্ট।

সুধামুখী বলে, তবে আর যাচ্ছ না ফিরে। চুকিয়ে বুকিয়ে চলে এসেছ, বুঝলাম।

যাতে আর কোনদিন না যেতে হয়, সেই ব্যবস্থা করে এসেছি।

পকেট থেকে নফরকেষ্ট ধাঁ করে বউয়ের

মটা আঁচলের টুকরো বের করে। বলে, এইটুকু ছিঁড়ে বাহুতে ধারণ করব। রক্ষাকবচ।

আবার একচোট হাসি। হাসি থামিয়ে বলে, ছেলেবয়সে দিদিমা এই মোটা তামার মাদুলি হাতে বেঁধে দিয়েছিল—ব্রহ্মকবচ, ভূতপেত্নী, পেঁচো-দানোর নজর লাগবে না। এবারও তাই। বউয়ের জন্যে কালেভদ্রে যদি মন আনচান করে ওঠে, শাড়ির আঁচলের দিকে তাকালেই ব্যাধি ঠান্ডা হবে—মনে পড়ে যাবে সমস্ত।

সুধামুখীও হাসতে হাসতে ভাত নামাতে গেল।

আর ওদিকে ঘাটের উপর রানী এসে সাহেবকে ধরেছে: যা বলেছিলে সত্যি-সত্যি তাই খাটল গো সাহেব। মা-কালী কথা কানে নিচ্ছেন না। বকাবকি করবে বলে তোমায় বলিনি। পরশু দিন মায়ের কাছে একশিশি তরল-আলতা চেয়েছিলাম। তোমার সেই মন্তর পড়ে সিগারেটের জায়গায় বললাম আলতা।

সাহেব জিভ কেটে বলে, সর্বনাশ করেছিস তুই। আলতা এখন রক্ত হয়ে গলা দিয়ে গলগল করে না বেরোয়!

ভীত হয়ে রানী বলে, রক্ত বেরুবে কেন গলা দিয়ে? কী করলাম?

মায়ের কাছে পায়ের আলতার হুকুম—উঃ, কতখানি সাহস তোর!

মা চটিজুতো দিলেন, সে-ও তো পায়ের। পায়ের চেয়ে বড় হয়েছে মাপে। আনকোরা নতুনও নয়। তবু দিয়েছেন তো তিনি। জুতো দিতে পারেন, আলতায় তবে দোষ হবে কেন?

কথা জোগানো থাকে মেয়েটার জিভের ডগায়। পেরে ওঠা দায়।

সাহেব বলে, পা ছুঁয়ে মা তো মাপ নিতে পারেন না, সেই জন্যে জুতো বড় হয়েছে। কিন্তু একবার দিয়েছেন বলে তোর নিজের একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকবে না? চটেছেন কিনা দেখ বুঝে এতবার এতরকম জিনিস এল, আলতার বেলা কেন ভুল মারলেন?

রানী বলে, বেশ, আলতা বাদ দিয়ে গন্ধ-তেল চাইব এক শিশি। মাথায় মাখবার জিনিস, এতে কোন দোষ নিতে পারবেন না। আমার লাভই হল—গন্ধতেলের দাম আলতার চেয়ে অনেক বেশি।

মা-কালীর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে গন্ধতেলের ব্যবস্থাও করতে হয়। কোন্ কৌশলে হবে, সেটা আপাতত মাথায় আসছে না। চটিজুতোর ব্যাপারে অতি অল্পের জন্য মাথা বেঁচে এসেছে। এক বিয়ে-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল সাহেব। ফর্সা কাপড়-চোপড় পরেছে, তার উপর এই চেহারা। চেহারাটা সর্বক্ষেত্রে অদ্ভুত কাজ দেয়। কন্যাপক্ষের এক মাতব্বর ডাকলেন: ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন খোকা, আসরে গিয়ে বোসো। তাঁরা ভাবছেন, বরযাত্রী হয়ে এসেছে। বরযাত্রীদের মধ্যে গেলে সরে সরে তাঁরা পথ করে দেন: বর দেখবে খোকা? যাও না, বরের কাছে এগিয়ে বোসোগে। এঁরা ভাবছেন, কন্যা-পক্ষের ছেলে। কিন্তু খোকা তো বসবার জন্য ঢোকেনি এ-বাড়ি। পাত্তা করছে ওদিকে, রকমারি খাদ্যের সুগন্ধ আসছে। বসে পড়া যায় স্বচ্ছন্দে, লোভও হচ্ছে খুব। তবু কিন্তু ভোজে বসা চলবে না সাহেবের। সবাই যখন বসে পড়বে, তার কাজ সেই সময়টা। একজোড়া জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়বে। সে জুতোর

বাছাবাছি বিস্তর। চটিজুতো—মেয়েরা যা পরে, সেই জিনিস। চটি হবে লালরঙের এবং হাল ফ্যাশানের। মা-কালী হয়ে পড়ে ফ্যাসাদ কত! সবাই খেতে গেল, ফুটফুটে একটা ছেলে সেই সময় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। ধর, নজর পড়ে গেল একজনার। বাৎসল্য বশে সে গিয়ে সাহেবের হাত এ'টে ধরেছে। পায়ের দিকে চোখ গেল—মেয়েদের জুতো বেটাছেলের পায়ে। বুঝতে আর-কিছু বাকি থাকে না। তারপরে কি হবে? ভোজ ফেলে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ দুদিক দিয়ে রে-রে করে পড়ল। পেটের চেয়ে হাতের সুখ করেই মজাটা বেশি।

হতে যাচ্ছিল ঠিক এমনিটাই।

ও খোকা, খেতে বসনি যে তুমি? যাচ্ছ কোথা? শোন, শোন—

সাহেব তো চোঁচা ছুট। সে লোকও পিছু ছুটেছে। পিছনে তাকায়নি সাহেব, তবে জুতোর শব্দ পেয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। ই'দুরের মতন এ-গলি সে-গলি ছুটে ঘণ্টা দুই পরে সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘাটে এসে পড়ল। এসে সোয়াস্তি, গড়িয়ে পড়ল ক্লান্তির চোটে। পায়ের চটি হাতে তুলে নিয়েছিল কিছুদূর এসে। জুতো-পায়ে ছোটা যায় না। এতক্ষণ পরে তৃপ্তি ভরে জুতোর পানে তাকিয়ে দেখে। খাসা জিনিসটা, রানীকে মানাবে ভাল। পায়ে কিছু বড় হবে। বেটাছেলে সাহেব যা পায়ে ঢুকিয়ে বেরুল, সে জিনিস বড় তো হবেই মেয়েছেলে রানীর পায়ে। পায়ে পরে বেরুনো ছাড়া জুতো সরানোর নিরাপদ উপায় কি? যা-বড় তা-বড় মহাশয় ব্যক্তিরাও এই পন্থা ধরেন।

কিন্তু একবার দুবার পাঁচবার সাতবারেও তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আবদারের পর আবদার চলল একনাগাড়ে। গতিক দাঁড়িয়েছে সেই বিধাতাপুরুষের মতো। সে গল্প সকলের জানা। হবে না, হবে না করে জেলের বাড়ি ছেলে হল। সৎ গৃহস্থ, মিথ্যাচার ফেরেব্বাজির ধার ধারে না—সাচ্চা পথে যা আসে, তাতেই খুশি। সেই জন্যেই গরিব বড্ড। পান্তা খেতে নুন জোটে না। জেলের মা বুড়ি, কিন্তু বিষম ঝানু। আট দিনের দিন রাত্রিবেলা বিধাতা পুরুষ শিশুর ললাটে ভাগ্য লিখে যান, বুড়ি সেই রাত্রে সুতিকাঘরের দুয়োর জুড়ে শুয়ে আছে। মতলব করেই শুয়েছে, ভাগ্য-লিখনের আগে একটা পাকা-বন্দোবস্ত করে নেবে। নিশিরাত্রে দু-পহরের শিয়াল ডেকে গেল, ঠিক সেই সময়টা পাকা-চুল, পাকা-গোঁফদাড়ি, কানে কলমগোঁজা, হাতে দোয়াত-ঝুলানো ভাবনা-চিন্তায় কুঞ্চিতভ্রূ বিধাতাপুরুষ সুড়ুৎ করে এসে পড়লেন। এসে সুতিকাঘরের দোরের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন, মেয়ে-মানুষ ডিঙিয়ে যান কেমন করে? বুড়িও নড়বে না কিছুতে আড় হয়ে এমনভাবে শুয়েছে—আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক নেই, যার মধ্য দিয়ে বিধাতাপুরুষ গলে বেরিয়ে যান। সময় বয়ে যাচ্ছে, ব্যস্ত হয়ে বিধাতা-পুরুষ বললেন, একটু সরে শোও বুড়িমা, কাজ চুকিয়ে চলে যাই। ত্রিভুবন-জোড়া কাজকর্ম, দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসত নেই।

বুড়ি জো পেয়ে গেছে। বলে, তুমি বিধাতা হাড়-বজ্জাত। আজকে কায়দায় পেয়ে গেছি। আমার ছেলের কপালে ছাই-ভস্ম কিসব লিখেছিলে, সারাজন্ম তার দুঃখধান্দায় গেল। দিনরাত্তির খেটে পেটের ভাতের জোগাড় হয় না। নাতির বেলা সেটা হচ্ছে না। ভাল ভাল সব লিখে আসবে কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব। নয়তো কাজ নেই।

বিধাতাপুরুষ বুঝিয়ে বলেন, দেখ মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও'রাই হলেন ওপরওয়ালা। ভাগ্য উপর থেকে ঠিকঠাক হয়ে আসে, কেরানি হয়ে সেইগুলো কপালে লিখে যাওয়া কাজ আমার। পারো তো ও'দের গিয়ে চেপে ধরো, চুনোপুটির উপর তম্বি করে কী ফল?

বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে বলে, পাচ্ছি কোথা মুখপোড়া দুটোকে? কৈলাসে আর গোলক-ধামে লুকিয়ে বসে থাকে, নিচে মুখো হয় না। ঢাকঢোল পিটে পুজোআচ্চা করে কত তোয়াজে মানুষ ডাকাডাকি করে—নৈবিদ্যির লোভ দেখিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে খপ্পরে একবার আনতে পারলে হয়, তখন আর ছেড়ে কথা কইবে না। তারাও কম সেয়ানা নয়, বোঝে সমস্ত। যত যা-ই কর কানে ছিপি এ'টে বসে আছে। অবিচার অনাচার তো কম হচ্ছে না—বাগে পেলে কৈফিয়ৎ চাইবে। সেই ভয়। সেইজন্য দেখা দেয় না।

বলে বুড়ি একেবারে চুপ। বিধাতাপুরুষ কত রকম খোশামুদি করেন, কিন্তু গভীর ঘুমে ঘুমাচ্ছে সে। এদিকে রাতের মধ্যে মর্ত্যধামের কাজ সারা করে ফিরতে হবে। না হলে বিষম কেলেঙ্কারি—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিন যুগের মধ্যে যা কখনো হয়নি।

তখন বিধাতাপুরুষ বলেন, শোন বলি, ভালমানুষের মেয়ে। জেলের বেটার হাতে তো রাজদণ্ড দেওয়া যাবে না, জালই হাতিয়ার। তোমার খাতিরে খানিকটা আমি বাড়িয়ে লিখে যাচ্ছি—জাল ফেললে ভাল মাছ একটা পড়বেই। নাতির অন্নের অভাব হবে না। লেখার প্যাঁচে এইটুকু করে যাব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ধরতে পারবেন না।

বিধাতার মুখ দিয়ে যা বেরুল, তার অন্যথা হবে না। একটুখানি ভেবে নিয়ে বুড়ি পথ ছেড়ে দেয়। আর খলখলিয়ে হাসে আপনমনে: ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। যে কথা বলে ফেলেছ, ঠ্যালাটা বুঝবে হাঁদারাম ঠাকুর।

বড় হল সেই নাতি। নাতিকে বুড়ি গাঙে খালে জাল ফেলতে দেয় না। বলে, জাল ভিজে যাবে, গায়ে কাদা লাগবে তোর। কোথায় পাতবি রে আজকের জাল? আমি বলে দিচ্ছি, বাড়ির উঠানে।

রাত দুপুরে জালে জড়িয়ে গিয়ে রুইমাছ উঠানের উপর লেজের ঝাপটা দিচ্ছে।

পরের রাতে জাল কোন্‌খানে পাতবে? ঘরের চালে। খানিক পরে চালের উপর যথারীতি মাছের আফালি।

বুড়ি বলে দেয়ঃ উই যে লম্বা তালগাছটা—বাঁশটাশ বেঁধে কষ্ট করে ওর মাথায় উঠে আজ জাল পেতে আসবি।

বিধাতাপুরুষ তো নাকের জলে চোখের জলে। জলে জাল ফেললে তাড়িয়েতুড়িয়ে একটা মাছ জালে ঢোকালেই হয়ে যেত। এখন নিজেকেই জলের মাছ ধরে কাঁধে বয়ে কখনো ঘরের চালে উঠে, কখনো বা গাছের মাথায় চড়ে জালে ঢুকিয়ে আসতে হয়। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, চোখে আবছা দেখেন—বেকায়দা পা ফেলে হুড়মুড় করে নিচে না পড়েন, প্রতিক্ষণে এই ভয়। অথচ না করে উপায় নেই, দেবতার বচন মিথ্যে হয়ে যাবে তা হলে।

বুড়িরও দুর্বুদ্ধির অন্ত নেই। সুঁইকাঁটা ও সেঁজির জঙ্গলে-ভরা একটা জায়গা—দিনের আলোয় অতি-সতর্ক হয়ে ঢুকলেও আট-দশ গন্ডা কাঁটা ফুটে যাবে—নাতিকে বলছে, ঐ কাঁটাবনে জাল পেতে আয় দিকি। রাগে রাগে বিধাতাপুরুষ খড়ি পেতে হিসাবে বসলেন—কাঁদ্দিন আর জনালাবে বুড়িটা, কত বছরের পরমায়ু। সে-ও দেখলেন, বিশ বছর এখনো। এই বিধাতা-পুরুষই একদিন অঢেল পরমায়ু কপালে লিখে দিয়েছেন, এমনি করেই তার শোধ তুলছে! নাতিটা বুড়ির বুদ্ধি শুনে অস্থানেকুস্থানে জাল পেতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেবে, বিধাতাপুরুষ তখন জল ঝাঁপিয়ে মাছ ধরে বেড়াবেন, মাছ না পেলে জেলেদের জিয়ানো মাছ চুরি করে এনে মহিমা বজায় রাখতে হবে। বিশ বছর ধরে প্রতিরাত্রে এই কান্ড! গোঁয়ার জেলেগুলো টের পেলে পিটিয়ে আধ-মরা করবে। জাল হাতে করে তবু করে বেড়াতে হবে এই সব। দেবতা হওয়ার গেরো এমনি।

সাহেবেরও ঠিক বিধাতাপুরুষের দশা। রানীর কাছে কী কুক্ষণে ঐ দেবতা হল, সারাজীবনে দেবতাগিরি ছাড়ল না। কত জায়গায় কতবার দেবতা হয়েছে! দেবতা আর সিঁধেল চোর উভয়েই অন্তর্ঘাতী। আশালতার বর হয়ে সেই যে গয়না সরাল (আসল বরেও গয়না সরায় সাহেব স্বচক্ষে দেখেছে)—আরও একবার সিঁধ কেটে তার ঘরে ঢুকেছিল। আশালতার শ্বশুরবাড়ি—বরের সঙ্গে সেই ঘরে সে আছে। পাকা-দালানে বড়কষ্টের সিঁধ—কিন্তু ঢুকে পড়ে শুধুমাত্র দেবতার কাজ করে বেরিয়ে আসে। ডেপুটির কাছে মিথ্যা জবাবদিহি করে, কারিগরের পক্ষে যার চেয়ে বড় অন্যায় হয় না।

কাজ একখানা নেমে যায়, হয়তো পনের-বিশ মিনিটে। কিন্তু গোড়া বাঁধতে হয় বিস্তর কাল ধরে। দরকারি ছাড়া বেদরকারিও কত বস্তু নজরে এসে যায়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটার নিজেরই এক ব্যাপার। পচার বুড়ি মা হাঁপানি-কাশিতে ভুগছে, ভাল পুরানো-ঘি মালিশের প্রয়োজন। দুটো থানার এলাকা পার হয়ে গিয়ে চকদারপুটে চক্কোত্তির বাড়ি—পচা বাইটা চক্কোত্তির কাছে গিয়ে পুরানো-ঘি চাইল। চক্কোত্তি আকাশ থেকে পড়েন: আমি কোথা পুরানো-ঘি পাবো?

পচা বাইটার নাম জানেন চক্কোত্তি, দস্তুরমতো সমীহ করেন তাকে। বলছেন, পুরানো-ঘি নেই আমার বাড়ি। থাকলে তোমার কাজে একটুখানি দিতে আপত্তি করব কেন?

সত্যি জানেন না?

পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করছি পঞ্চানন।

পচা বলে, হতে পারে। আপনার পিতামহ রামকিশোর চক্কোত্তি মরবার সময় বলতে ভুলে গেছেন। পুবের ঘরে যে সুঁদুরের খুঁটি আছে, তার গোড়ায় খুঁড়ে দেখুন। আমার সামনে খুঁড়ুন। রামকিশোর চক্কোত্তি মেটে ভাঁড়ে পাঁচ সের ঘি পুঁতেছিলেন। পুরানো-ঘি করবার জন্য। বছর চল্লিশ মাটির নিচে আছে।

সত্যি সত্যি ঘিয়ের ভাঁড় পাওয়া গেল। চল্লিশ বছর আগে খোঁজদারির কাজে এসে পচা বাইটা দেখে গিয়েছিল। বাড়ির কেউ জানে না, পচা এসে ঠিক ঠিক বলে দিল। তবে আর অন্তর্যামী নয় কিসে?

নফরকেষ্ট এক থালা গয়না নিয়ে এলো। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি—যেখানে যেটি পরতে হয়। বলে, যা-কিছু ছিল, বেচে খেয়ে তো বসে আছ। পরো দিকি—মানায় কেমন দেখা যাক।

নফরকেষ্টর রকম দেখে সুধামুখী হাসেঃ বুড়ো হয়ে গেলাম, ছেলে বড় হয়ে গেছে, এখন এই পরতে যাচ্ছি!

তা পরবে কেন? ভস্ম-মাখা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাক। আবার বল, মানুষ আসে না। আসবে কেন শুনি? বলি, মানুষ তো এ-পাড়ায় যোগ-তপস্যা করতে আসে না! সে হলে শ্মশানে মশানে যাবে।

কথা যা বলছে সত্যি। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। তবু ইতস্তত করে সুধামুখী। গয়না নাড়াচাড়া করে, হাসে ফিকফিক করে। নফরকেষ্ট আগ্রহ ভরে তাকিয়ে। সুধামুখী বলে, পেটের দায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু সত্যি বলছি লজ্জা করে। বড় লজ্জা আমার এখন। ছেলের চোখের উপর দিয়ে যাইনে। সাহেবও বোঝে, তখন সে বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকে না।

কথায় কথা এসে পড়ে। সুধামুখী বলে, তোমায় আসল যে কথাটা বললাম, তার কিছু করলে না এখনো। রাত্রে কেন সাহেব ঘাটে পড়ে থাকবে, একটু শোওয়ার জায়গা করে দাও বাড়ির মধ্যে। বড় কষ্ট ওর, কষ্ট আমারও। কোথায় কি ভাবে পড়ে আছে, শোওয়ার আগে একটিবার দেখে আসি। না দেখে পারা যায় না। লণ্ঠন হাতে করে ঘাটে ঘাটে ঘুরি। এক রাত্রে খুঁজে খুঁজে আর পাইনে। শেষটা যা দেখলাম—মাগো মা, মনে পড়লে এখনো বুক কাঁপে।

সিঁড়ির রানার উপর বসেছিল, বোধহয় অমনি ঘুম এসে গেছে। অথবা গুমোট গরম বলে ইচ্ছে করে বাবু গিয়ে জলের ধারে শুয়ে পড়েছে। এগিয়ে দেখি, জোয়ারের জল উঠে রানার উপরটাও প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইঞ্চিখানেক হয়তো বাকি। আর একটু হলে সাহেবকেও নিয়ে যেত—একদিন ভেসে এসেছিল, আবার তেমনি যেত চলে। অমন আর না শোয়, কড়া করে বলে দিয়েছি—গিয়ে গিয়ে দেখেও আসি। কে জানে কোন বেপরোয়া হতচ্ছাড়া বাপের বেটা—এক তিল ওকে আমি বিশ্বাস করিনে। ভয়ে কাঁপি সর্বদা। ছেলের ব্যবস্থাটা তুমি সকলের আগে করে দাও নফর।

নফরকেষ্ট বলে, বাঁশ দড়ি হোগলা দেখে দরদাম করে এসেছি। কাল হবে। কাল সন্ধ্যের মধ্যে সাহেববাবুর আলাদা ঘর। কিন্তু আমি যে পয়সা খরচা করে জিনিষ-গুলো নিয়ে এলাম, একটিবার পরে দেখাবে না?

খরচ করে ভালবেসে দিচ্ছে, কে দেয় এমন! গয়না নিয়ে সুধামুখী পরছে একটি একটি করে। সাহেবের কথার শেষ হয় না—মুচকি হেসে আবার বলে, সব তো হল। নিত্যিদিন আসছ তুমি, বাঁধা-সংসারের মতো হয়ে গেল খানিকটা। দিনমানেই বা ছেলে এমন পথে পথে ঘুরবে কেন? করপো-রেশনের ইস্কুলে মাইনেকড়ি লাগে না—এক একবার ভাবি, ঐখানে জুতে দিলে কেমন হয়!

এবার নফরকেষ্ট এক কথায় সায় দিতে পারে না: ইস্কুলে যাবে সাহেব—ইস্কুলে গিয়ে কোন চতুর্ভুজ হবে?

সুধামুখী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, হাতের লেখা মুক্তোর মতো। ছাপা বই বানান করে করে পড়ে যায়। আমি একটু-আধটু বলে দিই, বাকি সমস্ত নিজের চেষ্টায়। কে জানে কোন বড় বিদ্বানের বেটা—যেমন সাফ মাথা তেমনি স্মরণশক্তি। ছ-মাস এক বছর যদি একটু মাস্টারের কাছে বসতে পায়, সাহেব আমাদের কী হয়ে দাঁড়াবে দেখো। বিদ্যের কত কদর, তুমিই তো বলে থাক। তোমারই ছোট ভাইয়ের কাজ গদি-মোড়া চেয়ারে বসে দশ-বিশটা সই করা, দুটো-চারটে হুকুম-হাকাম ছাড়া। সেই কারখানার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ তোমায় সিদ্ধ হতে হয়। মাইনের বেলাও ভাইকে দেয় চারগুণ।

এইসব তুলনা এবং বিদ্যার গুণাগুণ নফরকেষ্টর ভাগ লাগে না। এড়িয়ে যেতে চায়। সুধামুখীকে তাড়া দিচ্ছে: হল তোমার? হাত চালিয়ে পরো। সেই পুরনো ডেরায় যাব একবার। রুজি-রোজগারে নামতে হবে। বউয়ের টাকা প্রায় তো ফুঁকে এলো।

এই স্বভাব নফরকেষ্টর। একটা কাজ করে সেই মুহূর্তে ফলাফল দেখতে চায়। গয়না পরা হয়ে গেল। নফর ধাঁ করে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘাড় কাত করে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। টিকলিটা সরিয়ে কপালের ঠিক মাঝখানে এনে দেয়। শেষ পোঁচড়া মেরে কুমোর যেমন এগিয়ে পিছিয়ে নিজের হাতের প্রতিমা দেখে। দেখে নফর প্রসন্ন হল: বাঃ বাঃ, তুমি নাকি মন্দ! গয়না পরে মেয়েমানুষগুলো একে-বারে আলাদা হয়ে যায়। আমার বউ ঝানু মেয়েমানুষ—ষোলআনা সেটা জানে, সারা-দিনমান গয়নার ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। শুয়ে পড়লে গায়ে ফোটে কিনা—রাত্তির-বেলা ঘরে এসে গয়না খুলত, তখন দেখতাম। বলব কি সুধামুখী, রূপ সঙ্গে সঙ্গে সিঁকিখানা। পিদিম নেভালে যেমন সব অন্ধকার হয়ে যায়।

একগাল হেসে বলে, তোমারও ঠিক তাই। গয়নায় বাহার খুলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি পরে থেকো না, গিল্টি চটে ভিতরের মাল বেরিয়ে পড়বে। সারাক্ষণের গরজই বা কি—সাজের সময়টা—এই সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা তিন-চার গায়ে থাকবে। এসব হল ব্যবসার সরঞ্জাম। আমার কাঁচিখানা কাজে অকাজে কেবলই যদি চালাই, ধার ক'দিন থাকবে। আর বলে দিয়েছে, আমরুল-পাতা কিম্বা সিদ্ধ-কাঁচাতেঁতুল দিয়ে মাসে একবার করে মেজে নিতে। গয়না চকচক করবে, চেকনাই এক পুরুষ দু-পুরুষ বজায় থাকবে।

সুধামুখী বলে, দেখতে কিন্তু অবিকল গিনিসোনা। তফাৎ ধরা যায় না।

নফরকেষ্ট বলে, গিল্টির যুগ চলেছে—দুনিয়াসুদ্ধ এই। চোখের দেখা নিয়ে ব্যাপার—কষ্টিপাথর নিয়ে কে ঠুকে দেখতে যাচ্ছে? এ বাজারে খাঁটিসোনার কাজ যারা করে তারা হল পয়লানম্বরি আহম্মক।

সুধামুখীও মনে মনে মেনে নেয়। আদরের মেয়েকে পারুল শখ করে মাকড়ি কিনে দিল, তা-ও গিল্টি। শুধু গয়নাই বা কেন, গয়না-পরার মানুষগুলো অবধি গিল্টি। (ক্রমশ)

মস্কোর চিঠি

প্রত্নতত্ত্বে সোভিয়েত গবেষকরা যা কাজ করছেন বাইরে তার খবর আমরা খুব কমই পাই। অথচ তাঁদের কাজের ফল প্রতিবছরই নানা পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি পত্রিকা।

ভারতবর্ষে সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নিয়ে চর্চা হওয়া প্রয়োজন। কারণ ভারততত্ত্ব বা ইণ্ডলজি বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে সোভিয়েত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের যোগ গভীর। বাবর যখন আজকের উজবেকিস্তান থেকে তাঁর সৈন্যসামন্ত লোকজন নিয়ে ভারত জয় করলেন এবং সেই বিজিত দেশকে স্বদেশ বলে মেনে নিলেন তখন এক নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘটল। তার ফলে স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য ও সাহিত্যে যেসব নতুন মহল খুলে গেল তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে বুখারা সমরকন্দের, উজবেক নাচ-গান বাজনার—যা এখনো বেঁচে আছে। উজবেকিস্তান ও সোভিয়েত দেশের অন্যান্য ইসলামী অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে যা পাওয়া গেছে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে তারা অমূল্য সম্পদ। বুখারা ও সমরকন্দে এই সেদিনই যে দেড়শটি প্রাচীন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে চতুর্দশ শতকের একটি কুরান।

শুধু তাই নয়। সম্প্রতি জানা গেছে উজবেকদের সঙ্গে ভারতের যোগ দেড় হাজার বছরের ঘটনা। দক্ষিণ উজবেকিস্তানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ খুঁড়ে বের করে দেখা গেছে যে, সেটি নির্মিত হয় খৃষ্টীয় ১ম শতকে, ধ্বংস হয় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে।

বহু শতাব্দী ধরে ভারত থেকে যেসব ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী এবং দেশজয়ী মধ্য এশিয়ায় এসেছিলেন তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন নিজেদের সংস্কৃতি। গড়েছিলেন শহর মঠ, মন্দির। দেশবিদেশের বহু গবেষক তা নিয়ে কাজ করেছেন, বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে সোভিয়েত বিপ্লব ঘটার আগে। কিন্তু যে ঐতিহাসিক সম্পদ পৃথিবী লুকিয়ে রেখেছে তার বুঝি আর শেষ নেই। তাই এদেশের কাগজপত্রে প্রায়ই দেখা যায় মধ্য এশিয়া বা সাইবেরিয়ায় কণিষ্কযুগের মন্দির আবিষ্কারের কথা, পাহাড়ের গুহায় প্রাপ্ত মূল্যবান পুঁথিপত্রের সংবাদ। এরকম একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার হল এক অত্যাশ্চর্য বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির। মধ্য এশিয়ার এক অঞ্চলে বহুকাল ধরেই অনেক উঁচু একটা ঢিবি ছিল। লোকে বলত সেটা নাকি এক সিদ্ধপুরুষের প্রাচীন আবাস। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই জনপ্রবাদের ওপর কোদাল চালাতে বেরিয়ে এল এক বিরাটাকার বুদ্ধমূর্তি যার বয়স হবে কণিষ্ক যুগের সমান। সেই সঙ্গে এক বৌদ্ধবিহার। সাম্প্রতিক আরেকটি আবিষ্কারও ভারত সংক্রান্ত। একটি ছোট্ট লোকালয়। তাতে আছে সরাইখানা, মন্দির, ছোট ছোট বাসস্থান। প্রাপ্ত জিনিসপত্র থেকে বোঝা যায় এ জায়গাটা ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এবং তাঁরা ছিলেন অগ্নি-উপাসক।

মধ্য এশিয়াতে এমন একটি উপজাতিরও সন্ধান পাওয়া গেছে যা তার জনসংখ্যার দিক দিয়ে খুবই সামান্য হলেও ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহসা চর্চার ক্ষেত্রে অসামান্য। ভাষা তাদের পঞ্জাব ও উত্তর ভারতের কয়েকটি ভাষার সঙ্গে খুবই মেলে। তাদের আচার ব্যবহারও উত্তর ভারতীয়। প্রসঙ্গত জানাই, বৌদ্ধধর্ম কিন্তু সোভিয়েত দেশ থেকে মোটেই লোপ পায়নি; সাইবেরিয়ায় এখনো অনেক বৌদ্ধ আছেন, তাদের মঠ-মন্দির আচার্য সবই আছে।

ভূমধ্যসাগর তীরের দেশগুলির প্রাচীন

ইতিহাসের সংগে সোভিয়েত আর্মেনিয়া, জর্জিয়া এবং কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী অঞ্চলের যোগ বহু শতাব্দীর। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস স্বয়ং এসব অঞ্চলে এসেছিলেন বলে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস। গ্রীসের সংগে এসব অঞ্চলের যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল তার একটি প্রমাণ হল কৃষ্ণসাগর তীরের সোভিয়েত অঞ্চলে প্রাচীন গ্রীক শহর আবিষ্কার। আর্মেনিয়ার প্রাচীন মঠগুলিতে যেসব বহু পুরনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে গ্রীক, বাইজেনটাইন সংস্কৃতি ও খৃষ্টধর্মের ইতিহাস সংক্রান্ত বহু দুর্মূল্য সম্পদ তাতে রয়েছে। এমন একটি হাজার বছরের প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া গেছে স্বরলিপি সমেত সংগীতালোচনা। এত পুরনো সুর বোধ হয় এখনো আর আবিষ্কৃত হয়নি।

সম্প্রতি আর্মেনিয়ার এক ঐতিহাসিক মিখাইল মাজমানিয়ান লিওনার্দো দার্ভিঞ্চির জীবন সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রকাশ করেছেন। দার্ভিঞ্চির জীবনের বহু তথ্যই তাঁর জীবনীকার ও গবেষকরা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ১৪৮০-১৪৮২ এই দুটি বছরের কথা কেউ বলেন না। ঐতিহাসিকদের মতে ঐ সময়টায় ক্ষমতায় ও বিত্তে প্রতিপত্তিশালী মেদিচি পরিবারের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র গড়ে ওঠে। দার্ভিঞ্চির সহানুভূতি ছিল ঐ ষড়যন্ত্রের প্রতি। মাজমানিয়ান প্রমাণ করেছেন যে, ঐ ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার ফলে দার্ভিঞ্চি চলে যান দেশের বাইরে এবং আসেন আর্মেনিয়ায়।

দার্ভিঞ্চির লেখা ছবি ও তাঁর আঁকা মানচিত্রের সাহায্যে মাজমানিয়াম তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সংগে আকস্মিকতার কিছুটা সম্পর্ক আছে। নিচের ঘটনাটা তার আরেকটি প্রমাণ। বছর দশেকের একটি ছোট্ট ছেলে হাঁটছিল স্তেপের বুকের এক নদীতীর ধরে। হঠাৎ তার পায়ে ঠেকল একটা চকচকে জিনিস। জিনিসটা মাটির ভেতর মাথা তুলেছে। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে ছেলেটি মাটি খুঁড়ে দেখতে পেল সোনার একটা মোটা চেন। তা থেকে গোল গোল মেডেল ঝুলছে। কাছেই আরো সব সোনার অলংকার। ছেলেটি সবকিছু নিয়ে যায়। কিরোভগোরোদ শহরের মিউজিয়মে। সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সম্প্রতি জায়গাটা খুঁড়ে বের করেছেন স্লাভনিক উপজাতির এক সর্দার ও তার স্ত্রীর চিতা, ৭ম শতাব্দীর। সে চিতার সংগে ছিল বহু অতি সুন্দর অলংকার, ঘট। সবই স্থানীয় কারিগরদের কাজ। কিছু অবশ্য বাইজেন্টিয়াম ও পারস্যের।

এই আবিষ্কারের ফলে এই মতই সমর্থিত হয় যে, খৃষ্টাব্দের সূচনায় এসব দেশেও মৃতদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল অন্য। স্বামী স্ত্রীর চিতা একই সংগে কেন? এটা কি ঘটনাচক্র না কি সতীদাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল? কিংবা হয়ত স্বামীর মৃত্যুশোক সইতে না পেরে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল বা তার উল্টোটা?

শেষের যুক্তিটা বেশ রোমান্টিক কিন্তু তার চেয়েও বড় রোমান্সের পরিচয় পাওয়া গেছে নভগোরোদ শহরে। প্রায় আটশ বছর আগে ঐ শহরের এক যুবক নিকিতা ভীষণভাবে প্রেমে পড়ে ঐ শহরেরই একটি মেয়ে জুলিয়ানার। কিন্তু প্রণয়িনীর কাছে নিজে যাবার সাহস তার হয়নি—হয়ত "জগদ্দা" গোছের কোন আত্মীয় সেই জুলিয়ানার ছিল। যা হোক নিকিতা বেচারী তার বন্ধুর ইগনাতের হাতে একটা চিঠি পাঠায় জুলিয়ানাকে, বার্চ গাছের বাকলে তাড়াহুড়ো করে লিখে। সে চিঠিতে ছিল বিয়ের প্রস্তাব। হয়ত চিঠির ফল কী হবে তারই দুশ্চিন্তায় কিংবা প্রেমের আবেগে নিকিতা বেচারা অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় ছিল। কারণ ঐ দুছত্রের চিঠিতে সে নিজের নামটাই দুবার দুরকম বানানে লিখেছে।

নিকিতাকে তার জুলিয়ানা কী উত্তর দিয়েছিল তা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শুভময় ঘোষ

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩৩ ॥

যতীশবাবু যদিও নিজের বাসাতেই ছিলেন কিন্তু কাউরের বাড়িতে রোজই একবার করে যেতেন। তার দোকানে চা খেতেন আর আড্ডা দিতেন খানিকক্ষণ। অশ্ব-প্রতিম রমেশের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়েছিল খুব। রমেশ লোকটি মূর্খ নয়। সবাই তাকে গুন্ডা বলে, সে গুন্ডামিও করে, নৃশংসভাবে লোকও খুন করেছে একবার, কিন্তু তার এ প্রকৃতিটা ষোল-আনা গুন্ডা-প্রকৃতি নয়। কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তার কার্যকলাপ কোনও রূপকারের তুলিতে চিত্রিত হ'ত তাহলে বিদ্রোহী বীর আখ্যা পেতে পারত সে। অনেকে তাকে কমিউনিস্ট বলে। কিন্তু ঠিক কমিউনিস্টও নয় সে। তার ভগবানে বিশ্বাস আছে, মা কালীর গোঁড়া ভক্ত সে, প্রতি বৎসর পিতামাতার শ্রাদ্ধ করে, কিছুদিন আগে গয়ায় পিন্ডও দিয়ে এসেছে। কিন্তু সে গোঁয়ার, কাঠ-গোঁয়ার। কোনরকম অন্যায়, বিশেষ করে গরীবদের উপর অন্যায় সে কিছুতেই সহ্য করবে না। সে নিজেই তার বিচার করবে এবং সাজা দেবে। যাকে সে খুন করেছিল, সে লোকটা মুসলমান। লোকটা ধর্ষণ করেছিল একটা ভিখারী মেয়েকে। রমেশের দল তাকে নিয়ে এসেছিল কিড্‌ন্যাপ করে মুখ বেঁধে, তারপর তাকে হত্যা করেছিল। এ জন্য তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ তো নেই-ই, বরং একটা সৎকার্য করতে পেয়েছে বলে মনে মনে গর্বিত সে। মশা, মাছি, ছারপোকা, সাপকে মেরে যেমন আমাদের দুঃখ হয় না, বরং মনে হয় একটা উচিত কর্মই করলাম, শয়তানদের মেরে তেমনি আনন্দ হয় রমেশের এবং রমেশের বন্ধু কাটরা আর ঝাবরার।

যতীশবাবু এদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেননি। তিনি প্রায়ই আসতেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতেন। সে কাহিনীর প্রধান "ভিলেন" ডাক্তার ঘোষাল। ডাক্তার ঘোষালের জন্যই যে তাঁর দু'দুটো জোয়ান ভাইঝি নষ্ট হয়ে গেল, ডাক্তার ঘোষালের জন্যই তাঁকে যে দেশ ছেড়ে আসতে হল, তাঁকে কোন কথা বলতে গেলে যে তিনি মেরে তাড়িয়ে দেন--- এই সব কথাই নানা রং দিয়ে ক্রমাগত বলেন তিনি। ডাক্তার ঘোষাল যে অতি পাজি লোক এখানে তার মূর্তিমন্ত প্রমাণ কাউ নিজে। কাউয়ের মা যে সাধারণ শ্রেণীর পতিতা ছিল, ডাক্তার ঘোষাল যে আর পাঁচজন খদ্দেরের মতোই তার কাছে এসেছিলেন, এ কথার উপর জোর দেয় না কেউ। ডাক্তার ঘোষাল যে কাউকে বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছেন তার জন্যেও এখানকার কেউ ডাক্তার ঘোষালের প্রশংসা করে না। এখানে যে কথা চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে ডাক্তার ঘোষালই কাউর মায়ের সর্বনাশ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অন্ধকারে মাঠ পেরোতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে মারা গেছে বেচারা। তারপর পাষণ্ডটা কাউকেও মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে একটি পয়সা না দিয়ে। এর মধ্যে যে খানিকটা মিথ্যা ছিল তা কাউ জানত। কিন্তু সেটা সে চেপে গিয়েছিল। চেপে গিয়েছিল, কারণ অপমানে তার বুক জ্বলছিল। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যেমন করে হোক এ অপমানের সে প্রতিশোধ নেবেই। শুধু তার নিজের অপমান নয়, তার মাসীমা ঝিনুকের অপমান। তার বদ্ধ ধারণা ঝিনুককে ডাক্তার ঘোষাল যাদু করে রেখেছে প্রখ্যাত শয়তানদের একটা যাদু করবার শক্তি আছে। সেই শক্তির জোরে লোকটা বেঁধে রেখেছে ঝিনুককে। তা না হলে অত অপমান সত্ত্বেও ঝিনুক তার কাছে আছে কেন? সে স্বচক্ষে দেখেছে লোকটা চুলের ঝুঁটি ধরে মারে ওকে।

চড় মারে, লাথি মারে, তবু ঝিন্টুক আছে কেন ওখানে? নিশ্চয়ই যাদু করেছে। এই যাদু-পাশ ছিন্ন করতেই হবে যেমন করে হোক। উদ্ধার করতেই হবে ঝিন্টুকে ওখান থেকে। কিন্তু কি করে তা করা যায়? রমেশ, কার্তরা আর ঝাবরা তাকে বলেছিল, তুই কি করতে চাস, জানাস আমাদের। আমরা ব্যবস্থা করে দেব। কাউ জানত সে কি করবে, কিন্তু ঠিক কেমন করে তা সম্ভব হবে, কবে সম্ভব হবে, তা ঠিক করতে পারেনি তখনও। কিন্তু মনের মধ্যে তার তুষানল জ্বলছিল দিবারাত্রি। সে তুষানলে যতীশবাবু এসে ইন্ধন জোগাতেন। তাঁর একটু স্বার্থও ছিল। একদিন কাউ তাঁকে বলেছিল, "আমি যদি হাতে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যাই তাহলে সে টাকা আপনাকেই দেব যতীশবাবু। পাওয়া অসম্ভব নয়, ঝাবরা মাঝে মাঝে আমাকে টাকা এনে দেয়।" যতীশবাবু আশায় আশায় ছিলেন। গণেশ হালদার স্কুলের জন্য যে ঘরটি চেয়েছিলেন সেটি পেলেন না।

শ্গাল-বিষ্ঠার প্রয়োজন হ'লে শ্গাল পর্বত-শিখরে গিয়ে মল-ত্যাগ করে, এইরকম একটা জন-শ্রুতি আছে। হরিহরবাবু শ্গালেরও উপর টেক্কা দিলেন। মিথ্যা কথা বললেন তিনি। বললেন, তাঁর ভায়রাভাইয়ের শালা আসবে, তার জন্যেই বাড়িটা তিনি রেখেছেন। বাড়িটা বাড়ি হিসেবে জঘন্য। ছাত ফাটা, কল, আলো কিছু নেই। চারিপাশে প্রতিবেশী নেই, আছে বন-জঙ্গল। ও বাড়িতে কেউ বাস করতে পারে না বলেই বাড়িটা খালি পড়ে আছে। বহুকাল আগে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে একজন ভাড়াটে ছিল, কিন্তু সে ছিল মাত্র একমাস। তারপর থেকে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি বাড়িটা অনায়াসে দিতে পারতেন। কিন্তু যেই শুনলেন রেফিউজি ছেলে-মেয়েদের জন্য এখানে স্কুল করবেন স্কুল-বিতাড়িত বাঙাল মাস্টার গণেশ হালদার অমনি ভড়কে গেলেন তিনি। রেফিউজিদের তিনি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। অহেতুক একটা রাগ আছে তাদের উপর। তাঁর প্রাণের বন্ধু উকিল নবগোপালবাবু বললেন, খবরদার দেবেন না মশাই, দিলে ও বাড়ি আর ফেরত পাবেন না। সুতরাং হরিহর ডাক্তার ঘোষালকে হাত কচলে কচলে মিথ্যে কথাটি বললেন, "আপনার কথা ফেলতাম না ডাক্তারবাবু। কিন্তু কি করব আমার ভায়রাভাইয়ের শালা, বউ চিঠি লিখেছে এখানে আসবে, তার জন্যে বাড়িটা যেন রেখে দি। আত্মীয় স্বজন, রাখতেই হয়েছে কি করব।"

সব শুনে ডাক্তার মুখার্জি প্রশ্ন করলেন, "আপনি দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক পড়াবেন তো? তার জন্যে বাড়ির দরকার কি। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে যে বিরাট বটগাছটা আছে তার তলাতেই শুরু করে দিন না স্কুল। রবিবার আর বুধবার ওখানে হাট বসে সে দু'দিন স্কুলের ছুটি থাকবে। বনস্পতি বিদ্যালয় নাম দিয়ে ওইখানেই শুরু করে দিন আপাতত। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ওই গাছ তলাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আজ তা বিশ্বভারতী হয়েছে।"

গণেশ হালদার বললেন, "বেশ"।

ব্যাপারটা নূতন ধরনের হওয়াতে তিনি আরও বেশী উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তাঁর উৎসাহ সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি আপনার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বই স্লেট কেনবার জন্য একশ টাকা চাঁদাও দিচ্ছি। আপনি দরকার মতো কিনে দেবেন ওদের। পরশু বৃহস্পতিবার, পরশু দিনই আরম্ভ করে দিন স্কুল। আজ সোমবার, তিনদিন হাতে পাচ্ছেন। রেফিউজি পাড়ায় খবরটা চাউর করে দিন।"

"বেশ।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

বৃহস্পতিবার মাত্র বারোজন ছাত্রছাত্রী জুটল। তাদের সঙ্গে তাদের বয়স্ক আত্মীয়রাও এসেছিল। গণেশ হালদার প্রত্যেককে একখানি করে বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত এবং স্লেট দিলেন। বারোটা স্লেটের উপর বারোটি ছেলেমেয়ের হাতে-খড়িও দিয়ে দিলেন তিনি। বারোটি "অ" লেখা হল, তাতে দাগা বুলোতে লাগল তারা। খানিকক্ষণ দাগা বুলাবার পর শতকিয়া ঘোষালেন নিজে। তারপর নিজে "বন্দে মাতরম্" গানটি গেয়ে শোনালেন। বললেন, "কাল থেকে এ গান স্কুল বসবার আগেই গাওয়া হবে। তোমরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে গাইবে। সবাই মুখস্থ করে ফেল গানটা।" তিনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন তা আগে কেউ জানত না। যে সব বয়স্ক আত্মীয়েরা এসেছিলেন গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁরা। তাঁদের মনে হল, এ গান নয়, এ যেন হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত ভক্তি-প্রস্রবণ।

গানের পর বক্তৃতা দিলেন একটি। বক্তৃতায় যা বললেন তা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারল না হয়তো, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা বুঝল এবং রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল।

...রে, জাগিয়ে মারে, তবু ঝিনুক আছে ...ওখানে? নিশ্চয়ই বাদ করেছে। এই ...পাপ ছিন্ন করতেই হবে যেমন করে ... উৎপাটন করতেই হবে ঝিনুককে ...থেকে। কিন্তু কি করে তা করা ... রমেশ, কাটরা আর আজরা তাকে ...লেন, তুই কি করতে চাস, জানাস আমাদের। আমরা ব্যবস্থা করে দেব। কাউ জানত সে কি করবে, কিন্তু ঠিক কেমন করে তা সম্ভব হবে, কবে সম্ভব হবে, তা ঠিক করতে পারেনি তখনও। কিন্তু মনের মধ্যে তার তুষানল জ্বলছিল দিবারাত্রি। সে তুষানলে যতীশবাবু এসে ইন্ধন জোগাতেন। তাঁর একটু স্বার্থও ছিল। একদিন কাউ তাঁকে বলেছিল, "আমি যদি হাতে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যাই তাহলে সে টাকা আপনাকেই দেব যতীশবাবু। পাওয়া অসম্ভব নয়, ঝাবরা মাঝে মাঝে আমাকে টাকা এনে দেয়।" যতীশবাবু আশায় আশায় ছিলেন। গণেশ হালদার স্কুলের জন্য যে ঘরটি চেয়েছিলেন সেটি পেলেন না।

শ্গোল-বিষ্ঠার প্রয়োজন হ'লে শ্গোল পর্বত-শিখরে গিয়ে মল-ত্যাগ করে, এইরকম একটা জন-শ্রুতি আছে। হরিহরবাব্ শ্গালেরও উপর টেক্কা দিলেন। মিথ্যা কথা বললেন তিনি। বললেন, তাঁর ভায়রাভাইয়ের শালা আসবে, তার জন্যেই বাড়িটা তিনি রেখেছেন। বাড়িটা বাড়ি হিসেবে জঘন্য। ছাত ফাটা, কল, আলো কিছ্ নেই। চারিপাশে প্রতিবেশী নেই, আছে বন-জঙ্গল। ও বাড়িতে কেউ বাস করতে পারে না বলেই বাড়িটা খালি পড়ে আছে। বহ্কাল আগে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে একজন ভাড়াটে ছিল, কিন্তু সে ছিল মাত্র একমাস। তারপর থেকে বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। ইচ্ছে করলেই তিনি বাড়িটা অনায়াসে দিতে পারতেন। কিন্তু যেই শ্নলেন রেফিউজি ছেলে-মেয়েদের জন্য এখানে স্কুল করবেন স্কুল-বিতাড়িত বাঙাল মাস্টার গণেশ হালদার অমনি ভড়কে গেলেন তিনি। রেফিউজিদের তিনি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। অহেতুক একটা রাগ আছে তাদের উপর। তাঁর প্রাণের বন্ধ্ উকিল নবগোপালবাব্ বললেন, খবরদার দেবেন না মশাই, দিলে ও বাড়ি আর ফেরত পাবেন না। স্তরাং হরিহর ডাক্তার ঘোষালকে হাত কচলে কচলে মিথ্যে কথাটি বললেন, "আপনার কথা ফেলতাম না ডাক্তারবাব্। কিন্তু কি করব আমার ভায়রাভাইয়ের শালা, বউ চিঠি লিখেছে এখানে আসবে, তার জন্যে বাড়িটা যেন রেখে দি। আত্মীয় স্থল, রাখতেই হয়েছে কি করব।"

সব শ্নে ডাক্তার ম্খার্জি প্রশ্ন করলেন, "আপনি দ্প্রে ঘণ্টা দ্য়েক পড়াবেন তো? তার জন্যে বাড়ির দরকার কি। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে যে বিরাট বটগাছটা আছে তার তলাতেই শ্র্ করে দিন না স্কুল। রবিবার আর ব্ধবার ওখানে হাট বসে সে দ্'দিন স্কুলের ছ্টি থাকবে। বনস্পতি বিদ্যালয় নাম দিয়ে ওইখানেই শ্র্ করে দিন আপাতত। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ওই গাছ তলাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আজ তা বিশ্বভারতী হয়েছে।"

গণেশ হালদার বললেন, "বেশ"।

ব্যাপারটা ন্তন ধরনের হওয়াতে তিনি আরও বেশী উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তাঁর উৎসাহ সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন ডাক্তারবাব্ বললেন, "আমি আপনার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বই স্লেট কেনবার জন্য একশ টাকা চাঁদাও দিচ্ছি। আপনি দরকার মতো কিনে দেবেন ওদের। পরশ্ ব্হস্পতিবার, পরশ্ দিনই আরম্ভ করে দিন স্কুল। আজ সোমবার, তিনদিন হাতে পাচ্ছেন। রেফিউজি পাড়ায় খবরটা চাউর করে দিন।"

"বেশ।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেলেন গণেশ হালদার।

ব্হস্পতিবার মাত্র বারোজন ছাত্রছাত্রী জ্টল। তাদের সঙ্গে তাদের বয়স্ক আত্মীয়রাও এসেছিল। গণেশ হালদার প্রত্যেককে একখানি করে বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত এবং স্লেট দিলেন। বারোটা স্লেটের উপর বারোটি ছেলেমেয়ের হাতে-খড়িও দিয়ে দিলেন তিনি। বারোটি "অ" লেখা হল, তাতে দাগা ব্লোতে লাগল তারা। খানিকক্ষণ দাগা ব্লাবার পর শতকিয়া ঘোষালেন নিজে। তারপর নিজে "বন্দে মাতরম্" গানটি গেয়ে শোনালেন। বললেন, "কাল থেকে এ গান স্কুল বসবার আগেই গাওয়া হবে। তোমরা সবাই মিলে আমার সঙ্গে গাইবে। সবাই ম্খস্থ করে ফেল গানটা।" তিনি যে এত স্ন্দর গান গাইতে পারেন তা আগে কেউ জানত না। যে সব বয়স্ক আত্মীয়েরা এসেছিলেন গান শ্নে ম্গ্ধ হয়ে গেলেন তাঁরা। তাঁদের মনে হল, এ গান নয়, এ যেন হৃদয় থেকে বতোৎসারিত ভক্তি-প্রস্রবণ।

গানের পর বক্তৃতা দিলেন একটি। বক্তৃতায় যা বললেন তা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্প্র্ণ ব্ঝতে পারল না হয়তো, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা ব্ঝল এবং র্দ্ধশ্বাসে শ্নতে লাগল।

গণেশ হালদার বললেন —"তোমরা আমার আপনার লোক। তোমাদের যাতে ভালো হয় তার জন্যে যতটা আমার সাধ্যে কুলোয় তা আমি করব। কিন্তু তার আগে গোটাকতক কথা শুনে নাও। রাজনীতির চক্রান্তে আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে এদেশে এসেছি। আবার যদি সুদিন আসে, আবার যদি ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়, আমরা আবার হয়তো নিজেদের দেশে ফিরে যাব। কিন্তু একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। যে দেশে আমরা এসেছি তা-ও আমাদের দেশ। আমাদের ভারত-মাতার এক রূপ নয়, অনেক রূপ। তিনি এক ভাষায় কথা বলেন না, অনেক ভাষায় কথা বলেন। একরকম খাবার এক মুখ দিয়ে খান না, বহু রকম খাবার বহু মুখ দিয়ে খান। কিন্তু যেখানেই যে রূপেই তিনি থাকুন, তিনি আমাদের মা, আমাদেরই আপন লোক। হিমালয় থেকে কুমারিকা এবং পাঞ্জাব থেকে আসাম সবই আমাদের দেশ। এক কথায় ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দেশই আমাদের বিদেশ নয়, সবই স্বদেশ। সব জায়গাতেই বাস করবার ন্যায্য অধিকার আমাদের আছে, সংবিধান অনুসারে সব জায়গাতেই আমাদের সমান অধিকার। সুতরাং তোমরা এদেশকে বিদেশ বলে মনে কোরো না। এদেশে তোমাদের উপর নানারকম অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে তা জানি। নিজের মাতৃভাষায় যাতে তোমরা লেখাপড়া করতে পার তার কোন সুবন্দোবস্ত নেই। তোমরা যে কাজে পটু সে কাজ করবার ব্যবস্থা নেই। তোমাদের প্রতিবেশীরা তোমাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, অনেক সময় বিদ্বেষের চোখে দেখে। এ সবই সত্য। এর জন্য লড়তে হবে। সেই লড়াইয়ের প্রধান উপকরণ—মনের জোর আর মনুষ্যত্ব। দেশে যখন ছিলে তখন কি তোমাদের উপর অত্যাচার হয়নি? বড়লোক জমিদার আর সুদখোর মহাজনদের অত্যাচারে কি বিপদে পড়নি? তখন যারা মানুষের মতো লড়তে পেরেছিল তারা জিতেছে, এ রকম নজির অনেক আছে। এখানেও সরকারের দপ্তরে অসাধু কর্মচারীর অভাব নেই, প্রতিবেশীদের মধ্যে পাজি লোক অনেক। এদের সঙ্গে লড়তে হবে, আইনত লড়তে হবে। কিন্তু এ যুদ্ধে তোমরা সকলের সহানুভূতি পাবে তোমরা সত্যিই যদি ভালো লোক হও। এইটেই আসল কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা। ওরা পাজি বলে তোমরাও পাজি হবে এটা কোনও কাজের কথা নয়। তোমাদের ভালো হতে হবে। ভালো থাকবার একটা প্রধান উপায় কাজ করা। তোমরা মনের মতো কাজ পাচ্ছ না বলে যে কুঁড়ে হয়ে বসে থাকবে, সরকারের দয়ায় যতটুকু ভাতা পাচ্ছ—তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, আর অলস হয়ে বসে পর-নিন্দা পর-চর্চা করবে, এ মনোভাব মোটেই ভালো নয়। কাজ অনেক আছে, করবার ইচ্ছে থাকলেই তা করা যায়। কাজের অভাব নেই। কিন্তু যে কাজই কর সৎ এবং ভদ্র থাকতে হবে, সবাই যাতে তোমাদের শ্রদ্ধা করতে পারে। নিজের মনুষ্যত্ব মর্যাদা হারিয়ে ফেললে চলবে না, আর তা যদি না ফেল তাহলেই দেখবে সবাই তোমাদের খাতির করবে, চেষ্টা করবে কিসে তোমাদের ভালো হয়। আর একটা অনুরোধও তোমাদের করছি, অন্যায় কখনও সহ্য করবে না। তোমরা নিজেদের একটা পঞ্চায়েত তৈরি কর। ইংরেজীতে এর নাম ইউনিয়ন। এই পঞ্চায়েতের কাজ হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। গোড়াতেই বলেছি ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই তোমাদের সব রকম সুবিধা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে, সেই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। দেশের সরকার এবং দেশের আইন তোমাদের পক্ষে। কতকগুলি নীচমনা স্বার্থপর রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্রে আমরা সে অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত হই তাহলে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে। আজ আর বেশী কিছু বলব না। সর্বশেষে আবার তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে মানুষ, তোমরা যে ভদ্র, তোমরা যে স্বাধীন দেশের নাগরিক, তোমরাও যে এই বিশাল দেশের যোগ্য অধিবাসী, এই বোধটা কখনও হারিও না। এই বোধটা যদি অন্তরে সদাসর্বদা জাগ্রত রাখ, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রথম দিনই স্কুলের খবর এবং গণেশ

মাস্টারের অসাধারণ আচরণের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, শুধু রেফিউজি মহল নয়, অন্যান্য মহলেও।

সব শুনে বিস্ময়ে ডাক্তার ঘোষালের চোখ দুটো চলকে বেরিয়ে আসবার মতো হলো। তিনি এই অবিশ্বাস্য প্রস্তাব শুনে ঝিনুকের মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"বিলেত যাব! তোমার সঙ্গে? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি? Have you gone mad?

"আমি পাসপোর্ট ভিসার সব ব্যবস্থা করছি। সেজন্য আপনি ভাববেন না। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে। ও দেশেও ডাক্তারি করতে পারবেন শামুক লিখেছে।"

"আমি ওদেশে যাব কেন! What's the reason?"

ঝিনুক গম্ভীর হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর যা বলল তা অপ্রত্যাশিত। অন্য কোন সময়ে সে বোধ হয় এ কথা বলত না।

বলল, "আপনাকে যেতে হবে, কারণ আমি যাব" ডাক্তার ঘোষাল ঈষৎ হাঁ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

"তুমিই বা যাবে কেন! এখানে কি এমন জলে পড়েছ।"

"তা আপনাকে পরে বোঝাব। তবে এটা জেনে রাখুন আমি যাবই। এখন চলুন "চিত্রশালা"য় গিয়ে দুটো ফোটো তোলাই। তারপর ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসার আর পুলিস সাহেবের কাছে যেতে হবে।"

"কেন!"

"পাসপোর্টের জন্য এসব দরকার। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানেও যাব।"

ডাক্তার ঘোষাল ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

"শুকনো ঘরে জল ঢেলে কাদা করছ কেন! বেশ তো আছি আমরা!"

"আপনি সুখে আছেন হয়তো, কিন্তু আমি নেই। কেন নেই সে আলোচনা পরে করব। এখন চলুন। পাসপোর্ট করিয়ে রাখলে তো কোনও ক্ষতি নেই। ইচ্ছে করলে না-ও যেতে পারেন। যাবেন কি না সেটা পরে ঠিক করবেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।"

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, "ফোটো তোলার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তোমাকে ত ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েক-দিন আগে একটা লোক এসে আমার ফোটো তুলে নিয়ে গেছে। কোনদিন জান যেদিন বাঁদরটা এসে পাঁউরুটি নিয়ে যায়। বাঁদরটার সঙ্গে লোকটার যোগাযোগ আছে কি না জানি না, কিন্তু এটা ঠিক লোকটা আমার ফোটো তুলেছে। হালদার মশাইও দেখেছেন। তাকে ধরলুম গিয়ে, সে বললে সে একটা পাখির ছবি তুলেছে—"

"তাই না কি!"

ঝিনুক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। বুকটা কেঁপে উঠল তার। তারা যে চোরাই মালের কারবার করে এটা জানাজানি হয়ে যায় নি তো! লোকটা পুলিসের গোয়েন্দা নয় তো? ডাক্তার ঘোষালকে কেন্দ্র করেই এ ব্যবসা চলছে। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিই এর প্রধান মূলধন। অজানা একটা লোক এসে ফোটো তুলে নিয়ে গেল কেন? সে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু সামলে নিতেও দেরি হল না তার।

"যাকগে সে যা হবার হবে। ও নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ নেই। এখন চলুন "চিত্রশালায়!"

"কেন ওসব ফ্যাচাং তুলছ, আমি যাব না কোথাও—"

"চলুন, লক্ষ্মীটি—"

ডাক্তার ঘোষালের বাহু ধরে মৃদু আকর্ষণ করল ঝিনুক। যদিও ডাক্তার ঘোষালের কপালে ভ্রূকুটি দেখা গেল, কিন্তু তিনি গলে' গেলেন ভিতরে ভিতরে। এই বোধ হয় প্রথম তিনি ঝিনুকের কাছে একটু আদরের আস্বাদ পেলেন।

"কি যে হাঙ্গামা কর তুমি ফর নাথিং।"

হয়নি আজও। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই আখালী লোভাতুর দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখে—সুযোগ পেলেই বুকে চেপে ধরে; চুমায় চুমায় অস্থির করে তোলে তাকে। আয়েতু অনেক পূজো দিয়েছে, অনেক মুরগী বলি দিয়েছে গুনিয়ার নির্দেশে—কিন্তু কিছুই হয়নি ফল। আখালীর তৃষিত মাতৃত্ব তৃপ্ত হয়নি।

সন্ধ্যাবেলায় আয়েতু বসেছিল বাড়ির সামনের আঙ্গিনাতে। সামনেই উজ্জা-ওয়েতা উৎসব—অর্থাৎ ধানকাটার আগের রাত্রের আহেরিয়া উৎসব। বছরের সবচেয়ে বড় শিকার অভিযান। আয়েতু বসে বসে পাথরে শান দিয়ে তীক্ষ্ণতর করে তুলছিল তীরের ফলা। সূর্যের আলো নিভে যাওয়ার আগে দিনের শেষ কাজগুলো সেরে নিচ্ছে আখালী। শুয়োরগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকেছে, মুরগীগুলো খাঁচায়। বাকি আছে

উঁচু মাচাং ঘরে এবার ছাগল দুটোকে তুলে দেওয়া। তাহলে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ পড়ন্ত রৌদ্রের দীর্ঘ ছায়া পড়ল যেন কার—সামনের উঠানে। আয়েতু মুখ তুলে দেখে একটি জিপসি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। তার কোলে একটি সদ্যজাত শিশু। মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশেক, পরনে ঘাঘরা আর উড়ানি। সীমান্তে রুপোর একটা মস্ত ঝুমঝুমি—হাতে একসার কাঁচের চুড়ি। মেয়েটি হাত পা নেড়ে কি যেন বলছে। আয়েতু বুঝতে পারে না তার ভাষা। কিন্তু ভঙ্গিটা আন্দাজ করতে পারে। একবার মুখে একবার বুকে-পেটে হাত দিয়ে সে যা বলতে চাইছে তাতে বোঝা যায় সে ক্ষুধার্ত। আয়েতু নিঃশব্দে উঠে গেল ঘরের ভিতরে, নিয়ে এল মাণ্ডিয়া-ভরা শুকনো লাউয়ের পাত্রটা। ইঙ্গিতে আদেশ করলে মেয়েটিকে হাত পাততে। তরল খাদ্যটা সে ঢেলে দেবে। মেয়েটি রাজী হল না। না-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। নারানপুরের হাটে-বাজারে যাতায়াত ছিল আয়েতুর। সে আন্দাজ করলে মেয়েটি এ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত নয়। এবার সে নিয়ে এল একটা পাকা পেঁপে। আশ্চর্য, তাও নিল না মেয়েটি। বারবার বাচ্ছাটাকে দেখায় আর বুকে করাঘাত করে। বুঝতে পারে না, সে কি বলতে চাইছে। আখালীও বেরিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে। দাঁড়িয়ে দেখছিল মেয়েটার কাণ্ড। কেমন করে কে জানে সে বুঝতে পারে মেয়েটির বক্তব্য। হঠাৎ ছুটে এসে কেড়ে নিল বাচ্ছাটাকে। দু হাতে চেপে ধরল তাকে নিজের নগ্ন বুকে। জিপসি মেয়েটি কোন আপত্তি করল না। ক্ষুধার্ত সে নয়, ক্ষুধার্ত তার শিশুকন্যাটি। মুরিয়ার ঘরে দুধ থাকে না। গরু ওরা পোষে; কিন্তু দুধ দোয় না। গরু-বলদ গাড়ি টানে, ক্ষেতে লাঙ্গল টানে, আর মাংস সরবরাহ করে। দুধ দেয় না।

আখালী বাচ্ছাটাকে নিয়ে গেল পাশের বাড়ি। মোরাঙ বউয়ের কাছে। মোরাঙ বউ সদ্যজাত সন্তানের জননী। জিপসি মেয়েটিও গেল ওর পিছন পিছন। বাচ্ছাটাকে দুধ খাইয়ে ফেরত দিতে হাত কাঁপছিল আখালীর।

রাত্রে ঘুমন্ত আয়েতুকে আখালী বললে : ঐ বাচ্ছাটা কখনও ওর মেয়ে নয়, বুঝলে? বাচ্ছাটার মা মরে গেছে।

ঘুমে জড়ানো চোখ না খুলেই আয়েতু বলে : কেমন করে বুঝলি?

: কী বোকা তুমি! যদি ওর মেয়েই হবে তবে ওর বুকে দুধ নেই কেন?

আয়েতু বলে : তা বটে!—পাশ ফিরে জুত করে শোয় ফের।

কিন্তু আখালীর চোখে ঘুম নেই। আবার খানিক পরে বলে : শুনছ?

: কী?

মাড়িয়া তরুণী—কোকামেটা

: আচ্ছা ওর যখন মা নেই, তখন চাইলে বাচ্ছাটাকে দেবেনা আমায়? আধো ঘুমের মধ্যে আয়েতু বলে : তা দেবে।

: দেবে?—উৎসাহে উঠে বসে আখালী—তাহলে চল নিয়ে আসি! এবার ঘুম ভেঙে যায় আয়েতুর। বলে : কি নিয়ে আসবি?

: কেন—ঐ বাচ্ছাটাকে। তুমি যে বললে চাইলে দিয়ে দেবে।

আয়েতু ধমক লাগায় : দূরে পাগলি! অতটুকু বাচ্ছাকে পুষবে কি করে? ও যে এখনও বুকের দুধ খায়। তোর বুকে কি দুধ আছে? আর তাছাড়া—

কিন্তু সে 'তাছাড়া' শুনবার মতো মনের অবস্থা আখালীর নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। আয়েতু বেচারি আর কী সান্ত্বনা দেবে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। আবার কখন ঐ ভাবেই আয়েতুর বাহুবন্ধনে অতৃপ্ত মাতৃত্বের বাসনা বুকে চেপে ঘুমিয়ে পড়ল আখালী।

রাত তখনও ভোর হয়নি। কুঁকড়ো ডাকেনি ভোরের। আয়েতুকে ঠেলে তুললো আখালী : এই শোন! বাচ্ছাটা এসেছে, জানলে! ঐ শোন আসকালোন ঘরে বাচ্ছাটা কাঁদছে।

এবার বিরক্ত বোধ করে আয়েতু। এ কী পাগলামি। কিন্তু না, সত্যিই যেন একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা যায় পাশের ঘরে। তারপর নিজের মনেই হেসে ফেলে আয়েতু। সেও কি আখালীর মতো পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি। জিপসির বাচ্ছা এ বাড়িতে কেমন করে আসবে। এ নিশ্চয় মোরাঙ-বউয়ের বাচ্ছার কান্না। কিন্তু আখালীর উৎসাহে ওকে উঠতে হল।

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। আস্‌কালোন ঘরটা বাড়ির পিছনে। জানালা নেই ঘরে। ছোট্ট ঘর, একটি মাত্র দরজা। বাড়ির বয়স্কা মেয়েরা মাসে তিন চার দিন মাত্র ঐ ঘরটায় কাটিয়ে আসে। প্রতি বাড়িতেই থাকে একটা করে আস্‌কালোন ঘর। ঘরটার সামনে এসে ওরা দুজনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্য, ঘরের ভিতর থেকে সত্যিই একটা সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা যায়। অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গেল আখালী বঞ্চিত বন্ধ্যা নারী—ফিরে এল মুহূর্তে সন্তান ক্রোড়ে; তৃপ্ত মাতৃত্বের পরিপূর্ণ হাসিটি মুখে ফুটিয়ে।

দিনের আলো ফুটলে দেখা গেল জিপসির দল যেখানে তাঁবু গেড়েছিল সেখানে জনপ্রাণী নেই।

কোয়াডোল পাথরটা যেমন উদাসীন দৃষ্টি মেলে দেখেছিল আমার ঠিকাদারের ছোট্ট ডিনামাইটের কৌটাটাকে, তেমনি উপেক্ষা ভরেই আয়েতু সেদিন দেখেছিল জিপসির পরিত্যক্ত শিশুকন্যাটিকে। আন্দাজ করতে পারেনি বিষকন্যার বিস্ফোরণী শক্তি।

আখালী ওকে বুকে করে মানুষ করতে থাকে—সাত রাজার ধন মানিক এসেছে সংসারে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি—যদিও সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা মুরিয়া সমাজে স্বীকৃত তাতে ওকে সুন্দরী বলা চলেনা আদৌ। আখালী ওর নাম রাখল রাঙিলা।

জিপসি মেয়েটি মানুষ হল মুরিয়া পরিবারে। ওরা কেউ জানতো না রাঙিলা বিষকন্যা!

রাঙিলার যখন তিন বছর বয়স তখন আখালীর কোলে এল তার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান—মাল্‌কো। সাদা আর কালো দুটি সন্তানকে মানুষ করতে থাকে আখালী। ক্রমে মেয়ে দুটি বড় হয়ে ওঠে। আর ঘরে রাখা যায় না। আখালী ওদের একে একে স্কুলে পাঠালো। সারাদিন মায়ের হাতে হাতে কাজ করে দুই বোন—তারপর সন্ধ্যায় চলে যায় ঘটুলে—ফেরে ভোর বেলা।

রাঙিলাকে মেনে নিল কারাংমেটার সমাজ, কিন্তু কারাংমেটার ঘটুলে ক্রমশ বুঝতে শিখল রাঙিলা—পুরোপুরি তাকে গ্রহণ করেনি কেউ।

কাবোঙ্গা থেকে পুঙ্গার মিছানা আসার পর অদ্ভুত পরিবর্তন হ'ল যেন রাঙিলার। কিন্দারি পাখির হালকা পালকের মতো মন নিয়ে রাঙিলা যেন নেচে বেড়ায় সারা পাড়া। কারাংমেটার কোন চেলিক তার মূল্য বোঝেনি, এজন্যে দুরন্ত ক্ষোভ ছিল রাঙিলার। ঘটুলে তার প্রেমিক ছিলনা, জীবনে একটিও কাঁকুই উপহার পায়নি সে, এ জন্যে মরমে মরে ছিল এতদিন। আজ তার দিন এসেছে। কাবোঙ্গা গাঁয়ের কোণ্ডা সর্দারের ছেলে চয়ন-শিরদার তার মূল্য বুঝেছে। তোমরা দেখে নাও যাকে

তোমাদের নজরে পড়েনি—তারই জন্যে ভিনগাঁয়ের সেরা ছেলে লামহাদা খাটতে আসছে। রাজপুত্রের মতো তার চেহারা, স্বয়ং লিঙ্গোপেনের মতো সুদর্শন। খবরটা রটে গেল মুখে মুখে। চয়নকে অনেকেই দেখেছে। ঘটুলের সবাই তাকে চেনে। চোখে পড়বার মতো ছেলেই যে। রঙিলাকে সবাই ঠাট্টা করে, মশ্‌করা করে। রঙিলা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে তা। কখনও ছদ্ম তাড়না করে বান্ধবীদের, কখনও হেসে স্বীকার করে নেয়। উশীর পাখি যেমন জোড়া পায়ে নেচে নেচে বেড়ায় রঙিলার ভাবখানাও তেমনি। কারাংমেটার ঘটুলে সাড়া পড়ে গেছে। চয়ন-শিরদার এ গাঁয়ে লামহাদা খাটতে এলে এ ঘটুলের সভ্য হতে হবে তাকে। কারাংমেটায় নয়া-ঘটুল, জোড়িদার-ঘটুল নয়। অর্থাৎ প্রতি তিন দিন অন্তর এখানে জোড় ভাঙে, জোড় গড়ে। কারাংমেটার সব মোটিয়ারীর মুখেই তাই হাসি ফুটেছে।

আর ঠিক সেই কারণেই মরমে মরে আছে মাল্‌কো। চয়নকে আর একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে তার কী আকুলতাই না ছিল। এ এক মাসে সে যে কতবার জোড়ি-মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে তা সেই জানে। সেই চয়নই আসছে কারাংমেটায়, সেই চয়নই এ ঘটুলের সভ্য হতে চলেছে। এ খবরে কোথায় মালকোর অন্তরাত্মা ধনুশীরের তারের মতো রিম্‌ঝিম করে বেজে উঠবে, না তার কান্না আসছে বুক ফেটে। ছি ছি ছি! এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়। এই যদি চয়নের মনে ছিল তা হলে সে রাত্রে কেন সে অমন মিথ্যার কুহক সৃষ্টি করেছিল?

কিন্তু! না, মাল্‌কো অন্যায় কথা ভাবছে। চয়ন তো কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। মাল্‌কোকে সে বুকে টেনে নিয়েছিল, আদর-সোহাগ করেছিল,—কিন্তু কই একবারও তো সে বলেনি মালকোকে সে জীবসঙ্গিনী করতে চায়। একথা যে মালকোর স্বপ্নেরও অগোচর। এ স্বপ্ন তো সে দেখেনি। মালকোও মুখ ফুটে বলেনি কোন কথা। চয়নকে দেখেই কি জানি কেন তার বুকের মধ্যে দুলে উঠেছিল। অরণ্যচারী পাহাড়ি মেয়েটির যৌবন হঠাৎ চিত্রকোট জলপ্রপাতের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চেয়েছিল ওর তারুণ্যের পায়ে। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার উদগ্র বাসনা জেগেছিল মনে। কিন্তু সে কথাও তো লাজুক মেয়েটা মুখ ফুটে বলেনি। চয়নও কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি সে রাতে। তা হলে মালকো এতটা মর্মাহত হল কেন? নিজেকেই সে নিজে প্রশ্ন করে। তবু কেন জানি মালকোর মনে হয়েছিল চয়নের ব্যবহারে একটা আন্তরিকতা ছিল—সাধারণ চেলিকের মতো তার আলিঙ্গন শুধু জৈবপ্রেরণার বশে নয়। নিজের অজান্তেই মালকো কিছু একটা আশা করে বসেছিল নিশ্চয়।

পাহাড়ি মেয়েরা এমন ক্ষেত্রে যা করে থাকে মালকো সে পথে গেল না। রঙিলার গাত্রবর্ণ যদি হয় মুরিয়া-ঘরের ব্যতিক্রম—চয়নের উদাসীনতা যদি হয় অ-সাধারণ তা হলে মালকোও পাহাড়ি মেয়ে হিসাবে একটু অন্য জাতের। প্রতিহিংসার কথা তার মনের কোণে জাগেনি। কোথায় মুখখানা লুকাবে সেই চিন্তাতেই লাজুক মেয়েটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

চয়ন আসছে। পাশের গাঁয়ের ঘটুলের সে শিরদার—রাজা। তাকে এখানেও উপযুক্ত একটা পদমর্যাদা দিতে হয়। কারাংমেটার কোতোয়ার সম্প্রতি বিয়ে করেছে। কোতোয়ারের পদ শূন্য। সুতরাং স্থির হল চয়ন এ গাঁয়ে এলে তাকেই করা হবে কারাংমেটার কোতোয়ার। আপত্তি করল রঙিলা নিজেই : কোতোয়ারের কাজ হচ্ছে মোটিয়ারীদের দেখ-ভাল্ করা। ফলে বেলোসা আর কোতোয়ারকে ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা পরামর্শ করতে হয়। মুরিয়া সমাজের নিয়ম অনুযায়ী ভাবী বধূ তার লোমহাদার সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তাই রঙিলা বললে : চয়ন কোতোয়ার হলে আমাকে তোমরা নিষ্কৃতি দাও।

শিরদার বলে : তা যেন দিলাম, কিন্তু বেলোসা হবে কে?

রঙিলা মুখ টিপে বলে : কেন মাল্‌কো! তার সঙ্গে চয়নের খুব ভাব যে!

: তাই নাকি, তাই নাকি? তা তো জানতাম না! তাই নাকি রে মালকো?

মাল্‌কোর মনে হল তার বেদনার স্থানটা ইচ্ছে করেই মাড়িয়ে দিয়েছে দিদি। কোন জবাব দিল না। উঠে চলে গেল বাইরে। হেসে উঠল্ সবাই আর সবচেয়ে বেশী হাসল রঙিলা-বেলোসা!

চয়ন কারাংমেটায় এসে পৌঁছালো বিকালে। প্রথমেই সে গিয়েছিল আয়েতুর বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটুল থেকে দল বেঁধে এল চেলিকেরা। চয়নকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘটুলে নিয়ে যাবে। ওদের ঘটুলের মর্যাদা বৃদ্ধি হল আজ। চয়ন বিখ্যাত তীরন্দাজ, নির্ভীক শিকারী। তার আগমন উপলক্ষ্যে আজ ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে ঘটুলে।

চয়নকে নিয়ে চেলিকের দল যখন ঘটুলে এসে পৌঁছালো তখনও সন্ধ্যা লাগেনি। শুধু কামদার বেলদার এসে ঝাটপাট দেওয়ার ব্যবস্থাপনা দেখে গেছে। দাফেদার তদারক করে গেছে। ওরা এসে বসল গোল হয়ে। বাচ্চা ছেলের দল, যারা এখনও ঘটুল-নাম পায়নি তারা একে একে আসছে এক এক টুকরো কাঠ হাতে নিয়ে। শুকনো কাঠখানা শিলেদার অথবা কাজাণ্ডিকে দেখিয়ে জমা দিচ্ছে ভাঁড়ারে। তারপর ফিরে এসে হাত তুলে জোহার করছে

সবাইকে, জোহার শিরদার, জোহার বেলদার, জোহার কোতোয়ার...

শিরদার একবার চারিদিক ঘুরে দেখে এল। কোথাও কোন কোণে ময়লা পড়ে আছে কিনা। কোথাও কারও কর্তব্যে কোন শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় কি না। তারপর সেও এসে বসে পড়ে চয়নের পাশে। এই সময় হঠাৎ দল বেঁধে হুড়মুড় করে ঘটুলে ঢোকে মোটিয়ারীর দল। চয়ন আড়চোখে একবার দেখে নেয়। এতক্ষণ তারা অপেক্ষা করছিল গ্রামদেবী জোড়ি-মাইয়ের ছাপরার কাছে। ওরা কখনও একা একা আসে না। অনেকগুলি মেয়ে আগে মন্দিরের কাছে জড়ো হয়—সেখানে চলে কিছুক্ষণ ফিসির ফিসির। তারপর দল বেঁধে ঘটুলে আসে হুড়মুড়িয়ে। আজ ওদের দেরী হবার আরও কারণ আছে। চয়নের কি কি পরীক্ষা নেওয়া হবে তারই পরামর্শ আঁটছিল এতক্ষণ।

ঘটুলে কোন নতুন চেলিক এলে তাকে সহ্য শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়। মোটিয়ারীরা যখন চুল আঁচড়ে দেয় তখন চিরুণীটা মাথার খুলিটাকেও আঁচড়ে তুলে ফেলার উপক্রম করে। যখন গা-হাতপা টিপে দেয় তখন নখ বসিয়ে দেয় চামড়ায়। এসব পরীক্ষায় যদি নির্বিকার থাকতে পারে নতুন চেলিক তবেই তো সে জাতে উঠবে?

মেয়েরা বসে পড়ল এখানে ওখানে, কেউ ছেলেদের কাছে, কেউ একা, কেউবা মেয়েদের ছোট দলে। এবার শুরু হল কাজের কথা। শিরদার বললেঃ সবাই এসেছে?

শিলেদারের গুনতি শেষ হয়েছিল, বললে ঃ দুজন মোটিয়ারী আসেনি!

ঃ বেলোসা কি বলছে? কেন আসেনি ওরা দুজন?

ঃ বেলোসা নিজেই আসেনি। আর আসেনি মালকো।

ঃ হুম!—গম্ভীর হয়ে যায় শিরদার। তারপর নিম্নকণ্ঠে চয়নকে বলে ঃ এই হয়েছে এক মহা মুশকিল। আমাদের ঘটুলের কোতোয়ার মাস দুয়েক আগে বিয়ে করে ইস্তফা দিয়েছে। আর আমাদের বেলোসাও কারও শাসন মানে না। ফলে মোটিয়ারীদের ঠিকমতো দেখা-ভাল হচ্ছে না। ভাবছি তোমাকে আমাদের কোতোয়ার করব। আপত্তি নেই তো?

চয়ন বললেঃ না আপত্তি কিসের, সবাই যদি চায়...

ঃ সে তো বটেই। সবাইকার মত নিয়েই এটা স্থির করেছি আমরা। তারপর শিলেদারকে হুকুম করে ঃ দুজন মোটি-য়ারীকে পাঠিয়ে দাও। ডেকে নিয়ে আসুক বেলোসা আর মালকোকে। যদি আসকা-লোনে থাকে তবে অন্য কথা—না হলে বলবে আমার হুকুম। না এলে শাস্তি পাবে।

মনে আছে এইখানে ডাক্তারবাবুকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ঃ কিন্তু শিরদার কি বেলোসাকে শাস্তি দিতে পারে?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ঃ শুধু শিরদার কেন, ঘটুলের নিয়ম না মেনে চললে ঘটুলের তরফ থেকে অন্য কেউও তাকে শাস্তি দিতে পারে। একমাত্র শিরদারকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় না। ঘটুলের আইন-কানুন কতদূর অমোঘ হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিই। সত্য ঘটনা। মাশোরা ঘটুলের কথা। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাস। ঘটুলের বড় বড় ছেলেরা সবাই ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত। ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত রাত্রে ওদের মাঠে পাহারা দিতে হয়। ক্ষেতের মাঝখানে উঁচু মাচাঙ বানায়। ওরা বলে 'কেতুল'। তার উপর বসে গোগা ঢোল পিটে অথবা পিটাকের্ বাজিয়ে বুনো শুয়োর তাড়ায়। সুতরাং বয়স্ক চেলিকেরা আর কেউ ঘটুলে আসছে না। মোটিয়ারীদের মধ্যে পাঁচজন ছিল বয়সে বেশ বড়। পূর্ণ যুবতী। আঠারো-বিশের কোঠায়। বেলোসা, তিলোকা, পিওসা, জানকি আর আলোসা। তরুণ চেলিকের কেউ ঘটুলে আসছে না—ওদের পাঁচজনের কাছে ঘটুলের সান্ধ্য-আসরকে মনে হলো লবণহীন মান্ডিয়ার মতো বিস্বাদ। শিরদার ঘটুলের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল চালানের উপর। পদমর্যাদায় সে শিরদার, কোতোয়ার, শিলেদার, এমনকি কাজাঙ্গিরও নিচে। ছেলেটির বয়সও অল্প—বছর বারো। অবশ্য বড় ছেলেদের অনুপস্থিতিতে বাকি যে বালখিল্যদল ঘটুলে আসছে তাদের মধ্যে সেই ছিল বয়োঃজ্যেষ্ঠ। বেলোসা-তিলোকার দল নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ আঁটল। ওরা চালানকে খবর পাঠালো যে তাদেরও ক্ষেতে যেতে হচ্ছে। রাত্রে সেখানেই থাকতে হচ্ছে। তাই তারা ঘটুলে আসতে পারবে না কদিন। অনেক পরিবারে বয়স্থ ছেলে না থাকলে বড় মেয়েরাও ক্ষেতে পাহারা দিতে যায় তাই এদের কোন সন্দেহ হয়নি প্রথমটা। কিন্তু ঘটুলের পুঁচকে সিপাহীর সন্দেহ

জাগলো। বছর দশেক বয়স তার। সন্ধান নিয়ে এসে চালানকে বললে : ওরা মোটেই পাহারা দিতে মাঠে যায় না। বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমায়!

অপরাধ গুরুতর। আত্মসম্মানে আঘাত জাগল বালখিল্য বাহিনীর। সাত থেকে বারো বছরের ঘটুল সভ্যদের অপমান বোধ হল। চালান দুটি বাচ্ছাকে পাঠালো মেয়েদের গ্রেপ্তার করে আনতে। সে দুটি সেপাইয়ের তখনও ল্যাঙট আঁটার বয়সও হয়নি। বেলোসা হচ্ছে ঘটুলের রানী সে হাঁকিয়ে দিল বাচ্ছা দুটোকে, বললে : বেশ করেছি, মিথ্যা কথা বলেছি। এবার সত্যি কথা বলছি। তোমাদের চালানকে বল, যতদিন না তোমাদের দাদারা মাঠ থেকে ফেরে, আমরা ঘটুলে যাব না।

চালান মাঠে খবর পাঠাল স্বয়ং শিরদারকে। শিরদার কিন্তু এল না, বলে পাঠালো : ঘটুলের দায়িত্ব তোমাদের উপর দিয়ে এসেছি, যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার শাস্তির ব্যবস্থা তোমরাই করবে।

খবরটা পৌঁছাল বেলোসা-তিলোকার কানে। ভয় পেল তারা। পরদিন সন্ধ্যায় গুটি গুটি হাজিরা দিল ঘটুলে। কিন্তু তাদের ঢুকতে দিল না সেই বাচ্ছা ছেলেটি—দ্বাদশবর্ষীয় চালান। বললে : তোমরা ঘটুলের ভিতরে এস না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। আগে সবাই আসুক, তোমাদের বিচার হবে।

ষোড়শী অষ্টাদশীর দল বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—শীতের রাত্রে।

বিচারে বালখিল্য বাহিনী স্থির করল—কান ধরে ওদের দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকতে হবে। শাস্তির মেয়াদ দুই 'রেলো'।

রায় শুনে কেঁদে ফেললে বেলোসা। সে হচ্ছে ঘটুলের মক্ষিরানী—সবার সামনে তাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে কান ধরে বসে থাকতে হবে! ক্ষমা চাইলে জোড় হাতে। কিন্তু বিচারক নড়লেও বিচার নড়ে না। অগত্যা যুবতীর দল দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসল কান ধরে। আর ন্যাংটা ছেলের দল নেচে চলে দুই প্রস্থ রেলো রেলো নাচ।

মনে আছে উপসংহারে ডাক্তার পিল্লাই বলেছিলেন: এঞ্জিনীয়ার সাহেব, সংবিধান আমাদেরও অনেক মৌলিক অধিকার দিয়েছে। সে অধিকার যারা ক্ষমতার দম্ভে বুটের তলায় মাড়িয়ে যায় তাদের নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে না হক ফাঁসী কাঠে ঝোলানোর বিধান আছে আপনাদের সভ্য জগতের আইনে—কিন্তু স্বেচ্ছাচারী এ্যাডমিনিস্ট্রেসনের দর্প জুডিসিয়ারির কাছে এমনভাবে চূর্ণ হতে সেখানে দেখেছেন কোনদিন?

(ক্রমশঃ)

লাক্ষাদ্বীপ আমিনদ্বীপ মিনিকয়

বনবিহারী মোদক

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?" কত দেশ, কত বিচিত্র জনপদের নব নব রূপ-বৈভব দেখার পরেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই যদি এরকম খেদ থাকে, আমাদের মত ঘর-কুনো জীবদের তাহলে অবস্থাটা কি?

"স্বদেশ", "মাতৃভূমি", "দেশমাতৃকা"—এসব কথা উচ্চারণমাত্রেই আমরা তো ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। কিন্তু মাতৃস্বরূপা সেই স্বদেশভূমিরই বা কতটুকু পরিচয় আমরা জানি? 'ঘরকুনো' বলে আমাদের যে অখ্যাতি, সে কি একেবারেই মিছেমিছি? বিদেশ বিভুঁই-এর কথা না-হয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু নিজেদের জন্মভূমি সম্বন্ধেও আমাদের এই সীমাহীন অজ্ঞতার জন্যে আমরা কিন্তু মোটেই লজ্জিত নই—সবচেয়ে পরিতাপের কথা এইটেই!

যদি প্রশ্ন করা হয়—ভারতের কোন্ কোন্ অংশ সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না? উত্তর কী পাওয়া যেতে পারে অনুমান করুন তো। নাগাভূমি, মিকির-মিজো-লুসাই পাহাড় অঞ্চল নেফা, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান-নিকোবর—সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে এর বেশীর ভাগই তো উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এসবের চেয়েও অজানা অংশ আমাদের স্বদেশে আছে। লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদ্বীপ, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জই ভারতভূমির সেই অজ্ঞাতপ্রায় অংশ। শুধু যে আরব সাগরের কাজল-কালো জলই এই দ্বীপ কটিকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাই-ই নয়; আমাদের ক্লৈব্য ও নিস্পৃহতাও অপরিচয়ের এই দুস্তর ব্যবধানের জন্যে কম দায়ী নয়।

ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১৯টি প্রবাল-দ্বীপ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব-সাগরের বুকে সিঁদুরে টিপের মত ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো। যে দ্বীপটি মালাবারের তটরেখার সবচেয়ে কাছে, সেটির দূরত্বও প্রায় ২০০ কিলোমিটার। দূরতমটির অবস্থিতি ভারতের উপকূলভূমির প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পশ্চিমে। লাক্ষাদ্বীপ ও আমিনদ্বীপ পরস্পরের অনেকটা কাছা-কাছি। মিনিকয় কিন্তু প্রায় নিঃসঙ্গ, একাকী। সবচেয়ে দক্ষিণে এটিরই অবস্থিতি। উত্তরতমটির নাম চেৎলাট। উত্তরের দ্বীপগুলোকে নিয়েই গঠিত হয়েছে আমিনদ্বীপ গ্রুপ, লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ গড়ে উঠেছে মধ্যাংশের দ্বীপ কয়েকটিকে নিয়ে।

সুপ্রাচীন এই দ্বীপমালার প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই মহামনীষী আলবেরুনীর লেখায়। 'নারিকেল দ্বীপমালা' ও 'কড়ি দ্বীপমালা' নামেই তিনি এগুলোকে পরিচিত করেছেন। কড়ি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তিনি মালদ্বীপকেও অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। এখন অবশ্য মালদ্বীপ ভারতের অংশ নয়। এই দ্বীপটি এখন সিংহলের।

লাক্ষাদ্বীপ, আমিনদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ

০ ৫০ মাইল

ম্যাঙ্গালোর · মহীশূর · ক্যানানোর · মাদ্রাজ · চেৎলাট · বিত্রা · কিলতান · কাদামাট · আমেনি · কোঝিকোড · আগাথী · আন্দ্রোথ · কবরত্তী · কালপেনি · কোচিন · এর্নাকুলম · কুইলন · ত্রিবান্দ্রম · মিনিকয় · কুমারিকা অন্তরীপ

অর্ধেন্দু দত্ত

খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে মুম্বা মোল্লাকা নামে আরবদেশীয় একজন ধর্মপ্রচারক এই দ্বীপমালার অনেকগুলিতেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করলেন। আন্দ্রোথ দ্বীপে এঁর সমাধি আজও দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের চোখে গোটা আন্দ্রোথ দ্বীপটা আজও তাই পরম পবিত্র। ধর্মপ্রচারক ঐ সাধুর বংশধরেরা তখন থেকেই আন্দ্রোথের কাজীর পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে আসছেন। ১৮৪৭ সালে যে কাজীসাহেব ঐ গদীতে ছিলেন, তিনিও সন্ত মোল্লাকার সাক্ষাৎ উত্তমপুরুষ এবং মহাসম্মানিত ঐ পদের দ্বাবিংশতম উত্তরাধিকারী।

আরও পরে ইতিহাসের পাতা উল্টে আসুন। ক্ষুদ্র এই দ্বীপমালার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনেও ক্ষমতার লড়াই এবং কামড়া-কামড়ি নেহাত কম হয়নি। ১৪৯৮ সাল। দারুণ গ্রীষ্মের দগ্ধতায় দিগন্তের পশ্চাদপটে স্নিগ্ধ সবুজের একটি বিন্দু দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল পর্তুগীজ বোম্বেটেদের একটি চলমান জাহাজ। লাক্ষা-দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট একটি দ্বীপে সেই প্রথম পড়ল লুব্ধ শ্বেতাঙ্গের সদম্ভ পদক্ষেপ। সেটা ছিল মে মাস। নারিকেলবীথির শ্যামলিমায় ঘেরা দ্বীপটি এবং তার নিরীহ নির্বিরোধ অধিবাসীদের দেখে জলদস্যুরা খুশীই হল। ঘাঁটি বানাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা—খুশী হওয়ার কথাই তো।

কাছাকাছি দ্বীপ কয়েকটিও অচিরেই তাদের কুক্ষিগত হল। গোটাকয়েক দুর্গ তৈরি করে দিব্যি জাঁকিয়ে বসল দস্যুরা। কিন্তু বিধি বাম। এমন দোর্দণ্ড প্রতাপের রাজত্ব পঞ্চাশটা বছরও টিকলো না। তাদের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, শান্ত দ্বীপবাসীরাও শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে উঠল, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করল বোম্বেটেদের। তখনকার মত তারা পাততাড়ি গুটোলো বটে তবে ব্যবসার ছলছুতোয় কিছু দিন পরে আবার তারা যাতায়াত শুরু করল।

কালক্রমে দ্বীপগুলো ক্যানানোরের রাজার অধীনস্থ হল। তারপর আবার হাত বদল হয়ে গেল টিপু সুলতানের দখলে। ১৭৯২ সালে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির ফলে স্থির হল যে দাক্ষিণাংশের দ্বীপগুলো আদিবাসী মোপলাদের নেতার অধীন থাকবে, বিনিময়ে মোপলা-প্রধান বার্ষিক দেবেন। কিন্তু এই করও প্রায়ই অনাদায় থেকে যেত। এমনিতেই দুর্জনের ছলের অভাব হয় না, তদুপরি খাজনা বা

মালডাইভের নিকটবর্তী মিনিকয় গ্রুপের বৃহত্তম দ্বীপ আণ্ড্রোথের একটি গ্রাম্য দৃশ্য

রাজ্যলোলুপ ইংরেজ আর কি দেরি করে? ১৮৭৭ সালেই দ্বীপগুলোকে তারা পুরোপুরি গ্রাস করল। নতুন মালিক হিসেবে দখলদারি বর্তালো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ওপর।

তারপর থেকেই এই দ্বীপপুঞ্জ মাদ্রাজ রাজ্যের (তদানীন্তন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) সংগে যুক্ত। আমিন দ্বীপ নামে অভিহিত উত্তরাংশের দ্বীপগুলো ছিল দক্ষিণ কানাড়া জেলার অন্তর্গত। লাক্কাদ্বীপ ও মিনিকয়ের দ্বীপসমূহ ছিল মালাবার জেলার অধীন। দূরস্থিত এই দ্বীপমালার সংগে ভারতের মূল ভূখণ্ডের যেটুকু ক্ষীণ যোগাযোগ তখনকার দিনে ছিল, একমাত্র এই মালাবার উপকূলের নৌবিদ্যাপটু লোকদের দৌলতেই তা সম্ভব হয়েছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে এ'রাই ছিলেন প্রায়-অপরিচিত এই দ্বীপপুঞ্জের সংগে ভারতভূমির একমাত্র সংযোগসূত্র।

অনুমিত হয় যে, মালদ্বীপসহ আরবসাগরের সমগ্র দ্বীপমালাকে এ'রাই 'লক্ষ দ্বীপ' (শত সহস্র দ্বীপের সমষ্টি) নামে অভিহিত করতেন। এই নামটিই কালক্রমে 'লাক্কাদ্বীপে' পরিণত হয়েছে।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে, ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্যতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দ্বীপগুলোর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ'র প্রধান প্রশাসনিক দপ্তর কোঝিকোডে অবস্থিত। নামটি অজানা মনে হলেও, কোঝিকোড কোন দ্বীপ নয়। ভারতের মূল ভূখণ্ডেই এটির অবস্থিতি; ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বন্দর কালিকটেরই এটি নবপ্রবর্তিত নাম। প্রশাসনিক দপ্তরের এই অবস্থিতির জন্যে, কেরল রাজ্যের সংগেই এই দ্বীপমালার ভাগ্য আজ অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে গিয়েছে।

॥ ২ ॥

ইতিহাসে যতটুকু জানা যায় তা ঐ পর্যন্তই। কিন্তু নীরস ইতিহাস তো মানুষের কল্পনাপ্রবণ মনকে ভরিয়ে তুলতে পারে না। সেজন্যে চাই কিংবদন্তী। তাও যথেষ্টই আছে। নয়নরম্য এই দ্বীপমালা সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত জনশ্রুতিরও অভাব নেই।

সামান্য যেটুকু চাষ-আবাদ দ্বীপগুলিতে হয়, তা সম্ভব হয়েছে মহাপরাক্রমশালী কয়েকটি দৈত্যের কৃপায়! চালু কিংবদন্তীগুলির একটি অন্তত তাই বলে। প্রবাল-চূর্ণের বালুকাময় ধূলিতেই দ্বীপগুলি ভরা। নীরস, অনুর্বর ও রুক্ষ এই স্তরটির কয়েক ফিট নীচেই রয়েছে প্রায়অভঙ্গ ও শক্ত প্রবালের আরেকটি স্তর। এটা এক ফুট থেকে দেড়ফুট পর্যন্ত গভীর। প্রধান দ্বীপগুলিতে এই স্তরটি পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলে নীচের ভিজে বালি বের করা হয়েছে, সামান্য কিছু চাষ-আবাদ যাতে সম্ভব হয়। কাজটি অমানুষিক শ্রমসাধ্য। আজকের মানুষ এত মেহনত করার কথা ভাবতেও পারে না। দ্বীপবাসীদের যেসব পূর্বপুরুষ দুঃসাধ্য এই খনন কার্যটি করে গিয়েছেন, তাঁদের বংশধরেরাই আজ তাঁদের কথা বেবাক ভুলে গিয়েছে। আজকের দ্বীপবাসীরা একাজ মনুষ্যকৃত বলে মানতেও নারাজ। কিংবদন্তীর কাল্পনিক দৈত্যরাই আজ তাঁদের গৌরব বেমালুম আত্মসাৎ করে বসে আছে।

আরেকটি কিংবদন্তীও লোকের মুখে

মুখে ফেরে। প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য কোন প্রমাণ না থাকলেও, এটি যে মূলত ইতিহাসভিত্তিক, তা সহজেই অনুমান করা চলে। কিংবদন্তীটি এই:

আরব দেশের বণিকদের প্রভাবে পড়ে মালাবাররাজ ভাস্কর রবিবর্মা চেরামন পেরুমল নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। রাজ্যের কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজধানীতে জোর গুজব—মুসলমান হয়ে মক্কাশরীফ দর্শন করবেন বলে তিনি নাকি ঐ বণিকদলের সঙ্গে আরব সাগর পাড়ি দিয়েছেন। খবর শুনেই হাজার দাঁড়ের জাহাজ নিয়ে ছুটল লোক-লস্কর। মহারাজকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু অদৃষ্ট দেবতার খেয়াল কে বুঝবে? দৈব-দুর্বিপাকে জাহাজডুবি হল। কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে কয়েকজন বিপন্ন মানুষ তীরে উঠল। সে-তীর এইসব দ্বীপভূমির। আজকের দ্বীপবাসীরা নাকি সেই অভিযাত্রীদেরই উত্তরপুরুষ।

কিংবদন্তীগুলো হয়ত কল্প-কাহিনী, কিন্তু আজকের দ্বীপবাসীরা যে ভারতের মূল-ভূমি, বিশেষত মালাবার উপকূল থেকে আগত হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনকারীদেরই বংশোদ্ভব, নিম্নোক্ত কারণগুলো বিবেচনা করলে সে-সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া চলে।

(১) হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এ'দের মধ্যে আজও বিদ্যমান। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার ঠিক অনুরূপ জাতিভেদ আজও এ'রা কঠোরভাবে মেনে চলেন। অসবর্ণ বিয়ে এ'দের মধ্যে আজও নিষিদ্ধ।

(২) ধর্মে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এবং আরবীয় মুসলমানদের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত হয়েও, এ'দের মেয়েরা কিন্তু মোটেই পর্দানসীন নন।

(৩) পরিহিত ধুতির ঝোলানো নিম্নাংশ উলটিয়ে তুলে ফেরতা দেওয়ার যে বহু-প্রচলিত রেওয়াজ গোটা দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে হামেশাই চোখে পড়ে, সে-রেওয়াজ এ'দের মধ্যেও আছে।

(৪) দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মেয়েরা যেসব অলঙ্কার ব্যবহার করেন, দ্বীপবাসিনীরাও সেগুলোরই অনুরাগিণী।

(৫) মালয়ালামই সবগুলো দ্বীপের (একমাত্র মিনিকয় ছাড়া) অধিবাসীদের মাতৃভাষা। প্রাচীন তামিল শব্দও এতে বহু পরিমাণে মিশ্রিত। অবশ্য, এক দ্বীপের ভাষার সঙ্গে আরেক দ্বীপের ভাষায়, স্থানীয় "বোলি"র (dialect) সামান্য কিছু পার্থক্য আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতে, এরকম স্থানীয় বিভিন্নতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আরবীয় মুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে আজ এ'রা সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। রক্তের সংমিশ্রণও অনিবার্যভাবেই ঘটেছে। এইসব কারণেই মালয়ালম ভাষা এখানে আরবী হরফে লেখা হয়। দ্বীপভূমির অধিবাসীদের জীবনের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অতিথি আপ্যায়নে ডাব হাতে আন্দ্রোথ যুবক

॥ ৩ ॥

আয়তনের দিক থেকে দ্বীপগুলো খুবই ছোট ছোট। মোট ১৯টি দ্বীপ, কিন্তু মোট আয়তন মাত্র ২৮ বর্গ কিলোমিটার! মিনিকয়ই এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। কিন্তু এই সর্ববৃহৎটিরও জমির মোট পরিমাণ মাত্র ১,১২০ একর। এক মাইলের চেয়ে বেশী চওড়া দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জে একটিও নেই। জনবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলোর মধ্যে যেটি ক্ষুদ্রতম, সেটির নাম বিত্রা। এটার আয়তনের কথা শুনলে হাসি পাবে। এটির মোট জমির পরিমাণ মাত্র ২৬ একর। আর জনসংখ্যা? মহানগরীর ঘিঞ্জি পরিবেশের মানুষদের পক্ষে সেটা ভাবাও কঠিন। সাকুল্যে মাত্র ৮০টি প্রাণী, ৩৩ জন নারী আর ৪৭ জন পুরুষ। ব্যস, এই নিয়েই তাদের জগৎ।

আগে বলেছি "জনবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলোর মধ্যে" বিত্রা ক্ষুদ্রতম। তবে কি

মিনিকয় দ্বীপে একটি সরকারী চিকিৎসালয়ে অপেক্ষমান রোগীর সারি

সম্পূর্ণ জনমানবহীন দ্বীপও এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আছে? হ্যাঁ, একটি-দুটি নয়, ১৯টির মধ্যে ৯টি দ্বীপই পুরোপুরি জনমানবশূন্য। প্রধানত পানীয় জলের অভাবেই এই দ্বীপগুলিতে মানুষের বসবাস সম্ভব হয় না। এছাড়া অন্য নানান রকমের অসুবিধে তো আছেই।

জনশূন্য এই দ্বীপগুলির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের নাম "বার্ডস আইল্যান্ড"। বালুকাময় এই দ্বীপটিতে শুধু পাখীদেরই রাজত্ব। হরেক রকমের অসংখ্য সামুদ্রিক পাখীই ছোট্ট এই দ্বীপটির একমাত্র বাসিন্দা। পাখীরা বাসা তৈরী করতে পারে, এরকম গাছপালা নিশ্চয়ই প্রচুর আছে এখানে—পাঠকের মনে এ-ধারণা স্বভাবতই জন্মাবে। কিন্তু শাখাবহুল বনস্পতি তো দূরের কথা, কোনরকম উদ্ভিদই এই দ্বীপটিতে নেই! তবে কি "শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা?" তা-ও না। শৈলের কোন নাম-গন্ধও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানকার সাগর-বিহঙ্গেরা বালুকা-বেলাতেই নীড় বাঁধে। আর বেচারীদের ডিমগুলো লুটে নেবার জন্যে, কাছাকাছি দ্বীপগুলো থেকে আসে লোভী মানুষের দল। ছোট ছোট দিশী নৌকোয় চড়ে, নির্দিষ্ট কয়েকটি ঋতুতে এরা এসে হাজির হয়। নৌকো বোঝাই করে ডিম নিয়ে গিয়ে কোঝিকোড, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই এবং উপকূলের অন্যান্য শহরে-বন্দরে সেগুলি বিক্রি করে। এই ডিম দ্বীপবাসী মানুষদেরও একটি প্রধান খাদ্য।

॥ ৪ ॥

যে দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি দ্বীপ সম্পূর্ণ জনমানবহীন এবং একটির লোক-সংখ্যা মাত্র ৮০ জন, সে দেশটাই বোধ হয় বসতি-বিরল—এরকম অনুমান স্বতঃসিদ্ধের মতই এসে পড়ে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক তার উল্টো। কেন্দ্রশাসিত এই দ্বীপমালার মোট জনসংখ্যা ২৪ হাজারেরও কিছু বেশী। ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপগুলির পক্ষে এই জনসংখ্যা রীতিমত আতঙ্কজনক। প্রতি বর্গমাইলে এখানে লোক বসতির ঘনত্ব ১,৯১২ জন! সে-হিসেবে এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির ওপরেও টেক্কা মেরেছে। অপরূপ নিসর্গ-শোভাময় অনুকূল পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাই জনসংখ্যার এই অভাবনীয় স্ফীতির কারণ হিসেবে অনুমিত হয়। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলনও এ-অবস্থার জন্যে কম দায়ী নয়।

মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখে তো আঁতকে উঠলাম। কিন্তু গবাদি পশু ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ার? এর আনুপাতিক সংখ্যাটা আরও তাজ্জবের ব্যাপার। আঙুলে গোনা যায়, এরকম গোটাকতক গরু-ছাগল এবং বেড়াল ছাড়া আর কোনরকমের কোন জন্তু-জানোয়ার কোন দ্বীপেই আপনি খুঁজে পাবেন না। নিজের পোষা কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বীপে বেড়াতে যাবেন? সে গুড়েও বালি। কুকুর সেখানে নিষিদ্ধ জানোয়ার। মাথা খুঁড়লেও কুকুর নিয়ে কোন দ্বীপে যাওয়া যাবে না। ঘাস-খড় কোন কিছু মেলে না বলে, দুধেল গাইও সেখানে বাঁচে না।

দ্বীপগুলির অধিবাসীরা সকলেই 'মোপলা' জাতীয়। আকৃতি পোশাক পরিচ্ছদ এবং রীতিনীতির দিক থেকে মালাবারের মোপলাদের সঙ্গে এদের কোন প্রভেদ নেই। খুবই শান্ত প্রকৃতির এবং সাদাসিদে ধরনের মানুষ এরা। আইনকানুনকে মান্যতা দেওয়ার প্রবণতা এদের সহজাত সংস্কারের মত। চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম প্রভৃতি অপরাধ দ্বীপগুলিতে একেবারেই নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদ কিন্তু এখানে হামেশাই হয়ে থাকে।

দ্বীপপুঞ্জের সবেধন নীলমণি হাই-ইস্কুলটি আমেনি-দ্বীপে অবস্থিত। পাঁচ-সালা যোজনাগুলিতে সমস্ত দ্বীপে শিক্ষা বিস্তারের ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় যোজনাকালের মধ্যে জনবহুল দ্বীপ-গুলির অধিকাংশতেই ইস্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। বর্তমানে এই দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৫·২৩ জন।

এইবার চাষ-আবাদের কথা। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার মত কিছুই নেই; কারণ, সাকুল্যে ক'টি ফসল এখানে জন্মায় তা আঙুলে গুণে বলা

যায়। প্রধান খাদ্যশস্য কিছুই এখানে উৎপন্ন হয় না। ডাল, কলা, দু-এক রকম শাকসব্জী এবং অপ্রধান খাদ্যশস্য— এই-ই এখানকার একমাত্র ফসল। চালের জন্যে মূল ভূখণ্ডের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই এদের।

ভারতের মূল ভূমি থেকে দ্বীপগুলির যে-কোনোটিতে প্রথম এসে পৌঁছুলে, যে-দৃশ্যটা আগন্তুকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে, তা হল নারকেল গাছের সংখ্যাধিক্য। যে দিকেই তাকান না কেন, সাগরজলের দিগন্ত-ছোঁয়া নীলিমায় পান্নার টিপের মত নারিকেল-বীথির স্নিগ্ধ শ্যামলিমা আপনার চোখ জুড়িয়ে দেবে। এই অগণিত নারকেল-গাছ একাধারে দ্বীপগুলোর শোভা এবং সম্পদ। নারকেলই এখানকার অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদস্বরূপ। নারকেলের শাঁস নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ; ছোবড়া দিয়ে দড়ি-দড়া, গালচে ও পাপোশ প্রভৃতি তৈরী— এগুলোই এখানকার একমাত্র শিল্প। নারকেল-ছোবড়ার শিল্প পুরোপুরি সরকারের একচেটে। এ-শিল্পে নারী-শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী। বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে নারকেল-চাষ শেখানোর জন্যে, সরকারী উদ্যোগে দ্বীপবাসীদের এখন তালিম দেওয়া হচ্ছে।

দুনিয়ার অন্য যে-কোন অঞ্চলের দ্বীপ-বাসী মানুষদের মতই, এরাও জলের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বিজড়িত। শুধু রূপকার্থেই নয়, জল বাচ্যার্থেই এদের জীবন। মাছই এদের প্রধান খাদ্য, মাছ ধরাই এদের প্রধান-তম উপজীবিকা। মাছ ধরায় এদের দক্ষতাও সর্বজনবিদিত। নিজেদের তৈরী পালতোলা ডিঙিতে চেপে নির্ভয়ে এরা বার-দরিয়ায় চলে যায়। দিনের শেষে (কখনও বা দু-এক-দিন পরে) যখন এরা নিজেদের দ্বীপে ফিরে আসে, সাগর-মায়ের অকৃপণ দানে এদের ছোট্ট তরী তখন কানায় কানায় ভরা। এই মাছ এরা মূলভূমিতে নিয়ে গিয়েও বিক্রি করে। মাছ ধরার কাজে যন্ত্রের ব্যবহার শেখানোর জন্যে সরকারের তরফ থেকে আজ-কাল জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। "বোনিটো" নামক বিশেষ এক ধরনের ম্যাকরেল-জাতীয় মাছ মিনিকয়ের আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সুস্বাদু মাছের একটি বড় ক্রেতা সিংহল। যথেষ্ট পরিমাণ বোনিটো মাছ সিংহলে রপ্তানিও হয়।

নৌকো তৈরির কাজে বংশানুক্রমিক নিপুণতা এই দ্বীপবাসীদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াতের জন্যে ছোট এবং সুন্দর একরকম পালতোলা ডিঙিনৌকো (Yacht) এরা তৈরি করে। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের নৌকোগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। এগুলিও ওদের নিজেদেরই তৈরি। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠ দ্বীপগুলির কোনটিতেই পাওয়া যায় না। তবু কী করে যে এরা নৌকো তৈরীর কাজে পুরুষানুক্রমে এরকম দক্ষতা অর্জন করে, সেটা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

মিনিকয় দ্বীপের এক অধিবাসী তাদের প্রধান পণ্য মাছ ও নারকেল-ছোবড়া রোদ্রে শুষ্ক করার ব্যবস্থা করছে

মূল ভারত ভূমির সংগে নৌবাণিজ্যও এদের আরেকটি প্রধান উপজীবিকা। বর্ষা শেষ হতেই দ্বীপবাসীরা ভাসিয়ে দেয় তাদের পালতোলা নৌকো। ভারতের পশ্চিম উপ-কূলে প্রায় প্রতিটি জনপদে এরা নিয়ে আসে নারকেল এবং তদ্জাত দ্রব্যসম্ভার; পাখীর ডিম, মাছ প্রভৃতি বিচিত্র দ্বীপজাত-পণ্য। ফেরার পথে নৌকো বোঝাই করে নেয় চাল, কাপড়, চিনি, চা এবং অন্যান্য নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। শিল্পজাত বিলাস-সামগ্রী এবং বউ-মেয়ের ফুট-ফরমাশ নিতেও তারা ভোলে না।

নৌচালনায় এদের জুড়ি মেলা ভার। এর একটা কারণ অবশ্য সম্পূর্ণ ভৌগোলিক। ১৭টি আলাদা আলাদা প্রবাল-প্রাচীর (Reef) দ্বীপগুলির সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে। দ্বীপগুলির উত্তর পাশ ঘেঁষে জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে তিনটি বিখ্যাত প্রবাল-চড়া। এগুলির নাম মুনিয়াল, কোরাদ্বীপ এবং সেসোস্ট্রীস্। মৎস্যাচারণভূমি হিসেবে বেশ নামডাক আছে এগুলির। প্রবাল-প্রাচীর-গুলির পশ্চিম পাশ, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবাহমুখে সম্পূর্ণ অবারিত। প্রবাল-চড়া এবং দ্বীপগুলির অধিকাংশই তাই গড়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত সংরক্ষিত পূর্বদিক ঘেঁষে।

প্রায় প্রতিটি দ্বীপের কাছেই মগ্ন প্রবাল-প্রাচীর থাকায় নৌচালনা এখানে অত্যন্ত বিপদসংকুল। সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ এইজন্যেই এগুলিতে আসতে পারে না। সমুদ্রের এই বিঘ্নসংকুলতা দ্বীপবাসীদের পক্ষে শাপে বর হয়েছে। এরা হয়ে উঠেছে সুদক্ষ নাবিক।

মিনিকয়ের নাবিকদের নামডাক এবিষয়ে আরও বেশী। বরিশাল-নোয়াখালী-চাটগাঁর মুসলমান মাঝি-মাল্লাদের মত জাহাজী কাজে এদেরও বহুসংখ্যকেরই কর্মসংস্থান হয়। সমুদ্রগামী জাহাজগুলো এদের পেলে লুফে নেয়।

॥ ৫ ॥

মিনিকয় সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলাদা-ভাবে আলোচনা করা ভাল। অন্য দ্বীপ-গুলির থেকে এটা বিচ্ছিন্ন এবং দূরবর্তী— এটা আগেই বলা হয়েছে কিন্তু শুধু যে অবস্থিতির দিক দিয়েই মিনিকয় স্বতন্ত্র, তা নয়। অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং

অন্য সব বিষয়ে এই দ্বীপটির পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসীদের চেয়ে মিনিকয়বাসীদের সামাজিক জীবনও অনেক বেশী সুসংগঠিত। এত বেশী বর্ণাঢ্য পোশাক-পরিচ্ছদও অন্য দ্বীপবাসীরা ব্যবহার করে না। রীতিনীতি ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার দিক থেকে মালদ্বীপবাসীদের সঙ্গে এদের এত বেশী সাদৃশ্য আজও বিদ্যমান যে, এরা মালদ্বীপবাসীদের বংশোদ্ভব বলেই অনুমান করা হয়। এমন কি ভাষার দিক দিয়েও লাক্কা-দ্বীপ-আমিনদ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। এখানকার প্রচলিত ভাষার নাম "মাল" (Mahl)। মালদ্বীপের লোকেরাও এই ভাষাতেই কথা বলে। মালয়ালম ভাষার সঙ্গে এর কোন সংস্রবই নেই। এ-ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রাচীন সিংহলী ভাষার সঙ্গে।

মিনিকয় দূরপ্রাচ্যগামী বাণিজ্যপোত-গুলির যাতায়াতের পথের উপরে অবস্থিত এই দ্বীপটির সমাধিক গুরুত্বলাভের এটিও আরেকটি কারণ। এর বিখ্যাত আলোক-স্তম্ভের (Lighthouse) আলো বিঘ্ন-সংকুল অকূল দরিয়ায় অগণ্য জাহাজকে বহুদূরে থেকে পথের নিশানা দেখায়। আজ থেকে দীর্ঘ ৭৭ বছর আগে, লণ্ডন বোর্ড অফ ট্রেড বিরাট এই লাইটহাউসটি তৈরি করিয়েছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত এটা ইংরেজদেরই দখলে ছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হওয়ার পর, মাত্র বছর কয়েক আগে (১৯৫৬ সালে) লাইটহাউসটি ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এসেছে।

॥ ৬ ॥

দ্বীপগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার এগুলির সর্বাঙ্গীক উন্নয়নের জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রভৃতি পর্যাপ্ত সংখ্যায় হচ্ছে। তৃতীয় যোজনায় যেসব জনকল্যাণমূলক কাজ লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে, সেগুলি সফল হলে শুধু যে মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী-দের কাছেই দ্বীপগুলো আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে, তাই-ই নয়। বেলাভূমির প্রমোদকেন্দ্র হিসেবে ফ্লোরিডার মিয়ামী বীচ বা হাওয়াইয়ের হনলুলুর মত, এই দ্বীপমালাও একদিন হয়ত শৌখীন বিদেশী পর্যটকদের প্রভূত সংখ্যায় টেনে আনতে পারবে। বিদেশী ভ্রমণকারী আকর্ষণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে-পরিকল্পনা সরকার এখন কার্যকরী করতে চাইছেন, সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রায় সবগুলো উপকরণই মনোরম্য বেলাভূমি সমন্বিত এই দ্বীপ-মালার আছে।

কিন্তু প্রীতিপ্রদ রবিকরোজ্জ্বল আবহাওয়া এবং অনিন্দ্যসুন্দর তটভূমি থাকা সত্ত্বেও অন্য অনেকগুলি অসুবিধের দরুন সাগর-মেখলা এই দ্বীপভূমি আজও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে স্পৃহনীয় হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বীপের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার মত কোনরকম যানবাহনই এখানে নেই। নিজের আদি ও অকৃত্রিম পদ-যুগলের ওপর যদি ভরসা করতে পারেন, ভালই। নতুবা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। একটি মাত্র সান্ত্বনা আছে, সেটি হল দ্বিচক্রযান; তাও "জান" কবুল করে প্রায়ই বালির ওপর দিয়ে ঠেলে নিতে হয়। সে-ঠেলা যে কী "ঠ্যালা," এক-মাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই তা বুঝবেন না।

জীবনযাত্রার আধুনিক সুখ-সুবিধে বলতে যা-কিছু বোঝায়, সে-সবেরও কোন বালাই নেই এখানে। এমনকি সমুদ্রের ধারে নারকেলের ছায়ায় বসে বসে দূরস্থিত প্রিয়-জনের চিঠি পড়বেন, তারও উপায় নেই। বর্ষার সময়ে পুরো ছটি মাস ডাক চলাচল একেবারেই বন্ধ। কর্তাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়বেন, তা-ও ঠিক হবে না। মে মাসের শুরু থেকে অক্টোবরের প্রারম্ভ পর্যন্ত স্বভাবশান্ত আরব সাগর একেবারে ক্ষ্যাপার মত ফুঁসতে থাকে। তদুপরি, দ্বীপের চারদিকে মগ্ন প্রবাল-প্রাচীর তো সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত ঘাপটি মেরে রয়েছেই। এদেশের বৃত্তি-কুশলী নাবিকদের মধ্যে যারা অতি-বড় দুঃসাহসী, ঐ অবস্থার মধ্যে পাড়ি দিয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যুকে হাত বাড়িয়ে কাছে ডেকে আনতে তারাও কেউ-ই রাজী হবে না। শুধু ডাক আনা-নেওয়া বলে নয়; জরুরী কোন আকস্মিক দরকারের জন্যে, মাথা কুটে মরলেও দ্বীপের বন্দীদশা থেকে বর্ষার ঐ ছ'-মাস আপনি মুক্তি পাবেন না। বহির্জগতের সঙ্গে দ্বীপগুলির যা-কিছু যোগাযোগ, সে ঐ অক্টোবরের শেষা-শেষি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত।

বলতে পারেন—'চিঠিপত্র না-ই বা এল, টেলিগ্রামেও তো খবরাখবর নেওয়া যাবে।' আজ্ঞে না, তারও কোন উপায় নেই। মাত্র চারটি দ্বীপ ছাড়া আর কোনটিতেই অয়্যারলেস স্টেশন নেই। প্রায় পুরোপুরি রবিনসন ক্রুশোর জীবন;—নয় কি?

কিন্তু বিঘ্ন-বিপদ আর অসুবিধে যেখানে অগণ্য, সেই অজানার হাতছানিই তো দুঃসাহসী যৌবনকে চিরদিন ঘরছাড়া করেছে। বাংলার তরুণরাও আজ আর পিছিয়ে নেই। বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যও আজ নতুন দিগন্তের সন্ধানে উন্মুখ। দূর-দুর্গম ও অপরিচিত এই দ্বীপমালার দিকে এ'দের জয়যাত্রার লগ্ন এখনও কি অনাগতই থাকবে?

পাখির শিস

অজয় দাশগুপ্ত

'গান শিখবে না সেতার ?'

বিভাসের এই প্রশ্ন আরতির খুব বোধগম্য হল না। সেই সঙ্গে আলোকিত কক্ষে একজন অপরিচিতের সামনে যে লজ্জা স্বাভাবিক তা তাকে আবৃত ক'রে ফেলল। একবার মুখটা তুলেই আবার আনত চোখ ভূমিতে রাখল। বিভাসের এই কথার মানে কি! একথা কাকে...আমি না...

'আমি চলি '

বিভাসের প্রশ্নের পর যে শূন্যতাটুকু মধ্যাহ্নের ন্যায় মন্থর, তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল যুবকটি। আরতি চকিত হল! কিছু বলার নেই এরকম যাওয়ায় তবু দু-নেত্রে স্থির প্রশ্ন, যেন 'যাচ্ছেন' কথাটি। অথচ কিছু বলল না।

সুধীর এবার হাসল। 'চলি কেমন ?'

'আবার আসবেন।' এবার আরতি আতিথেয়তার কর্তব্যটুকু শেষ করল। হাসিতে গান বাজাতে পারলে আরো ভাল হত। কিন্তু সে গান জানে না। তার চেতনায় বাহ্যিক গান নেই। অন্তর্লীন যে সুর ছিঁড়ে গেছে তা কি আর কোনোদিন জুড়বে, হয়তো ভবিষ্যতে...

'দাঁড়া—' বিভাস গায়ে জামা চড়াল। 'ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।' বউর দিকে মুখ ক'রে বলল সে। আরতি ঘাড় নাড়ল অকারণ। মনে হল কিছু একটা করা ভাল। 'আয়—' চৌকাঠে শব্দ তুলে দুজনে বেরিয়ে গেল।

দিনের আলোতেও অনালোকিত থেকে গেল হৃদয়ের কোথাও। এখনও আহত হয়ে আছে আরতি। শূন্য জলের গ্লাস আর সাদা প্লেটে ভাঙা খুচরো সন্দেশের চেহারা দেখে একটা বৈধব্যের গ্লানি তাকে ক্লিষ্ট করে তুলল। বিভাস এসব বুঝবে না, বুঝতে চায় না—পাখিগুলোর সব সাবধান বাণী সে ভুলেছে—ওর যত প্রযত্ন খাঁচাটায়। খাঁচা অটুট থাকলে ওকে শান্তি দেবে, কেউ দেখবে শিস দেবে। বিভাস যেমন অনবরত শিস দিচ্ছে।

তখন ছোট্ট অপরিসর রান্নাঘরে কয়লার আঁচ নিয়ে বিব্রত হয়েছিল আরতি। এমন আঁচ দেওয়া তার অভ্যাস নয়; কাঠের জ্বালে রান্নার কথা ভাবলে কান্না পায়। এখানে কয়লা পোড়বার আগেই নিজে সে পুড়ছে।

সুধীর হঠাৎ এল। এমনি বেড়াতে-বেড়াতে। বিভাস যেন সূত্র পেল কোনো কিছু অভাবনীয়র। ডাকল, 'আরতি...'

আরতি জানত। উঠে কাপড় গুছিয়ে আঁচল দিয়ে সিঁদুর বাঁচিয়ে ঘাম মুছল। হাসি পেল সিঁদুরের কথা মনে আসতে। বিয়ের রাতে কে যেন বলেছিল, সিঁদুর হচ্ছে এয়োর লক্ষণ, তোমার সিঁদুর যেন অক্ষয় হয়। আরেকটা কথা বিদ্যুতের মতো ছুঁয়ে গেল। এখন সত্যি-সত্যি চিহ্নিত হয়ে গেলে...

সামনে দাঁড়াতে হল পায়ে পায়ে।

'তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি—' বিভাস কি-রকম নিপুণ স্বামীর মতো হাসল। 'আমার স্ত্রী, আরতি; খুব ভাল মেয়ে।' কেউ যেন সরু লোহার শিকের গায়ে আঁচড় কাটছে। চুলে যেমন বিলি কাটে। অথচ সির-সির করছে আরতির শরীর।

'নমস্কার।' হাত দুটো জোড়া করে আনত-মুখী সে। কারণ বিভাসের শিস স্পষ্ট খুব।

'আমার বন্ধু সুধীর—খুব ভাল ছেলে;' গর্বিত ভাবটুকু চোখে জ্বেলে বিভাস একটা তুলনামূলক ভাব ফোটাল, বলল; 'খুব স্ট্রাগল ক'রে সংসার চালায়।'

তারপর মামুলি ধরনের হাসি সুধীরের। 'কলকাতা কেমন লাগছে বা আমাদের বাড়ি যাবেন ইত্যাদি।' আরতির কাছে একটু আগের রচিত এই ঘনিষ্ঠ ভাবটুকু ইতিমধ্যেই স্মৃতি। অথচ স্মৃতি কি পীড়াদায়ক, আরতি যেন মনে মনে বলল, বিভাস তুমি আজকাল কি মনে করতে পার—তোমার কি মনে পড়ে।

উঠোনে দাঁড়ালে একটুকরো আকাশ দেখতে পায় আরতি। প্রথম দিন এসে

বলেছিল, 'এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মরে যাব। কি বিশ্রী।'

'আমি!' বিভাস চমকেছিল ভান করে। অথচ আরতির পূর্ণ চোখ এই চমকের সমর্থনে খুশী হল কেন। সে তো খানিকটা চুক্তি ক'রে নিয়েছিল একরকম। বিভাসও পাল্টা চুক্তি করেছে। কিন্তু কেউ কি সেই চুক্তি মানছে, না মানলে উপায় কি। বিয়ের রাত থেকেই আসলে চুক্তির কথা বেমালুম ভুলেছিল আরতি। অনেক বেশি অবনত হয়ে আছে। অনেকখানি। বিভাস কি তাই বুঝে হাতের থাবা খুলে আরো স্নিগ্ধ হওয়ার ভংগী করছে। না কি পাখিওয়ালাকে নগণ্য ভেবে এমন গর্বিত, এমন ব্যাপৃত।

'তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে?'

রাতের ট্রেনটা লাইনের ওপর যতটা শব্দ তোলে তার চেয়েও গভীর শব্দ আরতির বুকে। 'হুঁ।' একটি সম্মতিসূচক শব্দ তাকে বারো বছর থেকে সুদূরে করে দিল। আড়ালে কেউ যেন হাঁটল নিঃশব্দে। আর আরতির ধুকপুকনিটুকু নিতান্ত আশ্রয় পেয়ে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হল। এখন অনেক সহজ গলার স্বর। 'আসলে আমি মুক্তি চাই—আমার জীবনটা নিয়ে এমন অশ্রদ্ধা অসহ্য।'

'কার কথা বলছ?' বিভাস ঘন হল কাছে।

'সবাইর। বাবা-মা। সংসার। এরা কুৎসিত।' আরতি যেন রোগীর মাথায় হাত বোলাচ্ছে। পান্ডুর মুখ যে হাওয়া পেয়ে ম্লান, ভেতরে তার চিহ্ন নেই।

'বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ভালবাসি।' বিভাসের চোখ করুণ, আপ্লুত, আবেদনে স্নিগ্ধ।

'জানি।'

'কিন্তু, তোমার কথা ভেবেই—'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি।' আরতি শান্ত। নিস্তরঙ্গ।

'সে কী!' বিভাস কনুইয়ের উপর মাথার ভর রাখল। এখনো আরতির হাত তার মাথায়।

'অবাক হচ্ছ যে!' আবেদনটিকে যেন মঞ্জুর করে হাসল আরতি। 'নয়তো তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'আমার অসুখ হয়েছিল—বুকের অসুখ. .' বিভাস এবার সান্ত্বনা পেয়ে নিজেকে খুলে ধরল। 'আমার আয় অনিশ্চিত—বাঁধা চাকরি করি না, মা বাবা কেউ নেই—তা ছাড়া তোমার বাবা মা. .'

'তারজন্যে ভেব না। তারা রাজী না থাকলেও আমার মত পাল্টাবে না।' আরতি অনুভব করল সে পঁচিশ বছরে পা দিয়েছে। এবং এই বয়েস বার-বার তাকে সাহস দিচ্ছে। বলছে আর এভাবে অপচয়ের মানে হয় না। না।

'আর দেরি করার মানে হয় না—এ-বার যা করবার করো।'

'কিন্তু তুমি জান এখনো কোনো স্থিরতা আমার নেই-'

'তবে আমি আত্মহত্যা করব।' অনেকবারের মতো আরতি ফুঁপিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু চোখের কোণ ভিজল না আর তেমন করে। বিভাস ফি এসে দেখল আরতি নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। ঘরের ভেতরের এত কম জায়গাও বিস্তৃত ওর কাছে।

'কি হল ?' জামা খুলল বিভাস। হুকে টাঙাতে গেল।

'কিছু না।' আরতির মনে হল ওর হাত থেকে জামাটা নিয়ে আমি টাঙালেই পারতাম। এটুকু ও আশা করে। সঙ্গে সঙ্গে একটি অলক্ষ্য চুক্তিপত্র চোখে ভাসল। আমি এমন ক'রে বিকিয়ে দিতে চাই কেন। 'যাও চান করে নাও, রান্না হয়ে গেছে।'

'যাচ্ছি।' সে পাখার সুইচ জোর করল। আরতির কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুতেই সে উষ্ণ হয়ে উঠতে পারে না। বুকের ভেতর অক্ষয় শান্তি স্থাপন করতে স্থির সংকল্প করেছিল সে—অথচ সেখানে শান্তির বদলে দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে—আর বাইরে এই হিমানী-প্রবাহ।

'কেমন লাগল সুধীরকে ?'

'ভাল !'

'শুধু ভাল ?' বিভাস আশ্রয়ের মতো হয়ে আরতির সামনে চোখ মেলল। আরতির মনে হল কেবল এই আশ্রয়টুকু দখল করবার জন্য আমার এত আয়োজন ! সাধের চেয়ে সাধের প্রমাণকেই গলায় পরে বেড়াচ্ছি। এ-কথা কি ভেবেছি আগে। ভেবেছি, ভেবেছিলাম। সব কথাই ভেবেছিলাম। স্লেটে লেখা অংকর দাগগুলো মুছে শুধু পঁচিশ বছরটাই বড় করে ভেবেছি। অথচ এমন হয়...'তোমার সব বন্ধুরাই তো ভাল ?' উত্তর দিতে যেটুকু দেরি হল, বিভাস হয়তো তাতে কিছু ধারণা করে নিতে পারে ধ'রে নিয়ে বলল, 'বেশ ভদ্রলোক'।

'আমার সব বন্ধু ভাল—কে বলেছে ?' বিভাস প্রথম কথাটাতেই জোর দিল।

'কেন তুমি।' আরতি ঠান্ডা স্বরে বলল।

'আমি, না, না—তবে ভুল বলেছি।' বিভাস উঠে পড়ল। 'কই তেল দাও।' আরতি তেলের শিশিটা নিয়ে কাছে এল। এ-টুকু করতে পেরে ভালই লাগল। হাতের তেল তালুতে ঘষতে ঘষতে কেমন কঠিন লাগছে বিভাসকে। 'জান, আরতি হিংসা মানুষকে পশু ক'রে ফেলে। অমানুষ।' বিভাস তোয়ালে নিয়ে স্নান করতে চলে গেল। উ সশব্দে অলীক একটি খাঁচার গায়ে কিছু দিয়ে আঘাত করল। ঝন ঝন একটা শব্দের রূপ, একটি পাখির আর্ত শিস...আনমনা আরতি অনেক আগের একটা কথা ভাবল, তুমি এত স্বার্থপর হয়ে গেলে...এখনই ওর, আমার...

'তুমি পর হয়ে যাবে, তবু এই ভাল।'

'আমি চিরদিন তোমার থাকব—আমার সবকিছুর অর্ধেক তোমার।'

কার মৃদু হাসি আরতিকে প্লাবিত করল। ঘোর একটি অন্ধকারে যেন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে সে। বিভাসকে বহুদিন আগে ভাবল। কালো রোগা একটি ভদ্রলোক। আড়াল থেকে হাসল আরতি। কি বিশ্রী। কিন্তু তখনো বিভাসের কাছে গিয়ে তার চোখ দেখেনি সে। পাঁচ বছর বাদে সেই চোখই আশ্রয় নিয়ে বিস্তৃত হল।

'বিয়ে পর কি তোমাকে আপন ক'রে পাব ?' বিভাস যেন দুলছিল কোনো স্মৃতি নিয়ে। ছোটবেলার মেলার দৃশ্য এখন হাতড়ে এনে দেখল বিভাস। 'পাখিটা কি উড়ে যাবে'—পাখিওলা হাসল প্রাজ্ঞ হয়ে। 'খোকাবাবু, খাঁচায় রাখবেন পাখিদের বিশ্বাস নেই।' একটু একটু করে পোষ মানিয়ে নিতে হয়।' কি মনে করে এ-কথা সে আরতিকে নিয়ে যেন বলল। আরতি তখন তেমনভাবে

একথা গায়ে মাখেনি। এখন মাখল।

'এখন পাচ্ছ না?' আরতি স্নিগ্ধ হাসল।

'পাচ্ছি. তবু বিশ্বাস হয় না।'

'কেন?' আরতি এ প্রশ্ন ক'রে নিজেকেই যেন যাচাই করল। তা হলে আমি কি পুরো বিশ্বাস করেছি ওকে। না করুণা করতে যাচ্ছি। করুণার প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর লাগল তার কাছে। পঁচিশ বছরের পুরনো হৃদয় নিয়ে কখনো করুণা করা যায় না। আসলে করুণা ভিক্ষার মতোই।

'তুমি পুরনো সব কিছু ফেলে দেবে—দিতে পারবে?'

তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে কেউ চেতনা সচকিত করল। আরতি হন্-হন্ করে দৌড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। যেন এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। চলে যাচ্ছিল সে।

'কি বললে না?' বিশ্বাস হাত ধরল।

বিদ্যুতের মধ্যে তার আকৃতি ছড়াতে চাইল ভাবী স্ত্রীর দেহে। আরতি স্থির। মূর্তির মতো শক্ত হয়ে গেল। এখন আর বুড়ো মনটাও বিদ্রোহ করতে পারছে না।

'মা। ধরে নাও না। অগোচরে হয়তো থেকে যাবে—তোমার কাছে কিছু তো গোপন নয়—' অকম্পিত স্বর আরতির।

'তা নয়—' বিভাস নিঃশ্বাস ফেলল। 'আমি ভাবছি, তুমি ভুলতে পারবে না। ভোলা যায় না এ-সব।' প্রগাঢ় বেদনা দুজনের মধ্যে ছায়া হয়ে এসে পড়ল।

'তোমাকে ভুলতে হবে—যা ঠিক করেছ, বাঁচবার জন্য বাস্তবিক আমরা এমন সিদ্ধান্ত নি। ভুলে যাওয়াই এখন সান্ত্বনা।'

'না না আমি ভুলতে পারব না—' কান্নায় ভেঙে পড়ল আরতি। 'তুমি মত দেবে আমি জানতাম, এবং জানতাম বলেই নিজে স্থির করেছি কিন্তু ভোলা অসম্ভব।' আকাশ যেন দূরবর্তী আরতিকে সান্ত্বনা দিল। অথচ আরতি চমকে উঠল, 'ছিঃ ছিঃ এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে যাবে—!' কথাটা চাবুকের মতো পিঠে এসে পড়ল।

পরিব্যাপ্ত কান্নায় তখন ফুলে ফুলে উঠছে আরতির বুক। গরুর গাড়ির নির্দিষ্ট গতি তাকে স্থির লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে ছড়ানো রাত। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে কেমন একটি গন্ধ উঠে এসে সমস্ত ভাবনাকে অচল করে দেয়। এমন রাত্রিই যেন আশ্রয়—আর তা আরতি পছন্দ করে নিয়েছে। পেছনের গাড়িতে বিভাস ও তার বন্ধুরা কথা বলছে। বিভাস হয়তো জ্যোৎস্নার কথা ভাবছে। তাই তার কাছে স্বাভাবিক। কাল রাতেও বলছিল, 'তুমি আমার শূন্য ঘরে আলো।'

আরতি এখন কলকাতায়—এখান থেকে বারো বছর আগের আরতিকে সে কাছে পাচ্ছে না। এটা কি তার দুঃখ না দুঃখ-বিলাস। আসলে সেই দিনগুলো নেই এ-কথাই এখন ও ভাবতে চায়। বিভাস তাকে অনবরত আকর্ষণ করে আছে।

বিয়ের আগের দিন বলেছে আরতি, 'আমার একটুও ভাল লাগছে না—ওকে আমি চাইনি। প্রয়োজনে শুধু মত দিয়েছি।' প্রয়োজনে শুধু? প্রয়োজনই কি মানুষকে ভালবাসায় না, ভাল লাগায় না।

'পরে দেখবে একে ছাড়া জগৎ অন্ধকার—প্রয়োজন মানুষকে এই শিক্ষা দেয়।'

একটা জীবন-প্রণালীর মেড-ইজির মতো অনেকগুলো কথা থেকে থেকে এমন করে ভেতরে বলে ওঠে।

'ওর বুকের অসুখ একেবারে সেরে গেছে?'

'ডাক্তাররা তাই বলে।'

'যদি আবার হয় কোনো দিন—' আরতি চোখে শঙ্কা দোলায়।

'যে কোনো লোকেরই তো হতে পারে!'

'কে জানে আমি কি পেলাম—হয়তো সারাজীবন এই নিয়ে ভুগব।' আরতি কান্নায় দোলে।

রাত্রে বিভাস শুয়ে দেখছে আরতিকে। আরতির একটি হাত যেন শূন্যে কিছু না পেয়ে শিয়রে অবনত।

'আরতি—'

'কি?'

'তোমার ভাল লাগছে?'

ভাল লাগছে? কাকে—কেন? কেন এ প্রশ্ন। আরতি চমকে উঠে আর সিরসির করতে থাকে। এ প্রশ্নের ভেতর বিভাস যে বিশ্বাসের বিষ মিশিয়ে রেখেছে তার কি উত্তর! এসব কথা বুকের ভেতর তোলপাড় করলেও স্বপ্নের মতো 'হু' শব্দটুকু বেরিয়ে আসে।

'সত্যি বলছ না মন রাখছ?' বিভাস আরতিকে কাছে টানে। আরতি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায় বিভাসের কাছে। তবু মনে হয় বাইরে খাঁচার একটি আবরণ আছে—যা খোলা যায় না, খুললে পাখি নাও থাকতে পারে।

'তুমি ছাড়া আমার কে আছে বলো?' আরতি বিষন্ন অথচ প্রগাঢ়।

'তোমার স্মৃতি, তোমার বয়স, তোমার সব।' কেমন দার্শনিকের মতো বিভাস ফাঁকা মাঠে দাঁড়ায়—কিন্তু তার কণ্ঠে অনুকম্পা, সান্ত্বনা। এ সমস্ত আজ সে অধিকার থেকে পাচ্ছে, আকস্মিক দুর্ঘটনার মতোই আরতি কাছে এসেছে।

আরতি হাসল। 'আমার সেই সব তুমি—তুমি—তুমিই।' আরতি বিভাসকেই একান্ত অবলম্বন ধরে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বিভাস অনুভব করল, পাখি পোষ মেনেছে—হৃদয়ের ভেতর দরজা খোলা থাকলেও সে উড়ে যাবে না।

'তোমার কিছুই আমার কাছে থাকবে না, কিছু না।'

'তোমার সবটুকুই কিন্তু থেকে গেল। আমি রেখে দেব।' আরতি ভেজা মুখ তুলে বলল। এবং যে-হাত তখন রিক্ত হয়ে তার মাথায় সান্ত্বনার আচ্ছাদন সেই হাত তাকে পুলক দিল।

'তোমার একটা ছবি দিও।'

'কি হবে?'

'রেখে দেব।'

'শেষ পর্যন্ত ছবি!' সমস্ত অভিমান-টুকু উঠে এল ঠোঁটে। মন যেন বলতে চাইল, তার আর দরকার কি। আশ্চর্য, আরতি শীতল হয়ে গেল। বলল, 'দেব।'

'শুনছ—' আরতি বিভাসকে বলল। বিভাস ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল।

'কি?'

'একটা ছবি তুলে দেবে আমার।' কথাটা কেমন বেরিয়ে এল।

'ছবি, ছবি কি হবে?' বিভাস বিস্মিত। চকিত। 'তোমার তো ছবি আছেই।'

'না, ওগুলো না।' যেন ব্যবহৃত ছবিতে কলঙ্কের লেপনটুকু বা গোপন কামনাটুকু সযত্নে এড়াতে চায় আরতি। 'একটা ভাল বড় করে ছবি।'

'আমাদের যুগল—' বিভাস মুখের সমর্থন খুঁজল। 'বেশ তো চল একদিন।'

'যুগল ছবি নয়।' আরতি অস্পষ্ট। তীক্ষ্ন তার স্বর। যুগল ধরে রাখার মানে নেই তার কাছে। তাতে যন্ত্রণা বাদ দিয়ে বাইরের মেদটুকুই আঁকা হবে। বলল সে, 'আমার একার।'

'কি করবে?' বিভাস এখন আলাদা করে আরতির কিছু ভাবতে চায় না। তাই একটু অধিকারকে বিস্তৃত করে। যেন দরজাটা খুলতে গিয়েও পাখিগুলোর সাবধানবাণী তাকে সতর্ক করে দেয়।

'দরকার আছে।' আরতি উঠে বাইরে চলে যায়। যেখানে একটুকরো আকাশ এখনো তার জন্য, তার একান্ত একার জন্য ভেসে আছে।

অথচ সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে স্বামীর প্রতি প্রীতির অনুভব সর্বাঙ্গে। তার চেহারা গয়না শাড়ি সমস্ত সেই প্রীতি-টুকুকে বিজ্ঞাপিত করে আছে। বিভাস কত সহজ কত ছেলেমানুষ তার কাছে। বিভাসের আবদারকে নিয়ে খেলা করতে কি গভীর সুখ। কাল রাত্রের কথা ভাবছে আরতি রিক্‌শটা যেন সুখের রাস্তা ধরে অন্য কোথাও যাচ্ছে। যেখানে শান্তি নামে অনবদ্য কিছু গাছে গাছে ফুটেছে। 'আমার কিন্তু ছেলে চাই—' 'অসভ্য' রাত্রের মতো আরেকবার মনে-মনে হেসে উঠল আরতি। 'আমি কি পেটে ছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছি!' 'ওসব জানি না—' বিভাসের কপট গাম্ভীর্য ভবিষ্যৎ বাবার রূপ নিয়ে সুন্দর দেখায়। 'এক বছরের মধ্যে ছেলেটি নেব।' যদি না দি, না পারি, তবে কি করবে—আমাকে ত্যাগ করবে?' 'না খুন করব।'

এই একান্ত কথাবার্তায় কখন চোখ বুজে এসেছিল আরতির। বিভাসকে কেন্দ্র করে ভাললাগা-ভাবটুকু মনে নাড়ছিল। হঠাৎ রিক্‌শটা লাফিয়ে উঠল; আর শুনতে পেল, 'বিয়ের পর এই হয়—স্বামী ছাড়া অবশিষ্ট কিছুই থাকে না—সুতরাং তোমার পরিবর্তনও জানা কথা।'

আবার কি ভাবল আরতি। মুখটুকু নিবে গেল।

'ছেলে কি হল?'

'অসভ্য।'

'অসভ্য আমি!'

'নয়তো কি।' আরতি হাসল। 'এত শিগগির ছেলে হলে লোকে কি বলবে?'

'কিন্তু আমার দরকার—ছেলেটাকে মানুষ করব।'

আকাশের ন্যায় চোখ দুটোকে বিস্তৃত করে মেলে ধরল আরতি। সেই চোখে ছোটখাট যে সব মেঘের ছায়া তা কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে যায় ভাবতে পারল সে।

'কবে—'

আরতি কাঁদতে চাইছিল। তার ঘরে এমন একটি ফাঁক সে রাখতে চায়নি। কিন্তু

সেই ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। বার-বার বিয়ের আগের চুক্তির কথাটা মনে পড়িয়ে দেয়। চুক্তির বেশী আমি বিভাসকে দিচ্ছি—না বিভাস চুক্তি ভঙ্গ করে কেড়ে নিচ্ছে নিঃশেষে! আরতি কোনো মীমাংসা খুঁজে পায় না। এখন শুধু এক-একবার ভাবে এ-সব চুক্তিও ভুয়ো, ছেলেমানুষি।

'কি হল?'

বিভাসের প্রশ্নে যেন জেগে উঠল আরতি। দূর থেকে কেউ ঘরে গেল এরকম লাগল। মনকে আঁকড়ে বলল, 'কি আবার!'

'কেমন লাগল?'

'খুব ভাল। ভয় ছিল হয়তো এ-সব ছবি বুঝব না।' আরতি আবার অন্তরঙ্গ। বিভাসের নিকট-সান্নিধ্য তাকে ভরে দিচ্ছে।

রিকশ থামল। চারপাশ তাকিয়ে আরতির এই রাতটুকুও ভাল লাগল। সেই সঙ্গে মনে পড়ল, বিভাসের ক্ষিধে পেয়েছে। সিনেমায় যেতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় মানুষটা খাবার সময় পায় নি। আহা! কেমন ভালবাসা বিছিয়ে রেখেছে বিভাস। তিলে তিলে পূর্ণ করছে। আরতি আবার পঞ্চদশী কোনো কিশোরীর মতো মনকে বলল, 'আমি ওর প্রেমে পড়েছি।'

পুরনো আরতি এখন ব্যবহৃত ভাবল নিজেকে। নতুন গড়ে তোলা অগোছালো সংসারটার গায়ে হাত বুলিয়ে সে বশে এনেছে। ছিমছাম হয়ে নিজেকে নির্দিষ্ট করে ফেলেছে।

হঠাৎ সেদিন কি কথার পর বিভাস হাসতে হাসতে বলল, 'কই, ছবি তুললে না?'

'ছবি!' আরতি চিরুনির ডগা দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিচ্ছে।

'বা বললে না একদিন।'

আরতি মনে করতে পারল না। 'কবে?'

'ভুলে গেছ—।'

কে যেন শেষবার বলল, 'একদিন দেখবে আস্তে আস্তে এই জীবন নিয়মিত হয়ে আসবে, দেখবে একদিন সব ভুলে যাবে।'

আজ আর বিব্রত হল না আরতি। আরশিতে সিঁদুরের উজ্জ্বল রঙ তাকে কমনীয় করল। মনে পড়ল, 'সিঁথির সিঁদুর যেন অক্ষয় হয়।' সেই অক্ষয়ের সাধনাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আরতি। বলল, 'মনে পড়ছে না। কি হবে গুচ্ছের ছবি দিয়ে।'

আরতি চলে গেল।

এখন আর আকাশ দেখার অবকাশ তার নেই। পঁচিশ বছর আজ প্রাণোচ্ছল হয়ে দুয়ারে প্রস্তুত। এই আবহাওয়া বিভাস দিয়েছে তাকে।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে দুজনে। আরতি লম্বা আঙুলে দিয়ে বিভাসের ঘামাচি খুঁটছিল। বিভাস টান হয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শুয়ে।

'জান, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।' আরতি চোখ তুলল।

'কি কথা?' বিভাস ঘাড় ফেরাল।

'আমাদের বোধ হয়...আমার মনে হচ্ছে এবার সেইটেই হবে—'

বিভাসের চোখ জ্বলে উঠল। চিৎকার করতে পারলে খুব ভাল হত।

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।' আরতি বিভাসের বুকে মুখ ঘষল।

বিভাস আনন্দে আরতির হাত চেপে ধরল। 'কত দেরি?'

'মাত্র ত দু মাস।'

'এবার অসভ্য কে?' হঠাৎ বলল বিভাস। হাসল বুক ফুলিয়ে।

'যাও' আরতির হাসি মিশে গেল এক সঙ্গে।

ঘুমোতে গিয়ে ভাবল বিভাস, আর ভয় নেই। এতদিন যে আশংকা গোপনে মাঝে মাঝে ছোবল তুলেছে—তার অবসান স্পষ্ট। পাখিটা আফিম ধরেছে—শেখানো বুলি রাধাকৃষ্ণ বলে এবার শিস দেবে। খাঁচাটা নিতান্ত আছে থাক। বিভাস পাশ ফিরল। তার গভীর সুখগুলো বুকে থেকে বেরিয়ে ঘরে খেলা করতে লাগল।

'ছেলেটা আমার প্রয়োজন দেবে' এই কথা আরতি শেষবার মনে আনল। তারপর মনে মনেই বলল, 'আমার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী।' সেই সঙ্গে তার মনে হল স্মৃতি অপ্রয়োজনীয়—পরিহার্যও; একমাত্র অনিদ্রা রোগীর কাছে তার কোন মূল্য থাকতে পারে—আমার দরকার নেই, আমার জীবনে ওগুলোর আর মূল্যও নেই।

আরতি কখন বিভাসকে কাছে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেও জানে না।

বিষ ছড়িয়ে মাছ ধরা

মাছ ধরার ব্যাপারে মেক্সিকোর অধিবসাদের খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির অভাব দেখা যায়। ওরা মাছ ধরে বিষ ছড়িয়ে, নয়তো ঢিল মেরে। আর ইয়ুকাটান উপত্যকায় ওরা চিংড়ী ধরে লাথি মেরে ডাঙায় ফেলে দিয়ে।

কোলিমা, চিহুয়াহুয়া, ওআস্কাকা, কুইন্টানা রু এবং মেক্সিকোর অন্যান্য অঞ্চলে রেড-ইন্ডিয়ানরা একটা বিশেষ গাছের মূল থেকে তৈরি বিষ সহযোগে মাছ ধরার রীতি পালন করে যায়।

এই বিষাক্ত মূলটি গুঁড়ো করে এক ধরনের মণ্ড তৈরি করে নদীতে ছড়িয়ে দেয়। সেই বিষ মাছকে কাবু করে দেয় এবং জেলেরা তখন সেইসব মাছ ঝুড়িতে তোলে। এই বিষের এমন গুণ যে এতে মাছই জ্ঞান হারায়, মানুষের কোন ক্ষতি হয় না।

পাথর ছুঁড়ে মাছকে ঘায়েল করা পুয়োর্তো ভ্যালার্তার দুষ্টু ছেলেদের একটি প্রিয় খেলা। ছ থেকে বারো বছরের ছেলেরা টেনিস বল মাপের ঢেলা হাতে নিয়ে পাহাড়ের চাতালে চড়ে বসে। জোয়ার থেমে যাওয়ার সঙ্গে ছোট ছোট মাছ পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমা হয়। আর ছেলেরা তখন তাদের হাতের ঢেলা দিয়ে সেগুলোকে মেরে ফেলে। সেইসব মাছ তখন পরিব্রাজকদের কাছে ছ আনা দরে বিক্রী করা হয়।

ইয়ুকাটান উপত্যকার আরো গভীর দেশে ছোট ছেলেরা লাথি মেরে গলদা চিংড়ি ধরায় খুব তুখোড়। ওদের রীতি হচ্ছে গোধূলির সময়ে একটা পেট্রল ল্যাম্প নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

জোয়ারের পর জল নেমে গেলে ছেলের দল চিংড়ীর দলের ওপর আলো ফেলে তাদের চলচ্ছক্তি রহিত করে দেয়।

তারপর তাগ মাফিক এক লাথির ঘায়ে চিংড়ীকে একেবারে তীরের একধারে নিক্ষেপ করার সঙ্গেই আর একদল ছেলে সেগুলিকে তুলে বালতিতে ভরে নেয়।

চিংড়ী ধরার এই রীতিবহির্ভূত উপায়ে এক একজনে ঘণ্টায় ছ থেকে আটটি পর্যন্ত শিকার করতে পারে।

স্কুল-পালানো একটি রোগ

ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকে যে স্কুল পালায় তার একটা ভেষজ কারণ আছে। মনোচিকিৎসাবিদ ডাঃ হার্ভে এস গসেনের মতে ঐ সব ছেলেমেয়েরা "স্কুলাতঙ্ক" বা এক প্রকার মানসিক স্নায়ু ব্যাধীতে আক্রান্ত।

"এই আতঙ্কের সঙ্গে", তিনি বলেন, "স্কুল পালানোর পার্থক্য আছে। এই দুই অবস্থা পরস্পরকে অতিক্রম করে, কিন্তু

বিশ্ববীচিথি

প্রথম ক্ষেত্রে স্নায়বিক পীড়ার বহু হেতু রয়েছে অথবা এমন কি মানসিক পীড়ারও, আর অপর ক্ষেত্রে কর্তব্যে অবহেলার প্রবণতাটা প্রাধান্য লাভ করে।

ছোটদের মধ্যে যারা এই আতঙ্কগ্রস্ত তারা স্কুলে যাবার সময় যতো এগিয়ে আসতে থাকে ততই কান্না এবং আশঙ্কার দুঃস্বপ্নে ওদের পেয়ে বসে।

"এই ভয়," ডাঃ গসেন বলেন, "স্কুলের ওপর নয়। এই ভয়টা হচ্ছে গৃহ এবং মায়ের কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হবার ভয়, আর এইটেই হচ্ছে সমস্যার মূল কথা।"

"এর প্রতিকার হচ্ছে মায়ের ওপর সন্তানের বিশ্বাস অর্জন করা কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই দীর্ঘ এবং জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ চিকিৎসা না হলে আবার সন্তান বড় হলে খেপাটে প্রকৃতির হয়ে দাঁড়ায়, সর্বদাই ভয় আর দুশ্চিন্তা—বাস্তব জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর একটা মনোভাব সর্বদা তাকে পীড়িত করে রাখে।

দেওয়াল ঢাকার কাগজ

ইংলন্ডে এখন খরচ বাঁচাতে অধিকতর সংখ্যক লোকে নিজেরাই দেওয়ালে নক্সাদার কাগজ সাঁটার কাজ করে নিচ্ছে। বাজারে যতো দেওয়াল ঢাকা কাগজ বিক্রী হয় তার শতকরা সত্তর ভাগই ব্যবহৃত হয় সাজানোর কাজে।

প্রতি রবিবার বাঁশী বাজিয়ে জার্মানীর ছোট্ট শহর হেমেলিনের এক ইঁদুরশিকারী বড় রাস্তা ও গলি থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে দলে টেনে নিয়ে মিছিল করে যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের অনেকে ইঁদুরের পোশাকও পরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় উপকথার ('Pied Piper of Hamelin') স্মরণে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি রবিবার এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়

মধ্যযুগে দেওয়ালে ছবি আঁকানো বা রেশমের এবং ভেলভেটের ওপর নানা বিচিত্র নক্সা করা মূল্যবান সজ্জার সুলভ সংস্করণ হচ্ছে দেওয়াল ঢাকা কাগজ।

মধ্যযুগে বইয়ে ছবি ছাপানোর কাজে দক্ষ মুদ্রাকর এবং কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীরাই ঐ কাগজের উদ্ভাবক।

দেওয়ালে কাগজ মারার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায় রানী এনের (১৭০২-১৪) রাজত্বকালে। সে যুগে কাগজের টুকরোগুলো হতো দু বর্গ ফিট মাপের এবং ওপরকার নক্সাটা এমন তৈরি করা হতো যাতে দেওয়াল ঢাকতে পাশাপাশি কতকগুলি সেঁটে দিলে একই জমি মনে করা যেতো। ১৭১২ সালে আঁকা, রঙ করা বা ছাপানো দেওয়াল কাগজের ওপর প্রতি বর্গ গজ পিছু এক পেনী করে কর ধার্য করা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেওয়াল-কাগজ অত্যন্ত দামী বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং ওর ব্যবহার ধনীদের গৃহে সীমাবদ্ধ হয়। কালক্রমে একটানা রোলে কাগজ তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হয় এবং ১৮৫১ সালে হাইড পার্কে অনুষ্ঠিত বিরাট প্রদর্শনীতে হাতে-ছাপা দেওয়াল কাগজ প্রদর্শিত হয় যা মুদ্রণ শিল্পের এক বিরাট কৃতিত্ব বলে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই প্রদর্শনী থেকে প্রথম যন্ত্রে মুদ্রিত দেওয়াল কাগজও বাজারে চালু হয় এবং সেগুলি হাতে-ছাপা সস্তার দেওয়াল-কাগজের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলে পরিগণিত হয়।

বর্তমানে বৃটেনে বছরে দেওয়াল কাগজ বিক্রীর পরিমাণ হচ্ছে কুড়ি কোটি রোল। আর ইংলণ্ডের তৈরি দেওয়াল-কাগজের প্রতিটি রোলে সাড়ে এগারো গজ থাকায় প্রতি বছর বৃটেনের গৃহগুলিতে সাড়ে সাত লক্ষ মাইল দেওয়াল কাগজ লাগানো হয়। বাজারে পাঁচ হাজার বিভিন্ন নক্সার দেওয়াল-কাগজ পাওয়া যায় এবং প্রতিনিয়তই নতুন নতুন নক্সারও আবির্ভাব ঘটে চলেছে।

অধিকাংশ লোকে তিন বছর অন্তর দেওয়ালে কাগজ বদলায়। ১৯৩০ সালের পর দেওয়ালকাগজ ব্যবহারের ফ্যাশন প্রায় লোপ পেয়ে যায় এবং যুদ্ধের সময় কাগজের অনটন হেতু পাওয়াই দুষ্কর হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শেষ হবার পর আবার ঐ ঝোঁকটা দেখা দেয় এবং এখন ওটা জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে। ১৭৪০ এবং ১৭৯০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত চীনা-ছাপা কাগজের প্রভূত চাহিদা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী উৎপাদকরা তাদের দেশের সেরা নক্সা শিল্পীদের নিয়োজিত করে দৃশ্য সমন্বিত দেওয়াল কাগজ তৈরি করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'কামদেব ও প্রজাপতি' এখনও লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে দেখতে পাওয়া যাবে। এই বিশেষ দেওয়াল-কাগজটির জন্য কম পক্ষে পনের শত কাঠের ব্লক তৈরি করতে হয়েছিল।

রুবেলা জাতীয় হামের জীবাণু আবিষ্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা রুবেলা জাতীয় হামের ভাইরাস বা জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। এই রোগের টিকার ব্যবস্থা করার এই হল প্রথম পদক্ষেপ।

সন্তানসম্ভবা মহিলারা প্রথমাবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হলে তাদের সন্তানের দেহে গুরুতর রকমের খুঁত দেখা দেয়। এজন্য পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগটি সম্পর্কে দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মেরিল্যাণ্ডের বেথেসডাস্থিত নেশনল ইনস্টিটিউট অব নিউরোলোজিকাল ডিজিসেস অ্যাণ্ড ব্লাইণ্ডনেস-এর ডাঃ জন এল সেভার এবং ডাঃ গিলবার্ট এম শিফ টিস্যু বা কলার মধ্যে রুবেলা জীবাণু আবিষ্কার করেছেন এবং তাদের পৃথক করে জন্মাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই চিকিৎসকেরা বলেন, আজ পর্যন্ত যত রকম জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রথম এই রোগে আক্রান্ত শতকরা বিরাশী জনের দেহ থেকে চিকিৎসকেরা এই জীবাণু পৃথক করে নিয়ে গবেষণাগারে জীবাণুমুক্ত বানরের দেহের কলায় বা টিস্যুতে প্রয়োগ করেন এবং এভাবে এদের জন্মাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর ঐ সকল নূতন জীবাণু তাঁরা পুরুষ স্বেচ্ছাসেবীদের দেহে প্রয়োগ করেন। তাদের রোগ লক্ষণ যে রুবেলা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, তাতেই এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই শিশু এবং পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণ হামে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণ হামের তুলনায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জন এফ এণ্ডার্স এবং তাঁর সহকর্মিরা সাধারণ হামের টিকা কয়েক বছর আগেই আবিষ্কার করেছেন। গামা গ্লবিউলিনের সংগে এই টিকা প্রয়োগ করে পৃথিবীর সকল দেশেই সাধারণ হাম এবং তার উপসর্গের ক্ষেত্রে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে।

চিত্রপ্রদর্শনী

ছবি আঁকার, শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখে অনেকেই। কিন্তু রঙ ও তুলির খরচ জোগাবার মতো সঙ্গতির অভাবে বহু জনেরই সে-অভিপ্রায় অংকুরেই লোপ পেয়ে যায়। এমন কোন উপাদানের উদ্ভাবন সম্ভব হতে পারে না? যা আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও শিল্পী হওয়ার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারে? বিজ্ঞানের ছাত্র থাকা-কালেই অজিত রায়ের মন এই চিন্তায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবয়েস থেকেই শিল্পী হবার ইচ্ছা, কিন্তু সঙ্গতির অভাবে সে-ইচ্ছা পূরণ হতে পারেনি। বিজ্ঞানের ছাত্র তখন, গ্রামের পথে যেতে যেতে খড়ের রঙে শেডের তফাৎটা তার দৃষ্টিতে পড়ে। চিন্তা করতে লাগলেন, খড় দিয়ে ছবি তৈরি করা সম্ভব হতে পারে কি না। সে সময়ে, ১৯৫০ সালে তার এক বন্ধু জাপান ঘুরে এসে জানালেন, ওদেশে খড় দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য তৈরি হয়। অজিত রায় স্থির করলেন, ওদেশে যদি সম্ভব হতে পারে, তাহলে আমাদের দেশেই বা তা হতে পারবে না কেন?

খড় নিয়ে তিনি নিয়মিত অনুশীলন আরম্ভ করলেন। দেখলেন সাধারণত ময়দার বা গঁদের যে আঠা ব্যবহার করা হয়, তাতে কাজ হচ্ছে না। বিজ্ঞানের স্নাতক হওয়ায় সুবিধে হল উপযোগী একটা আঠা তৈরি করার এবং এসিটোন ও প্লাস্টিকের সংমিশ্রণে তিনি সেটির উদ্ভাবনে সক্ষম হলেন। এক্স-রে প্লেট ঢাকবার যে কালো রঙের মোটা কাগজ, তার ওপরে তিনি খড় বসিয়ে ব্লেডের সাহায্যে খোদাই করে করে ছবি তৈরি আরম্ভ করেন আট বছর আগে। বিভিন্ন শেড আনার জন্য খড় (ধানের এবং গমের খড়, উভয়ই তিনি ব্যবহার করেন এবং বিদেশী প্যাকিংয়ের সঙ্গে যে খড় আসে, তাও তিনি সংগ্রহ করেন) জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তৈরি করে নেন।

প্রথম ছবি 'গ্রাম্য দৃশ্য' তৈরি করতে ছ মাস সময় লাগে। সে-ছবিখানি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে উপহার দিতে তিনি শিল্পীকে আলিঙ্গন করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জাপানে তৈরি খড়ের ছবির চেয়ে ভাল বলে অভিহিত করেন। তারপর অধ্যবসায় ও অনুশীলনের জোরে শিল্পী অজিত রায় এক-একখানি ছবি তৈরির সময় অনেক কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এখন তিনি দু-তিন দিনেই এক-একখানি ছবি সম্পূর্ণ করতে পারেন।

গত ১৬ই থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের ইনফরমেশন সেন্টার হলে তাঁর তৈরি বত্রিশখানি খড়ের ছবির এক প্রদর্শনী হয়। ঘর ছাওয়া আর গবাদি পশুর খাদ্য ছাড়াও খড় যে চমৎকার শিল্প-সৃষ্টিতে কতটা কাজের হয়ে উঠতে পারে, অজিত রায়ের ছবিগুলি না দেখলে তা বিশ্বাসই করা যেত না। তুলি দিয়ে রঙের সাহায্যে শেড আনা বা শূন্যে নম্বর তুলিতে অতি সূক্ষ্ম রেখা টানা—কোন কাজই খড়ের সাহায্যে যে অসম্ভব নয়, তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা গেল এই প্রদর্শনীতে। সোনার বরণ কন্যার গায়ের রঙটি ঠিক সোনার মতো। এমন ছবিও রয়েছে, যা হঠাৎ দেখলে তুলিতে আঁকা বলেই মনে হবে—না জানিয়ে দিলে খড়ের তৈরি বলে বিশ্বাসই হবে না। 'মা-কালী, তাজমহল, কোশাই নদীর তীরে, প্রদীপ ভাসায়ে জলে, পিরামিড, বৃষ্টি, কেরিঘাট দময়ন্তী, স্বর্ণহরিণ, ময়ূরপংখী, হংস-বলাকা' প্রভৃতি ছবিগুলি অসাধারণ শিল্প-কৃতিত্বের পরিচায়ক। উদ্ভাবনীশক্তি ও অধ্যবসায় যে অভাবনীয় কিছু গড়ে তোলায় কতটা সফল হতে পারে, অজিত রায়ের রঙ ও তুলি ছাড়াই খড়ের তৈরি ছবি তার একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল নিদর্শন। এ-ছবি-গুলির একটা নিজস্ব রূপ আছে, দৃষ্টিকে মুগ্ধ করার একটা নিজস্ব আকর্ষণশক্তি আছে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছবির পর্যায়ভুক্ত হলেও রঙ ও তুলির সাহায্যে আঁকা নয় বলে কলকাতার ফাইন আর্ট আকাদামির কর্তৃপক্ষ অজিত রায়ের এই প্রদর্শনী আকাদামি হলে অনুষ্ঠিত হওয়ার আপত্তি জানান—তাঁদের মতে, খড় দিয়ে তৈরি বলেই এ-ছবি 'হ্যাণ্ডিক্র্যাফট' পর্যায়ে পড়ে, সুতরাং আকাদামিতে তার প্রদর্শনী হতে পারে না। তাই যদি হয়, তাহলে গত বছর অর্জুন রায়ের পত্নীর সংগ্রহ গাছের ডাল, চেলা কাঠ, শিকড় ইত্যাদির বিভিন্ন মূর্তির প্রদর্শনী 'ভাস্কর্য' পদবাচ্য করে, কিংবা এই সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হাতের কাজের একটি প্রদর্শনী আকাদামিতে অনুষ্ঠিত করতে দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে?

দময়ন্তী — শিল্পীঃ অজিত রায়

পিরামিড — শিল্পীঃ অজিত রায়

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

সাহিত্যের শারদোৎসব

তার পায়ের ধ্বনি এখনও শোনে নি এমন কালা নেই। পাড়ায় পাড়ায় প্যাণ্ডেল সালু মাথা নেড়ে বলছে, আমি এসেছি: খবরের কাগজের পাতায় মোটা মোটা হরফের বিজ্ঞাপনগুলো জানান দিচ্ছে, আমি এসেছি: শহর হলে রাস্তাঘাট দোকানপত্র বাতি, গ্রাম হলে চণ্ডীমণ্ডপ বলে দিচ্ছে, উনি এসেছেন। মেঘের দল যদিও কৌতুক করে এই আগমনকে এখনও বিমর্ষ করে রাখছে তবু সেই ধোওয়া-আকাশের অফুরন্ত রোদ, তুলোট গগন, শেফালির গন্ধ আমরা মাঝে মাঝে না পাচ্ছি এমন নয়। বাড়িতে মধু-বিধুরাও দু' হাত তুলে নাচতে শুরু করেছে। অতএব সেই দুর্গোৎসব, যার গন্ধে প্যাণ্টুল-পরা কড়া বাঙালী সাহেব এবং আট হাতি খাটো ধুতি পরা দীন ফেরিওয়ালা উভয়েই সমান আকুল হয়ে ওঠে, সেই উৎসবকে আমরা সদরে পৌঁছে যেতে দেখছি। অপেক্ষা শুধু বোধনের সেই বাজনা, শিশির ভেজা প্রত্যুষে যা বেজে উঠবে। সম্বৎসরে একবার।

দুর্গামণ্ডপের সেই বাজনা যবে বাজবে, তার অনেক আগেই আরেক পাড়ায় কিন্তু প্রতিমা বিসর্জন ঘটে যাবে। ইতিমধ্যেই, এই লেখা সহৃদয় পাঠকের চোখে পড়ার আগেই, সে-পাড়ায় মণ্ডপ খুলে ফেলা হয়েছে, প্রতিমা এখন পথে নেমেছেন। মহালয়াতেই এ-পুজোর সমাপ্তি, শাস্ত্রীয় মতে। অশাস্ত্রীয়রা উপায়বিহীন বলে তার পরও কেউ কেউ সময় নেন।

বাঙলা দেশে সাহিত্যেরও দুর্গোৎসব আছে। তার আয়োজন শুরু হয়েছিল সজল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই। সম্পাদক-বৃন্দের চক্ষুতে তখন যে কী পরিমাণ জল ছিল একমাত্র তাঁরাই জানেন, তাঁরা আর তিনি—স্বয়ং ঈশ্বর। দায়টা যে কত বড় অন্যের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। কন্যার বিবাহে পিতার দায় যদি পাত্র-পক্ষ বুঝত! হা ঈশ্বর! সম্পাদকেরও সেই ব্যাকুল উদ্বিগ্ন মূর্তি অন্যের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। কোথায় লেখা, কার কার লেখা, কবে পাওয়া যাবে, কেমন করে ছবি আঁকানো হবে, পাতা বাড়বে, না, পাতায় টান পড়বে, সাজগোজটি ঠিক মত হল কি না, লগন সময় পেরিয়ে যাবে না ত—ইত্যাদি সহস্র চিন্তায় সম্পাদক ও তাঁর অনুচরবৃন্দ যে কত দফায় ঘর ও বাহির করেছেন, কত কাপ বিষ পান করছেন তার বর্ণনা দেওয়া রীতিমত কষ্টকর। এই ভাবে শনৈঃ শনৈঃ করে শুরু হয়েছিল, শ্রাবণ গগনে তখন ঘন মেঘ; তারপর এই যুগল-মাস ধরে অসীম ধৈর্যে পরিশ্রমে দায়িত্বটি পালন করে এখন তিনি নিশ্বাস ফেললেন। নিদ্রা ঘুচেছিল, খাদ্যে অরুচি হয়েছিল, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রতি চোখ ছিল না, 'পুজো সংখ্যার' অসংখ্য কীট তাঁকে সর্বক্ষণ উৎপীড়ন করেছে। এখন শেষ হল। সম্পাদকমশাই আজ আবার নিদ্রা অনুভব করতে পারছেন, সামনের টেবিলটা এ-যাবৎ লোকাল ট্রেনের পা-দানি হয়ে পড়েছিল, আপাতত একেবারে পরিষ্কার, নিকোনো, একটি কুচি কাগজ, এমন কি আলপিনও নেই। হাত মুখ ধুয়ে এসে তিনি শেষ কয়েকটি চুল আঁচড়ে নিচ্ছেন পরিপাটি করে, এবং হেঁকে বলছেন, কাল একবার গঙ্গা স্নান করব।

আমাকে একবার এক সম্পাদক ঠাট্টা

করে বলেছিলেন, যাক মশাই, ঢাকের পার্টি অ্যারেঞ্জ করার দায় আমার ছিল; খুঁজে পেতে পার্টি এনে দিয়েছি, এবার বাজনদাররা বাজাক।...এই বাজনদার হচ্ছেন লেখকরা।...অনুগ্রহ করে কেউ আমার প্রতি বিরূপ হবেন না, নিতান্ত পরিহাস করেই বলছি কথাটা, পুজোর মুখে যেমন বড় বড় রাস্তার মোড়ে বাজনদাররা ঢাক ঢোল নিয়ে তৈরী থাকে, এই পূজা সংখ্যার মুখে লেখকরাও তেমনি তৈরী। কার ঢাক কত ভাল, কার কাঠিতে কত যাদু, কার বা কত বোল ভাল—এ-সব বছরে বছরে যাচাই হয়ে গেছে; এখন সিধে কথা—আমায় যদি নাও তবে এই প্রণামী। বায়না দাও; চলো।

সম্পাদকদের সংগে লেখকরাও গত দু আড়াই মাস দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন। না না করেও, উপন্যাস দু তিনটে; গল্প আট দশটা; রম্য রচনা (সর্বজনীন চাঁদার খাতায়) গুটি কয়—এ ত দিতেই হয়েছে। যাঁরা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে দামোদরের বাঁধ বলে মনে করেন তাঁরা বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আর একটি দুটি সন্তানকে সর্ববিশারদ করব বলে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁরাও জানেন না—এই সন্তান শেষাবধি কুলাংগার হয়ে যাবে কি না!

যে যাই বলুক, আমি লেখকদের দোষ দিই না। ঠিক যে-কারণে পাড়ায় বসবাস করতে হলে সতেরো রকম চাঁদার খাতায় ভদ্রভাবে সিকি আধুলি ফেলে দিতে হয়, এও তেমনি। পাঁচশটা লেখা স্বয়ং ব্যাস-দেবও দু মাসে একা লিখে উঠতে পারতেন না গণেশকে ডিকটেশান দিয়ে, আর এই ক্ষীণজীবী বাঙালী লেখক ত সে তুলনায় নিতান্ত গণেশ-বাহন। ফলে একটি দুটি লেখা মনের গরজে, বাকি উড়ো খইয়ের মতন। উপায় কি! সেই লেখক-কুলও এখন নিশ্বাস ফেলতে পারলেন। এক ডজন কলম নিয়ে এই রণক্ষেত্রে নেমেছিলেন তিনি। আপাতত ও-প্রান্তে শান্তি বিরাজ করছে, এবং লেখক তাঁর কলমগুলি এতদিন পরে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারছেন।

সম্পাদক ও লেখক মিলিয়ে যে-প্রতিমা সাজালেন, এখন তার প্রতিষ্ঠা বইয়ের স্টলে। মেলায় যেমন মিঠাইঅলা বিপণি সাজিয়ে বসে পড়ে, বইয়ের স্টলগুলো আপাতত সেই রকম। কত অসংখ্য পত্রিকা, কত তার বিচিত্র রঙ, সে যে কী বসন ভূষণ দিয়ে বিবিধ রূপে সাজানো রতন তা পথিক মাত্রেই দেখতে পাবেন। কিন্তু বঙ্গ-পথিক তাঁকেই বলব, যিনি কয়েক দণ্ড দাঁড়িয়ে সেই স্তূপীকৃত পূজাসংখ্যার দিকে তাকিয়ে অনুভব করতে পারবেন, এই পূজা সংখ্যার অজস্র পাতায় সত্যিই এই দুর্গোৎ-সবের একটি ঘ্রাণ আছে। হয়ত তা নিতান্তই ক্ষিকে। তাতে কি শেফালির গন্ধও অনুগ্র, তার আয়ুও স্বল্প।

নন্দাঘুণ্টি অভিযান : সরস ও বিরল ভ্রমণ কাহিনী

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি—গৌরকিশোর ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

ব্যক্তিগত ভ্রমণকাহিনী বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু থাকলেও, সমবেত অভিযানের কাহিনী সত্যিই বিরল। বাঙালীর সত্যিকারের ইতিহাস যেমন লেখা হয়নি তেমনি বিজাতি-ধিক্কৃত বাঙালীর জীবনেও যে দুঃসাহসের ও বীরত্বের অবকাশ মধ্যে মধ্যে ঘটে থাকে একথাও অজ্ঞাত থেকে গেছে। সুদূরের এবং দুর্গমের জন্য চঞ্চল পিপাসা তাকে ঘরছাড়া করেছে তার একটি নিকট উদাহরণ আমাদের হাতের কাছেই আছে, নন্দাঘুণ্টি বিজয় কাহিনী। নন্দাঘুণ্টি নামের সঙ্গে কয়েকজন মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের নামও বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকল। পদে পদে বিপদ, বাধা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হতে অবশেষে সেই তুষার মৌলি শৃঙ্গ জয় ক'রে তারা ফিরে এসেছে, তাদের এই প্রথম সাফল্য আরও বৃহত্তর অভিযানের পথ খুলে দিয়েছে। আর এই কাহিনী লিখেছেন, বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম রম্য লেখক, ঔপন্যাসিক এবং অদম্য-রসিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ, রূপদর্শী হয়ে যিনি প্রথম বঙ্গদর্শনে এবং জীবনদর্শনে নেমে-ছিলেন।

কাহিনী যেমনই হোক, ঘটনা যতই তথ্যসংকুল হোক, গৌরকিশোরের কাছে তাই সরস ও সংবেদনশীল আলেখ্যের উপকরণ হয়ে ওঠে। সংবাদ-চিত্রকর তিনি, তাঁর জোড়কলম, রচনার মধ্যে তুলি এবং কলম দুইই আছে। কিন্তু এখানেই তিনি থেমে যাননি, রেখা-রঙের অতিরিক্ত যে তৃতীয় পরিণাম, অর্থাৎ লেখকের যা তৃতীয় নয়ন-পাতের ফল, সেই রসে তিনি সমুত্তীর্ণ। বস্তুকে তিনি বাস্তব করে তোলেন, রটনাকে তিনি রসে পরিণত করেন সমবেদনার গুণে। ব্যঙ্গাশ্রয়ী চোখ দুটির পিছনে তাঁর যে হৃদয় উপস্থিত তা সরকার, সহকর্মী। তাঁর অক্ষর-রেখা, তাঁর শব্দচিত্র দ্রুতলয়ী, ক্ষিপ্রচারী এবং চলচ্চিন্তার আশ্রয়ী।

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি যে অভিযানের কাহিনী তা রম্যভ্রমণের কাহিনী নয়। অজানা পথ, অজানা পথ চলা। সুতরাং কেবল দৃশ্যাবলী, কেবল শোভাসৌন্দর্যের অ্যালবাম তৈরি করার সৌভাগ্য লেখকের ঘটেনি। অনেক খুটিনাটি বিবরণ, অনেক জটিল পরিস্থিতির কার্যকারণ তাঁকে জুড়তে হয়েছে এই প্রসঙ্গে। লেখক এবং সহঅভিযাত্রীদের দিনপঞ্জী মৌখিক বিবরণ ও প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলম্বনে আশ্চর্য স্মৃতি-ধরের মত, সূত্রধারের মত ধারাবাহিক পারম্পর্য রক্ষা করে এই কাহিনী রচনা করেছেন। বইটি তার ফলে এমন চিত্তাকর্ষক এবং নাটকীয় কৌতূহলের কারক হয়ে উঠেছে যে উপন্যাসের মতই পাঠককে শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে দেয়। এই রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে কোথাও লেখকের আত্ম-ঘোষণা নেই। প্রায় কুড়িখানা ফটোগ্রাফ বইখানাকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। নন্দাঘুণ্টি বিজয় অভিযানের নেপথ্যে আর একজন বাঙালী রয়েছেন তিনি আনন্দ-বাজার পত্রিকা পক্ষের শ্রীঅশোককুমার সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁকে এবং লেখককে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

পুস্তক পরিচয়

পদাবলী সংকলন

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য ছয় টাকা।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালের মধ্যে রচিত তিনশ বাইশটি বৈষ্ণব গীতি-কবিতার সংকলন ও আলোচনাগ্রন্থ এটি। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-পূর্বকাল থেকে আধুনিক কাল-পর্যন্ত সময়ের পরিধিতে বিভিন্ন ভাবরসের মোক্ষ ও দার্শনিক তত্ত্বের বিকিরণ ঘটেছে

এমন পদাবলী আহৃত হয়েছে দেখে পাঠকমাত্রেই আনন্দিত হবেন। আক্ষেপানুরাগ থেকে মাথুর-ভাবোল্লাস পর্যন্ত সমস্ত স্তর-পরম্পর। এবং সংকীর্তনের অধিবাস, গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি সকল প্রকার বৈচিত্র্যের ধারাই এই সংকলনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের খ্যাতকীর্তি গবেষক, তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন সাহিত্যাবলীর যে নবমূল্যায়ন করেছেন, সাহিত্য পাঠকের কাছে তা স্মরণীয় হয়ে আছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা-প্রবন্ধে পদাবলীর দার্শনিক তত্ত্ব, পদাবলীর রস, চৌষট্টি রসের কীর্তন, ও নায়িকা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া প্রতিটি শতাব্দীর শীর্ষালোচনায় একটি ক'রে সূত্রধারণা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিটি পদই টীকাসংযুক্ত।

বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদনে এই গ্রন্থ সহযোগিতা করবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

প্রবন্ধ

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা—শ্রীঅধীর দে। সৃষ্টি প্রকাশনী; ১৪১বি, ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলিকাতা—৩৪। দাম—বারো টাকা।

কোনো দেশেই সাহিত্য শুধু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের ওপর নির্ভরশীল নয়। এদেরই পাশাপাশি সার্থক প্রবন্ধও যে কোনো সাহিত্যের স্তম্ভ বিশেষ। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিকটি উজ্জ্বল। বর্তমান-কালে শিশু-সাহিত্যেরও ওপর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত দে পূর্বসূরীদের আলোচনাকে ভিত্তি করে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও রীতি-নীতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা বিচারশীল ও যুক্তিনির্ভর। দেশী বিদেশী লেখকদের গ্রন্থ শ্রীযুক্ত দে'কে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রভূত সাহায্য করেছে। অবশ্য এখানেই শ্রীযুক্ত দে'র গ্রন্থের শেষ নয়, বরং শুরু বলাই উচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় প্রবন্ধের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর সুলিখিত পরিচায়িকায় উক্ত বিষয় এবং এই গ্রন্থের প্রয়োজন সম্পর্কে মূল্যবান সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি বিশালায়তন। এবং বিষয়টি নীরস, বলাই বাহুল্য। গ্রন্থটিতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাকে মোট চারিটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। রামমোহন পর্ব (১৮১৫-১৮৪২), অক্ষয়-ঈশ্বর পর্ব ১৮৪৩—১৮৭১), বঙ্কিমপর্ব (১৮৭২—১৮৯০), রবীন্দ্রপর্ব (১৮৯১—১৯৪৬)। পৃথক পৃথক পর্ব-প্রসঙ্গে সমসাময়িক

প্রবন্ধকারদের উদ্ধৃতি সহ লেখিক মূল্যায়নও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি'র প্রিয়নাথ সেনকে নিয়েই গ্রন্থের সমাপ্তি হয়েছে। প্রবন্ধ বিষয়ক রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। ১৯৬।৬২

ধর্ম

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা। নীরোদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য তিনটাকা।

এযাবৎ কেবলমাত্র শ্রীঅরবিন্দের লিখিত পুস্তকের মাধ্যমেই আমরা এই পরমযোগী এবং লোকোত্তর জ্ঞানীর মতামত জানিতে পারিতাম। যাহারা তাঁহার আশ্রমে গিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সম্যকভাবে জানিবার সুযোগ অল্পই পাইয়াছেন।

১৯৩৮ সালের কোন দুর্ঘটনার জন্য যখন শ্রীঅরবিন্দের নির্জনবাসে বাধা পড়ে, তখন যে-কয়জনের উপর তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ভার পড়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা তিনি যে-সব খোলাখুলিভাবে ঘরোয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইসব কথাবার্তার নোট রাখিয়াছিলেন। সেইগুলিই একত্রিত করিয়া এই পুস্তক। কিছু কিছু ইংরাজীর অনুবাদও আছে। লেখক নিজেই ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দের কথা হুবহু নোট করা অসম্ভব, তবে সাধ্যমত তাঁর ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্বে এগুলি প্রকাশ করিবার সংকল্প ছিল না বলিয়াই এগুলি শ্রীঅরবিন্দকে দেখাইয়া লওয়া হয় নাই।

কয়েকজন ভক্ত আশ্রমবাসী এই যে অভাবনীয় দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, পাঠক-সম্প্রদায় আজ তাহরা ভাগ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ধর্ম, সমাজ, জাতি, দেশ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আর্ট, ইতিহাস, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি প্রায় সর্ববিষয়েই আলোচনা হইয়াছে এবং এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী দ্বিধাহীনভাবে তাঁর সুচিন্তিত বহুমূল্য মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কথাবার্তার গতি ও প্রকৃতি চিত্তাকর্ষক। এই ঘরোয়া বৈঠকের ভিতর দিয়া আমরা শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। তাহা ভিন্ন তাঁহার জীবনের বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঘটনাবলী তাঁহার নিজের কাছ হইতে জানিতে পারি; এমন কি অগ্নিযুগের বিষয়েও। তাঁহার সমসাময়িক বহু ব্যক্তির উপরেও তিনি আলোকপাত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে অতি সরল প্রাঞ্জল ভাবে। এই অমূল্য পুস্তকটি প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নিকট আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঋণ স্বীকার করিতেছি। পুস্তকটি জাতির সম্পদ। ৫০৬।৬৯

বিবিধ

অনন্ত অধ্যায়। শ্রীবিনয় চৌধুরী। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

ভারতসম্রাট শাহান সা আকবর বাদশাহের জীবনের কয়েকটি গৌরবময় অধ্যায় লইয়া এই পুস্তকটি রচিত। হিন্দুদের উপর এবং হিন্দুধর্মের উপর আকবরের প্রীতি সর্বজন-বিদিত; হিন্দুদের প্রীতিধন্য সম্রাট তাই হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করিতে পারিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাঁহাকে যে কেবল ধর্মনিরপেক্ষ বিচক্ষণ শাসক হিসাবে দেখান হইয়াছে তাহা নহে; আমরা তাঁহার অন্তরের প্রীতিশুভ্র কল্যাণ-স্নিগ্ধ অন্তস্তলটিও দেখিতে পাই। এই পুস্তকেই আমরা সাক্ষাৎ পাই বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জুড়িয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রানী ভবসুন্দরীর, যিনি দুর্ধর্ষ পাঠান সর্দার ওসমানকে অসিযুদ্ধে ও সস্নেহ ব্যবহারে পরাস্ত করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে "রায়বাঘিনী" খেতাব লাভ করেন। আমাদের ইচ্ছা হয় সেই সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীর দরবার দেখিতে যেখানে মহারাজ মানসিংহ, রাজা বীরবল, মনীষী আবুল ফজল, ঐতিহাসিক বাদাউনি, কবি ফৈজী, পণ্ডিত আবদর রহীম খানখানা প্রভৃতি নবরত্নের অন্যতমেরা বাদশাহের দ্বারা সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। পুস্তকটির ভাষা ও বর্ণনাকৌশল বিষয়বস্তুর উপযোগী।

৬৪৮।৬১

পত্রিকা

Yule Recreation Magazine—Editor Sri Devi Prosad Chatterjee, 8, Clive Row, Calcutta-1.

এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর কর্মীদের প্রমোদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য বার্ষিক প্রকাশনটি কর্মীদের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেয়। ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া এবং হিন্দী, এই চারটি ভাষায় কর্মীদেরই লেখা রচনা সম্ভারে পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ।

ভ্রম-সংশোধন

"পুস্তক পরিচয়" বিভাগে ৮ই ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষের বইয়ের নাম ভুল বেরিয়েছিল; "কুর্টুস", নাম হবে "পটুম।"

• রঙ্গজগৎ •

বিদেশে ভারতীয় ছবি

সম্প্রতি বিদেশে কয়েকটি প্রধান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। সব ক'টি উৎসবের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ছবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পুরস্কার লাভ কোন ছবিরই ভাগ্যে ঘটেনি। তবে সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" কান উৎসবে প্রদর্শিত হবার পর সেখানকার সমালোচক ও বিদগ্ধজন কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

প্রতিবারেই বিদেশের উৎসবে ভারতীয় ছবি পুরস্কৃত হবে এমন আশা করা অযৌক্তিক। কিন্তু বিদেশে যখন ভারতীয় চলচ্চিত্রের কদর বেড়ে চলেছে, তখন বিদেশী চিত্ররসিকরাও হয়ত এই আশা পোষণ করে থাকেন যে, তাঁরা প্রতিবারেই বছরের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি দেখার সুযোগ পাবেন। যে ছবি বিদেশে যায় তা-ই যে এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট ছবি নয়, বিদেশী চিত্ররসিক বা সমালোচকদের তা জানার কথা নয়। অতএব তাঁরা ভারতীয় ছবির শিল্পমান সম্বন্ধে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আহরণ করেন সেটা আমাদের পক্ষে মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

ছবির নাম উল্লেখ করে লাভ নেই। তবে যে ছবি এ বছরে বাইরে পাঠানো হয়েছিল সে-সব ছবি যে বিদেশী সমালোচকদের মনে রেখাপাত করে আসতে পারবে না, এখানকার যে-কোন চিত্ররসিক নির্ভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন।

ছবি যাঁরা পাঠান তাঁরা এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে যদি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভাবেন তবে বিদেশে ভারতীয় ছবি উপেক্ষা ও অনাদরের হাত থেকে বাঁচতে পারে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট মহল এ ব্যাপারে আরও সচেতন এবং সতর্ক হবেন।

দমদম বিমান ঘাটিতে অবতরণ করছেন ভি শান্তারাম, পেছনে যমনভাই মানসাটা
ফটো—দেশ

নানা প্রসঙ্গে ভি শান্তারাম

[গত সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য ভি শান্তারাম কলকাতায় এসেছিলেন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিনই শ্রীশান্তারামের প্রথম বাংলা ছবি "পলাতক"-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয় কলকাতায়, টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। সুখ্যাত যাত্রিক গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করছেন।]

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে শ্রীশান্তারামের

"পলাতক"-এর সেটে (বাঁ দিক থেকে) দিলীপ মুখোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার, জহর রায়, সন্ধ্যা রায়, ভি শান্তারাম, অনুপকুমার, রুমা গুহঠাকুরতা ও শর্মিন মুখোপাধ্যায়; (ডাইনে) ক্যামেরার সামনে ভি শান্তারাম
ফটো—দেশ

সঙ্গে সোজা চলে আসি "পলাতক"-এর সেটে। গাড়িতে বসে নানা বিষয়ে কথা হল বোম্বাই-এর বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক-পরিচালকের সঙ্গে। প্রথমেই তাঁকে প্রশ্ন করি, বাংলা ছবি তৈরী করার প্রেরণা আপনি কোথা থেকে পেলেন? উত্তরে শ্রীশান্তারাম বলেন, "ছবির জগতে আছি গত চল্লিশ বছর ধরে। অনেক ছবিই তৈরী করেছি। সব ছবি তৈরী করেই যে সমান আনন্দ পেয়েছি তা নয়। অনেক সময় মনে হয়েছে, ছায়াছবিতে শিল্পের চেয়ে বাণিজ্যিক শর্তই বড় হয়ে উঠেছে। আমরা আগে শিল্পী, পরে ব্যবসায়ী। কিন্তু প্রথম দায়িত্বটি আমরা ইচ্ছা থাকলেও সব সময় সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি না। একটি শিল্পসুন্দর ছবি তৈরীর প্রেরণা অনুভব করেছিলাম। ভাবলাম, একটি বাংলা ছবি তৈরী করব। বাংলা ছবিতে শিল্পের সঙ্গে আপস করতে হবে না। এটা একটা "এক্সপেরিমেণ্ট" মনে করতে পারেন।

"যাত্রিক গোষ্ঠীর "স্মৃতিটুকু থাক" ছবিটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বিশেষত যাত্রিক গোষ্ঠীর চিত্র-পরিচালনার নৈপুণ্য দেখে। সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করলাম, ওঁদের দিয়েই ছবি তৈরী করাব। শ্রীযমনভাই মানসাটাকে বললাম, যাত্রিক গোষ্ঠী যদি ছবির জন্য বড় স্টার চান, তবে কিন্তু আমি নিরাশ হব। যাঁকে দিয়ে যে কাজ চলবে, তাঁকেই যেন ছবিতে নেওয়া হয়। অবশ্য আমি জানতাম, যাত্রিক গোষ্ঠী স্টার সিস্টেম-এর ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁরা পরে আমাকে পলাতক-এর "স্ক্রিপট্" শোনালেন। আমার খুব ভাল লাগল। গল্পটিতে বাংলার মাটির স্পর্শ আছে। বাংলা ছবি তৈরী করতে হলে এমন গল্পই চাই। "পলাতক" তৈরী করব মনস্থ করে ফেললাম।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বললেন, "আমি শুধু আশা করি না, নিশ্চিত জানি, এ ছবি সাফল্য লাভ করবেই। শিল্পের দিক থেকেও, ব্যবসার দিক থেকেও।"

কথা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'দেশ-এ 'এই লজ্জা!' নামে আপনারা যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আমাকে অনুবাদ করে শোনানো হয়। আপনারা যেভাবে আমাকে এই বাংলা ছবির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, তাতে কিন্তু আমিও খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। স্টার সিস্টেম-এর ওপর ভরসা না রেখে তো বাংলা ছবি এখানে তৈরী হচ্ছে। আমি নতুন কী আর করতে যাচ্ছি!"

শ্রীশান্তারাম এর পর বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকট-প্রসঙ্গে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কেন এই সংকট তিনি জানতে চাইলেন। অনেক কথাই তিনি শুনলেন। পরে বাংলা ছবির কোন কোন স্টার-এর মোটা পারিশ্রমিকের অঙ্কের কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, "তা হলে তো সংকট কোনকালেই দূর হবে না। বাংলা ছবির ব্যবসায়িক সীমাক্ষেত্র সংকীর্ণ। তার ওপর শিল্পীর চাহিদা যদি এত বেশী হয়, তবে বাংলা ছবির দুর্দিন ঘুচবে কেমন করে? বোম্বাই-এর কোন কোন শিল্পীর অস্বাভাবিক পারিশ্রমিকের কথাও আমি জানি। আমি বুঝি না, শিল্পীদের চাহিদা এমন অযৌক্তিক কেন হবে। আর এঁদের না হলে ছবি চলবে না, এমন ধারণাই বা প্রযোজকরা কেন রাখেন। আমি তথাকথিত স্টার সিস্টেম-এর বিরোধী।"

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট-প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বলেন, "আচ্ছা, কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরী হচ্ছে না কেন? এখানে তৈরী নিউ থিয়েটার্স-এর হিন্দী ছবি এককালে সারা ভারতের দর্শকদের কত আনন্দ দিত। এখানকার শিল্পীরাও সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কানন দেবী, সায়গল, উমাশশী, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ শিল্পীদের এখনও ভুলে যাননি পুরনো দিনের দর্শকরা। এখানে যদি হিন্দী ছবি তৈরী হয়, তবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পও বাঁচবে, সারা ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পও নিত্য নতুন শিল্পগুণের পরিচয় পাবে। একদিন তো বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছিল। আজ কেন পারবে না? আমি তো মনে করি, বাংলার শিল্পীরা আজও সারা ভারতের অন্তর জয় করতে পারে। এখানে হিন্দী ছবি তৈরী করতে হলেই যে বোম্বাই থেকে স্টার নিয়ে আসতে হবে, তার কী মানে আছে! যেমন আমার ইচ্ছা নয়, "পলাতক"-এ বোম্বাই-এর কোন শিল্পী অভিনয় করেন।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি তো ভাবতেই পারি না, যে চলচ্চিত্রশিল্পে সত্যজিৎ রায়ের মত শিল্পী রয়েছেন, সে শিল্পের কোন সংকট থাকতে পারে। সত্যজিৎ রায় সারা ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আমি তো মনে করি, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের এই সংকটের দিনে তাঁরই নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। তিনিই বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে পারেন। তিনি যদি কলকাতায় হিন্দী ছবি তৈরী করেন, সারা ভারতের দর্শক সানন্দে তা গ্রহণ করবেন। আমি তো জানি, সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে বাংলার বাইরের দর্শকদের কী অপরিসীম আগ্রহ।"

সত্যজিৎবাবুর কোন্ কোন্ ছবি আপনি দেখেছেন? — জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে।

"সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" ও "অপুর সংসার" দেখেছি। দেখে বিস্মিত হয়েছি। সব সংলাপ বুঝতে পারিনি। তবে তাঁর ছবিমাত্রই "গ্রেট আর্ট"। তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি নিয়ে আলোচনা-কালে শ্রীশান্তারাম বলেন, "ছবির দুটো দিক আছে—শিল্প ও ব্যবসায়। শিল্পের

সত্যজিৎ রায়ের "অভিযান" (অভিযাত্রিক নিবেদিত) ছবির একটি বহির্দৃশ্য; উপরে ছবির দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে ওয়াহীদা রেহমানকে স্ক্রিপট পড়াচ্ছেন সত্যজিৎ রায়; নীচে ছবির আলোকচিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায়ের সঙ্গে চিত্রপরিচালক

উৎকর্ষের জন্য এক্সপেরিমেণ্টাল ছবির প্রয়োজন আছে। তবে চিত্রপ্রযোজকের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থেকে এক্সপেরিমেণ্ট করা উচিত নয়।" কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পলাতক' আমার এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি। ছবির পরিবেশ যাতে নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে, তাই আমি ছবির অধিকাংশ দৃশ্য কলকাতার স্টুডিওতে তোলবার ব্যবস্থা করেছি। বোম্বাই-এ এ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, বোম্বাই-এর স্টুডিও-তে আড়ম্বর আছে। কিন্তু বাংলা ছবিতে শিল্পের এমন সব সূক্ষ্ম স্পর্শ থাকে যা বোম্বাই-এর স্টুডিওতে আমরা সহজে আয়ত্ত করে নিতে পারি না।"

কথায় কথায় আমরা স্টুডিওতে এসে পৌঁছলাম। সেটে সকলের সঙ্গে পরিচয় হল ভি শান্তারামের। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, রুমা গুহঠাকুরতা, সোমনাথ মণ্ডল প্রভৃতি। কলাকুশলীদের মধ্যে বংশীচন্দ্র গুপ্ত (শিল্পনির্দেশক) ও সৌমেন্দু রায়ের (আলোকচিত্রশিল্পী) সঙ্গে পরিচিত হলেন তিনি। ছবির প্রধান স্ত্রী চরিত্র হরিমতীকে অর্থাৎ সন্ধ্যা রায়কে দেখে শ্রীশান্তারাম বললেন, "ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। এই তো সত্যি-কারের হরিমতী।"

* শুভমুক্তি *

সত্যজিৎ রায়ের **'অভিযান'** (অভিযাত্রিক নিবেদিত) এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। এই ছবিতে দর্শকরা এক নতুন ধরনের চলচ্চিত্রকলার সন্ধান পাবেন বলে আশা করা যায়। সত্যজিৎ রায়ের এই ছবির নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওয়াহীদা রেহমান। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির নায়ক। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন রুমা গুহ-ঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চারু ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রেবা দেবী ও বীরেশ্বর সেন। সত্যজিৎ রায় নিজেই ছবির সংগীত-পরিচালক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরী হয়েছে।

বাজে ঘুঙরু (রামরাজ ফিল্মস), ম্যাডাম ঝপাটা (কলারস চিত্র) ও তিলাঞ্জলি দুনিয়া (এ কে প্রোডাকশনস) নামে আরও তিনটি ছবি এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। প্রথম ছবিটি (পরিচালনা: শিবরাজ শ্রীবাস্তব) সংগীতবহুল; দ্বিতীয়টি (পরিচালনা: রমা রসীলা) রহস্যচিত্র; তৃতীয়টি (পরি-চালনা: এ এম খান) যাদুরোমাঞ্চপূর্ণ।

চিত্ররথ পরিচালিত ফিল্ম এজ'র "কুমারী মন" ছবির একটি বহির্দৃশ্য; (ডাইনে) ছবির দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে অন্যান্যদের মধ্যে পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত লাহিড়ী, কণিকা মজুমদার ও আলোকচিত্রশিল্পী দিলীপ মুখোপাধ্যায়

চিত্র-সমালোচনা

সার্থক চিত্রসৃষ্টি

অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে বেনারসী বাইজি। জনতোষিণীর জীবনে এসেছে মুক্তিদাতা। একদিন যে ছিল তার খেলার সাথী, যার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল সেই আজ এসেছে তাকে মুক্তি দিতে। সে পালিয়ে যাবে এই পাপ-পুরী থেকে, দয়িতের হাত ধরে আবার সে এসে দাঁড়াবে বাইরের সুন্দর পৃথিবীতে। সে সুখ চায়, শান্তি চায়; সে চায় স্বামী, একটি মধুর জীবন। সবই সে হয়ত পেত। কিন্তু পাপ-ব্যবসায়ীরা ছোটবেলায় তাকে চুরি করে নিয়ে আসে পতিতালয়ে। সেবার সকলের সঙ্গে সে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল সূর্যগ্রহণের গঙ্গাস্নানে। গঙ্গার ঘাট থেকেই সে নিখোঁজ হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল পর আবার বুঝি তার জীবনে এল মুক্তিস্নানের লগ্ন। বিছানায় শুয়ে চিরআকাঙ্ক্ষিত জীবনের স্বপ্ন দেখে বেনারসী। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বিদ্যুতের আলো এসে ঠিকরে পড়ে তার মুখে, তার বালিশের ওপর। তার মাথার বালিশে সুতোর সেলাইয়ে লেখা রয়েছে দুটি কথাঃ সুখে থাক। বিদ্যুতের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দুটি কথা—সুখে থাক।

জটিল জীবন-যন্ত্রণা থেকে এক বিড়ম্বিতা নারীর উত্তরণ-মুহূর্তের এই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটি আশ্চর্য সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন তরুণ চিত্রপরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা তাঁর প্রথম সার্থক চিত্রসৃষ্টি "বেনারসী" (ফিল্ম ক্র্যাফট প্রাঃ লিঃ প্রযোজিত) ছবিতে।

শুধু এই একটি মুহূর্তই নয়, রসজ্ঞ দর্শককে প্রসন্ন করে রাখার মত আরও অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর এই ছবিতে। গঙ্গার ঘাটে বহু লোকের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার মাঝখানে সোনার অর্থাৎ ছোটবেলায় বেনারসীর চুরি হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি মনে রাখবার মত। বাইজি বেনারসীর মনের পরিচয়টি পরিচালক ফুটিয়ে তুলেছেন—একটি নিরুচ্চার মুহূর্তে—নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বেনারসী নীরবে তাকিয়ে দেখে পাশের বাড়িতে বাবা-মায়ের কোলে শিশুর আদর। নিপুণ শিল্পী যেমন করে তার তুলির আঁচড়ে ছবি আঁকেন, তেমনি করেই শ্রীগুহঠাকুরতা এই ছবিতে এ'কেছেন একটি জীবন, ও নানা পরিবেশের ছবি।

তাঁর প্রয়োগ-কর্ম অনেকটা পরিবেশ-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ শিল্পীর মতই তিনি ছবির প্রতি দৃশ্যের পরিবেশকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে ছবিতে নায়ক ও তার বন্ধুর সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকে নীচে নামা, চুল কাটার সেলুনে দুই বন্ধুর বৈকালিক কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা, নির্ধারিত জায়গায় যাওয়ার আগে তাদের আবার দেখা এবং ছবির শেষাংশে নায়ক ও তার উর্ধ্বতন কর্মচারীর চাকুরিগত দৈনন্দিন কর্মধারা, প্রভৃতির এমন অনেক ঘটনার অনাবশ্যক বিলম্বিত দৃশ্য ছবিটিকে মন্থরগতি করে তুলেছে। এবং ছবিটি অনেকাংশে বিবরণধর্মী হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই ধরনের বিন্যাসের মধ্যে দৃষ্টিনন্দন বহিরঙ্গ শিল্প ও সুন্দর দৃশ্য-আঙ্গিকের পরিচয় মেলে। এবং পরিচালকের বাস্তবানুগ পরিবেশ রচনার কৃতিত্বটিও প্রকাশ পায়। ছবির ঘটনা ও চরিত্রের নাট্যধর্মী বিশ্লেষণে পরিচালক বিশ্বাসী নন। "মেলোড্রামা" তিনি সতর্কভাবে পরিহার করেছেন এই ছবিতে। তবু তাঁর সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের প্রসাদগুণে দর্শকের মনকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর রসবোধের প্রমাণ বিশেষ করে পাওয়া যায় নাট্যপরিণতির অংশে—যখন কলোনীতে নায়িকার পূর্বজীবনের পরিচয় ব্যক্ত হয়ে পড়ে। এর পর থেকে নায়ক-নায়িকার একমাত্র দরদী বন্ধুর ময়নার খাঁচা হাতে নিয়ে দৌড়ে রেললাইনের পাশে এসে দাঁড়ানোর মুহূর্তটি পর্যন্ত দর্শকের মনকে অভিভূত করে রাখে। তবে কলোনীতে আসার পর নায়িকার মুখে একটি গান থাকতে পারত। বাইজির গান যে এতকাল গেয়েছে তার মুখে অন্য এমন গান যদি থাকত যা তার জীবনের নতুন রূপ ও নতুন মানসিকতার পরিচায়ক তবে রসের দিক থেকে ছবির আবেদনটি আরও বাড়ত। তবু নির্দ্বিধায় বলা যায়, "বেনারসী"র দোষ-ত্রুটি সামান্য, উপেক্ষণীয়; এর গুণ অনেক, আবেদন দুর্নিবার। এর চেয়েও বড় কথা, "বেনারসী"র মাধ্যমে বাংলা ছবিতে এক কৃতী পরিচালকের পদক্ষেপ ঘটল।

বিমল মিত্রর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এ ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রুমা দেবী। বেনারসীর জীবনের অন্তর্দাহ ও সুখ-সৌভাগ্য শিল্পী তাঁর মরমী অভিনয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর অভিনয়ের বড় গুণ, চরিত্রটির মর্ম-জ্বালা ও আশা-আকূতির সঙ্গে তিনি দর্শককে একাত্ম করে তোলেন। প্রণয়-

মুহূর্তে তাঁর অভিনয় মধুর। গানে ও নাচে যে তিনি পারদর্শিনী সে পরিচয়ও রয়েছে ছবিটিতে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় স্বচ্ছন্দ হলেও প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠতে পারেনি। বিবাহিত জীবনে নায়ক-নায়িকার অকৃত্রিম দরদী বন্ধুর চরিত্রে অনুপকুমারের অভিনয় প্রাণোচ্ছল। নাট্য মুহূর্তে তাঁর অভিনয় দর্শকের মনকে অভিভূত করে রাখে। অন্যান্যদের মধ্যে চরিত্রোচিত অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন তুলসী চক্রবর্তী, মমতাজ আমেদ, তরুণকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, শ্যাম লাহা, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, পরাগ গুহ-ঠাকুরতা, উজ্জ্বল গুহ, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুচ্ছন্দা, সুরুচি সেনগুপ্তা, বাণী গাঙ্গুলী, আশা দেবী, মেনকা দেবী ও জন কাবাস।

সংগীত-পরিচালক ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর আবহ সুররচনা মনোরম। ছবির আনন্দ-বেদনার মুহূর্তকে তাঁর সুরসৃষ্টি নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে চলে। তাঁর সুরারোপিত দুটি গান (গজলধর্মী) সুখশ্রাব্য।

দীনেন গুপ্তর আলোকচিত্রগ্রহণ আলো-অন্ধকারের মায়াজাল তৈরী করে ছবির শিল্পসৌন্দর্য বাড়িয়েছে। তাঁর ক্যামেরা ছবির দু-একটি বিশেষ মুহূর্তে সুন্দর 'মুড' সৃষ্টি করেছে। দৃশ্য-গঠনেও শ্রীগুপ্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজের মধ্যে প্রশংসনীয় হল শব্দগ্রহণ (দুর্গাদাস মিত্র), সম্পাদনা (হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়), শিল্প নির্দেশনা (রবি চট্টোপাধ্যায়) এবং রূপসজ্জা (মদন পাঠক)।

এবার পূজায় মেগাফোন কোম্পানীর রেকর্ডে কৌতুক-নক্সা পরিবেশন করেছেন জহর রায়, এবং দুটি রবীন্দ্র-সংগীত গেয়েছেন অরুন্ধতী দেবী (গুহঠাকুরতা)

* পাদপ্রদীপের আলোয় *

বলাকা অভিনীত "চিরকুমার সভা"

ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গত শনিবার য়ুনিভার্সিটি হলে বলাকা সঙ্ঘের মহিলা সভ্যারা সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" মঞ্চস্থ করেন।

"চিরকুমার সভা"র আবেদন চিরায়ত, এই নাটকের আনন্দরস চিরন্তন। বলাকার শিল্পীদের অভিনয়ে নাটকের এই অন্তর্লীন ভাবমাধুর্য যেন নতুন করে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন মীনাক্ষী গোস্বামী (চন্দ্রবাবু), বীণা চৌধুরী (অক্ষয়), উষসী বসু (রসিক), সর্বাণী রায় (শ্রীশ), প্রতিমা দাশগুপ্ত (বিপিন), ইলা রায় (পূর্ণ), পার্বতী দাশগুপ্ত (জগত্তারিণী), নূপুর গুপ্ত (নীরবালা), আরতি ঘোষ (পুরবালা), শুভা দত্ত (নৃপবালা), প্রণতা ভট্টাচার্য (শৈলবালা) ও নন্দিতা বসু (নির্মলা)। এঁদের সকলের অভিনয়ই মার্জিত, স্বচ্ছন্দ ও চরিত্রোপযোগী হয়ে ওঠে। বেলা সরকার, শোভা সেনগুপ্ত, সাধনা কীর্তি, পুষ্প ঘোষ ও মিনতি বিশ্বাস অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

উষসী বসু নাটকটি পরিচালনা করেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন বীণা চৌধুরী ও নূপুর গুপ্ত। এঁরাও প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

"প্রোফেসর" হিন্দীছবিতে কল্পনা

মোর্বালিটি-তে (রোল্যাণ্ড রোড) বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে চিত্রজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হন। (বাঁয়ে) করজোড়ে মোর্বালি-টির স্বত্বাধিকারী কমল দে (মাঝখানে) সমবেত চিত্রতারকাদের মধ্যে সাবিত্রী বসু, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাইনে) ভি বালসারার নেতৃত্বে "সাজ ও আওয়াজ"-এর শিল্পীরা (ধানুওয়াজ, মলয়, চিন্তাপ্রিয় প্রভৃতি) সংগীত পরিবেশন করছেন ফটো—দেশ

নির্মলেন্দু চৌধুরীর বিদেশ-যাত্রা

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সরকার এ-দেশের চারজন শিল্পীকে ওই দুই দেশে পাঠাচ্ছেন। শিল্পীরা হলেন : কৃষ্ণা যামিনী, রাধিকা-প্রসাদ মৈত্র, কেরামত খাঁ ও নির্মলেন্দু চৌধুরী।

জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর সতীর্থরা গত সপ্তাহে গ্রামোফোন কোম্পানীতে এক প্রীতি-সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনে কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৌধুরী বলেন, ইতি-পূর্বে তিনি তিনবার বিদেশ-সফরে গিয়েছেন এবং সেখানকার সংগীত-রসজ্ঞদের বাংলার লোকসংগীত শুনিয়ে এসেছেন। এবারকার বিদেশ-সফরে সহ-শিল্পীদের সংগে তিনিও যাতে স্বদেশের মান বাড়িয়ে আসতে পারেন—উপস্থিত সকলের কাছে তিনি এই শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেন। সম্মে-লনের শেষে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্মলেন্দু চৌধুরী অতিথিবৃন্দকে সুমধুর কণ্ঠসংগীতে আনন্দ দান করেন।

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে পারে, এমন শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির নির্মাতাকে ভারত সরকার ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ১৯৬২ সালে প্রদর্শনের ছাড়পত্র প্রাপ্ত ছবি এই পুরস্কার পেতে পারে। যে ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করবে অথবা বারো সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হবার মত জনপ্রিয়তা অর্জন করবে, সেই ছবিই এই বিশেষ পুরস্কারের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

কলকাতার নাগরিক জীবনের ওপর তৈরী ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি "পোরট্রেট অব এ সিটি" ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসন-এর মাধ্যমে গত সপ্তাহে কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে।

বোম্বাই সমাচার

চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর পরবর্তী রঙীন ছবির নায়িকা চরিত্রের জন্য শর্মিলা ঠাকুরকে নির্বাচন করেছেন। ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন শাম্মি কাপুর। ও পি নায়ার ছবির সংগীত পরিচালক।

চন্দ্রলেখা পিকচার্স-এর **"কৈলাসপতি"** ছবিতে তাণ্ডব-নৃত্য পরিবেশনের জন্য নৃত্যশিল্পী শচীনশংকর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সুমিত্রা দেবী, মহেশ দেশাই, জীবন ও নিরঞ্জন শর্মা ছবির মুখ্য শিল্পী। ধীরুভাই দেশাই ছবিটির পরিচালক।

কলকাতার অভিনেত্রী অভিনীত দুটি হিন্দী ছবির মুক্তিলগ্ন আসন্ন। ছবি দুটির নাম হল : **আসলি-নকলি** ও **বেগানা**। "আসলি-নকলি" ছবিতে একটি বিশিষ্ট স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়। "বেগানা" ছবিতে রয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় "আসলি-নকলি"র পরিচালক। "বেগানা" পরিচালনা করেছেন সদাশিব জে রাও কবি।

তাজমহলের পটভূমিতে শশধর মুখার্জির **"লীডার"** ছবির একটি সংগীত-দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। এই দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করবেন দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। রাম মুখার্জি ছবিটির পরিচালক।

তোমায় সাজাব যতনে

স্টুডিওতে মেক-আপ নিচ্ছেন

(বাঁয়ের সারি, উপর থেকে নীচে)
বাসবী নন্দী, নির্মলকুমার, কুন্তলা
চট্টোপাধ্যায়

(মাঝের সারি) সন্ধ্যা রায়, [illegible] রায়,
বিশ্বজিৎ, আশীষকুমার (ডাইনের
সারি) অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুলতা
চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, গীতা দে

পাঠকের চোখে

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

মহাশয়,

গত ১লা ভাদ্রের "দেশ"-এ নতুন দিল্লী থেকে লেখা শ্রীভট্টাচার্যের চিঠি পড়লাম।

এখানে লক্ষ করেছি বাংলা ছবি দেখার জন্য অবাঙালী দর্শকের ভিড়। আমার কয়েকজন অবাঙালী বন্ধু—যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না—এখানে যে-সমস্ত বাংলা ছবি মাঝে মাঝে আসে তার প্রতিটিই দেখেন; কারণস্বরূপ তাঁরা বাংলা ছবির গল্পসম্পদ এবং অভিনয়-উৎকর্ষের কথা বলেন। তাঁদের মস্ত বড় দুঃখ হ'ল, সংলাপ পুরোপুরি তাঁরা বোঝেন না এবং সূক্ষ্ম আলাপের মেজাজটুকু ধরতে পারেন না।

তাই আমিও বাংলা ছবির—হিন্দী বা ইংরেজী সাব-টাইটেল থাকলে সোনায় সোহাগা—নিয়মিত প্রদর্শনের জন্যে কলকাতার চিত্রপরিবেশকদের অনুরোধ করছি।

ইতি
কল্যাণকুমার ঘোষ
বোম্বাই-৮

মহাশয়,

বাংলা ছবির কদর দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানকার স্থানীয় চিত্রপরিবেশকরা দিল্লীতে বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে মোটেই সক্রিয় নন। "কাঞ্চনজঙ্ঘা", "কাঁচের স্বর্গ", "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" প্রভৃতি যেসব ছবি ইতি-মধ্যে কলকাতায় দেখানো হয়ে গেছে, এখানে আজও পর্যন্ত সেসব ছবি প্রদর্শিত হ'ল না। রাজধানী দিল্লীতে বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যা বর্তমানে বিশ হাজারেরও ওপর। আমার বিশ্বাস, ভাল বাংলা ছবি এখানে নিয়মিতভাবে দু সপ্তাহ ধরে চলতে পারে। এখানকার বাঙালীরা'ও বাংলা ছবি দেখবার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে থাকেন। বাংলা ছবির প্রযোজকদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন রাজধানী দিল্লীতে বাংলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার জন্য তাঁরা প্রবাসী বাঙালীদের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন।

ইতি
গৌতম সেন
নতুন দিল্লী-১

একটি আশা

মহাশয়,

ভিসকন্তি, ফেলিনি প্রমুখ ইতালীর চারজন অগ্রগণ্য পরিচালকের মিলিত প্রচেষ্টায় 'বোকাচিও সেভেন্টি' নামে এক-খানি সমাদরযোগ্য ছবি নির্মিত হয়েছে, এ কথা সকলে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। এ-ছবিতে উপাখ্যান চারটি। দর্শকরা সেই চারটি অংশে পরিচিত হন চারটি বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট চিত্রভাবনার সঙ্গে। এমন নক্ষত্র-সম্মেলন চিত্রামোদীর কাছে প্রায় ঐতিহাসিক ঘটনা। ঠিক এই পরিকল্পনায় বাংলাতেও একটি ছবি দেখবো, আমার এমন আশা বোধ করি অন্যায় নয়। ধরুন, সেই বাংলা ছবির উপাখ্যানগুলির ভার নিলেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং রাজেন তরফদার। ছবি দেখার আনন্দ ছাড়াও এতে পাওয়া যাবে: বাংলা চলচ্চিত্রের বহুমুখী নব্য ধারাটি; একত্রে তার পরিচিত শাখাসমূহ; প্রতিটির স্বকীয় মেজাজ। বাংলা দেশের প্রগতিশীল প্রযোজকরা এ সম্পর্কে ভেবে দেখতে পারেন। ইতি—

অমিয় বসু,
কলিকাতা-৯

রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" (পরিচালনা : দিলীপ মিত্র) ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

"বাংলা ছায়াছবির সংকট"

মহাশয়,

ইদানীংকালে বাংলা ছায়াছবির সংকট নিয়ে যেরকম আলোড়ন উঠেছে, সেটা বাংলা ছায়াছবির পক্ষে শুভ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে সংকটের আসল কারণ-গুলোর অনুসন্ধান করতে হবে। আমি বাংলা দেশের বিখ্যাত তিনটি শহর ঘুরে একটা ধারণা সঞ্চয় করেছি যাতে বাংলা ছবির সংকটের আসল কারণের কয়েকটা সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে।

(ক) আসানসোল—চারটি প্রেক্ষাগৃহ। একটিতে নিয়মিত বাংলা ছবি চলে, তিনটি নিয়মিত হিন্দী বই চলে। বাংলা একদম চলে না।

(খ) দুর্গাপুর—তিনটি প্রেক্ষাগৃহ। তিনটিতেই হিন্দী ও বাংলা ছবি চলে, তবে হিন্দী ছবি বাংলা ছবির চেয়ে অনেক বেশী চলে।

(গ) বর্ধমান—চারটি প্রেক্ষাগৃহ। একটিতে বাংলা ছবি চলে (ভালো হিন্দী ছবি মাঝে মাঝে চলে), আর তিনটিতে নিয়মিত হিন্দী ছবি চলে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব জায়গায় কি বাংলা ছবি চলে না? নিশ্চয়ই চলে, যদি কলিকাতা ও ওসব জায়গায় একই সঙ্গে বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করে। ভালো বাংলা ছবি এই সমস্ত জায়গায় আসতে আসতে অনেক পুরনো হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, হিন্দী ছবি এত চলে কেন?

প্রথম কারণ, প্রচার বাহুল্য; দ্বিতীয় কারণ, উপকরণ। নাচ, গান, বাজনা, মারামারি, সব-কিছু পাবেন হিন্দী ছবিতে। অনেক তথাকথিত ভদ্র বাঙালীর মুখে শুনেছি—আরে দূর, বাংলা ছবি! বাংলা ছবিতে কি লাইফ আছে মশায়? দেখুন হিন্দী বই, তিন ঘণ্টা 'এনজয়' করবেন—পয়সা উসুল হবে।

অনেক সিনেমা হলের মালিকদের বাংলা ছবি চালাবার ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা তা পারেন না। তার করণ, বাংলা ছায়াছবি চলে না। তাই আপনাদের কাছে আমার নিজস্ব কয়েকটি বক্তব্য জানাচ্ছি।

(১) বাংলা দেশের প্রধান প্রধান শহরে, কলকাতার সঙ্গে একযোগে বাংলা ছায়াছবির মুক্তিলাভ ঘটাতে হবে।

(২) সরকার থেকে—আইন মারফৎ প্রতি সিনেমা হলে মাসে দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ বাধ্যতামূলক বাংলা ছায়াছবির প্রদর্শনী চালু করতে হবে।

(৩) আর্থিক সাফল্যের প্রধান কারণ হিসাবে ভালো বাংলা ছবির সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গানসম্বলিত আমুদে বাংলা ছবি তৈরী করতে হবে।

(৪) স্টার সিস্টেমকে ধীরে ধীরে পরিহার করতে হবে।

(৫) বাংলার বাইরে যাতে বাংলা ছবির প্রচলন জোর চলে, তার জন্য সাব-টাইটেল বা অন্যাবিধ ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) "দেশ" পত্রিকার মত বাংলার সমস্ত পত্র-পত্রিকাতে নিঃস্বার্থভাবে "আরো বাংলা ছায়াছবি দেখুন"—এই স্লোগানকে প্রচার করতে হবে। ইতি—

পরিতোষ গুপ্ত, দুর্গাপুর—২।

খেলার মাঠে

একলব্য

কয়েকটি অপ্রধান প্রতিযোগিতার খেলা বাকি থাকলেও আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর এক-রকম যবনিকা পড়েছে। ময়দান পাড়ায় আর মাতামাতি নেই। মহাপুজোর আয়োজনে পাড়ায় পাড়ায় এখন মাতামাতি আরম্ভ হয়েছে। তাই বলে মন থেকে ফুটবল একেবারে মুছেও যায়নি। যাবার উপায়ই বা কোথায়? সারা বছরই যে এখন ফুটবলের অয়োজন! কলকাতার পর ক্রীড়ারসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে দিল্লি-বোম্বাইয়ের দিকে। দিল্লি ক্লথ মিল, রোভার্স, ডুরান্ড এবং জাতীয় ফুটবল সম্পর্কেও কলকাতাবাসীর প্রায় সমান আগ্রহ। কলকাতা যেমন ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর, তেমন সারা ভারতের সব আসরের সঙ্গেই তার অন্তরের যোগাযোগ।

শক্তিশালী হায়দরাবাদ একাদশকে ফাইন্যালে ৩—১ গোলে হারিয়ে এবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব। সুতরাং একই বছরে লীগ ও শীল্ড জয়ের কৃতিত্বে মোহনবাগান পেয়েছে কলকাতার ফুটবল 'ডাবলস', বাংলায় যার অর্থ ফুটবলের দ্বিমুকুট লাভ।

মোহনবাগানের 'ডাবলস' লাভ এই প্রথম নয়। এর আগে ১৯৫৪, ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালেও তারা লীগ ও শীল্ড ঘরে তুলেছে। কিন্তু কলকাতার ফুটবল খেলায় মোহন-বাগানের এবারকার বিজয়-বৈজয়ন্তী ঔজ্জ্বল্যে ভাস্কর। এর আগে কোন ক্লাবের পক্ষে দশবার লীগ জয় করা যেমন সম্ভব হয়নি, তেমন আর-কোন ক্লাবও এ পর্যন্ত চারবারের বেশী 'ডাবলস' পায়নি। মোট ৮বার শীল্ড লাভও ভারতীয় দল হিসাবে মোহনবাগানের নতুন কৃতিত্ব। এতদিন ইস্ট-বেঙ্গল ও মোহনবাগানের শীল্ড জয়ের সংখ্যা সমান ছিল। এবার মোহনবাগান এক ধাপ এগিয়ে গেছে। শুধু অতীতের কীর্তিখ্যাত ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবই মোহন-বাগানের চেয়ে একবার শীল্ড বেশী পেয়ে আর এক-ধাপ এগিয়ে আছে। গতবার ইস্ট-বেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম শীল্ড জয়ের হিসাব নিয়েই এই পরিসংখ্যান। সুতরাং এই হিসাবে মোহনবাগানের উপর্যুপরি তিন বছর শীল্ড লাভও কৃতিত্বের অন্যতম স্বাক্ষর। এর সঙ্গে মোট ১৬ বারের মধ্যে পর পর পাঁচ বছর শীল্ড ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৃতিত্বও যোগ করে দেওয়া যায়।

সবচেয়ে বড় কথা, ফাইন্যালে মোহন-বাগানের সাবলীল ও সংঘবদ্ধ ক্রীড়াধারা, যাকে তাদের সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ খেলা বলা যায়। ফাইন্যালে মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদ একাদশের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং উন্নত ক্রীড়াচাতুর্যও সাম্প্রতিক কালের এক স্মরণীয় খেলা। খেলার কথা পরে, আগে শীল্ডের খানিকটা পর্যালোচনা করে নিই।

* * *

আই এফ এ শীল্ডের এবার ছিল ৬৯তম প্রতিযোগিতা। মোট ৩৮টি দল নিয়ে এবারকার খেলার তালিকা রচনা করা হয়েছিল। বাইরের নাম-করা দলের মধ্যে ছিল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স, ওয়েস্টার্ন রেল, মহীশূর ও হায়দরাবাদ একাদশ। কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ও লীগ-রানার্স ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এরাও তৃতীয় রাউন্ড থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছিল।

মোট ৩৮টি দলের মধ্যে রাজস্থান ক্লাব ও হাওড়া ইউনিয়ন খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি। দেরাদুনের ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে পৌঁছয়নি—আর কোর অব সিগন্যাল দল একদিন উয়াড়ীর সঙ্গে ২—২ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে দ্বিতীয় দিনের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। বাকী ৩৪টি দলের মধ্যে চার সপ্তাহ ধরে খেলা হয়েছে ৩৪টি। দুটি অমীমাংসিত

১৯৬২ সালের লীগ ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব। শীল্ড ফাইন্যালের পর গৃহীত ফটো। খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লাবের সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্রীধীরেন দে, ফুটবল সম্পাদক শ্রীকরুণা ভট্টাচার্য এবং আই এফ এ'র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে দেখা যাচ্ছে

ফটো—দেশ

খেলা নিয়ে মোট ৩৬টি। ড্র ম্যাচের এমন সংখ্যাল্পতা অন্য কোনবার আই এফ এ শীল্ডের খেলায় দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। প্রথম রাউণ্ডে এক উয়াড়ী ও কোর অব সিগন্যালের খেলা ছাড়া আর ১১টি খেলার কোন খেলা ড্র হয়নি। দ্বিতীয় দিন কোর অব সিগন্যাল না খেলায় উয়াড়ী ওয়াক-ওভার পায়। সুতরাং ওটাও একদিনের খেলা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে জামসেদপুর স্পোর্টিং এবং ইস্টার্ন রেল এবং তৃতীয় রাউণ্ডে উয়াড়ী ও মহীশূরের খেলাই একদিন করে অমীমাংসিত থাকবার পর দ্বিতীয় দিনে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে। সুতরাং সহজ গতি নিয়েই এবার আই এফ এ শীল্ডের খেলা এগিয়ে গেছে।

এবার তিনজন খেলোয়াড় শীল্ডের খেলায় হ্যাটট্রিক করেছেন। এ'রা হচ্ছেন বাটা স্পোর্টস ক্লাবের এস বসু, এরিয়ানের এস মুখার্জি এবং বার্নপুর ইউনাইটেডের পি মিত্র। এস বসু দ্বিতীয় রাউণ্ডে হাওড়া জেলা একাদশের বিরুদ্ধে, এস মুখার্জি প্রথম রাউণ্ডে এলাহাবাদের ইয়ং স্টারস ক্লাবের বিরুদ্ধে এবং পি মিত্র দ্বিতীয় রাউণ্ডে কটক সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন।

যাদের ফুটবলে সুনাম আছে—এমন কয়েকটি ক্লাব এবার শীল্ডের খেলায় রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যদিও বর্তমানের মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব অতীত দিনের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু শীল্ডের প্রথম খেলাতেই উয়াড়ী ক্লাবের কাছে ৩—০ গোলে হার স্বীকার করে মহমেডান দলের বিদায় গ্রহণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দিল্লি একাদশ, ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স এবং ওয়েস্টার্ন রেলের পত্রপাঠ বিদায় গ্রহণও আশা করা যায়নি। দিল্লি এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স—দুটি দলকেই হার স্বীকার করতে হয়েছে কলকাতার হাইনবল স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে। আন্তঃরেল ফুটবল প্রতিযোগিতার সদাবিজয়ী এবং বোম্বাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টার্ন রেল দলের বি এন রেলের কাছে প্রথম দিনের খেলায় পরাজয়ও ধারণাতীত। ইস্টার্ন রেল শক্তিশালী দল হিসাবেই পরিগণিত। কিন্তু হুগলী জেলার বিরুদ্ধে ১—০ গোলে কষ্টার্জিত জয়ের পর দ্বিতীয় রাউণ্ডে জামসেদপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

এবার বার্নপুর, বাটা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বি এন আর এবং উয়াড়ীর খেলা প্রশংসার দাবি রাখে। বি এন আর সর্বপ্রথম এবার সেমি-ফাইন্যালে ওঠে এবং সেমি-ফাইন্যালের 'চ্যারিটি ম্যাচে' মোহনবাগানের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যায়। বার্নপুর ইউনাইটেড চন্দননগর ও কটক সম্মিলিত দলকে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে ওঠে। তৃতীয় রাউণ্ডে গতবারের যুগ্ম শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে নির্দিষ্ট ৭০ মিনিট ১—১ গোলে সমান সমান অবস্থায় থাকে। অতিরিক্ত সময়ে আর-একটি গোল খেয়ে তারা হেরে যায়। প্রথম ডিভিসনে নবাগত বাটাকে বিদায় নিতে হয় চতুর্থ রাউণ্ডে মোহনবাগানের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকার করে। মোহনবাগানের সঙ্গে বাটা ভালই খেলে এবং দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দশজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতা চালায়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩—০ এবং খ্যাতনামা মহীশূরকে ৩—২ গোলে পরাজিত করা উয়াড়ীর পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক। চতুর্থ রাউণ্ডে হায়দরাবাদের কাছে ২—০ গোলে পরাজয়ও তাদের অগৌরবের নয়। কারণ হায়দরাবাদের সঙ্গেও উয়াড়ী প্রায় সমানে প্রতিযোগিতা চালিয়েছে। দিল্লি এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে সহজেই পরাজিত করবার জন্য স্পোর্টিং ইউনিয়নেরও প্রশংসা প্রাপ্য।

* * *

আগেই বলেছি, হায়দরাবাদ এবং মোহনবাগান ক্লাবের ১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যাল খেলা গতিবেগ, ক্রীড়াধারা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক দিয়ে এক উল্লেখ-

একই বছরে লীগ ও শীল্ড জয়ের কৃতিত্ব

১৮৯৮—গ্লস্টার রেজিমেণ্ট
১৯০১—রয়াল আইরিশ রাইফেল
১৯০৮—গর্ডনস
১৯০৯—গর্ডনস
১৯২২—ক্যালকাটা
১৯২৩—ক্যালকাটা
১৯৩৬—মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৪১—মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৪৫—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬২—মোহনবাগান

যোগ্য ফাইন্যাল। এত গোলের সুযোগ এবং গোলে এত ভাল শট ইদানীংকালে আর কোন খেলায় হয়েছে বলে মনে পড়ে না। সত্যি কথা, হায়দরাবাদ তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তারা যে একটি গোল করেছে সেটাও মোহনবাগানের লেফ্‌ট ব্যাক রহমানের ভুলের মাসুল। তবু হায়দরাবাদ কোন সময় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উপর্যুপরি তিন বছর আই এফ এ শীল্ড লাভ

১৯০৮-০৯-১০...গর্ডনস এইচ এল আই
১৯২২-২৩-২৪...ক্যালকাটা
১৯২৬-২৭-২৮—শেরউড ফরেস্টার্স
১৯৪৯-৫০-৫১—ইস্টবেংগল
১৯৬০-৬১-৬২—মোহনবাগান

করতে কসুর করেনি। খেলাটিও কোন সময় ঝিমিয়ে পড়েনি। সূচনা থেকে শেষ অবধি খেলার মধ্যে গতিবেগ, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং সুতীব্র উৎসাহ উদ্দীপনা বজায় থাকে। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের মধ্যে খেলা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, যদিও মোহনবাগানের আক্রমণের সংখ্যা ছিল বেশী।

ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে হায়দরাবাদের খেলোয়াড়দের সুনাম সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে, শুকনো মাটিতে তাদের সংঘবদ্ধ ও সাবলীল ক্রীড়াধারা দর্শক চোখের তৃপ্তি-দায়ক। ১৯৫০ সাল থেকে আরম্ভ করে এই ক'বছর ভারতের ফুটবল মাঠ থেকে তারা গোলা ভরে ফসল তুলেছে। প্রায় সবই শক্ত মাটি থেকে তোলা। নরম মাটিতে তাদের ফলন নেই। প্যাচপেচে মাঠে হায়দরাবাদ খেলোয়াড়দের পা খোলে না। শুকনো মাঠেই তাদের চটকদার খেলা। ফাইন্যালে মোহনবাগানের সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তারা যে ৩—১ গোলে হেরে গেছে তার অন্যতম কারণ এই ভিজে মাঠ। আর একটি কারণও রয়েছে। সেটা তাদের মারাত্মক ভুল। দলের নিয়মিত ও নাম-করা স্টপার কালিমকে বসিয়ে দিয়ে তারা 'স্টপার' হিসাবে খেলিয়েছে ইনের খেলোয়াড় ইউসুফ খাঁকে। এতে আক্রমণভাগের শক্তি কমেছে, রক্ষণ-ভাগেরও শক্তি বাড়েনি বরং দুর্বল হয়েছে বলা যায়। যত বড় খেলোয়াড়ই হন, স্টপারের আয়াসসাধ্য ক্রীড়াধারায় নিজেকে একদিনে খাপ খাইয়ে নেওয়া শক্ত কাজ। এ কাজে ইউসুফ খাঁ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। মোহনবাগানের পুরোভাগের ক্ষিপ্রগতির সংগে কোন সময়ই তিনি এঁটে উঠতে পারেননি।

জামসেদপুর, উয়াড়ী এবং ইস্টবেংগল ক্লাবকে একে একে পরাজিত করে যেভাবে হায়দরাবাদ ফাইন্যালে উঠেছিল তাতে অনেকের ধারণা ছিল, হায়দরাবাদের পক্ষে এবার শীল্ড লাভ করা কষ্টসাধ্য নয়। যদিও সেমি-ফাইন্যালে হায়দরাবাদের কাছে গতবারের লীগ ও শীল্ড বিজয়ী ইস্ট-বেংগলের পরাজয়ের মূলে কিছুটা ভাগ্যের বঞ্চনা ছিল তবুও হায়দরাবাদের জয় ছিল ক্রীড়াধারার সংগতিসূচক ফলাফল। সত্যিই এইদিন দর্শক চোখের আনন্দদায়ক খেলার অবতারণা করেছিল হায়দরাবাদের খেলোয়াড়রা। তাই অনেকেই ভেবেছিলেন, সরাসরি জয়ের মাধ্যমে আই এফ এ শীল্ড এবার সর্বপ্রথম কলকাতার বাইরে যাবে। সরাসরি জয়ের মাধ্যমে বলছি এইজন্যে যে, ১৯৫৩ সালে বোম্বের ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ দল শীল্ড পেলেও খেলায় তাদের জয় ছিল না। ইস্টবেংগলের সংগে তিনদিন ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত থাকবার পর তারা শীল্ড পেয়েছিল হাইকোর্টের আপসরফায়।

শুধু বাইরের দলের শীল্ড লাভের ঘটনা কেন, বাইরের দলের শীল্ড ফাইন্যালে খেলার ঘটনাও কম। ১৯২৯ সালে রেংগুন কাস্টমস, ১৯৫৩ সালে ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ, ৫৪-তে হায়দরাবাদ স্পোর্টিং আর ৬০ সালে ইণ্ডিয়ান নেভী ছাড়া এর আগে আর কোন বাইরের টীম শীল্ড ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। তাই এবার যখন হায়দরাবাদ একাদশ ফাইন্যালে ওঠে তখন কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের আশংকা হয়, তারা বুঝি সর্বপ্রথম কলকাতাকে হারিয়ে শীল্ড নিয়ে যাবে। কিন্তু মোহনবাগানের উন্নত ক্রীড়াধারার কাছে তাদের পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে।

নরম মাঠে হায়দরাবাদের খেলার অসুবিধার কথা আগেই বলেছি। তবুও মোহনবাগান ফাইন্যালে যেভাবে খেলে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে তা অনেকদিন দর্শকদের মনে থাকবে। গোলকিপার থেকে আরম্ভ করে লেফ্‌ট আউট পর্যন্ত প্রতিটি খেলোয়াড় জয়লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে রাইট হাফ বিদ্যুৎ মজুমদার, লেফ্‌ট হাফ কেম্পিয়া এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। রাইট ইন অমল চক্রবর্তী এবং লেফ্‌ট আউট অরুময়ও সমপ্রশংসার

আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইন্যালে হায়দরাবাদ ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার একটি দৃশ্য ফটো—দেশ

অধিকারী। অধিনায়ক চুনী গোস্বামী ফ্লু রোগের শয্যা থেকে উঠে এসে যেভাবে দলকে চালিত করে সহ-খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তারও ভূয়সী প্রশংসা করা উচিত। দুটি অব্যর্থ গোল বাঁচাবার জন্য গোলকিপার শেঠের সাধুবাদ প্রাপ্য।

সবচেয়ে প্রশংসা প্রাপ্য বিদ্যুৎ মজুমদারের। সাধারণত মোহনবাগান দলের খেলায় একটি শির সবার উপরে থাকে। পঞ্চনদীর তীরের সেই বেণীপাকানো শিরও ফাইন্যালে বিদ্যুতের খেলার বিদ্যুৎঝিলিকে ম্লান হয়ে গেছে। ১৯৬২ সালের আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলাকে আমি বিদ্যুৎ মজুমদারের জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা হিসাবে অভিহিত করতে চাই।

সেণ্টার ফরোয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থের খেলায় ছিল সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের যুগ্ম মিশ্রণ। ক্রসবার ও গোলপোস্টে লেগে তাঁর দুটি শট গোলে ঢোকার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য আছে। আবার ক্রসবারে লেগে একটি বল বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে আছে দুর্ভাগ্য। পেনাল্টি সীমার মধ্যে অবৈধ বাধার ফলে আর একটি অবধারিত গোল থেকেও মঙ্গল বঞ্চিত হয়েছে। হায়দরাবাদের গোলটি যেমন মোহনবাগানের ব্যাক রহমানের ভুলের মাসুল, আত্মঘাতী গোল, তেমন অরুময়ের গোল হায়দরাবাদ গোলরক্ষকের ত্রুটির ফল। বল চাপড়িয়ে অরুময়ের পায়ের উপর ফেলার ফলেই তাঁর সহজ গোলের সুযোগ ঘটে।

যাই হোক, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ৩—১ গোলে জয় ক্রীড়াধারার শুধু সঙ্গতিসূচক ফলাফলই নয়, যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার; দলগত শক্তির সম্যক পরিচয়। গোল-সংখ্যা বেশীও হতে পারত তবু একটি কথা অস্বীকার করতে পারছি না। ভাগ্যদেবীও মোহনবাগানের প্রতি একটু সুপ্রসন্না ছিলেন। না হলে দু দিন আগে থেকে খেলার দিন দুপুর পর্যন্ত এমন বৃষ্টি হয়!

অদৃষ্ট এবং পুরস্কার নিয়েই জীবন-

সংগ্রাম। খেলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। কত খেলায় দেখেছি, একটি দল আক্রমণের উপর আক্রমণ চালিয়েও গোল করতে পারেনি, প্রতিপক্ষ মাত্র দুই-একবার আক্রমণের মধ্যে একটি গোল করে খেলায় জিতে গেছে। এখানেই অদৃষ্টের পরিচয়। এবার লীগের বারো আনা খেলা পর্যন্ত মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। আবার শেষ মুখে হাতের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ এসেও হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। ভাগ্যের এই লুকোচুরি খেলার পর পৌরুষ-প্রমত্ত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে মোহনবাগান লীগ পেয়েছে। শীল্ড ফাইন্যালের অনুকূল পরিবেশে পরাজিত করেছে ভারতের পরম শক্তিশালী এক টীমকে। সুতরাং অদৃষ্ট এবং পৌরুষের পুরোপুরি পরিচয় রয়েছে 'ডাবলসে'র সম্মান অর্জনকারী মোহনবাগানের ১৯৬২ সালের ফুটবল মরসুমে।

মোহনবাগানের ১৬টি ফাইন্যাল

১৯১১ সাল
মোহনবাগান (২) — ইস্ট ইয়র্ক (১)

১৯২৩ সাল
ক্যালকাটা (৩) — মোহনবাগান (০)

১৯৪০ সাল
এরিয়ান (৪) — মোহনবাগান (১)

১৯৪৫ সাল
ইস্টবেঙ্গল (১) — মোহনবাগান (০)

১৯৪৭ সাল
মোহনবাগান (১) — ইস্টবেঙ্গল (০)

১৯৪৮ সাল
মোহনবাগান (৩) — ভবানীপুর (০)

১৯৪৯ সাল
ইস্টবেঙ্গল (২) — মোহনবাগান (১)

১৯৫১ সাল
ইস্টবেঙ্গল (০) (২) — মোহনবাগান (০) (০)

১৯৫২ সাল
মোহনবাগান (২) (০) — রাজস্থান (২) (০)
(তৃতীয় দিন খেলা হয়নি)

১৯৫৪ সাল
মোহনবাগান (১) — হায়দরাবাদ স্পোর্টিং (০)

১৯৫৬ সাল
মোহনবাগান (৪) — এরিয়ান (০)

১৯৫৮ সাল
ইস্টবেঙ্গল (১) — মোহনবাগান (০)

১৯৫৯ সাল
মোহনবাগান : ইস্টবেঙ্গল (খেলা হয় নাই)

১৯৬০ সাল
মোহনবাগান (১) — ইণ্ডিয়ান নেভি (০)

১৯৬১ সাল
মোহনবাগান (০) (০) — ইস্টবেঙ্গল (০) (০)
(যুগ্ম বিজয়ী)

১৯৬২ সাল

নীচে আই এফ এ শীল্ডের সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হলঃ—

প্রথম রাউণ্ড

ভবানীপুর (১) : ক্যালকাটা (০)
বর্নাবিহারী ডিস্ট্রিক্ট (৩) : খিদিরপুর (১)
হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট (ওঃ ওঃ) : রাজস্থান ক্লাব (স্ক্র্যাচ)
বাটা এস সি (৪) : বোনিয়াটোলা (০)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২) : ডালহৌসী (১)
বি এন আর (৫) : ২৪ পরগনা (৩)
পোর্ট কমিশনার্স (ওঃ ওঃ) : হাওড়া ইউনিয়ন (স্ক্র্যাচ)
ইস্টার্ন রেল (১) : হুগলী জেলা (০)
জামসেদপুর (২) : পুলিস (০)
উয়াড়ী (২) (ওঃ ওঃ) : কোর অব সিগন্যাল (২) (স্ক্র্যাচ)
জর্জ টেলীগ্রাফ (১) : মুর্শিদাবাদ (০)
এরিয়ান (৪) : ইয়ং স্টারস—এলাহাবাদ (১)
কটক কম্বাইণ্ড (৩) : বালী প্রতিভা (১)
বার্নপুর ইউনাইটেড (৩) : চন্দননগর স্পোর্টিং (১)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

ভবানীপুর (১) : বর্নাবিহারী ডিস্ট্রিক্ট (০)
বাটা (৪) : হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট (১)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (৩) : দিল্লি একাদশ (০)
বি এন আর (৩) : পোর্ট কমিশনার্স (০)
জামসেদপুর (২) (১) : ইস্টার্ন রেল (২) (০)
উয়াড়ী (৩) : মহমেডান স্পোর্টিং (০)
জর্জ টেলীগ্রাফ (১) : এরিয়ান (০)
বার্নপুর ইউনাইটেড (৩) : কটক কম্বাইণ্ড (১)

তৃতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান (১০) : ভবানীপুর (০)
বাটা (ওঃ ওঃ) : দেরাদুন ডি এম এ (স্ক্র্যাচ)
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (২) : ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স (১)
বি এন আর (২) : ওয়েস্টার্ন রেল (১)
হায়দরাবাদ একাদশ (৩) : জামসেদপুর (০)
উয়াড়ী (০) (৩) : মহীশুর একাদশ (০) (২)
সিলেক্টেড ইস্টার্ন কম্যাণ্ড (২) : জর্জ টেলীগ্রাফ (১)
ইস্টবেঙ্গল (২) : বার্নপুর ইউনাইটেড (১)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

মোহনবাগান (২) : বাটা (১)
বি এন আর (২) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন (০)
হায়দরাবাদ (২) : উয়াড়ী (০)
ইস্টবেঙ্গল (২) : ইস্টার্ন কম্যাণ্ড (০)

সেমি-ফাইন্যাল

মোহনবাগান (২) : বি এন আর (০)
হায়দরাবাদ (১) : ইস্টবেঙ্গল (০)

ফাইন্যাল

মোহনবাগান (৩) : হায়দরাবাদ (১)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৭ই সেপ্টেম্বর—অদ্য সকালে জলপাইগুড়ি জেলার দইখাতা অঞ্চলে ভারতীয় এলাকায় আক্রমণকারী পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর সহিত পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত পুলিসের প্রবল গুলী বিনিময় হয়। কিছুক্ষণ গুলী চলিবার পর পাকিস্তানীরা নীল ঝাণ্ডা উড়াইয়া পলায়ন করে। পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকায় জোর করিয়া প্যাট কাটিতে আসে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই শোচনীয় ঘটনার উৎপত্তি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই নূতন সিরিজের ১০০ টাকার নোট চালু করিবেন। এই নূতন নোটে বর্তমানে গবর্নর শ্রী পি সি ভট্টাচার্যের স্বাক্ষর থাকিবে, তবে ইহার নকশার কোন পরিবর্তন হইবে না। শ্রী এইচ ভি আয়েঙ্গার এবং শ্রী বি রাম রাওয়ের স্বাক্ষরযুক্ত নোটও বিহিত মুদ্রা হিসাবে বাজারে চালু থাকিবে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—অদ্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পুনর্গঠিত কর্মসংস্থান উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকের উদ্বোধনকালে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের আরও নিয়োগের পথ বাতলাইবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যের 'কর্মসংস্থান উপদেষ্টা কমিটি'কে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দেশের ভিতরেই যখন মৎস্য সমস্যা রহিয়াছে, সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে মাছ রপ্তানির কথা চিন্তা করিতেছেন। সরকার এখন বিদেশে মাছ চালান দিয়া বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিতে উৎসুক বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর—আসামের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেখানকার বাংলা ভাষাভাষীরা আপাতত কোনরূপে সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী নম। তবে তাঁহারা আশা করেন, বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণের দাবি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি শীঘ্রই তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইবেন।

আরও প্রায় দুইশত বিদ্রোহী নাগা পূর্ব পাকিস্তানে পলাইবার জন্য তৈরী হইতেছেন বলিয়া জানা গেল। লুসাই পাহাড় অঞ্চলের কয়েকজন মিজো নেতা নাকি তাহাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন।

২০শে সেপ্টেম্বর—পাকিস্তানী সৈন্যরা ফেনী নদী অতিক্রম করিয়া ভারতীয় এলাকা ছোটাথল দখল করিয়াছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ফেনী নদী বরাবর পাক সৈন্যরা বহু পরিখা খনন ও বিবর ঘাটি নির্মাণ করিয়াছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা বরাবর পাকিস্তান বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

চীনা সৈন্যরা এখন তিব্বত সিকিম সীমান্তেও জোর টহল দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আগেও তাহাদের টহলদারি ছিল, তবে সৈন্য সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। চীনারা সীমান্তে ঘাটির সংখ্যাও বাড়াইয়াছে।

২১শে সেপ্টেম্বর—পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত রাত্রে নেফা সীমান্তে চীনা এবং ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে তিনজন ভারতীয় সৈন্য আহত হইয়াছে।

অদ্য গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাইক্লোনের মত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দেখা দেয়। সারাদিন বৃষ্টি হইয়াছে এবং ঝড়ো হাওয়া বহিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়িয়াছে। এক সময় ঝড় ঘণ্টায় ৫১ মাইল বেগেও প্রবাহিত হইয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—কলিকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত তালুকদার কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে পৌরসভার পরিচালনা ও প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া গোপনসূত্রে জানা গিয়াছে।

নেফায় শুক্রবার রাত্রে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে আটজন নিহত হইয়াছেন বলিয়া কলিকাতার প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়। নিহতদের মধ্যে বিমান চালক ও তাহার সহকারী রেডিও অপারেটর আছেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর—কিছুদিন যাবৎ রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে শ্রম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি দপ্তরের ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে। এই সব দপ্তরের অভিযোগ, পূর্ত দপ্তরের গাফিলতির ফলে পরিকল্পনার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটিতেছে।

লাদখের কার্গিল তহশীলে নরখাদক সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া নাফেন-এর সংবাদে জানা যায়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ : সে অন্তত ১১টি বালক-বালিকাকে ভক্ষণ করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই সেপ্টেম্বর—আজ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থানে ছাত্র-পুলিসের প্রচণ্ড সংঘর্ষে একজন নিহত ও ২৫৩ জন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ৫২ জনের আঘাত গুরুতর। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হইয়াছিল।

আজ লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সাধারণ বাজার সম্পর্কে যে অভিযোগ থাকুক না কেন, বৃটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিতে দৃঢ়সংকল্প।

১৮ই সেপ্টেম্বর—চূড়ান্ত ইস্তাহারের বিবরণ সম্পর্কে কোন মতৈক্যে উপনীত হইবার পূর্বেই আজ কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের অপরাহ্নের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ইস্তাহার সম্পর্কে মতানৈক্য দূর করার জন্য আগামীকাল পুনরায় কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন বসিবে।

এক সংবাদে প্রকাশ, শিক্ষা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আজ পূর্ব পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন ঐ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়।

১৯শে সেপ্টেম্বর—গত সোমবার ঢাকায় বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর গুলীচালনার বিরুদ্ধে করাচীসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের ছাত্রগণ একযোগে প্রতিবাদ জানান এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেন।

পর্তুগাল যাহাতে এঙ্গোলা সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়, তজ্জন্য প্রয়োজনবোধে পর্তুগালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া সাধারণ পরিষদের ঔপনিবেশিকতা কমিটি গতকল্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দেয়। প্রস্তাবটি এখন সাধারণ পরিষদে পেশ করা হইবে।

২০শে সেপ্টেম্বর—পশ্চিম জার্মানীর সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মস্কো হইতে নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদ উল্লেখ করিয়া আজ বলেন যে, চীনে রাশিয়ার যে সমস্ত বাণিজ্যিক দূতাবাস রহিয়াছে, সেইগুলি গুটাইয়া লইবার জন্য চীন সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনুরোধ জানাইয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লণ্ডন হইতে আজ প্যারিসে পৌঁছিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে তিনি তিনদিন প্যারিসে অবস্থান করিবেন।

২১শে সেপ্টেম্বর—পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াহিদুজ্জামান গতকল্য ফরিদপুরে কয়েক হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার বিরূপ সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছেন। মন্ত্রী মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া পচা ডিম ও জুতার মালা ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। পুলিস বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চালায়। ফলে প্রায় দুই শতাধিক লোক আহত হয়।

পিকিং হইতে রয়টারের খবরে প্রকাশ, চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে সীমানা বিরোধ আছে, সেই সম্পর্কে উভয় দেশের সরকারী কর্মচারিগণ পূর্ব হইতে কোন শর্ত নির্দিষ্ট না করিয়া যাহাতে আগামী মাসে পিকিং-এ আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন, তজ্জন্য চীন পুনরায় ভারতবর্ষের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর—নেপালের মন্ত্রিসভাকে আরও অবিচল ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আজ নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীহৃষীকেশ শাহকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। ডাঃ তুলসী গিরিকে পুনরায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর দেওয়া হইয়াছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর—ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল মহলকে বিমান ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার জন্য আলবেনিয়ার কম্যুনিস্টরা সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। আলবেনিয়ার কম্যুনিস্টদের মতে ঐ সকল সমর সরঞ্জাম কম্যুনিস্ট ও প্রগতিবাদীদের দমন করার জন্য সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রদীপ

টিক্-20-এর নূতন প্যাক কেন?

DIAZINON
tik-20
KILLS BED BUGS
Processed in India
TATA-FISON LIMITED
Bombay - Agra - Calcutta - Cochin

দামের কোন পরিবর্তন হয় নি। মূল্য ৮৫ নয়া পয়সা

স্থানীয় কর অতিরিক্ত

আপান যাতে আসল জিনিসটি পেতে পারেন তা নিশ্চিত করবার জন্য! টিক্-২০-এর নূতন বিশেষ-১ ধরণের সাদা প্যাকটি দেখে নেবেন! আপনি যে জিনিসটি কিনছেন সেটি যে নিকৃষ্ট রকমের কোন নকল নয় তা নিশ্চিত হয়ে নেবেন!

টিক্-২০ ছারপোকার পক্ষে মারাত্মক!

এতে আছে ডায়াজিনন যা দ্রুত কাজ করে এবং এই শক্তিশালী কীটনাশক সঙ্গে-সঙ্গেই ছারপোকাকে ধ্বংস করে! অন্যান্য বহু রকমের জিনিস যা করবার চেষ্টা করে মাত্র, টিক্-২০ তা সম্পন্ন করে। সেইজন্যই এটি বিস্তৃত-ভাবে পরিচিত, ব্যবহৃত—এবং এর নকলও বেরিয়েছে।

টিক্-২০ সহজেই ব্যবহার করা চলে!

হাত দিয়ে স্প্রে করার পাত্রটিতে ঢাকনা-ভর্তি টিক্-২০ ৩'বার ঢেলে নিয়ে কেরোসিন বা জল দিয়ে ভরে নিন। ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করুন।

টিক্-২০ এ খরচও কম!

টিক্-২০ এর সামান্য পরিমাণই যথেষ্ট। একবার ভাল ভাবে স্প্রে করে দিলেই তাড়াতাড়িই ছারপোকাগুলি ধ্বংস করে ফেলে এবং যে প্রলেপটি থেকে যায় তার ক্রিয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। এক বোতল টিক্-২০ অন্ততঃ ৬ মাসের জন্যে আপনার বাড়ীকে ছারপোকা থেকে রক্ষা করবে। আরসোলা বা পিঁপড়ে দূর করবার জন্যেও জায়গামত স্প্রে ক'রে টিক্-২০ ব্যবহার করা যেতে পারে।

টাটা-ফাইসন-এর তৈরী

দেশ

DESH 40 Naye Paise
SATURDAY, 6TH OCTOBER. 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ৪৯ সংখ্যা ॥ ৪০ পয়সা
শনিবার, ১৯ আশ্বিন ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

আনন্দময়ীর আগমনে

আনন্দময়ীর আগমন। উৎসবের দিন সমাগত। বহু উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায়-ঠাসা প্রতীক্ষার পর্ব শেষ হল; ঘোষিত হল আনন্দময়ীর আবাহন এবং আরাধনার উদ্যোগপর্বের সমাপ্তি। কাজ থেকে ছুটি, অভ্যস্তকর্মের দৈনন্দিন দায় থেকে কয়েকটি দিনের জন্য বাধাবন্ধহীন মুক্তির আশ্বাস। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, দোকানপাটে চলেছে এই বহুবাঞ্ছিত আনন্দোৎসবের প্রস্তুতি। এ-আনন্দ কারো একলা উপভোগের নয়, ছোট বড় ধনীনির্ধন সকলের আমন্ত্রণ এই আনন্দ যজ্ঞে; সকলেরই অভিষেক অনাবিল আনন্দ ধারায়। বাঙালীর হৃদয় সিংহাসনে আনন্দময়ী আরূঢ়; বরাভয়-দায়িনী মাতৃকামূর্তির কল্পনায় বাঙালীর স্বপ্নস্মৃতিসাধ বর্ষে বর্ষে উজ্জীবিত হয় নব নব বিস্ময়ের আস্বাদনে, উদ্দীপনায়।

বাঙালীর দুর্গোৎসব চিরকালই সর্বজনীন। বহুজনের বহুবিধ অংশ গ্রহণে তবেই আনন্দময়ীর আগমনী এবং বন্দনা সার্থক। যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃপূজার আয়োজন বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে বর্ধিত, বিস্তৃত হয়েছে। "আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি", সে আজকের কথা নয়, কিন্তু আজও আছে। বাজনা আছে, সাজনা আছে; লাউড স্পীকারের উচ্চরব ক্লান্তিকর, ক্লেশদায়ক মনে হলেও একালের আনন্দোৎসবে তার আধুনিক প্রতীক-মূল্য মান্য না করে উপায় নেই। সাজনা, বাজনা, লাউডস্পীকার, বিজলী আলোক-সম্পাত, দিনে অঞ্জলি, সন্ধ্যায় আরতি, পুরোহিতের মন্ত্র, ফুল-ফল-নৈবেদ্য আর পূজামণ্ডপে নব নব বেশভূষায় সজ্জিত দর্শনার্থী নরনারীর ভিড়, সব মিলিয়ে কয়েকটি দিনের জন্য অন্তত জীবনের ছন্দ যেন সর্বজনীন তরুণতার স্পন্দনে ভরপুর।

এই আয়োজন সমারোহ উদ্দীপনার উপযোগী প্রতিবেশ হিসেবে শরতের মত প্রশস্ত কাল আর কী হতে পারে? শীত ও গ্রীষ্ম উভয়েই অপ্রখর, বর্ষার মৃদঙ্গ স্তিমিত-প্রায়; জলে পদ্ম, স্থলে স্থল-পদ্ম ও শিউলি; বৎসরের এই ষাণ্মাসিক পর্বের মধ্যস্থলে শারদ শুক্ল পক্ষটি যেন বিশেষ করে বাঙালীর জাতীয় উৎসবের জন্যই চিহ্নিত। বাঙালীর মাতৃপূজায় এটি "অকালবোধন" নয়, বোধনেরই শ্রেষ্ঠ কাল।

এই দুর্গোৎসবের মধ্যেই বাঙালীর সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট। শুদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য নয়, পূজামণ্ডপের চতুঃসীমায় আয়োজিত এবং পথের মোড়ে মোড়ে স্টলে সাজানো মুদ্রণ-পরিপাটী শারদীয় পত্র-পত্রিকাগুলিরই বা কী বাহার! শাড়ীতে, পোশাকে, অলঙ্কারে যেমন উৎসব-সমারোহের আনন্দের ঝলক তেমনি শারদীয় সাহিত্য শিল্প-সম্ভারের অপরূপ সমাবেশ। আনন্দময়ীর আগমনে বাঙালীর আনন্দ পূজামণ্ডপ ছাড়িয়ে, শানবাঁধানো রাস্তার গণ্ডী পেরিয়ে দূর দূরান্তে বিস্তৃত। ট্রেনে ভিড়, প্লেনে ভিড়; বাঙালীর শারদোৎসব যাপনের পালাটা উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র ঘরে বাইরে সর্বত্র। যে-নবদম্পতি ছুটিতে সমুদ্র-সৈকতে যাচ্ছেন, ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালে নাটক মঞ্চস্থ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদল যাঁরা রাজধানী দিল্লি-অভিযাত্রী, সিমলা-মুশৌরি-দার্জিলিং-উটি-বোম্বাই-অজন্তার যাত্রী-যাত্রিণী যাঁরা তাঁদের সকলেরই মন এক সুরে বাঁধা—"আনন্দেরি সাগর হতে এসেছে আজ বান।" এ-সুর বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব-পর্বের; এ-সুর বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে সারা ভারতের মিলনের সুর।

শহরে, গ্রামে, সর্বত্র সারা বৎসরের দুঃখদৈন্যগ্লানি ভুলে, লাভ-লোকসান জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ মুলতুবী রেখে, শরতের সর্বজনীন আনন্দমেলায় যোগ দেবার ডাক এসেছে। সাড়া পড়েছে ঘরে ঘরে। ছেলেমেয়েরা নতুন বুশসার্ট-ফ্রক-রিবন-শাড়ী পরে বেরিয়ে এসেছে, যেন ছোট বড় সব হাসি উচ্ছল পাতা-বাহার, প্রজাপতি, রামধনু। মায়েদের সিঁদুর-কৌটা দেবী-প্রতিমার পাদমূলে রক্ষিত হবে। প্রবীণমহলে নানা পঞ্জিকার নানা মত নিয়ে গবেষণা। তরুণীরা—নাইলন-শিফনে সালঙ্কৃতা আধুনিকারা—উৎসবের দিনে স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী। পূজামণ্ডপের সাজসজ্জার আয়োজনে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবিধ কর্মসূচী রূপায়নে পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের ক্লান্তিহীন, নিদ্রাহীন তৎপরতা। সর্বজনীন সামাজিক আনন্দোৎসবের এই বিচিত্র বিপুল কলকোলাহলে আনন্দময়ীর আগমনী।

আনন্দময়ী এসেছেন। গৃহকোণের অন্ধকার আজ আলোকোজ্জ্বল। আনন্দের অখণ্ড, অনাবিল অভিজ্ঞতার মধ্যে আজ ছোট বড় সবাই সমান উজ্জ্বল, সমান উৎসাহদীপ্ত, সকলেই মাতৃগর্বে গর্বিত। মাতৃপূজার অঙ্গনে যেখানে দর্শনার্থী ভক্ত নরনারীর সমাবেশ, যেখানে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন, অসুরদলনীর সম্মুখে যেখানে চণ্ডীপাঠের মন্ত্রধ্বনি-মুখর সেখানে অহঙ্কার আপনা থেকেই পরাহত, অসূয়া আপনা হতে বিলীন। এক বৃহৎ, সর্বজনীন, মহৎ আনন্দ-পরিপ্লুত সত্তার মধ্যে সকলে মুক্ত, শুদ্ধ, অকুতোভয়। কারণ দেবী আনন্দময়ী, দশভুজা সমারূঢ়া।

বিজ্ঞপ্তি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশ পত্রিকার কার্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। ১৩ই অক্টোবর দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না। পরবর্তী সংখ্যা ২০শে অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

বৈদেশিকী

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন শেষ করে দেশে ফেরার পথে পণ্ডিত নেহরুর যেসব দেশে যাবার কথা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল ঘানা। কিন্তু পণ্ডিতজীর ঘানা পরিদর্শন সম্ভব হয় নি। শেষ মুহূর্তে ঘানা সরকারই পণ্ডিতজীর ঘানা যাত্রা স্থগিত করতে বলেন। ঘানায় যেরকম গণ্ডগোল চলল তাতে এই সময়ে কোনো বিদেশী অতিথির যথারীতি সম্বর্ধনার ব্যবস্থা অসম্ভব। তাছাড়া বর্তমান অবস্থা বিদেশীর চোখের সামনে মেলে ধরার মতো নয়। পণ্ডিত নেহরুকে আসতে বারণ করতে ঘানা সরকার বাধ্য হয়েছেন, নিজে বেকাদায় না পড়লে আত্মমর্যাদার উপর এরূপ আঘাত তাঁরা হানতেন না।

ঘানার জন্য দুঃখবোধ হয় কিন্তু আজ ঘানার জন্য যতটা দুঃখবোধ হয় ডঃ নক্রুমার জন্য ঠিক ততটা সহানুভূতির অনুভব হচ্ছে না যদিও এখনো ঘানার পক্ষে ডঃ নক্রুমার নেতৃত্ব অপরিহার্য বলেই মনে হয়। কিন্তু সেই নেতৃত্বকে একনায়কত্বে রূপান্তরিত করার প্রয়াস সম্বন্ধে এবং ঘানাকে "পুলিস স্টেটে" পরিণত করার ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব খবরাখবর পাওয়া যায় সেগুলি মোটেই সুখবর নয়। ডঃ নক্রুমা বা তাঁর দলের বিরোধীমাত্রেই ঘানার রাষ্ট্রীয় ঐক্যের শত্রু এই যুক্তি অন্ধভাবে মেনে নেওয়া উচিত নয়। যেখানে বারম্বার ডঃ নক্রুমার প্রাণ-নাশের চেষ্টা হচ্ছে সেখানে কড়া পুলিসী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাস্য যে এরূপ হিংসাজর্জর পরিস্থিতি সৃষ্টির দায়িত্ব কি এক তরফা?

ঘানার মতো জায়গায় পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলে না, দেশের উন্নতির জন্যই একনায়কত্ব এবং জোরজুলুমের আবশ্যকতা আছে—নক্রুমা সরকারের পক্ষে এরূপ সাফাই গেয়ে নিশ্চিত থাকা ঘানার বন্ধুর কাজ হবে না। তদ্বারা ডঃ নক্রুমার প্রতি প্রীতি প্রকট করা যেতে পারে কিন্তু সেটা আসলে ঘানার পক্ষে অপমানকর। শুধু অপমানকর নয়, তাতে ঘানাবাসীদের স্বাধীনতার যোগ্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। পার্লামেণ্টারী ডেমো-ক্রাসির বহির্বাস ছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ই না একথা বলা না যেতে পারে, কিন্তু পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসি না হলেই কি একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচকের কণ্ঠরোধ করতে হবে, হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দী দিয়ে জেল ভর্তি করে রাখতে হবে, সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা হরণ করতে হবে, সংবাদের উপর সেন্সরশিপ বসাতে হবে?

কোনো জাতিরই অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করার অধিকার নেই সুতরাং ইংরেজরা বলতে পারে না যে ঘানাবাসীরা যখন পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসির নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের শাসন করতে পারছে না তখন তাদের স্বাধীনতা দাবী করা উচিত হয়নি, তাদের ইংরেজের অধীনেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু একথাও ঠিক যে স্বাধীনতা দাবী করার সময়ে ডঃ নক্রুমা যদি বলতেন যে স্বাধীন ঘানায় একনায়কত্ব বা একপার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, সরকার বা ডঃ নক্রুমার বিরোধী কোনো সমালোচনা বরদাস্ত করা হবে না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে না, ইত্যাদি তাহলে ঘানার স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে তিনি জগতের কাছে যে সম্মান সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিলেন তা তিনি পেতেন না।

অনেককালের স্বাধীন এবং নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশগুলির বিচার করার সময়ে এক মাপকাঠি নিশ্চয়ই ব্যবহার করা উচিত নয়, কিন্তু নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশ হলেই সেখানকার নেতারা প্রাক্তন বিদেশী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন অর্থাৎ দেশবাসীদের নাবালক জ্ঞান করে তদুপযোগী শাসন ব্যবস্থা চালাবেন—এরূপ কখনই মানা যেতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কোনো সুষ্ঠু আলোচনা হয় না। যাদের সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়েছে তাদের মধ্যে একদল আছে যারা নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশগুলির কেবল খুঁতই খোঁজে, তারা কেবল নিন্দা করার অবসরই খোঁজে। কারণ তারা বলতে চায় যে, এসব দেশের স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতালাভের আরো দেরী ছিল, আরো অনেককাল এদের ইউরোপীয় শাসনের অধীনে থাকা উচিত ছিল। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের এই রকম সমালোচনা শুভ-বুদ্ধিপ্রণোদিত নয়, তার কোনো শুভ ফল হয় না, যারা সমালোচিত হন তাতে কেবল তাঁদের ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং তাঁরা শত্রুকৃত সমালোচনা অশ্রদ্ধেয় বলে তাতে তাঁরা কর্ণপাত করেন না। ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদী শাসন থেকে সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে যখন পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসির বিফলতা লক্ষিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান গোলমালের মধ্যে পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসনের স্থলে ক্রমশ একনায়কত্ব বা এক-দলীয় শাসনের দিকে আস্থা চলতে থাকে তখন সোভিয়েট রাশিয়া এবং কম্যুনিস্ট ব্লকের অন্য কর্তারা দুঃখিত না হয়ে খুসীই হন কারণ ঐরূপ অবস্থায় কম্যুনিস্ট প্রভাব প্রসারিত করা সহজতর হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

যে সমালোচনায় আত্মসমালোচনার ভাব জাগ্রত করতে পারে কেবল সেই সমালোচনাতেই কাজ হয়। সেরূপ সমালোচনার মূলে সহানুভূতি থাকা চাই। সেটা সম্ভব ছিল যদি নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশগুলি নিজেদের দোষগুণ ভুলত্রুটি সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিমূলক সমালোচনার দায়িত্ব স্বীকার করত। কিন্তু অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার উল্টো। কেউ কারো ভুলত্রুটি সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশগুলির প্রত্যেক-টাতেই একজন প্রধান নেতা খাড়া হয়েছেন যাঁকে সেই দেশের প্রতীক বলে ধরে নেওয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।। তার অর্থ এই যে প্রায় সর্বত্রই স্ফুট বা অস্ফুট আকারে একটা একনায়কত্বের ধারা চালু হবার উপক্রম হয়েছে এবং মুখ্য নেতাদের

যেন একটা "ক্লাব" গড়ে উঠছে যে-ক্লাবের সদস্যেরা পরস্পরের মর্যাদা বা স্টেটাস রক্ষা করার বিষয়ে খুব সতর্ক।

এই রকম চলে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে কোনো সাক্ষাৎ স্বার্থ-সংঘাত না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত এক দেশের নেতা ও সরকার অন্য দেশের নেতা বা সরকার সম্বন্ধে কেবল প্রশংসার কথাই বলে যান এবং দেশের লোকরাও কেবল তাই শোনে। মুশকিল হয় যখন কোনো স্বার্থ-সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন দেশবাসীদের হঠাৎ অনেক উল্টো কথা শুনতে হয়। শ্রীসুকর্ন যে আদর্শ মানব নন এবং ইন্দোনেশিয়া যে স্বর্গরাজ্য নয়, একথা অনেকে সম্প্রতি জানতে পেরেছে।

এরূপ অবস্থা নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশগুলির পক্ষে আদৌ মঙ্গলকর হয়নি। এর চেয়ে যদি এদের কর্তারা বিভিন্ন দেশের ভুলত্রুটি দুর্বলতা সংশোধনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করার অভ্যাসগুলি করতেন এবং বিভিন্ন দেশের জনসাধারণও বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরের অবস্থা ও সমস্যাবলী বুঝবার সুযোগ পেত তাহলে সকলেরই কল্যাণ হোত। আজ শ্রীসুকর্ণের শাসনের কোনো সমালোচনা করলেই সেটাকে ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আক্রমণ বলে ধরা হয়। শ্রীনক্রুমার কোনো কার্যের নিন্দা করলেই সেটাকে ঘানায় স্বাধীনতার প্রতি আক্রমণ বলে মনে করতে অনেককে শেখানো হয়েছে, হয়ত ভারতবর্ষেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বিদেশী কর্তৃক নেহরু সরকারের যে কোনো নীতির সমালোচনাকেই ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে মনে করবেন। এটাকে সুস্থ অবস্থা বলা যায় না।

* * *

চীনারা নেফা অঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম করে ভারতীয় এলাকার ভিতরে প্রবেশ করেছে। কয়েকদিন ধরে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে থেকে থেকে "গুলী বিনিময়" হচ্ছে। কিন্তু চীনাদের ভারতীয় এলাকা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে এরূপ কোনো খবর নেই। অথচ আমাদের কর্তাদের মায় স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীলালবাহাদুরকে পর্যন্ত আমরা হুংকার দিতে শুনেছি যে নেফায় ভারতীয় এলাকার মধ্যে চীনারা এক পা এগিয়েছে কি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। পাছে এটাকে আমরা ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে করি সেজন্য কর্তারা একথাও বলেছেন যে এই প্রতিজ্ঞা পূরণের উপযোগী সামরিক ব্যবস্থাও সব ঠিক আছে।

তবে প্রতিজ্ঞা পূরণটা হচ্ছে না কেন? তার কারণটা কী? ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছিল সেটা কি মিথ্যা? অথবা ব্যবস্থা আছে কিন্তু ভারতীয় সৈন্যেরা যথোপযুক্ত বলের সঙ্গে প্রত্যাঘাত করার হুকুম পাচ্ছে না। কারো কারো ধারণা যে লাদাক অঞ্চলেও অনেক জায়গায় ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থা এখন এমন স্তরে এসেছে যে ভারতীয় সৈন্যেরা এখানে আক্রমণ করলে চীনাদের ঠেলে ভারত সীমানা পার করে দিতে পারে। সেখানেও চীনাদের ঠেলে দেবার কোনো চেষ্টা নেই। নেফা অঞ্চলে চীনারা যখন নূতন করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে তখনও তাদের প্রাপ্য প্রত্যাঘাত জুটছে না।

ওদিকে চীনাদের সঙ্গে শীঘ্র কথাবার্তা আরম্ভ হওয়ার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। জমীনে কোন পক্ষের কী অবস্থা

তার উপর কথাবার্তার টেবিলে কে কোন্ সুর ধরতে পারবে সেটা অনেকটা নির্ভর করে। চীনারা পশ্চিম লাদাকে হাজার হাজার বর্গমাইল ভারতীয় এলাকার ভিতরে ঢুকে বসে আছে। পূর্বে ম্যাকমেহন লাইনের স্থিরতাও তারা ভেঙে দিল। এই অবস্থায় যদি "নেগোসিয়েশন" আরম্ভ হয় তবে তাতে কোন্ পক্ষের সুবিধা হবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে অবস্থা দেখে মনে হবে যে চীনাদের যাতে সুবিধা হয় ভারত সরকারের নীতি এরূপভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। তা না হলে এখন সামরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্যেরা চীনাদের ভারত এলাকা থেকে সুনিশ্চিত-রূপে দূর করে দিতে অগ্রসর হচ্ছে না কেন? লাদাক অঞ্চলে চীনাদের ভারতীয় এলাকা থেকে পুরোপুরি বার করে দেবার সাময়িক শক্তি যদি এখনো সংগৃহীত না হয়ে থাকে তবে নেফা অঞ্চলে চীনাদের কেবল ম্যাকমেহন লাইন পার করে দেওয়া নয় তার ওপারেও যতটা সম্ভব চীনাদের ধাওয়া করে নিয়ে যাওয়া উচিত। চীনারা যখন পশ্চিমে ভারতীয় এলাকার মধ্যে হাজার হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করে বসে আছে তখন পূর্বে চীনাদের ধাওয়া করে তিব্বতের মধ্যে কিছুটা অগ্রসর হওয়া ভারতীয়দের পক্ষে মোটেই অনুচিত হবে না।

যাঁরা মনে করেন—যে যদি নেপালী গণতন্ত্রকারীদের প্রতি ভারতবাসীদের বিন্দুমাত্র নৈতিক সহানুভূতি নেই এরূপ ঘোষণা করা হয় এবং আর আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপ যদি শ্রীসুবর্ণ শাসনের প্রভৃতির সম্বন্ধে রাজা মহেন্দ্র যেরূপ বলেন সেরূপ ব্যবস্থা ভারত সরকার করতে প্রস্তুত হন তাহলেই বর্তমান নেপাল সরকারের ভারত বিদ্বেষী ভাব কেটে যাবে—তাঁরা ভ্রান্ত। নেপালে চীনাদের প্রভাব বিস্তারের গতি প্রতিহত করতে না পারলে নেপালী সরকারের হাবভাবের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে না। এবং নেপালে চীনা প্রভাবের প্রসার বন্ধ করার একটি মাত্র নিশ্চিত উপায় আছে যদিও সেটি পরোক্ষ। সে উপায় হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে চীনাদের "এগ্রেশন" খতম করা। ভারতের যে ভূমি চীনারা বলপূর্বক দখল করে বসে আছে বলে ভারত অভিযোগ করছে সেখান থেকে যেদিন চীনাদের বলপূর্বক হটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে সেদিন কেবল নেপালে নয় বা কেবল হিমালয় অঞ্চলে নয়, সেটা সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটা নূতন ভাবের হাওয়া বইবে। সেদিন মহেন্দ্র শ্রীহৃষিকেশ শাহা এবং ডাঃ তুলসী গিরির মধ্যে কী জন্য কাকে ডাইনে এবং কাকে বাঁয়ে বসালেন তাই নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন হবে না।

১-১০-৬২।

সময় সাহিত্য সমালোচনা : পাঠকের চোখে

দুই আগুনের মাঝখানে

সুধীর রায় চৌধুরী

[উপন্যাস সংক্রান্ত এই মূল্যায়নে সময় সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে এই বছরের মতো শেষ আলোচনাবৃত্তের সূত্রপাত।

আয়তন উপন্যাসের একটি অন্যতম শর্ত, আবার উপন্যাস কখনো-কখনো আমাদের আয়তনে ভোলায়। উপকরণ উপন্যাসে বিচিত্র, আবার অবান্তর উপকরণ বৈচিত্র্যই কখনো-কখনো ঔপন্যাসিকের প্রলোভন হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিচারক মহাকাল। কিন্তু সমকালীন পাঠকেরও বিবেকের সমর্থন ও [illegible] মূল্য রয়েছে। পাঠকদের সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

—সম্পাদক, দেশ]

পুরনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনা

সব দেশেই লেখক-সমালোচকের সম্পর্কটা অহি-নকুলের খাদ্য-খাদকের মতো এবং লেখক-পাঠকের মাঝখানে সমালোচকের মধ্যস্থতার সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। সাধারণ পাঠকের কাছে সমস্যাটি খুবই সহজ। কোনো উপন্যাস ভালো লাগলে বহুদিন মনে থাকবে, আর খারাপ হলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাবে, কিন্তু এর মধ্যে সমালোচকের স্থান কোথায়? সেজন্য এমন পাঠকের সন্ধান হামেশাই মেলে, যিনি সহস্রাধিক উপন্যাস পড়েছেন, কিন্তু উপন্যাসবিষয়ক কোনো গ্রন্থ পড়েননি, কোনোদিন পড়বার তাগিদ পর্যন্ত অনুভব করেননি। অন্যদিকে এমন লেখকের সংখ্যাও কম নয়, যাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন কেউ গল্প-কবিতা-উপন্যাস লেখায় ব্যর্থ হলে সমালোচক হন। একজন ঔপন্যাসিক তো সমালোচককে [illegible] বাজার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অন্তত উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিতর্ক, এই বিরোধের আশু মীমাংসা সম্ভব নয়। কেননা সাহিত্যের সমস্ত শাখার মধ্যে উপন্যাসের পাঠক সবচেয়ে বিচিত্র এবং বিপুল—যাঁর বিদ্যা কেবলমাত্র অক্ষরজ্ঞানে সীমাবদ্ধ এবং যিনি জ্ঞানের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছেন, যিনি নিদ্রাকর্ষণের জন্য পুস্তকপাঠের পক্ষপাতী এবং সাহিত্য যাঁর গবেষণার বিষয়, এঁরা সবাই উপন্যাসের পাঠক হতে পারেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়, যেমন কবিতা-পাঠের জন্য আয়াস এবং অভিনিবেশ প্রয়োজন, সেখানে অধিকারীভেদ আছে। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে সবার অবারিত দ্বার। কেউ উপন্যাস পড়েন শুধু গল্পের আকর্ষণে, কেউ-বা গল্পের ছদ্মবেশে ইতিহাস-ভূগোল বিষয়ে শৌখিন জ্ঞানার্জনের জন্য, কেউ আরো স্থূল পরিতৃপ্তির জন্য। এঁরাই যদি উপন্যাসের একমাত্র পাঠক হতেন তাহলেও কথা ছিল।

কিন্তু আরেক শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁরা মনে করেন মানুষের অভিজ্ঞতাপ্রকাশের শক্তিশালী মাধ্যম হলো উপন্যাস। উপন্যাস তো শুধু গল্প বলে না, তার উপযোগিতা আরো গভীরে। কেননা কথায় বলে, বাস্তব গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর। সুতরাং উপন্যাস মানে শুধু ঘটনা-সংগ্রহ নয়—ঘটনার ক্ষেত্রে কল্পনার চেয়ে আদালত অনেক বড় ব্যাপারী। কিন্তু আমরা উপন্যাসে ঘটনা চাই না, চাই অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেয়, আমাদের বোধক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, ঔপন্যাসিক কি কোনো নির্দিষ্ট পাঠকের কথা ভেবে লেখেন? এই প্রশ্নের সরাসরি জবাবে অধিকাংশ লেখকই প্রেরণার কথা তুলবেন। কিন্তু এই তথ্য আজ খুব কম লোকেরই অবিদিত যে জনপ্রিয়তা নামক আজবকালের মোহে বহু লেখকই বিভ্রান্ত। মহাকাল কাকে মনে রাখবে এ অনিশ্চয়তার চেয়ে নগদবিদায়ের প্রতিই তাঁদের অধিকতর আগ্রহ। এঁদের কাছে লেখা ঠিক সাধনা নয়, আর পাঁচটা জীবিকার মতোই। সেজন্য এক্ষেত্রেও বৈষয়িক উন্নতিই একমাত্র মোক্ষ। এ তো আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, এক শ্রেণীর লেখক রাতারাতি তৈরি হয়েছেন যাঁদের বিষয় হলো কর্ম-জীবনের স্মৃতি-কথন। সেই চমকপ্রদ কাহিনী-বর্ণন যেদিন শেষ হবে, তাঁদেরও আর বলার কিছু থাকবে না। এইভাবে কেউ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তন্ত্র-জীবন বা অন্য কোনো রোমহর্ষক বিষয়ের প্রতি। অবশ্য সব দেশেই এ-জাতীয় লেখক আছেন এবং থাকেন, কিন্তু তাঁরা রম্যরচনাকার হিসেবেই স্বীকৃত হন, ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পান না। আমাদের দেশে গ্রন্থের প্রণেতা মাত্রেই লেখক।

তবুও এই সব লেখক সমাজকে উপেক্ষা করা যেতো, যদি জানতাম সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু লেখক আছেন যাঁদের কাছে সাহিত্যকর্মের চেয়ে আর কোনো প্রত্যাশা বড়ো নয়, যিনি আপসহীন এবং অবিচলিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরকম লেখক প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে খুবই কম। ভাবের

খরে চুরি করে লাভ নেই. গতকালের অধিকাংশ বিদ্রোহী লেখকরা আজ নীড়ে ফিরে গেছেন। তাঁদের চোখে-মুখে পেন্সন-পাওয়া প্রৌঢ়ের পরিতৃপ্তি। পার্থক্য এই যে জীবিকা থেকে অবসরগ্রহণ বাধ্যতামূলক, কিন্তু এখানে কে কাকে নিষেধ করবে? পাঠক মোহগ্রস্ত, প্রকাশক ব্যাধিগ্রস্ত।

মূল সমস্যা এইখানে। লেখক সাধারণ পাঠককে উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশক পারেন না, আর প্রকাশক ছাড়া লেখক হওয়া অসম্ভব। সেই পুঁথিলেখার যুগ যদি থাকতো তাহলে এক কথা ছিল। নিতান্ত শিশুও জানে যে বাংলা উপন্যাসের প্রধান ক্রেতা বিয়ের বাজার এবং সাধারণ গ্রন্থাগার। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বইয়ের মলাটই মলাট আর গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বিবেচ্য কোন্ বইতে খবলো আকর্ষণ কতটুকু, কোন লেখকের বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। আমার তো ঘোরতর সন্দেহ হয় রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন না করলে তারাশঙ্কর তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা বাংলাদেশে পেতেন কিনা। তারাশঙ্করের প্রতিভার আবেদন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জনমানিহিত থাকতো, যদি না রূপালী পর্দার জাদু তাকে উজ্জীবিত করতো। পাঠক হিসেবে আমাদের রুচিহীনতা লেখকদেরও বিবেকহীন করে তুলেছে। একেই তো কিছু কিছু লেখক এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগেন যে, তাঁরা কোনোদিন ইউরোপীয় পাঠক পাবেন না, তার ওপর স্বদেশের পাঠকের সম্বন্ধে তার অভাব তাঁদের প্রায় চার্বাকপন্থী করে তোলে। সুতরাং তাঁরা "যতোদিন বাজারে চাহিদা, ততোদিন উৎপাদন নিয়ে যাও" এই মূল মন্ত্রে বিশ্বাসী।

আর সেজন্যই দেখতে পাই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে গল্পকথকের মতো ভিড়, ঔপন্যাসিকের সংখ্যা ততো কম। ১৯৬০ সালের "জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী"তে বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা দুশো চৌষট্টি।* এই তালিকার মধ্যে আছে নতুন উপন্যাস ছাড়া পুনর্মুদ্রিত উপন্যাস, ডিটেক্টিভ উপন্যাস, কিশোর উপন্যাস এবং বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত উপন্যাস। এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উক্ত দুশো চৌষট্টিখানি উপন্যাসের মধ্যে অর্ধেকের ওপর আদৌ লিখিত না হলে সাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। এই তালিকায় যিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তিনি ফরমায়েশি লেখার গুরু নীহাররঞ্জন গুপ্ত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাত। তারপরেই আছেন ছয়খানি উপন্যাসের লেখক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ, সুবোধ চক্রবর্তী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা পাঁচ।

সুতরাং বাংলা উপন্যাসের সমালোচনাতে প্রধান কর্তব্য দাঁড়ায় এই অভিযোগপত্র তৈরি করা। যে সমস্ত লেখক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেন তাঁদের বিষয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু এককালে যাঁদের আবির্ভাবকে বিধাতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছিল, এখন তাঁদের সম্পর্কেই আমাদের সবচেয়ে বেশি হতাশা। পরিস্থিতি এরকম দাঁড়িয়েছে যে কোনো লেখকের দু-তিনটি উপন্যাস পড়লে তাঁর বাকি পঁচিশ-তিরিশটি উপন্যাসের বিষয় ও বক্তব্য না পড়েই বলে দেওয়া যায়। এর ব্যতিক্রম যাঁরা, সংখ্যায় তাঁরা নেহাতই নগণ্য। বছর বারো আগে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি গল্প-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "এ কেবল ছেলে নিয়ে ছেলে-খেলা নয়, এ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এর নাম শিল্প। এর প্রতিটি শব্দে প্রতিটি অক্ষরে ব্যক্তিসত্তার স্বাক্ষর। অন্যের সৃষ্টি যেখানে অনাসৃষ্টি। ছেলে! ছেলের জন্য কতটুকু যন্ত্রণা পেতে হয় উমাকে, তার চেয়ে লক্ষগুণ, কোটিগুণ যন্ত্রণা যে আর-একজনকে মুহূর্তে-মুহূর্তে দগ্ধ করে তার সন্ধান উমার জানবার কথা নয়। উমা পারে অপছন্দ হলে তার ছেলে-মেয়েদের টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে, নিজেকে নিশ্চিহ্ন হতে দিতে? সে সাধ্য উমার নেই। অতখানি নির্মম হবার ক্ষমতা নেই উমার। সৃষ্টির উপর এমন অপার্থিব মমতার অর্থও তাই তার অনধিগম্য।" কিন্তু আজ সত্যিই সন্দেহ হয়, আমাদের দেশের লেখকেরা সত্যিই কি পারেন অতোখানি নির্মম হতে? পাঠকের অভিজ্ঞতা অন্তত ভিন্ন।

সেজন্য পাঠক হিসেবে আমরা কোনো চমকেই আর অবাক হই না। যদি দেখি, কোনো ঘোর বিপ্লবী সাম্যবাদী লেখক নেহাতই জোলো প্রেমের কাহিনী ফেঁদেছেন অথবা বিশ্বসাহিত্যের অনেক মণিমুক্তা আহরণ ক'রে কোনো শাঁসালো বুদ্ধিজীবী বিভূতিভূষণের অপু এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাকার সংমিশ্রণে এমন এক বিচিত্র কিশোরের সৃষ্টি করেছেন যে, অকালপক্ব

* "জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী"তে উপন্যাসের তালিকার মধ্যে উপন্যাস বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থ ও ছোটোগল্পও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু উক্ত সংখ্যা আলোচনাগ্রন্থ ছোটোগল্পকে বাদ দিয়ে। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত তালিকায় বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা ষাট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই তালিকায় বাংলা থেকে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত উপন্যাসগুলি ধরা হয়নি। তাহলে শরৎচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করতেন।

অথচ অপরিণত, অথবা দেহ বিষয়ে সম্পূর্ণ শুচিবাইমুক্ত দীর্ঘ বক্তৃতার পর কেউ সতীত্বের জয়গানে মুখর, আমরা মেনে নি, কেননা পাঠকের এ-ই পরম গতি। বর্ণ পরিচয়ের সুবোধ বালকের মতো আমরা "যাহা পাই, তাহাই পড়ি এবং পড়িয়া পরিতৃপ্ত হই।" বিলিতি উপন্যাসেও মাঝে-মাঝে দেখা যায়, আমাদের দেশের উপন্যাসে তো হামেশাই চোখে পড়ে যে, সামাজিক উপন্যাসের নিবেদনে লেখক বড়ো বড়ো করে জানিয়ে দেন, এর প্রতিটি চরিত্রটি কাল্পনিক। না হলে হয়তো পাঠকেরা ভাববেন এগুলি বুঝি সব বাস্তব। কিন্তু আমাদের লেখকেরা পাঠক সম্পর্কে আরো বেশি "সহানুভূতি-প্রবণ" বলে তাঁদের মাঝে-মাঝে কত বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত "কলকাতার কাছেই"-এর দ্বিতীয় পর্ব "উপকণ্ঠে"র ভূমিকায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র জানিয়েছেন যে, "প্রথম বইখানি পড়ার পর বহু সাহিত্যিক বন্ধু ও অগ্রজ—পরিচিত ও অপরিচিত বহু পাঠক-পাঠিকাও—উমার সম্বন্ধে অকারণ নির্মমতার অনুযোগ করেছিলেন। এমন কি নির্বেদক মানুষ রাজশেখর বসু মহাশয়ও বলেছিলেন, 'পরের খণ্ডে উমার একটু ভালো ব্যবস্থা করবেন তো?' তাঁর এই উক্তিই আমার এ গ্রন্থ রচনার সংকোচ বাড়ে, পুরস্কার ... মনে ... কোনো বন্ধু লেখক তাঁর আদর্শ স্মরণ করেই উমার জীবনে যথাসাধ্য মিলনান্ত ছেদ টানবার চেষ্টা করেছি। তবে যা ভাগ্য তাতে এর চেয়ে বেশি কিছু ভালো হওয়া সম্ভব নয়, তার জীবন আরও ব্যর্থ, আরও শোচনীয়ভাবেই শেষ হওয়ার কথা।" আমরা ভাবছি, রাজশেখর বসুর চেয়েও বরেণ্য কোনো লেখক যেমন রবীন্দ্রনাথ যদি আজ বেঁচে থাকতেন এবং এই ধরনের অনুরোধ করতেন, গজেন্দ্রবাবু কী বিপদেই না পড়তেন! তখন যথাসাধ্যের পরিবর্তে হয়তো উমার জীবনে পুরোপুরি মিলনান্ত ছেদ টানতে হতো!

বস্তুত আমাদের অধিকাংশ লেখকের কাছে সংস্কার এবং মূল্যবোধের সংকট তুলামূল্য, ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুপস্থিত। সেজন্য দেখা যায় একটি স্বতঃসিদ্ধ, সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় বলতে হলেও তাঁদের দীর্ঘ বক্তৃতা করতে হয়, অপ্রাসঙ্গিকভাবে ঘটনাসমূহ ভিড় করে এবং যে-কোনো প্রকারে নায়ককে জিতিয়ে দেওয়া যেন উপন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য। আগে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই অভিযোগ করা হতো, এখন দেখছি সাধারণভাবে এটা বাঙলা উপন্যাসেরই লক্ষণ—নায়কের তুলনায় প্রতিপক্ষ গুণে-প্রতিভায় অনেক হীন। বিদেশী উপন্যাসে আমরা যখন পড়ি, একজনকে আরেকজনের খারাপ লাগছে, তখন আমরা মনে করি না যে, একজন খারাপ বলেই এ

ব্যাপার ঘটছে। আসলে দুজন সমান ভালো থাকলেও ব্যক্তিত্বের বিরোধ হতে পারে। পুরোপুরি ভালো লোক পুরোপুরি মন্দের মতোই দুর্লভ আর মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব ভালো-মন্দ নিরপেক্ষভাবেই হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা প্রায় ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে যে, নায়কের প্রতিপক্ষ ভিলেন হবে। মানুষের আত্যন্তিক নৈঃসঙ্গ্য ব্যক্তিত্বের সংকটের চিত্রণ বাঙলা উপন্যাসে একেবারেই নেই এমন কথা বলি না। কিন্তু বাঙলা উপন্যাসে প্রেমের সমস্যা বলতে যেমন এখনও প্রধানত সামাজিক বাধাকেই বোঝায়, তেমনি সংকট বলতে আমরা কোনো দুর্বৃত্তের অসদাচরণই বুঝি।

এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমরা অগ্রগ উপন্যাসিকের সাম্প্রতিক কালের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস গ্রহণ করবো —একটি অচিন্ত্যকুমারের "প্রথম কদম ফুল" ও অন্যটি প্রবোধকুমারের "বিবাগী ভ্রমর।"

তিরিশের বিদ্রোহী লেখকদের অগ্রণী ছিলেন অচিন্ত্যকুমার—দেহ-প্রেম বিষয়ে সংস্কারমুক্ত মতামতের জন্য একদা বহু নিন্দিতদের তিনি অন্যতম। তাঁর "প্রথম কদম ফুলে"র বিষয় প্রেমজ বিবাহ এবং একান্নবর্তী পরিবার। তাঁর "তরণা" গল্পটি যাঁদের মনে আছে, তাঁরা জানেন যৌথ পরিবারের চিত্রণে তাঁর কী অসাধারণ নৈপুণ্য। বস্তুত আমাদের সমাজব্যবস্থায় একান্নবর্তী পরিবারের যতো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবই থাক না কেন, উপন্যাসে প্রেমের সমস্যাকে এরকম যৌথ পরিবারের পটভূমিতে দেখার চেষ্টা বিরল।

অচিন্ত্যকুমারের বিষয়বস্তু তাই আমাদের উৎসাহ-আগ্রহ জাগায়। কিন্তু কিছুদূর পড়বার পর নিতান্ত অসতর্ক পাঠকেরও বুঝতে বাকি থাকে না যে, লেখক স্বয়ং যৌথ পরিবারের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী এবং তার জন্য তিনি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। তাই যে-কাকলি প্রেমের জন্য অনায়াসে মাতৃস্নেহ ও পিতৃগৃহ উপেক্ষা করে চলে আসতে পারে, সে পারে না স্বামীর অনুরোধে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকার প্রস্তাবে রাজি হতে অথবা আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্য চাকরি গ্রহণ করতে। দেবী চৌধুরানী যেমন খুশি মনে হারির মা, পাঁচির মার খবরদারি মেনে নিয়েছিল, এম-এ পাশ করা কাকলিও তেমনি স্বেচ্ছায় যৌথ পরিবারের দৈনন্দিন সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটাকেই সার্থকতা মনে করে। আমার আপত্তি একান্নবর্তী পরিবারের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু কী মূল্যে লেখক কাকলিকে জিতিয়ে দিলেন! সুকান্তের মতো হীনমনা স্বামীর সঙ্গে কাকলির বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে আমাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। কিন্তু যখন দেখি এর পর কাকলির জীবনে আর যে-দুজন পুরুষ এলো (বরেন এবং দীপঙ্কর) তারা চরিত্রের ঐশ্বর্যে বা ব্যক্তিত্বে সুকান্তের মতো অতি সাধারণ মানুষেরও যোগ্য নয়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, কাকলির নিয়তি নির্ধারিত। এই সুকান্তের সঙ্গে যে কাকলির পুনর্বিবাহ নিশ্চিত, তা জানতে একটুও দেরি হয় না। কেননা, কাকলি যেমন তার জীবনে সুকান্তের চেয়ে মহৎ কোনো পুরুষের সন্ধান পায়নি, তেমনি কাকলির অনুপস্থিতিতে সুকান্তের জীবনে যে এলো সে বিনতা! কিন্তু জনৈক প্রবীণ সমালোচকের সঙ্গে আমিও একমত যে, সত্যিই যদি কাকলির জীবনে সুকান্তের চেয়ে মহৎ কোনো পুরুষের আবির্ভাব হতো লেখক কি পারতেন সমস্ত কিছুর এতো সহজ মীমাংসা করতে?

প্রবোধকুমারের "বিবাগী ভ্রমরে"রও মূল উপজীব্য প্রেম। হাসুবানু প্রমুখ প্রবোধকুমারের অন্যান্য নায়িকার মতো হেনাও সর্বগুণসম্পন্না বিদুষী, রূপসী এবং বক্তৃতা-পটিয়সী। হেনা নরেন্দু পার্থ আশৈশব বন্ধু—তারা তিনটি ছেলের মতোই বড়ো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পার্থ একদিন বিলেতে চলে গেল। এই অবসরে মুহূর্তের দুর্বলতায় হেনা নরেন্দুকে বিয়ে করলো। কিন্তু বিয়ের দিনেই হেনার মোহভঙ্গ—সে আবিষ্কার করলো নরেন্দুর মধ্যে লুকিয়ে আছে বাপের ঐশ্বর্যে স্ফীত, উদ্ধত জন্তু। সে চলে এলো এবং ইতিমধ্যে পার্থ ফিরে এসেছে। সে চাইলো মীমাংসা করতে, কিন্তু দু-পক্ষই সমান অবিচলিত—নরেন্দু অ্যানিকে নিয়ে মত্ত থাকলেও হেনার ওপর কর্তৃত্ব ছাড়বে না, অন্যদিকে হেনার মনোভাবও অপরিবর্তিত। হেনা পার্থকে ভালোবাসে, কিন্তু হেনাকে গ্রহণ করতে পার্থের নীতি সংস্কারে বাধে। (পার্থের আচরণে অবশ্য তার সমর্থন নেই, শুধু হেনার উক্তি থেকেই একথা জানা যায়।) হেনা সব ব্যাপারেই বেপরোয়া, সব কিছুতেই সংস্কারমুক্ত—পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মর্যাদা বিষয়ে সে অনেক বক্তৃতা করতে পারে, পারে না শুধু যাকে ভালোবাসে, তাকে গ্রহণ করতে। হেনা মৃত্যুশয্যায় পার্থকে বলেছে, "অসুখ শরীরে সেদিন রাত্রিবাসের লোভ আমাকে পেয়ে বসেছিল। হার মানলুম নিজের কাছে। ভাবলুম, তোমাকে না জানিয়ে আগে তোমার স্ত্রী হই, তারপর একে একে সব তোমার কাছে চেয়ে নেবো। এবার সেরে উঠে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকবো, কেমন পার্থ (পৃঃ ৩১৪)?"

আসলে অধিকাংশ অগ্রজ লেখকদের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের ব্যবধান এতো দুস্তর যে, কিছুতেই তাঁদের জগতে সহজ হতে পারি না। তাঁদের ক্ষমতা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, কিন্তু আজ মনে হয় তাঁদের জীবনের প্রধান সমস্যাগুলি আমাদের কাছে সংস্কারমাত্র। তরুণ লেখকেরা ভালো-মন্দ যা-ই লিখুন না কেন, ভাবনা-চিন্তায় তাঁরা যথার্থ সমসাময়িক হতে চান অর্থাৎ সামাজিক বিধিনিষেধের চেয়ে মানবিক মূল্যবোধের সংকট তাঁদের কাছে বড়ো। এই সামগ্রিক চেতনা সব তরুণ লেখকেরই আয়ত্তে এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে উপন্যাসের মোড়কে স্নেহময়ী সংসারজননী, বাঙলার সতীসীমন্তিনী চিত্রণে তাঁদের যেমন অনীহা, তেমনি আবার উপন্যাসের পটভূমি প্রসারিত করার নামে বাঙালী যুবকের সঙ্গে লণ্ডন-কান্দাহারের মেয়ের প্রেমের বর্ণনাতেও অনাস্থা। আধুনিক উপন্যাস যদি মানুষের অনিবার্য বাসনার আধার হতো, যা পড়ে লেখকের সঙ্গে পাঠকও মনে মনে বলতেন, "রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা", তাহলে কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি এইটুকু মাত্র?

এই প্রশ্নই বিশেষভাবে ওঠে বিমল মিত্রের "কড়ি দিয়ে কিনলাম" আলোচনা প্রসঙ্গে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যিনি বাঙলা সাহিত্যকে নীল লেশা, জেলাল সংবাদ, আর একজন মহাপুরুষ ইত্যাদি গল্প এবং ছাই-এর মতো উপন্যাস উপহার দিয়েছিলেন, তিনি স্মরণীয় হয়ে রইলেন তাঁর "সাহেব বিবি গোলাম" ও "কড়ি দিয়ে কিনলাম" উপন্যাস দুটির মধ্যে। "কড়ি দিয়ে কিনলাম" বিশ শতকের মধ্যবিত্ত জীবনের ইতিকথা। "সাহেব বিবি গোলাম" যেমন গাঁয়ের ছেলে ভূতনাথের ওভারসিয়র ভূতনাথে পরিবর্তন চিত্রিত, এখানেও তেমনি দীপুর সেন সাহেবে রূপান্তরের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক-সামাজিক-ব্যক্তিগত পালাবদলের ইতিহাস নিহিত। লেখক অবশ্য আরো বেশি উচ্চাভিলাষী। রামায়ণের রূপকের আড়ালে তিনি আধুনিক জীবনের ভাষ্য রচনা করেছেনঃ "এই বর্তমান সংসার-জীবনেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাম-সীতা-রাবণ আপন মহিমায় বিরাজমান। অযোধ্যা আর লংকা শুধু ভৌগোলিক নাম-

পুরের মানুষে" এই ব্যাধিত চিন্তার প্রভাব খুব কম। উদ্বাস্তু মেয়ে মুক্তার হঠাৎ দেখা বাবরিচুলো চানাচুরওয়ালা বলাইয়ের সঙ্গে। বলাইয়ের চানাচুর উপহার এবং সহানুভূতি-ভরা কথা শুনে মুক্তা তার প্রেমে পড়লো। খুড়ির নির্যাতনে অধৈর্য হয়ে বলাইয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধবার আশায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বলাইয়ের মনে প্রেম ছিলো না, সে প্রেমের ভান করে তাকে বিক্রি করলো কুমারেশের কাছে। মুক্তা কিন্তু তখনও বলাইয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্নে বিভোর। এদিকে কুমারেশ একদিন পূর্ণিমা রাতে নৌকাবিহারের অছিলায় রুগ্না স্ত্রীকে জলে ফেলে দিলো। তাই দেখে বিস্মিত মুক্তার জলে লাফ দিয়ে পলায়ন এবং পথে বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। বিব্রত বলাই রতি এবং মতি কর্মকারের বাড়ি তাকে রেখে কলকাতায় ফিরে গেলো। এখানে এসে মুক্তার জীবনে আরেক সংকট এলো। পিতার পূর্বকীর্তির জন্য রতি-মতি দুই ভাইই অতিশয় নারীবিদ্বেষী, কিন্তু মুক্তার যৌবন তাদের লৌহগঠিত দেহেও চাঞ্চল্য আনে। এদিকে কুমারেশের গৃহে থাকাকালীন মুক্তার স্বপ্নে-জাগরণে শুধু বলাইকেই মনে পড়তো, কিন্তু এখানে অবচেতন মনে আরেকজন দীর্ঘ দেহীও আবির্ভূত হয়। যাই হোক, অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় রতি আত্মহত্যা করলো। মুক্তা সেই আশ্রয় ত্যাগ করে যেতে পথে আবার বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে সে নির্জন প্রান্তরে ছুরিকাহত হয়ে শায়িত। ভাগ্যচক্রে রতির ভগ্নীপতি শিবকুমারের সঙ্গে দেখা হলো। দুজনেই তাঁর আশ্রয়ে চললো এবং এই সুখী সম্পন্ন পরিবারে বলাইকে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ধরা দিতেই হয়। মুক্তারও নীড় বাঁধার স্বপ্ন সার্থক হতে চলে।

বিমল করের "অপরাহ্নে"র theme অনেক জটিল। আমাদের সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে পবিত্রতম মানবিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসটি কমলা, অরুণা (কমলার কন্যা), কল্যাণ (কমলার পুত্র) এবং অবিনাশ (কমলার প্রণয়ী) এই চারজনের জবানবন্দিতে ব্যক্ত। বিধবা কমলা অরুণা ও কল্যাণের শুধু মাতা নন, একই সঙ্গে তাঁদের মাতাপিতা ও বন্ধু। কিন্তু তাদের এই সুখী শান্ত জীবনে একদিন সংকট এলো—কমলার জীবনে আবির্ভূত হলেন পূর্বপ্রণয়ী অবিনাশ। স্নেহ এবং সম্মানের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলো। কমলার ছেলেমেয়েরা পরিণত, আত্মসচেতন। মধ্যবিত্ত সম্ভ্রমবোধ তাদের মায়ের সম্পর্কে সহানু-ভূতিশূন্য করে তুললো। অভিমানক্ষুব্ধ মা-ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু অবিনাশবাবু পারলেন না তাঁকে আশ্রয় দিতে, তিনি তার আগেই নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে ফিরে এলেন কমলা দেবী। তরুণ লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তীর "একটি রাত্রির উপা-খ্যানে"র সঙ্গে এই উপন্যাসের বিষয়গত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মাকে অনেক সময় হীন বৃত্তি গ্রহণ করে সন্তানকে মানুষ করতে হয়। কিন্তু সন্তান সাবালক হয়ে যখন জানতে পারে কী মূল্যে তারা বড়ো হয়েছে, তখনই শুরু হয় সংকট। কেননা মা তো সব-সময়েই চান সন্তানের কাছে সম্মানিতা থাকতে, মাতৃস্নেহকে যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে রাখতে। কিন্তু একজন মানুষের পরিচয় তো শুধু সন্তান হিসেবে নয়, সমাজে সে স্বতন্ত্র পুরুষ। হয়তো "অপরাহ্নে"র কমলা দেবীর তুলনায় "একটি রাত্রির উপাখ্যানে"র সুনন্দা দেবী একটু বেশি ভাবপ্রবণ, তাহলেও উভয়েই একই শূন্যতাবোধে আচ্ছন্ন।

এই বিপর্যস্ত মূল্যবোধ এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতার আরো কয়েকটি উদাহরণ গৌর-কিশোর ঘোষের "এই দাহ", সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের "সুপ্রিয়ার বন্ধন", শান্তি-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এসো নীপবনে।" শেষোক্ত উপন্যাসে অবশ্য হেমন্তের সাংবাদিক জীবনের ব্যর্থতাবোধের অতি-চিত্রণ মূল সমস্যাকে প্রসঙ্গচ্যুত করেছে।

প্রেম এবং দাম্পত্য সম্পর্কের শৈথিল্য ও শূন্যতা "এই দাহ" এবং "সুপ্রিয়ার বন্ধনে"র বিষয়। প্রথমোক্ত উপন্যাসের নায়ক গোলোকের জীবনে তিনজন নারী এসে-ছিল—স্বর্ণা, মনোরমা এবং চারুলতা। ছাত্রী স্বর্ণার সঙ্গে প্লেটোনিক প্রেম গড়ে ওঠবার আগেই গোলোক টের পেলো, সে যক্ষ্মা-ক্রান্ত, সুতরাং সে নিজেই সরে এলো। দেড় বছর পর রোগমুক্ত গোলোকের আলাপ হলো মনোরমা এবং তার স্বামীর সঙ্গে। মনোরমাও যক্ষ্মার আক্রমণ থেকে সদ্যো-মুক্ত। সেজন্য সুখী দম্পতি হলেও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগে স্বামী তার সঙ্গে কোনো দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক। বাধ্য হয়ে মনোরমা গোলোকের শরণ নেয়, কিন্তু দেহ-বিনিময়ের ঊর্ধ্বে গোলোকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপনে সে উৎসুক নয়, কেননা সে যথার্থই পতিপ্রাণা। এই ব্যাপারে একদিন চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবার পর গোলোকের জীবনে এলো চারু-লতা—দাসীশ্রেণীর দেহপসারিণী হলেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং সেজন্যই হয়তো বাবুদের বিষয়ে অবিশ্বাসিনী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চারুলতা এবং গোলোক ঘর বাঁধবে বলে ঠিক করে। বিয়ের দুদিন আগে মনস্থির করবার জন্য চারুলতা ছুটি নিয়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে মনোরমার পুনরাবি-র্ভাব, স্বামীর অনুকম্পা তার কাছে অসহ্য। গোলোকের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনেও তিনি নৈতিক আপত্তি তোলেন না, রোগের পুনরাক্রমণের ভয় করেন। এই সময়ে নাটকীয়ভাবে চারুলতার আবির্ভাব, এসে দেখে মনোরমা ও গোলোক আলিঙ্গনা-বদ্ধ। জীবনে বিশ্বাস আর তার ফিরে এলো না—অগত্যা প্রস্থান ও আত্মহত্যা। উপন্যাসের শেষে গোলোকেরও স্বেচ্ছামৃত্যু-বরণ।

সুপ্রিয়ার স্বামী বিমল বন্ধ্য এবং রথীনের ঔরসে খোকন তার ক্ষেত্রজ সন্তান। প্রত্যেক কুশীলবই প্রত্যেকের সম্পর্কে বিশ্লিষ্ট, কিন্তু নিজেদের স্বার্থে স্বাভাবিকতার অভিনয় করে যাচ্ছে। বিমল সন্তানের পিতা এই পরিচয়ে সমাজে তার সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখে। আর রথীন সুপ্রিয়ার সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে চোরের মতো খোকনকে দেখে যায়, ছেলের ভ্রূকুটি ও নীরব ভর্ৎসনা উপেক্ষা করেও।

এই মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের চিত্রণ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে সন্তোষকুমার ঘোষের কথা ওঠে। আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি অনুপস্থিত। "মুখের রেখা" ও "রেণু তোমার মনে"র পর তাঁর আর কোনো উপন্যাস সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে আরেকজন সন্তোষকুমার ঘোষের আবির্ভাব হওয়ায় সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ-নির্ভর পাঠকদের বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়েছে। আশা করা যায়, তারাশঙ্কর ও শ্রীতারাশঙ্করের মতো কোনো শ্রীসম্পন্ন মীমাংসা অচিরেই হবে।

"নীলাঞ্জনের খাতা"র পর বুদ্ধদেব বসুর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। আমাদের এক বছরের আলোচনায় তাই তিনিও বহির্ভূত। ইদানীং তাঁর মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি আগ্রহ কমে আসছে, অনুবাদকর্ম এবং প্রবন্ধরচনাতেই তিনি অধিকতর মগ্ন। যদিও আমাদের ধারণা অতীত সৃষ্টিকে সম্বল করে বেঁচে থাকবার মতো দুর্দিন তাঁর এখনও আসেনি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্প যে-গভীরতায় নিয়ে যায়, পাঠককে যেভাবে অভিভূত করে, তাঁর উপন্যাস সেই ব্যাপ্তি, সেই সংহতি অপেক্ষাকৃত বিরল—কিন্তু "প্রতিধ্বনি ফেরে" তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। উপন্যাসটিতে রয়েছে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের রহস্যময়তা। অগ্নিযুগের বিপ্লবী উমাপতি ঘোষালের স্মৃতিসভায় রিপোর্টার হয়ে এসেছে অসীম রাহা। সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলের বশে সে মৃত উমাপতির পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে উন্মোচিত করতে চাইলো। এই উদ্দেশ্যে সে জয়া, নীরজা দেবী, বিপিন-বাবু, নিশীথবাবু প্রভৃতি বিবিধ কর্মসূত্রে একদা উমাপতির সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে, তাতে তার বিস্ময় এবং বিভ্রান্তি আরো বেড়ে যায়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন মানুষের

কাছে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। হতাশ হয়ে অসীম রায় রামবাবুর কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করে। তাতে প্রসঙ্গত লেখা ছিলো: "উমাপতি ঘোষাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি বটে, কিন্তু তথ্য দিয়ে কোনো জীবনেরই সত্য জানা যায় কিনা এ সন্দেহই ক্রমশ বেড়েছে। ... ...

আপনি উমাপতির ব্যর্থতার রহস্য জানতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যর্থ কিনা, তাই আমার কাছে রহস্য হয়েই রইল। ... ...

উমাপতিকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে কিছুটা খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

আর একবার এই গ্রন্থনটিকে রহস্য-নগরীর কবি হবার চেষ্টা করবো।"

শক্তিমান লেখক সুবোধ ঘোষের সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলিতে ভাষাশিল্পের দিকে যে-অভীপ্সা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার অন্যতর পরিণতির সম্ভাবনা পাঠকের প্রত্যাশাকে তীব্র করেছে। তাছাড়া সুবোধবাবুই বোধহয় একমাত্র লেখক যাঁর লেখায় একটা প্রগাঢ় আদর্শবাদের সান্নিধ্য লাভে আমরা তৃপ্ত হই। সেদিক দিয়েও তাঁর কাছে পাঠকদের প্রত্যাশা কম নয়।

শুধু ভঙ্গি দিয়ে

আমাদের পাঠকদের বিষয়ে একটা অভিযোগ আছে, তাঁরা গল্প পড়েন না, গেলেন এবং তা-ও গোগ্রাসে। ধূর্জটি-প্রসাদের নায়ক যতোই আক্ষেপ করুক মানুষ হাঁস নয়, বাঙালী পাঠক ভাষার নীর বাদ দিয়ে গল্পের ক্ষীর গ্রহণে সুপটু। সেজন্য অচিন্ত্যকুমারের মতো নিপুণ শব্দশিল্পীও যখন ঊর্ধ্বতন অর্থে ঊর্ধস্তন প্রয়োগ করেন ("অধস্তন হয়ে ঊর্ধস্তনের বাড়ি গিয়ে গাফিলতির কৈফিয়ৎ চাওয়া এমন কী অন্যায়?"—প্রথম কদম ফুল, পৃঃ ৫৮০) অথবা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো সচেতন রচয়িতার উপন্যাসের চরিত্র অমিয়ভূষণ অবনীমোহন হয়ে যায় ("উপ-নগর" ২৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য), আমাদের পাঠকেরা গ্রাহ্য করেন না। কেননা, তাঁদের লক্ষ্য এক। যে-সমস্ত লেখক রচনার শৈলী বিষয়ে সচেতন বা ভাষাগত পরীক্ষার উৎসাহী, তাঁদের সম্পর্কে পাঠকের প্রবল ঔদাসীন্য রয়েছে। অথচ এটা কিরকম স্ববিরোধী শোনাতে পারে যে, একই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে যখন আন্দোলন চলছে যে গল্প বলার দায়িত্ব উপন্যাসের শেষ হয়ে গেছে, তখন আমাদের পাঠকের পক্ষপাতিত্ব সব সময়ে গল্পের দিকে।

একথা ঠিক উপন্যাসই হোক, গল্পই হোক, ভাষা ব্যবহারে সর্বদা নৈপুণ্য এবং সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু ভাষার উদ্দেশ্য বক্তব্যকে প্রকাশ করা, প্রসাধন তার মূল লক্ষ্য নয়। কথাটি সর্বজনবিদিত, তা সত্ত্বেও পুনরুক্তি মার্জনীয় এই কারণে যে, অনেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রকাশ ক'রে উপন্যাস আখ্যা দিতে চান। তাঁদের উপন্যাস রচনার মূলে কোনো অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন নেই, পঠিত জ্ঞানের প্রচারের চেষ্টাই প্রবল। এই জাতীয় লেখকরা আমাদের আলোচ্য নন। সমসাময়িক জীবনযাত্রাকে অনেকে প্রচলিত রূপকথা বা পুরাণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, কেউ সরাসরি রূপকরীতি গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো লেখক আবার অতীত যুগের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনের মূল্যায়নে ব্রতী ব'লে ভাষা-ব্যবহারেও প্রাচীন রীতির পক্ষপাতী। চিত্রকল্প হিসেবে পৌরাণিক চরিত্র বা রূপকের অনুষঙ্গ সব দেশের উপন্যাসেই দেখা যায়। "কড়ি দিয়ে কিনলাম"-এর ভূমিকাতে আমরা দেখেছি আধুনিক কালে পাত্র-পাত্রীর দুঃখবোধের মধ্যে লেখক সেই রামায়ণের যুগের অনুষঙ্গ খুঁজেছেন। কিন্তু এখানে লেখক শুধু সাদৃশ্য আবিষ্কারেই ক্ষান্ত। অনেকে আবার সমসাময়িক জীবনকে রূপকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অন্নদাশঙ্কর আধুনিক জীবনকে রূপকথার কাহিনীর মাধ্যমে পুনর্কথিত করেছেন। অন্যদিকে কমলকুমার মজুমদার শুধু পটভূমির দিক দিয়ে পশ্চাদানুসারী নন, ভাষা এবং মূল্যবোধেও অতীতাশ্রয়ী।

প্রসঙ্গত তারাশঙ্করের "মহাশ্বেতা" উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপন্যাসটি শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীনা, ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর কাহিনী। নীরা-বিনা সেনের কাহিনী একান্তভাবেই আমাদের সমসাময়িককালের। কিন্তু নীরা চরিত্রে অভিনবত্ব বাণভট্টের মহাশ্বেতার সঙ্গে সাদৃশ্যে। মহাশ্বেতার ছবি আঁকার ব্যাপারটিও উপন্যাসে lietmot If—এর কাজ করেছে। উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিষয়ে এক জায়গায় বলা হয়েছে, "কবি বাণভট্টের কাদম্বরী। নায়িকা কাদম্বরী, উপনায়িকা মহাশ্বেতা। আশ্চর্য চরিত্র মহাশ্বেতার। যাকে সে ভালোবাসে—যে তাকে ভালোবাসে, সেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার সেই ভালবাসার উত্তাপে দাহে। প্রেমের তপস্যা কোথাও সমুদ্র, কোথাও আগুন। সে আশ্চর্য।—সে ভালোবেসেছিল এক ব্রাহ্মণ কুমারকে—পুণ্ডরীককে—। পুণ্ডরীকের মৃত্যু হলো তার সঙ্গে মিলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গন্ধর্বকন্যা মহাশ্বেতা। সে প্রিয়তমের মৃত্যুতে সাজল তপস্বিনী। তপস্যা ক'রে প্রিয়তম পুণ্ডরীককে বাঁচাবে। মৃত্যুলোক থেকে আবার আসবে জীবনালোকে। এলো, আসতে হলো, পুণ্ডরীককে পুনর্জন্ম নিয়ে—। এবং সে যখন এলো মহাশ্বেতার আশ্রমে—হঠাৎ তাকে দেখলে, পূর্বজন্মের আকর্ষণ জাগলো, উথলে উঠলো—সে আত্মহারা হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলো মহাশ্বেতাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। মহাশ্বেতা শিলাসনে বসে তপস্যা করছিল, তার ধ্যানভঙ্গ হলো এবং হতচকিত হয়ে গেলো; একজন যুবা তাকে আলিঙ্গন করতে আসতে আসছে। চিনতে দেরি হলো এক মুহূর্ত। সেই এক মুহূর্তেই তার চোখ থেকে বের হলো তার ক্রোধের সঙ্গে তপস্যার তেজ; সেই তেজে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো (পৃঃ ২২০)।" এই বৃত্তান্তের উল্লেখে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে, "বিনো সেন সাগ্রহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন—এবার এবার আঁকবো—পাহাড়ের উপর কম্পিত দেবদারুবনে—মহাশ্বেতার সামনে—বরফের হিমশীতল সমাধির বরফ গলে যাচ্ছে—তার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে পুণ্ডরীকের ঈষৎ রক্তাভ মুখ। চোখ দুটির পাতা কাঁপছে—।"

কিন্তু সমরেশ বসুর "বাঘিনী" উপন্যাস পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে শুরু হলেও কিছুদূর পড়বার পরই বোঝা যায় যোগা-যোগটা নেহাতই আপতিক। উক্ত উপন্যাসের গঠনে সংহতির অভাব ও লক্ষণীয়।

উক্ত উপন্যাস বিষয়ে আমার আরো গুরুতর আপত্তি রয়েছে। যে-পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান সমরেশবাবুর বৈশিষ্ট্য তা এখানে অনুপস্থিত। সেজন্য চরিত্রগুলিকে মনে হয় মধ্যবিত্তসুলভ অচরিতার্থ বাসনার উপন্যাস-রূপ। সমগ্র উপন্যাসে চিরঞ্জীব এবং দুর্গা সম্পর্কে এমন মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি কার হয়েছে যার দ্বারা ঝানু আবগারী দারোগা বলাই পাল ও তার স্ত্রী মলিনাও আচ্ছন্ন। তা না হলে কোনো অবগারী দারোগা চোলাই মদের আসামীর সঙ্গে নিজের স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেয়? কৃষক আন্দোলনের কর্মী চিরঞ্জীব ব্যানার্জি আন্দোলন এবং সমাজ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চোলাই কারবার শুরু করে এবং এই সূত্রে বাঁকা বাগ্‌দীর মেয়ে দুর্গার (বাঘিনী নামে যে বেশি পরিচিত) সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। চিরো জানে চোলাই সে একা করে না, কৃষক আন্দোলনের কর্মী এবং সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সুতরাং তার কোনো বিবেক-দংশন নেই। কিন্তু একদিন দুর্গার দুই ব্যর্থ প্রেমিক কেষ্ট-ভোলা সুযোগ পেয়ে তার সম্ভ্রমহানির জন্য উদ্যত হতেই বাঘিনীর গুপ্ত ছোরার আঘাতে ভোলার মৃত্যু ঘটলো। বিচারে দুর্গার নির্বাসন এবং বিরহের ব্যর্থতাবোধে চিরোর পুনরায় কৃষক আন্দোলনে যোগদান। তার পুনরাগমনে শ্রীধরদা পরিতৃপ্ত হাসির সঙ্গে জানান যে, চিরো ফিরে আসবে তা তিনি জানতেন। ভাগ্যি দুর্গা খুন করেছিল!

পুরোপুরি রূপকথার পদ্ধতিতে লেখা হলো অন্নদাশঙ্করের "সুখ।" অবশ্য এ জাতীয় পরীক্ষা তিনি ইতিপূর্বেও করেছেন, সেকথা ভূমিকাতে উল্লিখিত আছে: "বহুদিন থেকে আমার সাধ কোনো একটি রূপকথার নির্যাস নিয়ে একালের একটি কাহিনী রচনা করবো। সেও হবে একপ্রকার রূপকথা। এই সাধ থেকে আসে সতেরো বছর আগে লেখা "হাসন সখী" গল্প। তখন হতেই মাথায় ছিল আর একটি কল্পনা। একটু বড়ো গোছের। এতোকাল স্পষ্ট হয়নি ব'লে লিখিনি। এইবার লিখতে বসে স্পষ্ট হলো। এর নাম রাখলুম "সুখ।"

কিন্তু "সুখ" যদিও রূপকথার নির্যাস দিয়ে গঠিত তবু নিজে একটি রূপকথা নয়। সে অভিলাষ আমার অপূর্ণ রয়ে গেল।"

অন্নদাশংকর এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েক বছর আগেকার লেখা "কন্যা" উপন্যাসের উল্লেখ করেন নি। আমার ধারণা তাঁর পরীক্ষা "সুখে"র চেয়ে "কন্যায়" অধিকতর সার্থক হয়েছে। "সুখে" রূপকথার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সংশ্লেষণ খুব শিথিল। ফলে চরিত্রগুলি (বিশেষভাবে মালা) শুধু সজীবতা নয়, স্বাভাবিকত্বও হারিয়েছে।

রূপকথা নয়, পুরোপুরি রূপকাশ্রিত হলো মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পুনরুত্থান।" পিতৃ-পরিচয়হীন কুবের বাঁচার অর্থহীনতা ও অসামর্থ্যে উদভ্রান্ত। কবরখানার পাশে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ কুবেরের হঠাৎ মনে হলো সামনের ফ্ল্যাটের তিনতলা থেকে কে হাত-ছানি দিয়ে ডাকলো। কিন্তু সেখানে প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনলো তিনতলা থেকে আজ কোনো আহ্বান আসা সম্ভব নয়, কেননা ওখানে আজ এক বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছেন। এই অনুসন্ধানসূত্রে নীলার সঙ্গে তার আলাপ এবং তার মাধ্যমে অপর্ণাদির সঙ্গে। অপর্ণাদি বহুদিন ধ'রে একটি উপন্যাস রচনায় মগ্ন। উপন্যাসের বিষয় চাঁদ সদাগরের কাহিনী; পুরনো কাহিনীর যেখানে শেষ, উপন্যাসের সেখানে শুরু: "বেঁচে উঠেই সেই মৃত স্বামী তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করবে সবাইকে, 'আমাকে তোমরা বাঁচালে কেন?' কেন আবার আমাকে এই নিষ্ঠুর বিশ্বে ছুঁড়ে মারলে? ফিরিয়ে নাও তোমাদের জীবন, ফিরিয়ে নাও। এই এই পুনরুজ্জীবন কে চেয়েছিল তোমাদের কাছে? আমি তো চাইনি।" বস্তুত এই প্রশ্নেই কুবের বিচলিত। সেজন্য অনিবার্য মৃত্যুর আগমনের প্রতীক্ষা না করেই কুবের এক সময় জীবিত অবস্থাতেই "লম্বালম্বি শুয়ে পড়লো কফিনে টান হয়ে, কিন্তু তার আগে এক হাতে কফিনের ডালাটা তুলে বুজিয়ে দেবার আগে, ঘাড় উঠিয়ে তাকিয়ে দেখলো, "কুবের সেন" নামটা সেই পাষাণের গায়ে জ্বলজ্বল ক'রে ফুটে উঠছে।" অবশ্য নীলা এবার তাকে উদ্ধার করলো জীবন্ত সমাধি থেকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আকর্ষণও পারলো না পুনরুত্থানকে সার্থক করতে।

এখনও পর্যন্ত যাঁর একটি উপন্যাসও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, অথচ আমাদের আলোচনায় অপরিহার্য, তিনি হলেন কমলকুমার মজুমদার। তরুণ লেখকদের মধ্যে তাঁর অনুকারী স্বল্প হলেও অনুরাগী বিস্তর। তাঁর দুর্ভেদ্য ভাষাই তাঁর বিষয়ে কৌতূহলের অন্যতম কারণ। তিনি প্রাক্-বৃটিশ যুগের শুদ্ধ হিন্দু চৈতন্য নিয়ে জীবনের মূল্যায়নে ব্রতী। পরিবেশ-সৃষ্টিতেও তিনি ব্রতকথা ও লোকাচারের পুনরুজ্জীবনে সচেতন। সেই milieu-র সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে অনেক সময় অর্থগ্রহণও দুরূহ হয়ে ওঠে। যেমন "ইহারা সকলেই যে এক এবং অভিন্ন, এ শুদ্ধ সত্য, আখ্যায় নহে, কোনক্রমেই আমাদের গৃহস্থ করে নাই, কেননা, ফুল আমাদের বাধা, মেঘ আমাদের বিপত্তি, স্বপ্ন আমাদের সীসকমাত্র; কেননা আমরা কাত্যায়নী ব্রত করি নাই, 'শ্মশান করেছি হৃদি এই গীত গাহি নাই (কংকাল এলেইজি)।"

আমার আপত্তি এই কারণে নয় যে, ভাষাপ্রয়োগ এবং দৃষ্টিভঙ্গির শুদ্ধতা তিনি সর্বত্র বজায় রাখতে পারেন নি (বস্তুত তাহলে ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার করতে হয়)—এই অভিনব ভাষা তাঁর কাছে কৌশল মাত্র। জনৈক বিশিষ্ট কবির মতে, বিচ্ছিন্ন-ভাবে কমলকুমারের কিছু কিছু পঙক্তি অতি শব্দকুশলী কবিকেও ঈর্ষান্বিত ক'রে তোলে। কিন্তু যখন সামগ্রিকভাবে তাঁর এই ভাষার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে তখনই সন্দেহ হয় কমলকুমারের ব্যাহত জয়েসের অনুসারী, আসলে এটি তাঁর বর্ম। কেননা তাঁর সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ব, ঐ মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ কিছুই নতুন নয়। সুতরাং বিষয় এবং বক্তব্যের দাবিতে তিনি পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করতে পারেন না। তারাশঙ্কর-বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় সে পরিবেশ আরো সজীবভাবে উপস্থিত। ধরা যাক, বিভূতিভূষণের "অন্তর্জলি" গল্প এবং কমল-কুমারের "অন্তর্জলি যাত্রা" উপন্যাসটি। শেষোক্ত উপন্যাসে খুঁটিনাটি অনেক বিস্তৃত, প্রাচীন হিন্দু বাঙলার পরিবেশ সজীবভাবে

উপস্থাপিত। কিন্তু বিভূতিভূষণ তাঁর নিরাভরণ গদ্যে একই সত্য প্রতিফলিত করেছেন। অথচ ভাষার কণ্ডুকবিতায় কমলকুমারকে অনেক বেশি দার্শনিক মনে হয়।

এই কৌশল বহু তরুণ লেখকের অন্বিষ্ট। কমলকুমারের দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে জ্ঞান এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁদের সবার না থাকার দরুন তাঁরা নির্ভর করেন অধীত বিদ্যার ওপর; ফলে তাঁদের উপন্যাসে বক্তব্যের চেয়ে বক্তৃতা বড়ো, আবেগের চেয়ে বর্ণনা। মাটির সঙ্গে এই সংযোগহীনতাকে তাঁরা আধুনিকতার অপরিহার্য শর্ত ব'লে মনে করেন। সাধারণভাবে বাঙলা উপন্যাসের ঐতিহ্য এ'রা প্রায় সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী। আন্তর্জাতিক চৈতন্যের দাবিতে ঐতিহ্যের মূল ছিন্ন করতে চান।

ঝোড়ো যুগের মাঝে

"বাঙলা দেশের অতি-আধুনিক সাহিত্যও কি ইউরোপের ঐতিহ্য থেকে জন্মাতে পারে না?"

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তি ঠিক প্রশ্ন নয়, একটি প্রস্তাব। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, আধুনিক বাঙলা কাব্য আন্দোলন সার্থক হলেও আধুনিক সমালোচনার মতোই আধুনিক গল্প-উপন্যাসও সৃষ্টি হয়নি। সেজন্য তাঁরা তারাশংকর-বিভূতিভূষণের চেয়ে কাফ্‌কা-কামুর সাহিত্যকে বেশি ঘনিষ্ঠ মনে করেন। তিরিশের লেখকদের মধ্যে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেই তাঁরা কিছুটা আস্থাবান. জ্যোতির্ময় দত্ত লক্ষ্য করেছেন যে, "বাঙলা উপন্যাসে প্রথম অকারণে আত্মহত্যা (যার জন্য কোনো বাইরের ঘটনা যেমন দারিদ্র্য রোগ-ব্যর্থপ্রেম ইত্যাদি দায়ী নয়) প্রথম সংঘটিত হয় "পুতুল নাচের ইতিকথায়" : "স্থির বিশ্বাসে আত্মদানের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে, কিন্তু আত্মহত্যার উদাহরণ নেই। এবং য়োরোপীয় সাহিত্যেও অকারণ আত্মহত্যা নতুন। জীবনানন্দের আগে সেই উট কি কোনো ভারতীয়কে আহ্বান করেনি? ডস্টয়েভস্কির আগে কোনো য়োরোপীয়কে?

মহাভারতেও আত্মহত্যার উল্লেখ আছে : ভীষ্মের। কিন্তু সেই মহান মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, আত্মবিজয়। বিশ্বসাহিত্যে আর কার মৃত্যু এমন পরিপূর্ণ, এমন সার্থক? আর আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেও ইচ্ছামৃত্যুর দৃষ্টান্তও আছে—যাদব ও তাঁর স্ত্রীর। এই যুগ-আত্মহত্যার চিন্তা পাঠককে অবশ ক'রে ফেলে: অকারণ, নিতান্ত অকারণ এ'দের আত্মহত্যা।"

সে যাই হোক, আমাদের পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসি। অতি-তরুণদের মতে পরিতৃপ্ত প্রেমের কাহিনী রচনার দিন শেষ হয়ে গেছে. আজকের উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য মানুষের মনের আত্যন্তিক স্ববিরোধ—তার নৈঃসঙ্গ্য এবং খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।

অবশ্য সন্দীপন প্রমুখ প্রস্তাবে যতোটা বিদ্রোহী, কার্যত ততোটা নন। পঞ্চাশের লেখকদের অনেকেরই শিক্ষানবিশি পর্ব শেষ হয়নি—জীবনদর্শন তো দূরের কথা, জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের অনেকের গড়ে ওঠেনি। অনুকূল পরিবেশে উপ্ত না হলে কোনো প্রভাবই স্থায়ী হয় না। প্রসঙ্গত বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি মনে পড়ে, "লেখকের চেয়ে অনিচ্ছুক দেশপ্রেমিক আর নেই।" যে কোনো সংকট বা সমস্যা যতই দেশাতীত হোক, দেশের মাটিতে তার মূল না থাকলে অর্থহীন। তবু কবিতার ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব তাড়াতাড়ি সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু উপন্যাসে নয়। স্বর্ণলতা-রমলার ঐতিহ্য রাতারাতি আনা কারেনিনা সৃষ্টি করা, তোরঙ্গের মধ্যে বিপ্লব আমদানি করার মতোই আকাশকুসুম মাত্র। একথা আধুনিক প্রাচীন সব লেখককে মানতেই হবে যে, শুধু পঠিতবিদ্যার ওপর নির্ভর ক'রে ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না।

উদাহরণ হাতের কাছে আছে। সুরজিৎ দাশগুপ্তের বুদ্ধিজীবীদের ডাক লাগানো "একই সমুদ্রে'র পর তাই প্রকাশিত হয় "দিনরাত্রি"র মতো ভাবপ্রবণ উপন্যাস। বুদ্ধি যদি কোনো বোধে না নিয়ে যায় তবে সে বুদ্ধি বৈনাশিক। দেবেশ রায়ের "কালীয় দমন" পড়ে আমরা ক্লান্তবোধ করি এই কারণে যে এখানে দর্শনায়ন অনেক আছে, কিন্তু মৌল অর্থে সংকট নেই। অন্যদিকে মতি নন্দীর "ফেরারী" উপন্যাসের সংকট কেমন যেন আরোপিত সন্দেহ হয়। উপন্যাসের বিন্যাস চমকপ্রদ, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ বাঙালি গেরস্থ কপিলের ওপর যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব আরোপ করেছেন তা বিশ্বাস্য হয়নি। কোনো আক্রোশে নয়, নেহাতই মুহূর্তের ক্রোধের বশে কপিল বাসের একজন সহযাত্রীকে লাথির আঘাতে খুন ক'রে ফেরারী। নিজের বাড়িতে বাস করেও লোকচক্ষুর অন্তরালে যে পাশবিক জীবন তা থেকে পরিত্রাণ পেলো আরেকটি খুন ক'রে। কপিলকে অসাধারণ করতে গিয়ে লেখক পারিপার্শ্বিককে অস্বাভাবিক করে তুলেছেন। পাশবিক নৃশংসতা যতোই বীভৎস হোক, তার বিবেক নেই, সুতরাং ন্যায়-যুক্তির প্রশ্নও নেই। কিন্তু মানুষ

পশুর মতো হীন আচরণ করলেও মনে-মনে তার এই নৈতিক মূল্যবোধ দ্বন্দ্ব হবেই। ঔদাসীন্যের অর্থ এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি নয়। প্রসংগত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ফাঁসি" এবং জগদীশ গুপ্তের "কলঙ্কিত সম্পর্ক" গল্পের কথা মনে পড়ে। শেষোক্ত গল্পটি পরিবর্ধিত হয়ে গত বছর "কলঙ্কিত তীর্থে" নামক উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সে যা-ই হোক উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যাটি নৈতিক মূল্যবোধের। স্বামী খুন ক'রে কারাবাস থেকে ফিরে এলে দু-জায়গাতেই স্ত্রী-ই পারলো না সহজ হতে—একজন আত্মহত্যা করলো, আরেকজন গৃহত্যাগ করলো।

কোনো তরুণ লেখক পল্লীজীবনের পটভূমিতে উপন্যাস লিখছেন এ ঘটনাই অভিনব। অনেকে তো স্পষ্টই ঘোষণা করেন আধুনিক সাহিত্য একান্তভাবেই নগর-কেন্দ্রিক। কিন্তু শুধু এই কারণেই পূর্ণেন্দু পত্রী "পাড়াগাঁর প্রণয় প্রান্তর প্রাণ" ও "অভিভূত চাষা" এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের "কুয়োতলা" উল্লেখ্য নয়। আধুনিক গ্রামীণ মানুষ তার কল্পনার সীমা ও অসীমতা নিয়ে পূর্ণেন্দুর উপন্যাসে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত। কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের প্রেক্ষিতে পূর্ণেন্দু পত্রীর পরীক্ষা আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। কদাচ কৃত্রিম না হয়েও কত সহজে গ্রামের milieu ফোটানো যায় তিনি তার প্রমাণ। এই প্রসংগে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কমলকুমারের পরিবেশ অতীত বাঙলা আর পূর্ণেন্দু পত্রীর আধুনিক গ্রামজীবন। কিন্তু এই প্রসংগে আমি অমিয়ভূষণ মজুমদারের "চাঁদ বেনে" উপন্যাসের ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অন্যদিকে অশালীন শব্দের সংগে সুমিত মার্জিত শব্দাবলীর মিশ্রণে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন কুয়োতলায়। জীর্ণ শব্দে কী জাদু নিহিত তার প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে উক্ত উপন্যাসে।

উক্ত বিবিধ উদাহরণ থেকে এটা অন্তত স্পষ্ট যে আজকের লেখকদের সামান্য লক্ষণ যদি কিছু থাকে তা হলে সেটা হলো আবেগের অস্থিরতা এবং চিন্তায় সংহতির অভাব। আমাদের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই এই নৈরাজ্য, সুতরাং উপন্যাসে তার প্রতিফলন হবেই। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ইয়োরোপের ঐতিহ্য থেকে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি আবেদন তুলে পর মুহূর্তেই প্রশ্ন করেছেন, "আর বাঙলা দেশের কোন্ ঐতিহ্য থেকেই বা "পুতুল নাচের ইতিকথা"র মতো অস্তিত্ববাদী উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল ?" অথচ তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আধুনিক বাঙালী লেখকদের তুলনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ইউরোপীয় প্রভাব যৎসামান্য ? তরুণ লেখকদের রচনার কথাই ধরা যাক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রবল অবিশ্বাস এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচণ্ড ক্লান্তি ও ঔদাসীন্যের মধ্যে দিব্যেন্দু পালিত সার্থক প্রেমের উপন্যাস লিখেছেন। সার্থক অর্থে সফল নয়, একটি স্বতন্ত্র মূল্যরূপে প্রেম সম্পর্কে আস্থা। "বৃহন্নলা" শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস। "সিন্ধু বারোয়াঁর" পর দিব্যেন্দু পালিতের "সেদিন চৈত্রমাস" প্রকাশিত হয়েছে। গত বছর অসীম রায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নীল রাখি" প্রকাশিত হলেও তাঁর পূর্বতন সৃষ্টির তুলনায় বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

এককালে বাঙলা উপন্যাস বিষয়ে অভিযোগ ছিল আমাদের জীবনে বৃহৎ উপন্যাসের উপযোগী পটভূমি নেই। এই কলঙ্কভঞ্জনে যাঁরা ব্রতী, তাঁদের দু-একজন ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছেন এবং এঁদের আরেকজন হলেন 'জুনাপুর স্টীলে'র গুণময় মান্না—দুঃখ হয় 'লখীন্দর দিগারে'র লেখকের জন্য! উপন্যাস রচনার যেটা প্রাথমিক শর্ত পাঠযোগ্যতা তা পর্যন্ত লেখক বিস্মৃত হয়েছেন। অবশ্য ফরমায়েশি লেখা বাঙলায় পুরোদমে চলছে। ধরা যাক, চাণক্য সেনের "মধ্য পঞ্চাশ"—উপন্যাসটি ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীতের পটভূমিতে লেখা। লেখক একেবারে হিসেব ক'রে অংক কষে পাঞ্জাবি মেয়ের সংগে গুজরাতি ছেলের, বাঙালি ছেলের সংগে মারাঠী মেয়ের প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই এবং এই জাতীয় সংহতির দিনে বিশেষ উপযোগী।

এক বছরের বাঙলা উপন্যাসের সাল-তামামি শেষ হলো। বলা বাহুল্য পাঠকের অনেক প্রিয় ও পরিচিত নাম অনুল্লিখিত থেকে গেলো। কিন্তু এ জাতীয় রচনা "জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী"র দায়িত্ব পালন করতে পারে না—পরিসংখ্যানের নমুনা দীক্ষণের মতো বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালের বাঙলা উপন্যাসের ধারা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিকই এ ধরনের আলোচনা আমাদের সমাজজীবনের সামগ্রিক পটভূমি ছাড়া অসম্ভব। তবে বৎসরান্তে একবার লেখক-পাঠকের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপযোগিতাও কম নয়। তাতে হয়তো উভয়পক্ষের আত্মতৃপ্তিবোধের অনেক লাঘব হয়। জনৈক মনীষীর মতে জাতীয় বা সাংস্কৃতিক সংকটের সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা তখনই যখন সংকট এসেছে, এই বিষয়ে সবাই অচেতন। সাধারণভাবে আমাদের লেখক - পাঠক - প্রকাশকের পরিতৃপ্তিবোধ দেখলে সন্দেহ হয় আমরা বোধহয় সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন—আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ধারণা বর্তমান অবস্থায় আমিই নির্ভুল দিঙ্‌নির্দেশক। লেখক দায়ী করেন সমালোচককে, সমালোচক লেখককে, প্রকাশক পাঠককে। তার ওপর শিল্পসাহিত্যে আজ "সাফল্যের চেয়ে বড়ো সার্থকতা নেই" এই আপ্তবাক্যের জয়-জয়কার। এই আত্মম্মন্য চিন্তাধারার মধ্যে বাঙলা উপন্যাসের আরেকটি বছর অতিক্রান্ত হলো।

আলো আর আনন্দের দ্বীপ ইনসব্রুক

রামেশ্বর ভট্টাচায

জার্মান আলপসের সর্বোচ্চ চূড়ায় **দাঁড়িয়ে** পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের রঙীন **চলচ্চিত্র** তুলছি, এমন সময় পরিষ্কার জার্মান ভাষায় মেয়েলী কণ্ঠে প্রশ্ন শুনলাম—"শুনুন।" পিছন ফিরে তাকাতেই দেখি—হাসিমুখে এক যুবতী দাঁড়িয়ে। আর পাশে এক যুবক সঙ্গী। এবার তরুণীটি আরও কাছে এসে বললেন—"আমাদের দুজনের একসঙ্গে একটা ছবি তুলে দেবেন?" বলা বাহুল্য, সানন্দে রাজী হয়ে যাই। ছবি তোলার পর বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন জার্মান যুবক-যুবতী। ওঁরা সদ্যবিবাহিত, এখন মধুচন্দ্র যাপন করতে বেরিয়ে পড়েছেন। যাত্রা আরম্ভ করেছেন বটে, তবে লক্ষ্যের কোন স্থিরতা নেই। আমার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে প্রশ্ন করায় সংক্ষেপে উত্তর দিই—অস্ট্রিয়ার টিরোল প্রদেশ। স্বামী-স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান আমার সঙ্গে টিরোলের রাজধানী ইন্সব্রুকের দিকে যাত্রা করতে। জার্মান ভবঘুরে চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকায় খুব বেশী অবাক হই না। দেশেবিদেশে ভ্রমণকালে অনেক রকমের সঙ্গী পেয়েছি, কিন্তু প্রাণচঞ্চল এই নব-দম্পতীর সঙ্গ আমার মত নিঃসঙ্গ ভবঘুরের পক্ষে নিতান্তই আশাতীত ছিল। অত্যন্ত সামান্য বিষয়েও ওঁরা হাসির ফোয়ারা তুলে যে মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, তাতে আমার শুষ্ক মরুভূমি-সদৃশ হৃদয়টাও যে রোমাঞ্চের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি, তা লিখে জানাতে কুণ্ঠাবোধ করছি না।

আলপস্ আমার কাছে নতুন নয়। স্বদেশে হিমালয়ের আকর্ষণে যেমন বারবার ঘুরে বেড়িয়েছি কুলু উপত্যকা থেকে ভুটান পর্যন্ত, তেমনই জার্মানীর, ফ্রান্সের অথবা ইটালীর শৈলশ্রেণীর সঙ্গেও আমার সখ্যতা অনেকদিনের। দেশের এবং বিদেশের অনেকেই আমাদের হিমালয়ের সঙ্গে আলপসের তুলনামূলক বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন—প্রমাণ করতে চেয়েছেন একের চেয়ে অপরের উৎকর্ষ, কিন্তু লোকালয় ছাড়িয়ে যখনই একের পর এক ছোট বড় শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করেছি, কিংবা নিতান্তই একাকী দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি পাহাড়ের কোলে, স্থির করতে পারিনি ইউরোপের আলপসের সঙ্গে সুদূর **হিমালয়ের পার্থক্য কোথায়?** তবে পাহাড় পর্বতের সঙ্গে এ দেশের মানুষের যে সম্পর্ক দেখা যায়, তার তুলনা বাস্তবিকই আমাদের দেশে নেই। গমনাগমনের সুবিধার জন্যই হোক অথবা এখানকার মানুষের সদাচঞ্চল প্রকৃতির জন্যই হোক, আলপসের সঙ্গে ইউরোপের সব অঞ্চলেরই অধিবাসীর পরিচয় অত্যন্ত নিবিড়। গ্রীষ্মকালে আলপসের সর্বত্র যেমন সৌখীন ট্যুরিস্টদের ভীড় দেখা যায় নানারকমের ছোটবড় শৈলনিবাসে, শীতকালে তেমনই বরফে ঢাকা আলপসের **প্রায় সব** জায়গাতেই **অসংখ্য** লোকের সমাবেশ ঘটে, বরফের উপর স্কী খেলার জন্য। আমাদের **দেশের** হয়তো অনেকেরই জানা নেই **শীতকালীন** খেলা-ধুলা **এখানে কতখানি** জনপ্রিয়। বরফের উপর খেলা-ধুলায় অংশ **গ্রহণের** জন্য কেবলমাত্র **শীতকালেই ছুটি** উপভোগ করেন এমন লোকের সংখ্যা এ দেশে মোটেই কম নয়। বরফের উপর **শীতকালীন খেলা**-ধুলার জন্য নানারকমের **প্রতিযোগিতা** ছাড়াও অলিম্পিকের আসর জমে **আলপসে**—প্রতি চার বছরে একবার। **১৯৬৪ সালের** শীতকালীন অলিম্পিকের অনুষ্ঠান **হবে** অস্ট্রিয়ার টিরোল প্রদেশের রাজ**ধানী** ইন্সব্রুকে। শুধুমাত্র শীতের খেলাধুলার জন্যই নয়, ইন্সব্রুক নগরীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেশেবিদেশে রূপকথার মতই পরিচিত। দক্ষিণের সুউচ্চ টুক্সার পর্বত-মালা ছাড়িয়ে ইন্ উপত্যকায় সূর্যরশ্মির যে

"আলো আর আনন্দের দ্বীপ"—ইনস্ব্রুক নগরী

সাম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার নামে ইনস্‌ব্রুকের বিখ্যাত শড়ক

প্রতিফলন দেখা যায়, তার প্রথম পরিচয়ে আমি হয়েছিলাম যুগপৎ বিস্মিত এবং মুগ্ধ। মনে মনে ভেবেছিলাম—সার্থক ইনস্‌ব্রুকের অপর নাম "আলো আর আনন্দের দ্বীপ"। জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার সীমারেখা বরাবর প্রায় তিন হাজার মিটার উঁচু ফোগেলকোর চূড়ায় দাঁড়িয়ে দূরে ইন উপত্যকায় আঁকাবাঁকা নদীর দু ধারে ইনস্‌ব্রুকের যে অপূর্ব শোভা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব দিকেই সদাজাগ্রত প্রহরীবিশেষ বরফাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণী দণ্ডায়মান। এমনই এক শৈলশৃঙ্গ থেকে ইনস্‌ব্রুকের সৌন্দর্য তুলির ডগায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন মহাকবি গ্যোটে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে। ইনস্‌ব্রুকের অতুলনীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে আরও অনেকবার জার্মান মহাকবি আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ইনস্‌ব্রুক নগরীর—রচনা করেছেন এইখানেই তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ।

ইন্ নদীর নামানুসারেই ইনস্‌ব্রুকের নামকরণ হয়েছে। ইনস্‌ব্রুকের অর্থ—ইন্ নদীর সেতু। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে ইন্ নদী প্রবাহিতা। ইন্‌কে বাদ দিয়ে ইনস্‌ব্রুককে মোটেই কল্পনা করা যায় না। এখানে ইন নদী অত্যন্ত খরস্রোতা। তাও আবার স্রোতের ওপর প্রায়ই বড় বড় পাথর

ইনস্‌ব্রুকের প্রধান নাট্যশালা। সামনে দেশ-বিদেশ থেকে আগত ভ্রমণকারী

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে যত্রতত্র। এমনই একখানা বড় পাথরের উপর ছবির পোজে স্ত্রীকে বসিয়ে আমার সংগী ভদ্রলোক যখন ছবি তোলবার জন্য আমায় দূরে থেকে ইশারা করছেন, জলদ্‌গম্ভীর স্বরে পিছন থেকে প্রশ্ন শুনলাম—"মশাই, শুনছেন? আপনি কি জার্মান বোঝেন?" তাকিয়ে দেখি দীর্ঘদেহ এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই উনি এবার বললেন—"দয়া করে আপনার সংগীকে বলুন—পাথরের ওপর থেকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। একবার পা পিছলে পড়ে গেলে কয়েক কিলোমিটারের আগে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাত্র কয়েকদিন আগে এই-ভাবে এক জার্মান ইঞ্জিনীয়ার সস্ত্রীক ডুবে মারা গেছেন। পাথরের ধাক্কায় ওঁদের কারো দেহ অক্ষত ছিল না।" অগত্যা আমার সঙ্গিনীকে ফিরে আসতে হয়েছে, চমৎকার একটা পোজের ছবির মায়া কাটিয়েই। ওঁরা ফিরে এলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক অত্যন্ত অন্তরঙ্গের সুরে নিজের পরিচয় দেন। কয়েক পুরুষ ধরে ইনসব্রুকেরই বাসিন্দা। বয়স তিয়াত্তর—এখনও দৌহিত্রের সংগে প্রতিবছর শীতকালে বরফে স্কী করে নেমে আসেন পাহাড়ের উপর থেকে। আগে এখানকারই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। আমার ছবি তোলার সাজ সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—"এখানে এসেছেন কি টেলিভিশনের জন্য ছবি তুলতে?" মৃদু হেসে জানাই—"চলচ্চিত্র তোলা আমার নেশা হলেও মোটেই পেশা নয়।" মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে ওঁর কিছু সময় লেগেছিল। এবার বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেন—"ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইনস্‌ব্রুকের সংগে আপনাদের যদি এখনও পরিচয় না হয়ে থাকে, তবে সানন্দে দেখাতে পারি সেই সব দর্শনীয় বস্তু, যার জন্য ইনস্‌ব্রুকবাসী গর্বিত।" বৃদ্ধ অধ্যাপকের সে আমন্ত্রণ আমরা আগ্রহের সংগেই গ্রহণ করেছিলাম।

ইউরোপের ইতিহাসে ইনস্‌ব্রুকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আর সেই সংগে টিরোলবাসীর শৌর্যের পরিচয়। পূর্ব পুরুষদের বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে গর্বে তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধের বুক ফুলে উঠেছিল আর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ইনস্‌ব্রুকের বিভিন্ন মিউজিয়মে বহু বীরের পূর্ণায়ব প্রতিকৃতির সংগে। আলপসের একান্ত অন্তঃপুরে ইন্ নদীর উপত্যকায় কত যে সম্রাট, রাজা, কবি, দার্শনিকের পদচিহ্ন রয়েছে তারই কাহিনী গুরুগম্ভীর গলায় শুনেছি অধ্যাপকের কণ্ঠে। তবে সবার চেয়ে যাঁর বীরত্বগাথা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি হচ্ছেন আন্দ্রেয়াস্ হোফার।

আন্দ্রেয়াসের জন্ম হয় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে। এই দেশপ্রেমিকের নাম আজ টিরোলের ঘরে ঘরে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্যাভেরিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য আন্দ্রেয়াস স্বদেশবাসীকে যে আহ্বান জানান—তাতে সাড়া দেয় টিরোলের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কৃষকেরা এবং আন্দ্রেয়াসের অসম-সাহসে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে এতই অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে যে, মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে দুর্ধর্ষ ফরাসী সৈন্য টিরোল থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু ইনস্ব্রুকের সে বিজয়োৎসব বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। শ্যোনব্রুনের সন্ধিতে ইনস্ব্রুক আবার ব্যাভেরিয়ানদের

টিরোলের দেশপ্রেমিক বীর আন্দ্রেয়াস হোফারের স্মৃতিসৌধ

হাতে চলে যায়। বীর আন্দ্রেয়াস আবার যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হন। পরে জয়ের কোনই আশা না দেখে আলপসের বনে-জঙ্গলে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু সঙ্গীদের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় বন্দী হন আন্দ্রেয়াস্ ফরাসী সৈন্যের হাতে। ইতিমধ্যে আন্দ্রেয়াসের বীরত্ব-কথা এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে, সম্রাট নেপোলিয়নের সৎ-পুত্র এগিয়ে আসেন আন্দ্রেয়াসের জীবন-রক্ষার্থে। নেপোলিয়নের নির্দেশে আন্দ্রে-য়াসকে অচিরেই গুলী করে মারা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আন্দ্রেয়াস লিখে

ইনস্ব্রুকের দক্ষিণে বরফাচ্ছাদিত টুক্সার পর্বতমালা

রেখে যান—"বিদায় হে পৃথিবী, মৃত্যু আমার কাছে এতই সাধারণ যে, আমার চক্ষুদ্বয় এর জন্য কখনও আর্দ্র হয়ে উঠবে না।" প্রায় দেড় শ বছর পরে ইনস্ব্রুকের জন্য দেশপ্রেমিকেরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন—ইনস্ব্রুকের শিল্পীরা পরে তুলি দিয়ে তারই বর্ণনা এঁকেছেন—সেইসব ছবিগুলি আজ ইসেলবার্গ পাহাড়ের আন্দ্রেয়াস্ হোফারের স্মৃতিমন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

আন্দ্রেয়াস্ হোফারের সঙ্গে আর যার কথা ইনস্ব্রুকের অধিবাসীরা বিশেষভাবে স্মরণ করে তিনি হচ্ছেন অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসা। মারিয়া টেরেসার অসংখ্য স্মৃতি দেখতে পাওয়া যায় ইনস্ব্রুকের সর্বত্র। ইনস্ব্রুক সম্রাজ্ঞীর এতই প্রিয় ছিল যে, তিনি পুত্রদ্বয়ের বিবাহোৎসব একই সঙ্গে ইনস্ব্রুকে আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস—বিবাহ অনুষ্ঠানের মাঝখানেই সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং শোকাতুরা সম্রাজ্ঞী সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসব বন্ধ করে দেন আর বিলিয়ে দেন গরিব প্রজাদের মধ্যে উৎসবের যাবতীয় সামগ্রী। "আলো-আনন্দের দ্বীপে" স্নেহবৎসলা রমণীর নিরানন্দের কথা স্মরণ করেই ইনস্ব্রুকের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সড়কের নামকরণ করা হয় সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার নামে।

শহর হিসাবে ইনস্ব্রুক খুবই ছোট—এক লক্ষেরও কিছু বেশী লোকের বসবাস। জার্মানীর গ্রামাঞ্চলেও যেমন কল-কারখানা দেখতে পাওয়া যায়, অস্ট্রিয়ায় শিল্পের তেমন প্রসার নেই। ইনস্ব্রুকে কাঠের কারখানা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোন শিল্প

ইন্ নদী: পিছনে বোর্টেল্‌ঙুরফ্ পর্বতশৃঙ্গ

আলোকের ঝর্নাধারায় টিরোল প্রদেশ

নেই বললেই চলে। আলপসের অন্যান্য শৈলনিবাসের মতই ইনসব্রুকও ভ্রমণকারীদের ওপর একান্তই নির্ভরশীল। বিদেশীর প্রতি সৌজন্যের কোন অভাব নেই। অস্ট্রিয়ায় সাধারণত জার্মান ট্যুরিস্টদেরই ভীড় হয় সবচেয়ে বেশী। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার ভাষা এক। ভাষা না জানার দরুন বিদেশভ্রমণের আনন্দ যে অনেক সময় পুরোপুরি উপভোগ করা যায় না, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

জার্মানী, নেদারল্যান্ড অথবা স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় যেমন বিদেশী ভাষার চর্চা দেখা যায়, সে তুলনায় বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের লোকেরা মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না বললেই চলে। "ইংলিশ খাল" পার হলেই দেখা যাবে, ইংরিজী ভাষা ফ্রান্সে কত অপাঙ্‌ক্তেয়।

ভাষাগত ঐক্য ছাড়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানীর বিশেষ মিল দেখা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর স্বরূপ চিনে নিয়েছে অস্ট্রিয়াবাসী, এ কথা সহজেই মনে করা চলে। শুধু অস্ট্রিয়া কেন, ইউরোপের প্রায় সব দেশই মনেপ্রাণে জার্মানীকে এখনও সন্দেহের চোখে দেখে। অস্ট্রিয়ার টিরোলবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহা আজও অব্যাহত। টিরোলের যে দক্ষিণাংশ বর্তমান ইটালীর অন্তর্গত, তা পুনরুদ্ধারের জন্য টিরোলবাসীর চেষ্টার অন্ত নেই। সংবাদপত্র অথবা রাজনৈতিক সমাবেশ মারফত পরিচয় পেয়েছি, ইটালীর বিরুদ্ধে টিরোল কেন, সমগ্র অস্ট্রিয়ার অধিবাসী কতখানি ক্ষুব্ধ। টিরোলের দাবি যে নেহাতই ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। দক্ষিণ টিরোলের ভাষা জার্মান এবং সংস্কৃতি সম্পূর্ণ টিরোলীয়—সুতরাং কোন যুক্তিতেই দক্ষিণ টিরোল ইটালীর কুক্ষিগত হওয়া উচিত নয়,—টিরোলবাসীর এ যুক্তি বাস্তবিকই অখন্ডনীয়। এদিকে বৃদ্ধ অধ্যাপকের মত সমগ্র অস্ট্রিয়ার জনমত স্থিরবিশ্বাসী যে, দক্ষিণ টিরোল অস্ট্রিয়া ফিরে না পেলে ইটালী সরকারের চাপে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দক্ষিণ টিরোল সম্পূর্ণ ইটালীর বনে যাবে।

যাই হোক, শীতকালীন অলিম্পিকের আগামী অনুষ্ঠানের জন্য ইনসব্রুকে জোর কদমে প্রস্তুতি চলেছে। তবে স্টেডিয়ামের কাজ এখনও অনেক বাকী। সেদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আবার ইনসব্রুকের অতিথি হবার সাধ থাকলেও সাধ্য হবে কিনা, জানি না। তবে এবারে যে কয়েকদিন ইনসব্রুকে ছিলাম, সদ্যবিবাহিত প্রণয়ীযুগল আর অধ্যাপক পরিবারের সাহচর্য এবং আতিথ্য আমার কাছে ইনসব্রুককে কতখানি সুন্দর করে তুলেছিল, তা বোধ হয় কোনদিনই ভুলতে পারবো না।

ফেরার পথে কারভান্ডেল পাহাড় থেকে দূরে উপত্যকায় আঁকাবাঁকা নদীর দু ধারে "আলো আর আনন্দের দ্বীপ"-এর দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি, আর মহাকবি গ্যেটের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়েছে—

"নদী-পর্বত, গাছপালা আর ফুলফলের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি বুঝি শুধুই দেখতে চায়—সে মানুষকে কত ভালবাসে।"

(আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত)

এসো মৃত্যু অমেয় আকাশ

সুনীলকুমার নন্দী

স্পর্ধিত বক্ষের তলে ভেঙে গেছে অসংখ্য প্রাসাদ,
ভেঙেছে ফুলন্ত বৃক্ষ একে একে সাজানো বাগানে,
আত্মীয় বান্ধব সব ভেসে গেছে সুদূর উজানে,
অটল পর্বতচূড়া ছুঁতে তবু পারে নি বিষাদ।
সংগ্রামে আহত দেহ রক্ত ঝরে, বিরূপ নিয়তি
সাম্রাজ্য বিস্তারে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে, বেহুঁশ
হয়নি সংকল্প তবু, দুঃসাহসী দর্পিত পৌরুষ—
পারে নি টলাতে লক্ষ্য জন্মলগ্নে আগতা শ্রীমতী।

জরং যৌবন-রাজ্যে ভগ্নজানু ঘৃণা বিদূষক
সাজাতে চেষ্টার ত্রুটি নিয়তির লক্ষ সেনাদল
করে নি:—এ-রক্তক্ষয়ী ধ্বংসযুদ্ধে নিতান্ত নিষ্ফল
পরিণাম জ্ঞাত, তবু শার্দুলের বিক্রমকুহক
কিছুতে গেলো না ভোলা...অবশেষে অন্তিম নিশ্বাস
সম্বল...ওখানে ও কে?...কর্ণে আসে মৃত্যুর উল্লাস-

নিয়তি পড়ুক পায়ে, এসো মৃত্যু অমেয় আকাশ।

ছড়া

কেতকী কুশারী

যারা তোমাকে বোঝে না তারা আমাকে বোঝে না,
যারা তোমাকে জানে না তারা ভাবে বাড়াবাড়ি,
পাহাড়ী পথেও বুনো ফুল যে খোঁজে না
সে দেখে না আমাদের এই ছাড়াছাড়ি।

তুমি স্বেদকণা তুমি আমার গহনা,
ময়ূরপেখমরঙ বাহারের শাড়ি,
বহুদিন তোলা আছে, পরাই হলো না,
না হয় সে দেখা যাবে তুমি এলে বাড়ি।

সিঁড়ি-ধোয়া জল পড়ে, পাখিরা থামে না,
সকালে শিশিরভরা ডাল কত নাড়ি,
মেঘের হয়েছে পাখা, নিষেধ মানে না,
চোখের উপরে দেয় দূরদেশে পাড়ি।

যারা চিকন নাগরী হয় কখনো কাঁদে না,
মেলায় হরেক খেলা, নানা কাড়াকাড়ি,
নিয়মিত প্রতি ডাকে চিঠি যে লেখে না
সেধে ভাব করে যদি আড়ি আড়ি আড়ি।

আমরা তারপর

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

তোমাকেই নিয়ে যাবো। ওই পারে বালুর বিছানা।
দুপুরের কাছে আছে সেইখানে বহু রোদ জানা।
ছায়ার চিহ্নের মতো রোদ এসে বনের গভীরে
আমাদের নিয়ে যাবে ভালোবেসে রহস্যের তীরে।
পাখিরা ছড়াবে কতো দল বেঁধে শব্দের ঝুমুর।
তুমি হবে নিরিবিলি অনির্বাণ কামনার সুর
তারপর সেইখানে। বাতাসের দেহের আদরে
হিমের নদীর মতো আমাদের দেহ যাবে ভ'রে।

এপারে রোজই তো আসি। এখানেও রোদের মিছিল।
এখানেও উড়ে-চলা পাখি আর আকাশের চিল।
এখানেও পাশাপাশি। ঠিক যেন নদী আর কুল
তুমি-আমি। তবু যেন সব কিছু ভুল শুধু ভুল
মনে হয় এইখানে। ওপারের রোদের হৃদয়ে
আমাদের ভালোবাসা হয়তো বা যাবে আলো হয়ে।

ট্রামে বাসে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, মন্ত্রিসভায় বর্তমানে যাঁরা মন্ত্রীর পদে আসীন আছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে কলিকাতার নানা সমস্যার বিহিত বিধান করিবার জন্য পূজার পরেই মন্ত্রী করা হইবে। খুড়ো বলিলেন—"বাইরে থেকে নূতন একজনকে নিলেই অবশ্য ভালো হত, অন্তত আর একজনের বেকারত্ব ঘুচত। যাক, এই নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। যাঁরা বর্তমানে আছেন, তাঁরা পূজোর ক'টা দিন জয়ং দেহি, যশো দেহি করুন, শিকে কার ভাগ্যে ছেঁড়ে তা তো বলা যায় না!!"

লাগোস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, 'ওবা' প্রাসাদে সংবর্ধনা সভায় নেহরুজীকে ভারতের বিশিষ্ট সন্তান বলিয়া অভিহিত করা হয়। শ্যামলাল বলিল—"ধন্যবাদান্তে নেহরুজী সবিনয়ে জানিয়ে দিতে পারতেন, বিশিষ্টের পর্যায়ে ভারত-সন্তানের অভাব নেই। 'নেহরুজীর পরে কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে নেহরুজী নিজেই বলেছিলেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী রয়েছে ভারতের ঘরে ঘরে, ছোট-বড় সকলের মধ্যে। তা হলেই দেখুন, বৈশিষ্ট্যে কেউ কম যান না।"

গৌহাটিতে রুই-কাতলা প্রভৃতি বড় বড় মাছ নাকি দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। —"পশ্চিমবঙ্গেও তাই। তা নইলে কি আর শুধু চুনোপুঁটিরা ধরা পড়ে!"—সহযোগীর মন্তব্য অনেকটা ধাঁধার মত শুনাইল।

তালুকদার কমিটির সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টের একটি প্রশ্ন—'জল ঘোলা হয় কেন?' বিশু খুড়ো বলিলেন—"উত্তর জলবৎ সহজ: অনেকে যে ঘোলা না করে জল খায় না!!"

সম্প্রতি একদিন দুই বিপক্ষ দলের দুই পৌরপিতা নাকি হাতাহাতি করিয়া পৌর প্রতিষ্ঠানে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"পিতৃপক্ষে পুত্রদের পিণ্ডি চটকানোর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন আর কি!!"

এক সংবাদে প্রকাশ, চীনারা নাকি ধোলার নিকটবর্তী ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছে। "ধোলা পর্যন্ত যখন আক্রমণ চলেছে, তখন আর ধোলাই কত দূর!'—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কলিকাতায় বর্তমানে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে হিন্দী ছবিই নাকি বেশী চলিতেছে। এই সংবাদ প্রসঙ্গে আমাদের শ্যামলাল কোন এক নাট্যকারের নাটকে ব্যবহৃত যুক্তিটা শুনাইল—"ইংরেজী মোটেই বোঝে না বলে ইংরেজী ছবি এ'দের কাছে ভালো। হিন্দী কিছু কিছু বোঝে বলে হিন্দী ছবি কিছু কিছু ভালো লাগে। আর বাংলা ভালো বোঝে বলে বাংলা কোন ছবিই এ'দের ভালো লাগে না।" শ্যামলাল বলিতে লাগিল—"নাট্যকারের সঙ্গে অবশ্য আমরা একমত নই। তবে গেঁয়ো যোগীর দুরবস্থা সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।"

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল বলিয়াছেন—তৃতীয় যোজনায় আমরা খাদ্যোৎপাদনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব।—"অবশ্য ইতিমধ্যে যদি ধস নামে তা হলে শীর্ষে চড়া সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে হ্যাঁ, হরিমটর আর কে মারে!'—বলে আমাদের শ্যামলাল।

নেহরুজী তাঁর প্যারিসের সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, বর্তমানে ধনতন্ত্রের মুখের চেহারায় পরিবর্তন হইয়াছে।—"সবিনয়ে বলি, মুখ যা ছিল তা-ই আছে, পরিবর্তনটা চোখে পড়ে মুখোশের জন্য।' মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

মাছ-ধরা জাহাজগুলির জন্য রাশিয়া নাকি কিউবাতে একটি পোর্ট নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আশা করি, সংবাদটাতে 'ফিশি' কিছু নেই!!"

নেহরুজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—আমরা এক স্টেপ এক স্টেপ করিয়া আমাদের অভীষ্টস্থল (নিরস্ত্রীকরণ)-এর দিকে অগ্রসর হইতে পারি। খুড়ো বলিলেন—"তা পারি। কিন্তু ভুল পা ফেললেই যে সেটা "গুস্-স্টেপ" হয়ে যাবে!!"

নেপাল হইতে তিব্বতে চাউল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"শুধু ভাতে-ভাতের চাল, না এ দিয়ে ফ্রাইড রাইস হবে তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

দামোদরের উপর "বিদ্যাসাগর সেতু" উদ্বোধন উৎসবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ইংরেজীতে লেখা একটি প্রচার-পুস্তিকা সম্বন্ধে নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে ইংরেজীর বদলে বাংলা ব্যবহার করাই ভালো।—"আমরা মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এবং এই মতও বেশ ভয়ে ভয়েই জানাতে চাই, 'পি সি'-এর বদলে বাংলা 'প্রফুল্ল' ব্যবহারের নির্দেশও তিনি দেবেন।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডি বলেন যে, বেতার কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা এমন হওয়া উচিত, যাহা লোকে সহজে বুঝিতে পারে।—"মুখ্যমন্ত্রীর সংবর্ধনা সভাকে "ভোজসভা" বলে প্রচার করার মধ্যে এই সহজ করার চেষ্টা ছিল কিনা তা বলা শক্ত।'—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শিক্ষক মহাশয়দের সাহায্যের জন্য সরকারী পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা মঞ্জুরি সংক্রান্ত ডি, পি আই-এর চিঠিখানা নাকি হারাইয়া যাওয়াতে তাঁহারা সাহায্য ঠিক ঠিক সময়ে পান নাই।—"তাঁহারা যে কী হারাইয়াছিলেন তাহা বুঝি জানেন না!'—বলেন অন্য সহযাত্রী।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

চোদ্দ

দরজার পাশে খাসা এতটুকু জায়গা। দু-কোদাল মাটি ফেলে জায়গাটা আরও একটু না হয় উঁচু করে দেওয়া যাবে। মাথার উপরে হোগলার আচ্ছাদন। সাহেবের শোবার জায়গা। রাজ-অট্টালিকা হার মেনে যায়। খাসা হবে, সুধামুখী বলেছে ভাল।

নফরকেষ্টর যে কথা সেই কাজ। হোগলা বাঁশ পরের দিনই এসে পড়ল। আর একজন ঘরামি মিস্ত্রি। মিস্ত্রির সঙ্গে নিজেই সমস্তটা দিন জোগাড় দিচ্ছে। যত ভাবছে, ততই খুশি হয়ে ওঠে। জল খেতে একবার সুধামুখীর রান্নাঘরে গিয়েছে, বলে, বেড়ে বুদ্ধি বের করেছ তুমি। দরজার পাশে শুয়ে থেকে সাহেব আমারও দোর খুলে দেবে। কড়া নেড়ে বাড়িসুদ্ধ লবেজান করতে হবে না। একবার একটুখানি ওঠা—তারপরে ঘুমোক না পড়ে পড়ে রাত ভোর। এক পহর বেলা অবধি ঘুমোক—ঘাটের লোকের মতো কেউ খিঁচোতে যাচ্ছে না।

ছাউনি সারা হয়ে গেল। নফরকেষ্ট কখনো পিছিয়ে, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে ঘুরে মুগ্ধ চোখে দেখছে। গয়না পরিয়ে সুধামুখীকে দেখেছিল যেমন কাল। হাঁ, সত্যিকার ঘরই বটে! বসা যায়, দাঁড়ানো যায়—পুরোপুরি পা মেলে টানটান হয়ে শোওয়া যায় কিনা, তারও একটা পরীক্ষা হওয়া নিশ্চয় উচিত।

সাহেব অদূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘর বাঁধা দেখছে। নফরকেষ্ট ডাক দেয়ঃ দেখিস কী রে ছোঁড়া! কলকাতার উপর এমন একখানা আস্তানা—খাদ লাট-সাহেব পেলেও তো বর্তে যাবেন। মাদুর নিয়ে এসে লম্বা হয়ে পড় দিকি এইবারে।

ডাকছে সাহেবকে, কিন্তু ডাক নয়—মেঘ-গর্জন। গলার স্বর আর কথাবার্তার ধরণই এই। চেহারায় ও কণ্ঠে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হয়েছে। পারত পক্ষে কেউ সে জন্যে কাছে ঘেঁসে না। নানান কথা নফরকেষ্টকে নিয়ে—সে নাকি ডাকাত খুনই করেছে পনের-বিশটা, তার মধ্যে বিনা অস্ত্রে হাতের থাপ্পড়েই বা কত! দেখে তাই মনে হবে বটে। এ হেন চেহারা সত্ত্বেও নিস্ফলা ফেরে না কেবল তার হাতখানার গুণেই। আহা-মরি কী একখানা হাত—অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। হাত নিয়ে নফরার বড্ড দেমাক।

নফরা বলছে, শুয়ে পড় সাহেব, দেখব। সারাদিন রোদে খেটে চেহারা আজ আরও উৎকট। শুতে বলছে কাঁচা মাটির উপর—শুইয়ে ফেলে তারপরে কি করবে, কে জানে। ভয় পেয়েছে সাহেব, থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাধ্যপনায় নফরকেষ্ট রেগে গেল। গর্জনই এবার সত্যি সত্যিঃ হাঁ করে দেখিস কি! কথা বুঝি কানে যায় না? মাদুর নিয়ে চোদ্দ পোয়া হয়ে পড়। চিত হয়ে শো, কাত হয়ে শো—জায়গায় কুলোয় কিনা দেখতে চাই।

কিন্তু তার আগেই ভীত সাহেব বোঁ করে ছুট দিয়েছে। তবে রে—বলে নফরকেষ্ট ছুটল। রোখ চেপেছে—ধরে ঐখানে শোয়াবে। এখনই, এই মুহূর্তে। তার স্বভাব—কাজ করলে ফলাফলটা চাই নগদ। সুধামুখী রান্নাঘরে তখন। ছুটতে ছুটতে সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ে। বারে কোলের পাশটিতে। চোখ বাইরে তাকিয়ে সুধামুখী নফরকেষ্ট দেখতে পায়।

ঐ তো মানুষ সুধামুখী—কালো চামড়া ঢাকা হাড় কয়েকখানা। রেগে গেলে ভিন্ন মূর্তি। নফরকেষ্ট হেন দৈত্যদানা কেঁচো একেবারে। সুধামুখী হুমকি দিয়ে ওঠেঃ কী হয়েছে?

নফরকেষ্ট মিনমিনে গলায় বলে, বেলা রান্নাঘরে সেই গোল হয়ে শুত। দিন কেন একভাবে কষ্ট করবে? পা ছড়িয়ে একবার শুয়ে পড় বাবা। কুলোলে জায়গা বাড়িয়ে দিতে হবে।

সুধাময়ী রায় দিল : সে দেখব। সরে পড় এখন তুমি। ছেলে পেয়ে গেছে।

সাহেব রান্নাঘর থেকে সরে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে নফর চলে সুধামুখী ডাকলঃ একটা কথা শুনে এদ্দিন যা হয়েছে হয়েছে, চালচলন ফেল এবারে। ভদ্দর হয়ে বেড়াবে। এই ভূতের মূর্তি দেখে ছেলে ভয় আমরাই আঁতকে উঠি, সে তো ছেলেমানুষ

নফরকেষ্টর মনে বড় লাগল। বলে, এমনধারা হয় কেন, সেটা তো একটু ভেবে দেখবে! হোগলা এক বোঝা মাথায় করে পোলের ঘাট থেকে এনেছি। সারাক্ষণ তারপরে ঘরামির সঙ্গে

টানা। এসব তো চোখে পড়বে না, কার্তিটারই দোষ হয়ে গেল।

সুধামুখী বলে, তোমার কথাবার্তা-গুলোও ঠেঙা-মারা গোছের। সেই জন্যে কেউ দেখতে পারে না। নিজের বউও না। নরম হয়ে মিষ্টি করে বলতে শেখ এবার থেকে।

রাগে নফরার ব্রহ্মতাল্ অবধি জ্বলছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। আপন মনে গজর-গজর করছে: ঘরে নবকার্তিকের উদয়—মদনমোহন বেশে ফুলোট-বাঁশি বাজিয়ে আমায় কথা বলতে হবে।

সুধামুখী জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ নফর?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, নরমশরম হয়ে খুব মিঠে সুরেই বলব, এবার থেকে। মনে মনে মহলাটা দিয়ে নিচ্ছি।

ঐ যে বলে দিল সুধামুখী, সত্যিই এর পরে নফরকেষ্ট সাহেবের সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলে না। নফর হেন লোকের পক্ষে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা

এবং কথায় কথায় হাসির ভাবে দাঁত বের করা—সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। ওর চেয়ে দশ ঘা লাঠি খাওয়া অনেক ভাল। তবু কিন্তু হাসতে হয় এবং গলা দিয়ে মোলায়েম আওয়াজও বের করতে হয়। না করে উপায় কী?

একদিন দৈবাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে। বর্ষার রাতদুপুরে ভিজে এসে তুরতুর করে কাঁপছে। দরজায় ঘা দিচ্ছে—ডেকে ডেকে সারা হল, সাহেবের সাড়া নেই। অথচ বৃষ্টির ছাট আসে বলে মাথার উপরের হোগলা ছাড়াও জায়গাটার চতুর্দিক দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। খেয়াল করে নিজেই সব করেছে, কেউ বলে দেয়নি। আহা, ভিজে যায় ছেলেটা—ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারে না! আর অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে নফরকেষ্ট দেখ ডাকাডাকি করে মরছে—জেগেও পড়েছে সাহেব, কিন্তু কম্বল আর চট গায়ে জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। আলস্য লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করে না। তারপর নিতান্ত যখন দোর ভাঙাভাঙি শুরু করল, উঠে হুড়কো খুলে দেয়। নফরকেষ্ট অমনি ঠাস করে মারে এক চড়।

চড় মেরেই বিপদ বুঝেছে। শব্দ বেরুনোর আগেই সাহেবের মুখে হাত চাপা দিল। কাতরাচ্ছেঃ কাঁদিসনে বাপধন আমার। আমি এর শতেক গুণ মারগুতোন খেয়ে থাকি। সুধামুখী অবধি ছাড়ে না, সে তো দেখেছিস। মেরে মেরে হাত ব্যথা হয়ে যায়, তবু এক ফোঁটা চোখের জল বের করুক দিকি। সামান্য এক চড়ে গলে পড়বি তো কিসের পুরুষমানুষ তুই?

পুরুষালির গৌরবে, এবং চোখের উপর নফরকেষ্টর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখে সাহেব চোখের জলটা মুছে ফেলে, কিন্তু ফোঁপাচ্ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, কেন মারবে আমায় তুমি? কী করেছি?

ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেছে, বলছি তো! ঘাট মানছি। তোর বাপ থাকলে সে মারত না? ধরে নে ভাই—আমি তোর বাবা। বাপের মতনই করি তোর জন্যে। শোওয়ার জায়গা ছিল না, পথে ঘাটে শুয়ে বেড়াতিস—গাঁটের পয়সা খরচা করে সেই সঙ্গে গতরে খেটে ঘর বানিয়ে দিলাম। মারই দেখছিস, ভাল কাজগুলো একবার তো ভেবে দেখবি! পুরুষ হয়ে জন্মেছিস, কত জায়গায় কত মার খেতে হবে। একটা চড়ে ঘাবড়ে গেলে হবে কেন?

মুখের কথায় কতদূর চিঁড়ে ভিজবে, ভরসা করা যাচ্ছে না! লেন-দেনে আসাই নিরাপদ। নফরা বলে, বেশ তো, যেমন মেরেছি রসগোল্লা খাওয়াব তোকে। সেদিন হয়েছিল, কাল সকালে আবার একদফা। যতবার মারব ততবার খাওয়াব, এই কথা রইল। সকাল বেলা দোকানে নিয়ে যাব। না নিই তো কুক ছেড়ে তখন কাঁদিস। কান্না তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এখন মুলতুবি রেখে দে।

পরদিন বেরোবার মুখে নফরকেষ্ট সত্যিই সাহেবকে ডাকছেঃ চল—

মনমেজাজ রীতিমত ভাল। সাহেবের উপর বড় খুশি, চড় খাবার কথা সে সুধামুখীকে বলে নি। বলে, মনে পড়ছে না? রসগোল্লা খেতে হবে যে দোকানে গিয়ে। আমায় এত ডরাস কেন বল দিকি? বাপকে যখন চিনিসনে, সে বাপ তো আমার মতোও হতে পারে। চেহারা খারাপ হলেই বাপ বাতিল করে দিবি?

হাত ধরে টান দেয়। লোহার সাঁড়াশি ঐ হাতখানা—সাহেবের নরম কবজি বুঝি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। আদর করে ধরেছে—রাগ করে ধরলে কী কাণ্ড না জানি!

ময়রার দোকানে গিয়ে উঠল। ময়রা পিতলের গেলাসে জল দিয়ে শালপাতা বের করে। নফরকেষ্ট হাঁ-হাঁ করে ওঠেঃ পাতায় কী ছেলেখেলা হবে গো! ওতে কটা মাল ধরবে? রস গড়িয়ে বাইরে যাবে। মালসা বের কর দিকি—দু-জনের দুটো মালসা।

সাহেব সভয়ে বলে, ওরে বাবা! পুরো মালসা খেতে হবে?

নফর সদয়ভাবে বলে, তুই ছেলেমানুষ, দশ-বারোটা না হয় কমই নে আগে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম—যত মার তত রসগোল্লা। এই লোভেই তো বেঁচে থাকা।

ময়রাকে ডেকে বলে দেয়, ছোট মালসা দাও ছোট মানুষটাকে। আমায় বড়। রস-নিংড়ে দিও না, তাহলে অর্ধেক দাম। রসগোল্লা খেয়ে নিয়ে বাড়তি রসে চুমুক দেব।

সাহেবকেই সালিশ মানেঃ কী বলিস তুই—অ্যাঁ? পয়সার মাল চেটেপুঁছে খাব। বড্ড কষ্টের পয়সা রে—

ময়রা মালসা ধুচ্ছে ওদিকে গিয়ে। সেই ফাঁকে নফরকেষ্ট মনের কথাটা বলে নেয়ঃ বয়স হয়ে চেহারা বেঢপ হয়ে গেছে একলা রোজগারের আর তাগত নেই। তুই আমার ডেপুটি হবি সাহেব? ডেপুটি বলিস কি খোঁজদার বলিস—একেবারে সোজা কাজ। ঘোরপ্যাঁচ যেটুকু সে রইল আমার ভাগে। সুধামুখীকে বলবিনে কিন্তু—খবরদার, খবরদার! কাউকে বলবি নে, মা-কালীর কিরে। তোকে যদি কাজের মধ্যে পাই বাপে বেটায় আমরা ধুন্দুমার লাগিয়ে দেব। যাবি?

রসগোল্লা এসে পড়ায় পরামর্শটা চাপা পড়ল। সময় নষ্ট না করে নফরকেষ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। কী তাজ্জব কাণ্ড—সাহেব নিজে খাবে, না নফরের খাওয়া দেখবে তাকিয়ে তাকিয়ে? তাই বটে, অমন পাথুরে গতর এমনি হয় না। রসগোল্লা সোজাসুজি সে গালে নেয় না। বাহার হয় না বোধকরি তাতে। ছুঁড়ে দেয় উপরমুখো, হাঁ করে তারপর গালে ধরে নেয়। পল্লীগ্রামে নাটা-

খেলা দেখা আছে—কিম্বা গ'ুটিখেলা? অবিকল সেই বস্তু। গোড়ায় একটা করে ছ'ুড়ে দিচ্ছে, হাত এসে গেলে তখন দ'ুটো তিনটে চারটে অবধি। শেষটা এত দ্রুত, যে নিরিখ করা যায় না চোখে। লম্বাপানা একটা বস্তু তীরবেগে খানিকটা উপরে উঠে ভেঙে এসে মুখগহবরে ঢ'ুকছে এইমাত্র বোঝা যায়। কোঁত-কোঁত করে গিলে খাওয়ার আওয়াজ—গালের মধ্যে বস্তুগুলো তিলেক দাঁড়াতে দেয় না, গিলে ফেলে পরবর্তীর জায়গা খালি করছে।

খেয়ে ঢেকুর তুলে তার উপরে ঢকঢক করে গেলাস দুই-তিন জল চাপান দিয়ে তখন সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়ে। হতাশ ভাবে বলে, নাঃ, কোন কাজের নোস তুই। পরের পয়সায় খাবি, তা-ও পেরে উঠলিনে। নিজের পয়সায় হলে তো বাবুভেয়ের মতন আধখানা কামড়ে রেখে দিতিস। খাটতে হবে তোর পিছনে—কাজ শেখাতে হবে, খাওয়াও তো শেখাতে হবে দেখছি।

রাস্তায় নেমে সেই নূতন কাজের আরও ভাল করে হদিস দিয়ে দিচ্ছে: আজকের দিনটা থাক, কাল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব—উ'? পয়সাকড়ি তোর আমার কাছে না থাক, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে ঘ'ুরছে। ধনদৌলতের দেবতা কুবের যত হাঁদারামকে বেছে বেছে টাকা দিয়ে দেন, মুটে হয়ে তারা পকেটে পকেটে বয়ে বেড়ায়। সেইগুলো ভাণ্ডার আমাদের—খুশি মতন তুলে নিই। নিয়ে তারপরেই ফুর্তিফার্তি, ময়রার দোকানে রসগোল্লার মালসা নিয়ে বসা।

কিন্তু পরদিন সকালে উল্টো কাজ এসে চাপল ঘাড়ে। ইস্কুলে দেবেই সাহেবকে, সুধামুখী ঠিক করে ফেলেছে। নিজেই সেই ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। সুধামুখীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলে তো সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দেবে। গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মতো খবরাখবর জেনে এল শুধু। হেডমাস্টার বলে দিয়েছেন, হাঙ্গামা নেই, অভিভাবক ছেলে নিয়ে আসুন, ভর্তি হয়ে যাবে।

নফরকেষ্টকে বলে, তুমি নিয়ে যাও।

ওরে বাবা!

সুধামুখী গরম হয়ে বলে, খরচ করতে হবে না—শুধু একটু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। তাই তুমি পারবে না?

করুণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নফর-কেষ্ট বলে, ভয় করে আমার।

কিসের ভয়?

দৈত্যসম মানুষটার ইস্কুল-পাঠশালে বিষম ভয়। শৈশবে তাকেও কিছুদিন যেতে হয়েছিল। একদিন গুরুমশায় এমন ঠেঙানি দিলেন, তারপরে আর কখনো পাঠশালা মুখো হয়নি। সেই আতঙ্ক রয়ে গেছে। খুনে মানুষ লোকে রটনা করে বেড়ায়। ভয়ডর বলতে কেবল এক পাঠশালার গুরুমশায়। ঐটে বাদ দিয়ে নফরকেষ্টকে যমের বাড়ি যেতে বল, হাসতে হাসতে সে চলে যাবে।

সুধামুখী চোখ পাকিয়ে সজোরে দিল ধাক্কা তার পিঠের উপর: যাও বলছি—

কী উপায়—চাকা গড়িয়ে দিলে গড়গড় করে চলবেই—নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল। ভয়ের বস্তু ইস্কুল-পাঠশালাই কেবল নয়—সুধামুখীও। সুধামুখীই বেশী। যাচ্ছে, আর গজর গজর করছে: দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে ইস্কুলে গিয়ে, এ'টোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে!

নফরকেষ্টর সঙ্গে ছেলে ছেড়ে দিয়ে সুধামুখী নিশ্চিন্ত নয়। মানুষটার হাড়হদ্দ জেনে বসে আছে, ইস্কুল বলে তার ইচ্ছামতো কোন একখানে নিয়ে না তোলে। নিজে চলল পিছু পিছু। ইস্কুলের কাছাকাছি এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নজর রাখে।

কতক্ষণ পরে দুজনে বেরিয়ে আসছে। নফরকেষ্ট হাসিতে ডগমগ। চোখ তুলে দূর-বর্তিনী সুধামুখীকে এক নজর দেখে নিয়ে চাপা গলায় সাহেবকে উৎসাহ দিচ্ছে: ঘাবড়াসনে। ইস্কুল এক বেলা বই তো নয়! বিকেল আর সন্ধ্যাটা পুরো হাতে রইল। যত ভাল ভাল কাজ সন্ধ্যার পরেই। কপালে লেগে গেল তো রোজগার মুঠোয় ধরবে না। আমি তো বলি ভালই হল, দুটো পথই তোর দেখা হয়ে যাচ্ছে। কোনটায় বেশী মুনাফা এখন থেকে বুঝেসমঝে রাখবি। কলম ধরবে না কাঁচি ধরে? বড় হয়ে যখন নিজের ইচ্ছেয় সবকিছু হবে, পছন্দমতো বেছে নিস।

সুধামুখী প্রশ্ন করে, হয়ে গেল?

নফরকেষ্ট এক গাল হেসে বলে, ছেলের বাপ হয়ে এলাম। পাকা খাতায় রেজেস্ট্রি-করা বাবা। ছেলে শ্রীগণেশচন্দ্র পাল, পিতা শ্রী[illegible] পাল।

সুধামুখী রাগ করে বলে, তুমি বাপ হতে গেলে কোন বিবেচনায়? সাহেবের বাপ মস্ত বড় মানুষ, ছেলের চেহারা দেখে যে না সে-ই বলবে। তুমি বড় জোর সে বাপের সহিস-কোচোয়ান।

নফরকেষ্টর মুখের হাসি নিভে গেল। বলে, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করল। বাপের ঠিক নেই, সে ছেলে ইস্কুলে ভর্তি করে না। তখন বলতে তো হবে একটা-কিছু!

সুধামুখী বলে, এমনি তো মুখ দিয়ে তড়বড় করে লম্বা লম্বা কথা বেরোয়। ভাল লোকের নাম একটা বানিয়েও বলতে পারলে না?

নফরকেষ্ট বলে, মুখে বলে দিলে হয় না, খাতার উপর সই করিয়ে নেয়। বাপের নাম বললাম, নবাব সিরাজদ্দৌলা কি সেনাপতি মোহনলাল। তখন খোঁজ পড়ত, কোথায় সেই সিরাজদ্দৌলা?—এসে সই মেরে যাক! নফরকেষ্ট পাল নাম দিয়ে সাংগে সাংগে হাংগামা চুকিয়ে এলাম। কাজটা বড় অন্যায় করেছি!

সুধামুখীকে চুপ করে যেতে হয়। এ ছাড়া উপায় ছিল না বটে! পাকেচক্রে বাপ হয়ে গিয়ে নফরের স্ফূর্তি খুব। সুধামুখী। কেবলই দমিয়ে দেয়, ক্ষেপিয়ে মজা দেখে। ইস্কুলে সাহেব ধাঁ-ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্লাসের সেরা ছেলে। সগর্বে সুধামুখী বলে, এ'টো-পাতের ধোঁয়া বলতে, এ'টো-পাত কি ধূপ-চন্দন বোঝ এবারে। তুমি এখনো নিজের নামে "ফ"-এর জায়গায় "ঋ" লিখে বোসো। কোন সুবাদে সাহেব তোমার ছেলে হতে যাবে? ওর বাপ মস্তবড় পণ্ডিত।

নফরকেষ্ট তর্কে হারবে না : ও লাইন আমি যে বাতিল করে এসেছি। আমার যে লাইন, সাহেবকে সেইখানে ফেলে তবে বিচার হবে। হাত সাফাইয়ের কাজে নফরা পালকে কেউ যদি কখনো হারাতে পারে, সে আমাদের এই সাহেব। কেষ্টঠাকুর গোকুলে বাড়ছে।

হাত নিয়ে বড় দেমাক নফরকেষ্টর। অনেক দিন পরের এক ব্যাপার বলি, ফুল-হাটায় জগবন্ধু বলাধিকারীর বাড়ি। কাজের গল্প করছে নফরা—যেমন তার অভ্যাস। ভানুমতীর ভোজবিদ্যা কোথায় লাগে সেই সব কাজের কাছে!

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে আছে। সাহেব তো আছেই। তাজ্জব হয়ে শুনছে সকলে। বলতে বলতে নফরকেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বলে, চাঁদিরূপোয় বাঁধিয়ে রাখবার মতো এই হাত। সুড়সুড় করে লোকের পকেটে ঢুকে যায়। সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসে পুকুরের মাছ জালে ছেঁকে তোলার মতন সর্বস্ব মুঠোর ভিতর নিয়ে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে বের করো দিকি আমার মতন এমনি একখানা হাত।

কখন এসে বলাধিকারীও দাঁড়িয়েছেন—হাসির শব্দে টের পাওয়া গেল। হাসতে হাসতে বলেন, হাজার লক্ষ রয়েছে নফর-কেষ্ট। তোমার হাত কোন ছার সে তুলনায়। টাকাটা-সিকেটা তোমার দৌড়, লাখ লাখ কোটি কোটির নীচে তাদের নজর নামে না। কৌশলও পরমাশ্চর্য—অংগ ছুঁতে হবে না, যার পকেটের যত টাকা ঠিক ঠিক বেরিয়ে কারিগরের কাছে চলে যাবে।

এ হেন গুণী ব্যক্তিদের কথা সবিস্তারে শুনতে কার না লোভ হয়। উৎকর্ণ সকলে। জগবন্ধুও বললেন অনেক কথা। কিন্তু টাকা কড়ি ঘটিত গোলমেলে সব ব্যাপার। মুর্খ-লোকের বুঝবার নয়। এইটুকু বোঝা গেল, দুনিয়া জুড়ে ছিনতাই। খিদে খিদে করে লোকে কাঁদছে—সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি খেটেও খিধে মারবার জোগাড় করতে পারে না। আবার ভিন্ন এক দল পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ক্ষিধে নেই বলে কাঁদছে, এক চামচ দুধ খেলেও পেটের মধ্যে গিয়ে পাক দেয়। (খিধে কিসে হয়, সেই জন্য কান্না।)

গয়নায় কাজ দিচ্ছে যাই বলো। বউয়ের কাছ থেকে মাহাত্ম্য বুঝে এসেই নফরকেষ্ট সুধামুখীকে কিনে দিয়েছে। নানা রকম তুকতাক চলে এদের মধ্যে—মন্ত্র আছে, কবচ আছে, শিকড়বাকড় আছে। ভূতপেত্নী তাড়ানোর রক্ষা-কবচের কথা সেই বলেছিল নফরকেষ্ট, আবার উল্টো রকমের সম্মোহন—কবচও রয়েছে ভূতপ্রেত কাছে টানা যায় যার গুণে। আঁধার রাত্তিরেতে প্রেমিক রূপে ঘোরাফেরা করে, ভূত বই তারা অন্য কিছু নয়। কন্ধকাটা-ভূত গো-ভূত—তেমনি হল প্রেমিক-ভূত। সম্মোহন-কবচ রাঙা সুতোয় বাম বাহুতে ধারণ করতে হয়। কাজল-পড়া অর্থাৎ মন্ত্রপূত কাজল দু-চোখে পরতে হয়। শিকড়বাকড়েরও নানা রকম বিধি। কিন্তু সকলের সেরা দেখা যাচ্ছে গয়না। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, কাজ পেতে দেরি হয় না।

পথচারীরা ইদানীং দেখছে খুব চোখ মেলে—দেখে সুধামুখী মানুষটা অথবা মানুষটার গা-ভরা গয়না, সঠিক বলা যায় না। নফরকেষ্টর টোপ ফেলে মাছ ধরার কথাটা এখানেও খাটে। গয়না হল টোপ, সুধামুখী বড়শি। কালো বড়শি লোভনীয় টোপে ঢেকে দিয়েছে। সেই টোপে পাঁচটা

মানুষ হয়তো দৃষ্টির ঠোক্কর দিয়ে সরে গেল, একটা কি গিলবে না শেষ পর্যন্ত? তা হলেই হল। সুধামুখী তখন গর্বভরে পা ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরবে। বড়শি-গাঁথা প্রাণীটা একটু দূরে দূরে পিছন ধরে যাচ্ছে, পালাবার জো নেই।

একদিন ভারি একটা সৌখীন লোক ফাঁদে পড়ে গেল। সুধামুখী যথারীতি গলির মোড়ের অবছা-অন্ধকার তার নিজস্ব জায়গাটিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লোকটা গট-গট করে সোজা কাছে চলে আসে। এবং পিছন পিছন নয়, পাশাপাশি কথা কইতে কইতে গলি পার হয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে। সুধামুখীর চেয়ে বয়সে ছোট বলেই মনে হয়। আর বাহারখানাও সত্যি দেখবার মত। দু-হাতের দশ আঙুলের ভিতর আটটা আঙুলে আংটি, বুড়ো আঙুল দুটো কেবল বাদ। কিন্তু সে ক্ষোভ পুষিয়ে নিয়েছে অনামিকা ও মধ্যমায় দুটো করে আংটি পরে। সবসুদ্ধ মিলে পুরো ডজন।

দরজার পাশের ঘরটুকুতে সাহেবের

এ সময়টি থাকার কথা নয় তবু কি কারণে ছিল। সুধামুখীর সঙ্গে লোকটা ঘরে গেল এসেন্সের উগ্র গন্ধে চারি দিক মাতিয়ে দিয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে, গন্ধ তবু বাতাসে ভাসে। কী খেয়াল হল, সাহেবও উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে এগোয়, উঁকি দেয় জানলা দিয়ে। সুধামুখী বাবুটিকে বিছানায় নিয়ে বসিয়েছে। সুতো আর পুঁথিতে রংবেরঙের কারুকার্য-করা একটা বড় পাখা—সেই পাখা হাতে সুধামুখী বাতাস করছে। রাজা বাহাদুরের কথা, অনেক দিন পরে সাহেবের মনে পড়ে যায়। তাঁকে এমনি ধারা খাতির করত। এই পাখা তারপরে আর বের হতে দেখেনি।

দুয়োর খুলে এক সময়ে সাহেব ঘরে ঢুকে পড়ে। সৌখীন বাবুটির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার সেই আশ্চর্য ভঙ্গিতে ডাকে, বাবা—

রাজা বাহাদুর ফৌত, কিন্তু বাবা বলার কৌশলটা তারপরেও চলেছে কিছু কিছু। কাজও হয়। সুন্দর ছেলের মুখে "বাবা"—ডাক শুনে ভদ্রলোকে মেজাজের মাথায় সিকিটা আধুলিটা গুঁজে দেয় ছেলের হাতে। হাত নেড়ে কেউ বা সরিয়েও দেয়ঃ যা, এখন চলে যা তুই। যা দেবার এইখানে রেখে যাব। সুধামুখীর হাতে সত্যিই বাড়তি কিছু ধরে দিয়ে যায়। আবার এমনও আছে, কিছুই দিল না। যাঃ, যাঃ—বলে তাড়া করে।

আজকে অনেক বছর পরে সাহেবের কী রকম হল—বাবুটির গা ঘেঁষে আবদারের সুরে ডাকে : বাবা গো—

বাবু খিঁচিয়ে উঠল : এটা কোত্থেকে জুটল রে?

সুধামুখী পরিচয় দেয় : ছেলে আমার—

তোমার ছেলে আমায় কি জন্যে বাবা বলতে আসে?

সুধামুখী বলে, সকলের বাপ দেখে ওরও বোধ হয় বাবা-ডাক মুখে এসে যায়। বড়-ঘরের ভালমানুষ দেখলে ডেকে বসে।

খোশামুদিতে বাবুটি ভুলবার পাত্র নয়। রাগে কাঁপছে। ভয় পেয়ে সুধামুখী কাতর কণ্ঠে বলে, ধর্ম সম্পর্কও তো পাতায় লোকে, ধর্মবাপ থাকে। ধরে নিন তাই।

রাখো চালাকি। প্যাঁচে ফেলানোর মতলব। বাবা বলিয়ে শেষটা খোরপোশের দায়ে ফেলবে—

খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরে হুংকার দেয় : ছোট মুখে বড় কথা। বাপ হই আমি তোর—উঁ?

ঠাই-ঠাই করে সাহেবের মুখে মারছে। থামে না। মারতে মারতে মেরে ফেলে নাকি? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব ছুটে পালায়। ছেলের পিছু পিছু সুধামুখীও ছুটল।

নিশ্চিন্তে বাবু এবার সিগারেট ধরায়। মুখের মধ্যে ধোঁয়া জমিয়ে আস্তে আস্তে কায়দা করে ছাড়ছে। গোল গোল আংটি হয়ে ধোঁয়া উপরে উঠে যায়। বাবু দেখে তাই সকৌতুকে, আর আয়েসে পা দোলায়।

সাহেবের হাত ধরে নিয়ে সুধামুখী আবার এসে ঢুকল : দেখুন বাবু, কী অবস্থা করেছেন দেখুন একবার চেয়ে। গালিগালাজ নয়, বাবা বলে ডেকেছে। যে ডাক শুনে শত্রুমানুষ অবধি আপন হয়ে যায়—

কেঁদে ফেলে বলতে বলতে। আংটির পাথরে সাহেবের চোয়ালের উপর অনেকখানি ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে। বাবু মনে মনে বেকুব হয়েছে। তাচ্ছিল্যভরে বলল, চামড়ায় ঘষা লেগেছে একটুখানি। একেবারে ননীর পুতুল বানিয়েছ, টুসকির ভর সয় না—সেটা আমি বুঝি কেমন করে?

একটা টাকা সাহেবের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, যা বললি বললি। বার দিগর আর বাঁদরামি করবি নে। খুন করে ফেলব। চলে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—

তবু কিন্তু মানুষটির আনাগোনা বহাল হল এই থেকে। আংটির বাহার দেখে সকলের মুখে মুখে আংটিবাবু নাম। আসে খুব কম—দু-একটা গান শুনে বালিশের তলায় কিছু রেখে দিয়ে চলে যায়।

আংটিবাবুর আঘাতের দাগ অনেক দিন ছিল। রানীর কাছে, বিন্তে ও দলবলের কাছে সাহেব দাগ দেখিয়ে দেমাক করে বেড়ায় : রাগী মানুষ কিনা আমার বাবা—মারের চোটে কেটে গেল। এ কাটা হীরের আংটির। হীরের কাচ কাটে সামান্য চামড়া কেন কাটবে না? বাবার দু-হাতের আট আঙুলে বারোটা আংটি—সমস্ত হীরের।

তা রেগে গেল কেন, কি করেছিলি তুই?

আজগুবি প্রশ্নে অবাক হয়ে সাহেব বলে, বড়লোক-মানুষ যে—রাগ হবে না? যার যত টাকা, তার তত রাগ। ঘরের লোক বাইরের লোক চাকর-দাসী সকলকে মেরে বেড়ায়। আমি একেবারে আপন—আমায় তো মারবেই।

নফরকেষ্টরও কানে গেল। সাহেবকে বলে, তাই বটে! আমার হাত গাল না ছুঁতেই তেরিয়া হয়ে উঠিস, রসগোল্লা খাইয়ে সামাল দিতে হয়। ও-মানুষটা মেরে আধ-জখম করল, সেই আহ্লাদে ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস। ও হল কিনা আংটিবাবু, আঙুলে আংটি—আমার নেড়া-হাতে শুধুই হাড়।

বুকের ভিতর থেকে গভীর এক নিঃশ্বাস মোচন করে বলে, একলা তুই কেন, দুনিয়া জুড়ে এক রীতি। বড়লোকের ধামা ধরে সবাই। বিয়ে-করা ধর্মপত্নীকে টোপ ফেলে ফেলে টেনে আনলাম—যেই না শুনেছে মাইনে কম, সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী।

ব্যঙ্গের সুরে কেটে কেটে বলে, ও সাহেব, তোর রাজাবাহাদুর-বাবার শাল ছিঁড়ে কবে ফালা-ফলা হয়ে গেছে, আংটি-বাবার মারের দাগও তো মিলিয়ে এলো—আবার কোন বড়লোক বাবা ধরবি, মারে-পোয়ে দেখ ভেবেচিন্তে।

শুনে সাহেবের রাগ হয় না, বড় কষ্ট হয়। ভয়ংকর দৈত্য-দেহের ভিতর থেকে এক অসহায় ভিখারী যেন বড় কান্না কাঁদছে। বলে, বড়লোক তুমি হও না কেন! গালগপ্প তো খুব—হেনো করতে পারি, তেনো করতে পারি, ধনদৌলত মুঠো মুঠো তুলে আনতে পারি—

পারি—। চকিতে সাহেবের মুখের দিকে

তাকিয়ে ঘাড় ফুলিয়ে নফরকেষ্ট বলে, আলবৎ পারি। তুই সহায় হ, পারি কিনা চোখের উপর দেখাচ্ছি। ভাগত আছে, মা দক্ষিণা-কালীর দয়াও আছে—

যে দিকে কালীমন্দির, নফরকেষ্ট সেই দিকে ফিরে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। বলে, আমরা নিমিত্তমাত্র, দয়াময়ী করেন সব। বাবুভেয়েদের পকেটের টাকা হাত তুলে এনে দেন। কাজের মধ্যে মায়ের নাম স্মরণ করবি, এই একটা কথা কোন দিন ভুলিস নে।

সাহেব বলে, কি করতে হবে, আমায় শিখিয়ে দাও।

নফরকেষ্ট খুশিতে তার পিঠ ঠুকে দিল: গোড়ায় গোড়ায় সকলকে যা করতে হয়—খোঁজদারির কাজ। এই দিয়ে হাতে-খড়ি। মক্কেল ধরে মালের হদিস দিবি, কারিগরে কাজ হাসিল করে আসবে। বিপদের ঝুঁকি নেই, খোঁজ দিয়েই তো তুই সরে পড়েছিস কাঁহা-কাঁহা তেপান্তর। ঘরে গিয়ে হয়তো বা ঘুমুচ্ছিস. ঘুম ভাঙিয়ে বখরা ঠিক হাতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সাচ্চা কাজকর্ম আমাদের এসব লাইনে—জুয়াচুরি-ফেরেব্বাজি নেই। নেমে দেখ্. দিন গেলে নির্ঝঞ্ঝাটে দু-তিন টাকার মার নেই।

সাহেবের থুতনির নীচে হাত রেখে মুখখানা এপাশ-ওপাশ করে দেখে। ছবি দেখার মতন। বলে, দু-তিন টাকা কি বলছি—তোর রোজগার গুণতিতে আসবে না। রাজপুত্তুরের রূপ নিয়ে জন্মেছিস—এই নাক-মুখ-চোখ, এই গায়ের রং! রোদে রোদে চালের দানা কুড়িয়ে বিধাতার-দেওয়া এমন জিনিস তুই বরবাদ করছিলি। হায়, হায়, হায়! আর সেই পোড়া বিধাতা আমার বেলা কি করল! এমন একখানা উদ্ভট চেহারা—পারলে নিজের মুখে নিজেই থুতু ফেলতাম। আহা-মরি চোঙ হাত নিয়েও নুলো হয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

দম নিয়ে আবার বলে, চেহারা দেখেই মানুষ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বিশ হাত ছিটকে পড়ে। কী করে কাজকর্ম হয় বল্। বলে, আমি নাকি খুনে ডাকাত। যারা বলে, তাদেরই খুন করতে ইচ্ছে যায়। ডাকাত হতে পারলে এই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে দারোগা-কনেস্টবলের তাড়া খেয়ে ঘুরি! সেই জন্যেই এত করে বলছি, বিধাতার-দেওয়া মূলধন নষ্ট হতে দিসনে বাবা। মহাপাপ। ভাঙিয়ে খা. কাজকারবারে লাগা, রাজ্যেশ্বর হয়ে যাবি।

পরবর্তী কালে সাহেব অনেক ভাল ভাল গুরু-ওস্তাদ পেয়েছে। কিন্তু পয়লা গুরু বলতে গেলে নফরকেষ্ট। হাতের কাজ বহুৎ-আচ্ছা, চেহারার দোষে তবু কিছু করতে পারে না। চেহারা দেখে মক্কেল আগেভাগে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সাহেবকে বড় যত্নে হাতে ধরে শেখায়। শিক্ষাদীক্ষা গুণজ্ঞান সমস্ত দিয়ে যাবে।

বলে আমার বউয়ের গর্ভের ছেলে হলেও এর বেশী করতাম না। সে বড় রূপসী—ছেলে হলে তোরই মতন রূপ হত। তার গর্ভের নোস. তা-ই বা জোর করে কে বলবে! আমার ঘর করতে চায় না, বাপের বাড়ি পড়ে থেকে নানান রকম বদনাম—

তর্কাতর্কি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে, অত হিসাবের কাজ কি—তুই ছেলে, খাতায় লেখা বাপ আমি এখন। ইস্কুলের তিনটে বাঘা বাঘা পণ্ডিত-মাস্টার সাক্ষি। বাপে-ছেলেয় আমাদের নতুন কাজকারবার। ছেলে খোঁজদার, বাপ কারিগর। দিগ্বিজয় করে বেড়াই গে এবার চল্।

কিন্তু সাহেব সম্পর্কটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেসে বলে, কাজকারবার কানায় আর খোঁড়ায়—

সে কেমন?

পাঠ্যবইয়ে গল্পটা আজই সে নতুন পড়ে এসেছে। কানা দেখতে পায় না, খোঁড়া হাঁটতে পারে না! কানার কাঁধে খোঁড়া চেপে বসল—দেখতে পাচ্ছে এবার, হাঁটতেও পারছে।

সাহেব বলে, আমাদেরও তাই। আমার চেহারা, তোমার হাত। দুজনে মিলে এক-মানুষ হয়ে গেলাম।

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১৬ ॥

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। বলি : কিন্তু মালকো আর রঙিলা কি এখনও ঘটুলে ফিরে আসেনি?

ডাক্তারবাবু চটে ওঠেন : আপনি তো বেশ লোক মশাই! নানান ফ্যাকড়া তুলে গল্পে বাধা দেবেন—আর যেই আমি অন্য প্রসঙ্গে আসব অমনি ধমক লাগাবেন?

আমি নিরীহের মতো বলি : সে কি কথা? ধমক দেব কেন? আমি শুধু বলতে চাইছি কারাংমেটা ঘটুলে এতক্ষণে বোধ হয় মালকো আর রঙিলা পেঁৗছে গেছে।

: না, পেঁৗছায় নি।—প্রতিবাদ করেন ডাক্তারবাবু। তার আগেই অন্যদিকে মোড় ঘুরল ঘটনাচক্র। ওরা সবাই মিলে অপেক্ষা করছে। রাত্রে ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মালকো আর রঙিলা এলেই সান্ধ্য আসর শুরু হবে। শিরদার চয়নকে বলে : আমরা ঠিক করেছি, মালকোকে এবার বেলোসা করে দেব।

চয়ন অবাক হয়ে বলে : কেন রঙিলা কি দোষ করল?

শিরদার হেসে বলে : রঙিলা বেলোসা থাকলে তোমাকে কোতোয়ার করব কেমন করে?

চয়ন আরও অবাক হয়ে বলে : কেন তাতে কী অসুবিধা?

ওরা হেসে ওঠে একসাথে। শিরদার বললে : কী বোকা হে তুমি! তুমি কোতোয়ার হলে রঙিলা কখনও বেলোসা থাকতে পারে?

: কেন পারে না তাই তো জিজ্ঞাসা করছি এতক্ষণ।

: সে যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তুমি যে তার লামহাদা।

অনেকক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয়নি চয়নের। তারপর বলে : কে বললে?

: কে আবার বলবে। সবাই বলছে। গাইতা নিজেই বলেছে। আর তাই যদি না হবে তা হলে তুমি কাবোঙ্গা থেকে এলে কেন?

চয়ন বুঝতে পারে কোথায় একটা প্রচণ্ড ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সে বলে : তোমাদের রঙিলা-বেলোসা কি আয়েতু গাইতার মেয়ে?

: তুমি জানতে না?

: আর মালকো? মালকো কার মেয়ে?

: মালকো বেলোসার ছোট বোন। আয়েতুরই ছোট মেয়ে।

চয়ন উঠে পড়ে। বলে : দাঁড়াও শুধিয়ে আসি গাইতাকে।

তখনই বেরিয়ে পড়ে সে। একটু পরেই রঙিলা আর মালকোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে দুজন মোটিয়ারী। কিন্তু চয়ন আর ফেরে না। রাত বাড়তে থাকে। ব্যাপার কি? চার পাঁচ 'রেলো' কেটে গেছে মনে লাগে। (এক দফা 'রেলো রেলো' নাচে মিনিট পনের সময় লাগে। সময়ের মাপকাঠিও ওদের নাচের ছন্দে বাঁধা।) চিন্তিত হল শিরদার। এত দেরী হয় কেন? শেষে ওরা কজনে নিজেরাই খোঁজ নিতে গেল আয়েতুর কাছে। আয়েতু বলে : হ্যাঁ, চয়ন এসেছিল তো, কথাবার্তা বলে আবার ঘটুলেই ফিরে গেল। সে তো অনেকক্ষণ!

: ঘটুলে ফিরে গেছে! কই না তো!

খোঁজ খোঁজ। ছোট্ট গ্রাম কারাংমেটা। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা গাঁয়ের সব-কটা ঘরই খোঁজা শেষ হয়ে গেল। নেই, কোথাও নেই চয়ন। কোথায় গেল একটা জলজ্যান্ত মানুষ? চিতাবাঘে ধরল না তো? বহু রাত্রি পর্যন্ত ওরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। মশাল জেলে আয়েতুও বের হল সন্ধানে। ভিনগাঁয়ের ছেলেটা প্রথম রাত্রেই গেল বাঘের পেটে! এই ছিল বড়া-দেওয়ের মনে?

রঙিলা আর মালকো দুজনেই স্তব্ধ! কারাংমেটা গাঁয়ের কেউ আর সেরাত্রে ঘুমালো না। নিশ্চয় বাঘে খেয়েছে ছেলেটাকে। রাত্রি প্রভাত হলে দেখা যাবে, তার রক্তাক্ত মৃতদেহ গাঁয়ের প্রান্তে পড়ে আছে কোন ঝোপের ধারে। কি জবাবদিহি করবে আয়েতু—যখন কাবোঙ্গা থেকে কোণ্ডা আসবে খবর পেয়ে?

রাত্রি প্রভাত হল। দিনের আলোয় আবার

নতুন করে খোঁজার পালা শুরু হল। আশ্চর্য, মানুষটা যেন হাওয়ায় উপে গেছে। বাঘে খেলে রক্তের দাগ তো দেখতে পাওয়া যেত—তাও পাওয়া গেল না কোথাও।

সন্ধ্যার দিকে সকল সন্দেহের নিরসন হল। কাবোঙ্গা থেকে এল কোন্ডা আর পাদরু। তাদের দেখে মুখ শুকিয়ে গেল আয়েতুর। কিন্তু তাদের কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে শেষ পর্যন্ত।

ক্ষমা চাইতে এসেছে ওরা। রঙিলা নয় মালকোর জন্যে লামহাদা খাটতে চায় চয়ন।

আয়েতু বলে : সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার ছেলে কোথায়?

: পাগলাটে ছেলে! ভুলটা বুঝতে পেরেই সে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয় কাবোঙ্গার দিকে। রাত যখন 'ভ'য়ষা হিকং'—মোষের মতো কালো তখন সে গিয়ে পে'ছায় কাবোঙ্গাতে। মাঝরাতে আমরা তো তাজ্জব।

আয়েতু বলে : পাগলাটে নয়, বদ্ধ উন্মাদ তোমার ছেলে! এদিকে আমরা তো ভেবে সারা। একটা মানুষ একা এমনভাবে

রাতের বেলা জঙ্গল পাড়ি দেবে তা কি করে আন্দাজ করব? পথে যদি বাঘ ভালুকের দেখা পেত?

পুত্রগর্বে গম্ভীর কোন্ডা বলে: তাহলে বাড়ি পৌঁছাতো ভয়ষা হিকতে নয়, সেই যার নাম 'কর্কুসানা-পোহার'। জানোয়ারটা মেরে তো আর জঙ্গলে ফেলে রেখে যেত না —টানতে টানতে নিয়ে যেত কাবোঙ্গায়!

আবার খানা-পিনার আসর বসল। আয়েতু এ নতুন প্রস্তাবেও রাজি। রঙিলাই হোক আর মালকোই হোক এমন ছেলেকে জামাই করতেই হবে। আপত্তি হল কিরিংগোর। ব্যবস্থাটা বুড়ি কিরিংগোর পছন্দ হয়নি, বললে—রঙিলা হল 'আকোইন',—বড় বোন, তার বিয়ে না দিয়ে মালকোর বিয়ে দিবি কিরে?

আয়েতু চুপি চুপি পিসিকে বলে: সেটাই তো হবে অজুহাত। রঙিলার বিয়ে ঠিক না হলে তো আর মালকোর বিয়ে দিতে পারি না। সুতরাং ছেলেটা বছরের পর বছর লামহাদা খাটবে আমার ক্ষেতে। বিয়ের কথা তুললেই বলব—আগে রঙিলার বিয়েটা হয়ে যাক!

কিরিংগোর পিচুটিভরা চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে ওঠে, বলে: তাই বল্! তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি!

মালকোর মা আখালী বলে: কিন্তু রঙিলার কথাটা ভেবে দেখেছ কি? সে কেমন করে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবে?

আয়েতু বিরক্ত হয়ে বলে: যেমন করে আর পাঁচজনে মুখ দেখায়। ভুল ভুলই। আর রঙিলার সঙ্গে তো ওর গিদা-আতোর হয়নি, হয়েছে মালকোর সঙ্গে।

আখালী বলে: তুমি কেমন করে জানলে?

: আমাকে জানতে হয়। আমি হচ্ছি গাঁয়ের গাইতা। সব খবর জানতে হয় আমাকে। রঙিলার সঙ্গে আতোর হয়েছিল ওদের কোতোয়ারের।

মালকোর মায়ের কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়—তা কেমন করে হবে? তা হলে রঙিলার মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন?

আয়েতু তাকে সান্ত্বনা দেয়: রঙিলার বিয়ের ব্যবস্থাও করে ফেলছি। দেখ্ না তুই!

যে নিষ্ঠাভরে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন দেবশিশু কচ তেমনি একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় চয়ন খাটতে থাকে আয়েতুর খামারে। সেই কুঁকড়ো-ডাকা ভোরে উঠে বেরিয়ে যায় মাঠে, বলদ জোড়া নিয়ে। লেগে যায় ক্ষেতের কাজে। লাঙল দেয়, বীজ ছড়ায়, নাড়া তুলে ফেলে, সার দেয়, ধান কাটে। আয়েতু যখন মাঠে আসে ততক্ষণে সূর্যদেব উঠে পড়েন তেঁতুলগাছের মাথায়। এতদিন আয়েতু নিজেই সব কাজ করত। ওদের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা আমাদের মতো নয়। ও দেশে ভাগ-চাষী নেই, মজুর-চাষী নেই। জমির অভাব কি? ফলে, লাঙল যার জমি তার। তাই দিনমজুর পাওয়া ভার। এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে বুড়ো। সব কাজের দায়িত্ব এখন চয়নের ঘাড়ে। জওয়া-উন্ডানায়, জল-খাবার বেলায় ওর জন্যে শুকনো লাউয়ের খোলায় জওয়া অথবা মান্ডিয়া নিয়ে মাঠে আসে—না মালকো নয়, রঙিলা। মালকোর সঙ্গে চয়নের দেখা-সাক্ষাতই হয় না। এ গাঁয়ে এসে পর্যন্ত একটি লহমার জন্যও সে নির্জনে সাক্ষাৎ পায়নি মালকোর।

সন্ধ্যার পর ছাগলছানাকে উঁচু মাচাঙে তুলে রাখা হচ্ছে—সকালে ঝাঁপ খুলে দেওয়া হবে
[মাড়িয়া গ্রাম]

এ দিক থেকে দেবশিশু কচের সাধনাকে সে ম্লান করে দিয়েছে। সে শুধু দূর থেকে দেখেছে মালকোর ছায়া, নেপথ্য থেকে শুনেছে তার কণ্ঠস্বর। লামহাদার সঙ্গে তার ভাবী পত্নীর দেখাসাক্ষাৎ হওয়া, কথা-বার্তা বলা নিয়মবিরুদ্ধ। তাতে সমাজে বদনাম নয়। ঘটুলের ভিতরে বা বাইরে ভাবী বধূ লামহাদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে না, তাকে জোহার পর্যন্ত করতে পারে না। আইন তাই বলে বটে, কিন্তু ব্যতিক্রমটাই এ ক্ষেত্রে আইন। জীবন-যাত্রার নানান প্রয়োজনে একই গৃহবাসী দুটি মানুষের প্রতিদিন বারে বারে মুখো-মুখি সাক্ষাৎ হয়। আর সে সাক্ষাৎ যে প্রতিবারই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে হবে, এমন কথা স্বীকার করে নিলে অতনুর মহিমা থাকে কোথায়? লামহাদার পক্ষে কাজের মরুভূমিতে ঐ তো একটিমাত্র মরূদ্যান। ভাবী পত্নীর পক্ষেও লামহাদার প্রতি অনুকম্পা জাগা স্বাভাবিক। যে মানুষটি ভিনগাঁ থেকে এসেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার জীবন-যৌবনের মূল্য মেটাচ্ছে তার প্রতি অনুকম্পা জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুই কি অনুকম্পা? নিশ্চয়ই নয়। সচরাচর মেয়ের মা সামাজিক বিধিনিষেধের কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যায়, অন্তত ভুলে গেছে বলে ভান করে। আহা ছেলেটি উদয়াস্ত খাটছে ওর সংসারে—দিনান্তের একটিমাত্র মুহূর্ত যদি ওর ক্ষণিক মাধুর্যে ভরে ওঠে তবে তাতে কার ক্ষতি। শুধু লক্ষ্য রাখে যেন গোপন সাক্ষাতকালে ওরা বাড়াবাড়ি না করে।

চয়নের দুর্ভাগ্য। ব্যতিক্রমটা তার ক্ষেত্রে নিয়ম হল না, হল ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রমটাই। মুরিয়া সমাজের আইনের মর্যাদা ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে কি না তা দেখে নেবার জন্য যেন উঠে-পড়ে লাগল রঙিলা। বাঘিনীর মতো পিঙ্গল চোখ তার। সেই দুটি চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত। কুঠার হাতে থাকলে যে চয়ন চিতাবাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পায় না, কারাংমেটা থেকে নিশাসমাগমে যে একা রওনা হতে পারে জঙ্গলের পথে সেই তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক চয়ন সর্দার পর্যন্ত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, ঐ পিঙ্গলনয়না মেয়েটির সান্নিধ্যে। রঙিলা যেন কোন মায়াবী, যেন মন্ত্রতন্ত্রের অধিকারিণী ডাইনী সে। মালকোকে সে

...আগলে রাখে। মালকো এমনিতেই ...ক, তারপর রঙিলার প্রতিবন্ধকতায় ... মালকোর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায় না। ... মাঝে দু-একবার চকিত দৃষ্টিপাত ... নগদ কিছুই পায়নি বেচারি। কিন্তু সেই ক্ষণিক চাহনিতেই অনুভব করেছে মালকোর মনোভাব। সে দৃষ্টি প্রেমে ...জ্বল, মমতায় কোমল। আখালী মাঝে মাঝে সুযোগের সৃষ্টি করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সতর্ক-প্রহরী রঙিলার চোখ এড়িয়ে কিছুই হবার উপায় নেই। অনাচার সে সইবে না কিছুতেই। 'জওয়া-উন্ডানা'র দায়িত্ব সেজন্যে রঙিলা নিজেই গ্রহণ করেছে।

'জওয়া-উন্ডানা'র ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আমাদের গ্রাম্য জীবনেও এ নাটিকার অভিনয় হয়ে থাকে। আমাদের দেশের চাষীভাইও মাঠে যায় সেই কাক-ডাকা ভোরে। দেড় প্রহর বেলায় কৃষকবধূ আসে মাঠে। গামছা দিয়ে মাথা-মুখ মুছে গাছ-তলায় একটু জিরিয়ে নিতে বসে কৃষক। চাষীবধূ সযত্নে খাবারের পুঁটুলির মুখ খুলে বার করতে থাকে খাবার। চাষীভাই ততক্ষণে পুকুরের জলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে বসে। ঘুঘুর একটানা ঐক্যতানে তাপদগ্ধ পৃথিবীর দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে কিসের শিহরণে। কৃষক-জীবনের এই মধ্যাহ্ন-নাটকের বিষয়বস্তু যে শুধু জান্তব আহার তা হলপ করে বলতে পারি না। ওরই ফাঁকে ফাঁকে চলে দাম্পত্য বিশ্রম্ভালাপ। মুড়কির মিষ্টরসেও যদি চাষীভাইয়ের পরিতৃপ্তি না হয়, জনবিরল আলের আড়ালে হঠাৎ যদি এক চুমুক মিষ্টতর মধুর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে পড়ে—তবে দোষ দেব কাকে? আর তাতে যদি কৃষকবধূ চারিদিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করে আঁচল সামলে উঠে পড়ে বলে : এমন করলি কাল থিকে আমি আসবনি বাপু, পুঁটিরে খাবার দে' পাঠায়ে দেবনে!—তা হলে সেটাকেও নাটকের পালা-বদল বলতে পারি না।

মুরিয়া কৃষকের জীবনেও 'জওয়া-উন্ডানা'র সময়টা অমনি মাধুর্যরসে ভরা। কৃষকের বধূ অথবা চেলিকের মোটিয়ারী

লাউয়ের শুকনো খোলায় 'জওয়া' নিয়ে আসে কিম্বা 'ঘাটো' অথবা 'মাণ্ডিয়া'। তরল-ভাত। বিরলপত্র বাবলা গাছের ছায়ায় মধুর রসের পরিবেশন ঘটে। সচরাচর লাম-হাদার জীবনে এই মুহূর্তটিই সবচেয়ে মধুর। ভাবী শ্বাশুড়ীর এই এক অজুহাত। বাড়িতে আর কে আছে যে খাবার নিয়ে যাবে? চয়নের ক্ষেত্রে এখানেও ব্যতিক্রম। ওর জওয়া নিয়ে আসে রঙিলা। মালকো নয়।

চয়নও প্রতিশোধ নিয়েছে। মুরিয়া সমাজ শুধু লামহাদা আর ভাবী বধূর সম্পর্কেই বিধিনিষেধের বেড়া তোলেনি। স্ত্রীর বড় বোনের সংগেও, অর্থাৎ 'আকোইনের' সংগেও সম্পর্কটা নিষেধের। স্ত্রীর ছোট বোনের সংগে ফস্টি-নস্টি চলতে পারে—বড় বোনের সংগে চলে না। আমাদের সমাজে যেমন বৌদির সংগে একটা কৌতুকের সম্বন্ধ পাতানো চলে, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সংগে কথাবার্তাই বলা চলে না, ওদেরও এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা ঐ রকম। স্ত্রীর বড় বোনের সংগে আকোইনের সংগে, সম্পর্কটার নাম ওদের ভাষায় 'মুরিয়াল নেহানা' অর্থাৎ 'নিষেধের-সম্বন্ধ'—ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক। অবশ্য আকোইনের সংগে কথা বলায় আপত্তি নেই —তাকে স্পর্শ করা বারণ। তা ছাড়া বিয়ে হলে তবেই এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য, তার আগে নয়। কিন্তু চয়ন অতি কঠোরভাবে এ নিয়ম মানতে শুরু করল—বিয়ের আগেই। রঙিলার সংগে বাক্যালাপও বন্ধ করে দিল ঐ অজুহাতে। সে লক্ষ্য করেছে রঙিলার চোখ দুটো ওর উপর পড়লেই জ্বলতে থাকে।

আগেই বলেছি কারাংমেটা ঘটুল নয়া-ঘটুল, জোড়িদার ঘটুল নয়। চয়ন এ গ্রামে আসার কিছুদিন পরেই পর্যায়ক্রমে একদিন রঙিলার দান পড়ল চয়নের মাসানিতে রাত্রি যাপনের। চেলিক-মোটিয়ারীর সম-অধিকার বিষয়ে ঘটুলের দৃষ্টি সদাজাগ্রত। কোন চেলিক বলতে পারে না অমুক মোটিয়ারীকে নিয়ে আমি শোব না। ওদের ঝগড়া হলে, আড়ি হলে সেটার স্থায়িত্ব দান-ফিরে-আসা পর্যন্ত। চয়ন কিন্তু দৃঢ়ভাবে আপত্তি করল। রঙিলা মালকোর বড় বোন; দু দিন পরেই সে হবে চয়নের 'আকোইন'—তাই তার আপত্তি। রঙিলা জ্বলে উঠেছিল এ অপমানে—কিন্তু ঘটুলের বিচারসভায় রায় দেওয়া হল চয়নের স্বপক্ষে। দিল শিরদার।

সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারেনি রঙিলা। এই ছেলেটির সংগে তার ঠোকা-ঠুকির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রথম দর্শনের অশুভ মুহূর্ত থেকেই। রঙিলা হলপ করে বলতে পারে প্রথম সাক্ষাতে সে চয়নের দৃষ্টিতে দেখেছিল একটা মুগ্ধ আর্তি! এমনভাবে কেউ তার দিকে তাকায়নি মুরিয়া সমাজে। নারানপুরে অথবা কোকা-মেটায় অনেকবার অনেক পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে ধারাস্নান করেছে—কিন্তু তারা কেউই মুরিয়া নয়। রঙিলা বুঝতে শিখে-ছিল তার পিঙ্গল চুল, কটা রঙ, নীলচে চোখ দেখে মুগ্ধ হবার মতো পুরুষ মানুষও আছে দুনিয়ায়। তারা মুরিয়া জাতির জানা দুনিয়ার বাইরের মানুষ। তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় হাটে-বাজারে, মাড়াইয়ে। শহুরে মানুষের সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওর। হৃদপিণ্ডে দোল দিয়ে উঠেছে জিপসী মায়ের রক্ত। নিজেকে সামলাতে পারেনি রঙিলা। সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সে প্রতিশোধ নিয়েছে ঘটুলের চেলিক দলের উপর। ঘটুলের অলিখিত আইনে বলে—মোটিয়ারী নিজস্ব ঘটুলের বাইরের কোন পুরুষের মাসনিতে বসবে না। কিন্তু রঙিলা সে আইনের মর্যাদা রাখেনি। কেন রাখবে? ওর নারীত্বকেই কি তারা প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে? রঙিলা জানে, বার বার মাড়াইতে এসে সে বুঝেছে, ওর চির-উপেক্ষিত রূপের দিকেই শহুরে মানুষগুলো বারে বারে ফিরে ফিরে চোরা-চাহনি হানে। হাজারটা মুরিয়া মেয়ের মধ্যে তার একটা বিশিষ্ট আসন আছে শহুরে মানুষের বিবেচনায়। রঙিলা জানে, তার নিজের দেহে মুরিয়া রক্ত নেই। ঐ শহুরে মানুষদের রক্তের সংগে তার একটা সম্পর্ক আছে। তাই সেই মেলার মানুষদের পূজার নৈবেদ্যকে সে সবসময় প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। বিদ্রোহী মেয়েটি তাই সবার দৃষ্টির অগোচরে গোপনে এভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে সমাজের অবিবেচনার বিরুদ্ধে।

চয়নই রঙিলার জীবনে প্রথম আদিবাসী পুরুষ, যার চোখে সে দেখেছিল তেমনি মুগ্ধ দৃষ্টি। ভেবেছিল, যত বাধার সৃষ্টি করতে পারবে, ততই উদগ্র হয়ে উঠবে চয়ন। কাবোংগা শিরদারের দুর্বার তারুণ্যের প্রতি বেশী আস্থা স্থাপন করেছিল রঙিলা। তাই চয়নকে এড়িয়ে কাবোংগার কোতোয়ারের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল। আশা করেছিল, চয়ন তা সইবে না, চয়ন তাকে ছিনিয়ে নেবে। আঘাতে আঘাতে মানুষটাকে জর্জরিত করতে চেয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল খরজিহ্ব ভিনগাঁয়ের মেয়েটির কাছে বাক্-যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চয়ন চাইবে প্রতিশোধ নিতে—বাহুযুদ্ধে। বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে সে পলাতকা রঙিলাকে বন্দী করে ফেলবে, কঠিন আলিঙ্গনের নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে দিতে চাইবে রঙিলার বুকের পাঁজরা!

সে-সব কিছুই হয়নি। দুরন্ত চয়ন শিরদার রঙিলাকে হতাশ করেছে। ভেড়ুয়ার মতো সে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে মেনী-মুখো মালকোর আঁচলের তলায়। চয়নের সে কাপুরুষতাকে রঙিলা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। তার উপর পুংগার মিছানার ভুল বোঝাবুঝি! চৈতদাণ্ডার উৎসব শেষে চয়ন জানাল, কারাংমেটার গাইতা আয়েতুর মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। কোণ্ডা ডেকে পাঠিয়েছে বিণ্ডোকে।

বিণ্ডো—কোতোয়ার। বিণ্ডো চেনে গাইতার মেয়েকে, বললে—হ্যাঁ দেখেছি। তারপর মুখটা কানের কাছে এনে বলেছিল, আরেতুর মেয়ে হচ্ছে কারাংমেটার বেলোসা। কোণ্ডা খুশী হয়েছিল। পাশাপাশি গাঁয়ের শিরদার-বেলোসার বিয়ে! রাজযোটক!

এসব ভিতরের কথা, রঙিলা জানে না। তার ধারণা, তাকে অপমান করতেই চয়ন এমনটা করেছে। তাকে রসাতলে আছড়ে ফেলবে বলেই তুলেছে 'পোড়ো ভূমের' ঊর্ধ্বলোকে! অরণ্য পর্বতের আদিম নারী! ওদের হৃদয়বৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। প্রেমে পড়লে ভালও বাসতে পারে নিবিড়-ভাবে—গাঁর্দা-আতোরের পথে যদি কোন বাধা এসে দাঁড়ায়, তাকে সরিয়ে দিতে হাত রক্তাক্ত করে বসতে দ্বিধা করে না। আবার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতি-আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে আচমকা। বন্য ওদের প্রকৃতি। চয়ন সতর্ক হয়, সাবধান হয়। শরাহত বাঘিনী জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলে যেমন সজাগ দৃষ্টি মেলে জঙ্গলে ঘোরা-ফেরা করতে হয়, চয়নের ভাবখানাও তেমনি। রঙিলা এখন আহত ব্যাঘ্রী। নখ-বিস্তার করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে সে এখন।

চয়ন ভাবে আর ভাবে। রঙিলা এতটা আহত হল কেন? সে কি সত্যিই ভাল-বেসেছিল চয়নকে? নাকি এ শুধুই খালসার দাহ, কামনার দহন? সে কি সত্যিই আশা করেছিল, চয়ন তারই জন্য লামহাদা খাটতে আসছে? সেই আশাতে ছাই পড়াতেই কি সে এমনভাবে ক্ষেপে উঠেছে? কিন্তু অমন অদ্ভুত প্রত্যাশাই বা করল কেমন করে রঙিলা? হ্যাঁ, চয়ন নিজের কাছে স্বীকার করে, ঐ মেয়েটাকে দেখে তার কেমন যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল সব। ওর পিঙ্গল চুল, নীল চোখ আর সাদা চামড়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল আর-একটি প্রায় ভুলে-যাওয়া মেয়েকে। যার জন্য ওকে চাবুক খেতে হয়েছিল একদিন।

চয়নের কৈশোর-কালের এ-অভিজ্ঞতার কথা অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম অনেক-দিন পরে গুপ্তেজীর কাছ থেকে। ডাক্তার পিল্লাই জেনেছিলেন আমার কাছ থেকে। গুপ্তেজী কিন্তু আমাকে সব কথা বলতে পারেননি। কারণ তিনি নিজেও জানতেন না সবটা। শুধু তিনি কেন, চয়ন নিজেও জানতে পারেনি তার অপরাধটা কি, কেন তাকে চাবুক খেতে হয়েছিল।

চয়নের বয়স তখন অল্প। ওদের গাঁয়ের সামনে একদিন অদ্ভুত-দর্শন একদল মানুষ এসে তাঁবু গাড়ল। তাদের গায়ের রঙ উন্তালা-ফুলের মতো লালচে-সাদা। যবের শীষের মতো সোনালী চুল, বর্ষণ-শেষের নির্মেঘ পোড়ো ভূমের মতো নীল চোখের তারা। অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করত। সরকারী লোক এসে গাইতাকে বলে গিয়েছিল যে, ওরা ভাল লোক, এসেছে ছবি তুলতে; কারও কোন ক্ষতি ওরা করবে না। গাইতা চয়নকে লাগিয়েছিল সেই বিদেশীদের সেবা করার কাজে। ওদের জন্য চয়নকে জল নিয়ে আসতে হত, ওদের পিছন-পিছন যন্ত্রপাতি ঘাড়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হত। ঐ অদ্ভুত-দর্শন মানুষগুলির মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। কত তার বয়স, তা আন্দাজ করতে পারেনি; কিন্তু প্রথম দিনেই সে দেখেছিল, মেয়েটি অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার নিরাবরণ পাথরে-কোঁদা বলিষ্ঠ দেহটার দিকে!

মেমসাহেবের খিদমৎ করতে হত। মেম-সাহেবের ছিল ছবি আঁকার বাতিক। যেদিন আকাশে মেঘ থাকত, সেদিন সাহেবরা যন্ত্রপাতি বার করত না। সেদিন ঐ মেয়েটি ছবি আঁকতে বের হত সারাদিনের জন্য। চয়ন বয়ে নিয়ে যেত ছবি আঁকার সরঞ্জাম, টিফিন-ক্যারিয়ার, জলের বোতল, সাবান-তোয়ালে। মেমসাহেব বসে ছবি আঁকতেন আর চয়ন বসে থাকত গাছের ছায়ায়। বেশী দূরে যেতে সাহস পেত না—দিনের বেলাতেও নারাঙ্গীর ওখানটায় ভালুক আসে জল খেতে। শুধু মেমসাহেব যখন স্নানে নামতেন নারাঙ্গীর ধারে কাপড়-জামা ছেড়ে চয়ন তখন সরে আসত একটা বড় পাথরের আড়ালে। তখনও সে অরক্ষিত মহিলাটিকে একা রেখে দূরে যেত না। নদীর ধারেই, পাথরের ওপিঠে বসে বসে শুনত জলের শব্দ।

স্নান শেষে মেমসাহেব ওর নাম ধরে ডাকত। ও বেরিয়ে এলে ওর হাতেও দিত নানান রকম অদ্ভুত খাবার। কেউ কারও ভাষা জানে না, তবু আকারে-ইঙ্গিতে বেশ কাজ চলে যেত ওদের।

একদিন চয়ন পাথরের আড়ালে বসে শুনছে জলকেলির আওয়াজ। আপনমনে বাঁশী বাজাচ্ছে সে। হঠাৎ শুনতে পেল মেমসাহেবের আর্ত-চিৎকার! মুহূর্তে টাঙ্গিটা তুলে নিয়ে ছুটে গেল চয়ন নদীর কিনারায়। নিশ্চয় কোন বন্য জন্তু!

ভুল হয়েছিল বেচারির। জন্তু নয় মানুষ! বন্য নয় সুসভ্য মানুষ! কিন্তু সেখানেই শেষ নয়: —চয়নের মনে হয়েছিল, তার মেম-সাহেবকে সে লোকটা আক্রমণ করেছে বুঝি। ওর মুরিয়া রক্ত মাথায় উঠে গেল। ও আক্রমণ করে বসল আগন্তুককে।

তারপর যে কি হল, চয়নের ভাল মনে নেই। অপরাধটা তার কি হল—তাও সে বুঝতে পারেনি। সে শুধু বুঝেছিল, ব্যাপারটা লজ্জাকর। পারলে সে আদ্যপ্রান্ত ঘটনাটা সকলের কাছে গোপন করে যেত—কিন্তু সাহেবের চাবুকের দাগটাকে লুকাবে কেমন করে? আর সবচেয়ে সে অবাক হয়েছিল এ-কথা ভেবে যে, মেমসাহেব কেন বাধা দিল না। চয়নের সাহায্য যদি সে নাই চাইবে, তাহলে অমন চিৎকার করে উঠেছিল কেন?

হয়তো এই ঘটনার পর থেকেই চয়ন মেয়েমানুষ জাতটাকেই এড়িয়ে যেতে শুরু করে। কিম্বা হয়ত ওর মনের একটা আজন্ম সংস্কার—নারীজাতির প্রতি অনীহা এতে দৃঢ়মূল হল এই মাত্র। চয়নের মনের ভাব বোঝা অসম্ভব। তবে একথা নিশ্চিত যে, কারাংমেটার বেলোসাকে দেখে ওর নিশ্চয় মনে পড়ে গিয়েছিল কৈশোরে দেখা আর-একটি নারীমূর্তিকে। হয়তো তাই চয়নের অন্তরাত্মা দুর্বার বেগে ছুটে যেতে চেয়েছিল ঐ আগুনবরণ মেয়েটির দিকে। নারাঙ্গীর তীরে নিরাবরণা একটি বিদেশিনীকে রক্ষা করবার জন্যে প্রথম কৈশোরে ওর যে একটা প্রেরণা জেগেছিল—যে অতৃপ্ত বাসনা প্রতিহত হয়েছিল সাহেবের চাবুকে—তাই হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল হয়তো বেলোসার সান্নিধ্যে। কে বলতে পারে কি হচ্ছে জন্য সেই আদিম অরণ্যচারীর মনের গহনে। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেতে দেরি হয়নি চয়নের। বিধি বাম। বেলোসা ওকে উপেক্ষা করে ধরা দিল কোতোয়ারের বাহু-বন্ধনে। চয়নের মনে হল, এই আগুনবরণ মেয়েগুলি সব একজাতের। ওর অশান্ত হৃদয় আশ্রয় খুঁজলো মালকোর কাছে—নিকষ-কালো মালকোর চেনা-জানা বন্দরে নোঙর ফেলার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল চয়ন। সেদিন থেকে রঙিলার দিকে তাকালেই ও দেখতে পায়, তার পিছনে রয়েছে একটা অদৃশ্য চাবুক! সে-চাবুক যখন নামবে চয়নের পিঠে, মাংস কেটে কেটে বসবে—তখন এই আগুনবরণ মেয়েটিও বাধা দিতে আসবে না। হাসবে খিলখিলিয়ে।

ওরা বিশ্বাসঘাতকের জাত! ঐ উন্তালা-ফুলের মতো ফর্সা মেয়েগুলি!

(ক্রমশ)

লণ্ডনের চিঠি

এ দেশের নাট্যজগতে এক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে আন্দোলনের নাম "সেন্টার ৪২" (Centre 42), এবং এর উদ্ভাবক হচ্ছেন বিশিষ্ট তরুণ নাট্যকার আর্নোল্ড্ ওয়েস্কার (Arnold Wesker) যিনি তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টি "চিপ্স্ উইথ এভ্রিথিং" দ্বারা ইংলণ্ডের রঙ্গকেন্দ্র "ওয়েস্টএণ্ড"-এ প্রবেশ-লাভের ছাড়পত্র অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। 'চিপ্স্' ব্যতিরেকে তাঁর প্রাক্তন চারটি নাটকের (The Kitchen, Chicken soup with Barley, Roots ও I'm talking about Jerusalem) ইতিপূর্বে সেখানে অভিনীত না হওয়ার কারণটি খুবই রহস্য-জনক, কেননা স্লোন্ স্কোয়ারে অবস্থিত লণ্ডনের প্রগতিশীল রঙ্গালয় রয়েল কোর্ট থিয়েটার-এ উপযুক্ত নাটকগুলির অসাধারণ সাফল্য ওয়েস্ট এণ্ড্-এর প্রযোজকদের উদাসীনতা ভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি; এবং সেজন্যই বোধ হয় লণ্ডনের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "The Observer"-এর খ্যাতনামা সমালোচক কেনেথ্ টাইনান্ বলেন যে, রয়েল কোর্ট থিয়েটারের অনু-প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হলে ওয়েস্কার, জন্ অস্বরন্, জন্ আর্ডেন্, হ্যারোল্ড পিন্টার, অ্যালান্ ওয়েন্, ডরিস্ লেসিং, বার্নার্ড কপ্স্, এন্. এফ্. সিম্প্সন্ প্রভৃতি তরুণ শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টি থেকে আমরাও বঞ্চিত হতাম। বস্তুত, সেন্টার ৪২কে আমরা ওয়েস্ট এণ্ড-এর এই ঔদাসীন্য ও রুদ্ধদ্বার নীতির বিরুদ্ধে এক পরোক্ষ প্রতিবাদের ফল হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

এ সত্য যে, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের রুচি-বোধের সঙ্গে নাট্যশালা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এবং এও সত্য, সেই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সক্রিয় শ্রেণী-চেতনার মাধ্যমেই এই রুচির চরম রূপ পরিলক্ষিত হয়, যেমন খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের এথেন্স বা এলিজাবেথীয় লণ্ডন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে থিয়েটার-অনুরাগী দর্শকদের মাঝে যে একতা বর্তমান তার মূলে আছে কেবলমাত্র তাদের থিয়েটার-অনুরাগ; এবং সে কারণেই প্রেক্ষাগৃহ এক বিশেষ কর্ষিত শ্রেণীর একচেটিয়া ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এবং যেহেতু ইংরাজ সংস্কৃতির যে কোন অভিব্যক্তি বা রূপ প্রকাশের প্রতি ইংরাজ শ্রমিকশ্রেণীর অগাধ অবিশ্বাস, সেহেতু ইংরাজী থিয়েটার হয়ে পড়েছে একটি বিশেষ সমাজ-শ্রেণীর রক্ষিত সম্পত্তি।

এই শ্রেণীর হাত থেকে নাটক ও নাট্য-শালার মুক্তি অভিপ্রায়ে রয়েল কোর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রয়েল থিয়েটার কোম্পানীর সে আশা পূর্ণ হয়নি, কারণ সমগ্র সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতি-নিধিকে দর্শকরূপে আকর্ষণ করার পরিবর্তে তারা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে কেবল-মাত্র সেই দর্শকদের যাঁরা থিয়েটারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেন। নূতন নূতন দর্শক সংগ্রহে রয়েল কোর্ট-এর এই অক্ষমতা ও আশাভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফলাফলই হচ্ছে সেন্টার ৪২।

সেন্টার ৪২-এর উদ্ভাবক ও পরিচালক বিশিষ্ট তরুণ নাট্যকার আর্নোল্ড্ ওয়েস্কার

ওয়েস্কার, লেসিং, কপ্স্ ইত্যাদি তরুণ শিল্পীর দল সেন্টার ৪২-এর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সমিতি থেকে নূতন দর্শক সংগ্রহের আশা পোষণ করেন। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আইল্ অব্ ম্যান্-এ ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের ৪২ নম্বর প্রস্তাব ইংরাজী-সমাজজীবনে শিল্প-সংস্কৃতির প্রবল গুরুত্ব স্বীকারান্তে ঘোষণা করে যে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের শোচনীয় ইতিহাস স্মরণ রেখে ভবিষ্যতে ইউনিয়নসমূহের নাট্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি শিল্প-চর্চার উন্নতিসাধনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করা উচিত। এই প্রস্তাবকে (resolution 42) কার্য-কর করাই সেন্টার ৪২-এর প্রধান উদ্দেশ্য।

এই বিশেষ কার্য নির্বাহার্থে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে ওয়েস্কারের কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যই তাঁর সংকল্প হচ্ছে অবিলম্বে তিন লক্ষ পাউণ্ডের সংস্থান। সেই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা লণ্ডনে এই আন্দোলনের মুখ্য কলাকেন্দ্র ও অভিনয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, তারপর দেশের প্রতিটি শিল্প-কেন্দ্রে অভিনয়ের জন্যে এক ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার-এর মারফতে তরুণ নাট্যকারদের সমাজচেতনামূলক নাটকের অবদান, এবং পরিশেষে ট্রেড ইউনিয়ন শিল্পোৎসবে ভ্রাম্যমাণ চিত্র-প্রদর্শন—এই হচ্ছে সেন্টার ৪২-এর বর্তমান কর্মতালিকা। ওয়েস্-কারের বিশ্বাস, দু' বছরের খরচের জন্যে তিন লক্ষ পাউণ্ড যথেষ্ট এবং মাত্র দু' বছরের মধ্যেই তাঁদের ক্রিয়াকলাপ যে সংস্কৃতির আংশিক রূপান্তরে সক্ষম হবে সে সম্বন্ধেও তাঁর কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং যদি এই অর্থসংস্থান সম্ভব হয়, তা হলে এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে হয়ত এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে।

সেন্টার ৪২-এর এই অসাধারণ কর্ম-প্রচেষ্টার যারা বিরোধী তাদের এ আন্দো-লনের বিরুদ্ধে অ-বিলম্বে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা এ শিল্প-প্রচেষ্টার আদর্শকে কাল্পনিক, অসম্ভব ও হাস্যকররূপে গণ্য করে, কেননা তাদের মতে ইংরাজ শ্রম-

জের সহজাত সংস্কৃতি-বিরুদ্ধতার ক পরিবর্তন মোটেই সম্ভব নয়। ার ৪২-এর প্রথম উৎসব-সাফল্য ষত হওয়ার পর ওয়েস্‌কারের সাথে ার সাক্ষাৎকালে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন য় তিনি এই সেকেলে যুক্তিটির াসঙ্গিকতার প্রমাণ হিসাবে দুটি যুক্তির তারণা করেন। প্রথমত, গত আঠারো ের অক্লান্ত পরিশ্রম, লক্ষ্য অনুযায়ী সংস্থানে অক্ষমতা ও অনুরূপ অসংখ্য তবন্ধক সত্ত্বেও গত ৯ই সেপ্টেম্বর লিংবরো (Wellingborough) শহরে প্রদত্ত প্রথম উৎসবের অসাধারণ সাফল্য। তীয়ত, ইংলিশ চ্যানেলের অন্য পারে স্থিত ৪২-এর ফরাসী প্রতিরূপ anchon-এর সফলতার উদাহরণ। রন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আমাকে আমে-কার ফেডারেল থিয়েটারের ইতিহাসও রণ করতে বলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আমেরিকা অনেক বেশী কৃষ্টিবিরোধী; কিন্তু তা সত্ত্বেও ফেডারেল থিয়েটার আমেরিকার সাংস্কৃতিক পরিবেশে এক আশ্চর্য আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৬ সালে এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র এক বছরের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার শিল্পী ও কর্মী এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। এবং এর পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এই অভিনয় সঙ্ঘের পাঁচ লক্ষ দর্শকের সাপ্তাহিক সহ-যোগিতায় যখন সাহিত্যিক সিন্‌ক্লেয়ার লুইস-এর ফ্যাসীবিরোধী নাটক "ইট ক্যান্‌ নট হ্যাপেন হিয়ার" দেশব্যাপী একুশটি প্রেক্ষাগৃহে যুগপৎ অভিনীত হয়। উনিশ শো ত্রিশের আন্তর্জাতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা ফেডারেল থিয়েটারের প্রেরণা ও উত্তেজনার মূল উৎস হলেও এ স্বতঃসিদ্ধ যে, এক অকৃত্রিম সমষ্টিগত অনুভূতি ও আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ আন্দোলনের পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভবপর হত না। এবং এই ভাবাবেগ সঞ্চারের জন্য যে কর্মপ্রণালী ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন, ৪২-এর পক্ষে তা যদি অর্জন করা সম্ভব না হয়, তা হলে এই আন্দোলনের মৃত্যু অবধারিত। সমষ্টিগত অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে যে-কোন বুদ্ধিগত প্রত্যয়ের রূপান্তর সম্ভব; সুতরাং নবীন নাট্যকারদের সমাজ-চেতনামূলক শিল্প-প্রচেষ্টা শ্রম-সমাজের কৃষ্টি সংক্রান্ত গতানুগতিক অচেতন গূঢ়ৈষার অবসান ঘটাতে পারে। উপরন্তু, যারা নিয়মিত থিয়েটার-দর্শক, তারা যে মূলত এক অভ্যাসের দাস, তার মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব নেই, আর থিয়েটার সম্বন্ধে শ্রমিক-সমাজের ভিত্তিহীন সন্দিগ্ধ মনোভাব যে এই সদর্থক অভ্যাসের বশীভূত হবে না, তারও কোন প্রমাণ নেই। অতএব অভ্যাস ও

শিল্পী পরিকল্পিত সেণ্টার ৪২

অবিশ্বাসের স্বল্পফলে যদি দর্শক-সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়, তা হলে রূপ কথা ও সংগীতের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংস্কৃতির বিস্তারও সম্ভব। বস্তুত, ফেডারেল থিয়েটার প্রযোজিত নাট্যতালিকাভুক্ত তিনটি বিশিষ্ট নাটকের অদৃষ্টপূর্ব সাফল্যই এর প্রমাণ। সেগুলি হচ্ছে : Murder in the Cathedral, Macbeth ও Doctor Faustus।

ওয়েস্‌কার, লেসিং, ওয়েন, কপ্‌স্‌ ইত্যাদির সাথে কথোপকথনের ফলে আমার এ ধারণা বদ্ধমূল যে, তাঁদের আদর্শবাদ মোটেই কাল্পনিক বা ইউটোপিয়ান নয়। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজও যে শ্রমিকসমাজের মতই কৃষ্টি-উদাসীন, সে সম্বন্ধে তাঁরা খুবই সচেতন: এবং এজন্যই তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, শিল্প-সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগানো, যে সাড়া তার প্রাতিস্বিক নির্বাচন ধর্মের তীক্ষ্ণতা অর্জনে সহায়তা ক'রে তাকে এই শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হবে যে, দেহগত আনন্দবোধের অপর নাম বুদ্ধিগত সৌন্দর্যবোধ নয়।

এই মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সেণ্টার ৪২ যদি সচেতনতা আনতে পারে, তা হলে শিক্ষার সাধারণ প্রক্রিয়ার দ্বারও তাদের পক্ষে আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে আর্নোল্ড ওয়েস্‌কার, ডরিস লেসিং, বার্নার্ড কপ্‌স্‌, অ্যালান ওয়েন, টেড্‌ কসচেভ্‌, মাইকেল ক্রফ্‌ট্‌, মাইকেল কাস্‌টো, রাল্‌ফ্‌ বণ্ড্‌, বিল ক্যারন্‌, টম্‌ ম্যাস্‌লার, জন ম্যাগ্‌রাথ, বেবা লাভ্‌রিন, ক্লাইভ গুড্‌উইম, কীথ্‌ টারনার, ফ্র্যান্‌ক্‌ ওয়ার্ড, জেরোম স্টান্‌ফোর্ড, ক্লাইভ এক্সটন, মাইকেল হেন্‌শ ইত্যাদি তরুণ শিল্পীদের অসাধারণ আত্মবিশ্বাস তাঁদের অনন্যসাধারণ পরিকল্পনার মতই আশ্চর্যজনক।

সেণ্টার ৪২-এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের বিশিষ্ট নামগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; যেমন—

গ্রেহাম গ্রীন, স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, জে· বি· প্রিস্টলে, স্যার কম্পটন ম্যাকেন্‌জি, স্যার হার্বার্ট রীড, স্যার জন রথ্‌স্টাইন, সি· পি· স্নো, ডেম্‌ পেগি অ্যাসক্রফ্‌ট্‌, লর্ড ওয়ালস্টন, টেরেন্স র‍্যাটিগান, জেনি লী, রিচার্ড হোগার্ট, অ্যালান সিলিটো, রেমণ্ড উইলিয়ামস, জোন প্লোরাইট, জেরাল্‌ড্‌ গার্ডিনার, হ্যারল্‌ড্‌ হব্‌সন, প্যামেলা হ্যান্‌স্‌ফোর্ড জনসন, এরিক নিউটন, ভেনেসা রেড্‌গ্রে স্পাইস মিলিগান, কেনেথ টাইনান, জর্জ ডেভিন, জনি ড্যাংক্‌ওয়ার্থ, বার্‌বারা হেপ্‌ওয়ার্থ, ফেলিক্‌স্‌ টপল্‌স্কি, বার্‌নেট শাইন, নিকোলাস সেকারস, জন পাইপার, রিচার্ড মার্স, পিটার সেলার্স, ক্লিও লেন, আর্নোল্‌ড্‌ হ্যাস্‌কেল, জ্যাক হিল্‌টন, জেরাল্‌ড্‌ ক্রোস্‌ডেল, সিরিল কুপার, এডওয়ার্ড কার্টার, পার্সি বেল্‌চার, সিড্‌নি বার্নস্টাড্‌ইন, জন বার্জার ও রবার্ট রোল্‌ট্‌।

—মিহিরকুমার গুপ্ত

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩৪ ॥

তারপর মিস্টার সেনের হঠাৎ মনে পড়ল রঙ্গানন্দ স্বামীর কথা। লোকটি বেশ নামজাদা সাধু। তাঁর চেনা-শোনা অনেকেই মন্ত্র নিয়েছে তাঁর কাছে। ভারত বিখ্যাত লোক। বড় বড় লোকদের তিনি গুরু এবং সংসার-সমুদ্রে অনেক মহারথীরই কর্ণধার। মিস্টার সেনের মনে হল, এঁর কাছে মন্ত্র নিলে কেমন হয়? অনেকদিন আগে তাঁর কাছে প্রস্তাবটা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন আরও কিছুদিন যাক, এখনও তোমার সময় হয়নি। এখন আর একবার প্রস্তাবটা করলে কেমন হয়। মিস্টার সেনের স্বভাব যখন যেটা করবেন ঠিক করেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলেন সেটা। তখনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। সেন মহাশয় কলেজ জীবনে বাংলার ভাল ছাত্র ছিলেন। সুমার্জিত ভাষায় তিনি নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখলেন।

শ্রীশ্রীচরণে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন,

মহারাজজী, আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। অনেকদিন আপনার খবর লইবার অবসর পাই নাই। সংসারের অনিত্য মায়ায় জড়িত-বিজড়িত হইয়া আপনার নিত্যবাণীর কথা বিস্মৃত হইতে-ছিলাম। বিস্মৃত হইতেছিলাম বলিলে ভুল হইবে, প্রায় প্রত্যহই আপনার সৌম্য মূর্তি মানসচক্ষে প্রতিভাত হইত, কিন্তু আপনাকে চিঠি লিখিবার মতো অবসর পাইতেছিলাম না। আমি যে কাজে এখন নিযুক্ত আছি তাহা বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। অসহায় রেফিউজিদের ভার গবর্নমেন্ট আমার স্কন্ধেই অর্পণ করিয়াছেন। সে দায়িত্ব কত বড়, কত মহান, কত গভীর, কত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। আপনার আশীর্বাদে সে কর্তব্য আমি যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু ভগবান আমার উপর আশানুরূপ দয়া করেন নাই। আমার স্ত্রী বহুকালাবধি দুরারোগ্য পক্ষাঘাত ব্যাধিতে শয্যাগত ছিলেন। কাল রাত্রে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমার একমাত্র কন্যা তনিমা পড়িবার জন্য লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামীই তাহাকে লইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী ডিগ্রীর, বিদেশী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ নহি। আমি তাহাদের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার বারণ শোনে নাই। পরিবর্তিত যুগের আবহাওয়া ভয়ঙ্কর, তাহার গতিও প্রলয়ংকরী। স্বীকার করিতেছি আমি তাহাদের কাছে হার মানিয়াছি। সংসারে আমি এখন সম্পূর্ণ একা। দূর সম্পর্কের যে দুই একজন আত্মীয় আছেন, তাঁহারাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। ত্যাগ করিবার কারণ আমি না কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সনাতন হিন্দুধর্মকেই আমি এই তথাকথিত প্রগতির যুগে আঁকড়াইয়া আছি। স্ত্রী-বিয়োগের পর তাই আজ অত্যন্ত অসহায়-চিত্তে আপনাকেই স্মরণ করিতেছি। আপনি ছাড়া আজ আর আমার প্রকৃত আত্মীয় কেহ নাই। আমি কিছুকাল পূর্বে আপনার নিকট দীক্ষা লইতে চাহিয়াছিলাম; কেন জানি না, বহুকাল হইতেই আপনার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া-ছিলাম, এখনও সে আকর্ষণ তেমনি আছে। সম্প্রতি আমার আত্মাও আধ্যাত্মিক পিপাসায় কাতর হইয়াছে। পার্থিব সুখে সে তৃষ্ণা মিটিবে না জানি। ইহাও জানি আপনি ছাড়া সে তৃষ্ণার বারি আমাকে কেহ দিতে পারিবে না। তাই আপনার নিকট গললগ্নী-কৃত-বাসে সানুনয়ে আবার কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—আমাকে রক্ষা করুন। আমি একা, আমি শোকাহত, আমি অবলম্বনহীন। আপনি ছাড়া আমাকে সান্ত্বনা দিবার, আমাকে পথ দেখাইবার, আমার অন্ধকার

জীবনে আলোক সম্পাত করিবার দ্বিতীয় লোক আর কেহ নাই। এবার আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, শ্রীশ্রীচরণে স্থান দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনার উত্তরের আশায় উন্মুখ প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

সেবক
শ্রীনিতাইগোপাল সেন

চিঠি পাঠাবার দু'দিন পরেই রঙ্গানন্দ স্বামীর উত্তর এল। চিঠিতে নয়, টেলিগ্রামে। Come atonce অবিলম্বে চলে এস। রঙ্গানন্দ তখন দেরাদুনে এক হোমরা-চোমরা বড়লোক শিষ্যের বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ করে ছিলেন। সাতদিনের ছুটি নিয়ে মিস্টার সেনও সেখানে চলে গেলেন। তিনি যখন কালেক্টার সাহেবের কাছে ছুটি নেবার জন্য গেলেন, তখন তিনি বললেন, 'ছুটি আপনাকে দিচ্ছি। কিন্তু ফিরে এসে আপনাকে একটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আপনার নামে কিছু কম্প্লেন এসেছে।'

ছোট কাচপোকা যেমন প্রকাণ্ড আরশোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়

তেমনি করে' ঝিন্‌ক ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে টেনে টেনে বেড়াতে লাগল চারদিকে। তার দৃঢ় সংকল্প পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থা সে করবেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাহায্য করলেন তাকে। পুলিস সায়েব আর ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের সঙ্গে ডাক্তার ঘোষালের আলাপ ছিল। তাঁরাও কোনও বাধা দিলেন না, বাধা ছিলও না তেমন কিছু। তারপর সে একদিনের জন্য ডাক্তার ঘোষালকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। সেখানেও তেমন কোনও বাধা হল না। বিলেতে যাঁর আপিসে ওরা চাকরি পেয়েছে তিনি মস্ত ধনী লোক। এক ডাকে সবাই চেনে তাঁকে। ঝিন্‌ক গিয়ে আবিষ্কার করল এখানকার আপিসেও তিনি চিঠি লিখেছেন এবং তাঁর চিঠির সঙ্গে ভারত গবর্নমেণ্টের বড় একজন অফিসারেরও চিঠি আছে। সুতরাং দু'জনের পাসপোর্টই হয়ে গেল সহজে। ডাক্তার ঘোষাল সবই যন্ত্রচালিতবৎ করে' যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইদানিং রগের শির দুটো বেশী ফুলে উঠেছিল, চোখ দুটোও যেন বাইরে ঠেলে আসছিল। মনে হচ্ছিল যেন দম-বন্ধ করে' আছেন। ঝিন্‌কও এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা নিরাপদ মনে করেনি। সে বুঝতে পারছিল আলোচনার সুযোগ দিলেই ডাক্তার ঘোষাল আবার ক্ষেপে উঠবেন, হয়তো বেঁকে দাঁড়াবেন। তাই সে চুপচাপ ছিল। তারপর আর এ নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগও হল না। কারণ কলকাতা থেকে ফিরে ডাক্তার ঘোষাল নিজের কাজকর্মে আরও বেশী করে' মেতে উঠলেন যেন। তাঁর রোগীর সংখ্যা আরও বাড়তে লাগল। ঝিন্‌কের মনে হল বিলেত যেতে তো এখনও অন্তত দেড়মাস দেরি আছে। হয়তো বেশী দেরিও হ'তে পারে, কারণ প্লেনে সীট পাওয়া মুশকিল। অনিশ্চিতও খানিকটা। ততদিনে সে ডাক্তার ঘোষালকে রাজি করে নেবেই। প্রেমে পড়লে স্ত্রীলোকেরা হয়তো বুঝতে পারে প্রেমাস্পদের উপর তার কতখানি জোর আছে। ঝিন্‌কের বিশ্বাস ছিল ডাক্তার ঘোষাল শেষ পর্যন্ত রাজি হবেনই। প্লেনে সীট বুক করে' তারপর এ নিয়ে আলোচনা করলেই হবে। ঝিন্‌ক বাইরের কোন লোককে এ বিষয়ে কিছু বলেনি কিন্তু। সে এখন ঘোরাফেরা করছিল তার কাকার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন এটাও হয়ে যাবে। এজন্য কাকারও একটা ফোটোর প্রয়োজন হওয়াতে ঝিন্‌ক একদিন তাঁকে বললেন, "তোমার দেশে ফিরে যাবার জন্যে পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করছি। তোমার একটা ফোটো তোলাতে হবে।"

বিস্মিত যতীশ জিগ্যেস করলেন, "তুমি যাবে না?"

"আমি যাব না। তুমি দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ, এখানে তোমার ভালও লাগছে না, তুমি একাই চলে' যাও।"

"সেখানে কোথায় থাকব। আমাদের ঘর তো পুড়ে গেছে।"

"নিধুকাকারা সেখানে এসে বসবাস করছেন খবর পেয়েছি। তাদের কাছেই থেক, মাসে মাসে কিছু খরচ পাঠাব তোমাকে।"

যতীশ স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে' যাচ্ছে। ইংরেজীতে যাকে 'কর্নার' করা বলে ঝিন্‌ক তাঁকে যেন তাই করছে তাঁর মনে হল। তিনি প্রতিদিন বারবার বলে' এসেছেন দেশে না গেলে তাঁর শরীর টিকছে না, দেশে গেলেই তিনি শান্তিতে থাকবেন, দেশে গিয়ে মাছের ফলাও ব্যবসা করবেন, দেশে তাঁকে যেতেই হবে—কিন্তু এখন, যখন ঝিন্‌ক দেশে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে' ফেলেছে —তখন তাঁর প্রাণটা কেবল যেন হুহু করে' উঠল। সে দেশে কি আর আছে? যে দাদার স্নেহচ্ছায়ায় এতদিন স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তমনে স-প্রতাপে যা খুশি করে' বেড়াতেন, সে দাদা তো আর নেই। সেখানে পর্বতের আড়ালে ছিলেন, পর্বত সরে' গেছে। দাদা নেই, বাড়িও নেই। ঝিন্‌ক, শামুক, সোনা কেউ সেখানে যাবে না, তিনি কি একা থাকতে পারবেন সেখানে? তাঁর হিন্দু বন্ধুরা কি কেউ বেচে আছে? মুসলমান বন্ধুরা কি তাঁকে ঠিক আগের মতো স্নেহভরে তাদের পাশে স্থান দেবে? তারা কি আগের মতোই আছে? বদলে যায় নি? এই ধরনের নানা চিন্তা তাঁর মাথায় ভিড় করে' এল। তিনি দেশের কথা বলতেন নানা ছুতোর

টাকা আদায় করবার জন্য। হাতে কিছু টাকা না থাকলে তিনি স্বস্তি পান না। দেশে থাকতে কত আমোদ প্রমোদ করতেন। এখানে সে সব কিছুই নেই। দশজনকে যখন তখন খাওয়ানো তাঁর একটা বাতিক ছিল। গ্রামের মহেশ ময়রার দোকানে খাওয়াতেন অনেককে। দাদা তার দেনা শোধ করতেন। এখানেও অনেককে খাওয়াতে ইচ্ছে করে, দল-বেঁধে সিনেমায় যেতে ইচ্ছে করে—কিন্তু টাকা কই? ঝিনুক হাতখরচ হিসাবে যে টাকা দেয় তাতে তাঁর নিজেরই কুলায় না।

সুতরাং টাকার কথাই পাড়লেন।

“দেশে নিজস্ব হ'য়ে থাকা যাবে না। বিশ ত্রিশ টাকা হাতখরচ নিয়ে সেখানে স্টাইলে থাকা অসম্ভব। যে স্টাইলে সেখানে বরাবর থেকেছি সে স্টাইলে না থাকতে পারলে দেশে কেউ আমাক মানবে না। তাছাড়া সেখানে মাছের ব্যবসা যদি আরম্ভ করি—কিছু একটা নিয়ে থাকতেই হবে—তার জন্যেও টাকা দরকার—”

“আমি আপনাকে প্রতি মাসে আপনার নিজের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা করে' পাঠাব। তাছাড়া দেশে আমাদের বাগান, জমি পুকুর আছে, তা-ও আপনি ভোগ করবেন। নিধুকাকার ওখানেই থাকবেন, আদর করে' রাখবেন তিনি। তিনি লোক খুব ভালো। আমার বাবাই তাঁকে মানুষ করেছিলেন এককালে, অভাবে পড়লে তাঁর সাহায্য আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। মাছের টাকার জন্য এখুনি কত টাকা চাই আপনার?”

“অন্তত, হাজার দুই না হলে তো আরম্ভই করা যাবে না। হাজার পাঁচেক যদি দিতে পারিস আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি।”

লোভে যতীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে' উঠল। ঝিনুক চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ। মাথানিয়ার মাঠে তার চোরাই টাকা পোঁতা আছে হাজার কয়েক। টাকাটা সে রেখেছিল রেফিউজিদের বিদেশে পাঠাবার জন্যে। সুবেদার খাঁর কৃপায় তার জানাশোনা অনেকেই চলে' গেছে। কিছুদিন পরে সে-ও চলে' যাবে।

বলল, “বেশ, পাঁচ হাজার টাকাই আপনাকে দেব। টাকাটা কিন্তু লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পারবেন তো-”

“খুব পারব।”

যতীশ বাবুর চেহারাটা বদলে গেল যেন। নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগল।

“তাহলে চলুন ফোটোটা তোলাই গিয়ে।” যেতে যেতে মনে পড়ল সেইদিন রাত্রেই সুবেদার খাঁর সংগে স্টেশনে দেখা করবার কথা আছে। টাইপ-করা চিঠিটা আবার বের করে' পড়ল সে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। স্টেশনের ঘড়িতে প্রায় দুটো বাজে। মেয়েদের ওয়েটিং রুমে কোন লোক ছিল না বলে ঝিনুক সেইখানে বসেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেন ‘লেট’ আসছিল সেদিন। প্রায় দু'ঘণ্টা লেট। স্টেশন মাস্টার পাণ্ডা এসে গল্প করছিলেন তার সঙ্গে বসে'। পাণ্ডা ইদানিং ডাক্তার ঘোষালের আড্ডায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি চতুর লোক। তিনি যে নীতির অনুসরণ করেন সে নীতির নাম ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি। প্রচুর ঘুষ খান, কিন্তু গোঁফে, ঠোঁটে বা হাতে সামান্য দাগ পর্যন্ত লাগে

না। প্রায় আলগোছে গিলে যান। তাঁকে যারা ঘুষ দেয় তারা জানতে পারে না যে কাকে ঘুষ দিচ্ছে। ঘুষ নেবার অন্য বেসরকারী লোক আছে। তারাই টাকা নেয় এবং সে টাকা লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে। এজন্য ঘুষেরই একটা অংশ পায় তারা। সুবেদার খাঁর চোরা ব্যবসাতেও একজন অংশীদার তিনি। তাঁর কাজ সুবেদার খাঁকে আড়াল করা। তিনি আর কিছু করেন না। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে সুবেদার খাঁ নির্ভয়ে মাল পাচার করতে পারতেন না। অনেকদিন তিনি টাকাকড়ির অংশ পান নি। তনিমার অন্তর্ধানের পর ভয়ে ভয়ে তিনি আর ডাক্তার ঘোষালের আড্ডায় যান নি। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—শেষে তিনিও যদি জড়িয়ে পড়েন—এই ধরনের একটা ভয় হওয়াতে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন তিনি। অনেকদিন পরে ঝিনুককে হঠাৎ স্টেশনে দেখে তাই তিনি সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। ওয়েটিংরুমে আর কেউ না থাকাতে তাঁর সুবিধাই হল।

"এই যে! অনেকদিন পরে দেখা হল। কোথাও যাবেন না কি?"

"না, যাব না কোথাও। সুবেদার খাঁ এই ট্রেন নিয়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

পান্ডা মুখ ফিরিয়ে অন্য দেওয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "সুবেদার খাঁ সৌভাগ্যবান লোক, ডাক্তার ঘোষাল তো সৌভাগ্যবান বটেই। আমিই অভাগা।"

মুচকি হেসে ঝিনুক বললে, "ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনার মতো সৌভাগ্যবান লোক ক'টা আছে এ শহরে। কাশীতে বাড়ি করেছেন, কলকাতায় করেছেন, এখানেও এক বিঘে জমি কিনেছেন শুনেছি। আপনার ছেলে বিলেত গেছে, মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছেন—"

"ঠিক, সবই ঠিক। কিন্তু ওসব হচ্ছে বাইরের সৌভাগ্য, ওইটেই লোকে দেখতে পায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি অভাগা, চিরবঞ্চিত, চিরভিখারী। মুখ ফুটে এসব বলা যায় না, বললেও বোঝানো যায় না। মন দিয়ে তা বুঝতে হয়, মনের কথা মনই জানতে পারে, যদি দরদী মন হয়—"

আবার দেওয়ালের দিকে চাইলেন।

বহুদিন আগে আর একবার তিনি ঝিনুককে একলা পেয়েছিলেন, তখনও এই রকম আবছা-আবছা রহস্যময় ভাষায় প্রণয় নিবেদন করবার চেষ্টা করেছিলেন। এবারও করলেন। কিন্তু ঝিনুকের তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না। সে চুপ করে' রইল। পান্ডা বুঝলেন সুবিধা হল না। অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হলেন।

"সুবেদার খাঁর আজ আসবার খবর কি করে পেলেন? চিঠি লিখেছিল না কি?"

"হ্যাঁ। দেখা করতেই লিখেছিলেন।"

"তার কারবারের খবর কি! বন্ধ হয়ে গেল নাকি। আমি তো ইদানীং কোন খবরই পাই নি।"

"প্রায় বন্ধই। আজকাল আর বিশেষ কিছু হয় না। হলে আপনি নিশ্চয় খবর পাবেন।"

"অ—"

পান্ডা গলা চুলকুতে চুলকুতে আবার দেওয়ালের দিকে চাইলেন। তারপর সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, "ওকে একটু সাবধান করে' দেবেন। পুলিস থেকে দু'একটা এনকোয়ারি এসেছিল ওর নামে। আমি অবশ্য চেপে দিয়েছি—"

"কি রকম এনকোয়ারি?"

"তা বলা চলবে না, অফিশিয়াল সিক্রেট। আপনাকে একটু হিন্ট দিয়ে দিলাম শুধু।"

"আচ্ছা বলব। আপনার কি আজ নাইট ডিউটি?"

"না। আমি এসেছি আমাদের ডি এস আজ এই ট্রেনে যাচ্ছেন বলে। তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে, তোয়াজ তদ্বিরও করতে হবে। চাকরি তো—"

একজন কুলী এসে বললে—"হুজুর একটো ফোন আয়া" পান্ডাকে উঠতে হল।

"দেখি কোথা থেকে ফোন এল আবার। ট্রেনের এখনও দেরি আছে, আপনি ওই ইজিচেয়ারটায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ুন। ঘুমে আপনার চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু করছে—"

মুচকি হেসে পান্ডা বেরিয়ে গেলেন। ঝিনুকের সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। সে ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার প্ল্যান ছিল স্টেশনের কাজ সেরে সে মাখানিয়ার মাঠে যাবে তার সেই টাকাটা তুলে আনতে। তার মনে হয়েছিল টাকাটা এনে এখন কাছে রাখাই ভালো। কাকাকে সে পাঁচ হাজার টাকা দেবে ঠিক করে' ফেলেছিল। নানাকথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙল দেখল একটি পায়জামা-পরা ফরসা ছিপছিপে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ক্যামেরা। ঝিনুক উঠে বসতেই লোকটি বেরিয়ে গেল। ঝিনুকও সঙ্গে সঙ্গে উঠে অনুসরণ করল তাকে। প্ল্যাটফর্মে বেরিয়েই কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেল পুরুষদের ওয়েটিংরুমে লোকটি বসে সাদা লম্বা একটি সিগারেট হোল্ডারে কালো একটি সিগারেট পরিয়ে নিবিষ্ট মনে ধরাচ্ছে। ঝিনুক ঢুকে পড়ল সেখানে। সবিস্ময়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনিই কি একটু আগে এক্ষুনি আমার কাছে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ, ভুল করে' ফিমেল ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়েছিলাম। ক্ষমা করবেন। আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে চলে এলাম।"

এরপর আর বলবার কি থাকতে পারে। ঝিনুক বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই নজরে পড়ল একটু দূরে একটা বাঁদরও বসে আছে, চুপ করে। তাকে ঘিরে একদল প্যাসেঞ্জারও ভিড় করেছে। বাঁদরটা ঝিনুকের দিকে মিটিমিটি চাইতে লাগল, মনে হল যেন রহস্যের সমাধান সে জানে। ঝিনুকের হঠাৎ মনে হল এই লোকটাই কি ডাক্তার ঘোষালের ফোটো তুলেছিল? তার সঙ্গেও বাঁদর ছিল একটা। কিন্তু এ নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার সময় আর সে পেল না, কারণ ঢং ঢং ঢং ঢং করে' ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে ইঞ্জিনের মাথার বড় আলোটাও দেখতে পেলে সে। ট্রেন এসে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, কারণ সুবেদার খাঁ ইনজিনে থাকবেন। সুবেদার খাঁ ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন ঝিনুক এসেছে কিনা। ঝিনুককে দেখতে পেয়েই তিনি বড় একটা কাঁঠাল বার করে' প্ল্যাটফর্মের উপর রাখলেন। কাঁঠালটা সম্ভবত ফেটে গিয়েছিল, কারণ একটা দড়ি তার চারপাশে জড়ানো ছিল। ঝিনুক কাছে আসতেই বললেন "কাঁঠালটা ওইখানেই নাবিয়ে দিয়েছি। সাবধানে নিয়ে যেও। বাড়ি গিয়ে আড়ালে খুলো ওটা। কোয়া ছাড়া অন্য জিনিসও আছে"। তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সোনার বাট আছে গোটা দুই। তারপর এখানকার খবর কি—"

"এখানে আমাদের বাসা বোধ হয় আর থাকবে না। কাকাকে দেশে পাঠিয়ে দেব। কালেক্টার সাহেব সুপারিশ করেছেন। প্যাসপোর্ট-ভিসার কোনও অসুবিধা হবে

না। আমি আর ডাক্তার ঘোষালও লণ্ডন চলে যাচ্ছি।"

"লণ্ডন? কেন!"

"সেখানে আমরা দুজনেই ভালো চাকরি পেয়েছি। ওখান থেকেই যতটা পারি রিফিউজিদের সাহায্য করব। এসব হীন কাজ আর ভাল লাগছে না। এদেশে আর থাকতেও পারছি না।"

সুবেদার খাঁর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"পাসপোর্টের কি হবে?"

"যাঁরা আমাদের চাকরি দিয়েছেন তারাই সে ব্যবস্থা করবেন। আমরাও দরখাস্ত করেছি। মনে হয় ওর জন্যে আটকাবে না।"

"ডাক্তার ঘোষাল রাজি হয়েছেন?"

ঝিনুক মুচকি হেসে বললেন, "এখনও পুরো হন নি, তবে মনে হয় শেষ পর্যন্ত হবেন।"

ঝিনুক আবার সুমিষ্ট হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল। মুখ ফিরিয়েই চীৎকার করে উঠল সে। দেখল সেই বাঁদরটা এসে কাঁটালটাকে ভেঙে ফেলেছে আর গপ গপ করে কোয়াগুলো খাচ্ছে। ছত্রাকার হয়ে পড়েছে সব চারিদিকে। ভিড় জমে গেছে। সুবেদার খাঁ তড়াক করে নেবে এলেন ইন্‌জিন্ থেকে, উবু হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন কাঁটালের কোয়াগুলো সরিয়ে সরিয়ে।

"নমস্কার। সুবেদার সায়েব যে। ও আর ঘাটাবেন না। মাল আমি নিয়ে নিয়েছি—"

কাগজে মোড়া বাট দুটো তুলে দেখালেন।

সুবেদার খাঁ বিস্ময়ে দেখলেন পৃথিবীনন্দন।

পৃথিবীনন্দন সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন।

"আপনি তো সাহেবগঞ্জে যাচ্ছেন?"

"চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। দরকারি কথা।"

প্রায় সেই সময়ই গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। সুবেদার খাঁ ইন্‌জিনে চড়ে বসলেন। পাশেই একটা খালি ফার্স্টক্লাস ছিল সেইটেতে পৃথিবীনন্দন উঠে বসলেন তাঁর বাঁদর নিয়ে।

ঝিনুক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

(ক্রমশ)

পানুদত্তের বানপ্রস্থ

চিত্ত সিংহ

হর্তুকীতলার একটা হর্তুকীও পড়ে নেই। কে যেন আগে-ভাগে সব কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। তা কুড়িয়ে নেবারই কথা। সরকারী রাস্তার উপরের এমন বেওয়ারিশ গাছের ফলের মালিক সবাই। কিছু বলবে কে? কিন্তু পানু দত্তের মনে হল এমনটি না হলেই ভাল ছিল। তাতে ফলের লোভে যে কেউ হাত বাড়াতে সাহস পেত না, খবরদারির সুঁচ ফাল হয়ে বিঁধত গায়ে। রক্তারক্তি হয়ে যেত। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আবার মনে হল, হয়ত গাছটা আদপেই বেওয়ারিশ নয়। হবেও বা কেন? এই বিশ্ব সংসারের কুটোকাটারও ওয়ারিশদার আছে, আর এ ত জলজ্যান্ত একটি গাছ, তায় ফলন্ত। তাছাড়া গাছটি নেহাত চারা নয়, চিরলে তক্তা হতে পারে, এমনিতে উচুঁদরের জ্বালানি। তা ছাড়া সরকারের হর্তুকী গাছ পোঁতার দায় কিসের? সরকার পুঁতলে বড়জোর বট অশ্বত্থ পুঁতবে, হর্তুকী পুঁতবে কোন দুঃখে। অবশ্য ভুল করেও পুঁততে পারে। কিন্তু এ গাছ ভুল করে পোঁতা হতেই পারে না। প্রথমত গাছটা সরকারী রাস্তার ওপরে নয় ধারে। পাশের জমি নন্দীদের: রাস্তার ধারের দোকানগুলোও। অবশ্য নন্দীদের জমি আর হর্তুকী গাছের মাঝ দিয়ে হাতখানেকের একটা রাস্তা খালধার ধরে ধরে সোনারপুরের দিকে চলে গেছে। লোকে যদিও বলে এটাও সরকারী রাস্তা, কিন্তু পানু দত্তর মন সায় দেয় না। শুধু শুধু সরকারের খালধারে হাতখানেক জমি ছেড়ে দেবার দায়? আসলে জমিটা নন্দীদেরই পুকুরের অংশ; পাড়ের গড়ানে জমি। নন্দীদের গা নেই তাই। নইলে তৌজি নম্বর ধরে খাসমহল থেকে খতিয়ানটা দেখলেই বোঝা যেত রাস্তার জমিটা কাদের। আর রাস্তার হিসেব পেলে গাছের হিসেব ত হাতের মুঠোয়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ওই ত বুদ্ধি দেবার লোক কামারপাড়ার নেত্য। তা প্রাইমারী ফেল নেত্যর পেটে বিদ্যেও কি, বুদ্ধিও কি! যদি পড়ত আমার হাতে, শুধু হর্তুকী গাছ নয়, রাস্তার জমিটাও চলে আসত নন্দীদের কাঁটাতারের আওতায়। কিন্তু নন্দীবাবুরা ওকে একেবারেই পছন্দ করে না। কেন করে না কে জানে! অবশ্য এখন আর কারও লাভ নেই। কেন নেই সে অনেক কথা। পানুদত্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হর্তুকী গাছের দিকে তাকাল।

সেই কখন থেকে একটি হর্তুকী পড়ার অপেক্ষায় বসে আছে। মরা ডাল পড়ছে, হলদে পাতা ঝরছে, এমনকি হঠাৎ করে একটা ডাংগুলির গুলিও পড়ল, কিন্তু হর্তুকী পড়ার নামগন্ধও নেই। পানু দত্তে প্রায় ঘেন্না ধরে এল, নিজের উপর যেন সংসারের উপর, এমনকি গাছের হর্তুকী উপরও। বাসিমুখে এখনো কিছুই পড়ল ন অথচ খাওয়া সেরেছে সেই কখন। পু তিন পো মাইলের মাঠ ডিঙিয়ে এসে তারপরও পহর যায় যায়। পানু দত্ত দাঁড়াল। মনে মনে বলল, নেহাত বয়স গেছে তাই, নইলে—। একবার ভাবল ধারে সার সার বাঁশের চালি বেঁধে পোতা বাঁশ একটা তুলে এনে দুচারটে

থাকা ডালে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে দেয়। কিন্তু তা করতে গেলে কাদা মাড়াতে হয়, তা ছাড়া ছাঁটার টানে যদি চালিগুলো ভেসে যায় আড়তদার বেইজ্জত করে ছাড়বে। বরং তার চেয়ে ঢিল ছোঁড়া যাক। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তার ধার থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে একটা ছুঁড়ল। ঢিলটা হর্তুকী গাছের গা-ঘেঁষে বটোকেষ্টর টিনের চালায় পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল। আরেকটা মারল, সেটাও। আরো একটা মারল, এটাও। হায়রে! মনে মনে ভাবল পানু দত্ত, সেই হাতের টিপ যে কোথায় গেল! অথচ ছেলেবেলায় কত কত ডাঁসা আম, পেয়ারা পেড়ে খেয়েছে। প্রায় ক্ষেপে গিয়ে আরেকটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে যেতেই দেখল, ঝাঁপ তুলতে তুলতে গালাগাল দিচ্ছে বটোকেষ্ট—শুয়োরের বাচ্ছা-দের জ্বালায় দিনে-দুপুরেও কি টিকবার জো আছে। ফিরে দাঁড়াতেই পানু দত্তের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে বলল—আপনি!

পানু দত্তের হাত থেকে ঢিলটা মাটিতে পড়ে গেল। নজর এড়াল না বটোকেষ্টর। চোখের পলক পড়বার আগেই সে আবার ঝাঁপের আড়ালে চলে গেল। পানু দত্ত অন্য সময়ে হলে বটোর কাণ্ড দেখে হাসত, আজ হাসল না। আসলে বটোর ভয় নিরর্থক। পানু দত্ত এখন ঢোঁড়ারও অধম। বিষ ত নেই, চক্করও না। পানু দত্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যদি একটা হর্তুকী পড়ে।

তা হর্তুকী একটা পড়ল। পানু দত্ত ছুটে গেল, কিন্তু তার আগেই নাপতে পাড়ার বিনুর মা বুড়ি যাচ্ছিল, কুড়িয়ে নিল। পানু দত্ত ঘুরে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে বেনেপাড়ার ধীরুর রাখালটা কানাডোমের ছেলে নগাকে সঙ্গে করে গাছ-তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। পানু দত্ত ওদের দিকে কটমট করে তাকাল। নিশ্চয়ই ছোঁড়া-গুলো হর্তুকীর মতলবে এসেছে। ক্ষণ কয় মনে মনে গজরে বলল, এই, গাছে উঠতে পারিস?

রাখাল ছোঁড়াটা ঘাড় নাড়ল।

—ওঠ।

—পয়সা দেবেন?

—পয়সা?—পানু দত্তের চোখ বড় হল। বলল—পয়সা কিসের রে?

—বা, গাছে উঠব অমনি অমনি!

ওরে আমার ঝিয়ারীর পুত, আব্দার কত।— মনে মনে বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল পানু দত্ত। শালার ছেলেগুলোও হয়েছে বিচ্ছু, কথায় কথায় পয়সা! পয়সা কি গাছে ফলে? পানু দত্ত থুক করে থুথু ফেলল।

আরেকটা হর্তুকী পড়ল।

কানার ছেলে নগা ছুটে হর্তুকীটা কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো মুখে পুরল। ধুলো মোছারও সময় নিল না।

আরো একটা পড়ল। রাখাল ছোঁড়াটা ছুটে গিয়েছিল, পানু দত্তও। রাখালটা হাত বাড়াবার আগেই ধাক্কা দিয়ে দত্ত কুড়িয়ে নিল। ছোঁড়াটা রুখে উঠতে যাচ্ছিল, দিলে আরেক ধাক্কা। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। নগা রুখে উঠল। বলল—ওকে আরেকটা ধাক্কা দিয়ে দেখ না, বেতের ঘারে—

পানু দত্ত নগাকে ধরবার জন্য যাচ্ছিল, নগা পেছুতে পেছুতে বললে—শালার বুড়ো!

—কি বললি?

—শালা—বলেই ছুটে নাগালের অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বক দেখাতে লাগল। রাখালটাও!

পানু দত্ত আর এগোল না। ভাবল, ডেঁপো ছোঁড়াদের কাণ্ড, আরো ঘাটালে নিশ্চয়ই সম্মান যাবে। সুতরাং এতক্ষণ যে ডাঁসা হর্তুকীটাকে গালের এপাশ ওপাশ করছিল সেটাকে জিভ দিয়ে মাড়ির দিকে ঠেলে দাঁত বসিয়ে দিল। হর্তুকীর রসে গাল ভরে গেল। ঢোক গিলতেই মুখ বিকৃত হল একটু, একটা কষ-তেতো স্বাদ পেল। একটু পরেই একটা মিষ্টি আমেজ। পানু দত্ত আরেকবার ঢোক গিলল। তারপর শাঁসটুকু চুষতে লাগল ধীরে ধীরে। আঃ। পানু দত্ত পায়ে পায়ে বটোকেষ্টর দোকানের বারান্দায় পাতা সুপুরী-গাছের বাখারির তৈরী টুলের উপর এসে বসে পড়ল। একবার তাকাল ডাইনে।

রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে গোপাল-পুরকে দুভাগে চিরে রামরতনের হাটের উপর দিয়ে, মহেশ্বরমহলের সুমুখ দিয়ে ঢালার মুখ ছুঁয়ে শিয়ালবুজোর দিকে। পানু দত্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল। দূরে যেখানটায় রাস্তার ছোট্ট বাঁকটা সুপুরীবাগানের

আড়ালে চলে গেছে সেখানে ধুলো উড়ছে। হয়ত তরকারি বোঝাই গরুরগাড়ি আসছে, অথবা গুড়ের কলসী বোঝাই হয়ে, নতুবা মোজাম্মেল ড্রাইভারের ধ্যাড়ধ্যাড়ে ফোর্ড গাড়িটা। কিন্তু কই বিকট শব্দ তো হচ্ছে না। নিশ্চয়ই গরুরগাড়ি, নিশ্চয়ই—

না, গরুর গাড়ি নয়, মোজেম্মেল ড্রাইভার-এর মান্ধাতাই ফোর্ডটাও নয়, বৃন্দাবন মাস্টারের স্কুল ছুটি হল। ছেলের পাল আসছে রাস্তার ধুলো ওড়াতে ওড়াতে। পানু দত্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল। ভাবল, হত যদি মাস্টার তবে বেত পিটে পিটে ছাল তুলে ছাড়ত। তা মাস্টারগুলোও তেমনি। ছুটি দিবি তো রোদ্দুরটা পড়ে গেলে দে, তা না তাতানো রোদে যখন রাস্তার বালি ফুটছে তখন কিনা ছেলে-গুলোকে ছাড়লি। এখন কি এসব ধম্মের বাছুর বাড়ি ফিরবে? ঠিক কারো আম-বাগানে গিয়ে ঢিল ছুঁড়বে, নয়তো কারো জামগাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে, হাত ভাঙবে, আতুর হবে।

—এই ছক্কা পাঞ্জা...

—দুরি তিরি

পানু দত্তর কান আলগা হল মুহূর্তেই। নিশ্চয়ই নন্দীদের ঘাটে পাশার ছক পেতেছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে ভাবল, নিশ্চয়ই তিনু কোবরেজের ছক। তা ছাড়া ছক আছে কার, তা ছাড়া সময়? পানু দত্ত গুটি গুটি ঘাটে এসে বসল। জুড়ি বেধেছে তিনু, মণি, শ্যাম আর গনু, নুটু, ধীরা। দু চারজন রসিকও এসে জুটেছে ধুপীপাড়া আর বারুইপাড়া থেকে। দত্তও ভিড়ে গেল। গনু একবার খেলতে খেলতে মুখ তুলে বলল, কাছারিতে গেলেন না দত্ত মশাই?

—আর কাছারি!—পানু দত্ত পুনরাবৃত্তি করল ভাঙা গলায়।

—তা বটে! গনু আবার দান দিতে মেতে গেল।

বারুইপাড়ার বামার ছেলেটা দত্তর পাশেই বসেছিল। এ কথা সে কথার পর দত্ত জিজ্ঞেস করল—এরে, তোর সেই জমির কবলা হয়ে গেছে?

হারু ঘাড় নাড়ল।

—কি হল?

—নন্দীবাবুরা আগে কাগজ দিতে রাজী হল না।

—তা বলে কয়ে টাকাটা ধরে দিলিনে কেন?

—নিশি বিশ্বাসের ছেলে দিলে ত!

—দিল না?

—না।

—তা তুই—পানু দত্ত নড়ে চড়ে হারার গা-ঘেঁষে বসে দুকথা বলতে যাবে, হারা উঠে পড়ল। তিনু কোবরেজ বললে—আরে বোস বোস, যাচ্ছিস কোথায়? হারা ইশারা করল চোখে। পানু দত্তর চোখ এড়াল না। ফস করে দত্ত বলল—আমি তোর কি করলাম রে হারা?

—আমি বলেছি? হারু মুখ কাঁচুমাচু করল।

—বেটা বারুইর পো, বলার কি বাদ রাখলি?—দত্ত কটমট করে তাকাল।

তিনু কোবরেজ বেশ রেগে গেল। বলল—তা অত সাতকাহন করে জমির কথা তুললেন কেন?

—দোষ হয়েছে?

—খেলা দেখতে এসেছেন দেখুন, তা না এখানেও সেই ঘোড়ার চাল!

—তাতে তোমার কি?—পানু দত্ত ক্ষেপে উঠে দাঁড়াল।

—আমি ছক পেতেছি তাই।

গনু নুটু মণি বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল—ছেড়ে দিন তিনুদা, লোকের স্বভাব না মলে যায় না। তা দিন দেখি, দান দিন। তিনু কোবরেজ আবার পাশা ছাড়ল।—এই ছক্কা......

পানু দত্ত প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঘাট ছেড়ে। সামনে রাস্তা। এগোতে যাবে, একরাশ ধুলোর ঝড়েরমত ছেলের পাল সামনে এসে পড়ল। পানু দত্তর ইচ্ছে হল ছেলেগুলোর কান মলে দেয়, এমনকি পা[illegible] খেলুড়ে বয়সীগুলোরও। মনের ইচ্ছে মনে রইল। গজ গজ করতে করতে আবার এ[illegible] বসল বটের সুপুরীর বাখারির চৌকিতে

ছেলেদের পায়ে পায়ে ওড়া ধুলোর রেশ[illegible] গুলো তখনো উড়ছে, ছেলেদের কয়েক[illegible] তখনো ঘুরঘুর করছে হর্তুকীতলায়। পান[illegible] দত্ত গালের পাশে এতক্ষণ জিইয়ে রা[illegible] হর্তুকীর বীচিটাকে জিভ দিয়ে টেনে এ[illegible] চুষতে চুষতে ভাবতে লাগল—সব শা[illegible] নেমকহারাম। নইলে এই তিনুর জন্যে কি [illegible] করেছি গেল বছরে। যতের পো নিধিরা[illegible] ত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল, তখন ত [illegible] চাটতে বাকি রাখেনি। এখন শালার বা[illegible] বেড়েছে। আচ্ছা, আমিও ভুগু দত্তর [illegible] পানু। নাইবা রইল বিষ, ছোবলানো ঠেকা[illegible] কে? পানু দত্ত হর্তুকীটাকে জোরে জো[illegible] কামড়াতে লাগল।

সামনের ছেলেগুলো তেমনি ধুলো উড়ি[illegible] ঘুরঘুর করছে হর্তুকীতলায়। পানু দ[illegible] চোখ সরিয়ে নিল। রাস্তার ওপাশের সাঁকো[illegible] বাঁশে বসে একটা টিটিংগে পাখী লে[illegible] দোলাচ্ছে। তার ওপাশের কেয়া ঝাড়ে এ[illegible]

দল চড়ুই ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। তার পরেই ছড়ানো মাঠ গুনগুনিপুকুরের ধার পর্যন্ত। এখান থেকে পুকুর পাড়ের মাদার গাছগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফুল ফুটেছে প্রচুর। পুকুরের পুবের বদ্যিদের বাড়ির টিনের চাল, পশ্চিমের মাঠ, মাঠের ওপারের হকসাহেবদের গাঁটাকেও দেখা যাচ্ছে। যদিও স্পষ্ট নয়। পানু দত্ত ধীরে ধীরে দৃষ্টিটাকে গুটিয়ে নিল। রোদ্দুরে মাঠ জ্বলছে। দূরের মাঠের অনেকটুকুকে মনে হচ্ছে জলা। দত্তর মনে হল তার মনের ভাব কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আগের রাগ আর অবশিষ্ট নেই। তার মনে হল, কতদিন এমনি দুপুর কোথা দিয়ে কেটে গেছে তার খেয়াল ছিল না। তখন কোথায় বাঁশের মাথায় পাখি বসে লেজ দোলাচ্ছে দেখবার দায় ছিল না, চড়ুই দেখার ফুরসত, মাদারের ফুল দেখবার মন। তখন মন ডুবে থাকত নথিপত্রে, কবলা কবুলিয়তে। আর আজ? পানু দত্ত হর্তুকীর বীচিটাকে জোরে জোরে চুষতে লাগল। হয়ত এমনিই হয়। সংগে সংগেই আবার ভাবল—

তিনু কোবরেজ মুখের উপর বড় বড় কথা বলে দিল, এতগুলো লোকের সামনে। শালার গনুরাও কিনা ফোড়ন দিল। কাল নিশ্চয়ই একথা সর্বত্র রাষ্ট্র করে দেবে হারু। তখন আরেকবার লোকে ছি ছি দেবে। কিন্তু কি করতে পারবে পানু দত্ত?

একটা বাস আসার শব্দ এল কানে। বাঁ দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই শহরের বাস আসছে। এখন গয়লারা ফিরবে দুধের খালি ঘড়া আর বাঁক নিয়ে। হয়ত গাঁয়ের কেউ কেউ আসবে শহর থেকে। পানু দত্ত ওদিকে তাকিয়ে রইল। ধুলো উড়ছে চালতাপুকুরের বাঁকে। জোর শব্দ আসছে। একটু পরেই বাস এসে দাঁড়াবে নন্দীর ঘাটে। দত্ত অপলক তাকিয়ে রইল।

ধুলো ক্রমে বাড়ছে, শব্দও। গাড়ি এল, বাস নয়, একটা জীপগাড়ি একটি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে পলকে হাওয়া হয়ে গেল। ভাল করে দেখাও হল না পানু দত্তর। শুধু লাল শাড়ির উড়ন্ত আঁচল, একখানা লাল টকটকে মুখ, একগাল হাসি আর একরাশ ধুলো ছাড়া কিছুই দেখল না। তবু পানু দত্ত তাকিয়ে রইল। দেখল ঝাঁক ঝাঁক ধুলোর আড়ালে হারিয়ে গেছে সেই গাড়ি, মেয়ে-ছেলেটা, তার শাড়ি, মুখ, হাসি। একটু পরে শব্দও। শুধু ধুলো উড়ছে এলোপাথাড়ি। পানু দত্ত ভাবল, হয়ত বড়লোকের বউ, বড় ঘরের মেয়ে। নইলে এত রূপ কি একটি শরীরে ধরে? না, পানু দত্ত এত রূপ এক অঙ্গে কখনো দেখেনি। যৌবনে দেখা সাতগাঁয়ের সেরা রূপসী চপলার শরীরেও নয়। চপলার ত এমন হাসি ছিল না, ঘর-পোড়া আগুনের মতো এত দাউদাউ রূপ। এমন সাজতে চপলা পারত না, কিছুতেই না।

পানু দত্ত আপন মনে মাথা নাড়ল। না, সে কাউকে দেখেনি। অবশ্য দেখার সময়ও ছিল না। বাইশ বছর বয়সে বিয়ে করে এনেছিল হরির মাকে। তারপর হরি হল, সারি হল, ব্রজ হল। ব্রজর পরেও তিনটে। কিন্তু সব মরে গেল, রইল শুধু হরি। একদিন হরির মাও গেল। ততদিনে কাছারি খাসমহলেই মজে গেল। আর চোখ তুলে দেখার সময় হল না পানু দত্তর। মেতে রইল জমিজমায়, কবলা খাতিয়ানে, মামলা-মোকদ্দমায়। চোখের উপরে কত কি ঘটে গেল। রায়বাড়ির অত বড় ভিটেয় ঘুঘু ডাকল, গুহরা তেত্রিশ টুকরো হল, মল্লদের ভিটেয় মুসলমান বসল, উপীন যে উপীন আঙ্গুল ফুলে উপেনবাবু হয়ে গেল, কিশোরীবাবুরা এসে দাঁড়াল রাস্তায়, আরো কত কি! প্রায় সব ঘটনাতেই পানু দত্তর ইশারা ইঙ্গিত ছিল, কিছু কারসাজি। তখন পানু দত্তর নামডাক কত, হইচই। ইতিমধ্যে হরি বড় হল, বিয়ে দিল, ছেলে হল। পানু দত্তর খেয়ালই ছিল না, কখন প্রায় শূন্য সংসার আবার চেঁচামেচিতে ভরে উঠেছে, জমি জমায় ফসলে জমজমাট। এ জমি কি করে, কি ভাবে এল পানু দত্তর হিসেব রাখার সময় ছিল না। এ সবই দেখত হরি। সেই ব্যস্ত লোক পানু দত্তর হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। সব কিছু থেকে ছুটি। সে কি জানত বুড়ো বয়সে হঠাৎ এমন ছুটিও তার ভাগ্যে ছিল। অথচ অভ্যেস, অভ্যেস। কিছুতেই যাচ্ছে না। সেদিন ছেলেকে কি বলতে যাচ্ছিল, ছেলে মুখের উপর বলে দিল, ওসবে সে নেই। থাকবে কেন? আজ আর থাকবার দরকার নেই হরির, হরির বউয়ের, তার ছেলেপিলের। কি ভুলই যে করেছে পানু দত্ত। বেনামীতে জমি কিনেছে সব ছেলের বউ আর বড় নাতীর নামে। যদি জানত এমন হবে, পানু দত্ত কি এত কাঁচা কাজ করত। কিছুতেই না। কিন্তু এখন আর শোধরাবার পথ নেই। দলিল দস্তাবেজ সব হরির হাতে। কখন হাতিয়ে নিয়েছে পানু দত্ত জানে না। সেদিন সুয়াবিলের আঠারো গন্ডার কাগজটা চাইতেই বলল—কি হবে, ওতে ত কোন গোলমাল নেই।

শুয়োরের বাচ্চা, গোলমাল থাকার মতো জমি আমি কিনিনি সে আমি জানি।—মনে মনে বলল। মুখে বলল—না তার জন্যে নয়, তালুকটা কাদের দেখতে চেয়েছিলুম।

—ঘোষেদের।—হরি জবাবে জানাল।

পানু দত্তর মুখ চুন হয়ে গেল মুহূর্তেই। হরি মুখস্ত করে রেখেছে সব। সবই! করবে নাওবা কেন। পানুর রক্ত বইছে না হরির শরীরে? তাহলে! তারপর আর কোন কথা বলেনি পানু দত্ত। গত দুদিন ধরে সে মুখ বুজে আছে। অথচ তিনদিন আগেও পানু দত্তর দাপটে ধান পলকে খই হয়েছে, আর গত তিনদিন পানু দত্তর তাপে ধানও ফাটছে না, ফোটা ত দূরের কথা। পানু দত্ত হর্তুকীটাকে জিভের উপর এনে ধীরে মাড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে দ্রুত চাপ দিতে লাগল।

রোদ্দুর এতক্ষণ দূরে দূরে হামা দিয়ে ফিরছিল। কখন হামাগুড়ি দিয়ে এসে পানু দত্তর পা জড়িয়ে ধরেছে খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতেই পাজোড়া তুলে নিল উপরে। হাঁটু থুতনি ছুঁল। একটু নড়ে-চড়ে একেবারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল পানু দত্ত।

বেলা ভাঙছে, বাড়ছে। পানু দত্ত ভুলতে চেষ্টা করল ঘর, ভুলতে চেষ্টা করল ঘাট, কাছারি, খাসমহল, রেজিস্টারী অফিস, তার অতীত। কি হবে ভেবে? ওই ত রাস্তার মাঝের থমকানো রোদ্দুর ক্রমে বাড়তে বাড়তে বটোকেষ্টর দোকান ছুঁয়েছে। ক্রমে আরো বাড়বে। হর্তুকী গাছের তলা দিয়ে এক সময়ে বটোকেষ্টর দোকানটাক রাঙিয়ে দেবে। তখন পুরনো টিনের চালা, মেঠো তেল দিয়ে রাঙানো বাঁশের খেজুরিচালে বোনা ম্যাড়ম্যাড়ে বেড়া সব ক্ষণ-কয়েকের জন্যে রঙীন হয়ে যাবে। তারপর ক্রমে মিইয়ে যাবে সে রঙ, মলিন হবে, ধূসর হবে। এক সময়ে সব রঙ খুইয়ে নাপতে পাড়ার বিন্দে মা বুড়ির চামড়ার মতো ঝুলে পড়বে ওই বটোর দোকান। পানু দত্তর ভাবতে ভাবতে মনে হল, তখন দোকানটিকে বুড়ির মতো মনে হবে, বুড়োর মতো মনে হবে, তারপর আরো অন্ধকার হলে আরো, আরো বাঁশতলির শ্মশানঘাটের পড়ো পড়ো ছাউনির মতো মনে হবে। তারপর একদিনের হঠাৎ ঝড়ে—ভেঙে চুমার হয়ে লুটিয়ে পড়বে ধুলোয়। তখন কিছুতেই সেই ছ্যাদরানো দরমা, খুঁটি, টিনের জঞ্জালগুলো বটো-কেষ্টর দোকান বলে চেনা যাবে না। কিছুতেই না। পানু দত্ত কিরকম যেন হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হল, সে ডুবে যাচ্ছে ভাবনায়। তার মনে হচ্ছে, তাকে যেন ভাবনার নিশিতে পেয়েছে। সে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর থেকে আরো গভীর এক নিতল অন্ধকারে। যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। রোদ না, মাছ না, ফুল, পাখি কিছু না! শুধু আঁধার আর আঁধার। এবং সেই অন্ধকারের তল ছোঁবার আগেই টের পেল সে-ও অন্ধকারে বটোকেষ্টর দোকান হয়ে গেছে, শ্মশানঘাটের পড়ো পড়ো চালা, ঝড়ে-পড়া ছ্যাদরানো দরমার বেড়া। ভয়ে, বিস্ময়ে পানু দত্ত নড়ে চড়ে বসার চেষ্টা

করল, পারল না। মনে হল তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। সে প্রায় মরিয়া হয়ে বাঁ পা-টা তোলার চেষ্টা করল, পারল না। কে যেন বিরাট ভার চাপিয়ে দিয়েছে পায়ের উপর। আবার চেষ্টা করল, ব্যর্থ হল। দত্তর মনে হল, পা-টা যেন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ, সাড়হীন, শক্তিহীন, কি ভার! কি ভার! পা ঝিনঝিন করে উঠল। ডান হাত দিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে, একযোগে কোনমতে খাড়া করল। ডান পা মাটিতে ফেলে বাঁ পায়ের উপর চাপ দিতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়ল। তার মনে হল, ও-পা যেন আর মাটিতে বসবে না, বসাতে পারবে না। পানু দত্ত ভীষণ ভয় পেল। একে বয়স হয়েছে, যদি অচল হয়ে যায়, যদি অবশ হয়ে বিছানা নিতে হয় তা হলে, তা হলে? পানু দত্তর ইচ্ছে হল, চিৎকার কারে কাউকে ডাকে, চেঁচিয়ে বলে—আমাকে তুলে ধরো, আমি—মরিয়া হয়ে বাঁ পা-টা মাটিতে পেতে জোরে চাপ দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে আবার কাত হয়ে বসে পড়ল। এ কী?

ঝিঁঝি ধরেছে পানু দত্তর পায়ে। খেয়াল হতেই শিরাগুলো টেনে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক্, এখনো অচল হয়নি, অবশ হয়নি পানু দত্তের মনে হল, এখনো সে পারে, বিশ্ব-সংসারকে ভেলকি দেখাতে পারে। সে উঠে দাঁড়াল।

একটা বিশ্রী শব্দ করে ঝাঁপ তুলল বটো-কেষ্ট। একটা বাঁশ ঠেকিয়ে দিল ঝাঁপের তলায়। পানুদত্ত ঘুরে দাঁড়াল।

—কি, দুপুর-ঘুম সারা হল?

বটো হাসল। বলল—উঠলেন কেন, বসুন। পানু দত্ত খুশি হল বটোর আহ্বানে। সুখ বোধ করল। না, সে একেবারে অপাঙক্তেয় নয়। একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।

পানু দত্ত এবার পা নামিয়ে বসল। রোদ্দুর সর্বাঙ্গে হাত বুলোচ্ছে, বুলাক। পানু দত্ত সরে বসবে না। তার এই তাপ, এই তেজ দরকার। রোদ্দুর থেকে যতটুকু পাওয়া যাবে কুড়িয়ে নেবে, এবং শেষবারের মত হরিকে, হরির বউকে, চতুর্দিকের নেমকহারাম এই বিশ্ব-সংসারকে বুঝিয়ে দেবে সে, সেই ঘোড়েল পানু দত্ত এখনো মরেনি। এখনো তার মাথায় শতসহস্র ফন্দি খেলে, অজস্র সুতোর জটিল জট খোলে, খুলতে পারে।

রোদ্দুর ক্রমে দত্তের গা বেয়ে বেয়ে চালার দিকে উঠে যাচ্ছে। তবু বাতাসে রোদ্দুরের আঁচ। সে একবার নড়ে চড়ে বসল। এক-ঝলক বাতাস এল। বটোর টিনের চালার উপরে জমে-থাকা শুকনো হর্তকী পাতার কিছু গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, কিছু শব্দ করে গড়াতে গড়াতে কোথাও আটকে গেল। সামনের রাস্তার ধুলো উঠল ঘুরে ঘুরে। গাছতলার পাতাগুলো ক্ষণকয়েক গড়াগড়ি দিয়ে স্থির হল।

পানু দত্ত দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফাঁকা মাঠে ক্রমে মানুষ দেখা গেল। পানু-দত্ত অপলক দেখছে। কে আসছে অমন দ্রুত, অমন ঝুঁকে। গোঁসাই বাড়ির ললিতের মতো অনেকটা। না, ললিত নয়। তবে কি রাম-ধুপীর ছেলে তিনকড়ি। না, তিনকড়ি অত লম্বা নয়। নিশ্চয়ই রায়মল্লদের সুরেন। না, এ প্রতাপ মাস্টার। লোকটা ক্রমে এগিয়ে আসছে। পানু দত্ত ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল। না, প্রতাপ মাস্টার বলে ত মনে হচ্ছে না। তা হলে? — বটো?

—আজ্ঞে।

—ঐ লোকটা কে বল তো? —আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে বলল—বড্ড চেনা মনে হচ্ছে।

বটো একটু হেসেই বলল—হরি আজ্ঞে।

—কে?

—আজ্ঞে হরিপদ।

পানু দত্ত পুলকে উঠে দাঁড়াল।

—উঠলেন যে!

—উঠি। বেলা পড়ে এল, একটু ঘুরি-ফিরি। পানু দত্ত হনহন করে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

নিশ্চয়ই হরি শহরে যাচ্ছে। কিন্তু এই অবেলায়! কি এমন রাজকাজ পড়েছে যে, বিকেলে শহরে যেতে হবে? আবার ভাবল, হয়ত কাজ আছে। কিন্তু সকাল থেকে একবারও বললে না ত। আমি কি—

না, তার চেয়ে বড় কথা, পানু দত্ত হরিকেও চিনতে পারেনি। যাকে মানুষ করল নিজের হাতে, যাকে অষ্টপ্রহর চোখের সামনে ঘুরঘুর করতে দেখল, তাকেও চিনতে পারল না। কি এমন দূরে ছিল হরি? ঐ ত বাঁশের সাঁকো ডিঙোচ্ছে, অথচ? পানু দত্ত নতুন ভাবনায় প্রায় মুষড়ে পড়ল। তা হলে চোখ একেবারেই গেছে! যাবেই তো! পানু দত্ত ভাবল, বয়স ত কম হল না। হরিরই বয়স হল পঁয়ত্রিশের উপর। পানু দত্ত জোরে জোরে পা ফেলতে লাগল।

কিন্তু কোথায় যাবে? অবশ্য সামনের বটতলায় কিছুক্ষণ বসা যায়, অথবা পানা-পুকুরের পাড়ে। না, তার চেয়ে ভাল রতন মুন্সীর ঘাটের চাতালে গিয়ে বসা। সেখানে নিশ্চয়ই দু-একজন পরিচিত লোক থাকবে। বরং তাদের সঙ্গেই গল্পগুজব করবে বসে বসে। একা থাকলে নিজের ভাবনাই কুরে খাবে। না, নিজের ভাবনা আর নয়। বয়স অনেক হল।

পানু দত্ত ইচ্ছে করেই ডান পাটাকে ধুলোয় ঘষে দিল। কিছু ধুলো ঝাঁক বেঁধে উপরে উঠে হাওয়ার উল্টো দিকে হেলে পড়ল। আবার বাঁ পা-টা টানল। এবারও সেই। দত্তর বেশ লাগছে। তাই সে বার বার একইভাবে পা টানতে লাগল। ধুলো উঠল, হেলল।

পানু দত্তর ভাল লাগছে।

একটা হাটুরে লোক তরকারির বাঁক কাঁধে প্রায় ছুটে চলছিল, সে একবার ঘাম মুছতে মুছতে পানু দত্তর পায়ের দিকে তাকিয়ে যথারীতি চলে গেল। পানু দত্ত একবার থমকে দাঁড়িয়ে নিজের পা জোড়া দেখল। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, মোজা পরিয়ে দিয়েছে। পানু দত্তর খুব খুশি লাগল। সে ঘাট পর্যন্ত গেল না। ধুলোর মোজা পায়ে বটতলাতেই বসে পড়ল।

বটতলা একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। গাছের উপরে কয়েকটা কাক-পক্ষী এ-ডাল ও-ডাল করছে। মাঝে মাঝে বটফল ঠোকরাচ্ছে। দু-একটা পানু দত্তের পায়ের কাছে, গায়ের কাছে পড়ল। পানু দত্ত তার একটা কুড়িয়ে নিয়ে উপরের দিকে ছুঁড়ল। পাখিগুলো নড়ে চড়ে বসল অন্য ডালে।

বেলা আরো ভাঙছে। পানুদত্ত বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। অনেক ধুলো উড়িয়ে শহরের একটা বাস শিয়ালবুজোর দিকে চলে গেল। একটু পরে উল্টো দিকের একটা বাস শহরের দিকে।

হরি নিশ্চয়ই এ-বাসে শহরে যাবে। পানু-দত্ত একবার সেদিকে তাকাল। অজস্র ধুলোয় বাসটা ঢেকে গেছে। নিশ্চয়ই হাত দেখাবে হরি। পানুদত্ত ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ওর মনে হল বাস থেমেছে নন্দীর ঘাটে। বাসের শব্দ হল, চলে গেল।

পানু দত্তর হঠাৎ চোখজোড়া জলে ভরে গেল। তার ইচ্ছে হল, ডুকরে ডুকরে কাঁদে। কিন্তু কেন, কিসের জন্য বুঝতে পারল না। দুঃখ তার অনেক, অনেক। কিন্তু সেজন্যে কি? না, পানু দত্তের মনে হল, তার জন্যে নয়। কিন্তু কি জন্যে, ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তবু হাতের তেলো দিয়ে চোখ-

জোড়া মুছল। তারপর ভাবতে লাগল—এত কান্না পাচ্ছে, এ কি রাগে, ক্ষোভে, নাকি অন্য কিছুর জন্যে। পানুদত্ত ঠিক-ঠিক কিছুই ভেবে পেল না। হাঁটুতে মুখ গ‍ুঁজে পানুদত্ত তাকিয়ে রইল রাস্তার ধারের প্রায় শুকিয়ে-আসা খাদের দিকে, যেটার অনেক-টুকু কলমী লতায় ঢাকা, মাঝখানে জল টলটল করছে এবং যে-জল হঠাৎ-হঠাৎ ছোট জাতের মাছের লেজের ঝাপটায় নড়ে চড়ে স্থির হচ্ছে। পানুদত্ত একটা বটফল কুড়িয়ে সেই জলে ছুঁড়ে দিল। চারদিকে বৃত্ত গড়ে গড়ে ফলটা স্থির হয়ে ভাসতে লাগল জলে। পানুদত্ত আরেকটা ছুঁড়ল, আরো একটা।

বিকেল আরো গড়াল। হাটুরে লোক হাটে যাচ্ছে। রাখাল ছোঁড়াগুলো গাঁয়ের দিক থেকে গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে রাস্তার দিকে। পানু দত্তর কাছারির কথা মনে পড়ল। হাকিম নিশ্চয়ই এতক্ষণ উঠি-উঠি করছে। উকিলবাবুরাও। অবশ্য খাসমহল এখনো খোলা আছে। সাব-রেজিস্টারের অফিসও নিশ্চয়ই নেত্য, বিপিন, দেবেন সবাই খুব মক্কেল ঘাটাঘাটি করছে। করবেই ত! পানু-দত্ত আরেকটা বটফল ছুঁড়ে মারল জলে। আর ভাবল, নিশ্চয়ই স্বভাব। নইলে কি এমন আর হত ওসব মামলায়। কিছুই না। তবু মিছিমিছি মক্কেল খেপানোতে মেতে রইল কেন? অথচ উকিলবাবুরা কতবার কেস নিতে অরাজী হয়েছে, তবু পানু দত্ত নাছোড়। দত্ত নিজের সর্বনাশা স্বভাবের জন্যে লজ্জিত হল। সঙ্গে সঙ্গে আবার এও মনে হল, শুধু একতরফা দোষই দিই কেন? নরু কি অরাজী ছিল, অথবা সনাতন? অবিনাশ নিজে থেকেই বলল মামলার কথা। বুদ্ধি নিশ্চয়ই পানু দত্ত দিয়েছে, কিন্তু একহাতে ত তালি বাজেনি। মিথ্যে মামলা নিজের জন্যে সাজায়নি সে। মক্কেলেরও সায় ছিল। অবশ্য তাদের শাস্তি হয়নি তা নয়, কিন্তু হাকিম সঙ্গে সঙ্গে তাকেও শাস্তি দিয়েছেন। হুকুম দিয়েছেন, দত্ত বাবুর তদ্বিরী কেস যেন আর না নেওয়া হয়। মক্কেলরা ছিটকে সরে গেল। কাছারির সবাই ছি-ছি করল পানু দত্তকে। তারপরও পানু দত্ত খাসমহলে কি রেজিস্টারী অপিসে যেতে পারত। পারতই ত! কিন্তু ব্যাপারটা হুহু করে ছড়িয়ে গেল মুখে মুখে। লজ্জা, লজ্জা। শুধু চক্ষুলজ্জায় আর ওদিকে যেতে পারল না। লোকে যা-নয় তাই বলল। পানু দত্ত কানে তুলো দিয়েছে, কালা সেজেছে। কি করবে সে? লোকের মুখের উপর ত আর ট্যাক্স নেই। পানু দত্তর মনে হল, সবটাই অদৃষ্ট, নইলে ছেলেও মুখের উপর সাতকথা শুনিয়ে দেয়?

হাঁটু থেকে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল। মা, এখনো অনেক বেলা। এখনো রোদ্দুর হেসে খেলে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। অথচ আগে আগে কখন যে দিন ফুরিয়ে যেত, কিছুতেই টের পেত না সে। আর এখন দিন যেন আর ফুরতে চায় না। কিছুতেই না। পানু দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে হল, হাকিমের একটি হুকুমেই তার গত-জীবনের সব মিথ্যে হয়ে গেছে, এমনকি সে নিজেও। পানু দত্ত উঠে দাঁড়াল। তার মনে হচ্ছে, তার যেন আর দম অবশিষ্ট নেই। কিসের যেন একটা দলা বুক বেয়ে গলায় এসে আটকে যাচ্ছে। পানু দত্ত একমুহূর্ত দাঁড়াল। সত্যিই অস্বস্তিটা ক্রমে বাড়ছে। ক্রমে তার মনে হচ্ছে, এই রোদ্দুর জড়ানো মাঠ-ঘাট, গাছ-পাতা-আকাশ, সব যেন ক্রমে অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন দাম নেই, কিচ্ছু নেই। সব নিরর্থক, সব মিথ্যা।

তার আর কিছুই ভাল লাগছে না। তবু সে হাঁটছে। কিন্তু এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছে সে, কোথায় যাবে? যদি একটু জল পাওয়া যেত, এক কাপ চা। না, চা খাওয়ার পয়সা পকেটে নেই। পানুদত্ত ঘুরে দাঁড়াল। সে রতন মুন্সীর ঘাটেই যাবে। হাত-মুখ ধুলে হয়ত মনটা ঠান্ডা হবে, মাথাটা স্থির। পানু দত্ত জোরে পা চালাল। ঘাটের কাছা-কাছি হবার আগেই তার মনে হল, না, সে বাড়িতেই যাবে। কেন যাবে, কিজন্যে যাবে, সে ভাবল না। শুধু মনে হল, ঘাটের চাইতে ঘর ভাল। সে মুখ বুজে পড়ে থাকবে বিছানায়, নতুবা বসে থাকবে পশ্চিমের বরান্দায়। আর-কিছু না হোক, নাতি-নাতনীগুলো ত আছে। ওদের সঙ্গে বসে বসে কড়ি খেলবে, কি গল্প করবে, নয়তো চোর-চোর খেলবে, নতুবা ঘোড়া সাজবে।

পানু দত্ত সরকারী রাস্তা থেকে মাঠে নামল।

মাঠটা চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের রোদ্দুর গিলছে। পানু দত্ত সারা শরীরে রোদ্দুর শুষতে শুষতে ধুলো পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কোথাও কেউ নেই। নাতি-নাতনী-দের কেউ না। পায়ের শব্দ পেয়ে একঝাঁক পায়রা উড়ে গেল। ধুলো উঠল। পানু দত্ত মুখ ঘুরিয়ে গোয়াল দেখল। ফাঁকা। নিশ্চয়ই সবাই গরু নিয়ে মাঠে গেছে। হরির ঘরের দিকে তাকাল। দরজায় শিকল তোলা। বউমা হয়ত কারো বাড়ি গেছে। পানু দত্ত ধুলো পায়ে নিজের ঘরের বারান্দায় উঠে এল। চারিদিকে শব্দহীন এক স্তব্ধতা মুখিয়ে আছে। একটা পাখি, কি একটা কুকুরও ডাকছে না কোথাও। কেন, কি হল? পানু দত্ত গলা বাড়িয়ে পিছনের পুকুর দেখতে চেষ্টা করল। না, ওদিকেও কোন শব্দ নেই। চাষের লোকগুলোরও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সব, কোথায়? অস্বাভাবিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় পানু দত্ত প্রায় মরিয়া হয়ে উঠল। তার মনে হল, সে আর দাঁড়াতে পারবে না। এক্ষুনি মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সে পা টেনে টেনে নিজের ঘরের দরজার ছিটকিনি খুলল। তারপর হাতের ধাক্কা দিতেই দরজা একেবারে খুলে গেল। আলো ঢুকল ঘরে। চোখ তুলে সামনে তাকাল পানু দত্ত। ঘরের ভেতরের একজোড়া চড়ুই শব্দ পেয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে গেল। পানু দত্ত পা দিল তার ঘরে। হঠাৎ, একেবারে আচমকা ঘরের এক কোণে টাঙানো ছবিটার দিকে নজর পড়ল। অবহেলায় পড়ে-থাকা ঝাপসা ছবিটার কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পানু দত্ত পায়ে পায়ে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেল। কি আশ্চর্য! কতদিন এ-ছবিটার কথা খেয়াল ছিল না তার। কতদিন, আজ যেন হঠাৎ আবিষ্কার করল সে। পানু দত্ত পায়ে পায়ে একেবারে ছবির নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জানকীর মুখ, চোখ, শাড়ির পাড়। কি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে পানু দত্তর দিকে। পানু দত্তর মনে পড়ল সব, সবই। মরবার কয়েক মাস আগে যতীনকে ডেকে এনে এ-ছবি তুলিয়েছিল। কত মিনতি করেছিল জানকী, ওকেও সঙ্গে বসার জন্যে। পানু দত্তর তখন সময় ছিল না, মনও নয়। পানু দত্ত অপলক ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল অনেক, অনেকক্ষণ। তারপর কখন সে নিজেও জানে না, একেবারে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তখন অন্ধকারে ছবি, ঘর সব ঝাপসা হয়ে গেছে। এমনকি, পানু দত্ত নিজেও।

সেতার একাডেমী অফ মিউজিক

তরুণ সেতারশিল্পী ইমরাত খাঁ তাঁর পিতা এনায়েৎ খাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে একটি সেতার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতত এর নাম-

ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ

করণ হয়েছে—সেতার একাডেমী অফ মিউজিক। এই সংবাদে আমরা আনন্দিত হয়েছি। শিল্পীসমাজে এনায়েৎ খাঁর নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। বাঙলাদেশে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অনেকেরই আশা ছিল কোনও প্রতিষ্ঠানে এই মহান্‌-শিল্পীর স্মৃতি সুরক্ষিত হবে। কিন্তু এ যাবৎ তা হয়নি। তাঁরই পুত্র যোগ্যতা অর্জন করে পিতার স্মৃতিকে রক্ষা করবার যে মহৎ প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইমরাত তাঁর পিতার স্নেহ-চ্ছায়ায় বর্ধিত হয়ে শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হননি বটে, কিন্তু তিনি তাঁর গুণবতী মাতার কাছ থেকে অতুলনীয় প্রেরণা লাভ করেছেন এবং তাঁর দাদা স্বনামধন্য বিলায়েৎ-এর অধীনে শিক্ষালাভ করেছেন। বিলায়েৎ বাল্যকালে তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পিতার ন্যায় তিনিও স্বকীয় প্রতিভার অধিকারী। তাঁর অতুলনীয় কর্তব্যগুলি যন্ত্র-বাদনের কৌশলকে অব্যাহত রেখেই গীতের লালিত্য বিস্তার করে। ইনিও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত আছেন জেনে আশ্বস্ত হয়েছি। তরুণ বয়সের উৎসাহকে সংগঠনের কাজে লাগাবার মত সৎপ্রচেষ্টা আর কিছুই হতে পারে না। এটি সাফল্য-মণ্ডিত হলে আমাদের গৌরব যথেষ্ট বর্ধিত হবে।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

সেতার সম্বন্ধে ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর নিজস্ব চিন্তা ছিল। তিনি কেবল শিল্পী ও শিক্ষকই ছিলেন না যন্ত্রের উন্নতি-বিধানেও তাঁর পরিকল্পনা ছিল। সেই-ভাবে তিনি তাঁর যন্ত্রকে সংগঠিত করে-ছিলেন। এইগুলি সবই জানবার বিষয়। আশা করি তাঁর পুত্রেরা শিক্ষার্থীদের এই সব বিষয়ই জানাবার চেষ্টা করবেন।

যে কোন যন্ত্রই বিশেষভাবে শেখবার জিনিস—কেননা এক যন্ত্র অপরের মত নয়। বাঙলাদেশে সেতার যেরকম জনপ্রিয় তাতে সেতার সম্বন্ধে বিশেষ অনুশীলনের যে একটা বিপুল আবশ্যকতা রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় আজকাল এদিকে শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। কোনক্রমে কিছুটা অগ্রসর হয়েই লোকে নানাস্থান থেকে কায়দাকানুন শেখবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। ফলে এই হয় যে, তাঁদের শিক্ষা কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অগ্রসর হয় না এবং কয়েকটি চমক-লাগানো কাজে কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করেই ক্ষান্ত হয়। আজকাল শিক্ষার্থীরা যখন কোনও বড় ওস্তাদের কাছে শিখতে যান, তখন ধরা পড়ে তাঁদের গলদ গোড়াতেই। অনেকে বাজনাই ঠিকভাবে ধরতে পারেন না—অনেকের টিপ্‌ সেই বাজনার উপযোগী নয় এবং অনেকের তারে আঘাত করবার প্রক্রিয়াও যথাযথ নয়। এই সমস্ত দোষ ঘটে প্রধানত যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা দেন তাঁদের ত্রুটি থেকে। অতএব শুধু শিক্ষার্থী নয় শিক্ষককও তৈরি করা দরকার হয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে যাঁরা কেবলমাত্র সরোদ বাজান তাঁরা আজকাল সেতার শিক্ষার্থীদেরও শেখাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এমনকি বেহালাবাদকগণও এ ব্যাপারে কম উৎসাহী নন। এতে যে শিক্ষা হচ্ছে তাতে একটা বিসদৃশ মিশ্রণ এসে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ধারণা হচ্ছে তাঁরা নতুন সুর-বিস্তারের রীতি আয়ত্ত করছেন, কিন্তু যন্ত্রের মূলরীতি থেকে যে সরে যাচ্ছেন সেটা তাঁদের পরিকল্পনায় আসে না। যখন ভুলটা নজরে আসে তখন তাঁরা এমন একটা অভ্যাসের কবলে পড়ে গেছেন যেটা দূর করতে যোগ্য ওস্তাদকে কষ্ট পেতে হয়। এই কারণে গোড়াতেই শিক্ষার্থী যে যন্ত্রে অধিকার অর্জন করতে চান সেই যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী অধ্যাপকের কাছে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। সেতার একাডেমী এই দিকে নজর দেবেন জানিয়েছেন এবং জানা গেল শ্রীমান ইমরাত নিজেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক থেকে শেষ পর্যন্ত সাধ্যানুসারে শিক্ষাপ্রদান করতে সচেষ্ট হবেন। এই প্রতিষ্ঠান যদি সেতারের মাধ্যমে যথার্থ শিক্ষার উপায়গুলি নির্ধারণ করতে পারেন, তাহলে অপরাপর বাদ্য-শিক্ষার পথও যথাযথভাবে প্রস্তুত হবে। আজকাল অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাদের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপনে যতটা, কাজে তার চারভাগের একভাগও হয় কিনা সন্দেহ। এ-হেন পরিবেশে কোনও সুযোগ্য শিল্পী তাঁর প্রতিভাকে প্রকৃত শিক্ষার কাজে নিয়োগ করবেন—এই আশ্বাস যখন পাই তখন আমরাও বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠি। এই প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ পেয়ে আমরাও আন্তরিক প্রীতিলাভ করছি।

বিদ্বান চউড়াইয়া

বিদ্বান চউড়াইয়া

মহীশূরের স্বনামধন্য বেহালাবাদক শ্রীচউড়াইয়া সম্প্রতি কলকাতায় তাঁর মনোরম বাদ্যানুষ্ঠানে আমাদের গভীর আনন্দ প্রদান করেছেন। তাঁর বয়স সাতষট্টি বছর হল। তাঁর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন কলকাতার দক্ষিণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-রসিকরঞ্জন সভা। ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। এই উচ্ছ্বসিত সমাদর থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ ভারতীয়দের অন্তরে তিনি কতখানি শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা শ্রীকেশভন এই শিল্পীর গুণাবলীর বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করেন। সংস্কৃতি বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর সভাপতিত্ব করেন।

বিদ্বান চউড়াইয়া খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন। তিনি বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। মহীশূর দরবার থেকে তাঁকে "সংগীতরত্ন" উপাধি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গানকলাসিন্ধু, সংগীতরত্নাকর তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত। সংগীত নাটক একাডেমী তাঁকে ১৯৫৬ সালে সম্মানিত করেছেন।

শ্রীচউড়াইয়া ১৮৯৫ সালে মহীশূরের কাছে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর মাতুলের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন, পরে খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ বিদারম কৃষ্ণাপ্পার শিষ্য হন। গুরু তাঁকে বেহালায় শিক্ষা-প্রদান করেন। বেহালাতেই তিনি বিপুল কীর্তি অর্জন করেছেন।

সাধারণ চার তারের বেহালার পরিবর্তে তিনি সপ্ততন্ত্রী বেহালা বাজিয়ে থাকেন। এটি তাঁর নিজের পরিকল্পিত বেহালা। তাঁর বেহালার আওয়াজ অসাধারণ গম্ভীর এবং সুরেলা। এখনও তাঁর বাজনা হৃদয়গ্রাহী। বহু কলাকৌশল তাঁর জানা আছে, কিন্তু তিনি শিল্পমাধুর্যে শ্রোতার চিত্ত জয় করেন। উত্তর ভারতীয় শ্রোতৃবর্গ তাঁর বাজনায় বিশেষ আকৃষ্ট হবেন। ছোট ছোট বহু সুরে তিনি সেদিন বাজালেন—তাতে বেহাগ, বাগেশ্রী, জৌনপুরী, পিলু, ভৈরবী, তোড়ী, মুলতানী প্রভৃতি বহু সুরের স্পর্শই পাওয়া গেল এবং সে স্পর্শ একমাত্র উচ্চতম কলাবিদের প্রয়োগেই সম্ভব। এঁর বাজনা এক এক সময় হাফেজ আলীর মাধুর্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এঁর সঙ্গে সঙ্গত করলেন দক্ষিণ ভারতের অপর এক খ্যাতিমান মৃদঙ্গবাদক পালঘাট মণি আয়ার। এমন উত্তম মৃদঙ্গ-বাদন শোনবার সৌভাগ্য কমই ঘটে।

বাঙলার পক্ষ থেকে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক তাঁকে অভিনন্দিত করেন। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং ভবিষ্যতে তাঁর বাদ্য শোনবার প্রতীক্ষায় রইলাম। যদি সম্ভব হয় কোনও কনফারেন্স কি তাঁকে একবার কলকাতার অধিবাসীদের কাছে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পরিচিত করাতে পারেন না?

ব্যাধিতে আবেগের প্রভাব

আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের ডাঃ হেনরী কে বীচারের মতে কেউ কোন ব্যাধির দ্বারা কিভাবে আক্রান্ত হয়, সেটা রোগীর মানসিক গঠনের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। জার্নাল অব দি আমেরিকান মেডিকাল এসোসিয়েশন'এ এক প্রবন্ধে তিনি এই ব্যাপারটি আখ্যাত করেছেন, "ব্যাধিকে বেষ্টন করা অনির্ধারিত প্রভাব এবং ব্যাধির চিকিৎসা" বলে।

এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি মন্ত্রতন্ত্র বা যোগের প্রভাবে মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন। আফ্রিকার এক সম্প্রদায়ে বন্য মুরগী খাওয়া নিষিদ্ধ। সেই সম্প্রদায়ের এক যুবককে ভাঁওতা দিয়ে একটি বন্য মুরগী খাওয়ানোর বছর কতক পরে সত্যটা জানতে পারার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লোকটির মৃত্যু ঘটে। সম্প্রদায়ের ওঝা কর্তৃক যুবকটিকে বিষ প্রয়োগের সন্দেহ টিকতে পারেনি।

কতকগুলি ফল খাবার পরে এক মাওরি স্ত্রীলোক জানতে পারে যে, সেগুলি তাদের সম্প্রদায়ের কাছে নিষিদ্ধ এমন এক স্থান থেকে আনা হয়েছে। জানবার আঠারো ঘন্টা পরেই তার মৃত্যু হয়।

উত্তর কুইন্সল্যান্ডের এক অধিবাসী তাকে মেরে ফেলার জন্য তুক করা হয়েছে বলে জানানোর পর পরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া যায়নি; লোকটি মারা যায়। ময়না তদন্তে মৃত্যুর কোন কারণই ধরা পড়েনি।

প্রতি বৎসর, ডাঃ বীচারও বলেন, অনেকের মৃত্যু ঘটে প্রশ্নাতীতভাবে প্রাণনাশক নয় এমন বিষ সেবন করে বা প্রাণঘাতি হতে পারে না নিজেদের দেহে এমন আঘাত করার ফলে। ডাঃ বীচার দৃঢ় প্রমাণ পেয়েছেন যে, "আঘাতের গুরুত্ব নির্ধারিত হয় তার দ্বারা কষ্টভোগ হবে কি হবে না তার ওপর। আন্‌জিও উপকূলে সাংঘাতিক ক্ষততে ভুগছিল এমন সৈনিকদের এক-চতুর্থাংশের (ব্যক্তির কাছে সেটা যুদ্ধ শেষ হওয়ার সামিল কারণ ক্ষতটা তার কাছে দেশে ফিরে যাওয়ার টিকিট বিশেষ) এমন যথেষ্ট যন্ত্রণা ছিল যার উপশমে একটা কিছু করা দরকার ছিল (এই লোকগুলি আতঙ্কগ্রস্ত ছিল না এবং সহযোগিতা দান করেছিল ও তাদের মানসিক অবস্থাও বেশ সুস্থই ছিল, অনেকের ক্ষেত্রে এ বাবদেই মরফিন প্রযুক্ত হয়নি, এবং চার ঘন্টার মধ্যে কাউকেই দেওয়াও হয়নি)।"

"যেখানে শল্য চিকিৎসকদের তেমন কিছু করার দরকার ছিল না, এমনি সব অল্প ক্ষতের ক্ষেত্রে অনেক বেশী বেদনা অনুভব করার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ বেদনা উপশম করানোর যতো চেষ্টাই হোক, তার সংগে বেদনা ভোগের কোন সম্পর্ক নেই।"

বিশ্ববিচিত্রা

যাই হোক, ডাঃ বীচার বিশ্বাস করেন যে, প্লেসবোদের সহায়তার প্রভাব ঝাড়-ফুঁকের বলে মৃত্যুর অনুরূপ প্রভাবের সংগে অসংশ্লিষ্ট নয়। তিনি একথাও বলেন যে, শল্যচিকিৎসার মতো প্রক্রিয়ারও প্লেসবো প্রভাব থাকা সম্ভব।

এমু দিয়ে ভেড়া চরানো

কমিক ওয়েস্টার্ন কাহিনীর চরিত্রের নামানুসারে ওয়াটসন নামক অস্ট্রেলিয়ার এক এমু নিউ সাউথ ওয়েলসের ইউন্টন নামক স্থানের কাছে ভেড়া চরানোয় সহায়তা করে।

ওর মালিক মিঃ অসওয়াল্ড গ্রেসনের সংগে ওয়াটসন নিয়মিতভাবে চারশোটি ভেড়াকে দুহাজার একর চারণভূমিতে বিচরণ করে। মিঃ গ্রেসন বলেন, "ওয়াটসন আমার ঘোড়ার এক দিকে কাজ করে এবং পিছনে পড়া ভেড়াদের দলে তাড়া করে নিয়ে আসে, আর অপর দিকে সে কাজ করে আমার কুকুরগুলো।"

জন্তুদের অন্যত্র কাজে নিয়োগের আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলিয়াম কামিঙ ষোল লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দামের একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে খুঁত বের করার কাজে পায়রাদের শিক্ষা দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, একটি পায়রাকে শিখিয়ে ইন্সপেক্টর করে তুলতে পঞ্চাশ থেকে আশী ঘন্টা সময় লাগে। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের কাজে পায়রাদের নিয়ে সাত বছর কাজ করার অভিজ্ঞতার পর অধ্যাপক কামিঙ বলেন, তাঁর সাম্প্রতিকতম পরীক্ষায় কতকগুলি কাজে মানুষের চেয়ে পায়রার বেশী দক্ষতা লক্ষ্য করেছেন।

তাঁর এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে গোলযোগ হয়েছে বলে জানাবার পর অধ্যাপক কামিঙ পায়রা নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম অংশের ওপর পাচড়ের দাগ ধরতে ইন্সপেক্টররা অক্ষম হয়।

আমেরিকার এক ঔষধ প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্যাপসুলে প্রলেপ ঠিক মতো পড়েছে কিনা দেখবার জন্য পায়রা নিয়োজিত করার কথা জানা যায়।

পায়রা নিয়োগে অন্যতম প্রধান সুবিধে হচ্ছে মানুষ যে কাজ একঘেয়ে খাটুনি মনে করে, পায়রারা সে কাজ করতে মোটেই ক্লান্তিবোধ করে না।

সস্তায় দক্ষ কাজে পায়রা নিয়োগে সাফল্য লাভ করার ফলে ভবিষ্যতে মানুষের

পৃথিবীর অদ্ভুদ প্রাণীদের মধ্যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার নুমব্যাট বা ডোরাকাটা পিপীলিকাভুক অন্যতম। এরা প্রথম লক্ষ্যতে আসে ১৮৩১ সালে। প্রধানত খোলা বনাভূমির এই অধিবাসী শহর প্রসারের চাপে প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এরা যাতে একেবারে লোপ লোপ পেয়ে না যেতে পারে সরকারিভাবে সে ব্যবস্থা করার ফলে এখন এরা লুপ্তপ্রায় জন্তুর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কাঠবিড়ালীর আকারের দেহ এদের, রঙ লালচে হলদে এবং তার ওপর পিঠে সাদা ডোরা। স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে এদের দাঁতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী—পঞ্চাশ। ছুঁচালো মুখে লম্বা জিহ্বা লালাতে ভর্তি থাকে যা ওদের প্রধান খাদ্য উপপোকা ভক্ষণে সহায়ক হয়

অন্যান্য প্রাণীকে ব্যবহারের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

যেমন বানরদের দিয়ে অনেক কিছুই করানো সম্ভব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতক দেশে গাছে উঠে নারিকেল নিচে ফেলার কাজে বানরদের শিক্ষা দেওয়া ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে।

আর নিউ ইয়র্কে এক শিম্পাঞ্জীকে ছিঁচকে চুরি শেখানো হয়েছে। সক্রেটিস নামক এই শিম্পাঞ্জীটিকে বিশ-তলা বাড়ি পাইপ বেয়ে উঠে অলংকার ও ঘড়ি চুরি করে নিয়ে আসতে শেখানো হয়েছে।

এই দুঃসাহসিক চুরি পুলিসকে হতভম্ভ করে তোলে। শেষে একদিন লুটের মাল একটা ব্যাগে পুরে ড্রেনপাইপ বেয়ে সক্রেটিসকে নিচে নামতে দেখে তবেই তারা চুরির রহস্যভেদ করতে সক্ষম হয়।

কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া

শিশুদের নার্সারী—বা করচ প্রকৃতিতে পুরনো ব্যাপার। যেমন পেঙ্গুইনেরা চালিয়ে আসছে বহু শতাব্দী ধরে। বাপ-মা মাছ শিকার করতে বের হলে অন্যান্য পাখিরা ডিমে তা দেবার কাজটা চালিয়ে যায়। কিন্তু পেঙ্গুইনদের মধ্যে সহযোগিতা সমষ্টিগতভাবে খাওয়ানো পর্যন্তও বিস্তৃত হয়।

বাপ-মা মাছ শিকার করতে গেলে "ধাত্রীরা" সমস্ত বাচ্চাদের একত্রিত করে শংখচিলদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য পাহারা দেয়।

বাপ-মা খাদ্য নিয়ে ফিরে এসে সবচেয়ে কাছে যে বাচ্চাদের পায় তাদের খাওয়ায়, তারা নিজেদের সন্তান কিনা সেটা লক্ষ্য করে না।

ক্ষুদ্র এডেলাই দ্বীপের পেঙ্গুইনদের সাম্প্রদায়িক নার্সারী থাকলেও তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ অত্যন্ত বেশী। তারা তাদের নিজেদের সন্তানদেরই শুধু খাওয়াবে এবং একই রকম দেখতে হাজার হাজার শাবকের মধ্যে থেকে নিজেদের সন্তানকে ঠিক বেছে বের করে নেয়।

কতক পাখির মধ্যে এই করচ প্রবণতা দুই বা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক মায়ের একই বাসায় ডিম পাড়া, এক সঙ্গে তা দেওয়া এবং বাচ্চাদের খাওয়ানো ও শুশ্রূষার কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পুরুষ উটপাখির দু-তিনটি স্ত্রীর হারেম থাকলে এমন ঘটে।

মার্গেনসার জাতীয় পাতিহাঁস যারা মাছ খেতে ভালবাসে, তাদের মধ্যে মায়েরা প্রায়ই একই বাসা এবং শাবকদের পালনের কাজ ভাগাভাগি করে নেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাবুই পাখিরা ঘাস দিয়ে গাছের ডালে যৌথ বাসা নির্মাণ করে। দেখতে অনেকটা নিরাট মৌচাকের মতো এই বাসায় অসংখ্য সুড়ঙ্গ থাকে পাখিদের ডিম পাড়ার জন্য। সম্প্রদায়গতভাবে এদের প্রচেষ্টা নীড় নির্মাণের বাইরে কিছু আর হয় না।

কতক জন্তুর মধ্যেও নার্সারীর সংগঠন দেখা যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ধারণা ছিল যে, জলহস্তীদের মধ্যে একজন বলবান পুরুষের তাঁবে বশ মানা স্ত্রীদের হারেম রাখার পিতৃশাসিত সংগঠনের প্রচলন আছে।

সাম্প্রতিক অনুশীলনে দেখা গিয়েছে যে, ঐ সমাজ হচ্ছে আসলে মাতৃশাসিত এবং এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে করচ, যেখানে মায়েরা সন্তান প্রতিপালনের কাজ ভাগাভাগি করে নেয়।

কোন পুরুষ করচের ধারে কাছে গেলে তাড়া খেতে হয়। এমনকি হৃদয় ব্যাপারেও মেয়ে জলহস্তীরাই এগিয়ে যায়।

করচ প্রথাটি সবচেয়ে বেশী উন্নত পিপীলিকা জাতীয় সামাজিক কীটেদের মধ্যে যেখানে কর্মীরা তাদের রানী প্রসবিত ডিমে তা দেয় এবং শাবকদের সৈনিক, কর্মী ও নৃপ হয়ে উঠতে সহায়তা করে।

চিদম্বরম্

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদুরা-মাদ্রাজ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা অনেক দেরি করে যখন চিদম্বরম্ পৌঁছল, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা।

মাদ্রাজ হতে ১৫১ মাইল দক্ষিণে ছোট একটি শহর চিদম্বরম্।

স্টেশনের বাইরে আসতেই কয়েকজন ঘিরে ধরে চেঁচাতে শুরু করল—ভন্‌ডি...ভন্‌ডি...ভন্‌ডি...ভন্‌ডি স্বামী...ভন্‌ডি স্যার!'

তামিল ভাষায় ভন্‌ডি মানে গাড়ী।

ওদের গাড়িগুলো খুবই চমৎকার। বেটেখাটো গরুতে টানা ছই-গাড়ি।

মাদ্রাজ প্রদেশের ছোট ছোট অনেক শহরে এখনও যাত্রিবাহী গরুর গাড়ি চলে। ঐসব শহরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে, কলের জল পাওয়া যায়, রেফ্রিজারেটর-এ রাখা সরবতের দোকানও আছে। রাস্তায় মোটর গাড়ি দৌড়ায়, আকাশে জেট প্লেন চীৎকার ছড়িয়ে যায়, আর তারই সঙ্গে গলঘণ্টির ঠুং ঠুং আওয়াজ তুলে যাত্রী নিয়ে ছোটে গরুর গাড়ী।

একেই বলে বিচিত্র, একেই বলে বিচিত্র দেশ!

অতি আধুনিককে, অতি নতুনকে সাদরে গ্রহণ করলেও ভারত তার প্রাচীন ব্যবস্থাগুলোকে, পুরাতন সব প্রথাকে একেবারে ফেলে দিতে বা ভুলে যেতে চায় না। যা কিছু পুরোনো কালের তার স্থান মিউজিয়াম্-এ, এরূপ ব্যবস্থায় রাজী না হয়ে স্থায়ী প্রয়োজন মেটাবার জন্য মানুষের প্রারম্ভিক বা আদি সৃষ্টিগুলোর অনেক কিছুকেই এ দেশ এখনও সযত্নে জীবিত ও চালিত রেখেছে।

একজন গাড়িওলা অপর সকলের চেয়ে একটু বেশী চটপটে। তাড়াতাড়ি আমার হাত-ব্যাগটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল—"কুড়া ইংগে ভা।" অর্থাৎ, আসুন, এদিকে আসুন।

যে কটা তামিল শব্দ সংগ্রহ করেছিলাম তারই একটা প্রয়োগ ক'রলাম—"এঙ্গেইরুক্কু নটরাজ ভিলাস হোটেল?" অর্থাৎ, নটরাজ বিলাস হোটেল কত?

সে বলল—"পাইনান্ডু অানা স্বামী" ......বারো আনা, বাবু।

গ্রামের পথে, অন্ধকার রাতে, জোনাকির মেলা দেখতে দেখতে গরুর গাড়িতে পাড়ি জমানো এখনও ভারতবর্ষের সকল প্রান্তেই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু, শহরের বুকে ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঝলমলানির মাঝ দিয়ে,

নটরাজ

গরুর গাড়িতে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, এ যেন আধুনিক কালকে পরাভূত করে প্রাচীনের জয়যাত্রা।

যন্ত্রবিজ্ঞানের লীলালাঞ্ছিত যুগকে সদর্পে উপেক্ষায় পিছনে ঠেলে রেখে আমাদের গরুর গাড়িটি চলতে লাগল।

গরুটা ছোট হলেও বেশ ছুটছিল। তবু মাঝে মাঝে চালককে বলতে লাগলাম—'শীক্কিরম্' অর্থাৎ শিগগির। কারণ, মাদ্রাজের অন্যান্য অনেক শহরের মত এখানেও হয়তো রাত দশটার পর হোটেলে খাবার না পাওয়া যেতে পারে।

প্রায় সওয়া ন'টায় উদ্দিষ্ট হোটেলটায় পৌঁছালাম। থাকবার ব্যবস্থা ভালই হ'ল। তবে, হোটেলওয়ালা বিনয়ের সঙ্গে জানালেন—"শাপাড় ইল্লে।" খানা শেষ।

পরের দিন।

সকাল আটটার মধ্যেই নটরাজ মন্দিরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া গেল।

চিদম্বরম্-এর প্রসিদ্ধি শৈবতীর্থ হিসাবে। এখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নটরাজ। নটরাজ ও নটরাজের মন্দিরটিই চিদম্বরম্-এর মুখ্য দর্শনীয়।

মন্দিরটির চারটি গোপুরম্ বা তোরণ-যুক্ত বহির্দ্বার। একটি সহস্রস্তম্ভ দেব-সভা ও রাজ-সভা নামে পাঁচটি কক্ষ ও মণ্ডপ, চিৎ-সভা, কনক-সভা, নৃত্য-সভা, শিব-গংগা জলাশয় নিয়ে প্রায় এক শ বিঘা জমির উপর মন্দিরটি বিস্তৃত।

আদি মন্দিরটির নির্মাতা ও নির্মাণকাল অজ্ঞাত থাকলেও জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পলহব-রাজ সিংহবর্মণ এই দেবালয়টির বিশেষ সংস্কারসাধন করেন।

চিদম্বরম্-এর পূর্বনাম ছিল থিলাই। স্থানটি ছিল জংগলাকীর্ণ।

জনশ্রুতিতে প্রকাশ, রাজা সিংহবর্মণের কুষ্ঠরোগ ছিল। সে সময় থিলাই বনের দেবমন্দিরটির কাছে ব্যাঘ্রপদ নামে এক সন্ন্যাসী বাস করতেন। তিনি কুষ্ঠাক্রান্ত একটি কুকুরকে মন্দির সংলগ্ন পুকুরে স্নান করে রোগমুক্ত হতে দেখেছিলেন। রাজা

প্রবেশদ্বারের অংগসজ্জা

সিংহবর্মণ একদিন ব্যাঘ্রপদের কাছে নিজের রোগের কথা প্রকাশ করলে সন্ন্যাসী রাজাকে এই পুকুরে স্নান করতে বলেন। কিছুকাল স্নানের ফলে রাজারও কুষ্ঠ ভাল হয়ে যায়। রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে মন্দির ও চিৎ-সভাটির জীর্ণোদ্ধার করেন।

সন্ন্যাসী ব্যাঘ্রপদ ও আচার্য পতঞ্জলি চিৎ-সভায় শিবের আনন্দ-তান্ডব দর্শন করেছিলেন। সেই দর্শনের অনুসরণেই আনন্দ-তান্ডবরত অপূর্ব নটরাজ মূর্তিটির সৃষ্টি।

পঞ্চ-ধাতুর মূর্তিটি চতুর্ভুজ। পরনে বাঘছাল ও স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য উত্তরীয়। মাথায় গঙ্গার ধারাবারা। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কর্ণাভরণে ভূষিত। পায়ের আঙ্গুলের দ্রাবিড়ভূমির স্ত্রীলোকদের অনুরূপ আংটি। দুই দক্ষিণ বাহুর প্রথমটিতে ডম্বরু ও দ্বিতীয়টিতে অভয়-মুদ্রা। বাম ঊর্ধ্ববাহুতে অগ্নি। নিম্ন-বাহু নৃত্যভঙ্গিমায় উত্তোলিত বাম পদের দিকে প্রসারিত। দক্ষিণ পদ মুয়লগন বামনের দেহে স্থাপিত।

এই মূর্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে শিবাচার্যের কোইরল পুরাণে এক কাহিনী আছে:

পুরাকালে কয়েকজন তন্ত্র-সাধক তারাগম-এর থিল্লই জঙ্গলে বাস করতেন। তাঁদের প্রতাপ দেবতাদের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠায় একসময় দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু শিবের সঙ্গে যুক্তি করে দুজনে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীর রূপ ধারণ করে উক্ত তান্ত্রিকদের কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ যে দেবতাদের প্রেরিত এ কথা বুঝতে পেরে তান্ত্রিকরা ব্রাহ্মণকে বধ করবার জন্য অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলেন। হোমাগ্নি হতে আবির্ভূত হল একটি বাঘ। শিব বাঘটিকে বধ করে তার ছালটা পরে ফেললেন। তান্ত্রিকরা তখন হোমাগ্নি থেকে সৃষ্টি করলেন মুয়লগন নামক ভয়ঙ্কর এক বামনকে। শিব মুয়লগনকে ধরাশায়ী করে তার দেহের উপর তান্ডব শুরু করলেন।

সত্যই কি নটরাজ মূর্তিটির সৃষ্টি উক্ত পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক?

বোধ হয় তার যথার্থ ভিত্তি স্বতন্ত্র। চিদম্বরম্ কথাটির বিশ্লেষণ করলে আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় চিৎযুক্ত অম্বর অর্থাৎ চেতনাযুক্ত আকাশ বা চিন্ময় আকাশ।

বেদ-এর বহু বিষয়, বিশেষ করে ব্রহ্মবিষয়ক উক্তি এবং ইঙ্গিতগুলি সাধারণের পক্ষে বোধগম্য না থাকায় পৌরাণিক যুগে সাধারণ লোকশিক্ষার সরল উপায় হিসাবে,—রূপক সাহায্যে,—বৈদিক তত্ত্ব, সত্য ও সিদ্ধান্তগুলির প্রচার এবং সর্বসাধারণকে বেদ বাক্যাদিতে নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাবান করে তোলবার চেষ্টা হয়েছিল। নটরাজের রূপক সৃষ্টি সেইরূপ এক বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রতি বা আকাশলিঙ্গের প্রতি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রসূত।

বিশাল প্রকৃতিকে ক্ষুদ্রমূর্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করবার তথা বেদ-এর ব্রহ্ম ও প্রকৃতি বিষয়ক তথ্যগুলি জ্ঞাত করবার জন্য,—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে বসন্তি কলেবরে—এই প্রবচনের মর্মানুসরণে ও মানব দেহকে ব্রহ্মের বা প্রকৃতির ক্ষুদ্ররূপ (Microcosm) জ্ঞানে, মনুষ্য আকৃতি এক বিশিষ্ট রূপক হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। অবশ্য, এখনকার মত তখনও হয়তো বেদ-এর বহু বিষয়েরই সঠিক পাঠোদ্ধার বা মর্মোদ্ঘাটন না হওয়ায় কিছু কিছু নিরর্থক গল্প সৃষ্টিও যে পৌরাণিক যুগে না হয়েছে এ কথা জোর করে বলা যায় না। তবু অধিকাংশই যে বেদ ভিত্তিক ও অর্থপূর্ণ তা সুনিশ্চিত।

এখানের আদি দেবতার নাম আকাশ-লিঙ্গ।

ঈশ্বরের নটরাজ রূপ বা আনন্দ-তান্ডবের রূপটির ভিত্তি বা মূল হ'ল এই আকাশলিঙ্গ।

আকাশলিঙ্গের আরাধনা ও অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলেই শিলকুই-এর নামকরণ হয় চিদম্বরম্।

এই আকাশলিঙ্গের মনোমুগ্ধকর প্রয়োজন।

আমাদের দৃশ্যমান জগতের গাছপালা, নদ-নদী সব কিছুকেই আমরা সাধারণভাবে, সাধারণ জ্ঞানে, প্রকৃতি বলি। এই নিসর্গ-প্রকৃতির তথা গ্রহাদি উৎপত্তি ও প্রাণী-বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেই আর্যঋষি ক্ষান্ত হন নি। প্রকৃতির সকল বস্তুর সৃজনের মূলে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা আবিষ্কার করলেন ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূত। মহর্ষি কণাদ প্রভৃতি সেই জ্ঞানকে আরও প্রসারিত করলেন। এল পরমাণুতত্ত্ব......সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অবয়বহীন পরমাণুই জাগতিক সব কিছুর শেষ বা প্রথম অবস্থা। ওইখানেই বৈশেষিক বা ভৌতিক দর্শন থেমে গেল। আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান বা ভৌতিক বিজ্ঞান ও পরমাণু এবং তার ভগ্নাংশ ইলেকট্রন্ ইত্যাদিকেই পদার্থের শেষ বা আদি তথা সংগঠক বলে ক্ষান্ত হয়েছে বৈদিক ঋষির জিজ্ঞাসা ও চিন্তা কিন্তু ঐখানে থামল না। পরমাণুতত্ত্বেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি জানতে চাইলেন—সৃষ্টিকর্তা কে? পরমাণুই সৃষ্টির শেষ বা প্রথম অবস্থা হলেও অবয়বহীন পরমাণু অবয়বযুক্ত জগৎ সৃষ্টির কারণ হ'তে পারে কি করে? পরমাণু সৃষ্টির কর্তা হওয়াও তো অসম্ভব। কারণ, পরমাণু যদি স্বয়ং জগৎ-নির্মাতা বা কর্তা হ'ত তা হ'লে কখন সৃষ্টি, আবার কখন প্রলয়—এরূপ দুই বিপরীত ক্রিয়া সম্ভব হ'ত না। হয় শুধু সৃষ্টিই হ'ত নয় তো প্রলয়। অতএব, পৃথক এক কর্তা অবশ্যই আছেন।

দেখা গেল—পরমাণুর কেন্দ্র (নিউ-ক্লিয়াস্-এ) তথা আরও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ-গুলিতে (প্রোটন আদিতে) সচেতনতা বা প্রাণস্পন্দন বর্তমান। ওই চেতনাই বিভিন্ন অবয়বযুক্ত বস্তু তথা জগৎ সৃষ্টির কারণ ও উপাদান স্বরূপ। সেই চেতনা বা প্রাণ সকলের অজ্ঞাতে ও অগোচরে উদ্ভূত হয়ে চলেছে।

এর পর প্রশ্ন জাগল—পরমাণুর প্রাণ-কেন্দ্রের বা নিউক্লিয়াস্-এর মধ্যের সেই জীবাত্মা, চেতনা বা প্রাণ, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনের সজীবতা বা গতি-চঞ্চলতা এল কোথা হ'তে? সে চিৎ বা চেতনার উৎসটি বা উৎপাদকটি রইলেন মানুষের চির-অজ্ঞাত।

মন্দির ও শিব-গঙ্গা জলাশয়

ঋষিরা সেই উৎস বা কর্তাটিকে অভিহিত করলেন পরমাত্মা নামে ব্রহ্ম নামে।

পদার্থে চেতনা বা প্রাণের সঞ্চার-ক্রিয়াটিও মানুষের অজানাই রইল। শুধু জানা গেল যে, পদার্থে চেতনার বা জীবাত্মার আবির্ভাব ঘটে আকাশ হ'তে আকাশ মাধ্যমে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন রয়ে গেল—আকাশ এই চেতনা পেল কোথা থেকে? চেতনা বা প্রাণ কেমন করে আকাশে সঞ্চারিত হ'ল?

ঋষিরা খুঁজতে লাগলেন আকাশের উৎপত্তি।

মীমাংসায় উপনীত হ'লেন—জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির অবস্থা ছিল অপ্রকাশিক, অরূপ ও অব্যক্ত, নিশ্ছিদ্র অবর্ণনীয় তমিস্রায় আচ্ছন্ন। প্রকৃতির সে অবস্থা বর্তমান পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির মূলে বা মূল প্রকৃতি। সেই অব্যক্ত, অরূপা মূল প্রকৃতির তমসা অব্যক্ত ব্রহ্মের চিৎশক্তি দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে শব্দ বা ধ্বনি উত্থিত হ'ল। তারপরই অন্ধকার ভেদ করে সেই ধ্বনি বহনক্ষম, প্রকাশক্ষম আকাশ হ'ল প্রস্ফুট। আকাশ নির্গুণ ও অরূপ ব্রহ্মের সগুণ রূপ প্রকাশ করবার বা পরিদৃশ্যমান এই ভৌতিক জগতের পট-ভূমিকা অর্থাৎ তাবৎ সৃষ্টির রূপ প্রকাশের পশ্চাদপট স্বরূপ হ'ল।

আকাশই অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রথম ব্যক্ত বা প্রকাশিত রূপ।

চিৎ-শক্তির বিক্ষোভ দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় আকাশ হ'ল চিৎগুণবিশিষ্ট—চেতনাময়, —প্রাণময়।

আকাশ হ'তেই চেতনা বা প্রাণ পদার্থে আবির্ভূত হয়, পদার্থকে আধার করে, পদার্থে সঞ্চারিত হয়ে জীবনের লক্ষণ প্রস্ফুট করে তোলে। আবার দেহান্তে আকাশেই ফিরে যায়।

তাই প্রাণের বা সেই চেতনার আদি আধার আকাশ হ'ল আরাধ্য। আকাশের পর একে একে সৃষ্ট হ'ল, প্রকাশিত হ'ল পঞ্চভূতের অপর চারটি মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি। এদের দ্বারা নির্মিত জগৎ আকাশের বুকে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আকাশ হয়ে রইল পৃথিবী তথা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সকলের অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির ধারক।

শুধু তাই নয়। আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের সব কিছুতেই আছে আকাশের উপস্থিতি। আকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাই তাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে বা তার অস্তিত্ব চাক্ষুষ করতে পারি না। কিন্তু সৃষ্টির কোনও কিছুই আকাশহীন হ'তে পারে না। আকাশ বা যাকে আমরা মাথার উপরের নীল শূন্যতা জ্ঞান করি, সেই শূন্যতা একটি পরমাণুর প্রোটন ও ইলেকট্রন-এর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান রূপেও বর্তমান, আবার নক্ষত্ররাজি এবং গ্রহ-গ্রহান্তরের মধ্যস্থ বিরাট দূরত্ব স্বরূপেও বিরাজিত। ঈশ্বরের মত আকাশও সর্বব্যাপ্ত।

কোটি কোটি মাইলের ব্যবধানে স্থিত গ্রহাদি আকাশের মাধ্যম সাহায্যে মহাকর্ষ দ্বারা সুসংহত ও ছন্দোবদ্ধ। ইন্দ্রিয়াতীত ও স্বয়ং অদৃশ্য হ'লেও আকাশই তাবৎ সৃষ্টির প্রকাশের মাধ্যম হয়ে সকলকে প্রকাশ করছে, সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করে

নটরাজ মন্দিরের গোপুরম

আছে। সেইজনাই আকাশ বা আকাশলিঙ্গ, শিব বা পরমেশ্বরের তেজ, পৃথ্বী ইত্যাদি অন্যান্য লিঙ্গরূপগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য হয়েছে।

চিদম্বরম্ এই আকাশলিঙ্গরই আরাধনাক্ষেত্র।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মা মূল-প্রকৃতিতে যে ক্ষোভ ঘটালেন মূল প্রকৃতির তমোভাবকে সৃষ্টির আনন্দে শিহরিত, আলোড়িত করে তুললেন বহু হওয়ার ইচ্ছায় প্রথম আকাশ রূপে প্রকাশিত হয়ে অণুতে পরমাণুতে চেতনা বা প্রাণরূপে ব্যাপ্ত হলেন তাঁর সেই সর্বব্যাপ্তিত্বের ক্রিয়াটি নৃত্যরূপে চিন্তিত ও সৃষ্টির নৃত্য আনন্দ-তাণ্ডব নামে অভিহিত হয়েছে। পরমাত্মার সৃষ্টিব্যাপী বিদ্যমানতা ও ছন্দোময় প্রকাশটির উপলব্ধি থেকেই নটরাজ মূর্তির কল্পনার জন্ম ঘটেছে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রেই সৃজন সংঘটনের পিছনে আছে আনন্দ। যে আনন্দ সৃষ্টি-চঞ্চলতা ঘটায়, জীবের বা জীবাত্মার সেই আনন্দ, পরমাত্মার আনন্দ তাণ্ডবেরই ক্ষুদ্রতর আংশিক অনুষ্ঠান মাত্র।

নটরাজ মূর্তির ডম্বরুটি শব্দসূচক। শির-ধৃতা গঙ্গা অপ এবং অগ্নি তেজ বোধক। আন্দোলিত কেশপাশ মরুৎ-এর অস্তিত্ব নির্দেশক। সমগ্র দেহটি ক্ষিতি জ্ঞাপক। পরনের ব্যাঘ্রচর্ম এবং নারীর উত্তরীয় ও পদাঙ্গুরীয় পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন প্রকাশক। সম্পূর্ণ মূর্তিটির তাৎপর্য বোধ হয় আকাশ, তেজ, বায়ু, জল, পৃথ্বী বা ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চভূত তথা পুরুষ ও স্ত্রী তাঁর হতেই প্রকাশিত, সবেই তিনি নৃত্যশীল।

মূর্তির পদতলে বামন। নাম মুয়লগন। সংস্কৃত ভাষায় 'গন' অর্থে প্রমথ বা শিবের সেবক। 'বামন' শব্দটি হিন্দু শাস্ত্রের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বর্তমান মানব জাতিকেই সূচিত করে।

নটরাজের দক্ষিণপদ মুয়লগনের দেহে স্থাপিত। এর অর্থ হতে পারে কোহিবল পুরাণোল্লিখিত অভিচার উদ্ভূত বামন বা অভিচারধর্মী দুষ্ট মানবকে তিনি দক্ষিণ পদের দৃঢ় পেষণে দমিত বা নিপীড়িত করে রেখেছেন। অথবা এই মূর্তির সৃষ্টিকারী শিল্পী হয়তো নিজেকে 'গন' অর্থাৎ সেবকরূপে দেবতার পদতলে প্রদর্শন করে গেছেন।

*

ভারতীয় শিল্পবোধের এবং অধ্যাত্ম-চিন্তার এক বিশিষ্ট ও যুক্ত নিদর্শন নটরাজ মূর্তিটির রচনা। এর ভাস্কর্য ও রূপ সৃষ্টি যেন ঐশ্বরিক অনুগ্রহ বলেই মনে হয়। ভাস্কর্যের দিক্‌পালদেরও নির্বাক করে দেওয়ার মত কারুশিল্পের এক অভিজ্ঞান এই নটরাজ মূর্তি। বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর Augusta Rodin, মাদ্রাজ মিউজিয়ম্-এ মূল নটরাজ মূর্তির ব্রোঞ্জে নির্মিত একটি অনুকৃতি দেখে বলেছিলেন:

"The pose is known amongst artists, but it has nothing common: for in every pose nature is expressed, and this to a degree which many do not realize. The unknown depths, the eternal background of life. Behind the elegance there is grace, but above that grace there is a sweetness, a strangely mighty sweetness. And beyond that our words fail.

"What a delicacy of modelling. What a torrential whirl of body! As it must be in a divine revelation, not the least inconsistency in this body; one feels everything in its right place. Even in the arrested pose the joints and muscles reveal the swing of the arms. And the flames which continue this winding torso, pressed here, stretched there, go over into two bullocks, two things, perfect levers in perfect angles, and two delicate feet dancing on the ground. They are wonderful, these two hands which separate the breast and the belly. The grace of this gesture view with that of Venus of Medici who defends her charms with her arms, where as this Siva seems to cover himself with this gesture. The shadow of this arm which divides the body, glides down along the things, one half in the dark, the other emerge in full light from the shadow. The privy parts remain invisible hidden in this darkness. Altogether, these are virtues of depth, of contrast, of strength which are essential; but not those details which count merely for themselves, mere useless flourishes except they can have a meaning in relation to the general movement.

"What a handsome profile, what a charming transition from the cheeks to the chin and throat! Hips like a lake of pleasure under vibrating nostrils! A tender mouth! The quiet light of these eyes! The quiet joy of this stillness! Eternal desires are on this mouth the eyes see and speak. In the dead matter of this bronze the soul has been caught and kept captive for centuries and centuries." *

* A. Rodin-এর এই বিবৃতি বরোদা মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সংগৃহীত।

মানুষের খাদ্যঃ কীট পতঙ্গ

রানী মজুমদার

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কিত এক সম্মেলনে বৃটিশ জৈবরসায়নবিদ্ ডক্টর এন ডব্লু পিরি বলেছেন—অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ভবিষ্যতে একদিন হয়তো মানুষকে ব্যাপকভাবে কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একথা শুধু ডক্টর পিরিই বলেন নি—এর আগেও অনেক বিজ্ঞানী কীটপতঙ্গকে মানুষের খাদ্যরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কীট-বিজ্ঞানী এল ও হাওয়ার্ড খুব জোর দিয়ে বলেছিলেন—পৃথিবীর খাদ্যাভাব দূর করতে হলে আমাদের কীটপতঙ্গ আহারে অভ্যস্ত হতে হবে। ১৮৮৫ সালে ইংল্যাণ্ডের ভি এম হল্টও কীটপতঙ্গকে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের দেহ পুষ্টিকর অনেক উপাদানই কীট-পতঙ্গের দেহে পাওয়া যায়। সুতরাং কীট-পতঙ্গ ভক্ষণে মানুষের কোন ক্ষতি হবার ভয় নেই, বরং লাভ হবার কথা।

এতো গেল বিজ্ঞানীদের কথা। কিন্তু কীট-পতঙ্গকে খাদ্য হিসাবে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে কি না—তা বলা শক্ত। কারণ এযাবৎ কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে আমরা ঘৃণার ভাবই পোষণ করেছি। কোন কোন কীট-পতঙ্গ ছুঁলে পর্যন্ত আমাদের সারাশরীর ঘৃণায় রি রি করতে থাকে; কেউ কেউ তো বমিও করে ফেলে। অজ্ঞাতসারে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমরা কখন কখন কীট-পতঙ্গ হয়তো খেয়ে ফেলি, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কীট-পতঙ্গ দেখলে কারোই তা খেতে ইচ্ছে করে না। এখানে একটা কথা বলা দরকার—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কীট-পতঙ্গকে অখাদ্য মনে করলেও—পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই কীট-পতঙ্গ খাদ্য হিসাবে বহুল প্রচলিত। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক মোজেস তাঁর মতাবলম্বিদের চার রকমের পঙ্গপাল ভোজনের বিধান দিয়েছেন। আমাদের দেশেও কোন কোন পার্বত্য জাতি বা আদিবাসীদের মধ্যে কীট-পতঙ্গ খাওয়ার প্রথা দেখা যায়।

কীট-পতঙ্গভোজীদের মতে—উইপোকা খুব সুখাদ্য। উইপোকার সন্ধান পেলে তারা আনন্দে নাচতে থাকে। আর আমরা উইপোকা দেখলেই তাকে মেরে ফেলি—বাসা ভেঙ্গে দেই। উইপোকা আমাদের দারুণ ক্ষতি করে। আফ্রিকার উইপোকা ভোজী উপজাতিরা খাদ্যের লোভে উইপোকার ঢিবি খুঁজে বেড়ায়। ঢিবি দেখলেই তা ভেঙ্গে ফেলে জ্যান্ত উইপোকাগুলিকে কাঁচা অবস্থায় টপাটপ খেতে থাকে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে অন্যের চেয়ে বেশী উইপোকা খাবার জন্যে। এর ফলে ঢিবির কাছে উইপোকা ভোজনের হিড়িক লেগে যায়। স্ত্রী ও পুরুষ উইপোকাই তাদের খুব উপাদেয় খাদ্য। তবে কেউ কেউ কর্মী উইপোকা খেতেও ভালবাসে। গর্ভবতী অবস্থায় রানী উইপোকা খেতে খুব সুস্বাদু। সেজন্যে এরা রানী উইপোকার ডিম পাড়বার সময়ের প্রতীক্ষায় থাকে। এরা উইপোকা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজখবরও রাখে। বিখ্যাত ইংরেজ অভিযাত্রী লিভিংস্টোন এ-সম্বন্ধে তাঁর এক চমৎকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন।

আফ্রিকায় থাকাকালে লিভিংস্টোন একবার একজন উপজাতীয় সর্দারকে তাঁদের সঙ্গে আহারের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। খাওয়ার আসরে নানা কথার মধ্যে লিভিংস্টোন সর্দারকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সর্দার এর উত্তরে বলেন—তাদের সবচেয়ে প্রিয়খাদ্য হলো উইপোকা। উত্তর শুনে লিভিংস্টোন খুব অবাক হয়ে যান। লিভিংস্টোনকে তখন সর্দার বলেন, আপনি যদি একবার উইপোকা খান তাহলে অন্য কোন খাদ্যই আপনার নিকট উইপোকার মত সুস্বাদু লাগবে না। যারা উইপোকা খেয়েছেন—তাদের মতে উইপোকা সুস্বাদু খাদ্য, আবার কারো কারো মতে উইপোকার স্বাদ কতকটা আনারসের মত। বর্মার কোন কোন পার্বত্য জাতিদের খুব উপাদেয় খাদ্য হলো উইপোকা। আমাদের দেশেও কোন কোন আদিবাসী উইপোকা খেয়ে থাকে। কোন কোন কীট বিজ্ঞানীর মতে প্রতি ১০০ গ্রাম উইপোকা থেকে ৫৬১ ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া যেতে পারে।

খাদ্য হিসাবে পিঁপড়েও কম উপাদেয় নয়। পিঁপড়েভোজীরা পিঁপড়ে দিয়ে নানা রকম মুখরোচক খাদ্য তৈরী করে। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের আদিবাসীরা পিঁপড়ের সরবৎ তৈরী করে, এটা তাদের অতি প্রিয় পানীয়। বাড়ীতে কেউ এলে—তাদের এই সরবৎ দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। **উইভার অ্যাণ্ট নামক পিঁপড়ে খুব ভাল করে বেটে এই মুখরোচক সরবৎ তৈরী করা হয়।** অনেকে আবার উইভার অ্যাণ্টের বাটনা অন্যান্য পদ রান্নার সময় ব্যবহার করে। এর ফলে তরিতরকারি, ঝোল প্রভৃতি নাকি খুব সুস্বাদু হয়। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের অতি প্রিয়খাদ্য হলো কারপেণ্টার অ্যাণ্ট। এরা কখনও কখনও এই পিঁপড়ে কাঁচা খেয়ে ফেলে—আবার কখনও কখনও রান্না করে খায়। বোর্নিওর কোন কোন অধিবাসী নালসো-পিঁপড়ে বেটে তা দিয়ে ভাত মেখে খায়। আমাদের দেশেও কোন কোন আদিবাসী পিঁপড়ে খেয়ে থাকে। মধু পিঁপড়েও রেড ইণ্ডিয়ানদের অতি উপাদেয় খাদ্য। মধু-পিঁপড়ের পেটে একরকম মিষ্টিরস জমা থাকে। মিষ্টিরসের ভারে এদের পেটটা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে থাকে। পিঁপড়ের পেট থেকে এই রস বের করে তা পান করে। অনেক সময় এই রস দিয়ে মিষ্টি সরবৎ তৈরী করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন শহরে প্যাকেটে করে পিঁপড়ের টোস্ট বিক্রী করা হয়। জাপান থেকে ভাজা পিঁপড়ে অন্য দেশে চালান যায়। প্রজাপতির লার্ভা বা শুককীট দিয়ে মেক্সিকোতে এক-প্রকার সুস্বাদু পানীয় তৈরী হয়। এই পানীয় অতি জনপ্রিয়। প্রজাপতির লার্ভা ভাজা গরম গরম খেতে নাকি খুবই উপাদেয়।

চীন দেশের কোন কোন অধিবাসীর প্রিয় খাদ্য হলো পঙ্গপাল, গঙ্গাফড়িং, বিছা, আরশোলা, গুটিপোকা, মৌমাছি ও বোলতার লার্ভা ইত্যাদি। তারা এইসব কীট-পতঙ্গ দিয়ে নানারকম খাদ্য তৈরী করে আহার করে। অস্ট্রেলিয়ার বুসম্যান নামক আদিবাসীদের প্রধান খাদ্যই হলো নানা জাতের কীট-পতঙ্গ।

গ্রীসদেশের কীট-পতঙ্গ ভোজীদের অতি উপাদেয় খাদ্য হলো উইচিংড়ী। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী অ্যারিস্টোটলও বলেছেন—বাচ্চা এবং স্ত্রী উইচিংড়ী অতি সুস্বাদু। আর স্ত্রী উইচিংড়ীর পেটে যখন ডিম ভর্তি থাকে—তখন তারা খাদ্য হিসাবে আরও উপাদেয় হয়।

খাদ্য হিসাবে পঙ্গপালও উল্লেখযোগ্য। পঙ্গপালের আবির্ভাবে আমাদের মুখ শুকিয়ে যায় ক্ষতির ভয়ে। এরা শস্যাদির ভীষণ শত্রু। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এরা মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের শস্যাদি এবং গাছপালা একেবারে সাফ করে দেয়। তাই পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা মাত্র তাকে তাড়াবার এবং মারবার চেষ্টা চলে নানাভাবে। কিন্তু পঙ্গপালের ঝাঁক দেখা-মাত্রই পঙ্গপালভোজীদের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা যায়। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই মিলে আনন্দের চোটে নাচতে থাকে। **আফ্রিকার পঙ্গপালভোজী আদি-**

বাসীরা দলে দলে ছুটে যায় পঙগপাল ধরবার জন্যে। কে কত বেশী পঙগপাল ধরতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে। অনেকে পঙগপাল ধরে ডানা ও পিছনের ঠ্যাং দুটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁচাই খেতে থাকে। তাদের এই পঙগপাল ভোজনের দৃশ্য দেখলে মনে হয় যেন মহোৎসব লেগেছে। কেউ কেউ পঙগপাল ভেজে বা আগুনে ঝলসে মুখরোচক করে খায়; অনেকে আবার পঙগপালের ডানা ও ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তাতে নুন মেখে ভেজে বা শুকিয়ে জমা করে রাখে। যখন পঙগপালের দেখা মেলে না তখন এইসব সঞ্চিত পঙগপাল তারা খায়। মিশর আরব, চীন প্রভৃতি দেশের অনেকেই পঙগপাল খেয়ে থাকে।

এসব কীট পতঙ্গ ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশে গুবরে পোকা, কাঠ পোকা, ঝিঁঝিঁ পোকা, ফড়িং, মাকড়সা, বিছে, ওয়াটার বিটল প্রভৃতি নানা জাতের কীট-পতঙ্গ খাদ্য হিসাবে চালু আছে।

বিজ্ঞানীদের মতে—এইসব কীট-পতঙ্গ শুধু উপাদেয়ই নয়, উপরন্তু এদের কারো কারো শরীর থেকে প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন প্রভৃতি পুষ্টিকর উপাদানসমূহ কম বা বেশী পরিমাণে পাওয়া সম্ভব।

সুতরাং ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে সভ্য-জগতে খাদ্য হিসাবে কীট-পতঙ্গ চালু হলে খাদ্যসমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচনা

সাধু-অসাধু

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকায় পর পর দুটি সংখ্যায় অদ্বিতীয় লেখক 'রঞ্জন' সাধুভাষার সপক্ষে তাঁর দ্বিতীয় মত জাহির করেছেন: মুশকিল এই, নদী মরুপথে ধারা হারাক বা কাদায় ঘোলা হোক, উৎসে সে কোনদিন ফেরে না। তবু বলতুম, 'সাধু! সাধু!!' কিন্তু সব সাধুও যে সাচ্চা নয়! ১২ আশ্বিন সংখ্যায় রচনাটির ছত্রেছত্রে গুরুচণ্ডালি আর মতিভ্রমের ভূরিভূরি প্রমাণ। রঞ্জন জানিয়েছেন, তিনি 'শিক্ষিত বৈয়াকরণ' নন, কিন্তু ব্যাকরণ 'কিছু সময় অধ্যয়ন' করেছেন। এই স্বীকারোক্তি নিতান্ত বিনয় নয়। আর একটি অ-সাধু প্রয়োগ যদি বরদাস্ত করেন, তবে বাল ব্যাকরণ অধ্যয়নে তাঁর কিছুতর বড় প্রয়োজন। লেখার সময় তিনি নাকি 'অন্ততঃ একটি অভিধান কাছাকাছি' রাখেন। বানানের নমুনায় মালুম, অভিধান কাছাকাছি রাখাই যথেষ্ট নয়, একেবারে হাতে-পাঁজি হলেই ভাল।

রঞ্জনের 'শূন্যে বাগবিভূতিতে' বিমোহিত অন্তত আমি যে হইনি, এই মুখবন্ধতেই তা' যথেষ্ট স্পষ্ট। 'চলতি' 'ছিলেমি', 'আতিশয্য' ও 'শৈথিল্য' থেকে সাধুনাং পরিত্রাণায় এ-যুগে যা সম্ভব হল, তার কয়েকটি নমুনা দেখুন।

১। 'হিন্দ্যোৎসাহী'। অর্থ কী? হিন্দিতে উৎসাহ? যথার্থ বিদ্যোৎসাহীরা কিন্তু এই অত্যুৎসাহে হোঁচট খাবেন। বিদ্যা+উৎসাহ 'বিদ্যোৎসাহ' হতে পারে, অতি+উৎসাহ অবশ্যই অত্যুৎসাহ। তাই বলে 'হিন্দ্যোৎসাহী'? এ রকম কোন শব্দ নিষ্পন্নও যদি হয়, তবে তার বানান ব্যাকরণের সঙ্গে লড়াইয়ের নয়, সন্ধির প্রাথমিক সূত্র যদি রঞ্জনের জানা থাকত) হওয়া উচিত 'হিন্দ্যুৎসাহী।'

২। 'তদাপি।' আমরা দুর্দান্ত পণ্ডিত-ম্মন্যতার হরেক দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদ্যপি বিলক্ষণ পরিচিত আছি, 'তদাপি' কিন্তু অদ্যাপি শুনিনি। অতঃকিম্? যদাপি?

দৈনিক পত্রিকা প্রসঙ্গে তথাগত ভ্রান্তি-বিলাস, 'স্বাশিত' "প্রতিপাদ্য" ইত্যাদি রকমারী বানানের উদাহরণ তুলে দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এক বন্ধু শুনে বললেন, উঁহু, অত লিখে কাজ কী, শুধু লেখো—সাধু সাবধান।'

সন্তোষকুমার ঘোষ
কলিকাতা।

আবৃত্তি-কথা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

'দেশ' ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২, সংখ্যায় শ্রীগোপাল সামন্ত 'আবৃত্তি-কথা' আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যিই একটি নতুন বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। কবিতা আবৃত্তি বা সোচ্চার পাঠের দুটি দিক আছে—পদ্ধতি বা আঙ্গিক এবং ভাব বা বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য সর্বত্রই আঙ্গিক ও বিষয় পরস্পর সাপেক্ষ, পরস্পর অনুসারী। আবৃত্তি সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্ত—'আগে বিষয়-বস্তুর মূল্যায়ন করে নিতে হবে; তার ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে পরিবেশন করবার উপযুক্ত অভ্যাস করে তারপরে তা উচ্চারিত করতে হবে শ্রোতাদের জন্য।' কবিতার সম্যক অর্থ, ভাব শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করাই আবৃত্তিকারের অভীষ্ট এবং সেজন্যই তাঁকে প্রকৃষ্ট উচ্চারণ, ছন্দ-তাল, ছেদ-যতি ইত্যাদি মানতে হবে, রাখতে হবে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর ছাড়াও অঙ্গ-সঞ্চালন, দৃষ্টিক্ষেপ, মুখভঙ্গী প্রভৃতি মাধ্যম অভিনেতাকে ভাবপ্রকাশে সহায়তা করে। কিন্তু আবৃত্তিতে একমাত্র কণ্ঠস্বরই অবলম্বন। আবৃত্তি একটি বিশিষ্ট চর্চা। কিন্তু এই মর্মে লেখক যখন বলেন 'নাটকের মধ্যে যে গল্পাংশ আছে অধিকাংশ কবিতার মধ্যে তা নেই' তখন দ্বিমত স্বাভাবিক। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের কবিতা বা নিসর্গ কবিতায় গল্প নেই সত্য, কিন্তু বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব, পুরস্কার বিতরণী সভায় নির্বাচিত কবিতা-বলী প্রায়ই কাহিনী আশ্রিত। যেমন—'দেবতার গ্রাস', 'দুই বিঘা জমি', 'গান্ধারীর আবেদন' অথবা সেই 'পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' —'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বা 'সোনার তরী' অবশ্য ব্যতিক্রম। যাই হোক ঐ গল্প বা কাহিনীটুকুও আবৃত্তির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং সে গল্পে যদি নাটকীয়তা থাকে তাও তুলে ধরতে হবে। (দ্রষ্টব্য—'দেবতার গ্রাস', 'পুরস্কার'—অন্তর্ভুক্ত 'প্রথম পূজা'।) লেখক 'থিয়েটারী ঢং' বলতে নিশ্চয়ই অতিনাটকীয়তা বা উচ্চগ্রাম আস্ফালন বোঝাতে চেয়েছেন। সেটি নিঃসন্দেহে সর্বথা বর্জনীয়। মোট কথা যেমন কবিতার ধ্বনিমাধুর্য, গীতিধর্মিতা ছন্দ-যতি রেখে আবৃত্তি করা উচিত তেমনি তার ভাবগাম্ভীর্য, নাটকীয়তা, চিত্রময়তা কোনোটাই উপেক্ষণীয় নয়। 'বাঁশি' ঘন গরজিত সংগীত। তুলনা ভাবি 'বীরশিশু'—যে ঝংকার; 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' অথবা 'বর্ষশেষ' কিংবা 'শাজাহান' কবিতার যে grandeur; 'সোনার তরী' বা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' যে গীতিধর্মিতা; 'বলাকা'-এর যে চিত্রময়তা—কবিতার মূল ভাবের সঙ্গে সেটুকুও ফুটিয়ে তুলতে হবে। তেমনি 'দেবতার গ্রাস' বা 'প্রথম পূজা'-র যে নাটকীয়, ঝাঁকি অথবা 'শাজাহান' কাব্য অন্তর্গত 'অমৃত' কবিতার যে কাহিনীপ্রাণতা রাখতে হবে আবৃত্তিকারকে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈত, সমবেত বা বিকল্প করে কবিতার বিভিন্ন স্তবক আবৃত্তি করলে আবেদন বেশ স্বচ্ছ হয়। যেমন 'প্রথম পূজা'য় একজন যদি কাহিনীর সূত্রধার হন এবং বিভিন্নজন যদি রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত এবং মাধবের উক্তি আবৃত্তি করেন তবে অনায়াসে কবিতাটির অন্তস্তলে যে নাট্যগুণ আছে তা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হতে পারে। অতএব আবৃত্তির জন্য গল্পাংশ ব্যতীত কবিতা যেমন নির্বাচন করা যায় তেমনি গল্পাংশপ্রধান কবিতাও নির্বাচন-যোগ্য। প্রসঙ্গতঃ, লেখক গদ্যকবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে কিছু যদি লিখতেন তাহলে প্রবন্ধটি, মোটামুটি সম্পূর্ণতা পেত। পরিশেষে, আবৃত্তি বিচারের মান নির্ণয় সম্পর্কে বলা যায় যে, বিচারক পূর্বাহ্নে যদি কবিতাটি পড়েন, বুঝে নেন, কবিতার ধ্বনি মাধুর্য, গীতিময়তা সম্পর্কে সচেতন থাকেন, সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলো যদি ভেবে রাখেন তবেই তিনি সম্যক বিচার করতে পারবেন।

মানিক বল কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া

চিত্রপ্রদর্শনী

...হলা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ শিল্পদক্ষতার সঙ্গে বিষয়বস্তুর কল্পনায় এবং অঙ্কনভঙ্গীতে বৈচিত্র্যের জন্য যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে শ্যামাশ্রী ঘোষকে নির্দ্বিধায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসের গ্যালারীতে সপ্তাহব্যাপি তাঁর ছবির একক প্রদর্শনীটি প্রভূত সম্ভবনাপূর্ণ এক প্রতিভাবান শিল্পীর কাজের পরিচয় দেয়।

১৯৬০ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে সসম্মানে পাস করার পর শ্যামাশ্রী ঘোষ বর্তমানে শিল্পশিক্ষক অনিল-কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে তাঁর স্টুডিওতে কাজ করছেন। এছাড়া তিনি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে শিল্প শিক্ষিকার পদেও অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ইতিপূর্বে দেশের বহু স্থানেই শ্যামাশ্রী ঘোষের ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কৃতিত্বের জন্য তিনি বহু পুরস্কারও লাভ করেছেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীর মোট উনচল্লিশখানি ছবির মধ্যে তেলরঙা, জলরঙা ছবি ছাড়া রঙীন খড়ি এবং কালি কলমের স্কেচও স্থান পেয়েছে। মাধ্যমের যেমন রকমফের রয়েছে তেমনি রকমারিতা দেখা যায় বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রেখার ভঙ্গীর দিক থেকেও। প্রতিকৃতিতে যেমন তেমনি তাঁর দক্ষতা ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে বা বিশেষ চরিত্রচিত্রণে। বলিষ্ঠ রেখা ও পরিবেশানুগ রঙের প্রয়োগে ছবিগুলি দর্শকমনকে ভাবময় শিল্পসৃষ্টির আস্বাদ এনে দেয়।

তেলরঙের ছবির ক্ষেত্রে মোটা রেখার কাজই বেশী, কয়েকখানি ছুরির সাহায্যে রঙের প্রয়োগে তৈরি ছবিও রয়েছে। তেলরঙে "জেলেনী" (৬নং), 'পাখিওয়ালা' (২নং), 'বিরাম' (১২নং), 'নৌকা' (১৩নং), 'তিব্বতী মেয়ে' (১৪নং), 'তেল ফুরনো লণ্ঠন' ১৬ নং) প্রভৃতি ছবিগুলি যে কোন প্রথম শ্রেণীর প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি অবলম্বনে "ভাবা-বেশ" (৯নং) ছবিখানি কল্পনা, রেখা ও রঙে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। শিল্পীর বাবার প্রতিকৃতি (১৫নং, এই ধরণের ছবিতে তাঁর দক্ষতা ফুটে উঠেছে। কুলু ও কাশ্মীরের স্কেচগুলিতে রেখা-চিত্রাঙ্কনে বেশ একটা সাবলীল ভঙ্গীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রদর্শনীতে শ্যামাশ্রী ঘোষ তাঁর আগেকার

স্নান — শিল্পী : শ্যামাশ্রী ঘোষ

স্মৃতিচারণ — শিল্পী : অনিতা রায়চৌধুরী

আঁকা ছবির সঙ্গে সম্প্রতি আঁকা কাজও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে ধাপে ধাপে তাঁর কাজের উন্নতির সঙ্গে চিন্তা ও জ্ঞানের উন্নতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় এখনও তিনি অনুশীলনে রত আছেন শিল্পীর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল।

*

সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টের ধর্মতলাস্থ নিজস্ব গ্যালারীতে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সপ্তাহব্যাপী একক প্রদর্শনী হয় শিল্পী অনিতা রায়চৌধুরীর ছবির। প্রদর্শিত মোট বারোখানি তেলরঙের ছবির মধ্যে শিল্পীর বিমূর্ত ধারার প্রতি অতি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ছবির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বোঝা সাধারণ দর্শকের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য। রঙের ছন্দে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা তাঁর যদি বা আছে কিন্তু সেদিক থেকে তিনি তেমন বৈচিত্র্য পরি-বেশনেও সক্ষম হননি এখনও। রচনাগুলি এমন জটিল যে অধিকাংশ ছবির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে মনের সাড়া পাওয়া যায় না। "এক বৃদ্ধ সংগ্রামী" (৮ নং) "স্মৃতিচারণ" এবং "নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্তি" (১২ নং) ছবি কখানিতে একটা অর্থপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে একটা সাবলীল শিল্পভঙ্গীর কিছুটা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। "পূজারিণী" (৯নং), "সঙ্গীতানুষ্ঠান" (১১নং) প্রভৃতি ছবি কখানির বক্তব্য স্পষ্টভাবে দৃষ্টিতে পড়লেও রঙের প্রয়োগের দিক থেকে একটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল না—ভাবের দিক থেকেও অসাধারণ কিছু নয়। ছবিগুলি দেখে মনে হলো শিল্পী এখনও তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে সক্ষম হননি—এখনও যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। কোন একটা বিশেষ ধারা তিনি ঠিক করে নিতে পারেননি।

জ্যামিতিক রেখা এবং [illegible] বিবিধ রঙের সংযোগে নক্সা ধরনের ছবি তৈরি করে অনিতা রায়চৌধুরী মহিলা শিল্পী বলতে পেলব হাতের কোমল রেখায় রমণীয় কিছু, কোমলতার যে-ছায়া চিত্ররসিকদের মনে জেগে ওঠে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু, [illegible] একটা চমক এনে দেবার প্রয়াসটি চোখে পড়ে।

ইতিপূর্বে গ্রুপ প্রদর্শনীতে অনিতা রায়চৌধুরীর ছবি দেখা গিয়েছে এবং একক প্রদর্শনী এই প্রথম। কিন্তু কাজের যে দৃষ্টান্ত দেখা গেল তাতে কোন একটি বিশিষ্ট ধারার দক্ষতা অর্জন না-করা পর্যন্ত সাধারণ্যে ছবি প্রদর্শিত করার ঝোঁক দমন করে রাখলেই ভাল হতো।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

বাঙলা রহস্য-উপন্যাস

রহস্য-কাহিনী-বিশারদ আমি নই। মোটামুটি ভাল পাঠক? তা-ও নয়। অতি সামান্য কয়েকটা বই, যা প্রলোভন বা প্ররোচনায় পড়েছি, তা নিয়ে এ-বিষয়ে মাস্টারি করার মতন দুর্বুদ্ধিও আমার নেই। তবে, এখনও আমার ধারণা, রহস্য-কাহিনী যদি ভাল হয়, তবে সময় কাটানোর এমন উপাদেয় খোরাক আর কিছু নেই।

প্রসঙ্গটা শুরু করলাম একটা কারণে। এই যে সেদিন যখন কলকাতা ঝড় ও বৃষ্টির ঝাপটা খেতে খেতে স্যাঁতসেঁতে অলস ও অসাড় হয়ে আসছিল— তখন একদিন আমার হাতে আচমকা একটি বাঙলা রহস্য-উপন্যাস ও একটি ওই শ্রেণীর পত্রিকা এসে পড়ে। আবহাওয়ার মেজাজ রহস্য-কাহিনীর উপযুক্ত এই বিবেচনায় সে রাত্রে আমি রহস্য-জগতে প্রবেশ করার সঙ্কল্প নিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে প্রকৃতি ঘন ঘন বজ্রপাত করছিল, ঝড় চলছিল এবং বৃষ্টিও। প্রথমে পত্রিকাটির পাতা ওল্টালাম, পরে বইটির পাতা। ঘণ্টাখানেক নানাভাবে, নানা গল্পে মন বসাবার চেষ্টাও করলাম। দেখা গেল, আবহাওয়া অনুকূল, কিন্তু মন প্রতিকূল।

ঘটনাটা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু কি যেন খেয়াল হল, পরের দিন আবার একটি বই নিয়ে বসলাম, আগাথা ক্রিস্টির গল্পের বই। বিদেশী বলে ঠিক নয়, তবু কোনো কিছুর প্রত্যাশার একটি গল্প পড়া গেল। বলা ভাল, কোনো সুখ পেলাম না।

বাংলা রহস্য-কাহিনী শিশু অথবা মহিলাদের পাঠ্য বলে জানি; কিন্তু ইংরেজী রহস্য-কাহিনীই বা কি এমন সুখপাঠ্য, এই প্রশ্ন অতঃপর আমার মনে এল। ......এই প্রশ্নের এক ধরনের সাফ জবাব আছে; সব শিল্পেরই এক কথা—, যা ভাল তা ভাল, যা মন্দ তা মন্দ। উপন্যাস কি সবই ভাল হয়, সব লেখকই কি ভাল লেখেন? কবিতা কি সব কবিরই উতরে যায়?

কথাটা যথার্থ। রহস্য-কাহিনী হলেই তা ভাল নয়, রহস্য-কাহিনীর লেখক যা লেখেন, তা-ই রহস্যময় নয় বা আমাদের পক্ষে আনন্দদায়ক নয়। এখানেও ভালর বিচার। লেখা ভাল হলে জমবে, লেখা খারাপ হলে বই ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করবে।

আপাতত এ-প্রশ্ন নিয়ে অকারণ আর সময় ব্যয় করতে চাই না। আমার অন্য একটি কথা মনে আছে, সেটিই বলি।

সমস্ত রহস্য-কাহিনীর মূল সূত্র মানুষের কৌতূহল নামক বৃত্তিটাকে জাগ্রত করা, তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলা, উগ্র করা, আর শেষাবধি নিবৃত্ত করা। যে-রহস্যকাহিনীর মধ্যে এই কৌতূহলের টোপ নেই, সে-রহস্য-কাহিনীর কপালে আগুন।

কৌতূহল যেহেতু আদি বস্তু (রহস্য-কাহিনীর), সেহেতু রহস্য-কাহিনীর লেখকরা ঘটনাকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেবেন, এবং ঘন ঘন ঘটনা ঘটবে, এতে আমার বা আপনার আপত্তি করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

আপত্তি করার কোনো কারণ থাকতে আপত্তি করার কোনো কারণ থাকতে কৌতূহলকে বাঙলা কাহিনীতে অতি নিম্ন শ্রেণীর কৌতূহলে পরিণত করা হয়েছে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোনো পাঠক এ-বই পড়তে পারে না। বেশীর ভাগ ইংরেজী গোয়েন্দা বইও যে খুব উচ্চমানের আমি তাও বলি না। দেখতে পাই ক্রাইম ফিকশান নামক পুস্তকমালার শতকরা নব্বুইটি বইয়ের সমালোচনায় বলা হয়, 'লেখক এই গ্রন্থে বস্তা বোঝাই ঘটনা ও শিহরণ আমদানি করেছেন।'

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙলা রহস্যকাহিনীর দুর্গতির প্রধান কারণ, লেখকরা প্রায় ভৌতিক-স্বেচ্ছাচারিতায় কৌতূহল জিইয়ে রাখেন। কলকাতায় রাত বারোটায় যে-লোক খুন হয়, তার হত্যাকারী রাত ভোর হবার আগে বোম্বাইতে গিয়ে বসে থাকে, এবং গোয়েন্দাপ্রভু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবিস্তার রহস্য জ্ঞাত হয়ে যান। বিমানের যুগে কলকাতা বোম্বাই এমন কিছু দূর পাল্লার পাড়ি না হলেও ভারতীয় আকাশ পথ এখনও আমেরিকার মতন নয়। একবার এই [illegible] বাঙলা গোয়েন্দা গল্পে

দেখেছিলাম, গ্রামোফোনের পিন তাক করে মেরে মানুষ মারছে কোনো ধুরন্ধর। আমার যতদূর ধারণা, এই গল্পের গ্রামোফোনের পিন যতই রোমাঞ্চকর মৃত্যুবাণ হোক না কেন, সাধারণ বিজ্ঞান ও জড় জগতের স্বাভাবিক নিয়ম একটিও সে মানে নি।

বস্তুত, মোটা এবং অসঙ্গত, কার্য কারণ-হীন গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ে পড়ে পাঠকও ধরে নিয়েছেন, গোয়েন্দা গল্পও এক ধরনের ভৌতিক কাহিনী। লেখক এবং লেখকসৃষ্ট গোয়েন্দা ক্ষণে ক্ষণে ভেলকি দেখাবেন তবেই না ঠিক গোয়েন্দা-গল্প হল; সাধারণ মানুষের অসাধ্য, সাধারণ বোধ-বুদ্ধির অগম্য যা তাতেই নাকি গোয়েন্দাগল্পের যা কিছু কারিকুরি।

অথচ, এ-যুগে গোয়েন্দা গল্পের চেহারা পালটে যাওয়া উচিত ছিল সবচেয়ে বেশী। নিম্নশ্রেণীর কৌতূহল পুরোপুরি ভাবে এই গোত্রীয় গ্রন্থ থেকে বাতিল হওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল গোয়েন্দা প্রভুদের ঐশ্বরিক বিচরণ। এমন কি, অপরাধের কার্য কারণ ও অপরাধীর চরিত্রও মামুলি ছকের বাইরে বাঁধাই সংগত হত।

সংসারে অপরাধ আছে, কিন্তু সেই অপরাধকে একেবারে আলাদা এক শ্রেণীর মানুষের পেশা এমন মনে করার হেতু নেই। এবং এও কদাচ মনে করা উচিত নয়, দুর্ভেদ্যমন কতকগুলি প্রখর বুদ্ধিমান শখের গোয়েন্দার ওপর নির্ভর করছে। যে অস্বাভাবিকতা (এবং একমাত্র কল্পলোক) গোয়েন্দা-কাহিনীর মূল পুঁজি ছিল বোধ হয়, সেই অস্বাভাবিকতা এবং নিছক অসংগত কল্পনার লীলা থেকে এখন তাকে মাটিতে নামিয়ে আনার সময় হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহার তার বৃত্তিগুলির সৎ ও অসৎ আচরণ, ঘটনার স্বাভাবিক বয়ান, চরিত্রের মানসিক জগৎ, ইত্যাদি এ-কালের গোয়েন্দা (রহস্য কাহিনীরও) কাহিনীর বিষয় হওয়া উচিত। কি ঘটল? কেমন করে ঘটল? মাত্র এই দুটি শর্ত পালন করাই রহস্য-কাহিনীর লেখকের দায়িত্ব নয়। আমার মনে হয়, ঘটনার মধ্যবর্তী যে অংশ এ-যাবৎ সাদা রাখা হত, এখন তাকে ভরাতি করলে কাজ হয়।

এ-যাবৎ গোয়েন্দারাই যে-কাহিনীতে রাজত্ব করেছেন সেই কাহিনীতে অন্যের মুখ দেখতে খারাপ লাগবে হয়ত। তবে সে নিতান্ত অভ্যাস-দোষে। নয়ত গোয়েন্দাদের ভূমিকা সাহিত্যে যদি কমে এবং তুলনায় অপরাধীর বিবেক দংশন, অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, আপন জালে আপনি জড়ানোর কৌতুক বাড়ে—তাতে কি কোনো ক্ষতি হবে?

আমি তেমন বইয়ের প্রত্যাশায় থাকলাম, যেখানে গোয়েন্দার ভূমিকা মৃত সৈনিকের অথচ যা রহস্য-কাহিনী। বলা বাহুল্য আমার প্রত্যাশা সোনার পাথরবাটি নয়।

পুস্তক পরিচয়

বাংলার লোক সাহিত্য : গবেষণা গ্রন্থ

বাংলার লোক-সাহিত্য : ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য—বার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

আলোচ্য বইখানি শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের পি এইচ ডি থীসিস। একটি ভূমিকা (১-১৩০ পৃঃ) এবং আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইখানিতে বাংলার লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ভূমিকায় সাধারণভাবে লোক-সাহিত্যের সমাজ-পরিবেশ, 'লোকসাহিত্যের বিষয়', বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সংগে লোকসাহিত্যের তুলনা ইত্যাদি প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। বই-এর মূলে আটটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্বতন্ত্রভাবে লোক-সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন; যেমন, 'ছড়া', 'গীতি', 'গীতিকা', 'কথা', 'ধাঁধা', 'প্রবাদ', 'পুরাকাহিনী', 'ইতিকথা'। পরিশিষ্টে আছে লোকসাহিত্যের তিনটি প্রসংগঃ (ক) বাংলা লোকগীতির সুর-বিচার, (খ) বধূর বিদায়-সংগীত, (গ) শব্দসূচী।

১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-য় যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'মেয়েলি ছড়া' এবং 'ছেলেভুলানো ছড়া' নাম দিয়ে সেই প্রবন্ধ দুটিই লোকসাহিত্যের দিকে সর্বপ্রথম বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রবন্ধ দুটি পড়ে অনেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশের কাজে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টার পরিচয় আছে পুরানো বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

সম্প্রতি লোকসাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগ মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা এম এ পরীক্ষায় লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ পত্র প্রবর্তিত হয়েছে, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে লোকসংগীত পরিবেশনের পরিমাণ বেড়েছে, প্রতি বছর কলিকাতায় লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে।

একদা লোকসাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর ঔদাসীন্য যেমন মাত্রাতিরিক্ত ছিল, আজকের এই অনুরাগও তেমনি অতিরিক্ত মনে হয়। লোকসাহিত্য যে এতদিন বেঁচে ছিল এবং আজও আছে তা শিক্ষিতজনের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও। যেমন সজীব ছিল বাঙালা সাহিত্য রাষ্ট্রভাষা না হয়ে এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার না পেয়ে। আশঙ্কা হয়, অনুরাগের চাপে লোকসাহিত্যের 'লোকত্ব' এবং 'সাহিত্যত্ব' লুপ্ত হবে। এবং লোক-সাহিত্যের ছদ্মবেশে মেকি জিনিস শহর-বাসী বাঙালীর চিত্তবিনোদন করবে।

আপাতদৃষ্টিতে যাকে লোকসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ মনে হচ্ছে তা যথার্থ অনুরাগ নয়। নগর জীবনের একঘেয়েমিত্বের মধ্যে পল্লী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই লোক-সাহিত্যের বাজারদর দ্রুত বর্ধমান। লোক-সাহিত্যের প্রতি যাঁর অনুরাগ যথার্থ ছিল তিনি লোকসাহিত্যের রূপটি 'লোক-সংঘট্টের' মধ্যে বসেই দেখেছিলেন। এবং সেই দেখাই যথার্থ দেখা।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের বই পড়ে মনে হয় তিনি লোকসাহিত্যের রূপটি যথার্থভাবে দেখাতে পারেননি, কেতাবী-ভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর বইএর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, লোকসাহিত্যের "আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের মধ্যে আজিও অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই। এই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যে সেই অভাব মোচন করিবার সর্বপ্রথম প্রয়াস।" (৮/০)

অন্যান্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও সমা-লোচনায় যদি একটি রীতি থাকে তাহলে লোকসাহিত্য সমালোচনা রীতিই বা থাকবে না কেন? অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তার সংগে "আধুনিক বিজ্ঞান" ও "পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি"র সম্পর্ক কি? "আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান" অর্থে বোধহয় Sociology-র কথা বলা হয়েছে। তাহলে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কি বলতে চান Sociology নির্দিষ্ট সমাজের সংজ্ঞা না জানলে লোক-সাহিত্যের মর্ম উদ্ঘাটিত হবে না। আমি Sociologyতে অজ্ঞ: সুতরাং শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের কথা সত্য বলে স্বীকার করছি। কিন্তু "পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতির" প্রয়োজন কি! বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের বিচার পাশ্চাত্ত্য মানদণ্ড অনুসারে হচ্ছে বলে? উনিশ এবং পরবর্তীকালের বাঙলা সাহিত্যের গড়নে ইংরাজী সাহিত্যের একটা বড় রকমের ভূমিকা ছিল। সুতরাং এই দুই সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড এক হওয়া অসংগত নয়। কিন্তু 'বৈষ্ণব পদাবলী' ও "পাঁচালী" কাব্য কি আমরা "পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলন করি"?

"বাংলার লোকসাহিত্য" একখানি গবেষণা

গ্রন্থ। রচনাটিকে তাই ইচ্ছা করেই গবেষণা-গন্ধী করা হয়েছে। 'আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান' ও 'পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-পদ্ধতি' ও সেই সূত্রে এসেছে। বইখানির ভূমিকাংশে লেখক তাঁর থীসিসটি নিবেদন করেছেন। কিন্তু সে থীসিস যে কি তা বইখানি পড়বার পরও দুর্বোধ্য রয়ে গেল। লেখক 'সমাজ-বিজ্ঞানের' বইগুলির উপর বেশী নির্ভর করেছেন বলে বিষয়টি নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেননি। লেখক নানা গ্রন্থের সাহায্যে লোকসাহিত্যের অনুকূলে সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তার কি প্রয়োজন আছে? সমাজ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা-অনুযায়ী ব্যাখ্যাত সমাজের আর যে মূল্য থাক লোকসাহিত্যের সঙ্গে তা সম্পর্করহিত। আমরা চাই যে সমাজ-পরিবেশের মধ্যে বাংলার লোকসাহিত্যের সৃষ্টি সেই সমাজ-পরিবেশের পরিচয়। এ-দিক থেকেও যে লোকসাহিত্যের আলোচনা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ সে ইঙ্গিত দিয়েছেন—"আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।" রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড) পৃঃ ৫৭৭ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের আলোচনা সে পথে অগ্রসর হয়নি।

লোকসাহিত্য বিশ্লেষণে লেখক রবীন্দ্র-নাথের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সংযত, তা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। রসের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের সেই অংশটুকুই আলোচনা করেছিলেন যা নিত্যকার রসবস্তু এবং যা বর্জনীয় তা তিনি বর্জন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের কাছে রসের কষ্ঠিপাথর নেই; তাই কি বর্জনীয় আর কি আলোচ্য সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট নয়। আলোচনা আরও তিন-চার শত পৃষ্ঠার চলতে পারত, অথবা আরও তিন-চার শত পৃষ্ঠা আগে সমাপ্ত হতে পারত। আলোচনা অতি বিস্তৃত। বই-এর আকার সম্বন্ধে লেখকের দুর্বলতা থাকা বিচিত্র নয়।

রবীন্দ্রনাথের ৮৬ পৃষ্ঠার আলোচনায় যা আছে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের ৭১৭ পৃষ্ঠায় তা নেই। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ এগুলির আলোচনা করেছিলেন, আনন্দের টানে, গবেষণার প্রবৃত্তি নিয়ে নয়।

২৪৪।৬২

শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস

সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৫৮-৯৫ : শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা। মূল্য ২, টাকা।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাপন্থী 'অ্যাংলিসিস্ট' এবং সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিদ্যাপন্থী 'ওরিয়েন্টালিস্ট'—এই দুই দলের মধ্যে যখন এদেশের শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের ঝড় বইছিল, তখন সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় (১৮২৪)। দুই দলেরই নেতা ছিলেন কিন্তু ইংরেজ, একদিকে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (ইংরেজী), আর-একদিকে হোরেস হেম্যান উইলসন (সংস্কৃত)। কলকাতায় পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার আদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮১৭) প্রধানত এদেশের বাঙালীদের উদ্যোগে (যদিও ডেভিড হেয়ার ও এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন), আর সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত ইংরেজদের উদ্যমে। শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম আশ্চর্য ঘটনা ঘটার নিশ্চয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। বোঝা যায়, এদেশের উন্নতিকামী প্রগতিশীল ব্যক্তিরা তখন নূতন পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং শাসকশ্রেণীর ইংরেজদের কাছে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কাম্য ছিল না। তা না হলে রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আমহার্স্টকে তাঁর বিখ্যাত পত্রখানি লিখতেন না (১৮২৩)। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও সংস্কৃত কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন তা গোঁড়া প্রাচীনপন্থী না হয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠল। এই মিলনের বাস্তব প্রতীকরূপে গোলদীঘিতে যখন সংস্কৃত কলেজের নূতন গৃহ নির্মিত হল তখন তার দু'দিকের দুই একতলা বাড়িতে হিন্দু কলেজও স্থাপিত হল। আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাদর্শের সমন্বয়-সাধনে যিনি দৃঢ়পদে অগ্রসর হলেন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রথম অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

এই কারণে নবযুগের বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সংস্কৃত কলেজ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের পুরাতন নথিপত্র থেকে বিদ্যাসাগরের কার্যকাল পর্যন্ত (১৮২৪-৫৮) ইতিহাস প্রথম খণ্ডে সংকলন করেছেন। তার ১৪ বছর পরে সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসের 'দ্বিতীয় খণ্ড' (১৮৫৮-৯৫) প্রকাশিত হল। শ্রীগোপিকা-মোহন ভট্টাচার্য একই আকর থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং কাওয়েল, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতাকালের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। কাওয়েল ইংরেজ, প্রসন্ন-কুমার হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং মহেশচন্দ্র টোলের ছাত্র। বিদ্যাসাগর-পরবর্তী এই তিনজন অধ্যক্ষ তিনদিক থেকে সংস্কৃত কলেজের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাসমন্বয়ের আদর্শকে পরিপুষ্ট করেছেন। সংকলকের তথ্যসংগ্রহে কোন ত্রুটি নেই, উপরন্তু বিদ্যা-লয়ের এই ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তথ্য সন্নিবেশিত হওয়াতে বইখানি অনুসন্ধিৎসুদের বিশেষ কাজে লাগবে।

তিনটি উপন্যাস

যখন বৃষ্টি নামলো। হিরণ্ময়ী। দি পাবলিশিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, ১১, ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট, কলকাতা—১। মূল্য: ৪·০০ টাকা।

তুলাদণ্ড। মণি গঙ্গোপাধ্যায়। অভিজিৎ প্রকাশনী সমবায় লিমিটেড, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য: ২·৫০ টাকা।

উপনিবেশে কয়েক দিন। কালীপদ পাল।

খগেন্দ্রনাথ পাল, ২।১৪৩, শ্রী কলোনী, কলকাতা—৪০। ম্ল্যঃ ২·৭৫ টাকা।

তিনজন লেখকই বাংলা সাহিত্যে নবাগত। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দুটি জিনিসের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়; এক, নিত্য প্রকাশক বৃদ্ধি; দুই, আকছার গতানুগতিক অপরিণত লেখকের দ্বারা লিখিত অসংখ্য পুস্তকের প্রকাশ। ব্যবসাগত দিক জানি না তবে সাহিত্যগত দিক দিয়ে ভাবলে এ-অনুমান স্বতঃই মনে আসে যে, বাংলা ভাষার পরিণত মানটি ক্রমে নিম্নমুখী। এই তিনজন লেখকের মধ্যে হিরণ্ময়প্রিয় ও কালীপদ পালের এই প্রথম গ্রন্থ; মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরো লিখেছেন ইতিপূর্বেই।

এ'দের মধ্যে অবশ্য হিরণ্ময়প্রিয় ঠিক এক দলে পড়েন না। 'যখন বৃষ্টি নামলো' যদিও তাঁর প্রথম উপন্যাস, তবু তা অন্য দুখানি বই অপেক্ষা সম্ভাবনায় প্রচুর উজ্জ্বল। প্রাথমিকভাবে বলা যায় যে, অন্তত এ-ব্যক্তি লিখতে জানেন বা সাহিত্য হয়তো একদিন তাঁর হাতে অনায়াস হবে অভ্যাস ও পরিশীলনে। গল্পটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও লেখক তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের ভিন্নতর প্রকাশকে আলো দিতে পেরেছেন। উপন্যাসটির উপজীব্য যদিও প্রেম, তবু এর মূলে নার্সিসিস্টিক চরিত্রের একটি মেয়ে, যার নাম নন্দিনী। গ্রন্থের বহুলাংশেই বর্ণনা-কুশলতায়, দৃশ্য রচনায় নন্দিনী উজ্জ্বল—কিন্তু জটিলতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেখানে মানসিকতা অন্যতর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারলে রসানুভূতি গাঢ় হতে পারত, সেখানে লেখকের ক্ষমতা সীমিত। যেহেতু একটি আবদ্ধ চতুষ্কোণের বাইরে কাহিনী গতি পায়নি, সেকারণ রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা এবং রক্তকরবী ইত্যাদির অনুসৃত চিন্তাগুলো স্পষ্ট হয়ে লেখককে দুর্বল প্রতিপন্ন করে। এঞ্জিনীয়ার নায়কের পাল-তোলা মন বা প্রেম সম্পর্কে দুরূহ ধারণা, পরে ট্র্যাজিডের কারণে তার পায়ের রোগ অবাস্তবতাকেই আশ্রয় দেয়। শোভনার রঞ্জনকে নিমন্ত্রণ করে প্রেম নিবেদন দৃষ্টি-কটু। এ-ছাড়া নন্দিনীর স্বামীকে লেখক ইচ্ছেমতো বা অন্যতর একটা কিছু করব, এই ঝোঁকবশত যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পে হাজির করেছেন, তা এতক্ষণের অন্তত একটি মিষ্টি প্রবাহকে ক্ষুণ্ণ করেছে। মোটামুটি কোনো স্থিরবক্তব্য যেমন অনায়াস হয়নি—তেমনি আয়াসসাধ্য কোনো দূর-দর্শনের পরিচয়ও এতে নেই। নিছক মামুলি ঘটনার মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি নন্দিনীকে মানস-প্রতিমা গঠনে প্রয়াসী করেনি; দুর্বল একঘেয়ে বাঙালী একটি মেয়েকেই শেষ পর্যন্ত পাঠকের সামনে হাজির করেছে। চিঠির মাধ্যম রচিত অংশ একান্তই লেখকের পলায়ন-বৃত্তির প্রমাণ।

এতৎসত্ত্বেও লেখকের কিছু কিছু অন্তরঙ্গ অনুভাবনা হৃদয় স্পর্শ করে। বিশেষ করে জীবনানন্দের কবিতার ব্যবহার, মিষ্টি শব্দে মেজাজ তৈরীর রীতি ও পরিচ্ছন্ন বলার ভঙ্গি তাঁর ভবিষ্যৎ ক্ষমতা সম্পর্কে আশাবাদী করে। বৌদি বা মাধব, এই চরিত্র দুটি বহুলাংশে অনুচ্চারিত কিংবা প্রয়োজন বাদে উপেক্ষিত। ফলে পরিমিতির জন্য এ'রা দুজনেই আগ্রহকে অনেক বেশি স্থায়ী করে তুলেছে।

'তুলাদণ্ড' গ্রন্থে আধুনিক জটিলতাকে, এবং এই জটিল অস্বাভাবিকতায় মানুষের হীনমন্যতার নীচতার পরিচয়কে লেখক ছকবাঁধা একটি কাহিনীতে বলতে চেয়েছেন। এর সঙ্গে মানানসইভাবে পরিশেষে রিভলবার নিয়ে আত্মহত্যায় বিনায়ক সেনের যন্ত্রণা-মুক্তি যথাযথ বলা যেতে পারে। এই পুস্তকে সন্নিবেশিত কোনো চরিত্রই আপন ব্যক্তিত্বকে, উপস্থিতিকে প্রতিপন্ন করেনি—লেখক ঘটিয়ে দিয়েছেন। একটি ঘটনার পর অন্য ঘটনাকে তাই বাধ্য হয়ে তিনি উন্মুক্ত করেছেন; যা লেখক সম্পর্কে মনকে নিরাশ করে মাত্র। ব্যবহৃত ভাষার দুর্বলতা, একটি চেরী গাছের সাজেশন, একান্ত ভিন্ন পরি-মণ্ডলের কিছু মানুষের নেহাৎ যাতায়াতে কাহিনী শ্লথ, ও অন্তরঙ্গতাহীন হয়ে পড়েছে। সম্ভবত তিনি অন্য কাহিনী নিলে সাফল্য অর্জন করতেন।

'উপনিবেশে কয়েকদিন' গ্রন্থটি কলোনী জীবন নিয়ে রচিত। একটি সুখী পরিবার হাওয়াবদলে করতে এসে কলোনীতে উঠেছে। এরা শহুরে। এদের চোখ দিয়ে লেখক বিভক্ত বাংলার উদ্বাস্তুদের আঁকতে চেয়েছেন। উদ্বাস্তু নিয়ে লেখার কিছু সুবিধে, তাতে লেখকরা বোধহয় কল্পনার রাসকে ক্রমে আলগা করে চাঁ[illegible] পাড়ি দিতে পারেন। নীচতা, দারি[illegible] ব্যভিচার, দয়া মায়া কারুণ্য অযাচিত স্নে[illegible] যাবতীয় বৃত্তি তাই এ-গ্রন্থেও আশাতী[illegible] ভাবে সন্নিবেশিত। কিন্তু যে দৃষ্টি থাক[illegible] হৃদয়ের অবচেতনে প্রবাহিত এই সব বঞ্চি[illegible] মানুষের হতাশা বেদনাগুলি আপনি প্রকা[illegible] হতে পারে কালীপদ পাল মহাশয়ের [illegible] জানা নেই। ফলে কতক অযথা কচকচি আ[illegible] চোখের জল এবং কিছু কলঙ্কিত চরিত্রে[illegible] মধ্যে গল্পটি সীমাবদ্ধ। মনোরমা নাম্নী দেবীর ভূমিকার মহিলা চরিত্রটি মাটি[illegible] মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—প্রাণ সঞ্চার হয় না[illegible] কিছু টাইপ চরিত্র বা কিছু অপাচার[illegible] আমদানীতেই যে সাহিত্যে হয় না এ বোধ[illegible] লেখকের আয়ত্তের বাইরে।

একটি কুৎসিত প্রচ্ছদ নিয়ে এমন পুস্তক[illegible] সাহিত্যে নিম্নগতিই প্রমাণ করে।

...ক্তিকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির সদস্যরা হলেনঃ বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারক শ্রী কে সি সেন, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। আগামী ইংরেজী বছরের ৩১শে মার্চের মধ্যে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করার জন্য কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

সংবাদে আরও প্রকাশ, বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের সংকট নিবারণের জন্য কলকাতায় হিন্দী ছবি এবং বাংলা ছবির হিন্দী চিত্র-রূপ তৈরির প্রয়োজন অপরিহার্য বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন। এবং কী উপায়ে এ কাজে চিত্রপ্রযোজকদের সাহায্য করা যায় সে বিষয়েও সরকার বিশেষভাবে ভাবছেন।

প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসাগত সম্পর্কের যে ধারা বর্তমানে বলবৎ আছে তার মধ্যে কোথায় গলদ রয়েছে এবং কীভাবে তা দূর করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ তদন্তের জন্য সরকার তদন্ত কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছেন। "হোল্ড-ওভার", "হাউস প্রোটেকশন" প্রভৃতি যেসব বিধি-ব্যবস্থার সুযোগ চিত্রপ্রদর্শকরা গ্রহণ করে থাকেন তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় বলে সরকার মনে করেন। কমিটি এই সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেবেন তার ভিত্তিতে সরকার এই বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের নানা সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য রাজ্য সরকার একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল।

* শুভমুক্তি *

দুটি বাংলা ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছেঃ **কুমারী মন** (ফিল্ম এজ) এবং **শুভদৃষ্টি** (এস সি প্রোডাকশন্স)।

বহিঃপ্রকৃতির কোলে "কুমারী মন" ছবিটির বেশীর ভাগ দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের বিপদসংকুল পটভূমিতে এই ছবির দৃশ্য গ্রহণ করেছেন নবাগত চিত্রপরিচালকগোষ্ঠী চিত্ররথ। দুর্বার জীবনাবেগ, জটিল নাট্যদ্বন্দ্ব ও পরস্পর-বিরোধী মূল্যবোধের সংঘাতে এই ছবির চিত্র-নাট্যের মূল উপজীব্য। কণিকা মজুমদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ছবির প্রধান শিল্পী। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী ছবির আখ্যান অবলম্বন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছবির সুরকার।

ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা বন্যায় এক দম্পতির সুখ-স্বপ্ন ভেঙে যায়। বাঞ্ছিত সুখ কি তারা ফিরে পেল? "শুভদৃষ্টি" ছবিটি এই ভাগ্যবিড়ম্বিত দম্পতির কাহিনী নিয়েই তৈরি। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ছবির কাহিনীকার। চিত্ত বসু পরিচালিত এই ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও সন্ধ্যা-রানী। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুর রচনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

এ সপ্তাহের দুটি উল্লেখযোগ্য নতুন হিন্দী ছবি হলঃ **বেজুবান** (গোপ প্রোডাকশন্স) ও **রূপ কী রানী চোরোঁ কী রাজা** (রাহুল থিয়েটার্স)।

"বেজুবান" ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অশোককুমার, নিরূপা রায়, অরূপ-কুমার ও হেলেন। রাম কামলানি ও চিত্র-গুপ্ত যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

"রূপ কী রানী চোরোঁ কী রাজা" ছবির নায়ক-নায়িকা হলেন ওয়াহীদা রেহমান ও দেবানন্দ। এচ এস রাওয়েল ছবিটি পরি-চালনা করেছেন। শংকর জয়কিষণ ছবির সুরকার।

অভিযান—বিশ্ব-চলচ্চিত্রের আর এক বিস্ময়

এমন ছবি বুঝি আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

পৃথিবীর সেরা ছবির মধ্যে একটি।

যে চলচ্চিত্রশিল্পে এমন ছবি তৈরী হয় তার কেন এই সংকট?

সত্যজিৎ রায়ের "অভিযান" (অভিযাত্রিক প্রযোজিত) দেখার পরই কথাগুলি মনে জাগে। উচ্ছ্বাস নয়, যুক্তিতুষ্ট অভিভূত মনের উপলব্ধি।

মহৎ চলচ্চিত্রের স্বরূপ ও সংজ্ঞা আমরা প্রতিবার নতুন রূপে দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলিতে। "অভিযান" আরও বেশী কিছু যেন দিয়েছে আমাদের।

কী এমন তার নিজস্ব ভাষা যার গুণে চলচ্চিত্র সাহিত্যের মতই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সহাবস্থান কেমন করে কতটুকু সম্ভব—"অভিযান" তারই এক প্রত্যয়নিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস এই ছবির মূল আখ্যান-ভিত্তি। বলতে দ্বিধা নেই, এই উপন্যাসে আমরা যা পেতে পারতাম অথচ পাইনি তাই যেন আমরা পেয়েছি "অভিযান" ছবিতে। উপন্যাসে যে কল্পনা অপূর্ণ, অপরিণত, তাই পূর্ণ ও পরিণত রূপ নিয়েছে এই ছবিতে।

রাজপুত ছত্রী নরসিং তারাশংকরের কাহিনীর নায়ক। এই চরিত্রের দোর্দণ্ড, রুক্ষ রূপটি অবিকৃতভাবে রক্ষা করেছেন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার তাঁর ছবিতে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু তিনি দিয়েছেন তাঁর চিত্রনাট্যে। চরিত্রটি ছবিতে বেদনায় ও বিভ্রমে মহৎ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে আছে পরলোকগতা স্ত্রীর নিষেধ ও অনুরোধ নরসিংকে উচ্ছৃংখল রমণীসঙ্গ থেকে দূরে রেখেছে। ছবিতে নরসিং এমন এক ব্যক্তি—যার চরিত্রের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি পাওয়া যায়। প্রচণ্ড প্রাণাবেগে যে নিয়ত অস্থির, সমাজের বিধি-নিষেধ, নিয়ম-শৃংখলা যার কাছে অসহ্য, ঝড়ের মত যে উড়ে চলে, বাঁধনছাড়া যার জীবন—পরলোকগতা স্ত্রীর নিষেধের ডোর তাকে প্রতিপদে বাঁধবে কেমন করে? ছবির নরসিং'ও মেয়েদের দিকে ফিরে তাকায় না, তার ট্যাক্সিতে মেয়েদের ঠাঁই নেই। স অন্য কারণে। ছবিতে বলা হয়েছে, স্ত্রী তার পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী। তাই সমস্ত স্ত্রীজাতির ওপর নরসিংয়ের আক্রোশ। নরসিংয়ের মত লোকের পক্ষে এই প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়, অলৌকিক নয়। **বরঞ্চ পররমণীর প্রতি উদাসীন উপন্যাসের নরসিং'ই যেন অনেকটা অবাস্তব।**

স্ত্রীজাতির প্রতি নরসিংয়ের এই অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ একদিন ভেঙে দিয়ে যায় ক্রীশ্চান মেয়ে নীলিমা। নীলিমা শিক্ষিতা, ইংরেজী জানে। নীলিমার মধ্যে নরসিং তার নিজের অপূর্ণতাকে যেন পূর্ণ দেখতে পায়। জীবনে সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে নরসিংয়ের মনে। ইংরেজী শিখে সমাজে উঁচু আসন পাবার বাসনা রয়েছে নরসিংয়ের অন্তরে। নীলিমাকে পেলে এসবকিছুই যেন সে পাবে। নীলিমাকে চায় নরসিং, তাকে ভালবাসে। কিন্তু তাকে পেল না সে। নীলিমাকে পেল এক বিকলাঙ্গ যুবক—যাকে ভালবাসে নীলিমা। সুস্থ সবল নরসিং হেরে গেল এক পঙ্গুর কাছে। কেন? সে সুশিক্ষিত নয় বলে? সে ড্রাইভার, তাই? ভাগ্যের এই অব্যবস্থা বিদ্রোহী করে তোলে নরসিংকে। অপমানবিদ্ধ নরসিং ডেকে পাঠায় "দুশ্চরিত্রা" গুলাবীকে (মূল কাহিনীতে তার নাম ফটিক)। গুলাবীকে দুশ্চরিত্রা বলেই ভাবত নরসিং। অনেক অসংযত সুখ-রজনী কাটাল ওরা দুজনে।

মূল উপন্যাসেও নরসিংয়ের এই পদ-স্খলন আছে। কিন্তু উপন্যাসে এর শিল্প-সম্মত যুক্তি কোথায়? ফটিক অর্থাৎ গুলাবীর রূপ? সে তো মায়মুগ্ধী।

পরিচালক-চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় নরসিংয়ের জীবনে এই দুই নারীকে এনেছেন দুটি সময়ে। দুই নারী পাশাপাশি চলেনি নরসিংয়ের জীবনে (মূল উপন্যাসে যা আছে)। ফলে নরসিংয়ের চরিত্রের একটি যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি খুঁজে পাওয়া যায় ছবিতে। এবং সেই সঙ্গে তার জীবনের ট্র্যাজেডি আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। সে বড় হতে চেয়েছিল। রাজপুতের রক্ত রয়েছে তার শিরায় উপশিরায়। সে চেয়েছিল মর্যাদা, আত্মপ্রতিষ্ঠা। সব কিছু চাইতে গিয়ে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল নরসিং। সবাই তাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইর কাছে আবার ফিরে গেল সে। জীবনের সহজ সুন্দর দুরন্ত গতিবেগটি সে হারিয়ে ফেলেছিল। উচ্চাশা মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছিল তাকে। জীবনের ভুল-ভ্রান্তিকে পথের ধারে সজোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বেগবান জীবনের নতুন অভিযানে। পাশে তার গুলাবী। সঙ্গে নিত্যসহচর রামা।

চলচ্চিত্র যে অনেক সময় সাহিত্যকে সার্থক করে তোলে, তাই প্রমাণ করলেন সত্যজিৎ রায় "অভিযান" ছবিতে। রোমাঞ্চ

চিত্ত বসু পরিচালিত এস সি প্রোডাকশন্স-এর "শুভদৃষ্টি" ছবির নায়ক-নায়িকা অরুণ মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়।

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের "সূর্যশিখা" (পরিচালনাঃ সলিল দত্ত) ছবির সেটে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার; অভ্যুদয় ফিল্মস-এর "অবশেষে" ছবির সেটে অসিতবরণ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

ও রুদ্ধশ্বাস ঘটনাপ্রবাহ এবং সাহিত্যরসের যে মেরুমিলন তিনি ঘটালেন এই ছবিতে তা তুলনারহিত। শুধু তাই নয়, সত্যজিৎ-প্রতিভার বিভিন্নমুখী প্রকাশে "অভিযান" চিহ্নিত। এই ছবি গতিময় ও গীতিময়, রোমাঞ্চকর ও রস-মধুর। নাটকীয় ঘটনার দ্রুততা ও অমোঘতার সঙ্গে এই ছবিতে ফুটে উঠেছে সুচারু সূক্ষ্ম শিল্পের নানা রূপ ও অলংকার। দর্শকের মনের সবটুকু বিস্ময় যেন নিঃশেষে কেড়ে নেয় এই ছবি।

সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের "ফিল্ম-আর্ট" বা চলচ্চিত্রকলার সঙ্গে দর্শকরা পরিচিত। আবার, পরিচিত নন'ও বলা চলে। কারণ তাঁর শিল্পরীতি একটির পর একটি ছবিতে নতুনতর রূপে প্রকাশমান। এই ছবিতে শিল্পের যে রূপ-রীতির সঙ্গে তিনি দর্শকের পরিচয় ঘটিয়েছেন তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে আমরা তাকিয়েই থাকতে পারি। কোন সংজ্ঞায় একে আমরা অভিহিত করতে পারি না। শুধু অনুভব করি, যা দেখলাম, যার রস গ্রহণ করলাম তা মহৎ।

এই মহত্তের পটভূমিতে রূপ নিয়েছে কয়েকটি পরিচিত অপরিচিত চরিত্র। পরিচিত চরিত্রে বাস্তবকে দু-চোখ মেলে আমরা দেখি। বাস্তবের অতিরিক্ত কিছু নয়, এক কণা কমও নয়। অপরিচিত যে চরিত্র দেখি মনে হয় তাই বুঝি অবধারিত। এই চরিত্ররাজির মানসিকতা, যন্ত্রণা ও অস্থিরতা, সততা ও শঠতা, সুখ ও দুঃখ একটি মুহূর্তের ব্যঞ্জনায় অথবা একটি ছোট ঘটনায় অপরূপভাবে ফুটিয়ে তোলার অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সত্যজিৎ রায় "অভিযান" ছবিতে।

টাইটেল শুরু হবার আগে ছোট্ট একটি দৃশ্যে পরিচালক পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর নায়ককে দর্শকের সঙ্গে। নায়কের অল্প কয়েকটি কথার মাধ্যমে। নিজের আভিজাত্য সম্বন্ধে নায়ক সচেতন, এ-নিয়ে সে গর্বিত —নীল রক্ত বইছে তার ধমনীতে। ছোট-লোকের সঙ্গে ব্যবসায় সে নামবে না। আর সেই সঙ্গে পরিচালক দেখিয়েছেন কী এক পরিবেশের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করে চলতে হয়। ওই অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি শুধু এক ধূর্ত, খলচরিত্র মোটর "মেকানিক"-এর ক্লোজ-আপ'এর ভেতর দিয়ে। ছবির এই প্রথম দৃশ্যটি দেখেই দর্শক চিনে নিতে পারেন নায়ককে, তার ক্রূর পরিবেশটিকে। এরপর দমকা হাওয়ার মত শুরু হয় ছবির গতি—গতির ছন্দে ছন্দে টাইটেল ভেসে ওঠে পর্দায়। টাইটেল-এর এমন প্রক্ষেপ-বিন্যাস এর আগে কোন ভারতীয় ছবিতে দেখা যায়নি।

ঘূর্ণি হাওয়ার মত হুহু করে চলে নরসিংয়ের গাড়ি। আর সেই সঙ্গে এগিয়ে চলে গল্প। গাড়ি যখন থামে, তারই অবকাশে আমরা চকিতে দেখে নিই জীবনের নানা রূপের আভাস। নরসিং ইংরেজী শেখার চেষ্টা করে—'এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন'। "স্লাই ফক্স"কে এর পরক্ষণেই আমরা ছবিতে দেখি। অত্যাচারী এস ডি ও এবং আরও বেশী করে পাপাচারী সুখনরামের মধ্যে। আবার গাড়ি চলে, গাড়ি থামে। জোসেফ ও নীলিমার সঙ্গে দেখা হয় নরসিংয়ের। নরসিং সুন্দর, মার্জিত জীবনের সন্ধান পায়। নরসিংয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম জেগে ওঠে একটি কথায়। নীলিমাকে সে অনুরোধ করে—কাউকে যেন না বলে একথা। সে "ট্রান্সপোর্ট" ব্যবসার পার্টনার হচ্ছে। নরসিংয়ের স্বপ্ন ভেঙে যায়। আবার সে কঠিন হয়ে ওঠে। কঠিন হৃদয় পুরুষকে টলাতে চায় এক সরলা নারী—গুলাবী। সে কত কিছু জানে, গাইতে জানে, নাচতে জানে। গান গেয়ে শোনায় তার নির্মম প্রেমিককে, তার সামনে নাচে। তারপর এক-দিন অভিমানে ফেটে পড়ে। ভোগবিলাসী পুরুষকে বলে, দিনের বেলায় আমাকে ভাল লাগে না বুঝি? এমন মনোময়, মধুর মুহূর্ত এর আগে কোন ছায়াছবিতে দেখা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না, ছবিতে ওয়াহীদাকে নেওয়ার জন্য সত্যজিৎ রায় সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সমালোচনা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা ছবিটি দেখলে বুঝবেন, গুলাবীর চরিত্রটি যেন ওয়াহীদার জন্যই তৈরী হয়েছে। এ-চরিত্রে আর কাউকেই মানাত না। আর সত্যজিৎ রায় তাঁর কথা রেখেছেন। বোম্বাইয়ের এই অভিনেত্রীকে তিনি সত্যিকারের শিল্পী-রূপেই ছবিতে উপস্থিত করেছেন। স্টার হিসাবে চটকদার গ্ল্যামার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেননি শিল্পী এই ছবিতে। ছবিতে তার প্রথম আবির্ভাব বিধবার বেশে, ঘোমটায় মুখ ঢাকা। হিন্দী ছবিতে এই নায়িকাকে কী রূপে, কী বেশে দেখা যায় তা "অভিযান"

ছবিতেই এক মুহূর্তের জন্য প্রত্যক্ষ করতে পারেন দর্শকেরা। ছবিতে একটি ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানীর শো-রুমে। দৃশ্যটিতে রয়েছেন নৃত্য-গীতরতা নায়িকা।

এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাহিনী স্থলের আবহাওয়া, পরিবেশ ও পরি-মন্ডলটি অতি নিখুঁতভাবে রচনা করেছেন সত্যজিৎ রায়। সেখানকার জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আমোদ-প্রমোদের ধারা (যার মধ্যে সার্কাস-সিনেমাও আছে) অবিকলভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিতে। দৃষ্টিনন্দন বহির্দৃশ্য সত্যজিৎ-বাবুর সব ছবিতেই থাকে, এ-ছবিতেও আছে। এবং এই সব বহির্দৃশ্যে দানা বেঁধে উঠেছে স্নিগ্ধ আবেগপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর মুহূর্তরাজি। কোন একটি রমণীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়ে নরসিংয়ের টর্চের আলো গিয়ে পড়েছে একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর। এই প্রস্তরখণ্ডে এর আগে ছিল শুধু জোসেফ ও নীলিমার নাম। তার নীচে লেখা রয়েছে নরসিংয়ের নাম ঃ এন সিং। টর্চের আলো আবার গিয়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে একটা ফুটন্ত ফুলের ওপর। নরসিং তখন অপেক্ষা করছিল নীলিমার জন্য। নীলিমা রাত্রে একা আসবে তার কাছে অভিসারে। নীলিমার জন্য প্রতীক্ষমান নরসিংয়ের মনের রঙ ও প্রসন্নতা এমনিভাবেই দুটি অনুচ্ছেদ মুহূর্তের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ রায়। আরও একাধিক বহির্দৃশ্যে দেখা যায় চলন্ত ট্রেন, বাস ও মোটরকে 'ওভার-টেক' করছে নরসিংয়ের গাড়ি। সে সব রোমাঞ্চময় দৃশ্য দর্শককে সানন্দ উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ করে রাখে। এবং সেই সঙ্গে নরসিংয়ের গাড়িটিও একটি "চরিত্র" হয়ে ওঠে—যাকে দর্শকরাও ভালবেসে ফেলেন।

অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনা এ-ছবিতে কোন কোন ক্ষণে সংলাপকেও হার মানায়। সুখনরামের "লাইটার"টি নরসিং প্রথমে নিল না এবং পরে নিল। এর ভেতর দিয়েই নরসিংয়ের মনের দুই অবস্থা—প্রথমে সুখনরামের সঙ্গে ব্যবসায় নামতে তার আপত্তি ও পরে সম্মতি—ছবিতে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। এবং নরসিংয়ের হাতে এই "লাইটার" দেখেই তাকে নিয়ে আশংকা দেখা দিয়েছে জোসেফের মনে। এমনি ধরনের অতুলনীয় ভাবদ্যোতক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে রয়েছে সারা ছবিতে যা প্রতি মুহূর্তে দর্শকের মনকে নিবিষ্ট করে রাখে।

আর দর্শকের শ্রুতিকে এবং সেই সঙ্গে মনকেও আবিষ্ট করে রাখে ছবির সুররচনা এবং "এফেক্ট মিউজিক"। "ফিল্ম মিউজিক" বলতে কী বোঝায়, কতটুকু তার ভূমিকা ও সীমারেখা তা এই ছবি দেখে রসজ্ঞ দর্শকরা বুঝতে পারবেন। কখনও রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে কয়েক পলের জন্য তিনি সুর ঢেলে দিয়েছেন ছবির কোন এক ভাবমধুর মুহূর্তে। আর সেই মুহূর্তের রসটি বাঁধা পড়েছে সুরের মূর্ছনায়। অপরদিকে এফেক্ট মিউজিক-এ কোন কোন ঘটনার কোমল ও রুক্ষ রূপটি প্রকাশ করেছেন সংগীত-পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ড্রামের আওয়াজে কাহিনীর পরিবেশ ও চরিত্রের উদ্দাম জীবনপ্রবাহ তাঁর রচিত এফেক্ট মিউজিক-এ বিধৃত। সংগীত পরিচালক হিসাবে শ্রীরায় এ-ছবিতে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তারও তুলনা নেই।

এ-ছবিতে তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব—যা এ-দেশে কোন পরিচালক আজও পর্যন্ত অর্জন করতে পারেননি—তা হল ঃ ছবির প্রত্যেক শিল্পীকে দিয়ে তিনি অসামান্য অভিনয় করিয়েছেন। এবং প্রত্যেক শিল্পীকে দেখলেই মনে হয়, তাঁকে বাদে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় অন্য আর কেউ করতে পারতেন না। ছবির কয়েকজন ড্রাইভার (নায়ক ছাড়া) নায়কের ট্যাক্সির যাত্রী, মফঃস্বলের উকিল, সুখনরাম, রামা—এদের সকলকে এক একটি টাইপ চরিত্রে গড়ে তোলার অনিন্দ্য কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন ছবিটিতে। আর তাদের সকলের মুখের সংলাপ এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক যার নজির ছায়াছবিতে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অভিনয়ে যিনি সকলের আগে দর্শকের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন তিনি হলেন নায়ক নরসিংবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এমন চরিত্রচিত্রণ শুধু দুর্লভ বললে কিছুই বলা হয় না। নরসিংয়ের মনের রূপ, তার ভ্রান্তি, ট্র্যাজেডি এবং সর্বোপরি তার চরিত্রের অপরিমেয় প্রাণাবেগ ও উদ্ধত আত্মমর্যাদা শ্রীচট্টোপাধ্যায় অপূর্ব কুশলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর অভিনয়ে। তাঁর এই চরিত্রাভিনয় শুধু এই ছবিরই নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আর যাঁদের অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে তাঁরা হলেন চারুপ্রকাশ ঘোষ (সুখনরাম) ও রবি ঘোষ (রামা)। এঁদের অভিনয় ভোলবার নয়।

ওয়াহীদা রেহমান (গুলাবী) এ-ছবির [illegible] অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন বোম্বাইয়ের এই অভিনেত্রী। দর্শকের মনকে তিনি মুখের কথায়, চোখের চাহনিতে ও অভিব্যক্তিতে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যান। এ-ছবির অভিনয় ওয়াহীদা রেহমানের শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ওয়াহীদা রেহমান

ছবির অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয়ও চমৎকার। মনেই হয় না এঁরা অভিনয় করছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হলেন অবনী মুখোপাধ্যায় (উকিল) অজিত বন্দোপাধ্যায় (নীলিমার বিকলাঙ্গ প্রণয়ী), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (জোসেফ), রুমা গুহঠাকুরতা (নীলিমা), শেখর চট্টোপাধ্যায় (বাস ড্রাইভার) ও অরুণ রায় (প্রথম দৃশ্যের মোটর-মেকানিক)। এ-ছাড়া, অন্যান্য চরিত্রে বীরেশ্বর সেন, রেবা দেবী, ভানু ঘোষ, কাজ্লী চক্রবর্তী, শৈলেন ঘোষ, ননী গাঙ্গুলী প্রভৃতির অভিনয় চরিত্রোচিত।

তরুণ আলোকচিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায় এ-ছবিতে ক্যামেরার যে কাজ দেখিয়েছেন বাংলা ছবিতে তার তুলনা বিরল। অন্ধকার রাস্তায় নায়কের চলমান ট্যাক্সির লাইটের আলোর যে দৃশ্য তিনি গ্রহণ করেছেন তা বাংলা ছবিতে আজও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সাধারণভাবে আলো-আঁধারির বিন্যাসে তিনি যে কৃতকার্যতা দেখিয়েছেন, ইনডোর-আউটডোর-এর সমতা যে-ভাবে রক্ষা করেছেন তারই বা তুলনা কোথায়।

সৌমেন্দু রায়

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বর্ধমানে অভিনেতা মহম্মদ ইজরাইল সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে "পথিক", "দেবী" ও "গঙ্গা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বংশীচন্দ্র গুপ্ত (শিল্পনির্দেশক) এ ছবির পরিবেশ ও প্রতি দৃশ্য নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন, ইনডোর-আউটডোর-এর প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাজ ছবিটিতে শুধুই বাস্তবানুগ নয়, শিল্পসুষমায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এমন শিল্পনির্দেশককে পেয়ে বাংলা ছবি গৌরবান্বিত। চিত্রসম্পাদনায় দুলাল দত্ত ছবির গতিকে অব্যাহত রেখেছেন। এমন ছবিতে সম্পাদনার ভূমিকা যে কত বড় সে সম্বন্ধে শ্রী দত্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর সম্পাদনার গুণে ছবির ঘটনাপ্রধান দৃশ্য—বিশেষত মারামারি ও চলতি গাড়ির ওভার-টেক-এর দৃশ্য—রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে।

ছবির শব্দগ্রহণ (দুর্গাদাস মিত্র, নৃপেন পাল ও সুজিত সরকার) এবং রূপসজ্জা (অনন্ত দাস) উঁচুদরের।

দর্শকের রায়

বাংলা ছবি ও আমি

দেখেছি পল্লীর রূপ, আর মৃত্যু

অনেকদিন পল্লীর বুকে জীবন কেটেছে। কিন্তু এখন ভেবে অবাক হই—এই দীর্ঘদিন পল্লীগ্রামে জীবনযাপন করেও বুঝতে পারিনি ঝড়ো হাওয়ায় জেগে-থাকা পদ্ম-পাতার অসহায় নুয়ে পড়ায়, স্বচ্ছ জলে জল-পোকার উচ্ছল চঞ্চলতায়, শেওলা-ভরা ডোবার নিঃসংগতায়, কলমিলতা ঘিরে ফড়িং-এর নাচনে, বাঁশবাগানের নিরাকার নিস্তব্ধতায় যে এত মাধুর্য, এত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। ঝমঝমানি বৃষ্টির সুরে যে অমন করে বাইরে টানে তা আগে জানিনি। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' দেখবার পর তখনকার এইসব তুচ্ছ (?) জিনিসগুলো আজ আমার কাছে নবরূপে আবির্ভূত হয়েছে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আমার হৃদয়বাণীর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অশ্রুতপূর্ব ঝংকার তুলে এক মায়াময় ঐক্যতানের সৃষ্টি করলো। নতুন করে পল্লী যেন আমায় পিছু ডাকতে লাগলো।

সত্যজিৎবাবুর ছবি দেখে আমি আর একটি জিনিস উপলব্ধি করেছি। সেটা হলো মৃত্যু। মৃত্যুকে আমি দেখেছি অত্যন্ত নিকট থেকে নানাভাবে। কিন্তু তখনকার দেখা এবং এখনকার দেখার মধ্যে পার্থক্য অনেক। সত্যজিৎ বাবুর ছবি দেখবার আগে পর্যন্ত মৃত্যু আমার কাছে দেখা দিয়েছিল উচ্চকিত হাহাকার রূপে, বিরাট উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে। এখনকার উপলব্ধি হচ্ছে—মৃত্যু আছে, তাই আছে হারানোর বেদনা—নেই উচ্ছ্বাস, হাহাকার অবশ্যই আছে কিন্তু তা অন্তর্বাহী। সত্যজিৎ বাবুর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'পরশপাথর' ছাড়া প্রায় প্রত্যেক ছবিতে মৃত্যুর এই রূপই দেখেছি। তারা সকলেই এসেছে আমাদের মধ্যে আনন্দ আর অনুভূতি নিয়ে। যাবার সময়ে নিঃশব্দে চলে গেছে আনন্দ কেড়ে নিয়ে আর আমাদের হৃদয়ের গভীরে রেখে গেছে তাদের অনুভূতি আর অক্ষয় স্মৃতি। ইন্দির ঠাকরুন, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, অপর্ণা, মৃন্ময়ী, বিশ্বম্ভর, খোকন এরা প্রত্যেকেই। তাই আজও যখন তাদের কথা ভাবি, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে বেদনাকাতর দীর্ঘশ্বাস—উচ্ছ্বাসহীন।

অহীনকুমার ঘোষ, কলিকাতা-৩।

আমাকে সংগ্রামী করেছে

"কাচের স্বর্গ" ছবিটি আমাকে অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রত্যয় নিয়ে সংগ্রাম

চিত্রলিখায় জানি আমি জানি, তব আলপনালিপি

অলকানন্দা রায়

ফটো—দেশ

তার জন্য ছায়াছবির একান্ত প্রয়োজন। মানুষের নৈতিক বোধ, তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, যে পথে গেলে মানুষ তার চিরন্তন সত্যকে জানতে পারবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তার মনকে ও তার সাংগঠনিক কার্যকে আরও উদার ও রুচিশীল করতে পারবে, সেই ছবির প্রয়োজন আজ বেশী। যে ছবি মানুষকে তার সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করবে, সংরক্ষণশীলতা থেকে তাকে মুক্ত করবে, আমি যা ভেবেছি যাকে আঁকড়ে ধরে আছি, সেটাই সব নয়, তার পরেও আরও আছে, এই শিক্ষা দেবে, সেরকম ছবির প্রয়োজন। সস্তা প্রেমের বা অপরাধ-কাহিনী নিশ্চয়ই বর্তমান সিনেমার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত নয়। মানুষের সূক্ষ্ম রসানুভূতির গভীরে পৌঁছনোই এর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সমীর ঠাকুর
শ্রীরামপুর

এম কে জি'র "রক্তপলাশ" (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবির নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়

করার অনুপ্রেরণা দান করেছে। উপলব্ধি করেছি, আত্মবিশ্বাস হারানো পাপ। আমাদের সমাজের শিরায়-উপশিরায় এখনও যে দূষিত রক্তস্রোত নিয়ত প্রবহমান সে সম্বন্ধে আমি আর একবার সচেতন হতে পেরেছি।

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শিউড়ি

"কেন"-র উত্তর পেয়েছিলাম

আমার জীবনের এক বিশেষ সমস্যায় একটি ছবি দেখে আমি "কেন"র উত্তর পেয়েছিলাম। ছবিটি হল : "পথে হল দেরি"। তার একটি জায়গার কথা : "অভাব দরজার গোড়ায় দাঁড়ালে ভালবাসা জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়।"

যে ছবি ভালবাসি—

অভিনয়ের জগৎ মানে যথেচ্ছাচারের জগৎ নয়, সে জগতের অর্থ শিক্ষা ও আনন্দ দান করা—যার মাধ্যমে সকল ব্যক্তিই কিছু না কিছু খুঁজে পাবে। হাল্কা চটুল, সস্তা ন্যাকামিতে পূর্ণ ছবি আমাদের দেশে যত না হয় ততই মঙ্গল। কারণ, এতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা নিজের সুমার্জিত রুচিকে বিকৃত পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বরং সুরুচিপূর্ণ ছবিগুলো এবং সাংসারিক-সামাজিক ছবিগুলো সকলের দেখার উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়। বিধিলিপি, ব্রতচারিণী, রাণী ভবানী, রানী রাসমণি, নিবেদিতা, মায়ামৃগ, মা, অসমাপ্ত জ্যোতিষী, শুভযাত্রা, বড়দিদি, মেজদিদি, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, দেবত্র প্রভৃতির মত ছবি দেখতে আমি ভালোবাসি। যার মধ্যে অশ্লীলতা নেই, আছে সুরুচিসম্পন্ন সমাজ-সংসারের চিত্র। আর সত্যজিৎ রায়ের ছবির মত ছবিই আজ আমাদের দেশে বেশী দরকার।

মুক্তি মুখোপাধ্যায়
নদীয়া

বর্তমান সমাজব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। সমাজ-জীবন ভরে উঠেছে নানা দুর্নীতির গ্লানিতে। এই দুর্নীতির স্বরূপ যাতে সাধারণ মানুষের চোখের সামনে ধরা পড়ে

* ছবির পর ছবি *

দেখা হল

নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান সুরঞ্জন চিত্র'র প্রথম প্রয়াস "দেখা হল" ছবির নিয়মিত চিত্র-গ্রহণ এই সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। বনফুল-এর "নবদিগন্ত" গল্প অবলম্বনে এই ছবির কাহিনী রচিত। নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, সুপ্রভা চৌধুরী, গীতা দে, জহর রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

নবারুণ রাগে

পরমহংস বাণীচিত্রর প্রথম প্রয়াস "নবারুণ রাগে" ছবির গান রেকর্ডিং-এর কাজ গত রবিবার টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়। ভি বালসারা ছবিটির সংগীত পরিচালক। গানে কণ্ঠদান করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা মিশ্র।

মেঘলা আকাশ

অমল দত্ত ইউনিট-এর "মেঘলা আকাশ"-এর চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। অমল দত্ত ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে রয়েছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শম্পা চক্রবর্তী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, তপতী ঘোষ, আরতি দাশ, দ্বিজু ভাওয়াল, নিভাননী প্রভৃতি। প্রি-না-দ ছবির কাহিনীকার।

চিকাগোর কোমিস্কো পার্কে ৩৫ হাজার দর্শকের সামনে বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে সোনী লিস্টন প্রথম রাউণ্ডেই প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্লয়েড প্যাটারসনকে পরাজিত করে বিশ্বজয়ী মুষ্টিকের গৌরব পেয়েছেন। সোনী লিস্টন হচ্ছেন বক্সিং-বিশ্বের বেয়াড়া ছেলে। সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে পুলিসের 'কালো খাতায়' বারবার তাঁর নাম উঠেছে। জেলও খেটেছেন। যাঁর পেছনে এই ধরনের কুখ্যাতি, বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে কেউই দেখতে চান নি। এমন কি নিউইয়র্কে তাঁর লড়াই করার অনুমতি মেলেনি। ফ্লয়েড প্যাটারসনের ম্যানেজারও এই লড়াইয়ের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্যাটারসনের ইচ্ছাতেই চিকাগোয় লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়।

প্রথম রাউণ্ডে মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডের মধ্যে লিস্টন বাঁ হাতের প্রচণ্ড 'হুকে' প্যাটারসনকে ভূতলশায়ী করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উঠে দাঁড়াতে না পারায় রেফারী লিস্টনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম রাউণ্ডে নক আউটের ঘটনা এই প্রথম নয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধাদের অন্যতম নিগ্রো মুষ্টিক জো লুই জীবনে ৪ বার প্রথম রাউণ্ডে প্রতিপক্ষকে ভূতলশায়ী করেছেন। তার মধ্যে ১৯৩৮ সালে মাত্র ২ মিনিট ৪ সেকেণ্ডের মধ্যে জার্মান

খেলার মাঠে

একলব্য

মুষ্টিক ম্যাক্স স্মেলিংএর জো লুই-এর কাছে পরাজয় স্বীকার উল্লেখযোগ্য। তারও আগে ১৯০৮ সালে ডাবলিনে টমি বার্নস এক মিনিট ২৮ সেকেণ্ডে জেম রোচকে ভূতলশায়ী করেছিলেন।

অসম্ভব ক্ষমতাশালী মুষ্টিযোদ্ধা সোনী লিস্টন। জীবনে ৩৫টি লড়াইয়ের মধ্যে একবার মাত্র তিনি হার স্বীকার করেছেন। প্যাটারসনের ৪১টি লড়াইয়ের মধ্যেও এটা তৃতীয় পরাজয়। প্যাটারসন ও লিস্টনের এই মুষ্টিযুদ্ধে যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে বিজয়ী লিস্টন পাবেন প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। পরাজিত প্যাটারসনের প্রাপ্যের পরিমাণ অনেক বেশী। তার ভাগে আসবে প্রায় আধ কোটি টাকার কাছাকাছি। মুষ্টিযুদ্ধ যেমন আসুরিক স্পোর্টস, রক্তবার করা খেলা তেমন খেলা থেকে সংগৃহীত হয় রাশি রাশি টাকা। প্রোফেশনাল বক্সিং টাকার খেলাও বটে।

*

বাঙলার ফুটবল মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। সাঁতারও শেষ হয়েছে। এখন ক্রিকেটের প্রস্তুতি আর প্রস্তুতি শীতকালীন খেলাধুলোর। টেনিস, টেবল টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, পোলো এবং অ্যাথলেটিক স্পোর্টসই শীতকালীন খেলাধুলোর মধ্যে প্রধান। যদিও টেনিস অভিজাত সম্প্রদায়ের খেলা তবুও টেনিসের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বাঙালী মেয়েরাও প্রতিযোগিতায় নামছে। রাজরাজড়ার খেলা পোলোর সে পরিমাণে জনপ্রিয়তা নেই। মুষ্টিমেয় ময়দানযাত্রীর মধ্যেই পোলোর আকর্ষণ। কিন্তু ক্রিকেটে কৌলীন্যের ছাপ থাকলেও ক্রিকেট এখন সর্বজনীন আনন্দ।

যাই হোক, বাঙলার খেলাধুলোর আপাতত বিশ্রাম। চিরাচরিত বিধি অনুযায়ী অক্টোবরের পয়লা তারিখ থেকে ময়দানের দ্বারও বন্ধ হয়েছে। দখলী জমির উপর যাতে স্বত্বস্বামিত্ব না জন্মায় তার জন্য ময়দানের মাঠ এবং তাঁবুর দখলদার প্রতি ক্লাবকেই পয়লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি বছর ক্লাবের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়। ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকেই এই ব্যবস্থা। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকারও সেই বিধি বলবৎ রেখেছেন। তবে আগে হুঁকোর খোলনলচে খুলে ফেলে আবার জোড়া লাগিয়ে হুঁকো তৈরি করতে হ'ত। অর্থাৎ ক্লাব তাঁবুর ছাউনি ও কাঠামো অপসারণ করে ১৫ দিন পরে আবার তাঁবু তৈরি করতে হ'ত। এখন শুধু ক্লাবের কাজকর্ম ১৫ দিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। এই ১৫ দিন ময়দানের 'অকাল'।

সোনি লিস্টন (ডান দিকে) ও ফ্লয়েড প্যাটারসনের মুষ্টিযুদ্ধের লড়াই। মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে প্যাটারসনকে ভূতলশায়ী করে বক্সিং-এর বেয়াড়া ছেলে সোনি লিস্টন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়েছেন

প্রতি বছর অকালবোধনের সমকালে, পূজোর আগে বা পিছে ময়দানের এই 'অকাল' ব্যবস্থা মন্দের ভাল। কারণ, মহা-পূজোর মাতামাতির মধ্যে ময়দান কারও মন টানে না। তা ছাড়া ময়দানেরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। ফুটবলের দাপাদাপিতে ক্ষতবিক্ষত মাঠকে ক্রিকেট খেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে তার পরিচর্যার প্রয়োজন। নতুন মাটি ফেলে, জল ছিটিয়ে ঘাস লাগিয়ে, বড় ঘাস ছেঁটে ফেলে আবার মাঠকে সজীব করে তুলতে হয়। না হলে এবড়োখেবড়ো এবং ঘাসবিহীন মাঠে ক্রিকেট খেলা চলে না। তাই ময়দানের মালীরা এখন মাঠের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

কলকাতার ফুটবল মরসুমের উপর আনুষ্ঠানিক যবনিকা পড়লেও তার জের কিন্তু এখনও কাটেনি। অন্তত একটি লীগ এবং একটি প্রতিযোগিতার খেলার শেষ ফলাফল ক্রীড়াঙ্গন থেকে আইনের আঙিনায় গিয়ে ঠেকেছে। বেঙ্গল সকার লীগ এবং ইলিয়ট শীল্ডের শেষ খেলার উপর সিটি সিভিল কোর্ট থেকে ইন্‌জাংশন জারি করা হয়েছে।

আশুতোষ কলেজ এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মধ্যে আই এফ এ পরিচালিত আন্তঃ কলেজ নক আউট ফুটবল প্রতি-যোগিতা ইলিয়ট শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার দিন-তারিখ ধার্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খেলার দিন যাদবপুর পলিটেকনিকের খেলাধুলোর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীদীনেশ ভট্টাচার্যের আবেদনক্রমে সিটি সিভিল কোর্টের বিচারপতি শ্রী এস কে সেন আই এফ এ এবং আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রী এম দত্তরায়ের উপর ফাইন্যাল খেলা স্থগিত রাখবার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেন।

যাদবপুর পলিটেকনিকের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অভিযোগঃ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আশুতোষ কলেজ ও যাদবপুর পলিটেক-নিকের সেমি-ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কিন্তু পরের দিন তিনি এ কথা জেনে আশ্চর্য হয়ে যান যে, যেহেতু পলিটেকনিকের অধিনায়ক রেফারীর অনুরোধে অতিরিক্ত সময় খেলতে রাজী হননি—সেহেতু পলিটেকনিক দলকে 'স্ক্র্যাচ্‌' করে দেওয়া হয়েছে। শ্রী ভট্টাচার্য আর্জিতে বলেন, তাঁর দলের অধিনায়ক অতিরিক্ত সময় খেলতে স্বীকৃত হননি, এ কথা সত্য নয়। তিনি আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীর কাছে আবেদন করে কোন ফল না পেয়ে কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন।

হোয়াইট বর্ডার ক্লাব এবং যাদবপুর অগ্রগামী দলের মধ্যে বেঙ্গল সকার লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলাটি স্থগিত রাখবার জন্য সিটি সিভিল কোর্টের বিচার-পতি শ্রী এস কে সেন আই এফ এ, আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায়, আই এফ এ-র সহ-সভাপতি ডাঃ পরিমল রায় এবং বেঙ্গল সকার লীগের উপর ইনজাংশন জারি করেছেন হোয়াইট বর্ডার ক্লাবের সম্পাদক শ্রীঅমিয় ব্যানার্জীর অভিযোগক্রমে।

ঘটনাটি একটু ভিন্ন ধরনের। হোয়াইট বর্ডার ও যাদবপুর অগ্রগামী দলের মধ্যে বেঙ্গল সকার লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় যাদবপুর দল ১—০ গোলে বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের অধিকারী হয়। কিন্তু যাদবপুর অগ্রগামী দলে কয়েকজন খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের যুক্তিযুক্ততায় সন্দিহান হয়ে হোয়াইট বর্ডার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণের পর বেঙ্গল সকার লীগ কমিটি হোয়াইট বর্ডারের প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত মনে করে হোয়াইট বর্ডারকেই বিজয়ী বলে সাব্যস্ত করেন। ফলে, বেঙ্গল সকার লীগের বিজয়ী হয়ে হোয়াইট বর্ডার আগামী বছর থেকে চতুর্থ ডিভিসন লীগে খেলবার অধিকার অর্জন করে। এদিকে আবার যাদবপুর অগ্রগামী বেঙ্গল সকার লীগ কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আই এফ এ-র মাইনর টুর্নামেণ্ট কমিটির কাছে আবেদন করে। মাইনর টুর্নামেণ্ট কমিটি খেলাটি পুনরনুষ্ঠানের আদেশ দেন। এবার হোয়াইট বর্ডারের প্রতি-আবেদনের পালা। আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী তাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন না। টুর্নামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত বহাল রেখে খেলাটি পুনরনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই খেলার বিরুদ্ধেই হোয়াইট বর্ডারের আপত্তি এবং সুবিচারের জন্য তারা কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছে।

ইলিয়ট শীল্ড এবং বেঙ্গল সকার লীগের দুইটি ব্যাপারই কোর্টের বিচারাধীন। সুতরাং এ সম্বন্ধে মন্তব্য মুলতুবি রাখতে হচ্ছে।

এইবার আই এফ এ শীল্ডের খেলার কিছু জের টানা যাক। গত সপ্তাহে শীল্ডের খেলার পর্যালোচনা করার সময় বলেছি, রাজস্থান এবং হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব এবার শীল্ডে অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু কেন অংশ গ্রহণ করেনি সে সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করা হয়নি।

বাঙলার তো কথাই নেই—আই এফ এ শীল্ড ভারতের সবচেয়ে নামডাকের ফুটবল প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় আই এফ এ-র দুটি প্রথম ডিভিসন লীগ ক্লাব যোগ দিল না—এর পেছনে নিশ্চয়ই কিছু কারণ বর্তমান।

হাতে প্রমাণ নেই। সুতরাং চ্যালেঞ্জ করলে চুপ করে থাকতে হবে। তবে আমি যতটুকু জানি, খেলোয়াড়দের উপর ক্লাব পরিচালক-দের বিরক্তিই এর প্রধান কারণ।

ক্লাব পরিচালকদের অভিযোগ : তাঁরা ক্লাব চালাবেন, ঝুঁকি ঝামেলা পোহাবেন, খেলোয়াড়দের দায়দাবি মেটাবেন, তাঁদের জামাই-আদরে রাখবেন অথচ খেলার ফলাফল 'গড়াপেটা' করার সময় খেলোয়াড়রা ক্লাবের মুরুব্বিদের মতের কোন মূল্য দেবেন না।

অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ বছর শেষ দিকের লীগের খেলা মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরেই হয়েছে বেশী। খেলার আগেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের যোগসাজসে ফলাফল 'গড়াপেটা' হয়ে গেছে। খেলা না বলে একে পয়েণ্ট ছাড়াছাড়ির খেলা বলাই ভাল।

এই পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির ফলেই নাকি রাজস্থান ক্লাব তাদের কয়েকজন তথাকথিত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ত দাবি করে এবং সেই কৈফিয়ত না পাওয়া পর্যন্ত কোন খেলায় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। আই এফ এ শীল্ডের খেলায় অবশ্য রাজস্থান ক্লাব অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু আজও খেলোয়াড়দের সন্তোষজনক কৈফিয়ত ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে এসেছে কিনা সন্দেহ। হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের শীল্ডে না খেলারও নাকি একই কারণ। খেলোয়াড়দের উপর ক্লাব পরিচালক-দের আস্থার অভাব।

এর চেয়েও বড় অভিযোগ আছে। শুধু পয়েণ্ট ছাড়াছাড়ি নয়, অর্থেরও প্রলোভন রয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের কাছ থেকে, জুয়াড়ীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে গোল ছেড়ে দেবার এবং গোল না করারও অভিযোগ আছে। কেউ খেলার আগে মাঠে নামে মাঠের মাটিকে প্রণাম করে সুনাম অর্জনের জন্য, কেউ মাঠে নামে নিজ দলকে প্রবঞ্চনা করে অর্থ উপার্জনের জন্য। খেলা এখন অর্থ উপার্জনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ক্রীড়াদক্ষতায় অর্থ উপার্জন তবু সমর্থন করা যায়, কিন্তু ক্রীড়া-প্রবঞ্চনায় অর্থ উপার্জন ক্রীড়াধর্মের কলঙ্ক।

এর থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় কি? উপায় নেই বলেই মনে হয়। কলকাতার খেলাকে কলুষমুক্ত করা বড়ই শক্ত কাজ। কারণ, যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে

সেই সরষের মধ্যেই যে ভূত বসে আছে। যেভাবে এবার পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাতে অন্য কোন দেশ হলে এতদিন অনুসন্ধান কমিটি বসে যেত। কিন্তু আই এফ এ-র পরিচালকদের মুখে একটি কথাও নেই। ক্রীড়া-সমাজও যেন এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

*

এখন খেলার আইন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। রেফারীর অজ্ঞতায় শীল্ডের তৃতীয় রাউণ্ডে সিলেক্টেড ইস্টার্ন কম্যাণ্ড এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দলের খেলাটি পণ্ড হবার উপক্রম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পণ্ড হয়নি তবে প্রহসনের মধ্যে শেষ হয়েছে বলা যায়।

ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের আক্রমণের মুখে টেলিগ্রাফের একজন খেলোয়াড় পেনাল্টি-যোগ্য অপরাধ করায় রেফারী বাঁশী বাজান। কিন্তু সেই আক্রমণ থেকেই গোল হওয়ায় রেফারী গোলের নির্দেশ দেন। এতে টেলিগ্রাফের খেলোয়াড়রা গোল নাকচের দাবি জানায়। রেফারী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকার ফলে টেলিগ্রাফ দল খেলতে অস্বীকার করে এবং মাঠের মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। খেলাটি পণ্ড হতে যাচ্ছে দেখে রেফারী প্রতিপক্ষ ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের কাছে গোল ছেড়ে দেবার আবেদন করেন। ফলে ইস্টার্ন কম্যাণ্ড খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে গোলটি ছেড়ে দেয়। পরে খেলা আরম্ভ হলে তারা আর একটি গোল করে বিজয়ী হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রেফারী, প্রদত্ত গোল এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় কি না? খেলার আইন অনুযায়ী নিশ্চয়ই ছেড়ে দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, গোল হবার অব্যবহিত আগের কোন অপরাধের জন্য বাঁশী বাজানো হলে সে গোল গ্রাহ্য হতে পারে কিনা? এখানেও একই উত্তর। গ্রাহ্য হতে পারে না। কারণ, গোল হবার আগেই রেফারীর সংকেতে বল 'ডেড' অর্থাৎ 'মৃত' হয়ে গেছে। 'মরা' বলে গোল হতে পারে না।

অবশ্য গোল হবার আগে রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের মারাত্মক ফাউল বা ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল রেফারী অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারেন। আইনে তার নির্দেশও দেওয়া আছে। ধরুন, আপনি সব বাধা কাটিয়ে একেবারে গোলের মুখ থেকে গোল করতে উদ্যত। গোলকিপারও পরাভূত হয়েছেন। কিন্তু গোলে তখনো বল ঢোকেনি। এমন সময় উপায়ান্তর না দেখে গোলকিপার পেছন থেকে আপনার হাত টেনে ধরলেন আর ঐ অবস্থায় কোন মতে পা বাড়িয়ে আপনি গোল করে ফেললেন। রেফারী কিসের নির্দেশ দেবেন? গোলের, না পেনাল্টির?

আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ : গোলের নির্দেশ দিতে হবে। প্রতিপক্ষ গোলকিপার আপনার হাত টেনে ধরার অপরাধ গোলের আগে হলেও এখানে পেনাল্টির নির্দেশ দিলে দোষী পক্ষই লাভবান হবে। পেনাল্টি থেকে গোল না-ও হতে পারে। তাই কোন অবস্থায় অপরাধী লাভবান না হয় সেদিকে রেফারীর সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আই এফ এ শীল্ডের তৃতীয় রাউণ্ডে ইস্টার্ন কম্যাণ্ড ও জর্জ টেলিগ্রাফের খেলার সময় রেফারী এদিকে দৃষ্টি রাখেন নি। আগে বাঁশী বাজিয়ে পরে আবার গোলের নির্দেশ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এক পক্ষের খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির জন্য সে গোলও নাকচ করেছেন।

শীল্ডের খেলায় আর একটি আইনঘটিত প্রশ্ন উপস্থিত হয় ইস্টবেঙ্গল ও হায়দরাবাদ একাদশের সেমি-ফাইন্যালে।

ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার অবনী বসু যে জামা পরে মাঠে নেমেছিলেন সে জামার রঙের সঙ্গে হায়দরাবাদ খেলোয়াড়দের জামার রঙের মিল ছিল। সুতরাং খেলা আরম্ভের আগে রেফারী তাঁকে জামা পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জামা বদলিয়ে গোলকিপার অবনী বসু নিজের জায়গায় যাবার আগেই রেফারী খেলা আরম্ভ করে দেন। খেলা আরম্ভ হয়েছে দেখে অবনী মাঠের এক পাশ থেকে গোলের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেন, এদিকে অরক্ষিত গোল দেখে হায়দরাবাদের রাইট ইন ইউসুফ খাঁ গোলে শট করেন। শট অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু ভাবছি, বল গোলে ঢুকলে কি অবস্থা হত।

গোলকিপার গোলে আছেন কিনা তা না দেখেই এভাবে খেলা আরম্ভ করার জন্য অনেকেই রেফারীর 'মুণ্ডপাত' করেছেন। খেলার আগে রেফারীর যেসব করণীয় কাজ তার মধ্যে দলে গোলকিপার আছেন কিনা সেটা দেখা অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কারণ, গোলকিপার ছাড়া খেলা আরম্ভ করার বিধান নেই। রেফারী অবশ্য বলতে পারেন, গোলকিপার মাঠের এক পাশেই ছিলেন, তিনি যদি সময় মত গোলে না দাঁড়ান তার জন্য আমি খেলা আরম্ভ করতে দেরি করব কেন? গোলকিপার দলে আছেন সেইটু দেখাই আমার কর্তব্য।

ঠিক কথা। কিন্তু ন্যায়নীতি বলে একটা কথা আছে। গোলকিপারকে যি জামা বদলাবার নির্দেশ দিলেন তিনি ত জন্য একটু সময় দেবেন না? নিজে জায়গায় দাঁড়াবার আগেই খেলা আরম্ভ ক দেবেন? অন্তত দেরির জন্য গোলকিপার সতর্ক করে দিয়েও যদি তিনি খেলা আর করতেন তা হলে এত সমালোচনা হত ন আর সত্যি কথা বলতে কি, অবনী ব জামা বদলাবার জন্য প্রয়োজনের চে একটুও বেশী সময় নেননি।

আমি আবার বলছি, রেফারীর সৌভাগ ইউসুফ খাঁর শটে গোল হয়নি। গো হলে রেফারীকে, সঙ্গে সঙ্গে আই এ এ-কে এক মহা সমস্যারই সম্মুখীন হ হত।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

সুনন্দা দে

"তুমি এত মেয়ের খেলাধুলার কথা [লি]খছ, অথচ খেলাধুলার জন্যে যার গলায় [এক]টি গভর্নরস মেডেল তার কথা লিখছ না [কে]ন?"

একাধিক বন্ধুর কাছ থেকে এই [অ]ভিযোগ অনেকবার আমাকে শুনতে [হ]য়েছে। বলেছি, সুনন্দা দের নাম আমার [লি]স্টে রয়েছে, হদিস পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত ঠিকানা পেলাম ১—এ, [দম]দম রোড। কিন্তু বাড়ির হদিস পেতে [হি]মসিম খেয়ে উঠলাম। চিড়িয়া মোড় [থে]কে নাগেরবাজার পর্যন্ত নম্বর খোঁজা-[খুঁ]জির পর শেষ পর্যন্ত বাড়ির হদিস [পে]লাম হরেকেষ্ট শেঠ লেনের উপর ঠিক [কা]শীপুর ক্লাবের পূব দিকে। দমদম [রো]ডের নম্বর কিন্তু বাড়িটি অনেক ভেতরে, [হ]রেকেষ্ট শেঠ লেনের উপরে।

নম্বর যেমন গোলমেলে বাড়িও যেন তেমন এক গোলকধাঁধা। বিরাট বাড়ি! শুনলাম, এইটিই অবিভক্ত বাঙলার স্বনামধন্য আই সি এস চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাক্তন কমিশনার স্বর্গত কে সি দের আদি বাড়ি।

ঐতিহ্যের কোলে জন্ম সুনন্দা দের। শুধু পরিবারের ঐতিহ্য নয়, খেলাধুলারও ঐতিহ্য। ঠাকুরদা কে সি দে টেনিস খেলেছেন কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বাবা, কাকা, জ্যাঠা সবাই খেলার ভক্ত, খেলোয়াড়ও।

বাবা স্বর্গত অ্যাটর্নি সুধীর দে কলেজ-জীবনে সব রকমের খেলাধুলা করেছেন।

হাতে আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়নশিপের সার্টিফিকেট, গলায় গভর্নরস মেডেল—খুশী মনে দাঁড়িয়ে আছেন সুনন্দা দে

কর্মজীবনে নিয়মিত টেনিস খেলেছেন কাশীপুর ক্লাবে। কাশীপুর ক্লাবের মজলিশে তাঁর ছিল 'দাদাভাইয়ের' ভূমিকা। সবাই 'দাদাভাই' বলে ডাকত, শ্রদ্ধা করত। খেলার পুরস্কারও আছে কিছু কিছু। সুধীরবাবুর ক্রীড়াপ্রীতির নিদর্শন হিসাবেই পল্লীর ছেলেরা ওখানে 'সুধীর স্মৃতি ব্যায়ামাগারের' প্রতিষ্ঠা করেছে।

জ্যাঠামশাই আর কে দে আগের যুগের স্বনামধন্য টেনিস খেলোয়াড়। টেনিস মহলে 'ববি দে' নামে যাঁর পরিচয়। লোয়ার সার্কুলার রোডের ক্যালকাটা ক্লাবের তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মারা গেছেন। একরকম টেনিস র‍্যাকেট হাতে করেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন বলা যায়। শেষ বয়স পর্যন্ত টেনিস র‍্যাকেটই ছিল তাঁর সদাসঙ্গী। তাঁর সঙ্গেই সুনন্দার খেলার মাঠে বেশী আনাগোনার সুযোগ ঘটেছে।

কাকা অধ্যাপক সুবোধ দে স্কটিশ চার্চ কলেজের ফিলজফির হেড অব দি ডিপার্ট-মেণ্ট। শুধু ক্রীড়ারসিক নন, টেনিস-ভক্ত। কাশীপুর ক্লাবে তাঁরও আনাগোনা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর উৎসাহদাতা। কাকিমা রেণু দে ব্যাডমিন্টন খেলায় সুনন্দার ডাবলসের পার্টনার।

মোটের উপর বাড়ির পরিবেশেই সুনন্দা খেলাধুলায় প্রচুর উৎসাহ পেয়েছে। পাশেই কাশীপুর ক্লাব থাকায় অনুশীলনের সুযোগ ঘটেছে। বোনেরাও কাশীপুর ক্লাবে খেলাধুলা করেছেন। কিন্তু সুনন্দার মত খ্যাতি কুড়োতে পারেন নি।

কাশীপুর ক্লাবেই সুনন্দার খেলাধুলার প্রথম পাঠ আরম্ভ। ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, টেনিস, সাঁতার, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস সব কিছুর ওখানে হাতেখড়ি। তবে আর সব খেলাধুলাই চাপা পড়ে গেছে মেয়েটির অ্যাথলেটিকসের কৃতিত্বের পাশে। অবশ্য বাঙলার প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রফুল্লকান্তি ঘোষের পার্টনার হিসাবে কাশীপুর ক্লাবের মিক্সড ডাবলসের পুরস্কার জুটেছে দু'বার। কিন্তু অ্যাথলেটিকসের কৃতিত্বের কাছে সে কৃতিত্ব কিছুই নয়।

কাশীপুর ক্লাবের ক্রিসমাস ডে স্পোর্টসের সব কটি বিষয়ে প্রথম স্থান বা কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের বার্ষিক স্পোর্টসে উপর্যুপরি পাঁচ বছর চ্যাম্পিয়ন-শিপ লাভের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। মণিমেলা স্পোর্টস এবং সব পেয়েছির আসরের স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ক্যামেরা লাভের কথাও ধরছি না। ১৯৫৭ থেকে পর পর তিন বছর ধরে স্কটিশ চার্চ কলেজ স্পোর্টসের মাত্র একটি বিষয়ে একবার দ্বিতীয় স্থান লাভ ছাড়া সব কটি বিষয়ে প্রথম স্থান দখলের কথাও বাদ দেব। যদিও এ এক অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব। প্রতি বছর পাঁচ-ছ'টি

১৯৫৯ সালের আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে ৮০ মিটার হার্ডলস রেসে নতুন রেকর্ড করছেন সুনন্দা দে

বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করে কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার আর কলেজের বেস্ট অলরাউণ্ড অ্যাথলেট হিসাবে 'জন কেলাস ট্রফি' আর কোন মেয়ে এতবার পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। সংগে ব্যাডমিণ্টন এবং টেনিকোয়েটেরও পুরস্কার এসেছে। তবু সীমায়িত সীমার মাঝে অসীমের গৌরব কম। সীমার বাইরেই বেশী কৃতিত্বের পরিচয়।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত ইন্টার কলেজ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে সুনন্দা দে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু নামাঙ্কিত গভর্নরস মেডেল পেয়েছে দুবার। প্রথম ১৯৫৮ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৬০ সালে। মাঝের-বারের চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবু ঐ বছরে ওর হার্ডলস রেসে রেকর্ড করার কৃতিত্ব আজও ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। ৮০ মিটার হার্ডলসে ১৫·২ সেকেণ্ডের নতুন রেকর্ডের পাশে আজও স্কটিশের সুনন্দা দের নাম লেখা রয়েছে।

এ ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম শতবার্ষিকী স্পোর্টস, ইউনিভার্সিটি সেণ্টিনারী স্পোর্টস থেকেও আহৃত প্রশংসাপত্রের অভাব নেই।

১৯৫৭ সালে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ ঘটেছে। সেবার লরেটোর রুমা দত্ত, জিলিয়ান বেলেটি ও হেলেন হল্যাণ্ডের সংগে আর দুটি কলেজের যে দুটি মেয়ের কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ ঘটেছিল তার মধ্যে একজন বেথুনের অঞ্জলি বিশ্বাস, অপরজন স্কটিশের সুনন্দা দে।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রবর্তিত ন্যাশনাল ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সী টেস্টে 'থ্রি স্টারস' সার্টিফিকেট লাভ সুদেহী সুনন্দার শারীরিক পটুতার অন্যতম সাক্ষ্য।

বলা যেতে পারে, খেলাধুলোর জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্ম। যাকে বলে ন্যাচারাল অ্যাথলেট। অনুশীলন অধ্যবসায় খুব বেশী নেই।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পরম ক্রীড়ানুরাগী স্বর্গত এস পি বিশ্বাস সুনন্দাকে বলতেন 'হর্স'-লেগেড লেডী'।

কিন্তু শুধু গতির মধ্যেই তো সুনন্দার জ্যোতি সীমাবদ্ধ নয়। দৌড়, ঝাঁপ, লাফ, নিক্ষেপ—সব কিছুতেই পারদর্শিতা। হাই জাম্প, লং জাম্প, শটপাট, ফ্ল্যাট রেস, হার্ডলস—সব রকমের স্পোর্টসের প্রশংসাপত্র ঘরে রয়েছে থরে থরে সাজানো। একটির উপর জোর দিলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হয়তো কষ্টসাধ্য ছিল না।

আগেই বলেছি, জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্ম। অনুশীলন এবং অধ্যাবসায় বেশী নেই সে কথাও ঠিক। তবু অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনার জেদ চেপেছিল একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

সেবার আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে সুনন্দার প্রথম বছর। ১৯৫৭ সাল। লরেটোর দৌড়পটু গর্বমত্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে হেলেন হল্যাণ্ড স্পোর্টসের সময় বলেছিলেন, বাঙালী মেয়েদের আমি ঘৃণা করি। সুনন্দার ভাল ফল দেখে বলেছিলেন—আই উইল কিক ইউ নেক্সট ইয়ার।

ওখান থেকেই কঠিন সাধনার সংকল্প এবং পরের বছর সুনন্দার কাছে হেলেন হল্যাণ্ডের পরাজয়।

স্পোর্টসে আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার জন্য আবার বাসনা এসেছে। বি এ পরীক্ষা এবং ল' ক্লাসে ভর্তির ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় ১৯৬১ ও ৬২ সালের ফলাফল ভাল হয়নি। ১৯৬৩তে আইন অধ্যয়নের সংগে সংগে স্পোর্টস অঙ্গনে কঠিন অধ্যবসায় শুরু করবেন বলে স্থির করেছেন সুনন্দা দে। শরীরকে পটু রাখবার জন্য সংগে আছে কথাকলি নৃত্যের রেওয়াজ।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি এক নেপালী গুপ্তচরচক্র পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সরকারীসূত্রে জানা গেল, কিছুদিন যাবত ইহারা পশ্চিমবঙ্গের নেপালীভাষীদের মধ্য হইতে উত্তর বঙ্গের একাংশ এবং সিকিমের নেপালভুক্তির দাবি তোলার চেষ্টা করিতেছে।

কাটিহারে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত শুক্রবার পূর্ণিয়া জেলার কাটিহার মহকুমায় বন্যাস্ফীত কাঁকই নদীতে প্রায় ৬০জন যাত্রী সহ একখানা নৌকা জলমগ্ন হয়। নৌকাখানা দুর্গাগঞ্জ হইতে সোনালীঘাটে আসিতেছিল। এ পর্যন্ত মাত্র একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—কেরলের কংগ্রেস-পি এস-পি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সহকারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্কর আগামীকাল কেরলের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবেন। কেরলের প্রজা সমাজতন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

রাজ্য সরকারের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য দপ্তরের অভ্যন্তরীণ কলহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। লেঃ জেঃ ডি এন চক্রবর্তীর বিদায় গ্রহণের পর কয়েক দিনের জন্য অবস্থা ভালর দিকে গিয়াছিল। এখন আবার জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, নেফা অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী চীনাদের সম্পর্কে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারতীয় বাহিনীকে অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তবে ভারত প্রথমে ন্যূনতম শক্তি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা বোধ করিবে না।

জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডি ভি সির চন্দ্রপুরা অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কারখানা নির্মাণের কাজে তাঁহাদের প্রদেয় অর্থ দিতে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুক্তি—এই কারখানা নির্মাণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কোন উপকার হইবে না। আর্থিক অনটনও তাঁহাদের অর্থ না দিবার অন্যতম কারণ বলিয়া প্রকাশ।

২৭শে সেপ্টেম্বর—গিরিশ্রেণীময় স্পিটি উপত্যকায় গত মঙ্গলবার হিমপ্রবাহের ফলে ১৮জন নিহত হইয়াছে বলিয়া আজ সরকারী-সূত্রে জানা গিয়াছে। পাঞ্জাবের পূর্তমন্ত্রী কুলু হইতে ফোনযোগে ইহা জানাইয়াছেন।

ভারত সরকারের ঔদার্যে নেহরু-নুন চুক্তি শুধু বেরুবাড়ির অর্ধাংশই পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দেয় নাই, ত্রিপুরার রেলপথের কিছু অংশও চিরস্থায়ীভাবে পাকিস্তানকে ইজারা দিয়া রাখিয়াছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর—পাঞ্জাবের বর্তমান বন্যার মত বিপর্যয়কর বন্যা স্মরণীয়কালের মধ্যে আর হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। এই বন্যার ফলে ২৬ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৪০ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

কল্যাণী শিল্প নগরীর জন্য ইতিমধ্যেই সরকার প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। ৩০ একর জমির উপর ২৭টি বিরাট শেডে শতাধিক ছোট ছোট কারখানা চালু করিবার পরিকল্পনা ছিল। শেডগুলি ফাঁকা পড়িয়া রহিয়াছে। এই শিল্পনগরীতে কারখানা প্রতিষ্ঠায় কাহারও ভরসা নাই।

২৯শে সেপ্টেম্বর—দেশাই ট্রাইব্যুনাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন। ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়াছেন যে, মাগ্‌গীভাতা শ্রমজীবী শ্রেণীর ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচীর অনুপাত অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। ইহা ব্যতীত বাড়িভাড়া এবং পারিবারিক ভাতা সম্পর্কেও কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।

দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ফলাও চোরা কারবার ও ফাটকাবাজির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে অদ্য এনফোর্সমেন্ট পুলিস কলিকাতার কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ীর গদি ও গৃহে যুগপৎ তল্লাসী করে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—রাজ্যপালকে আরও বেশী ক্ষমতা দিবার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের জন্য কোন কোন মহল প্রস্তাব করিয়াছেন। আজ পাঞ্জাবের বিদায়ী রাজ্যপাল শ্রী এন ভি গ্যাডগিল এক সাক্ষাৎকারের সময় উহার বিরোধিতা করেন।

উদ্বাস্তু রাজনৈতিক নির্যাতিতদের সাহায্য বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যেসব শর্ত আরোপ করিয়াছেন, রাজ্য সরকারের পীড়াপীড়িতে তাহার উপর কিছুটা সংশোধন করিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও আসল সমস্যার সমাধান হইবে না বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর—আজ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীএরিক লো রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের বিরোধী।

সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে ঢাকায় ও অন্যান্য জেলায় ধৃত সমস্ত ছাত্রদের মুক্তি দিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার আজ রাত্রে আদেশ জারী করিয়াছেন। ঢাকায় পুলিসের গুলীতে নিহত ব্যক্তিদ্বয়কে ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্নটি সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া সরকারীভাবে বলা হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—স্থানীয় কূটনৈতিক মহলে প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ, চীনে রাশিয়ার এখনও যে দুইটি বাণিজ্য দূতাবাস অবশিষ্ট আছে, আগামী মাসের শেষভাগে রাশিয়া ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে সেই দুইটি বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

আবহমণ্ডলে, জলের নীচে এবং মহাশূন্যে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধের জন্য আনীত ঈঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়ন আজও আবার বাতিল করিয়া দিয়াছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক শক্তি কমিশন আজ ওয়াশিংটনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গতকাল সোভিয়েট রাশিয়া বায়ুমণ্ডলে যে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে, প্রচণ্ডতার দিক হইতে তাহা আণবিক পরীক্ষা পর্যায়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিস্ফোরণ।

বার্সিলোনা এলাকায় সম্প্রতি যে বন্যা হইয়াছে তাহাতে এক রাত্রির মধ্যে ২৪২জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩৯৫জনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া সরকারীসূত্রে জানা গিয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট রাশিয়া মহাশূন্যের অবস্থা অনুশীলনের জন্য আজ নবম "কসমস" উপগ্রহটি কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে বলিয়া তাস সংবাদ প্রতিষ্ঠান সংবাদ দিয়াছে। উপগ্রহটি বিষুব রেখার সঙ্গে ৬৫ ডিগ্রী কোণে প্রতি ৯০·৯ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে।

আজ রাত্রিতে এডেনে বেতারের সংবাদ হইতে জানা যায়, ইয়েমেনের ইমাম ও তাঁহার অনুবর্তিগণ বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায় প্রাসাদের মধ্যে তাঁহাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। বিদ্রোহী সৈন্যগণ ইয়েমেনের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে এবং ইয়েমেনকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর—২০০ ভারতীয় সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া পাকিস্তান ভারতের নিকট এক প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই আক্রমণের সময় ভারতীয় বাহিনী নাকি বৃহৎ বন্দুক, গাদা বন্দুক এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

বরিশাল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, গত বুধবার প্রায় দুই হাজার বিক্ষুব্ধ ছাত্র বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঁচ ঘণ্টা আটক রাখে। পুলিস পরে ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চালায়। ফলে শতাধিক ছাত্র আহত হয়। প্রকাশ, ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামে সরকারহাটে গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভের আয়োজন হইয়াছিল।

২৯শে সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেন্ট কেনেডী গত রাত্রে বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে যদি একটা সীমাবদ্ধ চুক্তিও হয় তাহা হইলে অস্ত্রসজ্জা প্রতিযোগিতার তীব্রতা হ্রাসের ব্যাপারে উহা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হইবে।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ আজ করাচীতে বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী আর কোনও নূতন প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। এই সপ্তাহের প্রথমদিকে তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর—১৯৫৮ সালে জাতীর ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিবার পর এই চার বৎসরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে এখন পাকিস্তানে প্রচণ্ডতম রাজনৈতিক বিক্ষোভের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তাঁহার প্রেসিডেন্ট শাসিত কঠোর শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করিয়া পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রদীপ

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

স্বদেশ

SH 40 Naye Paise
turday, 20th October 1962

২৯ বর্ষ ॥ ৫০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

ভাষা সমস্যা

হিন্দী, ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষার সীমানার লড়াই কবে যে মিটবে তার স্থিরতা দেখা যায় না। তবু ভালো, লড়াইটা এখন পর্যন্ত তর্কাতর্কিমাত্র, ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের মত মারমুখী হয়নি। তবে "ইংরেজী হটাও" অভিযান যদি বাঁকা পথ ধরে, তাহলে অবশ্যই উপদ্রব ঘটবে। শ্রীনেহরু সম্প্রতি "ইংরেজী হটাও"-ওয়ালাদের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা করেছেন। তাতে রুষ্ট হয়েছেন সর্বভারতের সর্বরোগহর বুদ্ধিদাতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। অন্তত এই একটি বিষয়ে জয়প্রকাশজী এবং রামমনোহর লোহিয়াজী পুরোপুরি একমত। এঁদের বিশ্বাস ইংরেজী ভাষাকে দেশছাড়া না করলে দেশের স্বাধীনতার পূর্ণতা-প্রাপ্তি অসম্ভব। ইংরেজীকে দেশছাড়া করার উদ্দেশ্য অবশ্য এঁদের মতে সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দীর একাধিপত্য স্থাপন। উগ্র হিন্দী-ওয়ালারাও তাই চান। ইংরেজীকে সহযোগী রাষ্ট্রভাষারূপে চালু রাখার প্রস্তাবেও এঁদের ঘোর আপত্তি। হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার জন্য জনসংঘের নেতারা বিহারের জেলায় জেলায় শীঘ্রই প্রচার আন্দোলন শুরু করবেন; পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ওদিকে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার উদ্যোগে হায়দরাবাদে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত "ইংরেজী হটাও" সম্মেলনের একজন দিকপাল ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ভাষা-নৈতিক শুদ্ধাচার রক্ষার জন্য বসু-মহাশয় বক্তৃতা দেন বাংলায়; ডঃ লোহিয়া তার হিন্দী অনুবাদ শুনিয়ে সমাগত "ইংরেজী হটাও"-পন্থীদের জ্ঞান দান করেন।

ইংরেজী বিদায়ের জন্য হিন্দী-ওয়ালাদের অত্যুৎসাহের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু অহিন্দীভাষী পণ্ডিত ব্যক্তিরাও ইদানীং দেখা যাচ্ছে ইংরেজী হটানোর সংকল্পে নানাভাবে সায় দিচ্ছেন—সকলেই স্বচ্ছন্দচিত্তে সম্ভবত নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্তই দায়ে পড়ে। হিন্দী, ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষার সীমানার লড়াইটা কেবল সরকারী কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকলে সমস্যা এখনকার মত এতটা অনিশ্চিত এবং জটিল হত না। সরকারী কাজকর্মে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হবে, সে-বিষয়ে মোটামুটিভাবে চলনসই একটা নীতি স্থির হয়ে আছে। হিন্দীওয়ালারা যতই সোরগোল করুন, সহযোগী রাষ্ট্রভাষা ইংরেজীকে তাঁরা হটাতে পারবেন না। কিন্তু অহিন্দীভাষীরা যদি নিজ নিজ অঞ্চল থেকে ইংরেজীকে একেবারে হটিয়ে আঞ্চলিক ভাষাকেই আশ্রয় করেন, তাহলে হিন্দীর আধিপত্য বিস্তার রোধ করা অসম্ভব হবে। প্রত্যেক রাজ্যেই সরকারী কাজকর্মে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার প্রবর্তনের দাবি প্রবল হয়েছে। কিন্তু এ-ও দেখা গেছে যে, দ্বিভাষিক কিম্বা বহুভাষী রাজ্যে একটিমাত্র আঞ্চলিক ভাষা সরকারী কাজকর্মে ব্যবহার করা নানাভাবে বিপত্তিকর। সুতরাং সরকারী কাজকর্মে ইংরেজীর ব্যবহার একেবারে বরবাদ করা কার্যত অসম্ভব।

রাষ্ট্রভাষা এবং রাজভাষার প্রশ্ন ছাড়াও আর একটি ক্ষেত্রে ভাষা সমস্যা সমস্ত ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছে। এই সমস্যাটি হল শিক্ষার বাহন সম্পর্কে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজীই শিক্ষার বাহন। সমস্যা এই যে, এ-ক্ষেত্রেও ইংরেজী হটানোর উদ্যোগ চলছে। হিন্দীওয়ালারাই এই উদ্যোগের প্রধান প্রেরণাদাতা কিনা বলা যায় না। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার পক্ষপাতী। দিল্লিতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির উপাচার্যগণের সম্মেলনে সম্প্রতি বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। প্রথমে আশা করা গিয়েছিল যে, উপাচার্যগণ উচ্চশিক্ষার বর্তমান বাহন ইংরেজীকে হটানোর প্রস্তাবে সায় দেবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ অবিলম্বে না হোক যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার বাহন করা হবে আঞ্চলিক ভাষা।

আমাদের প্রথম আশংকা এই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের চেষ্টা এমন কতকগুলি অনর্থকর উপসর্গ সৃষ্টি করবে, যার ফলে উচ্চশিক্ষার আরও অবনতি ঘটবেই। উচ্চস্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী গ্রন্থাদি আঞ্চলিক ভাষায় এখন পর্যন্ত সামান্যই রচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নিজেও সে-কথা স্বীকার করেছেন। তারপর শ্রীনেহরু দুই কুল বজায় রাখার চেষ্টায় ভরসা দিয়েছেন, কিছু কিছু বিষয় একসঙ্গে ইংরেজী এবং আঞ্চলিক ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। সুতরাং ভরসা আপাতত দ্বিভাষিক ফর্মুলার। কিন্তু তাই যদি হয়, ইংরেজী ছাড়া উচ্চশিক্ষাস্তরে পঠন-পাঠন প্রকৃতপক্ষে যখন অসম্ভব, তখন ইংরেজীকে নিতান্ত ইংরেজী বলেই হটানোর দরকার কী? শ্রীনেহরু নিজেও এ-বিষয়ে সংশয়ী; নিজেই তিনি বারবার বলছেন ইংরেজী বরবাদ করা মানে বৃহৎ-বিশ্বের বাতায়ন বন্ধ করা। কেবল বৃহৎ বিশ্বেরই বা কেন, বহুভাষী ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ রাখতে হলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন রাখা অপরিহার্য।

সন্দেহ হয় যে, পরিণামে হিন্দীকেই সর্বভারতীয় যোগসূত্র করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষাপ্রেমীরা সম্ভবত প্রলুব্ধ হচ্ছেন এই কল্পনা করে যে, সর্বোচ্চ স্তরে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কাল্পনিক মর্যাদার চেয়ে উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ অনেক বেশী মূল্যবান। তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষাপ্রেমীরা এইভাবে ইংরেজী হটানোর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করার পরিণাম হবে হিন্দীর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রসার।

পূজা শেষ হল; মহিষাসুর
কিন্তু এখনো আছে।

বাংলা সমস্যা

নেপালের রাজা মহেন্দ্র চীনে-পটকা
দিয়ে দশেরা উদ্‌যাপন করছেন।

ভারতবিরোধী বক্তৃতা

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কেরালা কংগ্রেসকে
রেকর্ড-উচ্চে নিক্ষেপ করেছেন।
পি-এস-পি আর মুশলিম লীগ
কেবল ঠেলে-নিয়ে যাওয়া
রকেট ছিল।

কংগ্রেস

পি-এস-পি

বৈদেশিকী

সেপ্টেম্বর মাসে চীনারা "নেফা" অঞ্চলে "ম্যাকম্যাহন লাইন' অতিক্রম করে ভারতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে ভারতীয় ও চীনা সৈনাদের মধ্যে অল্পক্ষণ গুলী বিনিময় চলছিল। গত বুধবার বেশ একটা বড়রকমের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। তাতে দুই পক্ষেরই বেশ কিছু-সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে। মাদ্রাজের পথে কলম্বো যাত্রার পূর্বক্ষণে পণ্ডিত নেহরু শুক্রবার পালাম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, নেফা অঞ্চলে যে-চীনারা ঢুকেছে তাদের ভারত সীমানার বার করে দেবার জন্য ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

চীনারা "নেফা'তে"ও ভারত সীমানার ভিতরে ঢুকে সামরিক "পোস্ট" বসিয়েছে, এ খবর এখন জানা যাচ্ছে। পিকিং তো এখন "ম্যাকম্যাহন লাইন"কে সীমানা বলেই মানছে না। চীনা সংবাদপত্র, সরকারী "নোট" এবং বিবৃতি প্রভৃতির সুর থেকে নিশ্চিত বুঝা যাচ্ছে যে, চীনারা সহজে সরবে না, বরং তারা যতদূর এগিয়েছে সেখানে থাকার জন্য বা আরো এগুবার চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে তীব্রতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সুতরাং "নেফা" থেকে চীনাদের বার করে দেবার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই যে দুচার দিনের মধ্যেই আমরা শুনতে পাব "নেফা" চীনামুক্ত হয়েছে এরূপ আশা যেন কেউ না করে।

ভারত সরকারের সকল ঘোষণার তাৎপর্য সম্বন্ধেও সব সময়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। চীনাদের হটিয়ে দেবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ঘোষণার পরেও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, চীনাদের হটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি হবে না। বস্তুত বুধবারের বড়ো সংঘর্ষের পরে কয়েক দিন কোনো সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায় নি। অবশ্য দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও প্রতিদিন সংঘর্ষ হবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু চীন সম্পর্কে ভারত সরকারের গত কয়েক বছরের নীতি পরিচালনার ইতিহাস থেকে কিছুই বলা যায় না সৈন্যবাহিনীকে আবার কখন হাত গুটিয়ে নিতে বলা হবে।

"নেফা" থেকে চীনাদের হটিয়ে দেওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে পণ্ডিত নেহরু সাংবাদিকদের বলেন "সেটা সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করছে"। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলছেন, "নেফা থেকে চীনাদের হটানো হবেই। তা সে এক দিনেই হোক বা একশো দিনেই হোক বা হাজার দিনেই

হোক। "হাজার দিন" হলে প্রায় তিন বছর হয়। যুদ্ধের কথা কিছু বলা যায় না, যুদ্ধের মধ্যে এগুতে, পেছুতেও হয়—এ সবই ঠিক, কিন্তু ভারত সরকার যে চীনাদের সঙ্গে পুরোদস্তুর লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন এবং চীনারা না হটা পর্যন্ত তাদের উপর সামরিক চাপ অব্যাহত রাখা হবেই, এ বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া মুশকিল। যদিও প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরে রাষ্ট্রপতিও সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীদের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছেন তাতে মনে হয় যে, চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানোর আশা ভারত সরকারকেও ত্যাগ করতে হয়েছে।

কিন্তু ভারত সরকারের মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা চীনাদের দ্বারা প্রতারিত হবার সুযোগ পেলে সেটা ছাড়তে চান না। সুতরাং চীনাদের না হটা পর্যন্ত আর কোনো কথা নয়—ভারত সরকারের এই ঘোষণার উপর ষোলো আনা বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। তাছাড়া সামরিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও ভারত সরকারের প্রদত্ত আশ্বাস সব সময়ে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। "ম্যাকম্যাহন লাইন" অতিক্রম করে নেফাতে চীনাদের কিছুতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। চীনারা সে চেষ্টা করলে তাদের দূর করে দেবার মতো সামরিক ব্যবস্থা আমাদের আছে —এরূপ আশ্বাস দেশবাসীদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, চীনারা "ম্যাকম্যাহন লাইন" অতিক্রম করে ভারতীয় সীমানার মধ্যে ঢুকেছে, শুধু তাই নয়, ভারতীয় সীমানার মধ্যে সামরিক "পোস্ট" বসিয়েছে এবং সেখান থেকে তাদের এখনও হটানো যায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে যে সামরিক ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সেটার মধ্যে কিছুটা ফাঁক বা ফাঁকি ছিল।

চীনাদের "নেফা" থেকে হটিয়ে দেবার আদেশ সৈন্যবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে এই ঘোষণার মধ্যেও একটা গোলমেলে ভাব আছে। চীনাদের হটিয়ে দেবার জন্য সৈন্যবাহিনীকে এখন আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চীনারা যখন "ম্যাকম্যাহন লাইন" অতিক্রম করে "নেফায়" ঢোকে তখন তাদের প্রতি কীরূপ আচরণ করার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রতি আদেশ ছিল? তখন কি চীনাদের বাধা দেবার জন্য যথোপযুক্ত শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর ছিল না? যদি সেরূপ নির্দেশ থেকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই নির্দেশ পালন করতে সৈন্যবাহিনী সমর্থ হয়নি। অথবা, প্রথম থেকেই সর্বতোভাবে চীনাদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর ছিল না। এর যেটাই ঠিক হোক, "নেফা" অঞ্চলে ভারতের সীমানা রক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রদত্ত আশ্বাসের মধ্যে যে কিছু গোলমাল ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

যে কর্তব্য তাঁরা সম্পন্ন করতে পারবেন না এমন কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি সৈন্যবাহিনীর পরিচালকগণ গবর্নমেন্টকে দিয়েছিলেন, এরূপ মনে করার কোনো কারণ দেখি না। অথবা আমাদের সৈন্যবাহিনী সামরিক কৌশলে বা শৌর্যে চীনাদের চেয়ে খাটো বলে চীনারা "নেফায়" ঢুকতে পেরেছে এরূপ মনে করারও কোনো কারণ নেই। চীনারা যে সুবিধা করতে পেরেছে এবং এখনও পারছে তার কারণ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দক্ষতার অভাব নয়, তার প্রধান কারণ ভারত সরকারের রাজনৈতিক কর্তাদের আহাম্মকি, আত্মপ্রতারণা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রতারণা, এমনকি ধর্মনীতি বিসর্জন।

চীন কর্তৃক তিব্বতের স্বাধীনতাহরণকে স্বীকার করে নিয়ে সেই স্বীকৃতির ভিত্তির উপর যারা "পঞ্চশীলে"র মায়াসৌধ গড়েছিলেন তাঁদের ধর্মজ্ঞান ইতিহাসে নির্মম উপহাসের বিষয় হয়ে থাকবে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভার যে আমরা ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উপর ফেলে রেখে যেতে পারি নি, সেই প্রায়শ্চিত্ত যে আমাদেরই করতে হচ্ছে (অথবা আমাদেরই শুরু করতে হয়েছে) এটা ভালো। এর জন্য চীনাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। চীনারা যদি আর একটু রয়ে সয়ে এগুতো তাহলে আমাদের সরকারী কর্তাদের আহাম্মকির উপর-আবরণটা আরো কিছুকাল থাকত এবং তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির ধর্মজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে জাতি আরো অনেক দিন অচেতন হয়ে থাকতে পারত।

চীনের গ্রাস থেকে তিব্বতকে বাঁচাবার শক্তি ভারতের ছিল কিনা সেটা তর্কের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তিব্বতকে চীনের গ্রাস থেকে বাঁচাতে পারুক আর নাই পারুক, চীনের তিব্বতকে উদরস্থ করার পরে চীনা সরকারকে "পঞ্চশীলের" হজমিগুলি উপহার দেওয়া নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। আজ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীদের কাছে আবেদন করছেন—"আমাদের সৈন্যবাহিনী চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সীমানারক্ষায় নিযুক্ত, তোমরা তাদের সমর্থনে দাঁড়াও"। স্বদেশ রক্ষার এই আহ্বানে দেশবাসী নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। তারা কি কম সাড়া দিত যদি বারো বছর আগে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাদের বলতেন "চীন অন্যায় করে দুর্বল তিব্বতের স্বাধীনতা বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, ভারত সরকার তাতে বাধা দেবে, তোমরা আমাদের সমর্থনে দাঁড়াও?"

নিজেদের সীমানা রক্ষা সকলেই করে। নিতান্ত কাপুরুষ ছাড়া। সেটা বিশেষ কোনো মহত্ত্বের ব্যাপার নয়। কিন্তু দুর্বল প্রতিবেশীর স্বাধীনতারক্ষার জন্য বিপদ বরণে মহত্ত্ব আছে। সেই মহত্ত্বের আহ্বান উচ্চারণ করার যখন প্রয়োজন ছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী তা করেন নি। তখন আমাদের সরকার কৃপণের মতো হিসাব করেছেন এবং অচিরে অন্যায়কারীর সঙ্গে মিতালি করার পথ খুঁজতে শুরু করেছেন। তিব্বতের প্রতি চীন অন্যায় করছে এই বোধ যদি আগে ভারত সরকারের না থাকত তাহলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ভারত সরকার যে জ্ঞানপাপী তার নজির পণ্ডিত নেহরুর ১৯৫০ সালের প্রথম বিবৃতি থেকেই আমরা পাই। পণ্ডিত নেহরু নিজের

মনের সেই পাপবোধ কখনও সম্পূর্ণরূপে চাপা দিতে পারেননি, তবে চেষ্টা করেছেন কখনও প্রাকটিক্যাল রিজন বা তথাকথিত বাস্তবতার দোহাই দিয়ে, কখনও বা "আইডিয়োলজির" দোহাই দিয়ে। চীনারা তিব্বতীদের স্বাধীনতা হরণ করলেও তারা তিব্বতকে "মডার্ন" করে দিচ্ছে, সুতরাং চীনাদের আচরণ নিষ্ঠুর হলেও "ইতিহাসের" দৃষ্টিতে সেটা প্রগতির পরিচায়ক "প্রোগ্রেসিব"—এই ধারণার মধ্যে পণ্ডিতজী সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছেন এবং অন্য সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক হয়েও তিব্বতের বেলায় তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছেন। এইভাবে আইডিয়োলজির কাছে মানবতাকে বলি দেওয়া হয়েছে।

পণ্ডিতজীর এই আইডিয়োলজিক্যাল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ চীনাদের সুবিধা করে দিয়েছেন ও এখনও দিচ্ছেন বা ভবিষ্যতে দিতে পারেন বলে আশঙ্কা করি। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দক্ষতার উপর দেশবাসীর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সৈন্যবাহিনীর সমর্থনে তারা নিশ্চয়ই পশ্চাৎপদ হবে না, কিন্তু তাদের পক্ষে গবর্নমেন্টের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থা রাখা কঠিন। সৈন্যবাহিনীর সাফল্য সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করে অর্থাৎ সরকারের বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় যদি গোলমাল থাকে তাতে সামরিক সাফল্যের পথ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে এবং পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে সকলকে আস্থার যোগ্য বলে মনে করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ মেনন যদি কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হতেন অর্থাৎ বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রধান মন্ত্রণাদাতা না হতেন তাহলে হয়ত তাঁর সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না তুললেও হত। কিন্তু বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় তাঁর প্রভাব এবং কর্তৃত্ব কখনই নিরাপদ বলে মনে করা যায় না।

বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় সবই ভুল হয়েছে এ কথা বলা যেমন অর্থহীন হবে, তেমনি অনেক ভুলও যে হয়েছে সেটা আর তর্ক করে প্রমাণ করতে হবে না। তার প্রমাণ চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে। বর্তমান পরিচালকদের জীবদ্দশায় সব ত্রুটি সংশোধিত হবে না, কিন্তু সংশোধনের চেষ্টা অন্তত আরম্ভ করা দরকার। তা নাহলে পণ্ডিত নেহরুর বৈদেশিক নীতির গুণগান করে ভারতীয় পার্লামেন্টে গত চৌদ্দ বছর ধরে যে সব প্রস্তাব পাশ হয়েছে সেগুলি ভারতবাসীর রাজনৈতিক বুদ্ধিকে চিরকাল বিদ্রূপ করতে থাকবে।

১৫-১০-৬২

পালা-বদল

হরপ্রসাদ মিত্র

অঢেল নীলের কোলে সাদা মেঘের আঁশতোলা
এই উজ্জ্বল শূন্যতায় পৌঁছে
শিকারের নেশা কাটলো বুঝি।
ঋতুর সহজ উচ্ছ্বাসে নির্বিবাদ উৎসর্গ নয় এ,
এ নয় না-অস্থিরতার নশ্বর বিরতি।
হঠাৎ খুশীর চঞ্চলতা বললেও
সত্যের অপলাপ হবে।

শিকারীকে অন্যপক্ষে রেখে
এইবার শিকারের দিকে এগিয়ে যাবার পালা।
বাতাসে মিলিয়ে আসে চাবুকের শব্দ,
জলে অনিবৃত্ত পিপাসার বেদনা।

অরণ্যের দুর্ভেদ্য সবুজে, জ্বলন্ত শ্যামে
স্নিগ্ধ হরিৎশোভায়
প্রশান্ত এই নতুন সূর্যসত্য।
হরিণের চোখ দিয়ে বন্দুকের দিকে নজর রাখবার
অভূতপূর্ব এই কালসন্ধি।
আজ আশ্চর্য রোদ, আর আশ্চর্য যন্ত্রণা
সময়ের নদীতে গভীর এক বাঁক,
মনে আশ্রয়প্রাকারের ক্ষুধা।
শরীর বিহ্বল হয় বারুদের ঘ্রাণে।
সামনে দেখা যায় বহুসমারোহখ্যাত
উজ্জ্বল আকাশের শূন্য।

গুণিন

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আহা দেখ, দেখ ঐ গাছটাকে।
শীতের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত সর্বাঙ্গ
একটা পাতা অবধি নেই
কী অসহায়, আনগ্ন
বেচারী আকাশ কেটে দাঁড়িয়ে!
একটু নীলিমা পর্যন্ত গান করছে না—
এমনই অপদস্থ, মুমূর্ষু।
আহা, বোধহয় মরেই গেল!

আহা, মরেই কি গেল!
কিন্তু তুমি কুড়ুল তুলছ কেন?
তাই বলে এখনি কুড়ুল তুলছ কেন?
আমি যে বসন্তকেও
অনেকবার হেসে উঠতে দেখেছি,
অনেকবার দেখেছি টিটকিরি দিয়ে উঠতে
চামড়া-পোড়া শ্মশানেও।
লাল আঙরাখা, হলদে পাগড়ি—
বরং সেই গুণিনকে একটা খবর দাও।

পূর্বপত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মণীন্দ্রলাল বসুর সামনাসামনি বসে আমি আবার অনেকক্ষণ কথা বললাম প্রায় বাইশ-তেইশ বছর পর। অনেক—অনেক পর! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শিল্প সাহিত্যের, আশেপাশের সব মানুষের, মনের আর দেহের আর এই কলকাতা শহরেরই কত না পরিবর্তন হয়েছে! তা না হলে যে-পাড়ায় কৈশোরে-যৌবনে আমার সারা বেলা কেটে গেছে সেই বালিগঞ্জের গড়িয়াহাট রোডে পি-৩০ নম্বর খুঁজে পেতে এত দেরী হল কেন!

এ পাড়ায় এত বাড়ি ছিল না। এত দোকান ছিল না। আর আমার কৈশোর-যৌবনে যখন গড়িয়াহাট রোড ধরে এক সময় ডানদিকে বেঁকে লেকে চান করতে যেতাম তখন পথ ছিল নির্জন—এত ব্যস্ততা, এত জাঁকজমক ছিল না।

কিন্তু তখন, বাইশ-তেইশ বছর আগে, যখন মণীন্দ্রলাল থাকতেন পার্ক সার্কাসের কংগ্রেস একজিবিশন রোডে—তাঁর বাড়ি খুঁজে পেতে আমার এত দেরী হয়নি। আর হলেও সেকথা আজ মনে নেই। কেননা তখন ক্লান্তিবোধের চেয়ে তাঁকে দেখার আগ্রহ ছিল প্রবল—আজকের চেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

মণীন্দ্রলালের বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে সেদিনের কথা আজ বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ছে। জীবনের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় অল্প কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করবার আগ্রহে অনেক বাংলা বই পড়তে শুরু করে দিয়েছি। তখনও সব চেয়ে ইঙ্গিতময় ঋতু, সে ঋতু যৌবন, জীবনে আসেনি কিন্তু তার পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর বাইরের বর্ণ গন্ধ, আলো আর ছায়া, থেমে থেমে বেজে ওঠা বাঁশির সুর, সেতারের কাঁপা-কাঁপা কান্না মনের মধ্যে একটা প্রাসাদ—যা একান্তই আমার নিজের—গড়ে তুলতে শুরু করেছে।

আজ মনে হয়, একটা সরোবর আপনি সৃষ্টি হয়েছিল মনের মধ্যে, যেখানে কোন ছায়া ছিল না, কোন আলোড়ন ছিল না—সেই সরোবরে দূরে থেকে, যেন অনেক দূরে থেকে, আমি তখনও মণীন্দ্রলালকে দেখিনি, এক যৌবনের দূত কী অপূর্ব শিল্প লীলায় রাতারাতি পাপড়ির পর পাপড়ি খসিয়ে বিকশিত করেছিলেন বিচিত্র পদ্মকে। তখন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ফটো : দেশ

সদ্য-সদ্য 'রমলা' 'জীবনায়ন' আর ছোট গল্পের বই 'কল্পলতা' পড়েছিলাম।

কিন্তু সেদিন, অনেক বছর আগে, মণীন্দ্রলালের কংগ্রেস একজিবিশন রোডের বাড়িতে যে কথা বলতে গিয়েছিলাম, অল্প বয়সের ভীতি আর সংকোচে সে কথা আমার বলা হয়নি। হয় তো আজকের মতো করে বলবার ভাষাও ছিল না তখন। জীবনের অন্যান্য ঋতুর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কেমন করে বলব যে সব চেয়ে ইঙ্গিতময় কাল যৌবন আর তাঁকে মনে হয়েছিল তার দূত।

কিন্তু আশ্চর্য, সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা যে এত দাঙ্গা যুদ্ধ বিপর্যয়—এত সমস্যা আর পরিবর্তন সব কিছু ছাড়িয়ে এত পরে আবার মণীন্দ্রলালকে দেখে মনে হল যেন একই রকম—সেই যেমন তাঁকে দেখেছিলাম আমার যৌবনের প্রথম-প্রথম তাঁর কংগ্রেস একজিবিশন রোডের বাড়িতে—ঠিক তেমন।

বয়স কত হল তাঁর? ১৮৯৭ সালে জন্ম। গৌরবর্ণ। হাসিহাসি মুখ। ঠিক তেমন। কিন্তু আজ আমি তাঁকে আমার কথা শোনাতে আসি নি—তাঁর কথা শুনতে এসেছি—জানতে এসেছি কেন তিনি নীরব—সেই কথাটা কেমন করে তাঁকে বলব!

মণীন্দ্রলালের নতুন বাড়ির তেতলায় তাঁর লাইব্রেরীতে তিনি আমাকে নিয়ে এলেন। একটা বিরাট টেবিল। অনেক বই-এর আলমারী। একটা সোফা। জানলা দিয়ে শরতের হাল্কা রোদ ঘরে এসে পড়ে। আশেপাশে দেখা যায় অনেক বড় বড় বাড়ি।

"বস বস, ওখানে নয়", ঠিক পাখার তলায় আর একটা চেয়ার দেখিয়ে মণীন্দ্রলাল বলেন, "এখানে, আচ্ছা, কী খাবে? চা? কফি? কেক?"

"হবে হবে, এত ব্যস্ত হবার দরকার কী—আজ আমি অনেকক্ষণ থাকব", একটু ইতস্তত করে বলি, "আপনাকে অনেক প্রশ্ন করব বলেই এসেছি—"

"তোমাকে দেখেই সে কথা বুঝতে পেরেছি", মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান মণীন্দ্রলাল, "কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না—"

"কেন?"

"আমার বয়স কি এতই বেশী? তাছাড়া, আমি এখনও লিখছি, আরও অনেক লেখার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, এখনই কেন তুমি আমাকে 'পূর্বপত্রে' ফেলতে চাও?" আমি হেসে বলি, "কিন্তু 'পূর্বপত্রের' অনেক লেখক তো এখনও লেখেন। শুধু যাঁরা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক তাঁদের জন্যেই এ বিভাগ নয়—"

"তবে কাদের জন্যে?"

"কল্লোল-এর আগের যুগে যাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁরা আজও জীবিত—লিখলেও বাংলা সাহিত্যে আজ আর যাঁদের তেমন প্রভাব নেই। মানে মণিদা, আপনাকে বাদ দিলে এ বিভাগ সম্পূর্ণ হবে না," থেমে থেমে বলি, "কল্লোল-এর লেখকদের আগে, একটা নতুন সুর, জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ

পরবর্তী সাক্ষাৎকার : ১৭ নবেম্বর
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঋতু যৌবনকে কি আপনি নতুন করে রূপ দেন নি—মোড় ফিরিয়ে দেননি বাংলা সাহিত্যের? আপনি আঠারো-উনিশ বছর বয়সে 'রমলা' না লিখলে—"

"না না", এবার বাধা দিয়ে মণীন্দ্রলাল বলেন, "অত কম বয়সে নয়, আর কিছু পরে, 'রমলা' বোধহয় আমার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা। ওটা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় আমার পঁচিশ বছর বয়সে।"

"রমলা কি আপনার প্রথম লেখা?"

"প্রথম উপন্যাস। প্রথম লেখা নয়। তার আগে একটা ছোট গল্প লিখেছিলাম, 'অরুণ'। সেটাও 'প্রবাসী'র জন্যে লেখা। 'প্রবাসী' গল্প প্রতিযোগিতায় 'অরুণ' প্রথম হয়েছিল। আমি তখন 'ল' কলেজের ছাত্র।"

"তারও আগে কিছু লেখেন নি?"

"স্কুল-কলেজ ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে লিখতাম। তবে 'অরুণ' আমার প্রথম ছোট গল্প।"

"কিন্তু খুব ছোটবেলায় কখনও লেখবার ইচ্ছে হয়নি আপনার?" আমি একেবারে

পষ্ট ভাষায় বলে ফেলি, "অনেক আগে থেকে মনে মনে প্রস্তুত না হলে হঠাৎ কলম রে কি 'প্রবাসী'র গল্প প্রতিযোগিতায় থেম হওয়া যায় মণিদা?"

এবার মণীন্দ্রলাল হেসে বললেন, "প্রস্তুত বার কোন চেষ্টা আমি হয়তো একেবারে ছেলেবেলায় করিনি। কিন্তু—" একটু চুপ রে থেকে তিনি বলেন, "আমাদের াড়িতে অনেক বই ছিল, অনেক বই কেনা তে আর সকলের কাছে সেসব বই-এর খুব াদরও ছিল—"

"আপনি কি ছেলেবেলা থেকেই কলকাতায়?"

"হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি চব্বিশ পরগণার চাংড়ীপোতায়, এখন যার নাম সুভাষগ্রাম। তুমি চাংড়ীপোতার নাম শুনেছ? সুভাষ-চন্দ্র বসু, মানবেন্দ্র রায়ের গ্রাম। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুলালয় এখানেই। এই গ্রাম থেকেই দ্বারিক বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হত", মণীন্দ্রলাল হেসে বলেন, "আমি চাংড়ীপোতার বসু বংশের ছেলে। আমার ঠাকুর্দা প্রসন্নকুমার বসু প্রায় একশো বছর আগে কলকাতায় আসেন। ঝামা-পুকুরে তিনি বাড়ি তৈরি করেন। সে বাড়িতেই আমার শৈশব থেকে যৌবন কেটে যায়।"

"আপনার বাবার নাম কী?"

"প্রবোধচন্দ্র বসু। আমার বাবা মারা যান ১৯৪১ সালে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি-এল পরীক্ষায় প্রথম হন। তিনি জুডিসিয়াল সার্ভিসে ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "কিন্তু ওঁকে তো বাইরে-বাইরে ঘুরতে হত—আপনি ছেলে-বেলায় বাবার সঙ্গে কলকাতার বাইরে কোথাও থাকেননি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ছিলাম", মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা সূত্র খুঁজে পান মণীন্দ্রলাল, "সেই প্রথমবার। সেই হয়তো শেষবার। খুব ছেলেবেলায়, আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, বাবা তখন মুন্সেফ—চিটাগাং থেকে দশ-বারো মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর ধারে একটা জায়গা, নাম সাউথ রাউজান। বাবার কর্মস্থল। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। আমার একেবারে শৈশবের কথা। কিন্তু আজ, এত বছর পরেও সাউথ রাউজানের সেই সব দৃশ্য, পাহাড়ের মৌন, বনের সবুজ, মুখর কর্ণফুলী—আমি ভুলতে পারি না। চুপ-চাপ বসে থাকতাম, একটা ছোট ছেলে অবাক হয়ে দেখত অবাধ প্রকৃতির কী বিচিত্র রূপ!

বাইরে প্রকৃতির এই রূপ আর ভিতরে বই—অসংখ্য বাংলা বই। আমাদের সেই সাউথ রাউজানের বাড়িতে দেখতাম কলকাতা থেকে ঘন ঘন বড় বড় বই-এর পার্সেল আসত—"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করি, "এত বই কে পড়তেন—আপনার বাবা?"

"না, আমার মা। পড়াশুনোয় ভীষণ ঝোঁক ছিল তাঁর। 'মেঘনাদ বধ' মুখস্থ ছিল। আমার মার নাম ইন্দিরা সুন্দরী বসু। আমার দাদামশাই অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সুপণ্ডিত—তিনি ফরাসী ভাষাও জানতেন। 'রমলা' আমি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছি।"

"শুনেছি আপনিও তো অনেক ভাষা জানেন?"

মণীন্দ্রলাল হেসে বলেন, "ফরাসী জানি। দেখ না কত ফরাসী বই রয়েছে আমার লাইব্রেরীতে। কিছু কিছু জার্মানও জানি—দুখানি জার্মান নাটকের অনুবাদ করেছিলাম—"

"তারপর ?"

"কিন্তু সেসব কথা থাক। যা বলছিলাম—সেই সাউথ রাউজান! একটা কিছু যেন দিতে চেয়েছিল প্রকৃতি—তখন গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু পরে, যখন কলকাতার বাড়িতে এসে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে ভর্তি হলাম আর দুজন শিক্ষক, বরদাকান্ত বসু আর সুশীলকুমার গুপ্ত, যাঁদের পড়াবার রীতি বাংলা লেখার কথা আমার মনে প্রথম জাগাল, যাঁদের কথা আজও আমার প্রায়ই মনে পড়ে, তখন আমার সাউথ রাউজানের সেই সব দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে নতুন করে—সেই বন নদী পাহাড়—প্রকৃতির সেই অপরূপ রূপ!"

"তারপর ?"

মণীন্দ্রলাল বলেন, "১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজ! কী বিরাট লাইব্রেরী! দেশ-বিদেশের কত বই! কত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক! কত বুদ্ধিমান বন্ধু-বান্ধব", এতক্ষণ পর যেন মণীন্দ্রলাল মন খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেন, "আমার প্রফেসার কারা ছিলেন জান, হোমস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীকুমার ব্যানার্জি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র—এঁরা। আর আমার সহপাঠি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী, প্রফেসার নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিল্পী বীরেশ্বর সেন আর এমন আরও অনেকে।

একটা কথা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখন মনে হচ্ছে, আমার সাহিত্যিক হওয়ার বাসনার মূলে রয়েছে, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিরাট লাইব্রেরী, প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদের সান্নিধ্য আর আমার বন্ধুদের সঙ্গ। কত যে বই পড়েছি তখন, কত জেনেছি, হিন্দু হস্টেলের আসরে বসে ফণী নির্মল আর বীরেশ্বরের সঙ্গে কত আলোচনা করেছি! ওঁদের সকলেরই সাহিত্যে উৎসাহ প্রচুর। শ্রীঅরবিন্দর ইংরেজী মাসিক 'আর্য' আর প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আমরা নিয়মিত পড়তাম—"

"সেই সময় আপনি প্রবাসী গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেলেন ?"

"হ্যাঁ, সেই সময়। আমি বি-এ পাশ করি ১৯২০ সালে। 'অরুণ' 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবার পর চারুবাবু, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি 'প্রবাসী'র অন্যতম কর্মী ছিলেন, আমাকে একটা উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করলেন। হঠাৎ রাজী হতে পারলাম না। ইতস্তত করতে লাগলাম—"

"কেন ?"

"আরে, 'প্রবাসী'র তখন কত নাম! বেশ ভয় করতে লাগল। কী উপন্যাস লিখব 'প্রবাসী'-তে। যদি কারুর ভাল না লাগে—তখন? কিন্তু চারুবাবু ছাড়লেন না। বললেন, লিখতেই হবে—লিখুন। চারুবাবুর আন্তরিক আগ্রহেই 'রমলা' লেখা হয়েছিল", দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে মণীন্দ্রলাল বলেন, "এমন আন্তরিক আগ্রহের প্রকাশ না দেখলে আমি লিখতে পারি না। আর তখন সম্পাদকরাও ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কারা ছিলেন তখন? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন—"

"আপনি 'ভারতবর্ষে'ও লিখেছেন ?"

"হ্যাঁ। তাও হরিদাসবাবু আর জলধরবাবুর আন্তরিক আগ্রহে। আমার একটা উপন্যাস 'স্বপন' 'রমলা'র পর-পর 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেটা আর বই হয়ে বার হয় নি। আমিই চাই নি—" হঠাৎ হেসে ওঠেন মণীন্দ্রলাল, "আরও লিখেছিলাম 'ভারতবর্ষে' 'ইউরোপের চিত্রশালা' নামে দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী—ইউরোপে যত আর্ট গ্যালারি আছে, তার ইতিহাস—কিন্তু সেটাও বই হয়ে আর শেষ অবধি প্রকাশিত হয় নি।"

আমি অবাক হয়ে বলি, "কেন? এমন বই তো বাংলা সাহিত্যে তখন এক নতুন সংযোজন হতে পারত—"

মণীন্দ্রলাল হেসে বলেন, "ভয় ছিল বাংলা দেশের পাঠক যদি এমন বই-এর আদর না করে। কিন্তু পরে যখন মনে হল, আদর করতেও পারে তখন ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতে আর একবার ইউরোপ ঘুরে সেখানকার চিত্রশালার ইতিহাস আরও ব্যাপক, আরও দীর্ঘ করে তুলব", একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে মণীন্দ্রলাল বলেন, "কিন্তু তা আর হল কই।"

"কত সালে আপনি ইউরোপে যান ?"

"ল' পাশ করার দু' বছর পর, ১৯২৫ সালে। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলাম। আমি ইউরোপে ছিলাম চার বছর। ১৯২৯-এর শেষের দিকে ফিরি। ১৯৩০ সাল থেকে

কলকাতায় হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করি—"

"বিলেতের কথা বলুন ?"

"কী জানতে চাও বল না ?"

"তখনকার ইউরোপ কেমন ছিল ?"

হঠাৎ আমার কথার উত্তর দিতে পারেন না মণীন্দ্রলাল। চুপচাপ বসে থাকেন কিছুক্ষণ। একটু বিষণ্ণ মনে হয় তাঁকে, একটু চঞ্চলও। অনেক পরে বলেন, "এখনকার ইউরোপের সংগে তখনকার ইউরোপের তুলনা করবার জন্যে আর একবার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে—"

"গেলেই তো পারেন," ঘরের এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বলি, "বাধা কী আপনার ?"

"কোন বাধা নেই", মণীন্দ্রলাল যেন বিদ্রূপের হাসি হাসেন, "সোজা চলে যেতে পারি, কী বল ? আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই ? নিজের টাকায় যাব, খুশিমতো বেড়াব, সেই সব চেনা দেশগুলি আবার দেখব—যৌবনের দৃষ্টিতে যা কিছু তখন দেখেছিলাম ওপর-ওপর, এবার চলে যাব গভীরে—আবার নতুন করে লিখতে পারব—কী বল ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"কিন্তু দেশের বাইরে যাবার অনুমতি আমাকে দিচ্ছে কে ? নিজে টাকা খরচ করে যাব—তা-ও উপায় নেই। আশ্চর্য, একটি লোকও একটি কথাও বলছে না। তোমাদের স্বাধীন ভারতে শিল্পী লেখকেরও নিজের অর্থ ব্যয় করে বিদেশে গিয়ে সাহিত্যের রসদ জোগাড় করার উপায় নেই—"

"কিন্তু বাংলার অনেক লেখকই তো এখন বাইরে যাচ্ছেন প্রায়ই—"

"আরে সে তো অন্য দেশের নিমন্ত্রণ পেয়ে। নিজের ঘর থেকে এক পয়সা বেশি নিয়ে যাবার উপায় নেই। বিদেশে গিয়ে দেশের অর্থ অপচয় করায় আমাদের স্বাধীন ভারত সরকারের নাকি ঘোরতর আপত্তি", হেসে মণীন্দ্রলাল জোরে উচ্চারণ করেন, "অপচয় ! আমি শিল্পী, আমি লেখক, আমি নিজের দেশের জন্যে কত ভাবনাচিন্তা কাহিনী চরিত্র বয়ে আনতে পারি বিদেশ থেকে, নিজেদেরও ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দিতে পারি দেশে দেশে, সাংস্কৃতির আদান-প্রদানের সেতুও হয় তো নির্মাণ করতে পারি—কিন্তু কে আমার মূল্য দেবে শিল্পী হিসেবে ? কে আমার গুণাগুণ বিচার করবে ? রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মচারী ? পাসপোর্ট অফিসের চাকুরে ? শিল্প-সাংস্কৃতির যারা অগ্রদূত স্বাধীন ভারতের এইসব সরকারী কর্মচারীদের ওপরেই কি থাকবে তাদের পথ চলার সীমা নির্দেশ করার ভার ?"

নিজেকে হঠাৎ সংযত করে নিয়ে মণীন্দ্রলাল বলেন, "যে জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধের পর একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল, আবার তো তা গড়ে উঠল অসীম ধৈর্যে, অবিচল নিষ্ঠায়, অটুট কর্মশক্তিতে। আবার ভাঙল। গুঁড়ো-গুঁড়ো হল। কিন্তু এখন সেখানে চলেছে পুনর্গঠন—কী অদম্য উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, আমি তা দেখতে পাব না—আমার টাকা আমার শিল্পিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে খরচ করার অধিকার আমার নেই।

ছাত্র হয়ে গিয়েছিলাম তখন। সে কত বছর আগে ! চোখে ঘোর ছিল তখন। দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না। কত কিছুর কাছাকাছি গেছি, চোখ দিয়ে দেখেছি, মন দিয়ে দেখতে পারিনি। আবার দেখতে চাই—দেখতে পাব না—দেখতে দেবে না। আমি লিখব কেমন করে !"

মণীন্দ্রলালের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আস্তে আস্তে বলি, "এ নিয়ে আপনারা লেখালেখি করলেই তো পারেন ?"

"এ বয়সে সেটা কি আমার কাজ ? তোমরা করতে পার না ?"

"করা তো উচিত। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মণিদা।"

মণীন্দ্রলাল বলেন, "আমি জানি, আজও ইউরোপ আমার ভাল লাগবে—আমাকে হয় তো নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জোগাবে। একদিন, গোটা পৃথিবীটাই যেন চলে এসেছিল আমার আয়ত্তে। কত নতুন লেখকের নাম শুনেছিলাম ! কত দেশের কত মানুষের সংগে পরিচয় হয়েছিল !"

"আপনি কি লণ্ডনেই ছিলেন ?"

"লণ্ডনে আসতাম পরীক্ষা দিতে। আমার বেশি সময় সুইজারল্যাণ্ডেই কাটে—"

"কেন ?"

"আমার বড় কাকা, প্রসিদ্ধ ডাক্তার কার্তিক

চন্দ্র বসুর ছেলে চিকিৎসার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিল। আমি তার দেখাশোনা করতাম।"

"রোমা রোঁলার সঙ্গেও তো আপনার আলাপ হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে যাই তখন অন্নদাশঙ্করও আমার সঙ্গে ছিলেন।"

"অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে কি আপনার দেশে থাকতেই আলাপ ছিল?"

"না। ইউরোপেই আলাপ হয়। সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বোধহয় লণ্ডন থেকেই উনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তখন 'পথে প্রবাসে' 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত হচ্ছে। 'বিচিত্রা' আমার কাছে যেত। আমি অন্নদাশঙ্করের নাম 'বিচিত্রা' পড়েই জেনেছিলাম—"

"তারপর?"

"সুইজারল্যাণ্ডে অন্নদাশঙ্কর এসে আমার বাড়িতেই উঠলেন। আমরা দুজন একসঙ্গে সারা জার্মানী ভ্রমণ করেছিলাম।"

"বিলেত থেকে দেশে ফেরবার পর আপনার কি মনে হয়েছিল? পৃথিবী কি আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় নি তখন?"

"না, তেমন কোন কথা বোধ হয় মনে হয় নি। তবে অনেক ভেবে-ভেবে লিখতে হত। এত পড়েছিলাম, টমাস ম্যান, প্রুস্ত, কাফকা—সাহিত্যের ইতিহাস এত জেনেছিলাম যে হঠাৎ কিছু লিখতে সঙ্কোচ হত।"

"বিলেত যাবার আগে কি-কি বই বেরিয়েছিল আপনার?"

"'রমলা' আর তিনটি ছোট গল্পের বই, 'মায়াপুরী', 'সোনার হরিণ' আর 'রক্তকমল'। বিলেত থেকে ফেরবার কয়েক বছর পর 'কল্পলতা' নামে আমার আর একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়—"

"আপনার বই-এর সংখ্যা বড়ই কম।"

"আমি বরাবরই কম লিখি। আর, আগেই তো বলেছি সম্পাদকের দিক থেকে তেমন তাগাদা না পেলে আমার লেখাই হত না। 'জীবনায়ন' রামানন্দবাবুর জন্যেই আমাকে লিখতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে উনি নিজে যেতেন আমাদের পার্কসার্কাসের বাড়িতে। শান্তা দেবী তখন আমাদের কাছাকাছি থাকতেন—তিনিও আমাকে লেখার কথা মনে করিয়ে দিতেন।"

'জীবনায়নে'র পর আর কোন উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে আপনার?"

"হ্যাঁ। 'সহযাত্রিণী' আর 'এষণা', তাছাড়া একটা ছোট গল্পের বই 'ঋতুপর্ণ'ও আছে। ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'অলকা' মাসিক পত্রিকায় 'সহযাত্রিণী' বেরিয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা, ১৯৪০-৪১ সাল। কিন্তু সেদিন, বছরখানেক আগে 'প্রবাসী' ষষ্ঠ-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থের জন্যে সুধীর চৌধুরী মহাশয় আমাকে লিখতে বললেন। তখন লিখলাম, 'এষণা'—এখনও বই আকারে বার হয় নি। এটাই আমার শেষ উপন্যাস।"

"এখন কী করছেন?"

মণীন্দ্রলাল হেসে বললেন, "সুরেন্দ্রনাথ ল' কলেজে অধ্যাপনা করছি।"

"আমি লেখার কথা বলছিলাম?"

"লেখার ইচ্ছে হয়, মাঝে মাঝে কত ঘটনা কাহিনী মাথায় আসে। কিন্তু একটা তার যেন ছিঁড়ে গেছে। সব গোলমাল হয়ে গেছে। কোথাও শান্তি নেই।"

"কিন্তু আপনি লিখবেন না কেন?"

"লিখতে পারি না। চারপাশে যেন গোলমাল হয়ে যায়। চারপাশে হতাশা বিশৃঙ্খলতা, আর অশান্তি। আমি আর্টের জন্যেই লিখি। এখন আমার নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়, নিরাশ্রয়। বাইরে শান্তি না থাকলে আমার মনটাও যেন ঝিমিয়ে যায়।"

"কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল হলেও শিল্পীর কি নীরব থাকলে চলে?"

"হয় তো চলে না। কিন্তু এই পরিবেশে মহৎ কোন সৃষ্টি সম্ভব বলেও আমার মনে হয় না। মন সায় না দিলে লিখব কী, লিখব কেমন করে! এ সময় একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারলে হয়তো সব গ্লানি কেটে যেত।"

"আপনার মনের এমন অবস্থা কবে থেকে হয়?"

"দাঙ্গার সময় থেকে। তার আগে যুদ্ধ। বাবাও মারা গেলেন সেই সময়। আমিও যেন কেমন ঝিমিয়ে গেলাম—তার জের আজও চলছে।" বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মণীন্দ্রলাল বলেন, "দাঙ্গার সময়, আজও আমার মনে পড়ে, কী সাংঘাতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি, আমার স্ত্রী আর যে তোমাকে চা দিয়ে গেল, ওর নাম বাচ্চা—পার্কসার্কাসের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলাম!"

"বউদি এখানেই আছেন এখন?"

"হ্যাঁ। চল, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। কিন্তু আমার বাড়িটা একবার দেখবে না—আমার লাইব্রেরী?"

"নিশ্চয়ই।"

মণীন্দ্রলালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম নানা ভাষার অসংখ্য বই। রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থের দুর্লভ প্রাচীন সংস্করণ। কত দেশের দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থরাজি। পাশের ঘরে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পুতুল ছোট ছোট আলমারীতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণনগর থেকে আরম্ভ করে লণ্ডন, ফ্রান্স, চীন, জাপান, রুমানিয়া—প্রায় সব দেশের পুতুলই রয়েছে।

"এগুলো কার, মণিদা?"

"আমার স্ত্রীর। দেশ-বিদেশের পুতুল সংগ্রহ করা ওঁর শখ।"

দোতলায় এসে শ্রীমতী সবিতা বসুর সামনে দাঁড়ালাম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রী এঁর আছে। জনাই-বাকসার চৌধুরী বংশের মেয়ে। এঁর পিতামহ যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মতিলাল নেহরুর সমকক্ষ ও সমসাময়িক আইনজীবী ছিলেন।

শ্রীমতী বসুকে নমস্কার করে হেসে বললাম, "আপনার কথাও লিখতে হবে—কী লিখব, বলুন।"

"না, না।" বিচলিত হয়ে শ্রীমতী বসু বললেন, "আমার কথা কিছু লিখবেন না, ওঁর কথাই লিখুন—"

"আপনাকে বাদ দিয়ে মণিদার কথা কি লেখা যায়? কিন্তু আপনার অপূর্ব পুতুলগুলির কথা তো লিখতেই হবে। এত পুতুল একসঙ্গে কোথাও দেখি নি—"

দেরি হয়ে গেল। অনেক দেরি। শরতের সকাল গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে কখন। এখন প্রায় দুপুর। বারোটা বেজে গেছে। মহালয়ার ছুটি। এখনও রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। কড়া রোদ। আমি আস্তে আস্তে হেঁটেই একসময় রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ এসে পড়লাম। এ পাড়ায় আরও দু-একটা কাজ সেরে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু ইচ্ছে হল না। বেলা না হলেও বোধ হয় আর কোথাও যেতে পারতাম না। ভয় ছিল, তাল কেটে যাবে। মণীন্দ্রলালের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল।

কোন অভাব নেই মণীন্দ্রলালের জীবনে। কোন দৈন্য নেই। কখনও ছিল না। তাঁর বংশ-তালিকা উজ্জ্বল কৃতী মানুষের ভিড়ে। তাঁর পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরকুল রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধি বিত্ত সংস্কৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত। এবং সেই কারণেই মণীন্দ্রলাল যৌবনশিল্পী—তাঁর শিল্পমানসে যৌবন অম্লান। মণীন্দ্রলালের সৃষ্টিতে বার্ধক্যের স্থান নেই, জরার যন্ত্রণা নেই, ক্ষত-বিক্ষত জীবনের হাহাকার নেই—থাকতে পারে না।

যৌবনের গজদন্ত-মিনারে আজও যে শিল্পীর অক্ষত অবস্থান, তিনি দূরের মানুষ। আমার যৌবন নেই, আমি তাঁর নাগাল পাই না—পাব না।

আর আজকের যুবক? বাঁশি নেই তাদের হাতে—চোখের সামনে রক্তের মতো রাঙা লাল মাটির পথও নেই! আজকের যুবক যৌবনের দীপ্তি দিয়েই আত্মসাৎ করে নেয় দাহ দারিদ্র্য হাহাকার। আর হয়তো তাই বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় অকালবার্ধক্যের ভাঙা-চোরা দরজায়। এত অল্প সময়ে তারা হয়তো খুঁজে পায় না মণীন্দ্রলালকে।

এই দিশাহারা উদভ্রান্ত যুবকের ভিড়ে সু-উচ্চ স্বাধীন মিনার ছেড়ে নেমে আসতে পারবেন না মণীন্দ্রলাল—কৃত্রিম করে তুলতে পারবেন না তাঁর শিল্পীসত্তাকে—বিকৃত করতে পারবেন না তাঁর যৌবনশতদল। মণীন্দ্রলাল অকৃত্রিম শিল্পী।

আমি আজ তাঁর নাগাল পাব না। তবু হঠাৎ কখন মাথা তুলে তাকাব দূরে উচ্চ শুভ্র মিনারের দিকে। আর দূরে থেকে, অনেক দূরে থেকে, আমার পার-হয়ে-যাওয়া যৌবনের কান্নায়, এই অকৃত্রিম যৌবনশিল্পীকে জানাব অভিনন্দন।

চিত্রপ্রদর্শনী

হঠাৎ কোন আইডিয়া মাথায় এলে সেটাকে এঁকে রূপায়িত করতে তুলি রঙ জোগাড় করে নিয়ে বসতে বসতেই পারিপার্শ্বিকের কোন বিঘ্নতে শেষ পর্যন্ত সেটা মন থেকে সরে যাবার সম্ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। এরজন্য চিত্রকরদের অনেক সময়ে আফশোসের অন্ত থাকে না। তাই এমন অবস্থায় যাতে পড়তে না হয় তার জন্য শিল্পী বিবেক সাহা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। সরঞ্জাম নিয়ে গুছিয়ে বসার জন্য অপেক্ষা না করে তুলির কাজটা আঙুল দিয়ে সম্পন্ন করে নেওয়ায় তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেটা দেখা গেল মহেন্দ্রোদারের উদ্যোগে ফাইন আর্ট আকাদেমিতে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী এক প্রদর্শনীতে।

খুলনার আর্ট স্কুল থেকে পাস করার পর বিবেক সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। শ্রীসাহা চারুকলার সকল মাধ্যমেই কাজ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ভাবকে রূপায়িত করার জন্য ভাল উপাদান ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। কাগজ, রঙ এবং আঙুলই ছবি তৈরির পক্ষে যথেষ্ট।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে আঙুলের সাহায্যে আঁকা মোট তেত্রিশখানি ছবি দেখা গেল। এর মধ্যে জল রঙের ছবি এগারোখানি এবং বাকিগুলি কালিতে আঁকা স্কেচ। বলে না দিলে ছবিগুলি আঙুল ও নোখের সাহায্যে আঁকা, তুলির ব্যবহার হয়নি, সেটা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। ছবি আঁকায় এই ধরনের পরীক্ষা এই প্রথম এবং এর মধ্যে শিল্পীর উদ্ভাবনশীল চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জলরঙের আঁকা ছবি বা স্কেচগুলি অবশ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্যের কোন আস্বাদ দেয় না। তা ছাড়া সূক্ষ্ম রেখার কাজও, তুলির বদলে আঙুল ব্যবহারের জন্য, সীমিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছবিগুলি শিল্পগুণের প্রকাশে কৃতি শিল্পীর ছাপ দেয়। জলরঙে 'দিবা অবসানে' (১ নং), 'পার্বত্য-ভূমি' (২ নং), 'অনুদাত্ত মাধুর্য' (৪ নং), 'বনের পথে' (৬ নং) ছবি কখানি রঙের সুসমঞ্জস প্রয়োগ ও বিন্যাসের দিক থেকে প্রশংসালাভের যোগ্য।

স্কেচগুলির অধিকাংশই কাক, চিল, ময়ূর, সারস, পেচক, মুরগী প্রভৃতি পাখি, এবং মাছ ও খড়গোসের বিভিন্ন ভঙ্গীকে রূপায়িত করা। এর কতকগুলিতে বেশ সূক্ষ্ম রেখার কাজও লক্ষ্য করা যায় যা আঙুল বা নখের সহায়তায় আঁকা বলেই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বিনোবা ভাবের 'প্রতিকৃতি' 'শান্তির উপাসক' (২৭নং), 'মা ও শিশু' (২৯নং), 'পার্বত্য বালিকা' (১৯নং), 'মগ্ন' (১১নং), 'জ্যোতিষী' (১৮) প্রভৃতি ছবিগুলিতে স্কেচ আঁকায় শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্নতর মাধ্যমে ছবি আঁকার বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিবেক সাহার এই উদ্যম প্রশংসা করার মতো। এখনও অবশ্য তিনি পরীক্ষামূলক পর্যায়েই আছেন তবে আশা করা যায় এই নতুন মাধ্যমে তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি আঁকায় সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

চিল (স্কেচ) শিল্পী : বিবেক সাহা

অনুদাত্ত মাধুর্য (জলরঙ) শিল্পী : বিবেক সাহা

ট্রামে-বাসে

ছাপার হরফের মাধ্যমে বিজয়ার প্রীতি নমস্কার, শুভেচ্ছা, সাদর সম্ভাষণ ইত্যাদি প্রভৃতি জানাইতে আমাদের খুব ভাল লাগে। ইহাতে সাপ মরে, লাঠিও ভাঙে না। কোলাকুলির ধাক্কায় বুকের পাঁজরে ব্যথা হয় না, যাকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে গলাগলি করিতে হয় না এবং সব চাইতে বড় কথা, নেপথ্য-বিজয়ায় পয়সা খরচ করিতে হয় না। সুতরাং নির্ভয়ে "ট্রামে-বাসের" যাত্রী, পৃষ্ঠপোষক, পদমর্দক (বাংলা ভুল হইলেও কথাটা ভুল নয়) এবং আসনের বেয়াড়া শরিকদের বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি। অন্তত একটি দানাদার দিয়া প্রীতির দেনা যখন শোধ করিবার বালাই নাই তখন আপনারাও এই সৌজন্য নেপথ্যেই সারিয়া নিতে পারেন।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী টি এন সিং নাকি বলিয়াছেন যে, মেয়েরা যদি পাঁচ গজী শাড়ি পরেন তাহা হইলে সরকারের কিছু বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া যায়। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বাঁদীপোতার গামছা দিয়ে ম্যানেজ করে নিতে বললে 'কিছু' কেন অনেক বৈদেশিক মুদ্রাই বেঁচে যায়; এবং সেই সঙ্গে পুরুষদের জন্য কৌপীনবন্ত-র নীতিটা গেয়ে রাখলেও মন্দ হয় না!!"

শ্যামলাল বিশু খুড়োর মন্তব্যের জের টানিয়া বলিল—"মজার মজার খবর পুজোর আগে এবং পরে আমরা আরো অনেক শুনেছি। পাকিস্তানে একদল শিক্ষাভকারী জনাব সুরাবর্দীকে বলিয়াছেন—'হিন্দুর দালাল'। আমরা আর কী বলব, শুধু বলতে হয় শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর!!"

কলিকাতায় পুজোর কয়দিন ন্যায্য মূল্যের মাছের দোকান খোলা হয়।—"মাছেরা হেসেছে কি না জানিনে, তবে হেসেছেন হয়ত আড়তদারেরা। সরকারের ডালে ডালে লাফালাফি দেখে, ও'রা পাতায় পাতায় নাচানাচি করেছে।'—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রসংগত দ্রব্যমূল্যের তালিকা দোকানে দোকানে টাংগাইয়া দেওয়ার সরকারী নির্দেশটাও মনে পড়িয়া গেল।—"বস্ত্রের ছাপ-মারা মূল্যের ওপরে যে শিল্পীরা নূতন ডিজাইন করে তাক লাগিয়ে দেন, আয়করের বরাদ্দে ছাই দিয়ে যে কারিগররা খেরোয় বাঁধানো ডবল খাতা নিয়ে (এবং দুটোতেই মা কালীর সিঁদুর লেপা!) বগল বাজান, তাঁরা দ্রব্যমূল্যের টাঙগানো তালিকার কী রূপায়ণ করেন তা দেখার জন্য অপেক্ষা করুন!!"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।'

মহাত্মাজীর জন্মদিবসটিকে "পরিচ্ছন্নতা দিবস" হিসাবে পালন করার নিয়ম কয়েক বছর হইতেই চলিয়া আসিতেছে, এইবারেও তা পালন করা হইয়াছে।—"এবং তাতে কেউ কোন আপত্তি করেননি, করবার কথাও নয়; কেননা ৩৬৫ দিনের মধ্যে ঐ একটা দিন মাত্র তো!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

গান্ধী শান্তি সংস্থার সফরে গিয়াছেন শ্রীরাজাগোপালাচারী মহাশয়। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বৃদ্ধ হলেও যে তিনি বাঘ এই কথাটা আশা করি প্রেসিডেন্ট কেনেডি শোনেননি সুতরাং শান্তির বাণী নির্বিঘ্নেই প্রচার করা যাবে। ফল? তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়, আমাদের আদর্শ—মা ফলেষু!!"

সম্প্রতি 'বন্য পশু সপ্তাহ' পালন করা হইয়াছে।—"খুব ভালো কথা। তবে আশা করব 'জানর' (রূপদর্শীর ভাষায়) সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা হয়ত হবে না।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পূর্ব পাকিস্তানে টিকিটবিহীন কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করার ফলে ছাত্র-পুলিসে 'ঘর্ষ' বাধে।—"বিনা টিকিটে ভ্রমণের ব্যাপারে আমরা কায়েদে আজমের দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করিনে।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে জানা গেল, আমাদের জাতীয় আয় নাকি ২·২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্যামলাল মনের আনন্দেই বুঝি ইংরেজীতে মন্তব্য করিয়া বসিল—"হোয়াট এ রাইজ, মাই কাণ্ট্রিম্যান।"

কোন এক সাংবাদিক নেহরুজীকে বলেন—'সমবয়সী অনেকের চেয়ে আপনাকে কুড়ি বছর কম বয়সের মনে হয়; পরে প্রশ্ন করেন—'আপনার এই যৌবনের রহস্য কী?'—'আমি কোন কিছুতেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইনে।'—নেহরুজী সংক্ষেপে বলেন। বিশু খুড়ো বলেন—"ও'র কোন কিছুতে বিশেষ উদ্বেগ নেই বলেই তো আমাদের উদ্বেগের শেষ নেই!!"

সংবাদ পরিবেশক বলিয়াছেন চীন নাকি ভারতের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া কলংক রটনা করিতেছে।—"লোকের নিন্দা পুষ্পচন্দন অলংকার পইরাছি গায়"—সহযাত্রী বাউল গান ধরিলেন।

এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, হিটলার নাকি এখনও বাঁচিয়া আছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এটা ছাপার ভুল, হিটলার বেঁচে নেই, বেঁচে আছে হিটলারি!"

শ্যামলাল বলিল—"মিসিসিপী বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক নিগ্রো ছাত্রকে ভর্তি করা নিয়ে ডেমোক্রেসির মাদার টিংচাররা যে কান্ড করে বসলেন তাতে বারবার সেই নীলবর্ণ শৃগালের উপাখ্যানই মনে পড়তে লাগল!!"

লন্ডনের এক সংবাদে জানা গেল যে, কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'ধূমপান নিষিদ্ধ' বলিয়াই ছেলেরা ধূমপানের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁর বিদ্যালয়ে অবাধে ধূমপান করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।—"নেহাত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে বাধা রয়েছে, নইলে বিলেতের ঐ বিদ্যালয়ে অগণিত দেশী-বিদেশী ছাত্র ভর্তি এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াত।"—মন্তব্য করেন পাঁচ ছেলের বাপ বিশু খুড়ো।

'পুজোর ক'দিন কর্পোরেশনের আলোর ব্যবস্থায় কলকাতার পথ-ঘাট ঝলমল করে উঠেছে; দুষ্ট লোকেরা বলাবলি করছে—ওটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকারই আলোকিত সংস্করণ।'—সহযাত্রীরাও খুড়ো-শ্যামলালের মত লায়েক হইয়া উঠিয়াছেন!

কোয়েলালামপুরের এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানকার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নাকি ভ্রাম্যমাণ কমনওয়েলথ টিমের সঙ্গে স্থানীয় দলের ক্রিকেট খেলা যাহাতে বৃষ্টিতে পন্ড না হয় সেজন্য এক ওঝা ডাকিয়া আনিয়াছেন। তিনি নাকি রুমালে গিঁট দিয়া বৃষ্টি বাঁধিয়া দিতে পারেন।—"এই সঙ্গে যখন-তখন বৃষ্টি নামাইয়া দেওয়ার কায়দাটাও যদি তিনি আয়ত্ত করেন তা হলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক টিমই উপকৃত হবে। অনেক বছর আগে অ্যাশেজ-এর লড়াইয়ে লন্ডন উপকৃত হয়েছিল, এবং এই কথা বলেছিলেন সেখানকারই রাজা, স্বর্গত পঞ্চম জর্জ।"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

বিশ্ববিচিত্রা

তুষার মানবের অস্তিত্ব রূপকে

এভারেস্ট বিজয়ী এবং তুষারমানবের সন্ধানে বায়বহুল সরঞ্জামে সুসজ্জিত এক অভিযাত্রী দলের নেতা সার এডমান্ড হিলারী ঐ প্রাণীটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সামান্যমাত্রও বিশ্বাস পোষণ করেন না।

সম্প্রতি মাণ্ট্রলে এক ভাষণে তিনি বলেনঃ "আমার স্থির বিশ্বাস যে, তুষার-মানব রূপকথার একটি চরিত্র। যে অঞ্চল ওর আবাসভূমি বলে অভিহীত করা হয় সেখানে ওর অস্তিত্ব শুধু সে-অঞ্চলের অধিবাসীদের ধারণার মধ্যেই রয়েছে।

সার এডমান্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তুষারমানবের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তাঁর দলের সদস্যগণ কর্তৃক আহরিত যাবতীয় বিবরণীর তিনি একটি সরল ও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি বলেন, আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে তুষারমানবের পদচিহ্ন বলে যা ধরা হয় সেটা বরফের ওপর ছোট ছোট কোন জীবের পায়ের দাগ যা সূর্যকিরণে বরফ গলে যাওয়ার ফলে বড় দেখায়।

চীনারা বাস্তবিকই এভারেস্ট জয়ে সক্ষম হয়েছিল কিনা সে বিষয়েও সার এডমান্ড সন্দেহ পোষণ করেন। চীনাদের দাবি হচ্ছে তাদের পর্বতারোহীরা শিখরে উঠেছিল রাত দুটোর সময়, যখন কোন ছবি তোলা অসম্ভব। তাছাড়া শিখরদেশে পতাকা না পুঁতে ওরা মাও সে তুংএর এক আবক্ষ মূর্তি রেখে এসেছে।

সার এডমান্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, নেওয়ার স্বপক্ষে আরো প্রমাণের দরকার।

ঘুম কমিয়ে দীর্ঘায়ু লাভ

ঘুম কি এমন শত্রু হতে পারে যে আয়ু কমিয়ে দেয় এবং জীবনীশক্তি হ্রাস করে? প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট তাই মনে করতেন। তিনি প্রায় আশী বৎসর জীবিত ছিলেন এবং কখনও বেশী ঘুমান নি।

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে মত কি? তাঁরা বলেন আট ঘণ্টা ঘুম বেশী হয়ে যায়।

বস্তুত বৃটেনে চার বৎসরব্যাপী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার পরের চেয়ে বিনিদ্র রাত্রি কাটাবার পরদিন অনেকে বেশী ভালভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়, খেলাধুলোর ক্ষেত্রে উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারে।

নিদ্রা ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ, সার হার্মান ওয়েবার বলেন, অতিরিক্ত ঘুম মস্তিষ্কের শক্তি অকালে ক্ষয় হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অপর এক বিশেষজ্ঞ বলেন ঠিক কতটা ঘুম দরকার সেটা নিরূপণ করার কেবলমাত্র একটি উপায়ই আছে। ঘুমের সময় কমিয়ে কমিয়ে ন্যূনতম সময়টি ঠিক করে নিন এবং কখনও তার বেশী সময় দেবেন না।

এক চিকিৎসক বলেন, "গড়পড়তা মানুষের পক্ষে ছ ঘণ্টার ঘুমই যথেষ্ট এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সাড়ে ছ ঘণ্টা। তবে ঘুম গাঢ় বা পাতলা তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে।"

বিখ্যাত বৃটিশ চিকিৎসক সার জেমস ক্যান্টলি একবার ঘোষণা করেন যে ভোর চারটের পর তিনি কদাচিৎ শুয়ে কাটিয়েছেন। নেপোলিয়ন দিনে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা বিশ্রাম করতেন।

এক ঘণ্টায় হামবুর্গ থেকে সিডনী

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর ব্রুনস্উইক শহরে রকেট গবেষণাকারীদের এক সম্মেলন হয়ে গেল এবং এই সম্মেলন থেকেই জন-সাধারণ জানতে পারলো যুদ্ধের পর ওদেশের রকেট সম্বন্ধে গবেষণা কতদূর এগিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর দুই মহাশক্তির মধ্যে সুপার রকেট নিয়ে যে লড়াই শুরু হয়েছে, জার্মান বিজ্ঞানীরা সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় না। বর্তমানে জার্মান বিজ্ঞানীরা স্পেস গ্লাইডার বা মহাকাশে ভাসমান যান নিয়ে পরীক্ষা চালাতে মনস্থ করেছেন।

"ইউরোপ থেকে এক ঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়া"

গোয়েন্দা কুকুরের পিঠে বাঁধা লাউডস্পীকার—পশ্চিম জার্মানীতে দূর থেকে বেতারে গোয়েন্দা কুকুরকে নির্দেশ দেবার এই অভিনব উপায়টি সম্প্রতি বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বার্লিনের জরুরী অবস্থাকালীন পুলিস-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন কালে প্রদর্শিত হয়

খুড়োর গঙ্গাযাত্রা

শিবরাম চক্রবর্তী

এবার ফুটবলের মরসুম শুরু হতেই হরিপদর খুড়ো অসুখে পড়লেন।

প্রত্যেক বছরই পড়তেন এই সময়টায়। ফুটবলের সঙ্গে যেন তাঁর নাড়ির যোগ ছিল। হরিপদ বলে, তার কাকা এককালে ডাকসাইটে প্লেয়ার ছিলেন, তাই। এখন তো অথর্ব হয়েছেন নিজে আর মাঠে নামতে পারেন না, গোল দেবার খ্যামতা নেই, তাই গড়ের মাঠে বল পড়লেই তাঁর শরীরের মধ্যেই যত গোল হতে থাকে। স্বয়ং যমরাজ কিক্ করার জন্যে কর্ণারে এসে দাঁড়ান।

ফুটবলের দহরম লাগতেই তাঁর দেহে যেন আধিব্যাধির মহরম লেগে যায়।

তবে এবার যেন একটু বাড়াবাড়ি। প্রায় ফি শনিবারেই টালমাটাল যাচ্ছে। সেদিনই আবার লীগের, কি শীল্ডের কোন-না-কোন দারুন খেলা থাকে।

প্রায়ই হরিপদকে আপিস কামাই করতে হয়। নয়তো আপিসে এসে ছুটি নিয়ে চলে যেতে হয়। ডাক্তার ডাকতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে, নার্সের যোগাড় দেখতে হবে—একটা-না-একটা বায়না লেগে রয়েছেই।

আজকে আবার ফুটবলের মরসুমের শেষ খেলা। শীল্ডের ফাইন্যাল। মোহনবাগানের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোন্ এক দুর্ধর্ষ টীমের লড়াই। আর আজই আবার হরিপদর কাকার যায়-যায় অবস্থা।

আপিসে এসে অবধি সে উসখুস করছে, কখন সাহেবের কাছে ছুটির আর্জি নিয়ে যাবে।

সাহেবের কাছে গিয়ে কিন্তু-কিন্তু হয়ে খবরটা পেশ করতেই তিনি চোখ তুলে বললেন—কিসের জন্য ছুটি?

'আজ্ঞে, আমার সেই খুড়ো, যিনি অনেক-দিন ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছেন—'

'জানি। কিন্তু তার জন্য ছুটি তো তুমি নিয়েছ এর আগেই।'

'তাঁর জন্য ডাক্তার ডাকতে।'

'আরও নিয়েছ। আমার মনে পড়ছে বেশ।'

'নার্স যোগাড় করার জন্য। নার্স না রাখলে—'

'হ্যাঁ, জানি। নার্স না থাকলে ডাক্তার আসে না।' সমঝদারের মতন ঘাড় নাড়েন সাহেব : 'ভালো নার্সারি না হলে ডাক্তারি জমে না।'

'হাঁ সার।' সায় দেয় হরিপদ কেরানী। —'তারপর ওষুধ আনবার জন্যও ছুটি নিয়েছি কয়েকবার। দামী দামী ইঞ্জেকশনের ওষুধ, অথচ ভ্যাজাল নয়, খুঁজে বার করা দারুন ভ্যাজাল আজকাল।'

'জানা আছে। তা আজ আবার কিসের ছুটি?'

আজ্ঞে ও আমার সেই খুড়ো......

'আমার সেই খুড়োর আজ এখন-তখন অবস্থা......প্রায় যায়-যায়......।

'যায়নি এখানো?' সাহেব শুধান : 'তোমার চাকরিটা না খেয়ে যাবে না মনে হচ্ছে।'

'না সার, আজকেই যাবে। খাবি খাচ্ছেন এখন। লোকজন যোগাড় করে তাঁকে গঙ্গাযাত্রায় নিয়ে বেরুতে হবে আমায়...।'

'তাই নাকি? সে ত খুব ভালো কথা। গঙ্গাযাত্রায় গেলে শুনেছি কেউ আর নাকি ফেরে না। তাই কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।'

'তবে কেউ কেউ ফিরেও আসে নাকি আবার।' তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালেন : 'তোমার কাকার যেমন হাবভাব, কিছু বলা যায় না।'

'বলছেন কি সার? নাভিশ্বাস উঠেছে তাঁর এখন......।'

..."সেটা তোমার ভাইকেই দেব"

'বিশ্বাস হয় না আমার।'

'বিশ্বাস হয় না ত চলুন আমার সঙ্গে স্বচক্ষে দেখবেন।'

'না-না, নাভিশ্বাসে অবিশ্বাস করার কিছ নেই। তবে আমার ধারণা, তা-ও তি কাটিয়ে উঠবেন। গঙ্গার হাওয়া খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠে বসবেন আবার......।'

'অসম্ভব সার। এমন কথা বলবেন না।' হরিপদ শুনে দুঃখিত হয়।

'তোমার কয় কাকা?'

'একটি মোটে। ইনিই একমাত্র।'

'আর কোন কাকা নেই জানো তো ঠিক?'

'আমার কাকার খবর আমি রাখব না বলেন কি সার?'

'গঙ্গাযাত্রায় কাল নিয়ে গেলে হয় না?'

'কাল ত বাসিমড়া হয়ে যাবেন। সজ্ঞা নিয়ে যাওয়াই নিয়ম যে। এইটেই আমা কাকার শেষ ইচ্ছা। আর আমি কাকা একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে......এই কাকা আমায় বাবার মত কোলে পিঠে করে মানু করেছেন......এ'র অন্তিম ক্ষণে যদি আমি

এ'কে না দেখি ত কে দেখবে?'

'তাও তো বটে। তোমার আর ত কোন কাকা নেই। কার ওপর তুমি তাকাবে এর পর? বেশ, যাও। কিন্তু এই তো তোমার শেষ ছুটি? কী বলো?'

'হাঁ সার। আর ত আমার কাকা নেই। এ-কাকাও নেই আর।'

'এই তোমার শেষ ছুটি মনে থাকে যেন।'

পরের দিন হরিপদ আপিসে আসতেই তার তলব হল সাহেবের ঘরে।

'হরিপদ!' বললেন বড় সাহেবঃ 'আমার আপিসে শীগগিরই একটা চাকরি খালি হবে, ভাবছি সেটা তোমার ভাইকেই দেব।'

'আমার ভাই।' হরিপদ যেন আকাশ থেকে পড়ে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাই। তোমার সঙ্গে চেহারার ভীষণ মিল। মনে হয় যেন তোমারই জোড়া। তাকে আমি দেখেছি কালকে।' জানালেন সাহেবঃ 'কথা বলার সুযোগ পাইনি যদিও। যা ভিড় ছিলো।'

'কোথায় দেখলেন?' হরিপদ জিগোস করে—একটু অবাক হয়েই।

'তুমি কাল খুড়োর সংকারে আপিস থেকে ছুটি নিয়ে গেলে, তারপরে আমিও বেরুলাম। আর, তার একটু পরেই দেখাটা হল। অবশ্যি, সে আমায় দেখতে পায়নি।'

'কোথায় দেখা হল?' হরিপদ তখনো বিমূঢ়।

'খেলার মাঠে। কোথায় আবার? ময়দানে। বহুদিন ফুটবল খেলা দেখিনি, কাল শখ হল হঠাৎ দেখবার। চলে গেলাম শীল্ডের ফাইন্যাল দেখতে। সেইখানেই দেখা হল।'

'ময়দানে? গড়ের মাঠে?'

'না, মাঠে ঠিক নয়। আমি বসেছিলাম ক্লাবের বেঞ্চে, আর সে ছিল গোল পোস্টের দিকের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে। তুমি যখন নিমতলায় খুড়োর গঙ্গাযাত্রায় ব্যস্ত ছিলে, সে তখন দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের খেলা দেখছিল। বাবাঃ! কী তার লাফ ঝাঁপ! কী চিৎকার '

'আমার ভাই!' আপনমনেই আওড়ায় হরিপদ।

'ছেলেটি তোমার মতই দেখতে। অবিকল! তোমার মতই কাজের হবে মনে হয়। চাকরিটা খালি হলে তাকেই দেব ভাবছি।'

'ও! আমার সেই যমজ ভাই! বুঝতে পেরেছি এখন।'

বিস্ময়ের অবস্থার হরিপদ হাসিখুশির অবতারণা করেঃ 'ছোটবেলায় হারিয়ে গেছল ভাইটি! সে-ই তাহলে। মার মুখে শুনেছি তার কথা। সেই হবে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, সেই। সে ছাড়া আর কেউ নয়।'

'সে তাহলে' এই কলকাতাতেই আছে দেখছি।'

'নিশ্চয়। আর খেলার দিনে তাকে গ্যালারিতে দেখতে পাবে তুমি। নির্ঘাৎ দেখবে। যাও তার খবর নাও গে, খুঁজে বার করো তাকে।'

'নিশ্চয় বার করব সার। আপনি খেলার দিনে দিনে ছুটি দেবেন আমায়।'

'এখন থেকেই ছুটি দিলাম। যেখানেই থাক, তাকে খুঁজে বার করো আগে। চাকরিটা আমি তাকেই দিতে চাই।'

'বার করব সার। করব বইকি বার।'

'হ্যাঁ, তাই করো। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও খুঁজতে, দেরি করো না আর। আর, ভালো কথা, তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ফিরো না যেন। তাকে না নিয়ে আর ঢুকো না এ-আপিসে। বুঝলে?'

তাকে না নিয়ে আর ঢুকো না এ আপিসে

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

পনের

সুধামুখী টের না পায়। সে জানে, ইস্কুলে পড়ছে ছেলে। লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করবে—যেমন আর দশজনে করে থাকে। সুধামুখীর বাবা যেমন একজন। তাদের বেলেঘাটার গলিটুকু জুড়ে এবং পাড়ায় পাড়ায় যেমন সব শিষ্টশান্ত সংসারী লোকেরা। পড়ছে সাহেব ঠিকই, তাতে অবহেলা নেই। ইস্কুল যখন থাকে না, সেই সময়টা যে নফরকেষ্টর সঙ্গে।

নফরকেষ্ট বুঝিয়েছেঃ পড়ার সময়ে পড়তে তো মানা নেই। কাজকর্ম তারপরে। ভাল ভাল ঘরের ছেলেরা গাড়িজুড়ি চড়ে ইস্কুলে যায়, টিফিনে সন্দেশ খায় ছুটির পরে বাড়ি গিয়ে খেলা। ধরে নে, আমরা তেমনি খেলে বেড়াই দু-জনে।

কিন্তু খেলার আগেও কিছু আছে। ভাল ঘরের ছেলে ছুটির পরে বাড়ি ফিরছে, সাহেব একবার লক্ষ্য করে দেখেছিল। নফরকেষ্টর কথার মধ্যে সেই গল্প গুঁজে দেয়। মা দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজা অবধি এগিয়ে এসে। হাত ধরে ছেলেকে উপরে নিয়ে যায়। উপরের বারান্ডায় বসিয়ে খাবারের প্লেট দেয় হাতে। ছেলে খেতে চায় না তো মা একটা একটা তুলে জোর করে মুখে গুঁজে দিচ্ছে—

নফরকেষ্ট ওদিকে আগের কথার জের ধরে চলেছেঃ পড়বি যেমন, সংসারও দেখবি সেই সঙ্গে। চালের দানা খুঁটে খুঁটে মায়ের হাতে এনে দিতিস—ধরে নে, এ-ও তাই। চাল না এনে টাকাপয়সা খুঁটে নিয়ে আসা। খুব লাগসই গল্পটা বলেছিল—কানায় আর খোঁড়ায় একজোট। আমি হলাম সেই খোঁড়া—ঘাড়ে তুলে মোকামে হাজির করে দিস তবে আমি কাজ করি। তুই আপাতত কানা আছিস, দু-দিনেই চোখ ফুটে যাবে। তখন কারিগর খোঁজদার একাই সব। খোঁড়াকে লাগবে না, কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিবি। দিস তাই, রাগ করব না। তুই বড় হলে সুখই আমার।

বকবক করে নফরকেষ্ট এমনি সব বলছে। সাহেবের কানেও যায় না। ঘুরতে ঘুরতে এক রাস্তায় ইস্কুলের ফেরত এক বড়লোকের ছেলে দেখেছিল একদিন। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রকাণ্ড ঘোড়ায়-টানা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটেছে—'তফাত যাও' 'তফাত যাও' করছে। সহিস পিছনের পাদানি থেকে। ছেলে এসে পৌঁছল বাড়ি। গয়না-পরা ভারি সুন্দরী মা ফটক অবধি এগিয়ে এসে ছেলের হাত ধরলেনঃ এত দেরি কেন আজ? অনতিদূরে সাহেব—নিষ্পলক। দোতলার ঝুল-বারান্ডায় মা আর ছেলেকে আবার দেখা যায়। ছেলের মুখে মা খাবার তুলে দিচ্ছে। সাহেবের আসল মা-ও নিশ্চয় এমনি সুন্দর ছিল। মা মাত্রেই সুন্দর।

ফুলের বাগানের মধ্যে ঝকঝকে বাড়ি, হাস্যমুখ পরমাসুন্দরী মা-জননী, সুবেশ সুন্দর ছেলে, বিকালের রোদে-ভরা প্রসন্ন আকাশ, বড়-রাস্তায় গাড়ি-মানুষের সমারোহ—সমস্ত পার হয়ে এসে সাহেব পায়ে পায়ে তাদের গলিতে ঢুকে পড়ে। নর্দমার দুর্গন্ধ নোংরা জল গলি ছাপিয়ে ওপারে পড়ছে, লাফিয়ে পার হতে হয় জায়গাটা। দুটো মেয়ের মধ্যে কি নিয়ে হঠাৎ ঝগড়া বেধেছে—আকাশ-ফাটানো চেঁচামেচি। ভদ্র মানুষেরা—উজ্জ্বল পথের উপর এইমাত্র যাঁদের সব দেখে এলো—শুনতে পেলে ছি-ছি করে দু-কানে আঙুল দেবেন। কিন্তু ফণী আঢ্যির বস্তির যাবতীয় বাসিন্দা কাজকর্ম ফেলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে উপভোগ করছে। হাততালি দিয়ে স্ফূর্তি দিচ্ছেঃ লাগ ভেলকি, লেগে যা। এবং 'নারদ' 'নারদ' বলে কলহের দেবতা নারদ ঋষিকে আহ্বান করছে।

ঘোর হয়ে এলেই এক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়া। সাজগোজ সেরে মেয়েরা সব বেরিয়ে পড়ল—কেউ রাস্তায়, কেউ বা দরজায়। সাহেবও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে—খোঁজদার হয়ে মক্কেলের খোঁজ করে। ভাল কাজকর্ম যত কিছু সন্ধ্যার পর থেকেই। স্ফূর্তিবাজ লোকে টাকা খরচা করতে বেরোয় তখন। আহা, কষ্ট করে কত আর

ঘ্রেবে—সাহেবরাই কাজটুকু ঠিক করে সমাধা করে দেয়। খরচ করা নিয়ে কথা—লহমার মধ্যে সবসুদ্ধ খরচা হয়ে গেল। টাকা এবং টাকার ব্যাগটাও। মানুষজন এখন নতুন চোখে দেখে সাহেব—টাকা বয়ে বেড়ানোর মুটে এক একটা। সাহেবি পোশাক-পরা মানুষটা ঐ চুরুট ফুকতে ফুকতে যায়—ব্যাগের মধ্যে টাকা। শৌখিন কয়েকটি মেয়ে সুবাস ছড়িয়ে দোকানে ঢুকল—টাকা সুনিশ্চিত সকলের সঙ্গে, কে কোথায় গোপন করে রেখেছে সেই হল কথা। কপালে চন্দন স্থূলবপু একজন থপথপ করে যাচ্ছে—এই লোক নোটের তাড়া কোমরে বেঁধে নিয়েছে ঠিক। একরকম আলো ফেলে মানুষের চামড়া-মাংস ভেদ করে ভিতরের ছবি তুলে নেয়। সাহেবের চোখেও তেমনি কোন আলো থাকত—জামা-কাপড় ভেদ হয়ে টাকাপয়সা যাতে দেখতে পাওয়া যায়!

কাজকর্ম সেরেসুরে ফিরতে রাত হয়ে যায়। নফর তো চিরকালের মার্কা-মারা মানুষ—তাকে নিয়ে কথা নেই। কিন্তু নিশিরাত্রে সাহেব তার সঙ্গে রয়েছে, সুধামুখী দেখতে পেলে মারমুখি হবে। মেজাজি মেয়েমানুষ—কী যে করবে ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের মাথায় বসিয়ে দেয় এক ঘা, অথবা নফরার মাথায়!

কাজ নেই সাহেব, রাতে তুই বাড়ি যাস নে। আগে এঘাটে ওঘাটে আস্তানা ছিল, আবার তাই হোক।

দরজার পাশে সাহেবের হোগলার ঘর প্রায়ই এখন খালি পড়ে থাকে। ভোরবেলা ইস্কুলের মুখে বই-খাতা আনতে কেবল একবার যায়।

সুধামুখী ধরে ফেলে পথ আটকে দাঁড়াল: দিব্যি তো নিরালা ঘর—পুরানো রোগে কি জন্যে ধরল?

সাহেব বলে, গরম লাগে, ঘুমুতে পারি নে। গঙ্গার কী সুন্দর হাওয়া!

খাস কোথা রাতে? পয়সা কোথা পাস, না উপোস করে থাকিস?

সাহেব একগাল হেসে বলে, উপোস কোন দুঃখে করতে যাব? সন্ধ্যাবেলা গোগ্রাসে চাট্টি গিলে নেওয়া আমার ভাল লাগে না।

একটুখানি ঘুরিয়ে বলে, পয়সার অভাব কি পুরুষোত্তমবাবুরা থাকতে! রোজগার করে নিই।

এবং প্রমাণস্বরূপ পকেট উলটে টাকা-পয়সা সমস্ত ঢেলে দেয়।

দেখ আছে কিনা। নিয়ে চলে যাও।

সুধামুখী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সাহেব বলে, ওদের আড়তে একটা কাজ নিয়েছি।

কিন্তু সবই দিয়ে দিচ্ছিস—কিছু তো নিজের জন্য রাখলি নে।

অবহেলার ভঙ্গিতে সাহেব বলে, এসে যাবে আবার। পয়সা রোজগারের মতো সহজ কাজ আর নেই মা।

টাকাপয়সা তুলে নিয়ে সুধামুখী আঁচলে বাঁধল। কী ভাবল, কে জানে! ভাবল হয়তো, করুণার সাগর পুরুষোত্তমবাবু সাহেবকে আদরের চোখে দেখেছেন। সাহেবের চেহারার গুণে, সাহেবের কথা-বার্তা শুনে। অঢেল টাকা-পয়সা—কোন একটি অজুহাত করে দিয়ে দিলেই হল।

বই নিয়ে সাহেব ততক্ষণে ছুটে বেরিয়েছে। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল।

বর্ষাকাল এসে পড়ল।

গরম তো কেটে গেছে সাহেব। এবারে ঘরে এসে থাক।

এখন বৃষ্টিবাদলা। হোগলার ছাউনি পচে গেছে একেবারে। জল মানায় না।

সুধামুখী নফরকেষ্টর উপর গিয়ে পড়েঃ শুধু মুখে-মুখে বাপ হওয়া যায় না—

নফরকেষ্টরও তুড়ুক জবাবঃ লেখাতেও রয়েছে তো। ইস্কুলের খাতায় লেখা—মাস্টার-পন্ডিতেরা সাক্ষি।

বাপ হলে ছেলের সুখ-সুবিধা দেখতে হয়। ঘরের ছাউনি পচে গেছে, হোগলা দিয়ে নতুন করে ছেয়ে দাও।

নফর হা-হা করে হাসে ঃ এই কথা! হোগলা কেন সোনা দিয়ে ছেয়ে দিলেও ছেলে আর ঘরে থাকছে না। মন উড়ু-উড়ু, বাইরের টান—

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, ঘাটে মাঠে থাকতে দিয়েছিলে কেন সুধামুখী? আমি তো ছিলাম না তখন। আর হবে না, দুনিয়া চিনে ফেলেছে ছেলে।

শীতকাল সামনে। এবারে কি হবে সাহেব? ঘাটে যা কনকনে শীত—ঘরে না উঠে যাবি কোথায় দেখব।

কত শীত পড়ে দেখা যাক। ডরাই নে।

সুধামুখীর কথা সাহেব কানে নেয় না। কাজের গরজে বাইরে এসেছিল নফরকেষ্টর কথায়। থাকতে থাকতে এমন হয়েছে, সেই খুপরি-ঘরে পা দিতেই কেমন যেন আতঙ্ক।

ওরে সাহেব, অসুখ করবে শীতের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে যদি পড়ে থাকিস।

সাহেব বলে, শীতকাল বলে সবাই বুঝি চাল-বেড়া দেওয়া ঘরে গিয়ে উঠেছে! রাত্তিরবেলা বড়রাস্তার ফুটপাথগুলো ঘুরে একবার দেখে এসো। এত মানুষ বাইরে কাটাচ্ছে তো তোমার সাহেবই বা অক্ষম কিসে?

মাথায় খাসা এক মতলব এসে গেছে। তাই সাহেব অকুতোভয়। ফাঁকার মধ্যেই রাত কাটাবে সে, লেপ-বিছানা লাগবে না, অথচ ঘরে শোওয়ার চেয়ে ঢের বেশি সুখ। বলুন দেখি, কী সে ব্যাপার? হেঁয়ালির মতো ঠেকছে—

পাড়াটাই বড্ড সুখের যে! অন্য পাড়ায় হবে না। শীতকালটা আদিগঙ্গার ধারে ধারে আরও দক্ষিণে চলে যেতে হবে। কেওড়াতলায়। কালীক্ষেত্রের মহাশ্মশান মায়ের দয়ায় চিতার অকুলান নেই। অহোরাত্র সারি সারি জ্বলছে। দরাজ উঠোনের উপর চিতার জায়গা, চতুর্দিক ঘিরে পাকা দালান। আগুনে আগুনে হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে আছে। তবু যদি শীত করে, কোন এক চিতার পাশে বোস গিয়ে। পরের খরচায় গনগনে কাঠের আগুন—হাত সেঁক, পা সেঁক। তার পরে শয্যা নাও আরাম করে, দালানে বা উঠানে যে জায়গায় খুশি। কেউ কিছু বলতে যাবে না।

এমন ব্যবস্থা থাকতে কোন্ দুঃখে সাহেব তবে হোগলার মধ্যে মাথা ঢুকাতে যাবে?

সুধামুখীর সর্বক্ষণ দুঃখ, ঘরে মন বসে না—দিনে দিনে ছেলে আমার পর হয়ে গেল।

পারুল বলে, বয়স হচ্ছে কি না। বিয়ে দিলে ঠিক উল্টো হবে দেখো। কাজকর্মে বাইরে পাঠালে ছুতোনাতায় ঘরে এসে ঢুকবে।

তারপরেই পারুলের সেই পুরানো দরবার, অনেকবার যা হয়ে গেছে।

হাঁ—বলে দাও দিদি, যোগাড়-যন্তরে লেগে যাই। সামনের ফাগুনে দু-হাত এক করে দেবো। তুমি ছেলেওয়ালা—তোমার তো কিছু নয়। খরচ-খরচা হাঙ্গামাহুজ্জুত আমার।

বলে ফিকফিক করে হাসেঃ ভাল মজা হল—ছিলে দিদি, হয়ে যাবে বেয়ান। সম্পর্ক যা-ই হোক, আমি চিরকাল ছোট-বোন হয়েই থাকব।

সুধামুখী সস্নেহে তাড়া দিয়ে ওঠেঃ দূর পাগলী! একেবারে ছোট মানুষ যে ওরা। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। আমার সাহেবের হাঁড়িতে তোর মেয়ে চাল দিয়ে এসে থাকে তো নিশ্চয় তা হবে। কেউ খন্ডাতে পারবে না।

নাছোড়বান্দা পারুল বলে, ছোট তা কি হয়েছে! সেকালে কত ছোট ছোট বর-কনেয় বিয়ে হত। সে বড় মজা। আমাদের গাঁয়ে দেখেছি একজোড়া। কনে-বউয়ের পুতুলের মুন্ডু ভেঙে গেছে বরের হাত থেকে পড়ে। বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খিমচি কেটে ঝগড়া করে কেঁদে বউ অনর্থ করে। তারপরেও আবার শাশুড়ির কাছে গিয়ে নালিশ। বাড়ি সুদ্ধ মানুষ হেসে কুটি-কুটি হচ্ছে। আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে দিদি।

স্বপ্নে মেতে আছে পারুল, তাকে নিরস্ত করা দায়। সুধামুখী বলে, আসুক তো

ফাগুন মাস। কিন্তু বিয়েটা কোথায় হবে শুনি? বউ নিয়ে সাহেব কোন জায়গায় উঠবে? এখানে—এই বাড়িতে? অ ঘেন্না!

পারুলও বুঝি সেটা ভাবে নি! বলে, তাই কখনো হয়—ছিঃ ছিঃ! ঠিক ওপারে চেতলায় একটা ঘর দেখে এসেছি এখুনি নিয়ে নেওয়া যায়। সাহেবের আড়তের খুব কাছে হবে, আমরাও যখন তখন গিয়ে দেখে আসতে পারব। সব দিক দিয়ে সুবিধা। নিয়ে নেবো ঘরটা?

সুধামুখীও ভাবছে আলাদা জায়গায় ঘর নেবার কথা। ভাবনাটা পেয়ে বসেছে তাকে। সে ঘর চেতলায় নয়, কাছাকাছি কোনখানে নয়—এই কালীঘাটের অনেক দূরে একেবারে ভিন্ন এলাকায়। এ পাড়ার চেনা মানুষ সেদিকে যাবে না। নফরকেষ্ট নয়, কেউ নয়। জীবনের এই অধ্যায়টা আদিগংগার জলে ভাসিয়ে দিয়ে শুদ্ধ-স্নিগ্ধ হয়ে সাহেবের হাত ধরে মা আর ছেলে নতুন বাসায় গিয়ে উঠবে। পুরুষরা রাত্রিবেলা মুখ ঢেকে বিবরে এসে ঢোকে। ঘরে ফিরে গিয়ে আবার সেই আগেকার মানুষ—বিবরের লীলাংগনা অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে। সারা জীবনেও ফাঁস হয় না। এমনিই তো বহু, এক-শ'র ভিতরে অন্তত নব্বুই। সুধামুখীরও বা কেন হবে না?

ঠান্ডাবাবুর কথাঃ জীবন মরতে চায় না, বেঁচে থাকবার বড় সাধ। অঙ্কুর ইট-চাপা পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল—ডালে পাতায় কেমন সবুজ সুন্দর আমগাছ ঐ চেয়ে দেখ। সকালের রোদে স্নান করে পবিত্র হয়ে পাতা ঝিলমিল করছে। সুধামুখীও ঘরে ফেরার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। বাপের ঘরে ঠাঁই হবে না, ছেলের ঘরে যাবে। সাহেব, তাড়াতাড়ি তুই মানুষ হয়ে যা। ছেলে, ছেলের বউ, কচি কচি নাতি-নাতনী—সুধামুখী কর্ত্রী সে ঘরের। এ-পাড়ার, এবং এই জীবনের তিল পরিমাণ চিহ্ন নিয়ে যাবে না—না রানী সে ঘরের বউ হবে কেমন করে? ফুলের মতন মেয়ে রানী, বড় আদরের ধন, "মাসি" "মাসি" করে সুধামুখীর কাছে ঘোরে। তা বলে নতুন সংসারে বউ হতে পারে না পারুলের কলঙ্কের ফুল।

ফাগুনের ঢের দেরি, তাড়াতাড়ি কিসের পারুল?

পুরুষোত্তমবাবুর আড়তে কতক্ষণ ধরে কি কাজ—কত টাকা মাইনে দেয় না জানি। গতিক দেখে সন্দেহ আসে সত্যিই ঐ কাজ করে কি না। আড়ত দূরবর্তী নয়, এ পারের ঘাট থেকেই নজরে আসে। পুল পার সাহেবের খোঁজে খোঁজে একদিন সুধামুখী গিয়ে পড়ল সেখানে। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে, নেই সাহেব। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখতে পেল না। তারপর আরও ক'বার গেছে। আড়তের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না—তার সঙ্গে সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লে চাকরে সাহেব ছোট হয়ে যাবে অন্যদের কাছে, চাকরির ক্ষতি হবে।

হঠাৎ হয়তো একদিন সাহেব সুধামুখীর ঘরের মধ্যে ঢুকে খই ছড়ানোর মতো খাটের বিছানায় পয়সাকড়ি কিছু ছড়িয়ে দেয়। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুলো। ইচ্ছা মতন তাকে পাওয়া যায় না, বসে দুটো কথা বলা যায় না। নিশিরাত্রে সুধামুখী আবার আগেকার মতন এ-ঘাট ও-ঘাট খুঁজে বেড়ায়। কার মুখে যেন শুনতে পেয়ে একদিন সে শ্মশানে চলে এলো।

সাহেবের বড় পছন্দের জায়গা, শীতের রাত কাটানোর পক্ষে সত্যি চমৎকার। দিন-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টার মজুব, তবু কিন্তু রাত্রি যত বাড়ে মজুব আরও যেন বেশি করে জমে।

কাঁধে চড়ে চড়ে দেদার লোক এসে নামছে—নানা অঞ্চলের নানান বয়সি পুরুষলোক স্ত্রীলোক। চিতায় চিতায় এত বড় উঠানে দুটো হাত জায়গাও খালি নেই। যমরাজের রন্ধনশালার শতেক চুল্লি একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন। বিস্তর দল ঠায় বসে আছে নতুন চিতার জায়গা নেই বলে। একটা ভারি জাঁকের মড়া এসেছে। বিশাল খাট, ফুলের পাহাড়। যে বিছানায় শুয়ে মড়াটি শ্মশানে এসেছেন, ফুলশয্যায় লোকে এমন জিনিস পায় না। জায়গা পেয়ে অবশেষে চিতা সাজিয়ে ফেলল—সে বস্তুও চেয়ে দেখবার মতো। তিন চিতার কাঠ এনেছে বেশি মূল্য দিয়ে। তার উপরে দশ সের চন্দনকাঠ ও এক টিন ঘি।

আর একটা শিশু ছেঁড়া-মাদুরে জড়িয়ে অনতিদূরে এনে নামাল। দু-জনে নিয়ে এসেছে—একজন শ্মশানের অফিসে গেছে সংকারের ব্যবস্থায়। আর একজন মৃত শিশুর মাথায় হাত দিয়ে নিঃশব্দে বসে। দু-চোখে জল গড়াচ্ছে। খাটের মড়া ইতিমধ্যে চিতায় তুলে দিয়েছে, ফুলের গাদা এদিক-সেদিক ছড়ানো। সাহেবের কী ইচ্ছা হল—দু-হাত ভরে ছড়ানো ফুল ছেঁড়া-মাদুরের উপর রাখছে।

একজনে খিঁচিয়ে উঠল: কারে ধন কাকে দিস—আচ্ছা ছোঁড়া রে তুই! ইচ্ছে হয়, নিজের পয়সায় ফুল কিনে দিগে যা।

সুধামুখী এসে দাঁড়িয়েছিল। আকুল হয়ে ডাকল, সাহেব!

রাত্রিবেলা এত মৃত্যুর অন্ধিসন্ধিতে ছেলেটা পাকচক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সুধামুখীর সর্বদেহ শিরশির করে। ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরল: সাহেব রে—

কে যেন কাকে বলছে, সাহেব ফিরেও তাকায় না।

সুধামুখী বলে বাসায় চল্ বাবা।

এবারে সাহেব কথা বলল: হাত ছেড়ে দাও—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যা-কিছু পকেটে আছে মুঠো করে দিয়ে দিল।

আমি কি টাকা চাইতে এসেছি?

আমায় নিয়ে যেতে এসেছ। আমি যাব না।

সুধামুখী কেঁদে বলে, তোর একফোঁটা মায়ামমতা নেই সাহেব। মনে মনে তুই সন্ন্যাসী। ঘরবাড়ি ভুলেছিস। টাকা-পয়সা খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিস। কালকের খরচ বলে আধলা পয়সাও রাখলি নে। ভয় করে তোর রকম সকম দেখে।

নিশ্চিন্ত অবহেলায় সাহেব বলে, খরচ যেমন আছে, ভাঁড়ারও আমার অঢেল। পয়সা-কড়ি সত্যিই যেন গায়ে ফোটে, না সরালে সোয়াস্তি পাইনে।

মড়িপোড়ার দুর্গন্ধে সুধামুখী নাকে কাপড় দিয়েছে। নজর পড়তে সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে: ঘেন্না করে তো দাঁড়িয়ে থাকতে কে বলেছে! কাজ হয়ে গেল, বাড়ি চলে যাও।

বলেই সে আর সেখানে নেই। প্রাঙ্গণে অগণ্য চুল্লির কোনটা দাউদাউ করছে, নিভে আসে কোনটা। সাহেব তাদের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়। বহুরূপীর মতো রং বদলাচ্ছে—চিতার আলো ঝলসে ওঠে কখনো গায়ের উপর, কখনো সে আবছা অন্ধকারের ছায়ামূর্তি। এ-দলের কাছে গিয়ে কোথায় কি করতে হবে বাতলে দিয়ে আসে, ও-দলের মধ্যে গিয়ে মড়ার পরিচয় জিজ্ঞাসাবাদ করে। কোন এক চিতার পাশে বসে পড়ে হয়তো বা একটু আগুন পুইয়ে নিল। কাঠ কম দিয়েছে বলে ডোমের সঙ্গে ঝগড়া করে কোন দলের হয়ে। মড়া না সরাতেই বিছানাপত্র নিয়ে টানাটানি—একটা চেলাকাঠ তুলে ভিখারিগুলোর দিকে তাড়া করে যায়। ভারি ব্যস্ত-সমস্ত এখন সাহেব।

সুধামুখী থ হয়ে দেখছে। সাহেবের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি কোনটাই ভাল লাগে না। সাহেব কেমন যেন দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জোরজারি করা চলবে না এ ছেলের উপর, সত্যিকার দাবিও নেই। নিশ্বাস ফেলে সে পায়ে পায়ে ফিরে চলল।

সাহেবও এক সময় খুশি মতন একটা জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে।

আরামের ঘুম। পয়সা রোজগারের ফিকিরে কনেস্টবল এসে লাঠির গুঁতো দেয় না। ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কায় পুণ্যার্থীরাও গালিগালাজ করেন না। তবু কিন্তু এক একদিন ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে শেষরাত্রে। শ্মশানের তখন এক অদ্ভুত অভিনব চেহারা। সকলকে আগুন নিভে গিয়ে গনগনে করছে চারিদিককার চিতাগুলো। শ্মশানের বাসিন্দারা সব এদিক-সেদিক পড়ে আছে—কাঁথা-মাদুর কাপড়-চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছে, মড়ার সঙ্গে যা সমস্ত বিদায় করে দেয়। ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে হাতের খানিকটা বেরিয়ে আছে, কারো বা কোমরের একটুখানি। কারো পায়ের গোছা, কারো বা মাথার চুল। ক্ষীণ আলোয় মনে হবে মানুষ নয়, মড়ারাই চারিদিকে ছড়ানো। টুকরো টুকরো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ কেউ নয়। যেন দৈত্য এসে পড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়ে-গুলো ছড়িয়ে গেছে। অথবা লড়াইয়ের শেষে মৃত সৈনিক পড়ে আছে ইতস্তত। ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো—সুধামুখীর কাছে অনেকবার যা শুনেছে সাহেব। অস্ত্রের লড়াই ছাড়াও অহরহ অদৃশ্য নিষ্ঠুর লড়াই চলছে—অনেককে মেরে ফেলে জন কয়েকের বিজয়োৎসব। বিজয়ীরা এই রাত্রে অট্টালিকা-শিখরে উষ্ণ লেপ-গদির ভিতর মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে। ঠাণ্ডাবাবু থাকলে আরও হয়তো বলত, মহাশ্মশানের কেন—গোটা দেশটারই চেহারা দেখল সাহেব, এই নিশি-রাত্রে। মড়ার দেশ। সে মড়াও আস্ত নয়—টুকরো টুকরো অঙ্গ ছড়ানো।

এক দুপুরে অসময়ে ছুটতে ছুটতে নফরকেষ্ট বস্তিবাড়ি ঢুকল। এসেই বাইরের দরজায় খিল দিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ধপাস করে বসে পড়ে।

সুধামুখী ব্যস্তসমস্ত হয়ে পিছু পিছু চলে আসে: কি হল?

হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, এক গ্লাস জল দাও আগে।

ঢকঢক করে পুরো গ্লাস খেয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে কতকটা সুস্থির হয়েছে। সুধামুখী বলে, কে তাড়া করল—পুলিশ না পাবলিক?

নফরকেষ্ট বলে, বাঘ। একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গিয়েছিলাম।

চিড়িয়াখানার বাঘ ডাকে, নিশিরাত্রের স্তব্ধতায় এ পাড়া থেকে সুস্পষ্ট শোনা যায়। এই কিছু দিন আগে একটা বাঘ কি

গতিকে বেরিয়ে পড়েছিল খাঁচা থেকে, পথের মানুষের উপর হামলা করেছিল—

নফরকেষ্ট অধীরভাবে বলে, চিড়িয়াখানার বাঘ খাঁচায় থেকে থেকে তো বিড়ালের শামিল। এ হল আসল জন্তু, সুন্দরবনের মানুষখেকো। বন থেকে সদ্য-আমদানি।

তারপর সুধামুখীর দিকে চেয়ে সকাতরে ব্যাখ্যা করে বলে, আমার বউ।

কোথায় দেখা পেলে?

কালীবাড়ি তীর্থধর্মে এসেছিল। বউ, নিমাইকেষ্ট আরও যেন কে কে—আমার তখন চোখ তুলে তাকাবার তাকত নেই, এই ধরে তো এই ধরে। পাঁই-পাঁই করে ছুটেছি, খুব বেঁচে এসেছি।

ভাব দেখে সুধামুখী হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলল, সেই ব্রহ্মকবচের গুণে—

নফর বলে, তা সত্যি। ব্রহ্মকবচে মন আনচান-করা একেবারে আরোগ্য হয়েছে। কিন্তু বউয়ের জন্য কোন্ কবচের ব্যবস্থা করা যায় বল দিকি, আমার নামেই যাতে শতেক হাত ছিটকে যায়? আগে যেমন ছিল।

সুধামুখী খিলখিল করে হেসে বলে, কবচ হলেও পরাতে যাবে কে শুনি?

নফরকেষ্টও নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে বলে, কোন কবচেই কিছু হবে না আর এখন। লোভ পেয়ে গেছে। আমাকে তো চায় না, চায় আমার মাইনের টাকা। মানুষটার উপর যত ঘেন্নাই হোক, ধরতে পারলে ঠিক সেই কারখানার চাকরিতে নিয়ে বসাবে। মুনাফা বিস্তর। মাস গেলে পুরো মাইনেটা হাতিয়ে নেবে—একটা মানুষের পেটে-ভাতে কত আর খরচা হয় বলো।

সন্ধ্যায় কাজে বেরিয়ে সাহেবকেও বলল: ঘটনা দুপুরবেলার—এখনো আমার বুক-ঢিবঢিব করছে। হ্যাংগামের কাজে আজ যাচ্ছিনে, সোজাসুজি যদি কিছু হয়—

দিন দুয়েক পরে আবার দেখা যায়, ভীষণ ব্যাধিতে ভুগছে সে যেন। থপথপ করে পা ফেলছে বুড়োমানুষের মতো। হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ফিরে চল্ সাহেব, কাজকর্ম হবে না।

কি হল?

সেই বাঘ। ভেবেছিলাম ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। তা নয়, নিমাই চুপিসারে পিছন পিছন এসে আড্ডির বস্তি দেখে গেছে। আজকে যখন বেরুচ্ছি—হাওড়া থেকে অত সকালে এসে গলির মাথায় ওত পেতে ছিল। ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে।

বিপদটা কত বড়, সাহেবের সঠিক আন্দাজ নেই। নফরের অবস্থা দেখে তবু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে: তা হলে?

শাসিয়ে গেছে, আপোসে বাসায় গিয়ে যদি না উঠি, একদিন বউ নিয়ে এসে পড়বে। কী সর্বনাশ বল্ দিকি। যত ভাবি, হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে আমার। এমন অবস্থায় মক্কেল ফেলা যাবে না, বিপদ ঘটে যাবে।

পরের দিন নফর বলে, আজও এসেছিল। ভেবেছিলাম, বয়স হয়েছে, আর পাকছাট মারব না, যে ক'টা দিন বাঁচি একটা জায়গায় কায়েমি হয়ে থাকব। হতে দিল না কিছুতে। কপাল বড্ড খারাপ সাহেব, ভাবি এক হয়ে যায় অন্য। নিমাই শ্বশুরকে বলে সেই পুরানো কাজ ঠিকঠাক করে ফেলেছে, ধরে নিয়ে জুতে দেবে। সারা দিনমান ফার্নেসের আগুন, রাত্রে বউ। তার মধ্যে ক'দিন বাঁচব আমি বল্।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ঢোক গিলে নিয়ে বলে, পালাব, না পালিয়ে রক্ষে নেই। সুধামুখীকে কিছু বলিসনে এখন। কিন্তু নফরাকে কেউ আর কলকাতা শহরে পাচ্ছে না।

নতুন কাজের নেশায় সাহেব মেতে আছে। উৎকণ্ঠিতভাবে সে বলে, আমার কি হবে? কারিগর না হলে খোঁজদার তো হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ।

যাবি তুই? সাহেবের দিকে নফরকেষ্ট এক নজরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে: তোর যে কত ক্ষমতা, নিজে তুই জানিস নে—আমি সব চোখে দেখছি। মস্ত বড় কারিগর হবি একদিন। তা-বড় তা-বড় মুরুব্বিরা হাঁ করে তোর কাজ দেখবে।

উৎসাহে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, চল্ তাই। সুধামুখীকে টাকা পাঠাব, টাকা পেলে যে ভাবনাচিন্তা করবে না। সমস্ত টাকার খেলা—দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা। বাপ-বেটায় মিলে দিগ্বিজয় করে বেড়াব আমরা। আমি কারিগর তুই ডেপুটি, কখনও বা আমি ডেপুটি তুই কারিগর।

ঠিক সেই দিনই এক কাণ্ড ঘটে গেল। সুধামুখীর হারমোনিয়ামের গোটা দুই রীড পালটাতে দোকানে দিয়েছে, তারা আজ না কাল করছে। মহাবীর আনতে গিয়ে এই-মাত্র ফিরে এলো। ঝগড়া করতে চলেছে সুধামুখী—না হয়ে থাকলে যেমন আছে ফেরত আনবে। জরুরি দরকার। আংটি-বাবু কয়েকজনকে নিয়ে গান শুনতে আসবে রাত্রে, খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

সাজগোজে থাকতে হয় এই সন্ধ্যাবেলাটা। রাগে রাগে দ্রুত পা ফেলে চলেছে, নফরের দেওয়া গয়না ঝিলিক দিচ্ছে অংগ ভরে। কোন দিক দিয়ে ছুটতে ছুটতে সাহেব গায়ের উপর পড়ে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগ সুধামুখীর হাতে গুঁজে দিল। চাপা গলায় বলে, অনেক টাকা—নতুন হারমোনিয়াম হয়ে যাবে। বাড়ি চলে যাও ঢেকেঢুকে নিয়ে।

কি রে, কোথায় পেলি এ জিনিষ?

কিন্তু বলছে কাকে! লহমার মধ্যে সাহেব উধাও। কোন গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়েছে। সুধামুখী ভয়ে কাঁটা। কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে ফিরল।

গংগার ঘাটের সদরে যাওয়া সাহেবও আজকের দিনে অনুচিত মনে করে। আস্তির বস্তির নিজস্ব খোপে এক ফাঁকে এসে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যারাত্রে অনেক দিন পরে এসেছে। আলো জ্বালে নি, অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। আর দু-হাতে নিজের গাল চড়াচ্ছে। জীবন নাকি মরতে চায় না—ঠাণ্ডাবাবুর কথা। পাতা ঝিলমিল করে পাঁচিলের ধারের ঐ আমচারা যার সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষকে নাকি ভালই হতে হবে শেষ পর্যন্ত, খারাপ হওয়া চলবে না। কী সর্বনাশ! এই যদি নিয়ম হয়, সাহেবের তবে কী উপায়? নিয়ম সে ভাঙবেই, আরও জোর করে লেগে যাবে। সব গাছ-ই কি এই আমচারার মতো—পোকা ধরে পাতা ঝরে গিয়ে ডালপালা আধ-শুকনো হয়ে আছেও তো কত।

গালে চড় মেরে মেরেও বুঝি রোখ মিটল না। বই-খাতা দোয়াত-কলম আছে—এক সময় বসে অন্ধকারে কলম হাতড়ে নিয়ে খাতার উপর আঁচড় কাটতে লাগল। মনে যা সব উঠছে, লিখছে খাতায়।

কী কাণ্ড এই কতক্ষণ আগে! ট্রাম-রাস্তার উপর মস্ত বড় এক পোশাকের দোকানে সাহেব ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্ট আছে—অনেকটা দূরে, একেবারে আলাদা কেউ কাউকে জন্মে চেনে না এই রকমে ভাব। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের ব ও অতিরিক্ত রাঙা বলে কাজের সময় নফরের নীল চশমা চোখে। অংগে ধোপ দুরস্ত কাপড়-জামা। এও তার আপিসে

পোশাক—এক এক আপিসে এক এক রকম। কাজ অন্তে এ সমস্ত খুলে পাট করে রেখে আট-হাতি ধুতি পরে মহানন্দে বিড়ি ধরাবে।

বাচ্চাদের পোশাক যে দিকটায়, সেখানে বড়ঘরের এক বউ। দুর্গাপ্রতিমার মতো ঝকমকে চেহারা, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। মোমের পুতুলের মতো একটা ছোট মেয়ে বউয়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে—এই মা'র মেয়ে সেটা বলে দিতে হয় না। এক ডাই পোশাকআশাক নামিয়ে নিয়েছে, আরও নামাচ্ছে। মেয়ের জন্য পোশাক পছন্দ করছে মা—বিষম খুঁতখুঁতে, পছন্দ কিছুতে আর হয় না। দোকানের দুটো ছোকরা আর এই বউটি—তিনজনে হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণের বিস্তর রকমের চেষ্টার পরে একটি জামা অবশেষে মেয়ের গায়ে পরাল। বাচ্চা মেয়ের রূপের বাহার এক-শ গুণ হয়ে ফুটল এক পলকে। ছিল পদ্মকলি, পোশাক পরে যেন শতদল হয়ে পাঁপড়ি মেলল।

এমনি সময় সাহেব। ফুটফুটে ছেলে মুখ চুন করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেয়ে বউ হাত নেড়ে কাছে ডাকে। শতেক পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে: কার সঙ্গে কোথায় থাকে, কে কে আছে তার, ইস্কুলে পড়াশুনা করে কি না। সাহেবও তেমনি—বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব। নানাবিধ দুঃখের বৃত্তান্ত। বলতে বলতে জল এসে যায় চোখে। দরকার মতন এই জল নিয়ে আসা খেটেখুটে অভ্যাস করতে হয়। আর এইসব লাগসই গল্প বানানো। সাহেবের দেখাদেখি বউয়ের চোখেও জল এসে গেছে, দু-ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। কেল্লা ফতে—যা চেয়েছিল ঠিক তাই। ছেলেটার হাতে কিছু দেবে বলে বউ ব্যাগ খুঁজছে। কোথায় ব্যাগ? ব্যাগ ইতিমধ্যে লোপাট। সময় বুঝে সাহেব বাঁ-হাতের আঙুল তুলে কান চুলকে ছিল একবার। তার মানে বউ-ঠাকরুনের বাঁ-দিকে দোকানের কাউন্টারে বস্তুটি পড়ে আছে। খোঁজদারের কাজ এই অবধি। সে শুধু জানিয়ে দেবে মাল কোনখানটায় আছে, এবং মক্কেলকে অন্য-মনস্ক করে রাখবে। খবর বুঝে নফরকেষ্ট জামা দেখতে দেখতে এই দিকে এসে হাতের খেলা দেখিয়ে সরে পড়েছে। হিসাব-করা নিখুঁত কাজকর্ম, এক তিল এদিক-ওদিক হবার যো নেই।

এ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন। গোলমালটা তারপরেই। খোঁজ দেওয়ার পরেই খোঁজদার সরে পড়বে, এই হল বিধি। বউ ব্যাকুল হয়ে ব্যাগ খোঁজাখুঁজি করছে, সাহেব কি দেখে সামনের উপর অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে? যে জামা গায়ে পরানো হয়েছে, ছোট মেয়ে কিছুতে তা খুলতে দেবে না। বউয়ের চোখে আবার জল এসে যায়—বড্ড প্যানপেনে বউটা। ভাল ঘরের নরম মনের মেয়ে— কে

জানে, সাহেবের আসল মা-ও হয়তো এমনি-ধারা রাজরানী একটি। বউ দোকানের ছোকরাকে বলছে, কী করি আমি এখন! ট্যাক্সি করে না হয় বাড়ি ফিরলাম, বাড়ি গিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া দেব। আমার ডলির জন্মদিন আজ। পাঁচ ফুলের ডাল-ধোওয়া জলে চান করিয়ে দিলাম—সকলের আশীর্বাদ নিয়ে হাসিখুশি থাকতে হয় এই দিনটা, আনন্দ করতে হয়। আমার ভাইয়ের মেয়ে জামা পরে এসেছে—আপনাদের দোকানের তৈরি। মেয়ে বায়না ধরল, তারও ঠিক সেই জামা চাই। ভাবলাম, যাই, কতক্ষণ আর লাগবে। সাধ করে চাইল, না খেলে মুখভার করে বেড়াবে, সে হয় না। তা দেখুন, উল্টো হয়ে গেল—ছেলেমানুষের গায়ে পরিয়ে আবার খুলে নেওয়া, ওরা তো বোঝে না। আপনারাই বা কী করতে পারেন!

ভারী গলায় বলল বউটি। সাহেব হাত দিয়ে দেখে তারও চোখ ভিজে-ভিজে। কী কেলেঙ্কারি—শুনলে নফরকেষ্ট হেসে খুন হবে। যে শুনবে, সেই ছি-ছি করবে। কাজের দরকারে চোখে জল আনবে, তা বলে বেদরকারে আপনা-আপনি জল এসে পড়বে, এমন বেয়াড়া মন নিয়ে কাজকর্ম হয় কি করে? আর বুঝি দেখতে পারে না সাহেব, ছুটে বেরুল। এমন করে বেরুনো ঘোরতর অন্যায়, সকলে তাকিয়ে পড়ে।

এক-ছুটে চলে গেল তাদের সেই জায়গাটিতে। নালা-পুকুর বুজিয়ে ক্ষেত-মাঠ-জঙ্গল সাফসাফাই করে নতুন রাস্তা হচ্ছে, ড্রেনের পাইপ বসাবার জন্য মাটি তুলে পাহাড় করেছে, তারই পাশে একটা নারিকেল গাছ নিশানা।

টাকায় ঠাসা ব্যাগ, নফরকেষ্টর মুখে হাসি ধরে না। ছুটে এসে সাহেব হাত বাড়িয়ে বলে, দাও—

টাকা বের করে সাহেবের সামনেই গুণে-গেঁথে তার খোঁজদারির বখরা দেবে, সুকর্মের পারিতোষিক হিসাবে বাড়তিও দেবে কিছু—কিন্তু তার আগেই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব দৌড় দিল।

আবার এক অনুচিত কাজ। ব্যাগ নিয়ে পোশাকের দোকানে ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্টর সেই যে গল্প—নোটের তাড়া তুলে নিয়ে ধরা পড়ে গেছে; যে ধরেছে তারই পকেটে নোটগুলো ফেলেছে আবার। সাহেবও কোন রকম কায়দা করে যার ব্যাগ তাকে দিয়ে আসবে।

কিন্তু গিয়ে পড়ে তুমুল কাণ্ড। কোথায় বা সেই বউ, আর কোথায় সেই ডলি নামের মেয়ে! দোকানের মানুষজন হৈ-হৈ করে ওঠে: আবার এসেছে। এরই কাজ। ধরো ছোঁড়াটাকে—

রে-রে—করে ধরতে আসে। সাহেবের সুন্দর চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। একবার দেখলে আর ভোলবার জো নেই। দৌড়, দৌড়—

ভাবছে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে নাকি ব্যাগ? লাভ নেই, পিছনে ছোটা তা হলেও বন্ধ করবে না। মাঝে থেকে টাকাগুলো নষ্ট। এক রাশ টাকা, সুধামুখী নতুন হারমোনিয়াম কিনব কিনব করছে কত দিন থেকে—

আংটিবাবুরা গান শুনে অনেক রাত্রে চলে গেল। পারুলের হারমোনিয়ামটা এনে কাজ চালিয়েছে। তারপর নফরকেষ্ট যথারীতি এসে পড়ল। টুলের উপর চেপে বসে বউয়ের গল্প শুরু করে দেয়। বলে, বাঘে হামলা দিয়ে ফেরে, সেই অবস্থাটা চলছে এখন সুধামুখী। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন সময় না-জানি টুঁটি চেপে ধরবে—

এই পর্যন্ত—। হুংকার দিয়ে সুধামুখীই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘই বটে এই রোগাপটকা অস্থিসার রমণী। নফরাকে বাঘে ধরেছে। লম্বা চুলে ফাঁপানো এলবার্ট-টেড়ি, রাত্রে এই বিশ্রামের সময় বাবু নফরকেষ্ট কিঞ্চিৎ বাহার করে আসে। মুঠো করে ধরেছে সেই চুল—

ছেলেকে তোমার পথে নামিয়ে নিয়েছ?

ঠাস-ঠাস করে চড়। হঠাৎ সুধামুখী হাউ-হাউ করে কেঁদে হাত-পা ছেড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে: ছেলে নিয়ে আমার যে কত সাধ! লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, দশের একজন হবে। সে ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকে এখন।

কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছে। বারম্বার বলে, সর্বনাশ করেছ তুমি। ছেলে আমার কাছ থেকে কেড়ে তোমার পথে নিয়ে নিলে।

চড় খেয়ে নফরারও মেজাজ চড়েছে। বলে, কাঙালি-ভিখারির মতন চাল কুড়াত—তার চেয়ে খারাপ এ পথ?

সুধামুখী উঠে বসে খানিকটা শান্তভাবে বলে, মন্দ পথ, অধর্মের পথ—

নফরকেষ্ট বলে, তুমি বলো ছেলে তোমার, আমি বলি ছেলে আমার—আমাদের ঘর থেকে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বেরুবে, এই তোমার আশা? ঘেঁটুবনে চাঁপাফুল ফুটবে?

সুধামুখী বলে, ছেলে আমারও নয়, তোমারও নয়, অন্য লোকের—

কথা শেষ করতে না দিয়ে নফরকেষ্ট তিক্ত স্বরে বলে, যাদের ছেলে তারা হল বড়ঘরের অসতী মেয়ে আর বড়ঘরের বদমায়েস পুরুষ। তারা আমাদের চেয়েও খারাপ। আমাদের সোজা কথাবার্তা, স্পষ্টাস্পষ্টি কাজকর্ম। তাদের বাইরে ভড়ং, ভিতরে ইতরামি—

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে—মাথার এলবার্ট-টেড়ি ভেঙে গিয়েছে, পকেটের চিরুনি বের করে নফরকেষ্ট টেড়ি কাটতে লাগল। সুধামুখী রান্নাঘরে গেছে। ভাত বেড়ে ফিরে এসে দেখে নফরকেষ্ট নেই।

ক্ষুধার্ত মানুষটা কোনদিকে গেল—হেরিকেন হাতে নিয়ে সুখামুখী খোঁজাখুঁজি করছে। সাহেবের খোপের কাছে এসে দেখে দরজা হা-হা করছে। হয়তো বা ঐখানে পড়ে আছে রাগ করে—

কেউ নেই ভিতরে। সাহেবের কটা কাপড়-জামা টাঙানো থাকে, তাও নেই।

নজর পড়ল, খাতা খোলা রয়েছে, কলমটা এক পাশে। হিজিবিজি অক্ষর খাতার পাতায়। সাহেব লিখে গেছে আত্মগ্লানির কথা: আমি ভাল, আমার কিছু হবে না। কেন ভাল হলাম? হে মা-কালী, আমায় মন্দ করে দাও। খুব মন্দ হই যেন আমি—

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১৭ ॥

এতদিনে চয়ন বুঝতে পেরেছে সব কথা। রঙিলার আকর্ষণ ভালবাসার নয়—কামনার। যৌবনের ক্ষুধা। ক্ষুন্নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই রঙিলা চাবুকের ব্যবস্থা করবে। চয়ন তাই রঙিলাকে এড়িয়ে চলে। আর সেজন্যে ক্ষেপে গেছে রঙিলা। আহত সর্পিনীর মত উদ্যতফণা। সর্পিনী নয়, ডাইনী! হ্যাঁ, ডাইনী! রূপক নয়, সত্য কথা। তবে কথাটা খুব গোপন। তবু তা একদিন জানতে পারল চয়ন। জানালো কারাংমেটার শিরদার। যেদিন ও প্রত্যাখ্যান করল রঙিলা-বেলোসাকে আকোইন বলে, তারপর একদিন শিরদার ওকে জনান্তিকে ডেকে নিয়ে বললেঃ তুই খুব চালাক! বেলোসাকে বেশ কায়দা করে পাশ কাটালি যাহোক! বেলোসা হচ্ছে তোর আকোইন। মুরিয়াল নেহানা! কী বুদ্ধি!

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলেঃ কেন, এ জন্যে আমাকে বুদ্ধিমান বলছিস কেন?

শিরদার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললে : কথাটা খুব গোপন। তবে তোকে সব কথা বলব আমি। তুই হচ্ছিস কাবোঙ্গার শিরদার, আমাদের মালকোর লামহাদা। এ ঘটুলের কোতোয়ার। মালকো মাগীটা খুব লক্ষ্মী, খুব ভাল। তোর সব কথা জানা থাকা দরকার। সন্ধ্যাবেলা নারাঙ্গী নদীর ধারে মহুয়া গাছতলায় আসবি, সব কথা বলব তোকে।

সন্ধ্যাবেলা পায়ে-চলা পথ ধরে চয়ন এসে পৌঁছালো নারাঙ্গী নদীর ধারে। গ্রাম থেকে অদূরেই বয়ে চলেছে স্বচ্ছতোয়া নারাঙ্গী নদী। গাঁয়ের কাছাকাছি বিরাট এক বাঁক নিয়েছে। ওপারে বালির বিস্তৃতি, এপারে শেষ বসন্তের শীর্ণা নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জল। চয়ন বসল একটা পাথরের উপর। বাঁশীটা রয়েছে সঙ্গে। বাজাতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু না, বাঁশীর আওয়াজে অন্য কেউ আকৃষ্ট হয়ে এদিকে এসে পড়তে পারে। তারচেয়ে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। একটা বেনাঘাস নিয়ে অন্যমনস্কভাবে সে বালির উপর আঁচড় কাটতে থাকে। নদীর যেখান থেকে গাঁয়ের মেয়েরা জল নিয়ে যায় সেই প্রায়-ঘাট জায়গাটা এখান থেকে দেখা যায়। সূর্য অস্ত গেছে; আবছায়া হয়ে এসেছে চারিদিক। তবু অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করা যায় জলভরার পালা এখনও শেষ হয়নি। ম্লান গোধূলির আলো। গোধূলি তো নয় 'হিরুরি পোড়'—সবুজ-টিয়ের সময়। সন্ধ্যাবেলায় সবুজ টিয়ের ঝাঁক ঘরে ফেরে। তাই গোধূলি লগ্নের নাম—সবুজ-টিয়ের সময়। কিন্তু শিরদার আসছে না কেন? ভুলে গেল না তো? মহুয়া গাছটার দিকে নজর রেখেই বসেছিল চয়ন। ঘটুলে যাবার সময়ও হয়ে এল এদিকে।

মহুয়া গাছের ফাঁক দিয়ে উঠে এল শুক্ল-পক্ষের চাঁদ। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি। পোড়ো-ভূম রূপালী চাদর জড়িয়েছে যেন গায়ে। বনের এখানে ওখানে ছোপধরা জ্যোৎস্না। মোহময় প্রকৃতি। মনটা উদাস হয়ে যায়।

ট্যাঁক থেকে গুড়াটা বার ক'রে একটু তামাকপাতা বার করলে চয়ন। কি আর করা যায়? তামাকই চিবানো যাক খানিকটা। কিন্তু না, ঐ তো কে যেন আসছে। বনের মধ্যে শুকনো পাতার শব্দ। অবচেতন অনুপ্রেরণায় মাকসুটা হাতে তুলে নেয়। খুব সম্ভব শিরদার আসছে, কিন্তু এ বন্য-মানুষগুলো জঙ্গলে অদৃশ্য প্রাণীর পদ-শব্দ শুনলেই বাগিয়ে ধরে টাঙ্গিটা। না, কোন জানোয়ার নয়। মানুষই। কিন্তু নেমে এলো না কেন নদীগর্ভে? মহুয়া গাছতলাতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনে হচ্ছে।

পায়ে পায়ে উঠে এলো চয়ন। আশ্চর্য শিরদার নয়—মালকো!

চয়ন ছুটে এসে ওর হাত দুটি চেপে ধরে মালকো, মালকো!

উত্তেজনায় ভয়ে মালকো কাঁপছে! ওর বুকে মুখ লুকিয়ে বললে—জল নিতে এসেছিলাম। দেখলাম তুই বসে আছিস চুপটি করে। তাই......

ঃ রঙিলা? রঙিলা কোথায়?

ঃ রঙিলা! আশ্লেষ বন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলো মালকো। ও নাম শুনলেই সে চমকে ওঠে। বললেঃ দিদি আসেনি। বাড়িতেই আছে। মাঠ থেকে তুই বাড়ি আসবি, তাই পাহারা দিয়ে বসে আছে!

হিহি করে হাসলে চয়ন! খুব জব্দ হয়েছে রঙিলা। মাঠ থেকে সে আজ বাড়ি যায়নি। সোজা চলে এসেছে নারাঙ্গীর ধারে। খুব খুশী হয়ে উঠল চয়ন।

মালকো বললেঃ একটা কথা বলব?

ঃ কি? বলনা!

ঃ তুই আমার জন্যে লামহাদা খাটতে এলি কেন?

হো হো করে হেসে ওঠে চয়ন। কী বোকার মতো প্রশ্ন! তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেঃ তোকে জব্দ করব বলে।

ঃজব্দ? কেমন করে? কেন?

ঃতুই বলেছিলি 'ইয়ে ধান্দারি নিজানুবি বাইলো চো নাকাকি কাটি'। তা ধাঁধার জবাব তো আমি দিতে পারিনি। তাই ঠিক করেছি, তোকে বিয়ে করব; করে বলব এবার নিজের নাক নিজেই কাট।

মালকোও হেসে ওঠে খিলখিল করে।

কিন্তু ঐ আবার কার পায়ের শব্দ। নিশ্চয়ই শিরদার। চয়ন বলেঃ শিগগির

পালা! কাল ঠিক এই সময়ে এখানে আসবি। চুপি চুপি!

চকিত কৃষ্ণসার মৃগের মতো বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল মাল্‌কো।

হ্যাঁ শিরদার।

শিরদার এগিয়ে এসে বসল আর একটা পাথরের উপর। চয়নের পাগড়ি থেকে গুড়ার কৌটাটা তুলে নিয়ে এক টিপ তামাকপাতা বার করে চিবাতে থাকে। চয়ন ঘনিয়ে এসে বলে : রাঙিলার কথা কি বলবি বলেছিলি?

: বল্‌ছি, কিন্তু তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—সত্যি কথা বলবি?

: বল না, কি বলবি।

: চৈত-দাণ্ডার রাত্রে একসময় দেখেছিলাম ঘটুলঘরে আমাদের বেলোসা ছিল না, লক্ষ্য করে দেখলুম তুইও নাই—তোরা দুজন কি......

: দূর বোকা!—ধমক দিয়ে ওঠে চয়ন! না, না, সে-সব কিছু হয়নি।

: বাঁচলাম। খবরদার! তারপর মুখটা কানের কাছে এনে চুপিচুপি বলে—রাঙিলা ডাইনী, মন্তর-জানা ডাইনী। পাংনাহিন। ও ধুরেবান ছুঁড়তে পারে।

: কি করে জানলি?

: বলি শোন।

রাঙিলার জীবনের আদিকাণ্ডের কথা শোনাতে থাকে শিরদার। তখন সে নিজেও খুব ছোট, সব কথা জানতে বুঝতে পারেনি। পরে বড় হয়ে শুনেছে বাপ-দাদার কাছে। জানতে পেরেছে রাঙিলা মুরিয়া বংশের মেয়ে নয়—আয়েতু গোণ্ডের পালিতাকন্যা। আয়েতু যখন কুড়িয়ে পাওয়া জিপসির মেয়েটিকে মানুষ করতে শুরু করে তখন প্রবল আপত্তি হয়েছিল কারাংমেটার আদিবাসী সমাজে। এমন কাণ্ড আগে কখনও হয়নি। কিন্তু আখালী ততদিনে বঞ্চিত মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে সদ্যজাত শিশুটিকে—তার বুকের ভিতর থেকে বাচ্ছাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কারও ছিল না। শেষ পর্যন্ত সমাজপতিদের আঙ্গোপেনের স্মরণ নিতে হল। তাঁর পুজো দেওয়া হল সাড়ম্বরে। গুণিয়ার উপর আঙ্গোপেনের ভর হল। ভাবাবেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রক্তচক্ষু গুণিয়া ঘোষণা করলে—রাঙিলা হচ্ছে বিষকন্যা, পাংনাহিন!

চমকে উঠ্‌ল আয়াতু, শিউরে উঠল আখালী!

রাঙিলার সম্বন্ধে এমন ভয়াবহ কথা শুনেও আয়েতু কিন্তু তাকে ত্যাগ করতে রাজি হল না। ততদিনে বুড়ো গাইতা রেণোর মৃত্যু হয়েছে। আয়েতু বসেছে সেই শূন্য সিংহাসনে। ফলে গাইতার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারলে না কেউ। আয়েতুও বুদ্ধি করে একটা ভোজ লাগিয়ে দিল। দেবতার নামে একজোড়া শুয়োর বলি দেওয়া হতেই গুণিয়া ঘোষণা করলে দোষ কেটে গেছে।

আখালি বাচ্ছাটাকে বুকে জড়িয়ে বলে—হ্যাঁরে তুই নাকি পাংনাহিন, হ্যানার?

ফুলের মতো সুন্দর শিশু নিদন্ত হাসি হাসে ফ্যাক করে!

গাইতার ভয় আর অপদেবতার ভয়। দুটোই দুর্জয়। তাই কারাংমেটার মনের কুসংস্কারকে কেউ তাড়াতে পারলে না। রাঙিলাকে তাই কেউ আপন করে নিতে পারে না। সে যে বিষকন্যা, সে যে ডাইনী—এ কথাটা মনের গভীরে রয়েই গেল। তাই সব কিছু পেয়েও রাঙিলার মনে হয় কি যেন পাওয়া হয়নি। মেয়েরা আড়ালে একত্র হয়, ফিস্‌ফিসানি শুরু হয়ে যায়, বলাবলি করে নিরন্ধ্র অন্ধকারের ঘটু

সতরঞ্চি বোনা হচ্ছে—মাড়িয়া রমণী।

অজানা আতঙ্কের বাসা, সেখান থেকে একটা দুর্ভাবনা রয়েই গেল। রাঙিলা ক্রমে বড় হল। ঘটুলেও ভর্তি হল। চটপটে, বুদ্ধিমতী মেয়ে। অল্পদিনেই তার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হল। দিন দিন পদোন্নতি হতে থাকে তার, ক্রমে হল ঘটুলের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিতা—ঘটুল-বেলোসা। কিন্তু তবু অরণ্যপর্বতের আদিম মানুষগুলির বুকের মধ্যে যে অজানা আতঙ্কের বাসা, সেখান থেকে জীবনের কথা। রাঙিলা সে কাহিনীর সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে চায়—বোঝে ঘটুলের রানী হয়েও সে উপেক্ষিতা, যৌবন ব্যর্থ তার! মনে মনে ফুঁসতে থাকে। তবু ওদের কাছে স্বীকার করা চলে না সে কথা। সে যে বড় লজ্জার কথা—নারীত্বের অপমান। তাই কোন অভিযোগও আনা চলে না। সে কথার উচ্চারণ করা মানেই নিজের যৌবনকে লজ্জা দেওয়া, নিজের নারীত্বকে

ভূলুণ্ঠিত করা। তাই রঙিলাও প্রথম প্রথম মোটিয়ারীদের গোপন আসরে বানিয়ে বানিয়ে বলত তার কল্পিত অভিজ্ঞতার কাহিনী। নিজেই কাঠের কাঁকুই বানিয়ে পরত মাথায় আর বলত: কাল রাতে কি হয়েছিল জানিস,—কাল তো আমি শুয়েছিলাম কোতোয়ারের মাসানিতে, এমন অসভ্য কোতোয়ারটা, করলে কি......'

কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী রঙিলা বুঝতে শিখল, সবাই ওর চালাকিটা ধরে ফেলেছে। প্রকাশ্যে কেউ-ই সেটা স্বীকার করে না—আড়ালে হেসে লুটিয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে। সব চেলিকই সব মোটিয়ামারীকে গোপনে বলেছে, রঙিলা যেদিন তাদের মাসানিতে শুতে আসে, সে-রাত্রিটা তারা আড়ষ্ট হয়ে কাটিয়ে দেয়! ঘুমায় না, জেগে থাকে। পাশে শোওয়া ডাইনীটা যেন মাঝরাতে উঠে বুকের রক্ত না চুষতে আরম্ভ করে! রঙিলা সংযত হয়, কঠোর হয়—প্রতিশোধ নেবার জন্য নিশ্‌-পিশ্‌ করতে থাকে। কিন্তু প্রতিহিংসা

চরিতার্থ করবে কার উপর? ওরা সবাই, সবাই যে একদলে! ওরা যখন জোড়ায় জোড়ায় ঘুমোতে থাকে বাহুবন্ধের আশ্লেষ-আলিঙ্গনে, আর সে যখন বিনিদ্র নয়নে ছটফট করতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে হয়, চুপিসারে বেরিয়ে আসে বাইরে। আগুন লাগিয়ে দেয় ঘটুলের চালায়! মরুক পুড়ে আগুনের বেড়াজালে ঐ স্বার্থপর ছেলেমেয়ের দল! কিন্তু! তারপর তাকেও যে পুড়িয়ে মারবে কারাংমেটার বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো। মারুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ, তা হলে যে প্রমাণ হয়ে যাবে—সে সত্যিই ডাইনী। পাংনাহিন হানায়! একঘর জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে কখনও কোন মানুষ? এ-কাজ করলে জিত হবে তার ভিতরে বাস-বাঁধা ডাইনীটার, হার হবে সেই সত্তাটার, যে গান গায়, যে নাচে, যে ভালবাসতে চায়, যে ভালবাসা পেতে চায়!

চয়ন বাধা দিয়ে বলে ওঠে : কিন্তু কথাটা কি? রঙিলা কি সত্যিই ডাইনী?

: আমি তা কেমন করে জানব? —প্রতি-প্রশ্ন করে শিরদার।

: এই যে বললি—ও তো সত্যিই ডাইনী নয়?

: আহা! ও তো নিজে তাই ভাবে।

: ও নিজে জানে না—ও ডাইনী কিনা?

: তাই কি কেউ কখনও জানতে পারে।

: তা হলে ও যে ডাইনী তার কোন প্রমাণ নেই? এক গুণিয়ার কথা ছাড়া?

: না, আছে। সে কথা আর কেউ জানে না। আমি জানি। কাউকে বলিনি। তোকে বলি শোন।

শিরদার তখন বলতে থাকে তার অভিজ্ঞতা। গতবার নারানপুরে মাড়াইয়ের অভিজ্ঞতা। কাবাঙ্গোতে যে রাত্রে ওরা আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, ঠিক তার পরের রাত্রের ঘটনা। হাটের উত্তর দিকের মাঠে গাছতলায় ওরা আড্ডা গেড়েছিল। শিরদার লক্ষ্য করেছিল, একজন শহুরে মানুষ প্রায় সারাদিনই ঘুরঘুর করছে ওদের আস্তানাটির কাছে। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট কালো মতন বাক্স। সেটা দিয়ে বারে বারে আমাদের টিপ করছে। টিপই করছে। তার থেকে কিছুই বের হচ্ছে না অবশ্য।

চয়ন বলে : ওকে বলে ক্যামেরা। ওতে ছবি আঁকা যায় যন্তর দিয়ে।

শিরদার বলে : হাঁ, হাঁ, ঠিক কথা। আমিও পরে শুনেছিলাম, ওটা ছবি আঁকার যন্তর। তুই কি করে জানলি?

: কত নাড়াচাড়া করেছি ও যন্তর! যাক, তারপর কি হল বল?

: দেখলাম সারাটা দিনই ছোকরা যন্তর হাতে ঘুরঘুর করছে। ইচ্ছে করছিল দিই ব্যাটাকে সাবড়ে একটি টাঙ্গির ঘায়ে; কিন্তু গাইতার বারণ আছে। মাড়াইয়ে এলে সংযত হয়ে থাকতে হয় আমাদের। শহুরে মানুষের সঙ্গে কোন কারণেই মেলামেশা করা বারণ, ঝগড়া-ঝাঁটি তো একেবারে নয়। খানিকটা নজর করেই বুঝতে পারলাম, আমরা কেউ নয়—ওর লক্ষ্যস্থল আমাদের বেলোসা। তাই হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যেমন মোটিয়ারীদের নিকষ-কালো গায়ের রঙ পছন্দ করি, তেমনি ওরা, মানে শহুরেরা পছন্দ করে সাদা চামড়া।

চয়ন বলে : তাই নাকি?

: হ্যাঁ তাই। এ-জিনিস আমি আগেও দেখেছি। মানে আমাদের আগের বারের মাড়াইতে। তা সে যাই হোক, ছোকরা যে আমাদের বেলোসাকে দেখে মজেছে, সে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দুপুরে যখন মেয়েরা নারানপুরের বড়-তালাওয়ে স্নান করতে গেল, তখন একচোট ঝগড়াও হয়ে গেল। রঙিলা যখন স্নান করে উঠে কাপড় ছাড়ছে, সেই ছেলেটা তখন সেই যন্তরটা দিয়ে ওক টিপ করছিল। রঙিলা ক্ষেপে গেল। একটা মাটির ঢেলা তুলে মারলে ছুঁড়ে। ঢেলাটা ওর গায়ে লাগেনি। হি-হি করে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল ছেলেটা। তারপর শোন—বিকেলবেলা মোটিয়ারী যখন দল বেঁধে মেলা তলায় ঘুরছে, তখন সেই ছেলেটা আবার ওদের পিছু নেয়। রঙিলা ঘুরে দাঁড়াতেই ও তার হাতে গুঁজে দেয় একছড়া পুঁথির মালা। রঙিলা সেই মালাটাই ছুঁড়ে মারলে ছেলেটাকে। এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। পুঁথিগুলো ছিটিয়ে পড়ল রাস্তায়।

চয়ন বলে : তুই কী রে? আমাদের কোন মোটিয়ারীকে এমন করলে ঝাড়তাম মকসুর এক কোপ! ঘাড় থেকে মাথার বোঝাটাকে নামিয়ে দিতাম।

শিরদার বলে : আরে, আমিও তাই দিতাম; কিন্তু কি হল জানিস, সারাদিন শুলেপি খেয়ে খেয়ে আমার কোন হুঁশই ছিল না। কথাগুলো শুনেও মানে বুঝতে পারিনি। তারপর শোন। সন্ধ্যার দিকে বেলোসার জ্বর মত হল। বললে নাচবে না। আমরা দল বেঁধে চলে গেলাম হাটের পুব দিকের মাঠে। বেলোসা একাই শুয়ে রইল। রাত তখন ভুঁইষা হিকং। হঠাৎ একটা ছেলে এসে বেলোসাকে বললে—শিগগির এস, তোমাদের শিরদারকে সাপে কামড়েছে! ছেলেটাকে বেলোসা চেনে না। পরিষ্কার আমাদের ভাষায় কথা বলল সে। বেলোসার কোন সন্দেহ হয়নি। ছেলেটার পিছন পিছন চলে গেল বনের দিকে। তার একটু পরেই আমি ফিরে এলাম আস্তানায়। মেয়েটা জ্বর গায়ে একা পড়ে আছে। আমি শিরদার ও আমার বেলোসা। তাই নাচের আসরে মন লাগল না। ফিরে এসে দেখি, গাছতলায় কেউ নেই। এদিক-ওদিক খুঁজছি, ভানপুরীর শিরদার আমাকে দেখে বললে—কি খুঁজছ? বললুম—আমাদের বেলোসাকে দেখেছ? বললে—হ্যাঁ, এই তো এইমাত্র কে যেন এসে ডেকে নিয়ে গেল। বুকের মধ্যে কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। বনের যেদিকে নির্দেশ করল ভানপুরীর শিরদার ছুটলাম সেদিকে—

ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে শুনেছিলাম শিরদারের জবানীতে সে-রাত্রের দুর্ঘটনাটা। শিরদার উদ্ধার করতে পেরেছিল বেলোসাকে। অবশ্য সে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁচেছিল অনেক দেরিতে। গামছা নিংড়ে যেমন করে জল ঝরানো হয়, তার আগেই তেমনি করে তাকে নিংড়ে শেষ করেছিল সেই সভ্য-জগতের অসভ্য মানুষটা। বেলোসার তখন প্রবল জ্বর—বাধা দিতে পারেনি। ঘটনাচক্রে আর-একজন সভ্য-জগতের মানুষও তখন সেখানে গিয়ে হাজির হয়। শয়তানটা তখন পালায়।

শিরদার বলে : বেলোসা চিনতে পেরেছিল লোকটাকে। সেই ছোকরাই। সারাদিন যে ঘুরঘুর করেছে তার পিছনে। বেলোসার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল, বলেছিল : চল! ওকে খুঁজে বার করব! আর সবাইকে ডাক!

কিন্তু গাইতার কঠিন বারণ আছে। মাড়াইয়ে গিয়ে মারামারি করলে কঠিন শাস্তি দেবে গাইতা। তাছাড়া এখনও বাইরের লোক কিছু জানে না। কথাটা চেপে যেতে পারলেই সব দিক থেকে মঙ্গল। শিরদারের নেশা ছুটে যায়। বেলোসার হাত দুটি ধরে বলেছিল : ছেড়ে দে বেলোসা! ছেড়ে দে। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না একথা। জানাজানি হলে কারাংমেটার মাথা হেঁট হয়ে যাবে!

বেলোসা ওকে ধমকে উঠে : তুই ভেড়া! তুই ভেড়া হয়ে গেছিস! তোদের বেলোসার ইজ্জত যে নিল, তাকে ছেড়ে দিবি? তা হলে

টাঙিগ কাঁধে নিয়ে ফিরিস কেন 'ঘোরিয়া মাস্কার' বাচ্ছা!

শিরদার বলেঃ ওরা শহুরে মানুষ। মাথার বদলি ওরা মাথা নেয় না। ওদের কিছু বললেই হবে থানা-পুলিস। আমাদের গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। তোর পায়ে ধরছি—এবারকার মতো ক্ষান্ত দে!

বেলোসা বললেঃ নিয়া মিয়ার না তিতি গুট্টা!

অশ্লীলতম গালাগালটাও হজম করে নিয়েছিল শিরদার! কেন করবে না। থানা-পুলিস! বাঘ-সাপ, দত্যি-দানা, দস্যু-ডাকাত—এদের বিরুদ্ধে তবু লড়াই দেওয়া যায়: কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যে কোন হাতিয়ার নেই। গাঁয়ে একটা খুন হলে ওরা দশ-বিশজন মানুষের মাজায় দড়ি বেঁধে কোথায় নিয়ে যায়! তারপর? তারপর কি হয়, কেউ জানে না। যারা বেঁচে ফিরে আসে, তাদের কোন প্রশ্ন করতে ওদের সাহস হয় না। তাই অসভ্যদের অসভ্যতা ওরা উপেক্ষা করে—শহুরে মানুষদের এড়িয়ে চলে শুধু। রঙিলা ক্ষেপে গিয়ে শিরদারের গায়ে থুথু দিল। বললেঃ ভেড়ার বাচ্ছা! যা যা আমার সমুখ থেকে! আমি একাই এর বদলি নেব। আমি যদি সত্যিই 'পাংনাহিন নাহার' হই, তবে আমার 'ধুর-বান' ব্যর্থ হবে না। কুষ্ঠ হবে ওর মুখে।

এই বলে মট্‌মট্ করে আঙুলগুলো ফোটালো রঙিলা—মানে 'চুটকি-ধুর' ছুঁড়ে মারল আরকি। ডাইনীরা যেমন মন্ত্রপূত ধুরবান ছোড়ে।

চয়ন বললেঃ তাতে কি প্রমাণ হয়? ধুরবান কার্যকরী হল কিনা, কে জানে?

শিরদার বলেঃ সেই কথাই তো বলছি। মাস ছয়েক পরের কথা। নারানপুরের হাটে গিয়েছিলাম নুন আনতে। সেই ছোকরাটাকে দেখলাম। মুখে কুষ্ঠ হয়েছে তার!

(ক্রমশ)

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩৫ ॥

সাহেবগঞ্জে গঙ্গার ধারে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল সেইখানে গিয়ে বসেছিলেন সুবেদার খাঁ আর পৃথিবীনন্দন। বাঁদরটা কাছেই একটা পেয়ারা গাছে উঠে বসেছিল। স্টেশনে বা হোটেলে নির্জন জায়গা পাওয়া যায় নি বলেই তাঁরা এতদূর এসেছিলেন।

পৃথিবীনন্দন বললেন, "আমার ইতিহাসটা তাহলে শুনুন। আপনার সঙ্গে যখন হোটেলে প্রথম দেখা হয় তখন আপনাকে বলেছিলাম আমি সার্কাসের লোক। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসে যোগ দিয়েছিলাম। সেই থেকে সার্কাসে সার্কাসেই ঘুরেছি। হয়তো সারাজীবনটাই সার্কাসে কেটে যেত, কিন্তু জীবনের বন্ধন হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল। ফুল্লরা বলে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে সিংহের খেলা দেখাত। আমিই শিখিয়েছিলাম তাকে। আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গ, ফুল্লরাও পূর্ববঙ্গের মেয়ে। পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক 'রায়ট্' হবার অনেক আগেই ফুল্লরার বিধবা মা ফুল্লরাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। কারণ একজন মুসলমান 'রইস্' নজর দিয়েছিলেন ফুল্লরার উপর। দেশের লোক বলে আমার অনেক আগে থেকেই আলাপ ছিল ওদের সঙ্গে। ফুল্লরার মা কলকাতায় এক জায়গায় রাঁধুনী ছিল। আমিও তাদের কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য করতাম। ফুল্লরার মা হঠাৎ একদিন মারা গেল। তখন আমি এলাহাবাদে সার্কাস করছি। ফুল্লরা আমাকে চিঠি লিখল, 'আমি এখানে মায়ের চাকরিটা পেয়েছি। কিন্তু একা থাকতে ভয় করে। কারণ আমাদের গাঁয়ের সেই মুসলমান লোকটা এখানেও আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘোরা-ফেরা করছে'। আমি তখন তাকে আমার কাছেই নিয়ে এলুম। সার্কাসের খেলা শেখাতে লাগলুম। খুব ভালো খেলোয়াড় হয়েছিল সে। ওর মতো সিংহের খেলা আর কেউ দেখাতে পারত না। কিন্তু সে-ই সিংহের হাতেই একদিন ওর প্রাণ গেল। একটা নতুন সিংহ এসেছিল, সে এক থাবায় ফুল্লরার ঘাড়টা বেঁকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মরে নি সে, দুদিন বেঁচে ছিল। মৃত্যুকালে আমাকে বলে গিয়েছিল, 'আপনি আমাকে যে হারটা দিয়েছিলেন সেটা আর মায়ের কিছু গয়না আমার ছোট ক্যাশবাক্সে আছে। সে সব বিক্রি করে আপনি কোনও ভাল কাজে দান করে দেবেন'। এই বলে সে মরে গেল। আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি ক্যাশবাক্স নেই। চাকরটাও উধাও হয়েছে! আপনি আশা করি হাই-ব্রাও মরালিস্ট নন।"

সুবেদার খাঁ নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। আচমকা প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলেন। তারপর হেসে বললেন, "না, আমি কোন ব্যাপারেই হাই-ব্রাও নই।"

"গুড়। তাহলে শুনুন। ওই ফুল্লরা ছিল আমার চোখের আলো, মাথার মণি, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ফুল্লরা মারা যাওয়াতে আমার আর সার্কাসে থাকতে ইচ্ছে হল না। যে সিংহটা ফুল্লরাকে মেরেছিল তাকে গুলি করে আর ওই বাঁদর ছানাটাকে নিয়ে আমি সার্কাস পার্টি ছেড়ে দিলাম। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। বাড়ির কোনও খবর নিই নি। ইচ্ছে হল বাড়ি ফিরে যাই। খোঁজ করতে গিয়ে দেখি বাড়ি নেই, ভিটেতে মুরগী চরছে। আমার বুড়ো বাবা মা কলমা পড়ে মুসলমান হতে রাজি হয় নি বলে তাদের খুন করে গাজিরা নিজেদের বেহেস্ত যাওয়ার পথ প্রশস্ততর করেছেন। সুতরাং আমি কলকাতায় আবার ফিরে এলাম এবং অবলম্বনহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একমাত্র সঙ্গী ওই মংকু। ওকেই নানারকম খেলা শেখাতুম। ও এখন মানুষ হয়ে গেছে। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় একদিন বেটিংক স্ট্রীটে সেই চাকরটাকে দেখতে পেলাম, যে ফুল্লরার ক্যাশবাক্সটা নিয়ে সরেছিল। দৌড়ে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরলাম তাকে। তার অঙ্গে খাকি পোশাক, মাথায় লাল পাগড়ি, বললে সে এখন কনেস্টবলগিরি করছে। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বললাম, 'তুমি ক্যাশবাক্স চুরি করে' পালিয়ে ছিলে, তোমাদের উপর-ওলা সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, ক্যাশবাক্স আর তার মধ্যে যে সব গয়না ছিল তা যদি ফেরত না দাও আমি এখনই তোমাকে সেই সায়েবের কাছে নিয়ে যাব। তিনি আমার দোস্ত। লোকটা দেখল বেগতিক। বলল, ক্যাশবাক্স হুজুর আমি লোভে পড়ে নিয়েছিলাম তা ঠিক, কিন্তু তা আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম চোরা-বাজারে একটা লোকের কাছে। বললাম, বেশ, আমাকে নিয়ে চল তার কাছে। সেও

[illegible] মাল তার কাছে নেই, পাচার করে [illegible]। কোথায় পাচার করেছে সে খবরও [illegible] জানলুম তার কাছ থেকে। পুলিসের [illegible] বড় সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ [illegible] না, কনেস্টবলটাকে ধাপ্পা দিয়ে-[illegible]। কিন্তু চোরাবাজারের কারবারীদের [illegible] কথা বললাম না। তাদের অন্য গল্প [illegible]লাম এবং টাকার লোভ দেখালাম। [illegible]লাম ওই ক্যাশবাক্সের ভিতর গয়না ছাড়া একটা লোহার মন্ত্র-সিদ্ধ মাদুলী ছিল সেটাই আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। সেটা যদি তোমরা কেউ উদ্ধার করে দিতে পার তোমাদের বখশিশ দেব। টাকার লোভে তারা আমাকে এক চোরের আড়ত থেকে আর এক চোরের আড়তে নিয়ে যেতে লাগল। চোর হলেই সব সময় খারাপ লোক হয় না, ক্রমশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওদের দু'একজনের সঙ্গে। তারা আমাকে নানা সন্ধান দিত। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিলুম, জীবনে একটা নতুন অবলম্বন পেয়ে গেলাম। এইভাবে খোঁজ করতে করতেই শেষকালে আপনার নাগাল পাই। যে লোকটি আপনার সন্ধান দিয়েছিল সেই লোকটিই বলেছিল আপনি পাইকেরি দরে চোরাই মাল কিনে হংকংয়ে বিক্রি করেন। সেই থেকে আমি আপনার পিছু নিয়েছি। তারপর ভাগলপুরের একটা হোটেলে মংকুর সহায়তায় আপনার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল।

তারপর—যাক্ 'ডিটেলস্' শুনে লাভ নেই —এইটুকু শুধু জেনে রাখুন আপনার এবং আপনার দলের সমস্ত খবর আমি জোগাড় করেছি প্রমাণ সমেত। আপনি যাদের সঙ্গে কারবার করেছেন তারা অনেকে আপনার বিরুদ্ধে লিখিত বিবরণ দিয়েছে আমার কাছে। আপনাদের প্রত্যেকের ফোটো এমন কি ওই যে মেয়েটি কাল স্টেশনে এসেছিল তার ফোটো, ডাক্তার ঘোষালের ফোটো, স্টেশন মাস্টার পাণ্ডার ফোটো, এমন কি আপনার সেই হংকং কারবারীর ফোটোও—সব আমার কাছে আছে। আপনি তো আজ বমালসুদ্ধই ধরা পড়ে গেছেন। এই সব যদি পুলিসের কাছে ধরে দিই আপনি মহাবিপদে পড়ে যাবেন। আমি কিন্তু সেদিন আপনাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম তাই আপনাদের কথা আমি পুলিসকে বলব না। কিন্তু দুটি শর্ত আছেঃ প্রথম, আপনি ফুল্লরার যে গয়না নিয়েছেন তার দাম পাঁচ হাজার টাকা আমার চাই। সেটা কোন হাঁসপাতালে দেব। ফুল্লরার শেষ ইচ্ছা আমাকে পূর্ণ করতেই হবে। আমার দ্বিতীয় শর্তঃ আপনি যদি শুদ্ধি করে হিন্দু হতে না চান তাহলে আপনাকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে।"

সুবেদার খাঁ বিস্মিত হলেন।

"এ কথা বলছেন কেন!"

"কারণ আমি মনে করি প্রত্যেকটি মুসলমান হিন্দুস্থানের প্রচ্ছন্ন শত্রু।"

"আপনার এ রকম কুসংস্কার কেন? এটা প্রত্যাশা করি নি।"

"আপনি আমাকে চেনেন না, তাই প্রত্যাশা করেন নি। আমার অনেক রকম কুসংস্কার আছে। আমি শনি-মঙ্গলবার মানি, গ্রাহস্পর্শ মানি, গঙ্গা মানি, গয়া মানি—এটাও মানি। বাইরে যত ভালই হোক এটা আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক মুসলমান ভিতরে ভিতরে মুসলমানেরই ভালো চায়, হিন্দুর নয়। ওদের দিক থেকে বিচার করলে, এটা মহৎ গুণ, কিন্তু আমাদের দিক থেকে এ মনোভাব সাংঘাতিক বিপজ্জনক। মৌখিক প্রেম-বিনিময়ের দ্বারা এ মনোভাব বদলানো যায় না। গান্ধীজীর মতো লোকও হিন্দু-মোসলেম প্যাক্ট্ করে কিছু করতে পারেন নি। রাজনৈতিক দাবা খেলায় জিন্না সাহেবেরই জয় হয়েছে শেষকালে। দেশ যখন আলাদা হয়েই গেছে তখন যে যার দেশে থাকবে এইটেই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানরা পাকিস্তানে গিয়েই থাক। আমি মশাই আপনার কাছে সরলভাবে স্বীকারই করছি আমার জীবনের ব্রত হচ্ছে এদেশ থেকে মুসলমান তাড়ানো। আমি পুলিসে গোয়েন্দাগিরির চাকরিও করি। অনেক মুসলমান গুণ্ডাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেছি। আপনাকেও [illegible] কিন্তু আপনি

যদি পাকিস্তানে চলে যেতে রাজি হন, তাহলে কিছু করব না"।

সুবেদার খাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো।

"আপনি যখন আমার সম্বন্ধে এত খোঁজ নিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই এ কথা জানেন যে হিন্দুরা আমার পরিবারবর্গকেও নিঃশেষ করে দিয়েছে। এ-ও নিশ্চয় জানেন যে আজ পর্যন্ত সৎ অসৎ যে কোনও উপায়ে আমি যত টাকা রোজকার করেছি তা খরচ করেছি হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য—"

"জানি। কিন্তু এ-ও জানি যে আপনার চেতন লোকে কিম্বা অবচেতন লোকে এর একটা কারণও আছে।"

"কি কারণ?"

"শ্রীমতী ঝিনুক।"

হঠাৎ সুবেদার খাঁ তাঁর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেললেন। পৃথিবীনন্দন এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন সম্ভবত। তিনি মার্জারের মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুবেদার খাঁর উপর এবং বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলেন তাঁর প্যান্টের-পকেটে-ঢোকানো-হাতটা। একটু ধস্তাধস্তির পরই প্যান্টের ভিতর থেকে লোডেড রিভলভারটা বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীনন্দন ত্বরিত হস্তে সেটাকে তুলে নিয়ে লাফিয়ে দূরে সরে গেলেন। তারপর হেসে বললেন, "আমি সার্কাসের লোক খাঁ সাহেব। আমাকে অত সহজে ঘায়েল করতে পারবেন না। হ্যাণ্ডস্ আপ্—"

সুবেদার খাঁ হাত তুললেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিভলভারটা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর মনে হল তিনি যেন সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এখন আর কিছু করবার নেই।

"আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাব? থানায়?"

"না। আপনাকে যখন একদিন বন্ধু বলে স্বীকার করেছি তখন আপনাকে পুলিসের হাতে দেব না। এই সোনার বাট দুটোও আপনাকে ফেরত দেব, কারণ ওই হয়তো আপনার শেষ সম্বল। কিন্তু আমার ওই দুটি শর্তঃ আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে আর আপনাকে পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। আমি আপনাকে নিজে গিয়ে বর্ডার পার করে দিয়ে আসব। এদেশে আপনার স্থান নেই।"

"কেন সংবিধানে তো আছে—"

পৃথিবীনন্দন থামিয়ে দিলেন তাঁকে—"আমি জানি, সংবিধানে নানারকম উচ্চাঙ্গের উদারনীতি আছে। কিন্তু আমি উদার নই। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বদমায়েশ, পাজি লোক। এখন আপনি আমার পাল্লায় পড়েছেন, এখন আপনাকে আমার সঙ্গেই খানা খেতে হবে, আমার হুকুমেই চলতে হবে। হিন্দুস্থানে থাকা আপনার চলবে না, যদি থাকতে চান শুদ্ধি করে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে, কিম্বা জেলে থাকতে হবে। আশা করি আপনি আমাকে থানায় যেতে বাধ্য করবেন না। আসুন—" সুবেদার খাঁ তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন কি করবেন। শেষে ঠিক করলেন রাবণের উপদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। অশুভস্য কালহরণং। বললেন, "আপনি যখন এদেশ ছেড়ে যেতে বলছেন, অগত্যা তাই ছাড়ব। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। আমি চাকরি করি, চাকরি ছাড়বার আগে তাদের নোটিস দিতে হবে। এখানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যে টাকা পাওনা আছে সেটা তুলতে হবে। ওই সোনার বাট দুটো ঝিনুককে দেব বলেছিলাম, আপনি যখন মেহেরবানি করে ও দুটো ফেরত দিচ্ছেন, তাহলে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তার সঙ্গে দেখা করে ও দুটো দিয়ে আসব তাকে—"

"আর আমার পাঁচ হাজার টাকা?"

"সেটা আপনাকে এখুনি দিয়ে দিচ্ছি—"

কোটের ভিতরকার পকেট থেকে পাঁচখানি হাজার টাকার 'নোট' বার করে দিলেন সুবেদার খাঁ।

"এত টাকা আপনি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়ান?"

"তিনটে সোনার বাট পেয়েছিলাম। একটা বিক্রি করেছি।"

পৃথিবীনন্দন বললেন, "বেশ। সময় দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু এটা ঠিক জানবেন, যতক্ষণ আপনি এদেশে আছেন ততক্ষণ আমি আপনাকে চোখে চোখে রাখব, ততক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরব, এটা জেনে রাখবেন। সুবেদার খাঁ আর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। পৃথিবীনন্দনের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমার উপর দয়া করুন। এ দেশ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। এই আমার দেশ। আমার আপনার লোক এই দেশেই আছে। পাকিস্তানে কেউ নেই। সেখানে পাঞ্জাবী সিন্ধী, বেহারী মুসলমানে ভরে গেছে। তাদের আমি চিনি না। আমি এই দেশে থেকে হিন্দুদের সেবা করতে চাই। সেই সুযোগ আমাকে দিন। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে। এই সোনার বাট দুটো থাকুক আপনার কাছে। ওইটে নিয়েই কাজ শুরু করি আমরা। সত্যি আমি এদেশের হিন্দুর সেবা করতে চাই। আমাকে এর থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

সুবেদার খাঁর গলার স্বর কাঁপতে লাগল। পৃথিবীনন্দন মুচকি হেসে বললেন, "আপনি যা বলছেন তা অতি উচ্চাঙ্গের কথা।

দেশের বড় বড় নেতারাও ওই কথা বলছেন। কিন্তু আমি ও গিলছি না। ওইটেই হয়তো আদর্শ উচিত। কিন্তু আপনাকে আগেই আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অবুঝ লোক। আমার যেটা বিশ্বাস কে আমি একচুল নড়ি না। স্বকর্ণে মুখে রামনাম শুনলেও আমার মনে শুনেছি, ওটা ইলুশন। এ দেশ ত্যাগ করিয়ে আমি সোনার বাট আমি চাই না। ঘুষ নিই না।" সুবেদার থাঁর চোখ দুটো করে উঠল, কিন্তু তিনি কিছু পারলেন না।

"চলুন, স্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক্। এস।"

বাঁদরটা পেয়ারা গাছ থেকে নেমে এল লাফাতে লাফাতে। পৃথিবীনন্দন সুবেদার কে নিয়ে স্টেশনের দিকেই গেলেন।

গণেশ হালদারের বনস্পতি বিদ্যালয় খুব জমে উঠেছিল। জমে ওঠবারই কথা। কারণ এরকম স্কুল ও-প্রদেশে ছিল না। ওখানে শুধু পড়ানোই হ'ত না। হাতের কাজও শেখান হত। একজন ছুতোর, একজন কামার, একজন কুমোর এবং একজন দর্জীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। একজন ছাত্রকে তাদের কাছে প্রতিমাসে গিয়ে কাজ শিখে আসতে হত এবং এজন্য তিনি তাদের শিখাবার মজুরিস্বরূপ মাসে দশ টাকা করে দিতেন। সুঠাম মুকুজ্যেও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে জমিটাতে মাস্টার মশাই স্কুল করেছেন, যার উপর ওই বড় গাছটা আছে, সেই জমিটা তিনি তার মালিকের কাছ থেকে কিনে নেবার চেষ্টায় আছেন। জমিটা পরিমাণে দশ বিঘা। একটু বেশী টাকা দিলে জমির মালিক রাজি হয়ে যাবেন সম্ভবত। জমিটা নিজেদের দখলে এসে গেলে তখন তার একধারে তিনি একটা কারিগরি বিদ্যালয় করিয়ে দেবেন, একথাও বলেছেন। আর একধারে একটা ব্যায়ামশালা। সেখানে কুস্তি, লাঠিখেলা ছোরাখেলা প্রভৃতি শেখান হবে। সেকালে বাংলা দেশে একদা যে আদর্শে অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছিল সেই আদর্শেই বনস্পতি বিদ্যালয়কেও গড়ে তোলবার ইচ্ছা ছিল হালদার মশায়ের। তিনি ছেলেদের পড়াতেনও সেই আদর্শে। স্কুলের পড়াশোনা হয়ে গেলে তিনি ইতিহাসের গল্প করতেন নানারকম। দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতেন। গ্যারিবলডি, ম্যাৎসিনি, রাণা প্রতাপ সিং, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিং, রাণী লক্ষ্মী বাঈ, চাঁদ সুলতানা, অগ্নিযুগের বীরদের জীবন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন সেনগুপ্ত এদের কারো না কারো কাহিনী রোজ বলতেন ছেলেদের। গান্ধীজী আর পণ্ডিত নেহরুর কথাও বলতেন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েও কেন পেলাম না, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেশ ভাগ করে কেন খণ্ডিত হয়ে গেল, আমাদের চরিত্রের কি কি দোষ আমাদের স্বাধীনতাকে পরাধীনতার নিগড়ের চেয়েও দুঃসহ করেছে, এসব তিনি সহজ ভাষায় বিশদ করে বলতেন। এখানকার রেফিউজিদের সুখ দুঃখ নিয়েও আলোচনা হত এই বৈঠকে।

একদিন ব্যবসার প্রসঙ্গ ওঠাতে একজন রেফিউজি জেলেকে তিনি বললেন, "তোমরা তো ইলিশ মাছ ধরতে পার। এখানে ধর না কেন। এখানকার গঙ্গাতেও প্রচুর ইলিশ।"

সে বলল, "মাস্টারবাবু, ইলিশ মাছ ধরতে জানি। ইলিশ মাছ ধরব বলে ধার করে নৌকো আর জালও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। যাঁর জলকর তিনি মুসলমান। তিনি বললেন, তোমাদের লাভের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে। আমরা তাঁর দাবি মিটিয়ে খরচে কুলোতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে ও ব্যবসা ছাড়তে হল। এখন মাছ কিনে ফেরি করি। এদেশে এসেও মুসলমানের হাত থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, মাস্টার মশাই।"

গণেশ হালদার অনেক জেলেদের কাছ থেকে সই করিয়ে উপরে একটা দরখাস্ত করেছিলেন যে জলকরের মালিকেরা নির্মম-ভাবে জেলেদের শোষণ করছে তাতে মাছের দাম অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে, যাদের পুঁজি কম তারা এ ব্যবসায়ে নামতে পাচ্ছে না। কাগজে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেণ্ট নাকি নানা-রকম হোম ইনডাস্ট্রির উন্নতিকল্পে বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন, এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যবসাটির সম্মুখে যেসব অন্যায় বাধা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেগুলিকে গভর্নমেণ্ট যদি দয়া করে অপসারণ করেন তাহলে অনেক গরীব লোকের উপকার করা হবে।

এ দরখাস্তের কোনও উত্তর পর্যন্ত আসেনি। এ সরকারের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য। কোন দপ্তরে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায় না। কয়েকদিন পূর্বে এই বিভাগের কোন মন্ত্রী এ অঞ্চলে এসে-ছিলেন। শোনা গেল তিনি নাকি উক্ত জলকর ইজারাদারের বাড়িতে খানা-পিনা করেছেন। তা সত্ত্বেও গণেশ হালদার আর একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছেন ওপরওলার কাছে রেজেস্ট্রি করে। সেটারও কোন জবাব আসেনি।

এই প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলছিলেন, "এইসব ছোটখাটো স্ফুলিঙ্গই শেষকালে বিদ্রোহের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে ওঠে। দেশ জুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এইসব বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সিভিল-ওয়ারও শুরু হয়ে যায় অনেক সময়।"

"সিভিল ওয়ার কি সার"—জিগ্যেস করল একটি ছাত্র।

"সিভিল ওয়ার মানে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ। আত্মকলহ।"

"আত্মকলহ করা কি ভাল সার?"

"মোটেই ভালো নয়। কিন্তু অনেক সময় ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য তা করতে হয়। একজন বিদেশী বড় লেখক বলেছেন—পৃথিবীতে সিভিল-ওয়ার বা ফরেন ওয়ার বলে কিছু নেই। পৃথিবীর সব যুদ্ধই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধকে দুভাগে ভাগ করেছেন—ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ, আর অন্যায়ের জন্য যুদ্ধ। তাঁর মতে যুদ্ধ যদি লাগেই তাহলে ন্যায়ের পক্ষেই থাকা উচিত। তোমরা মহাভারতেও ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের কথা পড়েছ। পাণ্ডবরা ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন তাই তাঁদের জয় হল। আমাদেরও সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে তার জন্য লড়তে হবে। যুদ্ধে জয় যে হবেই এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় ন্যায়-যুদ্ধেও পরাজয় ঘটে। পারসীরা যখন গ্রীকদের আক্রমণ করেছিল, গ্রীকদের পরাজয় ঘটেছিল, কিন্তু যুদ্ধ থামেনি। যখন বড় হয়ে তাদের ইতিহাস পড়বে তখন জানতে পারবে কিরকম সর্বস্বপণ করে যুদ্ধ করে-ছিল গ্রীকরা। তারপর রোমানরাও এসে গ্রীস আক্রমণ করে। সে-ও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। অনেক ভালো ভালো গ্রীক প্রাণ

দিয়েছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস মারা গিয়েছিলেন, একটা অসভ্য রোমান সৈন্য তাঁকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে এসেছিল। আমাদের দেশেও বাইরের অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী কম আসে নি। তৈমুর, নাদির প্রভৃতির কথা তোমরা বড় হয়ে পড়বে। আমরা তখন অসহায় ছিলাম। এখনও অসহায় আছি। কিন্তু মানুষ যখন সব দিক থেকে অসহায় হয়ে পড়ে তখনও তাদের ভিতরকার শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এর প্রমাণ ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন। তারা দরিদ্র অসহায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তাদের মধ্যেই এমন সব লোক জন্মেছিল যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশনের বিদ্রোহ-অগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখা। তারা তাদের রাজা-রানীকে আর দেশের শোষক-সম্প্রদায়কে কেটে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। সেদিন রুশ দেশেও ঠিক এই কারণেই সারা দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। আমাদের দেশেও ইংরেজরা যখন ন্যায়ের পথ ত্যাগ করলেন, তাঁরা যে কিভাবে আমাদের শোষণ করে চলেছেন এটা যখন ধরা পড়ল, তখন দেশে জেগে উঠল শহীদের দল। মারাঠায়, বাংলায়, পাঞ্জাবে। বাংলা দেশেই বেশী। তারা প্রাণ তুচ্ছ করে ইংরেজদের উপর গুলী বোমা চালিয়ে দলে দলে ফাঁসি কাঠে উঠেছিল। ন্যায়সংগত স্বাধীনতার জন্য তারা মরতে ভয় পায় নি। সারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছে তারা। আজ যা আমরা পেয়েছি তার জন্য ওই শহীদের দলই প্রথম আন্দোলন করেছিল। বাংলা দেশে যারা করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল পূর্ববঙ্গের ছেলে। কিন্তু বিধাতার কি পরিহাস, স্বাধীন ভারতে আজ পূর্ববঙ্গ নেই। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কুকুর বিড়ালের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসও এই। অকথ্য অত্যাচারই মানুষকে যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছে স্বাধীনতা-লাভের জন্য। সব দেশে সব যুগে মানুষ ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, সাম্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে। সেই সব দধীচির অস্থিই বজ্র তৈরি করেছে অন্যায়-দৈত্যকে মারবার জন্য, অন্যায় অসাম্যকে ধ্বংস করবার জন্য।"

একজন জিগ্যেস করল—"সাম্য মানে কি? আমরা সবাই সমান হয়ে যাব?"

"ঠিক তা নয়। দূর্বাঘাস কখনও তাল গাছ হতে পারবে না। সাম্যের মানে হচ্ছে সবাই সমান সুযোগ পাবে। দূর্বাঘাস তাল গাছ দুজনেই সমান সুযোগ পাবে আত্মোন্নতি করবার। নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে সবাই বাড়বে। এরই নাম সাম্য। আমাদের সকলেরই সমান শিক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভোটের দাম সমান হবে, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ধর্মমতকে সমান সমান শ্রদ্ধা জানাতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষার পূর্ণ অধিকার পাবে। অন্য ভাষা কেউ যদি শিখতে চায় সে ব্যবস্থাও থাকবে। স্টেট সমানভাবে সকলের অন্ন-বস্ত্র শিক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। জলকরের ইজারাদার কোন পরিশ্রম না করে' লাভের অর্ধাংশ গ্রাস করবে, এ অন্যায় ব্যবস্থা আদর্শ সাম্যবাদী স্টেটে থাকবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে কিন্তু। পরশ্রীকাতরতার উপর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত নয়। যে সাম্যবাদে ধূর্ত মূষিক বা শৃগালের দল সিংহকে বিব্রত বা নির্বীর্য করবার চেষ্টা করে সে সাম্যবাদ আমাদের আদর্শ নয়। আমরা প্রত্যেককেই সমান সুযোগ দিতে চাই। সাম্যই সভ্যতার আদর্শ। কিন্তু সে সাম্যের মহিমা কি, তার আসল তাৎপর্য কি তা শিক্ষিত না হলে বোঝা যায় না। তাই সব চেয়ে আগে দরকার শিক্ষা, সুশিক্ষা। এখন আমরা মূর্খতার অন্ধকারে আর স্বার্থপরতার পঙ্কে ডুবে আছি। তার থেকেই আমাদের সর্বপ্রথমে মুক্তি পেতে হবে। তাই আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন অগ্নিযুগের নেতারা, যার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন, সর্বাগ্রে কর্মীদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ মূর্খের দ্বারা কোন অগ্রগতিই সম্ভব নয়। ফরাসী দেশেও ফরাসী বিদ্রোহের আগে একদল শক্তিমান লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন—তাঁদের সবাই এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট বলত। তাঁরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে সকলের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে, অন্যায় ট্যাক্সের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগাবার চেষ্টা করতেন। তাঁরা দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখতেন তা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন সকলের মনে। তাঁরা দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন বলেই ফরাসী বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশে স্বাধীনতালাভের পর যে সংবিধান রচিত হয়েছে তা খুবই উচ্চাদর্শমূলক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেসব উচ্চাদর্শ কার্যক্ষেত্রে আর উচ্চ থাকছে না। প্রাদেশিকতার হলাহলে সব বিষাক্ত হয়ে উঠছে। সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে সবাইকে আবার লড়তে হবে। কিন্তু এ লড়াই জিততে হলে নিজেদের চরিত্রকে গড়তে হবে সকলের আগে। অপরের দোষ অনুসন্ধান করবার আগে নিজেদের নির্দোষ হতে হবে—"

এইসব বক্তৃতা শুনতে অনেক লোক আসত। শহরময় গণেশ হালদারের খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্যাতি বিস্তৃত হলেই হিংসুটে লোকেদের টনক নড়ে। যে স্কুল হালদার মশাই ছেড়ে এসেছিলেন সে স্কুলের কর্তৃপক্ষেরা কেউ সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁর উপর। তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হওয়াতে আরও অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁদের বুকে তুষানল জ্বলতে লাগল। তাঁদেরই প্ররোচনায় পুলিসের স্পাইও এসে বসতে লাগল তাঁর বক্তৃতা-সভায়। গণেশ হালদার অনেককেই চিনতেন না, স্পাইদেরও চিনতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে ঝিনুক তনিমার আর একটা চিঠি পেল।

ঝিনুকদি,

অনেক বেড়িয়ে এলাম। সত্যি, পৃথিবী কত বড় আর মানুষ কত বিচিত্র। তুমি ঠিকই লিখেছ, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচিত হ'তে হবে। এরা অন্য গ্রহে যাবার তোড়জোড় করছে আমরা পৃথিবীরই খবর রাখি না। বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর জীবনদর্শনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁধতে হবে আমাদের বীণা। তবেই আমরা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে জমাতে পারব ভারতবর্ষের চিরন্তন সুর। আমাদের দেশে বিশ্বপ্রেমের নলচে আড়াল দিয়ে প্রাদেশিকতা আর নেপটিজমের চর্চা করতে করতে অজ্ঞ দেশবাসীর ভক্তি-গদগদ বা স্বার্থক্রীত ভোট-বাহুল্যের জোরে মেকি-নকল স্বাধীনতার পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে আমরা পোকামাকড় জড়ো করেছি, তা যে কত ভুয়ো, তা এদেশে কিছুদিন বাস করলেই বোঝা যায়। বাঙালী একদিন উপার্জনের তাগিদে নিজের মাতৃভূমি বাংলা দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ইংরাজ আমলের প্রবাসী বাঙালীদের কীর্তিকথা আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার বাইরেই বেশী সমাদৃত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেও একথা সত্য। কিন্তু এখন আমাদের মেকি স্বাধীনতার আবহাওয়ায় প্রাদেশিকতারই বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং বাঙালী আর ভারতবর্ষে আত্মবিস্তার করবার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। তাকে এবার ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে বেরুতে হবে। বাইরেই তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা হবে, সুবিচার হবে। প্রাচীন কালেও তো বাঙালী ভারতবর্ষের বাইরে ঘোরিয়ে অনেক কীর্তি স্থাপন করেছিল, স্বদেশী বিদেশী অনেকের মুখেই একথা প্রচারিত হয়েছে। আবার তাকে বেরুতে হবে। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় আমি নিশ্চয় তাদের সাহায্য করব। আমার সাধ্য অবশ্য আমার রূপ আর যৌবন। জানি না, এর জলুস কতদিন থাকবে। তবে সেদিন আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে' অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি ঝিনুকদি। আবিষ্কার করেছি উনি আমার রূপ-যৌবন দেখেই শুধু মুগ্ধ হননি বোধ হয়, আমার মধ্যে এমন একটা কিছু দেখেছেন, যা আমার দেহেই নিবদ্ধ নয়। এদেশে টাকার গন্ধ পেলে অভিসারিকা-উপযাচিকারা ছেঁকে ধরে পিঁপড়ের মতো। যারা এসেছিল, তাদের আমি দেখেছি। তাদের তুলনায় আমি সাধারণ বগি বা বিন্দি। কিন্তু আমি দেখলাম উনি সুকৌশলে তাদের এড়িয়ে গেছেন। আর একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাকে উনি পাঁচ হাজার পাউন্ড দিয়ে একটি হীরের হার কিনে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম, অত টাকা খরচ করে হার কেনবার শখ আমার নেই। ও টাকা দিয়ে বরং আমাদের মধ্যে যারা এদেশে চলে আসতে চায় তাদের আনবার ব্যবস্থা কর। তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দাও এখানে। উনি বললেন, তা আমি দেব, কিন্তু হারটা তোমায় নিতে হবে। বললাম, তুমি যখন অত করে বলছ নিতে আর আপত্তি করব না। কিন্তু আমার সত্যিকার একটা অদ্ভুত শখ আছে সেটা মেটাবে? কি শখ, জিজ্ঞেস করলেন। বললাম দেশে ফিরে গিয়ে যত মাতাল আর চরিত্রহীন অফিসার আছে তাদের নিমন্ত্রণ করে বড় পার্টি দেব একটা। আর সে পার্টিতে থাকবে যত ভ্রষ্টা মেয়েমানুষের দল। ওদের নাচিয়ে একটু মজা দেখতে চাই। উনি রাজী হয়েছেন এতেও। একবার দেশে ফিরে গিয়ে কোনও নামজাদা শহরে এই পার্টি দেবার ইচ্ছে আছে। উনি তোমাদের পাসপোর্টের আর ভিসার ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা কবে আসবে তা যদি আগে থাকতে জানতে পারি তাহলে এয়ারপোর্টে থাকব তোমাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য। তবে তোমাদের যদি দেরি হয় তাহলে আমরা থাকব না। আমাদের আপিসের ম্যানেজার যাবেন তোমাদের এরোড্রোম থেকে আনবার জন্য। তোমাদের আসবার তারিখটা তাঁকে জানিয়ে দিও। আলাপ হলে দেখবে উঁচু দরের ভদ্রলোক তিনি। আমাদের বাড়ি আছে এখানে একটা। সেইখানেই তোমরা এসে উঠবে। কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের কোম্পানিতে তোমার এবং ডাক্তার ঘোষালের চাকরি হয়ে গেছে। যেদিন আসবে সেইদিনই জয়েন করতে পারবে। আমরা রাশিয়ার একটা পাসপোর্ট জোগাড় করেছি। সেখান থেকে দেশে ফিরব। দেশে ফেরবার আগে তোমাকে একটা চিঠি দেব। এত সুখে আছি, তবু আমার দুঃখ কি জানো ঝিনুকদি? আমার বাবা। লোকে পিতৃ পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু আমার মাথা নুয়ে যায় লজ্জায়। তবু ও'কে সব কথা বলেছি। উনি বললেন, ভাঙা জিনিসকে জোড়া যায়, কিন্তু পচা জিনিস মেরামতের বাইরে। তোমার বাবার কথা যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে তিনি পচে গেছেন। তাঁকে যদি কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাও, আমি আপত্তি করব না। বাবার খবর কি আমাকে জানিও একটু। শামুক এখানে এসে কাজ করছে। এর মধ্যেই আপিসে তার সুনাম হয়েছে। তোমার ভাইপোকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। তোমরা আমাদের ভালবাসা জেন। মিস্টার পান্ডা আর সুবেদার খাঁর খবর কি? তোমাদের বাড়িতে কি এখনও তাসের আড্ডা বসছে? সব খবর দিয়ে উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও।

ইতি—

তনিমা

ডাক্তার ঘোষাল অনেক আগেই কলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঝিনুক বাইরের ঘরে একা বসে চিঠিটা পড়ছিল। চিঠি থেকে চোখ তুলেই দেখল সুবেদার খাঁ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কখন যে নিঃশব্দচরণে এসেছিলেন তা ঝিনুক বুঝতে পারেনি।

"আপনি কখন এলেন? বসুন।"

ঝিনুক তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল। সুবেদার খাঁ কিন্তু বসলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন।

"না, আমি বসব না। এখুনি চলে যাব।"

"আচ্ছা সেদিন রাত্রে সে ব্যাপারটা কি হল বলুন তো। ক্রাটালের ভিতর কি ছিল?"

"সোনার বাট।"

"আর ওই লোকটা কে! সঙ্গে বাদর—"

"পুলিস স্পাই। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমরা ধরা পড়েছি।"

"সে কি!"

"আমি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছি। ও লোকটা আমাকে এখানে থাকতে দেবে না।"

"সে কি! এখানকার চাকরি?"

'ছেড়ে দিচ্ছি। ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। তবে এখনও অন্তত মাসখানেক কাজ করতে হবে। তোমাকে একটা বিষয়ে সাবধান করতে এলাম। তুমি বলেছিলে বিলেত যাবার জন্য পাসপোর্টের দরখাস্ত করেছ। পাসপোর্ট পেয়েছ কি? স্পাইটা বাগড়া লাগাতে পারে। তার কাছে তোমার ফটো আর ডাক্তার ঘোষালের ফটো আছে দেখেছি। আমাদের সমস্ত খবর জোগাড় করেছে লোকটা। আমাকে বলেছে আপনি যদি পাকিস্তান চলে যান আপনার নামে রিপোর্ট করব না। আমাদের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ আছে তাও আমাকে দিয়ে দেবে বলেছে।"

"আমরা তো পাসপোর্ট পেয়েছি। এ মাসের শেষ সপ্তাহের সোমবার রাত্রের ট্রেনে আমাদের কলকাতা যাওয়ার কথা।"

"কথাটা বেশী প্রকাশ করো না। ট্রেনে চড়বার সময়েই যদি কোনও গোলমাল করে. যদিও সে কথা দিয়েছে তোমার কোন অনিষ্ট করবে না। কিন্তু পুলিসের লোককে বিশ্বাস নেই।"

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে মনে মনে মুষড়ে পড়ল ঝিনুক। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ হল না তেমন কিছু। দৃঢ় নিবদ্ধ ওষ্ঠে চুপ করে রইল সে কেবল। চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

ক্ষণকাল পরে বলল। "খবরটা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

সুবেদার খাঁ বললেন, "যেদিন তোমরা যাবে বলছ সেদিন আমারই ডিউটি। তোমরা যে ট্রেনে যাবে সে ট্রেন আমিই নিয়ে যাব। যদি বল গাড়ি ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি। স্টেশনে না উঠে সেইখানে ওঠাই নিরাপদ। একটু আগে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেক তাহলে—"

ঝিনুক যেন অকূলে কূল পেল।

"সে তো খুব ভালো হয়। কেউ আবার রিপোর্ট করবে না তো আপনার নামে?"

ম্লান হেসে সুবেদার খাঁ বললেন, "সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়। চাকরি ছেড়েই যখন চলে যেতে হচ্ছে তখন রিপোর্টের আর কি ভয়।"

"আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? ও কি আপনাকে চলে যেতে বাধ্য করতে পারে?"

"ও বলেছে আমি যদি পাকিস্তানে চলে যাই তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে যত প্রমাণ আছে সব আমার হাতে দিয়ে দেবে। আমি এ ব্যাপারে একা জড়িত হলে পাকিস্তানে যেতাম না, মকদ্দমা লড়তাম। হেরে গিয়ে জেল হলে জেলও খাটতাম। কিন্তু এর সঙ্গে তুমিও জড়িয়ে আছ যে। তোমাকে নিয়ে আদালতে বা জেলে টানাটানি করবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তোমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমাকে পাকিস্তানে যেতে হচ্ছে। এটা ঠিক জেন, যখন যেখানে থাকব—"

সুবেদার খাঁ আর বলতে পারলেন না, বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে।

"আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে। তোমার বিলেতের ঠিকানাটা কি—"

"এই যে দিচ্ছি।"

একটা কাগজে সে ঠিকানাটা টুকে দিলে। "চিঠি লিখবেন মাঝে মাঝে। আমার কাকাও পাকিস্তানে যাচ্ছেন। তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি, যদি সুবিধে হয় তাঁর সঙ্গেও দেখা করবেন।

"দাও নিশ্চয় দেখা করব!"

ঝিনুক আর একটা কাগজে তার কাকার ঠিকানাটাও লিখে দিলে। সে অনুভব করতে লাগল সুবেদার খাঁর কাছে সে অসীম ঋণে ঋণী, কিন্তু সে ঋণ শোধ করবার উপায় নেই। উনি যা চাইছেন তা সে কিছুতেই দিতে পারবে না।

ঠিকানা পকেটে পুরে একটা ছোট চামড়ার থলি বার করলেন তিনি প্যান্টের পকেট থেকে।

"এই নাও, এই বোধহয় তোমাকে আমার শেষ উপহার।"

"কি আছে ওতে।"

"সেই সোনার বাট দুটো। পৃথিবীনন্দন ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

"পৃথিবী নন্দন কে?"

"সেই স্পাই। স্পাই বটে, কিন্তু অসাধারণ লোক।

আচ্ছা চলি এবার তবে।"

সুবেদার খাঁ চলে গেলেন।

সুবেদার খাঁ বেরিয়েই দেখতে পেলো মংকু পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। একটু দূরে পৃথিবীনন্দনও দাঁড়ি-

...লেন। সেদিনের পর থেকে তিনি সুবেদার ... এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করেন নি।

ডাক্তার মুখার্জি সেদিন যেখানে বসে-ছিলেন সে জায়গাটা অদ্ভুত। ফাঁকা অথচ ...। নানারকম গাছ দিয়ে ঘেরা একটা বড় উঠোনের মতো জায়গা। সামনে বেশ খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা লতা-তোরণের ভিতর দিয়ে। দুটো গাছের ডাল যেন বাহু বাড়িয়ে পরস্পরকে সম্ভাষণ করছে আর তাদের উপর উঠেছে ঘনশ্যাম ত্যালাকুচো লতা, লাল লাল অনেক ফলও ধরেছে তাতে। সুন্দর একটা তোরণের মত হয়েছে। নীচে দিয়ে দূরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেইখানে দূর্বাঘাসের উপর বসেছিলেন সুঠাম মুকুজ্জে, সামনে একটা উঁচু ঘাসে-ঢাকা ঢিবির মতো ছিল, তার উপর নিজের ফাইলটা রেখে লিখছিলেন :

"আমি যেখানে আজ এসেছি সে জায়গাটা অতি পুরাতন। কিন্তু নাম নতুন ডাঙা। কবে কে এর নাম নূতন ডাঙা (এদেশের ভাষায় নঈ ময়দান) রেখেছিল তা জানি না, কিন্তু এটা জানি, এখানে এসে যখনই বসেছি তখনই নূতন একটা প্রেরণা পেয়েছি। আজ আপনাকে যে কথা বলতে যাচ্ছি তার জন্যে একটা নূতন প্রেরণারই দরকার। সত্য কথাও অনেক সময় অসংকোচে বলা যায় না। বিশেষত সে সত্যটা যদি ভয়ানক সত্য হয়। আর একটা কথাও আপনি ন্যায়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন—একথা আপনাকে এতদিন বলি নি কেন। এর কারণ প্রথমে অনেকদিন আমি কথাটা জানতেই পারিনি। তারপর যখন জানলুম তখন যার সম্বন্ধে কথাটা সে-ই সেটা প্রকাশ করতে বারণ করে দিলে। মাত্র কাল তার অনুমতি পেয়েছি।

গোড়া থেকেই শুনুন। আমি বিলেতে অনেকদিন কাটিয়ে যখন দেশে ফিরলুম তখন কোথায় বসব ঠিক করতে না পেরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দেশ তখন পাকিস্তান হিন্দুস্থানে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, রায়ট্ চলছে চারিদিকে। তখন পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত হিন্দু বাঙালীর দল পিলপিল করে পালিয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে। আমি তখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান বর্ডারে এক হাস-পাতালে আমার এক বাল্যবন্ধুর বাসায় ছিলাম। হাসপাতালটা হিন্দুস্থানে আর আমার বন্ধু সেই হাসপাতালের মেডিকাল অফিসার। একদিন গভীর রাত্রে একদল লোক হইহই করে একটি রক্তাক্ত অজ্ঞান মেয়েকে নিয়ে হাজির হল এসে। মেয়েটিকে পাকিস্তান ধর্ষণ করে তার স্তন দুটি কেটে তাকে পাকিস্তান বর্ডার পার করে হিন্দুস্থানে ফেলে দিয়ে গেছে গুণ্ডারা। দেখে শিউরে উঠলাম। পাশবিকতার এরকম চেহারা আর দেখি নি। মেয়েটি রূপসী এবং যুবতী। ধর্ষণের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু তখন সে মরে নি। আমরা দুই ডাক্তারে তখন লেগে পড়লুম। মেয়েটির জীবনীশক্তি প্রচুর ছিল, আমরাও চেষ্টার ত্রুটি করি নি, কোলকাতা থেকে ব্লাড এনে ট্রান্সফিউশনও করেছিলাম। আজকাল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ, মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল। তারপরই হল সমস্যা। শুনলাম মেয়েটি ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা। এতেই আরও মুশকিল হ'ল। চারিদিকে যেসব উদ্বাস্তু-কলোনী হয়েছিল তার একটাতেও সে থাকতে পারল না। তার অঙ্গহীনতার জন্য সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। একদিন আমাকে সে বলল, "আপনারা আমাকে না বাঁচালেই পারতেন। নরককুণ্ডে পচে মরার চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল।" আমার স্বভাবের মধ্যে একটা একগুঁয়েমি আছে, আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। আপনি একাধিকবার আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি যেতে দিই নি। এই মেয়েটির সম্বন্ধেও আমার তেমনি একটা মনোভাব জেগে উঠল। জিদ চড়ে গেল। মনে হতে লাগল—একে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে সত্যিই কি লাভ হল যদি একে মানুষের মতো বাঁচবার সুযোগ না দিতে পারি? একে কোন উদ্বাস্তু-কলোনীতে রেখে গেলে সত্যিই তো এর আরও শোচনীয় মৃত্যু হবে। ওর অতীত লুপ্ত হয়ে গেছে, দেশে ফিরবার উপায় নেই, ওর মা বাবাকে গুণ্ডারা হত্যা করেছে, ওদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ও যাবে কোথায়? ওর ভবিষ্যৎ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে এগিয়ে এসে বলবে ওর দায়িত্ব আমি নিলাম? তারপরই মনে হল এসব প্রশ্ন কাকে করছ তুমি। নদীতে একটা লোক ডুবে যাচ্ছে, অসহায় হাত দুটো তুলে সাহায্য প্রার্থনা করছে, আর তুমি তীরে দাঁড়িয়ে ভাবছ কে ওকে গিয়ে তুলবে? তুমি তো গিয়ে তুলতে পারো। মনস্থির করে ফেললাম একদিন। তাকে বললাম, "এ নরককুণ্ড থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারি, যদি তুমি রাজি থাক।"

"কি করে উদ্ধার করবেন আপনি"—বিস্মিত দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল সে।

বললাম, "তোমাকে বিয়ে করব। আমিও ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার এখনও বিয়ে হয় নি। তোমার আপত্তি না থাকলে তোমাকেই বিয়ে করতে পারি আইন অনুসারে।"

খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে রইল সে। তারপর বলল, "আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মতো একটা মেয়েকে বিয়ে করতে আপনার ঘৃণা হচ্ছে না? আপনার আত্মীয় স্বজন নেই? তাঁরা কি আমাকে ঘৃণা করবেন না?"

বললাম, "না, আমার কেউ নেই। ঘরও কোথাও বাঁধি নি এখনও। তোমাকে সত্যি আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি যদি আপত্তি না কর, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধি।"

কয়েকদিন পরেই রেজিস্টার্ড বিবাহ হয়ে গেল। তখন এখানে আমি বাড়িটা কিনেছি বটে কিন্তু গৃহস্থালী স্থাপন করি নি। ওকে এখানে নিয়ে এলাম। তারপরই সমস্যা শুরু হল। দেখলাম ও কিছুতেই যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, আলাদা আলাদা থাকতে চায়। রাত্রে আলাদা ঘরে, আলাদা বিছানায় শোয়। দিনের বেলা বেশীর ভাগই ঠাকুর ঘরে বসে থাকে আর কাঁদে। মুখে হাসি নেই, সর্বদাই কেমন যেন একটা বিমর্ষ বিষণ্ণভব। তখন আমি এখানকার স্কুল কমিটিতে ছিলাম। সেই সময় একজন শিক্ষক নিযুক্ত করবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দরখাস্তগুলো যখন এল তখন স্কুল কমিটি আমার উপর ভার দিলেন কাকে নেওয়া হবে তা ঠিক করবার। আমি দরখাস্তগুলো বাড়ি এনে আমার স্ত্রীকে দিলাম। বললাম, তুমিই ঠিক কর, কে যোগ্যতম লোক। তাকে একটা কাজ দিয়ে একটু অন্যমনস্ক করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে আপনাকেই যোগ্যতম লোক বলে নির্বাচন করল। আমিও পরে দরখাস্তগুলো

পড়ে দেখলাম তার নির্বাচন ঠিক হয়েছে। তারপর আপনি এলেন। আপনি যখন আমার বাড়িতে এলেন তখন আমার স্ত্রীই আমাকে অনুরোধ করল, ও'কে এখানেই থাকতে বল, এখানেই উনি খাওয়াদাওয়া করবেন। ও'কে আলাদা বাসা করতে দিও না। তাই হল, আপনি আমাদের বাসায় থেকে গেলেন। আপনার সংগে ক্রমশ আমার একটা ভালবাসার বন্ধন গড়ে উঠল। আমিও আপনার সংগে ক্রমশ যেন একটা একাত্মতা অনুভব করতে লাগলাম। আপনি যে বাইরের লোক, আমার কেউ নন—এ কথা আমার মন থেকে তিরোহিত হল ক্রমশ। এইভাবেই চলছিল, তারপর আপনার সংগে স্কুল কমিটির বিরোধ বাধল। আপনি এখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। ঠিক তার আগের দিন আমি সত্য ঘটনাটা শুনেছি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। কথাটা আমার কাছে এতদিন প্রকাশ করতে ইতস্তত করেছে সে, কিন্তু মনে মনে এজন্য সে-ও কম অস্বস্তি ভোগ করে নি। আমাকে বলল, "একটা কথা তোমাকে আজ বলব, রাগ করবে না তো।"

আমি বিস্মিত হলাম। এ ভাবে সে আমার সংগে আর কোনদিন কথা বলে নি।

বললাম, "না, রাগ করব কেন। কি কথা?"

সে একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, "যে মাস্টার মশাই আমাদের বাড়িতে আছেন, তিনি আমার দাদা। রায়টের সময় উনি বিলেতে ছিলেন। দরখাস্তগুলোর মধ্যে ও'র নাম দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল ইনি আমার দাদা। তারপর যখন এলেন তখন আর সন্দেহ রইল না। ও'কে তুমি বলো একদিন সব কথা খুলে। বলো তোমার বোন বুলিই আমার স্ত্রী।"

আমি একথা সেদিন আপনাকে বলতে পারি নি। কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকছিল। আপনার সংগে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়ল এটা খুবই সুখের কথা, আপনার উপর আমার আর একটা দাবি বাড়ল। এটাও খুবই আনন্দের, কিন্তু মাত্র এই দাবিটার উপরই আমি জোর দিতে চাই না, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, এই জোরেই আমি আপনাকে আমার সংগে রাখতে চাই, আপনি যা করছেন তা নিশ্চিত মনে করুন। আপনার সংগে এ আত্মীয়তা যদি না-ও বেরুত তাহলেও আমি আপনাকে ছাড়তুম না। এসব কথা সেদিন মুখে আপনার সামনে আমি বলতে পারি নি, কেমন যেন সংকোচ হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল প্রকাশ পেলে একটা মেলোড্রামাটিক গোছের কাণ্ড না হয়ে পড়ে। কিন্তু বলতে না পেরে অস্বস্তিও ভোগ করছিলাম। এখন তার অবসান হলো। একটা লতা-তোরণের ভিতর দিয়ে সামনে খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বাঁশপাতি পাখি। ঝিরঝির করে সুন্দর হাওয়া বইছে। দূরে কোকিল ডাকছে। আশপাশের ঘাসে সবুজ শোভা। আমাদের জীবনও এমনি সহজ ও সুন্দর হোক। আপনাদের যে পারিবারিক জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তা আবার নব নব শোভায় সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠুক নূতন পরিবেশে—এই এখন আমার অন্তরের কামনা।"

গণেশ হালদার এ চিঠিটা পড়া যখন শেষ করলেন তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। ডাক্তারবাবু তাঁকে রোজ যে লেখা টুকতে দিতেন তা তিনি শোওয়ার আগে টুকে তবে শুতেন। সেদিন লেখাটা পড়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুর বাড়িটা অন্ধকারে বিরাট একটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে গণেশ হালদার বাড়িটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ওই বাড়ির মধ্যে বুলি আছে? এতদিন ছিল? এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তবু এ সত্যি। নিশ্চয় সত্যি, ডাক্তার মুখার্জি যখন লিখেছেন তখন এ মিথ্যা নয়। হতবাক আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। রকেটের চীৎকারে তাঁর আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল। রকেট সর্বদা সজাগ প্রহরী। রকেটের সংগে তাঁরও ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি ডাকলেন, রকেট, রকেট কাম হিয়ার। রকেট তবু ডাকতে লাগল। চেনা-লোককেও এ রকম সন্দেহ-জনক পরিস্থিতিতে সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

কপাট খুলে ডাক্তার মুখার্জি বেরিয়ে এলেন, "কে, কে ওখানে—"

"আমি।"

এগিয়ে এলেন গণেশ হলাদার।

"ও, আসুন।"

"এখুনি আপনার লেখাটা শেষ করলাম। বুলি কই?"

"আসুন ভিতরে আসুন, সে জেগেই আছে।"

গণেশ হালদার অনুভব করলেন, তার পা দুটো থরথর করে কাঁপছে।

বুলি বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল।

গণেশ হালদার ঘরে ঢুকতেই সে 'দাদা' বলে প্রণাম করবার জন্য ঝুঁকল, কিন্তু মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল সংগে সংগে।

সন্ধ্যার পর ঝিনুক দুটো নূতন বড় স্যুটকেস নিয়ে ঢুকল।

ডাক্তার ঘোষাল সবিস্ময়ে বললেন, "হঠাৎ দুটো স্যুটকেস কিনলে যে?"

"এই দুটোতেই আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"বিলেত। বাঃ সব ভুলে গেলেন। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

"আমি যাব না।"

"আমাকে যেতেই হবে। আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন না?"

"এ অনুরোধ রাখা হবে না। আমি জীবনে টো টো করে অনেক ঘুরেছি। আর ঘোরবার ইচ্ছে নেই। ইউলিসিস্ শেষকালে বাড়ি ফিরে এসেছিল। I too want to settle down, আমিও শান্তিতে থাকতে চাই কোথাও।"

"বিলেতেই ঘর বাঁধব আমরা।"

"না, বিদেশে যেতে চাই না।"

"একবার ঘুরে বেড়িয়ে আসতে ক্ষতি কি। ভাল না লাগে চলে আসবেন।"

ডাক্তার ঘোষাল কোন জবাব দিলেন না। ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

তারপর বললেন, "না আর experiment করার সময় নেই।"

আবার সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। ঝিনুক তখন এ-নিয়ে আর আলোচনা করা সমীচীন মনে করল না।

বলল, "আপনি কি রাত্রে কোথাও বেরুবেন?"

"না।"

"তাহলে গাড়িটা নিয়ে বেরুব আমি একটু পরে।"

"কোথা যাবে?"

"পরে বলব, জরুরী দরকার আছে। একটা।"

ঝিনুক মাঝে মাঝে এরকম বেরিয়ে যায়। ডাক্তার ঘোষাল পছন্দ করেন না এটা। কিন্তু আজকাল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও সাহস হয় না তাঁর। তিনি জানেন প্রতিবাদ করলে ফল হবে না, ঝিনুক নিজের পথে নিজের মতে চলবেই। সুতো বেশী টেনে ধরলে সুতো ছিঁড়ে মাছ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ মৎস্য-শিকারীর মতো তাই তিনি আজকাল সুতোটা ঢিলে করে দেন যখনই দরকার হয়।

সেদিন রাত্রে ঝিনুক মাখানিয়ার মাঠে গিয়েছিল তার পোতা-টাকা তুলে আনতে। দুটো বড় বড় ফাঁক-মুখো শিশির মধ্যে টাকাগুলো পুরে শিল করে সে দুটো একটা চিহ্নিত জায়গায় পুঁতে রেখে এসেছিল সে। সবসুদ্ধ কুড়ি হাজার টাকা ছিল। হাজার টাকার কুড়িখানা নোট। আগে ন'হাজার ছিল, তারপর গণেশ হালদারের কাছ থেকে যে এগারো হাজার টাকা এনেছিল, সেটাও এখানে রেখে গিয়েছিল। টাকা নিয়ে কি করবে তার হিসাবও ঠিক করে ফেলেছিল সে। পাঁচ হাজার টাকা যতীশবাবুকে দেবে, আর পাঁচ হাজার টাকা কাউকে। কাউ সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা তার বরাবরই ছিল। সে যে ডাক্তার ঘোষালের ছেলে, ন্যায়ত ডাক্তার ঘোষালের সমস্ত সম্পত্তির এবং মনোযোগের সেই যে উত্তরাধিকারী এ কথাটা ঝিনুক একদিনও ভোলেনি। তাই সে কাউকে বরাবরই পুত্রবৎ স্নেহ করত। ডাক্তার ঘোষাল তাকে তাড়িয়ে দিয়ে যে অন্যায় করেছেন এটা সে ডাক্তার ঘোষালকে বরাবরই বলেছিল। বলেছিল তাকে খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষাল এক-রোখা লোক, একবার বেঁকে বসলে সোজা করা শক্ত। ঝিনুক তবু মনে মনে আশা করেছিল শেষ পর্যন্ত তাঁকে সোজা করবে। কিন্তু কাউয়ের কোন ঠিকানা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ বিলেত যাওয়ার সুযোগ এসে গেল। কাউকে খুঁজে নিয়ে আসার প্রশ্নই আর রইল না। এখন সে ঠিক করেছে যাবার আগে কাউকে যতটা পারে নগদ টাকাই দিয়ে যাবে আর বিলেতে গিয়ে যদি সুবিধা করতে পারে তো কাউকেও নিয়ে যাবে সেখানে। মনে মনে ঠিক করল কালই কাউকে খুঁজে বার করতে হবে যেমন করে হোক। হরসুন্দর কি খুঁজে আনতে পারবে তাকে?

ঝিনুক জানত না যে যতীশবাবু কাউয়ের ঠিকানায় যাতায়াত করেন। কথায় কথায় সেদিন রাত্রেই কিন্তু কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

ঝিনুক প্রথমেই ফিরল ডাক্তার ঘোষালের বাসায়। সেখানে গিয়ে শুনল ডাক্তার ঘোষাল পাশের বাড়িতে তাস খেলতে গেছেন। ডাক্তার ঘোষালের বাসায় তাসের আড্ডা ভেঙে যাবার পর থেকে তিনি প্রায় পাশের বাড়িতে তাস খেলতে যান। পাশের বাড়িটি একটি মেস। নানারকম লোক থাকে সেখানে।

ঝিনুক টাকাগুলি বার করে লুকিয়ে রেখে দিলে আলমারির মধ্যে। তারপর বাড়ি গেল। যতীশবাবু জেগে বসেছিলেন। ঝিনুককে দেখেই তিনি বললেন, "দেশে ফিরবার সরকারী অনুমতি আজ এসে গেছে। টাকার যোগাড় করেছ? টাকা না পেলে কিন্তু আমি কোথাও যাব না।"

"টাকার যোগাড় হয়ে গেছে। কাল তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"

"কাল?"

"হ্যাঁ, কারণ তারপরই আমাদের বিলেত যাওয়ার আয়োজন করতে হবে। এ সময় কাউ থাকলে ভাল হত। সে সব গুছিয়ে টুছিয়ে দিত। তাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোথায় সে যে আছে—"

'তাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাব'—এই কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন যতীশ। কাউ তাঁকে বলেছিল, সে যদি কোথাও থেকে হঠাৎ কিছু টাকা পায় সে টাকাটা তাঁকেই দেবে।

"কাউ কোথা আছে আমি জানি। টাকাটা তুমি আমাকেই দিতে পার, আমি গিয়ে দিয়ে আসব।"

"না, আমি তার হাতেই টাকাটা দিতে চাই। ঠিকানাটা আমায় বলুন।"

"সে কি তুমি যেতে পারবে। মনসুরগঞ্জের এক জঘন্য বস্তির মধ্যে। রহমতুল্লা লেন দিয়ে ঢুকতে হয়।"

"আপনি একটা কাগজে এঁকে দিন—"

কাগজ পেন্সিল এগিয়ে দিলে ঝিনুক। নিরুপায় হয়ে যতীশবাবুকে রাস্তার ছকটা এঁকে দিতে হল। কাউ তাকে তার ঠিকানা কারও কাছে প্রকাশ করতে বারণ করেছিল। যতীশবাবু কিন্তু ঝিনুকের কথা অমান্য করতে সাহস করলেন না।

এঁকে দিয়ে বললেন, "মনসুরগঞ্জের বড় মসজিদটা পার হয়ে পশ্চিম দিকে মিনিট পনেরো হাঁটলেই ডান দিকে রহমতুল্লা লেন পাবে। লেনে নাম লেখা নেই। ভাঙা একটা ডাস্টবিন আছে তার সামনে। ওখানে গিয়ে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কোনটা রহমতুল্লা লেন। সেই লেনে ঢুকে কিছু দূর গেলেই কালুর চায়ের দোকান দেখতে পাবে।"

"আচ্ছা, সে আমি খুঁজে নেব'খন।"

"তুমি টাকাটা কখন দেবে তাকে।"

"তুমি চলে যাওয়ার পর।"

যতীশবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান

সুরেশচন্দ্র রায়

পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্যতম সমস্যা-কণ্টকিত রাজ্য (Problem state) বলা হইয়া থাকে। সমস্যাগুলি যে কি তাহা লইয়া আজ পর্যন্ত কোন বিশদ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা অনেক, সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব-প্রকার সমস্যা একত্রীভূত করিয়া বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে ইহার প্রধানতম এবং মৌলিক সমস্যাটির আলোচনার প্রয়োজনীয়তাই বেশী। আমরা মনে করি, এই মৌলিক সমস্যাটির উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য সকল প্রকল্প রচিত ও অনুসৃত হইলেই ইহার অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম এবং মৌলিক সমস্যা বলিতে আমরা বুঝি ইহার নিজস্ব অধিবাসী বাঙালীর অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদের প্রাচুর্যের অভাব নাই। পশ্চিম-বঙ্গ শিল্পের ক্ষেত্রে আজও ভারতের শীর্ষ-স্থানীয়। ভারত ইউনিয়নে রেজেস্ট্রিকৃত সর্বমোট কারখানার ২৩ শতাংশ পশ্চিম-বঙ্গেই অবস্থিত। এখানে প্রায় ৭ লক্ষাধিক নিযুক্ত শ্রমিকের ৯৭টি পাটকল, ৬২টি কাপড়ের কল, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কাগজের কল, সর্বভারতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ উৎপাদনকারী সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সর্বভারতে উত্তোলিত মোট কয়লার ½ অংশেরও অধিক পশ্চিমবঙ্গের। এ ছাড়া গত ১৪ বৎসরে মোটর, সাইকেল, এলুমিনিয়ম, রেল ইঞ্জিন, স্টিল প্রস্তুতের জন্য বৃহৎ শিল্প-কারখানা এই পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। চা উৎপাদনে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান ভারতের দ্বিতীয়। এইসকল সত্ত্বেও বাঙালীর কর্মহীনতা ক্রমবৃদ্ধিশীল, দারিদ্র্যের কশাঘাতে বাঙালীর জীবন দুর্বিষহ।

শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর বাঙালী তার জাতীয় জীবনের এই অভিশাপের অভিব্যক্তি যখনই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রে তীব্রতররূপে পরিস্ফুট হইতে দেখে তখনই তার প্রতিবাদে ও আন্দোলনে সে মুখর হইয়া উঠে। এবং তখনই সর্বভারতের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গকে এক বিষম সমস্যাসংকুল অসম্ভবের রাজ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন সম্পদ প্রধানত বাঙালীর মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া, সহজ কথায় বাঙালীর কর্মহীনতার নিরসন করিয়া তাহাকে দারিদ্র্য-ভারমুক্ত করাই পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যা সমাধানের গোড়ার কথা।

পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বৃদ্ধিশীল। পরি-কল্পনার পর পরিকল্পনা এই সমৃদ্ধির পথে সহায়তা করিতেছে। তবু বাঙালীর আর্থিক সমস্যার কথায় আজও কেন বলিতে হইতেছে, সে "নিজ বাসভূমে পরবাসী"? সমস্যাটি অতি প্রাচীন, পশ্চিমবঙ্গের শক্তি-চালিত বৃহৎ শিল্পায়নের আদি ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গি জড়িত। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিলেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেই প্রাচীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পায় নাই। তাই পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি এখনও তার নিজস্ব অধিবাসী বাঙালীর সমৃদ্ধিরূপে দেখা দিতে পারিতেছে না। ইহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই যখন জানিতে পারি যে, প্রতি বৎসর অল্প টাকার মনি-অর্ডারে প্রায় ২৮ কোটি টাকা একমাত্র কলিকাতা শহর হইতেই পশ্চিম-বঙ্গের বাহিরে চলিয়া যায়।

সম্পদ সৃষ্টির নূতন উপায় শক্তি-চালিত বৃহত্তর শিল্পায়ন পশ্চিমবঙ্গে শুরু করিয়াছিল ইংরেজ জাতি। তাহারা বাংলা দেশের কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেই শিল্প সংগঠনের জন্য সুবিধা-জনক মনে করিয়াছিল। কারণ, নাব্য-(Navigable) হুগলী নদী বাহিয়া ইহার উভয় কূলে অবস্থিত কারখানায় উপজাত শিল্পদ্রব্য বহির্জগতে চালান দেওয়া সহজ ছিল। প্রধানত ইংরেজের মূলধনেই বাংলার শিল্পের বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্পদশালী বাঙালীরা তখন এ পথে অগ্রসর হন নাই। ইহার প্রধান কারণ হিসাবে বাংলার ভূমিব্যবস্থায় "জমিদারি প্রথা" প্রবর্তনকেই দায়ী কর

চলে। এই প্রথার ফলেই প্রায় বিনাশ্রমে এবং কোন ঝুঁকি না লইয়া জমির উপস্বত্ব হইতেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করা যাইত। বাংলার পিরামিডাকৃতি ভূমিব্যবস্থায় উচ্চতম জমিদার ও নিম্নতম চাষীর মধ্যে যে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারাই বাঙালী বুদ্ধিজীবী বা মধ্য-শ্রেণী। জনবৃদ্ধির ফলে যখন যেমনইএই উপস্বত্বের অপ্রতুলতা দেখা দিয়াছে তখন তেমনই ইহারা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল করিয়া জীবিকার জন্য চাকুরির বা বিদ্যাবুদ্ধি-নির্ভর ওকালতি-ডাক্তারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। এইসকল মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের মধ্যে যাহারা উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা পাইত, তাহারা ওকালতি, উচ্চ সরকারী চাকুরি, ডাক্তারি, অধ্যাপনা প্রভৃতি বুদ্ধি-জীব্য জীবিকা অনুসরণ করিত আর যাহাদের সে সুবিধা ছিল না তাহারা সামান্য কিছু ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের সওদাগরী অফিসে সামান্য চাকুরি করিত, কায়িক পরিশ্রম এবং ঝুঁকি লইয়া কোনরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠা বা বাণিজ্যে নামিতে চাহিত না। শুধু তাহাই নহে, ক্রমশ ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজের আদালতে ও চিকিৎসা উত্তর ভারতে যেমন যেমন প্রসার পাইতে লাগিল শিক্ষিত বাঙালী নিজের দেশে নবীন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইয়া বাংলা দেশ ছাড়িয়া সুদূরে উত্তর ভারতে যাইতে লাগিল। এইভাবেই সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাহিরেও চাকুরিজীবী বাঙালী কেবল লেখনী ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বল করিয়াই ছড়াইয়া পড়িয়া-ছিল। এইসব শিক্ষিত বাঙালীর দেখা দেখি বাংলার নিম্নবিত্ত জনসাধারণও শিল্প সংগঠনের দিকে সেদিন আকৃষ্ট হয় নাই। কলিকাতার গঙ্গার দুই কূলস্থিত চট ও অন্যান্য শিল্পের কারখানায় প্রয়োজন হইয়াছে শ্রমিকের। কিন্তু ছায়াবৃত পল্লীর কোল ছাড়িয়া সামান্য হইলেও স্বত্বপ্রসূ জমির মায়া কাটাইয়া বাঙালী নিম্নবিত্ত গ্রামীণ জন শ্রমিকজীবন গ্রহণে আগাইয়া আসে নাই। তখন এমন কি যাহারা একেবারে ভূমিহীন তাহারাও নিজ নিজ গ্রামে ভাগচাষী হিসাবে আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিত। ফলে, উত্তরবঙ্গে যখন চা-শিল্প গড়িয়া উঠিতেছিল সেখানেও পার্শ্ববর্তী বাঙালী কৃষককে চা-শ্রমিকের ভূমিকায় আকৃষ্ট করে নাই। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ হইতে দলে দলে ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকরূপে বাংলার কারখানায় ও চা-বাগিচায় যোগ দিয়াছে। সেখানে ভূমি-ব্যবস্থায় "রায়তৈয়ারি"-স্বত্ব প্রচলিত থাকায় ইহারা ভূমিচ্যুত হইয়া অনাহারের সম্মুখীন হইয়াছিল বলিয়াই তদানীন্তন কারখানায় শ্রমিকজীবনের অসহ অবস্থা স্বীকার করিয়াছিল। বাঙালী কৃষক সেদিন তাহাদের চোখের সম্মুখে এই বহির্দেশী শ্রমিককে করুণার পাত্ররূপে দেখিয়া থাকিবে। কারণ তখন তাহাদিগের নিকট স্ব-গৃহে থাকিয়া ভূমি-উপজাত অন্নের মুষ্টি-মাত্রও প্রবাসী শ্রমিকজীবনের পূর্ণাহারের চেয়ে অনেক মধুর মনে হইয়াছে। এইভাবেই বাংলার ভূমিতে এবং বাঙালী কৃষকের শ্রমে উৎপন্ন কাঁচামালের মাধ্যমে অর্জিত ধন প্রতিদিন বাংলাকে সম্পন্ন না করিয়া নিঃস্ব করিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাংলার ভূমিস্বত্ব আইন এবং ইংরেজী শিক্ষা বাংলার প্রায় সর্বস্তরের লোককে শিল্প ও বাণিজ্য-বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, যখন তাহারা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে উৎসুক তখন এইসব শিল্প-বাণিজ্যে কায়েমী স্বার্থবাদের দল (vested interest) বাঙালীকে জাতি হিসাবে শ্রমবিমুখ আখ্যা দিয়া কার-খানায় ঢোকার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা তথা বাঙালীর অর্থনীতির ভবিষ্যৎ দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আজীবন বাঙালীকে সময়ে তৎপর হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য-দেবের এই সতর্কবাণী তখন তাহাদের যথেষ্ট সজাগ করিতে পারে নাই।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা বাংলার পক্ষে এক মহা অভিশাপ বহন করিয়া আনিল। বাংলা হইল দ্বিখণ্ডিত। দ্বিখণ্ডিত বাংলার যে অংশ (পশ্চিমবঙ্গ) ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা আকারে অতি ক্ষুদ্র। এবং কৃষি, বন, নদীসম্পদে তত সম্পদশালী নহে। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের দুই বৎসরের মধ্যেই অনিশ্চিত জীবন আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) লক্ষ লক্ষ জন-সাধারণ প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বাসস্থান

ও জীবিকার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। (স্বাধীনতার পর ১৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তবুও আজও পূর্ব পাকিস্তান হইতে শরণাগতদের আগমন-স্রোত বন্ধ হয় নাই।) এই অগণিত জনজীবনের ভরণপোষণের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের স্বল্পতর জমির এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর শিল্প-সংগঠনের উপরই বর্তিয়াছে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪, কিন্তু ইহার আয়তন পুরুলিয়া সহ মাত্র ৩৪,৯৪৫ বর্গমাইল। অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ১০৩১ জনের বসতি, যেখানে সর্বভারতীয় হার মাত্র ৩৭০। পশ্চিমবঙ্গের মত একটি স্বল্পায়তন রাজ্যের পক্ষে এই বিপুল জনজীবনের সুস্থ জীবিকার্জন এবং ইহাদের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়ন করা যে এক বিরাট সমস্যা, একথা কেহই অস্বীকার করিবে না।

ভারত সংবিধানের নীতি নির্দেশিকায় (Directive Principles) ভারতবাসীর জীবিকার্জনের উপযুক্ত উপায় ব্যবস্থা ও কাজ করার অধিকার স্বীকৃত। এই নীতি রূপায়ণে সংবিধানে ভারতের জন্য এমন এক অর্থনীতি গৃহীত হইয়াছে যাহাতে ভারতের সম্পদ সর্বসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত হইবে। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হইবে না, যার ফলে সম্পদ জনসাধারণের সর্বস্তরে কল্যাণ সৃষ্টির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তি বা কোন সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হইবে। ১৯৫৪ সালে লোকসভায় এই অর্থনীতিকে আরও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়া বলা হইয়াছে—ভারতের অর্থনীতির লক্ষ্য হইবে "সমাজ

তান্ত্রিক ধাঁচের (Socialist pattern) সমাজ" গঠন। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বাস্তবে রূপায়ণের জন্য পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত ও অনুসৃত হইতে চলিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয়—এই দুইটি পরিকল্পনা শেষে তৃতীয়টির কাজও শুরু হইয়াছে। সংবিধানের লক্ষ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব অধিবাসী বাঙ্গালী জনসাধারণ অবশ্যই আশা করিবে, এইসব উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগে বাঙ্গালীজীবনকে যে অর্থনীতিক অনগ্রসরতা ও কর্মহীনতার অভিশাপ ছায়ার মত অনুসরণ করিতেছিল তাহা হইতে তাহারা মুক্তি পাইবে। পরিকল্পনাগুলিতে যে নানা উদ্যোগ ও কর্ম সৃষ্ট হইবে তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার অবশ্যই বাঙ্গালীর যথাযোগ্য ও সম্পূর্ণ অধিকার বাস্তবে পরিণত করিবেন।

বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই উহার বর্তমান রূপ ও প্রকৃতির সহিত পরিচয় হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে যে পরিসংখ্যান (Statistics) ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আমরা প্রধানত ১৯৫১ সনের আদমসুমারির বিবরণ হইতে এবং ১৯৫৩/৫৪ সনের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "পরিসংখ্যান সংস্থা" (Statistical Bureau) গৃহীত পরিসংখ্যান হইতে লইয়াছি। দীর্ঘদিন অতীত হইলেও আমাদের বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বণ্টন ও বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানে এমন কোন গতি সঞ্চারিত হয় নাই যে জন্য আমাদের ব্যবহৃত পরিসংখ্যানভিত্তিক আলোচনার মূল্য কম হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮·৯ জন অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে আবার ত্রিশ শতাংশ ভূমিহীন এবং কাজের অভাবে তাহারা বৎসরের ১৩০ দিনই বেকার থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজীবীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ২৬ জন আত্মনির্ভরশীল। এই শতকরা ২৬ জনের উপর নির্ভরকারী ৭৪ জনের মধ্যে আবার ৬৯·৮ জনই উপার্জনহীন এবং ৪·২ জন সামান্য উপার্জনশীল। গ্রামাঞ্চলে কর্ম-সংস্থান ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। ১৯৬২ সালের মে মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্ল্যানিং কমিশনের সভার মতে "গত দুইটি পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ বেকার ও অর্ধবেকার সমস্যার কোন সুরাহা করা সম্ভব হয় নাই।" গত ২১শে মে তারিখে কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে, "সরকারী দপ্তরে যে রিপোর্ট আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ সমস্যা খুব তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। বিশেষত, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম, জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলার অবস্থা খুবই সঙ্গীন।"

পশ্চিমবঙ্গের অ-কৃষিজীবীর সংখ্যা ৪১·১, ইহাদের মধ্যে মাত্র ৩৮·৮ জন উপার্জনশীল—এই ৩৮·৮ জনের উপর নির্ভরশীল ৬১·২ জনের মধ্যে আবার মাত্র ১·৯ জন সামান্য কিছু না কিছু উপার্জন করে, কিন্তু অবশিষ্ট ৬৯·৮ জনই আয়-শূন্য। এই অ-কৃষিজীবীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য হইতে আমরা আরো জানিতে পারিব।

১৯৫৮ সনের জুলাই মাসের এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী জনাব আব্দুস সত্তার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এই রাজ্যে কর্ম-নিযুক্ত অ-কৃষিজীবীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ। মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গে এক কোটির উপর অ-কৃষিজীবীর বাস। এবং তন্মধ্যে ত্রিশ লক্ষ কর্মপ্রার্থী, তাহা হইলে শ্রমমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য হইতে বলা চলে, ১৯৫৮ সনে ৭ লক্ষ অ-কৃষিজীবী কর্মহীন ছিল। এই তথ্যকে আরো বিশ্লেষণ করিয়া দেখা চলে।

১৯৫৩ সনে "রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থা" (West Bengal State Statistical Bureau) পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে অ-কৃষিজীবী কর্মহীনদের যে একটি নমুনা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ঃ—

অঞ্চল	কর্মহীনের সংখ্যা
টালিগঞ্জ বাদে কলিকাতা অঞ্চল	২,১০,৮০০
কলিকাতা শিল্পাঞ্চল	১,৩৩,৪০০
বড় শহর	৪৭,৯০০
অন্যান্য শহর	২৭,৩০০
গ্রামাঞ্চল (নদীয়া ও ২৪ পরগনা)	৬৫,১০০
	৪,৮৪,৫০০

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ক্রমবৃদ্ধিশীল কর্মহীনের সংখ্যা এই হিসাবে যোগ করিলে উল্লিখিত প্রায় ৫ লক্ষ কর্মহীনের সংখ্যা অবশ্যই ৭ লক্ষে পৌঁছিবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরো মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতি বৎসর শহর ও গ্রামাঞ্চলে যথাক্রমে ৫০ এবং ২৫ হাজার নূতন কর্মপ্রার্থী সৃষ্টি হইতেছে। এই বিরাট এবং ক্রমবর্ধিশীল কর্মহীন বাহিনীর সম্পর্কে আমাদের আরো মনে রাখিতে হইবে, কৃষি এবং শিল্পের মৌল (Structural) অনুন্নততাই এই কর্মহীনতার গোড়ার কথা। পশ্চিমবঙ্গের কৃষির পক্ষে ইহা স্বতঃপ্রকাশ, জনসংখ্যার অনুপাতে শিল্পেও যে পশ্চিমবঙ্গ অনুন্নত তাহার প্রমাণস্বরূপ জাতীয় কর্মসংস্থা (National Employment Services) কর্তৃক গৃহীত কর্মপ্রার্থীদের একটি শ্রেণীগত কর্মে বিভক্ত (Classified Breakdown) হইতে প্রমাণ পাইতে পারি—

১।	শিল্পে উচ্চতর কর্মী (Supervisory staff)	১,০৩৮
২।	দক্ষ ও অল্পদক্ষ কর্মী	১৮,১২৭
৩।	করণিক	৪২,০১২
৪।	শিক্ষা বিভাগের কর্মী	৪৭৪
৫।	গৃহ-কর্মী	২,০৩০
৬।	চিকিৎসক	১৬৩
৭।	ইঞ্জিনিয়ার	৮৩
৮।	অদক্ষ শ্রমিক	১,০৮,৩৭৬
৯।	অন্যান্য	৩,৯৯৯
		১,৭৬,৩০২

কর্মসংস্থান সংস্থার (Employment Exchange) অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, দক্ষ ও অল্পদক্ষ কর্মপ্রার্থীদের অপেক্ষা অদক্ষ কর্মপ্রার্থীদেরই অনেক বেশী সংখ্যায় কর্মসংস্থান হইয়া থাকে। শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নততাই ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের লক্ষ্য, শিল্পজাত দ্রব্যে স্বাবলম্বী হওয়া, অধিকন্তু বিদেশে উহা রপ্তানি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা। এই বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আরো নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পুরাতন শিল্পকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির দ্বারা সম্প্রসারিতকরণ, একমাত্র এই পথেই আমাদের দেশকে প্রয়োজনানুরূপ শিল্পায়িত করা সম্ভব। শিল্পায়নের এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অগ্রসর হইলেই দক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হারও বাড়িয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতিগণের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করি।

পশ্চিমবঙ্গের কর্মহীনতার সমস্যার প্রকৃতি আমরা দেখিলাম। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই এখানে কর্মহীনতা ব্যাপক। পরিসংখ্যান সংগ্রহ আমাদের দেশে এখনও নিখুঁত নহে—তবু কর্মহীনতার উপর যতটুকু পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হইয়াছে,

তাহাতেই ইহা স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীনতার অবস্থা এখনই গুরুতর, এমন কি ভয়াবহ পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে।

এই সমস্যার সমাধান করিতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মসৃষ্টি করিতে হইবে। সে সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার আগে কর্মহীনতা ও কর্মসংস্থানের তিনটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত, কর্মহীন বাঙালীর জন্য কর্মসংস্থান। মনস্তাত্ত্বিক এবং ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য যে কোন রাজ্যের অধিবাসী সেই রাজ্যে কর্মপ্রত্যাশী—ইহাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যেই নিজ নিজ পরিকল্পনায় কর্মসৃষ্টি এবং সেই সমস্ত সৃষ্ট কর্মে রাজ্য-অধিবাসীর কর্মনিয়োগে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্যবাসীর মত বাঙালী পশ্চিমবঙ্গেই কর্মে নিযুক্তির আশা করিবে, দাবি করিবে—ইহাতে কোন অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। কাজেই ন্যায়সঙ্গতভাবে পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীনতা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কী তাহা যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রধানত সেই আলোকেই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান পরিকল্পনা নির্ধারণ করিতে হইবে। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দপ্তরে গৃহীত তালিকা হইতে দেখা যায়, এই রাজ্যের বহিরাগত অধিবাসীরাই ইহার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এক বিষম প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত বাঙালীর শতকরা হার উক্ত পরিসংখ্যান-তালিকায় এইরূপঃ—

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা	পঃ বঙ্গবাসীর শতকরা নিয়োগ হার
১। তুলা	৩০·২৩
২। পাট	২২·৩৭
৩। ইঞ্জিনীয়ারিং	৬২·০৩
৪। লৌহ ও ইস্পাত	৩৩·৫৫
৫। ছাপাখানা	৭৩·৯৭
৬। কাচ	২৯·৭০
৭। রাসায়নিক	৫২·৬৫
৮। কাগজ	২৬·৩৫
৯। রবার	৩৪·৪৬
১০। অন্যান্য	৪৯·৭৭
	৪১·৪৭

উপরের তালিকাটি কর্মে নিযুক্তদের। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বহিরাগতদের চাপ সৃষ্টির আর একটি নমুনা পাওয়া যাইবে নিম্ন পরিসংখ্যান হইতে। ১৯৫৩ সনে কলিকাতায় কর্মপ্রার্থীদের এই সংখ্যাগুলি রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থান দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল।

অভারতীয় (মুখ্যত পাকিস্তানী)	৬,৮০০
অ-পশ্চিমবঙ্গীয়	২৯,৬০০
পশ্চিমবঙ্গে বাসকারী	১,৬৪,৪০০
বাংলাভাষী	১৫২·৯০০
অন্য ভাষাভাষী	১১·৫০০

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে বহিরাগতদের চাপ সম্পর্কে উপরের তালিকা দুইটি ইঙ্গিত দেয় মাত্র। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শ্রম দপ্তর এই রাজ্যে কর্মনিযুক্তির ধারা সম্পর্কে একটি দ্রুত সমীক্ষার (Survey) ফল প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ যে, পাটকলে নিযুক্ত বাঙালী শ্রমিক-সংখ্যা মাত্র শতকরা ২৩·৫২। অবশ্য সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মিলিত বাঙালী শ্রমিক নিয়োগ সংখ্যা—১৯৫৮ হইতে ১৯৬০ সালে শতকরা ৩·৪৪ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু। আবার এই সামান্য বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া লইলেও সাথে সাথে ইহাও লক্ষ করিবার বিষয় যে, বাণিজ্য সংস্থাগুলিতে ১৯৫৮—১৯৬০ সালে বাঙালী কর্মীর নিয়োগ শতকরা ১·১৪ কমিয়াছে।

এই সমীক্ষায় শ্রম দপ্তর আরো প্রকাশ করিয়াছেন, এই বৎসর শতকরা ১২ হারে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা চলে, ইহার প্রায় পূর্ণ সংখ্যাই বাঙালী কর্মপ্রার্থী।

অ-কৃষিজীবীদের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখনও প্রায় সর্বোচ্চ স্থানে। কিন্তু এই রাজ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বেসরকারী এবং অ-বাঙালীর পরিচালনাধীন। রাজ্য সরকার ইঁহাদের অধিক সংখ্যায় বাঙালী নিয়োগের অনুরোধ জানাইলেও তাহা অর্থকর হয় নাই, পূর্বোক্ত সরকারী সমীক্ষাতেই তাহা প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মহীনতার দ্বিতীয় লক্ষণীয় দিক ইহার শিক্ষিত কর্মহীন বাহিনী। ইহাদের সম্পর্কে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নাই। তবে সময়ে সময়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘোষণানুযায়ী তিন বৎসর পূর্বে শহর অঞ্চলে শিক্ষিত কর্মহীনের সংখ্যা ছিল অন্যূন দুই লক্ষ। এই তিন বৎসরে সংখ্যাটি নিশ্চিত দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী শ্রম দপ্তরে পূর্বোক্ত সমীক্ষার ফলে শ্রম দপ্তর এই রাজ্যে শিক্ষিত কর্মহীনদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে শ্রম দপ্তর ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, কোন বাঙালীকেই আজ শ্রমবিমুখ বলা যায় না। জীবিকার জন্য তাহারা সকল রকম শ্রমযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইতে অগ্রগামী। যাহা হউক, শিক্ষিত কর্মহীনদের কর্মসংস্থান কিছু বিশিষ্টতা দাবি করে। কারণ শিক্ষানুসারী ইহাদের কর্মে নিয়োগ করা আবশ্যক। যেমন করণিকের কাজের জন্য যে ধরনের শিক্ষিতের প্রয়োজন, প্রযুক্তি বিদ্যা ও কারিগরি কাজে

(Technology & Craft) শিক্ষিতদের অবশ্যই ভিন্নতর কর্মে নিয়োগ আবশ্যক। কর্মসৃষ্টির পরিকল্পনায় ইহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

কর্মসংস্থানের তৃতীয় লক্ষণীয় দিক হইল মহিলাদের কর্মহীনতা। পশ্চিমবঙ্গে, ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ কর্মসংস্থানের (Employment Exchange) তালিকা অনুযায়ী মহিলা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৭৪ হাজারের বেশী। এই সংস্থার অভিজ্ঞতা হইতে বলা হইয়াছে, পূর্বের পাঁচ বৎসরের মহিলা কর্মপ্রার্থী শতকরা ২০০ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তফসিলী সম্প্রদায়ের কর্মপ্রার্থিনীদের বাদ দিলে ইহারা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই আসিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও বেশী সংখ্যক করণিক ও শিক্ষিকার পদ-প্রার্থিনী। এই দুইটি ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহাদের জন্য কর্মসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অধিক রহিয়াছে।

এ পর্যন্ত আলোচনার দ্বারা আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ব্যাপক কর্মহীনতার "গতি ও প্রকৃতি"র একটি সাধারণ চিত্র উপস্থিত করিয়াছি। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যে কর্মসৃষ্টির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি অতিপ্রচলিত ধারণার উল্লেখ করা আবশ্যক। অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও যে রাজ্য কর্মসংস্থান সংস্থা রহিয়াছে, অনেকের বিশ্বাস, ইহাতে নাম তালিকাভুক্ত করিলেই জীবিকার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, এই সংস্থাটি কোন কর্মসৃষ্টি তো করে নাই, কর্মে নিয়োগের কোন অধিকারও ইহার নাই। কোথাও কর্ম খালি থাকিলে ইহা তালিকাভুক্ত উপযুক্ত প্রার্থীর সহিত উক্ত নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন করিয়া দেয় মাত্র। কাজ দিবার সম্পূর্ণ অধিকার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের। ১৯৬১ সনের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান সংস্থার একটি খতিয়ান হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

তালিকা-ভুক্ত	সংস্থা মারফৎ কর্মপ্রাপ্তি	মোট কর্ম-প্রাপ্তি	মোট কর্মখালি
১৫,৪৭৬	৬০৮	১,৫৩৩	৩,২১১

মাস শেষে মোট তালিকাভুক্ত—৩,৩০,১২৪ জন।

ইহা সত্ত্বেও এই সংস্থার প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। কর্মনিয়োগ-ক্ষেত্রে ইহাকে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এবং এইজন্য সংস্থাটিকে নিম্নতম স্থল গ্রামাঞ্চল হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত নানা শাখায় বিভক্ত করিয়া রাজ্যের প্রত্যেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত করিতে হইবে। তাহাতে কর্মপ্রার্থী ও নিয়োগকারীদের সংযোগ ব্যবস্থায় বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির যে এক দায়িত্বশূন্য সম্পর্ক ও দূরতিক্রম্য ব্যবধান রহিয়াছে তাহার পরিবর্তে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত হইবে।

ভারতে পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসৃত হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসর হইতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসৃত হইতেছে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় নূতন নূতন উদ্যোগ ও কর্মসৃষ্টি হইয়া থাকিলেও ক্রমবৃদ্ধিশীল কর্মহীনতার সহিত উহা সমতালে চলিতে পারে নাই। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ১৭ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর সৃষ্টি হইবে। বিশদ সমীক্ষা সম্ভব হইলে দেখা যাইবে এই সংখ্যা আরো বেশী।

প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় যথাক্রমে কৃষি ও বৃহৎ শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্পের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও শিল্পে আবশ্যক কাঁচামালের জন্য খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গ এখনও কৃষিপ্রধান। পল্লী-অঞ্চলে কর্মহীনতাও দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এজন্য বর্তমান প্রকল্পের লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়তাপূর্ণ উপায় অনুসরণ করিলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা দূরের নিশ্চয়তাও মিলিবে। এই দিক দিয়া ভূমি-সংস্কার আইনের ফলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্যের আইনসভার ভাষণ হইতে জানিতে পারি, সরকারের হাতে ২,৮৩,৬৪১ একর জমি বিতরণের জন্য আছে। বেনামিকৃত জমি

আইনবলে উদ্ধার করিলে আরো বহু সহস্র একর জমি সরকারে বর্তিবে। ইহা ছাড়া বহুল পরিমাণে আবাদযোগ্য অনাবাদী জমিও এই রাজ্যে রহিয়াছে। ফসল বৃদ্ধি এবং সুন্দর সুস্থ গ্রাম-জীবন গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া নিম্ন উপায়ে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য কর্ম সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

(১) সরকারের অধিকারের আবাদী জমি ১০/১৫ একরের প্লটে সমবায়ভিত্তিক চাষ;

(২) অনাবাদী জমি আবাদে আনিয়া উক্ত সমবায়ভিত্তিক চাষ;

(৩) ব্যাপক সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা এক ফসলী জমিকে দুই বা তিন ফসলীকরণ। ইহা দ্বারা কৃষকের সারা বৎসরের কর্ম-সংস্থান হইতে পারে;

(৪) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ ও সেচব্যবস্থা। এঁদো-মজা জলাশয় (গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য আছে) সংস্কার, নূতন জলাশয় খনন;

(৫) পথঘাট ও গৃহ নির্মাণ।

গ্রামাঞ্চলে এইসকল নির্মাণকার্যের জন্য বহিরাগত ঠিকাদার মজুরের সাহায্য কখনই লওয়া চলিবে না। অঞ্চলের কর্মহীন-আধাকর্মহীনদের স্থায়ী সংগঠনের (Corpse) উপর এই কাজের দায়িত্ব দিতে হইবে। প্রয়োজনমত উপযুক্ত গ্রামীণ ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক ও কর্মগত শিক্ষণও (Training) দিতে হইবে।

কৃষির সহিত গ্রাম্য কুটিরশিল্পও আবহমান কাল হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্ব। সংগঠিত কুটিরশিল্প দ্বারা কর্মসংস্থান যথেষ্ট হইতে পারে। কৃষি-কাজে সহায়ক অথবা কৃষিজাত দ্রব্যে উৎপন্ন বলিয়া এইসকল শিল্পের গ্রামাঞ্চলেই প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক।

(১) হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অধিকতর উন্নয়ন। এই দিকেই বর্তমান সরকারী দৃষ্টি সত্ত্বেও ব্যাপকতর ও সহযোজিত (Co-ordinated) সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় ইহার অধিকতর প্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্পে শক্তিচালিত তাঁতের প্রসারেরও সম্ভাবনা প্রচুর।

(২) হাতে তৈয়ারী কাগজ।

(৩) কুটিরশিল্প হিসাবে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম তৈয়ারী।

(৪) অঞ্চলভিত্তিতে সামবায়িক প্রথায় ঢেঁকি, চাকী, ঘানি প্রবর্তন।

(৫) পশুপক্ষী পালন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সর্বপ্রকার সুযোগ দিবার পরও বৃহত্তর লক্ষ্য লইয়া সমবায় প্রথার সংগঠন।

(৬) শহর-নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে "ডেয়ারী" স্থাপন।

(৭) গুটিপোকা ও মধুমক্ষিকা পালন।

(৮) প্রত্যেক জলাশয়ে মৎস্য চাষ।

(৯) বাগিচা তৈয়ারী। শুরুতে অল্প লোকের নিয়োগ আবশ্যক হইলেও পরবর্তী সময়ে অধিক কর্মসংস্থানের অপেক্ষা রাখে।

গ্রামের আঞ্চলিক ভিত্তিতে উপরের বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই কার্যকরী করা সম্ভব। রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। কিন্তু দায়িত্ব রহিবে গ্রামবাসীদের উপর। এতদুদ্দেশ্যে গ্রামে ও অঞ্চলে বিশেষরূপে সংগঠিত সংস্থার পরিচালন-দায়িত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। সরকার ও গ্রামবাসীর যুক্ত উদ্যোগে আবশ্যক অর্থের সংস্থান করিতে হইবে।

কৃষি ও শিল্পে উপরিউক্ত কার্যক্রম অনুসরণ করিলে শীঘ্রই দেখা যাইবে, বিভিন্ন উৎপন্নদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য আরো কর্মসংস্থান হইয়াছে।

(ক) গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও কুটিরশিল্পে নিযুক্তির পরও সেখানে অনেক কর্মহীন অবশিষ্ট থাকিবে এবং প্রতিদিনই ইহাদের সংখ্যা জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির সাথে বাড়িতেই থাকিবে। ইহাদের কর্মনিয়োগের

ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র আজও নিঃশেষ হয় নাই। যেমন উত্তরবঙ্গে কাপড়, কাগজ, চিনির বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবশ্যকতা রহিয়াছে। ইহাদের জন্য আবশ্যক কাঁচামাল উত্তরবঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং প্রয়োজনমত ইহার উৎপাদন আরো যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যায়। চা-শিল্পের জন্য আবশ্যক সকল রকম যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানাও উত্তরবঙ্গেই স্থাপন করা আশু প্রয়োজন। রাসায়নিক দ্রব্য ও বৃহৎ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান। কিন্তু দেশের সর্ববিধ উন্নতির সহিত প্রতিদিনই ইহাদের চাহিদাও বাড়িতে থাকিবে। ঐজন্য পশ্চিমবঙ্গে আরো একাধিক বৃহৎ রাসায়নিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, তুলনায় কম অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্পে অধিকতর সংখ্যক কর্ম-সংস্থান হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত হাওড়া অঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধি বহু কালের। সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইসকল ছোট ছোট কারখানা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নানা বৃহৎ শিল্পের জন্য আবশ্যক ছোট ছোট নিখুঁত যন্ত্রাংশ তৈয়ারি করা ছিল ইহাদের বিশেষত্ব, এবং ইহারাই বৃহৎ শিল্পে আবশ্যক যন্ত্রাংশের চাহিদা বহুলভাবে পূরণ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু নানাভাবে লোহা, কয়লা ইত্যাদি কাঁচামাল সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় এই অত্যাবশ্যক ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি লোপ পাইতে চলিয়াছে। এইগুলিকে আবশ্যক কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া কেবল পুনরুজ্জীবন করাই নহে, আরো নানা ধরনের যেমন রেল ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত অঞ্চলে স্থাপন করার গুরুত্ব অশেষ। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে (১) কাষ্ঠসামগ্রী, (২) দিয়াশলাই, (৩) গৃহে ব্যবহার্য ধাতব পাত্রাদি, (৪) সাবান তৈয়ারির জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যের আঞ্চলিক বণ্টনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অনেকখানি নিশ্চিত হইয়া উল্লিখিত পৃথক পৃথক শিল্প-সংস্থার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্বাচন যুক্তিযুক্ত।

ক্ষুদ্র শিল্প সমবায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত করা চলে এবং একই শিল্প রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে একাধিক সংখ্যায় সংগঠন সম্ভব। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান অগ্রণী।

পরিবহণ (Transport) কর্মসংস্থানের পক্ষে এখনও একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র। বিশেষত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এদিকে সহজেই আকৃষ্ট হইবে। আন্তঃরাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত সুগম হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য পরিবহণ ব্যবস্থা একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা সহ অগ্রসর হইতে পারে। এজন্য রাজপথ (Highway) জলপথ প্রয়োজনমত তৈয়ারি ও সংস্কার করিতে হইবে। এই নির্মাণের কাজেও নূতনভাবে কর্মী নিযুক্ত হইতে থাকিবে। বর্তমানে বহিরাগতেরা এই ক্ষেত্রে প্রায় সামগ্রিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। সেজন্য এইদিকে এই রাজ্যের গ্রামীণ যুবক-দিগকে এবং যানবাহন চালনায় ইত্যাদি কর্মে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

কর্মসংযোগের আর একটি বিস্তারশীল ক্ষেত্র রহিয়াছে—রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলে। এই দিকে রাজ্য সরকার পূর্ব হইতেই সক্রিয় রহিয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু ইহাতে সরকারের উদ্যোগের সাথে রাজ্যের জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা যুক্ত হয় নাই। সেরূপ হইলে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি যেমন দ্রুতগতি হইবে, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাইবে। কর্মসংস্থানের জন্য এখনও

উন্মুক্ত রহিয়াছে এমন কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রের উল্লেখ সহ সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান অভাবে ইহাতে কিরূপ সংখ্যক কর্মসংস্থান হইতে পারে তাহা নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু রাজ্যব্যাপী সহযোজিত পরিকল্পনার মাধ্যমে, আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালীর পূর্ণ কর্ম-সংস্থান আগামী তিন বা চারটি পরিকল্পনা কালের মধ্যেই হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান সমস্যায় আমরা যে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে প্রথমটি কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বহিরাগতদের চাপ বনাম বাঙ্গালী কর্মপ্রার্থী। আমাদের এবং রাজ্য সরকারকে স্মরণ রাখিতে হইবে, পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। প্রথমত, প্রত্যেক রাজ্যেই নিজ নিজ রাজ্যবাসীর দাবি অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গবাসী সেসব রাজ্যে কর্মের জন্য স্বভাবত ভিড়ও করে না। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা মাত্র ২,২৮,৩০৮ অথচ পশ্চিমবঙ্গে বহিরাগতের সংখ্যা ২৫,৬৫,৮৩৬। অধিবাসী-সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে পঞ্চম স্থানে। কিন্তু রেজেস্ট্রীকৃত কর্মহীনের সংখ্যায় ইহা প্রথম। সকল রাজ্য একই ভাবে পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া যেমন নিজ রাজ্যে সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে তেমনি সেখানে নূতন কর্মসৃষ্টির সাথে সাথে সেই সেই রাজ্যবাসীরই নিয়োগ হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য জনপ্রতি ৭০৲ টাকার উপর, এমন কি উড়িষ্যাও জনপ্রতি ৬৮৲ টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে কর্মে নিয়োগের দাবি (অন্যান্য রাজ্যের অনুসরণে) অগ্রাধিকার দিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, বহু শিল্পপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিষয়ে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কর্মনিয়োগে এই উদাসীনতা বা বিরাগ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক এবং 'দেশপ্রেমের' পরিপন্থী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এজন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে কঠোরতাও অবলম্বন করিতে হইবে। সমগ্র ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পরিকল্পনা (State Plan) যদি সংকীর্ণতাবোধের জন্য না হইয়া প্রয়োজনের তাগিদে হইয়া থাকে, তাহা অপ্রচুর। রাজ্যে নূতন সৃষ্ট কর্মের নিয়োগে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কঠোর হওয়া সংকীর্ণতার পরিচায়ক নহে।

কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শিক্ষায় অগ্রসরতাও একটি প্রধান সমস্যা। শিক্ষিত বাঙ্গালীর দুর্নাম ছিল তাহারা শ্রমবিমুখ। কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী যুবককে কোনরূপেই শ্রমবিমুখ বলা চলে না। জীবিকার্জনের জন্য তাহারা সকল রকম কর্মে নিযুক্ত হইতে চাহে। ইহা প্রতিদিন পথে ঘাটে প্রমাণিত হইতেছে। ১৯৫৮ সালের একটি হিসাবে শিক্ষিত কর্মহীনের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। প্রতি বৎসর বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে কর্মহীন হইতেছে আনুমানিক ৫০ হাজার হিসাবে। এদিকে শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজ্যের সৃষ্ট কর্মসমূহের মধ্যে কোন সমতা রক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কিছু কিছু প্রচেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহা অপ্রচুর। রাজ্যে নূতন সৃষ্ট কর্মের প্রকার ও সংখ্যা হিসাব করিয়া তদুপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা আজও হয় নাই। বিশেষ কর্মের জন্য উপযুক্ত কর্মী নাই, আবার বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর জন্য উপযুক্ত কর্ম নাই। এমনই গোলকধাঁধার পরিক্রমা চলিতেছে। এই অচল অবস্থা দূরে করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ কর্মের জন্য অল্প সময়ে শিক্ষণ (Short Course) ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষিতদের সেই কর্মে নিয়োগ করা চলিবে। জেলাকে ভিত্তি করিয়া কর্মসৃষ্টি ও শিক্ষণব্যবস্থা হইতে পারে। নির্মাণ পরিবহণ, কুটিরশিল্প ইত্যাদি পূর্বে উল্লিখিত সকল কর্ম সম্পর্কেই ইহা প্রযোজ্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কর্মসংস্থানের তৃতীয় প্রধান সমস্যা মহিলাদের কর্মসংস্থান। পাশ্চাত্যের মত বিদ্যালয়ে শিক্ষণের কাজে ইহাদের অগ্রাধিকার নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যোন্নয়ন ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন কর্মসৃষ্টি হইবে। সেখানেও ইহাদেরই দাবি অগ্রগণ্য। স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা, নার্স ভিন্নও চিকিৎসকের সহকারী প্রভৃতি কাজ উন্নততর দেশের মত আমাদের দেশেও মহিলাদিগের জন্য সংরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু

পরিবারে গৃহে সাহায্য করিবার জন্য গৃহকর্মী আবশ্যক। পাশ্চাত্যে এজন্য বিশেষ শিক্ষণব্যবস্থা রহিয়াছে। এখানেও ইহা প্রচলিত হইলে মহিলাদিগের কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিবে। বৃহৎ শিল্পের সহিত যুক্ত যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য আমাদের রাজ্যে কুটিরশিল্পের যথাযথ প্রবর্তন এখনও হয় নাই। জাপানে মহিলা-কর্মীরাই এইসকল ক্ষেত্রে নিযুক্ত হন। বৃহৎ শিল্পের সহিত সহায়ক-শিল্পের (ancillary) প্রতিষ্ঠায় নজর দিলে সেখানেও মহিলা কর্মী নিযুক্ত হইতে পারিবে। কুটিরশিল্প হিসাবে "কৌটাখাদ্য" (tin food) শিল্পের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহা মহিলাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র। পরিশেষে, লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ব্যাপক প্রচার ইত্যাদি কাজের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। ইহাও একমাত্র মহিলাদের জনাই নির্দিষ্ট থাকিতে পারে। মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রের প্রসার ও নূতন কর্মসৃষ্টির সময় মনে রাখিতে হইবে, মহিলা কর্মীদের জন্য বিশেষ আবাস ব্যবস্থা আবশ্যক। ২।৪টি মহিলা-কর্মী-আবাস বর্তমানে কলিকাতায় আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নগণ্য।

তৃতীয় প্রকল্পে সাধারণ হিসাবে ধরা হইয়াছে কৃষিজীবীদের জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষ ও শ্রমজীবীদের জন্য ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার কর্ম সৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই সময়ে নবাগত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে অন্যূন ১ কোটি ৭০ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কর্মে নিযুক্তদের সংখ্যার অতিরিক্ত একটি বৃহৎ সংখ্যক কর্মপ্রার্থী রহিয়া যাইবে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার পরও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৪০ লক্ষ প্রার্থী কর্মে নিয়োগের প্রত্যাশা করিবে। পরিকল্পনার ফলে কর্মে নিযুক্তি সম্পর্কে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক রহিয়াছে। প্রত্যেক পরিকল্পনার শেষেই যথেষ্ট সংখ্যায় কর্মহীন অবশিষ্ট (backlog) থাকিয়া নূতন কর্মপ্রার্থীদের সহিত ভিড় করে। এই পরিকল্পনান্তিক অবশিষ্ট কর্মহীন যাহাতে না থাকে এমনভাবেই আগামী দুই বা তিন (৪র্থ ও ৫ম) পরিকল্পনা রচনা আবশ্যক।

আমরা "বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান" সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালীর কর্মসংস্থান সকল রাজ্যের সকল অধিবাসীর কর্মসংস্থানের মত সমান গুরুত্ব দিয়া বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু ইহা আন্তরিকতার সহিত দৃঢ় ও ব্যাপকভাবে করা হইতেছে না। আমরা সেই দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জনাই এই আলোচনায় ব্রতী হইয়াছি। এই স্থলে আমরা একটি 'সতর্ক বাণী' উচ্চারণ করিতে চাহি। কর্মহীনতা যে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে অভিশাপ। অর্থনীতির দিক দিয়াই নহে, সমাজে দুর্নীতি সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে ইহা পরম সহায়কের কাজ করে। শিক্ষিতদের কর্মহীনতা রাজনীতিক প্রতিবাদ আন্দোলনে পর্যবসিত হইতে পারে। কিন্তু অশিক্ষিত কর্মহীনদের মধ্য হইতে সাধারণতঃ কেবল চোর, বাটপাড়, ঠগ, গুন্ডার সৃষ্টি হয় না, অন্যান্য বিষাক্ত দুর্নীতির জন্মস্থানও ইহাদেরই মধ্য হইতে হয়। অলস মস্তিষ্ক যে "শয়তানের কারখানা" তাহার পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত অশিক্ষিত কর্মহীনদের মধ্যেই মিলিবে।

আজ জাতীয় সংহতির জন্য রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, আর্থিক ক্ষেত্রেও উহার আবশ্যকতা গৌণ নহে। বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যপতিগণ ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন, দেশের সর্বত্র সামগ্রিক উন্নতির কালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি রাজ্যের অধিবাসী যদি বিপুল সংখ্যায় কর্মহীন থাকিয়া যায়, তাহা সমগ্রভাবে দেশের সংহতির মূলে অবশ্যই আঘাত হানিবে। অন্য পক্ষে তাঁহাদের উদ্যোগে যদি বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ইহারা যোগ্য স্থান লাভ করে তাহা হইলে রাজ্যের সর্বপ্রকার উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রেও উহার প্রভাব অনুভূত হইবে। রাজ্য পরিকল্পনা অনুসরণের জন্য পথঘাট, গৃহ নির্মাণ হইতে শুরু করিয়া নানা গঠনমূলক কার্যের অন্ত নাই, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিয়োগের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কোথাও কোন সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যাইতেছে না। আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী এবং বৃহৎ শিল্পপতিগণ সহযোগী হইলেই এই রাজ্যে এমন এক পরিবেশ সৃষ্ট হইবে যাহাতে বাঙ্গালীর কর্মহীনতা মোচনের পক্ষে এক গুণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র দেশের মঙ্গল বলিলে যেমন পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলও স্বীকার করিতে হয়, তেমনি স্বীকার করিতে হইবে, পশ্চিবঙ্গের মঙ্গল সমগ্র ভারতেরও মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যবাসীর হাতে হাত ধরিয়া উন্নত মস্তকে বাঙ্গালীও নিশ্চয়ই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়াইবার দাবি করিতে পারে। এবং এই সম-মিলনভূমির সৃষ্টিতে যাঁহারা অগ্রদূত হইবেন তাঁহাদের নিকট ভবিষ্যৎ ভারতবাসী অবশ্যই কৃতজ্ঞ রহিবে।

সহপাঠী সহযাত্রিনী

প্রভাতদেব সরকার

মাত্র কয়েক ঘণ্টায় শীততাপের এত তারতম্য হবে ভাবা যায়নি। গায়ে কোন শীত-বস্ত্র নেই। একটু অসুবিধায় পড়েছিল সুধাংশু। সন্ধ্যে থেকেই বেশ শীত-শীত করছিল।

কিন্তু এ'দের আতিথেয়তায় সে ভাবটা বারবার গোপন রাখবার চেষ্টা করলে সুধাংশু। কিন্তু আর বুঝি গোপন করা যায় না, সামান্য সুতীবস্ত্রের আবরণে শীত আটকায় না। মুখ-চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শীত-কাতুরে ভাবটা।

প্রথমে লক্ষ করলে কল্যাণী চায়ের সংগে সামান্য কিছু মুখরোচক নোনতা সংগ্রহ করে এনে বললে, 'ততক্ষণ চা-টা খান, গল্প করুন, তারপর আপনাদের খেতে দেব!'

নোনতা খাবারের প্লেটটা হাত বাড়িয়ে ধরে সুধাংশু সবিস্ময়ে বললে, 'এর পর আবার কি খাওয়াতে চান? তার মানে—'

সুধাংশু বন্ধুর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাইলে। কিন্তু সুশীলের মুখের কোন ভাবান্তর হল না। যেন অবধারিত বিধিব্যবস্থায় মানুষের কিছু বলবার নেই।

সুধাংশু নিজের মনে বলতে লাগল, 'আমি কিন্তু আর কিছু খেতে পারবো না।'

কথাটা কল্যাণী কানে তুললে না, আর বোধ হয় সে-ই প্রথম লক্ষ করলে 'আপনি বিছানার ওপর উঠে বসুন না, না, কিচ্ছু নেই! আপনি আরাম করে বসুন।'

এতক্ষণ চার-পা-ওলা একটা চেয়ারের কংকালের ওপর বসে ছিল সুধাংশু। অসুবিধা যত না বসার তার চেয়ে বেশী যেন বিনা নোটিসে কলকাতার উপকণ্ঠে শীত পড়ার! কিচ্ছুই বোঝা যায়নি শীতকালটা আজ সন্ধ্যা ছ'টা তিপান্ন মিনিট গতেই শুরু হবে—আশ-পাশের খোলা ড্রেনের পচা গন্ধের সঙ্গে মশার ঐকতান আসর জমাবে।

'বড্ড মশা আপনাদের এখানে!' সুধাংশু বিছানার ওপর উঠে বসে বললে।

কল্যাণী হেসে বললে, 'শীতকালেই বাড়ে।'

'আপনাদের অসুবিধে হয় না? উঃ, যা কামড়ায়!' অনাবৃত পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে সুধাংশু বললে।

কল্যাণী তেমনি হেসে বললে, 'না, শীতকাল তো, সব সময় মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে থাকতে হয়, হুল ফোটাবার জায়গা পায় না, কেবল মুখটা—'

সুধাংশু চেয়ে দেখলে, ঘরের আলো স্তিমিত হলেও কল্যাণীর মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। মুখে অনেক দাগ, মশা কামড়ানোর, প্রথমে ভ্রম হয়েছিল বয়স-ব্রণ বলে।

'ইস্-স্! শীতের কোথায় কি, এরই মধ্যে!'—আত্মপ্রবঞ্চনায় কথাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। সুধাংশু কল্পিত মশার কামড়ের উদ্দেশে অনাবৃত পায়ে হাত বুলোলে।

কল্যাণী তেমনি হেসে বললে, '

বছরই আছে! সঙ্গের সাথী!'

বেছে বেছে এমন একটা জায়গায় আস্ত

নেওয়ার জন্যে সুধাংশু বন্ধুকে দোষারো

করলে, 'জায়গাটাও বড় খারাপ! গাছ-প

আবর্জনা, শহরের সব কিছু আবার গা

আসে!'

সুশীল এতক্ষণ একটিও কথা বলে

স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিয়ে যেন তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মশা কামড়ালেই বা কি, না কামড়ালেই বা কি, মাথা গোঁজার একটা স্থান পেয়েছে এই যথেষ্ট!

সুশীল নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, 'দাও না একটা বাসা দেখে তোমাদের ওদিকে কাছে-পিঠে! বেঁচে যাই!'

আজকাল বাসা খোঁজার কথা অনেকেই বলে, নতুন বন্ধু না হয় বললে, সুধাংশু গায়ে মাখলে না। বললে, 'চেষ্টা করবো। সত্যি, সাংঘাতিক মশা!'

আবার মশাকামড়ে উত্যক্ত হবার আগে কল্যাণী একটা কাঁথা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এইটে চাপা দিয়ে বসুন!'

সুধাংশু কাঁথাটা পায়ের ওপর চাপা দিয়ে অপ্রস্তুতের মত হাসলে। ভদ্রমহিলা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন তাঁর স্বামীর অনাবিষ্কৃত বন্ধুটির শীত করছে। বড় বেকায়দায় পড়েছেন লেপতোশকের সময়ে এসে পড়ে ভদ্রলোক!

এর পর শীত সম্বন্ধে আলোচনা স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। কিন্তু আলোচনা জমে না, কল্যাণী আপ্যায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর সুধাংশু বন্ধুকে শুনিয়ে বললে, 'শীতটা আজ হঠাৎ পড়ল! একেবারে—'

সুশীল হাতের, নির্লিপ্তভাবে একখানা বাংলা খবরের কাগজ উল্টেপাল্টেই বললে, 'আজকাল এমনিই হচ্ছে, কোন কিছুর ঠিক নেই!'

হয়তো ট্রাম না থাকলেও বেশ আড্ডাটাই দেরি করা যায়। আরো অনেকখানি পথ বাড়ি ফেরবার কথা ভাবলে ট্রাম আপনিই এসে যায়!

সুধাংশু আন্তরিক অভিনয়কারিতার নজির দেখিয়ে বললে, 'সকালে কিরকম গরম, দুপুরেও তেমনি; কে জানে সন্ধ্যে থেকেই—'

সুশীল গম্ভীর হয়ে বললে, 'কোন ঠিক নেই!'

কল্যাণী ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনাদের জায়গা করি?'

সুধাংশুকে কিছু বলতে না দিয়ে সুশীল ব্যস্ত হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীতের রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া ভাল। তারপর যেতেও হবে অনেকখানি, এখানে নাকি!'

'কিন্তু...'

আর কোন 'কিন্তু'ই নয়, কল্যাণী ক্ষিপ্র হাতে আসন পাততে লাগল। সুধাংশু চেয়ে চেয়ে দেখলে। এই স্বল্পপরিসর ঘরে পরস্পরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রেখে বসবাসের কি প্রাণান্ত প্রচেষ্টা! শোবার চৌকি আছে, বসবার চেয়ার আছে, পড়বার টেবিল আছে, বাক্স-পেঁটরা আছে, জলচৌকির ওপর নিত্যপূজা বিধির আয়োজনও আছে; আবার অতিথি এলে দু'খানা আসন পেতে আপ্যায়নের স্থান সঙ্কুলানও আছে।

হয়তো এরই নাম খাপ খাওয়ানো অবস্থার সঙ্গে! কারও পক্ষে জীবনভোর, কারও তা সাময়িক।......

হয়তো খুব বেশী দিন নয়ঃ সুধাংশুর মনে হল: বিদ্যুৎচমকের মত চোখের ওপর ভেসে উঠলো, জীবনের আর এক ছবি।

এক দফা কোর্ট-ইয়ার্ডে, এক দফা গাড়ি-বারান্দার নীচে, আর এক দফা পার্লারের সামনে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রচুর অভ্যর্থনা করলেন। সুধাংশু অভিভূত হয়ে পড়েছিল! তারপর ড্রয়িং রুমে বসে আলাপ করতে করতে শ্রীমতী বললেন, 'জানো সুধাংশুবাবু আমার সঙ্গে পড়তেন!'

'তাই নাকি? হাউ ফানি!'

সত্যিই ফানি, শ্রীমতী এখন বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী! আর সুধাংশুবাবুকে দেখলে সে কথা কি মনে হবার উপায় আছে? দশ বছর আগে নামের খ্যাতি কি-ই বা ছিল যার সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে কেউ শ্লাঘা বোধ করবেন!

সুধাংশু তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'এক সঙ্গে নয়, এক সময়ে।'

শ্রীমতী সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'বারে, এক কলেজ তো!'

তাতে সহপাঠী হওয়ার গৌরব অর্জন করা যায় না। শ্রীমতীর স্বামী বীরেশবাবু মৃদু হাস্য করে স্ত্রীকে সমর্থন করলেন, 'ঐ-ই হলো!'

সুধাংশুর মনে হল, আসলে ভদ্রলোক স্ত্রীকে সমর্থন করলেন না, প্রসঙ্গটা চাপা দেবার মনোভাব প্রকাশ করলেন। কাজ কি ও নিয়ে তর্ক করে? হাসিটা অবজ্ঞাসূচক যেন।

কিন্তু শ্রীমতী বুঝলেন না। স্বামীকে ছাপিয়ে কৈশোর-যৌবনজীবনের পরস্পর-সান্নিধ্য-সুখ আহরণ করতে চাইলেন। তখন সবে মাত্র কলেজে সহ-শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু সম্যক চালু হয়নি। একই কলেজে সকাল এবং দুপুর ভাগ করা ছিল ছেলেমেয়ের শিক্ষাদানের নিমিত্ত, মেয়েরা শেষ করলে ছেলেরা শুরু করতো, আর বয়স সঙ্কোচের নিমিত্ত কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা একত্রে ছিল।

শ্রীমতী বললেন, 'ফিলজফি ক্লাসে এক-সঙ্গে পড়িনি, মনে নেই—কে সি পড়াতেন?'

সুধাংশু মনে করলে, হেসে বললে, 'অনেকদিন হয়ে গেছে, কিছু মনে নেই।'

শ্রীমতী ছাড়লেন না। চোখ তুলে বললেন, 'বেশ। মনে নেই', আচ্ছা, ঐ ছবিটা দেখুন দেখি ভাল করে, চিনতে পারেন কিনা কাউকে?'

সুধাংশু লক্ষ করলে। এত বড় ঘরে সত্যিই ছবিখানা মানায়নি। কেমন যেন টিমটিম করছে। উঁচু সিলিং-ওলা, চওড়া, প্রশস্ত দেওয়ালওলা ডিসটেমপার করা ঘরে বিখ্যাত অনেক ছবির পাশে ও ছবি নেহাতই বেমানান! তা ছাড়া বীরেশবাবুর লম্বা-চওড়া অনেক ছবি আছে।

ছবি অস্পষ্ট হলেও স্মৃতি কখনো অস্পষ্ট নয়। সুধাংশু বলেছিল, 'ছবিটা আপনার কাছে এখনো আছে?'

'বাঃ, থাকবে না কেন? কত কাণ্ড করে ফিলজফির সেমিনার করা হয়েছিল, মনে নেই! ছবি তোলা নিয়ে কি আপত্তি!'

যেন ঘটনাটা স্বামীকে এতদিন বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল শ্রীমতী, কথা প্রসঙ্গে যখন মনে পড়লো তখন জানিয়ে দিচ্ছে অকপটে!

'আপত্তি আপনারাই করেছিলেন—ছেলে-দের সাথে একসঙ্গে ফটো তুলবেন না!' সুধাংশু স্মৃতিচারণ করে বললে।

'আমরা নয়, সে অসীমা।' শ্রীমতী স্বামীর দিকে চেয়ে হাসলে।

বীরেশবাবু বললেন, 'কো-এডুকেশনে আপত্তি নেই, ছবি তোলায় আপত্তি? হাউ স্ট্রেঞ্জ!'

শ্রীমতী মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আপনায় আপনি সম্পূর্ণ হয়ে। এক ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একত্রে ছবি তোলার আপত্তির কারণটা বড় ব্যক্তিগত, কৌতুকপূর্ণ। অসীমার বাগ্‌দত্ত ভাবী স্বামীও আছেন ওর মধ্যে, প্রফেসার জে কে সি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবি তোলা হল। সেমিনারের পর অসীমা আর কলেজে আসেনি, নন্‌-কলেজিয়েট হয়ে বি-এ পাস করেছিল।

হাসতে হাসতে শ্রীমতী বললেন, 'আরো স্ট্রেঞ্জ, অসীমা এখন মস্ত সোস্যাল ওয়ার্কার, কত ছবি ছাপা হয় কত লোকের সঙ্গে!'

'কিন্তু তার কমপোজিশন ভিন্ন!' সুধাংশু বললে।

সে তুলনায় শ্রীমতীর উন্নতি কম হয়নি। ছবিতে শ্রীমতী মাথা নিচু করে আড়ষ্ট হয়ে আছে, প্রফেসারের কাছ ঘেঁষে বসেছে, আগাগোড়া ভাবটা কেমন ছলছল যেন!

ছবিটা নামানো হয়েছিল, সেটির ওপর মেলা ছিল। গুরুজনের ভয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার মত লাজুক-লাজুক চেহারা তখন সুধাংশুর। একেবারে শেষ সারিতে দাঁড়ানো।

'আপনার অনেক চেঞ্জ হয়েছে।' ছবির তলায় ছাপানো নাম পড়ে শ্রীমতী বললেন।

'আপনারও।' কথাটা বলেই সুধাংশুর খেয়াল হল, বীরেশবাবুর দৃষ্টিটা যেন কেমন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গটা বন্ধ করাই উচিত।

তারপরও পটপরিবর্তন হয়েছিল। ছবি সরে গিয়ে সেটির ওপর সুখাদ্য জড় হয়েছিল। শ্রীমতী একদা-সহপাঠীর আপ্যায়নে ত্রুটি করেননি। হতবাক হয়ে সুধাংশু সেদিন কেবল লক্ষ করেছিল, কেমন করে বেয়ারা কেবল খাদ্য-পানীয় বয়ে আনছিল। 'হরেক-রকম-ছে আনার' ফেরি-

ওয়ালার গাড়ির মত খাদ্যবাহী একটা গাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেয়ারাটা সবার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। শ্রীমতী দেবী উজ্জ্বল কার্পেটের ওপর ততোধিক উজ্জ্বল পদ-কমল ন্যস্ত করে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করেছিলেন।

সেদিন সান্ধ্য ভোজটা বোধ হয় সুধাংশুর সম্মানার্থেই আয়োজিত হয়েছিল। কৃতী সহপাঠীকে শ্রীমতী দেবী যথেষ্ট খাতির করেছিলেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে জনে জনে পরিচয় করিয়ে বলেছিলেন, 'লেখক সুধাংশুকুমার সর্বজ্ঞ, আর ইনি মিস্টার দাস, ডাল্টন অ্যান্ড কর্টন কোম্পানীর ম্যানেজার!'

সবাই স্মিত হাস্য করেছিল, যেন একজন সাহিত্যিকের সাহচর্যে কৌতুক বোধ করেছিল। বীরেশ সেন মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার, প্রকাণ্ড চাকুরে। কোন বিদেশী কোম্পানীর স্তম্ভবিশেষ, কভেনেন্টেড কেডার।

'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুবই ইয়ে হলাম! মিসেস্ সেন খুব আপনার কথা বলেন, আমার স্ত্রীও আপনার খুব একজন অ্যাডমায়ারার!'

'মিসেস সেনের একখানা কাগজ আছে, অর্ঘ'—নামটা বড় ইয়ে—কিন্তু কাগজটা ফার্স্ট ক্লাস! লিখুন না আপনি ওতে!'

কাগজটা প্রথমেই দেখেছিল সুধাংশু এবং সেই প্রথম। সম্পাদিকার নাম বড় বড় করে লেখা ছিল শ্রীমতী সেন!...

কল্যাণী কিছুতে ছাড়লে না। মাছ, মাংস, পায়েস সবটুকু চেটে-পুটে খেতে হল। সামনে বসে সে এমনভাবে তাড়া দিল যেন একজন পরম আত্মীয়কে অনেকদিন পরে কাছে পেয়েছে, খাইয়ে কিছুতে তৃপ্তি হচ্ছে না।

একবার সুশীল কেবল বলেছিল, 'যা পেটে ধরবে তাই খাবে তো, না, তুমি বললে পেটে জায়গা হবে?'

'তুমি থাম তো!' কল্যাণী তেমনি ব্যস্ত, 'একে খাচ্ছেন না, তুমি আবার ফোড়ন কাটছো! না না, মাংসটা সবটা খান, আমি শুনবো না কোন আপত্তি! কেন, ভাল হয়নি?'

'হয়েছে। কিন্তু—'

কব্জি ডুবিয়েই খেতে হল। খাওয়ার পরে বসতে হল। পুরোনো দিনের আলাপ হল। সুশীলের কথা কিছুই মনে ছিল না সুধাংশুর সহপাঠী হিসাবে। সুশীলই মনে করিয়ে দিলে।

সংকীর্ণ ঘরের জীর্ণ দেওয়াল নিরাভরণ, কেবল ঐ মাত্র ছবিটা ছাড়া। আর যা আছে একটি দেওয়ালপঞ্জী কোন মহাপুরুষের প্রতিমূর্তি সংবলিত।

ছবিটা পেড়ে সুশীল দেখালে। চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। ফিলজফি সেমিনারের সেই ছবি। শ্রীমতী সেনের ড্রয়িং রুমে যার এক কপি আছে। কিন্তু—

'এ ছবি আর এক জায়গায় দেখেছিলুম, তাতে কই আমার পাশে আপনার ছবি নেই!' কীটদষ্ট ছবিটা খুঁটিয়ে দেখলে সুধাংশু।

'একটা মজা হয়েছিল। ফার্স্ট এক্সপোজারে আমি ছিলুম না।' সুশীল হাসতে লাগল।

কারণটা মনে পড়ল সুধাংশুর, অসীমার সঙ্গে সুশীলের সহৃদয়তার তির্যক ব্যাখ্যা হতো প্রফেসার জে কে সি-কে নিয়ে। দোটানার ব্যাপার ছিল।

'তাই কারও কাছে আছি, কারও কাছে নেই। কেউ মনে রেখেছে, কেউ মনে রাখেনি।' সুরটা বড় অভিমানের মনে হল সুশীলের।

পাঠ্যাবস্থায় সুশীলের চাল-চলন ছিল রাজোচিত, নিত্য নূতন বেশবাস, সোডার বোতলের মুখ-খোলা অবস্থা, সদাই উচ্ছ্বসিত। সহপাঠীদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল সুশীল মজুমদার! বাপ ছিল বড় চাকরে। সে একটা দিন ছিল বইকি!

'চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে!' আজ ছবিটা দেখতে ভালই লাগে সুধাংশুর, পঁচিশ বছরে কত পরিবর্তন যেন লক্ষ করা যায়।

কল্যাণী চৌকির কাছে সরে এসে ঝুঁকে পড়ে আলেখ্য দর্শন করে বললে, 'আপনার চেহারা কিন্তু ভাল হয়েছে।'

সুধাংশু তাড়াতাড়ি বললে, 'বয়েস হয়েছে তো!'

বিরল-কেশ মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সুশীল বললে, 'কলেজে পড়বার সময় কি রোগা ছিল!'

বয়স হলে মানুষ ভাল দেখতে হয় না, বরং বয়সে মানুষকে কুৎসিত করে। সুধাংশুর বয়সকে লুকিয়ে ভাল দেখানোর যে কারণ সেটা কল্যাণী কিন্তু মুখে বলে না। সে স্বামীর সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে পারে। প্রতিবাদ করে বললে, 'কত বয়েস হয়েছে আপনার?'

'পঞ্চাশ।' সুধাংশু অনায়াসে বললে।

'ইস্-স্—' কল্যাণী মানলে না।

শীতও মানলে না। মুখে অনেক আপত্তি করলেও তোরঙ্গ থেকে সদ্য পাট-ভাঙা স্বামীর পশমের চাদরখানা এনে যখন হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে, সুধাংশু ফিরিয়ে দিলে না। বরং পরিহাস করে বললে, 'এ আর ফেরত পাচ্ছেন না।'

কল্যাণী তেমনি অমায়িক সুরে বললে, 'তবু তো আমাদের কথা মনে থাকবে!'

চাদর সুদ্ধ হাত বাড়িয়ে সুধাংশু বললে, 'না, না, আপনি রেখে দিন, সুশীলবাবুর কষ্ট হবে।'

'বলছি হবে না, আপনি গায়ে জড়িয়ে নিন।' কল্যাণী তাড়া দিয়ে বললে।

সেদিন শ্রীমতী সেনের বাড়ি থেকে এ অবস্থায় ফিরতে হলে হয়তো লজ্জায় একশেষ হয়ে যেত সুধাংশু, কিছুতেই সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারতে না। আজ কিন্তু সেসব কোন ভাবই মনে আসছে না। দোতলা বাসের মাথায় বসে পশমের চাদরটা মাথা মুড়ি দিয়ে অনেক কথাই মনে হল সুধাংশুর। কোথায় ছিল এই সুশীল, কোথায় ছিল তার স্ত্রী কল্যাণী, আর কোথায় ছিল বা সে নিজে! আশ্চর্য এক বিধির নির্দেশে পরস্পর ক[illegible] এসেছে। পঁচিশ বছর পূর্বে ঐ বড়লোকের ছেলেটা তাকে বোধ হয় দেখেও দেখেনি, সেও তত খেয়াল করেনি। পৃথিবীর অমন অনেক ঘটনার মত বুদ্বুদে মিলিয়ে গিয়েছিল।

আজ তারাই কত নিকট, আপন। এই সেদিন এক সভার শেষে সুশীল যেচে পড়ে আলাপ করেছিল, বলেছিল, আপনি

আমার সহপাঠী। আজকাল অনেকেই অমন বলে। কিন্তু সুশীল সে বলার দলে নয়। ঠিকানা সংগ্রহ করে বাড়ি এসে, কৈশোর-যৌবনের ভালবাসা উদ্দীপ্ত করেছে, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করেছে। আজ কি খেয়ালে সুধাংশু আশু শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিল! ওরা ধন্য হয়েছে, বন্ধুর শীতের কথা ভেবে বন্ধু-পত্নী পশমের এই কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। না নিলে শীত-কাতরতা অসহ্য হত কিনা বলা যায় না, কিন্তু নিয়ে যেন ভালই করেছে—ফেরত দিতে আর একদিন তবু আসা যাবে। মুড়ি-ঝুড়ি দেওয়া পশমের ব্যাপারের গন্ধটাও বড় মনোরম, সদ্যভাঙা সোঁদা সোঁদা। অদ্ভুত রোমাঞ্চ বোধ করে সুধাংশু।

তুলনা কিছু হয় না তবু তুলনাটা মনে আসে। ভূরিভোজন করিয়েছিলেন শ্রীমতী, পাশে বসে স্পর্শসুখ দিয়েছিলেন, চাঁপার কলি আঙুলের ছোঁয়ায় শিহরিত হয়েছিল সুধাংশু ক্ষণে ক্ষণে। যৌবনের অতৃপ্ত সাহচর্য-আকাঙ্ক্ষা যেন যৌবন মধ্যাহ্নে তৃপ্ত হচ্ছে। আরো অনেক আশা করেছিল সুধাংশু শ্রীমতীর স্বামী বিলেত-ফেরত মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, বড় চাকরি, গাড়ি-বাড়ি প্রতিপত্তি, বহু উচ্চে বিহার......ওঁদের সাহিত্যপ্রীতি অনেক......

সুশীলরা অনেক পড়ে গেছে। পাকিস্তানের ঘা সামলাতে পারেনি। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন ঐ এঁদোপড়া জায়গায় বাস করছে। কিন্তু আশ্চর্য, আজও এত ঘা খেয়েও জীবনের মিথ্যে রূপকারদের সমানভাবেই শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাচ্ছে, নিজেদের সব কিছু দিয়েও......

হঠাৎ পাশের ভদ্রলোক দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, 'কি পুড়ছে মশাই! দেখুন, দেখুন!'

সুধাংশু চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, পশমের গায়ের কাপড়টা নেড়েচেড়ে দেখলে।

ভদ্রলোক উৎসুক হয়ে দেখিয়ে দিলেন, 'ঐ তো, বেশ গর্ত হয়ে গেছে! কি করে পুড়লো?'

সুধাংশু কোন উত্তর দিলে না। নিরিবিলি যাবে বলে পিছনের বাসের মাথায় এসে বসেছিল, হাতে সময় ছিল বলে একটা সিগারেটও ধরিয়েছিল, তারপর কখন বাস চলতে সিগারেট ফেলে দিয়ে মুড়ি দিয়ে বসেছিল, সুশীলদের নিয়ে চিন্তা করেছিল। একটা ক্ষতি হয়ে গেল! এই-ই বন্ধুকৃত্য!

তখন সুধাংশু বলেছিল, 'দিচ্ছেন দিন, হারিয়ে গেলে কিন্তু জানি না!'

'আপনাকে জানতেও কেউ বলেনি, ওটা গায়ে জড়িয়ে নিন্।' সুশীলের স্ত্রী বলেছিল। সুশীল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে অনুমোদন করেছিল।

পোড়া গায়ের কাপড় কি করে ফিরিয়ে দেবে? বলবে, অসাবধানে পুড়ে গেছে? ছি-ছি! তখনই—

তারপর টেলিফোনে আলাপটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। রোমাঞ্চও বোধ করেছিল সুধাংশু সে সময় দূরবর্তিনীর স্বরমাধুর্যে। শ্রীমতী সেন সহপাঠিনীর সঙ্গ দিয়েছিলেন। প্রায়ই টেলিফোন করতেন, আমন্ত্রণ জানাতেন, তাঁর কাগজের জন্যে লেখা চাইতেন। কিন্তু তারপর—

ময়লা নোটগুলো মনে হয়েছিল আর চলবে না, হাতে ধরতে কেমন গা ঘিন্‌ঘিন্ করেছিল—সামান্য ক'টা টাকা, তাও এমন অবজ্ঞাভরে পাঠিয়েছিলেন শ্রীমতী দেবী স্বামীর অফিসের বেয়ারার হাত দিয়ে, আজও মনে পড়লে রাগ হয় সুধাংশুর। সমাজের ওঁদের কাছে তার লেখার মূল্য কি? অত আলাপ-পরিচয়ের ঐ পরিণতি! অনেক কথা সেদিন মনে হয়েছিল সুধাংশুর, কিন্তু উপায় ছিল না বলে লেখার পারিশ্রমিক হাত পেতে নিতে হয়েছিল, অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। আর নিজে ছাড়া কাউকে বলা যায়নি সে অপমানের কথা।

এখন পাট খুলে ফুটোটা দেখিয়ে দেওয়াই উচিত। অপরাধের কথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আর যদি সম্ভব হয়—

কল্যাণী বললে, 'ভাগ্যিস্ চাদরটা নিয়ে গিয়েছিলেন, নইলে আর এমুখো হতেন না!'

সুধাংশু মৃদু প্রতিবাদ করলে, 'তা কখনো নয়, আমরা ছেলেবেলার বন্ধু!'

'বন্ধুকে কি সবাই মনে রাখে? আ সে তো কোন্ যুগের কথা!' পশমে চাদরটা নিয়ে এক ধারে রেখে কল্যা বললে।

'তা হোক, আমাদের মনে আছে সুধাংশু বিশেষ আন্তরিক হবার চে করলে। বিছানার ওপর চেপে বসলে।

কল্যাণী সেদিনকার মত আপ্যায়িত স্ব বললে, 'আপনি বসুন, চা নিয়ে আসি।'

সুধাংশু বাধা দিয়ে বললে, 'থাক, থা আপনি বসুন, সুশীল আসুক!'

কল্যাণী বসল না, সেই স্বল্পপরিস ঘরে কিছু দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রইল স্বামী বন্ধুর সঙ্গে আলাপের ভঙ্গিতে। মি হয়তো কিছু নেই, তবু সেদিনের অ একজনের কথা চকিতে মনে হল সুধাংশুর একবারে স্পর্শ করে পাশে না বসলেও ক যেন নিকটবর্তিনী। সুশীল জানিয়েছি কল্যাণী তার লেখা পেলেই গোগ্রাসে না গেলে। খুবই অনুরাগিণী পাঠিকা তার।

আর অপরাধবোধটা যেন এখনই বে করে মনে হল। সুধাংশু তাড়াতা বললে, 'ঐ চাদরটা আপনি ফিরিয়ে দিন।'

'কেন? আজ তো কোন চাদরের দরক নেই।'

'দরকার আছে! দিন না, আর একদি নিয়ে যাব।'

শেষ পর্যন্ত বলতে হল এবং ক্ষতির ক স্বীকার করে সুধাংশু বললে, 'ওটার বদ নতুন একটা যদি—'

হঠাৎ সুধাংশু থেমে গেল। বন্ধুপত্নী মুখচোখের অবস্থা এমন বিরূপ হ'য়ে উঠ সে ধারণা করতে পারেনি। নিজের অপরা কথাও কিছু ভাবেনি।

সেদিন টেলিফোন-যোগে শ্রীমতী সে সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তার প্রতিক্রি কিছুই সামনাসামনি লক্ষ করা যায়নি কিন্তু লেখার সম্মানমূল্যের কথা উঠতে ওদিক থেকে রিসিভার নামিয়ে রা হয়েছিল ঝনাত করে। সুধাংশু তারপ নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল। শ্রীমতী সে সহপাঠিনী রাগই করেছিলেন—স্বামী অফিসের বেয়ারাকে দিয়ে তেল-চিটে ময় কয়েকটা নোট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সুধাংশু কিছু বুঝিয়ে বলবার আগে কল্যাণী সামনে থেকে সরে গেল। খুব গর্হিত প্রস্তাব করেছে সুধাংশু, অন্যায় অপ্রস্তুতের একশেষ।

সুশীল এসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ক বললে, 'খুবই চটে গেছে! বলছে, কি ক উনি ভাবলেন আমরা গুনাগার নেব! ও সঙ্গে কি আমাদের সেই সম্পর্ক!'

বেশ সহজ সুরে সুশীল বললে। কি সুধাংশু কিছুতে সহজ হ'তে পারলে ন মূল্যবোধের তারতম্য রয়ে গেছে। স্ত্রী সঙ্গে সুশীলও কি একমত? কিন্তু কেন

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

শারদীয় সংখ্যার পাঠক

সাহিত্য সংবাদের পাঠকবর্গকে বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাই।

হাতে কলম নিয়ে বসেছি, লেখায় মন বসছে না। বাইরে রোদ তেতে উঠেছে, আকাশের কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই, যাকে সুনীল বলে ততখানি নীল না হলেও শূন্যের ওই চাঁদোয়া নীল-বর্ণ। সকালে সন্ধ্যাতে আসন্ন শীতের আমেজও পেয়েছি। আর এই যে দুর্গোৎসব, সদ্য সদ্য যা বিদায় নিল, তার ঘ্রাণ এখনও মনে। সব জড়িয়ে কেমন এক আলস্য, একটু বা বিষণ্ণতা। ছেলেবেলায় জানি, পুজো পেরিয়ে গেলে মন খাঁ খাঁ করত, অনেক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি, কিন্তু গুরুজনে কোনোদিন বোঝেননি বইয়ের পাতা আঁকের খাতায় আবার করে মন ডোবানো কী শক্ত, কী শক্ত। ছুটির পর স্কুল খুললে মনে হত ঘণ্টাগুলো যেন লম্বা লম্বা রাক্ষস হয়ে গেছে। এই বয়সে যদি সে সব কথা মুখে আনি পাঠক কি আর শুনবেন! সম্পাদক মশাই হয়ত বলবেন, সোজা কথা বলুন মশাই, ফাঁকি মারতে ইচ্ছে করছে।

কথাটা বোধ হয় সংগত। ফাঁকি মারতেই মন চায়, অন্তত এই বিরতির পর। কিন্তু পুরোপুরি ফাঁকি দিলে দৃষ্টিকটু দেখায়। অতএব সর্বজনের ক্ষমা চেয়ে বলি, এই ফাঁকিটুকু মাপ করবেন।

আমি সাহিত্য পড়তে ভালবাসি। এই যে অগুনতি শারদীয় সাহিত্য রচিত হয়ে গেল তার কিছু কিছু নমুনা আমার টেবিলে রাখা রয়েছে। মাঝে মাঝে এ-পত্রিকা থেকে ক'টা পাতা উল্টেছি, কখনও বা ওই পত্রিকা থেকে। বলতে বাধা নেই, এখনও তার স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ, আমার অভ্যেসই ওই রকম, হুড়োহুড়ি করে, গো-গ্রাসে এক রাতে সাতটা গল্প, পঁচিশটা কবিতা পড়ে ফেলতে পারি না। শুনেছি ভোজন-রসিকদের অনেকের নাকি উপদেশ এই : গন্ধ শুঁকে আধ বেলা কাটাও, আধ বেলা পাত পাড়তে বলে, তারপর আসনে বসো। আমার মোটামুটি এই উপদেশটাই ভাল লাগে। পুজো সংখ্যার লেখা আর পুজোয় রেল ভ্রমণ কি এক জিনিস যে, আমার হাতে এক সপ্তাহের ছুটি—অতএব ভাই, আজই রাত বারোটায় গিয়ে লাইন দিয়ে টিকিট কেটে কালকের সকালের ট্রেন ধরতে হবে! যাঁরা মনে করেন, গরম গরম পাতে পড়ুক তাঁদের কথা আলাদা; তাঁরা সপ্তমীর রাত্রেই এক একটি পত্রিকার পাঁচটি উপন্যাস পঁচিশটি গল্পই পড়ে ফেলেছেন।

গতকালই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। বললেন, এ কদিন তিনি খাচ্ছেন ঘুমোচ্ছেন আর পুজো সংখ্যা পড়ছেন। শুনে মনে হল, খাওয়া আর ঘুমের সঙ্গে পুজোর লেখা পড়ে নেওয়ার সম্পর্কটা খুব গভীর।... আমার মতন কুঁড়ে পাঠকও যেমন আছেন তেমনি আছেন আমার বন্ধুর মতন কিছু অতি-উৎসাহী পাঠকও।

অতি-উৎসাহী পাঠকদের একটি ব্যাপার আমার মগজে ঢোকে না। এক নাগাড়ে বিছানায় শুয়ে তিন ঘণ্টায় মাত্র আটটা লেখা কি করে তাঁরা পড়েন! পড়তে ভালোই বা লাগবে কেন? একটি লেখার রস অথবা ভাব যদি মনকে আচ্ছন্ন করে তবে তৎক্ষণাৎ পাতা উল্টে কি করে আবার অন্য একটি লেখায় মন বসানো সম্ভব!... হয়ত এর জবাবে কেউ বলবেন, মশাই মনকে আচ্ছন্ন করলে তবে না কথা, যা সব পুজোর লেখা তাতে আর কথা বলবেন না।

পুজোর লেখা সম্পর্কে নানাজনের কাছ থেকে অনেক কথাই শুনে থাকি। ইদানীং কেউ কেউ নাক উঁচিয়ে বলছেন, পুজোর ভিড়টা তাঁরা আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না। সাহিত্য আর শাড়ি ত এক জিনিস নয় যে, পুজো বলেই একটা কিনতে হবে।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা অন্য রকম। পুজোর লেখা বলে আলাদা কিছু নেই। নিতান্ত একটা উপলক্ষ ঘটে, কাগজের আয়তন স্ফীত হয়, একাধিক লেখক এক জায়গায় লেখেন, কাজেই এই দশের সঙ্গে একাদশও নিজের লেখাটি যোগ করেন। হয়ত সে লেখা ভাল হয় না। কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ আছে কি, অন্য সময় লিখলেই লেখক অতি উত্তম শ্রেণীর কিছু লিখে ফেলেন? আমি স্বচক্ষে তেমন উদাহরণ বেশী দেখি নি। বরং পুজোর এই বারোয়ারি ভিড়েও অনেকের ভাল লেখা দেখেছি। এক সময় যখন পুজো সংখ্যা আজকের মতন এত বেশী ছিল না, তখন আমরা অনেক ভাল লেখা এই পুজোর ভিড়েই দেখতে পেয়েছি; আবার আজ অগণিত পুজো সংখ্যার মধ্যে আগের তুলনায় হয়ত ভাল লেখা কম পাই, কিন্তু সাধারণ-ভাবে বাঁধা লেখকদের বাইরেও বহু নতুন প্রচেষ্টা আমাদের চোখে পড়ে, চোখে পড়ে বৃদ্ধ এবং অতি তরুণদের মধ্যে যে পার্থক্য সাহিত্যগতভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তার চিহ্ন।

এ প্রসঙ্গে আপাতত আর স্ফীত করব না। আমি পাঠকদের কথা বলছিলাম। আমার মতন কুঁড়ে পাঠক, আমার বন্ধুর মতন ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত পাঠকের পরও এক শ্রেণীর পাঠক আমি দেখেছি। তাঁরা পত্রিকা কেনেন, অথচ আদপেই পড়েন না। আত্মীয়-দের পড়িয়ে বেড়ান। হয়ত কোনোটা দিয়েছেন বউদিকে পড়তে, কোনোটা শালীকে,

কোনোটা বা অন্য কাউকে। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আমি এখনও দেখতে পারি নি, অমুকে নিয়ে গেছে। শুনলাম ও'র লেখাটা নাকি এবার যাচ্ছেতাই হয়েছে।

এই ধরনের পাঠকরা শোনেন, শুধু শোনেন। কখনও শোনেন পাড়ার ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েটি কি বলছে, কখনও শোনেন স্ত্রী কি বলছে, কখনও বা শ্যালক এবং শ্যালিকার মন্তব্য। অতঃপর মাসান্তে তিনি সমস্ত শারদীয় সংখ্যার একজন বিশেষজ্ঞ পাঠক হয়ে যান। শুনে-শুনে-পড়া এই পাঠক অবশেষে শারদীয় সংখ্যার সমালোচক হয়ে চায়ের দোকানে কফিখানায় আপন বিদ্যা প্রকাশ করেন।

আমি বলে কি, আমার মতন কুঁড়ে পাঠক না হলেন; আমার বন্ধুর মতন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে শারদীয় সংখ্যা নাই বা পড়লেন; অথবা শ্রুতি-নির্ভর-পাঠক হয়ে আপন মহিমা নাই বা প্রকাশ করলেন: আপনার অবসর মতন পছন্দ মতন ধীরে সুস্থে একটি একটি করে লেখা পড়ুন, তাতে আনন্দ বেশী, আর তেমনভাবে দেখতে গেলে এই লেখার পালা ফুরোতে ফুরোতে আবার পুজো এসে যাবে।

রবীন্দ্র-দর্শন ও সাহিত্য : তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ

রবীন্দ্র-দর্শন। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। দুই টাকা।

ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ। শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সান্যাল অ্যান্ড কোং ১-১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা।

প্রত্যেক কবিই এক অর্থে ফলিত দর্শনের লেখক, কখনও পূর্বনির্দিষ্ট কোন দার্শনিক প্রস্থানের রসরূপোচিত্রী, কখনও বা স্বীয় প্রাতিভ দৃষ্টিবলে নতুন প্রস্থানের প্রবর্তয়িতা। রবীন্দ্র-রচনার ঊষাকালেই তাঁর প্রতিপাদ্য প্যাটার্নটি নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত হয়েছে, উপরন্তু নানাবিধ গদ্যরচনাতেও তিনি তাঁর দর্শনসূত্রগুলির পরিচয় রেখেছেন। ১৯১৮ সালে রাধাকৃষ্ণনের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে একজন দার্শনিকের মুখে থেকে শোনা গেল আন্তরিকভাবে তিনি "বেদান্তিন"। অতঃপর ১৯২৬এ কলকাতার সেনেট হলে ভারতীয় দর্শনমহাসভার সভাপতিত্ব, ১৯৩০এ অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালা, ইত্যাদির ফলে দার্শনিক সভাতেও তার উজ্জ্বল অনুমোদন জানা গেল।

যদিও "ফিলজফির সিস্টেমগুলি" সম্পর্কে তাঁর ভীতি তিনি উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, তথাপি তিনি যে বলেছেনঃ "আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে" (আত্মপরিচয়, পৃঃ ১০)—এই উক্তিরই মধ্যে তাঁর দার্শনিকতার বিশেষ প্রবণতাটি ধরা পড়েছে। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সূত্রেই শুরু করেছেন তাঁর আলোচনা : 'পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে মনন মার্গ ও অনুভূতি মার্গ এই দুটি মার্গের মধ্যে তাঁর পক্ষপাত অনুভূতি মার্গের প্রতি।...রবীন্দ্র-দর্শনে এই তথ্যই প্রতিপাদিত হয়েছে যে... হৃদয়বৃত্তিতে যে উপলব্ধি পাই তা তুলনায় সমৃদ্ধতর এবং সেই কারণেই বেশি তৃপ্তি-কর।'

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়েরও প্রধান কৃতিত্ব তিনি রবীন্দ্রদর্শনের আলোচনায় এই হৃদয়-বৃত্তিকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছেন, সব রকম দার্শনিক দুরূহতা নিঃশেষে পরিহার করে তাঁর আন্তরিক উপলব্ধি সাবলীল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। সমস্ত বিষয়টিকে তিনটি মূল দার্শনিক সমস্যায় বিন্যস্ত করে নিয়েছেন : ১ পরম সত্তার [illegible] অবলম্বনীয় মার্গ, ২ বিশ্বের রূপ, [illegible] মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ শূন্যকে [illegible] কখনই বড় বলে মানতে পারেন নি, বিশ্বকে ব্যক্তিত্বসমন্বিত লীলান্বেষী পরম সত্তার বিকাশভূমি বলে স্বীকার করেছেন, মানুষের সার্বভৌম সম্ভাবনাবিকাশী আচরণীয়কে তার ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্যপঙ্ক্তিসমূহ এবং অপরাপর স্বীকারোক্তির বহুল উদ্ধৃতি সহযোগে রবীন্দ্রদর্শনের এই চতুঃসীমা রেখায়িত করেছেন, আদৌ কোন জটিলতার প্রশ্রয় দেননি এবং জিজ্ঞাসুজনের জন্য সুন্দর ভূমিকা প্রণয়ন করেছেন, যেখানে সাধারণ পাঠকের দাবিও উপেক্ষিত নয়। বস্তুত তাঁর আলোচনায় আস্বাদ্যমানতা কখনও কখনও ইন্দ্রিয়স্পর্শী, অতএব পাঠক সেই পথ-নির্দেশে অসংশয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেন।

'ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ'ও কুত্রাপি বিশ্লেষণপন্থী নয়, পরিপূর্ণভাবেই আস্বাদনধর্মী আলোচনা। লেখক নিষ্ঠিত পুরাণবিদ এবং সেই সনাতন সত্যের আলোকে তিনি রবীন্দ্রভাবনার মান নির্ণয় করেছেন। সর্বত্রই কথকের আসন থেকে পরিবেশন করেছেন তাঁর অনুভবজারিত প্রতিপাদ্য, এই গ্রন্থ পাঠকালে পাঠক সেই ভক্তিসংরক্ত অনুভবের পারবশ্য স্বীকার করে নেবেন। যদিও সাহিত্যের প্রৌঢ় পাঠকের কাছে এর অধিকাংশ পৃষ্ঠাই আবেগজর্জর এবং কখনও অপচয় প্রতীয়মান হবে, কিন্তু কাব্য-

পুস্তক পরিচয়

কৌতূহলী প্রাকৃতজনের কাছে এর আবেদন ন্বিগুণ প্রতিষ্ঠা পাবে বলে আমাদের ধারণা (৩০২।৬২, ৬৭৪।৬১.

শারদ সাহিত্য

সপ্তর্ষি—সম্পাদক শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়। ৬২, গণেশচন্দ্র এভিনা্, কলিকাতা—১৩। মূল্য দুই টাকা।

পরিপাটি অংগসজ্জা ও ঝকঝকে ছাপার বৈশিষ্ট্যে "সপ্তর্ষি" দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। রচনার দিকটা অন্যান্য বছরের তুলনায় দুর্বল। আটটি ছোট গল্পের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মিহির আচার্য, নরেন্দ্র ঘোষ ও শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাই উল্লেখযোগ্য। কবিতার দিকটা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ; রচয়িতাদের মধ্যে আছেন, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি। দুটি উপন্যাস আছে যার একটির রচয়িতা সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

আনন্দ—সম্পাদিকা শ্রীমিনতি মুখোপাধ্যায়। ৭১।১, সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪। মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ।

শুধু গল্প ও দুখানি উপন্যাসের সমাবেশে নবপ্রকাশিত পত্রিকাখানির এই প্রথম শারদীয়া সংখ্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ গল্প ছাড়া এতে আছে একটি করে অপরাধমূলক গল্প, হাসির গল্প, করুণ রসের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, প্রেমের গল্প, যুদ্ধের গল্প ও ভৌতিক গল্প। নানা রকমের গল্প ও রহস্যোপন্যাসে যারা তৃপ্ত হতে চান তাঁদের এই বিশেষ সংখ্যাখানি ভাল লাগবে। লেখকদের মধ্যে আছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সমরজিৎ কর, দিব্যেন্দু পালিত, চিরঞ্জীব সেন, মণীন্দ্র রায়, কবিতা সিংহ, জয়দেব রায়, দিলীপ মিত্র, মিহির সেন, শত্রুঘ্ন গুপ্ত ও খগেন্দ্র দত্ত।

ফসল—সম্পাদক শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া, হাওড়া। মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ।

রসশেখর রাজশেখর বসু (পরশুরাম) সম্পর্কে নিতাই বসুর লেখা একটি প্রবন্ধ, রতন ভট্টাচার্য ও শংকর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, সমরেন্দ্র ঘোষাল, দিলীপকুমার সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, কল্যাণ চৌধুরী প্রভৃতির কবিতা ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ রচিত 'ডিরোজিও' নাটকের সমাবেশে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাখানি প্রকাশকদের সাহিত্য রুচির পরিচয় দেয়।

বসুধারা—সম্পাদক : ত্রিদিবেশ বসু। দাম : তিন টাকা।

তিনটি উপন্যাস (?) ও এগারোটি ছোটগল্প-সমেত মোট চুয়াল্লটি রচনায় সমৃদ্ধ

এবারের শারদ বসুধারা। উপন্যাস তিনটির রচয়িতা হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও অজিতকৃষ্ণ বসু; এবং ছোটগল্পগুলির লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। অবশিষ্ট রচনাগুলির লেখকদের মধ্যে যাঁর নাম পাঠকদের কাছে আকর্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে, তিনি হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সুন্দর প্রচ্ছদে শোভিত এবং সুমুদ্রিত "বসুধারা"র এই পরিচ্ছন্ন শারদ-সংখ্যাটি ক্রেতাদের প্রলুব্ধ করবে।

দর্শক—সম্পাদক : শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ২৫ নঃপঃ।

চিত্র ও ভাস্কর্য এবং নাটক, চলচ্চিত্র বিষয়ে চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলায় এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে কলারসিকদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করায় অন্যান্য বছরের মতোই পত্রিকাখানি তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। এই জাতীয় একমাত্র পত্রিকাখানির এই বিশেষ সংখ্যাটি কলারসিকমাত্রেরই সমাদর লাভ করবে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, সুনয়নী দেবী, ভোলা চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি সংখ্যাটির সম্পদ বাড়িয়েছে।

মানস—সম্পাদক : শ্রীরবি রায়। ৬৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ২ টাকা।

সাহিত্যরুচি এবং নিষ্ঠার সংগে সাহিত্যসেবার পরিচয়ে 'মানস' সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। কাব্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কিত প্রবন্ধ ছাড়া, গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও সুনির্বাচিত চিত্রসম্ভারে পত্রিকাখানি আদরনীয় হবার যোগ্য। লেখকদের তালিকায় আছেন মানস রায়চৌধুরী, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র সাহা, পংকজ দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অজয় গুপ্ত, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণধর, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়শংকর দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

গন্ধর্ব—সম্পাদক : শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা। ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ২·৫০ নঃ পঃ।

নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্যালয় সম্পর্কে স্বল্পসংখ্যক পত্রিকার মধ্যে 'গন্ধর্ব' আজ একটি বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। রচনা ও আঙ্গিক শোভায় এবারের শারদীয়া সংখ্যাখানি নাট্যামোদী মাত্রেরই কাছে একটি অপরিহার্য সংখ্যা হতে পেরেছে। এখনকার প্রতিষ্ঠাবান কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে বিমল করের একটি একাঙ্ক নাটক ছাড়া পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এতে আছে। রচয়িতা হচ্ছেন উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে আছেন শম্ভু মিত্র, নৃপেন্দ্র সাহা, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমরনাথ পাঠক, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রথীন্দ্রনাথ রায়, দিলীপ রায় প্রভৃতি যাঁরা বর্তমান নাট্য-আন্দোলনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

চিত্রপট—সম্পাদক : শ্রীমৃগাংকশেখর রায়। বি-৫ ভারত ভবন; ৩ চিত্তরঞ্জন এভিনু, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ১·০০ টাকা।

চলচ্চিত্রকে ঠিকভাবে বোঝবার, সে-বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার এবং চলচ্চিত্রের প্রকৃত শিল্পমহিমা উপলব্ধিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গঠিত ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। চলচ্চিত্রকে যাঁরা একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে গুরুত্ব দেন তাঁদের কাছে পত্রিকাখানি বহুবিধ তত্ত্ব, তথ্য ও আলোচনার জন্য অপরিহার্য। আলোচ্য সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন ধ্রুব গুপ্ত, ঋত্বিককুমার ঘটক, বিভাস চক্রবর্তী, মৃগাংকশেখর রায়, সুশান্ত বসু, কিরণময় সাহা, প্রদীপ্তশংকর সেন, প্রসূন দাশগুপ্ত, সমীর মৈত্র, অমলেন্দু বসু প্রভৃতি। সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র চিত্রনাট্যের এক অংশ এবং ভার্জিনিয়া উলফ ও ডগলস ম্যাকভে রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ দুটি সংখ্যাখানিকে সমৃদ্ধ করেছে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'সময় সাহিত্য সমালোচনায়' "দুই আগুনের মাঝখানে" প্রবন্ধের লেখক শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী। মুদ্রণ প্রমাদবশত নামটি শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

* রঙ্গজগৎ *

অযথা বোম্বাই-মোহ

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান দুর্গতি প্রতিরোধের উপায় কী—এ নিয়ে রাজ্য সরকার ও চলচ্চিত্রসেবীরা আজ গভীরভাবে ভাবছেন। এবং সংকট নিবারণের একটি ফলপ্রদ উপায় সম্পর্কে সকলেই একমত হয়েছেন। সেটি হল: কলকাতায় হিন্দী ছবি প্রযোজনা। অর্থাৎ এখানকার চিত্রপ্রযোজক ও চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি হিন্দী ছবি তৈরির কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, তবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যবসায়-পরিধি সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে। বাংলার দুঃস্থ কলাকুশলীরাও সুদিনের মুখ দেখতে পারেন।

সংকটমোচনের এই অন্যতম অব্যর্থ উপায়টিকে কার্যকর করে তোলার জন্য যখন এখানকার চিত্রপ্রযোজকদের সর্বাগ্রে সচেষ্ট হওয়া উচিত, তখন যদি দেখা যায় যে, এঁদেরই কেউ কেউ বোম্বাইয়ে গিয়ে হিন্দী ছবি তৈরির ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল, তবে ক্ষোভের কারণ ঘটে বইকি। বোম্বাইয়ে তৈরী হিন্দী চিত্রের প্রসাদে বাঙালী চিত্রপ্রযোজক বা চিত্র-পরিবেশক লাভবান হতে পারেন, কিন্তু বাংলার হতভাগ্য কলাকুশলীরা?

তা ছাড়া, বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের এই সংকটকালে কোন একজন চিত্র-প্রযোজক হিন্দী ছবি তৈরির কাজে অগ্রণী হলে অন্যান্যরাও এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করতে পারেন। এভাবে ধীরে ধীরে কলকাতাও হিন্দী ছবি তৈরির ক্ষেত্রে মাদ্রাজের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে।

হিন্দী ছবিতে বোম্বাইয়ের চিত্রতারকা না থাকলে চলবে না—এটাই যদি চিত্র-প্রযোজকের নীতি হয়, তা হলেই বা ক্ষতি কী। বোম্বাইয়ের চিত্রতারকারা মাদ্রাজে গিয়ে হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেন। কলকাতায় এসে বাংলা ছবিতেও এঁদের কেউ কেউ অভিনয় করেছেন। সুতরাং হিন্দী ছবি তৈরি করতে হলে বোম্বাই যাত্রা করতে হবে—এর সপক্ষে যুক্তি খুঁজে বের করা কঠিন।

অথচ দেখা যাচ্ছে, একাধিক প্রতিষ্ঠাবান বাঙালী চিত্রপ্রযোজক এই অযথা বোম্বাই-প্রীতি ত্যাগ করতে পারছেন না। এই মনোবৃত্তি বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমরা আশা করব, বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান সংকটের কথা ভেবে আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এই সর্বনাশা বুদ্ধি ত্যাগ করবেন।

জাপানের টোহো স্টুডিয়োর কর্মীদের সঙ্গে অসিত চৌধুরী

অসিত চৌধুরী

বিদেশ-সফরের অভিজ্ঞতা

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, জাপান এবং মধ্য ও দূর প্রাচ্যের কয়েকটি প্রধান শহর পরিভ্রমণ করে প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক-পরিবেশক অসিত চৌধুরী গত সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে তিনি যে একটি বিশেষ সুখবর দেন, তা-ই প্রথমে উল্লেখ করছি।

তিনি জানান, পশ্চিম জার্মানীর বেটা ফিল্মস পৃথিবীর ছয়জন শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালককে নিয়ে ছয়টি আলাদা টেলিভিশন-চিত্র তৈরী করছেন। এক ঘণ্টা-ব্যাপী প্রতিটি চিত্রে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালকদের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার ও তাঁদের দৈনন্দিন বিশেষ কর্মধারা (স্টুডিয়োয় ও গৃহে) চিত্রায়িত হবে। ছয়জন চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে জাঁ রেনোয়া, ইঙ্গেমার বেয়ারম্যান, কুরোসয়া, বুনুয়েল ও ইতালির একজন পরিচালক রয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর এই টেলিভিশন-দল সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে ছবি তোলার জন্য আগামী ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আসছেন।

বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা আছে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী চৌধুরী বলেন, "ইতালি, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় টেলিভিশন সিনেমাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। সে-সব দেশে বর্তমানে ২৫ থেকে ৭০টি চিত্রগৃহ প্রতি-মাসে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সিনেমা-দর্শকের সংখ্যা দিনের পর দিন কমছে। সেখানকার চিত্রপ্রদর্শকরা এখন ছায়াছবির দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বিদেশের শ্রেষ্ঠ ছবি দেখিয়ে চিত্রগৃহগুলি চালু রাখ

ভি শান্তারাম প্রোডাকশন্স-এর প্রথম বাংলা ছবি "পলাতক"-এর (পরিচালনা: যাত্রিক) একটি দৃশ্যে জহর রায়, অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায় ফটো: দেশ

যায় কিনা, তা-ই এখন বিশেষ করে ভাবছেন সেখানকার চিত্রপ্রদর্শকরা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ছবির কদরও সেখানে বেড়ে গিয়েছে।

"পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এক্সপোর্ট সংস্থা তৈরী করে আমরাও যদি নিয়মিত-ভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদেশে ছবি পাঠাতে শুরু করি, তবে ভারতীয় ছবির আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-ক্ষেত্র সহজেই গড়ে উঠতে পারে। এখনই এ-ধরনের এক্সপোর্ট সংস্থা তৈরী করার উপযুক্ত সময়।"

গ্রেট ব্রিটেন প্রসংগে অসিত চৌধুরী বলেন, "সেখানে বসবাসকারী বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা দু' লক্ষের উপর। লন্ডনেও প্রচুর বাঙালী রয়েছেন। যদি এমন একটি সোসাইটি গড়ে তোলা যায় (সেখানকার ও এখানকার প্রতিনিধিদের নিয়ে), যার উদ্যোগে প্রতি বছরেই ইংলণ্ডে নিয়মিতভাবে কয়েকটি বাংলা ছবি দেখানো যেতে পারে, তা-হলে প্রতি ছবি পিছু প্রযোজকের ভাগে মোট ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় হতে পারে। বাংলা ছবির বর্তমান সংকটকালে এই ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই কার্যকর করা উচিত।"

জাপান সম্পর্কে শ্রী চৌধুরী বলেন, "জাপানের চলচ্চিত্র শিল্প টেলিভিশনের ভয় থেকে মুক্ত। সেখানে সর্বাধিক ব্যয়-বহুল ছবির খরচ ছয় লক্ষ টাকার বেশী নয়। অল্প কয়েকটি সংস্থা দ্বারা জাপানের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেখানে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সর্বোচ্চ পারি-শ্রমিকের অংক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার সবচাইতে জনপ্রিয় শিল্পীদের পারিশ্রমিক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার বেশী নয়। কুরোসয়ার মত চিত্র-পরিচালকের পারিশ্রমিক ৩৫ হাজার টাকার বেশী নয়। ১১টি 'শব্দমঞ্চ'সম্বলিত স্টুডিয়োতে সেখানে প্রতি বছরে ৮৫টি ছবি তৈরী হচ্ছে। সুতরাং জাপানের চলচ্চিত্র শিল্প এখন সংকটমুক্ত। এবং সেখানে বিদেশী ছবির চাহিদা কম। তবে জাপান-সরকার বিদেশী ছবি আমদানীর ব্যাপারে সম্প্রতি উদার-নীতি অবলম্বন করেছেন। সরকার-স্থাপিত আর্ট থিয়েটার্স লিঃ-এর মাধ্যমে সেখানে এখন নিয়মিত-ভাবে বেশী সংখ্যায় বিদেশী ছবি আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। "প্রথম শ্রেণীর" (গুণানুক্রমে শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে) যে কয়টি ছবি অনতিবিলম্বে জাপানে প্রদর্শিত হবে, তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার" এবং "দুই কন্যা" অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। সাগ্রহেই তাঁরা এই ছবিগুলি নিয়েছেন।

"রেঙ্গুনে বাংলা ছবির চাহিদা খুব বেশী। সেখানকার বাঙালীরা বাংলা ছবি দেখার জন্য সদা আগ্রহান্বিত। কিন্তু গত বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে বাংলা ছবি একেবারেই যায়নি বলা চলে। হিন্দী ছবিই রেঙ্গুনের বাজারটি দখল করে আছে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগে রেঙ্গুনে নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করত। রেঙ্গুনবাসী বাঙালীরা এখন বাংলা ছবির কথা প্রায় ভুলেই গেছেন। এ-ব্যাপারে আমরাও মোটেই যত্নবান ছিলাম না। ফলে বাংলা ছবির একটি ব্যবসায়-ক্ষেত্র আমরা হারাতে বসেছিলাম। গত বছরের মধ্যে সেখানে একটি বা দুটির বেশী বাংলা ছবি দেখানো হয়নি। রেঙ্গুনে "কাবুলিওয়ালা", "সপ্তপদী" ও "তিন কন্যা" প্রদর্শনের ব্যবস্থা অবশ্য এখন হয়েছে। কিন্তু সেখানে নিয়মিত বাংলা ছবি পাঠানোর ব্যাপারে আমাদের আরও তৎপর হতে হবে।

"মধ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতীয় হিন্দী ছবির আদর বেশী। তার একটি অন্যতম কারণ হল, সেখানে বাংলা ছবি পাঠানোর কোন ব্যবস্থাই এতকাল ছিল না। সেখানকার দর্শকরা আমাদে ছবিই বেশী পছন্দ করেন। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কাহিনী ওঁদের পছন্দ নয়। সর্বজনগ্রাহ্য আমোদ-উপকরণ-সম্বলিত বাংলা ছবি তাঁরা সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। সিঙ্গাপুরের চিত্র-ব্যবসায়ীরা সাগ্রহে "সপ্তপদী" দেখাতে রাজী হয়েছেন। সেখানে বাংলা ছবি এই প্রথম মুক্তিলাভ করবে। থাই-ল্যাণ্ডে "তিন কন্যা" দেখাতে সম্মত হয়েছেন সেখানকার চিত্র-ব্যবসায়ীরা।

"আমি বিদেশে কোন ছবির প্রিণ্ট নিয়ে যাইনি। শুধু মুখের কথা ও প্রচার-পুস্তিকার জোরেই সর্বত্র কোন-না-কোন বাংলা ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে এসেছি। এতেই প্রমাণ হয়, বিদেশে আমাদের ছবির ব্যবসায়িক 'সাফল্যের সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে।

"য়ুরোপ ও আমেরিকায় ঘুরে দেখেছি, সেখানকার চলচ্চিত্র-ব্যবসায় মহল এবং বিদগ্ধ দর্শকসমাজ সত্যজিৎ রায়কে কী গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। ওঁরা ভারতীয় ছবি বোঝেন না, বাংলা ছবি বোঝেন না। ওঁরা শুধু বোঝেন সত্যজিৎ রায়ের ছবি—ওঁরা বলেন, "রে ফিল্মস।" আমেরিকায় আমি বোসলে ক্রাউথার, আর্থার নাইট প্রমুখ বিশিষ্ট চিত্র-সমালোচকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা এবং সেখানকার দর্শকরা সত্যজিৎ রায়কে পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকরূপে গণ্য করেন।"

"আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান বাড়িয়েছে। এ-কথা সকলেই জানেন। আমাদের উচিত, **এই অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ** করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, **আমাদের সরকার এই ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে অনেক সময় যে-সব ছবি পাঠানো হয়, সে-সব ছবি বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান বাড়িয়ে আসতে পারে না। বরঞ্চ ভারতীয় চলচ্চিত্রের কদর কমিয়েই দিয়ে আসে।** এতে **বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক প্রসার ও সাফল্যের সম্ভাবনাও সংকুচিত হয়ে** পড়ে। য়ুরোপ ও আমেরিকার চিত্র-রসিকরা **ভারতীয় ছবি দেখে ভারতীয়** চলচ্চিত্রের প্রতি বীত-**শ্রদ্ধ হয়ে** পড়েন। তাই প্রতি **বছরেই** বিদেশের চলচ্চিত্র-উৎসবে যাতে একটি করে সত্যজিৎ রায়ের ছবি পাঠানো হয়, সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।"

কলকাতার ছাত্রজীবন নিয়ে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী কর্তৃক তৈরী প্রামাণিক চিত্রের নায়ক তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

* চিত্র-সমালোচনা *

নবাগতের নিষ্ঠা

বাংলা ছবিতে তরুণ চিত্রপরিচালকদের পদক্ষেপ মনে আশার সঞ্চার করে। এঁরা আসেন নতুন প্রত্যয় ও অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে। সৃষ্টির অপূর্ণতার মধ্যেও তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয়টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চিত্ররথ ছদ্মনামের আড়ালে রয়েছেন এমনি এক নবাগত আত্মবিশ্বাসী তরুণ কলাকার-গোষ্ঠী। তাঁদের প্রথম প্রয়াস "কুমারী মন" (ফিল্ম এজ প্রযোজিত) এ-কথাই প্রমাণ করছে যে, এঁরা বাংলা ছায়া-ছবির জগতে স্থায়ী প্রবেশপত্র নিয়ে এসেছেন।

"কুমারী মন" অপরিসীম পরিশ্রম ও গভীর আত্মপ্রত্যয়ের এক সুন্দর নিদর্শন। সুন্দরবনের জলে-জঙ্গলে অনেক আপদ-বিপদ তুচ্ছ করে শিল্পীরা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। এই ছবির জন্য তাঁরা পরিশ্রম করেছেন প্রচুর। তাঁদের এই ঐকান্তিক সহযোগিতা অন্যান্য শিল্পীদের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে। এবং চিত্ররথ-গোষ্ঠী ও অন্যান্য কর্মী ও কলাকুশলীরা এই ছবি তৈরী করতে গিয়ে যে সহনশীলতা, ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তারও তুলনা বিরল। এঁদের সকলের সম্মিলিত অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের এক সার্থক ফলশ্রুতি এই "কুমারী মন"।

সুন্দরবনের বন ও নদী, এর ভীষণ ও **কোমল আরণ্যক রূপ এবং মনোরম নিসর্গ**—শোভা ছবিটিতে এক নয়নাভিরাম পটভূমি রচনা করেছে। এমন দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ এর আগে বাংলা ছবিতে খুব কমই দেখা গেছে। নির্মম প্রকৃতির কোলে সুন্দরবন-বাসীদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে যে শংকা দেখা দেয় এবং প্রতি দিবসের রোমাঞ্চ তাদের জীবনকে যে-ভাবে দোলায়িত করে, এই ছবিতে তার বিশ্বাসযোগ্য রূপটি দেখা যায়। বাস্তবনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ পরিচালক-গোষ্ঠী সুন্দরবনের এই কড়িকোমল পরিবেশে ছবির কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন।

ছবির মূল কাহিনীতে কোন অভিনবত্ব নেই (কাহিনীকার : শক্তিপদ রাজগুরু)। সদা কর্মব্যস্ত স্বামী ও নিঃসঙ্গ স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি (স্ত্রীর অভিমান ও অভিযোগই যার উৎস)। বাংলা ছবিতে একাধিকবার এবং বাংলা গল্পসাহিত্যে বহুবার দেখা গেছে। এদের মাঝখানে হঠাৎ করে এসে পড়েছে স্ত্রীর পূর্বপ্রণয়ী। এতে জটিলতা আরও বেড়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত এক নাট্যবিপ্লবের ভেতর দিয়ে আবার দম্পতির সুখমিলন ঘটেছে (এই নাট্য-পরিণতি সাহিত্যে যতটা দেখা না যায় তার চেয়ে বেশী দেখা যায় সিনেমায়)। ছবির আরেকটি উপাখ্যান গড়ে উঠেছে এক প্রণয়ী-যুগলকে কেন্দ্র করে। এরা সুন্দরবন অঞ্চলের বাসিন্দা।

চিত্রকাহিনীর নায়ক-নায়িকা শহরের মানুষ। নায়ক আদর্শবাদী। সুন্দরবনের নিষ্ফলা জমিকে সুফলা শস্যশ্যামলা করে তোলাই তার সাধনা। ওদের দাম্পত্য-জীবনের যে মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী ছবিটিতে **রূপায়িত তার জন্য সুন্দরবনের পরিবেশের** প্রয়োজন ছিল না। স্বামী যদি গৃহবিমুখ হয় এবং সদা কর্মব্যস্ত থাকে, তবে সব স্ত্রীই নিঃসঙ্গ বোধ করে—তা সুন্দরবনেই হোক, আর সভ্য শহরেই হোক।

সুখের কথা এই, নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য-জীবনের কাহিনীকে ছবিতে মুখ্য করে তোলা হয়নি। আদর্শবাদী নায়কের সাধনার সঙ্গে সুন্দরবনবাসীদের জীবন-ধারণের সংগ্রাম, সেখানকার তরুণ-তরুণীর প্রণয় এবং জনৈক খলচরিত্রের পাপাচার প্রভৃতি চিত্রনাট্যে মূল কাহিনীর স্থানটি দখল করেছে। সুন্দরবনবাসীদের সংস্কার ও সংগ্রাম এবং তাদের জীবনবাসনার রূপটি চিত্রনাট্যে ফুটে উঠেছে। সুরচিত ও সুগ্রথিত এই চিত্রনাট্য (রচনা : ঋত্বিক ঘটক) একটি মামুলী কাহিনীকে ছবিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

চিত্ররথ-গোষ্ঠী তাঁদের প্রয়োগ-কর্মে কয়েকটি রসমুহূর্ত রচনার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ছবির একটি নিঃশব্দ মুহূর্ত সত্যিই যেন বাঙময়। নায়ক, নায়িকা ও নায়িকার প্রথম প্রেমিক বসে রয়েছে। ওদের কারোর মুখে কোন কথা নেই। এই ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন কত কথার উচ্চারণ। এমনি সময়েই রেডিও থেকে ভেসে আসে একটি গান: "পুরানো সেই দিনের কথা......"। দর্শকের মনকে দোলা দেওয়ার মত আরও একাধিক মুহূর্ত রয়েছে ছবিতে—যা চিত্ররথ-গোষ্ঠীর রসজ্ঞান ও পরিমিতি বোধের পরিচয় দেয়।

ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে সাসপেন্স ও রুদ্ধ-শ্বাস ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টির ক্ষমতাও দেখিয়েছেন তরুণ পরিচালক-বৃন্দ। চলমান নৌকায় নায়ক ও তার বিশ্বাসঘাতক খল-চরিত্র কর্মচারীকে নিয়ে ছবিতে যে সাসপেন্স-মুহূর্তটি রয়েছে তা দর্শককে সত্রাস কৌতূহলে আবিষ্ট করে রাখে। এই সাসপেন্স-এর সঙ্গে পরিচালকরা মিশিয়ে দিয়েছেন ভিন্নতর এক নাট্যরস। এই মুহূর্তেই নায়কের কানে ভেসে আসে তার স্ত্রীর গাওয়া গান: "জীবনে পরম লগন করো না হেলা"। নদীর বুকে লঞ্চে বসে পূর্বপ্রণয়ীকে গান শোনাচ্ছে নায়কের স্ত্রী। একদিন সন্ধ্যায় নদীর বুকে নৌকোয় বেড়াবার সময় এই গানটিই নায়ক শুনতে চেয়েছিল স্ত্রীর কাছ থেকে। স্ত্রী শোনায়নি।

বিচিত্র বহির্দৃশ্যের সৌন্দর্য এই ছবির অন্যতম প্রধান সম্পদ। এবং রস ও রোমাঞ্চের উপকরণ এই ছবির এক বিশেষ

বি অ্যান্ড বি প্রোডাকশন্স-এর প্রথম প্রয়াস "মৌনমুখর" (পরিচালনা: ত্রয়ী) ছবির নায়িকা ভারতী রায় ফটো: দেশ

আকর্ষণ। ছবির শেষ দৃশ্য দর্শকের মনকে কৌতূহলাবিষ্ট করে রাখে। এক কথায় বলা যেতে পারে, প্রথম স্বাধীন চিত্র-পরিচালনায় চিত্ররথ-গোষ্ঠী এই ছবিতে যে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা রসজ্ঞ দর্শকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন অর্জন করবে।

অভিনয়ে যিনি প্রথমেই দর্শকের মনে রেখাপাত করেন তিনি হলেন নায়ক-বেশী অনিল চট্টোপাধ্যায়। চরিত্রটিকে তিনি অভিনয়ের গুণে ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। চরিত্রাঙ্কণে তিনি আদর্শবাদীর উৎসাহ ও বিড়ম্বিত স্বামীর ব্যথা সুন্দর-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নায়িকার রূপসজ্জায় কণিকা মজুমদারের অভিনয় সুমার্জিত, এবং সংবেদনশীলতায় প্রাণবন্ত। ছবির শেষে বিশেষ নাটকীয় দৃশ্যে স্বামীকে অভিযোগ করার সময় তিনি অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সুন্দর বনবাসিনী মরিয়মের প্রাণচাঞ্চল্য, প্রণয়াভিলাষ ও বিরহ সন্ধ্যা রায়ের মরমী অভিনয়ে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। তার প্রণয়ী ইফানের চরিত্রে সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের অভিনয় স্বচ্ছন্দ।

কাহিনীর খলপুরুষের ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকার পূর্ব-প্রণয়ীর চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। সুখ্যাত চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক যে একজন সুঅভিনেতা এই পরিচয় মেলে ছবির এক পাগল-চরিত্রে।

অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন আশা দেবী, দেবী নিয়োগী ও নির্মল ঘোষ।

সংগীত-পরিচালক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছবির আবহ-সুররচনায় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লোক-সংগীতের সুরারোপেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছবির আলোকচিত্রগ্রহণে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ক্যামেরা সুন্দরবন অঞ্চলের রমণীয় রূপটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। ঝড়-জলে নদীর বুকে একটি ভাসমান নৌকোর দৃশ্যগ্রহণে তিনি অনবদ্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা), রবি চট্টোপাধ্যায় (শিল্প নির্দেশনা) ও সুজিত সরকার (শব্দগ্রহণ)।

বন্যায় বিপর্যয়

বিয়ের আসরে বর-কনের শুভদৃষ্টি হ'ল না। কনে যখন তাকায় বরের দিকে, বর তখন কী জানি কেন অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। পরে বর যখন তাকায় কনের দিকে, কনের মুখ তখন ঘোমটায় ঢাকা।

তারপর বাসরঘরে মেয়েদের মধ্যে একজন যখন গান গায়—"লাজুক লতা ও কনে বউ", কনে বউ তখন ঘুমুচ্ছে, আর বর বসে রয়েছে ফুলশয্যার ওপর।

এই অস্বাভাবিক দুটি ঘটনা অকারণে ঘটানো হয়নি। বর-কনের চাক্ষুষ পরিচয় যদি আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে পরের ঘটনা যে দানা বাঁধতে পারে না। সে যাই হোক, মাঝরাতে এল ময়ূরাক্ষীর সর্বনাশা বান। ঝড়-বৃষ্টির তান্ডব অবশ্য আগেই শুরু হয়েছিল। বানে ভেসে যায় সমস্ত গ্রাম। বানের জলে অনেকক্ষণ সাঁতরে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নবদম্পতি।

এখানেই অঘটনের শেষ নয়। এক জেলের বাড়িতে আশ্রয় পায় কনে, আর বর খুঁজে বেড়ায় তার স্ত্রীকে। বরের নাম সিতাংশু, কনের নাম মলিনা।

সিতাংশু ও মলিনার দেখা হওয়ার অন্তর্বর্তীকালে আরও অঘটন ঘটে। মলিনা এক পাপাচারী প্রৌঢ়ের (বৃদ্ধও বলা চলে) কুনজরে পড়ে। পরে মলিনাই আবার কন্যার পবিত্র অধিকার নিয়ে গোপনে এসে দুশ্চরিত্রের সঙ্গে দেখা করে এবং তার অন্তরের পরিবর্তন ঘটায়। পাপিষ্ঠের চরিত্রের নৈতিক রূপান্তর ঘটার পর সে মলিনাকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসে তার শ্বশুরবাড়িতে।

যথাসময়ে নবদম্পতির সাক্ষাৎ ঘটে। তখনও দেখা যায় আর এক অঘটন। আবেগের আতিশয্যে মলিনার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। শেষ পর্যন্ত মুশকিলআসান কাহিনীকার (নাকি চিত্রনাট্যকার?) সকল মুশকিলের অবসান ঘটিয়ে দম্পতির পুনর্মিলন ঘটিয়ে দেন।

সংক্ষেপে এই হল "শুভদৃষ্টি" (এস সি প্রোডাকশন্স) ছবিটির মূল কাহিনী। আরও একাধিক চরিত্র এবং আনুষঙ্গিক উপ-কাহিনীও অবশ্য ছবির চিত্রনাট্যে সন্নিবিষ্ট। সেসবের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত "কাঁটা ও কেয়া" অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা।

চিত্রকাহিনীতে আকস্মিকতার উপাদানই নানা ঘটনার কার্য-কারণ সম্বন্ধটি গড়ে তুলেছে। যুক্তি ও সংগতি এই ছবির কাহিনীতে দুর্লক্ষ্য। তা না হলে যে নায়িকাকে ছবিতে বরাবর দেহ-মনে সুস্থ দেখা গেল, হঠাৎ করে কাহিনীর এক চরম মুহূর্তে কী করে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় ও স্মৃতিবিভ্রম ঘটে? সংগতিহীন ও অলৌকিক এমন আরও অনেক ঘটনা রয়েছে ছবিটিতে।

চিত্রপরিচালক চিত্ত বসু কাহিনী-বিন্যাসে এসব অবিশ্বাস্য উপাদান পরিহার করতে পারেন নি। এবং চিত্রকাহিনীর নানা ত্রুটির সামনে তিনি অনেকটা অসহায়ও বোধ করেছেন। তবে ছবিতে কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত রচনায় তিনি রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বন্যার সর্বনাশা রূপটি তিনি যেভাবে ছবিতে বিন্যস্ত করেছেন তা ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে।

নায়ক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আরও সপ্রাণ হতে পারত। নায়িকা সন্ধ্যা রায় নির্বাক মুহূর্তে চরিত্রটির অন্তর-বেদনা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, এবং বিশ্বাস-যোগ্যভাবে চিত্রনাট্যের দাবি পালন করেছেন।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে (জেলে-দম্পতি) মনোজ্ঞ অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন। অনুপকুমার একটি পার্শ্বচরিত্রে (অন্য এক জেলের ভূমিকায়) দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রামের য়ুনিয়ন বোর্ডের পাপাচারী প্রেসিডেন্টের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় চমৎকার।

নায়কের জননীর ভূমিকায় সন্ধ্যারানীর অভিনয় নিখুঁত। নায়কের প্রেমাভিলাষিণী এক আধুনিকার রূপসজ্জায় দীপিকা দাশের অভিনয় অনিন্দনীয়।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, নিভাননী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, মমতাজ আহমেদ, সুশীল দাশ ও চিত্রা মণ্ডল।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংগীত-পরিচালনা এ ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর রচিত আবহ-সংগীত ছবির নাট্য-মুহূর্তের ভাবরস নির্ভুলভাবে অনুসরণ করেছে। গানের সুর-রচনায়ও (বিশেষ করে লোকসংগীত ও কীর্তনাঙ্গ গান) শ্রীমুখোপাধ্যায় অনিন্দ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

গুপ্তশ্রী প্রোডাকসন্স-এর "নিশাচর" ছবির সেটে মঞ্জু দে ও শম্ভু মিত্রকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক ভূপেন রায় ফটো—দেশ

তাঁর গাওয়া "ও আমার আনচান আনচান করে রে পরান" গানটি মন-মাতানো।

অনিল গুপ্ত'র পরিচালনায় জ্যোতি লাহার চিত্রগ্রহণ ছবির শিল্প-কৌলীন্য বাড়িয়েছে। আলো-আঁধারের বিন্যাসে ছবিতে কোন কোন দৃশ্যে এই দুই কলা-কুশলী অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শব্দগ্রহণ (বাণী দত্ত) ও সম্পাদনা (রমেশ যোশী) সন্তোষজনক।

জ্যোতিতে "কিং অব কিংস্"

যীশু খৃষ্টের জীবনকাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী 'কিং অব কিংস্' (এম-জি-এম নিবেদিত) ছবিটি দর্শকদের অভিভূত রাখে। সত্তর মিলিমিটারে তোলা এই রঙীন ছবি জাঁকজমকপূর্ণ, বিস্ময়কর এর কলা-কৌশলের কাজ এবং আঙ্গিক গঠন। কিন্তু ছবিটি দর্শকের মন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তোলে এর বিস্তুবস্তুর গুণে। যীশু খৃষ্টের জন্ম, তাঁর ঈশ্বর সাধনা, ধর্মপ্রচার এবং ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তাঁর নরদেহ ত্যাগ—ইত্যাদি সব কাহিনীই ছবির চিত্রনাট্যে সংযোজিত। অলৌকিক দিব্যজীবনের এই চিত্ররূপ দর্শকের অন্তরে যেমনি ধর্মবোধ জাগ্রত করে, তেমনি তাঁর মনকে নাট্যরসে আপ্লুত করে তোলে।

জেফরি হান্টার যীশু খৃষ্টের ভূমিকায় অত্যাশ্চর্য অভিনয় করেছেন। ছবির অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রয়েছেন সিওভান ম্যাককেনা, হার্ড হ্যাটফিল্ড, রন র‍্যান্ডেল, রীটা গ্যাম, রুডিয়া ও রিজিড ব্যাজলেন। নিকোলাস রে ছবির পরিচালক।

* ছবির পর ছবি *

প্রেয়সী

সুবোধ ঘোষের বহুপঠিত কাহিনী "প্রেয়সী"র মঞ্চরূপ ইতিপূর্বে নাট্যামোদী-দের আনন্দ দিয়েছে। বর্তমানে এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী। দেবনারায়ণ গুপ্ত ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবির শুভমুহূর্ত-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবির প্রথম দৃশ্যটি গৃহীত হয়। বসন্ত চৌধুরী ছবির নায়ক-চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সংগীত-পরিচালনা করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

চোরা-বালি

মহালয়ার দিন, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গীতা পিকচার্স-এর "চোরা-বালি"র মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবির পরিচালক হলেন সুনীলরঞ্জন দাশ।

দু'টি ফুল একটি পাতা

শ্রীলেখা মুভীটোন-এর প্রথম নিবেদন "দু'টি ফুল একটি পাতা" ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিনতা রায় ও জ্যোতির্ময় রায়। শচীন অধিকারী ছবির পরিচালক। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, জহর রায়, অনু দত্ত, রেণুকা রায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, নৃপতি

চট্টোপাধ্যায় ও নবাগতা সুনীতা দত্ত ছবির মুখ্য শিল্পী। ভি বালসারা ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

এ প্রভু মহাপ্রভু

নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে মুখ্য চরিত্রে রেখে তৈরি হচ্ছে এই কৌতুকচিত্রটি। ছবিটি প্রযোজনা করছেন "তাসের ঘর" খ্যাত গোবিন্দ বর্মন (জে বি প্রোডাকশন্স)। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন গোরা ঘোষ। চিত্র-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রতন চট্টোপাধ্যায়। রাজলক্ষ্মী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিধন মুখোপাধ্যায় ছবির অন্যান্য প্রধান শিল্পী। কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

উইল ইউ ম্যারি মি

"উইল ইউ ম্যারি মি"—এই ইংরেজী নামে তৈরী হচ্ছে জর্পাজিত পিকচার্স-এর প্রথম বাংলা কমেডি ছবি। জগনাথ চক্রবর্তী ও কৌতুকাভিনেতা অজিত চট্টোপাধ্যায় ছবিটির যুগ্ম প্রযোজক। বিনয় চট্টোপাধ্যায় ছবির কাহিনীকার। চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করবেন নবগোষ্ঠী। বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর সম্ভবত ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পী হলেন জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাতীর্থ কালীঘাট

আনন্দময়ী চিত্রপীঠের প্রথম নিবেদন "মহাতীর্থ কালীঘাট"-এর শুভারম্ভ অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। ছবির জন্য ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া কয়েকটি গান ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। "[illegible]"-খ্যাত ভূপেন রায় ছবিটির পরিচালক। শঙ্করন [illegible] ও শম্পা চক্রবর্তী—এই দুই নবাগত [illegible]কে ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে। রথীন [illegible] ছবির সুরকার।

দর্শকের রায়

বাংলা ছবি ও আমি

ভুল ভেঙেছে

আমি আগে মনে করতাম, য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রীধারীরাই সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু "কাঁচের স্বর্গ" (যা রূঢ় বাস্তবের জাজ্বল্যমান আলেখ্য) আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে। আজও কত সঞ্জয় চৌধুরী অবহেলিত, লাঞ্ছিত। তাই আমি আর ভুলেও পুঁথিগত বিদ্যার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করি না।

অপর্ণা ভট্টাচার্য
আসানসোল

মানুষের পরিচয় কর্মে

মানুষের পরিচয় তার জন্মে নয়, কর্মে। "শিউলিবাড়ি" আমাকে এই সত্যের আলোয় মানুষকে বিচার করতে শিখিয়েছে।

সুচন্দ্রা রায়
কলিকাতা-১২

আমি নির্লজ্জভাবে কেঁদেছি

সিনেমার কোন করুণ দৃশ্য দেখে আমি সচরাচর কাঁদি না। মনকে প্রবোধ দিয়ে থাকি এই ভেবে যে, ওগুলো স্টুডিওতে তোলা। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" আর তপন সিংহের "কাবুলিওয়ালা" দেখে আমি নির্লজ্জভাবে কেঁদেছি। দুর্গার জন্য আনা কাপড়টা নিয়ে সর্বজয়ার নীরব কান্নার দৃশ্যটি আমার মধ্যে হঠাৎ যে আলোড়ন এনেছিল তার ধাক্কা আমি সামলাতে পারি নি। আমার দু চোখের জলধারা সেদিন কোন বাধাই মানে নি।

পি সি সেন
মাইথন

যে ছবি ভালবাসি

বাংলা চলচ্চিত্রের গতানুগতিক প্রেমোপাখ্যান আর ভাল লাগছে না। বাংলা ছবিতে অনেক এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে। কিন্তু আমাদের মত দর্শকের জন্য তা হয়নি। বাংলা দেশে চিত্রের উৎকর্ষ বাড়লেও সাধারণ দর্শকের মন ভরাতে পারে এমন ছবি কম আসছে। সুতরাং আমরা এই অনুরোধ করব যে, সাধারণ দর্শকের মুখ চেয়ে চলচ্চিত্রনির্মাতারা যেন ছবি অতিরিক্ত বক্তব্যাশ্রয়ী না করেন। চলচ্চিত্র আমাদের জন্য, আমরা তাই চাই।

—অশোক ভট্টাচার্য, ভাস্কর দেবরায়, শিলং।

আমি ভালবাসি সেই ছবি, যা বাস্তবকে দূরে রেখে অন্য জগতে বিচরণ করে না, যেখানে আমি দেখতে পাই, আমার চেনা, আমার জানা সমাজের প্রতিচ্ছবি অথবা যে ছবির মধ্যে পাই আমার অনেক ছোট ছোট জিজ্ঞাসার উত্তর।

মৃণালকান্তি ঘোষ,
সোদপুর।

বক্স অফিসের দিকে নজর না দিয়ে এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি তৈরি করা উচিত। গল্পকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ট্র্যাজেডি হলেও আপত্তি নেই। তা হলে কল্পনার আশ্রয় এবং স্টার সিস্টেমের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। তাই কাঁচের স্বর্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিন কন্যার মত ছবি ভোলবার নয়।

গোপাল ঘোষ
গোহাটি

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

রেনেসাঁস ফিল্মস-এর **ঢেউয়ের পরে ঢেউ** (পরিচালনাঃ ভূপেন্দ্র সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতা) আসন্ন সানফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে। ছবিটির ইংরেজী নামকরণ হয়েছে "ওয়েভস্ আফটার ওয়েভস্"। ভিন্নধর্মী কাহিনী সংবলিত এই ছবি দীঘার নয়নাভিরাম সমুদ্র-সৈকতে তোলা হয়েছে।

ই-আই-এম-পি-এ-এর সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ ও উক্ত সংস্থার প্রদর্শক-মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীশ্যামলাল জালান কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত **ফিল্ম কনসাল্টেটিভ কমিটির** সভ্য মনোনীত হয়েছেন।

কলকাতার ছাত্রজীবনকে কেন্দ্র করে একটি নতুন ধরনের প্রামাণিক চিত্র তৈরি করেছেন আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী। পাঁচ সপ্তাহ ধরে কলকাতায় ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করে বিদেশী কলাকুশলীর দল গত সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ফিরে গেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা হেলেন জীন রজার্স ছবিটি প্রযোজনা করছেন। ছবি তুলেছেন আমেরিকার যশস্বী টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান উইলিয়াম হার্টিগ্যান। শব্দধারণে ও আলোকচিত্রগ্রহণে এঁদের সাহায্য করেছেন দেবেশ ঘোষ ও রামানন্দ সেনগুপ্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রিধারী তাপস গঙ্গোপাধ্যায় এ ছবির নায়কের চরিত্রে অবতরণ করেন। কলকাতার নাগরিক জীবনের বিচিত্র তথ্যনিষ্ঠ রূপটি ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণও ছবির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছবিটি আমেরিকায় এ-বি-সি টেলিভিশন-এর মাধ্যমে আগামী নভেম্বর মাসে প্রচারিত হবে।

* পাদপ্রদীপের আলোয় *

মহিলা শিল্পীমহলের মহৎ প্রয়াস

বাংলা দেশের মহিলা চিত্র ও মঞ্চ-শিল্পীরা মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আজীবন অভিনয়-শিল্পের অনুশীলন করে শেষ বয়সে যে শিল্পীরা আজ আর্থিক দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন

গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে

(উপরে) অমর দত্তের পরিচালনায় "ত্রিধারা" ছবির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন যন্ত্রশিল্পিবৃন্দ (মাঝখানে) 'ত্রিধারা'র গানে কণ্ঠদান করছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (নীচে, বাঁয়ে) "নবারুণ রাগে" ছবির গানে কণ্ঠদান করছেন ইলা বসু, (ডাইনে) এই ছবির সংগীতপরিচালক ভি বালসারা কণ্ঠশিল্পী নির্মলা মিশ্রকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আলোচনা করার মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এই প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয়েছে "মহিলা শিল্পীমহল।" দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য একটি আশ্রম বা ... তৈরি করার কাজে বর্তমানে আত্ম-নিয়োগ করেছেন প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা। এই কাজে অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা আগামী ৫ই ও ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে "মিশরকুমারী" নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটকের পুরুষ চরিত্রে মহিলা শিল্পীরাই অভিনয় করবেন। শিল্পী-

বোম্বাই সমাচার

করছেন তার নাম রাখা হয়েছে "ছোটিসি মুলাকাত"। উত্তমকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন আলো সরকার। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শচীন ভৌমিক। শংকর-জয়কিষণ ছবির সুরকার।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক গুরু দত্ত যে ছবি তৈরি করছেন তার নাম রাখা হয়েছে "কনীজ"। গুরু দত্ত ও সিমি ছবির নায়ক নায়িকা। শংকর-জয়কিষণ ছবির সুরকার।

চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় বোম্বাই-এর নবগঠিত ফিল্ম প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালার নেতৃত্বে দু শো দম্পতির একটি বিরাট নৃত্যদৃশ্য দেখা যাবে ফিল্মালয়-এর ইস্টম্যান কালারে তোলা ছবি লীডার-এ। সম্প্রতি আগ্রায় তাজমহলের সামনে এই নৃত্যদৃশ্য গৃহীত হয়। রাম মুখার্জি ছবিটি পরিচালনা করছেন।

"ছেলেবেলা থেকে যখনই তাঁর সামনে গেছি, তখনই বিস্ময়ানুভব না করে পারিনি। .....তাঁর সান্নিধ্যে আত্মিক অনুভূতি জাগে। তাঁর শিষ্য আমরা। ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংগীতশিল্পীদের অন্তরে এই অনুভূতি জাগিয়ে রাখার জন্য তাঁর সঙ্গে তাঁর ছাত্র হিসাবে অংশ গ্রহণ করতে পারার জন্যে আমি সুখী।"
—রবিশংকর

গত ৭ই অক্টোবর ভারতের সংগীতগুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে খয়রাগড় সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ভারতের বহু স্থানে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়।

...দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কানন দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, মলিনা দেবী, সরযূ দেবী, যমুনা বড়ুয়া, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, বাসবী নন্দী, সুলতা চৌধুরী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, রেণুকা রায়, নমিতা সিংহ, গীতা দে, কেতকী দত্ত, জয়শ্রী সেন, দীপিকা দাশ, মিতা চট্টোপাধ্যায় শুক্লা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী, শ্যামলী চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ী, ছন্দা দেবী ও লীলাবতী।

সরযূ দেবী ও মলিনা দেবী নাটকটি পরিচালনা করবেন। সহযোগিতায় থাকবেন ...

বিশ্বজিৎ-নন্দা, বিশ্বজিৎ-আশা পারেখ ও বিশ্বজিৎ-রাজশ্রী—বোম্বাইয়ে তিনটি হিন্দী ছবির প্রধান শিল্পী-জোড়ে অভিনয় করছেন বাংলার শিল্পী বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ-নন্দাকে দেখা যাবে "ক্যায়সে কহুঁ" ছবিতে। আত্মারাম ছবিটি পরিচালনা করবেন। শচীন দেববর্মণ ছবির সংগীত পরিচালক। বিশ্বজিৎ-আশা পারেখ অবতরণ করছেন "মেরে সনম" ছবিতে। এ সপ্তাহে অমর-কুমারের পরিচালনায় ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ইস্টম্যান কালারে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। বিশ্বজিৎ-রাজশ্রী অভিনয় করবেন "শেহনাই" ছবিতে। এই রঙীন ছবির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে। এস ডি

* পাঠকের চোখে *

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

মহাশয়,

দিল্লি থেকে লেখা শ্রী ভট্টাচার্যের চিঠি পড়লাম।

তিনি লিখেছেন, দিল্লিতে বাংলা ছবির প্রদর্শনের সময় রবিবার সকাল সাড়ে ন'টা এবং তা ছবি দেখার পক্ষে অনুকূল নয়। এর উত্তরে আমি বলতে চাই যে, দিল্লিতে রবিবার ছাড়া আর কোন দিন বাংলা ছবি দেখাবার উপায় নেই। কারণ দিল্লিতে অধিকাংশ বাঙালী চাকরীজীবী এবং সপ্তাহে রবিবার ছাড়া আর কোন দিন তাঁরা ছুটি পান না। সুতরাং রবিবারটাই তাঁদের বাংলা ছবি দেখবার একমাত্র দিন। এছাড়া ভাল ভাল বাংলা ছবি রবিবার ছাড়াও অন্যান্য ছুটির দিনে দেখান হয় এবং অনেক সময় সময়েরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা" কলকাতার মত দিল্লিতেও দিনে চারটে শোতে দেখানো হয়েছিল। এ বৎসরের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছবি "ভগিনী নিবেদিতা" দিল্লিতে সন্ধ্যা ছ'টা ও রাত্রি ন'টা—এই দুই সময়ে প্রদর্শিত হয়।

তিনি লিখেছেন, প্রাতঃকালীন প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় টিকিট কিনতে গিয়ে হতাশ হতে হয়। এ-কথাটার মানে বুঝলাম না। দিল্লিতে যেদিন বাংলা ছবি প্রদর্শন হয়, তার এক সপ্তাহ আগে থেকেই ত অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়ে থাকে।

তবে সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য ভাল পরিচালকদের ছবি যদি এখানে তাড়াতাড়ি আনা যায়, তবে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প এবং দিল্লির প্রবাসী বাঙালিগণ যে লাভবান হবেন, এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত।

ইতি—

খেলার মাঠে

একলব্য

মহাপুজার মাতামাতির মধ্যে খেলাধুলোর কথা মনের উপর তেমন রেখাপাত করেনি। পুজো শেষ হয়ে গেছে, চারিদিকে খেলাধুলোও আরম্ভ হয়েছে। দুর্গোৎসবের পর এবার খেলার দুর্গোৎসব। খেলার দুর্গোৎসব কি? না, ক্রিকেট। শুধু ক্রিকেট বললে ঠিক হবে না। বলা উচিত টেস্ট ক্রিকেট। এমন উদ্যোগ-আয়োজন, এমন প্রস্তুতি, এত উৎসাহ-উদ্দীপনা আর কোন্ খেলায়? স্থায়িত্বের দিক দিয়েও টেস্ট ক্রিকেট দুর্গোৎসবের শামিল। পাঁচ-পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর মত।

কিন্তু ভারতে এবার তো টেস্ট ক্রিকেটের কোন আয়োজন নেই। প্রয়োজনের তাগিদে দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য রামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই, যিনি টেস্ট ক্রিকেটের ব্যবস্থা করে অগণিত ক্রিকেট-রসিকদের আনন্দ দিতে পারেন?

সম্ভাবনা অবশ্য দেখা গিয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট খেলার সব ব্যবস্থাও প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জয়পুরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সভায় বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেছে। সুতরাং কলকাতা তথা ভারতের ক্রিকেট-রসিকদের দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটের বদলে জোনাল ও রণজি প্রতিযোগিতার খেলা দেখেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পাকিস্তান দল এবার ভারত সফর করবে, এ ব্যবস্থা অনেকদিন আগে থেকে ঠিক থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভায় এ ভ্রমণ-ব্যবস্থা বাতিল করবার কারণ, দু' পক্ষেরই অসুবিধা। অবশ্য জয়পুরে কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সভায় পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী মহম্মদ হোসেন স্বয়ং উপস্থিত থেকে বলেছেন, 'রমজানের' জন্যে ভারতীয় দলকে নাকি দু' ভাগে ভাগ হয়ে পাকিস্তান সফর করতে হবে। সেটা বড়ই অসুবিধা। তাই দু' পক্ষই সফর-ব্যবস্থাকে আপাতত ধামাচাপা দিয়েছেন। কিন্তু রমজানই কি আসল কারণ?

পাকিস্তান অতীত-ভারতের অংশ-বিশেষ। এবং ভারতের দুই প্রান্তে পাকিস্তানের দুই অংশ। সুতরাং রমজানের জন্যে সফরের অসুবিধার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আসল কথা, পাকিস্তানের আভ্যন্তরিক রাজনীতি ক্রিকেটের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলার উপযোগী ত নয়ই। ঠাণ্ডা লড়াই লেগেই আছে। বোধ করি, তার উত্তাপও একটু বেড়েছে।

তা ছাড়া, ইংলণ্ড সফরে পাকিস্তানের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং ১৯৬০-৬১ সালে ভারত সফরের অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে পাকিস্তান কর্মকর্তাদের সফর সম্পর্কীয় হিসাবনিকাশ কষতে হয়েছে। ১৯৬২ সালের ইংলণ্ড সফরে পাকিস্তানের দুর্বলতা বিশেষভাবেই প্রকট হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলা তারা হয়তো যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।

ভারতের সম্মুখেও ছিল একই সমস্যা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দলের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট-যুদ্ধে লড়াই করা অনেকেই অযৌক্তিক বলে মনে করেছেন। তা ছাড়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর মাথায় যে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন, সেই আঘাতের ধাক্কা এখনো সামলিয়ে উঠতে পারেননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজেই তাঁর মাথায় দু'বার অপারেশন করা হয়েছিল। সম্প্রতি ভারতে আর-একবার অপারেশন করতে হয়েছে। দলের সহ-অধিনায়ক পাতৌদির তরুণ নবাব গিয়েছেন ইংলণ্ডে আবার পড়াশুনো আরম্ভ করতে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় পলি উমরিগর টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন। মঞ্জরেকারেরও খেলার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং শক্তিশালী করে দল গড়া বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তবুও হয়তো তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি দল খাড়া করা যেত, কিন্তু সে দল নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট-যুদ্ধে নামা যুক্তিসংগত হত কিনা সন্দেহ।

অস্ট্রেলিয়া-সফরকারী ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার

এর চেয়েও বড় কারণ রয়েছে। বহু অর্থের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে চারজন ফাস্ট বোলারকে ভারতে আনা হচ্ছে ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পটু করে তোলবার উদ্দেশ্যে। ফাস্ট বলের বিরুদ্ধেই ভারতের দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী। গত মরসুমে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত রাবার পেয়েছে, তার মূলে

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো

ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিশ্চয়ই কৃতিত্ব আছে। কিন্তু ইংলণ্ড টীমে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার না থাকায় ভারতের রাবার লাভ কিছুটা সহজ হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এত ভাল খেলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে শোচনীয় ব্যর্থতার এটাই প্রধান কারণ। তাই ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অভ্যস্ত করার প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু যাঁরা অভ্যস্ত হবেন, যাঁদের মধ্যে ক্রিকেটের সম্ভাবনা নিহিত, তাঁরাই যদি পাকিস্তান সফর করতে চলে যান, তবে এত পয়সা খরচ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে চারজন ফাস্ট বোলার আনার সার্থকতা কি?

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সভার আগেই কয়েকজন ক্রিকেট হিতৈষীর মাথায় কথাটা এসেছিল। কয়েকজন সদস্য পাকিস্তান সফর বাতিল করবার জন্যও প্রস্তাব পেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান বোর্ডের সম্পাদক মহম্মদ হোসেনই সব কিছুর ফয়সালা করে দিয়েছেন। প্রস্তাবে অবশ্য বলা হয়েছে, পাকিস্তান সফর-ব্যবস্থা স্থগিত

রাখা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ স্থগিত সফর নাকচেরই নামান্তর।

* * *

এবার ভারতের মাটিতে বা ভারতের সঙ্গে অন্য কোন দেশের টেস্ট খেলার ব্যবস্থা না থাকায় টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে আমাদের সমস্ত দৃষ্টি থাকবে অস্ট্রেলিয়ার দিকে। শুধু আমাদের কেন, সারা ক্রিকেট বিশ্বের আগ্রহ-ভরা দৃষ্টিই আজ অস্ট্রেলিয়ার দিকে। কারণ, সেখানে ক্রিকেট মাঠে বাঘ-সিংহের লড়াই। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা।

ইংলন্ড দল ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ায় পেণছে সফর আরম্ভ করেছে। ইংলণ্ডের পক্ষে এবার যাঁরা সফরে গিয়েছেন, আগে তাঁদের নাম ও টেস্ট খেলার তারিখগুলো জানিয়ে দিই। পরে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা যাবে।

(১) টেড ডেক্সটার—অধিনায়ক (সাসেক্স)
(২) কলিন কাউড্রে—সহ-অধিনায়ক (কেণ্ট)
(৩) ডেভিড শেফার্ড (সাসেক্স)
(৪) ডেভিড এলেন (গ্লস্টার্স)
(৫) কেন ব্যারিংটন (সারে)
(৬) লেন কোল্ডওয়েল (উরস্টার)
(৭) টম গ্রেভনী (উরস্টার)
(৮) রে ইলিংওয়ার্থ (ইয়র্কশায়ার)
(৯) ফ্রেডি ট্রুম্যান (ইয়র্কশায়ার)
(১০) ব্যারী নাইট (এসেক্স)
(১১) ডেভিড লার্টার (নর্দাম্পটনশায়ার)
(১২) জন মারে (মিডলসেক্স)

(১৩) পিটার পারফিট (মিডলসেক্স)
(১৪) ফ্রেড টিটমাস (মিডলসেক্স)
(১৫) জিওফ পুলার (ল্যাংকাশায়ার)
(১৬) ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ল্যাংকাশায়ার)
(১৭) অ্যালান স্মিথ (ওয়ারউইকশায়ার)

টেস্ট খেলার তারিখ—

প্রথম টেস্ট—ব্রিসবেন
(৩০শে নভেম্বর—৫ই ডিসেম্বর)
দ্বিতীয় টেস্ট—মেলবোর্ন
(২৯শে ডিসেম্বর—৩রা জানুয়ারী)
তৃতীয় টেস্ট—সিডনী
(১১ই জানুয়ারী—১৬ই জানুয়ারী)
চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড
(২৫শে জানুয়ারী—৩০শে জানুয়ারী)
পঞ্চম টেস্ট—সিডনী
(১৫ই ফেব্রুয়ারী—২০শে ফেব্রুয়ারী)

১৮৭৬-৭৭ সাল থেকে আরম্ভ করে দুই দেশের মধ্যে টেস্ট খেলা প্রবর্তনের পর অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড দলের এটি ২৯তম সফর। আগের ২৩টি সফরের মাত্র ৮বার ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ায় রাবার পেয়েছে। রাবার জয়ী অধিনায়ক হচ্ছেন এ শ্রসবেরী (১৮৮৪৮৬-৮৭), ডব্লিউ ডব্লিউ রিড (১৮৮৮), এ ই স্টডার্ট (১৮৯৪-৯৫), পি এফ ওয়ার্নার (১৯০৩-৪), জে ডব্লিউ এইচ টি ডগলাস (১৯১১-১২), এ পি এফ চ্যাপম্যান (১৯২৮-২৯) ডি আর জার্ডিন (১৯৩২-৩৩) ও লেন হাটন (১৯৫৪-৫৫)।

দুই দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত টেস্ট খেলা হয়েছে ১৮৩টি। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ৭৬টি এবং ইংলণ্ড ৬৩টি টেস্টে বিজয়ী হয়েছে। ৪৪টি টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে।

দুই দেশের টেস্ট-যুদ্ধের সম্মান বা 'অ্যাশেস' এখন অস্ট্রেলিয়ার দখলে। ১৯৫৮-৫৯ সালে পিটার মে যখন শেষবার ইংলণ্ড দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন, তখনই 'অ্যাশেস' তাঁদের হস্তচ্যুত হয়। ১৯৬১ সালে রিচি বেনো ইংলণ্ড সফরে গিয়েও বিজয়ী হয়ে আসেন। সুতরাং অ্যাশেস পুনরুদ্ধারের জন্য ইংলণ্ড যে এবার বিশেষভাবে চেষ্টা করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রতিবারের মত এবারও দেশ-বিদেশের ক্রিকেট পণ্ডিতরা টেস্টের ফলাফল নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। কেউ বলছেন, জেতার সম্ভাবনা দুই দলের সমান সমান। কেউ বলছেন, ইংলণ্ডের পাল্লা ভারী. কেউ বলছেন, ফিল্ডিং-এর উপর অনেক কিছু নির্ভরশীল।

ব্যাটিং-এর দিক দিয়ে ইংলণ্ড এবার সত্যিই শক্তিশালী। ডেক্সটার, কাউড্রে, শেফার্ড, ব্যারিংটন, পারফিট, পুলার—সবাই উঁচুদরের ব্যাটসম্যান। প্রচুর রান আছে এঁদের ব্যাটে। কিন্তু ব্যাটিং-শক্তির তুলনায় বোলিং ও ফিল্ডিং সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিজেদের দেশের মাটিতে শক্তিহীন পাকিস্তান দলের সঙ্গে খেলার সময়ই সে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরাও অনেক সময় ট্রুম্যান-স্ট্যাথামের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ব্যাট চালিয়েছেন, ফিল্ডিং-এও ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের ভুলচুক সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। অধিনায়ক ডেক্সটারের অবশ্য আশা আছে—এইসব ত্রুটি অনেকখানি শুধরে গেছে এবং অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর টীম চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটেরই পরিচয় দেবে।

এদিকে অস্ট্রেলিয়াও নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে আস্থাবান। ব্যাটিং এবং বোলিং কোন দিক দিয়েই অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের চেয়ে খাটো নয়। তা ছাড়া, নিজেদের মাটিতে খেলার তাদের বড় সুযোগ। তার চেয়েও বড় কথা, অস্ট্রেলিয়া দলের যিনি নেতৃত্ব করছেন, তিনি ক্রিকেট-বিশ্বের পরম বিজ্ঞ অধিনায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মোটের উপর, এবারকার অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে যে সমানে সমানে লড়াই হবে, তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খেলাও আকর্ষণীয় হবার সম্ভাবনা। কারণ, ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যে প্রাণবন্ত এবং চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলা দেখিয়ে গেছে, তারপর কোন আত্মরক্ষামূলক মন্থর ক্রিকেট খেলা অস্ট্রেলিয়ায় জমতে পারে না। অন্তত দর্শকরা সে খেলাকে স্বীকার করে নেবেন না।

* * *

দিল্লি ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা সমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছেছে। বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলাও আরম্ভ হয়ে গেছে। রোভার্সের পর ডুরাণ্ড। তারপর ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় ফুটবলের আসর।

কিন্তু জাতীয় ফুটবলের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে দুই পক্ষের মধ্যে মামলা আরম্ভ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোরেই জাতীয় ফুটবলের আসর বসবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

যাই হোক, ইতিমধ্যে বার্নপুরে জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবং প্রথমবারের প্রতিযোগিতায় বাংলা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে ভারতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে।

প্রথমবারের জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে মোট ১৩টি দল যোগদানের অভিপ্রায় জানালেও গুজরাট, পাঞ্জাব এবং মহীশুর শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেনি। ফলে ১০টি দল নিয়ে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। এই দশটি দলের মধ্যে বাংলার ছিল পর্যাপ্ত প্রাধান্য। বাংলার খেলার সঙ্গে অন্য কোন দলের তুলনাই চলে না। বাংলার খেলা বাদ দিয়ে বাকি খেলাগুলিতে যেখানে মোট ২০টি গোল হয়েছে, সেখানে তিনটি খেলায় বাংলা একাই করেছে—২৪টি গোল। তবে সেমি-ফাইন্যালে মাদ্রাজ ২৬ মিনিটের বেশী বাংলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ২৬ মিনিটের মধ্যেই পাঁচটি গোল হয়। পুরো সময় খেলা হলে গোলসংখ্যা অনায়াসেই দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ হতে পারত। ফাইন্যাল খেলার দিন বৃষ্টি না হলে আরও বেশী গোলে বাংলার জেতার সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক, পারস্পরিক যোগাযোগ, ক্রীড়াদক্ষতা এবং নৈপুণ্যে সব দিক দিয়েই বাংলার খেলার কাছে আর সব দলের খেলা ম্লান হয়ে গেছে।

এখন কথা হচ্ছে, স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ের নানা ধরনের সব ভারতীয় প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের আয়োজন কেন? ধরে নেওয়া যেতে পারে, ভাবীকালের দিকে নজর রেখে আর সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতার উপযোগী করে প্রস্তুত করবার সংকল্প নিয়ে এই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। অস্বীকার করছি না এর মধ্যে গঠনমূলক মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। আবার এ কথাও অনস্বীকার্য যে, বেশী প্রতিযোগিতার আয়োজনে আন্তরিকতা-হানির আশঙ্কা।

বার্নপুরে ভালভাবেই তার পরিচয় মিলেছে। প্রথমত, সব রাজ্য এতে অংশ গ্রহণ

করেনি। দ্বিতীয়ত, যারা অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যেও তিনটি রাজ্য অনুপস্থিত ছিল। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, সতেরো দিন ধরে বার্নপুরে প্রতিযোগিতা চলল অথচ ভারতীয় ফুটবলের নেতৃস্থানীয় কারও দেখা পাওয়া গেল না। ছেলেরা কেমন খেলল, কতটুকু সম্ভাবনার স্বাক্ষর রাখল, ছেলের নামে বুড়োরা খেলল কিনা, যাদের উপর প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল, তারাই বা কিভাবে দায়িত্ব পালন করল, তা দেখতে কেউই এগিয়ে এলেন না। খেলা হবে এই ফতোয়া জারি করলেই যেন তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের আচরণে স্পষ্টই প্রমাণ হয়েছে, জুনিয়র জাতীয় ফুটবলকে তাঁরা একটি অপ্রধান প্রতিযোগিতা বলে ধরে নিয়েছেন। প্রথম বছরেই কর্তৃপক্ষের যদি এই গাফিলতি হয়, তবে ভবিষ্যতে কি হবে সহজেই অনুমেয়।

প্রথম বছরের প্রতিযোগিতা হিসাবে

ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠান-অঙ্গনে উপস্থিত থাকবার প্রয়োজন তো ছিলই, এর সঙ্গে আরও একটি কারণও যোগ করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কারের সঙ্গে সদ্য পরলোকগত পুরুষ-সিংহ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম জড়িত। সুতরাং ডাঃ বি সি রায় স্মৃতি কাপের খেলায় উপস্থিত থাকার একটা নৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। বিশেষ করে, খেলার আয়োজন যখন বাংলায়, বাংলার জননায়কের নামে পুরস্কার আর ফেডারেশনের সভাপতির আসনে যখন একজন বাঙালী।

যাই হোক, মাত্র একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া প্রথম বছরের জুনিয়র জাতীয় ফুটবল যে ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে—এটা সুখের কথা। অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বাংলা ও মাদ্রাজের সেমি-ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে। বোম্বাইয়ের প্রথম শ্রেণীর রেফারী নটরাজন খেলার পরিচালক ছিলেন। অবৈধভাবে ফাউল করার জন্য রেফারী মাদ্রাজের একজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বার করে দেন। এর পর ২৬ মিনিটের সময় মাদ্রাজের গোটা দলই মাঠ ছেড়ে চলে যায়। দলের ম্যানেজার অবশ্য বুঝিয়ে-সুজিয়ে আবার ছেলেদের মাঠে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু রেফারী নটরাজন আর খেলা চালাতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, অবাধ্যতা এবং বেআইনী কাজকর্মের সঙ্গে আপসরফার কথা উঠতে পারে না।

মাদ্রাজের অপরিণতবয়স্ক ছেলেরা প্রতিযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি। ফলে তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখা গেছে। এ ঘটনা ভবিষ্যতে অন্যান্য দলকে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার প্রেরণা যোগাবে, উদ্যোক্তাদেরও সতর্ক হতে সাহায্য করবে। নীচে সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল :—

প্রথম রাউণ্ড

মাদ্রাজ (২)	:	রাজস্থান (০)
উড়িষ্যা (৩)	:	সার্ভিসেস (১)
কেরালা (ওঃ ওঃ)	:	গুজরাট (স্ক্র্যাচ)
মধ্যপ্রদেশ (ওঃ ওঃ)	:	পাঞ্জাব (স্ক্র্যাচ)
আসাম (ওঃ ওঃ)	:	মহীশূর (স্ক্র্যাচ)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

বাংলা (১৪)	:	কেরালা (০)
মাদ্রাজ (১)	:	মহারাষ্ট্র (০)
মধ্যপ্রদেশ (২)	:	আসাম (০)
উড়িষ্যা (১) (২)	:	অন্ধ্র (১) (১)

সেমি ফাইন্যাল

বাংলা (৫)	:	মাদ্রাজ (০)
উড়িষ্যা (৪)	:	মধ্যপ্রদেশ (২)

ফাইন্যাল

বাংলা (৫)	:	উড়িষ্যা (০)

* * *

জাতীয় স্কুল গেমসের শরৎকালীন খেলাধুলার অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি ইম্ফলে শেষ হয়ে গেছে। বাংলার স্কুল দল এই প্রতিযোগিতার তিনটি বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেছিল—ফুটবল, সাঁতার আর টেবিল টেনিস। এর মধ্যে তিনটি বিষয়েই বাংলা দল বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। ফুটবল ফাইন্যালে বাংলা দল পরাজিত করেছে মণিপুরকে। সাঁতারের ছাত্র ও ছাত্রী উভয় বিভাগেই বাংলার একচ্ছত্র প্রাধান্যের পরিচয় মিলেছে। সাঁতারের এক-আধটি বিষয় ছাড়া প্রায় সব বিষয়েরই প্রথম পুরস্কার এসেছে বাংলার ঘরে। টেবল টেনিসের ফাইন্যালে বাংলার ছেলেদের কাছে দিল্লিকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু মেয়েদের টেবল টেনিসে বাংলা বিজয়ী হতে পারেনি।

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বাঙলা দল

সাঁতারে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আজমীরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অধিকাংশ বিষয়ের প্রথম পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, সাঁতারে আমাদের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। কলকাতার কথা বলি। কলকাতায় প্রতি বছরই নূতন নূতন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বড় প্রতিযোগিতায় যোগদানের সময় যোগ্যতাসূচক মানে কেউই পৌঁছতে পারে না। এবারও এসিয়ান গেমসের ট্রায়ালে একজন সাঁতারুও যোগ্যতাসূচক মানে পৌঁছুতে পারেননি। ফলে এসিয়ান গেমসে ভারত থেকে কোন সাঁতারুকে পাঠানো সম্ভব হয়নি।

অথচ সাঁতারে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ কম নয়। শুধু উন্নতির ক্ষেত্রেই অন্তরায়। এর কারণ কি? কারণ শিক্ষার অভাব, সুইমিং পুলের অভাব। একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছবার পর যে বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞ ছাড়া সেটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। সাঁতারে উন্নতি করতে হলে এ কথা মনে রেখেই ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে গড়ে তুলতে হবে নতুন নতুন সুইমিং পুল।

* * *

মিডলসেক্সের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় "প্যাটসী" হেনড্রেন ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ৭৩ বছরে মৃত্যুকে অবশ্য অপরিণত বয়সের মৃত্যু বলা যায় না। তবু যাদের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরে উপকথায় পরিণত হয় তাদের মৃত্যু চিরদিনই শোকাবহ।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম হেনড্রেন সবসুদ্ধ ৫০টি টেস্টে খেলেছেন এবং ইংলণ্ড দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেছেন। টেস্টের ৮৩টি ইনিংসে তাঁর রানের সংখ্যা ৩৫২৫। ১৯৩০ সালে পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর ২০৫ রান টেস্ট খেলার বড় ইনিংস। উপর্যুপরি তিনটি সেঞ্চুরী এবং তিন শ রান করাও হেনড্রেনের কৃতিত্বের স্বাক্ষর। তবে রান করার চেয়েও রান করার ভঙ্গিতে হেনড্রেনের নাম ছিল বেশী।

স্কুলের ছাত্র অবস্থায় বোলার হিসাবে হেনড্রেনের নাম ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু ১৭ বছর বয়সে মিডলসেক্সে যোগ দেবার পর ব্যাটসম্যান হিসাবেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রতি মরসুমে তাঁর হাজার রান পূর্ণ হয়। সমসাময়িককালের খেলোয়াড়দের মধ্যে জ্যাক হবস ও মিডের পরই "অ্যাভারেজে" হেনড্রেনের স্থান ছিল।

যদিও হেনড্রেন কোনদিন ভারতের মাটিতে ক্রিকেট খেলেননি, তবু ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর লেখা বই ক্রিকেট মিউজিংসই তার প্রমাণ। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত এই বইয়ে তিনি মার্চেন্ট, মানকড় ও অমরনাথের ক্রীড়াদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। ভারত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে দেশ থেকে তিনজন খেলোয়াড় বিশ্ব ক্রিকেট দলে স্থান পেতে পারে সে দেশের ক্রিকেট প্রতিভা অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কি করা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও হেনড্রেনের সহানুভূতিসূচক আলোচনা ভারত-প্রীতির পরিচয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৭ই অক্টোবর—চীন-ভারত সীমান্তের পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় এলাকায় চীনাদের সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশের অবসান না ঘটা পর্যন্ত ভারত চীনের সহিত কোন প্রকার আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে না।

কেরল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার দুইজন প্রজা-সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী শ্রী কে চন্দ্রশেখরন ও শ্রী ডি দামোদরন পট্টি আজ সন্ধ্যায় মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্করের নিকট তাঁহাদের পদত্যাগপত্র পেশ করেন। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের জাতীয় কার্য-নির্বাহক পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহারা পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন।

৮ই অক্টোবর—শিয়ালদহ স্টেশন এলাকা হইতে বিগত কয়ে দিনে ৮।৯টি উদ্বাস্তু তরুণী উধাও হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, একদল সমাজ-বিরোধী লোক উদ্বাস্তুদের মধ্যে পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে। উহাদেরই যোগসাজশে ঐ সকল তরুণীকে পাচার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গভীর রাত্রে সংবাদ পাওয়া গেল বহুবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে একটি আসবাবপত্রের দোকানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে যান এবং এই সংবাদ প্রেসে যাওয়ার পূর্বে সংবাদ পাওয়া গেল যে, আগুন এখনও জ্বলিতেছে।

১০ই অক্টোবর—কেরল বিধানসভা আজ বিরোধী কম্যুনিস্ট দলের ডেপুটি লীডার শ্রীঅচ্যুত মেননকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। আগামীকল্য এই প্রস্তাবের উপর বিতর্ক হইবে। বিধানসভায় উপস্থিত কম্যুনিস্ট সদস্যগণ ছাড়া একমাত্র পি এস পি সদস্য মিঃ ব্যাবী জন কর্তৃক প্রস্তাবটি সমর্থিত হইয়াছে।

অদ্য রাত্রিতে এক ত্রি-পাক্ষিক বৈঠকে বেলুড়ের ন্যাশনাল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে আপস মীমাংসা হয়। কর্মচারীরা ট্রাইব্যুনালের রায় সাপেক্ষে বোনাসের বদলে দেড় মাসের বেতন অগ্রিম পাইবেন। ১৫ই অক্টোবর হইতে কার-খানা চালু হইবে। কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

১১ই অক্টোবর—মুনাফা নিরোধ আইনবলে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের ১৬ জন প্রধান মাছের আড়তদারদের উপর নোটিস জারি করিয়া-ছেন। এই নোটিসে সরকার আড়তদারদের কাছে মাছ আমদানির সূত্র, ক্রয়মূল্য এবং যানবাহনের খরচ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন।

শ্রী আর শঙ্করের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট দল কেরল বিধানসভায় যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন, আজ ৭৮—২৯ ভোটে তাহা বাতিল হইয়া যায়। এগারজন সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম লীগ গোষ্ঠী নিরপেক্ষ থাকেন।

১২ই অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ অপরাহ্নে সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে পালাম বিমান বন্দরে ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় সেনা বাহিনীকে ভারতভূমির নেফা এলাকা হইতে চীনা হানাদারদের হঠাইবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকার অনেকগুলি পণ্যকে সর্ব-প্রকার রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ জারি করিয়া-ছেন বলিয়া আজ নয়াদিল্লিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এই নূতন রপ্তানি আদেশ ১০ই অক্টোবর হইতে বলবৎ হইয়াছে।

১৩ই অক্টোবর—বহির্বিষয়ক দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন, গত ১২ দিন ধরিয়া ত্রিপুরায় ভারত-পাক সীমান্তে পাকিস্তানের দিক হইতে পাক সৈন্যরা মধ্যে মধ্যে গোলাগুলী বর্ষণ করিতেছে। পাক সৈন্যরা মর্টার, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও অন্যান্য প্রকার হালকা অস্ত্র ব্যবহার করিতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় ২৬ হাজার কর্মচারী পূজা বোনাসের দাবিতে আগামী ১লা নবেম্বর হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

১৪ই অক্টোবর—নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যায় যে, বোম্বাইয়ের মাজগাও ডক ও কলিকাতার গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপে বড় ধরনের রণতরী নির্মাণ করিবেন বলিয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্থির করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের বলরুমে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত বিশিষ্ট জনমণ্ডলী বিদেশী শাসন এবং এবং অর্থনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনায় হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বলিষ্ঠ সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানান।

বিদেশী সংবাদ

৭ই অক্টোবর—মুসলীম লীগের পূর্বতন প্রেসিডেণ্ট খান আবদুল কোয়ায়ুম খানকে গতকল্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং এক আদেশ জারি করিয়া সরকার তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তিনি ছয় মাসকাল প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করিতে পারিবেন না।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডিন রাস্ক ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আন্দ্রে গ্রোমিকো সাড়ে চার ঘণ্টা ধরিয়া বার্লিন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রকার মীমাংসায় পৌঁছাইতে পারেন নাই।

৮ই অক্টোবর—'আল আহ রাম' সংবাদপত্রের সংবাদ অনুযায়ী সৌদি আরবের রাজা সৌদ এবং জর্ডানের রাজা হোসেনের প্রতি অনুগত বেদুইন সৈন্যবাহিনীকে প্রজাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে প্রেরণের পূর্বে সৌদি-ইয়েমেন সীমান্তে সমাবেশ করা হইতেছে।

জাতীয় গণতন্ত্র ফ্রণ্টের নেতা মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী গতকাল ঢাকায় বলেন যে, একজনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিবার পরিবর্তে জনগণের উপর প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হউক, ইহাই বর্তমানে তাঁহার ও তাঁহার সমর্থকদের দাবি।

১০ই অক্টোবর—পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হবিবুল্লা খাঁ পাকিস্তানের রাজনীতিকদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, গত জুলাই মাসে জাতীয় পরিষদে গৃহীত রাজনৈতিক দল সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করিলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে।

'নিউ চায়না সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এক সংবাদে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যগণ আজ দক্ষিণ তিব্বতের চীনা সীমান্তরক্ষীদের উপর আক্রমণ করিয়া এগার-জনকে হতাহত করিয়াছে। চিহ্ তুং-এর নিকটে চীনা সীমান্তরক্ষীরা পাল্টা আঘাত করিতে বাধ্য হয়। চীনের খবরে প্রকাশ আজ সকাল ৯-২০ মিনিটে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধ এখনও চলিতেছে।

১১ই অক্টোবর—আজ সকালে ইয়েমেনের রাজধানী সানা হইতে মিডল ইস্ট নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছে যে, ইয়েমেনের নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—ইয়েমেন সৌদি আরবের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কঙ্গোলিজ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজাস্টিন বাম্বাকো আজ বলেন যে, কঙ্গোর প্রাক্তন সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅ্যাণ্টোয়েনে গিজেঙ্গা ও দক্ষিণ কাসাইয়ের নেতা শ্রীআগস্ট কালোঞ্জীকে শীঘ্রই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

১২ই অক্টোবর—নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা আজ এই অভিযোগ করে যে, গতকাল একখানি ভারতীয় বিমান এক ঘণ্টাকাল তিব্বতের অভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। অতঃপর বিমানটি চীন এলাকার ২৫ কিলো-মিটার অভ্যন্তরে পাংগাং পর্বত ও পাংগাং হ্রদের উপর দিয়া উড়িয়া যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের চিলমারি (রংপুর জেলায়) চেকপোস্টে ভারতীয় মালবাহী ১২ খানি স্টীমার ও গাধাবোট কয়েকদিন যাবৎ আটক হইয়া আছে এই জলযানগুলি আসাম হইতে কয়েক লক্ষ টাকার মাল লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল। এগুলির মাঝিমাল্লারা সবই পাকিস্তানের নাগরিক।

১৩ই অক্টোবর—সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পূর্ব জার্মানীর সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। এ ধরনের একটি চুক্তি অপরিহার্য।

১৪ই অক্টোবর—গ্যাংটকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, তিব্বতের রাজধানী লাসা দ্রুত একটি সামরিক ছাউনিতে পরিণত হইতেছে। চীনারা তথায় কয়েকটি সামরিক ব্যারাক তৈয়ারী করিয়াছে এবং সেনা বিভাগের অফিসের জন্য কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী বাড়ি দখল করিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।

মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 27th October 1962.

২৯ বর্ষ ॥ ৫১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

দেশরক্ষার দায়িত্ব

পনের বৎসরের মধ্যে স্বাধীন ভারত এর চেয়ে বৃহত্তর, কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নি। কাশ্মীরে পাকিস্তানী অভিযান কিম্বা ভারতের পশ্চিম উপ-কূলে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের শত্রুতাচরণ উত্তর সীমান্তে চৈনিক আক্রমণের তুলনায় আলপিনের খোঁচা মাত্র। পাকিস্তান অথবা পর্তুগাল আর যাই হোক ভারতের সঙ্গে কপট বন্ধুত্বের অভিনয় করে নি, কাজেই তাদের শত্রুতা এবং ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা কী-পরিমাণ ও কতদূর যেতে পারে সে-বিষয়ে গোড়া থেকেই ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে সজাগ থাকতে পেরেছে। কম্যুনিস্ট চীনের ভারতবিরোধী ভূমিকার পশ্চাৎপট সেদিক দিয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম। ছলনা ও প্রতারণার সাহায্যে চীন প্রথমে হিমালয় সীমান্ত পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তৃত করেছে। একথা এখন বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ শান্তির আশায় সরল বিশ্বাসে পিকিং-এর ধূর্তচূড়ামণিদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের রাষ্ট্র-নেতারা প্রতারিত হয়েছেন, তিব্বতের উপর চীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার ফলেই ভারতের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়েছে, এ-সবই সত্য কথা, কিন্তু এ-সব নিয়ে ক্ষোভ এবং আক্ষেপ প্রকাশ এখন একেবারেই নিরর্থক। দেশ বিপন্ন, প্রতিবেশী শত্রু তার কপট বন্ধুত্বের মুখোশ খসিয়ে এখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। এখন আর দ্বিধা নয়, অনুশোচনা নয়, কী হতে পারত বা হয়নি তা নিয়ে অতীত ভুলত্রুটির বৈঠকী বিচার-বিতর্ক নয়। এখন চাই সম্মুখ সমরে চৈনিক অভিযান বিপর্যস্ত করার জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি: চাই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রত্যেকটি দেশভক্ত নাগরিকের প্রস্তর-কঠিন প্রতিজ্ঞা, বৈদেশিক শত্রুকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের মহান কর্তব্য সম্পাদনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাসব্যসন কোন কিছু ত্যাগস্বীকারে আমরা পশ্চাৎপদ হব না।

স্বাধীন ভারতের নাগরিকবৃন্দের **দেশপ্রেমের কঠিনতম পরীক্ষা এই** সবেমাত্র শুরু। সম্মুখ সংগ্রামে উত্থান পতন ছাড়া যুদ্ধে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত ফলাফল একদিনে, এক সপ্তাহে কিম্বা এক মাসে নির্ধারিত হতে পারে না। চীনারা বহুদিন ধরে আয়োজন করেছে ভারতের বিরুদ্ধে বড়রকমের যুদ্ধের জন্য। তিব্বত দখল করার অনেক আগেই তারা কাশ্মীরে লাদক অঞ্চলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সামরিক ঘাটি নির্মাণে তৎপরতা দেখিয়েছে: সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে দ্রুত সৈন্য চলাচলের উপযোগী পথঘাট তৈরীর কাজও চীনারা অবহেলা করেনি। নেফা, ভুটান এবং সিকিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চীনা সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করা আরও সহজ হয়েছে তিব্বত অধিকৃত হওয়ার ফলে। ভারত-বর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে হিমালয় সীমান্তের এইসব অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-নেতারাও প্রথমদিকে হিমালয় সীমান্ত রক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে বিশেষ উদ্যোগী হন নি, নির্ভর করেছেন কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল চুক্তির উপর। চীনারা তিব্বত আক্রমণ করে দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করার পরই উত্তর সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পথঘাট নির্মাণ, ঘাটি স্থাপন, এবং নিয়মিত সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষার কাজ কিছু পরিমাণ অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু চৈনিক সামরিক অভিযানের বিপুল আয়োজন দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, আমাদের সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর জোয়ানদের শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধির আরও **দ্রুত এবং বিস্তৃত ব্যবস্থা করা অবিলম্বে অবশ্য প্রয়োজন।**

চৈনিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ভারত সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। তবে সুদুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তীর্ণ সীমান্ত জুড়ে আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রবল প্রতিপক্ষ যেভাবে প্রস্তুত হয়েছে আমাদের সামরিক প্রস্তুতি তার চাইতেও শক্তিশালী হওয়া দরকার। ধূর্ত চীন সরকার গত কয় বৎসরে সমগ্র হিমালয় সীমান্ত জুড়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র-বিমান-সজ্জিত সৈন্যবাহিনী সমাবেশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে পেরেছে। চীনা সৈন্যরা সেজন্য এখন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলেও অনায়াসে চলাচল এবং সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষায় সক্ষম। সম্মুখ সমরে বীরত্ব প্রদর্শনে আমাদের সীমান্তরক্ষী জোয়ানরা অবশ্য তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। তবে আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যের উপর নির্ভর করে না। রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ক্ষমতা প্রয়োজন: অগ্রবর্তী ঘাটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, মূল কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র বিমান সরবরাহ এবং চলাচলের ব্যবস্থাও সুবিস্তৃত ও নিখুঁত হওয়া চাই। এ-সব ব্যাপারে আমাদের দিকে এখনও কিছু করণীয় আছে। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ রক্ষার এবং দ্রুত সাহায্যদানের আয়োজন আরও স্বচ্ছন্দ এবং ঘনসন্নিবিষ্ট করা খুবই জরুরী প্রয়োজন।

কম্যুনিস্ট চীন রীতিমত স্পষ্ট ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ। ভারতের সামগ্রিক প্রস্তুতি সম্পর্কেও এখন আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংশয়ের প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। শান্তি বা আপস-নিষ্পত্তির কথা এখনও যাঁরা বলছেন, তাঁরা কখনই স্বাধীন ভারতের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনকে কিছুমাত্র মূল্য দেন না। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির চীন-পন্থীরা তো স্বদেশ রক্ষার আবেদনকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বিজাতীয় আনুগত্য জাহির করায় একটুও লজ্জিত নয়। জনযুদ্ধের ধুয়া ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিতালির বেলায় যেমন তেমনি চৈনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তিতেও কম্যুনিস্টদের দেশদ্রোহী স্বরূপ যথারীতি প্রকাশিত। চৈনিক অভিযান প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর সমবেত উদ্যোগ যাতে কোনমতে ব্যাহত, বিপর্যস্ত না হতে পারে সেজন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির সবরকম অপচেষ্টা নিরোধে **জনমত গঠন করা প্রয়োজন।**

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লালকেল্লা' ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের প্রস্তাবে শ্যাম ও কুল দুইই রক্ষা করেছেন।

ভারতের দাবি

চীনের দাবি

তাঁরা চীনা ভোজবাজিতে হাত পাকিয়েছেন।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে।

বড়দার পক্ষে সবই সম্ভব।

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার

ভারতীয় বাঘের শেষ পর্যন্ত ঘুম ভেঙেছে।

মাও ভেবেছিলেন ওটা নকল বাঘ।

Kutty

বৈদেশিকী

শান্তি, "শান্তিকামী" ইত্যাদি শব্দ এখন প্রায় অব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। "ফ্রীডম্", 'ফ্রী-ওয়ার্লড", "লিবারেশন" প্রভৃতি শব্দের অবস্থাও তথৈবচ। রাজনীতিকরা এই সব শব্দ এমন করে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন ও করছেন যে এগুলোর অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে অথবা এগুলোর এমন সব নূতন অর্থ দাঁড়িয়েছে যা এ সব শব্দের মৌলিক অর্থ থেকে ভিন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত সম্পূর্ণ উল্টো। সুতরাং এখন কোনো রাজনীতিকের মুখে "শান্তি" শব্দ বললেই যে তার অর্থ শান্তি বলে ধরে নেওয়া যাবে তা নয়। বক্তার আসল মতলব কী বুঝতে হলে শব্দটাকে আপাতত এক পাশে সরিয়ে রেখে দেখতে হবে বক্তা কী পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলছেন, কী বাস্তব লক্ষ্যের উপর তাঁর দৃষ্টি, সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি কী ধরনের অবলম্বনের প্রয়াসী ইত্যাদি। এই সবগুলো যোগ করলে দেখা যাবে যে সেই যোগফল এবং শান্তি শব্দের মূল সংজ্ঞার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

যেসব জিনিসের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা সামাজিক মনের একটা প্রায়-সহজাত সংস্কারে পরিণত হয়েছে সেই সব জিনিসের সংজ্ঞার্থক শব্দেরই এই ধরনের অপব্যবহার হয়ে থাকে। শান্তি, প্রেম, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দের অপব্যবহার এই কারণে হয় যে এই শব্দ যেসব জিনিসের বাচক সেগুলোকে মানুষে বিনাতর্কে মূল্যবান বলে ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কোনো কিছুর প্রোপাগাণ্ডাকে সফল করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সেটাকে সর্বজনাদৃত কোনো সদ্‌বস্তু বা সদ্‌-ভাবনার নামে চালিয়ে দেওয়া। সেইজন্যই আমরা চারদিক থেকে শুনি—"আমরা যা বলছি তাই স্বাধীনতা, আমরা যা চাচ্ছি তাই শান্তি, আমরা যা করছি তাই মানব-প্রেম।"

কিন্তু মানুষ নিজেকে অথবা অপরকে দীর্ঘদিন ভুলিয়ে রাখতে পারে না, অন্ততপক্ষে কোনো একটা ভুলে সে বেশীদিন স্থির থাকতে পারে না। কোনো একটা চিরন্তন ভালো কিছুর নামে তার উল্টোটা বেশীদিন চালানো যায় না। তবে মারটা প্রথম গিয়ে পড়ে সেই ভালো জিনিসটার নামের উপর যার আড়ালে খারাপ জিনিসটাকে চালাবার চেষ্টা হয়। কাউকে যখন আমরা ভণ্ড বলি তখন আমাদের মন্তব্যের মধ্যে একটা কথা উহ্য থাকে। সেটা হচ্ছে এই যে ভণ্ড যেরূপে নিজেকে লোক-

চক্ষে প্রতিভাত করার চেষ্টা করছে সেটা যদি তার সাচ্চা রূপে হোত তাহলে আমরা সেটাকে শ্রদ্ধাই করতাম।

একেবারে মূল থেকে দেখলে ভণ্ডামি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত অতি অল্প মানুষই হতে পারে। সাধারণভাবে যখন কোনো আদর্শের প্রতি সমাজের শ্রদ্ধা থাকে তখনও মানুষ জানে যে, ব্যক্তিগতভাবে প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই সেই আদর্শের সম্পর্কেও কিছুটা ভণ্ডামি আছে। তা সত্ত্বেও তখন আদর্শ সাধনার বস্তুই থাকে, উপহাসের বস্তু হয় না। কিন্তু এক একটা সময় আসে যখন ভণ্ডামির এই ব্যক্তিগত রূপ থাকে না, যখন আদর্শের বিপরীত একটা প্রবল শক্তি যেন বলপূর্বক আদর্শের সজ্জা হরণ করে নিয়ে নিজের অঙ্গে ধারণ করে একটা গোটা ঐতিহাসিক যুগ ধরে রঙ্গমঞ্চ অধিকার করে থাকে। তখন কেবল ভণ্ডামির উপর ঘৃণা হয় না, যে-আদর্শের বুলির আড়ালে সেই বিরোধী শক্তি তার আসন রচনা করে সেই আদর্শের কথাই তখন উপহাসাস্পদ হয়ে ওঠে।

এইজন্যই রাজনীতিকদের মুখে আজকাল "শান্তি", "শান্তিবাণী" ইত্যাদি শব্দ শুনলে অনেকেরই গা ঘিনঘিন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল থাকবে না। ইতিহাসে দেখা গেছে, এইসব শব্দ যেমন বারবার পাঁকে ডুবেছে তেমনি বারবার তাদের গায়ের ময়লা কেটেও গেছে। এইসব শব্দ যে-সব জিনিসের বাচক সেগুলি ক্ষণজীবী জিনিস নয়, ধর্ম এবং সভ্যতার জীবনের সঙ্গে সেগুলির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সেইজন্যই বোধহয় এই শব্দগুলিও চির-জীবী এবং সাময়িকভাবে এগুলির যতই অপব্যবহার হোক না কেন, এগুলির মধ্যে কদর্থ চিরস্থায়ী হতে পারবে না। তাই এইসব শব্দের উপর জগৎব্যাপী পাশবিক অত্যাচার চলছে দেখেও প্রকৃত শান্তি ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ও আলোচনা অবান্তর বলে কারো মনে করা উচিত নয়।

দেশের মধ্যে একদল যুদ্ধবিরোধী মানুষ থাকা কিছু খারাপ নয়, বরঞ্চ সকল গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেই সেটা মঙ্গলকর। কোল্ড্-ওয়ারী "যুদ্ধবিরোধী"দের বাদ দিলে প্রধানত দুরকমের যুদ্ধবিরোধী আছেন। একরকম আছেন যাঁরা সর্বসময়ের জন্য যুদ্ধবিরোধী, যাঁরা ষোল আনা অহিংসার সমর্থক, যাঁরা কোনো সময়েই যুদ্ধকে সমর্থন করেন না।

আর একরকম আছেন যাঁরা যুদ্ধ কখনই কর্তব্য নয় এরূপ মনে করেন না কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে, প্রায় সকল গভর্নমেণ্টেরই সুযোগ পেলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নামে অন্যায় করে লাভবান হবার দিকে একটা প্রবণতা আছে। এজন্য খুব বেশি সতর্ক থাকা আবশ্যক, বিশেষ করে কোনো দেশের গভর্ন-মেণ্ট যখন যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়। যেখানে আর কোনো পথ নেই, যেখানে যুদ্ধ না করাই অন্যায় হবে কেবল সেখানেই যুদ্ধ করা উচিত। সেই জন্য প্রত্যেক যুদ্ধের ব্যাপারেই নিজেদের সরকারের সিদ্ধান্তকে খুব ভাল করে বিচার করে দেখা উচিত এবং যদি দেখা যায় যে, সরকারের যুদ্ধে নামা অন্যায় হয়েছে তবে সরকারের নীতির সমালোচনা করা এবং তার সংশোধনের জন্য জনমত সৃষ্টি করা উচিত। যেক্ষেত্রে জাতির জীবন বিপন্ন কেবল সেই ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য সব সময়েই এই শেষোক্তশ্রেণীর যুদ্ধ-বিরোধীরা সরকারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার পক্ষপাতী এবং নিষ্প্রয়োজনে এবং অন্যায় করে যদি কোনো যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়ে থাকে তবে তার জন্য তাঁরা নিজেদের গভর্নমেণ্টকে তিরস্কার করা কর্তব্য বলে মনে করেন। বিশেষ করে বৃহৎ অথবা প্রবল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এরূপ যুদ্ধবিরোধী দল থাকা মঙ্গলকর। বুয়োর যুদ্ধের সময়ে অনেক উদার মনোভাবসম্পন্ন ইংরেজ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যুদ্ধনীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং বুয়োরদের কোনো জয়ের খবর এলে তাঁরা প্রকাশ্যে উল্লাস দেখাতেন।

জাতির জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে-যুদ্ধ তার কথা আলাদা। কিন্তু বলপ্রয়োগের দ্বারা বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে কল্পিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার নামে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার দিকে বৃহৎ বা প্রবল রাষ্ট্রগুলির একটা ঝোঁক আছে। সুতরাং দেশের মধ্যে যদি একদল মানুষ থাকেন যাঁরা এ বিষয়ে নিজেদের সরকারের উপরও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন তবে রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা নিশ্চয়ই মঙ্গলকর।

অহিংসাবাদীদের প্রভাবও দেশের পক্ষে কল্যাণকর, যদি সেই অহিংসাবাদ খাঁটি হয়। কারণ খাঁটি অহিংসাবাদ যে-আদর্শের দিকে মানুষের দৃষ্টি চালিত করতে চায় তার মহত্ত্ব এবং মানব সভ্যতার পূর্ণতর সার্থকতার পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান অবস্থাতেও যদি যুদ্ধ করা জাতির পক্ষে আবশ্যক এবং কর্তব্য হয় তাহলেও খাঁটি অহিংসাবাদীদের কাছ থেকে ইষ্ট ছাড়া অনিষ্টলাভের কোনো আশঙ্কা নেই। অহিংসাবাদ ন্যায়-অন্যায় বিচার-বোধহীন নয়, অহিংসাবাদ যেখানে খাঁটি সেখানে তার নৈতিক সমর্থন অন্যায় পথের দিকে যেতে পারে না। তাহলেও খাঁটি অহিংসাবাদ মানুষকে দুর্বল করে না, মানুষকে অন্যায়ের নিকট মাথা নোয়াতে দেয় না।

কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারতের বিপদ শুরু হবার পর থেকে ভারতীয় কম্যুনিস্ট-দের মনোভাব একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে যদি কোনো মতভেদ না থাকত তাহলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যেও মতভেদ হোত কি না বলা যায় না। যাইহোক ভারতীয় কম্যুনিস্টরা চীনাদের এখনো আক্রমণকারী বলে স্বীকার করেন না। "নেফাতে" "ম্যাকমেহন লাইনকে" ভারতের সীমানা বলে তাঁরা সরকারীভাবে মেনেছেন এবং সে লাইন রক্ষা করা ভারতের কর্তব্য বলেও তাঁরা প্রস্তাব পাশ করেছেন।

এটাও "কম্প্রোমাইজ" প্রস্তাব কারণ ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা পুরোপুরি চীনাদের সমর্থক। তাঁদের চক্ষে চীনা কম্যুনিস্টরা তিব্বতকে "মুক্ত" করেছে—এটা অবশ্য সাধারণভাবে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অভিমত। তবে গোঁড়া চীনা-ভক্তদের মতে চীনের ভারত আক্রমণও ভারতের "মুক্তি" সহায়ক হবে। এঁদের মতে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ভারতে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অন্যদের মতে বিনা যুদ্ধে অথবা প্রায়-বিনা যুদ্ধে নেহরু-রাজের কম্যুনিস্ট-রাজে রূপান্তর অসাধ্য বা অসম্ভব নয়। সুতরাং এঁদের পক্ষে চীনাদের ব্যবহার অস্বস্তির কারণ হয়েছে। এঁরা এখনো আশা করছেন যে নেহরু সরকার চীনাদের সঙ্গে যেমন করে হোক একটা মিটমাট করে ফেলবেন।

কিন্তু চীনাদের সঙ্গে ভারতের বড়ো রকমের যুদ্ধ লাগলে কম্যুনিস্ট পার্টিকে হয় গোঁড়া চীনাভক্তদের পথ নিতে হবে অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যেই ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করতে হবে, অথবা ভারতে কম্যুনিস্ট শাসনের স্বপ্ন চিরতরে বিসর্জন দিতে হবে। কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে ভারত সরকারকে চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সত্যিকারের কোনো সাহায্য করবে এরূপ মনে করা বাতুলতা হবে।

আলোচনা

ভাষা সমস্যা

মহাশয়,

স্বাধীন ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠনের অব্যবহিত পর থেকে অদ্যাবধি ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বারংবার ভারত-বাসীর চিন্তাশক্তির প্রগতির পথে বহুতর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের সামগ্রিক মনীষা আজ পর্যন্ত তার কোনপ্রকার সুসংগত সমাধান আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো না। তারও চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস যতটুকু না পাওয়া গিয়েছে অপপ্রয়াসের পরিমাণ তার চতুর্গুণ। সংস্কৃতি এবং সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ ক্রমাগত ব্যাথাহত হচ্ছে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি যেক্ষেত্রে যখন প্রাথমিক আবশ্যিক প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হয়েছে তখন নিতান্তই ভাষাকে কেন্দ্র করে এ-হেন বিভ্রান্তি মোটা-মুটি রকমের দুঃখজনক।

দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রশ্ন তুললে অবশ্য ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে অবজ্ঞা করা চলে না, কিন্তু দেশের মধ্যে অন্নবস্ত্রের সমস্যাগুলি যখন তাদের সমাধানের দাবী জানায় তখন বোধকরি ভাষার সমস্যা গৌণ বলেই প্রতিপন্ন হয়। বহুতর সমস্যাগ্রস্ত জাতির পক্ষে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনার প্রয়োজন। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি সমস্যাকেই পরি-কল্পনার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। দেশের জনসাধারণের ঐকান্তিক সাহায্য এবং সহানুভূতি ছাড়া যখন কোনো দেশেরই অগ্রগতি আশা করা যায় না, ঠিক তখন সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে কোনপ্রকার আবেগমিশ্রিত সমস্যার সৃষ্টি করা নিতান্তই অবিমৃষ্যকারিতা। অথচ দেশের শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য শিক্ষিত জনসাধারণও সেই আবেগমিশ্রিত সমস্যার ক্রমাগত ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাও ঐ প্রকার আবেগমিশ্রিত সমস্যার অঙ্গীভূত।

সাময়িক একটি বক্তৃতায় আমাদের প্রধান-মন্ত্রী বলেছেন যে সমস্যা নাকি প্রগতির পরিচায়ক। উক্তিটিকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অযথা মূল্যহীন কতক-গুলি সমস্যা সৃষ্টি করা নিশ্চয় তার অর্থ নয়। 'ইংরেজী ভাষা হটাও' আন্দোলন কতদূর কার্যকরী আর হিন্দীকে সমস্ত ভারতবাসী কি ভাবে গ্রহণ করবে—এ সব প্রশ্ন স্বতন্ত্র। দুশো বছর ধরে যে ইংরেজী ভাষা ভারতের ওপর আধিপত্য চালিয়ে এসেছে

কতটা হটান যাবে সে প্রশ্নের জবাব দেবে ভারতবাসী নিজেরা এবং অনন্ত কালচক্র। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রগণ্য। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা আমাদের কতটুকু সাহায্য করতে পারে—এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর উদ্ভাবন করা বর্তমানে অসম্ভব। তবে একথা যুক্তিযুক্ত যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার বর্তমান প্রস্তুতি কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় যখন বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বমৈত্রীর প্রচেষ্টা চলেছে ঠিক তখন ভাষার দিক থেকে সেকুলারইজম গ্রহণ করা নিতান্তই খুব অযৌক্তিক হবে না। এ বিষয়ে আপনারা যে মতবাদ প্রচার করেছেন গত সংখ্যায় তা সত্যই প্রশংসনীয়। সর্বভারতীয় যোগসূত্র হিসেবে হিন্দীর প্রসার এবং প্রতিপত্তি ঠিক কতটুকু বৃদ্ধি পাবে তা অবশ্য নির্ভর করবে ভারতের অ-হিন্দী ভাষীদের আন্তরিকতা এবং হিন্দী ভাষার নিজস্ব যোগ্যতার ওপর। কাজে কাজেই ও বিষয় নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে যদি প্রতিটি প্রদেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অপর যে কোন একটি দেশীয় ভাষা শিক্ষার রীতি প্রবর্তন করা যায় তবে আমাদের ভাষা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা প্রচুর পরিমাণে লাঘব হবে। অবশ্য ভাষা নিরূপণের সমস্যাটি মোটামুটি ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির ওপর ন্যস্ত করা হবে। সবশেষে এই কথা বলা চলতে পারে যে ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং সম্পর্কের যখন বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে তখন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নটিই যেন আমাদের সকলকে চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাটিকে আপাতত সার্বভৌমত্ব রক্ষার তুলনায় যেন গৌণ হিসেবেই মূল্য দেওয়া হয়। ইতি

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-৫।

কবিকেশরী

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

এ বছরের শারদীয়া দেশে পুনর্মুদ্রিত "কবিকেশরী" রচনাটির মধ্যে "রবি-পুরাণের" এমন কিছু অনুক্ত তথ্য রয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা জাতিগতভাবে অজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন-অভীপ্সাও চেতনার প্রতি, বিশেষত তাঁর বাস্তবগ্রাহী ও বিজ্ঞানময় মানসিকতার প্রতি আমাদের একটা নাতিশীতোষ্ণ নিস্পৃহতা আছে। এমন কি নিতান্ত লজ্জার কারণ হলেও এ কথা অসত্য নয় যে আজ পর্যন্ত এই অপরিশীলিত অনীহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জ্ঞানার্জনী চেতনা এক কটুছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র মানুষ যিনি এমন সর্বৈবভাবে নির্বিকল্প মহাকবি হয়েও দেশ ও দেশবাসীর ফলিত এবং প্রাত্যহিক জীবনের সার্বিক সমস্যার চিন্তা করেছেন। দেশে শিল্পবাণিজ্য, বিজ্ঞানের অনুধ্যান এবং কৃষিকর্মের উন্নয়নের জন্য তাঁর শুভচেতনা এবং গঠনমূলক চিন্তা পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ সমাজসেবীর জীবনব্যাপী সাধনার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি। আর তিনি এই শুভচেতনা ও গঠনমূলক চিন্তাকে মনে মনে অন্তরঙ্গভাবে লালন করেই সুখী এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন না, হাতে কলমে তিনি তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। এমন কি দরিদ্র প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য অথবা "আলুর চাষ বিস্তৃতির জন্য কলিকাতা এগ্রিকালচার অফিস হইতে আলুর বীজ আনয়ন করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন।" শুধু তাই নয়, আলুর চাষের জন্য বিশেষত নৈনিতাল আলুকে বাংলার মাটিতে ফলাবার জন্য হাতে কলমে একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও স্থৈর্যের সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং কৃতকার্য হন। "Land Records and "Agricultur" অফিসে ১৮৯৯ সালের সাংবৎসরিক রিপোর্টে কবির এই অভাবনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিহাস উল্লিখিত আছে।

"আহৃত তথ্যের পরিমাণে, রচনাটি" কতখানি সুবিন্যস্ত, সে প্রশ্ন না তুলেও এ কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা চলে যে "কবিকেশরী" রচনাটির মধ্যে "সেকালের একটি সুন্দর চিত্র" ছাড়াও রবীন্দ্র মহাজীবনের অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে, লেখাটি আমাদের অনুসন্ধিৎসু হ'তে প্রেরণা জাগায়।

মনীষীমোহন রায়
রানীর বাগান বহরমপুর।

কেরানী থেকে টাইগার

ইন্দ্র মিত্র

একই দিনে ঢুকেছি আমরা দুজনে—আমি আর অমিয় সরখেল।

কোথায় আমি, আর কোথায় অমিয় সরখেল। আমার গায়ে সস্তা ছিটের একটা হাফশার্ট, পরনে আধময়লা ধুতি, পায়ে ফুটপাথ থেকে কেনা স্যাণ্ডেল। আর অমিয়? প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, চকচকে বুটজুতো। নাঃ, চাকরিটা তাহলে নেহাত বাজেমার্কা নয়। নিখুঁত পোশাক-আশাক পরে অমিয় সরখেলের মতো মানুষ যে-চাকরিতে ঢোকে, অন্যের পক্ষে তো সে-চাকরি স্বর্গ।

কেরানীগিরি হোক, যাই হোক, একটা সরকারি চাকরি তো বটে। কোনো উপযুক্ত মামা-মেসো নেই, তবু তো কপালগুণে জুটে গেল। আমার উপর বিধাতার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে দেখা যাচ্ছে।

বিধাতা ছাড়া অমিয় সরখেলের কি কেউ আছে? কোনো শাঁসালো মামা—মেসো? নাকি, আমারই মতো, নিতান্ত কপালের জোরে চাকরি পেয়ে গেল?

অমিয় সরখেল আমাকে বলল—চলো ভাই, একটু চা খেয়ে আসি। নতুন চাকরি হল আজ, চলো, চা খেতে-খেতে একটু গল্প-গুজব করি।

—বেশ তো, চলো।

কাছেই ম্যাঙ্গো লেন। অমিয় সরখেলের সঙ্গে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। একই টেবিলে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে অমিয় সরখেল আমাকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি বরাবর কলকাতায় আছ? কোন কলেজে পড়তে?

না, আমি বরাবরের কলকাতাবাসী নই। পাকিস্তানী একটা ছোটোখাটো শহর থেকে সামান্য কিছুকাল হল এই বিশাল হিন্দুস্থানী শহরে চালান হয়ে এসেছি। সামান্য লেখাপড়া যা করেছি, পাকিস্তানী একটা কলেজেই করেছি।

জিভে-দাঁতে চুকচুক করল অমিয় সরখেল। যেন ঘোরতর দুঃখ পেয়েছে। দুঃখ আমার জন্য না পাকিস্তানের জন্য পুরোপুরি ঠাহর করা গেল না।

অমিয় সরখেল বলল—যাক গে, যেতে দাও। দুঃখ করো না। (আমি কখন দুঃখ করলাম রে বাবা!) তোমার পোশাক-আশাক দেখেই বুঝেছি যে...। যাক গে, যাক গে। আমার হিস্ট্রি কিন্তু অন্যরকম।

চা এসে গেল। প্যান্টের পকেট থেকে প্যাকেট বের করে অমিয় সরখেল নিপুণ ভঙ্গিতে একটি সিগারেট ধরাল। কাপের হাতলটি পর্যন্ত না ছুঁয়ে মাথা নিচু করে আশ্চর্য কায়দায় চায়ে একটি চুমুক দিল। আর আমি? আমি প্লেটে একটু চা ঢেলে সরাৎ-সরাৎ করে গিলে ফেললাম।

অমিয় সরখেল সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। ঘাড় নাড়লাম।

না, আমি সিগারেট খাই না। পরম করুণায় অমিয় সরখেল ইঞ্চিখানেক হাসল। এমন হাসি আমি প্রভু বুদ্ধের ছবিতে দেখেছি।

অমিয় সরখেল বলল—শোনো আমার হিস্ট্রি। না, থাক। নিজের হিস্ট্রি বলার আগে আমার ফ্যামিলির হিস্ট্রিটা আগে বলি। সংক্ষেপেই বলব। সেটা শুনলে আমার পজিশন তুমি অনায়াসেই আন্দাজ করে নিতে পারবে।

ওর ফ্যামিলি-হিস্ট্রি শোনার জন্য আমার একবিন্দু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সে কথা কেমন করে ওকে মুখের উপর বলি। আদর-

নিপুণ ভঙ্গীতে একটি সিগারেট ধরাল

যত্ন করে চা খাওয়াতে নিয়ে এসেছে, ভদ্রতার খাতিরে চায়ের সঙ্গে না হয় সরখেল-ফ্যামিলির হিস্ট্রিও (সংক্ষেপিত) খানিক গিললাম।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু লিখতে গেলে

বিস্তর কালি-কাগজ লেগে যাবে। মোট কথা, সরখেল-ফ্যামিলির মস্ত মান-মর্যাদা। অমিয় সরখেলের বাবা জমিদার, দাদামশাই ডেপ্টি (রিটায়ার্ড), মামাদের মধ্যে বিচক্ষণ সার্জন আছেন, ব্যারিস্টার আছেন, তিন মেসোমশাই তিনখণ্ড কোহিনুর। একটা মজার জিনিস দেখুন, অমিয় সরখেল ফ্যামিলির কথা বলতে গিয়ে মামাবাড়ির গল্পই বলে যাচ্ছে, আরে, তোর খুড়ো-জ্যেঠার খবর বল। তোর মামা-মেসো তোর ফ্যামিলি নাকি?

যাক, আমার অত কথায় দরকার কি।

অমিয় সরখেল বলল—আমার মেজদির কথা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

মিটমিটে হাসিটুকু ঠিক বজায় আছে। অমিয় সরখেলের হাত থেকে নিস্তার পেলে বাঁচি। ওর মেজদির কথা শুনলে অবাক হয়ে যাব না হাতি।

—নাম বলব না, নাম শুনলেই চিনে ফেলবে, কলকাতায় একডাকে সকলে তাঁকে চেনে। তা তিনি, বিশ্বাস করো, আমার

মেজদির প্রেমে একেবারে হাবুডুবু। আমার মেজদি দারুণ সুন্দরী কিনা। সুন্দরী, বিদুষী, নাচগানে এক্সপার্ট। ও হো, মেজদির নামটা বলা হয়নি তোমাকে। তুঙ্গভদ্রা সরখেল।

আমি আর খাব না, তাই আবার এককাপ চায়ের অর্ডার দিল অমিয় সরখেল। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বলল—কি আর বলব, সেই ভদ্রলোক তো মেজদিকে একদিন প্রপোজ করে বসলেন : তুঙ্গভদ্রা, তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

ছোকরা কি নিদারুণ বেহায়া!

যা হোক, আমি খুব আশ্চর্য হবার ভান করে বললাম—তোমার তো চমৎকার অদৃষ্ট ভাই। কেমন নামজাদা লোকের শালা তুমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অমিয় সরখেল বলল—অদৃষ্ট আর চমৎকার হল কই ভাই। আগে শেষ পর্যন্ত শোনো। মেজদি যে সব ভণ্ডুল করে দিলে। মেজদি যে তাকে রিফিউজ করে দিলে।

সেই রিফিউজি ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা জানতে পেলে মন্দ হত না। আজ থাক, আরেকদিন হয়তো ও নিজেই পরম উৎসাহে বলে বসবে! আমার পক্ষে এ-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা ভালো দেখায় না।

তুঙ্গভদ্রা সরখেলের প্রসঙ্গে ক্ষান্ত দিয়ে অমিয় সরখেল এবার আমাকে নিয়ে পড়ল—লাইফে তোমার অ্যাম্বিশন কী বলো।

—অ্যাম্বিশন একটা আছে। যদি কোনোদিন এই চাকরিতে পার্মানেন্ট হতে পারি।

অমিয় প্রায় আঁতকে উঠল।—এই, এই তোমার অ্যাম্বিশন! ছি-ছি, ছি-ছি। শেম। অবশ্য তোমাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, চিরকাল কোন এক এঁদো টাউনে কাটিয়ে এসেছ, বড়ো আউটলুক তুমি পাবে কোথায়। আমি আবার বরাবর এখানেই মানুষ, কলকাতাতেই আমি বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ। আমার অ্যাম্বিশন শুনলে তোমার তো মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

কী অ্যাম্বিশন, শুনি।

—আই-এ-এস দিয়ে খুব সম্ভব আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যাব। আর তা যদি না যাই তো লণ্ডনে যাব। পার্বালিসিটি, জর্নালিজম কিম্বা বিজনেস ম্যানেজমেন্টটা শিখে আসব। তাহলে আর দেখতে হবে না, হেসে-খেলে দেড় হাজার টাকার স্টার্টিং পেয়ে যাব।

বাস্তবিক, অমিয় সরখেলের উপর আমার রীতিমত শ্রদ্ধা হল। না হয় একটু বোলচাল দিচ্ছে, কিন্তু অ্যাম্বিশন বলে একটা পদার্থ আছে তো ভেতরে। নির্ঘাত একদিন ও উপরে উঠবে। আর আমি? হায়, আমি কিনা কেরানীগিরিতে পাকাপোক্ত হওয়ার অ্যাম্বিশন নিয়েই কৃতার্থ হয়ে আছি।

—যাক, আমি যদ্দিন এখানে আছি, তুমি কিছু ভেবো না। আপিসপাড়ার সব খবর রাখি, সকলের হালচাল আমার নখদর্পণে, আমার কথা মতো চলো, গায়ে তোমার আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না। কিন্তু আমি আর কদিন!

আমার ভবিষ্যৎ ভেবে অমিয় সরখেল দীর্ঘশ্বাস না ফেলে পারল না। সত্যি, ও আর কদিন। বাঘা-বাঘা আত্মীয় আছে, নামজাদা প্রায়-জামাইবাবু আছে, ওর আর ভাবনা কি, হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে চলে যাবে, নয় তো বিলেত ঘুরে এসে দেড় হাজার টাকা মাইনের কোনো সাহেবী আপিসে গ্যাট হয়ে বসবে।

বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম—এই সামান্য কেরানীগিরিতে তুমি ঢুকলে কেন অমিয়?

—একে কি আর ঢোকা বলে। নেহাত বাড়িতে বসে আছি, দুপুরে আমার আবার ঘুম আসে না, এখানে কাটিয়ে যাব দুপুরটা, আর কিছু না হোক, আমার হাতখরচটা তো চলে যাবে।

বলে কি, মাসে দেড়শ টাকা হাত খরচ! কে জানে, হতেও পারে, সরখেল-ফ্যামিলির সন্তান মাসে দেড়শ টাকা হাত খরচ করবে, এ আর বেশি কথা কি। দুনিয়ায় সকলেই তো আর আমার মতো বাড়িতে হাঁড়ি চাপিয়ে চাকরি করতে আসেনি।

—তুমি কি ম্যারেড?

অমিয় সরখেলের এই প্রশ্নে আমি না হেসে পারলাম না।

অমিয় সরখেল বলল—না, না, হাসির কথা নয়। তুমি তো বলতে গেলে মফস্বলের লোক। ওসব দিকে আবার আর্লি ম্যারেজ খুব চালু কি না। ভাগ্যগুণে তুমি বেঁচে গেছ। খবরদার, লাইফে এস্টারিশড না হয়ে কখনো ছাদনাতলায় যাবে না। কী করব, মায়ের কথা ফেলতে পারলাম না,—বলতে-বলতে গিয়ে ফুলশয্যার খাটে উঠে পড়ো না যেন। খবরদার।

অমিয় সরখেল কখন যে কোন লাইনে কথা বলবে, আগে থেকে ধরাছোঁয়ার উপায় নেই। ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল—তুমি চার্লস ডিকেন্সের নাম শুনেছ?

—শুনেছি?

—ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়েছ?

—হুঁ।

—না, না, ওসব নোট-ফোট মুখস্থ করে পাশ করার কথা বলছি না।—অমিয় সরখেল ঘন-ঘন মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—অরিজিন্যাল 'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়েছ? আপিসে চাকরি করতে এসেছ আপিসের প্রত্যেক বড়বাবু সম্পর্কে ডিকেন্সের দুটি সেন্টেন্স, সব সময় মনে রাখবে। ডিকেন্স অবশ্য কোনো বড়বাবুর সম্পর্কে বলেননি, কিন্তু প্রত্যেক বড়বাবুর সম্পর্কে সেন্টেন্স দুটি ষোলো আনা খাটে: টেক কেয়ার অব হিম। হি বাইটস।

নিজের মুখে বললে অবশ্য খুব খারাপ শোনায়, কিন্তু না বললেও নয়, চায়ের দাম কিন্তু অমিয়র পকেট থেকে বেরোয়নি, আমারই হাফশার্টের পকেট থেকে বেরিয়েছে। সামান্য খুচরো পয়সা কিনা, অমিয় সরখেলের পকেটে নেই।

ভাগ্যের গুণে কি দোষে বলতে পারি না, অমিয় সরখেলের পাশেই আমার সীট পড়ল। দিনের পর দিন যায়, আমার কান ঝালাপালা হতে থাকে। উঃ, কী দারুণ বকবক করতে পারে অমিয় সরখেল। দু-একটা কথার জবাব নিতান্তই না দিলে নয়, তাই দিই, কিন্তু তাতেই আমার চোয়াল প্রায় ভেঙে যাবার দশা।

একটা কাণ্ড হল একদিন।

ঠিক আমার পিছনেই বসেন মিস

মিস সর্বাধিকারী অমিয় সরখেলের উপর খুব প্রসন্ন নন। মিস সর্বাধিকারীর সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়েছিল অমিয় সরখেল, হুঁ-হুঁ চুপচাপ থাকি বলে ইয়ে-টিয়ে কি আর বুঝি না, বাছাধন কড়া ধমক খেয়ে ফিরে এসেছে।

যতদূর জানি, মিস সর্বাধিকারী খুব ভালো মেয়ে। ফাস্টনষ্টিতে নেই। আমার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দু-একটা সামান্য কথা বলেছে, সত্যি বলছি, কোনো ইয়ে-টিয়ে নয়, এমনি, সত্যি, সাদা-মাঠা কথা।

কড়া ধমক খেয়ে

কিন্তু অমিয় সরখেলের আর সহ্য হল না। আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে অমিয় বলল—বি কেয়ারফুল। মিস সর্বাধিকারীর কিন্তু তোমার উপর নজর পড়েছে। ও তো মেয়ে নয় বাবা, ছেলেধরা। মফস্বল থেকে এসেছ, গরীবের ছেলে, বন্ধু হয়ে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমার উপর অবশ্য অ্যাটেম্পট নিয়েছিল, কিন্তু, হুঁ-হুঁ, এ-শর্মা তেমন কাঁচা ছেলে নয়। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা।

যতখানি ভেবেছি অমিয় সরখেল দেখছি তার চেয়েও ঢের বেশি ছোটোলোক। আমার মতো গোবেচারার পর্যন্ত মাথায় রক্ত উঠে যেতে চাইছে। তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বললাম—না ভাই, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি এমন কিছু সুপাত্র নই যে আমার জন্য মিস সর্বাধিকারী পাগল হয়ে উঠবেন। তুমি অযথা তিলকে তাল করো না।

এ-লাইনে সুবিধা হল না দেখে অমিয় সরখেল একটানে বড়োবাবুর লাইনে চলে গেল। বলল—যাক গে, মেয়েলী ব্যাপারে

মনে রেখেছ তো? আমি আর কদিন আছি। হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, নয়তো—

—বিলেত চলে যাবে। জানি। কিন্তু অমিয়, তোমার কথা মিলছে না। আমাদের বড়োবাবু তো খুব ভালো মানুষ।

—ভালো মানুষ? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ভালো মানুষ? গুড ম্যান?—অমিয় সরখেল হা-হা করে হেসে উঠল—ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশ। ভালো মানুষের ছদ্মবেশ পরে আছেন বড়োবাবু। তুমি চিনতে পারছ না। কোন মফস্বলের এঁদো টাউন থেকে এসেছ, তোমার কোন দোষ নেই, ফোঁটা-তিলক দেখেই তুমি সরলমনে টাইগারকে বোষ্টম ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে আছো। যেদিন ঘাড় মটকাবে, সেদিন টের পাবে। বুঝবে, অমিয় সরখেল বাজে কথা বলেনি।

—আঃ, অমিয়। যতদিন ঘাড় না মটকাবে ততদিন পর্যন্ত তো—

—ঘাড় না মটকেও রক্ত চুষে নেওয়া যায়। —অমিয় সরখেল বিশদ করে বলল—তাই নিচ্ছে বড়োবাবু। এই সেকশনে সারাদিন উপুড় হয়ে খাটছে কারা? তুমি, আমি—আমরা যারা কেরানী। কটা টাকা পাচ্ছি মাসকাবারে? নাথিং। আর ওই বড়োবাবু, কাজের মধ্যে দু-অক্ষরে একটি সই লাগিয়ে দিচ্ছেন, মোটা মাইনে টেনে যাচ্ছেন। এসব কখনো ভেবে দেখেছ হাঁদারাম?

অমিয় সরখেলের আগে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে 'হাঁদারাম' বলেনি। তবু, তবু আমি চুপচাপ রইলাম। রইলাম। হয়তো হাঁদারাম বলেই চুপচাপ রইলাম। হাঁদারাম না হলে হয়তো আমি এতক্ষণে অমিয় সরখেলের সামনের পাটির দুটি দাঁত একটি ঘুষিতে তুলে নিতাম।

আমাদের বড়োবাবু সত্যি খুব ভালো। এমন কি, অমিয় সরখেলকেও তিনি একবিন্দু গালমন্দ করেন না, উপরওলার কাছে নালিশ করেন না অমিয় সরখেলের নামে।

অত তো বক্তৃতা দেয় অমিয় সরখেল, এককণা কাজ করে না। মাথায় ঘিলু বলে কোনো পদার্থ আছে কি না, সে বিষয়েই আমি ঘোরতর সন্দেহ করি। বড়োবাবু বরং আমাদের বলেন—তো কাজ না করে না করুক। হাতের পাঁচটা আঙুল কি আর সমান হয়? ওই একরকমের পাগল আর কি। ওর ভাগের কাজটা আপনাদের পাঁচজনকে ভাগ করে দিচ্ছি, একটু কষ্ট করে চালিয়ে দিন। ও থাক ওর মনে। যা বলে বলুক। কেউ কান না দিলেই হল।

এই বড়বাবুকে পর্যন্ত অমিয় সরখেল আড়ালে যা খুশি বলে। বলুন, ও কি মানুষ? সারাদিন হাঁটুর উপর রেখে রগরগে উপন্যাস পড়ে-পড়ে হাই তুলছে। আর মাঝে-মাঝে বলছে—উঃ, খাটতে খাটতে মরে

আর ফাঁক পেলেই আমাকে ডেকে বলে—জানো, বড়োবাবুরা ক্লার্কদের সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কি বলা-কওয়া করেন? সব ক্লার্ক ফাঁকিবাজ, কাজ করে না, চেয়ারে বসে ঝিমোয়, আড্ডা মারে। কী সাংঘাতিক মিথ্যে কথা একবার ভেবে দ্যাখো। অথচ, এই যে তুমি, এই যে আমি—আমরা যারা ক্লার্ক—খাটতে খাটতে আমাদের হাড়ে ঘুণ ধরে গেল। ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে কি হবে, এই বড়োবাবুগুলোকে হুট আউট না করলে ইন্ডিয়ার কোনো আশা-ভরসা নেই, নো হোপ। যাক গে, কদিন আর আছি। আমি তো গেলাম বলে।

দিনের পর দিন চলে গেল, কিন্তু অমিয় সরখেল গেল কই। যেমন ছিল, তেমনি আছে। হঠাৎ একদিন দেখি অমিয় সরখেলের উস্কুখুস্কু অবস্থা। আমাকে চুপে চুপে বলল—দারুণ বিপদ। আমি বোধহয় মরে যাব।

সাধ্যমতো আশ্বাস দিলাম। বললাম—অত ভাবছ কেন। মেডিক্যাল সায়েন্সের খুব উন্নতি হয়েছে আজকাল। যাই হয়ে থাক, সারবে।

—মেডিক্যাল সায়েন্সের জুরিসডিকশনের বাইরে। আমার দফা সারবে। তুমিই বলো, মায়ের মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত?

—না। একেবারেই না।

—কি আর বলব, বলা-কওয়া নাই, মা আমার বিয়ের কথা পাকা করে ফেলেছেন। দিল্লির মস্ত এক বিজনেস ম্যাগনেটের মেয়ে। বিয়ে না করলে আমাকে বিলেত যেতে দেবেন না। উঃ, আমার পেরেন্টসই আমার সর্বনাশ করলে।

—তা ভালোই তো। বিয়ে করে ফেলো। বউ নিয়ে দিব্যি বিলেত চলে যাবে।

—না না, বউ এখানে রেখে যাব। এখানে আমার ওল্ড মাদারের সেবা-টেবা করবে। লাইফে এসটাব্লিসড না হয়েই ছাদনাতলায় যেতে হল। কি করব, মায়ের কথা ফেলতে পারলাম না।

পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে অমিয় সরখেল বিয়ে করল। মিস সর্বাধিকারী বাদে সেকশনের সকলে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম।

ছুটি শেষ করে আবার আপিসে এল অমিয় সরখেল। দিব্যি হাসিখুশি। আমার অবস্থা হয়ে উঠল আরো করুণ, আরো সঙিন। সারাদিন আমার কানের কাছে খালি বউয়ের রূপব্যাখ্যা, গুণব্যাখ্যা। ভুল বললাম। বউয়ের চেয়েও শ্বশুরের কথা ঢের বেশি বলে। দিল্লির মস্ত বড়ো বিজনেস-ম্যাগনেট। জওহরলালের কোটে যে গোলাপ-ফুল থাকে, শ্বশুরমশায়ের কোটেও সবসময় সেই একই জাতের গোলাপফুল। উপ-টুপ নয় খাঁটি মন্ত্রীদের সঙ্গে শ্বশুরমশায়ের গলায়-গলায় ভাব।

আমি একদিন বললাম—ভালোই হল তোমার। এখন আর কি, প্যাসপোর্ট-টাসপোর্ট করে তাড়াতাড়ি বিলেতের টিকেট কাটো।

বুঝতেই পারছ, তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়

—না, ভাই, তাড়াহুড়ো করলে হবে না। মাদারের মনে কষ্ট দেব, তেমন কুলাঙ্গার আমি নই। আমাদের ফ্যামিলি-ট্র্যাডিশনই যে আলাদা। আগে মাদার, পরে আদার্স।

—কেন, তোমার মা কি তোমাকে বিলেতে যেতে দিতে আপত্তি করেছেন?

—আরে না, না। নট এট দি লীস্ট। অমিয় সরখেল নিখুঁতভাবে দুবার ঘাড় ঝাঁকুনি দিল—তবে মাদারের একটা ডিজায়ার আছে। সেটা ফুলফিলও না হলে, বুঝতেই পারছ, কিছু সময় লাগবে।

—কিছুই বুঝলাম না কিন্তু।

—নাঃ, এত কর্পোরেশনের জল খেয়েও তোমার কোনো চেঞ্জ হল না। যেমনি ছিলে, তেমনি থেকে গেলে। মাথার মধ্যে যা আছে তোমার, লোটাসের চাষ করা যায়।—অমিয় সরখেল মৃদুমধুর হাস্যে আমাকে কৃতার্থ করে বলল—নাতির মুখ না দেখে আমার মাদার আমাকে বিলেতে যেতে দেবেন না। বুঝতেই পারছ, তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়। নাকি, আরো এক্সপ্লেন করে বলতে হবে?

বিজনেস-ম্যাগনেট শ্বশুর দিল্লিতে কোনো কলকাঠি নেড়েছেন কি না জানি না, হঠাৎ একটা অভাবনীয় অর্ডার এসে গেল। অমিয় সরখেল প্রমোশন পেয়েছে। ক্লার্ক থেকে একনিশ্বাসে বড়োবাবু।

যাক, আমি অন্তত বাঁচলাম। আমাকে আর প্রাতিমুহূর্তে বক্তৃতা শুনতে হবে না। হয়তো আমার আয়ু কিছু বাড়ল।

দুদিন বাদেই অমিয় সরখেল আমাকে পিওন পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। ডেকেছে যখন, যাই। গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই আরম্ভ হল উপদেশ—স্যাড, ভেরি স্যাড। প্রমোশন তোমারই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন পেলে না জানো?

—বিজনেস-ম্যাগনেট শ্বশুর নেই বলে। কিন্তু মনে এলেও এ-উত্তর আমি উচ্চারণ করলাম না।

অমিয় সরখেল বলল—তুমি যদি আমার অ্যাডভাইস শুনে চলতে, তোমাকে পড়ে থাকতে হত না, বসে-বসে মাছি মারতে হত না, নির্ঘাত তুমি প্রমোশন পেয়ে যেতে। আরেকটা কথা শোনো, বেশি খেলেই শরীর ভালো হয় না, বুঝে-শুনে খাওয়া চাই; গাদা-গাদা কাজ করলেই হয় না, কাজের কোয়ালিটি থাকা চাই। আমাকে দিয়েই দ্যাখো। কোয়ালিটির ফল। এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও, মনে রেখো, ভালো কাজের পুরস্কার আছে।

কথামৃত শুনে চলে এলাম। পরদিনই আরেক অঘটন। অর্ডার এল, আমারও প্রমোশন হয়েছে, আমিও বড়োবাবু হয়ে গেলাম।

মনে খুব আনন্দ হল। এবার একবার অমিয় সরখেলের কাছে যাব নাকি?

কিন্তু অমিয় সরখেল নিজেই গ্যাটগ্যাট করে আমার কাছে এসে হাজির হল। সহাস্যে বলল—চলো, ভাই, একটু চা খেয়ে আসি। চলো, চা খেতে খেতে একটু গল্প-গুজব করি।

বেশ তো, চলো।

ম্যাঙ্গো লেনের সেই চায়ের দোকানেই ঢুকলাম। একই টেবিলে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

অমিয় সরখেল বলল—একটা কথা মনে রেখ, আমার অ্যাডভাইস শুনে চলেছ বলেই এত তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়ে গেলে। এই শর্মা আপিসপাড়ার সব খবর নখদর্পণে রাখে। বাবা, সরখেল ফ্যামিলির ছেলে। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা। যাক, এখন থেকে আমিও বড়োবাবু, তুমিও বড়োবাবু। একটা ব্যাপারে এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হয়ে চলতে হবে। দাঁড়াও, বলছি।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেটের ধোঁয়ার কয়েকটি রিং ছুঁড়ে অমিয় সরখেল আমাকে সাবধান করে দিল—সাবধান, সাবধান। নরম হয়ে থেকো না, একটু স্ট্রিক্ট হয়ে চলাফেরা করো। আপিসের নাড়ীনক্ষত্র জানি আমি, সব ক্লার্ক ফাঁকিবাজ, কাজ করে না, চেয়ারে বসে ঝিমোয়, আড্ডা মারে। ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে কি হবে, এই ক্লার্কগুলোকে হুট আউট না করলে ইন্ডিয়ার কোনো আশা-ভরসা নেই, নো হোপ। যাক গে, কদিন আর আছি। আমি তো গেলাম বলে।

ট্রামে বাসে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন নাকি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—চীনাদের নেফা অঞ্চল হইতে উচ্ছেদ করা হইবেই। খুড়ো ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। ক্ষমা মহতের লক্ষণ!"

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলিয়াছেন—শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করিতে হইবে। —"উন্নত কেন, সম্পর্কটা মধুর করার জন্যও শ্রমিক-মালিক দুপক্ষই চেষ্টা করছেন, তাঁরা চাইছেন উভয়ের মধ্যে 'বড়কুটুম' সম্বন্ধ গড়ে উঠুক"—বলে শ্যামলাল।

আগামী ২৮শে অক্টোবর টাকীতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বসিবে। সংবাদে শুনিলাম, স্থানীয় জনসাধারণ মন্ত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ বহন করিবেন সুতরাং বরাদ্দের চাইতে সরকারের খরচ পড়িবে অনেক কম। —"খুব ভালো কথা। টাকীর উদাহরণ নিশ্চয়ই অনুসরণযোগ্য। তবে আমরা ভাবছিলাম, সভাটা আর হপ্তা দুই পরে হলে সভায় সভাও হত আর ঐ সঙ্গে টাকীর সরেস খেজুর গুড়ও ছাঁদা বেঁধে আনা যেত"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

উক্ত মন্তব্যের জের টানিয়া আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"যা হোক, পল্লী অঞ্চলে মন্ত্রিসভার মাধ্যমে জনসংযোগ করতে হলে জলযোগের পরিসংখ্যানটাও নিয়ে রাখা ভালো—যেমন লেংচা, সরভাজা, গুপো সন্দেশ, ভাপা দই প্রভৃতি। ইলিশ, গলদা, ভেটকী, তপসের কথা বলা গেল না—বিষয়গুলি প্রায় সাবজুডিস্ স্তরে যাবো যাবো করছে বলে হুমকি শোনা যাচ্ছে!!"

ভারত সীমান্তে প্রতিরক্ষা কার্যে নিযুক্ত জওয়ানদের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া দিল্লিতে মিষ্টান্ন ক্রয় করা হইবে।—"আশা করি সেটা শুধু দিল্লির লাড্ডু হবে না"—সংক্ষেপে মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা নাকি চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন না, ফলে বর্তমানে চীনাদের আণবিক চুল্লীতে কোন কাজ হইতেছে না। —"কিন্তু চুলো গেলেও চাল নিশ্চয়ই থাকবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

টাকায় অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক সভার সভাপতি জনাব নুরুল আমীন নাকি বলিয়াছেন—ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই, মন্ত্রিত্বের কোন লোভ বা মোহ হইতে আমরা মুক্ত - - - "এবং ঠাকুরঘরে কে, প্রশ্নের উত্তরে—আমরা কলা খাইনে বলবই" শেষের কথা কয়টি অবশ্য আমাদের এক সহযাত্রীই বলিলেন।

এক আবিষ্কারের সংবাদে জানা গেল, ইংরেজদের তৈরি হকার 'পি-১১২৭' বিমানটি যেমন মাটি হইতে সোজা ঋজুভাবে উপরে উঠিতে পারে তেমনি পিছন ফিরেও উড়িতে সে সক্ষম। সহযাত্রী বলিলেন—"যুদ্ধে পশ্চাদপসরণের কৌশলই বড় কৌশল!!"

সংবাদ পরিবেশক বলিতেছেন, ধান চাউলের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাওয়ার পর পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চোলাই মদের কারবার শুরু হইয়াছে। —"নিতান্তই স্বাভাবিক কারণে, ধানের পর তো ধেনো আসবেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল, যার সম্বন্ধে কোন কোন মহলের ধারণা "ধেনো" বানান পর্যন্ত জানে না।

আনন্দবাজার-এর "অতীতের পৃষ্ঠা থেকে" বিভাগে সংবাদ পড়িলাম—গোলদীঘির চারধারে এত জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল (১৩৩২ সালে) যে তথায় অনায়াসে নৌকা চলাচল সম্ভব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র জনৈক বন্ধুসহ একখানা নৌকায় করিয়া "সঞ্জীবনী কার্যালয়" হইতে বাহির হইয়া মির্জাপুরের বাদলা হাওয়া সেবন করিতে বাহির হইয়াছিলে আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"ঘট অবশ্য ১৩৩২ সালের। ১৩৬৯ সালে (যদি নৌকা বিহারে যেতে চান তবে বি আনন্দবাজার, যুগান্তর, বিশ্বমিত্র প্রভৃ যে কোন কার্যালয় থেকে যে-কোন স্থ নৌকাযোগে গিয়ে বাদলা হাওয়া সে করতে পারেন, ডুব-সাঁতার, চিৎসাঁতার কা পারেন—কলকাতা আর সে কলক নেই তো!!"

আমেরিকাতে শুনিলাম সম্প্রতি এ "কানের ব্যাংক" স্থাপন হইয়াছে। —"বধিরতা ব্যাধি বর্তমানে স জনীন পুজোর মতোই ব্যাপক এ মারাত্মক(!) হয়ে উঠেছে। সুতরাং কা ব্যাংকে পৃথিবী উপকৃত হবে। কিন্তু য কানে তুলো গুঁজে বধির হয় তাদের বা কি এই ব্যাংক সারাতে পারে"—প্রশ্ন ক বিশুখুড়ো।

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনা জনগণের মনে ঐক্যের ভাব সৃ জন্য শিক্ষকদের নিকট আবেদন জানাই ছেন। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"শিক্ষক বকেয়া বাকীর জন্য মনমরা হয়ে আছেন ছাড়া ছাত্র ভর্তির সমস্যায় আবার নতুন নিতে পারবেন কি না সন্দেহ আ সুতরাং - - - -!!"

দীঘা সৈকত সংরক্ষণের প্রয়োজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকা নিকট একটি ঢেউ গণনার যন্ত্র আমদান জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা চাহিয়া বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলা —"কিন্তু যন্ত্রেরই বা প্রয়োজন কী, গণনার 'নো-হাউ'রা তো ছাপোষা গেরস্থে ঘরে ঘরেই আছে"—মন্তব্য করেন বিশ খুড়ো।

সোভিয়েট রাশিয়া নাকি তার সম্বন্ধে গবেষণায় রত হইয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন "রাশিয়া হয়ত এ পথে নুতন, তাই ব রাখছি, এ ক্ষেত্রে অন্ত পাওয়া ভার। আম তো 'তারকা'র চলা-বলা, হাসি-কাশি, শা জুতো নিয়ে কত গবেষণাই করছি. কি তাঁরা ডিজায়ার অব দি মথ হয়েই রইলেন

বিশ্ববিচিত্রা

কারাগারে যেতেও আনন্দ

প্রণয়ের খাতিরে কজন সুন্দরী কারাগারে যেতে রাজি হবে? স্পেনের রূপবতী সেনোরিতা কার্মেনের কাছে কিন্তু এক মাস কারাবাস লাভজনক হয়ে ওঠে—কারণ মুক্তির সঙ্গেই তার বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

কার্মেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মেয়ে। পিরেনীজ পর্বতের দক্ষিণে ওদের গ্রামে বাহাত্তর ঘন্টার ছুটিতে এক আমেরিকান সেনা এসে উপস্থিত হওয়ার পরই ওর জীবনে রোমান্সের সূত্রপাত।

মাত্র তিন দিনের ছুটি দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল আর আমেরিকান সৈনিকটি এক [illegible] হৃদয় ফেলে ফ্রান্সের রশফোর্টে তার বেস ক্যাম্পে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

কার্মেন চুপচাপ বসে থেকে বিরহজ্বালা সহ্য করার মতো মেয়ে নয়। চোরাই মাল গোপনে পাচার করার পথ ধরে সে পিরানীজ অতিক্রম করে সীমান্ত পার হয়ে রশফোর্টে বেস ক্যাম্পের সামনে হাজির।

ওর প্রেমিক প্রথমে বিস্মিত হলেও ওকে দেখে খুশীই হয় এবং বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু কার্মেনের কাছে ফ্রান্সে আসার ছাড়পত্র না থাকায় ফরাসী পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করে স্পেনে ফিরত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা। কার্মেনের পক্ষে সেটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। তল্পি-তল্পা বেঁধে সে আবার পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সে হাজির হয়। কিন্তু এবারও সে ফরাসী পুলিসের হাতে ধরা পড়ে।

আদালতে কার্মেন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকম্পা ভিক্ষা করে। সে বলে বিবাহ ঠিক করতে তার প্রেমিকের এক মাস সময় লাগবে এবং "আপনি যদি আমাকে স্পেনে পাঠিয়ে দেন তা হলে তৃতীয়বার ফ্রান্সে আসার মতো অর্থ আমি জোগাড় করতে পারবো না। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা বিয়ে যতদিন না হয় ততদিন যেন আমি এখানে কাজ করতে পারি।"

ম্যাজিস্ট্রেট কার্মেনকে এক মাসের কারাদণ্ড দেন।

অদ্ভুত সামগ্রী গিলেও বাঁচা যায়

মানসিক বিকারগ্রস্ত অনেককে মুদ্রা, সূচ, পিন, পেরেক, এমনকি কাচভাঙা, বাসন ভাঙা, হাতঘড়ি, থার্মোমিটার এবং চামচ ও কাঁটার হাতল পর্যন্তও গিলে ফেলতে দেখা যায়। ওয়াশিংটনের সেণ্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের শল্য ও অনুশীলন বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ

ট্রামে বাসে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন নাকি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—চীনাদের নেফা অঞ্চল হইতে উচ্ছেদ করা হইবেই। খুড়ো ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। ক্ষমা মহতের লক্ষণ!"

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলিয়াছেন—শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত করিতে হইবে। —"উন্নত কেন, সম্পর্কটা মধুর করার জন্যও শ্রমিক-মালিক দুপক্ষই চেষ্টা করছেন, তাঁরা চাইছেন উভয়ের মধ্যে 'বড়কুটুম' সম্বন্ধ গড়ে উঠুক"—বলে শ্যামলাল।

আগামী ২৮শে অক্টোবর টাকীতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বসিবে। সংবাদে শুনিলাম, স্থানীয় জনসাধারণ মন্ত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ বহন করিবেন সুতরাং বরাদ্দের চাইতে সরকারের খরচ পড়িবে অনেক কম। —"খুব ভালো কথা। টাকীর উদাহরণ নিশ্চয়ই অনুসরণযোগ্য। তবে আমরা ভাবছিলাম, সভাটা আর হপ্তা দুই পরে হলে সভায় সভাও হত আর ঐ সঙ্গে টাকীর সরেস খেজুর গুড়ও ছাঁদা বেঁধে আনা যেত"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

উক্ত মন্তব্যের জের টানিয়া আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"যা হোক, পল্লী অঞ্চলে মন্ত্রিসভার মাধ্যমে জনসংযোগ করতে হলে জলযোগের পরিসংখ্যানটাও নিয়ে রাখা ভালো—যেমন লেংচা, সরভাজা, গুপো সন্দেশ, ভাপা দই প্রভৃতি। ইলিশ, গলদা, ভেটকী, তপসের কথা বলা গেল না—বিষয়গুলি প্রায় সাব-জুডিস্ স্তরে যাবো যাবো করছে বলে হুমকি শোনা যাচ্ছে!!"

ভারত সীমান্তে প্রতিরক্ষা কার্যে নিযুক্ত জওয়ানদের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়া দিল্লিতে মিষ্টান্ন ক্রয় করা হইবে।—"আশা করি সেটা শুধু দিল্লির লাড্ডু হবে না"—সংক্ষেপে মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা নাকি চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন না, ফলে বর্তমানে চীনাদের আণবিক চুল্লীতে কোন কাজ হইতেছে না। —"কিন্তু চুলো গেলেও চাল নিশ্চয়ই থাকবে"—বলেন বিশুখুড়ো।

টাকায় অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক সভার সভাপতি জনাব নুরুল আমীন নাকি বলিয়াছেন—ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই, মন্ত্রিত্বের কোন লোভ বা মোহ হইতে আমরা মুক্ত - - - "এবং ঠাকুরঘরে কে, প্রশ্নের উত্তরে—আমরা কলা খাইনে বলবই" শেষের কথা কয়টি অবশ্য আমাদের এক সহযাত্রীই বলিলেন।

এক আবিষ্কারের সংবাদে জানা গেল, ইংরেজদের তৈরি হকার 'পি-১১২৭' বিমানটি যেমন মাটি হইতে সোজা ঋজুভাবে উপরে উঠিতে পারে তেমনি পিছন ফিরেও উড়িতে সে সক্ষম। সহযাত্রী বলিলেন—"যুদ্ধে পশ্চাদপসরণের কৌশলই বড় কৌশল!!"

সংবাদ পরিবেশক বলিতেছেন, ধান চাউলের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাওয়ার পর পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চোলাই মদের কারবার শুরু হইয়াছে। —"নিতান্তই স্বাভাবিক কারণে, ধানের পর তো ধেনো আসবেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল, যার সম্বন্ধে কোন কোন মহলের ধারণা "ধেনো" বানান পর্যন্ত জানে না।

আনন্দবাজার-এর "অতীতের পৃষ্ঠা থেকে" বিভাগে সংবাদ পড়িলাম—গোলদীঘির চারধারে এত জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল (১৩৩২ সালে) যে তথায় অনায়াসে নৌকা চলাচল সম্ভব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র জনৈক বন্ধুসহ একখানা নৌকায় করিয়া "সঞ্জীবনী কার্যালয়" হইতে বাহির হইয়া মির্জাপুরের বাদলা হাওয়া সেবন করিতে বাহির হইয়াছিলেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"ঘটনাটা অবশ্য ১৩৩২ সালের। ১৩৬৯ সালে কেউ যদি নৌকা বিহারে যেতে চান তবে তিনি আনন্দবাজার, যুগান্তর, বিশ্বমিত্র প্রভৃতির যে কোন কার্যালয় থেকে যে-কোন স্থানে নৌকাযোগে গিয়ে বাদলা হাওয়া সেবন করতে পারেন, ডুব-সাঁতার, চিৎসাঁতার কাটতে পারেন—কলকাতা আর সে কলকাতা নেই তো!!"

আমেরিকাতে শুনিলাম সম্প্রতি একটি "কানের ব্যাংক" স্থাপন করা হইয়াছে। —"বধিরতা ব্যাধি বর্তমানে সার্বজনীন পুজোর মতোই ব্যাপক এবং মারাত্মক(!) হয়ে উঠেছে। সুতরাং কানের ব্যাংকে পৃথিবী উপকৃত হবে। কিন্তু যারা কানে তুলো গুঁজে বধির হয় তাদের ব্যাধিও কি এই ব্যাংক সারাতে পারে"—প্রশ্ন করেন বিশুখুড়ো।

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক জনগণের মনে ঐক্যের ভাব সৃষ্টির জন্য শিক্ষকদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"শিক্ষকগণ বকেয়া বাকীর জন্য মনমরা হয়ে আছেন, তা ছাড়া ছাত্র ভর্তির সমস্যায় আবার নতুন ছাত্র নিতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে, সুতরাং - - - -!!"

দীঘা সৈকত সংরক্ষণের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট একটি ঢেউ গণনার যন্ত্র আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা চাহিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"কিন্তু যন্ত্রেরই বা প্রয়োজন কী, ঢেউ গণনার 'নো-হাউ'রা তো ছাপোষা গেরস্তের ঘরে ঘরেই আছে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

সোভিয়েট রাশিয়া নাকি তারকা সম্বন্ধে গবেষণায় রত হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"রাশিয়া হয়ত এ পথে নূতন, তাই বলে রাখছি, এ ক্ষেত্রে অন্ত পাওয়া ভার। আমরা তো 'তারকা'র চলা-বলা, হাসি-কাশি, শাড়ি-জুতো নিয়ে কত গবেষণাই করছি, কিন্তু তাঁরা ডিজায়ার অব দি মথ হয়েই রইলেন!!"

বিশ্ববিচিত্রা

কারাগারে যেতেও আনন্দ

প্রণয়ের খাতিরে কজন সুন্দরী কারাগারে যেতে রাজি হবে? স্পেনের রূপবতী সেনোরিতা কার্মেনের কাছে কিন্তু এক মাস কারাবাস লাভজনক হয়ে ওঠে—কারণ মুক্তির সঙ্গেই তার বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

কার্মেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মেয়ে। পিরানীজ পর্বতের দক্ষিণে ওদের গ্রামে বাহাত্তর ঘণ্টার ছুটিতে এক আমেরিকান সৈন্য এসে উপস্থিত হওয়ার পরই ওর জীবনে রোমান্সের সূত্রপাত।

মাত্র তিন দিনের ছুটি দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল আর আমেরিকান সৈনিকটি এক ব্যথাতুর হৃদয় ফেলে ফ্রান্সের রশফোর্টে তার বেস ক্যাম্পে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

কার্মেন চুপচাপ বসে থেকে বিরহজ্বালা সহ্য করার মতো মেয়ে নয়। চোরাই মাল গোপনে পাচার করার পথ ধরে সে পিরানীজ অতিক্রম করে সীমান্ত পার হয়ে রশফোর্টে বেস ক্যাম্পের সামনে হাজির।

ওর প্রেমিক প্রথমে বিস্মিত হলেও ওকে দেখে খুশীই হয় এবং বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু কার্মেনের কাছে ফ্রান্সে আসার ছাড়পত্র না থাকায় ফরাসী পুলিস ওকে গ্রেপ্তার করে স্পেনে ফিরত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা। কার্মেনের পক্ষে সেটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। তল্পি-তল্পা বেঁধে সে আবার পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সে হাজির হয়। কিন্তু এবারও সে ফরাসী পুলিসের হাতে ধরা পড়ে।

আদালতে কার্মেন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকম্পা ভিক্ষা করে। সে বলে বিবাহ ঠিক করতে তার প্রেমিকের এক মাস সময় লাগবে এবং "আপনি যদি আমাকে স্পেনে পাঠিয়ে দেন তা হলে তৃতীয়বার ফ্রান্সে আসার মতো অর্থ আমি জোগাড় করতে পারবো না। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা বিয়ে যতদিন না হয় ততদিন যেন আমি এখানে কাজ করতে পারি।"

ম্যাজিস্ট্রেট কার্মেনকে এক মাসের কারাদণ্ড দেন।

অদ্ভুত সামগ্রী গিলেও বাঁচা যায়

মানসিক বিকারগ্রস্ত অনেককে মুদ্রা, সূচ, পিন, পেরেক, এমনকি কাচভাঙা, বাসন ভাঙা, হাতঘড়ি, থার্মোমিটার এবং চামচ ও কাঁটার হাতল পর্যন্তও গিলে ফেলতে দেখা যায়। ওয়াশিংটনের সেণ্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের শল্য ও অনুশীলন বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ

পেট্রলের শক্তিচালিত রাইফেলের সাহায্যে শান্তকরণ ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে এই দু হাজার পাউণ্ড ওজনের গণ্ডারটিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আমেরিকার কাসার মেডিকাল এণ্ড ইকুইপমেন্ট কোম্পানী উদ্ভাবিত এই সরঞ্জামের সহায়তায় দুর্লভ জন্তুদের সংরক্ষণ-উদ্যানে স্থানান্তরিত করা সহজ হবে।

ডবলু এলরিজ বলেন ঐসব ব্যক্তিদের পাকযন্ত্র ঐসব সামগ্রী বিষয়ে অসুবেদী। শেষ পর্যন্ত সবই হজম হয়ে যাবে অথবা পাকস্থলী তাদের অবস্থান বরদাস্ত করে নেবে।

হাসপাতালে ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় ডাঃ এলরিজ ঐ ধরনের শত শত রোগীকে পরীক্ষা করলেও এক ডজনেরও কম জনকে তাঁর অস্ত্রোপাচার করার প্রয়োজন হয়েছে। সাধারণত একটা ফাউন্টেন পেন বা নখ-চাঁচার উকো পাকস্থলীতে বাঁকের মুখে আটকে যায় বলেই কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার দরকার হয়।

শব্দময় সভ্যতা বধিরতা বৃদ্ধি করে

আধুনিক জীবন ধারার এক অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গ শব্দ কারখানার এলাকা ছাড়িয়েও বিস্তৃত হয়—আমেরিকার পাবলিক হেলথ সার্ভিস প্রকাশিত "শব্দ ও শ্রবণযন্ত্র" বিবরণীতে এই তথ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। বাড়িতেই হোক, কিংবা রাস্তায় অথবা খেলার মাঠে বহুবিধ সূত্র থেকে শব্দের উদ্ভব হয়। বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত লাঙল, বেতার, টেলিভিসন সেট, শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ক্ষৌরকার্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্র, মোটরগাড়ি, ভূগর্ভস্থ রেল প্রভৃতি আবহ শব্দ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়েই চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পনের জনের মধ্যে একজন কানে কম শোনে। ক্রমবর্ধমান শব্দ এই সংখ্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। শহরগুলিতে গোলমালের মাত্রা যত বৃদ্ধিলাভ করছে ততই বাস ও ট্যাক্সিচালক, রাস্তা নির্মাতা এবং ট্রাফিক পুলিসদের মধ্যে বধিরতা বৃদ্ধিলাভ করছে।

বিবরণীটিতে বলা হয়েছে যে, বধিরতা নানা কারণে প্রভাবিত হতে পারে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে শব্দের তীব্রতা যা ডেসিবলে মাপা চলে। স্বাভাবিক কথাবার্তা মোটামুটিভাবে ষাট ডেসিবল শব্দ সৃষ্টি করে। খুব বেশী যানবাহনে দাঁড়ায় আশী ডেসিবল এবং শব্দময় ভূগর্ভস্থ পথে একশ ডেসিবল। বিমানে যে শব্দ সেটা হয় একশ কুড়ি ডেসিবল। জেট ইঞ্জিন প্রায় একশ চল্লিশ ডেসিবলের কাছাকাছি পৌঁছায় যে ক্ষেত্রে শব্দ কানে বেদনার সঞ্চার করে। কলকারখানায় শব্দের মাত্রা সাধারণত যা পঁচাত্তর থেকে একশ দশ ডেসিবল হয় সেটা একশ তিরিশ বা একশ চল্লিশ ডেসিবল পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারে।

যে কোন ব্যক্তি যাকে প্রতিদিন ঘণ্টা কতক ধরে একশ কুড়ি ডেসিবল শব্দের মধ্যে কাটাতে হয় তার স্থায়ীভাবে বধির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানের কাছে প্রকৃতির জবাব

একটা সময় ছিল যখন অত্যন্ত সাদাসিদে সাজসরঞ্জামের সাহায্যে বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। সেদিন পাল্টে গেছে, এবং আজ যে কোন গবেষণাই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সম্প্রতি ৫.৩ মিলিয়ন জার্মান মার্ক ব্যয়ে তৈরী একটি সিনক্রোসাইক্লোট্রন যন্ত্র গোয়েটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়ে চালু করা হয়েছে। এই আধুনিক পারমাণবিক যন্ত্রটি বসানোর ফলে গোয়েটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও শিক্ষণের কেন্দ্র হিসাবে নিজের মহান ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নির্মাতা ফিলিপস কোম্পানী এই সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছেন এবং পশ্চিম জার্মানীতে এটিই সর্বপ্রথম এই ধরনের যন্ত্র। এই যন্ত্রটির লক্ষণীয় নূতনত্ব হচ্ছে এর বিকীরণকে ভিন্ন পথে পরিচালনের ব্যবস্থা যার সাহায্যে বিকীরণের মাত্রাকে দ্বিগুণ করে অ্যাক্সিলারেশন চেম্বার থেকে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষাকক্ষে নিয়ে যাওয়া চলে। এই সাইক্লোট্রনের একটি প্রধান অংশ হচ্ছে ২০০ টন ওজনের ছয় ফুট ব্যাসের একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক যার চৌম্বক ক্ষেত্রে ভারী হাইড্রোজেনের ডিউটেরনগুলি কিংবা হিলিয়াম আয়নগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০,০০০ কিলোমিটার হারে গতিশীল করা যাবে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২৮ কিংবা ৫৬ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট।

চারদিকে পুরু কংক্রীটের দেওয়ালঘেরা একটি বিশেষ ল্যাবরেটারীর মধ্যে এই পারমাণবিক গবেষণার যন্ত্রটিকে বসানো হয়েছে যাতে কোন মৌলিক পদার্থ কোন প্রকারে আশপাশের বায়ুমণ্ডলে মিশতে না পারে। এই যন্ত্রে উৎপন্ন আইসোটোপগুলিকে পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন তথা প্রাণী বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও শিল্পগবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। গোয়েটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগের সর্বময় অধ্যাপক ফ্লেমারসফেল্ট বলেছেন যে, পারমাণবিক গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধান করা এবং প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রকৃতিই তার সদুত্তর দিচ্ছে। নতুন সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি সে কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অধ্যাপক ডাঃ ম্যাক্সবর্ন তাঁর অভিভাষণে বলেছেন, "আজ প্রকৃতিবিজ্ঞান কি মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনছে? বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো; আমাদের যুগে মানবজাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত করে তুলছে। যে সকল বিজ্ঞানী বর্তমানে মহাকাশ গবেষণা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজ করছেন, তাঁরাই পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান ও তার ফলাফল সম্বন্ধে সমধিক উৎসুক।"

গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন

শান্তিপ্রিয় বসু

কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে সামগ্রিক কারিগরী উন্নতি সাধনই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে কৃষি এবং শিল্পের দ্বৈত উন্নয়নের দ্বারাই বিপুল জনসংখ্যার জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। এই লক্ষ্যে পৌঁছানর উদ্দেশ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষককে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক এবং কারিগরী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে কৃষক বর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতে সক্ষম হন এবং সম্প্রসারণশীল শিল্পকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারেন। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য যে কৃষি এবং শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই সমান কারিগরী ও আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন স্থিরমত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কৃষি-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষও গত দশ বৎসরের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে অধিক অগ্রগতি হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলিতে উভয় ক্ষেত্রেই সমান প্রচেষ্টা ও শ্রমবিনিয়োগ সত্ত্বেও সমান কৃতকার্যতা লাভ করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫০-৫১ সালে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন সূচক ৯৬ (১৯৪৯-৫০ এর উৎপাদনসূচক সংখ্যা যদি ১০০ ধরে নেওয়া হয়), ১৯৫৫-৫৬ সালে ১১৭ এবং ১৯৬০-৬১ সালে ১৩৫। এর অর্থ দশ বৎসরে শতকরা ৪১ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাৎসরিক বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ৩·৫ ভাগ। সে স্থলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সূচক সংখ্যা ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৩৯ (যদি ১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন সূচক-সংখ্যা ১০০ ধরে নেওয়া হয়) এবং ১৯৬০-৬১ সালে ১৯৪। দেখা যাচ্ছে যে দশ বৎসরে শতকরা ৯৪ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ শিল্প উৎপাদন বেড়েছে বৎসরে ৭ শতাংশ হারে। এ দ্বারা স্পষ্টত এই প্রমাণ হয় যে প্রথম দুটি পরিকল্পনা কালে কৃষি অপেক্ষা শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেক দ্রুততর হয়েছে।

অতীত পরিকল্পনাগুলির ন্যায় পরবর্তী পরিকল্পনা কালেও কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে তুলনা-মূলক অগ্রবর্তিতার বৈষম্য অব্যাহত থাকবে। তৃতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আশা করা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষির উৎপাদন সূচক-সংখ্যা হবে ১৭৬ যে স্থলে ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১৩৫। সুতরাং শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি হবে লক্ষ্য। শিল্পের লক্ষ্য হল ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩২৯ যে স্থলে ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১৯৪। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে হবে শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি।

বোঝাই যাচ্ছে যে গত দশ বৎসরে শিল্পের সম্প্রসারণ কৃষিকে ডিঙিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কৃষি যে শিল্পের পাশাপাশি চলতে পারবে তার আশ্বাস নেই।

কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের চাইতে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিকতর সফলতার বহু কারণ থাকা সম্ভব। এর একটি কারণ এই যে কৃষিক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ অর্ধশিক্ষিত কৃষকের চাইতে আধুনিক শিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন দক্ষ কর্মীর সুনিপুণ পরিচালনা ক্ষমতা। শিল্পে কয়েকজন আধুনিক উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা সাফল্য-লাভ করা সম্ভব। কিন্তু কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি, একটি লাঙ্গল এবং দুটি বলদের মালিক অতি সাধারণ একটি কৃষকের বিনিয়োগ

ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ পরিবর্তন সাধনে লক্ষ লক্ষ সাধারণ কৃষকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বিজড়িত। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে কয়েকজন অভিজ্ঞ এবং শিক্ষিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভরশীল।

কৃষকদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য বস্তুর পারস্পরিক সংহতির অভাব এবং বিচিত্র আর্থিক মানসিকতাই কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত কারিগরী পরিবর্তনে বাধাস্বরূপ। তার ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং চিরাচরিত প্রথা নূতন কৃষিজ প্রণালীর প্রতি কৃষককে বিমুখ করে তুলেছে। তার ব্যক্তিত্ব আধুনিক ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন মানসিকতার বিপরীত। কৃষিকার্য তার নিকট গতানুগতিক জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার উপায়, ব্যবসায়িক অর্থে অর্থোপার্জন নয়।

কৃষককে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের প্রতি আকৃষ্ট করা যে কত কঠিন এবং আয়াস সাধ্য প্রত্যেক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতি বৎসরই কৃষি বৈজ্ঞানিকগণ নূতন নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করছেন। নিরীক্ষামূলক খামারগুলিতে এ সব আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করে অত্যাশ্চর্য ফললাভ করা গেছে। কিন্তু তথাপি এই সমস্ত আধুনিক প্রণালীর প্রতি কৃষককুল কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করতে স্বভাবত অনিচ্ছুক। জাপানী প্রথায় ধানচাষ একটি উন্নততর পদ্ধতি এবং এর দ্বারা দেশের গড় উৎপাদনের উপর শতকরা একশত ভাগ বেশী ফলন লাভ করা সম্ভব হয়েছে তথাপি এই আধুনিক উন্নত পদ্ধতির প্রতি কয়জন কৃষক আকৃষ্ট হয়েছেন? জমিতে সবুজ সার উৎপাদন দ্বারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়; কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন কৃষকই জমিতে নিয়মিত সবুজ সার প্রয়োগ করে। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেখান যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষককে তার গতানুগতিক কৃষি পদ্ধতি থেকে এই সব নূতন নূতন উন্নত পদ্ধতিতে আকৃষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন এবং শ্রমসাধ্য।

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে—"যদি এই সব আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং ব্যবহার দ্বারা আরও অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় এবং কৃষকের ব্যক্তিগত অর্থোপার্জন বৃদ্ধি পায় তবে কৃষক এই সকল পদ্ধতির প্রতি বিরূপ কেন? কেন এই প্রতিরোধ স্পৃহা?" আপাত দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বহু উত্তর থাকাই স্বাভাবিক। এই সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সাধারণ কৃষকের গতানুগতিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার ফলে হয়ত কৃষক এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে নারাজ। কিংবা এই সব প্রণালীর ব্যবহারের জন্য যতটা আর্থিক মূলধন প্রয়োগের প্রয়োজন সেরূপ যথেষ্ট অর্থ কৃষকের নেই। অথবা এই সকল আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য যতটা কারিগরী নিপুণতা প্রয়োজন সেই নৈপুণ্য কৃষকের নেই কিংবা এই সব উন্নত কারিগরী পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে ফসলবৃদ্ধি করা যে সম্ভব সে সম্বন্ধে কৃষকের সম্যক ধারণা নেই। উক্ত যে কোনও একটি কারণ কৃষকের উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের বিরূপতার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু উক্ত সমস্যাগুলি গুরুত্ব-পূর্ণ হলেও তার সমাধান অসম্ভব নয়। অধিক পরিমাণ কারিগরী এবং আর্থিক সহযোগিতার দ্বারা এবং সম্প্রসারণ শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে কৃষককে এই উন্নত প্রণালীর কৃষি পদ্ধতির প্রতি হয়ত আরও অধিক আগ্রহশীল করে তোলা যায় কিংবা এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জটিলতাগুলি আরও সরল করে নেওয়া যায় যার ফলে কৃষক তার সীমিত নৈপুণ্যের দ্বারাই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহশীল হতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল এই যে কেবলমাত্র এই আর্থিক এবং ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সমাধানই কি যথেষ্ট? এই সমস্যাগুলির সমাধান করলেই কি এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণের পথে কৃষকের আর কোন বাধা থাকবে না?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের

সমাজ বিজ্ঞানের সহায়তায় এই সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির বাহিক এবং প্রাণিজ দিকটাই আমরা এতদিন দেখে এসেছি। কিন্তু প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষকের অভিপ্রায়ানুগতা, অভিলাষ এবং ঈপ্সিত লক্ষ্যবস্তুর গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন। অর্থাৎ গ্রামীণ সামাজিক মূল্যায়নের উপরেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল হতে পারে। এই সামাজিক মূল্যায়ন কিংবা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের স্বরূপ কি? ট্যালকট্ পার্সন্স্ এবং এডওয়ার্ড শীল্স্ এর মতে—"মূল্যবোধ একটি বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী ধারণাশক্তি। এই ধারণাশক্তি একটি ব্যক্তি বিশেষের কিংবা গোষ্ঠী বিশেষের বৈশিষ্ট্য, যার দ্বারা সেই ব্যক্তির কিংবা সমষ্টির কোনও একটি লক্ষ্যবিন্দুতে উপনীত হবার উপায় এবং গতিপথ নির্দিষ্ট হয়।" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মূল্যবোধকে আমরা ঐচ্ছিক ধারণা-শক্তি বলে অভিহিত করতে পারি। ব্যক্তির কিংবা সমষ্টির একটি ঈপ্সিত বস্তু লাভ করার অনেকগুলি উপায় থাকে এবং সেই ব্যক্তি কিংবা সমষ্টির কোন পথ কিংবা উপায় গ্রহণ করবে সেটা নির্ভর করে তার মূল্যবোধ কিংবা ঐচ্ছিক ধারণা শক্তির উপর।

ম্যাক্স্ বেবার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি প্রটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দি স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজ্ম্" এ দেখিয়েছেন, কিভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং অবশেষে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তদানীন্তন পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নয়নের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সবাই ছিলেন প্রোটেস্টান্ট এবং এই প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের গতানুগতিকতাকে নিশ্চিহ্ন করেছিল। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়ে ছিল যে, সংচিন্তা এবং সংকার্যই আত্মিক মুক্তির একমাত্র পথ। তখন পাপ, অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্ত এবং অবশেষে মোক্ষলাভ এই ধর্মীয় চক্রেই মানুষের জীবন আবর্তিত হতো। গতানুগতিক কৃচ্ছ্রসাধন এবং সংজীবন যাপনই ছিল ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মোক্ষ লাভের চরম এবং একমাত্র উপায়।

কিন্তু তার সংচিন্তা, সংকর্ম এবং নিষ্কাম জীবনযাপন কোনও ব্যবহারিক উন্নতি সাধনের এবং উন্নততর জীবনমানের পথ নির্দেশ করতে পারে নি। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস সেই পথনির্দেশ করতে পেরেছিল। এই নতুন ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা দিল যে, সম্পদ আহরণ মানব জীবনের কর্তব্য এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণালাভের উপায়। কায়িক শ্রম কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় নয়, আত্মিক

মিতব্যয়, মিতাচার এবং পরিণামদর্শিতা এইসব ব্যক্তিগত সদগুণ আত্মিক উন্নতির পথ। যে সম্পদ-লিপ্সা ছিল ক্যাথলিক ধর্মমত অনুযায়ী পাপ, প্রটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস তাকে পরম পুণ্য বলে স্বাগত জানাল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গৌরব-বৃদ্ধিই হল একমাত্র জাগতিক কর্ম। খৃষ্টধর্ম বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষের প্রধান কর্ম হল ঈশ্বরের আদেশ পালন করা এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করা। এবং কঠিন শ্রম এবং আহরণ দ্বারাই ঈশ্বরের পবিত্র অভিলাষ পূরণ করা সম্ভব। এই নতুন বিশ্বাস এবং ধর্মবোধের উন্মেষের ফলে এক বুদ্ধিদীপ্ত আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হল। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা বেবার দেখিয়েছেন কিভাবে এই নূতন মূল্যবোধ পশ্চিম ইয়োরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের পথ সুগম করল।

তেমনি কিভাবে হিন্দুধর্মীর বিশ্বাস ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল বেবার তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন "রিলিজিয়ন্ অফ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে। ভারতবর্ষের কর্ম কেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসই ছিল ধনতন্ত্র বিকাশের প্রধান বাধা স্বরূপ। ইহ জন্মের কর্মরূপই নির্দিষ্ট করবে পরজন্মের জীবনরূপকে। সুতরাং এই জন্মের কোনও কর্ম বর্তমান জীবনের উন্নতি সাধন করতে পারবে না— পরজন্মের উন্নতি সাধন করবে মাত্র। ছুতোর, শূদ্র, এবং চামার এই জন্মের কৃতকর্মের জন্য ব্রাহ্মণ হতে পারবে না। কিন্তু যদি সৎপথে, সৎভাবে তার বর্ণনির্দিষ্ট কাজ করে এবং পুণ্য সঞ্চয় করে তবে তা আগামী জন্মের জীবন চরিত্রকে প্রভাবিত করবে। গীতার মূলবাণী হল—"কর্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" কারণ বর্তমান জীবনের কৃতকর্মের ফল আগামী জন্মেই প্রাপ্য। এ জীবনে শুধু জন্ম নির্দিষ্ট পথে কর্তব্য সম্পাদন কর। এই ধর্মবিশ্বাস হিন্দুধর্মে এক বিরাট স্থিতি আনয়ন করেছে। এবং স্থিতাবস্থাই পরিবর্তনের প্রধান বাধা।

সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায় ব্যবহারিক লাভ এবং উন্নতি হিন্দু সমাজের মূল্যায়নের বিরোধী। কারণ এক হল ধার্মিক হিন্দু কেবলমাত্র লাভের জন্য কর্ম-সম্পাদন করে না। তার জন্ম নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করে মাত্র। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুর বর্ণ এবং কর্ম নির্দিষ্ট হয়। কর্মের দ্বারা বর্ণ পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনাই তার নেই।

সুতরাং এই মূল্যবোধই যে সমাজে মূল কথা সে সমাজে কোনও উন্নয়ন এবং পরিবর্তন আনয়ন করা কঠিন শ্রমসাধ্য। বেবার বলেছেন—"হিন্দু সমাজে যতদিন এই কর্ম-কেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের আধিপত্য থাকবে বৈপ্লবিক মতবাদ এবং উন্নত চিন্তাধারা আনয়ন করা অবিশ্বাস্য।" কি ভাবে হিন্দু-ধর্মবিশ্বাস গতানুগতিকতার প্রশ্রয় দেয় সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"হিন্দু সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নূতন পরিবর্তনে এবং চিন্তাধারার প্রতি একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং ভীতিমিশ্রিত বীতরাগ। এমন কি আজও একজন ভারতীয় পাট চাষীকে তার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারে প্রবৃত্ত করা যায় না। কারণ এটা তার "দেশাচার বিরোধী।"

সুতরাং এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, হিন্দু সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তন বিরোধী। এই সমাজে ব্যবসায়িক বাস্তবতা-বাদের উন্মেষ সম্ভব নয়। কারণ ব্যবহারিক লাভের জন্য কেউ কর্ম করে না। সবাই বর্ণ নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে। সুতরাং যখন রাষ্ট্র নিযুক্ত কৃষিকর্মী বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও কৃষককে উন্নততর কৃষি পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট করতে না পেরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে ত্যাগ করে তখন সেই হতভাগ্য চিরাচরিত প্রথানুরক্ত কৃষককে দোষারোপ করে লাভ নেই। তার পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে যে মূল্যবোধ সে উত্তরাধিকার সূত্রে আহরণ করেছে সে শতাব্দী-লালিত মূল্যায়ন একদিনে পরিত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়।

সমাজতত্ত্বের এই বৃহত্তর বিশ্লেষণী ক্ষেত্র থেকে সূক্ষ্মতার বিশ্লেষণী ক্ষেত্রেও আমরা এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। রাষ্ট্রীয় কৃষিবিভাগের অন্তর্গত সামাজিক কৃষি সমীক্ষা বিভাগ সোসিও-এগ্রো-ইকনমিক রিসার্চ ইউনিট্ দ্বারা বারাসত মহকুমায় যে সমীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে যে সমস্ত কৃষক এই নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাদের মূল্যবোধ অন্যান্য কৃষকদের চাইতে ভিন্নতর। তাদের মানসিকতা বাস্তব, বিজ্ঞানসম্মত এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সুলভ। যে সকল কৃষক এই সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি বিরূপ তাদের মানসিকতা চিরাচারিতাশ্রয়ী এবং ধর্মকেন্দ্রিক।

কুসুম নায়ার তাঁর "ব্লসমস্ ইন দি ডাস্ট" গ্রন্থে কৃষি উন্নয়নের এই মানসিক দিকের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি পূর্ণ এক বৎসর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করেছেন এবং অবসর সময়ে কৃষকদের সঙ্গে তাদের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করেছেন। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন যে, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সমস্যা কারিগরী উন্নতি সাধন নয়। এর প্রাথমিক সমস্যা মানবিক। তাঁর মতে—"ভারতে কৃষি উন্নয়নের মূল সমস্যা ব্যবহারিক জ্ঞান কিংবা কারিগরী নিপুণতা নয়, বরং কার্য এবং শ্রমের প্রতি সামাজিক মনোভাবই এর মূল সমস্যা।" তিনি আরও বলেছেন—"মূল্যবোধের বিভিন্নতার উপরই যে কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নির্ভরশীল।"

"সমান সুযোগ এবং আর্থিক সহযোগিতা দান করলেই সর্বস্তরের মানব গোষ্ঠী অভিন্ন হৃদয়ে সাড়া দেবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমান উদ্যমসহ শ্রমশীল হবে", পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির এই প্রচ্ছন্ন একদেশ-দর্শিতার তিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন।

সুতরাং সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায় যে, সীমাবদ্ধ আশা আকাঙ্ক্ষা এবং চিরাচারিতাশ্রয়ীতায় পক্ষাঘাতগ্রস্থ ৫ কোটি কৃষক কুলের মনোভাব এবং মূল্যবোধের উপরই ভারতবর্ষের কৃষি উন্নয়ন নির্ভরশীল।

এই নিবন্ধের উপসংহারে একটি জার্মান প্রবাদবাক্য উদ্ধৃত করছি:—"হয় সুগভীর নিদ্রা উপভোগ কর, না হয় যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ কর।" আমাদের সুপ্তিমগ্ন কৃষককুলের খাদ্য গ্রহণ স্পৃহা বৃদ্ধি সাধনই কৃষি উন্নয়নের মূল্য সমস্যা।"

চিত্রপ্রদর্শনী

গত ১৫ই অক্টোবর থেকে আর্টিস্ট্রি হাউসে তিনজন শিল্পীর কাজের একটি সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রণব

কনে — শিল্পী : অতীন মিত্র

মুখোপাধ্যায়, নিমাই দাস এবং অতীন মিত্র —তিনজনই একই সঙ্গে কলকাতার আর্ট কলেজে চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। তিনজনের মোট যে তেতাল্লিশখানি ছবি এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি তাঁদের নতুন আঁকা—অধিকাংশই এই বছরের।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কুড়িখানি ছবিতে বিষয়বস্তুর দিকে থেকে বাস্তবকে অবলম্বনের একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং রকমারিত্ব আনারও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সরল ও বৃত্তাকার অত্যন্ত মোটা রেখা এবং উজ্জ্বল বর্ণের প্রয়োগের মধ্যে একটা একঘেয়েমির ভাব চোখে বড় লাগে। চরিত্রগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির মধ্যে অহেতুক করুণভাবের টান জীবনটা যে সকলের ক্ষেত্রেই দুর্বিষহ এমন একটা ধারণার সঞ্চার করে। ওরই মধ্যে 'জীবনের যা-কিছু অবশিষ্ট' (৩নং), গাছতলার বারবণিতাদের খরিদ্দারের প্রতীক্ষায় থাকা 'জীবিকা অর্জন' (৯নং), 'শীত' (১১নং), 'পাখিওয়ালা' (১৮নং) প্রভৃতি ছবি কখানি কিছুটা শিল্পবৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়।

নিমাই দাসও মোটা রেখায় বাস্তব-জীবনের কতকগুলি চরিত্রের বিশেষ ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিকে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর বারো-খানি ছবিতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা ও পড়ার দৃশ্যই বেশী। ঘন রঙে মুখের চেহারাকে আবছা করে তোলার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। এঁর আঁকা 'হুত' (২৪নং), 'একটি খেলার সামগ্রী' (২৫নং), 'বুদ্বুদ' (২৯নং) এবং 'শ্বেত ভূমিকা' (৩০নং) দেখে বোঝা যায় এখনও ইনি নিজস্ব একটা ভঙ্গীর উদ্ভবের চেষ্টায় রত আছেন।

অতীন মিত্রের এগারোখানি ছবির মধ্যে বিষয়বস্তু ও অঙ্কনরীতির মধ্যে বেশ একটা

পাখিওয়ালা — শিল্পী : প্রণব মুখোপাধ্যায়

গালগল্প শিল্পী: বিমল কর

বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। রেখা ও রঙের মধ্যে একটা ছন্দ আনার চেষ্টা আছে। এ'র আঁকা 'কনে' (৩৬নং), 'শ্বেত মূর্তি' (৩৯নং) এবং স্থাপত্যরীতিতে শহরের উ'চু বাড়ির আকারে মূর্তি'র আভাসযুক্ত 'নাগরিক' (৪১নং), 'স্নানার্থিনী' ছবিকখানি প্রশংসিত হবার যোগ্য।

*

১৮ই অক্টোবর থেকে আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী হয় বিমল করের চল্লিশখানি ছবির। ইনিও কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাস করেছেন এবং বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কাক্রাবানে বেসিক ট্রেনিং কলেজে লেকচারারের পদে অধিষ্ঠিত।

ইতিপূর্বে সম্মিলিত প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখা গেলেও একক প্রদর্শনী এই প্রথম। তবে একই প্রদর্শনীতে একজনের এতোগুলি ছবি ভিড় বলে মনে হয় এবং খুঁটিয়ে সবগুলি দেখে ঠিকমতো বিচার করাও সহজ নয়।

বিমল করের ছবিতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে রকমারিতা আছে, রেখা ও রঙে একটা স্বচ্ছন্দতা আছে এবং নয়নাবিমোহন ছন্দোময় প্যাটার্ন সৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা শিল্পরেশ লক্ষ্য করা যায়। তেলরঙে তুলিতে আঁকা, রঙপেষা ছুরির দ্বারা রঙ প্রয়োগে তৈরি, কাঠকয়লা এবং রঙখড়িতে আঁকা ছবির সমাবেশ শিল্পীর বৈচিত্র্যপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। কাগজ কেটে তৈরিও একখানি ছবি আছে। ইদানীং তিনি সরল ও বৃত্তাকার রেখার সহায়তায় আধুনিক রীতির ছবি আঁকাতেও যে পরীক্ষা করছেন সে পরিচয়ও পাওয়া গেল। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' (৬নং) ছবিখানিতে বিমূর্ত ধারায় ছবি আঁকার তিনি চেষ্টা করেছেন। প্রতিকৃতি আঁকাতেও শিল্পীর সুন্দর হাত আছে তার পরিচয় পাওয়া গেল কাঠকয়লায় আঁকা (১২নং) এবং তেলরঙে 'জনৈক শিল্পী' (৩০নং) ছবি দু'খানিতে।

'উদ্বাস্তু' (৩৯নং), 'দলবদ্ধভাবে কাজ' (৩৮নং), 'শৃঙ্গার' (২৯নং), 'প্রত্যূষের চিন্তা' (৩১নং), 'একাগ্রতা' (৩৩নং), 'তীর থেকে যাত্রা' (৩২নং) প্রভৃতি ছবিগুলিতে বিষয়বস্তুকে ভাবময় করে তোলায় দক্ষতা দেখা যায়। 'গালগল্প' (৮নং), গুমতি নদী' (১৬নং), 'গ্রামের হাট' (১৭নং) ছবিগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। রঙের দিক থেকে বিশেষ প্রশংসা লাভ করার মতো 'স্থির জীবন' (৯নং), 'মরসুমি ফুল' (১০নং), 'সবুজ ভূমিতে ফুল' (১৫নং), 'চুল বাঁধা' (২৩নং)—ছবি ক'খানি বেশ একটা প্রফুল্লতা এনে দেয়।

জেলে শিল্পী: হাকু শা

*

বোম্বাইয়ের তরুণ চিত্রশিল্পী হাকু শা'র ছবির একক প্রদর্শনী গত ১৭ই অক্টোবর অশোকা গ্যালারিতে উদ্বোধিত হয়েছে। অধ্যাপক এন এস বেনদ্রে ও সুব্রাহ্মণ্যের অধীনে বরোদার আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ অন্তে ১৯৫৯ সালে চারুকলায় এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ইনি আহমেদাবাদের আন্তর্জাতিক নক্সাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত।

রঙপেষা ছুরি দিয়ে আঁকা সমেত সাতের-খানি তেলরঙের সাহায্যে তৈরি ছবির মূর্তি-গুলিকে অস্বাভাবিক দীর্ঘায়িত করা। রেখার সংস্থাপন এবং রঙের প্রয়োগে পাশ্চাত্ত্যের, বিশেষ করে বর্তমান ফরাসী শিল্পধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিন্যাসে স্থাপত্য-রীতির অনুসরণও কতক ছবিতে স্পষ্ট। তবুও শিল্পী হাকু শা' একটা নিজস্ব ভংগীর উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন যা চিত্ররসিক মাত্রেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ছবিগুলিতে রঙের প্রয়োগে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদর্শনীটি আগামী ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকবে।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

বেতার জগৎ-এ প্রকাশিত টোড়ি রাগিণীর চিত্র

এবারকার শারদীয় বিশেষসংখ্যা "বেতার জগৎ"-এ একটি চমৎকার রঙীন চিত্র ছাপা হয়েছে; নাম—রাগিণী টোড়ি (রাজপুত চিত্র)। ছবিতে অরণ্যের পটভূমিকায় চলমানা নায়িকাকে দেখা যাচ্ছে, তার চারিদিকে কয়েকটি ময়ূর, আকাশে মেঘ, দুটি উড়ন্ত বলাকার মত পাখি। বর্ণশোভিত ছবিটি সুন্দর—এটি নিঃসংশয়ে পত্রিকার সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করেছে; কিন্তু এর পরিচয়টি যথার্থ নয়, অর্থাৎ, চিত্রটি আর যে রাগেরই হোক টোড়ির নয়। এই অসংগতি অনেকের চোখে পড়বে না, কেননা রাগ-রাগিণীর চিত্ররূপ সম্বন্ধে অনেকের অভিজ্ঞতা নেই, কৌতূহলও নেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন কারণ আজকাল দেখা যাচ্ছে এই ধরনের চিত্রগুলির পরিচয়ে প্রায়ই ভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে। সম্পাদকদের এর জন্য দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হবে না কারণ সকলেই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ'তে পারেন না; যাঁরা চিত্রগুলি প্রেরণ করেন দায়িত্বটা তাঁদের ওপরেই অর্পণ করা উচিত।

টোড়ি সম্বন্ধে এমন কোনও চিত্র পরিকল্পিত হয় নি যেখানে হরিণের উপস্থিতি নেই—অথচ হরিণের চিহ্নও ছবিতে নেই। রাগ-রাগিণীর মূল পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকলেই রাগমালা চিত্রের ওপর নির্ভর করেন কিন্তু রাগমালারও নানারকম পরিবর্তন ঘটান হয়েছে পরবর্তীকালে। অনেকের সংগ্রহে এইরকম চিত্র আছে কিন্তু কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে, সেগুলিই যথাযথ। এক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বর্ণনাকে স্বীকার করা উচিত। অনেকের হয়তো জানা নেই যে, তুহ্ফাতুল্ হিন্দ্ নামক গ্রন্থে (১৬৭৬) মীর্জা খাঁ যত্ন করে সাক্ষাৎ রাগমালা চিত্র থেকে রূপগুলি বর্ণনা করেছেন। রাধামোহন সেন তদীয় সংগীততরঙ্গ গ্রন্থে রাগাদির ধ্যানগুলি এই কেতাব থেকেই সংগ্রহ করে অনেক রঙ চড়িয়েছেন; কিন্তু রাগমালার উল্লেখও করেন নি। মীর্জা খাঁর পক্ষে মূল চিত্র পর্যবেক্ষণ করা কঠিন ছিল না, কেননা তিনি উচ্চতর সমাজে বিচরণ করতেন এবং এই চিত্রপরিকল্পনা হয়ত খুব বেশীদিন পূর্বের ঘটনা নয়। টোড়ি রাগিণীর লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে, এটি মালকোশ-এর রাগিণী জাতি সম্পূর্ণ। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—সাতটি সুরই লাগে। শিশির ঋতুতে দিবসের এক প্রহর অতিক্রান্ত হলে গাওয়া বিধেয়। চিত্ররূপ সম্বন্ধে বলছেন—টোড়ি রাগিণীর সজ্জাবিহীন শুভ্র দেহ। পরিধানে শুভ্র শাড়ি। কর্পূর, জাফ্রানের অনুলেপনযুক্ত। প্রান্তরে দণ্ডায়মান অবস্থায় নায়িকা বীণা-বাদনরতা। একটি হরিণশিশু আদরবিহ্বলভাবে সেই বাদ্য শ্রবণে রত এবং আসক্ত ও আচ্ছন্ন অবস্থায় বীণাবাদিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। সোমনাথ যিনি নাদময় এবং দেবময় রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তিনি বলছেন—

কলিতবিপঞ্চী বিপিনে
লালিতহরিণারুণাম্বরা হরিণী।
ধবলাঙ্গরাগরচনা মৃদুবচনা ভূষিতা
তোড়ী॥

দর্পণে টোড়ির বর্ণনা মীর্জা খাঁর বর্ণনার অনুরূপ :

তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে
বীণাধরা তোড়িকেয়ম্॥

রাধামোহন সেন এই রাগিণীর দুটি বর্ণনা দিয়েছেন। মূল বস্তু একই। বাহুল্য বর্জন করে আসলটুকু উদ্ধৃত করি—

মালকোশ প্রিয়া টোড়ি বালা পীতবরণা।
কেশর কর্পূর অঙ্গে শ্বেত বস্ত্র পরণা॥
প্রান্তরে বসিয়া করে বীণাযন্ত্র বাজনা।
গান শুনি কুরঙ্গিনিগণ হয়্যা মগনা।
সম্মুখে করিছে নৃত্য নাহি ভীতি চেতনা॥

এতগুলি বর্ণনায় কোথাও রাগিণী টোড়ির এমন চিত্র নেই যেটি বেতারজগৎ-এ প্রকাশিত চিত্রের সঙ্গে মেলে। সম্ভবত এটি

[illegible] মল্লারীর চিত্ররূপ। রাধামোহন [illegible] বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া গেল :

মল্লারীর রূপে আলো করে তিনপুর।
রক্তবাস পীত কাঁচলি মেঘ বধূর॥
ধরিল বরষা ঋতু রূপের মুকুর॥
ঋতুর প্রভাবে ঘন হয়্যা শতপুর।
দশ দিক অন্ধকার করিল প্রচুর॥
ঘোর গরজনে শব্দ শুনি গুরু গুরু।
চপলা চমকে বজ্র শব্দ দুরু দুরু॥
আনন্দে ময়ূরী নাচে সহিত ময়ূর।
চাতকের পিউ রব ডাকয়ে দাদুর॥

অপরাপর ব্যাপারের মত রাগরাগিণীর ছবিতেও গোলমাল দেখা দিয়েছে। আর্ট এবং সংগীত বিষয়ক পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ সাবধানতা অবলম্বন না করলে ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

বেতার জগৎ-এর কর্তৃপক্ষ একটু অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন আসলে চিত্রটি কোন রাগিণীর এবং যথার্থ পরিচয়টি উদ্ঘাটিত করে পাঠকসাধারণকে জানালে উপকার সাধিত হবে।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

=ষোল=

রাত্রিবেলা মেলগাড়ি হু-হু করে ছুটেছে। মাঝের জংশন-স্টেশন থেকে মধুসূদন মা-বউ আর বাচ্চা-ছেলে নি[illegible] উঠল। জুড়নপুরে সাহেব ঘুমন্ত আশালতার গায়ের গয়না চুরি করল, এই বাচ্চাকে তখন চার বছরেরটি দেখেছি। এ সময় মাস পাঁচ-ছয় বয়স।

রোগা মানুষ মধুসূদন, কিন্তু অশেষ কর্মিতকর্মা। মানুষ তুলে দিয়ে মালপত্তর গুনে গুনে তুলে সর্বশেষ নিজে উঠল। কামরার চতুর্দিকে মুহূর্তকাল নিরীক্ষণ করে দেখে। মাল ও মানুষ কোথায় কি ভাবে খাপ খাওয়াবে, মনে মনে তার নক্সা ছকে নিল। মা'কে বলে, ঐ কোণের বেঞ্চিটা নিয়ে নিলাম আমরা। দিব্যি নিরিবিলি হবে। চলো—

আগে আগে চলল সে নিজে। ঐ তো তালপাতার সেপাই—একে ডিঙিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে বোঁচকাবুচকি টিনের সুটকেস গ্লাডস্টোন-ব্যাগ ঘাড়ে তুলে ও হাতে ঝুলিয়ে টুকটুক করে পছন্দ-করা জায়গাটায় এনে ফেলছে। গোটা বেঞ্চিখানায় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে বলে, বসে পড় এইবার।

বউকে বলে, বাচ্চা কোলে কেন? ঐ কোণে শুইয়ে দাও। যত বেশি জায়গা জুড়ে নিতে পার এই সময়।

মালপত্র কোনটা বেঞ্চির তলে ঢুকিয়ে কোন কোনটা বাঙ্কের উপর তুলে দিয়ে লহমার মধ্যে গোছগাছ করে ফেলে। বউয়ের উপর খিঁচিয়ে উঠল : ওকি, হাত-পা গুটিয়ে অমনধারা কেন? গা-গতর ছড়িয়ে জায়গা নাও। এখন এই ফাঁকা দেখছ, এমন থাকবে না, তালতলা স্টেশনে গিয়ে বুঝবে ঠেলা। কালীপুজো গেছে কাল—পুজো দেখে কালীর মেলা সেরে মানুষজন ফিরে যাচ্ছে। কামরায় সর্ষে ফেলার জায়গা থাকবে না দেখো। বললাম যে জগদ্ধাত্রীপুজোর কটা দিন থেকে জগদ্ধাত্রীপুজোটা কাটিয়ে যাই। মামারাও কত বলল। তা মা'র হয়েছে—একটা জায়গায় যাবার বেলায় যেমন, আসার বেলাও তাই। রোখ চেপে গেলে আর রক্ষে নেই।

মধুসূদনের মা বলে ওঠেন, হাঁপানির টানে কর্তার কখন কি অবস্থা, মেয়ে দুটো পড়ে রয়েছে—মন ব্যস্ত হয় না! তোমার কি, চর্ব্য-চোষ্য খাওয়া আর আড্ডা রাজা-উজির মারতে পেলেই হল।

দিদিমাকে দেখতে মধুসূদনরা মামার বাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিল, ফিরছে এখন। মধুর মা নিজেই বুড়োমানুষ—তাঁর মা একেবারে থুন থুনে হয়ে পড়েছেন—কবে আছেন কবে নেই। নাতি মধুসূদনের ছেলেকে একটিবার তিনি চোখে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ সংগে নিজের মেয়ে মধুর মা'কে দেখাও হয়ে গেল। মধুর বাপ রোগি-মানুষ—নড়তে চড়তে পারেন না, তিনি রয়ে গেলেন জুড়নপুরে। আশালতা শান্তিলতা দু-বোনও বাপের সঙ্গে। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে পথে বেরুনো ঠিক নয়। তা ছাড়া বোন দুটোও চলে এলে রোগি-মানুষটাকে দেখে কে? মাত্র আটটা দশটা দিন থেকে সেই জন্যেই আরও তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরা।

বলেছে ঠিক, মধুসূদন খবরাখবর রাখে। তালতলার কাছাকাছি জঙ্গলবাড়ির শ্মশান-কালী বড় জাগ্রত। কালীপুজোর সাতদিন আগে থেকে শ্মশানক্ষেত্রে মেলা বসে। পুজো অন্তে আজ সকাল থেকেই মানুষ ঘরে ফিরতে লেগেছে। পায়ে হেঁটে, গরুর-গাড়িতে, নৌকায়, ট্রেনে। মেলগাড়ি তালতলা স্টেশনে না পৌঁছতেই তুমুল হৈ-

চৈ কানে আসে। দাঙ্গাই বেধে গেছে হয়তো বা প্লাটফরমের উপর।

মায়ের পাশটিতে মধুসূদন নির্বিঘ্ন জায়গা নিয়ে বসেছে। ঝিমুনিও এসেছিল একটু। গণ্ডগোলের সাড়া পেয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে। কামরার দেয়ালে লেখা ঃ বত্রিশজন বসিবেক। তাড়াতাড়ি মানুষ-গুলো গনে নেয়। ছোট-বড়য় মিলে তেইশ। পুনশ্চ গনে নিঃসংশয় হয়, তেইশই বটে। তিন লাফে তখন দরজায় গিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ট্রেন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে গেছে। বন্যাস্রোতের মতন লোক এসে দরজার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামরার ভিতর থেকে মধুসূদন বীরমূর্তিতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে। বলে, খুলে দিচ্ছি—চলে আসুন। মোটমাট নয়জন। তেইশ আর নয় বত্রিশ। তার উপরে আধখানা নয়। আধখানা কি, একটা কড়ে-আঙুল অবধি ঢোকাতে দিচ্ছিনে। আইন মোতাবেক কাজ।

কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা রক্তাম্বরধারী দীর্ঘদেহ একজন—কালীভক্ত মানুষ সেটা আর বলে দিতে হয় না—জঙ্গলবাড়ি কালীর মেলা থেকেই ফিরছেন। দরজার সামনে এসে অনুনয়ের কণ্ঠে বলছেন, যেতে হবে যে ভাই। দুয়োরটা ছাড়।

মধুসূদন বলে, জায়গা নেই, বত্রিশ পুরে গেছে।

সাধু-মানুষটি হেসে বলেন, আমায় দিয়ে তেত্রিশ হবে। হয়ে যাবে একরকম করে। আমি আর কতটুকু জায়গা নেব। হয় কিনা, দেখিই না উঠে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে ওঠে ঃ দেখবে কী আবার? লেখা রয়েছে বত্রিশ।

আমি যে যাবই ভাই—

বে-আইনি করে?

রক্তাম্বর সাধু ঝকঝকে দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলেন, তুমি বুঝি আইনের বাইরে যাও না কখনো? আমি যাই। যারা আইন করে তারাও যায়।

বচসার মধ্যে মধুর মা ওদিকে ভীত স্বরে চেঁচাচ্ছেন ঃ ওরে মধু, চলে আয় তুই। তোর তো জায়গা রয়েছে, চুপচাপ এসে বসে পড়। একবার গোঁয়ার্তুমি করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, কোনরকমে প্রাণরক্ষে হয়েছে—

গর্জে উঠে মধুসূদন মায়ের কথা ডুবিয়ে দেয় ঃ প্রাণ যায় যাবে সে মরণে পুণ্যি আছে। লোকে বলবে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে মরেছে।

রক্তাম্বর ইতিমধ্যে পাদানির উপর উঠে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে কামরার অবস্থা দেখছেন।

মধুসূদন ব্যঙ্গস্বরে বলে, ঐ উঁকি-ঝুঁকি পর্যন্ত। তার উপরে হবে না। আমি থাকতে নয়। দেখই না হয়ে একবার

চেষ্টা করে। তার চেয়ে গাড়ি ছাড়বার আগে অন্য কোনখানে চেষ্টা দেখগে।

ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তাঁকে। হঠাৎ সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। সাধুটি বাঁ-হাত আলগোছে রাখলেন মধুর গায়ের উপর। জোর করে সরিয়ে দিলেন এমন কথা কেউ বলবে না। মন্ত্রবলে মধু আপনিই যেন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে তাকাচ্ছে : এত শক্তি ধরে কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মতো সরু সরু ঐ আঙুলগুলো!

হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে কামরায় ঢুকে পড়ে মধুকে বললেন, জায়গায় গিয়ে বোসোগে। সবাই যাবে, একলা তোমার গেলে তো হবে না। এই ট্রেনে না গেলে প্লাটফরমে পড়ে সারারাত মশার কামড় খেতে হবে। পরের ট্রেন কাল দুপুরবেলা।

দরজা একেবারে মুক্ত করে দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, কম্‌সে‌কম আরও বারো-চোদ্দ জনের জায়গা হয়। চলে আসুন, পয়লা ঘণ্টা দিয়েছে।

মধুসূদন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে সাধু স্নিগ্ধস্বরে প্রবোধ দেন : অমনধারা করে না—ছিঃ! খুলনা অবধি যাওয়া নিয়ে ব্যাপার। তারপরে এ কামরা তোমারও নয়, আমারও নয়। ক ঘণ্টার মামলা, তার জন্যে এমন মারমুখি কেন ভাই?

দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে এক দঙ্গল ঢুকে পড়ল। পরের লোক এসে বেঞ্চিতে বসে বসে পড়ছে, রক্তাম্বর নিজে কিন্তু জায়গা কাড়াকাড়ির মধ্যে গেলেন না। বাঙ্ক বোঝাই জিনিষপত্র, তারই কতক ঠেলে-ঠুলে কায়ক্লেশে একজনের মতো একটু জায়গা হল। রক্তাম্বর বাঙ্কের উপর উঠে গেলেন। মধুর মা-বউ বসেছেন, তাঁদেরই প্রায় মাথার উপরে।

সমস্ত হল। কিন্তু দ্বাররক্ষী মধুসূদনেরই বিপদ এখন। মায়ের পাশে যেখানটা সে বসেছিল, ছুটোছুটি করে নতুন এক ছোকরা সেই জায়গায় এসে বসে পড়েছে।

মধুসূদন হুংকার দিয়ে পড়ে : উঠে পড়ুন আমার জায়গা এটা।

রণে পরাজিত মধুকে কে পোঁছে এখন! সেই ছোকরা খানিকক্ষণ তো কানেই শুনতে পায় না। বলে, জায়গাটা কি কিনে রেখে গেছেন মশায়?

মধুসূদন বলে, জায়গা ছেড়ে দরজায় চলে গেলাম সকলের উপকার হবে বলে।

উত্তম করলেন, পরের উপকারে পুণ্য হয়। পরকে বসতে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে কষ্ট করুন আরও পুণ্যি। গাড়ি এখন স্টেশনে স্টেশনে থামবে, আপনি বরঞ্চ দুয়োর আটকে লোক খেদিয়ে সারা রাত পুণ্যি সঞ্চয় করুন। বসতে যাবেন কি জন্যে?

এই নিয়ে আবার একদফা জমে উঠছে, ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধের ব্যাপার। ঠিক সামনের বেঞ্চিতে সাহেব আর নফরকেষ্ট। নফরকেষ্টর আপিসের পোশাক—ধবধবে জামা-কাপড়, চোখে নীল চশমা। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের জায়গা করে দেয় : বসুন আপনি। সত্যিই তো, আপনার একার কিছু নয়—সকলের জন্য লড়তে গিয়েছিলেন।

মধুর মা চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছেন সাহেবের দিকে। দেবতার মতো রূপবান ছেলের বিনয় ও বিবেচনা দেখে গলে গেছেন একেবারে। বাধা দিয়ে বললেন, সে হয় না। জায়গা ছেড়ে দিচ্ছ, তোমাকেও তো বাছা এত পথ তাহলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মধুর হক্কের জায়গা অন্য একজনে জুড়ে বসে রইল, সে তো একবার নড়ে বসে না। তুমি তবে কি জন্যে উঠতে যাবে? বসে থাক, যেমন আছ।

সাহেব হাসে। সরু সরু সাদা দাঁত। ছেলেপুলের দুধে-দাঁত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে বলতে হয়, এর বদলে তোমার দাঁত দিও ইঁদুর; নতুন দাঁত ঠিক যেন ইঁদুরের মতো হয়। সাহেবের সেই ইঁদুরের দাঁত। ক্ষুদে ক্ষুদে দুই পাটি দাঁতের অপরূপ হাসি—ঐ হাসি দেখেই মানুষের আরও বেশি করে টান পড়ে। হেসে সাহেব বলে, বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে মা, একটু-খানি দাঁড়াই। শরীর টান-টান করে নিই। বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। বড্ড কষ্ট যাচ্ছে কাল রাত্তির থেকে। বসে বসে রাত কাটানো পোষাবে না আমার। শুতে হবে।

সাহেবের জায়গায় মধুসূদন বসে পড়ল। সাহেব বাঙ্কের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে এইবার কথাবার্তার ফুরসত। উপর থেকে রক্তবসন সাধুটি মধুসূদনের কপালের ক্ষতচিহ্নের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, কী হয়েছিল ভাই?

মৃদু হেসে মধুসূদন বলে, যে দেখে সেই জিজ্ঞাসা করবে। লুকোবার জো নেই। তোমার ফাটা কপাল হাজার লোকের মধ্যে থাকলেও নজরে পড়ে।

মধুসূদন গর্বিত কণ্ঠে বলে, ফাটা কপাল নয়, জয়তিলক। কপালের উপর পাকা হয়ে লেখা আছে। সরকারি লোকের উপর চড়াও হয়েছিলাম। হাটে মানুষ গিজগিজ করছে, তারই ভিতর। বাঙালিকে ভীরু বলে অপরাধটা খণ্ডন করলাম।

কানাইলাল-ক্ষুদিরামের পর কেউ বাঙালিকে ভীরু বলে না নিতান্ত নিন্দুক আর শত্রুপক্ষ ছাড়া। কৌতূহলে রক্তাম্বর নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেন : সরকারি লোক হাটের ভিতর গিয়ে কি করছিল?

হাত-মুখ নেড়ে সেই বীরত্ব মধুসূদন সবিস্তারে বর্ণনা করে। সরকারি লোক মানে চৌকিদার। হাটের মালিক যথারীতি তোলা তুলে যায়, তারপরে চৌকিদারেরা জুটে চৌকিদারি তোলে। সুপারি একটা, পানপাতা দুটো, কাঁচালঙ্কা দু গণ্ডা, চিংড়ি-পুঁটি এক এক মুঠো, মুলো একটা পালং

এক আঁটি, টৌ-ব্যাপার যত আছে কারও এক পয়সা কারও আধপয়সা—এমনি হল রেট। হাটের সময়টা চারিপাশের গ্রামের পাঁচ-সাতটা চৌকিদার কাক-চিলের মতো পড়ে চৌকিদারি তুলতে লেগে যায়। পরে সমস্ত এক জায়গায় নিয়ে বখরা করে। এক বুড়ো সেদিন গোটা দশেক অকালের বার্তাবিলেবু নিয়ে বসেছে—তারই একটা ধরেছে এসে। বুড়ো দেবে না, চৌকিদারও ছাড়বে না। টানাটানি, কাড়াকাড়ি। চৌকিদারের ছিল লম্বা দাড়ি—

কথার মাঝে নিজের বুক ঠুকে মধুসূদন বলে, এই যে মানুষটা দেখছ, অন্যায় কিছু চোখে পড়লেই মাথার মধ্যে চনমন করে ওঠে।

রক্তাম্বর মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করেন : কম বুদ্ধির লক্ষণ।

মধুসূদন কানেও নিল না। তেমনি দম্ভ ভরে বলে যাচ্ছে, চৌকিদারের দাড়ি ধরে পাক দিয়ে শুইয়ে ফেললাম। তারপরেই কুরুক্ষেত্তোর কাণ্ড। রে-রে—করে চতুর্দিক থেকে ছুটেছে। মার-গুতোন শুরু হয়ে গেল—যাকে বলে হাটুরে-মার। কিল-চড়-ঘুষি—যে যতদূর কায়দায় পায় মেরে নিচ্ছে। মেরে হাতের সুখ করে।

চৌকিদারকে ?

উঁহু, তার কোমরে যে সরকারি চাপড়াশ। সরকারি লোক মারার তাগত কি যার-তার থাকে! মারছে আমাকে। হাটের মাঝে এক তালগাছ—রাগ না চণ্ডাল, সেই তালের গুঁড়ির উপর নিয়ে আমার মাথা ঠুকতে লাগল। আমি সেসব কিছু জানি নে, জ্ঞান হল হাসপাতালে গিয়ে।

রক্তাম্বর বলেন, কিন্তু রাগটা তোমার উপর কেন? তুমি তো সকলের ভাল করতে গিয়েছিলে।

আজকেও তো তাই, বসবার জায়গাটা অবধি বেদখল। পরে যেটা শুনলাম—গ্রাম পাহারা দেয় বলে পাবলিকেই চৌকিদারি আদায় করতে বলেছে। অন্যায়টা আসলে চৌকিদারের নয়, প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েতের। সবর থেকে চৌকিদারের মাইনে আসে, প্রেসিডেন্ট সেটা মেরে দেন। হুকুম আছে, এলাকার ভিতরে বন্দোবস্ত করে নাওগে। উল্টে চৌকিদারই প্রেসিডেন্টকে দিয়ে থাকে কিছু কিছু, নইলে চাকরি বজায় থাকে না। ঐ প্রেসিডেন্ট মশায়ের দোতলা পাকা-দালান, হাটের মাথায় পাই কেমন করে ওঁকে?

একটু থেমে দম নিয়ে মধুসূদন বলে, তবে কথা একই—চৌকিদারের দাড়ি ধরে প্রেসিডেন্টের দাড়ি ধরাই হয়ে গেল। সবাই সরকারি লোক। প্রেসিডেন্ট বলে কেন, লাট-সাহেবের দাড়ি—এমনকি, সমুদ্র-পারে ভারত-সম্রাটের অবধি দাড়ি ধরা হয়েছে। হয়েছে কিনা বল?

সম্রাটের দাড়ি ধরে এসেছে—সেই আত্ম-প্রসাদে মধুসূদন চারিদিক তাকিয়ে চোখের তারা বিঘূর্ণিত করছে, আর দ্রুতবেগে পা দোলাচ্ছে।

কতক্ষণ কাটল। রেলগাড়ি সড়াক-সড়াক করে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যায়। শিকল ধরে সাহেব তেমনি ঝুল খেয়ে আছে। চোখ বুঁজে আসে ক্ষণে ক্ষণে, মাথা কাত হয়ে পড়ে।

নজর পড়ে মধুসূদনের মা চুকচুক করেন : দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে বাছা, পড়ে যাবে যে!

লজ্জা পেয়ে চোখ মেলে সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে বললাম মা, কাল রাত্তির থেকেই

ধকল যাচ্ছে। চোখ ভেঙে আসছে। না শুয়ে উপায় নেই দেখছি।

মা অবাক হয়ে বলেন, বসতে না পেয়ে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোথায় শোবে তুমি?

সাহেব হেসে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বসার জায়গা না থাক, শোওয়ার তো অঢেল জায়গা।

শোবারই ব্যবস্থা করে নিল সাহেব। এক-দিকের বেঞ্চিতে পাশাপাশি মধুসূদন আর নফরকেষ্ট, উল্টো দিকে মধুর মা, বউ আর বাচ্চা-ছেলেটা। দুই বেঞ্চির ফাঁকে মেজের কাঠের উপর সটান সে শুয়ে পড়ল। গায়ে জামা—শীতের আমেজ বলে সাহেব জামা-সুদ্ধ শুয়েছে। মোটা সুতির চেক-কাটা চাদর কাঁধে ছিল, শুয়ে পড়ে গায়ের উপর চাপাল সেটা।

মধুর মা বলেন, পায়ের কাছে এ কেমন শোওয়ার ছিরি!

সাহেব বলে, আপনার পা গায়ে লাগবে, সে তো আশীর্বাদ আমার মা।

এমন সুন্দর কথা বলে ছেলেটা! পা একটু গুটিয়ে নিলেন মধুর মা। বেঞ্চির একেবারে কোণটায় বাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে বালিশ ঘিরে দিয়েছে, তার এদিকে বউটা গুটিসুটি হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। সামনা-সামনি বসে মধুসূদনও এক-একবার ঢুলে পড়ে, নড়েচড়ে চোখ রগড়ে খাড়া হয়ে বসে আবার। আর দীপ্ত চশমার অন্তরালে নফর-কেষ্টর চোখ বন্ধ কি খোলা, বোঝবার উপায় নেই।

দুলছে গাড়ি। খট্-খট্ খটাখট্। লোহার পাটির উপর দিয়ে ছুটেছে খুব জোরে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। কাঁচ জানালার বাইরে জোনাকিপুঞ্জ যাচ্ছে যেন তারা উড়ে ছুটে আসছে। কিন্তু দেখছে কে এত সব। কামরার সমস্ত মানুষ বসে থেকে আর দাঁড়িয়েই ঢোলে। চোখ বুজে রয়েছে। জগৎ সংসার এখন আর দেখবে না, যেন প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ একবার নফরকেষ্ট ডেকে ওঠে: ওরে খোকা! সাহেব নয়, আদি নাম গণেশও না। এমনি সব ক্ষেত্রে নতুন নামে ডাকবার বিধি। খোকা নাম বুড়ো হলে গেলেও চলে। বিশেষ করে, বাপের যে দাবিদার, সেই মানুষের মুখে।

চোখ খুলে মধুর মা বলেন, অকাতরে ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাকাডাকি কর কেন?

গাড়িতে উঠবার আগে গা-বমিবমি করছিল। এখন কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করে দেখি।

মধুর মা চটে গিয়ে বলেন, বলিহারি তোমার আক্কেল! বমি যদি আসে, ডেকে তুলতে হবে না। আপনি উঠে বসবে। দেখতে পাচ্ছি, বড্ড হিংসুটে মানুষ তুমি। বসে বসে নিজের ঘুম হচ্ছে না, ওকেও তাই ঘুমুতে দেবে না। কী হয় তোমার?

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে।

চমক খেয়ে মধুর মা তাকিয়ে পড়লেন তার দিকে: কেমন ছেলে তোমার?

সকলের যেমন হয়। পাশের মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, আপনার ছেলে যেমন ইনি।

ডেকে ডেকে ছেলেকে জ্বালাতন কর কেন? অসুখের কথা বললে, চুপচাপ তবে ঘুমুতে দাও। চোখ বুজে নিজেও বরঞ্চ ঘুমানোর চেষ্টা দেখ।

ব্যাপারটা নফরকেষ্ট যেন আগে খেয়াল করেনি, বুঝে দেখে বিষম অপ্রতিভ হয়েছে। তেমনিভাবে বলে, উতলা হয়ে পড়েছি কিনা, ছেলেটার মা নেই। আপনি ঠিক বলেছেন। ডাকাডাকি করব না, আরাম করে ঘুমোক।

গায়ের উপরের চাদর জায়গায় জায়গায় সরে গেছে। নফরকেষ্ট পরিপাটি করে ঢেকে দেয়। বেঞ্চির তলায় মধুসূদনের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ সাহেবকে ঢাকা দিতে গিয়ে সে বস্তুটাও চাপা পড়ে যায় চাদরের নিচে।

কালে কালেও গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে ব্যাপার। যখন যে ফ্যাশান ওঠে। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে বেড়ানোর রেওয়াজটা বড় বেশি আজকাল। হাতে দু-চার পয়সা হলেই লোকে ঐ ব্যাগ একটা কিনে ফেলবে।

কালীঘাটে, এমন কি কলকাতা শহরের উপরও আর নয়—আপাতত রেলের কাজ ধরবে, নফরকেষ্টরা ঠিক করে বেরিয়েছে। অতএব সকাল বেলা দুজনে চাঁদনির এক দোকানে গিয়ে ঢুকল।

মালে চাইনে, দামে সস্তা—এমনি জিনিস মশায়। হপ্তা পরে খতম হলেও ক্ষতি নেই। দেখতে খুব চমকদার হবে।

অভিজ্ঞ দোকানদার ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি। প্রীতি-উপহারের মাল। বাজার বুঝে সব রকম আমাদের রাখতে হয়। ঘর-ব্যাভারি থাকে, প্রীতি-উপহারও থাকে। যেমন ইচ্ছা নিয়ে নিন।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগ কিনে জঞ্জালে ভরতি করছে। যথোচিত ভারী হয় না দেখে রাস্তা থেকে গোটা কয়েক পাথরের খোয়া নিয়ে ভিতরে ঢুকাল। বাবু নফরকেষ্ট এবং তস্য পুত্র শ্রীমান গণেশচন্দ্র নগদ টাকায় টিকিট কেটে চলেছেন দেশ-ভ্রমণে। নফরের হাতে ব্যাগ, বাড়তি দু-চারটে জিনিস চেক-কাটা চাদরে সাহেব পুঁটলি করে নিয়েছে।

গাড়িতে উঠে সাহেব জানলায় মুখ দিয়ে বাইরের শোভা দেখছে। নফরকেষ্ট ভিতরের বেঞ্চিতে। ঘুম ধরেছে, ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

পাশের লোক খিঁচিয়ে ওঠে: বালিশ নাকি আমি—গায়ের উপর দিব্যি আরামে মাথা চাপিয়ে দিয়েছেন? খাড়া হয়ে বসুন।

মার্জনা চেয়ে নফর খাড়া হয়ে বসল। কিন্তু কতক্ষণ! চোখ বুজে এবার সে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে দুলছে। হঠাৎ এক সময় সাহেব চেঁচিয়ে উঠল: এই তো, এসে গেছি বাবা—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। গোটা দুই কেরোসিনের আলো টিমটিম করছে, সেই কয়েক হাত জায়গা ছাড়া ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে। হুড়মুড় করে দু-জনে নেমে পড়ল। গাড়িও ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। কয়েকটা রক্তবিন্দু—দূরবর্তী হয়ে ক্রমশ তা-ও মিলিয়ে গেল।

গেট-বাবু লণ্ঠন উঁচু করে দেখে বললেন, টিকিট যে তালতলার। এঃ, মশায়, এখানে

নেমে পড়েছেন। তালতলায় তো অনেক দেরি।

বিপন্ন নফরকেষ্ট বলে, কী সর্বনাশ! ঘুম এসে গিয়েছিল, ব্যস্তবাগীশ ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে উঠল। রাত্তিরবেলা অত আর বুঝে উঠতে পারলাম না—

সাহেব বলে, আমি যেন পড়লাম স্টেশনের নাম—

নফরকেষ্ট গর্জন করে ওঠেঃ তোর বাপের মাথা পড়েছিস। পিটিয়ে তুলোধোনা করব, টের পাসনি হারামজাদা।

পরক্ষণেই সকাতরে গেট-বাবুকে বলে, পরের গাড়ি কখন স্যার?

রাতের মধ্যে নেই। কাল দিনমানে—

নফর মাথায় হাত দিয়ে পড়েঃ উপায়?

গেট-বাবু দয়াবান। বললেন, ওয়েটিং-রুমের চাবি খুলে দিচ্ছি। ঐখানে পড়ে থাকুন। আর কি হবে!

ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দরজা এঁটে দিল। প্রয়োজন ছিল না, জনমানব কোন দিকে নেই। কিন্তু গুরুবাক্য : কাজের মুখে নিজেকেও বিশ্বাস নেই। আয়না ধরে নিজের চেহারাটাও দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হবে, আমিই ঠিক সেই লোক কিনা।

দরজা-জানলা বন্ধ করে নফরকেষ্ট দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ধরল। নামবার সময় ব্যাগ বদল করে এনেছে। কাজটা একেবারে নির্বিঘ্ন। ধরে ফেললে তো জিভ কেটে বলবে, তাই তো মশায়, বড্ড রক্ষে হয়ে গেল। যথাসর্বস্ব আমার ঐ ব্যাগের ভিতর—কী যে মুশকিলে পড়তাম।

কাঠি একটা শেষ হয়ে গেলে আর একটা ধরায়। সাহেবকে সতর্ক করেঃ একটা একটা করে বের কর সাহেব। যত্ন করে নামিয়ে রাখ। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মা-কালী কী জুটিয়ে এনে দিলেন, কিছু বলা যায় না। পলকা জিনিষও থাকতে পারে।

সাহেব বের করছে, ঝুঁকে পড়ে নফর দেখে। খাতা আর কাগজ। পুরোনো বাংলা হরপে লেখা কান-ফোঁড়া নানা রকমের দলিল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে উলটে-পালটে দেখে, কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নেই।

হায় মা-কালী, কী লীলাখেলা তোমার! নতুন লাইনের কাজ ধরে পয়লা বউনি-মুখে এটা কি করলে? ছেলেমানুষ কত আশায় ব্যাগ খুলেছে, তার মনটাই বা কী রকম হয়ে গেল! কাগজপত্র ফেলে শুধু ব্যাগটাই যে নিয়ে নেবে—তলা উইয়ে খেয়েছে না কি হয়েছে, দেখি মুচি দিয়ে মোটা চামড়ার পটি দিয়েছে সেখানটা। এহেন মহামূল্য বস্তু পাছে কোনদিন পাচার হয়ে যায়, বড় বড় অক্ষরে মালিকের নাম-ঠিকানা ব্যাগের গায়ে।

ক্রুদ্ধ হতাশায় নফর গর্জন করেঃ শয়তান! মণিমাণিক্য বোঝাই করে নিয়েছে, এমনিভাব দেখাচ্ছিল। তাই তো আরও বেশি করে আমার নজর ধরল। ডাহা বেকুব বানাল আমাদের!

সাহেব বলে, মামলার দলিলপত্তর এসব। যশোরে লোকটা মামলা করতে যাচ্ছিল। দলিল তো মণিমাণিক্যই ওর কাছে।

ব্যাগসুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলে, যাব তো ঐ দিকেই। আমি বলি, যশোরে নেমে কাগজগুলো পৌঁছে দিলেও হয়। উকিলের নাম-ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের অকারণ ক্ষতি করে কি লাভ!

এ কথায় নফরকেষ্ট ক্ষেপে যায়ঃ জামার দোকানে সেদিন ঐ কাণ্ড করলি—আবার তাই? কোন হতচ্ছাড়া দয়াময়ের ব্যাটা—এ লাইন তোর জন্যে নয়। ভলান্টিয়ার হয়ে পরের দুঃখ মোচন করে বেড়াগে যা।

ক্রোধের কারণ আছে সত্যি। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ এবং দুজনের রেলভাড়া গচ্চা গেল। কাজটায় বিপদ নেই বটে কিন্তু বরাতের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। নিতান্তই জুয়োখেলার মতো।

কাল রাত্রে এই হয়েছে। আজকে আর এক রকমের খেলা। রেলের কাজের বিস্তর পদ্ধতি। মধুর মায়ের সঙ্গে নফরার এত কথাবার্তা, কিন্তু বউ অথবা মধুসূদন একটিবার চোখ মেলেনি, কোনরকম সাড়া দেয়নি। সাড়া দেবার অবস্থাই নেই—নজর ফেলে বোঝা যায়। নীল চশমার আড়াল থেকে নফরকেষ্ট সমস্ত কামরায় একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপরে পায়ের চাপ দিল ঘুমন্ত সাহেবের গায়ে। রাস্তার কাজ, ট্রাম-বাসের কাজ, রেলের কাজ—কাজ অনুযায়ী নিয়ম-কায়দা সব আলাদা। আজকের এই কাজের কারিগর হয়েছে সাহেব। বয়স ও চেহারার গুণে সাহেবকেই এমনি ধারা ঘনিষ্ঠ হয়ে পরের কাছে শুতে দিয়েছে, অন্য কাউকে দিত না। নফরকেষ্ট হলে তো কিছুতে নয়। নফরকেষ্ট চাদর গুঁজে কাজের গোছগাছ করে দিল। সেটা ডেপুটির কাজ। কিন্তু ডেপুটি না বলে এই ক্ষেত্রে সর্দার বা সেনাপতি বলাই ঠিক। নিকটে ও দূরে ভাল করে দেখে নিয়ে পায়ের চাপে সেনাপতি নিঃশব্দ হুকুম দিলঃ সুসময়, লেগে পড় এইবার।

ইঙ্গিত পেয়ে সাহেব গাঁট থেকে ছুরি বের করে। হরেক রকমের ছুরি সঙ্গে—চামড়া-কাটা ছুরি, টিন-কাটা ছুরি ছাড়া কাচের টুকরো, পেরেক—তিন চারটে টাকাও। কাজের উপকরণ এই সমস্ত। টাকা রাখতে হয়—বিপদের মুখে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে পালাবে। সাহেবের সর্বদেহ চাদরে ঢাকা, শুধুমাত্র মুখ আলগা। সে মুখ-চোখ অঘোর ঘুমে ঘুমাচ্ছে, চাদরের নিচে দ্রুত হাতে কাজ চলছে ওদিকে। চাদর একটুকু নড়ে না। দীঘির জলের নিচে মাছ কত খেলে বেড়াচ্ছে, উপরের জলে না লাগে না যেমন। রীতিমতো কষ্ট ক[...] শিখতে হয়, এ বস্তু অমনি আসে ন[...] নফরকেষ্টর সাফাই হাতের গুণগান সর্ব[...] বাপ ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছে—ছেলে[...] উত্তরাধিকারী রূপে সেই গুণের খানিক দিয়ে দিয়েছে। ছুরিখানাই বা কী! মধুসূদনের ব্যাগ বেন চামড়ার নয়, মাখ[...] দিয়ে তৈরি। মাখনের দলার মধ্যে ছু[...] চালাচ্ছে।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগের কাজ সমাধা হল তো পাশে রয়েছে বোঁচকাবুচকি—ঘুমের ঘোরে চাদরের নিচের হাত বেরিয়ে এসে বোঁচকার উপর পড়ে। পায়ের আঙুলে চেপে ধরে নফরকেষ্ট চাদরের কোণ তাড়াতাড়ি সেদিকে টেনে দিল। দিয়ে চাপ দিল আবার পায়েরঃ নির্ভাবনায় চালিয়ে যাও বাপ আমার।

নিখুঁত কাজকর্ম, তিলমাত্র ত্রুটি নেই কোনদিকে। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ—উঁহু, শেষ পরিণাম বিবেচনা করে তাই বা বলা যায় কি করে? ইঞ্জিনে জোর দিয়েছে, ট্রেন বিষম দুলেছে। টিনের সুটকেশটা মধুসূদন বাঙ্কের উপর রেখেছে। হুড়মুড়িয়ে সেটা নিচে এসে পড়ে—পড়বি তো পড়, সাহেবের মুখের উপরে। চোখ মেলে মধুসূদনের মা হাউমাউ করে উঠলেনঃ ওরে কী সর্বনাশ! খুন হয়ে গেছে পরের ছেলেটা গো!

মধুসূদন তুলে নিয়েছে সুটকেস। সাহেবও উঠে বসল। তোবড়ানো পুরানো জিনিষ, জোড় খুলে টিন হাঁ হয়ে আছে। টিনের খোঁচা লেগেছে সাহেবের মুখের দু-তিন জায়গায়। রক্ত বেরিয়ে গেছে। বাঁ-চোখের ঠিক নিচেই একটা খোঁচা—অল্পের জন্য চোখ বেঁচে গেছে।

সোরগোল। কামরার মানুষ সকলের ঘুম ছুটে গেছে। মধুর মা আহা রে, আহা রে—করছেন। চোখে জল পড়ছে তাঁর। কে-একজন ওদিক থেকে বলে ওঠে, অসাবধানে রাখে কেউ অমন! খুব তো ফড়ফড়ানি মশায়। মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছিল—আইনে এবার কি বলবে?

মধুসূদন বেকুব হয়েছে, তবু মুখের জোর ছাড়ে না। লোকটার দিকে চেয়ে জবাব দেয়ঃ সাবধানেই রাখা হয়েছিল। সাধু মশায় ঐ যে সরিয়েঘুরিয়ে স্বর্গে চড়লেন, উনিই গোলমাল করেছেন। তা হয়েছে কি শুনি?

সাহেবও সেই সুরে সুর মেশায়ঃ কিছু হয়নি। ছড়ে গিয়েছে একটুখানি। এমন কত হয়। আমার এতে লাগে না।

মায়ের উপর মধুসূদন ধমক দেয়ঃ তুমি অমনধারা করছ কেন মা? সব তাতে বাড়াবাড়ি। যার লেগেছে সে বলে, কিছু নয়। হলেই বা কি! ব্যাগের মধ্যে এক-ডিস্পেনসারি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। হোমিও-প্যাথি অষুধ—যার এক দাগ খাইয়ে কাটা-মুণ্ডু জুড়ে দেওয়া যায়। তিন-চার বড়ি আর্নিকা খাইয়ে দিচ্ছি, ব্যথাটুকুও হবে না।

বেঞ্চির তলার গ্লাডস্টোন-ব্যাগ টেনে বের করে। এই গোলমালের মধ্যে নফরকেষ্ট কোন সময় জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। সিগন্যালের বিলম্বে গাড়িটাও লহমার জন্যে থেমেছিল বুঝি। টুক করে সেই সময় সে নেমে পড়ল। সাহেব ব্যূহবেষ্টনীর মধ্যে। ব্যাগ টেনে এনে বেঞ্চির উপর রেখে মধুসূদন অষুধ বের করবে। একদিকের চামড়ায় লম্বালম্বি ফাঁক। (ক্রমশ)

পূবে বাঙলার মেঠো হাওয়ায় মানুষ। শুভানুধ্যায়ীরা বলেন : কাঠবাঙাল।

অতএব অবলীলাক্রমে : ইলিশ মাছের নাম, জিভের জুড়ে ঘাম।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বাংলাদেশের ইলিশ সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে অতদূরে আসবে কি করে? কি করে কে জানে, কিন্তু চোখ-কান উত্তমরূপে সজাগ করে বোঝা গেল, সত্যি-সত্যি ইলিশ। ফিলাডেলফিয়ায় পাইন স্ট্রীটের এই ছোট দোকানটা অক্ষয় অমর হয়ে থাক। আমেরিকায় এখানেই প্রথম ইলিশ দর্শন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দংশনের অভিলাষ। ঝাঁপিয়ে পড়ি পড়ি ভাব, পাছে আর কেউ আত্মসাত করে। ভয়টা অবশ্য নিতান্ত অহেতুক, ইলিশের জামাই আদর (!) এদেশে নেই। এরা নাম রেখেছে : 'শ্যাড্'। সুন্দর হীরে চক্‌চক্‌ ইলিশের নামের কি চরম দুর্গতি! হ্যালিবট্‌, স্যামন, সোর্ডফিস নিয়ে এরা আত্মহারা। অথচ ইলিশের সঙ্গে সর্ষের মণিকাঞ্চন যোগটা একবার পরখ করেও দেখল না। অত গবেষণা, বিজ্ঞানে উন্নতি, চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছ, আর এই আবিষ্কারটুকুর জায়গা হ'ল না মাথায়? হতভাগা মানুষগুলোর জন্য সত্যিকারের মায়া হয়।

মৎস্যবিক্রেতা অবশ্য আমাদের ভাবসাব দেখেই টের পেয়েছেন, অসামান্যের দর্শন পেয়েছি আমরা।

—'তোমরা ইণ্ডিয়ান? এ মাছ বুঝি খুব পছন্দ? কি নাম তোমাদের দেশে?—তখন ইলিশটার আঁশ ছাড়ান হচ্ছে। যন্ত্রে হয়, একমিনিটেই সারা।

—টুকরো করে কেটে দেব? কয় টুকরো করব?

—'অনেক ধন্যবাদ। টুকরো করার দরকার নেই। গোটাটাই দিয়ে দিন।

টুকরো করতে বলি আর মুড়োটা ফেলে দিক আর কি। সাধারণত তাই করে কিনা। মুড়োর ঘণ্টের মর্যাদা বোঝার মত জ্ঞানগমি্য ভগবান এদের দেননি। মুড়ো যায় কুকুর কিংবা বিড়ালের পেটে, অথবা গারবেজ বক্সে। সোজাসুজি কি করে বলি—মুড়োটা ফেলে দিও না। তার চেয়ে বলা ভাল—গোটাটা দিয়ে দাও।

ফিলাডেলফিয়ার পরে বসটন আর নিউইয়র্কের ইলিশও চাখা গেছে। গঙ্গার ইলিশের সোয়াদটি কোথায়ও মিলল না বটে, কিন্তু চেহারাটি তো অন্তত দুরস্ত। দূর বিদেশে এই পরম পাওয়া।

রুই মাছ না হলে যাদের অন্ন রোচে না, তাঁরাও বেড়াতে আসুন, ফেলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক, বসটন—এই সব জায়গায়। নাম : কার্প, দাম : সস্তা। এরা বড় একটা খায় না। খ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত করে কই

ওয়াশিংটনের চিঠি

মাগুর খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু তার দেখা এখনো মেলেনি।

আবার শীত এল এল। গাছের পাতা অবিরাম ঝরছে। দুদিন ধরে বৃষ্টি বৃষ্টি। একটা আদর্শ খিচুড়ি সন্ধ্যা। ইলিশকেও বড় মনে পড়ছিল। তার অভাবের কঠিন বেদনা স্বপ্নের মত ঘিরেছিল। এটা ইলিশের সীজন নয়। তবুও মনে মনে খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজা। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি অবিরাম। একটা ইন্দ্রজাল, ভূতভবিষ্যৎ ডুবে গেল বুঝি। কিন্তু বর্তমান? ঢাকা পড়েই আবার যেন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা। কফি টেবিলের উপর রাখা খবরের কাগজে বড় হরফের খবর। টেলিভিশনে চলচ্চিত্র। ইলিশের ইন্দ্রজাল আবছায়া হয়ে এল।

যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় মানুষ কমাণ্ডার শির আকাশে উঠেছেন। সম্পূর্ণ সফল হয়েছে তাঁর আকাশ অভিযান। যন্ত্রপাতিতে কোন খুঁত নেই। ক্যাপ্টেন গ্লীন যেদিন আকাশের গায়ে ঠাঁই পেলেন তার কথা বারবার মনে পড়ে। সে কি গভীর উত্তেজনা। অজস্র নাগরিক—গৃহে, অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে—টেলিভিশনের সামনে দাঁড়িয়ে। সবাই কাজ ভুলেছে আজকের জন্য। শিরার শূন্যবিহারও উত্তেজিত করেছে, কিন্তু গ্লীনের আকাশ অভিযানের সঙ্গে এর তুলনা হ'ল না। প্রথমতমের সঙ্গে তৃতীয়ের একাসন কবেই বা মিলেছে?

আরো একদিনের ছবি ভাসে। রাশিয়া দুজনকে পর পর আকাশে পাঠালেন। একি সত্যি? আমরা কি হেরে গেলাম? কীরকম একটা চলন্ত জিজ্ঞাসা পথেঘাটে। টেলিভিশনের লোকেরা ক্যামেরা নিয়ে পথের উপর নেমে এসেছিল। ক্যামেরার সামনে আচমকা নিজেকে দেখে পথচারী হতবাক, তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে : রাশিয়ার এই সাফল্যে তোমার কিছু বলার আছে?

পথচারীর নিজের মনেও অনেক প্রশ্ন

কিন্তু একটা মতামত—দাঁড় করাবার মত চিন্তা করে এখনো হয়ত ভাবেন নি। বলতে গেলে গোলমাল হয়ে যায়। যা বলার ইচ্ছে, তার চেয়ে বেশী, হয়ত বা একেবারেই অন্য কিছু বলে ফেলেন—'কে বলেছে আমরা পেছনে পড়ে? আমরা এগোচ্ছি বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা নিয়ে। সবটুকু বুঝে শুনে। ওরা এগোচ্ছে অন্ধের মত।' কারো ভাববিলাস কম, 'আমরা শুরু করেছি দেরিতে, তাই হয়ত একটু পিছিয়ে আছি। আর বেশী দিন থাকব না। আমরাই আগে চাঁদে যাবো।'

একথা নিশ্চিত সত্য যে যুক্তরাষ্ট্র আকাশ-জয়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছে অনেক পরে। এর মধ্যে যতটুকু সে করেছে তা বিস্ময়কর। দেখা যাক্, কে আগে চাঁদের বুড়ির চরকা নিজের চোখে দেখে।

শিরা যখন আকাশের গায়ে গৌরবের প্রদীপ জ্বালালেন, ঠিক তখন তার তলার অন্ধকারটা জমাট বাঁধল মিসিসিপিতে। খবরের কাগজে শিরার পাশাপাশি আরো একটা বড় হরফের নাম: মেরিডিথ! 'greatest conflict between Federal and State authority since Civil War'

এ তুমুল বাগবিতণ্ডা যাঁকে কেন্দ্র করে, তার নাম: মেরিডিথ!

মেরিডিথের বয়স উনত্রিশ। যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর সঙ্গে বহুদিন যুক্ত। মেরিডিথের দোষটা তাঁর নয়, আসলে কারো নয়। দোষটা সূর্যের। আফ্রিকায় বড় বেশী তেজ এই তারকার। মানুষের রং কালো হ'ল তাই। মেরিডিথরা সেই কবে অদৃষ্টের ভেলায় ভেসে ভেসে আফ্রিকা থেকে এসেছিল। কিন্তু সূর্যের দেওয়া রংটা আজও মুছল না।

আদর করে দেওয়া নাম, 'ওলে মিস্'। আসল নামটা: মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়। ওলে মিসের সরস্বতী শ্বেতকায়া, সূর্যে পোড়া মানুষের প্রবেশ নিরুদ্ধ। মেরিডিথ তবু ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। চারদিকে একটা ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠল। এখনো সূর্য ওঠে চন্দ্র ওঠে— এ কি করে হবে? ওলে মিসে অশ্বেতকায়? অসম্ভব।

কিন্তু মেরিডিথের সম্বল তাঁর জীবন-বোধ, মনুষ্যত্ব। প্রবেশ তাকে করতেই হবে। এবং ওলে মিসে—অন্য কোথায়ও নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মূল শাসনতন্ত্র প্রতিটি নাগরিকের জন্য দিয়েছে মনুষ্যত্বের সমান প্রতিশ্রুতি—justice and equality to all. তা ছাড়া বিদ্যায়তনে বর্ণবৈষম্য কেন্দ্রীয় সরকার বেআইনী ঘোষণা করেছেন অনেক দিন হ'ল। নিজের চেষ্টায় কিছু হ'ল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেরিডিথ আবেদন করলেন, ওয়াশিংটনে।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বর্ণ-বৈষম্যকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকার মাটি থেকে সরাতে হবে। বিচার এবং সেনাবিভাগ থেকে অফিসারদের পাঠান হ'ল। অনুনয়ে বিনয়ে তাঁরা মিসিসিপির গভর্নর বার্নেটকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মেরিডিথের প্রবেশাধিকার আইনসিদ্ধ। বার্নেট বলেছেন, তা হয় না। অবশেষে বার্নেটের অনুপস্থিতির মুহূর্তে একদিন মেরিডিথ ভর্তি হলেন। কিন্তু ওলে মিসের ছাত্র আর স্থানীয় অধিবাসীরা তুমুল হট্টগোলে আকাশবাতাস কাঁপালেন। শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা। কেন্দ্রীয় সরকারকে কয়েক সহস্র সৈন্য পাঠাতে হ'ল। টিয়ার গ্যাস, জখম, গোটা দুই মৃতদেহ।

গভর্নর বার্নেট সম্প্রতি নানা কারণে মিসিসিপিতে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়েছিলেন! মেরিডিথের ব্যাপারে তার একরোখামি আবার তাকে জনপ্রিয় করেছে মিসিসিপিতে। ওলে মিসের একজন ছাত্র বলেছেন—'গত বছর ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসে আমাদের একটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখার সুযোগ মিলেছিল। সবাই আমরা প্রায় গভর্নর বার্নেট-সম্পর্কে লিখেছিলাম। অথচ আজ বার্নেট আবার হিরো হলেন।'

আর মেরিডিথ? তাঁর হস্টেলের আশে-পাশে তাঁরই নিরাপত্তার জন্য প্রহরী সৈন্য। ক্লাসে যাওয়ার পথে রক্ষিবাহিনী। ক্লাসের বাইরেও তাই। তবু মেরিডিথ নিরুৎসাহ হননি। এ তাঁর ভিতরের মানুষের দাবি, জীবনের দাবি। বন্ধুহীন নির্মম শীতলতার

মধ্যে হয়ত কাটবে তাঁর কয়েকটা বছর। এই বছরগুলি দক্ষিণের কোন নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা উত্তরাঞ্চলের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎফুল্ল উৎসাহের মধ্যে যাপন করা অত্যন্ত সহজ ছিল। কিন্তু জীবনের তাগাদায় কঠিন পথটাই বেছে নিলেন মেরিডিথ। মেরিডিথের মুখে মানায়ঃ ....It is more for America than it is for me.

মেরিডিথ প্রসঙ্গের বিস্তৃততর বর্ণনা মুখরোচক হবে নিঃসন্দেহে; কিন্তু এখানে তা অপ্রয়োজনীয়। আসল সমস্যার অর্থাৎ বর্ণবৈষম্যের সুবিন্যস্ত আলোচনাও এখানে প্রায় অসম্ভব। স্থানাভাব, তা ছাড়া লেখকের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ! তবু, দু-একটা আনাড়ী কথা উচ্চারণের অভিলাষ হয়ত ক্ষমার্হ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো সমস্যা প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমবয়সী। অজস্র আলোচনা একে ঘিরে। একটা গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেল। অনেক উপনদী থেকে বেগবান নদী। অনেক জাতির মানুষ মিশে আমেরিকা। যেন একটা melting pot—নানা ধাতু গলে গিয়ে একদেহে মিশছে। অত্যন্ত বলিষ্ঠ এক সমন্বয়, মহৎ বৃহৎ একটা জাতি।

এরা বেশীর ভাগ এসেছিলেন নানাসময়ে ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। আচার ব্যবহার এবং আকৃতির কমবেশী সাদৃশ্য গোড়াতেই ছিল। খানিকটা সময় লেগেছে শুধু একাকার হয়ে যেতে। ভালোভাবে 'আমেরিকানাইজড্' হয়ে যাওয়া মাত্র সবাই ভুলবে তার আদি দেশ আর পেশার খবর। তখন থেকে প্রথম পরিচয় : আমেরিকান।

আরো একদল মানুষ এসেছিল। ঠিক তা নয়, তাদের আনা হয়েছিল। এদের রং কালো। এরা ক্রীতদাস। অন্য সবার চেয়ে আলাদা। এরা আকারে মানুষ হলেও, থালাঘটিবাটির মত প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তি। স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে যে স্থায়ী পারিবারিক কাঠামো, যাকে আশ্রয় করে গোটা মানুষ লতিয়ে ওঠে তার কোন সম্ভাবনা ছিল না ক্রীতদাসের জীবনে। প্রভুর প্রয়োজনমত স্বামী বিক্রিত হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন। নাবালক পুত্র হয়ত নিক্ষিপ্ত হ'ল মাতাপিতার স্নেহচ্ছায়া থেকে বহুদূরে প্রভুর প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। এ অবস্থার মধ্যে মানুষের জীবন সম্ভব ছিল না। আমেরিকার সঙ্গে একদেহে মিশে যাওয়া তো অনেক দূরের স্বপ্ন।

গৃহযুদ্ধের পরে ক্রীতদাসরা মুক্ত হ'ল। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, পারিবারিক জীবন নেই, সমাজ নেই। নীহারিকার মত আকারহীন একটা অবস্থা। তবু ধীরে ধীরে এই মানুষগুলো এগিয়েছে। কিন্তু ঘষে-ওঠানো অসম্ভব একটা চিহ্ন তাদের নির্দিষ্ট করে রাখল। তাদের গায়ের রং কালো। মুহূর্তে বোঝা যায় : এদের পূর্বপুরুষ ক্রীতদাস হয়ে পা দিয়েছিল এদেশের মাটিতে। এই দুর্নিরোধ্য পশ্চাদন্বেষণের বোধটা অসুখের মত শ্বেতাঙ্গের অন্তরে চেপে বসে। ক্রীতদাসের বংশধর—কি করে তার সঙ্গে একাসনে বসব? একদা যাদের উপরতলা থেকে অঙ্গুলি হেলনে শাসন করেছি, তাদের প্রপৌত্রেরা উঠে এসে কাঁধে হাত রেখে বন্ধু হবে—এ ভাবনা মানুষকে চাবুক মারে। দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে একথা সত্য। মনুষ্যত্বের ধর্ম এটা নয় কিন্তু আটপৌরে মানুষের ধর্ম। আমরা যাকে মনুষ্যত্ব বলি তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ তো শুধু মহাপুরুষে। ব্রাহ্মণ শূদ্র কাহিনী অনেক প্রাচীন হ'ল—তবুও এরা একাকার হল কি ভারতের মাটিতে আজও? আমেরিকার নিগ্রোদের সঙ্গে ভারতের অস্পৃশ্য সমাজের তুলনা টানলে অসঙ্গত কিছু হবে না। তবে নিগ্রো সমস্যা অনেক বেশী জটিল।

অতএব কালো রংয়ের অনপনেয় প্রলেপ নিয়ে নিগ্রোরা আমেরিকান সমাজের বহিরঙ্গনে দাঁড়িয়ে রইল। দাস প্রথার প্রচলন সবচেয়ে বেশী ছিল যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে। এবং এ অঞ্চলই আজও বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে সর্বাধিক সজাগ। মোটামুটি বলা চলে, বর্ণবৈষম্য আমেরিকার দাক্ষিণী সমস্যা। উত্তরাঞ্চলেও বর্ণসচেতনতা একটা ক্ষীণ ধারার মত বয়ে চলেছে। তবে তার রূপ খুবই সূক্ষ্ম। যথা বিজ্ঞাপন দেখে বাড়ির খোঁজে গেলেন কালা আদমী। গৃহস্বামী অত্যন্ত মিষ্টি হেসে বললেন : এইমাত্র ভাড়া হয়ে গেল। কিন্তু স্কুলে কলেজে রেস্টুরেন্টে বর্ণবৈষম্য চোখে পড়লে সেটা হবে নিয়মের ব্যতিক্রম। সবচেয়ে বড় কথা এখানে সাদা কালো নির্বিশেষে প্রত্যেকের রয়েছে জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার। দক্ষিণের স্টেটগুলোতে নানা কৃত্রিম উপায়ে নিগ্রোদের এ অধিকার থেকে প্রায়শ বঞ্চিত করা হয়।

এ সমস্যার সমাধান রাতারাতি হবার নয়। অথচ এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত 'গণতন্ত্র', 'মুক্ত দুনিয়া'—যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রিয় স্বপ্নগুলো অর্থহীন প্রলাপের মত বাজে। কেন্দ্রীয় সরকার একথা ভাল করেই বোঝেন। বর্ণবৈষম্যকে জীবনের নানাক্ষেত্রে

বেআইনী ঘোষণাও করেছেন তাঁরা। কিন্তু দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গদের লাঠিপেটা করে এ সমস্যার সমাধান তাঁরা করতে পারেন না। এতে নতুন সমস্যা দেখা দেবে, সমস্ত আমেরিকার ভিত কাঁপবে। আর একটা গৃহযুদ্ধ আমেরিকা চায় না।

মূল ভূমিকা খুব সম্ভবত এসে পড়ছে নিগ্রো সমাজের উপর। দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গেরাও অন্তরে অন্তরে নিশ্চিত জানেন যে, বর্ণবৈষম্য মানুষের ধর্ম হতে পারে না। একটা অতি পুরানো গোড়ামি তাদের বিচারকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে শুধু। তাই যেদিন নিগ্রোরা সমত্বের যোগ্যতা এবং দাবি নিয়ে হাজির হবে সেদিন এই গোড়ামি গুলী খাওয়া জন্তুর মত একবার ঝাঁপিয়ে চিরদিনের মত শান্ত হবে। সবচেয়ে বড় কথা, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সহায়; উত্তরের শ্বেতাঙ্গেরা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

'সমত্বের যোগ্যতা' কথাটা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। শুধু গায়ের জোরে অসম দুজনকে একাসনে বসালে তা স্থায়ী হবার নয়। এটা পদার্থবিদ্যা এবং মনুষ্যচরিত্রের অত্যন্ত প্রাথমিক নিয়ম। গত দুশো বছরের মধ্যে নিগ্রোরা অনেক দূর এগিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মহিমায় তাদের অবদান নিশ্চিত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একথা সত্য যে শ্বেতাঙ্গের তুলনায় নিগ্রোরা অনেক পশ্চাৎবর্তী। এ খুবই স্বাভাবিক, তারা শুরু করেছেন গোড়া থেকে। তবু তাদের আরও দ্রুত এগোতে হবে, আরো নিষ্ঠা নিয়ে। একদিন শ্বেতাঙ্গের সমান্তরালে আরো একটি রেখা : কালা আদমী। তখন সমন্বয়, সমস্যার সমাধান। তার আগে খুব সম্ভবত নয়। বিখ্যাত নিগ্রো সাংবাদিক কার্ল রোয়েন বলেছেন, "....it is not enough....to pretend that integration will be a cure-all for every social problem in sight মার্টিন লুথার কিংয়ের উক্তিও উল্লেখযোগ্য :

We have become so involved in trying to wipe out the institution of segregation....that we have neglected to raise the moral and cultural climate in our Negro neighbourhoods.

আরো একটা অস্ত্র বোধহয় দরকার : মেরিডিথের মত লোক। যারা অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াবে, দৃঢ়, অনম্য। যখন বিশ্বাস হবে সমত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছি, তখন তাকে নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। মেরিডিথকে নিয়ে কত হইচই হ'ল। দুদিন বাদেই সব থিতিয়ে যাবে। মেরিডিথ নিয়মিত ক্লাসে যাবেন। হয়ত তার বন্ধু হবে না, কিন্তু শত্রুও খুব বাড়বে না। ক্রমে পরিবেশ সহজতর হয়ে আসবে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, অজস্র নিগ্রো ছেলে মিসে পাবে অনায়াস প্রবেশাধিকার। প্রথম ধাক্কাটা প্রাকৃতিক নিয়মেই কঠিন হয়ে বাজে।

দুজন মানুষের কথা বড় বেশী মনে পড়ে। জেমস আর এরিন। বব, রজার্স, ওয়েন, এরিন, জেমস এরা সহপাঠী সবাই শ্বেতাঙ্গ শুধু জেমস বাদে। এরা একই সঙ্গে ঢুকেছিল বস্টনের এই কলেজে। একই সঙ্গে ডিগ্রি পেল। ওয়েন অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে গেল, পেনসিলভেনিয়ায়। রজার্স নিউহ্যাম্পশায়ারে। বব মোটা মাইনের কাজ নিয়েছে ড় পোঁতে।

বাকি থাকল এরিন আর জেমস। এরিন দক্ষিণাঞ্চল থেকে এসেছিল। দক্ষিণাঞ্চলেও এরিনের মত শ্বেতাঙ্গ আছে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় কি?

এরিন চাকরি নিল দক্ষিণের কোথায় যেন, [illegible] জর্জিয়ায়। ওয়েন বব—এরা তো [illegible]। দক্ষিণে মরতে যাচ্ছিস এরিন আবার? উত্তরের শ্বেতাঙ্গেরা দক্ষিণের গোলমালের মধ্যে সহজে পা দিতে চায় না। অদ্ভুত এক পলায়নী মনোবৃত্তি।

এরিন হেসেছিল—গোলমাল বলেই তো যাওয়া দরকার। সেখানেই আমাদের বেশী দরকার। ছেড়ে এলে চলে না। সবাই মিলে দক্ষিণকে টেনে তুলব। দক্ষিণ আর গরীব থাকবে না। দক্ষিণে মানুষের অত অপমান আর হবে না—

আর জেমস? জেমস গিয়েছে আফ্রিকায়। একটা অজ পাড়াগাঁয়ে ইস্কুলের চাকরি নিয়ে। অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল এটা। বলে, নিজের বিদ্যে কাজে লাগানোর এই একটা সুযোগ। তাছাড়া দেখে আসি দেশটা। সূর্যের কত তেজ সেখানে—

—কতদিন থাকবে সেখানে জেমস?

—হয়ত বছর দুই। তার বেশী থাকব কি করে?

নিজের দেশের জন্য মন কাঁদবে। হোমসিক হয়ে কতদিন বিদেশে থাকা যায় বল?

এরা সবাই চলে গেছে। ল্যাবরেটরীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নতুন মুখ দু একটা আসছে। অন্য কোথায়ও গেলে হয়!

অনিমেষ চক্রবর্তী

ত্রিবর্ণ

বনফুল

॥ ৩৬ ॥

গণেশ হালদার সেদিন বনস্পতি বিদ্যালয়ে স্কুলের পড়াশোনার পর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর জীবনের সুর বদলে গিয়েছিল এবং তা আভাসিত হচ্ছিল তাঁর আচরণে, মুখমণ্ডলে এবং তেজোদ্দীপ্ত বক্তৃতায়।

তিনি বলছিলেনঃ—"আমরা যেন না মনে করি যে যেন-তেন প্রকারেণ ইংরেজকে দূর করে' আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা একথা যেন মুহূর্তের জন্য না ভাবি যে এখন আমাদের আর কিছু করবার নেই। একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে এ স্বাধীনতা আমরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করিনি। নেতাজীর আই-এন-এ সৈন্য যখন এদেশে ফিরে এল, নৌবহরের জংগী সৈনারা যখন বিদ্রোহ করল, এখানকার সৈন্যদের মধ্যেও যখন বিদ্রোহের আভাস দেখা দিল তখন চতুর ইংরেজ বুঝল এদেশে আর তারা রাজত্ব করতে পারবে না; যুদ্ধে তারা হীনবল হয়ে পড়েছিল, মিলিটারীর জোরে এ-দেশ শাসন করবার শক্তি আর তাদের ছিল না। তাই চতুর ইংরেজ দেশটাকে ভাগ ক'রে, স্বদেশসেবী বাঙালীদের আর মিলিটারি পাঞ্জাবীদের সর্বনাশ করে স্বাধীনতা নামক একটা ভুয়ো মাল আমাদের নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল। ইংরেজ যায় নি, সে দেশে ব'সে আমাদের কাছে চড়া দামে জিনিস বেচে আগেকার মতোই আমাদের শোষণ করছে আর মজা দেখছে। ইংরেজ যখন এদেশে ছিল, তখন আমরা বরং কিছু স্বদেশী ছিলাম, ইংরেজ চলে যাওয়ার পর সে পাট একেবারে চুকিয়ে দিয়েছি। রাস্তার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। আগে এত সাহেবী-পোশাক-পরা লোক রাস্তা ঘাটে দেখা যেত না। এখন সবাই আমরা সাহেব সেজেছি। এখনও আমরা বিদেশের দুয়ারে হাত পেতে আছি টাকার জন্যে, কলকব্জার জন্য, জ্ঞানের জন্যে। আমরা স্বাধীন হয়েছি একথা বলবার সময় এখনও আসে নি। বরং আমাদের পরাধীনতা যেন আরও বেড়েছে মনে হয়, মনে হয় আমাদের ভবিষ্যৎও যেন ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কারণ যে শিক্ষা পেলে আমাদের বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব সুগঠিত হবে, সে রকম শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না। বাইরে যা দেখছি বা শুনছি তা লোক-দেখানো আড়ম্বর মাত্র। দেশে আর মানুষ তৈরি হচ্ছে না। স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ নাগরিক হতে হলে চরিত্রে যে সব গুণাবলী থাকা দরকার সেসব গুণাবলী অর্জন করবার সুযোগ আমাদের ছেলেমেয়েদের নেই। অনেক পয়সা খরচ করে তারা যে ডিগ্রী পাচ্ছে তা একেবারে মূল্যহীন, কারণ ডিগ্রীর পিছনে যে বিদ্যা থাকলে তা সার্থক হয় সে বিদ্যা তাদের নেই। মিথ্যা মুখোশ-পরা কতগুলো গণ্ডমূর্খ তৈরি হচ্ছে কেবল। আমরা ক্রমশ ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছি। ইংরেজ আমলের পূজনীয় নেতারা, স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সকলেই বলে' গেছেন, মানুষ হওয়াই সবচেয়ে আগে দরকার। আত্মসম্মান-ভূষিত শিক্ষিত ধার্মিক মানুষ চাই। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত; এ বাণীর মর্ম আমাদের এবার বুঝতে হবে। মিথ্যা স্বাধীনতার মোহে মুগ্ধ থেকে আসল জিনিস আমরা হারিয়ে ফেলছি। আজকাল অবশ্য অনেকের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার ভড়ং দেখা যায়। কুকুর-পোষার মতো গুরু-পোষাও অনেক বড়লোকদের আজকাল ফ্যাশন হয়েছে। কিন্তু সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুত্বকে ঢেকে রাখবার মুখোশ মাত্র। আমাদের সত্যবাদী হ'তে হবে, নির্ভীক হতে হবে, সৎকর্মে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে হবে, তাহলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। এইগুলিই আধ্যাত্মিকতা-লাভের প্রথম সোপান। আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি, আমরা যদি আজ থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে মিথ্যা কথা বলব না, কোনও অলীক ভয়ে ভীত হব না, অলস জীবন যাপন করব না, তাহলেই দেখবে আমাদের চারপাশে একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে। সেই বিদ্যুৎ কালক্রমে জ্যোতির্ময় লোকে নিয়ে যাবে আমাদের। যে আধ্যাত্মিকতা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সেই আধ্যাত্মিকতার প্রধান অবলম্বন সত্য মিথ্যা নয়, অকপটতা, ভণ্ডামি নয়। আমরা যে জীবন যাপন করছি তা পশু-জীবনের চেয়েও খারাপ। পশুরা অন্তত নিজেদের চেষ্টায় আহার সংগ্রহ ক'রে জীবন ধারণের অনিবার্য আবেগে জীবনটা অন্তত ভোগ করে। আমরা কি তা-ও পারি? আমরা অলস, নির্বীর্য, পরমুখাপেক্ষী তামসিকতার জড়-পিণ্ড মাত্র। এই তামসিকতার কবল থেকে উদ্ধার পাও আগে। জীবনকে ভো

করতে শেখ, রাজসিক হও, আধ্যাত্মিকতার কথা তার পর ভেবো। স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বার বার বলে গেছেন। বরফ গলে আগে জল হয়, তারপর তা বাষ্প হয়ে আকাশে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। আমরা এখন বরফ হয়ে আছি, তামসিকতার জড় বরফ। কিন্তু আমাদের জাগতে হবে। এত বড় একটা জাত তামসিকতার অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে না। আমরা সত্য কথা বলব, আমরা ভয় পাব না, আমরা কাজ করব এই তিনটেই এখন আমাদের মূলমন্ত্র হোক। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এই আশ্বাসে অলস হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা স্বাধীনতা পাই নি, আমরা আজও পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক, আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। আমরা কতকগুলো লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ীর হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তারা আমাদের লুটছে, শুষছে। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে যে ধরনের শোষণ আর অত্যাচারের কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তারই পুনরাবৃত্তি

হচ্ছে আবার, নতুন ধরনের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এসে গেছে আবার দেশে। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতেই হবে—এ কলঙ্ক আমরা মোচন করব। তা করতে হলে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা চরিত্রবান হব, সত্য কথা বলব, ভীরু হব না, কাজ করব, যা হাতের কাছে পাব তাই করব।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, "কাজ তো আমরা করতে চাই মাস্টার মশাই। কিন্তু কাজ পাই কোথায়?"

"কাজ সর্বত্র আছে। কুলির কাজ কর, মজুরের কাজ কর—"

"তাও মেলে না সব সময়। যে কাজ করতে পারি সে কাজ পাই না। সে কাজের কোনও ব্যবস্থা নেই, সুযোগ নেই—"

"তাহলেই চুপ করে বসে থাকবে? তোমরা কি পাথর? কিছু না পাও তো বিদ্রোহ কর, সেটাও একটা কাজ, কিন্তু তা করতে হলে যে চরিত্রবল দরকার তা কি তোমাদের আছে?"

গণেশ হালদার দেখতে পান নি কিন্তু ভিড়ের মধ্যে একজন পুলিস অফিসার সাধারণ পোশাকে বসে ছিলেন। তিনি উঠে এসে বললেন, "মাস্টারমশাই, এ বক্তৃতা আপনাকে আমি দিতে দেব না। আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন।"

"থানায়?"

গণেশ হালদার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

"হ্যাঁ, আপনি জনতাকে অকারণে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। এরকম আরও রিপোর্ট আমাদের কাছে আগে এসেছে, তাই আজ আমি নিজে এসেছিলাম। স্বকর্ণে শুনলাম আপনি এদের বিদ্রোহ করতে বলছেন। আমি এখানকার থানার অফিসার-ইন-চার্জ। আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করলাম। চলুন আমার সঙ্গে।"

ক্ষুব্ধ জনতা হৈ হৈ করে উঠল। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল গণেশ হালদারকে। দু'চারজন যুবক এগিয়ে এসে বলল "ও'কে থানায় নিয়ে যেতে দেব না। ছেড়ে দিন ও'কে—" মারপিট হবার উপক্রম।

গণেশ হালদার তখন বললেন, "তোমরা স্থির হও। এরকম বে-আইনী কাজ করতে যেও না। আমি এ'র সঙ্গে থানায় যাচ্ছি। আমাদের স্বাধীন দেশের গণতন্ত্রে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়া আছে। দেখা যাক্ সে অধিকার মেকি না সত্য।" গণেশ হালদার পুলিস অফিসারের সঙ্গে থানায় চলে গেলেন।

যতীশবাবুকে ট্রেনে তুলে দিয়েই ঝিনুক ভেবেছিল কাউরের খোঁজে বেরুবে। কিন্তু বাড়ি ফিরেই সে তনিমার একটা টেলিগ্রাম পেল যে সে কলকাতায় এসেছে, ঝিনুকও যেন অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসে। সুতরাং কাউকে খুঁজে বার করবার আর অবসর সে পেল না সেদিন।

ডাক্তার ঘোষালকে গিয়ে বলল, "আমি আজ কলকাতা যাচ্ছি।"

"কলকাতা! কেন?"

"একটু দরকার আছে।"

তনিমা এসেছে এ কথাটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল সে। কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে মিস্টার সেন যদি এ নিয়ে কিছু গোলমাল করেন এই ভয়ে তনিমার আসার সংবাদটা সে গোপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করল।

"দরকার? কিসের দরকার!"

"কিছু জিনিসপত্র কিনব। আমার ভালো গরম জামা নেই। আপনার জন্যেও অন্তত গোটা চারেক ভালো স্যুট করান দরকার। এখানে ভালো হবে না।"

"আমি বিলেত যাব না।"

"কি যে এক কথা বলেন বার বার। প্লেনে সীট বুক করা হয়ে গেছে। ভাল না লাগে, ফিরে আসবেন।"

ডাক্তার ঘোষাল মুখ গোঁজ করে চেয়ে রইলেন। ঝিনুকের দিকে খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগল। তারপর হঠাৎ তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"আমাকে কি মনে করেছ তুমি—What do you take me for? আমি কি তোমার হাতের পুতুল? Am I a puppet in your hands? I am not."

Not কথাটার উপর জোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ঝিনুক মুচকি হেসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতা চলে গেল ঝিনুক। তনিমার সঙ্গে দেখা হতেই তাকে জড়িয়ে ধরল সে। সত্যিকার আবেগ-ভরে জড়িয়ে ধরল। ঝিনুক দেখল তনিমা আরও রূপসী হয়েছে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন।

"অমন করে কি দেখছ ঝিনুক দি।"

"তোমাকে। এক অঙ্গে এত রূপ আগে কখনও দেখি নি।"

"এই রূপই আমাকে নরকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আবার এই রূপই আমাকে স্বর্গে নিয়ে এসেছে। বাবার খবর শুনেছ?"

"না। আসবার আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম তাঁর ঘর বন্ধ। চাকরটা বললে ছুটিতে গেছেন।"

"তাঁর চাকরি গেছে। তাঁর নামে এত রকম কমপ্লেন এসেছিল যে গভর্নমেণ্ট তাঁকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আছেন এখন তাঁর গুরুর কাছে হরিদ্বারে। আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি যে মাসে মাসে তাঁকে দু'শ টাকা করে দেব। চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছি লণ্ডনের। সেখানে ফিরে গিয়ে উত্তর পাব আশা করি।"

"তুমি এখানে এসেছ কেন।"

"মজা করতে। তোমাকে যে পার্টির কথা লিখেছিলাম সেই পার্টি দেব এখানে আজ। বড় হোটেলে এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে।"

"তোমার স্বামী কই?"

"তিনি এসেই বম্বে চলে গেছেন। কাল আমাকেও ফিরে যেতে হবে। তুমি কবে যাবে?"

"এ মাসের শেষে। প্লেনে সীট বুক করা হয়েছে।"

"তখন আমরা বোধহয় লণ্ডনেই থাকব। আজ পার্টিতে এস কিন্তু। এই নাও কার্ড।"

"কি উপলক্ষে পার্টি?"

"উপলক্ষ অবশ্য আমাদের বিয়ে। কিন্তু ওটা বাইরের উপলক্ষ, সেইজন্য উনি এখানে রইলেন না। কারণ, আমারই খেয়ালে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, আমিই পার্টির প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। এসো তুমি।"

"কি হবে পার্টিতে?"

"নাচ গান, খানা পিনা। হোমরা চোমরা লোক সব আসবে। আমার স্বামীর নামে নিমন্ত্রণ পত্র গেছে, না এসে কেউ পারবে না। ওই নামটা নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনবে সবাইকে। এ'রা মুখে যদিও বলেন জনতাই গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে জানেন গভর্নমেণ্ট চালাচ্ছে এদেশের এবং বিদেশের ধনকুবেররা। সুতরাং কোনও ধনকুবের 'তু' করে ডাকলেই ছুটে আসবে সবাই। তুমি এস, মজা দেখতে পাবে।"

যে বিখ্যাত হোটেলে পার্টিটা হয়েছিল এবং যাঁরা যাঁরা সে পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের পরিচয় ইচ্ছে করেই গোপন রাখলাম। গোপন রাখাই সমীচীন। খবরের কাগজের পাতায়, সভায়, জলসায় এ'দের নাম প্রায়ই চোখে পড়ে আপনাদের। বাজারে এ'রা বিদগ্ধ-সমাজের অলংকাররূপে গণ্য। সুতরাং এ'দের নাম প্রকাশ করে এ'দের খেলো করবার ইচ্ছে নেই। যা হয়েছিল তা সংক্ষেপে বলছি।

সাধারণ খাবার তো ছিলই নানারকমের, কিন্তু মদ এবং মাংসের আয়োজন হয়েছিল প্রচুর। রাঁধা মাংস ছাড়া, কাঁচা মাংসও ছিল। এত বিভিন্ন রকমের নারী-সমাবেশ এবং এতরকম উলঙ্গ-ধর্মী নারীসজ্জার রঙীন প্রদর্শনী সাধারণত দেখা যায় না। বহুমূল্য মদ এসেছিল বহু প্রকারের এবং তা পরিবেশিত হচ্ছিল দরাজ দাক্ষিণ্যে। সুতরাং একটু পরেই মাতাল হয়ে পড়লেন সবাই।

তনিমা এবং ঝিনুকই কিছু খায়নি। মদ তো নয়ই, খাবার পর্যন্ত নয়।

সবাই যখন খুব মাতাল হয়ে টলছে তখন তনিমা টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে বলল, "আমার ইচ্ছে এবার নাচ হোক। আমি আপনাদের জন্য ভালো মুখোশ আনিয়েছি, তাই পরে আপনারা নাচুন এই আমার অনুরোধ। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ে নাচবে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

টেবিল থেকে নেমে একগাদা মুখোশ নিয়ে এল। ভালুকের মুখোশ। প্রত্যেক পুরুষের মুখে তাই পরিয়ে দিলে সে। বাঁদরের মুখোশও ছিল, সেগুলো পরিয়ে দিলে মেয়েদের মুখে। মুখোশ পরে সবাই কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। মুখোশ পরবার জন্যে সে কি হুড়োহুড়ি। একটু পরেই মাতাল বাঁদরদের গলা জড়িয়ে মাতাল ভালুকদের নাচ শুরু হল।

তনিমা আবার পাশের ঘরে চলে গেল। বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা চাবুক নিয়ে। সার্কাসে রিং মাস্টারদের হাতে যেমন চাবুক থাকে তেমনি চাবুক। তনিমা সেই চাবুকে চটাং করে একটা শব্দ করে কলকণ্ঠে বলে উঠল—Go on darlings, don't stop (বন্ধুরা থেমো না, চালিয়ে যাও)।

অবর্ণনীয় এই নাচ চলল খানিকক্ষণ ধরে। তারপর সবাই শুয়ে পড়ল। বমি করতে লাগল কেউ কেউ। ঝিনুক হলে ঢোকে নি। সে উপরের ঘরের একটা জানলা দিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ একটা উচ্চ তীক্ষ্ন হাসি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল বিরাট হলে। ঝিনুক উঁকি দিয়ে দেখল তনিমা কোমরে হাত দিয়ে হাসছে। তার মনে হল হাসির বেগে একটা তলোয়ার কাঁপছে যেন।

গণেশ হালদারকে পুলিস আটকাতে পারে নি বেশীক্ষণ। সঠাম মুকুজ্জো খবর পেয়েই চলে গিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেকালের উচ্চশিক্ষিত আই সি এস। তিনি সব শুনে গণেশ হালদারকে ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয় তিনি পুলিস অফিসারটিকে ডেকে বললেন, স্বাধীন ভারতে বক্তৃতা দেওয়া অপরাধ নয়। সে অধিকার সকলেরই আছে। গণেশবাবুর বক্তৃতার যে সব সারাংশ আপনারা আমার কাছে দাখিল করেছেন তাতে এমন

কিছুই দেখলাম না যার জন্যে ও'কে শাস্তি দেওয়া যায়। উনি গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করেছেন, সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকেরই আছে, আর উনি যা বলেছেন তা নিতান্ত শূন্যগর্ভ কথা নয়। সুতরাং ও'কে ছেড়ে দেওয়া হোক। ও'র বক্তৃতা শুনে কোথাও যদি বিশৃঙ্খলা বা বে-আইনী হট্টগোল হয় তাহলেই পুলিস তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তা যখন হয়নি তখন পুলিসের হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

গণেশ হালদার কিন্তু আর একটা সমস্যায় পড়েছিলেন যার সমাধান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা সুঠামবাবুর দ্বারা সম্ভব ছিল না। তিনি যেদিন আবিষ্কার করেছিলেন যে সুঠামবাবু তাঁর বোনকে বিয়ে করেছে এবং বুলি এই বাড়িতেই আছে সেদিন তিনি যতটা উল্লসিত হয়েছিলেন, বুলির কাছে যে আবেগে ছুটে এসেছিলেন, তা যেন অনেকটা কমে গেছে। তাঁর মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয়েছে বুলিকে এভাবে ফিরে না পেলেই যেন ভাল হ'ত। এ বুলি যেন সে বুলি নয়। হাসি-খুশিতে যার সর্বাঙ্গ ঝলমল করত সে এখন বিষাদের প্রতিমা। জীবন্ত মাছ-রাঙার মৃত্যু হয়েছে, তার জায়গায় বসে আছে একটা শোলার প্রাণহীন পাখি। এই যে শোচনীয় রূপান্তর, রাজনৈতিক দাবা খেলার এই যে বীভৎস পরিণতি, এর কি কোন চারা আছে? নেহরুর বক্তৃতাবলী পড়লে কি এ দুঃখের উপশম হবে? কোন বিধানসভায়, কোন লোকসভায়, কোন বিচারশালায় আবেদন করে কি এর প্রতিকার হবে? কে ফিরিয়ে দেবে সেই বুলিকে?

গণেশ হালদার আজকাল বুলির কাছে খানিকটা সময় রোজ কাটান। ছেলেবেলার সব গল্প করে তাকে প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুলির প্রফুল্লতা ফিরে আসে না। তার মুখটা যেন মুখোশের মতো হয়ে গেছে। তাতে ভাবের কোন তরঙ্গ ওঠে না। গণেশ হালদার নানারকম বই থেকে নানারকম গল্প প'ড়ে শোনান তাকে মাঝে মাঝে। তিনি যতক্ষণ পড়েন বুলি চুপ করে বসে থাকে। তার পর একটু ফাঁক পেলেই উঠে চলে যায়, ঠাকুরঘরে গিয়ে খিল দেয়। কথা প্রায় বলেই না। প্রশ্ন করলে 'হাঁ' কিম্বা 'না' বলে। এ যেন সে বুলি নয় এ যেন অন্য লোক। কোনও অদৃশ্য দৈত্য যেন এর ভিতরকার প্রাণরস শুষে নিয়েছে। বাইরে পড়ে আছে ছিবড়েটা। এই প্রাণহীন বুলিকে নিয়ে কি করা যাবে, এই সমস্যার সমাধান কে করবে? গণেশ হালদারও ক্রমশ যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ছিলেন।

সুঠাম মুকুজ্যে বাড়িতে ছিলেন না। গত রাত্রে বুড়ো জাম্বু কুকুরটা মারা গিয়েছিল। তিনি তাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন ফিরলেন তখন বেলা একটা। মুখে কোনও বিষাদ বা শোকের চিহ্ন নেই। হাসি-মুখে গণেশ হালদারকে বললেন, "জাম্বুকে মা গঙ্গার কোলে দিয়ে এলাম। বাঁচল বেচারা। ইদানিং বড়ই কষ্ট পাচ্ছিল। আজ তো আপনার ছুটি? চলুন তাহলে দোরাবগঞ্জে যাওয়া যাক। সেখানে একটা নূতন ধরনের কৃষ্ণ-চূড়া গাছ আছে জমিদারদের বাগানে। খবর পেলাম তাতে ফুল ধরেচে। অপূর্ব ফুল। সাদা আর গোলাপী মেশানো। মনে হয় এক ঝাঁক পরী নেবেছে। আর একটা জিনিসও দেখাব। লজ্জাবতী লতা। দেখেছেন কখনও? ওখানে প্রচুর আছে। আর আছে কেষ্ট পাগলা। তাকে বললেই সে নাচ দেখায়। অদ্ভুত নাচ। আপনার বোনকেও রাজি করুন না, কেষ্টর নাচ ভার ভালই লাগবে।"

সুঠাম ডাক্তার বালকের মতো উৎসাহে কেষ্ট পাগলার নাচের বর্ণনা করতে লাগলেন। সে তো হাত পা দিয়ে নাচেই, মাথা দিয়েও নাচতে পারে!

একটু পরে দোরাবগঞ্জের বাগানে গিয়ে হাজির হলেন তাঁরা। বুলিও সঙ্গে ছিল। গণেশ হালদার লক্ষ্য করছিলেন সে যেন ঠিক সুরে সুর মেলাতে পারছে না। কেমন যেন সশঙ্কিত হয়ে আছে। সুঠাম মুকুজ্যে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। এক অদৃশ্য আনন্দের হিল্লোল যেন চঞ্চল করে তুলছিল তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে। সেই অভিনব কৃষ্ণচূড়ার ডাল নুইয়ে নুইয়ে দেখাতে লাগলেন ফুলগুলো। সাদার সঙ্গে গোলাপী যে কি অপরূপ হয়ে মিশেছে তা দেখিয়ে বললেন, "গোলাপী গোলাপীই আছে, সাদাও সাদা আছে। কেউ কারও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে নি, তবু দুজনে মিলে কি চমৎকার শোভার সৃষ্টি করেছে, না? সমাজেও আমাদের ওইটেই বোধহয় আদর্শ হওয়া উচিত। কেউ রং বদলাতে পারে না, কিন্তু ভদ্রভাবে পাশাপাশি থাকতে পারে। কি বল?"

বুলির দিকে সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন তিনি। বুলি সসঙ্কোচে একটু হাসল শুধু।

ঠিক সেই সময় একটা সুরের পিচকিরি যেন ছুঁড়ে দিলে কে পাশের একটা ঝোপ থেকে।

"কে বলুন তো?"

ডাক্তার মুখার্জি হেসে জিগ্যেস করলেন গণেশ হালদারকে।

"আমি ঠিক বলতে পারছি না।"

বুলি একধারে ঘাড় ফিরিয়ে মুচকি হেসে বললে, "টুনটুনি—"

গণেশ হালদার বললেন, "ও অনেক পাখী চেনে। ছেলেবেলায় বাগানে বাগানে ঘুরত যে।"

"তাই না কি।"

আরও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন ডাক্তার মুখার্জি। "ওটা কি বল তো?"

"ছাতারে।"

"ওই তারের উপর?"

"নীলকণ্ঠ।"

"বাঃ! চল তোমাকে আরও পাখী চি
দেব। বাঁশপাতি চেন? দোয়েল?
পাখী?"

ডাক্তার মুখার্জি সত্যিই শিশুর
প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন।

একটু পরেই কিন্তু বুলির মুখে অ
সেই মুখোশ নেবে এল। আবার গ
হয়ে গেল সে। মানুষটা বদলে গেল
তারপর সুঠাম মুকুজ্যে গেলেন লজ্জা
লতার খোঁজে। একটু দূরে একটা

চারটে লজ্জাবতী খুঁজেও বার করলেন। ...দের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখালেন কেমন ছোঁওয়া ...র পাতাগুলো মুড়ে মুড়ে যাচ্ছে। ভেবে-...লেন এ-দেখে বুলি হয়তো একটু কৌতুক বোধ করবে। হয়তো সে-ও ছুঁয়ে দেখবে ...তাগুলো। কিন্তু সে কিছুই করল না, সে ...ন ক্রমশ আরও গম্ভীর হয়ে পড়তে ...গল।

কেষ্ট পাগলার নাচও দেখা হল। সত্যিই ...নারকম নাচ দেখাল সে। শির্ষাসন করে ...ট্টুর মতো ঘুরতে লাগল। নাচের শেষে ...োল বাজিয়ে গানও ধরল। সে গানের ধুয়া ঃ এই দুনিয়ার মরণ বাঁচন, জানি না ভাই ...হার নাচন, নেচে গেয়ে আমি দাদা সেই কথাটাই বুঝতে চাই। তোমরা কেন হাসছ ...াই।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "চল ওই উ'চু টিলাটায় গিয়ে বসা যাক। ওখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়।"

পশ্চিম আকাশে মেঘ ছিল না। দেখা গেল সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল অস্ত যাচ্ছে। ডাক্তার মুখার্জি বশিষ্ঠ নক্ষত্রটাকে দেখিয়ে বললেন, "সপ্তর্ষির ল্যাজের ওই মাঝের নক্ষত্রটার নাম বশিষ্ঠ, আর তার ঠিক পাশেই দেখ ছোট্ট অরুন্ধতী। ওই যে খুব ছোট্ট, টিপ টিপ করছে, ঠিক বশিষ্ঠের পাশেই—"

তারপর একটু হেসে বললেন, "আমাদের অবশ্য মনে হচ্ছে বটে ঠিক পাশে, কিন্তু আসলে ওদের মধ্যে ব্যবধান অনেক।"

এর পরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। বুলি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে'দে উঠল।

"কি হল হঠাৎ!"

ডাক্তার মুখার্জি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু বুলি কোন উত্তর দিল না। হালদার-মশাই অনেক জিজ্ঞাসা করবার পর সে অশ্রু-সজল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "আমি উচ্ছিষ্ট, আমি উচ্ছিষ্ট, আমি দেবতার ভোগে স্থান পাবার যোগ্য নই। আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, দূরে করে দাও, আমি আর পাচ্ছি না।"

এ কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠলেন সুঠাম মুকুজ্যে।

"আমরা কেউ দেবতা নই। সবাই মানুষ। আর মানুষ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কোনও জীবন্ত জিনিসই হয় না। প্রকৃতির স্পর্শে আমরা নিত্য-নূতন হই। যে বিরাট স্রোতে আমরা ভাসছি তাতে কোথাও কোন ময়লা জমতে পায় না। ও-সব কথা ভাবছ কেন! ছি, ছি, তুমি কখনও উচ্ছিষ্ট হতে পার?"

গণেশ হালদার যদিও পাশে বসেছিলেন তবু তিনি স-স্নেহে বাঁ-হাত দিয়ে বুলিকে জড়িয়ে ধরলেন। বুলি তাঁর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

ঝিনুক জিনিসপত্র গুছিয়ে বসেছিল। আজ রাত্রের ট্রেনেই তাদের কলকাতা যাওয়ার কথা। তারপর সেখান থেকে প্লেন ধরবে। ডাক্তার ঘোষাল কিন্তু সমানে 'না' বলে যাচ্ছেন। তবু ঝিনুক আশা করে আছে শেষ মুহূর্তে হয় তো রাজি হ'য়ে যাবেন। ট্রেন রাত বারোটার পর। সকালে দশটার সময়ই তিনি একটা দূরের কলে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবেন। ঝিনুক ভাবল এই সুযোগে কাউয়ের খোঁজটা নেওয়া যাক। তাকে টাকাটা দিতে হবে। এতদিন এত বিবিধ গোলমালের মধ্যে ছিল সে যে কাউয়ের খোঁজ নিতে পারে নি।

বেরিয়ে পড়ল ঝিনুক। অনেক খুঁজে খুঁজে অনেকক্ষণ পরে সে কাউয়ের ঠিকানাটা বার করল বটে, কিন্তু কাউয়ের সঙ্গে দেখা হল না। অন্য কোনও লোকেরও দেখা পেল না যে তার খবর বলতে পারে। সবাই তখন বেরিয়ে গেছে। সামনে দেখল একটা বড় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিতে কেউ নেই। দূরে একটা বারান্দায় এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বুড়ি বসে বসে চাল বাছছিল। মুখটা সিংহের মতো, চোখে ডাইনির দৃষ্টি। তার কাছে যেতে ভয় করে। তবু ঝিনুক গেল। সে বলল, "ট্যাক্সিটা রমেশের। রাত্রে সে ট্যাক্সি চালায়। কাউ বাজার করতে বেরিয়েছে। ফিরবে সন্ধ্যের পর। কালী-পুজোর বাজার করতে গেছে। সে আজ কালীপুজো করবে এখানে।" ঝিনুক তাকে বলে এল—'কাউ এলে তাকে বোলো তোমার মাসিমা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলেন। তিনি আজ রাত্রের গাড়িতে কলকাতা চলে যাবেন। যদি সময় করতে পারে যেন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে নিশ্চয়

দেখা করে। একটা জরুরী দরকার আছে। আমার ঠিকানা সে জানে।'

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘর-বার করছে ঝিনুক। ডাক্তার ঘোষাল তখনও ফেরেন নি। কাউও আসে নি। ঘড়িতে যখন আটটা বাজল তখন রীতিমত চঞ্চল হ'য়ে উঠল সে। ডাক্তার ঘোষাল রোহণীপুরে গেছেন। এখান থেকে ষোল মাইল। যেতে-আসতে দু'ঘণ্টার বেশী লাগা উচিত নয়। মাঝে খানিকটা অসমতল জঙ্গলে রাস্তা আছে। সবসুদ্ধ তিন ঘণ্টাই লাগুক। রোগীর বাড়িতে একঘন্টা। বেরিয়েছেন দশটার সময়, তিনটে নাগাদ তাঁর নিশ্চয়ই ফেরা উচিত ছিল। এত দেরি হবার মানে কি? কঠিন রোগী? রাত্রে সেখানে থেকে যাবেন না তো! অনেক সময় কঠিন রোগী হলে থেকে যান তিনি রোগীর বাড়িতে। ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল খানিকক্ষণ সে। তারপর তার আর একটা কথাও মনে হল। রাস্তায় মোটর খারাপ হ'য়ে যায় নি তো। মোটরটা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। এক্সিডেণ্ট হয় নি তো? কাউও তো এখনও এল না। শহরের পূর্ব দিক দিয়ে যে রাস্তাটা মফস্বলের দিকে চলে গেছে সেইটেই রোহণীপুরে যাওয়ার রাস্তা। এইটুকু শুধু ঝিনুক জানে। কাউ এসে পড়লে সাইকেল করে তাকে পাঠানো যেত সেখানে। কেউ আসছে না, কি আশ্চর্য! খানিকক্ষণ ঘর-বার করে ঝিনুক শেষে ঠিক করে ফেলল ন'টার মধ্যে কেউ যদি না এসে পড়ে তাহলে নিজেই সে বেরিয়ে পড়বে। ততক্ষণ কি করা যায়? গ্রামোফোনটা পেড়ে রেকর্ড বাজাতে লাগল। ন'টা বেজে গেল। একটা মোটরের শব্দ শোনা যাচ্ছে, না? উৎকর্ণ হয়ে রইল। বেরিয়ে চলে গেল মোটরটা। কাউও এল না। আসবে না বোধহয়। উঠে পড়ল ঝিনুক। একটা কথা তার মনে পড়ল। কাউয়ের বাড়ির কাছে সে একটা ট্যাক্সি দেখেছিল। কাউকে নিয়ে সেই ট্যাক্সিটা ভাড়া করে ডাক্তার ঘোষালের খোঁজে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এ ছাড়া তো অন্য কোন উপায়ও নেই। ট্যাক্সিটা পাওয়া যাবে কি? না পাওয়া গেলেই মুশকিল। এই মফস্বল শহরে ট্যাক্সি বেশী নেই, যা দু'একটা আছে তা প্রায়ই পাওয়া যায় না। ওই ট্যাক্সিটা যদি পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল ঝিনুক। কাউ যে বস্তিতে থাকে তা-ও কাছে নয়। হেঁটে গেলে এক ঘণ্টার উপর লাগবে। ঝিনুক রিক্‌শা খুঁজতে লাগল। অনেক রিক্‌শা-ওলাই রাত্রে ও-অঞ্চলে যেতে রাজি হ'ল না। বলল, ও-পাড়ায় এত রাত্রে যাওয়া নিরাপদ নয়। অনেকক্ষণ পরে একটা রিক্‌শাওলাকে বেশী পয়সার লোভ দেখাতে রাজি হল সে। তাতেই চড়ে বসল ঝিনুক। রিক্‌শয় চড়ল বটে, কিন্তু রিক্‌শটা ভাল নয়, কিছুদূর গিয়েই থামে, চাকাটা মেরামত করে নিয়ে আবার এগোয়। অনেকক্ষণ পরে অনেক দেরিতে সেটা অবশেষে পৌঁছল কাউয়ের বস্তির কাছে। রিক্‌শা-ওলা আর যেতে চাইলো না। বলল, ও বস্তিতে আমি ঢুকব না মাইজি। তার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হেঁটেই গেল ঝিনুক। তার মনে হল যদি ট্যাক্সিটা না পাওয়া যায় তাহলে আর যাওয়াই হবে না আজ। সুবেদার খাঁ অনর্থক দাঁড়িয়ে থাকবেন ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনালের কাছে। কাউ কি কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না? কাউকে দেবার জন্যে টাকাটাও সে এনেছিল সঙ্গে করে। যতীশবাবুকে দেবার পর যা বেঁচেছিল তা সবই সঙ্গে ছিল তার। সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে বেড়াচ্ছিল টাকাটা। সোনার বাট দুটো বাক্সে রেখে দিয়েছিল। তনিমা তাকে বলে গিয়েছিল যা-কিছু টাকা বাঁচবে তা কলকাতায় তার স্বামীর দোকানে যেন জমা দিয়ে যায়, তাহলেই বিলেতে গেলে সে টাকাটা তাকে দিতে পারবে। বেশী টাকা সঙ্গে থাকাটা বে-আইনী। তাই করবে ঠিক করেছিল ঝিনুক। আত্মরক্ষার জন্য সে একটা ছোরাও কিনেছিল। ছোরাটাও সঙ্গে ছিল তার। কিছুক্ষণ পরে সে যখন বস্তির ভিতর ঢুকল তখন পাড়া নিস্তব্ধ। একটা ভয়াবহ নীরবতা থমথম করছে চতুর্দিকে। আর একটু ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল ডাক্তার ঘোষালের মোটরটা দেখে। ডাক্তার ঘোষালও এখানে এসেছেন না কি? কেন? আরও ভিতরে ঢুকে পেট্রোম্যাক্সের আলো দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে প্রকাণ্ড এক কালীমূর্তি। তার সামনে বলি দেবার হাড়-কাট। পাশেই কাউয়ের সেই প্রকাণ্ড খাঁড়াটা চক্‌চক্ করছে। আশেপাশে কেউ নেই।

"কাউ—"

ঝিনুকের নিজের কণ্ঠস্বরই অদ্ভুত শোনাল নিজের কানে। কাউয়ের সাড়া পাওয়া গেল না। পাশের একটা ঘর থেকে গোঁগোঁ শব্দ শোনা গেল একটা। সেই দিকে এগিয়ে গেল ঝিনুক। গিয়ে যা দেখল, তাতে চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল তার। ডাক্তার ঘোষালের হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা বস্তার মতো ফেলে রেখেছে তাঁকে এক কোণে। এ কি! তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে বসে পড়ল ঝিনুক বাঁধন খুলে দেবে বলে।

"কে—"

কর্কশ কণ্ঠের চিৎকারে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে রমেশকে দেখতে পেল সে।

"কে আপনি' ওর গায়ে হাত দেবেন না।"

"আমি কাউয়ের মাসি-মা। এঁকে এমন করে' বেঁধে রেখেছেন কেন!"

"ওকে মা-কালীর কাছে বলিদান দেওয়া হবে। ও মানুষ না পশু।"

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল ঝিনুকের দৃষ্টি থেকে। "কি যা-তা বলছেন আপনি! উনি যে কত বড় মানুষ, তা আপনার ধারণা নেই। উনি পশু নন, দেবতা। পূর্ববঙ্গে রায়টের সময়, যখন আমাদের ফেলে পালাচ্ছিল, তখন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে' আমাদের বাঁ ছিলেন। উনি পশু? ওঁকে বা দেবেন? আমার প্রাণ থাকতে তা হবে

হঠাৎ সে শাণিত ছোরাটা বার করে' ডাক্তার ঘোষালের কছে। তার তেজো মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল রমেশ।

"কাউ কোথা?"

"ভিতরে আছে।"

"তাকে গিয়ে বলুন, তার মাসি-মা এ দেখা করতে। আমরা আজ চলে' যাচ্ছি থেকে, যাবার আগে তাকে কিছু টাকা যেতে চাই।"

রমেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইল

"সত্যি, ইনি রায়টের সময় আপ বাঁচিয়েছিলেন?"

"উনি না থাকলে আমরা কেউ বাঁচতুম

মেরে না মেরে ও'র গায়ে আপনারা কেউ হাত দিতে পারবেন না। ও'র বাঁধন খুলে দিন আর কাউকে খবর দিন।"

রমেশ বুঝল তারা ভুল করেছে। ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই কাউ এল।

"এ কি করেছ তুমি! পিতৃহত্যার আয়োজন করেছ? এতে কি মা-কালী সন্তুষ্ট হবেন? তুমি তোমার মাকে টুঁটি টিপে মেরেছিলে, কত টাকা খরচ করে' উনি তোমাকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তার এই প্রতিদান? ছি, ছি, ছি—"

কাউ গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল, "উনি আমাকে অপমান করে' কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনি আপনাকে যাদু করে রেখেছেন, আপনাকে আমি উদ্ধার করতে চাই।"

"আমাকে উদ্ধার তুমি করতে পারবে না। আমরা আজই এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হবে কি না সন্দেহ। যাবার সময় তাই তোমাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি, যাতে তুমি ভালোভাবে সৎপথে থাকতে পার—"

ঝিনুক ব্লাউসের ভিতর থেকে নোটের বাণ্ডিলটা বার করে' ছুঁড়ে দিলে কাউয়ের দিকে।

"গুণে নাও, পাঁচ হাজার টাকা আছে। আর এ'কে ছেড়ে দাও এখুনি। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এ'কে এভাবে ধরলে কি করে' তোমরা!"

রমেশ আবার এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "আমরাই ও'কে কল দিয়েছিলাম রোহিণপুরে। একটা সাজানো রোগীও অবশ্য ছিল। আমরা লুকিয়ে বসেছিলাম রোহিণপুরের জঙ্গলে। রাস্তার উপর দু-তিনটে গরুর গাড়ি কাত করে' রেখেছিলাম। উনি ফেরবার সময় যখন গাড়ি সরাবার জন্য হর্ন দিচ্ছিলেন, তখন আমরা বেরিয়ে এসে ধরে ফেললাম ও'কে। সহজে হয়নি ব্যাপারটা। আমাদের দু'জনকে ঘায়েল করেছেন উনি। তবে আমাদের লোকবল বেশী ছিল, উনি পারলেন না শেষ পর্যন্ত। ও'কে বেঁধে ও'র মোটরে করেই এনেছি এখানে।"

"ও'কে দয়া করে ছেড়ে দিন এখন।"

রমেশ মাথা চুলকে বলল, "কাউ না বললে আমরা ছাড়তে পাচ্ছি না। আমরা কাউয়ের কথাতেই এ-কাজ করেছি। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভুলই করেছি। কাউ কি বল তুমি?"

কাউ হঠাৎ ভেঙে পড়ল। ঝর ঝর করে' কাঁদতে লাগল সে। ঝিনুকের পায়ের উপর উপুড় হয়ে বলল, "আমায় ক্ষমা করুন মাসি-মা। আপনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। আমি সারাজীবন আপনার সেবা করব।"

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে ভিতরে চলে গেল। রমেশও গেল তার পিছু-পিছু। একটু পরেই ফিরে এল রমেশ।

"কাউ বলেছে ও'কে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমরা এখানে ও'র বাঁধন খুলতে চাই না। খুললেই উনি তেড়ে আসবেন। ও'র গায়ে সাংঘাতিক জোর। ঝাবরা এক ঘুষিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কাটরার পেটে একটা লাথি মেরেছিলেন, সে এখনও কথা কইতে পারছে না। তাই এখানে ও'র বাঁধন খুলব না। যেমন বাঁধা আছে, তেমনি অবস্থাতেই নিয়ে যান ও'কে।"

ঝিনুকেরও মনে হল, বাঁধন খুলে দিলে উনি এখানে সত্যিই হয়তো মারপিট করতে লেগে যাবেন। তার চেয়ে ও'কে এমনি নিয়ে যাওয়াই ভালো। আর-একটা কথাও মনে হল। উনি বিলেত যেতে এখনও রাজী হননি। ও'কে বাঁধা অবস্থাতেই ট্রেনের কাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাক। একবার টেনে ট্রেনে তুলতে পারলে, অন্তত কলকাতা পর্যন্ত গেলে, হয়তো ও'র মত বদলাবে।

"বেশ তাহলে তুলে দাও ও'কে।"

গাড়ির পিছনের সীটে শুইয়ে দেওয়া হল ডাক্তার ঘোষালকে।

তাঁকে নিয়ে ঝিনুক সোজা বাড়ি চলে গেল।

ট্রেনের আর বেশী দেরি ছিল না। ঝিনুক বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি নতুন স্যুটকেস দুটো আর টিফিন কেরিয়ারটা তুলে নিলে গাড়ির পিছনে। আর হরসুন্দরকে বলে গেল—"কম্পাউণ্ডারবাবু এখানকার যা ব্যবস্থা করবার করবেন। তাঁকে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি।"

ঝিনুক সোজা চলে গেল ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে।

সুবেদার খাঁ ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। ট্রেনের হুইশল্ দীর্ণ করে' দিচ্ছিল নৈশ অন্ধকারকে। ঝিনুক ট্রেনের কাছে এসে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ঘোষালের বাঁধনগুলো কেটে দিলে।

"উঠুন, চলুন"—

ডাক্তার ঘোষাল ছাড়া পেয়েই তড়াক করে' নেবে পড়লেন গাড়ি থেকে, তারপর মাঠামাঠি ছুটতে লাগলেন। ঝিনুক স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর একবার খুব জোরে হুইশল বাজল। ঝিনুক জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে। সুবেদার খাঁ ইনজিন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলেন। ঝিনুক উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিলেন তিনি।

গভীর রাত্রি। কাউদের বস্তি নিঝুম হয়ে গেছে। কালীপুজো হয়নি। প্রতিমা একা দাঁড়িয়ে আছে। ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"কাউ, কাউ, কাউ—"

হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করতে লাগলেন তিনি। কাউ বেরিয়ে এল।

"এ কি, আপনি ফিরে এলেন? মাসিমা কোথা?"

"সে চলে' গেল। আমি ফিরে এলুম তোমার কাছে। আমাকে মারতে হয় মার, কাটতে হয় কাট। যা তোমার খুশী।"

বলেই অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

ঝিনুক নির্বিঘ্নে বিলেত পেঁছিল গিয়ে। পেঁছিবার মাসখানেক পরে নিম্নলিখিত চিঠিটিও পেঁছিল তার হাতে।

সবিনয় নিবেদন,

পাগলা গারদ থেকে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আপনার ঠিকানাটা পেয়েছিলাম সুবেদার খাঁর কাছ থেকে। আপনি আমাকে চেনেন না। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আপনার সব খবর আমি জানি। একটি সংবাদ দিচ্ছি। পাকিস্তানে আবার একবার রায়ট হ'য়ে গেছে। সেই রায়টে আপনার কাকা যতীশবাবু মারা গেছেন। আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন সুবেদার খাঁ। হয়তো খবরটা আপনার কাজে লাগতে পারে তাই জানিয়ে দিলাম। সঙ্গে খবরের কাগজের কাটিং (cutting) পাঠালাম। দেখবেন খবরটা মিথ্যা নয়। নমস্কার জানবেন। ইতি

পৃথিবী নন্দন

প্রায় তিনমাস কেটেছে। ডাক্তার ঘোষালের উদ্দাম স্বভাব আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দিবারাত্রি মদ খান আজকাল। কাউ ফিরে এসেছে তাঁর কাছে। যতটা সম্ভব সামলে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

সেদিন ডাক্তার ঘোষাল অত্যন্ত বেশী মদ খেয়েছিলেন। তার উপর জ্বর হয়েছিল। খুব বমি করে' শুয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। কাউ হাওয়া করছিল শিয়রে বসে'। ভাবছিল কোন ডাক্তার ডাকবে কি না, এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কাউকে? হঠাৎ একটা প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। হু হু করে' হাওয়া উঠল একটা। হঠাৎ ডাক্তার ঘোষাল চেঁচিয়ে উঠলেন—"ভগবান আমাকে নিচ্ছ না কেন! নচ্ছার কোথাকার, damned swine, নরকেই ঠেলে দাও না বাবা, আর যে পারা যায় না।"

বলেই চুপ করে' গেলেন। কাউ বড়ই অসহায় বোধ করতে লাগল। এমন সময় একটি ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকল।

"কে—" জিজ্ঞাসা করলে কাউ

"আমি ঝিনুক।"

তড়াক করে' উঠে বসলেন ডাক্তার ঘোষাল।

"Get out, get out, get out—বেরিয়ে যাও এখান থেকে"

ঝিনুক নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইলো।

সমাপ্ত

বৃত্তাকার ঘরগুলির সামনে চিলতে উঠোন। এই উঠোনটুকুই ঘরগুলির জানলা দরজা, যা বলা যায় তাই। পাশাপাশি অনেকগুলি ঘরের দাওয়ায় একসঙ্গে উনুনে আঁচ পড়েছিল। রোজই পড়ে হয়ত। অসীম কোনদিন দেখে নি। আজ ঘরের খোলা দরজার কাছটিতে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর উবু হয়ে বসে দেখছিল। জমাট ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠোন থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। চাকা চাকা বৃত্তের মত দেখাচ্ছে। না, যেন একটা টিকিবাঁক দৈত্য মায়াবলে দেহটাকে টেনে টেনে বাড়াচ্ছে—ভয়াল করে তুলছে। সন্ধ্যে হয় হয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আঁধার আঁধার সন্ধ্যেকে যেন গ্রাস করছে।

অসীম নিজের মনে হেসে উঠলো। বিনয় বলে যুগযন্ত্রণা। আজকের যুগটাই নাকি এমনি নির্মম নীরস ভয়াল, আর এমনি জটিল—কুণ্ডলীপাকানো যন্ত্র। বিনয় যখন বলে ওর কপালটা কুঁচকে যায়, চোয়ালটা বেঁকে যায়। ও বলে, ও হ'ল যুগযন্ত্রণার জারজ সন্তান। অসীমের অসহ্য লাগে সে দৃশ্যটি। সে উঠে পড়ে, হাঁ পালিয়েই যায়। তবু আবার যায়, না গিয়ে পারে না। বিনয় যেন কেমন তাকে আকর্ষণ করে। কি যে সে আকর্ষণ তা তার কাছেও স্পষ্ট নয়। উদ্ভট উদ্ভট কথা শুনতে যায়। একদিন বিনয়কে সে জিজ্ঞেসও করেছিল, বলতে পারো কেন আসি তোমার কাছে? কি পাই?

বিনয় অমনি। এক মুহূর্তও দ্বিধা করে নি, উত্তর দিয়েছেঃ না এসে পারো না, তাই। যন্ত্রণা তোমাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু তুমি ভীরু, তুমি স্বীকার কর না। তাই নির্লজ্জ মানুষটার কাছে ছুটে আসো, যে মানুষ চীৎকার করে বলে, বলতে পারে যে সে যুগযন্ত্রণার জারজ সন্তান।

অসীমের সব গোলমাল হয়ে যায়, তবু যেন বিনয়ের কথায় একটা প্রচণ্ড সত্য আছে, যা সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী যদি হঠাৎ জমাট রক্তের কুণ্ডলী হয়ে পড়ে? কেমন হয়? নিত্য কি এমনি রক্তক্ষরণই ঘটছে না? এই এই বাস্তুঘরের মত বাড়ির পাশাপাশি ডেবার

মানুষগুলি, এদের রক্ত কি নিত্তাই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না? মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে ওঠে। অসীম ঐ ছেঁড়া মাদুরেই ক্লান্ত হয়ে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ে। একটা ভয় ভয় ঠাণ্ডা যেন তার পায়েব দিক থেকে ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

কেবল বিনয়কে মনে পড়ে। বিনয় এমন-ভাবে জীবনের ময়না তদন্ত করে যে ভয় হয়, কিন্তু তা যে অসত্য, তা ত' বলতে পারে না।

অসীম ক'টা দিনের অনেকগুলো ছবি রোমন্থন করার চেষ্টা করে। পারম্পর্যহীন সব ছবি। ক্লেদাক্ত সব ছবি।

মাথাটা আরো আরো ঝিমঝিম করে। তারপর ঝিম মেরে যায়। তখন ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। কোন কোন ঘরের দাওয়ায় প্রদীপ ও ল্যাম্প জ্বলে—তারই ঈষৎ আভা এসে উঠোনটায় পড়ছে। উঠোনে আলো-আঁধারি ভাব। অসীম ঘরে আলো জ্বালে না। নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকে।

অসীম পারতপক্ষে ঘরে আলো জ্বালেই না। জ্বালার দরকারই হয় না। যখন সে ঘরে ফেরে, তখন আর আলো জ্বালাব মত অবস্থাই থাকে না। হা-ক্লান্ত শরীরটাকে কোন রকমে টেনে এনে দিয়াশলাই-এর একটা কাঠি খরচ করে দরজার চাবিটা খুলে মেঝের ছেঁড়া মাদুরটায় লুটিয়ে দেয়। একটা দমবন্ধ হওয়া-ভাব বুকটাকে চেপে ধরতে থাকে। তারপর কখন আরো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কোন কোন দিন ঘুম কিছুতেই আসে না। রগটা টন্‌টন্ করতে থাকে, যেন ছিঁড়ে যাবে। ছট্‌ফট্ করে, তারপর কখন অজ্ঞান্তে পাশের ঘরের প্রতি আড়ি পাতে। প্রথম প্রথম তার শিক্ষা তার শালীনতাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। কতদিন সে কানে তুলো গুঁজে শুয়েছে। কিন্তু বৃথাই সে সাবধানী হতে চেষ্টা করেছে। এ যুগটাই বে-আব্রুর যুগ: এ যুগে আব্রু নেই, থাকে না। এ বস্তির মত বাড়িতে ত' নয়ই। কোন চেষ্টা করতে হয় নি, কতদিন কত তীব্র চীৎকারই না ভুয়া আব্রুটা ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছে। শুয়ে শুয়ে অসীম শুনেছে, একটা তীব্র চীৎকার ফেটে ফেটে পড়ছে: বেশ করি, ঘরে মানুষ আনি, কার খাই না পরি? নিজের সোয়ামী কিছু বলে না, ও'র ভাতার এলেন বলতে—তাও যদি না জানতাম।

পাল্টা চীৎকার উঠেছে, নষ্টা মেয়েমানুষ, আবার হাঁক পাড়ছে, দেখ না। দু-ঘরের দু বউ চীৎকার করছে, ঝগড়া করছে, রাত্রির অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

অসীম ছেঁড়া মাদুরটায় মুখ ঘষে ঘষে মুখটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে—ও শুনতে চায় না, শুনতে চায় না।

এমনি কত দিন গিয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে কৌতূহল জেগেছে, কৌতূহল থেকে কেমন একরকম সাধ—কল্পনার সাধ জেগেছে। সে নিজেও জানে না, কেন আড়ি পাতে কি লাভ এতে, কিন্তু তবুও আড়ি না পেতে পারে না। গভীর রাত। বস্তির মত বাড়িটা স্তব্ধ, নিথর। অদূরে কুকুর ডেকে চলেছে কেঁউ কেঁউ। তারই মধ্যে এপাশ ও-পাশের ঘরে শব্দ ওঠে। কেমন আবছা, আবছা শব্দ। অসীম কুকুরের মত আড়ি পাতে, শব্দটা শোনে। একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে প্রতি অঙ্গে, সারা দেহে। এক ধরনের শিহরণ জাগে। অসীম ছটফট করে। তারপর ঘরে ঘরে সে-শব্দও কখন থেমে যায়। অসীম একটা অশরীরী যন্ত্রণার মত কাতরাতে কাতরাতে রাত ভোর করে দেয়।

সকালে আর ঘরে থাকে না। বেরিয়ে পড়ে, হাঁটে, বিনয়ের কাছে যায়। বিনয় অসীমের চোখমুখ দেখে হাসে, তার নিজের রাত্রির গল্প বলে, এক এক রাত্রির এক এক রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার, বিচিত্র স্বাদের গল্প। মানুষের মাংসের স্বাদ। অসীম হাঁ করে গেলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিনয়ের সঙ্গ অসহ্য হয়ে পড়ে। অসীম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। বিনয় হাসতে থাকে, সে হাসি যেন তাকে তাড়া করে ফেরে।

এমনিভাবে দিন চলে। স্কুলে যায়, শিক্ষকতাও করে, কিন্তু কেমন যেন সব নীরস লাগে। অকারণে ছাত্রদের প্রতি কটূক্তি করে। সব সময়ই জ্বর জ্বর ভাব নিয়ে ঘোরে। তারপর আবার তেমনি রাত্রি আসে। তেমনি অন্ধকার রাত্রি। তেমনি আড়ি পাতে। অর্থযুক্ত শব্দ হয়। অসীম মরিয়া হয়ে ওঠে, তারপর আবার কখন নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

দিনের আলোয় সব ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে যায়, সে কি পাগল হয়ে যাবে?

হাজত ঘরে বসে অসীম ভাবে। বিনয়, বিনয় শুনলে কি বলতো? নিশ্চয়ই বলতো, ভীরু ভীরু, একটা সুযোগ পেয়েও যে ছেড়ে দেয়, তার বাঁচার কোন অধিকার নেই।

সে-ছবিটা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে, অথচ কালো কালো মোটা মেয়েটা অবলীলাক্রমে পুলিসকে বলে গেল, হাঁ, ঐ লোকটাই, সেদিন সেই রাতদুপুরে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরের দিকে যাচ্ছে, তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে কাপড় জড়িয়ে ঘরে

টেনে নিয়ে গিয়েছিল, আর তার চরম সর্বনাশ করে ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েটা বলে আর কাঁদে। মেয়েটার বাপ মা পাঁচটি ছোট ভাইবোন দাঁড়িয়ে থাকে। বাপ রাগে গর্জায়, ভদ্রলোকের ছেলের এমনি কান্ড। অসীম কিছু বলতে পারে না। কি বলবে সে? সব কিছুই তার কাছে কেমন অদ্ভুত লাগে। একটা বিস্ময়, একটা যন্ত্রণা তাকে অভিভূত করে ফেলে।

সেদিনও অমনি অন্ধকারে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মেঝেয় বিছানো মাদুরটায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। দরজাটায় বুঝি সেদিন তালাচাবি ছিল না, ভেজানো ছিল। তাও অসীম ভাবে নি, ভাববেই বা কেন, কিই বা ঘরে থাকে? অসীম ভাবে নি। অনেক ঘুরেছে; ক্লান্তিতে দেহ ছিঁড়ে যাচ্ছে। মাদুরটায় অনেক আরাম নিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণই বা হবে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। কি যেন অন্ধকারের মাঝে তার ক্লান্ত দেহটাকে আঁকড়ে ধরছে। ভয় পেয়েছিল কি? হাঁ, প্রথম অনুভূতিটা ভয় ভয় ভাব। সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। না, একটা নরম নরম চাপ তাকে ঘিরে ধরছে, আঁকড়ে ধরছে। ক্লান্তির ভাব কেটে গিয়ে ভয় জাগছে; ভয়ও কেটে গিয়ে মরিয়া ভাব জাগছে। অসীম মরিয়া হয়ে সেই অদ্ভুত পিণ্ডটাকে হাত দিয়ে চেপে আর জাপটে ধরেই চমকে উঠেছে। এ যে, এ যে... কোন সন্দেহই নেই। একটা দেহ, একটা তীব্র নিরাবরণ ক্ষুধা তাকে গ্রাস করতে চাইছে। কি যেন হ'ল অসীমের, পুরুষের সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই দেহ-পিণ্ডটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে অন্ধকার ঘরের আরো অন্ধকার কোণে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর? স্পষ্ট মনে আছে, অনেকক্ষণ অসীম বিহ্বল হয়ে বসেছিল, আর ঘরের কোণে একটা চাপা চাপা কান্না দলা বেঁধে উঠছিল। না, কোন সহানুভূতি জাগে নি, তীব্র ক্রোধও যে অনুভব করেছিল, তাও ত মনে করতে পারছে না। তার পুরুষ-শরীর কি ক্ষুধার্ত হয় নি? হয়ত হয়েছিল, অসীম ভাবে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটনার আকস্মিকতাই তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, আর তখন সে যা করেছে, জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় করার মতই করেছে। কিন্তু সত্যই সে ত' কিছু করেও নি। সেই যে নিরাভরণ মাংস পিণ্ডটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, তারপর নিশ্চল হয়েই বসেছিল। কতক্ষণ কেটে গিয়েছে তেমনি ভাবেই। চাপা চাপা কান্নাটাও দম মেরে গিয়েছে। আরো কমিনিট পর একটা খসখস শব্দ হয়েছে, আর দরজাটা খুলে একটা দমকা হাওয়া চাপা আনুনাসিক অথচ তীক্ষ্ম কান্নার সুর তুলে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর সকালেই এই কাণ্ড। পুলিস এসেছিল। বস্তির মত বাড়ির সব ঘরের মেয়ে পুরুষেরা জমা হয়েছিল। আজ হাসি পায়, সেই যে বউটি জোর গলায় চীৎকার করে বলে, ঘরে লোক এনেছি ত' কার কি, হক স্বামীই কিছু বলে না, সেই বউটিও হয় ত অবাক হয়ে গালে আঙুল দিয়ে সেই ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল। কালো কালো মেয়েটি কেঁদে কেঁদে তার 'দুর্দশার' কথা বলছিল। সব চোখগুলো থেকে কি বিদ্বেষ, কি ঘৃণাই না ঝরে পড়ছিল! অসীম বলবে কি? তখনও তার অভিভূতভাব কাটে নি। সে কিছু বলে নি। সরোজবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের অংকের শিক্ষক অসীম সেন পুলিস ভ্যানে গিয়ে উঠেছিল।

অসীম আজ আপসোস করে আর ভাবে, ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যাওয়াটা মনকে চোখ ঠেরা ছাড়া কিছু নয়; নিশ্চয়ই সে রাত্রে তার সাহস হয়নি; তার সংস্কার, তার শিক্ষাভিমান মুহূর্তের জন্য মাথা চাড়া

দিয়ে উঠেছিল। অথচ কি অকারণ। সে-ই না তার আগে রাতের পর রাত পাশের পাশের ঘরের প্রতি আড়ি পেতেছে!

অসীম হাজত ঘরে বসে বসে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। ঠিকই সে-ই অপরাধী। সে অপরাধী কম কিসে? তার মন, তার জৈব ক্ষুধা উন্মুখ ছিল, সে ঠিক অপরাধ করে নি, কেননা তার সাহসের অভাব হয়েছিল। হাঁ, তার সাহস হয়নি। অসীম স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছোয়, আর কেমন যেন সব শূন্য মনে হয় তার।

কিন্তু ঘটনাটাই বা ঘটলো কেন? তাও ভেবেছে। কিন্তু কোন কিনারা করে উঠতে পারে না।

সে রহস্যও একদিন উদ্ঘাটিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ও আকস্মিকই। আদালতের কাঠগোড়ায় মাথা নীচু করে অসীম দাঁড়িয়েছিল। পরনে তার ময়লা পোশাক। তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত মনও ছিল না, আর সত্যসত্যই যখন সে নিজেই নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, তখন আর সে কেন কিছু করবে। আর তা ছাড়া তার কথা আদালত বিশ্বাসই বা করবে কেন? সে তাই এক অপরাধী-অপরাধী অথচ কৌতুকমিশ্রিত মন নিয়ে মাথা নীচু করে সব শুনে যাচ্ছিল।

মেয়ের বাবা বলছিল, আসামীর ঘরের ঠিক বাঁ দিকের ঘরখানায় তারা থাকে—স্বামী, স্ত্রী, তার বড় মেয়ে হতভাগী মৃণালিনী, তার আর পাঁচটি ভাইবোন। মৃণালিনীর বয়স উনিশ; গরীবের ঘর, পাত্রস্থ করতে পারে নি, চেষ্টা করছিল, এমন সময় ভদ্রবেশী—

অসীমের হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় তার বাঁ দিকের পাশের ঘরটার দিকেও সে আড়ি পাততো।

কিন্তু অসীমের বিস্ময়-বোধ তখনো বাকী ছিল। একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে নিল, সেই কালো কালো মেয়েটি সাক্ষীর পাটাতনে উঠেছে।

এ কি! এ কি সে শুনছে। সেই কালো কালো মেয়েটিই না বলছে, না, সেদিন সে যা বলেছিল, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। না, না, উনি কিছু করেন নি। ভগবানের দিব্যি, বিশ্বাস করুন, উনি কিছু করেন নি। বিশ্বাস না হয়, ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করুন।

সারা আদালত ঘর বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। মেয়ের বাবা, মেয়ের পক্ষের উকীল কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল বইকি, কিন্তু না বিচারপতি সব থামিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটি তখন অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে। এও চাপা চাপা কান্না, কিন্তু এর অর্থ যেন ভিন্ন। আঁচলের খুঁট দিয়ে নিজেই মুখ চেপে ধরেছে, তবু কান্না থামা মানছে না। আর সেই মুহূর্তে এক নতুন ছবি অসীমের চোখে পড়ে গিয়েছিল। একটা অননুভূত শিহরণ, একটা তীব্র ভালো লাগার আবেশ তার সারা দেহমনকে এক নতুন অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

সে ক' মিনিটই বা। আদালত শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিচারপতি মামলা ডিসমিস করে আসন থেকে নেমে গিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ বিস্ময়বিমূঢ় প্রৌঢ় পিতা রোরুদ্যমানা কন্যাকে সংগে নিয়ে আদালত ঘর ছেড়ে গিয়েছে। অসীম তখনো সেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। 'বাবুজী' ডাকে সাড়া জেগেছিল অসীমের।

সেই যে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অসীম, আর কোনদিন সেই বস্তির মত বাড়িতে তার সেই পুরাতন ঘরে যায় নি, সেই ছেঁড়া মাদুরটায় হা-ক্লান্ত শরীরটাকে লুটিয়ে দিতে যায় নি। হাঁ, যাওয়ার লোভ খুবই হয়। লোভ হয়, একবার, অন্তত একবার সেই রাতের অন্ধকারে অর্থবহ একখানা ঘরের প্রায়-প্রৌঢ় পিতার যুবতী কন্যাকে গিয়ে বলে, তোমার বেদনা বুঝেছি, তাই মর্যাদা আর সম্মান দিয়ে তোমায় নিতে এসেছি।

বড় সাধ হয় অসীমের একবার গিয়ে সেই যুবতী কন্যাকে এ কথা বলে।

না, কোনদিন আর অসীম সে-মুখো হয় না, হ'তে পারে না, কোথায় যেন বাধা পেয়ে যায়। তবে বিনয়ের কাছেও সে আর যায় না।

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১৮ ॥

চয়ন প্রায় বছর খানেক ছিল আয়েতু গোণ্ডের বাড়িতে। মাঝে মাঝে নারাঙ্গী নদীর ধারে সেই গুপ্তস্থানে সে দেখা পেত মালকোর। মাঠ থেকে ফেরার পথে সেখানেই অপেক্ষা করত। মালকো সারা দিনের সব কাজ ভুললেও সাঁঝের বেলা 'জলকে চল' কর্তব্যটা ভুলত না। কিন্তু রঙিলার পিঙ্গল চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে বেশী দিন ফাঁকি দেওয়া গেল না। রঙিলা ওদের চালাকিটা ধরে ফেলল। এরাও সতর্ক হয়ে যায়। হাতে-নাতে ধরতে না পেরে রঙিলা শুধু ঝাঁপি-বন্ধ সাপিনীর মতো ফুঁসতে থাকে আপন মনে।

বছর ঘুরে আবার এল 'উইজ্জা-পাণ্ডাম' মাস। চৈত-দাণ্ডার পরব এল, গেল। মহুয়া ফুল আর তেন্দু পাতা সংগ্রহের মাস এল, গেল। তারপরেই 'উইজ্জা' উৎসব। মাঠে বীজ ছড়াবার শুভলগ্ন। বীজ বোনার আগে ওরা একটা বাৎসরিক শিকার অভিযানে বার হয়—'উইজ্জা-ওয়েতা' শিকার। চৌলিকের দল শিরাহার দ্বারস্থ হয়। শিরাহা ধ্যানে বসে, তার উপর আঙ্গোপেনের ভর হয়। শিরাহার কণ্ঠে শোনা যায় দেব 'কাদরেঙ্গালে'র নির্দেশ—জঙ্গলের কোন অংশে শিকারে গেলে লাভবান হওয়া যাবে তার নির্দেশ পাওয়া যায়। উইজ্জা-ওয়েতা শিকারে কোন ভাল শিকার না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে সেবার মাঠে ফসল ভাল হবে না। সেটা ভারি দুর্লক্ষণ। শিকারের দেবতা হচ্ছেন দেব কাদরেঙ্গাল, দেবী তাল্লুর-মুট্টাইয়ের ভৈরব। শিকার পেলে প্রথমেই কাদ-রেঙ্গাল-দেবকে কিছুটা মাংস উৎসর্গ করতে হবে। তারপর গাইতা ভাগ করে দেবে বাকি মাংসটা। যার তীরবিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে প্রাণীটা—সে নেবে চামড়া-খানা।

এ বছর উইজ্জা উৎসবে ওরা পেল দুটো খরগোশ, একটা সম্বল আর একটা বুনো-শুয়োর। একদিনে এতগুলি শিকার—খুবই সুলক্ষণ। বুনো শুয়োরটা মেরেছিল চয়ন। নিজেও আহত হয়েছিল দাঁতাল শুয়োরটার আক্রমণে। বাঁ পায়ের উরুতে হল বৃহৎ ক্ষত। ধরাধরি করে ওকে সবাই নিয়ে এল বাড়িতে। আখালী কারও কথা শুনলে না। মালকোর উপর দিল আহত মানুষটার শুশ্রূষার ভার।

আপত্তি জানাতে এসেছিল রঙিলা। এ কেমন ব্যবস্থা। লামহাদা আর তার ভাবী বধূ! কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করেনি আখালী। পরদেশী ছেলেটাকে দাঁতালে একেবারে ফেড়ে ফেলেছে। মালকো ছাড়া তার দেখভাল করে কে।

মাস দুই ভুগল চয়ন। মনে মনে ধন্যবাদ দিল দাঁতাল শুয়োরটাকে। ভাগ্যে সে জখম হয়েছিল! তাই রোগশয্যায় শুয়ে এতদিনে সে মালকোকে পেল নাগালের মধ্যে। তীক্ষ্ম-দৃষ্টি পিঙ্গলনয়না বড় বোনের পাহারা এড়িয়ে বেশী কাছে অবশ্য যেতে সাহস পায় না মালকো—তবু ওরই মধ্যে দুটো চুপি চুপি কথা, একটু সোহাগ, একটু স্পর্শ—তাই বা কম কি। আর এই দুর্ঘটনার জন্যই বোধ করি নরম হল আয়েতু। স্থির হল, চয়ন ভাল হয়ে উঠলে মালকোর সঙ্গে তার শুভবিবাহ হবে। 'ইরপু পাণ্ডাম' মাস থেকে শুরু হয় বিয়ের মরসুম। শেষ হয় বর্ষাগমে। বর্ষাকাল এসে গেল প্রায়। অবিলম্বে বিয়ে না হলে আবার এক বছর বিবাহ নাস্তি। তাই আয়েতু সম্মতি জানাল এবার। খবর পাঠাল কোণ্ডাকে, কাবোঙ্গায়।

চয়ন আজকাল একটু ওঠাহাটা করতে পারে। আজকাল ও আয়েতুর বাড়িতেই থাকে। ঘটুলে দিনের বেলা কেউ থাকে না। অসুস্থ মানুষটা একা পড়ে থাকবে কেমন করে? আয়েতু সম্পন্ন গৃহস্থ। তার বাড়িতে দুখানি ঘর। সামনের ঘরে থাকে চয়ন। ভিতরের ঘরখানির নাম 'আঘা'—মাস্টারস বেডরুম। মেয়েরা শোয় ঘটুলে। আয়েতুর অবিবাহিত ছেলে থাকলেও ঘটুলে রাত কাটাতে যেত। বিবাহিত ছেলে থাকলে তাকে তুলে নিতে হত নিজের ছাপরা—বিবাহিত মেয়ে থাকলে যেত স্বামীর ঘরে। এ ছাড়া মুরিয়ার বাড়িতে থাকে হাঁস-মুরগী-শুয়োর-পাঁঠার জন্যে একটা উঁচু চালা। মাটি থেকে উঁচুতে মাচার উপর ঘর। সন্ধ্যাবেলায় সেই উঁচু চালায় ঝাঁপি-বন্ধ করে রেখে দেয় হাঁস-মুরগী-পাঁঠাকে। আর আছে আসকালোন ঘর। চয়ন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মালকো শোয় মায়ের কাছে—আঘা ঘরে। দেখাদেখি রঙিলাও ঘটুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। সেও শোয় ঐ ঘরে মালকোর গা ঘেঁষে। না হলে রাতে পাহারা দেবে কেমন করে? বাইরের ঘরখানি ছোট আলগির দিকে একটা ছোট খোপ—জানালা বিকল্প। সেই ফোকর দিয়ে দেখা যা তারায় ভরা আকাশের একটা ছোট্ট আভাস

এতদিন অতটা উতলা হয়নি চয়ন। [illegible] মুহূর্তে শুনল আয়েতু কন্যাসম্প্রদা[illegible] রাজী হয়েছে অমনি কেমন যেন আনম[illegible]

হয়ে গেল সে। আর যেন ধৈর্য বাধা মানে না। খবরটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকে মালকোও আর এ ঘরে আসছে না। যা লাজ্বক মেয়ে।

ছোট্ট কাটুলে শুয়ে শুয়ে উশখুশ করছিল চয়ন। আর মাত্র এক মাস। তারপরেই তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ। ধরা দেবে মালকো। পাহাড়ী জোয়ানী! চয়ন ছোট্ট ফোকর দিয়ে তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকায়। উপত্যকাটা নিঝুম পড়ে আছে। ঝিমুচ্ছে যেন। রাত অনেক। চাঁদের আবছা আলোয় বনে-পাহাড়ে মাখামাখি। ঘটুলঘরের দিক থেকে ভেসে-আসা শোরগোলটা থেমে গেছে অনেকক্ষণ। জোড়ায় জোড়ায় ওরা শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়। যৌবনপুষ্ট মালকোর দেহটা মনের চোখে ভেসে ওঠে। আর এক মাস। তারপর আর বাধা থাকবে না। আর রঙিলা এসে মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে না। মালকোকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে কাবোঙগায়। ছোট্ট একটি কুটির বাঁধবে। বন-জঙ্গল দাবড়ে চয়ন

নিয়ে আসবে শিকার, সোনা ফলাবে মাঠে—লাজুক মিষ্টি মালকোর হাতে এনে দেবে নানা সম্পদ। ওদের দুজনের সংসারে সে তৃতীয় ব্যক্তিকে সহ্য করবে না। নিভৃতে থাকবে ওরা দুটিতে গাঁয়ের একান্তে। না, তা কেন? অতিথি-বন্ধু আসবে বইকি! অতিথি অভ্যাগতের সেবাযত্নই যদি না করল তবে কেমন মুরিয়ার সংসার গড়ে তুলবে ওরা। আর তা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি তো আসবেই। মালকোর বাচ্চা হবে না? চয়নের হাসি আসে! তারও বাচ্ছা হবে। চয়ন তাকে শেখাবে তীর ছোঁড়া, শিকার করা। পাঁচ-গাঁয়ের মানুষ অবাক হয়ে যাবে চয়নের ছেলেকে দেখে। ছেলে, না মেয়ে? আচ্ছা মালকোও কি চয়নের কথা এমনি করে ভাবে? এভাবে রাতের পর রাত আকাশের তারা গোনে? পাশের ঘরেই শুয়ে আছে মালকো। একবার চুপিসারে গিয়ে দেখে আসবে? না থাক, কাজ নেই! ঐ ঘরেই আছে রঙিলা, পাংনাইন হানার! পাশ ফিরে শোয় চয়ন। অস্ফুটে উচ্চারণ করে—মালকো, মালকো! যেন ঐ মিষ্টি নামের অস্ফুট উচ্চারণের মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে।

রাত কত হয়েছে খেয়াল নেই। ওরই মধ্যে কখন একটু তন্দ্রামতো এসেছে। হঠাৎ খুট করে কি একটা শব্দ হওয়ায় আচমকা ঘুমটা ভেঙে যায়। চয়ন উঠে বসে। দেখে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মালকো। অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না অবশ্য। চাঁদ অস্ত গেছে। আবছা তারার আলোয় মনে হল, মালকো একটা আঙুল রেখেছে ঠোঁটের ওপর। চয়ন কাটুল ছেড়ে উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে ধরতে যায় মালকোর শাড়ির আঁচল। চকিতে সরে যায় মালকো। চয়নের নাগালের বাইরে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। টলতে টলতে চয়ন ধীরপদে এগিয়ে আসে ওর দিকে। কিন্তু ধরা না দেবার খেলায় যেন মেতেছে মালকো। সেও ধীরপদে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। নেমে পড়ে উঠানে।

চয়ন একটু অবাক হয়েছে। মালকোর যে এতটা সাহস হতে পারে তা যেন ওর ধারণা ছিল না। লাজুক মুখচোরা মালকোও বুঝি মাতাল হয়ে পড়েছে আজ! আবছা আলো-আঁধারিতে চয়ন দেখল উঠানটা পার হয়ে মালকো ঢুকে গেল ওপাশের একচালা 'আসকালোন' ঘরে। হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে।

চয়ন সাবধানে নামল উঠানে। শরীর তার এখনও দুর্বল। পায়ে জোর পাচ্ছে না। কিন্তু মালকোর ঐ হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে এমন ক্ষমতা নেই চয়নের। পায়ে পায়ে সেও এগিয়ে যায় আসকালোন ঘরের দিকে।

নীরন্ধ্র অন্ধকার আসকালোন ঘরটা। একটাও জানালা নেই। একবার চয়নের মনে

মালকো—নারাণপুর

হল, কাজ নেই—ফিরে যাই। 'আসকালোন' ঘরটা অশুচি, অপবিত্র। কোন পুরুষ-মানুষের আসকালোন ঘরের চৌকাঠ পার হবার আইন নেই। তাতে অমঙ্গল হয়। মনটা তাই খুঁতখুঁত করছে। কিন্তু মালকোর সে হাতছানিকে উপেক্ষাই বা করে কেমন করে?

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঝেতে ছড়ানো আছে খড়ের বিছানা। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। শীতল একটা নারীদেহ! উন্মুখ প্রতীক্ষায় সেও বুঝি নিমেষ গুনেছিল। অন্ধ আদিম আবেগের বুকে নিঃশেষ হয়ে যায় দুজন।

কতক্ষণ কেটেছে? হঠাৎ বাইরে খুট করে একটা শব্দ হল। সংবিৎ পেয়ে চয়ন উঠে বসে। কে যেন আসছে। অন্ধকারের মধ্যে মালকোও নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে খুলে গেল আসকালোন ঘরের ঝাঁপের দরজা। অন্ধকারে চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। তারার অস্পষ্ট আলোয় চয়ন দেখল, একটি নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারের কাছে। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নির্ঘাত রঙিলা! সর্বনাশ!

কোথাও কিছু নেই, মালকো সেই নারী-মূর্তিকে একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ধরা পড়ে গেছে চয়ন। আর রক্ষা নেই। চয়নও উঠে আসে পায়ে পায়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে কাজ। আর লজ্জা সংকোচ করে লাভ নেই। মুহূর্তে মন স্থির করে চয়ন। ক্ষমাই চাইবে সে রঙিলার কাছে। ধাক্কা খেয়ে রঙিলা বসে পড়েছে খড়ের গাদায়। চয়ন এগিয়ে এসে তার হাত ধরে তোলে, কিন্তু ও কাঁদছে কেন?

চয়ন কাতরস্বরে বলে: এবারকার মতো মাপ কর রঙিলা!

: রঙিলা?—চমকে ওঠে, আগন্তুক মেয়েটি।

সে কণ্ঠস্বরে তার চেয়েও বেশী চমকে ওঠে চয়ন! এ তো রঙিলা নয়! এ কে! কে তুমি?

ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যে মেয়েটি এখন কাঁদছে সে আ[র] কেউ নয়—মালকো! কিন্তু তা কেমন ক[রে] হবে? অবাক হয়ে চয়ন ভাবে। তা হ[লে] সে মেয়েটি কে? যে তাকে অন্ধকারের ম[ধ্যে] হাতছানি দিয়ে ডেকে এনেছিল? এইমা[ত্র] গায়ের কাপড় সামলে যে ছুটে বেরিয়ে গে[ল] আসকালোন ঘর থেকে? যার সঙ্গে [...] এতক্ষণ...

হঠাৎ ওর ঘর থেকে বিদ্যুৎপৃষ্ঠে[র] মতো মুখ তুললো মালকো। মুখচো[রা] লাজুক মেয়েটার ভিতর থেকে হঠাৎ বেরি[য়ে] এল কোন রণচণ্ডী! ওর স্বভাবে[র] ছাড়িয়ে উঠল ওর আদিম রক্ত। নিষ্ঠু[র]

হাতে মাল্কো চালাতে থাকে চড়-চাপড়-ঘুঁষি। পাশে পড়ে থাকা একখানা কাঠ নিয়ে শেষ পর্যন্ত নির্মম হাতে থাকে আঘাতের পর আঘাত। সংবিৎ হারায় অধম চরনের কপাল কেটে গিয়ে দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে!

আশ্চর্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল! একটা আঘাতও প্রতিহত করবার চেষ্টা করেনি। শেষ পর্যন্ত মাথার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল অসুস্থ চরন নিরলায়।

প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা!

নিজেকে কাজের ধান্দায় ভুলে গেছি নারায়ণপুরের আধশোনা গল্প। ইট-কাঠ সিমেন্ট-লোহার স্তূপে আকণ্ঠ ডুবে আছি। ঘটনাচক্রে একদিন সন্ধ্যাবেলায় জয়পুর-রাজার গেস্ট হাউসে (বর্তমানে সেটি ডাক-বাংলো) দেখা হয়ে গেল সব পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে। ডাক্তার পিল্লাই, জয়দীপ মেহরা আর গুপ্তেসাহেব। ও'রা আমার আগেই এসে উঠেছেন ডাক-বাংলোয় রাত কাটাতে। খুশী হয়ে উঠলাম ও'দের দেখে। যাক্, রাতের আড্ডাটা তা হলে জমবে ভাল। নেপথ্যে বিধাতাপুরুষ বোধ করি হেসে-ছিলেন।

ডাক্তার সাহেবকে বলি : কেমন আছেন? আপনার রুগী কেমন?

: দুজনেই যথাপূর্বম্।

মেহরা সাহেবকে বলি : মধ্যপ্রদেশের মানুষ হঠাৎ উড়িষ্যায় যে?

শুনলাম, উনি এসেছিলেন কোরাপুটে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চীফ অ্যাড-মিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে পারালকোটের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে দেখা করতে।

: আরে গুপ্তেজী? আপনি এ পাড়ায়?

: আমি এসেছি ভালুক নাচ দেখতে!

: ভালুক নাচ! সে আবার কি?

গুপ্তে জবাব দেন না। মৃদু হাসেন। শুনলাম, আগামীকাল একটি অনুষ্ঠান আছে জয়পুরে। গুপ্তে সাহেব একদল আদিবাসীকে নিয়ে এসেছেন কোন নাচের প্রোগ্রামে। মেহরা বললেন : ভালুক নাচই বটে! কেন যে কর্তারা এই নাচের আয়োজন করেন বুঝি না। কী আছে ঐ নাচে যে, বাইরের লোক এলেই একদল অর্ধ-উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে জড়ো করে তাদের নাচাতে হবে?

ডাক্তারসাহেব বাধা দিয়ে বলেন : কিছুই কি নেই? ওদের নাচের রিদম, ছন্দ আর সুর সত্যই অনবদ্য!

হা-হা করে হেসে ওঠেন মেহরা। বলেন : কেন মনকে চোখ ঠারছেন ডাক্তারসাহেব? সত্যি কথাটা স্বীকার করুন। রিদম, ছন্দ আর সুর তো উপভোগ করেন না। আসলে দেখেন এমন কিছু যা শহরে-বাজারে দেখা যায় না! অবদমিত কামনার মূলে সুড়-সুড়ি লাগে—আরাম পান আর মনকে বোঝান নৃত্যরসের স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছেন।

লক্ষ করে দেখি, গুপ্তেজীর কালো মুখখানা বেগুনী হয়ে উঠেছে!

বেয়ারা কফির ট্রে এনে নামিয়ে রাখে।

একপাত্র র কফি ঢেলে নিয়ে মেহরা জুত করে বসেন। বলেন : ভালুকগুলো জঙ্গলে আছে জঙ্গলেই থাক। সভ্য জগতে তাদের ধরে নিয়ে এসে ভালুক নাচ দেখানো আমার বরদাস্ত হয় না। ন্যাংটা মানুষগুলোর কেলেঙ্কারি যতই লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা যায় ততই মঙ্গল!

গুপ্তেজীর মুখে আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বাভাষ। আমি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি বলি : আপনি অন্যায় বলছেন। সরকার নানাবিধ আদিবাসী পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছেন। দু চার বছরেই......

বাধা দিয়ে মেহরা বলেন : রাখুন মশাই! ওদের মধ্যে স্কুল খুললে, ওদের কাপড় পরাতে শেখালেই ওরা সভ্য হয়ে উঠবে? অসম্ভব! ওরা মনে প্রাণে অসভ্য বর্বর! ওদের শোধরানো যাবে না! শুধু দেখতে হবে, এ কলঙ্কের কথা যেন বাইরের জগতে জানাজানি না হয়ে পড়ে।

মনে হল, মেহরা যেন গুপ্তেজীকে আঘাত দেবার জন্যই এভাবে বলছেন। পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করছেন। তাই বললুম : সে ক্ষেত্রে আপনাদের পার্বালিসিটি ডিপার্টমেণ্ট আদিবাসীজীবনের যে প্রামাণ্য চিত্র তুলে এনেছে সেটা অন্যায় হয়েছে নিশ্চয় আপনার মতে?

: হয়েছেই তো!

আমি হেসে বললুম : ভাগ্যে শ্যুটিঙের সময় আপনি ছিলেন না। থাকলে নিশ্চয়ই এক্সপোসড স্পুলটা ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে কেড়ে নিতেন। অর্ধনগ্ন আদিবাসী রমণীর ছবি নিশ্চয় সভ্যজগতে আনতে দিতেন না!

গুপ্তেজী আড়চোখে একবার চাইলেন

আমার দিকে। যাক, ঈশান কোণটা সাফা হয়ে এসেছে। ঝড় এল না!

ডাক্তার পিল্লাই বললেন : কিন্তু কেলেঙ্কারি আপনি কোনটাকে বলছেন?

প্রসঙ্গান্তরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মেহরা। আবার হুল ফোটাবার চেষ্টা করেন নতুন করে : কোনটা নয়? যেমন ধরুন মুরিয়াদের ঘটুল। এমন বিশ্রী ব্যাপারের কথা সভ্য দুনিয়াকে জানিয়ে কী লাভ? ঘরের কেচ্ছা লুকিয়ে ফেলাই তো ভাল। এ কু-প্রথাকে যতদিন না আমরা সমূলে উৎপাটিত করতে পারব ততদিন ওটার কথা চেপে যাওয়াই উচিত।

ডাক্তার সাহেব দৃঢ় প্রতিবাদ করেন : আমি অন্তত আপনার সঙ্গে একমত নই। প্রথমত এটাকে আমি বিশ্রী ব্যাপার বলে মনে করি না, দ্বিতীয়ত, বিশ্রী হোক, সুশ্রী হোক—ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে। গোপন করে যাওয়ায় কোনও মঙ্গল নেই।

মেহরা বলেন : বিচার করার আবার আছে কি? অবিবাহিত নরনারী একসাথে রাত্রিবাস করে—তাতে সমাজের প্রত্যক্ষ অনুমোদন আছে—এর চেয়ে নৈতিক অবনতি আর কি হতে পারে?

পিল্লাই হেসে বলেন : আর কি হতে পারে আলোচনার আগে আমি প্রশ্ন করব—এটাকে নৈতিক অবনতির শেষ দৃষ্টান্ত আপনি মনে করছেন কেন? নীতির কোন সংজ্ঞায়?

নীতির সর্বজনীন সংজ্ঞায়। সর্বদেশে সর্বকালে সতীত্বের যে সংজ্ঞা স্বীকৃত, সেই সংজ্ঞায়।

: কিন্তু সতীত্বের সংজ্ঞাটা তো দেশ-কাল-নিরপেক্ষ একটা কনসেপ্ট নয়। ওদের সমাজে সতীত্বের ধারণাটা অন্য রকম। যেহেতু সেটা আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে না সেই হেতু সেটা খারাপ, এ কথা বলার মধ্যে আর যাই থাক, যুক্তি নেই। দেখতে হবে, ওরা যে সংজ্ঞাটা মেনে নিয়েছে তাতে ওদের সমাজ-জীবনে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে—কেমন করে ওরা তার সমাধান করেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ওদের ঐ ব্যবস্থায় কি আমাদের চেয়ে বেশী শান্তিতে আছে? সভ্য জগৎ আমাদের শিখিয়েছে, প্রাক-বিবাহ জীবনে ছেলেমেয়েদের কোন প্রত্যক্ষ যৌন-অভিজ্ঞতা থাকবে না; দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি সভ্য সমাজ এ নির্দেশ স্বতঃসিদ্ধের মতো মেনে নিয়েছে। ওরা এটাকে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে নারাজ। ওরা জানতে চায় তার কারণ!

মেহরা সাহেব নাটকীয় ভঙ্গিতে কানে হাত চাপা দিয়ে বলেন : ইয়ে বাৎ শুনুনোই গুনা হ্যায়!

পিল্লাই হেসে বলেন : সিরেফ কান বন্দ্ করনে সে নেহী চলেগা মেহরা সাব—দো আঁখে ভি বন্দ্ কিজিয়ে।

আমি বললুম : কেন চোখ বন্ধ করতে যাব কোন দুঃখে?

: চোখ-কান খোলা থাকলে যে ধরা পড়ে যাবে, ও আইন কেউই মানে না। অবশ্য আপনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন সে অপ্রিয় সত্যটাকে চাপা দিতে। মেহরা সাহেবের ভাষায় 'ঘরের কেচ্ছা লুকানোর চেষ্টাই স্বাভাবিক।' আপনারা ভাবেন এতেই সমাজের কল্যাণ। ওরা সেটাকে চাপা না দিয়ে সরাসরি অনুমোদন করে। এই তো তফাত?

আমি তর্কের খাতিরে বলি : কিন্তু আপনি কি একটু বাড়িয়ে বলছেন না?

: আমি তো তা মনে করি না। ১৯৩৮ সালে মিস্ ডরোথি ব্রমলি নামে একজন যৌন-বিজ্ঞানী মহিলা ছয় শ' জন আমেরিকার ছাত্রের কাছে চিঠি লিখে জানতে চান তাদের অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের মধ্যে শতকরা সত্তরজন চিঠির জবাবে জানিয়েছে প্রাক-বিবাহ জীবনেই তারা জীবনের মূল সত্যের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ডাক্তার ডিকিনসন, ডাঃ কিনসের স্ট্যাটিসটিক্স খুলে দেখুন......

মেহরা সাহেব বাধা দিয়ে বলেন : আমেরিকাই সভ্য জগতে একমাত্র প্রতিনি[ধি] নয়।

: মানলাম, বলেন ডাক্তার পিল্লা[ই] কিন্তু ওরা সত্যবাদী জাত। আমাদের দে[শে] এ ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স যোগাড়ই কর[তে] পারবেন না। আপনি যদি ছয় শ' [...] ভারতীয়ের কাছে চিঠি লেখেন, তা[...] প্রাক-বিবাহ জীবনের অভিজ্ঞতা জানা[...] তা হলে দেখবেন অর্ধেকের বেশী [...] জবাবই দেবে না সঙ্কোচে—বাকি ক[...] সত্য গোপন করবে, লজ্জায়!

আমি বললুম : বাস্তবে কি হয়, [...] হচ্ছে, সে কথা বাদ দিয়েও যদি আমি [...] করি কি হওয়া উচিত, তা হলে আপনি [...] বলবেন? বিবাহপূর্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ[...] জিনিসটা বাঞ্ছনীয়, না অবাঞ্ছনীয়?

ডাক্তারবাবু বলেন : আপনারাই ব[...] আপনাদের মত। আপনারা কি এট[া] অবাঞ্ছনীয় মনে করেন?

আমি বললুন : আলবাত! না হলে [...] জিনিসটার থ্রিলটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

মেহরা বলেন : শুধু তাই নয়, [...] সভ্য জগতের বনিয়াদই ধসে যাবে।

: আর গুপ্তেজী? আপনার মত?

কিন্তু কোথায় গুপ্তেজী? তিনি নিঃশ[...]

ঠে গেছেন কখন। খটকা লাগল। এমন তো ওয়ার কথা নয়? যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি তাতে তো দুপক্ষেজীর অনাসক্ত হয়ে পড়ার কথা নয়? ডাক্তার সাহেব কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। র্কে মেতে উঠেছেন। বলেন : তর্কশাস্ত্র লে বিচারকের কোনরকম 'বায়াস' থাকলে একটা ব্যবস্থার ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না। আপনারা একটা পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে এ কথা বলছেন।

: এ কথা কেন বলছেন?

: হিন্দুসমাজ আমাদের শিখিয়েছিল হিন্দু নারীর একবার মাত্র বিয়ে হবে, বিবাহের পর স্ত্রী হবে একমাত্র স্বামীর ভোগ্যা। স্বামীর মৃত্যুতে সে আবার ব্রহ্মচর্য পালন করবে। এই আইনকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছিল সতীত্বের কনসেপ্ট। মনে হয়েছিল এ ব্যবস্থা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং অনড়। বিধবা-বিবাহ এই ধারণাটায় হানল প্রথম আঘাত। হিন্দু কোড বিল দ্বিতীয়। বিদ্যাসাগর মশাই সতীত্ব কথাটার সংজ্ঞাটাকে

দিলেন অনেকখানি বদলে—হিন্দু কোড বিল দিল আর এক ধাপ এগিয়ে। প্রতিবারেই পরিবর্তনের প্রস্তাব ওঠামাত্র সমাজ হাঁ হাঁ করে তেড়ে এসেছিল। মনে হয়েছিল—এ অসম্ভব! মেহরাজীর ভাষায় এতে সভ্য দুনিয়ার বুনিয়াদ যাবে ধসে। তা যায়নি কিন্তু। নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর সমাজ তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েনি। এতদিন আমরা জানতাম, ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে প্রজননের গূঢ় সত্যটা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জন্যে কত ছেলের জীবন যে আমরা বিষময় করে তুলেছি, কত কুমারী মেয়েকে বলি দিয়েছি উদাসীর মাঠে তার লেখাজোখা নেই। তবে হ্যাঁ, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি খবরটা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে। ঘরের কেচ্ছা লুকানোর চেষ্টাই নাকি স্বাভাবিক! আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, সাম্প্রতিককালে একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন—এ ভুল পথ। ছেলেমেয়েদের ছোট বয়স থেকেই জীবনের মূল সত্যটার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পশ্চিমের অনেক স্কুলে কৈশোরের শুরুতেই এ বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। জীবনের তথাকথিত গোপন-সত্যটা তাঁরা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আপনাদের কি মত? তাঁরা ভুল করছেন?

মেহরা সাহেব জবাব দিলেন না।

কোণঠাসা হলেও আমি স্বীকার করলাম: না, তাঁরা ভুল করছেন না!

: আর আজ যদি আর একদল বৈজ্ঞানিক আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন—কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চাই শুধু থিয়োরেটিক্যাল লেকচারে শেখানো যায় না। ছবি, ম্যাজিক-লণ্ঠন আর বক্তৃতায় এ বিষয়ে শিক্ষা দেবার আয়োজন হলে জলে না নেমে সাঁতার শেখানোর চেষ্টা—তা হলে আপনি কি বলবেন?

মেহরা সাহেব আর ধৈর্য সংবরণ করতে পারেন না। তিক্তকণ্ঠে বলেন: দেখুন ডাক্তারসাহেব, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে...

বাধা দিয়ে পিল্লাই বলেন: আই বেগ টু ডিফার! দুনিয়ায় এমন অনেক জিনিস আছে যার নিজস্ব সীমারেখা নেই—আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী সীমারেখা টানি। অনন্ত আকাশকে বলি সিলেস্‌চিয়াল স্ফিয়ার, অবাঙ্‌মনসগোচরকে গুটিয়ে আনি নারায়ণ-শিখায়! বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব আনেন তখন সেটাকে দিক্‌চক্রবালের শেষ সীমান্ত বলে মনে হয়েছিল। হিন্দু কোড বিল যখন এল তখন বুঝলুম, যেটাকে সেদিন দিগন্তের বঙ্কিমরেখা মনে হয়েছিল আসলে সেটা চশমার ব্রীজ! বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হবার পর আপনি এখন বলছেন এইটেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত! মেনে নিই কোন্ যুক্তিতে? দিগন্ত-রেখার তো কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই—ওরা একটা সাব্‌জেকটিভ কন্‌সেপ্ট্‌। ওর পরেও দুনিয়া আছে! ওটা আপনার বদ্ধমূল সংস্কারের দিগন্ত মাত্র!

ডাক্তারবাবু থামলেন। মেহ্‌রা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। গুপ্তেজী আগেই রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে গেছেন। আমি বললুম: বেশ, যদি মেনেও নিই, তবু বলব—আপনি যে প্রস্তাব করছেন তাতে অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

: পারেই তো! কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তো সহজ হল। নতুন যে সমস্যা দেখা দিল, দেখতে হবে তার নতুন সমাধান কেমন করে পাওয়া যায়।

: কিন্তু নতুন সমস্যা মূল সমস্যার চেয়ে কঠিনতর হতে পারে। ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় যে ক্ষতি হচ্ছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যবস্থায় তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবাঞ্ছিত শিশুর বন্যায় সমাজ ভেসে যেতে পারে। ভ্রূণ-হত্যার হার বেড়ে যেতে পারে...

বাধা দিয়ে ডাক্তারসাহেব বলেন: যেতে পারে, আবার নাও পারে। সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, ভেরিয়ার এল্‌উইন সাহেব দুই হাজারটি মুরিয়া বিবাহ পরীক্ষা করেছিলেন—তার মধ্যে মাত্র ছাব্বিশটি ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনার জন্যে চৌলিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ মাত্র শতকরা ১·৩টি ক্ষেত্রে। খুব বেশী নয় নিশ্চয়। আর লক্ষ করার বিষয়—এই ছাব্বিশটি ক্ষেত্রেই স[...] সমাধান হয়েছিল বিবাহের মাধ্যমে।*

আমি বললুম: কিন্তু এত অবাধ [...] মেশা সত্ত্বেও সে দুর্ঘটনা এত কম [...] ঘটছে কেন?

---

* পিল্লাই সাহেবের কাছ থেকে ভে[...] সাহেবের সংগৃহীত আর একটি হিসাব [...] ছিলাম। ভেরিয়ার সাহেব দুই হা[...] বিবাহিত মুরিয়া মেয়ের ইতিহাস সংগ্রহ ক[...] বিবাহের কতদিন পরে তাদের প্রথম সন্তান [...] সে তালিকায় জানতে পারি:

সর্বসমেত পরীক্ষিত বিবাহিত মুরিয়া রমণী ... ... [...]

বিবাহের এক মাসের মধ্যে প্রথম সন্তান জন্মেছে ...

দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে ঐ ...

চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে ঐ ...

সাত থেকে নয় মাসের মধ্যে ঐ ...

অর্থাৎ বিবাহের নয় মাসের মধ্যে ঐ ... (২·৩[...]

এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ ... (৮৪·৬[...]

সন্তান জন্মানোর সঠিক সময় জানা যায় না ... ... (৫·৬[...]

সন্তান আদৌ জন্মায়নি ... ... (৭·৫[...]

১

: সেই রিসার্চই তো করছি। কয়েকটি কারণও আন্দাজ করেছি, তবে মতামতটা জনাবার মতো সংখ্যাতত্ত্ব এখনও হাতে নেই। সেই জন্যই তো বলছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর বিচার করতে হবে। আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় এই আদিম মানুষগুলি আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে এ কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নিন। ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজে বাৎস্যায়ন পড়ানো হয় না, পশ্চিমের আধুনিক বিদ্যায়তনে ওরা থিওরেটিক্যাল ক্লাস খোলার সাহস দেখিয়েছে। মানবিকতার উৎসমুখের এ মানুষগুলি মোহনার মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে আরও এক ধাপ! প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবরেটারী খুলে বসে আছে কয়েক শ', অথবা কয়েক হাজার বছর আগে। তার ফলাফল আমরা দেখে শিখতে পারি, ঠেকে শেখার আগে!

: বেশ তো, বলুন না কি শিখলেন?

: দেখাও শেষ হয় নি, শেখাও নয়। তবে এ পর্যন্ত শিখেছি অনেক কিছু। প্রথমত, সাম্যের চূড়ান্ত জয়। ঘটুলের প্রত্যেকটি সভ্য-সভ্যা যাতে সমান অধিকার পায় সেদিকে ওদের কড়া নজর। মার্কস-এঞ্জেলস্‌ আমাদের অর্থনৈতিক সাম্য দিয়েছেন—কিন্তু একটি রূপবান ছেলেকে একটি রূপহীন ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসাতে পারেন নি। একটি পঙ্গু ছেলের অন্নের সংস্থান করেছেন—কিন্তু মানুষ কি শুধু উদর নিয়ে বাঁচে? মুরিয়া সমাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছে। ঘটুলের সব ছেলে-মেয়ের উপর সব মেয়ে-ছেলের সমান অধিকার। শিরপুরী ঘটুলের একটা সত্য ঘটনা বলি। সেখানে একটি চেলিক ছিল, তার নাম চেয়াং। হঠাৎ তার বসন্ত হল। বেঁচে গেল প্রাণে, কিন্তু একটি চোখ কানা হয়ে গেল—মুখেও হল বিশ্রী বসন্তের দাগ। শিরপুরী ঘটুলে সবচেয়ে সুন্দরী মোটিয়ারী ছিল দুলোমা। দীর্ঘ রোগভোগের পর চেয়াং যেদিন প্রথম ঘটুলে এল সেদিন কোতোয়ার নির্দেশ দিল, সে দুলোমাকে নিয়ে শোবে। আহা বেচারী কতদিন পরে ঘটুলে এল। কিন্তু বাধ সাধলো দুলোমা নিজেই। বেঁকে বসল সে। কিছুতেই যাবে না চেয়াঙের 'মাসানি'তে। সবাই ছি ছি করে ওঠে। দুলোমা কিন্তু অটল। সুন্দরী দুলোমার প্রতি সবাই অনুরাগী—সেই মূলধনের ভরসায় সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল চেয়াঙের 'মাসানি'তে যেতে। এ ক্ষেত্রে শিরদারদের বিচার করে রায় দেবার কথা। শিরদার বললে—সে নিজে বিচার করবে না। সে জানতে চায় পাঁচজনে কি বলে। আপনারা যাকে ভোট দেওয়া বলেন, তাই দিল সকলে। ব্যালট-ভোট নয়, প্রকাশ্যে হাত তুলে। একজনও সুন্দরী দুলোমার পক্ষে ভোট দিল না। তাকে যেতেই হল চেয়াঙের মাসানিতে। অসংখ্যবার এ দৃশ্য দেখেছি আমি। ভানপুরী ঘটুলের দারোগা ছেলেটি অন্ধ। চক্রবেড়া ঘটুলের কোতোয়ারের একটি পা নেই। চক্রবেড়া হচ্ছে জোড়িদার ঘটুল। সে ঘটুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কোতোয়ারের জোড় হয়েছিল। সভ্য দুনিয়ায় আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন পঙ্গু ছেলে-মেয়েরা মুখ চুন করে ঘুরে বেড়ায়...

মেহ্‌রা বাধা দিয়ে বলেন—কিন্তু আমরাও পঙ্গু ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে উদাসীন নই। মূক-বধির-অন্ধদের স্কুল সভ্য জগতেও আছে। আমরাও ছেলেমেয়েদের শেখাই, 'কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।'

ডাক্তারসাহেব জোর দিয়ে বলেন: হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু একটু তলিয়ে ভেবে দেখেছেন কি? 'কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না'—এ উপদেশের হাই-পথেটিক্যাল অ্যাসাম্পশন হচ্ছে 'কানা-খোঁড়া একগুণ বাড়া!' তবে নাকি আমরা সভ্য, তাই প্রকাশ্যে কানাকে বলি পদ্মলোচন, খোঁড়াকে বলি টেনজিং নোরকে! আড়ালে তাই নিয়ে হাসাহাসি করি, তাতে দোষ নেই। কারণ সভ্য সমাজের মূল শিক্ষাটাই হচ্ছে—ভিতরে 'ছুঁচোর কেত্তন' চলে চলুক—বাইরে 'কোঁচার পত্তন'টা চাই। এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছেন আপনি, "ঘরের কেচ্ছা লুকাতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক!' ওরা কিন্তু মনে মুখে এক। তাই চেয়াং ওদের কাছে কানা নয়, চেলিক-কোতোয়ার খোঁড়া নয়, সে মানুষ!

আমি বলি: ডাক্তারসাহেব, আপনি মোদ্দা কি বলতে চাইছেন? এই মাড়িয়া-মুরিয়া-ভাত্রা-শবরদের সব ব্যবস্থাই ভাল? আমাদের অনুকরণযোগ্য? 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর?'

: আমি তো তা বলিনি। মাড়িয়াদের মধ্যে নরবলি দেবার ব্যবস্থা চালু ছিল। ওদের বিশ্বাস, নতুন আকর্ষিত জমিতে প্রথম চাষ করার আগে ভূমি-মাকে রক্তপান করাতে হয়। জোর করে এ প্রথা রদ করা হয়েছে। এখনও ওরা কুমারী ভূমি কর্ষণ করার আগে বলি দেয়—তবে মানুষ নয়, মুরগী। এ পরিবর্তনের আমি তো কোন আপত্তি করিনি। কিন্তু তাই বলে উন্নাসিক অভিমানে দূর থেকে ওদের সব কিছুকেই আদিম অসভ্যতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বরতা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। খোলা মন নিয়ে ওদের প্রতিটি ব্যবস্থা যদি বিচার করে দেখবার ক্ষমতা আপনার না থাকে তবে আমি বলব—আপনার মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন!

আলোচনায় বাধা পড়ে। গেস্ট হাউসের স্টুয়ার্ড এসে সবিনয়ে নিবেদন করে: ডিনার রেডি!

উঠে পড়তে হল। গুপ্তেজীকেও ডেকে পাঠালাম। চারজনে উঠে গেলাম ভিতরের বড় খানা-কামরায়।

আমার আর পিল্লাই সাহেবের বিছানা হয়েছে এক ঘরে। আর্দালী নন্দু থাপা বিছানা পেতে রেখেছে। জামা-কাপড় বদলে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব বলেন: আপনার বন্ধু গুপ্তেজীর কি মাথা খারাপ?

চমকে উঠে বলি: হঠাৎ এ কথা কেন?

: খাবার পরে বাইরের নির্জন বারান্দা দিয়ে আসছি, অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রলোক এসে চেপে ধরলেন আমার হাত দুটো! বললেন—'কংগ্র্যাচুলেসন্স!' আমি বললুম—'কিসের জন্য?' তার জবাবে ভদ্রলোক বললেন—'ঈশ্বর আপনার মংগল করবেন।' বলেই ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে।

আমি বললুম: ভদ্রলোকের মাথায় একটু ছিট আছে!

: তাই তো মনে হয়।

পিল্লাই সাহেব বাতি নিবিয়ে দিলেন।

(ক্রমশ)

প্রসাদময়ী জগদীশ্বরী

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

প্রায় এক শো আশি বছর আগেকার ঘটনা। সেদিন শ্যামা-অমাবস্যার পর দিন। মৃন্ময়ী কালিকার বিসর্জনের অপরাহ্ন।

কুলুকুলুনাদিনী দক্ষিণবাহিনী সুরধুনী ভাগীরথী। নদীতীরে গ্রাম ভেঙে পড়েছে। পল্লীতে পল্লীতে শ্যামাপূজার উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। আজ ঘাটে ঘাটে নিরঞ্জনের পালা। বাংলার শ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক আপন হাতে কালী-প্রতিমা নির্মাণ করে তাঁর সাধনপীঠে মাতৃ-পূজা করেছেন। আজ এই প্রতিমাকে আপন মাথায় বহন করে তিনি গঙ্গাতীরে আনছেন। সঙ্গে চলেছে শত শত ভক্ত। গত রাত্রে মাতৃ-আরাধনার অবসরে সাধক যে কথা বলেছেন সে কথা সবারই মনে পড়ছে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী উভয়েরই মন বিচলিত, উভয়েরই দুরু দুরু বক্ষ, উভয়েরই চোখে জল।

চিন্ময়ী জননীর মৃন্ময়ী প্রতিমার এই শেষ পূজো। সাধক বলেছেন—মা আমায় ঘুরাবি কতো—চোখ বাঁধা বলদের মতো? বলেছেন—আর নয়, আজ এই প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনেরও অবসান হবে। সারা গ্রামে বিদ্যুৎগতিতে এই কথা ছড়িয়ে গেছে।

শ্যামামূর্তি মাথায় নিয়ে সাধক চলেছেন আর গাইছেন—

প্রসাদ বলে ভক্তিমুক্তি
উভয়ই মাথে রেখেছি—
শ্যামানাম ব্রহ্ম জেনে
ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।

ভাগীরথীর তীরে এসে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করলেন মাতৃসাধক। জল যখন প্রায় কোমর স্পর্শ করেছে তখন প্রতিমাকে বুকের কাছে স্থাপন করে নির্নিমেষে মাতৃমুখপানে চেয়ে রইলেন। ভাববিহ্বল উদাত্ত কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হলো—

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন
বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী
এলেন কি না এলেন দেখি॥

তীরের জনতা মায়ের নামে জয়ধ্বনি করছিল। গ্রামের বিভিন্ন পল্লী থেকে প্রতিমা আসছে। ঘাট যেন লোকারণ্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সোচ্চার জয়রবের সঙ্গে বিসর্জনের বাজনা। সাধকের গীতিকণ্ঠ শুনে মুহূর্তে নীরব হলো জনতা। স্তব্ধ হলো ঢাক, চুপ করল কাঁসি। সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতার উপর ঘনিয়ে এল প্রতিপদের ধূসর সন্ধ্যা। পূর্ব দিগন্তের বিশীর্ণ চন্দ্রিমা।

সাধক আরো গাইছেন। সারা জীবন তিনি গানই গেয়েছেন। গানই তাঁর মন্ত্র, গানই পূজা। বিশ্বজননীর চরণে গানই তাঁর নিত্য-আরাধনা।

প্রসাদ বলে মন দৃঢ়,
দক্ষিণার জোর বড়,
মা গো, আমার দফা হলো রফা—
দক্ষিণা হয়েছে॥

জীবনের শেষ গানের এই শেষ চরণ।

প্রসাদ পীঠ

মাতৃ-আরাধনার এই চরম আকৃতি, পরম অঞ্জলি। বক্ষ থেকে মাতৃমূর্তি ভাগীরথীর স্রোতে নিমগ্ন হলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-রন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হলো প্রাণবায়ু।

এই সাধক রামপ্রসাদ। বাঙালীর মহা-মাতৃকাসাধনার শ্রেষ্ঠ সাধক। পরম যোগী, পরম কবি। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের পথ-প্রদর্শক।

আরো প্রায় তিন শতাব্দী আগেকার আর একটি ঘটনা। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেছেন। শ্যামা মাতৃভূমি আবার তাঁকে টেনেছে। তিনি বঙ্গদেশে আসছেন। গঙ্গার পূর্ব তীর ধরে তিনি নৌকাযোগে অগ্রসর হচ্ছেন। গঙ্গা-তীরবর্তী এই গ্রামে তিনি অবতরণ করলেন। এইখানে রয়েছে তাঁর কৃষ্ণমন্ত্রলাভের পরম-গুরু ঈশ্বরপুরীর জীবন্ত স্মৃতি। এ গ্রামে তাঁর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবাস, সেন শিবানন মুরারী গুপ্ত ও বাসুদেব দত্তের গৃহ।

ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শি শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু। নিমাই পণ্ডিতে পাণ্ডিত্য-ঊষর মরু-হৃদয়ে তিনিই প্র কৃষ্ণমন্ত্রবীজ বপন করেন, আত্মাভিমা গর্ব-বিশুষ্ক অন্তর-ফল্গুতে সঞ্চা করেন কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতধারা। গয়াধ পিতৃতর্পণের জন্যে গমন করেন নদী নিমাই। সেইখানে বিষ্ণুপাদপদ্মের ছা ঈশ্বরপুরী তাঁকে কৃষ্ণবিরহিণী রাধাভ অনুপ্রাণিত করেন। গয়াধামে ঈশ্বরপু সঙ্গে মিলন চৈতন্যভাগ্যের এক মহাসা ঘটনা।

প্রভু বোলে গয়া করিতে যে আইলাঙ।
তিহ আজ সত্য হইল ঈশ্বরপুরীরে পাইল

গুরুপীঠ দর্শন করলেন—কিন্তু গ তো নেই! গুরু-বিরহশোকে উন্মাদ মহাপ্রভু ধুলোয় লুটিয়ে লুটিয়ে ক্রন্দন ক লাগলেন। ঈশ্বরপুরীর ভিটা মহা বৈষ্ণব তীর্থ।

সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি
লইলেন বহির্বাসে বাঁধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোর জীবন ধনপ্রাণ।

এই গ্রাম কুমারহট্ট-হালিশহর। চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর জন্মভূমি, সাধক কবি প্রসাদের সাধনপীঠ। শাক্ত-বৈষ্ণব সাধনা মহা সংগমক্ষেত্র। এই গ্রামের ম প্রাচীনা গ্রামমাতৃকা সিদ্ধেশ্বরী। সীমান্তপ্রান্তে আছেন যেন শি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরাইজী। মহাত্মা যোগীপ্রবর নিগমানন্দ সরস্বতীর স মন্দির এই গ্রামেরই গঙ্গাতীরে প্রতি

অন্নকূটে ভক্ত সমাবেশ

॥ ২ ॥

বাগবাজারের মাসিমা বললেন—তুমি আমার পরমাত্মীয় বাবা, নইলে বাড়ি বয়ে তীর্থযাত্রার নিমন্ত্রণ নিয়ে আসো? ভোর-বেলা ঠিক দেখবে ইস্টিশানে গিয়ে বসে আছি।

আমি মনে মনে বলেছিলাম—না মাসিমা, আত্মীয়তা করছিনে দক্ষিণা দিচ্ছি। তোমারই কল্যাণে গতবার সতী-মা উৎসব দেখা আমার সার্থক হয়েছিল।

মনে পড়েছিল ঘোষপাড়ার দোল উৎসবের কথা। গৌরপূর্ণিমার গভীর রাত্রি। জ্যোৎস্নাস্নাত হিমসাগরের বাঁধাঘাটে বসে মাসিমা বলছিলেন বাউলতীর্থ ঘোষপাড়ার প্রাণস্বরূপিণী সতী-মার অলৌকিক রহস্য-কাহিনী।

বলছিলেন, বিশ্বাসই সব বাবা, বিশ্বাসেই সব মেলে। বিশ্বাসের বলে বোবার মুখে বোল ফোটে, অন্ধ চোখে দৃষ্টি জাগে, পংগু গিরি লংঘন করে।

হিমসাগরের এই মাহাত্ম্য সত্যি মাসিমা?

বিশ্বাস থাকলেই সত্যি—বিশ্বাস ছাড়া মিথ্যে। বলো তো, বোবার প্রাণে কি মন্ত্র নেই, অন্ধের অন্তরে কি ধ্যান নেই? ইন্দ্রিয় নেই বলে যা ইন্দ্রিয়াতীত তাও কি নেই?

বড়ো ভালো লেগেছিল বাগবাজারের এই মাসিমাকে। তাই স্নানযাত্রার দিনে তাঁকে সংগে নিয়ে এসেছি হালিশহরে। কলকাতা থেকে একই রেলপথে যাত্রা। হালিশহর আরো কাছে। নদীয়ার দক্ষিণ সীমান্তে ঘোষপাড়া, হালিশহর চব্বিশ পরগনার প্রায় উত্তর সীমায়। মাঝখানে চার পাঁচ মাইলের ব্যবধান।

শিবের গলির সামনের ঘাটে মাসিমা স্নান করলেন। খুব ভোরে ভোরে পেঁাছে গেছি। পিছনে পূর্ব আকাশে সূর্য উঠলেও ঝুরি-নামা বটের ছায়ায় ঘাটটি তখনো সুশীতল। ইতিমধ্যেই স্নানার্থীদের ভিড় শুরু হয়েছে। আজ স্নানযাত্রা, ঘাটে ঘাটে আজ সারা দিন ভিড়ের অবধি থাকবে না। হালিশহরের কেন্দ্রস্থলে এই রামপ্রসাদের ঘাট।

পূর্ব দিকে চলেছে শিবের গলি। ডান দিকে হালিশহরের নবীনতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়, বাঁ দিকে বহু প্রাচীন জোড়া শিবমন্দির। পিচ-বাঁধানো আঁকাবাঁকা পল্লীপথ। দু ধারে কোথাও বাড়ি, কোথাও বাগান, কোথাও দীঘি। সেই রাস্তা গিয়ে পেঁাছেছে প্রসাদ পীঠে।

দূর থেকে প্রথমেই চোখে পড়বে পঞ্চবটী। এই সেই কালী-কল্পতরু! এই পঞ্চবটীর মূলে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধক রাম-প্রসাদ সাধনা করতেন। বিশাল দুটি বট আর অশ্বত্থ জড়াজড়ি করে রয়েছে। গুঁড়ির কাছে প্রাচীন গাছ দুটি এমনি জড়িয়ে আছে যে, কোন্ গাছটি মূল কাণ্ড তা খুব ভালো করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না। পঞ্চবটীটি সিমেণ্টের নিচু প্রাচীর আর রেলিং দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধানো।

মাসিমাকে বললাম—বট আর অশ্বত্থের মাঝে আর একটি গাছ আছে, চোখে পড়েছে? ঐ দেখুন গাব গাছ। অশ্বত্থের গুঁড়ি দেখুন গাবের মূলকে গিলে ফেলেছে,—কিন্তু ওপর দিকে তাকিয়ে দেখুন, গাবের ডাল, গাবের পাতা। প্রসাদের মাতৃপূজার আকুলতায় গাব গাছে পদ্ম ফুল ফুটেছিল, জানেন তো সে কাহিনী? এই সেই গাব গাছ!

পঞ্চবটীকে ডান পাশে রেখে সামনে দক্ষিণমুখী রামপ্রসাদ মন্দির। নবনির্মিত বিশাল এক শ্বেত নাটমন্দির। সিমেণ্ট কংক্রিটের ছাদ,—সিমেণ্ট জমানো মোটা মোটা চৌকো থাম আর কড়ি, মধ্যে লোহার বীম। চারধারে ঢালাই লোহার কারুকার্য করা রেলিং। বিশাল এক চৌকো চাতাল,—যাতে পাঁচ শো লোক অনায়াসে বসতে পারে। সবুজ সিমেণ্টের ঝকঝকে মেঝে, মেঝের ঠিক মাঝখানে বিভিন্ন রঙের সিমেণ্টে আঁকা গোলাকার পুষ্পালিম্পন।

নাটমন্দিরের সঙ্গেই মন্দির সংলগ্ন। এটি একটি চূড়াবিহীন পুরনো পাকা বাড়ি, তবে উত্তমভাবে সংস্কৃত। পাশাপাশি তিনটি ঘর। দু' পাশের দুটি ঘরে ভোগরন্ধনশালা আর ভাঁড়ার,—মাঝখানের হলঘরটিতে কারু-কার্য করা জমাট টালির চকচকে মেঝে। পাশাপাশি অনেকগুলি খোলা দরজা আর জানলা। মাঝের দরজাটির সামনে সুন্দর সুউচ্চ শ্বেতপাথরের বেদী। সেই বেদীর উপর মাতৃ-বিগ্রহ।

সবে সকাল। রোদের তাত একটুও নেই। নীল আকাশে মেঘের মেলা। তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো পড়ে বট-অশ্বত্থের উঁচু ডালের পাতাগুলি চিকচিক করছে। কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে কাঁটালীচাঁপা আর কল্কে ফুলের সুবাস।

ইতিমধ্যেই নাটমন্দিরে যথেষ্ট ভিড়। পল্লীবধূরা স্নান সেরে পূজার্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত। ভক্তদল জমায়েত। শিশুরা ভিড়ের ফাঁকে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। সামনের প্রাঙ্গণছায়ায় উপকরণ

সাজিয়ে বসেছে ব্যাপারীরা। রাস্তার উপর কয়েকটি সাইকেল-রিকশা।

মহার্ঘ নবভূষণে সজ্জিতা হয়ে মা আসছেন। কালো কষ্টিপাথরের মাজা অঙ্গটি ঘিরে নতুন লাল বেনারসী, সোনার সঙ্গে পুষ্প-আভরণ, মাথায় রৌপ্যমুকুটে প্রভাতী আলো। সেই আলোর আভা মাথার উপরের লাল চাঁদোয়ায় লেগে মার মুখে ঠিকরে পড়েছে। চোখে যেন কিশোরী কুমারীর বিস্ময় আর আনন্দভরা দৃষ্টি। লাল জিভটিতে সুকোমল লজ্জা। মা চতুর্ভুজা—বামহস্তদ্বয়ে রৌপ্যনির্মিত খর করবাল আর অসুরমুণ্ড। দক্ষিণ পাণি-যুগে বরাভয়। মা নৃমুণ্ডমালিনী—তবে রক্ত-বেনারসীর আঁচল আর পুষ্পমালার তলায় মুণ্ডমালা আবৃত। পদতলে গৈরিক জটাধারী ধবলশবরূপী শিব। শিববক্ষে রূপার নূপুর পরা আলতা-রাঙা দক্ষিণ চরণ।

মাসিমা মন্দির-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন মাতৃমুখ-পানে। নাটমন্দিরে পরিচিত বন্ধুদলের কুশল সম্ভাষণে আমি আটকে গেলাম। এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এল প্রেমপদ। সে আমাকে দেখতে পেয়েছে, দূর থেকেই উল্লসিত কণ্ঠে হাঁক পাড়ছে—এই যে এসে গেছেন দাদা!

বাঁ পাশের দরজা দিয়ে মাসিমা বেরিয়ে এলেন। বললেন—মরি মরি। এ কেমন তোমাদের মা গো? লাল টুকটুকে চেলি পরা এ যেন এতোটুকু একরত্তি মেয়ে। কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

আমি মুচকি হেসে প্রেমপদর দিকে তাকালাম। বললাম—বলো হে, মাসিমার কথার জবাব দাও!

প্রেমপদ বললে—মাকে ঠিকই আপনি চিনেছেন। ইনি যে রামপ্রসাদের মা—সাধকের মরদৃষ্টির সামনে ইনি যে কন্যা জগদীশ্বরী হয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন। মায়ের নাম আমরা কী দিয়েছি জানেন? প্রসাদময়ী জগদীশ্বরী!

পূর্বস্মৃতি মন্থন করে মাসিমা বললেন—বছর আষ্টেক আগে একবার ত্রিবেণী গিয়ে-ছিলাম। সে সময়ে গঙ্গা পার হয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তখন এমনটি দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

বললাম—না মাসিমা, তখন এসব কিছুই ছিল না। চিন্ময়ী মার এই শিলাময়ী মূর্তিও ছিল না, এই চকচকে নাটমন্দিরও ছিল না।

তা হলে এতো সব হলো কী করে?

মা করিয়ে নিয়েছেন। এসব তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দেশের ফল। এ যুগেও বিশ্ব-জননীর অভিপ্রায় ভক্তের প্রাণে সোজাসুজি এসে বাজে, এ যুগেও অলৌকিক প্রেরণায় দেবী তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নেন। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে না।

কৃষ্ণ রাইজী মন্দির

মাসিমা বললেন—বিশ্বাস করব না? বলো কী? বিশ্বাস নিয়েই তো এসেছি বাবা!

মাসিমার মন জানতে আমার বাকি নেই। প্রেমপদকে বললাম—খুব ব্যস্ত না কি ভাই? নইলে এসো, ছায়ার ধারে বসে যাও, প্রসাদময়ীর প্রতিষ্ঠা-কাহিনী মাসিমাকে বলো। ওঁর খুব ভালো লাগবে।

বছর ছয় আগেকার কথা। সেদিন চৈত্র মাস। শিবের গলির সরু পথে বসন্ত বাতাসের হুড়োহুড়ি, আম গাছে কচি বউল ধরেছে। তখনো এই গলিতে পিচ পড়েনি, এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ মাটি।

লাল ধুলো-ভরা শুকনো পথে এক অচেনা ভদ্রলোক আসছেন। তখন ঠিক দুপুর-বেলা—ঝাঁ ঝাঁ রোদ। পঞ্চবটীর কাছে এসে আগন্তুক থমকে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখে কেমন এক অগাধ বিস্ময়, প্রাণের মধ্যে কী এক অদম্য আকুলতা। বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে দেখতে তিনি পুরো মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেন। দ্বার ব সামনের দেয়ালের উপর দরজার মাথায় এক প্রস্তর-ফলক, তাতে লেখা আছে—'রা প্রসাদ মন্দির- কুমারহট্ট-হালিশহর'।

এই আগন্তুক প্রবাসী বাঙালী, সু পূর্ব আসামের তেজপুর শহরের বহুদি অধিবাসী। তেজপুরেই তাঁর সংসার, ও কর্মজীবন। সেইখানে এক রাত্রে তিনি স্ব দেখলেন, তিনি যেন রামপ্রসাদের ভি এসেছেন। সেইখানে বৃক্ষছায়ায় দাঁি তিনি ভিটাস্থ মন্দিরের দিকে তাকি আছেন। এমন সময় এক নারীমূ মন্দির থেকে বার হয়ে এসে তাঁকে হ ছানি দিয়ে ডাকলেন। অচেনা পরিে অপরিচিতা নারী,—একটু ইতস্তত করে সম্মোহিতের মতো তিনি এগিয়ে গেলে সেই নারী তাঁকে বললেন—শোন, অ বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাও আমায়? স্বপ্নদ্রষ্টা উত্তরে বললে দাঁড়ান মা, আমি খাবার এনে আপন খাওয়াচ্ছি।

এইখানেই স্বপ্নের শেষ। অর্থহীন স্বপ্নের অকিঞ্চিৎকর একটি টুকরো। কিন্তু অবশেষে ভদ্রলোক মনের মধ্যে এক বিচিত্র ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। রামপ্রসাদ নামটি তাঁর মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। ঐ নামটিকে যে ভোলা যায় না। কে রামপ্রসাদ? কোথায় তাঁর মন্দির? কে ঐ মন্দির-নির্বাসিনী স্বপ্নময়ী নারী?

সন্ধানে সন্ধানে ভদ্রলোক বাংলা দেশে এসেছেন, এসেছেন রামপ্রসাদ-জন্মভূমি এই অপরিচিত হালিশহর গ্রামে। পথের লোককে প্রশ্ন করে করে এই পথে তিনি এসেছেন, দাঁড়িয়েছেন রামপ্রসাদ-মন্দিরের সামনে। স্বপ্ন মূর্ত হয়েছে। এই সেই পথঘাট, এই সেই পঞ্চবটী; এই সেই বৃক্ষছায়া, এই সেই মন্দির। স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আর এখন যা দেখছেন হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সেই স্বপ্নময়ী নারী কই! কাকে তিনি খাওয়াবেন, অন্নের দাবি কে তাঁর কাছে করেছিল?

চকিত উপলব্ধিতে স্বপ্নঘোর কেটে

গেল, পরম সত্যের আভায় উদ্ভাসিত হলো মনুর অন্তর। সত্যের আলোয় সার্থক হয়েছে স্বপ্ন,—ঐ মন্দিরে যিনি বিরাজ করছেন তিনিই যে রামপ্রসাদ-পূজিতা মহাকালিকা!

ধন্য স্বপ্ন, ধন্য ভাগ্য, ধন্য আমার দেবী-নির্দিষ্ট জীবন! দরজা ঠেলে তিনি মন্দির-কক্ষে প্রবেশ করলেন। রামপ্রসাদ-মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, আছে একটি ঘট। মা আছেন ঘটে। আগন্তুক সেই ঘটের সামনে আভূমি লুটিয়ে প্রণাম করলেন। মনস্কামনা করলেন,—স্বপ্নের মধ্যে যে চিন্ময়ী জগন্মাতাকে তিনি দেখেছেন, বিশ্ব-জনের নিত্য প্রত্যক্ষে তাঁকে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন এই মন্দিরে।

স্বপ্নাদিষ্ট পরবাসী ভক্তের আনুকূল্যে ও স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহে ১৩৬৪ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে রামপ্রসাদ-মন্দিরে এই মাতৃবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো। সেদিন স্নানযাত্রা,—বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অতি শুভতিথি। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-পীঠে প্রসাদময়ী জগজ্জননীর স্থায়ী রূপ-মূর্তি দর্শন করে ধন্য হলো দেশবাসী।

সেই থেকে প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার দিন এই মন্দিরে মাতৃ-প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হচ্ছে।

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার এই পুণ্যকাহিনী শুনে আমরা প্রসাদময়ী জগদীশ্বরীকে প্রণাম করলাম।

ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

॥ ৩ ॥

ভোগপ্রসাদ বিতরণ শেষ হয়েছে। পঞ্চবটীর ভিড় পাতলা হতে শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন। মাসিমাকে নিয়ে সেদিনের মতো প্রসাদ পীঠ থেকে বিদায় নিলাম। তখনো বেলা আছে। হালি-শহরের অন্যান্য পুণ্যস্থানগুলি তাঁকে দর্শন করিয়ে নিয়ে যাব।

ঘোষপাড়া রোড ধরে উত্তর দিকে চলেছি। আধ মাইলটাক দূরেই গঙ্গার কোলে শ্রীশ্রীনিগমানন্দ আশ্রম। সবুজ ঘাসে ছাওয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে সুবিশাল নিগমানন্দ মন্দির ও নাটমন্দির। আধুনিক অথচ ভাবগম্ভীর মন্দির-স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। তা ছাড়া তিন পাশে সাধু-আশ্রম, গ্রন্থাগার, পাঠশালা, ঋষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-উদ্যান।

নিগমানন্দের জীবন অতি বিচিত্র। নদীয়া জেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে মাতুল-গৃহে ১২৮৬ সালে কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম নলিনীকান্ত। পিতৃভূমি কুতবপুর গ্রাম। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়,—স্ত্রী এই হালিশহরেরই কন্যা। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে নলিনীকান্ত যখন দিনাজপুর জেলায় তাঁর কর্মস্থলে ব্যস্ত, তখন স্বগ্রামে তাঁর প্রেমময়ী পত্নীর অকালমৃত্যু হয়। স্ত্রীর ছায়ামূর্তি তিনি বারে বারে দেখেন ও তাঁর অমর আত্মার সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে নলিনীকান্ত সংসার ত্যাগ করেন। পূর্ণাঙ্গ স্বামী তাঁকে এই বলে উপদেশ দেন যে, তাঁর স্ত্রী শক্তিরূপিণী মহামায়ার অংশমাত্র। তিনি এই শোকাকুল অর্ধোন্মাদ যুবককে মাতৃসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তারাপীঠের মহাসাধক বামাক্ষেপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি মহামায়াকে প্রত্যক্ষ করেন। পুষ্করতীর্থে সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর প্রেরণায় জ্ঞান সাধনা করে তিনি জ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ হন ও নিগমানন্দ নামে অভিহিত হন। পরশুরাম তীর্থে মহাযোগী সুমেরুদাসজী তাঁকে যোগসিদ্ধ করেন। প্রেমিকগুরু গৌরীমার কাছে ভাবসাধনা সম্পূর্ণ করে তিনি পরমহংসত্ব লাভ করেন।

নিগমানন্দ ছিলেন পরমতান্ত্রিক পরম-যোগী পরমপ্রেমিক পরমহংস। সারা বাংলা ছাড়িয়ে সারা ভারত, এমন কি ভারতের বাইরেও তাঁর শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী। আসামের কোকিলামুখে তাঁর আদি আশ্রম ও সারস্বত মঠ। বাংলা দেশে সারস্বত আশ্রম পাঁচটি। তাঁর মধ্যে হালিশহর আশ্রমটি শ্রেষ্ঠ।

১৩৪১ সালে নিগমানন্দের তিরোভাব হয়। শক্তি ও প্রেমধর্মের মহাপবিত্র এই মিলনক্ষেত্রে গঙ্গাতীরের সারস্বত আশ্রমের কেন্দ্রে তাঁর পূতদেহ সমাহিত। সমাধিমন্দির তাঁর নিত্যভক্তবন্দিত মূর্তি। অদূরে বিল্ববৃক্ষমূলে নি শিব। আশ্রমপ্রান্তের দক্ষিণে ন মহাশ্মশান।

সারস্বত আশ্রম থেকে আধ ম উত্তরে। বড় রাস্তা থেকে বাঁ দিকে

খানি মাত্র কাঁচাপথ। আকাশে ছায়া—তরুছায়া সেই ছায়াকে রেখেছে। আম, কাঁঠাল, জামরুল, বেড়ার ধারে কৃষ্ণচূড়া আর । একটু এগিয়েই একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ওপারে শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরীর ।

দিকে পাঁচিল ঘেরা ঘাসে ছাওয়া একটি প্রাঙ্গণ। পঞ্চচূড় মন্দির। রঙের মন্দিরের সিমেন্ট বাঁধানো উ'চু । সামনে একসার চওড়া লাল সি'ড়ি। পাশে ক'টি পাকা ঘরে সেবাইতের আর যাত্রীর আশ্রয়। অঙ্গনের ধারে পুষ্পতরু।

কাল। দীর্ঘিকাটি জলে পরিপূর্ণ। নিস্তরঙ্গ নিভৃত।

লাম—মাসিমা, এই দীঘির নাম চৈতন্য ডোবা। ঐ মন্দির ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট—আজ এই দীঘি যেখানে দেখছেন, এই জায়গাই ছিল ঈশ্বরপুরীর কুটীরের প্রাঙ্গণ। এইখানে দাঁড়িয়েই মহাপ্রভু শ্রীগুরুস্মরণে চোখের জলে মাটি ভিজিয়েছিলেন। এই মাটি তুলে গেরুয়া বহির্বাসের আঁচলে বে'ধে বলেছিলেন—এ মৃত্তিকা মোর জীবন ধনপ্রাণ।

পায়ে পায়ে ঘাটের ধারে আমরা নেমে গেলাম। মাসিমা বললেন—এখানে এই ডোবা কেমন করে হলো বাবা?

মহাপ্রভু যখন একমুষ্টি মাটি তুলে বহির্বাসে বাঁধলেন তখন সমস্ত ভক্তমণ্ডলে আকুলিবিকুলি পড়ে গেল। সকলেই মুঠি ভরে এখানকার মাটি তুলে আঁচলে বাঁধতে লাগলেন। তারপর চার শতাব্দী কেটে গেছে। দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তজন এই পুণ্যস্থান দর্শন করতে এসেছেন তীর্থের পরম সঞ্চয় রূপে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন এক মুঠো করে মাটি। ধীরে ধীরে গর্ত বেড়ে বেড়ে কালে এই চৈতন্য ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীষ্মের খরতম টানেও চৈতন্য ডোবার জল একেবারে শুকোয় না।

মাসিমা এক অঞ্জলি জল মাথায় দিলেন। এই জল বড়ো পবিত্র, শ্রীচৈতন্যের অশ্রুবাষ্পকণিকা বুঝি এই জলে মিশে আছে।

পঞ্চচূড় মন্দিরটি বিশেষ প্রাচীন নয়। বছর পঁচিশের কিছু বেশী এর আয়ু। ষাট বছর আগে স্থানীয় লোকেরা ঈশ্বরপুরীর ফাঁকা ভিটায় একটি বেদী নির্মাণ করেন। তার আগে ঈশ্বরপুরীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চৈতন্য ডোবাটিই কেবলমাত্র ছিল। দূরাগত ভক্ত বৈষ্ণবরা খু'জে খু'জে ঐ ডোবাটিই দেখতে আসতেন। পরে এখানে একটি চালাঘর ওঠে, তাতে বিদেশী একজন সাধু কয়েক বছর বসবাস করেন।

বৈষ্ণবতিলক রামদাস বাবাজীর অনুপ্রেরণায় এই তীর্থ সম্প্রতি জাগ্রত হয়। বাংলার বৈষ্ণব-সমাজের দৃষ্টি এই তীর্থের প্রতি নতুন করে তিনি আকর্ষণ করেন। প্রতি ফাল্গুনী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে এখানে চৈতন্যচরণোৎসব পালিত হতে থাকে। বৃন্দাবননিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বাবাজীর প্রযত্নে ১৩৪২ সালে বর্তমান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়।

চৈতন্য ডোবার ঠিক সামনে ঘেরা পাঁচিলের মাঝখানে একটি খোলা দরজা। সেই দরজা দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। বেলা প্রায় তিনটে। জনপ্রাণী নেই, মন্দির-দরজা বন্ধ। পাশে যাত্রী-ঘরের বারান্দায় বসে আছে এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাবাজী আর বৈষ্ণবী। খালি গা, খালি পা, মুণ্ডিত মস্তক এক কিশোর ছুটে এল। সেবাইত গেছেন মাধুকরীতে, এখনো ফেরেন নি। এ ছোকরা সেবক। আগ্রহ ভরে মন্দির-দ্বার খুলে দিল। মন্দিরে আছেন প্রাণকৃষ্ণ বাবাজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জিউ।

আজ থেকে ঠিক সাতাশ বছর আগে মহা আড়ম্বরে ঈশ্বরপুরীর মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই উৎসবে সারা প্রদেশ থেকে বহু পণ্ডিত ভক্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগ দিয়েছিলেন। মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে প্রাণকৃষ্ণ বাবাজী নিজে এখানে কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। দেবসেবার জন্য রাধাবিনোদের নামে কিছু ভূসম্পত্তিও অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর এই সাতাশ বছরে এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানের যে শ্রীবৃদ্ধি হবার কথা ছিল তার কিছুই হয়নি।

নিবু নিবু করছে ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট। সেবাইতটি প্রায় যুবাপুরুষ, হৃষ্টপুষ্ট দেহ, কিন্তু যেন প্রাণশক্তিহীন। দৈনন্দিন মাধুকরী করে কোনোরকমে নিত্যপূজা ভোগ চালান। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে খুব বেশী

পরিচিতও নন, যেন নিজ বাসভূমে পরবাসী। সাংবৎসরিক উৎসা নিতান্ত টিমটিম করে জ্বলে।

এর প্রধান কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো যোগ নেই। প্রাণকৃষ্ণ বাবাজী এই মন্দির, তৎসংলগ্ন সম্পত্তি ও দেবসেবার ভার এক কমিটির হাতে দিয়ে যান। দুঃখের বিষয়, এই ট্রাস্টি কমিটিতে স্থানীয় লোক একজনও নেই। হালিশহরের তাঁরা নন, হালিশহরের ভালো-মন্দের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। শ্রীপাটের উন্নতি-অবনতির কোনো খোঁজ তাঁরা রাখেন বলে মনে হয় না। বর্তমানে যিনি সেবাইত, নিজের ক্ষমতা বা চেষ্টায় এর উন্নতি সাধনের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব বা উদ্যম তাঁর নেই বলেই মনে হয়।

॥ ৪ ॥

কেবল বাগবাজারের মাসিমাই একলা নন, রামপ্রসাদ-মন্দিরের সাম্প্রতিক কালের আশু উন্নয়ন দেখে কে না তাজ্জব হয়ে গেছে! কী ছিল আর কী হয়েছে গত পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে। যা ছিল টিমটিমে রেড়ীর তেলের বাতি, সে যেন আজ হাজার পাওয়ারের বিদ্যুতের আলোর ঝলমলে আনন্দ-দ্যুতি। এই আনন্দ-ভরা বিস্ময়ে হাজার ভক্তের মুখ উজ্জ্বল।

সবচেয়ে তাজ্জব হয়েছিল সতীশ সাধু। গত বছর শীতকালে দেখা হয়েছিল কাশী বিশ্বনাথে। দশাশ্বমেধ ঘাটে ভিখিরীদের আড্ডায় কুঁকড়ি হয়ে শুয়ে ছিল ভোরবেলা। মুখ দেখে চিনতে পেরে দাড়ি ধরে টান দিয়েছিলাম।

কম্বলটা বুকে টেনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বললাম, চিনতে পারো সতীশ?

চোখ কচলিয়ে ভালো করে তাকালে, তারপর ঘুষি বাগিয়ে বললে,—খুব পারি, কিন্তু এমন কাঁচা ঘুমটা ভাঙালে কেন হে?

আমি হেসে বললাম,—খুব হয়েছে, এখন গা তোলো, চলো চা খাই।

বললাম—সতীশ, কখনো তো যাওনি! একবার হালিশহরে চলো। রামপ্রসাদের মহা-কালীকে দেখে আসবে।

হালিশহর? রামপ্রসাদের পঞ্চবটী? মাপ করো ভাই!

কেন? কী হলো? কী অপরাধ?

উরে সর্বনাশ! যুদ্ধের আগে একবার যাইনি? যেমন ঘুটঘুটে জঙ্গল, তেমনি ভনভনে মশা! হাত পাতলে লোকে দুটো ভিক্ষে হয়তো দেয়—কিন্তু এ যে এক শো বড়ি কুইনিনের ধাক্কা বাবা!

আমি বললাম—দেখো বাপু, এই কাশীতে এসে এমন করে তোমাকে কেউ সেধে যাবে না। হালিশহরের সে-সব দিন আর নেই, জঙ্গলও নেই, মশাও নেই। যা পরিবর্তন হয়েছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। চলো আমার সঙ্গে।

মুচকি হেসে সতীশ বললে—যাবো হে, যাবো, বাংলায় অনেক বছর যাইনি। তবে হুট বলতেই ছুটি কী করে? হাতে কাজ রয়েছে, সারতে ক'টা দিন লাগবে যে!

কাজ যে সতীশের কী, তা শিবেরও ধারণার বাইরে। বাঁধনকে এড়ানোই ওর কাজ। সেই কাজেই সারা জীবন মত্ত।

বললাম,—আমার সঙ্গে যাবে না তা জানি। তবে যখনই যাও, ছাব্বিশে জানুয়ারির আগে পৌঁছো—সেদিন মার মহোৎসব।

নিগমানন্দ মন্দির

ছাব্বিশে জানুয়ারি। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। সমস্ত দেশব্যাপী ছুটির দিন। এইদিন হালিশহর প্রসাদপীঠে প্রসাদময়ী জগদীশ্বরীর অন্নকূট মহোৎসব।

গ্রাম-বাংলায় শীতের উৎসব শুরু হয় পৌষ সংক্রান্তি থেকে। তখন গোলায় নতুন ধান, কৃষকের প্রাণে আনন্দ। হালিশহর, কৃষিভিত্তিক গ্রাম নয়। তবে নতুন ধানের সময়ই অন্নকূট উৎসবের প্রশস্ত সময়। পৌষ মাসের অবসানে প্রথম বিশিষ্ট দিন স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্র ভারতের স্বাধীন যুগে প্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাধীন ছাব্বিশ জানুয়ারি, এই তা চিরসমুজ্জ্বল থাকবে। এই ি এই মাতৃ-উৎসব খুবই সুবিধাজনক

সাইকেল-রিকশায় চলেছিলাম। গলি সংকীর্ণ পথই বলতে পাশাপাশি দুখানা রিকশার স্বচ্ছন্দে মতো চওড়া নয়। গলির শুরুতেই লেগে গেছে। ভিড় ঠেলে এগোবা উপায় নেই। দুপাশে দোকানের স গেছে—তাতে রাস্তার মাঝখানে ঠাসাঠাসি। ফুল বাতাসা প্রসাদ পু টুকিটাকির দোকান প্রচুর। ধ কয়েকটি বিপণি চোখে পড়বা আবালবৃদ্ধবনিতা চলেছে প্র মাতৃ-দর্শনের আকূতি আর ভে লাভের আকিঞ্চন নিয়ে।

পঞ্চবটীর মাঠে তিলধারণের স্থ স্বেচ্ছাসেবকরা আপ্রাণ চেষ্টায় থেকে ভিড় সরাচ্ছেন। দু পাশ দি

...ত্র-দর্শনে বারান্দায় উঠছেন। সেখানে ...খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবিকারা নিয়োজিত। ...বটীর ঠিক গোড়ায় কাঁচা মাটিতে ...একজন বহিরাগত সাধু এসে আস্তানা ...গেড়েছেন। তাঁদের ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট ...দূরের যাত্রিদল। ওপার থেকে এক ...কীর্তন দল এসেছেন। পঞ্চবটীর এক-...প্রান্তে গিয়ে জমায়েত হচ্ছে। লাউড-...স্পীকারযোগে ঐ মাঠ ছাড়িয়ে ছড়িয়ে ...পড়ছে কালী-কীর্তনের সুর।

...মন্দিরের ডান পাশের মাঠে নতুন ...বনাত দিয়ে মস্ত এক চাঁদোয়া খাটানো ...রয়েছে। তার নীচে বিরাট বিরাট হাঁ-...ওয়ালা কাঠের উনুন জ্বলছে। সেইসব ...এর ইন্ধন যোগাতে কাছেপিঠের তিন-...চারটি পিটুলি গাছ সাফ। প্রতিটি ...উনুনের মাথায় বিশাল বিশাল হাণ্ডা ...র কড়া। অন্ন সিদ্ধ হচ্ছে, ব্যঞ্জন রান্না ...হচ্ছে, পরমান্ন ফুটছে। হাণ্ডার পর হাণ্ডা ...নামছে, বাঁশের চতুর্দোলার উপর গরম ...হাণ্ডাগুলি বসিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা কাঁধে ...করে সেগুলি নাটমন্দিরে আনছেন।

...নাটমন্দিরের ঠিক মাঝখানে অন্নকূট ...সাজানো হচ্ছে। স্তূপীকৃত অন্নের চার-...পাশে বড়ো বড়ো বারকোশ আর গামলা-...ভর্তি ব্যঞ্জন আর পরমান্ন। তিন দিক থেকে ...কেন পরদা মেলে নাটমন্দিরের এই ...অংশখানটি ছাওয়া। যাতে ভোগের ...পবিত্রতা নষ্ট না হয়। গতকাল রাত্রি ...থেকে ভোগের কাজ আরম্ভ হয়েছে— ...সারা দিনমানেও মিটবে না।

অন্নকূটের চূড়া মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। বেলা বাড়ছে। সংগে সংগে জনতা বাড়ছে তো বাড়ছেই। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের মাঠগুলি সব ভর্তি হয়ে গেছে। সেখানে বাঁশের খুঁটি আর ডাল বেঁধে বিশাল বিশাল চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। প্রসাদ বিতরণের সময় অন্তত হাজার-খানেক করে লোক এক-একটি চাঁদোয়ার নীচে বসতে পারবে।

অনেক ঠেলাঠেলি করে কোনো রকমে নাটমন্দিরের বারান্দায় উঠলাম। সেখান থেকে মন্দিরদ্বারে পৌঁছতে অসুবিধে কম। স্বেচ্ছাসেবিকারা ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। অল্পবয়েসী মেয়ে সব—স্কুলের ছাত্রী। তাদের নেতৃত্ব করছেন শিক্ষিকারা। লাইন বেঁধে ভক্তরা এগোচ্ছে। মন্দির-দ্বারের সামনে গিয়ে মাতৃ-দর্শন করে আবার নেমে এসে ভিড়ে মিশে যাচ্ছে। লাইনের ডান পাশে অবশ্য পাহারায় আছে একসার ঘর্মাক্তদেহ বলিষ্ঠ তরুণ। দর্শকদের লাইন যাতে অন্নকূটের চৌহদ্দির মধ্যে ভেঙে না পড়ে, সেদিকে তাদের লক্ষ্য।

মন্দিরের দরজার সামনে উঁকিটুকু মাত্র দিয়েছি। পিছনে কোন্ সুহৃদ ছিল জানিনে। তবে মহা ভাগ্যই বলতে হবে—নইলে অদৃশ্য হাতের ঠেলায় মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ব কেন, চৌকাটে ঠোক্কর লেগে হুড়মুড়িয়ে বসে পড়ব কেন মাতৃ-মূর্তির সামনে?

মুখ তুলে তাকালাম প্রসাদময়ী জগদীশ্বরীর মুখ পানে। চোখ আর ফেরে না। সারা প্রাণমন ভরে গেল মাতৃপ্রসাদে। আজ মা অন্নপূর্ণা অন্নদা—জীবধাত্রী পুজো-পালয়িত্রী মহাজননীর আজ বরবর্ণিনী রূপ। স্বর্ণবর্ণ বেনারসী আজ মা পরেছেন—অংগে কতো না স্বর্ণ-অলংকার। কিন্তু বেনারসী আর অলংকার আজ, যেন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—তাঁর বসন আর ভূষণ ঢেকে আছে পুষ্প-আভরণে। যে মাটিতে ফসল ফলে, সে মাটিতেই ফুল ফোটে। আজ তাই মার সজ্জা ফুলে ফুলে ফুলময়। মাথায় ফুলের মুকুট, কণ্ঠে ফুলের মালা, চার হাতে ফুলের বাজুবন্ধ আর কংকণ। বক্ষে পুষ্প-চন্দ্রহার, চরণে কুসুম-নূপুর। মাথার উপর চাঁদোয়া জুড়ে ফুলের ঝালর, থামগুলি ফুলের মালায় জড়ানো, ফুলের কার্পেট-বিছানো শ্বেতপাথরের বেদী।

বেলা অপরাহ্ন। দ্বিপ্রহর থেকে অন্নভোগ বিতরণ শুরু হয়েছিল। এখনো শেষ হয়নি। এখনো শিবের গলির মুখে মোটর আর সাইকেল-রিকশার চাপ। এখনো কাতারে কাতারে প্রসাদ-প্রার্থীরা আসছে। গলির ধারে পুকুরের কিনারে কিনারে ভলান্টিয়াররা লম্বা বাঁশ বেঁধেছেন—ভিড়ের চাপে যাত্রীরা পুকুরের মধ্যে পড়ে না যায়। দক্ষিণের মাঠে চাঁদোয়ার নীচে লাইন করে যাত্রীদের বসানো হয়েছে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, মেয়ে-পুরুষ, আভিজাত-অন্ত্যজ। অবারিত মায়ের দাক্ষিণ্য। সবাই পাশাপাশি বসে পেট ভরে মাতৃ-প্রসাদ খেয়েছেন। এক-এক লাইনে দু শো, এক-এক খেপে দু হাজার। অন্তত দশ হাজার ভক্ত ইতিমধ্যে পরিতৃপ্ত। সারা দিন ধরে খেটেছে দু শো জন তরুণ কর্মী। সকলেই এখানকার ছেলে-মেয়ে। প্রায় চল্লিশ মণ চাল নেমেছে, উনানের এখনো কামাই নেই। আর বসিয়ে খাওয়ানোর সময় নেই। কর্মীরা পঞ্চবটীর নীচে সামনের প্রান্তরে আর শিবের গলির পথে পথে কুড়ি পঁচিশটি দলে ভাগ হয়ে হাতে-হাতে ভোগ বিতরণ করছে। প্রসাদ-কণিকা-ব্যাকুল যাত্রিস্রোতের অবসান হবার আগেই সন্ধ্যা নেমে আসবে।

দুপুরবেলাই দেখেছিলাম বাউণ্ডুলেটাকে। বার বার চোখে পড়েছিল। হাঁটুর উপর তোলা খাটো একটা সাদা ধুতি, কোমরে একটা গামছা। চর্কির মতো ঘুরছে, পাগলের মতো খাটছে। ভোগশালায় দেখেছি চাল ধুচ্ছে, হাণ্ডা নামাচ্ছে, বারকোশ বইছে, উনুনের নীচে কাঠ গুঁজছে। দক্ষিণের মাঠে দেখেছি বালতি হাতে পরিবেশন করছে। এখন দেখছি, এঁটো পাতা মাথায় তুলে পরিষ্কার করছে প্রসাদ-প্রাংগণ।

এতোক্ষণে পড়ন্ত বিকেল। সূর্য নেমে গেছে মন্দিরের পিছনে। এখনই ঘনিয়ে আসবে শীতের সন্ধ্যা। দক্ষিণের মাঠে দাঁড়িয়ে হাঁক মেরে সতীশকে ডাকলাম।

শুনতে পেয়ে আর দেখতে পেয়ে ছুটে এল কাছে। দু হাত কনুই পর্যন্ত ভোগে মাখামাখি। বুক জুড়ে অন্ন-তিলক। পাগলের মতো কষে বুকে জড়িয়ে ধরল আমায়।

উত্তেজিত আলিংগন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম,—কী সতীশ, কেমন লাগছে?

আবার জড়িয়ে ধরল ডান হাতে। বললে—দীর্ঘজীবী হও ভায়া, শতায়ু হও মার দয়ায়। তোমার কথার টানে এসেই না এমন মাকে দেখলাম! জানো, সারা দিন তোমার কথাই ভেবেছি।

বাজে কথা। ভাবলে তো দেখতেই পেতে। আমি তো সকাল থেকেই তোমাকে দেখছি!

ডাকোনি কেন?

মায়ের নামে চর্কির পাক খাচ্ছ—আমি ডাকবার কে? তারপর কেমন লাগছে?

টেনে নিয়ে গেল বেলগাছের তলায়। টেনে পাশে বসালো। গলগল করে কথা বেরুতে লাগল মুখ দিয়ে। এই মাতৃ-

বিগ্রহ, এই বিশাল নাটমন্দির, এই মেলা আর এই দশ হাজার ভক্তের সমাবেশ,—এ ছিল তার কল্পনার বাইরে! কথা বলতে বলতে বাষ্পাকুল হয়ে এল চোখ।

আমি শুধোলাম—কবে এলে?

এই তো দশ দিন আছি।

দশ দিন? এবার আশ্চর্য হবার পালা আমার। আমি জানি, তিন দিনের বেশী সাধুদের প্রসাদপীঠে আশ্রয় দেওয়া হয় না। এই নিয়ে সেবার তারাপীঠে অভয়ানন্দ কম বিষোদ্গার করেনি।

আমি বললাম,—অ্যাঁ, এতোদিন থাকতে দিল? তুমি এখানে সাধুবাবার আশ্রম বানাবে নাকি হে? কেউ কিছু বলেনি?

সাধু? কোন্ হ্যায় সাধু? দাঁত বার করে সতীশ বললে,—পরনে গেরুয়া দেখছ যে, সাধু? আমি মার বিনি মাইনের কিঙ্কর! সকাল বিকেল জল তুলেছি, নাট-মন্দির ধুয়েছি, সিঁড়ি মুছেছি, তারপর উৎসব লাগতেই কাঠ কেটেছি, উনুন বানিয়েছি, ভোগ রেঁধেছি—

ব্যস, ব্যস, বলতে হবে না। আর আছ ক' দিন?

আর না ভাই। অন্নপূর্ণার অন্নকূট শেষ হলো। কাল যাব।

বুঝেছি। পায়ের তলাটা চুলকোচ্ছে। তাই না?

হা-হা করে হাসল সতীশ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। শীতের ধূসর সন্ধ্যা। মাতৃ-মন্দিরের অন্ধকার এক লহমায় কেটে গেল। একসঙ্গে সব ক'টি ইলেকট্রিকের টিউব জ্বলে উঠল। আলোয় আলোময় মাতৃ-মন্দির।

আমরা যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে মাতৃমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বরদাত্রী জননীর ঠোঁটে প্রসন্ন হাসি।

সতীশ বললে,—জানো ভায়া, এই লোকটা বড়ো মার খেয়েছিল জীবনে।

কোন্ লোকটা?

তোমাদের এই রামপ্রসাদ। অর্থকষ্ট, অন্নকষ্ট, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার অবধি ছিল না। দুঃখ-দারিদ্র্যের বোঝা-ভরা শ্রান্ত জীবন, ভাগ্যদিগন্ত জুড়ে শুধু হতাশার অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একটিমাত্র শাশ্বত আলোকশিখা—পরমমঙ্গলময়ী মাতৃচেতনা।

সতীশ আপন মনে বলে চলল,—এই দুঃখেই না রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন,—

আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জন্ম গেল
আর কতো দুখ দেও দেখি তাই।

কেমন উদাস শোনালো সতীশ সাধুর গলা। আমি বললাম—হঠাৎ এ কথা তোমার মনে পড়ছে কেন সতীশ?

সতীশ বললে—রামপ্রসাদ কবি। দু শো বছর পরেও সারা বাংলার আকাশে-বাতাসে তাঁর মাতৃ-সংগীতের সুর। রামপ্রসাদ সিদ্ধ মহাপুরুষ। আজ রামপ্রসাদের ভিটায় এতো উৎসব, এতো আলো, দাক্ষিণ্যের এতো উপচার। এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি বাউণ্ডুলে কি না, তাই বোধ হয় রামপ্রসাদের সেই দী[...] সংসারী রূপটাকে মনে পড়ে গেল! [...] পড়ল যে, লোকটা সর্ববঞ্চনার ম[...] বিশ্বাস হারায়নি। দুঃখের বিক্ষুব্ধ স[...] নিস্পন্দ হাতে মাতৃচরণের হাল ধরে রে[...] আর হুংকার করে জগজ্জননীকে বলে[...]

এ সংসারে এনে মাগো
করলি আমায় লোহাপেটা।
আমি তবু কালী বলি
সাবাস্ আমার বুকের পাটা[...]

সতীশের গম্ভীর কথার মাঝখানে [...] একটা মজার কথা আমার মনে পড়ে[...] আমি আপনমনে মুচকি হাসলাম। [...] বড়ো খিদে পেয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে [...] কাছে খাবার চেয়েছিলেন। সব ছ[...] সেই ছলনা দিনে দিনে ধরা পড়েছে। [...] দশ হাজার ভক্ত জেনেছে, [...] ক্ষুৎপিপাসার্তা ছায়াময়ী মা আজ [...] প্রকটিতা জননী অন্নপূর্ণা।

॥ ৫ ॥

প্রাচীন বঙ্গ-সংস্কৃতির ই[...] হালিশহর-কুমারহট্ট একটি উজ্জ্বল [...] এক শতাব্দী আগে পর্যন্ত [...] উজ্জ্বলতার দীপ্ত শিখায় নদীয়া-[...] পরগনা আলোকিত ছিল।

হিন্দু যুগে সুহ্ম বা রাঢ় দেশের [...] শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল স[...] বর্তমান ত্রিবেণীর অনতিদূরে। [...] হাসিকরা ধারণা করেন, পাল শাসনের

...পালরাজ কুমারপাল ভাগীরথীর অপর ... এই হালিশহর অঞ্চলে একটি ...র নির্মাণ করেন। ফলে এই অঞ্চল ...প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করে। সেই ...রপালের নামানুসারে এই স্থানের নাম ...রহট্ট। মহারাজ বিজয় সেন এইখানে ...ন রাজবংশের প্রথম রাজধানী স্থাপন ...রেন। সেই রাজধানীর নাম বিজয়পুর—...র অপভ্রংশ বর্তমান বীজপুর থানা, ...লিশহর যার অন্তর্গত।

মুসলমান আমলে হালিশহরের সমৃদ্ধি ...ব্যাহত ছিল। এই কুমারহট্টের শিল্প-...াগরিক সমৃদ্ধি দেখে মুসলমান শাসকরা ...লংকৃত হন। তাঁরা এই স্থানের নাম দেন ...বেলীশহর বা প্রাসাদময় শহর। সেই ...বেলীশহরই কালে হালিশহর নাম ...য়েছে।

কুমারহট্ট নাম নিয়ে আরো অনেক কিংবদন্তী আছে। প্রধান কিংবদন্তী হলো —কুমাররা এখানে এসে হাট বসাতেন। কুমার অর্থ রাজকুমার। বাংলার বিভিন্ন বিশিষ্ট উচ্চবংশের তরুণবৃন্দ এখানকার হাটে সেই দুর্লভ বস্তু কিনতে আসতেন —যা পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। সেই আশ্চর্য বস্তুর নাম বিদ্যা।

বৃটিশ শাসনের এক শো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাগরিক সংস্কৃতিপুষ্ট এই হালিশহর শ্মশানভূমে পরিণত হয়ে গেল। ইংরেজী শিক্ষার বন্যায় এখানকার যুগসঞ্চিত সংস্কৃত শিক্ষার ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রসার এখানকার সুপ্রাচীন ও সুনিপুণ হস্ত-শিল্পগুলিকে ধ্বংস করল। ইংরেজী-শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিকটবর্তী রেলপথের সাহায্যে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে জীবিকার আশায় দলে দলে যাত্রা করল।

এমন সময় হালিশহরের শিয়রে এল কালান্তক যম। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কৃতান্তের মতো নেমে এল বর্ধমানের জ্বর ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে কয়েক বছরের মধ্যেই হালিশহর উজাড় হয়ে গেল। দলে দলে লোক মরতে লাগল, দলে দলে লোক বাস্তু পরিত্যাগ করে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। বড়ো বড়ো প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হলো, মন্দিরে মন্দিরে পুজোবিহীন বিগ্রহের পাশে শৃগাল-কুকুরের নির্ভীক আস্তানা। শহর পরিণত মুমূর্ষু গণ্ডগ্রামে। পল্লীর পর পল্লীকে গ্রাস করল গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল রাম-প্রসাদের পঞ্চবটী!

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হালিশহরে শিল্পবিপ্লবের স্পর্শ লাগল। দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গার ধারে পাটকল, কাগজকল বসল। আবাসিকরা বাস্তুত্যাগ করলেও বহিরাগতের স্রোতে হালিশহরের ক্ষীয়মাণ জনসংখ্যা পূর্ণ হতে লাগল।

প্রতিবারের মতো এবারও শ্যামা অমাবস্যায় প্রসাদময়ী জগদীশ্বরীর মহাপুজো হবে। সারা দিনমান ধরে দেশ-দেশান্তর থেকে ভক্তগণ প্রসাদপীঠে এসে পৌঁছবেন। সংসারী আসবেন, বৈরাগী আসবেন। সমস্ত নাটমন্দির আর পঞ্চবটী যাত্রীতে ভরে যাবে। দেশের ছেলেমেয়েরা সেবাব্রতী হয়ে কোমর-বেঁধে লাগবে। কার্তিকসন্ধ্যার ছায়া নামতে না নামতেই ভোগের উনুনে আঁচ লাগবে। তারপর আলোর আলো। অমাবস্যার আকাশ চিরে বাজির পর বাজি উড়বে।

রাত্রি আটটা নাগাদ নাটমন্দিরের মাঝখানে প্রশস্ত এক আসর বসবে। সেই আসরে সংগীতালেখ্য প্রসাদমহিমা পরিবেশন করবেন রামপ্রসাদ লীলাকীর্তন সমিতি।

গভীর মধ্য-যামিনীতে মাতৃপুজোর আরম্ভ। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। সারা পঞ্চবটীতে মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, বিনিদ্র ভক্তদের প্রাণে নীরব মন্ত্র-গুঞ্জরণ। আকাশ নীরন্ধ্র অন্ধকার, সাধকের অন্তরে তিমিরে তিমিরহরা।

প্রসাদ গেয়েছিলেন—

জগৎ পালিছেন যে মা
সাদরে কি তাও জানো না।
কেমনে দিতে চাস তুই বলি
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥

প্রসাদময়ীর পুজোয় জীববলি নেই।

মাতৃসেবকদের কতো কাজ—কতো রকমের কর্তব্য। কেউ পুজোর আয়োজন করে, কেউ ভোগ রাঁধে, কেউ চাঁদা তোলে, কেউ মন্ত্র পড়ে। সেসব কাজে আমার ডাক পড়ে না। তাই মায়ের নামে নিজের কাজ আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠে আমি মাতৃ-আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছি জেলা থেকে জেলায়, গ্রাম থেকে গ্রামে।

প্রসাদময়ীর বন্ধন বড়ো বিচিত্র। কখনো রশি বড়ো, কখনো ছোট। রশি যখন আলগা, তখন কাঁধে ঝুলিটি ফেলে আমি পথে বার হই। মেলায় ঘুরি, তীর্থে তীর্থে বেড়াই। কোথাও শুনি জনকল্লোল, কোথাও শুনি নিঃসঙ্গ প্রাণের একতারা। বৈষ্ণবপাট আর শাক্তপীঠ দুই-ই আমার কাছে সমান।

ওরা আমার ধূসর উত্তরীয় ধরে টান দেয়—বলে, কোথা থেকে আসছ?

আমি বলি—কুমারহাট-হালিশহর থেকে। শাক্ত-বৈষ্ণব সমন্বয়ের পরমতীর্থ থেকে। যেখানে রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—

শিবরূপে ধর শিঙা
কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশি—
ও মা রামরূপেতে ধর ধনু,
কালীরূপের করে অসি।

ওরা আমাকে কাছে ডাকে, পাশে বসায়। দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়ায়, মন্দিরের কোণে দেয় রাতের আশ্রয়। ওদের আতিথেয়তার বিনিময়ে কী আমি দেব? শুধু মায়ের কথা বলি, শোনাই প্রসাদময়ী জগদীশ্বরীর কাহিনী।

বিদায় নেবার সময় বলি—মায়ের উৎসবে যাবে তো ভাই? যাবে তো বোন?

গেলে তোমার দেখাও মিলবে?

মিলবে না? নিশ্চয় মিলবে। সেদিন মা তাঁর বাঁধনের রশিতে কড়া টান দেবেন যে! সেদিন সব ঘোরা শেষ করে পঞ্চবটীর ছায়ায় এসে মায়ের পায়ে লুটোব। শ্রান্ত পথিক সেদিন আপন মনে গুনগুনিয়ে বলবে—

মা গো, আমার অঙ্গ জুড়োয়
তোমার ছায়ায় এসে।

কলিন উইলসন : রাগী ছোকরা(!)

কলিন উইলসনের একটি লেখা পড়লাম সদ্য। লেখাটির মূলে বিষয় যাই হোক, তার প্রধান একটি বক্তব্য হয়েছে সাহিত্য সমালোচনা এবং শৌখিন সমালোচকবৃন্দ। কলিন উইলসন বলতে চেয়েছেন, একেবারে বেয়াদপ কিংবা মূর্খ লেখক ছাড়া কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, আমি আমার খুশি মতন লিখব।

লেখকরা যে খুশি মতন লিখতে পারে না—তার নানা কারণ রয়েছে। যেমন—প্রকাশকের দাবি, অশ্লীলতার আইন ইত্যাদি। এ ছাড়াও আরও একটি কারণ রয়েছে, সমালোচক ও তাঁদের সমালোচনা। সমালোচকরাও প্রকাশকের দাবি, অশ্লীলতার আইন ইত্যাদির মতন চাপ দিয়ে লেখককে কাবু করে দিতে পারেন। অবশ্য এখানে সমালোচক কারা সে কথাও মনে রাখতে হবে, যারা কাগজে পত্রিকায় বেতারে দিনের পর দিন এই কাজটি করে বেড়াচ্ছেন। এ'রা প্রতারক। সাহিত্য জগতের নোংরা জীব।

কলিন উইলসন লিখছেন : আমার প্রথম বই বেরুবার পরই "রাগী ছোকরা" বলে আমার নামে লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর দেখলাম, সকলেই চাইছে আমি ক্রুদ্ধ যুবকের মতন ব্যবহার করি, সেই রকম মেজাজে ভাবনা চিন্তা করি। আমি নিজের কাছে নিজেকে বলেছি, হায়রে! আমার বিশ্বাস, স্বভাবতই আমি ধীর স্থির শান্ত-মেজাজের মানুষ। আমি অলস, ভাবপ্রবণ। আমার একটু পাণ্ডিত্যপনাও আছে। বলতে কি আমার স্বভাব নিয়ে রাগী ছোকরা হওয়া যায় না।...কিন্তু চারপাশে যে-ভাবে আমাকে "রাগী ছোকরা" তৈরী করা হল তাতে আমি লণ্ডন ছেড়ে পালিয়ে না এসে আর পারলাম না। আমি এখন ২৬০ মাইল দূরে পালিয়ে এসে রয়েছি, লণ্ডনের সাহিত্য-ফ্যাশান আর স্বেচ্ছাচারিতা থেকে অনেকটা তফাতে।

সাহিত্য শিল্পের যাঁরা পেশাদারী সমালোচক তাঁদের বিরুদ্ধে কলিন উইলসন খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন। বলেছেন এ'রা যেন ভেবে নিয়েছেন এ'দের বক্তব্য মতামত বিচার সব একেবারে চিরস্থায়ী, তার আর অদল বদল নেই।

এই সব অজস্র সমালোচকদের বুলিতে বুদ্ধিসুদ্ধিঅলা পাঠকের মতিভ্রম কিন্তু হয় না, জনসাধারণেরও নয়। সমালোচক যতই গালভরা বুলি বলুক, যতই শৌখিনী কথা লিখুন, করুন না সহস্র নিন্দা—তবু এ কথা ঠিক, প্রতিভাবান লেখক পাঠকের কাছে সর্বদাই শ্রদ্ধার আসন পাবেন।

কলিন উইলসনের লেখাটি পড়ে আমার বাংলা দেশের সাহিত্য সমালোচনার কথা মনে পড়ছে। আরও মনে পড়ছে ইদানীংকার লেখকদের কথা। মাতব্বর সমালোচক এবং উত্তেজিত তরুণ লেখকদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কোন পর্বে সমাপ্ত হয় দেখার কিঞ্চিৎ কৌতূহল আমার থাকল।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

বাঙলার রহস্য কাহিনী

জনৈক পাঠক একটি পত্রে জানিয়েছেন:

দেশ পত্রিকার ৪৯ সংখ্যায় বিদুরের "বাংলা রহস্য উপন্যাস" শীর্ষক আলোচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়লাম। বাংলা গোয়েন্দা বা রহস্য কাহিনীর অবাস্তব ঘটনা সংস্থান, আকস্মিক যোগাযোগ। অসংখ্য ভুল তথ্য এবং অধিকাংশ লেখকের বাস্তবজ্ঞানহীন লেখনী সম্বন্ধে বিদুরের কলম মোটামুটি ঠিক পথেই এগিয়েছে। বস্তুত বাং[illegible] কাহিনীতে তথ্য, ঘটনা, এমনকি তু[illegible] বর্ণনায় এমন ভুল চোখে পড়ে, "ভৌতিক স্বেচ্ছাচারিতা" ছাড়া অ[illegible] বলার উপায় নেই। রহস্য-রোমাঞ্চ[illegible] একটি পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত ব[illegible] উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হবে।

খ্যাতনামা এক লেখকের একটি উ[illegible] নায়ক সাধন প্রথম পরিচ্ছেদে সু[illegible] ফরসা রঙ ও দীর্ঘ দেহের [illegible] থাকলেও কয়েকপাতা পরেই সে [illegible] বেঁটে ও কুৎসিত হয়ে ওঠে। [illegible] লেখার পরেও কোনো লেখকের রচ[illegible] ধরনের ভুল হাস্যকর। এই ধরনের [illegible] বিষয়গত ত্রুটি আমি তাঁর অধিকাং[illegible] লক্ষ্য করেছি। বলা বাহুল্য, তাঁর [illegible] সচেতনতার পরিচয় আজও পেলাম [illegible]

ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত আর-এ[illegible] একটি মেয়ের আঙুলের ক্ষতে বিষ [illegible] করে তাকে হত্যার জন্য পানীয়ে[illegible] মেশানো হয় পটাসিয়াম সায়[illegible] হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড!! যে পদা[illegible] কোনো-একটি মুখে গেলেই মৃত্যু

ই দুটি পদার্থ লেখক একযোগে লেমনের [illegible]াসে মিশিয়েই ক্ষান্ত হননি। তাতে [illegible]াবানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন আঙুলের [illegible]ত।

[illegible] অন্যত্র প্রকাশিত একটি উপন্যাসের লেখক [illegible]না প্রসঙ্গে অকজ্যালিক অ্যাসিডকে [illegible]সবুজ রঙের তরল পদার্থ" বলেন। অনেকেরই জানা আছে, অকজ্যালিক অ্যাসিড সাদা ক্রিস্টাল রূপে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পঠিত জ্ঞানের উপরও লেখক নির্ভর করতে পারতেন।

আরও একটি স্বল্পখ্যাত রোমাঞ্চ-কাহিনীকারের রচনায় দেখা যায় Concave mirror প্রতিফলিত Real Image দেখা যায় শূন্যে, কোনো Screen বিনাই! এ ছাড়া অখ্যাত লেখকদের রচনায় রোজ কত যে ভুল চোখে পড়ে তার ঠিক নেই।

আসলে, আমাদের দেশে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার যে গুরুত্ব আছে, তার সিকিও রহস্য সাহিত্যের জোটেনি। ফলে, শক্তিহীন লেখকের স্বেচ্ছাচারও পাঠক নির্বিবাদে হজম করেছেন। এবং পাঠকও খুব অজ্ঞ বলেই সব মেনে নিচ্ছেন। এসব লেখার মধ্যে সাহিত্যরস খোঁজার চেষ্টা যেমন হয়নি, তেমনি লেখকরাও একে যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্রই ভেবে বসেছেন। অথচ রহস্যকাহিনীও যে ক্লাসিক সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে আসন পেতে পারে চেস্টারটন, ফ্রিম্যান, ডয়েল, ক্রিস্টির কয়েকটি লেখাই তার প্রমাণ।

উপরের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, বাংলা ও বিদেশী রচনা প্রায় সমমানের, বিদুরের এ অনুমান ভুল। একটি গল্প ও কয়েকটি বাজে বইয়ের সমালোচনা পড়ে কোনো প্রকল্প রচনা প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব। বস্তুত বিদেশী রচনায় (বৃহৎ বাজারের তুলনায় সেগুলি সংখ্যায় স্বল্প বটে, তবে বাংলা রহস্য কাহিনীর মতো প্রায় শূন্য নয়) প্রতিভার যে স্পর্শ পাওয়া গেছে, বাংলা রচনা এখনও তা থেকে বহু দূরে। সম্পূর্ণত বিদেশী প্রেরণায় বাংলা রহস্যকাহিনী সৃষ্ট হলেও, আজও সে একটি সাহিত্যধারা সৃষ্টিতে অক্ষম। বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত দুয়েকটি নাম মনে এলেও সমগ্রভাবে কিছুই হয়নি বলা যায়। তবু আমি আশা করব, বাংলার নবীন লেখকদল যথার্থ দরদ ও প্রাজ্ঞতা নিয়ে কেবলমাত্র রহস্য সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই এগিয়ে আসবেন এবং অচিরে বাংলা রহস্য সাহিত্য কিছুটা উন্নত হয়ে উঠবে।

নমস্কারান্তে

সুশান্ত চক্রবর্তী, নজরবাগ, লক্ষ্ণৌ

বিদুরের মন্তব্য

পত্র লেখকের সঙ্গে আমার মতবিরোধ কোথাও ঘটছে না। কিন্তু বিদুর কি পূর্বে কোথাও এ কথা বলেছেন যে, বাংলা ও বিদেশী রচনা (রোমাঞ্চ কাহিনী) সম-পর্যায়ের? বোধ হয় বলেন নি। বা যা বলেছেন, বলতে চেয়েছেন তার ভাবার্থ হল এই যে, বিদেশী রহস্য-কাহিনীও মাসে যদি হাজারখানা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে দশ-বিশখানা পাঠ্য, বাকি সব অপাঠ্য। পত্রলেখক যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা সংখ্যায় কজন, বা তেমন সাহিত্যিক বিদেশেই বা কজন আছেন? বাংলায়, বলতে কষ্ট হয়, চেস্টারটন এখনও স্বপ্নের অতীত। তবে আমিও পত্র-লেখকের মতন আশা করব বাংলায় এই বিশেষ সাহিত্য শাখাটির উন্নতি হোক। তার জন্যে লেখকও যেমন তৈরী হবেন, তেমন করে পাঠককেও তৈরী হতে হবে।

দুইজন মহৎ কবি : দু'টি স্বতন্ত্র মানসভূমি

নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি। শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ। ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল। আজহার-উদ্দীন খান। জিজ্ঞাসা। ১৩৩-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। পাঁচ টাকা।

দুজনেই বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন, একত্রে আলোচিত হবার এ ছাড়া আর কোন সাধর্ম্য কিংবা বৈপরীত্য আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে চোখে পড়া দুরূহ। সম্পর্ক-সন্ধানে সবিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠলে সম্ভবত এই কথাগুলি ক্রমশ মনে আসবে : দুজনেরই কাব্য তাঁদের বিপুল প্রাণধর্ম ও উদ্দাম আবেগে সংরক্ত এবং উদ্বেজিত; দুজনেরই চিন্তার একটি সাধারণ সূত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করে রচিত; হয়তো পরিণতিসূত্রেই, নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতি মোহিতলালের বাঙালী-প্রীতিতে পর্যবসিত। আরও একটি সূত্রে দুজনের মধ্যে সামান্য মিল আছে, গ্রন্থকারদ্বয় তাঁদের বইয়ের সূচনাতেই সেই নির্দেশ দিয়েছেন :

> আজ পর্যন্ত তাঁহার রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে।... অথচ নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিষ্ঠা একসময় গৌরবজনক ছিল। (নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি)
>
> তিনি নামজাদা লেখক কিন্তু...তাঁর কবিতা-গ্রন্থ ইত্যাদির পাঠক বড়ো-একটা নেই।... ভিতরে ভিতরে তাঁর বিরুদ্ধে একটা নিশ্চুপতার ষড়যন্ত্র চলেছে। (বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল)

সেই কারণে গ্রন্থকার দুজনেই তাঁদের আলোচ্য কবিদের সঙ্গে সহমর্মী ও সহৃদয়। এবং তাঁদের অনুমোদনকে সপ্রমাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁরা তাঁদের প্রতিপাদ্য কবিদের জন্য দুটি অনিবার্য ইতিহাসমুহূর্ত উল্লেখ করেছেন অথবা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন :

> বহিরঙ্গের দিক দিয়া মধুসূদনের কাব্যরীতির অনুবর্তন করিলেও রবীন্দ্র-যুগপ্রবৃত্তির সহিতই তাঁহার সাধর্ম্য গভীর এবং অন্তরঙ্গ।... তিনি যেন মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলন-সেতু। (নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি:পৃ ৩১০)
>
> রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মোহিতলাল একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তী দিনের কবিরা নতুন পথে পা বাড়াবার সাহস পেয়েছেন। (বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল : পৃ ৭৬)

নবীনচন্দ্র অথবা মোহিতলালের কাব্যপঙ্‌ক্তি-সমূহ থেকে আজ যদি আমরা গ্রহণীয় কিংবা উপভোগ্য কিছু খুঁজে না-ও পাই, তবু অন্তত এই কারণেও তাঁরা এমন সহজ বিস্মরণের যোগ্য নন। কিন্তু আদৌ সেই-জাতীয় কোন আগ্রহ কি এখনকার পাঠক অনুভব করেন? গ্রন্থকারদ্বয় এই বিচিত্র অনীহায় আক্ষেপ করেছেন এবং সেই পাপ-ক্ষালনে আত্মনিয়োগ করেছেন।

অবশ্য কুচক্রী সমালোচকের চোখে এই গ্রন্থ প্রণয়নের পিছনেও বিশুদ্ধ আগ্রহের পশ্চাতে ব্যবহারবুদ্ধির ছায়া রেখায়িত হতে পারে; নবীনচন্দ্র লেখককে গবেষণাকার্যে সিদ্ধি দান করেছেন, মোহিতলাল এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। কিন্তু তাতে গ্রন্থের মান আদর্শ কিংবা উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার কোন কারণ নেই, সাবলীল হবার অতিরিক্ত সুযোগ আছে। বস্তুত 'নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি' নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। যোলটি অধ্যায়ে পর্যায়ীকৃত এই বইয়ে লেখক প্রধানত নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক স্থাননির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন, নবীনচন্দ্র সম্পর্কিত ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি বিচার করেছেন। সেই সূত্রেই তদানীন্তন কাব্যধারায় নবীনচন্দ্রের অবস্থিতি এবং পাশাপাশি আলোচনা করেছেন নবীনচন্দ্রের কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাব : যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার চেতনা প্রভাস-এর ৮ম সর্গধৃত কতিপয় চরণে, অবকাশরঞ্জিনীর কোন পদে বিদায় অভিশাপ-এর দেবযানীর স্মৃতি-চারণাত্মক আবেগমন্থর ভাষার পূর্বা[illegible] অথবা কুরুক্ষেত্র-এর ১২শ সর্গে রবীন্দ্রনা[illegible] বৈরাগ্যবিমুখ সংসারাশ্রয়ী জীবননি[illegible] মুক্তিসাধনার পূর্বলেখ, ইত্যাদি। [illegible] কবিকৃতি-কে প্রধানত ঐতিহাসি[illegible] নির্ণয়েই লেখক সর্বদা ব্যবহার করে[illegible] প্রধানত কবিকৃতির আলোচনা বলেই হ[illegible] তাঁর গদ্যরচনার বিষয়েও যথেষ্ট মনো[illegible] দেন নি।

আসলে অন্যান্য গবেষণাগ্রন্থাদির মত বইটিও আদর্শ ছাত্রবোধ একটি বই, এর [illegible] লেখকের অন্তরঙ্গ কাব্যবিবেকের প[illegible] কোথাও নেই, কিন্তু লেখকের বিবিধ ত[illegible] নুসন্ধান-স্পৃহার পরিচয় আছে, সেইটু[illegible] ছাত্রের বিশেষ সুবিধা।

আজহারউদ্দীন খান-এর বইটি প[illegible] বর্তীর তুলনায় অনেক বেশী আংশিক দুষ্ট কিন্তু অপেক্ষাকৃত আন্তরিক। য[illegible] মোহিতলালের সার্বভৌম পরিচয় [illegible] বর্ণনা করেছেন—কবি-সমালোচক-প্রবন্ধ[illegible] এবং বাঙালী মোহিতলাল, কিন্তু স[illegible] অধ্যায়গুলিই অলিখিত বৃহত্তর আলো[illegible] ভূমিকাস্বরূপ। কিন্তু কবির প্রতি [illegible] অনুরাগ কখনও কখনও পাঠকের ম[illegible] সঞ্চারিত করে দিতে সমর্থ, তাতে ভুল [illegible] অনেক জায়গায় চটুল ও দায়িত্বহীন ম[illegible] করেছেন কিন্তু তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের অকৃত্রিমতা আছে, সেই অকপটতা গুণে [illegible] তাঁর প্রতিপাদ্য কবির জন্য পাঠকের আসন রচনা করে দিতে পারবেন। অ[illegible] মোহিতলাল সম্পর্কে আরও পূ[illegible] আলোচনা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা ক[illegible]

৩০৬। ৬২, ৩২[illegible]

শারদ সাহিত্য

ঘরে বাইরে—সম্পাদিকা : শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়। ১৮৮/২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য : ১·৫০ নঃ পঃ।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি কর্তৃক কেবলমাত্র মহিলাদের রচনা-সমাবেশে প্রকাশিত আলোচ্য সংখ্যাখানি তার পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। গল্প, রম্যরচনা, নক্সা ও কবিতা ছাড়া সূচিশিল্প, ঘরকন্না ও রান্না সম্পর্কিত রচনার জন্য সংখ্যাখানি মেয়েমহলে সমাদর লাভের যোগ্য। লেখিকাদের মধ্যে নামকরা সাহিত্যিক ছাড়া নতুনও অনেকে আছেন।

স্বস্তিকা—সম্পাদক শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২্ টাকা।

পূজোয় সময় উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধাদির সমন্বয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা দেখা যায় যে সব পত্রিকার 'স্বস্তিকা'ও সেই জাতের। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে বিবেকানন্দ সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ ছাড়া একটি উপন্যাস, ছটি গল্প, গুটিকয়েক কবিতা এবং সেই সঙ্গে ছোটদের জন্য গল্প ও কবিতা পরিবেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া বৈশিষ্ট্য বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

চিত্রাঙ্গদা—সম্পাদক শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত। ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ।

চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কিত রচনা ও চিত্রকে মুখ্য আকর্ষণ রেখে গল্প ও উপন্যাস দিয়ে পূজো সংখ্যা প্রকাশের যে রেওয়াজ চলেছে 'চিত্রাঙ্গদা' তা থেকে বিচ্যুত নয়। এতে আছে সর্বশ্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী ও প্রবোধ দের গল্প, শ্রীমন্ত ও শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তীর উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনয় বিষয়ক প্রবন্ধ ও ছবি।

জাগৃহি—সম্পাদক শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কাটজুনগর, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। মূল্য ১্ টাকা।

সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগের পরিচয়ের দিক থেকে আলোচ্য সংখ্যাখানি সাহিত্যরসিকদের সমাদরের যোগ্য। প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী সরোজ আচার্য, ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মিহির সেন, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, মিহির আচার্য, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, আদিত্য, ওহদেদার প্রভৃতি। এই বিশেষ সংখ্যাখানিতে বেশ একটা সাহিত্যরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ফসল—সম্পাদক শ্রীযামিনীকান্ত মাইতি। ২২, রামচরণ নস্কর লেন, ঘুসুড়ি, হাওড়া। মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ।

প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, রম্যরচনা ও নাটকের সমাবেশে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাখানি আঙ্গিক চটকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেয়ে রচনা সম্ভারের প্রতি মনকে টানার চেষ্টা করেছে। লেখকদের তালিকায় আছেন সর্বশ্রী ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, রামপদ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, নরেশ জানা, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, প্রবুদ্ধ প্রমুখ ত্রিশজন লেখক।

ছাত্র—সম্পাদক শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়। ৪৭ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ১·০০ টাকা।

প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের মাসিক মুখপত্রখানির শারদ সংকলনে ছাত্রদের কাজে লাগার মতো কতকগুলি প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শোভন সোম, অধ্যাপক করুণ মিত্র প্রভৃতি। এছাড়া ছটি গল্প, একটি বাঙ্গ নাটিকা এবং সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আলোক সরকার, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তেইশজনের কবিতা পরিবেশিত হয়েছে।

রাঙামাটি—সম্পাদক শ্রীশক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৬৮, বি সি রোড, বর্ধমান। মূল্য ১·০০ টাকা।

মফঃস্বলের সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সমাবেশে সংখ্যাখানি স্থানীয় সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বহ্নিশিখা—সম্পাদক শ্রীউত্তমকুমার দাশ। বারুইপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·০০ টাকা।

ছোট্ট হলেও পত্রিকাখানি পরিচ্ছন্ন এবং সাহিত্যরুচি সম্পন্ন। এর লেখক তালিকায় আছেন সর্বশ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শোভন সোম, আলোক সরকার, রতন ভট্টাচার্য, গীতা চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, প্রমুখ পঁচিশজন লেখকলেখিকা।

দক্ষিণা—সম্পাদক শ্রীগগনাথ মণ্ডল ও জনাব সামসুল হক। গাজী বিল্ডিং, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নাটকের সমাবেশে আর পাঁচটি শারদ সংকলনের ধারাই আলোচ্য সংখ্যাখানিতে রক্ষা করা হয়েছে। লেখকের তালিকায় খ্যাতনামা এবং নতুনদের অনেকেই আছেন। মফঃস্বলের প্রকাশন হিসেবে সংখ্যাখানি সমাদর লাভের যোগ্য।

সমাজ-সেবা—সম্পাদক শ্রীমদনগোপাল সেন। ২৪ দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২·০০ টাকা।

আঙ্গিক শোভা ও মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতার দিকটা উপেক্ষিত হলেও রচনার দিক থেকে এই বিশেষ সংখ্যাখানি আকর্ষণীয়। প্রতিষ্ঠাবান কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে তালিকায় আছেন সর্বশ্রী সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি। এছাড়া প্রবন্ধ ও কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জগদানন্দ বাজপেয়ী, নলিনীকিশোর গুহ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রভাতকিরণ বসু, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, শান্তিকুমার মিত্র, চিত্তরঞ্জন দেব প্রভৃতি।

সমাবেশ—সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা। মূল্য ১·০০ টাকা।

অধিকাংশই নবীন ও অখ্যাত লেখক-লেখিকার রচনার সমাবেশ হলেও আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো একটি পরিচ্ছন্ন প্রকাশন। রচনাবলীও সুনির্বাচিত।

অঙ্কুপত্র—সম্পাদক শ্রীসুবোধ ঘোষ। ১৫এ অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-১০। মূল্য ০·৫০ নঃ পঃ।

একটি প্রবন্ধ, চারটি গল্প এবং দশটি কবিতা সমন্বয়ে প্রকাশিত সংখ্যাখানির

লেখক লেখিকার অধিকাংশই অপরিচিত। কিন্তু তাহলেও প্রতিটি রচনাই সুপাঠ্য বলেই সংখ্যাখানি সমাদর লাভ করবে। আঙ্গিক সজ্জা এবং মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন।

সচিত্র শিশির—সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার মিত্র। ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ।

পুরনো সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে যেগুলি আজো প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে এই পত্রিকাখানি অন্যতম। বিয়াল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত হওয়ার গৌরব ছাড়া পত্রিকাখানি যে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলার পক্ষপাতী নয় সেটা আলোচ্য বিশেষ শারদীয়া সংখ্যা-খানির চেহারা ও রচনাবলীতেই স্পষ্ট। প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বন্দে আলি মিয়া, কল্যাণ সেন প্রভৃতি।

জাগরী—সম্পাদক শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা। ৯।এ হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। মূল্য ১·০০ টাকা।

নামকরা লেখকদের কিছু পূর্ব-প্রকাশিত রচনার সংকলনের সঙ্গে দু'একটি অখ্যাত লেখকের গল্প কবিতা নিয়ে পূজার সময় যে কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'জাগরী' সেই ধরণেরই একটি প্রকাশন। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সর্বশ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, 'শরৎচন্দ্র বসু, বিমল কর, বিমল মিত্র প্রমুখাৎ বহুজনের রচনাই এই সংখ্যাখানিতে পাওয়া যায়।

সাময়িক পত্রিকা

উত্তরসূরী—সম্পাদক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য। ১৮৬।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪। মূল্য ১·০০ টাকা।

নিছক সাহিত্য সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'উত্তরসূরী' নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-গুণে সাহিত্যরসিকদের কাছে প্রিয়। আলোচ্য 'সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য' সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যাখানিতে শ্রীবিনয় ঘোষের 'বাংলা সাহিত্যে সাময়িক পত্রের দান', শ্রীভবতোষ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন', শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ', শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র', শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'আধুনিক বাংলা সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্যের এ-কাল', শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের 'সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্যঃ সূত্রনির্ণয় প্রসঙ্গে', কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ ছাড়া শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও শ্রীমানস রায়চৌধুরী সংকলিত 'বাংলা সাময়িক সাহিত্যের যুগরেখা' তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই পাঠের যোগ্য।

News & Views—Editor Sri Prohlad Dey. Published from 42A, Beadon Row, Calcutta-6. Price Rs. 1.25 nP.

মুখ্যত চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথ, কবি-শেখর কালিদাস রায়, ডঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বাঙলার প্রতিষ্ঠাবান জনকয়েক সাহিত্যিকের ছবি ছাড়া বাকি সব রচনা এবং ছবি এদেশের ও বিদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে। সংখ্যাখানি চলচ্চিত্র তারকাদের ছবির বিশেষ সংখ্যা বলে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল।

বিবিধ

The Economic Studies—Hony. Editor Sri D. N. Mukherjee. Published by Economic Studies & Journals (Pvt.) Ltd. 2, Private Road, Dum Dum, Calcutta-28. Price Rs. 2|-.

শিল্পের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য বলে দেশের বিবিধ শিল্প পরি-কল্পনার পরিপ্রেক্ষীতে অর্থনীতিক অবস্থা কি দাঁড়ায় সে বিষয়ে দেশবাসীর পরিপুষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থনীতি সংক্রান্ত পত্র পত্রিকারও তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন। আলোচ্য পত্রিকাখানি শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন পরিকল্পনা অর্থ-নীতিক দিক দিয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত প্রবন্ধসম্ভারে সম্পুষ্ট। অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে বিশেষ করে পত্রিকাখানি কাজে লাগবে।

বালক রামকৃষ্ণ—নির্মল দত্ত। ব্যানার্জি অ্যান্ড মুখার্জি ব্রাদার্স। ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের কিছু কিছু ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পুস্তিকাখানির ভাষা সহজ ও সাবলীল। ৩১২।৬১

রাকা ও বাঁকা—পরাশর। এম চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স, ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'ভক্তমাল' নামক ভক্তিমূলক গ্রন্থের ১০টি পৌরাণিক কাহিনী এবং লোকসাহিত্যের একটি কাহিনী বর্তমান পুস্তিকাখানির উপজীব্য। সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত এই পুস্তিকার ভক্তিমার্গের সদুপদেশসমূহ ব্যবহারিক জীবনে তেমন কার্যকর না হইলেও সাধুতা, সজ্জনতা প্রভৃতি অবশ্য-শিক্ষণ উপদেশাবলী কিশোরদের মনে রেখাপ করিতে সমর্থ হইবে। ছোটদের উপযো প্রাঞ্জল ভাষা পুস্তিকাখানির বিশেষত্ব। ১৪১।

আহির ভৈরোঁ—শ্রীপারাবত। গ্রন্থজগ ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১ মূল্য—চার টাকা।

পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান সীমা অবস্থিত কোন গোপপ্রধান অঞ্চলের গো শ্রেণীর লোকদের দৈনন্দিন জীবনয তাহাদের সুখ-দুঃখ এবং হাসি-কা কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থখানি লেখক গোপদের সমাজজীবনের নিখুঁত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের সমা জীবনের নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে সা প্রেম রোমান্স প্রভৃতির কাহিনী ইহ স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সীমান্তে চোরাকারবারীদের গতিবিধি সম্পর্কেও বি তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। চরিত্রগুলির ম নন্দ, হরেকেষ্ট এবং নীলুর নাম উল্লে যোগ্য। ৯৭।৫

বৈশাখী— বাণী প্রসাদ চট্টোপাধ্যা তপতী পাবলিশার্স—৫/১এ, কলেজ ে কলিকাতা-৯। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ ন পয়সা।

এই গ্রন্থে লেখক হাড়ি, মুচী প্রভৃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমাজচিত্র, তাহাদে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষ দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং প্রেম নিবেদন ও তাহ পরিণতি প্রভৃতি বিষয়ের সম্যক আলো করিয়াছেন। উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থখা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বৈশাখী বিবাহিত নলিনীকান্তের প্রতি তার আকর্ষণ এবং ব বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়া তাহার সাফ জনক পরিণতি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না ২০৫/৬

* রঙ্গজগৎ *

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের জন্য যাঁরা ছবি নির্বাচন করেন তাঁদের বিচারবোধ ও দূরদর্শিতার উপর আমরা ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছি। সম্প্রতি এমন সব ছবি তাঁরা বাইরে পাঠাতে শুরু করেছেন যেগুলি বিদেশে পুরস্কৃত হওয়া তো দূরের কথা, সেখানকার চিত্রামোদীদের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারেনি। বিদেশে ভারতীয় ছায়াছবির এই পরাজয় আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে শুধু যে অসম্মানজনক তা-ই নয়, ক্ষতিকারকও বটে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় বর্তমানে টেলিভিশনের আধিপত্য শুরু হওয়ার ফলে চলচিত্রশিল্প ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, ওই দুই মহাদেশের চিত্রপ্রদর্শকরা এখন উৎকৃষ্ট বিদেশী ছবি দেখাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই সুযোগে একটি সুগঠিত 'এক্সপোর্ট' সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়-ক্ষেত্রটি সাগরপারেও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য ভারতীয় ছবির ব্যবসা-ক্ষেত্র যদি বহির্ভারতে প্রসারিত করতে হয় তবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ দেশ থেকে উৎকৃষ্ট ছবি পাঠাতে হবে। তা না হলে ভারতীয় ছবি সম্পর্কে বিদেশী চিত্রপরিবেশক ও চিত্রপ্রদর্শকদের ধারণা ক্রমশই নীচের দিকে যাবে।

এখন পর্যন্ত এ বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে যেসব ছবি পাঠানো হয়েছে সেগুলি বিদেশের চিত্রামোদী ও চিত্রব্যবসায়ীদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। চলচ্চিত্র-উৎসবে প্রদর্শিত অন্যান্য ভারতীয় ছবিগুলি দেখে বিদেশের চিত্ররসিক ও চিত্রব্যবসায়ীরা আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ নয়। এই পরিস্থিতির যদি আশু অবসান না ঘটে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে সক্রিয় ও সচেতন না হন তবে ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্যের আশা সুদূর-পরাহত হয়েই থাকবে।

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের "সূর্যশিখা" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবির নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী
ফটো—দেশ

বাঙলা ছবির সংকটে অন্যতম কর্তব্য

দেশ-বিভাগের পর বাঙলা ছবির বাণি
ক্ষেত্রটি খুবই সংকুচিত হয়ে পড়ে
ব্যবসায়-ক্ষেত্রের এই সংকোচন বাঙলা ছ
বর্তমান সংকটের অন্যতম কারণ। বা

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে "ভ্রান্তিবিলাস"-এর (উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড) গান রেকর্ডিং-এর দৃশ্যে ছবির কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পরিবেশক অসিত চৌধুরী, সংগীত-পরিচালক শ্যামল মিত্র, এবং প্রযোজক—নায়ক উত্তমকুমার
ফটো—দে

মৃণাল সেন পরিচালিত "অবশেষে" (অভ্যুদয় ফিল্মস) ছবির একটি দৃশ্যে অন্যান্য-দের মধ্যে অসিতবরণ ও পাহাড়ী সান্যাল

ছবির ব্যবসায়িক অঞ্চলটি কীভাবে প্রসারিত করা যায় সে ব্যাপারে আমাদের চিত্রপরিবেশক তথা চিত্রব্যবসায়ীদের সচেষ্ট হওয়ার সময় এসেছে।

গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রেঙ্গুনে নিয়মিতভাবে বাঙলা ছবি প্রদর্শিত হত। রেঙ্গুন বাঙলা ছবির একটি অপরিহার্য ব্যবসায়-ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হত। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রসেবী শ্রীঅসিত চৌধুরী তাঁর বিদেশ-সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেছেন যে, রেঙ্গুনে গত বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙলা ছবি একেবারেই যায়নি বলা চলে। হিন্দী ছবি রেঙ্গুনের বাজারটি দখল করে আছে। অথচ রেঙ্গুনে এখনও অনেক বাঙালী বাস করেন এবং বাঙলা ছবির জন্য তাঁরা অপরিসীম আগ্রহে কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রেঙ্গুনের চিত্রপরিবেশক ও প্রদর্শকরা নাকি এই মন্তব্য করেছেন যে, বাঙলা ছবির পরিবেশন-স্বত্ব ক্রয় করা তাঁদের পক্ষে অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অনেক অল্পমূল্যে নাকি তাঁরা হিন্দী ছবি দেখাতে পারেন।

যে পরিবেশন-শর্তে রেঙ্গুনে হিন্দী ছবি দেখানো সম্ভব হতে পারে, সেই একই শর্তে কেন সেখানে বাঙলা ছবি দেখানো সম্ভব হবে না তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। হয়ত রেঙ্গুনে মোটা অঙ্কের লাভের আশা কম বলেই আমাদের চিত্রব্যবসায়ীরা সেখানে আজকাল ছবির বাণিজ্য করতে ততটা উৎসাহ বোধ করেন না। কিন্তু বাঙলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন শহরে ছবি দেখিয়ে তাঁরা কি সব সময়েই প্রত্যাশিত অথবা অপ্রত্যাশিত ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে থাকেন? তবে রেঙ্গুনের এ ব্যাপারে তাঁদের এই সংকোচ কেন?

সংবাদে প্রকাশ, গত দশ বছরের মধ্যে রেঙ্গুনে একটি বা দুটির বেশী বাঙলা ছবি দেখানো হয়নি। রেঙ্গুনে বাঙলা ছবি দেখানোর ব্যাপারে আমাদের চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের এই ঔদাসীন্য বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। বাঙলার বাইরে অন্যান্য স্থানে যেভাবে বাঙলা ছবি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখানো হয়ে থাকে, রেঙ্গুনেও সেভাবে বাঙলা ছবি পাঠানোর ব্যাপারে বাঙলা চিত্রব্যবসায়ীদের তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করি। বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের এই সংকটকালে বাঙলা ছবির ব্যবসায়-ক্ষেত্র প্রসারের ব্যাপারে আমরা যেন সূচ্যগ্র মেদিনীও অবহেলা না করি।

শ্রীঅসিত চৌধুরী তাঁর বিবৃতিতে গ্রেট বৃটেনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, ওই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙলা ভষাভাষীর সংখ্যা দু লক্ষের উপর। ইংলণ্ডে নিয়মিতভাবে বাঙলা ছবি দেখানো যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন এবং প্রতি ছবি পিছু প্রযোজকের ভাগে মোট ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় হতে পারে। ওখানকার এবং এখানকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সোসায়েটি গঠন করে তার মাধ্যমে ইংলণ্ডে বাঙলা ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সারা বিশ্বে নিজেদের ছায়াছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনের জন্য য়ুরোপের প্রায় সব দেশেই 'এক্সপোর্ট' সংস্থা রয়েছে। এমন কোন সংস্থা আমাদের নেই। আমাদের সরকারও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। বাঙলা ছবির বর্তমান বিপর্যয়ের সময় আমাদের সরকার ও চিত্রব্যবসায়ীরা যদি একযোগে এ ধরনের এক্সপোর্ট সংস্থা গঠন করে ইংলণ্ডে নিয়মিতভাবে বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেন তবে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্প বিশেষ লাভবান হতে পারে। বিদেশে শ্রীচৌধুরী যেখানেই গেছেন সেখানেই নিজের পরিবেশনায় তিনি কোন না কোন বাঙলা ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে এসেছেন। য়ুরোপ, আমেরিকা, দূর ও মধ্য-প্রাচ্যের যেসব অঞ্চলে পূর্বে কখনও বাঙলা ছবি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তিলাভ করেনি সেসব স্থানেও তিনি বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করে এসেছেন। সঙ্গে তিনি কোন ছবির প্রিণ্টও নিয়ে যাননি। আজ বাঙলা ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্র প্রসারের প্রয়াসটি শুধু ব্যক্তিগত লাভালাভের ব্যাপার নয়' এ ধরনের প্রয়াসের সঙ্গে বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের ভাগ্য জড়িত। বাঙলা ছবির বর্তমান দুর্গতির সময়ে এ ধরনের প্রচেষ্টায় যিনিই আত্মনিয়োগ করবেন তিনি যে শুধু সফল চিত্রব্যবসায়ী হিসাবেই গণ্য হবেন তা নয়, বাঙলা চলচ্চিত্রসেবী হিসাবেও তিনি সাধু-বাদার্হ হবেন। এই সাধুবাদ শ্রীচৌধুরীর প্রাপ্য। শ্রীচৌধুরী বাঙলা ছবির বহির্বাণিজ্য তথা বিশ্ববিজয়ের যে পথটি প্রশস্ত করে এলেন, আমরা আশা করব, সে পথটি অন্যান্যরাও অনুসরণ

করবেন। এবং বহির্ভারতে বাঙলা ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রসারের একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

* শুভমুক্তি *

বিমল রায় প্রোডাকশন্স-এর **প্রেমপত্র** মুক্তিলাভ করছে এ-সপ্তাহে। বহু প্রতীক্ষিত এই ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন শশী কাপুর ও সাধনা শিবদাসানি। বিমল রায় ছবিটির পরিচালক. সংগীত পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী।

এ ছাড়া আরও দুটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবি দুটি হল : **রামলীলা** (চিত্র-ভারতী) ও **শিব-পার্বতী** (টি কে ফিল্মস)।

* ছবির পর ছবি *

ভ্রান্তিবিলাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত রসরচনা "ভ্রান্তিবিলাস"-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন উত্তম-কুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে কয়েকটি গান রেকর্ডিং-এর ভেতর দিয়ে এই ছবির নির্মাণ-কার্য শুরু হয়। প্রযোজক উত্তমকুমার ছবির দ্বৈত নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করবেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকার শিল্পীরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, সবিতা বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তরুণ-কুমার, মণি শ্রীমাণী, তমাল লাহিড়ী ও জয়-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। মানু সেন ও শ্যামল মিত্র যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সুরকার।

ত্রিধারা

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "ত্রিধারা" (এচ জি প্রোডাকশন্স) ছবির কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের এক ভিন্নধর্মী কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় নিজেই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী যথাক্রমে ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা হলেন—অসিতবরন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, অনুভা গুপ্ত, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও জীবেন বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

পলাতক

ভি শান্তারামের প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ এই বাঙলা ছবির কয়েকটি গান সম্প্রতি বোম্বাইয়ে রেকর্ড করা হয়। গানে কণ্ঠদান করেন সংগীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা ও পঙ্কজ মিত্র। যাত্রিক-গোষ্ঠী এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী কলকাতায় ছবির দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু করবেন।

মৌনমুখর

বি অ্যাণ্ড বি প্রোডাকশন্স-এর প্রথম প্রয়াস "মৌনমুখর" ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। শেখর রায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন 'ত্রয়ী' নামে এক অভিজ্ঞ কলাকার-গোষ্ঠী। সে... চট্টোপাধ্যায় ও ভারতী রায় ছবির ন... নায়িকা। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রে... বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর ... লিলি চক্রবর্তী ও অপর্ণা দেবী।

ফার্স্ট প্রাইজ

পূর্ণ পিকচার্স-এর প্রথম ছবি "ফা... প্রাইজ"-এর শুভমুহূর্ত অনুষ্ঠান স... ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। ... বসু ছবিটির পরিচালক-প্রযোজক। হি... সেন ছবির কাহিনীকার। ব্যঙ্গরস... এই কমেডি ছবির দুটি বিশেষ চ... অভিনয় করছেন তপতী ঘোষ ও অ... কুমার।

এমকোজ'র "রক্তপলাশ" ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে নিরঞ্জন রায় ও নায়ি... সন্ধ্যা রায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় ফটো—দে...

থিয়েটার সেণ্টারে মুখোশ সংস্থা নিবেদিত "ওরা থাকে ওধারে" নাটকের একটি দৃশ্যে নাট্য পরিচালক—অভিনেতা পিকলু নিয়োগী এবং শিশুশিল্পী মানস ও মিতা ফটো—দেশ

পাদপ্রদীপের আলোয় *

ওরা থাকে ওধারে

"ওরা থাকে ওধারে" নামে প্রেমেন্দ্র মিত্রর মরমী রসরচনার চিত্ররূপ একদা রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছিল। এই কাহিনীর একটি পরম উপভোগ্য নাট্যরূপ সম্প্রতি থিয়েটার সেণ্টার-এ মঞ্চস্থ করেছেন মুখোশ সংস্থা।

একই বাড়ির দুই ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের নিয়ে লেখা এই কাহিনীর একটি সুগ্রথিত নাট্যরূপ যে সম্ভব হতে পারে, এবং তা আড়াই ঘণ্টাকাল দর্শককে আমোদ-রসে আবিষ্ট করে রাখতে পারে, তা নাটকটি না দেখলে সত্যিই ধারণা করা যায় না। পেশাদারী মঞ্চে এমন চিত্তাকর্ষক নাটক খুব কমই দেখা যায়।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দুই পরিবারের লোকেরা প্রতিদিনকার সন্দেহ কোন্দল ও মান-অভিমানের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত কেমন করে একই পরিবারভুক্ত হয়ে পড়ে তা নিয়েই "ওরা থাকে ওধারে"-এর কাহিনী রচিত। এধার ও ওধারের ব্যবধান কেমন-ভাবে একদিন ভেঙে যায় তার মধ্যেই কাহিনীর আশ্চর্য সুন্দর মানবীয় আবেদনটি নিহিত।

কাহিনীর স্বচ্ছন্দগতি নাট্যরূপে এক দিকে যেমনি রয়েছে রঙ্গরসের উপকরণ—যা হাসিতে খুশিতে ক্ষণে ক্ষণে দর্শককে মাতিয়ে তোলে—অন্য দিকে তেমনি রয়েছে এর মানবিক অনুভূতি—যা দর্শকের মনে দোলা দেয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি এক মুহূর্তের জন্যও যেন কোথাও থামেনি। প্রতিক্ষণেই এই নাটক দর্শককে সকৌতুক কৌতূহলে নিবিষ্ট করে রাখে।

পিকলু নিয়োগী নাটকটি পরিচালনা করেছেন। নাট্যপরিচালনায় তিনি এই তরুণ বয়সে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

এই নাটকের এক বিশেষ আকর্ষণ এর মঞ্চ-পরিকল্পনা। অল্পপরিসর মঞ্চে "অ্যাপ্রনে"র সাহায্যে মঞ্চনির্দেশক যেভাবে একই বাড়ির দুটি পাশাপাশি ফ্ল্যাট দেখিয়েছেন, বাঙলা রঙ্গমঞ্চে তা অভূতপূর্ব বললে অত্যুক্তি হয় না। বাইরে থেকে বাড়িতে ঢোকবার প্রবেশপথটিও তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। নাটকের এই সুচারু বাস্তবসম্মত মঞ্চ-পরিকল্পনার জন্য অভিনন্দন পাবেন তরুণ রায়।

নাটকের সব ক'টি প্রধান ভূমিকার শিল্পীরা সুঅভিনয় করেছেন। এ'দের মধ্যে নাট্যপরিচালক পিকলু নিয়োগী (নেপাল) তাঁর কৌতুকাভিনয়ে দর্শককে সর্বাধিক আনন্দ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ কৌতুক-অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন সুশীল রায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, প্রণত ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবোত্তম চক্রবর্তী, মিলন রায়চৌধুরী, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও দীপক দত্ত। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে তপতী মণ্ডল, কৃষ্ণা রায়, বেলা রায় ও মঞ্জু রহ্মচারী প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। দুটি শিশুচরিত্রে মানস ও মিতাকে দর্শকের ভাল লাগবে।

নাটকের সংগীত-পরিচালনা ও আলোক-সম্পাতে যথাক্রমে তরুণপ্রসাদ ও শ্যামসুন্দর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

"শিশু চিত্রের প্রয়োজনীয়তা"

আধুনিক জীবনে ছায়াচিত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করা অসম্ভব। ছায়াচিত্র শুধু অবসর বিনোদনের মাধ্যম নয়। ছায়াচিত্র আজ মানুষের সংস্কৃতির ও জ্ঞানের বিকাশ সাধনের জন্য এগিয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের শিশু-চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই এবং এর সাহায্যে যে শিশু-মনকে ঠিক কিভাবে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে অবহিত নই। সাধারণত শিশু মন অনুকরণ-প্রিয়, কৌতূহলী। তাদের মনে সহস্র প্রশ্ন জাগে। আজকের দিনে শুধু ঠাকুরমার ঝুলির গল্প হলে চলবে না। পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনা, শিক্ষামূলক ছোট ছোট গল্প, বিজ্ঞানের কথা, যা আনন্দ দেবে, শিক্ষা দেবে, আদর্শ এবং প্রেরণা যোগাবে—ছায়াচিত্রের ভেতর দিয়ে তাই শিশুদের জন্য পরিবেশন করতে হবে। শিশুদের চরিত্র গঠনের সহায়ক হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্প সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। ধরে বেঁধে, চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে চরিত্র তৈরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয় বেশী। কিন্তু অনাবিল আনন্দ ও সংগীতমুখর ছবি, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার ছবি, যদি গল্পের ছলে ছোট ছোট শিশুদের দেখানো হয়, তারা আনন্দের সঙ্গে আদর্শকে সহজেই গ্রহণ করবে এবং নিজেদের জীবনকেও সেইভাবে গড়ে

তুলতে অনুপ্রাণিত হবে। নরম কাদার মত যে মন, তাকে যে ছাঁচে ফেলা যায়, তারই রূপ নেয়। আজ বাইরের আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক বিপর্যয়, সস্তা আমোদের কুরুচিপূর্ণ ছবি, ভারতবর্ষের কৃষ্টির মূলে আঘাত করে তরুণ মনগুলোকে কু-শিক্ষা, মিথ্যাচরণে অভ্যস্ত করে তুলছে। তরুণের দল সামান্য কারণে উচ্ছৃংখলতার চরম খেলায় মেতে উঠছে। তার প্রতিকার করার প্রয়োজন খুব বেশী। স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ শিশুদের জন্য রচিত শিশু-সাহিত্যের উন্নতিই বা কতখানি হয়েছে? আর তা পড়ার সময় কোথায়? কোন রকমে ক্লাসের সর্বোচ্চ ধাপটি অতিক্রম করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-দেওয়া কাগজটি হাতে করে বেরিয়ে এসে আজকের ছেলেরা পথে পথে ঘোরে। শিশুকাল থেকে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের আস্বাদ তারা পায় না বলেই তাদের জীবনের এই পরিণতি ঘটে। চিন্তা-শক্তি, কল্পনা-শক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার। বাল্যকাল থেকে চিন্তা আর কল্পনাকে আমরা যেখানে নিভৃত মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি, আজ সেখানে দেশ-দেশান্তরের আলোক-তরঙ্গ এসে আঘাত হানছে। যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করছে, তার কার্য-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

স্বদেশে, বিদেশে কি করে উন্নতি সাধিত হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষ কি করেছে, কি করতে পারে, সাধারণত এই সমস্ত ধারণাকে পুঁথিগত বিদ্যার মধ্য দিয়ে যেভাবে ছোটদের মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা চলে, সেটা নিছক পণ্ডশ্রম এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ব্যর্থই হন বেশী। কিন্তু ছায়াচিত্রের মাধ্যমে শিশুরা জ্ঞানের পথ সহজেই খুঁজে পায়। কারণ, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, শিশুমন চোখে দেখে যত সহজে কোন কিছু গ্রহণ বা অনুধাবন করতে পারে, শুধু কানে শুনে তা পারে না। তাই তাঁরা শিশু-শিক্ষার জন্য আজ দৃষ্টি-শ্রুতিবাহিত পদ্ধতি প্রচলিত করার চেষ্টা করছেন। আমাদেরও কর্তব্য, সেইভাবে ছায়াচিত্রের দ্বারা আমাদের দেশের মনীষীদের জীবন-কাহিনী, ইতিহাস, স্বাধীনতার সংগ্রাম, পুরাণের কাহিনী প্রভৃতি সবই শিশুদের সামনে তুলে ধরা। আর এই দায়িত্ব যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে উন্নতি অনিবার্য। কোন কাজ প্রথম চেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু নিখুঁত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করলে তা জাতীয় সম্পদ হয়ে উঠবে। বার্নার্ড শ' বলেছিলেন, "শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পিতামাতার হাত থেকে সরকারের স্বহস্তে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, সন্তান শুধু পিতামাতার সম্পত্তি নয়, সে হল সমস্ত দেশের, সমগ্র রাষ্ট্রের সম্পদ। শিশুদের সুস্থ দেহমন যাতে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বভাবসিদ্ধ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।"

আজ বৃহৎ পরিকল্পনায় ব্যক্তিগতভাবে অনেকের অগ্রসর হয়ে আসা যেমন কর্তব্য, সরকারেরও সে কর্তব্য আছে বলে মনে করি। শিশুচিত্র নির্মাণের কাজে সরকার ও চলচ্চিত্রসেবীদের একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

(শিশু চলচ্চিত্র পর্ষৎ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় পঠিত।)

'প্রেয়সী'র (রাধারানী পিকচার্স) সেটে নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও পরিচাল শ্যাম চক্রবর্তী ফটো—দে

মনরোর জীবনী চিত্র

মেরিলিন মনরোর জীবনী নিয়ে চারটি ছবি তৈরির আয়োজন চলছে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স যে জীবনীচিত্রটি প্রযোজনা করছেন তার নাম "লাইফ অব মেরিলিন মনরো"। ছবি তৈরির প্রাথমিক কাজ প্রায় সমাপ্ত। এই চিত্রে মনরো অভিনীত কয়েকটি ছবির দৃশ্য দেখা যাবে। মনরো শেষ যে ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন এবং যে ছবি থেকে পরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়, সেই অসম্পূর্ণ "সামথিংজ গট টু গিভ" ছবিটিরও একাধিক দৃশ্য মনরোর জীবনীচিত্রে দেখা যাবে।

মনরোর জীবনী নিয়ে প্যারিসে অ বিলম্বেই আরও একটি ছবির চিত্রগ্রহণ হবে। এই ছবিটির নাম রাখা হা "ইম্‌মরট্যাল ভেনাস"।

মনরোকে নিয়ে তোলা দুটি অল্পদৈ প্রামাণিক চিত্র ডিসেম্বরে আমেরি মুক্তিলাভ করছে। একটি আধ ঘণ্টাব ছবির নাম "মেরিলিন মনরো স্টোরি"। ওয়াল্ড এই ছবির কাহিনীকার। "মেরিলিন" নামে একটি প্রায় এক ব্যাপী ছবিও মুক্তি পাচ্ছে। এই ছ

নিবেদন করবেন : জনৈক টেলিভিশন-চিত্র-নির্মাতা।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রশংসা

ভারত সরকার আয়োজিত রঙ্গমঞ্চ-সংক্রান্ত শিক্ষা-সফর শেষ করে ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট নাট্যপ্রযোজক শ্রী টি কে শন্‌মুখম সম্প্রতি মাদ্রাজে ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বাংলা দেশ মঞ্চাভিনয়কে অন্যান্য আমোদ-মাধ্যমের উপর স্থান দিয়েছে। শ্রীশন্‌মুখম বর্তমান বাংলা নাট্য-আন্দোলনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিক উল্লেখ করে বলেন, বাংলা নাটকে কাহিনী, চরিত্র-কল্পনা ও অভিনয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, বাংলা দেশে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায় বেশ লাভজনক। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তা দেখা যায় না। "স্টার", "বিশ্বরূপা" এবং "রঙমহল" নাট্যালয়ের ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা উল্লেখ করে শ্রীশন্‌মুখম বলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় না। শুধু বিশেষ "সাউন্ড এফেক্ট"-এর জন্যই মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের উন্নত আঙ্গিক-সৌষ্ঠবের কথাও তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন।

প্রতিনিধিদল কলকাতায় অবস্থানকালে অভিনেতৃ সংঘ, রবীন্দ্র-ভারতী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং বাংলা নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন।

বিদেশী সমালোচকের চোখে 'দেবী'

"দি নিউ ইয়র্ক পোস্ট"-এর চিত্র-সমালোচক আর্চার উইনস্টন সত্যজিৎ রায়ের "দেবী"র সমালোচনায় বলেন, "সর্বক্ষণ যে আনন্দকণা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে বিরাজমান তা হল সংগীতের ব্যবহার, গতির সংগে সংগীতের যুগলমিলন। (ছবির চরিত্রের) মুখমণ্ডল ও অভিব্যক্তির ব্যাপারে তাঁর এক সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে—এই মুখ ও অভিব্যক্তি দেখতে বিস্ময়কর।

"দেবী'তে তিনি অপু-চিত্রত্রয়ের উদার মানবতা-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি একক, বিপর্যয়মূলে ধর্মীয় ঘটনাতে সংকুচিত করে এনেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর আর্ট দুর্বল হয়নি। বরঞ্চ এই ছবিতে তাঁর আর্ট অনেক বেশী শক্তিশালী। কারণ আর্ট অধিকতর শক্তিশালী তখনই হয় যখন কাহিনী ও মানবীয় উপকরণ একাকার হয়ে মিশে যায়। যা কিছু সত্যজিৎ রায় স্পর্শ করেন তার মধ্যেই তাঁর হাতের যাদুপ্রভাবটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার তিনি তাঁর মহৎ ছায়াছবির জানালাটি খুলে দিলেন—যার ভেতর দিয়ে আমরা ভারতকে দেখলাম, বুঝতে পারলাম।"

* সাংস্কৃতিকী *

বোম্বাইয়ের গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজো-মণ্ডপে এবছরে "চিত্রাঙ্গদা", "মন্ত্রমুগ্ধ" এবং "অংশীদার" মঞ্চস্থ হয়। কবিগুরুর নৃত্যনাট্যটি রমণীমোহন দত্তের সংগীত-পরিচালনা এবং মঞ্জুলিকা দাশগুপ্তার নৃত্য-পরিকল্পনায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সংগীতে ও নৃত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন শিবানী গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা ঘোষ, নীলা ঘোষ, শকুন্তলা রায়, ঊর্মিলা রায় ও ললিতা দত্ত। "মন্ত্রমুগ্ধ" ও "অংশীদার" পরিচালনা করেন যথাক্রমে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও অশোক বসু। দুটি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন ঝর্না সিংহ, মনীষা বসু, কল্যাণী বসু, মঞ্জুলিকা দাশগুপ্ত, অর্চনা চৌধুরী, সর্বাণী সান্যাল, নীতিন ঘোষ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ বর্ধন, অরুণ চক্রবর্তী এবং পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। বোম্বাই চিত্রজগতের সুপরিচিত সারমেয়-শিল্পী রিন-টিন-টিন নাটকে অংশ গ্রহণ করে।

লিওপোল্ডভিলে (কঙ্গো) এ বছর সর্বপ্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীরা। এ'দের প্রায় সকলেই ইউ-এন-ও'র হাসপাতালের সংগে জড়িত। এলিজাবেথভিল হতে বিমানে মাটি আনিয়ে দুর্গাপ্রতিমা গড়েন অনিলকুমার চক্রবর্তী ও প্রফুল্লজীবন বিশ্বাস। সপ্তমীর দিনে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন রত্না গুহ এবং স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন।

* পাঠকের চোখে *

॥ বাংলার বাইরে বাংলা ছবি ॥

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের এই দুর্দিনে আপনারা এর সংকটমোচনের জন্য যে অন্দোলন বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে শুরু করেছেন সেটা সময়োপযোগী। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হবার ফলে বাংলা ছবির প্রদর্শন-এলাকা খুবই সংকুচিত হয়েছে এবং বাংলা ছবি আর্থিক ব্যাপারেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কলকাতা ব্যতীত বাংলা ছবির প্রদর্শন-সীমানা বনগাঁ থেকে বর্ধমান পর্যন্ত। এই এলাকার সংকোচন হেতু বাংলা ছবির প্রযোজকসংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছে। যে ব্যবসায়ে লাভের অংক একরূপ অনিশ্চিত সাধ করে সেখানে কে আর অর্থ খাটাতে যাবেন? বাংলার বাইরে বাংলা ছবি এক-চেটিয়া হারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যদিও লক্ষ করেছি, এ-সকল জায়গায় (কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী) ভাল ভাল বাংলা ছবির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে সুচিত্রা ও উত্তমকুমারের ছবি হলে ত কথাই নেই। ছবিগুলি এই সব স্থানে প্রায় এক সপ্তাহের বেশী 'হাউস ফুল' অবস্থায় প্রদর্শিত হতে দেখেছি ও শুনেছি। এ-সমস্ত জায়গায় বাংলা ছবি রবিবার প্রাতঃকালীন শোতে বেশী দেখানো হয়। অধিকন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি এলে টিকিটের কালোবাজার আরম্ভ হয়ে যায় এ তথ্যও সামান্যমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। যা হোক, দৃষ্টান্ত আরো এমন অনেক দেওয়া যেতে পারে কিন্তু অনাবশ্যকবোধে তা থেকে বিরত থাকাই উচিত মনে করি। আমার মনে হয়, বাংলা ছবির বহুল প্রদর্শনের জন্য বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যাকে নিয়ে একটা 'জোন' সৃষ্টি করা যেতে পারে। কেননা, বাংলা ভাষার সংগে এই দুইটি প্রদেশের ভাষার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছে। তা ছাড়া মাদ্রাজের মত বাংলাদেশে হিন্দী ছবি তৈরি, ভাল বাংলা ছবির অন্যান্য ভাষায় ডাবিং

আজ ছবি, কাল ছায়াছবি

(বাঁয়ে) "শেষ অংক"র নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর (উপরে) "হাসি শুধু হাসি নয়" ছবিতে বিশ্বজিৎ, জহর রায় ও কল্যাণী ঘোষ (মাঝখানে) 'দেখা হল'র সেটে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় (পরিচালক) ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(নীচে) 'ত্রিধারা'র সেটে পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় এবং শিল্পী অনুরাধা গুহ ও অজিত চট্টোপাধ্যায়। বাঁপাশে ছবির নায়িকা সুলতা চৌধুরী।

এম-জি-এম'এর নিবেদন "লোলিটা" ছবির একটি দৃশ্যে স্যু লায়ন (লোলিটা) ও জেমস ম্যাসন (হামবার্ট)

প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা বাংলা দেশে নির্মিত ছবির প্রদর্শন-এলাকা বাড়ানো যেতে পারে। একদা নিউ থিয়েটার্স বহু হিন্দী ছবি তৈরি করে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আশা করি, বাংলার প্রযোজকগণ ঐতিহ্যপূর্ণ এই শিল্পটির সংকটমোচনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হবেন। পরিশেষে আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে প্রতিকারার্থে উদ্যোগী হয়েছেন।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য
ভুবনেশ্বর

অবহেলিত অঞ্চল

"দেশ"-এ পরিতোষবাবুর চিঠি পড়লাম। উক্ত বিষয়ে আমারও দু-একটি কথা বলার আছে। আমার নিবাস তমলুক। এটি একটি মহকুমা শহর, যেখানে শতকরা ৯৮ ভাগ অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলা। দুটি প্রেক্ষাগৃহ আছে এখানে। দুইটি প্রেক্ষাগৃহেই মাসের ২০।২২ দিন হিন্দী ছবি ও [illegible] ছবি দেখানো হয়। কোন মাসে বাংলা ছবির ভাগ্যে তাও জোটে না। উক্ত হিন্দী ছবিগুলিও খুবই নীচু স্তরের এবং বাংলাগুলি পুরানো বা কলকাতায় বহু পূর্বেই প্রদর্শিত।

এখানে উল্লেখ্য, বর্তমানে বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব দুর্গা পূজার সময়ও (মহালয়া থেকে) ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে অতি নীচু স্তরের ছবি এবং প্রত্যহ তিনটি শো করে। প্রতি হিন্দুধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্থানীয় উৎসবে—যে দিনে বাঙ্গালী দর্শক বিশেষ করে মহিলারা বাংলা ছবি দেখতে আগ্রহী—এই ধরনের হিন্দী ছবি এই দুই প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয়। এর জন্য আমরা অর্থাৎ এখানকার দর্শকরা প্রদর্শককেই সম্পূর্ণ দায়ী করছি।

প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন, দর্শক বাংলা ছবি দেখেন না। কথাটি হয়ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু এর জন্য দায়ী কারা? দর্শককে রুচিবান করার দায়িত্ব প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকের।

বাংলা ছবির সংকট মোচনের জন্য ই-আই-এম-পি-এ খুবই সক্রিয়। এইসব প্রেক্ষাগৃহ এই সংস্থার সভ্য। এই সংস্থার প্রথম কাজ হবে দর্শকদের রুচির উৎকর্ষ আনার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া এবং বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের প্রেক্ষাগৃহকে আইনের আওতায় এনে বাংলা ছবি প্রদর্শনে বাধ্য করা।

ইতি—
মাধব চক্রবর্তী
তমলুক

বোম্বাই সমাচার

অর্জুন হিঙ্গোরালির পরিচালনায় "সহেলি" ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রদীপকুমার ছবির নায়ক। কল্পনা ও বিজয়া চৌধুরী ছবির দুই বিশিষ্ট শিল্পী।

গেহরা দাগ ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। রাজেন্দ্রকুমার ও মালা সিংহ ছবির নায়ক-নায়িকা। ও পি রালহন ছবিটি পরিচালনা করছেন।

মেরে মেহবুব ছবির একটি নৃত্যদৃশ্য সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন পরিচালক-প্রযোজক এন এস রাওয়েল। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন সাধনা ও অমিতা। অশোককুমার, রাজেন্দ্রকুমার, প্রাণ ও নিম্মি ছবির প্রধান শিল্পী। নৌশাদ ছবির সংগীত পরিচালক।

আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ এবং ডুরান্ড কাপের খেলাই এতদিন ভারতের তিনটি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কিন্তু নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের ফতোয়া অনুযায়ী দিল্লি ক্লথ মিলস ফুটবল প্রতিযোগিতারও এখন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা। তবুও আভিজাত্যে দিল্লি ক্লথ মিল আই এফ এ শীল্ড বা রোভার্স ডুরান্ডের সমকক্ষ নয়। কিছুদিন থেকে দিল্লি ক্লথ মিলের প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দলের আনাগোনা দেখা গেলেও এখনো বহু নাম-করা দলের এ প্রতিযোগিতায় খেলার অনিচ্ছা আছে। এবারের কথাই ধরা যাক। কলকাতার নাম-করা দলের মধ্যে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল যোগ দেয়নি। গতবারের বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যোগ দেবার অভিপ্রায় জানালেও শেষ পর্যন্ত যেয়ে উঠতে পারেনি। তবু প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতা বলেই ভারতের কয়েকটি শক্তিশালী দল এবারকার ডি সি এম-এর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেছে। গতবারের রানার্স মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের মফৎলাল গ্রুপ মিলসকে ১—০ গোলে হারিয়ে সর্বপ্রথম সুদৃশ্য ডি সি এম ট্রফি লাভ করেছে।

মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার শক্তিশালী ফুটবল দল সন্দেহ নেই। ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে তাদের ডুরান্ড কাপ লাভ তার প্রমাণ। কিন্তু ফাইন্যালে মফৎলাল গ্রুপের সংগে তারা ভাল খেলতে পারেনি। এবং প্রতিযোগিতার পনেরো বছরের খেলার ইতিহাসে সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক ফাইন্যাল খেলায় তারা মাত্র একটি গোলে মফৎলাল গ্রুপকে পরাজিত করেছে।

তবে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টার ডি সি এম-এর খেলায় এক নতুন পদ্ধতির অবতারণা করেছে। তারা খেলেছে ৪-২-৪ প্রথায়। ইংরাজীতে যাকে বলে "ফোর-টু-ফোর" গেম। অর্থাৎ ৪জন ব্যাক, ২জন হাফ-ব্যাক ও ৪জন ফরোয়ার্ড দিয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। এই প্রথার খেলাতেই তারা কোয়ার্টার ফাইন্যালে কলকাতার উয়াড়ী ক্লাবকে ২—০ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে শক্তিশালী মহীশূর একাদশকে ৪—১ গোলে সহজেই পরাজিত করেছিল। কিন্তু ফাইন্যালে মফৎলাল গ্রুপ মিলসের খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে তাদের খেলা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

মফৎলাল গ্রুপই বোম্বাইয়ের প্রথম টীম যারা এবার ডি সি এম-এর ফাইন্যালে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইয়ং স্টারস ক্লাবকে ৩—১ গোলে এবং সেমি-ফাইন্যালে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে ২—১ গোলে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তারা উন্নত

খেলাধুলা

একলব্য

ক্রীড়াধারার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে না পারলেও ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেশী গোল করতে না দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের কৃতিত্ব আছে।

এবার গোয়া থেকে সর্ব-প্রথম একটি দল ডি সি এম-এর খেলায় যোগ দিয়ে বেশ কিছুটা খ্যাতি কুড়িয়েছে। সিমলা ইয়ংসকে ৪—১ গোলে এবং পাঞ্জাব পুলিসকে ২—১ গোলে হারিয়ে গোয়ার সালগাওকার ক্লাব কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠে। কোয়া[illegible] ফাইন্যালে তাদের হার স্বীকার করতে মহীশূরের কাছে।

জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবের ভার[illegible] ফুটবল ক্ষেত্রে এতদিন কোন সুনাম [illegible] না। কিন্তু আসামে বরদলুই ট্র[illegible] ফাইন্যালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবকে ১০ গোলে হারাবার পর তাদের কথা চি[illegible] কারণ ঘটে। দিল্লি ক্লথ মিলেও তারা হা[illegible] ইউনিয়নকে ৩—০ গোলে পরাজিত ক[illegible] তারপর রুরকির বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারি[illegible] ১—০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইন্যালে [illegible] সেমি-ফাইন্যালে অবশ্য মফৎলাল মিল[illegible] সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২—১ গে[illegible] হেরে যায়। কিন্তু সেমি-ফাইনা[illegible] পরাজিত দুইটি দলের খেলায় শক্তি[illegible]

বিজয়ীর পুরস্কার আশুতোষ ট্রফি সমেত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার যুগ্ম বিজয়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দল

মহীশূর একাদশকে ৪—১ গোলে হারিয়ে দিয়ে হার্ডলাইন কাপের সঙ্গে প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থান লাভ করে।

শুনেছি, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় জারনেল সিং এই বছর থেকে এই দলটির শিক্ষার ভার নিয়েছেন। শিক্ষায় যে কিছু ফল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হায়দরাবাদের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব সেন্ট্রাল পুলিস লাইন-এর দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় রুরকির বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিংএর কাছে পরাজয় স্বীকার করে বিদায় গ্রহণ এবারের ডি সি এম ট্রফির খেলার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফলাফল। নীচে ডি সি এম ট্রফির আগের বিজয়ী ও রানার্স দলের নাম দেওয়া হল:—

* * *

স্যার আশুতোষ মুখার্জি ট্রফি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে।

বিশাখাপত্তম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল ফাইন্যাল খেলা যাদবপুর ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪—৪ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। পরে আর খেলানো সম্ভব না হওয়ায় দুই দলকেই যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। টসে জয়লাভ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ৬ মাস স্যার আশুতোষ ট্রফি দখলে রাখার অধিকার অর্জন করে।

মূল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার আগে যাদবপুর উত্তর অঞ্চলের খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। নিচে উত্তরাঞ্চলের খেলায় যাদবপুরের ফলাফল এবং গোলদাতার নাম দেওয়া হল:—

যাদবপুর—(১) : বারাণসী—(০)
(রণজিৎ লাহিড়ী)

যাদবপুর—(১) (১) : দিল্লী—(১) (০)
(এস বসু ও জে নন্দী)

যাদবপুর—(৩) : গৌহাটি—(১)
(এ চ্যাটার্জি—২ ও জে নন্দী)

মূল ফাইন্যাল

যাদবপুর—(৪) : মহীশূর—(৪)
(এস বসু—৩ ও জে নন্দী)

পূর্ববর্তী বিজয়ী ও রানার্স

বিজয়ী	রানার্স
১৯৪৫—নিউ দিল্লি হিরোজ	কে ও ওয়াই এল
১৯৪৯—রাইসিনা স্পোর্টিং	সিটি ক্লাব—লক্ষ্মৌ
১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল	৫৮ গুর্খা—দেরাদুন
১৯৫১—রাজস্থান ক্লাব	৫৮ গুর্খা—দেরাদুন
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল	৫৮ গুর্খা—দেরাদুন
১৯৫৩—এরিয়ান জিমখানা—ব্যাঙ্গালোর	ই আর এ্যাকাউন্টস
১৯৫৪—জিওলজিক্যাল সার্ভে—কলিকাতা	হায়দরাবাদ একাদশ
১৯৫৫—আই এ এফ—দিল্লি	ডি এস এ—এলাহাবাদ
১৯৫৬—আই এ এফ	ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৭—ইস্টবেঙ্গল	ইস্টার্ণ রেল
১৯৫৮—মহঃ স্পোর্টিং	ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৯—সেন্ট্রাল পুলিস—হায়দরাবাদ	এম ই জি—ব্যাঙ্গালোর
১৯৬০—ইস্টবেঙ্গল	মহঃ স্পোর্টিং
১৯৬১—মহঃ স্পোর্টিং	মাদ্রাজ রেজিঃ সেন্টার

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আগের

বিজয়ী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪১—কলকাতা;
১৯৪২-৪৩-৪৪ পাঞ্জাব (পর পর তিন বছর)
১৯৪৫—আলীগড়;
১৯৪৬-৪৭-৪৮ মাদ্রাজ (পর পর তিন বছর)
১৯৪৯—মহীশূর;
১৯৫০—কলকাতা;
১৯৫১—নাগপুর;
১৯৫২—আলীগড়;
১৯৫৩—কলকাতা;
১৯৫৪-৫৫-৫৬—ওসমানিয়া (পর পর তিন বছর);
১৯৫৭—কলকাতা;
১৯৫৮—পাঞ্জাব;
১৯৫৯—ওসমানিয়া;
১৯৬০-৬১—কলকাতা;

* *

কায়রোতে বিশ্ব স্যুটিং প্রতিযোগিতায় বিকানীরের মহারাজা কার্নি সিং ক্লে পিজিয়ন স্যুটিং-এ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

রাশিয়ার প্রোফেসনাল স্যুটার ভ্যাদিমির জিমেংকো ও মহারাজা কার্নি সিংয়ের মধ্যে তিনবার সমান পয়েন্টে 'টাই' হবার পর চতুর্থ বারের প্রতিযোগিতায় জিমেংকো বিজয়ী হন, কার্নি সিং লাভ করেন দ্বিতীয় স্থান। রাইফেল স্যুটিংএর ইতিহাসে কার্নি সিং ও জিমেংকোর প্রতিযোগিতা এক নতুন ঘটনার সৃষ্টি করেছে।

ক্লে পিজিয়ন রাইফেলের সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগিতা। একটি মেশিনের মধ্য থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে এক একটি চাকতি এক এক দিকে বেরিয়ে যাবে আর ৩০ গজ দূর থেকে গুলী করে সেই উড়ন্ত চাকতি বিন্ধ করতে হবে। এইভাবে তিন দিনে বিন্ধ করতে হবে তিন শ'টি চাকতি। কিন্তু ৫০টি লক্ষ্য বিন্ধ করবার পর বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজন হয়। রাইফেল তেতে ওঠে। রাইফেল পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কত কষ্টসাধ্য প্রতিযোগিতা সহজেই অনুমেয়।

তিন দিনে ৩০০ ক্লে পিজিয়ন স্যুটিংর-এ পর দেখা যায়, মহারাজা কার্নি সিং ও ভ্যাদিমির জিমেংকো দুইজনই ২৯৫টি করে লক্ষ্য বিন্ধ করেছেন। দুজনেরই প্রথম স্থান। সুতরাং দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য বিচারকরা অতিরিক্ত ২৫টি করে লক্ষ্য বিন্ধ করবার নির্দেশ দেন। এবারও একই ফলাফল। দেখা যায় কার্নি সিং ও জিমেংকো দুইজনই ২৪টি করে লক্ষ্য বিন্ধ করেছেন। সুতরাং তৃতীয় বার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হয়। তৃতীয় বারও দুজন ২৪টি করে 'পাখিতে' গুলী মারেন। এইভাবে তিন তিনবার 'টাই'-এর পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ঠিক পরের দিন আবার দুজনকে ২৫টি করে গুলী ছুঁড়তে হবে। এবার জিমেংকো ২৪টি লক্ষ্য বিন্ধ করেন, মহারাজা বিন্ধ করেন ২২টি লক্ষ্য।

বিশ্ব স্যুটিং প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। দলগত প্রতিযোগিতার ১৪টি বিষয়ের মধ্যে ১৩টি বিষয়েই রাশিয়া বিজয়ী হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাতেও স্বর্ণপদকে তাদের সিংহ ভাগ। রাশিয়ার পরই আমেরিকার স্থান। আমেরিকার গ্যারি এন্ডারসন একাই তিনটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

৪৪টি দেশের প্রায় ৭০০ রাইফেল ও রিভলবার চালক বিশ্ব স্যুটিংএ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারত থেকে গিয়েছিলেন, মহারাজ কার্নি সিং, ঠাকুর কালু সিং, হরিচরণ সাহা, উদয়ন চিনু ভাই ও সি কে ভিসাজী। ভারতের একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি

বিখ্যাত রাইফেল চালক বিকানীরের মহারাজা কার্নি সিং

ছিলেন গীতা রায়। এর মধ্যে কার্নি সিংয়ের ক্লে পিজিয়নে দ্বিতীয় স্থান লাভ ছাড়া অভিজ্ঞান ব্যাজ (স্বর্ণ) পেয়েছেন। ক্লে পিজিয়নে কালু সিংও স্বর্ণ ব্যাজের অধিকারী হয়েছেন। স্কীট স্যুটিং-এও কালু সিংয়ের ব্রোঞ্জ ব্যাজ লাভের কথা উল্লেখযোগ্য। প্রোনে হরিচরণ সাহা পেয়েছেন সিলভার ব্যাজ।

* * *

পশ্চিম জার্মানীর অ্যাথলেটিক টীমের তিন সপ্তাহের জন্য ভারত সফরের ব্যবস্থা ভারতের অ্যাথলেটিক ক্ষেত্রের এক স্মরণীয় ঘটনা। দিল্লি, যোধপুর, জলন্ধর, কলকাতা, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও বোম্বাই এই ৭টি কেন্দ্রে ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিক প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। এ লেখা যখন পাঠকদের হাতে পড়বে তখন দিল্লির প্রতিযোগিতা শেষ হবার কথা।

অ্যাথলেটিক ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বমানের অনেক পশ্চাতে। আজ পর্যন্ত কোন অলিম্পিকে ভারত অ্যাথলেটিকসে একটি ব্রোঞ্জ পদকও পায়নি। তাই অন্যান্য খেলা-ধূলার তুলনায় এখানে অ্যাথলেটিকসের আকর্ষণ কম, একমাত্র পাঞ্জাব ও দিল্লি ছাড়া। তবু জার্মান অ্যাথলেটদের সঙ্গে ভারতীয় অ্যাথলেটদের প্রতিযোগিতায় সাধারণের মধ্যে সাড়া জাগাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ব খ্যাত অ্যাথলেট-দের মধ্যে আর্মিন হ্যারী, কার্ল কাউফম্যান বা এম কিণ্ডার ভারত সফরে আসছেন না। কিন্তু যারা আসছেন তাদের বিশ্ব খ্যাতি কম নয়। স্বল্প পাল্লার দৌড়ে পি গ্যাম্প, অ্যালফ্রেড হেবাউফ, ম্যানফ্রেড জার্মার, হেনজ সুচম্যানের বিশ্ব জোড়া নাম ডা[illegible] ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড অধিকারী কার্ল কাউফম্যানের অভা[illegible] ভারতের মিলখা সিংয়ের সঙ্গে প্র[illegible] দ্বন্দ্বিতা করবেন জার্মানীর জোকেম রেস্ক ও হেলসুথ জানজ। ৪০০ মিটার হার্ডলস রেসেও জানজের বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের ম[illegible] স্থান। ১০ হাজার মিটার দৌড়ে [illegible] কুবিক এবং দেড় হাজার মিটারে ক[illegible] আয়ার কাউফার জার্মানীর দুই খ্যাতনা[illegible] দৌড়বীর। জার্মান দলে ডেকাথলন দুইজন প্রতিযোগী রয়েছেন যারা ৮[illegible] পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম মোটের উপর জার্মান টীমকে পরম শ[illegible] শালী অ্যাথলেটিক টীম বলা যেতে পা[illegible] এমন একটি অ্যাথলেটিক দল এর ত[illegible] কোনদিন ভারত সফর করেনি। সেই হিসে[illegible] এর গুরুত্বও কম নয়।

নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে কলকাতা[illegible] রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সিন্ডার ট্র[illegible] রাত্রিকালীন আলোকমালার মধ্যে চ[illegible] ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিক স্পোর্টস[illegible] আয়োজন করা হয়েছে। আশা করা [illegible] জার্মান অ্যাথলেটিক টীমের ভারত সফর[illegible] ফলে আমাদের অ্যাথলেটিকস মান এক [illegible] এগিয়ে যাবে। সাধারণের মধ্যেও অ্যাথলে[illegible] সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি হবে।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

এষা মুখার্জি

খেলাধুলোয় খ্যাতি কুড়িয়ে যাঁরা সংসার-জীবনে প্রবেশ করেছেন বা এখনো খেলাধুলোয় সাধনার মধ্যেই নিমগ্ন আছেন, সেই-সব বাঙালী মেয়ের অনুশীলন, অধ্যবসায়, সাধনা ও সাফল্যের ছবি সবার চোখের সামনে তুলে ধরা আর আগামী দিনের আগন্তুকদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবার সংকল্প নিয়ে "দেশ"-এর পাতায় "খেলাধুলায় মহিলা" স্তম্ভের সূচনা।

অনেকের কথাই লেখা হয়ে গেছে। যাদের কথা জানতে জনসাধারণের আগ্রহ বেশী তেমন মেয়ে বেশী বাকি নেই। তাই আর ক'টি মেয়ের কথা লিখেই এ প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টানতে চাই।

বাঙালী মেয়েদের খেলাধুলো বলতে প্রধানত ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার ও অ্যাথলেটিক স্পোর্টস।

আজ আগ্নেয় অস্ত্রের খেলাতেও অনেক বাঙালী এগিয়ে এসেছেন। রাইফেল-রিভলবার স্যুটিং-এ অনেকেই স্বনামধন্যা। কিন্তু টেনিস খেলায় বাঙালী মেয়ের কৃতিত্বের স্বাক্ষর অত্যন্ত অস্পষ্ট। অনেকের কাছেই এজন্য কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। "তুমি মেয়েদের এত খেলাধুলোর কথা লিখছ কিন্তু টেনিসে একটি মেয়ের কথাও তো লিখলে না।" বলেছি—"তেমন মেয়ে কোথায় ?" টেনিস বড় শক্ত খেলা। বাঙালী ঘরের আদরের দুলালীদের হাত বড় নরম। শক্ত করে টেনিস র‍্যাকেট ধরতে যে শক্তির প্রয়োজন, বাঙালী মেয়েদের হাতে সে শক্তির যথেষ্ট অভাব।

আবার অবসর সময়ে নিজের মনে নিজেই ভেবেছি, তাই বা হবে কেন? বাঙালী মেয়ে যদি সাগরবিজয়িনী হতে পারে, দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেল জয় করতে পারে, বাঙালী মেয়ে যদি "কর্কপিটে" বসে ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝে এরোপ্লেন চালাতে পারে, বাঙালী মেয়ে যদি প্যারাসুট জাম্পার হতে পারে তবে টেনিস খেলাতেই বা পটু হতে পারবে না কেন? উত্তর খুঁজে পাইনি। তবে যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয় টেনিসের পরিবেশ সাধারণ বাঙালী মেয়ের পক্ষে প্রতিকূল। অভিজাত পরিবেশ, ব্যয়সাধ্য খেলা। ধনীর দুলালীদেরই ওখানে মানায় ভাল।

কিন্তু হাওয়া অনেকটা বদলে গেছে। পরিবেশ হয়েছে অনেক অনুকূল। বেঙ্গল লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কোচিং ক্যাম্পে আজ বাঙালী মেয়ের অভাব নেই। অন্তত দশ-বারোটি বাঙালী মেয়ে টেনিসের ডাকে সাড়া দিয়ে খেলায় বেশ একটু রপ্ত হয়ে উঠেছে। এষা মুখার্জি, জয়া গুপ্তা, বন্দা মুখার্জি, গৌরী মুখার্জি, সুশেবা মুখার্জি, দীপা সেন টেনিস লনে আজ এমন কত নতুন মুখের আনাগোনা। কেউ কেউ কম্পিটিশনে খেলছে। কেউ একটু নামও কিনেছে। দিলীপ বসু, নরেশকুমার ও সুমন্ত মিশ্রের শিক্ষার গুণে অনেকেই যে অনেক দূর এগিয়ে যাবে সে সম্বন্ধেও আশা আছে। এদের মধ্যে আজ একটি মেয়ের কথা লিখছি যার হাতে কিছু প্রাইজ এসেছে, ক্রীড়ানৈপুণ্যে যার স্থান সবার পুরোভাগে। নাম এষা মুখার্জি।

শান্তশিষ্ট বাধ্য মেয়ে। চোখের চাহনির মধ্যে একটা সারল্যের ছাপ। দেখলে মনে হবে, ঐ নিতান্ত বাধ্য মেয়ের পক্ষে তির্যক গতির অবাধ্য টেনিস বলকে বাগে আনা যেন অসম্ভব। ঐ শান্ত চাহনি প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতের প্যাঁচপোঁচ বুঝতে বুঝি অক্ষম। কিন্তু খেলার সময় লনের বুকে এষার অন্য চেহারা। চোখের তারায় ঈগল দৃষ্টি। চঞ্চল পদক্ষেপ, হাতের সতর্ক মার। গভীর মনঃসংযোগে প্রতিপক্ষকে পর্যবেক্ষণ। জেতার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা। চতুর্দশী এষা মুখার্জির অবশ্য বাঙলার টেনিস লনে পূর্ণিমার আলো বিকিরণ করার অনেক দেরি আছে। তবু বিশেষজ্ঞের অভিমত, ভারতীয় টেনিস ক্ষেত্রে সুপটু বাঙালী মেয়ের শূন্য স্থান এষার দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে।

টেনিস খেলায় স্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারিণী এষা মুখার্জি। যাকে বলে "ন্যাচারাল ট্যালেণ্ট"। কিন্তু মেচারের

বৈশিষ্ট্যেরও তো একটা কারণ আছে। সে কারণ কি? না, টেনিসের সুমহান ঐতিহ্যের কোলে জন্ম। মুখার্জি ঘরোয়ানার তৃতীয় পুরুষের তৃতীয় সন্তান এষা মুখার্জি। শুধু পিতৃকুলই টেনিসে সুপরিচিত নয়, মাতৃকুলও টেনিস-সমৃদ্ধ। পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুমহান প্রতিষ্ঠার কথা ছেড়েই দিচ্ছি।

ঠাকুরদাদা জে সি মুখার্জি, ঠাকুমা উষা মুখার্জি টেনিস খেলেছেন। ঠাকুমার বোন মিস দত্ত (এখন মিসেস এ এন রে) বোধ হয় প্রথম বাঙালী মেয়ে যিনি কম্পিটিশনে টেনিস খেলেছিলেন। বাবা অধীপ মুখার্জি মোহনবাগানের প্রাক্তন হকি অধিনায়ক। কিন্তু টেনিসেই তাঁর আসক্তি বেশী। মোহনবাগান ক্লাব টেনিসের দুবারের চ্যাম্পিয়ন। এখন টেনিস নিয়েই পড়ে আছেন। বড় ভাই জয়দীপ। ভারতের দুই নম্বর টেনিস খেলোয়াড়। বড় বোন বন্দারও টেনিসে অনুরাগ। খেলার হাত অবশ্য এষার মত নয়। নয় বছরের ছোট ভাই চিরদীপের কাছে লজেন্স বিস্কুটের চেয়ে টেনিস র‍্যাকেটের আকর্ষণ বেশী। এখন থেকেই সাউথ ক্লাবে আস্তানা বেঁধে নিয়েছে।

আগে বলেছি মাতৃকুল টেনিস-সমৃদ্ধ। খেলার কথা লিখতে হচ্ছে বলেই এদিকটা দেখাতে হচ্ছে। না হলে মাতৃকুলের এ পরিচয় নিতান্তই অবান্তর।

"চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু প্রাণধন ত্যজিলেন জীবন দার্জিলিং গিয়ে"—ছোটবেলায় এই গান শুনে চোখের জল পড়েছে। "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"—কবিগুরুর এই লেখা পড়ে শিহরিত হয়ে উঠেছি। আজ বিশাল ব্যক্তিত্বের সেই বিরাট পুরুষের প্র-দৌহিত্রী এষা মুখার্জির টেনিস খেলার কথা লিখছি। দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন দাশের মেয়ের মেয়ে এষা মুখার্জি। শুনলাম অবসর সময়ে দেশবন্ধু টেনিস খেলতেন। চিররঞ্জন দাশও টেনিস খেলেছেন নিবিড়ভাবে। মাতৃকুলের আরও অনেকেরই টেনিসের নেশা ছিল। তার মধ্যে অপর্ণা দেবীর পুত্র বাঙলার প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নাম করা যেতে পারে। কালীঘাট ক্লাবে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলবার সময় ক্রীড়াক্ষেত্রে "মানু" নামে যিনি পরিচিত ছিলেন। সিদ্ধার্থ রায়ের দুই ভাই শান্তনু ও সঞ্জয় রায়েরও টেনিসে ভাল হাত। মোটের উপর টেনিসের অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই এষার জন্ম। ওর রক্তের মধ্যেই রয়েছে টেনিসের নেশা। ভারতীয় টেনিসের পীঠভূমি সাউথ ক্লাবের সভাপতি ঠাকুরদাদা জে সি মুখার্জির সঙ্গে ছোটবেলা থেকে ক্লাবে যেতে যেতেই টেনিসকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে।

কম্পিটিশনে খেলায় অভিজ্ঞতা মাত্র এক বছরের। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে অর্ডন্যান্স ক্লাবের প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ এবং প্রথম রাউণ্ডেই পরাজয়। ১৯৬২ সালের অর্ডন্যান্স ক্লাবের হার্ডকোর্টে সেমি-ফাইন্যালে উন্নয়ন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় ওখানেই ইতি। কাশীপুর ক্লাবের ফাইন্যালে এক নম্বর জুনিয়র খেলোয়াড় রিটা সুরাইয়ার কাছে হার স্বীকার। ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে একই ফলাফল। তবু এর মধ্যে ক্রমোন্নতির পরিচয় রয়েছে। সাউথ ক্লাবের দুটি বিষয়েরই ফাইন্যালে উঠেছে এষা। হ... ক্যাপের ফাইন্যাল খেলা এখনও শেষ হ...

লরেটোর ফিফথ স্ট্যাণ্ডার্ডের ছাত্রী টেনিসের ছাত্রী প্রাক্তন এসিয়ান চ্যা... দিলীপ বসুর। পড়াশুনার সঙ্গে তালে টেনিস খেলায় এগিয়ে যাবার এষার সদাজাগ্রত তৎপরতা। স্কুলের ... পরই সাউথ ক্লাব লনের সবুজ ঘাস মন টানে। একটা দুর্নিবার অ... রয়েছে সাউথ ক্লাবের।

এষা মুখার্জি

দেশী ১,

১৫ই অক্টোবর—মুনাফা নিরোধ আইন অনুসারে মাছের আড়তদারগণ যদি সরকারের নিকট "রিটার্ন" দাখিলে গড়িমসি করেন তাহা হইলে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট আড়তদারগণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

নির্ভরযোগ্য মহলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে চীন গত কয়েকদিনে ভুটান ও সিকিম সীমান্তের সংযোগস্থলে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। এই স্থানটি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক ও পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং হইতে বেশী দূরে নয়।

১৬ই অক্টোবর—গতকাল চট্টগ্রামে ভারত-পাক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ফেনী নদী বরাবর বিরোধীয় অঞ্চলে অস্ত্র সংবরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হইতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, শুধু চিলমারিতে নহে, পূর্ব পাকিস্তানের জলপথে খুলনা, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর এবং বরিশালেও ভারতীয় মালবাহী আরও কতকগুলি স্টীমার ও গাদাবোট পাকিস্তানী লস্করদের কারসাজিতে আটক পড়িয়াছে। উহাতে প্রায় ১৫ কোটি টাকার মাল আছে।

১৭ই অক্টোবর—পুনর্বাসন দপ্তর হইতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে যে-সব উদ্বাস্তু কলোনী বিধিভূত করা হইয়াছিল, রাজ্য সরকার সেই সব কলোনীর অর্পণপত্রপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুদের জমিতে স্থায়ী স্বত্বাধিকার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে (কলিকাতা বাদে) প্রতি ১৫ ঘণ্টায় একটি করিয়া সশস্ত্র ডাকাতি হইতেছে; পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রে তথ্যটি জানা গিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় ডাকাতির সংখ্যাও দেড় গুণ বেশী।

১৮ই অক্টোবর—সীমান্তে চীনা হামলা বাড়ার সংগে সংগে সারা ভারতে চীনা গুপ্তচরদের কার্যকলাপও হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে। দার্জিলিং জেলায় গুপ্তচর উৎখাত অভিযান জোরদার হওয়ার পর বহু চীনা গুপ্তচর একদা কুখ্যাত কালিম্পং ছাড়িয়া কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে আড্ডা গাড়িয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী সমগ্র দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একই রকম আইন প্রণয়ন করিতে রাজ্য সরকারসমূহকে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান।

১৯শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা এখনও পূজার অগ্রিম বেতন পান নাই। যদিও রাজ্য সরকার ১৭ই সেপ্টেম্বর ঐ টাকা দিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। লাল ফিতার দাপটে অগ্রিম বেতন দূরের কথা, অনেকে সেপ্টেম্বরের বেতনই পান নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে মাছের দর বাঁধিয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহাতে খুচরা ক্রেতাদের খুব সুবিধা হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কারণ সরকার মাছের পাইকারী দর বাঁধিয়া

সাপ্তাহিক সংবাদ

দিবেন, খুচরা দর নয়। যে কোন মুহূর্তে এই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া জানান হয়।

২০শে অক্টোবর—আজ বিপুলসংখ্যক চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য লাদক এবং নেফা এই দুইটি অঞ্চলেই ভারতীয় এলাকার উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং নিছক সংখ্যার জোরে তাহারা আত্মরক্ষাকারী ভারতীয় সৈন্যগণকে বেকায়দায় ফেলিয়াছে।

ভারত-চীন সীমান্তে নেফা ও লাদক অঞ্চলে চীনাদের সহিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িবার সংগে সংগে কলিকাতার বড়বাজার ও অন্যান্য অংশে পাইকার ও আমদানিকারকদের মধ্যে মুনাফা লুটিবার ঝোঁক দেখা যায়।

২১শে অক্টোবর—লাদক ও নেফা এলাকায় আজও চীনা আক্রমণকারীদের সহিত প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের নিকট জানান যে, চীনা আক্রমণকারীরা নেফা এলাকায় নামকা চু নদীর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে। সৈন্য সংখ্যার জোরে ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সাহায্যপুষ্ট চীনাদের হাতে লাদক এলাকায় আরও দুইটি ঘাটির পতন হইয়াছে।

তুচ্ছ মতভেদ ভুলিয়া ভারতবাসীকে চীনা হামলার মোকাবিলা করিবার উদ্দেশে একতাবদ্ধ হইবার জন্য আজ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আহ্বান জানাইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই অক্টোবর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ কলম্বোতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভারত শান্তিপূর্ণভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু চীনের ধারণা অন্যরকম। তাহাদের বিশ্বাস যে, আগে এলাকা গ্রাস করিয়া পরে আলাপ-আলোচনা চালান উচিত।

হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর ন্যায় একটি নাৎসী প্রতিষ্ঠান গঠনের অপরাধে আজ লণ্ডনে চারজনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হইয়াছিল স্পিয়ারহেড। শ্রীকলিন জর্ডান ইহার নেতা।

১৬ই অক্টোবর—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী বি এন চক্রবর্তী গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জে দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণে ভারত আর রাজী নয়। কারণ তাহা হইলে ঐ উপ-মহাদেশে ফের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে—ফলে ভারত-পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবনে বিপর্যয় নামিয়া আসিবে।

আজ মস্কো রেডিও হইতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, রাশিয়া পৃথিবী হইতে ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ মাইল দূরবর্তী বৃহস্পতি গ্রহে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে এবং সেই তরঙ্গ বৃহস্পতিতে প্রতিহত হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

১৭ই অক্টোবর—চীন আজ ভারতবর্ষকে এই কথা বলিয়া দিয়াছে যে, কোনও বিমান চীনের আকাশসীমায় অনধিকার প্রবেশ করিলে চীন অবিলম্বে সেই বিমানকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করিবে কিংবা অবতরণ করিতে বাধ্য করিবে।

আবার পূর্ব পাকিস্তানে ময়মনসিং জেলায় আয়ুবশাহী তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে ২ জন সাংবাদিক সহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদে আরও প্রকাশ শত শত ছাত্রের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "রেঞ্জার—৫" মহাকাশযানকে চন্দ্রলোক অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন যে, আগামী রবিবার ইহা গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারিবে।

আজ দুইজন ইংরাজ এবং একজন মার্কিন জীব বিজ্ঞানীকে ১৯৬২ সালের জন্য চিকিৎসা বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার অর্পণ করা হইয়াছে। জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ইঁহারা যে গবেষণা করিয়াছেন তজ্জন্য ইঁহাদিগকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

১৯শে অক্টোবর—সিসিলির এক খবরে প্রকাশ—মৃত স্বামীকে সমাহিত করিবার জন্য যে কবর খনন করা হইয়াছিল, তাহাতেই অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া শ্রীমতী মারিয়া আগোস্টা প্রাণ হারাইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর শ্রীগোলাম ফারুক বলেন যে, সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যে অভূতপূর্ব বন্যা হইয়া গিয়াছে তাহাতে যে পরিমাণ শস্য গবাদি পশু ও বাসগৃহ নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য প্রায় ১৪০ কোটি টাকা।

২০শে অক্টোবর—গতকাল করাচীতে পাকিস্তান-নেপাল বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে এক দেশ হইতে অন্য দেশে মাল চলাচলে বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চুক্তি অনতিবিলম্বে বলবৎ হইবে এবং বর্তমানে ২ বৎসরের জন্য চলিবে।

পর্যবেক্ষকগণ আজ ওয়াশিংটনে বলেন যে, ভারত-চীন সীমান্তে কম্যুনিস্ট চীন ভারতীয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে বিরাট আকারে যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তজ্জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

২১শে অক্টোবর—নেপাল-তিব্বত সীমান্তের অতি নিকটে চীনা কম্যুনিস্টগণ কম্যুনিস্ট রীতিনীতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি মহল হইতে আজ বলা হয় যে, ভারত সীমান্তে চীনা কম্যুনিস্টদের নূতন আক্রমণ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করার কোন অভিপ্রায় ভারতের নাই। এই আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ চাহে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আসনটি কম্যুনিস্ট চীনকেই দেওয়া হউক।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা – ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৯শ বর্ষ

(৪০শ সংখ্যা হইতে ৫১শ সংখ্যা পর্যন্ত)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রদীপ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সময় সাহিত্য সমালোচনা—		৭৩
ট্রামেবাসে—		৭৬
চিত্র প্রদর্শনী—		৭৭
সাহিত্য সংবাদ—	বিদুর	৭৯
পুস্তক পরিচয়—		৮১
রঙ্গজগৎ—		৮৫
খেলার মাঠে—	একলব্য	৯৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৯৬

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপকুমার দাস

মডেল বি-৭৬৪ : ৪ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড, প্ল্যাষ্টিক ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারীতে চলে

দাম ২৬৫৲ টাকা

মডেল ইউ-৭৫৬ :
৩ নোভাল ভাল্‌ব, ২ ব্যাণ্ড, অল্প খরচে বড় সেটের কাজ দেয়। বেক্‌লন প্ল্যাষ্টিক ক্যাবিনেট

দাম ১২৫৲ টাকা

মডেল এ-৭৪৪ : ৪ ব্যাণ্ড, ৬ নোভাল ভাল্‌ব যাতে ৮ ভাল্‌বের কাজ হয়। ছাঁচে তৈরী ক্যাবিনেট **দাম ৪০৫৲ টাকা**

মডেল বি-৭৫৫ : ৫ নোভাল ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড, ভিনীয়র ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারী সেট

দাম ৩৫৫৲ টাকা

মডেল এ-৭৬৭ : ৭ ভাল্‌ব, ৮ ব্যাণ্ড, সুদৃশ্য বড় ক্যাবিনেট **দাম ৭২৫৲ টাকা**

সব দাম উৎপাদন শুল্কসমেত ; অন্যান্য কর আলাদা

GRA

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই
মাদ্রাজ • দিল্লী • পাটনা
বাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ

ন্যাশনাল একো

JWT/GRA-4226A

অতিমিহি, মিহি ও মাঝারি চাউল

জনসাধারণকে পূর্ব্বের দরে বিক্রয়

সম্প্রতি ধান্য ও চাউলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও প্রখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী মেসার্স পশুপতি দাস এন্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ জনসাধারণকে অতিমিহি, মিহি ও মাঝারী শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চাউল পূর্বেকার দরে বিক্রয় করিতেছেন। টেলিফোনে অর্ডার দিলে ইঁহারা কলিকাতার যে কোন স্থানে ক্রেতার রুচিমত চাউল কমবেশী যে কোন পরিমাণ পাঠাইয়া দেন। 'পোলাও'-এর জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত আসল সুগন্ধি বাসমতী ও 'পায়সের' জন্য কালজিরা এবং রোগীর পথ্যের বহু পুরাতন দাদখ[illegible] চাউলও এখানে পাওয়া যায়। বিক্রয় কেন্দ্র—৪৩/২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪। টেলিফোন: ২৪-[illegible]৮১, ৮২। টেলিগ্রাম: "রাইসকিংস"। প্রত্যেক শনিবার বেলা ২টার পর হইতে রবিবার সম্পূর্ণ দিবস দোকান বন্ধ থাকে।

রসবৈচিত্র্যে সুসমৃদ্ধ
তিনখানি নতুন বই

• আশাপূর্ণা দেবীর

অতলান্তিক

দাম—৫৲

• স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প

দাম—৪৲

• বিশ্বনাথ রায়ের

নানারঙ

চারখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস
সম্বলিত অভিনব ত্রৈমাসিক

চতুষ্পর্ণা

প্রথম সংখ্যা — দাম ৩৲

আশাপূর্ণা দেবী	:	জলছবি
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	:	দর্পণ
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	:	ঋণ
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	:	স্রোতস্বতী

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

(সি ৩৫৪১)

কনটেমপোরারীর বই

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

দাম ছ' টাকা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

...শ্রদ্ধা ও মমতার সঙ্গে শিল্পীসুলভ ভাষায় সমস্ত রচনাটি বিবৃত। লেখার গুণে রচনাটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, তৃপ্তিদায়ক মনে হয়েছে। পড়ে পাঠক তৃপ্তি ও আনন্দ দুই-ই একযোগে পাবেন বলে বিশ্বাস করি।

একটি ফুলকে ঘিরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

মিষ্টি গল্প রচনায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। তাঁর গল্পে আমরা আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত মানুষদের নিভৃত মনের সন্ধান পাই।

মন দেউলে দীপালোক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

দরদী কথাশিল্পী দক্ষিণারঞ্জন বসুর নবতম গল্প-সংকলন।

THE SWAMI VIVEKANANDA — A STUDY

BY MANOMOHAN GANGULY Rs. 3.00

স্বামীজীর সাহচর্যধন্য লেখক কর্তৃক লিখিত স্বামীজীর জীবন ও দর্শনের নির্ভীক আলোচনা।

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬৫, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩
সিটি অফিস: ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 3rd November, 1962.

৩০ বর্ষ ॥ ১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৭ কার্তিক ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

আমাদের নববর্ষ ও জাতীয় সংকল্প

ঊনত্রিশ বৎসর পূর্বে "দেশ" যখন **প্রথম আত্মপ্রকাশ** করে তখন বিদেশী **শাসনবন্ধন ছিন্ন** করার জন্য **সমগ্র** জাতি **কঠোর** সংগ্রামে সংকল্পবদ্ধ। আজ "দেশের" নববর্ষের সূচনায় স্বাধীন **ভারতবর্ষ** তার চেয়েও কঠিন সংগ্রামে **নিযুক্ত**, কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষার **সম্মুখীন**। স্বদেশ এবং সাহিত্য, উভয়ের সেবাতেই "দেশের" উদ্যম, উদ্যোগ-আয়োজন সমভাবে গত ঊনত্রিশ বৎসর-কাল নিয়োজিত হয়েছে। স্বদেশের ভালোমন্দ, জাতির উত্থান-পতনের সংগে 'দেশের' ভাগ্যও জড়িত, একথা বলা বাহুল্য। গত ঊনত্রিশ বৎসরে ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তার স্বাক্ষর বর্ষে বর্ষে "দেশ"ও যথাসাধ্য বহন করেছে। 'দেশ' কেবল সাহিত্য-দর্পণ নয়, সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে, দেশাত্ম-বোধের অনুশীলনেও বাংলা সাময়িক পত্র জগতে "দেশ" অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্ষে বর্ষে 'দেশের' আয়তন ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির প্রয়াসে 'দেশ' যে সাফল্য অর্জন করেছে তার মূলে আছে "দেশের" প্রতি পাঠকসাধারণের অকুণ্ঠ অনুরাগ **এবং** সতত উৎসাহশীল সমর্থন। আমাদের পাঠকসাধারণ ও পৃষ্ঠপোষক-**গণকে** সেজন্য সকৃতজ্ঞ অভিবাদন **জানাই**।

আমাদের নববর্ষে একান্তভাবে আমাদের নিজেদের কথা, পাঠকসাধারণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য আমাদের নূতন উদ্যোগ-আয়োজনের কথা সবিস্তারে আলোচনা করার উপযোগী সময় এখন **নয়। কারণ** স্বদেশ বিপন্ন, চৈনিক অভি-**যানের প্রচণ্ড** আঘাতে আমাদের **স্বাধীনতা**, নিরাপত্তা, শান্তি সব কিছুই **অচিন্তনীয় সংকটের সম্মুখীন**। বর্তমান **জরুরী** অবস্থায় একটিমাত্র চিন্তা, **একটিমাত্র সংকল্পই** সমগ্র জাতির **চেতনাকে এক লক্ষ্য**, অভিমুখে পরি-চালনা করছে। স্বাধীন দেশের জন-সাধারণের মন জাতীয় **সংকটমুহূর্তে** **এইভাবেই** সাড়া দেয়, সাড়া দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি **সমগ্র দেশে জরুরী** অবস্থা ঘোষণা করেছেন; জননিরাপত্তা ও নাগরিক শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনে ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স প্রবর্তিত হয়েছে। এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, স্বদেশরক্ষার জন্য দেশবাসীর সমস্ত শক্তি, দেশের যাবতীয় অর্থসামর্থ্য সামগ্রিক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করতে হবে। দেশরক্ষার জন্য অর্থ-সাহায্যের আবেদনে অল্প সময়ের মধ্যেই জনসাধারণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব, গভীর উৎসাহব্যঞ্জক। দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে দেশের তরুণ সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। এ-ও কম গৌরবের কথা নয়। চৈনিক অভিযান প্রতিহত এবং বিধ্বস্ত করার জন্য স্বদেশপ্রেমিক দেশ-বাসী মাত্রেই সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। এখন চাই দ্বিধা-দুর্বলতামুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব—সে নেতৃত্ব **যেমন রণাঙ্গনে** চাই তেমনি চাই রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা পরি-চালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি নীতি-নির্ধারণে।

এতদিন যেভাবে প্রধানত শ্রীনেহরু ও শ্রীকৃষ্ণ মেননের নেতৃত্বে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়েছে বর্তমান জরুরী অবস্থায় তার আমূল পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। প্রতিপক্ষ প্রবল, প্রতিপক্ষ বিশ্বাসঘাতক, প্রতিপক্ষ এখনও শান্তিপূর্ণ আপস-আলোচনার ছলনাময় প্রস্তাব প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায় সচেষ্ট। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা ইতিপূর্বে একাধিকবার এই-রকম ছলনায় ভুলে চীনাদের কূটনৈতিক ফাঁদে ধরা দিয়েছেন। তার ফলে ভারতের সামরিক প্রস্তুতি বিলম্বিত হয়েছে; তার ফলে বৃহৎ বিশ্বে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে, আক্রমণকারী চীনের প্রতি ভারতের মনোভাব সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সুযোগে সমগ্র **হিমালয় সীমান্ত** জুড়ে চীনারা অজস্র [illegible] **সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার** জন্য চীনা-দের বিপুল **সৈন্য-সমাবেশের** সংবাদ **পর্যন্ত ভারত সরকার যথাসময়ে** সংগ্রহ করেন নি কিম্বা **করতে সক্ষম** হন নি। আজ **যখন ভারত-রাষ্ট্রনায়কগণ** চৈনিক বিপদের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব উপলব্ধি করে জরুরী অবস্থায় জাতির **সমগ্র শক্তি** নিয়োগের সংকল্প গ্রহণ **করেছেন তখন** আশা করি, চৈনিক শান্তি-প্রস্তাবের প্রলোভনে তাঁরা আর কোনক্রমেই সামরিক শক্তিপ্রয়োগে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না।

আপৎকালে চৈনিক অভিযানের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এখন সর্বশক্তি নিয়োগে দৃঢ় সংকল্প, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ তার সুস্পষ্ট, সংশয়াতীত প্রমাণ চায় অতীতের ভুলভ্রান্তি, দ্বিধাদুর্বলতার প্রসঙ্গ আলোচনায় বিরত থাকা না হয় বর্তমানে সঙ্গত, কিন্তু পুরানো নেতৃত্বে জের যদি এখনও চলতে থাকে তা হলে চীনাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রনেতাদের প্রতিশ্রুতির মূল কী? আক্রমণকারী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদে গ্রহণ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধির ওকালতি বর্তমা[illegible] পরিস্থিতিতে যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি হতবুদ্ধিকর। শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্রনীতি গতিপ্রকৃতি ভারতের বন্ধুস্থানীয় যে-স[illegible] দেশ থেকে আমাদের জরুরী প্রয়োজন[illegible] মত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক[illegible] সম্ভব সে-সব দেশের আস্থা অর্জনে অক্ষম। গতানুগতিক নেহরু-নেতৃত্বে এই বিষম বোঝা ঝেড়ে না ফেলতে পারলে কেবল বড় বড় কথা, লম্বা লম্বা প্রতি-শ্রুতি ও সংকল্প ঘোষণা দ্বারা আমাদে[illegible] প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করা সম্ভ[illegible] মনে হয় না।

স্বদেশরক্ষার সংকল্প পূরণ কর[illegible] হলে ঘরে ও বাইরে সর্বত্রই নূতন নেতৃ[illegible] নূতন নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন। জাতী[illegible] সংকট প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রী[illegible] সরকার আইনবলে জরুরী **ক্ষম**[illegible] প্রয়োগের অধিকার গ্রহণ করেছেন, ভ[illegible] কথা। কিন্তু সে-ক্ষমতা প্রয়োগের জ[illegible] সুদৃঢ় নেতৃত্ব চাই। দেশপ্রেমী জ[illegible] সাধারণ সেই সুদৃঢ় নেতৃত্বের সুনিশ্চি[illegible] পরিচয় পাওয়ার জন্য **অধীরভা**[illegible] আগ্রহী। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা [illegible] মুহূর্তে হাতে-কলমে প্রমাণ করুন [illegible] ও বাইরে সর্বপ্রকার শত্রু দমনের [illegible] কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনের সংক[illegible] তাঁরা দেশপ্রেমী জনসাধারণের **পি**[illegible] পড়ে নেই।

চীনের প্রিয় খাদ্য

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

কে বেশি ভাই-ভাই

হিন্দী রুশী ভাই ভাই

রুশী চীনী ভাই-ভাই

Kutty

নেফা সঙ্কটের জন্য যারা দায়ী মহতাব এবং ত্যাগী চান যে তাদের শাস্তি হ'ক।

নেফার নরমুণ্ড শিকারী

✻ বৈদেশিকী ✻

আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নি, এমন কি কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারত সরকার এখনো কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করেন নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিজের ভাষাতেই প্রকাশ, যে কোনো আংশিক অর্থে নয়, যুদ্ধের পুরোপুরি অর্থেই কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের যুদ্ধ বেধেছে। বস্তুত তা না হলে সারা দেশের জন্য "জরুরী অবস্থা—এমারজেন্সি"—ঘোষণা করা এবং অর্ডিনান্স করে বৃটিশ আমলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের পুনরুজ্জীবন আবশ্যক বা সংগত হোত না।

কিন্তু তাহলে আনুষ্ঠানিক ভাবে কম্যুনিস্ট চীন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই বা কেন হচ্ছে না? এই অবস্থাটা কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। দেশের লোককে সর্বপ্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হচ্ছে। অথচ যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে না এবং যাদের সঙ্গে যুদ্ধ তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করা হচ্ছে না। এই অবস্থায় সকলের মন সরকারের নীতিগত লক্ষ্য এবং মানসিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবে না। অতীতে কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে ব্যবহারে ভারত সরকারের নীতি পরিচালনায় অপরিণামদর্শিতা, দৌর্বল্য, আহম্মকি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত আহম্মকির চেয়েও গর্হিত আরো কিছুর পরিচয় পাওয়া গেছে। সেই জন্যই জনসাধারণের চোখের সামনে থেকে সবরকম অস্পষ্টতা যতদূর সম্ভব দূর করা বিশেষভাবে আবশ্যক। সরকার আজ বলছেন "সাজো সাজো", কাল আবার কী ধুয়া তুলবেন কে জানে।

অনাবশ্যক যুদ্ধ কেউ চায় না, ভারতবাসীরা তো চায়ই না। কিন্তু যুদ্ধ যখন করতে হচ্ছে তখন কেন যুদ্ধ করছি, কী লাভ না করা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় যুদ্ধ ত্যাগ করব না—এই মৌলিক ব্যাপারে যথা সম্ভব সুস্পষ্টতা আবশ্যক। ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতা সরকার গ্রহণ করলেন, অথচ যুদ্ধ ঘোষিত হ'ল না এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যও এমন ভাষায় ঘোষিত হল না, যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, কোন ভুল বুঝবার বা ভুল বুঝাবার অবসর নেই—এ অবস্থাটা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এতে জাতির মনে সর্বস্বপণ করে দাঁড়াবার প্রেরণা আসতে পারে না। সুতরাং, অবিলম্বে "যুদ্ধ ঘোষণা" এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্য—"ওয়ার এমস্"ও সুস্পষ্ট জ্বলন্ত ভাষায় ঘোষণা করা আবশ্যক।

অতীতে দুই মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেছে "ওয়ার এম্‌স্‌" ঘোষণার দ্বারা মানুষ প্রতারিত হয়েছে। যে সব বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল, বস্তুত সেগুলি লাভ হয় নি, অথবা সামান্যই লাভ হয়েছে। হয়ত যুদ্ধ এমনই একটা ব্যাপার যার ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার নিয়ন্ত্রণের শক্তি মানুষের নেই। যারা বড়ো উদ্দেশ্যের কথা বলেছে তারা যে লোককে প্রতারিত করার জন্যই সব সময়ে বলেছে তা নয়, হয়ত মানুষের সীমাবদ্ধ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং শক্তি ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও—অতীতে "প্রতারিত" হওয়া সত্ত্বেও—মানুষের কাছে যখনই যুদ্ধের আহ্বান এসেছে তখনই তা কোনো বড়ো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে। কেবল স্বার্থের নামে সাময়িকভাবে কোনো বড়ো জাতির মনে যুদ্ধের প্রেরণা সঞ্চারিত করা যায় না। যার উদ্দেশ্য ভালো নয়, তাকেও এমন কোনো উদ্দেশ্যের বুলি আওড়াতে হয় যেটা যেভাবেই হোক ঠিক ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। মানুষকে প্রতারিত করতে হলেও বড়ো কিছুর নাম নিতে হয়। বার বার প্রতারিত হয়েও যে মানুষ বড়ো কিছুর নাম শুনলে উদ্বুদ্ধ হয় এইটাই মনুষ্যত্ব এবং মানবজাতির ভরসা।

কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এই যুদ্ধ আমরা কেন করছি, কী বা কী কী উদ্দেশ্য-সাধিত হলে আমরা ক্ষান্ত হবো—এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা চাই। চীনারা আমাদের সীমানা লঙ্ঘন করেছে, তাদের বহিষ্কারই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য-সাধিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হব না—মাত্র এইটুকু উদ্দেশ্য ঘোষণার দ্বারা এই জাতির মধ্যে পূর্ণ প্রেরণা সঞ্চার করা যাবে বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এটুকুও তো সুস্পষ্ট নয়, যুদ্ধবিরতির জন্য চীনাদের ভারতভূমি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাওয়া আবশ্যক, একথা পর্যন্ত এখনো বলা হচ্ছে না। সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে চীনারা যতদূর এগিয়েছিল ততদূর পর্যন্ত তারা পিছিয়ে গেলেই আমরা আপস নিষ্পত্তির আলোচনায় যোগ দিতে রাজী আছি—এখনও এই ধারণাই দেশবাসী এবং জগৎ-বাসীদের দেওয়া হচ্ছে। এইটুকুর জন্য সারা দেশব্যাপী "এমারজেনসি" ঘোষণা? "ডিফেন্স্‌ অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টকে" জাগিয়ে তোলা? এই বিরাট জাতিকে সর্বস্বপণ করে রুখে দাঁড়াতে বলা?

আর তার সঙ্গে কাঁদুনি—চীনারা আমাদের এমন করে ঠকালো, যাদের সঙ্গে আমরা এতো বন্ধুর মতো ব্যবহার করলাম তারাই আমাদের এমন করে আঘাত করল! এই কাঁদুনির মতো অশ্রদ্ধেয়, ঘৃণ্য আর কিছু হতে পারে না। পরস্বপহারী ঘাতকের দুষ্কর্মকে মেনে নিয়ে তার প্রতি বন্ধুত্ব দেখিয়েছি, তার পরিবর্তে যে অল্প সময়ের জন্যও বন্ধুতা পাই নি—ধর্মের দিক থেকে এইটাই আমাদের বাঁচোয়া। আমাদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের ভার ভবিষ্যদ্বংশীয়-দের উপর ফেলে রেখে যাবার সুযোগ যে চীনারা আমাদের দেয় নি, সেইটাই আমাদের প্রতি চীনাদের একমাত্র "বন্ধুত্বের" কাজ হয়েছে বলে মনে করা উচিত।

ভারত সরকারের 'বন্ধুত্বের' সাহায্যে কম্যুনিস্ট চীনা সরকার সীমানার সমস্যা যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছে সেই পরি-প্রেক্ষিতের ভিতরে ভারত-চীন সীমানা সমস্যার সমাধানই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, আমাদের অন্য কোনো "ওয়ার এম্‌" নেই—এই যদি হয় তাহলে এই যুদ্ধের সম্পর্কে জাতির মনে কোনো মহৎ প্রেরণার অনুভূতি সম্ভব কিনা সন্দেহ। যদি সেরূপ প্রেরণা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে তার ভিত্তি উদারতর হওয়া আবশ্যক। কেবল ভারতের সীমানার প্রশ্ন নয়, তিব্বতের স্বাধীনতার পুনরু-জ্জীবনের কথাও আমাদের "ওয়ার এম"-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে ভাবতে হবে। কম্যুনিস্ট চীন যদি তিব্বতের জাতীয় স্বাধীনতার বিনাশকারী না হোত, যদি চীনা কম্যুনিস্ট সরকারকে বন্ধু বলে ভাবার পক্ষে কোনো নৈতিক বাধা না থাকত, তবে সীমানার জন্য লড়াইয়ের প্রশ্ন হয়ত উঠতই না, চীনাদের সঙ্গে বিপদটাকে হালকা করে দেখাবার জন্য এবং ভারত সরকারের অসতর্কতার দোষ-ক্ষালণের জন্য পণ্ডিত নেহরু এক সময়ে যেমন বলতেন "এ সব দুর্গম জায়গায় একটা তৃণ পর্যন্ত জন্মায় না", দেশের লোকও তাই মেনে নিয়ে এই ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতো না, বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যাহোক একটা মিটমাট হয়ে গেলেই লোক খুশী হোত, তাতে চীনারা কিছু জমি পেলেও লোকে ভ্রূক্ষেপ করত না।

কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনাদের সঙ্গে যে-বিবাদ বেধেছে সেটা কেবল জমির ব্যাপার নয়, কেবল মানের ব্যাপারও নয়, তার চেয়েও গুরুতর—ন্যায় অন্যায়, ধর্মাধর্মের ব্যাপারও এর মধ্যে আছে। সেই জন্য এই প্রশ্ন, এই বিবাদ যে গণ্ডীর মধ্যে চীনারা এনে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে সেই গণ্ডীটাই আগে ভাঙ্গা দরকার। আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল লাদাকে এবং "নেফা"য় চীনাদের এগুনো বন্ধ করা নয়, তিব্বতের স্বাধীনতাও আমাদের অন্যতম "ওয়ার এম্‌" বলে ঘোষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তা না হলে এই যুদ্ধের ব্যাপারে দেশের প্রাণে কোনো মহৎ প্রেরণার অনুভূতি সম্ভব নয়।

তিব্বতের স্বাধীনতার প্রশ্ন এখন নিরর্থক, সে-সব চুকে-বুকে গেছে, ভারত সরকার নিজেই চীনের তিব্বতবিজয় এবং তিব্বতে চীনা কম্যুনিস্টদের কর্তৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন, সুতরাং সে প্রশ্ন এখন তোলা নিষ্ফল। বিশেষ করে ভারত সরকারের মুখে সেটা মানাবে না—এরূপ কথা বলার অর্থ পশুবলের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া এবং এই সিদ্ধান্ত করা যে, কেউ যদি ভয়, দুর্বলতা, যথা ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার লোভের বশীভূত হয়ে কোনো প্রবল অন্যায়কারীর দুষ্কর্মকে একবার সমর্থন করে থাকে তবে সে বিষয়ে তার আর কিছু বলা বা করার অধিকার নেই—এমন কি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার অধিকারও তার নেই। এরূপ যুক্তির কোনো সারবত্তা নেই, এরূপ যুক্তি কেবল কাপুরুষতারই সহায়ক হতে পারে।

ইতিহাসেও এই যুক্তির কোনো সমর্থন নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত চেম্বারলেনের নেতৃত্বাধীন বৃটিশ গবর্নমেণ্ট হিটলারের অনেক দুষ্কর্ম মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বৃটেন যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন সে-সব মেনে-নেওয়া বাতিল হয়ে গেল। সেগুলো বাতিল করার জন্য' বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পরিবর্তন আবশ্যক হয়নি। এমন নয় যে চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হয়ে সেগুলি বাতিল

করেছিলেন। যে-চেম্বারলেন মিউনিক চুক্তি করেছিলেন তিনিই যখন যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তখন তাঁরই কৃত মিউনিক চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। বৃটিশ গবর্নমেণ্টের "ওয়ার এমস্" রচনা করার সময়ে চেম্বারলেন কর্তৃক স্বীকৃত মিউনিক চুক্তির সিদ্ধান্ত-গুলিকে বাঁচাবার প্রশ্ন কখনো ওঠেনি।

বর্তমান ক্ষেত্রে ভারত সরকারের দিক থেকে তিব্বতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে জিইয়ে তোলার পক্ষে কোনো নৈতিক বাধা তো নেই-ই, কোনো "ফরম্যাল" বাধাও নেই। তিব্বত সম্পর্কে ভারত সরকার এবং কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের মধ্যে যে-চুক্তি হয় সেটা মেয়াদী চুক্তি ছিল। সেই চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরে সে চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। চীনারা আবার চুক্তি করতে চেয়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার তাতে রাজী হন নি। সুতরাং এখন আবার তিব্বতের স্বাধীনতার প্রশ্ন তোলার পক্ষে ভারত সরকারের কোনো বাধা অনুভব করার কারণ নেই, বিশেষত যখন ভারতের জাতীয় মন কোনো দিনই ভারত সরকার কর্তৃক তিব্বতে চীনা কর্তৃত্বের স্বীকৃতি ও অনুমোদনের নীতিতে সায় দিতে পারে নি। বাধ্য হয়ে স্বীকার করাকে যদি-বা ক্ষমা করা যেতো "পঞ্চ-শীলের" মন্ত্র পড়ে তার যে অনুমোদন করা হয়েছিল তার লজ্জা ভারতের মন থেকে কোনো দিন যাবে না।

ভারত-চীন বিবাদটা যদি কেবলমাত্র একটা সীমানা সংক্রান্ত বিতর্ক হয় তবে জগতের কানে ভারতের বক্তব্যে কোনো মহৎ সুর ধ্বনিত হবে না। দুটো বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ, সুতরাং ব্যাপারটা শান্তিভঙ্গের দিক থেকে গুরুতর, কিন্তু এই পর্যন্ত হলে এর মধ্যে কোনো বৃহৎ নৈতিক গুরুত্বের কথা থাকে না। জগতের লোক ধরে নেবে এবং অনেকে ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে যে, কোনো পক্ষের কথাই সম্পূর্ণ ঠিক নয়, দু-পক্ষই সত্য-মিথ্যা বলছে—তারই মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে বিবাদটা মিটিয়ে ফেলা উচিত। এ অবস্থায় যারা প্রচারকার্যে বেশী পটু তারাই একটু বেশী সুবিধা করতে পারবে। প্রচারপটুত্বে পিকিং যে নয়াদিল্লিকে হারিয়ে দিচ্ছে তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে এই বিবাদকে যদি ভারতবর্ষ একটা উচ্চতর স্তরে তুলতে না পারে তবে সে হারবে এবং সে হার কেবল সীমানা, কেবল জমি সংক্রান্ত হার হবে না। এই বিবাদকে যদি উচ্চতর স্তরে তুলতে হয়, আমরা যদি চাই যে, বিশ্ববাসীর চোখে এই বিবাদ নৈতিক গুরুত্ব লাভ করুক, তা হলে আমাদের দৃষ্টি লাদাকে, "নেফা"য় আবদ্ধ রাখলে চলবে না, তিব্বতের স্বাধীনতা এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতে হবে।

২১-১০-৬২

১০ম মুদ্রণ

প্রকাশিত হল

*

দাম

ছ টাকা

ভারত প্রেমকথা ॥ সুবোধ ঘোষ

'ভারত প্রেমকথার অভাবনীয় সাফল্যের মুদ্রণ-পরিসংখ্যান

প্রথম	মুদ্রণ, বৈশাখ	১৩৬২,	২২০০
দ্বিতীয়	মুদ্রণ, ভাদ্র	১৩৬২,	৩২০০
তৃতীয়	মুদ্রণ, বৈশাখ	১৩৬৩,	৪২০০
চতুর্থ	মুদ্রণ, পৌষ	১৩৬৩.	৫২০০
পঞ্চম	মুদ্রণ. মাঘ	১৩৬৪,	৩২০০
ষষ্ঠ	মুদ্রণ, মাঘ	১৩৬৫,	৩৩০০
সপ্তম	মুদ্রণ. মাঘ	১৩৬৬,	৩৩০০
অষ্টম	মুদ্রণ. মাঘ	১৩৬৭.	৩৩০০
নবম	মুদ্রণ, মাঘ	১৩৬৮,	৩২০০
দশম	মুদ্রণ, আশ্বিন	১৩৬৯,	৫২০০

১০টি মুদ্রণে মোট ৩৬,৩০০ কপি মুদ্রিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

অমানিশা

সুবোধ ঘোষ

ডাক্তার বিভূতিবাবু বলেছেন, না, কোনমতেই না; রাত নটার পর আর এক মিনিটও জেগে বসে থাকা উচিত হবে না। চুপচাপ, একেবারে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঘুম যত বেশি হবে, শরীরের তত বেশি উপকার হবে।

এবাড়ির রোগিণী মেয়ে দেবিকাও জানে, বিভূতি ডাক্তারের নির্দেশ তুচ্ছ করবার মত শক্তি তার এই রক্তহীন শরীরের হাড়মাসে নেই। একদিন সত্যিই রাত একটা পর্যন্ত বসে পেরেছিল দেবিকা; কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে তিনবার জ্ঞান হারাতে হয়েছিল। একবার শ্বাসকষ্ট হয়ে, একবার বমি করে আর একবার মাথা ঘুরে মূর্ছিত হতে হয়েছিল।

দেবিকার শরীরের এই অবস্থাটাই এবাড়ির প্রাণের সব চেয়ে বড় উদ্বেগ। শুধু বিভূতি ডাক্তার নয়, কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরাও সবাই একবাক্যে চ[illegible] না দিয়ে দেবুবাবুকে বলেই দিয়েছেন, এখন শুধু নিয়ম আর সাবধানতাই আপনার মেয়ের প্রাণ। একটু এদিক-ওদিক হলেই আপনার মেয়ের জীবন বিপন্ন হবে।

একথা দেবিকারও অজানা নয়। পঁচিশ বছর বয়সের শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে অনুমানেও অনেক কিছুই বুঝে নেওয়া সম্ভব। বুঝে নিতে দেরি হয়নি দেবিকার, বাবা আর মা হেসে-হেসে যা-ই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, এই সত্যটি বুঝতে একটুও অসুবিধে নেই যে, আর দেরি নেই। যেমন দেবিকার সাধের সেতারের তারে মরচে ধরেছে, তেমনই দেবিকার এই শরীরের পাঁজরের হাড়েও মরচে ধরেছে। যে-কোন মুহূর্তে ঠুং করে একটি ব্যথার নিঃশ্বাস

ছেড়েই দেবিকার রুগ্ন প্রাণের তার ছিঁড়ে যাবে।

দু'বছর আগেও দেবিকার মুখের দিকে তাকালে কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সাধ্য ছিল না যে, এই মেয়ের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য একটি বছরের মধ্যেই একটা করুণ রুগ্নতার চেহারা হয়ে উঠবে। সেই টানা-টানা চোখের তারার কালো নিবিড়তা ফিকে হয়ে গিয়েছে। গলার শিরাগুলি যেন ছেঁড়া জালের সুতোর মত এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। হাতের কব্জির হাড় কাঠের গাঁটের মত উঁচু, তাই সোনার সরু বালাটা গড়িয়ে পড়ে না গিয়ে কোনমতে ঠেকে আছে।

মেঘলা দিনে আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পেত এই মেয়ে। সেই যখন সাত বছর বয়স ছিল, তখন থেকেই আকাশের বিদ্যুৎকে বড় ভয় করতো দেবিকা। বিদ্যুৎ চমকালেই মেয়ের বুক চমকে উঠতো, সারা মুখে রক্তের ঝলকের আভা রাঙা হয়ে ফুটে উঠতো। আজও, এখনও বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে দেবিকা। কিন্তু দেবিকার মুখ আর এক-ঝলক রক্তের আভার ছোঁয়া লেগে রাঙা হয়ে ওঠে না। ওই শরীরে যেটুকু রক্ত আজও আছে, সে রক্তের পক্ষে ঝলক দিয়ে উথলে ওঠবার, কিংবা মুখ রাঙা করে দেবার শক্তি নেই।

কিসের অসুখ? এই প্রশ্নটার কোন সহজ উত্তর থাকলে দেবিকার বাবা মোহিত বাবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন; আর দেবিকার মা'ও বোধহয় তাঁর আড়ালের কান্নাকাটি একটু কম করে দিতে পারতেন। নানা ডাক্তারের অভিমতে অসুখটা এখন একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, কিসের অসুখ নয়? দেবিকার এই পঁচিশ বছর বয়সের শরীরের সবই যেন ভয়ানক এক অভিশাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ। ডান পাঁজরের একপাশে সব সময় একটা ব্যথা। ক্ষুধা হয় না, সামান্য তাপের জ্বর সব সময় গায়ে লেগে আছে। ঘুম কম। যখন তখন হাঁপ ধরে; পিঠে ফিক ব্যথা দেখা দেয়। তার ওপর রক্তাল্পতা; হাত-পা প্রায়ই ঠান্ডা হয়ে যায়। এই তো সেই মেয়ে; মোহিতবাবুর মেয়ে সেই দেবিকা, যে-মেয়ে কোনদিন রঙীন নখ-পালিশ ছোঁয়নি; তবু কলেজের বান্ধবীরা সন্দেহ করতো, দেবিকা রোজই হাতের দশ আঙুলের নখে রঙীন পালিশ লাগায়।

আজ ঘরের ভিতরের চেয়ার ছেড়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসতে হলে দেবিকাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কেউ একজন সামনে না থাকলে, এতটা নড়াচড়া করতে সাহস করে না দেবিকা। চেঁচিয়ে কাউকে ডাক দেওয়াও সম্ভব নয়, বিভূতি ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই চপ করে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না মা এসে ঘরে ঢোকেন। শুধু তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দেবিকা। —আমি এখন বাইরের বারান্দায় একটু বসবো, মা। আমার হাতটা ধর।

এই বারান্দায় বসলেই আজও দেখতে পাওয়া যাবে, সামনেই ব্যাডমিণ্টনের লন। সেই লন এখন জংলী আগাছায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মোহিতবাবুও আজকাল আর মালীটাকে বলেন না যে, ব্যাডমিণ্টন লনটাকে একটু পরিষ্কার করে রাখুক। হ্যাঁ, কিছু-দিন আগে একবার বলেছিলেন; কিন্তু বলতে গিয়েই মোহিতবাবুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। গলার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। আর কী হবে ওই ছাই ব্যাডমিণ্টনের লন পরিষ্কার করে? যে মেয়ে দু বছর আগেও ছুটোছুটি করে আর হেসে-চেঁচিয়ে ওই লনে রায়সাহেবের বউ নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে, সে মেয়ে আজ বারান্দার সিঁড়িতে একটানা দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মোহিতবাবুর বুকের ভিতরে একটা করুণ নিঃশ্বাস যেন কথা বলে বলে ছটফট করে—আর কি কোন-দিনও মেয়েটাকে ব্যাডমিণ্টন খেলতে দেখতে পাওয়া যাবে?

দীপ নিভছে। মোহিতবাবু জানেন, দেবিকার মা জয়াও জানেন, এই অসুখটা একটা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর অসুখ। একটা নাম-হীন অভিশাপ। কোন ঠিক নেই। যে-কোন মুহূর্তে একটি ভয়ানক ফুৎকার হেনে দীপ নিভিয়ে দেবে। তবু আশা ছেড়ে দিতে প্রাণ চায় না। দেবিকা আবার সুস্থ হবে, বেঁচে থাকবে; এটা আশা করা একটা অসম্ভবকে বিশ্বাস করা মাত্র। কিন্তু অনেক সময় অসম্ভবকেও তো সম্ভব হতে দেখা গিয়েছে। চারুবাবুর মা, সত্তর বছর বয়সের বুড়ো মানুষটি, অসুখে ভুগে ভুগে হাড়-সার হয়ে গিয়েছিলেন, এক মাস ধরে যাঁর বুকটা শুধু ধুকধুক করতো, জীবনের আর কোন লক্ষণ ছিল না, সেই মানুষও তো সেরে উঠলো। চারুবাবুর মায়ের হিক্কা দেখে এই বিভূতি ডাক্তারই একেবারে পরিষ্কার ভাষায় বলে-ছিলেন—আর বড় জোর এক ঘণ্টা। কিন্তু তারপর, প্রায় সাত মাস পরে, এই পাঁচ দিন হলো চারুবাবুর মা কাশী বেড়াতে গিয়েছেন।

তাই আশা ছেড়ে দিতে পারেননি মোহিত বাবু আর জয়া, যদিও আশা করবার মত কোন কারণ খুঁজে পাননি, কোন লক্ষণও দেখতে পাননি। আলমারির একটা তাক ভরে এক্স-রে প্লেটগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। প্রেসক্রিপসনের ফাইলগুলি এক-একটা বোঝা হয়ে আলমারির আর-একটা তাক ভরে রেখেছে। সেই সঙ্গে এই বাড়ির মন আর প্রাণের উপরেও একটা করুণ আতঙ্কের ভার চেপে রয়েছে।

ঠিক কথা; শুধু নিয়ম আর সাবধানতা এখন দেবিকার প্রাণ। ওষুধ খেতে হয়, কিন্তু দেবিকার মা জয়া কতবার নিজের চোখেই দেখেছেন, ওষুধ খেতে গিয়ে দেবিকার সাদা ও শুকনো ঠোঁটে একটা শীর্ণ হাসির রেখা শিউরে উঠেছে। দেবিকা নিজেও জানে, দীপ নিভছে। পঁচিশ বছর বয়সের মেয়ের মুখের এই হাসি যেন এত-দিনের এই জীবনটারই উপর একটা ঠাট্টার হাসি। একটা অভিমানও বটে। অসুখের প্রথম বছরটা দেবিকার চোখে-মুখে যে ভয় ঘনিয়ে রেখেছিল, সেই ভয়ের কোন চিহ্ন আজ আর নেই। সেই ভয়টাই আজ একটা ঠাট্টার হাসি হয়ে উঠেছে। দেবিকা জানে, সেই অবধারিত লগ্নটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বিভূতি ডাক্তারের ওষুধ, আর নিয়ম ও সাবধানতা বলতে গেলে একটা মিথ্যে চেষ্টার ব্রত মাত্র।

দেবিকার স্বামী সুমন্ত চৌধুরীও জানে, দীপ নিভছে। সুমন্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিভূতি ডাক্তার যে-সব কথা বলেছেন, তার মধ্যে মিথ্যে আশার কোন ছল-ভাষণ ছিল না। বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবাদী মানুষ, যদিও খুব নরম মনের মানুষ। দেবিকার বাঁচবার আশা নেই, কথাটা সুমন্তকে বলতে গিয়ে বিভূতি ডাক্তারের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠেছিল।

আজ নয়, দেবিকার সঙ্গে সুমন্ত চৌধুরীর বিয়ে হবার প্রায় এক বছর আগেই সত্য কথাটা খোলাখুলি ভাষায় সুমন্তকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার। সুমন্ত বিভূতি ডাক্তারের জেঠতুতো দাদার ছেলে; সুতরাং সুমন্ত ছেলেটির জীবনের জন্য বিভূতি কাকার মনে একটা মায়ার ভাবও ছিল। বিভূতি ডাক্তার বরং চেষ্টাই করে-ছিলেন, মোহিতবাবুর মেয়ে দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর যেন বিয়ে না হয়। তাঁর মতে, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। সুমন্তর পক্ষে দেবিকাকে বিয়ে করা অর্থ সুমন্তর জীবনে মিছিমিছি একটা শোকের আঘাত আহ্বান করা।

যেমন বিভূতি ডাক্তারের আপত্তি ছিল, তেমনই দেবিকার বাবা আর মা'রও আপত্তি ছিল। তাঁরাও বুঝেছিলেন, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না। কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত মেয়ের ইচ্ছা আর সুমন্তরও ইচ্ছার কাছে হার মেনে নিলেন।

ত্রিশ বছর বয়স, সুমন্ত চৌধুরীও কোন-দিন কল্পনা করতে পারেনি যে, একদিন গিরিডিতে বেড়াতে এসে একটা অদ্ভুত ঘটনার মায়ায় পড়তে হবে, আর মোহিত-বাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলতে হবে। মোহিতবাবুর সঙ্গেও সুমন্ত চৌধুরীর একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে। মোহিত-বাবুর স্ত্রী জয়া হলেন সুমন্তর লক্ষ্মী মামীর দিদি। লক্ষ্মী মামীকে গিরিডিতে

পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সুমন্ত। দুটো দিন গিরিডির বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। তারপর আবার নিজের কাজের জায়গায় ফিরে আসতে হয়েছিল।

জায়গাটা হলো সিজুয়া কলিয়ারী: গিরিডি যেতে বেশি সময় লাগে না। সিজুয়া কলিয়ারীর ম্যানেজার সুমন্ত চৌধুরী কিন্তু সিজুয়াতে ফিরে এসেও দুদিনের গিরিডির জীবনের স্মৃতিটাকে ভুলে যেতে পারেনি। সব সময় মনে পড়েছে, লক্ষ্মী মামীর দিদির মেয়ে দেবিকা এখন সেই রঙীন আলোয়ানটি গায়ে জড়িয়ে, বারান্দার চেয়ারে বসে সামনের লনের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ডাকছে, লনের জংলী আগাছার উপর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, চারদিকে সকালবেলার রোদ ঝলমল করছে; আর দেবিকার চোখের কালো তারা দুটো যেন করুণ বিষাদে সাদা হয়ে গিয়ে একটি আসন্ন অন্তিমের পায়ের শব্দ শুনছে।

দেবিকাকে দেখলে একটা সাদা মোমের পুতুল বলে মনে হয়। কিন্তু কী সুন্দর মুখটা। সেই রক্তহীন সাদা মুখেও যেন অদ্ভুত এক মায়ার প্রলেপ মাখানো আছে। প্রথম আলাপের পরেই একটি কথা বলেছিল দেবিকা, যদি সময় আর সুযোগ পান; আর যদি ইচ্ছে থাকে, তবে মাঝে মাঝে আসবেন।

এই সামান্য অনুরোধের ভাষাটা যেন সত্যিই ক্ষণিকের রক্তচ্ছটা হয়ে দেবিকার মুখ রাঙা করে দিয়েছিল। সেদিন বিভূতি ডাক্তারও দেবিকাকে একবার দেখতে এসেছিলেন। আশ্চর্য হয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার। কী ব্যাপার, দেবিকার চেহারা এই একদিনের মধ্যে এত ভাল হয়ে গেল কি করে? মুখটি তো খুবই ভাল দেখাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। রক্তশূন্যতার সাদাটে হয়ে গিয়েছে যে মেয়ের মুখ, সেই মেয়ের মুখে যেন রক্তাভ স্বাস্থ্যের সঞ্চার দেখতে পেয়েছিলেন বিভূতি ডাক্তার; তাই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

সিজুয়া কলিয়ারী থেকে গিরিডি, সুমন্ত চৌধুরীর গাড়ির পক্ষে গিরিডি পৌঁছাতে তিন ঘণ্টাও সময় লাগে না। তাই, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার গিরিডি এসেছে সুমন্ত।

মোহিতবাবু আর জয়ারও বুঝতে দেরি হয়নি, কেন আসে সুমন্ত। কিন্তু খুশি না হয়ে বরং বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন। ঘটনাকে তাঁদের মেয়ের জীবনে নিয়তির একটা নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলেও মনে করেছিলেন। শুধু নিজেদের মেয়ের জন্যে নয়, সুমন্তর কথাটাও তাঁরা ভেবেছিলেন। ছেলেটা কেন এই ভুল করছে? দেবিকার সংগে ভালবাসার সম্পর্ক নিবিড় করে তুলে কী লাভ হবে সুমন্তর? দেবিকাকে তো বিয়ে করতে পারবে না সুমন্ত। দেবিকাও সুমন্তকে বিয়ে করতে চাইবে না।

কিন্তু মোহিতবাবু আর জয়া দুজনেই

একদিন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন, সুমন্ত সত্যিই দেবিকাকে বিয়ে করতে চায়। কথাটা বলেছিলেন, বিভূতি ডাক্তার।

হ্যাঁ, সব জেনে শুনেই দেবিকাকে বিয়ে করতে চাইছে সুমন্ত। দেবিকার প্রাণটা যে একটা নিবু-নিবু দীপের প্রাণ, জেনেও সুমন্তর কোন আপত্তি নেই।

মেয়েকেও একেবারে স্পষ্ট করে প্রশ্ন করেছিলেন মোহিতবাবু, তোমারও কি এই ইচ্ছে? হ্যাঁ, বলে দিতে একটুও দেরি করেনি দেবিকা।

—কিন্তু ভেবে দেখ। এ বিয়ের কোন মানে হয় না।

দেবিকা—সব ভেবে দেখেছি বলেই বলছি, তোমরা আপত্তি করো না।

সবই ভেবেছিল সুমন্ত আর দেবিকা, দুজনেই। সত্যি কথা, খুব বেশি করে ভাবলে বুঝতে অসুবিধে থাকে না যে, এ বিয়ের সত্যিই সে-রকম কোন মানে হয় না, যে-রকম মানে পৃথিবীর অন্য দুটি নরনারীর বিয়েতে থাকে। সুমন্তের জীবনে দেবিকা শুধু নামেই স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু জীবনের দরকারে স্ত্রী হতে পারে না। সে সামর্থ্য ও শক্তি দেবিকার এই রুগ্ন জীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরে নেই। কিন্তু সেজন্য একটুও ব্যথিত নয় সুমন্ত। সুমন্তর ভালবাসায় সেই দুঃসাহস আছে, দেবিকার শুধু হাত ধরেই ধন্য হয়ে আর সুখী হয়ে থাকতে পারবে সুমন্ত।

সুমন্তকেও একটা কথা বলে দিতে দেবিকার এই রোগার্ত বুকের নিঃশ্বাসেও একটুও অসুবিধে ঠেকেনি। —আমি তো নিভে যেতেই চলেছি; দিনও ফুরিয়ে আসছে। আমি তোমাকে শেষে একটা দুঃখ দিয়েই চলে যাব। কিন্তু তুমি সে দুঃখ ভুলে যেও।

সুমন্ত—তার মানে?

দেবিকা—তুমি আবার বিয়ে করো।

সুমন্ত হাসে—বাজে কথা।

বাজে কথা বটে। কিন্তু সুমন্ত আর দেবিকা দুজনেরই মনের মধ্যে কোন কপটতা নেই। অস্বীকার করবার উপায় নেই, সুমন্তর জীবনটা হঠাৎ একদিন একলা হয়ে যাবে; গিরিডির এই বাড়িতে এসে এই বারান্দার এই চেয়ারে দেবিকাকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। বিভূতি ডাক্তার স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন, বড় জোর আর এক বছর। সুমন্তর ভালবাসার প্রাণটাও যেন নীরবে চিৎকার করে বলে উঠেছে, এক মাস হলেই বা কি?

দু'বছর আগে ঠিক যখন এম এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল দেবিকা, তখনই এই অদ্ভুত অসুখের অভিশাপ দেখা দিয়েছিল। আর পড়তে পারেনি, পরীক্ষাও দিতে পারেনি দেবিকা। রায়সাহেবের বউ নমিতা আরও কতবার এসেছে, কিন্তু আর ব্যাডমিন্টন খেলবার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু ওষুধ নিয়ম আর সাবধানতা দিয়ে রুগ্ন শরীরটাকে কোনমতে ধরে রেখে এই পৃথিবীর আলো-ছায়ার কাছ থেকে চরম বিদায় নেবার জন্যই তৈরী হয়েছিল যে মেয়ে, সেই মেয়েরই সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে হয়ে গেল।

পুরো এক বছরও পার হয়নি, যে বিয়ের কোন মানে হয় না, সেই বিয়ে গিরিডির এই বাড়িতেই হয়ে গিয়েছে।

বিয়েতে সুমন্তর দুই দাদা এসেছিলেন। তাঁরা কেউই প্রসন্ন হননি। শুধু একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থেকে আর গম্ভীর হয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বিভূতি কাকাও খুশি হননি। মোহিতবাবু আর জয়া তাঁদের মেয়ের মুখের হাসি দেখে হেসেছিলেন বটে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে চোখও মুছেছিলেন।

গিরিডির এবাড়ির জীবনের সমস্যা বলতে সত্যিই কিছু ছিল না। ছিল শুধু একটা বিষণ্ণ করুণ উদ্বেগ। দেবিকার এই রুগ্ন প্রাণের সব সাড়া যে-কোন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, সুস্থ হয়ে উঠবার কোন লক্ষণও নেই। একটা শোকের আঘাত মাথা পেতে স্বীকার করবার জন্যই মনে মনে তৈরী হয়েছিলেন মোহিতবাবু আর জয়া।

কিন্তু বিয়ের পর সত্যিই একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে; তাই ভয় পেয়ে আরও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছেন দেবিকার বাবা আর মা। বড় কঠিন, বড়ই নিষ্ঠুর, আবার খুব করুণও বটে, এই সমস্যা।

সুমন্ত মাসের যে-কটা দিন তার সিন্দ্রী কোলিয়ারীর কাজের জীবনে ব্যস্ত থাকে, সে-কটা দিন গিরিডির এই বাড়ির ভয়টাও যেন আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। বরং, মাঝে মাঝে বেশ খুশি হয়ে হাসতে পারেন মোহিতবাবু, যখন দেখতে পান যে, সুমন্তকে চিঠি লিখছে দেবিকা, আর দেবিকার সারা মুখ ভরে যেন একটা রঙীন আলোর হাসি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বিভূতি ডাক্তার খুবই স্পষ্টবক্তা; তাঁর ভাষার মধ্যেও কোন রাখা-ঢাকা চাপা-চাপির ব্যাপার নেই। বিভূতি ডাক্তার আবার বলেছেন—বিয়ে হলো, একরকম ভালই হলো। কিন্তু আর একটু সাবধান থাকতে হবে মোহিতবাবু।

—আপনি যা নিয়ম করে দিয়েছেন, তা তো সবই.....।

—সে-সব ছাড়াও একটা সাবধানতা দরকার।

—বলুন, কি করতে হবে?

—কথাটা হলো, দেবিকার যদি ছেলেপুলে হয়, তবে কিন্তু সর্বনাশের ব্যাপার হয়ে যাবে। তা হলে মেয়েটার আর দুটো মাস বেঁচে থাকবারও কোন আশা থাকবে না।

কিন্তু এই ভয়ানক করুণ সত্যটা কি সুমন্তর অজানা আছে? বিভূতি ডাক্তার বলেন, তিনি সুমন্তকে একেবারে খোলা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে দেবিকা কি জানে না? বিভূতি ডাক্তার বলেছেন, সুমন্ত নিজেই দেবিকাকে কথাটা বলে দিয়েছেন। কাজেই এখন ব্যাপারটা আর কারও জানা-অজানা সমস্যার কথা নয়। এখন এবাড়ির প্রাণের ভয় শুধু এই যে, যেন ভুল না হয়।

শিক্ষিত ছেলে সুমন্ত, এমন নিদারুণ ভুল করবেই বা কেন? শিক্ষিতা মেয়ে দেবিকা, তার পক্ষেও এমন সাংঘাতিক অসতর্কতা সম্ভব নয়। ওরা দুজনের কেউই অবুঝ নয়। মোহিতবাবু আর জয়া মাঝে মাঝে বিশ্বাস করেন, না ওরা ভুল করবে না।

সুমন্তর লক্ষ্ণৌ মামী একদিন এসেছিলেন, তিনি নিজেও অনেক চেষ্টা করে সুমন্তর চিঠি খুঁজে বের করে নিয়ে পড়েছেন। লক্ষ্ণৌ মামী তাঁর জয়াদিকেও চিঠির কথাগুলি শুনিয়ে দিয়েছেন। শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন জয়া। না, এত ভয় করবার কিছু নেই। সুমন্ত তো দেবিকার কাছে লেখা চিঠিতে একেবারে স্পষ্ট করে লিখেছে, বিভূতি কাকা মিথ্যে ভয় করছেন। আমাকে আর তোমাকে বোধহয় দুটো পাগল বলে সন্দেহ করেছেন।

সুমন্ত নিজেই নিয়ম করে নিয়েছে, প্রতি মাসে অন্তত দুটি তিনটি দিনের জন্য গিরিডিতে এসে থাকে আর চলে যায় সুমন্ত। এই দুটি-তিনটি দিন গিরিডির এই বাড়ির বিষণ্ণ প্রাণেও একটা খুশির সাড়া জেগে ওঠে।

আবার মাঝে মাঝে সিজুয়া কোলিয়ারীর অফিসে গিরিডির টেলিফোনের একটা উদ্বেগের আহ্বানও ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে। দেবিকার শরীর ভাল নয়; লক্ষণ খারাপ। যদি সম্ভব হয়, তবে তাড়াতাড়ি চলে এস।

এসেই দেখতে পেয়েছে সুমন্ত, জ্ঞান হারিয়ে আর অসাড় হয়ে শুয়ে আছে দেবিকা। খোঁপাটা ভেঙ্গে গিয়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শুকনো শীর্ণ হাত দুটো দুপাশে এলিয়ে পড়ে আছে। বিভূতি ডাক্তার চুপ করে ঘরের ভিতরে চেয়ারে বসে আছেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দেবিকার বিছানার মাথার কাছে বসেছে সুমন্ত। একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না সুমন্ত। দেবিকার মাথায় আর কপালে আস্তে আস্তে হাত বোলায়, মাঝে মাঝে দেবিকার একটা হাত ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

সুমন্ত যেন নিবু-নিবু দীপের সব চেয়ে বড় কামনার তৃপ্তিটিকে পূর্ণ করে দিয়ে বসে থাকে। এই তো চেয়েছিল দেবিকা। এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করা তো দেবিকার এই রুগ্ন প্রাণের আর দেহের সামর্থ্যে সম্ভব নয়। একদিকে মৃত্যুর হাত, আর, একদিকে সুমন্তর হাত; দেবিকার প্রাণ যে এইরকম একটি অভ্যর্থনা নিয়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

কিন্তু অন্যদিন, যেদিন দেবিকার অসুখের এরকম কোন বাড়াবাড়ি থাকে না, সেদিন সুমন্তকে কাছে দেখতে পেলে দেবিকা যেন ভুলেই যায় যে, দীপ নিভছে।

সুমন্ত আসে, সেদিন সময় মত ওষুধ খেতে ভুলে যায় দেবিকা। বেশি কথা বলতে নিষেধ আছে; কিন্তু ভিতরের ঘরে বসে একটানা একটি ঘণ্টা ধরে গল্প করেও যেন ক্লান্ত হতে বা থামতে চায় না। স্নানের সময় পার হয়ে যায়; দেবিকা তবু সুমন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দেবিকা হাসে—এবার এসেও আমাকে দেখতে পেলে; কিন্তু আসছে মাসে কি দেখতে পাবে?

সুমন্ত হাসে, কিন্তু হাসিটা যেন একটা চাপা বেদনার করুণ হাসি।—তা, আশা করতেই হবে, দেখতে পাবো।'

দেবিকা—আমার ভাবতে সব চেয়ে বেশি কষ্ট হয়, তুমি একদিন এখানে এসে আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার জন্যে কান্নাকাটি করো না।

সুমন্ত—চুপ কর।

দেবিকা হাসতে চেষ্টা করে।—সত্যিই, এ ছাড়া আমার আর কোন দুঃখ নেই।

সুমন্তর চোখ দুটোও যেন আসন্ন সেই শূন্যতার দিনটার রূপ দেখতে পেয়ে ছটফট করতে থাকে। ঘরের এই সব ছবি, ওই ফুলের টব; সবই সেদিন থাকবে। শুধু থাকবে না দেবিকা। দেবিকাকে সারা জীবনে এই পৃথিবীর কোন আলো-ছায়ার কাছে দেখতে পাওয়া যাবে না। তবু, এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে......।

সুমন্তর মনের কথাটা দেবিকারই হাসি-ভরা কথার ভাষাতে যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে। দেবিকা বলে—তবু সুখের মরণই বলতে হবে। তোমার স্ত্রী হতে পেরেছি, এই তৃপ্তি নিয়ে সুখেই মরতে পারবো।

তারপরেই মুখ টিপে যেন আরও একটা খুশির হাসি হাসতে থাকে দেবিকা।—তখন তোমারও মুক্তি।

সুমন্ত বলে—সাংঘাতিক মুক্তি। যাক্, ওসব কথা না তুললেই ভাল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত; গিরিডির এবাড়ির প্রাণের উদ্বেগটাও যেন মিথ্যে হয়ে কোথায় সরে থাকে। মোহিতবাবু বেশ হেসে-হেসে সুমন্তর সঙ্গে গল্প করেন। জয়াও মাঝে মাঝে এসে সুমন্ত আর দেবিকার কাছে বসে গল্প করে চলে যান।

যখন রাত হয়, রাত নটা পার হয়েও ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে পৌঁছে যায়, তখন একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া। মোহিতবাবুও মাঝে মাঝে উপরতলার ঘর থেকে নীচে নেমে এসে নীচের বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন। সুমন্ত যখন দেবিকার হাত ছেড়ে দিয়ে আর আস্তে

আস্তে হেঁটে উপরতলার ঘরের দিকে চলে যায়, তখন নিশ্চিন্ত হন মোহিতবাবু; নিশ্চিন্ত হন জয়া।

অনেকদিন পরে আবার সুমন্তর লক্ষ্মী মামী গিরিডির বাড়িতে এসেছেন। সুমন্তও এসেছে। বাড়ির সবারই মনেও পড়ে গিয়েছে, দেবিকা আর সুমন্তর বিয়ের একটি বছর পূর্ণ হলো।

এই এক বছরের মধ্যে দেবিকার শরীরের কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু কোন অবনতি হয়েছে বলেও বিভূতি ডাক্তার মনে করেন না।

লক্ষ্মী মামী বলেন—ভগবানের দয়া।

কিন্তু দেবিকা নিজেই ঠাট্টা করে হেসে ওঠে। —ভগবান যদি আরও বেশি দয়া করেন, তবে একজনের ওপর খুবেই অবিচার করা হবে।

লক্ষ্মী মামী—বুঝলাম না।

দেবিকা—আধমরা ফিঙের মত এভাবে ফড়ফড় করে আর ধুকধুক করে যদি আরও তিন-চারটে বছর বেঁচে থাকি, তবে তোমার ভাগ্নে বেচারার কী দশা হবে?

—কি হবে?

—বুঝে দেখ, কি বলছি।

চমকে ওঠেন লক্ষ্মী মামী। দেবিকার এই ঠাট্টার কথাটা যে ভয়ানক একটা বাস্তব সত্যের বজ্রধ্বনি। বেচারা সুমন্তর জীবনটা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না। দেবিকার সঙ্গে সুমন্তর বিয়ে মানে কদিনের একটা মায়ার বন্ধন স্বীকার করা মাত্র। সকলেরই জানা আছে, সে বন্ধন শিগগিরই ক্ষয় করে দেবার জন্য দেবিকার প্রাণের শিয়রে যমের ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সুমন্তর জীবনটা তো সব আশা আর পিপাসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবে। দেবিকা যে সুমন্তর যত সাধ আর শখের, স্বাস্থ্যের আর বয়সের কাছে একটা বঞ্চনা। এমন বঞ্চনা চিরস্থায়ী হবে না জেনেই তো সুমন্তর সঙ্গে দেবিকার বিয়ে হয়েছে।

লক্ষ্মী মামী আর কথা বাড়িয়ে তুলতে চান না।

এমন বিয়ের একটা বছর পূর্ণ হবার দিনটিতে কীই বা উৎসব হতে পারে? তেমন কিছুই হলো না। লক্ষ্মী মামী শুধু দুটো ফুলদানিতে দুটো টাটকা ফুলের তোড়া বসিয়ে দিয়ে দেবিকার ঘরে রেখে গেলেন।

সন্ধ্যা পার হয়। আর রাতটাও জ্যোৎস্নায় ভরে যায়। একবছর আগের রাতেও এইরকম একটা আলোমাখানো উতলা ভাব ছিল। মোহিত দত্তের এই বাড়ির বাগানের সব লতাপাতা ফুরফুরে হাওয়াতে সেরাতে যেরকম দুলেছিল, আজও ঠিক সেইরকম দুলছে।

রাত দশটা পার হয়ে যাবার পরেও দেবিকার ঘরের ভিতরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করছে সুমন্ত। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলে। এটাই নিয়ম। তবু একটু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না জয়া।—তুমি সুমন্তকে ডেকে একটু বলে দাও লক্ষ্মী, যেন আর বেশি গল্প না করে।

লক্ষ্মী মামী এসে ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ডাক দেন—এবার তুমি ওপরে যাও, সুমন্ত।

—এখনই যাচ্ছি। উত্তর দেয় সুমন্ত।

কিন্তু বুঝতে পারেন লক্ষ্মী মামী, তবু দেবিকার সঙ্গে গল্প করেই চলেছে সুমন্ত।

জয়া বলেন—রাত এগারটা যে পার হতে চললো লক্ষ্মী। আর তো এসব ভাল দেখায় না।

—কি বললে?

—আমার সত্যিই ভয় করছে, লক্ষ্মী।

—ভয়?

—হ্যাঁ। তুমি সুমন্তকে আর একবার ডাক দাও, লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী মামী ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে, আর দেবিকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে গিয়েই চমকে ওঠেন।

সুমন্তর একটা হাত ধরে রেখেছে দেবিকা। দেবিকার মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু মেয়েটার চোখ দুটো যেন কথা বলছে।

সুমন্তর চোখেও কী অদ্ভুত চাহনি। দেবিকার চোখের ওই ভয়ানক ব্যাকুলতাকে শান্ত করবার জন্য সুমন্তর চোখের দৃষ্টিটা ছটফট করছে। দেবিকা বলছে—আজ আর ওপরে যেও না।

সুমন্ত বলছে—আমারও আজ আর ওপরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

মরণভয় নেই মেয়েটার? আর সুমন্তই বা কী ভয়ানক অবুঝ মনের ছেলে! এত রাতে, এভাবে, এমন করে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে যে দেবিকার শিয়রের মৃত্যু মুখ টিপে হেসে ফেলবে। মেয়েটাও কি ভুলে গেছে যে, ওর হার্ট খারাপ, লিভার খারাপ, ওর ডান পাঁজরের একপাশে একটা সাংঘাতিক ব্যথা আছে। বিভূতি ডাক্তার এত স্পষ্ট করে যে-কথাটা বলে দিয়েছেন, সে-কথা ভুলে যাবার জন্যে

ইচ্ছে করেই ওরা দুজন আর পাগল হয়ে উঠলো?

সিঁড়িতে মোহিতবাবুর পায়ের শব্দ শোনা যায়। জেগে উঠেছেন মোহিতবাবু। বোধহয় জয়া নিজেই গিয়ে আর আতংকিত হয়ে মোহিতবাবুকে জাগিয়েছেন।

লক্ষ্মী মামীর আতংকিত প্রাণটাও আর নীরব হয়ে থাকতে পারে না। চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে ফেলেন লক্ষ্মী মামী—ও সুমন্ত, আর রাত করো না। ছিঃ, দেবিকার শরীরের কথাটা তো একবার ভেবে দেখতে হয়।

—যাচ্ছি মামী। ব্যস্তভাবে সাড়া দেয় সুমন্ত।

ঘর ছেড়ে চলে যায় সুমন্ত। দেখতে পান লক্ষ্মী মামী, দেবিকার চোখ দুটো ছলছল করছে। কিন্তু সেই সংগে দেবিকার দুই চোখের ঘন ভুরু দুটো যেন আহত সাপের শরীরের মত কুঁচকে পাকিয়ে কাঁপছে।

আজ না হয় লক্ষ্মী মামী ছিলেন; তাই এ বাড়ির প্রাণ একটা বিপদের ভয় থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু তারপর?

তারপর যতবারই সুমন্ত এবাড়িতে এসেছে, এবাড়ির মন আতংক ভরে গিয়েছে। একদিন এমন ঘটনাও চোখে দেখতে হয়েছে, দেবিকা নিজেই মাঝরাতে ঘরের বাইরে এসে উপরতলায় যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জয়া বলেন—এ কি কাণ্ড!

দেবিকা বলে—কিছুতেই ঘুম আসছে না, মা।

মোহিতবাবু দেখেছেন, অনেক রাতে নীচের তলায় নেমে বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে আছে সুমন্ত। মোহিতবাবু ভয় পেয়েছেন, বিপন্ন বোধ করেছেন; আর করুণ স্বরে সুমন্তকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছেন।—দুঃখ করো না, সুমন্ত। এখন ভোর হতে অনেক দেরি, এবার শুতে যাও।

জয়া মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর কাছে এসে কথা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছেন। —এমন বিয়ে না হলেই তো ভাল ছিল। আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

কিন্তু বিভূতি ডাক্তার স্পষ্টবক্তা; আবার সাবধান করে দিয়েছেন। —খুব সাবধান; যতই দুঃখের ব্যাপার হোক, এমন ভুল করতে দেবেন না।

[দুই]

বিভূতি ডাক্তার সব চেয়ে বেশি খুশি। ছ'মাসের মধ্যে দেবিকার অসুখের অনেক খারাপ লক্ষণ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দশ পাউন্ড ওজন বেড়েছে দেবিকার। মাথা ঘোরা আর নেই। পাঁজরের ব্যথাটাও খুব কম।

তবে কি সত্যিই সেরে উঠবে দেবিকা? বিভূতি ডাক্তার বলেন—এখন আমি জোর করে বলতে পারি, আশা আছে।

মিথ্যে বলেননি বিভূতি ডাক্তার। সত্যিই এক-একটি মাসে দেবিকার এই জীর্ণ শীর্ণ ও ভঙ্গুর শরীরটার উপর যেন একটা অভাবিত আকস্মিকের করুণা ঝরে পড়েছে। লালচে হয়ে উঠছে দেবিকার সাদা ঠোঁট। খাবারের পরিমাণ প্রায় ডবল হয়ে গিয়েছে। লনের চারদিকে একবার ঘুরে বেড়ালে হাঁপ ধরে না।

রায়সাহেবের বউ নমিতা এসে হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।—আমি এখন জোরগলায় চেঁচিয়ে বলতে পারি দেবি, আবার আমি তোমার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলবো।

সুমন্ত আসে। কিন্তু সুমন্তর চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক বিস্ময়ের নিবিড়তা টলমল করে। দেবিকার হাত ধরতে গিয়েই সুমন্তর হাতটা যেন একটা প্রাণময় কোমলতার স্বাদ পেয়ে চমকে উঠেছে। দেবিকার হাতের সরু বালা দুটো আর কব্জির গাঁটের কাছে ঢলঢল করে না। হাড়সার সেই হাত দুটো বেশ সুডোল হয়ে উঠেছে। সত্যিই তো, এটা যে একটা আশাতীত ঘটনা।

আরও ছটা মাস পার হতেই গিরিডির এই বাড়ির জীবনে যেন চার বছর আগের সুস্থ সুখী হাসির কলনাদ আবার বেজে ওঠে। নমিতা এসেছে, নমিতার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে দেবিকা, পনর মিনিট খেলার পরেও হাঁপিয়ে পড়েনি।

যে সেতারের তারে মরচে ধরেছিল, সেই সেতারে নতুন তার পরানো হয়েছে। সন্ধ্যা বেলা একবার সেতার বাজাতে ভুলে যায় না দেবিকা। মোহিতবাবু বলেছেন, এবার পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হলেই তো ভাল হয় দেবি।

দেবিকা বলে—হ্যাঁ, পরীক্ষা দেব।

সুমন্তর একটা চিঠিতেও নতুন একটা অনুরোধের কথা যেন নতুন আশার গুঞ্জন তুলে দেবিকাকে নিশ্চিন্ত করে দেয়। —হ্যাঁ, তুমি এখন এম এ পরীক্ষাটা দেবার জন্যেই তৈরী হও। আমি কিছুদিন এদিকে নতুন কাজে ব্যস্ত থাকবো। কাজেই অন্তত তিন মাসের মধ্যে গিরিডি যাবার সুযোগ হয়ে উঠবে না। যাই হোক, তোমারই সুবিধে হবে। তোমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে না। আমি থাকলেই তো যত ব্যাঘাত আর উৎপাত। আশা করি, আগের চেয়ে এখন আরও ভাল আছ।

দেবিকা জবাব দেয়। —তবু বলছি, যতই ব্যাঘাত আর উৎপাত হও না কেন, তিন মাসের পর কিন্তু আর দেরি করো না।

তিন মাসের মধ্যে একদিন হঠাৎ উৎপাতের মত দেখা দিয়েছে সুমন্ত। সুমন্তর গাড়িটা এসে শুধু দুটি ঘণ্টার মত গিরিডির এবাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কাজের দরকারে মধুপুরে যেতে হবে। তাই এসেছে সুমন্ত।

খুব ব্যস্ত সুমন্ত। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়েও চেয়ারে বসতে চায় না সুমন্ত। ঘরের ভিতরেই ঘুরে ফিরে দেবিকার সঙ্গে গল্প করে আর চা খায়। দেবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার হাসতে থাকে সুমন্ত। সুমন্তের পক্ষে দেবিকার এই সুস্থ-সুন্দর চেহারাটাকে দেখতে পাওয়া যে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। যে বাড়িতে এসে একদিন দুঃসহ একটা শূন্যতাকে দেখে ফিরে যেতে হবে বলে মনে করেছিল সুমন্ত, সে বাড়িতে দেবিকা আজ যেন একটি পূর্ণ অভ্যর্থনা হয়ে সুমন্তর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন মোহিতবাবু তেমনই জয়া, দুজনেই একটু বিস্মিত হলেন। সুমন্ত এল, কিন্তু একটি ঘণ্টাও থাকতে পারলো না। মধুপুরে চলে গেল।

কে জানে সুমন্তকে আজ এত ব্যস্ত করে তুলেছে কিসের জরুরী কাজ? এ বাড়ির এই ঘরের একটা চেয়ারেও কিছুক্ষণের জন্য বসে থাকতে পারলো না? সত্যিই সুমন্তর এই তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার মধ্যে যেন একটা উদ্বেগও আছে। সুমন্তর গাড়িটাও এত জোরে স্পীড নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল যে, দেখলে মনে হবে, ছুটে পালিয়ে গেল গাড়িটা।

দেবিকাও ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে, চলে যাচ্ছে সুমন্ত। কিন্তু সেজন্য দেবিকার চোখে কোন করুণতা আর কাতরতা নেই। হাসছে দেবিকার চোখ। আজ আর দেবিকার চোখের তারাতে সেই সাদাটে বিষাদের কোন চিহ্নও নেই। ঘন কালো চোখের তারা দুটো হাসতে গিয়ে আরও কালো হয়ে কাঁপছে আর দেখছে। আজ আর সুমন্তর দিকে তাকিয়ে দেবিকার চোখের চাহনিটার ব্যথিত হবার কোন দরকার হয় না। কারণ কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

এম-এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে হবে। কিন্তু বিভূতি ডাক্তার বললেন, এখন কিছুদিনের জন্যে ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে থাকলেই দেবিকার স্বাস্থ্যের সব চেয়ে ভাল উপকার হবে। পরীক্ষা এখন থাকুক।

সুমন্ত চৌধুরী শুধু দেবিকার চিঠিতেই জানতে পারে, ওয়াল্টেয়ারে চলে গিয়েছে দেবিকা, সঙ্গে গিয়েছেন দেবিকার মা। গিরিডির বাড়িতে এখন শুধু মোহিতবাবু আছেন। অন্তত তিনটে মাস ওয়াল্টেয়ারে থাকবে দেবিকা।

কিন্তু চিঠিতে একথাটা লিখতে পারেনি দেবিকা, বোধহয় লিখতে ভুলেই গিয়েছে যে, তুমিও একবার ওয়াল্টেয়ারে এস।

তবু সেজন্য সুমন্তর মনে কোন অভিমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। বরং মনে হয়, এরকম তাগিদ না করে ভালই করেছে দেবিকা। সুমন্তর কাজের চাপ যে এখন আরও বেড়েছে। তা ছাড়া খনির মেশিনারী কিনতে দুমাসের জন্য ইওরোপে যাবার কথাও উঠেছে। ইচ্ছে থাকলেও এখন ওয়াল্টেয়ারে যাওয়া সুমন্ত চৌধুরীর পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু ঝরিয়ার মনিবাবুর অনুরোধের চাপে পড়ে পনের দিনের জন্যে দার্জিলিং বেড়াতে যেতেই হয়। আর দার্জিলিংয়ে এসেও ওয়াল্টেয়ারে দেবিকার কাছে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যায় সুমন্ত।

শুধু মোহিতবাবু খবর রাখেন, সুমন্ত এখন দার্জিলিংয়ে আছে। শুধু মোহিতবাবুই চিন্তা করেন, দার্জিলিংয়ে না গিয়ে সুমন্ত এখন একবার ওয়াল্টেয়ারে গিয়ে দেবিকাকে দেখে এলেই তো ভাল করতো। আজ তো সুমন্তর পক্ষে চেয়ে সব বেশি খুশি হবার কথা, দেবিকা সেরে উঠেছে। এমন সৌভাগ্য তো কোনদিনও আশা করতে সাহস করেনি সুমন্ত।

ওয়াল্টেয়ার থেকে দেবিকা গিরিডিতে ফিরে আসবার পর মোহিতবাবু দেবিকার কাণ্ড দেখেও একটু আশ্চর্য হন। সুমন্ত এখন গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাচ্ছে না, সময় করতে পারছে না, এর জন্যে দেবিকার মনে যেন কোন আক্ষেপ আর কোন অভিযোগ নেই। সন্দেহ করেন মোহিতবাবু, সুমন্তকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা চিঠিও লেখে কিনা দেবিকা।

জয়া জিজ্ঞেসা করেন, সুমন্ত কবে আসবে?

দেবিকা হেসে হেসেই জবাব দেয়—সময় করতে পারলেই আসবে।

বিভূতি ডাক্তার আবার স্পষ্ট ভাষায় মোহিতবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন, না, আর ভয় করবার কিছু নেই। দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কথা বলতে গিয়ে বিভূতি ডাক্তারের গলার স্বরে যেন একটা খুশির উল্লাস বেজে ওঠে।—এখন ছেলেপুলে হলেও দেবিকার স্বাস্থ্যের কোন বিপদ দেখা দেবে না। বরং ভালই হবে।

গিরিডির এ বাড়ির প্রাণটা এইবার এতদিনে যেন একটা দুঃস্বপ্নের গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে। আর দুঃখ করবার, ভয় করবার, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। মেয়েটার তো বলতে গেলে পুনর্জন্ম হয়েছে। দেবিকার ভাগ্য আর বিভূতি ডাক্তারের চিকিৎসা, এ বাড়ির মেয়ের অকাল-মরণের অভিশাপ মিথ্যে করে দিয়েছে। সুমন্তের জীবনটাও একটা শূন্যতার আঘাত থেকে বেঁচে গেল।

মোহিতবাবু চিঠি লিখে সুমন্তকে জানিয়ে দিতে দেরি করেন না, দেবিকা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

তার আগে বিভূতি ডাক্তার নিজেই সুমন্তকে চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন—তুমি এখন দেবিকাকে তোমার কাছে নিয়ে যেতে পার। দেবিকার স্বাস্থ্যের সব বিপদ কেটে গিয়েছে।

মোহিতবাবুর কাছে, বিভূতি কাকা

কাছে, আর দেবিকারও কাছে চিঠি দিয়েছে সুমন্ত। কিন্তু স্পষ্ট করে জানতে পারেনি, ঠিক কবে গিরিডিতে আসবার সুযোগ পাওয়া যাবে, আর ঠিক কবে দেবিকাকে সিজুয়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। একটা অসুবিধে আছে, সিজুয়া কোলিয়ারীর ম্যানেজারের বাংলোটা সুবিধের নয়। এটা একটা পুরনো ফাটলধরা বাড়ি। নতুন বাংলো তৈরী হচ্ছে।

জয়া একটু বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, না হয় পুরনো বাড়িই হলো, তাতে কি এসে যায়? অন্তত একটা ভাল ঘর তো আছে। দুটো প্রাণীর থাকবার পক্ষে একটা ভাল ঘরই যথেষ্ট।

দেবিকা হেসে ফেলে—সে যখন মনে করছে অসুবিধে আছে, তখন অসুবিধে আছেই। তা ছাড়া, এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

লক্ষ্মী মামী যেদিন গিরিডির বাড়িতে আবার এলেন, সেদিন জয়া আর মোহিত-বাবু তাঁদের মনের কথাগুলি খুলে বলবার সুযোগ পেলেন। এখন সুমন্ত একবার এলেই তো পারে। আর তো কোন ভয় নেই। বিভূতি ডাক্তার বলেছেন, আর কোন সাবধানতার দরকার নেই।

লক্ষ্মী মামীর চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আর ওদের প্রাণের ইচ্ছার ওপর সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর পাহারা রাখবার দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে। মনে পড়ে লক্ষ্মী মামীর; সে রাতে দেবিকার ছলছল চোখের তারাতেও যেন আগুনের রেখা ঝলসে উঠেছিল। বাধা দিতে গিয়ে লক্ষ্মী মামী সেদিন নিজেও কেঁদে ফেলেছিলেন। তার আর কোন সন্দেহ নেই, যে বিয়ের কোন মানে ছিল না, সে বিয়ের এখন খুবই মানে হয়।

লক্ষ্মী মামী খুব তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তাই সুমন্ত এসেছে। কিন্তু দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছেন লক্ষ্মী মামী, সুমন্ত আর দেবিকা দুজনে শুধু বাইরের ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি মিনিট মাত্র কথা বলেই চুপ করে গেল। সুমন্ত ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়, আর বাগানের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেবিকা উপরতলায় উঠে যায়। যেন অপরিচিত দুটো মানুষ হঠাৎ মুখোমুখি দেখার ভুলটাকে শুধু একটু আলাপ করেই শেষ করে দিল।

সে রাতে ছিল আকাশভরা আলো, আজকের এই রাতে শুধু আকাশভরা কালো। কিন্তু গিরিডির এবাড়ির প্রাণে সে রাতের সেই করুণ আতঙ্ক আর নেই। তাই নীচের তলার একটি ঘরের একটি বড় খাটে নতুন করে বিছানা পাতা হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্মী মামী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, রাত দশটা বেজে গিয়েছে, তবু দেবিকা এই ঘরে ঢোকেনি। বারান্দার শেষ প্রান্তের ছোট ঘরের ভিতরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাগানের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে দেবিকা।

সুমন্ত কোথায়? দেখলেন লক্ষ্মী মামী, সুমন্ত তখনও বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে বই পড়ছে।

লক্ষ্মী মামী বলেন—রাত হয়েছে, তুমি এখন ওঘরে যাও সুমন্ত।

দেবিকারও কাছে এসে লক্ষ্মী মামী বলেন—এখানে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ওঘরে যা। অনেক রাত হয়েছে।

দেবিকা বলে—না।

—কি?

—ওঘরে যাব না।

—কেন?

—বিশ্রী লাগছে।

ধমক দেন লক্ষ্মী মামী—বাজে কথা বলো না। যাও, এখনি যাও।

চলে গেলেন লক্ষ্মী মামী। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বুঝতেও পারেন না, এ আবার কোন্ সমস্যা? কিসের অভিশাপ?

মোহিতবাবু আর জয়া, আর লক্ষ্মী মামী, তিনজনেই তিনটি স্তব্ধ আতঙ্কের মূর্তির মত উপরতলার একটি ঘরে বসে থাকেন আর রাত জাগেন। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেন, এতক্ষণে বোধহয় নীচের তলার বাইরের ঘরের আলো নিভেছে, সুমন্ত শোবার ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু দেবিকা কি এখনও ওর বেয়াড়া অনিচ্ছা নিয়ে ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে?

উঠলেন লক্ষ্মী মামী। নীচের তলায় এসেই দেখতে পেলেন সুমন্ত তখনও বাইরের ঘরে বসে বই পড়ছে, আর দেবিকা তেমনি দূরের ছোট ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকের এই অমানিশা যেন একটা নতুম অভিশাপ। সুমন্ত আজ দেবিকার জীবনের ভয়। দেবিকা আজ সুমন্তর জীবনের ভয়। আর, বাসরঘরের মত ওই ঘরটা যেন একটা কারাগারের কুঠরী। যাবজ্জীবন শাস্তির কুঠরী। ওঘরের ভিতরে ঢুকতে দুজনের কারও মনে একটুও আগ্রহ নেই।

লক্ষ্মী মামী আর ডাকাডাকি করে এই ভয়ানক অমানিশার স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেবার সাহস পেলেন না। কিন্তু আজও আবার চোখ মুছলেন। উপরতলায় উঠে গিয়ে মোহিতবাবু আর জয়ার কাছে একটা কথা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন।—না, এমন বিয়ের কোন মানে হয় না।

আমাদের বাঁচবার প্রসঙ্গে

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাঁচার দুটো অর্থ। এক অর্থ জীবন-ধারণ। অন্য অর্থ বাঁচার মত বাঁচা—মানুষের মত বাঁচা। পশুদের ক্ষেত্রে প্রথমটি সত্য। উভয়টি সত্য মানুষের পক্ষে। আজকে—সভ্যতার খুব একটা জটিল সময়ে প্রথম অর্থেই যদি আমরা খুশী থাকতে পারতাম, হয়তো অস্তিত্ব রক্ষা করা যেতো। কিন্তু মানুষ হলাম আমরা চাওয়ায় চাওয়ায়—খাওয়াতো চাইই—ভালমন্দ নানানটা, পড়া চাই, শিক্ষা চাই, আলো চাই, হাওয়া চাই, মুক্তি চাই। সোজা কথায় আমাদের বড় হওয়ার সঙ্গে আমাদের চাওয়ার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। চাইতে গিয়ে বাধা পেয়েছি; বাধা পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি—দাঁড়াতেই সত্যের দরজাটা চোখের উপর গিয়েছে খুলে।

কাজেই আজ যখন ইউরোপ বা আমেরিকায় ভোগবিলাসের উপকরণ জড়ো হয়েছে প্রচুর এবং আরোর জন্য চেষ্টা চলছে কলে-কারখানায়, তখন কেউ কেউ আমাদের দেশের 'প্রাচীন সরল জীবন প্রণালী' পড়তে পড়তে বিস্ফারিত বিস্ময়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এই সর্বনাশা চাওয়ার শেষ কোথায়। এ কোন অতলের দিকে মানব সভ্যতা চলেছে? সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই কামনা-কৃমিই সভ্যতাটাকে খাবে, এই আরো চাওয়ার নেশাতেই ভরাডুবি হবে। এমন যারা বলছেন, কৌতুককর বিষয় হচ্ছে, এমন নয় তারা আধুনিক যুগের উপকরণ যোগ থেকে কিছু বিযুক্ত হয়ে বলছেন। এ অনেকটা দোকানীর জিনিস খেতে খেতে দোকানীকে অভিসম্পাত করা। এও এক ধরনের অবিচার। কারণ এ-ক্ষেত্রে বিধেয় দুটোই হতে পারে—হয় খাও, গালাগালি কোরো না। অথবা ত্যাগ করো। ত্যাগও করব না আবার গালাগালি করব। এ যে একেবারে রামপ্রসাদী আসক্তি। আসল কথা, বাজারী ভাষায় বললে বলতে হয়, ইউরোপীয় জীবন প্রবাহ রীতি আমাদের হাটে মনোপলি হয়ে আছে। হয় গ্রহণ করতে হবে, নয়তো সরে দাঁড়াতে হবে। সূর্যের আলো পৃথিবীর যে যে দেশে গিয়ে পৌঁছয়, ইউরোপীয় জীবনপ্রণালী সেখানেই অনর্গল। শিক্ষায়-দীক্ষায়, পোশাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, চিন্তায় চর্চায়—সব কিছুতে। আর ভারতবর্ষে তাতো হবেই। দুশো বছরের প্রভাব।

এত হয়েও ইউরোপের সঙ্গে আমাদের দেশে বেড়াতে গেলে আমাদের ক্যামেরার বিষয়বস্তু ওদের বৈভব, আমাদের দেশে বেড়াতে এলে ওদের ক্যামেরা তাকিয়ে থাকে আমাদের উপচীয়মান দারিদ্র্যের দিকে, অশিক্ষার দিকে, অস্বাস্থ্যের দিকে, সৌন্দর্য হীনতার দিকে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের জীবনধারণের মান আমাদের কল্পনার অতীত। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, ধরন-ধারনটা আমাদের সাহেবদের চেয়েও বেশী সাহেবী। কবির সঙ্গে কবিওয়ালার যে পার্থক্য। নয়াদিল্লিতে যারা থেকেছেন, বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিদের আগমন উপলক্ষে নয়াদিল্লির চোখ-ঝলসানো নকল রূপ যারা দেখেছেন, তারা জানেন। সেই দিল্লির সঙ্গে ভারতবর্ষের বাকি অংশের বিন্দুমাত্র যোগ নেই।

আবার একটা লক্ষ্য করবার বিষয় কি এই জাঁকজমকে যারা দিন কাটাচ্ছেন, তাদের ঠাট অন্য কোন দেশের ধনীক শ্রেণী থেকে কোনো অংশে কম যায় না। দেশের প্রতি-নিধিত্ব করতে গিয়ে সরকারী প্রতিনিধিরা একটা বিশেষ গোষ্ঠীকেই প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার মান, আমাদের চেয়ে শতগুণে ধনী দেশ-গুলোর ধনীদের সঙ্গে পাল্লা দেয়। কথিত আছে আমাদের কোন রাষ্ট্রদূতের বিলাসায়োজন দেখে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া আমাদের দেশের শিল্পপতিদের ঐশ্বর্যবিলাস ওদেশের শিল্পপতিদের পর্যন্ত খুশী করে তোলে।

অথচ কি আর বলতে হবে কেমন করে আমাদের দেশের গরীব সাধারণ মানুষ বাঁচে। একেবারে গরিব যারা কৃষক শ্রমিক, তারা 'বাঁচে' এই মাত্র। এদের চেয়ে একটু উপরে যারা নিম্ন আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শহরাঞ্চলে বিশেষ করে যাদের বাস—যারা মোটামুটি খারাপ নেই বলে একটা ধারনার সৃষ্টি করা হয়েছে—তাদের অবস্থা অতি করুণ ও অসহায়। ভারতবর্ষের হয়তো এটা পরম সৌভাগ্য ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রাম এবং গ্রামের মানুষ এখনো মধ্যযুগের চিন্তা-ধারার মধ্যে বাস করে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক এখনো অশিক্ষিত, ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক বোকা। যদি এই নিঃস্ব মানুষগুলো বিংশ শতাব্দীর চিন্তা পেত, যদি তারা প্রকৃতমনের জীবনোপভোগের জন্য তৃষার্ত হয়ে উঠত, যদি তারা ভাষা পেত, কণ্ঠ যদি তাদের অনিরুদ্ধ হতো—[illegible]র্ষের পলিটিক্যাল নেতারা পালাতে পথ পেতেন না। এই গ্রামীণ মানুষগুলো চুপ করে থেকে সরকারের বোঝা কতই না লাঘব করে দিয়েছে।

একদিকে তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা হল। অন্য-দিকে তৃষ্ণা নিবারণের কোন উপায় নির্ধারিত হল না। টেণ্টালাসের দুঃসহ তৃষ্ণা নিয়ে প্রকৃত দুঃখ মাঝখানের মানুষগুলোর। যারা ইতিহাস পড়েছে, সাহিত্য পড়েছে, দর্শন পড়েছে, সমাজতত্ত্ব পড়েছে, জীবনঘটিত সব-বিদ্যাই যাদের আয়ত্তে, মানুষের বাঁচার বিচিত্র আয়োজনের কথা যার জানা, জীবনকে সুন্দর করে তোলার তৃষ্ণা যার আকণ্ঠ—সে নিজেই পরম অসহায়। তার পা-রাখার মাটি নেই। অপ্রশস্ত ঘর। ঘরে আলো নেই, হাওয়া নেই। সে আনন্দের অবকাশ থেকে বঞ্চিত। তার চোখের সামনেকার প্রাচীর দিগন্তের সবুজকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে বিশ্রাম নেই, বন্দী সে আষ্টেপৃষ্ঠে।

ইজম্-এর কথা বাদই দিলাম, মানুষের সাধারণ বুদ্ধির কাছে, নিম্নতম সহানু-ভূতির কাছে, অল্পসংখ্যক মানুষের সঙ্গে বাকি মানুষের এই যে ব্যবধান, তা এক বিস্ময়। অথচ দেশের মান মর্যাদা যাদের দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে, তারা এই মাঝখানের মানুষ। যতক্ষণ পর্যন্ত অংকুরে, ততক্ষণ জল হাওয়া আলো জুটবে না। অন্তরালের ব্যথা কাটিয়ে যেই প্রকাশিত হয়ে পড়ল—অমনি দাবিদারের আর অভাব রইল না। প্রগতির যে কোন কথাই হোক না কেন, শাসনের সমুদ্যত দণ্ডী পিঠ চাপড়ানো বুলি এই মানুষগুলোকেই শোনান। অথচ কতটুকু আয়োজন হয়েছে এই মানুষগুলোর জন্য? সাহিত্য ও শিল্পের নব নব প্রয়াস, নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষা, খেলায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, বিশ্ববিখ্যাত ছায়াছবির উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক চিন্তার আজো আমাদের দেশে যে-উৎস, তা এই মধ্যবিত্তের গৃহপ্রাঙ্গণ অথচ সরস বাঁচতে পাওয়ার সৌভাগ্য আজো এদের হল না।

ঠিক এইখানে আমাকে কিছু ভুল বোঝার অবকাশ আছে। আমি বলছি, সবকিছু নব নবীন প্রয়াসের মেরুদণ্ডে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন—তারা খেতে পান না এমন বলছি না (খেতে পাচ্ছেন এটা ধরে নিয়েই আমার বক্তব্যের শুরু)—খেতে পাওয়া ছাড়াও-যে মানুষের আনন্দের মুক্তির একটা জগৎ আছে সে জগতের সন্ধান তাদের অজানিত রইল। তারা কোনদিন সমুদ্রে যাবে না, কোন শৈলশিখরের প্রত্যুষের কি সন্ধ্যার আলো কোনদিন তাদের মন ভরিয়ে দেবে না, শহরতলীর নির্জন ঘরে বসে কোন গভীর শিল্প-চিন্তার অবকাশ তাদের জীবনে আসবে না। এও একটা দুঃখ আজকের সচেতন মানুষের মধ্যে আছে। কেউ সেটা প্রত্যক্ষত জানে, কেউ বা জানে না।

এই যে অপ্রশস্ত জীবনযাত্রা, এর একটা প্রত্যক্ষ বিষময় ফল আছে। সেই ফল আজ ফলতে শুরু করেছে। সামাজিক উচ্ছৃংখলতা গুণ্ডামি, ইতরতা, নীতিহীনতা, ব্যভিচার, অ-নাগরিক মনোভাব গাঢ় হয়ে সমাজ দেহে লেগে গেছে। চিরকাল মানুষ মনমরা, ম্লান হয়ে মানসিক শীর্ণতাকে স্বীকার করে নিতে পারে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, অস্থির জীবনের চাপ মানুষ বহুকাল সইতে পারে না। সইতে চায়ও না। তাই নিজের প্রয়োজনেই মানুষ আনন্দের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। সেই পথ যদি স্বাভাবিক না হয়, আনন্দ প্রকৃতি বিরুদ্ধ পথ দিয়েই আসে। আজকে কি তাই হয়নি?

আনন্দের যখন যথার্থ ভূমি পাওয়া গেল না—তখন উচ্ছৃংখলতার মধ্যে আনন্দ খোঁজা শুরু হল। তাই যদি না-হবে পুলিশের সঙ্গে মনোমালিন্যের সুযোগে ট্রামগাড়িতে কেন আগুন লাগানো হবে? সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিয়ালদহের চারপাশে যে উচ্ছৃংখলতা লেলিহান আগুনের মত সেদিন মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আমি মানতে রাজি নই তা একদিনের একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তলে তলে অনেক ক্ষোভ জমেছিল অনেক দিনের। এই যে শহরতলি থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কোনক্রমে জীবন হাতে নিয়ে ঝুলতে ঝুলতে ট্রেনে করে কলকাতার কলেজ-গুলোতে পড়তে আসে, আবার সন্ধ্যায় খালি পেটে অনিয়মিত ট্রেন ধরে অনিয়মিতভাবে বাড়ি ফিরে যায়, সত্যি তারা কলেজগুলোতে এসে কি পায়?—শিক্ষা? আনন্দ? অনুপ্রেরণা? বোধ হয় এক বিন্দুও নয়। যদি একটা কিছুও পেত, বোধ হয় এত সামান্য ছুতোয় বিনা বিচারে তারা শিয়ালদহে রওনা দিতে পারত না। তবে যে রওনা দিয়েছে তার স্পষ্ট দুটি কারণ দেখতে পাচ্ছি: (১) কলেজে ক্লাস করতে হবে না—এই এক আনন্দ, (২) একটা কিছু ঘটনা ঘটবে বা ঘটাবে, তার আনন্দ। সর্বশেষে ট্রামে আগুন লাগানোর ঘটনা দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। কিন্তু তাও দুর্বোধ্য নয়। এও এক ধরনের আনন্দ, যা প্রকৃতিতে বীভৎস এবং এর উৎস চরম ফ্রাস্ট্রেশান এবং পারভারশান। কথায় আছে দীঘি বড় হলে মাছও বড় হয়। ছুটতে না-পেলে মাছ বড় হয় না। একথা মানুষের পক্ষেও এক অর্থে গভীরভাবে প্রযোজ্য। আমাদের বিচরণ ক্ষেত্রের প্রসার, বিস্তৃত ভৌগোলিক পটভূমি কোনদিনই ছিল না। ধর্মাচরণ ব্যাপদেশে কোন কোন ধর্মগুরু প্রাদেশিকতার সেতুকে আসমুদ্র হিমাচল প্রলম্বিত করেছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্রতর গৃহকোণই চিরকাল আশ্রয় ছিল। আমাদের গৃহকোণী মনোবৃত্তি আমাদের এমন করে পেয়ে বসেছিল যে, অন্যের সমুদ্র যাত্রাকেও আমরা পাপ বলে ভাবতে শিখে-ছিলাম। একটা জাতি যখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে নূতন পৃথিবীর চিন্তা করেছে, তখন আমাদের পাড়ায় পাড়ায় অন্ধ সংস্কার, ঈর্ষা, দলাদলি, কুচক্র আশ্রয় পেয়েছে। মনঃক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থান-নিরপেক্ষ হলেও মূলত সে অবস্থান সাপেক্ষ। দেহ যদি চলে মনও চলবে। দেহ যদি না-চলে মন ঐখানেই এমন একটা কুণ্ডলী তৈরি করে নেবে—যার থেকে অনেক বিষময় ফল ফলতে আমরা দেখেছি। আমাদের সমাজ-চেতনার ইতিহাস কলঙ্কিত বিষক্রিয়া এবং বেদনারই ইতিহাস। আমাদের দেশে মানুষ দেশটাকে নিজের বলে পেল না, কোন দিনই। অতীতে যারা মরেছে বর্ণবিদ্বেষের জাঁতাকলে এখন তারাই মরছে অর্থনৈতিক চাপে। বস্তিতে যে মানুষ-গুলো দিন কাটায়, পশুর মত, তাদের জন্য সামান্য অনুভবশীল, যদি কয়েকজন প্রতি-নিধিও থাকতো সরকারী পরিকল্পনার আসরে, তাহলে পনের বছর স্বাধীনতায়, তাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপর বরাত দিয়ে সারতে হতো না। গত পনের বছর আমরা নাকি অনেক বন্ধ্যা বৃক্ষেও ফুল ফুটিয়েছি; না-হয় যেন সত্যি হল তাই—কিন্তু তা বলে দীর্ঘ পনের বছরেও নারকীয় বস্তিজীবন থেকে কেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হল না? কোনদিন সম্ভব হবে এমন আয়োজনও দেখছি না।

অথচ আমরা বোধ হয় সবাই জানি, এই অন্ধকারের অন্তরালে বিচিত্র পাপচক্রের সুড়ঙ্গ বহুদূর পর্যন্ত শিরা-উপশিরায় প্রসারিত। এই পাপচক্রের সুরভিত বায়ু-মণ্ডলে যারা জন্মমুহূর্তে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে আসছে, তাদের কাছ থেকে সুস্থ জীবনবোধ আশা করা পরিহাস মাত্র। অথচ এমন দরদী মানুষ আমার দেশে দুর্লভ হলো, যিনি আমাদের সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি, আকাশ আলো বাতাস মাটির প্রতিশ্রুতি দেবে। এমন মরমী মানুষ কবে আসবে, যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বলতে পারবে, রাজনীতি জীবনের চেয়ে অনেক ছোট, যে আমাদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে মানুষের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

আজকের তরুণদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি মহান কর্মপ্রবণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, শৃংখলাবোধ, চারিত্রিক সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করে—এমন ধরনের বক্তৃতা উচ্চমঞ্চের নেতা-দের কাছ থেকে প্রায়শই শোনা যায়। কিন্তু এই নেতারা উচ্চমঞ্চে বাসা বেঁধেছেন বলেই দেখতে পাচ্ছেন না। কী গভীর হতাশা, অবিশ্বাস, বিরোধী বিশ্বাসের অন্তর্দ্বন্দ্বে আজকের তরুণ মন বিক্ষত। রাষ্ট্র বা জাতির কাছ থেকে তারা যে উদাসীনতা পেয়েছে, আজ সেই উদাসীনতার মূল্যেই রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দেনা শোধ করছে। আজ যাদের পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স, কী তারা পেয়েছে? জন্ম তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল অত্যাচারের যুগে। কয়েক বছর কাটতে না-কাটতেই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর এদেরই দেহ মনের উপর দিয়ে উদ্ধত রথচক্র চালিয়ে গেল, সেই আঘাত সামলে নিতে না-নিতেই এল দেশ বিভাগের দুঃসহতম অধ্যায়। সেই রক্তস্রাবী অঙ্গচ্ছেদ, আমাদের দেহমনকে অসাড় করে রেখে গেছে। তবু সেই অচৈতন্য

দেহেই আঘাত পনের বছর ধরে একটানা-বেকারী, দুর্নীতি, কালো বাজারী, রাজনৈতিক কোন্দল, দুষ্টের পালন আর শিষ্টের দমন।

কাজেই এদের নিয়ে আর দুঃখ বা ক্ষোভ করে লাভ নেই। যদি সদিচ্ছা কিছু থাকে, পেছনে যে শিশুচোরাগুলি রয়েছে, যদি উপযুক্ত জল হাওয়া আলো দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে তোলা যায়, তবু একটা সান্ত্বনা। শিশু এবং কিশোররা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এমন ধরনের কথার কথা বলে কোন লাভ নেই, প্রকৃতই এদের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। আমরা জানি বাংলা দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা নব্বই জন প্রতিদিন ঠিকমত খেতে পায় না, পুষ্টিকর খাদ্যের কথা বাদই দিলাম। কাজেই যে খেতে পায় না, সে কেন দেহে মনে পুষ্ট হয়ে উঠছে না—এ আক্ষেপ অবোধের।

দ্বিতীয় কথা হল শিক্ষার জন্য একটা সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন। যে পরিবেশের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। দুঃখ করে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, আমাদের স্কুল ও বাড়ির মধ্যে ট্রাম চলে, কিন্তু মন চলে না। সে অনেক কাল আগের কথা। এ কথার সত্যতা অনুভব করে সেদিন পরাধীনতার নামে আমরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। কিন্তু আজ যখন ভাঙাগড়ার সব দায়িত্ব আমাদেরই হাতে, তখনও আমরা শিশুদের জন্য কি করতে পেরেছি? প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে একটা সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম পর্যন্ত আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

কলকাতায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি দুঃসহ কষ্টের দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় খেলাধুলো করার মত সামান্য জায়গা তারা পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের খেলাধুলোর স্থান কোন গলি অথবা বাড়ির সামনেকার রাস্তা। স্কুলবাড়ির কোন আকর্ষণ তাদের কাছে নেই। একটু বড় ছেলেদের খেলাধুলোর মাঠ নেই—খেলাধুলোর আয়োজন তারা পায় না। অথচ সমগ্র কলকাতায় জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। বড় ছোট নির্বিশেষে এত লোকের জন্য আলো হাওয়ার মুক্ত অঙ্গনের একান্ত অভাব। অথচ এখনো সমগ্র কলকাতায় যে পরিমাণে খালি জমি পড়ে আছে, তা দিয়ে আর কিছু না-হোক ছোটদের অভাব নিশ্চয় পূরণ করা যায়। মনে রাখতে হবে যে, ছিটেফোঁটা জমিগুলো এখনো খালি পড়ে আছে, এই প্রচণ্ড জনসংখ্যার কলকাতার গলি ঘুঁজিগুলিতে এখনো সে-পথেই আলো হাওয়া খেলে। এ পথেই, এখনো ছেলেমেয়েরা অক্সিজেন কিছু পায়, আকাশ আলোর আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ অনুভব করে। পারেন না-কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জনকল্যাণের নামে এই জমিগুলো দখল করতে? পারেন নাকি এই জমিগুলো প্রত্যেক পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সংরক্ষিত করতে? কলকাতায় যেখানে পা-ফেলার জায়গা ক্রমশ কমে আসছে, একটু শান্ত প্রকৃতির জনবিরল সুস্থতার মধ্যে বসে নিঃশ্বাস গ্রহণ যেখানে অসম্ভব কল্পনা, সে দেশে রেস খেলার নামে গলফ্ ক্লাবের নামে গুটিকতক ধনীর চিত্ত নন্দিত করার জন্য কি করে হাজার বিঘা জমি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখে? কার পৃষ্ঠপোষকতায় আজো এই অসহনীয় ব্যবস্থা চলে? বিধানসভার দুশো বাহান্ন জন প্রতিনিধির হাতে এমন কোন ক্ষমতা কি নেই যে ক্ষমতা বলে টালিগঞ্জের হাজার হাজার শিশুর নামে ঐ অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া যেতে পারে?

এ একটা সাময়িক উত্তেজনা বা আবেগের কথা নয়। এ আমাদের বাঁচবার কথা। মানুষের অপরিসীম শক্তির তড়িৎ প্রবাহকে বিচিত্র পথে বিন্যস্ত করতে হবে। তবেই সৃষ্টির সবদিক খুলে যাবে। তা-যদি না হয় আগুন লাগবেই। শত সতর্কতার ছিদ্রপথ দিয়ে হলেও আগুন লাগবে।

যদি সদিচ্ছা থাকে—(১) স্টেডিয়াম করো ফুটবল আর ক্রিকেটের। বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলের মানসিক শক্তি সুস্থ এবং স্বাভাবিক পথ খুঁজে পাবে। (২) প্রত্যেকটি কলেজ এবং স্কুলকে খেলার মাঠ দাও, খেলার আনুষঙ্গিক সুব্যবস্থা হোক, লেখাপড়ার মতই স্কুল কলেজগুলি যদি এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেতন থাকে, আজকের দিনের ভিত্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার মূল উৎপাটিত হয়ে যাবে। (৩) কলেজ লাইব্রেরীগুলিতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পড়াশুনার সুন্দর ব্যবস্থা কর[া] হোক। অল্প পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্যে[র] ব্যবস্থা করে এবং আনুষঙ্গিক আয়োজন হলে রক, রাস্তা এবং চায়ের দোকানের আকর্ষণ ছাত্রদের কাছে শিথিল হতে বাধ্য। (৪) পাড়ায় পাড়ায় যে সমস্ত ক্লাব [ও] লাইব্রেরী আছে, তাদের উপযুক্ত সাহায্য কর[া] হোক। প্রত্যেকটি ক্লাব লাইব্রেরী য[দি] পনেরটি ছেলেরও হৃদয়কে আকর্ষণ কর[তে] পারে, তাহলে তরুণদের বিপথগামিতা[র] সমস্যা দু দিনে আমরা ভুলে যাব। (৫[)] পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জ[ন্য] চিলড্রেন পার্কের ব্যবস্থা হোক, শিশুরা দে[হে] মনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবার অবকাশ পাবে[।] (৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অন্ততপক্ষে পুষ্টিকর জলযোগের ব্যবস্[থা] করা হোক। তাছাড়া আধুনিক ও সুচিন্তি[ত] উপায়ে শিক্ষায়তনগুলির প্রতি শিশুমনে[র] আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা হোক[।] (৭) কর্মক্লান্ত মানুষের জন্য যেখানে য[া] মুক্ত অঙ্গন আছে, খুলে দেওয়া হোক।

আপাতত এ হলেই অনেকখানি হ[য়ে] যাবে। তারপর জীবনমান উন্নয়নের জ[ন্য] পরিকল্পনার হাত প্রসারিত হোক। ঐটু[কু] যদি না-হয়, তা হলে নিশ্চয় স্মরণ কর[া] প্রয়োজন আছে: ভরাট করা সমুদ্র ও উচ্ছেদ করা অরণ্যের জগতে কী লাভ গ[ড়ে] ক্রিমীকীটের সভ্যতা, লালন করে দ্বিতী[য়] দীর্ঘ পরমায়ু কচ্ছপের মত?

আলোচনা

ভাষা সমস্যা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

'দেশ' পত্রিকার ৩রা কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "ভাষা সমস্যা" সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইংরেজী ভাষাকে এ দেশে প্রচলিত রাখবার পক্ষে সমর্থন জানানো হয়েছে। এর আগেও ইংরেজী ভাষাকে ভারতে বহাল রাখবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ আপনার পত্রিকায় পাঠ করেছি।

ইংরেজী ভাষাকে এদেশে প্রাধান্য দিতেই হবে—এই মনোভাব আজকাল একদল লোকের মধ্যে দেখা যায়। এতদিন ইংরেজী ভারতের প্রধান এবং রাজভাষা ছিল সেজন্য এখন তাকে রাজভাষার সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হলেও অন্তত সরকারী এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে প্রধান ভাষা হিসাবে মান্য করতে হবে। এটা অবশ্য নরম বা মধ্যপন্থী দলের দাবি। এমন বিজ্ঞজনের খোঁজও পাওয়া যায় যাঁরা ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করবার সমর্থন জানিয়ে থাকেন।

কিন্তু কেন? যে দেশে শতকরা আশি জন নিরক্ষর—সেখানে এমন অন্যায় দাবি কেন? তাঁরা কি মনে করেন যে, কোনো ভারতীয় ভাষা শেখার চেয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা সহজ? না, এতদিন বিদেশীদের দাসত্ব করে, তাদের বুলি মুখস্থ করে, নিজস্ব সত্তা বিসর্জন দিয়ে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ইংরেজীর [illegible] অতীত, বর্তমান এবং [illegible] ভারতকেও মাতৃভাষায় চিন্তা করা থেকে বঞ্চিত করাই শ্রেয় মনে করেন? বিদেশী ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য কি অন্য কোনো পথই নেই? পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে আছে কি, যে বিদেশী ভাষাকে আঁকড়ে ধরে বড় হয়েছে?

সন্দেহ নেই যে, ভাষা হিসাবে ইংরেজী পৃথিবীর উন্নততম ভাষাগুলির অন্যতম। এবং ভারতে তার চর্চা হওয়াও উচিত। কিন্তু এই যুক্তিতে নয় যে, ইংরেজী বর্জন করলে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগ-সূত্র ছিন্ন হবে। কারণ, বহির্জগৎ বলতে শুধু ইংরেজী ভাষা প্রচলিত দেশগুলিই বোঝায় না। ইংরেজী সমর্থকরা হয়ত বুক ফুলিয়ে বলবেন যে, পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু একথাও গৌরবের নয়। ইংরেজী ভাষার সমর্থকগণ ইংরেজী ব্যবহৃত অঞ্চলে যতই সুখ-সুবিধে পান, অন্যত্র সর্বক্ষেত্রেই একই প্রশ্ন—তোমাদের কি নিজেদের কোনো ভাষা নেই? এর উত্তর কি? ইংরেজী কি আমাদের ভাষা? ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কি তার সম্পর্ক?

ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ভাষা সম্বন্ধে কিরূপ সচেতন তা বলাই বাহুল্য। সেখানে স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষা ছাড়াও অন্ততঃ একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু সেটা একটি বিদেশী ভাষা শিখবার উদ্দেশ্যেই। সেখানে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলি শেখাবার ব্যবস্থার সম্ভাবনা কল্পনারও অগোচর। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ভাষাও মাতৃভাষাই। অন্যান্য দেশ থেকে যখন সেখানে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার্থে ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তখন প্রথমেই দাখিল করতে হয় সে দেশের ভাষা-জ্ঞানের প্রমাণপত্র। জার্মানীতে পাঁচ বছর আগেও শুধু বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু ইদানীং তাও হয় না। জার্মান ভাষা না জানলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন, সাধারণ কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রেও প্রবেশ দুঃসাধ্য। এর থেকে কি ধরে নিতে হবে যে, ইউরোপ অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগসূত্রবিহীন?

পাশ্চাত্ত্যের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। কারণ, সেখানকার সব দেশই আমাদের চোখে "ডেভেলপ্ড্"। এশিয়ার বা আফ্রিকার এমন দেশের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় যেখানে দেশী ভাষাকে সরকারী, বে-সরকারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি উচ্চস্তরের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাতেও লাগানো হয়েছে। মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে পথ হারিয়ে ঘণ্টা কয়েক ঘুরপাক খেলাম। রাস্তায় এবং গলিতে অবশ্য নাম লেখা ছিল। কিন্তু তা পড়তে পারার সাধ্য আমার ছিল না। শুনলাম, সেখানে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা।

ভারতে ইংরেজের সঙ্গেই ইংরেজীর আগমন। দুই শতাধিক কাল অল্প নয়। তাই এদেশে বিদেশী হলেও ইংরেজী ভাষা সমাজের ক্ষুদ্রাংশকে মোহিত ও বশীভূত করে। আগেকার যুগে ইংরেজী শিখলে নানা সুখ-সুবিধে ছিল। তাই তখন অনেকটা দায়ে পড়েই ইংরেজী শিক্ষা করতে হতো। কিন্তু সত্যকারের ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই থাকতো না। আজও প্রায় সেই অবস্থা! আপত্তির কোনো কারণ ঘটে না, যদি বাস্তবিক ইংরেজী সাহিত্য অথবা জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা বা অনুসন্ধানের জন্য ইংরেজী অধ্যয়ন করা হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ব্যবহার করা হচ্ছেই—অনেক তথাকথিত 'পাব্লিক স্কুলেও'ও এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষায়তনগুলি থেকে যে সকল ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন সমাপ্ত করে থাকেন তাঁরা দেশের সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অপেক্ষা অধিক মেধাবী, শিক্ষিত বলে পরিচিত হন। তারপর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার শেষ সোপান অতিক্রম করেন। ইংরেজী ভাষার দ্বারা 'শিক্ষিত' এই সম্প্রদায় নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হন। এ'দের সংখ্যা হাজার হাজার হলেও ভারতের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে এ'দের পরিচয় বা কোনো আদান প্রদানই সম্ভব হয় না। বিদেশী শিক্ষার দম্ভে এ'রা এতদিনের বিদেশী শাসকদের মনোভাব ত্যাগ করতে পারেন না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে এ'রা আজও সদর্পে বলতে পারেন, "আমরা আমরা, তোমরা তোমরা।"

ইংরেজীকে ইংরেজী বলেই বর্জন করা দরকার কি? নিশ্চয় না। ইংরেজীকে অ-ভারতীয় বলে সরানো দরকার। আমাদের এর 'সাংস্কৃতিক দাসত্বে'র থেকে মুক্ত হতে হবে। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হোক, যেমন জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা সাহিত্যচর্চা বা কোনো বিশেষ বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয়। তা হলে প্রকৃত ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটবে, সেটা হবে পরম লাভ। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যে বাংলায় বক্তৃতা দেন তার অংশ-বিশেষ ছিল, "বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটি প্রধান উপায়—শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?"

বিনীত
রাধেশ্যাম পুরোহিত
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা

সবিনয় নিবেদন,

১২ই আশ্বিন তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী "রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা ভাষা" প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের বানান সম্পর্কে তাঁর একটি ধোঁকা আমার ওপর সমাধানার্থে ন্যস্ত করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। ধোঁকাটি এই—রবীন্দ্রনাথ পূরবীর পাণ্ডুলিপিতে সায়াহ্ন, চিহ্ন, বহ্নি, মধ্যাহ্ন লিখেছেন কেন যেখানে সায়াহ্ণ চিহ্ণ ইত্যাদি হওয়া উচিত ছিল।

এক্ষেত্রে নতুন কিছু আলোকপাত করা যে সম্ভব নয়, তা ডক্টর আলী নিশ্চিতরূপে জানেন বলেই আমার মনে হয়। হ্ন এবং হ্ণ-এর পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ জানতেন না—এ সত্যিই অবিশ্বাস্য। তথাপি, তিনি কখনো কোনো লেখায় কিছুমাত্র ভুল করতে পারেন না, এ কথা আমরা ধরে নিতে পারি না। বানানের নিয়ম সম্পর্কে তাঁর ধারণার কোনো অস্পষ্টতা ছিল না—একথা এখনো দৃঢ়ভাবেই বলবো। চিহ্ন ইত্যাদি বানান সম্ভবত কবিতা লিখবার সময়ে ব্যাকরণের প্রতি সাময়িক অনবধানতার ফলে তিনি লিখেছেন। ছাপা হওয়ার পরে 'চিহ্ণ' এই সতর্ক পরিবর্তনকে তিনি সমর্থন করেছেন, তাও ধরে নেওয়া যায়। তাছাড়া হ্ন ও হ্ণ অনেকটা বাংলা হরফের কারসাজি। এমনও হতে পারে আলাদা করে লিখলে তিনি চিহ্ণ-ই লিখতেন। হ্ণ-এর আকড়িটুকু যে ন-এর পরিচায়ক এবং হ্ন-এর নীচে ছোটো করে ণ লিখলে যে সেটা ণ বলেই পরিগণিত হবে—একথা তাঁর জানা ছিল না ধরে নিলেও বলা চলে না যে তিনি তৎসম শব্দের নিয়ম জেনেশুনে অগ্রাহ্য করেছেন।

আমার রবীন্দ্রসাহিত্যের জ্ঞান সামান্য। তথাপি ডক্টর আলীর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাতে চাই যে রবীন্দ্রনাথও 'প্রসারতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দ্রষ্টব্য—ইউরোপে যাত্রীর ডায়ারি (নতুন সং খসড়া অংশ) ২৪১ পৃষ্ঠা, ৪র্থ পংক্তি। এই শব্দটির আর একটি ব্যবহার দেখি রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ডে ৭২ পৃষ্ঠা ৩য় পংক্তিতে মোহিতচন্দ্র সেন-কৃত কবির কাব্যগ্রন্থ ভূমিকার উদ্ধৃতিতে। আর একটি ব্যবহার—অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের শিল্পলিপি গ্রন্থে ৩০ পৃষ্ঠায়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমরা কি ভাবতে পারি যে এই শব্দের লেখকেরা শব্দটির অশুদ্ধি সম্পর্কে বরাবর অজ্ঞ? ভুল যে কোনো মানুষের হতে পারে। কিন্তু সার কথা এই, এঁরা 'প্রসারতা' লিখলেও এরা নিত্যশ্রদ্ধেয়, কারণ জিজ্ঞাসিত হলে প্রসারতা অশুদ্ধ পদ—একথা এঁরা স্বীকার করতেন; অন্তত আমার এই বিশ্বাস। ইতি।

বিজয়া দাশগুপ্ত
কলকাতা-১৯

অ স্তি ত্ব

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মৃত্যু উপস্থিত সম্ভাবনা;
আমার অস্তিত্ব তার হাতে ধ্রুব, স্থির।
আমি তাই ভবিষ্যতে-বিম্বিত-শরীর,
যেন তার প্রতি আলোকণা
অতীতে সঞ্চিত হয়ে হয় ইতিহাস।
নতুবা এ প্রভু পৃথিবীর ক্রীতদাস
হতে হবে মুক্তি-বিনিময়ে।
আর কোনো প্রজ্ঞা নেই, নেই কোনো প্রেরণা হৃদয়ে
আমি আর ভবিষ্যৎ ছাড়া।
সময়ের বেষ্টিত পাহারা
পার হয়ে হব আমি উজ্জ্বল সময়:
মৃত্যুকে শিয়রে রেখে এ সত্তার নেই আর ভিন্ন পরিচয়॥

দু'টি ক বি তা

দীপক মজুমদার

১

দূরে কাছে কেউ নেই অমল বিক্রেতা
হেঁটেছি সমস্ত রাত কথা শুধু কথা
লুপ্ত গান।
প্রতিদিন তোমার আড়ালে
শিরীষ ছায়ার মুখ নম্র নীরবতা
চুম্বন আলোর হাতে প্রদীপের গালে
শিখার প্রণত ওষ্ঠে, চোখে, শ্লোকে শ্লোকে
মহাঘণ্টা বেজে যায় মঙ্গল চিবুকে
ঋতুর ঋতুর ফুল কেবলি ঝরায়।

২

কোনো তৃষ্ণা নেই বুকে নেই
কোনো সংজ্ঞাহীন স্বর নেই
কী আশ্চর্য বলছি কিছু নেই
শব্দগুলি কেবল ঘোষণা।

বিরাট স্টেশনে লক্ষ রেখা
অকেজো বাক্যাংশগুলি একা
অসম্ভব শুনতে পাওয়া, শেখা
অতি দ্রুত বেতার বর্ণনা।

তবু বৃথা অন্ধকার ঘরে
তোমার চৈতন্য-গন্ধ ঝরে
এখনি বজ্রের মতো স্বরে
ভেঙে পড়বে অখণ্ড রচনা।

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১ ॥

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে!"

অবশেষে জীবনলাল সত্য সত্যই পথে বের হয়ে পড়লো। তখন বেলা হবে নয়টা, চৈত্রমাসের রোদে আকাশ ছাপিয়ে গিয়ে এত বড় পৃথিবীটার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। লোহার পুলটা দিয়ে গোমতী নদী পেরিয়ে এসে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে লখনৌ শহরের দিকে তাকালো, দেখতে পেলো অর্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর দক্ষিণ ধার বরাবর লখনৌ শহরের উচ্চাবচ প্রাসাদমালা। পশ্চিম দিক থেকে শুরু করলে প্রথমেই শিশমহল, তারপর মচ্ছি ভবন, তার পিছনে বড় ইমামবাড়া, আর একটু দূরে এলে রেসিডেন্সি, ফরহাদ বক্‌শ প্রাসাদ, ছত্তর মঞ্জিল, তারপরে মোতিমহল, সাহনজফ, সবচেয়ে দূরে কদম রসুল। প্রথম সারের পিছনে কেসর বাগ, ইমামবাড়া, সেকেন্দ্রাবাগ, নবাব কি কোঠির কতক চোখে পড়ে, কতক আভাসে বুঝে নেয় অভ্যস্ত চোখ। কতবার এই দৃশ্য সে দেখেছে, গোমতীর উত্তর তীরে হাজারিবাগের কাছে দাঁড়িয়ে। আজ আর একবার দেখে নিল, সে ভাবলো হয় তো এই শেষবার, আর যে লখনৌ শহরে ফিরবে এমন ইচ্ছা তার ছিল না, অন্তত শীগগীর তো নয়ই। উত্তর মুখে রওনা হওয়ার আগে আরও একবার দৃশ্যটা দেখে নেবার ইচ্ছায় ফিরে তাকালো শহরের দিকে। নদীতীরের এই দৃশ্য তার মনে এনে দিল নদীতীরের আর এক শহরের ছবি। কতবার সে গঙ্গায় বজরার ছাদ থেকে কাশীর দৃশ্য দেখেছে। সে-ও এমনি, তবু ঠিক এমনি নয়। এখানে শহরটা আর নদীর জল প্রায় সমতল। কাশীতে নদীর জলের মধ্য থেকে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি—উঃ কত উঁচুতে, তারপরে বাড়িগুলো, তাদের উচ্চতাও কম নয়। ঘাটে সিঁড়িতে বাড়িতে মন্দিরে মসজিদে, হ্যাঁ মসজিদও আছে বই কি, হিন্দুরা যার নামকরণ করেছে বেণীমাধবের ধ্বজা—সেও এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি দৃশ্য। কতবার তার মনে হয়েছে- সমস্ত শহরটা অনেক উঁচু থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ছে নদীর জলে। আর এ লখনৌ শহর নদীর তীরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীর শহর যদি স্নানার্থী, লখনৌ শহর বেড়াতে বেরিয়েছে নদীর ধারে। কিন্তু না বেশী ভাববার সময় তার ছিল না, আম্বালা পেঁছিতে অনেক দিন সময় লাগবে। তবু কি ভেবে আর একবার এসে দাঁড়ালো লোহার পুলটার উপরে। তিনটা পুলের মধ্যে এটাই সবচেয়ে হালের—এখনো খোদাই করা তারিখ বেশ স্পষ্ট পড়তে পারা যায়। শিশমহলের কাছে যে পুরানো পাথরের পুল আছে সেটা দিয়ে পার হলেই তার পথ অনেকটা কম হতো—অবশ্য ফরহাদ বক্‌শ প্রাসাদের নৌকার পুলের প্রশ্নই ওঠে না, অনেকটা পথ বেশি হাটতে হয়, তবে যে লোহার পুলটা নির্বাচন করেছিল তার কারণ আছে। বছর দুই জংগী বিভাগে, তার মধ্যে শেষ বছরটা আবার রেসালাদার মেজর (Cavalry Officer) পদে কাজ করবার ফলে আগে থেকে পরিকল্পনা স্থির করে কাজ করতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই লোহার পুলে পার হওয়াটা আকস্মিক নয়, তবে বাস্তব অনুমোদনও যে এমন কিছু আছে তা-ও নয়, ব্যাপারটা নিতান্তই একটা করুণ বিদায়ের স্মৃতির সংগে জড়িত। বছর খানেক আগে, না, এক বছরের কিছু বেশিই হবে, মানসাঙ্কে গণনা করে

...ল চমকে উঠল—কি আশ্চর্য, পুরোপুরি ঠিক তেরো মাস, সে তারিখটা ভুলতে পারবে না লখনৌ-এর কোন অধিবাসী, অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শা ঐ পুল দিয়েই নদী পার হয়ে লখনৌ পরিত্যাগ করেছিলেন। সে স্থির করেছিল সে-ও যখন লখনৌ পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছে ঐ পুল দিয়ে নদী পার হওয়াই সমীচীন। ওয়াজিদ আলি শার সঙ্গে নিজের তুলনায় হাসিতে তরঙ্গিত হয়ে উঠল সূক্ষ্ম কোমল গোঁফের রেখা। ওয়াজিদ আলি শা-ই বটে। তারপরে ভাবলো তাহলে তুলনাটা আরও একটু টেনে নেওয়া যাক না কেন। তখনই গুনগুন সুরে গান ধরলো—

> জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী
> তব হালে আলি পর ক্যা গুজরী,
> মহল মহল মে বেগম রোয়ে,
> জব হাম গুজরে দুনিয়া গুজরী॥

ওয়াজিদ আলি শার বিদায়ের পরে গজলটা লোকের মুখে মুখে ফিরতো, শোনা যায় নবাব নাকি গজলটা তৈরি করে গান করে-ছিলেন শহর ত্যাগের আগে।

নাঃ, আর ভাববার সময় নেই। জোর করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওনা হ'ল উত্তর মুখে। ঐ মুখ ফিরিয়ে নিতে বেশ একটু জোর লাগলো। কতদিনেরই বা তার সম্বন্ধ লখনৌ-এর সঙ্গে, নিজ শৈশবের পাঁচ ছয় বছর আর এদিকে বছর দুই—এই তো। তবু পিতার ইতিহাসকে ধরলে দুই পুরুষ বলতে হয়। হঠাৎ তার মনে হ'ল এই সামান্য ক' বছরের সম্বন্ধ ছাড়তে যখন এত কষ্ট—চিরকালের জন্য সংসার ছেড়ে যেতে না জানি কত কষ্ট হয়। কথাটা মনে পড়ায় আবার তার হাসি পেলো, সামান্য কারণে এমন কি বিনা কারণে হাসি পাওয়া তার এক রোগ। তখনই আবার হাসি পেলো

যখন মনে পড়লো এক রোগের কত রকম ব্যবস্থা। কাশীতে যখন বেনারস কলেজে পড়তো এই কারণে অকারণে হাসি দেখে অধ্যক্ষ ব্যালেণ্টাইন সাহেব বলতো I don't like grinning fools! আবার এই হাসি দেখেই লখনৌ-এর চীফ কমিশনার স্যার হেনরি লরেন্স বলতেন I like smiling faces। ভৈরব কাকা বলেছিলেন, বাবাজীবন তোমার খুব উন্নতি হবে। হয়েও ছিল তাই। এক বছর নবাবের রেসালায় থাকতে না থাকতে স্যার হেনরি লরেন্স তাকে আনিয়ে নিলেন কোম্পানীর রেসালায়, করে দিলেন রেসালাদার মেজর, দেশী লোকদের প্রাপ্য উচ্চতম পদ। সাহেব ভৈরব চাটুজ্জেকে বলেছিলেন, বেরব, (স্নেহাত্মক নামের বিকৃতি সাধন স্যার হেনরি লরেন্সের এক মুদ্রাদোষ। তাই ভৈরব হয়েছিল বেরব আর জীবন হয়েছিল গীবন)—সাহেব বলেছিলেন বেরব, আমার কাছে রাখবার উদ্দেশ্যে গীবনকে আমি A D C করে নেবো—কারণ I wish to remain surrounded by smiling faces.

ভৈরব জানতো শেষ পর্যন্ত A D C হবেই এমন সময় বিদায় চেয়ে বসলো সে।

অনেক কথা মনে পড়ে জীবনলালের। ভৈরব কাকার কথা মনে পড়তেই মৃত্যু সম্বন্ধে মন্তব্যের মূল মনে পড়ে। এটা ভৈরব কাকার সান্নিধ্যের ফল। তিনি রেসি-ডেন্সির খাজাঞ্চী হলেও আসলে যোগী পুরুষ। দিনমানটা টাকা পয়সা গুণে যে পাপ করেন সারা রাত ধরে জপতপ প্রাণায়ামে চলে তার স্খালন। তখনি মনে পড়ে স্যার হেনরি লরেন্সের কথা। জীবন জানে এই দুই জন ব্যক্তি তার সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে।

সাহেবের প্রকাণ্ড কক্ষ যখন তখন উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠতো, গীবন, গীবন! জীবন স্যালুট করে এসে দাঁড়ালে সাহেব এসে বলতেন, nothing in particular, I like smiling faces!

জীবন চলে যেতেই আবার হয় তো আধ ঘণ্টা পরেই ধ্বনিত হতো গীবন, গীবন।

॥ ২ ॥

একদিন কোম্পানীর গুলিতেই তুই মরবি।

গীবন, এই নাও তোমার পরিচয় পত্র। এখানা সাধারণভাবে লিখিত যাতে সর্বত্র ব্যবহার করতে পারো।

জীবনলাল কৃতজ্ঞভাবে বলে জেনারেল, স্যার, আপনার কাছে আমি ঋণী।

তবে ঋণভার আরও বর্ধিত হোক, এই বলে স্যার হেনরি আর একখানা চিঠি এগিয়ে দেয় জীবনের দিকে।

জীবন চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করে এখানা কি? সাহেব বলে চিঠিখানা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল রিজম্যানের নামে। তিনি এখন ঠিক কোথায় আছেন বলতে পারিনে, তবে দিন পনেরো আগে দেরাদুনে ছিলেন, এখনো সেখানেই থাকা সম্ভব।

তবে কি আমি প্রথমে দেরাদুনের দিকেই রওনা হব?

দেরাদুনের দিকে নয়, মাই বয়, সোজা দেরাদুন যাবে। সেখানে গিয়ে কর্নেলকে না পেলে অন্যত্র সন্ধান করবে। কাজেই আমার পরামর্শ বেরিলি হয়ে দেরাদুনে চলে যাও।

জীবন সবিনয় নিবেদন করে, স্যার, কেমন করে পরিশোধ করবো আপনার ঋণ।

জানতে চাও কেমন করে? সর্বদা মুখের প্রসন্নতা রক্ষা করবে, জীবন ব্যাধির ওর চেয়ে বড় প্রতিষেধক আর নেই। এই বলে সাহেব চুপ করে।

জীবন চেয়ে দেখে তার মুখ গম্ভীরতর হয়েছে। জীবন ভাবে সাহেবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর বিষাদের উৎস। কিন্তু তার অনভিজ্ঞ দৃষ্টি বেশিদূর চলে না। সাহেব হাত দুটো বুকের উপরে আড়া-আড়ি রক্ষা করে পায়চারি করতে থাকে সেই অবসরে জীবন দেখবার তাকে দেখে সে লক্ষ করে স্যার হেনরির কপালের প্রকাণ্ড গম্বুজটা চোয়ালের কাছে অবধি নেমে এসে হঠাৎ সরু ছুঁচলো হয়ে গিয়ে চিবুকে এসে যে সূক্ষ্ম বিন্দুটির সৃষ্টি করেছে তা তেমন লক্ষগোচর হয় না, তার কারণ একগুচ্ছ পাতলা সাদাপাকা দাড়ি চোখ দুটো সর্বদা মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁটে বেড়াচ্ছে। মুখের ভাব সন্দেহ অবিশ্বাস ও অপ্রসন্নতায় মাখানো এমন লোকের কি করে সে প্রিয় পাত্র হয় ভেবে পায় না। তখনি আবার তুলনায় মনে

[illegible] জেনারেল উট্রামের মুখ। মাথাটা [illegible]রের মুণ্ডটার মতো নিরেট আর প্রকাণ্ড—অথচ মুখে প্রসন্নতার অভাব নেই। কালো দাড়ি গোঁফে চুলে মাথা গাল চিবুক বেশ ঘের-দেওয়া। সেই কালো ফ্রেমের মধ্যে স্বাভাবিক প্রসন্নতাকে প্রসন্নতর মনে হয়। তার মনে পড়ে যে উট্রামের সংগে পরিচয় সামান্য হলেও ভৈরব কাকার পরিচয়ে তার কাছ থেকেও একখানা প্রশংসাপত্র পেয়েছে সে।

দেখো গীবন বিদায়ের আগে বন্ধুভাবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিই—এই বলে সাহেব হাত দুখানা লম্বা করে তার দুই কাঁধের উপরে রাখে আর সান্নিপাতিক দৃষ্টি তার মুখের উপরে স্থাপন করে বলে—শীঘ্রই একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠবে।

জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রত্যয়ের মাঝামাঝি সুরে বলে, গ্রীষ্মের ঝড়!

সে ঝড় নয়, সে ঝড় নয়, মাই বয়। তার মুখে ফুটে ওঠে একটা হাসির রেখা। গম্ভীরের হাসি মরুভূমির জলের মতোই মধুর।

অপ্রস্তুত হয়ে গম্ভীর হয় জীবন। নিত্যপ্রসন্নের গম্ভীরতা দাতার কৃপণতার মতোই কৌতুকের বিষয়।

কার্তুজের কথা নিশ্চয় তোমার কানে এসেছে।

ব্যাপারটা তো গুজব।

তার মানে অবাস্তব। এই তো। নিশ্চয় অবাস্তব। কিন্তু গীবন, মেঘে বিদ্যুতে বাতাসে যে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয় মাটি পাথরের তুলনায় সে-ও তো অবাস্তব।

কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না জীবন।

এমন ঝড় হিন্দুস্থানে আগে আর ওঠেনি।

নীরবতা। তার পরে আবার।

কোম্পানীর রাজত্ব বনিয়াদ সুদ্ধ নড়ে উঠবে। অপরের মুখে যা অবিশ্বাস্য সাহেবের মুখে তা প্রত্যয়ের বোধ আনে জীবনের মনে, একটা আশঙ্কার ছায়া খেলে যায় তার মুখে, লক্ষ্য করে সাহেব বলে—না কোম্পানীর রাজত্ব ধ্বংস হবে না, তবে খুব একটা নাড়া খাবে। ব্যক্তিগত বিপদ ও মৃত্যু অবশ্য অনিবার্য।

আবার নীরবতা। তারপরে পুনরায়।

আমার পরামর্শ এই যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে কখনো যেয়ো না, তুমি তো জানো কোম্পানীর গুলি সোজা ছোটে আর আমূল গিয়ে বিদ্ধ হয়।

জীবনের মনে পড়ে খুব ছেলেবেলার কথা। একদিন ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ায় মা জিজ্ঞাসা করেছিল আজ যে দেরি হ'ল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

গুম্‌তী নদীর চরে।

গুম্‌তী নদীর চরে? কি করছিলি?

লড়াই।

কার সংগে রে?

কোম্পানীর ফৌজের সংগে, আমি নবাবী ফৌজের জাঁদরেল।

মা বলে ওঠে, দেখছি একদিন তুই কোম্পানীর গুলিতেই মরবি।

মায়ের ভয় দেখে ছেলে হেসে ওঠে, শুধোয় কেন বলো তো মা?

কেন আবার কি! রোজ রোজ তুই নবাবী ফৌজের জাঁদরেল সাজিস, কোম্পানীর ফৌজের জাঁদরেল সাজতে পারিস নে।

নবাবী ফৌজের পোশাকের ভারি জলুস।

আর কোম্পানীর গুলি যে সোজা ছোটে।

ছুটুক।

ছুটুক কিরে। এখন থেকে স্বভাব যদি না বদলাস তবে কোনদিন মরবি কোম্পানীর গুলীতে।

ছেলে বুঝতে পারে না মায়ের ভয়ের কারণ। গুলি যেমনই ছুটুক পোশাকের জলুসটাই তো আসল। তা ছাড়া মৃত্যুটা শিশুদের কাছে তেমন ভয়াবহ নয়, ওরা যে কেবলি পেরিয়ে এসেছে জীবনমৃত্যুর সীমানা। বয়সের সংগে মৃত্যুভয় বাড়ে, সীমানাটা ক্রমে দূরে চলে যায় কিনা। বৃদ্ধের মতো মৃত্যুভীতি আর কার?

আজ স্যার হেনরির কথায় মনে পড়ে সেই অনেকদিন আগেকার ভুলে যাওয়া কথা, চাপা পড়া মাতৃমুখ।

স্যার হেনরি আবার আরম্ভ করে।

গীবন, নবাবী ফৌজ ভেঙে দেওয়ার পরে যখন তোমাকে কোম্পানীর রেসালায় নিয়ে আসি, ইচ্ছে ছিল বরাবর তোমাকে আমার কাছে রাখবো। কিন্তু কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে রেসালার বড় একটা অংশ কানপুরে পাঠিয়ে দিতে হবে। ক্রমে ক্রমে হয়তো সবটাই পাঠিয়ে দিতে হবে, কাজেই তোমাকে তো আর কাছে রাখা সম্ভব হবে না। তাছাড়া তোমার উন্নতির পথে বাধা জন্মাবার আমার কি অধিকার আছে? বৃহৎ পৃথিবী, বিপুল কর্মক্ষেত্র, যাও বেছে নাও

তোমার আপন পন্থা। God be with ye, my boy?

জীবন আশ্চর্য হয়ে যায়। সে জানতো সাহেবের স্নেহের পাত্র সে, কিন্তু এতখানি স্নেহ ছিল ঐ শুষ্ক লোকটির মনে আবিষ্কার করে সে বিস্মিত হয়ে যায়। শুষ্ক মেওয়া মধুরতর।

আমার দুঃসময়ে তোমার মতো একজন বিশ্বাসী লোক পাশে থাকলে নিশ্চিন্ত হতাম।

আবেগের সংগে বলে উঠল জীবন, যদি ইচ্ছে করেন আমার যাওয়া স্থগিত রাখতে পারি।

নিশ্চয়ই নয়। ভাবাবেগে কোন কাজ করা উচিত নয়। তাছাড়া কে বলতে পারে দূরে গিয়েই তুমি আমাদের বেশি সাহায্য করতে পারবে না।

এবারে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে মনে করে জীবন স্যালুট করে।

সাহেব বলে ওঠে ফাঁকা প্রশংসা পত্রের চেয়েও অনেক বেশি দরকারী একটা বস্তু তোমাকে দিচ্ছি, সাবধানে রক্ষা করো।

এই বলে টেবিলের দেরাজ খুলে বের করে আনকোরা একটি নতুন পিস্তল—

এই নাও, এগুলি সোজা ছোটে আর আমূলবিদ্ধ হয়। কাছে থাকলে অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করে সাহেবের এই দান। তারপরে পুনরায় স্যালুট করে প্রস্থান করতে উদ্যত হলে সাহেব সাগ্রহে করমর্দন করে জীবনের—আর বলে Keep your face smiling, my boy মনে রেখো দুঃসময়েই হাসির সর্বাধিক প্রয়োজন। আর শোনো, গিয়েই অবিলম্বে ভৈরববাবুকে পাঠিয়ে দিতে ভুলো না।

তারপরে কতকটা যেন নিজের মনেই বলে যায়, ভৈরববাবু যদিও জংলী আদমি নয়, তবু আশ্চর্য সাহস আর বুদ্ধি, কাছে থাকলে একশো সৈন্য থাকবার কাজ হয়। জীবন, এমন খুড়ো পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়, এইজন্যে তোমাকে মনে মনে অনেক-বার অভিনন্দন জানিয়েছি। যাও তাকে গিয়ে এখনি পাঠিয়ে দাও।

জীবন জানায় এখনি পাঠিয়ে দেবে।

জীবন বের হয়ে যায়, সাহেব তাকিয়ে দেখে আর অবাক হয়ে ভাবে ছ ফুট খাড়াই মানুষটা, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, ইউরোপীয় গড়নের দেহ, হাড়ে মাংসে পেশীতে এককাট্টা, যেমন সতেজ তেমনি সবল তেমনি সপ্রতিভ, আর রক্তটাতেও ভারতের মাটির চেয়ে ইউরোপের তুষারের মিল বেশি। সবচেয়ে স্মরণীয় তার হাসিটা। I love smiling faces! এমন সময়ে সাহেব চমকে ওঠে, সম্মুখে ঐ চির অপ্রসন্ন লোকটা কে?

সাহেবের ছায়া পড়েছে আয়নায়।

৩

বাজাড়ী-খেলোয়াড় ভৈরব চাটুজ্জে

সাহেবের কথায় তার মনটা চলে যায় ভৈরব চাটুজ্জের স্মৃতিতে। ভৈরব চাটুজ্জে তার আত্মীয় বা জ্ঞাতি নয়, পিতার বন্ধুত্বের সূবাদে কাকা। ভৈরব চাটুজ্জে ব্রাহ্মণ, জীবনলালরা কায়স্থ। কিন্তু ঐ নিষ্পর ভৈরব চাটুজ্জের চেয়ে তার বেশী আপনার আজ আর কেউ নেই। পর যখন আপন হয় তখন তার মতো আপনার আর কেউ হয় না। ভৈরব চাটুজ্জের কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে স্যার হেনরি লরেন্সের কথা আবার স্যার হেনরির কথা ভাবতে গেলেই মনে পড়ে ভৈরব কাকার কথা। এর দুজনে তার পিতামাতার স্থান অধিকার করেছিল। আপন পিতা-মাতা এখন তার

মনে মধুর স্মৃতিমাত্র, তারা যেন দূরে আকাশের যুগলতারা, তাদের আলো এসে পেঁছয়, তাপ পেঁছয় না। স্যার হেনরি আর ভৈরব চাটুজ্জে তার আকাশের চন্দ্র আর সূর্য, তার দিবা রাত্রিকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তাপ আর আলো দিয়ে সুগম করে তুলছে তার জীবনযাত্রাকে।

কিন্তু না, রয়ে বসে ভাবরোমন্থনের সময় নাই, রেসিডেন্সি থেকে ইসমাইলগঞ্জ অনেকটা পথ, পেঁছে হয়তো দেখবে বেশ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ভৈরব চাটুজ্জের। রেসিডেন্সির খাজাঞ্চীর চোগা চাপকান অন্তর্হিত, তার বদলে তসরের ধুতি আর নামাবলী উঠেছে যে দেহে তার কণ্ঠ থেকে বক্ষস্থল নানা আকারের রুদ্রাক্ষের আর নানা রঙের স্ফটিকের মালায় আচ্ছন্ন। হয়তো বা বসে গিয়েছেন আসনে। লখনৌ শহরের সবাই জানে ভৈরববাবু আসনে বসলে বাহ্যজ্ঞান বিবর্জিত হন। সারা রাত্রি চলে ধ্যান আর জপ। বছরখানেক আগে, ওয়াজিদ আলি শার লখনৌ পরিত্যাগের কিছু পরে

একদিন রাত্রে মাঝারি বেগের একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলে পরদিন প্রাতে সাহেব ভৈরব চাটুজ্জের ধ্যানের গাঢ়তা যাচাই করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেছিল বেরব, ভূমিকম্পের সময়ে তুমি কি করছিলে?

বিস্মিত ভৈরব বলে ভূমিকম্প! কখন হলো?

সাহেব স্থির করে যে বেরব একজন genuine যোগী, নইলে এমন তন্ময়তা হয় না। সাহেব ভাবতে থাকে এমন তন্ময়তা উৎপাদন করে কোন শক্তিতে। সাহেব আরও একটু বেশী খোঁজ করলে জানতে পারতো প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভৈরব চাটুজ্জে এক ভরি আহিফেন সেবন করে থাকে।

দিনের বেলায় তার অন্য মূর্তি। সুক্ষ্ম হিসাবী, গূঢ় বুদ্ধি, প্রবল কাণ্ডজ্ঞান, আত্ম-সম্মান ও সাধুতার খ্যাতিসম্পন্ন টাক-টিকি-মণ্ডিত কৃষ্ণকায় স্থূলোদর ব্যক্তিটিকে লখনৌ শহরের সকলেই সমীহ করে চলতো। এই সকলের মধ্যে খোদ নবাব ও রেসিডেন্ট সাহেবও পড়েন। রবিবার দুপুর বেলাটা পুরোপুরি তাকে পেতো জীবনলাল। ঘন্টা তিন-চার কাকার কাছে বসে পুরানো দিনের গল্প শুনতো জীবন। বাপ-মায়ের কথা, নবাব গাজিউদ্দিন শার কথা, নাসিরউদ্দিন শার কথা, ওয়াজিদ আলি শা আর তার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মোরসার ডি রাসেট সাহেবের কথা। ভৈরব চাটুজ্জে গল্প বলতে জানে বটে, চোখের উপরে ছবি জাগিয়ে তুলতো। আবার কখনও বলতো কাশীর কথা। কেমন করে তার বাপ আর সে নিতান্ত কিশোর বয়সে কলকাতা থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কাশীতে এসে পৌঁছল, কাশী থেকে পরে লখনৌ। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভৈরব চাটুজ্জে মন্তব্য করেছিল দেখো বাবা, অনেক দেশীয় রাজ্যের খোঁজ রাখি, মোটের উপরে বাঙালীরা লখনৌতে ভালোই আছে বলতে হবে।

প্রতিবাদ করে জীবনলাল বলে, কি বলছেন কাকাবাবু, এইতো বছরখানেক আগেও দেখেছি যে ওরা বাঙালীর সঙ বের করেছে। বড়ই ঘৃণা করে বাঙালীকে ওরা।

ঘৃণা নয় বাবা ঘৃণা নয়।

ঘৃণা নয়?

না, হিংসা। বাঙালীর বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতিতে এদের মনে হিংসার অন্ত নেই। যাকে এমনিতে ধরতে পারা গেল না তাকে সঙ সাজিয়ে মনে শান্তি পায় লোকে। দেখনি ছোট ছেলেরা উড়ন্ত চিলের ছায়াটার উপরে লাঠির আঘাত করে কেমন আনন্দে লাফায়।

তারপরে একটু থেমে বলে—এখন তবু তো কমে গিয়েছে, আমরা প্রথম যখন আসি বাঙালীর সঙ নিত্যিকার ব্যাপার চলেছে।

কমেছে শুনে খুশী হলাম। সুবুদ্ধি হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

সুবুদ্ধি কি সাধে হয়, ওর মধ্যে অনেক কিন্তু আছে। তবে শোন।

এই বলে তাকিয়াটা বুকের তলে জুত করে টেনে নিয়ে আরম্ভ করে, তবে বলি শোন। আমি প্রথমে যখন আসি, তোমার বাপ বছর কয় আগেই এসেছে, তখন কয়জনই বা বাঙালী ছিলাম এখানে। সংখ্যায় কম হলেও বাঙালীর খ্যাতি কম ছিল না। বাঙালী নাকি জাদুকর। ঘড়ি তৈরি করতেও ওরা, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মাপজোক করতেও ওরা, ইংরাজী বলতে কইতেও ওরা, জাদুকর না ভাববে কেন? নবাব গাজিউদ্দিনেরও সেই বিশ্বাস ছিল। সে কথা থাক। এখন যা বলছিলাম শোনো। আমরা এসে দেখি বাঙালীর সঙ নিত্যিকার ঘটনা। সন্ধ্যাবেলা বাজারের মধ্যে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে আলো জ্বালিয়ে শুরু হয়, প্রথম খানিকক্ষণ নাচ গান চলে, ঢোল করতালে বাজনা চলে, কিন্তু সবচেয়ে জমে ওঠে যখন বাঙালী সঙ দেখা দেয়। একটা লোককে ধুতি-চাদর পরিয়ে বাঙালী সাজায়, উল্টো গাধায় চড়ে সে প্রবেশ করে। তখন এইভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। একজন জিজ্ঞাসা করে তুমি কে?

সে বলে আমি বাঙালী।

গাধা উল্টো কেন?

আমাদের দেশে সবই উল্টো।

মাথায় পাগড়ী বা টুপি কিছু নেই কেন?

ভিতরেও কিছু নেই তাই বাইরেও কিছু নেই।

লখনৌ শহরে কেন?

বেচা-কেনা করতে।

বেচবেই বা কি আর কিনবেই বা কি?

বেচবো জরু, কিনবো গরু।

তখন কি হাসির হররা আর কি হাততালি। তখন দুইজন লোক এসে দুই কান ধরে তাকে গাধা থেকে নামায় আর মারতে থাকে, মারটা অবিশ্যি থিয়েটারে যেমন মারে, আস্তে আস্তে, যতক্ষণ না সে বলে হামি বাঙালী না আছি। ঐ স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসির হররা আর হাততালি।। তখন প্রথম এসেছি, বয়সও অল্প, বেজায় রাগ হতো। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই, রুজিরোজগার এ দেশে। তখন একদিন দুর্গাচরণ বাঁড়ুজ্জে, চন্দ্রশেখর মিত্তির আর প্রিয়নাথ মিত্তির আর আমি সবাই মিলে ভেবে এক উপায় স্থির করলাম। দুর্গাচরণের মাথায় আসতো নানা রকম প্ল্যান আর গায়েও ছিল তেমনি জোর। একদিন আমরা সবাই মিলে ওদের কাছে

গিয়ে বললাম ভাই তোমাদের সঙ বড়ই মজাদার কেবল একটা খ‍ুঁত।

বাঙালীর ভালো লাগছে বাঙালীর সঙ যাতে নিত্য অপমান করা হচ্ছে বাঙালীকে। শ‍ুনে ওরা খ‍ুব খ‍ুশী হল, শ‍ুধোলো কি খ‍ুঁত?

দ‍ুর্গাচরণ বলল—বাঙালী সঙকে যদি বাঙালীর হাত দিয়ে মারাও তবে আসর আরো জমে।

ওরা এক বাক্যে কেয়া বাত কেয়া বাত করে উঠল—বলল এ বাত ঠিক হ্যায়।

দ‍ুর্গাচরণ বলল—তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি বাঙালীকে মারতে রাজী আছি।

আপত্তি? বিলক্ষণ, আমরা খ‍ুব রাজী।

দ‍ুর্গাচরণ বলে আর সেই সংগে কিছ‍ু কিছ‍ু বাংলা গাল ছাড়বো।

বাহোবা, বাহোবা করে ওঠে ওরা।

ভবানী দীন বলে—এহিতো আচ্ছা বাত, জিসকী বন্দরী বহী নচায়ে।

টীকারাম বলে—বাঙালী আবার গালাগালি জানে নাকি? আমরা তো জানি লখনোবালার কাছে কেউ নয়।

তাকে থামিয়ে দিয়ে ভবানী দীন বলে—দ‍ু-চারটা নম‍ুনা শ‍ুনি।

দ‍ুর্গাচরণ বলল—প্রথমেই বলবো মারো শালাকে।

শালা সম্বোধন শ‍ুনে সমস্ত আসর উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে, ভবানী দীন তো একেবারে ব‍ুকে জড়িয়ে ধরে দ‍ুর্গাচরণকে—বিস্ময়ে অর্ধ-বিশ্বাসে বলে আরে ইয়ার, তোমদের ভাষাতেও শালা আছে?

তদধিক বাক্য ব্যয়ের শক্তি তখন তার অন্তর্হিত হয়েছে। দ‍ুর্গাচরণ থামবার পাত্র নয়, সে বলে, ইয়ার, এতেই এই! এখনি কি হয়েছে বলে আউড়ে যায় স-কার ব-কারের নামতা।

বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে তারা এতই ম‍ুগ্ধ হল যে প্রথম দ‍ুচার মিনিট হতভম্ব হয়ে বসে রইল, তারপরে সকলে একসংগে দাঁড়িয়ে উঠে দ‍ুর্গাচরণকে কোল দিতে উদ্যত হল। টীকারাম বলল,—ইয়ার এত্তদিন আমরা ভাবতাম যে বাঙালী বিলকুল বেওকুফ, এখন ভুল ভাঙলো, ব‍ুঝলাম যে বাঙালী বহ‍ুৎ এলেমদার।

কিন্তু তখন তারা বাঙালীর গ‍ুণে এমনি অভিভূত যে বাঙালীকে সঙ সাজানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে উদ্যত। আমরা দেখলাম সব মাটি হয়। তখন অনেক অন‍ুনয় বিনয় করে বললাম সঙ বন্ধ করো না, তাহলে তোমাদের দ‍ুর্নাম হবে, লোকে বলবে বাঙালীর কাছে ভয় পেয়ে গেলে।

তারা বলল—ঠিক বাত। জৈশা লাঠি উস্‌কো ভৈংস। তখনি রাজী হল। কিন্তু জানত না যে, জহাঁ গ‍ুল হ্যায় ব‍ঁহা কাঁটা ভি হ্যায়।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে পাজি ছিল দ‍ুজ্জ‍ু সিং। বলে কয়ে তাকে বাঙালী সাজানো হল। আর দ‍ুর্গাচরণ সাজলো লখনোবালা, পাগড়ি থেকে লপেটা পর্যন্ত এমন জমকালো পোশাক পরলো যে, ওয়াজিদ আলি শা বলে মনে হচ্ছিল। আগে উল্টো গাধায় বাঙালী সেজে ঢ‍ুকলো দ‍ুজ্জ‍ু সিং, তারপরে ঢ‍ুকলো দ‍ুর্গাচরণ। এখনো বেশ মনে আছে তার পোশাকে জল‍ুস দেখে দর্শকদের একজন বলে উঠল, ছছ‍ুন্দরকে শির পর চমেলী কা তেল। দ‍ুর্গাচরণ গিয়ে ওর কান ধরলে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল। কান ধরে তাকে হিড়হিড় করে নামিয়ে ফেলল গাধা থেকে, তারপরে আরম্ভ হল মার। দ‍ুর্গাচরণ আবার ছড়ির বদলে নিয়ে গিয়েছিল একগাছা শঙ্করমাছের লেজ। সে কি মার। আর দর্শকের কী উল্লাস। একজন খাস বাঙালীকে দিয়ে বাঙালী সঙকে মারানো হবে খবর রটে যাওয়ায় সেদিন ভিড়ও জমেছে বটে। মার, মার, সে কী মার।

মারের ঠেলায় দ‍ুজ্জ‍ু সিং বলে বহ‍ুৎ হ‍ুয়া আভি ছোড়ো।

কে কার কথা শোনে। মেরেই চলে দ‍ুর্গাচরণ। দ‍ুজ্জ‍ু সিং দেখলো আজ কিছ‍ু বাড়াবাড়ি, কিন্তু তখন নির‍ুপায়, পালাবার উপায় নাই, এক হাতে দ‍ুর্গাচরণ তাকে ধরে রেখেছে আর এক হাতে চাব‍ুক চালাচ্ছে। সে হাত জোড় করে আর বলে ছোড় দো ভাইয়া। দর্শক তখন মেতে উঠেছে, হেঁকে ওঠে ছোড়ো মৎ, ছোড়ো মৎ! আর দ‍ুর্গাচরণই বা ছাড়বে কেন, সে তো মেরে জখম করে ফেলবার উদ্দেশ্যেই গিয়েছে। অবশেষে দ‍ুজ্জ‍ু সিং যখন মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো দ‍ুর্গাচরণ দ‍ুই পায়ে চালাতে লাগলো লাথি। সমস্ত আসর হাসছে, আমরা ম‍ুখে কাপড় দিয়ে হাসছি, কোণে দাঁড়িয়ে গাধাটা হাসছে—আর সকলের হাসিকে ছাপিয়ে উঠছে দ‍ুজ্জ‍ু সিং-এর কান্না, গোড় লাগে ছোড় দো।

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল বাঙালী মারনেভি জানতা।

আর কোন উপায় নেই দেখে দ‍ুজ্জ‍ু সিং পালাবার উদ্দেশ্যে লাফিয়ে পড়লো আসরের মধ্যে। কিন্তু দর্শক তখন ক্ষেপে উঠেছে ছাড়বে কেন, ধরে ফেলে আচ্ছা করে কিলচড় ঘ‍ুষি লাথ চালাতে লাগালো, মারো শালা বাঙালীকো। আমরাও আড়াল থেকে বলতে লাগলাম, ছোড়ো মৎ মারো শালাকো।

ব‍ুঝলে বাবাজীবন সেদিনের কাণ্ড ভুলবার নয়।

জীবন স‍ুধায়, তারপর।

তারপর আর বাঙালী সাজবার লোক পাওয়া যায় না, ক্রমে বন্ধ হয়ে এল সঙ দেওয়া। তুমি বলছিলে ওদের স‍ুব‍ুদ্ধি হয়েছে। স‍ুব‍ুদ্ধি কি সাধে হয়েছে? গ‍ুঁতো চোটে হয়েছে।

গ‍ুড়‍ুম গ‍ুড়‍ুম দ‍ুম।

চমকে ওঠে জীবনলাল। অসম্প‍ূর্ণ গানের পদ বেঁধে যায় তার কণ্ঠে—জব ছোড় চলে লখনোনগরী। এতক্ষণ প‍ুরাতন স‍ুখ-দ‍ুঃখের মস‍ৃণ স্ম‍ৃতির পথে চলছিল মনোরথ হঠাৎ বন্দ‍ুকের গ‍ুলীর আওয়াজে তা ছিটকে পড়ে। এ পর্যন্ত সে মনের মধ্যে তাকিয়ে চলছিল এবারে বন্দ‍ুকের আওয়াজের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—

(ক্রমশ)

মস্কোর চিঠি

শিল্পের আসরে সবচেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক হল স্থাপত্য। যন্ত্র, শিল্প এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন—এই তিনের প্রয়োগে তার উৎপত্তি। সোভিয়েত স্থাপত্য এতকাল পর্যন্ত যেভাবে বিকাশ পেয়েছে তাতে যন্ত্রের প্রয়োগ অবশ্যই ঘটেছে, শিল্পের কথাও ভাবা হয়েছে তবে এমনভাব যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের শর্তটি তার সঙ্গে অবহেলাই পেয়েছে। সোভিয়েত স্থপতিরা মনে করেছেন বড় আকার এবং বহু অলংকার—এই হল সুন্দর স্থাপত্যের প্রতিশ্রুতি। হয়ত রুশ চরিত্রই তার জন্য কিছুটা দায়ী। কারণ, 'অগ্রমুনি' আর 'গ্রামাদুনি'—বিরাট এবং মস্ত—এই দুটি বিশেষণ ব্যবহার করার সুযোগ পেলে রুশেরা খুবই খুশী হন। একথাও স্মরণীয়, রুশ স্থাপত্যের যে ঐতিহ্য তা উত্তরে প্রধানত ইতালীয় ও কিছু পরিমাণে ফরাসী ঐতিহ্যানুসারী অন্যত্র বাইজেণ্টীয় এবং ইসলামী। কিছু আছে স্থানীয়—তাও প্রধানত উক্রেন, আর্মেনীয়া, জর্জিয়ায় রচিত। তাদের বৈশিষ্ট্য হল : মোটা চওড়া দেওয়াল, যা ভিত থেকে ক্রমশ ওপরে একটু চাপা হয়ে গেছে, মাথার ওপরে ভারী একটা গম্বুজ—যার চালটা তেকোণা। এর মোট ফল হল ঘাড়েগর্দানে গোছের একটা কিছু। এই চাপা এবং মস্ত ভাবটাকেই যদি বলি রুশ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তবে স্বীকার করতেই হবে এই সেদিন পর্যন্ত, স্তালিনোত্তর কালেও, রুশ স্থপতিরা তা মেনে চলেছেন। অবশ্যই তার সঙ্গে অনেক কিছু যোগ করে আজকের পাশ্চাত্ত্য যা সরিয়ে রেখেছে তার ইতিহাসের যাদুঘরে।

প্রাচীনকালের যেসব স্থাপত্যকীর্তি সোভিয়েত দেশে রয়েছে তারা অন্য দেশের মতোই প্রধানত গির্জা, মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ। সোভিয়েত আমলে বড় আকারের সাধারণ বাসগৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথাও ভাবতে হয়েছে। তার ফলে এক-একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে যার শরীরটা বারোক্, মাথাটা গথিক্। মস্কো রেডিওর ভাষায় "দুনিয়ার প্রথম চাষী মজদুর" রাষ্ট্রের নতুন স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্যও তাতে অবশ্যই আছে—বাড়ির মাথায় ও কার্নিশে ফসল নিয়ে কৃষাণী, হাতুড়ি হাতে মজদুরের মূর্তিতে। বাড়িগুলো যুগোপযোগী, সুবিধাজনক ও সুন্দর নাই বা হল! "সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম" তো বজায় রইল! তবে ঐভাবে বাড়ি বানাতে গিয়ে এক-একটি বাড়ি যে পরিমাণ সময়, অর্থ, প্রয়াস ও জায়গা নিয়েছে তাতে আরো বোধহয় তিন-চারটে হালফ্যাশানী আরামদায়ক বাড়ি বানান যেত। মস্কোর অতিপ্রসিদ্ধ মেট্রো স্টেশনগুলিও কোনটা দেখতে হয়েছে মিউজিয়মের মতো। কোনটা বা টাউন হল। অথচ এই সময়েই সোভিয়েত দেশে গৃহসমস্যা ওঠে তার চরমে। মস্কোর মতো শহরেও সে সময়ে বিরাট বিরাট উঁচু প্রাসাদের পাশেই ছিল ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়েঘর যেখানে স্নানের ঘর তো দূরের কথা আরো প্রয়োজনীয় কিছুও ছিল উঠোনের বাইরে এবং তার শরিক একাধিক পরিবার।

এখন এদেশের কর্মকর্তা এবং ইঞ্জিনীয়ার স্থপতিরা আবার ভুল বুঝতে পারছেন। এবং সব ত্রুটির দায়িত্ব স্তালিন ও তাঁর সহকারীদের ওপর ন্যস্ত করে নতুন পথে রূপ দিচ্ছেন আধুনিক সোভিয়েত স্থাপত্য-রীতিকে। তার প্রথম ফল হয়েছিল কতগুলো দশ-বার তলা উঁচু ব্যারাকের মতো বাসগৃহ। ক্রমে দেখা দিল ছিমছাম, খোলামেলা, পরিসরওয়ালা বাড়ি। গথিক রীতি উদ্ভূত আকাশছোঁয়ার নেশা তখনো না কাটলেও এ আমলে গড়া মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়িটি সে আমলে বানানো গগনচুম্বীদের চেয়ে অনেক বেশি তরুণকান্তি। কিন্তু এ-আমলের স্থপতি এবং বিশেষ করে নেতারা এতেও সন্তুষ্ট নন। খ্রুশভ নিজে সর্বদাই বলে থাকেন যে, আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও উপকরণ প্রয়োগ করে কম খরচায় দ্রুত বাড়ি বানান প্রয়োজন—তাতে পরিসর, আরাম, আলো-বাতাস, সুন্দর গঠন এসবই থাকবে, থাকবে না কেবল আড়ম্বর।

গৃহনির্মাণের টেকনিকের ক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশ এখন খুবই এগিয়ে গেছে। বাড়ি এদেশে এখন নির্মাণের জায়গায় তৈরি হয় না, হয় কারখানায়। এবং সেখান থেকে লরীতে চেপে সে আসে তার জায়গায়। সেখানে কাজ হল তার আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে জোড়া দেওয়া। মস্কোর একটি

মস্কোর স্মোলেনস্কায়া স্কোয়ারে বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের বৃহৎ ভবন

স্তালিনের আমলের স্থাপত্যের একটি নিদর্শন

নতুন পাইওনিআর ভবন

অতিপরিচিত দৃশ্য হল শহরের সর্বত্র মাথা তোলা ক্রেন—তারা ঐ দরজা-জানলাসমেত দেয়ালগুলোকে তুলে জায়গায় বসায়। এর ফলে এখন মিনিটে দুটো করে ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে এদেশে। এই হারে এবং এইভাবে বাড়ি বানাতে গেলে স্বভাবতই আঙুরলতার নক্শা আঁকা ফ্রীজ, মাথার ওপরে ছোটখাট পার্থেনন, প্রতি খাঁজে ফসলের আঁটি বা কাস্তে-হাতুড়ির অলংকরণ বাদ দিতে হয়। এমন কি খাঁজখোঁজগুলিই আর রাখা চলে না। তার ফলে দ্রুতবেগে গড়ে উঠছে খাড়া খাড়া বাড়ি যাদের বলা যায় লম্বা ও সমান্তরাল রেখার সমন্বয়। ফেরোবেটেন, প্লাস্টিক ও প্লাসপেন্সের ব্যবহারের ফল তারা। আগেকার ব্যারাকগোছের বাড়িগুলোর টিনে মোড়া তেকোণা ঢালু বিশ্রী ছাদগুলোর এখনকার বাড়িতে আর দেখা যায় না। ছিম-ছাম খাড়া দেয়ালগুলোয় দেখা দিয়েছে রঙের বৈচিত্র্য। স্তালিনরীতির শ্রেষ্ঠ ফল যদি বলি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়িটি (স্তালিনোত্তরকালে নির্মিত হলেও তা পূর্ব-রীতিরই অনুসারী) এ-আমলের স্থাপত্য-রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল ক্রেমলিনের নতুন কংগ্রেস ভবন। ক্রেমলিনের পরিবেশে তাকে মানাচ্ছে কি না তা নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় আছে। তবে ক্রেমলিনেও এ-যুগের হাওয়া বওয়াটা স্বাভাবিক ও উচিত।

এখনকার নতুন বাড়িগুলো দেখেই বোঝা যাবে সোভিয়েত শিল্প-জগতের কোন শাখা যদি সত্যিই আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের নিকট-বর্তী হয়ে থাকে তবে সে তার স্থাপত্য-রীতি। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মূলগত প্রভেদ সত্ত্বেও আমেরিকা ও ইউ-রোপের অনেক দেশের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক জায়গায় এক—তা হল সমুন্নত যন্ত্রশিল্প। এই যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন প্রয়োগপদ্ধতিতে অনেক পরিমাণেই মিল আছে। জেট বিমান, রকেট নির্মাণ, বৈদ্যুতিক কেন্দ্র গড়ন, এ-সবের টেকনিকের দিক দিয়ে পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী দেশের মধ্যে ভাশুর-বউ সম্পর্ক নেই। অথচ বেশ কল্পনা করা যায় আরো কয়েক বছর আগে আজকের নতুন রীতির বাড়ির পরিকল্পকরা নিন্দিত হতেন অবক্ষয়ী বুর্জোয়া মতবাদের ছোঁয়াচগ্রস্ত বলে। যদিও সে সময়েই ঐতিহ্যগত জাতীয় রীতির নামে যেসব বাড়ি গড়া হত তাদের স্থাপত্যরীতি তৈমুর লং বা তাঁর মতোই আর কোন প্রবল স্বৈরাচারী রাজকুলের সৃষ্টি।

স্থাপত্যে প্রাচীন জাতীয় রীতির অনুসরণের চাল—কুফলই বলা যায়—মস্কোয় দেখা যাবে "সোভিয়েত অর্থনীতিক সাফল্যের প্রদর্শনীতে" গেলে। এখন এই অবস্থার সমালোচকরা বলছেন যাঁরা বা

কারখানা বাড়ি গড়ার সময়ে যখন আমরা জাতীয় ঐতিহ্যের কথা না ভেবে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিবিদ্যার কথাই স্মরণ করি তখন গৃহনির্মাণেও তা করব না কেন। প্রযুক্তি বিদ্যা আধুনিক ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ মেনে চলে বলেই সব দেশে তার ফল অনেকটা এক রকমের। জাতীয়তা বা সাম্যবাদের দোহাই শত সহস্র-বার পাড়লেও একথা স্বীকার করতেই হবে। তাই সোভিয়েত মোটর গাড়ি চাইকার সঙ্গে আধুনিক শেভ্রলের চেহারার মিল থাকবেই। তু—১০৪ আর বুইং ৭০৭ জেট বিমান যমজ ভাই না হলেও আত্মীয়। সোভিয়েত রকেট ও মার্কিন রকেটের বাইরের চেহারাটা মোটা-মুটি এক ভিতরের শক্তিতে যত পার্থক্যই থাক না কেন। আমাদের চারপাশের সব কিছুতেই যখন দেখা যাচ্ছে দ্রুত রেখা-বিশিষ্ট, বাড়তি অঙ্গহীন জিনিসের প্রভাব তখন সেটাকে আধুনিককালের বিশেষ প্রয়োজনের ফল বলেই মানতে হবে। স্থাপত্যেও সে প্রয়োজনের প্রভাব পড়তে বাধ্য। স্তালিনের আমলে গৃহনির্মাণকে এত অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়নি বলেই হয়ত স্থাপত্যে আধুনিক রীতির প্রয়োজনের প্রতি স্থপতিরা ও এদেশের কর্মকর্তারা মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। একালের লোকেরা পূর্বের ভুলের ভুক্তভোগী বলেই নতুন স্থাপত্য রীতিকে নিজেদের উন্নততর নির্মাণ কৌশল দিয়ে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলছেন। শুধু তাই নয় এখন যদি

ক্রেমলিনে নতুন যুগের হাওয়া

এদেশের কোথাও বলশই থিয়েটারের ধাঁচে নাট্যালয় বা সংস্কৃতি ভবন নির্মিত হয়, তৈরী হয় বারোক ও গথিক রীতির অদ্ভুত সংকর্ষ তবে নির্মাতাদের তীব্র সমালোচনা সইতে হয়। সম্প্রতি ইজভেস্তিয়ায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্মাণ বিভাগের এক বড় কর্মী "স্থাপত্য, অর্থনীতি, সময়" নামের একটি বড় প্রবন্ধে "অনাবশ্যক আড়ম্বরের" সমালোচনা করে বলেছেন, "সোভিয়েত মানুষের রুচি এবং বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক দাবি মেটাতে অক্ষম এইসব অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ নির্মাণ কার্যের কোনই প্রয়োজন নেই।"

সোভিয়েত স্থাপত্য রীতিতে যে আধুনিকতার ছাপ দেখা যাচ্ছে তা কি শুধু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে? এ যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার এতই ব্যাপক যে মানুষের হৃদয়ের এলাকাও তার আওতার বাইরে থাকছে না। আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যেও পড়ছে সুউন্নত যন্ত্রশিল্পের প্রভাব। একালের বেশভূষা,

আসবাবপত্র, কলম, ঘড়ি, বাসনপত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য সব কিছুতেই এমন একটা স্টাইল দেখা দিচ্ছে যা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিশেষ করেই এ যুগের। আধুনিক সমালোচকরা বলছেন তার মূল কথাটাই হল দ্রুতগতি রেখার ছন্দ যা সংক্ষেপকে সুন্দর বলে মানে। এ যুগের এই বিশেষ রীতি সোভিয়েত দেশেও ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করে তার পা বাড়িয়ে চলেছে। সোভিয়েত চিত্রকর ও ভাস্করদের হাল আমলী কাজেও দেখা যাচ্ছে এই যুগলক্ষণ। সংগীত, নৃত্য ও নাট্যেও তা বেশ স্পষ্ট। সাহিত্যেও তা আসন্ন—কারণ এই সেদিনই সাহিত্যে এ-বছরের লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত লিথুনীয় লেখক এদুয়ার্দাস মিয়েজেলাইতিস একটি প্রবন্ধ লিখেছেন "যুগের হাওয়া" নামে। তাতে সাহিত্যে নতুন রীতির সঞ্চালন ও নতুনের অন্বেষণকে তিনি বলেছেন যুগ-লক্ষণ। এবং বলেছেন ক্রেমলিনের কংগ্রেস ভবন হল এই "যুগের হাওয়ার প্রতীক।"

শুভময় ঘোষ

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

(১৭)

মধুর বুড়ি দিদিমা পদক-যশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ দেখেছেন। বড় মামী দিয়েছেন কোমরের নিমফল, ছোট মামী কপালের পুটে। এই তিন দফা গয়না রুমালে একসঙ্গে বাঁধা ছিল। আরও নাকি পাঁচ টাকার নোট দুখানা। সমস্ত লোপাট।

বাঙ্কের উপরের রক্তাম্বর সাধু লম্ফ দিয়ে পড়লেন। রাগে গরগর করছেন: আঁ, ছোঁড়া তুই কোঁচড়ের ইঁদুর হয়ে কুটুর-কুটুর কাপড় কাটিস?

বাঘের মতন পড়ে সাহেবের টুঁটি চেপে ধরলেন। আক্রোশে মধুসূদনও মারছে, কিন্তু সাধুর কাছে লাগে না। দমাদম কিল মারছেন পিঠের উপর। মুষলধারে —থামাথামি নেই। বেপরোয়া ঘুঁসি। কামরা-ভরা লোকের হাত নিসপিস করছে—কিন্তু সাধুই মেরে চলেছেন রকমারি কায়দায়, এদিক থেকে সেদিক থেকে পাকচক্কোর দিয়ে। অন্যের এগোবার সাধ্য নেই তার ভিতরে। কাণ্ড দেখে সকলে থ হয়ে গেছে। যা রাগ, একেবারে মেরেই ফেলেন বুঝি!

তাঁকেই ঠেকাচ্ছে এখন সকলে মিলে: অত মার মারছেন, মরে যাবে যে! আপনার কী এতে বাবাজী?

যাক মরে। যাক, যাক। এরা সব মানুষ নামের কলঙ্ক, সমাজের আপদবালাই। মরে গেলে ধরিত্রী জুড়োয়।

কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে তাঁর: আমারও সর্বনাশ হয়েছিল এমনি গাড়ির কামরায়। পরিবারের গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। গয়নার দুঃখেই পরিবার শেষটা আত্মঘাতী হল। গলায় দড়ি দিল। তারপর থেকে আমার এই দশা। নিকুচি করেছে সংসারের! সাধু বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে পুরনো স্মৃতিতে রাগ আবার চড়ে যায়। পা তুলে লাথি কষিয়ে দিলেন সাহেবের পিঠে।

মধুসূদনের মা আঁকুপাকু করছেন। রক্তাম্বরের উপর ক্ষেপে ওঠেন: ধর্মকর্ম কর না তুমি? চণ্ডালের রাগ যে হার মেনে যায় তোমার কাছে।

আর এক প্যাসেঞ্জার বলে, ধর্ম না কাঁচকলা। কাপালিক এরা—মারণ-উচাটন কাজ। পোশাকে টের পাচ্ছেন না? নরবলি দেয়। কায়দায় পেয়েছে একটাকে। খাঁড়া-মেলতুক কোথায় পায়—হাত-পা দিয়েই বলির কাজ সারছে।

জনকয়েক এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে রক্তাম্বরকে সরিয়ে দেয়: আর মারবেন না, উল্টে আপনিই কেসে পড়ে যাবেন, সাধু বলে ছাড়বে না। আমাদেরও রেহাই দেবে না পুলিস, সবসুদ্ধ হাতে দড়ি পড়বে। এখন ঠাণ্ডা হন। দৌলতপুর এসে যাচ্ছে, গাড়ি অনেকক্ষণ থামবে। রেল-পুলিসের জিম্মা করে দেওয়া যাবে।

মুখ বাঁকিয়ে রক্তাম্বর বলেন, পুলিস! বলবেন না, বলবেন না—এই বয়স অবধি পুলিস আমার ঢের ঢের দেখা হয়েছে। আপনারা এ দরজা দিয়ে বেরুলেন, পুলিসের হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে আসামিও অন্য দরজায় বেরিয়ে গেল।

মধুসূদন বলে, পুলিস সাচ্চা হলেই বা ক্ষমতা কী তাদের! কোর্টে কেস তুলে দিল—দু-মাস ছ-মাসের জেল। মজাসে সরকারি খানা খেয়ে পাকা-ঘরে শুয়ে একদিন বেরিয়ে এল জেল থেকে। এসে তখন দুনো তাগত নিয়ে কাজে লাগে।

উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। বলে,

জেল-টেল কিছু নয়—ধরে এদের ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তবে সমুচিত শিক্ষা হয়। ফাঁসির পরেও গলায় দড়ি বেঁধে গাছে টাঙিয়ে রাখা। রোদে শুকোক, কাকে ঠুকরে ঠুকরে খাক। অসৎকর্মের পরিণামটা চোখে দেখুক সর্বজন।

সাহেব হাপুস নয়নে কাঁদছে। সকলের বলাবলিতে মারগুতোন আপাতত বন্ধ। তল্লাসি চলছে কাপড়চোপড় ও জায়গাটার এদিক-সেদিক।

গয়না-টাকা কোথায় রাখলি তুই?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেব বলে, আমি নিইনি। আমি কিছু জানিনে।

মধুর মা মাথা ভাঙাভাঙি করছেন: মিছামিছি তোরা মারধোর করলি। ও নেয়নি, অমন ছেলে নিতে পারে না। চেহারা দেখেও বুঝিস না তোরা—চোরের কখনো এমন দেবতার রূপ! নিয়ে থাকে তো গেল কোথা জিনিসগুলো—গিলে খেয়েছে মুখের ভিতর ফেলে?

মায়ের কথারই জবাব দেয় মধুসূদন সাহেবের উপর তড়পে উঠে: তোর সেই বাপটাকে দেখছিনে তো! গেল কোথায় লোকটা? তাকে দিয়ে পাচার করলি?

মা ওদিকে বলেই চলেছেন, বউটা হয়েছে তেমনি অগোছালো—কোথায় কি রাখে, ঠিকঠিকানা থাকে না। ব্যাগে না রেখে হয়তো বা সুটকেশে রেখেছে—সুটকেশটা দেখ তোরা খুঁজে। আনেইনি হয়তো মোটে। তোর বড়মামীর কাছে রাখতে দিয়েছিলি—খোঁজ নিয়ে দেখবি, সেইখানে পড়ে আছে। উঃ, বাছা তুই কার মুখ দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি রে!

চকিতে সাহেব মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়। কে যেন বুকের মধ্যে বলে ওঠে, দুনিয়াময় মায়ের কোল—মায়ের কোল বাদ দিয়ে পালাবি কোনখানে হতভাগা? রেলের কমারাতেও মা। এক কাঠাও ভুঁই পাবিনে মায়ের কোল যেখানটা নেই।

মধুর বউয়ের উপর দোষ পড়েছে, বউ কথা না বলে পারে কেমন করে? বলে, আমি অগোছালো মানুষ—জিনিস না হয় ফেলে এসেছি। কিন্তু ব্যাগটা যে এমন করে কেটে ফালা-ফালা করেছে, সে মানুষটা কে?

সাহেব বলে, আমি করিনি—

বেঞ্চির তলে অনেকটা দূরে এই সময় ছুরি আবিষ্কার হল। নফরকেষ্টকে আর সব দিয়েছে, ওটা দেয়নি পাশাপাশি যেসব মাল আছে সেই কাজের সময় লাগবে বলে। দুর্ঘটনায় আর কিছু হতে পারল না। ছুরিটা হাতে তুলে ধরে মধু বলছে, কার এটা—এল কোত্থেকে?

সাহেব বলে, আমার জিনিস নয়।

মার বন্ধ করে রক্তাম্বর ফুঁসছিলেন এতক্ষণ অজগর-সাপের মতো। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন: বটে রে! একে চোর, তায় মিথ্যুক! ছুরির বুঝি পাখনা হয়েছিল, উড়তে উড়তে তোর কাছে এসে গেছে?

বলেই এক ঘুসি। আবার দ্বিতীয় ঘুসি তুলেছেন, ছুটে এসে একজনে হাত চেপে ধরে। ঠেকানো কি যায়! মানুষটার গায়ে অসুরের বল—সে তো কামরায় ঢোকবার মুখেই সকলের চাক্ষুষ হয়েছে।

বললেন, দৌলতপুর-টুর নয়—শেষ জায়গা খুলনায় নিয়ে ফেলব। ওখানকার থানা কোর্ট সর্বত্র আমার খাতির। মধুবাবু খাঁটি কথাই বলেছে—এই বয়সে এত বড় বিচ্ছু ছোঁড়ার ফাঁসি হওয়াই উচিত। পানসা আইনে সে তো হবার জো নেই, কদ্দুর ঠেসে দেওয়া যায় দেখি। চুল পাকবার আগে বাছাধনের বেরুতে না হয়, সেই তদ্বির করব। বেরিয়ে এসে লাঠি ঠুকঠুক করে দশ দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়াবে, অন্য কিছুর তাগত থাকবে না।

খুলনা স্টেশনে ট্রেন তখনো ভাল করে থামেনি, রক্তাম্বর সজোরে সাহেবের ঘাড় ধাক্কা দিলেন: চল—

মধুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন, সত্যি সত্যি যে নিয়ে চললে বাবা।

ভগবানের নাম করি, সত্যি ছাড়া মিথ্যে এ মুখে বেরোয় না। বেরোবার উপায়ই নেই।

সাহেব আর্তনাদ করছে। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে তাকে প্লাটফরমে নামিয়ে ফেললেন।

লাইনের শেষ স্টেশন। সকলে নেমে পড়ছে। সাধু ডাক দিলেন, আপনাদের কেউ কেউ চলে আসুন মশায়রা।

কোথায়?

আপাতত থানায়। তারপর কোর্টে, যখন থেকে ডাক পড়তে শুরু হবে। ছোঁড়াটাকে এত সমাদরে নিয়ে যাচ্ছি, সাক্ষি-টাক্ষি দিয়ে কৈবল্যধামের ব্যবস্থা করবেন তো!

যে লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে রক্তাম্বর তারই হাত চেপে ধরেন: আপনি একেবারে

সামনের উপর ছিলেন মশায়, সমস্ত চোখে দেখেছেন। আপনি আসুন।

লোকটা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাপ করতে হবে বাবা ঠাকুর। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, থানায় ছুঁলে একশ-আঠার। চশমা খোলা ছিল সে সময়টা, একেবারে কিছু দেখতে পাইনি।

মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, যাবেন এই ভদ্রলোক, যার জিনিস খোয়া গেছে। গিয়ে পড়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসুন। অন্যের কি দায় পড়েছে?

মধুসূদন খিঁচিয়ে উঠল : তা বই কি! আমি গিয়ে থানায় উঠলাম—স্টিমার ফেল করে বাচ্চা আর দুটো মেয়েলোক সারাদিন ঘাটের উপর পটোল-পোড়া হোক। যা যাবার সে তো গেছেই, গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া তুলে কাজ নেই। পা চালিয়ে চলো মা, আমাদের স্টিমারেই বুঝি সিটি দিল ঐ।

দেখা যাচ্ছে, এত লোকের মধ্যে শিক্ষা-দানের উৎসাহ একজনেরও নেই। এ বলে তুমি যাও, ও বলে আপনি যান। এবং নিজ নিজ মাল ও মানুষ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে প্রত্যেকেই ব্যস্ত। বিরক্ত হয়ে রক্তাম্বর বলেন, না আসেন তো বয়ে গেল। থানা-স্টাফের মধ্যে আমার বিস্তর শিষ্য-সেবক, কোর্টেও অনেক ভক্ত। আপনাদের কাউকে লাগবে না, আমার একার সাক্ষিতেই হয়ে যাবে। বাকি সাক্ষিসাবুদ যা লাগে, ওরাই সব গড়েপিটে নেবে।

মধুর মা তখনও বলছেন, কেউ যাবে না—তোমারই বা কী গরজ ঠাকুর! তোমার তো কানাকড়িও খোয়া যায়নি। ছেলের মুখের দিকে একটিবার তাকাও না। কিছু করেনি, এ ছেলে ভাল বই মন্দ করতে পারে না। ছেড়ে দিয়ে যাও।

সাহেবের দু-চোখ ভরে অকস্মাৎ জল নেমে আসে। নদীর জলে ভেসে-আসা ছেলে—মা নেই, মাকে দেখেনি কখনো। অথচ মা যেন সর্বত্র। গর্ভধারিণী মাকে না পেয়ে ভালই হয়েছে বোধ হয়। ছোট বাড়ির একখানা দু-খানা কি পাঁচখানা ঘর জুড়ে খুঁটিনাটি গৃহকর্মে ব্যস্ত একফোঁটা মা নয়—তার মা চরাচর ব্যাপ্ত। যে বাড়ির যত মা এতাবৎ সে দেখে এসেছে, সকলের সঙ্গে একাসনে এক মূর্তি হয়ে তার মা-জননী। কুয়াসামগ্ন অনন্ত সমুদ্র দেখার মতো চোর-সাহেবের মনে এক বিশাল অনুভূতির অস্পষ্ট আভাস। সাধু হিড়হিড় করে টেনে জনতার আগে আগে চললেন. সাহেব মুখ ফিরিয়ে বারম্বার মধুর মাকে দেখে নিচ্ছে।

প্লাটফরমের শেষ মাথায় টিকিটবাবু। রক্তাম্বর নিজের টিকিটটা দিলেন, আর সাহেবকে দেখিয়ে একটি টাকা গুঁজে দিলেন তার হাতে।

সাহেব বলে, টিকিট তো আছে আমার।

সাধু হেসে ফেললেন : বটে! মুফতের কারবার নয়, লাগ্য করে কাজে নেমেছিস?

টিকিটবাবুর দিকে ফিরে বললেন, জমা রইল টাকাটা। মনে করে রাখবেন পরের কোন কেসে উশুল হবে।

ফাঁকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর কণ্ঠ-স্বর মধুমাখা হয়ে উঠেছে। মুচকি হাসি মুখে। বললেন, এত মারলাম তোকে, ব্যথা লাগে নি?

সাহেবও হেসে ফেলে : মারলে তো লাগবে! শুধু তম্বি, শুধুই আওয়াজ। কামরার মেজের ধুলোবালি কিছু গায়ে লেগেছিল, আদর করে থাবা দিয়ে সেই সমস্ত যেন ঝেড়েঝুড়ে দিলেন—আমার তাই মনে হচ্ছিল।

গলা ফাটিয়ে তুই কেঁদে উঠলি—সেই সময়টা একবার সন্দেহ হল, লেগে গেল নাকি হঠাৎ?

শতকণ্ঠে সাধু মশায় তারিপ করছেন : আমায় অবধি ধোঁকা ধরিয়ে দিস, বাহাদুর বটে তুই! সকলের মধ্যে সাট না থাকলে কাজ ভালভাবে নামে না। খাসা তোর শিক্ষাদীক্ষা—মুখ ফুটে বলতে হয়নি, বলবার ফুরসতও ছিল না, আপনা থেকেই বুঝে নিলি। জোর কান্না কেঁদেছিলি বলেই তো বিনা দ্বিধায় তোকে আমার হাতে ছাড়ল, এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলি।

যেতে যেতে পরিচয় নিবিড় হচ্ছে।

আপনজন কে কে আছে তোর? বাপ বেঁচে আছে?

হুঁ—

মা?

হুঁ, হুঁ, হুঁ—। মায়ের কথায় বার তিনেক হুঁ দিয়েও সাহেবের তৃপ্তি নেই। রক্তবসনধারী এই যে পুরুষটি, ইনিও যেন মা হয়ে গেলেন তার।

ভাই-বোন আছে?

সাহেব এবারও ঘাড় নেড়ে দেয়। খুব সম্ভব মিথ্যা কথা হল না। যে দেখে সেই বলে, সাহেব কোন বড়মানুষের ছেলে। বড়-মানুষরা হামেশাই মরে না—কোন অভাবে

মরতে যাবে? ঘর ভরভরাতি থাকে তাদের, ছেলেপুলে কিলবিল করে। অতএব বাপ-মা-ভাই-বোন সবই আছে তার। পরিচয় না জানুক, আছে নিশ্চয় পৃথিবীর কোথাও। এবং সুখে আছে।

রক্তাম্বর সাধু প্রশ্ন করেন, নাম কি রে তোর? বাপের নাম কি?

'খোকা' নাম নফরের মুখে একবার বেরিয়ে গেছে, নতুন-কিছু না বলে ওটাই আপাতত চালানো যেতে পারে। এবং 'সরকারি খেয়া' অদূরে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে তাই থেকে উপাধিটা মনে এসে যায়।

খোকনচন্দ্র সরকার। এক কথায় বলে দিল, কিন্তু বাপের নামে কিছু ভাবনার ব্যাপার। অগণ্য বাপ—রাজা বাহাদুর থেকে শুরু করে নফরকেষ্ট অবধি। কমবেশী সবাই কিছু কিছু বাপের কাজ করেছে। এই পল্টনের ভিতর থেকে কার নামটা পছন্দ করে বলবে, হঠাৎ কিছু মাথায় আসে না।

জবাব না পেয়ে সাধু মশায় অন্য রকম ভাবলেন। মৃদু হেসে বলেন, পালিয়ে এসেছিস বুঝি—নাম বললেই আমি বুঝি ধরে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব! ভয় করিস নে—আমি ঠিক উল্টো রকম ভাবছি। কী কাজ করে তোর বাপ?

এতক্ষণে ভাল একটি বাপ ঠিক করে ফেলেছে। চেতলায় চালের আড়তের মালিক পুরুষোত্তম সা। বিশাল মানুষটি, ভুঁড়ি ততোধিক বিশাল—গলায় সোনার হার হাতে সোনার চাকতি, হাতবাক্স-ভরা কাঁড়ি কাঁড়ি নোট। এর চেয়ে উপযুক্ত বাপ কে কোথায় পেয়ে থাকে!

কি করে বাপ তোর?

চালের ব্যবসা।

ব্যবসাদারের গুষ্ঠি তবে তোরা! সাধু হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তোর ব্যবসাটাও স্বচক্ষে দেখলাম। দেখে তাজ্জব। আহা-মরি হাতখানা তোর। চাদরের নিচে গুটগুট করে কাজ করে যাচ্ছিস—ছুরি ধরা থেকে আঙুল ঘুরিয়ে ব্যাগের মাল বের করে পাচার করে দেওয়া—সমস্ত ব্যাপারটা ছবির মতন চোখের উপর ভাসছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে দিই অমন হাত। ছক-বাঁধা সাজানো কাজকর্ম। নির্গোলে বেরিয়েও যেতিস ঠিক—বাক্স পড়ে বিপদ ঘটাল। দোষ তোদের নয়—নিয়তি, তার উপরে কারো হাত নেই। কাজের গোছগাছ করে দিচ্ছিল, সে মানুষটাও ভাল। তাক বুঝে মাল নিয়ে কেমন সরে পড়ল। পাকা লোক। দুয়ে মিলে খাসা দলটুকু গড়েছিস তোরা।

নদী-তীরে নৌকোঘাটে এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধকণ্ঠে সমানে তারিফ চলছে। বলছেন, হাতের চেয়েও বড় রাজপুত্রের মতো তোর এই চেহারাখানা। মরি মরি, কী চেহারা

নরে জন্মেছিস—চোখ ফেরানো যায় না। মা-কালী যাকে দয়া করেন, চার হাত ভরে তার উপর ঢেলে দেন। এত গুণ নষ্ট হতে দসনে, বুঝলি? মহাপাতক। কাজ দখার পর থেকে শুধু এই কথাটাই ভাবছি। এমন কাঁচা বয়সে পুলিসের হাতে না পড়ে যাস। বয়স হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে দু-চারবার ফাটক ঘুরে এলে খারাপ হয় না—ভালই বরঞ্চ, মুখ বদলানো। পুলিস এখন থেকেই যদি পিছনে ফিঙে লাগে, সব শক্তি বরবাদ করে দেবে। সেইটে ভেবেই অমন করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নইলে, চেনা নেই জানা নেই, সবে আজ পয়লা দিনের দেখা—এত কান্ড করবার গরজটা কী ছিল!

ভাঁটা সরে নদীজল অনেকটা দূরে নেমে গেছে। ডান হাতটা সাধু মশায় একটুখানি তুলেছেন কি না তুলেছেন, ঘাটে-বাঁধা এ-নৌকো ও-নৌকো থেকে পাঁচ-সাত জন মাঝি ঝপঝাপ লাফিয়ে পড়ে ডাঙা মুখো ধাওয়া করল। কাদায় হাঁটু অবধি বসে যায় কোনখানে, কখনো বা পিছলে পড়ে যাবার গতিক—উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে তারা।

সাধু চেঁচিয়ে বলেন, অত জনে কেন রে? আসতেও হবে না। যার নৌকোয় চড়ন্দার নেই, ওখান থেকে বলে দাও। আমিই নেমে যাচ্ছি।

মাঝিরা কানেও নেয় না।

সাহেবের দিকে সাধু বলেন, যাবি রে আমার সঙ্গে?

সাহেব তখন সেই কাদামাটির উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। কষ্ট করে—বেশ শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু এই কাজটুকু না হওয়া পর্যন্ত মনে যেন কিছুতে সোয়াস্তি আসে না। তার এই বিষম দোষ। কোন একটু উপকার পেলে প্রাণ অমনি কানায় কানায় ভরে যায়, উপকারীকে কায়-মনে সেটার জানান দিতে হবে। তাদের যে কাজ, সে পথের দস্তুর আলাদা। সুন্দর চেহারা, সাফাই হাত, উপস্থিতবুদ্ধি—যাবতীয় গুণ রয়েছে, কিন্তু এই বদখত ভালমানুষিটা না ছাড়তে পারলে উপায় নেই।

প্রণাম সেরে উঠেই অনুতাপ। সেই আর এক দিনের মতো মা-কালীর নামে সাহেব মনে মনে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে: মা-কালী, মন্দ মানুষ কর আমায়। খুব-খুব মন্দ। নফরকেষ্টর মতোও নয়—ও মানুষ মন্দ বটে, কিন্তু এক একসময় বড্ড ভাল হয়ে যায়। একেবারে নিটোল নিখুঁত মন্দ মানুষ করে দাও।

সারা জীবন ধরে সাহেব তার অজানা মা আর অজানা বাপের নামে গালিগালাজ করে এসেছে। কোন সৎ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আর সজ্জন পুরুষ—তাদের রক্ত থেকে এই দোষ বর্তেছে। ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই—বুড়ো হয়ে মরতে গেল, এই দোষের সেদিনও সংশোধন হয়নি।

থাক এস। সকলকে পিছনে ফেলে এক মাঝি ছুটতে ছুটতে রাস্তার উপর উঠল। আবদারের সুরে বলে, ঝড়ু-মাঝি সেদিন এই ঘাটে রেখে গেল, আজকে আমি ফেরত নিয়ে যাব। ঘাড় নেড়ে দিন বলাধিকারী মশায়, ওদের সব হাঁক দিয়ে বলে দিই।

ভাঁটি অঞ্চলের সুবিখ্যাত বলাধিকারী মশায়—জগবন্ধু বলাধিকারী। গাড়ির মধ্যে সারাক্ষণ সাধুমানুষ হয়ে এসেছেন কলকাতা শহরটার বাইরে সাহেব একেবারে নতুন—তখন অবধি নাম শোনেনি, কোন কিছুই জানে না বলাধিকারী মানুষটি সম্বন্ধে। কিন্তু ঘাটের উপরে এ হেন খাতির দেখে অবাক হয়ে যায়।

মাঝি বলছে, চরণধুলো আজ আমার নৌকোয় দিতে হবে। নয়তো মাথা খুঁড়ব পায়ে।

জগবন্ধু হেসে বলেন, ধুলো কোথায় পাব গো? এক-পা চটচটে কাদা। তাই তোমার নৌকোয় মাখাব। কি বলবে, বলে দাও ওদের ডেকে।

পুলকিত মাঝি জলের দিকে ফিরে পিছনে অন্যদের উদ্দেশে বুড়ো-আঙুল নাচায়। অর্থাৎ কেল্লা মেরে দিয়েছি আগে-ভাগে ছুটে এসে, তোমাদের শুধু কাদা ভাঙাই সার।

নিজের নৌকোর মাল্লাদের চিৎকার করে বলে, নিমকির ঘাটে নিয়ে নৌকো ধর, ঐখানে যাচ্ছি আমরা।

এই অঞ্চলে একসময় বিস্তর নুন তৈরি হত। নুনের কোন বড় মহাজন পাকা-ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন নুনের নৌকো চলাচলের জন্য। রশি দুয়েক পথ—মাঝি সেই ঘাটের কথা বলছে। সেখানে গেলে কাদা ভেঙে নৌকোয় উঠতে হবে না।

বলাধিকারী বলেন, কেন আবার কষ্ট করে উজান ঠেলে মরবে! গাঙ-খালের দেশের মানুষ কাদা ভাঙতে পারব না—পা দুখানা তবে তো মোড়ক করে লোহার সিন্দুকে রেখে দিলেই হয়।

নৌকা নিয়ে যাচ্ছে সেই নিমকির ঘাটে। ডাঙার উপরে হাঁটতে হাঁটতে এঁরা পথটুকু চলেছেন।

জগবন্ধু সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জঙ্গলবাড়ির মা ভারি জাগ্রত। কত জায়গা থেকে কত মানুষ আসে, দেখলি তো তার খানিক খানিক। আমি যাই ফি বছর। সকলের যেমন—আমিও মানত শোধ দিই, নতুন বছরের জন্য মানত করে আসি—

বলে হাসতে লাগলেন। মাঝি ফোড়ন কেটে ওঠেঃ মস্তবড় সংসার আমাদের এই বলাধিকারী মশায়ের। ভাল মন্দ কার কখন কি হয়, সেই জন্য মায়ের বাড়ি ধন্না দিয়ে পড়েন।

সংসার না-ই বা থাকল, আমি নিজে আছি। নিজের জন্য গিয়ে মানত করি।

মাঝি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনার সংসার নেই! তল্লাটের মধ্যে এত বড় সংসার কার আছে শুনি? কার মাথায় এত দায়-ঝক্কি?

জগবন্ধু বোধ করি প্রসঙ্গটা আর এগুতে দেবেন না। কথা ঘুরিয়ে নিলেনঃ মেলার মানুষ তিন-চার রাত্রির মধ্যে চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। নৌকোয় উঠেই মাদুর পেতে পড়ব। গাবতলির আগে আমায় কেউ ডাকবে না, তোমায় বলা রইল মাঝি। গাব-তলি গিয়ে ভরপেট সকলে জলটল খেয়ে নেবে।

সাহেবকে বলেন, আকাশের উপর থেকে ভগবান অন্তর্যামী হয়ে দেখেন। আমারও হল তাই। বাঙ্কের উপর থেকে দেখেছি। বাঙ্কটা পেয়ে গিয়ে ভারি স্ফূর্তি হয়েছিল। চলন্ত গাড়িতে ঘুমুতে মজা—মালপত্র ঠেসান দিয়ে বসে বসেই ক'দিনের বকেয়া ঘুম উশুল করে নেব। ঢুলুনিও এসেছিল। তোদের জ্বালায় হল না। হঠাৎ দেখি, কাজ-কর্ম শুরু করে দিয়েছিস ঠিক আমার নজরের নিচে। অমন একখানা মজাদার কাজের শেষ না দেখে পারি কেমন করে? কিন্তু সেই লোকটাকে আর দেখলাম না—বাপ হয়ে যে ছেলের গায়ের চাদর গুঁজে দিচ্ছিল।

পিছন থেকে নফরকেষ্ট অমনি সাড়া দিয়ে ওঠেঃ আজ্ঞে, এই যে—আমি—

দ্রুত সামনে চলে এসে সাহেবের মতো সে-ও বলাধিকারীর পায়ে গড় করল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত ছুঁইয়ে জগবন্ধু হেসে বললেন, খোকনচন্দ্রের যে বাপ, এমনধারা কাঁচা বাবস্থা তার হাতে কেন হবে?

নফরকেষ্ট সচকিত হয়ে বলে, আজ্ঞে?

ভুঁড়িটা বড্ড একপেশে তোমার বাপু। একদিক চিটেপানা আর একদিক বেঢপ মোটা। ঠিক করে নাও, ঠিক করে নাও। কত ডাক্তার কত দিকে—পেটে কী রোগ হয়েছে, কেউ হয়তো টিপে দেখতে গেল।

জামার নিচে কোমরে মাল বেঁধে নিয়েছে, ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটির মধ্যে একদিকে সেটা সরে গিয়েছে। সলজ্জে নফরকেষ্ট সামাল করে নিল।

সাহেব বলে, কী করব আমি, বলে দিন।

বলেই তো দিয়েছি। আমার সঙ্গে চল। গাড়িতে গাড়িতে ছ্যাঁচড়ামির কাজ ছেড়ে দে, পিটিয়ে শেষ করবে কোন দিন। কাল রাত্রেই তো হচ্ছিল। ক্ষমতা নষ্ট হতে দিতে নেই, উচিত কাজে লাগা।

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে ফেলে আমিও কিন্তু যাব না বলাধিকারী মশায়।

সাহেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, যাওনি ঐ গাড়ির মধ্যে?

নফরকেষ্ট বলে, আমায় দু-ঘা মারলে তোমার গায়ের ব্যথা কম হত নাকি কিছু?

বলাধিকারী নফরকেষ্টকে সমর্থন করেনঃ ঠিক করেছে। কাজের এই নিয়ম। মার কি বলছিস রে, মেরে ফেললেও দলের কেউ এসে চেনার ভাব দেখাবে না। নির্বিঘ্নে কাজে নেমে গেল, সকলে একত্র হলে—আবার তখন পুরানো সম্পর্ক।

সাহেবের দুটো মানুষ বলাধিকারীর সঙ্গে জলের রাজ্যে চলল। (ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ১৯ ॥

পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে সেই একই প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। ডাক্তার পিল্লাই বললেন : আমার দেখতে ইচ্ছা করে একটি মাড়িয়া ছেলে বা মেয়েকে সভ্যজগতে নিয়ে এসে মানুষ করলে কি হয়।

রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে মেহরো-সাহেব বলেন : আমি একটা ঘটনা জানি। সে চেষ্টাও এক ভদ্রলোক করেছিলেন— কিন্তু ফল হয়েছিল করুণ।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি ঘড়ি দেখলুম। ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। সুতরাং উসকে দেওয়া চলতে পারে। বললুম গল্পটা আমরা শুনতে পাই না?

মেহরো বলেন : আমার আপত্তি নেই। তবে আপনাদের হাতে সময় আছে তো!

ডাক্তার সাহেব বলেন : আমার তাড়া নেই।

গুপ্তেজী হাঁ-না কিছুই বলেন না।

গল্প শুরু করেন মেহরো-সাহেব : আপনারা নিশ্চয় জানেন—এই দণ্ডকারণ্য থেকে নানান জাতের আদিবাসীকে চালান দেওয়া হত আসামের চা বাগানে। দেশ-স্বাধীন হবার পর চা-বাগানের সাহেবরা ক্রমে ক্রমে বিলাতে ফিরে গেল বাগান বেচে দিয়ে। এখানকার শ্রমিক- সরবরাহের যে বিলাতী প্রতিষ্ঠানটি ছিল তারাও চাটি-বাটি গোটাল। সরকার সমস্ত সম্পত্তিটা কিনে নিলেন। আমাকে পাঠানো হল সম্পত্তির দখল নিতে। সবকিছু সাহেবরা নিয়ে যেতে পারেনি। গুদামঘর থেকে বার হল ভাঙ্গা গলফ্ স্টিক্, বিলিয়ার্ড টেবিল, পিয়ানো, গাদা-বন্দি প্রাচীন পাঞ্চ আর লন্ডন-টাইমস্। সেই সাথে পেয়ে গেলাম খান চারেক ধূলিজীর্ণ ডায়েরি। লেখকের নাম আর্নেস্ট স্টেটন। সম্পত্তির বর্তমান মালিক স্যামুয়েল বারওয়েলের বাপের নাম ছিল ডেভিড বারওয়েল। অথচ ডায়েরি পড়ে দেখলাম এই স্টেটন-সাহেবই ছিলেন তখন সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক। কোন সূত্রে সেটা হাত বদলিয়ে এল বারওয়েল পরিবারের হাতে?

যাইহোক, ডায়েরি পড়তে পড়তে অভি-ভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বিজন অরণ্যের মধ্যে কয়েকটি অচেনা বিদেশী চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল আমার মানসপটে।

উনিশ শ' সাত, আট, নয় আর দুই বছর বাদ দিয়ে বারো। চারখানি ডায়েরি।

উনিশ শ' সাতের ডায়েরিতে দেখি বিপত্নীক এক প্রবাসী খাঁটি ইংরাজ ভদ্র-লোককে। আর্নেস্ট স্টেটন। বাহান্ন বছরের বৃদ্ধ। একমাত্র কন্যা ডেইজীর বয়স তখন একুশ। স্টেটন সাহেব লিখছেন : আমরা বাপ-বেটি দুজনেই আত্মকেন্দ্রিক। 'দি নুক'-কে কেন্দ্র করে আমরা একটি বৃত্ত টেনেছি। তার বাইরে আমরা সচরাচর যাই না। না ভুল বললুম। বৃত্ত নয়, উপবৃত্ত। ইলিপস্। দি নুক ইস্ নট্ দ সেন্টার—আওয়ার লাইফ সাইক্ল হ্যাস্ টু ফোসাই—বেবী, এ্যান্ড হার পুয়োর ওল্ড ড্যাড।

এই আত্মকেন্দ্রিক পরিবারের বন্ধু ছিলেন বারওয়েল দম্পতি। মাঝে মাঝে আসতেন ভাইজাগ থেকে মেজর গেব্রিয়াল—হাসপাতালের ডাক্তার। এস পি সাহেব, ডি এমও আসতেন। দি নুক-এ সান্ধ্য আসর বসত কয়েকটি বিদেশীকে ঘিরে।

উনিশ শ সাতের মার্চ মাসে প্রথম উল্লেখ দেখি বারওয়েলের। বারোই মার্চ আর্নেস্ট

স্টোন লিখছেন : বারওয়েলের এই ভাইপোটিকে আমার ভাল লেগেছে। চমৎকার ছেলে। সম্প্রতি এসেছে বিলাত থেকে। ভারতবর্ষ দেখতে এসেছিল, এখন বলছে এখানেই থেকে যেতে চায়। আমার মতো ও বোধহয় এই অদ্ভুত দেশটার প্রেমে পড়ে গেছে। সাবধান ডেভিড, এ বড় সাংঘাতিক দেশ—একেবারে অক্টোপাস। যাকে ধরে তাকে আর ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত আমার মতো পচে মরতে হবে এই অরণ্যপর্বতে!

বোধকরি নেপথ্যচারী একজন সেদিন হেসেছিলেন। বারওয়েলের ভাইপো ডেভিড বারওয়েল উত্তরকালে এই অরণ্যপর্বতের মায়াবন্ধন সত্যিই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেই 'বারওয়েল-ভিলা' থেকে সে প্রতি সন্ধ্যায় আসতো দি-নূকে।

আর্নেস্ট স্টোনের আইভি-লতায় ঘেরা পাথরের বাংলো-বাড়ির ফটকে সন্ধ্যা হলেই জ্বলতো একটি কেরোসিনের বাতি। ডাইনামো তখনও বসেনি। ফটকের পিলারে একটা কুলুঙ্গি। তার ভিতরে জ্বলে সন্ধ্যা-দীপ। কাচের গায়ে লেখা "দি-নূক"। ফটক থেকে লাল কাঁকরের পথটা এসে আশ্রয় খুঁজেছে গাড়ি বারান্দার তলায়। দুধারে নানান জাতের ফুলের গাছ—মরশুমি চারা আর ক্যাকটাস্। ডানহাতি দারোয়ানের কুটুরি, বাঁয়ে ছোট্ট কেনেলে একজোড়া পুডল। ড্রইং-রুমের দেওয়ালে ট্যান-করা বাঘ-ভালুক আর হরিণের চামড়া, মোষের সিং, সম্বরের স্টাফ্ট্ মাথা। পিয়ানো, বুককেস আর ডোম-বসানো সেজবাতি।

এই ছিল রাজ্য। রাজ্যে রানী নেই। রাজা দিবারাত্র কোম্পানির কাজে ব্যস্ত। এ রাজ্যের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা ছিল রাজকুমারী ডেইজি। বুড়ো আর্নেস্টের—বেবীমাঈ! পোষা হরিণ, খরগোশ, এক-ঝাঁক পায়রা, আর পুডল দুটো ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই তার। এমন নিঃসঙ্গ মিরাণ্ডার জীবনে এল নায়ক। ডেভিড বারওয়েল। সাতাশ বছরের তারুণ্যের প্রতীক। সমুদ্র পারের নীল আলো ওর চোখের তারায়। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় নয়, সাইকেলে চেপে সে আসত সাত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে।

তারপর যা হয়ে থাকে। সাতই আগস্ট আর্নেস্ট স্টোন তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখেছেন : "আজ আমার বড় আনন্দের দিন। ডায়েরির এই পাতাটা কালো কালিতে নয়, সোনার জলে লেখা উচিত ছিল আমার। আজ ডেভিড এসে আমাকে জানাল সে আমার বেবীকে বিয়ে করতে চায়। বললুম : বেবীর কাছে প্রপোস করেছ? বললে : সে ভরসা না দিলে কি এ দুঃসাহস দেখাতে পারি?

'দুজনকে ডেকে এনে আশীর্বাদ করলাম। কাল একবার বারওয়েল ভিলায় যেতে হবে। ডেভিড ছেলেটি ভাল। বিনয়ী, বুদ্ধিমান,

দরদী আর কমঠ। বেবীর মা বেঁচে থাকলেও এমন জামাই পছন্দ হত তার। বেবী সুখী হবে। করুণাময় ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।

'কিন্তু তুমি? তোমার কি গতি হবে আর্নেস্ট স্টোন? এই নির্বান্ধব পাষাণ-পুরীতে তুমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? সারাদিনের শ্রমে ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে যখন ফিরে আসবে "নুকে" তখন দাখিণের ঘরে কোনও আলোর রেখা আর নজরে পড়বে না। ড্রইংরুমে বসে থাকবে না কোন অভিমানিনী—কেন রাত হল ফিরতে তার কৈফিয়ত তলব করতে। হিসাবের খাতা কেড়ে নিয়ে কেউ বলবে না—উলের গুলি পাকিয়ে দাও দেখি, দস্তানা বুনব তোমার। মাঝরাতে কোন অভিভাবিকা এসে সেজবাতি নিভিয়ে দিয়ে বলবে না—এত রাত জেগে কাজ করলে শরীর খারাপ করবে। কিন্তু এসব তুমি কী বলছ স্টোন? মেয়েকে বিদায় দিতে কি শেষে চোখে জল এসে যাবে নাকি তোমার? তুমি না ডিভনশায়ারের বিখ্যাত স্টোন-বংশের ছেলে? তোমার পূর্ব-পুরুষ না ট্রাফালগারের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে? তোমার চোখে জল? ছি!'

বুড়ো স্টোনের আশংকা কিন্তু সত্য হল না। মেয়ে বেঁকে বসল। বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। মেয়েকে বুড়ো বোঝাল এই হচ্ছে মেয়েদের নিয়তি: পুরাতন আবাস ছেড়ে যাওয়াই তার ভাগ্যের নির্দেশ, বললে : বেবী, আমি শুধু তোমার বাপ নই, আমি তোমার মা-ও। আমি বলছি তুমি ওকে বিয়ে কর, তুমি সুখী হবে।

মেয়ে বললে : ড্যাডি, কিন্তু আমিও যে শুধু তোমার মেয়ে নই, আমি তোমার ছেলেও! তোমার বেবীকে না দেখলে তুমি আর পাঁচটা বছরও বাঁচবে না বাবা!

জবাব দেবে কি? ট্রাফালগারের যুদ্ধের বীর সৈনিকের অধঃস্তন পুরুষ হু হু করে কেঁদে ফেললে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

সমাধানের পথের সন্ধান দিল ডেভিড বারওয়েল। বললে : মিস্টার স্টোন, তোমার বয়স হয়েছে। য়ু নীড অ্যান এ্যাসিস্টেন্ট। তুমি আমাকেই নাও না কেন। আমাকে তোমার পার্টনার করতে পার, কর্মচারীও করতে পার। আমি সবেতেই রাজি। আমার তরফে শুধু একটিমাত্র শর্ত।

হাতে স্বর্গ পেল স্টোন। তবু দুরু দুরু বুকে বলে : কী শর্ত?

: মিস্ স্টোনের পরিচয় এর পর থেকে হবে মিসেস্ ডেভিড বারওয়েল! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বুড়োর। হা-হা করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললে : সো য়ু প্রপোস টু সার্ভ এ্যাস্ লামহাদা?

: লামাহাদা? হোয়াসার্ট?—নবাগত ডেভিড বুঝতে পারে না রসিকতাটা। বুঝেছে ডেইজি। বাপের গালে চুমু খেয়ে বলে : য়ু নটি ওল্ড বয়!

আনন্দের জোয়ার এসে লাগল অরণ্য-প্রান্তের নিভৃত 'নুকে'। রোজই পার্টি, পিকনিক, শিকার। রায়পুর থেকে ভাইজাগ থেকে এমনকি সুদূর কলকাতা থেকে এলেন বন্ধু-বান্ধব, নব দম্পতিকে অভিনন্দন জানাতে। বৃদ্ধ ফাদার জোনস্ নিজে বিবাহ দিলেন ওদের।

ডায়েরির বাকি কয়মাসের পাতা ছাপিয়ে আনন্দ স্রোত যেন উপছিয়ে পড়েছে পরের বছরের ডায়েরিতে। ডেভিড অত্যন্ত বুদ্ধি-মান, ডেভিড অত্যন্ত পরিশ্রমী, ডেভিড তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করবে। বাবুর চুরি সে বন্ধ করেছে। বাবুর অত্যাচার সভয়ে থেমে গেছে।

বাবু বলতে ম্যানেজার মিশ্র। কলকাতা-বাসী বন্ধুদের অনুকরণে আর্নেস্ট স্টোন তাঁর দেশীয় কর্মচারীকে 'বাবু' বলে ডাকতেন। মিশ্রজী লোকটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে ডায়েরির। মিশ্র ছিল এ প্রতিষ্ঠানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে। আর্নেস্ট স্টোন বহুবার বহুজনের মুখে শুনেছেন মিশ্রের বিরুদ্ধে নানান অভি-যোগ। মিশ্র এ প্রতিষ্ঠানের টাকা বেনামীতে খাটাচ্ছে। মিশ্র আদিবাসী গ্রামে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করছে। সবাই শুনেছেন, হাতে নাতে ধরতে পারেননি। তাছাড়া ঘাঁটাতেও সাহস হত না মিশ্রকে। বস্তুত মিশ্রই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রাইম-মুভার।

সেই মিশ্রকে একেবারে শায়েস্তা করে দিয়েছে ডেভিড। হান্টার দেখিয়ে বলেছে এ কথা যদি তোমার নামে দ্বিতীয়বার শুনি তাহলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব!

মিস্টার স্টোন জনান্তিকে ডেভিডকে

ডেকে বলেছিলেন : একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ডেভিড? লোকটা যদি ইস্তফা দিয়ে বসে?

: তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটা এ্যাকসেপ্ট করব। ডেভিডের সাফ জবাব। আপনার ধারণা ভুল। ঐ রকম অর্থলোভী অত্যাচারী নীচ ম্যানেজার না থাকলে আপনি আরও সহজে আরও অনেক বেশী শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারতেন।

মিশ্র পদত্যাগ পত্র পেশ করেনি। সাবধান হয়ে গিয়েছিল সে।

বৃদ্ধ স্টোন দ্বিগুণ উৎসাহে ব্যবসা বিস্তারে মন দিলেন।

কিন্তু বাধ সাধলেন এবার বিধাতাই স্বয়ং!

উনিশ শ আট সনের সতেরই ডিসেম্বর। আর্নেস্ট স্টোনের দিনপঞ্জিতে অল্প কয়েকটি ছত্র লেখা আছে : কোরাপুট সিমেটারীতে আমার বেবীমাঈকে শুইয়ে রেখে এলাম। শ্বেত করবী গাছের তলায় সাদা ফুল খুব ভালবাসত বেবী!

ডিসেম্বর মাসের বাকিকটা পাতা শ্বেত-করবী ফুলের মতোই সাদা!

পরের বছর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আর্নেস্ট স্টোন লিখছেন:

: মুশ্‌কিল হয়েছে বাচ্ছাটাকে নিয়ে। অতটুকু বাচ্ছাকে আমি কেমন করে মানুষ করব? অথচ প্রায় মাসখানেক হতে চলল। হাসপাতাল থেকে মেজর গেরিয়েল তাগাদা দিচ্ছেন। যা হয় মতিস্থির করতে হবে। মিসেস বারওয়েল ওকে নার্সারীতে দিয়ে দেবার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? আমার বেবী মাঈয়ের ছেলে নুকে মানুষ হবে না? বেবীও শৈশবে মাতৃহারা। তাকে তো মানুষ করে তুলেছিলাম। এবার সাহস পাচ্ছি না কেন? আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? কিন্তু ডেভিড বদ্ধপরিকর। ছেলেকে সে কোনও শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে চায়। যায় যাক। আমি বাধা দেব না। এ অরণ্য-পর্বতের সঙ্গে ডেভিডের নাড়ির যোগ নেই। সে এখানে নোঙর গেড়েছিল ডেইজির আকর্ষণে। ডেইজি নেই, তাই জাহাজও আর বন্দরে থাকতে চাইছে না। কিন্তু আর্নেস্ট? তুমি কি করবে? তুমি তো জাহাজ নও, তুমি গাছ। এই অরণ্যে শিকড় গেড়েছ তুমি—এর আলো-বাতাস, জ্যোৎস্না, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত তোমাকে প্রাণের নিবিড় টানে একান্ত করে বেঁধে রেখেছে। তোমার তো মুক্তি নেই!

অরণ্যের একটা প্রাণময় সত্তা আছে। মানুষীর মতো সেও জানে নিবিড় করে ভালবাসতে। শ্বাপদ-সংকুল গহন, অরণ্য রমণীর হৃদয়ের মতোই দুর্গম, রহস্যময়ী। তার আকর্ষণও তেমনই অমোঘ। আর্নেস্ট স্টোন ও অরণ্যের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছেন। মুক্তির স্বপ্ন তাই তিনি দেখেন না। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার পালা যৌবনের প্রারম্ভেই একদফা হয়ে গেছে। হার মানেন নি। জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়ে হাল ছাড়েননি। বেবীকে জড়িয়ে খাড়া হয়ে ছিলেন এতদিন। আজ আর সে বয়স নাই —না থাক, তবু তিনি ডিভনসায়ারের স্টোন পরিবারের ছেলে, নতি স্বীকার করলেন না নিয়তির কাছে। জীবনের অপরাহ্নে এসে নতুন করে শুরু করলেন খেলা—এবার আবার নতুন ঘুঁটি—বেবীর বাচ্ছা স্যাম!

বুড়ো স্টোন দিনসাতেক পরে ডায়েরিতে লিখেছে: ডেভিডকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিই দিলাম। যে কান্ডটা করেছে তারপর তাকে যেতে দেওয়াই মঙ্গল। ও পাগল হয়ে যাবে এখানে থাকলে! কাল সন্ধ্যাবেলাই হল বিশ্রী কান্ডটা। অফিসের বাবুরা এল দল বেঁধে। মিশ্রের জামা তুলে দেখালে আমাকে। পিঠে সত্যই চাবুকের দাগ! বাবুরা বললে—এর প্রতিকার না হলে তারা থানায় যাবে। অনেক বুঝিয়ে শেষে তাদের ঠান্ডা করি। গভীর রাত্রে ডেভিড ফিরল। মদে চুর হয়ে আছে। তবু তখনই তাকে ডেকে পাঠালুম। এসে দাঁড়ালো। খোলা চোখ দুটো আমার মুখে মেলে। বললুম: মিশ্রকে চাবকেছ?

ঃ কেন?

ঃ ইট ওয়াস্ দ লাস্ট ডিসায়ার অফ ডেইজি!

বুঝতে পারিনা ও মাতলামি করছে, না পাগলামি! কী আর বলব, তবু বললুমঃ তুমি কি কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত নও?

ও বললে ঃ হ্যাঁ অনুতপ্ত। আই স্যাড রাদার হ্যাভ ইউস্ড মাই রিভলভার!

বললুমঃ তুমি মুক্তি চেয়েছিলে ডেভিড। তোমাকে মুক্তিই দিলুম আমি!

মাতালটা বললেঃ থ্যাংক্স!

ডায়েরির পরের কয় পৃষ্ঠা পড়ে বুঝতে পারি পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন তিনি। ডেভিড নয়, আর্নেস্ট স্টেন। কিন্তু ডেভিড থাকেনি। ফিরে গিয়েছিল স্বদেশে। মিশ্রের অপরাধটা শুনেছিলেন পরে। মেয়েটিকে নিয়ে এসে তুলেছিলেন নিজের বাড়িতে। শুনেছিলেন তার করুণ ইতিহাসঃ

মেয়েটির নাম লিখমু। আর্নেস্ট তাকে বরাবর মেরিয়া নামে উল্লেখ করে গেছেন। বোধকরি লিখমুর এ নামকরণ তিনিই করেছিলেন। মেরিয়ার বাড়ি ছিল বড়া পারাঙ গাঁয়ে। মাত্র দু বছর হল বিয়ে হয়েছে। ডেইজির চেয়ে অল্প ছোট হবে হয়তো বয়েসে। স্বামী ছিল ঘটুলের কোতোয়ার। মিশ্র তাকে দাদন দিয়ে টিপছাপ নিয়েছিল। মেরিয়া বলে, কোতোয়ার জানত না এ দাদনের অর্থ কি। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ধারণা দাদন নেওয়া হয়েছে বিড়ি-পাতা সরবরাহের জন্য। মিশ্র বেনামীতে বিড়ি-পাতা, হরতুকি-মহুয়া সরবরাহের ব্যবসা করত। তারপর যেদিন মিশ্র দলবল নিয়ে গ্রাম থেকে ওকে ধরে আনতে যায়—তখন সে বুঝতে পারে এ দাদন হচ্ছে আসামে কাজ করতে যাবার জন্য। মিশ্র দয়া করেনি। ওরই মতো অনেকগুলি হতভাগ্যকে মিশ্রের লোকেরা টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে ফেলে। সে রাত্রে মেরিয়া ছিল প্রসব-বেদনায় শয্যাশায়ী। স্বচক্ষে সে কিছু দেখেনি—শুনেছে শুধু আর্তনাদ আর কান্না। সব কথা সে জানেনা। শুধু এটুকু জানে গ্রামের লোক বাধা দিতে গিয়েছিল—একটা খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়। মধ্যরাত্রে নবজাতকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনেছিল একবার, আর ভোর রাত্রে দেখে তার খড়ের বাসায় আগুন! আর কিছু সে জানেনা। জ্ঞান ফিরে এলে সে জানতে পারে—তার স্বামীকে চালান দিয়েছে কোন চা-বাগানে—আর তার সদ্যোজাত সন্তান পুড়ে শেষ হয়েছে স্বামীর ভিটের সংগে!

আর্নেস্ট স্টেন নিরাশ্রয় মেয়েটিকে এনে তুললেন দিনুকে। তারই হাতে তুলে দিলেন ডেইজির স্মৃতি হুটুকুকে—স্যামুয়েল বারওয়েলকে। বারণ করেছিল সবাই। আদিবাসীদের প্রতিশোধ-প্রবণতা ভয়ানক বেশী! সে হত্যা করবে শিশুকে! কিন্তু আর্নেস্ট স্টেন কারও কথায় কর্ণপাত

আদিবাসী মজুরণী—কোরাপুট

করেন নি। বলেছিলেনঃ মেরিয়া জানে আমি মেরিয়ার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমার হারানো মেয়েকে—তাই আমিও জানি স্যামের মধ্যে মেরিয়াও খুঁজে পাবে তার হারানো ছেলেকে। অদ্ভুত যুক্তি। কিন্তু দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়। তাই হল শেষ পর্যন্ত।

অসাধ্য সাধন করলেন আর্নেস্ট স্টেন। চুয়ান্ন বছরের যুবক! ডেভিড নেই। না থাক। একাই সব দেখা শোনা করেন। এদিকে মেরিয়াকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব আছে। মেরিয়া এ-বি-সি-ডি চিনল, আঁক কষতে শিখল। তিলে তিলে একটি পিতৃহৃদয়ের শূন্য স্থান দখল করে নিল সেই প্রকৃতির সন্তান। শুধু তাই নয়। স্টেনের দৌহিত্রকে নিজের বুকের অমৃত পান করিয়ে মানুষ করে তুলল সে। অদ্ভুত এক পরীক্ষার নেশায় মেতে উঠলেন স্টেন। ব্রিটিশ-ধমনী নিঃসৃত রক্তের সংগে মাড়িয়া যুবতীর বুকের দুধের ককটেলে কী দাঁড়ায় দেখবেন তিনি। দেখবেন, প্রতিহিংসা-পরায়ণ আদিবাসীর মনে বাইবেলের প্রতিক্রিয়া।

স্যাম হাঁটতে শিখল—মেরিয়া শিখ[ল] বুকের উপর কাপড় তুলতে। স্যামের দাঁ[ত] আর মেরিয়ার হাতে ছুরি কাঁটা উঠল প্রা[য়] একই সংগে। স্যাম যেদিন শিখল এ-বি-সি-ডি, মেরিয়া সেদিন শিখল 'লাস্ত দা[ন] নেবার।' মিসেস্ বারওয়েল বলেন ঃ অদ্ভু[ত] তোমার মনের জোর আর্নেস্ট! সব খুইয়ে[ও] তুমি ভেঙে পড়নি।

কিন্তু বৃদ্ধ আর ব্যবসায়ের দেখা শো[না] করে উঠতে পারেন না। সব দায়িত্ব এ[সে পড়ে] মিশ্রের উপর। ডেইজি নেই, ডেভিড [নেই] —মিশ্রের তো পোয়া বারো। মনের আন[ন্দে] চুটিয়ে ম্যানেজারি করতে বসল সে! বি[ন্তু] গোল বাধল হঠাৎ! মারাত্মক একটা দুর্ঘ[টনা] ঘটতে ঘটতে দৈবক্রমে বেঁচে গেল মিশ্র। আসছিল সাহেবের সংগে দেখা করতে সন্ধ্[যার] পর। একাই। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটা ধারালো তীর [...] কান ঘেঁসে গিয়ে বিঁধল ইউক্যালিপট[াস] গাছের গায়ে। মাড়িয়া তীর। বিষ[...] এসেছে সাহেবের বাড়ির দিক থেকেই!

মিশ্র ভয়ে কুঁকড়ে গেল একেবা[রে]। সাহেবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল—[...] ব্রাঞ্চ-অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। সাহে[ব] চিন্তায় পড়লেন। মেরিয়াকে ডেকে জিজ্ঞ[াসা] করলেন। সরাসরি অস্বীকার করল মেরি[য়া]। বাড়ি তল্লাসী করে কোন মাড়িয়া ধনু[ক] পাওয়া গেল না। কিন্তু এ কথা মনে [মনে] জানতেন আর্নেস্ট স্টেন যে মেরিয়া মি[...]

[illegible] করতে পারেনি। পাহাড়ি মেয়েটির [illegible] প্রতিশোধের আদিম আকাঙ্খা একেবারে [illegible] দেওয়া যায়নি 'লাভ দাই নেইবার' মন্ত্রে। [illegible] মরদ আর ফিরে আসেনি কোনদিন। [illegible] থেকে অধিকাংশই অবশ্য ফেরে না। [আর]নেস্ট স্টোন এ ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু খবর পান নি। ধূর্ত মিশ্র চালান [illegible]বার সময় নাম-ধাম এমনভাবে পাল্টায় যে [illegible] থেকে আর কোন মানুষকে সনাক্ত করার উপায় থাকে না। মিশ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন [illegible]সেও আদ্যপ্রান্ত অস্বীকার করে গেছে ঘটনাটা। বড় পারাঙের কোতোয়ারকে রিক্রুটই করা হয়নি আদপে।

আর্নেস্ট স্টোন বাইবেল পাঠের সময়টা বাড়িয়ে দিলেন শুধু। পড়লেন—পরম-করুণাময় যিশু বলেছেন: এক গালে চড় মারলে আর এক গাল বাড়িয়ে দিতে হবে,—অত্যাচারীর সম্বন্ধে ঈশ্বরকে ডেকে বলেছেন: ওরা জানেনা ওরা কি করছে। প্রভু! ওদের তুমি ক্ষমা কর।

মেরিয়া নতজানু হয়ে চোখ বুজে সাহেবের সংগে সংগে উচ্চারণ করত সেই অহিংসার মন্ত্র। স্যাম দু একটা কথা বলতে শিখেছে। সে শুধু বলত : আমেন!

বৃদ্ধ তাকে বুকে তুলে নিয়ে বলতেন : ইয়েস, ইয়েস! আমেন! হিংসার বদলে হিংসা নয়, ক্ষমা—করুণা!

কিন্তু তবু কিছু হল না। দ্বিতলের ঝোলা বারান্দা থেকে মেরিয়ার হাত ফসকে বিরাট একটা পাম-গাছের টব আবার পড়ল মিশ্রের মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে! বাইবেলের প্রভাব দেখবার মতো মনের জোর আর ছিল না মিশ্রের। সাহেবের হাতে পায়ে ধরে সে বদলি হয়ে গেল ব্রাঞ্চ অফিসে।

বছর তিনেক পরের কথা। সেবার বাস্তারে ভীষণ গণ্ডগোল। প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। সাহেব অসুস্থ। উত্থান শক্তি রহিত। এদিকে ও'দের প্রতিষ্ঠানের নামে কারা সব গোপনে নালিশ জানিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। তদন্তে আসছেন উপর-আলা। আর্নেস্ট স্টোন নিরুপায় হয়ে ডেকে পাঠালেন মিশ্রকে। এতদিনের প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে ছুটে আসতে হল মিশ্রকে। কিন্তু সাবধানী লোক সে। দুজন বডিগার্ড নিয়ে সে দেখা করতে এল সাহেবের বাংলোতে তদন্তকারী অফিসারকে নিয়ে। নিচের বড় হল কামরায় বসে এত্তালা পাঠালো উপরের ঘরে। সাহেব তখন দ্বিতলের ঘরে শয্যাশায়ী। উপর থেকে নেমে এল মেরিয়া—ভায়োলেট রঙের একটা স্কার্ট-গাউন পরেছে সে। গলায় জড়োয়া নেকলেশ। সেজবাতির আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। দীর্ঘদিন পরে চার চক্ষুর মিলন হল আবার। মিশ্র দেখল ডেইজির নেকলেশ উঠেছে মেরিয়ার গলায়। মেরিয়া দেখল মিশ্রের চোখে সেই ক্রুর দৃষ্টি আজও তেমনি আছে। তদন্তকারী অফিসার অবাক হয়ে মিশ্রকে জনান্তিকে বললে—ইনি কে?

মিশ্র মেরিয়ার শ্রুতিগোচর করেই জবাব দিলে : এ বাড়ির আয়া!

মেরিয়া অপমানটা হজম করে নিলে। মনে মনে সে করুণাময় যিশুর ভালো ভালো উপদেশগুলি আওড়াতে থাকে। হিংসা নয়, ক্ষমা :—করুণা! রাগ সে করবে না, সে তো সত্যই আর্নেস্ট স্টোনের কন্যা নয়, সে এ বাড়ির আয়া-ই।

অফিসার বললে : স্ট্রেঞ্জ গার্ল!

সাহেবের সংগে ওদের দেখা হল। মিশ্র জনান্তিকে মেরিয়াকে বললে—আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। কিন্তু অজানা হাতের তীর অথবা ফুলের টব যদি আমার কাছ ঘেঁষে ছুটে যায় তাহলে বড়া পারেঙের কোতোয়ারের ঘরের মতো এই নুকটিকেও পুড়িয়ে শেষ করব আমি! মনে রেখ, এখন ডেভিড নেই, মিস্টার স্টোনও এখন শয্যাশায়ী!

মেরিয়ার চোখ দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেছিল, হঠাৎ সেও বলে বসে : তুমিও মনে

রেখ, ডেভিড নেই—কিন্তু যাবার সময় সে চাবুকটা আমাকে দিয়ে গেছে! ড্যাডি শয্যাশায়ী কিন্তু তাঁর পিস্তলে মরচে ধরতে দিইনি আমি!

বলেই উঠে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। সেখানে ঘুমোচ্ছিল ওর কুড়িয়ে পাওয়া ইংরাজ সন্তান। স্যামুয়েল বারওয়েল। তাকে জড়িয়ে ধরেছিল বুকে। তারপর উঠে গিয়ে নতজানু হয়ে বসেছিল মেরী-মাতার ছবির সম্মুখে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেছিল : আমাকে তুমি বল দাও! আমি অন্যায় করে ফেলেছি! আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিশোধ নয়—করুণা! হিংসা নয়, প্রেম!

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

তদন্তকারী অফিসার ভাল রিপোর্টই দিয়ে গিয়েছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। সফল হয়েছিল মিশ্রের কারসাজি।

আমি বললুম : কিন্তু মিস্টার মেহ্‌রা, আপনি গল্পটা শুরু করার সময় বলেছিলেন আদিবাসীদের শিক্ষিত করলেও তারা আদিম থেকে যায়—সে সিদ্ধান্তের তো কোন মীমাংসা হল না।

মেহ্‌রা বলেন : গল্পটা আমার শেষ হয়নি এখনও। তদন্তকারী অফিসার চলে যাবার পরেই খুন হয়েছিলেন মিশ্র। আমূলে বিদ্ধ হয়েছিল একটা বিষাক্ত তীর তাঁর কণ্ঠ-নালীতে!

ডাক্তারসাহেব বলেন : মেরিয়ারই জিত হল শেষ পর্যন্ত? দ্বৈরথ সমরে মিশ্রই হারল?

: একেবারে যে হারল তা নয়! মিশ্র তার আগেই একটি চাল চেলেছিল। তদন্ত-কারী অফিসারের ভাল রিপোর্টের পিছনেও কিছু ইতিহাস আছে। দামী মদ আর নগদ মূল্য দিয়েই শুধু অমন একখানি হয়-কে-নয়-করা রিপোর্ট আদায় করা যায়নি। সে রাত্রে অফিসার ভদ্রলোকটিকে সরবরাহ করতে হয়েছিল আরও একটি ম-কারযুক্ত পদার্থ! মাড়িয়া যুবতী মেরিয়া!

আমি বললুম : তারপর?

: তারপর আবার কি? এখানেই তো গল্পের শেষ!

: কিন্তু বুড়ো আর্নেস্ট স্টোনের কি হল? মেরিয়ার? ফাঁসী?

: বুড়ো স্টোনের কথা জানি না। তবে মেরিয়ার ফাঁসী হয়নি। বেকসুর খালাস পেয়েছিল সে। বিচারে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি।

: তাহলে সে নিশ্চয় ফিরে এসেছিল স্টোনের কাছে।

: না। ফিরে সে আসেনি।

: তাহলে কোথায় গেল সেই মেয়েটি?

: তা আমি জানি না। আন্দাজ করতে পারি। এজাতীয় একটি মেয়ের বাবার মতো একটিমাত্র রাস্তাই এরপর কল্পনা করা যায়। সম্ভবত কোন ব্রথেলে গিয়ে নাম লিখিয়েছিল!

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ হুংকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠেন গুপ্তেজী : সাট আপ!

ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা! বেয়ারা-গুলোও এগিয়ে এসেছে সে চীৎকারে। গুপ্তেজী উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিস্মিত হয়ে বলেন : হোয়াট ডু য়ু মীন?

: আই সে য়ু উইথড্র দ্যাট ইনসাল্টিং রিমার্ক!

মেহ্‌রা আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন প্রতিপক্ষকে। তারপর ধীরে সুস্থে বললেন : আপনি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন নাকি?

গুপ্তেজী টেবিলে একটা প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত করলেন। ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল কাচের পাত্রগুলো। তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে এক আদিম বর্বরতা। কঠিন কণ্ঠে উনি বলেন : আমি জানতে চাই সেই মাড়িয়া ভদ্রমহিলার নামে যে কুৎসিত কথা আপনি উচ্চারণ করেছেন তা প্রত্যাহার করবেন কিনা।

ডাক্তার সাহেব ওঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতটা চেপে ধরে বলেন : আপনি কি ক্ষেপে গেলেন মিস্টার গুপ্তে?

মেহ্‌রা কিন্তু মেজাজ ঠিক রেখেছেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন : না! আমার দৃঢ়বিশ্বাস সেই খুনে মাগী কোন ব্রথেলেই আশ্রয় নিয়েছিল!

এবং সে কথা শোনার সংগে সংগে গুপ্তেজী যা করলেন তা পাগল অথব মধ্যযুগীয় নাইট ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারে না। বাঁ-হাতে-ধরা জলের গেলাস থেকে আধ গ্লাস এঁটো জল ছুঁড়ে দিলে প্রাতরাশ টেবিলের অপর প্রান্তে জরদ্গী মেহ্‌রার মুখে!

আমি আর ডাক্তার সাহেব দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওঁদের মাঝখানে। হাত হাতিটা আর হল না।

কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত! আর তা হা এক গাদা পিয়ন আর্দালির সামনে।

মেহ্‌রা জামাটা পালটে যখন গাড়ি উঠ্‌লেন তখন তাঁর মুখ দেখে বিদ সম্ভাষণের কথাও বের হল না আমার মু দিয়ে। বলা বাহুল্য, তিনি শাসিয়ে গেলেন এর শোধ তিনি নেবেন। গুপ্তেজী যাব আগে একবার আমার সংগে দেখা করা চাইলেন। তাঁর পিয়ন এক টুকরা কাগ এনে দিল আমার হাতে। সেই কাগজে উল্টো পিঠে শুধু লিখে দিলাম : আপন ব্যবহারে আমরা লজ্জিত। আপনি মেহ সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইবার আগে আপন

দেখা করতে পারছি না বলে দুঃখিত। সাহেব গাড়িতে উঠবার সময় গত কথাটাই বললেন আবার : আপনার কিন্তু বন্ধ উন্মাদ!

আসখানেক পরের কথা। শুনলাম পরাক্রান্ত মহারাজ প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ-দেওকে মধ্যপ্রদেশ সরকার হঠাৎ গ্রেপ্তার করেছেন।

কী ব্যাপার? কে এই প্রবীরচন্দ্র? কেনই বা এই গ্রেপ্তার? শুনলাম, প্রবীরচন্দ্রের পরিচয়। জানলাম কেন এই নিয়ে এত হৈ চৈ।

প্রবীরচন্দ্র বাস্তারের বর্তমান মহারাজা। ১৯৫৯ সালে পিতা প্রফুল্লচন্দ্র প্রবাসে মারা গেলে ইনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সিংহাসনে উঠে বসেন। প্রবীরচন্দ্র সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ। সুন্দর ইংরাজি বলতে পারেন। সুন্দর চেহারা। বাৎসায়নের উপর পড়াশুনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্ত্রে বিশ্বাসী। শোনা যায়, নিজেও নানা ধরনের

গুপ্তসাধনা করে থাকেন গোপনে। ১৯৫৭-তে প্রবীরচন্দ্র আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। কংগ্রেস মনোনয়নে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার যা চায়, তিনি তা চান না। কিম্বা বলা যায় তিনি যা চান তাতে কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন পান না। ফলে বিরোধ বাঁধল। পদত্যাগ করলেন মহারাজা। আইনসভা থেকেই শুধু নয়, কংগ্রেস পার্টি থেকে। আদিবাসীদের বোঝালেন, কংগ্রেস সরকার আদিবাসীদের কল্যাণ চায় না। তাই তিনি দলত্যাগ করে চলে এসেছেন।

এরপরেই শুরু হল তাঁর সরকার-বিরোধী অভিযান। প্রবীরচন্দ্রকে ডেকে পাঠানো হল ভূপালে, পরে নয়াদিল্লিতে। আলাপ-আলোচনায় কোন ফল হল না। মহারাজা বাস্তারে ফিরে এলেন। নতুনভাবে আন্দোলন চালালেন তিনি। সরকার বিরক্ত হলেন। মহারাজের উপর আদেশ জারি করা হল তিনি যেন তাঁর রাজ্যসীমার বাইরে না যান বিনা অনুমতিতে। মহারাজ সে আদেশে কর্ণপাত করলেন না। গোপনে রওনা দিলেন রায়পুরের দিকে। বাধা পেলেন মাঝপথে। গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে।

খবরটা শুনলাম জগদলপুরে গিয়ে। শহরটা থম্ থম্ করছে। কখন কি হয় অবস্থা। দোকানপাট বন্ধ। এখানে ওখানে জটলা। ফিসফাস গুজগুজ। রাস্তায় যেন টহলদারী জীপের প্রাবল্য। হাট বসেনি। পথঘাট ফাঁকা। ধুলোর ঝড় তুলে পুলিসের জীপ ছোটাছুটি করছে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে গিয়ে দেখি ঐ কথাই আলোচনা হচ্ছে। বিলিয়ার্ড টেবিলে মার্কার অনুপস্থিত, ব্যাডমিন্টন কোর্টের বাল্ব জ্বলছে না;—মায় তাসের টেবিলে সাতাকাবের সাহেব-বিবির দল এমন পটের সাহেব-বিবির মতো ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছেন যে, তাসের সাহেব-বিবিরা আর প্যাকেটের বাইরে মুখ বাড়ায়নি। আদিবাসী বিদ্রোহ হবে না তো? এটাই মুখ্য চিন্তা!

পাণ্ডেজী বললেন : এক নম্বর ঘাঘু তো ফাঁদে পড়লেন, দু-নম্বরের কি হবে?

মেহ্‌রা-সাহেব বলেন : দু-নম্বর ঘাঘুর খবর শোনেন নি? হি ইস্ আণ্ডার অর্ডারস্ অফ সাস্পেন্সন্!

: তাই নাকি?—ঝুঁকে পড়ে সবাই।

: হ্যাঁ, অর্ডার বেরিয়ে গেছে।

পার্শ্ববর্তী পাণ্ডেজীকে বলি : দু-নম্বর ঘাঘুটি কে?

পাণ্ডেজী মুখটা কানের কাছে এনে বলেন : আপনার দোস্ত! গুপ্তেজী!

: গুপ্তেজী! গুপ্তেজী সাসপেণ্ডেড হয়েছেন? কেন?

: আসল অপরাধ বোধহয় রাজদ্রোহ! অবশ্য আপাতত তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে অন্য একটি অপরাধে। চার্জসীট ফ্রেম করা হলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা।

আমি তো স্তম্ভিত!

মেহ্‌রা বলেন : বাছাধন অনেক খেলা দেখিয়েছেন। এইবার, আমিও দেখে নেব—ও কতবড় গুপ্তেশ্বর! চাকরি নট্ তো হবেই, গলায়-তক্তি হাফপ্যাণ্ট পরে কপির চাষও করতে হবে! আপনাকে বলিনি এঞ্জিনীয়ার সাহেব—অপমানের শোধ আমি নেবই!

মিসেস্ মেহ্‌রা বিশুদ্ধ ইংরাজিতে আদুরে-গলায় বলেন : প্রিয়তম, এভাবে ভূপাতিত শত্রুর উপর খাঁড়ার আঘাত হানা ক্ষাত্রনীতিসম্মত নয়।

উঠে পড়লাম। ভাল লাগছিল না। সকলের অলক্ষে বেরিয়ে এলাম ক্লাব থেকে। গুপ্তেজীর ডেরা জানা ছিল। একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি সেদিকে। গুপ্তেজীর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ জয়পুরের গেস্ট-হাউসে। সেদিন দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি, কী যেন বলতে চেয়েছিলেন, আমিই প্রত্যাখ্যান করেছিলুম। আজ অযাচিতেই যাচ্ছি গুপ্তেজীর কাছে। ভদ্রলোক রূঢ়ভাষী, রগচটা মেজাজী মানুষ—তবু তাঁর চরিত্রের কোন একটা দিকের প্রতি আমার মোহ ছিল। আমার ভাল লাগত ভদ্রলোককে। এ বিপদের দিনে একঘরে মানুষটির পাশে গিয়ে দাঁড়াবার একটা প্রেরণায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই চললাম তাঁর বাসায়।

গুপ্তেজী বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে দেখে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। যেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমি এসেছি সৌজন্য-সাক্ষাতে। তবু মনে হল বেশ খুশী হয়ে উঠেছেন মনে মনে। আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বসালেন, বলেন : কি খাবেন বলুন, কোল্ড-ড্রিংস্ না চা?

বললুম : খেতে আমি আসিনি, কিন্তু ব্যাপারটা কি?

বিচিত্র হেসে গুপ্তেজী বলেন : ব্যাপার কিছুই নয়। আমার এখন অখণ্ড অবসর। পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। শুনেছেন নিশ্চয় আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

: শুনেছি। কিন্তু কি করেছিলেন আপনি?

: তেমন কিছুই নয়। আদিবাসীদের কিঞ্চিৎ উপকার।

: সেটা তো সরকারও চান। আপনার মাধ্যমেই করতে চান। তাহলে?

গুপ্তেজী একটু চিন্তা করে বললেন : মুশকিল কি জানেন, আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটার ঠিক মিল নেই। আমি মহারাজের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ছিলাম।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি : গুপ্তেসাহেব, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। আপনি বাড়াবাড়ি করছেন নাকি? আপনার আমার

[illegible] ক্ষুদ্রজনের এ ব্যাপারে স্বপক্ষে বিপক্ষে থাকার কোন মানে হয়? আপনি কি ভেবেছেন? মহারাজার গ্রেপ্তারে বাধা দিয়েছেন?

হা-হা করে হেসে ওঠেন গুপ্তেজী: আমি কি পাগল? আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে!

শুনলাম ঘটনাটা। কোন্ডাগাঁওয়ের হাটে গিয়েছেন গুপ্তেজী। দেখেন একটি বিখ্যাত চা-কোম্পানীর মোবাইল-ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে হাটের অদূরে। বিনা-পয়সায় বিতরণ করা হচ্ছে ভারতীয় চা। গুপ্তেজী নিজে চা খান, দিনে আট-দশ হাফ-কাপ। তবু তিনি ক্ষেপে গেলেন। হঠাও গাড়ি।

সাধারণ লোক হলে বোধহয় ঝামেলা না বাড়িয়ে মানে মানে সরে পড়ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তার-জোনের ম্যানেজার ছিলেন সে গাড়িতে। চা-কোম্পানীর প্রচার-বিভাগের উচ্চকর্মচারী। তিনি প্রতিবাদ করলেন। চলে যাও বললেই হল? কথা কাটাকাটি থেকে বচসা; এবং গুপ্তেজীর মতো গুণীজন উপস্থিত থাকতে মৌখিক বচসা হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হয়নি।

অচিরে মামলা উঠল কোর্টে। গুপ্তেজীর বিরুদ্ধে ম্যানেজারের অভিযোগ নয়—ভারতীয় চা-প্রতিষ্ঠান মামলা আনছেন সরকারের বিরুদ্ধে। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত। বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে মামলা মুলতুবী রাখা হল। গুপ্তেজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিলই—সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁকে এই ব্যাপারে।

বললুম: চায়ের উপর হঠাৎ এভাবে ক্ষেপে গেলেন কেন? আপনি নিজে তো একজন পাঁড় চা-খোর?

: শুধু চা-খোর নই, চাকরও বটে!

: তাহলে?

: তাই তো জানি চাকরির মতো চাও একটা বিশ্রী নেশা। আরও জানি এই হচ্ছে নেশা-ব্যবসায়ীদের ট্যাকটিক্স। ভারতবর্ষে এভাবেই হয়েছে !! আর কফির প্রচার, চীনে হয়েছে আফিং-এর। আদিবাসীদের চা-খাওয়া শিখিয়ে শিক্ষিত করে তোলায় তাই আমার আপত্তি। বিনা পয়সায় চা-বিতরণের এই বদান্যতাকে তাই বাধা দিতে গিয়েছিলাম।

কী আর বলব এ পাগলকে। প্রসঙ্গ বদলে বলি: ডিফেন্সের কি ব্যবস্থা করছেন? কোনও উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন?

একটা আড়ামোড়া ভেঙ্গে উনি বলেন: নাঃ! আমি কোন ডিফেন্স দেবনা।

: ডিফেন্স দেবেন না? বলেন কি! কি করবেন তাহলে?

: রিসাইন করব। ফাইন হলে ফাইন দেব; আর জেল হলে তো কথাই নেই। বেকার মানুষের তাহলে একটা হিল্লে হয়ে যাবে!

আমাকে নির্বাক দেখে নিজে থেকেই ফের বলেন: ভেবে দেখলাম, এভাবে দূর থেকে ওদের উপকার করা যাবেনা। আদিবাসীদের সত্যিকার ভাল করতে হলে ওদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে হবে—ওদের জীবনের ভাগীদার হতে হবে। সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে বসে উপদেশ বর্ষণ করে কোন ফল হবে না।

: কিন্তু সে তো আর আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়!

: কেন নয়? দুপাতা ইংরাজি পড়েছি বলে কি আমি মাড়িয়া হয়ে যেতে পারিনা?

এবার আমার হেসে ওঠার পালা। হাসতে হাসতেই বলি: না গুপ্তেজী! সংকল্প করে ও অধিকার পাওয়া যায়না। সে অধিকার পেতে হলে তা জন্মসূত্রে পেতে হয়।

একটু সময় লাগল জবাবটা দিতে। কয়েকটা মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন দেওয়ালের একটা ছবির দিকে। সেই আল-খাল্লাধারী বৃদ্ধ সাহেবটির দিকে। তারপর যেন বহুদূরের থেকে অস্ফুটে জবাব দিলেন গুপ্তসাহেব সম্মোহিতের মতো: আপনার ধারণা ভুল। জন্মসূত্রেই সে অধিকার পেয়েছি আমি। আমি, আমি, গোন্ড... মাড়িয়া গোন্ড!

আমি বজ্রাহত।

সামনের দেওয়াল-ঘড়িটায় ক্রমাগত টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ!

দমকা হাওয়ায় গত বৎসরের নিঃশেষিত পৃষ্ঠা একটা দেওয়ালপঞ্জি উড়ে উড়ে পড়ছে।

রাত বাড়ছে। রিক্সা-আলা জানতে চায় — আরও দেরী হবে কিনা। কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারিনা। গুপ্তেজী নিজে থেকেই বলেন: মাপ করবেন, আজ আর আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিনা। তবে জানাব, যাবার আগে আপনাকেই শুধু জানিয়ে যাব। আরও একদিন জানাতে চেয়েছিলাম, আপনি শুনতে রাজি হন নি। কিন্তু আজ আর নয়।

উঠে এলাম নীরবে। বুঝলাম গুপ্তেজীর অন্তরেও কী একটা কথা ঐ নিঃশেষিত-পৃষ্ঠা দেওয়াল-পঞ্জিটার মতোই ও'র অন্তরের প্রাচীরে ক্রমাগত মাথা খুঁড়ে চলেছে। গুপ্তেজীর গুপ্তকথা। এ কাজের দুনিয়ায় যে ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন উনি তার প্রয়োজন বুঝি নিঃশেষ হয়েছে—একটি একটি করে ক্যালেন্ডারের ঝরাপাতার মতো উড়ে চলে গেছে ও'র কর্ম-চঞ্চল যৌবনের দিনগুলি; প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে এসে ও'র মনে আজ জেগেছে আত্ম-জিজ্ঞাসা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাইটহুড ত্যাগ করা যায়, কিন্তু অন্যায় কি তাতে পরাভব মানে? হঠাৎ-ওঠা দমকা হাওয়ায় তাঁর অন্তরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে সেই প্রশ্নটাই।

(ক্রমশ)

হিমালয়ের পথ

অজিতকুমার দাশ

নেপালে ভারত-বিদ্বেষের ঝড় উঠেছে।

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে হিম-শীতল হিমালয়ের বুকে যেন আগুন লেগেছে। পঞ্চশীলের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি অনেক দিন আগেই হয়েছিল। তবু হিমালয় অভিযাত্রী কেউ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালে তার মৃতদেহ যেমন বহুদিন বরফের নীচে বেশ তাজা থাকে, আমাদের পঞ্চশীলও তেমনি মৃত অবস্থায় এতদিন বরফ-চাপা তাজা অবস্থায় ছিল। নেফা-সীমান্তে বারুদের আগুনে এতদিনে সেই শব দাহ হচ্ছে।

শ্মশানে ভূত-প্রেতের নৃত্য হবে এ আর নতুন কথা কি। তবু অনেকের চোখে এখনও বিসদৃশ লাগছে নেফার সংঘর্ষের দিনগুলিতেই বেছে বেছে নেপালী নাচানাচি। ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের স্থিতাবস্থার অবসান ঘটিয়ে চীন যেই নতুন করে ভারতীয় এলাকা গ্রাসের জন্য এগিয়ে গেল; আপোস আলোচনার পর্ব পেরিয়ে আমরা যেই প্রথম প্রকাশ্য সংগ্রামের দিকে এগিয়ে এলাম, যত পরিমিতভাবে বা সতর্কতার সঙ্গেই হোক, অমনি নেপাল উঠে-পড়ে লেগে গেল ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে।

অনেকে এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকের মতে নেপালের রাজকীয় রাজ সরকারের অভিমান হয়েছে, ভারতের বুকে সুবর্ণ সামসের, ভারত সামসের প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেপালী নেতা আশ্রয় গ্রহণ করে রাজবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য।

নেপাল-ভারত চুক্তি মতে এই দুটি দেশেই দু দেশের নাগরিকদের বসবাসের স্থানের পূর্ণ অধিকারের ব্যবস্থা করা রয়েছে। যতদিন সেই চুক্তি চালু থাকবে আমরা কি করে বলব যে একদল নেপালী এ দেশে কিছুতেই থাকতে পারবে না।

তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, আমরা তা বলব কেন? অন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই—কবে নেপালীরা প্রাণ খুলে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। ভারত-বিরোধী আন্দোলন চট করে একটা দাঁড় করিয়ে দিতে কবে এরা তৎপরতার অভাব দেখিয়েছে?—আরেকটা কথা আমাদের ভাবতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্য আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে বা রাষ্ট্রীয় আদর্শে কত অসঙ্গতি আসতে দিতে পারি?

ভারতবর্ষকে ঘাটি করে নেপালী জাতীয়তাবাদীরা যদি তাদের কার্যসূচী ঠিক করে তার কতটুকু আমরা সমর্থন করব বা কোন অংশটার বিরোধিতা করব?

ঠিক এগার বছর আগেকার কথা। ১৯৫১ সালের দশহরার দিন। রক্সৌল থেকে নেপালের বীরগঞ্জ শহরে সন্ধ্যাবেলায় বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দশহরার দিন নেপালের পুজোর দিন তো বটেই আবার দেশজুড়ে জুয়াখেলারও দিন। ট্রেন বোঝাই ভারতীয় জুয়াড়ীরাও এসেছিল দলে দলে বীরগঞ্জে জুয়ার উৎসবে মেতে উঠতে। হঠাৎ রাতের অন্ধকারে বীরগঞ্জে গর্জে উঠল এরোপ্লেনের কড়া আওয়াজ। অদ্ভূত ব্যাপার। বীরগঞ্জে তো কোনও এরোড্রম নেই। এত নীচে প্লেন কেন? বিপদ হল নাকি কিছু! মোটেই না। নেপালীদের হিমালয়ান এভিয়েশনের একটি প্লেন, যা কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা করত কিছুদিন আগে পর্যন্তও, তারই একটি উড়ো জাহাজ জেনেশুনে বিপথে উড়ে এসেছে রাতের অন্ধকারে বীরগঞ্জের নেপালীদের ওপর আকাশ থেকে আবেদনপত্র ছড়াতে। রাণাশাহীর বিরুদ্ধে বর্তমান রাজা মহেন্দ্রর পিতা ত্রিভুবনের সমর্থনে সংগ্রামের আহ্বান নিয়ে।

নেপালের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সেই অধ্যায়ে ভারতের সহযোগিতায় নেপালের সর্বত্র ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল। আর আজ আমরা এদেশবাসী প্রবাসী নেপালীদের কোনও সক্রিয় সংগ্রাম করতে দিচ্ছি না তবু এদের কেন চুক্তি অনুসারে থাকতে দিচ্ছি তাই নিয়ে ত্রিভুবন-তনয় মহেন্দ্রের রাগের শেষ নেই।

১৯৫২ সালে রাণাশাহীর অবসান ঘটল। নেপালে জনপ্রিয় রাজা ত্রিভুবন ভারতের সহায়তায় জনপ্রিয় রাজতন্ত্রের শীর্ষে উপবিষ্ট হলেন। ১৯৫৩ সালে আবার কাঠমাণ্ডু গেলাম। তখন তেনজিং ও হিলারীর এভারেষ্ট বিজয়ের খবর পাওয়া গেছে।

দার্জিলিংএর অধিবাসী তেনজিং। ভারতীয় নাগরিক। জন্ম যদিও এভারেস্টের পাদদেশে থোলকুম্ভু গ্রামে। "আমাদের" তেনজিং এরকম কোনও ভাব তবু আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের তেমন ছিল না। তবে কি কুক্ষণে কোনও কোনও কাগজে, এদেশে বিদেশে, তেনজিংকে ভারতীয় বলা হ'ল। আর যায় কোথায়। ভারত বিদ্বেষে তরুণ নেপাল জ্বলে উঠল। বলল, তেনজিং নেপালী—তেনজিংকে এভারেস্ট থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কিডন্যাপ করে নিয়ে পালাব।

ভারতীয় বিদ্বেষ হঠাৎ কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তার একটি ঘটনা বলব। তেনজিংএর ফেরার পথে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক বেস ক্যাম্পের দিকে পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছি। মাঝপথে কিছু নেপালী তরুণ ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাদের ধরল। আদেশ হ'ল ওরা আগে তেনজিংএর সঙ্গে দেখা করবে, পরে আমরা ভারতীয়রা যাব। যদি কথা না শুনি তবে ঐ পাহাড়েই আমাদের শেষ করে দেওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ফিল্ম ডিভিশনের সুযোগ্য ক্যামেরাম্যান বন্ধুবর থাপা ভারতীয় হ'লেও পদবীতে নেপালী গন্ধ আর অনর্গল নেপালী বলতে পারে। থাপা মধ্যস্থতা করল। আপোস হ'ল, আমরা সবাই এক জায়গায় অপেক্ষা করব—ভারতীয় অভারতীয় এবং নেপালী সবাই। তবে তেনজিং যেদিন ভোরে এদিকে নেমে আসবে তার আগের দিন রাতে জন চারেক নেপালী তেনজিংএর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখা করবে—জানতে, এভারেস্ট যে বিজয় করেছে ভারত বা নেপাল কোন দেশের অধিবাসী সে?

এই সেদিন খবরের কাগজে উত্তর প্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশে ধ্বস নেমে এসে বহু লোকের জীবন বিপন্ন হবার খবর বেরিয়েছিল। কয়েকদিন পরে দেখলাম ফিল্ম ডিভিশনের একটি দলও আটকে পড়েছি[লেন]

এবং ক্যামেরাম্যান থাপার নেতৃত্বে কোনও রকমে বেঁচে ফিরেছে। পড়ে মনে হ'ল, যেখানে পাহাড়ে গোলমাল সেখানেই ত্রাণ-কর্তা থাপা!

যাক সে কথা। এবার তেনজিং-এর কাঠমাণ্ডু ফেরার দিনটার কথা মনে পড়ছে। আকাশে বাতাসে উৎসবের ছোঁয়াচ। কিন্তু সেদিন তরুণ নেপালের কণ্ঠে কোন ধ্বনিটা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল? সেই ধ্বনি হ'ল : "তেনজিং কো, নেপালী হোক" (তেনজিং কে—তেনজিং নেপালী!)—ভারতীয় নয়।

তখন একটি ভারতীয় সামরিক দল কাঠমাণ্ডুতে ছিল। নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে নেপালী সৈন্যদের আধুনিক সমরকলা শেখাবার দায়িত্ব নিয়ে এরা এসেছিল। আরেকটি ভারতীয় সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং দল প্রথম ভারত-নেপাল সড়ক ত্রিভুবন রাজপথ তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

তারপর ত্রিভুবন রাজপথ তৈরি হ'ল। সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে নেপালী সৈন্যদল আধুনিক ধরনের সমর-কলায় পটু হ'ল।

হিন্দি-চিনি ভাই-ভাইএর মত তখন হিন্দি-নেপাল ভাই-ভাইতে ভারত-নেপালের আবহাওয়া ভরপুর। এমনি সময়ে প্রধান-মন্ত্রী নেহরু এলেন নেপাল ভ্রমণে। অনেক আশা নিয়ে আবার নেপাল গেলাম—নেহরুজীর নেপাল দর্শনের সাংবাদিক দর্শকের ভূমিকাতে।

সরকারী অভ্যর্থনার ত্রুটি কোথাও দেখলাম না। গোচর এরোড্রোম থেকে কাঠমাণ্ডু শহর পর্যন্ত "লাল কার্পেটের" অভাব নেই। কিন্তু কার্পেটের ঢালাও লাল মসৃণতাতে কে এমন করে বাদ সাধল? কাঠমাণ্ডুর পথেঘাটে এ কি? রাস্তায় ভারতবিরোধী পোস্টারের প্রাচুর্য অবহেলা করার মত মোটেই না? দেখে মনে হয় ঐ পোস্টারগুলি প্রধানমন্ত্রী নেহরু আসার আগে সরিয়ে ফেলার কোনও চেষ্টাই হয়নি।

ভারত ও নেপালের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে রাজনৈতিক সমতার দাবি জানিয়েছিল ওই প্রাচীর পত্রগুলি! আরও বলেছিল—ভারত-নেপাল বাণিজ্য সম্পর্কে যেন দু-দেশের সমান অধিকার থাকে! প্রশ্ন হ'তে পারে ভারত কবে আবার নেপালের সার্বভৌমিত্বকে অস্বীকার করল? নেপালীরা উত্তর দেবে, যেদিন ভারতীয় লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, নেপাল যদি চীনাদের দ্বারা কখনও আক্রান্ত হয় তবে ভারত নেপালের পাশে এসে দাঁড়াবে। সুবিধা-বাদী একদল নেপালী একথা চেপে গেল যে পুরোনো ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব চুক্তির একটি ধারাই হচ্ছে যে দু দেশের যে কোনও একটি শত্রুর সম্মুখীন হ'লে অন্য দেশটি বন্ধুর সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

এরপর ভারত-নেপাল বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ ফুরাল। পুরোনো চুক্তি অনেক অদল বদল করে নতুন করে চালু হ'ল। নতুন চুক্তির তাৎপর্য বিচার করতে বেগ পেতে হয় না। নেপালের সমস্ত বিদেশ থেকে আমদানীকরা জিনিসই ভারতের পথে নেপালে যায়। সাধারণত কলকাতার বন্দরে এ সব মাল খালাস হয় —জলপথে বা হাওয়াই জাহাজে যেভাবেই আসুক। আগেকার ব্যবস্থায় নেপালগামী দ্রব্য-সম্ভার কলকাতার কাস্টমস-এর মারফত যেত। ভারতীয় হারে আমদানী শুল্ক জমা দিয়ে বা শুল্কের গ্যারাণ্টি দিয়ে মাল ছাড়িয়ে নেপালে পাঠান হ'ত। নেপালে পৌঁছাবার সার্টিফিকেট পেলে সেই জমা টাকা বা গ্যারাণ্টি ফেরত হ'ত। এখন সরাসরি ভারতের মধ্য দিয়ে মাল নেপালে যায়। এর ফলে, ঐ মালের একাংশ সংগে সংগেই কর ফাঁকি দিয়ে এদেশে ফিরে আসতে পারে। ভারত-নেপাল সীমান্তে এমন কড়াকড়ি কোনও পাহারা নেই যাতে এই বেআইনী চালান বন্ধ হ'তে পারে।

ভারত-নেপাল বাণিজ্য চুক্তি নব পর্যায়ের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন এমনি একজন বিচক্ষণ সরকারী কর্মচারীকে বললাম—"এই ব্যবস্থায় তো নেপাল থেকে ভারতে চোরা চালান বেড়ে যাবে। করের দিক থেকে আমাদের সমূহ ক্ষতি। আপনারা নেপালের এই আব্দারে রাজী হ'লেন কেন?" ভদ্রলোক বললেন যে, আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয় বা বাণিজ্য দপ্তর এতে রাজী ছিল না। কিন্তু আলোচনার শুরুতেই ভারত সরকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও যেন নেপালের অনেক আব্দার মেনে নেওয়া হয়। যুক্তি এই যে নেপালকে তুষ্ট রাখতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা কত টাকা ঢালছি—লোকসানটাকেও একটি রাজনৈতিক দাদন বলে যেন মেনে নাওয়া হয়।

আমরা তো তাই মেনে নিয়েছি। আর দাদন দেওয়ার ব্যাপারে অমাদের দাক্ষিণ্যের তুলনা হিমালয়ের দক্ষিণে আর কোনও দেশে পাওয়া ভার। প্রতিবেশীর দাঁত কড়মড়ানিতে আমরা নিজেদের প্রায় ৩২ পাটি দাঁতই তুলে দান করতে পারি।

সমস্ত নেপাল জুড়ে সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকার ভারত-বিদ্বেষের বন্যা বইছে। ভারতকে দাঁতে চিবিয়ে খাওয়ার মত রাগ। নেপালী সংবাদপত্র দাবি করেছে, ভারতকে বাদ দিয়ে এখন থেকে নেপালী বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানের পথে নেপালে আসুক। কলকাতা বন্দরে নয়। চট্টগ্রামের বন্দরে বিদেশী মাল নামান হোক। ভারতবর্ষকে বয়কট কর। তবে ছোট্ট একটি অনুরোধ ভারতকে কর। ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানে নামান নেপালের আমদানী-করা মাল যেন ভারত যেতে দেয়। কাঠমাণ্ডু-ঢাকা সরাসরি এরোপ্লেন সার্ভিস চালু কর। তবে ভারত যেন দু দেশের প্লেনকে ভারতে না নেমেই ভারতের আকাশের উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেয়।

যেদিন ঐ দাবি কাঠমাণ্ডুর কাগজে বেরিয়েছে ঠিক সেইদিনই কলম্বোতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নেপালের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রবাহ এই ভারত-বিরোধী মনোভাবের দরুন সামান্যও শুকিয়ে যাবে না। এই ধরনের বৈষ্ণবীয় রাজনীতির তুলনা পাওয়া ভার। ঠিক এই রাজনীতির আদর্শে এই কিছুদিন আগেও আমরা চীনে ভারতীয় পাটের থলের রপ্তানী হ'তে দিয়েছি, আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতির পরোক্ষ সহায়তায়।

যারা নেপাল-ভারতীয় সম্পর্কের অবনতির ভয়ে ভীত তাঁদের এখনও অভয় দেওয়া চলে। ভারতের দিক থেকে বিনয়, দাক্ষিণ্য সংযম, শিষ্টতা বৈষ্ণব-পনার কোনও অভাব হবে না। এই তো সেদিন বীরগঞ্জ থেকে নেপালীরা এসে আমাদের রক্সৌল বাজারে গুলী চালিয়ে নিরীহ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জখম করে গেল। আমরা তো তার বদলে রক্সৌলের বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দিইনি। আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। ঠিক কি ভাবে ঐ গুলী চালনার অনুসন্ধান হবে, তাতে সামান্যও যেন নেপালের অসুবিধা না হয়। অসন্তোষের কারণ না হয় আমরা তাই নিয়ে লিপির পর লিপি পেশ করছি। চীন ভারত আক্রমণ করেছে, চীনের নয়া বন্ধু নেপাল ভারতকে এখনও শুধু জুতোই মারছে। রক্তাক্ত সংঘর্ষে তো অবতীর্ণ হয়নি। এখনই আমরা কি করে ধৈর্য হারাব। সহ্য করার একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আমরা এত কষ্ট করে গড়ে তুলেছি—কলসীর কানার আঘাত তার কণাও স্পর্শ করতে পারবে না।

নামাবলি / শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দাদা-দিদি সিস্টেমের অনুরূপ কিছু ইংরেজ-আমেরিকানদের বেদে-পুরাণে লেখে না। ওদের অনেক সাফ-সাফ ব্যাপার। ওখানে ছোট-বড় সবাই একাকার। সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। আমেরিকানরা আরও বেশী সরেস। দাদা-দিদির কোন খোল-নলচে আড়াল নেই। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি, মা-বাবাকে পর্যন্ত বাদ দেয় না—নাম ধরে ডাকে। স্টানলি একদিন সকালে দেখি দিব্যি ফোন তুলে বলছেঃ দেখ রুথ, আমার শোবার ঘরের টেবিলের উপর সেই যে......। স্টানলির সাতপাকে বাঁধা কেউ ছিল না, তা আমরা ল্যাবরেটরীতে সবাই জানতুম। বেপাকে বাঁধা যদি বা কেউ থাকে—তাদের কেউ এই সাত-সকাল বেলা পরের বাড়িতে নৈব নৈব চ। টেলিফোনের রিসিভারটি নামিয়ে এসে অনেকটা অনুনয়ের সুরে ও বললো—শী ওয়াজ মাম্—মাকে করছিলুম। ব্যাপারখানা একবার দেখুন, পুলাকে ছেলে মায়ের নাম ধরে ডেকে হুকুম চালাচ্ছে। মা-ও গররাজী নয়।

আমেরিকায় কেউ বাদ যায় না। সবার নামের টিকিতে টান পড়ে। এমনকি, মাস্টারদেরও রেহাই নেই। এ দেশেও মাস্টারদের নাম ছাত্রদের মুখে মুখে ফেরে—তবে প্রকাশ্যে নয় নেপথ্যে। কফি হাউসে, আড়ালে আবডালে। কিন্তু আমেরিকায় বহু বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসরের ক্লাসে দেখা যায় নিতান্ত পুঁচকে ছোকরা, যার গলা টিপলে দুধ বার হয়—সে-ও সেই ডাকসাইটে প্রফেসরের নাম ধরে ডেকে ক্লাসের মধ্যে মহা-বিবেচকের মত কিছু বলছে। রকফেলার ইনস্টিটিউটের একজন প্রফেসর—যাঁর নাম পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে, তাঁর ক্লাসে বসবার আমন্ত্রণ পেয়ে স্বচক্ষে দেখেছি, জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা এসে ক্লাসে বসেছে। ক্লাসে বসেই অবলীলাক্রমে ধুঁয়ো ছাড়ছে। দেখে মনে হয়, অনেক কষ্ট করে যেন ওইটুকু মনোনিবেশ করতে তারা পেরেছে। তাঁর লেকচারের মাঝে আচম্বিতে এক ছোকরা তাঁর নাম ধরে ডেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। কলকাতায় এমন কাণ্ড ঘটলে পৃথিবী রসাতলে যেত। কিন্তু প্রফেসর এমন মাঝপথে প্রশ্ন পেয়ে পুলকিত হন। তাঁর ক্লাসে একজন মেয়েকে রোজ বেহালার বাক্স হাতে আসতে দেখতুম। বড় অবাক লাগত—ক্লাসে বেহালা হাতে মেয়েটি কেন আসে। আর যা হোক, ক্লাসটা সংগীতের ছিল না—নিউক্লিক অ্যাসিডের তাৎপর্য তো মিউজিক নয়। বৃদ্ধ প্রফেসরটিকে জিজ্ঞাসা করলুমঃ আপনি নজর করেন—ঐ বেহালা হাতে মেয়েটিকে? উনি বললেনঃ বিলক্ষণ। ও রোজ বেহালা শেখে; শিখে এখানে আমার ক্লাসে আসে। কোথাও বেহালার বাক্সটি বেচারী প্রাণে ধরে রাখতে পারে না—তাই ক্লাসে নিয়ে আসে। দেখেছি অবশ্য বাক্সটির সে সদ্ব্যবহার করছে টেবিলের মত ব্যবহার করে। এমন উদার-মতের প্রফেসর এদেশে বিরল। এদেশে প্রফেসরের দায়িত্ব শুধু পড়ানোতে নয়, বোধ হয় প্রহরীগিরি করাও। খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। তখন সবেমাত্র মিলে-জুলে পড়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে—মেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা থাকত কম। ছেলেরা ক্লাসে বসে থাকত। ছাত্রী কজনকে সঙ্গে করে

অবলীলাক্রমে ধোঁয়া ছাড়ছে

তাদের প্রফেসর প্রহরী হয়ে ক্লাসে ঢুকতেন এবং ঘণ্টা পড়লে মাস্টারের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদেরও তৎক্ষণাৎ মেয়েলোকে উধাও হয়ে যেতে হত। ক্রমে সেই বিবরে

মেয়েদের সংখ্যা বাড়লো এবং ছেলেদের সংখ্যা কমতে কমতে এক বছর মেয়েরা এত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেল যে, সে বছর দেখা গেল, দুটি মাত্র ছেলে ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। বাকি সবকটি মেয়ে। ফলে ক্লাসে মেয়েরা আগে এসে বসে থাকত, আর ছেলে দুটি ঘণ্টা পড়লে প্রফেসরের সঙ্গে আসত। এসব এই কলকাতার ব্যাপার। পনের-কুড়ি বছর আগে।

আর একজন আমেরিকান প্রফেসারের কথা বলি। কালিফোর্নিয়ার বার্কলের ডানিয়েল মেজিয়া। খুব নামজাদা অধ্যাপক। খুব জনপ্রিয়। সেখানে খুব মজার নিয়ম। যে কোন প্রফেসারের ক্লাসে যে কেউ এসে বসতে পারে। অধ্যাপকের জনপ্রিয়তার ওপর ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা নির্ভর করে। যে ক্লাসে যত ছাত্র বুঝতে হবে সে অধ্যাপকের তত নাম ডাক। মেজিয়া প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কিন্তু তাঁর ক্লাসে দেখেছি পদার্থ-বিদ্যার ছাত্র এমনকি ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র পর্যন্ত আসে। সবাই তাঁকে "ড্যান" বলে—ডানিয়েলের অপভ্রংশ। মেজিয়ার সঙ্গে আলাপ জমলে উনি বললেন ও'র এক ছাত্র-ছাত্রীর—যারা ওরফে স্বামী-স্ত্রী তাদের কাছে একটা দিন কাটিয়ে আসতে—তারা অদ্ভুত গোছের জীব, তাদের জীবন-যাপন দেখার মতন। তারা আপ্যায়িত করতে একদিন যাওয়াও হল। দেখলুম তারা নব-বিবাহিত। সানফ্রানসিসকোর কাছে সমুদ্রে ভাসমান এক বোটে থাকে। বোটখানি ভ্যানগগের প্রিয় উজ্জ্বল কমলা রঙে ছোপান। সেই ছোট্ট নৌকার অপর বাসিন্দে হল একটা স্পেনিয়েল কুকুর ও একটা ছোট কালো বেঁটে গোছের উল্লুক। এই চারজনের কিচির-মিচির নিয়ে ওদের সংসার। নৌকায় চড়ে তারা উৎফুল্ল মনে দিনগুজরান করত। দিনে ল্যাবরেটরীতে মাইক্রোসকোপের আলো আর রাত্রে চাঁদের আলো এই নিয়ে তাদের জীবন কাটছে। কোথাও তখন মেঘ নেই। সেই কালো উল্লুকটির নাম তারা তাদের প্রিয় শিক্ষাগুরু ডানিয়েল মেজিয়ার নামানুসারে রেখেছে "ড্যান"। প্রফেসর মেজিয়ারও একথা জানতে বাকি নেই। তার জন্য তিনি গর্ববোধ করেন এবং ভাবেন যে তাঁকে এমন খাতির বুঝি আর কোন ছাত্র করেনি। ক্যালিফোর্নিয়ার এক ডজন বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী এ খবর শুনে হাসবে না কাঁদবে ভাবে। তাদের মধ্যে বলাবলি হত কলকাতার কোন প্রফেসারের নামে পোষা উল্লুক দূরে থাক মায় কুকুরের নামটা রাখলে অবস্থাটা কি হত? এ জন্মে আর কলেজের দরজা পার হতে হতো না। এ কথা ঠিকই।

উল্লুকটির নাম তারা তাদের প্রিয় শিক্ষা-গুরু ডানিয়েল মেজিয়ার নামানুসারে রেখেছে "ড্যান"

আজ থেকে আমাকে 'হাওয়ার্ডডা' বলে ডাকবে

বন্ধু অশোক ঘোষ এল কিছুদিনের জন্য কালিফোর্ণিয়ার ক্যান্সার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে। সেখানে আমাদের নন্দী ও মিহির আগে থেকেই ছিল। তারা অশোকের চেয়ে জুনিয়ার। তাই ল্যাবরেটরীতে ঘুরতে ফিরতে অশোককে অশোকদা বলে ডাকত। তাদের গবেষণার পুরোধা ডক্টর হাওয়ার্ড বার্নসও নন্দী ও মিহিরের কথা শুনে শুনে অশোককে ঘোষ না বলে অশোকদা বলতে শুরু করে দিল কিছুদিনের মধ্যেই।

একদিন হাওয়ার্ড সবাইকে নিয়ে লাঞ্চে বসেছেন। তিনিই প্রশ্ন তুললেন : আচ্ছা ঘোষকে তোমরা "এশোকডা" বল কেন? মিহির বললে : ঘোষের নাম অশোক কিন্তু উনি আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। তাই অশোকদা বলি। দাদা হল big brother.

হাওয়ার্ডের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। সত্যি সত্যি রাগ করে বললেন : ও বিগ ব্রাদার মানে "ডা"। কিন্তু তোমরাও তো এতদিন আমার প্রাপ্য সম্মান আমায় দাওনি, আমায় তো কখনও হাওয়ার্ডদা বল নি, ছিঃ ছিঃ। ভারতবর্ষের লোকেরা জানতুম অমায়িক। এখন দেখছি তা নয়। নেভার মাইন্ড। আজ থেকেই তোমরা সবাই আমাকে হাওয়ার্ডদাই বলবে। কেমন? হাওয়ার্ডদা!!

নাও ঠ্যালা, কোথায় অশোকদা আর কোথায় হাওয়ার্ডদা।

সাপুড়ে

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্চর্য এক একটা ঘটনা ঘটে, এক এক **সময়ে** ঠিক যেন গল্পের মতো। একটুও সাজিয়ে গুছিয়ে, একটুও ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে না লিখলেও রূপে রসে নিটোল এক একটি ছোটগল্প বলে মনে হবে প্রত্যেকটা। উধাও কল্পনার কোন প্রয়োজনই নেই সেখানে; চোখের উপর দেখা সব কাহিনী যা পাকা সাহিত্যিকের কল্পনাকেও বুঝি হার মানায়।

আমি সাহিত্যিক নই, গল্প-লেখকও নই। সত্য ঘটনায় কতখানি খাদ মেশালে তা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়, সম্ভবপর কাল্পনিক ঘটনার কতখানি প্রকাশ বাঞ্ছনীয় কতখানি নয়, এসব তত্ত্ব আমার কাছে চিরকালই দুরূহ। ক্যামেরার সরঞ্জামে ঠাসা আমার প্রিয় ঝোলাটি কাঁধে ফেলে আমি ঘুরে বেড়াই যেদিকে দু' চোখ যায়। চারিদিকে অজস্র আবর্তে ঘূর্ণমান বিচিত্র জীবন-প্রবাহকে ক্ষণমাত্র সময়ের অবকাশে বন্দী করে ধরে আনবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াই সারাদিন। সব সময়েই যে ধরে আনতে পারি এমন নয়। কত সময় এমনও হয় যে, ক্যামেরার ঝোলায় হাতই পড়ে না। বোধ হয় ভুলেই যাই আমার আশু উদ্দেশ্যের কথা। কেননা, জীবন, নিরাভরণ অনাবৃত জীবন, তখন মুখোমুখি সামনে এসে দাঁড়ায় একেবারে। সেইদিকে তাকিয়ে মনের পর্দায় যেসব আশ্চর্য ছবি ধরে নিয়ে আসি, আলোকচিত্রণবিদ্যার সাধ্য কি তার কাছাকাছি কিছুও আমায় উপহার দিতে পারে!

তবু ছায়ালোকচিত্রশিল্পের অপরিসীম মূল্য আছে আমার কাছে। অন্তত এইজন্য যে এই সূত্র ধরে আমি জীবনের কাছে, খুব কাছে, এসে পৌঁছতে পারি যে কোন সময়ে। একটু প্রীতি, একটু অন্তরঙ্গতা আর দেখবার আগ্রহ আর বোঝবার অভিনিবেশ নিয়ে আটপৌরে জীবনের বৃহৎ বিস্তৃত আঙিনায় যদৃচ্ছ ভ্রমণের কোন বাধা নেই আমার। আর এইসব পর্যটনের সময়েই এক একটা কাহিনী, এক একটা রূপকথা যেন জীবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। অভিভূত করে দেয় তাদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব, মুগ্ধ হই তাদের অনির্বচনীয় রূপে।

বাংলা দেশের পশ্চিম সীমায় এই যে জেলা, এখানে এসে পৌঁছেছি কিছুদিন আগে। উদ্দেশ্য—এখানকার প্রাচীন মন্দির-গুলির একটা ফোটোগ্রাফিক কভারেজ করা। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে এখানে। গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে। পরিচয় হবে কত অপরিচিতের সঙ্গে। এইসব মানবীয় স্পর্শের ফোকরে ফোকরে কোথায়

বিষহরির সন্তান

যে কোন্ কাহিনী অপেক্ষা করে আমার জন্য, কে জানে।

নিবিড় অরণ্য ছিল একদা এ অঞ্চলে। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে হাতির পাল যে সে অরণ্যে ঘুরে বেড়াত, সরকারী কাগজপত্রে তার উল্লেখ আছে। বেশী দিনের কথা নয়, যখন এ পরগনা বর্ধমান মহারাজের জমি-দারির শামিল ছিল, তখন এ জেলার নাম ছিল জঙ্গল মহাল। নামটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দেওয়া। তাদের আমলে জঙ্গল বোধ করি আরও গভীর, আরও দূরবিস্তৃত ছিল।

সহজবোধ্য কারণেই এ অঞ্চলে সর্প পূজার প্রচলন আবহমান কাল থেকে। মা মনসার এ তল্লাটে প্রবল প্রতাপ। দেবীর মূর্তি-সমেত স্থায়ী মন্দির হয়ত বেশী নেই। কিন্তু প্রতি বছর শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে সাপের ফণা তোলা মাটির ঘটকে মনসা জ্ঞানে পূজো না করে এরকম একটিও গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ। মনসা পূজার সব চেয়ে দর্শনীয় অঙ্গ বোধ করি দেবীর ভাসান—এ জেলার লোক যাকে "ঝাঁপান" বলে। এই বিসর্জনের শোভাযাত্রায় একাধিক ভক্ত হাতে গলায় জ্যান্ত গোখুরো সাপ জড়িয়ে প্রকাশ্য পথ দিয়ে দেবীর অনুগমন করবেন—এটাই চিরাচরিত রীতি। এ জেলায় যেদিন এসে পৌঁছেছিলাম, মনে আছে, সেদিন ছিল "ঝাঁপান"। কয়েকটি শোভাযাত্রায় এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলাম। আর কলকাতা

মা মনসার পায়ের ছাপ

সাবেক কালের সাবলীলতা যেন আশ্চর্য কৌশলে ফিরে পেয়েছে এই বৃদ্ধ সাপুড়ে। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কি যেন বললে মনে মনে। তারপরে ক্ষিপ্রহস্তে ডালা তুলে নিলে সামনের ঝাঁপিটার।

একটা বিশালকায় গোক্ষুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল ভিতরে। সাদা-কালোর বুটিদার মসৃণ চিকন শরীর। ফণা না তুলে শুয়েই রইল সাপটা। এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে বংশী। আমি একটুও ভুল দেখিনি—স্পষ্ট অনুভব করলাম সে দৃষ্টিতে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ হাত নেড়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল বংশী—দ্যাখেন, দ্যাখেন বাবু, এই কাছটিতে এসে দ্যাখেন। মা মনসার আসন বটে এটি। কেমন কালোর উপর সাদা সাদা ফুল বসিয়ে নিজের মনের মতন আসনটি বানাইছে মা বিষহরি। আপনারা তো সব বাবু লোক, ভদ্দর লোক। আপনারা তো সাপ বুলবেন এটিকে। এটি সাপ লয় বটে। আসন, আসন, মা মনসার নিজের আসনটি দেখে ল্যান বাবু।

পর পর অনেকগুলো ঝাঁপি খুলেছিল বংশী। কোনোটায় খরিশ, কোনোটায় দুধে গোখুরো, কোনোটায় ময়াল, কোনোটায় চিতি। সাদা, কাল, নীল, ময়ূরকণ্ঠীতে অপূর্ব সব কারুকার্য। সবই মা মনসার আসন। আপন খেয়ালে তিনি নানা রঙের নানা নকশার আসন বানিয়েছেন নিজের ব্যবহারের জন্য। এদের সামান্য সাপ বলে যারা ভাবে তারা আসল কথাটার কিছুই জানে না। আর এই যে গোখরোর ফণার পিছন দিকে বাঁকানো কালো দাগটি, ওটি তো স্বয়ং মা বিষহরির পায়ের ছাপ। না হবেই বা কেন? মায়ের পায়ের তলায় মাথা পেতে দিয়ে যাদের জীবন কাটে তাদের মাথায় অন্য আর কি দাগ পড়বে?

ঝাঁপিগুলো বন্ধ করে ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আরও অনেক কথা বলেছিল বংশী। তার একটাও তার অসুস্থতা সম্পর্কিত নয়, তার পারিবারিক অভাব অনটন বিষয়ে নয়। মা মনসা তার ধ্যান জ্ঞান। মনসার কিংবদন্তীতে, মনসার কাহিনী-রূপকথায় তাকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত মনে হয়েছিল আমার। আর্থিক অসচ্ছলতার কথা একবার মাত্র মুখে এসেছিল তার। তাও প্রকারান্তরে, অন্য কথার প্রসঙ্গে। বলেছিল, কত যত্নে, কত সাবধানে এই যে সাপগুলিকে সে বড় করে, পেটের দায়ে সেগুলিকে বেচে দিতে হয় অপরের কাছে। খরিদ্দারেরা সাপ প্রতিপালনের রীতি-নীতি কিছুই জানে না। বাচ্ছাদের হয়ত দুধ-কলাটা, ইঁদুরটা, বেঙটা খেতে দেয় না ঠিক সময়ে। কত কষ্ট দেয় হয়ত। এমনিতেই একটু রাগী স্বভাব ওদের। আদর করে, তোয়াজ করে, বুঝে-সুঝে চলতে হয় তাদের সঙ্গে। তা না করে, মেজাজ দেখালে, হয়ত মেরেই ফেলে তার এত সাধের বাচ্ছাদের! কিন্তু উপায় কি! পেট তো চালাতেই হবে তাকে!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বংশী। অন্যের আশ্রয়ে তার "দুধের বাচ্ছাদের" ক্লেশের কথাই বোধ করি ভাবছিল একমনে। রাস্তার ওপারে একটা ডাঙগা জমিতে ঝাঁপি-গুলো নিয়ে গিয়ে সেখানে সাপের ফোটো তোলবার কথা যতক্ষণ তার ছেলেদের সঙ্গে বলছিলাম ততক্ষণ চুপ করেই সে বসে ছিল। উঠে আসবার সময় বললে—মায়ের থানে মা মনসাকে দর্শন করে যান বাবু, ছবি আপনার ভাল হবে।

বংশীর ছেলেরা মায়ের থানে নিয়ে গিয়ে-ছিল আমাকে। ইঁটের তৈরি, এক-কুঠরি একটু পাকা দালান। আয়তনে নগণ্য, তবু পল্লীর এই চালাঘর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিতরে, দূরের দেওয়াল ঘেঁষে মা মনসার মাটির চালি। এটিকে বিসর্জন দেওয়া হয় না; পূজা হয় সংবৎসর। পূজার সামান্য উপকরণ মূর্তির সামনে মেঝেতে সাজানো রয়েছে। আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা, আশ্চর্য এক নীরব শান্তি এই ছোট ঘরটির ভিতরে। বংশীর ছেলেরা বললে, প্রতি-বেশীদের কাছে চাঁদা তুলে, শহর থেকে ভিক্ষে করে এই কুঠরিটুকু বংশীই তৈরি

করিয়েছে অনেক কষ্টে। সঞ্চয় বলতে সামান্য যা কিছু ছিল নিজের তাও সব দিয়ে দিয়েছে এই মন্দিরের তহবিলে। সকালে সন্ধ্যায় এই ঘরখানায় এসে চুপ করে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত্রিতে একটি তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় মূর্তির কাছে। সে-আবছা অন্ধকারে হয়ত কিছুই দেখতে পায় না, তবু অনেক রাত অবধি বংশী একা একা বসে থাকে ওই মনসার চালির দিকে তাকিয়ে।

মনসার স্থান থেকে বার হয়ে ফোটোগ্রাফীর তন্ময়তায় কেটেছিল কিছুক্ষণ। তার পরে, বংশীর সেই মাটির দাওয়ায় ফিরে এসেছিলাম তাকে ধন্যবাদ জানাতে। হাঁপানির টানটা আর ওঠেনি। তখনও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসেছিল বংশী। ছবি তুলতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি শুনে খুব খুশী হয়ে উঠল। বললে, এইবার আপনার ঠেঙে একটি জিনিস লিব বাবু। বলেন, আপনি দিবেন জিনিসটি! জিনিসটি।

এ-কথা বংশী আগেও তুলেছিল একবার। যে ব্যাপারে তার দ্বারস্থ হয়েছি, সেই সাপের ছবি তোলার কাজ শুরু হবার অনেক আগেই এ-বাহানা সে গেয়ে রেখেছে। তার ব্যগ্রতাটা সহজবোধ্য। এই ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাটাকে ত্বরান্বিত করবার এই করুণ প্রয়াসকে ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখেছিলাম।

আমরা শহুরে মানুষ, শিক্ষিত ভদ্রলোক। কারও কাছে উপকৃত হলে তাকে যে মৌখিক ধন্যবাদ জানাতে হয়—তা সে বিনয়বচন যতই কেন না কৃত্রিম হোক—আর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে উপকারের ঋণ শোধ করতে হয় অর্থমূল্যে, এ ধারণা আমাদের মজ্জাগত। অন্য দিকে, এ বিশ্বাসও আমাদের বদ্ধমূলে যে আর্থিক প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে অপরের উপকার কেউ বড় একটা করে না। বংশীর অভীষ্টটা নির্ভুলভাবে আন্দাজ করতে আমার সেজন্য কিছুই বেগ পেতে হয়নি। উপকার তার কাছে অবশ্যই পেয়েছি। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মৌখিক ধন্যবাদের উপরে একটু বাড়তি খরচ পড়বে এ-ক্ষেত্রে। সঙ্গত কিছু ব্যয়ের জন্য আমি তৈরী ছিলাম।

বলেন বাবু, জিনিসটি দিবেন আমাকে। না হলে বলেব নাই।

অসীম আগ্রহ বংশীর চোখেমুখে। দু'হাতের পাতা মাটিতে রেখে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে।

শহুরে লোকের স্বাভাবিক অভ্যাসে ভেবেছিলাম, এতো বড় যন্ত্রণায় পড়া গেল। আগে থেকে প্রতিশ্রুতি দিলে তবে সে তার আরজি পেশ করবে—এ কি অন্যায় আবদার! পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, পারিশ্রমিকের অংকটা বুঝি বা একটু বেশী হবে। এ তারই তোড়জোড়।

নাগরিক সাবধানতায় যখন বংশীকে সন্তর্পণে এ-কথা বলেছিলাম যে আমার সাধ্যের অতীত না হলে তার ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করব, তখন বিমল আনন্দে ভেসে গিয়েছিল সেই কালদষ্ট জীর্ণ মুখখানি। গভীর প্রত্যয়ের এক আশ্চর্য সুর বেজে উঠেছিল সেই ক্ষীণ স্খলিতকণ্ঠে—এ আপনি ইচ্ছা করলেই পারেন বাবু। আপনারা বড়নোক, ভদ্দর নোক। আপনাদের এক কথাতেই হয়ে যাবে কাজটি।

পকেটের মনিব্যাগে হাত রেখে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি সেই কাজ, তখনও ভাবিনি উত্তরটা আমার এতক্ষণের ধারণার বিরুদ্ধ কিছু হবে। একটু ইতস্তত করল বংশী। ঠিক কিভাবে কথাটা বলবে বোধ হয় একটু ভেবে গুছিয়ে নিল। থেমে থেমে বললে তারপরে—আমার মায়ের মন্দিরটি তো দেখে এলেন বাবু! কত কষ্ট করেন বানাইছি ওটিকে। রাত্তিরে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় একলা বসে থাকি। আলো নাই; মায়ের মুখটি দেখতে পাই না। এই তো বাবু ইলেকট্রিকের তার এসে গিয়েছে এদিকে।

ময়ালের ভয়াল গ্রাস

আমার মায়ের মন্দিরে একটা ইলেকট্রিকের বাতি করিয়ে দেন বাবু!......

টাকা নয়, চিকিৎসা নয়, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবার আরজিও নয়। শুধু মায়ের মুখটি দেখতে পাবার সসংকোচে-বলা এক ভীরু বাসনা। মনিব্যাগ থেকে হাত আপনিই সরে এসেছিল। উত্তরের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠায় বংশী অপেক্ষা করে যাচ্ছে একথা জেনেও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারিনি। এই সহজভাবে উচ্চারিত সামান্য একটু অনুরোধ যেন অপ্রত্যাশিত কষাঘাতের মতো এসে পড়ল আমার শিক্ষিত মনের উপরে।

* * *

এ-কাহিনী এখানেই শেষ হলে ক্ষতি ছিল না। ছোটগল্পের স্বাদের খুব হয়ত হানি হত না তাতে। কিন্তু আর একটা চাবুকের মার বিধাতাপুরুষ আমার জন্য তুলে রেখেছিলেন। কিছুদিন পরেই সেটা জানতে পারলাম।

কিছু চাঁদা তুলে, কিছু নিজে দিয়ে, ইলেকট্রিক কোম্পানীর অফিসে ঘোরাঘুরি করে, মাস খানেকের মধ্যে মনসার মন্দিরে একটা আলোর ব্যবস্থা করা গেল।

বংশীর ছেলে এসে খবর দিয়ে গেল এক-দিন। আজ সন্ধ্যার দিকে কাজ শেষ হবে মিস্ত্রীদের। রাত্রেই আলো জ্বলবে মন্দিরে। বংশী বিশেষ করে বলে পাঠিয়েছে আমি যেন অবশ্যই যাই। না গেলে, সেও মন্দিরে যাবে না। আরও বললে, সকাল থেকে আনন্দের আতিশয্যে তার বাবা কেমন যেন পাগলের মতো করছে। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, গান গেয়ে উঠছে কখনও কখনও। বুঝলাম, অনেক দিনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার সম্ভাবনায় খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে বংশী।

বংশীর নিমন্ত্রণ আমি ঠেলতে পারিনি। দামী কার্ডে, সোনার-জলে-ছাপানো কত নিমন্ত্রণপত্রই তো এ-জীবনে পেয়েছি। কিন্তু বংশীর এই নিমন্ত্রণের সঙ্গে কি তুলনা হয় তাদের?

সন্ধ্যার দিকে, রওনা হবার মুখে, এক ডাক্তার বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন আমার বাসায়। স্থানীয় হাসপাতালের খ্যাতনামা চক্ষু-চিকিৎসক। বংশীর কাহিনী শুনে বললেন, ইন্টারেস্টিং, হাইলি ইন্টারেস্টিং—আমিও যাব। আমারও আর দেরি করবার সময় নেই। দুজনেই বার হলাম একত্রে।

দাওয়া থেকে হাত ধরে বংশীকে নিয়ে এলাম তার মায়ের মন্দিরে। ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে। বংশীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এই পথটুকু পার হতে হতে কত কথাই যে সে বলবার চেষ্টা করল! তার আনন্দের কথা, কৃতজ্ঞতার কথা। ধীরে ধীরে তাকে বসিয়ে দিলাম দরজার কাছে, মন্দিরের মেঝের উপরে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বংশী বসল ঘরের ডান দিকের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। সম্পূর্ণ নিষ্কম্প শরীর। দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জলের ধারা নেমেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মায়ের মুখটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, বংশী? সেই অশ্রুর মধ্যেও হাসি ফুটে উঠল বংশীর মুখে। বিমল আনন্দের, পরম চরিতার্থতার হাসি। বললে, আহা, কি সুন্দর আমার মায়ের মুখখানা, বাবু! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব, একেবারে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার বন্ধুটি সন্দেহ প্রকাশ করলেন প্রথমে। নিম্নকণ্ঠে বললেন, ও তো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছে—মূর্তি দেখতে পাচ্ছে কি করে! আমারও কি রকম সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু বংশী তখন তন্ময় হয়ে গেছে একেবারে। মা বিষহরির একটা স্তব সুর করে গাইতে শুরু করেছে। আমরা যখন উঠে এলাম, মনে হল বংশী ঠিক বুঝতে পারল না যে আমরা চলে যাচ্ছি। অর্থহীন দৃষ্টিতে এক পলকের জন্য আমাদের পানে তাকিয়ে আবার চেয়ে রইল সেই দেওয়ালের দিকে।

নিজেই অগ্রণী হয়ে বংশীর চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন ডাক্তার বন্ধুটি। যথাসময়ে শুনেছিলাম তাঁর রিপোর্ট। বংশী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। তার আর আরোগ্যলাভের কোনোই আশা নেই। দর্শন-যন্ত্রের প্রধান কোন শিরার গুরুতর হানি হয়েছে। সেদিন-কার তীব্র উত্তেজনাও তার কারণ হতে পারে।

আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল বংশীর সঙ্গে। এ-জেলার মন্দিরের ফোটোগ্রাফিক কভারেজটা শেষ হবার পরে কলকাতায় ফিরবার মুখে, সন্ধ্যার দিকে বংশীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ছেলেরা বাড়ি ছিল না। নাতি-নাতনিরা বললে, দাদু গিয়ে বসে আছে ও-ই মনসার মন্দিরে। সেখানে এসে বংশীর পাশটিতে বসেছিলাম নীরবে। কথা না বললে বোধ হয় বংশী টেরও পেত না যে আমি এসেছি। নাতি-নাতনির হাত ধরে এসেছে নিশ্চয়। তাদের খেলার তাগাদা, নানা কাজ। বুড়োকে মন্দির অবধি পৌঁছে দিয়েই এক ছুটে তারা পালিয়েছে। দেবী মূর্তির দিকে পিছন করে বসে আছে বংশী একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে।

যখন বললাম, আমি এসেছি—বংশী শুনল কথাটা। যখন বললাম, দু'একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছি—অর্থহীন এক বোবা দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকাল কিছুক্ষণ। যখন জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মায়ের মুখটি রোজ এখানে এসে দেখ তো, বংশী! যেন কথা বলবার মতো একটা বিষয় সে খুঁজে পেল। বললে—রোজ, রোজ আসি বাবু! আহা, কি সুন্দর আমার মায়ের মুখখানা! ও-মুখ না দেখে কি থাকা যায়?.....

তারপরে, একটু থেমে বলল—আমার বাড়িটাতে আর মন্দিরে আসবার পথটাতে বড় অন্ধকার, বাবু! তো নাতি-নাতনির হাত ধরে চলে আসি। এখানে এলেই সব দেখতে পাই।

বংশীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

বিশ্ববিচিত্রা

যন্ত্রের সহায়তায় শিক্ষা

পাশ্চাত্যের স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আজকাল নানারকম যন্ত্রের নিয়োগ হয়ে চলেছে। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ স্কুল মাস্টার্সের এক কমিটি এইভাবে যন্ত্রের নিয়োগ "অমানুষিক" বলে অভিহীত করেছেন।

বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা ডগলাস স্টুয়ার্ট এই বিষয়ে আমেরিকায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সম্প্রতি বিবৃত করেন। তিনি বলেন, অধুনা শত সহস্র আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রী যন্ত্রের সহায়তায় শিক্ষালাভ করছে এবং তাকে "সূচীবদ্ধ পাঠ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।" শিক্ষার এই বৈপ্লবিক পদ্ধতি (এটাকে স্বয়ংকৃত শিক্ষা বলা হয়) ১৯৫৭ সালে রুশিয়া কর্তৃক মহাকাশে প্রথম স্পুটনিক নিক্ষেপ করার পরই প্রভাবিত হয়। এই ঘটনাটি আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দেয়। প্রথম স্পুটনিক পৃথিবী পরিক্রমা করার পূর্বে বহু বছর ধরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্কিনার দাবি করে আসছিলেন "শিক্ষক, বক্তৃতা বা চলচ্চিত্রের সাহায্যে যা শেখানো হয় সেটা যন্ত্রের দ্বারা অর্ধেক সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব।"

স্পুটনিকের পর অধ্যাপক স্কিনারের প্রতিপাদ্যটি ব্যবসায়িকভাবে গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে আমেরিকায় দু'হাজার বিদ্যালয় শিক্ষাদায়ক যন্ত্রের ব্যবহার করছে এবং বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কর্মচারিদের ঐ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য বছরে প্রায় সাড়ে ন' শত কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

এই যন্ত্র যা করে তা হচ্ছে এক একটি ফ্রেমের পর ফ্রেমের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীর সামনে জ্ঞাতব্যের একটি সূচী উদ্ঘাটিত হয়: উত্তরটা সংগে সংগেই মিলিয়ে দেখা যায়। উত্তর ঠিক হওয়াটাই ছাত্রকে কাজ করে যেতে উদ্দীপিত করে তোলে। আর একটি সুবিধা হচ্ছে যন্ত্রশিক্ষক কখনও ক্লান্ত হয় না বা ছাত্রকে তিরস্কারও করে না। তারা সর্বদাই ন্যায়বান। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন ইলিনোইস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কম্পুটারের সংগে যুক্ত একটি যন্ত্রে তাদের উত্তর টাইপ করে। ছাত্র তারপর "বিচারক" লেখা একটা বোতাম টিপলেই কম্পুটার "ঠিক আছে" বা "না" উত্তর দেয়। কোন ছাত্র যদি বারবার "না" উত্তর পায় তখন সে "সহায়তা" লেখা একটা বোতাম টিপে দেয়। কম্পুটার তখন তার ভ্রান্তি দূর করার জন্য পরপর কতকগুলি ফ্রেম তার সামনে তুলে ধরে। ছাত্র যদি ধরতে পারে কোথায় তার ভুল হচ্ছিল তখন সে "আহা" লেখা একটি বোতাম টিপে দেয় এবং কম্পুটার তখন তাকে যেখানে ভুল হয়েছিল আবার সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

ভার্জিনিয়ার রোয়ানোক শহরে শিক্ষা-যন্ত্রের সাহায্যে চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছাত্র পনের বৎসর বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট বীজ-গণিতের একটা কোর্স নির্ধারিত সময়ের অর্ধেক সময়ে আয়ত্ত করে ফেলতে সক্ষম হ... এইভাবে কম্পুটার যন্ত্রের সাহায্যে পা... ঘণ্টার পাঠ্য আট ঘণ্টায় আয়ত্ত করিয়ে দে... সম্ভব।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন পদ্ধতি... অবিশ্বাস করার মতো লোকের অভাব নে... তাদের আশংকা আমেরিকানরা শেষ পর্য... যন্ত্রমানবে (রোবোট) পরিণত হ... তা সত্ত্বেও সর্বদিক লক্ষ্য ক... দেখা যায় স্বয়ংকৃত শিক্ষা ব্যা... যুক্তরাষ্ট্রে প্রসার লাভই কর... পরবর্তী বারো বছরে ক... শিক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিদের ত্রিশ...

জার্মানীর ডাকঘরে ব্যবহৃত চিঠি বাছাই করার আধুনিকতম যন্ত্র—গত বছর ... ডাকে জার্মানীতে ৯ হাজার টন চিঠি বিতরণ করা হয় যার মধ্যে বিদেশী দেশের পত্রের আদান-প্রদানের পরিমাণ ছিল তিন হাজার টন—১৯৬০ সালের চেয়ে ... ৪·৮ বেশী। এইভাবে ক্রমবর্ধমান চিঠির বিলি ব্যবস্থা তরান্বিত করার জন্য ঘরগুলিতে এই ধরনের যন্ত্র প্রতিষ্ঠা বাবদ ডাক বিভাগ আগামী পাঁচ বছরে বারো কোটি মার্ক ব্যয়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন

টেকনিকাল কাজে যে দরকার হবে সেজন্য শিক্ষাযন্ত্র ও সূচীবন্ধ টেক্সটের নিয়োগ অবধার্য; এবং যারা স্বয়ংকৃত শিক্ষাদানের পক্ষপাতী তারা দাবি করেন যে শিক্ষাযন্ত্র এতো দক্ষতার সংগে কাজ করে যে ছাত্ররা বইপড়ার এবং মৌলিক কাজ করার জন্য হাতে অনেক সময় পাবে।

পাকস্থলী বরফে রেখে ক্ষত আরোগ্য

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যবিদরা পাকস্থলীকে বরফে রেখে গ্রহণী সংক্রান্ত ক্ষত (duodenal ulcer) সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তুলতে সক্ষম। শল্য চিকিৎসা বিভাগের প্রধান ডাঃ ওয়েন ওয়াঙেনস্টিনের বিশ্বাস এই টেকনিকটি এত সহজ যে হাসপাতালের আউটডোর ক্লিনিকেও সম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

বরফ জল ও অ্যালকোহল ভর্তি একটা থলি ব্যবস্থা রোগী গিলে নেওয়ার সংগে পাকস্থলীর তাপমাত্রা শূন্যেরও কয়েক ডিগ্রী নীচে নেমে যায়—"পাথরের মতো শক্ত" করে তোলার মতো জমাট হবার পক্ষে যথেষ্ট।

এক ঘণ্টা পর পাকস্থলীকে আবার গরম করে তোলা হয়। পাকস্থলীর অম্ল ক্ষরণ তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্ষতজনিত সমস্ত যন্ত্রণারও অবসান হয়েছে। রোগী তখন স্বচ্ছন্দে সাধারণত যে খাদ্য গ্রহণ করে তাতে ফিরে যেতে পারে এবং আর কোন ওষুধের দরকার করে না।

এক্স-রে'তে দেখা গিয়েছে ক্ষতের মুখগুলি তিন সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। পাকস্থলীর কোন তন্ত্রীর কোন রকম ক্ষতি হয় না।

আমেরিকান মেডিকাল এসোসিয়েশনের পত্রিকায় এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে ডাঃ ওয়াঙেনস্টিন বলেন যে, ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়ার অর্থ অম্ল ক্ষরণসহ সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করিয়ে পাকস্থলীকে শৈত্যাবস্থায় নিক্ষেপ করা। তিনি বলেন কতক্ষণ ধরে এই চিকিৎসা চললে ফল পাওয়া যায় তার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে পুনরায় রোগের লক্ষণ দেখা দিলে, ঠাণ্ডায় জমানো টেকনিকটি এমন অ-জটিল যে আবার তা প্রয়োগ করা চলে।

পাকস্থলী ঠিক কতটা সহজাত শক্তি বিহীন হতে পারে সেটা একটি কুকুরের পাকস্থলীতে ব্যাঙ পুরে দিয়ে দেখানো হয়। দেখা গেল স্বাভাবিক তাপে ব্যাঙটি ছ'ঘণ্টায় হজম হয়ে গিয়েছে। তারপর কুকুরের পাকস্থলী ঠাণ্ডায় জমিয়ে একটি ব্যাঙ পুরে দেওয়া হয়। কেবল শ্বাসের সুবিধার জন্য বাইরে থেকে একটি অক্সিজেন নল সংযুক্ত করা হয়। ব্যাঙটি পাকস্থলীতে ছত্রিশ ঘণ্টা থাকে এবং তাকে জীবিত বের করা হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভিনব গবেষণা

টুয়েবিনগেন শহরে ভাইরাস রিসার্চ সেণ্টার নামে যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, সেখানে নানাদেশের গবেষকরা এসে জমায়েত হন। কেন্দ্রের দশটি অতিথিঘর সব সময়েই ভরা। প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে ১৫,০০০ পত্র-পত্রিকা, ৫,০০০ বই ও ২৫০টি সাময়িকী আছে। পশ্চিম জার্মানীতে ভাইরাস গবেষণা সম্বন্ধে এত বিরাট লাইব্রেরি আর কোথাও নেই।

শুধু বিজ্ঞানী নয় সাংবাদিকরাও চাঞ্চল্যকর খবর যোগাড়ের আশায় মাঝে মাঝে এখানে হানা দিয়ে থাকেন। এসে তাঁরা এখানকার কলকব্জা, সাজসরঞ্জাম, ফটোগ্রাফ, মিটার ইত্যাদির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। এখানে এসে অনেকেরই ইলেকট্রোনিক মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুদের জগৎ দেখার সুযোগ ঘটে, অবশ্য কিছুই বোঝে না তারা। এখানকার অদ্ভুত জটিল যন্ত্রপাতি থেকে কোন চাঞ্চল্যকর খবরের খোঁজ তারা পায় না।

তবুও এখানে এলে সাধারণ লোকের ভয় লাগে। কেননা, তারা জানে কিভাবে জীবনের মৌলিক কোষগুলি মৃত্যুর অসুরশক্তির সংগে পাঞ্জা লড়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। গবেষকদের কাছে আগন্তুকরা জানতে চায় বিভিন্ন রোগের ওপর বিজ্ঞানের জয়ের কথা। এখানকার গবেষণার ফলে আজ ইনফ্লুয়েঞ্জা সৃষ্টিকারী ভাইরাসের কথা জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ভাইরাসে নাইট্রাস অ্যাসিড প্রয়োগ করে তাদের বংশগত পরিবর্তন সাধনে সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। হাতেকলমে যে জ্ঞান আজ এখানে সঞ্চয় হয়, মানুষের রোগযাতনা লাঘবের চেষ্টায় কালই হয়তো সারা পৃথিবীর চিকিৎসকরা বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবেন। টুয়েবিনগেনের ভাইরাস রিসার্চ কেন্দ্রটি একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র। সমগ্র পশ্চিম জার্মানীতে এটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। দেহবিজ্ঞানী, প্রাণীরাসায়নিক পদার্থবিজ্ঞানী, পদার্থ-রাসায়নিক, পশু-চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এখানে সমবেতভাবে কাজ করে যা আর কোথাও চেষ্টা করে দেখা হয়নি। সেকালের মত গুপ্তভাবে একক প্রচেষ্টায় আজ আর কিছু করা সম্ভব নয়, আজকাল ছক-কাটা তালিকা অনুসারে একদল লোক একসংগে কাজ করে। এতে গবেষণার সুবিধা হয়, পরস্পর পরস্পরের জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে, হাতের কাছেই অন্যান্য দেশের গবেষণার ফলাফল পায়।

একশো বছর আগে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের পথিকৃৎ জোহানেস ম্যুইলের যা বলেছিলেন, ভাইরাস রিসার্চ কেন্দ্রে তা সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান একমাত্র উন্নতি করতে পারে যদি তার সেবায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ও অন্যান্য সব বিজ্ঞান প্রয়োগ করা যায় এবং যদি সেই সব বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে একটি সুষম ছন্দে কাজ করানো যায়।

সময় সাহিত্য সমালোচনা : পাঠকের চোখে

দুই আগুনের মাঝখানে

সবিনয় নিবেদন,

উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সময়-সাহিত্য-সমালোচনায় ছেদ পড়েছে দেখলুম। আলোচনাগুলির জন্য ধন্যবাদ। এই ধরনের আলোচনায় অনেক কাজ হয়। আমরা, যারা সাধারণ পাঠক (এবং ইদানীংকার কোনো কোনো সমালোচকের ভাষায় "মূর্খ"), আমরা এই ধরনের আলোচনায় কিছু কিছু লাভবান হবার আশা রাখি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আলোচনাগুলি—বিশেষ করে উপন্যাস ও গল্প সম্পর্কে—পড়ে তৃপ্ত হইনি। চিন্তা করবার মতো প্রায় কিছুই এর মধ্যে পাইনি। অধিকাংশ স্থলে যুক্তি নেই, বেশিরভাগই অত্যন্ত সাধারণ ও সাদামাঠা কথা, যা আমরা, (যারা কিছুই জানি না বা বুঝি না), যে কেউই বলতে পারতুম। (ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোনো কোনো পাঠকের পত্রই তার প্রমাণ)। আর যা আছে, তা বিভ্রান্তিকর ও নিতান্ত একপেশে। গল্প সম্পর্কে আলোচনাটি অনর্থক হেঁয়ালি ও কথার মারপ্যাঁচে পূর্ণ, বাকি সালতামামি। বলা উচিত হবে কি না জানি না; কিন্তু আলোচনাগুলি পড়ে মনে হয়, এঁরা পাঠকদের প্রায়ই দোষ দেন বটে, কিন্তু আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যে পঠন-পাঠন ও তথ্যজ্ঞান থাকলে যথার্থ সমালোচকের দায়িত্ব পালন করা হয়, এঁদের তা নেই। তাই এঁদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকেছে, লঘু মনে হয়েছে। এগুলি কথার কথাই শুধু নয়, প্রমাণও নিবেদন করব।

তার আগে আমি কি ধরনের পাঠক, কটাক্ষ এড়াবার জন্যে, তার উল্লেখ করছি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি নতুনই, বর্তমানে অধ্যাপনা করি। উঁচুদরের (!) সমালোচক হবার আশা রাখি না। বই পড়ি স্বভাবে, বিদেশী সাহিত্যও কিছু কিছু পড়া আছে। অনেক লেখাই হাতে পেলে ও যোগাড় করতে পারলে পড়ি, এমনকি তরুণ-লেখকদের হালের লেখা পর্যন্ত। আমার মনে হয়, সকলে না হোক, অন্তত শতকরা পঁচিশ ভাগ পাঠক আমার মতো। সাধারণ।

"দুই আগুনের মাঝখানে" প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য : "এমন পাঠকের সন্ধান হামেশাই মেলে, যিনি সহস্রাধিক উপন্যাস পড়েছেন, কিন্তু উপন্যাসবিষয়ক কোনো গ্রন্থ পড়েননি, কোনোদিন পড়বার তাগিদ পর্যন্ত অনুভব করেননি।"...ঠিক কথা। কিন্তু, কেন পড়ব? বাংলা সমালোচনা, অন্তত সাম্প্রতিক, কি বস্তু, তা তো আমাদের জানা আছে। হয় উচ্ছ্বাস, যুক্তিহীন প্রশংসা, নয় যুক্তিহীন ধিক্কার। কেন ও কি জন্যে, তার উত্তর নেই। উপরন্তু ইতিহাসজ্ঞানের অভাব, বোধের অভাব, গভীরতার অভাব। আজকাল ফ্যাশন হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা। মানিকবাবু বড় লেখক, সকলেরই জানা আছে। কিন্তু, আমাদের গুণী সমালোচক-বৃন্দ "বড়" বলেই খালাস, কেন-র উত্তর নেই। সন্দেহ হয়, উত্তর বোধ হয় এঁদের জানা নেই। সমালোচনা পড়লে আজকাল সেইজন্য আমাদের, পাঠকের মনে ভয় ও উদ্বেগ দেখা দেয়।

সুবীরবাবুর প্রবন্ধের কথাই ধরা যাক। "নিতান্ত শিশুও জানে যে বাংলা উপন্যাসের প্রধান ক্রেতা বিয়ের বাজার ও সাধারণ গ্রন্থাগার"; ইত্যাদি কথা বলে পাঠকদের হেয় করবার স্পর্ধা তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর ভাবা উচিত ছিল, ভগ্ন ও আংশিক সত্যকে সমূহ সত্যরূপে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত কিনা। বি[illegible] উপহারে আজকাল আগের তুলনায় বেশি কাটে, সত্যি। কাটলে ক্ষতি কি? বিক্রি হয়। তাতে পরোক্ষলাভ লেখকদেরই। ক[illegible] কে না জানে, পপুলার লিটারেচর সব [illegible] ও সবকালেই বেশি কাটে। তাতে পা[illegible] সমাজ হেয় হয়ে যান না। কেন না, [illegible] লেখা বা মহৎ সাহিত্যের অনু[illegible] পাঠকের সংখ্যাও কিছু আছে। [illegible] থাকলে তারাশংকরের বই বিক্রি হ[illegible] না, তিনি "চীপ" না-হওয়া সত্ত্বেও। তা হ[illegible] এতদিন পরেও রবীন্দ্রনাথের বই হাজা[illegible] হাজারে বিক্রি হতো না; তা হলে বিভূ[illegible] ভূষণ অপরিচিতই থেকে যে[illegible] অর্বাচীনের মতো শোনায়, যখন গ্রন্থাগা[illegible] সমূহকেও অভিযুক্ত হতে দেখি। আ[illegible] সংকটের দিনে, গ্রন্থাগার আছে বলেই অ[illegible] বেশি সংখ্যায় বই পড়তে পাই; যে-সং[illegible] বই, মনে হয়, সমালোচকরাও পড়েন [illegible] আমার এক বন্ধু সম্প্রতি সমালোচক হি[illegible] নাম করেছেন। তিনি সব লেখকের বই প[illegible] না, কোনো কোনো লেখকের বই প[illegible] ঘৃণাবোধ করেন। যাঁদের বইয়ের পা[illegible]

উল্টে দেখেন না, তাঁদের বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করে গালমন্দ করেন। বোধ হয় এইটেই এখনকার রীতি। কিছুদিন আগে দুটি প্রমাণ সাইজের উপন্যাস-সমালোচনা গ্রন্থ বেরিয়েছে। শুনি কাগজ দুর্মূল্য, কিন্তু এসব বই ছাপা হয় কেন? বা, কি করে?

(২) সুবীরবাবুর একটি উক্তি: "আমাদের এটা প্রায় ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে যে, নায়কের প্রতিপক্ষ ভিলেন হবে........." (পৃঃ ৮৮৪) ইত্যাদি। কোন লেখকের উপন্যাসে এরকম পেয়েছেন তিনি?—তারাশঙ্কর? বিভূতি-ভূষণ? মানিক? সতীনাথ ভাদুড়ী? সঞ্জয় ভট্টাচার্য? অমিয়ভূষণ মজুমদার? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী? বিমল কর? জবাব দিন। পাওয়া অবশ্য যায়—ঠিক এইরকমই—অবধূত, নীহার গুপ্ত প্রভৃতি কারো কারো লেখায়। মাপ করবেন, কাকে কি মূল্য দিতে হয়, তা আমরা জানি। শেষোক্ত ব্যক্তিবৃন্দ যতই পপুলার হন, আলোচনায়, যে-কোনো আলোচনায়, সাধারণ পাঠক তাঁদের সম্পর্কে মোটেই চিন্তিত নয়।

(৩) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে সুবীরবাবু জীবনবোধের অভাব—ইত্যাদি অভিযোগ এনেছেন। তাঁর আগেই বলা হয়েছে: "মধ্যবিত্ত জীবনে মানবিক সম্পর্কের অসারতা সম্পর্কে তিনি সচেতন।" উক্তিটা পরস্পরবিরোধী। তা হলে প্রশ্ন করতে হয়, সুবীরবাবু জীবনবোধ বলতে কি বোঝেন? ভগবৎ প্রেম? আশাবাদ বা "অসারতার" বিপরীত কিছু? সব লেখককেই যে আশাবাদ ইত্যাদির তকমা আঁটতে হবে, তার কি মানে আছে! জীবনবোধ কথাটির এমন অপপ্রয়োগ আর দেখিনি। আরো ভুলতে পারি না, "সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু"র লেখক সম্পর্কে এইরকম উক্তি করা হয়েছে।

(৪) বিমল করের আলোচ্য উপন্যাস "অপরাহ্ণ"। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে। সুবীরবাবু বিচক্ষণ সমালোচক; কিন্তু তাঁর বোধ হয় খেয়াল হয়নি, "নির্বাসন" ও "খোয়াই" নামক বিমলবাবুর দুটি উপন্যাস আরো পরে প্রকাশিত হয়েছে, তারপর বেরিয়েছে "দেওয়াল" (৩য় খণ্ড)। প্রসঙ্গত, "একটি রাত্রির উপাখ্যান" নামক জনৈক তরুণ লেখকের যে-উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, "অপরাহ্ণ" প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অবান্তর মনে হয়। দ্বিতীয় উপন্যাসটি সাময়িক পত্রিকায় অপরাহ্ণের অনেক পরে ছাপা হয় এবং বলা প্রয়োজন, কাহিনীটি সম্পূর্ণ "অপরাহ্ণ"-প্রভাবিত। কাহিনীগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করে লেখক বিমলবাবুর উপর কিছুটা দায়িত্ব আরোপ করতে চান, কোনো কোনো পাঠকের এরকম মনে হতে পারে।

(৫) বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার উদাহরণস্বরূপ সুবীরবাবু গৌরকিশোর ঘোষের "এই দাহ" এবং সুধী-রঞ্জনের "সুপ্রিয়ার বন্ধন" উপন্যাস দুটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, সাধারণ যৌন সমস্যা কি করে "বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা"র পরিচয় হতে পারে, তা বোধগম্য হলো না। সুবীরবাবুর ব্যাখ্যা এখানে যথেষ্ট নয়। এ-সমস্যা শুধু মধ্যবিত্ত জীবনে কেন, উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত বা ইংলণ্ড অথবা হলিউডের জীবনের সমস্যাও হতে পারে। অবশ্য বিশেষণগুলি ইদানীং খুবই চালু, ব্যবহারে লোভ সংবরণ করাও কঠিন। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এসো নীপবনে"র নামোল্লেখে রয়েছে, কিন্তু আলোচনা নেই কেন, বুঝলাম না। সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে পাশ কাটানো আলোচনার অর্থ কি? রমাপদ চৌধুরী সম্পর্কে তিনি কি বলছেন নিজে কি সে বিষয়ে সজ্ঞান?

(৬) "শুধু ভঙ্গি দিয়ে" সুবীরবাবু অনেক স্থলে বাজিমাৎ করেছেন। অচিন্ত্য-কুমার ব্যবহৃত "ঊর্ধ্বতন" কথাটি ছাপার ভুল কিনা, জানি না। সুবীরবাবুই বলেছেন, অচিন্ত্যকুমার "নিপুণ শব্দ-শিল্পী"।

(৭) ব্যালান্সের অভাবে রচনাটি অত্যন্ত একপেশে হয়ে পড়েছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, এবং উল্লেখ্য বলেই আলোচনাযোগ্য অনেক উপন্যাসের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই; কিন্তু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রূণাবস্থার অনেক রচনাকে সমালোচক অধিকার দিয়েছেন। "এখনও পর্যন্ত যাঁর একটি উপন্যাসও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, অথচ আমাদের আলোচনায় অপরিহার্য", এই বলে তিনি একজন লেখককে একবারে আলাদা করে দিয়েছেন। অথচ, আলোচনায় অপরিহার্য নয়, নিতান্ত গৌণ বলে মনে হয়, এমন অনেক লেখকের পিছনে অতিরিক্ত বাক্যব্যয় করেছেন। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজনের উপন্যাসের উল্লেখ আছে, আছে ভূয়সী প্রশংসা; কিন্তু, কৌতূহলবশত, উপন্যাসটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়েও কোনো ফল পাইনি। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে অথবা কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কি না, এ সন্ধান কেউই দিতে পারেননি। নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় ও পড়া যায়, এইরকম উপন্যাস না হলে আমাদের অসুবিধা হয়।

(৮) অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তরুণ-লেখকদের আলোচনা প্রসঙ্গেও। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় কেন এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলেন না, তা বোঝা গেল না। কথাবস্তু হিসেবে গ্রাম-জীবনের ব্যবহার সম্পর্কে সুবীরবাবু অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু এই বিষয়ে তরুণদের মধ্যে যিনি বিশিষ্ট, সেই বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। গত বছর তাঁর "কাকচরিত্র" প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতির্ময়বাবুর "মনসিজ"। আরো কয়েক-জন তরুণ ঔপন্যাসিকও মর্যাদা পাননি।

(৯) আলোচনা শেষ করার পূর্বে আরো

দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত প্রভৃতি বলেছেন, এই মর্মে সুবীরবাবু কয়েকটি উক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধার করেছেন। এ'রা কারা? কোথা থেকে উদয় হয়ে সুবীরবাবুর কলমে ভর করলেন? তাছাড়া প্রথমোক্ত জনের যে-হাস্যকর উক্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে বাহবা দেওয়া যায়। বাংলা সাহিত্য, আমার ক্ষুদ্র ইতিহাসজ্ঞানে যতটুকু জানি, তার জন্মমুহূর্ত থেকেই ইউরোপের ঐতিহ্য থেকে যথেষ্ট নিয়েছে এবং এখন আরো বেশি নিচ্ছে, প্রয়োজন হলে সরাসরি। তাছাড়া, প্রত্যেক প্রসঙ্গেরই সীমা ও সীমানা নির্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বা তারাশঙ্কর বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা সতীনাথ ভাদুড়ী কি বলেছেন, তা শুনতে প্রস্তুত আছি। রাম-শ্যাম-যদুর কাছে নয়; আপাতত বেদবাক্য মনে হলেও, নয়।

নমস্কার। ইতি—

সলিলকুমার চক্রবর্তী
কলিকাতা-৯

॥ ২॥

সবিনয় নিবেদন,

দুই আগুনের মাঝখানে আলোচনাটি সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। আলোচনাটির লক্ষ্য আধুনিক উপন্যাস ও তার লেখক। যদিও বলা হয়েছে এক বছরে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির আলোচনাই মুখ্য। কিন্তু এর লেখকরা এক বছরের নন, অনেক বছরের।

এই এক বছরের উপন্যাস নামে বিজ্ঞাপিত কিছুসংখ্যক বই-এর সঙ্গে আমার যৎসামান্য পরিচয় ঘটেছে। এগুলি উপন্যাস কিনা এবং এগুলি আধুনিক কিনা—সোজাসুজি বলি, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে।

সুতরাং, বর্তমান আলোচনায় উপন্যাস শব্দটিকে বাদ দিতে চাই। গত কয়েক বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লেখা বন্ধ আছে। কিছু সাড়ে বত্রিশভাজার গল্প, কিছু রম্যরচনা, কিছু মঞ্চনাট্য বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। সোজা কথায় আমরা কিছু গল্পের বই পেয়েছি। এটা অস্বীকার করব না।

বইগুলি নতুন। কিন্তু এগুলি আধুনিক কিনা তাতে সন্দেহ আছে। নতুন অথচ আধুনিক নয়। নয় কেন? স্মরণ রাখা প্রয়োজন—গত যুগের আধুনিকতা এবং এ যুগের আধুনিকতা এক নয়। আধুনিকতা কোটপ্যান্টে নয়, আচার আচরণে নয়। আদর্শে। কোন দৃষ্টি দিয়ে শিল্পী জগৎ এবং জীবনকে দেখছেন—আধুনিকতা সেই দৃষ্টিতে। বলা যেতে পারে, যে দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক সত্যের দ্বারা পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত, সেই দৃষ্টিই আধুনিক। এই দৃষ্টির সামনে ভাবালুতা, আধ্যাত্মিকতা, রোমান্টিকতা ইত্যাদির ভিতরকার অজস্র ফাঁকি ধরা পড়ে। এই বিজ্ঞানসম্মত শিল্প দৃষ্টির অধিকারী শিল্পী মানুষকে মুখ্যত দুটি রূপে দেখেন: একটি তার ব্যক্তিগত রূপ অপরটি তার সমাজগত রূপ। এবং মানুষ তার ভালমন্দ সবকিছুর জন্যে তার এই দুটি সত্তার কাছে দায়ী। মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাটি এই আধুনিকদের কাছে উপেক্ষিত। ভাগ্য, ভগবান, ইত্যাদি সংক্রান্ত আবেগবহুল ভাবালুতা মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয় না। সমস্ত কিছুর পশ্চাতে যে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রিয়াশীল—এটা তারা অস্বীকার করেন দৃঢ় কণ্ঠে। মানুষই মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা প্রভৃতির জন্যে দায়ী। এর পশ্চাতে কোন আধ্যাত্মিক মায়া বা লীলাখেলা নেই। জগৎ এবং জীবনকে এরা জগৎ এবং জীবনের পটভূমিতে দেখেন: এবং বিচার-বিশ্লেষণ করেন বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান কালের কয়জন লেখককে আধুনিক বলা যাবে? অনেক লেখকের মধ্যে অল্প কয়েকজনকে। অল্প কয়েকজনের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম। সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বলে পাঠক বঞ্চিত। পাঠক হিসাবে আমাদের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নই এবং ফরমায়েশ মতো বস্তু পেয়ে মনটাও আমাদের ফরমায়েশী হয়ে গেছে। ফলে আধুনিক উপন্যাসের বদলে অনুরোধের গল্প একটু লম্বা আকারে আমরা পাচ্ছি। এবং তাতে আমাদের মন যোগাবার মতো উপকরণ প্রচুর থাকছে। আমাদের সব কয়জন বৃদ্ধ লেখকের লেখায় যা থাকেঃ—প্রথমত উত্তেজনা। দ্বিতীয়ত যৌবনসাদৃশ্য আবেগ, করুণ রস, এবং শেষে আধ্যাত্মিকতা।

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথার" পরবর্তী কালের তারাশঙ্করের কথাই ভাবুন। এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে বলছি হাঁসুলী বাঁকের উপকথার লেখক আজ দূরে সরে গেছেন। আর কোন নামোল্লেখ না করেও বলছি, আমাদের প্রায় সব লেখকই যেন "জলের মতো ঘুরে ঘুরে একই কথা" বলেন।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে আধুনিককালে আনুধিক লেখকের অভাব। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর প্রমুখেরা জোলা, মোপাসাঁ প্রমুখের কাছে অল্পবিস্তর শিক্ষানবিশী করেছিলেন। নির্মোহ দৃষ্টিতে তারাও মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশেষকে অতিক্রম করে সমগ্রের কথা ভাবতে পারেননি। বড়ই দুঃখের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করে চলেছেন। জীবন সম্পর্কে তাঁর কোন কথা কি বলবার নেই? বিমল কর মধ্যবিত্ত মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না।

হাল আমলের নতুন লেখকদের পাঠক হিসাবে বিচার করতে দ্বিধাবোধ করি। কারণ তাঁদের অনুশীলনকাল এখনো শেষ হয়নি। তাঁদের কাছ থেকে নিরাশ হবার মতো অবস্থা এখনো আসেনি। দু-এক জনের মধ্যে যে জাতীয় বিপ্লবের আভাস লক্ষ করেছি, তাতে আশান্বিত হয়েছি। এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি,—সকলে না হলেও কয়েকজন আধুনিক। সেই কয়েকজনের মধ্যে মতি নন্দী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট।

বাংলায় উপন্যাস চাই। সে উপন্যাসকে উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। আপনস্বরূপে তাকে চেনা যাবে।

সোমালি মিত্র
বর্ধমান

ট্রামে-বাসে

চীনাদের আক্রমণাত্মক অভিযান এর প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সখেদে মন্তব্য করিয়াছেন,—চীনের সঙ্গে সৌহার্দ সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছি, এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের আসন প্রাপ্তি সম্বন্ধেও আমাদের প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতিদানে চীন আমাদের ক্ষতি সাধন করিতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"শুধু কি তাই, 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' চীৎকারে কণ্ঠের ক্ষত এখনো শুকোয়নি। তাছাড়া, মোজাফরপুরের বাছাই লিচু; হায় অকৃতজ্ঞ চু-এন-লাই, লিচু খাওয়ার শখ কি তোমার ফুরাইয়া গিয়াছে!!"

শ্যামলাল চুপ করিয়া ট্রামের জানালার বাইরের দিকে তাকাইয়া আছে, একটিও রা কাড়িতেছে না। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় শ্যামলাল মুষড়াইয়া গিয়াছে, হয়ত আবার সেই নিষ্প্রদীপ, চাল-কয়লার লাইন, শহরত্যাগের হিড়িক ইত্যাদি ভাবিয়াই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মাভৈঃ বাণী শুনাইবার সহযাত্রীর অভাব নাই, "যা হবার হবে, এখন থেকেই কেন' বলা মাত্র শ্যামলাল মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আসন্ন যুদ্ধ (অবশ্যই অভিযান) আমি ভাবছিনে, ভাবছি আসন্ন শীতের কথা। আর এই সঙ্গে মনে পড়ছে পশমী কোটটার কথা; শুনেলাম চীনা ডাইং ক্লিনিং অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে, কোটটা যদি... শ্যামলাল কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাম্প্রতিক সভায় নাকি বলিয়াছেন যে, ১৮ হাজার ফুট উঁচুতে কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে (সেটা নাকি, ভারি আশ্চর্য তো!) এখানে বসিয়া সেসব জানা যায় না শুধু লোকদের উত্তেজিত করা যায়। "শুধু শাক দিয়ে নয়, কথা দিয়েও তবে মাছ ঢাকা যায়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধের একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাউক ইহাই সকার কাম্য। "কিন্তু কালীঘাটে যে শুনে এলাম কে বা কারা প্রার্থনা করছে—'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই'!—বাজারের হালচাল দেখিয়া মনে হইতেছে, সহযাত্রীর কথাটা বুঝি নেহাৎ মিথ্যা নয়, গো-বধে আনন্দ করার মতো উন্মাদের দল নিশ্চয়ই নির্মূল হইয়া যায় নাই, বিচিত্র এই দেশ।

এক সংবাদে শুনিলাম রাশিয়া হইতে একটি ফুটবল দল নাকি ভারতে খেলিতে আসিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"টিকিট আমরা পাব না, তাই খেলা দেখাও হবে না। তবে এই সূত্রে আবার একবার (এই বছরের মতো আপাতত শেষ) কলিকাতা স্টেডিয়ামের আলোচনা শুনব এবং খোস খবরের ঝুটায় ধেই ধেই নৃত্য করব।"

এক সংবাদে জানা গেল বিপথগামী শিশুর সংখ্যা নাকি বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"শুধু খোকা কেন, বিপথগামী রামখোকাদের সংখ্যাও বড় কম যায় না।"

চীনের সঙ্গে নাকি পাকিস্তানের "নির্যুদ্ধ চুক্তির" কথা বিবেচনা করা হইতেছে।—"নেহাৎ ঘরোয়া ব্যাপার, আমাদের কীই বা বলবার আছে। তবু বলি, "নন-অ্যাগ্রেশন" কথাটাও যেন চুক্তিতে থাকে, অ্যাগ্রেশনটা যে যুদ্ধের চেয়ে কম নয়, চীন সে চেনা দিয়েছেন"—বলেন খুড়ো।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি প্ল্যানিং কমিশন তেমন দৃষ্টি দিতেছে না, ইহার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করিতেও তাহারা নারাজ।—"অর্থের প্রয়োজনই বা কী, সিম্পি মানবের জন্য পাঁচটা পয়সা, অবশ্যই ৮ নঃ পঃ, হাতে থাকলেই যথেষ্ট"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

ডেপুটি পুলিস কমিশনার লালবাজারে কলিকাতার পাঁচটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ময়দানে আরো একটি ঘেরা-মাঠ এবং যেসব ঘেরা-মাঠ আছে সেগুলির আসন বৃদ্ধি সম্পর্কিত ব্যাপারে নাকি আলোচনা করিয়াছেন। "কিন্তু প্রতিনিধিদের পরিবর্তে বন মহোৎসবের কর্মীদের, অভাবে ময়দানের মালীদের সঙ্গে আরো অধিক বৃক্ষ রোপনের কথা আলোচনা করলে পারতেন, আসন তো শেষ পর্যন্ত গাছের ডালেই করে নিতে হবে"—মন্তব্য করেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

মাছের আড়ৎদারগণ নাকি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে তাহারা সরকারের নিকট নতি স্বীকার করিবে না।—"তাহলেই হল, রামে মারলেও যা রাবণে মারলেও তাই, আমাদের পক্ষে হানাদার আর আড়ৎদার দুই-ই অপ্রতিরোধ্য!!"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিহারের রাজ্যপাল জামশেদপুরের কলেজের ছাত্রীদের পরামর্শ দিয়াছেন,—মাল্য যদি দিতেই হয় তাহা হইলে তাঁরা যেন "অর্জুনের" গলাতেই মাল্য দেন—"এমনিতেই তো চারদিকে যুদ্ধের দামামায় কাঠি পড়ছে, চড়ুকেদের পিঠও চড়চড় করছে, আবার যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিয়ে লাভ কী; "অর্জুনের" ভাগ্যে ঈর্ষা না করার মতো ভাসুর-দেবর আছে কি না সন্দেহ"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে চীনা আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনাকালে নাকি বলিয়াছেন যে, দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি যাহাতে না হয় সে দিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"অবশ্য মাছের দরটা অবশ্য কচিৎ কদাচিৎ ব্যভিচারী, যথা ছাগীর মুখে দাড়ির মতো ব্যতিক্রম হয়েই থাকবে!!"

শ্রীরাজাগোপালাচারী শান্তি সফর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা "বেশ কিছু আশা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন"। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমদানী বাণিজ্যে "আশা"র ওপরে কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই, যদিও ওটা লাকশারি গুডস-এর পর্যায়ে পড়ে—সুতরাং...!!"

চিত্র প্রদর্শনী

শরতের শেষের দিকে কলকাতায় আরম্ভ হয় চিত্রপ্রদর্শনীর মরশুম। এ বছরের মরশুমের আরম্ভটা হয়েছে ভাল। গত ২৩শে অক্টোবর ফাইন আর্টস আকাদমির রবীন্দ্র গ্যালারীতে এক সপ্তাহের জন্য উদ্বোধিত হয় যুগোস্লাভিয়ার সমসাময়িক শিল্পীদের ছবির এক বিরাট প্রদর্শনী। ছবির সংখ্যার দিকেই বিরাট নয়—মোট তেতাল্লিশজন শিল্পীর তেতাল্লিশ খানি ছবি—আকৃতিতেও ছবিগুলি বিরাট। বৃহত্তম ক্যানভাসটির মাপ ২৬,১৮০ বর্গ সেন্টিমিটার এবং ক্ষুদ্রতমটির মাপ, ৩,৮০৭ বর্গ সেন্টিমিটার। আমাদের দেশের শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনীতে এই মাপের কাজ কচিৎ দেখা যায়।

প্রদর্শিত ছবিগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার শিল্পীরা তাঁদেরই প্যারিপার্শ্বিক থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করলেও ইওরোপের আধুনিক চিত্রধারার মতো বিশ্বজনীন আবেদনে সম্পৃক্ত। ছবিগুলির মধ্যে একটা কাব্যিক ছন্দ ফুটিয়ে তোলায় শিল্পীদের বিশেষ দক্ষতা লক্ষ করার বিষয়। এতোজন শিল্পী, সুতরাং চিত্রাঙ্কণের বিভিন্ন ধারার অনুসৃতি থাকাই স্বাভাবিক এবং তা দেখাও গেল—বাস্তবপন্থী, বিমূর্ত ধারাপন্থী, কিউবিজম, ইম্প্রেসনিজম প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় আঁকা দক্ষশিল্পীদের কাজ থেকে যুগোস্লাভিয়ার সমসাময়িক শিল্প আন্দোলনের একটা সম্যক পরিচয় লাভের সুযোগ পাওয়া গেল।

জেলেনী শিল্পী: লক্ষণ পাই

নেপালি মালবাহক শিল্পী: কল্যাণ বসু

*

গত সপ্তাহে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চিত্র প্রদর্শনী হয় গ্র্যান্ড হোটেলে কুমার গ্যালারীতে লক্ষণ পাইয়ের সর্বাধুনিক ছবির একটি সংগ্রহ নিয়ে। এ বছর লক্ষণ পাইয়ের এটি দ্বিতীয় প্রদর্শনী। কেবলমাত্র দেশেই নয়, ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় আধুনিক শিল্পীদের যে-কজন তাঁদের ছবি দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন লক্ষণ পাই তাঁদের অন্যতম।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে শিল্পী বড় হলে একটা নিজস্ব খেয়াল খুশীকে তাঁর কাজে ব্যক্ত করায় তৎপর হন। লক্ষণ পাইয়ের আলোচ্য প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখে সেইটাই মনে হয়। প্রদর্শিত ছবিগুলিতে শিল্পী সাধারণ দৃশ্য ও চরিত্রকেই বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপিত করেছেন—রঙের নির্বাচন ও প্রয়োগে প্রত্যেকখানি ছবিই চট করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নও দেখা যায়—কিন্তু রেখার বিন্যাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গুহায় আঁকা চিত্রের অনুসরণ যেন প্রতিভাকে বিশ্রাম দিয়ে খেয়ালীপনাকেই কাজে লাগানো হয়েছে। তবে তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলিতে বেশ দীপ্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, চিত্ররসিকদের খুশী করার মতো একটা নিজস্ব ভঙ্গী লক্ষ করা যায় যে-ভঙ্গীটা তাঁকে এদেশের এখনকার শিল্পীদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

*

কল্যাণ বসু একাধারে শিল্পী, লেখক এবং পরিব্রাজক। কিছুকাল আগে তিনি উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল হয়ে নেপাল পর্যন্ত ঘুরে আসেন। তাঁর সেই ভ্রমণের পথে নেপালের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সেখানকার যেসব মানুষ তাঁর চোখে পড়েছিল তাদের নিয়ে আঁকা সেইসব তেলরঙ, জলরঙের ছবি ও স্কেচের একটি প্রদর্শনী গত ২৪শে অক্টোবর এক সপ্তাহের জন্য আর্টিস্ট্রি হাউসে উদ্বোধিত হয়।

কল্যাণ বসু চিত্ররসিকদের কাছে অপরিচিত নন, বছর তিনেক আগে একই স্থানে তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য প্রদর্শনীতে তেলরঙা তুলিতে আঁকা ছবি আছে নখানি, রঙঘষা ছুরিতে আঁকা চারখানি এবং জলরঙের নখানি। এছাড়া বত্রিশখানি স্কেচও প্রদর্শিত হয়। বাস্তবধর্মী ছবিগুলি রঙ ও রেখার দক্ষ

ধার্মিক মহিলা শিল্পী: শ্রীদাম সাহা

অভিসারিকা — শিল্পী : বাসুদেব দাস

বিন্যাসে দৃষ্টিকে মোহিত করে তোলার মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তেলরঙের "কাঠ-মাণ্ডুর পথে", "জানালা থেকে", "পথ নির্মাণ", "হনুমান ডোকা", "পশুপতিনাথ মন্দির", "একদল নেপালী" ছবিগুলি বিশেষ শিল্পকৃতিত্বের পরিচায়ক। স্বচ্ছন্দ-গতি রেখা ও মনোরম রঙের প্রয়োগ লক্ষ করার মতো। জলরঙের ছবিগুলি নেপালের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আঁকা। ধূমপায়ী, গ্রাম্য মহিলা প্রভৃতি ছবিগুলিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং শিল্প ব্যক্তিত্বে বেশ দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। স্কেচেও শিল্পীর বেশ দক্ষতা লক্ষ করা যায়।

এইসঙ্গে কল্যাণ বসুর ছাত্রী ইন্দ্রাণী সেনের দশখানি ছবির এক প্রদর্শনী যুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রীকে উৎসাহ দেবার জন্যই সম্ভবত এই অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু বোধহয় উৎসাহ দেবার এটা ঠিক পথ নয়। কারণ যে ছবি এখানে দেখা গেল তাতে ইন্দ্রাণী সেন এখনও এমন দক্ষতা অর্জন করেননি যাতে তাঁর ছবি প্রদর্শনী করে দেখাবার ব্যবস্থা করা চলে।

•

গত ২৫শে অক্টোবর আকাদমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে শ্রীদাম সাহার ছবির সপ্তাহব্যাপী একক প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয়। ১৯৫৫ সালে কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে ভাস্কর্য ও মডেলিংয়ে এবং ১৯৫৮ সালে কারুশিল্পে সম্মানের সংগে তিনি ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে তিনি আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে রৌপ্যপদক লাভ করেন এবং আরো কতকগুলি প্রদর্শনীতেও তিনি পদক ও সম্মানপত্র পাবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্তমানে তিনি হুগলীর অন্তর্গত ইটাচুনা বেসিক ট্রেনিং কলেজে কারুশিল্পে শিক্ষকতা করেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পীর সাঁয়ত্রিশ-খানি ছবি ও দশটি পোড়ামাটির কাজ দেখা গেল। ছবিগুলির অঙ্কন রীতিতে পোড়া-মাটির পুতুলের ঢঙ অবলম্বন করে শিল্পী একটা নিজস্ব ভঙ্গী আয়ত্তের চেষ্টা করছেন। সেদিক থেকে শ্রীদাম সাহার ছবি-গুলির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। গায়ক, ভিখারী, হস্তী সওয়ার, ফকির সাহেব, বাউল, দুই মহিলা, ধার্মিক মহিলা প্রভৃতি প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিই এই জাতের। পোড়ামাটির মূর্তিগুলিতে সূক্ষ্ম কাজে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নৌকাবাচ, মা ও সন্তান, তাঁতিনী, মিছিল, বিশ্রামরত মহিলা, প্রসাধনরত মহিলা প্রভৃতি পোড়ামাটির কাজগুলি বাঙলার অতীত ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়।

•

ছবিতে মডেলিংয়ের প্রভাব দেখা গেল ২৬শে অক্টোবর ইনফরমেশন সেণ্টারে উদ্বোধিত বাসুদেব দাশের একক চিত্র-প্রদর্শনীতেও। প্রখ্যাত শিল্পী সুনীলমাধব সেনের ছাত্র হলেও তিনি গুরুর প্রভাব কাটিয়ে একটা নিজস্ব ভঙ্গীর উদ্ভাবন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। আঠারো বৎসর ব্যাপী শিল্পসাধনায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অবশেষে মাটির দুর্গা মূর্তি তাঁর প্রেরণার আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য দুর্গার মূর্তি বলতে মানসচক্ষে যে রূপটা ফুটে ওঠে, শিল্পী দাশের ছবিতে হুবহু সেরূপটা পাওয়া যায় না—প্রদর্শিত দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ছবি তিনখানিতে বরং তার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। এখানে শিল্পীর রেখার বুননীতে আপাতদৃষ্টিতে একটা জটিল রূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তবে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে মূর্তিগুলির চিরা-চরিত রূপটি উদ্ভাসিত পাওয়া যায়। কামার, কুয়াতে কে?, অভিসারিকা, বিচিত্র মাছ, কেশ প্রসাধন, চাঁদের আলোয় প্রাগৈতিহাসিক দম্পতি প্রভৃতি মডেলিংয়ের ধারায় আঁকা ছবিগুলিতে নতুনত্বের আশ্বাস পাওয়া যায়। প্রয়োজন—একটি মুখ এবং পত্র—ছবি দুখানিতে স্থাপত্য রীতির অনু-সরণ লক্ষণীয়। 'উৎসব' ছবিখানিতে রঙের সমারোহে বিমূর্ত ধারার ছবি তৈরিতে শিল্পীর চেষ্টা দেখা যায়। কাজে রকমারিতা থাকলেও শিল্পীর বর্তমান মূল প্রবণতা মডেলিং রেখাকে ছবিতে অবলম্বন।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

জন স্টেইনবেক

১৯৬২ সালে সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পেলেন জন স্টেইনবেক। ইতিপূর্বে আরও পাঁচজন আমেরিকার লেখক এই সম্মান দ্বারা ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে একমাত্র ও'নীল-কে বাদ দিলে বাকি চারজনই মূলত ঔপন্যাসিক। স্টেইনবেকও অপর চারজনের সমগোত্রীয়।

১৯০২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যালিনাস-এ তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন ট্রেজারার, মা স্কুলের টিচার। স্টেইনবেকদের পারিবারিক ইতিহাস খুঁজলে বাবার দিক থেকে প্রুশীয় রক্ত এবং মায়ের দিক থেকে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বংশানুক্রম পাওয়া যায়। নিউ ইংল্যাণ্ড মারফতই এঁদের আগমন সম্ভবত।

কৈশোর ও যৌবনে স্টেইনবেক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেছিলেন, ডিগ্রী নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তাঁর জীবনীকাররা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টেইনবেকের উৎসাহ ছিল মেরিন বায়োলজিতে।

বিদ্যার্জনের স্বাভাবিক পথ থেকে সরে এসে স্টেইনবেক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নানা রকম পেশা গ্রহণ করলেন, মনে বোধ হয় এ কামনা ছিল, কেতাবের বিদ্যা থেকে নয়, রাস্ত চিনির কারখানা চাষবাস মৎস্যচাষ দিনমজুরী —ইত্যাদির মধ্য থেকে তিনি জীবনের শিক্ষা নেবেন। নিউ ইয়র্ক-এর একটি খবরের কাগজের সংবাদদাতার কাজও তিনি করেছিলেন কিছুকাল, কিন্তু চাকরিটা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। সংবাদদাতা হিসেবে, কেবলমাত্র ঘটনাটুকু পেশ করবেন লেখায়— এই নীতি তিনি নাকি মেনে নিতে পারেননি।

যদি দুঃখ দুর্ভাগ্য এবং দারিদ্র্যকে জীবনের অন্যতম প্রধান অভিজ্ঞতা বলে স্বীকার করতে হয় তবে স্টেইনবেক সে অভিজ্ঞতা পুরোপুরি অর্জন করেছেন। এক সময় মাত্র মাসিক কুড়ি ডলার রোজগারে স্টেইনবেককে সস্ত্রীক বেঁচে থাকতে হয়েছে। প্রধান অবলম্বন ছিল মাছ ধরা, স্ত্রীর সঙ্গে মিলেমিশে Montere Bayতে মাছ ধরাই ছিল তাঁর জীবিকা।

১৯২৯ সালে, ক্যালিফোর্ণিয়ায় ফিরে আসার পর তাঁর প্রথম উপন্যাস—"কাপ অফ গোল্ড" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক রোমান্স বলা হয়েছে। এই উপন্যাসটিতে অন্যের প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

এর পর বছর তিনেক স্টেইনবেক প্রধানত ছোট গল্প লিখেছেন। খ্যাতি পাননি; প্রতিষ্ঠাও নয়। ১৯৩২ সালে তাঁর আর-একটি উপন্যাস প্রকাশিত হল : "প্যাস্টিউরস অফ হেভেন।" সমালোচকরা বললেন, এই বই ঠিক উপন্যাস নয়—ছোট গল্প জুড়ে জুড়ে একে উপন্যাস করা হয়েছে, ক্যালিফোর্ণিয়ার এক উপত্যকায় বসবাসকারী বিভিন্ন পরিবারের কাহিনী শিথিলভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থটিতে।

বলা বাহুল্য, স্টেইনবেকের প্রথম দিককার বইগুলোর বিক্রী ছিল খুবই খারাপ। চিকাগোর এক গ্রন্থ-ব্যবসায়ী অপর এক প্রকাশককে স্টেইনবেক সম্পর্কে উৎসাহিত দপ্তর ন নবার "টর্টিলা ফ্ল্যাট" প্রকাশকদের দপ্তর থেকে ফিরে আসার পর প্যাসকাল কভিচি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯৩৫ সালে "টর্টিলা ফ্ল্যাট" প্রকাশিত হয়। স্টেইনবেক সেই প্রথম সৌভাগ্যের মুখ দেখলেন। অনেক সমালোচকই মনে করেন, টর্টিলা ফ্ল্যাট আর কারুর মতন নয়, স্টেইনবেকের মতনই; তাঁরই যোগ্য।

"টর্টিলা ফ্ল্যাট" যদি আঞ্চলিক উপন্যাস হয়, তবে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "ডুবিআস ব্যাটল-কে সর্বহারার উপন্যাস বলতে হয়। অবশ্য, কমিউনিস্টরা এতে হতাশ হয়েছিল। কারণ তাদের পার্টি লাইনের 'সিঁড়ি ধরে উপন্যাসটি শেষ হল না।

১৯৩৭-এ "অফ মাইস অ্যাণ্ড ম্যান" প্রকাশ পেল; ছোট উপন্যাস, নাটকের মন নিয়েই যেন লেখা। সেই বছরই এর নাট্যরূপে দেখা দিল।

সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম ও সম্মানের অধিকারী হলেও ১৯৩৯-এ "গ্রেপস অফ রাথ" প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত স্টেইনবেক

আমেরিকার সাহিত্যকুলে শীর্ষদের আসনটি লাভ করতে পারেননি। "গ্রেপস অফ র‍্যাথই" তাঁকে আমেরিকার অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত করল।

তারপর থেকে এ-যাবৎ স্টেইনবেক আরও বহু গ্রন্থ লিখেছেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর প্রণীত গ্রন্থসংখ্যা তুলনায় কমে এসেছে, সম্ভবত তাঁর শেষ গ্রন্থ বেরিয়েছে বছর দুই আগে।

জন স্টেইনবেক-এর সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের মনে একটি দ্বিধা আছে: ..no body ever has any idea where do have him. This makes his books a very exciting reading adventure, but it also means that, though he has now publsihed a round dozen of novels, his position in our fiction, and even his future, remain, a dozen years after **The Gsapes of Wrath** quite undefined and hypothetical.

স্টেইনবেক সম্পর্কে আমার জ্ঞান অতি অল্প। উপরের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা। আমি যতদূর জানি, বাঙালী পাঠকসমাজে স্টেইনবেকের কদর আছে, বোধ হয় হেমিংওয়ে ও কলডওএলের পর স্টেইনবেক-এর গ্রন্থ এদেশে যত বিক্রী হয়, অন্য কোনো আমেরিকান গ্রন্থকারের অতটা নয়।

স্টেইনবেকের গ্রন্থের যাঁরা মনোযোগী পাঠক তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন, ভদ্রলোককে বাস্তবিক কোনো এক বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক হিসাবে চেনা করা যায় না। সমালোচকরা হাতড়ে দেখেছেন, সাহিত্যের যে কটি ধারা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত, স্টেইনবেক তরা প্রায় সব কটির সুযোগ নিয়েছেন যাকে আমরা ন্যাচারালিস্টিক উপন্যাস বলে থাকি—'গ্রেপস্ অফ র‍্যাথ' তার উদাহরণ হতে পারে; বস্তুত আমেরিকার ও বিদেশের অনেকেই উপন্যাসটিকে এই শ্রেণীর বলে দাবি করেছেন। কিন্তু অপরাপর সমালোচকরা মনে করেন, এর মধ্যে সিম্বলিজমও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। বিশেষত শেষ দৃশ্যকে প্রতীকী না ধরে উপায় নেই। স্টেইনবেকের লেখায় প্রতীক নতুন নয়; তিনি প্রকৃতিকে বার বার প্রতীকী করে ব্যবহার করেছেন, অনেক সময় মানবেতর প্রাণীকেও; এমন কি 'হি ইউজেজ কলার সিম্বলিজম অলসো।'

কোনো ধরা বাঁধা সাহিত্য-স্কুলে না ফেলা গেলেও একথা স্বীকার করতে কারুর বাধেনি, স্টেইনবেক সেই শ্রেণীর শিল্পী যাঁরা প্রধানত জীবনের স্থূলে ও সূক্ষ্ম উভয় দিককেই সাহিত্যে ধরতে চেয়েছেন। ক্ষুধার্ত কৃষাণদের দেশত্যাগ যদি তাঁর সাহিত্যের উপাদান হয়ে থাকে তবে এ-কথাও সংগে সংগে স্মরণ করতে হবে যে, লরেন্সীয় নীতিহীনতা ও দায়িত্বহীনতাকেও (!) তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। এমন কি সেই ধরনের রহস্যময়তাকেও। মানবের প্রতি সহানুভূতি ও বেদনা সত্ত্বেও, অনেক সময়ে তাঁর রচনায়, আত্মনিগ্রহকে অনুচিত মূল্য দেওয়া হয়েছে, অনেক সময় নিষ্ঠুরতা ও অনাচার তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে। মানুষকে কখনও কখনও তিনি পশুর সমগোত্রীয় করে তুলেছেন।

স্টেইনবেকের জীবনী ও সাহিত্য বিষয়ে যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তাঁরা মনে করেন, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অসাফল্য ও মোহভঙ্গ-দ্বারা তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলি প্রভাবিত। পরবর্তী-কালে স্টেইনবেক এই ত্রুটি খানিকটা সামলে উঠেছিলেন। কিন্তু ভাবপ্রবণতা তাঁর কোনো কোনো লেখাকে ভারাক্রান্ত করেছে। কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও 'গ্রেপস অফ র‍্যাথ' স্টেইনবেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমেরিকার সাহিত্য ইতিহাসে এই গ্রন্থটির আরও মূল্য এই কারণে যে, প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত আমেরিকা বার বার যা চেষ্টা করেছে—

to make the American novel full, free expression of life—

'গ্রেপস অফ র‍্যাথ' সেই প্রচেষ্টার অনেকখানি [illegible] করেছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রকাশ রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী পাঠকবর্গের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

২২৬।৬২, ২৩০।৬২

কলকাতার ইতিহাস : প্রাচীনকালের কতিপয় চিত্র

টাউন কলিকাতার কড়চা—বিনয় ঘোষ। বিহার সাহিত্যভবন প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। ছয় টাকা।

বণিকী-সভ্যতার বন্দর এই কলকাতা, উনিশ শতকের বাঙালীর রেনেশাঁসী কেন্দ্র-বিন্দু, তার সমগ্র জীবনের রাজধানী। এই কলকাতা শহরকে কেন্দ্র ক'রে কম রোমাঞ্চ এবং রোমান্সের ঘূর্ণাবর্ত জাগেনি একদা। এই কল্লোলিনী তিলোত্তমার জন্ম-ইতিহাস এবং জীবনযাপনের দিনপঞ্জী নিয়ে তাই গবেষণার আর অন্ত নেই। কত উত্থানপতন, কত আনন্দবেদনা এর পথে, প্রাসাদের ইটকাঠ-পাথরে ছড়ানো।

যে কয়েকজন লেখক কলকাতার ইতি-হাসকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন, তার বিগত জীবন-যৌবনকে তাৎ-ক্ষণিকতার দীপাবলীতে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁদের অন্যতম। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর কলকাতা বিষয়ক কয়েকখানি গবেষণা গ্রন্থ বেরিয়েছে। তথ্যবহুলতা তাঁর লেখার একটি বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য গ্রন্থে কলকাতার সামগ্রিক পরিচয় নেই। লেখক তার কয়েকটি বিশিষ্ট দিক, কয়েকটি বিচিত্র অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ট্যাভার্ন ও কফি হাউস, সাহেব-নবাবদের টাউন, নতুন বাঙালী বড়লোক, পাল্কি ও ল্যান্ডোর যুগ, ক্রীতদাস ও কুলিমজুর, নতুন শহরে পুরা-তন ভৃত্য, ডুয়েল, সেদিনের ইংরেজ বিচারক, মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্য এই বিভিন্ন বিষয় বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিনয়বাবুর রচনা তথ্যবাহী হলেও আলোচ্য গ্রন্থে সরসতা বিরল নয়। গল্পের মত চিত্তাকর্ষক তাঁর বর্ণভঙ্গী এবং বর্ণনীয় বিষয়। কলকাতার এই কড়চাগ্রন্থটি আমাদের আনন্দ দিয়েছে। ২১৯।৬২

রবীন্দ্র নির্দেশিকা

রবীন্দ্র নির্দেশিকা—নির্মলেন্দু রায়-চৌধুরী। ক্যারিয়ন পাবলিকেশনস। ৭৬, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দশ টাকা।

রবীন্দ্র অভিধান (২য় খণ্ড)—সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১নং শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ছ' টাকা।

'রবীন্দ্র নির্দেশিকা' ও 'রবীন্দ্র অভিধান' রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসরের বিশেষ অবদান। রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাসম্ভারের পথ-নির্দেশক হিসাবে এই উভয় গ্রন্থের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বিশ্বভারতীকৃত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর বিষয়সমূহের অভিধান-ভিত্তিক নির্দেশিকাটি এক খণ্ডেই সম্পন্ন হইয়াছে। উপরন্তু রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড, ছায়াচিত্রে রবীন্দ্র সাহিত্য এবং নাটক—এই সকলের তালিকাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র অভিধানখানি রবীন্দ্র রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র হিসাবে রচিত। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডেও স্বরবর্ণ শেষ হয় নাই। তৃতীয় খণ্ডে স্বরবর্ণ শেষ হইবে। সময়োচিত এই দুইখানি গ্রন্থের

অনুবাদ গল্প

স্তেফান জেৎসাইগের গল্পসংগ্রহ (২য় খণ্ড) অনুবাদক : দীপক চৌধুরী। রূপা, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা

এই গল্পসংগ্রহটি সাম্প্রতিক বাংলা

সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। একটি ভাষা যেমন প্রচুর আগন্তুক বা বিদেশী শব্দ গ্রহণ ক'রে নিজের শব্দভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বহির্বিশ্বের ঐশ্বর্য আহরণ আপন দিগন্ত প্রসারের সহায়ক।

জেভায়াইগের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বই তাঁকে সমগ্র বিশ্বে স্মরণীয় করেছে। ভ্রমণবিলাসী এবং বহুঅভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই লেখক বাস্তব চেতনার সঙ্গে মানবতাবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষকেই তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মানুষ য়ুরোপের দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দ্বিধায় পীড়িত নায়ক। কি নাৎসী বন্দীশিবিরে, কি গণিকাগৃহে সেই নায়কের একই জিজ্ঞাসা, অসুন্দর জগতে সুন্দরের প্রত্যাশা তার চোখে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, ক্ষমতাদীপ্ত নিপুণ বর্ণনায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রচিত জেভায়াইগের গল্প একটি বিশেষ দেশের পটভূমিতে অংকুরিত হলেও তার আবেদন আন্তর্জাতিক। তাই বিশ শতকের য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে যিনি আত্মিক সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী, স্তেফান জেভায়াইগের সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে তাকে পরিচিত হতেই হবে।

স্তেফান জেভায়াইগের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় নতুন নয়। উপন্যাসের প্রচ্ছদে ইতিপূর্বে জেভায়াইগের অনেক গল্পই অনূদিত হয়েছে। তবে একই গ্রন্থে এবং সুলভ মূল্যে সমগ্র গল্পের সংকলন প্রয়োজন ছিল। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহ সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এই সংগ্রহে নির্বাচিত এবং অনূদিত পাঁচটি গল্পই জেভায়াইগের বহুখ্যাত গল্পগুলির অন্যতম। বিশেষত 'খেলার রাজা দাবা' এবং অপরিচিতার গল্প দুটি জেভায়াইগের অসামান্য রচনা। এছাড়া "পলাতক" (দি রানওয়ে), চন্দ্রালোকিত কানাগলি (মুনবিম) এবং লেপোরেল্লা এই সংগ্রহের অপর তিনটি আখ্যান। একটি ভাষার সাহিত্যকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভাষান্তরকারকে স্বভাবতই কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এক দেশের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি অন্যদেশের আচার-অনুষ্ঠানের সমধর্মী না হওয়ায় প্রয়োজনের খাতিরেই হয়তো সর্বত্র পরিবেশ বর্ণনা বা বাক-ধারা-প্রবচন ব্যবহারের যথাযথ অনুবাদ সম্ভব নয়। অনুবাদক দীপক চৌধুরী সে-বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী। যে দেশে য়ুরোপীয় ভাষায় য়ুরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় লাভ করার মতো পাঠকসংখ্যা অল্প নয়, সে দেশে সঙ্গত কারণেই অনুবাদকের দায়িত্ব অনেক। শ্রীযুক্ত চৌধুরী সে দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করেছেন। এ অনুবাদ-কর্ম সকল স্তরের পাঠকের কাছেই অভিনন্দিত হবে আশা করা যায়। ৪।১১।৬১

প্রবন্ধ-সাহিত্য

উপন্যাস-পাঠের ভূমিকা—শিশির চট্টোপাধ্যায়। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত; গ্রন্থপঞ্জী বাদ দিলে মোট এক শ আটাশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই নিবন্ধ গ্রন্থটির প্রথম পাঁচটি অধ্যায় ব্যয়িত হয়েছে উপন্যাস জিনিসটি কি এবং গতিপ্রকৃতি বোঝাতে। চুরানব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী, কোটেশন-কণ্টকিত বিশুদ্ধ আলোচনায় অবশ্য বিদেশী লেখকের রচনা ও তাঁদের মতবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। হেনরি জেমস্, জেমস্ জয়েস, ডরথী রিচার্ডসন ও ভার্জিনিয়া উলফ্ সে ক্ষেত্রে তাঁর উপজীব্য। এবং এই বিদেশী লেখকদের মধ্যে যিনি বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি জয়েস। এ'দের আলোকে তিনি বাঙালী লেখকদেরও মূল্য কষেছেন। সম্প্রতিকালে বাঙালী লেখক অবশ্য তাঁর মতে মুষ্টিমেয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্করকে বাদ দিলে আর মাত্র জনদশেক হাতে থাকেন, এই দশজনের এক একজন আবার চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মতি নন্দী।

সমগ্র আলোচনায় বেশ জটিলতা আছে; তবে সামগ্রিকতা নেই। আধুনিকতার আধুনিক ব্যাখ্যা তিনি করেছেন গলার জোরের সঙ্গে (এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে)। চলতি কালের অনেকগুলি স্মরণীয় উপন্যাসের এবং লেখকের নাম বাদ পড়েছে—এ ছাড়া এ গ্রন্থে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছু নেই। ছাপার ভুলেও কিছু বৈচিত্র্য আছে বলে মনে হল না। ৩৩৩।৬২

শারদ সাহিত্য

পূজারিণী—৪৫, মহারাজ ঠাকুর রোড, কলিঃ-৩১। পূজারিণী আসর থেকে প্রকাশিত। দাম প'চাত্তর নঃ পঃ।

ঢাকুরিয়ার পূজারিণী আসরের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনায় 'পূজারিণী' নামে ছোটদের একটি শারদীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতে 'সুনির্মল বসু, শৈল চক্রবর্তী', জ্যোতিভূষণ চাকী, শংকু মহারাজ, অতীন্দ্র মজুমদার, স্বপন বুড়ো প্রভৃতির লেখা ছাড়াও শিশুদের একটা নিজস্ব বিভাগ আছে। পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জাও বিশেষ সুরুচির পরিচায়ক। এ ধরনের ছোটদের পত্রিকা সত্যই প্রয়োজনীয়।

অঙ্গনা—সম্পাদিকা প্রতিভা রায়। ১২০বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ।

মহিলাদের সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এবং কেবলমাত্র মহিলা সাহিত্যিকদের রচনায় শোভিত হলেও পত্রিকাখানি সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনা একাঙ্কিকা ও ভ্রমণ-কাহিনীর রচয়িত্রীদের তালিকায় আছেন রমা চৌধুরী, মানসী দাসগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, পুষ্পদল ভট্টাচার্য, কেতকী কুশারী, প্রমুখ ছাব্বিশজন লেখিকা।

ছোট গল্প—সম্পাদক শ্রীলালমোহন দাস ও শ্রীসুভাষ বসু। ১১।৪ নয়ানচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·০০ টাকা।

তরুণ গল্পকারদের ত্রৈমাসিক পত্রিকার আলোচ্য বিশেষ সংখ্যাখানিতে নতুন লেখকদের মধ্যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ

রায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, লালমোহন দাস, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গল্প এবং শ্রীদিব্যেন্দু পালিতের "পাণ্ডুলিপি, ভাষা ও টিকা" এবং শ্রীমলয় রায় চৌধুরীর "আলেকজান্দ্রীয় যুগের বিহবল থেকে" সম্পর্কিত আলোচনা সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সমাবেশ—সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। ২৩।৩এ ক্রীক লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য ১·০০ টাকা।

সাহিত্যরুচি সম্পন্ন প্রকাশনগুলির মধ্যে আলোচ্য পত্রিকাখানি উল্লেখযোগ্য। এর প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও একাঙ্কিকা রচয়িতাদের মধ্যে অধিকাংশই নতুন। রচনাগুলির মধ্যে সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

মহেঞ্জোদারো—সম্পাদক শ্রীসমীর দত্ত। ৫৫।৪ নটবর পাল রোড, হাওড়া। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।

সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক ত্রৈমাসিক "মহেঞ্জোদারো"-র আলোচ্য শারদীয় সংখ্যা খানিতে তরুণ প্রকাশক গোষ্ঠীর পত্রিকা পাঠকদের সাহিত্য প্রীতি ও শিল্পরুচি গড়ে তোলার প্রশংসনীয় চেষ্টা লক্ষ করা যায়। বণিক রায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দু রক্ষিতের প্রবন্ধ, দেবেশ রায়ের গল্প, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নাটক ছাড়া কবিতা, গ্রন্থ সমালোচনা ও প্রাচীন ও নবীন শিল্পীদের কাজের প্রতিলিপি সংখ্যা খানিকে সুপাঠ্য ও সুদৃশ্য করে তুলেছে।

গণবার্তা—সম্পাদক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মূল্য ৩·০০ টাকা।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা মুখ্যত রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ, জাতীয় সংহতি সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, মুল্‌করাজ আনন্দ, হুমায়ুন কবির, জয়প্রকাশ নারায়ণ, হেম বড়ুয়া, পি রামমূর্তি, নির্মল বসু, মাখন পাল, প্রভৃতির আলোচনা সংকলন এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সুশীল রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রমুখ বাইশজন কবির মৌলিক কবিতা ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ কজন কবি কর্তৃক বিদেশী কবিদের রচনার অনুবাদই উক্ত সংখ্যাখানির মুখ্য আকর্ষণ। এ-ছাড়া আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাখানিতে একটি বিদেশী থেকে অনুবাদ-সহ মোট চারটি গল্প আছে।

রঙ্গজগৎ

দর্শকের রায়

দর্শকের রায় আমরা পেয়েছি। "যে ছবি ভালবাসি" শিরোনামায় "দর্শকের রায়" বিভাগে অনেক দর্শকই তাঁদের অভিমত জানিয়েছেন। এবং তাঁদের অভিমত গতানুগতিকতা-বর্জিত ছবির সপক্ষে। অর্থাৎ অবাস্তব ও হাল্কা আমুদে ছবি তাঁদের পছন্দ নয়। কেউ কেউ আবার গঠনমূলক সামাজিক আদর্শের ছবির প্রতি তাঁদের বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। কোন কোন দর্শক জানিয়েছেন, তাঁরা মানবতা ও ধর্মবোধ সংবলিত ছবিই বেশী ভালবাসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবির প্রয়োজনীয়তার কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ছবির বর্তমান সংকটমুহূর্তে দর্শকের রায়ের গুরুত্ব যে খুবই গভীর তা সকলেই স্বীকার করবেন। বাংলা ছবির দর্শকের যে রায় আমরা সংগ্রহ করেছি তা থেকে এই তথ্যই প্রতীয়মান যে, তাঁরা গতানুগতিকতার আস্বাদে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছেন। বাস্তবের স্পর্শরহিত এবং শিল্পশর্ত-নিরপেক্ষ ছবির প্রতি তাঁরা আর অনুরাগী নন।

আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতারা দর্শকের এই রায় থেকে কর্তব্যের নির্দেশ পেতে পারেন। এবং এই সত্যটিও আবিষ্কার করতে পারেন যে, দর্শকের রুচির পালাবদল ঘটেছে। আজকের দিনের দর্শক নতুনের পক্ষপাতী। নতুন চিন্তাধারা ও নতুন অনুশীলনের সমর্থক তাঁরা। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাঁদের আর সন্তুষ্ট রাখা যাবে না।

বাংলা ছবির দর্শকের এই নতুন মানসিকতাকে যদি আমাদের চিত্রনির্মাতারা শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন, তবে শিল্পের উৎকর্ষ সাধনই যে শুধু সম্ভব হবে তা নয়, চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট-নিবারণের পথটিও প্রশস্ত হবে। আমরা আশা করব, আমাদের চিত্রনির্মাতারা এই শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হবেন।

অসীম পাল পরিচালিত "দুই বাড়ি"র (চিত্রালয়) একটি দৃশ্যে তন্দ্রা বর্মন ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

সুরঞ্জন চিত্র'র "দেখা হল" (পরিচালনাঃ নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়) ছবির নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

আর্ট ও সংকট

অভিযান-এর ভূমিকা

চলচ্চিত্রশিল্পে ব্যবসায়িক সংকট যখন দেখা দেয়, তখন সেই সংগে আর একটি দুরূহ সমস্যা কলাকারদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। এই সমস্যা হল শিল্পকলার সমস্যা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকরা সাধারণত চান হাল্কা আমোদ ও স্থূল ভাবাবেগ। ছবিতে এই দুই উপকরণ পেলেই দর্শকরা সন্তুষ্ট। শিল্পীর মনে কিন্তু দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। শিল্পী বলতে এখানে কলাকার অর্থাৎ চিত্রপরিচালকের কথাই বলা হচ্ছে। কোন শিল্পনিষ্ঠ চিত্রপরিচালক হয়ত আপস মেনে চলতে রাজী নন। কিন্তু তাঁরও ব্যক্তিগত জীবিকার সমস্যা রয়েছে। সুতরাং মানসিক যন্ত্রণার সংগেই হয়ত তাঁকে চিত্রপ্রযোজক অথবা চিত্রপরিবেশকের দাবি মেনে চলতে হয়। অর্থাৎ এমন সব উপাদান নিয়ে তাঁকে ছবি তৈরি করতে হয় যা তাঁর শিল্পীমন বরাবর বর্জন করে চলতে চেয়েছে।

চিত্রপ্রযোজক অথবা পরিবেশকের যুক্তি হল চিত্রশিল্পের সংকটের কালে বেশীর ভাগ দর্শক যা চান তাই নিবেদন করতে হবে। বাংলা ছবি মোটেই চলছে না। সুতরাং যে ধরনের ছবি একবার বক্স-অফিসের দাক্ষিণ্য পেয়েছে সে ধরনের ছবিই তৈরি করতে হবে। এই হল তাঁদের যুক্তি।

চলচ্চিত্রশিল্পের ব্যবসায়িক সংকটকালে এই কারণেই আর্ট-এর শর্ত উপেক্ষিত থেকে

আপসহীন মহৎ চিত্র "অভিযান" বাংলা ছবির এই দুর্গতির কালে যেন এই সত্যটিই ঘোষণা করতে এসেছে, সংকটের ভয়ে আমরা যদি শিল্পের অর্থাৎ আর্ট-এর বিকৃতিকেই মুক্তিকবচ বলে আঁকড়ে ধরি, তবে ছায়াছবির অপমৃত্যুকে আমরা এড়াতে পারব না। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকটকালে "অভিযান"-এর ব্যবসায়িক সাফল্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। "অভিযান" এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। পথ দেখাবার ভূমিকা—যে পথে আর্টও বাঁচবে, ব্যবসায়িক স্বাচ্ছন্দ্যও দেখা দেবে। যাঁরা ভাবেন, সংকটের দিনে বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এবং দর্শকদের আনন্দ দিতে হলে স্থূলে আমোদের আশ্রয় না নিলে রক্ষা নেই, তাঁদের কাছে একটি "চ্যালেঞ্জ" হিসাবে এসে উপস্থিত হয়েছে "অভিযান"।

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড-এর "ভ্রান্তিবিলাস"-এর গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে ছবির পরিচালক মানু সেন, নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও প্রযোজক-নায়ক উত্তমকুমার ফটো—দেশ

যায় এবং আর্ট-এর নন্দনবনে মত্ত হস্তীর তাণ্ডব শুরু হয়। ছায়াছবি থেকে নন্দনতত্ত্ব, লাবণ্য এবং শিল্পের সূক্ষ্ম, সুচারু রস বিদায় নিতে আরম্ভ করে। জীবনবোধের জায়গায় অতিনাটকীয় স্থূল ভাবাবেগ ও নিরুচ্চার অনুভূতির পরিবর্তে শ্রুতিবিদারক সংলাপ ছায়াছবির মূল্য উপজীব্য হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রে মঞ্চনাটক অথবা অবিশ্বাস্য উপকরণ সংবলিত চড়া সুরের মেলোড্রামার আধিপত্য দেখা দেয়।

চলচ্চিত্রশিল্পের এই সংকট ব্যবসায়িক নয়। এটা আর্ট-এর সংকট। এই সংকট যদি দূর না হয় তবে চলচ্চিত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

কোন কোন চলচ্চিত্রানুরাগী এই মন্তব্য করে থাকেন যে, আজকালকার তথাকথিত "এক্সপেরিমেণ্টাল" ছবি বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে ব্যবসায়িক স্বাচ্ছন্দ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম। তাঁদের এই যুক্তি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। হালের কোন 'এক্সপেরিমেণ্টাল' ছবি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেনি এমন কথা বলা যায় না। সফল 'এক্সপেরিমেণ্টাল' ছবির সংখ্যা একটি নয়, একাধিক। তা ছাড়া এক্সপেরিমেণ্টাল ছবির জন্মলগ্নে চলচ্চিত্রশিল্প যদি এই নতুন শিল্পসমীক্ষা দ্বারা লাভবান না হয় তাতেই বা দুঃখের কী আছে। যে কোন বিষয়ের অনুশীলনে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে কিছুকালের জন্য প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত লাভের আশা ত্যাগ করেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। সিদ্ধি আসে পরে, সাধনার শেষে। এ নিয়ে ক্ষোভ করা অন্ধ বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয়।

আর্ট-এর শর্ত অবহেলিত হবে না, অথচ ছায়াছবির বাণিজ্যিক স্বার্থও রক্ষিত হবে—বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান বিপর্যয়ের দিনে এই বিস্ময়কর "এক্সপেরিমেণ্ট"-এর স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে এসেছে সত্যজিৎ রায়ের "অভিযান"। "অভিযান"-এর অসামান্য ব্যবসায়িক সাফল্য এ কথাই প্রমাণ করছে, বাংলা ছবির দর্শকরা হাল্কা, চটুল আমোদ-রসের খদ্দের নন। তাঁরা আমোদ চান ঠিকই। কিন্তু এই আমোদ যদি আর্ট-এর ভেতর দিয়ে আসে, মহৎ আর্ট ও সুস্থ আমোদ-উপকরণের যদি সমন্বয় ঘটে, তবেই তাঁদের বাসনা ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

✱ শুভমুক্তি ✱

দুটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে এ-সপ্তাহে। ছবি দুটির নাম : **হামারি ইয়াদ আয়েগী ও ম্যাডাম জোরো।**

তনুজা ও কিশোর "হামারি ইয়াদ আয়েগী"র দুই প্রধান শিল্পী। কিদার শর্মা এই রোমাণ্টিক ছবির প্রযোজক-পরিচালক।

নাদিরা, আজাদ, তিওয়ারী, শেখ ও ভগবান অভিনীত "ম্যাডাম জোরো" রোমাঞ্চ-পূর্ণ ছবির পরিচালক হলেন আক্কু।

✱ চিত্র-সমালোচনা ✱

কাগজে-কলমে

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের সর্বাধুনিক হিন্দীছবি "প্রেমপত্র"র (বিমল রায় প্রোডাকশন্স) প্রণয়োপাখ্যান বাঙালী দর্শকের কাছে নতুন নয়। এই কাহিনী নিয়ে কয়েক বছর আগে "সাগরিকা" নামে একটি বাংলা ছবি তৈরী হয়েছিল। এবং বেশ কিছুকাল পূর্বে তৈরী "লভ্‌লেটার" নামে একটি ইংরেজী ছবির কাহিনী "প্রেমপত্র" অথবা "সাগরিকা"র প্রেমোপাখ্যানের উৎস।

আলোচ্য প্রেমকাহিনী ইতিপূর্বে বিদগ্ধ দর্শককে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। "প্রেমপত্র" এ-কাজে সফল হবে তাও দুরাশা মাত্র। বিমল রায়ের মত কৃতী পরিচালক কেন এই পুরনো, বিবর্ণ প্রেমোপাখ্যান নিয়ে ছবি তৈরী করতে গেলেন এই প্রশ্নই আজ বিশেষ করে তাঁর গুণগ্রাহীদের মনে জাগবে।

'সিনেমার গল্প' বলতে আমরা এমন এক ধরনের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত যার মধ্যে জীবনবোধ ও বাস্তবের স্পর্শ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই ধরনের কাহিনীর নায়ক-নায়িকা যেন এই পৃথিবীর মানুষ নয়, গ্রহান্তরের মানুষ। কারণ তাদের মানসিকতা, জীবনবাসনা ও যন্ত্রণার সঙ্গে আমরা, এই গ্রহের বাসিন্দারা, মোটেই একাত্ম হয়ে উঠতে পারি না।

যে কাহিনী নিয়ে এত কথার অবতারণা তার নায়ক-নায়িকা প্রথম পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উভয়ের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ অপরিহার্য বলেই নায়িকা সাময়িকভাবে নায়ককে ভুল বোঝে। শেষ পর্যন্ত নিয়তি-নির্দিষ্ট মিলন ওদের ঘটে। কী করে তা সম্ভব হয় তা-নিয়েই মূল প্রণয়-কাহিনীর বিস্তার।

মদনদেবতার অদৃশ্য বিধান সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। একটি মিথ্যা প্রেমপত্র কেন্দ্র করে (যা নায়ক লেখেনি নায়িকাকে) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। আবার বহু প্রেমপত্রের বিনিময়ের ভেতর দিয়ে ওদের মধ্যে প্রেম গড়ে ওঠে। বিলেতপ্রবাসী নায়ক জানত প্রেমপত্র লিখছে তার ভাবী স্ত্রী। সে'ও লিখে জানাত তার প্রেম। নায়ক জানত না তার ভাবী বধূর নামে এত চিঠি লিখে চলেছে তার অনুতপ্তা পূর্বপ্রণয়িনী। পত্রে পত্রে যে প্রেম গড়ে ওঠে তার সুখপরিণতির মধ্যেই প্রেমকাহিনীর পরিসমাপ্তি।

প্রণয়োপাখ্যানটি যত কণ্টকল্পিতই হোক না কেন, চিত্রপরিচালনার গুণে ছবিটি সুখ-

পূর্ণ পিকচার্স-এর "ফার্স্ট প্রাইজ" ছবিতে (পরিচালনা : পরেশ বসু) তপতী ঘোষ ও অনুপকুমার

ভোগ্য হতে পারত। দুঃখের বিষয়, হয়নি। বিমল রায়ের প্রয়োগ-কর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যই ছবিটিতে বিদ্যমান। কোন কোন দৃশ্যে প্রবীণ পরিচালক সত্যিই রসবোধ ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অবান্তর ঘটনা ও বাহুল্যভারে জর্জরিত

বীর জওয়ানদের সেবায়

শিবাজী গণেশন দিল্লিতে তাঁর "রাখী" ছবির একটি শো-র সমস্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভারতীয় জওয়ানদের সেবায় দান করেছেন।

সিনেমেটোগ্রাফ এক্সজিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার আবেদনে বোম্বাই অঞ্চলের সমস্ত চিত্রগৃহের মালিকরা ৪ঠা নভেম্বরের সকল শো-র বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে তাঁদের প্রাপ্য অংশ বীর জওয়ানদের সেবায় দান করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

এবং মন্থরগতি এই ছবি সর্বাঙ্গীনভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

শশীকাপুর ও সাধনা শিবদাসানি ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ওঁদের অভিনয় চিত্রনাট্যের দাবি আশানুযায়ী মিটিয়েছে। এবং সুন্দরী অভিনেত্রী সাধনা ছবিতে কোন কোন মুহূর্তে প্রাণসঞ্চার করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সীমা, চাঁদ ওসমানী, পদ্মা দেবী (কলকাতা), সুধীর ও রাজেন্দ্রনাথ।

সলিল চৌধুরীর সংগীত-পরিচালনা এই ছবির এক বিশেষ সম্পদ। আবহ-সুর-রচনায় শ্রীচৌধুরী সুন্দর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর সুরারোপিত গানগুলিও সুখশ্রাব্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক।

উজলা প্রোডাকশন্স-এর "দুই নারী" (পরিচালনা : জীবন গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিতে বিকাশ রায় ফটো—দেশ

কল্পনা মুভীজ-এর "শেষ অঙ্ক" (পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য) ছবির ডাবিং-এর জন্য সংলাপ বলছেন দীপক মুখোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর ফটো—দেশ

ছবির পর ছবি

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রবীণ চিত্রপরিচালক মধু বসু অনেকদিন পর যে ছবিখানি উপহার দিচ্ছেন তার নাম "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ"। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। সেবকচিত্র প্রতিষ্ঠান এই ছবির প্রযোজক। "ভগিনী নিবেদিতা" খ্যাত অমরেশ দাশ ছবির নামভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে জানা গেল। সুর-রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে অনিল বাগচীর ওপর।

ঢেউয়ের পরে ঢেউ

রেনেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" ছবিটি এবারকার সানফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হচ্ছে। কলকাতায় অনতিবিলম্বেই ছবিটি মুক্তিলাভ করছে। টেনিসনের একটি কবিতার ভিত্তিতে ছবির কাহিনী রচিত। ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহঠাকুরতা যুগ্মভাবে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। শম্পা, শঙ্কর ও বাদল ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রবিশঙ্কর ছবির সংগীত পরিচালক।

রক্তপলাশ

এম কে জি প্রোডাকশন্স-এর ক্রাইম ছবি "রক্তপলাশ"-এর মুক্তি আসন্ন। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির রহস্যপূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছে নয় বছরের এক কিশোরকে কেন্দ্র করে—যে একটি খুনের একমাত্র সাক্ষী। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, নিরঞ্জন রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, ছায়া দেবী, বীরেশ্বর সেন, বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, জহর রায় এবং কিশোর শিল্পী বাসুদেব এই ছবির মুখ্য শিল্পী। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

দাদাঠাকুর

জালান প্রোডাকশন্স-এর "দাদাঠাকুর" অবিলম্বেই মুক্তিলাভ করবে। এই ছবি যাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে তৈরী তাঁর নাম শ্রীশরৎ পণ্ডিত। তিনি আজও জীবিত। সমাজসেবী, সাংবাদিক এবং রসিকপ্রবর শ্রীশরৎ পণ্ডিতের নাম জানেন না এমন বাঙালী খুব কমই আছেন। "দাদাঠাকুর"

ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সুধীর মুখোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পীরা হলেন : বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণকুমার। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

মহাতীর্থ কালীঘাট

আনন্দময়ী চিত্রপীঠ-এর প্রথম নিবেদন "মহাতীর্থ কালীঘাট"-এর চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন "বধূ"-খ্যাত ভূপেন রায়। রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, রেণুকা রায়, কৃষ্ণা ঘোষ, শঙ্করনারায়ণ, শ্যামল ঘোষ ও শম্পা চক্রবর্তী ছবির প্রধান শিল্পী।

সুখে স্বপ্নে বাসী গীত

কলকাতার স্টুডিওতে সম্প্রতি একটি হিন্দী ছবি তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। ছবিটির নাম "সুখে স্বপ্নে বাসী গীত"। প্রযোজনা করছেন কিরণ ফিল্মস। গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে ছবির গান রেকর্ড করা হল। বলরাজ সাহনি, বিপিন গুপ্ত, জীবনকলা, মির্জা মুশারফ, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও আরতি দাস ছবির প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এই মাসেই ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। অরুণ চৌধুরী ছবিটির পরিচালক। পবিত্র দে ছবির সুরকার।

অসিত চৌধুরী সংবর্ধিত

গত শুক্রবার চন্দননগরের লখরাজ ভবনে সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত, বিশিষ্ট চলচ্চিত্রসেবী

অসিত চৌধুরী ফটো—দেশ

আনন্দময়ী চিত্রপীঠ-এর "মহাতীর্থ কালীঘাট"-এর একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালক ভূপেন রায় ফটো—দেশ

শ্রীঅসিত চৌধুরীকে ওই স্থানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং এস পি প্রোডাকশন্স-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার ও শ্রী এস বি রায়।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীচৌধুরী চন্দননগর-বাসীদের বলেন, বাংলা ছবিকে ভালবাসেন বলেই আপনারা আমাকে আজ এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। আমি বিশ্বাস করি, বাংলা ছবির প্রতি আপনাদের অনুরাগ যদি অটুট থাকে তবে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের মৃত্যু নেই। ভাষণদানকালে শ্রীচৌধুরী বাংলা চলচ্চিত্রের বহির্বাণিজ্য বিস্তারের সম্ভাবনাটি ব্যক্ত করেন এবং বিদেশে সত্যজিৎ রায়ের ছবির জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সাংবাদিক শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ ও শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় এবং চলচ্চিত্রসেবী শ্রীহরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মনোজ্ঞ ভাষণে শ্রীঅসিত চৌধুরীর সমাজসেবা ও বহুমুখী কর্মপ্রতিভার কথা উল্লেখ করেন।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গত মঙ্গলবার শ্রীঅসিত চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সাংবাদিকগণের নিকট শ্রীচৌধুরী তাঁর বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীচৌধুরীকে সংবর্ধনা ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রী বি ঝা। সংস্থার জনৈক সভ্য শ্রীরমেন চৌধুরী একটি সময়োচিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

লণ্ডনে "দেবী"

লণ্ডনের বিশিষ্ট চিত্রপরিবেশক-সংস্থা "কনটেম্পোরারি ফিল্মস" সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" ছবিটির পরিবেশনস্বত্ব ক্রয় করেছেন। "দেবী" লণ্ডনে আগামী বছরের প্রথমে মুক্তিলাভ করবে। এই চিত্র-পরিবেশক-সংস্থা সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" ও "অপুর সংসার" ইতিপূর্বে বৃটেনের জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করেছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের "টু ডটার্স" ("পোস্টমাস্টার" ও "সমাপ্তি") ছবির পরিবেশন-স্বত্বও এই সংস্থা ক্রয় করেন।

গত সপ্তাহে লণ্ডন চলচ্চিত্র-উৎসবে "দেবী" প্রদর্শিত হয়। এবারকার লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে মোট ৩০টি কাহিনীচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

গীতশ্রী ঘোষ দস্তিদার

* সাংস্কৃতিকী *

গত বিজয়া দশমীর দিন দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন **সাধক-শিল্পী দিলীপকুমার রায় ও ইন্দিরা দেবী।** প্রথমে তাঁরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপর রচিত গান দ্বৈতকণ্ঠে পরিবেশন করেন। পরে শ্রীরায় শ্যামাসংগীত গেয়ে শোনান।

১০ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ভবনে দিলীপকুমার রায় ও ইন্দিরা দেবী রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন সকাশে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন। প্রথমে তাঁরা দ্বৈতকণ্ঠে জয়দেব রচিত "প্রলয় পয়োধি জলে" ও মীরার ভজন গেয়ে শোনান। শেষে শ্রীরায় ইন্দিরা দেবী রচিত একটি ভজন গান করেন।

কুমারী গীতশ্রী ঘোষ দস্তিদার এ-বছর হিমাংশু সংগীত প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্র-সংগীত, আধুনিক ও রাগপ্রধান-এ প্রথম স্থান এবং ভজন ও খেয়াল-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এবং সর্বশ্রেষ্ঠা প্রতিযোগীর সম্মান লাভ করেছেন। গিরিজাশঙ্কর সংগীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, ভজন, রাগপ্রধান, আধুনিক ও শ্যামাসংগীতে প্রথম স্থান এবং রবীন্দ্রসংগীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। তানসেন সংগীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, রাগপ্রধান ও ভজনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। বেতার অনুষ্ঠানে ইনি মালা ঘোষ দস্তিদার নামে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

"সেতু"র অভূতপূর্ব সাফল্য

বিশ্বরূপায় "সেতু" একাদিক্রমে তিন বৎসর অভিনীত হয়েছে এবং গত ৮ই অক্টোবর চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে। নাটকটি মোট ৭০০তম অভিনয়-রজনী অতিক্রম করেছে। ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যায় "সেতু"র এই অভাবনীয় সাফল্যের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ার (পুনা) যে কলাকুশলী-ছাত্র আলোকচিত্র বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করবেন তাঁকে একটি "স্বর্ণপদক" পুরস্কার দেওয়া হবে। পরলোকগত বিশিষ্ট আলোকচিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্র-কলাকার মনু দাশগুপ্তের স্মৃতি রক্ষার্থে এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর অগ্রজ শ্রীকালীসাধন দাশগুপ্ত। ১৯৬৩ সালেই এই পুরস্কার প্রথম দেওয়া হবে।

এস মুখার্জি ফিল্ম সিণ্ডিকেট-এর প্রথম চিত্রপ্রয়াস "লীডার"এর একটি দৃশ্যে বৈজয়ন্তীমালা ও দিলীপকুমার

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গত সপ্তাহে ম্যাজেস্টিক সিনেমায় লেস্টার জেমস পেরিজ পরিচালিত "রেকাবা" সিংহলী চিত্রের প্রদর্শনের আয়োজন করেন।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে গত সপ্তাহে জনতা সিনেমায় পল ভেরহোভেন পরিচালিত "দি কোল্ড হার্ট" (পূর্ব জার্মেনী) এবং হরিসাধন দাশগুপ্তের "কোনারক" প্রদর্শিত হয়।

চেকোশ্লোভাক দূতাবাসে **ফিল্ম গ্রুপ** "টেরেজা" (চেকোশ্লোভাকিয়া) ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ হুমায়ুন কবীর **বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের** "অনারারী" সভ্যপদ গ্রহণে সম্মত হয়েছেন।

বোম্বাই সমাচার

প্রযোজক-পরিচালক অমরজিৎ যে নতুন ছবিটি নিবেদন করছেন তার নাম "তিন দেবিয়াঁ"। এই ছবির নায়িকা তিনজন। একজন নায়ক। নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন দেবানন্দ।

জ্যোতি স্বরূপের পরিচালনায় "বিন বাদল বরসাত" ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ ছবির নায়ক-নায়িকা। হেমন্তকুমার ছবির সংগীত পরিচালক।

দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী গীতাঞ্জলি বোম্বাই-এর একটি ছবিতে অভিনয় করছেন।

ছবিটির নাম পরশমণি। বাবুভাই দেশাই ছবিটির পরিচালক। মহীপাল ছবির নায়ক।

মুকুল পিকচার্স-এর রাজা ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। রাধাকান্ত ছবিটি পরিচালনা করছেন। বিজয়া চৌধুরী ও জগদীপ ছবির প্রধান ভূমিকার শিল্পী।

বিশ্বজিৎ ও নাজির হোসেনকে নিয়ে চিত্রপরিচালক অমরকুমার "মেরে সনম" ছবিটির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য সম্প্রতি গ্রহণ করেন। ছবিটি টেকনিকালারে তোলা হচ্ছে। ও পি নায়ার এই ছবির সংগীত-পরিচালক।

* পাঠকের চোখে *

বাংলা ছায়াছবির সংকট

মহাশয়,

বেশ কিছুদিন যাবৎ 'দেশ' পত্রিকায় 'বাংলা ছায়াছবির সংকট' নিয়ে যেসব আলোচনা হচ্ছে তা নিয়মিত পড়ছি। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নানা-জনের নানা মন্তব্য পড়ে শেষ পর্যন্ত আমি একটি সহজ এবং আমার মতে শ্রেষ্ঠতর উপায় খুঁজে পেয়েছি যার দ্বারা বাংলার ছায়াছবি সংকট থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আমার মতে কথাটা "বাংলা ছায়াছবির সংকট" না হয়ে "বাংলার ছায়াছবির সংকট" হওয়া উচিত। বাংলা ছায়াছবির সংকট কোথায়? সর্বত্রই বাংলা ছবি সুধীজন-সমাদৃত। যেসমস্ত দর্শক হাল্কা ধরনের হিন্দী ছবি ভালবাসেন তারা কখনই সুচিন্তিত বাংলা ছবি দেখে আনন্দ পাবেন না। সুতরাং বাংলা ছবিকে তার স্বাভাবিক গতিতেই এগিয়ে নিয়ে যদি সাথে সাথে বাংলার স্টুডিওতেই হিন্দী ছবি তৈরি করা হয় তবেই বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট মোচন হবে। হিন্দী ছবির অভিনেতা বাংলা দেশেই অনেক আছেন।

"দেশ"-এ প্রকাশিত দুর্গাপুর থেকে শ্রীপরিতোষ গুপ্তের লেখা চিঠির একটি অংশ উল্লেখ করে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি। তিনি লিখেছেন—"নাচ, গান, বাজনা, মারামারি—সব পাবেন হিন্দী ছবিতে। অনেক তথাকথিত ভদ্র বাঙালীর মুখে শুনেছি, 'আরে দূর, বাংলা ছবি। বাংলা ছবিতে কি লাইফ আছে, মশায়? দেখুন হিন্দী বই, তিন ঘণ্টা 'এনজয়' করবেন—পয়সা উসুল হবে।'

প্রথমত মনে রাখতে হবে, বাঙালীর জন্ম ছায়া-শীতল, চির-শ্যামল বাংলা মায়ের কোলে। তাই বাঙালী মাত্রেই শান্ত, সংযত

ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহঠাকুরতা পরিচালিত রেনেসাঁস ফিল্মস-এর "স্লেট
এর পরে সেটা" ছবির একটি [illegible]

বাংলা ছবি দেখুন

CURRENT

ADVANCE

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'সুবর্ণরেখা' ছবির একটি মনোরম দৃশ্য

ভালবাসে না। তাই হিন্দী ছবির উপাদান দিয়ে যদি বাংলা ছবি প্রস্তুত হয়, তবে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন দর্শকরা কোথায় যাবেন?

আমার মতে, বাংলা ছবিকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় আরো ভাল বাংলা ছবি প্রস্তুত করা। এ বিষয়ে সত্যজিৎবাবু আদর্শস্থানীয়। শুনেছি, তাঁর নির্মিত 'অভিযান' একালের শ্রেষ্ঠ ছবি। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, সত্যজিৎবাবুর প্রতিটি সৃষ্টি পূর্বেরটির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু অন্যান্য পরিচালকগণ দুই একটা ভাল ছবি করলেও পরের ছবিটাই খারাপ করে ফেলেন। সুতরাং বাংলা ছবিকে সার্থক করে তোলার এবং তার মর্যাদা বাড়াবার দায়িত্ব পরিচালক এবং প্রযোজকের হাতে। দর্শকের হাতে নয়।

যেসমস্ত বাঙালী (পরিতোষবাবুর ভাষায়) হিন্দী ছবি দেখে আনন্দ পান তাঁরা কখনই বাংলা ছবির মার্জিত রূপ দেখে তৃপ্তি পাবেন না। মাত্র তিন ঘণ্টা উপভোগ করার জন্য বাংলা ছবি নয়। অনেক সমস্যার সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় বাংলা ছবিতে যা অনেক হিন্দী ছবিতে দুর্লভ। বাংলা ছবিতে যেদিন হাল্কা হিন্দী ছবির উপাদান আসবে সেদিন বাংলা 'চলচ্চিত্র' শিল্পের স্টুডিও নিমতলায় স্থাপন করতে হবে।

বাংলা ছবিগুলি যদি ভারতের প্রধান শহরগুলিতে কলকাতার সাথে একযোগে দেখানো যায়, তবে খুবই ভাল ফল পাওয়া যাবে। দুঃখের বিষয়, অনেক ভাল ভাল ছবিই এখন পর্যন্ত আসামের প্রধান শহর গৌহাটিতে প্রদর্শিত হয় নি। অথচ এখানে বাংলা ছবির দর্শক বাঙালীর চেয়েও বেশী। এখানে বর্তমানে চারটি প্রেক্ষাগৃহ এবং অচিরেই নূতন একটি সম্পূর্ণ হবে। এখানে যদি নিয়মিতভাবে বাংলা ছবিগুলিকে কলকাতার সাথে একযোগে দেখানো যায়, তবে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে।

সবশেষে আবার অনুরোধ জানাচ্ছি, বাংলা ছবিতে যেন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই বিকাশ লাভ করে।

আমার মতে, 'বাংলা' চলচ্চিত্রের সংকট নেই, আছে 'বাংলার' চলচ্চিত্রের সংকট এবং সেই সংকট মোচনের চেষ্টা করাই ভাল।

ইতি
কাজল দেব
গৌহাটি

টেলিভিশন-চিত্রে সত্যজিৎ

মহাশয়,

গত ২০শে অক্টোবর, ১৯৬২ সংখ্যায় 'দেশ'-এর 'রঙ্গজগৎ'-এ প্রকাশিত শ্রীঅসিত চৌধুরীর সংগে সাক্ষাৎকারে বিবরণ পড়লাম।

একটি বিশেষ সুখবর, পশ্চিম জার্মেনীর বেটা ফিল্মস বিশ্বের ছয়জন শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকের সাক্ষাৎকার ও তাঁদের দৈনন্দিন বিশেষ কর্মধারা (স্টুডিওয় ও গৃহে) টেলিভিশন-চিত্রে রূপায়িত করবেন। বেটা ফিল্মস কর্তৃপক্ষকে তাঁদের এই অভিনব প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়, আমাদের সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার ও কর্মধারা সেখানে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রবৎ।

কিন্তু আনন্দের অপর পৃষ্ঠে যে অপরিসীম পরিতাপ তা হল, আমরা অর্থাৎ টেলিভিশনবিহীন দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক সমাজ বেটা ফিল্মস কর্তৃপক্ষের এই নব সৃষ্টির রসগ্রহণে বঞ্চিত হব।

'দেশ' পত্রিকা মারফৎ বেটা ফিল্মস কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, টেলিভিশন-চিত্র ছাড়াও ছায়াচিত্রে বিষয়টি যাতে চিত্রায়িত করা যায়, সে বিষয়ে তাঁরা যেন সহানুভূতির সংগে চিন্তা করেন।

ইতি
সনৎ মুখোপাধ্যায়
পুরুলিয়া

খেলার মাঠে

একলব্য

নেফা ও লাদকে চীন সৈন্যের আক্রমণে দেশে আজ সংকটজনক অবস্থা। চীন ভারতভূমির খানিকটা অংশ ইতিমধ্যেই গ্রাস করে বসে আছে। ভারতের জওয়ানরা মরণপণ করে তাদের বাধা দিচ্ছে। স্বাধীন ভারতে এমন সংকট, এমন দুর্দিন আর কোনদিন আসেনি। তাই এই অবস্থার মধ্যে খেলাধুলোর খবর নিতান্তই গৌণ।

দেশের সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ডুরাণ্ড ফুটবল কমিটি ডুরাণ্ড কাপ এবং সুব্রত কাপের খেলাও বন্ধ রাখবার সিদ্ধান্ত করেছেন। খুবই সময়োপযোগী কাজ হয়েছে, সন্দেহ নেই। সীমান্তে যখন শত্রুর রণদামামা আর যুদ্ধের তাণ্ডবনৃত্য তখন সামরিক বিভাগের লোকজনের খেলা নিয়ে মেতে থাকা সম্ভব নয়। ডুরাণ্ড এবং সুব্রত কাপের খেলা সামরিক বিভাগের উদ্যোগেই পরিচালিত হয়। কমনওয়েলথ গেমে অংশ গ্রহণ করতে হলেও প্রধানত সামরিক বিভাগের অ্যাথলীটদের নিয়েই দল গড়তে হবে। সামরিক প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, এই সংকটজনক মুহূর্তে খেলাধুলোর প্রয়োজনে ভারতভূমি ত্যাগ করে একটি বিরাট দলকে বিদেশে পাঠাবার অর্থ অবস্থার গুরুত্বকে অস্বীকার করা।

তবু দেহমনের আনন্দ লাভের উপকরণ হিসাবে এই সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও খেলাধুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই দেশের মধ্যে খেলাধুলো যথারীতি চলতে থাকবে। আমাদেরও তার খবর পরিবেশন করতে হবে।

দেশরক্ষার প্রয়োজনে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং-এর অর্থসাহায্যের আবেদনকেও সাধুবাদ জানাই। খেলাধুলোর সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে রাজা ভালিন্দার দেশরক্ষার জন্য অর্থসাহায্যের এক আবেদন করেছেন। ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা থেকে সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশও তিনি দেশরক্ষার কাজে প্রেরণ করতে অনুরোধ করেছেন। ভালিন্দার সিং-এর আবেদনে সাড়া পাওয়া গেছে। উড়িষ্যা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যেই জাতীয় দেশরক্ষা ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দান করেছেন। অন্যান্য ক্রীড়াসংস্থাও দেশের ডাকে সাড়া দেবেন, সন্দেহ নেই। আমরা খবর পেয়েছি, পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া-পরিচালকরাও কিভাবে এই প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করছেন।

* * *

অবশ্য খেলাধুলোর জন্য না হলেও ভারতের কোন প্রতিনিধিকে পার্থে যেতে হচ্ছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশ ভারতের কমনওয়েলথ গেমসে অংশ গ্রহণের একটা নৈতিক মূল্য আছে। দ্বিতীয় কারণ, ১৯৬৬ সালে এই ভারতের মাটিতেই কমনওয়েলথ গেমের আয়োজন করার জন্য ভারত বিশেষ আগ্রহী। পার্থের সভাতেই ঠিক হবে ১৯৬৬ সালের কমনওয়েলথ গেমের স্থান-কাল।

ভারতে কমনওয়েলথ গেমের আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সমর্থন পাওয়া গেছে। ভারত সরকার ত্রিশ লাখ টাকা সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবশ্য কমনওয়েলথ গেমসের জন্য প্রায় এক কোটি টাকার প্রয়োজন। বাকী টাকা ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে সংগ্রহ করতে হবে।

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং বলেছেন, এই টাকা তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন। আর ভারত কমনওয়েলথ গেমে অংশ গ্রহণ না করলেও ১৯৬৬ সালে ভারতের মাটিতে খেলাধুলোর এই বিরাট অনুষ্ঠানের

ডান দিকে—দিল্লির ন্যাশন্যাল স্টেডিয়ামে প্রথম ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় জার্মানীর খ্যাতনামা অ্যাথলীট হেলমুট জানজ ৪০০ মিটার হার্ডলস রেসে প্রথম স্থান অধিকার করছেন

বাঁ দিকে—ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিকসের ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থানাধিকারী জার্মানীর হেবাউফকে ডান দিকে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় স্থানে জার্মানীর ম্যাম্পার ও তৃতীয় স্থানে স্থানে রয়েছেন ভারতের পাওয়েল

আয়োজনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে না। অর্থাৎ ভালিন্দার সিং-এর আশা আছে, কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশন ১৯৬৬ সালের স্থান সম্পর্কে ভারতের অনুকূলেই রায় দেবেন।

• • •

বোম্বের এ সি সি অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী দল ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীচিদম্বরামের একাদশকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করে মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপ লাভ করেছে।

মৈনুদ্দৌলা গোল্ড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এক স্মরণীয় নাম। কিন্তু ভারতে রণজি প্রতিযোগিতার প্রবর্তনের পর হায়দরাবাদের এই বিশিষ্ট প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। ক্রিকেট-রসিকদের মন থেকেও মৈনুদ্দৌলার স্মৃতি বিলীন হতে থাকে। বহু বৎসর পরে আবার মৈনুদ্দৌলার খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতিই হবে বলে মনে করি।

রণজি প্রতিযোগিতার প্রবর্তনের আগে দিল্লীর রোসেনারা ক্লাব পরিচালিত অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, হায়দরাবাদের মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপের খেলা আর বোম্বের কোয়াড্রাঙ্গুলার এই তিনটেই ছিল ভারতের প্রধান তিনটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই তিনটি প্রতিযোগিতা থেকে বহু খেলোয়াড় বেরিয়েছে যারা পরবর্তী কালের ক্রিকেটে সুপ্রতিষ্ঠিত। দিল্লির অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং হায়দরাবাদের মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপের খেলা ভারতীয় ক্রিকেটের যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে নতুনভাবে আয়োজিত প্রথমবারের মৈনুদ্দৌল্লা গোল্ড কাপের খেলা মাত্র পাঁচটি দল নিয়ে পরিচালিত হলেও এই পাঁচটি দলে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ভারতের কৃতী খেলোয়াড়, যাকে বলে 'ক্রিম অব ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট'। এর সঙ্গে ভারতে আগত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুজন ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রিস্ট ও লেস্টার কিং এবং

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার লেস্টার কিং

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিভাবান খেলোয়াড় লালা অমরনাথ অংশ গ্রহণ করায় খেলার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়।

প্রথম খেলায় হায়দরাবাদ দল ভিজিয়ানাগ্রাম (বিজয়নগর) দলকে ৫২ রানে পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় বোর্ড সভাপতি শ্রীচিদম্বরামের একাদশ প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলকে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে। বোম্বের অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানীও ফাইন্যালে ওঠে হায়দরাবাদ দলকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পরাজিত করে। এ সি সি এবং বোর্ড সভাপতির দলের ৪ দিনব্যাপী ফাইন্যাল খেলাও দুই ইনিংসের ফলাফলে মীমাংসিত হয়নি, সে কথা আগেই বলেছি।

এই প্রতিযোগিতার খেলায় বিজয়নগর দলের পক্ষে হারদিকারের নট আউট থেকে ৯৭ রান, আই এ এফ দলের বিরুদ্ধে বিজয় মঞ্জরেকারের ১৮৪ রান, এ সি সি ও হায়দরাবাদের সেমি-ফাইন্যালে দিলিপ সারদেশাইয়ের ৮১ ও জয়সীমার ৯৯, ফাইন্যালে নাদকার্নীর ৯৮ ও ৭৭, আব্বাস আলী বেগের ৬৯ ও ৯০ এবং পলি উমরিগরের ১০৪ রান উন্নত ব্যাটিং-এর উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

বোলিং-এর দিক দিয়েও নাদকার্নী এবং উমরিগর সাফল্য অর্জন করেছেন। সেমি-ফাইন্যালে উমরিগর ৫৯ রানে হায়দরাবাদ দলের ৬টি উইকেট দখল করেন। ফাইন্যালে নাদকার্নী ৮৮ রানে দখল করেন চিদম্বরামের দলের ৬টি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার লেস্টার কিং-এর বোলিং সাফল্যের কথাও উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখ করবার মত বোলিং-এ বুড়ো হাতের ভেল্কি দেখানোর কথা। লালা অমরনাথ মাত্র ২৭ রানে আই এ এফ দলের ৭টি উইকেট নিয়ে বোর্ড সভাপতির দলকে অতি সহজে ফাইন্যালে তুলে দেন। নিচে ফাইন্যালের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হলঃ—

এ সি সি—প্রথম ইনিংস—২৭৩ (আর জি নাদকার্নী ৯৮, পলি উমরিগর ৬০, এ এল ওয়াদেকার ৫৫; লেস্টার কিং ৫৪ রানে ৪ উইকেট)।

চিদম্বরামের একাদশ—প্রথম ইনিংস—২৪৮ (আব্বাস আলী বেগ ৬৯, শের মহম্মদ ৪৬, মঞ্জরেকার ৪৩; আর জি নাদকার্নী ৮৮ রানে ৬ উইকেট, পলি উমরিগর ৯৭ রানে ৩ উইকেট)।

এ সি সি—দ্বিতীয় ইনিংস—২৪৭ (পলি উমরিগর ১০৪, আর জি নাদকার্নী ৭৭; লেস্টার কিং ৬১ রানে ৩ উইকেট, রয় গিলক্রিস্ট ২৯ রানে ২ উইকেট, ভি ভি কুমার ৮০ রানে ৩ উইকেটে, বিজয় মঞ্জরেকার ২৬ রানে ২ উইকেট)।

চিদম্বরামের একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—(৮ উইঃ) ২২৬ (শের মহম্মদ ৪৮, আব্বাস আলী বেগ ৪০, লেস্টার কিং ৩৫, মঞ্জরেকার ৩৩; আর বি দেশাই ৩৭ রানে ২ উইকেট, এম কে মন্ত্রী ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

(এ সি সি দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী)

• • •

ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ফাস্ট বোলিং করার পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্য এবং ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পটু করে তোলবার উদ্দেশে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে তিনজন ফাস্ট বোলার ইতিমধ্যে ভারতে এসে পৌঁছেছেন তার মধ্যে জামাইকার ২৩ বছর বয়স্ক ফাস্ট

বোলার লেস্টার কিং কলকাতায় এসে তাঁর শিক্ষাসূচী আরম্ভ করে দিয়েছেন।

লেস্টার কিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ বোলার। এই বছরই কিংস্টনে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ টেস্ট খেলায় তিনি মাত্র ২০ রানে ৫টি উইকেট দখল করে বোলিং-এ দক্ষতার পরিচয় দেন। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে আগেও কিং-এর নাম ছিল। টেস্ট খেলায় সাফল্যের পর নাম ছড়িয়ে পড়ে। আগামী বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে দল ইংলণ্ড সফর করবে সেই দলেও কিং নির্বাচিত হয়েছেন।

তরুণ বোলার কিং-এর হাবভাব এবং স্বভাবে তারুণ্যের পূর্ণ ছাপ। কোন কিছুতেই ক্লান্তির চিহ্ন নেই। এক দল শিক্ষার্থী নিয়ে তিনি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে দুই দফায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ছেলেদের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। কিংএর মতে, ফাস্ট বোলারের পক্ষে পায়ের জোরের চেয়ে মেরুদণ্ডের জোরের বেশী প্রয়োজন। যার মেরুদণ্ড একটু দুর্বল তার পক্ষে ফাস্ট বোলার হওয়া শক্ত। কঠিন পরিশ্রম করার শক্তিও ফাস্ট বোলারের অন্যতম গুণ।

উইকেট সম্পর্কে কিং-এর অভিমত, 'নিষ্প্রাণ' উইকেট থেকে ভাল বোলার বের করা এক রকম অসম্ভব। অবশ্য ভাল এবং মন্দ দুই রকমের উইকেটেই অনুশীলন প্রয়োজন কিন্তু উইকেট যদি 'ডেড' অর্থাৎ নিষ্প্রাণ হয়, তবে সে উইকেট থেকে বোলার কোন সাহায্য পায় না।

আজ কিং এই কথা বলছেন বলে কথাটির উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি কিন্তু 'ডেড' উইকেট যে বোলারের মৃত্যুফাঁদ এ কথা সর্বজনবিদিত। টেস্ট খেলাকে পাঁচ দিন টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুদিন থেকে পরিকল্পনামত ভারতের উইকেট তৈরী হচ্ছে, যে উইকেট ব্যাটসম্যানের পরম সহায়ক। বোম্বের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামের উইকেটকে তো বলা হয় 'ব্যাটসম্যানস প্যারাডাইস'। বিশ্ববিখ্যাত ফাস্ট বোলার কিথ মিলার নাকি একবার ব্রাবোর্ন মাঠের উইকেটে বল করতে হবে শুনে হেসে বলেছিলেন, : বাব্বা, ওখানে বল করব না, কি জানি বিজয় মার্চেণ্ট হয়তো আমার বলের বিরুদ্ধেই দু-তিন শো রান করে ফেলবে। যাক সে কথা, কিং-এর পরামর্শমত এখন থেকে ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট মাঠে যদি স্পোর্টিং উইকেট তৈরী করা হয় তবে তা থেকে বোলার ও ব্যাটসম্যান সমান সুযোগ পাবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলারদের শিক্ষাও কাজে লাগবে।

• • •

টেনিসের বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে বিখ্যাত আমেরিকার এডওয়ার্ড পটার বিশ্ব টেনিসের যে ক্রমপর্যায় রচনা করেছেন তার মধ্যে প্রথম ১০ জনের ৫ জনই অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। গ্র্যাণ্ড স্লামের অধিকারী রড লেভারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফ্রান্স, উইম্বলডন, ফরেস্ট হিল ও অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে তিনি অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। এক উইম্বলডন জয়ের কৃতিত্বেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের মর্যাদা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আরও তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতার জয়। সুতরাং অ্যামেচার টেনিসে রড লেভারের শ্রেষ্ঠ আসন বহালই রয়েছে। গতবারের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সনও এবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার অপর কীর্তিমান খেলোয়াড় নীল ফ্রেজার পেয়েছেন চতুর্থ স্থান।

বিশ্ব দাবা খেলা প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার ছাত্রী নোনা গ্যাপ্রিণ্ডাশভিলি

ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিকসে হ্যামার থ্রোর বিজয়ী জার্মানীর হ্যানস ফাল্লে

এডওয়ার্ড পটারের বিচারে মহিলা বিভাগেও শীর্ষস্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেনিস পটিয়সী মার্গারেট স্মিথ। ক্রমপর্যায়ে ভারতের রামনাথন কৃষ্ণনের স্থান এবার নেমে গেছে। গতবারের ক্রমপর্যায়ে কৃষ্ণনের স্থান ছিল পঞ্চম। এবার তিনি পেয়েছেন নবম স্থান।

এখানে বলা প্রয়োজন, বিশ্ব টেনিসে সরকারীভাবে ক্রমপর্যায় রচনার কোন বিধান নেই। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের অভিমত অনুযায়ী ক্রমপর্যায় রচনা করেন। অস্ট্রেলিয়ার টেনিস বিশেষজ্ঞ হ্যারী হপম্যানের ক্রমপর্যায় তালিকা এখনো প্রকাশিত হয়নি। নিচে এডওয়ার্ড পটারের ক্রমপর্যায় দেওয়া হল।

পুরুষ বিভাগ—প্রথম—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), দ্বিতীয়—রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া), তৃতীয়—ম্যানুয়েল সান্তানা (স্পেন), চতুর্থ—নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), পঞ্চম—চার্লস ম্যাকিনলে (ইউ এস এ), ষষ্ঠ—জান এরিক লাণ্ডকুইস্ট (সুইডেন), সপ্তম—মার্টিন মুলিগান (অস্ট্রেলিয়া), অষ্টম—র‍্যাফেল ওসুনা (মেক্সিকো), নবম—রামনাথন কৃষ্ণন (ভারত), দশম—ফ্রেড স্টোলি (অস্ট্রেলিয়া)।

মহিলা বিভাগ—প্রথম—মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া), দ্বিতীয়—মেরিয়া বুনো (ব্রেজিল), তৃতীয়—ডার্লিন হার্ড (ইউ এস এ), চতুর্থ—কারেন সুচম্যান (ইউ এস এ), পঞ্চম—রেনি সুরম্যান (দক্ষিণ আফ্রিকা), ষষ্ঠ—অ্যান হেডন (গ্রেট ব্রিটেন), সপ্তম—ভেরা সুকোভা (চেকোশ্লোভেকিয়া), অষ্টম—স্যাণ্ড্রা রেনল্ডস (দক্ষিণ আফ্রিকা), নবম—ক্যারোল ক্লাডওয়েল (ইউ এস এ), দশম—বিলি জিন মোফিট (ইউ এস এ)।

সরকারীভাবে বিশ্ব টেনিসের ক্রমপর্যায় তালিকা রচিত না হলেও বিভিন্ন দেশের ক্রমপর্যায় রচনার ভার কিন্তু সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের উপরই ন্যস্ত। সম্প্রতি নিখিল ভারত লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ সামসের সিং ভারতীয় টেনিসের যে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করেছেন নিচে সেই তালিকাও দেওয়া হল।

পুরুষ বিভাগ—প্রথম—আর কৃষ্ণন, দ্বিতীয়—জয়দীপ মুখার্জী, তৃতীয়—প্রেমজিত লাল, চতুর্থ—আখতার আলী, পঞ্চম—নরেশকুমার ষষ্ঠ—ভি আর বালসুব্রহ্মনিয়াম।

মহিলা বিভাগ—প্রথম—মিস জেনু ভাগিপয়া, দ্বিতীয়—মিস আর আডানি, তৃতীয়—মিস লীলা পাঞ্জাবী, চতুর্থ—মিস এল উর্ডারিজ, পঞ্চম—চেরে চিত্তারমা।

বালক বিভাগ—প্রথম—বিনয় ধাওয়ান, দ্বিতীয়—এস এস মিশ্র, তৃতীয়—পি ভার্গব, চতুর্থ—জে মিনোত্রা, পঞ্চম—এস মিনোত্রা।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২২শে অক্টোবর—নেফা ও লাদক অঞ্চলে চীনারা তাহাদের সংগ্রামক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। নেফার পাহাড়-পর্বত অঞ্চলের সংগ্রাম এখন কামেং ডিভিশন হইতে লোহিত ডিভিশনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লাদক রণক্ষেত্রে এই প্রথম তাহারা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিল।

"আমরা সংগ্রাম করিতেছি মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকার রক্ষার জন্য। আরও কিছু কিছু বিপর্যয় হয়ত আমাদের ঘটিবে। কিন্তু পরিণামে জয় অনিবার্য।" সোমবার জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেন।

২৩শে অক্টোবর—আজ সকালে নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে দুইদিনব্যাপী বার্ষিক রাজ্যপাল সম্মেলন উদ্বোধন করিয়া রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি, ভারত-ভূমি রক্ষা ও হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার ব্যতীত আমাদের সম্মুখে আর কোন পথ খোলা নেই।

চীনা হানাদারদের হিংস্র বাহু আরও বিস্তৃত হইয়াছে। তাওয়াং শহরের দিকে তাহারা আজ থাবা বাড়াইয়াছে। বস্তুত দক্ষিণে সমগ্র নেফা অঞ্চলকে তাহারা এক রক্তাক্ত রণাঙ্গনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। ওদিকে উত্তরে লাদকের অবস্থা অপরিবর্তিত।

২৪শে অক্টোবর—মধ্য নেফায় সুবর্ণশ্রী ডিভিশনে চীনারা নূতন ফ্রণ্ট সৃষ্টি করিয়াছে। তথায় তাহারা লংজুর দক্ষিণ-পশ্চিমে আসাফিলায় একটি ভারতীয় ঘাটির উপর ভারি মর্টার ও স্বয়ংক্রিয় সমস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

লাদক ও নেফা আক্রমণ করিবার পর চীন ভারতকে আপস আলোচনার যে সর্ত দিয়াছে ভারত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ভারত জানাইয়াছে যে, প্রাক-অভিযানস্থলে ফিরিয়া না গেলে চীনের সঙ্গে কোন প্রকার মীমাংসার কথা চলিবে না।

২৫শে অক্টোবর—পলতায় দীর্ঘকালের পুরানো ও একেবারে সেকেলে বাষ্পচালিত চারটি ইঞ্জিন এবং বয়লারগুলি অদূর ভবিষ্যতে বিকল হইয়া যাইতে পারে এবং ইহার দরুন সমগ্র মহানগরীতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর আমাদের জওয়ানরা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাওয়াং ছাড়িয়া সরিয়া আসিয়াছে। সেখানকার বেসামরিক লোকদের গতকালই অপসারিত করা হইয়াছিল। মঠনগরী তাওয়াং আজ চীনের কবলে।

২৬শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অদ্য নয়াদিল্লিতে সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে জাতীয় সংকট ও আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতরক্ষা—১৯৬২' নামে একটি জরুরী বিধিও বলবৎ হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স অনেকটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনেরই অনুরূপ।

ভারতীয় বাহিনী নেফায় আক্রমণকারী চীনা বাহিনীকে প্রবল বাধা দিতেছে। তেজপুরগামী রাস্তার উপর তাওয়াং-এর প্রায় পাঁচ মাইল পূর্বে জাং নামক স্থানে চীনা ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। চীনাপক্ষের বহুলোক হতাহত হয়। লাদক রণাঙ্গনের অবস্থা অপরিবর্তিত।

২৭শে অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ তাঁহার দলের সহকর্মীদের বলেন যে, ভারতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা ও শহরতলিতে আঠারটি চীনা গুপ্তচরঘাটি আছে বলিয়া পুলিসের এক গোপন রিপোর্টে প্রকাশ। এই ঘাটিগুলির সহিত কিছু কিছু চীনা দরদী কম্যুনিস্ট কর্মীর যোগাযোগ অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৮শে অক্টোবর—নেফা অঞ্চলে একপ্রকার বিভ্রান্তিকর শান্ত অবস্থা বজায় রাখিয়া চীনা আক্রমণকারিগণ গতকাল লাদকে কয়েকটি নূতন আক্রমণ আরম্ভ করে। গতকাল তাহারা দামচক এলাকায় নূতন আক্রমণ চালাইয়াছে।

কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ার দুইটি স্থানে এবং দক্ষিণ কলিকাতার একটি স্থানে ভারত আক্রমণকারী কম্যুনিস্ট চীনের নেতাদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। ওই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকাও জনগণ দাহ করে।

বিদেশী সংবাদ

২২শে অক্টোবর—প্রেসিডেণ্ট কেনেডী আজ হোয়াইট হাউসে বেশ কয়েকটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠান করেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা কিউবা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট হয়ত নাটকীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন—সে ব্যবস্থা এমনই জোরালো হইবে যে, বার্লিন সঙ্কটে তাহার প্রভাব পড়িবে, দূর প্রাচ্যেও হয়ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন যে, চীনাদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ভারত এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ সামরিক সাহায্য চাহে নাই। মুখপাত্র আজ পুনরায় ঘোষণা করেন যে, চীনের সহিত বিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি "সম্পূর্ণভাবে ভারতেরই দিকে।"

২৩শে অক্টোবর—কিউবায় সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি নির্মাণের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, এই অভিযোগে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী সোমবার রাত্রেই কিউবার বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর কিউবাগামী প্রত্যেকটি জাহাজ সমুদ্রে থামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে এবং কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে সেগুলি আটক করা হইবে।

তাসের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েত সরকার আদেশ দিয়াছেন যে, গুরুত্বপূর্ণ রকেট বাহিনী, বিমানবিধ্বংসী বাহিনী এবং ডুবোজাহাজ বাহিনী হইতে বয়স্কদের যেন অবসর গ্রহণ করিতে দেওয়া না হয়। সমগ্র সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—আজ কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ-অবরোধ প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর নিরপেক্ষ, পশ্চিমী মিত্ররাষ্ট্র বা কম্যুনিস্ট, যে-কোন দেশেরই জাহাজ কিউবার দিকে অগ্রসর হইবে, মার্কিন নৌ-সেনারা তাহাতে আরোহণ করিয়া উহাতে "আপত্তিকর" অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হিউম গত রাত্রিতে লণ্ডনে এক বক্তৃতাকালে বলেন, নিরপেক্ষ থাকিলেই যে নিরাপদ থাকা যায় না চীনরা আজ ভারতীয়দিগকে তাহাই সমঝাইয়া দিতেছে। পৃথিবীতে ভারতবর্ষই নাকি সাম্রাজ্যবাদের শক্ত ঘাটি এবং সেইজন্যই চীনারা নিরপেক্ষ ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ ওয়াশিংটনে বলেন যে, অবরোধ-কারী মার্কিন নৌবহর একখানি সোভিয়েট তৈলবাহী জাহাজ আটক করে এবং পরে উহাকে কিউবায় যাইবার অনুমতি দেয়। মনে হয় আরও প্রায় ১২খানি কিউবাগামী সোভিয়েট জাহাজ তাহাদের গতিপথ পরিবর্তন করিয়াছে।

১৮ জন সদস্যবিশিষ্ট সুইডিস সাহিত্য অ্যাকাডেমী ৬০ জন লেখকের তালিকা হইতে নয় মাস যাবৎ বাছাইয়ের পর মার্কিন সাহিত্যিক স্টাইনবেককে ১৯৬২ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরূপে পাকাপাকিভাবে নির্বাচিত করিয়াছেন। এই বছর পুরস্কারের পরিমাণ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

২৬শে অক্টোবর—"চীনের মীমাংসা প্রস্তাব" সম্পর্কে রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপাত্র "প্রাভদার" সম্পাদকীয় পড়িয়া রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করিতেছেন, এখন হইতে রাশিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যে চীনকে সমর্থন করিবে।

রাশিয়া পশ্চিমী কূটনীতিকদের মস্কোর বাহিরে ভ্রমণের উপর নিষিদ্ধনিষেধ আরোপ করিয়াছে বলিয়া আজ মস্কোর কূটনৈতিক মহল জানান।

২৭শে অক্টোবর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শ্রীকেনেডীকে জানাইতেছেন যে, তুরস্ক হইতে মার্কিনীরা যদি তাহাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি সরাইয়া নেয় তাহা হইলে রাশিয়া কিউবা হইতে আক্রমণাত্মক বলিয়া বিবেচিত অস্ত্র অপসারণ করিতে রাজী আছে।

'নিউ ইয়র্ক' হেরাল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু মার্কিন সাহায্য চাহিয়া প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর নিকট এক জরুরী পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

২৮শে অক্টোবর—শ্রীক্রুশ্চেফ আজ এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কিউবায় সোভিয়েট ঘাটি গুটাইয়া ফেলা হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ করিবে না বলিয়া শ্রীকেনেডী আশ্বাস দেওয়ায় সোভিয়েট ঐ ঘাটি গুটাইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছে।

পাকিস্তানের অন্যতম ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন গতরাত্রে সরকার-সমর্থক পাকিস্তান মুসলিম লীগের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক— ১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ৩৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

প্রবাসী পথে

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মিত্রালয়, শ্যামনগর থেকে প্রকাশিত
শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস—

"বন্দন-হীন-গ্রন্থি"

পড়ে এক বাক্যে সকলেই প্রশংসা করেছেন। মহালয়ার অনেক আগেই পাঠকের হাতে বইখানি পৌঁছে সাড়া এনেছে। নায়ক নেপালকে আপনারা কেউই ভুলতে পারবেন না। শেষ পাতাটি পর্যন্ত আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে নেপাল। আর নায়িকা অমিতা। আসামের প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত সার্থকনামা একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস। দাম—৩, মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান: **পুঁথিঘর**
২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

(সি-৩৬৪৪)

আমার দেখা ক্রিকেট

বেরী সর্বাধিকারী

॥ বাংলা ভাষায় ক্রিকেটের পাঠ্য পুস্তক ॥

অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি ও অসংখ্য ডায়াগ্রামের সাহায্যে ক্রিকেট খেলার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ । দাম: ৪·০০

খেলাধুলায় বাঙলার মেয়ে

॥ মুকুল ॥

ত্রিশটি বাঙালী মেয়ের খেলাধুলো, সংগ্রাম সাধনা এবং অধ্যবসায় ও অভিযানের ফটো ও আর্ট প্লেট শোভিত জীবনালেখ্য। ক্রীড়া সাংবাদিকের চোখে দেখা সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ রম্যরচনা। মেয়েদের খেলাধুলোর একমাত্র বই। দাম : ৫·০০

আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিনয় ঘোষ কৃত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র
১ম খণ্ড ১২·৫০ ॥

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খণ্ড: ৩·০০ ॥ ২য় খণ্ড: ৭·০০ ॥ ৩য় খণ্ড: ১২·০০ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আমার সাহিত্য জীবন
২য় মুঃ ৪·০০ ॥

আমার কালের কথা
২য় মুঃ ৪·০০ ॥

রসকলি ৩·৫০ ॥ ● **শিলাসন** ৩য় মুঃ ২·৫০ ॥ ● **বিস্ফোরণ** ৩য় মুঃ ২·০০ ॥ ● **ডাক-হরকরা** ৪র্থ মুঃ ২·৫০ ॥

সমরেশ বসুর

বি টি রোডের ধারে
৪র্থ মুঃ ৩·০০ ॥

শ্রীমতী কাফে
২য় মুঃ ৬·০০ ॥

বাঘিনী ২য় মুঃ ৭·০০ ॥ ● **সওদাগর** ২য় মুঃ ৬·০০ ॥ ● **গঙ্গা** ৫ম মুঃ ৫·৫০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ী

চিত্রগুপ্তের ফাইল
২য় মুঃ ২·০০ ॥

সত্যি ভ্রমণ কাহিনী
৩য় মুঃ ৩·৫০ ॥

গণনায়ক ২য় মুঃ ২·৫০ ॥ ● **সংকট** ২য় মুঃ ৩·৫০ ॥ ● **অপরিচিতা** ২য় মুঃ ৩·০০ ॥ ● **চকাচকী** ২·০০ ॥

জরাসন্ধের

লৌহকপাট
১ম পর্ব (১৪শ মুঃ) ৪·০০ ॥
২য় ,, (১২শ মুঃ) ৩·৫০ ॥
৩য় ,, (৭ম মুঃ) ৩·০০ ॥

তামসী ৬ষ্ঠ মুঃ ৫·৫০ ॥
ন্যায়দণ্ড ৫ম মুঃ ৬·৫০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

বনহংসী
৪র্থ মুঃ ৪·৫০ ॥

নওরঙ্গী তিন টাকা ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

মণিপদ্ম
২য় মুঃ ৪·০০ ॥

তুঙ্গভদ্রা ২য় মুঃ ৪·০০ ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মৃগতৃষ্ণা
তিন টাকা ॥

মাথুর (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

মহাকাল
(২য় মুঃ) ৩·৫০ ॥

নীলাঞ্জন (২য় মুঃ) ৪·০০ ॥

সরলাবালা সরকারের

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ
(সচিত্র) ৮·৫০ ॥

হুমায়ুন কবিরের

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী
৩য় মুঃ ৩·৫০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুতুল নাচের ইতিকথা
৮ম মুঃ ৩·০০ ॥

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান
২য় মুঃ ২·০০ ॥

জীয়ন্ত ২য় মুঃ ৮·০০ ॥ ● **সোনার চেয়ে দামী** ১ম খণ্ড: ৩য় মুঃ ২·২৫ ॥ ২য় খণ্ড: ২য় মুঃ ৩·৫০ ॥ ● **প্রাগৈতিহাসিক** ৪র্থ মুঃ ৩·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : বারো

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Satuarday, 10th November, 1962

৩০ বর্ষ ॥ ২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৪ কার্তিক, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

জাতীয় সংহতি

'আমার প্রতিটি অঙ্গ যদি সুস্থ সবল থাকে আমি হিটলারকে বৃটেনের মাটি ছুঁতে দেব না'—বিগত বিশ্বযুদ্ধে বেতার ভাষণের সময় একদা চার্চিল কথাটি বলেছিলেন। তাঁর এই উক্তি পরে প্রাচীর-পত্র হিসেবেও শোভা পেয়েছে। চার্চিলের বক্তব্য ছিল, জাতীয় সংকটের সময় দেশের প্রত্যেকটি বিভাগকে সংহত ও সুস্থ থাকতে হবে। প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষকে স্বকর্মে অবিচল ও তন্ময় থাকতে হবে।

কথাটি যথার্থ। মানুষ যেমন বহু অঙ্গের সমষ্টি, বিবিধ কর্মের দ্বারা তার চেতনার পরিচয়, তেমনি দেশ নামক নিতান্ত মাটি ও জলের বস্তুটি আমাদের সর্বজনের [illegible] কর্ম ও প্রচেষ্টার সমষ্টি। [illegible] শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী, শিল্পী, রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক—সমস্তই সেই দেশের অংশ, সকলের কর্ম দ্বারাই দেশের জীবন ও চেতনা, তার পরিচয়। মানুষকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে যেমন তার অংগগুলিকে সুস্থ রাখা ও এক ঐক্যের মধ্যে যুক্ত রাখা কর্তব্য, জাতির জীবনেও তেমনই সংহতির প্রয়োজন।

চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী চেতনা এসেছে তার তুলনা নেই। আমরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত, পররাজ্য লোভী চীন আমাদের মাতৃভূমিতে হানা দিয়েছে—এই দুঃসংবাদ সমস্ত ভারতকে ত্বরিতে একই চিন্তা ও একই মর্মে উদ্বুদ্ধ করল। সেই চিন্তা এই, আমরা আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অপহরণ করতে দেব না; আমরা প্রতিটি ভারতবাসী শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমির জন্যে সংগ্রাম করব।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু জাতির কাছে যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে বলেছেনঃ "আক্রমণকারী চীন শক্তিশালী ও নীতিজ্ঞানহীন রাষ্ট্র। তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের দাঁড়াতে হবে। ...চীনের এই আক্রমণ ভারতের পক্ষে চরম সংকট। সংকটে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মাথা তুলতে হবে।" রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণও এই মর্মে জাতীয় সংহতি দাবি করেছেন। অন্যান্য দেশনেতারাও বারম্বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, আজকের দুর্দিনে ঐক্য ও মিলিত বোধ দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সৌভাগ্যের কথা, বহু ভাষাবলম্বী, বিবিধ-বেশ ও ধর্ম-আচারী ভারত চক্ষের পলকে আত্মিক ঐক্যে মিলিত হতে পেরেছে। আজ তার জাতীয় সংহতির অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি অবিস্মরণীয় গানে বলেছেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' বস্তুত, এই বিপদে আমাদের ভীত হবার কারণ নেই, দেশের ইতিহাসে দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী; তথাপি সেই দুর্যোগে 'তরিতে পারি শকতি যেন রয়'—এই বাক্যই মানুষ পদবাচ্য প্রতিটি প্রাণীর একমাত্র প্রার্থনা হতে পারে।

আমরা সেই শক্তির অধিকারী। তার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাবে, এই জাতীয় চেতনার কথা। যুদ্ধের ভীষণ ভূমিতে যাঁরা প্রাণ দিলেন, অসীম শৌর্য দেখালেন রণক্ষেত্রে, যাঁরা দলে দলে সৈন্য বাহিনীতে যোগদানেচ্ছু হয়ে ফৌজী-দপ্তরের দ্বারে স্বেচ্ছায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এঁরা সকলেই সেই চেতনার প্রকাশ। এমন কি দীর্ঘকাল সৈন্য-বাহিনীতে কাজ করার পরও যাঁরা স্বল্পকাল হল প্রৌঢ় বয়সে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, আজ তাঁদের পক্ষ থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গেল, কেউ এই সংকটের দিনে অলস হয়ে বসে থাকতে চান না, সাধ্যমত জাতির জন্যে কিছু করতে চান।

আমাদের যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্যে দেশব্যাপী কী সহানুভূতি ও সমবেদনা। প্রতিটি রাজ্যে এঁদের কল্যাণে ও শুভেচ্ছায় মানুষ তার সাধ্যমত দান করেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের প্রতিও আমরা সমভাবে উদার হতে পেরেছি। বিদেশী অতিথি রক্তদান করছেন, এ যেমন তাঁর উদারতা তেমনি দেশী মানুষও আজ তার রক্ত দলে দলে দিয়ে আসছে কর্তব্যবোধে।

এতদ্‌সত্ত্বেও জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম আছে। যেমন—উন্নয়নমূলক কার্যে সহায়তা করার জন্য আমাদের কঠোর শ্রম ও আত্মত্যাগ করতে হবে, ব্যবসায়ী-দের সৎ ও সচেতন থাকতে হবে, যেন মুনাফা-কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না পায়, খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, শ্রমিক মালিক বিরোধ যেন কোনোক্রমেই না জাগে, তাতে উৎপাদন হ্রাস পাবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক—এই তিন দিক থেকেই আমাদের যুদ্ধ চালাতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই তিন পথেই অগ্রসর হতে হবে, নচেৎ জাতীয় সংহতি ব্যাহত হবে।

আমরা বিলক্ষণ জানি, জাতীয় সমৃদ্ধি গঠনে দেশ মগ্ন ছিল। অসমাপ্ত কর্ম আমাদের চারপাশে। খাদ্যে, বস্ত্রে, শিল্পে সক্ষম হবার সাধনায় আমরা যখন পরিশ্রমরত তখনই এই গণতান্ত্রিক বৈষয়িক উন্নতির মূলচ্ছেদ করতে এক-নায়কতন্ত্রী কম্যুনিস্ট চীন আমাদের আঘাত করেছে। আরব্ধকর্ম যদি আমরা সফল করতে না পারি—তবে সেও আমাদের পরাজয় হবে। জগতের কাছে, বিশেষত শত্রুর কাছে সে-পরাজয়ও আমরা স্বীকার করব না—এই বোধ যেন আমাদের থাকে।

আরও একটি কথা প্রসঙ্গত বলা দরকার। আমরা এই চরম মুহূর্তে এমন কোন ঝুঁকি নিতে পারি না যাতে আমাদের ক্ষতির আশঙ্কা আছে। জন-নিরাপত্তা, জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ও জরুরী সংস্থা-গুলিতে চীনা-প্রেমিকদের কোনো মতেই স্থান হতে পারে না। অবশ্য চীনা-প্রেমিকদের দুই মূর্তি—রাতে মোহিনী, দিনে বাঘিনী। আজ যাঁরা চাপে পড়ে, নিজেদের অস্তিত্ব অবলোপের ভয়ে ভারতবন্ধু সেজেছেন তাঁরা আপাতত মোহিনী হলেও দেশের শত্রু। কোনো ক্রমেই এঁদের জাতীয় সংহতির কোনো বিভাগেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। করলে সে-ক্ষতির দায় আমাদের বহন করতে হবে।

সর্বদিক থেকে সমবেতভাবে শত্রু প্রতিরোধ করাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

নিরপেক্ষ নীতি

বাহুবল রাহুসম মোর নীতি গ্রাসিবারে চায়!!

‘ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল’

স্টালিনের আমলে ক্রুশ্চেভ রুশী ‘খো-খোল’
নৃত্য যেমন নাচতে পারতেন এখনও তা পারেন।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অবশেষে দুটো
প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব

জ্যোতি বসুর
গলাবাজি এবার
বুঝি থামল।

Kutty

নিজেদের বলে দাবি করেছিল। ১২০০ বর্গমাইল তারা আগেই বেআইনীভাবে দখল করেছিল। বর্তমান আক্রমণের ফলে চীনারা আরও প্রায় ২০০ বর্গমাইল স্থান দখল করল।

ভারতীয় জওয়ানদের অসুবিধা

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিপুল চীনা বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানরা যে শৌর্যের পরিচয় দিয়েছে, ভারতের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু কেবলমাত্র শৌর্যের জোরে যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। ভারতীয় জওয়ানরা যখনই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পেরেছে, তখন থেকেই চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পেরেছে এবং পাল্টা আক্রমণও সম্ভব হয়েছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সংখ্যায় ভারতীয় জওয়ানরা অনেক কম ছিল। চীনাদের যাতায়াত-ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় তাদের পক্ষে লাদাকে ট্যাংক ও ভারী ভারী কামানও ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। নেফাতেও ম্যাকমেহন লাইনের খাগলা ঘাটির চার মাইল দক্ষিণ থেকে চীনাদের ভাল রাস্তা ছিল। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এ-সব একেবারেই অনুপস্থিত। লাদাকে ভারতীয় ঘাটি থেকে যাতায়াতের ভাল রাস্তার দূরত্ব ছিল প্রায় পঞ্চাশ মাইল। নেফার প্রতি ঘাটিতে ভারতীয় জওয়ানরা ৫০ থেকে ১০০ জন করে ছড়িয়ে ছিল। সব জায়গায় যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাও ছিল না, গাড়ি ও খচ্চরের সাহায্যেই জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে সে সুযোগ ছিল না। সে-সব এলাকার ভারতীয় জওয়ানদের হেলিকপটারের উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু চীনাদের আক্রমণের দ্বিতীয় দিন থেকে সে সুযোগও আর থাকেনি। রসদ সরবরাহ তো দূরের কথা, আহত সৈনিককেও আনা সম্ভব হয়নি। এই সব অসুবিধার সঙ্গে শীতের কাপড়ের অভাবও যুক্ত হয়েছিল। বন্দুকের শেষ গুলীটি নিঃশেষ করে যে-সব আহত-সৈনিক পথঘাটবিহীন জঙ্গলে ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন সৈনিকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। গত জুলাই মাস থেকে সীমান্তের ঘাটিগুলিতে চীনা-আক্রমণ যেখানে একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল, সেখানে ভারতীয় জওয়ানদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না করা মারাত্মক অপরাধ। সেই অপরাধের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা-দপ্তর থেকে বিদায় দিতে হয়েছে।

আক্রমণ হঠাৎ ঘটেনি

চীনের ভারত-আক্রমণ কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের আগেই চীন লাদাকের আকসাই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং '৫৭ সালের মধ্যে ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা তৈরি করে। এই এলাকায় ১৯৫৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর একদল চীনা সৈন্য ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে আক্রমণ করে। ভারত অবশ্য ওই রাস্তা সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ পাঠায় ১৯৫৮ সালে ১৮ই অক্টোবর। অন্য দিকে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ৫০ জন চীনা সৈন্য নেফায় অনধিকার প্রবেশ করে ১৯৫৮ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর। মনে রাখা দরকার, ওই সময়ে আমাদের সঙ্গে "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" চলেছে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে তিব্বত দখল করবার পর থেকেই চীন ভারতকে পৃথিবীর সামনে হেয় প্রতিপন্ন করবার ব্রত গ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালের আগস্ট তিব্বত পরিবেষ্টিত ভুটানের ৮টি গ্রাম দখল করে। ভারতের প্রতিবাদে কোন কাজ হয় না। তারপরেই লংজু আক্রমণ।

ভারত যে চীনের দাবি মেনে নেবে না, চীনের তা অজানা নয়। ভারত সরকার লাদাক অঞ্চলের দিকে মনোযোগ দেওয়ায় চীনারা এ বৎসরের এপ্রিল মাস থেকে আর কোন নূতন জায়গা দখল করতে পারেনি। কিন্তু ভারত যাতে নিজের এলাকায় রাস্তা তৈরি করতে না পারে, তার জন্য চীনা সৈন্যরা গত ২১শে জুলাই যুগপৎ চীপ-চাপ নদী উপত্যকা ও প্যানগঙ লেক অঞ্চলে ভারতীয় সেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। লাদাকের মত ম্যাকমেহন লাইনের উত্তরে চীনারা গত তিন বৎসর ধরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে এবং ভারত-ভুটান ও তিব্বতের ত্রিসংগমের নিকট নেফার কামেং বিভাগের খাগলা ঘাটির চার মাইল উত্তর থেকে বছরের সব সময়ে ব্যবহারের উপযোগী রাস্তা তৈরি করে। বেশ কিছু সংখ্যক চীনা সৈন্যকে তিব্বতে রেখে ওই এলাকার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত করে তোলা হয়। চীন ভাল করেই জানত যে, ভারতকে বেশী সময় দিলে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করা যাবে না এবং সেজন্য গত ৮ই সেপ্টেম্বর ৩০০ চীনা সৈন্য খাগলা ঘাটি ঘিরে আসাম রাইফেলের সৈনিকদের অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। গত ২৬শে জুলাইয়ের নোটে ভারত সরকার কোন শর্ত আরোপ না করেই যে আলোচনার প্রস্তাব করেছিলেন, চীন তাও প্রত্যাখ্যান করে। সীমান্তে চীনা তৎপরতা বৃদ্ধি ও চীনাদের অনমনীয় মনোভাব ও নোটে কড়া কড়া কথা শোনানো সত্ত্বেও ভারত সরকার চীনা আক্রমণের আশংকাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেন নাই। চীনাদের রকম সকম দেখে লোকসভার এক বিরোধী দলের নেতা গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, চীনারা লাদাক অঞ্চলে স্থিতাবস্থা যথারীতি বজায় রেখে শীগগিরই নেফা এলাকায় আক্রমণ চালাবে। অবশ্য ওই ভবিষ্যদ্বাণীও ভুল প্রমাণিত হয়েছে, চীনারা একই সঙ্গে লাদাকও আক্রমণ করেছে। চীনারা ভারত আক্রমণের জন্য আগে থাকতেই ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিকে নিজের দলে টেনেছে। চীন ম্যাকমেহন লাইন মেনে নিয়ে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ মিটিয়েছে। নেপালের রাজতন্ত্র ও পাকিস্তানের আয়ুবশাহী গণতন্ত্র বর্তমানে কমিউনিস্ট চীনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। সিকিম ও ভুটানের স্বার্থ এখনও ভারতের সঙ্গে জড়িত। ভারতীয় এলাকা দখল ছাড়া ভুটান ও সিকিমে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থাই হবে এখন চীনের প্রধান চেষ্টা।

ভারতীয় ফৌজের সর্বাধিনায়ক জেঃ থাপার

'ভারতের জয় অনিবার্য' —নেহরু

চীনা-আক্রমণ ও তারপর

চীনা-আক্রমণের ফলে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু চীনাদের নির্লজ্জ ও নীতি-জ্ঞানহীন বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং তিনি যে এতদিন "বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক-বিহীন এক কাল্পনিক জগতে" বাস করছিলেন, সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। চীন আক্রমণ করা সত্ত্বেও ভারত চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেনি, কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেনি, রাষ্ট্র-সংঘেও চীনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেনি। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেও যাতে আলোচনার দ্বার একেবারে বন্ধ না হয়ে যায়, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। চীনের রাষ্ট্রসংঘের সদস্য না থাকা কোন কারণ নয়, কারণ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভারত-আক্রমণ থেকে চীনকে নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে বন্ধুস্থানীয় দেশগুলির রাষ্ট্র বা সরকারের প্রধানদের যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তাতে কোন সুফল প্রসব করেনি। সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার আগে ভারত ও চীনের বিরোধ মেটাবার জন্য লাইবেরিয়া যে প্রস্তাব করে, ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে। ২৪শে অক্টোবর চীন বিরোধ মীমাংসার জন্য ভারতের কাছে তিন দফা প্রস্তাব করে।

নিজের মা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এখনও তোমরা অন্ধকারে বসে আছ কেন?
এখনও তোমরা নিচু গলায় কথা বলছ কেন?
এসো, তোমরা এই পথের উপরে এসে দাঁড়াও।
এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও।
নিজের মা-কে একবার মা বলে ডাকো।

কেননা, তোমাদেরও
আয়নায় মুখ দেখতে হয়।
কেননা, তোমাদেরও
স্পষ্ট চোখে
নিজের চোখের দিকে তাকাতে হয়।

তাহলে তোমরা অন্ধকারে বসে আছ কেন?
তাহলে তোমরা নিচু গলায় কথা বলছ কেন?
এসো, তোমরা এই পথের উপরে এসে দাঁড়াও।
এসো, তোমরা এই রোদ্দুরে এসে দাঁড়াও।
এসো, তোমরা এই হাওয়াকে একবার,
বিশ্বাসঘাতক এই উত্তুরে হাওয়াকে একবার
ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে ওঠো—
মা আমার! মা আমার!

ভাগ তুই

অরুণকুমার সরকার

ভাগরে ভাগরে ভাগ
ভাগ তুই নিজের জঙ্গলে
স্বদেশ খোঁয়াড়ে তোর, চিড়িয়াখানার
পরীষে দুর্গন্ধে আলোভ্রষ্ট সমস্বরে
আফিমে চণ্ডুতে ব্যাং আরশুলার
খানা কি খোঁদলে ভাগ
ভাগ তুই
প্যাণ্টুলে জুতোর ছাপ, থুতুমাখা
থ্যাবড়া মুখ নিয়ে।
ভাগরে ভাগরে ভাগ। কুকুরে-শেয়ালে
খচ্চরের দল ভাগ, নর্দমার
মাছি ঘিনঘিনে
ভাগরে ভাগরে ভাগ
ভাগ তুই চীনে।

টুনি মেম

সৈয়দ মুজতবা আলী

[পূর্বে প্রকাশিত অংশের চুম্বক : এস. আই খানের কাছে খবর এল একটা পরিত্যক্ত বাংলোর পিছনের রান্নাঘর মেরামতির সময় মাটির তলায় একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে এবং খুলির ভিতর একটা বুলেটও পাওয়া গেল। কঙ্কাল থেকে অনুমান করা গেল, মেয়েলোকটি যে সময় খুনটা হয়েছিল সে সময় ঐ বাংলোয় [illegible] নামে এক ইংরেজ বাস করত। কঙ্কাল [illegible]। খান খবর নিয়ে জানতে [illegible] ওয়ারেন্ট [illegible] আবিষ্কার হল। এই গল্প দেশ ২৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

ইতিমধ্যে [illegible] হয়ে গিয়েছে। খান বললে, 'এদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 'সত্যের কোনো মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর বুকে লুকোনো একটা কাব্য সৌন্দর্য আছে।' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'ওঃ! কি যেন বলছিলুম। মনে পড়ছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নতুন বুদ্ধির উদয় হল। [illegible] নয়। [illegible] পারলুম ছিল। আমি জানতুম সাহেবরা বাড়ি ফেরবার [illegible] তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেটটা পাওয়া গেছে সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকেই ছোঁড়া হয়েছে।

যাক। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুয্যে একবার জার্নালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা বলার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনো জ্ঞান যে-কোনো খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন কোনো না কোনো দিন জার্নালিস্টদের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিসের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাসুন্দি ঘাঁটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একখানা খাতাতে লেখা থাকে কে কবে নিরুদ্দেশ হল—অবশ্য যাঁর

রামভজনের বউ টুনি মেম—

আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। [illegible] পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কঙ্কালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কম্বলে, এ-ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার।

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জোর অনুসন্ধান চালালুম। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশ কথা পাশ কথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শুধোই সেই বিহারী রামভজনের কি হল?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরো কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস :—

রামভজনের বউ টুনি মেম—

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, 'বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে?'

খান বললে 'সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ওয়ারা সাহেবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সাহেবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় 'টুনি মেম'।

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারো বাড়া আরেকটা কারণ ছিল। সামনাসামনি না হোক আড়ালে আবডালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্কিরি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে রামভজনকে বাদ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনাকে ওয়ারেন সাহেবের বাংলোর গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শুধোলুম, 'তারপর?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, [illegible] তিন দিনের পর যখন রামভজনের [illegible] নতুন [illegible] এল— [illegible] —তখন তারা বললে, রামভজন

আগেই দেশে পৌঁছয়নি। আরগড়ের কেউ বললে টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিতিবিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বললে দার্জিলিং না কোথায় যেন চা বাগানে কাজ নিয়েছে।'

'আর টুনি মেম?'

'সে তখন ওঁহারার রক্ষিতা। কিন্তু 'রক্ষিতা' বললে হয়তো ওঁহারা ও টুনি মেম দুইজনারই প্রতি অবিচার করা হয়। ওঁহারা টুনি মেমকে রেখেছিল রানীর সম্মান দিয়ে আর টুনি মেম ওঁহারাকে ভালোবেসে ছিল লায়লী যে-রকম মজনুনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব কথা আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ওঁহারার বাংলোয় নিয়ে যায়। শীত-কাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তার পর যে-কোনো কারণেই হোক ওঁহারা তাকে গুলী করে মেরে বাবুর্চিখানার ছিতের ভিতর পুঁতে ফেলে। যে-লোক ছটা পরিবারকে খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধুলো-খেলা

শুনেছি স্বর্গের দেবশিশুরা অমর...

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারী রাগে চায়ের দোকানে যে সব চেয়ে বেশী ওকীব-হাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে বললে কসম খেয়ে কোনো-কিছু তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই, ওঁহারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায়?

খবর পেলুম, ওঁহারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দুরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোনো পথ না পেয়ে ওঁহারা সায়েবের বাবুর্চির সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবারে সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পাঁচিল খাড়া হল। বহু অনুসন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়।

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সায়েবদের এই যে বাবুর্চি ক্লাসের লোক এরা সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং পাফিং রোস্টো-মোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রাঁধে, শুয়োর গোরুর মাংস এবং যেসব বাসন বাসন ঘেঁষতে লোকে দূরে থেকে দেখেই শেষ-বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খাস কোনো বংশ সন্তানের সাধ্য। অতএব এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ওঁহারার বাবুর্চি নিশ্চয়ই অন্য কোনো সায়েবের চাকরি নিয়েছে।

তোকে পূর্বেই বলেছি, আরগড়ের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা বাগান আব-জাব করছে। আমি প্রতি উইক-এন্ডরে আজ এটা কাল সেটার তদন্ত করতে লাগলুম। পরনে খানসামা-বাবুর্চির পোশাক। সবাইকে শুধোই, বাবুর্চির চাকুরি কোথাও খালি আছে কি না। আরো শুধোই, আমার এক ভাই নাম ভাঁড়িয়ে এক কুলী রমণীর সঙ্গে বসবাস করছে—অসল কারণ অবশ্য আমি ওঁহারার খানসামাটার

আমাদের মা তার জন্য বড় কান্নাকাটি করছে, —তার খবর কেউ জানে কি না?

বাগানের পর বাগান ব্যাংকা ড্র করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী আর মুর্শীদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল।

এক চা-বাগিচার কম্পাউণ্ডার শুধু যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, 'ও! টুনি মেম। দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সুখেই না আছেন।" আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম, ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে। সেখানে গিয়ে শুনি, বাবুর্চি পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলী লাইনের একটা কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

পড়ি পড়ি এই পড়ি ত্রিভঙ্গ মুরারী গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন-বাঁশের তৈরী কুঁড়েঘর। বাঁশের তৈরী দরজাখানা ঘরের মাটিতে পড়ছে।

ভিতরের দৃশ্য আরো মারাত্মক। স্যাঁত-সেঁতে নয় রীতিমত ভেজা মাটির ভিত। হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত। আল্লায় মালুম গর্তে সাপ না ইঁদুর কি আছে। এক কোণে একটা ভাঙা উনুন। কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না। তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু একটা ভাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে। তারই পাশে মলমূত্র। নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম ম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাড্ডিসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধুঁকছে। ছেলেটি কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। কেউ না বললেও আমি চট্ করে বলে দিতে পারতুম ইটি ওঁহারার সন্তান। শুনেছি স্বর্গের দেব-শিশুরা অমর কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা একরকমই দেখাতো।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একবারের তরে চোখও খুললো না। সে শক্তিটুকুও তার গেছে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, 'বহু বৎসর পুলিসে কাজ করে করে আমি এখন সংগ-দিল—পাষাণ হৃদয়। তখন সবে পুলিসে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।

সে আরো নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের মাইটা ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। জোরে করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙানো

—— চক্রবর্তী

যেন তার গলা চেপে ধরছে আর কক্ করে গোঙরানো বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরো বীভৎস।

চাটাইয়ের উপরে শুয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতছিন্ন বুক ঢেকে একখানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে—চোখ বন্ধ করে কি জানি, কি জানি জীবন-মরণ অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পুলিসের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কণ্ঠরোধ করে পুলিসের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পুলিস। ওঁহারার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম, "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে।"

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমরা সিলেটিরা যদি কুলী রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানকি-মাগীর বেলেল্লাপনা, কুলী-রমণীকে স্ত্রীর সম্মান কেও দেয় না, তার পাড়ওয়ালাদের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরও বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখে মুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, "কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই। আচ্ছা আমার খবর নিসনে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কেঁদে কেঁদে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না। এ দিকে আবার বউ বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।"

আমার চেঁচামেচি শুনে কুঁড়ে ঘরের সামনে এক পাল কুলী মেয়েমদ্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দোরে দাঁড়িয়ে বললুম, "তোমাদের মধ্যে কেউ রাজী আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফ সুৎরো করতে, আর বেচারী বউটার সেবা-টেবা করতে? এখখুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরো দু'টাকা হাঁড়ি কুঁড়ি চাল ডালের জন্য।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে "মুন্নি, মুন্নি!"

মুন্নি এগিয়ে এল। পুরনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পেরেছিলুম, এই গরীব বিধবা একমাত্র মুন্নিই যতখানি পারে টুনি মেমেদের দেখ-ভাল্ করেছে। সেও নিঃসম্বল, কীই বা করতে পেরেছে। কিন্তু

মুদীর দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।"

আমি বললুম, "খুব ভালো করেছ।"

মুদি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চৌকাঠের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। তিনি সেই আগের মত শুয়ে আছেন। হাত দুখানা বুকের উপর।

আমি উস্‌খুস্‌ করছি এমন সময় তিনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়ে বললেন, "আপনি সব কিছু জানতে চান,—না?"

আমি হকচকিয়ে উঠলুম। কিন্তু তাঁর [illegible] নেই। আশ্বস্ত হলুম। বললুম, "কি করে এ-অবস্থায় পৌঁছলেন?"

খান বললে, উত্তেজনা উত্তেজনা। আমি তখন অর্ধমৃত। "বন্ধু, বন্ধু, তোমার এখন শরীর দুর্বল তুমি—" ঐ ধরনের কিছু একটা বলা না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।

তিনি বললেন, "আমি আপনাদের [illegible] তুলনা। আপনারা [illegible] সহজে গণ্য করেন না। সহজ কথায়, আমি একদিন রাজকন্যার সম্মান পেয়েছিলুম।"

খান বললে, 'বিশ্বাস করবি নে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মহীয়সী ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাক।'

আমি বললুম, 'আশ্চর্য।'

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, তিনি যেমন যা বলেছিল।

বললে, "অনেক অপমান নির্যাতন সয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমাকে সইতে হয়নি—মুখ বুজে। নূতন অপমান আর কি হতে পারে? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুদির নাক অল্প অল্প ডাকছে। তিনটে [illegible] এদিক ওদিক নাচছে।

তিনি বললেন, 'ওহায়ো সাহেবের মেম এনেছিল বিলেত থেকে এ দেশের হাতী-গণ্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ওবাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

"আপনি মুরুব্বি, আপনাকে সব-কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার ত্রাণ-কর্তা, আমার বন্ধু রূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে? আর এ যে আমার বুকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহা-পাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমায় দেবেন তার জন্য আমি তৈরী।

কিন্তু জানো দিকিনি ভাই সাহেব, আমি কুলী-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতি-বেশিনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চুম্বক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায় সেটা আমি আরো ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক্, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সাহেব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরিজী পড়াতে শুরু করলে, বললে

'তোমাকে আমি আমার মনের মতো করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোনো পাঠশালা-মক্তবের আঙিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলুম বলে এ জন্মে তারই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়েবেই অবাক।"

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফ্‌টার অল্ সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই-ভাবেই।

বললে, "বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি হয়েছিল বলতে পারিনে, কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলী-মজুরেরা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছিনে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নূতনভাবে তাকে ভালোবাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।"

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপন মনে যেন কথা বলছে। আবার কখনো বা সংবিতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে, আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

"সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুঁশের মতো। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি সে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—"

সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়

খান বললে, 'আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এই বারে জানতে পারবো, সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেত-খামারের প্ল্যান করেছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ওঁরা ডবল-ক্রসিং করেছিল! রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানিনে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিলে। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম, টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সান্ত্বনা দিলুম এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলী-কামিন্ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাদাদ্ (বিধিদত্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশী তুফান-ঝড় এত বেশী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেঁতে কুঁড়ে ঘরে এসে পৌঁচেছে যে এখন সে নির্ভয়—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশি দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দুবলা পাতলা মেয়ে, পুলিসের এক ফুঁয়ে সে কোথা কোথা মুলুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এক ফোঁটাও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দাঢ্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, "কিন্তু সায়েব ছিল আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি, সায়েব ছিল পাগল। দুটো জিনিসে যে তার পাগলামী কত বিকটরূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।"

তারই স্মরণে টুনি মেম যেন [illegible] উঠলো। বললো, "[illegible] দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে [illegible] করতো [illegible] [illegible] দেখে দেখে নিজেও যেন আমার উপর কি সব আনতো বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজকর্ম সে বন্ধ করেছে, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুস্থাবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, 'কিছুটি মুখে দাও', তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, '[illegible] খাবে', নয় বলতো, 'মুখে দিয়ে কিছুই নামবে না'। ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম। আমার জাত ভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ও জিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু ওরকম বেহদ মদ কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি, কত-বার— তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায় থাকলে সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনো খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ-কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার

এই নদের বান কম্পাউণ্ডের দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন?"

খান দম নিয়ে বলল, "দেখ, মিতু, এর পর বহুকাল চা অঞ্চলে কাজ করার ফলে নিম্নতর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি,

পাগলের মত তাকে বন্দুক হাতে নিয়ে করলে তাড়া

বাচ্চা কাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে,—এসব ওদের ডাল ভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।"

আমি বললুম, 'সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। গোলাপুরে আর বেশী দূরে নয়।'

খান বললো 'টুনির কাহিনীও শেষ হয়ে চললো। শোন্। টুনি বললে "আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসি খুশির মানুষ সায়েব। হঠাৎ কোনো আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত তাকে বন্দুক হাতে নিয়ে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বুঝতুম যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায়। আমার নিজের কোনো ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না যে সে আর আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকর বাকরকে নিয়ে হত মুশকিল। আমার স্বামীকে—"

খান থামলো। আমি তেড়ে বললুম, 'ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল না কি?'

খান বললে, 'ভাই এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরালো। আমি নাচার। আবার মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এই নিয়ে দু'বার হল; তিন বারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে," ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।" তার পর আমাকে শুধালে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না? আমি বললুম, না ভাইয়ের সন্ধানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, "তাহলে জানতে, যা সবাই জানে। ঐনিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

সায়েব ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বদ্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শুধু চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস। আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি।' আমি চেষ্টা করেছিলুম সায়বকে ঠাণ্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলাম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনো দুঃখ করিনি। আমার সায়েবকে পেয়েই আমি খুশি ছিলুম আমি সুখী ছিলুম কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়েব ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। এর পূর্বে সায়েব আমাকে কখনো একা ফেলে যায়নি। একা থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু কেমন যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাত্তিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

পর দিন সায়েব সন্ধ্যের দিকে ফিরে এল।

আমি কে, আমি কি ?

আমি তাকে হাতে ধরে নিয়ে যেতে চাইলুম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে দু হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নিচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টে আমার দিকে। সায়েব এ-ভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি ?

ভাই সায়েব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

ঠিক তার চার দিন পর পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেল।

কুকুর বেড়ালকেও মানুষে এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েবের রক্ষিতা, আমার তো কোনো হক্ক নেই। পুলিস বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলতলায় এসে বসে রইলুম। সেখানে সায়েব আমার জন্য একটা সীমেণ্টের বেদী বানিয়েছিল।

যে চাকর-নফর সেদিন সকাল বেলা পর্যন্ত আমার পা চেটেছে তারাই এখন আমাকে লাথি ঝাঁটা মারলো। চাকরি গেছে যাক, কিন্তু ঐ 'কুলী' মেমটাকে যতখানি পারি অত্যাচার-অপমান করে তার দাদ তুলে নিয়ে যাই।

আমি একটি কথাও বলিনি।

মোকদ্দমাতে সব কথা বেরল। সবাই জানে। সেই সেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মুরুব্বী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।

আমি জানতুম, আমার সায়েব এ সব চা বাগিচার সায়েবদের ঘেন্না করতো। কতবার তাকে বলতে শুনেছি, যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডাণ্ডা মেরে বেড়ায় তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনো সুযোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজুর , আর সায়েবরা আপন দেশে সব সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকুও

এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।

তোমাকে বলেছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করলে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কসিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলেছে, 'আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই। আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।' এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আরংগড়ের পাদ্রী সাহেব আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।"

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'তিন বারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শুধালুম, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনো খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেন ওটা অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন। আজও বুঝতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কি না। টুনি শুধু বললে, সায়েব নাকি তাকে বলেছিল, সে কলকাতার উকিলদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে তবে [illegible] পরিষ্কার নয়। চুলোয় [illegible] কথা, আমার ইচ্ছে শুধু [illegible] নিশ্চিত হওয়া সম্বন্ধে [illegible] কিছু নেই যে [illegible] বলার সময় সে তার [illegible] দিয়েছিল, এবারে [illegible]

[illegible]

[illegible] নিয়ে যেই [illegible] বললে, [illegible] বাড়ি থেকে [illegible] সেদিন বাড়ি ফিরে [illegible] দেখেছিল সে তো [illegible] সেবার বেলল সায়েব [illegible] দূরের একটা ছোট পোস্টঅফিস [illegible] যে দুজন সায়েব তার গায়ে [illegible] তাদের নামে ছাপানো চিঠি [illegible] বিজ্ঞাপন হিসেবে পাঠায়। আচ্ছা, [illegible] ভাইয়া, আমি যে বলেছিলুম সায়েবের মাথায় ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? ওটা কি ধরা পড়তো না। পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সায়েবলোগের ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি তার মনে ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট অফিস থেকে সেগুলো এসেছিল তার সেই ধরে পুলিস দু দিনের ভিতর ধরে ফেলল সে পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল,

...। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করেছে।"

খান মন্তব্য করে বললো, 'টুনি মেমের নরম আর শক্ত দুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে "মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দিকিন ঐ সব পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট কাচ্চাবাচ্চাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘুণাক্ষরেও সায়েবের এই দুর্বুদ্ধির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দা দিতুম।

আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি। শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার 'স্ত্রীর' ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানিনে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।

সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।

আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করনেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জাগয়া নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি গলায় ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—"

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে?"

খান বললে, 'এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নমের রদ্দি কুঁড়ে ঘরে এসে পৌঁছল তার বর্ণনা দেয়নি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।'

আমি বললুম, 'আমি স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাইনে। তার পর কি হল তুই বলে যা।'

খান বললে, 'টুনি সে রাত্রে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাঁকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাঁকে রিসিভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পুলিসের য়ুনিফর্ম পরে। আমি অবাক হয়ে বললুম, "স্যর, করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পুলিসকে সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।"

খেলুম উৎকট ধমক। বললেন, "রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোবাল-খান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির 'কিরামি' বের করেছে একশ' সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোঁটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলুম গণ্ডা তিনেক ধাতানি। কীই বা করি আমি? তিনি দুঁদে অফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুনে কবুল করাতে পেরেছেন বলে তাঁর খুব নাম ছিল — পাঠানকে "বেইমান" বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি জানতেন বলে। আমি চুপ করে গেলুম।'

'গট্ গট্ করে মিলিটারি বুটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়ে ঘরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তার পর, মশাই, আরম্ভ হল দুঁদে পুলিসের যত রকম কায়দা-কেত্তা, ফন্দি-ফিকির, সন্ধি-সুড়ুক তার নির্মম প্রয়োগ। দুনিয়ার ভয়-প্রলোভন, মধু, হুমকি, কটু-সম্ভাষণ সব-কুছ চালালেন ঘড়েল পুলিস-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পুলিস দেখে টুনি মেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুললে না। কাড়া ছটি ঘণ্টা পুলিস সায়েব তাঁর শেষ চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরলেন সেই কুঁড়ে ঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হাঁ, না পর্যন্ত বলেনি।

আমার লজ্জাটুকু পর্যন্ত পুলিসকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করে-ছিলুম, তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব-কিছু জানতে পেয়ে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাইই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পুলিসকর্তা ঘায়েল হয়ে গিয়ে সে-কথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে হল—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।'

খান বললে, 'তা'র পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।'

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

'হুঁ।'

আমি শুধালুম, 'তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোনো হিল্লে হল না?'

খান অনেকক্ষণ কোনো উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে যাকগে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পারিনি —সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনো টুনি মেমের শেষ চাউনির কথা ভাবি। সে চাউনিতে কি ছিল?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম। টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাকে তার সর্ব দেহমন দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল—তিনি যে তার ডুবডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন। আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দূত রূপে, তাঁরই মিত্রিশক্তারূপে। তার পর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দিনে যেসব চাকর নাকর তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। আমার মতলব ছিল, তার বাচ্চা দুটোকে বাঁচিয়ে নাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার 'স্বামীকে' ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনো কথা হয়নি গাড়ি বোলপুরে এসে থামল।

চেরাচেরিতে ম্যানেজার গোঁসাই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালুম, ওদের কি হল। খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে। ১

(১) এই 'সত্য ঘটনামূলক গল্পটির' প্রথমাংশ কয়েক মাস পূর্বে 'দেশে' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে বিদেশ চলে যেতে হয়। বাকিটুকু এর আগে শেষ করতে পারিনি বলে আমি আমার প্রীত স্নেহাসক্ত পাঠক পাঠিকাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। একাধিক পাঠক পাঠিকা সম্পাদক মহাশয়কে চিঠি লিখে তাঁদের ফরিয়াদ জানান। তাঁদের কাছে ডবল মাফ চাইছি।

দৃষ্টিপাত

আশাপূর্ণা দেবী

চোখে আলো লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল। আর চোখ খুলতেই মনে পড়ে গেল ইলার, কেন তার অর্ধস্ফুট চেতনার মধ্যে নিমপাতার আস্বাদ, কেন তার সমস্ত শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণার দাহ।

ইলার কি জ্বর হয়েছে?

তা একরকম জ্বরই বৈকি!

হয়তো থার্মোমিটারের পারায় ধরা পড়বে না, কিন্তু মানসিক উত্তাপ মাপবার কোন যন্ত্র যদি হাতের কাছে থাকতো!

ঘরের চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখল ইলা, তারপর গা পাক দেওয়া একটা ঘৃণায় চোখ বুজে ফেলে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুলো।

কিন্তু চোখ বুজলেই কি চোখের স্নায়ুতে কেটে বসা দৃশ্যটার ছাপ মুছে যায়? চোখ বুজেও দেখতে পাচ্ছে ইলা, ঘরের ও-দেওয়ালের চৌকিটায় তার বাবা খালি গায়ে পেটটা খুলে শুয়ে আছে, এখন সকাল হয়ে গেছে তবু তার নাকডাকার আওয়াজে ঢিলে পড়েনি। সমান তালে ডেকে চলেছে সে নাক, আর তারই তালে তালে পেটটা উঠছে, নামছে, থেকে থেকে থরথর করে কাঁপছে।

চোখ বুজেও দেখতে পাচ্ছে বাবার ক'দিন আগে কামানো মাথাটা। কাঁটা কাঁটা চুল গজিয়ে যে মাথা আরও কুশ্রী হয়ে উঠেছে।

আজ নিয়ে চার দিন!

মনে মনে হিসেব করল ইলা। চারদিন হল মাথাটা কামিয়েছে জগদীশ। জগদীশের মা মরার অশৌচান্ত হয়েছে সেদিন। ওই চার দিন আগে।

চোখ বুজে শুয়ে দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম দিনটার কথা ভাবছে ইলা। ঠাকুমা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে বাবা যেদিন বিদেশ থেকে এল! দূর বিদেশে থাকে, ন' মাসে ছ' মাসে, দু' বছরে এক বছরে, এক-আধবার আসে। এবার এল প্রায় ওই দেড় বছরের মাথায়। সেই কথা বলেই চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি ঢুকেছিল জগদীশ। 'ওগো মাগো! আমি যে তোমায় দেড় বছর দেখিনি। তুমি যে বলেছিলে এবারের শীতে একখানা কম্বল চাই তোমার!" আরও অনেক আক্ষেপ করেছিল জগদীশ।

আধবুড়ো লোকটার মাতৃশোকের ওই প্রাবল্য দেখে 'আহা' করেছিল অনেকে, আবার মেয়েমানুষের মত ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না দেখে হেসেওছিল কেউ কেউ মুখ বাঁকিয়ে।

ইলা হাসেনি, শুধু মুখ বাঁকিয়েছিল। তবু তখন মাথায় কতকগুলো চুল ছিল জগদীশের, চেহারাটা এত কুৎসিত লাগছিল না। মাথা কামিয়ে ন্যাড়া মাথাটা ধড়ের চাইতে বেমানান ছোট দেখানোর দরুণ এত কুৎসিত লাগছে এখন। আর সামনের দুটো দাঁত যে নেই, তার জায়গায় যে খানিকটা অন্ধকার গহ্বর, সেটা আরও বেশী ধরা পড়ছে গোঁফ কামানোর দরুণ।

ইলার হঠাৎ মনে হ'ল মা-বাপ মরে গেলে মুখ মাথা সব চেঁচে পুঁছে সাফ্ করে ফেলবার মানে কি? কী উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাতে? বিলাসিতা কমে?

জেগে জেগে শুয়ে থাকা যায় কতক্ষণ? উঠে বসল ইলা। বাইশ বছর বয়সকে লজ্জা দেওয়া রোগা পাকসিটে শরীরটা তার যেন মটমটিয়ে উঠল। আঙুলের গিঁটগুলো টেনে টেনে একবার মটকে নিল সে, তারপর পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল।

মা কোন ভোরে উঠে গেছে।

তাই ওঠে সে।

ভোরে না উঠলে চলে না লীলার। একশো রকমের কাজ তার। তার ওপর আবার এই ক'দিন ধরে চলেছে হাজারো ঝঞ্ঝাট। একেই তো দীর্ঘকাল ধরে ভুগে আর ভুগিয়ে তবে মরেছেন ভবরানী, তা ছাড়া আছে মৃত্যুর আনুষঙ্গিক দায়।

এই তের চোদ্দটা দিন ধরে ইলা শুধু শাশুড়ী মরলে কী করতে হয়, আর কী করতে নেই তার ফিরিস্তি শুনেছে বসে

বসে। গতকাল নাকি 'নিয়মভঙ্গ' গেছে। অতএব আশা করা যাচ্ছে, নিয়মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া গেল এবার।

ঠাকুমাকে সত্যিকার ভালবাসতো ইলা।

কিন্তু মন কেমন করবার সময় পাওয়া গেল না। পিসি এল পিসতুতো ভাই এল, তারা 'চতুর্থী' করল, 'ভুজ্যি' না কি যেন করল, তারপর আলাদা হে'শেল করে মাছ-ভাত রান্না করে খেল, আর সবাই মিলে গাদাগাদি করে এই একটা ঘরে শুল। কখন আর তবে মন কেমন করবে ইলার? কাল তারা বিদায় নিয়েছে। হাঁফ ছেড়ে বে'চেছে ইলা। কিন্তু মন কেমনটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে।

একখানা বই পড়ে নেই।

আলাদা কোনও আশ্রয় নেই বাইশ বছরের ইলার। কোথায় বসে খোল ধরবে মনটাকে। অথচ ছেলেবেলায় যখন প্রয়োজনবোধ ছিল না, তিন তিনখানা ঘরে ঘরে দৌড়িয়েছে ইলা। খেলেছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। এখন থেকে হয় রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে উবু হয়ে বসে, শুতে হয় এই একটা ঘরে গাদাগাদি করে।

কিন্তু কেন?

আর দুখানা ঘর কি ভূমিকম্পে পড়ে গেছে ইলাদের? না, ভূমিকম্প নয় ভাড়াটে! দুখানা ঘরে ভাড়া বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল জগদীশ বাপ মারা যাবার পর। বলেছিল, 'দুটো ঘরের আর দরকার কি? তিনটে মেয়েমানুষ একটা ঘরেই শুতে পারবে। আর তাই শোয়াই তো দরকার। সবাই সবাইকে আগলানো হবে। আমি যেদিন রিটায়ার করে এসে বসবো, ইলু ততদিনে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে, আর মার যা শরীর—'

অতএব মা বউ মেয়ের বোঝা সমান সচ্ছলভাবে বসিয়ে খাওয়া-পরায় সচ্ছলতা আনতে চেষ্টা করেছিলেন জগদীশ।

ভাড়াটেরা লোক ভালো, মাসের প্রথমেই ভাড়াটা দিয়ে যায়। এতোদিন ভবরানীর হাতে দিত, এর পর থেকে হয়তো লীলার হাতেই দেবে। কিন্তু বলতে গেলে লীলাকে ওরা চেনেই না, যা চেনে ইলাকে, আর চিনতো ভবরানীকে। ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাব বজায় রাখতে জানতেন ভবরানী। তাই না মাসে ছ' মাসে ছেলে বাড়ি এলেই নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে শুতে যেতেন ভাড়াটেদের গিন্নীর ঘরে।

একদা যে ঘর নিজেদের ছিল, সেই ঘরেই করুণাপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জায় মাথা কাটা যেত ইলার। বলত, 'কি দরকার? দুটো দিন যা হোক করে— কিন্তু ভবরানী ছাড়তেন না। বলতেন, 'চল বাপু চল। তোর মামার মত নাক ডাকে, ঘুম হয় না আমার।

ইদানীং আর আপত্তি করতো না ইলা, মুখখানা বেজার করে চাদর বালিশ নিয়ে ঠাকুমার পিছন পিছন গিয়ে দাঁড়াত ভাড়াটেদের ঘরের দরজায়। করবেই বা কি? একতলা এই বাড়িটার ছাদের সিঁড়িটা পর্যন্ত পড়েছে ওদের ভাগে। কাজেই ছাদে পড়ে থাকারও জো নেই। কিন্তু কটা দিনই বা? জগদীশের ছুটি অল্প, মাইনে অল্প, অথচ কর্মস্থল দূরে। কাজেই আসা মানেই যাওয়া আর যাওয়া মানেই অনেকদিন না আসা।

বাড়িতে থাকতো শুধু তিনটে মেয়ে-মানুষ!

তো বছর খানেক যা ভুগেছিলেন ঘরে পড়ে, নইলে ভবরানী একধারে মেয়ে এবং পুরুষ দুইয়েরই কাজ করতেন। কিন্তু শেষের একটা বছর—

চৌকি থেকে নামল ইলা।

পায়ের গাঁটগুলো মটমটিয়ে উঠল; জগদীশের নাকের শব্দ এখন আর কানে আসছে না। কিন্তু ঠাকুমার হতো। ইলা ভাবল, ঠাকুমা তো এই চৌকিটাতেই শুয়ে থাকতো! সারাদিন। অথচ ইলা চৌকি থেকে নামলেই বলতো, 'পাকাটির পারা পা চড়চড় খটখট করে, গায়ে একরত্তি মাসের বালাই নেই, জগা যে কি করে এ মেয়ের বিয়ে দেবে!'

ঠাকুমা ভাবত! ইলা দাঁতে দাঁত চেপে একবার মুখচে খাটের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'আর কারও দায় পড়েনি সে কথা ভাববার।'

আর একবার ভাবল, জগদীশ নাকি বারো মাস বিদেশে বিভুঁইয়ে কষ্টে কাটায়, এসে পর্যন্ত হাঁড়ি রাঁধা করতে হয়েছে বলে লীলা আপসোসে মরছে। বলছে, 'অশৌচ যাবে, মানুষও বাড়ি ছাড়া হবে। বারো মাস খাওয়ার কষ্ট দুটোদিন যে একটু রেঁধে বেড়ে পাঁচ রকম খাওয়াবো তার উপায় নেই।'

ইলা ভাবে—বারো মাস খাওয়ার কষ্ট হলে পেটে অত মাংস জমে কি করে মানুষের।

ভাবল, তারপর ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

দেখল মা উনুন ধরাচ্ছে।

মুখটা দেখা যাচ্ছে না, এক মুঠো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্ছে মুখের সামনে। সরে এল। 'মা' বলে ডাকতে ইচ্ছে হল না। আগে ডাকত, বরাবর ডাকে। ঘুম ভেঙে উঠে এসে অকারণেই 'মা' বলে ডাকে। আজ ডাকল না।

কিন্তু লীলাই ডাকল।

বলল, 'ইলু, উঠেছিস? কাঠের কুচি জেলে চায়ের জলটা চাপিয়ে দে দিকিন। আর দেখ, জুতোর সেলফের নীচে ঠোঙায় দুটো হাঁসের ডিম আছে, বার করে ভেজে ফেল। তোর বাপ এনে রেখেছে কাল চুপি চুপি। আহা, এসে পর্যন্ত তো আলোচালের পিণ্ডি গিলতে গিলতে প্রাণ গেল।'

লীলার আক্ষেপ শুনে মনে হতে পারে, যেন বিদেশবাসী মানুষটার ওই কষ্টকর আর অরুচিকর জিনিসটা গেলবার কথা ছিল না, যেন সুখে সাধে বেড়াতেই এসেছিল সে, নেহাৎ কোন একটা কারণে পড়ে—

কড়া একটা মন্তব্য মুখের আগায় এসে ছিল ইলার, সামলে নিয়ে নীরবে এগিয়ে গেল 'বাথরুম' নামক করোগেট টিনের ঘেরটায়।

লীলা বলল, 'চলে যাচ্ছিস, চায়ের জলের উনুনটা জ্বাললি না?'

ইলা তেতো গলায় বলল, 'হচ্ছে। অত তাড়াতাড়ি কী আছে? যিনি খাবেন তিনি তো এখনো নাক ডাকাচ্ছেন!'

লীলার ভুরু কুঁচকে ওঠে।

বলে, 'কথার ছিরি দেখ মেয়ের! যেন পাড়ার লোকের কথায় কথা বলছে!'

ইলা জবাব দিল না। চলে গিয়ে জলের কলটা খুলে দিল জোড়ে।

এইটুকু! শুধু এই সুখটুকু আছে! আসল কলটা, প্রথম কলটা ভাড়াটেদের ভাগে চলে যায়নি। এদিকেই আছে। জলটা প্রচুর পাওয়া যায়। আর জলই তো শান্তি, জলই তো জীবন।

কিন্তু শান্তিটাই বেশীক্ষণ দেয় কে?

লীলা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'আর কতক্ষণ সাবান মাখার বহর হবে? আর কারুর কাজ নেই?' ইলা উত্তর দেয় না। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে আসে, নিঃশব্দে রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙানো তারে ঝোলানো শাড়িটা সায়াটা টেনে নেয়।

অথচ আগে হলে উত্তর দিত।

অন্যদিন হলে উত্তর দিত।

এক কথার বদলে সাত কথা শুনিয়ে দিত।

কাপড় ছাড়বার জায়গা নেই।

ঘরে জগদীশ।

ধোঁয়ায় ধুন্ধুলোক দেড় হাত রান্না ঘরটাতেই ঢুকে পড়ল ইলা। আর মনে মনে ভাবল, ভাড়াটেদের বাড়িতে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে না, যাতে ওরা উঠে যায়? নিদেনপক্ষে ওদের অবস্থাটা হঠাৎ খুব ভাল হয়ে যাক না! নিজেদের বাড়ি করুক। চলে যাক দুখানা ঘরের মায়া ছেড়ে!

কিন্তু সত্যিই কি তাতে ইলার কোন সুরাহা হবে? 'এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে—'

তা হলে?

আচ্ছা ইলার একটা বিয়ে হয়ে যাওয়া কি সত্যিই এত অসম্ভব? খুব বিচ্ছিরী বিয়ে! কালো কুচ্ছিত তোতলা বোকা যা হোক বরের সঙ্গে। ইলা আপত্তি করবে না,

আলো তবু মিথ্যে নয়

বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনার এ-আঁধার দুর্নিরীক্ষ্য দুর্নিবার তবু
মনের কোথাও কিছু রোদ লেগে আছে সুদিনের।
এ কথা তো স্বপ্ন নয়, সোনালী রোদের ঋতু
ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে প্রাণ এই তো সেদিনও।
পৃথিবীর সব চেয়ে ঢ্যাঙা দূরবীনও
পাবে না সন্ধান তার; তবু জানি আজো
মনের কোথাও কিছু রোদ লেগে আছে সেদিনের।

যদিচ এ-অন্ধকার চট্‌চটে পিচের মতন
চোখে লেগে রয়েছে এখন
তবু এ আলোকস্বপ্ন, রৌদ্রের কিছু উষ্মা, আলোকিত মন—
কয়টি উজ্জ্বল কথা, মননের রশ্মি-বিকিরণ
—এ সব হয়নি বৃথা, বৃথা নয় সুদিনের স্মৃতিলেশ কোনো।
তাই তো এ-মনে কিছু রোদ লেগে রয়েছে এখনো।
চিরদিনকার সত্য অতঃপর হয় যদি হোক এ-আঁধার—
তথাপি বিশ্বাস করি আলোকের বার্তা নয় মিছে,
মিছে নয় রৌদ্রে দীপ্র স্মৃতি দুদিনের।

যেহেতু এ-মনে কিছু রোদ লেগে আছে সুদিনের।

হৃদয় জ্বলে

(রঁদো)

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

হৃদয় জ্বলে : প্রখর তাত :
বাতাসে ক্রুর সাপের দাঁত।
ডাইনে বাঁয়ে ঝড়ের শর,
অন্ধকার দৃষ্টিহর;
দুস্থ দিন, রিক্ত রাত।

আকাশ থেকে অকস্মাৎ
হবে সবুজ বৃষ্টিপাত।
জীবনে আশা কী দুর্মর!
হৃদয় জ্বলে :

তোমার দুটি আলোর হাত
আনবে ঘরে সুপ্রভাত!
দগ্ধ মাঠ অনুর্বর
ফেলবে ঝেড়ে শুকনো খড়;
ফলাবে সোনা নীল প্রপাত!
হৃদয় জ্বলে :

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা

অন্নদাশঙ্কর রায়

যেদেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বদলের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হলো প্রধানমন্ত্রী উ নু ও তাঁর দলের। তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম। কে বাধা দেবে? কিন্তু এর পরিণাম হলো অশুভ। শান কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবী উঠল আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এখনো লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জনগণ যদি কোনো দিন গণতন্ত্রের মর্যাদা দেয় তা হলে সেই সঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র থাকতে পারে না। কারণ গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্ম-কর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মার ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনো করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র, হলোই বা সেটা ফাসিস্ট শাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তানের বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এর উত্তরে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক? কারটা বেঠিক?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষা রূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারী কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। বলাবাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকের কাজকর্মের ভাষা। নিচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরো দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজীর প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারী ভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস-লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসীদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ পনেরটি, সেদেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটিমাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনে। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়-বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন

বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনেরো বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইস্যুতেই হবে।

হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটিমাত্র যুক্তি। অধিকাংশ লোক হিন্দী চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তান যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের আশঙ্কা জাগে। এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের

বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলাও কি দিতে পারিনে?

তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দীকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না। এমনি না মানার লক্ষণ চার দিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে দল যদি সব কটা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দীর প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা সহজ উপায়। যেমন হিন্দুর উপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। হিন্দী হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দী হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দী শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরেজীকে যারা বিদায় করবে তারা কি ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না?

হিন্দী যে ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে হিন্দী কি বুঝতে পারছে না যে, আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না? ভাগ করার নমুনা কি এই যে, হিন্দীই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর-সব আঞ্চলিক ভাষা? সব কটা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হবে। প্রতিযোগিতার বা পরীক্ষার ভাষা যদি হয় ইংরেজী, তা হলে আমাদের ন্যায়-বোধ যতখানি চরিতার্থ হয় হিন্দী হলে ততখানি হয় না। বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে হটাতে চাও? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত কর যে-ভাষা আমাদের ন্যায়-বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি যে-কোন ভাষা, অহিন্দীভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজীর মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দী চলে না সেখানেও ইংরেজী চলে। ইংরেজীর অধিকারে না থাকলে সেসব অঞ্চল হিন্দীর অধিকারেও আসত না। ইংরেজী নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংলণ্ড। তেমনি আরো অনেকগুলি সত্যেরও উৎপত্তি ইংলণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসন-ব্যবস্থা, সংবিধান, আইন আদালত, পার্লামেণ্ট, আর্মি নেভী, পুলিস স্কুল কলেজ, লেবরেটরি, রেল স্টীমার, ডাকঘর, ডাক্তারখানা ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও ট্রাম, বাস, মোটর—কোনটিই বা বিদেশাগত নয়? এমন কি কংগ্রেসও তো বিদেশী। হিন্দ, হিন্দু, হিন্দী।' এসবও তো বিদেশী ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশী পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। "রাজ ভবন" বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পালটে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী একটা বিকট হিন্দী নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটা টেলিফোন নামক বিদেশী একটা যন্ত্রই। বিদেশী বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজী। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল। এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরেজী শিখতে হবে। অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীতে কারো আপত্তি নেই। তাই যদি হলো তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালীরা জিতে যাবে, হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেইভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদ-বদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজীই থাকবে, ইংরেজী ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দীকেও অন্যতম মাধ্যম কর তবে বাংলাকেও করতে হবে, ওড়িয়াকেও করতে হবে, অসমীয়াকেও করতে হবে, তামিল তেলেগু কন্নাড়িগ মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দী ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজীই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম রূপে থাকুক। ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দু, মরাঠি, গুজরাতী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরোটি ভাষা। শুধু হিন্দী নয়। যেখানে হিন্দীকে বসালে অহিন্দীভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজীকে রাখাই সমীচীন। বিদেশী বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশী বলে শুধু হিন্দীকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবীকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর

কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দী আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে সেখানে হিন্দীর আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরেজী যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটি ভাষা। অন্য একটিমাত্র ভাষা। সেই বিদেশী নজিরের জোরে হিন্দীকেও একচ্ছত্র করতে হবে। কিন্তু বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদের নেই? বেলজিয়ানদের নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষ পর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায়, ইংরেজী হলো বিদেশীর ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ, তাই হোক। তা হলে ইংরেজীর নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব কটা ভাষাকেই হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়দেরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা —হিন্দী হলেও—কাজের কথা নয়। সবগুলি ভাষা সবগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপোস রফা না করি তবে অনীতিকতার সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

॥ ২ ॥

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তা হলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো। এরা যে যার সুবিধামতো এক একটা স্বদেশী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক স্বদেশী ভাষাকে। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দুর সার্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দী বা একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হতো। অত দূর যেতে হবে কেন?

ধরুন, ১৯৪৭ সালে যদি জিন্নাসাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যেতেন, যদি অখন্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তা হলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হতো, না একাধিক হতো? এক হলে সেই এক কি হিন্দী হতো, না হিন্দী উর্দুর যমজরূপে হতো? সকলেই জানেন যে একমাত্র হিন্দীর একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় সমস্ত ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো, নয় ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হতো।

দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দী ও অন্যদিকে উর্দু একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দুভাষী মুসলমানদের শাসন শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দুর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করেছে। আদর্শের জন্যে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনো কালেই মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশভাষী। জোরে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, শুধু পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দুভাষীরা যদি তাতে নারাজ হন, তবে রাষ্ট্র দু' ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দুভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হবে। আপসের আর কোনো উপায় নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, কিন্তু আপসের একমাত্র উপায়।

উর্দুর বিরুদ্ধে নয়, উর্দুভাষীদের প্রভুত্ব সনদের বিরুদ্ধেই পূর্বপাকিস্তানীদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দীভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষী, এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উল্টোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দীভাষীদের সংখ্যাধিক্য ও ভোটাধিকার উপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দী নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপসের আর কী উপায় আছে—ইংরেজীকে 'সহচর ভাষা'রূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে, দেশ বহুখন্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরী, কেরলী, বাঙালী, তামিল, অসমীয়া গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি, সেটা কিন্তু নির্বিরোধে দেশ চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায়, তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইস্যু যার একপ্রান্তে হিন্দীভাষীদের স্বার্থ, অপর প্রান্তে অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপসের প্রস্তাব। ওই 'সহচর ভাষা'। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশী বলে ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছা করলে ইংরেজীর বদলে বাংলা, তামিল, মারাঠি ইত্যাদি চোদ্দ পনেরটি ভাষাকে 'সহচর ভাষা' বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরো সহজ নয়, আরো জটিল।

'বিদেশী' এই বিশেষণটাই যদি হয়ে নাক্ট্যেগোড়া হয়ে থাকে, তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো 'আন্তর্জাতিক ভাষা' ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই বা বেখাপ হবে কেন? আগেকার দিনে বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেতো, ইদানীং স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ বলে দিয়েছে যে,

হিন্দীও ওদের পক্ষে বিদেশী। আমরাও তো দেখছি হিন্দী শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দীতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরেজীতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবীর কাছাকাছি নয়। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়।' এখানে 'কী' হলো কেন? 'কা' হলো না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। এমন কি সর্বনামকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে?

যাই হোক হিন্দী আমাদের দেশের সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' হে'কেছি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তা হলে বাধছে কোন্‌খানে? বাধছে এইখানে যে, ভারত যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দী ভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হওয়ামাত্র ভারতকে বলতে পারা যাবে হিন্দী রাষ্ট্র। তখন হিন্দী-ভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী তামিলভাষী পাঞ্জাবীভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির সদস্যেরা সর্ব-সম্মতিক্রমে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের মধ্যে তখনি দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষ ছিলেন হিন্দীর সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজীর। বলা বাহুল্য ইংরেজীর সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। শুধু বিদেশীর নয় বিজেতার ভাষা। ইংরেজীর সমর্থন করেছিলেন বলে, তাঁরা যে কম স্বদেশী বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোট দিয়ে দেখা গেল দু'পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দী ও ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সব ক'টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা। কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দী যদি সে রকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে, তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়। সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীর একটা নাম-ডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দী এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজীও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বলে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হবে।

লোকমুখে হিন্দীই থেকে যাবে একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারী ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরেজী না হয়ে উর্দু কিংবা তামিল হতো তাতেও হিন্দী গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরেজীকে যেমন তাঁরা 'বিদেশী' বলে অপাংক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না। হলোই বা সে স্বদেশী।

॥ ৩ ॥

হিন্দী থাকছে, ইংরেজীও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দীতে চান তাঁরা হিন্দীতে ভাববিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরেজীতে চান, তাঁরা ইংরেজীতে। যদি বিনিময় করবার মতো ভাব থাকে। যদি সে রকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাববিনিময় হয় না? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দুতেও।

গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতেই ভাববিনিময় করতেন, কিন্তু জীবনের শেষদিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালীতে ফিরে বাংলায় ভাববিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্য তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি উর্দুতেও কথা বলতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে কথা বলেছেন ১৯৪৫ সালে। ভাববিনিময় একটি-মাত্র ভাষায় হবে—হিন্দীতে—এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজীর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক [illegible] যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, [illegible] ভাষায়, বলুন তো? ইংরেজীতে!

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুণ বচসা বেধে গেল। খোঁপায় আর [illegible] নয়, পাঞ্জাবীতে আর হিন্দীতে। তামাশা এই যে, দু'পক্ষেরই বাকযুদ্ধ বাহিত হলো উর্দু সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হলো উর্দু। মনে আছে ছেলেবেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুস্থির। হিন্দী নয়, ইংরেজী নয়। উর্দু। যেখানে উর্দু উভয়ের জানা সেখানে ভাববিনিময়ের ভাষা উর্দু হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে যিনি যাই পড়ুন না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বাতচিৎ হয় উর্দুতেই।

সরকারী ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দুতেই পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেকখানি লক্ষ্য করেছি।

তেমনি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজীর কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজীকে উচ্ছেদ করতে পারবেন না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে। লোকে চায় হাই স্কুল। টোল নয়, মাদ্রাসা নয়, বনিয়াদী নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজীর কাজ হবে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা। সে কাজ হিন্দীর দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে। সে প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতো তা হলে আমরা কেউ ইংরেজীকে সরকারী ভাষা বা তার সহচর করতুম না। [illegible] খারিজ করত সেন্টিমেন্ট। বাংলাভাষাই হতো রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরোতো না। লোকে ইংরেজীকে চাইত বাংলার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। সৃষ্টির ও সমালোচনার আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজীর যুগ যায়নি। হয়তো আর শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজী যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড় লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় [illegible], খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিবেকহীন, সেই জন্যেও বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায় তা হলে অর্ধশতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে? ইংরেজী যদি বাংলাকে বা হিন্দীকে এগিয়ে নিতে না পারে তবে ইংরেজীর অবস্থানকাল আধ শতাব্দীও নয়। আরো আগে তার উপর থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজী শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজী যে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে এটা আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পস্তাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পস্তানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারীর ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজী শেখে। বাঙালীর ছেলেরা ফাঁকি দেয়।

ইংরেজীর পেছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দীর এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দীর অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দুকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দী লেখা যায় না, ছাপা যায় না? রোমক লিপিতে ছাপা হলে হিন্দী বই কাগজ আরো চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালীরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দী বই কাগজ

ধরলো ছিন্ন চিন্তার ফাঁক দিয়ে। গোমতীর উত্তর দিকে সে আসেনি, এ দিকটা তেবোক তার অপরিচিত। দক্ষিণ দিকে ফিরে দেখলো লক্ষ্ণৌ শহরের মিনার মসজিদ মঞ্জিলের শেষ চিহ্নটুকু কখন মিলিয়ে গিয়েছে। আর অর্জুন নিম হরতকি বনের মধ্যে দিয়ে সোজা উত্তরে চলেছে তার পথ। কাছেভিতে কোথাও একটা চটি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে করতে চলতে লাগলো সে।

তিনদিন তিন রাত অতিবাহিত হ'য়েছে তার পথে। দুপুরবেলা চটি পেলে ভালো নতুবা গাছের তলায় বিশ্রাম করে, সন্ধ্যাবেলা খুঁজে নেয় একটা চটি, অভাবে গৃহস্থের বাড়ি। গৃহস্থের বাড়িতে চটির স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, তবে প্রচুর আদর যত্ন পাওয়া যায়, পয়সাও লাগে না। এ কয়দিনের মধ্যে শহর বলতে কিছু তার চোখে পড়েনি, যেসব গ্রাম চোখে পড়েছে তাদেরও নিতান্ত লক্ষ্মী-ছাড়া চেহারা। লক্ষ্মীশ্রীর অভাবের কারণ সে এখন বুঝতে পারে, দেশের সমস্ত শ্রী চোলাই হ'য়ে গিয়ে লক্ষ্ণৌ শহরকে মণ্ডিত করেছে হিন্দুস্থানের বিলাস-পুরীতে। জনপদ ক্রমেই বিরলতর হ'য়ে আসছে। চাষের ক্ষেত বাদ দিলে সমস্ত ভূখণ্ড শাল মহুয়া অর্জুন নিম মহানিমে আচ্ছন্ন। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। পথে লোক চলাচল কম, মাঝে মাঝে টাটু ঘোড়ার সোয়ার বা দু'একখানা একা গাড়ি। সে ভেবে পায় না লোক চলাচলের অভাব এদিককার স্বাভাবিক অবস্থা, না কোন বিশেষ কারণ আছে? বিশেষ আর কি থাকবে ভাবে সে। এই সময় পথ চলার জীবনে আর একটা অভিজ্ঞতা ঘটলো, ঐ আফিঙগোলা লুটের মতোই, তবে তার চেয়ে অনেক বড়। সেই ঘটনার সংগে মন্তব্য মিলিয়ে নিয়ে খানিকটা বুঝতে পারে দেশের অবস্থা জীবনলাল।

॥ ৫ ॥

খাজনা আদায়ের চিরন্তন পদ্ধতি

নিতান্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে সন্ধ্যারাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল জীবনলাল। অনেক রাতে যখন তার ঘুম ভাঙলো খুব খিদে অনুভব করলো, মনে পড়লো চাপাটি তৈরি করতে দেরি আছে দেখে শুয়ে পড়েছিল, সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়েছে। উঠে আলো জ্বালিয়ে দেখলো যে চটির যে চাকরটিকে চাপাটি তৈরি করতে বলেছিল, সে খানকতক চাপাটি কিছু ভাজি আর এক লোটা জল রেখে গিয়েছে। মুখ ধুয়ে চাপাটিগুলো খেয়ে, পেট-ভরে জলপান করে আলো নিবিয়ে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লো। এবারে আর ঘুম আসে না, না আসবার কারণও আছে, বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। ঘুম এলো না তবে বন্যার বেগে এলো সারাদিনের ঘটনার স্মৃতি। সারাদিনে যা এলোমেলোভাবে ঘটে গিয়েছে এখন তা গুছিয়ে মনের মধ্যে সাজাতে চেষ্টা করলো। বুঝতে পারলো যে সেদিনের আফিঙের গোলা লুট আর আজকের কোম্পানীর তহসিলদারের খাজনা আদায়ের পদ্ধতি এক সূত্রে গাঁথা। নবাব সরকারের দুর্দান্ত তহসিলদার রঘুবীর সিং এর কাহিনী সে অনেকবার শুনেছে। কোন তহসিলে দীর্ঘকাল অনাদায়ী থাকলে নবাব সরকার থেকে রঘুবীর সিং-এর উপরে ভার দেওয়া হ'তো। নবাবী ফৌজ সংগে করে গিয়ে সে চড়াও হ'তো তালুকদারের কেল্লার উপরে। এ একটা রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ। পরাজিত না হ'লে কেউ উপুড় হস্ত হ'তো না। যা আদায় হ'তো তা থেকে প্রথম খরচ খরচা বাদ যেতো, তারপরে ভাগ ভাগি হ'তো উজির নাজির তহসিল-দারের মধ্যে, টাকায় ছ' আনার বেশী জমা পড়তো না নবাব সরকারে। তারপরে যখন রঘুবীর সিং-এর নিকাশের তলব হ'লো তখন সে কেঁচো খুঁড়তে সাপ, সাপ খুঁড়তে কেন হয়েছে? নিকাশ দিতে গেলে ফিরে কেঁচো হ'তে হয় সেই সংগে দিতে হয় গর্দান। কাজেই সে নবাবের রাজত্ব ছেড়ে কোম্পানীর রাজত্বে সরে পড়লো। নবাবের তহসিলদার হওয়ার কেউ রঘুবীর সিং বিপদের আশংকায় সবাই সরে পড়েছে, যে পারেনি সে ধনেপ্রাণে মারা পড়েছে। এ সব ছিল নবাবী আমলের

কথা। কিন্তু কোম্পানীর আমলেও যে পুরানো রীতি চলছে ভাবতে পারেনি সে।

গাঁ-টার নাম বন্দীপুর। কাছে আসতেই দেখলো যে একটা মাটির কেল্লাকে ঘিরে দুই পক্ষে রীতিমতো বন্দুক চলছে। তার মনে হ'ল এদের কোন ঘরোয়া হাঙ্গামা হবে, দুই তালুকদারের মধ্যে এমন তো হ'য়েই থাকে। এগিয়ে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময়ে দেখতে পেলো ই'দারার ধারে ব'সে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লোটা মাজছে।

জীবন শুধালো পাঁড়েজি ব্যাপার কি, কিসের হাঙ্গামা।

পাঁড়েজি তাকে 'ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে বলল, ও কথা ছেড়ে দিন সাহেব।

তবু শুনি না কী হচ্ছে। তালুকদারদের লড়াই নাকি?

পিতলকে ঘ'সে ঘ'সে সোনা করা যায় কিনা পরীক্ষায় রত বৃদ্ধ বলল আপনার আধা অনুমান সত্য, এক পক্ষে তালুকদার।

আর এক পক্ষে? শুধায় জীবন।

মুলুকদার।

বুঝতে না পেরে জীবন বলে সে আবার কে?

কোম্পানীরাজ।

কোম্পানীর সঙ্গে লড়াই! সে আবার কি? চমকে ওঠে জীবনলাল।

জীবন নীরব। বৃদ্ধ লোটা মেজে চলে।

কিছুক্ষণ পরে জীবন বলে লড়াইটা কি নিয়ে?

এবারে তত্ত্বদর্শী বৃদ্ধ যে উত্তর দেয় তা 'পৃথিবীর ইতিহাস' নামে যদি কোন মহাগ্রন্থ থাকে তবে তার মলাটের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য। সে বলে চিরকাল যা নিয়ে লড়াই হয়ে আসছে জরু আর গোরু।

জরু তো বুঝি গোরু এলো কোত্থেকে? গোরু বুজলেন না সাহেব, জিনকো গোধন বোলতা! তারপরে বৃদ্ধ বলে, সংস্কৃতে যাকে বলে কামিনী কাঞ্চন। লড়াই তো এই দুই নিয়ে। আর কি নিয়ে কবে লড়াই হ'য়েছে বলুন বাবু সাহেব, রামায়ণ, মহাভারত সব তো এহি।

তবে কি খাজনা আদায় করতে এসেছে কোম্পানীর তহসিলদার।

এবারে ঠিক সমঝেছেন, সাহেব।

কিন্তু খাজনা দেয় না কেন?

কেন দেবে। তালুকদার বলে তালুক তার লাখেরাজ, নবাব সরকারে আদলা কড়ি নেহি দিয়া। কোম্পানী দলিল দেখতে চায়। এত বয়স হ'ল এমন অদ্ভুত কথা তো কখনো শুনিনি। দলিল আবার কি? নবাবের জবান দলিল।

অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যা বলল সে কথাও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের' উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা আবশ্যক।

সে বলল, সাহেব, এ হচ্ছে শ্রুতি স্মৃতির দেশ। বেদবেদান্ত পুরাণ ষড়দর্শন সমস্তই তো মুখের কথা আর কালের স্মৃতি। বলুন সাচ বাৎ কিনা? বেদব্যাসের ভিটার কি দলিল ছিল, না গৌতম মুনির দস্তাবেজ ছিল। দলিল দস্তাবেজ পাট্টা কবুলিয়ত সব তো এসেছিল মুসলমানদের সঙ্গে তবু নবাব দলিল দস্তাবেজ দেখতে চায়নি। মুসলমান হ'লে কি হবে হিন্দুরীতি মান্য ক'রে চলতো। আজ শালা কোম্পানী দেখতে চায় দলিল।

না, পিতল সোনা হওয়ার নয়। লোটা ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো বৃদ্ধ।

আজ সকালে কোম্পানীর দুটো বরকন্দাজ জখম হয়ে গিয়েছে। জৈস করনী বৈসী ভরনী।

তারপরে জীবনের উদ্দেশ্যে বলল ওদিকে যাবেন না সাহেব, আপনার কাজে যান।

জীবন বুঝলো সেই ভালো, সে রওনা হ'তে যাচ্ছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ তাকে ডেকে বলল, দেখবেন সাহেব, কোম্পানীরাজ দুদিনে ফোত হ'য়ে যাবে। শালা আফিংখোর সরকার।

জীবনলাল শুনলো আফিঙখোর। বলল আফিঙখোর! আফিঙ খায় কে?

সবহি খায়। বয়স হ'লে আপনি

...বেন। শালা আফিঙচোর সরকার।

তারপরে আফিঙচোর সরকারের বাপান্ত ফউত্ত কামনা করতে করতে বৃদ্ধ রওনা ...ল গাঁয়ের দিকে। দুই পক্ষে তখনো জোর ...ড়াই চলছে।

দেখো বাবা উপকার করবার ইচ্ছাটাই সব ...য় উপকার করবার পন্থাটা জানাও ...াবশ্যক।

ভৈরবের কথার উত্তরে জীবন জানায় ...বাবী আমলে এ রাজ্যে বিচার ছিল না, ছিল ...ত্যাচার আর অন্যায় আর জুলুম। নবাবের না ছিল উপকার করবার ইচ্ছা না ছিল শক্তি, না ছিল পন্থার জ্ঞান।

তবু তো লোকে নবাবকে ছাড়তে চায়নি। অত্যাচারী ওয়াজিদ আলী শার লক্ষ্ণৌ ত্যাগের দৃশ্য তো দেখেছো।

ওটা সাময়িক দুঃখ। সাপে কাটা আঙুলটা কেটে ফেলতেও দুঃখ হয়। সেই রকম দুঃখ।

সাময়িক দুঃখ বলি কি রকমে? এ রাজ্যে এত অত্যাচারই যদি হবে কই লোকে তো রাজ্য ছেড়ে কোম্পানীর মুল্লুকে গিয়ে বাসা বাঁধেনি।

কিন্তু উল্টো পক্ষে এ কথাও তো বলা যায় যে কোম্পানীর রাজত্ব হওয়ায় সবাই যদি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, কই তার চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না। লোকে তো বিদ্রোহ করছে না।

আজ করছে না বলেই কাল করবে না, কোন কালে করবে না এমন নয়।

কাকাবাবু, রঈস লোকে, তালুকদারে, ফৌজের কর্নেল জেনারেলরা অসন্তুষ্ট হতে পারে, সাধারণ লোকে সুখেই আছে।

বাবা সবচেয়ে দুঃখ সাধারণ লোকেরই। তাদের দুঃখের কারণ।

কোম্পানী যে আফিঙে হাত দিয়েছে। আফিঙের উপরে ট্যাক্স বসানোয় রাজ্যের প্রত্যেক গরীব গুর্বো চাষী ভুষোর ঘরে অসন্তোষ আঙুলে গলিয়ে দিয়েছে। আফিঙ আর নুন গরীবের দুই সম্বল। এ দেশে অন্ন কেড়ে নিলে লোকে এমন অসহায় বোধ করে না, উপবাসে এরা অভ্যস্ত: বস্ত্র কেড়ে নিলেও অসহায় নয়, বিভূতি মেখে লজ্জা নিবারণ করে। কিন্তু আফিঙ। গৃহীর আফিঙ সন্ন্যাসীর গাঁজা—এ দুই যেন কোন রাজা স্পর্শ না করে।

আর নুন।

নুনের উপরেও এরা বসাবে ট্যাক্স। এ কথা জেনো বাবা কোনকালে কোম্পানীর রাজত্বের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ করবার দরকার হয় তবে নুন নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সবাই আফিঙ খাবে এটাই কি ভালো?

ভালো নয়। কিন্তু সবাই যদি আফিঙের ট্যাক্সকে মন্দ ভাবে তবে মন্দ বলেই ধরে নিতে হবে। ঐ যে বললাম উপকার করবার ইচ্ছাটাই সব নয়—পন্থাটাও জানা আবশ্যক। আবার দেখো, হিন্দুস্থানের কি গরীব কি রইস আদমি লাখেরাজ, দেবত্র, ব্রহ্মত্র, পীরত্রে অভ্যস্ত। কোম্পানী রাজত্ব পেয়েই দলিল দাবি করে বসলো। এ দেশের রাজার জবান যে সবচেয়ে বড় দলিল। এরা দলিল দেখাবে কেমন করে।

তাই বলে বিনা স্বত্বে ভোগ করবে।

কার জিনিস ভোগ করছে বলো।

যার জিনিসই ভোগ করুক খাজনা না পেলে কোম্পানীর চলবে কি করে?

নবাবের চলতো কি করে?

নবাবের চলতো জুলুম করে।

জুলুম তো এক রকমের নয় বাবা। এই যে ধরো এক কলমের আঁচড়ে নবাবের ফৌজের পঞ্চাশ হাজার সিপাহীকে বরখাস্ত করে ফৌজ ভেঙে দেওয়া হল। এ কি কম জুলুম! বেকার সিপাহীর মতো ভয়ানক বস্তু আর নাই রাজ্যের পক্ষে। প্রত্যেকে একটা চলন্ত কামান।

এ কথা কি সাহেবরা বোঝে না? কেউ কেউ বোঝে, সবাই বুঝবে এমন ভরসা করা উচিত নয়। তবে বলি শোনো। উট্রাম সাহেব বিদায় নিচ্ছেন, স্যার হেনরি এসেছেন চীফ কমিশনার পদ গ্রহণের জন্যে। খাস কামরায় দুজনে কথা হচ্ছে। আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি, উট্রাম সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, খবর হলেই ভিতরে ঢুকবো। সাহেবদের মধ্যে কথা চলছে, আমার কানে আসছে কথার টুকরো। উট্রাম বলছেন, স্যার হেনরি তোমাকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে রেখে যাচ্ছি বলে দুঃখিত।

স্যার হেনরি শুধোলেন বিপদটা কিসের?

কিসের নয়। বললেন উট্রাম। বললেন একটি সদ্যপ্রোথিত বিষবৃক্ষের ভার তোমার উপরে দিয়ে চললাম।

বিষ বৃক্ষ! চমকে উঠলেন স্যার হেনরি? তারপরে বললেন কেন?

নবাবের ছিল ষাট হাজার সৈন্যের ফৌজ। তার পনেরো হাজার মাত্র রেখে বরখাস্ত করা হয়েছে প'য়তাল্লিশ হাজার সিপাহীকে। এদের রুজিরোজগার গেল, নবাবী ফৌজে থাকতে লোকচক্ষে এদের যে মান সম্ভ্রম ছিল তাও গিয়েছে। এই বেকার সিপাহীদের প্রত্যেকে কোম্পানীর উপরে অসন্তুষ্ট।

স্যার হেনরি বললেন, এত বড় ফৌজ রাখবার তো কারণ নেই। তাছাড়া কোম্পানীর নিজেরই আছে হাজার হাজার সিপাহী।

সেটাও বিপদের আর একটা মস্ত কারণ।

কেন বলো তো।

উট্রাম বললেন কোম্পানীর ফৌজের অধিকাংশ সিপাহী, যাদের বলা হয় পুরবিয়া, এই অযোধ্যা রাজ্য থেকে সংগৃহীত। পঁয়তাল্লিশ হাজার সিপাহীর এরা সবাই kinsman। এদের অসন্তোষ কোম্পানীর ফৌজের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে বাধা। দুই পক্ষের মধ্যে চালাচালি হয়েছে এমন অনেক চিঠি আমার হাতে এসেছে যা থেকে বুঝতে পেরেছি, ওদের নোকরি গিয়েছে আমাদেরও থাকবে না—এ সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে সকলেরই মনে।

স্যার হেনরি সমর্থন জানিয়ে বলেন, এমন হয়ে থাকলে বিপদের কথা বটে।

বিপদের উপরে বিপদ আবার ঐ accursed চর্বি মাখা কার্তুজের ব্যাপার।

ওটা অবশ্যই Fiction!

অবশ্যই Fiction! স্যার হেনরি তুমি অভিজ্ঞ লোক, তোমাকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। বহুজনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই Fiction স্থান গ্রহণ করে Fact-এর। বিচারে নামলে প্রমাণ হবে যে চর্বি মাখানো কার্তুজ mare's Nest-এর মতো অসম্ভব। কিন্তু বিচারে বসছে কে? অবিশ্বাসের হাওয়া উঠেছে, আগুনে কত-

দূরে ছড়াবে কে জানে! সেইজন্যেই প্রসন্ন মনে বিদায় নিতে পারছি না। তবে ভরসা এই যে, তোমার মতো বিচক্ষণ কাণ্ডারীর হাতে ভার দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ভৈরব চাটুজ্জ্যে থামলে জীবন বলে, আচ্ছা কাকাবাবু, জেনারেল উট্রাম আর স্যার হেনরি দুজনেই প্রধান রাজপুরুষ। এ'রা যখন বিপদ বুঝেছেন তখন প্রতিকার করেন না কেন?

বাবা এ নবাবী মুল্লুক নয়। নবাব বললেন উসকো শির লাও। গেল মানুষটা। আবার নবাব বললেন উসকো তালুক দো। হ'ল সে তালুকদার। নবাবের ইচ্ছাধীন নবাবী শাসন।

আর কোম্পানীর শাসন?

ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্থান নাই তাতে, সমস্তই আইনের অধীন। এ'রা যত বড়ই হোন, একক কিছু করবার ক্ষমতা নেই এ'দের। তুমি তো ইংরাজী পাটীগণিত পড়েছ। সি'ড়ি ভাঙা অঙ্ক মনে পড়ে? ধাপে ধাপে উঠতে হবে, এক ধাপ ডিঙিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। গাঁয়ের চৌকিদারটা থেকে বড়লাট অবধি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। ধাপ ডিঙোতে গেলে কি, ভুল করলে।

জীবন বলে, তবে তো ধাপ উঠতে উঠতেই কেল্লা ফতে।

কেল্লা ফতেই হোক আর কেল্লা গড়াই হোক ধাপ ডিঙোবার উপায় নেই।

কত কথা মনে আসে জীবনলালের। আশ্চর্য হয়ে যায় এমন ক'রে কে এগুলো সাজিয়ে রেখেছিল মনের মধ্যে। চিন্তার জোয়ারের বেগে ঘুম পালিয়েছে, গরম লাগে, পিরান খুলে ফেলতেই গলায় দুলে ওঠে রুপোর সরু শিকলিতে বাঁধা সোনার তক্তিটা। এটার কথা এ কয়দিন ভুলেই গিয়েছিল, চমকে ওঠে সে। চিন্তার ধারা আবার বইতে শুরু করে নূতন খাতে।

॥ ৬ ॥

তুক না-তাক

জীবন উঠে ব'সে বাতি জ্বালায় তারপরে গলা থেকে তক্তিটা খুলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে, না জানি কি রহস্য আছে এর মধ্যে নিহিত। এক ইঞ্চি চওড়া, দু ইঞ্চি লম্বা, পুরুত্বে আধ ইঞ্চির কম তক্তিটার দু'দিকেই আগাগোড়া সূক্ষ্ম কাজ করা পাতলা সোনার পাতে মোড়া, একদিকে বাংলা অক্ষরে খোদাই করা "২৩শে আগস্ট, ১৮৫৭ সাল", ভালো ক'রে দেখলে তবে নজরে পড়ে। ছোট ছেলেদের গলায় অনেক সময়ে যেমন তক্তি ঝুলিয়ে দেয় বাইরে থেকে দেখতে সেইরকম। ভিতরে কী আছে ভাবে জীবন। লখনৌ থেকে বিদায়ের ঠিক পূর্বে যখন সে ভৈরব চাটুজ্জেকে প্রণাম করতে গেল, ভৈরব বললেন, একটু বসো বাবা। এই বলে তিনি শয়নগৃহে গিয়ে সিন্দুক খুলে বের ক'রে নিয়ে এলেন তক্তিটা, বললেন গলায় পরো। এই বলে নিজেই গলায় রুপোর শিকলি এ'টে দিয়ে বুকের উপরে দুলিয়ে দিলেন।

জীবন ভাবলো এটা বোধ হয় রক্ষাকবচ জাতীয় কিছু হবে, অনির্দেশের মুখে বের হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন পিতৃস্থানীয় গুরুজন পরিয়ে দিলেন গলায়। সময়োচিত কিছু বলা কর্তব্য মনে ক'রে জীবন বলল, ভালই হ'ল, যে পথে বের হচ্ছি সঙ্গে দেবতার আশীর্বাদ থাকা ভালো।

একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে ভৈরব বললেন, হ্যাঁ, দেবতার আশীর্বাদ বইকি, সকল দেবতার বড়।

খট্‌কা লাগে জীবনের মনে।

ভৈরব বলেন, তোমার পিতার মৃত্যুর সময়ে তুমি কাছে ছিলে না। সময় হ'য়ে এসেছে বুঝতে পেরে নবীন বলল, ভৈরব, জীবনকে আসতে লিখেছ বটে, কিন্তু বোধ হচ্ছে, এসে পৌঁছবার আগেই আমাকে যেতে হবে। বলল, আমার স্থাবর অস্থাবর যা আছে তুমি সব জানো, তাকে বুঝিয়ে দিয়ো। আর নিজ হাতে তাকে এইটি দিয়ো—এই বলে বালিশের তলা থেকে বের করলো তক্তিটা। তারপরে একটুখানি মৃদু হেসে, নবীনের সেই হাসিটা তুমি পেয়েছ, মন্তব্য করলো, কখন ডাক আসে কে বলতে পারে, তাই হাতের কাছেই সর্বদা রেখেছি। এই বলে আমার হাতে তুলে দিল তক্তিটা।

অধীর কৌতূহলে জীবন জিজ্ঞাসা করলো, কাশী থেকে দু' বছর হ'ল এসে পৌঁছেছি, এতদিন কেন দেন নি কাকাবাবু?

তারপরে বলল, রাগ করবেন না কাকাবাবু, বাবার হাতের শেষ দান কিনা তাই বলছি।

রাগ করবো কেন বাবা। এমন ভাবা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এতদিন না দেওয়ার কারণ অবশ্যই আছে। এ দু'বছর কাছে কাছেই ছিলে তাই দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। আজ বিদায় নিচ্ছ বলে দিলাম, নতুবা আরো কিছুদিন না দিলেও চলতো।

রহস্য ঘনতর হয় জীবনের মনে, শুধোয় বাবা কি দেওয়ার তারিখ বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন।

দেওয়ার তারিখ নয়, এটা খোলবার তারিখ, এই বলে তিনি তক্তিটা উলটিয়ে তুলে ধরেন তার চোখের সম্মুখে, শুধান, দেখতে পাচ্ছ কিছু?

কই, না।

খুব ঠাওর করে দেখো তো।

এবারে জীবন বলে, হাঁ, কি যেন লেখা রয়েছে, বাংলা অক্ষর বলেই মনে হচ্ছে।

ঠিকই ধরেছ, বাংলা অক্ষরই বটে।

জীবন পড়ে ফেলে, "২৩শে আগস্ট, ১৮৫৭ সাল।" তারপরে শুধোয় হঠাৎ, এ তারিখটার অর্থ কি?

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবীন বলল, ওটা জীবনের জন্ম তারিখ।

ভৈরবের কথায় বাধা দিয়ে জীবন বলে ওঠে, আমার জন্ম তারিখই তো বটে, বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি, তিনি সর্বদা ইংরেজী সব তারিখ ব্যবহার করতেন।

ঠিকই শুনেছ। আমি ভাবলাম, তক্তিটা বুঝি জন্মদিনের আশীর্বাদ। বললাম, বেশ তাকে দেবো।

নবীন বলল, শুধু দিলেই চলবে না, বলো যে ঠিক ঐ তারিখে তক্তিটা ভেঙে ভিতরে যে কাগজ আছে সেটা যেন পড়ে। আমার নিজের হাতের লেখা। শুধোলাম, কী আছে জানতে পারি কি? সে বলল, সে কথা আর শুধিয়ো না, সেটা শুধু জীবনের জানার জন্যই। বলল, পাছে ভুল হয় তাই খোদাই করে দিয়েছি, ঐ তারিখে জীবনের বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ হবে। বলল, পড়া হলে কাগজ টুকরো যেন ছিঁড়ে ফেলে দেয়—আর সোনাটুকু রেখে দেয় যেন যখন বিয়ে করবে বউয়ের গলে গড়ে দিলে খুশী হব। ভাবলাম, অবসর মতো আর একবার ভালো করে শুধিয়ে ভিতরের রহস্য জেনে নেবো। কিন্তু হঠাৎ সেই রাত্রেই তার ডাক পড়লো। শেষ রাতে তুমি এসে পৌঁছলে মাতুলালয় থেকে।

জীবন স্তব্ধভাবে বসে থাকে, সেই শোকাবহদৃশ্য আর একবার অভিনীত হয়ে চলেছে তার মনে।

ভৈরব বলে, ভেবেছিলাম তক্তিটা যখন খুলবে তখন জেনে নেব কী লেখা আছে। কিন্তু দেখছি তা হয়ে উঠল না। এটাকে সর্বদা সযত্নে রক্ষা করবে, গলায় ঝুলিয়ে রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ। তারপর পিঠের উপরে বাঁধা ফৌজী থলিটাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, ও তোমার থলি ঝুলি আদৌ নিরাপদ নয়। পথে ঘাটে চোর ছ্যাঁচড়ের দৃষ্টি সকলের আগে পড়বে ঐ তোমার থলির দিকে। দেখো, বাবার কথার যেন অন্যথা না হয়—এই বলে তিনি প্রণত জীবনকে আশীর্বাদ করলেন।

জীবন প্রণত অবস্থাতেই বলল, বাবার, আপনার কারো কথার অন্যথা হবে না নিশ্চয় জানবেন।

তখন দু'জনেরই মনের যে অবস্থা অধিক কথা বলবার উপায় ছিল না কারো। চোখের জলে মেয়েরা সুন্দর, পুরুষে বিরত।

কিন্তু বেশি ভাববার সময় থাকে না, ভোর হয়ে আসে, যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। হাত মুখ ধুয়ে দাম চুকিয়ে দেয়। তারপরে পোশাক পরে ফৌজি থলিটা পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে, তাতে ভরে নেয় খানকতক চাপাটি আর একটু গুড়। স্যার হেনরি লরেন্সের দেওয়া পিস্তলটা পেটির মধ্যে ভরে কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধে, হাতে নেয় পাকা বাঁশের লাঠিখানা, চটিদারকে সেলাম জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে জীবনলাল। এ হচ্ছে গিয়ে তার নিয়মিত উদ্যোগপর্ব—কদিন এই একভাবে চলছে।

চটিদারের কাছে খবর সংগ্রহ করেছে আর দিন তিনেকের মধ্যেই বেরিলি পৌঁছানো যাবে। চটিদার লোকটি বেশ মোটা সোটা গোলগাল, চটিদারের যেমন চেহারা হওয়া উচিত তেমনি। সকলেরই আস্থাভাজন। সংসারে মোটা লোককেই সকলে সহজে বিশ্বাস করে, ওদের ভরা পেট কিনা, ঠকিয়ে নেবার প্রয়োজন কম।

চটিদার শুধিয়েছিল, বেরিলিতে কেন সাহেব? আপন লোকজন আছে?

কর্নেল রিজম্যানের কথাটা চেপে গিয়ে বলল, সাহেব, কোম্পানীর ফৌজে চাকুরির আশায় যাচ্ছি।

কোম্পানীর ফৌজে! তার বিস্ময় চাপা থাকে না, বেরিয়ে পড়ে ঐ দুটি শব্দে। আবার বলে, কোম্পানীর ফৌজে!

তার বিস্ময়ে বিস্মিত হ'য়ে জীবন শুধোয়, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর কি? কোম্পানীর ফৌজের মতো সুখের চাকুরি আর কোথায় আছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। তার চেয়ে বরঞ্চ—

কথাটা শেষ করে না, এদিক ওদিক তাকায়।

জীবন শুধোয়, তার চেয়ে বরঞ্চ কি বলুন।

চটিদার সে কথার মধ্যে না গিয়ে বলে, সাহেব, আপনাকে দেখে তো রঈস আদমি মনে হচ্ছে, আপনাকে বলাতে আর ক্ষতি কি —এই বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে কুলুঙ্গি থেকে চারখানা ছোট ছোট চাপাটি বের করে।

জীবন বলে, আমি তো খান আষ্টেক চাপাটি নিয়েছি, আমার আর দরকার নেই।

সাহেব, এ খাওয়ার জন্যে নয়, সামনের গাঁয়ে পৌঁছে দেবার জন্যে।

কাকে পৌঁছে দিতে হবে? আমি তো কাউকে চিনি না।

সে আপনাকে চিনে নেবে।

তা কেমন ক'রে সম্ভব? আমি না চিনলে সে চিনবে কেমন ক'রে?

বাৎলে দিচ্ছি সাহেব। গাঁয়ে ঢুকলে যদি কোন লোক আপনাকে দেখে বলে ওঠে "জিন ঢুঁড়া তিন পাইয়াঁ, গহরে পানি পৈঠ" আপনি তার উত্তরে দোঁহার বাকি ছত্রটা বলবেন

"মাঁয় বৌরি ঢুঁড়ণ গয়ী,
রহী কিনারে বৈঠ।"

অমনি দু'জনে জানপহচান হয়ে যাবে। তখন সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, "দো চার"। আপনি তখন চাপাটি চারখানা তার হাতে দিতে দিতে বলবেন, "হাম নাচার।" চাপাটি দিয়েই জোর কদমে হেঁটে চলে যাবেন, পিছনে তাকাবেন না, কিংবা সে গাঁয়ে বিশ্রাম করবেন না।

জীবন অবাক হ'য়ে যায় ব্যাপারটা শ্রনে, বুঝেতে পারে না রহস্য। তখনি অবশ্য মনে পড়ে যে, গ্রামাঞ্চলে এইভাবে বেমার চালান দেওয়ার একটা তুক প্রচলিত আছে বটে। শুধোয়, আপনাদের গায়ে কি বীমার আছে?

চটিদার বলে, বড় ভারি বীমার সাহেব। এই বলে একটু মুখ টিপে হাসে, সেটা জীবনের চোখ এড়িয়ে যায়।

তখন চটিদার ছড়াটা বার কয়েক আবৃত্তি করিয়ে মুখস্থ করিয়ে দেয় জীবনকে, সতর্ক ক'রে দেয়, সাহেব চাপাটি দিতে ভুলে গেলে, বীমার আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে, হুঁশিয়ার থাকবেন, ভুল যেন না হয়।

ভুল হবে না জানিয়ে রওনা হ'য়ে যায় জীবন। চটিদার বলে, এই ভগেলু, কে গেল জানিস? ভগেলু আটা ঠাসতে ঠাসতে বলে, একটা আদমি।

চটিদার একটা সরু পালক দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বলে, একটা গদ্দা।

কর্তব্যনিষ্ঠ ভগেলু মুখ তোলে না, বলে, পোশাক আশাক তো রঙ্গিস আদমির মতোই।

তবে রঙ্গিস গদ্দা। এদের মতো বুদ্ধু লোক দিয়েই আমাদের কাজ হাসিল হবে।

আটায় আর একটু জল দিতে দিতে ভগেলু উত্তর দেয়—"অকেলা চনা ভাড় নাহি ফোড়তা।"

কণ্ডুয়ন সুখে নিমীলিত নেত্র চটিদার বলে, তুম্ ভি বুদ্ধু। শোনোনি কি—"রোজ রোজ রগড় সে পাথর ভী ঘিস জাতা হ্যায়।"

সর্বশক্তিমান প্রবাদের শক্তিতেও প্রত্যয় জন্মায় না ভগেলুর মনে, মুখ তুলে নীরব জিজ্ঞাসায় তাকায় মনিবের দিকে। মনিব পালকটা সযত্নে রেখে দিয়ে বলে, তবে বুঝিয়ে দিই শোন।

এই বলে সে রামচরিত মানসের একটা শ্লোক আবৃত্তি করে।

রহা না নগর বসন ঘৃত তেলা।
বাঢ়ী পুঁছি কীন্হ কপি খেলা॥
কৌতুক কহঁ আয়ে পুরবাসী।
মারহি চরণ করহি বহু হাঁসী॥

তারপরে জিজ্ঞাসা করে, কি বুঝলি বল।

ভগেলু বলে, হনুমানজী লঙ্কা দহন করলেন।

বাহবা। কি দিয়ে দহন করছেন।

মহাবীরের লেজ দিয়ে।

বাহবা। কিন্তু লেজ কি মহাবীর?

দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে ভগেলু বলে, মহাবীর তো পরমাত্মা।

বাহবা, বাহবা। লেজ তো একটা মাংসের রশ্মি, না আছে তার আঁখ, না আছে তার হাত, না আছে তোর মতো এত বুদ্ধি, না আছে আমার মতো আক্কা, তবু তাই দিয়ে তো লঙ্কাকাণ্ড ঘটালো পরমাত্মা। ঐ আদমিটার মতো, তখনো দূরে দেখা যাচ্ছিল জীবনকে, লোককে দিয়েই কোম্পানীর সোনার লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে পরমাত্মা?

অবোধ ভগেলু তবু শুধোয়, পরমাত্মা কে?

চটিদার বিস্ময়ে ক্ষেপে বলে ওঠে, ওরে ভগেলু, তুই যে একেবারে বুদ্ধু বনে গেলি। এমন মর্মান্তিক অভিযোগেও চৈতন্যোদয় হয় না তার, অবুঝ দৃষ্টিতে সে তাকিয়েই থাকে মনিবের দিকে। চটিদার দেখে যে, রূপকে বুঝবার লোক নয় ভগেলু, সহজ টাকা ছাড়া ও খুশী হবে না। তখন বলে, মনে নেই কদিন আগে লখনৌ গিয়েছিলি কাকে দেখতে? হাতীতে চেপে এসেছিল কানপুর শহর থেকে—

এবারে ভগেলুর চোখে প্রত্যয়ের আলো জ্বলে ওঠে, সোৎসাহে বলে, নানা মহারাজ।

খুব হয়েছে, নে এখন কাজ কর।

ভগেলু আটার তালের উপরে প্রবলবেগে মুষ্টাঘাত চালাতে চালাতে গান ধরে—

"অবধ মে রানা ভয়ো মরদানা
পহলো লড়া ভই বক্সর মে,
সিমরি কে ময়দানা,
অবধ মে রানা ভই মরদানা
তবৈ লাট ঘবড়ানা।"

চটিদার ডাক দিয়ে বলে, ওরে মরদানা, থালাখানা বক্সরের ময়দান নয়, ভেঙে ফেলবি যে।

কে কার কথা শোনে, অনেক চেষ্টায় একটা স্থূল কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছে—প্রবলতর বেগে ঘুষি চালাতে চালাতে অধিকতর উৎসাহে সে গেয়েই চলে

"অবধ মে রানা ভয়ো মরদানা
তবৈ লাট ঘবড়ানা।"

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ২০ ॥

অনেকদিন আগে গুপ্তেজীকে বলেছিলুম: আপনিও তো হিন্দু, তিনি জবাব রুখে উঠেছিলেন: নো আয়াম নট! আর হিন্দুধর্মের যে আদর্শের কথা আপনি শোনালেন তাতে বলব—সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

কথাটা ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল সেদিন। ভেবেছিলুম, কি জানি হয়তো ভুল ধারণা আমার। হয়তো গুপ্তেজী হিন্দু নন খৃষ্টান, অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী। স্বপ্নেও ভাবিনি উনি নিজেকে মাড়িয়া গোণ্ড বলে পরিচয় দেবেন। পেন লিঙ্গোপেন, বড়া দেও, ভীমুল-পেন, ভুল্লুরেমটুইয়ের উপাসক বলে নিজেকে অকপটে ঘোষণা করবেন।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল গুপ্তেজীর দীর্ঘ পত্রে। জগদলপুরে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের তিন দিনের পরে পেলুম তাঁর ভারী বেয়ারিং চিঠি। মনের ভার কারও একজনের কাছে না নামিয়ে মানুষ শান্তি পায় না। কি জানি কেন গুপ্তেজী আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন এজন্য। এই দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার আগে তাঁর গুপ্ত কথা অকপটে জানিয়ে গেলেন আমাকে।

গুপ্তেজীর সে দীর্ঘ চিঠিখানি আজও আছে আমার কাছে। তাঁর শেষ স্মৃতি। মাঝে মাঝে কর্মহীন অবসরে মাঝে মাঝে সেখানা খুলে পড়ি, আর মনে পড়ে যায় দণ্ডকারণ্যের পথে-প্রান্তরে ঘুরে-যাওয়া নানান টুকরো ঘটনা। অদ্ভুত মানুষটার চরিত্রটাকে ভেবেছিলাম জানা হয়ে গেছে। কেন তাঁর মনের গতি এ পথে গেল তা ভেবে দেখিনি। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারই যেন শেষ কথা। কেন এ মাধ্যাকর্ষণ তা জানবার স্পৃহা জাগেনি মনে। গুপ্তেজীর সেই দীর্ঘ চিঠি পড়ে বুঝতে পারি কী মর্মান্তিক অভিমানে তিনি জীবনের পথে ভারসাম্য হারিয়ে এমন এক্সেন্ট্রিক হয়ে উঠেছিলেন। নিজেকে বরাবর তিনি আদিবাসীদের সমতলে দাঁড় করিয়েছেন মনে মনে আর তাই আমাদের দেখতে পেয়েছেন ওদের দৃষ্টি দিয়ে।

পাগলা-গারদে যদি দৈবক্রমে আটক পড়ে একজন সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষ, চিড়িয়াখানার সিম্পাঞ্জিটার মস্তিষ্ক যদি হঠাৎ মানুষের মতো কার্যকরী হয়ে পড়ে তাহলে দর্শকদের কৌতুক-এক্সকারসানকে তারা যে চোখে দেখত গুপ্তেজী সেই চোখ দিয়ে বরাবর দেখে এসেছেন আমাদের—হোয়াইট মেনস্ বার্ডেনের নবতম ধ্বজাধারী মানুষগুলিকে।

গুপ্তেজী লিখছেন: আমার এ চিঠিখানি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন আপনি। এত কথা কেন আপনাকে ইতিপূর্বে বলিনি আর এখনই বা কেন এত লোক থাকতে আপনাকেই জানিয়ে যেতে চাই সব কথা।

এতদিন এ কথা সকলের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলাম লজ্জায়, সংকোচে। এ আমার গৌরবের কথা নয়। আর আজ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি তার কারণ আপনিই ঘটনাচক্রে আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

অনেকদিন আগে আপনি আমাকে একটি ক্যালেন্ডার দিয়েছিলেন মনে আছে? না। ভুল বললাম! আজ আর সৌজন্যের খাতিরে মিথ্যা কথা লিখব না। ছোটখাট ভদ্রতার কৃত্রিমতাকে ছাড়িয়ে উঠে নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই এ চিঠিতে। তাই সত্যি কথাই বলব এবার। আপনার কাছ থেকে ক্যালেন্ডারখানা আমি কেড়ে রেখেছিলাম। প্রতি মাসে একখানা একখানা করে তার পাতা খুলে নিয়েছি—তবু যতবার পঞ্জিকাহীন ছবিখানার দিকে তাকিয়েছি ততবারই আমার মনে জেগেছে একটা প্রশ্ন। এ ছবিখানা অন্যায়-যে-করে সেই মোহনের ঘর থেকে কেড়ে এনেছিলেন আপনি; অন্যায়-যে-সহে তার কাছ থেকেও সেটা কেড়ে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু ওটা কাছে রাখবার অধিকার কি ছাই আমারই ছিল? যে মানুষ লোক লজ্জার সংকোচে নিজের সত্য পরিচয় গোপন করে লোকসমাজে ঘুরে বেড়ায়—তারও তো অধিকার নেই সত্য প্রকাশের ঐ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ চিত্রটি রাখবার।

আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন আপনি। বলেছিলাম, আমি মাড়িয়া গোন্ড। হয়তো ঘৃণা হয়েছিল আপনার। কিন্তু সেদিনও আমি সত্য কথা বলিনি। আজ বলছি। আমি মাড়িয়া গোন্ডও নই—তার চেয়েও নীচু স্তরের জীব। আমার পরিচয়, আমি—'ভুলা-হুয়া'।

শব্দটাকে ইংরেজিতে আক্ষরিক অনুবাদ করলে বলা উচিত 'বর্নড-বাই-এ্যাক্সিডেন্ট'। এমন ইংরাজি শুনলে আপনি হাসবেন। প্রতিশব্দটা 'অবৈধ-সন্তান'। কিন্তু অসভ্য আদিবাসী সমাজে বৈধতাটা বড় কথা নয়—ওরা বলে 'ভুলা-হুয়া।' ভুল ভুলই—অন্যায়ও নয়, পাপও নয়। অন্তত যে জন্মাচ্ছে তার নয়! আমি যদি ওদের সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে না আসতাম তাহলে এভাবে আত্মপরিচয় গোপন করে ফিরতে হত না আমাকে।

সংসার, সন্তান সবকিছুই হয়তো পেতাম জীবনে। অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিত না আমাকে ঐ অসভ্য মানুষগুলি!

যাক্ সে কথা। আমার জন্মের ইতিহাসটাই আগে বলি। আমার বাবা ছিলেন পুলিস বিভাগের উঁচুদরের অফিসার। নামটা আর করব না। উপাধিটা তো জানেনই। মধ্যপ্রদেশ সরকারে জাঁদরেল অফিসার বলে একপক্ষে সুনাম অপরপক্ষে দুর্নাম কিনেছিলেন। বাস্তারের বিদ্রোহ দমন করতে রাজধানী থেকে তিনি এসেছিলেন এই দণ্ডকারণ্যে। কোন সালে? যে সালে বাস্তারে বিদ্রোহ হয়। সেটা কোন সাল তা তো ওরা জানে না। না, আবার ভুল বলছি;—আর 'ওরা' নয়, এবার থেকে 'আমরা'। কোন সালে বিদ্রোহ হয়েছিল তা তো আমরা জানি না। আমাদের কি লিখিত বর্ণমালা আছে যে লিখে রাখব? আপনারাও লিখে রাখেননি। দিল্লিতে সেবার আপনারা দরবার করছেন। কলকাতায় মোহনবাগান প্রথম শীল্ড পাওয়ায় হচ্ছে দারুন হৈ হৈ! খবরের কাগজে আমাদের কথা ছাপবার মতো স্থান সংকুলান হয়নি। দণ্ডকারণ্যের গহন অরণ্যে ইংরাজের বুলেটে কতজন জংলি মানুষ মুখ থুবড়ে পড়েছিল কে তার হিসাব রাখে? সে সময় বাস্তার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন বৈজুনাথ পাণ্ডে। তিনি আদিবাসীদের অধিকারের দরদী লোক ছিলেন। প্রগতিমূলক কর্মসূচী ছিল তাঁর। কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সমবায় প্রথায় আদিবাসীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সভ্য দুনিয়ার তদানিন্তন মানুষ তাঁর সেই প্রগতিমূলক কর্মসূচীকে সুনজরে দেখল না। তারা আদিবাসীদের উত্তেজিত করল—বেছে বেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর চালানো হল অত্যাচার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল যা হয়ে এসেছে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। নীরব তৃতীয়পক্ষ—ইংরাজ সরকার এবারে আসরে নামলেন। কঠিন দমননীতির আশ্রয়ে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করা হল। বৈজুনাথ পাণ্ডের স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হল না। এখান থেকে আসামের চা-বাগানে দাস ব্যবসায়ের সাপ্লাই-এজেন্সির ইংরাজি মুলধনে আঁচড়টি লাগল না।

আমার বাবা বস্তারে এসেছিলেন এই শুভ কার্যের ব্রত নিয়ে। বিদ্রোহদমন করে, লেবার-রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানকে বিপদমুক্ত করে ফিরে গিয়েছিলেন এখান থেকে। কিন্তু যাবার আগে একটি স্থায়ী কীর্তি রেখে গিয়েছিলেন তিনি। সে কীর্তি এই 'ভুলা-হুয়া' আমি!

এই কথাই সেদিন জানাতে চেয়েছিলাম আপনাকে জয়পুরের রেস্ট হাউসে। জয়দীপ মেহ্‌রাকে অকারণে অপমান করিনি আমি। রেভারেণ্ড আর্নেস্ট স্টোনের পালিতা কন্যা মেরিয়া আমার মা!

ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতটার ভূমিকা বড় অদ্ভুত। লর্ড কার্জন, মাইকেল ও'ডায়ার আর টেগার্টরাই শুধু আসেনি সুদূর সাগরপারের দেশ থেকে। পশ্চিমের রক্তে জন্ম নিয়েছেন ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের মতো মানুষও। আমিও শৈশবে এসেছিলাম অমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে। তাঁর ছবি আপনি দেখেছেন আমার ঘরে। তাঁর গল্প শুনেছেন জয়পুরে—আমি আর্নেস্ট স্টোনের কথা বলছি।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে আমার মা ফিরে এলেন

তাঁর আশ্রয়ে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার মায়ের। খুনের অপরাধ থেকে মুক্তি পেলেও নিষ্কৃতি পেলেন না তিনি। তাঁর দেহের অভ্যন্তরে তখন দেখা দিয়েছে নতুন প্রাণের স্পন্দন। যদি পুরোপুরি মাড়িয়া হতেন তাহলে হয়তো এ দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারতেন তিনি; কিন্তু কাল হয়েছিল তাঁর ইংরাজি শিক্ষা। ভুল তাঁর কাছে আর ভুলমাত্র নয়, 'লেজিটিমেসির' সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছিল তাঁর।

ঈশ্বর করুণাময়—আমার মতো অবাঞ্ছিত সন্তানকে গর্ভেই ধারণ করেছিলেন তিনি, ক্রোড়ে ধারণ করেননি। সন্তান হতে গিয়ে তিনি মারা যান।

বুড়ো আর্নেস্ট স্টোন তখন ষাটের কাছাকাছি। সদ্যোজাত শিশুর জন্য ওয়েট-নার্স খুঁজতে বের হলেন আবার! জীবনে তৃতীয়বার!

বাধ সাধলেন এবার তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা। মিসেস্ বারওয়েল এ অনাচার মেনে নিতে রাজি হলেন না কিছুতেই। তাঁর ভাইপোর ছেলে একটি মাড়িয়া গভর্নেসের অবৈধ সন্তানের সঙ্গে এক সঙ্গে মানুষ হতে পারে, না। না কিছুতেই না!

আর্নেস্ট স্টোন কিছুদিন গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। তারপর নতুন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালেন একদিন। সমস্ত সম্পত্তিটা দান করে গেলেন দৌহিত্রকে। নাবালক দৌহিত্রের অছি নিযুক্ত করলেন এক ট্রাস্টিকে মিসেস্ বারওয়েল তার এক্সিকিউটার। নিজে যোগ দিলেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনে। বিশাল সম্পত্তি থেকে সামান্য মাসোহারার ব্যবস্থাও রাখলেন না। ষাট বছরের বৃদ্ধ। ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর তীব্র বীতরাগ জন্মেছে তখন।

কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীরাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন না। না করাই স্বাভাবিক। লক্ষপতি আর্নেস্ট স্টোনকে পেলে তাঁরা হয়তো ধন্য হয়ে যেতেন; কিন্তু এ যে নিঃস্ব স্টোন!

আমার মায়ের গ্রামেই একা হাতে কাজ শুরু করলেন উনি। খড়োচাল ঘরে আবার একটি মাড়িয়া মেয়েকে কন্যাত্বে বরণ করে নতুন জীবনযাত্রার সূচনা করলেন!

রেভারেণ্ট স্টোন আমাকে ব্যাপ্‌টাইস্ করেছিলেন। ধর্মমতে আমি খৃষ্টান! মানুষ হয়ে উঠেছিলাম সেই ইংরাজ ধর্মযাজকের কৃপায়। তিনিই ছিলেন শৈশবে আমার অবলম্বন, বাল্যে আমার সহচর, কৈশোরে আমার ধ্রুবতারা।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কি জানেন? এই মহাপুরুষকে আমি চিনতে পারিনি। আমি, হ্যাঁ আমিই তাঁকে হত্যা করেছি! এ ক্ষেদ আমার যাবে না জীবনের শেষদিন পর্যন্ত! আজও প্রতিদিন শয্যা-গ্রহণের আগে সেই আলখাল্লাধারী বৃদ্ধের ফটোর সম্মুখে এসে দাঁড়াই, নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি! তবু সান্ত্বনা পাই না।

আমার বয়স তখন পনের। সেই পনের বছর বয়েসে কি ঘটেছিল বলার আগে বলে নিতে চাই—জীবনের এই প্রথম পনের বছরই আমার সবচেয়ে সুখে সবচেয়ে আনন্দে কেটেছে। অদ্ভুত দুই নৌকায় পা দিয়ে চলেছিলাম এই পনেরটা বছর। গাঁয়ের ঘটুলে আমি ছিলাম কাজাঞ্চি। অথচ রবিবারে সাহেবের সঙ্গে উপাসনা করতাম। গাঁয়ের সকলের দেখাদেখি আমিও তাঁকে সাহেবই বলতাম। ইংরাজি বলতে শিখেছিলাম তাঁর সান্নিধ্যে। পড়তেও। আর মাড়িয়া ভাষা তো জানতামই।

সেবার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গ্রামে কারও অসুখ হলে সাহেবই ওষুধ দেন। এবার সাহেব নিজেই অসুস্থ। গাইতার সঙ্গে আমি ছুটলাম শহরে—জীবনে প্রথম। আমি মাড়িয়াদের মতো কাপড় পরতাম—সার্ট-প্যান্ট নয়। তাই আমার মুখে ইংরাজি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন শহরের ডাক্তারবাবু। তিনি এলেন আমাদের সঙ্গে সাহেবকে দেখতে।

কিন্তু ঐ শহরে ডাক্তার ডাকতে যাওয়াই আমার কাল হল। বাইরের দুনিয়াকে দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। আমি যে মাড়িয়া নই— এ কথাটা হঠাৎ উপলব্ধি করলাম যেন। ঘন ঘন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে যাই। সাহেবের কাছে বায়না ধরে শহরে যাবার উপযুক্ত দু একটা জামা কাপড়ও করালাম। সাহেব ওষুধ খেয়ে সামলে উঠলেন বটে, কিন্তু আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না।

সাহেবকে ধরে বসলাম—আমি শহরের

স্কুলে ভর্তি হব। সাহেবের প্রবল আপত্তি ছিল—কিন্তু আমার আগ্রহে, আর সেই ডাক্তারবাবুটির পরামর্শে আমাকে শেষ পর্যন্ত সেই শহরের স্কুলেই ভর্তি করা হল। বছর পাঁচেক পড়েছিলাম সে স্কুলে। থাকতাম ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই। তাঁর ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করে দিতে হত আমাকে—মায় ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা! ডাক্তারবাবু স্থানীয় লোক—ওড়িয়া। তাঁর একটি ছেলে আর একটি মেয়েও পড়ত আমাদের স্কুলে। ছেলেটি আমার সংগে আর মেয়েটি বছর দুই নীচের ক্লাসে। ছেলেটি আমাকে বিষ নজরে দেখতে শুরু করল। আমার প্রথম অপরাধ ক্লাসে তার চেয়ে আমি বরাবর বেশী নম্বর পেতাম। দ্বিতীয় অপরাধ তার বোন আমাকে ঐ বয়সেই একটু সুনজরে দেখতে শুরু করে। ছেলেটি বাপের কাছে আমার নামে মিথ্যা করে লাগাল। সবটা অবশ্য মিথ্যা নয়—তার ত্রয়োদশী ভগ্নীটি ইতিমধ্যে আমার মনে কিছুটা মোহ বিস্তার করেছিল বটে।

তাড়িয়ে দেওয়া হল আমাকে। ফিরে এলাম গ্রামে। কিন্তু এখন আমি অন্য মানুষ। জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করে এসেছি আমি। গাঁয়ে ঐ অসভ্যদের মধ্যে আর মন বসে না। ঘটুলে যাবার কল্পনাতেই মনটা সংকুচিত হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। চুপটি করে গিয়ে বসলাম তাঁর পাশে। বললেন ঃ তুমি নাকি ঘটুলে যাওয়া বন্ধ করেছ?

বললুম ঃ হ্যাঁ।

ঃ কিন্তু কেন?

উনি প্রশ্ন করছিলেন গোণ্ডিতে। আমি জবাব দিলুম ইংরাজিতে। বললুম ঃ ঘটুলের ব্যবস্থাকে আমি ঘৃণা করি, সেটাকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করি।

সাহেবের ভ্রূ-দুটো কুঁচকে উঠল, বললেন ঃ কিন্তু আমাদের বাপ পিতামহের আমল থেকে কেউই তো এটাকে নৈতিক অপরাধ মনে করেনি।

আমিও চটে উঠে বললুম ঃ আপনার বাপ-পিতামহের কথা জানি না—কিন্তু আমার বাপ-পিতামহ ঘটুলে মানুষ হননি। আপনিই তো বলেছেন, আমার বাবা হিন্দু ছিলেন।

ঃ কিন্তু তোমার মা, মামারা, দাদামশাই?

ঃ তাদের সংগে কোন সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না। আমি হিন্দু—মাড়িয়া নই।

বৃদ্ধ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ তাহলে তুমি কি করতে চাও?

ঃ আমি আমার স্কুলেই ফিরে যেতে চাই। আপনি অন্য একটা ব্যবস্থা করে দিন।

ঃ তা না হয় দিলুম। ধর তুমিও পাশ করলে সেখান থেকে। তারপর কি করবে?

ঃ কি করব তা জানি না তবে আর যাই করি এ গাঁয়ে আর ফিরে আসব না।

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ জবাব দেননি। তারপর ইংরাজিতেই বললেন ঃ বেশ! তাই করে দেব—কিন্তু সেই সংগে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। এ কথা জানবার বয়স হয়েছে তোমার।

ধীরে ধীরে আমার জন্ম ইতিহাস বলে গেলেন উনি। সব কথাই খুলে বলেছিলেন। সে কাহিনী আপনি শুনেছিলেন জয়পুরের গেস্ট হাউসে, জয়দীপ মেহ্‌রার মুখে। মনে আছে, অনেক বড় বড় লোকের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি সে কাহিনীর মাঝে মাঝে—আলেকজাণ্ডার, টলেমি, জরোস্টার, কন্‌ফুসিয়াস্, মায় স্বয়ং যীশু খৃষ্টের নামও করেছিলেন। আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন জন্মটা কিছু নয়—সেটা মানুষের হাতের বাইরে। কর্মেই মানুষের পরিচয়। সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে যা বলেছিলেন তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে যে হিন্দু সমাজে আমার ঠাঁই হবে না। মাড়িয়া সমাজে 'ভুলা হুয়োর' কিন্তু পূর্ণ মর্যাদা আছে। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন মাড়িয়া পরিচয়টাই বহন করি।

সে রাত্রেই গৃহত্যাগ করেছিলাম। প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল ঐ বৃদ্ধের উপর। কেন ছোটবেলাতেই তিনি আমাকে খুলে বলেন নি? কেন এতদিন এসব কথা গোপন করেছিলেন আমার কাছ থেকে? আমার বাপের সংগে আমার মায়ের বিবাহ হয়নি, এ কথা কেন জানাননি? বিবাহ তো দূরের

তাঁদের মধ্যে প্রণয়ও হয়নি। একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে মিথ্যা রিপোর্ট লেখাবার প্রয়োজনে আমার মাকে বলি দেওয়া হয়েছিল একজন লালসাজর্জর পুরুষের কামনার যূপকাঠে! সেই অকথ্য অত্যাচারের, সেই ক্ষমাহীন ব্যাভিচারের স্থায়ী কলঙ্কচিহ্নটার নাম, আমার ব্যক্তিসত্তা!

মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। মনে হল কয়েকটা মানুষকে পরপর খুন করতে পারলে বোধহয় এ যন্ত্রণার উপশম হবে। পেন্সিলকাটা ছুরিটা হাতে সারারাত পায়চারি করেছিলাম রেভারেণ্ড আর্নেস্ট স্টোনের খড়ো-ঘরের সামনের বারান্দায়। পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ভোররাত্রে গৃহত্যাগ করেছিলাম।

এরপর সাহেবের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। নানান বন্দরে ঘুরেছি উদ্‌ভ্রান্তের মতো। ভারতবর্ষের বাইরেও চলে গিয়েছিলাম জাহাজের খালাসী হয়ে। কোথাও শান্তি পাইনি। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে চাকরি নিয়েছিলাম মধ্য প্রদেশের আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগে। জন্মভূমির টান কি মানুষে সহজে কাটাতে পারে?

নিজের গ্রামেও গিয়েছি। কেউ চিনতে পারেনি। সাহেবের কুটিরের চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু মাটির ঘরখানা আজও আছে। গাঁয়ের পাদ্রী সেই ঘরেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিল। শুনলাম ১৯৪০ সালে চুরাশী বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন ঐ বৃদ্ধ স্টোন সাহেব। যে পেন্সিল-কাটা ছুরিটা আমি সাহস করে ওঁর বুকে বসাতে পারিনি —সেটাই যেন আমার অলক্ষ্যে কে বিঁধিয়ে দিয়েছিল ওঁর বুকে, আমি গৃহত্যাগ করার পর! জীবনের শেষ আট-দশটা বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ওখানেই। কোরাপুট থেকে আহ্বান এসেছিল, মিশনারীরা নিয়ে যেতে চেয়েছিল—উনি যাননি। গাঁয়ের মানুষই দেখেছে, পরিচর্যা করেছে। তাঁর সাহেবের শেষ ইচ্ছানুযায়ী ওঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল—না সে গ্রামে নয়, কোরাপুটে।

আপনি তো দণ্ডকারণ্য-উন্নয়ন-সংস্থার চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িটা তৈরী করছেন। ঐ টিলার নীচে একটা ছোট কবরখানা আছে লক্ষ করেছেন? এখন যেটা চীফ-অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেবের বাংলো ওটা ছিল টি ডি এল এ এস্টেটের, অর্থাৎ লেবার রিক্রুটিং অফিসের সাহেবের বাড়ি। সেই বাংলো বাড়ির উল্টো দিকে এই সিমেট্রী।

ঐ কবরখানার উত্তর পশ্চিম ধারে দেওয়াল ঘেঁষে দেখবেন দুটি কবর আছে। বাপ আর মেয়ের। পাশাপাশি। শ্বেতকরবী গাছটা এখন আর নেই; কিন্তু গাছের চিহ্নটা টের পাবেন পাঁচিলের ফাটলটা দেখে। সেটা আর মেরামত করেনি কেউ। কবর দুটি জীর্ণ, তবু রেভারেণ্ড আর্নেস্ট স্টোনের এপিটাফটা এখনও পড়া যায়। মিসেস্ বারওয়েল নাকি ওটা লিখেছিলেন। এর চেয়ে ভাল এপিটাফ অন্তত আমি লিখতে পারতুম না। কাত হয়ে হেলে পড়া পাথরটার একদিকে খোদাই করা আছে তাঁর জন্ম তারিখ, অন্যদিকে মৃত্যু দিন। আর মাঝখানে লেখা:

'আণ্ডার দিস্ স্টোন লাইস
রেভারেণ্ড আর্নেস্ট স্টোন
উইথ অল হিস আর্নেস্টনেস।'

আপনি আমার এ চিঠির জবাব দিতে পারবেন না। আমার পরবর্তী ঠিকানা আমি নিজেই জানি না। এটুকু জানি সে ঠিকানায় ডাক বিলি হয় না। চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়েছি। সেটা বড় কথা নয়, না দিলে আমাকে ওঁরাই বরখাস্ত করতেন। স্থির করেছি ত্রিশ বছর আগে সাহেব আমাকে যা আদেশ করেছিলেন এবার তাই পালন করব। জন্মসূত্রে যারা আমার আত্মীয় তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করব। রেভারেণ্ড স্টোনের মতো আর্নেস্টনেস্ নাইবা থাকল, আমার যেটুকু সাধ্য তাই করব আমি। কিছু জমি বন্দোবস্ত নেব খাস আবুজমাড়ে। খেত খামার করব। মাড়িয়া হয়ে যাব। কে বলতে পারে হয়তো সংসারও পাব সেখানে। ওখানে তো আর আমি জারজ নই। আমি ভুলা-হয়া মাত্র!

সত্তর বছর বয়সে যদি আর্নেস্ট স্টোন নতুন জীবন শুরু করতে পারেন তাহলে এ বয়সে আমিই বা পারব না কেন?

একটা কথা। নারানপুরে গিয়েছিলাম মোহনকে খুঁজে বার করতে। তার সংগে একটা বোঝাপড়া বাকি ছিল। এ অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি না। তেমন মায়ের সন্তান আমি নই। কিন্তু আমাকে কিছুই করতে হল না। দেব আঙোপেনের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে মোহনের উপর। মোহন নারানপুরে নেই। তার নাকি কুষ্ঠ হয়েছে। স্থানীয় চিকিৎসকের নির্দেশে সে গেছে বোম্বাই অথবা কলকাতায়।

শীঘ্রই চলে যাচ্ছি আবুজমাড়ে। সভ্য-জগত থেকে বেশী কিছু সাথে নেব না। ঘড়ি-কলম-জামাকাপড় ছাড়াই যদি আমার মাতৃকুলের যুগ-যুগান্তর সচ্ছন্দে কেটে গিয়ে থাকে তাহলে আমারও তা কাটা উচিত। যে কয়টি জিনিস সাথে নিয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে রইল রেভারেন্ড স্টোনের ফটোগ্রাফ, আর আপনার দেওয়া একটি স্মৃতিচিহ্ন—সেই নিঃশোষিত-পৃষ্ঠা ক্যালেণ্ডারের ছবিখানি। হোয়াইট মেনস বার্ডেনের ব্যভিচার দেখে শিউরে-ওঠা কবি-গুরুর ছবিখানি।

গুপ্তেজীর চিঠিখানির অনুলিপি পাঠিয়েছিলাম নারানপুরে-ডাক্তার পিল্লাইকে। জয়পুরে গুপ্তেজীর অদ্ভুত আচরণের এ কৈফিয়ৎ ডাক্তার সাহেবেরও জানা উচিত।

শেষদিকে মোহনের উল্লেখ ছিল। সেটার কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই মোহন-রঙিলার উপাখ্যানটাও লিখেছিলাম চিঠিতে সবিস্তারে। যে অন্যায় করেছিলাম সেদিন অন্যায় সহ্য করে তার জন্য অনুতাপও জানিয়েছিলাম অকপটে।

জবাব এল কিছুদিনের মধ্যেই। গুপ্তেজীর চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার মাত্র আছে সে জবাবে—আর কিছু নেই। লিখেছেন : আমিও আপনার গুপ্তেজীর সঙ্গে একমত। আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন ঘটনা-স্থলেই গুপ্তেজীকে মোহনের অপরাধের কথা না বলে। তার চেয়েও বড় অপরাধ করেছিলেন আমার কাছে সে কথা গোপন করে। আপনাকে আমি বারে বারে বলে-ছিলাম—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কথা বলে যেতে। রঙিলার সম্বন্ধে এত বড় সংবাদটা তা সত্ত্বেও কেন যে আপনি গোপন রেখে-ছিলেন, তা আজও আমার বুদ্ধির অগোচর। প্রথম রাত্রেই যদি অকপটে সব কথা বলতেন আপনি তাহলে চয়নের কেসটা নিয়ে এত বেগ পেতে হত না আমাকে। তখনই নির্ভুল ডায়োগনাইস্ করতে পারতাম।

আপনার চিঠি পড়েই বুঝতে পারলাম চয়নের কী হয়েছে। কেন সে পাগল হয়ে গেছে। কী আশ্চর্য, এমন সহজ সমাধানটা আপনার মাথায় আসেনি মোহন-রঙিলা উপাখ্যান জেনেও?

মোহন আমার চিকিৎসাধীনেই ছিল। আপনার চিঠি পেয়েই ডায়েরি খুলে দেখলাম মোহন কবে প্রথম আমার কাছে এসেছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান। অন্তত আপনার গুপ্তেজীর চেয়ে বুদ্ধিমান। সে বুঝতে পেরেছিল তার কুষ্ঠ হয়নি, হয়েছে অন্য একটি সুপরিচিত রতিজ রোগ। কেস হিস্ট্রি লেখাবার সময়ে প্রথম রোগাক্রান্ত হবার একটা সম্ভাব্য তারিখ বলেছিল অকপটে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম ঐ তারিখেই গত বৎসর নারানপুরে মাড়াই হয়। লাফিয়ে উঠলাম নিজের আবিষ্কারে। ডাক্তারী বইটা হাতে নিয়ে তখনই চলে গেলাম চয়নের ছাপরায়। রোগাক্রান্ত একটি পুরুষের ফটো ওর সামনে মেলে ধরে বললাম : রঙিলার ধুরবানে তোমার কি এই রকম হয়েছে?

যেন ইলেকট্রিক চাবুক মেরেছি ওকে। চয়ন লাফ দিয়ে উঠে বলে : তুই কেমন করে জানলি?

বললুম : আমাদের ডাক্তারী পাংনাহারাও (ঝাড়ফুঁকওয়ালারা) এই ধুরবানের (মরণ-মন্ত্রের) কাটান জানে। এই দেখ, ধুরবানের ছবি তুলে রেখেছি—আর এই দেখ ভাল হয়ে যাবার পরের ফটো।

ফটো জিনিসটাকে চয়ন ভাল রকমেই চিনত—এই খাঁচোয়া। ব্যস। চয়ন সম্পূর্ণভাবে শরণ নিল আমার। অকপটে স্বীকার করল সব কথা। যে রাত্রে অন্ধকারে সে রঙিলাকে মালকো বলে ভুল করেছিল তারপর দিন সকালেই রঙিলা ওর সঙ্গে গোপনে দেখা করে। সরাসরি দাবি জানায় চয়নকে বিবাহ করতে হবে রঙিলাকে। চয়ন জ্বলে উঠেছিল ওর নির্লজ্জতায়। যে গালাগালে সবচেয়ে আহত হয় রঙিলা সেই গালই দিয়েছিল তাকে। বলেছিল : পাংনাহিন! তুই ডাইনি!

রাগ করেনি রঙিলা। খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল : তাহলে তো তুই জানিসই। ঠিক বলেছিস; আমি পাংনাহিন! কালরাত্রে যে কান্ডটা তুই করেছিস তারপর যদি আমাকে ফেলে মালকোকে বিয়ে করতে ছুটিস তাহলে আঙুল মটকে ধুরবান ছুঁড়ব তোর দিকে!

চয়ন রুখে উঠে বলেছিল : তাই ছোঁড়! আমি ভয় পাই না তোকে। মার আমাকে। খুন করে ফেল্! দেখি তুই কত বড় ডাইনি!

অদ্ভুত হেসে রঙিলা বলেছিল : না রে, প্রাণে তো তোকে মারব না। একটি ধুরবানে তোকে মেয়েমানুষ বানিয়ে দেব! আর মালকোকে বিয়ে করতে পারবি না। তার-পর খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল আমাদের শিরদারকে বলব, তোর জন্যে লামহাদা খাটতে যাবে কাবোগায়!

দুরন্ত ভয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিল চয়ন! রঙিলার পিঙ্গল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছিল—পারে, ইচ্ছে করলে রঙিলা একটা জলজ্যান্ত পুরুষমানুষকে পৌরুষ থেকে চিরবঞ্চিত করতে পারে!

তার সে আতঙ্কতাড়িত মুখখানা দেখে আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল রঙিলা। বলেছিল : সেই ঠিক হবে! পুরুষমানুষ হয়ে যেমন লোভে লোভে আসকালোন ঘরে ঢুকেছিলি তেমনি ওখানেই ঢুকতে হবে তোকে এরপর!

দুরন্ত ক্রোধে পাশে পড়ে থাকা ধনুকটা তুলে নিয়েছিল চয়ন। অব্যর্থ লক্ষ্যে মারলে একটা বিষাক্ত তীর। একচুল বিচলিত হল না রঙিলা। চোখ দুটো শুধু ধ্বক করে জ্বলে উঠল তার। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে! আঙুলগুলো মটমট করে মটকে বিড়বিড় করে কি যেন বললে। তারপর ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় দেওয়ালে গেঁথে যাওয়া তীরটা সবলে উৎপাটিত করে আবার ছুঁড়ে দিয়ে গেল চয়নের দিকেই।

অসাড় হয়ে বসে রইল চয়ন, কাবোগা-

গাঁয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী তীরন্দাজ! মাত্র পাঁচ হাত দূরের লক্ষ ভেদ করতে পারেনি সে। জ্ঞান হবার পর এত কাছের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার কথা মনে পড়ে না তার। চয়ন শিরদার তার পৌরুষকে হারাতে শুরু করেছে!

দুদিন কি তিনদিন! চয়ন লক্ষ করল ধুরুবানের ফল ফলাতে শুরু করেছে। সে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে—তিল তিল করে তার পৌরুষ ক্ষয়িত হতে শুরু করেছে! ক্রমে সে নারীতে পরিণত হয়ে যাবে! দুঃসহ এ চিন্তা! এ কথা কাউকে বলা যাবে না। কিন্তু আজীবন এ কথা লুকিয়েই বা রাখবে কেমন করে? মালকোকে কি বলবে?

তারপরের ইতিহাস আর ওর জানা নেই।

আয়েতু আন্দাজ করেছিল কিছুটা। রাঙুলাকে চেপে ধরেছিল সে: চয়ন পাগল হয়ে যাচ্ছে কেন?

অকুতোভয়ে রাঙুলা বলেছিল: আমার জন্য। আমি ওকে ধুরুবান মেরেছি!

: ধুরুবান! তুই ধুরুবান ছুঁড়লি কেমন করে? তুই কি তাহলে সত্যিই পারনাহিন?

চীৎকার করে উঠেছিল রাঙুলা: হাঁ আমি পারনাহিন। কিন্তু কথাটা তো তুই জানিস। না হলে যে আমার জন্যে কামহানা খাটাতে এল কেন তুই তাকে মালকোর হাতে তুলে দিলি?

আয়েতু তুলে নিয়েছিল দাকসুটা। কিন্তু কোপ বসানোর আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল রাঙুলা। আয়েতুও ছাড়বার পাত্র নয়। তাড়া করল তাকে। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল ডাইনিটা। আয়েতু ফিরে এল। যাবে আর কোথায়? ফিরবে ঠিকই। আর তখন আয়েতু দেখে নেবে রাঙুলা কত বড় পারনাহিন।

কিন্তু সে সুযোগ আর আয়েতু পায়নি কোনদিন।

রাঙুলা আর ফিরে আসেনি। জঙ্গলের পথেই সে চলে গিয়েছিল—কোথায়? তা কে জানে! তারপর আর তাকে কেউ দেখেনি কারাংমেটায়।

চিঠি শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ল রাঙুলাকে। তাকে প্রথম দেখেছিলাম কাবোংগা ঘটুলে। প্রশ্ন করেছিলাম—গুপ্তেজীকে—এমন মেয়ে কেমন করে এল মুরিয়া গাঁয়ে। শুনে ক্ষেপে গিয়েছিলেন উনি; বলেছিলেন: সভ্য জগতের মানুষের অসাধ্য কাজ আছে? জঙ্গলের মধ্যে এসে একটা মেয়ের সর্বনাশ করে যাওয়া আর শক্ত কি। সেদিন তাঁর হঠাৎ উষ্মা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আজ বুঝতে পারি কারণটা। মায়ের কথা মনে পড়েছিল গুপ্তেজীর।

কিন্তু গুপ্তেজী নয়, আজ রাঙুলার কথাই মনে পড়ছে আমার। কাবোংগা ঘটুলের একরাতের অতিথির সেই প্রগল্‌ভ নাচ: 'হো মান্না হো লালসাই'—চয়ন শিরদারের প্রতি নিক্ষিপ্ত সেই বিদ্রূপবাণ: সারাং সারপাতে উদিতন সায়দার। মনে পড়ছে তার লাস্যময়ী মূর্তি। তারপর অন্ধকার নির্জন অরণ্যে দেখেছি তার আর এক রূপ! সেদিন সে ছিল নিরাবরণা ধর্ষিতা ভার্গব-নন্দিনী! রাঙুলা বেলোসার অন্তরেও হয়তো ছিল অমৃতকুম্ভ। স্বামী-সন্তান-সংসার চেয়েছিল সেও আর পাঁচটা মুরিয়া মেয়ের মত। পায়নি। গুপ্তেজী যেমন মাড়িয়া মায়ের ছেলে হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের সমাজে, হয়তো রাঙুলাও তেমনি বন-জঙ্গল ভেদ করে ফিরে এসেছিল তার মাতৃ-কুলের সমাজে। কে জানে? অথবা হয়তো বনজন্তুর হাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তার অতৃপ্ত দেহমন!

পিল্লাই সাহেবের চিঠির জবাব লিখে উঠতে পারিনি। বছরের প্রথম তিনটে মাস আমাদের কাজের চাপ বেশী। মাসখানেক পরে আবার একটি চিঠি এল নারানপুর থেকে। এবার ডাক্তারবাবু নয়, লিখছেন মিসেস পিল্লাই:

একটা সুখবর আছে। একটা নয় দুটো। প্রথমত চয়নের নাকি অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে চিকিৎসায়। প্রায় রোগমুক্ত সে। আপনার বন্ধুর মতে আরোগ্য নাকি দ্রুততায় ওঁর আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে উঠছে। বোধ হয় প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্যে। এই সপ্তাহেই ইনজেকসান-কোর্স শেষ হচ্ছে। সে এখন ধরতে গেলে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। সে যাই হোক আগামী পঁচিশে মার্চ চয়নের বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। এখনও প্রায় মাসখানেক সময় আছে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করছি, ত্রুটি মার্জনা করে এ বিবাহে যোগদান করলে আমরা দুজনই শুধু বাধিত হব না স্বয়ং চয়নও খুশী হবে। তারই অনুরোধে আপনাকে আসতে লিখছি। এই মওকায় একটা মুরিয়া বিয়ে দেখে নিতে পারবেন, এটাও কম লাভ নয়, আপনার তরফে।

দ্বিতীয় সুখবরটা হচ্ছে, উনি রিসাইন দিচ্ছেন। রিসার্চের কাজে যোগদান করবার মন হয়েছে এতদিনে। বিয়ে মিটে গেলেই আমরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে যাব।

এই সঙ্গে একটা দুঃসংবাদও দিচ্ছি গোপনে। এ অঞ্চলে আদিবাসী মহলে একটা গোপন ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত হচ্ছে মনে হয়। মহারাজ প্রবীরচন্দ্রের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চয়ন মনে হয় সেই দলে পাণ্ডাগিরি শুরু করেছে। উনি তাই তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারি করে দিতে চান। যেন সংসার থাকলেই পাগল মানুষে পাগলামি ছাড়তে পারে! আমি তা মোটেই বিশ্বাস করি না। ভুক্ত-ভুগী কিনা। আপনি কি বলেন?

এ বিষয়ে আমি কি বলি তা অবশ্য জানাইনি। তবে চয়নের বিয়েতে যেমন করে পারি যাবার চেষ্টা করব—এ কথা জানালাম। মুরিয়া-বিয়ে দেখার এমন দুর্লভ সুযোগ ছাড়ব কেন?

(ক্রমশ)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন

২০শে থেকে ২৮শে অক্টোবর রেডিও সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনে বিভাগীয় মন্ত্রী ডক্টর গোপাল রেড্ডী আকাশবাণী যে যে বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বলে মনে করেন তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথিত একটি কৃতিত্ব—বাদ্যবৃন্দ। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের যন্ত্র সহযোগে এটি নাকি শ্রোতাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাদ্যবৃন্দের অনুষ্ঠান আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এই অনুষ্ঠান আমাদের আনন্দ প্রদান করে এবং মাঝে মাঝে প্রশংসনীয় মেলডির যে সৃষ্টি হয় না তা নয়, তবে বিশেষ কৃতিত্ব বলে একে দাবি করা যায় কি না সন্দেহ। এই বাদ্যবৃন্দের নূতনত্বের দিকে সুরকারদের উদ্ভাবন ক্ষমতার অধিকতর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

ডাঃ রেড্ডী এক ভাষার সুরকে অপর ভাষায় প্রতিফলনের উদ্যোগ করতে বলেছেন। ইংরেজি পত্রিকার ভাষায়—The interchange of tunes and melodies। তাঁর মতে এক ভাষার সংগীতগুলি অপর ভাষায় প্রয়োগ করে বোঝাতে না পারলে সেগুলি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থেকে যাবে। এই সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধারকল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন এবং তাতে উৎসাহও দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবে শংকা প্রকাশ না করে পারি না কারণ সাহিত্যের মত সংগীত অনুবাদের জিনিস নয়। মূল সংগীতের বৈশিষ্ট্য-গুলি বুঝিয়ে দিয়ে সেগুলি শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরলে ক্ষতি কি? দক্ষিণ ভারতীয় কোন বিশিষ্ট সুরকারের গান যদি বুঝতে হয় তাহলে আগে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তারপরে মূল-গানগুলি শুনলে বিদগ্ধ শ্রোতা সেগুলির মূল্যায়নে সক্ষম হবেন। কেবলমাত্র সংগীতের কায়িক পরিচ্ছদকেই যদি অপর ভাষায় অর্পণ করতে হয় তাহলে যাঁরা হাল্কা বিলিতি সুর রেকর্ড থেকে নকল করে ভারতীয় গানে প্রয়োগ করেন তাঁদের কিছু বলবার থাকবে না। তাঁরা তখন সরকারকেই এই প্রচেষ্টার সাক্ষী মানবেন। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে গুরুত্বর সাবধানবাণী উচ্চারণ করা উচিত ছিল বলে মনে করি। সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্যকে পরিচিত করা সর্বাগ্রে দরকার। এক সংগীতের প্রভাব অপর সংগীতের ওপর তখনই পড়ে যখন তার গভীরত্ব উপলব্ধির বস্তু হয়; নইলে যা ঘটে তাকে নকল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

মন্ত্রী মহাশয় উপদেশ দিয়েছেন ক্লাসিকাল রীতি রক্ষা করে নতুন সংগীত রচনায় ব্রতী হতে হবে এবং রাগসংগীত অবলম্বন করে সংগীত রচনা করলে সরকার তাতে উৎসাহ প্রদর্শন করবেন। এতে নাকি ক্লাসিকাল সংগীত জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। একথা অস্বীকার করবার নয় কিন্তু আমরা সুখী হতাম যদি তিনি কাব্যসংগীতের উল্লেখ করতেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীত হচ্ছে কাব্যসংগীত। তার বর্তমান অধোগতি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এই লিরিক-সংগীত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উল্লেখ এবং প্রস্তাব থাকা উচিত ছিল বলে মনে করি। আকাশবাণী যেখানে সার্থকতায় পৌঁছোতে পারেন নি, সেখানে তাঁদের পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা কি প্রকার হতে পারে তার একটা আলোচনা আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে আশা করেছিলাম। আকাশবাণীকে চলমান জীবনধারার সংগে অধিকতর নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনের কাব্যসংগীতকে মনোহর করে তুলতে না পারলে জনপ্রিয়তার ঘোষণা নিরর্থক।

উক্ত সম্মেলনে একটি মিউজিক সিম্পোসিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে দেখা গেল। আলোচনার বিষয়বস্তু—"ঠুংরী"। আকাশ-বাণী যে পুস্তিকা কেবলমাত্র প্রোগ্রামের জন্য দামী কাগজে ছেপেছেন তাতে এই সিম্পোসিয়ামের ভাষণগুলি যোগ করে দিলে চিন্তার পরিচয় পাওয়া যেত। গত বৎসরেও এইসব আলোচনা পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হবার প্রস্তাব আমরা করেছিলাম।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত ২১শে অক্টোবরের সংগীত সুপরিবেশিত হয়েছে। শ্রী ডি কে দাতার প্রথম শুদ্ধ কল্যাণে বেহালা বাজালেন। তাঁর বাজনা ভাল তবে নূতনত্ব কিছু নেই। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। আজকাল এক ধরনের বেহালা শুনেছি যা কণ্ঠসঙ্গীতের হুবহু অনুকৃতি। বেহালা শুনলে মনে হবে ঠিক একটা বিলম্বিত এবং দ্রুত খেয়াল শুনলাম। বাদ্যের যে একটা বিশেষ আবেদন আছে তার কোনো পরিচয়ই এইসব সঙ্গীতে মেলে না। মনে হয় বেহালাবাদকগণ কণ্ঠ-সঙ্গীতের ওস্তাদের কাছে তালিম নেন এবং তাঁদের স্বকীয়তা বলতে খুব কমই আছে। এই ধরনের উদাহরণ আমরা সমর্থন করি না। যন্ত্রকে কণ্ঠ থেকে আলাদা করে দেখবার মত মন তৈরি না হলে যন্ত্রী শিল্পী হিসাবে সাধারণত অত্যন্ত অসমর্থ হবেন। হাফীজ আহমদ খাঁ সাহেব কানাড়া এবং ভৈরবী গাইলেন। তাঁর গলা খুব তৈরি—সবই আছে কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চারিত হল না। এক কৌশলের পুনরাবৃত্তিও এঁর অনুষ্ঠানে একঘেয়েমি এনে দিয়েছে। বাসবরাজ রাজগুরুর আসবার কথা ছিল কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে গাইলেন শ্রীপ্রসূন বন্দ্যো-পাধ্যায়। তাঁর গান চমৎকার লাগল। কোথাও এক জিনিসের পুনরাবৃত্তি নেই; প্রশংসনীয় পরিমিতিবোধ। তাঁর সংগীতে একটা বিশিষ্ট আবেদন আছে। পরি-সমাপ্তিতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিলেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী। তাঁর ঠুংরী অপূর্ব। প্রত্যেকটি কাজ অন্তরকে দোলা দিয়েছে এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে। তাঁর টপ্পাও বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। এঁরা চলে গেলে এঁদের স্থান আর পূর্ণ হবে কি না সন্দেহ। যন্ত্র সহযোগিতায় ছিলেন শ্যামল বসু, লতিফ খাঁ, বোজওয়েল সান্যাল এবং সাগীরুদ্দিন। এঁদের সহযোগিতা সুন্দর এবং সার্থক।

বার্লিনের চিঠি

এখন গাছের সেই-পাতারা ঝরতে শুরু করেছে, যার মৃদুধ্বনিতেও পথিকের বুক কেঁপে ওঠে। এদেশেও এখন শরৎকাল; হেরবস্ট্ (Herbst)। রৌদ্র পলাতক। অভিমানী মেয়ের মত আকাশের গুমরানো মুখ। এবার রাগটা যেন একটু বেশীই গ্রীষ্মের ওপর। কেন না, গ্রীষ্মের অনুদারতা সত্যি এবার বেদনাদায়ক। গ্রীষ্ম এলোই না! না পারল নর-নারীরা নদী আর লেক-গুলিতে ঝাঁপিয়ে চান করতে, না পারল ছুটির দিনে বালি আর ঘাসের ওপর এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে গায়ে তাপ্রালো সূর্যে রৌদ্রস্নান করতে। নাঃ, এ বছর আর ব্রাউন হওয়া গেল না। এত দুঃখ! মেয়েদের দুঃখটা আর এক ধাপ বেশী। ছোট ছোট হালকা জামাগুলি বাক্সবন্দী হয়েই রইল। অথচ ইতিমধ্যে আরো কত নতুন ফ্যাশনের জামা কাপড় বাজারে বেরিয়ে গেছে। আর এরই মধ্যে পাতা ঝরতে শুরু করে দিয়েছে। আর কি, এবার দেখতে দেখতে শীত এসে যাবে। তারই শুভ্রচরণের পদধ্বনি যেন শুরু হয়েছে শুকনো পাতার অঞ্জলিতে। অথচ এই সময় আমাদের চোখ পৃথিবীর মানচিত্রে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ছোট্ট এক প্রদেশে, যেখানে এক সোনালী মেয়ে বুকে ধানের দুধের ভারে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে ফসলের মাঠে, প্রান্তরের কাশ ফুলের শিখা নীলাকাশের শুভ্র মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ এক বিপরীত জীবনযাত্রা চালচলন আর ভাষার মধ্যেও বাঙালী ছেলেদের মুখে মুখে পূজোর আলোচনা। এখানে অনেক সন্ধ্যায় বাঙালী ছেলেদের মাঝেও Jazz-এর সুর বাজে, সে আধুনিক Jazz-এর সাথে মাঝে মধ্যে আমাদের ঢাক ঢোলের তালে আর ট্রামপেটের সুর খুঁজে পাওয়া যায়. তবু "আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি" তার যেন তুলনা নেই। পথে দেখা হল, এমন কত ছেলের মুখেই ত শুনলাম—"জানেন ত, আজ মহাষ্টমী, এতক্ষণে বোধ হয় কলকাতায় সন্ধ্যা, আর লক্ষ লক্ষ মানুষে পথ-ঘাট ভরে গেছে।" আমি তাদের হয়ে সমগ্র বাঙালী পাঠকদের জানাই আমাদের প্রবাসজীবনের 'শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা। আজকে আমাদের এই মহান উৎসবের দিনে বাঙালীমাত্রেই জানেন, পূজোর এ-সুরের সাথে বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির স্রোত ছড়িয়ে পড়েছে শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে, যেখানেই বাঙালী আছেন। বিদেশে বাঙালীমাত্রেই জানেন, বাংলার জল-মাটি-মানুষ আর ভারতবর্ষ তাঁদের কাছে কতখানি প্রিয়। তা নাহলে, শরতের এই রূপ, পাতা ঝরার গান, বনে-বনান্তরে প্রকৃতির উজাড় করা বিচিত্র রঙের সমারোহে প্রকৃতির এমন অভিসারী রূপ, যার তুলনা নেই, তবু চোখে মুখে যার এমন বিদেশী রঙের ঘোর, সামনে খাবারের প্লেটে রুটির টুকরো, হুরস্ট (সসেজ জাতীয় খাদ্য) আর শুয়রের চর্বি, তখনও তার চোখে ভেসে উঠবে কেন পুরুলিয়া, রাঁচী রোড, আর হাজারীবাগের বনজংগল,

তুর্কী কবি নাজিম হিকমতের "ভালবাসার কাহিনী"-ব্যালে নৃত্য নাটিকার একটি বিশেষ দৃশ্য

যেখানে পথের ধারে, গাছের শাখায় শাখায় কোন এক মহান শিল্পীর তুলি থেকে ছিটকে পড়া লাল রঙে ফুটে ওঠে লক্ষ লক্ষ পলাশ। এদেশের মানুষ যখন গর্ব করে বলে—দেখ, আমাদের শরৎকালে কত রঙ! আমি তাঁদের সবিনয়ে বলি—চলো আমার দেশে। ভারতবর্ষের সব পথ আমি চিনি না। তবে আমার যতটুকু চেনা পথ আছে, সেখানে তোমাদের এই রঙের চাইতেও আরো গাঢ় রঙ জ্বলে বসন্তোৎসবে পলাশের নেশায়। আমি অবশ্য পাঠকদের আমন্ত্রণ জানাবো না এ দেশের প্রকৃতির রূপ দেখতে। প্রকৃতির সব রূপ এক ভারতবর্ষের অঙ্গে অঙ্গেই জড়িয়ে আছে। বরং পাঠকদের বলব, আসুন বার্লিনে, দেখবেন সংস্কৃতির এক বিশাল উৎসব এই অক্টোবর মাসে।

পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত পৃথিবীর এমন সাংস্কৃতির মহাসম্মেলন পৃথিবীর আর কোন নগরীতে এত ব্যাপকভাবে হয় কিনা, আমার জানা নেই। বার্লিনের এই অক্টোবর মাসের উৎসবকে Berliner Festwochen বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম—দুই বার্লিনেই এই উৎসব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় তরফ থেকেই আয়োজনের অন্ত থাকে না। একদিকে সৈন্য আর যুদ্ধোপকরণের সমাবেশের প্রতিযোগিতা, অন্য দিকে তেমনি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রতিযোগিতা। মাঝখানে Mauer, প্রাচীর। পূর্বের মানুষ পশ্চিমে এসে এই উৎসবে আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি পারে না পশ্চিম বার্লিনের মানুষ পূবে গিয়ে। উভয় তরফের দুঃখটাই নেহাত কম নয়। তবে পশ্চিম জার্মানির মানুষ আর বিদেশীদের এই সময় মজা। কেন না, তারা বাছাই করা অনুষ্ঠানগুলি দুই বার্লিনেই গিয়ে দেখতে পারেন। যেমন এখানে পশ্চিম জার্মানির নর-নারীর জন্যে সস্তায় ট্রেন ও প্লেন আর হোটেলের ব্যবস্থা আছে কেবলমাত্র Theater des westens-এ অনুষ্ঠিত বার্নার্ড শ'র "পিগম্যালিয়ন"-এর পটভূমিকায় রচিত সংগীতবহুল "মাই ফেয়ার লেডি" নাটক দেখাবার জন্যে। এক বছরের ওপর হয়ে গেল "মাই ফেয়ার লেডি"র অভিনয় আজো শীর্ষস্থানে। মিউনিকেও শুরু হয়েছে এর অভিনয়। নিউইয়র্কে "মাই ফেয়ার লেডি" অভিনয় এ পর্যন্ত আয় করছে ৮০ মিলিয়ন মার্ক। "মাই ফেয়ার লেডি" ছাড়াও এই চৌদ্দ দিন দুই বার্লিনে দুই পৃথিবীর সেরা ব্যালে, নাটক, অপেরা, কনসার্ট, প্যান্টোমিমে, Jazz-এর আয়োজন নেহাত কম নয়। দুই বার্লিন মিলিয়ে বাছাই করা গোটা ৫০ হলো এই ১৪ দিনের বিনয়ানুষ্ঠানের দীর্ঘ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটার নাম উল্লেখ করছি। Akademie der Kuenste হলে National theater Mannheim-এর Das lange Weihnachtsmahl ও Kafka-র Ein Bericht fuer eine Akademie und In der Strafkolonie, Theater des Westens-এ Royal Ballet, London কর্তৃক অনুষ্ঠিত Peter Tschaikowsky-র Dornroeschen, Gabriel Fauré-এর La Fete Etrange, Igor Strawinsky-র Danses Concertantes, Arthur Bliss-এর Checkmate Piraikon Theatron, Athen (এথেন্স)-এর Elektra (Sophokles-এর) Schiller Theater-এ ফ্রাংকফুর্টের সরকারী রঙ্গমঞ্চের নিবেদন বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক ও নাট্যকার Kleist-এর (জার্মান সাহিত্যের পরিচয় এদেশে Goethe-Kleist-Thomas Mann-এর ভাষা হিসাবে) Penthelisea; Wuppertaler Buehnen নিবেদিত O'Neill এর নাটক Alle Kinder Gottes haben Fluegel (ইংরেজী নামটা আমার জানা নেই); সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলহার্মোনিকা কর্তৃক মোৎসার্ট, বেটোফেন, ব্রাহ্‌মস্‌, স্ট্রাভিন্‌স্কি প্রভৃতির বাছাই করা সিম্ফনী এবং জুলিয়েন Kammersprechchor-এ বার্লিনার ফিলহারমোনিকা এবং হামবুর্গ ও কোলন-এর Rundfunkchor কর্তৃক সুর ও সঙ্গীত পরিবেশন; এছাড়া, Robert Shaw Chorale and Orchestra, U S A, I Virtuosi di Roma, Julian Bream Consort, London, William Kroll-Quartett, New York-এর অংশ গ্রহণ ত আছেই। অপেরায় Deutsche Oper Berlin-এর নাম সর্বপ্রথম আসে। সেখানে আর সবার মধ্যে Mozart ও Verdi-র বিভিন্ন অপেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিশেষ আকর্ষণের মধ্যে ছিল New York City Ballet ও আফ্রিকান ব্যালে। এবং নাটক,

চার অধ্যায় রচিত "দেবদাসী"-ব্যালের নিকিয়ার ভূমিকায় ওলগা ময়সেয়েভা Marius Petipa কর্তৃক এ প্রথম পরিচালিত হয় এবং Ludwig Minkus কর্তৃক সংগীত

ব্যালে ও অপেরার ওপর বিভিন্ন বিতর্ক সভা। বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাত-অখ্যাত শিল্পী ও স্থপতিদের শিল্পপ্রদর্শনী এই সংস্কৃতি-উৎসবকে মহিমামণ্ডিত করে তোলে। এই প্রসঙ্গে স্ট্রাভিনস্কীর প্রসঙ্গ একটু টানছি। মাস দুয়েক পূর্বে হামবুর্গে অতিবৃদ্ধ স্ট্রাভিনস্কীর আগমন ও তাঁর অনুষ্ঠান এদেশে চাঞ্চল্য এনেছিল। তাঁর দেশ রাশিয়ায়। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পর তিনি দেশত্যাগ করেন। তাঁর শিল্পী-জীবন বেছে নেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। এই মহান শিল্পী যখন আজ তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে নিজের দেশ রাশিয়ায় আবার ফিরে যেতে চাইবার প্রস্তাব করলেন, সেই মুহূর্তে পশ্চিমী দেশগুলি তাঁকে নিয়ে তর্ক আর নিন্দায় ঝড় তুললে। জানি না, শেষ পর্যন্ত স্ট্রাভিনস্কী কি করবেন।

পূর্ব বার্লিনের বিশাল অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে বিভিন্ন শিল্পী দল এখানে অংশ গ্রহণ করতে আসে। এবং সাংস্কৃতিক অভিযানে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি পশ্চিমকে পেছনে ফেলে কোথায় এগিয়ে গেছে, সে শুধু দুই বার্লিনের প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার বোঝা যায়। গত বছরের বুদাপেস্তের ব্যালে "গীজেলা", প্রাগের "Laterna Magica" এবং রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান না দেখলে বোঝা যায় না, দেশে দেশে সংস্কৃতি কতদূর এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে, লোকনৃত্য এবং সংস্কৃতিকে নগরের মহত্তম মঞ্চে তুলে ধরে তাদের আরো কত মহত্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সুন্দর করা যায়, নতুনের জন্য তাঁদের কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন শিল্পের সংমিশ্রণে আরো কত শক্তিশালী সংস্কৃতি জন্ম নিতে পারে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অনু-ষ্ঠানের মধ্যেই তা স্পষ্ট। এখানে আমি প্রাগের "Laterna Magica"-র প্রসঙ্গ টানছি। এই নতুন শিল্পকর্মটি এমন কি পশ্চিম বার্লিনের মানুষও জানে না। অথচ চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব বার্লিনে এর কী বিপুল সমাদর, তা গত বছর দেখেছি। ১৯৫৮ সালে বেলজিয়ামে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় প্রাগের এই "Laterna Magica" প্রথম স্থান লাভ করে। আমার হাতে এই মুহূর্তে কোন ছবি নেই। তাই একে পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝান শক্ত। তবে এটুকু বলতে পারি, ব্যালে, কনসার্ট, থিয়েটার ও ফিল্মের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব বলিষ্ঠ বিপুল গতিসম্পন্ন শিল্প। একই সঙ্গে তিনটে ভাষায় অনুষ্ঠান চলতে থাকে। দেশদেশান্তর, পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, জনপদ, লোহা, মেশিন, ফ্যাক্টরী, মানুষ, তার জয়যাত্রা—সমস্ত কিছুতে বিপুল প্রাণের সঞ্চার। বিশাল তার পটভূমিকা। শুধু জীবন, জীবন আর জীবন। একটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যে এমন শিল্পেরই ত প্রয়োজন। তবে এই জাতীয় অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানায় অসম্ভব। কোন দেশের সরকারের উদার হস্তের কল্যাণ কামনা সংস্কৃতি-চর্চার ওপর না থাকলে এ সম্ভব নয়। লোহা যে লোহা,

পেটার চেয়কোভস্কির বিশ্ববিখ্যাত ব্যালে "DORN-ROESCHEN" (ডোরন-রোয়শেন-এর অর্থ যদিও গোলাপ-কাঁটা, প্রকৃতপক্ষে এ-ক্ষেত্রে শব্দটি জার্মান রূপ-কথার এক অতিপরিচিত চরিত্রের নাম বোঝাচ্ছে।) নাম-ভূমিকায় ইরিনা কোলপাকোয়া

"লেনিনগ্রাদ সিম্ফনী" ব্যালের আর একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য

লোহার মত প্রাণহীন বস্তুও এখানে যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠছে। যে রক্ত-মাংসে গড়া শিল্পী সশরীরে এইমাত্র পিয়ানো বাজাচ্ছিল মঞ্চে, পরক্ষণে পেছনের বিশাল পর্দায় শুধু পিয়ানোর রীডগুলি আর শিল্পীর দশটি আঙুলের খেলা ভেসে উঠল, তারই পটভূমিকায় সশরীরে ব্যালেরিনারা দেহ মেলে ধরল। পেছনের পর্দায় জাতির জীবনের বৃহৎ শিল্পের চলমান ছবি, তার প্রতিটি মেশিন আর প্রাসাদের প্রাণমূর্তি তুলে ধরছে ব্যালেরিনার দেহভঙ্গিমায়। দূর পাহাড়ে পাহাড়ে যে সব মেয়েরা খেলা করছে, তারাই পর্দার পাহাড়ের চূড়া থেকে ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে আসছে, তারপর জীবন্ত দেহে একেবারে মঞ্চের উপর। দু' একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিলাম। ফিল্মে যে অসংখ্য শিল্পীরা আছেন, এই অনুষ্ঠানে তাঁদের সবার ঠিক সেই বেশে উপস্থিত থাকা চাই। তাই ছবি আর জীবন্ত দেহের পার্থক্য ঘুচে যায় অভিনয়ানুষ্ঠানের সময়। ব্যালের যে কী অফুরন্ত প্রাণশক্তি, এবং তাকে কতভাবে কাজে লাগান যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখলাম কিরভ থিয়েটার, লেনিনগ্রাদের ব্যালেতে। পূর্ব বার্লিনের বিশাল ফ্রিডরিখস্টাডট্-পালাস্টে এই ব্যালে গ্রুপটি ১৫ দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তাঁরা এই কয়-দিন যে সব ব্যালে প্রদর্শন করেন, তার মধ্যে Peter Tschaikowski-র DORNRO-ESCHEN, নাজিম হিকমেতের কাব্য নাটিকাবলম্বনে "ভালবাসার কাহিনী", Dmitri Schostakowitsch-এর Lenin-grader Sinfonie, দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক Pieter Abraham-এর উপন্যাস অবলম্বনে Kara Karajew-এর "Auf dem Gewitterpfad", ভারতীয় দেব-দাসীর কাহিনী অবলম্বনে "Das SCHATTENREICH", যে-ব্যালেটি ১৮৭৭ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী পেট্রোস-বুর্গে প্রথম মঞ্চস্থ হয়, Chopin-এর CHOPINIANA (Les Sylphides), গোগোলের ঐতিহাসিক গল্প অবলম্বনে "Taras Bulba" বড় ব্যালে হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া "স্পার্টাকাস"-এর অংশ, এবং "দি ডাইং সোয়ান"-এর তো তুলনাই নেই। ধবলশুভ্র বসন, সমুদ্রস্পন্দিত সুরের স্রোত, সেই সাথে শিল্পের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর প্রকাশ ও অনুভূতিতে পৌঁছুবার জন্যে যে আর্তি, নিপুণ উর্বশী-দেহের যে ব্যঞ্জনায় মহৎ শিল্প "ব্যালে", তারই মহত্তম প্রকাশ "দি ডাইং সোয়ান" আর সব ব্যালেগুলিকে ছাড়িয়ে কোথায় যেন গিয়ে পৌঁছেছে। যার তুলনা কোন-প্রকারেই চলে না। দি ডাইং সোয়ানের ভূমিকায় Olga Moissejewa-র অনবদ্য অভিনয় ভুলবার নয়। এই দেশে থিয়েটার, ব্যালে, অপেরা ও অর্কেস্ট্রা সীম্ফনী অনুষ্ঠানের পর দর্শক ও শ্রোতাদের হাত-তালি দেবার একটি বিশেষ প্রথা আছে। অনুষ্ঠানশেষে পর্দা পড়ে গেল, প্রবল হাত-তালি শুরু হল; হাততালি না থামলে

প্রধান শিল্পীরা আবার মঞ্চে এসে অভিনন্দন গ্রহণ করবেন, এর পরেও হাততালি চললে, সমবেত শিল্পীরা এসে মঞ্চে দাঁড়াবেন; আবার পর্দা পড়ে গেল, তার পরেও যদি হাততালি চলে, তখন প্রধান শিল্পীরা কখনো একা, কখনো দ্বৈত, কখনও বা তিন-চারজন হাত ধরাধরি করে পর্দার বাইরে এসে দাঁড়াবেন সেই করতালি-সমুদ্রের মাঝে। সাধারণত তিন-চারবার শ্রোতা ও অভিনেতাদের মাঝে এরকম অভিনন্দনের এক নতুন অভিনয়ের পালা চলে। এর পরেও যদি হাততালি চলতে থাকে, তখন শিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করতে সত্যি দ্বিধাবোধ করেন, না আসবারই চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রোতারা নাছোড়বান্দা। কয়েক হাজার মানুষ তখন একতালে হাততালি দিতে থাকে, তার মানে – আমাদের দাবি মানতে হবে! এবার যখন শিল্পী এসে ঢুকলেন, তখন আরো প্রবল ঝড়ের মত হাততালি। আমি ঘড়ি ধরে দেখছিলাম, দি ডাইং সোয়ান-এর পর ১০ মিনিট ধরে হাততালি পড়েছিল, ব্যালেরিনা Olga Moissejewa-কে সাতবার মঞ্চে এসে সাত রকম অঙ্গবিন্যাসের মধ্য দিয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করে, তাঁকে শেষ পর্যন্ত করুণ ভঙ্গিমায় দর্শকদের কাছে প্রার্থনা জানাতে হল—এবার আমাকে বিদায় দিন, নয় ত দি ডাইং সোয়ান-এর মত আমাকেও মরতে হবে। আর শুধু একবার হাততালি দেখেছিলাম, [illegible] সিম্ফনি [illegible] পরি-বেশনের পর [illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] এর জন্য সমবেত উচ্ছ্বাসে।

এই প্রসঙ্গে [illegible] উচিত। [illegible] [illegible] হয়। [illegible] ও [illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible], তার উচ্ছ্বাস [illegible] ও চার্লস [illegible] প্রভৃতির [illegible] দিয়ে এখন থেকেই এক নতুন [illegible] জন্ম হল। [illegible] দুইটি ধারাকে [illegible] এক, [illegible] দুই—[illegible] তাৎপর্যপূর্ণ [illegible] শিল্প পরিবেশন।

১৭৬৬ [illegible] Francesco Araja "La Forza dell' amore e dell' odio" মঞ্চস্থ করে

তিন কোটি মার্কে নির্মিত ইউরোপের আধুনিকতম ব্যালে ও অপেরা মঞ্চগৃহ "জার্মান অপেরা বার্লিন" (Deutsche Oper Berlin)-এর দৃশ্য

কাইজার-পত্নী Anna Joannowna রাশিয়াতে প্রথম ব্যালে ও অপেরার উদ্বোধন করেন। তার পরেই ফরাসী নৃত্যশিক্ষক Jean-Baptiste Landé পেটার্সবুর্গে এসে পৌঁছেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর "Kadetten"-এর সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে কাইজারিন আনা এই নৃত্যশিক্ষককে নিয়োজিত করে তাঁর প্রথম ব্যালে স্কুল স্থাপন করেন। এইভাবেই ২২৬ বৎসর পূর্বে পিটার্সবুর্গের ব্যালের জন্ম হয়। এরপর কত না নামী-অনামী ইতালী, ফরাসী ও অস্ট্রিয়ার ব্যালে গুরু পিটার্স-

Franz Kafka-র কোন এক কাহিনী "In der Strafkolonie"-কে Akademie der Kuenste হলে মঞ্চস্থ করবার জন্যে তার নাট্যরূপ, দৃশ্য-পরিকল্পনা এবং মঞ্চগঠন তৈরী করেছেন অধ্যাপক হির্বাল স্মিডট্

বুর্গে এসেছেন আর নতুন প্রেরণা নিয়ে পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছেন। এভাবে পিটার্সবুর্গ ইউরোপের ব্যালে নাচের চর্চা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে লোকনৃত্য-গুলিকেও আরো সুন্দরভাবে তুলে ধরে, আস্তে আস্তে ব্যালের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হ'ল। তাই আজ গোগলের "Taras Bulba"-র মত গল্পকে (যা সম্পূর্ণই লোকনৃত্যের মাধ্যমে রূপ দেওয়া হয়েছে) আমরা ব্যালেরূপে দেখতে পাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, নানা লোকনৃত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ কোথায় পড়ে আছে। লোকনৃত্যগুলি অবহেলায় অবলুপ্তির পথে। সামান্য দৃষ্টান্ত—ছৌ নৃত্য। পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনে ছৌ নৃত্য কতখানি, তা তাদের জীবনের সাথে মিশলে বোঝা যায়। প্রতি বছর চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামান্তরে দেখা যায় ছৌ নৃত্যের আসর। চৈত্রের শেষে ঝালদার রাজবাড়িতে সমস্ত পুরুলিয়া জিলার ছৌ নৃত্যের এক ব্যাপক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়—সেখানে দেখেছি, আমাদের সমাজে এখনো যারা "অর্ধসভ্য", অর্ধাহারী, সারারাত সেই সব ধুলোমাটিমাখা মানুষের হাজার জনতা, আর জনতার ব্যাকুলতা, প্রবল উচ্ছ্বাস। এরকম কত অসংখ্য লোকনৃত্য আর গান ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের শহর থেকে কিছু দূরে চাষা-ভুষা মানুষগুলির মাঝে—যা নিয়ে আমাদের পত্রপত্রিকা আর মঞ্চ-গুলিতে খুব অল্পই চর্চা, আরো অল্প গবেষণা। যা-ও বা কিছু চর্চা হ'ল ত, তাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নতুনতর রূপে প্রকাশের কোন আয়োজন নেই।

আজ সোবিয়েৎ রাশিয়াতে ব্যালের যে চর্চা, তা সারা পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়—তার এক প্রবল ঢেউ যেন পূর্ব বার্লিন পর্যন্ত অনুভূত হয়। যদিও প্রাগ্বিপ্লব যুগের বিরাট কালের ব্যালে ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে ফরাসী পরিচালক Charles Didelot (১৭৬৭—১৮৩৭), পুশকিন আদাম গ্লুস্কভস্কি (নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের পরবর্তীকালে), চেয়কভস্কি, গ্লাসুনভ, মারিয়াস পেটিপা, লেভ ইভানভ, আনা পাভলভা, ফোকিন প্রভৃতির অসাধারণ প্রতিভা আর অবদান, তবু ব্যালে আরো বৃহত্তর সমাজে ব্যাপকতর রূপ নিয়েছে বিপ্লবের পর। ১৯৪০ সালে যুদ্ধের মাঝেও যখানে রূপ নিচ্ছে Prokofjews পরিচালিত "রোমিও ও জুলিয়েৎ" তেমনি ১৯৪১-'৪২ সালে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে আসে Olga Jardan-এর নেতৃত্বে একটি ছোট্ট ব্যালে গ্রুপ লেনিনগ্রাদের হেলডেন-স্টাড্ট্-এ বোমা আর অনাহারের মধ্যেও। ১৯৪৫ সালের পর আজ নতুন নতুন ব্যালের জন্ম শুরু হয়েছে। তার মধ্যে "লেনিন-গ্রাদের সিম্ফনী" আর নাজিম হিকমতের "ভালবাসার কাহিনী" এখানে বিশেষ চাঞ্চল্য এনেছে। নাজিম হিকমতের সাথে আমার পরিচয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনূদিত "নাজিম হিকমতের কবিতা"র মাধ্যমে। কিন্তু "ভালবাসার কাহিনী" ব্যালের মধ্যে দিয়ে নাজিম হিকমতের যে পরিচয় পেলাম, তা যেন শতগুণে ব্যাপক ও গভীর। নাজিম হিকমত নিজে Arif Melikow ও Juri Ghigorowitsch-এর সাথে অনেক পরি-শ্রমের মধ্যে দিয়ে এই বিরাট ব্যালে নৃত্য-নাট্যটিকে রূপ দিয়েছেন। আর এই "ভালবাসার কাহিনী" দেখার পর এই কথাই মনে আসে, আমাদের ঐতিহ্যগত কাহিনী-গুলিও ব্যালেতে কত সুন্দরভাবে রূপ দেওয়া যেতে পারে। শুধু চাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মত সংগঠন যেখানে এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাচীন ও আধুনিক অনেক লেখকের কাহিনীকেই রূপ দেওয়া হচ্ছে সসম্মানে। নির্দ্বিধাতেই বলবো পশ্চিমে এর কোন চিহ্ন নেই। এমন কি, পশ্চিম জার্মানির থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র Theater Heute এর বাৎসরিক বিশাল সংকলনে পশ্চিম জার্মানি, পূর্ব জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যাণ্ডের (অর্থাৎ জার্মান ভাষায় অনুষ্ঠিত) সকল অভিনীত নাটকগুলির তালিকা আছে, Maxim Gorki Theater-এ অভিনীত আর সকল নাটকগুলির নামোল্লেখ আছে, অথচ "বসন্তসেনার" কোন উল্লেখ নেই। অথচ পূর্ব বার্লিনে গত মে-উৎসবের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল জনস্রোতে যে সব বিরাট বিরাট ব্যানার, পোস্টার আর ছবি ভাসছিল, তাতে ম্যাক্সিম গোর্কী থিয়েটারের তরফ থেকে "বসন্তসেনার" বিরাট ছবিই তুলে ধরা হয়েছিল। এর পরেও যে সব বিশ্বনিন্দুক বন্ধুরা সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির বিরুদ্ধে কেবলমাত্র প্রচারের অভি-যোগ উত্থাপন করবেন, তাদের আমি সোচ্চারে ধিক্কার দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো না।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

আঠারো

গাবতলির হাট অদূরে। সারি সারি চালা দেখা যায়। হাটবার আজকে। সূর্য চলে এসেছে, জমজমাট হাট এখন। গাঙের বাঁধ ধরে হাটুরে মানুষের পিলপিল করে যাওয়া-আসা চলছে।

বলাধিকারীর ঘুম নামে মাত্র। ডাকতে হয়নি, আপনিই উঠে পড়েছেন। হাটের দিকে আঙুল তুলে বলছেন, শীতকালে এবারে এই জমাতে শুরু করল। কি করবি, জিজ্ঞাসা করছিলি না—দেদার কাজ। ধান পেকেছে, কাজের অভাব নেই আমাদের ভাঁটি অঞ্চলে। দিনের কাজ আছে, রাতের কাজ আছে—কাজের আর স্ফূর্তির দিন এখন। মানুষের দরকার অঢেল। ধান কাটার মানুষ চাই, পাঠশালা বসবে তার জন্য গুরুমশাই চাই, অসুখ হলে পয়সার গরমে এখন সকলে ওষুধপত্তোর খাবে তার জন্য ডাক্তার চাই, যাত্রার দল খুলবে তার সখী চাই মোশানমাস্টার চাই—কত মানুষের কত কাজ! এ কি তোর শহরবাজার পেলি, কাজ-কাজ করে মানুষ যেখানে চোখের জলে বুক ভাসায়?

নৌকা ততক্ষণে হাটখোলা ধরো-ধরো করেছে। একদিকে কতকগুলো পত্রহীন বাবলাগাছ। বলাধিকারী বলেন, মরশুমের মুখে এখন বাবলাবনে এক নতুন হাট বসেছে—মানুষ-হাটা। গাঙের খোল থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা জায়গা সাফ-সাফাই করে গামছা পেতে সারবন্দি সব বসে আছে বিক্রি হবার জন্য। ক্ষেতেল চাষী, গুরুমশায়, ডাক্তারবাবু, গানের ছোকরা—হরেক গুণের মানুষ। বলিস তো তোকেও ওর মধ্যে বসিয়ে দিতে পারি খোকনচন্দোর। হাটুরে মানুষ এক মরশুমের দরদাম ঠিক করে নৌকোয় নিয়ে তুলবে। এ সমস্ত হল দিনমানে সদরের উপরের কাজ, আর রাতের কাজের খবর যদি চাস—

বলাধিকারী অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসলেন। নৌকোর মাঝিমাল্লার ব্যাপারটা যে অজানা তা নয়। তবু এ সমস্ত অপরের কান বাঁচিয়ে বলার রীতি। এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, রাতের কাজেরও মরশুম এই। পুরো মরশুম চলছে। নিশিকুটুম্বরা সব দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে, বার-দশেরার দিন। দলে দলে বলাবি নে—আয়োজন বৃহৎ, সেজন্য দলে দলে। বাইরে বাইরে ওদের সকলের কাজ, আমার ছুটি এই সময়টা। ছুটি বলেই জঙ্গলবাড়ি মায়ের দর্শনে যেতে পারলাম।

একেবারে হাটের নিচে এসে পড়েছে। বলাধিকারী ফিক-ফিক করে হাসেন : বিয়ে করার বাসনা যদি হয়ে থাকে, তারও মরশুম কিন্তু এই। জামাইহাটা ঐ যে—ঢোঁড় কেটে ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জামাইরা সব ঐখানে এসে বসেছে। স্বয়ম্বর সভা। তবে কনে আসে না, আসে কনের বাপ-দাদারা। ঘুরে ঘুরে তারা আলাপ-পরিচয় করবে, কনের দর তুলবে। বরপণ নয়, কন্যাপণ। দরে বনিবনাও হয়ে গেল, জামাইটাও নেহাৎ অপছন্দের নয়—কনেওয়ালা তখন বাড়ির ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে যাবে, বরকর্তা গিয়ে কনে দেখে টাকাকড়ি কিছু দাদন দিয়ে কথা পাকা করে আসবে।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলাধিকারী হেসে বলেন, কী রে যাবি নাকি নেমে জামাই-হাটায়? তোর মতন জামাই পড়তে পাবে না, চেহারায় মেরে দিবি—খুব সস্তা পণে কনে গেঁথে ফেলবি।

হাসাহাসি চলে খানিকক্ষণ। কথা হয়েছিল, হাটে নেমে মিষ্টিমিঠাই এবং টিউব-ওয়েলের মিঠাজল ভরপেট খেয়ে নেবে সবাই। কিন্তু ঘাটে এসে মাঝি এখন আড় হয়ে পড়েছে : গোনের আর অল্পই আছে, দেরি করলে জোয়ার এসে যাবে। রাতও হয়ে আসে এদিকে—কোনখানে নৌকো বেঁধে গোনের আশায় সেই রাত দুপুর অবধি ঠায় বসে থাকা—ফুলহাটা পৌঁছানো তাহলে সকালের আগে নয়। পেটে ক্ষিধে সকলের—তা বেশ, একজন কেউ নেমে গিয়ে ক্ষিধের রসদ নিয়ে আসুক। যাবে আর আসবে। কিন্তু বলাধিকারী মশায় কিছুতে নয়।

জগবন্ধু হতাশ হয়ে বলেন, শুনলে তোমরা? আদালতে বিচার হয়ে জেল দেয়, মাঝি আমায় বিনা বিচারে আটক করেছে। যে কেউ তোমরা নেমে গিয়ে ঘুরে ফিরে আসতে পার, আমারই কেবল পাড়ের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মানা। মনে দুঃখ লাগে কিনা বলো।

মনের দুঃখে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। নৌকার এই নতুন মানুষ দুটো সত্যিই বা সেইরকম ভেবে বসে—মাঝি তাড়াতাড়ি তাই কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: হ্যাঁ, অন্যায় বলে থাকি তো ধরে মারুক সকলে। আপনি নেমে পড়লে তুলে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা! হাটের মধ্যে কত দেশের কত মানুষ, কত দোকানপাট। এ দোকান থেকে ডাকবে: একটুখানি বসে যান বলাধিকারী মশায়। ও দোকানি ছুটে এসে ধরবে, পা ছুঁইয়ে যান একটিবার দোকানে। অমুক এসে শলাপরামর্শ চাইবে, তমুক এসে হাত পাতবে—একটা-দুটো টাকা দিয়ে যান। শতেক জনের হাজারো রকম দায়—হাট না ভাঙা পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে দেবে না।

নিজের প্রশংসায় বলাধিকারী বিব্রত বোধ করছেন। বাধা দিয়ে বলে ওঠেন: থাক থাক, চুপ কর দিকি। এরা ভাববে, সত্যিই বুঝি আমি দরের মানুষ। টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আর কেউ নয়—তুমিই নেমে পড় মাঝি। মুড়ি-বাতাসা আর মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। মিঠাজল এনো এক কলসি। দু-দুজন কুটুম্বমানুষ—মিষ্টি বেশি করে নিয়ে এসো। শহর থেকে এসেছে, পেট না ভরলে ফিরে গিয়ে নিন্দেমন্দ করবে।

ঘাটের উপর বোঠে পুঁতে নৌকোয় কাছি করে মাঝি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে একছুটে বেরিয়ে গেল। টাকাপয়সা যার যাক মানুষ মরে মরুক—সমস্ত সইবে, কিন্তু অকারণ গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকোর মাঝির বুকে তখন শেল বিঁধতে থাকে।

সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখছে। দুচোখ ফেরানো যায় না। সেই ছোট্ট বয়সে কালীঘাটে নৌকোর মাঝিদের কাছে এমনি সব জায়গার গল্প শুনেছে। মন উচাটন হত চোখে দেখবার জন্যে, এতদিনে ভাগ্যে তাই ঘটল। নৌকোয় নৌকোয় ঘাটের জল দেখবার উপায় নেই। বিশাল নদীর ওপারে দীর্ঘব্যাপ্ত সবুজ রেখা অস্পষ্ট নজরে আসে। জনালয় নেই ওদিকে, বাদাবন। বাঘ-সাপ-কুমিরের আরামের রাজ্য।

বলাধিকারীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়: নামটা দিয়েছে বেশ—বলাধিকারী। ঠিক ঠিক মানিয়েছে। বলের নমুনা গাড়িতে উঠবার মুখেই একটুখানি দেখালেন—মধুসুদন মানুষটাকে পোকামাকড়ের মতন আঙুলের ডগায় খুঁটে ফেলে দিলেন যেন।

জগবন্ধু বললেন, বলাধিকারী কারও দেওয়া নাম নয়—কৌলিক উপাধি। এক বয়সে দেহচর্চা করে গায়ের বল কিছু করেছিলাম বটে। নিলাম দারোগার চাকরি—সে চাকরি হল খুনি-বদমাশ চোর-ডাকাতের নামে নিরীহ ভাল ভাল মানুষ ঠেঙিয়ে দুটো পয়সার সংস্থান করা। তার জন্য গায়ের বল চাই বইকি! কিন্তু মানুষের আসল বল বুদ্ধিবল—সে বস্তু কেউ চোখে দেখে না। আমার সেদিকটা একেবারে খাটো। কারো ঘটে একটু যখন বুদ্ধি দেখি, মানুষটাকে খাতির করি। কপালবহীন মানুষ, [illegible], পয়সাওয়ালা কাউকে দেখলে [illegible] কী রকম [illegible] করে! [illegible] নৌকোয় তুলে নিয়ে যাচ্ছি—[illegible] মগজের বুদ্ধি আর সুচতুর [illegible]।

এবং [illegible] ও মগজের গুণপনায় মুগ্ধ বলাধিকারী ঐ নৌকোখানাতেই [illegible] করে দিলেন।

নিম্নকণ্ঠে বললেন, আমাদের মাঝি উল্টো করে বোঠে পুঁতে গেল কেন?

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে বলে উঠলেন, তুই যে ডাঙার দেশের মানুষ, ভুলে গিয়েছিলাম। উল্টো-সোজার কি জানিস! ঠাহর করে দেখ, সব ডিঙিওয়ালা বোঠের চওড়া মাথা মাটিতে পুঁতেছে। পোঁতবার সুবিধা, চাপ দিলেই বসে যায়। আমাদের উল্টো। সরু দিকটা পোঁতা, চওড়া মাথা উঁচুতে। কেন রে?

সাহেব কি জানে, আর কি বলবে! অবোধ চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

বলাধিকারী বুঝিয়ে দিচ্ছেন: হাটখোলা জায়গা—কতজনে কত মতলব নিয়ে ঘুরছে। রাত্রিকাল সামনে। বোঠে উল্টো করে পুঁতে জানান দেওয়া হল, বাপু হে, আমরাও ঐ কাজের কাজি। পিছু নিও না কেউ আমাদের।

বলেন, দেশভাষায় এ জিনিসের নাম চোর-সংজ্ঞা। সংজ্ঞা অনেক রকম আছে। মনে

ধর, পিছন ধরেছে একটা দল। আমাদের নৌকো মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসছে। অন্ধকারে মানুষ ঠাহর হয় না। কাছাকাছি এসে বলবে, এক ছিলিম তামাক দাও ও মাঝি-ভাই। কিংবা বলবে, মাছ কিনে আনলাম, আঁশ-বঁটিখানা একবার বের করো ভাই। নৌকো মারার মুখে এই সমস্ত বলে। কি করবি তখন, সামাল দেবার উপায়টা কি?

উপায়ের কথাটা আপাতত চাপা পড়ে যায়। খাবার ও জলের কলসি নিয়ে মাঝি ফিরে এলো। নৌকো ছুটিয়ে দিয়েছে, হাট-খোলায় সময়ের ক্ষতিটুকু পূরণ করে নেবে।

আধখানা বাঁকও যায়নি। কে-একজন চেঁচামেচি করছে না পিছন দিকে? বাতাসে তেমনি একটা আওয়াজ ভেসে আসে।

বলাধিকারী চোখের উপর দিকটায় হাত রেখে নিরীক্ষণ করেন। সন্ধেবেলা চারিদিক ঘোর হয়ে এসেছে। দেখেন জেলে-ডিঙি একটা। এদের এই গতি—জেলেডিঙি যেন নদীজলের উপরে তরতর করে উড়ে আসছে।

বলাধিকারী বললেন, বোঠে তুলে ধরো তোমরা। দেখা যাক। কী যেন বলছে। নৌকো রাখতে বলছে, এমনি মনে হয়।

খানিকটা কাছে এলে বলাধিকারী এক-গাল হেসে ফেলেন: আরে, বংশী না? বংশীই তো বটে। মামার বাড়ি এসেছিল বোধহয়।

বংশী চেঁচাচ্ছে: আমি যাব, আমি যাব। নিজ হাতে বোঠে ধরে অভিনব কায়দায় জলের উপর মারছে। বলাধিকারীর ফুলহাটা গাঁয়ের মানুষ বংশীধর। অনুগত, এবং প্রতিপাল্যও বটে। এই গাবতলির নিকটবর্তী সোনাখালিতে পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি—স্বনামধন্য ওস্তাদ পচা বাইটা। এত বড় গুণী মানুষের আপন নাতি বংশী—মেয়ের ছেলে। বাইটার মেয়ে এই একমাত্র ছেলে রেখে অনেক দিন আগে মারা গেছে।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বলাধিকারী আবার সাহেবের দিকে ফিরলেন: বোঠের মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছে বংশী। কি বলছে শোন।

সাহেব কান পেতে শোনেন। আওয়াজ বিচিত্র বটে। সাধারণ বোঠে বাওয়ার মতো নয়।

কি বলে?

বলছে একটা-কিছু ঠিকই। ধরি-ধরি করেও সাহেব সেটা ধরতে পারে না।

বোঠের তালে তালে বলাধিকারীই এবার মুখে বলছেন, সাঙাত-সাঙাত সাঙাত-সাঙাত—তাই না? নৌকোর গায়ে জল করে ছল-ছলাৎ, আর বোঠে করে সাঙাত-সাঙাত। সাঙাত কিনা বন্ধু। এ-ও এক চোরসংজ্ঞা। সেই যে কথা হচ্ছিল—নৌকো মারবে বলে পিছন ধরে এসে পড়েছে, রাতের অন্ধকারে কেউ কাউকে চোখে দেখছে না, তখনকার উপায় কি? জলের উপর বাড়ি মেরে বোঠে দিয়ে কথা বলাবি। কাঠে কথা বলানো গুণীলোক ছাড়া পারে না। সাঙাত বুঝে তোবা-তোবা করে তারা ফিরে যাবে।

পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারী, সেকাল-একালের বিস্তর খবর তাঁর কণ্ঠাগ্রে। প্রাচীন চৌরশাস্ত্রের কথা উঠে পড়ে। সেই সূত্রে চোরসংজ্ঞা—অর্থাৎ, চোরে চোরে চেনা-জানার জন্য নানারকম গুপ্ত-সংকেত। ভ্রম বশে এক চোর অন্য চোরের ক্ষতি না করে বসে। কিন্তু বাইরের চতুর লোকে চোরসংজ্ঞা জেনে গিয়ে ঠিক উল্টোটাই ঘটিয়েছে অনেক সময়। রাজপুত্র বরসেনের কথা পাওয়া যায়—চার চোর দেখতে পেয়ে তিনি চোরসংজ্ঞা করলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে তারপর তিনিই তাদের মূল্যবান চোরাই-মালের উপর বাটপাড়ি করলেন। রাজা বিক্রমও ঠিক এমনি করেছিলেন..

জেলেডিঙি ইতিমধ্যে পাশে এসে পড়েছে। হাতের বোঠে ফেলে বংশী বলাধিকারীর নৌকোয় উঠল। বলে, খুব পেয়ে গেলাম। হাটবার দেখেই মামার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, হাটুরে-নৌকো ধরব এখান থেকে। তা হলে হাট ভাঙা অবধি হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হত। বাঁক ছাড়িয়ে এসে আপনাকে দেখলাম—এক নজর দেখেই বুঝেছি, বলাধিকারী মশায় ছাড়া কেউ নন। উঃ, কী টান টেনে আসতে হল!

মাল্লাদের দিকে চেয়ে বলে, গোন কিছু নষ্ট হল তোমাদের। আমি তার পূরণ করে দিচ্ছি। দাঁড়ের মুরুব্বি, তামাক ধরাও তুমি এবারে। আমি খানিকটা টানব।

বুড়ো দাঁড়ি একজন—মানুষটাকে সরিয়ে দিয়ে বংশী দাঁড়ে বসে গেল। লহমার মধ্যে সব কিছু আপন তার। সাহেবের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না, হাতের দাঁড় উঁচু হয়ে থাকে। চোখ টিপে নিম্নকণ্ঠে বলে, কাণ্ডখানা কি, মেয়েছেলে হরণ করে কোথায় নিয়ে যাও তোমরা?

রসিকতাটা ঐ বুড়ো দাঁড়ির সংগে। বলাধিকারী খবরের কাগজ খুলে বসে-ছিলেন। সাপ্তাহিক চাউশ কাগজ, মেলা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। যে রকম আয়তন, এক প্রান্তে উপুড় হয়ে শুয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য প্রান্ত পড়া যায়। কথা কানে পড়তে হেসে উঠলেন: শুনলি রে খোকন-চন্দোর, তোকে মেয়েছেলে বলছে।

বংশী জোর দিয়ে বলে, যে দেখবে সে-ই

একথা বলবে। আজেবাজে পাঁচ-খেঁদি মেয়েছেলে নয়—রাজকন্যে। চুল খাটো করে ছেঁটে চুড়ি ভেঙে হাত ন্যাড়া করে বেটাছেলে সেজেছে। যাত্রার দলে পুরুষমানুষ গোঁফ কামিয়ে মাথায় পরচুলা গায়ে গয়না পরে মেয়েমানুষ হয়, তার উল্টো।

বুড়ো দাঁড়ি এইবারে জবাব দিলঃ চাও তো রাজকন্যে তোমার ঘরেই তুলে দেওয়া যায় বংশী।

বলাধিকারী বলেন, ওরে বাবা! বংশীর ধর্মপথে মতি যাবে, পরিবারের সেজন্য কপাল ক্ষয়ে গেল দেবতা-গোঁসাইর কাছে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে। তার উপরে এই উৎপাত গিয়ে পড়লে ঠাকুর-দেবতাকে না বলে সোজাসুজি সে ঝাঁটা তুলে দাঁড়াবে।

ঘরের পরিবারের কথা, বিশেষ করে নিজের পুরুষকে ভাল করবার চেষ্টা—এই সমস্ত উঠে পড়ায় বংশীর লজ্জার অবধি নেই। সাহেবের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

বলাধিকারী হেসে বললেন, অত করে কি দেখিস—লাইনের লোক। মাল কাঁচা এখনো, কিন্তু ভারি সরেস। আপন লোক ছাড়া কি ডেকে এনে নৌকোয় তুলেছি!

এক চোট হেসে নিয়ে বললেন, কে নয় লাইনের শুনি? দুনিয়া সুদ্ধ চোর—ভারিগুলো বাইরে বাইরে ভড়ং দেখিয়ে বেড়ায়। একটা চোরের কথা কেউ যদি ভাল করে লেখে, সমাজের সকল মানুষের জীবনী লেখা হয়ে যায়। যে লেখক লিখছে, সে ও কিছু তার বাইরে নয়।

দাঁড়ের মুঠো আবার সেই বুড়োর হাতে দিয়ে বংশী সাহেবের পাশটিতে চলে গেল। বলাধিকারী কাগজ পড়ছেন। পাছে কোন-রকম ব্যাঘাত না ঘটে মৃদুস্বরে দু-জনের আলাপ পরিচয় চলে। এই যে পাশে চলে এল, কোন দিন বংশী আর আলাদা হইনি। বুড়ো বয়সে সকলের মতো সাহেব একদিন বলশক্তি হারাল, সেদিনেরও আশ্রয় বংশীর বাড়ি। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা, আগে বলতে যাই কেন?

কাগজ পড়ছিলেন বলাধিকারী। কাগজ-খানা ভাঁজ করে রেখে মুখ তুলে বংশীকে বললেন, মরে গেছে বুড়ো?

প্রশ্নটা হঠাৎ পড়ে বংশী হকচকিয়ে যায়ঃ কার কথা বলছেন?

কার আবার! পঞ্চানন বর্ধন—পচা বাইটা। যার মরার দরকার দুনিয়ার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি। মামার-বাড়ি থেকেই তো ফিরছ?

হ্যাঁ—বলে বংশী ঘাড় নাড়ে। বেদনার সুরে বলে, নতুন করে কী মরবে! এককালে মুল্লুক চষে বেড়িয়েছে, সেই মানুষটা আজ বাইরের দোচালা ঘরে দিনরাত পড়ে আছে। বিষ-হারানো ঢোঁড়া। বাড়ি-ভরা মানুষ-জন, পুতের বউ দু-দুজনা, নাতিপুতি দু গণ্ডা আড়াই গণ্ডা—কিন্তু ভাতের থালা-

খানা রেখে যাওয়ার মানুষ হয় না বুড়োর ঘরে। কেউ যায় না সে ঘরে—বাড়ির লোক নয়, বাইরের লোকও নয়। একটা মানুষ দেখার জন্যে হা-পিত্যেশ করে থাকে। মরেই গেছে বাইটা—ঘরে বাইরে সকলে সেই রকম ভেবে নিয়েছে।

বলাধিকারী তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, ভাবাভাবির কি! পুরোপুরি গেলেই তো হয়। বুকের নিচের ধুকপুকানি কোন্ লোভে আর ধরে রাখা—আবার কি বয়স ফিরবে? সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাইটামশায়কে।

একটু থেমে আবার বলেন, ভাবি অনেক সময় সেকালের অত বড় গুণী মানুষটার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের আশা আর এখন? একটা জবাবও দিল। বলে, গুণজ্ঞান যা-কিছু আছে ষোলআনা পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিলে মুক্তি হবে না। দুনিয়ায় কিছু দিয়ে যাব। সেই নেবার মানুষের আশা করে আছি।

বংশী এবারে আগুন হয়ে ওঠেঃ মুখের কথা! একবর্ণ বিশ্বাস করবেন না, বলাধিকারী মশায়। কতজনা এলো গেল, কাউকে ছিটেফোঁটা দেয়নি। গুরুপদ ঢালি—তাকে দেখেছেন আপনি—গোঁফ ওঠার আগে থেকে শাগরেদি ধরেছে। গোঁফ পেকে শাদা হয়ে গেল, বিরক্ত হয়ে এখন আর বড় যায় না। আমি আপন লোক, মরা মেয়ের এক ছেলে—বড্ড ধরাধরিতে দশ-বিশটা পাখ-পাখালি জন্তু-জানোয়ারের ডাক শেখালেন, আসল বস্তু কিছু নয়। আপনার কথার জবাব তো চাই—ধানাই-পানাই বলে মুখ রাখেন। আসলে মহা কঞ্জুষ। হচ্ছে তেমনি। আজা মশায়ের দোদামশায় বলে না এ তল্লাটের মানুষ—আজামশায়। কষ্ট দেখে শিয়ালটা কুকুরটা অবধি কেঁদে যায়।

বলাধিকারী বলেন, বাহাদুরি করে বেঁচে এসেছে, কিন্তু মরার বাহাদুরি দেখাতে পারল না। কষ্ট সেই দোষে।

সাহেব এর মধ্যে কথা বলে ওঠেঃ দোষ বয়সের। বয়স হলে কার না এমন হয়!

বলাধিকারী উত্তেজিত হয়ে বলেন, সেইটে হবার আগে মরে যাবে। বাঁচার জন্যে যেমন বিবেচনা আছে, মরার জন্যেও তাই। পচা বাইটা অর্ধেকটা জিতে আছে—বড় জাঁক-জমকের জিত। বাকি অর্ধেকে বেদম হার তেমনি। একই মানুষের এমনিধারা দু-চেহারা কেমন করে হয়, কেন হতে দেয়, তাই ভাবি।

বংশী অবাক হয়ে বলে, মরা তো নিজের হাতে নয়, ঠাকুর যেদিন নিয়ে নেবেন—

হুঙ্কার দিয়ে বলাধিকারী মুখের কথা থামিয়ে দিলেনঃ হাতে নয়—কি বলছ তুমি! মানুষ মারতে পারে নিজের হাতে, মরতেও পারে নিজের হাতে। জীবন-মরণ মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সেইজন্যে তো বাঁচোয়া। সেই হল মানুষের বড় শক্তি, মস্তবড় বল-ভরসা।

না বুঝে বংশী হাঁ করে থাকে। সাহেবেরও চমক লাগে—চমকে তাকায় বলাধিকারীর দিকে। নফরকেষ্টর কোনরকম হাঙ্গামা নেই—খাসা অভ্যাস। কাজের সময় কাজ, বাকি সময় ঘুমানো। দাঁড়ানো-বসা-শোওয়া ইত্যাদি অবস্থা এবং সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ইত্যাদি সময় নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বসে বসেই আপাতত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মউজ করে ঘুমুচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে নাসাধ্বনিতে পরিচয়।

হাতের খবরের কাগজটা তুলে ধরে বলাধিকারী বললেন, খবর বেরিয়েছে, অসমসাহসী এক ছেলে দিন দুপুরে কলকাতার চৌরঙ্গির উপর সাহেবকে গুলি করেছে। হাজার মানুষ সেখানে, তাড়া করে ময়দানের মধ্যে ধরেও ফেলল। ধরেছে কিন্তু ছেলেটিকে নয়—একটা মড়া। পকেটে বিষ ছিল, ছেলেটি মৃত্যুর ঘুলঘুলি দিয়ে সরে পড়েছে পুলিসকে কলা দেখিয়ে। এই মরার ছিদ্রটুকু আছে বলেই তো নিশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়—অসহ্য হলে ছিদ্রপথে টুক করে বেরিয়ে পড়ব।

দম নিয়ে আবার বলেন, শুধু এই একটি ছেলেরই ব্যাপার নয়। মরা-মরা খেলা চলেছে যেন বাংলাদেশ জুড়ে। মধু-দার সঙ্গে ছোটবেলা এক ইস্কুলে পড়েছি। পড়া পারত না বলে পণ্ডিত মশায় মেরে ভূত ভাগাতেন। হঠাৎ দেখি, মধু-দা দেবতা—সেই পণ্ডিত গদগদ হয়ে মধু-দার কথা আমায় বললেন। মরার খেলায় নামজাদা খেলোয়াড় হয়েছে বলে। আজ এমনি ব্যাপার—হাতে রিভলভার বোমা একটা কিছু থাকলেই সে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। রিভলভার মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু—মৃত্যু দিতে

পারে সে মানুষ, মৃত্যু নিতেও পারে নিজের উপর। মধু-দার এক বুড়ি-ঝি ছিল। আপন কেউ নয়, অনেক কাল ধরে আছে এই পর্যন্ত। শিক্ষাদীক্ষাহীন পাঁচাত্তর বছুরে বুড়ির কাছেও মধু-দা দেবতা। সেই বুড়ি-ঝির একটা গল্প বলি শোন্।

বলছেন, মধু-দা বাড়ি নেই, বোমা আছে বাড়িতে। পুলিসে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, ভোর হলেই সার্চ হবে গ্রামের মানুষ সাক্ষী ডেকে এনে। বুড়ির মনে এলো, ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয় গোলমেলে বস্তু। কী করা যায়! জিনিস পুলিসের হাতে পড়লে বাবুরে তো রক্ষে রাখবে না। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল বুড়ির—দরদ থাকলে আসে মাথায় বুদ্ধি। বুড়ি করল কি—ভাত রান্নার যে উনুন, তার তলায় গর্ত খুঁড়ল খন্তা দিয়ে। বস্তুটা গর্তের ভিতর দিয়ে মাটি চাপা দিল উপরে। তার উপরে ছাই। রান্নাবান্না হয়ে গিয়ে উনুনে যেন ছাই জমে আছে। একবার ভেবেছিল, ছাইয়ের উপর গনগনে আগুন কিছু থাকলে কেমন হয়। বিচার করে দেখে, রান্না তো সেই সন্ধ্যারাত্রে হয়ে গেছে, সকাল অবধি আগুন থাকে কি করে? ভাগিস দেয়নি আগুন—বোমা ফেটে তাহলে কী কাণ্ড হয়ে যেত! মধু-দা হাসতে হাসতে একদিন এই গল্প করেছিল। কলেজে পড়ি তখনও আমি।

এবার বলাধিকারী বংশীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার মাতামহ চতুর মানুষ বটে কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি। বয়সকালে বুদ্ধির খেলা খেলে বেড়িয়েছে, কিন্তু বয়স কাটিয়ে এসে উপরদিককার মুক্তির ঘুলঘুলিটা দেখতে পায় না। তাহলে এত হেনস্থা সইত না, কবে এদ্দিন পালিয়ে বেরুত। মরা জিনিসটাই বোঝে না বাইটা মশায়। ভারি ভারি কাজ হাসিল করেছে—মরা দুরুস্থান, একটা আঁচড় পর্যন্ত কারো গায়ে লাগে নি। না নিজের, না কোন মক্কেলের। সে বটে কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। বড়ভাইটা যেমন ছিল, ছোটভাইও প্রায় তাই। পেচো মল্লিক, শুনতে পাই, ফাঁসির দড়ি নিজের হাতে গলায় পরেছিল।

বংশী চুপচাপ এতক্ষণ। বলাধিকারীর কথাবার্তা কানে ঢুকেছে ঠিকই, অন্য কানের ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেছে। নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিল। বলল, আজ্ঞামশায় শাগরেদ চায়। আপনাকে বলেছে, আপনিই তবে আমার নামটা উত্থাপন করে দিন। আপনার খাতিরে যদি নরম হয়। নয়তো যা গতিক—সকল গুণজ্ঞান বুড়োর সঙ্গে এক চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কাতর হয়ে বলে, দুই মামা আমার দুই পথের পথিক—কেউ কিছু নিয়ে গেল না। একমাত্র নাতি আমিই তাহলে লোকও ধর্মত ষোলআনা হকদার। বলুন তাই কিনা? এদ্দিন ধরে আঁকুপাঁকু করে বেড়াচ্ছি—এবারও মামার-বাড়ি সেই মতলব নিয়ে যাওয়া। তা সে-কথায় আঁচ দিতে গেলে বুড়ো তেড়ে মারতে আসে। বলে, শিয়াল-কুকুরের ডাক শিখিয়েছি—সেই তো ঢের।

বলাধিকারী হো-হো করে হেসে উঠলেনঃ যা বলেছি, বাইটা মশায়ের নজরটা খাটো কিন্তু বুদ্ধিটা ঝকঝকে পরিষ্কার। গুণ-জ্ঞান তোমায় দিতে যাবে কেন? ময়লা ঘটিতে ভাল দুধ রাখলেও কেটে যায়। তুমি পেলে সে জিনিস কাজে আসবে না, পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরুবে। নাতিকে ভালরকম জানে কিনা—কুকুর-শিয়ালের ডাকগুলো দিয়েছে, জন্তু-টন্তু ভাবে হয়তো।

বংশীর অপ্রতিভ মুখ দেখে বলাধিকারী কথা অন্যভাবে ঘুরিয়ে নেনঃ গুণজ্ঞান নিয়ে কী-ই বা করবে তুমি? ছিটেফোঁটা যা আছে তাই নিয়েই তো বউয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ কোন্দল।

বংশী বলে, বউ কিছু টের পাবে না। মেয়েমানুষ জাত, টের পাবে কি! আবার তাও বলি—এখন সাধবার সামান্য টুকটাক, টুকটাক সিঁদকাটার ব্যাপার—তাতেই যায় পেট ভরে না। তাই-কামারের মতন ভারী ভারী ঘা মারতে পারি যদি কখনো, এক এক ঘায়ে এক-শ দু-শ ছিটকে এসে পড়ে—সেদিন ঐ বউই দেখতে পাবেন সোহাগে গলে গলে পড়ছে।

আকাশ-ছোঁয়া ঝাউয়ের সারি নজরে আসে। ফুলতলাটা এসে গেল। বড় গাঙ ছেড়ে খালে ঢুকবে, মোহানার উপর নীল-কুঠি। নীলকর সাহেবরা সারি সারি ঝাউ-গাছ পুঁতে কুঠির বাহার বাড়িয়েছিল—কত কালের সাক্ষী সুদীর্ঘ বিশাল গাছ-গুলো।

কুঠির কাছাকাছি এসে বলাধিকারীর মুখে আবার মৃদু হাসি। ঐ ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে সহোৎসাহে হাত তুলে সাহেবকে দেখাচ্ছে ছাদের কার্নিশের সেই জায়গাটা। এখন আর দেখা যাচ্ছে না। একদিন উপরনে দিয়ে দিয়ে ডেকের উপর তুলে ছাদ করে দেখিয়ে দিলো। মৃত্যুর সঙ্গে ওখানটা মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। দু-দশ দিন নয়, ঘণ্টা-ঠিক কতক্ষণ মুখোমুখি ছিলাম, বলতে পারব না। বিশ ঘণ্টাও হতে পারে। চোখ-মুখ বাঁধা, পা বাঁধা—বিবস্ত্র কিছুই আমার কাছে নেই। দু-খানা হাতের দশ আঙুলে কার্নিশ ধরে ঝুলছি, দশটা আঙুলে আঁকড়ে ধরে আছি জীবনটা। তখন চোখ বুজলেই মৃত্যুর চেহারাটা সামনের উপর পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। তার পরে এক সময় হাত ছেড়ে দিয়েছি। সবাই ভাবে, বাধ্য হয়ে ছেড়েছি, শক্তিতে আর কুলোয় নি বলেই। কিন্তু ধারণা ভুল। ঠিক সেই ক্ষণের অনুভূতিটা এখনো আমি স্পষ্ট ভাবতে পারি। মৃত্যুর সঙ্গে চেনা হয়ে গিয়ে সাগ্রহে আনন্দে হাত ছেড়েছিলাম—মজা কোথায় পেতে ধরলে বলে। পরিচয় করে না বলেই তো মৃত্যু নিয়ে লোকের অকারণ ভয়।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিচিত্রা

মাছ টাটকা কিনা পরীক্ষার উপায়

জার্মানীতে মাছের ব্যবসা এবং মাছ সংরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। হামবুর্গের ফেডারেল ইন্সটিটিউট অব ফিশ প্রসেসিং-এ দু বৎসর অনুশীলনের পর বিশেষজ্ঞরা, যাকে বলা যায়, একটি সর্বকর্মবিশারদ যন্ত্রের উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন যার সাহায্যে মুহূর্তে মধ্যে মাছের গুণাগুণ অর্থাৎ কি পরিমাণ টাটকা সেটা নির্ধারণ করা সম্ভব। যন্ত্রটি সঠিক কত ডিগ্রী টাটকা সেটা প্রকাশ করবে এবং অটল নির্ভুলতার সঙ্গে সংরক্ষণ সম্ভাবনা নির্দিষ্ট করে দেবে। এর অর্থ হচ্ছে অতি দুর্গম শহর ও গ্রামাঞ্চলেও নিয়মিতভাবে টাটকা সামুদ্রিক মাছ সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব করে তোলা।

এই আবিষ্কারটি সম্প্রতি ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ডাঃ লুডর্ফ এবং তাঁর সহযোগী কর্মী ডাঃ হেনিংস সংবাদপত্রের প্রতিনিধি-দের সমক্ষে প্রদর্শন করেন। সরঞ্জামটি ট্রানজিসটার প্রক্রিয়াযুক্ত। দুটি ইলেকট্রোড লাগানো হয়—একটি মাছের গায়ে এবং অপরটি লাগানো হয় ০ থেকে ১০০-র মধ্যে ভাগ করা একটি মাপযন্ত্রে যাতে মাছের সজীবতা সরাসরি ধরা যায়। বিভিন্ন রকম মাছের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রী আছে যা একটি রঙীন ছকে দেখতে পাওয়া যায়। ডাঃ হেনিংস ঘোষণা করেন যে সরকারী-ভাবে অভিহিত এই "মৎস্য পরীক্ষক" যন্ত্রটির ব্যাপক উৎপাদন হবে এবং এই বছরেই তৈরি হতে থাকবে। ডাঃ হেনিংস জানান যে বাজারের উপযোগী করে তৈরি হবার আগে মাছের বাজার পরিদর্শকরা যাতে নিজেদের বেল্টে লাগিয়ে সহজে বহন করতে পারে সেইভাবে যন্ত্রটির আকার ছোট ও হালকা করা হবে। এখন এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে জার্মানিতে ভবিষ্যতে যে কোন জায়গায় মাছ নিলাম হবার সময় বিক্রেতা ও ক্রেতা মাছের সঠিক টাটকা অবস্থা জেনে কেনার ও বিক্রীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

স্বর-প্রতিলিপির নিজস্ব চরিত্র

আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরীর এক বৈজ্ঞানিকের মতে আপনার কণ্ঠস্বর এমনি স্পষ্টতে আপনার নিজস্ব যে এমন একদিন আসবে যেদিন কাউকে সনাক্ত করা ব্যাপারে আঙুলের ছাপের মতই কাজ দেবে।

শব্দ ব্যাপারে অনুশীলন রত লরেন্স কি কেস্টা স্বরপ্রতিলিপির শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে একটি পরিকল্পনার ছক করেছেন।

স্বরপ্রতিলিপি হচ্ছে কোন লোকের মুখ-নিসৃত একটি মাত্র কথার ছোট ছোট 'ছবি'। ছবিগুলি ভিন্ন ভিন্ন পর্দায় স্বরের সক্রিয়-তার রূপ প্রকাশ করে—**যে রূপ বা প্যাটার্ন** ভিন্ন ভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং সনাক্তসাধ্য।

স্বরপ্রতিলিপি, সময় সময় যাকে প্রত্যক্ষ কথা বলে অভিহিত করা হয়, সেটিকে বৈজ্ঞানিকরা সাধারণত স্পেকট্রোগ্রাম আখ্যা দেন। অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে দৃশ্যমান প্রতিলিপিগুলি কতকগুলি মৌলিক প্যাটার্ন দৃষ্টির সামনে অনাবৃত করে তোলে যা কানের চেয়ে চোখেই বেশী স্পষ্ট হয়।

স্পেকট্রোগ্রাম প্রস্তুতের পদ্ধতিটি বেল লেবরেটরির একদল বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সতের বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়।

পরীক্ষাসূত্রে একটি শব্দ বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত করিয়ে স্বর-প্রতিলিপি গ্রহণ করা হয়। শব্দটির প্রতিটি উক্তির প্রতিলিপি পৃথক পৃথক কার্ডে গৃহীত হয়। কার্ডগুলি স্থান পরিবর্তন করে শিক্ষিত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি-দের কার শব্দের কোন্ ছবি সেটা বেছে সাজিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পঁচিশ হাজার সিদ্ধান্তের মধ্যে ঐ সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সাতানব্বই শতক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে সক্ষম হন।

"ভ্রাম" শব্দটি বলিয়ে পাঁচজন লোকের এই স্বরপ্রতিলিপি গ্রহণ করা হয়। ওপরের একেবারে বাঁ-দিকের এবং নিচের একেবারে ডান দিকের স্বরপ্রতিলিপি একই ব্যক্তির

বৈজ্ঞানিক কেরস্টা আশা করেন যে বক্তা তাঁর স্বর বদলাবার যতো চেষ্টাই করুন, যথেষ্টসংখ্যক নমুনা পেলে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে থেকেও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব। আধুনিক বোতাম-টেপা কম্প্যুটার টেক-নিকের সহায়তায় বিশেষভাবে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বর-প্রতিলিপি সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারবে।

"ইলেকট্রনিক সিস্টার"

ভবিষ্যতে সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর হাসপাতালগুলিতে অত্যন্ত অসুস্থ রোগীদের ওপর সবসময় চোখ রাখা যাবে।

কর্তব্যরত সিস্টার অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য রত ডাক্তার এই যন্ত্রটির সামনে বসে থাকেন এবং যে রোগীদের সঙ্গে এই যন্ত্রের সংযোগ থাকে, তাদের গায়ের উত্তাপ, রক্তচাপ এবং নাড়ীর গতি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এই যন্ত্রে জানতে পারা যায়। একটি হাতল টেনে রোগীর ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। সিস্টার নিজের জায়গাতে বসেই রোগীর অবস্থা জানতে পারে এবং প্রয়োজন হ'লে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকেও সতর্ক ক'রে দিতে পারে।

সম্প্রতি কলোনে যে আন্তর্জাতিক হাস-পাতাল প্রদর্শনী হয়ে গেলো, তাতে এই "ইলেকট্রনিক সিস্টার" ছিল অন্যতম চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার।

হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার লোকের ঘাটতি ক্রমশ বাড়তে থাকায়, পরি-শ্রম বাঁচানোর নানারকম যন্ত্র এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। পরিষ্কার করার একটা বড় ধরনের যন্ত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি প্রতিদিন দশ হাজার বর্গ মীটার জায়গা পরিষ্কার করতে পারে - মেজে ঘসে পরিষ্কার করা ধোওয়া শুকানো এবং পালিশ করার কাজের সঙ্গে রোগবীজাণুও মেরে ফেলে। রান্নাঘরের একটি যন্ত্র একটি কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে রোগীদের খাদ্য সরবরাহ করতে পারে। শিশুদের জন্য যন্ত্রচালিত দোলনা সহ আরও হাজার হাজার জিনিস ছিল যা নার্স ও ডাক্তারদের পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য এবং রোগীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই উদ্ভাবন করা হয়েছে।

গ্রহদের মাঝে প্রবহমান মৃদু 'বায়ু'

কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভূপদার্থবিদ্ অধ্যাপক এইচ কে পেটৎবওল্ড একটি নূতন সত্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির একটি পরম বিস্ময় হচ্ছে "গ্রহদের মাঝে বায়ুপ্রবাহ"; এটি হয় মহাকাশে প্রলম্বিত অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার বাতাসের সহিত আন্দোলনের ফলে এবং এর কারণ হচ্ছে কক্ষ-পথে সূর্যের আবর্তন।

পরমাণু "শূন্য" এবং উহার ভর (MASS) একটি ঘন অংশের (nucleu) মধ্যে কেন্দ্রীভূত, এটি প্রমাণ করায় ১৯০৫ সালে জার্মান অধ্যাপক লেনার্ডকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে প্রায় অভর বিদ্যুতিয়-গুলি (Electrons) ঘুরপাক খায়। নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালীন তাঁর ভাষণে লেনার্ড বলেছিলেন যে, পরমাণুর বাকী অংশ গ্রহদের মাঝে বিশাল ফাঁকার মতই শূন্য। পরমাণুর "শূন্যতা" সম্বন্ধে ধারণা আজও বদলায়নি, কিন্তু তাঁর সেদিনের সেই তুলনা আজ বর্জিত হয়েছে।

গ্রহগুলির বায়ুমন্ডলের একেবারের প্রান্ত-ভাগের কণাগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে পড়া প্রলম্বিত মহাকাশ লসিকা বা স্পেস প্লাজমার মধ্যে ক্রমে ক্রমে মিশে যায়। আমাদের নিজেদের এই পৃথিবী, তারও চারদিক এই রকম লসিকার মেঘে ঘেরা, যেটি বায়ুমন্ডলের প্রান্তে এসে মহাকাশে মিলিয়ে গেছে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে রেকর্ডার সংগৃহিত তথ্য থেকে বায়ু-মন্ডলের সীমানায় বাতাসের ঘনত্ব সম্বন্ধে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

গবেষণার ফলে অধ্যাপক পেটৎবওল্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কক্ষপথে সূর্যকে আবর্তন করার সময় আমাদের এই পৃথিবী যখন সূর্যের সামনে আসে, তখনই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের প্রান্তভাগে বাতাসের ঘনত্ব সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় এবং সেটি সব-চেয়ে কমে যায় যখন পৃথিবী সূর্যের উল্টো-পিঠে আসে। পেটৎবওল্ডের সূত্রের ভিত্তিস্বরূপ ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সূর্য তার কক্ষপথে মহাকাশে ভ্রমণ করার সময় তাকে পরিবেষ্টিত প্লাজমা বা লসিকাকে সঙ্গে নিয়ে চলে। এই চলার পথে তার সামনে দিকে সংকুচিত অপেক্ষাকৃত নিশ্চল প্লাজমার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঐ সময় পৃথিবী যদি সেই সংকুচিত প্লাজমার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে সেই প্লাজমা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক কণা পৃথিবীর বায়ু-মন্ডলের সীমানায় অনুপ্রবেশ করে এবং তার ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপ ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৮ই নভেম্বর ১৯৬২। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী এবং জন্মের অর্ধশত এক বর্ষপূর্তির বৎসর। একসঙ্গে মনে পড়ে কিশোর সুব্রত, খেলার সাথী সুব্রত, প্রতাপান্বিত জেলা-শাসকের পুত্র সুব্রত, আর এক দিকে বিরাট তকমা লাগানো মিলিটারী পোশাক-পরা সুদর্শন সুব্রত, সতীর্থের স্নেহময় পিতা সুব্রত, সংসারের পত্নীপ্রাণ সুব্রত, চারুলতার স্নেহের ধন সুব্রত।

সুব্রতর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় হাওড়া জেলা স্কুলে। পিতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাওড়ার জেলাশাসক, বোধ হয় হাওড়ার প্রথম ভারতীয় জেলাশাসক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কলিকাতার সন্নিকটস্থ জেলার শাসনভার সকল সময়েই ইংরেজ সিভিলিয়ান রাজকর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত। যেমন ২৪ পরগণার সদর আলিপুরে, হাওড়ার সদর হাওড়ায়। বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা—বিশাল প্রাঙ্গণে-শোভিত ও উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জেলা-শাসকের আবাসস্থল। হাওড়া স্টেশন থেকে বারকোণ্ড সেতু যেখানে হাওড়া কোর্টের কাছে শেষ হয়েছে, তারই পার্শ্ব দিকে প্রহরী-মোতায়েন ঈষৎ পীতাভ প্রাচীরে ঘেরা বিরাট দ্বিতল অট্টালিকা। নীচের তলায় তাঁর অফিস দু-একখানা ঘরে, উপরে বাস-স্থান। বাড়ি বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে। রাস্তার দু ধারে কত রকম ফুলের গাছ। কম্পাউণ্ড যথেষ্ট বড়—এমন কি ছোট ফুটবল খেলার মাঠ ধরতে পারে। রাস্তা পার হলেই হাওড়া জজ কোর্ট ও রেজেস্ট্রী অফিস। তারপরই কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা পুকুর (এখন যেটি ভর্তি করে দেওয়ানী আদালত তৈরী হয়েছে)। পুকুরের পশ্চিমে একটি ছোট রাস্তা তেলকলঘাট রোড (বর্তমানে নিত্যধন মুখার্জি রোড) ও এভিন্যু রোডকে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযুক্ত করেছে। এই ছোট রাস্তাটির পশ্চিম গায়ে হাওড়া জেনারেল পোস্ট-অফিস, হাওড়া জেলা স্কুল, হাওড়া জেলা বোর্ডের অফিস ও একটি চার্চ। চার্চটি বর্তমানে হাওড়া জেলা হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত মাতৃসদন। রাস্তার পূর্বে পুষ্করিণী ও জেনারেল হাসপাতাল। অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি থেকে স্কুল মাত্র দু মিনিটের হাঁটাপথ।

সুব্রত মুখার্জি

সুব্রতর বাবা যখন জেলাশাসক তখন [illegible] সুব্রতর [illegible] হাওড়া জেলা স্কুলে [illegible] পর খেলার সময়, বিশেষত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় সে আমাদের খেলার সাথী। বাড়ীর থেকে তার আসার খুব সুবিধা ছিল।

স্কুলের উত্তর দিকে হাওড়া ময়দানের এক অংশ ছিল জেলা স্কুলের খেলার মাঠ ও মাঝখানে ট্রাম লাইন।

পিতৃকুল

সুব্রতর পিতামহ-পরিবারের সঙ্গে আমার মাতামহদের পরিচয় ছিল ভাগল-পুরে। শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আদিবাস ছিল হুগলীতে, আমার মাতা-মহদের চুঁচুড়ায়। সেই স্থান ত্যাগ করে তিনি ভাগলপুরে যান ও সেখানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। আমার দিদিমার কাছে ভাগলপুরের গল্প শুনতাম যে, মাঘোৎসবের সময় দিদিমাও নিমন্ত্রিত হতেন। নিবারণবাবুর বাড়ি থেকে মেয়েরা এসে নিমন্ত্রণ করে যেতেন ও তিনি যেতেন মেয়েদের সেই উৎসবে। তাঁদের আচার-ব্যবহারের ধরন-ধারণ তখনকার দিনে অনু-করণের ও আলোচনার বস্তু ছিল। নিবারণ-বাবুর কৃতী পুত্রের মধ্যে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পরে এক্সাইজ কমিশনার হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জে সি মুখোপাধ্যায় কলিকাতা পোর্ট-প্রতিষ্ঠানের মুখ্য এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পরে টিটাগড়ের টাউন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের অন্যতম ছিলেন। এই সতীশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ই সুব্রতর পিতা। কয়েকবার হাওড়া জেলা স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় সস্ত্রীক সতীশচন্দ্র উপস্থিত থেকে পৌরোহিত্য করতে। অতি স্বল্প-ভাষী, স্থিতপ্রাজ্ঞ, সৌম্যদর্শন অথচ কঠোর সংযমের সঙ্গে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন। ১৯৬২ সালে সতীশচন্দ্র আই সি এস সার্ভিসে প্রবেশ করেন ও উন্নীতের পরে অবসর হয়ে থাকেন।

মাতৃকুল

বংশমর্যাদায় তদানীন্তন কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ডঃ পি কে রায় একজন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বলে সুপরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি আই-ই-এস পর্যায়ের শিক্ষা-ব্রতী তবুও তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ করা হয় প্রায় অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে। তাঁর বিদুষী পত্নী শ্রীমতী সরলা রায় ছিলেন স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অগ্রদূতী—একজন অক্লান্ত কর্মী, মহীয়সী মহিলা। এঁরই প্রতিষ্ঠিত গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল গত বৎসর প্রতিষ্ঠাশতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালন করেছে। সরলা দাশ যেবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবেন, সেইবারেই সদ্য বিলেতাগত পি কে রায়ের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন ও নাম হয় সরলা রায়। এঁদের কন্যা চারুলতা ওরফে মিনি রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রী। মিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ানো হ'ত না। অল ইণ্ডিয়া উওমেন কনফারেন্সের সঙ্গে ইনি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সংযুক্ত। স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার বিলাতে গিয়েছিলেন। অতি শিক্ষিত, উচ্চাদর্শী পিতৃকুল ও মাতৃকুল থেকে উদ্ভব সুব্রতর। সুব্রতর মাতৃস্বসা হেমলতা আজও ৭২ বৎসর বয়সে কর্মিষ্ঠা ও গোখেল স্মৃতি শিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করেন। সুব্রতর দিদিমার ভগিনী হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী লেডী অবলা বসু। সুব্রতর এক মাতুল আই এল রায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানবাহিনীতে যোগদান করেন ও ডি এফ সি (Distinguished Flying Cross) পদক প্রাপ্ত হন।

বাল্যকাল

সাত নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে মাতামহের গৃহে ১৯১১ সালের ৫ই মার্চ কলিকাতায় সুব্রতর জন্ম হয়। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, আদরের দুলাল সুব্রত। জন্মের কয়েক মাস পরেই মুখোপাধ্যায় পরিবার বিলাত যাত্রা করেন। তখন সুব্রতর বয়স ছয়মাস মাত্র। সঙ্গে বড় ভাই প্রশান্ত ও দুই দিদি লতা ও নীতা। লতার পোশাকী নাম রেণুকা। হাওড়ায় যখন জেলাশাসক সতীশচন্দ্র সেই সময় লতার বিবাহ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এস এন রায়ের সঙ্গে।

১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চুঁচুড়ায় বিরাট ট্যাঙ্ক আসে যুদ্ধের সম্বন্ধে প্রেরণা ও জনমত তৈরি করতে ও সৈন্য সংগ্রহ কার্যে। শিশু সুব্রত তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলল। তখন কে জানত এই বালক উত্তরকালে ভারতীয় বিমান-বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হবেন। তার খুব প্রিয় ভূষণ ছিল নৌবাহিনীর অফিসারদের নীল রঙের কোট, কেননা রঙিন জামা সহজে ময়লা হবে না। শৈশবে সে ডায়োসেশান স্কুল ও লরেটো কনভেন্টে পড়ে এবং ১৯২২ সালে পিতামাতার সঙ্গে আবার ইংলণ্ডে যায় ও হ্যামস্টেড স্কুলে ভর্তি হয়। এক বছর বাদে সে ভারতে ফেরে। কেননা, সিভিলিয়ান পিতা মনে করেন যে, পুত্র দেশে ফিরে আগে নিজের দেশকে দেখুক, জানুক, দেশের মাটিতে দেশের শিক্ষা লাভ করুক, তারপর প্রয়োজন হ'লে বিলেতে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাবে। জানি না, মাতামহীর প্রভাব এ বিষয়ে ছিল কিনা। দেশে যখন ফিরল সুব্রত, তখন সতীশচন্দ্র হাওড়ার জেলা শাসক। নিকটেই সরকারী স্কুল, সেখানেই সে ভর্তি হল। স্কুলে ঠিক-মত পড়লে তার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার বছর ছিল ১৯২৮। সতীশচন্দ্রের সংসারে শক্তিশালিনী স্ত্রী চারুলতা যা করবেন তাই হ'ত।

একদিন মিনি রায় অর্থাৎ মাতা চারুলতা মুখোপাধ্যায় হাওড়া জেলা স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক কালীবাবুকে ডেকে বললেন, 'দেখুন, আমি ছেলে নিয়ে বিলেতে ভর্তি করে দেব। পরের বছরে যাব। কিন্তু এখানের ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করলে চলবে না; আপনারা তৈরী করে দিতে পারবেন কি?'

'দেখুন চেষ্টার ত্রুটি হবে না।' বললেন গৃহশিক্ষক।

ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন ১৯২৬ সালে ও প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ালেন ১৯২৭ সালে। ছাত্র হিসেবে সুব্রত বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিল না সত্য,

কিন্তু তার হৃদয় ছিল বিরাট, গুরুজনে ভক্তি ছিল অসীম। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সমালোচনাও হয়েছিল। যাই হোক, সুব্রত ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে।

পরবর্তী কালে কালীবাবুকে পরিহাসচ্ছলে সুব্রত প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি যে, সংস্কৃত পড়াবার সময় জিজ্ঞাসা করা হল 'সে খেলা করছে' কথাটা সংস্কৃতে কি হবে?

সঙ্গে সঙ্গে বললে—'সং খেলায়তি'।

এত সরল ছিল যে, গৃহশিক্ষক কালীবাবুকে মাঝে মাঝে সে বলত, 'স্যার, আপনি আমাদের এখানে একদিন খেয়ে যান।'

'না বাপু, তোমাদের এখানে মুসলমান বাবুর্চিতে রান্না করে।'

'স্যার, স্কাউটের ক্যাম্পে বাবুর্চিতেই তো রাঁধতো। আপনি তো সেখানে খেতেন!'

'তা হোক, সে বিদেশে নিয়ম নাস্তি।'

বিলাত থেকে সদ্য প্রত্যাগত আই সি এস শ্রীসত্যেন রায় এসেছেন হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে। পড়ার শেষে সুব্রত কালীবাবুকে বলল, 'স্যার, চলুন, দিদির বরকে দেখিয়ে আনি। মাথায় কত বড় টাক, দেখবেন আসুন।'

'সে হবে 'খন।' ব'লে কালীচরণ আঢ্য মহাশয় এড়িয়ে গেলেন।

হাওড়া জেলা স্কুলে সেবার প্রথম বয়-স্কাউটের সূচনা হয়। কালীবাবুই প্রথম ট্রেনিং নিয়ে আসেন শিক্ষক হিসাবে ও বয়স্কাউটের দল গড়েন। সুব্রত ছিল তার প্রধান ও কার্যকরী সদস্য। পরবর্তী কালে হাওড়া জেলা স্কুলের প্রাক্তন ও নবীন ছাত্রদের সম্মিলনী উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে সে এসেছিল। কালীবাবুকে সে বলেছিল, 'স্যার, আপনি আমার মিলিটারী ট্রেনিংএর গুরু।'

সেই সম্মিলনী উৎসবে প্রাক্তন ও নবীন ছাত্রদের খেলায় লেগে গেল নিজে খেলাতে। শিশুদের মত সরল ছিল তার অন্তঃকরণ।

স্কুলে পড়ার সময় একবার শৈলেন গুপ্ত (বর্তমানে হাওড়ার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী) প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবেরা সুব্রতকে জোর ক'রে 'আলু কাবলী' খাওয়ায়। এই সংবাদে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক বীরেনবাবু (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) শৈলেন প্রভৃতি কয়েকটি ছাত্রকে বোধ হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ছেলের উপর জোরজুলুমের প্রতিবিধান মানসে ও স্বয়ং নিযুক্ত অভিভাবক হিসাবে বেজায় ভয় দেখান 'রাস্টিকেট' করবেন ব'লে। যদিও সংবাদ প্রধান শিক্ষকের উচ্চকর্ণে পৌঁছায়নি সেবার।

ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর বিলেত যাওয়ার পূর্বে কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে সুব্রত। পিতামাতার বাসনা ছেলেকে ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজে পাঠাবেন। উদ্দেশ্য—ডাক্তার হবার জন্য উদ্যোগ-অনুশীলন লাভ করা। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ভারত সরকারের এক প্রেস নোট-এ বলা হল যে, ভারতীয়দের বিমানবাহিনীতে নেওয়া হবে। সেই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি বিলেতে সুব্রতর পিতা সুব্রতর কাছে পাঠান। এই সংবাদে সুব্রত অতি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মাতার কিন্তু মত ছিল না সে মাকে বারবার লিখে জানিয়েছে যে

বিবাহোত্তর

এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

আজ আপনাদের কাছে যে কাহিনীটি নিবেদন করতে যাচ্ছি সেটি দূরে প্রবাসের কোনো সহৃদয় পাঠক কিম্বা সুন্দরী পাঠকারিণী যেন ভুলক্রমেও সত্য বলে মনে না করেন। ঘটে যা তা সব সত্য নহে।

ফাঁদে পরবার জন্য আমাদের সত্যিই কোন পরিশ্রম করতে হয় না

শ্রীমতী ক ও শ্রীমতী খ পরস্পরের পরিচিত ছিলেন না। একটি বৃহৎ ককটেল সভায় তাঁরা ঘটনাচক্রে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমতী খ ভীতু প্রকৃতির এবং নিরীহ, তিনি বিস্ফারিত নয়নে শ্রীমতী ক-এর কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন, হঠাৎ শ্রীমতী ক অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি তাঁরই দিকে ফিরিয়ে বললেন, আমার বিবাহিত জীবনের ঘটনা পরম্পরা বোধহয় আপনার জানা নেই। জানেন আমার স্বামীর লক্ষ লক্ষ ডলার আমি হেলায় ফেলে এসেছি?

শ্রীমতী খ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলেন। মাত্রাধিক্য ঘটলে লোকে কেমন আচরণ করে থাকে এ বিষয়ে তাঁর একটা মোটামুটি জ্ঞান ছিল বলেই এতদিন ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু মুখোমুখি হলে তাদের কি দিয়ে ঠেকানো যায় সেরকম শিক্ষা তাকে কেন দেওয়া হয়নি ভেবে রাগ হলো মনে মনে। কিছু একটা না বললেও খারাপ দেখায় তাই অসহায়ভাবে উত্তর করলেন, শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম।

শ্রীমতী ক মাথায় আঙুল ঠুকে বললেন, এখনো এই পর্যন্ত পৌঁছয় নি। ভয় পাচ্ছেন কেন?

শ্রীমতী খ লজ্জিত হয়ে পড়লেন, ছি ছি, সেরকম কোনো চিন্তাই আমার মনে আসেনি।

পরক্ষণেই মনে হলো এটা বুঝি তাঁর সেকেলেপনার প্রতি কটাক্ষ।

তাছাড়া দেখছেন না, হিন্দু হলেও আমার কোনো ট্যাবু নেই।

শ্রীমতী ক ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তাঁর চোখের দৃষ্টি বলতে চাইল সেইজন্যই তো আপনার হাতের গ্লাস হাতেই আছে বহুক্ষণ যাবৎ।

শ্রীমতী খ ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রতিভ ভাবে হাসলেন। বুঝলেন একে এই অবস্থাতেও ঠেকান গেল না। বেগতিক দেখে আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেন একবার, আপনি কিছু বলছিলেন?

শ্রীমতী ক সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বেশ উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করলেন— দেখুন, আমাদের সমস্যা আপনাকে বোঝান অতি দুরূহ। আপনাদের দেশে মা-বাবারা বেশ ঠিক করে ফাঁদটি পেতে রাখেন, আপনারা চোখ বন্ধ করে সোজা গিয়ে তার মধ্যে ঝুপ করে পড়বেন বলে। সেরকম কোনো সুবিধে আমাদের সমাজে নেই— অতএব......

শ্রীমতী খ বাধা দিয়ে বললেন, আমি হলে ঠিক ওরকম ভাবে বলতাম না; কিন্তু তর্ক করা সমীচীন হবে না মনে করে আবার বললেন, যাই হোক, আপনার কথাটা মোটামুটি ঠিক। ফাঁদে পড়বার জন্যে আমাদের **সত্যিই কোনো পরিশ্রম করতে হয় না।** **কেবল জামাকাপড় কেনাকাটায় যা একটু পরিশ্রম।**

শ্রীমতী ক বললেন, আপনাদের অন্যের চেষ্টায় গড়ে ওঠা দাম্পত্য জীবন কেমন দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছে আমার বহুদিন থেকে আছে।

: কোনো মতে আরম্ভ হয়ে গেলে শেষপর্যন্ত ঠিকই চলে যায় গড়িয়ে গড়িয়ে। তবে মাঝে মাঝে কি আর বেলাইন হয়ে যায় না? ট্রেন ওলটানোর খবরও তো আকছার পাওয়া যায়, কি বলেন?

আমার ধারণা এ সব ক্ষেত্রে অসুখী হবার সম্ভাবনাই প্রবল। শ্রীমতী খ চটেমটে উত্তর দিলেন, আপনি কি বলতে চাইছেন বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রবল? কিন্তু খবরের কাগজে এবং লোকমুখে যা রিপোর্ট পাওয়া যায় তাতে তো আমার ধারণা—

ট্রামে-বাসে

শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে অপসারণ করিয়া প্রতিরক্ষার উপকরণ উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যাপারের ভার দেওয়া হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সবিনয়ে নিবেদন করব, ঢাল-তরোয়াল ছাড়া শুধু খামচি মেরে কিন্তু নিধিরামরা যুদ্ধ জয় করতে পারেনি; আর শুধু ছড়ি ঘুরিয়ে সাংবাদিকদের তাড়ানো যায়, হানাদারদের নয়—মেননজী এই কথা কটি মনে করে রাখলে দেশ উপকৃত হবে।"

শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় কয়েকদিন আগে বলিয়াছিলেন—১৮ হাজার ফুট উপরে কী ঘটিতেছে তা এখান হইতে জানা যায় না। এই বিবৃতির উপরে শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"সংবাদে শুনলাম তাওয়াং এলাকার কোন এক স্থানে চীনারা পৌঁছে গেছে, সেখানকার উচ্চতা ৫ হাজার ফুট। ১৮ থেকে ৫-এ নেমেছে. এবারে সেখানে কী ঘটছে আশা করি বসু মশাই জানতে পেরেছেন।"

মন্তব্যের জের টেনে সহযাত্রী বলিলেন—"হয়ত এখনো জানতে বাকী আছে। কেননা বসু মশাই এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে নাকি বলেছেন যে, 'বন্ধুদের অনুরোধেই' তিনি বিবৃতি দিচ্ছেন। এমন বন্ধু-বৎসল কিন্তু সত্যিই বিরল, এবং পরের মুখে ঝাল খাওয়াও নূতন নয়!!"

শ্রীরামমনোহর লোহিয়া জৌনপুরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছেন যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে চীনাদের কেবল আমাদের ভূখণ্ড হইতে তাড়াইয়াই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়, তাহাদের তিব্বত পর্যন্ত অভিযান চালাইয়া সেখান হইতেও তাহাদিগকে বিতাড়ন করা উচিত।—"উচিত তো বটেই। তবে মনে রাখতে হবে এটা 'আংরেজী হটাও'-এর মতো অত সহজ নয়"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সীমান্ত মীমাংসার জন্য নেহেরুজী যে যুক্তি দিয়াছেন (অর্থাৎ ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে চীনারা যেখানে ছিল, সেখানে ফিরিয়া গেলেই আলোচনায় তিনি সম্মত) তাহা চীনারা কেন যে মানিয়া লইল না তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন আচার্য বিনোবা ভাবে। —"কিন্তু বুঝবেন কী করে, চীনারা যে ভূদানের সঙ্গে ভূ-ভক্ষণ গুলিয়ে ফেলেছে" —মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন—চীনারা মিথ্যাবাদী। শ্যামলাল বলিল—"কাজে কাজেই তাদের প্রধানমন্ত্রীর নামের সঙ্গে যে মিথ্যা অর্থাৎ "লাই" কথাটা জড়িয়ে রয়েছে, বানানটা Lai করা হয় শুধু প্রটোকলের সৌজন্যে!!"

গৌহাটি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় নাকি চোর-ডাকাতদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান—দেশে চৈনিক আক্রমণের জন্য পুলিসদের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইতে পারে, অতএব তাহারা যেন কিছুদিনের জন্য তাহাদের বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ রাখে।—"আমরা তো জানতাম চোরা ধর্মের কাহিনী শোনে না, কী জানি, রামরাজ্যে হয়ত চোরারাও রামদাস হয়েছে"—বলেন বিশু খুড়ো।

শান্তিনিকেতন হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন—চু-এন-লাই একদিন শান্তিনিকেতনে আসিয়া সংগীত ভবনের মেয়েদের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া মন্দিরা বাজাইয়াছেন।—"এখনো বাজাচ্ছেন, কালের মন্দিরা যে দুই হাতে বাজে, ডাইনে আর বাঁয়ে; আগে ডাইনে বাজিয়েছেন, এবার বাজাচ্ছেন বাঁয়ে, আর নাচছেন বামক্ষ্যাপারা"—বলেন সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নাকি দার্জিলিং জিলা পরিভ্রমণ কালে বিভিন্ন স্থানের পার্টি কমরেডদের বলিয়াছেন—সমাজতন্ত্রী চীন কখনো পররাজ্য আক্রমণ করিতে পারে না।—"গোপাল দা-ঠাকুর কিন্তু ঠিক শালুকটি চিনেছেন"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

চীনারা প্রচার করিতেছে—নিরীহ চীন-মেষকে ভারত-সিংহ গিলিয়া খাইতেছে।—"কিন্তু নিরীহ মেষের চামড়াটি তুলে ফেললেই দেখা যাবে, আসলে সে নেকড়ে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতায় চাল, ডাল, সরিষার তেল, নারিকেল তেল প্রভৃতির দর বৃদ্ধি পাইয়াছে।—"শুধু নেফা এলাকায় নয়, নাফা-এলাকায়ও হানাদাররা তৎপর হয়ে উঠেছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সম্প্রতি এক সংবাদে শুনিয়াছিলাম—যতদিন সীমান্তে চীনাদের আক্রমণ চলিতে থাকিবে ততদিন পাকিস্তান কাশ্মীরের দাবি উঠাইয়া ভারতকে উদ্ব্যস্ত করিবে না।—"ভাবলাম সূর্য বুঝি পশ্চিমে উঠছে! কিন্তু মহম্মদ আলী সাহেবের প্রতিবাদ শুনে বুঝলাম, পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠে না, ওঠে অর্ধ-চন্দ্র"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম সোভিয়েত দেশে নাকি পুতুল নাচের খুব চর্চা হয়। —"অসম্ভব নয়, সোভিয়েত পুতুলের ডলাগা-নাচ তো আমরা এদেশে থেকেও দেখছি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

শ্রীনেহেরু দেশের সংকটের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"প্রকাশ থাকে যে—পরিবার পরিকল্পনার নীতির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নেই!!"

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মহিলারা সোনাদানা দান করিতেছেন।—"খুব ভালো কথা। মা লক্ষ্মীরা বুঝেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন, আর্মলেট নয়, আর্মামেণ্ট"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

যুদ্ধ আর যুদ্ধের খবরের মাঝখানে অকস্মাৎ জনৈক ক্রীড়ারসিক-সহযাত্রী শুনাইলেন—অস্ট্রেলিয়া সফররত এম সি সি-এর খেলোয়াড় শেফার্ড নাকি গির্জায় গিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"খেলা-ধুলোয় তা হলে আমরাই শুধু 'হে মা কালী' করিনে!!"

"গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন"

সবিনয় নিবেদন,

গত ১০ই কার্তিকের দেশে প্রকাশিত শ্রীশান্তিপ্রিয় বসুর "গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন" শীর্ষক নিবন্ধটিতে লেখক ম্যাক্স বেবার ও সোরোকিনের যে মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া কৃষকদের ব্যবহারিক লাভ বিমুখতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে লেখকের কিছু বক্তব্য রহিয়াছে।

প্রখ্যাত সমাজ তত্ত্ববিদ সোরোকিন মোটামুটিভাবে মূল্যবোধের পার্থক্যহেতু বিভিন্ন জাতির কৃষ্টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতানুযায়ী হিন্দু সমাজের মনোভাব কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত (Active Ideational Mentality)। সোরোকিনের মতবাদের ভিত্তি হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহ এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সমাজ জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছিল না। ম্যাক্স বেবার মনে হয় সোরোকিনের তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া কেবলমাত্র হিন্দুধর্মগ্রন্থ পাঠান্তে ভারতীয় সমাজকে ব্যবহারিক লাভ তথা পরিবর্তন-বিরোধী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

প্রাক-ব্রিটিশ যুগের হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদের পরধন গ্রাসের অভিযান, জমিদারদের অর্থলোলুপতা, কোনারক ও খাজুরাহোর স্থাপত্য, নর্তকীদের [illegible] বা চার্বাকের জীবন-বেদ, কোনটাই কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শন নহে। ব্রিটিশ যুগের হিন্দু জমিদারদের ভোগস্পৃহাও কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত মনোভাবের পরিপন্থী। এখন যদি উচ্চবিত্তরা কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া থাকেন, অশিক্ষিত কৃষকগণ যাহারা ধর্মগ্রন্থ পড়ে অক্ষম, তাহারা কিভাবে সেই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইবেন? তাহা ছাড়া, যাহারা ভারতীয় গ্রামজীবনের এবং সেই সঙ্গে উহার নীচতা, দলাদলি ও স্বার্থপরতার সহিত পরিচিত, তাহারা কখনই স্বীকার করিবেন না যে কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস হিন্দু গ্রাম্য সমাজের প্রধানতম মনোভাব।

ম্যাক্স বেবার ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ না ঘটাকে আমাদের কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের নিদর্শনরূপে পেশ করিয়াছেন এবং শ্রীবসু তাহা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থাকাকালীন অন্য কোন দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহা ব্যতীত, ইংরাজদের আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা তৎকালীন যে কোন উন্নত দেশের সমতুল্য ছিল। আমাদের বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য না হইয়া কিভাবে ইংরাজেরা সেই শিল্পকে ধ্বংসের পথে লইয়া যান, তাহা কাহারও অজানা নয়। ম্যাক্স বেবার যদি প্রাক-ব্রিটিশ যুগের ভারতের বস্ত্রশিল্পের বা বহির্বাণিজ্যের সাফল্যের ইতিহাস সম্যকরূপে জানিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই ভারতীয় সমাজকে কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিতেন না। হিন্দুধর্মগ্রন্থে বহু স্থানে পার্থিব উন্নতি বিরোধী উক্তি রহিয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাহা কোনদিনই পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই।

তাহা হইলে অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের কর্মবিমুখতা ও পরিবর্তন বিরোধিতাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করিব? সোরোকিনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে (যদিও তাঁহার মতানুযায়ী নয়) বলা যায়, ভারতীয় কৃষকের ভিতর কৃত্রিম ধর্মবিশ্বাস-মনোভাবের (Pseudo Ideational Mentality) প্রাধান্য অধিক। কৃত্রিম ধর্মবিশ্বাস-মনোভাবের উদ্ভব তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ জাগতিক উন্নতি কামনা করে, কিন্তু প্রাকৃতিক বা অন্য কোন শক্তির প্রবল বিরোধিতায় সে উহা লাভ করিতে পারে না। তখন সে আপনার দুরবস্থাকে বিধাতার নির্দেশ বলিয়া গ্রহণ করে এবং অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয় না। ভারতে কৃষিজাত উৎপাদন মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে কৃষকের আশা আকাঙ্ক্ষা বহু শতাব্দী ধরিয়া বহুবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির বাধাকে অতিক্রম করিবার শক্তি ভারতীয় কৃষক কোনদিনই সঞ্চয় করিতে পারে নাই। ইংরাজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত বহু শ্রমিক কৃষকে পরিণত হয় এবং অনিবার্যভাবে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। কৃষি-মূলধন সংগঠিত হইতে পারে নাই, ফলে কৃষকগণের ক্রমান্বয়ে আর্থিক অবস্থার অবনতিই ঘটে। এইরূপ অবস্থায় ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূত বলিয়া পরিচিত, কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটা সম্ভবপর হয় নাই। সরকারী সাহায্যের অভাবে কৃষকেরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় নাই। এই দুই কারণে মনে হয় কৃষকদের মধ্যে দেখা দিয়াছে কর্মবিমুখতা। পরিবর্তন বিমুখতাও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করিবার অক্ষমতা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অপরদিকে বহু বৎসর ধরিয়া উন্নত সেচ প্রণালীর উপর নির্ভরশীল পাঞ্জাবী হিন্দু কৃষকদের ভিতর কর্মোৎসাহ ও অবস্থার উন্নতি করিবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। (কুসুম নায়ারের "ব্লসমস্ ইন দি ডাস্ট" ও প্রকাশ ট্যাণ্ডনের "পাঞ্জাবী সেঞ্চুরী" দ্রষ্টব্য।) সুতরাং অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের জাগতিক উন্নতি বিরোধী মূল্যবোধের জন্য তথাকথিত কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস দায়ী নহে। যদি ভারতীয় কৃষকের ব্যবহারিক উন্নতির পরিপন্থী মনোভাবের জন্য কৃত্রিম ধর্মবিশ্বাস দায়ী হয়, তাহা হইলে শ্রীবসুর বিশেষ চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, কেননা কৃত্রিম ধর্মবিশ্বাস মনোভাবের ভিত্তি দৃঢ় নয় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত উহা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিবর্তিত হইবে।

নমস্কারান্তে,

নিলয় মজুমদার
হেস্টিংস, কলিকাতা

সাহিত্য সংবাদ

কৌতূহল ও প্রয়োজন : সাহিত্য বিচার

বিদুর

একটি লেখা দেখতে বসে প্রসঙ্গটি মনে এল। নতুন কথা কিছু নয়, তবু একবার আলোচনা করা যেতে পারে।

কোনো একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সম্পর্কে বহু মান্যগণ্য সমালোচকরা মন্তব্য করেছিলেন, গ্রন্থটি কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু প্রয়োজনে লাগে না। এর প্রাঞ্জল অর্থ বোধ হয় এই রকম দাঁড়াবে, লেখাটি পড়ে নানা বিষয়ে কৌতূহল জাগল, কিন্তু আমাদের কোনো কাজে এল না।

আমার যৎসামান্য বুদ্ধিতে ভেবে দেখছি, সাহিত্য বিষয়ে এ-রকম সাদামাটা অথচ সার কথা কচিৎ বলা যায়। বোধ হয় এ-কথা ঠিকই যে, যদি কোনো প্রাজ্ঞ সমালোচককে প্রশ্ন করা হয়, আপনি মোটামুটি কোন রীতিতে সাহিত্য বিচার করবেন, তবে তিনি হয়ত জবাবে বলবেন, আমার ওজন দেখার দুটি বাটখারা, একটি কৌতূহলের অন্যটি প্রয়োজনের।

অন্যে দ্বিমত হবেন, হতে পারেন; কিন্তু আমি প্রায় নিঃসন্দেহ, সাহিত্যের প্রাথমিক বিচার এই দুই ভিন্ন বাটখারাতেই হয়েছে।

কিছু সাহিত্য আছে যা কেবলমাত্র আমাদের কৌতূহল নিরসন করে। বলা বাহুল্য, এর সংখ্যা বেশী। বেশী এই কারণে যে, সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক কখনো প্রাথমিক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারেন না। ভাবের উদয় ঘটলেই কলম ধরেন, তার অন্য বন্ধু সমুদ্র দর্শন করে এসেই 'সামুদ্রিক'-গল্প লিখতে বসেন, অথবা উপন্যাস। কথাটা হয়ত বাড়াবাড়ি শোনাল। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে তাই কি নয়? বাঙলা সাহিত্যের (অন্যান্য সাহিত্যেই বা কম কি) অধিকাংশ লেখার ধর্ম এই, অধিকাংশ লেখকই আমাদের অল্পাধিক্যের কৌতূহল নিরসন করেছেন।

আমাদের জীবনের পরিধি বৃহৎ নয়, আমাদের দেখাশোনা অল্প, অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। ঠিক এই সব কারণেই অন্যের অভিজ্ঞতা শুনতে ভালবাসি। আমাদের যে-কৌতূহল বাঘের গল্প শোনায়, তার থেকে কিঞ্চিৎ পরিশীলিত কৌতূহল রোমাঞ্চকর গল্প শোনায়। আর হয়ত তার চেয়েও কিছু উন্নত কৌতূহল থাকলে অন্য গল্প শুনতে চাই। কিন্তু মূলত, সাধারণ পাঠকের দাবি থাকে তার কৌতূহল নিরসন করা হোক, সাধারণত লেখক মনেপ্রাণে এই দাবি মেটাবার দায়িত্বকেই মেনে নেন। খুব সাধারণ কথা, যত সহজে অন্যেরা মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে, অত সহজে অন্য কিছু নয়। মাত্র এই কারণেই এ-জাতীয় লেখকের সংখ্যা সর্ব দেশেই অধিক।

দ্বিতীয় বাটখারার কথা যা বলেছি, সে বস্তুটির সাদামাটা নাম প্রয়োজন। আমি প্রায় নিশ্চিত যে, প্রয়োজন শব্দটিতে নাক কুঁচকে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সাহিত্যের মহলে শব্দটি এখন বাতিল হতে চলেছে।

পাঠক আমায় মার্জনা করবেন, এ-সব বিষয়ে আমি কিছুটা প্রাচীন পন্থী। আমি বিশ্বাস করি, ভাল সাহিত্য আমার কাজে লাগে, আমার প্রয়োজন মেটায়।

চাল গম তেল, ফল জল, বাস ও বস্ত্রাদি আমাদের জীবনরক্ষা ও প্রাণরক্ষার জন্যে যে অর্থে অপরিহার্য, প্রয়োজনীয়—সে-অর্থে সাহিত্য শিল্প প্রয়োজনীয় নয়। শীতের দিনে এক জোড়া জুতো যে কবিতা অপেক্ষা অনেক প্রয়োজনীয়—অন্তত এক পাত্র উষ্ণ পানীয়—এ কথা আমাদের অতি উৎসাহী তরুণ কবিরাও মনে মনে স্বীকার করবেন পৌষ এসে গেলে। কিন্তু আমি জানি, তারা কখনও মনে করবেন না, শরীরের প্রয়োজন মিটলেও মনের প্রয়োজন তাতে মিটবে।

সাহিত্যে যাকে ওরা 'ইউটিলিটি' বলেছে, (আমি বলেছি কাজে-লাগা) তার স্থূল অর্থ যাঁরা করতে চান তাঁদের প্রতি আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বিশ্বাস, উঁচুদরের সাহিত্য সব সময়েই আমাদের কাজে লাগে। গরম কাপড় পোকায় কাটবে এই বিবেচনায় ও সাংসারিক জ্ঞানে যাঁরা ন্যাপথলিনের গুলি বাক্সে রাখেন তাঁরা অবশ্য কখনও আশা করবেন না, এই ধরনের কোনো কাজে-লাগার দ্রব্য ভাল সাহিত্য তাঁদের দিতে পারে। না, পারে না।

কিন্তু যে-মানুষ মনে কিছু গ্রহণ করতে চায়, রক্ষা করতে চায়, তার কাছে সাহিত্যের ওই হিসেবটা বড়—কি পেলাম।

ছোট করে একটা উদাহরণ দিই। মহাভারত পাঠ করলে (যে যেমন সংস্করণ হোক) কি এ-কথা মনে হয় না, এর রাজসভায়, বনপর্বে, যুদ্ধবিগ্রহে, এর চরিত্রে, হিংসায় অথবা সহনশীলতায়, ক্ষমা অথবা ত্যাগে এমন কিছু পাওয়া যায় যার প্রয়োজন আমি অনুভব করেছি। আমার আত্মিক অভাব কোথাও এরা উপ্ত করেছে, কোথাও পূর্ণ করতে চেয়েছে। কর্ণ যদি কেবলমাত্র যুদ্ধই করতেন তবে সে যুদ্ধ বর্ণনায় আমি কৌতূহল অনুভব করতে পারতুম তাঁকে গ্রহণ করতে পারতাম না। যে বিষণ্ণ-ছায়ায় কর্ণ-চরিত্র ঘেরা রয়েছে, যে নীতি দুর্নীতিতে সে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত, তার প্রতি মানবহৃদয়ের আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং আমি তাকে দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করি।

আমরা সহস্রবার দেশী-বিদেশী মহৎ গ্রন্থের আলোচনাকালে একটি শব্দ শুনেছি—'his teaching—' অর্থাৎ তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান বা শিক্ষা। এই জ্ঞান অথবা শিক্ষাই অসাধারণ শিল্পের বড় কথা, কেন না এই শিক্ষা আমাদের হৃদয় ও মনের কাজে লাগে, তাকে ব্যবহার করতে পারি বা না পারি।

ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কে জনৈক রুশ লেখক বলেছিলেন — ডস্টয়েভস্কি আমাদের আত্মাকে নতুন ভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন—he sweetened the ground for a spiritual renaissance ....

আমি, বলা বাহুল্য, কমিউনিস্ট 'মাৰ্ক' [illegible] সাহিত্যে 'প্রয়োজন-বস্তুটি' বিশ্বাস করি না; কিন্তু যে-অর্থে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'[illegible] সঙ্গে শিল্পী কবি এদের যোগ জগতের সঙ্গে [illegible] যোগ—' সেই যোগাযোগ বিশ্বাস করি, এবং 'প্রয়োজনে'ও।

একটি চিঠি : "রহস্য-কাহিনীতে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ"

সবিনয় নিবেদন,

[illegible] Concave Mirror [illegible] Real Image দেখা যায় [illegible] কোনো Screen বিনাই।"

[illegible] প্রকাশিত আমার লেখা সম্পর্কেই এই মন্তব্য করেছেন। উক্ত রচনায় রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত যে কয়েকটি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তার প্রতিটি তথ্য আমার দ্বারা পরীক্ষিত। Plane Mirror-এর Virtual Image দেখার জন্যে যেমন Screen এর প্রয়োজন হয় না, তেমনি Concave Mirror-এর Real-Image-এর জন্যেও সবসময়ে তার দরকার হয় না।

বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞাননির্ভর কাহিনী লেখার সমস্যা সম্পর্কে একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক দুঃখ করে বলেছিলেন, 'এ দেশে এ ধরনের কাহিনী লেখার আগে পাঠক তৈরী করে নেওয়া দরকার।' ইতি—

অদ্রীশ বর্ধন

পুস্তক পরিচয়

নাট্যসাহিত্য : নাট্যরীতি ও শৈলীর আলোচনা

নাটক লেখার মূল সূত্র—শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলা দেশে নাটকের অভাব যেমন প্রকট, নাট্য সমালোচনারও তেমনই। "নাটক লেখার মূলসূত্র" যে ধরনের গ্রন্থ সম্ভবত বাংলা ভাষায় সে জাতীয় কোনো বই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। রচনারীতির মূলসূত্র নিয়ে আলো[illegible], অর্থাৎ রচনা-কারখানার আবেষ্টনী, মনস্তত্ত্ব এবং ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা। এই কারখানা কখনো টেকনিশিয়ান সমবায়, কখনো লেখক নিজে। যে আবেগ এবং বক্তব্যকে যে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাকরণসংগতভাবে তিনি বা তাঁরা রূপ দিতে চেষ্টা করে থাকেন মূলসূত্র সেই পথেরই নির্দেশ এবং বিশ্লেষণ করে থাকে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য নাটক সম্বন্ধে বেশ কিছুকাল ধরে যে চিন্তা ও গবেষণা করছেন তার প্রমাণ পাই তাঁর ইতিপূর্বেকার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা-জাতীয় একাধিক গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থখানি আধুনিক, আধুনিককালের বিভিন্ন নাট্য-রচনাশৈলীর মূল উপকরণ নিয়ে আলোচনা আছে এর মধ্যে এবং এই গ্রন্থের লক্ষ্য নাট্যশিক্ষানবীশ ও রচনানবীশেরা। যাঁরা নাটকের কার্যকারণ ধরনধারণ বুঝতে চাইবেন, বা সজ্ঞানে লিখতে চাইবেন তাঁদের জন্য এ বই লেখা হয়েছে। অর্থাৎ এর মধ্যে এক দিকে যেমন বিদ্যায়তনিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা থাকবে, অপর দিকে মৌলিক অনুসন্ধিৎসার রস ও রসদের যোগান সমান পরিমাণে থাকবে।

বর্তমান গ্রন্থে প্রাথমিক প্রয়োজন অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হয়েছে নিঃসন্দেহে। এবং [illegible] অনেকাংশেই সুলিখিত। কিন্তু নবীননাট্যকারকে কতখানি উদ্দীপনা ও ব্যাকরণজ্ঞান যোগাবে এই গ্রন্থ সেই বিষয়েই সন্দেহ আছে। এবং 'অনেকাংশে সুলিখিত' এই কথা বলার কারণ আরও একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। বইটি আগা-গোড়া দ্রুত ধাঁচে লেখা, মাত্র অবয়ব সংক্ষিপ্তিকে লক্ষ্য করে এ কথা বলছি না। ভাষায়, ভাবপ্রকাশের মধ্যে এবং লেখকের সংগৃহীত বৈদেশিক আলোচনা ও উপকরণ-সমূহকে আক্ষরিকভাবে বসিয়ে যাবার ভঙ্গীতে তাঁর অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে পরিমাণ ইংরেজী কোটেশান মূলপাঠের মধ্যে অদ্বিতীয় রূপে ব্যবহার করেছেন, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-সমীকরণ করেন নি, ভাষান্তরে রূপ দেবার চেষ্টা করেন নি, তাতে আপাতদৃষ্টিতে যেমন তাঁর অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে, পরিণামে তেমনই অধ্যবসায় ও মৌলিকতার অভাব ধরা পড়েছে।

ষড়-অঙ্গ নাট্যরীতির শৈলীর দিকে তাঁর ইংগিত আছে। কিন্তু উদাহরণ নেই, যাকে বলে 'ইলাসট্রেশান'। সাংকেতিক ও রেডিও-নাট্য সম্বন্ধে প্রায় সংজ্ঞা-স্পর্শী আলোচনা করেছেন; আর চিত্রনাট্য, যে বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হতে পারত, সেটি কতক-গুলি পরিভাষা-টীকা-টিপ্পনীর পরিচয় হয়ে রয়েছে। কয়েকজন বিদেশী প্রবন্ধকারের বাক্উদ্ধৃতি ছাড়া কিছু নেই। তথাপি প্রথম প্রয়াস হিসাবে, প্রাথমিক পথপ্রস্তুতি

হিসাবে এই গ্রন্থের মধ্যে যে উপকরণ পেয়েছি তজ্জন্য লেখককে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটির মুদ্রণ আরও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী লিখিত ভূমিকা এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

৩২৫।৬২

কয়েকটি উপন্যাস

ললিত বিভাস—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর প্রকাশন, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য দশ টাকা।

শেষ পরিণাম মৃত্যু; তাকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সুধাকান্ত সে-কথা জানতেন। সকলেই জানে। কিন্তু অমোঘ সেই পরিণামের কথা জেনেও সবাইকে কাজ করে যেতে হয়। যে যার আপন পথে কাজ করে। সকলের পথ এক নয়। কারও প্রেমের; কারও কর্মের। সুধাকান্তর আস্থা ছিল প্রেমে, ভালবাসায়। আনন্দ তার বন্ধু। সে জেনেছিল, জীবনে যদি প্রতিষ্ঠা পেতে হয়, তাহলে কর্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। মূলত এই ভিন্ন পথের মানুষ দুটিকে নিয়েই রচিত হয়েছে 'ললিত বিভাস'।

সুদীর্ঘ উপন্যাস। কিন্তু আয়তনের দীর্ঘতা এক্ষেত্রে পাঠককে ক্লান্ত করে না। তার অন্যতম কারণ হয়ত এই যে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ এবং ঘটনার নিরন্তর প্রবাহ এই গ্রন্থের গল্পাংশে একটি তীব্র গতি এনে দিয়েছে। চরিত্রের সংখ্যাও অল্প নয়; কিন্তু চরিত্রের অরণ্যে তাই বলে পাঠককে কোথাও হারিয়ে যেতে হয় না। তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, কেন্দ্র-চরিত্র সুধাকান্ত আর আনন্দের জীবনের সঙ্গে তারা সংপৃক্ত হয়ে আছে; সুধাকান্ত আর আনন্দের ব্যক্তিত্বকে ঠিক মতো পরিস্ফুট করে তুলবার ব্যাপারে তাদের কারও ভূমিকাই নগণ্য নয়। এমন কী, পারুল কিংবা গোপারও নয়, গ্রন্থের প্রায় উপান্তে যাদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে।

কাহিনী এবং চরিত্র রচনায় এই উপন্যাসের লেখক সত্যিই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা এই যে, কাহিনী এবং চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বিপরীত দুই আদর্শের সংঘাতকে বেশ স্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। বক্তব্য প্রধান উপন্যাসে অনেক সময় বক্তব্যের ভারে উপন্যাসটি পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। 'ললিত বিভাস'ও বক্তব্য প্রধান উপন্যাস; কিন্তু

সুখের কথা এই যে, বক্তব্যের উপস্থাপনায় এখানে বক্তৃতার ভঙ্গিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। বক্তব্য এখানে সোচ্চার নয়; কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এগুলি প্রশংসার কথা। এখন একটি ত্রুটির কথাও বলব। কাহিনীর দীর্ঘতা যদিও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেনি, তবু সন্দেহ নেই যে, 'ললিত বিভাস'-এর কাহিনী আর-একটু হ্রস্ব হতে পারত। হলে ভাল হত; উপন্যাসটি সে ক্ষেত্রে আরও সংবদ্ধ হত। আর তা ছাড়া, চরিত্রগুলির বেশীর ভাগেরই যদিও প্রয়োজন আছে, তবু তাদের কাউকে-কাউকে আর-একটু কম জায়গা দিলে কিছু ক্ষতি হত না। ৩৬৯।৬২

নিঃসংগ নক্ষত্র—মনি গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যায়ন—৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখিকা অরোর দ্যুপাঁ—জর্জ স্যাঁদ এই ছদ্মনামে বহু উপন্যাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। লেখিকার ব্যক্তিগত জীবন ঘটনা-বহুল। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে লেখিকা নাট্যকার আলফ্রেদ দ মুসে এবং সঙ্গীত-শিল্পী ফ্রেদরিক সোপ্যাঁর প্রেমে পড়েন। এই প্রেমের কাহিনী অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর। এই ফরাসী লেখিকার বিচিত্র জীবন-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রেম, রোমাঞ্চ ও ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও এই ফরাসী লেখিকা নিজেকে নিতান্ত নিঃসংগ বোধ করিতেন। ফরাসী লেখিকার এই নিঃসংগতার দিকটি গ্রন্থকার অত্যন্ত নিপুণভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ১৬৯।৬২

শারদ-সাহিত্য

চতুষ্পর্ণা—সম্পাদক শ্রীঅরুণ ঘোষ। ৫।২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০ টাকা।

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই সাময়িক পত্রিকাখানির আলোচ্য প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাখানিতে রয়েছে চারটি উপন্যাস যার রচয়িতা হচ্ছেন সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। এইভাবে পত্রিকাখানির প্রতিটি সংখ্যায় চারটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টি পরিবেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই সাহিত্যসৃষ্টি বলতে কেবলমাত্র উপন্যাসই নয়, 'রম্যরচনা, আলোচনা, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, কাব্য ও অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বৃক্ষশাখা থেকে' চারটি সাহিত্য-পর্ণ চয়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এর প্রকাশক। এই অভিনব প্রকাশনটি সাহিত্যরসিকদের সমাদর লাভ করবে আশা করা যায়।

সাহিত্যতীর্থ—সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। ৬৭, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১·৭৫ নয়া পয়সা।

বার্ষিক সাহিত্য সংকলনের এই নবম বার্ষিক সংখ্যা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটিকা, ভ্রমণ কাহিনী ও চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ। লেখকের তালিকায় বিশিষ্টদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী কালীদাস রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, পরিমল গোস্বামী, পশুপতি ভট্টাচার্য বিভাস রায়চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বনফুল, বিমল মিত্র প্রভৃতি। শিল্পী শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা দুখানি ছবি পত্রিকাখানির শোভা বাড়িয়েছে।

বিশ্ববার্তা — সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ৪৪।৪ গরচা রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ২·০০ টাকা।

প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, রম্য ও রসরচনার সমাবেশে পত্রিকাখানি পূর্ববর্তী বছরের ধারা ও রূপ রক্ষা করেছে। বৈশিষ্ট্য বলতে তেমন কিছুই নজরে পড়ে না। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রমুখ প্রভৃতি।

সমকালীন—সম্পাদক : শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩। মূল্য ৫০ নঃ পঃ।

নিছক সাহিত্য-সম্পর্কিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর পরিবেশনে 'সমকালীন' তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের প্রবন্ধ, শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্যের 'ইসলাম সংস্কৃতি ও আমরা', শ্রীঅনিল চক্রবর্তীর 'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প', শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'পিণ্ডারীর ওড্ ও হেমচন্দ্র', উইলিয়ম ফকনার সম্পর্কে শ্রীবর্ণাঢ্যকুমার সেনের প্রবন্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের 'সার উইলিয়াম জোন্স', শ্রীআনন্দকুমার স্বামীর 'লোকায়ত শিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি', শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের 'দুর্গাপূজার অর্থনীতি' এবং শ্রীরবি মিত্রের 'সৌজন্য ও ভদ্রতাবোধ' বিষয়ক রচনাবলী চিন্তাশীল পাঠকদের মনের খোরাক যোগাবে।

উত্তরসূরী — সম্পাদক : শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য। ১৮৬/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪। মূল্য ১·০০ টাকা।

বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে 'উত্তরসূরী' যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে আলোচ্য সংখ্যাখানি তার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে। প্রবন্ধের মধ্যে আছে শ্রীঅমলেন্দু বসুর রচিত 'সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনা', শ্রী[illegible] বণচৌর 'অন্তর্চরিত ও [illegible]', ডঃ সুশীল রায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: সমসাময়িক সমাজ ও বাংলা', শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'ছেলে ভুলানো ছড়ায় বিবাহ', শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' এবং শ্রী[illegible] ভট্টাচার্যের '[illegible] চিত্ররূপ'। এছাড়া, সর্বশ্রী অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, [illegible] বসু, মণীশ ঘটক, বিষ্ণু দে, [illegible], কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, [illegible], [illegible], অরুণ ভট্টাচার্য, [illegible] প্রমুখ পঞ্চাশ জন সুখ্যাত কবির রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

কল্যাণী—সম্পাদক : শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৫ [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ১·৫০ নঃ পঃ।

শারদীয় প্রকাশনের মধ্যে আলোচ্য পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংকলন প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাসের পরিবর্তে সংখ্যাটিতে কেবলমাত্র ভ্রমণ-বিষয়ক রচনা প্রকাশিত করা হয়েছে। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী লীলা মজুমদার, নরেশ, সন্তোষ ঘোষ, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রণজিৎকুমার সেন, বিমল ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, সম্বুদ্ধ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিশিষ্টে শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ সংকলিত বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের তালিকাটি এ-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের বিশেষ কাজে লাগবে।

রঙ্গজগৎ

শিল্পীদের প্রতি আমাদের আবেদন

পবিত্র ভারতভূমি আজ পররাজ্যলোভী কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক আক্রান্ত। চীনের বর্বরোচিত আসুরিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের বীর জওয়ানেরা দেবসেনার মত রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা আজ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের জাতীয় জীবনে এতবড় সংকট এর আগে আর দেখা দেয়নি। এই নিদারুণ সংকটে প্রতি ভারতবাসীর যা কর্তব্য আমাদের

প্রতিরক্ষা তহবিলে কমপক্ষে একদিনের পারিশ্রমিক দান করুন। অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহের জন্য কণ্ঠশিল্পীরা দলে দলে গান গেয়ে নগরের প্রতি ঘরে ঘরে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ান। জাতির অন্তরে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য প্রতি অনুষ্ঠানে কণ্ঠশিল্পীদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

শিল্পীরাও সে কর্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শিল্পীদের সামনে আজ মহান আত্মত্যাগের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলার চলচ্চিত্র ও মঞ্চের শিল্পীরা এবং আমাদের কণ্ঠশিল্পিবৃন্দ আত্মদানের এই মুহূর্তটিকে ব্যর্থ হতে দেবেন না।

ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই হয়ত আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু বিপন্ন ভারত তাঁদের কাছে আরও চায়, আরও তাঁদের দিতে হবে। পরম পাওয়ার আনন্দ রয়েছে এই দানে। এই দান মানুষকে মহৎ করে।

আত্মদানের আহ্বানে বাঙালী চিরদিনই সর্বাগ্রে সাড়া দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের শিল্পীরাও আত্মত্যাগের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সারা ভারতকে পথ দেখাবেন।

রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" (পরিচালনা : দিলীপ মিত্র) ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায় ফটো : দেশ

মহাসংকটে

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রশিল্পলোক এবং শিল্পীর কর্তব্য

ভারতভূমি গ্রাসে উদ্যত চীনা অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংকট ও জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন। জাতির এই সংকটকালে শিল্পলোক এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের কর্তব্য কী?

প্রতিরক্ষা তহবিলে আমাদের শিল্পীদের

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "দাদা ঠাকুর" (জালান প্রোডাকশন্স) ছবিতে সুলতা চৌধুরী, নামভূমিকায় শিল্পী ছবি বিশ্বাস ও তরুণকুমার

রেনেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউ এর পরে ঢেউ" (পরিচালনা : ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও ও স্মৃতীশ গুহঠাকুরতা) ছবিতে শম্পা ও শঙ্কর

অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অর্থদান করেছেন। এবং জওয়ানদের সেবায় অন্যান্য সামগ্রীও তাঁরা নেতাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বাংলার চলচ্চিত্রলোক ও মঞ্চজগৎও জাতির এই সংকট সময়ে নিষ্ক্রিয় নয়।

কিন্তু আমাদের শিল্পলোক এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের কি আরও বেশী কিছু করবার নেই? দেশ যখন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত এবং এমন এক শত্রু যার রাজনীতিক দর্শন ভারতের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য, তখন আমাদের সর্বাগ্রে কিসের প্রয়োজন? অর্থের? না, আত্মিক বলের? আপৎকালীন অবস্থায় অর্থের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অর্থ অপরিহার্য। কিন্তু মনোবল, আত্মবিশ্বাস এবং দেশপ্রেমের প্রয়োজন বুঝি তার চেয়েও অনেক বেশী। জাতি যদি পরভূমিগ্রাসী শত্রুকে প্রতিরোধ করতে চায় তবে তাকে বিগতদিনের মতই আজ আবার নতুন করে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।

ভারতবাসীকে জাতীয়তার ভাবাদর্শে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলার কাজে বাংলার চিত্রব্যবসায়ী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা আজ এগিয়ে আসতে পারেন। বোম্বাই-এর সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার চিত্রপ্রযোজক এবং শিল্পী ও কর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে দেশাত্মবোধক গান অবলম্বনে অতি অল্পদৈর্ঘ্যের অনেকগুলি ছবি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এবং পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণও শুরু হয়ে গেছে। জনপ্রিয় শিল্পীরা এইসব ছবিতে আত্মপ্রকাশ এবং কণ্ঠদান করছেন। প্রখ্যাত কলাকুশলীরা এইসব ছবি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করছেন।

আদর্শবাদ ও জাতীয় সংগঠনের কাজে বাংলাদেশই চিরকাল সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে। বাংলার চলচ্চিত্রলোক কি আজ পিছিয়ে পড়বে?

আমাদের চিত্রপ্রযোজক ও পরিবেশকরাও বোম্বাই-এর চিত্রব্যবসায়ীদের মত দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল প্রমুখ কবিদের দেশাত্মবোধক গান এককালে বাঙালী জাতিকে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। অতি অল্পদৈর্ঘ্যের ছবিতে তাঁদের দেশাত্মবোধক গানের চিত্রায়ণ জাতির প্রাণে দেশভক্তির সঞ্চার করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের শিল্পী ও কলাকুশলীরা এইসব ছবির কাজে আনন্দের সংগে অংশ গ্রহণ করবেন। স্টুডিয়োর মালিক ও কর্মীরাও এই কাজে বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য দেখাবেন না। এখন প্রয়োজন শুধু চলচ্চিত্রসেবীদের এগিয়ে আসা। দেশাত্মবোধক গান অবলম্বনে কমপক্ষে দশ মিনিটব্যাপী অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরির কাজে আমাদের চিত্রব্যবসায়ীরা যদি অগ্রণী হয়ে আসেন তবে তাঁরা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন, ভারতভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদ লাভ করবেন। এইসব ছবি রাজ্য সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের সকল প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হতে পারে। আমাদের চলচ্চিত্রসেবীরা কি এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদনে উৎসাহী হবেন না?

বাংলার পেশাদারী ও শৌখিন মঞ্চসেবীদের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন জাতির এই সংকটকালে অন্তত কিছুকালের জন্য দেশাত্মবোধক নাটক মঞ্চস্থ করেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য মহৎ। বাংলার রঙ্গমঞ্চ থেকে একদা দেশপ্রেমের বন্যা উৎসারিত হয়েছে। আজ কি আবার তা সম্ভব হয় না? বাংলার রঙ্গশালা কি আবার দেশাত্মবোধের পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে না? আমাদের কণ্ঠশিল্পীদের অনুরোধ করি, আপনারা চারণ-কবির মত বাংলা দেশকে স্বাদেশিকতার প্রেরণায় আবার উদ্দীপিত করে তুলুন। প্রত্যহের প্রভাত-পরিক্রমায় আপনাদের দীপ্ত কণ্ঠে দীপক রাগিণী বেজে উঠুক, ঘরে ঘরে নগরবাসীর মোহ-তন্দ্রা ভেঙে যাক।

নিদারুণ সংকটের মুহূর্তে দেশবাসীকে জাতীয়তার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করে তোলার এই মহৎ দায়িত্ব যদি আমাদের শিল্পলোক ও শিল্পীরা গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা জাতির শ্রদ্ধা ও ভারতভাগ্যবিধাতার বর লাভ করবেন।

বাংলার চলচ্চিত্রলোকের

নেতৃবৃন্দের আবেদন

পররাজ্যলোভী কম্যুনিস্ট চীনের ভারত-আক্রমণের নিন্দা করে **শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ** সভাপতি, ই-আই-এম-পি-এ, **শ্রীঅজিত বসু** সভাপতি প্রযোজক শাখা (ই-আই-এম-পি-এ), **শ্রীমধু বসু, সভাপতি,** সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স য়ুনিয়ন, এবং **শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়,** সভানেত্রী অভিনেতৃ সঙ্ঘ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে বিবৃতি প্রদান করেন তার সারমর্ম:

বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমরা যাতে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি এবং পরিপূর্ণভাবে জাতীয় সরকারের সংগে সহযোগিতা রক্ষা করতে পারি, তার জন্য আমরা পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিদের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অনৈক্য ও বাদ-বিসংবাদের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা তাঁদের কাছে আরও আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন ভারত সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে অর্থসাহায্য ও সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টায় সকলেই আমাদের সাহায্য করবেন আমরা এই আশা রাখি। সংগৃহীত সমুদয় অর্থ আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করব।

ভারতভূমি সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ও আস্থার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরা অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছি। আমরা দৃঢ়নিশ্চয় যে, সকল শিল্পী ও কলাকুশলী নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই কর্তব্য পালন করবেন।

দেশের এই গুরুতর পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নেতৃত্ব সঠিক বলে আমরা মনে করি এবং ভারতের সীমানা হতে চীনা সৈন্যের অপসারণের ভিত্তিতেই আপস-আলোচনা সম্ভব বলে তিনি যে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন আমরা তা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

স্বাধীন ভারতের সীমানা আক্রমণ করে আমাদের শান্তি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর চীন যে আঘাত হেনেছে, তার প্রতিকারার্থে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সমানভাবে সহযোগিতা করে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা সকল শিল্পী, কলাকুশলী এবং চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতিরক্ষা তহবিলে এ পর্যন্ত

শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য দান

এস কি রামচন্দ্রন (দক্ষিণ ভারত) : মোট ১০০,০০০ টাকা; রাজ কাপুর : ৫০,০০০ টাকা; দিলীপকুমার : ৫০,০০০ টাকা; মীনাকুমারী : ৫০,০০০ টাকা; শিবাজী গণেশন : ৫০,০০০ টাকা; বৈজয়ন্তীমালা : ২৫,০০০ টাকা; শাম্মি কাপুর : ২৫,০০০ টাকা; সাবিত্রী (দক্ষিণ ভারত) : ২৫,০০০ টাকা; জেমিনি গণেশন : ২৫,০০০ টাকা; দেব আনন্দ : ২০,০০০ টাকা; গুরু দত্ত : ২০,০০০ টাকা; বি সরোজা দেবী : ১০,০০০ টাকা; আশা পারেখ : ১০,০০০ টাকা; সাধনা শিবদাসানি : ১০,০০০ টাকা; নন্দা : ১০,০০০ টাকা।

শিল্পপতিদের উল্লেখযোগ্য দান

এস এস ভাসান ও তাঁর সংস্থা : ১০০,০০০ টাকা; এ ভি মায়াপ্পান : ৫৫,০০০ টাকা।

অগ্রদূত পরিচালিত শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স-এর "নবদিগন্ত" ছবির একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী

সময়োচিত শুভ ২.

পহেলা সিপাহী

চীনা সৈন্যদের ভারত-আক্রমণ ও ভারতীয় জওয়ানদের মরণপণ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বোম্বাই-এর বি আর ফিল্মস "পহেলা সিপাহী" নামে দু হাজার ফিটের একটি প্রামাণিক চিত্র তৈরি করেছেন। সাহির লুধিয়ানভি রচিত একটি গানের দৃশ্যরূপ হিসাবেই ছবিটি চিত্রিত হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন যশ চোপরা।

ভারতের প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদান এবং জওয়ানদের সেবায় বস্ত্র, স্বর্ণ ও রক্তদানের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার অভিপ্রায়ে বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান ডকুমেণ্টারী প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্যেরা সাত দিনের মধ্যে পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শিল্পী-কুশলীরা এবং স্টুডিয়ো-মালিকেরা এসব ছবির জন্য কোনরকম পারিশ্রমিক দাবি করবেন না। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় এই ছবিগুলি সারা ভারতে অব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে। এ ছাড়া ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে বোম্বাই-এর চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকুশলী, শিল্পী ও কর্মীরা বিনা পারিশ্রমিকে ৫২টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। ফিল্মস ডিভিসনের মাধ্যমে ছবিগুলি সারা ভারতে মুক্তিলাভ করবে। প্রথম ছবিটির কাজ শুরু হয়েছে গত ২রা নভেম্বর, মেহবুব স্টুডিয়োয়। এই ছবিতে দিলীপকুমারকে দেশাত্মবোধক গান গাইতে দেখা যাবে। গানে কণ্ঠদান করবেন হেমন্ত কুমার। বসন্ত দেশাই ছবির সুরকার। সব কটি ছবিই দেশাত্মবোধক গান নিয়ে তৈরি হবে।

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরি-

ইস্টার্নী প্রোডাকশন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" (পরিচালনা : নবগোষ্ঠী) ছবির গান রেকর্ডিং-এর দৃশ্যে সংগীত-পরিচালক শ্যামল মিত্র ও সুজাতা চক্রবর্তী ফটো—দেশ

বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের ৭০০তম অভিনয়-রজনীর স্মারক উৎসবে জয়শ্রী সেন জওয়ানদের সেবায় নিজের কানের দুল মন্ত্রী শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন ফটো—দেশ

প্রেক্ষিতে ভারতের সীমান্ত-সমস্যার উপর আলোকসম্পাত এবং জনমনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের অভিপ্রায়ে অনতিবিলম্বে প্রামাণিক চিত্র তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন দিলীপকুমার, রাজ কাপুর, বিমল রায়, বি আর চোপরা ও রাজবংশ খান্না। বোম্বাই চলচ্চিত্র-জগতের এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উল্লিখিত প্রামাণিক চিত্র তৈরির প্রস্তাব করেছেন। এবং এই কাজে তাঁরা তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

জাতীয় কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ কলকাতার শিল্পলোক

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, পূর্বাঞ্চলের সমস্ত চিত্রগৃহের এক দিনের সকল প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে। এই টাকার অঙ্ক আনুমানিক পাঁচ লক্ষ (প্রমোদ কর সহ)।

গত ৩রা নভেম্বর বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের ৭০০-তম অভিনয়-রজনীর স্মারক উৎসবে রঙ্গশালার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার প্রতিরক্ষা তহবিলে ৭০০্ টাকা ও সাত ভরি সোনা দান করেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

বিশ্বরূপা থিয়েটারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, আগামী ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় "সেতু"র এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। টিকিট বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

অভিনেতৃ সঙ্ঘ গত সপ্তাহে তাঁদের বিজয়া সম্মিলনী উৎসব বন্ধ রেখেছেন এবং উৎসবের জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

উত্তম চিত্রের "বিন বাদল বরসাত" ছবির নায়িকা আশা পারেখ

তোমারি দানের পুণ্য

জওয়ানদের সেবায়

(উপরে) মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে অলঙ্কার তুলে দিচ্ছেন কানন দেবী (মাঝখানে) গলার হার খুলে দিচ্ছেন সন্ধ্যা রায় (নীচে) অলঙ্কার দান করছেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

উত্তমকুমার ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড-এর "ভ্রান্তি বিলাস"-এর (পরিচালনা : মানু সেন) প্রথম দিনের স্যুটিংএ গৃহীত একটি দৃশ্যে সাবিত্রী বসু ও উত্তমকুমার

ফটো—দেশ

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে দুটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করছে। ছবি দুটির নাম: **দাদাঠাকুর** (জালান প্রোডাকশন্স) ও **ঢেউয়ের পরে ঢেউ**।

বহুপ্রতীক্ষিত "দাদাঠাকুর" সাংবাদিক, সমাজসেবী এবং রসিকপ্রবর শরৎ পণ্ডিতের জীবনকাহিনী অবলম্বনে তৈরী। দাদাঠাকুর নামেই তিনি বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। দাদাঠাকুর আজও বেঁচে আছেন। ইহজগতে নেই ছবি বিশ্বাস, যিনি দাদাঠাকুরের ভূমিকায় এই চিত্রে অভিনয় করেছেন।

নলিনীকান্ত সরকারের মূল রচনার ভিত্তিতে "দাদাঠাকুর" ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সুধীর মুখোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন। এই জীবনীচিত্রে নলিনীকান্ত সরকারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তরুণকুমার। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী এবং গঙ্গাপদ বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

রেনেসাঁস ফিল্মস-এর "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" টেনিসনের একটি কবিতার কাহিনী অবলম্বনে তৈরী। দীঘার মনোরম সমুদ্র-সৈকতে ছবিটি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত। ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল এবং স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতা যুগ্মভাবে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। রবিশংকর এই ছবির সংগীত পরিচালক। নবাগত শিল্পীরা এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শম্পা, বাদল ও শংকর। এবারকার সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

বর্তমান সপ্তাহে একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম **রাখী** (প্রভুরাম পিকচার্স)। শিবাজী গণেশন এ ছবির প্রযোজক। এ ভীম সিং পরিচালিত এই ছবির প্রধান শিল্পীরা হলেন অশোককুমার, প্রদীপকুমার, ওয়াহীদা রেহমান ও অমিতা। রবি ছবির সংগীত পরিচালক।

* চিত্র-সমালোচনা *

ভিন্নধর্মী বোম্বাই-ছবি

কিদার শর্মা পরিচালিত "হামারী য়াদ আয়েগী" (শো পিপল) ছবিটির একাধিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

এই ছবির পটভূমি উদয়পুর। উদয়পুরের বর্ণাঢ্য প্রাকৃতিক শোভা ছবিটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। যে প্রেমোপাখ্যান এই ছবিতে চিত্রায়িত তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে ট্র্যাজেডিতে। বোম্বাই-এর ছবিতে সাধারণত রোমাণ্টিক ট্র্যাজেডি খুব একটা দেখা যায় না এবং ছবির প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যেও রসের উপকরণ রয়েছে—যা রুচিসম্মত। ছবির গান ও আবহ-সংগীত বোম্বাই-নির্মিত হিন্দী ছবির চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করেনি। কয়েকটি গান ও আবহ-সুর রাগাশ্রয়ী।

এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই ছবিটি রুচিবান দর্শকদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে। অবশ্য ছবির কোন কোন দৃশ্যে স্থূল অতি-নাটকীয় উপাদান যে একেবারেই নেই তা নয়। চিত্রকাহিনীর বিস্তার ও বিন্যাসের মধ্যেও অসংগতি এবং অযৌক্তিকতা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু চিত্রপরিচালক তাঁর প্রয়োগ-কর্মে সর্বাংগীণভাবে উন্নততর শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিতে সুঅভিনয় করেছেন [illegible]। নায়িকার চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। মাধবী এক বিধবা যুবতীর চরিত্রের নিরুচ্চার বেদনা সুন্দর অভিনয়ে প্রকাশ করেছেন। নায়ক অশোকের অভিনয় স্বচ্ছন্দ। অনন্তকুমার ছবির অন্য একটি বিশেষ চরিত্রের উল্লেখযোগ্য শিল্পী।

সংগীত-পরিচালক স্নেহল ভাটকরের কৃতিত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উঁচুদরের।

* সাংস্কৃতিকী *

গত ২০শে অক্টোবর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় **শ্রীমতী মণিমঞ্জুষা মজুমদার**

এবারকার বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় খেয়ালে প্রথমস্থান অধিকারিণী মণিমঞ্জুষা মজুমদার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন

পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতে (খেয়াল) বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীমতী মজুমদার গত বছর নিখিল ভারত বেতার সংগীত প্রতিযোগিতায় উচ্চাঙ্গ লঘু কণ্ঠ-সংগীতে (ঠুংরী) প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং তার আগের বছর ওই প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ ও ধামারে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। শ্রীমতী মজুমদার সংগীতরত্ন শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী, এবং কলিকাতা টেলিফোনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এ সি বসুর কন্যা।

গত ২৯শে অক্টোবর **মেগাফোন হাউসে** (রাসবিহারী অ্যাভিনিউ) কণ্ঠশিল্পীরা **গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং অধিকর্তা** শ্রী পি কে সেনের জন্মদিন পালনের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে গান গাইলেন শ্যামল মিত্র, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, ইলা বসু, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। শ্রীসেন শিল্পীদের কাছে এই আবেদন জানান, **তাঁরা যেন জাতির এই সংকটে প্রতি অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের ভাব জাগিয়ে তোলেন।**

পরমহংস বাণীচিত্রের "নবারুণ-রাগে" (পরিচালনা : অতনু ঘোষ) ছবির একটি দৃশ্যে জহর রায় ও তরুণকুমার ফটো—দেশ

তুলেছে তার সহজ ব্যঞ্জনা, প্রেরণা ও অকৃত্রিমতা। গল্পের কাহিনীকে সাবলীলভাবে চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। মৃত্যুর দৃশ্যগুলি মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় সেখানে দেখানো হয়েছে মানুষের আত্মা অসীমে মিশে যাচ্ছে। মানুষ যখন এই পৃথিবী ছেড়ে যায়, তখন চারিদিকে এক শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না কিন্তু সেই অনাত্মাকেও সত্যজিৎ রায় অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আঠারো মাস আগে "ডি ভেলট্" কাগজের লণ্ডন প্রতিনিধি সেখানে এই ছবিটি দেখে লিখেছিলেন যে,

হামবুর্গে সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত"

পিটার এলেন

বাৎসরিক হামবুর্গ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সপ্তাহে বাংলা ভাষায় ইংরেজী সাব-টাইটেল সহ সত্যজিৎ রায়ের ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে স্বর্ণসিংহ বিজয়ী "অপরাজিত" দেখানো হয়েছিল।

"পথের পাঁচালী" ও "অপুর সংসারের" মত "অপরাজিত" ছবিটিও জার্মান চিত্র-রসিক ও সমালোচকদের মনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা ও সম্মানের মূলে রয়েছে "অপরাজিত"-র মত ছবি।

সত্যজিৎ রায়ের অপূর্ব কাজ সম্বন্ধে স্থানীয় একটি সংবাদপত্র এইরকম লিখেছিল: ছবিটি শুধু ভারতীয়দের নয়, সর্বসাধারণের চোখ খুলে দিয়েছে। গভীর মানবিক আবেদনে ভরা ছবিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে চরম আত্মত্যাগের প্রস্তুতি। ছবিটি এই কথাটাই প্রমাণ করে যে, ভারতীয়রা ধীরে হলেও স্থিরভাবে হাজার বছরের ঐতিহ্য ঝেড়ে ফেলে রূঢ় বাস্তবের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি এই শিক্ষাই দেয় যে, সেই পথে এগিয়ে যেতে হলে আত্মত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। ছবিটির সমালোচনায় "ডি ভেলট" নামে কাগজটি লিখেছিল যে, ছবিটিকে শক্তিশালী করে

মৃণাল পরিচালিত "অবশেষে" (অভ্যুদয় ফিল্মস) ছবির একটি দৃশ্যে **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও কুনাল বসু**

[illegible]বিটিতে অদ্ভুত মানবিক আবেগ আছে তবে [illegible]ভাগকে নিয়ে কোনও বিলাপ নেই। [illegible]র কিছুই যেন সহজভাবে হয়ে যাচ্ছে। [illegible]বিটির সর্বত্র একটি মানবদরদীর স্পর্শ [illegible]স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"অপরাজিত" দেখার পর জার্মানীর জন[illegible]সাধারণ "অপুর সংসার" দেখার জন্যে অধীর [illegible]গ্রহে অপেক্ষা করছে। জার্মানীর চিত্র[illegible]শিল্প এখন অত্যন্ত নিম্নমুখী, তাই তারা [illegible] যখন ভাবপ্রকাশের একটা নতুন [illegible] খুঁজছে, তখন এইসব ভারতীয় চিত্র [illegible] সেই নতুন পথেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ফেলিনি ৮½

ইতালির বিখ্যাত চিত্রপরিচালক [illegible]দারিকো ফেলিনি সম্প্রতি যে ছবিটি [illegible]রির কাজে ব্যস্ত আছেন তিনি তার [illegible] নামকরণ করেছেন "ফেলিনি ৮½"। [illegible]" কেন? ফেলিনি বলেছেন, এটি আমার [illegible] ছবি নয়। অষ্টম এবং একের অর্ধেক। "বোকাচিও সেভেন্টি"র তিনটি অংশের [illegible] অংশ তাঁর। পুরো ছবিটি তিনি তৈরি [illegible]। তাই সব মিলিয়ে এই ছবি [illegible]

[illegible]

করাতে ফেলিনি অনিচ্ছুক। তিনি বলেন, চিত্রপরিচালকের একমাত্র সংবাদ সরবরাহ-মাধ্যম হল পর্দা, অর্থাৎ "স্ক্রীন"। তাই চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে চিত্রপরিচালকের নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু বলার বা জানাবার প্রয়োজন নেই।

* ছবির পর ছবি *

রক্তপলাশ

এম কে জি প্রোডাকশন্স-এর রহস্যচিত্র "রক্তপলাশ" আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, কমল মিত্র, জীবেন বসু ও শিশুশিল্পী বাসুদেব। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

মর্যাদিগন্ত

[illegible] মল্লিক প্রোডাকশন্স-এর "মর্যাদিগন্ত" অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করছে। [illegible] ছবিটির পরিচালক। [illegible] আদর্শের দুটি নারীর প্রণয়-জীবনের সমস্যা ও জটিলতা এই ছবির কাহিনীর মূল উপজীব্য।

বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী ছবির চারটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

বোম্বাই সমাচার

ভারতের নাগরিক হিসাবে **জাতীয় কর্তব্যসাধনে চিত্রজগতের শিল্পী ও কর্মীরা পিছিয়ে থাকবে না**—চীনের ভারত-আক্রমণ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন অভিনেতা দিলীপকুমার। "গঙ্গা-যমুনা"র ইউনিটকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বোম্বের ইয়ুথ সার্কল কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে দিলীপকুমার জাতির সংকটে শিল্পীদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

বোম্বাই-এর ইম্পিরিয়াল সিনেমায় হেমন্তকুমারের "**বিশ সাল বাদ**" রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ অতিক্রম করেছে। ছবির এই সাফল্য উপলক্ষে প্রযোজক হেমন্তকুমার গীতাঞ্জলি পিকচার্সের সকল কর্মীকে তিন মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া প্রেক্ষাগৃহের কর্মীদেরও এক মাসের বেতন [illegible]

[illegible] দিলীপকুমার ও ওয়াহিদা রেহমানকে নিয়ে "**দিল্ দিয়া দরদ্ লিয়া**" ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। দিলীপকুমার ছবির কাহিনীকার [illegible] ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন [illegible] প্রাণ, শ্যামা [illegible] প্রভৃতি।

জয় মুখার্জি ও [illegible] ভূমিকায় যে ছবিটিতে [illegible] করছেন তার নাম হল: "ফির চাহাতা হ্যায় কোঈ [illegible] **তসবির আপাকি**।" [illegible] ছবিটির পরিচালক। সংগীত-পরিচালক [illegible] কল্যাণজী ও আনন্দজী।

[illegible] ভট্টাচার্যের পরিচালনায় গীতিকার [illegible] প্রথম প্রয়াস **তিসরী কসম** ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। রাজ কাপুর, ওয়াহিদা রেহমান ও রেহমান ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শংকর-জয়কিষণ।

রূপ-তারা স্টুডিওতে [illegible] ও [illegible] পরিচালনায় "গজল" ছবির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। মীনাকুমারী ও সুনীল দত্ত ছবির প্রধান শিল্পী। মদনমোহন ছবির সংগীত-পরিচালক।

[illegible] ফিল্মস-এর "প্রোফেসর" ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে বলে জানা গেল। শাম্মি কাপুর ও কল্পনা ছবির নায়ক-নায়িকা। লেখ ট্যাণ্ডন ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

* খেলার মাঠে *

একলব্য

দেশের জরুরী অবস্থার জন্য পার্থের কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের যোগদান না করার সিদ্ধান্তকে গত সপ্তাহে সাধুবাদ জানিয়েছি। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দর সিং ১৯৬৬ সালে ভারতের মাটিতে কমনওয়েলথ গেমস-এর আয়োজন করার প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় এ সপ্তাহেও তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

যদিও ১৯৬৬ সালের এখনও ৪ বছর দেরি, তবু ভারত আজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন, যে অনিশ্চয়তার মধ্যে তাকে কাল কাটাতে হচ্ছে, সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে কমনওয়েলথ গেমস-এর মত একটা বড় জিনিসের ভার নেওয়া সত্যিই বিপজ্জনক। চীনের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত-সংগ্রাম কবে মিটবে তার স্থিরতা নেই। সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায়, অল্প দিনের মধ্যেই সংগ্রাম শেষ হবে, তা হলেও যুদ্ধের ক্ষত বড় বিষম ক্ষত। এ ক্ষত থেকে সেরে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সময়ের প্রয়োজন। কমনওয়েলথ গেমস-এর আয়োজনের ভার পেলে ভারতকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হত। তার জন্য অর্থ এবং সামর্থ্য দুইয়েরই প্রয়োজন। কমনওয়েলথ গেমস-এর জন্য প্রয়োজনীয় এক কোটি টাকার মধ্যে ভারত সরকার ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সরকারেরই এখন বিপুল অর্থের প্রয়োজন। বাকি ৭০ লক্ষ টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? তা ছাড়া নতুন করে স্টেডিয়াম গড়ার জন্য লোহা-সিমেন্টের প্রয়োজন আছে, লোক-লস্কর, শ্রমিক-মজুরের প্রয়োজন আছে, উৎসাহ, উদ্দীপনার প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংকটের সন্ধিক্ষণে এই সব কথা চিন্তা করে রাজা ভালিন্দর যে কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠানের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছেন এ জন্য আবার তাঁকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

• • •

প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ভারতের দিকে দিকে সাড়া জেগেছে। অর্থ ও সামর্থ্য নিয়ে সবাই এগিয়ে আসছেন। খেলোয়াড়রাও পিছিয়ে নেই। ক্রীড়াক্ষেত্রের কর্মকর্তারাও অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রী এম এ চিদম্বরম এবং অতীত দিনের কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীবিজয় মার্চেন্ট প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ দানের জন্য দরাজ হাতে এগিয়ে এসেছেন। আবার ছোট ছোট দানেরও অন্ত নেই। মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক এস মান্না দান করেছেন তাঁর ১৯৪৭ সালের শীল্ড জয়ের প্রীতি-পুরস্কার একটি স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়। ১৯১১ সালের পরে মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয়বার আই এফ এ শীল্ড লাভ করে ১৯৪৭ সালে। এস মান্না ছিলেন দলের অধিনায়ক। সেই বছর মান্নার জীবনে আরও স্মরণীয় এই কারণে যে, সেটা ছিল স্বাধীনতা লাভের বছর। শীল্ড জয়ের কৃতিত্বে অধিনায়ক মান্না ক্লাবের কাছ থেকে প্রীতি-উপহার হিসাবে ক্লাব-প্রতীক সমন্বিত যে আংটিটি পেয়েছিলেন সেটিই দান করেছেন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রীতি-উপহার ও প্রিয় সামগ্রী, কৃতিত্বের পুরস্কার দানের আরও নজির আছে। এসব দান থেকে দেশের সংকটে দাতার অভিভূত হবারই প্রমাণ মেলে। মহানুভবতারও পরিচয় রয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেদিন চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হলে বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার পর যেভাবে পুরস্কার-বিজয়ীদের পুরস্কার নিয়ে নিলাম করে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা জুলুমের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এক একজন করে বিজয়ী পুরস্কার গ্রহণ করেন আর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীপংকজ গুপ্ত কাকেও ধমক দিয়ে, কারও উপর আবদার করে, কারও মাথায় চাঁটি মেরে সেই পুরস্কার টেবিলে জমা করে রেখে দেন। পরে নিলাম করে তা থেকে সংগ্রহ করেন এক শো টাকা।

পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন দীপক ঘোষ এবং উষা আয়েঙ্গার জীবনে বহু পুরস্কার পেয়েছেন। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপেই দীপকের এটি ছিল চতুর্থ এবং উষার ছিল অষ্টম পুরস্কার। পুরুষদের ডাবলসে বিজয়ী দীপকের সঙ্গী জ্যোতির্ময় ব্যানার্জিও জীবনে কম পুরস্কার পাননি। সুতরাং এঁদের কাছে পুরস্কারের মূল্য কম। কিন্তু জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন তের-চৌদ্দ বছরের ছেলে অধীপ ব্যানার্জির এইটিই ছিল জীবনের প্রথম পুরস্কার। বাড়ীতে মা-বাবা-ভাই-বোনেরা হয়তো বসেও ছিলেন আজ পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরবে। কিন্তু বিজয়ী হয়েও তাকে শুধু-হাতে ঘরে ফিরতে হল।

আজ খবরের কাগজে প্রতিরক্ষার জন্য অধীপ ব্যানার্জির জীবনের এই প্রথম পুরস্কার দানের কথা ফলাও করে প্রকাশ করা যায়। এতে অধীপের বাহবাও পড়তে পারে। কিন্তু অধীপ তো এখনো "পাবলিসিটি স্টান্টের" বয়সে পৌঁছয়নি। পাবলিসিটি স্টান্টের চেয়ে ওর কাছে যে জীবনের প্রথম পুরস্কারের মূল্য বেশী।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিকস টেস্টে ১০০ মিটার দৌড়ের দৃশ্য। জার্মানির আলফ্রেড হেবাউক (বা দিকে) প্রথম ম্যানফ্রেড জার্মার (মধ্যে) দ্বিতীয় ও ভারতের কে এল পাওয়েল তৃতীয় স্থান দখল করছেন

ক্রীড়া পরিচালকদের কাছে অনুরোধ, খেলাধুলোর ভেতর দিয়ে প্রতিরক্ষার জন্য তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করুন, কিন্তু তার মধ্যে যেন জুলুমের চিহ্ন না থাকে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সব পর্যায়ের মানুষ দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছে। "আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান" তার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। এর মধ্যে জুলুমের স্থান কোথায়?

* * *

দিল্লি, যোধপুর ও জলন্ধরে ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার পর কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামেও ভারত-জার্মান চতুর্থ অ্যাথলেটিক টেস্ট শেষ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, সব জায়গাতেই জার্মানীর অ্যাথলীটরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ অ্যাথলীট মিলখা সিং এবং গুরবচন সিং কলকাতায় আসতে না পারায় এখানে জার্মানদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য আরও বেশী করে চোখে পড়েছে। ১৭টি বিষয়ের মধ্যে জার্মানীর অ্যাথলীটরা ১৪টি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ভারতের অ্যাথলীটরা প্রথম স্থান দখল করেছে মাত্র তিনটি বিষয়ে। এর মধ্যে আবার দুটি বিষয়ে অর্থাৎ হাই জাম্প ও হপ স্টেপ জাম্পে জার্মানী প্রতিযোগিতা করেনি। কলকাতার চতুর্থ টেস্টে ভারতের প্রাধান্য বলতে মাত্র একটি বিষয়ে। সে বিষয়টি হচ্ছে দীর্ঘ লাফ।

কিন্তু দিল্লিতে ১৮টি বিষয়ের মধ্যে জার্মানী ১০টি ও ভারত ৮টি বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করেছিল। যোধপুরে ১৭টি বিষয়ের মধ্যে ১২টি বিষয়ে ছিল জার্মানীর প্রথম স্থান। জলন্ধরে ১৮টি বিষয়ের মধ্যেও ভারত ছয়টি বিষয়ে প্রথম হয়েছিল। সুতরাং মিলখা সিং ও গুরবচন সিং-এর অনুপস্থিতিই যে কলকাতায় জার্মানীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও জলন্ধরে ৪০০ মিটার দৌড়ে মিলখা সিং জার্মানীর জোয়াকিম রেসকের কাছে পরাজিত হয়েছেন। তবু দিল্লিতে মিলখাই বিজয়ী হয়েছিলেন। কলকাতাতেও তাঁর জয়ের আশা ছিল।

দৌড়ের বিজয়ী জার্মানীর কার্ল আয়ার কাউফার

মিলখা দলে থাকলে রিলে দৌড়েও হয়তো ভারত বিজয়ী হতে পারত। আর গুরুবচন সিং-এর ১১০ মিটার হার্ডল রেসে প্রথম স্থান তো বাঁধাই ছিল। দিল্লি, যোধপুর বা জলন্ধরে কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি।

যাই হোক, প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান নিয়ে কথা নয়, আসল পার্থক্য দুই দেশের অ্যাথলীটদের দৌড়ঝাঁপের পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। জার্মানীর অ্যাথলীটদের দৌড়ের সুন্দর সাবলীল ভাব। যেন উড়ন্ত পাখী এগিয়ে চলেছে। ডানার ঝটপটানি কম। আর ভারতীয় অ্যাথলীটদের এগিয়ে যাবার মধ্যে একটা আড়ষ্টতার ছাপ। ফলাফল এবং মানের পার্থক্য দেখে অনেকেই স্পোর্টস শেষে মন্তব্য করেছে 'আমরা অনেক পেছনে, আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস মানে পৌঁছুতে আমাদের এখনো বহু অনুশীলন বহু সাধনার প্রয়োজন।'

কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছুতে ভারতীয় অ্যাথলীটদের এখনো বহু সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের অগ্রগতি সম্পর্কে জার্মানীর বিশেষজ্ঞ "কোচ" ডাঃ অটো পেলৎজার যে কথা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডাঃ পেলৎজার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, ৩৫ বছরের সাধনায় অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে ভারত যেটুকু এগিয়ে গেছে ইউরোপের অ্যাথলীটরা প্রথম ৩৫ বছরের মধ্যে সেটুকু এগোতে পারেনি।

আধুনিক অ্যাথলেটিকস নিয়ে ইউরোপে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে প্রায় ৭০ বছর আগে। কিন্তু ১৯২৭ সালের আগে ভারতে পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যাথলেটিক-সের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় অ্যাথলীটদের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের পরিকল্পনাও সাম্প্রতিক ঘটনা।

৩৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে ইউরোপের অ্যাথলীটরা যখন যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁদের অ্যাথলেটিকস আন্দোলনের বয়স ৩৬ বছর। ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমস্টার্ডামে তাঁরা যে ফলাফল করেছিলেন, আজ ৩৫ বছরের সাধনায় ভারতীয় অ্যাথলীটদের ফলাফল তার চেয়ে অনেক উন্নত। একমাত্র বর্শা ছোঁড়ার রেকর্ড ছাড়া আজকের সমস্ত বিষয়ের ভারতীয় রেকর্ডের কাছে ১৯২৮ সালের ইউরোপীয় রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৩৫ বছরে ইউরোপ যেটুকু অগ্রগতির পরিচয় দিতে পারেনি, আমরা তার চেয়েও বেশী অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছি।

তথ্য দিয়ে এই বিষয় ভালভাবেই প্রমাণ করা যেতে পারে। তাই ১৯২৮ সালের অলিম্পিক ইউরোপীয় অ্যাথলেটিকস মানের সংগে ভারতের বর্তমান রেকর্ডের এক তুলনামূলক হিসাব নিচে প্রকাশ করছি।

১০০ **মিটার দৌড়**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ১০·৮ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—১০·৬ সেকেন্ড (এল পিন্টো ও মিলখা সিং)

২০০ **মিটার দৌড়**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ২১· সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—২০·৮ সেকেন্ড (মিলখা সিং)

৪০০ **মিটার দৌড়**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৪৭·৮ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—৪৬·১ সেকেন্ড (মিলখা সিং)

৮০০ **মিটার দৌড়**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ১ মিঃ ৫১·৮ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—১ মিঃ ৫০·৬ সেকেন্ড (দলজিৎ সিং)

১৫০০ মিটার দৌড়—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৩ মিঃ ৫৩·২ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—৩ মিঃ ৫১·১ সেকেন্ড (অমৃত পাল)

৫০০০ **মিটার দৌড়**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ১৪ মিঃ ৩৮ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—১৪ মিঃ ৩২·৬ সেকেন্ড (তারলোক সিং)

৩০০০ **মিটার স্টিপল রেস**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৯ মিঃ ২১·৮ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—৮ মিঃ ৫৪ সেকেন্ড (পান সিং)

১১০ **মিটার হার্ডলস**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ১৪·৮ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—১৪·৫ সেকেন্ড (শ্রীচাঁদ ও জগমোহন সিং)

৪০০ **মিটার হার্ডলস**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৫৩·৯ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—৫২·৫ সেকেন্ড (জগদেব সিং)

৪×১০০ **মিটার রিলে**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৪১·৫ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—৪০·৯ সেকেন্ড (পাওয়েল, নাগভূষণ, সত্যনারায়ণ ও ফেরাও)

৪×৪০০ **মিটার রিলে**—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড; ভারতীয় রেকর্ড—৩ মিনিট ১০·৯ সেকেন্ড (জগদীশ, দলজিৎ, মাখন ও মিলখা)

লৌহবল নিক্ষেপ — ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৪৯ ফুট; ভারতীয় রেকর্ড—৫১ ফুট [illegible] ইঞ্চি (দীনসা ইরানী)

হাতুড়ী ছোড়া—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮)—১৬৮ ফুট ৭ ইঞ্চি; ভারতীয় রেকর্ড—১৭২ ফুট ৯ ইঞ্চি (বলবীর সিং

ডিসকাস নিক্ষেপ — ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ১৫৫ ফুট; ভারতীয় রেকর্ড—১৫৯ ফুট ৯ ইঞ্চি (বলাকার সিং)

দীর্ঘ লাফ—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি; ভারতীয় রেকর্ড—২৪ ফুট ৯½ ইঞ্চি (রাম মেহের সিং)

উচ্চ লাফ—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৬ ফুট ৩½ ইঞ্চি; ভারতীয় রেকর্ড—৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (অজিত সিং ও গুরবচন সিং)

হপ স্টেপ ও জাম্প—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ৪৯ ফুট ৭ ইঞ্চি; ভারতীয় রেকর্ড—৫১ ফুট (মহীন্দার সিং)

পোল ভল্ট—ইউরোপীয়-মান (১৯২৮) ১২ ফুট ৫ ইঞ্চি; ভারতীয় রেকর্ড—১৩ ফুট ২½ ইঞ্চি (গুরদীপ সিং)

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতীয় রেকর্ডের অনেকগুলিই দু-তিন বছরের পুরনো। আর ১০০ মিটার দৌড়ে বোম্বাইয়ের লেভি পিন্টো রেকর্ড করেছেন ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ ৯ বছর আগে।

* * *

এখন দুই দেশে অ্যাথলেটিকসের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। জার্মানীতে অ্যাথলেটিকস খুবই জনপ্রিয়। পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসীর মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ অ্যাথলীট। আর আমাদের প্রায় ৪৪ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ৪০ শতও অ্যাথলীট নেই। ফুটবল, ক্রিকেট বা অন্যান্য খেলাধুলার মত এখানে অ্যাথলেটিকসের কদরও কম। এই যে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ভারত-জার্মান অ্যাথলেটিক টেস্ট হয়ে গেল, কত দর্শক-সমাগম হয়েছিল? বড় জোর পাঁচ-ছয় হাজার। আর জার্মানীর সংগে ভারতের এক ঘণ্টা ফুটবল খেলা হলে কত লোক হত? টিকিট পাওয়াই কষ্টকর হত নাকি? কলকাতার তুলনায় দিল্লি-পাঞ্জাবে অবশ্য অ্যাথলেটিকসের আকর্ষণ কিছু বেশী। জলন্ধরে ভারত-জার্মান তৃতীয় টেস্টে প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শকসমাগম হয়েছিল। পাঞ্জাবে যেমন অ্যাথলেটিকসের কদর, তেমন পাঞ্জাবী সম্প্রদায়ের অ্যাথলীটদের নিয়েই ভারতের যা কিছু গর্ব। যাক সে কথা। যা বলছিলাম।

জার্মানীর স্কুল কলেজে খেলাধুলা একরকম বাধ্যতামূলক। জিমন্যাস্টিকস এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে তাদের খেলাধুলা ও অ্যাথলেটিকসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। গ্রীষ্মের পর অ্যাথলেটিকসের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের বাছাই করা হয় যাদের মধ্যে আছে অ্যাথলেটিকসে উন্নতি করার প্রচুর সম্ভাবনা। তারপর আরম্ভ হয় কোচিং। শুধু অ্যাথলেটিকসের মধ্যেই যাদের খেলাধুলা সীমাবদ্ধ, জার্মানীতে এমন ক্লাবের সংখ্যা কম নয়। বহু ফুটবল ক্লাবের অ্যাথলেটিক বিভাগ রয়েছে। আবার অ্যাথলেটিকসে খ্যাত এমন ক্লাবের রয়েছে ফুটবল বিভাগ, যেমন আইনট্রাক্ট ফ্রাঙ্কফুর্ট, এইচ এস ডি হামবুর্গ, ও এফ সি নুর্নবার্গ। জার্মানীতে পুলিস, রেল বা সামরিক বিভাগের অ্যাথলীটদের পৃথক স্বীকৃতি নেই। বরং এইসব বিভাগ থেকে অ্যাথলীট সংগ্রহ করে ক্লাবে তাদের কোচিং দেওয়া হয়। মোটের উপর অ্যাথলেটিকসের উন্নতির জন্য জার্মানীর প্রচেষ্টার অভাব নেই।

সেই জার্মানীর সংগে পাল্লা দিয়ে ওঠা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়—এ কথা আগেই ধরে নেওয়া গিয়েছিল। বিশেষ করে, কার্ল কাউফম্যান এবং এম কিণ্ডার ভারত সফরে না এলেও জার্মানী থেকে যাঁরা ভারত সফর করতে এসেছেন তাঁরা ইউরোপের অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিচিত। এমন একটি শক্তিশালী ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ অ্যাথলেটিক টীম আগে কোনবার ভারত সফর করেনি।

এর আগে অবশ্য বিশ্বখ্যাত কয়েকজন অ্যাথলীট কয়েকবার শুভেচ্ছা সফর হিসাবে ভারত ঘুরে গেছেন। ক'বছর আগে কলকাতার ইডেন উদ্যানে রাত্রিকালীন আলোকমালার মধ্যে কয়েকজন আমেরিকান অ্যাথলীটের সংগে ভারতীয় অ্যাথলীটদের দৌড়ের পাল্লা হয়েছে। অতীতে দিল্লীতে এবং পাঞ্জাবে পাক অ্যাথলীটদের সংগে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে দুই দেশের মধ্যে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার ব্যাপক ব্যবস্থা এই সর্বপ্রথম। আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, জার্মান অ্যাথলীটদের এই ভারত সফরের ফলে ভারতে অ্যাথলেটিকসের জনপ্রিয়তা অনেকখানি বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

✻ সাপ্তাহিক সংবাদ ✻

দেশী সংবাদ

২৯শে অক্টোবর—লাদক অঞ্চলে চীনারা নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া প্রবল চাপ দিতে থাকায় ভারতীয় সৈন্যরা দামচক ও জারা-লা ত্যাগ করিয়াছে। নেফায় উভয় পক্ষের মধ্যে দুই এক স্থানে গুলী বিনিময় ব্যতীত অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।

চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতকে সর্ব-প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত বলিয়া মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শ্রীকেনেডী ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলানও আশ্বাস দিয়াছেন।

৩০শে অক্টোবর—বেশ কয়েকজন কংগ্রেসী সংসদ সদস্য নাকি শ্রীনেহরুকে গত কয়দিন ধরিয়াই বলিতেছেন—চীনের আক্রমণের ফলে দেশে যে আপৎকালীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রধানমন্ত্রীরই প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভার গ্রহণ করা উচিত।

দশদিন পূর্বে ভারতীয় সৈন্যেরা পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করার পর আজ সর্বপ্রথম তাহারা রণাঙ্গনে আগাইয়া গিয়াছে। সিয়াং বিভাগে ভারতের একটি অগ্রবর্তী ঘাটির উপর চীনরা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালায়। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর ভারতীয় জওয়ানরা সেই ঘাটিটি ছাড়িয়া মূল ঘাটিতে সরিয়া আসে।

৩১শে অক্টোবর—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামীকাল হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রতিরক্ষা দপ্তর স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণমেনন প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী হইবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরূপে শ্রীকৃষ্ণমেননের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক সমালোচনা হইতেছে, প্রধানমন্ত্রী তাহার নিকট এইভাবে নতি স্বীকার করিলেন।

ভারত আক্রমণকারী দেশের সহিত ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেশী সহযোগিতায় লিপ্ত থাকিলে ঐ সব বিদেশীকে গ্রেপ্তার, আটক ও অন্তরীণ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারী করা এক অর্ডিন্যান্স অনুসারে সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন।

১লা নবেম্বর—অদ্য অর্ডিন্যান্স জারির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যরাত্রে ধাপা ও টেংরা অঞ্চলে হাজার হাজার চীনা অধিবাসীদের নিজ নিজ গৃহে অন্তরীণ রাখা হয় এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাসগৃহে তল্লাসী চালানো হয়।

নেফা রণাঙ্গনে ভারতীয় জওয়ানরা জং এলাকায় আগাইয়া নিয়া শত্রু সন্ধানের কাজ চালাইয়া যাইতেছে। গতকাল চীনারা জং এলাকায় ভারতীয় টহলদারদের লক্ষ্য করিয়া মর্টার হইতে গোলাবর্ষণ করে। নেফা ও লাদক রণাঙ্গন হইতে যুদ্ধের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

২রা নবেম্বর—ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক জে কে গলব্রেথ আজ নয়াদিল্লীতে ঘোষণা করেন, চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র শনিবার হইতে কলিকাতায় পৌঁছিতে শুরু করিবে।

প্রকাশ, কম্যুনিস্ট পার্টির চীনা-অনুরাগী দল বিজয়ী ডাঙ্গে দলের সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৩রা নবেম্বর—পাঞ্জাবের সাংরুর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পাঞ্জাবের দুই-জন কম্যুনিস্ট এম এল এ-কে জাতীয়তা-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য নিবারক নিরোধ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য মহল হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, চীন পক্ষকালের মধ্যেই ভূটান আক্রমণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে চুম্বি উপত্যকায় চীনা সৈন্যের সমাবেশ করানো হইয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর—গতকাল চুশূলে এলাকায় চীনারা ক্ষুদ্র অস্ত্রের সাহায্যেই একটি ভারতীয় পরিবহণ বিমানের দিকে গুলী নিক্ষেপ করে। বিমানটি অবশ্য অক্ষত অবস্থায় ঘাটিতে ফিরিয়া আসে।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬২ সালের ১২ই নবেম্বর হইতে '৬½% সুদে স্বর্ণবণ্ড—১৯৭৭' বাজারে ছাড়িবেন বলিয়া আজ ঘোষণা করিয়াছেন। স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা বণ্ড কিনিতে হইবে। স্বর্ণের মূল্য প্রতি দশ গ্রামে ৫৩ টাকা ৫৮ নঃ পঃ অর্থাৎ তোলাপ্রতি ৬২ টাকা ৫০ নঃ পঃ ধরা হইবে। এই বণ্ডগুলি সম্পদ করের আওতায় পড়িবে না।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে অক্টোবর—মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর আজ ঘোষণা করেন যে, কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ যতদিন না উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে, ততদিন মার্কিন নৌ-অবরোধকারী জাহাজগুলি ক্যারেবিয়ানের নির্দিষ্ট স্থানেই মোতায়েন থাকিবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পাকিস্তানের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ভারতের চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

৩০শে অক্টোবর—রাশিয়া আজ ভারত ও কম্যুনিস্ট চীনের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের অনুরোধ জানায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে, "সাধারণ বুদ্ধির দিক হইতেই এ ব্যাপারে কোন পূর্ব শর্ত আরোপ করা উচিত হইবে না।"

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আজ কমন্সসভায় ভারতের উপর চীনের বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন, এই আক্রমণ প্রতিরোধে ভারত বৃটেনকে যাহা করিতে বলিবে, বৃটেন তাহাই করিবে।

৩১শে অক্টোবর—পাকিস্তান সরকার নাকি ব্রিটেনকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারতের উপর চীনা আক্রমণকে তাঁহারা (পাক সরকার) সমগ্র উপমহাদেশের বিপদ বলিয়া মনে করেন এবং বিপদ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহারা কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপারে কোন রকম পীড়াপীড়ি করিবেন না।

মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর আজ বলেন যে, এই সপ্তাহেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে বিমানযোগে ক্ষুদ্র ধরনের অস্ত্রাদি, গোলাগুলী এবং অন্যান্য অস্ত্র পাঠানো আরম্ভ হইবে।

১লা নবেম্বর—আজ ওয়াশিংটনে কূটনীতিক মহল বলেন যে, কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ফাইডেল কাস্ত্রো রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের নিকট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, কিউবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি অপসারণ সম্পর্কে রাশিয়া তাহার সহিত পূর্বাহ্নে কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই সংকটকালে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও হাভানার খবরে জানা গেল, উ থাণ্টের কিউবা শান্তি মিশন কার্যত ব্যর্থ হইয়াছে। মার্কিন সরকার ১লা নবেম্বর হইতে সমুদ্র পথে পুনরায় কিউবা অবরোধের ও আকাশ পথে সজাগ প্রহরার নির্দেশ দিয়াছেন।

২রা নবেম্বর—মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান আজ কুয়ালালামপুরে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি ভারতবর্ষ এবং কম্যুনিস্ট চীনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ বাধিয়া যায়, তাহা হইলে মালয় ভারতবর্ষকে অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাগুলী দিয়া সাহায্য করিবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন গতকাল সাফল্যের সহিত একটি মহাকাশযানকে মঙ্গলগ্রহের অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছে। এই যানটিতে [illegible] ১' নামে একটি স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন রহিয়াছে।

৩রা নবেম্বর—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শ্রীকেনেডী আজ জাতির উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, গত রাত্রে কিউবায় সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটিসমূহ ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের অনশনরত জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ সকাল পর্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় আছেন। পাকিস্তান সরকার মৌলানা ভাসানীর উপর হইতে কতক-গুলি বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া গতকাল এক বিবৃতি দিয়াছেন।

চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন-লাই আজ ঘোষণা করেন যে, ভারত যদি চীনাদের অধিকৃত বিরোধীয় সীমান্ত এলাকা পুনর্দখলের চেষ্টা করে, তবে একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, চীন সামরিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। ✻

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সৌন্দর্য্যের প্রতিমা যেন...

হালকা প্যাস্টেল রঙ থেকে শুরু করে
উজ্জ্বল রঙের রকমারী শেডে,
এমব্রয়ডারীর বৈশিষ্ট্যে, আর
নক্সার বৈচিত্র্যে সেরা
কেম্‌ব্রিক, ভয়েল ও পপলিন।

হাকোবা

চীকন্‌ ও
এম্‌ব্রয়ডারী করা।

সব প্রধান দোকানে পাওয়া যায়

পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র :

বিমলকুমার দিলীপকুমার, ৬৯ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট কলিকাতা-৭
রাধাকৃষ্ণ কাপুর, ২৩ যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট কলিকাতা-৭
রামস্বরূপ এণ্ড কোং, ১৭ নূরমল লোহিয়া লেন, কলিকাতা।

সূচীপত্র

(সি ৩৮৮৭)

জলে বিহারে মডেলা উল

মুক্তবায়ুতে বহির্বিশ্ব স্বাভাবিকভাবেই পশমীবস্ত্রের উপযোগী··· মডেলা উলে বোনা আঁটসাঁট জামা··· ওয়ার্স্টেড বা ফ্লানেলের অমসৃন সুন্দর পাতলুন।

মহান উল প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানগুলিতেও সুন্দরভাবে মানায়। সেখানেও আপনি সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে একমাত্র মডেলা উলে তৈরী পোষাকেই আপনার সাজসজ্জা একেবারে নিখুঁত হয়ঃ

modella

মডেলা — উৎকৃষ্ট উলের প্রতীক

[illegible]

MDL. 771 EVEREST

সূচীপত্র

সূচীপত্র

দেশ

DESH 40 Naye Paise
SATURDAY, 17TH NOVEMBER, 1962.

৩০ বর্ষ ॥ ৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

চীনের ড্রাগন

সম্প্রতি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহর্ যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন নানা দিক থেকেই তা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সবল কণ্ঠে অনাবৃত সত্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে আমরা মরণ পণ করেছি, চীনের বর্বর আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করব তার ফলাফল যাই হোক। চীনের কমিউনিজম এক নয়া সাম্রাজ্যবাদ, সে নিজেকে সাম্রাজ্যবাদের বড় রকম বিরোধী বলে জাহির করে বেড়ায় অথচ সে পরদেশ আক্রমণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘৃণ্য পথ অনুসরণ করছে। তার রাষ্ট্রের চেহারা সম্পূর্ণ সামরিক, তার কোনো দায়িত্ব নেই। আমরা চীনকে প্রতিহত করব।

ভারত আক্রান্ত হবার পর ভারতীয় জনসাধারণের চোখে চীন-ড্রাগনের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে প্রতিবেশী এই বিরাট রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে সহানুভূতি ও বন্ধুজনোচিত মনোভাব ছিল একাধিক কার্য কারণে তার মূল শিথিল হয়ে আসছিল। তথাপি আমরা 'ভাই চীনী'কে চিনি নি। ভারতীয় বিশ্বাস বুঝি বা এই রকমই। সৌভাগ্যের কথা তাকে চেনা গেছে, এবং নগ্নভাবেই।

শত্রুকে মর্মে মর্মে চেনার পর প্রতিটি ভারতবাসী মর্মে মর্মে যা অনুভব করেছে, করছে; তারা অবিচল হয়ে যে-সংকল্প গ্রহণ করেছে, নেহরুজীর সেদিনের ভাষণ সেই জাতীয়-অনুভবেরই একক প্রকাশ। তাঁর কণ্ঠস্বরের অন্তরালে সমস্ত ভারত নিজ স্বর যোগ করেছিল।

বিবেকবান প্রতিটি মানুষই আজ একটি বিষয়ে সচেতন। এশিয়ার মাটিতে চীন এক প্রাত্যহিক সমস্যা। সে রাক্ষস কুলোদ্ভব দশাননের মতন, ঐশ্বর্যে নয়, লালসায়। লাল তারকা চিহ্নিত এই উপগ্রহটিকে আমরা দূরান্ত থেকে দেখেছিলাম বলে তার চরিত্র সম্ভবত বুঝি নি। আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, সর্বহারার স্বর্গরাজ্য থেকে যে অতিকায় দানবটি বেরিয়ে এসেছে তার চাতুর্যের অন্ত নেই। সে শঠ এবং ধূর্ত। স্বর্ণমৃগের ছলনা দিয়ে সে ভোলাতে চেয়েছে সাধারণ মানুষকে, বস্তুত তার উদ্দেশ্য অপহরণ।

হিমালয়ের ওপার থেকে তারা এই-ভাবেই নেমে আসছিল নিম্ন এশিয়ায়। গায়ে কমিউনিজমের নামাবলি, মুখে শান্তি ও সৌহার্দ্যের বুলি, কমণ্ডলুতে মুক্তি-বারি। এই ছদ্মবেশী নরখাদককে চেনা যায়নি তার ধূর্ততার জন্যে, এখন চেনা গেছে।

কিন্তু, এখনও এমন কতিপয় জীব আছে, যারা চতুষ্পদের তুল্য। গৃহপালিত এইসব চতুষ্পদ প্রভুর অন্ন খেয়েছে বলে প্রভু যেদিকে ছোটাচ্ছেন সেদিকে ছুটছে। জ্ঞান বুদ্ধি অথবা বিবেক পশুর কাছে আশা করা বৃথা, শারমেয়-চরিত্রের মজা এই, সে প্রভু বিনা অন্য কিছু চেনে না।

আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক দলটি 'চীনা'-প্রেমে বিগলিত ছিল (এখনও আছে, হয়ত চুপিসারে) তারা বারংবার ভারতীয় জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, চীন শান্তির দূত, সে কখনও ভারতকে আক্রমণ করতে পারে না। এই দল আরও বোঝাবার চেষ্টা করেছে, হিমালয় সীমান্তে পর্বত চূড়ায় কি ঘটছে না ঘটছে তার বিবরণ ভারত সরকারের মুখ থেকে শোনা তারা প্রয়োজন মনে করে না; এরা এতকাল বীরদর্পে সভাসমিতিতে ঘোষণা করেছে, ভারতের 'সব কুছ ঝুটা', যদি সত্য দেখতে চাও তবে রাশিয়ার দিকে তাকাও, চীনের দিকে তাকাও।

আমরা, বলা বাহুল্য, নিতান্ত ভদ্রজন বলে এই উৎকোচ-গ্রহণকারী প্রচারবিদদের এ-যাবৎ কিছু বলি নি। বলা অবশ্য উচিত ছিল। না বলার পরিণাম হয়েছে, এরা জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যার মোহ সঞ্চার করার সুযোগ পেয়েছে। এবং সেই সুযোগ স্পর্ধার মতন হয়ে উঠেছে। নয়ত, এমন সময়েও এই দুঃসাহস হয়, এরা নেহরুজীর কুশ-পুত্তলিকা দাহ করে।

পিকিং-প্রেরিত নির্দেশনামায় কি গোপন নির্দেশ এদের প্রতি দেওয়া আছে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে এ সংবাদ আমরা রাখি, ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা সে-দেশে অনেকদিন থেকেই চলেছে, সেখানে ভারতকে পররাজ্যলোভী বলে প্রচার করা হয়, প্রচার করা হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু আমেরিকান দাস হয়ে পড়েছে, কারণ ভারত আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছে দেশ উন্নয়নের ব্যাপারে। সম্প্রতি লাল-চীনে এই প্রচারও ব্যাপক যে, ভারত ইন্দো-মার্কিন সামরিক গ্রাসে পতিত হয়েছে।

আপাতত, আমরা একটি বিষয় স্পষ্ট করে বুঝেছি। বুঝেছি, চীনের অন্দর-মহলে বুভুক্ষা তীব্র, তার 'কমিউন' হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তার সংস্কৃতি গোলাবাবুদের মধ্যে মৃত, মিলিটারি-জমের নৃশংসতায় তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হচ্ছে। আর এই বিপুল জনসংখ্যার ভার লাঘব করতে, খাদ্যের বস্ত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পেরে, নিজের দেশের বিবেকবানদের কণ্ঠরোধ করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা নাজী জার্মানির মতন পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয়েছে।

আমাদের সরল বক্তব্য, এমন বিপজ্জনক দেশের সঙ্গে যাদের যোগা-যোগ তারা আমাদের শত্রু। যে রাজ-নৈতিক দল দীর্ঘকাল এই যোগাযোগ বজায় রেখেছে, আমরা তাকে সন্দেহ করি। এই দল কপট, তার কুম্ভীরাশ্রুতে বিগলিত হলে আমাদের সর্বনাশ হবে। একটা কথা আছে, যে-লোক পরস্ত্রীতে আসক্ত তাকে তার নিজের স্ত্রীর বিপদে কখনো ডেক না; বিষ দেবে।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস আমাদের নেই। বিভিন্ন সময়ে তাদের দ্বারা আমরা প্রবঞ্চিত হয়েছি। একদা এরা জাতীয় শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল —তখন নানা কারণে এরা জাতির মার্জনা পেয়েছে; আজ আবার এই দেশীয় শত্রু ও প্রতারকদের আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। এবার কোনোক্রমেই বিশ্বাস-ঘাতক চীনা-গুপ্তচরদের আমরা মার্জনা করতে পারি না।

পুরাতন ভৃত্য

প্রভুকে বাঁচাবার জন্য ভৃত্যের আত্মত্যাগ।

KUTTY

ভারতের পৃষ্ঠদেশে ছোরা মারতে উদ্যত আয়ুব খাঁকে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিরস্ত করছেন।

পার্টি লাইন

চীন-ভারত যুদ্ধে বিস্ময়কর রুশনীতি

'কোন খেলা যে খেলব কখন
ভাবি বসে সেই কথাটাই।'

* বৈদেশিকী *

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পণ্ডিত নেহরু নিজের স্কন্ধে নিয়েছেন। "ডিফেন্স প্রোডাকশন"-এর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রীপদ সৃষ্টি করে সেই পদ শ্রীকৃষ্ণ মেননকে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ মেনন এখনও ক্যাবিনেট মিনিস্টার থেকে গেলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে পণ্ডিত নেহরু কতটা স্বেচ্ছায় এবং কতটা চাপে পড়ে সরালেন সেটা আপাতত নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ মেননকে এতদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে রাখা ভুল হয়েছিল এবং বর্তমান অবস্থায় তাঁর হাতে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাখা মারাত্মক হত, একথা উপলব্ধি করেই পণ্ডিতজী শ্রীমেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরালেন অথবা কেবল চাপে পড়ে তাঁকে সরাতে বাধ্য হলেন এ প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর এ সময়ে হয়ত দাবি করা উচিত হবে না কিন্তু বিষয়টা একেবারে চাপা দেবার মতোও নয়।

চাপ তো ছিলই—জনমতের চাপ, কংগ্রেস পার্টির ভিতর থেকে চাপ, হয়ত সৈন্যবাহিনীর ভিতর থেকেও চাপ এসেছিল। পণ্ডিতজী এটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন দেশের লোকের উৎসাহ, উদ্যম, সাহস, বিশ্বাস এবং ত্যাগের আগ্রহ বজায় রাখতে হলে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাখা আর চলবে না। শ্রীকৃষ্ণ মেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে রাখলে দেশের লোকের বিশ্বাস হারাতে হবে এবং তার মানে হবে সর্বনাশ—একথা শ্রীনেহরু নিশ্চয়ই বুঝেছেন।

কিন্তু একথা বুঝলেও শ্রীমেননকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত করতে পণ্ডিত নেহরুকে নিজের মনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট দ্বন্দ্বের যাতনা বোধ করতে হয়েছে। কারণ শ্রীমেননের প্রতি দেশের লোকের আস্থার অভাব স্বীকার করে নেওয়ার সময়ে পণ্ডিতজীর পক্ষে নিজেকে তার স্পর্শমুক্ত বলে মনে করা সম্ভব নয়। অতীতে যখনই শ্রীমেননের কোনো ত্রুটির সমালোচনা করা হয়েছে তখনই পণ্ডিতজী মেননের সমর্থন করেছেন এবং শ্রীমেননকে বাঁচানোর জন্য শেষ পর্যন্ত সবসময়েই শ্রীমেননের কৃতকার্যের জন্য নিজেকে দায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। সমালোচকগণ তা সত্ত্বেও যখন শ্রীনেহরুকে "বেনিফিট অব দ্য ডাউট" দিতে চেয়েছে পণ্ডিতজী উত্তরে তাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ যখন বলেছে যে পণ্ডিতজী যে নীতি স্থির করেছেন সেটা ঠিক, সেটা সমর্থনযোগ্য কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মেনন তাকে মোচড় দিয়ে বিকৃত করে দিচ্ছেন তখন পণ্ডিতজী রাগ করে বলেছেন যে, তিনি খোকা নন যে শ্রীকৃষ্ণ মেনন তাঁর নীতিকে মোচড় দিয়ে অন্য রকম করে দিচ্ছেন আর তিনি তা বুঝতে পাচ্ছেন না, শ্রীমেনন যা বলেন এবং করেন তদ্দ্বারা তাঁরই (শ্রীনেহরুরই) নীতি অনুসৃত হচ্ছে, ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ মেননের পদাবনতির সিদ্ধান্ত করার সময়ে পণ্ডিতজী এসব কথা স্মরণ না করে পারেন নি। তাহলে কি পণ্ডিতজীর বলা উচিত ছিল যে, শ্রীমেননের যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তার জন্য তিনিও (শ্রীনেহরুও) সমান দায়ী, অতএব তাঁকেও ইত্যাদি? না, দেশের লোক এবিষয়ে—অন্য বহু বিষয়ে তো বটেই—শ্রীনেহরু এবং শ্রীমেননকে (প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুনঃ পুনঃ শ্রীমেননকে নেহরু-নীতির নির্ভুল প্রযোজক বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও) একদৃষ্টিতে দেখে না। শ্রীনেহরু যে বহু ভুল করেছেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। পণ্ডিতজী নিজেই বলেছেন যে, নিজের সৃষ্ট একটা অবাস্তবতার মধ্যে এতদিন তিনি ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজীকে দেশ বিশ্বাস করে। তিনি ভুল করেছেন, ভুল করলে তার ফলভোগ করতেই হবে, সুতরাং তাঁর ভুলের জন্য দেশের ক্ষতি হয়েছে একথাও না বলে উপায় নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের লোক তাঁকে বিশ্বাস করে। তিনি ভুল করতে পারেন কিন্তু দেশের লোক বিশ্বাস করে যে দেশের যাতে অমঙ্গল হয় এমন পথে তিনি জ্ঞানত চলবেন না। এই জন্যই অতীতের বহু সাংঘাতিক ভুলের জাজ্বল্যমান প্রমাণ আজ সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সংকটের দিনে দেশের লোক পণ্ডিতজীকে দেশের কর্ণধাররূপে চায়।

শ্রীমেনন সম্বন্ধে অন্যকথা। শ্রীমেনন সম্পর্কে কথা হচ্ছে যে, দেশের লোক তাঁকে বিশ্বাস করে না। শ্রীমেনন সম্পর্কে যে অভিযোগ তা এ নয় যে তিনি ভুল করেছেন। তাঁর সম্পর্কে দেশের লোকের আশংকা এই যে, তিনি নিজের কোনো গূঢ় লক্ষ্য অনুযায়ী চলেছেন, সেদিক দিয়ে তিনি মোটেই ভুল করেন নি। বিপদ এই যে তাঁর লক্ষ্যটাই আপত্তিজনক, ভারতের মঙ্গলের পরিপন্থী। এসব বিষয় ষোল আনা প্রমাণ পেয়ে মানুষ সিদ্ধান্ত করে না, প্রবল আশংকার কারণ দৃষ্টিগোচর হলেই মানুষকে কর্তব্য স্থির করতে হয়। দেশের নিরাপত্তা যখন বিপন্ন তখন একটু "অতিরিক্ত" সাবধান হওয়া কিছু দোষের নয়।

শ্রীমেনন যদি একেবারে মন্ত্রীমণ্ডলী ছেড়ে যেতেন তাহলে এ আলোচনা হয়ত অবান্তর হতো। কিন্তু শ্রীমেনন "ডিফেন্স প্রডাকশন"-এর মন্ত্রী হয়ে ক্যাবিনেটে থাকলেন। এই নূতন দপ্তরের সীমানা ঠিক কী হবে তা এখনো বুঝা যাচ্ছে না। এই দপ্তরের দায়িত্ব কি কেবল দেশের মধ্যে সামরিক উৎপাদন সম্পর্কে থাকবে অথবা বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যাবিধ সামরিক দ্রব্যাদির সংগ্রহের ব্যবস্থাও তার এক্তিয়ারভুক্ত হবে? যাই হোক সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাবার পক্ষে এই দপ্তরের কুশলতা একান্তভাবে আবশ্যক। এটা কেবল "এক্‌জিকিউশনের" ব্যাপার নয়, এর মধ্যে মৌলিক নীতি স্থির করা এবং দায়িত্ব পরিচালনার ব্যাপার অনেক আছে।

সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক নীতির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গীভাবের সম্পর্ক রয়েছে সেটা এখন এক-মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না। আজ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের বৈদেশিক নীতির পরিচালনার বহুবিধ ভুলের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ যোগ আছে। ভুল না করার শত চেষ্টা করলেও ভুল হয়, আমাদের নীতি নির্ধারণ ঠিক মতো হলেই যে আমরা এই বিপদ পুরো মাত্রায় এড়াতে পারতাম তাও হয়ত নয় কিন্তু ভুল না করলে বিপদ এরূপ বিকট আকারে বোধহয় দেখা দিত না।

বৈদেশিক নীতির যে-সব ভুল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নানা ন্যূনতা এবং ত্রুটিতে প্রতিফলিত দেখা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রেই সেই সব ভুল শ্রীকৃষ্ণ মেননের প্ররোচনা ও সহায়তায় সম্পাদিত হয়েছে, কারণ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ মেনন শ্রীনেহরুর প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মন্ত্রণাদাতাই কেবল ছিলেন না, কার্যত নীতির পরিচালনার ব্যাপারেও শ্রীমেনন মুখ্য অংশ নিয়েছেন। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অতিক্রম করতেও দ্বিধা করেন নি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব শ্রীনেহরু নিজের স্কন্ধে নিয়েছেন, তাতেই মেনন-সমস্যা মিটে গেল এরূপ মনে করলে ভুল হবে।

বৈদেশিক মন্ত্রী তো আগাগোড়া জওহরলালজীই আছেন, শ্রীমেননের তো বৈদেশিক দপ্তরে কোনো পদ ছিল না, তা সত্ত্বেও বিদেশে ভারতের বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যাতা হিসাবে পণ্ডিতজী তো শ্রীমেননকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, পণ্ডিতজীর মন্ত্রণাদাতা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ মেনন যে-একটা বিশেষ প্রভাব এবং প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, শ্রীমেননের উপর পণ্ডিতজীর যে-ধরনের নির্ভরশীলতা ভারত সরকারের একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, সে বিষয় কোনো পরিবর্তন হয়েছে বা হবে কিনা? তা যদি না হয় তবে শ্রীনেহরু বৈদেশিক মন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নাম গ্রহণ করলেন বলেই যে খুব একটা বড়ো কিছু পরিবর্তন হলো তা নয়।

পণ্ডিতজী তো গত পনেরো বছর বৈদেশিক

মন্ত্রী আছেন, আর সেই বৈদেশিক নীতি যে অভ্রান্ত ছিল না সেকথা আজ পণ্ডিতজী নিজে পর্যন্ত স্বীকার করছেন। সুতরাং পণ্ডিতজী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই সব চিন্তা দূর হলো তা নয়। বরঞ্চ তাঁর বোঝা যে দ্বিগুণ হলো সেটা একটা ভাবনার কথা। তাহলেও আপাতত এইটাই দরকার ছিল। দেশ পণ্ডিতজীকে ভালবাসে, তাঁকে বিশ্বাস করে, তিনি দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। সেজন্য তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের একটা বৃহৎ নৈতিক মূল্য আছে। এই নাম গ্রহণ জাতির উদ্বোধন এবং উৎসাহবর্ধনের পক্ষে পরম সহায়ক হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাও ভাবতে হবে অর্থাৎ ভাবতে হবে পণ্ডিতজীর মুখ্য মন্ত্রণাদাতা কারা হবেন, নীতির রূপায়ণে, "এক্জিকিউশনে", তাঁর মুখ্য সহায়ক কারা হবেন। এই জন্যই প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ মেনন এতদিন পণ্ডিতজীর মন্ত্রণাদাতা হিসাবে যে-স্থান অধিকার করেছিলেন সেই স্থানে কি তিনি এখনো থাকবেন? যদি না থাকেন তবে সে স্থান কে বা কারা নিচ্ছেন?

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন একরকমভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন। স্বভাবতই তিনি দপ্তরের প্রধান পদগুলিতে নিজের মনমত লোক বসিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মেননের পরিচালিত নীতির যদি কোনো পরিবর্তন বা উন্নতিসাধন করা এখন লক্ষ্য হয়—সে লক্ষ্য না থাকলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব হস্তান্তর করার কোনো অর্থ হয় না—তবে সেই নীতির উদ্ভাবন ও রূপায়ণে যাঁরা বিশেষ অংশ বা "ইনিশিয়েটিভ" নিয়েছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের সকলকে পূর্বপদে রাখা সঙ্গত বা প্রয়োজন হবে কিনা বিবেচ্য। বলা বাহুল্য একথা অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সম্পর্কেই, যাঁরা কোনো বিশেষ নীতিকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের বলে ভাবতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে, এখানে এমন কিছু প্রস্তাব করা হচ্ছে যাকে "উইচ্ হান্টিং" বলা যেতে পারে। বৈদেশিক মন্ত্রীর দপ্তরের ভিতরেও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ত আছে। বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী জেনারেলের পদে বর্তমানে যিনি (শ্রী আর কে নেহরু) অধিষ্ঠিত আছেন বর্তমান অবস্থায় ঐ পদে তাঁকে রাখার ঔচিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ পূর্বেই বৈদেশিকীতে প্রকাশিত হয়েছে। (বিলম্বে প্রাপ্ত)

১।১১।৬২

*

পণ্ডিতজী বোধ হয় আশা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মেননের হাতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত কাজের একাংশ রেখে তিনি নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেই মেনন-সমস্যা মিটে যাবে। তাতে মিটল না। বাইরের জনমতকে তো নয়ই, কংগ্রেস পার্টির ভিতরের জনমতকেও তা দ্বারা বাগ মানানো গেল না। শ্রীমেননকে মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য-পদে ইস্তফা দিতে হলো।

মন্ত্রিমণ্ডলীর বাইরে থেকেও যদি শ্রীমেনন এমনভাবে চলেন যাতে লোকের ধারণা হবে যে, গবর্নমেন্টের বাইরে থেকেও শ্রীমেনন সরকারী ব্যাপারে তাঁর মতামত এবং প্রভাব খাটাবার সুযোগ পাচ্ছেন, তাহলে শ্রীমেননকে নিয়ে বিতর্কের অবসান তো হবেই না, বরঞ্চ সেটা আরো বিশ্রী ধারা নিতে পারে। দেশের পক্ষে সেটা আরো ক্ষতিকর হবে। শ্রী মেনন যদি এখন "পাবলিক লাইফ" থেকে অবসর নিয়ে কিছুকাল কাটাতে পারতেন তাহলে বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হত। অবশ্য ভারতের নাগরিক হিসাবে তিনি যদি এ সময়ে চুপ করে বসে থাকতে না চান তাহলে তাঁর উপর জোর করা যাবে না। তবে শ্রীমেনন শ্রীনেহরুকে লিখেছেন যে, শ্রীনেহরু তাঁকে যে-কাজ দেবেন তিনি সেই কাজ করার জন্যই প্রস্তুত আছেন। সুতরাং পণ্ডিতজী যদি এখন শ্রীমেননকে কিছুদিন চুপচাপ করে কেবল "প্রাইভেট সিটিজেন" হয়ে থাকার পরামর্শ দেন তাহলে আশা করি শ্রীমেনন সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু পণ্ডিতজী সেই পরামর্শ দেবেন কি? দিলে সকলের পক্ষেই ভালো হয়।

* * *

রাজাজী কম্যুনিস্ট পার্টিকেও আপাতত অবসর গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। বৃদ্ধের বচন উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এখন পার্টি ভেঙ্গে দিয়ে অথবা পার্টির কাজ সসপেন্ড রেখে আবার যখন কম্যুনিস্ট পার্টির নামে কাজ করার সুযোগ আসবে তখন পার্টির পুনঃসংগঠন করার পরামর্শ মোটেই মন্দ পরামর্শ নয়। কারণ কম্যুনিস্ট পার্টির "লিগ্যাল্" প্রাণ রাখতেই এখন প্রাণান্ত হতে হবে।

কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে-প্রস্তাব পাশ হয়েছে সেটা বিশেষ করে পার্টির "লিগ্যাল" অস্তিত্ব বাঁচাবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। কিন্তু উপস্থিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ এই প্রস্তাবেরও বিরোধী ছিলেন। তাঁরা চীনা কম্যুনিস্ট কর্তৃক ভারত আক্রমণকে কিছুমাত্র নিন্দনীয় বলে মনে করেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কম্যুনিস্ট পার্টির এই অংশ সম্বন্ধে যা কর্তব্য তার ভার প্রধানত পুলিসের উপর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাঁরা প্রস্তাবের সমর্থক তাঁরা কি বিরোধী চীনা-দরদীদের পার্টি থেকে বার করে দিতে প্রস্তুত আছেন বা সক্ষম? স্বেচ্ছায়ই হোক আর পুলিসের কার্যের দ্বারাই হোক পার্টি ভাগ হয়ে যাবেই।

যাঁরা প্রস্তাবের সমর্থক তাঁদের "সদুদ্দেশ্য"ও কাজের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। পার্টির একটা প্রকাশ্য "লিগ্যাল" অংশ এবং একটা "আন্ডার গ্রাউন্ড" অংশ থাকবে এবং দুয়ের মধ্যে সহযোগ চলবে—বর্তমান অবস্থায় এরূপ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রকাশ্য অংশের লিগ্যালিটি বাঁচাতে হলে আন্ডার গ্রাউন্ডওয়ালাদের থেকে দূরত্ব ক্রমশ বাড়াতে হবে এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কও অদূর ভবিষ্যতে খোলাখুলিভাবে ছিন্ন করতে হবে—যদি না চীনাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা মিটমাট হয়ে যায়।

কম্যুনিস্ট পার্টি যে প্রস্তাব পাশ করেছে সেটা ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, চীনের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষের যতশীঘ্র সম্ভব অবসান হোক কেবল এটাই যে কম্যুনিস্ট পার্টি চায় তা নয়, চীনের সঙ্গে বেশি দিন এবং প্রবলভাবে যুঝবার শক্তি যাতে ভারতের না হয় সেটাও কম্যনিস্ট পার্টির চেষ্টা হবে। কারণ চীনের সঙ্গে বেশিদিন যুদ্ধ চললে কম্যুনিস্ট পার্টির লিগ্যাল অস্তিত্ব বজায় রাখবার বর্তমান কৌশল অচল হয়ে যাবে। কেননা ভারত রক্ষার কথা প্রস্তাবে যাই বলা হোক না কেন, কার্যত দেখা যাবে কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতার মানে হবে যুদ্ধ-জয়ের চেষ্টা নয়, চীনাদের সঙ্গে যে-কোনো শর্তে আপোস করার অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা।

দু-এক মাসের বেশি কম্যুনিস্ট পার্টির এই উদ্দেশ্য গোপন করে রাখা সম্ভব নয়। এরই মধ্যে ভারত সরকারকে চীনা শর্তে আপোসের পথে আনা সম্ভব হবে—এই অকথিত যুক্তিই কম্যুনিস্ট পার্টির গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তি। তা না হলে কম্যুনিস্ট পার্টির দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রস্তাবের কোনো অর্থই করা যায় না। কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি লড়াই করে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করার মানে হবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের থেকে নিজেদের শুধু বিচ্ছিন্ন করা নয়, তার বিরুদ্ধে যাওয়া। এটা মস্কোকে অথবা পিকিংকে গুরু বলে মানার প্রশ্ন নয়। এক্ষেত্রে মস্কো পিকিং-এর বিরোধিতা করছে না, করবেও না। মস্কোর অনুরাগীই হোক বা পিকিংয়ের অনুরাগীই হোক পৃথিবীর কোনো কম্যুনিস্ট পার্টিই চীনের বিরুদ্ধে কিছু বলছে না, সকলেই চীনের সমর্থন করছে।

কেউ কেউ বলছেন, ভারতীয় কম্যুনিস্টরা কি যুগোশ্লাভিয়ার টিটো, হাঙ্গারীর ইমরে নাজ অথবা কিছুটা পোল্যান্ডের গোমুলকার প্রদর্শিত পথে চলতে পারেন না? কিন্তু এইসব দৃষ্টান্ত এখানে খাটে না। এঁদের সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের পার্থক্য এই যে, এঁরা যখন [illegible]

গিয়েছেন বা যাবার চেষ্টা করেছেন তখন এ'রা স্বদেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা চায়, তারা ক্ষমতা পায়নি। যে-সব দেশে কম্যুনিস্টরা এখনো ক্ষমতা পায়নি, ক্ষমতা পাবার চেষ্টা করছে, সে-সব দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলন অর্থাৎ মস্কো-পিকিং অ্যাক্সিসের আশ্রয় ছাড়তে পারে না, তাদের পক্ষে মস্কো-পিকিং-এর এজেন্টের কাজ করা ছাড়া উপায় নেই

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক ভিত্তিই পাল্টে দিতে হয়। তাতে "কম্যুনিস্ট পার্টি" আর কম্যুনিস্ট পার্টি থাকবে না, লেনিন-স্তালিন-মাও-এর "ঐতিহ্যের" অনেকটাই খসে যাবে, তবে ভালো কিছুও বাঁচবে। রাজাজীর পরামর্শ অনুযায়ী ভারতীয় কম্যুনিস্টরা যদি পলিটিকস্ থেকে আপাতত অবসর গ্রহণ করে এসব কথা চিন্তা করে দেখতেন তাহলে ভালোই হতো। তার অবশ্য কোনো আশা নেই। সুতরাং দুর্ভোগ আছে।

৮-১১-৬২

চীনা দস্যুর প্রতিরোধে ভারত

ইবন বতুতা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গত ৮ই নবেম্বর লোকসভায় চীনকে সর্বপ্রথম "সাম্রাজ্যবাদী" হিসেবে অভিযুক্ত করেন। চীন যুদ্ধের মারফৎ সমস্ত বিরোধ মীমাংসায় বিশ্বাসী বলে তাঁর এ-কথা মনে হয়েছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের বিরোধ যে একটি বিরাট ধাপ্পার উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা বলতে তিনি কসুর করেন নি। প্রধানমন্ত্রী ও এবং ভারত সরকার এতদিন "নিজেদের সৃষ্ট" যে জগতে বাস করছিলেন, মনে হচ্ছে সেই জগতের মায়া এখনও কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। কারণ ভারত-চীন সংকটের কারণ শুধুমাত্র সীমান্ত বিরোধ নয়।

কেবলমাত্র সীমানা নিয়েই এই বিরোধ নয়। চীনের কমিউনিস্টরা নাৎসী জার্মানীর মতই উগ্র জাতীয়তাবাদী। কোন সুদূর অতীতে যেসব এলাকা চীন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, সেগুলি অধিকার করতে বর্তমান চীন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এশিয়াতে একটি শক্তিশালী দেশ গড়ে তুলবার জন্য এগুলি দখল সে করতে চায়। আবার শক্তিশালী দেশ হিসেবে দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে হলে চারিপাশে যেমন অনেকগুলি তাঁবেদার রাষ্ট্র দরকার, তেমনি অপর কোন দেশ যাতে শক্তিশালী হতে না পারে, সে ব্যবস্থাও করা দরকার। চীনাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের মাদকতা সৃষ্টি করবার জন্য মাও-সে-তুং ১৯৩৯ সালে কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভিয়েতনাম অধিকার করবার কথা ব্যক্ত করে-ছিলেন। চীনের এই উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সংমিশ্রণ এশিয়াতে একটি বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কমিউনিস্টরা চীনে যুদ্ধের মারফৎ ক্ষমতায় এসেছিল। যুদ্ধকে চীন কখনও ভয় করে না। কারণ মাও-সে-তুংয়ের মতে, "প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই কুড়ি কোটি লোক নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আবির্ভাব হয় এবং লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ কোটি। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ করতে চায়, তা হলে একথা নিশ্চিত করে বলা চলে যে, আরও কয়েক কোটি লোক সমাজতন্ত্রের শিবিরে যোগ দেবে" (৩০শে মার্চ, ১৯৬০)। তৃতীয় মহাযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য সকলেই শঙ্কিত। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধে মাও-সে-তুংয়ের কোন ভয় নেই। কারণ মাও সে-তুংয়ের মতে, পারমাণবিক যুদ্ধে "পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক হয়ত মারা যাবে কিন্তু বাকী

লাদাক: চীনাদের দাবী ১৫০০০ বর্গমাইল (চিহ্নিত)। ১৯৫৭ সাল থেকে ১২০০০ বর্গমাইল চীনের দখলে। এবারে বাকীটা দখল করতে চায়।

ভীত প্রতিবেশী: পূর্বে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নেপালে চীন লাসা-কাঠমাণ্ডু রাস্তা তৈরি করছে। অনেক তিব্বতীশাসিত সিকিমের উপর চীনের থাবা উদ্যত। ভারতীয় রক্ষাকবচযুক্ত ভূটানে চীন অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে।

নেফা: মাত্র তিন বছর আগে চীনারা ম্যাকমেহন লাইন সম্পর্কে প্রথম আপত্তি জানায়। এখন গোটা নেফা দাবী করছে। চীনাবাহিনী অতর্কিত আক্রমণে ১২টি ঘাঁটি দখল করে।

কারাকোরাম গিরিপথ

কলিকাতা

বঙ্গোপসাগর

অর্ধেক তো বে'চে থাকবে! সাম্রাজ্যবাদ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে এবং গোটা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।" ১৯৫৭ সালে মাও সে-তুং এই কথাগুলি বলেন অথচ সে সময়ে চৌ এন-লাইকে পঞ্চশীলের জয়লাভে মত্ত দেখা গেছে। চীন কর্তৃক যুদ্ধবাদী নীতি অনুসরণের অন্য কারণও রয়েছে। ধনতন্ত্রের যে পরিবর্তন হয়েছে, সে কথা চীনারা স্বীকার করে না। চীনাদের এখনও বিশ্বাস যুদ্ধ ছাড়া ধনতন্ত্র টি'কতে পারে না। আর যুদ্ধ যখন করতেই হবে, তখন আগেই শত্রুকে আঘাত হানা দরকার।

'ভারত যা চাইবে তাই দেব'। —ম্যাকমিলান

কমিউনিস্ট চীন যে ভারতকে তার পয়লা নম্বরের শত্রু মনে করে, ১৯৫০ সালে চীনাবাহিনীর তিব্বত অভিযানের সময়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আকসাই-চীন এলাকায় চীনের অনুপ্রবেশও ঐ সময়। অবশ্য তার আগেই চীন এশিয়ার দেশগুলিতে চীনা-পদ্ধতিতে কমিউনিজম বিস্তারের চেষ্টা করে। ফিলিপিন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রহ্মদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম—সর্বত্রই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ প্রচেষ্টা একমাত্র পরাধীন ভিয়েতনামে সফলতা লাভ করে। এবং পরেই চীনা কূটনীতি ভিন্নপথ নেয়। গণতন্ত্রের পথে উন্নতিশীল ভারতবর্ষকে প্রধান শত্রু মনে করবার অন্য কারণও রয়েছে। স্বাধীনতা বজায় রেখে জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারলে ভারতই এশিয়ার প্রভাব বিস্তার করবে এবং তখন নিজের দেশের মানুষকে পার্টির শৃংখলে আর বে'ধে রাখা সম্ভব হবে না।

প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতকে আলাদা করবার জন্য চীন যে কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিল, ভারত তার কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে। ভীতি সৃষ্টি করেই চীন ব্রহ্মদেশ ও নেপাল এবং বিরোধ-মীমাংসার নামে ইন্দোনেশিয়াকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং নিজে উদ্যোগী হয়েই পাকিস্তানের দাবী মেনে নিয়েছে। ব্রহ্মদেশের উত্তর এলাকা থেকে চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীকে বিতাড়িত করতে গিয়ে ব্রহ্মসৈন্যেরা ১৯৫৩ সালে কমিউনিস্ট চীনের সৈন্যদের দেখতে পায় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালে সংঘর্ষ বাধে। চীনা ম্যাপে ব্রহ্মের ৭০ হাজার বর্গমাইল এলাকা চীনের বলে দেখানো হয়। ১৯৫০ সালে ভূটান ও ১৯৬০ সালে নেপালের সীমান্ত নিয়েও গোলমাল দেখা দেয়। জুলাই মাসে চীনারা নেপালের সীমান্তরক্ষীদের উপর গুলী চালিয়ে একজনকে হত্যা করে। নেপাল সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসায় তৎপর হয়। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার বেলায় চীন একের পর এক ধাপ্পা দিতে থাকে। কিন্তু অন্যদেশগুলির সঙ্গে চীনের বিরোধের সময় ভারত বন্ধুরাষ্ট্রের হয়ে কোন কথাই বলেনি। চীনকে নিজের শর্তে মীমাংসা করবার সুযোগ দিয়েছে। চীনারা এভারেস্টের উত্তর দিক নিয়েই খুশী হয়। ১৯৬১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত চুক্তি অনুসারে চীন ম্যাকমেহন লাইন বরাবর সীমান্ত স্বীকার করে ব্রহ্মদেশের এলাকা ত্যাগ করে যায়। ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সঙ্গে পর্বতের উত্তর দিকে ঢালু অংশ বরাবর সীমান্ত স্বীকার করে আগের সীমান্ত বজায় রাখলেও ভূটান ও ভারতের ক্ষেত্রে চীন ঐ নীতি অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। ১৯৫৯ সালে চীন তিব্বত পরিবেষ্টিত ভূটানের আটটি গ্রাম দখল করে। কিন্তু ভারতের অংশ দখল করা সত্ত্বেও ভারত চীনকে নিজের এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে পারেনি। ফলে চীনের কাছে ভারত যে কত দুর্বল, সে কথা এই অঞ্চলের নিরপেক্ষ দেশগুলির ভাল করেই জানা। আর এই কারণেই নেপাল চীনের পক্ষে যোগ দিয়েছে। ব্রহ্মদেশ ও সিংহল চুপ করে আছে। নেফাতে ভারতীয় জওয়ানদের প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের ফলে ভূটান সম্পর্কে তাই একটু আশান্বিত বোধ করা সম্ভব।

"গণতন্ত্র রক্ষা তহবিল" প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী মালয়ের টংকু আবদুল রহমান

চীনের কমিউনিস্ট সরকারের আসল চরিত্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের মোহ পুরোপুরি না কাটলেও অস্ত্রশস্ত্র আমদানির নীতি পরিবর্তনের সুফল ফলতে আরম্ভ করেছে। নূতন অস্ত্রে বলীয়ান ভারতীয় জওয়ানদের জন্য বার বার ওয়ালং আক্রমণকারী চীনাদের ফিরে যেতে হয়েছে। চীনাদের নিকট থেকে জং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয়নি। অপর সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দৌলতবেগ ওলদি ভারতের হাত ছাড়া হয়েছে এবং চুশুলের উপর চরম আক্রমণের জন্য চীনারা তৈরি হচ্ছে। অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, চীনরা লাদাকে যে পরিমাণ জমি দাবী করেছিল, তারচেয়েও বেশী জমি নাকি চীনারা দখল করেছে।

চীনা আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতবাসীদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা দেখা যাচ্ছে। বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়েরাও পিছিয়ে নেই। দেশরক্ষার জন্য তাদের দাবির জন ভারতীয় শুল্ক আইন ইতিমধ্যেই বদল করতে হয়েছে। বিদেশীরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। ইংলন্ড ও কেনিয়া ছাড়া ফিনল্যান্ড থেকেও স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে ভারতে আসবার প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় হাজার ছাত্র রক্তদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পররাজ্যগ্রাসী চীনকে প্রকাশ্যে সমর্থনকারীর সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। কিন্তু ভারতকে এখন পর্যন্ত যারা সমর্থন করেছে, তাদের মধ্যে নিরপেক্ষ দেশের সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। অথচ এই নিরপেক্ষ দেশগুলিকেই আমরা এতদিন বন্ধু জেনে এসেছি। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ভারতের অনেক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা আছে বলে এতদিন শোনানো হলেও সেসব এখন ফুটো বেলুনের মত চুপসে গিয়েছে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মত ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াও ভারতকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিতে পারে। তবে ভারতের জন্য সেই দেশের জনসাধারণের নিকট থেকে সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে "গণতন্ত্র রক্ষা তহবিল" প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব একমাত্র মালয় সরকারের প্রাপ্য।

সরকারী স্তরেও তৎপরতা কম নয়। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, সে বিষয়ে এখন আর কারও সংশয় নেই। ফলে প্রধানমন্ত্রী চীনের শর্তে আলাপ-আলোচনার পথ পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য চৌ এন-লাইয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত শ্রীমেননকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেবলমাত্র দানের ওপর নির্ভর না করে অর্থমন্ত্রী বন্ড বিক্রি করে সোনা সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছেন। জিনিসপত্রের দাম বন্ধ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য এর কার্যকারিতা রাজ্যসরকারের কর্মদক্ষতার উপরেই নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৩৩ জন সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছে। জনসাধারণের সহযোগিতা কাজে লাগাবার জন্য রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় নাগরিক পরামর্শদাতা কমিটিও গঠিত হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষেরা ছাড়া অ-কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলের নেতারাও পরিষদ ও কমিটি মারফৎ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ১১।১১।৬২

ভ্রম সংশোধন : গত সংখ্যায় মুদ্রণপ্রমাদবশত লাদাকে চীনাদের দাবি ১৫০০০ বর্গমাইলের পরিবর্তে ১৫০০ ছাপা হয়েছিল।

পূর্বপত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গত বছর কুমুদরঞ্জন যখন আনন্দ পুরস্কার গ্রহণ করতে কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে এ সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন তাঁর সংগে এখানেই আমার সাক্ষাৎকার পর্ব চুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনকে এত কাছে পেয়েও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমার মন সায় দেয় নি। এ শহর যার প্রাণকেন্দ্র, এখানকার ধূলি গন্ধ কোলাহল যন্ত্র বেদনা সুখ দুঃখ যার মজ্জায়-মজ্জায় সে যদি আজন্ম প্রকৃতি-লালিত শহর-বিমুখ এক প্রাচীন কবির সামনে এখানে হঠাৎ দাঁড়ায় তাহলে তাঁর প্রতি যে একেবারেই সুবিচার করা হবে না, এমন ভংতি মনে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমি কলকাতায় কুমুদরঞ্জনের সংগে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়েছিলাম আমার সাক্ষাৎকার।

আজ অনেক পরে শেষ আশ্বিনের হালকা রোদ-জ্বলা গ্রামের কাঁচা রাস্তায় পুরনো বাসের ঘন ঘন ঝাঁকানিতে সেই কথা মনে করে মনে মনে নিগূঢ় তৃপ্তির স্বাদ পাই। আমার পথ দীর্ঘ। বর্ধমান স্টেশনে নেমে বাসে যেতে হবে প্রায় বাইশ-তেইশ মাইল। নতুন হাটে নেমে কিছুদূর হাঁটতে হবে। তারপর নৌকোয় পার হতে হবে কুনুর নদী। দুই নদী—কুনুর আর অজয়ের সংগমে কুমুদরঞ্জনের গ্রাম, কোগ্রাম।

শহরের শেষ স্পর্শও বোধহয় মিলিয়ে গেছে। আমি বাইরে তাকিয়ে থাকি। এত বড় আকাশ কখনও দেখিনি। প্রথম-প্রথম আবিষ্কারের বিস্ময়ে দিশা হারালেও, অল্প পরে ভাবতে সংশয় জাগে, এ আকাশ আমার। তখন বিস্ময় আর বেদনার তীব্র অনুভূতিতে এক অধিকার-চ্যুত কাঙাল মানুষের মতো আমি দেখি হলুদ-সবুজ ধান ক্ষেতের আয়োজন বিস্তৃত শোভা। আমি দেখি কচি কিশোর বট। এরা বড় হবে, বুড়ো হবে—তারপর একদিন জটে-জটে জটিল হয়ে শহরে যেমন দেখি তেমন বটের রূপ নেবে সেকথা এখন ভাবা যায় না। কোথাও কোথাও দূরে ধূ ধূ প্রান্তরে পাশাপাশি দুই নারকেল গাছ যেন নৃত্যের অপরূপ ভঙ্গিতে নুয়ে পড়ে রচনা করেছে তোরণ-দ্বার। আর দেখা যায় আরও দূরে আকাশের দূর প্রান্ত থেকে ডানা ঝাপটে আমের শাখায় আশ্রয় নেয় সাদা বক। এখানে আজ হঠাৎ গাছ বক মাটি আর আকাশ যেন অন্য রূপ নেয়। বাসের ভিতরে তাকাতে ইচ্ছে করে না। ভাল লাগে না পেট্রলের গন্ধ। মোটরের গমগম শব্দ শুধু যেন মুহুর্মুহু ছন্দপতন ঘটিয়ে বিরক্তির সৃষ্টি করে। এক-একবার মনে হয় বিকল হয়ে যাক এই বাস। আমি এখানে নেমে পড়ি। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে অন্তত একবার প্রকৃতির নিবিড়ে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে অনুভব করবার চেষ্টা করি, এ অকৃপণ সৌন্দর্য উপভোগ করার পূর্ণ অধিকার আমারও আছে। আর বাইরে চেয়ে-চেয়ে আমি যেন হঠাৎ কুমুদরঞ্জনের খুব কাছে পৌঁছে যাই। কিন্তু তখনও, আশ্চর্য, যে-পদগুলি আমার মাথায় খেলে যায় তা কুমুদরঞ্জনের নয়—

"তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে
বসেছি বিজনে, নব নীপ বনে
পুষ্পিত তৃণদলে।

শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে;
ফুৎকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে;
শ্যামসন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটিকা জ্বলে।
মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান,
গান বিরচিব ব'লে॥"

আমার সংগে ছিল কুমুদরঞ্জনের অকৃত্রিম ভক্ত রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। এ পথে সে আগেও এসেছে বলে আমি জানি না কোন এক কল্পিত ভীতিতে আমি তাকে

....

পরবর্তী সাক্ষাৎকার : ৮ই ডিসেম্বর
শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া

....

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
শ্রীহরি গংগোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

সঙ্গে এনেছিলাম। নতুন হাটে বাস থেকে নেমে কোগ্রামের পথে চলতে-চলতে রমেন যেন এক শহুরে আনাড়ীকে চিনিয়ে দিচ্ছে গাছ, নদীর নাম বলে দিচ্ছে, দূরে আঙুল দেখিয়ে বলছে, "ওই সে কুমুদরঞ্জনের বাড়ি।"

তখন শেষ শরতের বিকেল গড়িয়ে-গড়িয়ে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে যেন থেমে আছে। আর একটু পরেই অন্ধকার হবে। আর তখন, নৌকোয় কুনুর নদী পার হতে-হতে চারপাশে তাকিয়ে মনে হয়, মাটির সোঁদা গন্ধে, কৃষ্ণচূড়ার মৌন আমন্ত্রণে, আখ আর আমগাছের ছায়ায় শিথিল হয়ে যাবে আমার এতদিনের বিশ্বাস—আমি ভুলব অস্থির শহরের খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলিকে।

আমাদের অপেক্ষায় কুমুদরঞ্জন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোটখাট দেহ। প্রসন্ন মুখ। আরও এগিয়ে এসে দুই হাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। বার বার প্রশ্ন করলেন, আসবার সময় পথে কোন অসুবিধা হয়েছে কি-না। যত বলি, কিছু হয়নি, খুব আরামে এসেছি—কুমুদরঞ্জন মানতে চান না—স্থির হতে পারেন না। উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

"খুব কষ্ট হবে। কেন এত দূরে শুধু শুধু এলে!"

"আপনাকে দেখতে এলাম।"

"আমি একটা দীন নগণ্য পাড়াগেঁয়ে মানুষ। আমার জন্যে এত কষ্ট করে এত-দূরে আসা কেন—"

বাধা দিয়ে বলি, "আপনার শরীর কেমন আছে?"

"ভাল—খুব ভাল। তিন-চারদিন পরে দু-একদিনের জন্যে কলকাতায় যাচ্ছি—সেখানেই তো দেখা হত—"

"আমি ইচ্ছে করেই এখানে এসেছি। কলকাতায় দেখা হলে আপনার এই বাড়ি, ওই ক্ষেত, আপনার অজয়-কুনুর আমি তো দেখতে পেতাম না।"

কুমুদরঞ্জন আমার কথা শুনে খুশী হয়ে বলেন, "এসব আমার বড় আপনার। এদের জন্যেই রয়ে গেলাম। আর, মন্দিরগুলো দেখবে না?"

"নিশ্চয় দেখব। কোথায়?"

"এই তো কাছেই। মঙ্গলচণ্ডীর বড় করুণা। মা আমায় রেখেছেন বলেই তো আছি এখানে। আর লোচনদাসের মন্দিরও আছে। শোন একটা কথা বলি, অশোকবাবু বোধ হয় কথাটা জানেন না—"

"অশোকবাবু? কোন অশোকবাবু?"

"তোমাদের আনন্দবাজারের অশোক সরকার—"

সোজা হয়ে বসে বলি, "ও হো। তিনি কী জানেন না?"

প্রসন্নমুখে কুমুদরঞ্জন বলতে থাকেন, "মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে দেখতে পাবে, একটা শিবমূর্তিও আছে সেখানে। ওই শিবের নাম নীল লোহিত। অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছে ছিল, শিবের জন্যে একটা আলাদা মন্দির প্রতিষ্ঠা করি—"

"তারপর?"

"কিন্তু তার জন্যে অন্তত পাঁচশ টাকা দরকার। কোথায় পাই! মা মঙ্গলচণ্ডীকে বললাম, মা, যদি কোন প্রকাশকের কাছ থেকে পাঁচশ টাকা পাইয়ে দাও তাহলে তা দিয়ে নীল লোহিতের মন্দির প্রতিষ্ঠা করি" ভক্তিতে ভিজে ওঠে কুমুদরঞ্জনের গলার স্বর "মঙ্গলচণ্ডীর কাছে চেয়েছিলাম পাঁচশ টাকা মা দিলেন দ্বিগুণ—এক হাজার টাকা। আনন্দ পুরস্কার পেলাম।"

তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "নীল লোহিতের জন্যে আলাদা মন্দির তৈরি হয়ে গেছে?"

"শুরু করে দিয়েছি। সিমেন্টের জন্যে শেষ হতে আর একটু বাকি আছে।"

অল্প অল্প অন্ধকার আসছে। আজ অমাবস্যা। একটি ছেলে ঘরে লণ্ঠন রেখে গেল আর একটা গ্যাসের আলো। এর মধ্যে চা এসেছে, সঙ্গে প্রচুর খাবার। আপত্তি জানিয়েছিলাম। কুমুদরঞ্জন শোনেন নি। সেই এক কথাই শুনিয়েছিলেন, অনেক কষ্ট করে আমরা শহর থেকে এসেছি—আরও কত কষ্ট হবে! আমাদের মতো মানুষের যথা-যোগ্য অভ্যর্থনা জানাবার কোন উপচার তাঁর নেই। এই সামান্য আহার প্রত্যাখ্যান করলে তিনি বড় লজ্জা পাবেন। বয়স্ক কবির অকৃত্রিম বিনয়ে অস্বস্তি বোধ হয়।

জানলা দিয়ে দেখা যায় বাঁশ ঝাড়ে জোনাকির দ্রুত আনাগোনা। বাড়ির ভিতরে প্রশস্ত উঠোন। কাছাকাছি আর কোন বাড়ি নেই। মানুষ নেই। শব্দ নেই। যেখানে বসে আছি সে-ঘর কুমুদরঞ্জনের। তিনি এখানেই লেখেন, পড়েন, ঘুমোন। দুটো বই-এর আলমারী। একটা টেবিল। কয়েকটা চেয়ার। একটা খাট। আর কিছু নেই।

একটু পরে প্রশ্ন করি, "আপনি এখানেই থেকে গেলেন কেন?"

"মঙ্গলচণ্ডী রাখলেন, তাই।"

"শহরে থাকতে ভাল লাগে না?"

"না। বড় ভয় হয়। শহরে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়", একটু চুপ করে থেকে কুমুদরঞ্জন বলেন, "এই কোগ্রামেই মাতুলালয়ে ১২৮৯ সালের ১৮ই ফাল্গুনে আমার জন্ম। এখানেই পাঠশালায় হাতে খড়ির পর পড়া শুরু করি। তারপর এগারো-বারো বছর বয়সে কলকাতার সেণ্ট্রাল ইস্কুলে ভর্তি হই—"

আমি হেসে প্রশ্ন করি, "কলকাতায়?"

কুমুদরঞ্জনও হাসেন, "হ্যাঁ, কলকাতা শহরে। রিপন কলেজ থেকে এফ-এ পাশ করি আর ১৯০৫ সালে সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করি—বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম।

"কিন্তু কাব্যচর্চা শুরু করলেন কখন ?"

"আমার দশ-বারো বছর বয়সে। আমাকে আমার দূর সম্পর্কের এক মামা যতীন্দ্রনাথ মল্লিক বাড়িতে পড়াতেন—তিনিই আমাকে প্রথম কবিতা লেখায় উৎসাহ দেন। আর ছেলে বয়সে লেখা আমার সেইসব কবিতা পড়ে আনন্দ পেতেন আমার মাসীমারা, গ্রাম্য গৃহিণীরা। আমি পাঠ্য-পুস্তকের কবিতা ছাড়া তখন আর কোন কবিতার খবরই জানতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, ফকিরদের গীত ও রাখালদের গান আমার বড় প্রিয় ছিল।"

"গল্প-কবিতার বই কবে থেকে পড়তে শুরু করলেন ?"

"খুব ছেলেবেলায় পড়বার মতো গল্পের বই পাই নি। ছিলও না। বাড়িতে মহাভারত, হরিকথা পাঠ হত—তা শুনতে খুবই ভাল লাগত। একটু বড় হবার পর আরব্য-উপন্যাসের গল্পগুলোও ভাল লেগেছিল।"

"আর তারপর কাদের লেখা আপনার ভাল লাগে ?"

"কলেজ-জীবনে প্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাই আমাকে যেন কাব্যের প্রকৃত রূপ দেখায়। তারপর আরও অনেক ইংরেজ কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হই। কিপলিংকে আমার খুব ভাল লাগত, তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে ভক্তির ইঙ্গিত আমাকে মুগ্ধ করত। তাঁর গদ্যও ভালবাসতাম।"

"আর তখন আমাদের দেশের কার-কার লেখা আপনার ভাল লাগত ?"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হয় দেরিতে। তার আগে বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়তে পড়তে কাঁদতাম। কীর্তন গান প্রথম যেদিন শুনি, আমার মনে হল ভগবান ঠিক এমন সুরেই বাঁশি বাজাতেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের "মলিন হাসি", "নীরব বিদায়", "বিজয়া"—এসব কবিতা আমাকে মুগ্ধ করত। গোবিন্দ দাসের কবিতাও খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।"

"তারপর ?"

"আমি 'ভক্তমাল', 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'পদকল্পতরু' ভক্তির সঙ্গে পড়তে বড় ভালবাসি। দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ ও জীবনী পড়ি। ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়—এ ধারণা আমার ছেলেবেলা থেকেই ছিল, রামকৃষ্ণর কথায় সে-বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে—একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পেয়েছি।"

কুমুদরঞ্জন কথা বলে যান আবেশের ঘোরে। তারপর হঠাৎ অনেকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবেন। একটু ইতস্তত করে এবার আমি জিজ্ঞেস করি, "আপনার প্রথম কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ?"

"নব্য ভারতে। আমি তখন সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি," কুমুদরঞ্জন নিজেই বলতে

বলেন, "আমার প্রথম বই 'শতদল' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনুকরণে লেখা, বোধহয় ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। আমি তখন মাথরুন হাই ইস্কুলের অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক।"

"রবীন্দ্রনাথকে সে-বই পাঠিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, খুব সঙ্কোচের সঙ্গে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই কবিগুরু লিখলেন, 'আপনার শতদল পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মতো রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনো কখনো মৌমাছির হুলের পরিচয় পাওয়া যায়।'......

এই চিঠি পেয়ে নিবিড় আনন্দে মন ভরে গেল। আমার গোটা দিনটাই কে যেন স্বর্ণকিরণে রাঙিয়ে দিল", কয়েক বছর পর রবীন্দ্রনাথের আর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। লিখেছিলেন, 'মাসিক পত্রে আপনার যে-কোনো কবিতা পড়িয়াছি তাহাতেই বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি। আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গসাহিত্যে অম্লান শোভায় বিরাজ করিবে।'...রবীন্দ্রনাথ মাসিক পত্রেও আমার কবিতা পড়েন", কুমুদরঞ্জন থেমে-থেমে বলেন, "এত আনন্দ আমি রাখব কোথায়!"

"রবীন্দ্রনাথকে আপনি প্রথম দেখলেন কবে?"

"১৯০১ সালে। আমি তখন এফ-এ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে মজুমদার লাইব্রেরী থেকে দু'টি পত্রিকা প্রকাশিত হত, 'সমালোচনী' আর নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'। এই দুই পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'শাঙন' নামে তখন আমার একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল 'সমালোচনী'তে। এই আপিসেই আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি। কবিকে প্রণাম করতেই তিনি হেসে আমাকে বললেন, 'এসো কবি কুমুদরঞ্জন এস।' আমি তো একেবারে আনন্দে অভিভূত। এ সৌভাগ্য পায় কে!"

কুমুদরঞ্জনকে এখনও যেন ভাবের ঘোরে বিহ্বল মনে হয়। আমি আস্তে শুধু জিজ্ঞেস করি, "তারপর?"

"তারপর রবীন্দ্রনাথকে দেখি কাশিম-বাজারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়িতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে। তিনিই ছিলেন সভাপতি।"

"আপনি শান্তিনিকেতনে যান নি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। আমার আজও মনে আছে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম বিকেল চারটেয়। সেইদিনই কবির সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলাম শান্তিনিকেতন। কত কথা যে হল তাঁর সঙ্গে। রাসকিন থেকে শরৎচন্দ্র—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান, কালিদাস রায়—কেউই বাদ পড়ল না", কুমুদরঞ্জন হাসি মুখে বলেন, "একটা মজার কথা বলি। রবীন্দ্রনাথ এক সময় আমাকে বললেন, 'ওহে তোমার গান যে আমার ওপরও চাপিয়েছ।' আমি তো অবাক। কবির কথার অর্থ ধরতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, 'লোকে এখানে এসে বলছে যে আমি 'ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে'—গানটি বেশ লিখেছি। তারা ভাবছে কবিতাটি আমার রচনা।' আমি শুনে বললাম, ভালই তো, নদী যদি সাগরে মেলাবার সৌভাগ্য লাভ করে তাতে আপনার বাধা দেওয়া কেন?"

"রবীন্দ্রনাথ তখন কী উত্তর দিলেন?"

"তিনি বললেন, আমি সকলকেই বলেছি যে আমার নয়, ওটি তোমার লেখা।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "শতদলের পর আপনার কোন বই প্রকাশিত হয়?"

"বনতুলসী, তারপর উজানি, একতারা, বীথি, বনমল্লিকা, নূপুর, তূণীর অজয়—"

"এসব বই এখন বাজারে পাওয়া যায়?"

"না। অনেক বই-ই ছাপা নেই। তবে কয়েক বছর আগে মিত্র ও ঘোষ আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত করেছে। তোমাকে এক কপি উপহার দেব।"

"আপনার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' তো বি-এ অনার্সের পাঠ্য?"

"হ্যাঁ।"

"কোন-কোন কবিতা পাঠ্য?"

সরল হাসি হেসে কুমুদরঞ্জন বলেন, "আরে না না, ওসব আমি জানি না।"

"কবিতার জন্যে আপনি পারিশ্রমিক পান?"

"কেউ দেয়, কেউ দেয় না। একটা সামান্য কবিতার মূল্যের কথা ভাবতে আমার বড় সঙ্কোচ হয়। একবার এক সম্পাদক একটি কবিতার জন্যে আমাকে প্রথমে কুড়ি টাকা পাঠান, তারপর আরও তিরিশ টাকা পাঠিয়ে দেন। আমি সেই তিরিশ টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে তাঁকে লিখলাম, বড় বেশি দিয়েছেন —একটা তুচ্ছ কবিতার জন্যে এত বেশি টাকা আমি নিতে পারব না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী উত্তর পাব জেনেও ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করি, "রবীন্দ্রনাথের লেখা আপনার কেমন লাগে?"

কুমুদরঞ্জন সোজা হয়ে বসে বলেন, "অপূর্ব! অমন আর হয় না।"

"আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?"

'রবীন্দ্রনাথের পর কিছুই হয় নি।"

"আপনি আধুনিক কবিতা পড়েন?"

"বিশেষ না। জীবনানন্দ আমাকে এক কপি 'ঝরা পালক' পাঠিয়েছিল। ভাল লাগে নি। পরে যখন কলকাতায় জীবনানন্দর সঙ্গে দেখা হল তখন তাকে বলেছিলাম, ওহে জীবনানন্দ, ভগবানকে ডাক, ভগবানে বিশ্বাস রাখ তাহলে তোমাকে আর লোনা জল ঘেঁটে-ঘেঁটে বেড়াতে হবে না—শান্তি পাবে।"

কুমুদরঞ্জনের এই উক্তি দূরে থেকে, শহরে বসে শুনলে হয় তো বিদ্রূপ করবার ইচ্ছা হত তাঁকে কিন্তু এখন অমাবস্যার গম্ভীর অন্ধকারে কোগ্রামে অশীতিপর কবির সামনে বসে আমার মনে হয়, যিনি বেড়ে উঠেছেন এই পরিবেশে, মানুষ হয়েছেন ধর্মভীরু পরিবারে লোচনদাসের ভিটেয় গ্রাম্য মাসিমা-দিদিমার কাছে, রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব কবিতা আর ভক্তিমূলক নানা গ্রন্থ পাঠে যিনি শৈশব থেকে তৃপ্তি পেয়েছেন এবং ভগবানকে দেখার ইচ্ছে এখনও যাঁর প্রবল, তিনি যে তৃপ্ত হবেন, পূর্ণ হবেন, আপন মনে পৃথিবীর এক প্রান্তে শান্তির নীড় রচনা করে সুখে কাল কাটাবেন—এ স্বাভাবিক।

তবু আবার তাঁকে বলি, "আজকের কবির লোনা জল না ঘেঁটে উপায় কী। আপনাদের সময়ে যা ছিল না এমন অনেক কিছুই তো আজকাল দেখা দিচ্ছে। কত প্রশ্ন, সমস্যা, দ্বিধা—"

"ওসব দুর্দিনের", কুমুদরঞ্জন হাসেন, "সাময়িক সমস্যা নিয়ে চিরকালের কাব্য হয় না—"

"কিন্তু নতুন মূল্য বোধে কবির ভাব ভাষা প্রতীক প্রকাশভঙ্গি কি বদলে যাচ্ছে না?"

"ভাব চিরদিন একই থাকে। প্রকাশভঙ্গির চেয়ে ভাবই তো আসল—"

"কিন্তু 'মানসী'র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সেঁজুতি'র রবীন্দ্রনাথের কি তফাৎ নেই?"

আমার প্রশ্ন শুনে কুমুদরঞ্জন আবার হেসে বলেন, "আমি দীন নগণ্য পাড়াগেঁয়ে মানুষ—"

কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়, তাঁর এ বিনয় কৃত্রিম নয়। তরো কাব্যের মতো তাঁর মনও সহজ—অতি সরল।

আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় একদিন ইস্কুলে বাংলার ক্লাসে মাস্টারমশাই কুমুদরঞ্জনের 'শ্রীধর' পড়াতে-পড়াতে একটি লাইনে এসে থমকে গিয়েছিলেন—"আঁখিদ্রব মুকুতার মালা।" এবং তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বারবার বুঝিয়েছিলেন, কী গভীর সমবেদনায়, কী সূক্ষ্ম অনুভূতিতে মানুষের বিন্দু-বিন্দু অশ্রু মুক্তোর মালায় রূপান্তরিত হয়। সেই মাস্টারমশাই অবশেষে উক্তি করেছিলেন, "এমন অপূর্ব কবিতা আমি খুব কম পড়েছি।"

রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্য গগনে, তখন কুমুদরঞ্জনের আবির্ভাব। যে-কবি রবীন্দ্র-দীপ্তিতেও পাঠকসাধারণের কাছে নিজের একটা বিশেষ স্থান করে নিতে পারেন এবং রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর প্রতিভা স্বীকার করে নেন, তখন তিনি যে কবিত্বশক্তিতে কোনমতেই হীন ছিলেন না, সেকথাই আজকের পাঠকের মনে হয়—

"বন্দী সিংহ নগরের পিঁজরায়
গিরি-গহনের কুসুমগন্ধ পায়।
কাটিতে চাহে সে লতার শিকল,
চাতকের মতো আছে যে ঈগল,
পাহাড়িয়া ঝড় এসে লাগে তার গায়॥

কিংবা

"রাখিয়া গেলাম আঁখির পিয়াসা
আরতির দীপে তুলি,
হিয়ার ভকতি রাখিয়া গেলাম
পাদ্য-সলিলে গুলি।
মিশায়ে গেলাম বিদায়ের ক্ষণে
কাতর কামনা পথধূলি সনে
তোমার প্রসাদে ভিখারীর আজ
পূর্ণ হয়েছে ঝুলি॥"

মূলত ভক্তিরসালোকের যাত্রী হলেও কখনও কখনও কুমুদরঞ্জনের গায়েও পাহাড়িয়া ঝড় এসে লাগে। আর তখন কবিত্বের আবেগে তাঁর কবিতায় কাব্যধর্মই প্রধান হয়ে ওঠে—

"সব চেনা পথে গত চেনা ঘুম
দূরগতদের ভিড়।
পথতরু-শাখে উড়ো দিনগুলি
বাঁধিয়াছে যেন নীড়
কত শরাহত কপোতের ব্যথা
শ্যেনের তীক্ষ্ম রব
শুষ্ক তৃণের মঞ্জরীগুলি
যেন জেগে উঠে সব।
পর্যুৎসুকী মন—
স্মরে কত গত মহাসমারোহে
নীরব নিষ্ক্রমণ।"

কুমুদরঞ্জনের পরিধি সীমিত। তাঁর চেনা-জানা গণ্ডির বাইরে তিনি পা বাড়াতে চান নি। তিনি দেখেছেন, অজয়ের চর, অজয়ের বন্যা, ধান্য ক্ষেত, কুন্দর, শীতের অজয়, বকুলতরু, ঘোষালপুকুর, পুরানো বাড়ী প্রাচীন অশ্বত্থ, ভুঁই চাঁপা, জুঁই, ফিঙা, টুনটুনি—তিনি দেখেছেন, ডোমের মেয়ে, বাউল। কুমুদরঞ্জনের কাব্য অভিজ্ঞতায় সহজ হয়েছে—অনুশীলনে দুরূহ এবং বিশ্বব্যাপ্ত হয় নি। আর গ্রামের বাইরে তিনি যেতে রাজি নন বলেই তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা নির্দেশ করা সহজ—

"হায়রে আমি বৃথাই বকি
নড়বে না যে কোথাও সখি
গৃহই তাহার পৃথ্বী গোটা বিশ্বচরাচর।
নারায়ণকে যে চেয়েছে
এক ঠাঁইয়েতে সব পেয়েছে
দূরে যাবার নামেই প্রিয়ার গায়ে আসে জ্বর
কম্পনে লো, এই ঠিকানাই রইল অতঃপর॥"

কিন্তু হঠাৎ কখন আর এক আকাঙ্ক্ষায়, চঞ্চল চকোরের গগনবিহারে, আর এক অনুভূতি সেই একই কবির মুখে অন্য গান আনে—

"ভুলে যাই আমি গোটা এ-ভুবন
ভুলে যাই মোর গৃহ,
গগনের চাঁদ হইয়াছে আত্মীয়।"

কিংবা

"ঝঞ্ঝায় আমি শুনি হই অস্থির
ভাঙার শব্দ সোমনাথ মন্দির;
চিতোরী জহর-ব্রতের গন্ধ পাই,
উড়ে ঝঞ্ঝার দগ্ধ পুঁথির ছাই
ভস্মীভূত সে পুস্তকাগার আলেকজান্দ্রিয়ার।

আবার কুমুদরঞ্জনকে প্রশ্ন করি, "আপনি যদি অজয় কুমুরের ধারে না থেকে সেইন কিম্বা টেমস নদীর ধারে থাকতেন তাহলে কি আপনার মনে হয় না আমরা আপনার কাব্যে নতুন অভিজ্ঞতার সুর শুনতাম?"

"না, কিছুই হত না।"

"কেন?"

"যদি কিছু হয়ে থাকে এখানে থেকেই হয়েছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাকে এখানে রেখেছেন, তাঁর ইচ্ছা হলে, আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাবার প্রয়োজন হলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতেন।"

কুমুদরঞ্জনের মুখ দিয়ে তাঁর মনের সহজ কথাগুলি যেন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। তিনি থামেন না। এক মুহূর্তও ইতস্তত করেন না। আমি চুপ করে থাকি। এর পর তাঁকে কিছু বলা যায় না, কোন প্রশ্ন করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত মনুগ্রাহীজনের যুগে শুধু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ।

কিন্তু এই অনায়াস বিশ্বাস শুধু কুমুদরঞ্জনের কাব্যের সামগ্রীই নয়, তাঁর গোটা জীবন এই নিঃসংশয় নির্ভরে পূর্ণ। তাঁর মনে কোন দৈন্য, কোন অতৃপ্তি, কোন যন্ত্রণা নেই। এখনও শীত গ্রীষ্মে বর্ষায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায় ভোর চারটেয়। বাড়ির ছেলেরা চারপাশে ঘুরে-ঘুরে শোনায় বৈতালিক। এর ব্যতিক্রম নেই। গভীর নিষ্ঠায় পরিবারের প্রত্যেকে যেন পেয়ে যায় একটা নিশ্চিত আশ্রয়। জীবনের কোন অবস্থাতেই যেন কেউ নিরাশ্রয় উদভ্রান্ত বিশৃঙ্খল না হয়ে পড়ে তার জন্যে শৈশব থেকে মন প্রস্তুত করে দেন কুমুদরঞ্জন। তাঁর প্রত্যেক সন্তানই কৃতী—জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মাঝে মাঝে কুমুদরঞ্জনের মনেও যে প্রশ্ন জাগে না তা নয়। কিন্তু উত্তর তাঁর জানা

আছে বলেই ব্যাকুল সংশয়ে তাঁর মন আলোড়িত হয় না এবং হয় তো সেই কারণেই আবেগের তীব্রতায় তাঁর মিল, তাঁর ছন্দ গতানুগতিক প্রথা ছাড়াতে পারে না এবং নতুন চিত্রকল্পের সন্ধানে মন হাতড়ে সময় ব্যয় করবার প্রয়োজনও তাঁর হয় না—

"পুঞ্জিত পাপ যাহারা করিল জমা
এবারও তাদের তুমি কি করিবে ক্ষমা?
তোমার নামের তারা কি মহিমা বোঝে?
মদোন্মত্ত তারা কি তোমাকে খোঁজে?"

যে আজন্ম নির্বিবাদ ঈশ্বর-বিশ্বাস কুমুদ-রঞ্জনের সম্বল তা লালিত হয়েছে, আরও দৃঢ় হয়েছে গ্রাম্য পরিবেশে, অবাধ প্রকৃতির অনুকূলে আশ্বাসে। কুমুদরঞ্জন শহর-বিমুখ কারণ তাঁর অবচেতনে হয়তো একটা ভীতি আছে, এই আশ্বাস, এই লালনের সমর্থন বিজ্ঞানগর্বী যন্ত্রমুখর চঞ্চল কর্মময় নগরে মিলবে না। হয়তো তাঁর বিশ্বাস শিথিল হবে না কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে তপোবন-নির্জনতার অভাবে তিনি আঘাত পাবেন—বিচলিত হবেন—

"কাঠ-পাথরের শহরেতে হয় না আমার ঘুম
রাত্রি ভরি' হরঘড়ি সেই ঘর্ঘর গুম্‌গুম্‌!
স্বস্তি নাহি তিল, গর্জিছে হুইসিল,
কড়া নাড়ার নাই তো বিরাম,
যাতায়াতের ধুম।"

যে কবি শহর-বিমুখ বিজ্ঞানে তাঁর আস্থা এবং শ্রদ্ধা না থাকাই স্বাভাবিক। বহু পুরাতন প্রথা ও বিশ্বাস চূর্ণ করে বিজ্ঞান সভ্যতাকে যে এক নতুন রূপ দিচ্ছে, পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করছে নতুন-নতুন আবিষ্কারে সে কথা কুমুদরঞ্জনের মনে হয় না। শুধু বিজ্ঞানের ভয়ংকর বীভৎস রূপটাই তাঁর চোখে পড়ে—

"সভ্যতা এল সূক্ষ্ম শরীরে আণবিক পর্যায়ে
র‍্যাটল সাপের টোটেম তাহার গায়ে:
হাতে ঠগী-ফাঁস, কনক কলস কাঁখে,
উচাটন আর মারণ মন্ত্র হাঁকে,
বিভেদ এবং বিপ্লব-ডাকা
মঞ্জীর তার পায়ে।"

কিন্তু বিভেদ বিপ্লব মারণমন্ত্র কি পুরাণ রামায়ণ মহাভারতে নেই? কুমুদরঞ্জন তা গ্রহণ করেন, আত্মসাৎ করেন কারণ সেগুলি ঐশ্বরিক সুষমামণ্ডিত। এমন কি, তাঁর প্রেমও তিনি মেনে নেন স্বকীয় বিশ্বাসের অলৌকিক মর্যাদায়—

"হয়তো এমনি আলোক তিথিতে
তুমি যা বলেছ মিছে নয়
হল সাবিত্রী-সত্যবানের
শুভদৃষ্টির বিনিময়।
আজও শোনা যায় কলধ্বনি যে
সেই স্রোত বহা মালিনীর
বেতসকুঞ্জ তেমনি শোভন
হয়নি বদল অবনীর।"

কিন্তু পৃথিবী পরিবর্তনশীল। এই শান্ত ছবি, এমন নিঃসংশয় মন, এত সহজ বাক্য প্রয়োগ আধুনিক কবির পক্ষে কল্পনা

কথাও কঠিন। আর জটিল জীবনের জট খোলবার চেষ্টায় আজ নিঃসন্দেহে অন্যরূপ নিয়েছে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য। ঝরে গেছে বাসি মূল্যবোধ—অগ্রজের অটল বিশ্বাসে আস্থা নেই। এসেছে মড়ক মহামারী যুদ্ধ—এসেছে ভীতি সংশয় বিভ্রান্তি হতাশা অন্বেষণ। এসেছে নতুন শব্দ প্রতীক প্রতিমা। যুক্তির সোপান বেয়ে-বেয়ে চৈতন্যের আলোয় মুক্তি খুঁজেছে কবি। সংশয়-যন্ত্রণার সীমা ছাড়িয়ে আশ্রয় নিতে চেয়েছে মানুষীর হৃদয়ে। পিছটান, হতাশা বিসর্জন দিয়ে কর্মের প্রেরণায় উজ্জীবীত হতে চেয়েছে—

"তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে?
উন্মাদ, আজও হয়নি আমার মন
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান খান!"

কিন্তু তারও পরে নিসর্গ আর মনের আশ্চর্য সংগতি সংহত আবেগে ফুটে উঠেছে—

"এবং তুষারমৌলি পাহাড়ে
কুয়াশা গিয়েছে টুটে
এবং নীলাভ রৌদ্রকিরণে ঝরে প্রশান্ত ক্ষমা,
এবং পৃথিবী রৌদ্রকে ধরে প্রসন্ন করপুটে।
দ্যাখো, কোনোখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই;
আছে অনন্ত মিলনে
অমেয় আনন্দ, প্রিয়তমা।"

কিংবা—

"তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষাঋতু
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্রদহন
কখনো কি আর সাগরে মরুতে বাঁধবে সেতু
মেঘ-যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে
তুমি ছুঁয়ে যাবে মন?"

কখনো কখনো আত্মপ্রত্যয়ের ভিন্ন চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"অতএব তীর্থযাত্রী,
পাপিষ্ঠের মিথ্যে প্রতীক্ষায়
থেকো না, ভাসাও নৌকো।
অবিবেকী প্রাণের প্রবাহে
স্বর্গের প্রত্যাশা নেই,
মাথা কোটে মাটির মায়ায়—
অপার শূন্যতা জ্বালা
সংকলিত মাটির প্রবাহে
বহায় তৃষ্ণার গঙ্গা বন্যাতায়, আমার ঈশ্বর
মাংসল পেশীতে মূর্ত,
উৎকণ্ঠার পীড়নে সুন্দর।"

খাবার পর রাতে শোবার আগে কুমুদ-রঞ্জন বলেছিলেন, "কোন ভয় নেই এখানে, দরজা-জানলা খোলা রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও—"

দরজা-জানলা খোলাই রেখেছিলাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। ভয় লাগছিল। চোর-ডাকাত জীব-জন্তু মানুষের ভয় নয়—প্রকৃতির এক অদ্ভুত ভয়। আমি বাইরে তাকাতে পারছিলাম না, আমি ঘরে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না।

তন্দ্রাঘোরে ভয়ংকর নিস্তব্ধতায় বারবার চমকে উঠছিলাম। কোন শব্দ নেই, কিন্তু একটা প্রচণ্ড শব্দের তরঙ্গ যেন আমার শ্রবণ বিকল করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সুস্থ বলিষ্ঠ গাছগুলো অমাবস্যার গম্ভীর অন্ধকারে বুনো হাতির মতো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে আমাকে পিষে ফেলতে, এখনই লুপ্ত করে দেবে আমার চৈতন্য। নিদারুণ ভয়ে আমার শরীর-মন হিম হয়ে যাচ্ছিল।

পরদিন ভোর-ভোর কুমুদরঞ্জনকে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আর ঝরঝরে বাসটাকে মনে হল বড় চেনা। গ্রামের টানা পথ ধরে আসবার সময় তাকাতে পারলাম না বট অশ্বত্থ আম নারকেল গাছের দিকে, চোখ তুলে। আর দেখতে পারলাম না বিশাল আকাশ।

ভাল লাগছিল পেট্রোলের গন্ধ। আমি কখন দ্রুত গতি ট্রেন ধরব, শহরে পৌঁছব, কখন শুনব ট্রামের ঘণ্টা, ক্রেনের শব্দ—আমি প্রহর গুনছিলাম।

হাওড়ায় প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষের ভিড়। ব্যস্ততা। চিৎকার। দূরে নতুন-পুরনো এঞ্জিন। লাল সবুজ বগি। সান্টিং ইয়ার্ডে হুস হুস শব্দ। হুইসেলের আওয়াজ। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম খণ্ড আকাশ। সূর্যের আলোয় রূপোলি হাওড়া ব্রিজ ঝলমল করছে—

"ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল
আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে
আরো বড় চেতনার লোকে;
অনন্ত সূর্যের অস্ত
শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক
সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে
মেনে নিতে হয়;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব;

অচিরাৎ

নিখিলকুমার নন্দী

সারাদিন সঙ্গে ছিল এক পাখি।

সঙ্গী ছিল সারাদিন নীল পাখি।
পাখা যার
ডুব-আকাশ। বুকে তার
দুপুরের মেঘ।
কক্ষহীন পক্ষহীন কী যে সেই উত্তীর্ণ আবেগ!
কলকণ্ঠ পাখি সেই সারাদিন সঙ্গে উড়ে উড়ে
কাছে কাছে ঘুরে
দুর্গমের দিয়েছে সংবাদ
কী যেন সে দুরূহ বিষাদ
সহবাস-মালা, তার
শঙ্খসাধ অস্তিত্বে ছড়িয়ে
বহু দূর বহু পথ গিয়েছি ছাড়িয়ে
নিরুচ্চার নিরুপম নীলকণ্ঠ কপিশ দুরাশা
যেন আকাশের চিত্র চিত্রাবলী সার
পাখা তার;
স্নেহক্ষরা দ্রবদূর্বা বুক যার
ঘনপয়োধর মেঘ, মেঘের ঝংকার
সঙ্গী ছিল সারাদিন সেই পাখি, সেই নীল পাখি।

২

তারপর একা-একা সমুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা এলে
কমলা গোধূলিরথে রাত্রি ঘনালে
মেঘে মেঘে জ্যোৎস্না জড়ালে
দীপ্তনীল জোনাকির স্বর্ণপথ ধরে
রাত্রিরূপ ঘন গাছে গাছের বিবরে
সেই পাখি
সেই নীল পাখি
ঘননীল রাত্রি—নীড়—রাত্রি চেয়ে
রাত্রিবাস অঙ্গ ছেয়ে
আসঙ্গ আহ্লাদে স্বেদপিচ্ছিলতায়
উড়ে উড়ে যায়
দূরে ঘুরে যায়।
হায় নীল পাখি
আমি তার দিনময় চিন্ময় উদ্ভাসনায়
পথ চলি চলাপথ পথ চলি পথচলা পায়......
শিশিরার্দ্র ফিরব একাকী।
হায় সঙ্গময় সঙ্গীহারা
সেই কলকণ্ঠহারা
নীল
হায় নীল পাখি।

সারাদিন সঙ্গে ছিল এক পাখি।

জাদুঘর

অসিত দত্ত

মুহূর্তকে কে রাখতে পারে বিধৃত আপন করতলে?
কে পারে সময় থেকে তুলে নিতে সমুদ্রের স্বাদ?
কে পারে বিস্মৃত হতে হৃদয়ের গভীর আঘাত,
কেউ পারে নাকি? কেউ নয়, মূঢ়, বুকে দাহ জ্বলে।

অবিরাম জ্বলে পোড়ে নষ্ট করে নিবে যায় ক্ষয়ে।
শুধু কি আমার ঘরে পড়ে আছে শোক পুঞ্জীভূত?
বেদনা হতাশা দুঃখ অবসাদ এখানে আহূত,
শুধু কি আমার স্মৃতি দাহ্য এই নিষ্ঠুর সময়ে?

চেয়ে দ্যাখ্ চারিদিকে অপোগণ্ড পুরুষ রমণী
কাতারে কাতারে ঘোরে গভীর নেশায়, যত্নে অতীতের শব
দেয়ালে টাঙিয়ে ঢাকে এই শীতে গ্রীষ্মের টগরে।
পাখি এসে বাসা বাঁধে যেখানে একদা ছিল
কত রক্ত বহুমূল্য খনি,
তারা সব ভুলে যায়, সুখ দুঃখ শোক স্মৃতি, সব।
শুধু তুই জ্বলে যাস একা মৃত রিক্ত জাদুঘরে।

বিশ্বচিকিৎসা

মাথাধরা সম্পর্কে গবেষণা

অধুনা মাথাধরা নিয়েই আমাদের যত মাথা ব্যথা। বলতে গেলে মাথাধরা এখন একটা নিয়মিত ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে এবং মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যন্ত্রণাদায়ক এই ব্যাধি থেকে অব্যাহতিলাভের কোন পথও দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত এই মাথাধরা কেমন করে নিরাময় করা যায় তা নিয়ে সারা পৃথিবীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের নিদারুণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়েছে।

আমেরিকায় এ নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলছে এবং এ জন্যে নিউ ইয়র্কের মন্টফিওর হাসপাতালে পৃথক একটি বিভাগই রয়েছে। এর নাম হেডেক ক্লিনিক (Headache Clinic)। আমেরিকার প্রখ্যাত স্নায়ুরোগ ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আর্নল্ড পি ফ্রায়েডম্যান এই ক্লিনিকের পরিচালক। এই ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। শুধুমাত্র মাথাধরা নিয়ে গবেষণা করা ও তার চিকিৎসা করা এই ক্লিনিকের কাজ এবং এ ধরনের ক্লিনিকের মধ্যে এইটিই সর্ববৃহৎ। মোট চৌদ্দজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোরোগবিদ্, অ্যালার্জি-বিশেষজ্ঞ ও এক্স-রে বিশেষজ্ঞ এখানে কাজ করেন। এছাড়া সেবিকা ও যন্ত্রকুশলীরাও আছেন। এই ক্লিনিক যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের দশ সহস্রাধিক রোগীর চিকিৎসা ক'রে শতকরা নব্বইজনকে সুস্থ করে তুলেছে এবং এইভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষকেরা বিশ্বাস করেন যে, মাথাধরার উৎস মাথার মধ্যে নয়, অন্যত্র। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ক্লিনিকে গবেষণা করা হচ্ছে। ডাঃ ফ্রায়েডম্যান "নিউজউইক" পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে বলেছেন : "আমরা আমাদের রোগীদের মাথাধরার চিকিৎসা করতে গিয়ে কাঁধের ওপরের কোন অংশের চিকিৎসা করি না, করি তার নিম্নাংশের।"

যে মূল কারণ থেকে মাথাধরার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, মাথাধরা শারীরিক বা মানসিক বিপর্যয়েরই একটি লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীকে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। যথা, যন্ত্রণাটা ঠিক কোন্ জায়গায় হচ্ছে—কপালে, মাথার ওপরে, না, ঘাড়ের পিছনে দিকটায়? কোন্ সময়ে সাধারণত মাথাধরা শুরু হয়? মাথাধরা কি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, না, ধীরে ধীরে কমে যায়? অস্বাভাবিক কাজের চাপ, মস্তিষ্ক চালানর ফলে অথবা খাওয়ার পরে মাথাধরা কি বেড়ে যায়? এর সঙ্গে অন্য কোন উপসর্গ থাকে কি—যেমন, বমির ভাব, কানে ভোঁ ভোঁ করা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া ইত্যাদি?

প্রত্যেকটি রোগীকে পরীক্ষা করা হয় খুব ভালভাবে। রক্ত-পরীক্ষা থেকে শুরু করে মাথার এক্স-রে পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় অতি আধুনিক যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে কি ধরনের বুক-ধড়ফড়ানি হচ্ছে তা ধরা পড়ে, মাংসপেশীর আক্ষেপ কতখানি হচ্ছে তা বোঝা যায়। এছাড়া এ সমস্ত যন্ত্রে মাথার ধমনীগুলির চাপও ধরা পড়ে।

সমস্ত পরীক্ষার পর রোগীর একটি বিস্তারিত ইতিহাস প্রস্তুত করা হয়। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার ফলাফলও থাকে

এর মধ্যে। "ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বলেছেন, "যারা পুরাতন মাথাধরা রোগে ভুগছে, তাদের চিকিৎসায় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক।"

মাথাধরা রোগে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও ডাঃ ফ্রায়েডম্যান মনে করেন, এ-রোগের চিকিৎসায় রোগীর ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করা

ভবিষ্যতে অন্ধদের দেখতে পাবার একটি সম্ভাব্য উপায়—"বাদুড় রাডার" অভিহীত যুক্তরাষ্ট্রের লকহীড মিজাইল এণ্ড স্পেস কোম্পানী উদ্ভাবিত এই জটিল-চেহারার সরঞ্জামটি সামনের কোন প্রতিবন্ধক জানতে এবং পাশ কাটিয়ে যাবার সহায়ক

এবং ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা অধিকতর প্রয়োজন। যাঁরা প্রচণ্ড মাথাধরা রোগে ভুগে থাকেন, তাঁদের জন্য চোখের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, মানসিক ও স্নায়বিক চিকিৎসার বিধান দেওয়া হয়।

মন্টিফিওর ক্লিনিকে ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, যে ধরনের মাথাব্যথা খুব সাধারণভাবে দেখা যায়, তার মূল কারণ হল মাথা ও ঘাড়ের মাংস-পেশীর ক্রমাগত সংকোচন, দীর্ঘ সময় কোন কাজে মনঃসংযোগ বা নিবিষ্টচিত্ততা, অনুশাসন, যাতে মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন অথবা ভাবাবেগপ্রধান এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

আর-এক ধরনের মাথাধরা আছে, যার উৎসমূল স্নায়ু। একে মাইগ্রেন বলা হয়। এটিও প্রায়শঃই দেখা যায়। সাধারণত এই ধরনের মাথাধরার সংগে বমনেচ্ছা ও বমন দেখা দেয়। ডাঃ ফ্রায়েডম্যান বলেছেন, এই ধরনের মাথাধরার কারণ জানা নেই, তবে তাঁরা যে সমস্ত প্রমাণ পেয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, মাইগ্রেন রোগীরা পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না।

তিনি বলেন, এই ধরনের মাথাধরায় দেহ-যন্ত্রগুলিতে যে পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং যার ফলে এই রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই রোগাক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে মস্তিষ্কের কোন এক স্থানে ধমনীগুলি সংকীর্ণ হয়ে যায়।

ডাঃ ফ্রায়েডম্যান মনে করেন, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই মাইগ্রেনের আক্রমণ বেশি হয় এবং এর কারণ সম্ভবত নারী ও পুরুষের মধ্যে মনতাত্ত্বিক বিভেদ।

মাইগ্রেন উপশমের একটি নতুন প্রক্রিয়া বেরিয়েছে। শিকাগোয় আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত "আরকাইভস অব অপোলারিংগোলজী" গ্রন্থে এর উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ছোট্ট ইনহেলারের মধ্যে এই মাথাধরার ওষুধ থাকবে। ওষুধটির নাম আর্গোটামাইন টারট্রেট। ছোট ইনহেলারের মধ্যে থাকার ফলে স্বল্প পরিমাণ ওষুধের আঘ্রাণ নেওয়া যাবে। দ্রুত রোগ উপশমে এই প্রক্রিয়া খুবই কার্যকর।

বিভিন্ন ধরনের মাথাধরা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং এই রোগ নিরাময়ে অনেক অগ্রগতিও হয়েছে, একথা সত্য। তবুও ডাক্তাররা মনে করেন, এবিষয়ে গবেষণার কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ গবেষণাগারে জীবজন্তুর ওপর এ-পরীক্ষার কাজ চালানো যায় না, মানুষের ওপরই মাথাধরার ওষুধের পরীক্ষা চালাতে হয়।

✻ চিত্র প্রদর্শনী ✻

শিল্পকর্মে প্রতিভার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের জন্য এখনও আমাদের দেশে শিল্পীকে যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয় তারই একটি দৃষ্টান্ত শ্রীরাখালচন্দ্র দাস। কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজ থেকে পাস করলেও চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা এবং শিল্পগুণে তাঁর রুজি রোজগারের উপায় করে দিতে অক্ষম হয়। এটা হয়েছে আমাদের দেশের জনসাধারণের শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা বিষয়ে উদাসীনতার জন্যই। তা নয়তো শিল্পী দাসের যে গুণের অভাব নেই এবং প্রকৃতই যে তিনি প্রতিভার অধিকারি সেটা গত ৯ই নভেম্বর থেকে আকাদমি অফ ফাইন আর্টস গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপি তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী থেকেই বোঝা গেল। বাস্তবধর্মী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর রূপায়নে অত্যন্ত কৃতি এই শিল্পীকে জীবিকার জন্য স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভারের কাজ নিয়ে থাকতে হয়েছে।

অবসর সময়ে আঁকা বিভিন্ন ঋতুতে এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের বন, উদ্যান, গ্রাম্য পথের দৃশ্যাবলী সূক্ষ্ম রেখা ও মনোরম রঙের বিন্যাসে দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অনুভূতির পুলক জাগিয়ে তোলার মতো কৃতিত্ব দেখা যায়। প্রদর্শিত মোট বাইশখানি ছবির মধ্যে অধিকাংশই প্রাকৃতিক দৃশ্য। এর মধ্যে 'ধূসর আকাশের নিচে', 'সবুজ উপত্যকা', 'রঙের রাগিণী', 'গ্রামে সূর্যাস্ত', 'গাছের ফাঁকে পুষ্করিণী' প্রভৃতি ছবিগুলি যে কোন প্রদর্শনীতেই প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য। 'শহরের গলি' এবং 'ডাঃ রায়ের শবযাত্রা' ছবি দুখানি একটু বৈচিত্র্য যোগ করে। মানুষের প্রতিকৃতিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবময় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় 'লালিমা', 'সুষমা', 'জনৈক অভিনেতা' এবং 'স্নেহময়ী মা' ছবি চারখানিতে। 'একটি মেয়ের পশ্চাতে একজন পুরুষ' ছবিখানিতে ইম্প্রেসানিস্টিক রীতিতে চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই ধারায় এখনও তিনি তেমন দক্ষতা আয়ত্ব করতে পারেননি যতটা দেখা গেল নয়নাবিমোহন রঙের সমাবেশে বাস্তবধর্মী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ক্ষেত্রে।

• • • •

শিল্পী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর তৃতীয় একক চিত্রপ্রদর্শনী গত ১০ই নভেম্বর আর্টিস্ট্রি হাউসে উদ্বোধিত হয়। তেলরঙ (প্যাস্টেল ও তুলি উভয়ই), জলরঙ এবং স্কেচ মিলিয়ে মোট পঁয়তাল্লিশখানি ছবি এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পীর কর্মদক্ষতার পরিচয় লাভের সুযোগ অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু একটি প্রদর্শনীতে সংখ্যায় এতগুলি ছবি সাধারণ দর্শকদের কাছে ভিড় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং ফলে তাদের পক্ষে খুঁটিয়ে দেখার অসুবিধে হয়।

লালিমা শিল্পী : রাখালচন্দ্র দাস

বিষয়বস্তুর দিক থেকে শিল্পী শ্রীচক্রবর্তীর প্রবণতা দেখা গেল মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন মুহূর্ত এবং পারঘাট ও জেটির প্রতিই বেশী। 'সান্ধ্যভোজন', 'রামবাবুর সংসার', 'সান্ধ্য আলাপ', 'একটি পরিবার', 'প্রসাধন', 'ছাদের উপর', 'ত্রয়ী' প্রভৃতি ছবিগুলি মধ্যবিত্ত জীবনকে রূপায়িত করেছে। 'পথের ধারের ফেরিওয়ালা', 'রাস্তায় ঘুমন্ত মানুষ' ও 'বাজারে' ছবি কখানি বৈচিত্র্য যোগ করেছে। 'নদীর ধারে', 'অলস নৌকার সারি' ছবিগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিতে না পারলেও শিল্পীর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। মধ্যবিত্ত জীবনকে যেমন, তেমনি নদী ও গঙ্গার দৃশ্যাবলীতে স্তিমিত গাঢ় রঙের প্রয়োগে একটা ভাবময় ছন্দোবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টিতে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কাঙর গ্রাম' 'পাইনের সারি', 'নিঃসঙ্গ সওয়ার', 'মেঘ', 'শকট বাহিনী' প্রভৃতি ছবিগুলিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর রূপায়ণেও ব্যক্তিত্বপূর্ণ একটা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচখানি স্কেচ থেকে এই মাধ্যমে শিল্পীর যে বেশ হাত আছে সেটা উপলব্ধি করা যায়। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে যেমন তেমনি চিত্রায়ণে শিল্পী মূলত বাস্তবধর্মী এবং সে বিষয়ে বেশ বলিষ্ঠ কৃতিত্বের তিনি অধিকারি।

প্রদর্শনীটি ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

ত্রয়ী

✻

...চিৎকার
...আছে।
...ক। গিজ...
...ড়িয়ে ...

সৌদামিনী মালো

শওকত ওসমান

'একটু দাঁড়াও।'

আমার বন্ধু নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাঁটতে হাতে হেঁচ্‌কা টান দিয়ে বললে।

"কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।"

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। খাজনা-সংক্রান্ত একটা মামলা ছিল, তার দিন পড়ে গেছে। সুতরাং এখানে এই টাউট-দালাল উকীল-মোক্তারের দঙ্গলে আর এক তিল দাঁড়াতে মন চায় না।

কিন্তু আমার মামলায় তদবির, যুক্তি-পরামর্শ, উকীলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়ায় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়।

আমার আরো আপত্তি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতকটা কিল্লাত ঘুরে মক্কা আসার মত। কোর্ট টিলার উপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নীচে নেমে আবার উপরে উঠতে উঠতে জান খারাপ। রীতিমত হাঁপানি ধরে যাবে।

তবু নাসিরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটে নি। আর সময় কাটবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক্ত লোক। তার হাতে হাল সঁপেই আমি নিশ্চিন্ত। এই ক্ষেত্রে আর ঘাড় বাঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরো বাড়াতে রাজী নই।

কিন্তু টিলা-পথে যথারীতি নেমে আবার উপরে ওঠার সময় তামাশা দেখা গেল। আদালতের পেছনে একফালি মাঠের উপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পাদ্রীকে ঘিরে। যীশুখৃষ্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা, ফর্সা লম্বাটে চেহারা। গলায় ক্রশ ঝুলছে।

"এ ত আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন!" নাসির হঠাৎ বলে উঠল।

আমরা ক্রমশ উপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, "আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেট করার অপরাধে আমার কোর্টে ব্যাটা কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনী বলব। এখন পা চালাও।" দুজনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃদ্ধকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়।

অকুস্থলে দেখা গেল, লোকজন কম জমে নি। ব্যাপার কী। ব্রাদার জন তখন চিৎকার করছে, "এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। very good ভেরি গুড।"

আমরা দুই কৌতূহলী দর্শক। গিজ্‌গিজ্‌ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

পাদ্রী হাঁকছে, "দর্শক মণ্ডলী!" আমি তখন নাসিরকে বললাম, "বেশ বাংলা বলে ত।" "বহুদিন এই দেশে আছে বলবে না কেন?" নাসির জবাব দিয়েই আবার পাদ্রীর উপর চোখ ফেললে।

পাদ্রী হাঁকতে লালগ, "দর্শকমণ্ডলী! এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। এক প্লটে বারো 'কানী' জমি। পুকুর। আর আছে তিন "একর" জমির উপর বসতবাড়ি, পুকুর গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচুগাছ, পাঁচটা—আরো ফ্রুট-ফলের গাছ আছে। এখন নীলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত—" ব্রাদার জন দম নিল।

কৌতূহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ণ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইলে, সম্পত্তি কার?

"এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে, সৌদামিনী মালো সিস্টার।"

"আজব নাম!"

পাদ্রী বাগাড়ম্বর শুনে আরো বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর-গলায় বলে উঠল, "সৌদামিনী মালো চার্চের সিস্টার—বহেন্, ভগ্নী ছিল। তিনি এক মাস মারা গেছেন। চার্চ তার সম্পত্তি নীলাম করছে।"

শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদ্দুর বেশ নিদয়। হঠাৎ গরম পড়ছে।

নেপথ্যে একজন বললে, "সাহেব, জল্দি করো।"

"অল্‌রাইট" উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হে'কে উঠল, "সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি। এবার নীলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিডিং করুন। 'হায়েস্ট বিডার' উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।"

পাদ্রীর সঙ্গে দুজন কুলি শ্রেণীর যুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ-ইশারা মত একজন হে'কে উঠল, "পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।"

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, "পাঁচ হাজার পাঁচ শ'।"

পাদ্রীর সহকারী হাঁকলে, "পাঁচ হাজার পাঁচ শ'। আর কেউ ডাকবেন?"

কিন্তু আর কারো হাঁক-ডাক শোনা যায় না। অবিশ্যি দর্শক-মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথার। পাদ্রী-সরকারী আবার হাঁক দিলে, "পাঁচ হাজার পাঁচ শ'—এক—পাঁচ হাজার পাঁচ শ'—দুই—"।

হঠাৎ একজন ডাক বাড়ালে, "ছ' হাজার।"

"ভেরি গুড্" ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সরকারী ছ হাজার ছ হাজার রবে আরো কয়েকবার হক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাড়ল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা ত নেই। পেন্সনে যে ক'টা টাকা পাই, তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি সস্তায় পাওয়া যেত। বড় আফসোস হতে লাগল। দাঁড়িয়েছিলাম, সম্পত্তি কোন্ ভাগ্যবানের পাতে যায়, তা' দেখার জন্যে।

নীলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন হাজারের পর আর দাম শতে-শতে লাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে, 'ন' হাজার ন' পঞ্চাশ'। আরো পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাদ্রী-সহকারী হাঁক দিতে লাগল, 'দশ হাজার এক—দশ হাজার দুই—।' তারপর সে স্তব্ধ। জনতা নীরব। তিন বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

ওদিকে রোদ্দুর বাড়ছে। বৃদ্ধকালে তবু কেন দাঁড়িয়ে ছিলাম? আজ বলতে লজ্জা নেই। হয়ত সম্পত্তির লোভে। ক্ষুধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরো পঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার একশ'। বোঝা গেল, নীলাম-ডাকিয়েদের পকেট শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নদারাৎ। যিনি শেষ পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়াচ্ছিল সে অপরের কাঁধের উপর দিয়ে।

প্যাণ্টী-সহকারী হাঁক দিলে, "দশ হাজার একশ'—এক—দশ হাজার এক শ—দুই—"। সে থামলো তারপর। পাঁচ ছ' মিনিট কেটে গেল। আর "তিন" উচ্চারণ করে না সে। এবার লোকটাকে দেখলাম যে দশ হাজারের উপর একশ' বাড়িয়েছিল। মাঝ-বয়সী লোক, কিন্তু বুড়ো-বুড়ো ঠেকে। প্যাণ্ট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখমলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখে মুখে। কতক্ষণ আর নীলাম-কর চুপ থাকতে পারে? কিন্তু 'তিন' আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। তার চেয়ে বে-সবুর যিনি ওস্তাদের মার দিয়েছেন শেষ সময়ে। সে ত জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা বেধে গেছে। কৌতূহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে, রোদ্দুর সত্ত্বেও নড়ে না।

ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ সপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, "দর্শকমণ্ডলী!"

কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। নীলামদাতা এবার কী করবে?

ব্রাদার জন মুখ খুললে; যেন গীর্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচার বেদী থেকে 'সার্মন' দিচ্ছে, এমনই কণ্ঠস্বর: ভ্রাতৃগণ, আজ নীলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামী-কল্য পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার একশ' হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন।

দর্শকদের মধ্যে অনেক গুলতানি শুরু হল। আর টুপি-পরা সেই শেস-পোঁচ মারা নীলাম-শিল্পী ত রেগেই খুন। ব্রাদার জনের চারিদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, "This is sheer hypocrisy এটা জোচ্চুরি...ইত্যাদি।" আমার কৌতূহলের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সান্নিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই। নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললেন, "আর ভিড়ে সাঁধিও না।"

—একটু মজা দেখে যাই।

—আর মজা দেখে কাজ নেই। যা' গরম সর্দি-গর্মি হয়ে মরবে। চলো বাড়ি যাই।

—একটু দেখে যাই না।

—দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব বৃত্তান্ত শুনে নিও।

আকাশে সূর্য তখন দোজখের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলুম।

আবার চড়াই-উৎরাই। ওঠা-নামার ব্যাপারটা এমন কষ্টকর।

নাসির হেসে বললে, "আরো মজা দেখতে গেলে আমাদের মজা ভেঙ্গে যেত।"

রসিকতার দিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, "নাসির ব্যাপার কি?"

সে বেশ মাথা দুলিয়ে হঠাৎ ব্যঙ্গ আর ক্রুরতা-মাখানো এক রকমের হাসি ছড়িয়ে শেষে মুখ খুললে, "বাবা, এর নাম ব্রাদার জন!"

"জন"?

—হ্যাঁ, ও এক জন বটে। আমার কোর্টে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম What have you to say তোমার কি বলার আছে? জন জবাব দিলে, 'End justifies the means.' উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছি ভিক্ষুকদের লঙ্গরখানায় ভাত প্রদানের জন্য।

—অপরাধ স্বীকার করলে?

—হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাস। আজ দেখলে না, কিভাবে ম্যানেজ করলে।

—কি ম্যানেজ?

—ঐ সম্পত্তির দাম কমসেকম পঁচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে, চোখ নাচিয়ে, জনের বাহাদুরীর অবস্থাটা ফোটাতে চাইল।

—কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, তার নীলাম করছে ব্রাদার জন? এ ব্যাপারটা কী?

নাসির তার সাদাচুল-মাথা দুলিয়ে চোখের কোনায় হাসি মাখিয়ে জবাব দিলে, "সেটাই ত মজা।"

—মজা?

——শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মত চিজকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।

—ত বয়ান করো।

—বেলার দিকে খেয়াল আছে? খেয়ে-দেয়ে এসো সন্ধ্যায় আমার বাড়ি, তখন সব সবিস্তার বলব ব্রাদার জন সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।

—না, অত দেরী করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।

—বেশ!

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উৎরাই শেষ হয়ে গেছে। তাড়া-তাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাতে লাগলুম।

॥ ২ ॥

জানো সাজ্জাদ, ভাবছি, কোথা থেকে আরম্ভ করব? ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোল্লা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে বলতে পারো। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে শুরু করতে হয়।

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধি-বাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ঐ অঞ্চলে কতদিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা ত চেনই। অবিশ্যি তখন ওখানে মিশনের পাদ্রী ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালই। এদের আবার ভালমন্দ কী? বৃটিশ রাজত্বের ভিত পাকা করতে এদের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হত, যেন দরকার মত আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরিব দেশে এখানে-ওখানে দু' চারটে দাতব্য ডিস্পেন্সারী, কি এক-আধটা স্কুল চালায়। লোকেরা ভাবে, আহা কি সব দয়ার প্রাণ! বৃটিশরা ভালই জানত, The nearest way to poor man's heart is down their throat—ইংরেজেরই প্রবাদ। ওরা এইভাবে কিছু কিছু খৃষ্টানও বানায়। তারা ত ইংরেজের খয়ের-খাঁ বনে যেত। বলতে পারো—ইংরেজ বাহাদুর এমনভাবে কিছু দেশী বাচ্চা তৈরী করত। নদীয়ার কাছে ত কত মুসল-মানকে ওরা এইভাবে খৃষ্টান করে ফেলে। পড়োনি নজরুলের 'আত্ম-কথা'? আসলে এরা কেউ যীশুখৃষ্টের ভৃত্য নয়, এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভৃত্য। হ্যাঁ, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম। একটু ধৈর্য ধরে শোনো। বৃদ্ধকালে তাল রাখা দায়। কথায় কথায় অনেক দূরে চলে গেছি।

হ্যাঁ, সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আরদালী। কিন্তু বেজায় তুখোড় লোক। প্রভুর মন যুগিয়ে চলার শিল্প সে বেশ রপ্ত করেছিল। যে-কোন অফিসারকেই খুশী করার পন্থা-আবিষ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মুলো ভালোই পেত। বখশিসে মোটা পেট, এমন আরদালী তুমি দুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি অবিশ্যি তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। তখন সস্তার বাজার। পুরো বেতন বাঁচল, তার উপর উপরি ইনকাম। আর সে ত মিশরের সম্রাট হতে চায়নি। চেয়েছিল, গ্রামে দু'চার বিঘে জমি-জিরেত, একটু অনটন-মুক্ত দিন-যাপন। পনর বিশ বছরের চাকুরীতে জগদীশ তা পুষিয়ে নিলে। কিন্তু বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলে-পুলে নেই। এখন না হয় ফ্যামিলি প্ল্যানিং—"জমিন আবাদ, বাচ্চা বাদ" ধুয়া শুনছো। ক' বছর আগে কে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাত? জগদীশের, মোদ্দা কথা, ছেলেপুলে হয়নি। সে-যুগে কে বন্ধ্যা, তা ত আর ঠিক করা যেত না—গেলেও, গাঁয়ে এসব রেওয়াজ ছিল না। সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ ত গুম করে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায়নি। হঠাৎ মরে গেল। অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে। কু-লোকেরা রটিয়ে দিলে, সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বংশ রক্ষা হক, কিন্তু অপরের সন্তানে নয়। সৌদামিনী ভিতরে ভিতরে হয়ত এমন একটা দুর্জয় পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এই সব ক্ষেত্রে কোন মেয়ে কী করে, বোঝা দায়।... কিন্তু তুমি বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে—তা অনুমান করা মুশকিল? মুশকিল কিছুই নয়। এমন হতে ত পারে। আমিও বলছি, গুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোন তদারক হয়নি। তখন সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ পার। জগদীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কী ওদিক। হয়ত যৌবনের থাই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে—তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মিলাতে পারেনি। অতএব দুষ্ট গরুর চেয়ে

শূন্য গোয়াল আচ্ছা। আমিও বলছি, অনু-স্নানের কথা। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সে-ও হুঁশিয়ার মেয়ে। আর রব-দব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার উপর সম্পত্তি। গ্রামের দু'চার জন ছুঁচোর মত হয়ত ছোঁ-ছোঁ শব্দে ঘুরঘুর করেছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগদীশেরই বউ হয়ে থাকল। অপবাদ কেউ দিতে পারলে না। অবিশ্যি জগদীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোন আত্মীয়ের নামে সম্পত্তি লিখে-পড়ে সৌদামিনীকে জীবন-স্বত্বের অধিকারিণী করে দিতে পারত। কিন্তু তা' হওয়ার যো ছিল না। ওর নিকট-আত্মীয় ছিল জেঠতুতো দাদা। সে স্বদেশী করত। জগদীশ সরকারের পেয়ারের লোক। অন্যদিকে স্বদেশীবাবু। সাপে-নেউলে আর কি দিয়ে বন্ধুত্ব হবে? এসব কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তা হলে সব বুঝতে পারবে। জগদীশ ত মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ঐ আত্মীয়ের লোভ সহজে কি মেটে? অবিশ্যি আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশীবাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তারও বয়েস হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপুলে আছে। জেলটেল খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশীবাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে গুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলান এবং তৎ-মত্ততায় দু'চার পয়সার দালালী বা টাউটগিরি কমিশনে একটা আয়ের পথ ত খোলা যায়। এক কথায় স্বদেশীবাবুর শুভ্রতা তার টুপির মধ্যেই নিবন্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। ভুল বললাম, বউদি নয়, সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কঠোর হওয়ার মত যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার হীরার চেয়ে শক্ত হতে পারে, যত বাগড়া ত সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। মনোরঞ্জন মালো প্রথম প্রথম কতগুলো স্ট্র্যাটেজি—পাঁয়তাড়া কষে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনীর কলাবাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়েব। কিছু চারাগাছ মাড়ানো। কিন্তু বিধবা পাড়াপড়শীদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এল। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাত্রে সে বন্দুক ছুঁড়ত। কমিশনার সাহেব জগদীশকে নিজের বন্দুক দিয়ে দিয়েছিলেন বখশিসস্বরূপে। অস্ত্রখানা এখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তাছাড়া তার তাক আশ্চর্য। বাড়ির উঠানে চিল ঢুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন ফেল মারলে। বউদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপর্যাপ্ত। অবিশ্যি সৌদামিনীর হাতে কয়েকটা লোক ছিল। তার জমিনের চাষী, কয়েকজন। তারা বলত, "মায়ের অন্নে প্রতিপালিত, মার ত অপমান হতে দিতে পারি নে।" স্বদেশীবাবুর সে-ও একটা ভয়। ছোট লোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরস্থর মুর্গী দেখলে জিভে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন তাকায় আর লোভের চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্যি সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে, বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ সাদা, দেহে প্রৌঢ়ত্বের রেখা। কিন্তু আদাওতি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশী-বাবু।

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে ত পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর ঢের বেশী রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভাল নয়। য়ুরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। ফলে ডোনার্স'রা আর খাত-মত চাঁদা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয়-বৃদ্ধির উপায় একটা করতেই হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত। মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কারণ, বাবু এলাকার সবচেয়ে ভাল ইংরেজী কইয়ে-বলিয়ে। ভাষা মারফৎ একটা অদৃশ্য যোগ-সূত্র গড়ে ওঠে। অবিশ্যি তখনও পাদ্রীর ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা হত, তা খোদাকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী [illegible] মুখে ছাই

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট-দশ-বিশ মাইল দূরে দূরে তার মাতৃকুলের কিছু ভাইবোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মানুষের প্রাণ ত হাঁপিয়ে ওঠে। সৌদামিনী বছরে এমন দু'একবার দম ফেলতে বেরুত। তখন ঘর পাহারা দিত তার চাষী এবং কামীনেরা। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার সে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর দুয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোষ্যপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোষ্যপুত্র? সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন মালিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারী। সৌদামিনী তাকে মানুষ করে তুলতে নিজের সামান্যতম আরাম পর্যন্ত বিলিয়ে দিলে। এবার সৌদামিনী জননী; যেন সদ্য আতুড়-ঘর-ছাড়া। চব্বিশ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা ফর্সা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দু'টো ঝিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশী বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাড়া-পড়শীর চক্ষুশূল। ওর জন্যে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলে বাড়ি এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আরো পাঁচ-ছ'বছর এইভাবে কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্যি চুল পেকে গেছে। চেহারা নিষ্প্রভ। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিগ্ধতা, দয়াসঞ্জাত এক রকমের তাপহর-স্পর্শ। অবিশ্যি মনোরঞ্জন বসে নেই। তারও বয়স বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংসার। অর্থাৎ সর্ব রকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন গেরো এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো। একটা মেয়ে-মানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা বরকন্দাজের উপপত্নীর (হোক বউদি) কাছে? একটা কিছু করতে হয়। রাদার জনের মিশন চলছে না ঠিকমত। রুজি-রোজগার প্রয়োজন। একদিন ওদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। মনোরঞ্জন মনে মনে এসব লংকাভাগ করেছিল নিশ্চয়। আঁচ করতে পারো সাজ্জাদ। ....হ্যাঁ, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোমা ফাটালে, স্বদেশী আমলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।

পোষ্যপুত্র জাতে নমঃশূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ। কী ভয়ানক শাস্ত্র-বিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী। রাম, রাম। মনোরঞ্জন এই ঢিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু'চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়েত-মাহিষ্য ছিল, তারা দাঁতে আঙুল কাটলে। ছিঃ ছিঃ, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়স বেশী, তারা মন্তব্য করলেঃ কলিকাল। সৌদামিনীকে গ্রাম্য-সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। সে বেশ জোর দিয়ে হলপ করে বললে, হরিদাস শূদ্র— তার দূরসম্পর্কীয় এক গরিব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাতত ঐখানে চুকল। কিন্তু সৌদামিনীর বিরুদ্ধে ত মনোরঞ্জন একা নয়। আরো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আছে। সুতরাং গ্রামের অচ্চল নিষ্কর্মা প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খোঁজ নিয়েই দেখা যাক্। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহা-খরচ যাবে যাক্। আহা, ভগবান যাকে ডাক দেয় সে ত হেঁটে হেঁটে বারাণসী চলে যায় তীর্থ করতে। এই দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল, ওদের সেবায় ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গীত প্রাণ বারোয়ারী রাহা-খরচে সৌদামিনীর সেই আত্মীয় বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে ফিরল। বাজি মাৎ। মজকুর ব্যক্তির কোন ছেলেই নেই। সব মেয়ে। সৌদামিনী ঝুট্ বলেছে, মিথ্যাবাদিনী। সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়, নচেৎ কল ত ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার বেশ রোয়াবের সঙ্গে জবাব দিলে। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে। আর জুলুম শুরু হল। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুধেল দু'টো গাই হারিয়ে গেল। এমন ছোটখাট নিত্য নির্যাতন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় গ্রামে এল। ইহকালের

খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন সব শুনে গ্রামবাসীদের মিটিয়ে ফেলতে বলল ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মানুষ করছে......মানুষ......'সে শূদ্র আছে না কায়েৎ আছে গড্ এসব দেখিতে বারণ করিয়াছে.........' এই জাতীয় নানা বাণী ছাড়লে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাদার জনকে উকীল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জন্যে। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও একপাশে চুপি চুপি কী কথা হল তা' ব্রাদার জনের গডই জানে। বিষয়-নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো ত সম্পত্তি-নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, 'দুদিন সবুর করো, আমি ফায়সালা করিয়া দিবে।' আর মনে রেখ সৌদামিনী এখন কোণঠাসা। এক হপ্তায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে তো বুড়ি মনে হতো না, এখন ত শ্মশানযাত্রীর শামিল ধরে নিতে পার। যারা সেই অবস্থায় ওকে দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ির বাইরে যেত না। যেতে চাইলে সৌদামিনী কেঁদেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই গ্রামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরীয়া-ধর্মপুত্র ত একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির বুড়ো মানুষ এই ঈশ্বর-প্রাণ ব্যক্তিদের থামালে। কিন্তু সৌদামিনী বাপের বেটী, বাঘের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ—বেরিয়ে এলো এক-দম নিরস্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। ক্ষিপ্ত জনতার সামনে সে এবার বোমা ফাটাল। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মত আগুন ছড়িয়ে বললে.........কি বললে শোন। তার কথাটাই মুখ-জবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর উপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

"......শোন্ আভাগীর ব্যাটারা, ধম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠিরের দল......আমার হরিদাস শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন্, কী। তোরা ত জানিস, আমি বছরে একবার দুবার আত্মীয়বাড়ি যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দুহাজার লোক মরছে হপ্তায়। আমি ফিরছিলাম হরিশ্চক থেকে...আলোকডাঙার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্টা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পাল্কি রেখে ওরা গেল জল খেতে। পুকুর আছে, বিঘে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধানক্ষেত, ধান পেকে গেছে। আর পনর দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের ক্ষেতের চাল খেয়ে, কিন্তু তা আর হল কই। হঠাৎ শুনলাম, ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে, মুখে দাড়ি। তার পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে বসে মরা মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে, আবার উঠে বসছে। কিন্তু সেও চিঁচিঁ করছে, ধুঁকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়ালে। চোখের চাওনি কি করুণ! আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে, কিন্তু অনাহারে অনাহারে দেড় বছরের বেশী দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম......নিয়ে এলাম......পাল্কীর ভেতর লুকিয়ে রাখলাম ......আফিম খাই, সঙ্গে দুধ ছিল......দুধ দিতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আত্মীয়ের কাছে তিন মাসের জন্যে রেখে এলুম দু'শ টাকা দিয়ে। ভাল খাওয়াদাওয়ায় ছেলেটো বেশ তাজা হয়ে উঠল। তারপর নিয়ে এলাম। ওর আসল বাবা লুঙ্গিপরা দাড়িওয়ালা সেই মুসলমান চাষী......আমার হরিদাস মুসলমান......"।

যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার উপর। রেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত পর। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেল না। তামাশা দেখতে দুচার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার আরো গণ্ডগোলে গড়াতে পারে, তাই ধর্মপুত্রেরা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে। বুঝলে, আর গোলমাল বিধেয় নয়। ব্যাপার আরো থিতিয়ে যাক্, তখন দেখা যাবে। মনোরঞ্জন অন্তত তাই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাতে হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডাকিয়ে আনলে এক হপ্তা অপেক্ষার পর। সে খৃষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্ম ত্যাগ ভাল নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে 'আজ থাকলে হত' বলার মত।

সৌদামিনী খৃষ্টান হয়ে গেল। তিন-চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে-পড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়িতে। ব্রাদার জন সম্পত্তি দেখার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ করলে।

কিন্তু সাজ্জাদ, বুড়ো গাছ উপড়ে অন্য জায়গায় পুঁতলে কি আর শিকড় গজাবে? কিসের যীশুখৃষ্ট আর বটবৃক্ষ—! সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলি হওয়ার আগে এক সিস্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী প্রায় কাঁদিত আর চীৎকার দিত:

........আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল—! হে যীশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে।

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে।

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৭ ॥

পুরানো সেই দিনের কথা

এ পথের কি অন্ত নাই ? কোথায় শেষ এ পথের ? ভাবতে ভাবতে চলে জীবনলাল। এ অঞ্চলটা ফাঁকা মাঠ নয়, ঘন আম-বাগানে পূর্ণ। বোলের গন্ধে বাতাস মন্থর, মধুতে পল্লব মসৃণ, আর মৌমাছিদের চাপা গুঞ্জনে আকাশ মুখর। কিন্তু সেদিকে আজ জীবনের মন ছিল না, সে ভাবছিল এ-পথের কি অন্ত নাই, কোথায় শেষ এ-পথের ? কুড়ি বছরের যুবকের চিন্তার ধরন এ নয়। তার ভাবনা, কেন পথ শেষ হয়! জানি এ-পথের অন্ত কোথায়! অল্প বয়সে মানুষ সর্বজ্ঞ, বয়স বাড়বার সঙ্গে কমে আসে তার সর্বজ্ঞতা, অবশেষে মরবার সময়ে বোঝে কিছুই জানে না সে। তবে যে আজ জীবনের চিন্তার স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, তার কারণ ঐ তক্তিটা। পিতার জীবনের সমস্ত রহস্য নিয়ে ওটা ঝুলছে তার গলায়। নিজের বয়সের সঙ্গে পিতার বয়স মিলে গিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে তার বয়সটা। অথচ এ কদিন কেমন করে ভুলে ছিল তক্তিটার কথা। পথের অভিনবত্বই ভুলিয়ে দিয়ে থাকবে। আফিঙগোলা লুট, বন্দীপুরে খাজনা আদায়ের পদ্ধতি থিতোতে দেয়নি মনটাকে। কাল রাত্রে নূতন করে যেন আবিষ্কার করলো তক্তিটাকে। এখন প্রতি পদক্ষেপে ওটা বুকের উপরে ঠক্ ঠক্ করে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে, ভুলতে দেবে না নিজের অস্তিত্ব। একবার হঠাৎ একটা চিন্তার লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া ছুটে চলে যায় মনের মধ্য দিয়ে। বিবাহ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ কি ? বাবা থাকতো লখনৌতে, কাশীতে মামার বাড়িতে থেকে সে পড়তো বেনারস কলেজে, বয়স যখন তার ষোল-সতেরো, বড়মামা বাবাকে জানিয়ে দিলেন, নবীনবাবু, এবারে জীবনের বিয়ের যোগাড় করি, আজ্ঞা করুন।

বাবা লিখেছিলেন, এখনো ওর বিয়ের বয়স হয়নি।

প্রত্যুত্তরে মামা জানালেন, বিলক্ষণ, আমারই দুই ছেলের বিয়ে দিয়েছি এর চেয়ে কম বয়সে।

বাবা লিখলেন, ওর বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করবো।

তারপরেই বাবার মৃত্যু হ'ল, ও চলে এলো লখনৌ। নানা গোলমালে বিয়ের কথা আর ওঠেনি—বাবা-মা নেই, তুলবেই বা কে।

তখনি তার মনে হয়, এ হতেই পারে না। তার বিয়েটা এমন গুরুতর ব্যাপার নয় যে, তার জন্যে সোনার তক্তির পরিকল্পনা করতে হবে। আর তাছাড়া, এ বিষয়ে কোন বিধি-নিষেধ থাকলে ভৈরব কাকাকে বলে গেলেই চলতো। আবার কখনো বা মনে হয়, হয়তো গুপ্তধনের সংবাদ আছে। তখনি হাসি পায়। মৃত্যুকালে যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভার যাঁর উপরে দিয়ে গিয়েছেন, সেই ভৈরব কাকাকেই বলে যেতে পারতেন গুপ্তধন থাকলে তার সন্ধান। না ওটা আরো অসম্ভব। আর যে কি সম্ভাবনা থাকতে পারে, ভেবে পায় না সে। হঠাৎ পথের দিকে দৃষ্টি পড়ে। না! শেষ নাই এ-পথের। অদৃষ্টের কুণ্ডলীকৃত ফিতের মতো খুলেই চলেছে পায়ের নীচে থেকে দিগন্তের প্রান্ত অবধি। হঠাৎ মনে পড়ে এই পথচলার সঙ্গে তার দুই পুরুষের ইতিহাস জড়িত। পিতার জীবনটাও শুরু হয়েছিল পথচলা দিয়ে, তাঁর স্বাধীন জীবনেরও শুরু হ'ল ঐ পথচলাতেই। সে গল্প কতবার শুনেছে বাবার কাছে, ভৈরব কাকার কাছে। এই যাত্রায় বেরিয়ে পড়বার

কয়দিন আগে থেকে কেবল ঐ কথাই হয়েছে ভৈরব কাকার সংগে। কতবার শোনা, তবু শেষ হ'তে চায় না। সে ভাবে, এই পথ, ঐ গল্প দুই-ই অশেষ।

ভৈরব বলে, আমাদের দু'জনেরই বাড়ি ছিল ত্রিষড়ের কাছে। ইংরাজী শিখতে হবে নেশা পেয়ে বসলো, কলকাতায় এসে হেয়ার সাহেবের পটলডাঙার ইংরাজী পাঠশালায় ঢুকলাম।

ঠাকুর্দা আপত্তি করলেন না? শুধোয় জীবন।

করেননি আবার। কিন্তু গাঁয়েই দুজন ইংরাজী-পড়া ভদ্রলোক ছিলেন, বেশ রোজগার করতেন, তাঁরা বোঝালেন, বললেন, গাঁয়ে বসে গাঁজা-গুলি খেলে কি ভালো হতো। পড়ুক, পড়ুক, আখেরে উন্নতি হবে। বাবা আর আপত্তি করলেন না। মা কিছুদিন কান্নাকাটি করলেন, ইংরাজী শিখে খৃষ্টান হয়ে যাবে ছেলে।

এ তো আমার ঠাকুর্দা, ঠাকুরমার কথা। আপনার?

আমার ও দুই বালাই আগেই ঘু'চেছিল।

কিন্তু পশ্চিমে আসবার ভূত চাপলো মাথায় কি ক'রে?

বাবা, আগে মাথার খবর নাও, তারপরে ভূতের খবর নিয়ো। কয়েক বছর পটলডাঙার পাঠশালায় প'ড়ে দু'জনে ঢুকলাম হিন্দু কলেজে। সংগে সংগে নবীন হেয়ার সাহেবের কারখানায় ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখতে লাগলো। হেয়ার ওর উপরে খুব খুশী। তাঁর বিশ্বাস, বাঙালী কেবলই কেতাবী পড়াশোনা নিয়ে থাকে, হাতের কাজ শিখতে চায় না। নবীন দুই দিকেই আছে, তাই তাঁর বড় প্রিয়পাত্র—মুখে লেগেই আছে নবীন ডাট্! তোমরা বালির দত্ত কি না, মস্ত কুল।

আর আপনারা?

চাটুজ্জে তো জানই। এখন কুলের কথা থাক, কি ক'রে অকূলে ভাসলাম, তাই শোনো। একদিনের ওলাউঠোয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা গত হ'লেন। তখন আমাদের দু'জনের কারো'ই 'আর পিছু ডাকবার লোক রইলো না। শুনে-ছিলাম যে, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরাজী-জানা লোকের কদর খুব বেশি। তখন দুইজনে শলা-পরামর্শ ক'রে সামান্য যা কিছু হাতে ছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাশী বলে।

জীবন স্বগতোক্তিতে বলে ওঠে, সে যে অনেক পথ।

অনেক পথ বইকি! এখন তবু রানীগঞ্জ অবধি রেলগাড়ি হয়েছে—শুনেছি শীগগীর কানপুর অবধি চলবে রেলগাড়ি।

এলেন কি ক'রে?

যে ক'রে তোমাকে চলতে হবে! চরণ মাঝির নৌকাই একমাত্র ভরসা। না, ওটা ঠিক হল না, কেবলই যে হেঁটেছি, তা নয়। কখনো নৌকা, কখনো ঘোড়া, কখনো উট, তবে পায়ে হেঁটেই বেশি। তেমন পয়সা থাকলে আগাগোড়াই নৌকায় যাওয়া যায়। আমাদের সামান্য পুঁজি, নৌকাচড়ার বাবুগিরি করলে চলবে কেন? তাই পায়ে হাঁটতেই হয়েছে বেশি পথ। এইভাবে তিন মাসে এসে পৌঁছলাম কাশীতে। তারপরের সব কথাই তো জানো।

তবু বলুন, ভালো ক'রে মনের মধ্যে গেঁথে নি। আর কতদিন শুনতে পাবো না কে জানে।

গল্প আর পথ কখনো পুরানো হয় না।

কাশীতে এসে হেয়ার সাহেবের প্রশংসা-পত্রের বলে সহজেই দু'জনে কাজ পেলাম ইংরাজী স্কুলে।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরব মন্তব্য করেন, বাবা, আজ দেখছি সেদিনের দুঃখের

স্মৃতিও মধুর হ'য়ে উঠেছে। টক আমের আমসত্ত্বও মিষ্টি বই নয়।

তারপরে আবার শুরু করেন।

নবীন সঙ্গে সঙ্গে খুলল ঘড়ি মেরামতের কারখানা, বেশ দু' পয়সা রোজগার করতে লাগলো। এমন সময়ে সংবাদ পেলো যে, অযোধ্যার নবাব গাজিউদ্দিন শা ঘড়ি মেরামত করবার লোক খুঁজছেন। তাঁর ছিল কল-কারখানার উপরে ঝোঁক। নবীন চলে গেল লখনৌ। একাই গেল। তোমার মাকে রেখে গেল আমাদের বাড়িতে। কিছুদিন আগে আমরা দু'জনেই বিয়ে করেছি। এই সময়ে তার লখনৌ বাসের বছর পাঁচেক সম্বন্ধে বেশি জানি না। মাঝে মাঝে আসতো কাশীতে, তবে লখনৌর কথা বড় বলতো না। জিজ্ঞাসা করলে মন্তব্য করতো, লখনৌ আমাদের মতো গেরস্থের জায়গা নয়। কেন, শুধোলে বলতো এক কথায় বলতে পারবো না, গিয়ে দেখো। এমন সময়ে একটা সুযোগ জুটে গেল লখনৌ যাওয়ার। রেসিডেন্সির খাজাঞ্চী ছিলেন উত্তরপাড়ার প্রিয়নাথ মুখুজ্জে। তিনি একজন ইংরাজী নবিশ নায়েব খাজাঞ্চীর সন্ধান করছিলেন। নবীনের কাছে সেই খবর পেয়ে গেলাম, চাকুরিও জুটে গেল। তোমার মা আর কাকীমা রইলেন কাশীতেই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, নবীন যা বলেছিল সত্য। লখনৌ আমীর ওমরা রইস আদমি গুন্ডা আর দাগাবাজদের শহর।

এই বিচিত্র পৃথিবীর উত্তরমেরু দক্ষিণ-মেরু হচ্ছে নবাব আর রেসিডেন্ট সাহেব। আমরা দু'জনেই রেসিডেন্টের আশ্রিত। গাজিউদ্দিন শার মৃত্যুর পরে নবাব নাসিরউদ্দিন শা ঘড়ির কারখানা তুলে দিলে নবীন রেসিডেন্টের কাছে মীরমুন্‌শীর কাজ নিয়েছিলেন। নিয়ে গেলাম তোমার মা আর কাকীমাকে। নাসিরউদ্দিন শার এন্তেকাল হওয়ার কয়েক দিন আগেই হ'ল তোমার জন্ম। বেশ সুখে কাটছিল। সুখ শীতের রোদ, বেশিক্ষণ থাকে না। তোমার বয়স যখন বছর পাঁচেক, তখন তিন দিনের জ্বরে তোমার মা আর কাকীমা স্বর্গে গেলেন, আগে তোমার মা আরপরে তোমার কাকীমা। তাঁরা ছিলেন দুই বোনের মতো। এক বোঁটায় যেন ফুটেছিলেন, এক ঝড়ে তেমনি ঝরে পড়লেন। এক ফুঁয়ে সুখের বাতি নিবে গেল, তেলও ছিল, সলতেও ছিল, কেবল যা না থাকলে সব না থাকার সামিল, সেই আলো গেল নিবে।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরব নীরব হন। বুঝতে পারা যায় প্রচুর রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালার বর্ম পরিধান সত্ত্বেও বুকের মধ্যে কাঁচা ক্ষত রয়ে গিয়েছে।

জীবন ব্যথার অংশ ভাগ করে নিয়ে বলে, আমার দু'জনকেই বেশ মনে পড়ে, দু'জনেই লাল কস্তা পেড়ে শাড়ি পরতেন আর দু'জনেরই নাকে ছিল নাকছাবি।

বিস্মৃত ছবি ঝলক মেরে ওঠে ভৈরবের চোখে, সোৎসাহে বলতেন, ঠিক বলেছ বাবা—ঐ ছিল তখন ভদ্র গৃহস্থ মেয়ের পোশাক।

আমি খেলা করে ফিরে এলে মা শুধোতেন কি করছিলে এতক্ষণ?

কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে লড়ছিলাম।

তিনি হেসে বলতেন, তুই দেখছি একদিন কোম্পানীর গুলীতেই প্রাণ হারাবি।

কাকীমা বলতেন, খেলা বই তো নয়, কেন ও সব অলুক্ষণে কথা বলো।

ভৈরব বলে, তারপরে দুজনে যুক্তি করে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কাশীতে তোমার মাতুলালয়ে।

পথ চলতে চলতে কত কথাই না মনে পড়ছে জীবনের। সে ভাবে এই অপরিচিত পথ যেন নেপথ্যবর্তী শ্রুতিকারের মতো অস্ফুট কণ্ঠে জীবন কাহিনীর সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছে তার হাতে। জানলো কি করে? পথ সব কথা জানে। পথ চলা যেন পা দিয়ে গল্প বলা।

"জিন চুঁড়া তিন পাইয়া, গহরে পানী পৈঠ" চমকে ওঠে জীবন। হাঁ একটা গাঁয়ের কাছে এসে পড়েছে বটে, সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা লোক। লোকটা আবার আবৃত্তি করে—

জিন চুঁড়া তিন পাইয়া, গহরে পানী

...দোচা।" হঠাৎ মনে পড়ে না বাকি ছড়টা। দু এক মুহূর্ত মনের মধ্যে হাতড়িয়ে খুঁজে পায় ছড়াটা, বলে ওঠে—

"আয় বোরী চড়েন গরী, রহি কিনারে বৈঠ।" লোকটা হাত বাড়িয়ে দেয়—"দো চার!" এবারে আর ভুল হয় না জীবনের "হায় লাচার" বলতে বলতে চাপাটি চারখানা তার হাতে দিয়েই হন হন করে এগিয়ে যায়, পিছনে তাকানো চলবে না, এ গাঁয়ে থাকা চলবে না।

॥ ৮০॥

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ

ঘুম ভেঙে গিয়ে বিছানায় উঠে বসে জীবনলাল। উঃ কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন। গায়ের কাপড় ভিজে জবজবে হ'য়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি সব খুলে ফেলে নূতন কাপড়-চোপড় পড়ে। তারপরে বাতিটা জেলে স্থির হয়ে বসে। কিন্তু স্থির হয়ে থাকবার কি উপায় আছে। হৃৎপিণ্ড আছাড় খাচ্ছে, সেই তালে তালে কাঁপছে সমস্ত শরীর। স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্তের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিতে চায় মন, কিন্তু তার কি উপায় আছে। নাগপাশে ক্লিষ্ট হরিণ যেমন অজগরটার দিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকাতে বাধ্য হয়, তেমনি ক'রে তার দৃষ্টি পড়ছে স্বপ্নের ভীষণ মাধুর্যের দিকে। একটা বলবান লোককে চার-পাঁচটা বলবান লোকে গলা টিপে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। সে কী ধস্তাধস্তি। ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে আসে লোকটা। অসাড়, অজ্ঞান, এবারে বোধহয় মৃত। এবারে আততায়ীরা ছুটে পালায়। ওকি একজনের হাত দিয়ে রক্ত ঝ'রছে কেন? রক্ত পড়বে না আশা করেই গলা টিপে মারে মানুষকে। তবে রক্ত এলো কোথা থেকে। আর্তনাদ করতে করতে ছুটতে থাকে লোকটা। নাঃ, এদের কাউকে চেনে না জীবন। কিন্তু একি, হঠাৎ আবির্ভাব কেন তার পিতার। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন কার দিকে? কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান? তারই কি? কিন্তু দেখাতে চান কাকে? ঐ আর্তনাদ-কারী আহত লোকটাকে কি? সে কি রক্ষা করতে এসেছিল, না আততায়ীদের একজন। কিছুই বুঝতে পারে না জীবন। হয়তো

স্বপ্নটার স্থায়িত্ব মুহূর্তকাল, কিন্তু জাগ্রত চৈতন্যের স্পর্শে ক্রমে দীর্ঘ বিস্তারিত হ'য়ে পড়ছে দামী রেশমী কাপড়ে এক-ফোঁটা রঙ যেমন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যায়।

জীবন ভাবে, এ-স্বপ্নের মূল কোথায়? এমন কোন ঘটনার কথা তো জানা নাই। তাছাড়া এ-স্বপ্নের সঙ্গে তার পিতার সম্বন্ধই বা কি? তিনি তো নিতান্ত ভালো মানুষ ছিলেন। পিতার মুখে, ভৈরব কাকার কাছে তাঁদের জীবনের পর্বানুক্রমিক সমস্ত বৃত্তান্তই তো শুনেছে, কই, তার মধ্যে এমন ভয়াবহ স্বপ্নের ভূমিকা তো নাই। দুঃস্বপ্নে দুশ্চিন্তায় তার মস্তিষ্ক ও শরীর ঝিম-ঝিম করতে থাকে। সে বোঝে, ব'সে থাকলেই দুশ্চিন্তার নাগপাশ নিষ্ঠুরতর হ'য়ে উঠবে। রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়। বাইরে এসে দেখে, ভোর হতে বাকি নেই। চটিদারকে জাগিয়ে দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বেরিলির দূরত্ব জেনে নেয়।

চটিদার জানায়, এই নকিপুর গ্রাম থেকে শহর বেরিলি ছ ক্রোশ পথ, একটু পা চালিয়ে গেলে দুপুরের আগেই পৌঁছতে পারবেন। রামরাম জানিয়ে বিদায় নেয় জীবন।

পথ চলছে সে অন্য মনে, সন্ধান করছে স্বপ্নের মূল। হঠাৎ তার মনে পড়ে, এমন একটা ঘটনা যেন শুনেছিল। ভৈরব কাকা প্রায়ই বলতেন, চারটি শব্দে অযোধ্যার নবাবের ইতিহাস বিবৃত করা যায়। বিলাসী নবাব, অর্থগৃধ্নু উজীর, অত্যাচারী রাজ-কর্মচারী আর দোমনা ইংরেজ রেসিডেন্ট। এর অন্যথা নেই, বদল নেই, ব্যতিক্রম নেই—এক ছাঁচে সব ঢালা। তবু তার মধ্যে যদি ইতরবিশেষ করতে হয়, নাসিরউদ্দিন শাকে সবসে আচ্ছা বলতে হয়। গাজিউদ্দিন শার বিশ্বাসী উজীর ছিল আগা মীর। নবাবদের নিয়ম এই, সিংহাসনে বসেই আগের আমলের উজীর-নাজিরের তাড়িয়ে দেওয়া। আগা মীরের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল—কিন্তু কয়েক মাসের জন্য মাত্র। গ্রেপ্তারী হুকুম বের হবে আশঙ্কায় মীরসাহেব ধন-দৌলত ও ছেলেমেয়ে নিয়ে রেসিডেন্টের শরণ নিল। জোঁকের মুখে চুন পড়লো। রেসিডেন্টের আশ্রিতের কেশ স্পর্শ করবার ক্ষমতা নেই নবাবের। আগা মীর তো কোম্পানীর ফৌজের পাহারায় পাঁচ কোটি টাকার ধনসম্পত্তি নিয়ে চলে গেল কানপুরে। তারপরে উজীর হল ফজল আলি। লোকটা আবার বাদশা-বেগমের অনুগৃহীত। লোকটা চোদ্দ মাসে ত্রিশ লক্ষ টাকা কামালো। তারপরেই পর পর এলো রামদয়াল আর আকবর আলি। ভৈরব চাটুজ্জে বলেন, এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান এক রকম। প্রভেদের মধ্যে একজন সোজা কাটে একজন জবাই করে, পাঁঠার তাতে অল্পই লাভ। একটা কথা জেনে রেখো বাবা, সংসারে দুটিমাত্র জাত আছে, সবল আর দুর্বল। সব সবল এক জোট।

জীবন শুধোয় সব দুর্বল একজোট নয় কেন?

তবে আর দুর্বল বলছি কেন? দুর্বল বলেই একজোট হয় না, একজোট হয় না বলেই দুর্বল। আর যখন একজোট হল তখন আর দুর্বল থাকল না, সন্ধানে লাগলো নূতন দুর্বলের।

হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে ভৈরব বলে, ঐ দেখো বুড়ো বয়সের রোগ, সুযোগ পেলেই বকুনি শুরু হয়ে যায়। যাক গে, তারপরে শোনো। শুনে রাখো এ সব কথা। আমরা আর কদিন। শেষ দুই উজীরের সময়ে লখনৌ শহরের অধিবাসীর ধনপ্রাণ সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠলো। আগে এক অত্যাচারী ছিল নবাব—এখন দেখা দিল হাজার অত্যাচারী। চোর ডাকাত ঠগ জালিয়াত আর পথে ঘাটে দিনে-দুপুরে মেয়েরা বেইজ্জত হতে লাগলো। শেষে এমন চরমে উঠলো যে রেসিডেন্ট বড় লাটকে জানাতে বাধ্য হলেন, বড় লাট চাপ দিলেন, নবাবের সংবিৎ হল। তখন নবাব হাকিম মেহেদি নামে একজন জবরদস্ত লোককে উজীর নিযুক্ত করলেন। হাকিম মেহেদি যোগ্য লোক কিন্তু তাই বলে তার লোভ কম নয়,—হয়তো সেইজন্যই বেশি। কর্মি লোক প্রায়ই দুর্বৃত্ত আর সৎ লোক প্রায়ই অকর্মণ্য। এই বিচিত্র হেরফেরের জন্যই সংসারের বারো আনা দুর্দশা। তার উজীর হওয়ার আগেকার কথা বলছি। দুটো জেলার আদায়ী ভার ছিল তার উপর। তার পরে আর একটা জেলার ভার পেলো। আগেকার তহশীলদার অমর সিং, জাতিতে রাজপুত, বেশ ধনী আর ক্ষমতাশালী, সে ছাড়বে কেন? হাকিম মেহেদি তাকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। অমর সিং সাবধান হয়ে চলে। হঠাৎ মিলে গেল সুযোগ। একদিন সকালে অমর সিংকে মৃত অবস্থায় তার ঘরে পাওয়া গেল।

...মেহেদি রটালো যে, বিষপানে আত্মহত্যা করেছে সে। মৃতদেহ দেওয়া হল আত্মীয় স্বজনকে। অন্ত্যেষ্টি সংকারের সময়ে গঙ্গাজল দেওয়ার জন্যে যখন তার মুখ খোলা হল দেখা গেল যে, মুখের মধ্যে একটা তর্জনীর ছিন্ন কর্তিত অংশ। চমকে ওঠে সকলে।

চমকে ওঠে জীবন। তবে কি ওই ছিন্ন তর্জনী স্বপ্নে দৃষ্ট রক্ত ঝরা ঐ লোকটার? তাও কি সম্ভব? স্বপ্নে কি গল্পের পাদপূরণ সম্ভব? যদি বা সম্ভব হয়—এই গল্পের কাঠামোর মধ্যে কোথায় তার পিতার স্থান? সে নিশ্চয় দেখেছে পিতাকে, বাপকে চিনতে ভুল করবে কেন? কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি? ছিন্ন অঙ্গুলি ঐ লোকটা কে?

আরে কিধার যাতা?

জীবন উত্তর দেয় শহর বেরিলি।

প্রশ্নকর্তা বিস্ময়ে পরামর্শ দেয়, যাও, যাও গাঁওমে যাও। বেরিলি মৎ যাও।

কেন বাপু?

"বেরিলি কি বাজার মে লাঠি গিরারে" গান করতে করতে সে ছুটে চলে যায়।

উপরের প্রশ্নোত্তরে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠে জীবন দেখে যে চারদিকে কেমন একটা অরাজকতার দৃশ্য। সবাই যেন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। কারো মাথায় মোট, কারো ঘাড়ে মোট, কারো কাঁধে মোট। কেউ স্ত্রীর হাত ধরে শিশু সন্তানকে বগলে করে দৌড়চ্ছে, কেউ বা দৌড়তে দৌড়তে পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছে, সঙ্গীরা তাকে তুলবার জন্যেও অপেক্ষা করছে না।

ব্যাপার কি ভাবে জীবনলাল। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যায় না, উত্তর দিতে গেলেও তো একবার থামতে হয়, সে সময় কারো নেই। তাকে দেখেও দেখছে না কেউ। সেই ধাবমান, পলায়মান জনতার মধ্যে সে একাকী উল্টা মুখে চলেছে। ব্যাপার কি ভেবে পায় না জীবনলাল। অবশেষে একজন ছুটতে ছুটতে পিছনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালো। অঙ্গুলি অনুসরণ করে সে দেখতে পেলো শহরের উত্তর দিকে, সে এগোচ্ছে দক্ষিণ থেকে, অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছে। সে বোঝে যে ঘরবাড়ি পুড়ে গিয়েছে বলেই এরা পালাচ্ছে। এমন সময় এক ঝাঁক গুলির শব্দ একসঙ্গে কানে আসে, সেই সঙ্গে তুমুল কোলাহল। এগিয়েই দেখা যাক। শহরের মধ্যে ঢুকে দেখে যে দুদিকের বাড়ির দরজা, জানলা ঘুলঘুলি সব বন্ধ, ভিতরে লোক আছে কি না আছে বুঝবার উপায় নাই। সমস্ত শহর যেন আজ দিনদুপুরে জনশূন্য কিম্বা নিদ্রিত। হঠাৎ চমকে উঠল, বোঁ করে একটা গুলি কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল নাকি? ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে কে উচ্চস্বরে সতর্ক করে দিল—রাস্তায় থেকো না, বাড়িতে আশ্রয় নাও, গুলি চলছে।

দেখে গুলি তো চলছে, কিন্তু আশ্রয় নেবে কোন্ বাড়িতে, সব যে দরজা বন্ধ।

যেখানে পারো ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো, ওরা এদিকে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই গুলি কানের কাছ দিয়ে পাগড়ির উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

জীবন দেখলো আর বিচারের সময় নেই, সামনে যে বাড়ী পেলো দরজায় মারলো ধাক্কা। আশ্চর্য, দরজা খুলে গেল আর দেখতে পেলো সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক রমণী, সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে সেই সবে কৈশোরোত্তীর্ণ পুরুষের অনভ্যস্ত চক্ষুও বুঝতে পারলো যে, রমণী যুবতী আর আশ্চর্য সুন্দরী।

বাবুসাহেব, আপনি কি বাঙালী?

(ক্রমশ)

লণ্ডনের চিঠি

মানুষের সামাজিক দাবি ও রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন করাই কি শিল্পসৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য, না শিল্পসাধনার মাধ্যমে প্রাতিস্বিক ভাবাবেগের কল্পনাপ্রবণ অভিব্যক্তিই শিল্পীর প্রধান কর্তব্য? মাত্র কয়েক বছর আগেও ইংরেজী চারুশিল্পী মহলে এ প্রশ্ন অবাস্তবই নয়, অসঙ্গত বলেও বিবেচিত হ'ত। কিন্তু ইদানীং এ দেশের অনিশ্চিত আবহাওয়ার মতই এ দৃষ্টিভঙ্গীর অনিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে লণ্ডনের চেলসি, কেনসিংটন ইত্যাদি আর্ট স্কুলে ও মফস্বলের কয়েকটি প্রগতিশীল শিল্পকেন্দ্রে। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই আলোচনা আবহাওয়া-আলোচনার মতই যে একদিন সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে: কেননা, প্রথমত, শিল্পবুদ্ধিবাদী ভাব-প্রত্যয়ের প্রতি এ জাতির প্রবৃত্তিজাত অশ্রদ্ধা; এবং দ্বিতীয়ত, বীয়ার, রোস্ট বীফ-ইয়র্কশায়ার পুডিং, আবহাওয়া-আলোচনা, সংবাদপত্র পাঠ ইত্যাদি জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত হতে যে সামগ্রিক আবেদনের প্রয়োজন, শ্রেণীসচেতন ইংরাজ সমাজের সংখ্যাল্প সম্প্রদায় ব্যতিরেকে অন্যান্য সামাজিক স্তরে সে আবেদনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

তবুও লণ্ডনে ও মফস্বলে শিল্পধারা সম্বন্ধীয় উক্ত আলোচনা যে সমাজ-সচেতন মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে : ইউরোপীয় শিল্প-ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও এ দেশের শিল্পচর্চায় একেবারেই নজিরহীন। এ সূত্রে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভৌগোলিকভাবে ইউরোপীয় মহাদেশের এক বিশিষ্ট অংশ হয়েও ইংলণ্ডের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান মোটেই ইউরোপীয় নয়। এবং সেজন্যই হয়ত গেরিকলট, কোরবে, ভ্যান গঘ, লেজার ইত্যাদির সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় বিদ্রোহজনিত দৃষ্টিভঙ্গী সম-সাময়িক ইংলণ্ডের শিল্পজগতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

কিন্তু অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর মৃত্যু হয়েছে অনেক, অনেক দিন আগে। সুতরাং বিংশ শতকের শেষ অর্ধে শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণত মানুষের সামাজিক দাবি ও রাজনৈতিক দায়িত্ব বুদ্ধি বলতে আমরা কি বুঝি, সে সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত ধারণা বাঞ্ছনীয়। দাবি ও দায়িত্ব বুদ্ধির অর্থ এ নয় যে, চারুশিল্পীর চিত্রপট কোন বিশেষ সামাজিক সমস্যা বা রাজনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ রূপায়ণে একটি বিরাট ইস্তাহারে রূপান্তরিত হোক। উপরন্তু তার অর্থ এও নয় যে, স্বীয় কর্মে নিবিষ্ট তথাকথিত নীতিবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকুক।

এইভাবের প্রকৃত তাৎপর্য অনুসন্ধানে লণ্ডনে ও মফস্বলের কয়েকটি শিল্পকেন্দ্রে নিয়মিত যাতায়াত ও আলোচনার পর সেখানকার অধিকাংশ তরুণ শিল্পী ও ছাত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তিতে পুরোপুরি-ভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় আমি এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যটি তাঁদের নিজেদের ভাষাতেই উল্লেখ করতে চাই। তাঁরা আমাকে বলেন : যদি কোন শিল্পীর বিশেষ কোন' এক ছবি তোমার ভাল লাগে তা হলে সেই ভাল লাগার পরবর্তী মুহূর্তেই তোমার চেতনা-জগতে একটি অপরিচিত উপাদানের সৃষ্টি হয়, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণা ইতিপূর্বে তুমি অনুভব বা অনুমান করতে পারোনি। অভিজ্ঞতার এই অপরি-হার্য অংশটি সেই ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাতের বাস্তবতা ও তার আনুষঙ্গিক উপাদান-সমূহের (রং, গঠন, আয়তন ইত্যাদি) স্মৃতিটিকে একটি নতুন বা অতিরিক্ত আকার দান করে, ফলে ছবিটির বিষয়বস্তু, রূপবিন্যাসে, বা রচনাসৌষ্ঠবের মারফতে সম্পর্কে একটি নিশ্চিত চেতনার উন্মেষ হয়। শিল্পী-প্রদত্ত কোন ঘটনা বা অনু-ঘটনার পরিচিত রূপ (যেমন কোন মানুষের মুখ) তার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ দেয়; কেননা, কেবলমাত্র ব্যবহৃত আকৃতিসমূহ দ্বারাই শিল্পীর পক্ষে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা সম্ভব। কখনো কখনো কোন ছবির বিষয়বস্তু বা আকার-বিন্যাস সম্পর্কে তোমার নিশ্চিত স্মৃতি-বিভ্রম সত্ত্বেও সেই ছবিটির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের আবেগময় অনুভূতি বা সৌন্দর্যবোধক অভিজ্ঞতার অকস্মাৎ উপস্থিতিই এই প্রত্যয়ের সত্য প্রমাণ করে।

হয়ত প্রশ্ন করতে পারো, কোন শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাতিস্বিক তাৎপর্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তোমার সংযোগ কি, এবং কোন প্রক্রিয়া অনুসরণে সেই প্রাতিস্বিক দৃষ্টিভঙ্গী তোমার আনন্দবোধ সঞ্চারে সক্ষম হয়? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : মনুষ্যমানের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তির অপরিসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার নিজস্ব চেতনার ক্রমউন্নয়ন। এবং যেহেতু পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপের পরোক্ষ তাৎপর্য হচ্ছে সেই জগতের সঙ্গে এক নিশ্চিত সম্বন্ধ স্থাপন করা, সেহেতু চেতনা ব্যতিরেকে কোন নিশ্চিত সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব, যে সম্বন্ধ স্থাপনের পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে সক্রিয়তা। এই সক্রিয়তার রূপবিকাশ অসংখ্য : যেমন, ক্লাসিকাল গ্রীসের ভাস্কর্য,

'ইকারস ট্রান্সফর্মড্'

—মাইকেল এয়ারটন

ক্লাসিকাল ভাস্কর্যের দৈহিক উৎকর্ষ, রেমব্রাণ্ট-এর নৈতিক মহানতা এবং ম্যাটীস-এর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তোমার নিজস্ব সৃপ্ত-শক্তির অশেষ সম্ভাবনার চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যদিও উক্ত উদাহরণগুলির পরিমিত পরিসরে সমগ্র সত্যের স্থান নেই, তবুও এ সত্য যে, কেবলমাত্র একটি ছবির মারফতে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনার চেতনা বৃদ্ধি সম্ভব, কিন্তু আসল কথা এই যে, উন্নয়ন সম্ভাবনা বর্ধনের প্রতিশ্রুতিই মহাশিল্পের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, যে প্রতিশ্রুতি আশা বা নিরাশামূলক শিল্প-বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নয়; কারণ এ অংগীকারের মূল উৎস হচ্ছে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ কোন শিল্পবস্তুর উপর শিল্পী কিভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন বা করেন। অথবা এক উদাহরণের সাহায্যে আমরা হয়ত বলতে পারি যে, গণহত্যা সম্পর্কে শিল্পী গোয়ার দৃষ্টিভঙ্গীই গণ-হত্যাকে ঘৃণ্য হিসাবে গণ্য করার পক্ষে যথেষ্ট।

পাশ্চাত্ত্য শিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে তোমার যদি ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকে তা হলে দুটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য স্বীকার করতে তুমি বাধ্য। প্রথমটি হচ্ছে: বাস্তবতা জয়ের অভিলাষ—মানটেগনা পিয়েরো, ডেগা, পোসি—এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি, এবং এ'দের বিশ্বাস যে, জীবনের বিশৃঙ্খলতার জন্যে আমরাই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। কেননা, কাল, আয়তন, গতি ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি শুধু বোধগম্যই নয়, নিয়ন্ত্রণসাধ্যও। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি হচ্ছেন: এল গ্রেকো, রেমব্রাণ্ট, ডেলাক্রয়, ওয়াটো, ভ্যান গঘ—এ'দের অভিলাষ মনুষ্যাবস্থার পরিবর্তন সাধন; এবং যেহেতু মানবীয় পরিবেশ একমাত্র মানুষেরই সৃষ্টি, সেহেতু এ'রা বিশ্বাস করেন যে, সেই পরিবেশের পূর্ণ রূপান্তরের ক্ষমতা মানুষের মুঠোয়।

এখন তুমি হয়ত বলতে পারো: মনুষ্য-আশা যে শিল্পকার্যের মূল উৎস, সে ধারণা তো বহু পুরোনো, এবং এই ধারণার সাথে সামাজিক দাবি বা রাজনৈতিক দায়িত্বের যোগাযোগ কি? এখানে তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে, কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্যসূচক অর্থ মোটেই চিরন্তন নয়, সেটা ক্রম-পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন যুগে একই শিল্পকর্মের ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়; এবং সেজন্যই হয়ত এক মহাশিল্পীর পক্ষে কালোত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। শিল্প-প্রতিশ্রুত উন্নয়ন বা উন্নতি-বর্ধনের তাৎপর্য নির্ভর করে দর্শক ও তার কালের উপর; কিংবা ভাষান্তরে এ নির্ভর করে সেইসব বাধাবিঘ্নের উপর যেগুলি মনুষ্যপ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

বিংশ শতাব্দী হচ্ছে তাদেরই শতাব্দী যারা মানুষের দাবি, দায়িত্ব ও সমতায় উগ্র বিশ্বাসী। এ শতাব্দীর ইতিহাস সাধারণ মানুষের সচেতনতার ইতিহাস। সুতরাং শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি সাধারণ মানুষকে তার দাবি ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করতে সক্ষম কিনা, সেইটাই এ যুগের শিল্প-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। শিল্পের চিরন্তন রূপ বা তার অপরিবর্তনশীলতার সঙ্গে এ ভাবের বিন্দুমাত্রও সংযোগ নেই। সংযোগ নেই, তার কারণ, বিংশ শতাব্দী হচ্ছে এক বিপ্লবময় শতাব্দী এবং ইতিহাসের কোন এক বিপ্লবময় অধ্যায়ে যে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা যদি সেই বিপ্লবের সপক্ষে না হয়, তা হলে সেটা তার বিপক্ষে। এই প্রত্যয়ের যৌক্তিক পরিণাম বা তার সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি পাবে গত অর্ধ শতকের ইতিহাসে, যে ইতিহাস মাইকেল এনজেলোকে এক বিপ্লবী শিল্পীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব এ শতাব্দীতে শিল্পে সামাজিক বৈশিষ্ট্য যারা অস্বীকার করে তারা এ শতাব্দীকেও অস্বীকার করে, যেমন জ্যাক স্মিথ, জন ব্র্যাটবি ইত্যাদি সম-সাময়িক ইংরাজী শিল্পের প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধির দল, যাদের শিল্পপ্রচেষ্টায় কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ নেই। কেননা, তাদের দৃষ্টি সময়, জীবন ও পৃথিবীর প্রতি

নিবন্ধ নয়, এবং কাল সংক্রান্ত এই ঔদাসীন্যের জন্যই তাদের শিল্পপ্রচেষ্টা আমাদের সুপ্তশক্তির সচেতনতা আনতে সক্ষম নয়। উপরন্তু বাস্তবতা জয়ের বা মানবীয় পরিবেশ পরিচালনার অভিলাষও তাদের শিল্পদর্শনে অনুপস্থিত। বস্তুত অযৌক্তিকতা ও অনিয়ন্ত্রণ তাদের জীবন-দর্শনের মূল উৎস।

কিন্তু তথাকথিত আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে এ নিয়মের যে কোন ব্যতিক্রম নেই, তা বলতে চাই না; বলতে চাই না, কেননা, তা সত্য নয়। এর ব্যতিক্রম আছে, এবং যে শিল্পী উক্ত শিল্পসংজ্ঞার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধির প্রমাণ দান করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর নাম হচ্ছে মাইকেল এয়ারটন, যাঁর বিতর্কমূলক কলাবিন্যাসে এ দেশের প্রতিষ্ঠিত সমালোচকের দল বেশ একটি মুখরোচক রসদের আস্বাদ পেয়েছেন, ফলে তাঁরা এ বিদ্রূপাত্মক মতপোষণে মোটেই লজ্জিত নন যে, এয়ারটন হচ্ছেন একবিংশ শতকের শিল্পী। সমালোচকগোষ্ঠীর এই বাতুলতা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে আমরা হয়ত বলতে পারি যে, আধুনিক ইংরাজী শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এয়ারটনই হচ্ছেন একমাত্র শিল্পী যাঁর শিল্পসৃষ্টির মুখ্য উপাদান হচ্ছে কালচেতনা, যে চেতনার মাধ্যমে তিনি এ যুগের একটি বিশেষ রূপকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। মনুষ্যবাদে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মানুষের প্রতি আস্থা ও অনাস্থার সংগ্রামে এয়ারটন-এর শিল্পীমন চিরবিক্ষত, এবং সেজন্যই এ শতকের আধিবিদ্যক সংগ্রামের যথাযথ রূপ তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টায় বর্তমান। অসাধারণ নৈতিক সাহস, স্বাধীন মুক্ত রচনাসৌষ্ঠব, অনন্যসাধারণ মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা তিনি মানবীয় পরিবেশের মৌলিক শর্তের নিয়ন্ত্রণে চিরব্যস্ত। বস্তুত এ যুগের মানুষের একাকিত্ব সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ মোহমুক্তি আমরা দেখতে পাই শিল্পীর "সেলফ পোর্ট্রেট"-এ : অসীম নক্ষত্রখচিত আকাশ, আরশিতে প্রতিফলিত শিল্পীর দীপালোকে উদ্ভাসিত প্রতিকৃতি, আরশির পাশে শিল্পীর ছোট্ট প্যালেট। মানুষ ও শিল্পী হিসাবে আমরা সীমাহীন কালো আকাশের বন্দী, এবং এই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হচ্ছে আমাদের প্যালেট, অর্থাৎ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কর্ম বা শিল্পপ্রচেষ্টার মাধ্যমে এই অবশ্যম্ভাবী অবস্থার নিয়ন্ত্রণসাধন। সেজন্যই হয়ত কালো আকাশের মতই ব্যাপক এবং আকাশের তারাগুলির মতই অসংখ্য মাইকেল এয়ারটনের বিষয়বস্তু, যেমন—কৃষকের দল, প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, শ্যেনপোষক, নগ্নমূর্তি, সন্ধানরত ওরফিউস, আধুনিক জ্যাজ ও ডাইভারস, কেইন, ইকারাস ইত্যাদি। প্রত্যেকটি চিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনুষ্যমনের সুপ্তশক্তির অপরিসীম সম্ভাবনা ও মনুষ্যক্ষমতার ব্যাপকতা স্বীকার। ভেলাসক-এর অনুসরণে অঙ্কিত তাঁর মদ্যপানার্থ গেলাসের পটভূমিতে আমরা কিসের ইঙ্গিত পাই?—মন্ত্রিয়ান-এর বিমূর্ততা; রাজপথে নৃত্যরত তাঁর মানুষটির অঙ্গসঞ্চালন আমাদের কিসের ইঙ্গিত দেয়? সীমাবদ্ধ মহানগরীর লৌহবেষ্টনী থেকে এক নাগরিকের মুক্তিপ্রচেষ্টা; কাচের ফাটলে মানুষের হাতটায় কিসের অঙ্গীকার?—অসংগত বাস্তব জগতের বন্দী যে মানুষ, সেই মানুষের বিদ্রোহজনক প্রতিশ্রুতি।

কালসচেতন মাইকেল এয়ারটন-এর শিল্পসৃষ্টিতে যে দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ আমরা পাই এ যুগের সামাজিক দাবি ও রাজনৈতিক দায়িত্বে অনুপ্রাণিত সেই দৃষ্টিভঙ্গী মনুষ্যমনের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তির অশেষ সম্ভাবনা সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিজস্ব চেতনার ক্রম-উন্নয়নে সহায়তা করে। সেজন্যই এয়ারটন-এর সমসাময়িক শিল্পীর দল তাঁকে মোটেই স্পর্শ করতে পারে না, যে শিল্পীদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান কালকে উপেক্ষা করা। এবং আধুনিক যুগকে উপেক্ষা করাই যে কারুশিল্পের প্রধান অভিপ্রায়, তাকে আধুনিক নামে উল্লেখ করাকে তুমি যদি বিরাট প্রহসন বলে স্বীকার না করো, তা হলে সেটা নিশ্চয়ই একটা ট্র্যাজেডি—তোমার পক্ষে মানুষ ও দর্শক হিসাবে, আমাদের পক্ষে শিল্পী ও মানুষ হিসাবে।

মিহিরকুমার গুপ্ত

ট্রামে-বাসে

শ্রীকৃষ্ণ মেনন মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় লইয়াছেন। —"দ্বাপরের কৃষ্ণ বলেছিলেন—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। কলির কৃষ্ণ—কেবিনেটং পরিত্যজ্য এক কদমং ইত্যাদি ইত্যাদি মনে মনে বলেছেন কিনা বলতে পারব না। তবে এটা শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, তিনি আর যখন মন্ত্রী থাকবেন না, তখন তিনি হয়ত ক্যানটীন চালাতে পারেন। ক্যানটনমেণ্ট থেকে ক্যানটীনে পতন প্রায় গোলকধাম খেলার কড়ি চিৎ-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। যা হোক, নিবেদন করব, চাউ চাউ ফ্রাইড-রাইস যেন ক্যাণ্টীনে থাকে!!"—মন্তব্য অবশ্য বিশুখুড়োই করিলেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় এক সভায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতি দিয়া পাপ স্খালন করিতে পারিবেন না। —"প্রয়াগে মুড়োয় মাথা, পাপী যাক যথা তথা"—এই পাঁতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় শ্যামলাল এবং বলে—"সুতরাং মা ভৈঃ"।

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জির ভাষণে জানা গেল, বাঁকুড়ার একটি মহিলা-সংস্থার কর্মীরা নাকি জনসাধারণকে বুঝাইতেছেন যে, চীনারা তাদের নিজেদের ভূমি দখল করিতেছে। সুতরাং চীনের বিরুদ্ধে আমরা লড়িব কেন? —"নেই কাজ ত খই ভাজ বলে একটা কথা আছে, ভদ্রমহিলারা বিপ্লবব্যবস্থা না করে মা লক্ষ্মীরা ত খৈ ভাজলেই ভালো করতেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

দিল্লী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, ট্রেড ইউনিয়নের জনৈক কর্মী নাকি পরামর্শ দিয়াছেন—দেশের জন্য আমাদের কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করা উচিত। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"কাঞ্চনের পর কামিনীর প্রশ্ন যে আসবে তা জানতাম, কিন্তু একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি!!"

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীকেশবন সৈন্যদের জন্য বই সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন। —"কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু 'ফনতরা' বুক ফাইন্যাল নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সীমান্ত সমস্যার সমাধান সম্পর্কে চীনাদের মনোভাব—আমার দখলে যা আছে আমার দখলে থাকুক, আপনার দখলে যা আছে, আসুন আমরা ভাগ করিয়া লই। —"অর্থাৎ সোজা কথায়, তোমার জরু আমার জরু, আমার জরু, আমার জরু"—বলেন বিশুখুড়ো।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত দিল্লিতে নেহরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি নাকি জানিতে চাহিয়াছেন, বর্তমান সংকটকালে ফ্রান্স কী আকারে ভারতকে সাহায্য করিতে পারে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আশীর্বাদের পরিবর্তে বর্তমানে লৌকিকতার প্রয়োজনই বেশি।"

বর্মা সরকার নাকি দুইটি শ্বেত হস্তী লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। —"শ্বেত হস্তী আমাদের প্রায় 'জলভাত' হয়ে গেছে, ওতে আর আমরা বিব্রত বোধ করিনে, কিন্তু বিব্রত হয়ে পড়েছি একদল পীত পাগলা হাতী নিয়ে"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলিকাতায় ব্যাংক অব চায়নার লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়াতে কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পিকিং ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং জানাইয়াছেন, ভারতকে খেসারত দিতে হইবে। —"কিন্তু খেসারতের প্রশ্ন আসে কিসে? ব্যাংকটি তো 'লাল বাতি-ই জ্বালিয়েছে, অন্য রঙের বাতি তো নয়, সুতরাং এত গোসা কেন"—বলে শ্যামলাল।

নেফা সীমান্তের এক সংবাদে প্রকাশ, একদিন নাকি কয়েকটি চীনা সৈন্য আমাদের সৈন্যদের খুব কাছাকাছি আসিয়া হিন্দী-চীনী-ভাই-ভাই বলিয়া চেঁচাইয়াছে। —"আমাদের সৈন্যরা নাকি এই চেঁচামেচিকে বনজঙ্গলে বান্দুং-এর ভূতের চেঁচামেচি মনে করে কোন সাড়া দেয়নি"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

ভারতকে অস্ত্র সাহায্য দিতে মানা করিয়া ইউ কে-কে এনক্রুমা যে উপদেশামৃত দান করিয়াছেন, তাহাতে সবাই তাজ্জব বনিয়া গিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, বিভিন্ন দেশ হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্য দিয়া এনক্রুমা তাঁর দেশে হাইড্রো ইলেকট্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া টম্যাটোর চাটনি পর্যন্ত তৈয়ার করিতেছেন। —"তা করুন। কিন্তু চেঁচড়া তৈরির এই প্রয়াস কেন"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

এই বৎসর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইবে না বলিয়া নাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। —"কিন্তু কয়েকদিন আগেকার সংবাদে শুনেছিলাম, চু এন-লাই ঘোষণা করেছেন, শান্তির পথ খুঁজে বের করার প্রয়াস আমাদের কোনদিন শেষ হবে না। এমন একটা জুৎসই শান্তির কথা শোনার পরও যদি নোবেল কমিটি শান্তি পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান না পেয়ে থাকেন, তবে তাঁরা সত্যিই কৃপার পাত্র"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

শ্যামলাল বলিল—"রক্তদান সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হতে হবে। শুনেছি রক্তের শ্রেণী বিভাগ আছে, সব রক্ত সবাইর সয় না। হালে চারিদিকে যে-বদ রক্তের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, তাতে না-দেখে—না-শুনে যে-কোন রক্ত নিলে, লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি, ব্লাড ব্যাংক সাবধান!!"

উক্ত সংবাদের জের টানিয়া বিশুখুড়ো বলিলেন—"চীনা মাটির পুতুল সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এ পুতুল যা ভাঙবার ভাঙবেই, শুধু তার মাটি নিয়ে যারা 'কুলচুর'এর -ভড়ং করেন, সে কথাটা প্রণিধানের সময় এসেছে।"

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

— উনিশ —

ঘাটে নেমে বংশী নিজের বাড়ি চলল। নৌকোর এই পথটুকুর মধ্যেই ভাব জমে গেছে সাহেবের সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে ফিরে আসে আবার, সাহেবের কানে কানে উপদেশ দেয়। ঠিক এই কথাগুলোই ইতিমধ্যে আরও অনেকবার হয়ে গেছে : মানুষ ভাল বলাধিকারী মশায়। মস্তবড় মহাজন। পাকসাট মেরো না, ঠাণ্ডা হয়ে থেকো। যা বলবেন, হেঁ-হেঁ করে যাবে। কাজ করতে বললে মুখের কথা মুখে থাকতে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শ্বশুরবাড়ি মেয়ে পাঠানোর সময় মা-খুড়ি-পিসি যেমন বলে দেন। বলে, সব জায়গায় বলাধিকারীর খাতির। ঐ মানুষের নজর ধরেছে, কেষ্টবিষ্টু হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। আমিও রইলাম—এই গাঁয়ের মানুষ, শতেক বার দেখা হবে। সকালবেলাই যাব। সকালে না পেরে উঠি তো বিকালে।

খুলনার নৌকোঘাটা থেকেই বলাধিকারীর খাতির দেখতে দেখতে আসছে। কিন্তু বাড়ির উঠানে এসে সাহেবের ভক্তি চটে যায়। পেট-মোটা প্রকাণ্ড আয়তনের গোলা, পিছন দিকটায় খান তিন-চার মেটে-দেয়ালের ঘর। এই মাত্র। ওর মধ্যে একটিকে বৈঠকখানা বলা হয়। তক্তাপোশ জুড়ে ফরাস—কিন্তু ফরাসের উপর চাদর জোটেনি, শুধুই মাদুর। নিয়মমাফিক হাতবাক্স ফরাসের প্রান্তে—বাক্সের উপরে কাগজপত্র রেখে হিসাব লেখা হয়, ভিতরে টাকাপয়সা। পেরেক ঠুক ঠুকে হাতবাক্সের সর্বঅঙ্গে যেন কুষ্ঠব্যাধি।

কী কাজে এসেছে একটা লোক, তক্তাপোশের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসেছে। এবং রোগা লম্বাটে একজন কান-ফোঁড়া খাতায় হিসাব টুকছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—জগবন্ধু বলাধিকারী নাম বলে দিলেন। ক্ষুদিরাম হাতবাক্স থেকে টাকা-রেজগি বের করে থাক দিয়ে লোকটার সামনে রাখে, গণে নিয়ে থলিতে ভরে লোকটা চলে যায়। অতএব গোমস্তা ও ক্যাশিয়ার হল ক্ষুদিরাম। চেতলার পুরুষোত্তম সা'র গদিতে একজন এমনি ছিল। পাখনার কলম নিয়ে হাতবাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে সমস্ত দিন বসে বসে লিখত।

কুষ্ঠগ্রস্ত হাতবাক্সর মহিমা সাহেব পরে একদিন শুনেছিল ক্ষুদিরামের কাছে। মন্দ লোকের রিপোর্ট পেয়ে সদর থেকে খোদ পুলিসসাহেব হঠাৎ একবার জুতোর ধুলো দিল এই ঘরে। খাতাপত্তর দেখে বাক্স উলটে পালটে টাকাপয়সা গণেগেঁথে দেখে —আনায়-গণ্ডায় মিল। আরে বাপু থাকেই যদি কিছু, তুই ধরবি সেটা সাহেবের পো! পুলিশের কর্তা যতই চতুর হোক, জগবন্ধু বলাধিকারীর চেয়ে বেশি নয় কখনো। হাত-বাক্সটা বড় পয়মন্ত—কাঠ বদলে কবজা-পত্তর পালটে তালি দিতে দিতে আদি জিনিসের প্রায় কিছুই বজায় নেই। তবু ফেলা যাবে না।

জগবন্ধু বললেন, পাকশাকের ব্যবস্থা করে ফেলুন ভটচাজ মশায়। ও-বেলা ভাত পেটে পড়েনি। এই দু-জনের চাল বেশি নেবেন আজ থেকে। থাকবে এখানে। কাজ-কর্মে লাগিয়ে দেব বলে টেনে নিয়ে এসেছি। কাজলীবালাকে দেখছি নে, শুয়ে পড়ল নাকি?

সাহেব ও নফরকেষ্টর আপাদমস্তক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বারম্বার নিরীক্ষণ করে। আগন্তুক দুটির প্রতি অঙ্গ বুঝি মুখস্থ করে নিচ্ছে। গোমস্তা ও ক্যাসিয়ার ছাড়া ভট্টাচার্যের অতএব আর এক পরিচয়—পাচক। দু-পাঁচ দিনেই অবশ্য জানা গেল, সমস্ত বাইরের চেহারা, ভুয়ো পরিচয়। মানুষ যা-কিছু কামনা করে সমস্ত আছে নাকি এই ক্ষুদিরামের। অশীতিপর বাপ-মা এখনো বর্তমান। ভাইরা সকলেই কৃতী। স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও বুঝি গোটা দুই। নিজেও ক্ষুদিরাম মূর্খ নয়—এককালে বাড়িতে টোল ছিল, সেই রেওয়াজে বাপ এই কনিষ্ঠ ছেলেকে সংস্কৃত পড়তে দিয়েছিলেন। সকলকে নিয়ে জমজমাট একান্নবর্তী সংসার, ক্ষুদিরামই কেবল ভাঁটি অঞ্চলে নোনা জল খেয়ে এইভাবে পড়ে থাকে। সর্বস্ব ছেড়ে এসেও বংশ-গরিমা ছাড়তে পারেনি, যার তার হাতের রান্না চলে না। রান্নাঘরে সেই গরজে ঢুকে পড়তে হয়।

দেখাদেখি বলাধিকারীও যান কখনো কখনো। কিন্তু ক্ষুদিরাম থাকতে হবে না, হাতা-খুন্তি কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে। কী আর করবেন, মনোদুঃখে নিজ ঘরে ঢুকে পড়েন তখন। সে ঘর বইয়ে ঠাসা। স্ত্রী নেই, দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে মহানন্দে সংসারধর্ম করছে—ত্রিসংসারের মধ্যে বলতে গেলে আছে কেবল বই। অবসর পেলেই জগবন্ধু বইয়ের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্ত্রী থাকতে ঠাকুরদেবতারা এবং প্রচুর জপতপ ছিল। সমস্ত গিয়ে এখন তেত্রিশ কোটির মধ্যে শুধুমাত্র মা-কালীতে এসে ঠেকেছে। তা-ও যে কতখানি ভক্তির বশে আর কতটা কাজকর্মের গরজে, ঠিক করে বলা যায় না।

না, ভুল বলা হল। মেয়ে যে আরও একটি—কাজলীবালা। শুয়ে পড়ল নাকি কাজলীবালা — ক্ষুদিরামকে বলাধিকারী জিজ্ঞাসা করলেন। বলতে বলতে সে এসে পড়ল।

বলাধিকারী বললেন, তাড়াতাড়ি যোগাড়-যন্তর করে দাও কাজলী। ভটচাজ মশায় রান্না চাপাবেন।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জানিস রে খোকনচন্দোর, এই হল কাজলীবালা। আমার মেয়ে।

কটকটে কালো রং, উদ্দাম দাঁতের ছড়া ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে, কুৎসিৎ কুদর্শন। কোমল-মধুর স্বরে তার পরিচয় দিচ্ছেন। এই কণ্ঠ যেন বলাধিকারীর নয়, বুকের ভিতরে থেকে অন্য কেউ বলছে। বললেন, ছোট মেয়েটাও বিয়ে হয়ে চলে গেল, এই মেয়ে তখন ফাঁকা ঘরে এসে উঠল। ঘর আমার ভরে রেখেছে। বড্ড সৎ—

হেসে উঠলেন ঃ বোকা কিম্বা ভীরু—তারাই সৎ হয়। কাজলী আমার ভীরু একটুও নয়, বোকা। জীবনে এত পোড় খেয়েও বুদ্ধি কিছুতে জন্মাল না ; সৎ রয়ে গেল।

কাজলী কলকল করে বলে, সামনের উপর সদাসর্বদা আপনাকে দেখি, অসৎ হই কি করে ? ইচ্ছে হলেও তো পেরে উঠিনে।

রান্নার জোগাড়ে দ্রুত সে রান্নাঘরে ছুটল। হাসিমুখে ক্ষুদিরাম খুব উপভোগ করছে। বলে, হল তো ? মুখের উপর কেমন জবাবটা দিয়ে গেল। অসৎ বলে দেমাক করতে যান, এমন যে কাজলীবালা সে পর্যন্ত মানে না।

নিশ্বাস ফেলে বলাধিকারী বলেন, কি জানি! সৎই ছিলাম বটে একদিন। ফুল শুকিয়ে গিয়ে এখন কটুফল। ফলের চূড়োয় আধশুকনো ফুল একটু যদি থেকে থাকে, দায়ী তার জন্যে ঐ কাজলীবালা। শুকিয়ে একেবারে নিঃশেষ হতে দেয় না।

সাহেবকে এনে যখন ফেলেছেন, কাজকর্মে ঠিক লাগিয়ে দেবেন। সঙ্গী নফরকেষ্টও বঞ্চিত হবে না। দেবেন বলাধিকারী ঠিকই দুটোদিন আগে আর পরে। যে কাজ ধান-কাটা কিম্বা ডাক্তারি অথবা গুরুগিরি নয়, তা-ও বুঝতে বাকি থাকে না। মাঝে মাঝে সাহেবকে একান্তে ডেকে নিয়ে স্ফূর্তি দেন ঃ শহরে দেখে এসেছিস বাঁধা নিয়মের কাজকর্ম—পাঁচটা সাতটা দশটা রাস্তার মধ্যে। এখানে এলাহি কান্ডকারখানা—অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কপালে জয়পত্র এঁটে ডাঙা-ডহর ভেঙে ছুটোছুটি। তোরও জয়-জয়কার পড়ে যাবে, দিব্যচক্ষে আমি দেখছি। রোজগারের কথা ধরিনে—দোকানদার-অফিসার ফড়ে-চাষা রোজগার সবাই করে থাকে। নামধাম পাবি তুই অঢেল—সেকালে যেমন ছিল পচা বাইটা, একালের যেমন কেনা মল্লিক। চাই কি ছাড়িয়েও যেতে পারিস ওদের। কার ভিতরে কতখানি বস্তু, কাজে না পড়লে সঠিক নিরিখ হয় না।

কাজ হবে-হবে করছেন, এমনিভাবে মাসখানেক কেটে গেল। শুয়ে বসে সাহেবের দিন কাটে না, ছোঁক-ছোঁক বেড়ায়, অধীর হয়ে এক এক সময় বলাধিকারীর কাছে গিয়ে পড়ে। নফরকেষ্টর মহৎ গুণ, ঘুম ও জাগরণ একেবারে তার হাত-ধরা। কাজ পড়ে গেল তো পাঁচ-দশটা অহোরাত্রি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়; কাজ নেই তো সারাদিন ও সমস্ত রাত অবিরাম ঘুমোয়। ফুলহাটায় এসে মনের সাধে যে ঘুমোচ্ছে। দুপুরের আহার শেষ হতে না হতে ঘুমে ঢলে পড়ে, মাঝে একবার রাত্রিবেলা ভাতের থালাটা সামনে এনে ঠেলেঠুলে তুলে দিতে হয়—একটু ক্ষণের ঐ বিরতি। নফরকেষ্টর সময় কাটানোর অসুবিধা নেই।

বলাধিকারী বলেন, ছটফট করিস কেন, জলে পড়ে যাসনি তো! দেখেশুনে হেসে-খেলে হাসিস্ফূর্তি করে বেড়া। ছুটকো-ছাটকা যদি কিছু মেলে তার সন্ধানে আছি। তার বেশী এবারে হয়ে উঠবে না। সামনের মরসুমটা আসতে দে না—লুফে নেবে তোর মতন ছেলে।

চুকচুক আওয়াজ তুলে বলেন, দুটো মাসও আগে যদি পেতাম! কেনা মল্লিককে বললে সোনা হেন মুখ করে কোন একটা নৌকোর সংগে রওনা করে দিত। নতুন বলে হাতে কাজ করাতে দিত না, তাহলেও ধারাটা দেখে বুঝে আসতিস। এ মরশুমে কিছু হবে না। কাজের লোক সব বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখ—বুড়ো বাচ্চা আর মেয়েলোক। সমর্থ জোয়ান-পুরুষ কদাচিৎ এক-আধটা।

ঘুরে ফিরে একটা নাম কেবলই আসে—কেনা মল্লিক। কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। কেনার নামে সকলে তটস্থ। ভরা মরশুমে মল্লিকের দলবল চতুর্দিকে এখন রে-রে করে বেড়াচ্ছে। কাপ্তেন নিজেও ঘরে বসে থাকে না, আলাদা পানসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বিজয়া-দশমীর ঠিক পরের দিন। শরৎকাল দিগ্বিজয়ে বেরুনোর সময়। রাজ-রাজড়াদের সেই পুরানো রীতি কেনা মল্লিক এবং তার আগে বেচারাম মল্লিক ভাটি অঞ্চলে বজায় রেখে আসছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বংশী এসে ডাকে : চল সাহেব, একটা জায়গায় ঘুরে আসিগে।

সাহেব অর্থভরা হাসি হাসে : সত্যি রে?

বংশী কিন্তু গম্ভীর। বলে, রাতে বেরুনোর কথা আমাদের মুখে শুনলেই লোকে অন্যরকম ভেবে নেয়। তুমি পর্যন্ত। বিয়ে করতে যাব, সেইদিন সকালেও এক সাঙাত বলছে, সত্যি কথাটা ভাঙ দিকি ভাই—কোথায়? যেন দুনিয়ায় আমাদের অন্য কিছু থাকতে নেই—সুখসর্বস্ব যা-কিছু ঐ। কাজ অবিশ্যি আটরঙা, নামটা আছে কিন্তু আমার। পচা বাইটার নাতি, সেই সুবাদে। এ নাম একবার রটলে সাত-সমুদ্রের জল ঢেলেও ধুয়ে ফেলা যায় না।

সাহেব বলে, কী এমন বললাম যে একগলা কথা শোনাচ্ছ? কোন তীর্থধর্মে যাওয়া হবে, তাই জানতে চেয়েছি শুধু।

বংশী বলে, ইস্কুলবাড়িতে—ছোট মামা যেখানটা আস্তানা নিয়েছে। ধর্মের জায়গা, পুণ্যি খানিকটা কুড়িয়ে আসবে দেখো ফেরার সময়।

ছোট মামা মুকুন্দ। মুকুন্দ বর্ধন—সোনাখালির পচা বাইটার কথা হয়ে থাকে, তার ছোট ছেলে। মুকুন্দকে নিয়ে বংশী যখন তখন গালিগালাজ করে। বলে, পাকা মানুষ হয়েও আজামশাই ভুল করে বসলেন—পণ্ডিত বানাতে গেলেন ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে। উচিত প্রতিফল তার। জন্মদাতা পিতার নামে নাম সিঁটকায়। সোনাখালির এমন ঘর-বাড়ি ছেড়ে ইস্কুলে পড়ে থাকে। বর্ধনকুলের মুষল।

সাহেব বলে, হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু পাপী দৈত্য, প্রহ্লাদ মহাভক্ত। বাপে বেটায় ধুন্দুমার—

বংশী লুফে নিয়ে বলে, ঠিক তাই। ছোট মামার ঐ মতিগতি, তার উপর জুটল এসে ছোট মামীটা। সে এক পোটচুন্নির বেটি—গায়ে একটু চিকন ছটা, সেই দেমাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথহাটে। পাপের ছোঁয়া লেগে না যায়। ঘরের বউ পুরুষকে কোথায় বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে—সে-ই আরো বেশি করে বিগড়ে দিল ছোটমামাকে।

একলা মুকুন্দকে নয়, ঐ সঙ্গে তার বউকে জুড়ে বংশী নিন্দে-মন্দ করে। পচা বাইটার নামে সাহেবের আগ্রহ, তার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে চায়। বাইটার ঘরসংসারের যাবতীয় কথা। গুণী মানুষটা বয়স হয়ে গিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে। যার জন্য বলাধিকারী বুড়োকে মরতে বলেন। মরেছে কি বেঁচে আছে, উঁকি দিয়ে দেখে না বাড়ির লোক। তেষ্টায় চিঁ-চিঁ করছে, জলটুকু এগিয়ে দেবার পিত্যেশ নেই। বড় ছেলে মুরারি জমিদারি সেরেস্তার নায়েব। জমিদারের কাজ এবং নিজেদের যে ভূ-সম্পত্তি আছে তাই নিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়। বড় বউয়ের এক গাদা ছেলেপুলে, কাঁধের উপর সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি। কিন্তু বাবু মানুষ ছোটঠাকরুনের ঝক্কি-ঝামেলা নেই, ফুলেল তেল মেখে গতর দুলিয়ে বাহার করে বেড়াবে—

এক ফোঁটা মেয়ে সুভদ্রা বউ হয়ে এল, পচা বাইটা তখনও শক্তসমর্থ। মুকুন্দ একটা পাশ দিল সেবার। বাইটার ছেলে হেন কাণ্ড করে বসল, মানুষ একেবারে তাজ্জব বনে গেছে। পাশ-করা বরের বউ হয়ে সুভদ্রারও মাটিতে পা পড়ে না। আর কিছু কাল পরে বউ খানিকটা সোমত্ত হয়ে বরের কানে বিষমন্তোর দেয় : তুমি বিদ্বান হলে কিন্তু বাড়ির তো নিন্দে গেল না। চোরের বাড়ি বলে মানুষে আঙুল দেখায়। সকাল বেলা চক্ষু মুছে উঠে চোর-শ্বশুরের মুখ দেখতে হয়। বাইরে কোথাও কাজকর্ম দেখ। দু-জনে বাসা করে ধর্মভাবে থাকা যাবে।

সত্যি সত্যি এই বলেছিল কিনা, ধর্ম জানেন। কিন্তু লোকে বলে। সুভদ্রার নাক-সিঁটকানো দেখে বিশ্বাসও হয় তাই।

...াড়ার দিকে নখ নেড়ে ফিসফিসানি। ...নের সংগে গলা চড়তে চড়তে ক্রমশ রুদ্র-...র্তি। দিশা না পেয়ে মুকুন্দ ফুলহাটায় ...নে বংশীর বাড়ি এসে উঠল। বাইটার ...ড়ি, এবং সেই পথের পথিক বলে বংশীরও ...সলপ নাম হতে শুরু হয়েছে। লোকে ...লে, বাইটার বেটা বিদ্যে শিখে নতুন কায়দার কাজ ধরবে। পীঠস্থানে এসে পড়েছে—মাথার উপরে বলাধিকারী, পিছনে বংশীধর। অতএব তাড়াতাড়ি সে মাইনর ইস্কুলের এই মাস্টারি কাজ জুটিয়ে নিয়ে বংশীর বাড়ি ছাড়ল। কলঙ্ক মোচন করল। সেই থেকে আছে। স্বামী-স্ত্রী ধর্ম-বাসা বানিয়ে একত্র থাকবে, আজও সেটা ঘটে ওঠে নি। গোড়ায় পনের টাকায় ঢুকেছিল, এখন শোনা যায় কুড়ি। ইস্কুলের মাইনের কথা ঠিকঠাক বলবার জো নেই—খাতায় লেখে হয় তো পঞ্চাশ। যত বড় সাধু মাস্টার হও, এটুকু করতে হবে। সবাই করে, সকলে জানে। যে ইন্সপেক্টরকে দেখাবার জন্য করতে হয়, সে ভদ্রলোকও জানেন নিশ্চয়।

এ মাইনেয় ধর্মবাসা হয় না। ছোটবউ অগত্যা চোর-শ্বশুর এবং নায়েব ভাসুরের ভাতেই পড়ে আছে। মরমে মরে থেকে দু-বেলা দুই থালা অন্ন কোন গতিকে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

সন্ধ্যারাত্রে বংশী এসে বলল, বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, এখানে দু-জনে বসে ভুটুর-ভুটুর করে কি হবে? সে তো রোজই আছে। ইস্কুলবাড়ি যাচ্ছি, তুমিও চল।

সাহেব বলে, মতলব কি, বউয়ের তাড়ায় আবার ক-খ-ঠ নিয়ে পড়বে নাকি? সুবিধেও রয়েছে, তোমার ছোটমামা নিজে মাস্টার—

সে কি আর এই বয়সে! সময় থাকতে তুমি যা-হোক খানিকটা করে নিয়েছ।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু বউ বলছে ভাল হওয়া নাকি সব বয়সেই চলে। বলি, এমনি তবু দু-চার পয়সা আসে, ভাল হয়ে গেলে খাব কি শুনি? মেয়েমানুষ জাত, হিসেবজ্ঞান নেই—আদাজল খেয়ে লেগেছে। তা ভাবলাম একটা দিনেই কিছু আর ভাল হয়ে যাচ্ছি নে, দেখেই আসি না কেমন। খানিক পথ গিয়ে মনে হল, একলা না গিয়ে দোসর নেওয়া ভাল—একা না বোকা। তোমার কাছে চলে এসেছি।

বংশীর ভাব দেখে না হেসে পারা যায় না। হেসে উঠে সাহেব বলে, কী ব্যাপার ইস্কুলবাড়িতে?

একলা পড়ে থাকে ছোটমামা—দিনমানে ইস্কুল, সন্ধ্যার পরে কি করে? কিছুদিন থেকে তাই পাঠ ধরেছে। গীতা-পাঠ হত গোড়ায়, সে কটোমটো জিনিষ শোনার মানুষ হয় না। গীতা ছেড়ে আজ ক'দিন রামায়ণ ধরেছে। খুব জমেছে নাকি, নিত্যিদিন বউ সেখানে যাচ্ছে। আমায় যেতে বলে। আজকে বড্ড শাসিয়ে গেছে—

বিরস মুখে বলে, সীতা বনে গেলেন রামের পিছন ধরে। কলির সীতার উল্টো ফরমাস, তার পিছন ধরে আমায় গিয়ে রামায়ণে বসতে হবে। আসরে না দেখতে পেলে বাড়ি ফিরে আজ মুণ্ডু খেতো করবে, সতীলক্ষ্মী বলে গেছে।

অগত্যা সাহেবকে উঠে পড়তে হয়। বলে, রামায়ণ-গান দিয়ে গৃহস্থ ভূত তাড়ায় শুনেছি। আমার মতন জ্যান্ত ভূত সেখানে নিয়ে চললে বংশী—

বংশী বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, এই কথায় হেসে ফেলেঃ সে বটে ক্ষুদিরাম ভটচাজের গান। ইঁদুরে-খাওয়া হারমোনিয়াম আছে, সেই বাজনা সঙ্গে। বাজনা বলে আমায় দেখ, গান বলে আমায়। ইদানীং আর তেমন শুনিনে। রামায়ণ তো রামায়ণ—ওঝার মন্তোরও তার কাছে লাগে না, ভূতের ঠাকুরদা বেহ্মদত্যি অবধি পৈতে ছিঁড়ে বাপ-বাপ করে পালাবে। ছোট মামার পাঠ তেমন নয়—শুনেছি খুব মিষ্টি। আমার বউ একটা দিন গিয়েই জমে গেল। সন্ধ্যে হলেই ঘরবাড়ি ফেলে ছুটে গিয়ে পড়বে।

সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে বলে, এই দেখ, ভয় ধরিয়ে দিলে। আমিও যদি জমে যাই —শখ করে এক দিন গিয়ে রোজ রোজ যেতে হয় যদি। বলা যায় না কিছু—শেষটা হয়তো ভস্ম মেখে সোঁদালফলের মতো ছড়া ছড়া জটা ঝুলিয়ে সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সে নাকি বড় কষ্ট—ভক্তদের ঘি-দুধের সেবায় যা-কিছু রক্ত হল, মশা-ছারপোকায় তার ডবল টেনে নেয়। খাস কালীঘাটের আসল সাধুর মুখে শুনেছি।

হেসে ওঠে সাহেব, সে হাসিতে বংশী যোগ দিল না। বলে, সাধু হলে একটা দিক বড় বাঁচোয়া। এক দিন দেখি, থানার বড়বাবু ঘাড় নিচু করে ছোটমামার গীতা-পাঠ শুনছে। হিংসা হচ্ছিল—মামার কাছে বেটা কেঁচো হয়ে বসেছে, আমার কাছে—বাঘ। ছোটমামার কষ্ট যা-ই হোক, চৌকিদার-দারোগার চোখর-রাঙানি নেই। ঐ লোভে এক এক সময় সাধু হতে ইচ্ছে করে।

আসরের একটা কোণ নিয়ে দু-জনে বসে পড়ল। মুকুন্দ মাস্টারের অভিপ্রায় ছিল, সৎপ্রসঙ্গ করে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের বনিয়াদ গড়বে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পড়া মুখস্থ না করে পাঠ শুনতে আসবে কেন? গার্জেনেরও ঘোরতর আপত্তিঃ লেখাপড়া করে আখেরের ব্যবস্থা করুক এখন, ধর্মকথা শোনার সময় অনেক পরে—বুড়ো হয়ে পড়লে। আসর তবু দিব্যি জমেছে। ছেলে না পাঠিয়ে ছেলের মা-বাপ মাসি-পিসিরা আসে। যাদের ছেলেপুলে পড়ে না, তারাও সব আসে। মরশুমে পড়ে বাড়ির পুরুষ বাইরের কাজে চলে যাবার পর ভিড় অতিরিক্ত রকম বেড়েছে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকেও এসে জোটে। জলচৌকির উপরে পাঠের আসন। সামনে পিতলের ফেরোয় সিঁদুর ও আম্রপল্লব দিয়ে ঘটস্থাপনা হয়েছে। পাঠের আগে ও পরে সেই ঘটের সামনে গড় হয়ে বিড়বিড় করে সকলে কামনা জানায়ঃ কাজ-কর্ম খুব ভাল হয় যেন ঠাকুর, থলি-ভরা টাকা নিয়ে ঘরের ছেলেরা সুভালাডালি ঘরে চলে আসে। যত দিন তারা না ফিরছে, তল্লাটের মানুষ কোন রকম ধর্মকর্ম বাদ দেবে না। তাদের পাপে এদের পুণ্যে কাটাকাটি। ভক্ত শ্রোতা পেয়ে মুকুন্দও প্রাণ ভরে লেগে যায়। প্রহরের শিয়াল ডেকে গেল, পাঠ তবু থামে না।

বংশী ফিসফিসিয়ে বলে, ঐ দেখ আমার বউ। ঘোমটার ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আড়ে লম্বায় চৌকো মাপের ঐ যে বউটা। অবাক হবার কি আছে—আমি সরু, বলে বউয়ের বুঝি মোটা হতে নেই আঃ, আঙুল দিয়ে দেখিও না, রেগে যাবে।

থতমত খেয়ে সাহেব হাত নামিয়ে নেয়ঃ তা বটে! ভূতপেত্নী বাঘ আর স্ত্রীলোককে আঙুল দেখাতে নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।

বংশী হেসে ফেলল: কি জানি বাবা, বাঘ ভূতপেত্নী সামনাসামনি দেখিনি। কিন্তু ঐ যে দেখছ গদগদ হয়ে পাঠ শুনছে, বাড়ির চৌকাঠে পা দিলেই মারমূর্তি। গাছের ফুল পাতার মতো আমায় যেন আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে।

হাসির ছলে প্রথম দিন সাহেব যা বলেছিল, সত্যি বুঝি তাই খেটে যায়। আসা পাঠ মুকুন্দর, প্রাণ কেড়ে নেয়। খানিকটা বুঝি নেশা ধরে গেল, প্রায়ই সে আসে। বংশীই বরঞ্চ পাকসাট মারতে চায়, ঠেলেঠুলে সে-ই আনে বংশীকে। আসর সুদ্ধ লোক ঘন ঘন সাহেবের দিকে তাকায়। তার চেহারার গুণে। গুণ নয়, অভিশাপ—চেহারাটার উপরে অত মানুষের নজরগুলোর অবিরাম খোঁচাখুঁচি। অস্বস্তি লাগে। তবে এখানে এই আসরে বসে একটা নতুন উপলব্ধি—পাঠ আরম্ভ হতেই ভিন্ন লোকে চলে যায় সে যেন। অন্যে কি করছে, খেয়াল থাকে না।

রাম-বনবাসের জায়গাটা হচ্ছে সেদিন। সাহেব তন্ময় হয়ে শুনছে। রামচন্দ্রের মতন তারও বনবাস। কোন রাজবাড়িতে জন্ম হল তার—সাতমহল অট্টালিকা, অগুণতি দাসদাসী, হীরা-মাণিকের ছড়াছড়ি —সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে পুরী থেকে নির্বাসন দিল। বারো বছর কবে পার হয়ে গেছে, দুই বারো হতে যায়—ফেরার দিন কই আসে না। কোন দিনই আসবে না। ঠিকানাই জানে না কোথায় তার অযোধ্যাপুরী। ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যে নিশিরাত্রে চুপি চুপি পুঁটলিতে পুরে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিল। ঘুমে অচেতন পুরবাসী, কেউ কিছু জানলই না—কেমন করে আকুল হয়ে রামের পিছন ধরে ছুটবে? পুত্রশোকে রাজা দশরথ কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছেন—অথবা আপদ চুকিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি-ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন, তাই বা কে বলতে পারে!

বংশী হঠাৎ গায়ে ঠেলা দেয়: কী হচ্ছে সাহেব? সাহেব নামটা চালু হয়ে গেছে

ইতিমধ্যে। বলছে, এই সাহেব, চোখ মুছে ফেল। চল, বাড়ি যাই।

সম্বিত ছিল না সাহেবের। জাগ্রত হয়ে বুঝতে পারে, দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। কেলেঙ্কারি! সকলের দৃষ্টি তার দিকে।

ধড়মড় করে উঠে পালিয়ে যাবে, কিন্তু মুকুন্দ মাস্টারও দেখে ফেলেছে। পাঠের মধ্যেই হাতের ইসারায় তাকে বসতে বলল। নিরুপায় হয়ে বসতে হয়। অধ্যায়টা শেষ করে মুকুন্দ বই বন্ধ করল। বলে, আজকে এই পর্যন্ত।

হরিধ্বনি দিয়ে শ্রোতারা উঠে পড়ে। সাহেবও উঠছিল সকলের সঙ্গে, মুকুন্দ মানা করেঃ আমার ঘরে চল একটুখানি। নিয়ে এস বংশী, আলাপ করি। বলাধিকারী মশায়ের ওখানে আছ, সেটা শুনেছি। কদিন থাকবে এখানে ভাই?

'ভাই' বলে ডাকলেন অমন মান্যগণ্য মানুষটি। কম্পাউণ্ডের একদিকে খোড়ো-ঘরে মুকুন্দ মাস্টারের বাসা। অদূরে ঐ রকম আরও খান দুই ঘরে পুরোনো দপ্তরি রজনী বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে। পাঠের আসর ইস্কুলের বড় বারাণ্ডায়।

সাহেবকে সামনে বসিয়ে মুকুন্দ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। বলে, সাধুসন্তের চেহারার মধ্যে পুণ্যের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। তোমারও সেইরকম ভাই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবের মানুষ, ভক্ত মানুষ সংসারে বড় কম। এসো তুমি যে কদিন আছ।

ঐ চোখের জলের কাণ্ড—তারই সঙ্গে মিলেছে চেহারা! লজ্জা—কী লজ্জা! গ্রাম সুদ্ধ মানুষ—তাই বা কেন, কত গাঁয়ের কত মানুষ আসে, সকলে দেখে গেল। ফুলহাটায় থাকাই তো চলে না এর পর। পুরুষ-মেয়ে আঙুল দিয়ে দেখাবেঃ ঐ যে—দেখ, দেখ, সেই ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়াটা।

নানা কথায় রাতটা কিছু বেশি বয়ে গেছে। মুকুন্দ উনুন ধরাবে এবার। বলে, চিঁড়ে ফুরিয়ে গেছে, নয়তো হ্যাঙ্গামে যেতাম না। যাক গে, চাল ফুটিয়ে ফ্যানসা ভাত ঘুটে নিই। কতক্ষণ লাগবে!

বংশী বলে, নিজে কেন হাত পুড়িয়ে খাও ছোটমামা? আমি খারাপ, আমার আজামশায় খারাপ—আমাদের ভাত না-ই খেলে। রজনীরা পাশে আছে, ওর বউ চাট্টি রেঁধে দিতে পারে না?

মুকুন্দ বলে, রজনী নিজে থেকেই বলেছে কতবার। এমনি পাঁচ-ছটা ছেলেপুলে, তার উপর আমি গিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাইনে।

ফেরার পথে বংশী বলে, অর্ধেক দিনই উপোস ছোটমামার। আজ ঠিক ঝাঁঝালো ক্ষিধে, গরজ করে তাই উনুন ধরাতে গেল। রজনী দপ্তরির সঙ্গে হলে খাও না খাও বাঁধা খরচা দিয়ে যেতে হবে। সেই জন্যে এগোয় না, কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে খায়। কঞ্জুষ বুঝি?

দায়ে পড়ে হতে হয়েছে। পেটে না খেয়ে দুঃখধান্দা করে পয়সা বাঁচায়—বাসা করে ছোটমামীকেও পাপের সংসার থেকে উদ্ধার করে আনবে। সে আর এ জন্মে নয়। দেহ থাকলে অসুখবিসুখ আছে, লোকালয়ে থাকলে দায়বেদায় আছে। টাকাটা সিকিটা পয়সাটা জমিয়ে জমিয়ে যা করল, এক ঝোঁকে সব লোপাট। বছর আন্টেক তো হয়ে গেল, রাই কুড়িয়ে বেল আর হয় না। ভেবেচিন্তে দুটো পয়সা রোজগার বাড়াবে, সে ইচ্ছেও তো নয়। সাঁজের বেলাটা পুঁথি না পড়ে তিনটে ছেলে পড়ালে কোন না পাঁচটা টাকা আসে! আলাদা ধাঁচের মানুষ—মাথা খারাপ, বলাধিকারী বলেন। নিজের মাথা নিয়ে চুপচাপ থাকলে কথা ছিল না, পুঁথিপত্তর শুনিয়ে আরও যে দশটা ভাল মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমার বউয়ের তাই করেছে। 'ভাল হও' 'ভাল হও' দিন-রাত বউ কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে। আগে অমন ছিল না, ছোটমামার পাঠ শুনে হয়েছে।

এর পর সাহেবের নিজের কথা উঠে পড়ল। বংশী বলে, আজামশায়ের গুণজ্ঞান আছে, তার বেটা ছোটমামাও দেখছি গুণ করে ফেলতে পারে। ভিন্ন রকমের গুণ—উল্টো দিকে। আমার বউকে করেছে। তুমি বিদেশি মানুষ, বলাধিকারী আশায় আশায় কোন মুলুক থেকে টেনে এনে বাড়ির উপর ঠাঁই দিয়েছেন—কটা দিনেই তোমার চোখে জল বের করে ছাড়ল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে সাহেব চাপা দিতে চায়ঃ না না, উনি কি করলেন! পাঠ শুনে কেমন হয়ে গেল—জেগে জেগেই যেন দুঃখের স্বপ্ন দেখলাম একটা—

বংশী প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, পাঠ তো আমিও শুনলাম। আগেও কত দিন শুনেছি। আমার তো কই লঙ্কার গুঁড়ো চোখে ঠেসেও এক ফোঁটা জল বের করা যায় না। ছোটমামা তবে খাঁটি কথাই বলেছে—ওদেরই ভাবের মানুষ তুমি। ভক্ত মানুষ। বলাধিকারীর আশায় ছাই। ভুল মানুষ নিয়ে এসেছেন।

সাহেব সভয়ে বলে, খবরদার বংশী, বলাধিকারী মশায়ের কানে না যায়। হাসবেন, ঠাট্টা করবেন। তাড়িয়ে দেবেন হয়তো দূর-দূর করে। তোমার ছোটমামার এই পোড়া ইস্কুলে আর আসব না।

মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, কোন দিন আর আসছি নে। সর্বনেশে জায়গা। যা বললে—খুবই সত্যি। মনটা ভিজিয়ে একেবারে জোলো করে দেয়। বুড়ো-বুড়িরা হাঁ করে বসে শুনছিল, তাদের পোষায়—পুঁথি শুনবে, তারপর বাড়ি ফিরে বসে বসে ঝিমোবে। কাজ-কাজ বলে পাগল করে তুলছি, আফিঙের ডেলা মুখে পুরে বসলে কাজ দেবেন বলাধিকারী কোন ভরসায়?

মুখে এই বলল, মনে মনেও সা[...] সর্বক্ষণ নিজেকে এবং অজানা বাপ-মা[...] নামে ধিক্কার দিচ্ছে। বাপ অথবা মা—দু[...] মধ্যে একজন। কথায় কথায় কেঁদে ভাসা[...] নিশ্চয় একের স্বভাব। বাপই হয়তো[...] নির্দোষ অবোধ সন্তান বিসর্জনের ব্যাপা[...] কোমলপ্রাণ বাপ হয়তো জানত না [...] শয়তানী মা চুপিচুপি আত্মকলঙ্ক ভাসি[...] দিয়েছে। দিয়ে সতী হয়েছে দশের মা[...] অথবা হতে পারে, প্রসবকালে অচেতন মা[...] অজ্ঞাতে দানব বাপ নিজের দায়দা[...] নিশ্চিহ্ন করে গেছে—মা তারপরে কেঁদে[...] কত। আজও হয়তো কাঁদে। এত [...] ভুবনের মধ্যে কোন কিছুই দিল না তা[...] পিতৃমাতৃ পরিচয়টুকুও নয়—উত্তরাধিকা[...] শুধুমাত্র সেই অপরিচিত অপদার্থ মানু[...] প্যাচপেচে কাদার মতো মন। প্রতিপ[...] যা নিয়ে অপদস্থ হচ্ছে।

নেশা কিন্তু কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পা[...] না। দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। খাতির[...] বাড়ছে—মুকুন্দ ভাই বলে, সাহেব ভা[...] ছোড়-দা। সন্ধ্যা হলেই মন উসখুস ক[...] আসরে গিয়ে বসবার জন্য। হঠাৎ এর ম[...] বংশীর বউ ভেদবমি হয়ে কাহিল হ[...] পড়ল। বংশীর যাওয়া বন্ধ। ঘোমটা[...] মধ্য দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গতিবি[...] দেখবার মানুষটা নেই, কোন দায়ে আসা[...] হাত-পা কোলে করে বসে থাকবে? সাহে[...] যাক একা একা।

বংশীর কাছেও সে কথা স্বীকার করতে[...] লজ্জা। আজে-বাজে বলে কাটান দেয়[...] বলে, হাটে গিয়েছিলাম। কোন হাটে রে[...] দিশা না পেয়ে ভুল এক গাঁয়ের নাম ক[...] দেয়, ঐ বারের হাট সে গাঁয়ে নয়। ধ[...] ফেলে বংশী হেসে খুন। সন্ত্রস্ত হ[...] সাহেব বারবার বলে, বলবে না কাউ[...] দোহাই। বলাধিকারী মশায় টের না পান[...]

আসরে বিশগণ্ডা চোখের উপর জান[...] জানি হয়ে পড়ছে, আসরের বাইরে ভি[...]

সময় ছোড়-দার কাছে গিয়ে বসে। এক একদিন অপরাহ্ণে ইস্কুলের ছুটির পর থাল-ধারে বেড়ায় দু-জনে। কায়দা পেলেই সাহেব মহাগুণী পচা বাইটার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আদায় হয় না কিছুই। মন্ত্র-গুপ্তির মতো মুকুন্দ বাপের কথা চাপা দিয়ে ভগবান নিয়ে পড়ে। বেড়ানোর মুখেও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে যেতে হয়। নিতান্ত যে খারাপ লাগে, তা নয়।

ঘরে ফেরার সময় সাহেব অনুশোচনায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সারাপথ মনে মনে মা-কালীর পায়ে মাথা খোঁড়েঃ অনেক দূরে তুমি আছ মাগো, তবু কি আর দেখতে পাচ্ছ না? বলাধিকারী মশায়ের অনেক আশা আমার উপর, সব বুঝি বরবাদ হয়ে যায়। সর্বনেশে ধার্মিক ঐ ছোড়দা—কোনদিন তার কাছে যেন না আসি। চোখ দুটো খুঁড়ে ফেললেও এক ফোঁটা জল যেন না বেরোয়। মন্দ করে দাও আমায় মা-জননী—যার চেয়ে মন্দ মানুষ কোনদিন কোথাও হয়নি।

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ২১ ॥

বরকর্তা ডাক্তার পিল্লাইয়ের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি নেই। গোটা তিনেক তাঁবুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম কারাংমেটায় তার আগেই কম্পাউন্ডারবাবু তিনটি তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছেন। একটাতে থাকব আমরা তিনজনে। পাশের তাঁবুতে মিসেস পিল্লাই আর কম্পাউন্ডারবাবুর স্ত্রী—তৃতীয়টি রান্নাঘর। লতা-পাতা দিয়ে অস্থায়ী স্নানাগারও একটি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

দুটি মাত্র খাটিয়া জোগাড় করা গেছে। দৈর্ঘ্যে সে দুটি এত ছোট যে, তাতে আমার পক্ষে শোবার চেষ্টাটা হবে হাস্যকর; সুতরাং এই মওকায় শিভ্যালরি দেখিয়ে সে দুটি মহিলাদের তাঁবুতে চালান করে দেওয়া গেল। মাটিতেই পুরু করে খড় বিছিয়ে নিয়ে বিছানা পেতে নিলাম। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে জুত করে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেন: ও কি মশাই, শুচ্ছেন যে? বিয়ে দেখতে যাবেন না?

: বিয়ে? সে তো কাল। আজ আবার কি?

: মুরিয়া বিয়ে আপনাদের মতো এক সন্ধ্যার ছেলেখেলা নয়। রীতিমতো সাত দিন ধরে চলে বিবাহ-উৎসব। চয়নের বিয়েটা অবশ্য বিশেষ কারণে তিন দিনেই শেষ হচ্ছে।

: বিশেষ কারণটা কি?

শুনলাম ব্যাপারটা। আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে মিটিং হচ্ছে এ-বেলা ও-বেলা। মহারাজের গ্রেপ্তারে ওরা ক্ষেপে গেছে। এমন পরিবেশে দীর্ঘদিন আনন্দ উৎসব চলে না। বস্তুত গাঁয়ের গাইতার মেয়ের বিয়ে না হলে এ-অনুষ্ঠান স্থগিতই রাখতে হত হয়তো। মুরিয়া সমাজের মাতব্বররা বাধাও দিতে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে সংক্ষেপে সারা হবে বিয়ে।

পরশু এসেছে কাবোঙ্গার বরযাত্রী দল। বিকেল নাগাদ। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে গত কালের অনুষ্ঠানসূচীর একটা রিপোর্ট পাওয়া গেল। কাবোঙ্গা ঘটুলের সব কয়জন চেলিক-মোটিয়ারী এসেছে সহযাত্রী হয়ে। এসেছে ওর বাপ কোন্ডা, গাঁয়ের গাইতা গাদরু, চয়নের মা, কাকা, কাকিমা, ইত্যাদি।

সন্ধ্যাবেলায় আগুন জেলে কাবোঙ্গার দল ক্যাম্প-ফায়ার করেছিল। নাচ আর গান। চয়ন নিয়েছিল নেতৃত্ব। এই নাচ নাকি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কারণ অবিবাহিত চেলিক হিসাবে এই তার শেষ নাচ। নাচের নামও 'শেষ-নাচ'।

নাচ শেষ হল রাত নটা নাগাদ। তখন শোনা গেল আয়েতুর বাড়ি থেকে মান্দ্রি ঢোলের ডুগ্‌ ডুগ্‌ ভেসে আসছে। সবাই ছুটলো সেদিক পানে। ডাক্তারবাবুও গিয়েছিলেন ওদের পিছু-পিছু। কনের বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছে ছেলে-বুড়োর দল। বুড়োর দল অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না। দু-এক পাত্র লান্ডা খেয়ে সরে পড়ল এদিক সেদিক। কারাংমেটার চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন বের করে আনল ঘর থেকে কনেকে। দুলোসা আর জানকি দুজনে ওর দুহাত ধরে নিয়ে এসে বসাল সভার মাঝখানে। এর পর শুরু হল গান। নাচ নয় কিন্তু।

এখানেই তফাৎ। কাবোঙ্গার ওদের ছিল আনন্দ-উৎসব। তার গানের সুরও তাই দ্রুতলয়ে—তার সঙ্গে নাচ না হলে জমে না। কারাংমেটার এই সান্ধ্য আয়োজন কিন্তু বেদনাবিধুর বিদায় অনুষ্ঠান এখানে গানের সুর তাই বিলম্বিত লয়ে। নাচবার উৎসাহই নেই কারও। মালকোই গাইল প্রথম গান। তার তিনটি স্তবক: প্রথম স্তবকটা আয়েতুর উদ্দেশ্যে:

বাবা গো বাবা, তুমি আমার কাছে (এস)।
অজানা ঘরের ঘরনী করে
(আজ তুমি আমাকে) বিদায় দিচ্ছ।
হায় বুড়দেও কেন (তুমি আমাকে বাবার)
পুত্রসন্তান করনি?
(তাহলে আজ আমাকে) এভাবে
চলে যেতে হত না......
আমি (বাবার) সংসারকে
বড় করতে পারতাম......
(বাবার) ক্ষেতে কাজ করতাম......
আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি)॥

অন্তরাটা আথালীকে উৎসর্গ করা:

মা গো মা, তুমি আমার কাছে (এস)।
গতকালকেও আমি (তোমার হাতে হাতে)
কাজ করেছি......
ধান ভেঙেছি, ঝাঁট দিয়েছি,
জল ভরেছি ঘড়ায়......
তুমি (এতটুকু বেলা থেকে)
আমাকে খাইয়েছ, পরিয়েছ......
আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি)॥

শেষ স্তবকে সম্বোধন করা হয়েছে ঘটুলের বান্ধবীদের:

ও দুলোসা, ও তিলোকা,
ও আলোসা, ও জানকি;
তোমরা সবাই আমার কাছে (এস)।
আমি (তোমাদের সঙ্গে) নেচেছি,
গেয়েছি, হেসেছি, কেঁদেছি......

সময় ছোড়-দার কাছে গিয়ে বসে। এক একদিন অপরাহ্নে ইস্কুলের ছুটির পর খাল-ধারে বেড়ায় দু-জনে। কায়দা পেলেই সাহেব মহাগুণী পচা বাইটার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আদায় হয় না কিছুই। মন্ত্র-গুপ্তির মতো মুকুন্দ বাগের কথা চাপা দিয়ে ভগবান নিয়ে পড়ে। বেড়ানোর মুখেও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে যেতে হয়। নিতান্ত যে খারাপ লাগে, তা নয়।

ঘরে ফেরার সময় সাহেব অনুশোচনায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সারাপথ মনে মনে মা-কালীর পায়ে মাথা খোঁড়েঃ অনেক দূরে তুমি আছ মা-গো, তবু কি আর দেখতে পাচ্ছ না? বলাধিকারী মশায়ের অনেক আশা আমার উপর, সব বুঝি বরবাদ হয়ে যায়। সর্বনেশে ধার্মিক ঐ ছোড়দা—কোনদিন তার কাছে যেন না আসি। চোখ দুটো খুঁড়ে ফেললেও এক ফোঁটা জল যেন না বেরোয়। মন্দ করে দাও আমায় মা-জননী—যার চেয়ে মন্দ মানুষ কোনদিন কোথাও হয়নি।

(ক্রমশ)

দণ্ডকশবরী

বিকর্ণ

॥ ২১ ॥

বরকর্তা ডাক্তার পিল্লাইয়ের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি নেই। গোটা তিনেক তাঁবুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম কারাংমেটায় তার আগেই কম্পাউন্ডারবাবু তিনটি তাঁবু খাটিয়ে ফেলেছেন। একটাতে থাকব আমরা তিনজনে। পাশের তাঁবুতে মিসেস পিল্লাই আর কম্পাউন্ডারবাবুর স্ত্রী—তৃতীয়টি রান্নাঘর। লতা-পাতা দিয়ে অস্থায়ী স্নানাগারও একটি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

দুটি মাত্র খাটিয়া জোগাড় করা গেছে। দৈর্ঘ্যে সে দুটি এত ছোট যে, তাতে আমার পক্ষে শোবার চেষ্টাটা হবে হাস্যকর; সুতরাং এই মওকায় শিভ্যালরি দেখিয়ে সে দুটি মহিলাদের তাঁবুতে চালান করে দেওয়া গেল। মাটিতেই পুরু করে খড় বিছিয়ে নিয়ে বিছানা পেতে নিলাম। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে জুত করে শোবার উপক্রম করছি, পিল্লাই সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেনঃ ও কি মশাই, শুচ্ছেন যে? বিয়ে দেখতে যাবেন না?

ঃ বিয়ে? সে তো কাল। আজ আবার কি?

ঃ মুরিয়া বিয়ে আপনাদের মতো এক সন্ধ্যার ছেলেখেলা নয়। রীতিমতো সাত দিন ধরে চলে বিবাহ-উৎসব। চয়নের বিয়েটা অবশ্য বিশেষ কারণে তিন দিনেই শেষ হচ্ছে।

ঃ বিশেষ কারণটা কি?

শুনলাম ব্যাপারটা। আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে মিটিং হচ্ছে এ-বেলা ও-বেলা। মহারাজের গ্রেপ্তারে ওরা ক্ষেপে গেছে। এমন পরিবেশে দীর্ঘদিন আনন্দ উৎসব চলে না। বস্তুত গাঁয়ের গাইতার মেয়ের বিয়ে না হলে এ-অনুষ্ঠান স্থগিতই রাখতে হত হয়তো। মুরিয়া সমাজের মাতব্বররা বাধাও দিতে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে সংক্ষেপে সারা হবে বিয়ে।

পরশু এসেছে কাবোঙগার বরযাত্রী দল। বিকেল নাগাদ। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে গত কালের অনুষ্ঠানসূচীর একটা রিপোর্ট পাওয়া গেল। কাবোঙগা ঘটুলের সব কয়জন চেলিক-মোটিয়ারী এসেছে সহযাত্রী হয়ে। এসেছে ওর বাপ কোন্ডা, গাঁয়ের গাইতা গাদরু, চয়নের মা, কাকা, কাকিমা, ইত্যাদি।

সন্ধ্যাবেলায় আগুন জ্বেলে কাবোঙগার দল ক্যাম্প-ফায়ার করেছিল। নাচ আর গান। চয়ন দিয়েছিল নেতৃত্ব। এই নাচ নাকি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কারণ অবিবাহিত চেলিক হিসাবে এই তার শেষ নাচ। নাচের নামও 'শেষ-নাচ'।

নাচ শেষ হল রাত নটা নাগাদ। তখন শোনা গেল আয়েতুর বাড়ি থেকে মাদ্রি ঢোলের ডুগ্‌ডুগ্ ভেসে আসছে। সবাই ছুটলো সেদিক পানে। ডাক্তারবাবুও গিয়েছিলেন ওদের পিছু-পিছু। কনের বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছে ছেলে-বুড়োর দল। বুড়োর দল অবশ্য বেশিক্ষণ থাকল না। দু-এক পাত্র লান্ডা খেয়ে সরে পড়ল এদিক সেদিক। কারাংমেটার চেলিক-মোটিয়ারীর দল তখন বের করে আনল ঘর থেকে কনেকে। দুলোসা আর জানকি দুজনে ওর দুহাত ধরে নিয়ে এসে বসাল সভার মাঝখানে। এর পর শুরু হল গান। নাচ নয় কিন্তু।

এখানেই তফাৎ। কাবোঙগার ওদের ছিল আনন্দ-উৎসব। তার গানের সুরও তাই দ্রুতলয়ে—তার সঙ্গে নাচ না হলে জমে না। কারাংমেটার এই সান্ধ্য আয়োজন কিন্তু বেদনাবিধুর বিদায় অনুষ্ঠান এখানে গানের সুর তাই বিলম্বিত লয়ে। নাচবার উৎসাহই নেই কারও। মালকোই গাইল প্রথম গান। তার তিনটি স্তবকঃ প্রথম স্তবকটা আয়েতুর উদ্দেশ্যেঃ

বাবা গো বাবা, তুমি আমার কাছে (এস)।
অজানা ঘরের ঘরনী করে
(আজ তুমি আমাকে) বিদায় দিচ্ছ।
হায় বড়দেও কেন (তুমি আমাকে বাবার)
পুত্রসন্তান করনি?
(তাহলে আজ আমাকে) এভাবে
চলে যেতে হত না......
আমি (বাবার) সংসারকে
বড় করতে পারতাম......
(বাবার) ক্ষেতে কাজ করতাম......
আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি)॥

অন্তরাটা আখালীকে উৎসর্গ করাঃ

মা গো মা, তুমি আমার কাছে (এস)।
গতকালকেও আমি (তোমার হাতে হাতে)
কাজ করেছি......
ধান ভেঙেছি, ঝাঁট দিয়েছি,
জল ভরেছি ঘড়ায়......
তুমি (এতটুকু বেলা থেকে)
আমাকে খাইয়েছ, পরিয়েছ......
আজ আমি পরের ঘরে (চলে যাচ্ছি)॥

শেষ স্তবকে সম্বোধন করা হয়েছে ঘটুলের বান্ধবীদেরঃ

ও দুলোসা, ও তিলোকা,
ও আলোনা, ও জানকি,
তোমরা সবাই আমার কাছে (এস)।
আমি (তোমাদের সংগে) নেচেছি,
গেয়েছি, হেসেছি, কেঁদেছি......

এতদিন আমি তোমাদেরই
একজন (ছিলাম)......
তোমাদের ভালবেসেছি
আর গালমন্দ দিয়েছি......
তোমরাও ভালবেসেছ
আর গালমন্দ দিয়েছ......
সেই আমি আজ পরের ঘরে
(চলে যাচ্ছি)॥

এ-গান মালকো রচনা করেনি। কে রচনা করেছে, কেউ জানে না। ছড়ার পদকর্ত্রীকে কেই বা চেনে? কিন্তু আমার কেমন মনে হল, বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় যে মেয়েটি এ-গান প্রথম বেঁধেছিল, সে যেন আমার পরিচিত। এই মেয়েটিই না লিখেছিল সেই বাংলা ছড়াটা?

ঃ বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন
খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন
ভাতারখাকি বলে।

গানের আসর ভেঙেছিল রাতের দ্বিতীয় প্রহরে।

আজ সকালে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তার নাম 'সামধি ভেট।' সামধি অর্থ বেয়াই, ভেট তো সাক্ষাৎ। এ-অনুষ্ঠান দুই বেয়াই—দুই বেয়ানের। এখানে বর-কনে তো নয়ই—তাদের বন্ধু-বান্ধবীরাই আসতে পায় না। বস্তুত এ-অনুষ্ঠানে বুড়ো-বুড়িদের রঙ্গ-রসিকতার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। হয় টাকের পাসপোর্ট অথবা পাকা চুলের ভিসা—এর একটা না দেখাতে পারলে সামধি ভেটের আসরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

দুর্ভাগ্য আমার—এ-অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারিনি। এক কন্যার জনক ডাক্তার পিল্লাইও এখানে ছাড়পত্র পাননি।

এর পর দুপুরবেলা হয়েছে 'মাণ্ডা-মিছানা'। মাণ্ডা সম্ভবত মণ্ডপের অপভ্রংশ। মিছানা হচ্ছে আহরণ বা সংগ্রহ। বিবাহমণ্ডপ যে কাঠ দিয়ে তৈরি হবে, তার কাঠ সংগ্রহ করাও নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে করতে হবে। অনেকটা আমাদের 'জল-সইতে' যাওয়ার মতো অহেতুক হুল্লোড়! দু পক্ষের চৌলিক দল এক হয়ে যাবে কাঠ কাটতে। যে গাঁয়ে বিয়ে হচ্ছে, সেই গাঁয়ের গাইতা প্রথমে এক কোপে কাটবে একটা মহুয়া গাছের চারা। তারপর অন্যান্য সকলে চালাবে ঝপাঝপ মাকসু। দু পক্ষের মোটিয়ারীর দল কোন সাহায্য তো করবেই না, উপরন্তু নানাভাবে বাধা দেবে। টিটকারী দেবে, কাপড় ধরে টানবে, পিছন থেকে চেপে ধরবে উদ্যত কুঠার। চৌলিকদের চটলে চলবে না। শত বাধা অগ্রাহ্য করে ডালগুলো কেটে নামাচ্ছে তারা। এখানেই তাদের কর্তব্য শেষ।

এবারে দু পক্ষের মোটিয়ারীর কাজ।

সেই কাটা-গাছের ডাল তাদের বয়ে আনতে হবে বিবাহ-মণ্ডপে। ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে প্রয়োজন মত। আর এবার দুদলের চৌলকরা নেবে প্রতিশোধ! তারা সাহায্য তো করবেই না, বরং বাধা দেবে নানানভাবে। কাপড় খুলে দেবার চেষ্টা করবে, ডাল চেপে ধরবে, অথবা টিটকারী-ভরা গানে গানে বিব্রত করে তুলবে ওদের। মাতব্বরেরা মাঝে মাঝে শুধু ধমক দিতে থাকবেন : নাও-নাও, রঙ্গ-রসিকতা বন্ধ রেখে কাজটা করে ফেল এবার।

অবশ্য কম্পাউণ্ডারবাবু বলেছিলেন, এসব আইন মুরিয়া সমাজে সর্বজনীন নয়। তিনি ইতিপূর্বে যে দুটি মুরিয়া বিয়ে দেখেছিলেন, সেখানে 'সার্মাধ ভেটে' এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল না। 'মান্ডা-মিছানাতে'ও কেউ কাউকে বাধা দেয়নি। হতে পারে, হয়তো এটা স্থানীয় লোকাচার।

দুর্ভাগ্য আমার। এসব কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি গিয়ে পৌঁছবার আগেই এসব অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেছে। আজ রাত্রে শুনলাম বরের মাথায় মুকুট পরানোর উৎসব হবে। তাই দেখতে গেলুম সবাই দল বেঁধে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বিবাহ-মণ্ডপে বেশ লোক জমেছে। চেয়ার কোথায় পাবে? কাটুল পেতে দেওয়া হল আমাদের জন্য। বড় বড় গোটা পাঁচেক মশাল জ্বলছে। মণ্ডপের মাঝখানে একটা মাটির বেদী। তার উপর একটা জ্যামিতিক নক্সা আঁকা। এর নাম 'ঘাড়ি'। গাইতা স্বয়ং এটি এঁকেছে, আর পুজারী মন্ত্রপাঠ করেছে। এটা নাকি মঙ্গলচিহ্ন।

বেদীর সামনে একটা মাদুর পাতা। তার উপর বসেছে চয়নের শ্বশুর আয়েতু। আর তার কোলে বসে আছে চয়ন। আমাদের দেখে মিটি মিটি হাসছে। ওর গলায় তিন-প্রস্থ কড়ির মালা, উপর হাতে বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে বালা—কপালে পুঁথির টায়রা।

গাদরু এবার একটি কুশের আংটি, কয়েকটি কড়ি আর শিয়ারি পাতায় করে এক ঠোঙা মধুকে উৎসর্গ করল, আয়েতু গোণ্ডের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে। এটা পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য। না হলে খুশিমনে নিজ গোত্রের একটি মেয়েকে ভিন্ন গোত্রে যেতে দেবেন কেন তাঁরা? শুনলাম, বিবাহের এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কি যেন একটা গোণ্ডি শব্দও বলল ওরা, যার অর্থ 'গোত্রান্তর-অনুষ্ঠান'।

এবার আয়েতুর ছুটি হল। আর শ্বশুরের কোলে নয়, এবার বসতে হবে কোন বৌঠানের কোলে। সম্পর্কে বৌদিদি হন, এমন একজন প্রৌঢ়া মহিলা এসে বসলেন সেই মাদুরে। [illegible] দল এবার এসে ঘিরে ফেললেন বরকে। অনেকটা আমাদের যেমনভাবে শুভদৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে একটা কাপড় দিয়ে আড়াল করা হল, যাতে সভাশুদ্ধ কারও দেখতে কোন অসুবিধা না হয়। এবার হবে 'নয়ী-মোর' উৎসব। ডুগ্ ডুগ্ করে বাজল মান্দ্রি ঢোল। কাবাণ্ডগার গাইতা গাদরু এবার নিয়ে এল মুকুটটা। 'নয়ী-মোর'। বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় 'তেল-টোপর' বা 'তৈল-মুকুট'। হাতে নিয়ে দেখলাম। তালপাতায় বোনা অদ্ভুত জিনিসটা। গোটা তিনেক নয়ী-মোর আনা হয়েছিল—তার মধ্যে একটা পছন্দ করা হল। যে তৈরি করেছে, তার শিল্পবোধকে তারিফ করতে হয়। প্রায় ফুটখানেক ব্যাসবিশিষ্ট এই মুকুটগুলিতে বিজোড় সংখ্যক পাপড়ি থাকা চাই। যেটা পছন্দ করা হল, সেটাতে সাইত্রিশটা পাপড়ি।

নয়ী-মোরটা সাতবার চয়নের মাথার উপর দুলিয়ে দিয়ে গাদরু হঠাৎ বীরবিক্রমে একটা হুংকার দিয়ে চয়নের মাথায় [illegible] বসিয়ে দিল। যেন অলিম্পিক [illegible] ভেঙেছে গাদরু—সমবেত সকলে [illegible] জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। ফিরিঙ্গি [illegible] সিনেমা দেখতে গিয়ে কিছু না [illegible] আমরা যেমন জনতার সঙ্গে সুর মি[illegible] হেসে উঠি মাঝে মাঝে ইয়াঙ্কি রসিক[illegible] —এক্ষেত্রেও তেমনি আমরা করতালিযো[illegible] অভিনন্দন জানালুম গাদরুকে, [illegible] অভূতপূর্ব সাফল্যে। গাদরু এবার চয়নের মাথায় একটা শুকনো লাউয়ের হাতায় করে তেল ঢেলে দিল আর কচি আম পাতায় হলুদ নিয়ে ওর সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিল। এই সুযোগে মোটিয়ারীর দল 'নয়ী-মোর উৎসবের একটা গানও গেয়ে নিল সমবেত কণ্ঠে :

কাট্টা ছিন্দ্ বুটা রতি রতি কান্দে
ওহো......রতি রতি কান্দে ॥
ন্দরে ছিন্দ্ বুটা বাবু মোর পিন্দে,
ওহো......বাবু মোর পিন্দে ॥
ন্ধো তে বান্ধো পূজারি,
ছুটুক মোর বান্ধো,
ওহো......ছুটুক মোর বান্ধে ॥

অর্থাৎ,
বাগানের ঐ তালপাতা কি
কাঁদছে সারা রাতি?
ওহো (কেন) কাঁদিস সারা রাতি?
কাঁদিস নারে তালের পাতা,
তোকেই আমার নাতি
ওহো (জানি) করবে বিয়ের ছাতি ॥

বাঁধ্ পূজারী বাঁধরে এবার
যতন করে বাঁধ
ওহো (এল) নাতির ঘরে সাথী ॥

নয়ী-মোর গর্ভাঙ্কের এখানেই পড়ল যবনিকা।

এবার দু-তিনজনে ধরাধরি করে নিয়ে এল পাত্রীকে। একবস্ত্রা কন্যার সাজ যেটুকু,

সেটুকু শুধু অলঙ্কারের আতিশয্যে। কানে, গলায়, হাতে, পায়ে। তবে চুলটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে খুব যত্ন করে। আর আশ্চর্য, ওর মাথায় একটাও কাঁকুর নেই। এত সাজ-গোজ সত্ত্বেও বস্ত্রের স্বল্পতা হেতু আমাদের চোখে ওকে বিয়ের কনে বলে মনেই হচ্ছে না।

এবার আবার আয়েতুর কোলে বসল চয়ন। আর কোল্ডার কোলে মালকো। দুই সামনি বসল মুখোমুখি। কারাংমেটার দুলোসা, তিলোকা এসে মালকোর হাতে আচ্ছা করে তেল মাখালে কনুই পর্যন্ত। তারপর গাদরু একটা কুশের আংটি এনে পরিয়ে দিল চয়নের বাঁ হাতের কনিষ্ঠায়। কি যেন বলল সুর করে। মন্ত্রোচ্চারণ করল বোধ হয়। এবার বরের কর্তব্য হচ্ছে নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলে কন্যার বাঁ হাতের অনামিকায় সেটা পরিয়ে দেওয়া। আর কনের কর্তব্য, কিছুতেই সেটা আঙুলে না পরা। ফলে রীতিমতো হাত-কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। বুঝলাম, এই জন্যেই মালকোর সখীরা তার হাতে তেল মাখিয়ে দিয়েছে—যাতে চয়ন হাত ধরলে সেটা পিছলে যায়! এই হাত কাড়াকাড়ির খেলা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ বরকনে কেউই নিজের শ্বশুরের কোল ছেড়ে উঠতে পারবে না কিন্তু। মোটিয়ারীর দল হাততালি দিয়ে ওদের ঘিরে নাচতে থাকেঃ

মুদা মুদা ইন্টোনি রে দাদা।
সোনা পেকো আয়ে রো দাদা ॥

শেষ পর্যন্ত কিন্তু চয়নই জিতল। মালকোর বাহুমূলে ধরে টেনে আনল কাছে। জোর করে পরিয়ে দিল আংটিটা ওর অনামিকায়। প্রথামতো মোটিয়ারীরা ধিক্কার দিল মালকোকে—সে নাকি লোক-দেখানি বাধা দিয়েছে—আন্তরিকভাবে বাধা দেয়নি।

কে যেন কি একটা বললে, আর হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

আমি কৌতূহলী হয়ে বলি : কি, কি বলল ও ?

পিল্লাই সাহেবের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। প্রায় কানে কানে বলেন : ও আর আপনার শুনে কাজ নেই।

বুঝলাম কিছু একটা রসিকতা করা হয়েছে যা আমাদের ধারণায় শ্লীলতা-বহির্ভূত।

হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাল মালকো। আর যাওয়ার পথে তার তৈলাক্ত মুঠিতে চয়নের পিঠে কষিয়ে দিলে একটা কিল—দুম করে! চয়নও উঠে পড়ে ছুটল তার পিছনে—কিন্তু নাগাল পেলে না বধূর। কারাংমেটার চেলিকেরা তাদের প্রিয় মালকোকে আড়াল করে ঘিরে দাঁড়াল, তাকে পালাবার রাস্তা করে দিল। এই নাকি নিয়ম। পরদেশী পুরুষের আক্রমণ থেকে ঘটুলের প্রতিটি মোটিয়ারীকে রক্ষা করার কঠিন দায় চেলিক দলের। এই দেবযানের মতো সে অধিকার প্রয়োগ করল তারা। ওদের সমবেত বাধাদানে হার মানতে হল চয়নকে। কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হল অগত্যা।

এর পর মধ্যাহ্ন বিরতি।

তাঁবুর দিকে ফেরার পথে বললুম : যাই বলুন মিসেস্ পিল্লাই, ওদের এই আংটি পরানোর খেলা আমাদের কড়ি খেলার চেয়ে ঢের বেশী ইন্টারেস্টিং।

শর্মিলা দেবী সায় দিয়ে বলেন : বটেই তো, আহা এমন কিল মারবার সুযোগ আমরা পাই না!

ডাক্তার পিল্লাই বলেন : প্রকাশ্যে কিল মারতে পার না বলেই বুঝি জনান্তিকে বাকি জীবনটা ধরে সে খেদ মিটিয়ে নাও ?

কম্পাউন্ডারবাবুর স্ত্রী না শুনতে পাওয়ার ভঙ্গি করে হাসি গোপন করেন।

শর্মিলা দেবী ধমক দিয়ে ওঠেন : চুপ কর!

কিন্তু চুপ করতে দিলে না শর্বরী। আমার কোল থেকে সে প্রশ্ন করে মাকে : তুমি বাবাকে কিল মেরেছিলে মা ?

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো নাচ-গান হৈ-হল্লার আওয়াজে। কী ব্যাপার ? না, স্নান করানো হচ্ছে বরবধূকে। এই সাত সকালে ? শুনলুম,—হ্যাঁ, তাই নিয়ম। জুত করে চা-টাও খেতে দিল না দেখছি। গুটি গুটি গিয়ে হাজির হওয়া গেল বিয়ের মণ্ডপে। মোটিয়ারীরা আট-দশ কলসি জল এনে রেখেছে সূর্য ওঠার আগেই। এবার কন্যাপক্ষের মোটিয়ারীরা ধরে নিয়ে এল বরকে—তারপর বরপক্ষের মোটিয়ারীরা ধরে আনবে কনেকে। প্রথমে স্নান করবে বর, পরে কনে। তাতেও মুক্তি নেই—ও বেলা বরকনে নাকি একসঙ্গে আবার স্নান করবে। আর সেই যুক্ত স্নানই হচ্ছে, যাকে বলে "লাগির"—বা বিবাহের মূল অনুষ্ঠান।

স্নান করাবি তো জল ঢাল—তা নয়, বরকে ধরে নিয়ে এসে দল বেঁধে গান ধরল সবাই। আর শুধু কি গান ? সেই সাথে নাচ।

দুল্‌হি না আঙ ধোইলা চেলিক-সুন্দর
পানি।
"পানিয়া পানিয়া" বোলিস রে নোনা......
আবে পানিয়া পাওয়ালিস রে নোনা......
দুল্‌হি না আঙ ধোইলা চেলিক-সুন্দর
পানি ॥

অর্থাৎ :
কনেকে আজ স্নান করাব চেলিক-সুন্দর
জলে।
"কাঁকুই কাঁকুই" মরতেছিলি খুঁজি :
কাঁকুই খোঁজা শেষ হল আজ বুঝি !
(তাই) কনেকে আজ স্নান করাব চেলিক-
সুন্দর জলে ॥

অনুবাদ শুনে আমি বললুম : তা না হয়, বুঝলুম— কিন্তু পানির বিশেষণ "চেলিক-সুন্দর" হল কেমন করে ?

পিল্লাই বলেন : আপনি সাহিত্যিক মানুষ

হয়ে এমন বেরসিকের মতো কথাটা বললেন? way যদি weary হতে পারে, pillow হতে পারে sleepless তা হলে পানির পক্ষেই বা "চৌলিক-সুন্দর" হওয়া অসম্ভব কিসে?

আমি বললুম: তা বটে!

স্নানের পর "তীর-তেল" উৎসব।

বরকনেকে বসানো হল মণ্ডপে। মাথার উপর যন্ত্র-কর রেখে ওরা বসল পাশাপাশি। হাতের ফাঁকে গুজে দেওয়া হল একটা তীর। ফলাটা উর্ধ্ব আকাশের দিকে।

মোটিয়ারীরা প্রথামত গান ধরল:

দুলহা কাঁহা গেল রে বেলোসা?
ওহাহি হুহার গেল সে বেলোসা॥

চয়ন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বললে। হাঁ হাঁ করে ছুটে এল ওর মাসী-পিসির দল। কী একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেন। তারপর চয়ন একটু থতমত খেয়ে চুপ-চাপ বসে পড়ল। মোটিয়ারীরা অন্য একটা গান ধরল। মিসেস পিল্লাই কৌতূহলী হয়ে বলেন: ব্যাপারটা কি?

বুঝিয়ে দিলেন রমানাথন। বিয়ের আসনে বর যখন বসবে তখন তাকে কথা বলতে নেই। যাবতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ঠাট্টা-তামাসা তাকে নিশ্চুপ সহ্য করতে হবে। কোন উত্তেজনাতেই তাকে বিচলিত হতে নেই। তাতে নাকি ভারি অমঙ্গল হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে "বেলোসা"র নামে ও ঠাট্টাটা চয়ন হজম করতে পারেনি। ও গানের অর্থ হচ্ছে "বর কোথায় পালালো রে বেলোসা, সে কি তোর বোনকে নিয়ে ভেগে পড়তে চায়?"

যাই হোক, এর পর এগিয়ে এল পূজারী। হলুদ-গোলা জল আর তেল ঢেলে দিল বর-কনের মাথার-উপর-ধরা তীরের উপর। মাথা বেয়ে গা বেয়ে পড়তে লাগল হলুদ-গোলা তেল।

শর্মিলা দেবী বললেন: রাম রাম রাম। স্নানের পর এই কাণ্ড!

পিল্লাই বলেন: না হলে আর এদের লক্ষ্মীছাড়া বলেছে কেন? তোমার লক্ষ্মীর পাঁচালিতেই তো লেখা আছে লক্ষ্মীছাড়ার সংজ্ঞা—"স্নানের পরেতে করে তৈলের মর্দন!"

আমি বললুম: আপনি কি বাংলাভাষায় কোন বই পড়তে বাকি রাখেন নি? কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে মায় লক্ষ্মীর পাঁচালি?

পিল্লাই হেসে বলেন: সবই এই লক্ষ্মীর কৃপায়। শাস্ত্রের অর্থভেদ না করতে পারলেও সহপাঠিনীর মর্মভেদ করতে যেটুকু দরকার।

মিসেস্ পিল্লাই ধমক দিয়ে ওঠেন: আঃ! চুপ করুন তো দেখি আপনারা!

দুপুরবেলা আহারাদির পর হবে আসল অনুষ্ঠান। লাগির। যদিও পিল্লাইসাহেব বলেছেন সবকয়টি অনুষ্ঠানই সমান গুরুত্ব-পূর্ণ, তবু এদের ভাবগতিক দেখে মনে হল আসল উৎসব হচ্ছে—"লাগির"। অনেকটা আমাদের সিন্দুর-দান উৎসবের মতো।

অর্থাৎ বরকনে বিবাহমণ্ডপে গিয়ে দাঁড়াবে —সামনে-পিছনে। আমাদের বরকনে যেমন দাঁড়ায় কনকাঞ্জলির সময়। গাঁটছড়াও বেঁধে দেওয়া হবে দুজনের বস্ত্রখণ্ডে। এর পর একজন উঠবে মণ্ডপের চালে, আর মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথে জল ঢালবে চালের উপর থেকে।

দুপুরবেলা আহারাদি সেরে আরাম করছি। ওরা বলেছিল লাগির বসবে "বাহাং-এর্তায়" অর্থাৎ পড়ন্ত বেলায়, অপরাহ্নে। ঘণ্টা দুই-তিন গড়িয়ে নেওয়া চলতে পারে। শর্মিলা দেবী পাশের তাঁবুতে শর্বরীকে ঘুম পাড়াচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি। ডাক্তারসাহেব খড়ের গাদার উপর চাদর বিছিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছেন। আমি একটা নয়ীমোর নিয়ে এসেছিলাম গাদরুর কাছ থেকে চেয়ে। বিকালে সেটা তাকে ফেরত দিতে হবে। স্কেচবইতে সেটার একটা নক্সা আঁকবার ব্যর্থ চেষ্টায় আমি গলদঘর্ম।

ডাক্তারসাহেব বলেন: কি করছেন বলুন তো। তখন থেকে? পাতার পর পাতা কাটা-কুটি করে চলেছেন দেখছি।

বললুম: জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং-এর একটা কঠিন অংক কষছি।

: জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং? কারাংমেটা গাঁয়ে?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, চোখের আন্দাজে চোদ্দ ডিগ্রী চব্বিশ মিনিটের একটা কোণ কেমন করে আঁকা যায় তাই ভাবছি। কিছুই হচ্ছে না, পাতার শ্রাদ্ধ ছাড়া!

: সে আবার কি? অমন বিদ্ঘুটে একটা একটা কোণই বা আঁকবার জন্যে মরণপণ করে বসেছেন কেন?

বললুম: কি করি বলুন। এ বেটা নিরক্ষর নয়ীমোর বানানে-ওয়ালা কোথায় ড্রইং শিখেছিল জানি না—কিন্তু লোকটা তার নক্সায় পঁচিশটা নিখুঁত পাপড়ি তুলেছে। ৩৬০ ডিগ্রীকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে এক-একটা কোণ হয় চোদ্দ ডিগ্রী চব্বিশ মিনিট। বিনা প্রটেক্টরে ও হতভাগা তালপাতার প্যাটার্নটা যদি বানিয়ে ফেলতে পারে তাহলে চোখ আন্দাজে আমি তার

একটা নক্সা আঁকতে পারব না ? না পারলে এর পর শিবপুর কলেজ রি-ইউনিয়নে ঢুকতে দেবে না যে আমাকে !

হা-হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার সাহেব।

ঠিক সেই সময়েই কারা যেন এল তাঁবুর সামনে।

ঃ কে? ভিতরে এস। সম্ভবত বললেন পিল্লাই মাড়িয়া ভাষায়।

ঘরে এল তিন-চারটি মেয়ে। কারাংমেটার মেয়ের দল। সংগে এসেছে মালকো। তার হাতে একটা মাদুর। নতনেত্রে কি যেন বললে মালকো।

ডাক্তারসাহেব হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ডেকে আনলেন মিসেস্ পিল্লাইকে। বলেন ঃ তোমার জন্য মালকো এই উপহারটি নিজে হাতে তৈরি করে এনেছে।

শীতলপাটির মত কি একটা বনজ উদ্ভিদ দিয়ে বোনা হাত চারেক লম্বা দেড়-হাত চওড়া নক্সা-কাটা একটা মাদুর। ওরা বললে মাসুনি। শর্মিলা দেবী হাত ধরে মালকোকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। যাবার আগে মালকো আমাদের জোহার করে গেল।

বুঝলাম এটুকু না করে তৃপ্তি পাচ্ছিল না মালকো। চয়নের আশা ত্যাগ করেছিল বেচারি। ডাক্তারবাবুই সেই চয়নকে সুস্থ-সবল করে ফিরিয়ে এনেছেন মৃত্যুর মুখ থেকে। চয়ন ভাল হয়ে গেছে, আবার কাছে টেনে নিয়েছে মালকোকে, আদর করেছে তাকে। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে মালকোর। আজ সে চয়নের ঘরণী হতে চলেছে। তাই ডাক্তারবাবুকে স্বহস্তে বোনা এই মাসুনিটি দিয়ে সে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

ঘন্টাখানেক পরে শর্মিলা দেবী ফিরে এলেন ওদের নিয়ে।

—আরে, আরে, এ কে ? মালকোকে যে আর চেনাই যায় না। এতক্ষণ ধরে বাঙালী কায়দায় তিনি পাশের তাঁবুতে বসে কনেকে সাজিয়েছেন। মালকোর পরণে একটা সিল্কের ছাপা শাড়ি, গায়ে বুটিদার ব্লাউজ। মুখে শ্বেতচন্দনের অভাবে স্নো-র ফোঁটা, কপালে কুমকুমের টিপ। আর সবচেয়ে মজা, লজ্জাজড়িত চরণে মালকো এসে ডাক্তার-বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। নিঃসন্দেহে এটা শর্মিলা দেবীর ট্রেনিং। কিন্তু তিনি তো ওদের ভাষা জানেন না। তালিম দিলেন কেমন করে ? ডাক্তার পিল্লাই বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন মনে হল। আজ এই যে ফুলটি ফুটতে চলেছে এর পিছনে দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রম আছে তাঁর। মুখটা তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে উঠে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন উনি। কি বললেন, তা না বুঝলাম আমি, না মালকো। উনি আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন মাতৃভাষায়।

আমি বললুম ঃ বরকনের জন্য আমিও একটা উপহার এনেছি, সেটা এখন দেওয়া আইনসম্মত ?

ঃ এখনই দিতে পারেন—বললেন ডাক্তার-বাবু।

সুটকেশ খুলে বার করে দিলাম পাঁচ-সেলের একটা বড় টর্চ। খুব খুশী হল ওরা। বারে বারে জ্বালিয়ে-নিবিয়ে দেখে নিল।

বিকালে লাগির দেখতে গেলাম যখন তখনও দেখি মালকো সেই ছাপা শাড়ি-খানাই পরে আছে। বাঙালী কায়দায়, অর্থাৎ যাকে মেয়েরা বলে "ড্রেস-করে"। পোষাকটা পছন্দ হয়েছে সকলের এটা বোঝা যায়। এরা বোণ্ডো-শবর বা মাড়িয়াদের মতো নয়। ব্লাউজ না পরলেও মেয়েরা বুকে কাপড় দেয়। যদিও বেশ বোঝা যায় বেশীদিনের অভ্যাস নয় সেটা। কাপড় সরে গেলে বা পড়ে গেলেও স্থান পায় না সহজে।

আমরা নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলুম। অনুষ্ঠান শুরু হবে এমন সময় জঙ্গলের দিক থেকে ভেসে এল ঢোলের আওয়াজ। সবাই যেন শিউরে উঠল সে শব্দ শুনে। গাদরু দু পা এগিয়ে গেল মন্ডপ ছেড়ে। তারপর কান পেতে শুনতে থাকে। সমস্ত বিবাহমন্ডপটা স্তব্ধ, উৎকর্ণ। কারা ঢোল বাজাচ্ছে তা ওরা জানে না, তবে সংকেতটা বিপদের।

একটু পরেই জঙ্গল থেকে বার হয়ে এল ওরা। জনা তিন-চার মাতব্বর শ্রেণীর লোক। পা টলছে সকলেরই। মদ্য পান করেছে মাত্রাতিরিক্ত। গাদরু আয়েতুর দল বেরিয়ে এল সভামন্ডপ ছেড়ে।

ওদের মধ্যে একজন লোকের হাতে ত্রিশুল জাতীয় একটা বর্শা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সেই দলপতি। ডাক্তারবাবু কানে কানে বললেন ঃ এই লোকটাই হচ্ছে কাবোঙ্গার গুণিয়া, যে বলেছিল চয়ন কোনদিন আর ভাল হবে না।

লোকটা মাজায় হাত দিয়ে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল এবার। সকলের উপর ঘোলাটে-লাল চোখ দুটো বুলিয়ে নিল—মালকোর বেশবাস দেখে ব্যঙ্গের-হাসি হাসল। তারপর বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে কি যেন বলতে থাকে অনর্গল।

ভাষা না বুঝলেও তার বক্তব্যের মধ্যে ব্যঙ্গ, শ্লেষ আর উত্তেজনামূলক শব্দ যে যথেষ্ট ছিল সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না। বারে বারে আমাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কি যেন বলছে সে।

গুণিয়া উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ডাক্তার পিল্লাই শুধু উঠে দাঁড়ালেন। গাদরু বোধ হয় বাধা দেবার জনাই এগিয়ে আসছিল, তাকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আসরের মাঝখানে মহড়া নিয়ে দাঁড়াল চয়ন। দু হাত বাড়িয়ে আমাদেব আড়াল করে দাঁড়াল বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে-আসা বর।

চয়ন নিরস্ত্র। গুণিয়ার হাতে দীর্ঘাকৃতি ত্রিশূল। চয়নের পাঁজরা ঘেঁষে অবস্থা

তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়াল সশস্ত্র ঢোলকদল—দলপতির নির্দেশের অপেক্ষায়।

চয়নকে উঠে আসতে দেখে গুণিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে মাটিতে থুথু ফেলল। মুখটা বাঁ হাতের পিঠে মুছে নিয়ে কি যেন বলল চিবিয়ে চিবিয়ে। আর তারপরেই খল খল করে হেসে উঠল মাতালটা।

মুহূর্তমধ্যে ক্ষেপে গেল চয়ন। গর্জন করে কি যেন বলল ওকে।

গুণিয়াও প্রত্যুত্তরে গর্জন করে উঠল আর সংগে সংগে উদ্যত করল হাতের ত্রিশূল। শিউরে উঠলুম আমরা সবাই; কিন্তু ক্ষিপ্র শার্দুলের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চয়ন মাতালটার উপর। একটা ধস্তাধস্তি। সকলে গিয়ে ছাড়িয়ে দেবার আগেই চয়ন কেড়ে নিয়েছে ওর ত্রিশূলটা আর বাঁ হাতে টিপে ধরেছে ওর গলা। ডাক্তারবাবু মাড়িয়া ভাষায় কি যেন চীৎকার করে বললেন চয়নকে। মন্ত্রের মতো কাজ হল তাতে। চয়ন ওকে ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচু করে ফিরে এল সভা-মন্ডপে।

লোকগুলো আর কিছু করতে সাহস পেল না। গাদরু, আয়েতু আর কোন্ডা অনেক অনুরোধ-উপরোধ করল ওদের, ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু না, গুণিয়া ওদের মিলিত অনুরোধ উপেক্ষা করে সদর্পে ফিরে গেল জঙ্গলের দিকে। যাবার আগে শাসিয়ে গেল।

এবার বসল পরামর্শ সভা। সবাই গাল-মন্দ করল চয়নকে। সে কিন্তু আর একটা কথাও বলল না। দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল ঠায়। বুড়ি কিরিংগো কি একটা ফোড়ন কাটল আর গাদরু ঘাড় নেড়ে বলল ঃ হয় !

ডাক্তারবাবু বললেন ঃ চলুন, তাঁবুতে ফেরা যাক এবার। আজ আর "লাগির" হবে না। অমঙ্গলের সূচনা হয়েছে। চয়ন নিয়ম ভেঙেছে। আজ রাতটা তাকে উপবাসী থাকতে হবে। কাল সকালে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে—বিকালে বিয়ে।

চোখের উপর ঘটল ঘটনাটা অথচ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যেন "ডাব্" করা হয়নি—এমন একটা কন্টিনেন্টাল ছবি দেখছিলুম এতক্ষণ। তাঁবুতে ফিরে এসে সবিস্তারে তার ব্যাখ্যা শুনলুম।

(আগামী সপ্তাহে সমাপ্য)

রক্তচাপ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

এই সেই বয়স। এইবার হাতের কাছে একটা লাঠি চাই, যা পেলে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়, দেখা যায় আরো অনেকক্ষণ।

অথচ কাল, হ্যাঁ, কালকেই, এই ভয় অথবা ভাবনার চিহ্নমাত্র ছিল না কোথাও, না কাজে, না কথায়। দেহ-মনের এই দুঃখময় অবসাদের কথা চিন্তা কিম্বা কল্পনা করার এমন নিবিড়, নিশ্ছিদ্র অবকাশ আদৌ ছিল না, কারণ কল্পিত ঈশ্বরের তুল্য দীর্ঘ দিন, মাস ও বছরের শ্রম আর অধ্যবসায়ে গড়া সেই পরিচিত স্বর্গে সিদ্ধেশ্বর তখনো সর্বশক্তিমান।

আর আজ?

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পরিবর্তন কি বিপুল ভয়াবহ!

এখন নিজেকেই আধো-চেনা, অজানা মনে হয়।

যেন কথা ছিল, এই ঘর ছেড়ে দূরে, বহুদূরে কোথাও চলে যাবেন। কিন্তু না যেতে পারা, অর্থাৎ যেতে পারার অক্ষমতাই এখন, এই মুহূর্তে তাঁর অসাড়-অক্ষম দেহকে অবর্ণনীয় গ্লানি আর অপরিমাণ অস্বস্তির মাঝখানে শুইয়ে রেখেছে, যেহেতু এই ঘর, ঘরের যাবতীয় আসবাব ইত্যাদির সহিত নিজেকে নিষ্প্রাণ এবং বেমানান ঠেকে। হয়তো দরজা খুলে বাইরে গেলে, রোদ কিম্বা হাওয়া-ভর্তি মাঠ অথবা পথের যে-কোন জায়গায় দাঁড়ালে এই একই বেদনাদায়ক, ক্লান্তিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে, ফলত অবোধ, নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বল যে-কোন জীবের মতই এইমতে পৃথিবীর পথ-ঘাট-মাঠ মাড়িয়ে অবসন্ন হতে-হতে-হতে, বিষণ্ন হতে-হতে-হতে ফুরিয়ে যাবার অমোঘ বিধানকে চিরতরে নিঃশেষিত, মতান্তরে রূপান্তরিত, হবার নিয়তিকে মেনে নিতে হয়, হবে এবং হবেই। কিন্তু আপাত এই ঘর, দুঃসহ নিরালোকে শীতল, সুখদায়ক এই যে শয্যা, যার কথা ভুলে—যা কিনা অতি পুরাতন, প্রায় ঐতিহাসিক, কিছু-বা অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন স্মৃতি; ফুলের গভীরতর ঘ্রাণ, উপরন্তু সম্মিলিত শব্দের ধ্বনিপুঞ্জে স্তব্ধ সেই দূরতম রাত্রিকেই স্মরণে আপাত-মুখর, জীবন্ত করে তোলে। বন্ধ দরজার পরপারে অন্য কোথাও চলে যাবার সাধ্য কিম্বা সাহস অথবা তাগিদ বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই, যেহেতু অবসর বিনোদনের সাধ এবং সম্বল চিরতরে অন্তর্হিত। তিনি মুমূর্ষুপ্রায়।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাত কাঁপে। লাল, নীল অবশেষে বেগুনি রোশনাই জেবলে কাঠিটা নিবে গেলে সিদ্ধেশ্বর একইসঙ্গে বিস্ময়, বিরক্তি এবং বিব্রত বোধ করেন। যেন এইভাবে ঠিক এতখানি বিস্ময়ের কোন ভূমিকা অথবা প্রস্তুতি ছিল না। অথচ তিনি নিয়মিত ধূমপানে অভ্যস্ত। প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটিমাত্র কাঠি জেবলে পাঁচজন বন্ধুর মুখে আগুন ধরিয়ে একদা তাঁকেই গুনে গুনে পাঁচটি টাকা জিতে নিতে হয়েছিল। অথচ আজ যখন পার্থিব যাবতীয় বস্তুসকল শান্ত, সমাহিত, তখন তাঁর বুকে, বুক থেকে মস্তিষ্কের কোষে-কোষে এ-কোন্ ঝড়ের মাতামাতি!

হেসে জবাব চেয়েছিল নিশাপতি, 'এবার কী করবে?'

কথাটা সাময়িকভাবে অদ্ভুত হাস্যকর মনে হলে সংক্ষেপে উচ্চারণ করেছিলেন, 'ব্ল্যাকমার্কেটিং।'

অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে নিশাপতি নিবে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার উৎসাহ আর ছিল না। বরং নিজেকে নিঃশব্দ আর উদাস রাখার প্রাণপণ সাধনায়

তৎপর-হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে তাঁকেই উপেক্ষা এবং অবজ্ঞা দেখাবার পথ খ্যুঁজে পেতে চেয়েছিল।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা তুমি খুঁজিছ ঈ—" এই অবধি পড়ে অন্যত্র চোখ ফেরাবার আগেই দৃষ্টি ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, ব্যথায় উদ্বেল, কাজে-কাজেই কিঞ্চিৎ পরিমাণ লোভ তাঁকে পেয়ে বসে। অনুরাধার অভাববোধ আপাতদুঃখের হলেও বর্তমান মুহূর্তে তা হৃদয়ের পরমতম অবলম্বন। তিনি কবি নন, কারণ কবিতা লেখেননি। অথচ কেউ-কেউ, তিনি জানেন, স্ত্রী কিম্বা প্রিয়াকে হারিয়ে প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁদের হাতের কাছে কি এইসব তুচ্ছ অথচ মূল্যবান উপকরণসমূহ ছিল না? কিন্তু খ্যাতির বাসনা তাঁকে, কই, তেমন করে পাগল করে না! নতুবা কয়েক ছত্র মিলিয়ে শখ মেটানো এমন কি অস্বাভাবিক?

হাতের কাজে তার দক্ষতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না বলেই মুখ মনে পড়ে। মুখ-চোখ-নাক মিলিয়ে সমস্ত অবয়ব, এমন কি, বুকের বাঁ পাশে আফ্রিকার মানচিত্রের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ যৌতুকচিহ্ন, তবু পুরোপুরি ধরে রাখা কিম্বা গড়ে তোলার সাধ্য নেই যে-কারণ মেয়ের প্রতিমার মতই ভেঙে-গুঁড়িয়ে নিয়ত নতুন আর অচেনা হচ্ছে অনুরাধা। অথচ একদিন সে ছিল, যার উপস্থিতি অসংখ্য ভালো-মন্দের যোগফলে ধন্য এবং প্রায় একই সংগে তৃপ্তি ও অতৃপ্তির কারণ।

সিগারেটের সর্বশেষ অংশটুকু ছাইদানির ভেতরে ফেলে দিলে আগুন নিবে যাবার অস্পষ্ট শব্দটাই কানে মৃদুতম আলোড়ন জাগিয়ে তাঁকে সহসা স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়ে দূরস্মৃতি-কৈশোরের প্রান্তে নিয়ে যেতে চায়। ছোলা বন্দরের চিহ্ন ছিল না। স্টিমার ডুবির পরেও বাবা ছাড়া কী করে বেঁচে গিয়েছিল তারা কজন! অথচ এমন করে পরাজিত সৈনিকের গ্লানি কিম্বা হতাশা এবং সংগোপনে টিকে থাকার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, সুতরাং আত্মতৃপ্তি নিয়ে শুধু নিজের জন্যে বাঁচা, বাঁচার প্রবলতম ইচ্ছা তাঁর চেতনাকে আজ পর্যন্ত বিদ্ধ করেছে কতবার। হয়তো একা হলে মরে যাওয়া সম্ভব হত না বাবার। ভেসে ওঠার একমাত্র ইচ্ছাই তাঁকে বেঁচে থাকার সাহস এবং সান্ত্বনা যোগাতো। যেমন তিনি একা নন, অর্থাৎ হতে পারেননি বলেই সাফল্য আর ব্যর্থতা, ব্যর্থতা আর সাফল্যের হাতে মার খেতে খেতে মরে বেঁচে আছেন। লোকে জানে, তিনি সফল, কৃতবিদ্য ও সুখী পুরুষ, যার সমাজ কিম্বা সংসারের সংগে যোগাযোগ যত ক্ষীণ, ততই নিবিড়।

দেয়ালের পেরেকে ফুলের মালা। একটা পাপড়িও — — এখনো। গন্ধ, ফুলের গন্ধ কি তেমনি তাজা আর টাটকা আছে এখনো? হয়তো না।

ফুল আর মালা দেখতে-দেখতে দৃশ্যটা মনে পড়ে। কিন্তু কি দরকার ছিল ভিড় জমিয়ে, সভা করে তাঁকে চিরকালের মত বিদায় জানাবার। বানানো কথায় তিনি কি মুগ্ধ হতে পেরেছিলেন আদৌ? সে-খবর কেউ রাখেনি। প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝখানে দেয়াল, থাম অথবা টেবিল-চেয়ারের মতই প্রাণহীন, অনড় অস্তিত্বকে সন্তর্পণে আরামে রাখার দায়িত্ব যে কি কঠিন আর দুঃসহ তা একমাত্র তিনিই অনুভব করেন এবং অনুভবের ফলশ্রুতিস্বরূপ অপমান আর বেদনাকেই চরম পুরস্কার ভেবে কখন চুপি-চুপি প্রায় চোরের মত পালিয়ে আসেন। এসে যে গভীর কিছু স্বস্তি লাভ করেছেন তা হয়তো ভুল, কারণ লাঞ্ছনার গ্লানি হয়তো ঠিক পরমুহূর্তেই আরেকবার মৃত্যু অথবা স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সেইসব পৌরাণিক অথবা আধা-ঐতিহাসিক ঘটনাসকল একে-একে স্মরণ করিয়ে তাঁকে ক্রমশ অস্থির এবং অসহায় করে তুলেছে। নতুবা এতদিন পরে এখন, এই মুহূর্তে নিজেকে যথার্থমুক্ত এবং সুখী ভেবে তৃপ্ত হবার যাবতীয় উপকরণ প্রভৃতি হাতের মুঠোয় বর্তমান। আপাতত তিনি নির্ভয়, নির্বন্ধ। অথচ সেই তিনি আজন্মের সাধ, সাধনা অথবা ইচ্ছাকেই তুলো আর কাপড়ের সুগঠিত স্তূপ পাশবালিশের মত অনাত্মীয় আবর্জনাবোধে দৈহিক সম্পর্কবিহীন বিছানার প্রান্তে শুইয়ে চিরতরে নিশ্চিন্ত, নির্বিঘ্ন এবং সমাহিত হতে চেয়ে বরং দ্বিগুণ পরিমাণে দ্বন্দ্ব আর সংসারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এক অপরিচিত শূন্যতাবোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুকের ক্ষীণতম শব্দটুকু শোনার আশায় ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্ত।

'চ্যাটার্জির আবার ভাবনা!

কয়েক পা এগিয়ে জানলা; জানলার বারো কি চৌদ্দ ফুট নিচে উদ্যত তর্জনীর মত সোজা সড়ক, সড়কের ওপারে মাঠ, মাঠের শিয়রে নিষ্পত্র শিমুলের গাঁটে-গাঁটে জমাট রক্তের ফোঁটা। গরাদ চেপে, পলক না ফেলে মাত্র তিন কি চার সেকেণ্ডের মধ্যে এইসব দৃশ্যমান বস্তুসমূহ একে-একে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দৃশ্য কিম্বা জগৎপ্রায় দেখে নিচ্ছেন। এবং এই অবসরে নিজেকে বয়স্ক বিশ-শতকী সভ্যতার সংস্পর্শবিহীন কোন দূরতর দ্বীপের অধিবাসী প্রতীয়মান হলে সেই বহুজনবিদিত শিশুপাঠ্য কাহিনীর একমাত্র নায়কের যাবতীয় রোমাঞ্চের শরিক হতে পেরে ভীত, সন্ত্রস্ত এবং করুণ হলেন। সিদ্ধেশ্বরের বারো কি চৌদ্দ কিম্বা বড় জোর আঠারো ঘণ্টা পূর্বেকার কোন সুদূর অতীতের কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্যে বিড়ম্বিত বোধ

'এখন রিটায়ার করা মানেই অক্ষয় স্বর্গ লাভ, কী বল হে চ্যাটার্জি?'

মাঠের পথ সহজ এবং সংক্ষিপ্ত করার বাসনায় একটি যুগল কোণাকুণি পাড়ি জমিয়েছে। কখনো পাশাপাশি, কখনো আগে-পিছে। অলসগতি তাদের পদচারণা অনেক বছর আগেকার সেই নিষ্ঠুরতম দৃশ্যের যবনিকা কী ভাবে এবং কেন যে অপসারিত করে তা অকল্পনীয়! ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পাশে যুবতীর দ্বিখণ্ডিত দেহ তখন প্রাণহীন কিন্তু কব্জির গায়ে আঁট করে বাঁধা ঘড়িটা তবু ক্লেশহীন নিরুচ্চার কণ্ঠে নামতা পড়ে চলেছে ঠিক। দেখে বিস্মিত, অভিভূত হয়েছিলেন সেদিন। কোন অভাব অথবা আর্তির স্পর্শ খুঁজে পান নি। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে বিরল সবুজ ঐ প্রান্তরে প্রাণময়, দৃঢ় এবং বিশ্বাসী পদচারণা তাঁকে এ-কোন্ সহায়হীন, অতলগর্ভ শূন্যতার নিরবয়ব অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয়, যার শব্দহীন একমাত্র ধ্বনি কালান্তরে বিস্তারিত বিপুল ও ভয়াবহ।

ধীরে ধীরে, আহা সেই নিঃশব্দ যুগল দিগন্তে বিলীন! অথবা তারই দিগন্ত হলে —এ দূরের যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার

আগেই খবরের কাগজ চোখে পড়ে। নিয়মিত অভ্যাসের বসে হাতে তুলে নিতে গিয়ে তিনি সম্মুখে টিপয়ের ওপর নির্বিকার পোষা খরগোশ কিম্বা বেড়ালের মতই গোল আর সাদা টাইমপিসের দিকে তাকিয়ে হয়তো জীবনে প্রথম সময় আর বয়সের প্রতি ঘাতকের ক্রোধ আর বিবেকীর পরম সন্দেহে উন্মত্ত হন।

আজ আর ডেকে তোলে নি কেউ। অথচ অ্যালার্মের চাবি ঘুরিয়ে ঘুমোনো তাঁর স্বভাব। অন্যদিন, এমন কি গতকাল অবধি চিৎকার করে ডেকেছে। আর এখন, এই মুহূর্তে নিস্পন্দ, নিথর। চতুর্দিকে শব্দ করে কিছুই বাজে না। অথবা বাজে, যেমন তিনি নিঃশব্দতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্পন্দমান। দৃশ্যত অনুগত ভৃত্যের মতই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই ব্যস্ত, উন্মুখ। যেন জেনে নিতে তৎপর, আপাতত কিংবা আমরণ কী করণীয় এবার।

চশমার কথা ভুলে চোখের সামনে কাগজ মেলে ধরেন। কিন্তু বিচিত্র সব ভাবনা যেহেতু বিচলিত করে সুতরাং অস্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে খবরের চেহারা সৌষ্ঠব-সংগতিশূন্য।

...লাডাক সীমান্তে...লোকসভায় শ্রী... কলিকাতায় পানীয় জলের ক...মুখ্যমন্ত্রীর ...পাকিস্তানী গুপ্তচর...ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির জন্য...ভীমনাগের সন্দেশ...অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড...শোলমারীর সা... কবিগুরুর ভাষায়...। দুর্বৃত্তের পলায়ন...... এ যেন আঙুলের ডগায় রেডিওর নব ঘুরিয়ে দেশ থেকে মহাদেশে বিচরণ।

'রাবিশ!'

দলা পাকিয়ে ঘরের কোণে কাগজটা ছুঁড়ে দেন। পৃথিবীর যাবতীয় খবর এবং সেইসব খবরের সত্য-মিথ্যার এমন নয়নলোভন শোভাযাত্রার দিকে চেয়ে বয়স্কর কটাক্ষ ও শাসন একটিমাত্র বিশেষণে বিদ্ধ করার দীনতা তাঁকে অকারণ বিরক্ত ও বিমর্ষ করে। চতুর্দিক যেহেতু আলোহীন; নিশ্ছিদ্র ছিল, সুতরাং দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিহত সেই শব্দ আর্তনাদে অবসিত কোলাহলস্তিমিত কিন্তু নিষ্ঠুর।

দু'পা পিছিয়ে যেতেই কপালের বাঁ পাশে রগের ঠিক কাছাকাছি যন্ত্রণাটা প্রথম টের পেলেন এবং মনে পড়ে, বছর-পাঁচেকের ভেতরে ঘন-ঘন বারকয়েক চশমার কাঁচ বদলাবার পরেও ইদানীং বেলা পড়ে আসার মতই প্রায় চুপি-চুপি চোখের ধার কমে এসেছিল। কথাটা তিনি এমন কি নিজেকে পর্যন্ত গোপন করার বাসনায় মরিয়া। কারণ মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার দীর্ঘকাল পরেও চাকরির প্রতি তাঁর অফুরন্ত মায়া।

অন্তিম আবেদন তবু অগ্রাহ্য হয়। আজ থেকে আমরণ ছুটি। ঘোষণাটা তাঁর কাছে মৃত্যুর সামিল। অথচ বন্ধুদের উৎসাহ সীমাহীন। কেউ-কেউ অভিনন্দন জানাতে ব্যগ্র। বৃদ্ধের মৃতদেহ সংকারে শ্মশানবন্ধু তরুণের উল্লাস মনে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের সন্ধানে বুকের ওপরে হাত কেউ রাখে না, তাই এত বিড়ম্বনা। নতুবা টের পেতো সবাই, সিদ্ধেশ্বরের যন্ত্রণা কোথায়!

ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে ঘুমোতে চাইলেন। কিন্তু সারারাত যাকে ঘুম পাড়াতে পারে নি, এখন নি-বাতাস ঘরের এই অসহ্য আবছায়া তাঁকে মাথার যন্ত্রণা ভোলাবে কী দিয়ে? চোখের পাতা জোড়া লাগাতে গিয়ে তাই অস্বস্তি বোধ করেন। যন্ত্রণা দ্বিগুণ মনে হয়। চোখের জ্বালা অসহ্য। অথচ চাকরির আয়ু শেষ না হলে আজ এখন কলঘরে ঢুকে স্নান, পনেরো কি বিশ মিনিট পরে খাবার ঘরে, তারও আধঘণ্টা পরে রীতি-মত যুদ্ধযাত্রীর ব্যস্ততা সহকারে আফিসের গাড়িতে উঠে একমাত্র ধ্যান ছিল, কাজ আর কাজ! আজ কিন্তু সেইসব পুরাতন ব্যস্ততা, চিন্তা অথবা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। ইচ্ছে হলে সারাদিন, সারারাত ঘুমিয়ে, স্বপ্ন দেখে বছর, যুগ, অবশেষে শতাব্দীর দরজায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু তিনি অক্ষম, অপারগ। এতদিন পরে মরা ডালে দমকা হাওয়া লাগার মতই বার্ধক্যের বোধ তার চেতনাকে দুলিয়ে দিয়ে যায়। অথচ কতদিন এই একটিমাত্র সংবাদ শোনাতে এসেই বিমুখ হয়ে ফিরে গেছে কত কেউ।

'ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছো, বিয়ে-থা দিয়েছো, এখন তারা যে-যার পায়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে আর কী চাই তোমার চ্যাটার্জি?'

'আমি হলে এখন ঘরে ফিরে বিছানায় টান-টান হয়ে পড়তাম। ঘুম ভাঙলে পাহাড়-সমুদ্দুর মানে দু'চোখ যেদিকে তাকাতো ছুটতাম।'

'নিদেনপক্ষে তাস-দাবা-পার্কের বেঞ্চ তো কেড়ে নিচ্ছে না কেউ।'

'তাহলে? চলে এসো চ্যাটার্জি, জলদি চলে এসো।'

ওভার-সিক্সটি বন্ধুদের আহ্বানে অসাময়িক হাসি ছাড়া উপহার দেবার কিছু

ছিল না। বরং নিজেকে অত্যধিক সচল, সবল প্রমাণ করার মূলে ছিল সুখ, ছিল উত্তেজনা, আরাম, প্রশান্তি।

এবার ডান পাশের রগটা টিপ-টিপ করে। নাকের ঠিক ওপরে, দুই ভুরুর মাঝামাঝি গরম সূচ ফুটিয়ে দিচ্ছে কেউ। আর কিছু চেয়ে দেখার ইচ্ছে অথবা সাহস যেন নেই। কারণ মাথাটা ঘুরছে। পায়ের তলায় দুলে-দুলে উঠছে পৃথিবী। মদ খাওয়ার অভিজ্ঞতা দিয়ে অংশত অবস্থাটা মিলিয়ে নেয়া যায়। তখন শখ হত মাঝে-মাঝে আফিস থেকে বেরিয়ে বারে ঢোকার, একটা বাদশাহী মেজাজ এসেছিল কিছুকালের জন্য। বার থেকে বেরিয়ে পার্কের বেঞ্চ কিম্বা গঙ্গার পাড়ে নরম ঘাসের ওপরে টান-টান হয়ে স্টিমারের করুণ আর্তনাদ শোনা যেতো। বুকের মধ্যে আড়া-মোড়া ভাঙতো, ফুঁপিয়ে উঠতো কৈশোর, ভোলা বন্দর। শিয়রে, কানের দু'পাশে ঢেউ, জলোচ্ছ্বাস, ভাসিয়ে যেতে-যেতে আবার ফিরে আসার দুঃসহতম স্মৃতি।

কিন্তু এখন অনুরাধাকেই মনে পড়ে। বড় বেশী মনে পড়ে যেন। তার সব কথা, অবয়ব যা আধ ঘণ্টা আগেকার ভাবনায় অস্বচ্ছ ছিল, কেমন ধূসর, কিছু বা খণ্ডিত।

আর অনুরাধার কাঁধে একই মাথার পেছনে সেই আশ্চর্য, উজ্জ্বল এবং সুখী মুখ যার নাম নিশাপতি। আপিসের টাকা বাগিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে যুদ্ধের বাজারে নেমে পড়েছিল বলেই না আজ ওর বাড়ি, গাড়ি, মন্ত্রীত্ব। অবলাবান্ধব সমিতির রাখাল রাজা!

বাইরে একটা কোলাহল। যেন দূরাগত জলরাশি বিপুল আবেগে, উচ্ছ্বাসে ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে চায়। চতুর্দিকে গৃহ পতনের শব্দ হয়। পাখিদের ডাক কিম্বা হাওয়ার স্বনন দূরতম বৃষ্টিকেই স্বাগত জানায়।

চোখের ওপর বাঁ হাতের তালু চেপে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার হয়ে আসে সব। চোখ মেলে তাকাবার শক্তি আর নেই। এমন কি বাঁ হাতটা নামিয়ে কাঁধের পাশে যথারীতি ঝুলিয়ে দেবার সাধ্যও উধাও। শ্বাস কষ্টের বোধ তীব্রতম যন্ত্রণার আকারে এইবার, এতক্ষণে ধরা দেয়। বুকের স্পন্দন স্তিমিত, মন্থর হয়ে আসে। মাঝে-মাঝে চিমনির ভেতরে হঠাৎ হাওয়া ঢুকে গেলে লণ্ঠনের শিখা যেমন থেকে-থেকে লাফায়, লাফিয়ে সশব্দে আলোর অন্তিম দশা ঘোষণা করে, প্রশস্ত বক্ষপটের অন্তরালে ঠিক তেমনি অথবা ততোধিক জোরালো আর ব্যাপক আকারে দৈবাৎ হৃৎপিণ্ডের দাপাদাপি সরবে জানাতে ব্যস্ত যে, বিকল হবার অধিকার তারও আছে এবং এক্ষুনি অত্যন্ত শৃংখলাবদ্ধভাবেই সারাদেহে চূড়ান্ত বিশৃংখলার আবির্ভাব ঘটাতে তার জুড়ি নেই।

শেষ রাত্রে কারেণ্ট বন্ধ হয়ে যাবার পর এইবার অতর্কিতে প্রায় বিনা নোটিসেই মাথার ওপরে পাখাটা ঘুরতে শুরু করে। অবশ্য দূরাগত বৃষ্টির ধ্বনি ছাড়া তাঁর লুপ্তপ্রায় চেতনা অন্য কোন স্পর্শ-গন্ধ রহিত। হাওয়ার শীতল স্পর্শ আপাতত স্নানের স্নিগ্ধতা দানে অক্ষম। তিনি দ্বিধাহীন, নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চল। অথচ উৎফুল্ল কিম্বা তৃপ্ত হবার এই ছিল প্রকৃষ্ট লগ্ন। কারণ সময়ের মত স্বাধীন, মুক্তপক্ষ সিদ্ধেশ্বর এই মুহূর্তে যেখানে, যতদূর খুশি যেতে পারেন। তাঁকে পিছু ডেকে বাধা দেবার সাধ্য অথবা সাহস আর কারো নেই, একমাত্র তাঁর ইচ্ছা যদি বাদ না সাধে। কারণ চাকুরি ছাড়া আর কোন বস্তু কিম্বা বিষয়ের প্রতি তাঁর মনযোগ অথবা রুচি ছিল না বলেই তিনি অদ্যাবধি সশরীরে বিদ্যমান।

যন্ত্রণাটা আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ মনে হয়। একটা তরল আগ্নেয় স্রোত যেন সন্তর্পণে মাথার পেছনে মেরুদাঁড়া বেয়ে ক্রমশ নিচে অন্ধকারে কোথায় নেমে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দিতে চাইছে বিষ। হাত-পা অসাড়। শরীর শীতল হয়ে আসে। চুল আর পাতলা চামড়ায় ঢাকা মাথার খুলিটা বুঝি ফেটে চৌচির হবে। কারণ ভেতরে ভেতরে রক্ত ক্ষরণ অনুভব করা যায়। এবং অনুভব করতে গিয়ে দশ কি পনের বছর আগেকার অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়কে তোলপাড় করে। সূর্যাস্ত দেখার লোভে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করে সহসা আর্তনাদ করতে চেয়েছিলেন। ফাটলের অন্ধকারে শশকের করুণ চীৎকার তখনো পাথরে-পাথরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সেই স্তব্ধ, রঙিন চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হয়েছিল চরম অসফল। কালান্তক সেই সাপের চেহারাটা দেখা যায়নি কখনো। তারপর আজ, এতদিন পরে, এই মুহূর্তে নিজেকে, নিজের এই দুর্বল, অসহায় অবস্থাকে স্মরণ করেই শশকের উপায়হীন আত্মসমর্পণের সাধ তাঁকে পীড়িত করে। এবং ক্রমাগত সন্দেহ আর সন্ত্রাস প্রায় নিশ্চিতির পথে তাঁকে টেনে নেয়। অর্থাৎ তিনি যেন সেই শব্দ-গন্ধ-বর্ণহীন গহ্বরে ক্রমশ বিলীয়মান শশকের আর্তনাদ। তাঁর কথা বলার অথবা ভাবনা-চিন্তার শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু ঘরে-ঘরে তখনো অফুরন্ত কাজের ব্যস্ততা!

স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্য

ক্ষমা চেয়ে বলি, বাঙালী সাহিত্যিকদের যত দোষই থাক, একটি মহৎ গুণ, উপদ্রব থেকে এ'রা শতহাত দূরে থাকতে ভালবাসেন। বাঙালী-স্বভাব ষোল আনাই; ফলে নিরীহ, নির্ঝঞ্ঝাট। এ'রা দায়ে না পড়লে বৃষ্টিতে ভেজেন না, নিজের বাড়িতে আগুন না লাগা পর্যন্ত পাড়ার লোককে ডাকেন না। বাণপ্রস্থের সময় এলে হরিদ্বার বেড়াতে যান। এমন চরিত্রের মানুষ যাঁরা, তাঁরাও দেখলাম, সম্প্রতি অকপটে সেই পুরানো কথাটাই আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন: 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ।'

এ'রা যে মেষ নন, তার প্রমাণ সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখা গেল। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

বাঙলা দেশের রথী-মহারথী সাহিত্যিক থেকে শুরু করে নিতান্ত শিক্ষানবিশী সাহিত্যিক পর্যন্ত—প্রায় পঁচাত্তর জন—একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অকপটভাবে নিজেদের মতামত জানিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি চীনের ভারত আক্রমণ। এ'রা বলেছেন, তাঁরা চীনকে দস্যু ও বর্বর মনে করেন, মনে করেন চীন পররাজ্যলোভী এবং শঠ। ভারতভূমি আক্রমণ করে চীন এশিয়ার গণতন্ত্রের ও শান্তিকামী ভারতীয় জনসাধারণের ঘৃণ্যতম শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। এর কোনো মার্জনা নেই। চীনকে ধিক্কার দিয়ে এ'রা আরও বলেছেন, স্বদেশের সংকটে আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করে জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের মহান কর্মে আত্মনিয়োগ করব।

আমি, বলা বাহুল্য, যদি না অনধিকারী হই, স্বাক্ষরদাতা হিসেবে আমার নাম তাঁদের সঙ্গে যোগ করলাম। এমন ভাবাও অসঙ্গত নয়, কলকাতার বাইরে বা বিদেশে যে-সব বাঙালী সাহিত্যিক আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা 'মেষ' নন এবং শত্রু 'বিভীষণ'ও নন, তাঁরাও মনে মনে তাঁদের স্বাক্ষর এই বিবৃতির তলায় যোগ করতে গৌরব বোধ করছেন।

'শৌখিন দেশপ্রেম' বলে একটি কথা আছে। কথাটার জন্মবৃত্তান্ত আমার জানা নেই, জানা থাকলে বলতুম, যিনি এই কথাটি তৈরী করেছিলেন, তিনি আর-একটি কথা তৈরী করতে ভুলে গিয়েছিলেন, সেই কথাটি এই: শৌখিন 'দেশ-বিদ্বেষ।'

একটা বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ, বাঙলা দেশের সাহিত্যের ঐতিহ্যে শৌখিন দেশপ্রেম কদাচ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে একেবারে হালের নজরুল ইসলাম পর্যন্ত যে স্বদেশপ্রেম আমাদের সাহিত্যে ব্যক্ত, তার মধ্যে ক্ষীরের ভাগ কম থাকতে পারে, কিন্তু গঙ্গার জল এক ফোঁটাও ছিল না। বঙ্কিম স্বদেশপ্রেম নিয়ে শৌখিনতা করেছেন, এমন কথা চণ্ডালেও বলবে না। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ-বিদ্বেষী, এমন কথা কাউকে বলতে আমি শুনিনি, এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলাল যখন লিখেছিলেন, 'ধন-ধান্য পুষ্পভরা', তখন কদাচ শৌখিন দেশপ্রেম বশে এই চরণটি লেখেন নি—"ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি/আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি।" এতদসত্ত্বেও যদি আমাদের দেশপ্রেমের সাহিত্যে অশ্রু ও আবেগের ভার বেশী হয়ে থাকে, তার একমাত্র কারণ স্বাভাবিক হৃদয়-দুর্বলতা ও আবেগপ্রবণতা; কারণটা এই নয় যে আমরা কৃত্রিম বা শৌখিন স্বদেশপ্রেমে মেতেছিলাম। সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর হতে পারে, স্বভাবের সততার দিক থেকে নিশ্চয় নয়। প্রেমের বেলায় অতিশয়োক্তি সাধারণ মানুষেই ঘটিয়ে থাকে, কবি সাহিত্যিকেরা স্বদেশপ্রেমের বেলায় যদি তেমন না ঘটাতেন তবেই আশ্চর্য হবার ছিল।

চীনের কম্যুনিজম যে প্রকারান্তরে নতুন সাম্রাজ্যবাদ সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

এই কুৎসিত নব-সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় দোষ, মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতাকে চিরতরে এ রুদ্ধ করে দেবে। রাশিয়ার দিকে চোখ ফেরালে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাই। চীনের বেলায় আরও ভয়ঙ্কর ভাবে এ-সত্য প্রকট। এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার নেই, চীন আমাদের পরম শত্রু, সমস্ত এশিয়ার পক্ষেই তার ছায়া বিপজ্জনক। দৈত্যের মত সে আমাদের এবং এশিয়ার গণতন্ত্র ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছে, তার অমানুষিক রাষ্ট্র-উদরের গহ্বরে আমাদের আত্মসাৎ করতে চায়। মানুষ হিসেবে তাকে প্রতিরোধ করা আমাদের কর্তব্য।

মানুষ হিসেবে যা করব আমরা, সাহিত্যিক হিসেবে তা কেন না করব? সাহিত্যের আদি শর্তই ত মানুষ। কাজেই আজকের এই দুর্দিনে এবং সংকটে সাহিত্যিকরা যে স্বদেশের শত্রুকে ধিক্কার দেবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এমন কি এ'রা যে-কর্তব্য স্থির করেছেন, জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চারের মহান কর্তব্য, তার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কি এখন থেকে বাঙালী সাহিত্যিকরা সকলেই স্বদেশ-গাথা গাইবেন? তা হলে কি আমরা উন্মত্ত জাতীয়তার আবেগ সঞ্চার করব জনসাধারণের মধ্যে?

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যাঁর পক্ষে সম্ভব তিনি স্বদেশ-গাথা অবশ্যই গাইবেন। দোষ কোথায়! অন্যায় বা কিসে! মা-কে মা বলে ডাকতে কি এতই লজ্জা? নিশ্চয় নয়। আমি এমনও মনে করি, স্বদেশ-গাথা গাইলেই তার অন্য নাম উন্মত্ত জাতীয়তা হয় না। যে বিপজ্জনক জাতীয়তার প্রতি আমাদের কারও কারও বিতৃষ্ণা আছে—তার আদর্শ আমরা কখনও গ্রহণ করি নি—আমরা কখনও এমন কথা বলি নি— আমরা "প্রভু জাতি" তোমরা "পশুবংশ"। আমরা "ব্লণ্ড বীস্ট" নই। আমরা স্বদেশে রণ-নিনাদ সৃষ্টি করে অন্য জাতিকে "মুক্ত" করতে যাচ্ছি না যখন তখন মানসিক দিক থেকে আমাদের জাতীয়তাবোধকে সভ্যতার শত্রু মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই। ফলে সাহিত্যিক হিসেবে প্রেরণা সঞ্চারের কর্মে আমাদের অগৌরব কোথায়!

বাঙলাদেশে এক সময় "প্রগতিবাদী"র ভেক ধরে যাঁরা রুশীয় মাটিকে মাতৃজ্ঞানে স্তুতি করেছেন, স্ট্যালিনকে পিতৃজ্ঞানে, এবং যাঁরা দীর্ঘকাল সাহিত্যকে ধর্মঘটের মজুরের খাদ্য-আন্দোলনের হাতিয়ার বলে মনে করে এসেছেন, তাঁরা অবশ্য আপাতত বিপাকে পড়তে পারেন। ক'বছর আগে চীনের "শত-পুষ্প"-র কাল্পনিক শোভায় যাঁদের মুখ নিরন্তর মধুবর্ষণ করেছে, এখন তাঁরা খুবই বিপদগ্রস্ত। এ'দের পক্ষ থেকেও একটি দ্বিধাজড়িত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আমার রীতিমত সন্দেহ হয়, উপায়ান্তর না থাকলে এমন বিবৃতি তাঁরা প্রকাশ করতেন না। তাঁদের কি এই ভয় হয়েছে যে, এ-সময় তাঁদের একঘরে করে ফেলা হবে? নয়ত হঠাৎ ঐক্যের প্রসংগ ওভাবে আসে কেন? কেন লিখতে হয়: "আজকের এই অশান্ত পটভূমিতে দেশের মধ্যে যেন কোনো রকম ঐক্য-বিরোধী আন্দোলন না হয় বা পারস্পরিক বিদ্বেষপুষ্ট না হয়..." ইত্যাদি। ঠাকুর ঘরে ঢুকে কলা-খেয়ে আসা চোর সবসময় আগ বাড়িয়ে বলে, 'আমি ত কলা খাই নি'। কি করে এ'রা রাতারাতি জেনে ফেললেন, দেশের এই সংকটে 'ঐক্য-বিরোধী আন্দোলন' বা "পারস্পরিক বিদ্বেষপুষ্ট" আন্দোলন সৃষ্টি হবে! কই, এ-যাবৎ কোথাও ত অন্য কোনো মুখ এ-কথা বলে নি! ভাবতে অবাক লাগে, যেখানে সংকট ঘোষণা হওয়া মাত্র ভারতের জনসাধারণ ও সর্ব সম্প্রদায়ের লোক স্বতঃপ্রণোদিত সংহতি ও ঐক্যের যোগে মিলিত, সেখানে এ'রা প্রারম্ভেই "বিরোধী" আন্দোলনের ভয় পান, এ'রা "বিদ্বেষ" অনুমান করে আতঙ্কিত। এই নীতিজ্ঞান এতকাল কোথায় ছিল? এ'রাই কি দীর্ঘকাল ধরে অ-কমিউনিস্ট সাহিত্যিকদের প্রতি বিষোদ্গার করে আসেন নি? তবে? বলা বাহুল্য, উক্ত অংশ থেকে মনে হয় যেন কেউ বলতে চান: "হে স্বদেশপ্রেমীরা, তোমরা এখন আমাদের প্রতি বিষোদ্গার করিও না, বিদ্বেষ পোষণ করিও না, আমরা অনুরোধ করি বীরের ধর্ম পালন কর, শত্রুকেও অসময়ে আক্রমণ করিতে নাই।"

যদি পাঠক অপরাধ না নেন, তবে বলি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "রিফর্মড হিন্দুজ"-অনুসরণে বলি এইসব "ডিফর্মড কমিউ-নিস্ট"রা "From the above দেখতে পাচ্ছি বেশ, যে তাঁরা neither fish nor flesh",

ভ্রম সংশোধন

স্টেইনবেক সম্পর্কে প্রকাশিত লেখাটিতে দুটি মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর বদলে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ছাপা হয়েছে তাঁর জন্মতারিখ হিসেবে। দ্বিতীয় ভুল 'টরটিলা ফ্ল্যাট' বা 'টর্টিলা ফ্ল্যাট'-এর পরিবর্তে 'টর্টিলা' হয়েছে। র-ফলা বিভ্রাটটুকু শুধরে নিতে হবে।

উল্লেখযোগ্য কাব্য সঙ্কলন : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন। শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য আট টাকা।

এ বছরের পঁচিশে বৈশাখে দ্বিজেন্দ্র-কাব্য সঞ্চয়ন প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা দেশে সম্পূর্ণ এবং সম্যক পরিচিত কবি। তবু নাট্যকার হিসাবে তিনি আমাদের কাছে যতটা আত্মীয়, গীতিকার হিসাবেও তিনি যতটা নিকটজন, কবি হিসাবে হয়ত অতটা নন। কেন? মাত্র পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ তাঁকে কবি হিসেবে ভুলে গেল কেন? স্বল্পায়ু জীবন, এবং স্বল্পতর সাহিত্যজীবন নিয়ে তিনি বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিলেন, আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল করেই রেখে গেছেন তিনি। তবু আজ নতুন করে তাঁর কাব্য সঞ্চয়নগ্রন্থ হাতে নিয়ে এই কথাই ভাবতে হল আমাদের।

রবীন্দ্রসমকালে রবীন্দ্র-প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তাঁর সাধ্য-প্রতিভাকে বহুমুখী করে তুলেছিলেন বলে তাঁর কবিপ্রসিদ্ধি যে কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাট্যমত্ততা, হাসির কবিতা ও গানের আকর্ষণ এবং আর্য-পুরাণপ্রীতি তাঁকে গভীর কবিতায় নবারীতি-পরীক্ষিত হতে দেয়নি। তাছাড়া ১৯১৩ সালে আঙ্গিক এবং বিষয় বক্তব্যে বাংলা কবিতা যে পর্যন্ত পৌঁছেছিল, রবীন্দ্রক্ষেত্রেও তা চূড়ান্ত গৌরবের চিহ্ন হয়ে ওঠে নি। দ্বিজেন্দ্রলালকে আয়ুহীনতায় সেইখানেই থামতে না হলে যুগবিবর্তনে তিনিও জয়ী হতেন। ফর্মে, টেকনিকে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার শেষ লেখা আমরা দেখতে পাইনি, আর সেই সঙ্গে হালআমলের প্রকাশনায় তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ ঘটেনি বলে তিনি আধুনিক বাংলা কাব্য পাঠকের ঘনিষ্ঠ কবি নন। সেই দিক থেকে এই কাব্য সঞ্চয়নের গুরুত্বপূর্ণ মূল্য আছে।

হাসির গান (১৯০০), আষাঢ়ে (১৮৯৮), মন্দ্র (?), আলেখ্য (১৯০৭) ও ত্রিবেণী (১৯১২) কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে এই গ্রন্থে এবং তৎসহ কিছু গান ও চারিটি নাট্যকাব্যের খণ্ডিত অংশ ও Lyrics of Ind ইংরেজী কাব্যগ্রন্থের (১৮৮৬) দুটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

নাট্যকাব্যের খণ্ডাংশ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না করলেই ভাল হত বলে আমাদের ধারণা। শুরুতে বিভিন্ন লেখকের লেখা যে প্রবন্ধাবলী গ্রন্থভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়েও আমাদের কিছু বলবার আছে। যে কোনো সংকলন গ্রন্থ একক এবং একাগ্র দৃষ্টির পরিচায়ক হয়ে উঠবে এটাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ লেখক বা কবির যে চরিত্র সংকলক অথবা সম্পাদক আবিষ্কার, অনুভব ও বিশ্বাস করেছেন, রচনা নির্বাচনের মধ্যেও তাই রূপায়িত হয়ে ওঠা চাই। সংকলন গ্রন্থে জনমত সমাবেশের স্থান কোথায়? এর জন্যে স্বতন্ত্র আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারত। সংকলয়িতার আলোচনা বা ভূমিকাই এই গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য এবং যথেষ্ট ছিল বলে আমাদের মনে হয়।

আর একটি অভাব আমরা অনুভব করেছি এই প্রসঙ্গে। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ঘটনাপঞ্জী না থাকায় আমাদের উদ্রিক্ত কৌতূহল অনেকাংশে অতৃপ্ত থাকে। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর হয়েছে।

৩৮৯।৬২

সাহিত্যের ইতিহাস

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব)ঃ তারাপদ ভট্টাচার্য, এস গুপ্ত অ্যান্ড (প্রাইভেট) লিমিটেড, ৫৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, মূল্য আট টাকা মাত্র।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এর জন্য যে equipment দরকার, তা সকলের আয়ত্তাধীন নয়। ইতিহাসের উপাদানগুলির সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতেও দীর্ঘকালের অধ্যয়ন—অনুসন্ধান আবশ্যক। এ-ছাড়া দরকার ঐতিহাসিক দৃষ্টি। সে-দৃষ্টির অধিকারী সকলে হতে পারে না। কোন্‌টির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কোন্‌টির নেই, এ বাছ-বিচারে ঐতিহাসিক দৃষ্টি না থাকলে পদে পদে বিভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কবিদৃষ্টি যেমন সকলের থাকে না, ঐতিহাসিক দৃষ্টিও তেমনি সকলের থাকে না। এ-দৃষ্টি অনুশীলনের দ্বারা কেউ আয়ত্ত করতে পারেন, কেউ অনুশীলন করেও পারেন না। আরও একটি কারণে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা দুরূহ। সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গেলে অন্তত চার-পাঁচটি Academic discipline-এর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হয়। কারণ, সাহিত্যিক উপাদানই সাহিত্যের ইতিহাস রচনার একমাত্র উপাদান নয়।

সম্প্রতি কিছুকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের ছোট-বড় ইতিহাস এত বেশী লেখা হচ্ছে যে, মনে হয়, বাঙালী গবেষকরা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা সবচেয়ে সহজ মনে করেন। এক দিক থেকে সহজই বটে। যাবতীয় Survey জাতীয় রচনাই সহজ। দায়-দায়িত্ব সেখানে কিছু কম।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনার একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ইতিহাসের উপকরণগুলিকে তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করে নেপথ্য-বাসে স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ পাঁঠার ল্যাজা-মুড়া-শিং-খুর প্রভৃতি অখাদ্য অংগগুলি বাদ দিয়ে তিনি কেবল খাদ্য মাংসটুকুই পাঠকদের পরিবেশন করেছেন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের গবেষণার একটু নমুনা দিই—"বংগসাহিত্যের দৃষ্টি সংকীর্ণ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং ভাবালু। ......বাঙালীর জাতীয় জীবনই ইহার জন্য দায়ী। জাতীয় মন অপরিণত, সংকীর্ণ ও আদিম ধর্মভাবের ভাবুক।"

"শম্বুকের মতো ক্ষুদ্র পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের কঠিন আবরণের মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করিয়া বাঙালী দীর্ঘ ছয়শত বৎসর একইভাবে চক্ষু বুজিয়া কাটাইয়াছে। ......সেইজন্য প্রাচীন বংগ-সাহিত্য হইয়াছে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে ক্লান্তিকর সাহিত্য।"

এরকম গবেষণার পরিচয় শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের গ্রন্থের পাতায় পাতায় আছে। আজকাল অভিভাবকশূন্য বাংলা দেশে বহু বাঙালী গবেষক বহুপ্রকার প্রলাপ বকে চলেছেন। অভিভাবক নেই, তাই এ'রা নিরঙ্কুশ। ৪৫৯।৬২

কিশোর সাহিত্য

সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী। দাম, এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নিম্ন শিশুসাহিত্যে যাদের কাছে নেহাতই

আজগুবী অথচ বড়দের সাহিত্যের পক্ষে যে পাঠকমন এখনও অপরিণত, তাদের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্যই কিশোর সাহিত্য। প্রবীণ লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে কিশোর মনের এই চাহিদা পূরণ করে এসেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের সে-সব স্বল্পসংখ্যক কৃতি-সাহিত্যিকদের অন্যতম যাঁরা মুখ্যত বয়স্কদের লেখক হয়েও ছোটদের জন্য সমপরিমাণ উৎসাহী।

"সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড" তাঁর আরও একটি কিশোর উপন্যাস। ঐতিহাসিক পটভূমিতে এর কাহিনী নির্মিত। মারাঠা বীর শিবাজী যখন দিগ্বিজয়ে ব্যস্ত, তখন তাঁরই এক কিশোর অনুচর সদাশিব সর্বদা তাঁর সমস্ত যুদ্ধ পরিকল্পনাকে সাহায্য করে এসেছে। শিম্বারাও-এর গোপন পত্র নিয়ে চাকণ দুর্গে অভিযান, দুর্গম্বারে চিঠি পাঠাবার কৌশল, বাড়ির পথে ডাকাতের কবল থেকে পরিত্রাণ, কুকুর উদ্ধার—এমনি অসংখ্য ঘটনার মধ্যে সদাশিবের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী এ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার এমন একটি আকর্ষণ আছে যার সমন্বয়ে এ কাহিনী প্রতিটি কিশোর-পাঠকের মনকে উত্তেজিত এবং উদ্দীপিত করবে। ৩৩৮।৬১

শারদ-সাহিত্য

শিক্ষক—সম্পাদক শ্রীমহীতোষ রায়-চৌধুরী। শিক্ষক কার্যালয়: ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। মূল্য এক টাকা।

কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, ছয়টি ছোট গল্প এবং কয়েকটি কবিতা ও ভ্রমণকাহিনী আলোচ্য সংখ্যাখানিতে স্থানলাভ করিয়াছে। এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রভাকর মাঝি, গোপাল ভৌমিক, কালিদাস রায়, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শ্রীময়ী—সম্পাদনা অঞ্জলি বসু, নির্মল ভাই. পি-৬০৫, 'ও' নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা

আলোচ্য সংখ্যায় আছে চারটি প্রবন্ধ, কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা। বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে আছেন—যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, ডঃ রমা চৌধুরী, ইলা মিত্র, স্বামী নির্লেপানন্দ প্রভৃতি। নবাগত লেখকদের রচনাও ভাল লাগিয়াছে।

মহিলা মহল—অঞ্জলি বসু প্রধান সম্পাদিকা। ৫৪বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রায় ডজনখানেক কবিতা, কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ ও আলোচনা সহযোগে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত আলোচ্য সংখ্যাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় নতুন লেখিকা ব্যতীত বিশেষভাবে যাঁহাদের নাম করা যাইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে আছেন—বাণী রায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ডঃ রমা চৌধুরী এবং মায়া বসু।

রঙ্গজগৎ

বাংলার চলচ্চিত্রসেবী, শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতি

বর্তমান জাতীয় সংকটে ভারতের চলচ্চিত্র-মহল যে-ভাবে সাড়া দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশংসা বুঝি বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজের সমানভাবে প্রাপ্য নয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ এ-ক্ষেত্রে কলকাতাকে পেছনে ফেলে চলে গিয়েছে।

কলকাতার চিত্রব্যবসায়ীরা যে জাতির সেবায় এগিয়ে আসেন নি, তা নয়। প্রতিরক্ষা তহবিলে তাঁরা সকলেই সাধ্যমত দান করেছেন এবং করছেন।

কিন্তু অর্থদানের চেয়েও আর একটি বড় দান আছে। তা হল : দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধের সঞ্চার। জাতির সংকটকালে এই মহৎ কর্তব্যের আদর্শে সব চাইতে বেশী অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছেন বোম্বাই-এর চলচ্চিত্রব্যবসায়ী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা। তাঁরা জাতির অন্তরে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে একটির পর একটি

জাতির অন্তরে দেশাত্মবোধ সঞ্চার, এবং প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নগরীর পথে পথে বেরিয়ে পড়ুন

চলচ্চিত্রসেবী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা অল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক ছবি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করুন

অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করে চলেছেন। সেখানকার শিল্পী ও কলাকুশলীরা এ-কাজে বিনা পারিশ্রমিকে সানন্দে আত্মনিয়োগ করেছেন। মাদ্রাজের চিত্রব্যবসায়ী, শিল্পী ও কলাকুশলীরাও এ-কাজে নিশ্চেষ্ট নন। ওই দুই অঞ্চলের চলচ্চিত্রশিল্পীরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে রাজপথে এসে নেমেছেন।

আজ নিরুৎসাহ শুধু কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীরা। দেশপ্রেম তাঁদের নেই এমন কথা বলছি না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনেকেই হয়ত প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ ও অলঙ্কার দান করেছেন। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাতির অন্তরে দেশ-প্রেম সঞ্চারের কাজেও তাঁদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জাতির দুর্দিনে তাঁরা এই ভূমিকা সার্থক করে তুলুন।

পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এস কে জি'র "রক্তপলাশ" ছবিতে অনিল চট্টো-[illegible] ও রবীন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় (ভি-জি)

ভি শান্তারামের প্রযোজনায় নির্মীয়মান (পরিচালনা : ঋত্বিক) "পলাতক ছবির নায়ক অনুপকুমার

বোম্বাই-এর শিল্পীদের দেশাত্মবোধ

কলকাতায়ও যা দেখা যেতে পারত, এখনও পারে

বোম্বাইয়ে গত সপ্তাহে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ ডিফেন্স কমিটি গঠিত হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ব বিভাগের প্রতিনিধিরা এই কমিটিতে রয়েছেন।

কমিটির সভার সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি রাজ কাপুর ঘোষণা করেন, শুধু চলচ্চিত্রশিল্পীদের পক্ষ থেকেই জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করা হবে। তিনি শিল্পীদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন প্রয়োজন হলে ভারতের অন্যান্য শহরে গিয়ে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহের কাজে সহায়তা করেন।

এ-সপ্তাহে বোম্বাই-এর চলচ্চিত্রশিল্পীরা রাজ কাপুর, দিলীপকুমার, দেব আনন্দ, নার্গিস প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীদের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহের জন্য [illegible]

বোম্বাই-এর সংগীত-পরিচালকদের সংস্থা এক জরুরী সভায় মিলিত হন। এবং ওই সভায় প্রতিরক্ষা তহবিলে দানের জন্য সভ্যদের কাছ থেকে ৬০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

নাম রাখা হয়েছে মঙ্গেশকর নাইট। আগামী ১লা ডিসেম্বরের রাত্রি। সে-রাত্রে যশস্বিনী কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকর ও তাঁর ভাই বোনেরা—আশা ভোঁসলে, মীনা, ঊষা ও হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর—দেশাত্মবোধক

চিত্রাভিনেতার বদান্যতা

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা এম জি রামচন্দ্রন (এম এল সি) মাদ্রাজের বিধান পরিষদে ঘোষণা করেন, ১লা নভেম্বর থেকে চলচ্চিত্র মারফৎ মোট রোজগারের এক-চতুর্থাংশ তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন। যতদিন ভারত শত্রুমুক্ত না হয়, ততদিন তিনি এমনিভাবে দান করে যাবেন। ইতিমধ্যে তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শিল্পীকে তাঁর দানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গান পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিল্পী-পরিবার জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন।

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহে দুটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

বোম্বাই-এর অ্যাসোসিয়েশন অব প্লে-ব্যাক সিঙ্গারস্ সাধারণ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনের বাইরে সকল দেশাত্মবোধক গানের রেকর্ড এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তৈরী প্রামাণিক চিত্রের জন্য গৃহীত রেকর্ড বাবদ প্রাপ্য রয়্যালটির দাবি বহুলাংশে 'শিথিল' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যে বিনা পারিশ্রমিকে গান করার জন্য সংস্থা সদস্য-শিল্পীদের অনুরোধ জানিয়েছেন।

ভি শান্তারাম ফিল্মস ডিভিসন-এর হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত ও দেশাত্মবোধক অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপাল রেড্ডীকে তার পাঠিয়েছেন।

দেশজোড়া

কলকাতার শিল্পলোক

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসো- সভায় এই

শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স-এর "নবদিগন্ত" (পরিচালনাঃ অগ্রদূত) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

শত্রুমুক্ত না হচ্ছে ততদিন প্রতি মাসের শেষ সোমবারে পূর্বাঞ্চলের (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মণিপুর ও ত্রিপুরা) সমস্ত সিনেমা-গৃহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে। ২৬শে নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এ-ছাড়া সংস্থার সভ্যরা স্বতন্ত্রভাবেও প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করছেন। আশা করা যাচ্ছে, এ-ভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হবে। এবং প্রতি মাসের চিত্রপ্রদর্শন লব্ধ টাকার অঙ্ক আনুমানিক পাঁচ লক্ষ হবে বলে সংস্থা মনে করেন। ইতিমধ্যে যাঁরা স্বতন্ত্র-ভাবে প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ ইস্টার্ন মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন (২৫,০০১,), কপুরচাঁদ লিঃ (১৫,০০১,), দীপচাঁদ কাঁকরিয়া (১৫,০০১,), রূপবাণী গ্রুপ (১০,০০১,) এবং ছায়াবাণী, অরোরা, মান-সাটা, পপুলার ফিল্মস, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স, বসুশ্রী ও বীণা সিনেমা, কল্পনা মুভীজ ও বিলিমোরিয়া লালজী (প্রত্যেকে ৫০০১,), শ্যামলাল জালান ও বি ভাগা (প্রত্যেকে ৬০০১,)।

পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের পক্ষ থেকে অরোরা স্টুডিও ৭০০ ফুটের একটি তথ্য-চিত্র নির্মাণ করেছেন। দেশরক্ষার ডাকে এ-রাজ্যের নর-নারী কী-ভাবে সাড়া দিচ্ছেন তা-ই ছবিটির বিষয়বস্তু। ছবিটির নাম রাখা হয়েছে "আহ্বান"। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় তোলা এই ছবি গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে।

আগামী ২৬শে নভেম্বর স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। নাটকটি হল "কারাগার" (মন্মথ রায়)। প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে। নাটকে অংশ গ্রহণ করবেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, বাসবী নন্দী প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পী। নাট্য

শ্রেষ্ঠ দান

একদিন ছায়াছবিতে অভিনয় করে তিনি প্রতি মাসে ৭,৫০০, টাকা রোজগার করতেন। আজ এই অভিনেত্রীকে দর্শকরা ভুলে গেছেন। রোজগারও তাঁর আর নেই আজ। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের জন্য তাঁরও মন কেঁদে উঠেছে। প্রতিরক্ষা তহবিলে দেওয়ার জন্য তিনি বোম্বাই-এর সিনে আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর কাছে পাঁচ টাকার একটি নোট পাঠিয়ে দিয়েছেন। শিল্পী-সংস্থা আনন্দের সঙ্গে এই দান গ্রহণ করেছেন।

পরিচালনা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দেবনারায়ণ গুপ্ত ও অনিল বসু।

শৌভনিক সংস্থা প্রতি মাসে মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছু অংশ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন।

আমরা আবেদন করেছিলাম

ই-আই-এম-পি-এ'এর শুভ প্রয়াস

কম্যুনিস্ট চীনের বর্বরোচিত ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক ছবি তৈরির আয়োজন করছেন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসো-সিয়েশন। এই ছবিতে পররাজ্যলোভী চীনের আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের দুর্জয় সংকল্পের সক্রিয় রূপটি তুলে ধরা হবে। নবেম্বর মাসের মধ্যেই বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজি ভাষায় তৈরি হবে এই ছবি। এবং আগামী ৭ই ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলের চিত্র-গৃহগুলিতে এবং পরে সারা ভারতে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে। তপন সিংহ ই-আই-এম-পি-এর হয়ে ছবিটি তৈরির দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ছবিতে বিনা পারিশ্রমিকে বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পী, কলাকুশলী, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালকরা কাজ করবেন বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন।

সংস্থার সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ এই চিত্র নির্মাণে সহযোগিতা করার জন্য বাংলা ছবির সকল শিল্পী ও কলাকুশলীর কাছে সংবাদপত্র মারফৎ আবেদন জানাচ্ছেন।

জাতির সেবায়

অভিনেতৃ সংঘ

জাতির অন্তরে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অভিনেতৃ সংঘ কলকাতার পার্কে উন্মুক্ত আকাশের নীচে আধঘন্টাব্যাপী নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। এই নাটক পথচারীরা বিনা পয়সায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাবেন। তাঁদের প্রথম নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে ১৬ই নভেম্বর, দেশপ্রিয় পার্কে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পিবৃন্দ। তাঁরা প্রণব রায় রচিত 'ডাক' নামে একটি দেশাত্মবোধ নাটক, অভিনয় করবেন। ২০শে নভেম্বর এই নাটক অভিনীত হবে উত্তর কলিকাতায়, দেশবন্ধু পার্কে।

এ-ছাড়া অভিনেতৃ সংঘ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ১ লক্ষ টাকা দান করবেন বলে মনস্থ করছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা রঙমহল-এ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করছেন। প্রথম নাটক "উল্কা" মঞ্চস্থ হবে ২৮শে নভেম্বর। সংঘের শিল্পীরা এই নাটকে অংশগ্রহণ করবেন।

* শুভমুক্তি *

রক্তপলাশ (এমকেজি) এ-সপ্তাহের একমাত্র নতুন বাংলা ছবি। এক রহস্যঘন হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এই রোমাঞ্চকর ছবির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি), নিরঞ্জন রায়, উৎপল দত্ত, জীবেন বসু, জহর রায়, বিপিন গুপ্ত, ছায়া দেবী এবং শিশুশিল্পী বাসুদেব এই ছবির প্রধান শিল্পী। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

একটি হিন্দী ছবি এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটির নাম **জয় ভবানী** (প্রভা পিকচার্স)। জয়শ্রী গডকার, মনোহর দেশাই, নিরঞ্জন শর্মা, সাগু ও বীনা ছবির প্রধান শিল্পী। ধীরুভাই দেশাই ও এস মহিন্দর যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত-

চিত্র-সমালোচনা

দেশাত্মবোধক এবং উপভোগ্য

আজ জাতির অন্তরে নতুন করে দেশাত্মবোধের উন্মেষের প্রয়োজন যখন খুব বেশী, ঠিক এমনি সময়েই এসে উপস্থিত হল "দাদা ঠাকুর" (জালান প্রোডাকশন্স) ছবিটি। যেদিন বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ-তরুণীর দল মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশী শক্তির সংগে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই অগ্নিযুগের পটভূমিতেই "দাদা ঠাকুর" ছবির কাহিনী বিস্তৃত।

বাংলার এক কৃতী পুরুষকে কেন্দ্র করে এই ছবির আখ্যানভাগ গঠিত। তাঁর নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত—দাদা ঠাকুর নামেই ইনি বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। দাদা ঠাকুর আজও জীবিত। সমাজসেবী, সাংবাদিক এবং সর্বোপরি রসিকচূড়ামণি বিদূষকরূপে ইনি বাঙালীর শ্রদ্ধাভাজন। দাদা ঠাকুরের কর্মময় জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় এই ছবির আখ্যানভাগ (নলিনীকান্ত সরকারের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত)। জীবনের এই অধ্যায়ে ইনি কেমন করে কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সাংবাদিক-জীবন শুরু করেন, সুভাষচন্দ্র, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলার বরেণ্য ব্যক্তিরা তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন, কীভাবে তিনি গ্রামের এক ফুলুরিওয়ালাকে, যাকে আমরা বলি 'কমন ম্যান', মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার করে দিলেন প্রভৃতি ঘটনা ছবির চিত্রনাট্যে সংযোজিত। এইসব এবং আরও অনেক ছোটখাটো ঘটনার ভেতর দিয়ে চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মানুষ দাদা ঠাকুরকে অর্থাৎ এক খাঁটি বাঙালী চরিত্রকে আঙ্কিকের দিক থেকে বিশ্লেষিত), এক আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্রকে ছবির চিত্রনাট্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার কাজে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

দাদা ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছে এমন একাধিক তরুণ-তরুণীর উপাখ্যান রয়েছে ছবিতে। তাদের মধ্যে দর্পনারায়ণ ও লতার কাহিনী অতিমাত্রিক কল্পনার আশ্রয়ে পুষ্ট। এদের নিয়ে ছবিতে একটি আলাদা নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। এই কাহিনীতে নাট্যরসের আস্বাদ মেলে। তার চেয়েও এতে বেশী রয়েছে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা —আজকের জাতীয় সঙ্কটের মুহূর্তে যার সার্থকতা গভীর। কিন্তু দর্পনারায়ণ ও লতাকে ঘিরে ছবিতে আঙ্গিকের দিক থেকে যে বিবাদ গল্পটির রূপ নিয়েছে, তার প্রাধান্যে ছবিটির মূল বিষয়বস্তু লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছে কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। "দাদা ঠাকুর" একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-চিত্রের রূপ পেল কিনা, দাদা ঠাকুরের জীবন-আলেখ্য ছবিতে গৌণ হয়ে পড়ল কিনা, এ নিয়ে বিদগ্ধ দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। দাদা ঠাকুরের জীবনের আরও সব রঙ্গরসের ঘটনা এবং বিদূষকরূপে তাঁর নানা "উইট" যদি সম্পূর্ণরূপে ছবির বিষয়-বস্তু হত, তবে "দাদা ঠাকুর" একটি মহৎ চিত্রের গৌরব অর্জন করতে পারত। এবং দাদা ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় বাঙালী দর্শকরা আরও বিশেষভাবে পেতে পারতেন। কল্পিত উপাখ্যান চিত্রনাট্যে এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে, কোন কোন মুহূর্তে মনে হয়েছে, দাদা ঠাকুর যেন ছবির নাট্য-কাহিনীরই একটি চরিত্র, প্রামাণিক চরিত্র নয়।

তবে চিত্রনাট্যকার শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এই, তিনি প্রামাণিক, জীবনীমূলক ও কল্পিত সব ঘটনা তাঁর চিত্রনাট্যে সুচারুরূপে সুগ্রথিত করে তুলেছেন।

চিত্র পরিচালক হিসাবে সুধীর মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে বৈদগ্ধ্যের পরিচয়

চিত্র-বিচিত্রা

হাসি : বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

তিন সন্ধ্যা : সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যা রায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ফটো : দেশ

দিয়েছেন। দাদা ঠাকুরের সহধর্মিণীকে তিনি যেভাবে ছবিতে উপস্থিত করেছেন, ব্রাহ্মণ-পত্নীর সলজ্জ ভাব ও বাংলার ঘরের কুল-বধূর স্নেহ-মমতা তিনি যেভাবে এই চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য। দর্পনারায়ণ ও লতার উপাখ্যানের বিন্যাসেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সংযম ও রসজ্ঞান এবং ছবির একাধিক বিপ্লবী চরিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার কাজে তাঁর কল্পনাশক্তি দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ছবিতে ভোট-যুদ্ধের কৌতুকপ্রদ পর্বটির বিন্যাসের কাজেও তিনি প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্র পরিচালক ছবিটিকে এক দিকে যেমনি দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সঞ্জীবিত করে তুলেছেন, অপর দিকে তেমনি ছবিটিতে তিনি নাট্যাবেগ ও কৌতুকরসের উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। এই বাণীবাহ ও উপভোগ্য ছবি পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু তাই বলে ছবির দোষ-ত্রুটি যে নেই, তা নয়। ছবির দুটি বড় রকমের বৈসাদৃশ্য দর্শকের নজর এড়ায় না। দাদা ঠাকুর কি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর জীবনসংগ্রাম শুরু করেছিলেন? ছবি দেখে কিন্তু তাই মনে হবে। আর ছবির নেতাজী ও শরৎচন্দ্রকে দেখে হাসিও পায়, দুঃখও লাগে। ছবির শরৎচন্দ্রকে দেখে দর্শক পীড়া বোধ করবেন।

ছবির প্রধান সম্পদ প্রধান শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য। ছবির নাম-ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে গিয়েছেন পরলোকগত শিল্পী ছবি বিশ্বাস। তিনি বাদে এ-চরিত্রের অভিনয় আর কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ছবির অন্য দুই প্রধান চরিত্র দর্পনারায়ণ ও লতার রূপসজ্জায় আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী। এ-ছবিতে বিশ্বজিতের অভিনয় দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে। সুলতা চৌধুরীর মুগ্ধকর অভিনয় তাঁর শিল্পী-জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় এ-ছবির এক প্রধান আকর্ষণ। শুধুই কৌতুকাভিনেতা নয়, চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও তিনি এ-ছবিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দাদা ঠাকুরের পরম স্নেহভাজন নলিনীর চরিত্রে তরুণকুমারের অভিনয় মনোজ্ঞ, স্বচ্ছন্দ ও প্রাণোচ্ছল। দাদা ঠাকুরের সহধর্মিণীর ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয় মরমী ও সংবেদনশীল।

ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু, বিধায়ক ভট্টাচার্য, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় প্রশংসনীয়।

সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ-ছবিতে তাঁর সুনাম অম্লান রেখেছেন। ছবির গানের সুরারোপে, বিশেষ করে দাদা ঠাকুর রচিত গানে তিনি কাহিনী-কালোচিত রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির সব কটি

এ-বছর তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে নৃত্য পরিবেশন করেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য।

ফটো—দেশ

গানই জনপ্রিয়তা লাভ করবে। ছবির আবহ-সুর রচনায়, বিশেষ করে কৌতুক-মুহূর্তে, সুরকার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বিভূতি চক্রবর্তী ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে সুষ্ঠু। কোন কোন দৃশ্যে উচ্চ মানের পরিচায়ক। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে শব্দগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশের কাজ পরিচ্ছন্ন।

সার্থক এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি

এ-বছরে সান ফ্র্যান্সিসকো'র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত এবং বিদেশী সমালোচকগণ কর্তৃক প্রশংসিত "ঢেউ এর পর ঢেউ" (রেনেসাঁস ফিল্মস) ছবিটি এক নতুন চমক নিয়ে এসেছে। বাংলা চলচ্চিত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নতুন যুগ শুরু হয়েছে। "ঢেউ পর পরে ঢেউ" এই যুগের এক স্বতন্ত্র-চিহ্নিত চিত্রপ্রয়াস। এই ছবি যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠ এবং প্রত্যয় স্থিতনিষ্ঠ বলেই এমন শিল্পশোভন চিত্রসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

টেনিসনের একটি কবিতা "এনক-আর্ডেন" —এই ছবির আখ্যান-ভিত্তি। কবিতার ছায়াবলম্বনে একটি নিটোল গল্প ছবিতে রূপ নিয়েছে। সহজ সরল মানুষের সুখ-দুঃখ এই গল্পের আধেয়।

মূল কাহিনীতে রয়েছে একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে। সাগরপারে আছে জেলেদের একটি গ্রাম। জেলের ঘরের ছেলেমেয়ে ওরা। সমুদ্রের তীরের বেলাভূমিতে ওরা খেলা করে, বালির ঘর তৈরি করে। ছোট্ট মেয়েটি হল ঘরণী। ঘরের কর্তা হবে কে? মেয়েটি তার খেলার দুই সাথীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আমি দুজনেরই বউ হব।

কৈশোরের খেলা একদিন সত্য হল। বড় হয়ে দুজনেরই বউ হল মেয়েটি। এবং দুটি ছেলের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের ভেতর দিয়েই তা সম্ভব হল।

মানবিকতা ও প্রীতিরসে আলিপ্ত এই এই কাহিনী, যা দর্শকের মনকে কখনও আনন্দে প্রসন্ন করে রাখে, কখনও বা করুণ-রসে দোলা দেয়।

ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও স্মৃতীশ গুহ-ঠাকুরতা ছবিটি পরিচালনা করেছেন। বাংলা ছবিতে ওঁরা নবাগত। কিন্তু প্রথম স্বাধীন চিত্র পরিচালনায় তাঁরা সামগ্রিকভাবে যে প্রয়োগ-কৌশল, পরিমিত জ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নবাগতের অনভিজ্ঞতার পরিচয় হয়ত ছবির প্রয়োগকর্মে কোন কোন মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটনাবিন্যাসেও অনেক ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের অভাব হয়ত দেখা যায়। কিন্তু এইসব সামান্য দোষত্রুটি পরিচালকদ্বয় ছবির অন্যান্য গুণ দিয়ে অনায়াসেই ঢেকে দিয়েছেন।

একটি সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াস হিসাবে এই ছবি নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ দর্শকের সাধুবাদ পাবে। পুরো ছবিটি দীঘার সমুদ্র-সৈকতে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তোলা। দীঘার নয়নাভিরাম সমুদ্র-সৈকতের পটভূমিতে গৃহীত এই ছবির প্রতি দৃশ্য দর্শকের দুই নয়ন বিমোহিত করে রাখে। বিচিত্র বহির্দৃশ্যের এমন অপরূপ সৌন্দর্য এর আগে বাংলা ছবিতে খুব কমই দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছবির যুগ্ম পরিচালক ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ছবির আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ অপূর্বভাবে সম্পাদন করেছেন। সমুদ্র তীরের উন্মুক্ত প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য এবং দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির রূপের পরিবর্তন তিনি যেভাবে তাঁর ক্যামেরার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। উঁচুদরের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য এই ছবি এক বিরল শিল্পসৃষ্টির গৌরব পেয়েছে।

ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল

'ঢেউ এর পরে ঢেউ' সুন্দর 'এক্সপেরিমেণ্টাল' ছবির বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে আরও একটি কারণে। চিত্রনির্মাতারা এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য পরিচিত শিল্পীদের প্রধান ভূমিকায় এনে উপস্থিত করেন নি। ছবির তিনটি পার্শ্বচরিত্রের শিল্পী বাদে আর সবাই নতুন। নতুন মুখ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিকে [illegible] তুলেছে।

অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
আজ উদ্দীপক গানের পালা

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে
জননীর লাজ......

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা

(উপরে) সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র (মাঝখানে) মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, (নীচে) নির্মলেন্দু চৌধুরী (ডাইনে) দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

ফটো—দেশ

কাহিনীর তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শম্পা, শংকর ও বাদল। এ'দের অভিনয় আন্তরিকতাপূর্ণ ও সপ্রাণ। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন আরতি দাশ, ধীরাজ দাস, সুহৃদ রায়, স্বপ্না মিত্র, তারা ভাদুড়ী, শান্তনু, স্বপন ও গোপা।

সংগীত-পরিচালক যে তাঁর সুরসৃষ্টির ভেতর দিয়ে সময় সময় কাহিনীকার হয়ে উঠতে পারেন, অর্থাৎ কাহিনীর নানা মুহূর্তের রস ও বিভিন্ন চরিত্রের মনের ভাবটি সুরের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, রবিশংকর এই ছবিতে তার প্রমাণ রেখেছেন। এই ছবিতে তাঁর রচিত আবহ-সুরের মাধুর্য ও প্রভাব দর্শককে আবিষ্ট করে রাখে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে সুন্দর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা) এবং শ্যামসুন্দর ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় (শব্দগ্রহণ)।

* ছবির পর ছবি *

বিভাস

সমরেশ বসুর "অচিনপুরের কথকতা" অবলম্বনে তৈরী হচ্ছে জেনিথ পিকচার্স-এর "বিভাস"। বিনু বর্ধন ছবিটি পরিচালনা করছেন। চিত্রনাট্য রচনা করে দিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিকাশ রায় ও তরুণকুমার ছবির প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার। গত সপ্তাহে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে।

অপরূপ কথা

কিশোর-চিত্র "পরিবর্তন"-খ্যাত মনোরঞ্জন ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী হচ্ছে "অপরূপ কথা" (ফোটো-প্লে সিণ্ডিকেট)। গত রবিবার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই কিশোর-চিত্রটি পরিচালনা করছেন পঞ্চক। সন্তোষ সেনগুপ্ত ছবির সংগীত-পরিচালক।

দুই নারী

জওসা প্রোডাকশন্স-এর দ্বিতীয় চিত্র-নিবেদন "দুই নারী"র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে এসেছে। দুই নারীহৃদয়ের অন্তরবেদনা এই ছবির কাহিনীর মূল উপজীব্য। সমরেশ বসু রচিত কাহিনী ছবির আখ্যান-ভিত্তি। জীবন গঙ্গোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, কাজল গুপ্ত, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

সাদার্ন সমিতি আয়োজিত গুণী-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং চুণী গোস্বামীকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সন্ধ্যারানী। ফটো : দেশ

* সাংস্কৃতিকী *

গত ৬ই নভেম্বর দি কন্সালিডেটেড অ্যাসোসিয়েশন-এর (হেম কর লেন, কলিকাতা-৫) সাংসারিক বিচিত্রানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "দেশ"-এর সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। অনুষ্ঠানে সংস্থার ছাত্র-সভ্যরা প্রতিরক্ষা তহবিলে দানের উদ্দেশ্যে শ্রীসরকারের হাতে ২০১, টাকা তুলে দেন। শ্রীসরকার তাঁর ভাষণে বলেন, টাকার অঙ্ক বেশী না হলেও এই দান মহৎ। কারণ, ছাত্ররা এই টাকা সংগ্রহ করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহিলাদের শ্রীসরকার অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন জওয়ানদের ব্যবহারের জন্য গরম জামা তৈরি করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস। যাদুকর এ সি সরকারের কয়েকটি খেলা, অরূপ গায়েনের পরিচালনায় হবি গ্রুপের যন্ত্রসংগীত ও শ্রীজহর রায়ের কৌতুক-নকশা সকলকে আনন্দ দান করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য।

ব্যাপী তানসেন সংগীত সম্মেলন শেষ হয়। এবারকার সংগীত সম্মেলনে যে-সব বিখ্যাত শিল্পীরা কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডি এন পটবর্ধন, ভীমসেন যোশী, হীরাবাঈ, আলি আকবর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমানত আলি ও ফতে আলি, ওসমান খাঁ ও সারদাবাঈ। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন কুমারী রীতা ভাণ্ডারী, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, মায়া চট্টোপাধ্যায়, মালতী সেন ও বুলবুল লাহিড়ী। প্রথম দিনে সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন লালগোলার রাজা রাও ধীরেন্দ্রনাথ রায় এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীরাজেন্দ্র সিং সিংঘী।

সাদার্ন সমিতি (শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৫) গত সপ্তাহে গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচুনী গোস্বামীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীগোস্বামীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যারানী। বিশিষ্ট শিল্পীরা গুণীজন সম্বর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মৃণাল চক্রবর্তী, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, সুজাতা চক্রবর্তী, ধনঞ্জয়, অঞ্জলী বক্সী ও অনিল দত্ত। কৌতুক-নকশা ও কৌতুক-গান পরিবেশন করেন জহর রায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, মিণ্টু দাসগুপ্ত, পিণ্টু দত্ত। যোগেশ দত্ত পরিবেশন করেন মূকাভিনয়। অজয় বিশ্বাস পরিচালিত এই অনুষ্ঠানটি জওয়ানদের সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের … ব্যবস্থা করেছেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

' প্রতিরক্ষা ভান্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রতি রাজ্যের ক্রীড়া পরিচালকরাই তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। বহু খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড় তাঁদের অতীত কীর্তির সাক্ষী কাপ মেডেল দান করে জাতীয় ভান্ডারকে পুষ্ট করছেন। ক্রীড়া পরিচালকদের নিয়ে বহু জায়গাতেই কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতির এই সংকট-মুহূর্তে কিভাবে খেলোয়াড়রা দেশের কাজ করতে পারেন তারই চেষ্টা চলেছে। বাঙ্গলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ৪ দিনব্যাপী এক আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নামানুসারে দুটি দল গড়া হবে; এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪ জন ফাস্ট বোলার সমেত ভারতের সব খ্যাতনামা খেলোয়াড় দলে থাকবেন। খুবই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। খরচ-খরচা বাদে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এ খেলা থেকে অনায়াসেই এক দেড় লাখ টাকা সংগৃহীত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার বাঙ্গলার ক্রিকেট রসিকরাও একটা ভাল খেলা দেখার সুযোগ পাবেন। এবার ভারতে টেস্ট খেলার কোন আয়োজন নেই। ক'বছর ধরেই শীতের দিনে টেস্ট খেলা দেখা যেন আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এবার খেলার ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই মন-মরা হয়ে বসে ছিলেন। এখন তাঁরাও আশ্বস্ত হবেন। বলা বাহুল্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪ জন ফাস্ট বোলারের সঙ্গে যদি ভারতের নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা খেলায় অংশ গ্রহণ করেন তবে সে খেলার আকর্ষণ টেস্ট খেলার চেয়ে কিছু কম হবে না। আর এ খেলার ডাকে সবাই যে সাড়া দেবেন সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ।

বাঙ্গলার ফুটবলের কর্মকর্তারাও প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন। ইতিমধ্যে আই এফ এর সম্পাদক শ্রী এম দত্তরায় কলকাতার চারটি প্রধান ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টার্ন রেলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে এই ব্যবস্থা করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় বা সন্নিহিত কোন রাজ্যে যদি এই চারটি ক্লাবের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয় তবে খেলা থেকে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ প্রতিরক্ষা ভান্ডারে প্রদান করতে হবে। রাঁচী, পাটনা এবং গৌহাটি থেকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্লাবের কাছে প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য আক্রমণ এসেছে। আশা করা যায়, এভাবেও বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ করা যাবে। বোম্বাইতে রোভার্স কাপে অংশ গ্রহণকারী দলের বাছাই খেলোয়াড়দের সঙ্গে এশিয়ান গেমের ভারতীয় ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলা থেকে কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ব্যাংগালোরে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সময়ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুরূপ প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা হবে বলে তোড়জোড় করা হচ্ছে।

বিজয়নগরের মহারাজকুমার অর্থাৎ ক্রিকেট বিশ্বের স্বনামধন্য 'ভিজি'ও দিল্লিতে ৪ দিনব্যাপী এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। 'ভিজি'র পরিকল্পনামত এ খেলাতেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪ জন ফাস্ট বোলার সমেত ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নামানুসারে দুটি দল গড়া হবে। 'ভিজি' প্রদত্ত একটি স্বর্ণমুদ্রায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী খেলার আগে মাঠে নেমে 'টস' করবেন, পরে দুই দলের দুই অধিনায়ক নিজ নিজ দলের ভার নেবেন। স্বর্ণমুদ্রাটি পরে কোথায় যাবে সংবাদে তার উল্লেখ না থাকলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রতিরক্ষা ভান্ডারেই যাবে। ভারতের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমার শুধু ক্রিকেটের জন্যই বিখ্যাত নন, আতিথেয়তা এবং দানের জন্যও বিখ্যাত। পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে তাঁর মাইনার টাকা ইতিমধ্যেই মাসে মাসে তিনি প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মহৎ উদ্দেশ্যে আয়োজিত খেলায় ব্যবহৃত স্বর্ণমুদ্রাদি কি

এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এম সি সি দলের খেলায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক এল ফ্যাভেল স্ট্যাথামের বলে ক্যাচ তুলে পারফিটের হাতে আউট হচ্ছেন

তিনি পকেটে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন? নিশ্চয়ই না। যাই হোক, দিল্লির প্রদর্শনী খেলা সম্পর্কে এখনো পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়নি। ভিজি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির অনুমতি পাবার পর অন্যান্য ব্যবস্থা করবেন বলে ঠিক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি খেলার আয়োজনে অনুমতি দেবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আর খেলার আগে মাঠে উপস্থিত থেকে তাঁরা যদি 'টস' করেন তবে দর্শকে সে মাঠ ভেঙে পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীবিজয় মার্চেণ্টের উদ্যোগে এই মাসের শেষাশেষি বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামেও একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন হয়েছে। খেলাটি দেখবার এক শর্ত: যাঁরা ভারত সরকারের ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট কিনেছেন তাঁরাই এ খেলা দেখার টিকিট কিনতে পারবেন। ইতিমধ্যে বিশ লাখ টাকার সার্টিফিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। খেলার মধ্য দিয়ে অর্থ সংগ্রহের এও এক নতুন প্রচেষ্টা।

প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ক্রিকেট টিমের বিভিন্ন জায়গায় সফরের উদ্যমও প্রশংসনীয়। বড় জায়গায় ভিড় না বাড়িয়ে এঁরা যদি ছোট ছোট শহরে এবং প্রধানত রেল বিভাগের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে সফর করেন তবে উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হবে সন্দেহ নেই।

সব প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের যে-সব প্রচেষ্টা চলছে তার মাত্র কয়েকটি প্রচেষ্টার উল্লেখ করলুম। নানা জায়গায় নানাভাবেই খেলোয়াড় ও ক্রীড়া পরিচালকরা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

অর্থ সংগ্রহ তো বটেই, জাতির সংকট সময়ে দেশের মধ্যে খেলাধুলোর এই ব্যবস্থার আরও কয়েকটি ভাল দিক আছে। তার মধ্যে জনসাধারণকে আনন্দ দান, এবং তাদের নৈতিক বল অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টা অন্যতম। আর তার চেয়েও যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে দেশের সঙ্কট সম্পর্কে খেলোয়াড় ও জনসাধারণকে অবহিত করা, তাঁদের দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা।

যুদ্ধের জন্য খেলোয়াড়দের বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই আমরা দেখেছি কত বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মুষ্টি-যোদ্ধা জো লুই, টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান-কারী লেন হাটন এবং আরও কত কীর্তি-মান খেলোয়াড়ের সৈনিক-রূপী ছবি কতদিন আমাদের দেশের কাগজেই ছাপা হয়েছে। আর সৈনিক খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন, জো হার্ডস্টাফ, রেগ সিম্পসনের খেলা তো এই ইডেন গার্ডেনেই চোখে দেখেছি। ফুটবল মাঠে ... কম্পটন,

প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের খেলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এ'রা ভারতেই ছিলেন সৈনিক হিসাবে। যুদ্ধের পর প্রথম যে দলটি ভারতে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল তার গোটাটাই ছিল সামরিক দল—অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট টীম।

আজ তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি, কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিলে ভারতের খেলোয়াড়কুলও সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করতে দ্বিধা করবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

* * *

প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস তথা আই এফ এর সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সভাপতি করে বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার প্রতিনিধিদের যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটির কাছে আমার একটি আবেদন আছে।

সংবাদে দেখছি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে চিত্রতারকাদের নিয়ে কলকাতার ইডেন উদ্যানে না হয় রবীন্দ্র সরোবরে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ক্রিকেট মাঠে বোম্বাই ও কলকাতার বিখ্যাত চিত্রতারকাদের আবির্ভাব ঘটিয়ে অন্তত এক লক্ষ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা আছে। বিখ্যাত গায়ক এবং সুরকার শ্রীহেমন্ত মুখার্জি এই খেলার আয়োজনে সহায়তা করবার জন্য নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছেন। প্রাথমিক আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে।

স্পোর্টস কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা ক্রীড়া সমন্বয় সমিতির কাছে এই খেলা সম্পর্কেই আমি সবিনয়ে আমার আপত্তি জানিয়ে রাখছি। সত্যিকারের খেলা থেকে যেখানে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা হচ্ছে সেখানে খেলার এই প্রহসন কেন? প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এ ধরনের খেলার আয়োজন অবস্থার গুরুত্বকেও কিছুটা হাল্কা করে দেবে বলে আমার বিশ্বাস। স্কুল ও কলেজের চপলমতি ছাত্রছাত্রীদের উপরও এ ধরনের খেলার প্রভাব তাদের 'মাথা খাওয়ার' সহায়ক।

সবশেষে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে আমি বলতে চাই—ক্রিকেট খেলার একটা আভিজাত্য আছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় এবং গায়ক-গায়িকার সঙ্গীতের মতই ক্রিকেট খেলার রূপ রস আছে। খেলাটিকে হেলা-ফেলার চোখে দেখা হচ্ছে বলেই তো আজ চিত্রতারকাদের তার মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে। কই, খেলোয়াড়দের দ্বারা তো জলসার কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না? ব্যবস্থা হলেও সে জলসায় লোকসমাগম হবে না। খেলোয়াড়ের গলায় সঙ্গীত বে-সুরো হয়ে উঠবে। তাই যদি হয় তবে চিত্রতারকাদের ক্রিকেটও বে-সুরো হবে না কি? অবশ্য যে খেলোয়াড় গান গাইতে পারেন বা যে চিত্রতারকার ক্রিকেটে হাত আছে তাঁদের কথা পৃথক। কিন্তু সে চেষ্টা তো হচ্ছে না। চেষ্টা হচ্ছে খেলার মাঠে তারকাদের জড় করে খেলার প্রহসনের মধ্য দিয়ে অর্থসংগ্রহ করার। এতেই আমার আপত্তি।

চিত্রতারকা, সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতারা তাঁদের বৃত্তির মধ্য দিয়েই প্রতিরক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। সেটা তাদের পক্ষে সম্মানেরও বিষয়।

স্পোর্টস কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছে আমার আবেদন, তাঁরা খেলোয়াড়দের দ্বারা প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করেই অর্থ সংগ্রহের যেন চেষ্টা করেন। আর চিত্রতারকাদের খেলার ব্যবস্থা যদি অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে থাকে তবে যেন সেইসব চিত্রতারকাদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয় যাঁদের সত্যিই ক্রিকেটে কিছুটা হাত আছে।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

পূর্ণিমা ঘোষ

১৯৫৯ সালের কথা। শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লী ফুটবল ক্লাবের সংগে বোলপুরের বাঁধগোড়া ক্লাবের ফুটবল খেলা। মাঠের চারপাশ ঘিরে উৎসাহী দর্শকের ভিড়। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মধ্যে খেলা বেশ জমে উঠেছে। বল একবার যাচ্ছে ও গোলের দিকে, একবার আসছে এদিকে। গোল হয় হয়, আবার বেঁচে যায়। মাঝে দর্শকদের হাততালি আর বাহবা পড়ে। এমন জমাটি খেলার মধ্যেও কিন্তু মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে বাঁগোড়ার অভিযোগের ফলে। তারা খেলার ফাঁকে ফাঁকে রেফারীর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে—"খেলতে পারছি না স্যার, ওদের ক্যাপ্টেন বড় ফাউল করছে।" বাঁশী বাজাতে বাজাতে রেফারী মুচকি হাসেন। ভাবখানা : তোমরা ওর সংগে পেরে উঠছ না, আমি কি করব?

শান্তিনিকেতনের ফুটবলে সেদিন বাঁধগোড়া ক্লাবের অশান্তির কারণ হয়েছিল যে খেলোয়াড়টি, সে কিন্তু ছেলে নয়, মেয়ে। গুরুপল্লী ক্লাবের পালের গুরু, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন। নাম পূর্ণিমা ঘোষ।

আমার এই লেখা পড়ে অনেকে হয়তো সেদিনের রেফারীর মত মুচকি হাসি হাসবেন, কারও বা মুখে চোখে ফুটে উঠবে অবিশ্বাসের হাসি, কেউ ভাববেন মেয়েটি শখ করে একদিন মাঠে নেমেছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের সাম্প্রতিক ফুটবলের যারা খোঁজখবর রাখেন তাঁদের কাছে একটু খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন, মেয়েটি সত্যিই ভাল ফুটবল খেলোয়াড়। না হলে তাকে ক্লাবের ক্যাপ্টেন করবে কেন?

তাই বলে কি মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলে খেলবার যোগ্যতা ছিল? কিংবা স্পোর্টিং ইউনিয়ন বা ভবানীপুর ক্লাবে? নিশ্চয়ই না। তবে শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে ফুটবলে বেশ একটু পরিচয় ছিল পূর্ণিমা ঘোষের।

দলের অধিনায়ক হতে হলে কিছু বিশেষ যোগ্যতা থাকা চাই। সে যোগ্যতা ছিল বলেই পূর্ণিমার উপর গুরুপল্লী ক্লাবের অধিনায়কত্বের ভার পড়েছিল। এবং বেশ কিছুকাল যোগ্যতার সংগে খেলেই পূর্ণিমা প্রমাণ করে দিয়েছিল, অধিনায়কত্বের ভার বইবার পক্ষে সে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পায়ে ছিল টল কিক, ট্যাকলিং ভাল ছিল, সবচেয়ে যেটা ভাল ছিল সেটা হচ্ছে মনের জোর, আর দেহের শক্তি। প্রথম দিকের পজিশন ছিল ব্যাক, পরে সেণ্টার ফরোয়ার্ড। এক দু' বছর নয়, ছোট বেলা থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাস না করা পর্যন্ত নিয়মিত গুরুপল্লী ক্লাবে ফুটবল খেলেছে পূর্ণিমা ঘোষ। এখন বিশ্বভারতীর ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রী। এখন আর ফুটবলের রেওয়াজ নেই। সেদিন অর্থাৎ গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খোলবার আগের দিন বিশ্বভারতী মাঠে বড় ছেলেদের সংগে ফুটবল নিয়ে অবশ্য খানিকটা পেটাপেটি করতে দেখা গেছে পূর্ণিমা ঘোষকে। সেটা ছিল শখের খেলা। প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখন বড় দেখা যায় না। তবে এখন খেলার সময় বাঁশী বাজাতেই বেশী আনন্দ। অনেক খেলাতেই রেফারীর ভূমিকা।

ফুটবল মরদের খেলা। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ম্যানস গেম'। দেহের শক্তি, পায়ের নৈপুণ্য এবং মাথার বুদ্ধি দরকার ফুটবল খেলায়। তার চেয়েও বড় দরকার 'তুম্‌ভি মিলিটারী তো হাম্‌ভি মিলিটারী' বলবার মত মনের জোর। ফুটবল মাঠে নেমে যে খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের সংঘর্ষ বাঁচিয়ে খেলতে চায়, আমরা তাকে উপহাস করি। বলি, 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বধূরে' ভাব নিয়ে ফুটবল খেলা চলে না। চিরাচরিত ও গণ্ডীবদ্ধতার বাঁধ ভেংগে ঘরকুনো বাঙালী মেয়ের পক্ষে এ হেন ফুটবল খেলায় বেশ কিছুটা পটু হতে হলে কতখানি ডানপিটে হতে হয় তা সহজেই অনুমেয়।

শুধু কি ফুটবল? ক্রিকেট এবং হকি খেলাতেও বেশ খানিকটা দখল রয়েছে পূর্ণিমার। হকির অবশ্য ভূমিকা কম। কিন্তু ক্রিকেটে অনেক বড় রানের অধিকারিণী পূর্ণিমা। টেনিস বল আর তক্তা ব্যাট দিয়ে প্রথম শুরু। পরে 'লাল আপেলে'র আকর্ষণে সত্যিকারের ক্রিকেটে আসক্তি। হাতে বোলিং অবশ্য ভাল খোলেনি, কিন্তু ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং-এ পুরুষের কাছে কোনদিন পিছু হটেনি পূর্ণিমা। শীতের দিনের মিঠে রোদে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা একদল ছেলে মাঠে ক্রিকেট খেলছে, তার মধ্যে চুড়িপরা দুখানি হাতে 'উইলো' নাচছে, উইলোর তাড়নায় 'লাল আপেল' মাঠের

ফুটবলে শট করছেন পূর্ণিমা ঘোষ

বাউণ্ডারী পেরিয়ে যাচ্ছে আর লজ্জায় ছেলেদের মুখ লাল হয়ে উঠছে—কতদিন এ দৃশ্য দেখে শান্তিনিকেতনের ক্রিকেট রসিক মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে গেছে আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পুরুষ নারীর মিলিত ক্রিকেটের স্মৃতি মনে এনে পুলকিত হয়ে উঠেছে। এখন অবশ্য ক্রিকেট খেলাও একরকম ছেড়ে দিয়েছে পূর্ণিমা ঘোষ। বাস্কেট বলেই এখন আকর্ষণ বেশী। অ্যাথলেটিকসে বিশ্বভারতীর চ্যাম্পিয়ন মেয়ে, সাঁতারেও শখ আছে।

অন্যান্য খেলাধুলোতেও পূর্ণিমার কিছু কিছু দখল আছে। টেবল টেনিসে বেশ হাত চলে। টেনিসেও একেবারে অচল নয়। স্কুল ও কলেজের ব্যাডমিণ্টনে একাধিক-বারের সিংগলস ও ডাবলসের বিজয়িনী। বাস্কেট বলে বিশ্বভারতী টিমের অধিনায়িকা। ১৯৬১ সালের বিশ্বভারতীর যে টিম শ্রীরামপুরে বাস্কেট বল খেলতে এসেছিল, পূর্ণিমাই ছিল সে দলের অধিনায়িকা। অনেক খেলায় বড় স্কোরারের পাশেও ওর নাম লেখা আছে।

মাত্র ৯ বছর বয়সে অ্যাথলেটিকস স্পোর্টসের মাধ্যমেই পূর্ণিমার ক্রীড়াজীবনের শুরু হয়েছিল। অন্য খেলাধুলো করলেও অ্যাথলেটিকসের সঙ্গে কিন্তু কোনদিন বিচ্ছেদ ঘটেনি। কারণ শরীরকে পটু রাখতে হলে অ্যাথলেটিকস যে খেলাধুলোর অবিচ্ছেদ্য অংগ। আজ অ্যাথলেটিকসে শান্তি-নিকেতনের মেয়েদের মধ্যে পূর্ণিমা সত্যিই অনন্যা। এবং দিনে দিনে ক্রমোন্নতিরই পরিচয় মিলছে।

১৯৬০ সালে বিশ্বভারতীর সিনিয়র গ্রুপে প্রোমোশন এবং ঐ বছরই ১০০ মিটার দৌড় ও লোহার বল ছোঁড়ায় প্রথম আর ডিসকাস ছোঁড়ায় দ্বিতীয় হয়ে পয়েণ্টের হিসাবে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন।

১৯৬১ সালেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তবে দৌড় ও ডিসকাসে দ্বিতীয়, লোহার বল ছোঁড়ায় প্রথম। তবু চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার।

১৯৬২ সালের লোহার বল, ডিসকাস এবং বর্শা মেয়েদের নিক্ষেপের তিনটি বিষয়ে প্রথম, লং জাম্পেও ওর শ্রেষ্ঠত্ব, শুধু দুশো মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়। চ্যাম্পিয়নশিপ আর পাবে কে? এইভাবে পর পর তিন বছরই বিশ্বভারতীর সিনিয়র স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার এসেছে পূর্ণিমার হাতে। প্রথমবারের সভানেত্রী শ্রীনন্দিনী কৃপালনী আদর করে ওর হাতে প্রাইজ তুলে দিয়েছেন। দ্বিতীয়বারের সভাপতি শ্রীকালি-দাস ভট্টাচার্য পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন, তৃতীয়-বার শাবাশ জানিয়েছেন। বিশ্বভারতীর ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

১৯৬১ সাল পূর্ণিমার জীবনে আরও একটি কারণে স্মরণীয়। ভারত সরকার আয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রোফিসিয়েন্সী

পূর্ণিমা ঘোষ

টেস্ট অর্থাৎ শারীরিক পটুত্বের পরীক্ষায় এই বছর পূর্ণিমার হাতে আসে 'থ্রি স্টারসের' সার্টিফিকেট। শ্রীনিকেতনের সাঁতার প্রতি-যোগিতাতেও প্রথম পুরস্কার মিলেছিল।

একটি কথা এখানে বলা দরকার। খেলা-ধুলোর মান অনুযায়ী বিচার করলে পূর্ণিমা হয়তো বাঙলার খেলাধুলোর পুরোবর্তিনী-দের সমপর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু যে মেয়ের সব খেলাধুলোতেই কিছু কিছু দখল আছে, গতানুগতিকতার বাঁধ ভেঙে যে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট খেলতে পারে, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে বইকি।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলো সম্পর্কে বাবা ও ভাইদের আগ্রহ ওকে খেলাধুলোর দিকে আরও বেশী করে ঠেলে দিয়েছিল। বাবা রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ছিলেন কৈলাসহরের অধিবাসী। পূর্ণিমা যখন এক বছরের তখন শান্তিনিকেতনের চাকরি নিয়ে চলে আসেন। যৌবনে খেলা-ধুলোর পটু ছিলেন। ফুটবল খেলেছেন ঢাকার উয়াড়ী ক্লাবে। শান্তিনিকেতনে এসেও খেলার চর্চা ছাড়েননি। একদিন ওঁর সুন্দর খেলা দেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ভারি খুশী হয়ে একখানা সার্টিফিকেটও লিখে দিয়েছিলেন। পূর্ণিমার বড় ভাই সত্য-নারায়ণ ঘোষও শান্তিনিকেতনের ভাল ফুটবল খেলোয়াড়। এই ভাইদের কাছ থেকেই পূর্ণিমার ফুটবল খেলা শেখা। আর পূর্ণিমার ক্রীড়াজীবনের সাফল্যের মূলে আছেন বিশ্বভারতীর ক্রীড়াধ্যক্ষ শ্রীসুবোধ-নারায়ণ চৌধুরী।

খেলাধুলোর মতই ওদের পরিবারের নাচগানের দিকে ঝোঁক। পূর্ণিমার ভাই ও বোনেদের এ বিষয়ে সুনাম শান্তিনিকেতনে সর্বজনবিদিত। নাচগানে পূর্ণিমারও কিছু কিছু দখল আছে, তবে বোনেদের মত নয়। বাড়ির আর সবাই যখন পায়ে ঘুংগুর পরে নাচের তালিম দিয়েছে, পূর্ণিমা তখন পায়ে অ্যাংকলেট পরে মাঠে ছুটে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মোটের উপর খেলাধুলোর প্রবল আসক্তিই পূর্ণিমার ক্রীড়াজীবনের সাফল্যের সোপান।

দেশী সংবাদ

৫ই নবেম্বর—ভারতের উত্তর সীমানার সহিত সংলগ্ন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরে অবিলম্বে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হইবে। বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতাও এই ব্যবস্থার অন্যতম। নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর এক ঘরোয়া বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

ভারতীয় বাহিনী পরিকল্পিতভাবে লাদকের দৌলতবেগ অলডি ঘাটি ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এই দৌলতবেগ অলডি ঘাটি কারাকোরাম গিরি-বর্ত্মের নিকটে এবং চীনারা ইহার পূর্বে সরকারীভাবে স্বীকার করিয়াছে যে, স্থানটি ভারতীয় অঞ্চল।

৬ই নবেম্বর—চুশুল হইতে কয়েক মাইল দূরে নূতন চীনা সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষিত হইয়াছে। লাদকের চুশুলে পৃথিবীর উচ্চতম বিমানঘাটি অবস্থিত। চীনারা ভারতের এই বিমানঘাটির উপর আক্রমণ চালাইবার তোড়জোড় করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

গতকল্য কলিকাতায় সোনার দর তোলা প্রতি প্রায় কুড়ি টাকা কমিয়া যায়। স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি সোনার দর স্থির না হওয়া পর্যন্ত নগদ টাকায় সোনার গহনা বিক্রি বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আজ কংগ্রেস সংসদ দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধিকাংশ সদস্য দাবি করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মেননকে অবশ্যই মন্ত্রিসভা হইতে সরাইতে হইবে।

৭ই নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী আজ অপরাহ্নে কংগ্রেস সংসদ দলের জরুরী সভায় এই ঘোষণা করেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীকৃষ্ণ মেননের পদত্যাগপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঘোষণা শুনিয়া সদস্যরা উল্লাস প্রকাশ করেন।

নেফার ওয়ালং-এর নিকটে চীনারা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। এই অঞ্চলে ভারতীয় ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে গোলা বিনিময় হয়। ভারতীয় জওয়ানদের কেহ হতাহত হয় নাই। ওয়ালং-এর নিকটে এই প্রথম কামানের গোলাবর্ষণের সংবাদ জানা গেল।

৮ই নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, যা আসে আসুক, যা ঘটে ঘটুক—চীনের নগ্ন বর্বর ব্যাপক আক্রমণের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে সদস্যগণ বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান।

শীতে জবর লড়াইয়ের জন্য চীনা সৈন্য নাকি নেফা সীমান্তে প্রস্তুত। খবর আসিয়াছে চেকোস্লোভাকিয়া হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র অধিকৃত ভারতভূমিতে পৌঁছিতেছে। আর আসিয়াছে সাইবেরিয়ার কড়া ঠাণ্ডায় লড়াই করিতে সমর্থ মাঞ্চুরীয় বাহিনী।

৯ই নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় [illegible] সংকট সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করিয়া বলেন যে, চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতির অভাব সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে। তবে তিনি ইহাও বলেন যে, পরে এক সময়ে এই তদন্ত করা যাইতে পারে।

আজ সকালে পুণা হইতে ৫ মাইল দূরস্থ হিঙ্গে 'ভারতরত্ন ডঃ দোন্দু' কেশব কার্ভে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঋষিতুল্য এই দীর্ঘায়ু মনস্বীর বয়স হইয়াছিল ১০৪ বৎসর।

১০ই নবেম্বর—অদ্য লোকসভায় পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এই মর্মে এক ঘোষণা করেন যে, বর্তমান জরুরী অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থায়ী করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহের জন্য দেশব্যাপী ক্রেতা সাধারণের জন্য বিপণি প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

নেফার লোহিত বিভাগে ওয়ালং-এর নিকটে ভারতীয় জওয়ানদের একটি রণোন্মত্ত চীনা সৈন্যদল বারবার আঘাত করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে। বীরদর্পে ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। লাদকের পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

১১ই নবেম্বর—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন শীঘ্রই প্রতিরক্ষা মন্ত্রিরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবেন। কংগ্রেসের অন্য একটি মহলে এই দপ্তরের ভার সম্পর্কে প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগীরও নাম শুনা যাইতেছে।

আজ সকালে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মাঝি ও বাকুলাহা স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত একটি সেতুর উপর এক দুর্ঘটনার ফলে ট্রেনের ছাদে অবস্থিত ২৫ জন যাত্রী নিহত হয় ও আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৫ই নবেম্বর—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সম্পর্ক-মন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টো করাচীতে এক জনসভায় বলেন, চীনের সহিত ভারতের সংঘর্ষে পাকিস্তান ভারতকে সমর্থন করিবে না। এমন কি ভারত কাশ্মীর ছাড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান কোন কিছু আলোচনা করিতেও নারাজ।

বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীএন্টন যুগভ পদচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহাকে বুলগেরিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হইতেও বিতাড়িত করা হইয়াছে। আজ সোফিয়াতে সরকারীভাবে এই সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

৬ই নবেম্বর—বোম্বাই-এর একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে লণ্ডন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগ জানিতে পারিয়াছেন : ভারতের বিরুদ্ধে [illegible] জন্য প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র চেকোস্লোভাকিয়া হইতে চীনে যাইতেছে। সমরাস্ত্র লইয়া চৌদ্দটি ট্রেন চেকোস্লোভাকিয়া হইতে রাশিয়া হইয়া চীনের দিকে যাইতেছে।

সৌদি আরব সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে বলিয়া আজ মক্কা রেডিয়ো হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

৭ই নবেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নির্বাচনে আজ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ডেমোক্র্যাটিক পার্টিই জয়ী হইল। ফলে কংগ্রেসের সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ দুইটিই তাঁহার (কেনেডির) নিয়ন্ত্রাধীন রহিল।

আজ নিউ চায়না নিউজ এজেন্সির এক সংবাদে প্রকাশ, চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে পুনরায় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন-লাই শ্রীনেহরুকে এক নূতন অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

৮ই নবেম্বর—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্তান তাহার এলাকার ভিতর দিয়া ভারতের জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতে দিবে না।

তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী শ্রীফেরিদুন [illegible] আঙ্কারায় বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের আপত্তির জন্য ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। [illegible] অন্যতম সহযোগী পাকিস্তান তুরস্কের সদস্য।

৯ই নবেম্বর—মার্কিন প্রতিরক্ষা [illegible] ঘোষণা করা হয় যে, আজ মার্কিন [illegible] জাহাজগুলি পরিদর্শন তিনখানি সোভিয়েট জাহাজ আটক করিয়া উহা পরিদর্শন করে। [illegible] সোভিয়েট জাহাজগুলি কিউবা হইতে [illegible] পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র লইয়া যাইতেছিল।

ভারতকে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের [illegible] প্রতিবাদ জানাইবার জন্য পাকিস্তানী [illegible] সভার সদস্যদের এক প্রতিনিধিদল [illegible] মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রকাশ, মার্কিন [illegible] প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] চালাইতে [illegible] [illegible] ব্যবহৃত হইবে না। [illegible] নীতি আরও বলেন যে, [illegible] রাষ্ট্রসংঘকে অস্বীকার করিয়া [illegible] তাহা সহিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

১০ই নবেম্বর—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম [illegible] সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। সরকারী নিউজ এজেন্সি ভিয়েৎনাম প্রেস [illegible] ভিয়েৎনামের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক [illegible] উদ্ধৃত করিয়া ঐ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে।

মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু রহমান আজ ঘোষণা করেন যে, 'ভারতকে তাহার প্রয়োজনের সময় সাহায্য করার জন্য একটি 'গণতন্ত্র রক্ষা তহবিল' খোলা হইয়াছে। তিনি নিজেই তাহার চেয়ারম্যান।

১১ই নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জ আজ অভিযোগ করেন যে, অনুমান ১০টি কাতাঙ্গী বিমান উত্তর কাতাঙ্গায় পাঁচবারে প্রায় ৭০টি বোমা ফেলিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৪০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

এখন থেকে উইল্‌স* এর ২০ টির প্যাকেট পাবেন

THEY'RE GOOD...
THEY'RE WILLS

WILLS

NAVY CUT
MEDIUM CIGARETTES
MADE IN INDIA

দাম: ১৲ টাকা

উইল্‌স মানেই ভালো সিগারেট

* প্রতিটি উইল্‌স [illegible]
প্যাকেটে একটি [illegible] চিহ্ন থাকে।
এই চিহ্ন [illegible]
উইল্‌স-এর উৎকর্ষের গ্যারান্টি।

JWTW

প্রদীপ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গান শোনবার নিমন্ত্রণ	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫৩
বিশ্ববীবিচিত্রা		৩৫৯
আলোচনা		৩৬২
চিত্রপ্রদর্শনী		৩৬৩
প্রবাসে		৩৬৪
সাহিত্য সংবাদ	বিদুর	৩৬৫
পুস্তক পরিচয়		৩৬৭
রঙ্গজগৎ		৩৭১
খেলার মাঠে	একলব্য	৩৭৯
খেলাধুলোর মহিলা	মুকুল	৩৮২
সাপ্তাহিক সংবাদ		৩৮৪

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 24th November 1962

৩০ বর্ষ ॥ ৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

সংকটের পুরস্কার

আমাদের দুই মহাকবি তাঁদের মহাকাব্যে একটি করে বন-পর্ব রেখেছেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে বনগমন করেছিলেন, পাণ্ডুপুত্রেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। রাজার দুলাল রাজবাড়ির সুখ-পালঙ্কে নিদ্রা যাক—বোধ হয় এমন ইচ্ছা কবিদ্বয়ের ছিল না। সুখের ও ভোগের জড়তা থেকে রাজপুত্রদের ক্লেশ, কৃচ্ছ্রতা, বিপদ ও দুর্যোগের জগতে নির্বাসিত করতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ব্যথা জাগে নি। কেননা, সঙ্কট ও দুঃখেই আমাদের মনুষ্যচরিত্র গঠিত হয়, তার সর্ব-দুর্বলতার শোধন ঘটে। 'যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার, আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার।' বস্তুত, চরিত্রের শুদ্ধি আঘাত ও বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে যেখানে চেতনা অবিরল থাকার সুযোগ পায় না। আর সে আঘাত ত পুরস্কারেরই নামান্তর।

সেদিন চীনা আক্রমণ প্রসঙ্গে নেহরুজী একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন : চীনের এই আকস্মিক আঘাত সহসা ভারতের মুখ থেকে এক যবনিকা সরিয়ে ফেলেছে দেখতে পাচ্ছি এই দেশের তারুণ্য দুর্বার, এই জাতি প্রাণচঞ্চল। গত কয়েক দিনের মধ্যে দেখতে পেলাম ভারতের আত্মসমাহিত দৃঢ় মূর্তি। নেহরুজী যে-মূর্তি দেখতে পেয়েছেন ভারতের সে-মূর্তি আজ সর্বজনের চক্ষেই স্পষ্ট।

আমরা হিংসাপন্থী নই। যুদ্ধ বিষয়ে আমাদের অনাগ্রহ এত প্রবল যে, সামরিক শক্তিকে এ-দেশে গত পনেরো বছরে প্রয়োজনানুযায়ীও গঠিত করা হয়নি। যেহেতু আমরা যুদ্ধবাজ নই, যুদ্ধের নীতিতে অবিশ্বাসী। তবু, আজ যখন অন্যের প্ররোচনায় অস্ত্র ধরতে হল, তখন এ-কথা মনে না করে পারছি না, এই সঙ্কট এক অর্থে আমাদের কাছে আশীর্বাদের তুল্য।

দীর্ঘকাল আমরা নিদ্রিত ছিলাম। গত বিশ্বযুদ্ধ আমাদের জাতীয় সংগ্রাম হয়ে দেখা দেয় নি, বৃটিশ রাজনীতি তখন বিশ্বাস করে নি, সভ্যতার মহাশত্রু ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আমরা অন্যদের মতনও যুঝতে পারি। তারপর স্বাধীনতা প্রাপ্তি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ-যাবৎ সমস্ত জাতি এক ধরনের জড়তার মধ্যে বাস করছিল। গত মহাযুদ্ধের ঔরসজাত কিছু চোরা-সন্তানরা সমাজের সর্বস্তরে

....

বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় হুগলী নদীর দুই পাশে জেঁকে উঠেছিল চটকলের সারি। প্রাচীর ঘেরা এই চটকলগুলির আড়ালে যে রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত এতকাল চাপা পড়েছিল তা তুলে ধরেছেন শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ এই কাহিনী

"অসমাপ্ত চটাব্দ"

আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

....

দুর্নীতির বংশবৃদ্ধি করছিল, কিছু মানুষ আপন স্বার্থে দেশের নানা মহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আমাদের সঙ্কীর্ণ-চিত্ত করে তুলছিল, আর সমগ্র দেশ নৈমিত্তিক জীবন ধারণের কর্মগুলি সম্পন্ন করে নিশ্চেষ্ট বসেছিল। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, কিন্তু তার স্বাদ পাইনি। জড়তার মধ্যে জাতি যেন নির্জীব হয়ে বসেছিল। দায়িত্বহীন, সংকীর্ণচিত্ত, কর্তব্য-পরাঙ্মুখ, লোভী, নীতিহীন আমরা প্রকৃতপক্ষে এইসব কলুষে কলুষিত হয়ে জীবন তরী ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

যে জাতি সভ্যতার শরিক হতে চায়, তার পক্ষে এত জড়তা কেন? অচেতন সে যার ইন্দ্রিয়সমূহ অব্যবহার্য, যার বোধ মোহাচ্ছন্ন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিরাট কর্মের সম্মুখীন করে বলেছিলেন : হে অর্জুন, কর্মে ক্লীবতা আশ্রয় করো না, মোহ দূর করো। ...

আমাদের জাতীয় জীবনেও সেই র
এসেছিল। আমরা কখনও ত
করিনি—স্বদেশের সঙ্গে হৃদয়ের
যোগ ভোট দিয়ে রক্ষা করা যায় না
জন্য ব্যক্তিগত একটি চেতনা দর
সে-চেতনা নীতিগত—তার মধ্যে ত
গুলি দায়িত্ব যুক্ত রয়েছে।

চীনের আকস্মিক আক্রমণ আ
সে-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন
পেরেছে। শত্রু আজ প্রকারান্তরে
মতন আমাদের এ বোধ জাগ্রত করে
দেশের কাছে আমাদের কতক দায়
ভারতবাসী হিসেবে ভারতের
দুঃখে আমার সুখ, আমার দুঃখ।

বলা বাহুল্য, আজ যখন সমস্ত ভ
ভূমি একই সঙ্গে গর্জন করে
স্বাধীনতার জন্য মরণ পণ করেছি—
মনে হয় আমরা কেউ আর বিচ্ছিন্ন
প্রাদেশিকতার অথবা ভাষার সঙ্কী
আমরা অন্ধ হয়ে নেই। যখন রক্ত
কেন্দ্রে শত শত অখ্যাত অজ্ঞাত
দরিদ্র মানুষ স্বেচ্ছায় গিয়ে দাঁ
থাকে রক্তদান করতে, তখন এ
কখনো মনে আসে না, বাঙলার রক্তে
প্রদেশের সৈনিক জীবন ফিরে প
এই যে প্রতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ
যে সীমান্ত সৈনিকের জন্য রক্তদান
দ্বারা একটি মহৎ সত্য প্রমাণিত
আমাদের ঘুম ভাঙছে।

নিঃসংশয়ে বলি, সমাজের
সামাজিক মানুষ হিসাবে আম
কতকগুলি অলিখিত অঙ্গীকার অ
সেই অঙ্গীকারের শর্তগুলি সর্ব
বিদিত, একাত্মবোধ দায়িত্ব-চে
সহানুভূতি বিবেচনা মানবিক
যদি কোনো সমাজবাসী জীব এই
সমাজবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে
জীবন মানুষের জীবন নয়, স্বাথ
পশুর। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানে এদে
অধিকাংশ মানুষের চর্মচক্ষে এ
করেই জড়তা ও মোহনিদ্রা নেমেছি
সৌভাগ্য যে, আজ সে নিদ্রা থেকে অ
জেগে উঠেছি।

এই যে সঙ্কট, যার চেহারা যু
অনুরূপ—তার দিকে তাকিয়ে অ
শুধু বলতে পারি, শত্রুর বজ্র আমা
প্রতি নিক্ষিপ্ত হলেও মানবতার দায়ে
আজ আমরা কলুষমুক্ত হয়ে জেগে ও
সুযোগ পেয়েছি। ভারত ভাগ্যবিধা
বোধ করি এই ইচ্ছাই ছিল। আম
এখন একমাত্র প্রার্থনা :

'কর মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠো
বেদনায়।'

শ্রীচ্যবন
আমাদের নূতন
প্রতিরক্ষামন্ত্রী
নিযুক্ত হয়েছেন।
এই নূতন দায়িত্ব
তিনি যোগ্যতার
সঙ্গেই পালন
করবেন।

"ভিতু কাঁহাকা"

"শ্রীগোপাল রেড্ডী আবেদন জানিয়েছেন পত্রপত্রিকায় যেন চ্ছ স্থান দান করা হয়। আমি তাঁকে এই জায়গাটুকু ড়ে দিলাম।

এই নিন মিস্টার রেড্ডী।"

—কুট্টি।

Kutty

* বৈদেশিকী *

পশ্চিমা এবং কম্যুনিস্ট এই উভয় ব্লক থেকে স্বতন্ত্র থাকার "নন-এলাইনমেণ্ট"-এর নীতি বলতে কী বুঝায়, এই নীতির নামে এতদিন ভারত সরকার যেভাবে চলেছেন তার ফলাফল কী হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নীতি বজায় রাখা উচিত বা সম্ভব কিনা এবং বজায় রাখতে হলে কীভাবে চলতে হবে এই সব বিষয় নিয়ে লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে। তর্ক-বিতর্ক চলছে। পার্লামেণ্টে "নন-এলাইনমেণ্ট" নীতির সমর্থন ঘোষিত হলেও তর্ক-বিতর্ক চলবে। তার কারণ শুধু এ নয় যে, অনেকে ভাবছেন যে এ-নীতি অকেজো হয়ে গেছে, তার চেয়েও বড়ো কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে বুঝাই কঠিন হবে এই "নন-এলাইনমেণ্ট"-এর ব্যাপারটি কী। চীনারা কম্যুনিস্ট ব্লকের অন্তর্গত বৃহত্তর জাতি, তাদের সঙ্গে ভারতের লড়াই বেধেছে। তাতে সহানুভূতি এবং সাহায্যের আশ্বাস এখন পর্যন্ত যে সব রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া গেছে সেগুলি সবই পশ্চিমা ব্লকের অন্তর্গত। এই অবস্থায় চীনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং ভাবতে হবে যে পশ্চিমা এবং কম্যুনিস্ট ব্লক উভয়ের নিকট থেকে আমরা সমান দূরে আছি—এই ভাবটা সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে নিশ্চয়ই সহজবোধ্য হবে না।

কিন্তু "নন-এলাইনমেণ্ট"-এর নামে আমাদের সরকারী কর্তারা যদি এতদিন নানারকম উচ্চশ্রেণীর শূন্যগর্ভ বাক্যবিস্তার না করতেন তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপারটা এতো দুর্বোধ্য হতো না। "নন-এলাইনমেণ্টের মুখ্য মানে যদি হয় কোনো ব্লকের সঙ্গে সামরিক প্যাক্টে আবদ্ধ না হওয়া তবে সে-নীতি এখনো সম্পূর্ণ অচল না হতেও পারে। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতির কাছ থেকে ভারত সরকার যে-রকমের সামরিক সাহায্য চাচ্ছেন এবং পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন তার জন্য তাদের সঙ্গে সামরিক প্যাক্ট করার কথা তারা কেউ তোলেনি। সামরিক সাহায্য ভারত পাচ্ছে কিন্তু তার জন্য সাহায্যদাতাদের সঙ্গে সামরিক "আলায়েন্স" সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। অন্যরকমের এবং বৃহত্তর সাহায্য যদি আবশ্যক হয় তবে "আলায়েন্স" না করে তা পাওয়া যাবে কিনা সেটা অবশ্য পরের প্রশ্ন। তবে আপাতত "নন-এলাইনমেণ্ট" বজায় রেখেও আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিমা শক্তির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। "নন-এলাইনমেণ্ট" যতদিন পর্যন্ত বজায় রাখা যায় অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমা ব্লকের কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক আলায়েন্সে আবদ্ধ হতে না হয় ততদিন পর্যন্ত চীনের সঙ্গে যুদ্ধ, কেবল চীনের সঙ্গেই যুদ্ধ বলে ধরা যায়, গোটা কম্যুনিস্ট ব্লকের সঙ্গে শত্রুতা ঘোষণার প্রশ্ন উঠে না। কম্যুনিস্ট চীনের বর্তমান নীতি কম্যুনিস্ট ব্লকের অন্য সব দেশে মনঃপূত হয়ত নয়। খোলাখুলিভাবে চীনের দুষ্কার্যের নিন্দা করতে না চাইলেও কোনো কোনো কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হয়ত চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে বা চীনকে সাহায্য করতে তেমন আগ্রহশীল নয়। এই সব রাষ্ট্র যদি অনেকটা নিরপেক্ষতার ভাবও নেয় তাহলে সেটাও ভারতের পক্ষে লাভ। যুদ্ধ করার সময়ে দেখতে হবে শত্রুর বলবৃদ্ধি কিসে যাতে না হতে পারে।

অবশ্য এটাও একটা স্থায়ী অবস্থা নয়। কম্যুনিস্ট ব্লকের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির কর্তারা হয়ত ভাবছেন যে, চীনের সঙ্গে পুরোপুরি লড়াই করবার সাহস ভারতের হবে না, ভারত শীঘ্রই চীনের সঙ্গে একটা মিটমাট করতে রাজী হবে। কিন্তু ভারত যদি ভয় না পায় এবং চীনের কাছে হার মানতে রাজী না হয় তাহলে কম্যুনিস্ট ব্লকের অভ্যন্তরে চাপের সৃষ্টি হবে এবং অন্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে চীনের সাহায্যে অগ্রসর হবে কি না এখন থেকে আন্দাজ করা কঠিন। আমেরিকা প্রভৃতি পশ্চিমা রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভারত সাহায্য পাচ্ছে দেখে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি কতদিন খোলাখুলিভাবে চীনাদের পাশে এসে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তাও বলা যায় না। এমন হতে পারে যে, একদিকে পশ্চিমাদের কাছ থেকে ভারত সাহায্য পেতে থাকবে এবং অন্যদিকে চীন অন্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সাহায্য পেতে থাকবে, তাহলে অবশ্য "নন-এলাইনমেণ্ট" একটা অন্তঃসারশূন্য বাক্যে পরিণত হবে। যাই হোক চীনাদের পক্ষে সমস্ত কম্যুনিস্ট ব্লকের সমর্থন পাওয়ার পথে ভারতের "নন-এলাইনমেণ্ট" নীতির, কোনো ব্লকের সঙ্গে সামরিক আলায়েন্স না করার নীতির কিছু কার্যকারিতা আছে।

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি আশঙ্কার কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। "নন-এলাইনমেণ্ট" নীতি ভারত এখনো ছাড়ে নি কিন্তু চীনাদের আক্রমণ রোধের জন্য "নন-এলাইনমেণ্ট" নীতি যদি ছাড়া আবশ্যক হয় তবে তা [illegible] ভারত প্রস্তুত আছে এটা যেন স্থির করা হয়, এবং সে কথা চীনা তথা অন্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রদের জানিয়ে দেওয়াও আবশ্যক। নন-এলাইনমেণ্ট কোনো একটা চিরন্তন লক্ষ্য নয়, সেটা একটা সাময়িক উপায় মাত্র। চীনাদের কাছে হার মানব, ভারতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হলো তাও স্বীকার তবু "নন-এলাইনমেণ্ট" নীতি ছাড়ব না—এই রকম ধারণা যেন জন্মাতে দেওয়া না হয়, এইরকম দুর্বুদ্ধির প্রশ্রয় যেন দেওয়া না হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ সতর্ক বাণী উচ্চারণের প্রয়োজন হতো না, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতে সে প্রয়োজন আছে। কিছু সংখ্যক চীনাদরদী ভারতে আছে বলেই যে কেবল এই সতর্কতার প্রয়োজন তা নয়। আমাদের কর্তারা "নন-এলাইনমেণ্ট"কে একটা প্র্যাকটিক্যাল পলিসি হিসাবে প্রচার না করে এটাকে একটা মহৎ আদর্শ, একটা অতি উচ্চ নৈতিক লক্ষ্য বলে এতো বছর ধরে প্রচার করে এসেছেন। তার ফলে সাধারণ মানুষ, এমন কি কর্তাদের নিজেদের মনেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। "নন-এলাইনমেণ্ট"-এর একটা মহৎ দিক ছিল না বা থাকতে পারত না তা নয়। কোনো ব্লকের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রশ্নের নিরপেক্ষ বিচার করার সুযোগ থাকে এবং স্বাধীনভাবে মতামত দেওয়া যায়—এইটাই ছিল "নন-এলাইনমেণ্ট"-এর নৈতিক মহত্ত্বের দিক। কিন্তু সেই সুযোগ ও স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কি আমরা করেছি বা তা করতে হলে যে শক্তি থাকা আবশ্যক তা সংগ্রহ করার চেষ্টা আমরা করেছি? নিরপেক্ষভাবে কেবল সত্য ও ন্যায়ের সমর্থন ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা কি সব সময়ে করেছেন? কম্যুনিস্ট চীনের কথাই ধরা যাক। চীনাদের আজ আমরা বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ বলে গাল দিচ্ছি। কিন্তু যার জন্য চীনাদের কৃতজ্ঞতা আমরা দাবি করতে যাচ্ছি সেটা কী? চীনারা তিব্বতের স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং ভারত সরকার তার উপর "পঞ্চশীলের" মার্কা লাগিয়ে স্বীকৃতি দান করেছেন। তিব্বতের স্বাধীনতার মৃতদেহের উপর "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" নৃত্য হয়েছে। এই তো "নন-এলাইনমেণ্ট"-এর মহত্ত্বের বহর।

"নন-এলাইনমেণ্ট" নীতিকে প্রকৃত মহৎ রূপ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে গোড়া থেকেই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে অন্যধারায় চালাবার চেষ্টা করতে হতো। উভয় ব্লকের কাছে সব সময়ে হাত পেতেই যারা আছে তাদের পক্ষে সত্যকার নৈতিক প্রভাবের অধিকারী হওয়া কেমন করে সম্ভব হবে? এখন সেসব পুরনো কথা তুলে এখন বিশেষ লাভ নেই। তবে এখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা মনে পড়ছে। ভারতবর্ষের মস্তিষ্ক থেকে বেদান্তের মহান আদর্শ বেরিয়েছে। কিন্তু কাজে কী দেখা যায়? আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সমাজের বাস্তব রূপের মধ্যে কী আকাশ পাতাল পার্থক্য! স্বামীজীর মনে তাই প্রশ্ন উঠেছিল, একটা বড়ো আইডিয়া প্রচার করলেই কি ভারতের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল? তার রূপদান কি অন্য জাতি করবে?

• • •

গত কয়েক সপ্তাহের "বৈদেশিকী"তে

কেবলমাত্র ভারত-চীন সংঘর্ষ এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। এমনকি কিউবাতে সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটি নিয়ে যে-সব ব্যাপার ঘটেছে এবং ঘটছে সেগুলির পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। কারো কারো কাছে এটা মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। অথবা কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, চোখে একটা বালুকণা পড়লে মানুষ যেমন জগৎসংসার ভুলে গিয়ে কেবল নিজের চোখ রগড়াতে থাকে আমাদেরও সেই দশা হয়েছে।

আসলে কিন্তু কিউবা নিয়ে যতটা ত্রাস-সৃষ্টি হয়েছিল "সংকটটা" তত ভয়ানক বলে আমাদের মনে হয়নি। সোভিয়েট-মার্কিন যুদ্ধ প্রায় লাগে-লাগে। তার মানেই নিউক্লিয়ার যুদ্ধ এবং জগৎ ধ্বংসের আশংকা—আমাদের ঠিক এরূপ কখনো মনে হয়নি। "সংকটের" ধ্বনিটা সকলের চেয়ে ইংরেজরাই একটু বেশি উচ্চগ্রামে তুলেছিলেন। ভয়ের কোনোই কারণ ছিল না তা নয় তবে ইংরেজরা যে-রকম গেল-গেল রব তুলেছিলেন ততটা নয়। ইংরেজদের ভয়ের সঙ্গে অন্য একটা ভাবেরও বেশ একটু মিশাল ছিল: ইংরেজ সমালোচকদের কথার মধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডির কিউবার নৌ-অবরোধের আদেশটাকে শ্রীইডেনের সুয়েজ-আক্রমণের প্রায় সামিল করে দেখার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সুয়েজের ব্যাপারে শ্রীইডেন ও বৃটেনের ভাগ্যে যে পরাজয় ও অপমান জুটেছিল এ ক্ষেত্রে শ্রীকেনেডি ও মার্কিন গবর্নমেন্টকেও তার কিছুটা আস্বাদ যদি পেতে হতো, তাহলে বৃটেনে অনেকে মনে মনে খুশী হতেন। মিশরের ব্যাপারে ইংরেজের মধ্যে যারা ইডেন নীতির বিরোধী ছিল তারাও অনেকে কিন্তু সেই সময়ে আমেরিকার ব্যবহারে খুশী হয় নি।

এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং মার্কিন গবর্নমেন্ট একটু অপদস্থ হলে অনেক ইংরেজই মনে মনে একটু খুশী হতেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি পৃথিবীকে প্রায় খাদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন, শ্রীক্রুশ্চফের ধৈর্য বাঁচিয়ে দিয়েছে—এই ধরনের উক্তি যে-সব ইংরেজ করেন তাঁরা যে সোভিয়েট ভক্ত তা নয় তবে শ্রীকেনেডি ও আমেরিকাকে যে তাঁরা ভালোবাসেন না সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কারণ কিউবা সম্পর্কে শ্রীকেনেডি ও শ্রীক্রুশ্চফের আচরণের পক্ষে বা বিপক্ষে আর যাই বলা যাক না কেন এ পর্যন্ত দেখা গেছে তাতে অন্তত ধৈর্যগুণে সোভিয়েট নেতার শ্রেষ্ঠত্বের কোনো প্রমাণ নেই।

মিঃ কেনেডি

কিউবার নৌ-অবরোধের ব্যবস্থা করে শ্রীকেনেডি সোভিয়েট গবর্নমেন্টকে কিউবা থেকে নিউক্লিয়ার এবং ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটি তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। অন্য পক্ষে শ্রীকেনেডিও সোভিয়েট গবর্নমেন্টকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমেরিকা কিউবাকে আক্রমণ করবে না; তা ছাড়া, হয়ত সোভিয়েট গবর্নমেন্ট আশা করেন যে, সোভিয়েট রাজ্য ঘেঁষে বিদেশে যেসব মার্কিন নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ঘাটি স্থাপিত আছে অতঃপর সেগুলি তুলে নেওয়ার বিষয়ে আমেরিকা আপোস আলোচনায় রাজী হবে। সুতরাং দু পক্ষেরই কম-বেশি লাভ হয়ত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা শ্রীক্রুশ্চফের ধৈর্যের প্রশংসা করেন তাঁরা কি মনে করেন যে, আমেরিকা যখন কিউবার নৌ-অবরোধ ঘোষণা করেছে তখন বলপ্রয়োগের দ্বারা সেই অবরোধ লংঘন করার চেষ্টা করাই অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই সোভিয়েট গবর্নমেন্টের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল এবং সোভিয়েট গবর্নমেন্ট তা যে করেন নি সেটা শ্রীক্রুশ্চফের ধৈর্যগুণের প্রমাণ?

আসলে সোভিয়েট অথবা মার্কিন গবর্নমেন্টকেও এতটা বেহিসাবী মনে করার কোনো কারণ নেই। দুপক্ষেরই জানা আছে যে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরিণাম কী। খাদের কিনারে গিয়ে পাঁয়তাড়া কষা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক, হঠাৎ একদিন সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু অন্যেরা যতটা কিনার বলে দেখে আসলে দুই কুস্তিগীরই জানেন যে, তাঁরা ততটা কিনারে যাচ্ছেন না। ভয়ে বা ভুলে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে কিন্তু মুখরক্ষা বা প্রেস্টিজের জন্য নিউক্লিয়ার যুদ্ধ কেউ আরম্ভ করবে না।

অমুকে যা করেছে তাতে আমাদের "চ্যালেঞ্জ" করা হয়েছে, অতএব যুদ্ধ না করলে মান রক্ষা হবে না—অতীতকাল থেকে এরূপ একটা যুক্তির চলন আছে। কিন্তু একটু পরীক্ষা করে দেখলেই দেখা যায় যে যেটা চলে এসেছে সেটা যুক্তি নয়, যুক্তির নামে সেটা একটা ফাঁকি মাত্র। কেবল প্রেস্টিজের জন্য দুটি সমান বা প্রায় সমান বলশালী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ যদি হয় তবে সে অন্য স্বার্থের তাগিদে বা ঘটনাচক্রে। যদি অন্য কারণে যুদ্ধ অনিবার্য না হয় তবে কেবল প্রেস্টিজের খাতিরে দুটি সমান বলশালী রাষ্ট্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। যদিবা এক পক্ষ বে-ফাঁস কথা কিছু বলে ফেলে বা বে-ফাঁস কাজ কিছু করে ফেলে যাতে অপরের মান আহত হয় তবে তার "শান্তিপূর্ণ" সংশোধনের জন্য "ফরমুলা" বার করা কঠিন হয় না। সেটা কঠিন হয় যখন প্রবল দুর্বলের বিরুদ্ধে "প্রেস্টিজ"-হানির অভিযোগ আনে। অর্থাৎ দুর্বলকে যখন মারার দরকার হয় তখনই কেবল "প্রেস্টিজের" যুক্তি কাজে খাটানো যায়। অর্থাৎ যখন ওটা যুক্তিই নয়, ফাঁকি মাত্র।

গত অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী নিজেই ভারতের প্রচার-ব্যবস্থার অপদার্থতার কথা স্বীকার করেছিলেন। লোকসভায় ও বাইরে প্রতিরক্ষা-দপ্তর নিয়ে হৈচৈ সৃষ্টি হলেও, প্রধানমন্ত্রীর খাস-দপ্তরটি সম্পর্কে খুব বেশী বিতর্ক হয়নি। ফলে আমাদের প্রচার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আজও পর্যন্ত তেমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। পিকিং রেডিয়ো ও চীনা প্রচার-কৌশলের কল্যাণে আমাদের বক্তব্য সঠিকভাবে খুব কম স্থানেই পৌঁছাচ্ছে। প্রতিবেশী পাকিস্তানেও লোকে জানে যে, ভারতই চীন আক্রমণ করেছে এবং চীন ভারতের কোন এলাকা দখল করছে না, নিজের এলাকাই পুনরুদ্ধার করছে। লণ্ডন টাইমসে পাকিস্তান সম্পর্কে মন্তব্য থাকায় লণ্ডনস্থ পাকিস্তানী দূতাবাস এই সেদিনও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদের জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদ পাঠিয়েই আমাদের প্রতিনিধিরা দায়িত্ব শেষ করেন। বিদেশীরা চীনা আক্রমণের গুরুত্ব যে ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেনি, তার জন্য ভারত সরকারের নীতিও কম দায়ী নয়। প্রধানমন্ত্রী চীনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। চীনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ কূটনৈতিক সম্পর্ক আজও ছেদ করা হয়নি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, চীনই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে ভারতকে পৃথিবীর নিকট আক্রমণকারী হিসাবে প্রমাণের চেষ্টা করবে। কঙ্গো, গাজা ও পশ্চিম ইরিয়ান থেকে ভারতীয় জওয়ানদের আজও ফিরিয়ে আনা হয়নি। সম্প্রতি কঙ্গো থেকে ভারতীয় জওয়ানদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চীনা আক্রমণের পরেও গাজাতে একজন ভারতীয় জওয়ানকে পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধ হলেই বিশ্বযুদ্ধ হয় না। কঙ্গোতে হয়নি। কোরিয়াতেও হয়নি। এমন কি লাওসেও হয়নি। কাজেই চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য দেশবাসী যেভাবে এগিয়ে এসেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার সামান্য প্রকাশ পেলেও, আক্রান্ত ভারত ও আক্রমণকারী চীনকে এক পর্যায়ে ফেলা সম্ভব হত না। কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস হয়েছিল। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির এই ব্যর্থতার জন্য লর্ড রাসেলও আক্রমণকারী চীনার বিপক্ষে ও ভারতের সপক্ষে

মাকারিওস: যিনি জওয়ানদের জন্য রক্ত দান করেছেন।

সরব নন। সাইপ্রাসের উদ্যোগে গত ১৬ই নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়ে আহূত গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলির সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। ৪৫টি নিরপেক্ষ দেশের মধ্যে ৩৫টি দেশ সভায় যোগ দিয়েছিল। ঐ সভাতেও মিশর ও ঘানার শান্তি প্রস্তাবে ভারত ও আক্রমণকারী চীনকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

আলবেনিয়া ছাড়া আর কোন কমিউনিস্ট দেশ চীনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেনি। তবে রাশিয়ায় প্রকাশিত মানচিত্রে ভারতের যেসব অঞ্চল চীন দাবী করেছে, সেসব অঞ্চল চীনের বলে দেখানো হয়েছে। এজন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটি রুশ মানচিত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন। চীনও প্রথমে এইভাবে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেছিল। চীন বর্তমানে ভারত আক্রমণে ব্যস্ত থাকার সুযোগ ক্রুশ্চভ পুরোপুরি গ্রহণ করতে চান। ১৯শে নভেম্বর রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে ক্রুশ্চভ স্ট্যালিনপন্থীদের সম্ভবতঃ একেবারেই কোণঠাসা করবেন। পূর্বে ইউরোপে তিনি এ ব্যাপারে মোটামুটি সফল হয়েছেন।

প্রেসিডেণ্ট ন্যুরেরে: 'আমরাও অস্ত্র দিয়ে ভারতকে সাহায্য করব।'

চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ক্রমেই সাড়া দিচ্ছে। গত ১৭ই নভেম্বর পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ও ১৪,৫৯০ তোলা সোনা জমা পড়েছে। বাজারে স্বর্ণ-বণ্ড বের হওয়ার পরেও জনসাধারণ প্রতিরক্ষা তহবিলে সোনা দান করছে, বণ্ড কিনছে না। পাঞ্জাববাসীর পক্ষ থেকে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তিন মণেরও বেশী সোনা উপহার দিয়েছেন। সেনাবাহিনী ও হোমগার্ডে যোগ দেওয়ার জন্য জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন। ছাত্রদের এন সি সিতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কিন্তু এসব বাস্তবে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র এখনও আগের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে নেফার অধিবাসীরাও পিছিয়ে নেই। তারা রাস্তা তৈরি, মাল বহন প্রভৃতি কাজেও এগিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্যত্র জনসাধারণের সহযোগিতা কাজে লাগাবার কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। ভারতভূমি থেকে চীনাদের বিতাড়িত করতে হলে গেরিলা সংগ্রাম করবারও দরকার হবে এবং সেজন্য আসামের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল দশ হাজার যুবকের একটি মৃত্যুবাহিনী গঠনের সংকল্প নিয়েছে। চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মিজোরা স্বতন্ত্র মিজোভূমির আন্দোলন স্থগিত রেখেছে। ফিজোও নাগা বিদ্রোহীদের সাহায্য গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন সৈনিকেরা দেশরক্ষার সংগ্রামে যুক্ত হতে চান। কিন্তু কেন জানি না, সরকার এখনও এদের কাজে লাগাবার কোন সিদ্ধান্ত করেননি।

সরকারী প্রচার-দপ্তরের ব্যর্থতা বিরোধীদলই অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু বিরোধীদলের কোন কোন নেতা এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারত থেকে চীনকে বিতাড়িত করবার পর চীনা দস্যুদের হাত থেকে তিব্বতকে মুক্ত করবার কথা বলেছেন। চীন ১৯৫০ সালে লাদাকে গোপনে রাস্তা তৈরি করে এবং ১৯৫১ সাল থেকেই দক্ষিণ তিব্বতে রাস্তা ও সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে আরম্ভ করে। ভারতের উত্তর সীমান্ত ঘিরে চীনারা তিব্বতে যেভাবে রাস্তা তৈরি করেছে, তাতে তিব্বতকে নিরপেক্ষ স্টেট করতে না পারলে ভারত কখনও চীনা দস্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। পরস্পরের আত্মরক্ষার জন্যই চীন ও রাশিয়া মাঝখানে মঙ্গোলিয়া রেখেছে। চীনের আত্মরক্ষার অজুহাতেই চীন কোরিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। বৃটেন তিব্বতে অনেক সুখ-সুবিধা আদায় করবার জন্যই তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। তিব্বতের ব্যাপারে ভারতের ঐ ধরনের কোন ইচ্ছা ছিল না। শুধুমাত্র চীনকে খুশী করবার জন্য তিব্বতের উপর চীনের সাম্রাজ্যবাদী দাবী মেনে নিয়েছিল। একটি জাতিকে রক্ষা করবার কথা বাদ দিলেও, ভারতের আত্মরক্ষার জন্য তিব্বতের মুক্তির কথা আজ না হলেও ভবিষ্যতে একদিন ভাবতে হবেই।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী: 'ভারতকে সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত'।

চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের আন্দোলন এখনও পর্যন্ত শহরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। চীনা দস্যুর বিরুদ্ধে গ্রামের লোককে সংঘবদ্ধ করবার ব্যাপারটি আর ফেলে রাখা ঠিক হবে না। আবার সকলেই সামরিক দিকের উপর জোর দিচ্ছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবার প্রচেষ্টা আজও প্রায় অনুপস্থিত। একমাত্র ইস্পাত ও অর্থমন্ত্রীর দপ্তর দুটিকেই সক্রিয় মনে হচ্ছে। অন্যান্য দপ্তরগুলি প্রোগ্রাম কার্যকর করবার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেননি। অবশ্য অধিকাংশ প্রোগ্রাম বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের এবং বেশীর ভাগ রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত কথায় সক্রিয় হয়েছেন, কাজে নয়। ১৯-১১-৬২

সীমান্তের প্রশ্নচিহ্ন

অজিতকুমার দাস

হিমালয়ের বুকে কাঁপন ধরেছে। বরফের গায়ে জ্বলে উঠেছে আগুন। বারুদের আগুন। সেই আগুনে গলে নেমে এল বীরের রক্তের সহস্রধারা। দেবতাত্মা হিমালয়ের আত্মা আর্তনাদ করে উঠল।

২০শে অক্টোবরের প্রথম আলোর চরণ-ধ্বনির সঙ্গে সে আর্তনাদ এসে আঘাত করল ৩৫০ বছরের পুরোনো টোয়াং মঠের মন্দির দ্বারে। ঝড়ের হাওয়াতে যেন অসময়ে কেঁদে উঠল মন্দিরের অগণিত ঘণ্টাগুলি শুনে কেঁপে উঠল টোয়াং মঠ নগরীর প্রায় হাজার খানেক অধিবাসীর দল। শক্ত করে জপের মালা আর চক্র হাতে নিয়ে বুদ্ধের সামনে এসে দাঁড়াল নির্দেশপ্রার্থী মন্দিরের পাঁচ শতাধিক পূজারী ও শ্রমণের দল।

নির্দেশ এল ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কাছ থেকে। সরে আসতে হবে। পলায়ন নয়। সামরিক প্রয়োজনে সাময়িক পশ্চাদপসরণ। সরে আসতে হবে উঁচু পাহাড় থেকে নীচে দক্ষিণের দিকে, বমডিলার পথে।

এই প্রভাতের সব কিছুর আকস্মিকতা জ্বলন্তরূপে দেখা দিল টোয়াং-এর অধিবাসী প্রতিটি মনপা স্ত্রী-পুরুষের কাছে। 'ওঁ মণিপদ্মে হুং' মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষগুলির অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে যেন শুরু হল নির্মম এক পরিহাস।

প্রতিদিন যারা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" এই প্রার্থনা দিয়ে ভয়ানাং ভীষণানাং পর্বতের বুকে তাদের জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করেছে সত্যিই কি তারা কোনও দিন ভেবেছিল যে একদিন বৌদ্ধ ধর্মের পূত পবিত্র আশ্রয়, ঘর বাড়ি, মঠ, মাটি ফেলে এমনি করেই বেরিয়ে পড়তে হবে নিরুদ্দেশের পথে? বুদ্ধ শরণ প্রার্থী এরা, প্রার্থনায় কোনও দিনই কোনও ফাঁক বা ফাঁকি রাখেনি। হাজার হাজার বৎসর ধরে এরা শান্তির মন্ত্র জপ করে এসেছে। কোনো ত্রুটি তো এদের প্রার্থনায় ছিল না। মনপা মেয়েরা ফুল দেখলে পাগল। প্রতিদিন অজস্র ফুল তুলে নৈবেদ্য সাজিয়েছে। দেবতার গলায় মালা দিয়েছে—আর বাকিগুলি বুকে ঠেকিয়ে মাথায় গুঁজেছে। তাই বুঝি বুদ্ধ শরণ কামনা এমনি করে এত তাড়াতাড়ি পূর্ণ হল!

৩৫০ বছরের পুরোনো মন্দির ছেড়ে কি সত্যিই যেতে হবে! কেন এ শাস্তি? সাড়ে তিন বছর আগেকার জমা করা প্রতিশোধ নেবার দিন কি ওরা আজ বেছে নিল?

সেদিনটি টোয়াং-এর ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯৫৯ সালের ৫ই এপ্রিল। সেদিন প্রভাতে সূর্য ওঠা সকলেরই যেন নূতন করে সফল মনে হয়েছিল।

সেদিন এসেছিলেন টোয়াং-এ আশ্রয় নেবার জন্য সত্যিকারের বুদ্ধ শরণপ্রার্থী ভারতযাত্রী দালাই লামা। মাত্র ১৮ দিন আগে ১৭ই মার্চ, ১৯৫৯ নরবুলিংকা রাজ-প্রাসাদ থেকে সাধারণ ভিক্ষুর বেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিব্বত ও তিব্বতীয় এলাকা-বাসীদের "জীবন্ত বুদ্ধ", ভক্তদের একাধারে রাজা ও ঈশ্বর (God-king) দালাইলামা। প্রায় বারো বছর আগে ১৭ই অক্টোবর ১৯৫০ সালে অতর্কিতে চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য তিব্বত আক্রমণ করে। লাল ইতিহাসের রক্ত-চক্ষুর দৃষ্টিতে তিব্বত চীনদেশের অংশ এই দাবি আদায়ের জন্য। ভীত চকিত তিব্বত ভারতের দিকে তাকায় সাহায্যের জন্য, সাহসের জন্য, সহানুভূতির জন্য। বিহ্বল, ভারত সরকার সেদিন তিব্বতের পাশে এসে দাঁড়াননি। লাল চীনের সৈন্য তিব্বত অধিকার করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে পঞ্চশীলের বিকারগ্রস্ত ভারত পিকিং-এ স্বাক্ষরিত ভারত-চীন চুক্তির মাধ্যমে তিব্বতকে "চীনের তিব্বতীয় এলাকা" (Tibetan region of China) বলে প্রকাশ্যে প্রচার করে সরকারী ভাবে মেনে নে স্মরণ রাখা দরকার ঐ একই চুক্তিতে ও হয়েছিল পঞ্চশীলের। এই পাঁচফোড়ন বং দিন আমরা আমাদের বৈদেশিক নীতি ঝালে ঝোলে সকলে ব্যবহার করেছি উপস্থিত সযত্নে কৌটোয় তুলে রেখে দিয়ে আপাতত একটু বিস্বাদ ঠেকছে বলে।

৩১শে মার্চ ভারত সীমান্তে দাঁড়ি দালাইলামা দূত মারফত ভারত সরকারে সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতে আশ্র চাইলেন। সেই দিনই পিকিং ডেইলী ভার সরকারকে সাবধান করে দিল যেন দালাই লামাকে নিয়ে ভারতবর্ষ নাচানাচি না করে আশ্রয় না দেয়, কারণ দালাইলামার ব্যাপা তিব্বতের ব্যাপার এবং সেইজন্যই একান্ত ভাবে চীনের 'ঘরোয়া' ব্যাপার।

সেদিন প্রথম পঞ্চশীল থেকে ভারতে মোহমুক্তি শুরু হল। পার্লামেন্টে প্রধান-মন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করলেন ভারত দালাই লামাকে আশ্রয় দেবে। তিব্বতীয় শরণার্থি-দেরও গ্রহণ করবে। চীনের মিতালি রক্ষা করতে গিয়ে আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় না দিয়ে আত্মবঞ্চনা বা মনুষ্যত্বের অবমাননা করবে না। সমস্ত বিশ্ব আশ্বস্ত হল। নেফা সীমান্তে দালাইলামার জন্য অপেক্ষারত আমাদের ভারতীয় সাংবাদিক দলের মধ্যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

তারপর ৫ই এপ্রিল ভিক্ষুর বেশে মুখে চোখে সাহস ও বিশ্বাসের দিব্য-বিভা ছড়িয়ে টোয়াং-এ এলেন দালাইলামা। কঠিন পার্বত্য জঙ্গলময় পথে দীর্ঘদিনের পথ চলায় ক্লান্ত শ্রান্ত। কিন্তু ক্ষোভ নেই, আফশোস নেই। দাসত্বের বেড়াজালের আড়ালে জীবন দুঃসহ হওয়াতেই যে তিনি দুর্গম পথের দুর্বার আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। টোয়াং-এ

বেশ লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম তত্ত্বকথার অভাব হয়তো এদের মধ্যে পাওয়া যাবে। তবে এদের জীবন মূলত ধর্মভাবাপন্ন। এরা সৌন্দর্য-প্রিয়; যদিও দারিদ্র্যের জন্য এদের সৌন্দর্য-বোধ ফুল ভালবাসা বা ফুল সাজানর মধ্যেই অনেকটা সীমিত।"

ত্রিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোটামুটি পাঁচ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে অবশ্য মনপারাই একমাত্র অধিবাসী নয়। সব অধিবাসীরা মনপাদের মত অত গুণের নয়। বুদ্ধের প্রভাবও সব উপজাতীদের মধ্যে সমান দেখা যায় না।

টৌয়াং তিব্বত ও ভূটান সীমান্তের গা ঘেঁষা সুতরাং ঐ দুদেশের ধর্ম, আচার, বিচার এখানেই বিস্তৃতি লাভ করেছে বেশী। এখান থেকে যতই পূব দিকে সরে যাওয়া যায়, যথা ব্রহ্মদেশের দিকে, ততই নতুন নতুন উপজাতিদের সঙ্গে পরিচয় হয়। যেমন ডাফলা উপজাতিরা দুর্ধর্ষ। আগিন উপজাতিরা অত্যন্ত অস্বচ্ছল অবস্থায় নেহাত কষ্টকর জীবন যাপন করে, কারণ ওদের জমি অত ভাল নয়, প্রকৃতি অকরুণ। আবার আবর জাতি অত্যন্ত স্বাধীনতচেতা এবং অকারণে সন্দিগ্ধ, বিশেষ করে সমতলভূমির "সভ্য" লোকগুলির সম্পর্কে।

এই বৈচিত্র্যই নেফার বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্র পরিচালিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এই নেফা অঞ্চলটি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। পূব থেকে পশ্চিমের দিকে গেলে এই বিভাগগুলি এই সারে পাওয়া যাবে—কামেং, সুবর্নসিরি, সিয়াং, লোহিত ও তিরাপ। এর মধ্যে তিরাপ ছাড়া আর সব বিভাগেরই উত্তরে তিব্বত। কামেং-এর পশ্চিমে ভূটান। লোহিত ও তিরাপের পূবে ব্রহ্মদেশ।

২০ই অক্টোবর অতর্কিতে চীনা আক্রমণ যখন শুরু হয় তখন কেবল ভূটান সীমান্তে কামেং বিভাগের উত্তরাংশ আক্রমণকারীদের লক্ষ্য বলে মনে হয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তিরাপ ছাড়া চীনারা নেফার আর বাকী চারটি বিভাগেই, অর্থাৎ তিব্বতের দক্ষিণে সব কয়টা বিভাগেই তাদের আক্রমণ প্রসারিত করে ফেলে।

কিন্তু টৌয়াং-এর পতনের পর এদের আক্রমণকে রোধ করার শক্তি আমাদের ক্রমশ বেড়েছে। আর কোনও বড় জনপদ এখনও চীনাদের হাতে পড়েনি। বহুক্ষেত্রে আমরা শত্রুর আক্রমণকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। নতি স্বীকারও যে কোথাও করিনি তা নয়।

সংবাদপত্রে ভারতীয় জোয়ানদের বীরত্বের বহু কাহিনী ছাপা হচ্ছে, আরও হবে। কিন্তু এই সব অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত জোয়ানদের সঙ্গে "নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়" এই বিশ্বাসে নিজেদের ধরনে শত্রু চীনা সৈনাদের সঙ্গে নিজস্ব ভঙ্গীতে সংগ্রাম করে যাচ্ছে নেফার বিচিত্র এই পার্বত্য উপজাতীর দল। আজও যদি এদের সঙ্গে একজোট হয়ে দা বা বর্শা

টৌয়াং-এর মনপা রমণী তার শিশুপুত্রকে নিয়ে চলে এসেছে বমডিলার পথে

নিয়ে অটোমেটিক রাইফেল হাতে চীনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারি সেই অগৌরব আমাদের। ওদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে আমরাই অপদার্থ প্রমাণিত হব।

কেন আমরা এইসব বলিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, পার্বত্য জীবনে অভ্যস্ত দুর্ধর্ষ উপজাতীয়-দের গত পনেরো বছরে আত্মরক্ষার আধুনিক কলকাঠি রপ্ত করাইনি? কেন এদের এগিয়ে দিয়েছি অবাঞ্ছিত বিদেশী আক্রমণকারীর বারুদের আগুনের সামনে? কোন নীতিতে নেফা অঞ্চল এতদিন পরিচালিত হয়েছে? এর উত্তর পাওয়া যাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নেফা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতির ঘোষণায়। ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী নেফা পরিচালনা সম্পর্কে এক পঞ্চ নীতির অবতারণা করেন। মোটামুটি তা হল এই:

১। উপজাতীয়দের নিজস্ব ধরনের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যেন তাদের উন্নতি প্রচেষ্টা করা হয়।

২। জমি, জঙ্গল ইত্যাদিতে ওদের অধিকার মেনে নিতে হবে।

৩। ওদের দিয়েই ক্রমশ ওদের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। 'বাইরের' লোক বেশী আনা ঠিক হবে না।

৪। এদের শাসনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। একরাশ পরিকল্পনা এদের উপর হঠাৎ না চাপানই ভাল।

৫। উপজাতীয়দের কতটা উন্নতি হল সে বিচার হবে ওদের চরিত্রের বিকাশের মধ্যে, সংখ্যার কচকচানিতে নয়।

এই নীতির কোথাও উপজাতীয়দের বহিঃশত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা শিক্ষা দেবার কোনও কথা নেই। কারণ তখনও আমরা ভারত সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে দুটি বিশ্বাসে বিশ্বাসী। প্রথম: হিমালয়ের দুর্ভেদ্য বাধা অতিক্রম করে কেউ আমাদের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না। দ্বিতীয়: "হিন্দি চিনি ভাই ভাই" নীতি ভারত সীমান্তকে চীনাদের লুব্ধদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে।

মনপা ও অন্যান্য উপজাতীয়দের মন পাওয়ার জন্য আমরা এ কয় বছর কম চেষ্টা করিনি, পেয়েছিও। কিন্তু তাদের মান রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা করিনি।

আজ টৌয়াং ও তার আশে পাশের অঞ্চলে, শত্রু-বিপর্যস্ত নেফার সর্বত্র অগ্নি পরীক্ষায় আত্মশোধনের সূত্রপাত হয়েছে। এই টৌয়াং-এ প্রথম দালাইলামাকে আশ্রয় দিয়ে, রক্ষীর ব্যবস্থা করে আমরা দুর্নীতি পরায়ণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে নীরব অথচ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। এই টৌয়াংই হল প্রথম জনপদ যা এই আক্রমণে আত্মত্যাগ করে সমগ্র জাতির সামনে বিরাট এক প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে।

টৌয়াং-এর মন্দির ভারতের প্রাচীনতম বুদ্ধ মন্দিরই শুধু নয়। এই মন্দির ১১০০০ ফুট হিমালয় শীর্ষে অবস্থিত সর্বোচ্চ বুদ্ধ মন্দিরও বটে। নেফায় যতদিন আগুন জ্বলবে ততদিন অধিকৃত নেফা অঞ্চলের প্রতিভূ হয়ে টৌয়াং প্রত্যেক ভারতীয় জোয়ান ও ভারতবাসীকে ডেকে বলবে—আর সত্যাদন, আর কতদূর?

চীনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা

ঘনশ্যাম মেহ্‌তা

[ভারত সীমান্তে চীনের বর্বরোচিত আক্রমণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত; পাঠক মাত্রেই তা জানেন। চীনের পররাজ্য গ্রাসের চক্রান্ত ও দূরভিসন্ধি কি-রকম প্রবল, বর্তমান প্রবন্ধ ও সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটি সে-বিষয়ে অতিরিক্ত আলোকপাত করবে। লেখক পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এই গোপন ও বিভ্রান্তিকর মানচিত্রটি সংগ্রহ করেন।

——সম্পাদক]

চীনের 'পিপলস্ ডেইলী' কাগজে একটি উগ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম: "ভারত-চীন সীমান্ত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে নেহরুর দর্শন।" চীনাদের অভিযোগ, নেহরু এমন বিশাল এক সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উৎসুক, যা 'অতীতে ব্রিটেনের এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।' অভিযোগের সপক্ষে তারা উদ্ধৃত

舊民主主義革命時代(1840-1919)
帝國主義割取中國領土圖

এই মানচিত্রটি 'আধুনিক চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল: ১৯৫৪। সবুজ রেখায় অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলকে চীন নিজস্ব বলে দাবি করে। বাম পার্শ্বের '—' চিহ্নিত রেখা আফিং যুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং '

সংগ্রহ করেছে নেহেরুজীর 'ভারত সন্ধানে' গ্রন্থ থেকে। প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা ব্যতীত, এই উদ্ধৃতি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

ভবিষ্যতের ভারত প্রসঙ্গে নেহেরুজী লিখেছেন: "ভারত প্রাচ্যের সবখানি না হলেও, এ-কথা ঠিক যে, সমগ্র প্রাচ্যদেশে ভারত একদিন বিপুল প্রভাব বিস্তার করবে। ভারত মহাসাগর এলাকায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং এমন কি, মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সর্বত্র—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গণ্য হবে ভারত। বর্তমানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ভারতকে একরকম সুবিধা দিয়েছে, বিশ্বের একাংশে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এবং এই প্রয়োজন ভবিষ্যতে আরো দ্রুত স্পষ্ট হবে। ভারতের দুই প্রান্তে, ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিকে যদি একটি অঞ্চল হিসেবে ধরে নেওয়া যায়—যেমন: ইরান, ইরাক, আফগানিস্থান, ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ প্রভৃতি—তাহলে, সংখ্যালঘুদের জন্য বর্তমানে যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেগুলি অন্তর্হিত হবে; অন্তত, সমস্যাগুলির বিচার হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে।"

এই অংশটুকুই ভারতকে 'সাম্রাজ্যবাদী' হিসেবে প্রচারার্থে ব্যবহার করেছে চীন। এইটুকু মাত্র উদ্ধার করেই, 'পিপলস্ ডেইলী' প্রশ্ন করেছে ভারতের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণ। পরের পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করার মতো সাহস বা সততা কাগজটি দেখায়নি; যেখানে নেহেরুজী স্বর্গত জি ডি এইচ কোলের একটি উক্তি ("ভারত একদিন অতি-জাতীয় —Supernational— মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রস্থল হতে বাধ্য") সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন: "বিশেষ মানবিক বন্ধনের ভিত্তিতে সুদৃঢ় না হলে, বিশ্বকে কতকগুলি অতিজাতীয় এলাকায় বিভক্ত করা আমার পছন্দ নয়।"

ভূতের মুখে রাম নাম উচ্চারণের এর চেয়ে বড় উদাহরণ দুর্লভ। অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায় যে, বৃহৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন ভারত নয়, চীনই দেখছে। বস্তুত, আপাতদৃষ্টিতে যতোটা মনে হয়, চীনের দুরভিসন্ধি তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু লাডাক ও নেফা-র চীনের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ নয়; তার ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী।

সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ থেকে জুলাই ১৯৬০ পর্যন্ত আমি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলুম। ১৯৬০, মার্চের একদিন শুনলুম পিকিংয়ের নেপালী ছাত্ররা চীন-ভ্রমণরত নেপাল সরকারের প্রতিনিধিদলকে চৈনিক ইতিহাসের একটি পাঠ্য-পুস্তক উপহার দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি বিভ্রান্তিকর মানচিত্র। নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, শ্রীযুক্ত বি পি কৈরালা, ঐ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন।

কৌতূহলবশত ঐ গ্রন্থের একটি কপি আমি সংগ্রহ করেছিলুম। গ্রন্থের নাম: "আধুনিক চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"; লেখক: লিউ পে-হুয়া; এবং প্রকাশক: ই-চ্যাং বুক কোম্পানী। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ কাল: মার্চ, ১৯৫৪।

মানচিত্রটি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য ও আতঙ্ক বোধ করি। তাতে নির্দিষ্ট করা ছিল: "প্রাচীন বৈপ্লবিক প্রজাতন্ত্র যুগে (১৮৪০-১৯১৯) সাম্রাজ্যবাদিগণ কর্তৃক অধিকৃত চৈনিক অঞ্চল।" বর্তমানের চীনা ঐতিহাসিকগণ আধুনিক চীনের ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন। প্রথম পর্বের সময়কাল ১৮৪০ থেকে ১৯১৯, যার শুরু অহিফেন যুদ্ধে (Opium War) এবং শেষ ৪ঠা মের বিপ্লবে। এটি প্রাচীন বৈপ্লবিক প্রজাতন্ত্র যুগ। দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়েছে পিপলস্ রিপাবলিক-এর প্রতিষ্ঠায়: নূতন বৈপ্লবিক প্রজাতন্ত্র যুগ (১৯১৯-১৯৪৯)। তৃতীয় পর্ব: সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের যুগ; এখনো শেষ হয়নি। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মানচিত্রে চীন এক বিশাল ভূখণ্ডকে নিজস্ব বলে দাবি করেছে, যা চীনের মতে, প্রাচীন পর্বে সাম্রাজ্যবাদিগণ লুণ্ঠন করেছিল।

মানচিত্রটি এই নিবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হলো। চিত্রে নির্দিষ্ট চীনা ভাষার বিভিন্ন উল্লেখের অনুবাদে স্পষ্ট হবে, চীনের পররাজ্য গ্রাসের লোভ কি-রকম প্রবল:

১। বিশাল উত্তর-পশ্চিম: মানচিত্র অনুসারে, এই ভূখণ্ড ১৮৬৪-র চুগুচাক্ সন্ধির শর্তে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া অধিকার করেছে। আধুনিক সোভিয়েট দেশের কাজাকস্তান, কিরঘিজিয়া এবং তাজিকিস্তান-এর অন্তর্ভুক্ত।

২। পামীর: ১৮৯২ সনে ব্রিটেন ও রাশিয়া কর্তৃক গোপনে অধিকৃত।

৩। নেপাল: ১৮৯৮, 'স্বাধীনতা'র পরে ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত।

৪। সী-মেং-সিউং (বর্তমানে সিকিম): ১৮৮৯, ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত।

৫। পিউ-তান (সমগ্র ভূটান): ১৮২৬, 'স্বাধীনতার পরে ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত।

৬। আ-সা-মী (সমগ্র আসাম): ১৮২৬, ব্রিটেন কর্তৃক ব্রহ্মদেশকে প্রদত্ত।

৭। ব্রহ্মদেশ: ১৮৮৬, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

৮। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ: ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত।

৯। মা-লা-চীয়া (বর্তমানে সমগ্র মালয়): ১৮৯৫, ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত।

১০। সিয়েন-লো (সমগ্র থাইল্যান্ড): ১৯০৪, ইংরাজ ও ফরাসি'র তত্ত্বাবধানে 'স্বাধীন ঘোষিত'।

১১। আনাম (বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া): ১৮৮ ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত।

১২। তাইওয়ান এবং পেংহু দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৫, শিমোনোসেকি'র সন্ধি অনুসারে জাপানকে প্রদত্ত।

১৩। সুলু দ্বীপপুঞ্জ: ব্রিটেন কর্তৃক অধিকৃত।

১৪। ব্রিটেন কর্তৃক সীমান্ত লঙ্ঘন আক্রমণ।

১৫। লিউ-চিউ (রাইউকু দ্বীপপুঞ্জ) ১৯১০, জাপান কর্তৃক অধিকৃত।

১৬। কোরিয়া: ১৮৯৫, স্বাধীনতা ১৯১০, জাপানের সঙ্গে যুক্ত।

১৭ ও ১৮। বিশাল উত্তর-পূর্ব (সোভিয়েট পূর্বাঞ্চলের বৃহৎ অংশ): আইগান (১৮৫৮) ও পিকিং (১৮৬০)-এর সন্ধি অনুসারে রাশিয়াকে প্রদত্ত।

১৯। কিউ-এই (কুরিল দ্বীপপুঞ্জ): জাপান ও রাশিয়ার অধিকারে।

[সাপ্তাহিক LINK-এর সৌজন্যে।

অনুবাদ: দিব্যেন্দু পালিত]

উৎপাত উপলক্ষে গদ্য রচনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভেবেছিলাম কোনদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবো না
মরে যাবো এই ভেবে নয়
মানুষকে মারতে হবে এই ভেবে—
একটা পিঁপড়েকে মারার পাপস্খালন একজীবনে হয় না।
আমার দিকে কেন বন্দুক তুলেছিল বেল্লিক?

কতদিন পর এই হিমালয়ের স্তব্ধতাকে হত্যা?
তীব্র ভালোবাসা বড় তীব্রতম ঘৃণা হতে পারে।
আমি ভালোবাসায় দীর্ঘ হতে চেয়েছিলাম
আমি ভালোবাসা চেয়েছিলাম স্ত্রীলোকের, বালকের,
জননীর, অচেনা মানুষের;
চেয়েছিলাম ন্যাশপাতির, জ্যোৎস্নার, নিস্তব্ধতার—
জানি না মানুষ মেরে কার জন্য কিসে সাম্যবাদ।

জীবনে প্রথমবার প্লেনে চেপে সীমান্তের দিকে চলে যাবো
এ শীতে দাঁতের বাজনা থেমে যাবে কামানে রাইফেলে
লোভী, পীত সিংধেলের মাথায় চালাবো রাগী বুলেট
রক্ত, ঘিলু, থ্যাঁতা মাংস ছিটকে পড়বে পাহাড়ের ওপারে
উল্লাসে হো-হো করে বাড়ি ফিরে বলবো:
জয়ী আমি আজ।
আমার বুক থেকে ভালোবাসা মুছে এমন ভয়ংকর ক্রোধ
জাগিয়ে তোলার জন্য, অতীতের কবিতা ছবির দেশ চীন,
তোমাকে আবার কবে ক্ষমা করতে পারবো জানি না।

প্রতিরোধের গান

অতীন্দ্র মজুমদার

রুদ্ধ কণ্ঠে তোল আওয়াজ
শহরে নগরে গ্রামে প্রান্তরে
রুখে প্রতিরোধে সুদৃঢ় আজ!
আমার মাটিতে যে বাড়াবে তার লোভের হাত
আমার খামারে সঞ্চিত সোনা যে নেবে লুটে
আমার ভায়ের বুকে যে ফোটাবে বিষের দাঁত
—তোলো আওয়াজ—
হানো তার বুকে তীব্র তীক্ষ্ণ ঘৃণার ক্রোধের দীপ্ত বাজ!
হাতুড়ি লাঙলে কলমে ছড়াও প্রতি জনপদে মন্ত্র আজ,
বর্বর প্রেত-দস্যুর যত স্পর্ধাকে পিষে, পোড়াও আজ,
ছলনার গাঢ় লালরঙে আঁকা মীরজাফরের সুহৃদ-সাজ॥

বজ্রকণ্ঠে তোল সে গান—
যে-গানে মাটির বুক চিরে ওঠে
কোটি ভাই, কোটি নওজোয়ান!
তোমার চোখের সব আলো তার চক্ষে দাও
তোমার হাতের সব জোর দাও মুষ্ঠি ভরে
তোমার বুকের সব আশা তার বক্ষে দাও—
—গাও সে গান—
যে-গানে মাটির প্রতি তৃণে তৃণে জাগে প্রতিরোধে অযুত প্রাণ,
দানবের টুঁটি টিপে ধরে যারা রাখে জননীর শ্রদ্ধা মান,
গাও সে গান—
যে-গানে মরণে জয় করে আসে সারা ভারতের নওজোয়ান॥

সম্পর্ক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দু'দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে মানিঅর্ডারটা শেষ পর্যন্ত ফেরত পাঠালাম। এই দু'দিন পিওন আমার নাগাল পায়নি। কিন্তু আজ হাতে হাতে ধরে ফেলেছে। নোটগুলি আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয় আর কি। কিন্তু আমি হাত সরিয়ে নিলাম। মুষ্টিবদ্ধ করতেও পারতাম। ভিতরে ভিতরে কিসের একটা ক্ষোভ আর আক্রোশ আমার মনকে অস্থির করে তুলেছিল। পিওন বেশি কথা বললে আমি ওকে যেন দু' এক ঘা লাগিয়েও দিতে পারতাম। মানিঅর্ডারের ফর্মের ওপর আমি নিজের হাতে লিখে দিলাম, "রিফিউজড", এই আমার প্রতিশোধ। বাবার ওপর আমার প্রতিশোধ।

আমার রুমমেট শুভেন্দু পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও বলল, 'এ কী করলে বিভাস। ছিঃ। মোটেই উচিত হল না কাজটা। শত হলেও তোমার বাবা তো!'

আমি বললাম, "হ্যাঁ ডাকতে হলে ওই বলেই ডাকতে হয়। কিন্তু সম্পর্ক তো কিছু নেই।'

তবু আমার বন্ধু শুভেন্দু দিনের মধ্যে অনেকবার আমাকে বলেছে, 'কাজটা ভালো করলে না বিভু। কাজটা মোটেই ভালো হল না তোমার।'

আমি ওকে ধমক দিয়ে বলেছি, "থাক থাক তোমার আর যাত্রার দলের বিবেক সাজতে হবে না। তুমি চুপ কর।"

কিন্তু শুভেন্দু চুপ করলেও সেই বিবেক আমার কানের কাছে থেকে থেকে ফিসফিস করেছে, 'ভালো হল না ভালো হল না। এক-জন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে অনর্থক দুঃখ দিয়ে তোমার লাভ কি হল।'

তারপর ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি, ক্লাস করেছি, লাইব্রেরীতে বসে খানিকক্ষণ পড়তে চেষ্টা করেছি, পড়ায় মন বসেনি। কফি হাউসে আমি কখনো যাইনে ওখানকার অত হইচই আমার ভালো লাগে না—সহ্য হয় না। কিন্তু আজ গিয়েছি। আজ আমি ওই হইচই-য়ের মধ্যে একটি অস্ফুট স্বরকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যে জন্যে গিয়েছিলাম তা হয় নি। যা ভুলতে চেয়েছিলাম তা ভুলতে পারিনি। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যেই উঠে এসেছি। তারপর সন্ধ্যার অনেক আগেই এসে ঢুকেছি আমার এই ডেরায়। বেগবাগানের এই অখ্যাত মিশনারি হস্টেলের ছোট্ট ঘরে। এ ঘর আজ আমার একার। আমার সহকর্মী বন্ধু শুভেন্দু ওর এক কাকার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাবে। বেশি রাত হলে আজ আর হস্টেলে ফিরবে না। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলে গেছে। ভালোই হয়েছে। শুভেন্দু আজ এঘরে থাকলে আমাকে আনমনা করবার জন্যে নানা আজে বাজে কথা বলত। আর না হয় খুঁটে খুঁটে আমার মনের কথা টেনে বার করবার চেষ্টা করত। ও আমার অনেক কথাই জানে। এক হিসেবে মোটামুটি সবই ওকে আমি বলেছি। তবু আমার মনে হয় ও যেন সব বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে ও অমন জোর করে বলতে পারত না। 'তোমার বাবার টাকা না নিয়ে তুমি অন্যায় করেছ।' সংসারে একজনের দুঃখ পুরোপুরি আর একজনে বোঝে না। বোঝানোও বোধ হয় যায় না। আমার বাবা যে শুভেন্দুর কি আর কারো বাবার মত নন সে কথা ও জানে কিন্তু সব সময় এর ভিতরের অর্থটা মনে রাখতে পারে না।

আমি অনেক দিন অনেক লক্ষ্য করেছি। বিশ বছর উত্তরে যাওয়ার পরেও এই সেদিন

পর্যন্ত আমি আমার বাবাকে খুব কাছে থেকে দেখিনি। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কাছে থাকিনি। আদর না, শাসন না, উপদেশ নির্দেশ কিছু না। আমি শুধু তাঁর পদবী-টুকু আমার নামের সঙ্গে বহন করে চলেছি আর শিরায় শিরায় যে রক্তস্রোত বইছে তার মধ্যে আমার বাবার কতটুকু কি আছে না আছে জীবতাত্ত্বিকরাই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর দেওয়া কোন পোশাক পরিচ্ছদ আমি পরিনি অন্তত আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে পরিনি। তাঁর রুচি বুদ্ধির কতটুকু কি প্রভাব আমার চরিত্রের ওপর পড়েছে তাও আমি জানিনে। 'তুই তোর বাবার মত হয়েছিস' এ কথা আমার মামা বাড়িতে কাউকে কোনদিন বলতে শুনিনি। বাবা বলে যে কেউ একজন থাকে, থাকতে হয় সেই বোধই আমার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না। যার অভাবও কোনদিন বোধ করিনি। যাঁকে আমি মা বলে ডাকি, শুধু ডাকা কেন, মা শব্দটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁর পরম সুন্দর মুখখানি আমার মনে পড়ে, সর্বাঙ্গে যাঁর স্নেহস্পর্শ আমি দূরে বসেও অনুভব করি তিনি যে আমার মা নন মাসীমা এ কথাও আমি বেশ বড় হয়ে জেনেছি। বড় হয়ে মানুষ কত কীই তো জানে। কত কিছু সম্বন্ধেই তার কৌতূহল থাকে। আমারও ছিল। সেই সঙ্গে নিজের অতীতের অন্ধকার যবনিকা তুলে দেখবার লোভও কম ছিল না। আমি আমার ছেলে-বেলার অনেক অর্ধোচ্চারিত কথার অনেক অনুচ্চারিত ইশারার অর্থ এখন আমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারি। আগে পারতাম না। কিন্তু আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মামা আর মামীমাকে কথা বলতে দেখলে আমি সেখান থেকে নড়তে চাইতাম না! ধমক খেলে আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে আড়ি পাততাম, যখন মনে হত আমার সম্বন্ধে ওঁরা কিছু বলছেন না, তখন নিরাশ হয়ে খেলার সঙ্গীদের দলে গিয়ে ভিড়তাম।

আমার এই স্বভাব দেখে মামা মাঝে মাঝে হেসে মাসীমাকে বলতেন, 'রেণু তোর ছেলে এমন মেয়েলী স্বভাব পেল কী করে রে।"

মামীমা বলতেন, "মেয়েলী কি বলছ, ও বড় হয়ে একটা আস্ত স্পাই হবে। আর কী কোটনাই না হয়েছে। কেবল এর কথা ওর কাছে, ওর কথা এর কাছে লাগাবে।"

মামা বলতেন, 'ভালোই তো। আমি যখন কোর্টে যাই আমার বিরুদ্ধে কী তোমরা বল না বল আমি তো কিছু জানতে পারিনে আমার হয়ে আমার ভাগ্নে সব নোট করে রাখে।'

মামীমা বলতেন, "আবার ভাগ্নের মামাটিও কী করেন না করেন, বলেন না বলেন বাচ্চুর নোটখাতায় তাও সব তোলা থাকে এ কথা মনে রেখো। আমার তো মনে

হয় অনেক ব্যাপারে ও ওর বাবার মত হয়েছে।”

সংগে সংগে মামা-মামীর আর মাসীমার মধ্যে চোখোচোখি হল। বাবার কথা চাপা পড়ে গেল। (আমি যাকে মা বলে ডাকি এখানে বলবার সুবিধের জন্যে তাঁকে মাসীমাই বলছি। যে মা আমার দেড় বছর বয়সে মারা গেছেন, যিনি শুধু স্মৃতি দিয়ে গড়া, আমার কাছে শুধু কিংবদন্তী। তাঁর কথাও তো মাঝে মাঝে আমাকে বলতে হবে। ইতিমধ্যে আমি আরো এক মায়ের সন্ধান পেয়েছি। তিনি আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁকে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। আমার নিজের মার মত এই মাও আমার কাছে নিতান্তই শ্রুতিময়ী। কিন্তু লোকান্তরিতা মা যেমন আমার কোন খোঁজ-খবরই আর নিতে পারেন না, এই মা তেমন নন। ইনি আমাকে কয়েকখানা চিঠি লিখেছেন। প্রত্যেক চিঠিতেই ওঁরা যেখানে থাকেন সেই ডিব্রুগড়ে যাওয়ার কথা আছে। মনে মনে বিমাতার ওপর আমার যত বিরূপতাই থাকুক, নতুন দেশে গিয়ে নতুন মহিলাটির সংগে আলাপ করবার কৌতূহল আমার কম নেই। কিন্তু মাসীমাকে সে কথা বলতে ভয় হয়। পিতৃকুলের কারো সম্বন্ধে আমার সম্পর্ক তো ভালো সামান্য কৌতূহলও যেন তিনি সহ্য করতে পারেন না। আমি তাঁর সর্বস্ব। তিনিও আমার সর্বস্ব হয়ে থাকতে চান।)

ছেলেবেলা থেকে এমনি আভাসে ইঙ্গিতে শ্রুত আর অর্ধশ্রুত নানা কথা আর মন্তব্যের ভিতর দিয়ে বাবার যে মূর্তি আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তা কোন রূপবান গুণবানের প্রতিকৃতি নয়। দিদিমার কথা একটু একটু আমার মনে আছে। আমার সাত-আট বছর বয়সে তিনি মারা যান। আমার মামাত ভাই-বোন বিন্টু মিন্টুর সংগে কত রূপকথা লেপ-কাঁথার নীচে শুয়ে শুয়ে তাঁর কাছে শুনেছি। কিন্তু বাবার কথা উঠলেই তাঁর রূপ পাল্টে যেত। আমি যদি বলতাম, "বাবার গল্প বলনা দিদিমা।"

দিদিমা জবাব দিতেন, "তার কথা আর কী বলব বল। সে একটা শয়তান পাষণ্ড।"

বিন্টু বলত, "পাষণ্ডের কটা শিং আছে ঠাকুরমা?"

মিন্টু বলত, "দূর শিং থাকবে কেন। হাতির মত বড় বড় দাঁত আছে। সেই দাঁত দিয়ে সে টেনে তুলে নেয়। তারপর আছড়ে আছড়ে মারে। সার্কাসে হাতি এসেছিল দেখিসনি?"

বিন্টু তখন ক্লাস থ্রীতে পড়ে। পাষণ্ড মানে যে হাতি নয় এক ধরনের ষণ্ড, আর ষণ্ড মানে যে ষাঁড় সে কথা ও ছোট বোনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মিন্টু কিছুতেই তা মানতে রাজী হয়নি।

আমি চুপ করেছিলাম। ওদের এই

তর্কাতর্কিতে আমি যোগ দিইনি। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম পাষণ্ড মানে ষাঁড়ও নয়, হাতিও নয়, তার চেয়েও অনেক নিষ্ঠুর অনেক হিংস্র কোন জন্তু।

কিন্তু দিদিমার এসব কথা আমার ভালো লাগেনি। ভারি রাগ হচ্ছিল, কষ্ট হচ্ছিল শুনতে। ইচ্ছা হচ্ছিল দিদিমার মুখ চেপে ধরি। তাঁর সব কথা বন্ধ করে দিই।

কিন্তু আমি না করলেও মাসীমা বন্ধ করে দিতেন। ঘরের বিছানা তুলতে তুলতে দিদিমাকে ধমক দিয়ে বলতেন, "ও সব কি হচ্ছে। ও সব কথা ছাড়া কি কোন কথা নেই? তুমি কখনো ওর সামনে ওর বাবার নিন্দে করবে না মা। তিনি ভালো হন মন্দ হন তাতে আমাদের কী এসে যায়? তাঁর সংগে তো আর কারো কোন সম্পর্ক নেই।"

দিদিমা মাসীমার কাছে খুব জব্দ। যতক্ষণ তিনি ঘরে থাকতেন দিদিমা আর কোন কথা বলতেন না। বেরোবার সংগে সংগেই আবার গজগজ শুরু করতেন। মা আর মেয়ে একই ঘরে থাকতেন। আমি মাসীমার কাছে শুতাম। কিন্তু সে খুব বেশী রাত্রে। সন্ধ্যা বেলায় গল্প শোনার জন্যে আমার দিদিমাকে দরকার হত। ভোরবেলায় সূর্যস্তব কি কৃষ্ণের শতনাম শুনবার জন্যে আমার দিদিমাকে ছাড়া চলত না। আমি দুজনকেই ভালোবাসতাম। আবার দুজনকে ঝগড়া করতে দেখতেও আমার বেশ লাগত। বেশীর ভাগ ঝগড়াই আমাকে নিয়ে হত। মাসীমা বলতেন আদর দিয়ে আমাকে দিদিমা নষ্ট করছেন। আবার দিদিমাও কোন কোন দিন উল্টো চাপ দিতেন, "পরের ছেলে নিয়ে তোর অত মাথা ব্যথা কেন? দীক্ষা নিলিনে কিছু নিলিনে, ধর্ম-কর্মের নামও আনিসনে মুখে। কেবল ছেলে ছেলে করেই আছিস সারাদিন। এত আদিখ্যেতা সহ্য হয় না আমার।'

পর শব্দটা আমি ও'দের ঝগড়ার মুখেই প্রথম শুনি। অর্থ বুঝতে পারি আরো পরে।

বাবাকে দেখিনি কিন্তু ছেলেবেলা থেকে আভাসে ইংগিতে যেসব কথা শুনেছি তাতে তাঁর সম্বন্ধে ভালো ধারণা গড়ে ওঠে না। তবু কেউ তাঁর নিন্দা করলে আমি ঠিক খুশী হতে পারতাম না। এত নিন্দানন্দ সত্ত্বেও তাঁকে দেখবার আমার বড় কৌতূহল ছিল।

ঠিক কত বছর বয়সে মনে নেই মাসীমার ঘরে স্বামীস্ত্রীর একসংগে তোলা একখানি ফোটো দেখে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা মা, উনি বুঝি আমার বাবা?'

মোটাসোটা গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোকের ছবির দিকে আমি আঙুল বাড়িয়েছিলাম।

মাসীমা বলেছিলেন, 'না। উনি তোমার মেসোমশায়।'

আমি বলেছিলাম, 'তা কী করে হবে? বিণ্টু-মিণ্টুর বাবা-মার ছবি তো একসংগে ও ঘরে বাঁধানো আছে। তোমার পাশে মেসো-মশাই কেন থাকবে মা?'

মাসীমা বলেছিলেন, 'তোর যত সব পাকা পাকা কথা। যা, পড়তে বোস গিয়ে।'

আমার কৌতূহল তবু মেটেনি। জিজ্ঞাসা করেছি, 'আচ্ছা মা, মেসোমশাইকে কেন দেখতে পাইনে?'

মাসীমা একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'কী করে পাবি বাচ্চু। তিনি তো আর এ পৃথিবীতে নেই। তিনি অনেক আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'স্বর্গে।'

আমার মনে পড়ল, দাদুও তো স্বর্গে গেছেন। দিদিমা একদিন বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমার এক মাও স্বর্গে রয়েছেন। মানুষের আপনজনের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গে থাকে আর কেউ কেউ এই পৃথিবীতে বাস করে এ কথা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ আমি 'জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা মা, আমার সেই মা আর ওই মেসোমশাই দুজনেই বোধ হয় স্বর্গে এক বাড়িতে আছে?'

মাসীমা চমকে উঠে বলেছিলেন, 'তোর কোন্ মা?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'আমার আসল মা। আমার যে মা মরে গেছে।'

একটি গোপন সত্য আবিষ্কার আর তার প্রকাশের আনন্দে আমি উল্লসিত হয়ে উঠে-

ছিলাম। কিন্তু মাসীমা সেই আনন্দের অংশ নিতে পারেননি। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'এসব কথা তোকে আবার কে বললে? বউদির তো খেয়ে না খেয়ে কোন কাজ নেই—।'

মাসীমার অমন সুন্দর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, একটু বা বিকৃত।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে অপরাধ স্বীকার করেছিলাম, 'আর বলব না মা, আমি আর বলব না।'

মাসীমা আমার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলেন, 'আমি তোকে সব বলব বাচ্চু। তুই বড় হয়ে ওঠ, লেখাপড়া শেখ, তখন তোকে সব বলব।'

মাসীমা আর কিছু বলেননি। তারপরে সব চুপচাপ। শুধু বৃষ্টির ফোঁটার মত জলের কয়েকটি ফোঁটা আমার পিঠের ওপর টপ টপ করে পড়েছিল বেশ মনে আছে।

আমি কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি রাখিনি। যে কথা বললে মাসীমা কষ্ট পান সে কথাও আরও অনেকবার বলেছি। দুষ্টুমি করার জন্যে, পড়াশুনো না করার জন্যে যখনই মাসীমা আমাকে শাস্তি দিয়েছেন, আমি তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ শোধ নিয়েছি। মাসীমার হাতের মুঠি থেকে ছিটকে সরে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছি, 'আমার নিজের মা হলে কি এমন করতে পারত? আমাকে কখনো বকত, মারত?'

ঝগড়াঝাটির সময় তেমনি মামাকেও খোঁটা কম দিইনি। মামাত ভাইবোনদের কাছে তাঁর পক্ষপাতের কথা তুলেছি, 'তোদের কি—তোদের জুতোও দামী হবে, জামাও দামী হবে। তোরা মুখের কথা খসাতে না খসাতে সব আসবে। তোরা তো আর মামা-বাড়িতে পড়ে নেই! তোরা নিজেদের বাড়িতে আছিস নিজেদের বাবার কাছে! তোদের সঙ্গে কি আর আমার তুলনা?'

ছেলেবেলায় বড় নিষ্ঠুর ছিলাম আমি। কুকুর বিড়াল কীটপতঙ্গকে কোনদিন কষ্ট দিইনি। আমার যত আক্রোশ ছিল আমার আপনজনের ওপর। যাদের আমি ভালো-বেসেছি তাদেরই বেশী কষ্ট দিয়েছি। সব-চেয়ে বেশী দুঃখ দিয়েছি মাসীমাকে—যাঁর মধ্যে আমি আমার মাকে পেয়েছি।

মাসীমাকে আলাদা করে কিছু বলতে হল না। বড় হয়ে বড় হতে হতে আস্তে আস্তে দিনের পর দিন আমি সবই জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম।

আমার মা টি বি-তে মারা গেছেন। তাঁর অসুখের সময় আমার বিধবা মাসীমা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি তখন বাপের বাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে এসেছেন। শ্বশুর শাশুড়ী ছিলেন না। ভাসুর দেওর ছিলেন। কিন্তু সব আলাদা আলাদা। আমার দিদিমা আর মামা মাসীমাকে তাঁদের কাছে থাকতে দেননি, অন্য কোথাও যেতে দেননি, অন্য কিছু

করতেও দেননি। অনেকদিন পর্যন্ত আমিই ছিলাম মাসীমার একমাত্র অবলম্বন।

বাবার কথাও শুনেছি। বাবা পাঁচ বছর বিপত্নীক হয়ে কাটিয়েছিলেন। এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আমার মামাবাড়িতেও দু-একবার পরিব্রাজক হিসেবে দেখা দিয়ে গেছেন। তারপর ডিব্রুগড়ে এক মেডিক্যাল ফার্মে চাকরি নিয়ে সেখানে দ্বিতীয়বার সংসারী হয়েছেন। ছেলেমেয়ে তিনটি কি চারটি, আমরা সঠিক জানিনে।

একটু ভেবে দেখতে গেলে দোষের কিছু করেননি। আমি বড় হয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি কী এমন দোষ তাঁর? অল্প-বয়সে ঘর ভেঙ্গে গেলে কার না ফের ঘর বাঁধতে সাধ হয়? কজনেই বা তা না বেঁধে পারে? না পারার চেয়ে পারাই তো ভালো। মৃত্যু যদি ঘর ভেঙে দেয় তুমি আবার ঘর বাঁধবে। মৃত্যু ছাড়াও অন্য কোন দৈব দুর্বিপাকে ঝগড়াঝাটি কলহ বিবাদে ঘর ধূলিসাৎ হয় তুমি আবার ঘর গড়ে তুলবে। গৃহীরা তো তাই করে। বাবাও নতুন কিছু করেননি।

তবে আমার দায়িত্ব তিনি নিতে পারতেন। শুধু এই একটি ব্যাপারে আমার ক্ষোভ গিয়েও যায় না। কেন তিনি আমাকে আমার মামাবাড়িতে ফেলে রাখলেন? কেন তিনি আমাকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন না? মামাবাড়িতে আমি অবশ্য কোন কষ্টই পাইনি। ছেলেবেলায় আমি যতই ঝগড়া করি না কেন, বড় হবার পর থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, মামা ভাগ্নে আর ছেলের মধ্যে কোন পক্ষপাত দেখাননি। আমরা সমান আদর-যত্নে মানুষ হয়েছি। তবু মনের খুঁতখুঁতি থেকে যায়। শত হলেও মামাবাড়ি। যুবক শক্ত-সামর্থ উপার্জনক্ষম বাবা থাকতে আমি কেন মামার ঘাড়ে এসে পড়লাম? যে দায়িত্ব মামার নেওয়ার কথা ছিল না তা তিনি কেন নিতে বাধ্য হলেন? এই অবিবেচনার জন্যে বাবাকে আমি দায়ী না করে পারিনে!

কিন্তু মাসীমার কথাবার্তায় আমার কেন যেন মনে হয়েছে, এর জন্যেও বাবাকে ষোল আনা দায়ী করা চলে না। আমি একটু বড় হওয়ার পর তিনি নাকি আমাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিদিমা নিতে দেননি। তিনি বলেছেন, 'ওকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে? তোমার চাল নেই চুলো নেই, বাসা নেই বন্দর নেই—তুমি ওকে মানুষ করবে কী করে?'

তারপর বাবার যখন ফের চাল-চুলো হল, তিনি বিয়ে-থা করে ফের যখন ঘর বাঁধলেন, তখনও তিনি আমাকে আর একবার নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিদিমা দেননি, বলেছেন, 'সৎমার হাতে আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারব না। দিলে কি ও বাঁচবে, না মানুষ হবে?'

মাসীমা হেসে বলেন, 'তা ছাড়া তুমিই কি থাকতে পারবে? তুমি তোমার মাসীর কোল ছেড়ে নামতে চাইতে নাকি? তুমিও থাকতে পারতে না, তোমার মাসীও থাকতে পারত না।"

তা জানি। আমাকে ছেড়ে থাকতে এখনও আমার মাসীমারও যে কী কষ্ট হয় তা কি আর আমি জানিনে? রামপুরহাট থেকে এই কলকাতা কতটুকুই বা দূর ক'ঘণ্টারই বা রাস্তা। তবু প্রতিবার চলে আসবার সময় মাসীমার মুখ দেখে মনে হয়, তাঁর ছলছল চোখ দেখে মনে হয়, আমি যেন সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে চলে যাচ্ছি। ফের যেন তিনি আমাকে আর ফিরে পাবেন না। কোন কোনওবার আমার মনে হয়েছে, কাজ নেই আমার বিদ্যার্জনে। আমি ও'র কাছ-ছাড়া হব না। আমি ও'কে বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করতে দেব না। আমি চিরকাল ও'র কাছেই থেকে যাব।

আবার কখনো কখনো ও'র এই উগ্র আসক্তি আমাকে বিরত এমনকি পীড়িত করেও তুলেছে। বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছি আমি। ও'র কাছ থেকে আমি অনেক দূরে—অনেক দূরে সরে থাকতে পারলে যেন বাঁচি। আমার মা যত দূরে গেছেন, তত দূরে না হলেও আমার বাবা যত দূরে সরে রয়েছেন ঠিক তত দূরে, ঠিক তেমনি করে ও'র সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে দূরে চলে যেতে আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার মন গভীর মমতায় ভরে ওঠে। সত্যিই তো, আমি ছাড়া ও'র আর কে আছে? আজ আমার বয়স হয়েছে, পড়াশুনো বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আমার পৃথিবী অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে, জীবনের কোন রকমের কোন সংগ্রামকেই আমি আর ভয় করিনে, উদ্দেশ্য স্পষ্ট হোক, অস্পষ্ট হোক, স্থির হোক, অস্থির হোক, জীবনের স্বাদ আমি পাচ্ছি। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আজ মাসীমাকে আমার না হলেও চলে। কিন্তু আমাকে ছাড়া যে ও'র কোন-দিন চলবে না সে কথা ভুলি কী করে?

বাবাকে আমি আসামীর কাঠগড়া থেকে অনেকদিন আগেই নামিয়ে এনেছিলাম। সত্যি, তাঁকে প্রায় বেকসুরে খালাস দেওয়া যায়। আমি যে বাবার ছেলে না হয়ে আমার এই বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মামার ভাগ্নে

হয়ে রয়েছে তার জন্যে অনেকখানি দায়ী ঘটনাচক্র। কিন্তু নিজের কাছে তিনি আমাকে নাই বা রাখলেন, খরচপত্র তো পাঠাতে পারতেন। তা হলে ভিতরে ভিতরে মামার কাছে আমাকে এমন চিরঋণী হয়ে থাকতে হত না।

মামীমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা।

তিনি বললেন, "এতেও বিজনবাবুর বিশেষ দোষ নেই। তিনি খরচপত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তোমার মাসীমাই—। ও'দের সব মান-অভিমানের পালা কে বুঝবে বাবা ? কিন্তু বাচ্চু, তোমারই বা ওসব আদ্যিকালের পুরোনো কথা ঘাঁটবার লোভ কেন? তোমার অভাব কিসের? ঠাকুরঝির ও যাই হোক কিছু আছে। শুধু তার সম্পত্তির আয় থেকেই তোমার পড়াশুনোর খরচ চলে যেতে পারে। তোমার মামা অবশ্য তা কিছুতেই নেবেন না। গরীব হলেও নিঃস্ব ফকির তো আর নন। তোমার কী চাই তাই বল তো ? একটি টুকটুকে বউ ছাড়া তোমাকে সবই তো এনে দিয়েছি।"

আমিও হেসে জবাব দিলাম, "মামীমা, অনেক জিনিসই যে বাকি রয়েছে।"

মামীমা যদি রসিকতা করেন, আমিই বা ছাড়ব কেন। তা ছাড়া কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে মামীমার সঙ্গে আমি প্রায় দেওর-বউদির সম্পর্ক করে ফেলেছি। দেখে মজা লাগে, মাসীমার আবার এতটা ভালো লাগে না।

কিন্তু শুধু মাসীমার ধমক খেয়ে নয়, নিজের স্বভাবেই পুরোনো পারিবারিক কাহিনী থেকে আমার মন সামনের দিকে সরে এল। আমি দেখতে লাগলাম, পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে। চিনবার জানবার বুঝবার ভালোবাসবার বস্তু আর ব্যক্তির অভাব নেই। আমার ছেলেবেলা মায়ের কোলেই কেটেছে, না মাসীর কোলেই কেটেছে, আমি বড় হবার পর সে কথা আজ তুচ্ছ হয়ে গেছে, আমার থাকা-খাওয়া, পড়াশুনো বাবার টাকায় চলেছে না মামার টাকায় চলেছে, এ তথ্যও আজ তাৎপর্যহীন, অকিঞ্চিৎকর। আর এক বছর বাদে এম-এ পাস করবার পর আমি কিছু না কিছু করবই। আমার রোজগারের টাকা বাবা পেতেন, তার বদলে মামা পাবেন এইটুকুই যা পার্থক্য। এই ভিন্নতা শুধু শব্দের। অর্থ এক। আমি, যেমন মাতৃস্নেহ পেয়েছি মাসীর কাছ থেকে তেমনি না হয় পিতৃস্নেহ মামার কাছ থেকেই পেলাম। আমার মনে এখন আর কোন ক্ষোভ নেই, খুঁতখুঁতি নেই। আমার জীবনধারা উৎস থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। সেদিকে সে আর ফিরেও তাকায় না। আমার এখন মনে হয়, আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতীতের সব বন্ধনমুক্ত। বর্তমান আমার কাছে পরম উপভোগ্য। ভবিষ্যৎ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে—আমি আমার নিজের হাতে তাকে কী আকার দেব, রূপ দেব, সেই অপেক্ষায়। সেখানে বাবা কাকা মামা মাসী সবায়েরই এক নম্বর দু নম্বরের পার্ট। প্রধান ভূমিকা আমার। কোন দৃশ্যই আমার অনুপস্থিতি সইতে পারে না। আমি রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে না দাঁড়ালে নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

স্নেহ ? স্নেহ আমি ঢের পেয়েছি। স্নেহের অপেক্ষা আমি আর করিনে। বরং অতি স্নেহের বিড়ম্বনা আমি মাঝে মাঝে ভোগ করি। মাসীমা আমাকে সপ্তাহে দুখানা করে চিঠি লেখেন। আমাকে তার জবাব দিতে হয়। একখানা চিঠি কম পেলে তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। সব যত্নেও মাঝে মাঝে আমি বড় বিব্রত বোধ করি। কোন কোন সময় এমন চিঠিও যায় যা নিতান্তই কর্তব্যবোধ থেকে লেখা, যাতে মায়া-মমতা শ্রদ্ধা-প্রীতির নামগন্ধও নেই।

আমার বন্ধু শুভেন্দুও ওর পিতৃস্নেহের অত্যাচারে কম জর্জরিত নয়। ওর বাবাও ঘন ঘন চিঠি লেখেন, উপদেশ নির্দেশ দেন, শুভেন্দু যা একেবারেই বাহুল্য মনে করে। মাঝে মাঝে ছুটিতে ও ওদের গাঁয়ের বাড়িতে যায়। আর ফিরে এসে আমার কাছে নালিশ করে, 'বাবার জ্বালায় আর পারা গেল না। তিনি চান, আমি একেবারে তাঁর ছাঁচে ঢালাই

হয়ে গড়ে উঠি। আমার চুল ছাঁটা দাড়ি কামানো থেকে শুরু করে কী পড়ব, কখন পড়ব, তাও তিনি বলে দেবেন। সব তাঁর পছন্দমত করতে হবে।'

শুভেন্দুর বাবা হাইস্কুলের হেডমাস্টার। এম-এ পরীক্ষার্থী পুত্র তাঁর আর ছাত্র হতে রাজী নয়। আমার মামা অত খবরদারি করেন না। তিনি তাঁর মুন্সেফ কোর্ট আর মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত। শুভেন্দুর বাবার মত আমার যে একটি বাবা নেই এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। এক মাসীর স্নেহেই আমি অস্থির। এর পরেও যদি অগাধ পিতৃস্নেহ ধারাবাদলে নেমে আসত, আমি ধরে রাখবার পাত্র পেতাম কোথায়?

যখন বাবাকে দিয়ে আমার আর কোন প্রয়োজনই নেই, তাঁর অস্তিত্বের কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি তখন মাত্র এই দিন পনের আগে তিনি আমার এই ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম বিজনবিহারী দত্ত।'

নাম বলবার দরকার ছিল। ছেলেবেলায় আমাদের রামপুরহাটের বাড়িতে আমি ও'কে দু-একবার দেখেছি। ও'র চেহারা আমার মনে আছে। তা ছাড়া ও'র ফোটো আমি মাসীমার ট্রাঙ্কের ভিতরে দেখেছিলাম। সে ফোটো কেন যে দেয়ালে টাঙানো হয়নি, আমি জানিনে। হয়তো দিদিমার অপছন্দ ছিল। তারপর অন্য সবাইয়ের।

আমি তাঁকে প্রণাম করে একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম। বাবা সেই ফোটো থেকে বেশী বদলাননি। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। ফুট-ফুটে ফর্সা রঙ। একগাছিও পাকা চুল দেখলাম না মাথায়। পরনে ছাই রঙের ট্রাউজার আর সাদা শার্ট। বেশ স্মার্ট চেহারা। আমার মামার মত কি শুভেন্দুর বাবার মত যেমন রাশভারি নন, তেমনি বুড়িয়েও যাননি। দেখে ভাল লাগল। দেখলাম শুধু আমি নই, শুভেন্দু পর্যন্ত তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। একটু বাদেই সে অবশ্য আমাদের কথা বলবার সুযোগ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না। কী বলব? মনেক কথাই যে মনের মধ্যে জমে রয়েছে। অনেক অভিযোগ-অভিমানের কথা। সেসব একা একা নিজের মনে মনে বলা যায়। কিন্তু একজন অর্ধ-পরিচিত ভদ্রলোককে তার কিছুই বলা যায় না।

তিনিই প্রথম কথা বললেন, 'এদিকে যে একটা হস্টেল আছে জানতামই না। বেশ খুঁজে খুঁজে তোমাকে আবিষ্কার করলাম।'

মনে মনে ভাবলাম আবিষ্কার! এক হিসেবে অবশ্য তাই। কিন্তু সত্যিই কি আমাকে তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন? আমার সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কতটুকু তিনি জানেন বা জানবার মত গরজ তাঁর আছে?

বললাম, 'আপনার খুব কষ্ট হয়েছে।'

তিনি বললেন, 'না, না, কষ্ট কি আর! কষ্ট আমার কিছুতেই হয় না। ফার্মের কাজে এসেছিলাম। আজই চলে যাব। ভাবলাম, তোমাকে একবার দেখে যাই। ক'দিন ধরেই ভাবছি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি।'

মাত্র ক'দিন ধরে! এই বিশ বছরের মধ্যে মাত্র ক'দিন ধরে আমার কথা ও'র মনে পড়ছে!

আমি বললাম, 'আমি আসছি। আপনি একটু বসুন।'

তিনি বাধা দিলেন। হেসে বললেন, 'ওসব ফর্মালিটি রাখো। খাবার-টাবার আনাতে হবে না।'

কিন্তু আমি তাঁর নিষেধ মানলাম না। হস্টেলের চাকরকে একটি টাকা দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম।

ফিরে এসে দেখি তিনি সিগারেট ধরিয়ে আমার টেবিলের বইগুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

আমি এসে তক্তপোশের ওপর বসতে তিনি ফের আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'তুমি কি হিস্ট্রিতে এম এ দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'আর্টস। আমার সায়েন্স ছিল। বি এসসি পর্যন্ত পড়েছিলাম। তারপর আর হল না। আমি ভেবেছিলাম তোমাকেও ওরা ওদিকেই দেবে। কোন টেকনিক্যাল লাইনে-টাইনে যেতে পারতে। শুধু আর্টস পড়ে—।'

মনে মনে হাসলাম। যে বাবা আমার কোন খোঁজখবরই নেননি, কোন যোগাযোগ রাখেননি, তিনিও চান, আমি তাঁর মত হই। তাঁর পছন্দমত পড়াশুনো করি, তাঁর রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণামত নিজের জীবনকে গড়ে তুলি। শুধু শুভেন্দুর বাবাই নন প্রত্যেক বাবাই কি চান ছেলে তাঁর প্রোটো-টাইপ হোক?

বললাম, 'ইন্টারমিডিয়েটে যখন ভর্তি হই তখন এসব নিয়ে কথা হয়েছিল। মা নিজেও বলেছিলেন সায়েন্স নিতে। কিন্তু—।'

আমার কিন্তুটুকু তিনি শুনতে চাইলেন না। বা শুনবার মত ধৈর্য রইল না তাঁর। তিনি অতি আগ্রহে বলে উঠলেন, 'বলেছিল? রেণু বলেছিল?'

আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। বোধ হয় বুঝতে পারলেন অতটা আগ্রহ দেখানো ঠিক হয়নি। অতটা উৎসাহিত হয়ে ওঠা অশোভন হয়েছে।

আমি নিচু গলায় বললাম, 'হ্যাঁ বলে-ছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, মামাও বলে-ছিলেন। কিন্তু আমিই সাহস পেলাম না। অংক-টংক জানিনে। অংক আমার গোড়া থেকেই বিভীষিকা। বিণ্টু—আমার মামাতো ভাইয়ের কথা বলছি। ও একেবারে উল্টো।

অংকে কখনো নাইনটির কমে পেত না। এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে শিবপুরে। ওরও এবার ফাইনাল ইয়ার।'

কিন্তু বাবা যেন এসব কিছুই শুনছিলেন না। আমাদের পারিবারিক খুঁটিনাটি বৃত্তান্তে তাঁর কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হল না।

তাহলে কিসে তাঁর আগ্রহ? আর কোন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি? আমি কি ও'র দ্বিতীয় সংসার—আমার বৈমাত্রেয় ভাইবোনদের কথা জিজ্ঞাসা করব? এ আমার ঠিক ঈর্ষা নয়, অনুদারতা নয়, ওসব কথা তুলতে আমি সংকোচ বোধ করলাম। তিনি নিজে যদি তোলেন, তা হলে আমি তাতে যোগ দিতে পারি। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় ও প্রসঙ্গে যেতে পারিনে। মামাবাড়িতেও আজকাল ও'দের কথা কেউ তোলেন না। মাসীমা তো নয়ই, মামা-মামীকেও ও'দের কথা উল্লেখ করতে শুনিনে। অনুল্লেখ দিয়ে, অস্বীকৃতি দিয়ে আমরা ও'দের অস্তিত্বহীন করে রাখতে চাই। এখন হঠাৎ ওসব কথা পাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চা আর খাবারটা এসে গেলে বাঁচা যেত।

বাবা অনামনস্কভাবে ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির পাতা ওলটাচ্ছিলেন। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম ওই ওলটানোই সার। একটি লাইনও পড়ছিলেন না। কি করছিলেন, কে জানে! নিজের জীবন-ইতিহাসের কোন কোন অধ্যায়ে কি তিনি ফিরে গিয়েছিলেন?

বইটি বন্ধ করে ফের তিনি আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'রেণু তোমাকে খুব ভালোবাসে। না?'

এ প্রশ্নের উত্তর অবান্তর। একান্ত বাহুল্য। আমি তাই চুপ করে রইলাম।

তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ও আর কী করে?'

বাবা জানতে চান, মাসীমা ভালোবাসা ছাড়া আর কি করেন। আমি দেখেছি, তিনি যা করেন, ভালোবাসার জন্যেই করেন।

বললাম, 'কী আর করবেন? ঘর-সংসারের কাজ। অবসর সময়ে একটু পড়েন-টড়েন। সেলাই বোনা-টোনাও আছে।'

বাবা বললেন, 'একেবারে ঘরের মধ্যেই রইল। অথচ ওর অনেক পার্টস ছিল। তোমার মায়ের চেয়েও—।'

'আপনি কার কথা বলছেন?'

আমি বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলাম। আমি শুনতে চাই তাঁর কথা, আমি জানতে চাই। এ আমার কৌতূহল মাত্র নয়। মমতাও। যিনি আমার স্মৃতিতে নেই। কিন্তু কল্পনায় আছেন। নানা সময় নানাভাবে ধরা দিয়েছেন, সাড়া দিয়েছেন। অথচ তাঁর কথা আমরা কেউ আর কখনো বলিনে। বাবার দ্বিতীয় পক্ষকে আমরা ইচ্ছা করে ভুলেছি, প্রথম পক্ষকে বিস্মৃতি নিজে এসে ঢেকে দিয়েছে। সেজন্যে কারো কোন চেষ্টা করতে হয়নি।

বাবা বললেন, 'তোমার মার কথা।'

তাঁর গলা খুব মৃদু। যেন খুব গোপন, অবৈধ কোন প্রসঙ্গ তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বললেন, 'তার কথা তুমি বোধ হয় বিশেষ কিছু শোননি।'

বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'শুনবার কীই বা আছে। বিশ্বাস করো, আমি তাকেও ভালোবাসতাম। হ্যাঁ, শেষদিন পর্যন্ত। কিন্তু—'

হস্টেলের চাকর খাবার নিয়ে এলো। বাবা বাঁচলেন, আমি বাঁচলাম।

তিনি বললেন, 'দেখ তো, এসব আবার কেন আনালে। মিষ্টি-টিষ্টি আমি খাইনে।'

আমি বললাম, 'একটু খান।'

তিনি সিংগাড়াগুলি রেখে জোর করে দুটি সন্দেশই আমার হাতে তুলে দিলেন।

ছেলেবেলায় কি পেয়েছিলাম না পেয়েছিলাম, মনে নেই, কিন্তু বড় হবার পর এই আমি প্রথম পিতৃস্পর্শ পেলাম। কিন্তু এ স্পর্শের কি আলাদা কোন স্বাদ আছে? মাহাত্ম্য আছে? কী জানি!

খেতে খেতে বাবা ফের মাসীমার কথায় ফিরে গেলেন। বললেন, 'রেণুর অনেক গুণ ছিল। কিন্তু কাজে লাগাল না। ও একেবারে ঠিক ওর মায়ের মত হয়ে রইল। আমি ওকে বলেছিলাম আরো পড়াশুনো করতে, বাইরের কাজকর্ম করতে। কিন্তু ও আমার কোন পরামর্শই শুনল না। ও আমার কোন কথা, কোন অনুরোধ রাখল না। কিছুই আর নিল না আমার কাছ থেকে। শুধু তোমাকে ছাড়া। আর আমি দিলামই যদি, একেবারে স্বত্বত্যাগ করে দিয়ে দিলাম।'

বাবা আমার দিকে তাকালেন না। চায়ের কাপ শেষ না করেই দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন।

হঠাৎ কিসের একটা বিদ্বেষে আমার মন ভরে উঠল। তিনি আমাকে দিয়ে দিলেন? আমি কি একটা নির্জীব বস্তু? স্মারক-চিহ্নের সোনার আংটি? আমাকে তিনি নিয়ে এসেছেন এ কথা মানি, কিন্তু আমাকে দিয়ে দেবার অধিকার তাঁকে কে দিল?

আরো কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম। তারপর হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ইস, অনেক দেরি হয়ে গেল। লিণ্ডসে স্ট্রীটে আমার আর একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।'

এ যেন অন্য মানুষ। একেবারে কর্মিতকর্মা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। কিছুক্ষণ আগের স্মৃতিভারাতুর প্রৌঢ় ভদ্রলোক এরই মধ্যে কোন লোকে উধাও হলেন? নাকি বাবা জোর করেই তাঁকে বিদায় দিলেন, লুকিয়ে ফেললেন? তা যদি পেরে থাকেন, অসীম ক্ষমতা ও'র।

যাওয়ার সময় বললেন, 'তোমাকে তো কিছু দেওয়া হল না।'

ব্যাগটা একবার খুলে দেখলেন, বললেন, 'না। এতে কুলোবে না।'

বললাম, 'কিছু আপনাকে দিতে হবে না।'

বাবা একটু হেসে বললেন, 'তুমি যখন হও, একটি তামার পয়সা দিয়ে মুখ দেখেছিলাম। তোমার দিদিমা বললেন, তাই নিয়ম। বাপকে তাই নাকি দিয়ে দেখতে হয়।'

আশ্চর্য, প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসিমুখেই বিদায় নিলেন। সেই প্রথম পুত্রমুখ দর্শনের স্মৃতি তাঁকে কি জীবনের সব দুষ্কৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে?

আমি জানি, এক শ' টাকার এই মানি-অর্ডারটা ফেরত পেয়ে তাঁর মুখের সেই হাসিটুকু নিবে যাবে। তিনি খুব দুঃখ পাবেন, কষ্ট পাবেন, তা আমি জানি।

কিন্তু কষ্ট আমরা কেই বা না পেয়েছি?

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥৯॥

রমণী না স্বৈরিণী না কুহকিনী

জীবন আবার শুনতে পেলো আপনি কি বাঙালী? এতক্ষণ নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিল, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল বুদ্ধিতে অভিভূত ভাব, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিভব কাটিয়ে শুধোলো, কি করে বুঝলেন?

বাঙালীবাবুদের মুখে চোখে এমন একটা কিছু অসামান্য আছে যা সহজেই বুঝিয়ে দেয় বাঙালী বলে।

আপনি বুঝি অনেক বাঙালী দেখেছেন?

অনেক আর দেখলাম কই। অনেক দেখলে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাংলা মুলুকেই চলে যেতাম।

জীবন কি উত্তর দেবে ভাবছে এমন সময়ে বাইরের গোলমাল উৎকটতর হ'য়ে উঠল।

যুবতী বলল, ভিতরে চলুন, লুকোতে হবে।

কেন, লুকোবো কেন?

তবে এই বাড়িতেই বা ঢুকলেন কেন?

গুলী চলছিল, গায়ে লাগতে পারে আশঙ্কায়।

সে আশঙ্কা এখনো যায় নি, বরঞ্চ বেড়েছে।

কেমন?

এখনি ওরা এসে খানাতল্লাসি করবে?

ওরা কারা?

তা বুঝি জানেন না। সিপাহীলোক ক্ষেপে উঠেছে।

কাদের উপরে?

কিছুই খোঁজ রাখেন না আর রাহী সেজে পথ চলছেন। সাহেবদের উপরে।

আমি সাহেব নই, সাহেবের চাকুরিও করি না, আমার উপরে রাগবে কেন?

কিন্তু আপনি তো বাঙালী। ওদের এক বুলি ইংরেজ ঔর বাঙালী এক হ্যায়।

এবারে হেসে ওঠে জীবন। স্যার হেনরি উপস্থিত থাকলে বলতেন, I love that smiling face।

যুবতী বলে, এ সময়ে আপনার হাসি পায়। আপনার সাহস তো কম নয়।

হাসতে যে সাহসের দরকার হয়—এই প্রথম শুনলাম। কিন্তু এখনো শুনলাম না, কেন বাঙালীর উপরে রাগ।

সেটা না হয় রয়ে-ব'সে পরে শুনবেন। এখন এইটুকু জেনে রাখুন আপনাকে যে সিপাহি ধরবে সে পঁচিশ টাকা ইনাম পাবে। আসুন, ঐ শুনুন ওরা আরো কাছে এসে পড়েছে। অন্ধকারে চলতে আপনার অসুবিধা হবে, আমার হাত ধরুন, বলে অপেক্ষা না করে ধরলো জীবনের হাত—নিন আসুন।

জীবন ইতিপূর্বে কখনো অনাত্মীয় যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করে নি। চলতে চলতে সে বলল, বাঙালীর মাথার দাম মাত্র পঁচিশ টাকা—শুনলে সব বাঙালী ক্ষেপে উঠবে। টোলে পড়বার সময়ে পণ্ডিতমশায় বলতেন আমার মাথার মধ্যে নাকি গোবর ভরা—তবু তার দাম পঁচিশ টাকার বেশি।

পচা গোবর হ'লে অবশ্যই বেশি।

কেন?

কেন কি পচা গোবর যে সার, ফুল ফোটায়, ফল ধরায়।

দুজনে দোতালার একটি প্রশস্ত কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দরজা-জানলা বন্ধ—একটি শেজের আলো জ্বলছে।

যুবতী বলল, এই ঘরে আপনাকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

জীবন এক নজরে ঘরটা দেখে নিল, এক-ধারে প্রশস্ত পালঙ্কে কোমল শয্যা, দেয়ালে তৈলচিত্র, এক পাশে বাদ্যযন্ত্র, বুঝল যুবতীর পরিচয়। তখনি তার হাত ছেড়ে দিয়ে, ঘরে নিরাপদে ঢুকবার পরেও এতক্ষণ হাত ছাড়ে নি, যুবতীও আপত্তি করে নি, বলে উঠল, আমি তোমার ঘরে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাতে চাইনে।

এক দমকায় 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামাতেই বুঝতে পারছি যে আমার পরিচয় বুঝতে ভুল হয় নি আপনার।

এই সপ্রতিভ রমণীর কথার উত্তর খুঁজে পায় না জীবন।

রমণী আবার বলে—কিন্তু এখন বুঝেছি যে ও মাথার দাম পঁচিশ টাকাও নয়, ওতে পচা গোবরের বদলে আছে তাজা গোবর।

ঈষৎ বিরক্তির সুরে জীবন বলল, এখন ঠাট্টা রাখো।

সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। এমন নিরেট মাথা অল্পই দেখা যায়। আপনি অতর্কিত আক্রান্ত হয়েছেন তখন হাতের কাছে যা পাবেন তাই দিয়ে আত্মরক্ষা করবেন—এই তো স্বাভাবিক। অত্যাচারের মুখে আচার আঁকড়ে থাকলে মরতে হয়।

মরলামই বা।

তবে বাড়িতে ঢুকলেন কেন?

গুলীতে মরতে চাই না।

ফাঁসিতে মরতে চান! হাজতে পচে মরতে চান। বাস্তবিক আপনার বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারা যায় না।

অনেকটা নরম হ'য়ে জীবন বলে, তবে কি করতে হবে?

পিঠের ওই বোঁচকাটা খুলুন, পাগড়ী খুলুন। বাপরে বাপ, কোমর বন্ধে আবার পিস্তলও আছে দেখছি। এমন জঙ্গী বাঙালী পেলে সিপাহীরা আপনাকে জেনারেল না ক'রে দিয়ে ছাড়তো না। এই বলে সাহায্য করে, পাগড়ী, বোঁচকা, পিস্তল খুলতে।

এবারে?

দাঁড়ান, আগে এগুলো পাশের ঘরে লুকিয়ে রেখে আসি।

জিনিসগুলো নিয়ে যুবতী প্রস্থান করলে পরিশ্রান্ত জীবন পালঙ্কের উপরে বসে। মুহূর্ত পরে যুবতী ফিরলে শুধোয়, এবারে কি করতে হবে।

উপরের পিরানটা খুলে পালঙ্কে শুয়ে পড়তে হবে, অভিনয় করতে হবে যেন আপনি আমার পেয়ারের মানুষ।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে জীবন, পারবো না।

বাপরে বীর পুরুষ।

তার স্বর স্নেহময় ব্যঙ্গে মিশ্রিত। তারপরে হেসে বলে, ওঃ, অভিনয়ে আপত্তি বুঝি, একেবারে আসল চাই।

একটু থেমে বলে সযি খাঁর লোকের হাতে মাথাটা বেঁচে গেলে ইচ্ছা করলে তাও পাবেন। ওই শুনুন, নিচের তলায় ঢুকে পড়েছে। শুয়ে প'ড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন, কারণ এখন আমি যা করবো তা দেখা আপনার মতো বীরপুরুষের কর্ম নয়।

জীবন শুয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায়, ভিতরে ভিতরে ঠেলা মারতে থাকে প্রচণ্ড কৌতূহল। সিঁড়িতে অনেকগুলি লোকের পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে। যুবতী দক্ষ দ্রুত হস্তে দোপাট্টা কাঁচুলি ঘাগরা খুলে ফেলে স্বচ্ছ একটা ওড়না গায়ের উপর টেনে নেয়, অপেক্ষা করে খোলা দরজার সম্মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় তমিজ মিঞা, সঙ্গে পাঁচ-সাত জন বন্দুক কিরিচধারী সিপাহী।

তমিজ মিঞা যুবতীকে ঐ বেশে দেখে এক গাল হেসে বলে এ কি পান্নাবিবি, আজ যে দিনদুপুরে চাঁদের জলুস।

তার কথার উত্তরে মাথা ঘুরিয়ে-দেওয়া হাসি নিক্ষেপ করে পান্না বলে, কেন মিঞাসাহেব, দিনদুপুরে চাঁদ কি কখনো দেখ নি।

তমিজ মিঞা গজল রচনা করে, গান গায়, কোম্পানীর আবগরী বিভাগে কাজ করে, নানান রসের উপরে তার স্বাভাবিক অধিকার, রসিক লোক। সে বলল, এখন দুঃখ হচ্ছে যে আগে দেখি নি। রাতের চাঁদের চেয়ে দিনের চাঁদ অনেক বেশি সুন্দর।

পান্না বলে, কেউ দেখে না তাই রক্ষা।

এমন সময়ে তমিজ মিঞার লক্ষ্য পড়ে পালঙ্কের দিকে, বলে, রক্ষা আর কই চাঁদবিবি, ওই যে রাহু হাজির।

পান্না তাকে দেখিয়ে বলে, আর এদিকে এই যে খোদ কেতু হাজির।

না পান্নাবিবি, একসঙ্গে রাহু আর কেতু আক্রমণ করলে চাঁদ আর আস্ত থাকবে না, এখন চললাম।

প্রস্থানোদ্যত তমিজ মিঞাকে শুধোয়—তা কি মনে ক'রে এদিকে এসেছিলে মিঞাসাহেব?

বাড়ি বাড়ি তলাসী ক'রে বেড়াচ্ছি বখৎ খাঁর হুকুম। লোকে বলল এখানে নাকি একটা আদমী ঢুকেছে।

পান্না বলে—ঐ তো দেখতে পাচ্ছ আদমী।

তমিজ মিঞা রসিক পুরুষ আদমীতে আদমীতে তফাত বোঝে, বলল কী যে বলো, বিবি। পেয়ারের আদমী আর দুশমন আদমীতে তফাত কি বুঝতে পারবো না। এখনো বুড়ো হই নি বিবি, চুল দাড়ি যে পেকেছে ওটা আমাদের বংশের ধাত।

সেলাম মিঞাসাহেব। আর একদিন এসো। দিনে না রাতে।

যখন ফুরসত হবে তোমার।

পান্নাবিবি, ফুরসত বুঝি আর হবে না। কেন?

বখৎ খাঁর হুকুম সবাইকে দিল্লি রওনা হ'তে হবে।

কৃত্রিম দুঃখে পান্না বলে, তবে তো বড় মুশকিল।

তখন উভয়পক্ষে সেলাম জানানোর পরে তমিজ মিঞা দলবল নিয়ে বিদায় হ'য়ে যায়।

মুখ ফেরাতে পারি? শুধোয় জীবন।

মুখ ফেরাতে পারি। বড় সাধু। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হচ্ছিল, দেখি নি কি! ঘাগরা, কাঁচুলি পরতে পরতে উত্তর দেয় পান্না।

কখখনো না, বলে উঠে বসে জীবন।

অনুমতি না নিয়েই উঠে বসলে যে; যদি আমার কাপড় পরা না হ'তো। দেখবার ইচ্ছাটি আছে সাহস নাই। কাপুরুষ।

এ অপবাদের উত্তর না দিয়ে জীবন বলে আবার ঐ লোকটাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলে কেন?

তোমার কি একাই ভোগদখল করবার মতলব নাকি?

কখখনো না বলে রেগে ওঠে জীবন।

পৌরুষের আর কিছু না থাক রাগটি আছে, তবু ভালো।

তোমারই মতলব ভালো নয় দেখছি।

কাঁচা মৃগ-মাংসে আমার লোভ নাই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

তাই বুঝি বুড়ো ভেড়াকে নিমন্ত্রণ ক'রে রাখলে।

কাজেই, শাস্ত্রেই বলেছে কি না কচি পাঁঠা বুঝে মেরে।

বাক্‌যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে জীবন বলে ওঠে, পাম্না, তোমার কোন্‌ কথাটা যে সত্য আর কোন্‌টা পরিহাস বুঝতে পারি না।

সময়ে পারবে। আর তা ছাড়া পরিহাসের মতো নিষ্ঠুর সত্যই বা কোথায়। নাও, এখন ওঠো খোকাবাবু।

অনাত্মীয় যুবতীর মুখে বিশ বৎসরের যুবককে খোকাবাবু সম্বোধন অপমানের চূড়ান্ত। জীবন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে দেখো অপমান ক'রো না।

মুখ টিপে হাসে পাম্না, বলে, খোকাবাবু নয় তো কি? শুতে বললাম শুলে, উঠতে বললাম উঠলে।

বাক্‌যুদ্ধে পর্যুদস্ত জীবন বলে, এবারে আর শোয়াও নয়, উঠাও নয়। আমার জিনিস-গুলো দাও।

বিস্মিত পাম্না শুধায় কেন?

রওনা হ'ব।

কোথায়? বখৎ খাঁর সঙ্গে দিল্লি নাকি?

পাগল, আমি ওদের সঙ্গে যাবো কেন?

কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে পাম্না বলে, পাগল না হলে কেউ এখন রওনা হওয়ার কথা ভাবে না।

কেন?

দেখলেই খুন ক'রে ফেলবে।

তবে?

তবে আর কি ওরা রওনা না হ'য়ে যাওয়া অবধি এখানে থাকবে।

কতদিন হবে?

তিনদিন হ'তে পারে আবার তিনমাস হতেও, ঠিক নাই।

অসহায়ভাবে বলে, এইভাবে বসে থাকবো?

ব'সে থাকবে কেন; বাজাই, খাবে, শোবে, ঘুমোবে, গান যদি জানো তো গাইবে আমি সঙ্গে নাচবো—কিন্তু সব আগে স্নান করবে, রোদে তেতেপুড়ে এসেছ, অতএব ওঠো।

বিস্ময়ের অবধি থাকে না জীবনের। কে এই রমণী? বিনা ভূমিকায় কেমন ক'রে সে প্রবেশ করলো তার জীবনের মধ্যে। সে ভাবে এক মুহূর্তের পরিচয়ে চিরকালের জানা হয়ে যাওয়ার নামই কি প্রেম! শুধায় আমার পরিচয় জানো না, নাম জানো না, কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাবো কিছুই জানো না, বাড়িতে স্থান দিচ্ছ মনে ভয় ডর নেই।

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে ফেললে, দাঁড়াও একে একে উত্তর দিই। এই বলে আরম্ভ করে—তোমার নাম জীবনলাল, আসছ লখনৌ থেকে, যাবে—

বাধা দিয়ে বিস্ময়ে জীবন বলে ওঠে তুমি কি মায়াবী নাকি, তুমি কি জাদু জানো?

গম্ভীরভাবে পাম্না বলে, কিছু কিছু জানি বই কি? বোকা পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারি!

সে কথাটা কানে না তুলে জীবন শুধায়, আচ্ছা যাদু যদি জানো বলো যাবো কোথায়?

জানি না, কারণ তুমিও জানো না, তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত দিল্লিতেই যেতে হবে।

বখৎ খাঁর সঙ্গে নাকি?

না, কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে।

জীবনের আর সন্দেহ থাকে না যে পাম্না যাদুকরী। সত্যিই তো এইমাত্র সে মনে মনে সংকল্প করছিল যে কর্নেল ব্রিজম্যানের ফৌজে যোগ দিয়ে দিল্লি যাবে আর সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়বে। স্বীকারোক্তির সুরে সে বলে উঠল, পাম্না সত্যিই তুমি যাদু জানো।

সেইসঙ্গে কিছু ইংরাজীও জানি। তার-পরে ব্যাখ্যার সুরে বলে, আমার কিছু কিছু ইংরেজ ভক্তও আছে কি না, তাদের কাছেই শিখেছি।

না হয় শিখলে কিন্তু তাতে ক'রে আমার নামধাম জানা যায় কি ক'রে?

এমন বোকাও তো দেখি নি। তোমার ঐ থলেটার উপরে ইংরাজী অক্ষরে জীবনলাল, লখনৌ লেখা আছে কিনা।

এমন জটিল সমস্যার এমন সরল সমাধানেও সংবিৎ হয় না জীবনের, শুধায় আর দিল্লি যাওয়া।

সে কথা ধীরেসুস্থে বলবো, এখন ওঠো

তো, এই নাও তোমার থলিঝুলি, এই বলে পাশের ঘর থেকে এনে দেয় সেগুলো, নাও লক্ষী ছেলের মতো কাপড়-চোপড় বের করো, আর ছেড়ে ফেলো গায়ের পিরান, কোর্তা।

নত হয়ে থলিটা তুলে নিয়ে জীবন রওনা হয়।

ও কি চললে কোথায়?

যেখান থেকে দুমুহূর্ত আগে এসেছিলাম সেখানে।

বুদ্ধিমতী পান্না মুহূর্তে সব বুঝে নেয়, বলে, আমার ঘরে, আমার হাতে জলগ্রহণ করবে না এই তো?

ক্ষণকালের জন্য একটা স্বচ্ছ বাষ্পের পর্দা ঢেকে দেয় পান্নার হাসিতে উজ্জ্বল চোখ দুটি। তখনি সামলে নিয়ে বলে তার প্রয়োজন হবে না। আমাদের শিবপুজোর জন্য পাঁড়ে ঠাকুর আছে। সে রাঁধে ভোগ— প্রসাদ পাবে তুমি। হল তো।

ধীরে ধীরে থলিটা নামিয়ে ফেলে জীবন। সত্যই সে বড় পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত। তার খাদ্যের ও বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক।

পান্না বলে, জীবন তুমি আমাকে কিছুই জানো না, আমি তোমাকে যতটা জানি তার চেয়েও কম জানো তুমি আমাকে।

স্বীকারোক্তির দৃষ্টিতে সে তাকায় পান্নার দিকে, সত্যই বুঝতে পারে না এই অপরিচিতা ঘরণী না বৈরিণী না কল্যাণী!

পান্না তার হাত ধরে বলে, এসো আমার সঙ্গে।

॥১০॥

পান্না

"পান্না ষোড়শী, অকলঙ্ক শশী। সর্বাঙ্গ সুন্দরী বলে পান্না রোহিলখণ্ডে সুবিখ্যাতা। ঐ প্রদেশের সর্বসাধারণের ধারণা, পান্নার ন্যায় রূপবতী এবং গুণবতী রমণী বুঝি ধরাধামে আর জন্মগ্রহণ করেনি। পান্না সুশীলা, চরিত্রবতী, বুদ্ধিমতী। নর্তকী বলে সে বারবিলাসিনী নয়। বিধাতার বিধানে সে পরপুরুষগামিনী বটে, কিন্তু একের প্রতিই তার প্রীতি, যখন যার তখন তার। কর্নেল ক্রসম্যান বলেন, পান্নার মুখের মধুর হাসিটুকুর দামই দশ হাজার টাকা। পান্না রামজানি জাতীয়া। আচার নিষ্ঠা প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়। প্রত্যুষে স্নান করে পান্না ঘণ্টাকাল শিবদুর্গার পুজো করে এবং সেই সময় কাগজে হিন্দী অক্ষরে একশত আটটি করে রাম নাম লেখে; সপ্তাহান্তে প্রত্যেক রাম নাম স্বতন্ত্র করে কেটে টুকরা টুকরা করে। সেই কাগজের টুকরা আটার সঙ্গে মিলিয়ে মটরের ন্যায় এক একটি বড়ি তৈয়ারি করে। এইরূপে সপ্তাহে ৭৫৬টি রামনামের গুলি তৈয়ারি হয়। একজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সেই রাম-নামের গুলিসমূহ মৎস্যকুলের আহারের জন্য রামগঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। পান্না মাছ মাংস খায় না। পান্না যেখানে বসে সেখানে কোন নীচ জাতি বসতে পায় না। নীচ জাতি কর্তৃক স্পৃষ্ট হলে সে স্নান করে। যে বিছানায় হুঁকো থাকে সে বিছানা হঠাৎ কোন অপর জাতি কর্তৃক স্পৃষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল পরিবর্তিত হয়। উচ্চশ্রেণীর রামজানি জাতীয় প্রায় সকল নর্তকীই এইরূপ আচারবতী। পান্না ভ্রাতৃ-গৃহেই থাকে। ভ্রাতা গৃহস্থ, তার স্ত্রী কুলবধূ মাতাও পর্দানশিন। ভ্রাতৃবধূর ঘোমটা দীর্ঘ। অসূর্যম্পশ্যারূপা বলে যে কথা আছে তা পান্নার ভ্রাতৃজায়াতেই সার্থক হয়েছে। বাইরের বৈঠকখানাই পান্নার অধিকারে। পান্না সেখানেই থাকে। সেখানেই ওস্তাদ এসে পান্নাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেয়। সেখানেই পান্নার বন্ধুবান্ধব এসে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে। অন্দরে থাকে পান্নার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও মাতা। তারা গৃহস্থ। পান্নার রঙ সাদা ধপধপে, সেই শ্বেত পদ্ম থেকে গোলাপী রঙের আভা ঈষৎ দৃষ্ট হয়। মনে হতো বুঝি কোন স্বর্গের বিদ্যাধরী ধরাধামকে আলোকিত করতে এসেছেন। বড় বড় ইংরেজগণ বলতেন, ইংলণ্ডীয় রমণী বলে পান্নাকে ভ্রম হয়, কেননা, পান্নার যেমন রঙ সেরূপ রঙ এদেশে সম্ভবে না।" *

এই রামজানি সম্প্রদায়ের আদি বাস নৈনিতালের পার্বত্য অঞ্চলে, তারা নিজেদের পৌরাণিক কিন্নর জাতির বংশধর মনে

* বিদ্রোহে বাঙালী নামে গ্রন্থ থেকে ঈষৎ পরিবর্ধিত আকারে গৃহীত।

করেন। তাদের আদিবাস যেখানেই হোক তারা ছড়িয়ে পড়েছে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, পাঞ্জাব, দিল্লি অঞ্চলে। এদের রমণী সকলেই অসামান্য সুন্দরী, নৃত্য গীতাদিতে দক্ষ। পান্না সকলের উপরে। জঙ্গী ইংরেজ মহলে তার বড় খাতির। বেরিলি, মীরাট, দিল্লি, আম্বালা প্রভৃতি শহরে পান্নার নৃত্যগীত না হলে ইংরেজদের আসর জমে না। এমন কি একাধিক বার সিমলা পর্যন্ত তাকে যেতে হয়েছে। একবার লাহোর যাওয়ার ডাক এলো, পান্না বলল, বুড়ো মাকে ছেড়ে এত দূরে যেতে পারবে না। হাজার মোহর পাবে। না, সে লোভেও নয়। অন্য শ্রেণীর নর্তকীরা স্বভাবতই ঈর্ষা করে, বলে ওর রঙটা আসল নয়, মেমসাহেবদের কাছে থেকে রঙ চেয়ে নিয়ে মাখে। দু-একজন গোপনে সে পরীক্ষা করেছে—আসরের মধ্যে ঘামে রঙ গলে গিয়ে মুখ বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। তাদের আর ডাক পড়েনি। "পান্না ষোড়শী।"

ওটা অলঙ্কার, তার বয়স পঁচিশের কম নয়। তবে ষোড়শী বলতে বাধা নেই, কারণ সুন্দরী রমণীর বয়স পুরুষের চোখে, চোখ যদি বলে ষোড়শী, তবে অবশ্যই ষোড়শী। এই পান্নার ঘরে অদৃষ্টের দূরপ্রসারী হাত নিয়ে এলো জীবনলালকে।

ওগো জীবনবাবু, ওঠো, ওঠো আর কত ঘুমোবে।

জীবন ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে, বলে খুব ঘুমিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ আবার জীবনবাবু হতে গেলাম কেন?

শুনেছি যে বাবু না বললে বাঙালীরা রাগ করে। যত বাঙালী দেখলাম সবাই বাবু। আচ্ছা তোমাদের দেশে কি সকলেই বাবু।

উল্টে প্রশ্ন করে জীবন—তোমাদের দেশে কি বাবু নেই।

আছে বইকি। এই বেরিলিতেই কত বাবু আছে। বাবু লছমি নারায়ণ, বাবু মহাদেও পরসাদ। আমাদের দেশে বাবু মানে জমিদার। তোমাদের দেশে সকলেই জমিদার নাকি?

এটা সরল জিজ্ঞাসা না গোপন ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে জীবন স্বীকার করে, সত্যি কথা বলতে কি বাংলা দেশে আমি কখনো যাইনি। আমার জন্ম লখনৌ শহরে, মানুষ কাশীধামে, আপাতত উপস্থিত বেরিলিতে তোমার বাড়িতে।

বাপ মা ছেড়ে এমন বেগানা ভাবে বেরিয়ে পড়তে গেলে কেন?

তাঁরা ছেড়ে গিয়েছেন, তাই আমার ছাড়বার কথা ওঠে না।

দুজনেই ছেড়ে গিয়েছেন? কতদিন আগে?

বাবা গিয়েছেন দু-বছর হল, মা গিয়েছেন আমার বয়স যখন পাঁচ। কিন্তু আমার জীবন চরিত না হয় পরে শুনো। এই তহখানার

অন্ধকারে আর ভালো লাগছে না। ঘুলঘুলিটা খুলে দাও, আলো বাতাস আসুক।

সেই সঙ্গে বখৎ খাঁর লোক।

এখনো সে ভয় আছে নাকি?

ভয়? তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে দু'বার এসে খোঁজ করে গিয়েছে।

কি বললে?

বললাম খুঁজে দেখো।

যদি খুঁজতো।

খুঁজে পাবে কেন? এই তহ্‌খানার খোঁজ মা আর ভাই ছাড়া কেউ জানে না।

তারপর বলে, মাকে তো আহারের সময়ে দেখেছ। ভাই শহরের বাইরে গিয়েছে— সন্ধ্যাবেলায় আসবে।

জীবন বলে, তোমার মাকে প্রণাম করে কী মনে হল জানো; যেন দেবী প্রতিমাকে প্রণাম করে উঠলাম।

মিথ্যা বলেনি জীবন, দুঃখ সহ্য করবার অপরিসীম ক্ষমতা যদি দেবত্বের লক্ষণ হয় তবে মা আমার দেবী নিশ্চয়।

সংসারে অনেক কথা আছে যার সূত্র অনুবৃত্তি সম্ভব নয়, নীরবতাই তার যথার্থ উপসংহার।

কিছুক্ষণ পরে জীবন বলল, তোমার ভাই এলে নিয়ে এসো, পরিচয় করব।

এ মহলে তারা কেউ আসবে না, মা ভাই, ভাইবউ কেউ নয়, এ মহলে আমার একার অধিকার। পরিচয় করতে হলে তোমাকেই যেতে হবে অন্দর মহলে।

এদের জীবনযাত্রার প্রকৃতি বুঝতে পারে না সে, চুপ করে থাকে। তারপরে শুধোয় বেলা কত হবে?

বোধ হয় ছটা।

তবে এখনো রোদ আছে। ঐ উপরের ঘুলঘুলিটা খুলে দাও, ওখান দিয়ে বখৎ খাঁর লোক আসতে পারবে না।

তক্তপোশের উপরে ঘুলঘুলি খুলে দিতেই এক পিচকারি আলো এসে পড়ে পান্নার মুখে। প্রথম পূর্ণ চন্দ্রোদয় দর্শনে প্রথম মানুষের বিস্ময় দেখা দেয় জীবনের মুখে চোখে, স্থানকাল পাত্র ভুলে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে পান্নার দিকে। ঘরের আলো আঁধারির মধ্যে সে বুঝতে পেরেছিল পান্না সুন্দরী কিন্তু সৌন্দর্য যে এমন সুন্দর এই প্রথম বুঝলো। পান্নার ভারি ভালো লাগে। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি নারী-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এইভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পরে পান্না ওষ্ঠাধরে আদিম ঊষার জাদু ফুটিয়ে তুলে শুধোয়, সে স্বর স্বপ্নের পদক্ষেপের মতো মৃদু, কি দেখছ?

জীবন বলে, পান্না তুমি সুন্দর। সেই বিশেষণহীন অলংকার বর্জিত ছোট তিনটি শব্দ অগ্নিগর্ভ বজ্রদণ্ডের মতো মুহূর্তে আমূল নিহিত হয়ে যায় পান্নার অস্তিত্বে। বাক্যের সীমান্তে এসে পড়েছে তারা। যখন তাদের সম্বিৎ হল পান্না বলে, অন্ধকার না হওয়া অবধি তুমি অপেক্ষা করো, তারপরে তোমাকে নিয়ে যাবো তেতালার ছাদে।

কিন্তু বখৎ খাঁর লোক?

বখৎ খাঁর লোক কি আর আজ রাত্রে মানুষ থাকবে। তারা কোম্পানীর রাজত্ব জয় করেছে এখন সারারাত গাঁজা ভাঙ সিদ্ধি চলবে, মাঝখান দিয়ে খোদ লাটসাহেব চলে গেলেও ফিরে তাকাবে না। তুমি বসো, আমার বেশি দেরি হবে না।

বেরিয়ে যায় পান্না।

জীবন হাতের উপরে মাথা রেখে ভা[বে] থাকে এ আবার কোন্ নূতন সূত্র যু[ক্ত হল] তার জীবনে? সোনার তক্তিটার কথা এত[ক্ষণ] মনে ছিল না। ভাবলো একটা রহস্য [নি]চলেছি বুকে দুলিয়ে আবার হঠাৎ এ[সে] জুটলো এই স্নেহময়ী কুহকিনী। বু[ঝতে] পারে না কোন্ নক্‌শা তুলতে যাচ্ছে অ[দৃশ্য] কারিগর তার জীবনের কিংখাপের উপ[রে] কেবল বোঝে যে বুনন ক্রমেই জটিল [হয়ে] উঠছে। নিজের জীবনের উপরেও অধি[কার] নাই মানুষের, কত অসহায় সে।

(ক্রম[শঃ])

প্যারিসের চিঠি

প্যারিস, ১২ই অক্টোবর, ১৯৬২

দেশ থেকে বহু দূরে থাকলেও কল্পনা করতে পারি পুজোর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন শুরু হয়েছে। প্যারিসেও এখন বাৎসরিক ছুটির শেষে সঙ্গীতের মরসুমে শুরু হয়েছে। বাইরে আবহাওয়ায় শীতের আমেজ। শহরের অভ্যন্তরে অপেরা, অপেরা কমিক, থিয়েটার হল, কনসার্ট হল সব সরগরম। অপেরা কমিকে ভারতীয় পটভূমিতে তৈরী গল্প "লাকমে" (লক্ষ্মী)ই বলুন, ক্লাসিক্যাল অপেরা "কারমেন" বা "ফাওস্ট"ই বলুন, সব হলই ভর্তি। কনসার্ট হলে বেথোভেন, মোজার্ট, হাইডেন বা ব্রামস, তালিকায় যাঁর নামই থাকুক তিলধারণের জায়গা নেই। থিয়েটার হলগুলিতে একই অবস্থা। আধুনিক সঙ্গীতের গায়ক-গায়িকা যেমন এডিথ পিয়াফ, আজনাভুর, ইভ মঁতাঁ, দিস্তেল ও তাঁদের শ্রোতারাও বাদ নেই। "অলিম্পিয়া" হল তাই লোকে জমজমাট। আসলে সঙ্গীত-পাগল এই ফরাসী জাতি। তার প্রমাণ সর্বত্র। এই জাতির একটা বড় গুণ হল যে জাতীয় সংকটের সময়েও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোনদিন হারিয়ে ফেলেনি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যেদিন ফরাসী সঙ্গীত বিদেশী বিশেষত ইটালিয়ান প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল সেদিনও জাতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বোয়ালদিও, ওবেয়ার প্রভৃতি শিল্পী। বেরলিওজ কয়েকটি বিখ্যাত সঙ্গীত রচনা করলেও তাঁর গান বড় একটা কেউ শুনত না সেদিন। ক্লাসিকাল অপেরা ও সিম্ফনীতেও প্রাধান্য ছিল বিদেশীর—ফরাসীর সৃষ্টি সেদিন সীমাবদ্ধ ছিল অপেরা কমিকে। ফরাসী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের পুনর্জাগরণ শুরু হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত অপেরা "ফাওস্ট"-এর জন্যে গুনোর রচিত সুরের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু সে তো সবে শুরু, তখনও অনেক কিছু করার বাকী ছিল। ফরাসী সঙ্গীতের নতুন রূপ আবিষ্কার করে তাকে সুষ্ঠুভাবে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাঁ সায়েন, সেজার ফ্রাংক প্রভৃতি। তবে যাঁরা সেদিন ফরাসী সঙ্গীতের পুনর্জাগরণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরও কয়েকজন সুরসাধকের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়।

ভাঁসা দাঁদি, ক্রদ দ্যব্যুসি ও গাব্রিয়েল ফোর। এঁদের চেষ্টায় ও উৎসাহে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে স্থাপিত হয় সোসিয়েতে নাসিওনাল দ্য ম্যুজিক বা জাতীয় সঙ্গীত সমিতি। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন দ্য কাস্তিও লালো, মাস্নে। এঁদের স্লোগান ছিল "ARS GALLICA"। এই সমিতির উদ্দেশ্য কী ছিল তা এর সংবিধানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে :

"সমিতির সদস্য সমস্ত ফরাসী সঙ্গীত রচয়িতার রচনাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করানোই হল সমিতির মূল উদ্দেশ্য। সত্যিকার ভাবগম্ভীর সঙ্গীত সৃষ্টিকে উৎসাহ দান করা, জনপ্রিয় করা ও রচয়িতাদের সত্যিকার শিল্প সৃষ্টির উচ্চাকাঙ্খা পরিপূরণের সুযোগ করে দেওয়াও এই সমিতির উদ্দেশ্য।"

জাতীয় সঙ্গীত সমিতির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল ফরাসী সিম্ফনী ও চেম্বার সঙ্গীতের পুনর্জাগরণ এবং তা উপযুক্ত মর্যাদায় স্থাপিত করা। কারণ এ পর্যন্ত সিম্ফনী বলতে বেরলিওজের সিম্ফনী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর হাইডেন বা মোজার্টের সিম্ফনীর মাপকাঠিতে সেদিনের ফরাসী সিম্ফনীকে খাঁটি সঙ্গীতও বলা চলে না। বেরলিওজের সিম্ফনী ছিল কতকটা সাহিত্যের আচরণে ঢাকা সুর—লিজ্স্ট-এর রচনার মত। আসলে সেদিন সিম্ফনী রচনায় ফরাসী প্রতিভাব খুব প্রকাশ হয়নি। গুনো রচনা করেছিলেন বটে কয়েকটি সিম্ফনী, কিন্তু তাদেরও এমন শক্তি ছিল না যা দিয়ে ফরাসী জাতিকে নতুন কিছু পরিবেশন করে সন্তুষ্ট করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী সিম্ফনীর যে উজ্জ্বল প্রকাশ হয় তার প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন সাঁ সায়েন। যুগটা ছিল ভাগনেয়ার ও সেজার ফ্রাঙ্ক-এর। সে যুগে সঙ্গীতকে ব্যবহার করা হত দর্শন, নীতিবাদ বা ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের জন্যে। কাজেই সে যুগে এর বাইরে নতুন রীতির কিছু করতে হলে যথেষ্ট সাহসের দরকার হত। প্রায় ভলতেয়ারের গভীর মেধা ও দেসকার্তেসের যুক্তি নিয়ে সাঁ সায়েন তাঁর ক্লাসিকাল রচনার মধ্যে দিয়ে প্রচার করলেন : শিল্প শিল্পের জন্যেই তিনি বললেন, একটি শক্তিশালী রচনা ছন্দের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সুরের সংমিশ্রণের মধ্যেই আবির্ভাব হয় সুন্দরের। আবেগ হল সুন্দরেরই বাহ্যিক প্রকাশ। ১৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর এই ফরা প্রতিভার তিরোধান হয় আলজিরিয়াতে তাঁর জন্ম হয়েছিল প্যারিসে ১৮৩ খৃষ্টাব্দে। ফরাসী সঙ্গীত প্রতিভার ক বলতে বসে অনেকের কথাই বলতে হয়, ত জায়গার অভাব। তাই আজ শুধু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের জীবন কথাই ব যাঁর প্রতিভা সমস্ত ফরাসী সাংস্কৃ জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে; যাঁর স্থির, অব আলো ফরাসী সঙ্গীতকে এক নি অতীতের মধ্যে থেকে বার করে এক নি ধারায় পরিচালিত করে উজ্জ্বল ভবিষ্য

প্যারিসের "অপেরা" প্রেক্ষাগৃহ

নিয়ে গেছে। জীবিতকালে এই ...কে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে ... ফরাসী সংগীতে এক নূতন স্রোত ... দেবার সাহসিক প্রচেষ্টার জন্যে, এক ...বিক পরিবর্তনের জন্যে। এই "বিপ্লবী" ...ধক ফ্রান্সের এক সাধারণ পরিবারে ...ছিলেন। খুব সাধারণভাবে জীবন ...য়ে নিঃশব্দেই তিনি লোকান্তরিত হন। দেশবাসী তাঁর কথা স্মরণ করেনি ...দন। কিন্তু ফরাসী সংগীতের ঐতিহ্যে, ...সী সংস্কৃতিতে তাঁর অসামান্য অবদান ... অস্বীকার করতে পারবে না।

... একশ বছর আগে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ...আগস্ট প্যারিসের কাছে স্যাঁ জার্ম্যাঁ ...লে-তে ক্লদ দ্য ব্যুসির জন্ম হয় এক ... দোকানদারের ঘরে। পরিবারে সংগীত- ... কেউ করেননি কোনদিন, সংগীতের ... ছিলেন না কেউ। কল্পনাবিলাসী ...নের ছোট্ট ছেলে দ্য ব্যুসি বাগানের গাছে ...ছ প্রজাপতি ধরে বেড়াতেন। সবচেয়ে ...দর প্রজাপতিগুলি ধরে তাঁর ঘর সাজাতেন ও খুব অবাক হয়ে বড় বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন তাদের পাখার রঙের অপূর্ব সংমিশ্রণের দিকে। পরবর্তীকালে দ্য ব্যুসির রচিত সুর ও ছন্দকে সেই প্রজাপতিদের বিভিন্ন বিপরীত রঙের সঠিক ও পরিমিত মিশ্রণের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

প্রকৃতির পূজারী দ্য ব্যুসি ছোট বয়সেই গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মায়ের একটি পুরানো পিয়ানো নিয়ে চেষ্টা করতেন তাতে সুর তুলতে। বিকেলবেলা কাছেই দুর্গের ধারে বেড়াতে গিয়ে সামরিক বাজনা শুনে এসে চেষ্টা করতেন নিজে নিজেই সেই সুর তুলতে। একদিন তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন ইউরোপীয় সংগীতের মহা-গুরু শোপাঁর ছাত্রী মাদাম দ্য ফ্লারভিল। তিনি ছোট ছেলের এই সংগীত পিপাসা দেখে তাকে পিয়ানো বাজানো শেখালেন ও তার মায়ের অনুমতি নিয়ে প্যারিসের সংগীত বিদ্যালয় "কনসেয়ারভাতোয়ারে" ভর্তি করে দিলেন। খুব ছোট বেলায় দ্য ব্যুসি স্বপ্ন দেখতেন নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণের। কিন্তু সংগীতের আহ্বানে, সুরের আকর্ষণে নৌবাহিনীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ত্যাগ করে ১১ বছর বয়সে দ্য ব্যুসি সংগীতের ক্লাসে সুরের ভাষা শেখার কাজে মনোযোগ দিলেন। উঁচু কপাল, কালো কোঁকড়া চুল, বাদামী চোখে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, ঠোঁটে একটু রহস্যময় হাসি নিয়ে সেই ছোট বয়সেই দ্য ব্যুসি গুরু লাভিগনাক-এর কাছে অভিযোগ করতেন গানের কোনো কোনো থিওরীর বিরুদ্ধে অথবা সুরের রচয়িতাদের ছন্দজ্ঞানের সংকীর্ণতায়। ক্লাসের শেষে মাস্টারমশাই ডুরাণ্ডও কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন তার কাজের। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু হেসে বলতেন, "হ্যাঁ, তবে তোমার কাজে একটু নতুনত্ব আছে বৈকি!" দ্য ব্যুসি কিন্তু তাঁর প্রথম রচনা "ট্রিও" এই মাস্টারমশায়কেই উৎসর্গ করেন।

এমন সময় ভাগ্যক্রমে সারা ইউরোপ ভ্রমণের এক সুযোগ এসে যায় তরুণ দ্য ব্যুসির। ফলে তাঁর কল্পনা, তাঁর শিল্পীমনের বিরাট প্রসার লাভ করে এবং তাঁর সৃষ্টি সুর একটা লক্ষ্য খুঁজে পায়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দ্য ব্যুসি তাঁর গুরু মারমঁতেল-এর সুপারিশে সমাজের একজন নামজাদা মহিলা মাদাম নাদেদজা দ্য মেক্-এর সংস্পর্শে আসেন। নাদেদজা এক রুশ রেল ইঞ্জিনীয়ারের স্ত্রী। এই ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়িতে গানবাজনার জন্যে একজন পিয়ানিস্ট খুঁজছিলেন। তিনি তরুণ দ্য ব্যুসিকে নিয়োগ করলেন ও ফ্লোরেন্স, ভেনিস, ভিয়েনা ও সর্বশেষে মস্কো নিয়ে যান। মাদাম দ্য মেকের চেষ্টায় দ্য ব্যুসি পরিচিত হন সংগীতের মহাগুরু পার্সিফাল ও ত্রিস্তান-এর রচয়িতা ভাগ-নেয়ার-এর সঙ্গে। সে সময় ভিয়েনাতে হানস রিশ্‌তার-এর পরিচালনায় ভাগনেয়ার রচিত ত্রিস্তান-এর অনুষ্ঠান হয়। দ্য ব্যুসি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে তিনি ভাগনেয়ার-এর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হন। মস্কোতে গিয়েও অনেক রাশিয়ান শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

প্যারিসে ফিরে এসে দ্য ব্যুসি মাদাম মরো স্যাঁতি-র গানের ক্লাসে পিয়ানিস্টের কাজ নেন ও শেষ পর্যন্ত গুনোর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত "ক'করদিয়া" নামে সংগীত সমিতির পিয়ানিস্ট হন। এই গুনোই প্রথম আবিষ্কার করেন তাঁর তরুণ সহকর্মী দ্য ব্যুসির অসাধারণ প্রতিভা।

এই সময় দ্য ব্যুসি স্থপতি ভার্সানিয়ে-এর স্ত্রীর অপূর্ব গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন ও ভার্সানিয়ে দম্পতীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। সেই থেকে তাঁকে দেখা যেত সর্বদাই হয় ভার্সানিয়েদের প্যারিসের বাড়িতে অথবা তাঁদের প্যারিসের কাছে বাগান-বাড়িতে। প্রায়-নিরক্ষর দ্য ব্যুসিকে

মাদাম ভার্সানিয়ে পড়াতেন ও বিনিময়ে দ্য ব্যুসি তাঁর জন্যে সুর রচনা করতেন। ভার্সানিয়েদের প্যারিসের রু দ্য কনস্তানতিনোপলের বাড়ির পাঁচতলার ঘরে বসে দ্য ব্যুসি জীবনের অতি মূল্যবান পাঁচটি বছরের প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বহু রচনা করেছেন। কোন সময় পিয়ানোর সামনে বসে, কখনো ঘুরতে ঘুরতে কখনো বা টোবাকো-নিয়ে কাগজে সিগারেট বানাতে বানাতে। অনেক ভাবতেন, তারপর পিয়ানোতে সুরটা তুলে নিয়ে ভালো লাগলে কাগজে লিখতেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দ্য ব্যুসি L' ENFANT PRODIGUE লিখে রোমের পুরস্কার পান, কিন্তু পুরস্কার পেয়েও খুব খুশী হননি তিনি। কুড়ি বছর পর এই পুরস্কার পাওয়া সম্বন্ধে বলেছিলেন—"বসন্তের এক সন্ধ্যায় সেন নদীর পুলের ওপর দাঁড়িয়ে নীচে "বাতো মুশ" বা "মাছি জাহাজ" চলে যাওয়ার পর সেন নদীর ঢেউয়ের ওপর পড়া অস্তমিত সূর্যের রক্তরাগ দেখছিলাম মনের আনন্দে। তখন কে একজন দিল এই সংবাদ। সমস্ত আনন্দই মাটি হয়ে গেল, এখন যত সরকারী নাম ডাক, বাঁধা- বাঁধি। তারপর প্যারিস ছেড়ে রোম যাওয়া? অসম্ভব...।" দ্য ব্যুসি প্যারিস ছেড়েছিলেন। কিন্তু রোমের স্কুলের কঠোর নিয়মে ও কড়াকড়িতে স্বাধীনতাপ্রিয় ফরাসী মন হাঁপিয়ে উঠল। তবে সেখানে গিয়ে একটা লাভ হয়েছিল। তাঁর শিক্ষিত বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে কবি বদলেয়ার, ভেরলেন ও শেক্সপীয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন এবং শেক্সপীয়ারের "অ্যাজ ইউ লাইক ইট" এ সুর দেন। রোমে থাকার সময় দ্য ব্যুসি তিনটি রচনা করেন। "জুলেইমা" "লা প্রাঁতা" বা বসন্ত ও "লা দামোয়াজেল এলা"। অর্থাৎ মনোনীত তরুণী। রচনা তিনটি ফরাসী সংস্কৃতির কর্ণধার অ্যানস্তিত্যু দ্য ফ্রাঁস-এ পাঠান। কিন্তু এ নিয়ে আনস্তিত্যুর পরিচালকদের সঙ্গে দ্য ব্যুসির একটু মনোমালিন্যই হয়ে যায়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে এসে সঙ্গীতের আর এক মহাগুরু ব্রামস-এর সঙ্গে দ্য ব্যুসির পরিচয় হয়। লাঞ্চ খেতে খেতে দুই সঙ্গীতজ্ঞের অনেক কথা হয়। ব্রামস বলেন যে তাঁর মতে একজন সুর-শিল্পী সর্বপ্রথম তার নিজের দেশের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকবে। ফরাসী জাতি তাঁকে একজন খাঁটি জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ বলে গণ্য করে জেনে ব্রামস খুব গর্বও প্রকাশ করলেন। রাত্রিবেলা ব্রামস নিমন্ত্রণ করলেন দ্য ব্যুসিকে ডিনারে। ডিনারের পর দ্য ব্যুসিকে নিয়ে যান BIZET-এর অপেরা দেখাতে। অপেরা শেষে দুই সঙ্গীতজ্ঞ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বেরিয়ে এলেন।

আসলে দ্য ব্যুসি চেয়েছিলেন তাঁর সুরের মধ্যে একটা শক্তিশালী কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও সরল, স্বাভাবিক, নিরঙ্কুশ শিল্প সৃষ্টি করতে। যে-শিল্প সোজাসুজি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবে। টেকনিকের নিয়ম কানুন নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত হন নি তিনি। তাই একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল পিয়ানোতে বিখ্যাত অপেরা "কারমেন"-এর একটা সুর তুলছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। সুরটি ছিল "কারমেনের" সেই বিখ্যাত লাইন যেখানে ডন কারমেনকে ছুরি মেরে হা হা করে কাঁদছেন আর বিলাপ করছেন তার প্রিয়তমার জন্যে।

অনেকে বলেন দ্য ব্যুসির সঙ্গীত রচনায় রুশ ও জার্মান শিল্পের প্রভাব খুবই বেশী। কথাটা ঠিক নয় সর্বাংশে। তাঁর নিজস্ব রচনা-রীতি গঠনে সাহায্য করেছিলেন সোঁপাঁ, গ্রিগ, ফোর, মাসনে ও গুনো। ভাগনয়ার-এর প্রভাব কাটাতেও দ্য ব্যুসির বেশী দিন দেরি হয়নি। শীঘ্রই তিনি ফরাসী সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। "রেভ্যু ... " নামে এক সাময়িক পত্রিকার ডিরেক্টর দ্য ব্যুসিকে পরিচয় করিয়ে দেন আঁদ্রে জিদ, ক্লদেল, রেগনিয়ে, পিয়ের লুই, ভিয়েলে গ্রিফাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিকের সঙ্গে। তারপর পরিচয় হল কবি মালার্মে ও চিত্রকর হুইসলার-এর সঙ্গে। মালার্মে দ্য ব্যুসিকে চিন্তা ও আবেগে পূর্ণ এক ভাষা শেখান, আবার ভেরলেনের মত তিনি "রোমান্টিসিজম" বা "রিয়ালিজম" প্রভৃতি মতবাদ থেকে দূরে সরে যান।

দ্য ব্যুসি ছিলেন যাকে বলে "ইমপ্রেশনিস্ট" শিল্পী। অন্তরের অনুভূতি-কেই সুরের মারফত সত্যিকার রূপ দিয়েছেন। যেমন মোনে, রেনোয়ার, সিসলে বা পিসারোর মত চিত্রশিল্পী রেখার চাইতে রঙকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন দ্য ব্যুসিও তাঁদের মত সুরের ও ছন্দের সমন্বয় ও সঠিক সংমিশ্রণ কে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মেতারলিঙ্ক-এর "পেলিয়াস এ মেলিজাঁদ" বের হওয়ার পর ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দ্য ব্যুসি ওতে সুর দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন ও দশ বছর কাজ করে তার সুর রচনা শেষ করেন। দ্য ব্যুসির অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে : "নকত্যুরন", "ল্য প্রেল্যুদ আ লাপ্রেমিদি দাঁ ফোন" ইত্যাদি। কবি মালার্মে তাঁর "আপ্রেমিদি"তে দ্য ব্যুসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সেই থেকে দ্য ব্যুসির নাম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তখনও তাঁকে রস-রচনার জন্যে কেউ চিনত না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে "চিলড্রেনস কর্নার" ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে "ত্রোয়া বালাদ দ্য ফ্রাঁসোয়া ভিল" অর্থাৎ ফ্রাঁসোয়া ভিলঁ'র তিনটি ব্যালাড রচনা করে দ্য ব্যুসি সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় দেন। এডগার আলেন পো-র লেখায়ও তিনি সুর দেন। তারপর আবার থিয়েটারের জন্যে লিখতে শুরু করেন।

"ল্য মারতির দ্য স্যাঁ সেবাস্তিয়াঁ" রচনার মধ্যে দিয়ে দ্য ব্যুসি তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে মতামত

জানান। দ্য ব্যুসি বলছেন ঃ "আমি মানি না যে শহরের একটা বিশেষ স্থানই কেবল ভগবানের ধ্যানের জন্যে সুপ্রশস্ত। আমি স্বীকার করি না যে একজন লোক গির্জার সাদা পোশাক পরেছে বলেই ভগবানের সবচেয়ে কাছে পৌঁছে গেছে। আমার আত্মার মধ্যে প্রকৃতি এক অপরূপ রূপ নিয়ে দেখা দেন। এই গাছপালা, ফুলফল, মাটির বুকে স্নিগ্ধ ঘাসের হাসি—এই বিশাল দয়াময়ী প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, আপনা থেকেই আমার দুই হাত জোড় হয়ে আসে। ওকেই বলব আমি প্রার্থনা।"

দ্য ব্যুসি ধর্ম ও সঙ্গীতকে এক সঙ্গে মিশিয়ে বলতেন ঃ "সঙ্গীতের গভীর গোপন তথ্যের কথা কে জানতে চাইবে? সমুদ্রের গর্জন, পাতার সিরসির, দূরে দিগন্ত আমাদের মনে এক গভীর দাগ কেটে যায়, আর সেই স্মৃতি থেকেই একদিন জন্ম নেয় গানের ভাষা ও সুরের রেশ। সঙ্গীতে সমৃদ্ধ আত্মা এভাবেই সুন্দরকে আবিষ্কার করে।"

জীবনের সমস্ত বাস্তবতা, সুরের ভিতর দিয়ে সুন্দরকে, শ্বাশ্বতকে আবিষ্কারের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যেও ভাগনেয়ার-এর মত এই মহাগুরুর জীবনেও নিঃসঙ্গতা একটা অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। জীবনের এই গভীর দুঃখের দিনগুলির কথা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনা "শাস দ্য বোর্তোতসে"-তে। বন্ধু পিয়েরকে তিনি লিখেছিলেন ঃ "তোমার স্নেহের ভীষণ প্রয়োজন আমার। আমার জীবনের অন্ধকার আকাশে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। মনে হচ্ছে সবাইকে বিরক্ত করছি।"

এরপর রাশিয়া, লা হেগ, আমস্টারডাম, রোমে কাজ শেষে প্যারিসে ফিরে দ্য ব্যুসি ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে আকাদেমী দে বোজ আর (Academie des biaux Arts) এর চেয়ার গ্রহণের আমন্ত্রণ পান। কিন্তু স্বার্থগত দলাদলির জন্যে দ্য ব্যুসির মনোনয়নপত্র ১৯১৮ সালের আগে বিবেচনা করা হয়নি। ইতিমধ্যে মৃত্যুর শীতল হাত আস্তিত্যু দ্য ফ্রাঁসের অতি সম্মানের, অতি আকাঙ্ক্ষিত ঘর থেকে দ্য ব্যুসিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

দ্য ব্যুসির ৫২ বছর বয়সে ইউরোপে জ্বলে ওঠে প্রথম মহাসমরানল। সে সময় ছোটখাট কয়েকটি রচনা ছাড়া দ্য ব্যুসি বিশেষ কিছু করেননি। শুধু মৃত্যুর পূর্বে দেহে অস্ত্রোপচার হওয়ার আগের দিন তাঁর একটি বিখ্যাত ও অতি মর্মস্পর্শী রচনা শেষ করেন ঃ "ল্য নোয়েল দে-জ-আঁফাঁ কি ন' প্লু দ্য মেইজ'" অর্থাৎ "ঘরবিহীন শিশুদের বড়দিন"। এই রচনার ভাষা ও সুর সব কিছুই অতি মর্মস্পর্শী।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও কিন্তু দ্য ব্যুসি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে তাঁর চিন্তা, ধ্যান ও সংগীতে কোনদিন ভোলেননি। তাই জীবনের শেষদিকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ফ্রাঁসকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করে রচনা করেন ঃ "ওদ্ আ লা ফ্রাঁস" ফ্রাঁসের গৌরব সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়কে তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জয়-পরাজয় বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ফ্রান্সে আর বেশী দিন রইলেন না দ্য ব্যুসি। দারিদ্র্যজনিত অসুস্থতা তাঁর শীর্ণ দেহে প্রকট হল। ১৯১৮ সালের ২৫শে মার্চ দ্য ব্যুসি ইহলোক ত্যাগ করলেন। ২৮শে মার্চ প্যারিসের "পেয়ার লাশেজ" সমাধিক্ষেত্রে মাত্র কয়েকজন বন্ধুর উপস্থিতিতে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। যে প্রিয় দেশের সংস্কৃতির প্রসারে সংগীতের প্রচারে, সংগীতকে পুরাতনের জড়তা কাটিয়ে নতুন জীবন দান করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন এই মহাসাধক, তাঁর তিরোধানে তাঁর দেশবাসী ফেলেনি এক ফোঁটা চোখের জল। দ্য ব্যুসির মৃত্যুর পর দুই একটি কাগজ "লে দেবা" "লা ভিক্টোরিয়া" ছাড়া কেউ তাঁর প্রসঙ্গে উল্লেখ পর্যন্ত করেনি।

কিন্তু তাই বলে বিদেশ এই মনীষীকে ভোলেনি। দ্য ব্যুসির মৃত্যুর পর লণ্ডনের মিউজিক্যাল টাইমস-এ আর্নেস্ট নিউম্যান-এর লেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রিয়া, জার্মেনী, হাঙ্গেরী, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের পত্র-পত্রিকাগুলি দ্য ব্যুসি সম্বন্ধে বিরাট বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে জানিয়েছে বিশ্ব-সংস্কৃতি কি হারাল!

দ্য ব্যুসির মৃত্যুর সংগে ফরাসী সংগীতের একটি যুগের অবসান হয়।

অজিতকুমার দত্ত

দণ্ডক-শবরী

বিকর্ণ

॥ ২২ ॥

গর্ণিয়া আসছে দন্তেওয়ারা থেকে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছে সে। প্রবীরচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে সরকার তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা বিজয়চন্দ্র ভঞ্জদেওকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তারের মহারাজা বলে ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস সরকারের সে-নির্দেশ মেনে নিতে রাজি হল না আদিবাসী প্রধানেরা। প্রাক্তন মহারাজার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবীরচন্দ্র যতদিন জীবিত আছেন ততদিন মাতা দন্তেশ্বরীর নির্দেশে তিনিই বাস্তারের রাজা। 'ডিভাইন রাইট অফ কিংস্' নাকি কংগ্রেসী সরকারের ফতোয়ায় নাকচ করা যায় না। বিজয়চন্দ্র সিংহাসনে বসলেন, কিন্তু প্রজাসাধারণের সমর্থন পেলেন না।

গত সপ্তাহে জেলা কর্তৃপক্ষ নতুন রাজাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দান্তেশ্বরী মাতার মন্দিরে। সাড়ম্বরে নতুন রাজা মায়ের পুজো দেবেন। অভিষেকের পরে এটাই চিরাচরিত প্রথা। দন্তেশ্বরী মায়ের পুরোহিতেরা সে পুজো প্রত্যাখ্যান করল। বিজয়চন্দ্রকে তারা নতুন মহারাজ বলে মেনে নিতে রাজি নয়। দেখা দিল সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। গোবিন্দমাণিক্য বনাম রঘুপতি, ইংলণ্ডেশ্বর বনাম টমাস বেকেট! কিন্তু যুগ পালটেছে। রাজায় রাজায় লড়াই হলে আজকাল উলু-খাগড়াই মরে। মা আর রাজরক্ত চান না! বেকেটরাও মরে না। মরে সাধারণ মানুষ! তাই রক্তারক্তিটা মুলতুবি থাকল। এ পক্ষ নানাভাবে বোঝালেন। ওরা বললে: একটি মাত্র শর্তে নতুন রাজাকে মেনে নিতে রাজি আছি। তোমরা আমাদের সাবেক রাজা প্রবীরচন্দ্রকে ছেড়ে দাও। তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলুন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তাঁর ভাইকে শাসনদণ্ড দিয়েছেন—তবেই রাজার ছোট-ভাইকে মেনে নেব আমরা।

সে শর্ত এ পক্ষের থেকে পালন করা সম্ভবপর হয়নি।

উত্তেজনা বাড়ছে। আদিবাসী দল-নেতাদের কাছে গোপন নির্দেশ আসতে শুরু করেছে—গোপনে প্রস্তুত হও সবাই। বিদ্রোহ অনিবার্য। জোর করে মহারাজকে বন্দিশালা থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে!

গর্ণিয়া বলতে এসেছিল—এ সময়ে দেশের আহ্বান উপেক্ষা করে, আদিবাসী সমাজের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে যারা বিয়ের আসরে নাচগান নিয়ে মাতে, তাদের ধিক, শতধিক। আমরা কংগ্রেসী সরকারের লোক বলে সে আমাদের কিছু শিক্ষা দিয়ে দেবার শুভ কামনা নিয়ে এগিয়ে আসছিল। চয়ন ছুটে এসে বাধা দেওয়ায় শেলেষের সংগে বলে: পুরুষমানুষের ঝগড়ায় তুই মেয়ে-মানুষ কেন আসিস আগ্ বাড়িয়ে।

চয়ন বিস্মিত হয়ে বলেছিল: মেয়েমানুষ মানে?

নিষ্ঠিবন ত্যাগ করে, মুখটা মুছে নিয়ে গর্ণিয়া বলেছিল: ... ডাক্তারসাহেব যতই মিথ্যা ... গালকে। যতই গোপন করুক—এ চাকু... সবাই জানে রাঙলা তোকে এক ... মেয়েমানুষ করে রেখে গেছে। ... তার খলখল হাসি!

আনন্দ উৎসবের মাঝখানে হঠাৎ এ ঘটনায় সকলেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ... পর্যন্ত বুড়ি কিরিংগোর বিধানই বহাল রইল। আজ রাত্রে উপবাস করতে হবে চয়নকে। কাল সকালে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম তাঁবুতে। এমন একটা কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউই আশংকা করেনি। সন্ধ্যার পর আজ আর নাচগান কিছুই হল না। রণক্লান্ত শিবিরের শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতা নেমে এসেছে উৎসবমুখর কারাংমেটা গাঁয়ের বুকে। রাতে শোবার সময় বললুম: লাগির দেখা আমার বরাতে নেই। কাল সকালেই ফিরতে হবে আমাকে।

ঃ আর একটা দিন থেকে যেতে পারেন না? 'লেন শর্মিলা দেবী।

ঃ উপায় নেই। মার্চের আজ পঁচিশ তারিখ!

পরদিন সকালেই ফিরতে হল বটে, কিন্তু যতটা বিষণ্ণ বদনে ফিরতে হবে আশঙ্কা করেছিলুম তার চেয়ে সহস্রগুণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে হল।

ভোরবেলাতেই খবর পাওয়া গেছে—চয়ন গোপনে গৃহত্যাগ করেছে, কাল গভীর রাত্রে। গুণিয়ার দল যেখানে থানা গেড়েছিল সেখানেও জনমানব নেই। আদিবাসীদের গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে চয়নের যোগাযোগ ছিলই। কাল রাত্রে সেখান থেকে কী এক গোপন নির্দেশ এসেছে। এনেছিল গুণিয়াই। মধ্যরাত্রে সে এসেছিল নাকি চয়নের ছাপরায়। আজ সকালে এই কান্ড।

ফিরে চললাম মার্চ-ফাইনাল বিল পাশ করতে। মালকোর বুকফাটা কান্নাটা কানে বাজছে—মাড়িয়া ভাষায় কী যেন বলছে আর্তকণ্ঠে।

ভার্গব তনয়া অরজার ধর্ষনাশ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন একদিন তাঁর প্রেমাস্পদ মধুমন্তনগরাধিপতি মহারাজ দন্ড। অরজার তপোধন পিতা দেবারিগুরু শুক্রাচার্য তাই অভিসম্পাত দিয়েছিলেন দন্ডকে। ফলে মধুমন্তনগরী ভস্মীভূত হয়েছিল দাবানলে। সেই ভস্মস্তূপের উপর কালে দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ অরণ্য। দন্ডকারণ্য। এই হচ্ছে দন্ডকারণ্যের নামকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা।

ফিরবার পথে মনে হল প্রেমাস্পদের প্রতি ভার্গব-তনয়ার আর্তকণ্ঠই কানে বাজছে বুঝি। চার যুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা কামমোহিত বিরহী ক্রৌঞ্চের মতোই করুণ কণ্ঠে বলছেঃ ফিরে এস,...ফিরে এস—ফিরে এস!

অরণ্যবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। স্বেচ্ছায় এসেছিলাম এখানে—অরণ্যকে দেখব বলে। যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই মনে হচ্ছেঃ দেখা হল না, দেখা হল না! হে অরণ্য-দন্ডক, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। আমিই চোখ তুলে তাকাইনি। অরণ্যকে দেখতে গিয়ে আমি শুধু দেখে এলুম অরণ্যচারীদের।

মনে পড়ছে বিভূতিবাবুর রচনা—'আজ এখান থেকে...বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বছর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিনে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোলো দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করছি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েছি শহরের কলকোলাহলের পরে—তোমাকে প্রণাম করি।'

ষোলো দিন নয়, দীর্ঘ দুবছরের মধ্যেও তো এমন দৃষ্টি নিয়ে অরণ্য দন্ডককে দেখিনি! প্রণাম জানাইনি অরণ্যের অধিদেবতাকে। রঙিন প্রজাপতি, শিমুলের রাঙা-ফুল, ধনেশপাখির ডাক, জলপ্রপাতের জলপতন ধ্বনি আর লেজ-ঝোলা হলদে পাখি তো আমারও চেতনার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু কই সে কথা তো লেখা হল না ডায়েরিতে! একসার অর্ধ-উলঙ্গ নরনারী আমার দৃষ্টির সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল শুধু।

কাল রাত্রে পড়ছিলুম বিভূতিবাবুর ডায়েরি। লিখছেন—'রাঙা-ফুলে ভর্তি বড় শিমুল গাছটা চোখে পড়ল। আমি সৌন্দর্যে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম, আর নড়তে পারিনে, অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সে কথা এখানে লিখেও রাখলুম এজন্য যে এইসব দুর্লভ অনুভূতিরাজী যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই কটি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে খুলে বসলুম দন্ডক-শবরীর ডায়েরি। পাতার পরে পাতা লিখে গেছি—কিন্তু কই এমন একটিও অনুভূতির কথা তো আমি লিখিনি! তবে কি যাবার দিনে বিভূতিবাবুর সুরে সুর মিলিয়ে আমার বলার অধিকার হবে না—'প্রণাম, হে খেয়ালী অরণ্য দেবতা, প্রণাম!'

সে অধিকার না অর্জন করে থাকি তবু খেদ নেই। আমি দেখে গেলুম আরণ্যক জীবনকে। মানব সভ্যতার উৎস মুখের

সরল বাসিন্দাদের। তাই বা কম কি? তাও তো পড়েছিল অনাদৃত এতদিন আমার চোখ তুলে দেখার অপেক্ষায়! যাবার দিনে না হয় আমি বলে যাব: প্রণাম হে আরণ্যক জীবন, প্রণাম!

তারিখটা আজও মনে আছে। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ। শুক্রবার।

মার্চ-ফাইনালের হিড়িকে কোরাপুট থেকে ছুটে এসেছি জগদলপুরে। চীফ এ্যাকাউণ্টস অফিসারের দপ্তরে শেষ রাত্রে ওস্তাদের মার মারতে। সমস্তদিন উবুড় হয়ে পড়েছিলাম বিল-এম-বি-র স্তূপে। ফিনানসিয়াল ইয়ারের শেষদিন। কাজকর্ম মিটতে রাত আটটা। শ্রান্ত দেহে অফিস থেকে বেরিয়ে জীপে গিয়ে বসলাম। ড্রাইভার পাঁড়েজিকে বলি: ধরমপুরা কলোনীতে চল। সার্কিট-হাউসে আজ রাতে থাকব।

স্বল্পভাষী পাঁড়েজি সিনেমা হাউসের কাছে মোড়-ঘুরবার সময় বললে: লেকিন হুয়া ক্যা?

তাইত। ব্যাপার কি? এতক্ষণ নিজের চিন্তায় ডুবেছিলাম বলে খেয়াল করিনি। শহরটা যেন থমথম করছে। সিনেমার শো বন্ধ। দোকানপাট খোলা নেই একটাও। পথে লোক চলাচলও অতি ক্ষীণ। শুধু এখানে-ওখানে গলির মোড়ে মোড়ে জটলা। অত্যন্ত জোরে একটা ওয়েপন-কেরিয়ার ওভার-টেক করে গেল পাশ দিয়ে। ব্যাপার কি? খবরের কাগজও দেখিনি দিন তিনেক। রেডিও শোনাও হয়নি। পথে পথে কেটেছে কদিন। ডুবে ছিলাম বিলের সমুদ্রে। জেলখানার উপর, হ্যাঁ স্পষ্ট মনে পড়ছে, জাতীয় পতাকা-টাকে উড়তে দেখেছি পতাকাদণ্ডের শীর্ষ-দেশেই। তাহলে শহর এমন শোকাচ্ছন্ন, স্তব্ধ কেন?

সার্কিট-হাউসে পৌঁছে পেলাম খবরটা।

লোহাণ্ডিগুড়ায় গুলী চলেছে। হতাহত নাকি অসংখ্য। অসংখ্য? মানে?

কেউ বলে পঞ্চাশ, কেউ বলে শ'য়ের উপর!

সার্কিট-হাউসের পাশেই একজন উ'চু মহলের অফিসারের ডেরা। হানা দিলাম সেই রাত দশটায়। বোস-সাহেব জেগেই ছিলেন। বসালেন আপ্যায়ন করে। হ্যাঁ, খবর ঠিকই। গুলী চলেছে। হতাহতের নির্ভুল সংখ্যা জানা যায়নি। তবে হ্যাঁ, কিছু লোক মারা গেছে বটে।

বললাম: আমি তো কিছুই জানি না। কি হল এর মধ্যে?

শুনলাম বিস্তারিত সব ঘটনা। ওড়িষার কোরাপুটবাসী আমার এত কথা জানা ছিল না।

বিজয়চন্দ্রকে দন্তেশ্বরী মন্দিরে পুজো না দিতে দেওয়ার পর থেকেই বাস্তারের রাজ-নৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। আদিবাসী দলপতিদের কাছে গোপন নির্দেশ আসে—জোর করে ছিনিয়ে আনতে হবে কারারুদ্ধ মহারাজ প্রবীরচন্দ্রকে। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওরা প্রস্তুত হচ্ছিল কদিন ধরে। গতকাল হাট ছিল করঞ্জিবাজারে। ওরা দলে দলে সমবেত হয়েছিল সেই হাটে। তীর ধনুক, বর্শা, মাকসু হাতে নিয়ে মাদ্রি ঢোলে যুদ্ধের দামামা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এসেছিল সশস্ত্র জনতা। সামনের কয়েক-জনের হাতে দেবনাগরি হরফে হালবিতে লেখা "রাজাকে ফিরিয়ে দাও।"

সে ফেস্টুন দেখে বুঝতে পারা যায় এ আন্দোলনের পরিচালনা আদিবাসী দল-পতিরা করছে না, করছে আর কেউ। দেব-নাগরি হরফ তো দূরের কথা, ফেস্টুন কাকে বলে তাই ওরা জানে না। সরকারী মহলে খবর পৌঁছেছিল ঠিক সময়েই। পুলিশ ফাঁড়িতে প্রস্তুতির অভাব ছিল না। পুলিসের বড় কর্তাও হাজির হলেন অকুস্থলে। নতুন মহারাজা বিজয়চন্দ্রকেও নিয়ে যাওয়া হল। বিরাট জনতা এগিয়ে আসতে থাকে পুলিস ফাঁড়ি লক্ষ্য করে। তাদের কণ্ঠে একটি মাত্র ধ্বনি—'আমাদের রাজাকে মুক্তি দাও!'

অনেক কষ্টে গতকাল সে আন্দোলনকে রোখা গেছে। পরদিন, অর্থাৎ আজ হাটবার গেছে লোহাণ্ডিগুড়ায়। চিত্রকুট জল-প্রপাতের দিকে যে পথটা চলে গেছে জগদলপুর থেকে পুবমুখো—যেখানে এক-কালে ছিল সমৃদ্ধিশালী চক্রকোট তালুক আর কুরুশপাল, সেই পথের ধারেই নগণ্য গ্রাম। স্থানীয় লোকেরা কিছু খবর জানতো না। অথচ রাত শেষ হবার আগেই দেখা গেল সেখানে দলে দলে এসে জমায়েত হচ্ছে নানান জাতের আদিবাসী জনতা। রাতে কারা যেন এসে জনতাকে কানে কানে বলে গেছে: দূর বোকা! কাল করঞ্জিবাজারে তোরা অমন ভেড়য়ার মতো হঠে এলি কেন?

ওরা বলেছিল সাহেব যে বললে, না হলে গুলী ছুড়বে?

আগন্তুক শুভার্থী বলেছিল: দূরে হাঁদা-রাম! ওরা গুলী ছু'ড়বে না। ছু'ড়লেও ফাঁকা আওয়াজ করবে। ভয় নেই।

এদের সরল প্রশ্ন: ফাঁকা আওয়াজ মানে?

আদিবাসী-দরদী মর্মাহত হয়ে বলেন: কী গাধা তোরা! ফাঁকা আওয়াজ মানে বুঝিস না? মানে, শুধু ধোঁওয়া বের হবে, শব্দ হবে, গুলী বার হবে না। কারও গায়ে তা লাগে না। ও শুধু ভয় দেখাবার জন্যে ছোঁড়া হয়। বোকারা ধোঁয়া দেখেই ভয় পায়। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে শুনিস নি? এখন সত্যিকারের গুলী ছোঁড়া আইনে মানা!

একজন বলেছিল: দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে মানে? এতদিনই তো দেশ স্বাধীন ছিল। এখন পরদেশীরা এসে আমাদের রাজাকে বন্দী করে রেখেছে—এই কথাই তো সেদিন বললি।

আগন্তুক হতাশ হয়ে বলেঃ তোদের নিয়ে আন্দোলন করা ঝকমারির কাজ বাবা।

আদিবাসীদের বৃদ্ধ দলপতি বলেছিল ঃ ওসব বাজে কথা বাদ দে। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে ওরা গুলী করবে না। এই তো? গুলী করলেও তাতে মানুষ মরবে না। ফাঁকা আওয়াজের ধোঁয়ায় আর শব্দে এক-আধটু চোট চোট লাগতে পারে, কিন্তু তাতে মানুষ মরে না—এই কথাই তো বলতে চাইছিস?

একজন আদিবাসী তরুণ এগিয়ে এসে বলেছিল ঃ মরে মরুক! আমাদের হাতেও তীর আছে! এক এক তীর, এক এক মানুষ! বল কি করতে হবে।

ঃ এই তো! ঠিক বলেছিস!—ঘনিয়ে আসে আদিবাসী দরদী! তোদের ভয়টা কি? তোদের তীর তো আর ফাঁকা আওয়াজ করবে না। একটি তীর খসবে, একটি পুলিস খসবে। নয় কি?

সর্দাররা হি-হি করে হেসে উঠেছিল শুনে ঃ তা আর নয়? একটি একটি তীর,

একটি-একটি মানুষ! হুঁ-হুঁ বাবা, আমরা ফাঁকা আওয়াজ করি না!

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, কিন্তু রক্তাক্ত!

পরদিন ভোরেই ওরা জমায়েত হল তীর-ধনুক হাতে। শেষ রাত্রে সেই যে ভদ্রলোক হাঁড়ি-হাঁড়ি শুলিপ সরবরাহ করেছিল, সে বললে—নরসিংহগড়ে নয়, ঐ পুলিস ফাঁড়ির ভিতরেই আটক আছে তোদের রাজা। যা এগিয়ে যা, কিছুতেই ফিরবি না। তাহলে দন্তেশ্বরী মায়ের অভিশাপ পড়বে তোদের উপর। যেমন করে হক ছিনিয়ে আনতে হবে তোদের রাজাকে!

ঘন ঘন মাথা নেড়ে এরা বলে ঃ হয়, হয়!

সশস্ত্র জনতা এগিয়ে আসছে!

সাবধানবাণী উচ্চারিত হল—হালবিতে, গোণ্ডিতে, মাড়িয়া ভাষায়!

ঃ আর এগিও না! ফিরে যাও!

ওরা চীৎকার করে ওঠে ঃ রাজাকে ফিরিয়ে দে।

ঃ আর এক পা এগিয়ে এলেই আমরা গুলী ছুঁড়ব!

এদের সর্দার হা-হা করে হেসে ওঠে ঃ ছোঁড় না কত ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়বি। আমরাও তীর ছুঁড়ব! এক একটি তীর, এক একটি মানুষ! হুঁ হুঁ বাবা, আমরা ফাঁকা আওয়াজ ছুঁড়িনা—এগিয়ে আসে ধনুক হাতে সহস্র জোয়ান।

হঠাৎ গর্জে উঠল 'পুস-গুড়াম', বজ্র! গুম্-গুম্-গুম্।

কিন্তু একি! এমন তো হওয়ার কথা নয়! একসার আদিবাসী ভাইয়া মাটিয়ে শুয়ে পড়ে ওভাবে কাতরাচ্ছে কেন? এতো ফাঁকা আওয়াজ নয়! সেই বাবুটি কোথায় গেল—যে হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ জুগিয়েছিল কাল শেষ রাতে?

ও কি?...পথের ধুলোয় এত লাল রঙ কেন?...একি রক্ত?...ফাঁকা আওয়াজেই এত রক্ত? ভানপুরীর সেঁয়াই, বেনুরের লাখমু-ভাই, লোহাণ্ডিগুড়ার গাইতা অমন নিথর হয়ে পড়ে রইল কেন পথের ধুলোয় মুখ গুঁজরে? না, না! এমন তো হবার কথা ছিল না! কোথায় কি যেন ভুল হয়েছে!

আদিবাসী নেতারা ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকায়! কি করবে বুঝে উঠতে পারে না!

ঐ তো কাবোঙ্গার গুনিয়া! বাঁ হাতে তলপেট চেপে ধরে বসে পড়েছে পথের ধুলোয়। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে মুঠি বেয়ে! সর্দার ঝুঁকে পড়ে বললে ঃ কী হয়েছে গুনিয়া ভাই?

যন্ত্রণায় বিকৃতমুখে কাবোঙ্গার গুণিয়া শুধু বললে ঃ ফাঁকা আওয়াজ নয় সর্দার!... ওরা সত্যিকারের গুলী ছুঁড়ছে! পালাও!

উর্ধ্বশ্বাসে পিছু হঠতে শুরু করেছে পঞ্চাশ গাঁয়ের আদিবাসী জনতা! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেশা ছুটে গেছে ওদের।

প্রাণধর্মের তাগিদে কাজ। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল তারা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে।

শুধু রক্তাপ্লুত কতকগুলো হতভাগ্যের মৃতদেহ পড়ে রইল পথের ধুলোয়।

ফিরে এলাম সার্কিট-হাউসে। রাত তখন এগারোটা।

দেখি সার্কিট-হাউসের সামনে একটা মেডিক্যাল ভ্যান। এখুনি এসেছে। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম সামনের হল-কামরাটায় বসে আছেন ডাক্তার এবং মিসেস পিল্লাই। ডাক্তার সাহেবের চোখে বাসা-ভাঙ্গা ঝড়ের পাখীর অবোধ দৃষ্টি।

ঃ কি হয়েছে?—ছুটে গেলাম ও'র কাছে।

ঃ বারোজন মারা গেছে।—বললেন উনি গাঢ়স্বরে।

ঃ বারোজন? কিন্তু আপনি এখানে এত রাত্রে?

ঃ খবর পেয়ে এইমাত্র এসে পেঁৗছলাম।

ঃ থাকছেন তো এখানেই আজ রাত্রে?

ঃ ঠিক বলতে পারি না। কম্পাউণ্ডার-বাবুকে পাঠিয়েছি হাসপাতালে। সে ফিরে এলে বুঝতে পারব, বাকি রাতটুকু এখানেই থাকব, না লোহাণ্ডিগুড়ায় যেতে হবে।

ঃ লোহাণ্ডিগুড়ায়! এত রাত্রে?

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন না। বাইরে কিসের শব্দ হওয়ায় উঠে দেখতে গেলেন কম্পাউণ্ডারবাবু ফিরে এসেছেন কিনা।

শর্মিলা দেবীকে বলি ঃ কি হয়েছে বলুন তো ঠিক করে?

চয়নও গিয়েছিল লোহাণ্ডিগুড়ায় রাজাকে ছিনিয়ে আনতে!

ঃ সে কি! তার কোন খবর পাননি?

ঃ না!

ঃ যারা মারা গেছে...

ঃ হ্যাঁ, কম্পাউণ্ডারবাবু সেই খোঁজই আনতে গেছেন। যে বারোজন মারা গেছে তাদের নাম ঠিকানার সন্ধানে।

নির্বাক বসে থাকি দুজন।

একটু পরে শর্মিলা দেবী বলেন ঃ মালকোর দিকে আর তাকানো যায় না। সেও এসেছে। কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে গেছে হাসপাতালে।

বললুম ঃ আপনারা ভুল করেছেন। যদি... যদি চয়ন মারা গিয়ে থাকে, মানে তাহলে মালকোকে নিয়ে মুশকিলে পড়বেন আপনারা!

ঃ কিন্তু কি মনে হয় আপনার? চয়ন... চয়ন...?

হেসে বলি ঃ পাগলরাই দীর্ঘদিন বাঁচে শর্মিলা দেবী, সুস্থ সবল মানুষ বড় তাড়াতাড়ি পট করে মরে যায়!

—বলেই বুঝতে পারি অন্যায় করেছি। ও'র দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে বসেছি অজান্তে। একদিন উনি বলেছিলেন—চয়নের মৃত্যু কামনা করেন তিনি। সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতেই এ বক্রোক্তি করে-ছিলুম—কিন্তু এ পরিবেশে সেটা করা ঠিক

হয়নি। অসমাপ্ত বিবাহ-বাসর থেকে চয়ন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর ও'রা কতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন আন্দাজ করা যায়। এই মধ্যরাত্রে ও'রা ছুটে এসেছেন নারানপুর থেকে সেই ছেলেটির সন্ধানে। ঠিক এ সময় ও-আঘাত করা আমার পক্ষে সৌজন্যের পরিচায়ক নয়। মাথাটা নীচু হয়ে যায় শর্মিলা দেবীর—বুকের উপর নেমে পড়ে মুখটা।

অপ্রস্তুতের একশেষ। আমি অনুতপ্ত কণ্ঠে বলি ঃ মাপ করবেন শর্মিলা দেবী, আমি ঠিক ও কথা বলতে চাইনি...

ধীরে ধীরে মুখটা তোলেন উনি। দু' চোখে নেমেছে জলের দুটি ধারা। ধরা গলায় মিসেস পিল্লাই বলেন ঃ বিশ্বাস করুন এঞ্জিনিয়ার সাহেব,—সেদিন আমি যা বলেছিলাম সেটাই আমার অন্তরের শেষ কথা নয়! আজ আমি সর্বান্তঃকরণে চাইছি চয়ন সুস্থ-সবল হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক!... না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়! আজকের দুর্ঘটনায় চয়ন যদি আবার পাগল হয়েও গিয়ে থাকে, আর তার চিকিৎসার জন্য আবার যদি উনি ক্ষেপে ওঠেন, তবু আমি চাই সে বেঁচে থাকুক! সেই প্রার্থনাই নিরন্তর করছি, এ দুঃসংবাদ পাওয়ার পর থেকে!

ঠিক কথা। আমারই ভুল হয়েছিল সেদিন। মানুষ শুধু স্বার্থপর নয়। মানুষের সম্বন্ধে এইটেই শেষকথা হতে পারে না। না হলে কী বিশ্বাসের পাথেয় নিয়ে আজকের এই স্বার্থপর দুনিয়ায় মানুষ চড়াই ভাঙছে? পরের দুঃখে চোখের জল ফেলবার শুভলগ্নই যদি না এল জীবনে তাহলে এই দুনিয়াদারী প্রহসনের অর্থ কি? কে জানে হয়তো শুয়োরছানার আর্তনাদ শুনে চয়নের মাও স্থির থাকতে পারত না!

শর্মিলাদেবীর চোখের জল আর বাধা মানছে না। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন উনি। উঠে যাব কিনা ভাবছি, সেই মুহূর্তেই নিভে গেল ইলেকট্রিক বাতি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। রাত বারোটায় সার্কিট-হাউসে বাতি নিভে যায়। কর্তৃপক্ষের মিতব্যয়িতার এ বন্দোবস্তই আমাকে অব্যাহতি দিল রোরুদ্যমানা একটি মহিলার মুখোমুখি বসে থাকার বিড়ম্বনা থেকে।

টর্চের আলো পড়ল প্রবেশদ্বারে। ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন, তাঁর পিছন পিছন কম্পাউন্ডারবাবু। প্রবেশদ্বারের সামনে তারাভরা আকাশের পশ্চাৎপটে আর একটি হতভাগিনী তরুণীর সিলুয়েৎ! মালকো!

প্রশ্ন করি ঃ কি হল? হাসপাতালে খবর পাওয়া গেল?

কম্পাউন্ডারবাবু জবাব দিলেন ঃ হাঁ স্যার। বারোজনই মারা গেছে। আর আহত হয়েছে অনেক। আহতদের মধ্যে খুঁজে দেখেছি, চয়ন নেই।

আর প্রশ্ন করতে সাহস হয় না।

শর্মিলাদেবীই পরের প্রশ্নটা করেন ঃ আর যারা মারা গেছে?

ঃ তারা হাসপাতালে নেই। মৃতদেহগুলি রাখা আছে থানায়। বারোজনের মধ্যে আটজনকে সনাক্ত করা গেছে—তার মধ্যেও চয়ন নেই। বাকি চারজন এখনও বেওয়ারিস!

আবার প্রশ্ন করি ঃ তাদের দেখেন নি?

ঃ না স্যার। আমাকে সেখানে ঢুকতে দিল না। সমস্ত এলাকাটা পুলিস কর্ডন করে আছে। তাই তো স্যারকে বলছি— আপনি চলুন, মালকো এখানে ও'র কাছে থাক বরং। —অন্ধকারের মধ্যে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারি মিসেস পিল্লাইয়ের দিকে নির্দেশ করেছে সে।

শর্মিলা দেবী ডাক্তারসাহেবকে বলেন ঃ সেই ঠিক হবে। মালকো আমার কাছে থাক। তুমি বরং ভ্যানটা নিয়ে মর্গে যাও!

ডাক্তারবাবু এসে পর্যন্ত কোনও কথা বলেননি। এখনও কিছু বললেন না। সামনের একখানা চেয়ারে বসে পড়েছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখখানাও দেখতে পাচ্ছি না।

কম্পাউন্ডারবাবু আবার অনুরোধ করেন ঃ স্যার?

হঠাৎ ডাক্তারবাবু ছেলেমানুষের মতো ঝুঁকে পড়েন আমার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে আমার হাত দুটি ধরে বলেন ঃ আপনি যাবেন? অবশ্য রাত এখন অনেক, আপনিও পরিশ্রান্ত......

আমি বললুম ঃ সেজন্য কিছু নয়, কিন্তু আমাকে আপনার সঙ্গে নিতে চাইছেন কেন?

ঃ না ঠিক সঙ্গে নয়। আমি তাহলে এখানেই অপেক্ষা করতুম।—একটু ইতস্তত করে ফের বলেন ঃ কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহ আমি কেমন যেন স্ট্যান্ড করতে পারি না!

বক্তা রমানাথ পিল্লাই! পাঁচ বছর কাটা-

ছেঁড়া মড়া ঘেঁটে রেকর্ড-মার্ক নিয়ে ডাক্তারী পাশ করেছেন। বুঝতে পারি ওঁর অবচেতন মন বলছে, চয়ন ঐ বেওয়ারিশ চারজনের একজন। চয়নকে উনি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। তাই এ দ্বিধা। ডাক্তার নিজের নিকট আত্মীয়ের চিকিৎসা করে না—প্রিয়জনের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করে না।

কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার পক্ষে কিছুতেই এখন সম্ভবপর নয়, মড়া-কাটা-ঘরে যাওয়া। বলতে হল সে কথা: ডাক্তার পিল্লাই, আমি নিতান্ত দুঃখিত। আমি যেতে পারছি না। একটা ভারি জরুরী কাজ বাকি আছে আমার। সেটা আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে।

আমার হাতটা ছেড়ে দিলেন ডাক্তারসাহেব।

: ও! আয়াম সরি! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান এবার। মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলেন। আদেশের ভঙ্গিতে কম্পাউণ্ডারকে বলেন: ইয়েস্, আয়াম রেডি। চল, আমরা দুজনেই যাই তাহলে—ওঁর কি একটা জরুরী কাজ আছে বলছেন!

বাধা দেন ঊর্মিলা দেবী: দাঁড়াও। আমার তো কোন জরুরী কাজ নেই। আমি যাব তোমার সঙ্গে। মালকো বরং অপেক্ষা করুক চৌকিদারের বউয়ের কাছে!

: তুমি? কিন্তু সে কাটা-ছেঁড়ার মধ্যে...

: হোক! আমি তোমাকে একলা যেতে দেব না। চল...

ওঁরা তিনজনে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে মেডিক্যাল-ভ্যানটা আর্তনাদ করে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে একাই পড়ে রইলাম আমি।

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই আমাকে উঠতে হল। সত্যই অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ বাকি ছিল আমার। সে কাজটা আমাকে যেমন করেই হক শেষ করতে হবে আজ রাত্রে—এই একত্রিশে মার্চ রাত্রেই।

স্যুটকেশ হাতড়ে বার করলাম একটা মোমবাতি। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা। আর বার করলাম আমার পাণ্ডুলিপি। আজ রাত্রেই 'দণ্ডক-শবরী'র ডায়েরি শেষ করতে হবে। ডাক্তারবাবুরা ফিরে এলে আমার ইচ্ছা মতো এ কাহিনী আর শেষ করতে পারব না।

হাড়ে হাড়ে চিনি সেই উদাসীন নাট্যকারটিকে! লোকটার কোন সেন্স অফ প্রপোর্সান নেই! যার নিশ্চিত মরার কথা তাকে বে-মক্কা বাঁচিয়ে তোলে, যার মৃত্যুর সম্ভাবনামাত্র নেই তাকে ফেলে বেঘোরে মেরে! লক্ষ কোটি নায়ক-নায়িকা নিয়ে যুগযুগান্তর ধরে ঐ যে নেপথ্য নাট্যকার লিখে চলেছে এ বিশ্বনাটক ও না কেয়ার করে বক্স-অফিসকে, না কোন নাট্য-সমালোচককে! ঐ খেয়ালী লোকটা একবারও ভেবে দেখবে না নাটকের এই অংকে চয়নের এভাবে মরার কথা নয়। মরতে হলে অনেক আগেই সে মরতে পারত! লোহাণ্ডিগুড়ার ধুলোয় তাকে বে-মক্কা মেরে ফেলাটা হবে অতি চীপ স্টাণ্ট! কিন্তু ও পাগল নাট্যকারকে কিছু বিশ্বাস নেই—ও সব পারে!

আমি থেকে গেলাম সেই নেপথ্য-নাট্যকারের উপর টেক্কা দিতে! ডাক্তারবাবু ফিরে আসার আগে আমার কাহিনী শেষ করতে হবে। এ চয়ন মহাকালের হাতের পুতুল নয়—একে সৃষ্টি করেছি আমি, একে পুনর্জীবন দিয়েছেন ডাক্তার পিল্লাই! আমার নায়ককে আমি মরতে দেব না, কিছুতেই না...

আমি লিখব: প্রায়ান্ধকার লাসঘরে ডাক্তার পিল্লাই টর্চের আলোয় একটি একটি করে বারোটি মৃতদেহকে পরীক্ষা করে চলেন। দুর্জয় সাহসে তাঁর হাত ধরে পাশে পাশে চলেছেন সেই দুঃসাহসী বাঙালী মহিলাটি। ভয়ে, আতংকে, উত্তেজনায় নীল হয়ে গেলেও স্বামীর হাতটা ধরে আছেন বজ্রমুষ্ঠিতে। প্রতি মুহূর্তেই আশংকা করছেন এখনই একটি চেনামুখ দেখে শিশুর মতো আর্তনাদ করে উঠবেন তাঁর পাগল-স্বামী! ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে চলেছেন সারি দেওয়া মৃতদেহ।

তারপর? তারপর শেষ মৃতদেহটি পরীক্ষা করে ডাক্তার পিল্লাই ছোট ছেলের মতো বলে উঠবেন: থ্যাংক গড! হি ইস নট দেয়ার!

—না, এখানেই শেষ করব না। এর পরেও একটা ছোট অনুচ্ছেদ লিখব। চয়ন আর মালকোর মধুমিলনের দৃশ্য। কেমন করে? ও লিখতে বসলে মন-গড়া একটা সিচুয়েসান ঠিক দাঁড় করাতে পারব। এখন কাজ হচ্ছে শুধু তাড়াতাড়ি করা। বাস্তবের চয়ন মরুক বাঁচুক, আমার চয়নকে আমি বাঁচিয়ে তুলব ডাক্তারবাবুরা ফিরে আসার আগেই।

তাড়াতাড়ি কলমটা খুলে লিখতে বসি!

এক-ফোঁটা কালি নেই কলমে......

উপায় নেই! অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মতো বসেই থাকি ডাক্তারবাবুর ফিরে আসার অপেক্ষায়। আমি নিরুপায়। ইচ্ছামতো চয়নকে আর বাঁচাতে পারব না। যা ঘটেছে তাই আমাকে লিখতে হবে এরপর। আমাকে মেনে নিতে হবে সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন নাট্যকারের চরম নির্দেশ!

সমাপ্ত

* গানের আসর *

শার্ঙ্গদেব

আবেদন

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে
ভারতমাতা।
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে শত্রু করে কভু
হব না বন্দী
ডরি না থাকে যাই অদৃষ্টে অধর্ম সঙ্গে
করি না সন্ধি।
ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে—শত্রুসৈন্যদল করিব
বিভিন্ন
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব না
রিপুদলপদচিহ্ন।

সাজ সাজ সকলে রণ সাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে
চল সমরে দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত জয় মাকালী॥

লঘুগুরু ছন্দে গানটি রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সম্পূর্ণ গানটি উদ্ধৃত করিনি যেটুকু বর্তমানে প্রয়োজন সেটুকুই তুলে দিলাম। বেতার প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করি গানটি প্রয়োজনমত প্রচার করুন এবং বাদ্যবৃন্দ এর কনসার্ট পৌঁছে দিন আমাদের ঘরে ঘরে, অরণ্য পর্বতে সৈনিকদের হৃদয়ে। দিলীপকুমার রচিত "সুরবিহার" গ্রন্থে এর স্বরলিপিটি পাওয়া যাবে।

চীনকে ভারত সীমান্ত থেকে বহিষ্কৃত করবার যে দৃঢ়সংকল্প দেশবাসী গ্রহণ করেছেন তার দৃপ্ত ঘোষণা শোনা যাচ্ছে গীতশিল্পীদের কণ্ঠে। তাঁরা দেশাত্মবোধক সংগীত প্রচারে ব্রতী হয়েছেন কিন্তু তাঁদের কণ্ঠকে আরও বলিষ্ঠ, আরও মুক্ত, আরও উচ্চ করে তুলতে হবে। এতদিন যে নির্বীর্য "আধুনিক" প্রেমসংগীত মৃদুকণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে আজ তার পরিবর্তে পুরুষের পৌরুষ এবং নারীর শক্তি জাগ্রত হোক। তাঁরা এই সুযোগ গ্রহণ করুন এবং যাঁরা তাঁদের নিয়োগ করেন তাঁরা তাঁদের এই সুযোগ প্রদান করুন। যে শক্তি তাঁদের মধ্যে আছে আজ তার পূর্ণ বিকাশ হোক। এই উপলক্ষ্যে আমাদের গীতিকারদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন সময়োপযোগী সংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এ পর্যন্ত যে গান শুনেছি তা অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের রচনা বাকি দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নজরুল রচিত। এইসব গানের পরিবেশ ছিল স্বতন্ত্র—তখনও ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল। আজ স্বাধীন ভারতের সংকল্পকে প্রচার করবার জন্য নতুন সংগীতের প্রয়োজন। নতুন উদ্যমে নবগাথায় জাতির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করবার এই গুরুদায়িত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে বর্তমান গীতিকারদের। এর বিশেষ শুভ ফল হবে এই যে, আমাদের সংগীতে যে অবাঞ্ছিত পেলবতা এসে গেছে তা দূরীভূত হবে এবং কাব্যসংগীতেও স্বাভাবিক প্রকাশভংগী সব কৃত্রিমতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

এই সঙ্গে রঙ্গালয়সমূহকেও আমরা অনুরোধ করব তাঁরা তাঁদের দায়িত্বকেও যেন স্বীকার করে নেন। বহু কাল ধরে সাধারণ রঙ্গালয়ে দেশাত্মবোধক নাটক দেখা যায়নি। এ সম্বন্ধে তাঁদের একটা পরিকল্পনা নির্ণয় করা দরকার যাতে দেশাত্মবোধক কিছু সময়োপযোগী রচনা তাঁদের তরফ থেকে প্রচারিত হয়। বাংলার যাত্রাসম্প্রদায় অনায়াসেই এই ভার গ্রহণ করতে পারেন যেমন একসময় মুকুন্দদাস করেছিলেন সমাজ চেতনা জাগ্রত করবার অভিপ্রায়ে।

বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই আবেদন উপলক্ষ্যে আর একটি বক্তব্য আছে। আমরা শিল্পী—আর্টের পূজারী। এমন কিছু আমাদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে পারে না যা বর্বরোচিত, যা রক্তলোভী পররাজ্যলিপ্সু দস্যুদের রণহুংকারের সমপর্যায়ে পড়ে। যা কিছু প্রকাশ হবে তা আমাদের আত্মসম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখবে, ভারতের আদর্শকে সম্পূর্ণ বজায় রাখবে—এটাই আমাদের অভিপ্রেত। এই সংকটকালেও মহাসম্ভ্রান্ত বীর্যবন্ত আভিজাত্য থেকে বিচ্যুতি যেন আমাদের না ঘটে।

বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শতবার্ষিকী

একশো বছর পূর্বে ১৮৬২ সালের ১৬ই অক্টোবর এক উদারচরিত গীতশিল্পীর জন্ম হয়েছিল যাঁর কথা আজ আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। ইনি বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈশোরে রাওলপিণ্ডি থেকে ইনি বেহালায় মামার বাড়িতে চলে আসেন—তারপর বাকি জীবন বেহালাতেই কাটিয়ে ১৯৪৪ সালে লোকান্তরিত হন। মেটেবুরুজে ওয়াজেদ আলী শার মজলিসে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং নবাবের অনুগ্রহপুষ্ট প্রসিদ্ধ গায়ক আলীবক্সের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। ইনি খেয়াল গাইতেন কিন্তু সে খেয়াল আজকের যুগের মত নয়। তার চাল চলন গমকে অনেকটা ধ্রুপদের গাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হত। যে-সব গান তিনি গাইতেন সেসব গান আজও প্রচলিত, কিন্তু তার রীতি যুগোপযোগী রীতি অনুসারে সরলতর হয়ে গিয়েছে। শুনেছি আলীবক্স গোয়ালীয়রের লোক ছিলেন। গোয়ালীয়রের আসল জিনিস ছিল ধ্রুপদ। এক শ্রেণীর ধ্রুপদীই পরে খেয়াল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সেকালের গোয়ালীয়রশিল্পীরা ধ্রুপদী ঢঙের একরকম খেয়ালের সূত্রপাত করেন। সম্ভবত বামাচরণবাবু আলী বক্সের কাছ থেকে এই প্রকৃতির খেয়ালই আয়ত্ত করেছিলেন। এই ধরনের খেয়ালে মীড় এবং গমকের কাজে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। এতে স্বরগুলি আজকালকার খেয়ালের মত কাটা কাটা ভাবে লাগে না, শিল্পীর তুলির টানের মত একটা স্বাভাবিক স্পর্শের মধ্য দিয়ে স্বরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তব্যে তাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করে। এই কাজে একটা আভিজাত্য এবং মেজাজের পরিচয় পাওয়া

যেত যা উনবিংশ শতাব্দীর সংগে সংগেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

গান বাজনায় প্রবল আসক্তি সত্ত্বেও বামাচরণবাবু নাকি যখন বেহালায় আসেন তখন তাঁর সংগীতে পারদর্শিতা কিছুই ছিল না। কাছাকাছি এক হরিসভায় ভাল গান হয়, তিনি শুনতে আসতেন। তাঁর আগ্রহ দেখে একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি গান করতে পারেন কিনা। বামাচরণবাবু তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করলে প্রশ্নকর্তা তাঁকে মাকাল ফল বলে উপহাস করেন। সেই থেকে সংগীত শিক্ষায় তাঁর বিশেষ উদ্যম দেখা দেয়।

বামাচরণবাবু সম্পর্কে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে শুনেছি যে প্রথমে তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ নামক একজন সংগীতজ্ঞের নিকট গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নাকি তাঁর গোঁপদাড়ি দেখে তাঁকে যবন-লক্ষণাক্রান্ত ঠাউরে শেখাতে চাননি, পরে শিবপুরের এক গায়কের সাহায্যে ওয়াজেদ আলীর সভায় প্রবেশ করেন এবং নবাব অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আলী বক্‌সকে গান শেখবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বামাচরণকে গান শেখাতে প্রতিশ্রুত হন। আলীবক্‌স মুখে রাজি হলেও আসলে খুব কমই শেখাতেন; তথাপি বহু আনুগত্যের পর বামাচরণ কিছু কিছু তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নবাবের আসরে এক গায়িকার গানের পর বামাচরণ তাঁর গান পরিবেশন করে বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাজ খাঁ তাঁকে যৎসামান্য পুরস্কারও প্রদান করেন যা তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতে বাধ্য হন। ওয়াজেদ আলী শার মৃত্যুর পর বামাচরণ অসহায় ওস্তাদকে নানাভাবে সাহায্য করলেও প্রতিদানে সামান্যই শিক্ষা পেতে লাগলেন। অবশেষে একদিন ওস্তাদের স্ত্রী এই সহৃদয় যুবকটির প্রতি অবহেলার জন্য স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করলেন এবং আলী বক্‌স তাঁর হৃদয়হীনতা উপলব্ধি করে লজ্জিত হলেন। এর পর থেকে আজীবন বামাচরণকে তিনি আন্তরিকভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তৎকালীন সংগীত সমাজে বামাচরণের অসামান্য সম্মান ছিল। খেয়ালের সেই গম্ভীর অথচ সুললিত ঢঙ আর কারুর কাছে পাওয়া সম্ভব ছিল না। শিষ্যদের কাছে তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন শিক্ষক হিসাবে। সেখানে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। সংগীত তাঁর পেশা ছিল না; তিনি চাকরী করে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বলেন তিনি ছিলেন সাধু, সহৃদয়, রসিক এবং দানশীল ব্যক্তি। এই সংগীতজ্ঞের পুণ্য স্মৃতি গোচর করে আমার স্মৃতিতর্পণ করলাম।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ কুড়ি ॥

বংশী বলেনি কিছু। বলাধিকারীর তবু টের পেতে বাকি নেই। বৈঠকখানা-ঘরে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য আর সাহেব—সেইখানে হুংকার দিয়ে এসে পড়লেন: মুকুন্দ মাস্টারের কাছে বড্ড যে আনাগোনা! ব্যাপার কি?

পাকা লোক ওকিবহাল হয়েই বলছেন, অস্বীকার করে লাভ নেই। তাচ্ছিল্যের ভাবে সাহেব বলে, পাঠ করেন নেহাৎ মন্দ নয়। কাজকর্ম নেই, সন্ধ্যাবেলা বসেছি গিয়ে দু-এক দিন।

ঘৃণাভরে বলাধিকারী বলে উঠলেন, বোকা ছাগল! ছাগলের মতন নুরও রেখেছে একটু। এক একটা মানুষ হয় এই রকম। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলেন, ভূত নয়, ভগবান। দুটোর মধ্যে বড় বেশি তফাৎও নেই। হায় রে হায়, পচা বাইটার মতো গুণীর বেটা শেষকালে ভগবানের কিল খেয়ে মরছে!

সাহেব ফস করে বলে বসল, হয়তো বা বাইটা মশায়ের পরিণাম দেখে। পাপের শাস্তি—বলছিলেন একদিন মাস্টারমশায়।

'ছোড়দা'—সাহেবের মুখে এসে গিয়েছিল আর কি! মাস্টারমশায় বলে সামাল দিল। বলাধিকারীর গায়ে যেন আগুনের সেঁক লাগে। খিঁচিয়ে উঠলেন, পাপ-পুণ্যের কথা এর মধ্যে আসে কিসে? বুড়ো হয়ে কোন মানুষটা বিছানা নেবে না, জোয়ান-যুবোর মতো পাকচক্কোর মেরে বেড়াবে, বল দিকি সেই কথাটা! মুকুন্দ মহান্ত ঐ যে সদাচারে আছে, লম্বা লম্বা বচন ঝেড়ে আড়কাটির মতন তোদের ভালোর দলে টানছে—বুড়ো হলে তারও ঠিক বাইটার গতি। গীতা-রামায়ণে ঠেকিয়ে দেবে না।

ক্ষুদিরাম হেঁট হয়ে খাতায় একটা যোগ দিচ্ছিল, ঘাড় তুলে এইবার বলে, দল ভারি করার ব্যাপার আসলে। গাঁজার নেশা একলা জমে না। চুরি বলেন সাধুগিরি বলুন, সব নেশার ঐ এক নিয়ম। খুলনা শহরে পাদ্রি সাহেবরা রাস্তার মোড়ে টুলের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচায়: পাপের চাপে অধঃপাতে তলিয়ে যাবে, শিগগির আমাদের খোয়াড়ে চলে এসো। কাঠমোল্লাদেরও ঠিক ঐ কথা। যাবেন কোথা? অজাগা পাড়াগাঁয়ে পটুয়ারা পট দেখিয়ে পালা শুনিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়—সেখানেও পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়। মরার পরে যমদূতের ঢেঁকির পাড় দিয়ে অসতী নারীকে চিঁড়ে কুটছে, ঘানিগাছের মধ্যে চোর-ডাকাত পিষে তেল বের করছে—

বলাধিকারী ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, যে-বাড়ি ভিক্ষে করতে এসেছে সেই মানুষটাই হয়তো শঠতা-বঞ্চনায় টাকার পাহাড় জমিয়েছে। তার পরিণাম পটে লেখে না।

ক্ষুদিরাম সহাস্যে বলে, তা-ও আছে। শাস্তি নয়, পুরস্কার। ফকির-বোষ্টম অতিথি-ভিখারি অন্ধ-আতুরকে দিয়েছে বলে বৈকুণ্ঠধামে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে হীরা-মুক্তো খাওয়াচ্ছে তাকে। বুঝলেন মশায়, ভালোর দলের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। ওদের তোড়জোড় টাকাকড়ি সাজসরঞ্জাম অনেক।

পচা বাইটার কথা ঘুরছে ক্রমাগত বলাধিকারীর মনে। বললেন, বাইটা মশায়ের শাস্তি পাপের দায়ে নয়, বুদ্ধির দোষে। যা-কিছু রোজগার বিষয়আশয় ঘরবাড়িতে লগ্নি করে ফেলল। তা-ও বেনামি, সরকার কবে কোনটা বাজেয়াপ্ত করে বসে সেই ভয়ে। হোক তাই—কিন্তু বিষ না থাকুক কুলোপানা চক্কোরে দোষটা কি ছিল? ভান দেখাবে, এত খরচখরচা করেও আছে এখনো অঢেল। সেই মেজাজে চলবে। রাত্রে দুয়োরে খিল দিয়ে দুটো পাঁচটা টাকা নিয়ে টুংটাং করে নখে বাজিয়ে যাবে—কবাটের বাইরে নিশ্বাস বন্ধ করে বাড়ির লোকে গুনবে দু-শ পাঁচ-শ টাকা। পরের দিন সকালে দুয়োর খুলতে না খুলতে দেখবে চরণ-সেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। টাকা না-ই বা থাকল, টাকার ঝাঁঝ থাকলেও কাজ চলে যায়। এইটুকু কেন যে ঘটে এলো না বাইটার! মুকুন্দ বর্ধনেরও এই দুর্গতি শেষ বয়সে, যদি না হাতে-গাঁটে পয়সা জমিয়ে রাখে। সে আর হয়েছে! অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ অবস্থা—দিন চলে না এখনই এই জোয়ান বয়সে।

সাহেব এই কদিনেই সেটা বুঝেছে মুকুন্দর জন্য মায়া পড়ে গেছে বোধকরি মনে মনে। বলে, আড়কাটি যদি বলেন, সে মাস্টারমশায় নয়—আমি। আমিই ভাগিয়ে নিয়ে আসব ভালোর পথ থেকে। নয়তো সত্যি সত্যি উনি মারা পড়বেন।

ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম বলে, পাঁড নেশাখোর বাপু, পেরে উঠবে না। কাজলীবালাকে পারা গেল? আর, এই যে ইনি—

বলাধিকারীর দিকে চেয়েও হয়তো অনুরূপ কিছু বলত। তার আগে বলাধিকারী বলেন, পাঁড়-সাধু আমি

ছিলাম রে। অমন দু-চারটি মুকুন্দমাস্টার গুলে খেতে পারতাম। 'সত্যমেব জয়তে' জপ করতাম, সত্য ছাড়া এক চুল এদিক-ওদিক হব না—সংকল্প ছিল আমার। আপনার তো সবই জানা ভটচাজ মশায়। সোনার পাথরের বাটি নাকি হয় না, কাঁঠালের আমসত্ত বললে নাকি লোকে হাসে—আমি কিন্তু তাই হয়েছিলাম। সাধু দারোগা। এদেশ-সেদেশ আমায় ঐ নামে বলত। বলত—আর এখন বুঝতে পারি, হাসত টিপে টিপে। গরব করত কেবল আমার স্ত্রী। সেই গরবের দায়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল তাকে।

গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলাধিকারী চুপ হয়ে গেলেন।

তখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে লোকে দারোগা হতে চাইত। (এবং খোদ জমিদার না হয়ে কোন একটা মহালের নায়েব।) দারোগা মানে শাহান-শা সেই এলাকার। খাওয়ার ব্যাপারে যে-কোন বস্তুর বাঞ্ছা হোক, বেড়াতে বেড়াতে হাটে গিয়ে কনেস্টবলকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া। কারো ঘাড়ে একটি বই দুটো মাথা নেই যে দাম চাইবে। পরার ব্যাপারে তাই। সর্বব্যাপারেই। সদরে যাবেন হয়তো দারোগাবাবু, খবর দেওয়া হয়েছে, একলা মানুষটির জন্য পুরো সতরঞ্চি খালি রেখে শেয়ারের নৌকো থানার ঘাটে এনে বেঁধেছে। শোনা গেল, দুপুরের গুরুভোজনের পর নিদ্রা দিচ্ছেন দারোগাবাবু। ডেকে তুলে খবরটা দেবে, এত বড় তাগত কারো নেই। গোন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর পরে সমস্ত পথ উজানে গুণ টেনে মরতে হবে, ছইয়ের নিচে ঠাসাঠাসি মানুষগুলো গরমে গলে জল হয়ে যাবার যোগাড়। তবু না মাঝিমাল্লা না প্যাসেঞ্জার—মুখে কেউ রা কাড়ে না। নিস্তব্ধ ধ্যানমূর্তি সব—কথাবার্তার আওয়াজ ডাঙার উপর গিয়ে দারোগাবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়।

জগবন্ধু দারোগাই কেবল সৃষ্টিছাড়া। হাটে বাজারে নিজে কখনো যান না। বাইরের মানুষ পাঠিয়ে সওদা করেন, দারোগার লোক বুঝতে পারলে পাছে কেউ কম দাম নেয়। কোথাও যেতে হলে বিনা খবরে ঘাটে এসে শেয়ারের নৌকোয় অপর দশজনের পাশে ছেঁড়া-মাদুরে বসে পড়েন। যেমন চিরদিন হয়ে আসছে—দায়ে-বেদায়ে কেউ হয়তো হাসি-হাসি মুখ করে ভেট নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—জগবন্ধু দারোগা এই মারেন তো মারেন; মানুষটাকে থানার সীমানা পার করে দিয়ে তবে সোয়াস্তি। পুলিসের মানুষ হয়ে এমন পরমহংসের স্বভাব, কোন আহাম্মক সেটা বিশ্বাস করে? ভাবছে, ভেটের পরিমাণ যথোচিত হয়নি বলেই রাগ। দুনো তেদুনো আয়োজন নিয়ে আসে আবার, তাড়া খেয়ে চলে যায়।

ইতর-ভদ্র ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। অমুক কাজের তদ্বিরে এই রকম দিতে হয়, তমুক কাজের তদ্বিরে ঐ রকম—একটা অলিখিত নিয়ম চলে আসছে। সকলেই মোটামুটি সেটা জানে। কালাপাহাড়ের মতো বনেদি নিয়মকানুন ভেঙে ফেলছে ধর্মধ্বজী দারোগা। ভেঙে আর কোন নিয়ম বহাল হল, ঘুণাক্ষরে জানা যাচ্ছে না। হতবুদ্ধি জনসাধারণ। পাশাপাশি থানাগুলোরও রাগ—বিশেষ করে একেবারে পাশে ঝিনুকপোতার বড়বাবু অনাদি সরকারের। এই নিয়ম-রীতি সর্বত্র যদি চালু হয়ে যায়, শুখো মাইনের কয়েকটি টাকা ছাড়া কিছুই আর লভ্য থাকবে না। ঐটুকুর জন্যেই কি ঘরবাড়ি ছেড়ে চোর-ডাকাত ঠগ-বোম্বেটে ঠেঙিয়ে নোনা রাজ্যে পড়ে আছে? জগবন্ধুর নিজ থানায় অন্য যে সব কর্মচারী, তারা অবধি বিরক্ত। সাহস করে বড়বাবুর মুখের উপর কিছু বলতে পারে না।

আজকের দিনের সুবিখ্যাত কেনা মল্লিকের বড় ভাই বেচারামের দিনকাল তখন। চালনা-বন্দরের নিচে থেকে দরিয়া পর্যন্ত দলবল নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করে বেড়ায়। জগবন্ধু বলাধিকারীর বিদঘুটে চালচলতি বেচারাম একেবারে বিশ্বাস করে না। বলে, দূর! কড়া দেবতা শনিঠাকুর কিম্বা খাণ্ডারণী মা-কালী অবধি পুজো পেলে বর দিয়ে যান। পুজো দিয়ে ঠাণ্ডা করছি, দাঁড়াও।

বিপন্ন কারিগরেরা ধরে বসেঃ সকলের মাথার উপরে তুমি কাপ্তেন মশায়। মানুষটা জলে ডাঙায় বেয়াড়া রকম চোখ ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে কাজ হবে কেমন করে?

বেচারাম কথা দিলঃ এনে দিচ্ছি ওটাকে মুঠোয় ভরে। বন্দোবস্ত হয়ে যাক। তার পর যেমন ইচ্ছে খেলিয়ে নিয়ে বেড়িও।

জগবন্ধুর ছোট মেয়ের বিয়ে। থানার লাগোয়া কোয়ার্টার, বিয়ে সেইখান থেকে হবে। সামুদ্রিকাচার্য ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাসা অতি নিকটে—একখানা মাঠের এপার-ওপার। বাড়ির দরজায় প্রাচীন এক সাইন-বোর্ডে উপাধি সহ ভট্টাচার্যের নাম লেখা। হাত-দেখা প্রশ্ন-গণনা কোষ্ঠি-বিচার কোষ্ঠি-প্রস্তুত স্ফোটক-বিচার শান্তিস্বস্ত্যয়ন তান্ত্রিক-কবচ এবং আরও বিস্তর পণ্যের ফিরিস্তি ছিল, অনেক বছরের রোদবৃষ্টি খেয়ে অস্পষ্ট অবোধ্য হয়ে গেছে, কাছে গিয়ে নজর খাটিয়েও এই ক'টির বেশি পড়তে পারা যায় না।

থানার পরম সুহৃৎ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে থানার লোকের পাশে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে—সে লোক চাই কি খোদ বড়বাবু হোন, অথবা মুন্সি বা থানার কোয়ার্টারে জল-তোলার চাকর। ভট্টাচার্যের বাসায় সকাল-সন্ধ্যা মানুষের ভিড়—ভাগ্য-গণনার ব্যাপারে আসে যৎসামান্য, প্রায় সকলেই অন্য দশ রকমের দায়গ্রস্ত মানুষ। থানার কাছে তাদের হয়ে দরবার করতে হবে, সেই জন্যে এসে ধরেছে। পরের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ ক্ষুদিরামও অমনি লেগে পড়ে যায়। বরাবর এই নিয়মে চলে এসেছে, কেবল হতচ্ছাড়া এই সাধু দারোগা বাগ মানে না কিছুতে।

ভাঁটি অঞ্চলের যেখানে যত থানা, আশে-পাশে এই ধরনের একজন দু-জন সুহৃৎ থাকে। থাকে তাই ইতরজনের সুবিধা। কেউ ডাক্তারি করে, কেউ ঠিকেদার, কেউ ইস্কুলের মাস্টার, কেউ বা একেবারে কিছুই না। থানার বিয়েথাওয়া-অন্নপ্রাশনে কোমরে গামছা বেঁধে দিন নেই রাত নেই খাটা-খাটনিতে লেগে পড়ে। অথবা থানার বাবুদের বুড়োহাবড়া কোন আত্মীয় টেঁসে যাবার দাখিল—সুহৃৎ মশায়ের কোমরের গামছা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে উঠে যায়। আপন জনেরা ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে—শ্মশান-বন্ধুর যথাযোগ্য সাজ নিয়ে এই ব্যক্তি রাত্রি জেগে সতর্ক প্রহরায় রয়েছে, বুকের ধুক-ধুকানিটুকু থামলেই হরিধ্বনিতে থানা মাত করে সকলকে ডেকে তুলে মড়া খাটিয়ায় চড়াবে। দেরি করিয়ে দিচ্ছেন বলে ধৈর্য হারিয়ে বিড়বিড় করে গালিও পাড়ে মুমূর্ষুর উদ্দেশেঃ কী মায়া রে বাবা! এত কাল ধরে ভোগসুখ করলি, তবু লালসার নিবৃত্তি নেই! খাবি খেয়ে খেয়ে কেন খামোকা কষ্ট পাচ্ছিস, দেবচক্ষু হয়ে পড় এবারে। ভোগান্তি আর সহ্য হয় না, একটা কাজ নিয়ে কাঁহাতক দিবানিশি এমন পথে থাকা যায়।

এমনি সুহৃৎ একজন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। জগবন্ধু পাত্তা দেন না বলে তাঁকে এড়িয়ে খিড়কির পথে কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীর পিতামহ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ—সেই ধারা খানিকটা চলে আসছে। স্বামী-মেয়ে ছাড়াও একদঙ্গল ঠাকুর-দেবতা তাঁর সংসারে। থানার মতো জায়গাতেও কালী মহাদেব গণেশ লক্ষ্মী রাধাকৃষ্ণ সংকীর্ণ একটু তাকের উপরে গাদাগাদি হয়ে নিয়মিত নিত্যসেবা পেয়ে আসছেন। ক্ষুদিরাম টোলে পড়ে নানা শাস্ত্র শিখে এসেছে, জমিয়ে নিতে অতএব দেরি হয় না।

ভুবনেশ্বরী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে ধরেনঃ বলুন ভটচাজ্জিমশায়, কি দেখতে পান?

ক্ষুদিরাম কল্পতরু এসময়টা। আয়ু থেকে আরম্ভ করে ধনদৌলত, স্বামী ও মেয়েদুটোর সুখশান্তি—সংসারে যা কিছু কামনার বস্তু থাকতে পারে একনাগাড়ে মুষলধারে বর্ষণ করে। এত প্রাপ্তির পরেও ভক্ত না হয়ে কেমন করে পারবে! ক্রমশ এমন হয়ে দাঁড়াল—কোন তিথিতে কি খেতে নেই ক্ষুদিরাম পাঁজি দেখে বলে দেবে, ভুবনেশ্বরী বঁটি পেতে তবে আনাজ কুটতে বসবেন।

এমনি চলছিল। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ

করে জগবন্ধুর সঙ্গে এবারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়ে গেল। বরের কোষ্ঠি কনের কোষ্ঠি মিলিয়ে ক্ষুদিরাম যোটক-বিচার করল, গণ-রাশি হিসাব করে শুভকর্মের দিনক্ষণ ঠিক করে দিল। পাকাদেখার দিন পাত্র-আশীর্বাদ করে এলো জগবন্ধুর সঙ্গে পাত্রের বাড়ি গিয়ে।

নদী-খালে বান ডেকে সারা অঞ্চল ডুবে গিয়ে ছিল। জল সরে গিয়ে এখন অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা। জেলে খবর দিয়ে আনা হয়েছে, মন তিন-চার পোনামাছের সরবরাহ দেবে। কিন্তু বায়না নিতে তারা আগু-পিছু করে। বানের জলের সঙ্গে মাছও বেরিয়ে গেছে। জালে যদি মাছ না পড়ে তখন যে জাত যাওয়ার ব্যাপার।

বলে, যার পুকুরে হুকুম হবে, হুজুরের নজরের সামনে দড়াজাল নামাব, যতক্ষণ যেভাবে বলেন টেনে যাব। কিন্তু চুক্তির বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে ভরসা পাইনে।

ক্ষুদিরামকে পেয়ে ছোট-দারোগা চোখ টিপে টিপ্পনী কাটেঃ শুনেছেন ভটচাজ-

মশায়? দিনে দিনে কী অরাজক অবস্থা হল, বুঝুন একবার। জেলের পুত থানার উপর দাঁড়িয়ে বলে কিনা বায়না নেবো না। কালী বিশ্বাসের আমল হলে ঐ কথার পরে উঠে আর বাড়িঘরে যেতে হত না, রোদের মধ্যে চোদ্দ-পোয়া হয়ে বেলান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দশেধর্মে চোখে দেখে সামাল হত।

জগবন্ধুর ঠিক আগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কালী বিশ্বাস ছিলেন বড়বাবু। তুলনাটা তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ছোটবাবু যত যা-ই বলুক, হেন অবস্থায় ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মরে গেলেও হাঁ-না কিছু জবাব দেবে না। কোন কথা কার কানে কি ভাবে হাজির হবে—কথা খুব ওজন করে বলতে হয়। একেবারে না বলাই ভাল। ছোটবাবুও বোঝে সেটা, উত্তরের প্রত্যাশা করে না। একজন কাউকে সামনে রেখে মনের গরম খানিকটা বের করে দেওয়া।

বলছে, ঘাড় নেড়ে যাবার সাহসই হত না, বাপ-বাপ বলে বায়না নিত, সাগর ছেঁচে মাছ এনে দিত। হেঁ-হেঁ, সে হল কালী বিশ্বাস—লোকে বলত কলি বিশ্বাস, নরদেহে সাক্ষাৎ কলিঠাকুর।

ক্ষুদিরামকে মধ্যস্থ মেনে বলে, সেই দেখেছেন আর এ-ও দেখুন। দেখে দেখে চক্ষু সার্থক করুন। কলি উল্টে সত্যযুগের উদয় আমাদের থানার উপর। কী করব—আমরাও সব হাত-পা গুটিয়ে ধ্যান-নেত্র হয়ে বসে আছি। আমরা অধার্মিক লোক, আমাদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু আপনি হেন কারিতকর্মা ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে মাছের কথা আপনাকেও একবার বলা হল না। সকলকে বাদ দিয়ে যজ্ঞি হবে, চৌকিদার-দফাদার বেটারা করে দেবে। করুক তাই। শেষ অবধি দক্ষযজ্ঞ—চক্ষু মেলে মজা করে দেখে যাব আমরা।

কথা ঠিক বটে। এসব কাজে চিরকাল ক্ষুদিরামকেই হাঁকডাক করতে হয়। এবারে দফাদার-চৌকিদারের ডাক পড়েছে। অপমান বই কি! ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম ছোটবাবুর কথা স্বীকার করে নেয়। এবং সম্ভবত অপমানের জ্বলুনিতেই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে।

দ্রুতপদে মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সুঁড়িপথে অদৃশ্য হয়। ঘুরে এসে খিড়কির পথে টিপিটিপি জগবন্ধুর কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল। যে পথে বরাবর ভুবনেশ্বরীর কাছে আসা-যাওয়া। জগবন্ধুকে অভয় দিয়ে বলে, মাছের জন্য চিন্তা নেই বড়বাবু। আমার দায়িত্ব রইল।

হেসে বলে, শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে আকাশের বেয়াড়া গ্রহগুলো অবধি বাগিয়ে নিয়ে আসি, আর জলের ক'টা মাছ তুলতে পারব না! পুকুর কতকগুলো দেখে রেখেছি, পনের-বিশ সের করে এক-একটা মাছ—চার মন তো নস্যি। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা জাল-দাড় নিয়ে এসে পড়বে, নিজে আমি সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকব।

কাজকর্মের মধ্যে ক্ষুদিরামকে জড়াবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় এখন জগবন্ধুকে রাজি হতে হল। আশ্বস্ত হলেন। বললেন, বাজার হিসাবে যা ন্যায্য দাম, পুকুরওয়ালারা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। সিকি পয়সার তঞ্চকতা না হয়। এ দায়িত্বও আপনার উপর।

যে আজ্ঞে, তাই হবে।

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম আবার বলে, আমি আজকের মানুষ নই বড়বাবু। এ থানায় কতজনাই তো এসে গেলেন, এমন ধনুক-ভাঙা পণ কারো দেখিনি।

আমার তাই। পরের দয়া নিয়ে কিম্বা পরকে ফাঁকি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব না। মেয়ের তাতে কল্যাণ হবে না।

ক্ষুদিরাম গদগদ হয়ে উঠল: আহা, হাটের মধ্যে ঢোলসহরৎ করে বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। দশেধর্মে শুনুক। ক-জনে বোঝেন এতখানি, ক্ষমতা হাতে পেলেই তো গরিব মারবেন! আপনি আমায় ডাকেন নি বড়বাবু, অসুবিধার কথা কানে শুনে উপযাচক হয়ে ছুটেছি। পরসেবা, বিশেষ করে সজ্জনের সেবায় মহাপুণ্য। আমার চিরকালের নেশা বড়বাবু। এক বয়সে মাসের পর মাস রাত জেগে অঞ্চল পাহারা দিয়ে বেড়াতাম, আমি ছিলাম দলপতি। আপনার আগে কালী বিশ্বাস ছিলেন এখানে। অতি খচ্চর। টারা চোখ, বাঁ-হাতের ছটা আঙুল—খুঁতো

...গুলো হয় ঐ রকম। আমার সঙ্গে ... না। দারোগা আছ, চোর-ছ্যাঁচোড়ে ... করবে—সত্যপথের পথিক, আমি কেন ... করতে যাব? বলুন।

সত্যের পথিক পরসেবী মানুষটির সম্বন্ধে জগবন্ধু কিন্তু উল্টোটাই শুনেছেন। আবার এ-ও শুনেছেন, অতিশয় কাজের মানুষ।

আগের কথার জের ধরে ক্ষুদিরাম বলে, দাম দিলে নেবে না কেন বড়বাবু? কালী বিশ্বাস দিত না। ঐ আসনে বসে ক-জনে বা দেয়! না পেয়ে পেয়ে সেইটেই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছে। জলে বাস করে কুমির ক্ষেপানো তো ভাল কথা নয়।

জগবন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলেন, যত শয়তান জুটে সরকারের নামে কলঙ্ক দিয়েছে। চোর ধরবার চাকরি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় চোর কোথায় আছে?

চারখানা গ্রামের মধ্যে গোটা আষ্টেক পুকুর ঠিক করে রেখেছে ক্ষুদিরাম। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা দড়াজাল নামাল। মাছ ধরার নামে বিস্তর লোক জুটে যায়। সকলের চোখের সামনে জাল টানছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূব থেকে পশ্চিম নানা রকমে নানান কায়দায় টানে। চার-চারটে গ্রাম ঘুরল, মাছের একখানা আঁস পর্যন্ত ওঠে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে ক্ষুদিরাম। এবং খবর পেয়ে জগবন্ধু বলাধিকারীও।

জেলেরা বলে, জানতাম আমরা ভটচাজ-মশায়। জলের উপরটা দেখে তলার খোঁজ বলে দিতে পারি। ভাতভিত্তি যে আমাদের। কথাটা বলেছিলাম, মিলিয়ে দেখে নিন এবার। শুধু-শুধু নাজেহাল হলাম।

বেইজ্জতি ব্যাপার। 'দধি-মৎস্যাদির আয়োজন করিব, আপনারাও করিবেন—' লগ্নপত্রের এই চিরকালের বয়ান। বিয়ের ভোজে মাছ বাদ—বিধবারা মাছ খায় না, তেমনি একটা অলক্ষুণে যোগাযোগ মনে এসে যায়। নিমন্ত্রিতেরাই বা কি বলবে? এত বড় থানার উপর বসে থেকে অঞ্চল চুঁড়ে মাছ মিলল না, এ কি বিশ্বাস হবার মতো কথা?

কী হল ভটচাজমশায়? শুনেছিলাম, অত্যন্ত দক্ষ লোক আপনি, কাজে নেমে কখনো হারেন না—

মুখ চুণ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের, তা বলে মুশড়ে পড়বার পাত্র নয়ই বলে, হেরে গিয়েছি কি করে বলি। মাঝরাত্রে লগ্ন—বারোটার পর। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী বিয়ের পরেই না হয় ভোজে বসবে। উচিতও তাই। কাজের আগে কেউ খেতে চায় না। সে খায় কলকাতা শহরে। খেয়ে পানের খিলি মুঠোয় নিয়ে ট্রাম ধরতে ছোটে।

জগবন্ধু ভরসা পান না। বলেন, বিকাল পর্যন্ত বেয়ে স্রেফ ঝাঁঝি আর পাটাশেওলা তুলে বেড়াল। কোথায় কে মাছ জিইয়ে রেখেছে—এই তিন-চার ঘণ্টায় চার মন মাছ হয়ে যাবে? হবার হলে দিনমানেই হত।

ক্ষুদিরাম অবিচলিত কণ্ঠে বলে, দেখাই যাক।

জেলেরা তো বাড়ি চলে গেল। পারবেও না তারা—সারাদিন যা খেটেছে, নড়ে বসবার তাগত নেই। কারা যাচ্ছে এর্বারে মাছ ধরতে?

জিভ কেটে হাত দুটি জোড় করে ক্ষুদিরাম বলে, ঐটি জিজ্ঞাসা করবেন না বড়বাবু। সঠিক আমিও জানি নে। একটু-আধটু যা জানি, বলা যাবে না আপনার কাছে। তবে ভার দিলে কাজ তুলে দেবে, মনে করি। কী হুকুম হয়, বলুন। সময় নেই, বুঝতে পারছেন।

জগবন্ধু গুম হয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

বলেন, উপায় যখন নেই, যা করবার করুন গে। কিন্তু আমার কথা, দাম ষোলআনা নেবে তারা। রাত্রিবেলার খাটনি—ষোল আনার উপরেও কিছু নেবে।

অবস্থাটা চট করে ভেবে নিলেন। কি ভাবে কোথা থেকে মাছ এল এই দারোগাগিরি মেয়ের বিয়ের মুখে একটা দিন না-ই বা করলেন। শাস্ত্রের উক্তি, মূল্য দিলেই দ্রব্যের দোষ শোধন হয়। হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দেবেন তিনি। সকলের মুকাবেলা।

দ্বিধাভরে বলেন, সারাদিনে লবডঙ্কা। অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে কি হবে—আমি কোন ভরসা দেখছি নে ভটচাজমশায়।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে বলে, দাঁতি-দানোর কাজ অন্ধকারেই খোলে ভাল। তৈরি হয়ে আছে সব। বলে কি জানেন বড়বাবু, পুকুরের মাছ তো হাতের মুঠোর জিনিস—হুকুম হলে বাদা থেকে বাঘের দুধ দুয়ে এনে দিই। সেই দুধে দিদিমণির বিয়ের পায়েস হবে। অন্য রাঁধাবাড়া হয়ে যাক, মাছ এসে পড়লেই কুটে ভেজে চড়িয়ে দেবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সাঁ করে বন্দোবস্তে বেরিয়ে গেল।

প্রহরখানেক রাত। বড় একদল বরযাত্রী এসে উঠল নৌকাঘাটা থেকে। জগবন্ধু তাঁবুটিতে বসেছিলেন, খানিকটা সেরে কুটুম্বদের আদরঅভ্যর্থনায় ছুটলেন। বরের আসর গমগম করছে।

এমনি সময় ক্ষুদিরামের আবির্ভাব। ফিসফিস করে বলে, একটু ইদিকে আসবেন বড়বাবু।

সশব্দে জগবন্ধু বলেন, খবর কি?

কী আবার! মাছ। বলেছি তো, হারিনে আমি কোন কাজে। একটিবার এসে চোখে দেখুন।

দু-হাত দু-দিকে প্রসারিত করে বলে, মাছ নয়—এই বড় বড় রাজপুত্তুর। দেখে যান।

একটুখানি ফাঁক কাটিয়ে জগবন্ধু হেরিকেন-লণ্ঠন হাতে ক্ষুদিরামের পিছু পিছু চললেন। থানার সীমানাটা ছাড়িয়ে বাদামতলার অন্ধকারে মাছ এনে গাদা করে গেছে। এনেছে বেশিক্ষণ নয়—লেজের ঝটপটি এখনো দু-চারটের।

একটা মাছের কানকোয় হাত ঢুকিয়ে ক্ষুদিরাম তুলে ধরল ভাল করে দেখানোর জন্য। মাছের ভারে মানুষটাই যেন নুয়ে যাচ্ছে। হেরিকেন উঁচু করে জগবন্ধু দেখে নিলেন, দেখে ভারি প্রসন্ন। রাজপুত্র বলে বর্ণনা দিল—লালচে রঙের সুপুষ্ট রুইমাছ, পুচ্ছ লাল, উপমা কিছুমাত্র বেমানান নয়। মাছ যেন জিইয়ে রাখা ছিল কোন খানাখন্দে, হুকুম পাওয়ামাত্র তুলে দিয়ে গেল।

ক্ষুদিরাম বলে, রান্নার দিকটাও আমি দেখছি। আপনি একবার চোখে দেখে গেলেন, দেখে খুশি হলেন, বাস!

জগবন্ধু সবিস্ময়ে বলেন, সমস্তটা দিন জাল টেনে টেনে মরল, এত মাছ কোন্ পুকুরে ছিল তাই ভাবছি।

জেলেদের কথা তো! বক্র হাসি হেসে ক্ষুদিরাম বলে, হাটে হাটে বেটারা হাতে কেটে ট্যাংরা-পুঁটি বেচে বেড়ায়, কতটুকু মানুষ ওরা—দুনিয়ার খবর কী জানবে! সে জানেন এক অন্তর্যামী ভগবান, আর ঐ দাঁতিদানোগুলো। ডাকতে হাঁকতে বরাবর ওরাই এসে পড়ে, থানার লোকের কোন দায় ঠেকতে হয় না। এবারে নতুন নিয়ম করতে গিয়েই মুশকিল হল। সে যাক গে, শেষ রক্ষে হয়ে গেছে—এখন আর ভাবনা কি?

দেখছি না তো তাদের কাউকে। মাছ ফেলে দিয়েই পালাল। আমার যে নগদ টাকা হাতে-হাতে দেবার বন্দোবস্ত।

ক্ষুদিরাম বলে, আপনার সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে, তবেই হয়েছে! পাই-তকের মধ্যে অতবড় বুকের পাটা কারো নেই। তবে আমি আগে থেকে চুক্তি করে নিয়েছি, দাম কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে আবদার শোনা হবে না। ভাববেন না বড়বাবু। আপোসে না নিতে চায় তো মানুষ চিনিয়ে দেব আমি—কনেস্টবল-চৌকিদারে পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে থানার উঠানে এনে ফেলবে, বাপের সুপুত্তুর হয়ে দাম নিয়ে যাবে। শুভকর্মের মধ্যে এ নিয়ে মাথা গরম করবেন না, খুশি মনে কন্যা-সম্প্রদান করুন গে। আমি রান্নার তদারকে যাচ্ছি।

এই ছাড়া কী ব্যবস্থাই বা হতে পারে এখন! জগবন্ধু কড়া হয়ে বললেন, দাঁড়ি-পাল্লা ধরে মাছের সঠিক ওজন নিয়ে নিন এক্ষুনি। জলের মাছ, জল-মরা বলে পাঁচ-দশ সের বাদ—এসব ধানাই-পানাই আমার কাছে করতে যাবেন না। পোয়া-ছটাক অবধি হিসাব করে দাম কষে ফেলুন। তারপরে কোটা-বাছা, তারপরে রাঁধাবাড়া। এই কাজটা শেষ করে তবে আপনি নড়বেন।

হুকুম দিয়ে জগবন্ধু চললেন। মনে মনে প্রবোধ নিচ্ছেন: অত দেখতে গেলে হয় না। বাজার থেকে কতই তো কেনাকাটা করি, কোন্ সূত্রে কোন্ বস্তুটা এল তাই নিয়ে কে খোঁজাখুঁজি করতে যায়? ন্যায্য পরিমাণ দাম দিয়ে দিলেই বিবেকের কাছে দায় থাকল না।

সত্য জগবন্ধুকে খুঁজতে হয়নি, পরের দিন থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পেতে লাগল। বুধবার, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের তারিখ যেদিন, রাত্রিবেলা পুকুরের মাছ চুরি হয়েছে। সে পুকুর একটি দুটি নয়—এজাহারের পর এজাহার আসছে, গোনা-গুণতি ছাড়িয়ে যাবে এমনি গতিক। এবং শুধুমাত্র এই থানায় নয়, পাশের থানা ঝিনুকপোতার এলাকার ভিতরেও। সর্বনেশে কাণ্ড করেছে বেটারা—যেখানে যত ভাল পুকুর, সর্বত্র জাল ছেঁকে বেড়িয়েছে।

(ক্রমশ)

গান শোনবার নিমন্ত্রণ

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

তপনকে সিগারেট খেতে শিখিয়ে নিজেই হাত কামড়াচ্ছি।

গোড়াতে ভেবেছিলুম—সব ভদ্র সন্তানই যেমন ভেবে থাকে—তপন একবার সিগারেট ধরুক, তারপর ওকে আমিই চেপে ধরব। কিন্তু এমনিতে যত দিল-দরিয়াই হোক, সিগারেট কিনতে বললেই ওর জবাব : দুর-দুর, পয়সা দিয়ে ধোঁয়া কিনে খাব?

তার মানে আমি যে সিগারেট কিনছি তাতে পয়সা খরচ হচ্ছে না। অন্তত ওর যে হচ্ছে না—তাতে আর সন্দেহ কী!

সঙ্গে যখন থাকে, তখন আমি একটা প্যাকেট কিনলে তার সাতটাই ও উড়িয়ে দেবে। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, ভাই তপন, ডাক্তারেরা বলেছেন সিগারেট খাওয়া খুব খারাপ। ওতে ক্যানসার হয়।

—তুমি যে খাচ্ছ বড়ো?

আমি তখন খুব উদাস হয়ে গিয়েছিলুম। চোখ দুটোকে অত্যন্ত ভাবুকের মতো করে চেয়েছিলুম নিশ্চয়, কিন্তু তখন নিজের চোখ আমি দেখতে পাইনি, গভীর গলায় বলেছিলুম, আমার জন্যে ভেবো না ভাই। আমি মারা গেলে পৃথিবীতে কার কী আসে যায়! দেখতেই পাচ্ছ, ব্যাঙ্কে চাকরি করি। হাজারে হাজারে পরের টাকার হিসেব লিখছি, অথচ নিজের বেলায়—! এমন একটা থার্ডক্লাস জীবনের কোনো মানে হয়? অথচ তোমার মূল্যবান জীবন—

তপন বলেছিল, আমিও তো ব্যা-ব্যা—

—না ভাই, আমি আপত্তি করছি। তুমি কোন্ দুঃখে ব্যা-ব্যা করবে?

—ধুত্তোর! ব্যা-ব্যা নয়—ব্যা-ব্যা—অ্যাংক! আমিও তো সেই কী বলে—সেই ব্যা-ব্যা—চুলোয় যাক, চাকরি করি। কাজেই এক সঙ্গেই না হয় ক্যা-ক্যা-ক্যা—

ওর 'ক্যা-ক্যা' জিজ্ঞাসার সঙ্গে আমাকেই 'অ্যানসার'টা জুড়ে দিতে হয়েছিল—কী আর করা! কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, তপন আমার সিগারেট খাবেই এবং সেজন্যে আমার সঙ্গে সহমরণে যেতে পর্যন্ত প্রস্তুত আছে।

রবিবার সকালে মেসের চাকরকে দিয়ে সবে এক বাক্স সিগারেট আনিয়েছি এবং একটা ধরিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হাসি নিয়ে তপনের প্রবেশ। কী করে যে টের পায়—আশ্চর্য!

চকিতে মাথার ভেতরে একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা এসে গেল। তপন ঘরে ঢুকতেই বেশ কায়দা করে সিগারেট প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলুম ঘরের কোণায়। বললুম, যাঃ—ফুরিয়ে গেল!

—বটে—তাই নাকি? তা হলে খালি প্যাকেটটাই আমি নিই, কী বলো?—তপনের হাসি কান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল : ব্রাদার, আমার সঙ্গে চালাকি? খালি প্যাকেটে কখনো অমন চপ করে শব্দ হয়?

বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলুম, ঠিক কুড়িয়ে নিয়েছে।

ব্যাজার হয়ে ভাবছি, ছুঁচোবাজীর বারুদ মিশিয়ে ওর জন্যে একটা স্পেশ্যাল সিগারেট তৈরী করা যায় কিনা—তপন এসে আমার পাশে বসে পড়ল। ডাকল, সুকুমার?

—হুঁ।

—সুকুমার, শুনছ?

—শুনব না কেন?—তপনের পকেট থেকে বিদ্যুৎ বেগে আমি প্যাকেটটা পুনরুদ্ধার করলুম : দেখতেই তো পাচ্ছ—নাকের দু দিকে ব্যালান্স করে একজোড়া বড়ো বড়ো কান খাড়া হয়ে আছে।

—আছে নাকি?—তপন হ্যা হ্যা করে হাসল : আমি ভেবেছিলুম দুটোই কাটা গেছে বোধ হয়।

রসিকতা। পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। গম্ভীর হয়ে বললুম, বাজে কথা থাক। কিছু বলবার থাকলে বলো।

—বলতেই তো এসেছি, কিন্তু তুমি এমন

ছাটলোক হয়ে গেছ যে একটা সি-সি-সি—তপন একেবারে ছি-ছি করতে লাগল।

তারপর গোটা কয়েক লম্বা লম্বা টানে সিগারেটটা শেষ করে বললে, গান শুনবে?

—তুমিই শোনাতে চাও নাকি?—আমার রোমাঞ্চ হল: একবার আর্টিস্ট হয়ে তুমি আমার পিলে চমকে দিয়েছিল, গান শোনালে—মানে টু বি ভেরী ফ্র্যাংক—হাসপাতালে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা আমায় নাও করতে হতে পারে!

—শাট আপ!—তপন চটে গেল: আমি গান শোনাব কেন? শোনাবেন আমার পা—পা—পা—

—তোমার পা শোনাবেন, তোমার পা কি গান গাইতে পারেন? শুধু তোমার কেন, পৃথিবীর কোনো পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকের পায়েরই কি গান গাওয়া সম্ভব?

হাই টী! আমি কান খাড়া করলুম।

আমার সংশয় তপনকে জানাতে হল।

—আঃ ইয়ার্কি নয় সুকুমার। গান শোনাবেন পা—পারুল পিসিমা।

যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

—কিন্তু তোমার পারুল পিসিমা আমাকে গান শোনাবেন কেন? আমাকে তো চেনেন না।

—তোমাকে ঠিক চেনেন না বটে—সরু গোঁফের ভেতর থেকে তপন মিটমিট করে হাসল: কিন্তু কী একটা গল্প—মানে মধ্যে মধ্যে কাগজপত্রে যেসব রাবিশ তোমার ছাপা হয়, তারই একটা পড়ে দারুণ উত্তেজিত হয়েছেন। তাতে তুমি গান সম্বন্ধে কী যেন লিখেছিলে, পিসিমা বলেছেন, লোকটি দারুণ গুণী—একে আমি গান শোনাব। শুনে বেশ খানিকটা উৎসাহ এল বটে কিন্তু সন্দেহ গেল না।

—ইয়ে—কী বলে, কিছু মনে কোরো না ভাই—তোমার পিসিমা—মানে সেই রকম গান করেন না তো—যা শুনে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে, ঊর্ধ্বশ্বাসে লোকে—

—আরে না—না! পা-পা-পারুল পিসিমা চমৎকার গাইতে পারেন, কীর্তন, ভ-ভজন, বাউল—সবগুলোতে এক্সপার্ট। বাইশটা মেডেল আছে, তার তিনটে অবিশ্যি টিনের।

—টিনের? টিনের কেন?

—আরে সব জো—জো—জো—মানে চোর। রুপোর বলে চালিয়ে দিয়েছে—তপনের মুখে ধিক্কার ফুটে বেরুল: কাউকে বিশ্বাস করতে আছে নাকি দুনিয়ায়? মরুক গে, আজ বিকেলে তোমার গান শোনা আর 'হাই টী' খাবার নেমন্তন্ন।

—হাই টী?—আমি কান খাড়া করলুম।

—হুঁ। চায়ের সঙ্গে গরম কাটলেট, মাংসের সিঙাড়া, পুডিং—

আর বলতে হল না—আমার আপাদ-মস্তকে শিহরণ জাগল। মেসে কী খেয়ে না দিন কাটছে। 'হাই টী'র প্রস্তাব শুনেই আমার মনের ভেতর 'ট্রা-লা-লালা' করে একটা বিলিতী গান গুনগুন করে উঠল।

—আলবাত। তবে তো যেতেই হয়। এমন গান শোনবার সুযোগ কিছুতে ছাড়া যায় না।—তপন এর ভেতরেই আবার আমার সিগারেটের প্যাকেটটা দখল করেছে, কিন্তু দেখেও আমি দেখতে পেলুম না: কখন যেতে হবে—কোথায় যেতে হবে?

—পাঁচটায়। সে আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব। তুমি কোনো চি-চি-চি—

—না—না, আমি কোনো রকম চিঁচি' করব না। যা করবার তুমিই করো।

তপন একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, শুধু একটা কথা আছে ভাই। যাওয়ার সময় কিছু চকোলেট-টফি—এসব নিয়ে যেয়ো।

—চকোলেট-টফি? — আমি আশ্চর্য হলুম: কেন, পিসিমাকে প্যালা দিতে হবে নাকি?

—ধুৎ, পিসিমা প্যা—প্যা—মানে নেবেন কেন? আমার দুটি পিসতুতো ভাই আছে, একটার পাঁচ বছর আর একটার সাত। ওরা

একটু ওগুলো ভালোবাসে, মানে চায়-টায়। সত্যি বলতে কি ভাই, পিসিমার গান ভালো, খাওয়ানও ভালো, কিন্তু ওদের জন্যেই পিসিমার বাড়িতে আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

তপনের 'মীননেস' দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, ওর হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিলুম আমি। দুটি শিশু—কবি যাদের সম্পর্কে বলেছেন "নন্দনের এনেছে সংবাদ—ইহাদের করো আশীর্বাদ"—তাদের দুটো চকোলেট কিনে দিতেও তপনের মন খারাপ হয়ে যায়! তার ওপর আবার পিসতুতো ভাই! ঠিক করলুম, এর পরে ওর কাছ থেকে আমি সিগারেটের দাম আদায় করব।

বললুম, তুমি তো আচ্ছা ছোটলোক হে! দুটো বাচ্চা—আহা—হাই টী'র কথা মনে পড়তে আমার স্বর আরো মধুমাখা হয়ে উঠতে লাগল: এই তো ওদের চকোলেট খাওয়ার বয়েস! তুমি কি আশা করো ওরা তোমার কাছে চকোলেট না চেয়ে এক কল্কে তামাক চাইবে?

তপন সরু গোঁফের ফাঁকে একটু হাসল—বেশ আধ্যাত্মিক রকমের হাসিটা। বললে, আচ্ছা, পাঁচটার সময় আমি আসব। তৈরি থেকো।—তার পরেই খপ করে আমার হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে বললে, এটা খালি প্যাকেট—তুমি ফেলে দিয়েছিলে। এখন একটা আমার প্র-প্র-প্র—

'প্র-পরা-অপ' ইত্যাকার অবশিষ্ট উপসর্গ-গুলো অনুচ্চারিত রেখেই তপন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি হাঁ-হাঁ করে ওঠবারও সময় পেলুম না।

তখনই বোঝা উচিত ছিল, গান শোনানো আর হাই টী খাওয়ানোর ভেতরে নির্ঘাৎ একটা প্যাঁচ আছে কোথাও। যে রকম বিচ্ছিরি দিনকাল, তাতে খামোকা কেউ কাউকে গান শুনিয়ে পুডিং কাটলেট খাওয়ায় না। আমার মামাতো ভাই নগেনদাকে একবার ট্রাম গাড়িতে পাশের লোকটি একটা মস্ত গোলাপ দিয়ে বলেছিল, পেশোয়ারী গোলাপ স্যার—আপনাকে প্রেজেণ্ট করলুম। হাসি-হাসি মুখে নগেনদা বিভোর হয়ে পেশোয়ারী গোলাপ শুঁকছেন, সেই ফাঁকে লোকটা তার পকেট মেরে দুশো টাকা সুদ্ধু মনিব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে গেল!

আপাতত নগেনদার সেই করুণ কাহিনীটা বার বার মনে পড়ছে আমার।

পিসেমশাই চা বাগানের ম্যানেজার, অবস্থা তাঁর ভালোই দেখা গেল। জাঁকালো বাড়ি, সামনে মস্ত বাগান। গেট পেরিয়ে যেই ঢুকেছি, অমনি দুটি গোলগাল আহ্লাদে চেহারার ছেলে প্রায় মার মার করে তেড়ে এল আমাদের দিকে।

—পোকাদা এসেছে—পোকাদা—

তপন চৌধুরীর পোকাদা' বলে একটি মনোরম নাম আছে, এই তথ্যটি অবগত হয়ে মন পুলকিত হল। এবং আরশোলা কিংবা গুবরে পোকা কোনটার সঙ্গে ওর বেশী সাদৃশ্য আছে সেটা বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময়—

তপন হাঁ-হাঁ করে উঠল: আমি নয়—আমি নয়—ওর কাছে—ওকে ধরো—

ওর কাছে? কার কাছে? কাকে ধরবে এবং কেনই বা ধরবে? এতগুলো জটিল জিনিস এক সঙ্গে অনুধাবন করবার আগেই সেই শিশু দুটি তৎক্ষণাৎ আমাকে আক্রমণ করল। একজন আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ পকেটটাকে হাতড়াতে লাগল, আর একজন ডান পকেট থেকে টফির ঠোঙাটা বের করে নিয়ে তীরবেগে ছুট লাগালো।

প্রথমটি তখন পকেট থেকে রুমাল, চাবি, দু চার আনা খুচরো পয়সা—সব মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলছিল। আত্মরক্ষার জন্যে একটা চড় প্রায় তুলে ফেলেছি—এমন সময় আর একজনের হাতে ঠোঙাটা দেখেই সে তাড়া করল তাকে। পরের অধ্যায়টা আর জানা গেল না, কারণ দুজনেই ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে আমি বললুম, তা হলে এরাই—

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল তপন।

—হুঁ, এরাই। গাবু আর টাবু। ভগবানের স্-স্-স্পে-পে—

—স্পেশ্যাল—

—ক-কর-ক্রিয়েশন!

মাটি থেকে রুমাল-চাবি কুড়িয়ে নিয়ে পয়সাগুলো খুঁজতে খুঁজতে বললুম টফি-গুলো হাতে করে দেবার তরও সইল না দেখছি। একটু ক্ষুধিত ছিল মনে হচ্ছে।

—ক্ষুধিত? এরা সব সময়ই ক্ষুধিত থাকে। যাকে বলে মহাবুভুক্ষা।

—আমার পাঞ্জাবীর পকেটটা একটু ছিঁড়েও দিয়েছে হে।

—আর আমার কী ছিঁড়েছে, জানো?—সরু গোঁফের ফাঁকে তপন মিটমিট করে হাসল: বা-বারোটা।

—অ্যাঁ!—নিদারুণ আতঙ্কে আমি আর্তনাদ করি: বলো কি হে, শেষ পর্যন্ত ভদ্র পোশাকে ফিরতে পারব তো?

—ভ-ভগবানকে ডাকো।

—তার মানে?—আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল: তুমি কি বলতে চাও—

ও যে কী বলতে চায় সেটা আপাতত জানা গেল না। কারণ পারুল পিসিমা এসে পড়লেন। আর তাঁর পিছনে টাক মাথা যে বেঁটে-খাটো ভদ্রলোক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন, তাকে পিসেমশাই বলেই সন্দেহ হল আমার।

—ডাবু-টাবু এসেছিল বুঝি?—পারুল পিসিমার গোলগাল মুখ থেকে স্বর্গীয় বাৎসল্য উছলে পড়ল: ছেলে দুটোর ভারী মায়ার প্রাণ।

লোকজন দেখলে তক্ষুনি ছুটে আসে।

—আর দেখতে দেখতে আপন করে নেয়।—পিসেমশাই সস্নেহে সংযোজন করলেন।

আর পত্রপাঠ পকেট মারে—এইটে বলতে গিয়েও আমাকে সামলে নিতে হল।

তখন পিসিমার দৃষ্টি আমার ওপর গিয়ে পড়ল।

—তুমিই তো সুকুমার?

করজোড়ে বললুম, আজ্ঞে।

পারুল পিসিমা কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার 'আলো ঝলমল সন্ধ্যা' বলে একটা গল্প পড়ে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি লিখেছ: মুমু মিঞা তখন মনের খুশিতে চৌতালে একখানা দিলরুবা গাইছিল।'

চৌতালে দিলরুবা গাওয়া যায় এ কথা কে কবে ভেবেছিল!

পিসেমশাই বললেন, আর দিলরুবা বলে একটা সুর আছে—একথাই বা কে কবে শুনেছে! আমরা জানতুম ওটা একরকম বাজনা।

পিসিমা বললেন, ভেবে দেখো, আমরা কত কম জানতুম!

আর পিসেমশাই বললেন, আরো ভেবে দেখো, গল্প লেখকেরা আমাদের চাইতে কত বেশি জানেন!—আবেগে পিসে মশাইয়ের টাকটা পর্যন্ত চকচক করতে লাগল।

ও'দের এই ভাবনার প্রতিযোগিতায় আমার কি রকম অস্বস্তি লাগতে লাগল। প্রায় বলতে যাচ্ছি, দিলরুবা এক রকমের জাপানী গজল—পিসে মশাই-ই বাধা দিলেন। বললেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি আর কথা হয়? চলো-চলো—ভেতরে চলো—

ভেতরে পা বাড়াতে আমার ঠিক সাহস হচ্ছিল না—সেই মায়ার প্রাণ' ছেলে দুটির পুনরাক্রমণের সম্ভাবনায় শিহরণ জাগছিল সর্বাঙ্গে। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না। তা ছাড়া তৎক্ষণাৎ 'হাই টী'র কথাও মনে পড়ে গেল। আর পিসিমার গোলগাল হাসি হাসি মুখখানা দেখে এমনও সন্দেহ হচ্ছিল সে পুডিং-কাটলেটের ব্যাপারটাও নেহাত মন্দ জমবে না।

শুধু তপনকে একবার বললুম, ভাই পোকাদা—

হাঁড়ির মতো মুখ করে তপন বললে, এগোও'

তা হলে এগোই। কবিগুরু বলেছেন, 'নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়' ইত্যাদি। কী 'রবে আর রবে না'—সেটা এখনো জোর করে বলা মুশকিল। কারণ সেই শিশু দুটির আর একবার আবির্ভাব ঘটলে জামা-টামা আস্ত নিয়ে ফেরা যাবে কি না, সে ব্যাপারে এখনো নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। মনকে ভরসা দিয়ে বললুম, ঠোঙায় আধ পাউন্ড টফি ছিল—সেগুলো শেষ করে আনতেও তো সময় লাগবে!

পিসিমা আর পিসেমশাই আমাদের ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলেন। সোফা চেয়ার নেই—ঢালাও ফরাস পাতা। সঙ্গীত শিল্পীর ঘর যেমন হয়ে থাকে। কোণায় ঠেসান দেওয়া তানপুরা, ফরাসে হারমোনিয়াম আর বাঁয়া-তবলা। শিশু দুটিকে কাছাকাছি দেখা গেল না—গানের আসরে এসে বিরক্ত করবে না বলেই ভরসা হল।

—বোসো—বোসো—বলে পিসিমা ধাঁ করে নিজেই বসে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়াম টেনে নিলেন। আর পিসেমশাইকেও তবলা-বাঁয়ার পাশে আসন নিতে দেখা গেল।

তপন আমার কানে কানে বললে, পিসেমশাই খুব ভালো তবলচী।

অর্থাৎ একজন সঙ্গীত করেন, আর একজন সঙ্গত। আদর্শ জীবন সঙ্গী একেই বলে—এরই নাম সঙ্গদান।

পিসিমা বললেন, মুশকিল কি জানো সুকুমার, দেশে সমঝদার নেই। এত ভালো গান শিখেছি, আমি—বাইশটা মেডেল আছে আমার (আমার মনে পড়ল, তার তিনটে টিনের)—তবুও শোনাবার লোক পাওয়া যায় না। শহরের লোকগুলো যে এত বেরসিক কী বলব! এই পোকাটা (তপনের মুখটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল) আগে তবু মাঝে মাঝে আসত, এখন ওর টিকিও দেখবার জো নেই। কিন্তু বিদ্যেটা যখন শিখেইছি, তখন লোককে না শোনালে কি ভালো লাগে? তুমিই বলো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

হার্মোনিয়ামের একটা রীড টিপতে টিপতে পিসিমা বললেন, তা হলে চা-টা কি এখুনি খাবে? না গান শুনে—

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিলুম, গান কী, হয়ে যাক না—কিন্তু পিসেমশাই বাগড়া দিলেন। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে তবলার কী সব ঠুকছিলেন, বললেন, আরে না—না, চায়ের জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সুকুমার কি রকম গুণী ছেলে দেখতে পাচ্ছ না? ও চৌতালে দিলরুবা গাইতে পারে—তুচ্ছ চায়ের জন্যে এসেছে নাকি এখানে? চা না হলেই বা কি আসে যায় ওর? গানই হচ্ছে আসল কথা—তার টানেই তো এমন করে ছুটে এসেছে!

কী সর্বনাশ! চা না হলেই বা কী আসে যায়? এমন বিপজ্জনক সম্ভাবনার জন্যে কে তৈরী ছিল! আধ পাউন্ড টফি বিনি-পয়সায় পাওয়া যায়নি, গাবু-টাবুর জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত, একমাত্র ভরসা হাই টীও বরবাদ হবে নাকি শেষ পর্যন্ত? আমি তপনের কানে কানে কাতরস্বরে বললুম, ভাই পোকাদা—

তপন দাঁত খিঁচিয়ে বললে শাট আপ!

পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন কী বলছ?

—কিছু না—কিছু না!—তপন জানালো: সুকুমার বলছে, চা না হলেও ওর চলবে—গা-গা—গানই হোক!

কী বিশ্বাসঘাতক। পোকাদা বলে ডেকেছি বলেই কি এ রকম প্রতিহিংসা নিতে হয়? আমি তারস্বরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই পিসিমা গান ধরলেন। ভজন। আর পিসেমশাই পত্রপাঠ বাঁয়া-তবলাকে আক্রমণ করলেন।

গান-টান আমার কাছে গ্রীক ভাষার চাইতেও জটিল, কিন্তু মিনিট কয়েক শুনে মনে হল, পিসিমা ভালোই গান। মিষ্টি দরাজ গলা—অনেকদিন ধরে সাধনা করেছেন বোঝা যায়। আরো মনে হল পেট ভরা থাকলে ঘণ্টা দুই তাঁর গান শোনা আমার পক্ষেও নেহাত অসাধ্য ব্যাপার নয়। হাই টীর কথা ভুলে গিয়ে আমিও একটু জমে উঠেছি, তালে তালে মাথা নড়ছে, এমন সময়—

চকোলেট—চকোলেট—

দ্রুত গাবু ও টাবু অকুস্থলে প্রবেশ করল। ডাকল: পোকাদা—পোকাদা—

তপন আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল।

—আমি নয়—আমি নয়—এই সুকুমারকে ধর—

তার নিজের ভূত দুটিকে পত্রপাঠ আমার দিকে চালান করল সে।

গাবু এবং টাবু—কোনটির কী নাম কে বলতে পারে, একটি ধপাং করে আমার কোলে বসে পড়ল, আর অবিলম্বে দু পাশের পকেট সন্ধান করতে লাগল। দ্বিতীয়টি আমার কাঁধের ওপর দাঁড়ের ময়নার মতো অধিষ্ঠিত হল এবং আমার বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে।

আর সমস্বরে শোনা গেল: চকোলেট—চকোলেট—

—এখন নেই, পরে কিনে দেব—ক্ষীণকণ্ঠে বক্তব্য জানিয়ে আমি গাবু-টাবুর হাত থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ফলে কোলেরটি আরো ভালো করে গদিয়ান হয়ে বসল এবং কাঁধেরটি বেশ শক্ত হাতে আমার চুলগুলো আঁকড়ে ধরল। খুব আরাম বোধ করলুম না—বলাই বাহুল্য!

—আছে চকলেট, তুমি লুকিয়ে রেখেছ—বলে একজন আবার দু পকেটের সর্বস্ব চারদিকে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল আর সিগারেটের প্যাকেটটা বেরুবা মাত্রই বিদ্যুৎ-গতিতে সেটাকে হাতিয়ে ফেলল তপন। দ্বিতীয়জন আমার কাঁধের ময়ূর সিংহাসনে আসীন থেকে টপ করে চশমা জোড়া খুলে নিলে।

—আহা-হা, করছ কী, চশমা দাও—চশমা দাও—

পারুল পিসিমা বিভোর হয়ে গান গাইছেন—এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তিনি দেখতেও পেলেন না। পিসেমশাই তবলা বাজাতে বাজাতে এক ঝলক মধুর হাসি বিতরণ করলেন আমার দিকে। অর্থাৎ যেন বলতে চাইলেন: তোমাকে কত ভালোবাসে দেখে নাও একবার।

—চশমা দাও বলছি—

—চকোলেট্ দাও তবে—বলেই আমার বাঁ কানে পুটুস্ করে চিম্‌টি কাটল।

আর একজন এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। পা ভর্তি ধুলো—আমার কাপড়জামা তচ্‌নচ্ করে দিয়ে ধাঁই করে নাকের নিচে খাম্‌চি দিলে একটা। বললে তোমার গোঁফ নেই কেন?

স্কন্ধাসীনটি এবার ঝট্ করে পকেটের ফাউণ্টেন পেনটা তুলে নিয়ে বললে, জানিস, ওর গোঁফ শেয়ালে খেয়ে নিয়েছে।

দুটি নন্দনের শিশু পরম পুলকে হেসে উঠল। এমনকি পিসেমশাই পর্যন্ত মিট মিট করে হাসলেন তাই শুনে। বাৎসল্য রসে চোখ দুটি চিকচিক করতে লাগল তাঁর।

কংস অত্যন্ত খারাপ লোক ছিলেন, তিনি পত্রপাঠ ভাগ্নেদের সংহার করে বসতেন। কিন্তু এই বালক দুটির জন্যে একটি কংস মামা জন্মগ্রহণ করলে কি খুব অন্যায় হত সেটা? কাঁধের শিশুটিকে প্রাণপণে নামাবার চেষ্টা করতে করতে এইসব বীভৎস এবং অন্যায় চিন্তা আমাকে পেয়ে বসতে লাগল। কিন্তু এদের কোনো কংস মামা জন্মাননি এবং কাঁধের ভূত যে ইচ্ছে করলেই নামানো যায় না, সেটা বুঝতেও দেরি লাগল না।

আবার চুলের মুঠিতে আরো শক্ত টান পড়ল, দ্বিতীয় শিশুটি প্রথমটির হাত থেকে

অবকার চশমাজোড়া সংগ্রহ করে ফেলল, আর আমার ঘাড়ের ওপর কেউ পিন দিয়ে আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হল। অনুমান করা গেল আমারই কলম দিয়ে বোধ হয় কিছু লেখা হচ্ছে ওখানে। কিন্তু ঘাড়টা যে ঠিক বিদ্যাচর্চার জায়গা নয়—এই কথাটা কিছুতেই বোঝানো গেল না। করুণ সুরে বললুম, ভাই তপন—

—আমি তো গোড়াতেই বলেছিলুম।

বলেছিল বটে, কিন্তু একজোড়া মহীরাবণ যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, ঘুণাক্ষরেও তো আর আভাস দেয়নি। তাহলে কে আসত এ বাড়ির ত্রিসীমানায়! এতক্ষণে কোনো রহস্য আর আমার অজানা রইল না। পিসিমা ভালোই গান, তবু যে কেন যে লোকে তাঁর গান শুনতে আসে না, এমনকি হাই-টীর লোভে নয়—সেটি হাড়ে হাড়ে বোধগম্য হল আমার।

পারুল পিসিমার ভজন শেষ হল। একবার তাঁর বংশধরদের দিকে চেয়ে দেখলেন।

মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব

—ঘাড়ে উঠেছ কেন টাবু? নামো।

উত্তরে আমার স্কন্ধ দেশের ওপর থেকে—"ই'—কি'চ—'বলে শব্দ হল একটা। অনুমান করলুম, টাবু ভেংচি কাটল।

আমি মনে মনে বলছি মারিব মারিব

আর পিসেমশাই তেমনি মধুর হেসে বললেন, দেখেছ, আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রকম ন্যাওটা হয়ে উঠেছে ওর!

এবার পিসিমা বললেন, হু'—ওদের খুব মায়ার প্রাণ।—আর বলেই চোখ বুজে কীর্তন ধরলেন। আমার নাভিশ্বাস উঠবে বলে মনে হল! ঘাড়ের ওপর কলম দিয়ে সমানে বিদ্যাচর্চা হচ্ছে, একজন আমার নাকটাকে খিমচে চলেছে। আর ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছি: শিগগীর চকোলেট দাও—দাও বলছি—

পিসিমা গাইছেন: 'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।' আমার মন বলছে—'মারিব—মারিব আমি নিশ্চয় মারিব।' কিন্তু মারবার জো কী। পিসিমা চোখ বুজে আছে বটে, কিন্তু পিসেমশায় ঠিক লক্ষ করছেন আমাকে অথবা তাঁর শিশুদুটিকে। 'নিজে টিকেট কেন—মালের উপর নজর রাখ—' রেল কোম্পানির এই আশ্চর্য বাণীটি তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছেন বলেই মনে হল!

ভাবলুম, এইবারে ধূর্জটির মতো উঠে দাঁড়াই—যা হোক একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটে যাক, ঠিক তখন—

দৈববাণীর মতো তপনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: চলে আয় টাবু-গাবু, তোদের চকোলেট, কিনে দিই।

—ই'—কি'চ—আমার কাঁধে আনন্দ ধ্বনি উঠল। এক লাফে নেমে পড়ল টাবু, কলমটা কোলের ওপর খসে পড়ল—এক ছোপ কালি লাগল কাপড়ে। আর গাবু আমার চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তপনকে অনুসরণ করল।

মুক্তি!

কিন্তু ততক্ষণে আমি বিধ্বস্ত, বিচূর্ণিত—এক কথায় প্রায় নিহত! জামা-কাপড়ের অবস্থা বর্ণনার বাইরে, নাকে মুখে গালে জ্বালাময়ী অনুভূতি, কলমটা দিয়ে আর লেখা যাবে কিনা সন্দেহ, চশমাটা অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। পিসিমা গাইছেন, 'মরিলে ঝুলায়ে রেখো তমালেরি ডালে'—আমি ভাবছি জীবিত অবস্থায়ও কাউকে ঝোলানো যায় এবং এই মুহূর্তেই ঝোলানো উচিত! কতক্ষণ কাটল জানি না। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক বজ্রাহত হয়ে বসে আছি আর সেই ফাঁকে পিসিমা আর একখানা কীর্তন ধরেছেন, ঠিক তখন—

দরজার বাইরে দুটি কচি গলায় 'হা-রে-রে রে' গোছের হাঁক উঠল এবং আমার হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়ে আবার দুই মহীরাবণ এসে প্রবেশ করল।

এবার শিশুপাল বধ করব—নির্ঘাৎ। একটা চড় তুলে আমি তৈরী হয়ে গেলুম। কিন্তু—

কিন্তু এবার যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অভাবিত। দুই শিশুর হাতে দুটি ছোট ছোট পেন নাইফ চিক চিক করে উঠল। একজন চক্ষের পলকে হার্মোনিয়ামের বেলোটি ফাঁসিয়ে দিলে, আর একজনের অস্ত্রাঘাতে বিকট আওয়াজ করে তবলার চামড়া দুভাগ হয়ে গেল!

পারুল পিসিমা আর্তনাদ করলেন, আর পিসেমশাই কয়েক সেকেন্ড বজ্রাহত হয়ে বসে রইলেন। চোখ ভরা বাৎসল্য স্নেহ এক মুহূর্তে নিদারুণ জিঘাংসায় পরিণত হল, দুটি সন্তানের কান ধরে বেড়ালছানার মতো শূন্যে তুলে নিলেন, দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর, আজ তোদের আমি—

আর তপন আমার কানে কানে বললে, সুকুমার কুইক!

কিসের কুইক, কোথায় কুইক—কিছু বলবার দরকার ছিল না। দু জনেই ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে বেরুলুম। দূর থেকে চটাস চটাস করে যতো চাঁটির আওয়াজ আসছে—পিসেমশাই নতুন দুটি বাঁয়া-তবলায় হাত পাকাচ্ছেন নিশ্চয়। রাস্তায় এসে সেই অবস্থাতেই একটা রিকশয় লাফিয়ে উঠলুম আমরা। মিনিট তিনেক গেল দম ফিরে পেতে। তারপর তপন বললে, ভে-ভেনডেটা। দু বছর ধরে লা-লা-লাইফটা হেল করে দিয়েছিল। আজ বাইরে নিয়ে গিয়ে দু-খানা ছুরি কিনে দিয়ে এলেছি, হা-হার-হার-হার—মরুক গে, আর তবলায় অত মিঠে আওয়াজ বেরোয় কেন জানিস না? ওর ভেতরে অনেক চ-চকোলেট আর লজেন্স লুকোনো থাকে কিনা—তাই। তারপরেই বা-বা-ব্যাস!

হাই টী জুটলনা, কিন্তু প্রাণটা যে অন্তত বেঁচে গেল, এই কৃতজ্ঞতাতেই তপনের কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আমি আর ফেরত চাইতে পারলুম না।

* বিশ্বচিত্রা *

পোষা বেড়াল থেকে সাবধান

অনেকেই বাড়িতে বিড়াল পোষেন, বিড়াল নিয়ে অনেক সোহাগ করেন, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিড়াল নিয়ে খেলা করে, আদর করে। চর্ম-চিকিৎসকদের মতে বিড়ালকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কারণ সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর কীল শহরের খবরে প্রকাশ যে, বহু চর্ম-চিকিৎসক এক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে একটি বিড়ালকে পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন যে, তার লোমে একপ্রকার সংক্রামক রোগের ছত্রাক রয়েছে। বিড়ালটির দেহে রোগের লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট না হলেও এক রকম আলোর সাহায্যে চর্ম-চিকিৎসকরা লোমের আক্রান্ত অংশ ধরতে পেরেছেন। আক্রান্ত অংশে এই আলো পড়লেই স্থানটি ফসফরাসের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে। ফলে চিকিৎসকরা যথাসময়ে রোগ নির্ণয় করে তার চিকিৎসা শুরু করতে পারেন।

লোমের এই ছত্রাকগুলি বিশেষভাবে শিশুদের ত্বকের পক্ষে বিপজ্জনক। আক্রান্ত পোষা বিড়ালকে সামান্য ছুঁলে কিম্বা তার লোম আঁচড়ে দিলে ঐ ছত্রাক শিশুদের ত্বকে সংক্রামিত হয়, কারণ শিশুদের ত্বকের চর্বিতে ঐ ছত্রাক-প্রতিরোধের কোন পদার্থ থাকে না এবং নির্বিরোধে রোগ বাড়তে থাকে।

সাম্প্রতিক কালে ছত্রাকজনিত রোগ ও ছত্রাকাক্রমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রুত বিস্তারলাভ করছে। আজকাল ছত্রাক-জনিত রোগের তুলনায় জীবাণুঘটিত রোগ হ্রাস পাচ্ছে। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হফের মতে দুটি কারণ ছত্রাক-জনিত রোগ বৃদ্ধিলাভ করছে। আধুনিক ওষুধপত্রে আজকাল মূত্রগ্রন্থির বহিরাংশ (অ্যাড্রোনাল কোর্টেক্স) থেকে তৈরী পদার্থ-সমূহ যথেষ্ট ব্যবহার করার ফলে দেহের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা কমে আসে, অথচ এই-সব বিপজ্জনক ছত্রাকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ত্বকের প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব ঘটলে গুরুতর ক্ষতি হতে থাকে এবং চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। আর আজকাল যেসব অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরী হচ্ছে, তার গোড়ার উপাদান হচ্ছে নানা-প্রকারের সূক্ষ্ম ছত্রাক। এইসব ওষুধের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবদেহের সূক্ষ্মকোষে (মাইক্রোফ্লোরা) পরিবর্তন ঘটে। সে কারণে এইসব ওষুধ শুধু যে দেহের পক্ষে বিপজ্জনক বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করে তা নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন সব বীজাণুর বিস্তার বন্ধ করে, যেগুলি বিপজ্জনক ছত্রাকের অপসারণে বা প্রতিরোধের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। আর ত্বকের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম কোষগুলির সামান্য পরিবর্তন ঘটলেই নানারকম ভয়াবহ সূক্ষ্ম রোগ জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে দ্রুত ছড়াতে থাকে। বর্তমানে এইসব ছত্রাকঘটিত রোগের চিকিৎসায় প্রচুর সক্রিয় উপাদানসমন্বিত একরকম ট্যাবলেটে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাচ্ছে। তবে চর্ম-চিকিৎসকরা জনসাধারণকে এই বলে সাবধান করেছেন যে, বিড়ালকে নিয়ে বেশি সোহাগ না করাই ছত্রাকজনিত রোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রকৃষ্টতম উপায়।

চাঁদে বাড়ি তৈরির হিড়িক

চাঁদে বাড়ির পরিকল্পনাকারি স্থপতিদের মধ্যে তাড়াহুড়ো লেগে গিয়েছে। চাঁদে প্রথম যে মানুষ পৌঁছবে তাদের জন্য বাড়ির নক্সা তৈরি করতে হবে তাঁদের—সময়ও বেশী নেই।

পূর্ব নাইজিরিয়ার ইগবো শহরে মাটির নীচ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্থানীয় রাজার সমাধির মধ্যে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ার। এই আবিষ্কার নাইজিরিয়ার প্রাচীন শিল্প ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন আলোকপাতে সহায়ক হয়েছে

রুশীয় বৈজ্ঞানিকরা ইতিমধ্যেই চাঁদে পৌঁছানো তাদের অভিযাত্রীদের বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং কতকগুলি পরিকল্পনাও ঠিক করা হচ্ছে।

চাঁদের ভূভাগ কয়েক মাইল গভীর ধূলি-কণায় আবৃত হওয়ায় বাড়িগুলিকে ধূলোয় ভাসমান অবস্থায় থাকতে হবে। এই ধূলোর সাগর বেড়েই চলেছে—প্রতিদিন প্রায় একশ টন করে ধূলো জমছে। কাজেই বাড়ি-গুলিকে ভাসমান রাখা এবং বেশ শক্তভাবে নোঙর করে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।

কিন্তু সর্বাগ্রে চাঁদের স্থপতিকে একটা প্রচণ্ড স্থলজ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে। সমুদ্রে একটা বিরাট টাওয়ার তাদের তৈরি করতে হবে যেটি চাঁদে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের "চোখ" হিসেবে কাজ করবে।

তারপর সেকেণ্ডে পঞ্চাশ মাইল গতিশীল যেসব উল্কা চন্দ্রপৃষ্ঠে অনবরত বিস্ফোরিত হয় তাদের খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়িগুলির ওপরে ধাতু নির্মিত বিরাটকার ছাতা তৈরি করতে হবে।

একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে পৃথিবীতে কোন জিনিসের যা ওজন চাঁদে তার ওজন এক ষষ্ঠমাংশ। এখানে এক টন ভারবাহী লিফট চাঁদে ছ-টন ভার বহন করতে সক্ষম হবে।

চাঁদে সিঁড়ি পৃথিবীর তুলনায় অধিকতর দুরারোহ হবে কারণ চাঁদের অধিবাসীদের, আমরা যে পরিমাণ শক্তি খাটাই, তার চেয়ে ছগুণ বেশী শক্তি নিয়োগ করার দরকার হবে। ঠিক একই কারণে চাঁদের দৌড়বাজরা একশ গজ দৌড়ের রেকর্ড দেড় সেকেণ্ডে দাঁড় করিয়ে দেবে।

আবহাওয়ার দরুণ কোন ঝামেলা থাকবে না কারণ চাঁদে আবহাওয়া বলতে কিছু নেই। মেঘ নেই, কুয়াশা বৃষ্টি বাতাস বা তুষার কিছুই নেই।

চাঁদের স্থপতির সবচেয়ে মাথাব্যথা হচ্ছে দিন এবং রাত্রির মধ্যে তাপের যে পাঁচশ ডিগ্রীর তফাৎ হয় তার সংগে কিভাবে যুঝতে পারা যাবে তাই নিয়ে।

দিনের আলো স্থায়ী হয় দুসপ্তাহ। তেমনি অন্ধকারও। হিমশীতল রাত্রি-কালের জন্য এমন বিশেষ ধরনের একটি কেন্দ্রীয়তাপ উৎপাদন ব্যবস্থা রাখতে হবে যা দিনের বেলাটা শীতল রাখায় নিয়োজিত হতে পারবে।

লেবরেটরি এবং কারখানা ছাড়া প্রতি গৃহে শোবার ঘর, বসবার ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর এবং এমনকি চিত্রগৃহের জন্যও প্রচুর জায়গা রাখতে হবে।

আমাদের কাছে এটা বিলাস মনে হতে পারে, কিন্তু মহাকাশের সবচেয়ে বড় শত্রু—

একঘেয়েমী ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে লড়াই করতে ওগুলো দরকার।

রক্ত জমানোর সুব্যবস্থা

দস্যু চীনের সঙ্গে সংগ্রামরত আহত জোয়ানদের জন্য রক্তদানে সারা দেশ ভেঙে পড়েছে। প্রদত্ত রক্তের প্রতিটি বিন্দু সংরক্ষণের সুব্যবস্থার দিকেও তাই বিশেষ নজর রাখা দরকার কারণ তা না হলেই এমন একটা সময় আসে যখন রক্ত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও প্রতি বছর তিন কোটি নব্বই লক্ষ টাকা মূল্যের জমা করা রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। জমা করা রক্তে একুশ দিন পর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং মানুষের দেহে প্রয়োগের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের অনুশীলন কেন্দ্রের অন্তর্গত ঔষধ ও দন্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ যোশেফ সণ্ডার্স এই অপচয় রোধ করার একটা উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। সদ্যপ্রাপ্ত রক্তকে জমাট করে রাখার তাঁর প্রক্রিয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য তাজা রেখে দিতে সক্ষম হবে। রহস্যটি হচ্ছে অতি দ্রুত জমাট বাঁধানো। তিনি বলেন, "এটা এত দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে যাতে বড় বড় বরফের স্ফটিক যেন দানা বাঁধতে না পারে কারণ ঐ স্ফটিকই রক্তকোষ-গুলিকে ধ্বংস করে দেয়।"

আর তাই রক্ত নেবার পরই সেটিকে এলুমিনিয়ামের আধারে ভর্ত্তি করে সঙ্গে সঙ্গে তরল নাইট্রোজেনে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই রক্ত জমে কঠিন হয়ে যায়। ডাঃ সণ্ডার্সের প্রক্রিয়ায় জমাট করা রক্তে বহু বছর সমস্ত গুণ বজায় থাকে। প্রক্রিয়াটি বিশদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ব্লাড-ব্যাংকগুলির একটা সমস্যার সমাধান হতে পারবে।

ভাজা "বরফ"

"ট্যুইস্ট" নাচের হুজুগ কাটতে না কাটতেই আমেরিকার 'স্মার্ট' মেয়েরা গলার হার এবং কানের দুলে "ভাজা মার্বল" ব্যবহার করছে।

এই নতুন হুজুগের উদ্ভাবক হচ্ছেন লঙ আইল্যাণ্ডের এক গৃহকর্ত্রী, মিসেস রুথ মান। আকস্মিকভাবে একদিন তিনি রন্ধন-শালায় আবিষ্কার করেন যে বরফের জলে মার্বল "ভেজে" নিয়ে তাকে দামী পাথরের মতো দেখতে করে তোলা যায়।

প্রক্রিয়াটি হচ্ছে একটি শুষ্ক চাটুতে দশ মিনিট মাঝামাঝি তাপে মার্বলগুলি "ভাজতে" হবে। তারপর তাড়াতাড়ি সেগুলিকে বরফ জলে ফেলে দেওয়া চাই। এর ফলে উত্তপ্ত কাচের ভিতরটা ফেটে যায় কিন্তু ওপরটা অবিকৃত থাকে।

আলোচনা

সেতার শিক্ষায়তন

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকায় ৬ই অক্টোবর, ১৯৬২ তারিখের সংখ্যায় শ্রীশার্ঙ্গদেব "সেতার একাডেমি অব মিউজিক" শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্যে লিখিয়াছেন—'বাঙলা দেশে বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা তাঁর (এনায়েৎ খাঁর) সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অনেকেরই আশা ছিল, কোনও প্রতিষ্ঠানে এই মহান শিল্পীর স্মৃতি সুরক্ষিত হবে। কিন্তু এযাবৎ তা হয়নি।"

এ সম্বন্ধে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি ইমদাদ খার পুত্র এনায়েৎ খার নিকট ১৯২৫ খৃঃ হইতে ১৯৩৮ খৃঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর সিতার ও সুরবাহার শিক্ষালাভ করিয়া আজ ৩৭ বছর যাবৎ ঐ দুই যন্ত্রের সাধনা করিয়া আসিতেছি, এবং এনায়েৎ খার মৃত্যুর পর ১৯৩৯ খৃঃ হইতে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদান করিতেছি। ১৯৪৮ খৃঃ "ইমদাদখানি স্কুল অব সিতার" শিক্ষায়তন স্থাপন করিয়া এযাবৎ বহু ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছি। ১৯৬০ খৃঃ "ইমদাদখানি কলেজ অব মিউজিক" প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন অপেক্ষায় তাহার কার্য আরম্ভ হয় নাই, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাইলে নিয়মিত কার্য পরিচালনা আইনত নিষিদ্ধ আছে। ইতি—

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী,
কলিকাতা।

"গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন"

সবিনয় নিবেদন,

গত ১০ই কার্তিকের শ্রীশান্তিপ্রিয় বসুর লিখিত 'গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন' এবং ২৪শে কার্তিক শ্রীনিলয় মজুমদার লিখিত উঁহার আলোচনা খুবেই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, কারণ আজকালকার দিনে বিষয়টি আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজে কৃষিবিষয়ক গবেষণার ছাত্র হইয়া বহু গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিয়া কৃষি উন্নয়নের বহুমুখী বাধার কারণ উদ্ঘাটন করিতে গিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে শ্রীবসুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তিনি কৃষকদের কর্মবিমুখতা ও পরিবর্তন বিরোধীতার কারণ হিসাবে ধর্মবিশ্বাসকে অথবা ধর্মান্তিরবাদকে অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি ম্যাক্স বেবার ও সোরোকিনের মতবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের "সোসিও-এগ্রো-ইকনোমিক রিসার্চ" নামক সংস্থার গবেষণার ফলাফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমি কৃষকদের কর্মবিমুখতা ও পরিবর্তন বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এমন কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পাই নাই যাঁহারা ধর্মের উপর সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন। আমি হয়তো এ বিষয়ে শ্রীনিলয় মজুমদারের সহিত কিছুটা একমত হইতে পারিলাম কারণ গ্রামবাসিগণকে অথবা কৃষকগণকে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার ধর্মবিরোধী অসামাজিক কর্ম হইতে

সম্পূর্ণভাবে মিবৃত্ত দেখিতে পাই না। তাঁহারা একমাত্র কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রথা প্রবর্তন ও উন্নয়নকে ধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করিবেন কেন ? কৃষি উন্নয়নের বাধা বহু-বিধ, তাহা অল্পে লিখিয়া শেষ করা যাইবে না বা এ স্থলে তাহা আমার বক্তব্যও নহে। ম্যাক্স বেষার ও সোরোকিনের মতবাদের সত্যতা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে আমাদের দেশের সামাজিক জীবনের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা। তাহা তাঁহাদের কতখানি ছিল বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু শ্রী বসু যদি তাঁহার নিবন্ধটি প্রধানত পূর্ব উল্লেখিত সংস্থার গবেষণার বিস্তৃত ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া মত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে হয়তো তাহা আরও অনেক সহজে গ্রহণযোগ্য হইত ও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়া উক্ত বিষয়ে চিন্তান্বিত করিতে পারিতেন।

নমস্কারান্তে
ললিত মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

চিত্র প্রদর্শনী

হানাদার চীনা দুর্বৃত্তদের এ দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করার সামরিক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে তোলায় আজ ভারতের আপামর জনসাধারণ সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। যার যা সামর্থ্য অযাচিতভাবে দান করছে প্রতিরক্ষার ব্যয় নির্বাহে। চিত্রশিল্পীরাও চাইছেন তাঁদের সাধ্যমত দান করতে। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশেরই আর্থিক সঙ্গতি কি সেটা দেশবাসীর অজানা নেই। তবুও তাঁরা পিছিয়ে থাকতে চান না। নগদ অর্থ না থাক, তাঁদের আঁকা ছবি আছে এবং তাঁরা সেগুলি বিক্রি করে সেই অর্থ রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করতে চান। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ছবি কিনে শিল্পীদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তোলারও সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। এই সম্পর্কে আমরা যে একখানি পত্র পেয়েছি, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক সহৃদয় জনসাধারণ সমীপে আমরা সেটি পেশ করছি ঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি একজন চিত্রশিল্পী। গত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমার নেপালে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবচিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে ও নানা পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, কয়েকটি ছবির বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থই রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা দেব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার প্রদর্শনীতে কোন ছবিই বিক্রয় সম্ভব হল না।

আপনি মহান, মহানুভব, কয়েকটি ছবি আপনার পত্রিকা মারফত কোন উপায়ে বিক্রয় হলে আমার একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আমি সামান্য চিত্রশিল্পী। আর্থিক ও শারীরিক দিক দিয়ে দেশের কোন প্রয়োজনে আসতে অক্ষম। তবুও এইভাবে যদি কোন কাজে আসতে পারি সামান্য, তবে আমার "চিত্রী-জীবন' সার্থক মনে হবে।

শেষ নিবেদন, আপনি যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও কোথায় ও কবে ছবিগুলি রেখে আসবো বলেন, তবে সানন্দে রেখে আসতে পারি।

বিনীত

কল্যাণ বসু

৫৪বি, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা-২৯

।প্রতিরক্ষার কেন প্রয়োজন এবং চীন হানাদারদের এদেশের মাটি থেকে বিতাড়নে দিকে দিকে যে সাড়া ও উদ্যোগ তারই চিত্র-সহযোগে পশ্চিমবঙ্গ ইনফরমেশন সেন্টারে অনশষ্ঠিত প্রদর্শনীর একাংশ

*

"কাপুরুষের মতো মাতৃভূমির অসম্মানের নীরব সাক্ষী হওয়ার চেয়ে আমি বরং চাই ভারত বীরের মত অস্ত্রধারণ করে আত্মসম্মান রক্ষা করুক"—উক্তিটি মহাত্মাজীর। পররাজ্য-লিপ্সু চীন আজ আমাদের মাতৃভূমিকে দখল করতে উদ্যত হওয়ায় সমগ্র ভারত শত্রুকে বিতাড়নে যেভাবে জেগে উঠেছে তারই একটি আলোকচিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের সার্কুলার রোডস্থ ইনফরমেশন সেণ্টার হলে। পণ্ডিত নেহরুর কথায় "পবিত্র ভারতভূমিকে যারা আক্রমণ করেছে তাদের হটিয়ে দিয়ে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে" যে শক্তির প্রয়োগ আমাদের কর্তব্য সেটা কিভাবে দেশব্যাপী বিবিধ আয়োজনে ও উদ্যোগে রূপায়িত হয়ে উঠেছে প্রদর্শনীটি থেকে তারই এক সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

দরে ভারতব্যাপী জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কি রূপ নিয়েছে তারই চিত্রবিবরণী সাধারণ্যে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যেই এই প্রদর্শনীটির আয়োজন। কি দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ভারতের বীর জওয়ানরা প্রহরা দিচ্ছে, নেফা ও লাদকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শত্রু বিতাড়নে কি করছে এবং সেইসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেশরক্ষায় জনসাধারণ কি ধরনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে—তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার বিভিন্ন পরিচয়-সমন্বিত বহু চিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখা যায়। ছবিগুলির অধিকাংশই সংবাদপত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলেও এক জায়গায় এক জোটে এবং বেশ বড় আকারে পরিবেশিত হওয়ায় সাধারণ লোক প্রতিরক্ষা কাজে নিজেদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হবার একটা সুযোগ লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের প্রচার-

প্রতিরক্ষা এবং দেশের সার্বভৌমিকত্ব রক্ষায় স্বর্ণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, রক্ত ও শ্রম

বিভাগ এই তথ্যমূলক প্রদর্শনীটির আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদার্হ।

* ট্রামে-বাসে *

বিশ্ব খুড়ো বলিতে লাগিলেন—"জেনারেল কারিয়াপ্পা সম্প্রতি কলিকাতা ময়দানে এক বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর বক্তৃতায় সবাই খুশী হয়েছেন শুধু জনতার তিনটি পক্ষ ছাড়া।

তাঁরা হলেন (এক) কম্যুনিস্ট—এ'দের সম্বন্ধে বলেছেন—'এ'রা আমাদের বাগানের গোখরো সাপ।' ফোঁসফোঁসানি নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে বিষদাঁত নেই, কী আর করা; (দুই) মহিলাবৃন্দ—জেনারেল অনুরোধ করেছেন—'আপনারা সংকটকালে লিপস্টিক মাখা, সিনেমা রেস্তরাঁয় যাওয়া বন্ধ করুন'—এই নিয়ে ফোঁপানি কি আর হয়নি দু-এক ক্ষেত্রে; (তিন) মন্ত্রী মহোদয়গণ—কারিয়াপ্পা বলেছেন—'বর্তমানে এ'দের সংখ্যা কম হওয়া উচিত'—এ কি সব্বোনেশে কথা, এত কাঠখড় পুড়িয়ে...!!

শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—আমাদের সরকার এবং চীনা সরকারের বন্ধুস্থানীয় কোন সালিশের সাহায্য গ্রহণ কেন সম্ভব নয়, কেন উভয়েই নিজেদের মত আঁকড়াইয়া থাকিবেন? তাঁর এই বক্তব্যে অবাক হইয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন, —একজন ভারতীয়ের এ-জাতীয় চিন্তা কি করিয়া সম্ভব! অবাক হইয়াই বুঝি শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"শ্রীবসু তো ভারতীয় নন, কম্যুনিস্ট !!"

শ্রীবসুর প্রসঙ্গেই অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, তিনি নাকি, তাঁর পার্টিকে সম্প্রতি সংগঠিত নাগরিক কমিটিতে গ্রহণ করার অনুরোধ লইয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। শ্রীসেন এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই।—"সেন মশাইদের অনেকেরই বৈদ্যখ্যাতি আছে। শ্রীপ্রফুল্ল সেন নিজে হয়ত বৈদ্য নন, কিন্তু সিগ্রিগেশনে যে তিনি বিশ্বাসী সে প্রমাণ পাওয়া গেল।"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

করাচীতে একদল পাক প্রতিনিধি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করিয়া ভদ্রলোকের এক কথার মত বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের

এই বিপদেও তাঁরা কোনরূপে সহযোগিতা করিবেন না। কিন্তু চীনদের এই অভিযানে পাকিস্তানও যে নিরাপদ থাকিবে না, এই কথা বলাতেও তাঁরা সিদ্ধান্তে অনড় রহিলেন। সংবাদদাতা বলিতেছেন, পাকিস্তানের এই মূঢ়তায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিস্মিত হন। শ্যামলাল বলিল—"পাকিস্তানের মনোভাব সম্বন্ধে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এই অজ্ঞতায় আমরাও কম বিস্মিত হইনি; তিনি কি জানেন না যে, নিজের নাক গেলেও অন্যের যাত্রাভঙ্গে তাঁদের উন্মাদ উল্লাস।"

পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী জনাব আব্দুল কাদের নাকি বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য বন্ধ করিলে তা হবে পাকিস্তানের পক্ষে শাপে বর, পাকিস্তান নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। খুড়ো বলিলেন—"ভাইসাহেব, তা হলে আর বর সাজা হল না, এক পা তো কাটা গেছে, এখন শুধু বাকী এক পায়ে দাঁড়াতে হলে যে ক্রাচের দরকার !!"

শ্রীনেহরু দেশবাসীকে বলিয়াছেন, তাঁরা যেন সংকটে আপসেট না হন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"না, আপসেট আমরা হব না। তবে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ খেলতে গেছে, মা কালী না করেন, সেখানে একটা বিপর্যয় হলে কী হবে বলতে পারিনে।"

সম্প্রতিক সংবাদে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ মেনন বার-এ যোগদান করিবেন। জড়িত কণ্ঠে জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বহুত আচ্ছা, তা হলে আর প্রহিবিশনটা"—তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"চুপ কর অজবুগ, এবার তোর সে বার নয়।"

সরকার সোনার ফাটকা বাজার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শ্যামলাল সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"ভো ভো শ্বশ্রুনন্দিনীগণ, ভো ভো কনের শ্বশ্রুমাতাগণ, জেনে রাখুন, সোনার বায়নাক্কা যেন আর না শুনি !!"

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীহাদুলেকার তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—'কম্যুনিস্টরা বারবার জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়াছে।—"এবং কখনো কখনো জবাই দেবে বলেও শাসিয়েছে।"—শেষের মন্তব্য বিশু খুড়োর।

ভাতের বদলে অধিক পরিমাণে গম খাইতে বলা হইয়াছে।—"অতঃপর মিস্ এ মিল'-এ পরামর্শও এল বলে। তবু চীনাদের অভিযানটা অ্যাগ্রেসন (নগ্ন হলেও), ওটা যুদ্ধ নয়।—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

লোকসভায় খনি ও পূর্তমন্ত্রী বলিয়াছেন—দেশে জ্বালানির অভাব নাই। 'দেশ জ্বালানিয়ার অভাবও আছে, তা নয়।" সংক্ষেপে মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদদাতা বলিতেছেন—কম্যুনিস্ট এম পি হিটস আউট অ্যাট চায়নীজ। —"আমরা বলি, আস্তে, একটু দেখে শুনে খেলুন, নইলে হিট্ আউট হওয়ার সম্ভাবনা।"—বলে শ্যামলাল।

শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—অফিসের কর্মী হইতে আরম্ভ করিয়া মাঠের চাষী পর্যন্ত সবাইকে সৈনিক হইতে হইবে। —"সৈনিক কেন, আমরা ইতিমধ্যে সবাই সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে আছি; আমাদের রণকৌশলের এলেম দিয়ে জেনারেল থাপরকে পর্যন্ত থাপ্পড় মেরে এগিয়ে যেতে পারি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।" বলেন বিশু খুড়ো।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন "জওহরলাল স্পিরিট" অর্জন করিতে বলিয়াছেন।

—"খুব ভালো কথা, কিন্তু বড় শক্ত। এটা তো আর জহর কোট নয়!"—বলে শ্যামলাল।

✻ সাহিত্য সংবাদ ✻

বিদুর

অবশেষে (!)

একটা গল্প মনে পড়ছে। এক ফরাসী ভদ্রলোক, রাজপরিবারের কোনো কুটুম্বই হবেন, তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ এক আশ্চর্য বাজি রাখলেন। প্যারির রাস্তায় সন্ধ্যের পর শত শত মেয়ে দেখা যায় যারা বেশ সুন্দরী। তবে এদের বেশীর ভাগের সৌন্দর্যই নকল। কিন্তু এমন মেয়েও আছে যার সৌন্দর্য প্রায় নিখুঁত। চোখ থাকলে এই আসল নকল ভেদ করা যায়। বুঝলে বন্ধু, আমি তোমার সঙ্গে বাজি রাখছি, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমি পথে বেরুব। মাঝ রাত পর্যন্ত ঘুরব পথে পথে দোকানে পানশালায়; আর আমি তোমায় বলছি, আমি এমন একটি তরুণীকে খুঁজে বার করব, যার তুল্য সুন্দরী তুমি আর দেখ নি। ইত্যাদি বলে সেই রূপবান এবং ধনী ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসলেন। বন্ধু বললেন, তুমি কি সেই সুন্দরীকে বিয়ে করবে? ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, অবশ্যই নয়। যদি খুঁজে বেরোয় তবে আমি বাজি হারব, বাজি হারার ক্ষতিপূরণ দিতে আমি তাকে বিয়ে করব। আর যদি আমি বাজি জিতি তোমায় ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে হবে।......ব্যাপারটা অদ্ভুত। বন্ধু ভেবে পেলেন না, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে। তার দিক থেকে তো কোনো ক্ষতি কোথাও নেই।

অতঃপর যথাসময়ের যথাবিহিত সাজসজ্জা করে ভদ্রলোক প্যারির রাস্তায় সুন্দরী খুঁজতে বেরুলেন। ভদ্রলোকের চোখ পাকা জহুরীর। যা দেখেন তাতেই তিনি ভোম-কানা হবেন এমন কথা নয়। তা ছাড়া খুঁতঅলা মেয়ে বেরুলে সেটি তাঁর ঘাড়ে পড়বে। অতএব নিখুঁত সুন্দরী দরকার, যাতে

কলিন উইলসন

হতভাগা বাউণ্ডুলে-স্বভাব বন্ধুটো আর না ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অনেক পথ হাঁটা হল, অনেক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজকরা মেয়েদের যাওয়া-আসা দেখা হল, তবু পছন্দ হল না। তারপর ঢোকা গেল পানশালায়। নাচের আসরে। অপেরায়। ক্রমে রাত বাড়তে বাড়তে গভীর হয়ে এল। ভদ্রলোক দেখলেন, মাঝ-রাত হতে আর বেশী দেরি নেই। আবার পথে নামলেন ভদ্রলোক। রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে, দোকানপত্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভদ্র-লোক হাঁটতে লাগলেন। বাড়িতে সেই বন্ধু বসে আছে, সময় গুনছে; সময় উত্তরে যাবার আগে ভদ্রলোককে সুন্দরীসমেত ফিরতে হবে, নয়ত বাজিতে হার হবে। অবশ্য শুধু হাত বাড়ি ফিরে গেলে সে-হারের ক্ষতিপূরণ কী দিতে হবে তিনি জানেন না, বন্ধুই জানে।

প্রায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, একটি দোকানের প্রায়-বন্ধ দরজা দিয়ে একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দোকানের কাছা-কাছি এগিয়ে গেলেন। বাতি নিবে আসছে দোকানের, ঝাঁপ ফেলার যোগাড়, ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে দোকানের দরজায় পা রাখলেন। হাত বিশ পঁচিশ দূরে কোণাকুণি ভাবে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। আহা, উর্বশী যেন।

বুড়ো দোকানদার ঝাঁপ ফেলতে এসেছিল, বলল, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কর্তা; কাল আসবেন।......ভদ্রলোক বললেন, আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।......বুড়ো দোকানদার তাকাল, ভদ্রলোকের ইশারা অনুসরণ করে মেয়েটিকে দেখল। তারপর কেমন বিমর্ষমুখে ভদ্র-লোককে বলল, দেখুন কর্তা এটা দর্জির দোকান, মেয়েদের জামাটামা তৈরী করা হয়। ......ভদ্রলোক বললেন: সে আমি দোকানে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার কোনো জামা করাবার দরকার নেই, মেয়েটিকে দরকার।......বুড়ো দোকানদার এবার বিরক্ত হয়ে বলল, মশাই — আপনি মদের নেশায় ভুবন অন্ধকার দেখছেন। ওটা কোনো মেয়ে নয়, রক্তমাংসের শরীর নয়, দোকান-সাজানো পুতুল। আমার এটা দর্জির দোকান; আমায় ও-সব রাখতে হয়।

অতঃপর দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেল; এবং ভদ্রলোক বার কয়েক চোখ রগড়ে দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে সত্যিই ভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে।

গল্পটার মধ্যে কতখানি কৌতুক আছে আমি জানি না। কিন্তু সাধারণ সত্য আছে।

কিংবা বলি দুটি সরল উপদেশ আছে। (ক) অতিমাত্রায় জহুরী হতে গেলে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত অন্ধই হতে হয়; (খ) নিখুঁত সৌন্দর্য ওই রকম—বাস্তবে বিরাজ করে না।

ঠিক এই প্রসঙ্গে আমার এমন কথাও মনে হল, হয়ত অনেক জহুরী নিজেকে যত পাকা ভাবেন, তেমন পাকা নন। কলিন উইলসন-এর কয়েকটি মন্তব্য সম্প্রতি চোখে পড়ল যা দেখে মনে হচ্ছে কোনো সময় তাঁর অবস্থা ওই ভদ্রলোকের মতন হতে পারে।

উইলসন তেজী ছোকরা, যা বলেন সরাসরি বলেন, মনে হয় যেন টেবিলে পা তুলে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে নির্বিকার চিত্তে বলছেন।

ইনি স্পষ্ট করে বলেছেন : আমি কেন যৌন বিষয় নিয়ে লিখি জানেন, কারণ এ-ব্যাপারে আমার চেয়ে সেরা কথা আর কেউ এ-যাবৎ লিখতে পারে নি। "When I read about sex in D. H. Lawrence, in Mapupassant, in Widekind—even in Joyce—I suddenly feel: These men are liars." মোপাসাঁ, লরেন্স, জয়েস-কে এত সহজে ধাপ্পাবাজ বলতে আর কেউ পারেন নি বোধ হয়। উইলসন পারলেন। তিনি আরও বলেছেন, মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ব্যাপারটা প্রয়োজনীয় তার কথা বলতে গিয়ে এঁরা কি যেন পারেন নি। একমাত্র জার্মান নাট্যকার Wedekind, যৌন বিষয়ে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে লিখতে শুরু করেছিলেন। উইলিআম ব্লেকের যৌন ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার মোটামুটি একটা মিল আছে, কিন্তু ব্লেক ত ঔপন্যাসিক ছিলেন না, আমি ঔপন্যাসিক। আমি এখন Ritual in the Dark-এর পরবর্তী অংশ লিখছি। এ-দেশে ও বই ছাপা হবে না জানি। ব্রুসেল অথবা স্টকহলম-এ যেতে হবে কেউ যদি কিনতে চান।

উইলসন তাঁর এই গ্রন্থটি সম্পর্কে খুব উচ্চাশা পোষণ করেন। তাঁর ধারণা, এর আগে যে-সব লেখকরা যৌন বিষয় নিয়ে লিখেছেন তিনি তাঁদের চেয়ে তাঁর বক্তব্যকে আরো সার-কথায় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

এ-সব উক্তির পরই ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন যে, সব লেখাই কম্প্রোমাইজ-এর ব্যাপার। সৎ এবং সাহসী লেখককেও একটা মিটমাট করতে হয় বাধ্য হয়ে। হেনরী মিলার-এর মতন লেখককেও।

কিন্তু, কলিন উইলসন মনে করেন, কম্প্রোমাইজ আর প্রস্টিটিউসান এক জিনিস নয়।

আমি ভাবছি, উইলসন যদি শেষ পর্যন্ত সবার সেরা যৌন-বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে মোমের পুতুল দেখিয়ে দেন তা হলে তাঁর ভক্তরাই হতাশ হবেন বেশী। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত ত 'মিটমাট'। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত উইলসন ইতিমধ্যেই কোথাও একটা মিটমাট করে ফেলবেন।

* পুস্তক পরিচয় *

রবীন্দ্র সাহিত্য : কবিজীবনী ও সাহিত্যের আলোচনা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (প্রথম খণ্ড)—কাজী আব্দুল ওদুদ, ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। বারো টাকা।

'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ'-এর অবতরণিকা অংশ পড়ে ধারণা হয়েছিল বইখানি রবীন্দ্রনাথের জীবনী। পরের অধ্যায়টি পড়ে বুঝলাম লেখকের আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের জীবন নয়, সাহিত্য। অর্থাৎ জীবনকে বুঝবার জন্য সাহিত্য নয়, সাহিত্যকে বুঝবার জন্য জীবনের অংশ বিশেষ গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রজীবনকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাষ্যরূপে ব্যবহার করে এর আগে অনেক বই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনাই উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিশীর আলোচনায় সাহিত্য পুরোভাগে জীবন নেপথ্যে, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় জীবনের অংশই প্রধান। এ'দের বইগুলির কথা মনে রেখে আলোচ্য বইখানি পড়তে বসলে স্বভাবতই পাঠকের মনে হবে বইখানি লিখবার কোন প্রয়োজন ছিল কিনা। যদি বলা যায়, শ্রীযুক্ত বিশীর আলোচনায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যেকটি দিকের আলোচনা নেই; তাই ক্রমানুসারে সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলীর আলোচনাই বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তার উত্তরে বলব, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-এর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। কাজী আব্দুল ওদুদ এ'দের রচনার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত। তথাপি কোন্ বক্তব্য প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে কোন্ শ্রেণীর পাঠকদের কথা মনে রেখে তিনি বইখানি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ঠিক বোঝা গেল না। অনেককাল আগে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি' নাম দিয়ে দুইখণ্ডে রবীন্দ্রসাহিত্যের একখানি আলোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' 'রবিরশ্মি'র রীতি ও আদর্শে লেখা। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার ইতিহাসে 'রবিরশ্মি'র একটা মূল্য আছে। সে ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেও নিঃসন্দেহে বলা চলে, 'রবিরশ্মি' জাতীয় বই-এর প্রয়োজন আজ আর নেই।

'অবতরণিকা' বাদে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' তিনটি বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত— 'কিশোর কবি', 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', 'এবার ফিরাও মোরে'। এই তিনটি অধ্যায়ে লেখক 'বনফুল' থেকে 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য-পদ্য রচনার পরিচয় বিবৃত করেছেন। লেখকের আলোচনার বিষয় ব্যাপক। এমন ব্যাপক বিষয়ের গভীর আলোচনা হওয়া শক্ত। এ ক্ষেত্রেও সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। আলোচনা প্রায় পুস্তক-পরিচয় জাতীয়। কবিতা-নাটক-গল্পের সারাংশ দেওয়া হয়েছে। তারপরেই দুই একটি দ্রুত মন্তব্য। একটু নমুনা দিই—

"স্বপ্নের পরের কবিতা 'আশার সীমা'। কবি বলছেন, আশার সীমা নেই। যতই পাই না কেন আমাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে না। কিন্তু যাকে ভালোবাসি তাকে যদি পাই তবে তাকে নিয়ে আমাদের মন প্রকৃতই খুশী হয়—আমাদের অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হয়।" পৃঃ ৩২৫

গ্রন্থমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রায় যাবতীয় কবিতা, নাটকের সারাংশ দেওয়া হয়েছে। এর বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 'জনপ্রিয়' কবিতাগুলি পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার কি কোন তাৎপর্য আছে? যেমন, "বধূ কবিতা খুব জনপ্রিয়" পৃঃ ৯৫, "মেঘদূত কবিতাটি বিখ্যাত" পৃঃ ১০২, " 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাট্যকাব্য" পৃঃ ১২৩, "পরশপাথর একটি বিখ্যাত রূপক কবিতা" পৃঃ ১৩৯, "বৈষ্ণব কবিতা অতিশয় জনপ্রিয়" পৃঃ ১৪০, " 'দুই পাখী' কবিতাটিও খুব জনপ্রিয়" পৃঃ ১৪১, "যেতে নাহি দিব কবির একটি বিশেষ জনপ্রিয় কবিতা" পৃঃ ১৪২, "মানস-সুন্দরী কবিতাটি সুদীর্ঘ এবং সুপ্রসিদ্ধ" পৃঃ

১৪৬, "বসন্ধরা কবিতাটিও সদীর্ঘ এবং সপ্রসিদ্ধ" পৃঃ ১৬০ ইত্যাদি। এ-রকম মন্তব্য বই-এর প্রতি পাতার চার-পাঁচবার করে আছে।

একটি বিষয়ে লেখকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-গুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের রচনাকাল এবং রচনার ইতিহাস যেখানে দেওয়া সম্ভব লেখক সেখানে তা দিয়েছেন। প্রবন্ধটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, পরে প্রবন্ধটির কোন পরিবর্তন-পরিবর্জন করা হয়েছে কিনা—সমস্ত তথ্য লেখক সযত্নে এই গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। তদুপরি প্রত্যেকটি প্রবন্ধের বস্তুসংক্ষেপও দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভালো আলোচনা বেশী নেই। সেই কারণে লেখকের এই আলোচনা মূল্যবান। লেখক যদি কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে তাঁর বই-এর মূল্য বাড়ত। ৩৪৪।৬২

উপন্যাস

চন্দ্র সূর্য তারা—অমলেন্দু চৌধুরী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। চার টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির আলোচনায় মৃগাঙ্ক ও সুপ্রিয়ার চরিত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৃগাঙ্কর কর্মময় জীবন শুধু সাহিত্যচর্চা এবং নানাবিধ গ্রন্থপাঠ ও তৎসংক্রান্ত চিন্তাজালে জড়িত ছিল বলিয়া জীবনের অন্যান্য দিকগুলি তার মনে কোন প্রকার রেখাপাত করিতে পারে নাই। সুপ্রিয়া মৃগাঙ্কর কাছে একটু আশ্রয় এবং জীবনে স্থায়িত্বের দাবি জানাইয়াছিল। কিন্তু মৃগাঙ্ক সুপ্রিয়ার সেই দাবি পূরণে অক্ষমতা জানাইয়াছে। চরিত্র বিশ্লেষণে লেখকের দক্ষতা আছে। ১৪৬।৬২

কিশোর সাহিত্য

রঙীন ফুল—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। সংযোগ, ২৯ গ্রীক রো, কলিকাতা-১৪। দুই টাকা।

লাল শঙ্খ—মণিলাল অধিকারী, শ্রীপ্রকাশ ভবন। দুই টাকা।

পায়ে পায়ে মরণ—শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দুই টা—।

শিশুসাহিত্য সাময়িক সাহিত্য নয়। তা যেমন বিশেষ কোন কালের নয় তেমনই বিশেষ কোন বয়সেরও নয়। তাই শিশু-সাহিত্য পড়ে বয়স্করাও সমান আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক লেখকের ধারণা, ছোটদের বুদ্ধিবৃত্তি সামান্য, তাদের জিজ্ঞাসাও অল্প, যেমন তেমন করে একটা গল্প খাড়া করে দিলেই তারা লুফে নেবে, লেখকের চাতুর্য ধরার ক্ষমতা তাদের নেই। এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অল্প। কিন্তু

বাংলাদেশের অন্যতম শিশুসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ শিশুদের এত ছোট এবং অবহেলার পাত্র মনে করেন নি।

'রঙীন ফুল' আটটি ছোটগল্পের সংকলন। গল্পগুলি সচিত্র। কয়েকটি পৌরাণিক গল্পও রয়েছে—যেমন অজানা অশোক, চন্দ্রকেতু, আবর্তন প্রভৃতি। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক গল্পগুলি সুলিখিত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তার বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। বাকি হালআমলের ছোটদের নিয়ে যে গল্পগুলি লেখিকা লিখেছেন সেগুলি আমাদের মুগ্ধ করেছে। শিশুমনস্তত্ত্বে গভীর মনোযোগ এবং অভিজ্ঞতা না থাকলে, দরদ না থাকলে এমন গল্প লেখা যায় না। দুই ধরনের গল্প এক সঙ্গে না মেশালেই ভাল হত। অভ্যন্তর চিত্র এবং প্রচ্ছদপট সুন্দর।

'লাল শঙ্খ' একটি গতানুগতিক ছকবাঁধা রহস্য গল্প। বিপুল গুপ্তধনের অন্বেষণ এবং প্রাপ্তিই এই গ্রন্থের গল্পবস্তু। প্লট রচনায়, চরিত্র চিত্রণে লেখকের দুর্বলতার চিহ্ন বিদ্যমান। ভাষায় আকর্ষণী ক্ষমতা নেই। লেখক ছোটদের ভোলাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

'পায়ে পায়ে মরণ' সেই তুলনায় অনেক সজীব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। একটি বাঙালী কিশোর নাবিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাহাজডুবীর ফলে কি করে একটি অজানা দ্বীপে আশ্রয় পায় এবং সঙ্গীহীন অবস্থায় প্রায় দশ বছর কাটিয়ে পুনরায় দেশে ফিরে আসে—তারই সাক্ষাৎ-বিবরণী আছে এই ছোট্ট উপন্যাসখানির মধ্যে। গল্প-কাহিনীতে যদিও আজগুবিত্ব আছে তবু বর্ণনায় ও চরিত্র রচনায় লেখকের মুন্সী-য়ানার কিছু স্বাক্ষর পাওয়া যায়। স্থান ও কাল বৈচিত্র্যে কাহিনী উপভোগ্যও হয়েছে। লেখকের ভবিষ্যৎ রচনা আরও বুদ্ধিমুক্ত হবে আশা করা যায়।

৩০৪।২৭৯।২৭৮।৬২

বিবিধ

সাধুবাবা শ্রীতারাচরণ পরমহংস। শ্রীঅনিলবরণ চৌধুরী প্রকাশক : ইউনাইটেড প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ৪৫এ, মতিশীল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ৩·৫০ নঃ পঃ।

দুরূহ ও দুর্বোধগম্য শাস্ত্রপাঠ অপেক্ষা সাধক জীবনী পর্যালোচনা অধিকতর সহজসাধ্য ও আনন্দদায়ক; কেন না নিরবয়ব শাস্ত্রবাক্য সকল সাধক জীবনে সাবয়ব হইয়া উঠায় মানুষ সে জীবন হইতে অনেক পাথেয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। অনিলবাবু ভক্ত লোক। লেখার গুণে এই পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনী সবিশেষ

আবার একখানি ছবি পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ৩৪৮।৬২

তারকার মৃত্যু, কালরাত্রি—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থপীঠ, ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। এক টাকা আশি নয়া পয়সা।

সুলেখক অমরবাবু এই ধরণের আরও অনেক বই লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য সংখ্যার দুই-দিকে দুইখানা উপন্যাস স্থানলাভ করিয়াছে। রহস্য-রোমাঞ্চক পর্যায়ের বই-গুলির ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থ-টিকে নিছক ডিটেকটিভ উপন্যাস বলা চলে না। ডিটেকটিভ উপন্যাসের ধাঁচে রচিত হইলেও এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি ঘটনা রহস্য-পূর্ণ ও রোমাঞ্চকর। ঘটনাবিন্যাসে লেখকের লিপিচাতুর্য অনস্বীকার্য। এই ধরনের উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে। মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসার্হ।

৪৮৫।৬২

শারদ-সাহিত্য

শারদীয় দামোদর—সম্পাদক, দাশরথি তা, বীরহাটা, বর্ধমান। মূল্য এক টাকা।

কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ, অসংখ্য কবিতা এবং অল্প কয়েকটি গল্প এই সংখ্যাখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। নবাগত লেখক ছাড়া শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরেজাউল করিম ও শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জনতা—সম্পাদক, তাপস সাহা, ১৬এ, অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

এই সংখ্যার রচনাসম্ভারে আছে বহু গল্প, প্রবন্ধ এবং অল্প সংখ্যক কবিতা ও রম্য রচনা। প্রখ্যাত লেখকলেখিকাগণের মধ্যে আছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, গুরুপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাণী রায়, পরিমল গোস্বামী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশাপূর্ণা দেবী, পুষ্পকেশ দে সরকার এবং সুশীল রায় প্রভৃতি।

রঙ্গজগৎ

শুভ কর্মপথে

বৃহৎ জনজীবন থেকে চলচ্চিত্রশিল্পীরা বিচ্ছিন্ন, স্বদেশে ও'রা প্রবাসীর মতই বাস করেন—এই মিথ্যা অভিযোগ পোষণ করার আজ আর কোন কারণ নেই। জাতির বর্তমান সংকটে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, দেশাত্মবোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি তাঁদেরও আছে। জাতির সেবায় আজ তাঁরাও এগিয়ে এসেছেন।

বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পীদের নিয়ে এই অভিমান ছিল, তাঁরা বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিল্পীদের মত দেশসেবার আহ্বানে তেমন করে সাড়া দিতে পারেন নি। আমাদের আর সে দুঃখ নেই। বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিল্পীদের দেশপ্রেম আজ হয়ত অনেকটা সোচ্চার। কলকাতার শিল্পীদের দেশাত্মবোধ সে তুলনায় অনেকটা নীরব। এতে ক্ষতির কোন কারণ নেই। বরঞ্চ উচ্ছ্বাস, আবেগ বা উত্তেজনাকে অনেক সময় বিশ্বাস করা যায় না। এবং বিশেষ করে পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনে উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার চাইতে শান্ত, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের মূল্য অনেক বেশী।

কলকাতার শিল্পীসমাজ আজ নানা ভাবে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। জাতির অন্তরে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের কাজে তাঁরা সকলেই যেন এগিয়ে আসেন, এবং ভারত যতদিন শত্রুমুক্ত না হয় ততদিন তাঁরা আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে এ-কাজে অবিচল চিত্তে নিয়োজিত থাকেন—এই আমাদের কামনা।

জাতির অন্তরে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে কণ্ঠশিল্পীরা গত রবিবার উত্তর-কলকাতায় দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথ-পরিক্রমা করেন। ছবিতে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, উৎপলা সেন, সুচিত্রা মিত্র, রমা গুহ ঠাকুরতা, উদয় পাল, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের দেখা যাচ্ছে ফটো—দেশ

রাজপথে উদ্দীপক গান গাওয়ার জন্য এসে দাঁড়িয়েছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, সমরেশ রায়, নীতা সেন ও ইলা বসু ফটো—দেশ

দেশসেবায় উদ্‌বুদ্ধ

কলিকাতার শিল্পলোক

তপন সিংহের পরিচালনায় ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অল্প দৈর্ঘ্যের যে দেশাত্মবোধক ছবিটি তৈরি করেছেন তার নাম রাখা হয়েছে **আমার দেশ।** এই ছবিটিতে কলকাতার শিল্পী ও কলা-কুশলীরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ছবি তৈরির কাজে স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির মালিকরাও কোন টাকা দাবি করবেন না। যে অভিনয়-শিল্পীরা এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, অরুন্ধতী দেবী, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, ভারতী দেবী, জহর গাঙ্গুলী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ও দিলীপ রায়। বাংলা ছবির কণ্ঠশিল্পীরাও ছবিতে আগ্রহের সঙ্গে কণ্ঠদান করবেন। তাঁদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, উৎপলা সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, মৃণাল চক্রবর্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্দীপক গান ও নেপথ্য-ভাষণের ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হবে।

অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে গত শুক্রবার

আর-ডি-বি অ্যান্ড কোং'এর "সাত পাকে বাঁধা" (পরিচালনা : অজয় কর) ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন

ও মঙ্গলবার যথাক্রমে দেশপ্রিয় পার্ক ও দেশবন্ধু পার্কে প্রণব রায় রচিত 'ডাক' নামে একটি দেশাত্মবোধক নাটক অভিনীত হয়। জনমনে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এই নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। নাটকে অংশ গ্রহণ করেন পাহাড়ী সান্যাল, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, সুশীল দে, পুলিনকুমার, মিণ্টু চক্রবর্তী, স্নেহাশিস সরকার ও সরস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেন। অভিনেতৃ সংঘ কলকাতার রাজপথের ধারে এমনি আরও একাধিক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করবেন বলে জানা গেল।

কলকাতার কণ্ঠশিল্পীরা 'আর্টিস্টস ইন এড অব ডিফেন্স কমিটি' নামে নিজেদের মধ্যে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এই সংস্থার উদ্যোগে গত রবিবার দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধক প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে কণ্ঠশিল্পীরা উত্তর কলকাতায় উদ্দীপক গান গেয়ে নানা পথ পরিক্রমা করেন। তাঁদের এই অভাবনীয় প্রয়াস জনগণের সাধুবাদ অর্জন করে। কণ্ঠশিল্পীরা সেদিন পথ-পরিক্রমায় সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিলেন 'চল চল চল, ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল', 'হও ধরমেতে ধীর', 'আমি ভয় করব না', 'এক-সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' ও 'দুর্গমগিরি কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার'। আগামী রবিবার তাঁরা দক্ষিণ কলকাতার পথে বের হবেন।

গত বৃহস্পতিবার ভারত প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅতুল্য ঘোষের আহ্বানে কলকাতার চলচ্চিত্রলোক ও মঞ্চ-জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কংগ্রেস ভবনে সমবেত হয়েছিলেন। ওই সভায় **'স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রীন কো-অর্ডিনেটিং কমিটি'** নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন: শ্রীজগন্নাথ কোলে (চেয়ারম্যান); শ্রীঅজিত বসু ও শ্রীমধু বসু (ভাইস চেয়ারম্যান); শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকহর গাঙ্গুলী (যুগ্ম সম্পাদক); শ্রীঅসিত চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ); শ্রীমতী মঞ্জু দে ও অজিত চট্টোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক) এবং শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীমতী সরযূ দেবী, শ্রীউত্তমকুমার, শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীসুশীল মজুমদার, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীঅশোককুমার সরকার ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (সদস্যবৃন্দ)। এই সংস্থার মাধ্যমে চলচ্চিত্র ও মঞ্চলোকের জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল কর্মপ্রচেষ্টা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে।

কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পের আরও যে-সব **সংস্থা প্রতিরক্ষা তহবিলে** অর্থ দান করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: পূর্ণ থিয়েটার (২,০০০), জনতা পিকচার্স অ্যান্ড থিয়েটার্স (২,৫০১), ইন্টালী টকিজ ও মায়াপুরী সিনেমা (২,৫০১), সুবারবন একজিবিটার্স (১,২৫১), বঙ্গবাসী সিনেমা (১,০০১), ইস্টার্ন টকিজ (১,০০১) ও প্রভা পিকচার্স (১,০০১)।

* শুভমুক্তি *

মেহবুব প্রোডাকশন্স-এর পরিবেশনায় বিখ্যাত জাপানী চিত্র **"দি আইল্যান্ড"** (পরিচালনা : কানেতো শিন্দো) এ সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তিলাভ করছে। ছবিটি ১৯৬১ সালে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভালে "গ্র্যান্ড প্রি"-লাভের সম্মান অর্জন করে। দ্বীপবাসী এক কৃষক দম্পতির ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবনযাত্রার কাহিনী এ-ছবির আখ্যানবস্তু। দেশে-বিদেশে এই ছবি উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে।

এ ছাড়া দুটি হিন্দী ছবি এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ছবি দুটির নাম: **বাত এক রাত কী ও মা-বেটা।**

দেব আনন্দ, ওয়াহীদা রেহমান ও জনি ওয়াকার অভিনীত "বাত এক রাত কী" (অলঙ্কার চিত্র) ছবির পরিচালক হলেন শঙ্কর মুখার্জি। এস ডি বর্মন ছবির সংগীত-পরিচালক। প্রণয়, রোমাঞ্চ ও নাচ-গান এই ছবির প্রধান আকর্ষণ।

"মা-বেটা" (তর্সাবীরস্তান) ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতা, নিরুপা রায়, মনোজকুমার ও আই এস জোহর। পারিবারিক মেলোড্রামা এই ছবির মূল উপজীব্য। লেখরাজ ভাকরি ও হেমন্তকুমার যথাক্রমে এই ছবির পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক।

* চিত্র-সমালোচনা *

প্রণয়ের রক্তস্বাক্ষর

আমাদের সেন্সর-বোর্ডের নীতি ক্রমশই যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। যে ছবি অপ্রাপ্তবয়স্কদের দর্শনীয় নয়, সে-ছবিকেও তাঁরা অনেক সময় সর্বসাধারণের জন্য অনুমোদন করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আবার এমন ছবিও তাঁরা কোন কোন সময় প্রাপ্তবয়স্কদের [illegible]

অনুমোদিত হলেও ক্ষতির কারণ নেই। সেন্সর-বোর্ডের এই দুর্বোধগম্য নীতির ফলে এমকেজির "রক্তপলাশ" ছবিটি অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের কাছে নিষিদ্ধ ফলের মতই এসে উপস্থিত হয়েছে। যদিও এ-ছবি অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের সর্বনাশ ঘটাবার মত নয়।

"রক্তপলাশ"-এর কাহিনী বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত। বন্ধ ঘরে দুই যুবকের হাতাহাতি ও একজনের মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী এক বালক। পুলিশ এই মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলেই ধরে নিয়েছে এবং এটাও জানে, একমাত্র বালকটিই বলতে পারে খুনী কে। দুই যুবকের মধ্যে যে নিহত হয়নি সে খুনের দায় এড়াবার জন্য বালকটিকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হবার জন্য সচেষ্ট। পুলিশ কিন্তু সাক্ষীকে ধরে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পলায়নরত যুবকও কেমন করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং বালকের সত্যভাষণ ও বুদ্ধির ফলে যুবক কীভাবে খুনের দায় থেকে রেহাই পায় তা-নিয়েই ছবির অন্যতম উপাখ্যান গঠিত।

ছবির অপর উপাখ্যান প্রেমের। মিথ্যা খুনের দায়ে যে-যুবক আত্মগোপনপ্রয়াসী তার প্রণয়িণী হল নিহত ব্যক্তির সহোদরা। ওরা কী-করে পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হল এবং একটি অপঘাতে মৃত্যুজনিত দুর্দৈবের অবসানে তাদের প্রেমের রক্তপলাশটি কেমন করে প্রস্ফুটিত হল তা-নিয়েই এই প্রণয়োপাখ্যানের পরিণতি।

ছবির স্বচ্ছন্দগতি চিত্রনাট্যে এই দুই উপাখ্যান সুগ্রথিত। তবে এর মধ্যে কোন উপাখ্যানটি প্রধান, কোনটি অপ্রধান তা বলা খুব কঠিন নয়। একটি নিটোল রোমান্টিক গল্পের আঙ্গিকেই "রক্তপলাশ"-এর কাহিনী গঠিত। অবশ্য ছবিতে একটি পাপ-চক্র আছে, একজনের মৃত্যু ঘটেছে, এই মৃত্যুর একজন সাক্ষী রয়েছে, খুনের দায়ে একজন পালিয়ে বেড়িয়েছে ও সে পরিশেষে নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। ছবির এই সব ঘটনা কিন্তু ক্রাইম ড্রামার রূপ নেয়নি। এই ঘটনারাজির মধ্যে সাসপেন্স নেই। এই সব ঘটনা একটি রোমান্টিক ড্রামার উপলক্ষ বলেই মনে হয়েছে। তবে এক বুদ্ধিমান বালক ও তার ভূমিকা ছবিতে নূতনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছে এবং তার কার্যকলাপ ছবির শেষ পর্যন্ত দর্শকের কৌতূহলকে ধরে রেখেছে। ছবিটির মূল আকর্ষণ এই বালক ও তার সক্রিয় ভূমিকা।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের চিত্রপরিচালনার প্রধান গুণ হল: কাহিনীটিকে তিনি উপভোগ্য করে চলচ্চিত্রপটে উপস্থিত করেছেন। যদিও চিত্রপরিচালক তাঁর প্রয়োগ-কর্মে কোন কোন মুহূর্তে বাঁধা-ধরা রীতি পরিহার করতে পারেননি বরং অনাবশ্যক দুয়েকটি দৃশ্য—যেমন হোটেলের 'বল'-নাচ—বর্জনে উৎসাহ প্রকাশ করেন নি, তবুও একটি রোমান্টিক উপাখ্যান পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মতভাবে ছবিতে উপস্থিত করায় কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেছেন। নদীর বুকে জাহাজের পটভূমিতে এবং জাহাজ-বন্দরের আশে-পাশে তিনি ছবির ঘটনাবহুল দৃশ্য যে-ভাবে বিন্যস্ত করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ছবির কাহিনীতে সাসপেন্স-এর উপাদান না থাকলেও, চলন্ত ট্রেনে, জাহাজে, পথে এবং ঘরের মৃত্যু-ঘটনায় রোমাঞ্চের উপাদান বিন্যস্ত করার কাজে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কল্পনাশক্তির পরিচয় মেলে। সর্বোপরি একটি বালক-চরিত্রকে অবলম্বন করে এবং নদীর বুকের নতুন ঘটনাকীর্ণ পটভূমি আশ্রয় করে তিনি ছবিটিকে যে-ভাবে উপভোগ্য করে তুলেছেন তার জন্য তিনি সাধুবাদ পাবেন।

ছবির রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। রোমান্টিক অভিনয়ে এই শিল্পী-জোড় যে দর্শকের আস্থা অনায়াসে অর্জন করতে পারেন—এই ছবিতে তার সংশয়াতীত প্রমাণ রয়েছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিনীত চরিত্রের প্রণয়াভিলাষ এবং বিড়ম্বনা ও বেদনা নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। চরিত্রটিতে ব্যক্তিত্ব আরোপেও তিনি সফল হয়েছেন। সন্ধ্যা রায় তাঁর চরিত্রের মাধুর্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয় মার্জিত ও সংবেদনশীল।

ছবিতে যে দর্শককে সর্বক্ষণ মুগ্ধ করে

রুওলা প্রোডাকশন্স-এর "দুই নারী" (পরিচালনা: জীবন গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিতে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

সরকার প্রোডাকশন্স-এর "নির্জন সৈকতে" (পরিচালনা: তপন সিংহ) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর ও অনিল চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

রাখে সে হল শিশু-শিল্পী বাসুদেব। এই শিশু-অভিনেতা তার চরিত্রাংকণে বুদ্ধিমত্তা এবং মনোভাব প্রকাশের যে শক্তি দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। ছবির শেষাংশ এই অভিনেতার জন্যই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মৃত্যুর রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি অভিনয় করে দেখাবার সময় এই শিশু-শিল্পী দর্শককে নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ করে রাখে।

ছবিতে নিহত পাপচারী যুবকের চরিত্রে নিরঞ্জন রায় নৈপুণ্য ও যোগ্যতার সংগে অভিনয় করেছেন। পাপ-চক্রের নায়ক উৎপল দত্ত ও অন্যতম দুর্বৃত্ত দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও প্রশংসার যোগ্য।

ছবির অন্যান্য প্রধান চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, জীবেন বসু, জহর রায়, রেণুকা রায়, শিশির বটব্যাল, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি), বীরেশ্বর সেন ও মণি শ্রীমাণী।

সংগীত-পরিচালক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছবির আবহ-সুররচনায় সুন্দর কল্পনাশক্তি ও রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির নানা মুহূর্তের কড়িকোমল রূপটি তাঁর সুররচনায় বিধৃত। গানের সুরারোপেও শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। তিনি নিজে এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গানে (শ্যামল গুপ্ত কর্তৃক সুরচিত) কণ্ঠদান করেছেন। গান দুটি জনপ্রিয় হবে আশা করা যায়।

অনিল গুপ্তের পরিচালনায় জ্যোতি লাহার চিত্রগ্রহণ ছবির এক বিশেষ সম্পদ। আলোকচিত্রে ছবির বিভিন্ন দৃশ্যের 'মুড' ধরে রাখতে এবং ছবিটিকে শিল্পসৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলতে এই দুই প্রখ্যাত কলাকুশলী তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখেন রবীন দাশ (সম্পাদনা), বাণী দত্ত (শব্দধারণ) এবং কার্তিক বসু (শিল্পনির্দেশনা)।

* ছবির পর ছবি *

মন-মৌজি

কৃষ্ণ পানজু পরিচালিত এ-ভি-এম'এর "মন-মৌজি ছবিটি আগামী সপ্তাহে কলকাতা ও শহরতলিতে মুক্তিলাভ করবে। সাধনা ও কিশোরকুমার ছবির প্রধান শিল্পী। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় শিল্পীরা হলেন প্রাণ, আনোয়ার হোসেন, অসীমকুমার, ভারতী রায়, মোহন চটি, দুর্গা খোটে, ওম প্রকাশ ও অচলা সচদেব। মদনমোহন ছবির সংগীত-পরিচালক।

নবদিগন্ত

শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স-এর "নবদিগন্ত" ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। এক নতুন ধরনের কাহিনী নিয়ে তৈরী এ-ছবি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত। বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় ছবির চারজন প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

দুই বাড়ি

অসীম পাল পরিচালিত চিত্রালয়-এর "দুই বাড়ি" ছবিটি আশু মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রণয় ও কৌতুক উপকরণে গঠিত এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শৈলেশ দে। অনিল চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মন, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, মিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার প্রভৃতি ছবির মুখ্য শিল্পী। কালীপদ সেন ছবির সুরকার।

জোড়া বলদ

এস এইচ কে প্রোডাকশন্স-এর নতুন হাসির ছবি "জোড়া বলদ"-এর শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে সম্পন্ন হয়। ছবির কাহিনীকার-পরিচালক হলেন দিলীপকুমার বসু। জহর রায় ও অনুপকুমার ছবির দুই মুখ্য শিল্পী।

পরলোকে শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ

বাংলার চলচ্চিত্রসেবী, শিল্পী ও কলাকুশলীদের অন্যতম দরদী অভিভাবক, ই-আই-এম-পি-এ'এর সভাপতি শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ গত শনিবার ভোরে পৌনে পাঁচটায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সাতষট্টি বৎসর বয়সে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন।

ফরিদপুরের জেলার মদনপুর গ্রামে ১৮৯৬ সালে শ্রীঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা-জীবন শুরু হয় কলকাতায় এবং এখানেই

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ

তিনি এম-এ পাস করেন এবং আইন পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে আসেন এবং "ওয়াটার-প্রুফ" তৈরির কারখানা খোলেন ও পরে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি "রূপবাণী" চিত্রগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে "ভারতী" ও "অরুণা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেই তিনি ই-আই-এম-পি'এ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক শ্রীঘোষ সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। শ্রীঘোষের মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের একজন একনিষ্ঠ চলচ্চিত্রসেবীর তিরোধান ঘটল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা ও একাধিক নাতি-নাতনী এবং অগণিত বন্ধু ও গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রীদের মহৎ প্রয়াস

মহিলা শিল্পী মহল

কলকাতার চলচ্চিত্র ও মঞ্চের মহিলা শিল্পীরা নিজেদের যে নতুন সংস্থাটি গড়ে তুলেছেন তার নাম রাখা হয়েছে 'মহিলা শিল্পী মহল'। যে-সব মহিলা শিল্পীরা আজ বার্ধক্যে এসে পৌঁছেছেন অথবা শারীরিক অসুস্থতার ফলে যাঁরা আজ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, যাঁদের দেখবার কেউ নেই, তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেছেন মহিলা শিল্পী মহল। দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের জন্য অবিলম্বে একটি 'ওল্ড এজ হোম' তৈরি করা এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এবং এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই মহিলা শিল্পী সংঘ আগামী ৫ ও ৭ই ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে 'মিশরকুমারী' নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন।

গত বুধবার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার জনৈকা মুখপাত্র হিসাবে শ্রীমতী কানন দেবী সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘকাল ধরেই আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু নানা অনিবার্য কারণে তা এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমরা আশা করি, জনসাধারণের সহযোগিতা পেলে আমরা আমাদের কাজে সফল হব। সংস্থার সম্পাদিকা শ্রীমতী সাধনা রায় চৌধুরী তাঁর ভাষণে মহিলা শিল্পী মহলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং অন্যান্য তথ্যাদি পরিবেশন করেন।

"মিশরকুমারী" নাটকটি পরিচালনা করবেন শ্রীমতী সরযূ দেবী ও শ্রীমতী মলিনা দেবী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ী। নাটকের বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অংশ গ্রহণ করছেন মলিনা দেবী, চন্দ্রা দেবী, কানন দেবী, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, অনুভা গুপ্ত, মঞ্জু দে, সুলতা চৌধুরী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, শুক্লা দাস, গীতা দে, কেতকী দত্ত, জয়শ্রী সেন, দীপিকা দাশ, শ্যামলী চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ী, সিপ্রা মিত্র, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, নমিতা সিংহ, ছন্দা দেবী ও লীলাবতী।

সংস্থার মুখপাত্র উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান যে, "মিশরকুমারী" নাট্যাভিনয়ের এক দিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

মহিলা শিল্পী মহলের এই অভিনব শুভ প্রয়াসকে সকলেই সাধুবাদ জানাবেন। দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের সাহায্য করার মহৎ দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চের সঙ্গে অভিনেত্রী হিসাবে বহুদিন যাবৎ জড়িত। নতুন যাঁরা চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে এসেছেন তাঁরাও মহিলা শিল্পী মহলের এই কাজে আত্মনিয়োগ করবেন বলে আমরা আশা করি।

"নারী যদি কখনও সুন্দর হয়"

এবারকার লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে যে-ছবিটি দর্শক এবং সমালোচকদের চমক দিয়েছে, সেটি এসেছিল ফিনল্যান্ড থেকে।

প্রেস ক্লাবে মহিলা শিল্পী মহল আহূত সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার উপস্থিত সভ্যাদের মধ্যে (দণ্ডায়মান) শ্যামলী চক্রবর্তী, শুক্লা দাস, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্ত, সবিতা বসু, তপতী ঘোষ, নমিতা সিংহ, বনানী চৌধুরী (উপবিষ্ট), চন্দ্রা দেবী, মলিনা দেবী কানন দেবী, বাঁশরী লাহিড়ী, সরযূ দেবী, সাধনা রায়চৌধুরী, ভারতী দেবী ও রেণুকা রায় ফটো—দেশ

আর-ডি-বি-অ্যান্ড কো,-এর 'এক টুকরো আগুন' (পরিচালনা: বিনু বর্ধন) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মণ

নামঃ "রাকাস্" (প্রিয়তমা)। পরিচালক: মোন্ কুর্কভারা।

নিউ ওয়েভ ধারার পরিচালক কুর্কভারা এ-ছবিতে এক প্রণয়ীযুগলের কাহিনী বিবৃত করেছেন। যুবক ও যুবতীটির পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি—এই হল চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু। যুবক ও যুবতী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ওরা সকল সময় পরস্পরকে নিয়েই আছে। দুজনের ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রণয়-সম্পর্কও মাঝে মাঝে দেখা গেছে এবং সে-ব্যাপারে সাময়িকভাবে সাড়া দিতে ওদের দ্বিধাবোধ হয়নি। শুধু লক্ষণীয় এই, সেইসব ছোট-খাট সম্পর্ককে ওরা প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব দেয়নি। কাহিনীর এই বস্তুনিষ্ঠ বিবরণে ফিনল্যান্ডের আধুনিক সমাজ ও যুব-সম্প্রদায়ের মানসিকতা প্রতিফলিত।

নায়ক এক অলস লেখক। মুক্ত প্রেমে বিশ্বাসী। বিবাহের কথা ভাবতে নারাজ। প্রণয়িনী যেদিন সন্তানসম্ভবা হল, সেদিন তাকে তার দর্শন আর বিশ্বাস আর তত্ত্ব-মূলক চিন্তা ছেড়ে নেমে আসতে হয়েছে বাস্তব-জগতে। কিন্তু তার আগে না।

চমকের ব্যাপারটা অবশ্য অন্যত্র। পরি-চালক নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের এমন একটি দৃশ্য ছবিতে উপস্থিত করেছেন, সেন্সরের কাঁচি (অধিকাংশ দেশেই) যে-দৃশ্য অক্ষত রাখবার পক্ষপাতী হবে না। সে-দৃশ্যে অন্তঃসত্ত্বা নায়িকা নিরাবরণ। নায়ক তার দেহে কান দিয়ে শিশুপ্রাণের স্পন্দন শোনবার চেষ্টায় আত্মহারা। হঠাৎ এক সময় নায়ককে ফিসফিস করে বলতে শোনা যাচ্ছেঃ 'নারী যদি কখনও সুন্দর হয়, তবে সে এখন, এই সময়ে—এই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে।'

বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ছবিটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জাকো পাকার্সভির্তা ও সিনিকা হুনুলা।

অসমাপ্ত 'ক্লিওপেট্রা'

টোয়েণ্টিএথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর "ক্লিওপেট্রা"র জন্য ইতিমধ্যে সাড়ে তিন কোটি ডলার (প্রায় ১৮ কোটি টাকা) খরচ হয়ে গেছে। কাজ কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

পরিচালক জোসেফ ম্যাংকিউইজের কাছে আর ছবিটি নেই। ফক্স কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট ডিক জানিল এফ জানুক "অসমাপ্ত ক্লিওপেট্রা" প্যারিস থেকে উদ্ধার করে হলিউডে নিয়ে গেছেন। এই "উদ্ধার-কার্যের" পর জানুককে কম সমা-লোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। বিলি ওয়াইল্ডার নাকি টেলিগ্রামে তাঁকে বলেছেন, "এর পর যার আত্মসম্মানবোধ আছে এমন কোন চলচ্চিত্রকার আপনার কোম্পানির হয়ে কখনও কাজ করতে চাইবেন না..." "ক্লিওপেট্রা"র নায়িকা এলিজাবেথ টেলর তখন প্যারিসে সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন। পরিচালকের অপমানে ক্ষুব্ধ শ্রীমতী টেলরও ভাঙা ভাঙা গলায় নাকি প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এলিজাবেথ টেলর

পরিচালক ম্যাংকিউইজ বলেছেনঃ আমি জানুককে ছবির অর্ধেকটা দেখিয়েছিলাম। ভদ্রলোক তখন বললেন, চমৎকার পরি-চালনা। আশ্চর্য, তার পরেই একটি চিঠিতে জানালেন, আমার চাকরি নেই। আমার চেয়েও শিল্পীরা বেশী মর্মাহত।...আমার ছবিতে ব্যাকগ্রাউণ্ড ঠিক ব্যাকগ্রাউণ্ডই, তার বেশী নয়। জানুক চান যুদ্ধের ঘটা। সবই বেশী বেশী। ব্যাকগ্রাউণ্ড বলতে তিনি এ-ই বোঝেন।"

জানুকও অবশ্য আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, কাজ দেখে তাঁর বিচার। তাঁর হিসাবে ম্যাংকিউইজ ৭৫ লক্ষ ডলার (প্রায় ৪ কোটি টাকা) জলে দিয়েছেন।

এ-ভি-এম'এর "মন মৌজি" ছবির একটি দৃশ্যে প্রাণ ও সাধনা

লড়ক তোমার রণে   দাও সে তোমার অস্ত্র

বাংলার শিল্পীদের দুর্জয় পণ : ভারত শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যে-কোন আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকবো।

ফটো—দেশ

দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে অভিনেতৃ সংঘ কলকাতার পার্কে যে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন তার দুটি দৃশ্য : ভিড় ঠেলে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল; নাটকের একটি দৃশ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায় সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জনৈক শিশুশিল্পী ফটো—দেশ

অভিনেতা রিচার্ড বার্টন ১৭ সপ্তাহ রোমে ছিলেন—কাজ করলেন মাত্র এক সপ্তাহ। রডি ম্যাকডোয়ালকে চার মাসের মধ্যে মাত্র এক দিন সেটে ডাকা হয়েছিল। ম্যাংকুইজ নিজে কুড়ি মাসে ১৭ লক্ষ ডলার (প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা) উপার্জন করেছেন। তা ছাড়া ব্যক্তিগত খরচের জন্য তিনি পেয়েছেন ৬০ হাজার ডলার (তিন লক্ষ টাকা)।

এইসব ব্যাপার জানুককে আনন্দ দিতে পারেনি। ছবিটি কী অবস্থায় পাওয়া গেছে, এই প্রশ্নের উত্তরে জানুক বলেন, "ক্লিওপেট্রা"র নাট্যপ্রধান দৃশ্যগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু গোটা ছবিতে 'কন্টিনিউটি' নামক ব্যাপারটির অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ফোটোগ্রাফিও মাঝে মাঝে বেশ খারাপ। সতর্কতার সঙ্গে এখন এটি সম্পাদনা করতে হবে। তার জন্য অন্তত আরও ২০ লক্ষ ডলার (এক কোটি টাকা) দরকার। ছবিটি আগামী বছরের মে মাসে মুক্তি পাবে।

ছবির সংস্কার-কর্মের দায়িত্ব এখন জানুকের। তবে সে-কাজ সম্পর্কে ম্যাংকিউইজ যদি কিছু কথাবার্তা বলতে চান, তাতে জানুকের আপত্তি নেই। জানুক জানেন, তাঁকে লোকে ভুল বুঝবে। আর এও জানেন, কোম্পানি-কর্তাকে লোকে মনে-প্রাণে পছন্দ করতে পারে না, কখনও না। কিন্তু তা-ই বলে কর্তব্যবিমুখ হবেন তিনি কেমন করে?

* পাঠকের চোখে *

"বাংলা ছায়াছবির সংকট"

মহাশয়,

বাংলা ছায়াছবির সংকট নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা 'দেশ' পত্রিকায় পড়লাম। তবে সবাই এটাকে বাংলা ছবির 'সংকট' বলেছেন, কিন্তু ৩রা নভেম্বর তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় গৌহাটি থেকে 'কাজল দেব' এটাকে 'বাংলার ছায়াছবির সংকট' এই পর্যায়ভুক্ত করে ব্যাপারটা আরও সংকটপূর্ণ করে তুলেছেন বলে মনে হল আমার। যুক্তি হিসাবে তাঁর বাঙালী বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো লাগলো।

আসল কথা, যতদিন আজকের নিয়মে বাংলা ছবির গতিপথ নির্দেশিত হবে ততদিন এ সংকট থাকবেই। বাংলা ভাষার মাধ্যমে যে ছবি প্রস্তুত হয় তার দর্শকসংখ্যা অবাংলা ছবির তুলনায় খুবই কম। অথচ প্রবাসে অবাংলা ছবির চাহিদার সাথে সাথে দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাও অনেক বেশী। চাহিদা যেখানে বেশী অবাংলা ছবির, আমদানিও সেখানে বেশী হবে এটা তো স্বাভাবিক। তাই আজকের প্রতিযোগিতার যুগে অর্থনৈতিক সমস্যাটাই বাংলা ছায়াছবির অন্যতম সংকট বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিয়েই আজকে বাংলা ছায়াছবির সংকাট মোচন করতে হবে।

এই পর্যায়ে আমার মতে বাংলা ছবি যদি হিন্দী ভাষায় প্রস্তুত করে চলচ্চিত্রের বাজারে উপস্থিত করা যায় তবে দর্শকের সংখ্যার সাথে সাথে চাহিদাও বাড়ানো যেতে পারে। নীতিগতভাবে বাংলার আদর্শকে বজায় রেখে উৎকৃষ্ট বাংলা ছবি হিন্দী ভাষায় সারা ভারতে দেখানো সম্ভব করে তোলা অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, টাকার জন্য যখন অবাঙালীদের দ্বারস্থ হতে হয় তখন বাংলা ছবির হিন্দী চিত্ররূপ চালু করে অল্প সময়ের মধ্যে ঋণমুক্ত হয়ে শিল্পের নিজস্ব সত্তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

তৃতীয়ত, বাংলার বাইরের শহরে, হিন্দী ছবির প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবির নিয়মিত 'শো'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, সেখানেও নিয়মিত বাংলা ছবির প্রেক্ষাগৃহ নেই—ভাবলে অবাক লাগে।

চতুর্থত, নতুন নতুন বাংলা ছবি যাতে একই সাথে বহু জায়গায় মুক্তিলাভ করতে পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

পঞ্চমত, বাঙালী পরিচালকদের একটি গোষ্ঠী তৈরি করে উপযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে বাংলা ছবি হিন্দী ভাষায় প্রস্তুত ও পরিবেশনের ব্যবস্থা কার্যকরী করে তুলতে হবে।

সবার উপরে মনে রাখতে হবে, ছায়াছবি সমাজের দর্পণ। কিন্তু এ বিষয়ে অবাংলা ছবি আমাদের নিরাশ করে। তার মধ্যে ঘটনা-সন্নিবেশে সমাজব্যবস্থায় অঘটনের প্রাধান্যই বেশী চোখে পড়ে। আমরা যা নই, বা ছিলাম না কোনকালে, সেইসব অবাস্তব বিষয়বস্তু দিয়ে আজকের ছায়াছবির 'লাইফ' ফিরিয়ে আনার প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।

'দর্শকের জন্য শিল্প, না শিল্পের জন্য দর্শক'—এর বিচারবিভ্রান্তি না ঘটিয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখে বাংলা ছায়াছবির সংকটমুক্তির পথই আজ খুঁজতে হবে।

অজিত চক্রবর্তী
নিউ দিল্লি-১

খেলার মাঠে

একলব্য

কুয়ো ভেদিস ফুটবল? ফুটবল কোন্ পথে?

পোল্যান্ড থেকে প্রকাশিত স্পোর্টস-প্রেস ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি জগৎবিখ্যাত ফুটবল কোচ গুস্তাভ সিবেসের সঙ্গে কয়েকটি সাক্ষাৎকারে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

গুস্তাভ সিবেস ছিলেন হাঙ্গেরীর জাতীয় দলের ফুটবল কোচ। যে হাঙ্গেরী ১৯৫২ সালে অলিম্পিক জয় করেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে, হ্যাঁ দুর্ভাগ্যক্রমেই রানার্স হয়েছিল ১৯৫৪ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায়, লন্ডনে ইংলন্ডকে হারিয়েছিল ৬—৩ ও বুদাপেস্টে ৭—১ গোলে। সিবেসই ছিলেন পরম শক্তিশালী এই ফুটবল দলের স্রষ্টা। ১৯৫৬ সালের রাজনৈতিক বিদ্রোহের ফলে হাঙ্গেরীর সেই দল ভেঙ্গে গেছে। কয়েকজন খেলোয়াড় আশ্রয় নিয়েছেন বিদেশে। গুস্তাভ সিবেস আর হাঙ্গেরীর কোচ নেই। কিন্তু ফুটবল সম্বন্ধে সিবেস মুখ খুললেই বিশ্বের ফুটবল রসিক কান পেতে তাঁর কথা শোনে।

সিবেস বলেছেন—আত্মরক্ষামূলক খেলার পদ্ধতিই আজকের ফুটবলের আকর্ষণহানির প্রধান কারণ। এবার চিলিতে যাঁরা ওয়ার্ল্ড কাপের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন, খেলার এত নীচু মান, এমন হতাশব্যঞ্জক খেলা তাঁরা আর কোনদিন দেখেননি। প্রায় প্রতি দলই আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়ে খেলেছে। গোলের সামনে রক্ষণব্যূহ রচনা করে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে যত চেষ্টা করেছে, প্রতিপক্ষের গোলে আক্রমণ চালাতে তত চেষ্টা করেনি। ফলে ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি হয়েছে বেশী। মারপিটও না হয়েছে, এমন নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এবারকার বিশ্ব কাপের খেলা অবৈধ ফাউলের আধিক্য এবং অ-খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয়ে কলঙ্কিত।

সিবেস মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন, ফুটবল এখন সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সিবেসের মতে, আক্রমণই হচ্ছে খেলার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। যেসব খেলোয়াড় উন্নত কলা-কৌশলের অধিকারী, যাদের পায়ে ভাল কাজ আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে, তাদের দ্বারাই আক্রমণমূলক ক্রীড়াধারা সম্ভব। উন্নত ধরনের নৈপুণ্য এবং সুপরিকল্পিত ক্রীড়া পদ্ধতিই আধুনিক ফুটবলের মূল কথা হওয়া উচিত। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশীলতারও প্রয়োজন। আর প্রয়োজন উন্নত ধরনের শিক্ষার। যাতে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন সহজতর হয়। আধুনিক ফুটবলে যে ধারা চলেছে তাতে যে দল আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়ানীতি পরিত্যাগ করে আক্রমণাত্মক পদ্ধতির দিকে জোর দেবে তারাই ভবিষ্যতে শক্তিশালী হিসাবে গড়ে উঠবে। এটাই সিবেসের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বিশ্ব ফুটবল থেকে আত্মরক্ষামূলক খেলার পদ্ধতি পরিবর্তনের উপায় কি? সবাই যদি ভিখারী হয় তবে ভিক্ষা দেবে কে? আত্মরক্ষামূলক খেলার নীতি যখন সব দলের মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তখন এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া তো কষ্টকর। আবার এ অবস্থা বেশীদিন বজায় থাকলে ফুটবলের ভবিষ্যৎও অন্ধকার। ইতিমধ্যেই ফুটবলের আকর্ষণ অনেকখানি কমে গেছে। দু বছর আগে খেলায় যেমন দর্শকসমাগম হত, এখন আর তেমন হয় না। দর্শকদের যেন কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব। অনেক খেলাই গোলশূন্য থেকে যায়। কিম্বা এক আধটি গোলে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা।

হয়। সিবেসের মতে, 'আঘাতের পর আঘাত' করবার বাসনা না থাকলে এমন ঘটবেই।

তা হলে উপায়? উপায় নিশ্চয়ই আছে এবং ফুটবলের বিজ্ঞ গবেষক সিবেস তার উপায়ও বলে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, ফুটবলের আইন-কানুনকেই ঢেলে সাজতে হবে—যাতে ফুটবল খেলা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, খেলায় আক্রমণাত্মক নীতি বজায় থাকে।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, একটি দল প্রায় সারাক্ষণ প্রতিপক্ষ সীমানায় বল রেখে আক্রমণ চালিয়ে গেল অথচ একটিও গোল করতে পারল না। তারা হয়তো পেল বিশ বাইশটি কর্নার কিক, প্রতিপক্ষের ভাগ্যে জুটল দুটি কি তিনটি। প্রতিপক্ষের রক্ষণ-ব্যূহ রচনাই এর প্রধান কারণ। সর্বাবিবয়ে শ্রেষ্ঠ দল কি কতগুলি কর্ণার কিক পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে? প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-প্রাচীরের জন্য গোল করতে পারবে না?

সিবেস বলেছেন—'ছোটবেলায় আমরা দেখেছি, তিনটি কর্নার কিকের বিনিময়ে একটি পেনাল্টি মিলত। এখন যদি তিনটি কর্নারের জন্য পেনাল্টি সীমা রেখা থেকে একটি ডাইরেক্ট কিকের নির্দেশ দেওয়া হয় তবে মন্দ হয় না। পাঁচটি কর্নার কিকের জন্য একটি পেনাল্টিরও নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কিংবা আরও বেশী সংখ্যক কর্নারের বিনিময়ে একটি গোল।

এই পদ্ধতির প্রবর্তন হলে আত্মরক্ষামূলক খেলার মনোভাবে যে ভাঁটা পড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিরক্তিকর অফসাইড আইন সিবেস একেবারে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। এতে খেলার গতিবেগ বাড়বে, খেলায় বেশী গোল হবে। সবচেয়ে যেটা সুফল পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে গোলের সময় খেলোয়াড় অফ-সাইডে ছিল কি ছিল না এই বিতর্কমূলক প্রশ্নের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ। সিবেস বলেছেন, এই বিতর্কমূলক অফসাইডের জন্য কত খেলা নষ্ট হয়ে যায়, কত জয় পরাজয় ঘটে, তার হিসাবনিকাশ নেই। উপমা দিয়ে বলেছেন, এই আইনই ১৯৫৪ সালে বিশ্ব কাপ লাভের গৌরব থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে। বার্নে পশ্চিম জার্মানীর সংগে হাঙ্গেরীর ফাইন্যাল খেলায় পুসকাসের গোল রেফারী অফ-সাইডের অজুহাতে বাতিল করে দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঠের দর্শক, ক্যামেরার ছবি, ফিল্মের চিত্র সাক্ষী পুসকাসের সে গোল অফসাইডদুষ্ট ছিল না।

খেলায় আকর্ষণ বাড়াবার জন্য টাচ-লাইনে থ্রোর পরিবর্তে কিকের নির্দেশ দেওয়ার কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে। আর সেই সংগে খেলোয়াড় পরিবর্তনের কথাও বিশেষভাবে ভাবা উচিত।

এখন অবশ্য গোলকিপার পরিবর্তন করার নিয়ম চালু হয়েছে—অপর একজন খেলোয়াড় পরিবর্তনের বিধান আছে—বিশ্রাম সময়ের মধ্যে। এই আইনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থেকে গেছে। আইনে বলা হয়েছে—যদি কোন খেলোয়াড় গুরুতর-ভাবে আহত হয় এবং রেফারী সেই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন, তবেই বিশ্রাম সময়ের মধ্যে আহত খেলোয়াড়ের বদলি গ্রহণ করা যেতে পারবে। কিন্তু আমি যদি সামান্য আঘাতেই চিৎকার করে বড় আঘাতের ভান করে মাঠের মধ্যে শুয়ে ছটফট করি, তবে রেফারীর সাধ্য কি আঘাতের গুরুত্ব আন্দাজ করা। সত্যি কথা বলতে কি, বিতর্ক এড়াবার জন্য রেফারীরা এখন চেয়েও দেখেন না, খেলোয়াড় আহত হয়েছেন কি হননি। বদলি নিতে চাইলেই মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্রাম সময় পর্যন্ত। তার পরে নয়। পরে একমাত্র গোলরক্ষকেই বদলি করার নিয়ম আছে।

সিবেস বলেছেন, আইনের ফাঁক নয়, সব সময়ের জনাই দুজন খেলোয়াড় বদলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, অতীতে একজন খেলোয়াড় পরিবর্তনের ফলে খেলার ফলাফলই অন্যরকম হয়ে গেছে। কখন কাকে পরিবর্তনের প্রয়োজন, পরিবর্তনের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা খেলার হালচাল ও গতির উপর নির্ভর করে। নির্ভর করে প্রতিপক্ষের ক্রীড়াধারার উপরে। বিশ্রাম সময়ের মধ্যে খেলোয়াড় পরিবর্তনের প্রয়োজন না-ও হতে পারে।

মোটের উপর, সিবেসের মতে, এমনভাবে আইনের পরিবর্তন করা দরকার, যাতে খেলার আকর্ষণ বাড়ে, আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াধারারও অবসান ঘটে।

ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আইন প্রণয়ন কমিটির উপর দোষারোপ করে সিবেস বলেছেন, দীর্ঘ ৮০ বছর হল ফুটবল আইন একটা বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র একবার অফসাইডের আইনের পরিবর্তন করা ছাড়া বড় রকমের কোন পরিবর্তন হয়নি। এঁরা কি চুপ করে বসে থাকবেন?

• • •

শুধু আইনকানুন নয়, ক্রীড়াধারারও পরিবর্তনের পক্ষপাতী গুস্তাভ সিবেস। অবশ্য তার জন্য খেলোয়াড়দের যথেষ্ট কলা-কৌশলের অধিকারী হতে হবে। প্রসঙ্গত, তিনি হাঙ্গেরী দলে তাঁর প্রবর্তিত 'ওয়েভ অ্যাটাকে'র কথা তুলেছেন। এই আক্রমণের অর্থ—যখনই প্রতিপক্ষ আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করবে, তখনই নিজেদের রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগ মিলে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই পদ্ধতির নিখুঁত প্রয়োগ অবশ্য যথেষ্ট অনুশীলন-সাপেক্ষ।

ফুটবলের ধারা পরিবর্তনের জন্য সিবেস আরও কতকগুলি উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, খেলোয়াড়দের ফরোয়ার্ড-হাফব্যাক-ব্যাক হিসাবে গড়ে তোলা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি বাস্কেট বলের ক্রীড়াধারায় খেলোয়াড়দের সু-পটু করে তোলবার পক্ষপাতী। সাম্প্রতিক ডাক্তারী পরীক্ষার ফলে নাকি দেখা গেছে, বহু খেলোয়াড় এক পায়ে খেলতে খেলতে একপেশে হয়ে পড়েছেন। তাঁদের শরীরের এক দিক সুগঠিত অন্য দিক দুর্বল। এক পায়ে জোরালো শট, অন্য পায়ে শট নেই। ছোটবেলা থেকে প্রাকৃতিক ক্রীড়া-পরিবেশের মধ্যে বাড়তে না দিয়ে ধরে ধরে ক্রীড়াপদ্ধতির পাঠ বিলি ও প্রতিভার অপমৃত্যুর অন্যতম কারণ বলে সিবেসের বিশ্বাস। অনেক সময় শিক্ষাপদ্ধতি খেলোয়াড়দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়—যদি সমষ্টিগত ক্রীড়াধারার কাছে ব্যক্তিগত প্রতিভাকে খাটো করার চেষ্টা থাকে। কোন খেলোয়াড়কে একটা বাঁধাধরা ক্রীড়া-পদ্ধতির অধীন করা উচিত নয়, ক্রীড়াপদ্ধতিকেই খেলোয়াড়ের অধীন করা উচিত। তবেই ফুটবল খেলা আরও আকর্ষণীয় হবে, খেলা রূপে-রসে ভরে উঠবে। যন্ত্রচালিত ক্রীড়াধারা থেকে ফুটবল মুক্তি পাবে।

'ফিফা', অর্থাৎ ফেডারেশন অব ইণ্টার-ন্যাশনাল ফুটবল ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ এবং দেশ-বিদেশের ফুটবল পরিচালকরা গুস্তাভ সিবেসের মতের কতখানি মূল্য দেবেন, জানি না। তবে ফুটবলই যাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, তাঁর উপদেশের যে যথেষ্ট মূল্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

দীপা চ্যাটার্জি

৪৯বি মির্জাপুর স্ট্রীটে সৌমিত্র চ্যাটার্জিদের বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবের জমাটি আসর। খেলাধুলোর নানা আলোচনায় আসর সরগরম। টীকা-টিপ্পনী হাসি-তামাশায় সবাই মশগুল। চায়ের সঙ্গে যতটুকু পারে আলোচনা থেকে রস সংগ্রহ করছে। আসরে ক্রীড়ারসিকের অভাব নেই। ক্রীড়াবিদও রয়েছেন কয়েকজন। তার মধ্যে ফুটবল ও ব্যাডমিণ্টনে বাংলার মুখ-উজ্জ্বলকারী দুই খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জি ও দীপু ঘোষের মুখ্য ভূমিকা।

কথা হচ্ছিল ব্যাডমিণ্টন নিয়ে। অর্থাৎ এ খেলায় কার কতটুকু যোগ্যতা। হঠাৎ চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠলো। দীপু বললে—'আমি বউদিকে সঙ্গে নিয়েই প্রদীপদা ও সৌমিত্রদাকে হারিয়ে দিতে পারি।'

'তাই নাকি? বেশ আমরা চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি—' বলে লাফিয়ে উঠল ভারতীয় ফুটবলের উজ্জ্বল প্রদীপ—প্রদীপ ব্যানার্জি।

কিন্তু খেলার শর্ত কি? যারা হারবে তারা অপরপক্ষকে জুতসই করে খাওয়াবে। রাজী?

রাজী।

বাজির খেলা ঠিক হয়ে গেল। এক দিকে প্রদীপ ব্যানার্জি ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি, অপর দিকে দীপু ঘোষ ও সৌমিত্র-র সহধর্মিণী অর্থাৎ দীপুর বউদি দীপা চ্যাটার্জি। খেলার দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল। শিয়ালদার ক্রেমব্রাউন ইনস্টিটিউটে খেলা।

খেলার ফলাফল? বলা বাহুল্য, দীপু ঘোষ ও দীপা চ্যাটার্জির কাছে হার স্বীকার করতে হল প্রদীপ-সৌমিত্রকে। জুতসই খাওয়াটা হয়েছিল কিনা, আর কার ট্যাঁক থেকে পয়সা বেরিয়েছিল সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মোটের উপর ঐ খেলার পরই আবিষ্কার হয়ে গেল, দীপা চ্যাটার্জির এখনো বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপে ব্যাডমিণ্টন খেলার যোগ্যতা আছে।

এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, এই সৌমিত্র চ্যাটার্জি আর দীপা চ্যাটার্জি কে?

হ্যাঁ, আপনারা যাঁর কথা ভাবছেন সেই ছায়ালোকের প্রিয়দর্শন কায়া সৌমিত্র চ্যাটার্জির সহধর্মিণীই দীপা চ্যাটার্জি।

খেলাধুলোর ভূমিকা কম। বাংলার খেলাধুলোয় পুরোবার্তিনীদের পুরোভাগে আসার সুযোগ ঘটে নি কোনদিন। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বার সময় অবশ্য দুবার ব্যাডমিণ্টন ও টেবলটেনিসে কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার হাতে এসেছে। কিন্তু সে তো ১৯৫৫-৫৬ সালের কথা। আর পরিমিত গণ্ডির মধ্যে প্রাধান্য প্রকাশ। কলেজ ছাড়া ওপেন কম্পিটিশনে দীপা চ্যাটার্জিকে কোনদিন খেলতে দেখা যায় নি।

ক্রেমব্রাউন ইনস্টিটিউটের ঐ খেলার পর প্রদীপ ব্যানার্জি এবং দীপু ঘোষের অনুরোধেই বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় দীপা চ্যাটার্জির অংশগ্রহণ এবং দীপুর সঙ্গে খেলে ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। সিঙ্গলসের খেলায় দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জির কাছে পরাজয়। এটা এই বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালের জানুয়ারীর কথা।

ঐ খেলার সুবাদেই বাংলার প্রতিনিধিত্ব। এ বছর আন্ত রাজ্য ব্যাডমিণ্টনের আঞ্চলিক খেলায় দীপা চ্যাটার্জি বাংলা দলে স্থান পেয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে সাইরনপুর থেকে অবশ্য ও'রা হার স্বীকার করে ফিরে এসেছেন। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে জিতেছিল বাংলার টীম। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে খেলায় হালে পানি পায় নি।

সি আই টি রোডের জিমখানা ক্লাবে গতবার যাঁরা বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা দেখেছেন তারা কেউ দীপা চ্যাটার্জির খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হলেও এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি যে, ও'র হাতে ভাল মার আছে আর একটু অনুশীলনের ফলে তার মধ্যে পূর্ণতাও আসতে পারে। বিশেষ করে, ছ-সাত বছর পরে ক্রীড়াঙ্গনে নেমে যে মেয়ে বাংলা দলে নিজের জায়গা করে

দীপা চ্যাটার্জি

নিতে পারে তার যোগ্যতা অস্বীকার করি কি করে? শুধু কি ছ-সাত বছর পরে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে উঠেছে দীপা চ্যাটার্জির? খেলেছিল তিন মাসের কোলের ছেলে সৌগতকে কোর্টের পাশে আয়ার কোলে শুইয়ে রেখে। অর্থাৎ মা হবার পর। এবং ডাবলসের খেলায় সে জয় খুব সহজসাধ্যও হয় নি। প্রথম রাউণ্ডে গোরা শীল ও ডিনিয়া মল্লিককে ওদের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় রাউণ্ডে হারেন অরুণ ব্যানার্জি ও রূপা মুখার্জি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর। ফাইন্যালে দীপু ও দীপার জয় পঙ্কজ গুহ ও নীলিমা সেনের বিরুদ্ধে।

সালকিয়ার মেয়ে দীপা চ্যাটার্জি। বাবা চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ডানকান ব্রাদার্সের লেবার অ্যাডভাইসার। জুট মিলের চাকরি। যখন যে বাংলোয় বাসা বেঁধেছেন তখন সেখানেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধুলোয় মেতে উঠেছেন। নিজের বিলিয়ার্ড ও স্নুকার খেলার শখ। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে টেনিস খেলেন বাংলোর লনে, সাঁতার কাটেন সুইমিং পুলে।

ব্যারাকপুরের বাংলোতেই দীপা চ্যাটার্জির খেলাধুলোয় প্রথম হাতেখড়ি। ভাইবোন সবারই খেলার নেশা। ক্রীড়ারসিক পরিবার। কিন্তু পড়াশুনার দিকেও বাবা-মার সতর্ক দৃষ্টি। তাই পড়াশুনাতেও সবাই কৃতী। শুধু খেলাধুলোতেই স্কটিশ চার্চ কলেজে সুনাম ছিল না দীপা চ্যাটার্জির, ভাল মেয়ে হিসাবেও অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ফিলসফিতে অনার্স-সহ ওখান থেকেই ১৯৫৮ সালে বি-এ পাস করেন। যখন এম-এ'র ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী তখন বিয়ে হয় সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে। তারপর খেলাধুলোর সঙ্গে একরকম বিচ্ছেদ। শুধু যখন জগদ্দলে বাবার বাংলোয় বেড়াতে গেছেন তখন একটু নাড়াচাড়া করেছেন টেনিস বা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট নিয়ে। তাকে ঠিক খেলা বলা চলে না। হাতের আড়বিড় ভাঙা আর কি?

পিতৃকুলের মত দীপা চ্যাটার্জির শ্বশুরকুলেরও খেলাধুলোয় আসক্তি। যাঁরা কলেজের খেলাধুলোর খবর রাখেন তাঁরা সবাই জানেন, সিটি কলেজে পড়বার সময় সৌমিত্র চ্যাটার্জি নিয়মিত হকি খেলেছেন আন্তঃ কলেজ লীগে। হাওড়া জিলা স্কুলে স্পোর্টসম্যান হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল সব খেলাধুলোয় পারদর্শী বলে। ওখানে থাকা-সময়ে অল ইণ্ডিয়া স্কুল গেমসে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ঘটেছে। ঘোড়ায় চড়া শিখেছেন নিজের খেয়ালে। চিত্রাভিনেতা হিসাবে পরে সেটা কাজেও লেগেছে। নিজেই বললেন—'খেলাধুলোর চর্চা শরীরকে চাঙ্গা রাখতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করে। সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে মনের দিক দিয়ে। অনেক বেশী ফূর্তি পাই খেলাধুলোর মধ্যে।'

কৃষ্ণনগরের ছেলে সৌমিত্র চ্যাটার্জি। ক্রীড়াপটু হিসাবে ওদের পরিবারের নাম কৃষ্ণনগরে সর্বজনবিদিত। জ্যাঠামশাইদের মধ্যে নিমাই চ্যাটার্জি ও মণীন্দ্র চ্যাটার্জি এরিয়ান ক্লাবের অতীত দিনের নাম-করা ফুটবল খেলোয়াড়। সুহৃদ চ্যাটার্জি কৃষ্ণনগরের বাইরে আসেন নি। কিন্তু ওখানকার সমস্ত খেলাধুলোয় তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে।

দুই পরিবারের ক্রীড়াপ্রীতি এখন দীপা চ্যাটার্জিকে খেলাধুলো সম্পর্কে নতুন আগ্রহ এনে দিয়েছে। সঙ্গে আছে শ্বশুর-শাশুড়ীর উৎসাহ, স্বামীর প্রেরণা।

অনুশীলনের অবশ্য সুযোগ কম। কভার্ড কোর্টের নিতান্ত অভাব। তবু যখনই সুযোগ ঘটে তখন হয় লিলুয়ায়, না হয় ওয়াই এম সি এ-তে অনুশীলন করতে যান কখনো স্বামীর সঙ্গে, কখনো দীপু ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে। এখন বালিগঞ্জের মনোহরপুকুরে বাড়ি বদল করেছেন। বাড়ির পাশেই একফালি জমিতে ব্যাডমিণ্টনের আসর তৈরি হয়েছে। অনেক সময় ওখানেও চলে খেলার রেওয়াজ। জগদ্দলের বাংলোয় গেলে তো কথাই নেই—সেখানে বাপ-বেটি, শ্বশুর-জামাই সবাই মিলে খেলায় মেতে ওঠেন, সাঁতার কাটেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ*

দেশী সংবাদ

১২ই নভেম্বর—হঠাৎ দেশপ্রেমের নামাবলীতে গা ঢাকিয়া কম্যুনিস্টরা পশ্চিম দিনাজপুরে শহর ও গ্রামাঞ্চলে আড়ালে-আবডালে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের বিষ ছড়াইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদর দপ্তর খাস রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এ-ধরনের অভিযোগ পেঁছিয়াছে।

লোকসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী মেনন আজ জানান যে, চীনে ও তিব্বতে ভারতীয় কূটনৈতিক অফিসের লোকদের উপর সম্প্রতি নূতন করিয়া কঠোর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

১৩ই নভেম্বর—সিকিমের মহারাজা শ্রীতাশি নামগ্যাল চীনের কার্য-কলাপে সিকিমের নিরাপত্তা গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় আজ সিকিমে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সিকিম নিরাপত্তা আদেশ, ১৯৬২, বলবৎ করা হইয়াছে।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাহার তীব্র সমালোচনা করেন।

ভারত সরকার আজ একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সমগ্র দেশে সোনার ফাটকা কারবার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই নিষেধাদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

১৪ই নভেম্বর—মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযশবন্তরাও বলবন্তরাও চ্যবন ভারতের নূতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি-ভবন হইতে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে আজ ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ তাঁহার জন্মদিনে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার ওজনের দ্বিগুণেরও কিছু বেশী—১,৩০,০০০ গ্রাম সোনা উপহার পাইয়াছেন। এই সোনা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা হইবে।

১৫ই নভেম্বর—এখন ভারতীয় বীর জওয়ানরা ভারতভূমি হইতে চীনা শত্রুদের উচ্ছেদের জন্য প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ চালাইতেছেন। ওয়ালং হইতে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট লোহিত ডিভিশনে ভারতীয় জওয়ানরা অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি করিয়া উত্থাপিত এক বে-সামরিক প্রস্তাব আজ লোকসভায় অগ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবটি লইয়া পায় চার ঘণ্টা আলোচনা চলে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে রঘুরামাইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

১৬ই নভেম্বর—বিপুল সংখ্যক চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য লাদক এবং নেফা—দুইটি অঞ্চলেই ভারতীয় এলাকার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ভারতীয় সৈন্য আত্মরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও বিফল হয়। চীনা সৈন্য নিছক সংখ্যার জোরেই আগাইয়া আসে। একমাত্র নেফা অঞ্চলেই তাহারা এক ডিভিশনেরও অধিক সৈন্য নিয়োগ করে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে কম্যুনিস্ট চীনের ভারতভূমি আক্রমণের ফলে বর্তমান জরুরী অবস্থায় চীন-দরদী দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা করিবার দৃঢ় দাবি ধ্বনিত হয়।

১৭ই নভেম্বর—আজ নেফার ওয়ালং এলাকায় চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া প্রতিরক্ষা দপ্তরে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শিবসাগর বিভাগের পাণ্ডু-তিনসুকিয়া অঞ্চলে উত্তর সীমান্ত রেলের মেন লাইনে লাকোয়া এবং সাফ্রি স্টেশনের মধ্যে সোলা লেভেল ক্রসিং-য়ে ৮ ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হয়। রেল লাইনের উপর বড় বড় পাথরের চাঁই ও ইটপাটকেল রাখা হয়।

১৮ নভেম্বর—গতকাল রাত্রে এক ডিভিশন চীনা সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে পূর্ব নেফায় ওয়ালং শহর ও উহার সংলগ্ন বিমানক্ষেত্রের পতন হইয়াছে। অন্যদিকে দক্ষিণ লাদকের চুশুল এলাকায়ও আবার রণদামামা বাজিয়া উঠিয়াছে। চীনারা ভারতীয় অগ্রবর্তী ঘাটিগুলির উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতেছে।

অদ্য বিকালে বর্ধমান শহরে চীনা আক্রমণের প্রতিবাদে আয়োজিত এক বিরাট শোভাযাত্রা কম্যুনিস্টদের দ্বারা দুইবার আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের ফলে শোভাযাত্রীদের মধ্যে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিস ৫১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১২ই নভেম্বর—ভুটানের আশেপাশের অঞ্চলে চীনা আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া এবং ভুটান সীমান্তে চীনা আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়া ভুটান সরকারও রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে মনোনিবেশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

হংকং হইতে প্রাপ্ত এবং 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বার্তায় বলা হইয়াছে যে, "হিমালয়ের সংকট" হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য চীনের নেতৃবৃন্দ এখন উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন।

১৩ই নভেম্বর—'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকা আজ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে কম্যুনিস্ট দেশগুলি পাকিস্তানের উন্নয়নে সাহায্য প্রদান করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব ইউরোপের তিনটি কম্যুনিস্ট দেশ তো ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে সাহায্য-দানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

১৪ই নভেম্বর—কলম্বোর চীনা দূতাবাস হইতে প্রকাশিত ও ওখানকারই একটা প্রেস হইতে মুদ্রিত ভারতবিরোধী পুস্তিকা 'মোর অন নেহরুজ ফিলসফি' সম্পর্কে সিংহলের বহির্বিষয়ক দপ্তর খুব সম্ভব তদন্তের নির্দেশ দিবেন।

নিউ ইয়র্ক টাইমস এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ("দি স্ট্রেন অন রেড চায়না") বলিয়াছেন যে, হিমালয় অঞ্চলে ভারতের সুদৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে, শেষ পর্যন্ত চীনকেই পস্তাইতে হইবে।

১৫ই নভেম্বর—আজ সিংহলের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জের আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর কয়েকজন সদস্য বিশ্ব সংস্থায় চীন-ভারত সংগ্রাম সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন বলিয়া সিংহল সরকারকে জানানো হইয়াছে।

আণবিক যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত আলোচনা করিতে পারে বলিয়া শ্রীক্রুশ্চফ যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই মস্কো ও পিকিংয়ের মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

১৬ই নভেম্বর—নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর খবরে প্রকাশ, চীন ভারতকে জানাইয়াছে যে, ভারতীয় বাহিনীর অফিসার ও জওয়ান লইয়া মোট ৯২৭ জনকে তাহারা পাকড়াও করিয়াছে। ধৃতদের মধ্যে আছেন সেভেনথ্ ইণ্ডিয়ান ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার কে পি দালভি, সাতজন ফিল্ড গ্রেড অফিসার ও নয়জন কোম্পানী গ্রেড অফিসার।

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারিগণ বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে কানাডা হইতে পরিবহণ বিমান সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিতেছে এবং ভারতের নিকট কিছু পরিমাণ বিমান বিক্রয় করিবার জন্যও ভারতের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছে।

১৭ই নভেম্বর—খ্যাতনামা বৃটিশ দার্শনিক ও আণবিক নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের নেতা লর্ড রাসেল চীন-ভারত সীমান্তের "বিপজ্জনক সংগ্রাম" সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, সীমান্ত সংগ্রাম বাধাইবার ব্যাপারে চীনকেই আমি অপরাধী বলিয়া মনে করি।

বিখ্যাত মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট ভারতে চীনা আক্রমণকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

১৮ই নভেম্বর—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আলী করাচীতে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীতে (ইংরাজেরা এই কোম্পানীর মালিক) যে ধর্মঘট চলিতেছে পাকিস্তান সরকার সেই ধর্মঘটের মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। এই ধর্মঘটের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দিয়া নদীপথে স্টীমারযোগে মাল প্রেরণ বন্ধ আছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ২০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্বাসঘাতকের আঘাত—	... ...	... ৩৯৫
ব্যঙ্গচিত্র—কুট্টি	... ...	... ৩৯৬
বৈদেশিকী—	... ...	... ৩৯৭
চীনা দস্যুর প্রতিরোধে ভারত—ইবন বতুতা ...		... ৩৯৯
ধন্যবাদ (কবিতা)—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	...	... ৪০১
পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি—	... ...	... ৪০২
অসমাপ্ত চটাব্দ—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়		... ৪০৪
আত্মার স্বর (কবিতা)—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়		... ৪১৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ 'আজ দেখো আমার উদ্যত লৌহমুষ্টি'

(সি ৯৪০০)

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 1st December 1962

৩০ বর্ষ ॥ ৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

বিশ্বাসঘাতকের আঘাত

ভারত সরকার স্বভাবতই নরম প্রকৃতির। দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত সহজে করেন না, জরুরী সময়েও নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোর এই স্থিরতা হয়ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চীনের ব্যাপক আক্রমণের পর যখন জাতীয় সংকট তীব্র হয়ে উঠল, তখন দেশবাসী বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেছে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ভারত সরকারের মনোযোগ নেই। চীন-পন্থী কমিউনিস্ট নেতারা তখনও দিবালোকে বিচরণ করছেন, এবং বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে চীনা-আক্রমণকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে যাচ্ছেন। এই অবস্থা যে কী দৃষ্টিকটু তার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যাবে, ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরে জনসাধারণ কমিউনিস্ট-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সরকারকে জানিয়েছে, এই দেশ-শত্রুদের সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সাধারণের দাবী যখন তীব্রাকার ধারণ করল, তখনই ভারত সরকার ভারতরক্ষা আইন বলে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করলেন। দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ভারতে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্ন-স্বরূপ—এই বিবেচনায়, যাঁরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন—তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আধা-নেতারাই রয়েছেন সংখ্যায় ভারী হয়ে।

চীন-পন্থী, অর্থাৎ চীনা কমিউনিজমের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যাঁরা সমর্থক, (যাঁরা প্রথমে তাঁদের মিত্রদের প্রকাশ্য শত্রুতা ডামাডোলের মধ্যে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে এই কাঁটা গলায় বিঁধিয়ে নিয়েছিলেন) তাঁরা যে দেশের আপদকালে পঞ্চমবাহিনীর কাজ করছেন এ-বিষয়ে ভারত সরকারের দ্বিধা দূর হতে যথেষ্ট দেরী হল। জনসাধারণের অবশ্য তা হয় নি। ঘরের শত্রু বিভীষণকে তারা আপনগুণে পূর্বেই চিনতে পেরেছিল। সরকার যে কেন পারেন নি সেটাই আশ্চর্যের। তাঁরা কি ভেবেছিলেন, জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই পঞ্চম-বাহিনীদের গ্রেপ্তারে কোনোরকম প্রতিবাদ উঠতে পারে! হয়ত, ভারত সরকারের দুর্বল মনে এ-ধরনের কোনো দ্বিধা থেকে থাকতে পারে যে, জনসাধারণের মনে এদের বুঝি সত্যই কিছু স্থান আছে, ফলে ঠিক ওই মুহূর্তে, ব্যাপক গ্রেপ্তার ঘটলে, কোনো কোনো জায়গায় কিছু বিশৃংখল দেখা দিতে পারে! বলা বাহুল্য, তেমন অঘটন অদ্যাবধি ঘটে নি।

কমিউনিস্ট নেতারা সর্বদাই দাবী করেছেন যে, তাঁদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক গভীর। চাষী মজুর শ্রমিক সাধারণ মানুষের সাচ্চা নেতা হিসেবে এঁদের দাবী বহুবার অহমিকা-বাক্য হিসাবে শোনা গিয়েছে। এই সব গায়ে-পড়া ট্রাস্টিরা সাধারণ মানুষের কতটুকু বিশ্বাসভাজন তার চূড়ান্ত পরীক্ষা আজ হয়ে গেল। এই ব্যাপক গ্রেপ্তার সত্ত্বেও কোথাও একটু প্রতিবাদ নেই, ক্ষোভ নেই; কেউ বলছে না, এটা অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ হল। বরং ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা, যে-সব কমিউনিস্ট নেতা কিছুদিন মাত্র আগে সাধারণের ভোট কুড়িয়ে দেশের আইনসভাদিতে আসন লাভ করেছিলেন, আজ সেই অঞ্চলের জনসাধারণই তাঁদের পদত্যাগ দাবী করছে। কী অল্পে তাসের প্রাসাদ ধসে যায় এই বুঝি তার উদাহরণ।

কস্মিনকালে কেউ কি বুঝেছে, কোনো মানুষ গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলে জেলের কর্মচারীরা তার কাজ করতে চায় না? দেখা যাচ্ছে, এই বাংলাদেশে এমন ঘটনাও ঘটল। কিছু কমিউনিস্ট নেতাকে কোনো একটি জেলে রাখার পর সেখানের কর্মচারীরা এঁদের দেশদ্রোহী জ্ঞানে ঘৃণায় এই নেতাদের কোনো কাজ করতে চান নি। ভাগ্যের কী নিদারুণ পরিহাস! স্বঘোষিত দেশসেবকরা আজ কি না জেলখানাতেও দেশদ্রোহী বলে ঘৃ
এবং ধিকৃত!

একটা কথা আছে, দুকান কা
লজ্জা নেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট পা
ইতিহাস এই রকম, তার দুকান কা
ফলে লজ্জা তার কোনো কালেই নে
সার্কাসের ক্লাউনের মতন সে যখন খু
ডিগবাজি খেয়ে নিজেকে সামলে নি
কেরামতি দেখায়। গত বিশ্বযুদ্ধ থে
এ-যাবৎ তার নানা প্রক্রিয়ায় ডিগবা
খাওয়া আমরা দেখেছি। সম্প্রতি দেখ
তার যে শুধু লজ্জা নেই এমন নয়,
সমস্ত জাতির ধিক্কার সয়েও গোপ
গোপনে শয়তানের ক্রিয়াকর্ম করে চলে
যে গুন্ডাবাজি চিরকাল দুর্নীতিপরায়
দের একমাত্র সম্বল বলে সামাি
মানুষের কাছে ঘৃণার বস্তু, কমিউনি
দলে তার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এরা চা
দোকান থেকে অসহায় যুবককে
এনে ছোরা মারছে, এরা কলকাতা চন্
নগর, বর্ধমান, আসানসোল মানছে
অ-কমিউনিস্ট নিরীহ জনসাধার
সুযোগ পেলেই ছুরিকাঘাত করা
কলকাতার যাদবপুরে এমন ঘটনা ঘটে
ঘটেছে চন্দননগরে, বর্ধমানে। কাপুরু
স্বভাব এই, বিশ্বাসঘাতকের ধর্ম
তারা পিছন থেকে ছুরি মারে।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভারত
গণতন্ত্রের পৃষ্ঠে ছুরি মারার জ
দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে আছে জ
চীন আক্রমণ সেই সুযোগ এনে দিয়ে
কিন্তু জাতীয় ঐক্যের এবং দেশবা
দৃঢ়তার জন্যে কমিউনিস্টদের
বিশ্বাসঘাতক ছুরি শেষ পর্যন্ত আমা
পিঠে পড়ে নি। কিন্তু প্রশ্ন এই,
কি তাদের হাতের ছোরা ফেলে দিয়ে
যদি চীনা-পন্থীরা বিদায় নিয়ে থ
তবে ইতস্তত এই ছুরিকাঘাত যে
কার পৃষ্ঠদেশে? যদি ডাঙ্গে-প
কমিউনিস্টরা জাতীয় সংকটে আম
সঙ্গে একযোগে শত্রু-প্রতিরোধে ম
তবে কার হাত দিয়ে এ ছোরা আ
করতে আসছে?

এ-প্রশ্নের সদুত্তর দাবী করা যায়
কেননা, আমরা যদি না কমিউনিস্
নতুন চালে ভুলে গিয়ে থাকি,
স্পষ্টই দেখব—ওদের একদল আম
সামনে বন্ধুর বেশে হাত বাড়িয়ে ব
আর অন্যদল সেই সুযোগে পিঠে
মারছে। আমরা এ-সময় নিশ্চয় বি
ঘাতকের ছুরি খাওয়ার জন্যে পিঠ
রাখতে পারি না।

বাইশে নভেম্বর থেকে তারা "যুদ্ধ-বিরতি" করবে বলে ২০-এ নভেম্বর চীনারা যে ঘোষণা করে, সেটা কোনো প্রস্তাব নয়, সেটা একরকমের হুকুম। তাতে বলা হয়েছে, চীনারা কী করতে যাচ্ছে এবং ভারতকে কী করতে হবে এবং ভারত যদি তা না করে, তা হলে চীনারা কী করবে বা করতে পারে। অক্টোবর মাসে চীনারা তাদের আক্রমণের এই পর্ব আরম্ভ করেই কতকগুলি শর্ত জানায়, যেগুলির ভিত্তিতে তারা ভারত সরকারকে আপস-নিষ্পত্তির আলোচনায় আসতে বলে। চীনারা যুদ্ধের জন্য বিপুল-ভাবে প্রস্তুত হয়ে আক্রমণ আরম্ভ করে। তারা জানত যে, ভারত সরকারের পক্ষে সে-সব শর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেগুলি মেনে নিলে বস্তুত চীনারা ভারতভূমির যতটা দখল করেছে, ততটা তো যাবেই তার পরেও চীনাদের এগোবার সুযোগ দেওয়া হবে। এই আক্রমণের আপাত-সাফল্যের জোরে চীনারা তাদের ২৪ অক্টোবরের শর্তগুলি ভারতকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চাচ্ছে। যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ যেমন করে বিজিতের উপর দাবি করে, এটা সেই রকমের একটা ব্যাপার।

চীনাদের এই দাবি তারা কিন্তু এমনভাবে সাজিয়ে প্রচার করছে যেন চীনারা শান্তির জন্য ব্যাকুল, চীনই ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। চীনা সরকারের বিবৃতিতে ভারত সরকারকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে প্রাপ্তিমাত্র এই বিবৃতিকে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় বলে ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু বর্তমান ভারত সরকার চীনাদের কাছে এতকাল ধরে এবং এতরকমে বেকুব বনেছেন যে, চীনাদের সম্পর্কে আত্মসম্মান বজায় রেখে কিছু করার মতো মনোবলই যেন এই সরকারের লোপ পেয়েছে।

চীনারা ২২ তারিখ থেকে আর আক্রমণ করেনি। ঐ তারিখ থেকে আমাদের দিক থেকেও চীনাদের উপর কোনো গোলা গুলী চালানো হয়নি, তাদের হটিয়ে দেবার কোনো চেষ্টা হয়নি। অর্থাৎ আমরাও 'যুদ্ধ বিরতি' করেছি। সামরিক সুবিধা-অসুবিধার দিক থেকে এই 'যুদ্ধবিরতি' ভারতের পক্ষে সাময়িকভাবে বাঞ্ছনীয় কি না জানি না, বাঞ্ছনীয় হতেও পারে। অর্থাৎ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলেও আপাতত একটু বিরাম পেলে ভারতের প্রস্তুতির দিক থেকে খানিকটা সুবিধা হতে পারে। কিন্তু সে-কথা চীনের পক্ষেও প্রযোজ্য। চীনাদের দিক থেকে এই সাময়িক বিরামের প্রয়োজন ও মাত্রা হয়ত আরো বেশি। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার সমতলভূমির কাছাকাছি চীনারা পেঁাছে গেছে, এর পর এগোতে হলে তার জন্য বিশেষ প্রস্তুতির হয়ত আবশ্যকতা আছে।

চীনারা বোধহয় অনুমান করেছিল এবং সে-অনুমান ঠিকই হয়েছে যে, তারা যদি 'যুদ্ধবিরতি' করে, তবে ভারত সরকার তা না মেনে পারবে না—সামরিক দুর্বলতার জন্যও বটে এবং চীনাদের এই 'পীস্ অফেন্সিভের' ধাক্কায় ঘাবড়ে গিয়েও বটে।

তাছাড়া, চীনারা বলেছে যে, তারা ১লা ডিসেম্বর থেকে তাদের ঘোষিত শর্তানুযায়ী পিছু সরে যেতে আরম্ভ করবে। চীনারা কী করে, দেখার জন্য ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়ত অযৌক্তিক নয়। অবশ্য চীনারাও এই সময়ের মধ্যে ভারতের ভাব-গতিক লক্ষ্য করবে। এই কদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু এই কদিনের উপর দীর্ঘ ভবিষ্যতের গতি নির্ভর করছে। এই কদিনের মধ্যে বুঝা যাবে যে, চীনাদের কাছে আমরা পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছি কি না, চীনারা আমাদের সরকারের মেরুদণ্ড সত্যিই ভেঙে দিয়েছে কি না।

চীনারা বলে যে, তারা কতদূর পেছুবে এবং কতদূর পর্যন্ত ভারতীয়েরা যেতে পারবে, তার বেশি এগোলেই চীনারা ভারত আক্রমণ করবে। চীনাদের এই শর্ত বা তার কাছাকাছি কোনো ব্যবস্থা কি আমরা মেনে নেব অথবা মেনে নিতে পারি, এমন কোনো ইঙ্গিত আমাদের কথায় বা কাজে প্রকাশ পাবে? অথবা ভারতভূমি থেকে চীনাদের সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না, এই জাতীয় সঙ্কল্পে আমরা স্থির থাকব? এর মধ্যে কোন্ পথটা ভারত নিল, সেটা এই নভেম্বর মাসের কদিনের মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে।

কম্যুনিস্ট চীনের শর্তে বা তার কাছাকাছি কোনো শর্তে, এমন কি বর্তমান পরিস্থিতিতে "৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থানের" ভিত্তিতে আলোচনায় স্বীকৃত হওয়াও কম্যুনিস্ট চীনের কাছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বন্ধক দেওয়ার সামিল হবে। ভারতভূমি বলতে আমরা যা বুঝি, সেখান থেকে চীনারা সম্পূর্ণ সরে যাবে—ভারতবাসীর এই অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় সৃষ্টির অবকাশ যদি দেওয়া হয়, তা হলে শীঘ্র হোক, বিলম্বে হোক ভারত স্বাধীনতা হারাবে। চীনারা পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত সারা হিমালয় অঞ্চলব্যেপে যে-জায়গা জুড়ে বসেছে, সেখানে তাদের শক্তি যদি শিকড় গেড়ে রয়ে যায়, তবে লাদাকের কথা তো ছেড়েই দিই, নেপাল, ভূটান, সিকিমও চীনাদের দ্বারা কবলিত হতে বেশিদিন লাগবে না। সম্প্রতি চীনারা যে সামরিক সাফল্য লাভ করেছে, সেইটাই যদি ভারত ও চীনের শক্তি-পরীক্ষার শেষ দৃষ্টান্ত হয়, তবে কম্যুনিস্ট চীনের প্রভাব কেবল হিমালয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার ব্যাপ্তির পথ প্রশস্ততর হবে এবং ভারত-বর্ষের উপর তার ছায়া ক্রমশ ঘনতর হয়ে উঠবে।

এখনই ভারতের সমতলভূমিতে নেমে এসে বসার পরিকল্পনা চীনাদের ছিল না, সুতরাং এখন একটু পিছিয়ে যেতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এবারে চীনাদের যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, সেটা তারা নিশ্চয়ই ভুলবে না এবং সেটা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পক্ষে নিশ্চয়ই উৎসাহোদ্দীপক হবে, যদি তারা বুঝে যে, ভারত তাদের সামরিক শক্তির কাছে মাথা নুইয়েছে। গোটা দেশের তুলনায় চীনারা ভারতের মধ্যে একটুখানি মাত্র জায়গায় ঢুকতে পেরেছে, কিন্তু এমন হতে পারে, এই একটুখানি জায়গায় তারা যে আমাদের হারিয়েছে, সেটাতেই আমাদের চরম হার হয়ে গেছে—ঐ একটুখানি যুদ্ধের দ্বারাই তারা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্যের ভিত্তি রচনা করেছে।

এই আশঙ্কা দূর করতে হলে এই সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকতে হবে যে, চীনার ভারতভূমি থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না। কোনো নিষ্পত্তির আলোচনায় যোগ দেব না, তাতে যেই যা ভ্রম করুক, যেদিক থেকেই যত চাপ

আসুক। কারণ এটা ভারতের জীবনমরণ সমস্যা। চীনাদের উদ্ধত সামরিক শক্তির কাছে যদি আমরা মাথা নোওয়াতে না চাই তবে চীনারা যে হুকুম করেছে, সেটা যে আমরা মানি না, মানব না, তা এখনই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে—চীনাদেরও জানিয়ে দিতে হবে। সকল ভারতবাসীর মনেও সেটা এমনভাবে অঙ্কিত করে দিতে হবে যে, সে-বিষয়ে যেন কারো এতটুকু সংশয়বোধ না থাকে। আজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের লোক সরকারের পিছনে আছে কি না সেটা প্রশ্নই নয়, বরং যে-প্রশ্নটা মাঝে মাঝে অনেকের মনে উদয় হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, আমাদের সরকার সব সময়ে আমাদের ঠিক আগে আগে চলছেন কি না, না, মাঝে মাঝে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে এই যে, আমাদের সরকার এবং চীনা কম্যুনিস্ট সরকারের মধ্যে বিবাদের সীমানাটা সাধারণভাবে দেশবাসীর কাছে এখনো খুব সুস্পষ্ট নয়। হাজার চিঠি লেনদেন হয়েছে, তার মধ্যে থেকে আমরা কবে কোন্ লাইন ধরছি, কোন্ লাইন ছাড়ছি, ঠিক করে বুঝে ওঠা অথবা মনে করে রাখা কঠিন। সাধারণ মানুষের মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে থাকতে পারে, এমন কোনো লক্ষ্যের ধারণা আমাদের সরকার সৃষ্টি করতে পারেন নি। এই অবস্থায় চীনাদের পক্ষে মানুষকে বিভ্রান্ত করা আরো সহজ।

চীনারা অবশ্য তাদের নিজেদের লক্ষ্য কী, সেটা খুব পরিষ্কার করেই জানে। অতীতের চীনা সম্রাটদের যে-কোনো বাস্তব বা কাল্পনিক দাবি অনুযায়ী রাজ্যবিস্তার এবং তাছাড়া বাকী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের প্রভাবাধীন কম্যুনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা—এইটাই যে কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের লক্ষ্য, সেটা কম্যুনিস্ট চীনের এই ক' বছরের ক্রিয়াকলাপ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। কম্যুনিস্ট-নীতি সম্পর্কিত শ্রী মাও সে-তুং-এর লেখা পড়লে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট-শাসনের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কম্যুনিস্ট চীন নিরুদ্বেগ এবং নিশ্চেষ্ট হবে না। কম্যুনিস্ট চীনারা জানে যে সব একসঙ্গে পাওয়ার জিনিস নয়, সেজন্য তারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য কী, সে সম্বন্ধে ভুল করার আর কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ভারত সরকারের লক্ষ্য কী, সে সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে এখনো কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ভারতের যে-জায়গা চীনারা অন্যায়ভাবে দখল করেছে, তার পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে ভারতের লক্ষ্য—কেবল এই কথা বললেই আজ মানুষের কাছে অবস্থাটা পরিষ্কার হবে না। প্রথমত, সীমানার খুঁটিনাটি তর্কটা এত জটিল করে তোলা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যাপারটার একটা পরিষ্কার ধারণা করাই মুশকিল। তাছাড়া, এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, কয়েক মাইল এদিক-ওদিকের প্রশ্নই এটা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুতর বিষয় নিয়ে আসল ঝগড়া। কয়েক মাইল পার্বত্য ভূমির জন্য আমরা লড়ছি না, কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের যে-ধারা তিব্বত পেরিয়ে হিমালয়ের উপর দিয়ে এদিকে নেমে আসতে উদ্যত হয়েছে, তাকে ঠেকানোই হচ্ছে আসল কাজ।

অমুক তারিখে অমুক পক্ষ কোথায় ছিল, তার ভিত্তিতে আলোচনা দ্বারা সে-কাজ সম্পন্ন হবে না। তিব্বত যদি কম্যুনিস্ট চীনের কবলে থাকে, তা হলে কি সে-কাজ সম্পন্ন হতে পারে? কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক শক্তির কাছে মাথা নুইয়ে তার সঙ্গে এমন আপস করলাম, যাতে হিমালয়ে চীনা শক্তির প্রতিষ্ঠা চিরকালের মতো স্বীকার করা হল, তা হলে কি কম্যুনিস্ট চীনের গতি সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে? সাধারণত সীমানার সংঘর্ষ বলতে যা বুঝায়, এই বিবাদটা যে তার চেয়ে ঢের বেশি বড়ো বিবাদ, একথাটা দেশবাসীকে বুঝাতে হবে এবং সেটা বুঝাতে হলে অমুক তারিখের অবস্থানের ভিত্তিতে আলোচনা করা-না-করা প্রশ্নটাকে আজ অবান্তর বলে মনে করতে হবে এবং এমনভাবে আমাদের লক্ষ্যের কথা বলতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝে যে, এটা সত্যই একটা জীবনমরণের প্রশ্ন।

কম্যুনিস্ট চীনের শক্তি হিমালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ, ভারতের স্বাধীনতার বিপদ—এই কথাটাই আজ দেশবাসীকে বুঝতে হবে। ভারতের যে-ভূমি চীনারা দখল করেছে, সেখান থেকে চীনাদের হঠাতে তো হবেই, তাছাড়া, এটা বুঝতে হবে, তিব্বত যদি চীনা কম্যুনিস্টদের কবলে থাকে, তবে ভারতের যে-ভূমি হাতছাড়া হয়েছে, তার পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করাও যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি ভারতের স্বাধীনতার বিপদও কাটবে না। চীনা শক্তির ও প্রভাবের দক্ষিণমুখী অগ্রগতি ঠেকানো আমাদের অন্যতম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা উচিত। শ্রী মাও সে-তুং যদি কম্যুনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা ভারতবর্ষের গভর্নমেণ্ট বদলানোর চেষ্টা চীনের নিরাপত্তার জন্য আবশ্যক এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একটা কর্তব্য বলে মনে করতে পারেন, তবে তিব্বতের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের পক্ষে কাম্য কেন হবে না?

চীনারা যদি বুঝে যে, ভারত তাদের সামরিক শক্তির কাছে মাথা নুইয়ে তাদের শর্তে আবদ্ধ হতে রাজী নয় এবং কম্যুনিস্ট চীনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকে ব্যাহত করার জন্য সে বদ্ধপরিকর, তা হলে চীনারা হয়ত পিছু সরে যাবে না, বা কিছুটা সরে গেলেও তাদের সঙ্গে অচিরে সংঘর্ষ বাধবে। তা যদি বাধেও, তবু ভয় করলে চলবে না। আরো প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সংঘর্ষে নামা উচিত। এখন একটা সাময়িক মিটমাট করে নিয়ে কিছুটা সময় নেওয়া যাক—এই যুক্তি যদি গ্রহণ করা হয়, তবে তার অনিবার্য পরিণাম হবে ধ্বংস। কারণ এখন যদি চীনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে নিষ্পত্তির আলোচনায় যাওয়া হয়, তবে জাতির নৈতিক শিরদাঁড়ায় যে-ঘা খাবে, তাকে আর সোজা করা যাবে না।

আর প্রস্তুত হওয়ার যদি প্রশ্ন হয়, তবে আমরা যেরকম প্রস্তুত হতে থাকব, চীনারা হয়ত তার চেয়েও বেশি প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে। লাভের মধ্যে হবে এই যে, চীনাদের তুলনায় আমাদের 'মোরেল' আরো নেমে যাবে এবং ফলে কোনোদিনই কী 'মোরেল', কী বাস্তব প্রস্তুতিতে আমরা চীনাদের নাগাল পাব না। প্রস্তুতিতে যতই ত্রুটি থাক, মার খাওয়ার ভয় যতই বেশি থাক, ভারত যদি এখন রণে ভঙ্গ দেয়—তা সে যে-অজুহাত দিয়েই হক—তা হলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হবে।

২৪-১১-৬২।

চীনা দস্যুর প্রতিরোধে ভারত

ইবন বতুতা

গত ১৫ই নভেম্বর চীনারা দ্বিতীয়বার যে বড় রকমের আক্রমণ আরম্ভ করেছিল, তা এক সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। এই এক সপ্তাহের আক্রমণে নেফা এলাকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান চীনাদের হাতে চলে যায়। চীনারা ১৫ই নভেম্বর ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের ওয়ালং আক্রমণ করে। ১৭ই নভেম্বর ওয়ালংয়ের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ওয়ালংয়ের পতনকে

ভারতীয় স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল চৌধুরী

একটি বড় রকমের বিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। লোহিত বিভাগের ওয়ালং থেকেই চীনারা দ্রুতগতিতে আসামের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ভারতীয় জওয়ানরা পিছু হঠতে থাকে এবং ওয়ালংয়ের ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হাউলিয়াং-এ এসে ২১শে নভেম্বর চীনাদের প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়। জং ভারতীয়দের হাতছাড়া হয় ১৭ই নভেম্বর। ১৮ই দুর্ভেদ্য সে-লা ঘাটির পতন হয়। সে-লার বিপর্যয় ওয়ালংয়ের পতন থেকে কম মারাত্মক নয়। কারণ চীনারা কেবলমাত্র সে-লা দখল করে নি, প্রচুর রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্র সমেত কয়েক হাজার ভারতীয় জওয়ানকেও ঘিরে ফেলেছিল। চীনারা ১৭ই নভেম্বর বমডি-লার নিকট দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর পাশ কাটিয়ে ১৬,৭৫৯ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সে-লা গিরিপথের ভারতীয় ব্যূহকে বিচ্ছিন্ন করে। ১৮ই নভেম্বর সে-লার পতন ঘটে এবং তার পরের দিনই বামডি-লা চীনারা দখল করে। নেফা সীমান্তের ভারতীয় ঘাটি থাগলা থেকে বামডি-লা'র দূরত্ব ১০০ মাইল। আর বামডি-লা থেকে আসামের তেজপুরের দূরত্বও সড়ক পথে ১০০ মাইল। ২১শে নভেম্বর চীনারা নেফার দক্ষিণ-সীমান্তের নিকট ফুটহিলসের কাছাকাছি চলে আসে। ফুটহিলস থেকে তেজপুরের দূরত্ব সড়ক-পথে ৩৫ মাইল। ভারতীয় জওয়ানরা ফুটহিলসে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলছে। ওদিকে চুশুল এলাকায় ভারতীয়দের আরও কয়েকটি ঘাটি হাতছাড়া হয়। ঐ এলাকায় চীনারা ট্যাংকও ব্যবহার করে।

চীনাদের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত সমরকৌশল ও বিপুল সংখ্যক চীনা সৈন্যর আক্রমণ এবারেও নেফাতে ভারতীয়দের বিপর্যয়ের কারণ। ওয়ালং এলাকায় চীনারা ১০ হাজারের বেশী সেনা নিয়োগ করে বলে জানা যায়। চীনারা কামান, ভারী মর্টার ও 'রিকয়েললেস' বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে। এই শেষোক্ত অস্ত্রটি বিমান-বিধ্বংসী কামান হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। সে-লা এলাকাতেও চীনারা নাকি দুই ডিভিসন সেনা নিয়োগ করে। নতুন আক্রমণের জন্য চীনারা তৈরি হচ্ছে বলে যারা আগে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, ১৫ই নভেম্বরের আক্রমণ সেই আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে। চীনারা ঐ সময়ে নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করে পিছনের ঘাটির সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছে। যে-এলাকায় রাস্তাঘাটের অভাবে ভারতীয়েরা অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার-দাবার পাঠাতে পারে নি, সে-এলাকায় চীনারা পনেরো দিনের মধ্যেই ঐ সব অসুবিধা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। চীনারা কেবলমাত্র ভারতীয় এলাকা দখল নয়, বেশী সংখ্যক ভারতীয় জওয়ান গ্রেপ্তারের দিকেও নজর দিয়েছে।

চীনা-অধিকৃত ভারতীয় এলাকার সীমান্তে ভারতীয় জওয়ানদের ব্যস্ত রেখে চীনারা পিছনে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছিল। চীন এবারে অন্যপথ নিয়েছে। ২১শে নভেম্বর ভোরে চীনারা ঘোষণা করে যে, ঐদিন মধ্যরাত থেকে চীনারা অস্ত্র সংবরণ করবে এবং আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর ভারতীয় ও চীনাদের সীমারেখা থেকে ২০ কিলোমিটার পিছনে সরে যাবে। যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে চীন অনেকগুলি শর্ত আরোপ করে। এই তথাকথিত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির ভেলকি দেখিয়ে চীনারা একদিকে অধিকৃত এলাকা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি এবং পৃথিবীর সামনে ভারতকে যুদ্ধবাজ ও আক্রমণকারী হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। ২২শে নভেম্বর থেকে চীনারা দুই সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধ রেখেছে।

গেটস্কেল : 'আমি এই নিশ্চয়তা চাই যে, ভারতকে সাহায্য-দানের সকল ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।'

চীনা আক্রমণে ভারতীয় বাহিনী বিপর্যয়ের ফলে তেজপুরের অসামরিক অধিবাসীদের শহর পরিত্যাগের নির্দে[শ] দেওয়া হয়। দুদিন পরে অর্থাৎ ২০[শে] নভেম্বর তেজপুরে বিমান আক্রমণে[র] আশংকা প্রকাশ করা হয়। বে-সামরি[ক] কর্তৃপক্ষ তেজপুরে ও মঙ্গলদই শহর পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন এবং ব্রহ্মপুত্রে[র] দক্ষিণ পারে নওগাঁয় সরকারী দপ্ত[র] স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। তেজপুরে[র] অধিবাসীরা যখন শহর ছেড়ে চলে গি[য়ে]ছিলেন, সে-সময় চীনাদের হাত এড়ি[য়ে] পাহাড়ীরা খাদ্যশস্য ও গৃহপালিত জী[ব]জন্তু সমেত তেজপুরে এসে হাজির হয়।

নেফার প্রথম বিপর্যয়ের সময় দেশর[ক্ষা] মন্ত্রী বিদায় নেন। এবারে জেনা[রেল] থাপার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের [পদ] থেকে দীর্ঘমেয়াদী ছুটি নিয়েছে[ন।] ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়[কের] দায়িত্ব পড়েছে চুয়ান্ন বৎসরের বাঙালী [বীর] লেঃ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর উ[পর।] ১৯০৮ সালে কৃষ্ণনগরে লেঃ জেঃ চৌধু[রীর] জন্ম। সান্ডহার্স্ট-এ সামরিক শিক্ষাপ্র[াপ্ত] এই বাঙালী বীর ১৯২৮ সাল থে[কে] বিখ্যাত ভারতীয় জওয়ান। লেঃ চৌধুরী পরাজয় কাকে বলে জানেন

অতীতে বৃটিশ বাহিনীর সংগে তিনি সুদান, ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া ও ব্রহ্মদেশে লড়াই করেছেন। স্বাধীন ভারতেও বিপদের দিনে ডাক পড়েছে এই 'বিজয়-প্রতীক' সেনাপতির। ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ-অভিযানে তিনি ছিলেন ১নং সাঁজোয়া বাহিনীর নায়ক। গত ডিসেম্বরে তাঁর অধিনায়কত্বে সাড়ে তিনশ বছরের পরাধীনতা থেকে গোয়াবাসীরা মুক্তিলাভ করে। ভারতের ঘাটি থেকে চীনা দস্যুদের বিতাড়িত করবার কাজে লেঃ জেনারেল চৌধুরীর নিয়োগ সারা দেশে নতুন আশার আলো হিসেবে অভিনন্দিত হয়েছে।

বিপদের দিনে যারা পাশে এসে দাঁড়ায় তারাই প্রকৃত বন্ধু। চীনা দস্যুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিদেশী বন্ধুদের সাহায্য অপরিহার্য। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। ভারতের বিপদকে ইংলণ্ড যাতে নিজের বিপদ বলে মনে করে তার জন্য শুধু ম্যাকমিলান নয়, শ্রমিক দলের নেতা শ্রীগেটস্কেলেরও দুশ্চিন্তার সীমা নেই। প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের চাহিদা নির্ধারণের জন্য গত ২২শে নভেম্বর একই সংগে একটি বৃটিশ ও একটি মার্কিন মিশন দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব শ্রী এভারেল হ্যারিমান মার্কিন মিশনের নেতা। এই হ্যারিমানই ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আজকের মত সেদিনও একটি বৃটিশ মিশন তাঁর সংগী ছিল। বৃটিশ মিশনে আসেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্যার রিচার্ড হাল, কমনওয়েলথ দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রী জন টিলনে। কমনওয়েলথ সেক্রেটারী শ্রীডানকান স্যাণ্ডাস দিল্লি পৌঁছেছেন ২৪শে নভেম্বর। মিশনের অনুসন্ধানের অপেক্ষায় চীনা দস্যুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ফেলে রাখা যায় না। তাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানির সংগে বিমান আমদানিও আরম্ভ হয়েছে। ২২শে নভেম্বর কানাডা থেকে এসেছে ৬টি ডাকোটা বিমান। বৃটেন থেকে আসছে ৮০টি ক্যানবেরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে ২০টি সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান। অস্ট্রেলিয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। রাশিয়া থেকে মিগ এখনও পাওয়া যায় নি। পাওয়া যাবে কিনা, একমাত্র ভবিষ্যৎ তা বলতে পারে।

গলব্রেথ : 'ভারতকে সামরিক জোটে ভেড়াবার জন্য নয়, তার নীতিকে বিশ্বাস করেই এই অস্ত্র সাহায্য।'

আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসী যখন একতাবদ্ধ হচ্ছে এবং ভারতের বন্ধুস্থানীয় দেশগুলি সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে, তখন চীন ভারত ও বিশ্বের জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য ২১শে নভেম্বর এক নূতন প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি যে বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেই চীন ২২শে নভেম্বর মধ্য-রাত থেকেই যুদ্ধ-বিরতির সঙ্কল্প ঘোষণা করে। যুদ্ধবিরতি কখনও একপক্ষের ইচ্ছা অনুসারে হয় না। আর তা ছাড়া ভারত যদি আক্রমণকারী হয়, তা হলে চীন কী করে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে? ২২শে নভেম্বরের প্রস্তাবে চীন মোটামুটি ২৪শে অক্টোবরের প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করে। আলাপ আলোচনা আরম্ভ করবার জন্য ভারত চীনকে ৮ই সেপ্টেম্বরের সীমারেখার উত্তর দিকে চলে যেতে বলে। চীন ১লা ডিসেম্বর হতে ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রাধীন সীমারেখা' থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তরে চলে যাবে। চীনারা নেফাতে চীন-ভারত সীমান্তের উত্তরে নাকি আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করছে বলায়, 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রাধীন সীমারেখার' প্রকৃত অর্থ জানতে চাওয়া হয়।

চীনা সরকারের জবাবে জানা গিয়েছে যে ১৯৬০ সালের দুই দেশের অফিসারদের বৈঠকে চীনারা যে সীমারেখা দাবি করে এবং বর্তমানে ব্যাপক আক্রমণের দ্বারা চীনারা যে 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রাধীনে সীমারেখা' সৃষ্টি করেছে, ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বরের সীমারেখার সংগে তার হুবহু মিল রয়েছে। চীনারা পিছনে সরে যাবে, কিন্তু অধিকৃত এলাকায় বে-সামরিক শাসনব্যবস্থা বজায় রেখে চেকপোস্ট বসাবে এবং দূতাবাসের মারফৎ চীন ভারতকে চেকপোস্টগুলি সম্পর্কে খবর দেবে। অর্থাৎ চীন অধিকৃত এলাকা পরিত্যাগ তো দূরের কথা সামরিক বাহিনী সরিয়ে নিয়েছে কি না, সে-সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ারও কোন সুযোগ থাকবে না। ভারত চীনের এ-প্রস্তাবে রাজী হলে ভারতীয় বাহিনীকেও বর্তমান স্থান থেকে কুড়ি কিলোমিটার পিছনে সরে আসতে হবে এবং তারপরেই আলাপ আলোচনা হতে পারে। নেফার বেলায় চীনারা অবশ্য আসল "বে-আইনী" ম্যাকমেহন লাইনের উত্তরে আরও কুড়ি কিলোমিটার পিছিয়ে যেতে পারে। ভারত যেটাকে ম্যাকমেহন লাইন বলে জানে, চীন সেটা স্বীকার করে না। চীনারা ঠিক কোন জায়গাটি ম্যাকমেহন লাইন হিসাবে মনে করে, তা একমাত্র চীনাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। আবার "প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখার" উত্তরে চীনাদের অধিকৃত কুড়ি কিলোমিটার এবং সীমারেখার দক্ষিণে ভারতের কুড়ি কিলোমিটার এলাকায় কোন সেনাবাহিনী রাখা যাবে না। চীন তার নিজের এলাকায় সৈন্য রাখবে কি না, সেটা অবশ্য চীনাদের উপর বিশ্বাস করতে হবে। ভারত যদি নেফাতে বর্তমান প্রকৃত নিয়ন্ত্রাধীন সীমারেখার কাছাকাছি যায়, লাদাকের বর্তমান এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে অস্বীকার করে এবং ৮ই সেপ্টেম্বরের আগের ভারতীয় এলাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তা হলে প্রস্তাব কার্যকর করবার জন্য চীন সক্রিয় হবে। চীনের প্রস্তাব কার্যকর হলে ভারতকে শুধু সরেই আসতে হবে না, নেফার বিরাট এলাকা ছাড়া লাদাকের ৪৩টি ভারতীয় ঘাটিও চীনাদের উপঢৌকন দিতে হবে।

দ্য গল : 'ভারতের সাহায্যে ফ্রান্স সর্বশক্তি নিয়ে প্রস্তুত।'

ন্যাসের : 'চীন আক্রমণকারী।'

চীনের এই অপমানজনক প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে চীনাদের শান্তিকামী হিসাবে প্রচার করবার লোকের অভাব নেই। প্রতিবেশী পাকিস্তানই চীনের সবচেয়ে বড় বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। ভারত যাতে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র না পায়, তার জন্য পাকিস্তান চীনের ভারত আক্রমণকে সামান্য সীমান্ত সমস্যা বলে প্রচার করছে। ভারতের সংগে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকা পাকিস্তানী প্রচারে সাহায্য করছে। এই প্রচারের ফলে পাকিস্তানের বিরোধী দলই সরকারপক্ষকে নাজেহাল করেছে। পাকিস্তানকে ভারতের পক্ষে আনবার জন্য অনেকে আয়ুবের কাছে অনুরোধ করেছেন, অনেকে চাপ দিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি এবং কাশ্মীর উপঢৌকন না দিলে পাকিস্তানকে চুপ করানোও সম্ভব হবে না।

সারা দেশের লোক আগের মতই দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে আসছে। চীনাদের সংগে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ফেটে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তিনদিনব্যাপী আলোচনায় জনগণের বক্তব্যই মোটামুটি প্রতিফলিত হয়েছে। ভারত সরকার ২২শে নভেম্বর থেকে সারা ভারতে চীনাপন্থী দেশদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ করেছেন। ২৬-১১-৬২

ধন্যবাদ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ধন্যবাদ তোমাকে,   সঙ্ঘমূর্তি শঠতা!
আমায় তুমি চমকালে।
ভুলতে বসেছিলাম হয়ত, যে
শিব শক্তি অভেদ,
অবিরোধী মানে নির্বীর্য নয়।
শুধুই মেঘ হ'তে চেয়েছিলাম হয়ত,
—করুণা কোমল ধারা আর লঘু রঙীন শোভা।
আমার বুকে বজ্রবহ্নি তুমি জ্বালালে।

তোমার কাছেই ঋণী হ'লাম,
বিষকীটচক্র কপটতার!
তোমার বৃশ্চিকপুচ্ছই
আমার শান্ত শোণিত স্রোতে
এনেছে তপ্ত দুর্বার বন্যা-বেগ,
আমার অসন্দিগ্ধ শৈথিল্য দিয়েছে ঘুচিয়ে।

পরমপ্রীতিতে প্রসারিত
আমার দক্ষিণ করের বরমুদ্রাই তুমি দেখেছ।
আজ দেখো আমার উদ্যত লৌহমুষ্ঠি,
হিমালয়ের ওপারেও যা পৌঁছোবে।

ভাঙা ভেবে যা-তে ঘা দিতে চেয়েছিলে
তা-ই আজ অখণ্ড অয়স্কঠিন
মৃত্যুপণ এক শপথ,
কুমারিকা থেকে কৈলাস অবধি।

আমার চূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিটি কণা থেকে
উৎক্ষিপ্ত হবে
তোমার যূথবাহন দম্ভের বিস্ফোরক কালস্ফুলিঙ্গ।

আমিও হিমালয় পার হয়ে গেছি কতবার,
গেছি, অমিতাভের অমৃতবাণী নিয়ে,
আর তুমি এলে লোলুপ শ্বাপদসঞ্চারে।
তবু, আমার ঋণ তোমায় স্বীকার করাব,
গিরিরাজের পবিত্র তুষার আবার নিষ্কলুষ করে'
তোমার চোখের মদমত্ত রক্তিমা-ই
যেদিন দেব কাটিয়ে।

পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি

পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইনরিশ্ লুবকে সস্ত্রীক সম্মানীয় অতিথি-রূপে গত ২৬শে নভেম্বর ভারতবর্ষে এসেছেন। ৩০ নভেম্বর একদিনের জন্য তিনি কলকাতায় আসছেন। ভারতের এই সংকটকালে ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু পশ্চিম জার্মানী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে—সে দেশের রাষ্ট্রপতির এই শুভাগমন আমাদের কাছে তাই তাৎপর্যপূর্ণ। অতিথিকে যোগ্য সমাদর জানাতে ভারত কোনোদিনই কার্পণ্য করেনি। আজ আমাদের চরম বিপর্যয়ের দিনেও আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরের প্রীতিপূর্ণ সম্বর্ধনা জানাচ্ছি।

ফেডারেল রাষ্ট্রপতি ডক্টর হাইনরিশ লুবকে

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১৮৯৪ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ওয়েস্ট-ফালিয়ার অন্তর্গত এংকহাউজেনে ডক্টর হাইনরিশ্ লুবকের জন্ম হয়। ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি বন, বের্লিন এবং মুনস্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জরিপ বিদ্যা, পরিকল্পনা-প্রণয়ন-বিদ্যা, কৃষি-বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র, প্রশাসন-বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও গৃহনির্মাণ-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। হাইনরিশ্ লুবকে ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র; জরিপ-বিদ্যার শেষ এবং পরিকল্পনা-প্রণয়ন বিদ্যার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে। ১৯১৪ সালের ১লা আগস্ট তিনি এই বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ কাল পর্যন্ত তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর "লৌহক্রস" প্রদান করা হয়। তিনি একজন কৃতী লেফটেন্যাণ্ট হিসাবে তাঁর এই সৈনিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২৩ সাল থেকে ডক্টর লুবকে জার্মানীর কৃষি সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টায় ১৯২৬ সালে জার্মানীর সম্মিলিত কৃষক সমিতি এবং "রাউয়ারলাণ্ড" নামে বৃহৎ কৃষক বসতি গড়ে ওঠে।

রাজনীতিতে যোগদান

১৯৩১ সালে হাইনরিশ্ লুবকে প্রুশীয় প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৩৩ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরকারী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে তাঁকে পর পর দুবার গ্রেপ্তার করেন। সব সমেত তাঁকে ২০ মাস ধরে কারাগারে অবস্থান করতে হয়। কারাবাসের পর হাইনরিশ্ লুবকে পৌরবসতি এলাকা স্থাপন এবং শিল্প কারখানা নির্মাণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁকে এইসব কাজে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়।

গৌরবময় কর্মজীবন

১৯৪৫ সালে ডক্টর লুবকে জার্মানীর অন্যতম রাজনৈতিক পার্টি ক্রিশ্চান ডেমক্র্যাটিক ইউনিয়নে যোগদান করেন এবং এই বছরের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত ওয়েস্ট-ফালিয়ার প্রাদেশিক বিধান সভা এবং ১৯৪৬ সালের ২রা অক্টোবর নর্থরাইন-ওয়েস্টফালিয়ার প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারী থেকে ১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডক্টর হাইনরিশ্ লুবকে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য নর্থরাইন ওয়েস্ট-ফালিয়ার কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নর্থরাইন ওয়েস্টফালিয়ার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর তিনি বনের জার্মান রাইফ-আইজেন সংঘের অ্যাটর্নি-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালের ২৮শে জুলাই বনের রাইনীয় ফ্রীডরিশ-বিলহেলম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টি তাঁকে অনারারী ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৪৯ সালের ১৪ই আগস্ট ডক্টর হাইনরিশ্ লুবকে প্রথম জার্মান বুন্দেস্টাগের সদস্য এবং ১০ই অক্টোবর খাদ্য, কৃষি এবং বন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

ফ্রাউ বিলহেল্মিনে লুবকে

১৯৫৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর [illegible]-ডিনাস্-লাকেন নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে তিনি দ্বিতীয়বার জার্মান বুন্দেস্টাগের সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই বছরের ২০শে অক্টোবর জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের চ্যান্সেলার ডক্টর কনরাড আডেনাউয়ার তাঁকে খাদ্য, কৃষি এবং বন দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত

১৯৫৯ সালের ১লা জুলাই ক্রিশ্চান ডেমক্র্যাটিক ইউনিয়ন এবং ক্রিশ্চান সোশ্যাল ইউনিয়নের প্রস্তাব অনুসারে বের্লিনের ফেডারেল সম্মেলনে ডক্টর হাইনরিশ্ লুবকে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক থিয়োডোর

১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি, সাহিত্যিক এবং দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে "জার্মান গ্রন্থ-ব্যবসায়ী সভার শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। মানুষের অধিকারের জন্য শ্রান্তিহীন সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসাবে জার্মান গ্রন্থ-প্রকাশকগণ এই শান্তি-পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। শান্তি-পুরস্কার - প্রদান - উৎসব উপলক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টের সেণ্টপল গির্জায় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে ফেডারেল রাষ্ট্রপতি ডক্টর লুবকে (বাঁদিকে) এবং ফেডারেল রাষ্ট্রপতির পত্নী ফ্রাউ লুবকের মাঝখানে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে

হয়েসের জায়গায় জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ডক্টর হাইনরিশ্ লুবকে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি সফর করেছেন :

ফ্রান্স	১৯৬১ সালের ২০শে জুন থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত।
সুইজারল্যাণ্ড	১৯৬১ সালের ৫ই জুলাই থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত।
লাইবেরিয়া	১৯৬২ সালের ১১ই জানুয়ারী থেকে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত।
গিনি	১৯৬২ সালের ১৫ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত।
সেনেগল	১৯৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত।

অসমাপ্ত চটকল

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

লটারিতে টাকা পেয়ে কতলোক বড়লোক হয়ে গেছে মুখে-মুখেই শুনে এসেছি, কিন্তু আমাদেরই পরিবারে একেবারে আমার জলজ্যান্ত জাঠতুতো দাদা সেই যে একদিন লটারি-পাওয়া ভাগ্যবান পুরুষরূপে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াবেন এ কে ভেবেছিল? সেই জাঠতুতো দাদা যেদিন তার আপিস যাবার ঠিক আগে একখানা চিঠি পেয়ে খামখানাকে খুলে কি রকম বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিয়ে দেরি করে আপিসে গেল, তার অনেকক্ষণ বাদে আমরা বুঝলুম দাদা লটারিতে টাকা পেয়েছে।

দেড় হাজার টাকা। দাদার পক্ষে বড় কম নয়। এক সঙ্গে দেড় হাজার টাকা দাদা চোখেও দেখেনি। জেঠিমা এবং ঠাকুমা দুজনে মিলে অনেক হিসেব করেও ঠিক মালুম করতে পারলেন না টাকার অঙ্কটা কত বড়। বাড়ির কর্তাদের মধ্যে গবেষণা সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। পরিবারের মধ্যে টাকাটা যখন এসেই গেছে তখন ওটা নিয়ে কি করা যায়? অনেকেরই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বহুত রকম সদিচ্ছা ছিল যা মেটাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তাঁদের কথা শুনে মনে হল এ টাকাটা আসবে তাঁরা আগে থেকেই জানতেন এবং সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা তাঁরা করেই রেখেছিলেন।

দাদা কিন্তু আপিস থেকে ফিরে এসেই জানিয়ে দিলে লটারির দেড় হাজার টাকাটা হাতে পেলে সে কি করবে তার পুরো বন্দোবস্ত সে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। তার আপিসেরই এক বন্ধু একখানা পুরোনো লরি দাঁওয়ে কিনবে বলে কিছুদিন ধরে মতলব ভাঁজছিল। ছ-হাজার টাকা দাম। সাড়ে চার হাজারের মত যোগাড় হয়েছে। দাদার দেড় হাজার পেলেই ছ-হাজার হয়। এর উপর আর কি কথা? দাদা কথা দিয়ে এসেছে দু-জনে মিলে লরিটা কিনবে এবং ভাগে মাল-বওয়ার ব্যবসা শুরু করে দেবে। লভ্যাংশ দাদার অংশ অনুসারে চার ভাগের এক ভাগ। কর্তারা মুখে দাদার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু দাদার লটারির টাকার কোনো ভাগই যে তাঁরা পেলেন না তাতে বিষম চটলেন মনে মনে।

এই হচ্ছে আমাদের লরি কেনার ইতিহাস। এই ঘটনার সঙ্গে আমার সমস্ত জীবনের গতি যে কী অদৃশ্য বন্ধনে বাধা ছিল তা কি আর সেদিন জানতুম? ভবিতব্যের এক অমোঘ নির্দেশে সেইদিনই আমার পরিণত জীবনের মোটামুটি চিত্রটি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। সেইদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে আমি হব চটকলের বাবু এবং মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার, অত্যাচার, প্রবঞ্চনার চাক্ষুষ জ্ঞানে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন ঐশ্বর্যশালী হবে অন্যদিকে তেমনি মনুষ্যকুল চালিত করবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মন হয়ে উঠবে সন্দিহান।

আমাদের উঠোনে বেশ খানিকটা জায়গা ছিল বলে লরিটা আমাদের উঠোনেই থাকত। কিন্তু কারবার চলতে থাকলো দাদার বন্ধুর বাড়ি থেকে। দাদার বন্ধুর বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরের তক্তাপোশটাকে সরিয়ে একখানা চেয়ার, একটা টেবিল, দু-খানা টুল, লাল পালিশ করা ছোট্ট একটা আলমারি, কিছু কাগজপত্র কালি দোয়াত আর রবার স্ট্যাম্প এই সাজিয়ে দিতেই সেটা দাদাদের কারবারি আপিস-ঘর হয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরের যে দেয়ালটা রাস্তার উপর সেখানে হলদে রং-এর একটুকরো টিন মেরে তাতে লিখে দেওয়া হল—অমুক ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানী! শুরু হয়ে গেল ব্যবসা। আমাদের পাড়ার লোকেরা সবাই জেনে গেল আমাদের পাড়ার একটা লরি এসেছে। আর দাদার বন্ধুর পাড়ায় যত দোকান আছে সবাইকে জানানো হয়ে গেল, যদি কারো লরির প্রয়োজন ঘটে তাহলে অমুক ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানীর আপিসে খবর দিলেই মুহূর্তে লরি এসে পড়বে।

আমি 'আই-এ'টা কোনরকমে পাশ করে আরও লেখাপড়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে ছিলুম। আমাকে আরো পড়াবার সামর্থ্য বাড়ির কারুর নেই—তা ছাড়া লেখাপড়ায় কোনোদিনই এমন কিছু কৃতিত্ব দেখাইনি যাতে করে আমার লেখা-

পড়ার পিছনে আরো খরচ করাটাকে অনর্থক বিলাস ছাড়া আর কিছু বলে কেউ ভাবতে পারেন। বরং সকলেই চাইছিলেন, মুখ ফুটে যদিও কেউ প্রকাশ করেননি, যে এইবার একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে আমি যেন নিজেকে বাড়ির উপযুক্ত পুত্র বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যাই।

কিন্তু চাকরি কেমন করে পেতে হয়, কেমন করেই বা তার চেষ্টা করতে হয় এ-সব আমার কিছুই জানা ছিল না। হাতে প্রচুর সময় থাকায় দাদাদের লরিতে কোনো মাল বইবার কাজ এলে আমি উঠে বসতুম। বেশীর ভাগ সময়েই অবশ্য লরিটা পড়ে থাকতো আমাদের উঠোনে। ডাক আসতো কালে ভদ্রে। তখন তাড়াহুড়ো করে ঠিকে ড্রাইভার খোঁজা হত। মাইনে করা ড্রাইভার তো ছিল না। আমি লরিতে উঠে ড্রাইভারের পাশটিতে বসে পড়তুম।

ঠিক এমনি করেই একদিন দাদার লরিখানা বারাসত থেকে কাঁচা গাঁটের পাটে বোঝাই হয়ে যখন জগদ্দল অঞ্চলের এক চটকলে ঢুকলো, সেইদিনই আমার কপাল খুললো। অযাচিত অভাবিতভাবে ঘুচলো আমার গলগ্রহ দশা। এখন ভেবে দেখলে মনে হয়, দাদার যে দেড় হাজার টাকা সেটাও যেমন লটারির ফল, আমি যে কেউ কিছুই নই, হঠাৎ একটা চাকরি পেয়ে গেলুম সেটাও ঐ একই লটারির ফল।

আমরা যে চটকলের দরজার সামনে এসে হাজির হলুম তার দরজা তখন বন্ধ। দরজার সামনে রাস্তার বাঁ পাশে ঠিক আমাদেরই মত আরো অনেক লরি পাট বোঝাই হয়ে সারি-সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চটকলে সব সময়েই এমনি। একটা দুটো কি তিনটে দরোয়ান সারাক্ষণ খাড়া থাকে ফটকটা একটুখানি ফাঁক করে রেখে। হুকুম বিনা কোনো গাড়ি ঢোকবার বা বেরবার উপায় নেই। অন্তত দশ হাত উঁচু প্রাচীর। পাঁচিলের উপর কাঁটা-তার এ-পার থেকে ও-পার অবধি লম্বা করে টানা। জেলখানার মতো। ওপারে কি আছে দেখবার যো নেই। শুধু দেখা যায় প্রকান্ড মোটা একখানা ইটের তৈরি চিমনি উঠেছে আকাশকে প্রায় ছুঁয়ে। তার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে পাঁশুটে রং-এর ধোঁয়া। আর সেই পাঁচিলের ধারে খোলা নর্দমার পাশে চট বিছিয়ে বসে আছে ফেরিওয়ালারা। মোটা কোরা কাপড়ের গাঁট, জামা, ফতুয়া, লুংগী গেঞ্জি এই সবই বেশী। বাসন, তেলের কুপী, ছুরি, কাঁচি, দড়ি আর নানা-রকম নিত্যব্যবহার্য জিনিসও এখানে ওখানে ধুলোর মধ্যে সাজানো।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক। আমাদের লরিটা আসতেই সে হঠাৎ এগিয়ে এসে আমাদের লরির নম্বরটা পড়ে নিল। তার হাতে ছিল একটা ছোট্ট ময়লা খাতা— মনে হল যেন তারই সঙ্গে নম্বরটা মিলিয়ে

দেখছে। তারপর সে আমাদের ড্রাইভারকে হাত নেড়ে ইশারা করলো এগিয়ে যেতে এবং ফটকের দরোয়ানও ঐ লোকটার কি একটা ইঙ্গিত দেখে ফটক খুলে ধরল।

কে যেন কাকে বলে উঠল—মিল্‌কো লরি! কানে পেঁাছল কথা, কিন্তু ভেবে উঠতে পারলম না দাদাদের লরিটা মিল্‌কা লরি হয়ে গেল কি করে! অত তখন ভাবিওনি। পাঁচিল-ঘেরা অত বড় একটা কারখানা নিজের চোখে দেখা সেই আমার প্রথম। তারই দরজা খুলে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করছি এই অভিজ্ঞতাটাই আমার কাছে এত নতুন যে, মনে হচ্ছিল যেন কোনো রহস্য-পুরীর মধ্যে প্রবেশ করছি। সেখানে কোন কলে কি চলে, কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, কোন ভাষায় কোন ইঙ্গিতে কথা চলে এ সব আমার বোধশক্তিতে আমার ধারণায় ছোঁয়াই যায় না।

সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছিল আরো অনেক পরে, যখন আমি চটকলের চাকরিতে বহাল হয়ে গেছি। সে কথা পরে বলছি।

আমাদের লরি খোলা ফটকের মধ্যে দিয়ে ঢুকতেই দরোয়ান হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলে কোন দিকে যেতে হবে। মাটিত পাতা তৈলাক্ত রেলের লাইন, মাথার উপর কপিকল, বাতাসে উড়ছে ধুলোমাখা পাটের ফেঁসো। সোজা কিছুদূরে যেতেই আবার এক দরোয়ান হাত দেখিয়ে বলে দিল জুট হ্যান্ডলিং ডিপার্ট-মে চলা যাও। যেন আমাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে একটা করগেটের দরজার সামনে এসে আমরা থামলুম। কত উঁচু দরজা-খানা! মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকছে। এরই আড়ালে গুদম ঘর—পাট গুদম! আমাদের লরিখানা দাঁড়াতেই জুট-হ্যান্ডলিং ডিপার্ট-এর দু-তিনজন কুলি টপাস করে আমাদের লরির পাটের বোঝাই-এর উপর লাফিয়ে উঠে পাট পরীক্ষা করতে লেগে গেল। চুলের মুঠি ধরার মতো করে টেনে টেনে পাটের গোছা বার করতে লাগল নিজের ইচ্ছামত পাটের গাঁট থেকে। এর অনেক পরে জেনেছিলুম চটকলের এই সব ওস্তাদ পরীক্ষক লরি থেকে বেছে সব সময় ভালো পাটের গোছাগুলি বার করে দেখায় সায়েবদের পরীক্ষার জন্যে। খারাপ বা জলে ভেজা পাট বার করে না। কাঁচা মাল যারা সরবরাহ করে তাদের সঙ্গে আগে থেকেই এই সব কুলিদের বন্দোবস্ত করা থাকে। এর জন্যে তারা বেশ মোটা টাকা পায়। অনেক ক্ষেত্রে মিলের যে সায়েবের উপর কাঁচা পাট কেনার ভার তাঁর সঙ্গেও গোপনে বরাদ্দ করা থাকে সরবরাহকারীর, কাজেই তিনিও মাল কেনবার সময় বিশেষ খুঁটিয়ে দেখে নেন না। কুলিদের হাত থেকে পাটের গোছা নিয়ে একবার নাকের কাছে এনে শোঁকেন, খানিক টেপেন, একবার দৈর্ঘ্যটা আন্দাজ করেন তারপর আবার কুলির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছে ফেলেন। পরীক্ষা যখন চলেছে, হঠাৎ কোথা থেকে এলেন এক ভদ্রলোক। পরনে ফিন-ফিনে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, মুখে পান, তৈলাক্ত কোঁকড়া চুল, কিন্তু দাড়ি গোঁফ বোধ হয় দু-তিন দিন কামানো হয়নি। এসে তিনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বসলেন। তাইতে আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি লরি থেকে নেমে প্রথমেই তাঁর ভুল শুধরে দিলুম। বললুম—আমাকে কেন আপনি-আপনি করছেন? বয়েস তো একটা—

ভদ্রলোক বললেন—লরিটা কার?

—দাদার লরি। আসছিল তাই চড়ে পড়লুম। ঘুরে যাবো একটু।

লরিটা যে আসলে শেয়ারের, দাদার যে আরও একজন অংশীদার আছেন সেটা মুখে এলেও বলতে কি রকম বাধল। তা ছাড়া বলতে গেলেও অনেক কথা বোঝাতে হয়—সেও এক অসুবিধা।

—আহা, তবে-তো একই কথা হল। শোনো, তোমার দাদাকে একটা কথা বোলো। বলতে পারবে?

—আজ্ঞে কেন পারব না?

বেশ বোলো যে এই লরি কাল থেকে আমার কাজে রোজ খাটবে। অন্তত পাঁচ মাস। তোমার দাদা যেন আর কারো কাছে কখনো দেন। যদি দিয়েও থাকেন নাকচ করে দিতে বোলো। আর বোলো এর দরুন আজ যা ভাড়া ঠিক হয়েছে তার থেকেও আরও দুটাকা বেশী ভাড়া আমি দেব।

—বলব।

—বাড়ি ফিরেই বলা চাই। দেরি করলে চলবে না। কাল সকালে আমার লোক গিয়ে টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে আসবে।

নিজেকে আমার মস্ত লোক বলে বোধ হতে থাকল। এত বড় দায়িত্ব এর আগে কেউ কোনোদিন আমায় দেয়নি। সেই দায়িত্ব-বোধের জন্যেই বোধহয় বললুম—দাদার সঙ্গে কিন্তু সন্ধ্যের আগে আমার দেখাই হচ্ছে না। আপিসে যায় কিনা!

—তাতেই হবে। তাতেই হবে।

সন্ধ্যায় দাদা ফিরলে দাদাকে সব বললুম। বললে—বাঃ এ তো চমৎকার অফার পাওয়া গেছে। ভাড়াও বেশী তার উপর পাঁচমাসের কড়ার। আজ এখানে কাল ওখানে করতে হবে না। যা তুই শিশ্পীর আমার পার্টনারকে খবর দিয়ে আয়। বন্দো-বস্তের জন্যে ওরই বাড়িতে আসবে।

এই মস্ত খবর দিয়ে এবং খবরের দরুন পেট ভরে সন্দেশ খেয়ে বাড়ি ফিরে সেদিন ভারি তৃপ্ত পেয়েছিলুম। কিন্তু ঐ যে বলছিলুম দাদার লটারিতে আমারও কপাল খুলে গিয়েছিল সেটা তার পরের দিন।

পরের দিন আবার লরিতে পাট বোঝাই করে চটকলে ঢুকলুম। সেদিনও দেখলুম বিস্তর পাটের লরি মিলের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে। সবাই ভিতরে ঢোকার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের লরি কিন্তু বিনা বাধায়, এক হাতের ইশারার পর আর-এক হাতের নির্দেশ অনুসারে সোজা গিয়ে হাজির হল ঈপ্সিত স্থানে।

গুদমের দরজা সেদিন খোলা। পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত পাটের গাঁট এক স্তরের পিছনে আর এক স্তর। উচ্চ থেকে উচ্চতর। বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ চাষীর জীবন ধারনের সম্বল। চটকলের মূল রসদ। ইংরেজরা সোহাগ করে যার নাম দিয়েছে 'দি গোল্ডেন ফাইবার'। এই নিয়ে যারা কারবারে নেমেছে সোনায় ভরে গেছে তাদের ঘর। আধ খোলা ঘরের মধ্যে থেকে জমা-পাটের স্যাঁতসেতে আর কড়া গন্ধের সঙ্গে একটা গরম হাওয়া বেরিয়ে আসছে। মনে হয় যেন পাটের কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কারা—তাদেরই গরম নিঃশ্বাসের হলকা বাইরের বাতাসে এসে মিশেছে।

আমাদের পাট পরীক্ষা হয়ে গেলে আগের দিনেরই মত লরি থেকে যখন পাট নামানো হচ্ছে এবং আমাদেরে মতো আরো দু-তিনখানা লরি এসে গুদমের সামনে দাঁড়িয়েছে আর চলেছে তাদের পাট পরীক্ষা, ঠিক তখনই আগের দিনের সেই আদ্দির পাঞ্জাবি পরা বাবুটি এসে হাজির হলেন। আজকে তাঁর সঙ্গে এক সায়েব। সায়েব দেখলুম সেই বাবুটির সঙ্গে পাট পরীক্ষা করতে লাগলেন। বাবুটি আমাকে দেখে চিনেছিলেন। সায়েব এক সময় যখন গুদমে ঢুকছেন সেই সময় বাবুটি এসে আমায় বললেন—আজও বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করা হয়? ইস্কুল কলেজ নেই?

—আজ্ঞে না। আই এ-টা পাশ করেছি। আর পড়বার ইচ্ছে নেই।

—কেন হে কি হল?

—লেখাপড়া করে আর কি হবে বলুন? সেই তো ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি। তার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা ভালো।

তখন আমার বয়েস এবং অভিজ্ঞতা এতই কাঁচা যে চাকরি সম্বন্ধেও তাই। অতি সহজে চাকরি বা ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের মত গম্ভীর গম্ভীর কথা বলতে পারতুম।

বাবুটি বোধহয় একটু মনে মনে হাসলেন। বললেন—এটি অতি খাঁটি কথা। তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আপাতত যখন তুমি কিছুই করছ না, একটা চাকরিই কর না কেন? করবে? ঐ ত্রিশ টাকাই মাইনে।

প্রথমটা ভারি অপমানিত বোধ করলুম। কিন্তু সে এক মুহূর্তে। কথার মধ্যে যে শ্লেষটা ছিল সেটা হঠাৎ যেন উবে গেল। উবে গিয়ে যেটা বাকি রইল সেটা ঐ তিরিশ টাকা। মাসে মাসে তিরিশটা করে টাকা হাতে আসার কল্পনার মধ্যে যে সুখ সেটা সত্যিই আমার চিত্তের উপর বর্ষণ করে দিয়ে গেল। ঐ এক মুহূর্তেই যে বদলটা এল আমার মধ্যে তাতে করে মনে হল আমি আর ছেলেমানুষ নই, বড়দের মতো করে বাস্তবকে দেখার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেছি। ভাবলুম—এ কি সত্যি? তুচ্ছ নগণ্য আমি। অজানা অচেনা। এখানকার এই কালিবেল বাবুটি, যাঁর সঙ্গে সায়েব ঘুরে বেড়ায়, তিনি আমায় চাকরি দিতে চাইছেন?

আমি একটু আমতা আমতা করে বললুম—চাকরি করতে বলছেন? কোথায়?

—যদি রাজী থাকো তো বলো। এই-খানেই এই চটকলে। ঐ যে সায়েব বেরিয়ে আসছেন। নাম কি তোমার?

—শ্রীসুকুমার পালিত।

—সুকুমার? বেশ, বলি তাহলে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম—আচ্ছা।

ঘটনার পর ঘটনা এমন দ্রুত ছন্দে একটার পর একটা হুড়মুড় করে আমার জীবনে কখনও আসেনি। কি যে বলছি, কি যে করছি, সেদিন আমার সব কিছুই উপলব্ধির বাইরে।

বাবুটি দেখলুম সায়েবের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কি সব কথা কইলেন। সায়েব একবার ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। তারপর যতদূর মনে পড়ে যাবার সময় বোধহয় বলে গেলেন—টেক হিম।

বাবুটি মিষ্টি হেসে এগিয়ে এসে বললেন—হয়ে গেল। কালকে এসে জয়েন কোরো। রেশনিং বিভাগে চলে আসবে। আমার নাম কোরো। আমার নাম বিভূতিবাবু। সবাই চেনে। আটটার সময় এসো। আটটায় হাজিরা দিতে হয়।

—আজ্ঞে কালই? সামনের মাসের পয়লা থেকে...

এই তো বললে বসে আছো। দেরি করে লাভ কি? যত দেরি করবে ততই লোকসান। বেশী দেরি করলে চাকরি ফসকেও যেতে পারে।

—আচ্ছা' বলে সেদিনের মতো চলে গেলুম।

ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি পাওয়ার এই আমার ইতিহাস। দাদার লটারির প্রত্যক্ষ ফল।

বিভূতিবাবু ছিলেন রেশনিং বিভাগের বাটোয়ারিবাবু। যুদ্ধের সময় তখন কলে কলে রেশনিং চলেছে। প্রধানত চালেরই রেশন। তার সঙ্গে বাঁধা দরে কখনও কখনও সর্ষের তেল, চিনি, ময়দাও দেওয়া হত।

আমাকে সেই বিভাগেরই এক সামান্য কেরানীর পদে বহাল করা হল। বলা হল আমাকে হিসেব রাখতে হবে।

আমার একটু ভয় হল। হিসেব রাখার আমি কি জানি? কেউ যদি শিখিয়ে না দেয়, কোথায় কি ভুলচুক করে ফেলব তারই বা ঠিক কি? কিন্তু বিভূতিবাবুই আমায় বাঁচালেন। একটু আগেই তিনি আমায় বলে গিয়েছিলেন যে, আমায় হিসেব রাখতে হবে, আবার একটু পরেই এসে বললেন—ও হে সুকুমার, ভাল করে শিখে পড়ে না নিলে তো আর তুমি খাতা লিখতে পারবে না—কে-ই বা এখন শেখায় তোমায়? তুমি এক কাজ কর, এই খাতাটা নাও। দেখ দেখি নম্বরগুলো পড়তে পারো কি না।

বলে আমার হাতে একখানি ছোট্ট ময়লা নোট বুক দিলেন। তাতে দেখলুম পেন্সিলে লেখা একসারি অক্ষর আর সংখ্যা গোটা গোটা করে লেখা। বেশ কয়েক পৃষ্ঠা। একটু লক্ষ করে বুঝলুম সেগুলি লরির নম্বর।

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এগুলি গাড়ির নম্বর বুঝি?

বিভূতিবাবু বললেন—ঠিক বলেছ। চল কি করতে হবে বলে দিই।

সেই থেকে আমার কাজ হল কারখানার বাইরে একটি ল্যাম্পপোস্টের পাশে খাতাটি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকা এবং লক্ষ্য করা পাটে-বোঝাই হয়ে যে লরিগুলি আসছে যদি কোনো নম্বর মিলে যায় তাহলে দূর থেকে দরোয়ানকে ইশারা করা—দরজা খুলে দাও। যে লরির নম্বর মিলবে না তার জন্যে কোনো ইশারা নেই। তাকে অপেক্ষা করতে হবে সার-বন্দীর মধ্যে গেটের বাইরে। ভিতরে যাবার জন্যে অনুমতি চেয়ে পাঠাতে হবে এবং অনুমতি পত্র এসে পৌঁছান পর্যন্ত, সে যতই দেরি হোক, অপেক্ষা করতে হবে বাইরে দাঁড়িয়ে, ঝড়, বৃষ্টি, রোদ সব কিছু মাথায় করে।

আমাদের লরিটা আগের দিন ঢোকবার সময় যে লোকটি খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক তাঁর জায়গায় আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। ঠিক তাঁরই মতো খাতা দেখে নম্বর মিলিয়ে চললুম। সেই পূর্বোক্ত ভদ্রলোক যে কোথায় গেলেন আজও জানি না।

কারখানার বড় ফটকের ঠিক সামনে পর পর তিনখানা খাবার দোকান। মাঝেরটা বেশ বড়, পাশের দুটো কিছু ছোট। খোলা নর্দমার উপরেই ঝুলে আছে দোকানের খাবারের আলমারি। তার কাঁচের ডালার পিছনে বড় বড় জিলিপি, হিংএর কচুরি, মোটা মোটা ঝুরি ভাজা, ফুলুরি, বেগুনি ইত্যাদি। বিরাট কড়ায় সব সময় কিছু না কিছু ভাজা হচ্ছে। খাবার বাসি হতে পায় না। গ্যালভানাইজ টিনের গোল্ড বয়লারে জল ফুটে চলেছে সর্বক্ষণ। যখন দরকার তার থেকে ফুটন্ত জল কানিতে মোড়া গুঁড়ো চায়ের উপর ঢেলে চায়ের নির্যাস বার করে নেওয়া হচ্ছে—এর আর বিরাম নেই। কারখানা চলুক আর বন্ধ থাকুক খদ্দেরের অভাব নেই এই তিনটে দোকানে। দোকানের ভিতরে বসবার তক্তা আছে। বাইরে খোলা নর্দমার ধারে আছে সরু সরু কাঠের টুল। খদ্দেররা নর্দমার ধারের এই টুলগুলিকেই পছন্দ করে বেশী। নর্দমার গন্ধ চা বা জিলিপি পুরি খাবার সময়ও কারো নাকে যায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এই দেখি। এখানকার কারখানার লাগাও রাস্তার ধারের জীবনটা নতুন রকম লাগে। ছোট দোকানের একটাতে সন্দেশ, মনোহরা, পান্তোয়া বিক্রি হয় আর অন্যটায় কেক বিস্কুট নান-খাতাই। সন্দেশ আর পান্তোয়া আনিয়ে খেয়ে দেখেছি, ছানার চেয়ে ময়দার স্বাদই বেশী। সন্দেশের উপর পেস্তার কুঁচির মতো একরকম জিনিস দেওয়া থাকে। চেখে দেখেছি আসলে সেগুলি সবুজ রং করা নারকেলের কুঁচি। তাহলেও আমার মন্দ লাগে না। এ সব যেন এই বিরাট কারখানার পাঁচিলের ছায়ায় বেশ মানিয়ে যায়। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে এখানকার রাস্তার ধারের খোলার চালের দোকানগুলি, যেখানে হারিকেন লণ্ঠন থেকে চুলের ফিতে পর্যন্ত সব কিছু বিক্রি হয়, একটুও অসঙ্গত ঠেকে না। উত্তুঙ্গ পাঁচিল তুলে জায়গাটাকে মৃতবৎ করে তোলবার যে চেষ্টা এক সময় করা হয়েছিল, এই সব নোংরা দোকানের ভিড়, রাস্তার ধারে এবং রাস্তার ধুলোর উপর সস্তা পণ্যের হাট তা একেবারেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। জায়গাটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত!

'মিলু কা লরি' যে কাকে বলে বুঝে উঠতে দেরি হল না। মিলু কা লরি মানে আমার হাতের ময়লা তেলচিটে ছোট্ট খাতার তালিকাভুক্ত লরি—যাদের নম্বরগুলি মিলে যাচ্ছে। দাদার লরির নম্বরও খাতায় লেখা ছিল। কিন্তু সেটা মিলু কা লরি কি করে হয় এ রহস্যের সমাধান হল যখন বুঝলুম বিভূতিবাবুর ভাড়া-করা লরির অন্য নাম হচ্ছে মিলুকা লরি। তাদের গতি কেউ রোধ করতে পারে না। তাদের ছাড়পত্র আমার হাতের ঐ ময়লা খাতার পাতায়। তাদের চালই আলাদা।

বিভূতিবাবু রেশনিং বিভাগে কাজ করেন কিন্তু তাঁর আসল কাজ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ সব কথা আমার কানে আসতে লাগল এবং খুব দ্রুতই আসতে লাগল। অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, কোনো অজানিত কারণে আমার উপর বিভূতিবাবুর সুনজর পড়েছে। তাই অনেকেই অযাচিতভাবে আমাকে বিভূতিবাবু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলতে লাগলেন।

রেশনিং বিভাগের সামান্য পদের কেরানী বিভূতিবাবু। যুদ্ধের সময় খাবার জিনিসের, বিশেষত চালের ঘাটতি পড়ায় সর্বত্র যখন রেশনিং চালু হল তার বেশ

কিছুদিন আগে থেকেই চটকলের কর্তারা কলের মজুরদের কম দরে কিছু কিছু খাবার সরবরাহ করতে শুরু করেছিলেন। কলের মালিকই এর দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, নইলে পরে হয়তো শুধু চালের দুর্মূল্যতার ফলেই সব মজুর কারখানা ছেড়ে ফিরে যেত গ্রামে—কারখানাই বন্ধ হয়ে যেত। বিভূতিবাবু সেই গোড়া থেকেই আছেন। যে সময় গভর্নমেণ্ট চালের কন্ট্রোল সম্পূর্ণ নিজ হাতে নেননি সে সময় নানান গোপন আড়ত ঘুরে বিভূতিবাবু চাল যোগাড় করে কারখানার গুদমে এনে ভরেছেন। কোথায় কবে কত দামে যে চাল পাওয়া যাবে তার তোয়াক্কা সেই যুদ্ধের বাজারে তখন কে করে? কাজেই বিভূতিবাবুর হাতে তখন থেকেই কিছু কাঁচা পয়সা আসতে আরম্ভ করেছে। এবং অভিজ্ঞতা শুরু হয়েছে কেমন করে বেশ-মোলায়েমভাবে কিছু অর্থাগম করা যায় অযথা কারুর চোখ না টাটিয়ে।

হারিচ সায়েব যে কিছু বুঝতেন না তা নয়। রেশনিং বিভাগকে চালু রাখার দায়িত্ব ছিল তাঁর। বিভূতিবাবু বা অন্যান্য সরকারবাবুরা যদি বাইশ টাকা দরে চাল কিনে বিল সহ প্রমাণ দেন চব্বিশ টাকা দরে কিনেছেন, হারিচ-এর তাতে রাগ হবার কথা নয়। যুদ্ধের বাজারে এ তো হবেই। এ সবকে বাধা দিতে যাওয়া বা বন্ধ করার চেষ্টা করা মানেই যুদ্ধের গতিকে রোধ করা।

কারখানায় কারখানায় রেশনিং চালু রাখতে পেরেছিলেন বলে মিল-কর্তারা পরে কত বাহাদুরি নিয়েছেন। গভর্নমেণ্ট যখন রেশনিং বিভাগ গঠন নিয়ে, চালের 'প্রোকিওরমেণ্ট' নিয়ে, পল্লীতে পল্লীতে রেশনের দোকান খোলার সমস্যা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন ততদিনে কলকাতা শিল্পাঞ্চলে 'ফুড-স্টাফ-স্কীম' রীতিমত চালু হয়ে গেছে। সারা যুদ্ধের মধ্যে দশ লক্ষ মজুরকে খাবার যুগিয়ে গেছে এই কারখানার মালিকরা। বরঞ্চ যারা তা পারেনি, যারা বেশী দাম চেয়েছে, যারা উপযুক্ত চাল দিতে পারেনি, চাল নিয়ে চোরাই কারবার করতে গিয়ে ঠেকায় পড়ে গেছে, তাদেরই বরং কারখানায় হরতাল হয়েছে, লক্-আউট হয়েছে কারখানা বেচাল হয়ে গেছে।

সরকারী রেশনিং যখন পুরো চালু হল বিভূতিবাবু যখন তাঁর ছোট্ট বিভাগের ছোট-কর্তা, তখন কালো বাজার থেকে চাল এনে মিলকে ঠকিয়ে পয়সা করার পথ বন্ধ হল। তা হোক, কিন্তু রেশনের মাল এদিক ওদিক সরিয়ে রাখা, ওজনে প্রত্যেককেই কিছু কম দিয়ে উদ্বৃত্তটাকে কালোবাজারে বেচে দেওয়া—এগুলিতে কোনো বাধা ছিল না। হারিচ সায়েবের দুজন বাবুর্চি, ছজন মালী, চারজন বেহারা, দুজন দরোয়ান এরা সব সময় রেশনের সব চেয়ে ভালো চাল, বেশ খানিকটা বাড়তি তেল আর চিনি নিয়মিত পায়। হারিচ সায়েব জানেন। জেনে খুশী। কালে অকালে

তিনি নিজেও যে বিভূতিবাবুর কাছ থেকে কলাটা মুলোটা পান না তা তো নয়। রুই-কাতলাও মাঝে মাঝে মেলে। তাই বিভূতি-বাবুর আগেকার রোজগার মন্দা পড়লেও তাঁর প্রতিপত্তি অল্প-বিস্তর ছড়াতে থাকে। সামান্য মাইনের কেরানী হলেও কারখানার অনেকেই জানে সায়েব তাকে বেশ পছন্দ করেন।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন হারিচ সায়েব বিভূতিবাবুকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন—বিভূতি, তোমায় একটা বিশেষ কাজের ভার দিচ্ছি। বারাসতে যেতে পারবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সাহেব। অনায়াসে।

—তোমার দৈনিক কাজের কোনো ক্ষতি হবে না? রেশন বেটে দেওয়া, হিসেবপত্র এ সব?

—ভাববেন না সায়েব। গোছানো ডিপার্ট-মেণ্ট। সব কিছু ম্যানেজ হয়ে যাবে। কোনো অনুযোগ শুনতে পাবেন না।

অপিসের অন্য সব চুনোপুঁটি বড়বাবু-ছোটবাবুদের সংগে এইখানে ছিল বিভূতি-বাবুর তফাত। যাঁরা বড়বাবু তাঁরা তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ অনুচরদের নিয়ে ছোটোখাটো একটি সামন্তরাজ্য গড়ে তারই ভোগসুখে মেতে থাকতে ভালবাসতেন। তাঁরা চান তাঁদের অস্তিত্ব এবং প্রতাপ প্রতিমুহূর্তে তাদের নিম্নতন কর্মীরা সশঙ্কিতচিত্তে অনুভব করুক এবং বুঝুক যে এক মুহূর্তে তাঁরা সরে দাঁড়ালে তাঁদের সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু বিভূতিবাবুর আপিস চালানোর প্রথা ছিল অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তিনি জমিদারি তাঁবেদারী প্রথায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আপিস চালানোর এমন আশ্চর্য গুণ ছিল যে প্রয়োজন হলে যে-কোনো সময় তিনি সরে দাঁড়াতে পারতেন। তাতে তাঁর আপিসের কাজের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটত না। এই দুর্লভ গুণের কদর হারিচ সায়েব করতেন।

সায়েব শুনে খুশী হলেন। বিভূতিবাবু সায়েবের একখানা চিঠি নিয়ে বারাসতের পাটের বাজারে স্থানীয় এক দালালের সংগে দেখা করলেন। দালাল তাঁকে প্রচুর কাঁচা গাঁট দেখালো। বিভূতিবাবুর উপর ভার ছিল পাটগুলি দেখে সায়েবকে এসে বলা। কেমন ভাবে কি কি দেখতে হবে তা সায়েব কিছুই বলে দেন নি। তা ছাড়া পাট কি করে চিনতে হয় বিভূতিবাবু রেশনিং বিভাগের কেরানী তার কী বা জানেন?

তিনি প্রশ্ন করলেন—কত গাঁট পাট মজুত আছে এখানে?

—দেড় হাজার।

—দেড় হাজার? বেশ তাহলে তিন মণ কি চার মণ করে যদি গাঁট হয় তবে দাঁড়াচ্ছে হাজার পাঁচেক মণ—এই তো?

বিভূতিবাবু যে পাটের গাঁটের একজন দক্ষ বিচারক এই ধাপ্পাটা তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে যত পারেন বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ভয় ছিল দালাল না ভেবে বসে এ আবার কোন্ বুদ্ধুকে সায়েব পাঠিয়েছে।

তারপর বিভূতিবাবুর হঠাৎ মনে হল পাটগুলো কেমন ভিজে ভিজে ঠেকছে না? ভিজে পাট নিয়ে কারখানায় অনেক গোল-মাল হয় তিনি জানতেন। ওজনে বেশী হয়ে যায়। সুতোর জোর কমে যায় বলে চট বোনবার সময় থেকে-থেকে সুতো ছিঁড়ে যায়। তাঁতীরা তখন রাগ করে চেঁচামেচি শুরু করতে থাকে। ঘণ্টায় যত গজ কাপড় বোনবার কথা তার থেকে কম বোনা হয়—তাদের আয়ও সেই অনুপাতে কমে যায়।

বিভূতিবাবু বললেন—এ তো দেখছি ভিজে পাট। জল ঢেলেছেন। নাকি?

দালাল ততক্ষণে বিভূতিবাবুর বিদ্যের দৌড় আঁচ করে ফেলেছে। সে বললে—জল ঢালবো কেন বাবু? কাঁচা গাঁটের পাট তো ভিজে হবেই খানিকটা। কিন্তু এমনিতে শুকনো। দেখুন না হাত দিয়ে—হাতে জল লাগবে না।

বিভূতিবাবু হাত দিয়ে দেখলেন সত্যি ভিজে তো ঠেকছে না একটুও। অথচ তাঁর সন্দেহ গেল না। ভিজে ভিজে গন্ধ, ভিজে ভিজে রং—কোথায় যেন পাটের স্তরে স্তরে জল লুকিয়ে আছে।

ফিরে এসে সায়েবকে সেলাম করে বিভূতিবাবু বললেন—পাট দেখে এলুম সায়েব।

—কেমন দেখলে? কত পাট?

—হাজার পাঁচেক মণ হবে।

—পাট চেন?

—পাট চিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে সায়েব। তবে এটুকু বলতে পারি যে পাট ভিজে।

—কেমন করে বুঝলে?

হলপ্ করে বলতে পারব না সায়েব। দালাল আমায় ছুঁয়ে দেখতে বললে, ছুঁয়েও কিছু ধরতে পারিনি। তবে খানিকটা গন্ধে খানিকটা আন্দাজে মনে হল যেন পাট ভিজে।

—এই তো বেশ শিক্ষা হচ্ছে। এইরকম করলে বিভূতিদের মধ্যে তুমিও এক্সপার্ট হয়ে উঠবে। শোনো বিভূতি। আমাদের মিল-এ এখন কাঁচা গাঁটের পাটের প্রয়োজন। আমার কাছে দালালেরা যাওয়া-আসা করছে। তুমি একটু এদিকে আমায় সাহায্য কর। কাল একবার শেওড়াফুলির পাটের বাজারে যাও। আরও এদিকে-ওদিকে দালালেরা যা খবর দিয়েছে একবার নিজের চোখে দেখে এসো।

বিভূতিবাবুর ট্রেনিং শুরু হল। পাট চেনার ট্রেনিং নয়, কত পাটে কত জল, কত মেশানো কত ছাঁট এটুকু বুঝতে আর কত সময় লাগে? আসল ট্রেনিং হচ্ছে বাজার চেনা। কোন্ বাজারে কত পাট কোন্ সময় আসে। কারা চালান দেয়, কে কে বড় বড় দালাল, কার সংগে কার রেষারেষি, কার সংগে তার গলাগলি। কে কার এজেণ্ট হয়ে কাজ করে। মোটামুটি কে কত দরে কোথা থেকে কেনে এবং কতবার হাত-বদল হয়ে মাঠের পাট চাষীর হাত থেকে অবশেষে চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলীর বাজার-গুলোতে গরুরগাড়ি বোঝাই হয়ে এসে পৌঁছয়—এমনি অতি-প্রয়োজনীয় বাজারের খুঁটিনাটি খবর।

বিভূতিবাবুর এদিকে মাথা ছিল, আগ্রহ ছিল। পাটের দালাল, আড়তদার এবং জমাদার দারোয়ানদের সংগে তিনি বনিয়ে চলতে পারতেন। এই গুণে তিনি নিজেকে অতি দ্রুত সুশিক্ষিত করে তুললেন।

তারপর আর একদিন আর এক বিশেষ কাজে হারিচ সায়েব বিভূতিবাবুকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

—শোনো বিভূতি।

—ইয়েস্ সার্।

—কাঁচা গাঁটের পাট যা বেশীর ভাগ খাল দিয়ে আসত তা আর আসবে না। খালের জল শুকিয়ে গেছে। সামনের পাঁচ-ছ-মাস লাখ লাখ মণ পাট এসে জমবে ঐ শেওড়া-

বাজার থেকে লরি করে আনতে হবে মাল।

—ইয়েস্ সার।

—ইয়েস্ সার মানে? লরির ব্যবস্থা আমার এখনি করতে হবে—বাজারের আড়তদার তো এখানে মাল পেঁৗছে দেবে না।

ইয়েস্ সার।

—থামো বিভূতি। গর্দভের মতো ইয়েস্ সার ইয়েস্ সার কোরোনা। আমাকে এখন লরির কনট্রাক্ট ঠিক করতে হবে। এক-শ থেকে সওয়া-শ লরি রোজ খাটবে—বড় সহজ কথা নয়। তোমার কথা ভাবছিলুম এই জন্যে যে তুমি তো বাজার-টাজার বেশ চিনেছ—তুমি কিছু লরির কনট্রাক্ট নিলে তোমার কিছু রোজগার হতে পারে।

বিভূতিবাবু গলে পড়লেন।

সায়েব বলে চললেন—আমি অবশ্য বাজারে যারা লরি সরবরাহ করে তাদেরও জানাবো। তারা কাজ নিতে চাইলে তাদের কাছ থেকে টেন্ডার চাইবো। সুতরাং তুমি কি দরে লরি খাটতে দেবে সেটাও যাচাই হয়ে যাবে।

বিভূতিবাবুর নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে। বিশেষ করে সায়েবের কাছ থেকে বার বার এমন পৃষ্ঠপোষণ পাবার পর থেকে।

বিভূতিবাবু সায়েবকে ভরসা দিয়ে গেলেন—চারদিনের মধ্যে তিনি জানাতে পারবেন কত দরে তাঁর পক্ষে কত লরি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বিভূতিবাবু চার দিন আপিস থেকে ছুটি নিলেন। এই চারদিনে সায়েব লরির কনট্রাক্টরদের কাছ থেকে টেন্ডার পেয়ে গেলেন। পাঁচদিনের দিন বিভূতিবাবু এসে সায়েবের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

কি কথাবার্তা হল সবটা জানা যায় নি। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই জানা গেল যে লরি সরবরাহের বেশ মোটা একটা অংশ বিভূতিবাবুর ভাগে পড়েছে। আরো শোনা গেল বিভূতিবাবুর 'রেট'ই যে সব চেয়ে কম ছিল তা নয়, কিন্তু অন্যান্য সরবরাহকারীদের রেট কম হলেও তারা যে সময়-মতো এবং মিল-এর সুবিধামত লরি নিয়ে সব সময় আসতে পারবে তার স্থিরতা নেই। কাজেই বিভূতিবাবুর টেন্ডার গৃহীত হল। বিভূতিবাবুর রেট হল লরি-পিছু প্রতি ট্রিপ্-এ সাড়ে সাতাশ টাকা। অন্যান্য সরবরাহকারীদের কারো পঁচিশ, কারো সাড়ে পঁচিশ। লরি ভাড়ার খরচ পড়তো বিভূতিবাবুর প্রতি ট্রিপ্-এ চোদ্দ থেকে পনের টাকা। মাল বোঝাই মাল খালাসের খরচ মিল দিত। তবে বিভূতিবাবুর আরো কিছু নিজস্ব খরচ ছিল—যেমন দৌড়োদৌড়ি করবার জন্যে দু-একজন বিশ্বস্ত লোক

রাখতে হয়েছিল। বাকিটা সমস্তই লাভ।

দাদার লরির সঙ্গে বিভূতিবাবুর সংযোগ এই সূত্রেই। দাদাদের নতুন ব্যবসায়ে ঢুকেই এইরকম একজন বাঁধা খদ্দের পেয়ে যাওয়ায় পরম লাভ হয়েছিল। সুবিধে ছিল দিনের মধ্যে তিন-চারবার লরি খাটত এবং ভাড়া টাকা বিভূতিবাবু কোনোদিন ফেলে রাখতেন না।

বিভূতিবাবুর লরি কেন যে মিল্কা ল... নামে পরিচিত সে রহস্যও এইসব শু... পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। বিভূ...

বাবু যখন মিল্-এরই রেশনিং বিভাগের চাকুরে এবং হারিচ সায়েবের প্রিয়পাত্র তখন তাঁর লরি মিল্-কা লরি না তো কি? তা ছাড়া ও লরিকে মিলের ফটকে আটকালে অথবা পাট-গুদমে মাল খালাস করতে দেরি করলে ফিরে গিয়ে আবার নতুন মাল ভরে আসবে কি করে? এই কারণেই তো অন্য লরি যেখানে সারাদিন একবারের বেশী ট্রিপ্ দিতে পারে না, অন্য লরি যেখানে মিল-এর মধ্যে ঢুকেও মাল খালাস করতে পারে না, হয়তো আটকাই পড়ে যায় সারা রাতের জন্যে, মিল্‌কা লরি সেখানে তিনবার-চারবার ঘুরে আসতে পারে। আশীখানা লরির সংগে বন্দোবস্ত করা কি চাট্টিখানি কথা? পঁচিশখানা লরি দিয়ে তাই বিভূতিবাবুকে আশিটার কাজ চালাতে হয়।

হারিচ সায়েবের মুখটা বেশ খুশী খুশী লাগে। বিভূতিবাবু ঘন ঘন তাঁর আপিসঘরে এমন কি তাঁর কুঠিতেও আজকাল যাতায়াত করেন। হারিচের মেম-সায়েবও বিভূতিবাবুকে চিনে গেছেন—বিবুটি বিবুটি বলে ডাকেন। যারা কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, দেখো এইবার বিভূতির পদোন্নতি হবে, গায়ে কোটপ্যাণ্ট উঠবে, বিভূতিকে আর চেনা যাবে না, তাদের অবশ্য হতাশ হতে হয়।

মাসের পর মাস যায়, বিভূতিবাবু রেশনিং বিভাগের সত্তর টাকা মাইনের যে বাবু সেই বাবুই থাকেন। আদ্দির পাঞ্জাবি পরা তাঁর চিরকেলে অভ্যেস—সেই পাঞ্জাবি আর ধুতিই থাকে টিকে। কোনো বদল হয় না। কোনো নতুনত্ব দেখা যায় না তাঁর পোশাকে, আশাকে, আচরণে, ব্যবহারে। নিয়মিত ঘড়ি ধরে তিনি হাজিরা দেন। সবার সংগে হাসিমুখে বিনীতভাবে কথা কন—আপিসের সহকর্মী, দরোয়ান, চটকলের মজুর, সবাই তাঁর কাছে সমান। যেমন বরাবর ছিল।

কারখানার সকলেই কিন্তু জানে জলের স্রোতের মত যে লরিগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কারখানার মধ্যে পাট বোঝাই হয়ে ঢুকছে তার মধ্যে আশিখানা বিভূতিবাবুর। জলের স্রোতের মত যেমন লরিও ঢুকছে মিলে জলের স্রোতের মত তেমনি টাকাও ঢুকছে বিভূতিবাবুর কোন এক অদৃশ্য পকেটে।

যে লোকটি কারখানার বাইরে ল্যাম্প-পোস্টের ধারে দাঁড়িয়ে বিভূতিবাবুর লরিগুলি সনাক্ত করত সে একবার অন্য এক লরিওয়ালার কাছে কিছু টাকা পাবার লোভে তাদের একটা লরিকে মিলের ফটকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বেচারা জানত না মিলের ভিতরে বিভূতিবাবু পাট গুদামের কাছেও আর একটা 'চেকিং' রেখেছিলেন। জানবার কথাও নয়, কারণ মিলের মধ্যে সে কোনোদিন ঢুকতেও পায়নি। বিভূতিবাবু লরি সহজেই ধরে ফেললেন যে বাইরের একখানা লরি দু-বার মাল নিয়ে মিল-এ ঢুকেছে। অমার্জনীয় অপরাধ। চারিদিকের আট-ঘাট এমনিভাবেই বাঁধা ছিল যাতে করে বাইরের কোনো লরি একবারের বেশী মাল নিয়ে দুবার ঢোকার কোনো সুযোগই পাবে না।

সেই হতভাগ্য লোকটিকে বিভূতিবাবু এমন নিঃশব্দে জগদ্দলের সেই ল্যাম্প পোস্টের তলা থেকে সরিয়ে দিলেন এবং আমাকে সেখানে বহাল করলেন যে কারুর চোখেই পড়ল না। কারুর মনেই হল না যে একটা নতুন কিছু ঘটেছে। সে লোকটিকে কেউ কোনদিন আর জগদ্দলে দেখেনি। আমাকেও এমনভাবে সেই ল্যাম্প পোস্টের গায়ে লেপটে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল যে মনে হতে থাকল সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমি ঐখানে ঠিক অমনিভাবে একটা ময়লা নোট বই হাতে দাঁড়িয়ে আছি।

বিভূতিবাবুর সব কাজই এমনি। কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না, বাইরে থেকে কিছু বোঝবার যো নেই। তাই বিভূতিবাবুর ভাণ্ডারে যখন রাশি রাশি টাকা এসে জমা হতে লাগল—অন্য যে-কোনো লোক হলে তার পোশাকে আশাকে তো বটেই, কথা-বার্তা হাবভাব চালচলনে পর্যন্ত নতুন টাকা আমদানির সুর ধরা পড়ত। বিভূতিবাবুর কিন্তু কিছুই হল না।

সমস্ত লাভটা বিভূতিবাবুর পকেটে আসছিল বলে কেউ বিশ্বাস করেনি। আরো অনেক অদৃশ্য হাত ছিল এবং যিনি এই সমস্ত উদ্যোগের প্রধান কর্তা হারিচ সায়েব —তিনিই বা এই অদৃশ্য মিছিলের অগ্রণী হয়ে থাকবেন না কেন? তা হলেও বিভূতিবাবুর লাভের কড়ির হিসেব খুব কম করে ধরেও লোকে বলত লরি-কণ্ট্রাক্টের পাঁচ মাসে অন্তত বিশ চল্লিশ হাজার টাকায় দাঁড়াবার কথা। বিভূতিবাবু যে-রকম ঘরের মানুষ তাতে করে এই টাকার অংকটায় তাঁর টলে যাবার কথা। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত, উচ্ছ্বসিত বা বেসামাল হননি।

হারিচ সায়েব বুঝলেন, তাঁর অনুচরদের মধ্যে এক নিরেট প্রস্তর তিনি পেয়েছেন—সলিড রক!

বিভূতিবাবু আমার কাজে খুশী হয়েছিলেন। লরি সনাক্ত করার কাজে ছেলেমানুষ আমাকে নিযুক্ত করার আসল কারণই ছিল, তিনি জানতেন আমার বয়েসের গুণে তাঁকে আমি ঠকাতে পারব না। লোক-ঠকাবার মত বয়েসই আমার তখনও হয়নি। খুব বেশী দিন আমাকে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে দাঁড়াতে হয়নি। আস্তে আস্তে কারখানার দরোয়ান বিভূতিবাবুর পঁচিশ তিরিশখানা লরি আর তার ড্রাইভারদের চিনে ফেললে। আমি তখন গিয়ে রেশনিং বিভাগে বসলুম এবং খাতা লেখার কাজ শেখায় মন দিলুম। মাঝে মাঝে হঠাৎ যদি দু-একখানা লরি কোনো কারণে ছাটাই হয়ে গিয়ে নতুন লরি আমদানি হত তখন একবার বাইরে গিয়ে আমায় লরি চিনিয়ে দিয়ে আসতে হত।

চটকলে এসেছিলুম নতুন, ক্রমে পুরোনো হলুম। শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম গিয়ে নতুন বর্ষা নামল। খালে জল এসে পড়ায় ডাঙ্গার পথে

কারখানায় পাট আনা বন্ধ হয়ে গেল। বিভূতিবাবু এসে বসতে লাগলেন রেশনিং আপিসে। তাঁর ঘোরাঘুরি বন্ধ হল। পান খাওয়া একটু কমল। তারপর পুজোর সময় বিভূতিবাবুর গায়ে নতুন চুনোট-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনে কাঁচি ধুতি দেখা গেল প্রতি বছরেই যেমন দেখা যায়। শেষে বছর ঘুরতে খরার সময়ে যখন খালের জল শুকোতে আরম্ভ হল, বড় বড় নৌকোর তলা আটকে যেতে লাগল পাঁকে তখন আবার বিভূতি-বাবুর ডাক পড়ল হার্লিচ সায়েবের ঘরে। আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন—লরির কণ্ট্রাক্ট।

বাংলা দেশে যে আড়াই কোটি মণ পাট জন্মায় তার প্রায় সবটাই নদী নালা খাল বিলের পথে কলকাতায় এসে পৌঁছয়। পাট গাছ কেটে ডোবার জলে পচিয়ে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে যখন চাষীরা কাঁচা কাঁচা পাট বেঁধে ফেলে ঠিক তখনই বাংলার জলপথ জলে ভরপুর। নৌকো বোঝাই হয়ে গাধা-বোটে বোঝাই হয়ে জলে জলে সেই পাট চটকলের চট-প্রেস'-এর ঘাটে ঘাটে পৌঁছয়। এই হচ্ছে চটশিল্পের সব চেয়ে বড় বাহাদুরি। ভারি ভারি মাল বহনের কাজ এইতে সস্তায় সারা হয়। এ না হলে, যদি রেলের পথে, ডাঙার পথে এই আড়াই কোটি মণ পাট চটকলে আনতে হত তাহলে আজ পৃথিবীর বাজারে এত সস্তা দরে চটের থলি চটের কাপড় বিকোতো না—চটের বাজারও এত বিস্তৃত, এত লাভবান এত লোভনীয় হতে পারত না। কিন্তু এই আড়াই কোটি মণ পাটের বিরাট বোঝা বইতে বইতেও অনেক পাট থেকে যায় যা নৌকোয় ওঠে না। বর্ষার জলের ঢল যেমন আসে তেমনি চলেও যায়। ক্ষেতের ফসল সব জায়গায় ঠিক সময় কাটাও হয়ত হয় না। তা ছাড়া ভরা-নদী থেকে দূরেও কিছু গ্রাম থাকে সেখানকার চাষীরা যেবার পাট চাষ করে, তাদের পাট নৌকোয় করে চালান দেওয়া যায় না। এমনি করে একটা ছিটে-ফোঁটা অংশ থেকে যায় প্রতি বছরই—যাকে হয়তো খানিকটা জলপথে আর বাকিটা স্থল পথে আনতে হয় কলকাতার বাজারে। আড়াই কোটি মণের এই ছিটে-ফোঁটা কিন্তু বড় কম নয়। এই ছিটে-ফোঁটার একটুখানি ফোঁটা প্রতি বছর এসে জমে খরার সময়ে বারাসত, শেওড়াফুলি, হুগলী আর অন্যান্য পাটের বাজারে। তারই কিছু অংশ লরির মারফত বয়ে আনার তোড়জোড় আমাদের মিলকে করতে হয় খরার সময়। এই হল বিভূতিবাবুর মরসুম।

বলা বাহুল্য বিভূতিবাবুর প্রচুর অভিজ্ঞতা জন্মেছে ইতিমধ্যেই। আবার নতুন করে লরির কণ্ট্রাক্ট পেতে তাঁর কোনই কষ্ট হল না। আমারই চোখের সামনে কয়েক বছরের মধ্যে বিভূতিবাবু বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হয়ে পড়লেন। (ক্রমশ)

আমার স্বর

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্বরতা, তুমি সভ্যতার মুখোশ পরে থাকলেও
তোমাকে চিনতে আমি ভুল করিনি।
বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত জীবাণু তোমার সর্বাঙ্গে,
জিহ্বায় বীভৎস লালসার লেলিহান শিখা;
তবু সে অশুভ আগুনকে, তোমার উদ্যত রক্তচক্ষুকে
আমি এতটুকু ভয় করি না।
কিংবা তুমি যতোই প্রলোভনের ফাঁদ পাতোনা কেন,
আমি আর তাতে পা দেবো না।

অশেষ দুঃখবরণে, প্রভূত রক্তের মূল্যে
যে পবিত্র প্রজ্ঞার অনল আমি আহরণ করেছি,
বহুযুগের তপস্যায় অর্জন করেছি যে অমর্ত্য আলো,
তাকে তুমি নিভিয়ে দিতে
অথবা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।
হৃদয়ের ঐশ্বর্যে গড়েছি মানব-সভ্যতার যে স্বর্ণমিনার,
তাকে ধূলিসাৎ করা তোমার সাধ্যাতীত।

তোমার নগ্ন হিংসার নখরে
আমাকে বিদ্ধ করার সামর্থ্য নেই তোমার।
শ্রেষ্ঠ মানবতার ধর্মে আমি দীক্ষিত,
ন্যায় ও সত্যের বর্মে আমি সুসজ্জিত,
আত্মশক্তির আয়ুধে, প্রেমের মন্ত্রবলে আমি বলীয়ান;
আমাকে আর তুমি প্রতিহত করতে পারবে না—

চীনের প্রতি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বহুদিন আমরা পাশাপাশি হেঁটেছি,
বহুদিন,
কখনো তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখিনি
দেখিনি, অবিশ্বাসী রেখাগুলো কখন জমা হয়েছে কপালে, ভুরুতে,
পেশীগুলো ফুলে উঠেছে ঘাতকের গোপন সঙ্কেতে,
দেখিনি, দেখিনি।

তাকালে হয়তো দেখতে পেতাম
হৃৎপিন্ড আমূলে ভেদ করতে পারে এমন একটা ছোরা
কেমন অনায়াসে তুমি সঙ্গে নিয়ে ফিরেছ এতদিন,
চক্ষে, জিহ্বায়, চোয়ালে শ্বাপদের লোলুপ বন্যতা,
মুখশ্রী আসলে এক ক্রূর, ধূর্ত, প্রবঞ্চক মুখোশ
তাকালে হয়তো দেখতে পেতাম।
রক্তপাতলোভী হিংস্র বর্বর বিশ্বাসঘাতক
কখনো তোমার মুখের দিকে তাকাইনি।

অনেকদিন আমরা পাশাপাশি হেঁটেছি
অনেকদিন,
আজ আর জায়গা চিনে নিতে ভুল হবে না,
এতদিনের সব বিশ্বাসের বন্ধুতার ভালবাসার
এমনকি সাধারণ মানবতার মর্যাদাকেও কলঙ্কিত করেছ যে-তুমি,
রক্তপাতলোভী নেকড়ের মতো হিংস্র বর্বর বিশ্বাসঘাতক চীন,
আজ থেকে আমরা দাঁড়াবো

মুখোমুখি॥

বিশ্বচিত্রা

"রয়টারের" কাহিন।

ভারতের প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র পাঠকই বিশ্বব্যাপ্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টারের নাম শুনেছেন। সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর আকেনের ছোট্ট একটি সরাইতে, যখন এই বিশ্ববিখ্যাত সংবাদ প্রতিষ্ঠানটির অতি নগণ্য আরম্ভের স্মারক হিসেবে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয় তখন সকলেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়।

১৮৫০ সালে এই সরাইতে, বার্লিনের একজন প্রাক্তন ব্যাংক কেরানী ও পুস্তক বিক্রেতা পল জুলিয়াস রয়টার, পায়রার সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদানের ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। এই পায়রার ডাক কালক্রমে বিশ্বব্যাপী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফরাসী ও জার্মান টেলিগ্রাফ লাইন যথাক্রমে ব্রাসেলস্ ও আকেনে এসে শেষ হত। সেই যুগে দ্রুত সংবাদ সরবরাহের আর কোন ব্যবস্থা না থাকায় ইয়োরোপের তখনকার দুটি প্রধান শহর প্যারিস ও বার্লিনের মধ্যে শেয়ারের বাজার দর তাড়াতাড়ি জানবার কোন উপায় ছিল না। কাজেই ব্রাসেলস্ ও আকেনের মধ্যে যে একশত মাইল ব্যবধান থাকতো তা যুক্ত করার জন্য রয়টার পায়রার ডাকের প্রচলন করেন। এতে তাড়াতাড়ি নিশ্চিতভাবে সংবাদ পাওয়া সহজ হয়। তারপর যখন এই ব্যবধানটুকুও টেলিগ্রাফ লাইন বসিয়ে যুক্ত করা হল তখন পায়রার ডাকও তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেললো। রয়টার তখন স্থির করলেন যে লন্ডনের আর্থিক জগতেই তাঁর এই সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং ১৮৫১ সালে তিনি বৃটেনের রাজধানী লন্ডনে গেলেন এবং ঘটনাক্রমে সেই বছরেই ইংলিশ চ্যানেলে সমুদ্রের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন বসানো হয়।

রয়টার লন্ডনে যে প্রথম টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন করেন তাতে ছোট দুটি কোঠা ছিল এবং অফিসের প্রতিষ্ঠাতা কোন টেলিফোন না নিয়ে কেবলমাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক একজন অফিস-বয় নিয়ে কাজ করতেন। আজ সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে শ্বেত-বর্ণের এক বিরাট বাড়িতে রয়টারস্ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর অবস্থিত। বিশ্বের সমস্ত সংবাদ আজ এখানে আসে এবং এখান থেকে আবার অতি আধুনিক ও অতি দ্রুত প্রেরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র সেই সংবাদগুলি পরিবেশিত হয়।

আকেনের সরাই থেকে যখন পায়রাগুলি উড়ে গিয়ে প্যারিসের সর্বশেষ বাজার দর নিয়ে আসতো তার একশ বারো বছর পরে, জুলিয়াস রয়টারের অতি ক্ষুদ্র টেলিগ্রাফ অফিসটি এখন বিশ্বের শত শত নগর ও
অফিসটি এখন বিশ্বের শত শত নগর ও
শহরে অবস্থিত তাদের অফিস বা সংবাদ-দাতাগণের কাছ থেকে সর্বশেষ সংবাদ বিবরণী পায়। ১৮৫০ সালে জুলিয়াস রয়টার যখন তাঁর সংবাদ সরবরাহের অফিস খোলেন তখন তাঁর কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে রাজি করাতে সাত বছর সময় লেগেছিল। বর্তমানে রয়টার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দুশ সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য দেশে আরও হাজার হাজার সংবাদ-পত্রকে সংবাদ সরবরাহ করে। সমস্ত দেশের বেতার কেন্দ্রই তাদের সংবাদের বুলেটিন তৈরী করার জন্য রয়টারের সাহায্য নেয়।

জুলিয়াস রয়টার নিজে এবং আর একটি মাত্র বালকের সাহায্য নিয়ে প্রথমে যে অফিস খোলেন, সেই অফিসেই এখনও, লন্ডন ও বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র-গুলি সহ দুই হাজারের বেশী কর্মী প্রতি-দিন চব্বিশ ঘণ্টা এবং প্রতি বছর তিনশ

দেখতে পুরু গদির ওপর মোটরগাড়ি মনে হলেও আসলে জলে এবং স্থলে সমান চলতে পারে—হোভারক্র্যাফট পদ্ধতিতে তৈরি একটি ল্যান্ডরোভার। সামরিক প্রয়োজনে বৃটেনে নতুন ধরনের যে সব যানবাহন তৈরি হচ্ছে এটি তারই একটি

পঁয়ষট্টি দিনই সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা, পরিবেশন ও বণ্টন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। লন্ডনের ৮৫নং ফ্লীট স্ট্রীটে একশত জনেরও বেশী সহকারি সম্পাদক প্রতিটি সংবাদ বিবরণী পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে নির্বাচন করেন এবং বিভিন্ন কর্মীর মাধ্যমে সেগুলি ইয়োরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে পরিবেশন করা হয়। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি অবশ্য টেলিপ্রিণ্টারের মাধ্যমে সোজাসুজি তাদের সম্পাদকীয় দপ্তরেই সংবাদ বিবরণীগুলি পেয়ে যান। ইয়োরোপের বেশীর ভাগ এলাকাতেই টেলিপ্রিণ্টারের যোগাযোগ রয়েছে, তবে অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে বেতারযোগে সংবাদ সরবরাহ করা হয়। রয়টারের লণ্ডনের সদর দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লক্ষ শব্দ পরিবেশন করা হয়।

প্রথম থেকেই জুলিয়াস রয়টার এই নীতি স্থির করে দেন যে, তাঁর এজেন্টগণ যে সব সংবাদ পাঠাবেন তা সঠিক ও সন্দেহাতীত হতে হবে। তাঁর সংবাদ সেবার এতো সুনাম ছিলো যে রানী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯-১৯১০) একবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রেরিত একটি সংবাদ সম্পর্কে ডিসরেলীর কাছে চিঠি লেখেন যে, "রয়টার এই কথা বলেছে এবং সে ভালো করে জেনেই খবর দেয়"। তিনি তাঁর রোজনামচায় প্রায়ই রয়টারের প্রেরিত টেলিগ্রাম উল্লেখ করতেন। ব্যারণ উপাধি লাভ করে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস রয়টার পরলোক গমন করেন। তারপর থেকে তাঁর উত্তরাধিকারিগণও এই সুনাম বজায় রেখে এসেছেন। সঠিকতা, অপক্ষপাতিত্ব, যাথার্থ্য এবং দ্রুতগতি এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

'মনের কথা

অসংখ্য ব্যক্তিকে নিজের সংগে নিজেকে কথা বলতে দেখা যায়। কিন্তু এই অভ্যাসটা মানসিক অশান্তির কারণ নাও হতে পারে।

এইভাবে কথা বলাটাও স্বাভাবিক। শোনবার কেউ যদি নাও থাকে তাহলেও আমরা আমাদের চিন্তাটা এইভাবে প্রকাশ করতে ভালবাসি।

অধিকাংশ ব্যক্তি, মনের কথা মুখে উচ্চারণ যদি নাও করে, তাহলেও সময় সময় কাল্পনিক কথাবার্তা চালায়, সম্ভবত কি বলবে সেটা মনে মনে ভেজে নেয়।

কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলে মনের জোর বাড়াতে কথাগুলো উচ্চারণে প্রণোদিত করাই দরকার।

নিজে নিজে কথা বলা অনেকের ক্ষেত্রে সঙ্গী পাওয়ার মতো হয়। বহু লোক, বিশেষ করে যারা একলা থাকে তাদের কাছে নিস্তব্ধতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

অনেকে রেডিও খুলে দেয়। তারা মন দিয়ে হয়তো শোনে না। কিন্তু বেতারে প্রচারিত কণ্ঠস্বর বা সঙ্গীত তাদের সংগ দান করে।

আবার এমন লোকও আছে যারা তাদের নিজেদের পছন্দ মতো বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। একমাত্র তাদের নিজের ইচ্ছাতেই তা হতে পারে।

বিপদ ঘটে যেক্ষেত্রে আত্ম-সংলাপী ব্যক্তি নিজের সংগটাই এত উত্তম মনে করে যে অপরের সংগ চায়ই না। এ থেকেই একটা অসুস্থ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

কোন নিঃসংগ প্রতিবেশীকে কথা বলতে শুনে চট করে খারাপটা ভেবে নেবেন না। তা করলে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে বাড়িতে মহলা দিতে সময়ে সময়ে আমোদিত বা বিব্রতও হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

আত্ম-সংলাপী ব্যক্তিরা, এক মনোবিজ্ঞানী যে মন্তব্য করেছেন, তাতে খুশী হতে পারেন : "এরকম যারা করে সেসব লোক অনেক কিছু ভাবে। আমি নিজেও তাই করি, কখনো কখনো, রাস্তা দিয়ে চলার সময়েও।"

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১১ ॥

"পিয়া মহারে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী"

সন্ধ্যাবেলায় পান্না যখন জীবনকে নিয়ে তেতালার ছাদে গিয়ে বসলো তখন চৈত্র মাসের আকাশে তারা উঠেছে। চাঁদ উঠবার তিথি নয়। শতরঞ্জির উপরে সাদা জাজিম বিছানো, এক পাশে ছোট দুটি তাকিয়া। দেয়ালের পাশে রক্ষিত জলভরা নূতন কুঁজো থেকে সোঁদা সুগন্ধ উঠছে; রেকাবিতে রাখা বেলফুল ছড়াচ্ছে গন্ধ; নীচে বাগানে ফুটেছে রজনীগন্ধা, মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে তার গন্ধ এসে পৌঁছচ্ছে। সারা দিন শহরময় যে তাণ্ডব চলেছিল তাতে বিরাম ঘটায় এখন সমস্ত নিস্তব্ধ।

প্রথমে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকবার পরে পান্না প্রথমে কথা বলল, জীবন একটা গান গাও।

গান! চমকে ওঠে জীবন।

চমকে উঠলে কেন লখনৌ তো গান-বাজনার জায়গা।

তা বটে, কিন্তু আমি তো লখনৌর মানুষ নই, তোমাকে তো বলেছি আমি মানুষ হয়েছি কাশীতে।

কাশীতে কি মানুষে গান করে না?

গান করে, গান শেখে না, অন্তত আমি শিখিনি। কিন্তু এত বাদবিতণ্ডায় দরকার কি, শুনতে চাও গাইছি, তবে দ্বিতীয়বার আর শুনতে চেয়ো না, এই একটি গানমাত্র জানি। প্রাণরক্ষাকর্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করবার ইচ্ছা তার হল না। সে গাইলো—

"জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী।"

গান শেষ হলে পান্না বলল, তোমার গলা আছে সাধলে বেশ দাঁড়াবে।

তাহলে সাগরেদ ধরে নাও না কেন?

পান্না হেসে বলল, আমার সাগরেদ হলে সারাজীবন তামাক সেজেই কাটাতে হবে, আমার গলা থাকতে তোমার গলা কে শুনতে চাইবে।

বেশ একবার পরীক্ষা হোক কেমন গলা তোমার।

পান্না কথা বলে না, তাই সে উপরোধের সুরে বলল, পান্না একটি গান গাও।

কি গান ফরমাশ করো। আমি নাচ-ওয়ালী, সেই গান শুনবে।

জীবন বলে ঠিক এই মুহূর্তে যে গানটি আমাকে শোনাতে ইচ্ছা করছে তাই গাও
নিজেই নিজেকে ফরমাশ করো।

বেশ তবে তাই হোক, তানপুরাটা নি
আসি।

উঠে গিয়ে তানপুরা নিয়ে এসে বসলে
তারপরে তানপুরাটা কোলের কাছে খা
করে ধরে বাজাতে বাজাতে আরম্ভ করলো-

"পিয়া মহারে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী
নৈণাঁ আগে রহজ্যো মহানে ভুল মৎ
জাজ্যো জী

সে কী কণ্ঠ! মধুরে কোমলে, মিনা
অনুনয়ে, জীবন অবাক হয়ে ভাবে সে ক
কণ্ঠ।

"ভোসাগর মে' বহী জাত হুঁ,
বেগ মহারী সুধ লীজ্যো জী।"

ছাড়া পাওয়া খাঁচার বিহঙ্গের মতো সুর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে উঠতে কোন্ শূন্যে চলে গিয়েছে, মিলিয়ে গিয়েছে আর চোখে পড়ে না। আবার পর মুহূর্তে ডানা গুটিয়ে ফিরে আসে খাঁচার কাছে—"পিয়া মহাঁরে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী।" সে কী কণ্ঠ ভাবতে ভাবতে অনুবাদ করে নেয় মনে মনে—প্রিয় আমার আঁখির আগে দাঁড়াও, আঁখির আগে দাঁড়াও, আমাকে ভুলো না। এই ভবসাগরে আমি ভেসে যাচ্ছি, একবারটি আমার খোঁজ নাও।

তানপুরার তারে তারে অঙ্গুলির লীলায় সুর জাগিয়ে পান্না গায়—"মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, মিল বিছুড়ন মৎ কীজ্যো জী।" হে মীরার প্রভু, হে গিরিধর নাগর, একবার মিলন হলে আর যেন ছেড়ে যেয়ো না।

"মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর"—ঐ ছত্রটিতে সুর যেন ফিরে ফিরে মাথাকুটে মরছে, হে মীরার প্রভু ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না।

জীবন অবাক হয়ে ভাবে এ কোন্ আত্ম-

নিবেদন গ্রস্ত ছিল ঐ লাবণ্যময়ী স্বৈরিণীর অন্তরে। এই অজ্ঞাত উৎসের স্বচ্ছ উজ্জ্বল উৎসারণে নিজেই যেন অবাক হয়ে গিয়েছে নারী।

"পিয়া মহাঁরে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী—
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর"—

ছত্র দুটি ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বারে বারে গায় পান্না। জীবন বুঝতে পারে কেউ শুনতে চায়নি এ গান, তাই আজ প্রথম আহ্বানে বেরিয়ে এসে আর থামতে চাইছে না। মীরার ভজন আগেও শুনেছে সে, কিন্তু বুভুক্ষু চিত্তের প্রথম খাদ্যমুষ্টির অমৃত ছিল না তাতে। তার মনে পড়ে, বলেছিল পান্না, তোমাকে বুঝতে পারি না. এখন বুঝলো না-বোঝার পরিমাণ অতলস্পর্শ! স্নেহময়ী পান্না, রহস্যময়ী পান্না, বারাঙ্গনা পান্না, সাধিকা পান্না। না জানি আরো কি রূপ আছে তার। সে বোঝে এক মানুষের মধ্যে হাজার মানুষের বাস।

গান শেষ হয়ে গেলেও তন্ময় ভাব কাটে না জীবনের, সে তখনও শুনছে "পিয়া মহাঁরে নৈণাঁ আগে, মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর।"

কি গো সারা রাত গান শুনেই কাটাবে, না খাওয়া-দাওয়া আছে।

পান্না, এখন বিরক্ত করো না।

পান্না হেসে বলে, গান শুনে যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয় এতদিন কানে শোনা ছিল এবারে চোখে দেখা গেল।

পান্না এমন করে নিজের গানকে নিজে লঙ্ঘন করে যেয়ো না।

ওগো নির্বোধ পুরুষ, নিজের গানকে লঙ্ঘন করে যেতে পারি বলেই আজও বেঁচে আছি।

স্পষ্ট দেখতে পায় বোঝে না কথাটা জীবন। পুরুষের ফরমাশে যে-সব গান গাইতে হয় তাদের লঙ্ঘন করতে না পারলে কবে তলিয়ে যেত এই পান্না।

তবু যে বোঝে জীবন মনে হয় না পান্নার। প্রসঙ্গ উল্টিয়ে বলে গানেই তো পেট ভরে গিয়েছে বুঝলাম, এখন শুনি শোয়াটা কোথায় হবে ?

আর যেখানেই হোক তোমার ঐ পাতাল-পুরী তহখানায় নয়।

তবে কি পান্নার কাছে নাকি ?

রুষ্ট কণ্ঠে জীবন বলে পান্না, তোমার কি লজ্জা নাই ?

তোমার আছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম, নাও এখন ওঠো।"

পান্নার বাড়িতে দিন কাটে জীবনের। সারাদিন লুকিয়ে থাকতে হয় তহখানায় তবু সেখানেও মাঝে মাঝে চাপা আওয়াজে এসে পৌঁছয় শহরের তাণ্ডব। কখনও কামানের গুম্ গুম্, কখনও বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম, কখনও জনতার হল্লা। পান্না এসে শুনিয়ে যায় টুকরো-টাকরা খবর যা লোকমুখে ভেসে আসে, তার কতক সত্য, কতক গুজব। শহরের সাহেবরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে নৈনিতালের দিকে, মেম ও শিশুরা পালকির বাহক না পাওয়ায় সাহেবদের সঙ্গে ঘোড়াতেই পালিয়েছে। পল্টনের ছাউনি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারী খাজাঞ্চিখানা থেকে লুটে নিয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। হীরানন্দ শেঠ, জহুরিমল শেঠ, লছমিনারায়ণ প্রভৃতি প্রত্যেকে আড়াই লাখ টাকা ভেট দিয়েছে বখৎ খাঁকে যিনি এখন বেরিলির নবাব। পান্না বুঝিয়ে দেয় নামে ভেট আসলে জোর করে আদায়।

আবার কোনদিন বা এসে বলে যায় দিল্লিতে বাহাদুর শাহ আবার হিন্দুস্থানের বাদশাহী নিয়েছেন। মীরাটে একটিও সাহেব জীবিত নেই। জঙ্গীলাট লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে। মতান্তরে সিপাহিদের হাতে মারা পড়েছে। কলকাতা থেকে বড়লাট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে জাহাজে চড়ে সোজা দেশে রওনা হয়েছে। লখনৌতে স্যার হেনরী লরেন্স সিপাহীদের হাতে বন্দী। ওয়াজিদ আলি শা লখনৌ বলে রওনা হয়েছেন। এমন কত কথা।

জীবনের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না; ভয়ে নয়; ভীরু লোক অনিশ্চয়ের মুখে একাকী পথে বের হয় না। নিষ্ক্রিয়তাই তার দুশ্চিন্তার হেতু। এই রাজ্যব্যাপী ওলট-পালটের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবে, বাহুবলে ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় করবে এই তার ইচ্ছা। কিন্তু পান্নার ইচ্ছা অন্যরূপ। যাওয়ার প্রস্তাব করলে পান্না নিষেধ অনুরোধ উপরোধ ব্যঙ্গ পরিহাস করে, অবশেষে কাঁদতে শুরু করে। জীবনকে নিরস্ত হতে হয়। কখনও ভাবে জোর করে চলে যাবে—পান্না তার কে। এ চার পাঁচ দিন আগেও তো সে ছিল না তার জীবনে। একদিন শুধিয়েছিল, তুমি আমাকে বাঁচাতে গেলে কেন ? পান্না বলেছিল এত বাড়ি থাকতে

তুমি আমার বাড়িটাতে ঢুকতে গেলে কেন ?

জীবন বলে সেটা আকস্মিক।

পান্না উত্তর দেয় এমন সব আকস্মিকের আলার নামই তো অদৃষ্ট।

রক্ষা করেছ বেশ করেছ এখন যেতে দাও।

সেটা তোমারও হাতে নেই আমারও হাতে নেই, নইলে আর অদৃষ্ট কেন !

জীবন শুধোয় আমার সঙ্গে তোমার ক-দিনের পরিচয়! আমার প্রতি এমন স্নেহ কেন ?

সদ্যোজাত শিশুর সঙ্গে মায়ের ক-দিনের পরিচয়, তার প্রতি মায়ের স্নেহ কেন ?

উত্তর খুঁজে পায় না জীবন।

এক একবার তার সন্দেহ হয় পান্না কি তাকে ভালোবেসে ফেলেছে! জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। সে বুঝে নিয়েছে পান্নার ব্যক্তিত্ব খরধার অসির মতো যার সোনার হাতলটি মনোরম কারুকার্যে ভরা। ঐ কারুকার্যে মুগ্ধ হতে না হতে কখন ঝলসে ওঠে ইস্পাতের ফলা। সে মনে মনে ভয় করে পান্নাকে। ভালবাসায় ভয় গিনি সোনায় খাদ — ওটুকু আছে বলেই মনে মনে গড়া যায় অলংকার।

একদিন দুপুর বেলা ঘুম থেকে জেগে দেখে যে পান্না পাশে বসে বাতাস করছে। বলল তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন ?

আগাগোড়া ঘামে ভিজে গিয়েছে, জামাটা খুলে ফেলো।

জামা খুলতেই চকচক করে উঠল সোনার পাটা। এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল জীবন, পান্নার ঠাট্টার ভয়ে।

বুকের উপরে ওটা আবার কি ? হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বলল, সাধে কি খোকাবাবু বলি। এ রক্ষাকবচ পরিয়ে দিল কে ?

রাগত স্বরে জীবন বলল, এটা রক্ষাকবচ নয়।

ওঃ বুঝেছি, কর্ণের মতো অক্ষয় কবচ। বীরপুরুষ তাতে আর সন্দেহ কি ? তাহলে দুর্যোধনের মতো দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে আছ কেন ? মার মার শব্দে বেরিয়ে পড়ো।

এ সব শ্লেষের উত্তর জোগায় না তার, হতাশভাবে বলে ওঠে—পান্না তুমি কখন যে ঠাট্টা করো, কখন যে সত্য কথা বলো বুঝতে পারি না।

ও দুই ভিন্ন নয়। কিংখাবের উপরের দিকে সেটা পদ্মফুল নীচের দিকে সেটাই নিরর্থক আঁকজোক, সেটাই তো হল ঠাট্টা।

তারপরে বলে এটা যদি রক্ষা কবচ নয়, অক্ষয় কবচ নয়, তবে কী এটা ?

সে কথা আমিও জানি নে।

তবে কি ভূত এসে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

তাও নয়। এই বলে সমস্ত বিবৃত করে জীবন। সমস্ত শুনে পান্না গম্ভীরভাবে বলে, তোমার জীবনেও অদৃষ্ট একটু মোচড় দিয়ে গিয়েছে দেখছি।

চমকে উঠে বলে, পান্না তবে কি তোমার জীবনেও অদৃষ্টের মোচড় আছে নাকি ?

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলে, নির্দিষ্ট তারিখের আগে ওটা কখনও খুলো না, নিশ্চয় বিশেষ কারণ আছে।

ঐ দিন যে আমি একুশে পদার্পণ করবো।

পান্না প্রায় বলেছিল, তবে তুমি আমার পাঁচ বছরের ছোট্ট কিন্তু শেষ মুহূর্তে আটকে গেল মুখে। তার বয়স যে পঁচিশ হয়েছে, যৌবনের পশ্চিমে হেলে পড়বার বয়স, এ কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না।

তার নীরবতার সুযোগ নিয়ে জীবন বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, পান্না, যাই।

ছেড়ে তো দিতেই হবে, আজ না হয় কাল। ধরে রাখবার উপায় থাকলে রাখতাম।

তারপরে হঠাৎ বলে ফেলে আমার ছোট বোন থাকলে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে আটকে রাখতাম।

যা নেই, মিছা সে লোভ কেন দেখাও ?

ছিল বইকি !

মারা গিয়েছে ?

না, না, মারা যায়নি। সে তুমি অনুমান করতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

রহস্যময়ী পান্না।

জীবন শুধোয়, ঐখানেই কি অদৃষ্টের মোচড় ?

পান্না ঘাড় নেড়ে নীরব অনুমোদন জানায়।

॥ ১২ ॥

পান্নার হাসিই কান্না

সন্ধ্যার সময়ে ছাদের উপরে বসে পান্না নিজের জীবন কাহিনী বিবৃত করে, জীবন এক মনে শোনে।

জীবন, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ে হয়ে জন্মানোর মতো অভিশাপ আর নেই।

এমন কথা কেন বলছ পান্না।

এ কয়দিন আমাদের সংসারে থাকবার পরেও এ কথা বলছ। যে জীবন আমি যাপন করছি, আমাদের সমাজে ঘরে ঘরে সেই

জীবন। সেইজন্যে আমাদের সমাজে সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিলে সকলে প্রার্থনা শুরু করে হে হরপার্বতী পুত্র দাও। অন্য সম্প্রদায় থেকে মেয়ে নিয়ে এসে ছেলের বিয়ে দেওয়া যায়। আর মেয়ে হলে যেমন দেখছ তাই অনিবার্য। আমার মাকে দেখেছ, ভাইকে দেখেছ কিন্তু ভাই-বউয়ের লম্বা ঘোমটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেয়েছ কি ? যেখানে একদিকে বেপর্দা সেখানে অন্যদিকে পর্দার বাড়াবাড়ি না হয়ে যায় না। যাকগে ওসব কথা। যা বলতে বসেছি। আমাদের আদি নিবাস সহদেওপুর, নৈনিতাল পাহাড়ের নীচে, বেশ গরীব অবস্থা ছিল আমার পিতার। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে আমার ভাই জ্যেষ্ঠ। সংসারে প্রথম সন্তান মেয়ে নয় পুত্র, মার আদর আর ধরে না, বাবা তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়ে দিলেন সোনা দিয়ে। তার পরে আবার সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল, জন্ম হল আমার। মার সর্বাঙ্গে যেখানে যেখানে সোনার অলঙ্কারের দাগ পড়েছিল এবার সেখানে পড়লো।

এই পর্যন্ত বলে পান্না থামে, জীবনের শুধোতে সাহস হয় না, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে—

এবার সেখানে পড়লো চিং গাছের চাবুকের দাগ।

জীবন বলে ওঠে, কি সর্বনাশ।

সর্বনাশ বইকি। হরপার্বতীর অভিশাপ বয়ে মেয়ে জন্মেছে, সর্বনাশ ছাড়া আর কি!

হরপার্বতীর অভিশাপ।

বুঝতে পারে না জীবন।

বুঝিয়ে বলে পান্না। প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে হরপার্বতী নির্জন বনের মধ্যে বিহার করছিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে কাঠ কুড়োতে গিয়ে দেখে ফেলে। মহাদেবী রেগে উঠে অভিশাপ দিলেন আজ থেকে তোর সম্প্রদায়ের মেয়েদের বারাঙ্গনা বৃত্তি উপজীবী হবে। মেয়েটি মহাদেবীর পা জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল, পায়ের উপরে মাথা কুটতে লাগলো, তাহলে যে বংশ লোপ পাবে মা। তখন মহাদেবী কতকটা শান্ত হয়ে বললেন, আমার কথা ফিরবার নয়, তবে বংশ লোপ হবে না, অন্য সম্প্রদায় থেকে মেয়ে এনে ছেলেদের বিয়ে দেওয়া চলবে কিন্তু মেয়েদের এ ছাড়া গতি নেই। মেয়েটি আবার বলল আমরা যে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হয়ে থাকব। মহাদেবী বললেন কলঙ্কিত! আজ থেকে তোরা হরপার্বতীর সেবক। তোদের যে কলঙ্ক দেবে, তাদের বংশে সন্তানসন্ততি ক্রমে দেখা দেবে কলঙ্ক চাঁদের ব্যাধি, রাজযক্ষ্মা। মেয়েটি হরপার্বতীকে প্রণাম করে নত মাথায় ফিরে এলো।

পান্না থামে। জীবন বলে, মেয়েদের জন্মদান কি মায়ের দোষ।

নয়তো কি। হরপার্বতীর অভিশাপ তো মিথ্যা নয়।

ওটা তো গল্প।

ছি ছি ছি এমন কথা মুখে আনতে নেই, বলে হাত দিয়ে জীবনের মুখ চেপে ধরে।

তারপরে বলে, তা ছাড়া কি জানো দুর্বলের দোষ চিরকাল। যাক শোনো। আমার বয়স যখন ছয় সাত বছর তখন আবার সন্তান হবে মার। বাবা মাকে বললেন আবার যদি মেয়ে হয় তবে একটা আস্ত চিং গাছ ভাঙবো তোমার পিঠে। বাবার যে কথা সেই কাজ, মায়ের চেয়ে বেশি কেউ জানতো না। তবু এতটুকু বিকার দেখা দিল না তার মুখে। তাঁর গায়ে সোনার দাগ আর চিং-গাছের চাবুকের দাগ সমান শোভা পায়। জীবন, সেদিন তুমি বলে ছিলে যে আমার মা যেন পাষাণের দেবী প্রতিমা। আরো বাড়িয়ে বলতে পারতে। এমন আঘাত আছে যাতে পাষাণ ভাঙে, মা কখনো ভেঙে পড়ে নি। পাষাণের চেয়েও কঠিন মানুষের ধৈর্য।

তারপরে ক্রমেই আসন্ন হতে লাগলো সেই ভীষণ দিন। এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন আমার মাতুল। তিনি এসে সব অবস্থা শুনে আর বাবার নিত্য নতুন চাবুক কাটা দেখে দাদার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করলেন। আমি জানতে পারবো কেন, আমি তো নিতান্ত ছেলেমানুষ। সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই মা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন জ্ঞান হল দেখলেন বাবা সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোলে সদ্যজাত পুত্রসন্তান হাতে সোনার অলঙ্কারের পোঁট।

ব্যাপারটা কি হল বুঝলাম না।

এটা আর বুঝলে না। মায়ের অজ্ঞান হওয়ার সুযোগে সন্তান বদলা বদলি হল। হয়েছিল মেয়ে সে জায়গায় রাখা হল ছেলেকে।

এমন যোগাযোগ ঘটা তো সহজ নয়।

নয়ই তো। অনেক খোঁজাখুঁজি অনেক

খরচের পরে আমাকে ব্যাপারটি ঘটাতে হয়েছে। তিনি আর দাদা, অনেক সন্ধান করে বার করলেন যে পাশের গায়ের আমাদের সম্প্রদায়ের একটি গরীব পরিবারে আসন্ন-প্রসবা এক রমণী আছে। মামা তাদের কিছু টাকা দিয়ে রাজি করালেন আর ওকে নিয়ে এলেন আমাদের গাঁয়ে। তারপরে দুই বাড়ির দাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে টাকা খাইয়ে সমস্ত পাকা করে রাখলেন। জীবন, টাকায় অনেক কিছু হয়। তারপরে যথাসময়ে টাকার লীলা প্রকট হল। মেয়ের স্থানে এলো ছেলে, ছেলের স্থানে গেল মেয়ে।

উপন্যাসের মতো বিস্ময় কাহিনী শুনে অবাক হয়ে যায় জীবন। শুধোয় তোমার সে বোনের কি হল পরে খোঁজ নিয়েছিলে।

আমার তো খোঁজ নেওয়ার কথা নয়। তবে তারা নিজ গ্রামে ফিরে গেলে দাদা লুকিয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতো, কখনো কখনো টাকা দিত। বছর খানেক পরে একবার ফিরে এসে দাদা বলল মেয়েটি নাকি মারা গিয়েছে, তবে তার বিশ্বাস টাকার লোভে কাউকে বেচে দিয়েছে, নিজের মেয়ে তো নয়। আমি অবশ্য এসব কথা বড় হয়ে অনেক পরে শুনেছি।

কে নিলো কোথায় নিয়ে গেল কিছু জানতে পেরেছ কি?

কেমন করে জানবো? দুনিয়াটা তো ছোট নয়। যদি মরে গিয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই।

আর সেই ভাইটি?

যার আসবার কথা নয় এ সংসারে এসেও সে রইলো না।

অধীর আগ্রহে জীবন বলে কি হল মুখে বলো? মৃত্যু?

তার চেয়েও হয়তো ভীষণ। তার বয়স যখন বছর দুই একদিন রাতে তাকে নেকড়েতে নিয়ে গেল।

নেকড়েতে নিয়ে গেল? চমকে ওঠে জীবন। চমকে উঠলে কেন? এমন তো হামেশাই হচ্ছে, বিশেষ গ্রীষ্মকালে, গেল বছরেও এ গাঁয়ের দুটো ছেলে নেকড়ের পেটে গিয়েছে। গরমিকালে রাতের বেলায় সবাই বাইরে চারপাই পেতে শোয়, তখন মাঝে মাঝে নেকড়ে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মুখে ধরে তুলে নিয়ে যায়।

লোকে তাড়া করে না।

জানতে পারলে করে, কিন্তু ওরা এমন কৌশলী যে নিঃশব্দে কাণ্ডটি ঘটে। আর ছেলেটা যদি একবার কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে শুনেছে কে? সবাই তখন ঘুমে অচেতন।

কি হ'ল সেই ছেলেটার অনুমান করতে পারো?

অনুমানের অবকাশ কোথায়? হয়তো পশুর পেটে গিয়েছে, আর যদি বেঁচে গিয়েই থাকে তবে হয় তো পশুতে পরিণত হয়েছে।

তোমার মা এ সব বিবরণ জেনেছেন?

জেনেছেন অনেক পরে, বাবার মৃত্যুর পরে দাদা সব খুলে বলেছে।

মা নিশ্চয় খুব কাঁদলেন!

জীবন, পাষাণ কি কাঁদে?

তবে ঝরনা ঝরে কেন?

কিন্তু যে পাষাণের চেয়েও কঠিন!

তুমি কাঁদোনি পান্না?

ভাই কাঁদতে গেলে সারাজীবন ভোর কাঁদতে হয়।

একটু আধটু কাঁদলেই বা।

হিসাব ক'রে কাঁদা যায়! এখান থেকে শরৎকালে উত্তর দিকে তাকালে হিমালয়ের বরফ দেখতে পাওয়া যায়, সোনার রোদে ঝকঝক করছে। বলো তো সে হাসি না কান্না? হাসি যদি তবে গ্রীষ্মকালে গ'লে গিয়ে বন্যা নামায় কেমন ক'রে, কতবার তো ভেসে গিয়েছে আমাদের রামগঙ্গা। কান্না যদি তবে এমন সকৌতুক উজ্জ্বল কেন?

উত্তরের আশা না রেখে বলে যায় পান্না যেন সে নিজেকেই শোনাচ্ছে।

জীবন, তুমি অনেকবার বলেছ আমি কথায় কথায় হাসি। কেন জানো? আমার হাসিই কান্না। সন্ধ্যাবেলায় মুজরার আসরে যখন ইয়ারদের রসিকতায় হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠি তখন অনেক সময়ে পাশের ঘরের লোক চমকে উঠেছে—পান্না কাঁদে কেন? পান্না কাঁদে কেন? পান্নার হাসিই যে কান্না।

জীবন বুঝলো অনেক কালের রুদ্ধ উৎস খুলে গিয়েছে সহজে থামবে না।

বুঝলে জীবন, হাসির তবকে মুড়ে জমাট চোখের জল এনেছি থরে থরে, লোকে বিচার না করে হাসির মুদ্রা ভেবে নিয়ে যায় পকেট ভরে। যাক তাতেই যদি খুশী হয়। লোকে বলে পান্নার হাসির দামটুকুই হাজার মোহর। এ হাসি অশ্রুগর্ভ বলেই যে তার মূল্য। নইলে ফাঁকা হাসির আওয়াজে কাককপক্ষীটাও মরতো না।

জীবন চৈত্রমাসের আকাশের দিকে তাকায়, দেখে যে পান্নার বেদনা বিশ্বব্যাপী হ'য়ে উঠে আকাশের তারাগুলোকে টনটন করাচ্ছে। ঐ নূতন কুজোর ভেজা মাটির গন্ধ, ঐ বেল-ফুলের প্রগাঢ় গন্ধ সমস্ত যেন স্তম্ভিত হ'য়ে কান পেতে আছে, সন্ধান করছে পান্নার অশ্রুর গোপন উৎসটির।

পান্না আবার বলতে শুরু ক'রেছে এমন সময়ে শহরের উত্তর দিকে তুমুল কলরব উঠলো গোরে আয়ে গোরে আয়ে, গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।"

চটকা ভেঙে যায় পান্নার, বলে তুমি ব'সো আমি খোঁজ নিয়ে আসি ব্যাপার কি? সত্যই কি কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়লো নাকি?

(ক্রমশ)

মস্কোর চিঠি

মার্কিনীরা প্রায়ই একটা বড় শব্দের কিছুটা ছেঁটে তার এক সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করে থাকে। একালে রুশরা দাঁতনটে আলাদা শব্দের অংশ জুড়ে নতুন বকচ্ছপ গড়ে তোলে। পুরনো কালের কোন রুশ যদি হঠাৎ আজ কাউকে বলতে শোনেঃ "ভেদেনেখেতে মস্‌অব্‌ল্যাস্তের কলখোজ-নিকদের জলসায় যাব" তবে সে নিশ্চয় ভাববে এ কোন সাংকেতিক ভাষা। ভেদেনেখে হল চারটি রুশ শব্দের আদ্যক্ষর যার মানে সোভিয়েত অর্থনীতিক সাফল্যের প্রদর্শনী। মস্‌ অব্‌ল্যাস্ত হল মস্কোর পরিপার্শ্ব। কল্‌খোজ কথাটা এখন আমাদেরও পরিচিত। তার আসল রূপ হল কাল্লেখেজেনয়ে খাজাইস্তভ। শব্দের এমন সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ রুশদের মধ্যে এতই বেশি যে কিছুকাল আগে পত্রিকায় একজন আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেনঃ 'শেষ কালে কি আমরা বলব ইঃ তিঃ লুঃ? (ইয়া তিবিয়া লুব্‌ল্যু—আমি তোমায় ভালবাসি)। কিন্তু আজকের রুশ ভাষায় এমন শব্দ এতই চলে গেছে যে তাদের বাদ দেওয়া অসম্ভব। সব্‌খোজ (রাষ্ট্রীয় খামার)। কম্‌সোমোল্‌ (যুব কম্যুনিস্ট লীগ), রাইকম্‌ (আঞ্চলিক কমিটি), মীদ (পররাষ্ট্র দপ্তর), জাগ্‌স্‌ (সিভিল রেজিস্ট্রেশন অফিস), জিল (এক জাতের মোটর গাড়ির নাম—তার কারখানার নামের আদ্যক্ষর নিয়ে রচিত), এ জাতীয় শব্দ আধুনিক রুশ অভিধানের বহু পাতা জুড়ে আছে।

রুশ ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রচুর। রুশদের কাছে জীবন, বই, বন্ধু, কাজ সবই ইনটিরিয়েসনা — ইনটেরেস্টিং। কখনো কখনো বিদেশী শব্দগুলোর মর্মার্থ অবশ্য একটু বদলে গেছে। একটি রুশ মেয়েকে দেখে কেউ যদি বলে 'সিম্‌পাতিচ্‌নায়া দেবুশকা' প্রথমে হয়ত বুঝতেই পারবেন না সিম্‌পাতিচ্‌নায়া কথাটা এসেছে সিম্‌পাথি থেকে। সেটা যখন জানলেন তখন যদি আক্ষরিক অনুবাদ করেন Sympathetic girl তবে নিশ্চয় মুশকিলে পড়ে ভাববেন যে মেয়ের সঙ্গে আলাপই হল না সে Sympathetic.....কিনা তা জানা গেল কী করে? আসলে সিম্‌পাতিচ্‌নায়া দেবুশকা বলতে বুঝতে হবে ভাল দেখতে একটি মেয়ে। এখানে রাস্তায় অনেক জায়গাতেই পিচের উপর মোটা সাদা রঙে লেখা থাকে "স্তোপ"—থামো। বলাই বাহুল্য স্টপ থেকে তার উদ্ভব। কিন্তু রুশদের কাছে যে কোন থামাই "স্তোপ" নয়, বিশেষ প্রয়োজনে হঠাৎ থামাটাই হল "স্তোপ"—গাড়ি বা যন্ত্রের ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ বেশি।

কোনো বান্ধবী যদি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, "চল আজ তিয়াত্‌র-এ যাই।" কিম্বা "রেস্তরান নাৎসিয়োনাল-এ খানাপিনা করে বেড়িয়ে আসি প্রস্পেক্ত মীরা ধরে। আমার মাশিনা আছে।" আপনি সবটাই হয়ত বুঝতে পারবেন কিন্তু আটকে যাবেন 'মাশিনায়'। ভাববেন—"মাশিনা—মেশিন—যন্ত্র। কিন্তু কী মেশিন, সেলাই কল না সেদযন্ত্র।" মাশিনা মানে মোটর গাড়ি, আভ্‌তো মাশিনার রূপান্তর। তেমনি প্রস্পেক্ত মীরাও Peace Prospect নয়, peacl Avenue।

রুশদের যদি বলেন তাদের ভাষায় বিদেশী শব্দ অশেষ, তারা সঙ্গে সঙ্গেই বলবে, সব এসেছে লাতিন থেকে। আরো বলবে—"বিদেশী ভাষাতেও আমাদের শব্দ কম নয়। সোভিয়েত, কলখোজ, বালেতো মানে (ব্যালে উৎসাহী), ভদকা, বর্শ (একজাতের সুপ), স্পুৎনিক, এমন সব উত্তম বস্তু আপনারা পেলেন কোথা থেকে? আর আপনারাও কি সবসময় এ শব্দগুলোর বেলায় মূল অর্থ মেনে চলেন? স্পুৎনিক কি শুধুই কৃত্রিম উপগ্রহ? এই যে আমরা এক সঙ্গে পথ হেঁটে চলেছি তাতে আমি কি আপনার আর আপনি কি আমার স্পুৎনিক (সহযাত্রী) নয়?"

জাতীয় জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বদল ঘটে, শব্দ ভাণ্ডারও বাড়তে থাকে। কস্‌মোনাভৎ (এস্ট্রনট) কথাটা এই সেদিনও ছিল অত্যন্ত এবস্ট্রাক্ট। কিন্তু এর মধ্যেই কস্‌মোদ্রোম্‌, কস্‌মিচিস্কি করাবল (মহাশূন্যের জাহাজ) ইত্যাদি অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে। এমনকি এখন রুশরা কস্‌মিচিস্কায়া পিয়াতিলেৎকা (পঞ্চ-বার্ষিকী), কস্‌মিচেস্কি উস্‌পেখ (সাফল্য) এসব নতুন প্রয়োগও গড়েছে।

আজকাল আর এদেশে মুচিতে জুতো

তৈরী করে না, তাঁতীতে কাপড় বোনে না। জুতোর কারখানায় যারা কাজ করে তারা মুচি নয় বলেই তাদের হয়েছে নতুন নাম—"ওব্‌ড়্‌শিক্‌" (ওবুড্‌—জুতো)। কাপড় কলের কর্মীরা হয়ে উঠছে "তেক্‌সতিলশিক" (টেক্সটাইল থেকে)। একালে শহরে গ্রামে সর্বত্রই নানা সাধারণ খাবার ঘর ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে যারা কাজ করে তারা আর নিছক রাঁধুনে নয়, তারা হল "পিশ্চেভিক" বা এসেছে "পিশা" বা খাবার কথাটি থেকে।

তেমনি আবার বিপ্লবের ফলে জারের কোর্ট ভেঙ্গে পড়ায় দূর হয়েছে Courteous বা ব্লাগোভস্পিতান্নি কথাটা। গালান্ত্‌নি বা গ্যালাণ্টও এখন আর কেউ নয়। আরো লোক পেয়েছে এধরনের অতিসজ্জিত ভাষাঃ আপনার মনোযোগ উপস্থাপিত করুন। সময় কোথায় অতটা কথা বলার আর তা বোঝার? তাই এখন সবাই সরাসরি বলেঃ খেয়াল করে দেখুন। এখন সভা সমিতিতে লোকে প্রস্তাব পড়ে, ঘোষণা করে না।

রাস্তায় একদল অল্পবয়সী ছেলেকে দেখে এখন নিঃসংকোচে "পারনি" বা "রিবিয়াতা" বলে ডাকতে পারেন। এককালে এ দুটো শব্দে শুধু চাষীমজুর ঘরের ছেলেদের বোঝাত। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ঘরের ছেলেদের তখন বলা হত "ইউনোশা" বা "ইউনেৎস"। বিপ্লবের পর তারা পারনি আর রিবিয়াতাদের ঠেলায় পলাতক হয়েছে তাঁদের প্রিয় তিলিনিৎসাদের (বান্ধবী) নিয়ে। এখন রুশ পারনিরা পাল্ল-গার (মেয়ে-বন্ধু) হাত ধরে সিনেমায় যায়। শিল্পী, লেখক, অধ্যাপক, সরকারী কর্মীরা এখন মাইনে বা বেতন পান না। পান মজুরী (পলুচ্‌কা) —কথাটা আগে শুধু মজুরদের মধ্যেই চলতি ছিল।

রুশদের একটা বড় অভ্যাস হল সব কথার পিছনেই একটা ক্ষুদ্রার্থক বা আদরার্থক জুড়ে দেওয়া। আমার এক সহকর্মী অফিসে এসেই তার বান্ধবী গালিয়াকে টেলিফোনে ডেকে একঘণ্টা ধরে আউড়ে চলেঃ গালোচ্‌কা, গাল্‌কা, গালিঙ্কা, গালুশকা। ভিড়ের সময় বাসে আগে প্রায়ই শোনা যেত কণ্ডাক্টর বলছে "প্রথাজিচে নিম্নোশোচ্‌কু" (একটু ঢুকে যান)। নিম্নোশোচ্‌কু কথাটা হল নিম্নোশ্‌কো থেকে, যার আবার উৎপত্তি নিম্নোগো বা অল্প কথাটা থেকে।

কোন রুশ বাড়িতে গেলে গৃহকর্ত্রী ইলেকট্রিক সামোভার থেকে "চায়" বা চা ঢালতে ঢালতে আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন "চাইকু খাচিচে ?" (একটু চা ইচ্ছে করেন ?)

রুশদের এই আদরার্থক শব্দপ্রীতির অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হলেন আমার প্রতিবেশীর বুড়ি মা। এক বছরের বাচ্চা নাতী সাশাকে তাঁর আদরের আর শেষ নেই —সাশেংকা, সাশোচ্‌কা মালেংকি (মালি—ছোট্টটি), খারোশিংকি (খারশি—ভাল), মিলাসিংকি (মিলা—মিষ্টি)। এসব তো রোজ চলবেই, সাশা যখন ভেজাবে তখনো ঠাকুর মা আদর করে বলবেন "মক্রিংকি" (মক্রি—ভেজা)। তারপর তার জাঙ্গিয়া বদলে সাহল্লাদে ঘোষণা করবেন সাশা "সুখিংকি" (সুখই—শুকনো)।

রুশদের রীতি হল বড়দের চিওচা আর জাজা বলে ডাকা। তার মানে মাসি আর মামা বা কাকী আর কাকা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বেলায় বলতে হবে দেদু আর বাবুশ্‌কা দাদু দিদিমা। ছোটরাই কথাগুলো বেশী ব্যবহার করে আর তাদের মুখে চিওচিংকা, বা দেদুশ্‌কা খুবই মিষ্টি শোনায়। বড়রাও অপরিচিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বেলায় বাবুশ্‌কা দেদুশ্‌কা বলে থাকেন। তবে বাবুশ্‌কা কথাটা খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। কারণ সব বৃদ্ধাই যে সে ডাকে খুশি হন তা নয়, তাই সব ক্ষেত্রে চিওচা বলাটাই বিবেচনার কাজ।

রুশ ভাষায় শব্দভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। প্রতিটি ক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থার জন্য আছে একেকটি শব্দ; অবশ্যই মূল ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ জুড়ে তারা রচিত। খাজিচ কথাটার মানে হল যাওয়া। তা থেকেই ভীখাজিচ্‌, প্রখাজিচ্‌, পথাজিচ, পদ্‌খাজিচ, অংখাজিচ

ইত্যাদি বহু শব্দ গড়ে উঠেছে। তার কোনটার মানে বাইরে যাওয়া, কোনটার ভিতরে ঢোকা, কোনটার ঘুরে যাওয়া, কোনটার কোনো জায়গায় কাছ পর্যন্ত যাওয়া, কোনটার তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, কোনটার এই মুহূর্তে যাওয়া, কোনটার কোনো না কোনো সময়ে যাওয়া।

সেই সঙ্গেই আবার এমন কতকগুলো শব্দ আছে যারা চেহারায় প্রায় এক কিন্তু শুধু এক্সেন্টের তফাতে সম্পূর্ণ আলাদা। পুশকিন, লের্মন্তভের দেশের লোকেরা কি "কবিতা"কে "প্রাকৃতিক বিপর্যয়" বলে মনে করেন? তা না হলে "স্তিখি" আর "স্তিখিয়া" এমন কাছাকাছি দুটো শব্দে ও দুটো কথা বোঝাবে কেন? দারাগোই, দোরোগো, দারোগা হল যথাক্রমে প্রিয়, দামী, পথ। এদের প্রথম দুটোতে একটা সম্পর্ক থাকতেও পারে— ইংরেজীতে যেমন আছে। কিন্তু তৃতীয়টা? যার সঙ্গে দারোগা বা পথ চলতে ভাল লাগে সেই কি দারাগই?

অন্য সব ভাষার মতোই রুশ ভাষাতেও এমন অনেক কথা আছে যা শুদ্ধ যুক্তির বিচারে অসম্ভব। সুন্দর কিছু দেখে রুশ মেয়েরাও বাঙালিনীদের মতো বলে ওঠেন, "ওমা! কী ভীষণ সুন্দর!" (উঝাস্নো ক্রাসিভা) বা "স্ত্রাশ্নো ইন্টেরিয়েসনা"— দারুণ ইনটেরেস্টিং। বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক কর্নেই চুকভস্কিকে কয়েকজন পাঠক তাঁর ভাষায় এ ধরনের উদ্ভটতা দেখে চিঠি লেখে। চুকভস্কি একটি প্রবন্ধে পত্র-লেখকদের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এমন উদ্ভটতার দোষ কি শুধু তাঁর একারই? পুশকিন, তলস্তয় তো বটেই, ঐ পত্রলেখকরাও কি বলেন না "যুদ্ধে লোকে দ্রুগ দ্রুগকে মারে" (একে অন্যকে— কিন্তু দ্রুগ কথাটির মানে বন্ধু, কাজেই আক্ষরিক অনুবাদে কথাটা দাঁড়ায় যুদ্ধে বন্ধু বন্ধুকে মারে, শত্রুকে না)। রুশ প্রবাদে বলে "চড়াই মারতে কামান স্ত্রেলাচ্ দেগো"। স্ত্রেলাচ্ কথাটার জন্ম স্ত্রেলা বা তীর থেকে। আধুনিক আর্টিলারীর দ্বারা তীর ছোঁড়াটা শুধু অসম্ভব নয়, হাস্যকরও।

বিরাট স্তেপের বর্ণনায় রুশরা প্রায়ই একটি বিশেষণ ব্যবহার করে থাকেন "নিওবিয়াৎনী"। তার উৎপত্তির সূত্র অনুযায়ী মানে করলে কথাটা দাঁড়ায় যাকে আলিঙ্গন করা যায় না। চুকভস্কি বলছেন, একটু ভেবে দেখলেই ধরা পড়ে বিরাট স্তেপ কেন, বাড়ির ছোট্ট উঠোনটুকুকেও আমরা আলিঙ্গনে ধরতে পারি না।

বাংলার মতো রুশ ভাষাতেও লাল কালি, নীল কালি, সবুজ কালির চল আছে (কালি-চোর্নিলা, চোর্নি=কালো)। যদিও আসলে তারা সোনার পাথর বাটিরই সামিল। একটা অপূর্ব কিছুর বর্ণনায় রুশরা বলবে: এন্‌ভো পেরম্ নি অপিসাচ্। তার আসল মানে বর্ণনার অতীত। আক্ষরিক মানে: পেরো বা কলমের দ্বারা এর কথা লেখা যায় না। আসলে কিন্তু একালে কোনো কথাই কেউ কখনও "পেরো" দিয়ে লেখে না কারণ ও কথাটার মূল অর্থ হল পালক আর তার কলম।

ছন্দের খাতিরে আর বিশেষ জোর দেবার জন্য একই কথার পুনরাবৃত্তি আমাদের মতো রুশরাও করে থাকে। রুশরা বলে "স্তৌদ্ ই প্রাম", সেটা আমাদের "লাজলজ্জা" ছাড়া আর কিছুই না। বাঙালীদের মতো রুশরাও বক্তৃতা দিতে খুবই ভালবাসে এবং সেখানে তারা প্রায়ই বলে থাকে "আমি ৎসেলিকোম ও পোল্‌নোস্তুউ বলতে চাই........" (তার মানে বক্তা সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে কিছু বলতে চান)।

এমন বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে। চুকভস্কি ঠিকই বলেছেন, "ন্যায়শাস্ত্র হল ন্যায়শাস্ত্র, তার দ্বারা ভাষা তৈরী হয় না।" আর শুধু কি রুশ ভাষা? জার্মান, ফরাসী, ইংরেজীতে সুপণ্ডিত চুকভস্কি ওসব ভাষা থেকেও এমন বহু উদ্ভটতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সুকুমার রায়ের একই "শব্দ-কল্পদ্রুম" কবিতাতেই পাওয়া যাবে আমাদের ভাষার বহু অদ্ভুত ভঙ্গীর উদাহরণ।

চুকভস্কির মতে, "সাধারণজনই বড় শিল্পীর মতো নিজেদের ভাষা তৈরী করেন।" আর সেই জনাই ভাষায় এমন বহু অদ্ভুত শব্দ ও ইডিয়ম। কিন্তু ওগুলোই ঘটায় প্রতিটি ভাষার সমৃদ্ধি। তার ফলেই দেখা দেয় প্রতি ভাষার বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব (এটাও কি "লাজলজ্জা"র মতোই হল না!) ভঙ্গী?

শুভময় ঘোষ

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

= একুশ =

ঝিনুকপোতার বড়-দারোগা অনাদি সরকার হাঁসিমস্করা করছে, খবর কানে এসে গেল। লোকজনের মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে বলে, জগবন্ধু দারোগার কন্যাদায়—ব্যাপার সামান্য নয়। নিজের এলাকায় কুলালো না, তা মুখের কথাটা বললে আমিই সংগ্রহ করে দিতাম। তাতে বুঝি ইজ্জতে বাধে—তারও বড়, পয়সা খরচ হয়। তার চেয়ে রাতের কুটুম্ব পাঠিয়ে সোজাসুজি কাজ হাসিল করে নিয়ে গেল।

নিঃসাড়ে যেন মন্ত্রবলে কাজ সেরে গেছে। প্রতি পুকুরে জলের মধ্যে বোঝা বোঝা পালা—অর্থাৎ গাছের ডালপালা ও কঞ্চি ইত্যাদি। হঠাৎ এসে কেউ জালের খেওন না দিতে পারে। জাল ফেলবার আগে পালা তুলে ফেলে সমস্ত পুকুর সাফ-সাফাই করে নিতে হবে। জলে নেমে পড়ে তাই করেছে, তারপরে জাল নামিয়েছে আট-দশখানা গাঁয়ের পনের-বিশটা পুকুরে। সন্ধ্যার পরে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা সময়ের ভিতর। লগ্নের মুখেই মাছ এসে পড়ল। বাছাই-করা সারের সার মাছ—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের উপমায়, রাজপুত্তুর। কতগুলো জাল নিয়ে কত মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল রে বাবা! এত বড় কান্ড, টুঁ শব্দটি নেই—পাকা হাতের পরিপাটি কাজ। সকালে উঠে ডাঙার উপর পালা এবং পুকুর-পাড়ে জাল ঝাড়ার চিহ্ন দেখেই মাছ চুরির ব্যাপার মালুম হল। ভদ্র মানুষজন দশের মধ্যে অবশ্য নিন্দে-মন্দ করে, কিন্তু মনে মনে চমৎকৃত হচ্ছে।

এক পুকুরের মালিক বলল, পুকুর ঠিক উঠানের উপর বলেই জালের শব্দ একটুখানি কানে গিয়েছিল। কিন্তু বেরুতে গিয়ে দেখে, বাইরে থেকে শিকল আঁটা। শিকল এ'টে বন্দী করে মাছ ধরছে। চে'চানি দিল একটা। ঝটিতি বউ এসে মুখ চেপে ধরে ঃ ঘরের মধ্যে ঢুকে গলা দুইখন্ড করে দিয়ে যাবে। এক হাত মুখে চাপা দিয়েছে, আর এক হাতে দরজার খিল হুড়কো একের পর এক এ'টে দেয়। কথা বের হতে দিল না, বেরুতেও দিল না ঘর থেকে।

ঝিনুকপোতার দারোগা বলে বেড়াচ্ছে, সর্বপক্ষী মাছ খায়, নামটি কেবল মাছ-রাঙার!

সেই আসরে কে-একজন নাকি টিপ্পনী কেটেছে ঃ মাছরাঙা তো চেলা-পুঁটি খায় বড়বাবু, বলাধিকারী খান তিমি। মাছের রাজা তিমি খেয়ে খেয়ে উনি তিমিঙ্গিল হয়েছেন।

বন্ধু-লোকেরা আছে—তাদের কাজ ও-থানার কথা এ-থানায় এসে বলে যাওয়া। যত শোনেন, জগবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। এতদূরে তলিয়ে দেখেন নি। এখন যে মুখ দেখাবার উপায় থাকে না আপন-পর কারো কাছে। ধর্মের কাছেই বা জবাবদিহি কি?

ক্ষুদিরাম ভট্টচার্য নির্বিকার। বলে, এই দেখুন, মুখ দেখাবার মুশকিল কি হল? অনাদি সরকার এত বলে বলে বেড়াচ্ছে, তার বউয়ের গলার নেকলেশটা লক্ষ্য করে দেখেছেন? খুকির বিয়ের নেমন্তন্নে সেই নেকলেশ পরে এসেছিল। শ্বশু[র] দারোগাগিরি করে হীরে-বসানো এ[...] জিনিস দেওয়া যায়? বলুন। পুকুরচুরি ব[...] ও'রা সব জিনে যাচ্ছেন, এ তো পুকু[রের] ক'টা মাছ! তা-ও লোকগুলো নি[...] বুদ্ধিতে করেছে, আপনি কিছু বলতে [...] নি। আবার তা-ও বলি, তড়িঘড়ির কা[জ] কর্ম, বলে-কয়ে অনুমতি নেবার স[ময়] কোথা? পায়তারা কষতে গেলে কিছুই [...] না। তবে হ্যাঁ, ধর্মের ঐ কথাটা যা বললে[ন]

একটু দম নিয়ে বলে, ধর্ম কিছু [...] পালিয়ে যায় নি একটা-দুটো দিনের মধ্যে[...] ধর্ম এখনো রাখা যায়। পুকুরে মাছ পে[...] বিক্রি করে দুটো পয়সা পাবে বলে। পা[...] পেলেই চুকে-বুকে গেল। এই কথাটা আপ[নি] তো গোড়া থেকে বলে আসছেন।

জগবন্ধু অধীর হয়ে বলেন, পুকু[র] ওয়ালাদের ডেকে আপনি তাড়াতাড়ি ব্যব[স্থা] করে দিন ভটচাজ মশায়। আজকে যদি [...] যায়, কাল অবধি সবুর করবেন না।

সেইমাত্র একটা এজাহার শেষ হল [...] দারোগার কাছে। লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছি[ল] ক্ষুদিরাম ডেকে এনে জগবন্ধুর সাম[নে] হাজির করল।

লোকটা ফোঁত-ফোঁত করে কাঁদ[...] ছা-পোষা গৃহস্থ বড়বাবু, বেটারা সর্ব[নাশ] করে গেছে। মাছগুলো বুক-বুক [...] রেখেছিলাম—একসঙ্গে বেচে দিয়ে বিঘে [...] ধানজমি করব।

কি পরিমাণ গেছে, আন্দাজ করতে পা[রো]

লোকটা বলে, জলের মাছ—সঠিক [...] কেমন করে। চান করবার জো ছিল না, [...]

...জর দিত। একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বিরক্ত হয়ে বলেন, তবু বলবে তো একটা-কিছু?

তাড়া খেয়ে লোকটা বিড়বিড় করে দ্রুত হিসাব করে নেয়ঃ গণে-গণে সেখানে একশ বাছাই রুই ছাড়লাম। অর্ধেকও যদি মরে-হেজে গিয়ে থাকে—

ক্ষুদিরাম প্রশ্ন করে ওঠেঃ কত বড় হয়েছিল?

সের পাঁচেক করে ধরে নিন। যাকগে যাক, আরও কিছু ছাড় করে দিয়ে গড়ে চার সের করেই হল—

রুই ছাড়া অন্য মাছও কিছু থাকবে তো পুকুরে! কাতলা মৃগেল বাটা সরপুঁটি—

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিল বই কি! অঢেল ছিল।

লোকটা চলে গেলে ক্ষুদিরাম বলল, নিন, হল তো! শুধু রুইমাছই পাঁচমণ। তা ছাড়া কাতলা মৃগেল—আরও শত শত রকমের। অঢেল ছিল সেসব।

বলাধিকারী আতকে উঠলেনঃ কী সর্বনাশ! আমাদের তো মোটমাট চারমণ। তারও কতজন ভাগিদার। ডাহা মিথ্যেকথা বলে গেল লোকটা।

ক্ষুদিরাম হেসে বলে, এই লোক বলে কেন—যার কাছে বলবেন, হিসাব এমনিধারাই দেবে। এখন এই। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচটা টাকাও যদি কাউকে দিয়েছেন, এজাহারের ঠেলায় ছোটবাবু অস্থির হয়ে যাবেন. সরকারী খাতা হুদ-হুদ করে ভরাট হয়ে যাবে। পুকুর ডোবা খানাখন্দ যার একটা আছে, কেউ আর বাদ পড়ে থাকবে না।

ছি-ছি! জগবন্ধুর মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না।

ক্ষুদিরাম বলে, আরও আছে বড়বাবু। হাতে-হাতে ক্ষতিপূরণ মানে চুরির দায় ঘাড় পেতে নেওয়া হল। ভেবে দেখবেন এদিকটা। চোরাই মাছে বিয়ের ভোজ হয়েছে, ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির হয়ে গেল।

স্তম্ভিত জগবন্ধু। বলেন, কী জগৎ!

সত্যি কথা, উচিত কাজকর্মের ধার দিয়েও কেউ যাবে না!

ক্ষুদিরাম নিরীহ ভাবে বলে, বিদ্যাসাগর-মশায় এটা করে গেলেন।

কী করলেন তিনি—অমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি?

দ্বিতীয় ভাগে লিখে গেলেন—'সদা সত্য কথা বলিবে'। আরও বিস্তর ভাল ভাল কথা লিখলেন—"রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না"। ছেলেপুলে না দৌড়ে কি ছায়ায় বসে বসে আফিংখোরের মতো ঝিমোবে? ঐ বয়স থেকেই বুঝে নিয়েছে, বইয়ে থাকে এ সমস্ত—বানান করতে হয়, মানে শিখতে হয়, কাজে খাটাতে নেই। যেদিকে তাকাবেন এই। সত্য নিয়ে কারও শিরঃপীড়া নেই। এক-আধজন যদি দৈবাৎ মেলে, গবেট বলে তামাসা করবে তাকে লোকে।

আজও বলাধিকারী ক্ষুদিরামকে বলে থাকেন, প্রথমপাঠ আপনার কাছেই পেয়েছি ভটচাজ মশায়। গুরুমান্য আপনার প্রাপ্য। চমক লেগেছিল বড্ড সেদিন। ন্যায়নীতি কোন এক কালে নিশ্চয় জীবন্ত ছিল। কিন্তু রকমারি সমাজপদ্ধতির সঙ্গে এটিরও বিলয় ঘটেছে। একশ'র মধ্যে নিরানব্বুই জনই যা মানে না, তাকে আর ধর্ম বলা যায় কি করে? ইতিহাসের মাটি খুঁড়ে বিলুপ্ত বহু জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণায় লাগে, জীবনধারণের কাজে আসে না। ন্যায়ধর্মের যা সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই রীতিগুলোই সমাজ আজকে ধরে রেখেছে।

ক্ষুদিরাম ছোট্ট একটু প্রতিবাদ করে: শতের মধ্যে নিরানব্বুয়ের হিসাবটা ঠিক হল না বলাধিকারী মশায়। হাজারে ন-শ' নিরানব্বুই বলাও বেশি হয়ে যায়।

বলাধিকারী বলেন, সত্য-ন্যায়ের একটা পাতলা পোশাক শুধু ঢাকা দেওয়া। সেই পোশাকের নিচের চেহারাটা সবাই জানে। নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম থেকেই বুঝতে পারে। কিন্তু বাইরে চাই ওটা। তবে পোশাকটুকুও জীর্ণ হয়ে এসেছে। আর বেশি দিন নয়।

এসব এখনকার কথা। বলাধিকারী ও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মধ্যে হাসা-পরিহাস চলে এমনিভাবে। সেদিনের জগবন্ধু আলাদা মানুষ। অন্য কোন উপায় না দেখে চারমণ মাছের দাম হিসাব করে তিনি ক্ষুদিরামের হাতে দিলেন। দাম শোধ না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। টাকাটা দিয়ে থানার বড়বাবু হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের হাত জড়িয়ে ধরলেন: আশাসুখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। অজান্তে অন্যের উপর জুলুম হল, আঙুল ভেঙে তারা শাপ-শাপান্ত করবে, কিছুতে এটা সহ্য হচ্ছে না। ধর্মভার আপনার উপরে—পাইপয়সা কারো কাছে ঋণ না থাকে দেখবেন।

ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে অভয় দেয়: যারা মাছ ধরেছে, পুরো টাকা তাদের হাতে পৌঁছে দেব। কার পুকুরের কত মাছ তারাই জানে, ঠিকমতো বাটোয়ারা করে দেবে। একটা জিনিস জানবেন, চুরি করুক যা-ই করুক ধর্ম রেখে কাজ করে তারাই। ছ্যাঁচড়ামি ঘেন্নার বস্তু। কথা দিল তো কিছুতে তার নড়চড় হবে না। আমার কাছে কথা দিয়েছিল, বড়বাবুর মানের হানি হয় কিছুতে সেটা হতে দেব না। তাই করল কিনা বলুন। যেভাবেই হোক, কাজ ঠিক তুলে দিল।

মূল্য যথাযোগ্য স্থানে গিয়ে পড়বে, এত কথাবার্তার পরেও জগবন্ধুর পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। সান্ত্বনা: তিনি অন্তত মূল্য শোধ করে দিয়েছেন। এবং মনে মনে কঠোর সংকল্প করলেন, এমন অনিশ্চিত সন্দেহ-সংকুল কাজের মধ্যে কোনদিন আর যাবেন না। মরে গেলেও নয়। যা হল, এইখানেই শেষ।

তবু কিন্তু শেষ হয় না। মাসখানেক পরে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি এল। থানার সেই কোয়ার্টারে। হাটবার সেদিন। চাকর সঙ্গে নিয়ে জগবন্ধু নিজে হাট করে আনলেন। রাত প্রহরখানেক। রান্নাঘরে ভুবনেশ্বরী রান্নাবান্না করছেন, খোলা দরজায় ঢপ করে কি এসে পড়ল পিছন দিকে। আর একটু হলে গায়ের উপর পড়ত। মানকচুর পাতায় কলার ছোটা দিয়ে সযত্নে বাঁধা পুঁটলি। খুলে দেখে অবাক। কচুপাতায় মাংস বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বাইরের ঘরে গল্পসল্প করছিলেনন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী ডাকিয়ে আনলেন: দেখ, কী কাণ্ড!

পাড়াগাঁ জায়গায় মাংস এমনি বিক্রি হয় না। একজন কেউ উদ্যোগী হয়ে পাঁঠা-খাসি মারে। যার যেমন প্রয়োজন—কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বা এক টাকার মতন ভাগ নিয়ে নেয়। জগবন্ধুও তাই করবেন। সুপুষ্ট খাসি একটা ঠিক করে এসেছেন—রাত্রিবেলা মাছ ইত্যাদি হোক, দিনমানে কাল খাসির ঘাড়ে কোপ পড়বে। কিন্তু কোন সব অলক্ষ্য আত্মীয়জনেরা রয়েছে, জামাই-সমাদরের এতটুকু খুঁত তারা হতে দেবে না। এই রাত্রে ছাগল কেটে মাংসের ব্যবস্থা করেছে। হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না এতদূর স্বজন তারা।

ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করেন, কে দিয়ে গেল বল তো?

আবার কে! বিয়ের মাছ যারা দিয়েছিল। এমন নিঃসাড়ে এসে ফেলে দিয়ে যাওয়া অতিবড় গুণী লোক ছাড়া পারবে না।

ভুবনেশ্বরী বলেন, মাংস রাঁধতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কিসের মাংস কে জানে? চোখে দেখে তো চিনবার জো নেই—শিয়াল-কুকুর কেটেও দিয়ে যেতে পারে।

জগবন্ধু বললেন, আমারও ঠিক সেই মত।

এ মাংস জামাইয়ের পাতে দেওয়া যাবে না। কুকুর-শিয়ালের নয়, সেটা হলপ করে বলতে পারি। তার চেয়েও খারাপ। কার ঘরে ঢুকে সর্বনাশ করে এসেছে। মাংস আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও তুমি।

এতদূর করলেন না অবশ্য ভুবনেশ্বরী। এখন চাপিয়ে দিয়ে মাংস রান্না হতে রাত তো পুইয়ে আসবে। রেখে দেওয়া যাক, কাল দিনমানে দেখেশুনে রান্নাবান্না করা অথবা কাউকে দিয়ে দেওয়া—যা হোক কিছু করবেন।

পরের দিন রোদ উঠবার আগেই জানা গেল, জগবন্ধুর অনুমান খাঁটি। ডাকের রানার রাখহরি পুঁইয়ের বুড়ি মা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আধক্রোশ পথ ভেঙে থানায় এসে কেঁদে পড়ল: দারোগাবাবু, আমার রাঙি ছাগলটা চুরি গেছে কাল রাত্রে। গোয়ালের একটা পাশ ছাগলের জন্য শক্ত করে ঘিরে দিয়েছে—সকালে দেখি, ঝাঁপ খোলা, ছাগল নেই। কেঁদো কি শিয়ালে নিয়েছে ভাবলাম। তারপরে দেখি কচুপাতায় বাঁধা মাংস। আমার রাঙিকে কেটেকুটে গৃহস্থের ভাগ রেখে গেছে।

হাপুসনয়নে কাঁদছে বুড়ি ছাগল নয়, যেন পুত্রশোকের কান্না। চুরি-করা খাদ্য-বস্তুর ভাগ গৃহস্থকে দিলে পাপ অর্শায় না, চৌর-শাস্ত্রের বিধান এই। আর গৃহস্থকে কোনপ্রকারে যদি সেই বস্তু খাওয়ানো যায়, উল্টে তখন পুণ্যলাভ। রাঙির মাংস চোর তাই রাখহরির বাড়িতেও কিছু দিয়েছে।

যথারীতি এজাহার লিখিয়ে বুড়ি ফিরে যাচ্ছে। কান্না দেখে জগবন্ধু বিচলিত হয়েছেন। একটা কনেস্টবল দিয়ে বুড়িকে ডাকিয়ে আনলেন।

বুড়োমানুষ কষ্ট করে পুষেছিলে, কত দাম হতে পারে তোমার ছাগলের?

সরল সাধাসিধে স্ত্রীলোক, কথায় কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলে, ব্যাপারি এসে ন-সিকে বলেছিল শীতকালে। দিইনি। বলি, এত ছোট খাসি না-ই বেচলাম। বড় হোক।

জগবন্ধু তিনটে টাকা তার হাতে দিলেন। বিবেক-দংশন অনেকটা শীতল হল।

বুড়ি অবাক হয়ে গেছে। থানার মানুষ হাত উপুড় করে টাকা দিচ্ছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চার যুগের মধ্যে বোধকরি এই প্রথম। এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে শুধুমাত্র এই থানায়।

বিস্ময়ের ধকল খানিকটা সামলে নিয়ে বুড়ি বলে, দাম আপনি কেন দেন বড়বাবু? আপনার কোন দায় পড়ল?

আমতা-আমতা করে জগবন্ধু অকস্মাৎ এক কৈফিয়ত খাড়া করে ফেললেন: ছেলের অকালমৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ এসে রাজা রামচন্দ্রকে গালি পাড়ে। শম্বুক বধ করে তবে নিষ্কৃতি। নিয়মই তাই। যার রাজত্বে বসবাস, প্রজার অমঙ্গলের দায় তারই উপর বর্তায়। থানার উপর বসে মাস মাস সরকারের মাইনে খাচ্ছি—মুল্লুকের চোরডাকাত যতদিন না শাসন হচ্ছে, লোকের ক্ষতি লোকসান ন্যায়ত ধর্মত আমাদেরই পূরণ করা উচিত।

বুড়ির এত সমস্ত বোঝার গরজ নেই। টাকা ক'টি আঁচলের মুড়োয় গিঁট দিয়ে পরমানন্দে চলে গেল।

বাসায় গিয়ে জগবন্ধু স্ত্রীকে বললেন, মাংস আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে বলেছিলাম। দিয়েছ নাকি?

রাখহরির মার খাসি-চুরির বৃত্তান্তটা ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরীর কানেও পৌঁছে গেছে। বললেন, ফেলিনি ভাগ্যিস। রেখে দিয়েছি, এইবারে চাপাব।

জগবন্ধু কঠিন কণ্ঠে বললেন, না। খুঁড়ে মাটি চাপা দেব। কাক-কুকুরের মুখেও না যায়।

আবার কি হল? ভুবনেশ্বরী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন: সন্দেহ তো মিটে গেছে। ছাগলের মাংস—বুড়ির পোষা খাসির। পুরো খাসির দামও তুমি দিয়ে দিলে—

জগবন্ধু বললেন, ঠিক ঐ জন্যেই। এ যাত্রা জামাই মাংস খাবে না, মাংসের নাম-গন্ধ উঠবে না বাড়িতে। কাল কিম্বা পরশুও যদি তুমি মাংস রাঁধতে বোসো, ওধারে ছোটবাবুরা থাকে—খবর চেপে রাখতে দেবে না। বলবে, বুড়ি হৈ-হৈ করে পড়েছিল বলে মাংস সাঁতলে সাঁতলে কদিন রেখে দিয়েছে।

এত করেও কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ রইল না। পুঁইপাড়ার এক বেওয়া স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে জগবন্ধুর বাসায় চিঁড়ে কুটে দেয়। ভুবনেশ্বরী তার মুখে প্রথম শুনতে পেলেন। পরে অন্যখানেও শুনেছেন। রাখহরি পুঁই বলেছে, জগবন্ধু দারোগার জামাই এসেছে, খবর আগে টের পাইনি যে। মাকে বলে দিতাম, রাঙি ছাগল গোয়ালে না রেখে নিজের কাছে নিয়ে শোয়। ঘরের দুয়ারে হুড়কো দিয়ে সর্বক্ষণ যেন জেগে বসে থাকে। খবর পাইনি, সময়ে দিতে পারিনি—দারোগার ভূত-প্রেতগুলো খাসি নিয়ে ঠিক সেই জামাইয়ের ভোগে লাগাল।

রাখহরি পা'ুই যাদের ভূতপ্রেত বলছে এবং ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দাঁতাদানো বলেছিলেন, অদৃশ্য থাকলেও নিতান্ত অজানা নেই তারা এখন। বেচা মল্লিকের দলবল। বেচারাম নাকি জাক করে বেড়াচ্ছে : একদিন বাগানের এক কাঁদি মর্তমানকলা পাড়িয়েছিলাম, কাঁদি ধরে উঠানে ছুড়ে দিল। এবারে যে গাঁয়ে গাঁয়ে পুকুর তোলপাড়, মানুষের গোয়ালে খাসি-পাঁঠা থাকবার জো নেই।

জগবন্ধু যত শোনেন ততই অস্থির হয়ে উঠছেন। আহার নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের দাম হিসাব করে সমস্ত মিটিয়ে দিয়েছেন?

আলবৎ!

প্রশ্ন করে শুনে নিতে হল, ক্ষুদিরাম সেজন্য মর্মাহত হয়েছে। বলে, টাকা-আনা-পাই পর্যন্ত হিসাব। এখন আর বলতে দোষ কি—বেচারামের নিজের হাত দিয়েই।

খাসির দামও আমি দিয়ে দিয়েছি। বুড়ি নিজ মুখে যা বলল, তারও কিছু বেশি ধরে দিলাম। সেই বেচারাম তবে আবার এসব রটায় কেন?

দুর্জন লোক, সাচ্চা কাজকর্ম বরদাস্ত করতে পারে না। এমনধারা বড় একটা দেখে না তো চোখে। কানেও শোনে না। আমাদের ভাঁটি অঞ্চলে নিতান্ত আজব ব্যাপার!

আজকের দিনে হলে জগবন্ধু সজোরে সায় দিয়ে উঠতেন: শুধু ভাঁটি অঞ্চল কেন, যেখানে মানুষ আছে সেখানেই। কিন্তু সেদিনের সাধু-দারোগা আলাদা মানুষ। বিবেচনার ভুলে দুর্জনের দঙ্গলের ভিতর গিয়ে পড়েছেন, মনে মনে শতেকবার সেজন্য কানমলা খাচ্ছেন। তুমিও ক্ষুদিরাম ভট্টচায চিজটি বড় কম নও। যোগসাজস তোমার সঙ্গেও। জেলেদের সম্ভবত টিপে দিয়েছিলে সারাদিন চেষ্টাচরিত্র করে খালি জাল নিয়ে তারা ডাঙায় উঠল আমাকেই জালে আটকাবার জন্যে।

কিন্তু মনের এই সব কথা মুখে প্রকাশ করা চলে না। সংসারে চলেন বলে দেশসুদ্ধ শত্রু। তার মধ্যে এই মানুষটা সুহৃদরূপে সামনে ঘোরাফেরা করে, তাকে বিগড়ে দিয়ে আরও একটা শত্রু বাড়ানো কাজের কথা নয়। সতর্কভাবে খোশামুদির সুরে জগবন্ধু বলেন, আপনার চোখ দুটোয় কিছুই এড়াবার জো নেই ভটচাজ মশায়। মনের কথা বলি একটা। সারাক্ষণ সেই যে জাল বেয়ে একটি ঝেঁয়া-পুঁটি অবধি পড়ল না, হতে পারে জেলেদের শয়তানি। হতে পারে ছেঁড়া জাল নামিয়েছিল। অথবা টানবার সময় জালে ভার বাঁধেনি, জাল উপরে উপরে ভাসিয়ে এনেছে।

কথা না পড়তে ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে বসে আছে: সবই হতে পারে বড়বাবু। হতে পারে কি, নিশ্চয় তাই। বেচারাম কলকাঠি টিপছিল দূর থেকে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবল একটুখানি। খাপছাড়া ভাবে বলে, তার দিকটাও দেখতে হবে বইকি! দোষ আমাদেরও বলাধিকারী-মশায়। এতদূর আমরাই জমিয়ে তুলেছি।

বলাধিকারী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন। ক্ষুদিরাম বলে, মাছের দাম যদি না দিতাম, খাসি মেরে তবে আর মাংস দিতে আসত না। মাংসের দামও দিয়েছেন, আবার কি এসে পড়ে দেখুন। যতবার ঘাটাঘাটি করবেন, ততবার একটি করে চাপান দিয়ে যাবে। থানার মালিক আপনি—আপনার মেয়ে-জামাই তারও মেয়ে-জামাইর মতো খানিকটা। জামাই-এর নাম করে কিছু যদি ইচ্ছে করে দিয়ে যায়, আপনি তার দাম শোধ করতে যাবেন। বেচারাম সেটা অপমান জ্ঞান করে। নতুন নয়, বরাবরের নিয়ম এই তার। অগস্তি সাহেবের মতো বাঘা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘোল খাইয়েছে—নিতে হল তাঁকে বাধ্য হয়ে।

জগবন্ধু চমকে উঠে বললেন, ঘুস নিলেন অগস্তি!

বেচারাম বলে ভেট—যতক্ষণ তার রাগের কারণ না ঘটে। খুব মান্য করেই দেয়। আপনারা ঘুস মনে করেন সে কি করবে বলুন।

অগস্তি সাহেবকে যারা জানে, ঘুস হোক আর ভেটই হোক সে দরবারে গিয়ে পৌঁচেছে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। শীতকালে হাকিমরা তখন মফস্বলে গিয়ে তাঁবু ফেলতেন। খোদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বড়-মেজ-ছোট সকল রকমের হাকিম। শাসন-বিচার হত উকিল-মোক্তারের আরজি-সওয়াল বাদ দিয়ে। আমলারাও অনেকে যেত হাকিমের সহযাত্রী হয়ে। বড় মজা সেই দিনগুলো। আহারাদির নিত্য নতুন রাজসূয় আয়োজন—এক পয়সা খরচা নেই সেই বাবদে। আশপাশের যাবতীয় জমিদার-তালুকদার গাঁতিদার-চকদার সিধা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে সকাল বিকাল। এই নিয়ে পাল্লাপাল্লি—অমুক এই সাইজের গলদাচিংড়ি দিয়ে গেছে তো অঞ্চল চুঁড়ে দেখ, তার চেয়ে বড় কোথায় মেলে। এমনি ব্যাপার। কোন আমলা এবারে কোন হাকিমের সঙ্গে যাবে তাই নিয়ে দস্তুরমতো তদ্বির চলত সদরে।

বেচারামও বরাবর ভেট পাঠিয়ে আসছে। দুনিয়ার উপর এক কাঠা জায়গাজমি নেই, ইজ্জত তবু জমিদারেরই। তার আয়োজনই সকলের চেয়ে বিপুল। দুর্জন লোক বলে তার সঙ্গে কেউ প্রতিযোগিতায় যায় না।

অগস্তি এলেন জেলার কর্তা হয়ে। বিষম নামডাক, বাঘে-গরুতে জল খায় তাঁর প্রতাপে। পৌষমাসে ফুলহাটার অনতিদূরে মাঠের মধ্যে তিনি তাঁবু ফেললেন। সদরের গোটা অফিসটাই যাচ্ছে—বড় তাঁবু ঘিরে পাঁচ-সাতটা ছোট তাঁবু।

যথানিয়ম বেচারামের সিধা গিয়ে পড়েছে। দূর দূর করে হাঁকিয়ে দিলেন অগস্তি। জিনিষপত্র কিনেকেটে এনে খাবে, রায়তের কাছ থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত কারও নেওয়া চলবে না।

চারজন লোক গিয়েছিল, ফিরে এসে কাপ্তেনের সামনে ধামাঝুড়িগুলো নামাল। অবমানিত বেচারামের মুখের উপর দাউ দাউ করে যেন আগুন জ্বলে। এলকোর মধ্যে বসে ভেট ফিরিয়ে দেয়—তার-ই চির-কালের অধিকারে হস্তক্ষেপ। হোক তাই, কিনেকেটে এনেই খাওয়া-দাওয়া করুক।

সরকারি লোক যে দোকানে যায়, মাল নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে গণ্ডগোল—মাল বেচে কোন বিপদে পড়বে। সরিয়ে

ফেলেছে। তিন ক্রোশ দূরের বড় গঞ্জ থেকে চাল-ডাল আনিয়ে তাঁবুর লোকের রান্নাবান্না হল। তিন-চার দিন চলে এই ভাবে, তারপর সেখানেও বন্ধ। পুরো একদিন শুধুমাত্র পুকুরের জল খেয়ে অগস্তিসাহেব সদরে চলে যান। কী নাকি জরুরি ব্যাপার সেখানে, এস ডি ও আসছেন অগস্তির জায়গায়।

আমলারা ব্যাকুল হয়ে গিয়ে পড়েঃ আমাদের উপায় কি করে যাচ্ছেন হুজুর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে থাকব কেমন করে?

মেজাজ হারিয়ে অগস্তি খিঁচিয়ে ওঠেনঃ কি দিচ্ছে, তোমরা কি নিলে সদর থেকে আমি কি দেখতে আসব এখানে? খবরদার, আমার কানে কখনো যেন না পৌঁছয়। তা হলে রক্ষে রাখব না।

আমলারা চোখ তাকাতাকি করেঃ পথে এসো বাপধন! বেচারামও শুনল—আমলাদেরই কেউ গিয়ে বলে থাকবে। আগের বার চার-জনকে পাঠিয়েছিল, এবারে তার ডবল—আটজন। ধামা-ঝুড়ি মাথায় দিনদুপুরে হৈ-হৈ করে তারা ভেট নিয়ে চলল।

জগবন্ধু দারোগার ব্যাপার কিন্তু এই তোলগাটুকুর মধ্যে নয়, আরও বহুদূর গড়িয়েছে। সদর অবধি। ক্রমশ সেটা প্রকাশ পেতে লাগল। সদরে পুলিসসাহেবের কাছে বেনামি চিঠি যাচ্ছেঃ দারোগা পাইকারি হারে উৎকোচ লইতেছে, যত চোর-ডাকাত তাহার শিষ্যসাগরেদ, প্রজাসাধারণ বিপন্ন—

দুর্গম ভাটি অঞ্চলে এটা নতুন ব্যাপার নয়। নিয়মই বরঞ্চ এই। দুর্জনদের হাতে রেখে খানিকটা তোয়াজ করেই কাজকর্ম চলে। ভাবখানা হল—তোমায় আমি বেশি ঘাঁটাব না, তুমিও উৎপাত বেশি করবে না। নিতান্ত নিয়মরক্ষায় যেটুকু লাগে—সরকারি ইজ্জত এবং আইনকানুনের মর্যাদা মোটামুটি বজায় রাখবার মতো। এসব বৃত্তান্ত সদরে একেবারেই যে না পৌঁছয় এমন নয়। কিন্তু কেউ মাথা গলায় না। গলাতে গেলে মাথার কাঁধ থেকে নেমে পড়ারই অধিক সম্ভাবনা। ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে জানিনে-জানিনে করেই কাজ-কর্ম চলে যায়।

এবারে অভিনব ব্যাপার। চিঠির মারফত সবিস্তারে খবর আসছে। একটা চিঠি গুটিয়ে পাকিয়ে ঝুড়িতে ফেলতে না ফেলতে পরের চিঠি। ধাপধাড়া জায়গাতেও পোস্টাপিস বসিয়ে সরকার এই সর্বনাশটি করেছেন। এক পয়সা, খুব বেশি তো দুটো পয়সার মাশুলে খবর কাঁহা-কাঁহা মুল্লুকে চলে যায়। বেচা মল্লিকের কাজ নয় —সে এত লেখাজোখার ধার ধারে না। রণক্ষেত্রে অন্যেরা এসে পড়েছেন। ঝিনুক-পোতার অনাদি সরকার জাতীয় লোকেরা।

—দারোগার জন্যই প্রজাদের ধনসম্পত্তি সহ বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ জগবন্ধুর মেয়ের বিয়ের উল্লেখঃ শিষ্যসাগরেদ পাঠাইয়া একরাত্রে এই অঞ্চলের যাবতীয় পুকুরের মাছ তুলিয়া আনিল। তাহাতেই দায় উদ্ধার হইল। মাছ-চুরির এজাহার পড়িয়াছে সেই তারিখ এবং দারোগার কন্যার বিবাহের তারিখ মিলাইয়া দেখিলেই হুজুরের বোধগম্য হইবে। ইহার পর অধিক তদন্তের কি আবশ্যক থাকিতে পারে?

ক্রুদ্ধ বেচা মল্লিকও এদিকে হৈ-চৈ লাগিয়েছে। হাঁকডাক করে বলছে, আধলা পয়সা ঘুস নেবে না বড় মুখ করে বলত। সে মুখ রইল কোথা? বলি, কালী-দুর্গা ষেণ্ঠে-মহাদেবের চেয়ে দারোগা কিছু বড় দেবতা নয়। তাঁরা অবধি বিনা ঘুসে নড়েন বসেন না—পুজোআচ্চা সিন্নি-মানত ঘুসেরই রকমফের। পুজো পেয়ে তুষ্ট হয়ে তবে একটা কাজ করে দেন। আর জগবন্ধু দারোগা, তোমার অত ডাঁট কিসের হে? অবিশ্যি, পুজোর কায়দাটা বুঝে নিতে হয় ভাল করে—কি ফুলে কি মন্ত্রে কি রকম নৈবেদ্যে কোন দেবতার পুজো। বাঁধাধরা এক নিয়মে সকল পুজো হয় না। সংসারের যত-কিছু গণ্ডগোল ঠিক জায়গায় ঠিক পুজোটি বসাতে পারে না বলেই।

কাপ্তেনের হাসাহাসি নানাসূত্রে জগবন্ধুর কানে আসে। বাদার হরিণ মেরে ঝিনুক-পোতা থানায় কোন মক্কেল দিয়ে গেছে। দারোগা অনাদি সরকার সেই উপলক্ষে জগবন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। খেতে খেতে তিনিও বললেন কথাটা। যথাযথ দরদ দিয়ে বললেনঃ নোংরা কথাগুলো আপনার নাম ধরে বলে বটে, কিন্তু ঝোঁকটা

সমগ্র পুলিস-সমাজের উপর এসে পড়ে। চুপচাপ থেকেই আসকারা পাচ্ছে, রীতিমত শাসন হওয়ার দরকার।

সহানুভূতি ও দুঃখে টগবগ করে ফুটছেন তিনি। কিন্তু জগবন্ধু লক্ষ্য করেছেন ঠোঁটের আড়ালের হাসিটুকু। হাসি যেন বলছে, কি হে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির, আমাদের কথা লোকে ঠারেঠোরে বলে, তোমায় নিয়ে যে জগঝম্প পেটাচ্ছে আকাশ-পাতাল জুড়ে।

ক্ষেপে যাচ্ছেন জগবন্ধু। ভালো থাকতে গিয়ে এই পরিণাম। ভালোকে মন্দের খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে যেন মানুষের সোয়াস্তি।

ক্ষুদিরামকে একদিন বললেন, শুনেছেন?

ক্ষুদিরাম বলে, রেখেঢেকে তো বলে না, কেন শুনব না বলুন? এক্তিয়ারের মানুষ নয়, মুখে চাবি আঁটারও জো নেই।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও জগবন্ধু ইতিমধ্যে অনেক জেনেছেন। পরগাছা বিশেষ—যে যখন দারোগা হয়ে থানায় আসে তাকেই আঁকড়ে ধরে। এই থানায় আসার প্রথম দিনটা মনে পড়ে। জগবন্ধু এলেন, কালী বিশ্বাস কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ক্ষুদিরাম ঢুকবার পথে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করল। সে-ই যেন গৃহকর্তা, জগবন্ধু অতিথি। কালী বিশ্বাসের দিকে চেয়ে একটা সাধারণ ভদ্র বাক্যেরও কার্পণ্য তখন। নতুন দারোগার মনস্তুষ্টি হবে বলে কালী বিশ্বাসের ট্যারা চোখ নিয়ে রসিকতাও করে একটু: বিশ্বাস মশায় তাকালেন চোরটার দিকে, চোর ভাবে গাছের উপরের পাখি দেখেছেন। কথাবার্তাও তাই, ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। কালী বিশ্বাসের কানে না যায়, লজ্জিত জগবন্ধু তাড়াতাড়ি এটা-ওটা বলে কথা চাপা দিলেন। অথচ জানা গেল, ঐ কালী বিশ্বাসের দিনেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দারোগার দারোগার প্রধান অমাত্য এবং সর্বকর্মে দক্ষিণহস্ত। টাকার জন্য করে তা নয়। ক্ষুদিরামের বাড়ির অবস্থা ভাল, টাকায় কোন স্পৃহা নেই। আরও একটা কথা সবাই বলে, মানুষটা বিশ্বাসঘাতক নয়। যাকে যখন সুহৃৎ বলে মেনে নেবে, প্রাণ ঢেলে দেবে তার কাজে। স্বভাবই এই রকম বিচিত্র।

এমনি ভাবে আর চলে না। জগবন্ধু ঠিক করলেন, ক্ষুদিরামের হাতের পুতুল না হয়ে কাপ্তেন বেচা মল্লিককেই শাসন করবেন সোজাসুজি। এই প্রতিজ্ঞা। মুখে চাবি আঁটার জো নেই, ক্ষুদিরাম বলে। জেলের ঘরে চাবি এঁটেই বেচারামের মুখ বন্ধ করে দেবেন। সুযোগও চমৎকার জুটে গেল—দুঃসাহসিক ডাকাতি।

(ক্রমশ)

রমণী

সুশীল রায়

মনোরমা রেণুকা শিবানী ছায়া গৌরী—সকলেই দেখা করতে আসে রোজ। গরাদের ওপাশে দাঁড়িয়ে তারা কুশল জিজ্ঞাসা করে বিন্দুর।

বিশেষ কোনো কথা বলে না বিন্দু-বাসিনী। চুপ করে চেয়ে থাকে ওদের মুখের দিকে। অপরাধিনীর মত চেয়ে থাকে সে।

কিন্তু তার কোনো অপরাধ আছে বলে সে জানে না। অথচ, তাকে এনে আটক করা হয়েছে এখানে।

"আবার পনেরো দিন বাদে বুঝি দিন পড়ল?" জিজ্ঞাসা করল শিবানী।

বিন্দুবাসিনী উত্তর দিল না। কিন্তু মন্তব্য করল গৌরী, বলল, "সবই তো জান ভাই তোমরা। কত দিন বাদে দিন পড়ল, তা তো জানই। অযথা ওসব তামাশা কেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বয়স্থা মনোরমা, শাড়ির পাড় দিয়ে ঠোঁটের পানের দাগ মুছতে-মুছতে বলল, "কম দিন হল না এ লাইনে। একটি জীবনই কাটিয়ে ফেললাম, কিন্তু এমনটি কখনো দেখিনি মাইরি। কতজন এসে আমাদেরই খুন করে গেল। কেউ বা হিংসেয় জ্বলে, কেউ বা গয়নার লোভে। কিন্তু ঘরে এসে নিজে খুন হয়ে গেল—একথা কে বিশ্বাস করবে?"

"তুমি বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু হাকিম?" ছায়া বলল, "হাকিম যদি বিশ্বাস না করে তবে তো হয়।"

"হাকিমের বিশ্বাস তো সাক্ষি-সাবুদের উপর। বিন্দুর তো কোনো সাক্ষিও নেই।" আক্ষেপের সুরে বলল মাঝবয়সী রেণুকা।

তারা দুঃখ জানাচ্ছে, আক্ষেপ জানাচ্ছে; তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, তারা একটু হাহুতাশও করছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ করে তাদের এই সহানুভূতি ও সমবেদনা সেই বিন্দুবাসিনী একেবারে নীরব ও নির্বিকার।

গরাদের ওপারে পাথরে-খোদাই-করা একটা মূর্তির মত সে অনড় ও অটল। তার জীবনে ঘটে গিয়েছে এই অঘটন, এর জন্যে অনুশোচনা সে করছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না তার মুখ দেখে। অথচ, মনে-মনে সে মানছে যে পাপ সে করে নি। যে-ব্যবসায় করে তার জীবিকার্জন তা'কে লোকে ঐ নাম অবশ্য দেয়, তাঁ দিক; তা নিয়ে তার কোনো নালিশ নেই। কিন্তু যে-ঘটনার জন্যে আজ সে এখানে বন্দিনী, সে-ঘটনার জন্যে তার কোনো অনুতাপ নেই। এর জন্যে কঠিন সাজা যদি লেখা থাকে তার ভাগ্যে, তাহলে কেবল দুর্ভাগিনী বলেই সে মনে করবে নিজেকে। এর বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এর বেশি সাজা কি তার আর দরকার আছে? এই তো খুব হল, এই তো খুব হচ্ছে। আর, ঐ লোকটা, যার জন্যে সে এই নাকাল, সেও কি সাজা কম দিয়েছে

তাকে। বেঁচে থেকে জ্বালিয়েছে, মরে গিয়েও রেহাই দিচ্ছে না লোকটা এই বিন্দুবাসিনীকে।

আর-জন্মে শত্তুর ছিল।

আর-জন্মে যে শত্তুর ছিল, এ জন্মে সে সোয়ামী হয়ে আসে নি বটে, কিন্তু বিন্দুবাসিনী তাকে বড় মান্য করত; লোকটার মান-ইজ্জত নিয়ে বড় হুশিয়ার ছিল বিন্দু। যেমন-তেমনলোক তো নয় সে, তার ঘরে আসত ব'লে লোকটা খাটো ছিল না। তার ঘরে আসে বলে কেউ তাকে খাটো মনে না করে, এইজন্যে খুব আড়াল করে রাখত তাকে বিন্দুবাসিনী।

সে যে কি ছিল, আর কে ছিল—এখন তো সবাই তা জেনে ফেলেছে। শিবানী-রেণুকা-ছায়া-গৌরী-মনোরমারা তো কাণ্ড দেখে অবাক। লোকটা মারা গিয়েছে শুনে দলে-দলে লোক এল ফুলের মালা নিয়ে, তাদের পাড়াটা মাতিয়ে দিল তারা; তাক লাগিয়ে দিল সকলকে। কেউ জানত না যে এমন লোক আসে এই পাড়ায়, কেউ জানত না বিন্দুবাসিনী এতবড় ভাগ্যবতী।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর নাম সকলেই জানেন। তাঁর মৃত্যুর খবরও

সকলেই জানেন। আমরা বলছি অধ্যাপক অপূর্বকান্তি মুস্তাফির কথা। এবার বোধ হয় ব্যাপারটা আপনাদের কাছে খোলসা হল।

তাঁর মৃত্যুর যে খবর বেরিয়েছে তাতে অনেক খবর বলা হয়নি তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্যেই। তিনি যে একজন প্রবীণ ও প্রাচীন অধ্যাপক, তাঁর সম্মান যে কেবল ছাত্রমহলেই না, তাঁর সম্মান যে অনেকটা দেশব্যাপীই—একথা নতুন করে বলার মানে হয় না। এই দার্শনিক ও আত্মভোলা অধ্যাপকের জীবনদর্শন নিয়ে অনেক পত্রিকাতেই অনেক প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তার কিছু-কিছু আপনারা পড়ে থাকবেন। যাঁরা তাঁর লেখা বা তাঁর সম্বন্ধে লেখা পড়েন নি, তাঁরাও তাঁর নাম জানেন, এবং তাঁর নামের ওজন বোঝেন—এইটুকুই আনন্দের কথা।

তাঁর মর্যাদা রক্ষার জন্যে তাঁর মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে যেসব কথা বলা হয়নি, সেই সব কথা ফাঁস করে দেবার জন্যেই যে আজ এই লেখনী ধারণ করা হয়েছে, একথা কেউ যেন না মনে করেন।

আমরা কলম ধরেছি কেবল বিন্দু-বাসিনীর কথা বলার জন্যে।

একটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে বিন্দু। মামলার বিচারে কি দাঁড়াবে, সে কথা আমরা বলতে পারিনে। কিন্তু বিন্দু এখনো বন্দিনী, সে এখন পুলিসের হেফাজতে। কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা তার বারণ।

রেণুকা - শিবানী - মনোরমারা আসে, পুলিস পাহারায় তারা গরাদের এ-পাশে দাঁড়িয়ে দেখা করে যায় তার সঙ্গে। হয়তো কোনো কথা তারা বলে, কিন্তু কোনো কথার জবাব দেয় না বিন্দুবাসিনী।

সে ভাবে, সে ভাবে তার জীবনের কথা। শিশুকালের কথা তেমন মনে পড়ে না, কৈশোরের কথাও বুঝি ভুলে গিয়েছে সে। সে ভাবে তার যৌবনকালের কথা। কি করে, কোন্ ঘটনায় বা কোন্ দুর্ঘটনায় সে এসে পৌঁছল এই জীবনে—যে জীবনকে লোকে ঘৃণা করে, অথচ সেই ঘৃণ্যজীবন যারা যাপন করে তাদের উপর লালসা যাদের প্রচুর—এসব কথা বলতে সে আর চায় না। এসব কথা সে বলেছে অনেক অনেক অনেক লোকের কাছে, অনেক অনেক অনেক রাত্রি জেগে জেগে; সেসব কথার বেশির ভাগই বানানো, যে যেমনটি শুনলে খুশি হয় তার কাছে তেমনটি করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা। তার জীবন দুনিয়ার মানুষের কাছে ঘৃণ্য হতে পারে, কিন্তু তার নিজের কাছে তার জীবন একটা বিস্ময়। কখনো দুঃসহ, কখনো ক্লান্তিকর, কখনো-বা অসহ্য ঠেকেছে বটে নিজের জীবনটা; অথচ তখনই সে ভেবেছে সে যদি তার জীবন কাটাত একটা কুলবধূ হয়ে, তবে লোকের কাছে হয়তো কিছুটা মানমর্যাদা পেত, কিন্তু তার লোকসান হয়ে যেত বিস্তর।

আর্থিক লোকসানের কথা ভাবছে না বিন্দু। সে ভাবছে অন্য কথা। সে ভাবছে—জীবনে এত মানুষ দেখা হত না, এত বিচিত্র মানুষ।

অনেক দেখেছে সে, অনেক জেনেছে। দেখতে-দেখতে আর জানতে-জানতে তার যৌবনের দিন-ক'টা প্রায় পার হব-হব করছে, এমনি একদিন রাত্রে তার দরজায় কে-যেন টোকা দিল।

খোঁপাটা জড়িয়ে নিয়ে, গায়ের কাপড় একটু সামলে, দরজা খুলে দাঁড়াল বিন্দু।

দরজার ওপারে এক প্রবীণ পুরুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, হাতে লাঠি, কাঁচা-পাকা গোঁফ দিয়ে উপরের ঠোঁট একটু ঢাকা, মোটা চশমায় চোখ-দুটোও ঝাপসা।

খুব চেনা-চেনা লাগল বিন্দুর এই লোকটাকে। বলল, "আসুন।"

ঘরে নিয়ে সমাদর করে তাকে বসাল বিন্দু। তার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

তাকিয়ার উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে অপূর্বকান্তি বললেন, "হাসছ যে!"

"খুব চেনা লাগছে। তাই। এর আগে এ-ঘরে কখনো আসা হয়েছিল?"

"উঁহু।"

"তবে, এ পাড়ায় অন্য কোনো ঘরে?"

"না তো।"

তবে এত চেনা লাগার মানে? বিন্দু অনেকক্ষণ ধরে ভাবল।

অপূর্বকান্তি গলার চাদরটা নামিয়ে বললেন, "এসো, বোসো।"

তাঁর গায়ের উপর গা এলিয়ে বসে পড়ল বিন্দু।

সে আজ বারো বছর আগের ঘটনা।

অপূর্বকান্তিকে অমন চেনা লাগার কারণ বুঝতে বেশিদিন সময় লাগল না বিন্দুর।

কাগজে-কাগজে এই মুখটার ছবি ছাপা হয়েছে কতবার, কতবার তা চোখে পড়েছে বিন্দুর।

যেদিন পুরো পরিচয়টা বিন্দু জানতে পারল, সেদিন অহঙ্কার যেন তার ধরে না। তার জীবন তার কাছে বুঝি ধন্যই না, তার জীবন তার কাছে যেন মান্যও হয়ে উঠল।

বিন্দু শাড়ির আঁচলটা ঘাড়ের উপর পেঁচিয়ে নিয়ে বলল, "আপনিই তিনি?"

অপূর্বকান্তি হেসে বললেন, "আমিই আমি।"

সে তো বারো বছর আগেরই কথা হল।

অপূর্বকান্তি বলেছিলেন, মনে পড়ে বিন্দুবাসিনীর—তিনি বলেছিলেন, "তুমি বুঝি কাগজপত্র পড়?"

"পড়িই তো! রাতের বেলা তো আসেন আপনারা। সারাটা দিন করি কি? মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক—যখন যা জোটে পাতা ওলটাই।"

"তুমি এমন পণ্ডিত, তা জানলে তো আসতাম না হে তোমার কাছে। আমি ফাঁস হয়ে গেলাম?" অপূর্বকান্তি বুঝি আতঙ্কের সঙ্গেই বলেছিলেন।

তাঁর কথা শুনে বিন্দু হেসেছিল, বলেছিল, "আমার কাছে হোক-না ফাঁস। আর কারও কাছে ফাঁস না হলেই তো হল?"

বারো বছর আগের সেই কথা রক্ষা করতে গিয়েছিল বিন্দুবাসিনী। আজ তাই বুঝি সে ফাঁসির আসামী।

এই বারোটা বছর প্রতি রাত্রে অপূর্ব-কান্তি নিয়মিত এসেছেন। রাত্রি দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর দরজায় তাঁর হাতের টোকা পড়ত। রাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা টেনে দিয়ে বিদায় নিতেন অপূর্বকান্তি মুস্তাফি।

ইদানীং বড় ক্লান্ত বড় অবসন্ন আর বড় বিষণ্ণ দেখাত অপূর্বকান্তিকে।

"শরীর ভালো না বুঝি?" জিজ্ঞাসা করত বিন্দুবাসিনী।

লাঠিটা দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতে-রাখতে, গলার চাদরটা বিন্দুর হাতে দিতে দিতে অপূর্বকান্তি বলতেন, "আর কতদিন ভালো থাকবে শরীর। বয়সটা হল কত?"

"ষাট ষাট।" পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বিন্দুবাসিনী বলেছেন, "ও কথা ভাবতে নেই। বয়সের গাছপাথর নেই, এমন কত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ আর এমন কী বয়স হয়েছে?"

হাসতেন অপূর্বকান্তি। কথাটা যে হাসির, সেজন্যে হয়তো নয়; এ ধরনের কথা এসব তল্লাটে শোনা সহজ না, তবু সেই কথা এমন আন্তরিকভাবে বলায় তাঁর একটু হাসি পেত। হাসি পেত হয়তো নিজের কথা ভেবেই। চোদ্দ বছর আগে বিপত্নীক হয়েছেন তিনি। একটা অভ্যস্ত জীবন থেকে একটা অভ্যাস সরে যাওয়ায় কেমন ফাঁকি আর ফাঁকা ঠেকত নিজেকে। সেই ফাঁক পূরণ করতে গিয়ে তিনি বুঝি পড়ে গিয়েছেন একটা ফাঁদে। হয়তো এই কথা ভেবেই হাসি পেত তাঁর।

বিন্দু বলেছে, "নিজের কথা ভেবে আমার হাসি পায়। কত নাম আপনার, কত সম্মান। আর, আপনি কিনা আমার কাছে? এটা বুঝি আমার ভাগ্য।"

দুজনেই হয়তো দুজনের ভাগ্য ভাগাভাগি করতে থাকে। এটা আমাদের কাছে হয়তো খুবই হাস্যকর ঘটনা, কিন্তু ওদের কাছে এ ব্যাপারটা কিছুতেই হাসির না।

তেমহলা বাড়ির নীচতলার একটা ঘর বিন্দুর। অপূর্বকান্তি চলে যাবার পর অনেকদিন মনোরমারা হুটপাট করে এসে ঢুকেছে তার ঘরে দোতলা-তেতলার ঘর থেকে। এসেই জিজ্ঞাসা করেছে, "কে আসে রে রোজ ওই বুড়োটা। কিসের সোয়াদে অতটা সময় কাটাস তুই ওর সঙ্গে?"

বিন্দু হেসেছে, বলেছে, "আমিও তো জোয়ান নই রে আর। বয়স কত হল?"

"ষাট, ষাট। বালাই বালাই।" মনোরমা বিন্দুর থুতনিতে হাত দিয়ে বলেছে, "মেয়েমানুষের আবার বয়স আছে নাকি? যতদিন জীবন ততদিন যৌবন।"

কে এসেছে তার ঘরে তা কেউ জানে নি। এতটা কাল ধরে বিন্দু আগলে রেখেছিল। কিন্তু, তার আক্ষেপ এই, শেষ পর্যন্ত—

হাকিম বললেন, "কি হল শেষ পর্যন্ত খুলে বলো।"

আজ আবার আদালতে হাজির হতে হয়েছে তাকে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে বিন্দুবাসিনী।

ওপাশে সার বেঁধে বসে আছেন জুরির দল। এক পাল বুড়ো। ওঁদের মুখের দিকে চেয়ে অপূর্বকান্তির কথা মনে হল বিন্দুর। ঠিক অমনি বুড়ো হয়েছিলেন তিনি।

হাকিমের হুকুম শুনে বিন্দু বলল, "আমি তাঁকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। প্রাণে বাঁচাতে পারব না জানি। মানে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।"

উকিল ধমক দিয়ে বললেন, "হেঁয়ালি রেখে দাও। কি হল বলো।"

"অত মানী লোক। তাঁর মান বাঁচাতে—"

আবার ধমক দিলেন উকিল, কথার সোজাসুজি উত্তর চাইলেন।

বিন্দু বলল, "বড় অসুস্থ ছিলেন কয়েকদিন থেকে। আসতে আমি বারণ করেছি। কথা শোনেন নি। সেদিন রাত্রে ঘরে ঢুকেই হাঁফাতে লাগলেন। পাখার হাওয়া দিলাম। চোখে-মুখে জল দিলাম। একটু পরে দেখি, সাড়া নেই শব্দ নেই, সব ঠান্ডা।"

"অসম্ভব অবিশ্বাস্য।" বাধা দিয়ে উঠলেন উকিল।

হাতুড়ি পিটে হাকিম বললেন, "বলো।"

বিন্দু বলল, "রাত তখন সাড়ে দশটা। কি করব ভেবে পেলাম না। বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, অমন মানী লোকের মান বাঁচাবার জন্যে কি করব ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে বেজে গেল রাত দুটো। নিষুতি হয়ে এল পল্লী। পানের দোকানের আলো নিবল। আমি ঐ ধড় টেনে তুলে নিয়ে—"

"কেন? হোয়াই?"

"একটু দূরে রাস্তার মোড়ে শুইয়ে রেখে আসার জন্যে—"

"আনবিলিভেবল। অবিশ্বাস্য।"

বিন্দু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল যে, মারা তো তিনি গেলেনই, কিন্তু তার ঘরে তাঁর মৃত্যু ঘটল—এটা সকলকে জানিয়ে লাভ। তাঁর মত মানুষের কি তাতে মান বাড়বে?

অট্টহাস্য করে উঠল আদালতে জমায়েত জনতা। মনোরমা-শিবানী-রেণুকা-ছোট গৌরীর দল কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বিন্দু একটু দম নিয়ে বলল, "একটুর জন্যে ধরা পড়ে গেলাম। টহলদারি পুলিস আমাকে দেখে ফেলল। যা ফাঁস হবে না ভেবেছিলাম, তা ফাঁস হয়ে গেল ধর্মাবতার!"

উকিল বললেন, "একেবারে সত্যি কথার মত শোনাচ্ছে, মাই লর্ড। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দি স্টেটমেণ্ট ইজ ফল্‌স্‌ অ্যান্ড ফেব্রিকেটেড।"

জুরিদের নিয়ে হাকিম তাঁর খাস কামরায় চলে গেলেন পরামর্শের জন্যে। আমরাও আর অপেক্ষা না করে আদালত ত্যাগ করলাম।

মামলার রায় কি হল, সে কথা আর লিখে লাভ নেই। খবরের কাগজে আপনারা তা দেখেছেন।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

শাঁসালো জর্মনি

এ রকম ধন-দৌলতের ছড়াছড়ি আমি এ-জীবনে কখনো দেখি নি!

ত্রিশ বত্রিশ বছর ধরে ইয়োরোপ যাওয়া-আসা করছি। সব-কিছু দেখেশুনে মনে হয়েছে, ধনদৌলত এবং তার বণ্টন-ব্যবস্থা সুইটজারল্যাণ্ডেই সব চেয়ে ভালো। ১৯২৯।৩০ সালের কথাই ধরুন। ইংলণ্ডের তখন প্রচুর কলনি, বিস্তর দৌলত বিদেশ থেকে আসছে। সুইটজারল্যাণ্ডের কলনি নেই; সে পয়সা কামায় মালপত্র রপ্তানী করে। কিন্তু ইংলণ্ড বেশী ধনী হওয়া সত্ত্বেও তার সে ধনের অনেকখানি চলে যায় গুটিকয়েক পরিবারের কাছে, কিন্তু সুইট-জারল্যাণ্ডে সে ধনের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় অনেক বেশী ধর্মানুমোদিতরূপে। সে-দেশেও লক্ষপতি কোটিপতি আছে, কিন্তু তার অধিকাংশ ধনের হিস্যা পায় আপামর জনসাধারণ।

ফ্রান্স খুব ধনী দেশ নয়। কিন্তু সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত দেশ।

আর জর্মনি যেন জুয়াড়ীর দেশ। কখনো তার সামনে স্তুপোহয়ে টাকা আর কখনো সে লাটে উঠি উঠি করছে। কখনো রেস্তরাঁ-কাবারে গমগম করছে, কখনো রাস্তায় রাস্তায় জোয়ান মেয়ে-মদ্দ কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একেবারে যখন তার দুর্দিন প্রায় চরমে তখন ১৯২৯ সালে প্রথম আমি জর্মনি যাই। তার দুরবস্থা চোখে পড়ল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ করলুম যে, এরা একদিন রীতিমত ধনী ছিল। ঘরের আসবাবপত্র সেই প্রাচীন দিনের খানদানী মজবুৎ এবং রুচি-সংগত। ওয়ালপেপার, পর্দা, টেবিলক্লথ পুরনো হয়ে এসেছে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় এগুলো দামী এবং একদা এরা বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। ১৯২৯-এ কিন্তু বিপর্যয়ের পালা।

আর ১৯৬২তে দেখি—দাঁড়ান একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বাঙলায় যখন বলি, 'অমুক কাকের ছানা কিনছে' তার অর্থ সে দু হাতে পয়সা ওড়াচ্ছে। জর্মনে বলা হয়, সে জানলা দিয়ে পয়সা ছুড়ছে।

এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রাক্তন মন্ত্রী সম্বন্ধে নানা রকমের আহাম্মুখীর কেচ্ছা শুনতে পাওয়া যায়। জর্মনভাষা-ভাষী দেশগুলোতে আহাম্মুখের রাজার নাম পলাডি।

ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পলাডি দেখে এক দুদিনের চ্যাংড়া ছোকরা জব্বর দামী একখানা স্পোর্টস মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছে। পলাডি শুধোলে, "ক ও?' ল্যাণ্ডলেডি বললে, 'রেখে দিন ওর কথা। বাপ মরেছে। ছোকরা দেদার টাকা পেয়েছে। এখন জানলা দিয়ে পয়সা ছুড়ছে।'

পলাডি বেজায় উত্তেজিত হয়ে বার বার শুধোয়, 'কোথায় থাকে সে? ঠিকানা কি?'

এবারে জর্মনি গিয়ে দেখি, সবাই জানলা দিয়ে টাকা ছুড়ছে। কুড়োবার লোক নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট, জর্মনির কুত্রাচ কোনো রেল স্টেশনে আর পোর্টার, মুটে নামক নিরতিশয় প্রয়োজনীয় প্রাণীটি নেই। আমারই চোখের সামনে আমারই আড়াই মণী টৈয়া লাশ ভাতিজা নামল এক ঢাউস সুটকেস নিয়ে। মুটে নদারদ। ওপারে যেতে হবে ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে। বাবাজী সুটকেস টানছে আর বনাত্ত, মোটা সুটকেসে ভাগভাগি করে নিয়ে এলে [illegible] ব্যালান্সড হয়ে চলতে পারেন। বাবাজী ওপারে যখন পৌঁছলেন তখন পিঠের ঘাম কোটের বাইরে চলে এসেছে — সেদিন সে-সন্ধ্যায় টেম্পারেচার ছিল [illegible] থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। ধকল কাটাতে বাবাজীর খেতে হয়েছিল তিন লিটার বিয়ার। অবশ্য জর্মনিতে বিয়ার সস্তা।

আর দাসী চাকরানী? তবে শুনুন।

সবসুদ্ধ আটটি পরিবারে ডিনার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ খেয়েছি—কারো বাড়িতে দাসী দূরে থাক, একটি হেল্পিংহ্যাণ্ডও দেখতে পাইনি। কেন নেই, সেই প্রশ্ন শুধালে পর আমার অধ্যাপকের বিধবা বললেন, 'মেড, তা রাখা যায় বই কি! চার শ পাঁচ শ টাকা মাইনে। তাঁকে একখানা ঘর দিতে হবে—রেডিয়োটা অবশ্য তিনি নিজেই আনবেন সিনেমায় ক'দিন যাবেন, ছুটি ক'দিন দিতেই হবে সেটাও আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া হবে, পাকাপোক্ত। তারপর তিনি নেমে এলেন রান্না ঘরের কাজে—নখে ঝাঁ চকচকে নেলপালিশ, এই মাত্র লাগানো হয়েছে, এখনো পেণ্টের গন্ধ বেরুচ্ছে তাই কাজ করেন অতি সন্তর্পণে, পাছে বার্নিশে জখম লাগে। খানিকক্ষণ বাদে দেখবে তিনি নেই। বিবি আপন কামরায় গেছেন সিগারেট খেতে। সেটা দিনে ক'বার হয় না হয় সে তোমার কপাল। তার উপর মোটা দড় কাজ তিনি করবেন না—যেমন ধরো, জানলার শার্শিগুলো জল দিয়ে মোছা পোছা। তার জন্য সপ্তাহে একবার ক'রে তোমাকে অন্য লোক আনাতে হবে। কি হবে অত সব বয়নাক্কার ভিতরে গিয়ে।'

* *

ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধোলুম, 'ওটা কি

ছে?' দেখি হামবুর্গের মত শহরে—যেখানে কি না প্রতি ইঞ্চি জমি মহামূল্যবান—সেখানে এক জায়গায় হাজার খানেক মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বললে, 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড্ কার্। একটা কিনবেন? মাত্র হাজার থেকে আরম্ভ। গত বছর, জোর আগের বছরের মডেল। টিপ্-টপ্ কণ্ডিশন। পেট্রল-টেট্রল ভর্তি। দুটি কথা কইবেন—সাঁ করে তেড়ে হেঁকে বেরিয়ে যাবেন।'

বলতে না বলতে সে ঢুকে গেছে ঐ মোটরের মেলায়। ওর কথা ঠিক। গাড়ি-গুলো যেন কাল পরশু কেনা। আমি শুধোলুম 'তা গাড়িগুলো এই খোলামেলায় জলঝড় খাচ্ছে?'

বললে, 'ঐ তো, স্যর, রগড়। হামবুর্গে গাড়ি পাবেন সহজে—গারাজ পাবেন খুব যদি কপালের জোর থাকে।' তারপর শুধোলে, 'আপনার দেশে হাল কি রকম?'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশের অনেক লোক পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে'।—পূর্ব-জন্মটা কি চীজ্ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলতে হল। শেষ করলুম এই বলে, 'সেই পূর্বজন্মে যদি অশেষ পুণ্য করে থাকো, তবে এ জন্মে তোমার কপালে মোটর থাকলে থাকতেও পারে। মোটরই যখন নেই তখন গারাজের তো কথাই ওঠে না।'

পরের ঘটনা, কিন্তু এই সংবাদে বলে ফলি। এর কিছু দিন পর গিয়েছি সেই বন্ শহরে যেখানে ছাত্রজীবনের কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেতে দেখি, সামনে অগুনতি মোটর। আমার সতীর্থ—এখন নামজাদা ব্লিস্টার—সঙ্গে ছিল। শুধোলুম, 'পরবটরব আছে নাকি রে? হ্যার আডেনাওয়ার এলেন নাকি? তিনি না কাছেপিঠে কোথায় যেন থাকেন?'

শুধোল 'কেন?'

'ঐ যে অত মটর গাড়ি।'

'সে তো স্টুডেণ্টদের।'

বলে কি! ত্রিশ বত্রিশ বছর পূর্বে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ' তিনেক অধ্যাপকদের ক'জনার মোটর গাড়ি আছে আমরা আঙুলে গুণে বলতে পারতুম। আর আজ!

হামবুর্গে ফিরে যাই।

আমার এক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন আমার চেয়ে বছর পনেরো বড়। তিনি যুদ্ধের পর গত হন। উঠেছিলুম তাঁরই বিধবার বাড়িতে। তাঁরই এক মেয়ে কথায় কথায় বললে, 'জানেন আজকাল এ দেশে অনেক ছেলে মেয়ে স্টুডেণ্ট থাকাকালীনই বিয়ে করে ফেলে। কর্তাগিন্নী চললেন মোটর হাঁকিয়ে কলেজে—যেমন মনে করুন মেডিকেল কলেজ। পিছনের সীটে একটি বাচ্চা, কোলে আরেকটি। কলেজে পৌঁছে ছোটটি রাখলেন ধাইয়ের জিম্মায়, অর্থাৎ ক্রেশে। বড়টা গেল বাগানে খেলতে।'

ওদের খেলার জন্য নাকি স্পেশাল বাগান আছে। সত্যি আছে কি না সেটা আমি চেক্ আপ্ করার সুযোগ পাইনি। তবে এ-কথা সত্য এখন বেশ-কিছু ছেলেমেয়ে পাঠাবস্থাতেই বিয়ে করে।

বললুম, 'আগে তো এরকম ছিল না, এখনই বা হল কি করে?'

বললে, 'আগে বাপমায়ের এতটাকা ছিল কোথায় যে ছেলেকে বলবে 'তুই বিয়ে কর। নাতি পোষার পয়সা আমার আছে।' আমিও বলি, সেই যখন বিয়ে করলেই একদিন তখন শুকিয়ে শুকিয়ে বুড়ো-ভাটাটি হয়ে যাবার কি প্রয়োজন?'

আমার মনে পড়ল এক বিয়েতে স্বর্গতা ইন্দিরা দেবী একটা জোয়ান ছোকরাকে বললেন, 'দেখ দিকিনি, ছেলেটা কি রকম বুদ্ধিমানের মত বিয়ে করে ফেলল। তোরা তো পিত্তি না চটিয়ে খেতে পারিসনে।'

কিন্তু এ স্থলে বলে রাখা ভালো, জর্মনিতে কোনো ছেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে বাপের সঙ্গে থাকে না—ভিন্ন বাসা বাঁধে।

অতএব বাপ দুটো সংসার পুষবে। এন্তের টাকা না থাকলে পারে কেডা?

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি এই ভারতবর্ষে বাল্য বিবাহে আমরা পৌঁচেছিলুম এই পদ্ধতিতেই—ধাপে ধাপে! কারণ জানি, অতি প্রাচীন যুগে এদেশে বাল্যবিবাহ ছিল না। তারপর বোধ হয় হঠাৎ একদিন আমাদের ধনদৌলত বেড়ে যায়—আজ যে-রকম জর্মনিতে। তখন আমরাও ছেলেছোকরাদের বিয়ে দিতে লাগলুম, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবার পূর্বেই। ক'রে ক'রে, আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে গৌরীদান!

এ পৃথিবীতে নূতন কিছুই নেই।

নন্দকুমারের চিঠি

চিত্তপ্রিয় মিত্র

বাঙ্গালী ঘরের এক সাধারণ ব্যক্তি **নিজের প্রতিভা** ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় **সমাজের উচ্চ হইতে উচ্চতর** স্তরে **আরোহণ করিয়া স্বার্থান্বেষী** ও ঈর্ষা-**পরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের** চক্রান্তে বহু নির্যাতন **ও অত্যাচারের** মধ্যেও কি ভাবে বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিতে পারে নন্দকুমারের জীবনী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার আচরণে বাঙ্গালী চরিত্রের পরিচয় পাইয়া ভবিষ্যৎ-দর্শী ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ও শাসকগণ বাঙ্গালীর প্রতি সেই সময় হইতেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখিতে যত্নবান হন।

নন্দকুমারের বিচারের শেষে তাঁহার সুযোগ্য ইংরেজ এডভোকেট মিঃ ফেরার দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আপনার স্বদেশ-বাসীরাই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনার জীবননাশের সহায়তা করিয়াছে।" কলিকাতার কারাগার হইতে তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে লিখিত পত্রের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না করা গেলেও আংশিকভাবে যাহা বোধগম্য হয় তাহার মর্মার্থ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল। "......শ্রীরায় জগৎচন্দ্র থাকিয়া আপনাদিগের মতলব মাফিক বেগম-সাহেবার......শ্রীযুক্ত বড়সাহেবকে লেখাইয়াছে।......জানিতে পারিবে জগৎচন্দ্র রায়ের বুদ্ধিতেই হইতেছে......।"

উল্লিখিত জগৎচন্দ্র রায় নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্মানীর স্বামী। হিংসা ও স্বার্থের জন্য তিনি নন্দকুমারের ও গুরুদাসের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলেন। কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজরা এই গৃহবিবাদের সুযোগ লইয়া নিজেদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। সিরাজের বিরুদ্ধে মীর্জাফর এবং মীর্জাফরের বিরুদ্ধে তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে অনুরূপ অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে প্ররোচনা দিয়া ইংরেজরা তাঁহাদের জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করেন। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে একটা সমূহ বিপদ আশঙ্কা ও জরুরী অবস্থার আভাস পাওয়া যায়।

পত্রে নন্দকুমার আরও লিখিয়াছেন—"......১৭ রোজ রাত্রের পর ২০ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম।........তাহার দুষমনকে নিরস্ত করিব। কমবক্ষ্য পায় ......৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকার হুণ্ডি রাতে বেরাতে এথা পাঠাইবে.....বাক্যার্থ লোকসান না হয়।......"

"দুষমনকে নিরস্ত করিব" এই আপোস-হীন উক্তি তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। '১৭ রোজ রাত্রের পর ২০ রোজ রাত্রে' এই কথায় বুঝা যায় যে, মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় ডাক আসিতে চারদিন সময় লাগিত। পত্রের সারাংশ এইরূপঃ নন্দকুমার কলিকাতার কারাগারে আবদ্ধ। তাঁহার জামাতা শ্রীজগৎচন্দ্র রায় নিজ মতলবমত নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বেগমসাহেবা মনিবেগমকে প্ররোচিত করেন। মামলার কৌশুলী ও প্রধান সাহেবের জন্য ৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন। জেলে থাকিয়া এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুত্র গুরুদাসকে এই অর্থ অবশ্য সংগ্রহ করিয়া অতি সত্বর পাঠাইতে বলা হইয়াছে। মিঃ কোম, মিঃ জাক্সারসন, মিঃ জেকেরন, মিঃ মিডিলটন প্রভৃতি সাহেবের নাম এই পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় ঐসব ইংরেজ তাঁহার সপক্ষে ছিল। মিস্টারকে লেখা হইয়াছে 'মেস্তর'। 'বড়-সাহেব' ও 'প্রধান সাহেব' আখ্যায় কয়েকবার সম্বোধন করিয়া সম্ভবত গভর্নর সাহেবকেই বুঝাইয়াছেন। তিনি জানিতেন বড়-সাহেবরা উপঢৌকনস্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। পুত্র গুরুদাসের চাকুরীর জন্য হেস্টিংস সাহেব প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

। পুত্র গুরুদাসকে লিখিত নন্দকুমারের চিঠি

পত্রের অন্য একটি দিক হইতেছে বাঙ্গালী চরিত্রের মাধুর্য। পুত্রকে 'প্রাণ-প্রতিমেষু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রথমেই 'শুভাশীর্বাদ' জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পরিশেষে মঙ্গল সংবাদ চাহিয়া পরম সুখী করিতে বলা হইয়াছে। চিঠির শিরোনামায় 'শ্রীশ্রীহরি-শরণম' ও মাঝে মাঝে 'শ্রীশ্রী' নাম উল্লেখে তাঁহার ধর্মানু-রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দকুমারের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষের কারণ মানুষের পর শ্রীকাতরতা। নন্দকুমার কোন রাজা, মহারাজা বা জমিদা বংশসম্ভূত ছিলেন না। বিত্ত-শালী ব্যবসায়ী ধনকুবেরে গৃহেও তাঁহার জন্ম হয় নাই সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীব পরিবারে প্রতিপালিত হই তিনি নিজের চেষ্টায় দেশে একজন প্রধান নেতৃস্থানী ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তখনকা দিনে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণে সাধারণত কুঁড়েঘরে বাস করি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। বারে শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মত তাঁহা জমিদারী ভাবাপন্ন ছিলেন ন তাঁহার পিতামহ রামগোপা রায় (চট্টোপাধ্যায়) মথুরান মজুমদারের কন্যাকে বিব করিয়া জঙ্গীপুরের অন্তর্গ পারলু গ্রামের বাস্তুভিটা ত্য করিয়া নলহাটির ভদ্রপুরে ব করিতে থাকেন। সমসাময়ি কালে বাস্তুভিটা ত্যাগ ব বৈষয়িক অসচ্ছলতার প্র দিত এবং বংশমর্যাদারও হ হইত।

জুজুঘাটার রাজবাড়ি ফটো: বাদল সরকার

আনুমানিক ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পদ্মনাভ মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের ফতেসিং, ঘোরাঘাট ও শতসৈকা পরগণার ভারপ্রাপ্ত নায়েবের কাজ করিতেন। নন্দকুমার প্রথমত পিতার অধীনে ঐস্থানে তহশীলদার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। আলীবর্দী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজ প্রভু নবাব সরফররাজ খাঁকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাংলার মসনদে বসিলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের নিকট তিনি অতি হেয় প্রতিপন্ন হন। আভ্যন্তরীণ স্বধর্মীয় বিদ্রোহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নন্দকুমার হিজলী ও মহিষাদল এলাকায় আমীনের পদপ্রাপ্ত হন। সেই সময় লুণ্ঠনকারী মারাঠাবর্গী বাহিনীর উপর্যুপরি অতর্কিত ও তড়িৎ আক্রমণে বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্বের মূলে ঘুণ ধরাইয়া দেয়। অধিকন্তু পাঠান সেনাপতি ও মোগল অধিনায়কদের বিদ্রোহে অনন্যোপায় হইয়া প্রজাদিগকে নিজ নিজ ধনপ্রাণ ও মানমর্যাদা রক্ষাকল্পে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নবাব আহ্বান জানাইলেন। এই কারণে নবাব আলীবর্দী জমিদারদিগকে দুর্গ নির্মাণ, পরিখা খনন, সৈন্য সংরক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের অবাধ ব্যবহারের সুযোগ দেন। এই সুযোগে হিন্দুদের মনে ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনা জাগিল। দেশের এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন নন্দকুমারের মনেও রেখাপাত করে এবং তাঁহাকে নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা করিয়া তোলে। বর্গীর হাঙ্গামায় কৃষি ও

ভদ্রপুরে নন্দকুমারের প্রাসাদ
ফটো: শ্যাম বিশ্বাস

শিল্পে বিঘ্ন ঘটিলে নন্দকুমার সর্বস্বান্ত প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা সমীচীন মনে করেন নাই। রায় রায়ান চিন্ময় রায় এই কারণে নবাবসমীপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া নবাবের আদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদ পাঠাইয়া দেন। পদ্মনাভ নিজ তহবিল হইতে বাকী খাজনা পরিশোধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন।

নন্দকুমার জীবিকার প্রত্যাশায় হুগলী আসিলেন। কলিকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে তখন ভবিষ্যতের এক বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পটভূমিকা রচিত হইতেছে। কলিকাতার ইংরেজ, চন্দননগরের ফরাসী, ব্যাণ্ডেলের পর্তুগীজ, চুঁচুড়ার ওলন্দাজ, শ্রীরামপুরের দিনেমার, বাঁকী বাজারের জার্মান ও নানাস্থানের আর্মেনীয়ান বণিকেরা দৈনন্দিন প্রয়োজনে হুগলীর ফৌজদার ও দেওয়ানের নিকট প্রতিনিয়ত আনাগোনা করিত। নন্দকুমারের সংস্কৃত ও ফার্শীভাষায় পারদর্শিতা ও জমিদারী সংক্রান্ত কার্যের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় ঐ সকল বিদেশী বণিকগোষ্ঠী হুগলীর ফৌজদারের নিকট নানা কারণে আবেদন নিবেদন করিবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত। এইরূপে বিদেশীয় বণিকদের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। তাঁহার কর্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার বেগ খাঁ তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় সিরাজদ্দৌল্লা আলীবর্দীর প্রতিনিধি হিসাবে হুগলী পরিভ্রমণকালে প্রথম দরবার করেন। ইংরেজেরা নন্দকুমারের মাধ্যমে সিরাজকে ও ফৌজদারকে বহু উপঢৌকন দেন। নন্দকুমারকেও উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়া হয়। সময় সময় ফৌজদারের সাময়িক অনুপস্থিতিতে নন্দকুমার অস্থায়ী ফৌজদাররূপে কার্য চালাইতেন। নবাবী আমলে হিন্দুরা দেওয়ানী বিভাগে, মুসলমানরা শাসন সংক্রান্ত কার্যে ও নবাবের আত্মীয়স্বজন বা

সম্ভ্রান্ত বিদেশী মুসলমানরা ফৌজদার অথবা মিলিটারী গভর্নরতুল্য কার্যে নিযুক্ত হইতেন। নন্দকুমারের পদোন্নতি দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলেই ঈর্ষার চোখে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলাদেশে কোন হিন্দুর ফৌজদারপদপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এই নিয়োগে তাঁহার পদমর্যাদা ব্রাহ্মণ সমাজপতি নদিয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকেও হার মানাইয়াছিল, হুগলীর ফৌজদারের আদেশ নদীয়া ও বর্ধমান প্রভৃতি জমিদারদের উপর প্রযোজ্য হইত।

সিরাজউদ্দৌল্লা কলিকাতা অবরোধ করিলে ইংরেজরা ফলতার দক্ষিণে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। চন্দননগরের ফরাসী ও ব্যাণ্ডেলের ওলন্দাজেরা সিরাজের আহ্বানে কেহই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় নাই। ঐ সময়ে নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিয়া সিরাজ গৃহশত্রুদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য মনোনিবেশ করেন। নন্দকুমার সিরাজ কর্তৃক কলিকাতার পরিবর্তিত নাম আলীনগর অনুসারে আলীগড় দুর্গ নির্মাণ করেন এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন এলাকায় পুরাতন টানার দুর্গের সংস্কার করেন। গঙ্গাবক্ষে নানা স্থানে স্তূপীকৃত ইট ও বড় বড় গাছ ফেলিয়া ইংরেজদের পুনরাগমনে বাধার সৃষ্টি করেন। সিরাজের ভাই পূর্ণিয়ার নবাব সৌকতজঙ্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ দাবী করিলে সুযোগ বুঝিয়া ক্লাইভ ও ওয়াটসন তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিতে সাহসী হন এবং হুগলী শহর বিধ্বস্ত করিয়া ব্যাণ্ডেলের দিকে অগ্রসর হন। নন্দকুমার ব্যাণ্ডেলের নিকট ইংরেজদের বাধা দিয়া ইংরেজ সেনাপতি কূটকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের বাংলাদেশ আক্রমণ আশংকায় সিরাজ অপমানজনক শর্তে ইংরেজদের সঙ্গে আলীনগরের সন্ধি করিতে বাধ্য হন (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ)। জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য সিরাজ নন্দকুমারের অধীনে হুগলীতে দশ হাজার অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই ইংরেজ ও নবাব উভয়েই উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে সাহায্য করিবেন বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হন। ইওরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ইংরেজরা এই দেশে নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফরাসী চন্দননগরের দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। নবাব কর্তৃক ইংরেজ ও ফরাসী উভয় শক্তিকে তোষণনীতির জন্য নন্দকুমার কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া দুই বিদেশী শক্তির যুদ্ধের গতিবিধি দেখিবার জন্য নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১১ই জুলাইর চুক্তি অনুসারে নবাবকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করা উচিত ছিল। ইংরেজরা টেরানু নামক একজন বিশ্বাসঘাতক ফরাসী সৈন্যের সহায়তায় চন্দননগর দুর্গের গুপ্তপথের সন্ধান পাইয়া অনায়াসে ফরাসী দুর্গ অবরোধ করিতে সক্ষম হয়। ফরাসীরা এত সহজেই পরাজিত হইবে ইহা নন্দকুমার ভাবিতেই পারেন নাই। অর্মে সাহেবের মতে ক্লাইভ উমিচাঁদের মাধ্যমে নন্দকুমারকে ১২০০০, টাকা ঘুষ দিয়া নিরপেক্ষ থাকিতে প্ররোচিত করেন। ফৌজদারের বাৎসরিক বেতন ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। এই সামান্য টাকার লোভে নন্দকুমার আত্মবিক্রয় করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। নবাবের সুনজরে থাকিবার জন্য ও বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্য হুগলীর ফৌজদার এমন কি হুগলীর দেওয়ানকেও ইংরেজরা প্রায়ই বহু অর্থ নজরানারূপে প্রদান করিত। সমসাময়িক মুসলমান লেখক গোলাম হোসেন নন্দকুমারকে চক্রান্তকারী আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণের কথা বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। 'রিয়াজুল সালাতিনে'-ও এ কথার উল্লেখ নাই। যাঁহার অন্ধকূপ হত্যার ন্যায় অলীক কাহিনী রচনা করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে নন্দকুমারের নামে মিথ্যা উৎকোচ গ্রহণের অভিসন্ধিমূলক গুজব রটনায় নন্দকুমারের পদচ্যুতি ঘটাইয়া নিজেদের কার্য সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা বিচিত্র নয়। নন্দকুমারকে কর্মচ্যুত না করিলে সম্ভবত ইংরেজরা পলাশী প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্থলে নবনিযুক্ত ফৌজদার মহম্মদ উমর বেগ ইংরেজদিগকে কোনরূপ বাধা দিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পলাশীর পরে মীর্জাফর মসনদে বসিলে রাজকোষের অর্থ ভাণ্ডারের বন্টনের মধ্যে নন্দকুমার কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। সিরাজ নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলে তাহার পক্ষে নবাবের বিরুদ্ধাচারণ করা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ তখনকার দিনে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেমের মাপকাঠি এখনকার মত ছিল না। তখন মোগল, পাঠান, ইংরেজ, ফরাসী, আর্মেনীয়ান প্রভৃতি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহযোগিতা ও বিরুদ্ধা-

কুঞ্জঘাটার দুর্গাবাড়ি

ফটো: ধান মজুমদার

ভক্তমণ্ডলী সহ ভাগবত গীতা পাঠরত চৈতন্যদেব (কুমার গৌরীশংকর রায়ের সৌজন্যে)

চরণ দুই-ই করিত। পলাশী চক্রান্তের পর নন্দকুমার কোম্পানীর এজেন্ট ও নবাবের প্রধানমন্ত্রী রায় দুর্লভের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। তখন সকলের নিকট তিনি ব্ল্যাক কর্নেল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রায়, কান্ত পাল ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় নন্দকুমার ইংরেজদের তাঁবেদার ছিলেন না। বাঙ্গালীবীর কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের ন্যায় নন্দকুমার স্বাধীন মনোভাব বজায় রাখিয়া কাজ করিতেন। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মুসলমান রাজপুরুষেরা ইংরেজদের অধীনে চাকুরী করা অপমানজনক মনে করিয়া অনেকে ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য বাংলা হইতে উত্তরপ্রদেশে চলিয়া যান। ইংরাজ-দের প্রতি হিন্দুদের মনোভাব ছিল ভিন্ন-রূপ। মুসলমান শাসকের পরিবর্তে ইংরেজ শাসন তাহাদের নিকট প্রভু পরিবর্তনের তুল্য ছিল। ইংরেজদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের তৎপরতায় নন্দকুমারের প্রতি মীর্জাফর বিরূপ হইলেন। নগদ টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া নবাব বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলীর রাজস্ব কোম্পানীর হাতে ছাড়িয়া দিলে হেস্টিংস এই বিভাগের প্রথম কালেকটার নিযুক্ত হইলেন। হেস্টিংস খাজনা আদায়ে অকৃতকার্য হইলে ক্লাইভ নন্দকুমারকে ঐ বিভাগে কালেকটার বা তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার ক্ষমতা দিলেন। নবাবও এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া ঐ এলাকার রাজা মহারাজা ও জমিদারদিগকে জানাইয়া দেন। অযোগ্যতায়, বিফলতায়, অপমানে ও ঈর্ষায় হেস্টিংস নন্দকুমারকে জব্দ করিবার জন্য সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় রহিলেন। ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে নন্দ-কুমারের দুরবস্থা দেখা দেয়। বিশ্বাস-ঘাতক ইংরেজ প্রধান গোপনে গভীর রাত্রিতে মীর্জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কলি-কাতায় তাহাদের আশ্রয়ে আসিতে বাধ্য করেন। এই অবস্থায় মীর্জাফর ও নন্দ-কুমারের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি জন্মে। নন্দকুমার মীর্জাফরকে পুনরায় নবাব করিবার জন্য সম্রাট শাহ আলমের এজেন্টের সহিত গোপনে যোগাযোগ করেন। এই সম্পর্কে একখানা গুপ্তচিঠি গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের হস্তগত হয়। মীরকাশিমের মন্ত্রণায় অতঃপর নন্দকুমারকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ক্লাইভ ও কোম্পানীর ডিরেক্টারদের অবগতির জন্য ভ্যান্সিটার্টের কুশাসনের বর্ণনা দিয়া তিনি মীর্জাফর নামীয় শীলমোহরযুক্ত গোপন চিঠি ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত তাহাও ভ্যান্সিটার্টের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বর্ধমান রাজাধিরাজ, বিহারের নেতা কামগর খান, মারাঠা নেতা শ্রীভট্ট প্রভৃতির সহিত যোগা-যোগ করেন। এই সব কারণে তাঁহাকে সুদূর দাক্ষিণে অন্তরীণ রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাহাতে তিনি কাহারো সহিত যোগাযোগ রাখিতে না পারেন। কিন্তু যে কোন স্থান হইতেই তিনি বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাইতে পারেন এই আশংকায় তাঁহাকে কলিকাতার মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখা শ্রেয় বিবেচিত হয়। রায় দুর্লভের বেনামীতে নন্দকুমার নবাবের অধীনে প্রধান প্রধান হিন্দু কর্মচারী ও সম্রাট শাহ আলমের অধীনে সৈন্য বিভাগে সেনাপতি-দিগের নিকট চিঠিপত্র লেখেন। ক্লাইভের মতে রাজা দুর্লভরামকে ইংরেজদের নিকট অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন করার জন্যই নন্দকুমার এই বেনামী চিঠি লিখিয়াছিলেন। প্রবঞ্চনা হইলেও ইহা শাসন ও সৈন্য বিভাগের প্রধান প্রধান হিন্দুকর্মচারীদিগের সহিত যোগা-যোগের চিন্তাধারার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেয়। মীরকাশিমের হাতে পড়িলে জগৎ শেঠ, মহাতাব চাঁদ, রাজা স্বরূপ চাঁদ, রাজা রাম-নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির ন্যায় নন্দকুমারকেও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইত। মীর্জাফরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা নন্দকুমার

পুনরায় মীর্জাফরকে নবাবীপদ গ্রহণ করিতে সম্মত করিলেন। তৎসত্ত্বেও ইংরেজরা নন্দকুমারকে মীর্জাফরের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ যাইতে বাধা দেন। মীর্জাফর গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের বাধানিষেধ উপেক্ষা করিয়া নন্দকুমারকে মুচ্ছাদ্দি বা প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ মুর্শিদাবাদে লইয়া আসিলেন এবং নিজস্ব জায়গীর ও কোষাগারে অর্থাৎ রায় খালসার দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় কুঞ্জঘাটায় তিনি বাসস্থান নির্মাণ করেন। নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়িতে এখনও দুর্গাপূজা হয়।

তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম মীর্জাফরকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব উপাধিতে ভূষিত করিয়া সনদ পাঠান। সঙ্গে তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধিও দেওয়া হয়। দিল্লীর প্রতি এই আনুগত্য ইংরেজদের মনঃপূত হয় নাই। ইংরেজরাই নবাবকে মসনদে বসাইয়াছেন। সুতরাং দিল্লীর সম্রাটের সনদ গ্রহণ তাঁহারা বাহুল্য মনে করিলেন। ইহার মধ্যে নন্দকুমারের কূট-নৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন কোন গোপন ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি আছে সন্দেহ করিয়া ইংরেজরা তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। মীর্জাফরের মৃত্যুর পর তিনি নজউদ্দৌল্লার জন্য দিল্লীর সম্রাট হইতে পুনরায় সনদ আনিবার ব্যবস্থা করিলে ইংরেজরা নজউদ্দৌল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নন্দকুমারকে কলিকাতায় বন্দী করেন। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে একটি দশ হাজার টাকা মূল্যের ঝালরযুক্ত পাল্কী উপহার দেন। কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট তাহা আত্মসাৎ করেন। ভ্যান্সিটার্ট নন্দকুমারের কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে গোপন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া ক্লাইভের অবগতির জন্য শীলমোহরযুক্ত খামে রাখিয়া যান। ক্লাইভ পুনরায় গভর্নর হইয়া আসিলে নন্দকুমারকে মুক্তি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বের মত আর বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহাকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য তিনি ভ্যান্সিটার্টের কুশাসনের বিরুদ্ধে তদন্ত করিবার ভার নন্দকুমারের উপরেই অর্পণ করিলেন। এই তদন্তের লিখিত বিবরণী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ বিলাতে বোর্ড অব ডাইরেক্টারদের অবগতির জন্য—লইয়া যান। মীর্জাফর মৃত্যুকালে ক্লাইভের নামে যে পাঁচ লক্ষ টাকা উইল করেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নন্দকুমারের স্বীকৃতি নেওয়া হয়। বিদেশীদের কুশাসনে ও নায়েব সুবা রেজা খাঁর অত্যাচারে বাংলা দেশে '৭৬-এর মনন্তর দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় নন্দকুমার নিজদেশে অন্নসত্র খুলিয়া দরিদ্র প্রজাদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তিনি যে সর্বসাধারণের সহিত যোগাযোগ রাখিতেন তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি দেশ বিদেশের লক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুধীমণ্ডলীর এক বিরাট জনসমাবেশ করিয়াছিলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি এখনো কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে সংরক্ষিত আছে। তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন পাঞ্জাবদেশীয় বোপদেব। বোপদেব রাজা মানসিংহের গুরু বাসুদেবের চতুর্থ বংশধর। তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন চৈতন্যদেবের ভক্ত শ্রীনিবাস ঠাকুরের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর। চৈতন্যদেব ভক্তমণ্ডলীসহ ভাগবত গীতা পাঠ শুনিতেছেন—এই দৃশ্যপটের একটি চিত্র রাধামোহন ঠাকুর নন্দকুমারকে উপহার দেন। কথিত আছে চৈতন্যদেবের সময় হইতে এই চিত্র শ্রীনিবাস ঠাকুর বংশে পূজিত হইয়া আসিতেছিল। সম্ভবত ইহাই চৈতন্যদেবের সর্বপুরাতন চিত্র, বাংলা দেশের পুরাতন চিত্রশিল্পের অপরূপ নিদর্শন।

আকালীপুরে প্রতিষ্ঠিত চৈত সিংহের কালীমূর্তি (কুমার গৌরীশংকরের সৌজন্যে)

নন্দকুমারের পোশাক (কুমার গৌরীশংকরের সৌজন্যে)

হেস্টিংসের দৌরাত্ম্যে লুণ্ঠিত সামগ্রী সহিত মহারাজ চৈতসিংহের স্থাপিত বিরা[illegible] কায় একটি প্রস্তরনির্মিত কালীমূ[illegible] হুগলীর নদীপথে বাংলাদেশে চলিয়া আ[illegible] ঐ সঙ্গে কাশিমবাজারের কান্তবাবু লক্ষ্ম[illegible] জনার্দন মূর্তি ও মন্দিরের প্রস্তরস্তম্ভ সমূহ উপঢৌকন স্বরূপ লইয়া আসে[illegible] কিন্তু ভয়াবহ ঐ বিরাট কালীমূর্তি প্রতি[illegible] করিতে কেহই সাহসী হন নাই। নন্দকুম[illegible] গুরুদাসকে আনুষ্ঠানিক পূজা অর্চ[illegible] করিয়া ঐ কালীমূর্তি মহাসমারোহে প্রতি[illegible] করিতে নির্দেশ দেন। এইরূপ কালীমূ[illegible] বাংলাদেশে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণী নদী তীরে ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুরে [illegible] কালীমূর্তি এখনও পূজিত হই[illegible] আসিতেছে।

হালিসহরের কালীসাধক রামপ্রসাদে[illegible] সঙ্গে নন্দকুমারের যোগাযোগ ছিল এ[illegible] তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি কয়েক[illegible] কালীসাধনার গান রচনা করিয়াছিলে[illegible] নিম্নলিখিত গানটি তাহার একটি নিদর্শন

হরিণহীন রজনীস-বদনী-তারা কোকনদ
যিনি ত্রিনয়ণী। বিম্বাধর
মৃদুহাসা, বিহিতামরগ[illegible]
প্রতি মা ভয়ভাষা, অমৃতযুত, ভুবন
মোহিতরূপ, অতসীকুসুম বরণী॥
ত্রিশূলে কর—বালাদি আয়ুধ শোভিত কর
সসৈন্য মহিষকুল সমূলে বিনাশ কর,
কোটি যোগিণী আবৃত শিবে, শিবে মৃগে[illegible]
বাহিনী। কমলদলাশ্রিত শশী অদ্ভুত,
সুরবন্দিত পদে এ শোভা প্রকাশিত,
নন্দকুমার বাঞ্ছিত পদে, রাখ তারিণী।২"

মহারাজা নন্দকুমারের অনুরোধে অন্তি[illegible] শয্যায় মীর্জাফর কিরীটেশ্বরী দেবীর চর[illegible] মৃত পান করিয়া শান্তিলাভ করেন।

ক্লাইভের ন্যায় হেস্টিংস নন্দকুমার[illegible] স্বপক্ষে রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ন[illegible] কুমারের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি বিরুদ্ধপ[illegible] থাকিলে বিপদের সম্ভাবনায় তাঁহার প[illegible] গুরুদাসকে নবাবের খাস সম্পত্তির দেও[illegible] ও জামাতা জগতচন্দ্রকে তাহার অধী[illegible] নায়েব পদে নিযুক্ত করা হয়। কি[illegible] কিছুতেই নন্দকুমারকে দমন করা গেল [illegible] তিনি নিজ বিপদ আশংকা তুচ্ছ কা[illegible] হেস্টিংসের কুশাসনের বিরুদ্ধে ১৭[illegible] খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ কলিক[illegible] কাউন্সিলের নিকট চাঞ্চল্যকর অভিযোগা[illegible] প্রেরণ করেন। বিদেশী শাসনের বিরু[illegible] ইহাই এদেশে প্রথম প্রতিবাদপত্র। ভবিষ্য[illegible] যাহাতে কোন ভারতীয় বৃটিশ শাস[illegible] বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী না হয় তা[illegible] কঠোর দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্য নন্দকুমা[illegible]

হেস্টিংসের স্বাক্ষরযুক্ত ফার্সী দলিল
(কুমার গৌরীশংকরের সৌজন্যে)

বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্র করা হয়। অতি আশ্চর্যের বিষয় রেজা খাঁর মত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ইংরেজদের প্ররোচনা লাভ করিয়াও নন্দকুমারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ আনিতে পারেন নাই। মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট গ্রেহাম সাহেবের মুন্সী কমলুদ্দিন ও হেস্টিংসের বানিয়া কান্তবাবুর সাহায্যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির পাল্টা নালিশ দায়ের করিয়া হেস্টিংস স্বয়ং অভিযোগমুক্ত হইবার প্রয়াসী হন। ইংরেজদের মনোনীত মুর্শিদাবাদের নায়েব সুবা রেজা খাঁর প্রতি নবাব নাজিমের বিশ্বাস ছিল না। ইংরেজদের ভয় ছিল নবাব নাজিম সুযোগ পাইলেই রেজা খাঁকে অপসারণ করিয়া নন্দকুমারকে নায়েব সুবা পদে নিয়োগ করিবেন। এই জন্য নজমউদ্দৌল্লার সহিত সন্ধিপত্রে রেজা খাঁর নায়েব সুবা পদ চুক্তিবদ্ধ করা হয়। নন্দকুমারকে এই পৃথিবী হইতে চিরতরে অপসারণ করিবার জন্য ইংরেজ শাসকবর্গ বদ্ধপরিকর হয়। 'মোতাক্ষরীণ' পুস্তকে নন্দকুমার মৃত্যুকালে নগদ ৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান এইরূপ লেখা আছে। তিনি সামান্য ৪০ হাজার টাকার জন্য তমসুক জাল করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তমসুকপত্রের সম্পাদনকারী বুলাকীদাস মৃত্যুর পূর্বে নন্দকুমারকে বিশ্বাস করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহার স্ত্রী এই সম্বন্ধে নন্দকুমারকে কোনরূপ সন্দেহ করেন নাই। নালিশের বিষয়বস্তু ছিল ৭।৮ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন শনিবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অবৈধ ও অন্যায়ভাবে নন্দকুমারকে তাহার কলিকাতার বাসভবন হইতে বন্দী করা হয়। রাত্রিকালে কোন বাড়িতে হানা দেওয়া ইংরেজদের আইন বিরুদ্ধ। কথিত আছে বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার স্থলে নন্দকুমারের কাছারীবাড়ি ছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের প্রাঙ্গণে হরিণবাড়ি নামে জেলখানাতে তাঁহাকে আটক রাখা হয়। তিনি ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারাগারে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সহিত একত্রে বাস করিলে জাতিচ্যুত হইবার আশংকায় তিনি কারাগার অভ্যন্তরে ভিন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার দাবি করেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবার সুযোগও তিনি চাহিলেন। তাঁহার কৌশুলী মিঃ জেরেট জানাইলেন যে, নন্দকুমার এই পরিস্থিতিতে নির্জলা উপবাস করিতে থাকিলে তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন জেলরক্ষক মিঃ টেণ্ডল নিজ দায়িত্বে জেলফটকের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব থাকিবার ঘর নন্দকুমারকে ব্যবহার করিতে দিয়া সমস্যার সাময়িক সমাধান করিলেন। ইহাতে টেণ্ডল দম্পতির ত্যাগ স্বীকারের নিদর্শন রহিয়াছে। প্রধান বিচারপতি মনোনীত কৃষ্ণজীবন, বানেশ্বর, কৃষ্ণগোপাল ও গৌরীকান্ত শর্মা এই চারজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নন্দকুমারের এই অবস্থায় আহারাদি করিলে নিশ্চিত জাতিভ্রষ্ট হইবেন জানালেন। তাঁহারা তাঁহার জন্য জেল আঙ্গিনায় একটি পৃথক খড়ের ঘর তৈয়ারী করিতে সুপারিশ করিলেন। ১২, টাকা ব্যয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভোজন করাইয়া নন্দকুমার প্রায়শ্চিত্ত করিলে পুনরায় সমাজে স্থান পাইবেন এইরূপ বিধানও দেওয়া হয়। নন্দকুমার এই বিধান উপেক্ষা করিয়া আমরণ উপবাস করিবার সংকল্প করিলেন। ইহাই ইংরেজ আমলে জেলখানায় আমরণ অনশন ব্রতের প্রথম দৃষ্টান্ত। জেলার মিঃ ইয়াণ্ডিল নন্দকুমারকে যে পানীয় জল সরবরাহ করিতেন তাহা নন্দকুমারের হাত-পা ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার মার্ডিশন নন্দকুমারকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তিনি প্রকৃতই উপবাসী রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে দুর্বল দেখা যাইতেছে না। অতঃপর জেলপ্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি দালানের ছাদের উপর তাঁবু টানাইয়া তাঁহার পৃথক থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তার জন্য ভিন্ন কুঁড়ে ঘর তৈয়ারী করা হয় নাই। তিনি বন্দী হওয়ার ষষ্ঠদিনে বৃহস্পতিবার অনশন ভঙ্গ করেন। কারাগারে শ্রেণী বিভাগের সূচনা নন্দকুমারের জন্যই প্রথম সম্ভব হইল। কাউন্সিলের সভ্য ক্লেভারিং বারওয়েল ও মনসন নন্দকুমারের সঙ্গে জেল অভ্যন্তরে দেখা করিতে আসিলে চারিদিকে গুজব রটিয়া যায় যে, নন্দকুমারকে জোর করিয়া মুক্ত করা হইবে। পলায়ন করিলে জালিয়াৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন ভাবিয়া তিনি কোন সময়েই পলায়নের চেষ্টা করেন নাই। ৮ই জুন হইতে ১৬ই জুন আটদিন-ব্যাপী বিচারের শুনানী হইয়াছিল। ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীটের উত্তরদিকে সেন্ট এণ্ড্রুজ গির্জার প্রাঙ্গণে তখন প্রধান বিচারালয় ছিল। বর্তমান হাইকোর্ট বিল্ডিং তখনো হয় নাই। নবাগত তিনজন বিচারপতি কেহই এদেশের ভাষা, রীতি-নীতি, আইনকানুন কিছুই জানিতেন না। বারজন জুরীর মধ্যে কেহই এদেশীয় হিন্দু কিম্বা মুসলমান ছিলেন না। অথচ জুরীর বিচারের মূলে উদ্দেশ্যই ছিল স্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা বিচার করা। ইংল্যাণ্ডের আইন, ভারতীয় প্রজার উপর প্রযোজ্য হইবার রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত না হওয়ায় এদেশে কার্যকরী হইতে পারে নাই। বিচারকদের বেতনও তখন পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয় নাই। তাহাদের বেতন কোম্পানীর ডাইরেক্টাররা অনুমোদন করিতেন। ইংল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালতে আপীল করিবার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। সুতরাং এই বিচার সম্পূর্ণরূপে গভর্নর জেনারেলের আওতায় শাসনতান্ত্রিক বিচারের প্রহসন ভিন্ন কিছু নয়। ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত আইন অনুসারে তখনকার দিনে প্রায় ২০৬ রকমের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল। বহু বিবাহ এই অপরাধগুলির অন্যতম হওয়াতে এ দেশীয় বহু হিন্দু মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। সাক্ষীদের শুনানীর পর বিবাদির কৌশুলীকে জুরীদের বুঝাইবার জন্য উপসংহারে কিছু বলিবার রীতি ছিল না। বাংলা হইতে ফার্সী এবং ফার্সী হইতে ইংরাজীতে সাক্ষীগণের বক্তব্য জুরী ও বিচারকদিগকে বুঝান হইত। নন্দকুমারের আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার বিপক্ষীয় মিঃ ইলিয়ট নামক অধস্তন এটর্নীকে দোভাষীর কাজে নিযুক্ত করা হয়। মোহনপ্রসাদ, মহবৎ খাঁ, কমলুদ্দিন, হাসান আলী, সমরুদ্দিন, খোজা পিদ্রুস, কৃষ্ণজীবন ও নবকৃষ্ণ এই নয়জন বিচারে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। খোজা পিদ্রুস ও তাহার স্ত্রী, এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাহারা একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াত করিত। অন্যান্য সাক্ষীরাও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ

ও পরোক্ষভাবে কোম্পানীর তাঁবেদার ছিল। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজসাহীর রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি গণমান্য হিন্দুরা ভয়ে নন্দকুমারকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ ও জামাতা রাধাচরণ রায় এই দুঃসময়ে নন্দকুমারকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। বাংলার নবাব মোবারকদ্দৌলা জুন মাসের ২১ তারিখে এক পত্রে ইংলণ্ডের রাজার অনুমতিপত্র ভিন্ন নন্দকুমারের ফাঁসি স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কৌশুলী মিঃ ফ্যেরেট ইংলণ্ডের রাজার নিকট তাঁহার প্রাণভিক্ষা চাহিয়া আবেদন করেন। নন্দকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনগণ রাজার নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নকারী নন্দকুমারকে এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারণ করিয়া অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণাদির বিলুপ্তি ঘটান হইল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই আগস্ট আনুমানিক ৭০ বৎসর বয়সে নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

কলিকাতার তৎকালীন শেরিফ মিঃ মেক্রেবি ফাঁসির দিন তাঁহার উজ্জ্বল, সৌম্য ও নির্ভীক মূর্তির বর্ণনা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহাকে পালকিতে করিয়া ফাঁসিমঞ্চে যাইতে অনুরোধ জানানো হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফাঁসির সময় তাঁহার দুই হাত রজ্জুবদ্ধ থাকাতে ও মুখমণ্ডল কাপড়ে আবৃত থাকাতে পদ-সঞ্চালন করিয়া তাঁহার ফাঁসির ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়াছিলেন। খিদিরপুর ব্রীজের উত্তর কোণে হেস্টিংস এলাকায় কুলিবাজার নামক স্থানে ফাঁসিমঞ্চ অবস্থিত ছিল। বারাসতে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল, এই ধারণা ভুল। সাধারণের দেখিবার জন্য তখন ফাঁসিমঞ্চ উন্মুক্ত থাকিত। নন্দকুমারের ফাঁসি তৎকালীন বাঙালী সমাজে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা সেদিন অরন্ধন ব্রত পালন করিয়াছিলেন। হিন্দুরা ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গঙ্গাস্নান করেন। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই এই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানীর শাসন এলাকার বাহিরে গঙ্গার পশ্চিম পারে শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাস-স্থান পরিবর্তন করিলেন। মফঃস্বলের হিন্দুরা কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে এই পাপস্থানের একবিন্দু জলও পান করিতে বিরত থাকিতেন। সাধারণ লোকেরা জুরীদিগকে কসাইটোলার জুরী বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। ঢাকা শহরে এই ব্রহ্ম-হত্যার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। কলিকাতা শহরের তখন পত্তন হইতেছে। মুর্শিদাবাদে নবাবী আমলের ৫০ বৎসর গতপ্রায়। পুরাতন রাজধানী ঢাকা শহরের গৌরব তখনো ম্লান হয় নাই। কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে স্বতঃপ্রবৃত্ত বিক্ষোভ ইহাই প্রথম। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রমাণস্বরূপ একটি গ্রাম্য ছড়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"নন্দকুমারের মা কাঁদে
ঐ গঙ্গার পারে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা
ঘোড়ার ডিঙ্গা বেয়ে
মোল্লাতে কোতর কাঁদে
ফোয়ারাতে হাঁস
যোড় বাংলায় কাঁদে
সোনার গুলোতি বাঁশ।"

পার্লামেন্টে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে বুঝিতে পারিয়া হেস্টিংস ইলিয়ট সাহেবকে তাড়াতাড়ি ছুটি মঞ্জুর করিয়া বিচারের সত্যতা প্রমাণ করিবার [illegible] ইংলণ্ড পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। [illegible] দ্বারা এই বিচারে হেস্টিংসের যে গো[illegible] যোগাযোগ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যা[illegible] ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সাত বৎসরব্যা[পী] হেস্টিংসের বিরুদ্ধে হাউস অব্ লর্ড[সে] অভিযোগ চলিতে থাকে। ইংরেজ শিল্পী হেস্টিংসের ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া তাহা[কে] ঘোরতর পাপী ও নরাধম বলিয়া প্র[illegible] করেন। হেস্টিংসকে নির্দোষ প্র[মাণ] করিবার জন্য তখনো এদেশ হইতে [illegible] গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত প্রশংসা[পত্র] ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। নন্দকুমার[illegible]

দৌহিত্র রাজা মহানন্দ একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন। হাউস অব কমন্স সভায় হেস্টিংস নির্দোষ প্রমাণিত হন নাই। হেস্টিংস নিষ্কৃতি পাইলে কাশীর ইংরেজবৃত্তিভোগী পণ্ডিত সমাজ, সিরাজ বেগম উম্মতয়েচ্ছা, মীরজাফরের ভগ্নী কুরুন্নিফা ও নসুফাউন্নিসা প্রভৃতি অনেকে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া ইংলণ্ডে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। নন্দকুমারের ফাঁসি হেস্টিংসের বিবেকে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগস্ট তারিখে হেস্টিংসের সহিযুক্ত একটি ফার্সী দলিলে হেস্টিংস নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে রাজা বাহাদুর ও হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া সামান্য খাজনায় এক বিরাট জমিদারীর বন্দোবস্ত দেন। সম্ভবত উপরোক্ত বন্দোবস্তে তাঁহার পাপের বোঝা তিনি কিছুটা লাঘব করিতে চাহিয়াছিলেন।

বিভারিজ সাহেবের মতে একটা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নন্দকুমারকে অন্যায় ও অবৈধভাবে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতীয়দের এইরূপ স্পষ্ট উক্তি করার সাহস দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শাসনে ইহাই প্রথম রাজনৈতিক ফাঁসি। দুঃখের বিষয়, নন্দকুমারের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখনো সংশয় রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নাগরিকদের আগমনে ও নবাবের সুপারিশের ফলে রাধাচরণ মিত্র নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ইংলণ্ড-এর রাজকীয় করুণায় ফাঁসির আদেশ হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। নন্দকুমারের ক্ষেত্রে মুক্তিভিক্ষার আবেদনপত্রে ইংলণ্ডের রাজার অভিমত এখনো সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। হয়তো রাজা কর্তৃক তাঁহার ফাঁসি রহিত হওয়ার আদেশ এদেশে পৌঁছাইবার পূর্বেই নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। নিয়মতান্ত্রিক বৃটিশ শাসনে তাঁহার প্রাণভিক্ষার আবেদনপত্রের পরিসমাপ্তি কি হইয়াছিল, তাহা গবেষণার বস্তু। পরবর্তীন হরিণবাড়ি জেল প্রাঙ্গণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রস্তুত করিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর আমলের কুশাসনের যবনিকা টানিবার ব্যবস্থা করেন। নন্দকুমারের কারাবাসের স্মৃতিবিজড়িত এই ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর ভাষায় বহু অব্যক্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। হেস্টিংস গোষ্ঠীর চিত্র ঐ স্মৃতিসৌধে রক্ষিত আছে। নন্দকুমারের কোন মূর্তি বা ছবি এদেশে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত ইংলণ্ডের শিল্পীদের এলবামে পাওয়া যাইতে পারে।

সুড়ং

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

একটা হাত—নরম, খুব নরম, আর কয়েকটি চুড়ি, ঠাণ্ডা—শীতের সকালে আরও অনেক ঠাণ্ডা, যেন খুব আস্তে আস্তে, ভয়ে-ভয়ে, এক সময় চন্দনের গালে, গলায় আর কাঁধে এসে পড়ল।

তখন ঘরে অনেক লোক। অনেক ভিজে ভিজে চোখ। বিষণ্ণ মুখ। আর, একটা খাটে ফুলের চাপে-চাপে, সাদা-সাদা অনেক ফুল, হিরণ্ময়ীর নিস্পন্দ দেহ প্রায় ঢাকা পড়েছে।

এত লোকের ভিড়ে, ধূপ আর ফুলের গন্ধে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে, চন্দন আরও অস্থির হয়ে উঠেছিল, আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল ওরও দেহ। ঠোঁট দুটো কাঁপছে এখনও, ও যেন জোর করে ঠোঁট চেপে-চেপে কান্না চাপছে। কিন্তু ওর চোখ থেকে জল পড়ছে টপ টপ। বুকটা কেমন করছে। ও ভাবছে, ওর মার, যার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে আজ ভোরে, খুব ভোরে, আলোর একটা রেখাও তখন ছিল না কোথাও—তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হিরণ্ময়ীর দেহটা, ঠাণ্ডা নিথর হয়ে গেলেও, ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে, কান্নায়-কান্নায় ভাঙা-ভাঙা স্বরে একবার বলে, সকলকে শুনিয়ে-শুনিয়ে চিৎকার করে, মা, ওমা, মা, ওঠ, কথা বল! মা আমার ক্ষিধে পেয়েছে। ও মা, আমাকে কে দেখবে? মা, ও মা—

এই ভাবনায় সময়-সময়, দূর থেকে

প্রীতিলতা চন্দনের মুখ দেখছিল। সে তাকে দেখছিল অনেকক্ষণ থেকে। একটু দূরে, ঘরের একদিকে, যেদিকে শীতের সকালেও রোদের একটা হাল্কা রেখা ছায়ার মতো খেলছে, সেদিকে একা, একেবারে বাইরের লোকের মতোই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চন্দন কাঁপছিল।

চন্দনকে দেখছিল প্রীতিলতা। কচি মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কেঁদে-কেঁদে লাল হয়ে গেছে চোখ। ছেলেটা হয়তো কিছু মুখে দেয়নি সকাল থেকে, দিতে পারেনি। আস্তে আস্তে উঠে, এক-পা এক-পা করে প্রীতিলতা এগিয়ে আসে চন্দনের কাছে। তখন জানলার শিক দুই হাতে শক্ত করে ধরে, বাইরে একটা লাল গোলাপ কলির দিকে তাকিয়ে চন্দন কাঁদছিল। ও দেখছিল না তখন হিরণ্ময়ীর ফুলে-ফুলে ঢাকা ঠাণ্ডা দেহের দিকে। দেখতে পারছিল না আর, এখান থেকে হিরণ্ময়ীর মৃতদেহ ভিড়ে-ভিড়ে দেখা যায়ও না।

শীতের ফ্যাকাশে সকাল। প্রথম দিক হলেও, বাইরে, এই জানলা দিয়েও দেখা যায়, দূরে পাঁচিলের ওপারে, এখনও চাপ-চাপ স্থির পাতলা ধোঁয়ার মতো কুয়াশার আমেজ আছে। সেদিকেও দেখছিল না চন্দন। ও আরও শক্ত করে, এই এক ঘর লোকের সামনে, ওর ভেতরের, ওর বুকের হাড় চিরে-চিরে বেরিয়ে আসা গরম, ভয়ংকর গরম কান্নাটাকে থামাবার চেষ্টায় জানলার দুটো মরচে পড়া শিক চেপে ধরছিল সমস্ত শরীরের ভার রাখবার জন্যে। তখন আস্তে আস্তে, অনেক মানুষের পাশ কাটিয়ে, এই দিকে, এই জানলার কাছে এসে চন্দনের পেছনে দাঁড়ায় প্রীতিলতা।

চন্দন কাঁপছে। ঠোঁট চেপে ধরেছে। এখনও জল পড়ছে চোখ দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য, ওকে কেউ দেখছে না। বোধ হয় প্রীতিলতাই প্রথম ওকে দেখল। ওর গায়ে হাত দিল। ওর চোখ মুছিয়ে দিল শাড়ির এক প্রান্ত দিয়ে। তারপর সরে এল ওর কাছে—খুব কাছে।

আর, আরও আস্তে, বোধ হয় যত চাপা স্বরে কথা বলা যায়, তেমনি করে, চন্দনের গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে প্রীতিলতা বলে উঠল, "চন্দন, না, এমন করে না। লক্ষ্মী ছেলে! কেন? আমি কি নেই!"

এখন, ধূপ আর ফুলের গন্ধে, প্রথম শীতের ভিজে ভিজে সকালে প্রীতিলতার চাপা স্বরে বলা কথাগুলো যেন হঠাৎ একটা নাড়া দিল চন্দনের কচি বুকে আর এতক্ষণ জোর করে, জানলার শিকে ভর করে, যে কান্নাটাকে সে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল, তা বেরিয়ে এল চন্দনের বুক ঠেলে, চোখ ঠেলে, হু-হু করে। আর তখন, জানলা ছেড়ে, প্রীতিলতার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজল চন্দন। মাথা ঘষল। আর সেই ঘরটাকে চমকে দিয়ে একটা ব্যাকুল আর্তনাদ হঠাৎ যেন সেখানে ভেঙে পড়ল, "মা! ও মা! মা—"

প্রীতিলতা আরও জোরে, যত জোরে পারে, চন্দনের মাথাটা বুকে চেপে বলছিল, "চন্দন—চন্দন, আমি আছি—আমি আছি—"

এক ঘর লোক, আরও বেশি চোখ, তখন সেই ভয়ংকর আওয়াজে চন্দনকে দেখল। প্রীতিলতাকে দেখল। আর, দেখতে-দেখতে ঠেলাঠেলি না করে, সন্তর্পণে এগিয়ে এল সেই জানলার কাছে—ওদের পাশে। আর একদিকে ভোর থেকে জ্বলে-জ্বলে একটা ধূপ কাঠি প্রায় নিবে এসেছে। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হিরণ্ময়ীর ঠাণ্ডা বুকের ওপর থেকে কেমন করে মাটিতে পড়েছে। সে-খাটের কাছে এখন কেউ নেই। এখন এখান থেকে হিরণ্ময়ীর ফুলে-ফুলে ঢাকা

মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু চন্দনের মুখ প্রীতিলতার বুকের মধ্যে। ও দেখল না। শুধু কাঁদল প্রীতিলতাকে জানলার শিকের মতো আঁকড়ে ধরে। অনেকক্ষণ।

আর, পরে, অল্প পরেই, কয়েকটা মাস শেষ হয়ে গেলে, একদিন, বিয়ের মতো, উৎসবের মতো, সেই প্রথম শীতের সকালে হিরণ্ময়ীর মৃত্যুও বাসি হয়ে গেল, পার হয়ে গেল প্রীতিলতারই এক বুক জমাট উত্তাপে হিম ঋতুর ছেঁড়া-ছেঁড়া কুয়াশা আর এক-এক বিষণ্ণ থম থম প্রহরের মতো।

এখন, অনেক দিনের, কৈশোরে প্রথম-প্রথম কিম্বা তারও আগের, অনেক আগের, একটা ভাবনা, অস্থির আবেগের আর ইচ্ছার কী একটা যেন—কল্পনা আর বাসনা, যা ভেসে উঠত, দুলে উঠত চন্দনের ভয় লজ্জা আর কামনার—তার একেবারে একার, ছোট—মনের মধ্যে খুব ছোট একটা আয়নায়—সেখানে একটা মুখ, একটা বুক, হাত চুড়ি আর প্রীতিলতার, হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পরের প্রীতিলতার—গোটা শরীরটা স্থির হয়ে, স্পষ্ট হয়ে ফুটল। হঠাৎ একবারে, সেই শীতের ভোরে হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর মতোই।

ফুটল পূর্ণ ইচ্ছার মতো। আর, এখন চন্দনের মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে সেই ছোট আয়নাটা গ্রীষ্মের, গাছ-মাটি-কাঠ পোড়ানো নির্লজ্জ প্রখর রোদে যেন ঝকঝক করে উঠল—একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে দুই হাতে রগড়ে-রগড়ে মুছে দিলে যেমন দেখায় ঠিক তেমন। এখন, হিরণ্ময়ীর মৃত্যুর পর থেকে প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্ত চন্দনের বুকের মধ্যে সেই ঝকঝকে ছোট আয়নাটাকে বড় করে, অনেক বড়। আর সেখান থেকে ঠিকরে পড়া একটা আলো, তাজা খুশির মতো জ্বল-জ্বল করে চন্দনের মুখে, ও যে মুখ ঘষে প্রীতিলতার কোলে আর বুকে, যে মুখ লুকোয় তার টাটকা ভাঁজ-ভাঙা শাড়ির মধ্যে ছোট একটা ছেলের মতোই। তখন আবেগের ঢেউ-এ একেবারে ডুবে যাওয়া চন্দনের মনে হয়, ও কখনও, ওর জন্মের পর থেকে হিরণ্ময়ীর মৃত্যু পর্যন্ত, একদিনও, এমন করে তাকে প্রীতিলতার মতো ভালবাসতে পারেনি। পারলে, হয়তো তারই জন্যে, তারই টানে, আরও কিছুদিন বাঁচতে পারত হিরণ্ময়ী। কিন্তু না বাঁচুক, এখন চন্দনের মনে হয়, হিরণ্ময়ী নেই বলেই প্রীতিলতা আছে।

প্রীতিলতা, তার মা, যার বুকের মধ্যে, রক্তের মধ্যে অল্পে অল্পে বেড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে চন্দন—ওর সেই ভাবনা, আজ আবার নরম-নরম ছোঁয়ায়, প্রীতিলতার কোল শাড়ি আর বুকের উষ্ণতায় ওকে ছোট আরও ছোট, অনেক ছোট করে, বোধ হয় ভ্রূণের মতোই ফিরিয়ে নিয়ে যায় প্রীতিলতার দেহের অন্ধকারে—ওর জন্মের আগের, অনেক আগের, অস্থির অদ্ভুত এক কল্পলোকের অস্পষ্ট ছায়ায়। আর এই কথাটা, এই

সত্যটা, যা চন্দন কখনও ভাবতে পারেনি হিরণ্ময়ীর বেলায়, ভাবতে পারেনি কারণ একটা নতুন প্রাণকে পৃথিবীতে আনবার ক্ষমতা হিরণ্ময়ী হারিয়ে ফেলেছিল অনেক আগেই, যখন এই ভাবনা নিয়ে খেলা করবার বয়সও ছিল না চন্দনের। আর যখন ভাবতে শিখল চন্দন, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝল, তখন হিরণ্ময়ীকে ওর মা বলে প্রীতিলতার মতো আদর করতে পারল না। পারল না কারণ হিরণ্ময়ীর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গায়ে হাত দিয়ে ও কখনও এই তৃপ্তি, ভ্রূণ হয়ে আবার একটা উত্তপ্ত দেহের অন্ধকারে মিশে যাওয়ার আনন্দ অনুভব করতে পারেনি।

এখন প্রীতিলতার কানের কাছে মুখ এনে সেই এক কথাই একা-একা বারবার শোনায় চন্দন, "মা, ওমা, আমি যখন ছোট, খুব ছোট তখন তুমি কোথায় ছিলে—কোথায়?"

"কোথায় আবার? তোদের বাড়ির কাছেই। দেখতে পাসনি?"

"তখন আমাকে ডাকনি তো? কেন বল নি যে, আমি যাকে মা বলে ডাকতাম সে আমার কেউ নয়, আমার মা তো তুমি। আমি কার পেটে ছিলাম? তোমার না?"

প্রীতিলতা হেসে বলে, "হ্যাঁ।"

"তবে ডাকনি কেন?"

আবার হাসে প্রীতিলতা, "বুড়ি তাহলে মারত না আমাকে?"

প্রীতিলতার কোলে মাথা রেখে ওর লম্বা পাতলা আঙুল টিপতে-টিপতে চন্দন বলে, "তুমি ডাকলে আমি ঠিক যেতাম—পালিয়ে যেতাম—"

"বুড়ি বেঁচে থাকলে তুই কিছুতেই আমার কাছে যেতে পারতিস না রে চন্দন।"

"পারতাম—খুব পারতাম। আমার কথা বিশ্বাস হয় না বুঝি?"

প্রীতিলতা চন্দনের গাল টিপে বলে, "হয়।"

"তবে? আসনি কেন? আমাকে ডাকনি কেন?" আর তাই এতদিন পর চন্দন হঠাৎ মেজাজ দেখায়, "কেন আসনি?"

"দূর, তুই ডাকলে আমি কি না এসে পারি?"

"কই, এখনও তো আস না। আমি কত ডাকি তোমাকে। খালি বাড়িতে একা-একা থাকতে আমার ভয় করে না?"

"ভয় কি রে, বুড়ো ছেলে! লক্ষ্মী, এবার পড়াশুনোয় মন দে।"

"বুড়ির মতো কথা বল না?"

"বা রে, এত বড় ছেলে যার সে বুড়ি হবে না?"

"না না না," প্রীতিলতার কাঁধ দুটো জোরে-জোরে ঝাঁকিয়া দিয়ে চন্দন বলে, "আমার মা বুড়ি হয় না—হয় না।"

প্রীতিলতা আস্তে বলে ওঠে, "পাগল।"

এখন আপনমনে একবার বাইরে তাকিয়ে, একবার জানলা দিয়ে আকাশ দেখে প্রীতিলতার গলায় হাত রেখে দাঁত চেপে

বিড়বিড় করে ওঠে চন্দন, "আমার যদি আর কোন ভাই থাকত কিম্বা বোন, তোমার আর কোন ছেলেমেয়ে তাহলে আমি তার গলা টিপে দিতাম, বিষ খাইয়ে দিতাম, মেরে ফেলতাম—"

প্রীতিলতা বলে, "কেন রে ডাকাত?"

"না, আমি ছাড়া, আর কোন ছেলেমেয়ে তোমার থাকবে না—" ইচ্ছে করে, প্রীতিলতাকে সাবধান করবার জন্যেই যেন জোর দিয়ে চন্দন বলে ওঠে, "আমার ভাই-বোন যদি কিছু হয়, আমি তাকে মেরে ফেলব—মেরেই ফেলব।"

প্রীতিলতা তার মুখ চাপা দিয়া হাসতে-হাসতেই বলে, "ডাকাত—ডাকাত! থাম!"

না, তেমন কোন ভয় নেই প্রীতিলতার। কিন্তু হঠাৎ কোল জুড়ে এসে এই অবুঝ ছেলেটা, অবাধ্য শিশুর মতোই তার সব কাজ, সব দায়িত্ব, সব কর্তব্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। ওর সারাদিনের ডাকাডাকি, জেদ আর আবদার—এই নিয়েই এখন প্রীতিলতার জগৎ। আর কেউ নেই। আর কিছু নেই। তার স্বামী সংসার—এই ছেলেটা যেন গিলে খেয়েছে রাক্ষসের মতো।

এক-একবার প্রীতিলতার ইচ্ছে হয়েছে একে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে। এই অল্প বয়সে, হিরণ্ময়ী একটা বিরাট বাড়ি আর অনেক টাকা রেখে গেলেও, শুধু চাকর-বাকরের ভরসায় ও থাকতে পারে নাকি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস, ওর গালে গলায় মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে জোর করে চাপে প্রীতিলতা। তা হয় না। এখনও চন্দনকে সব সময় কাছে রাখবার বয়স হয়নি প্রীতিলতার। এখনও রাতের অন্ধকারে তাকে ডাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ। কাছে রাখে অনেকক্ষণ। এখন চন্দনের বোঝবার বয়স। বোঝে বুঝুক। কিন্তু তবুও তাকে এত কথা, তার স্বামীর অন্ধকার বিছানায় আমন্ত্রণের কথাটা এক বাড়িতে থাকার সুযোগ দিয়ে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে একটা অস্বাভাবিক দ্বিধা জাগে প্রীতিলতার।

আর যখন, চন্দনের শোবার ঘরে জোরে-জোরে সিলিং ফ্যানটা ঘোরে, যখন কাঠফাটা রোদ এড়াবার জন্যে সব জানলাগুলো বন্ধ থাকে, কেউ থাকে না কাছাকাছি, একটা মানুষও না, তখন সে-ঘরেই অনেক পুরনো বড় এক আয়নায় দূর থেকে, চন্দনের মাথা কোলে নিয়ে, নিজের মুখ দেখতে-দেখতে চোখ কটকট করা দৃষ্টিতে, বুকখালি করা চেষ্টায় হিরণ্ময়ীর ছায়া খোঁজে প্রীতিলতা।

কিন্তু নেই। ওই আয়নায় শুধু প্রীতিলতার যন্ত্রণাময় মুখ আর, তার কোলে যে শুয়ে আছে চন্দনের আধখানা শরীর স্পষ্ট, বাইরের রোদের মতো, পোড়া পোড়া সূর্যের মতো ভয়ংকর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এত পরিষ্কার যে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না প্রীতিলতা।

"চন্দন, ওরে ও চন্দন, ঘুমোলি বাবা?"

"উঁ হু, কী?"

"তুই ছোট, আরও ছোট, অনেক ছোট হয়ে আমার কাছে এলি না কেন রে দুষ্টু ছেলে?"

তখন, প্রীতিলতার কথা শুনে, উৎসাহ আর উত্তেজনায় জ্বলে ওঠে চন্দনের মুখ আর চোখ। ও বলে একরাশ কথা, ওর ইচ্ছার কথাটা পুরোপুরি শোনায় প্রীতিলতাকে, "আমি ছোট হয়ে যাই, কত ছোট, তুমি জান না মা, তোমার বুকে হাত দিয়ে, গালে গাল রেখে আমার মনে হয়, আমার বয়স পাঁচ কি ছয়, তুমি জান না? না, তুমি কিচ্ছু জান না, তুমি আমাকে ছোট হতে দাও না, একবারও আদর কর না—আমার মা না কি তুমি?"

চন্দনকে বুকে চাপে প্রীতিলতা, সেই সঙ্গে আর একটা নিশ্বাসও। আর সেই বড় পুরনো আয়নায়—আয়নাটা বোধ হয় হিরণ্ময়ীরই, আর একবার সে দেখে নিজের মুখ, কেমন হয়ে গেছে, আঁকা-বাঁকা ভাঙা-চোরা অদ্ভুত, বুড়ি-বুড়ি, চোখ দুটো শুকনো, ঝাপসা। দু-এক ফোঁটা জলও নেই। কেন!

"তোকে আদর করব, ঠিক করব। আজ নয়, পরে, আর একদিন, পুজোর সময়, বিজয়ার দিন—"

"দূরে", রাগ করে চন্দন। অভিমান করে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কথা বলে না।

"এই—এই, ছোট ছেলের, পাঁচ-ছয় বছরের কচি ছেলের বুঝি এত রাগ থাকে?"

"তুমি ছোট হতে দাও আমাকে?"

"মা ছেলেকে ছোট করে না বড় করে?"

"আমি চাই না বড় হতে—"

এবার বড় একটা নিশ্বাস চাপবার কোন চেষ্টাই করে না প্রীতিলতা, "ইচ্ছে করলেই কি ছোট থাকা যায় রে চন্দন?"

"আমি চাই না শুনতে তোমার কথা। তুমি আমার মা নাকি? আমি ছোট হব—হব—হবই", উপুড় হয়ে প্রীতিলতার কোলে জোরে জোরে মুখ ঘষতে ঘষতে চন্দন আর একবার বলে, "হবই।"

ওকে শান্ত করবার চেষ্টায় কথা ঘোরায় প্রীতিলতা। হাসতে হাসতে বলে, "এই চন্দন, এই দুষ্টু, তুই ওর সামনে অমন প্যাঁচার মতো বসে থাকিস কেন? কথা বলতে পারিস না? জানিস না, ও তোর কে হয়?"

"কে?" চন্দন মুখ তুলে তাকায় প্রীতিলতার দিকে। "তুই-ই বল?"

"বাবা? দূর—" হি হি করে হাসে চন্দন।

"এই, অত হাসছিস কেন? বুড়ো বাপ না হলে বুঝি মন ওঠে না তোর?"

"দূর, আমার বাবা কবে মরে গেছে!"

"তবে?"

"মেসোমশাইকে—"

তাড়া দিয়ে প্রীতিলতা বলে ওঠে, "কী বলতে বলেছি?"

এক নিশ্বাসে তখন চোখ বন্ধ করে বলে চন্দন, "বাবাকে আমার ভয় করে, লজ্জা করে—"

প্রীতিলতা হাসে, "কেন, কেন রে?"

"কী জানি!" হঠাৎ চুপ হয়ে যায় চন্দন। অনেকক্ষণ কথা বলে না। তাকায় না প্রীতিলতার দিকে। মাথা তুলে আয়নাটা দেখে। সেখানে প্রীতিলতার ছায়া। এখন হাসছে প্রীতিলতা। চন্দন দেখে। কিন্তু নিজে হাসে না—হাসতে পারে না।

আর তখন চন্দনের গালের কাছে মুখ নিয়ে আসে প্রীতিলতা। আস্তে আলগোছে ঠেকায়। অস্ফুট একটা শব্দ। আয়নায় বারবার নিজেকে দেখে প্রীতিলতা—ওর মুখ নয়, ভাঙাচোরা বুড়ি-বুড়ি, আর একটা, হিরণ্ময়ীর মুখ।

এখন হাসে চন্দন। ভেঙে পড়ে খুশিতে প্রীতিলতার বুকের ওপর, কোলের ওপর, আর হাসতে হাসতেই বলে, "তবে যে বললে বিজয়ার দিন, হি—হি—হি—"

কিন্তু ওর গায়ে আর হাত রাখে না প্রীতিলতা, মাথায়ও না। আয়নার দিকেও তাকায় না। উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় দরজার দিকে। তখন দূর থেকে, খাটে শুয়ে-শুয়েই চন্দন জিজ্ঞেস করে, "এখন এত তাড়াতাড়ি কেন যাও?"

"আমার কাজকর্ম নেই সংসারের? তোর বাবার ফিরে আসবার সময় হল না? এই চন্দন শোন, সন্ধ্যেবেলা যাবি বই-খাতা নিয়ে, আমার সামনে বসে পড়াশুনো করবি।"

"মেসোমশাইকে আমার ভয় করে—"

"আবার মেসোমশাই?"

খাটের এপাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে চন্দন বলে, "দূর!"

প্রীতিলতা চলে যায় তাড়াতাড়ি পা ফেলে, কোনদিক না তাকিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে। পাড়ার আর কেউ যদি তাকে দেখে তাহলে সে কাউকে দেখতে চায় না বলেই চোখ তুলে তাকায় না। আর বাড়ি ফিরে, তৎক্ষণে ফিরে এসেছে দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রীতিলতা সব রাগ ঢেলে দেয় তার ওপর।

"মুখ ফুটে দুটো কথা বলতে পার না? ছেলেটাকে কাছে ডেকে একটু আদর করতে তোমার কী কষ্টটা হয় শুনি?"

প্রীতিলতার মেজাজ দেখে হাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ, "কী হল?"

"ছেলেটার মা মরেছে দুদিন আগে, আমি না-হয় ওকে বুকে তুলে নিয়েছি, কিন্তু তুমি? কাছে ডেকে দুটো মিষ্টি কথাও বলতে পার না?"

হাসতে হাসতে হালকা স্বরেই বলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, "ওকে এবার এ বাড়িতেই নিয়ে এস প্রীতি। দিনের মধ্যে অতবার এ বাড়ি ও বাড়ি করলে—"

প্রীতিলতা বাধা দিয়ে বলে, "তোমার

জন্যেই তো আনতে পারি না। বুড়ো বয়সেও একটু লজ্জা আছে নাকি তোমার!"

"আহা হা, তা বলে ছেলের সামনে—"

"আমি সব জানি। ও অন্য ঘরে থাকবার ছেলে নাকি ভেবেছ? রাত-বিরেতে যদি দরজা ভেঙে আমার কাছে চলে আসে তখন?"

"তখন?" প্রীতিলতার কাছে সরে এসে বলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, "ছেলে ঘুমবে তো?"

"যাও! দরকার নেই আমার ওকে কাছে রাখবার।"

কিন্তু একদিন, এই কথা বলাবলির কিছু পরেই, চন্দনকে কাছে রাখবার দরকার হয় প্রীতিলতার। কাছে, খুব কাছে, বোধহয় বুকের মধ্যেই তাকে রেখে নেয় প্রীতিলতা। সারারাত—যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় দ্বিজেন্দ্রনাথ। তখন, অন্ধকারে পাখার সোঁ সোঁ আওয়াজেও, চন্দনের গরম নিশ্বাস বারবার আসে যায় তার খোলা বুকে।

কিন্তু জ্বরের ঘোরেও ঘুমোয় না চন্দন। শরীর গুটিয়ে পড়ে থাকে, আঁকড়ে থাকে প্রীতিলতাকে। কথা বলে ফিসফিস করে। বোধহয় ভয় পাচ্ছে, তার সব কথা শুনে ফেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ।

দুটো ছোট খাট। দুটো মশারি। একটাতে চন্দন আর প্রীতিলতা। অন্যটায় দ্বিজেন্দ্রনাথ। সেদিকে মাঝে মাঝে তাকায় প্রীতিলতা। অন্ধকার। মশারির মধ্যে দিয়ে কিছু দেখা যায় না। তবুও সে ভয় পায়। তার স্বামীর খেয়াল আছে তো? মনে আছে কি সে চন্দনের জ্বর একটু বেশি বলে সে-ও আছে এ ঘরে, এই খাটে, তার পাশে। একটু সতর্ক থাকতে হয় প্রীতিলতাকে, যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের তাহলে সব চেয়ে আগে কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিতে হবে তাকে।

চন্দন আজ ছাড়েনি প্রীতিলতাকে। সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল—অনেক রাত অবধি, জ্বর যতই বাড়ে, ততই বোধ হয় ক্লান্তির ঘোরেই এক কথা, শুধু এক আব্দার তার মুখে, "থাক থাক, আজ রাত্তিরে তোমাকে থাকতেই হবে আমার কাছে—হবেই। আমি তোমাকে ছাড়ব না—কিছুতেই না। দেখি, আজ তুমি কেমন করে, আমাকে ছেড়ে এখান থেকে চলে যাও!"

যদি চন্দনের ঘরেই তার কথা মতো এক থেকে যেতে পারত প্রীতিলতা তাহলে বোধহয়, এখন মনে হয়, ভাল হত—খুব ভাল হত, প্রীতিলতা বেঁচে যেত। কিন্তু ও জানে, খুব জানে, তার বয়সের কথা মনে করে, কাছাকাছি সকলের, দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা ভেবেও সে আপন মনেই বুঝে নেয় ওখানে চন্দনের বিছানায় এক-একা অন্ধকারে থাকবার কথাটা কেমন অদ্ভুত ধোঁয়া-ধোঁয় হিম-কুয়াশা শীত ঋতুর মতোই ঝাপসা কনকনে কান্না-কান্না যেন! আরও, আর একটা ভাবনা, না চাইলেও, যেন থাকার ইচ্ছেটাকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে মাঝে মাঝে এখনও জ্বলে ওঠে প্রীতিলতার মনে, অনেক

অনেক ছোট হয়ে কেন তার কাছে এল না চন্দন!

তার মাথাটা বুকে চেপে রাখে প্রীতিলতা। আর বারবার, আস্তে, যত আস্তে কথা বলা যায়, সে শুধু বলে, "ঘুমো ঘুমো ঘুমো। কাল জ্বর বাড়বে। নিজে ভুগবি আর আমাকে ভোগাবি—"

অন্ধকার ঘরে পাখা চলার একটানা শব্দে, পাশের খাটে দ্বিজেন্দ্রনাথের জোর নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে চন্দনের গলাটা কেমন ধরা-ধরা শোনায় প্রীতিলতার কানে, "চাই না ভাল হতে। আমার জ্বর যেন কখনও না সারে—"

"ও কী কথা? দুষ্টু ছেলে!"

"জ্বর সারলে, রাত্তির বেলা তোমার পাশে শুতে পাব না যে", প্রীতিলতার গোটা শরীরটা নিজের কাছে, খুব কাছে টেনে নিয়ে চন্দন বলে, "আমার মা নাকি তুমি?"

"ওরে চন্দন, লক্ষ্মী বাপ আমার, এবার ঘুমো। আমার ঘুম পায় না বুঝি?"

"না, পায় না। এক রাত জেগে থাকতে পার না আমার জন্যে?" এবার চন্দন প্রীতিলতাকে একটা ঘা দেবার ইচ্ছায় বলে, "আমার অসুখ করলে, আমার মা, নিজের মা, সারা রাত জেগে বসে থাকত আমার মাথার কাছে", রাগ করে পাশ ফেরে চন্দন। আবার বলে, "আমার মা নাকি তুমি!"

ফিরে থাক ওপাশে। দরকার নেই ওর এপাশে ফেরবার। ওর কপাল টিপতে-টিপতে কান্না-কান্না গলায় বলে প্রীতিলতা, "এবার ঘুমো—লক্ষ্মী ঘুমো!"

পাশ ফিরেই পড়ে থাকে চন্দন। নড়ে না। কথাও বলে না। ওর মাথায় মুখ রাখে প্রীতিলতা। আস্তে, সাবধানে। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে এবার বুঝি সত্যিই ঘুমোয়।

আর ওদিকে হঠাৎ প্রীতিলতা ভয় পায়—ভীষণ ভয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের নাক ডাকা থেমে যায়। একটা উদভ্রান্ত আশঙ্কায় এই মুহূর্তে খুঁজে-খুঁজে আকাশ থেকে জ্বলন্ত সূর্যকে টেনে এনে আলোয়-আলোয় ঘর ভরিয়ে দিতে চায় প্রীতিলতা। ভোর হবে কখন—কখন!

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তাকেই খোঁজে দ্বিজেন্দ্রনাথ, "ওগো কই, কাছে আসবে না?" পাশের খাট থেকে একটা সরীসৃপ যেন লম্বা-লম্বা দাঁড়া মেলে এখুনি বেঁধে ফেলবে প্রীতিলতাকে।

"চন্দন, চন্দন—"ওকে জোর করে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে প্রীতিলতা জাগিয়ে দিতে চায়।

আর ওপাশ থেকে অসহিষ্ণু দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বরে বিরক্তি ফোটে, "এই রাতে অসুস্থ ছেলেটাকে জাগাচ্ছ কেন? ঘুমোক না বেচারী", একটা হাই তোলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, "কই—"

এপাশ থেকে প্রীতিলতার চাপা ধমক চমকায়, "আঃ—"

"এসো না গো। ওগো—"

রাগে আর লজ্জায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের জেদে, পশুর মতো আব্দারে মাথাটা ঠিক থাকে না প্রীতিলতার। ঝুঁকে পড়ে সে আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে চন্দনকে। সত্যি ঘুমিয়েছে তো। তারপর বারবার তার দিকে তাকাতে তাকাতে সাবধানে মশারি তুলে ভয়ে-ভয়ে চোরের মতো এ খাটে দ্বিজেন্দ্রনাথের পাশে এসে তাকে খুব জোরে চিমটি কাটে প্রীতিলতা, "একটু লজ্জাও করে না তোমার? ছি ছি, অতবড় ছেলে রয়েছে না ঘরে? একদিন ধৈর্য ধরতে পার না?"

জানোয়ারের মতোই হাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ। সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে, "ছেলে তো

ঘুমিয়ে আছে—ছেলের বাপের দিকে একবার দেখবে না প্রীতি!"

"থাক থাক, আর সোহাগে কাজ নেই। এই আস্তে, আঃ কী কর! যদি ওর ঘুম ভেঙে যায়—"

"আরে না না।"

একগলা লজ্জায় অন্য খাটের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রীতিলতা। এক মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হতে পারে না এখানে। আর তার স্বামীকে, তার শরীরকে পোড়া পোড়া কর্কশ কঠিন মনে হয় প্রীতিলতার। ছেঁকা লাগে ওর গালে কপালে মুখে—সারা দেহে। এখন এখান থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথকে ঠেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় অন্য খাটে। চন্দনের পাশে গিয়ে আদরে-আদরে তাকে জাগিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু তাকে অনেকক্ষণ জানোয়ারের মতো, সাপের মতো পাকে-পাকে বেঁধে রাখে দ্বিজেন্দ্রনাথ। ছোবল দেয়। ছাড়ে না। আর এই প্রথম, ওদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বোধহয় প্রীতিলতা এই রাতেই অল্পে-অল্পে মরতে থাকে, মনে মনে কাঁদতে থাকে, পড়তে থাকে স্বামীর শয্যায়।

আর অনেক পরে লাফিয়ে হুড়মুড় করে চন্দনের কাছে এসে শান্ত হয় প্রীতিলতা। ঠাণ্ডা হয়। খুশির নিশ্বাস ফেলে অন্ধকারেই একবার দেখে চন্দনকে। এখনও ঘুমিয়ে আছে তো। আর ওকে তখন একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় চন্দন। কথা বলে না।

কাঠ হয়ে যায় প্রীতিলতা। বোবা হয়ে যায়। কী লজ্জা—কী লজ্জা! এখন আর একবার ওই খাটে লাফিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। একটা সাপকে, জানোয়ারকে, তার স্বামীকে টুকরো টুকরো করে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে চায় প্রীতিলতা। কিন্তু আবার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। আবার ঘুমোয় দ্বিজেন্দ্রনাথ।

চন্দনের ধাক্কায় কান-লাল-করা লজ্জায়, যেন ব্যভিচার করার গ্লানিতে আর ধরা পড়ে যাওয়ার ক্ষোভে পাশ ফিরে হাঁপায় প্রীতিলতা। এখন চন্দনকে ছুঁতেও তার ভয় হয়। কী বলবে এখন তাকে—কী কৈফিয়ৎ দেবে!

কিন্তু হঠাৎ চন্দনকে বুকে টেনে নেয় প্রীতিলতা। আদরে-আদরে তাকে চমকে দেয়। আর চন্দন শক্ত করে ধরে তাকে। গালে গাল রাখে। মুখও। প্রীতিলতা বাধা দেয় না।

"ওর মাথাটা হঠাৎ খুব ধরেছিল", অনেকক্ষণ পর, ভেবে-ভেবে যেন একটা কারণ খুঁজে পায় প্রীতিলতা, "তাই আমি গিয়েছিলাম ওখানে—জানিস?"

এখন হাসে না চন্দন। প্রীতিলতার গলায় চাপ দিয়ে বলে, "আমি কালও আসব এখানে। রোজ আসব। অসুখ সেরে গেলেও তোমার সঙ্গে এখানেই ঘুমিয়ে থাকব।"

ভয়ে ভয়ে প্রীতিলতা বলে, "দূর পাগলা!"

"আসবই। দেখো, ঠিক—"

"বুড়ো ছেলে মার সঙ্গে রোজ রোজ শোয় নাকি?"

"তবে কার সঙ্গে শোয়?"

"বউ-এর সঙ্গে। তুই যখন বড় হবি, আরও বড়, তখন আমি তোর বিয়ে দেব। রাঙা টুকটুকে সুন্দর বউ আসবে তোর", একটা নিশ্বাস জোরে ফেলে প্রীতিলতা বলে, "তখন তুই কি তোর এই বুড়ি মার সঙ্গে শুতে চাইবি—"

"তুমি বউ", দ্বিজেন্দ্রনাথের খাটের দিকে আঙুল দেখিয়ে চন্দন বলে, "ওর বউ। আমি ওকে মারব—" সেই অন্ধকারেও প্রীতিলতা বুঝতে পারে, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চন্দন—হিংস্র হয়ে ওঠে।

"ছি ছি চন্দন, আস্তে। ওসব কথা বলে না। ও তোর কে হয়—সে জানিস না?"

"না না, কেউ হয় না। আমি ওকে ওসব বলে ডাকতে পারব না। তুমি তো ওর বউ। আমার মা নাকি! বউ, এই বউ—"

"চন্দন, চন্দন, আমি কাঁদব, তুই এসব বললে আমি ঠিক কাঁদব—" ঝরঝর করে জল পড়ে প্রীতিলতার চোখ দিয়ে চন্দনের গালের ওপর, চোখের ওপর, মুখের ওপর।

তবুও বলে চন্দন, "কাঁদ না, আমার কী? বউ—তুমি তো ওর বউ। আমার মা নাকি? আমি আর আসব না, থাকব না—কোনদিনও না—"

"চন্দন, চন্দন", থমকে যায় প্রীতিলতা, "এই তুই কাঁদছিস? কেন রে?" উঠে বসে ওর মাথাটা প্রীতিলতা কোলের ওপর তুলে নেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ভয়ংকর হয়ে ওঠে চন্দন, "ছুঁয়ো না, আমাকে ছুঁয়ো না, কখনও না—" প্রীতিলতার ছোঁয়া বাঁচাতেই যেন সে গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে আসে খাটের একদিকে। কাঁদে। একটা বউ-এর জন্যে, কিম্বা বুড়ি হিরণ্ময়ীর জন্যে—কে জানে!

শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথ নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। আর দুজন ঘুমতে পারে না। কিন্তু একটা কথাও বলে না কেউ। ভোরও হয় না।

* চিত্র প্রদর্শনী *

বর্তমান সংকটে দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সঙ্গে প্রতিরক্ষার সাহায্যে শিল্পীরাও এগিয়ে এসেছেন। আর্থিক সঙ্গতি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই না থাকায় তাঁদের কাছে যা সোনার সমতুল্য—নিজেদের সেই শিল্পকর্ম তাঁরা দান করেছেন। গত ২৩শে নভেম্বর আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের উদ্যোগে তাদের গ্যালারিতে ছিয়ানব্বই জন শিল্পীর কাজের একটি প্রদর্শনী এই উদ্দেশ্যে উদ্বোধিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রী বি সি মালিকের সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল পত্নী শ্রীমতী ডবলু ও ব্যাক্সস্টার প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন।

প্রবীণ এবং নবীন শিল্পীদের মোট একশত ত্রিশটি শিল্পকর্মের এই সমাবেশে ৬০, টাকা থেকে ৬০০০, টাকা মূল্যের ছবি ও ভাস্কর্য রয়েছে এবং গুরু স্থানীয় থেকে আধুনিক পরীক্ষামূলক কাজে নিরত শিল্পীদের অনেকেরই কাজ এক স্থানে দেখার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। কতক নতুন কাজ থাকলেও ইতিপূর্বে সুখ্যাত কৃতিত্বপূর্ণ কাজই বেশী। সোসাইটি অফ কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস, ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটি, ইন্ডোকন্টিনেন্টাল আর্টিস্টস, স্টুডিও গ্রুপ ও মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পীজোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করার এই ধরনের এবং এমন বৃহৎ প্রচেষ্টা ভারতে এই প্রথম।

এতগুলি দ্রষ্টব্যের বিচার স্থানাভাবে সম্ভব নয়। এর মধ্যে শিল্পরসিক জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মতো ছবিও কম নেই। অতুল বসুর আঁকা যামিনী রায়ের প্রতিকৃতি শিল্পীর নিজস্ব বিশেষ ধারার একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। কৃষ্ণ রায়ের আঁকা মহাত্মাজীর স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিকৃতিটিও অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পূর্ণ চক্রবর্তী এবং সতীশ সিংহ তাঁদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধারায় আঁকা ছবি দান করেছেন। গোপাল ঘোষের দুটি প্রাকৃতিক শোভাময় দৃশ্যসম্বলিত ছবি তাঁর প্রতিষ্ঠানুযায়ী প্রতিভার পরিচয় দেয়। অন্নদা মুন্সীর 'রামায়ণ' ও 'শেষ বিচার' ছবি দুখানি কল্পনা ও শিল্পকৌশল প্রয়োগে বলিষ্ঠ প্রতিভার পরিচায়ক। রথীন মৈত্রের 'মায়ের স্বপ্ন' ও 'ফুল হাতে বালিকা' তাঁর সুখ্যাত ছবির মধ্যে গণ্য। নীরোদ মজুমদারের "উচ্চৈঃশ্রবা" নতুন ছবি এবং রঙের প্রয়োগ ও রেখার ছন্দোবন্ধ সমাবেশের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সনৎ করের 'প্রতিবেশী', সুনীলমাধব সেনের 'ধানকাটা', 'একটি মেয়ের মুখ', সুবীর সেনের 'পুলকোচ্ছাস' ও 'ক্ষুদে কুস্তিগীর', অনিলবরণ সাহার 'ইমারৎ', কল্যাণ সেনের 'সঙ্গী' ও 'মাছমারার দল' প্রভৃতি ছবিগুলিও শিল্পপ্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ছাড়া ইন্দ্র দুগার, পূর্ণিমা গৌরীশংকর, সমর ভৌমিক, রঘুনাথ গোস্বামী, শ্যামল দত্ত রায়, সুভাষ রায়, সুধীররঞ্জন ভূষণ, অনিতা রায় চৌধুরী, চন্দ্রনাথ দে, ইন্দু রক্ষিত, জগদীশ রায়, কিশোরী রায়, অনিল ভট্টাচার্য, দেবকুমার রায় চৌধুরী পাচু গুপ্ত, মুরলীধর টালি, সুকুমার দত্ত, টুটু লাহিড়ী প্রভৃতির ছবিগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভাস্কর্য বিভাগে কাঠে খোদাই, পোড়ামাটির এবং সিমেণ্টে তৈরি কতকগুলি কাজ পরিবেশন করেছেন মাধব ভট্টাচার্য, সুবল সাহা ও সুভাষ রায়।

শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ও বিত্তশালী জনসাধারণের প্রত্যেকেরই কর্তব্য প্রতিরক্ষায় শিল্পীদের এই প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তোলা। প্রদর্শনীটি ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে।

*

রঙ ও রেখায় লালিত্য ফুটিয়ে সন্তোষকুমারী রোহতাগি যে পুলকিত করে তোলার মতো প্রতিভার অধিকারিণী গত ১৯শে নভেম্বর আর্টিস্ট্রী হাউসে উদ্বোধিত তাঁর ছবির একক প্রদর্শনীটি থেকে সেটা উপলব্ধি করা গেল। শিল্পী রোহতাগি বিশেষ বৃত্তি পেয়ে প্যারিসে যান শিল্পকলা চর্চায় এবং ইওরোপে থাকাকালে ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনে যে সব দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেই অভিজ্ঞতাই তিনি প্রদর্শিত পঁয়তাল্লিশখানি ছবিতে প্রকাশ করেছেন। কতকগুলি ছবি সঙ্গে সঙ্গে রঙে আঁকা এবং বাকিগুলি স্কেচ থেকে পরে তৈরি করা। এটি তাঁর পঞ্চম একক প্রদর্শনী।

মূলত বাস্তবানুসরণপন্থী হলেও রঙের

ফাইন আর্টস আকাদমি গ্যালারিতে প্রতিরক্ষার সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত চিত্রপ্রদর্শনীর একাংশ

আলাপ শিল্পী : সন্তোষকুমারী রোহতাগি

প্রয়োগে কতক ছবির ক্ষেত্রে ইম্প্রেসানিস্টিক ধারার অনুসৃতি লক্ষ করা যায়। খুঁটি-নাটিকে বিশদভাবে না এ'কে রঙের সাহায্যে আভাসে বুঝিয়ে দেবার সুষ্ঠু ও দীপ্ত শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পথের ও পার্কের দৃশ্যের সঙ্গে খালে গণ্ডোলা, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই, বাজারের একাংশ, কাফে ছাড়া প্রতিকৃতিরও সমাবেশ শিল্পীর বিষয়-বস্তু নির্বাচনে রকমারিতার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে পার্কে ভ্রমনার্থীদের ছবি 'শরৎকাল', 'প্রাতঃবিহার', 'প্রভাতের আলো', 'ভেনিসের খাল', 'গণ্ডোলা', ও 'রবিবারের সকাল' প্রভৃতি ভাবময় আবহাওয়ার রূপ ফুটিয়ে তোলায় কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের চমৎকার রূপ ফুটেছে বাজারের ছবি 'প্রথম খরিদ্দার'-এ। আলোর মোহময় দীপ্তি দেখা যায় 'বার' ছবিখানিতে। 'ইভেত', 'জেনি-ভিয়েভ', 'আদ্রিয়ানা', 'লিলিয়েন', 'অদেৎ', 'লোলা' প্রভৃতি ছবিগুলি ইম্প্রেসানিস্টিক ধারায় প্রতিকৃতি অংকনের সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'ফলিজ বাজেয়ার', 'মাটাডর', 'ষাঁড়ের লড়াই' প্রভৃতি ছবিগুলি বাস্তবানুগামীতার প্রশংসনীয় সৃষ্টি। শিল্পীর আঁকার সাবলিল ভংগীতে সাধারণ দৃশ্যও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

*

দীর্ঘ বিরতির পর পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এণ্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে সপ্তাহব্যাপী যে চিত্রপ্রদর্শনীটি গত ২৩শে নভেম্বর উদ্বোধিত হয়েছে তার শিল্পী হলেন গোপাল সান্যাল। ১৯৫৫-৫৬-তে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিপ্লোমা লাভের পর ভারত গভর্নমেণ্টের বিশেষ বৃত্তি পেয়ে তিনি চিত্রাংকন বিষয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের অধীনে তিন বৎসর অনুশীলন কাজে রত থাকেন। কল্পনাশক্তি, ভাব ও অংকনকৌশলে মৌলিকত্বের পরিচয়ের জন্য দিল্লির আধুনিক শিল্পকলার রক্ষণাগার ও ললিতকলা আকাদমি এ'র কয়েকখানি ছবি কিনে রেখেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে এ'র ছবি অন্তর্ভুক্ত হলেও একক প্রদর্শনী তাঁর এই প্রথম।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁর আঠারোখানি ছবির অধিকাংশেই ত্রিকোণ ও বৃত্তাকার মোটা রেখায় কিউবিজম ধারার অনুসরণে একটা নিজস্ব শিল্পভঙ্গীর উদ্ভাবন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনেকটা ভাস্কর্যের প্রভাব ফুটে উঠেছে মোটা তুলির টানে মুখ্যত সাদা, কালো, ঈষৎ হলদে এবং মেটে লাল রঙে দীর্ঘায়িত অঙ্গ, মানুষের ডিম্বাকৃতি মুখা-বয়বে বৃহৎ অক্ষিগোলকের মধ্যিখানে অতি ক্ষুদ্র চোখের তারা ছবিগুলির একটা অপ্রাকৃত রূপ দৃষ্টিতে প্রতিভাত করে তোলে। তাঁর সৃষ্টি 'মানুষ ও যন্ত্র', 'রেসের ঘোড়া সমেত জুয়াড়ি', 'স্মৃতিমন্থন', 'মানুষ ও ছাগল', 'সঙ্গীতজ্ঞ', 'জীবন ও মৃত্যু', 'সমাজ', 'স্বপ্ন', 'নারী ও ঘোড়া' প্রভৃতি এই ধরণের এবং অন্যান্য ছবির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তেমন অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী দৃষ্টিকে সহজেই আকৃষ্ট করে, একটা ভাবোদ্দীপক চিন্তাশক্তির আভাস এনে দেয়। এই পর্যায়ে 'স্মৃতিমন্থন', 'গোলাপ হাতে নারী' এবং 'নারী ও ঘোড়া' ছবি তিনখানি একটা বিশেষ মেজাজের পরিচয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কিছুটা ইম্প্রেসানিস্টিক ধারার অনুসরণে উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগে আঁকা বাস্তবানুগ দৃশ্য 'বিবাহের শোভাযাত্রা' এবং 'মাছধরা নৌকা' ছবি দুখানিতে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন।

প্রদর্শনীটি ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্ব-সাধারণের জন্য খোলা থাকবে।

স্বপ্ন শিল্পী : গোপাল সান্যাল

সাহিত্য সংবাদ

নতুন করে পাওয়া

কোনো কোনো কথা নাকি সুন্দরী রমণীর মতন। প্রথম শ্রবণেই প্রেম ঘটে।

সম্প্রতি একটি লেখা দেখছিলাম। 'লেখক কি সর্বদা নিজের অভিরুচি মতন লিখতে পারেন?'—প্রসঙ্গটা এই। (যে-প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে কলিন উইলসন দু-দফা লিখেছেন,—এবং যার মর্ম আমি আপনাদের দেবার চেষ্টা করেছি পূর্বেই।) ইউজিন আয়োনেসকো উক্ত বিষয়ে তাঁর মতামত দিয়েছেন সংক্ষেপে। লেখাটি আমার বড় ভাল লেগেছে। আর ভাল লাগার প্রথম কারণ এই, প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি অত্যন্ত সুন্দর একটি কথা পেয়েছিলাম: "All thought, all art is aggressive."

ইউজিন আয়োনেসকো সম্প্রতি বাংলা দেশেও সাহিত্যমহলে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে পড়েছেন। নাট্যকার হিসেবে এক দশক আগেও তাঁর নামের প্রচার এতটা হয়নি, তাঁর স্বভূমিতেও নয়। গত পাঁচ ছ'বছরের মধ্যে য়ুরোপ তাঁকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে। শুনেছি, আমেরিকাও। ফরাসী দেশের মতন জায়গায়, যেখানে প্রতিভারা ধূমকেতুর মতন উদয় হন ও বিলীন হন, সেখানে আয়োনেসকো এক যুগ তাঁর নাটকাদি নিয়ে উপেক্ষিত পড়ে থাকলেন এটাই আশ্চর্যের। ...অবশ্য এই উপেক্ষার পরিণতি ভালই, আজ য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে আয়োনেসকো নবীন সাহিত্য-সমাজের কাছে সমাদর ও সম্মান লাভ করছেন আশাতীতভাবে।

আপাতত তাঁর জীবনী-প্রসঙ্গ থাক, তাঁর লেখার বক্তব্য বলি। আয়োনেসকো বলেছেন: আমি বিশ্বাস করি, শিল্প এবং চিন্তার ইতিহাসে একটা সময় আসে যখন শিল্প ও চিন্তাকে নতুনভাবে প্রাণ পেয়ে নিতে হয়। (তিনি 'রিনিউআল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এ-ক্ষেত্রে, শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ।) কিন্তু এই সময় কখন আসে, কিভাবে আসে? তার উত্তরে আয়োনেসকো বলেছেন, যখন সংস্কৃতির এক চরম অবস্থা আসে।

মানুষের ইতিহাস ঘাটলে দেখব—একের পর এক সংকট এসেছে। এই সংকট নানা চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে, কখনও শর্ত

ইউজিন আয়োনেসকো

ভাঙা হয়েছে, কখনও স্পষ্ট অস্বীকার করা হয়েছে, কখনও তুলনা এসেছে, কখনও বা আমরা পুরোনো মনোভাব গ্রহণ করাও শ্রেয় মনে করেছি, অবশ্য নতুন দৃষ্টিতে।

"যদি সংকট না থাকে—" আয়োনেসকো বলেছেন, "যদি সংকট না থাকে তবে থাকবে বদ্ধদশার আবিলতা, পাথরের জড়তা, আর মৃত্যু। সমস্ত চিন্তা, সমস্ত শিল্পই তাই অ্যাগ্রেসিভ।"

রোমান্টিসিজমও এই অর্থে ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে আক্রমণ। ক্লাসিসিজমের সার্বিক সত্যর বিরুদ্ধে রোমান্টিসিজম তার নিজের পৃথক সত্য ধারণা করেছে এবং প্রকাশ করেছে। নতুন চিন্তা ধারার বশবর্তী হয়ে যে রোমান্টিকরা নিজেদের মনোভাব অনুভব করাবার চেষ্টা করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। আবার পারনাসিয়ান আন্দোলন যে রোমান্টিসিজমের বিরোধিতা করে নতুন ধরনের ক্লাসিসিজমের মধ্যে ফিরে যাবার চেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। সিম্বলিজম আবার পারনাসিয়ান আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সিম্বলিজমের বিরোধিতা করেছে ন্যাচারালইজম। এইভাবেই চলেছে।

সমস্ত শিল্প আন্দোলনই বিদ্রোহ; প্রত্যেক যুগের শিল্পীরাই একটি নতুন ধরন আবিষ্কার করেন, বা করবার চেষ্টা করেন। মানুষ কখনও কখনও এটা সহজে কখনও বা যথেষ্ট পরে বুঝতে পারে যে, বিশেষ এক রীতিতে সব কিছু বলার দিন ফুরিয়ে গেছে, এখন নতুনভাবে বলার ভাষা অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে।

পুরোনো ভাষা (এখানে ভাষা মানে শব্দ সমষ্টি নয়, বলার ধরন, চিন্তা, মন ইত্যাদি) ব্যবহারে ব্যবহারে নিঃশেষিত, পুরোনো নকশা লক্ষ বার টাঙানো হয়েছে, এখন আর এই পুরোনোতে চলবে না, নতুন ভাষা খুঁজে নিতে হবে, পুরোনো নকশাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে, নয়ত নতুন জিনিস যা বলার আছে লেখার আছে তা লেখা হবে না।

নতুনের শুরু কেন হয়? প্রধানত এই কারণে। হয় যে নতুনরা একটি সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা জানাতে চায়, তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে বহুলাংশেই তারা পৃথক।

এই যে চিন্তা, নতুনদের চিন্তা—তারা বহুলাংশে পূর্বদের চেয়ে পৃথক—এই মনোভাব বা ধারণা ক্রমশ কমে আসে, কমে আসবেই। আর তখন দেখা যাবে, পুরোনো-দের সঙ্গে নতুনদের একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে। যখন পুরোনোর সঙ্গে নতুনের চরিত্রগত কোনো সাদৃশ্য বা কোনো এক রকমের একাত্ম সম্পর্ক দেখা যাবে—তখনই তার মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পাবে, নিজেকে চিনতে পারে। আর সাহিত্য শিল্পের ইতিহাসে সেটাই মাত্র টিকে-থাকবে।

অতঃপর আয়োনেসকো তাঁদের নব্য-সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার কথা বলেছেন, নিজের লেখার বিষয় সামান্য কিছু জানিয়েছেন—কিন্তু এ-আলোচনায় তা অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করলাম না।

আয়োনেসকোর বক্তব্যটি আমার কাছে সব সময় গ্রহণীয় হয়ে থাকল। আমারও বিশ্বাস, সাহিত্য ও শিল্পগত নব্য আন্দোলন কখনই সার্থক হয় না, যতক্ষণ না তা পুরোনোর সঙ্গে কোথাও না কোথাও যুক্ত হতে পারছে। সম্পূর্ণ নতুন বলে কোনো কথা বস্তুত চিন্তা বা শিল্পে নেই। একটি উদাহরণ দিলে বলতে হয়, কলকাতার মাটিতে যে ল্যাঙড়া আম গাছটি আজ ফলবান, তার অতীত আছে, আর আছে বলেই এই আম-ফলের স্বাদে, মাটির বিভিন্নতা সত্ত্বেও, বেনারসী ল্যাঙড়ার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে।

বাঙলা দেশের তরুণ লেখকদের আমি অনুরোধ করব, এই সত্যটি তাঁরা যেন অস্বীকার না করেন। কোনো নতুনই অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, কোনো নতুনই কাজের নয়, যার সঙ্গে পূর্বসম্পর্কের সংযোগ না ঘটছে নতুন ভাবে। আয়োনেসকো যে অনেক ভেবেচিন্তে এবং প্রাজ্ঞের মতন 'রিনিউঅ্যাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাতে আমার সন্দেহ নেই।

একটি চিঠি

মাননীয় বিদুর,

ভারতের ওপর চীনের বর্বরোচিত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ই নভেম্বর-এর 'দেশ' পত্রিকায় 'স্বদেশ প্রেম ও সাহিত্য' নামে আপনার একটি সুচিন্তিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আপনি যে মন্তব্য করেছেন তা' সর্বাংশে সত্য, যদিও তথাকথিত কিছুসংখ্যক প্রগতি-শীল (দুর্মতিশীল?) লেখক আপনার মন্তব্যকে অনেকটা 'ফতোয়া' বলে মনে করবেন। এ'রা এখন বাতাসের হৃদপিণ্ড, অন্ধকারের মেদ-মজ্জা এবং আলোর নাভি-শ্বাস ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন; আপনার মন্তব্যে এ'দের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে এ প্রায় অবধারিত সত্য।

সোভিয়েট রাশিয়া যখন মারাত্মক মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় তখন সর্বপ্রথম 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখকদের একটি সমবেত বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল; যদিও সেবারও অনেক 'দুর্মতিশীল' লেখক সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানে উৎসাহবোধ করেন নি। এবারও অনিচ্ছাসত্ত্বে নিতান্তই ঠেকে অনেককে বিভিন্নস্থানে স্বাক্ষরদান করতে হয়েছে, পিঠ বাঁচানোর জন্য হলেও হয়েছে। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়বোধ করবার মত কথা এই যে, সেবার যাঁরা স্বাক্ষরদান করে-ছিলেন এই আন্তর্জাতিক অপরাধ সম্পর্কে তাঁরা কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনার প্রয়াস পান নি। মানবতার এই লাঞ্ছনা কি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে একেবারেই নিকৃষ্ট ছিল?

অপদার্থতা ও হঠকারী নীরবতার একটা সীমারেখা থাকা উচিত। লেখকরা আজকাল প্রায়শই অনেক গালভরা কথা বলে থাকেন, বিশেষত গদ্য লেখকরা। কবিরা তবু কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করেন, যদিও তাঁদের কবিতা আমাদের মত স্বল্পশিক্ষিত দেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার পথে বিস্তর বাস্তব অন্তরায় রয়েছে। সব লেখক অন্তত আজকের জন্য একটু মাটির কাছাকাছি এসে প্রাণ খুলে উদাত্ত কণ্ঠে কথা বলুন। এবং বলুন। শুধু স্বাক্ষরদানই যেন 'সব' বলা না হয়। আর 'শব'-এর জন্যও যেন বলা না হয়! ইতি—

অমূল্যরতন সেন, কল্যাণনগর

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

উক্ত গ্রন্থাবলীর গ্রাহকগণকে জানান হইতেছে যে, আগামী ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ঐ গ্রন্থাবলীর কয়েক খণ্ড দিবার জন্য প্রস্তুতি চলিতেছে। কলিকাতা উদ্বোধন অফিস হইতে যাঁহারা লইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আমাদিগকে জানাই-বার আবশ্যক নাই।

যাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত কেন্দ্রের মাধ্যমে পাইতে চাহেন, অথবা নিজ নিজ ঠিকানায় গ্রন্থগুলি ডাকযোগে বা রেলওয়ে কিংবা বিমানযোগে পাইতে চাহেন, তাঁহারা পূর্বে জানাইয়া না থাকিলে আগামী ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে সবিশেষ বিবরণ সহ পত্র দ্বারা অবশ্য আমাদের জানাইয়া দিবেন; নতুবা গ্রন্থ পাইতে অসুবিধা হইবে। এতদুভয় ক্ষেত্রে গ্রন্থ পাঠাইবার খরচ গ্রাহক-গণকে বহন করিতে হইবে তাহা পূর্বেই আমরা জানাইয়া দিয়াছি। ঐ প্রকার পত্রে গ্রাহকগণ প্রথম রসিদ নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

কেন্দ্র—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—(কলিকাতার বাহিরে)—আমিনাবাদ (লক্ষ্ণৌ); মুঠিগঞ্জ (এলাহাবাদ); রামকৃষ্ণনগর (কানপুর); খার (বোম্বাই); বাঁকীপুর (পাটনা); আসানসোল (বর্ধমান); বাঁকুড়া; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক (মেদিনীপুর); শিলং (আসাম); জামসেদপুর (বিহার); শিল্পমন্দির (বেলুড়-মঠ); ২৪ পরগনা—রহড়া, টাকী, নরেন্দ্রপুর, সরিষা; কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম (বেলঘরিয়া); রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, ৪নং নস্করপাড়া লেন, হাওড়া; জলপাই-গুড়ি; মালদহ; সারগাছি (মুর্শিদাবাদ); অদ্বৈত আশ্রম (বারাণসী—১); টি· বি· স্যানাটোরিয়াম্ (রাঁচী); শ্রী বি বি ঘোষ (পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, পুরুলিয়া)।

(কলিকাতার এলাকা)—বরাহনগর (কলিকাতা—৩৬); এইচ· কে· ঘোষ অ্যাণ্ড কোং, ২৫-এ সোয়ালো লেন (কলিকাতা-১); আশুতোষ কলেজ (প্রিন্সিপ্যাল শ্রীজ্যোতিষ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ৯২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড (কলিকাতা—২৬)।

বাগবাজার, উদ্বোধন কার্যালয়ের আফিসের সময়ঃ—সকাল ৭টা হইতে ১০॥টা, এবং বৈকাল ২॥টা হইতে ৫টা।

* ট্রামে-বাসে *

বিশু খুড়ো বলিলেন—"চীন-দরদী কমিউনিস্ট সভ্যদের, যাঁরা সর্বসাধারণ কর্তৃক 'অর্বাচীন' নামে খ্যাত হয়েছেন, গ্রেপ্তার করা হয়েছে" এই পর্যন্ত বলিয়াই বিশু খুড়ো কবিতা ধরিলেন—"তেনারা ফুঁকেন চোঙ্গা অতি চমৎকার, হঠাৎ চাহিয়া দেখি ভেঙে চুরমার!!"

হোমগার্ড রিক্রুট করার প্রসঙ্গে জনৈক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"হোম গার্ড সংগ্রহে কোন অসুবিধেই নেই। রাত দশটার দু'মিনিট পর বাড়ি ঢুকেছি আর বাপ্‌স, সে কী তম্বি, হোম গার্ড তো ঘরে ঘরে তৈরি হয়েই বসে আছে!"

আসাম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অংশ চীনের অধীনে দেখাইয়া একটি মানচিত্র ছাপা হইয়াছে এবং ইহা নাকি কলিকাতায় বিলি করা হইয়াছে।—"মানচিত্রটি দেখিনি, সুতরাং বলতে পারব না টেরিটিবাজার, চ্যাংরা, ছাতাওয়ালাগলি এবং মনুমেন্টের তলাকে চীনের অধীন দেখান হয়েছে কি না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ক্যালকাটা রয়েল টার্ফ ক্লাব সরকারের অনুরোধক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপটি এই বছরে স্বর্ণনির্মিত হইবে না।—"তা না হোক, বাজি-ধরা ঘোড়াটি বাজি মাৎ করলেই সোনার চাঁদ বলে তার ল্যাজ ধরে ধেই নৃত্য করব"—বলেন জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্রী।

চীন অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছে—"কিন্তু হিমালয়ের দারুণ শীতে সীজ-ফায়ার-এর কথাটাকে সবাই নেহাত ছেঁদো কথা বলেই মনে করছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

বিধান সভার সংবাদে পড়িলাম শ্রীসিদ্ধার্থ রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, একদিন আমি উহাদের সঙ্গে (কমিউনিস্টদের দেখাইয়া) মিশিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাদের আর আমার মধ্যে দূরত্ব দিল্লী হইতে পিকিংএর দূরত্বের সমান। শ্যামলাল বীরবলের গল্প উদ্ধৃত করিয়া বলিল—"একদিন সম্রাট আকবর মানুষের সঙ্গে গাধার দূরত্ব কী জিজ্ঞেস করায় বীরবল নাকি তাঁর দাঁড়াবার স্থান থেকে সম্রাটের দাঁড়াবার স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব মেপে বলেছিলেন—'এই ধরুন চার হাত।' রায় মশাইর মাপজোপ দেখে বীরবলের কথাটাই মনে পড়ল!!"

নেহেরুজীর নিকট জনাব আয়ুব খাঁ যে চিঠি দিয়াছেন সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তান প্রেসে প্রতিক্রিয়া ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়।—"হবেই। একটা চিত্র হল সুদক্ষ শিল্পীর অন্যটা নেহাতই গেঁইয়া পটুয়ার"—বলেন বিশু খুড়ো।

প্রসংগত অন্য এক ক্রিকেট রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"অস্ট্রেলিয়ায় এম, সি, সি-র ব্যাটিং বিপর্যয়ের কাহিনী পড়ে মনে পড়ল, এ'রাই বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে পাঁচদিন ক্রিকেট খেলার কোন মানে হয় না। এম সি, সি সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়া কি বলেন সেটা দেখবার জন্য রোজ খবরের কাগজের পাতা উল্টোই।"

কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, কাজটা ঠিক এই সময়ে ঠিক হয় নাই। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু লাহিড়ী মশাই হয়ত সরকারকে "সদাশয়" বলিতে কার্পণ্য করবেন না, কেননা বিধান সভায় বসু মশাই যখন তাঁকে গুলী করার জন্য বুক পেতে দিয়েছিলেন তখন গুলী কেউ করেননি বরং 'কী বাহারে' বলে তারিফই করেছেন!"

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন,—'দেশবাসী কি শুধু কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিবে?'—"নিশ্চয়ই নয়, সৎকার করার পর প্রেতের উদ্দেশ্যে পিন্ডান্তে পিন্ড শেষ করাও যে শাস্ত্রের বিধান"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

প্রসংগত ছাত্রীদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা মনে পড়িল।—"এ ক্ষেত্রেও শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে অসুবিধে হবে না, শুধু রণকৌশলটা হবে রকমফের অর্থাৎ খেংরার বদলে রাইফেল চালনা"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

আমাদের নবনির্বাচিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন নাকি বলিয়াছেন যে, রাশিয়া চীনকে 'ভাই' বলিয়া ডাকে, আর আমাদের বলে 'বন্ধু'। সুতরাং বিপদে 'ভাই' ভাই-এর পাশেই দাঁড়াইবে।—"কিন্তু হিন্দী-রুশী ভাই-ভাইও ত আমরা বলেছিলাম; সেই সম্বন্ধ চুকেবুকে গিয়ে যদি এখন গিন্নীর ভাই হয়ে থাকি, সে অবশ্য আলাদা কথা"—বলে শ্যামলাল।

প্রসংগত বিশু খুড়ো অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন—"রাশিয়া একবার এই কথাও বলেছিল যে, রুটির শেষ টুকরোটি তারা ভারতের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাবে। রুটি নয় ছেড়েই দিলাম। আপাতত "মিগ"-এর কথাটাই ভাবছি; সেটাও কি গন্ উইথ দি উইন্ড!"

ওয়ালং-এর পতন ঘোষণার পর হুগলী জিলার কোন এক অঞ্চলে নাকি মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইয়াছে।—"মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ বলে যে একটা কথা আছে, সেই ইতরের অর্থ এবারে সুস্পষ্ট হল"—বলে শ্যামলাল।

ট্রামে-বাসের মারফতে আমরা প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীকে বলেছিলাম যে, আমরা কিছুতেই আপ্‌সেট্ হব না, তবে রোভার্স কাপে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের যদি কোন একটা বিপর্যয় ঘটে তা হলে কী হবে বলতে পারিনে। সেই বিপর্যয় ঘটেছে, মোহনবাগান রোভার্স কাপ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন বাকী রইল অন্ধের নড়ি ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু সাত সাতবার রোভার্স কাপ বিজয়ী অন্ধ্র পুলিসের কথা ভেবে ইস্টবেঙ্গলের অনিষ্টের কথাই শুধু মনে পড়ছে,—'পুলিস অ্যাকশনের' বিরুদ্ধে কি আর তারা দাঁড়াতে পারবে"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী'

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের নাটক : প্রতীক ও রূপক নাটকের আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য—শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, বুকল্যান্ড প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ১০·০০ টাকা।

১৯০৮ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন যেগুলির মধ্যে সমালোচকেরা রূপ এবং বিষয়গত একটা ঐক্যসূত্র দেখতে পেয়েছেন। বিভিন্ন সমালোচকের বইতে এই নাটকগুলি বিভিন্ন নামে আখ্যাত, যেমন—রূপক, সাঙ্কেতিক, প্রতীক ও তত্ত্বপ্রধান। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলি। এগুলিকে লেখক রূপক নাট্য বলেছেন। কারণ রূপক এবং প্রতীক লেখকের মতে Symbol-এর বাংলা প্রতিশব্দ। এ-সম্পর্কে লেখক যে যুক্তি দিয়েছেন তা যথার্থ।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনাকে তিনটি খন্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খন্ডের বিষয় প্রতীকের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ। এই আলোচনাটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। বিষয়টি জটিল বটে, কিন্তু লেখক আলোচনার সূত্রগুলি সতর্কতার সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে একটা স্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন। তবে এই খন্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দিকে ইংরাজী বই থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ কিছু বেশী। যেমন "সংকেত স্পষ্ট হইলে আর তাহা প্রতীক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সেইগুলিকে তখন চিহ্ন বলিয়া চিহ্নিত করাই সংগত। সুশান ল্যাংগার বলিয়াছেন..." (উদ্ধৃতি) পৃঃ ২; এর পরেই "প্রতীকে গোপনতা এবং প্রকাশের সমন্বয় হয়। ক্যাজিয়ার বলিয়াছেন......(উদ্ধৃতি)। ল্যাংগারও মনে করেন..." (উদ্ধৃতি)। এরকম উদ্ধৃতি কণ্টকিত লেখা বাংলায় এক সময় খুব চলত। এখন এ রকম লেখা খুবই বিরক্তিকর। লেখক যে তত্ত্বটিকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার জন্যে ল্যাংগার ও ক্যাজিয়ারের সাক্ষ্য কি অপরিহার্য? আদৌ নয়। একটু পরেই সেই বক্তব্যটিকেই লেখক উদাহরণ সহযোগে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন।

ল্যাংগারের অনুসরণে লেখক দুই শ্রেণীর চিহ্নের কথা বলেছেন—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। এই দুই শ্রেণীর চিহ্নের একটা বৈশিষ্ট্য লেখক উল্লেখ করেননি। প্রাকৃতিক চিহ্ন সর্ব দেশের এবং সর্ব কালের। ধোঁয়া সর্বত্রই অগ্নির চিহ্নরূপে স্বীকৃত। কৃত্রিম চিহ্ন স্থান-কালের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। নারীর সিঁথির সিন্দুরে যে বিবাহের চিহ্ন এটা সর্ব দেশে এবং সর্ব কালে স্বীকৃত নয়।

প্রতীকের আর একটি বৈশিষ্ট্য লেখকের আরও স্পষ্টভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল। প্রতীক বুদ্ধির জগতে সত্য নয়, অনুভবের জগতে সত্য। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি শালগ্রাম শিলা। ভক্তের পূজিত শালগ্রাম শিলাটি আর দশখানা প্রস্তরখন্ড থেকে পৃথক হয়ে উঠছে ভক্তের অনুভবে। শালগ্রাম শিলায় দেবত্ব নেই। ভক্ত শালগ্রাম শিলায় দেবত্ব আরোপ করছে বলেই সাধারণ প্রস্তরখন্ড বিশেষ হয়ে উঠছে। প্রস্তরখন্ড মাত্রেই প্রতীক নয়। শালগ্রাম শিলাই প্রতীক। রক্তকরবী ফুল আরও দশ-বার রকমের ফুলের মত একটা সাধারণ ফুল। সেই সাধারণ রক্তকরবীর বিশেষ হচ্ছে "রক্তকরবী" নাটকে। এই বিশেষত্ব আরোপ করছেন রক্তকরবীর নাট্যকার। সুতরাং প্রতীক মাত্রেই মানুষের অনুভবের সৃষ্টি। সাহিত্যে প্রতীক সার্থক হয় কি ভাবে? পাঠক-দর্শক যদি নাট্যকারের বিশেষ রক্তকরবীকে বিশেষভাবে দেখে তবেই রক্তকরবীর প্রতীকত্ব সার্থক।

প্রথম খন্ডের আলোচনায় লেখক অনেক ইংরাজী বই-এর সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু Symbolism সম্পর্কে একখানি প্রমাণিক বই গ্রন্থ তালিকায় দেখতে পেলাম না। The Meaning of Meaning by C. K. Ogden and I. A. Richards, Routledge & Kegan Paul Ltd., Tenth edition 1960 —এই বইখানি দেখলে লেখক অবশ্যই উপকৃত হতেন।

দ্বিতীয় খন্ডে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলির আলোচনা। ভূমিকায় লেখক দাবি করেছেন প্রথম খন্ডের আলোচনার উপর দ্বিতীয় খন্ডটি স্থাপিত। আসলে তা ঠিক নয়। প্রথম খন্ডে প্রতীক সম্পর্কে যে সূত্রগুলি লেখক সযত্নে দাঁড় করিয়েছেন দ্বিতীয় খন্ডে নাটকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে সে সূত্রগুলি ব্যবহার করা হয়নি। নাটকগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যার উপর লেখক বেশী জোর দিয়েছেন। তত্ত্ব ব্যাখ্যা ত আগে বহুজনে করেছেন। এই তত্ত্বগুলি প্রতীকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে প্রকাশ করেছেন দ্বিতীয় খন্ডের আলোচনায় সেইটিই প্রধান হওয়া উচিত ছিল।

রাজা নাটকের প্রতীক কি? অন্ধকার ঘর। এই অন্ধকার ঘরটি নাটকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা অনুধাবনযোগ্য। এই নাটকে আলো এবং অন্ধকারের প্রতীক-মূল্য আছে। আলো খন্ডতার প্রতীক, অন্ধকার অখন্ডতার। আলোয় আমাদের চোখ সক্রিয়। চোখ মানুষে মানুষে, মানুষে প্রকৃতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। চোখ ধাঁধা লাগায়, বিভ্রান্ত করে। চোখ ছুটে চলে "ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে।" চোখ এবং আলো রূপজগতের। অন্ধকারে চোখ চলে না, মন চলে। মনের দৃষ্টি, ধ্যানের দৃষ্টি অখন্ডতাকে দেখায়, অরূপকে দেখায়। মন এবং অন্ধকার অরূপ জগতের। এই আলো এবং অন্ধকার, চোখের দৃষ্টি এবং মনের দৃষ্টি, রূপ-জগৎ এবং অরূপ-জগৎ—রাজা নাটকের ভিত্তি। রানীর নির্ভর চোখের উপর; তার আকর্ষণ আলোর দিকে, রূপের দিকে। রাজা তাকে বলেন, মনের দৃষ্টির উপর নির্ভর কর, অন্ধকারকে শ্রদ্ধা কর, অরূপের মধ্যে নিমজ্জিত হও। রাজা নাটকের সূচনায় অন্ধকার ঘর, সমাপ্তিতে অন্ধকার ঘর। এই অন্ধকার ঘরই সমগ্র নাটকখানির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করছে। রাজা নাটকের যেমন অন্ধকার ঘর, তেমনি মুক্তধারার বাঁধ, রক্তকরবীর রক্তকরবী, ডাকঘরের ডাকঘর, অচলায়তনের অচলায়তন। এই প্রতীকগুলিকে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল।

তৃতীয় খন্ডে রূপক নাটকের সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই খন্ডে আর-একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা উচিত ছিল। রূপক নাটকের ভাষা-উপমার বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতাটি আলোচনার যোগ্য। এবং সে-আলোচনা না থাকলে রূপক নাটকের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। আশা করি, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করবার সময় এ-কথাটি মনে রাখবেন।

সাধারণত এই ধরনের বাংলা সমালোচনা বা গবেষণা গ্রন্থ পড়তে গিয়ে মন হাঁপিয়ে ওঠে। শ্রীযুক্তে দাশগুপ্তের বইখানি পড়ে আনন্দ পাওয়া গেল। ৩৩১।৬২

বিপ্লবী জীবন

শহীদ প্রফুল্ল চাকী—শ্রীকালীপদ বাগচী। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম দেড় টাকা।

প্রখ্যাত বিপ্লবী বীর প্রফুল্ল চাকীর জন্মস্থান বগুড়া, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল রংপুর এবং কলিকাতায়। একদা পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার লাট যথাক্রমে ফুলার ও ফ্রেজারের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার কাজে পার্টি কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া প্রফুল্ল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থকাম হন। ইহার পরে তৎকালীন যুগান্তর ও বন্দে মাতরম পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার বিচারক কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার আদেশও প্রফুল্ল সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড কলিকাতা হইতে মজঃফরপুরে বদলি হইয়া যান। সেখানেই প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া রাত্রির অন্ধকারে ভুলক্রমে তথাকার জনৈক ইংরেজ ব্যারিস্টারের পত্নী ও কন্যার গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া পড়েন। ফলে দুইজন মহিলাই নিহত হন। মজঃফরপুর হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের সময় মোকামাঘাটে প্রফুল্ল এক পুলিস বাহিনীর সম্মুখীন হন এবং গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য নিজের রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এইভাবে অকালে তরুণ বিপ্লবীর জীবনের অবসান ঘটে। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেন। ইহাই আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য। যে মহাপ্রাণ এমন অক্লেশে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনী গ্রন্থ তদনুরূপে উচ্চাঙ্গের হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক মুদ্রণ প্রমাদ বইখানির যাবতীয় সৌষ্ঠব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

বিবিধ

ইন্ডালুমিন বুলেটিন—আশীষকুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত।

ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানীর বেলুড় ওয়ার্কসের পক্ষ হইতে এই সংস্থার কর্মীদের মধ্যে বিতরণের জন্য বর্তমান সংখ্যাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। অ্যালুমিনিয়াম শিল্প সম্পর্কে বহু তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধে পূর্ণ আলোচ্য সংখ্যাখানি পাঠে এই শিল্পের প্রচার এবং প্রসার সম্পর্কে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। কয়েকখানি চিত্র সম্বলিত ইহার মুদ্রণ প্রশংসার যোগ্য। বহিরাবরণ আকর্ষণীয়।

প্রাপ্তি সংবাদ

কুটজ—কাজী আশরাফ মাহমুদ।

কর্ণাটরাগ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র কাব্যের পুনর্বিচার—ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়।

চার্লস স্টেইনমেজ—হেনরী টমাস। অনুবাদক জগদানন্দ বাজপেয়ী।

সমুদ্র নয় মন—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য।

সূর্য শিক্ষা—মায়া বসু।

বেচা কেনা সমস্যা—অজিতরঞ্জন গুপ্ত।

ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর প্রগতিশীল অধ্যাত্মবাদ—শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষ।

ফুল মোতিয়া—প্রশান্ত চৌধুরী।

বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়।

অগ্নিকন্যা—বোম্মান বিশ্বনাথম।

অঘটন আজো ঘটে—দিলীপকুমার রায়।

বিগত বসন্ত—সাগরিকা শ্যাম।

আকাশ ও পৃথিবী—মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ।

ঈশানুসরণ—স্বামী সচ্চিদানন্দ।

কালীপূজা গীতি আলেখ্য ও তত্ত্বমালা—শ্রীগণপতি পাঠক।

কিশোর সুভাষ—তপনকুমার সেনগুপ্ত।

ঘুংগু—সুশীলচন্দ্র মজুমদার।

বঙ্কিমচন্দ্র—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাসক সজ্জা—মদন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা ও লিপি এবং পরিভাষা সমস্যার সমাধান—দেবলকুমার গুপ্ত।

মহারানী সুচারু দেবীর জীবনকাহিনী—প্রভাত বসু।

সূর্পিত সাগর—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

স্মৃতি চারণ ২য় খণ্ড—দিলীপকুমার রায়।

স্বামী নির্মলানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

হিমকান্ত কাঠমাণ্ডু—প্রবোধ দে।

আধুনিক বাংলা ছন্দ ১৮৫৮-১৯৫৮—নীলরতন সেন।

তীর্থে নারী হত্যা—শ্রীধনঞ্জয় দাশ মজুমদার।

স্বাধীনতার সাধনা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।

রবীন্দ্র সংগীত সাধনা—সুবিনয় রায়।

ছিন্ন বাধা—সমরেশ বসু।

চুনু—শিউলি গুপ্ত।

সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ—সোমেন্দ্রনাথ বসু।

বাঁধ ভাঙ্গা ঢেউ—স্পর্টেনিক।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী বাংগালা বিভাগ ১৯৫৯-১৯৬০—বি এস কেশবন।

বাঁধ—সুনীল মুখোপাধ্যায়।

ঝড়ের সংকেত—প্রবোধকুমার সান্যাল।

লালনিক—অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা প্রসংগে—জন স্টুয়ার্ট মিল: অনুবাদক—রাখাল দত্ত।

গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি—জন এইচ হলওয়েল। অনুবাদক—অধীরকুমার রাহা।

ছায়াপথ—বিজন ভট্টাচার্য।

সোনালী মাছ—বিজন ভট্টাচার্য।

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

শেষ প্রহর—সোমেন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন (লীলা-প্রসঙ্গ অবলম্বনে)—স্বামী তেজসানন্দ।

রূপময় ভারত—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রমেন্দ্র দেশমুখ্য।

শাহজাদা—বারীন্দ্রনাথ দাশ।

বন্ধনহীন গ্রন্থি—শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজেকে জান ২য় খণ্ড—স্বামী প্রজ্ঞাচৈতন্য ভারতী।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা—সংকলক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

দণ্ডকারণ্যের বাঘ—সাগরময় ঘোষ।

প্রবচন—অনির্বাণ।

পার্থশী—জ্যোতিভূষণ চাকী।

আধিখ্যাল্য—আগন্তুক।

"যদি শরম লাগে তবে—"—শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন।

কালান্তরের রূপকথা (১ম পর্ব)—কমলাপ্রসাদ ঘোষ।

দিনান্তের রঙ—আশাপূর্ণা দেবী।

প্রাচীন প্যালেস্টাইন—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাল্মীকি রামায়ণ (সরল বাংলা অনুবাদ)—শ্রীতারাপ্রসন্ন দেবশর্মা।

ফিরে পাওয়া—কনক মুখোপাধ্যায়।

প্রাণতরঙ্গ—প্রফুল্ল রায়চৌধুরী।

সোনামুখী মেঘ—দীপনলাল চৌধুরী।

রাগরূপ—সুনীল চট্টোপাধ্যায়।

পরীর ডানা—সুকোমল বসু।

চাকা কেন ঘোরে (পদার্থ ১ম পাঠ)—এডওয়ার্ড জি হুয়ে। অনুবাদক—অ কু রা।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যে নদী মরুপথে—যোগীলাল হালদার।

রূপ নয় আগে মন—সমীরণ গুহ।

তুমি মহাত্মা—শান্তশীল দাশ।

নাগরিক—অভিজিৎ।

পান্থশালা—রমেন লাহিড়ী।

অনেক আলোর অন্ধকারে—পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সাহিত্য দর্পণ ১ম খণ্ড : ১ম—৫ম পরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ কবিরাজ। অনুবাদক—অবন্তীকুমার সান্যাল ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মাটির সুর—আবদুল গনি খান।

নীরজা—মহেশ ভরদ্বাজ।

বাপুজী ও স্বাধীন ভারত—শ্রীঅমলেন্দু রায়।

বঙ্গে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিস্তার—স্বামী শংকরানন্দ।

ব্রহ্মানন্দ লীলা কথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য।

হরতাল—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

সদ্ধর্ম রত্নমালা—শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু।

জাতক নিদান—ধর্মপাল ভিক্ষু।

মহাক্ষুধা—মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়।

মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নীলকণ্ঠের বিষ—মনোজ মিত্র।

তৃতীয় প্রহর—অশোক সরকার।

দূরদিগন্ত—গোবিন্দ হালদার।

এক আকাশ তারা—স্বপন দাস।

স্বামী ধ্যানানন্দ—কমলকুমার সিংহ।

মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস—ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

রসশেখর রাজশেখর—নিতাই বসু।

রূপমতী নগরী—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই নাকি—ননীগোপাল মজুমদার।

মাদাম কুরী—ইভা কুরী। অনুবাদক—কল্পনা রায়।

সেনী রাগমালা ১ম খণ্ড—ওস্তাদ শওকত আলি খান।

একটি ফুলকে ঘিরে—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

অনেক দিনের অনেক কথা—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত।

অতি দূর আলোরেখা—মণীন্দ্র রায়।

ছায়া সূর্য—আশাপূর্ণা দেবী।

তিন ছন্দ—আশাপূর্ণা দেবী।

পত্রবিলাস—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মরসুমী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

সোনারূপোর কাঠি—কবিতা সিংহ।

বিলিতি ছড়া ২য় খণ্ড—শ্রীসুকুমল দাশগুপ্ত।

একই সুরের আলপনা—জয় ঘোষ।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা—বাণী রায়।

যাদু কাহিনী—অজিতকৃষ্ণ বসু।

ইতস্ততঃ—এককলমী।

ছাতাবাহার—গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

কুমারী ধরম—তারকদাস চট্টোপাধ্যায়।

সাফ্‌ সওয়াল—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

জোনাকি মন—পরিতোষ মজুমদার।

ঘরে বাহিরে সাহিত্য চিন্তা—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

ঊর্মিমালা—অসিত গুপ্ত।

বৈশাখী বসন্ত—সুকন্যা।

বাঁকা জল—অনিল বিশ্বাস।

আধুনিক সেলাই, বোনা ও কাটিং—মীরা দেবী।

নটমল্লার—অবিনাশ রায়।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

ছায়া মায়া রাতে—কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

লিখবো বলে মন—প্রফুল্লকুমার গুপ্ত।

রঙ্গজগৎ

এবার ফিরাও মোরে

জাতির চরম সংকটের দিনে বাংলার মঞ্চ ও চলচ্চিত্রসেবী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা যে-ভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন তার জন্য আমরা সত্যিই গর্বিত। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ছোট করব না। কারণ, যে মহৎ কর্তব্যবোধে তাঁরা আজ উদ্বুদ্ধ তা সাধুবাদেরও অতীত।

আমাদের কলাকুশলীরা গরীব। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে কলকাতার স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির কলাকুশলীরা প্রতিরক্ষা তহবিলে সাধ্যানুযায়ী অর্থ দান করেছেন। আরও অর্থ তাঁরা দান করবেন বলে জানিয়েছেন। এই দান মহৎ। এর তুলনা নেই।

বাংলার মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত শিল্পীরা কলকাতার পার্কে অক্লান্তভাবে দেশাত্মবোধক নাটক অভিনয় করে চলেছেন। কণ্ঠশিল্পীরা নেতাদের আহ্বানে পার্কে পার্কে উদ্দীপক গান গেয়ে জনমনে দেশপ্রেমের প্রেরণা আনবার জন্য সচেষ্ট। শুধু তাই নয়, রাজপথে নেমে এসেও তাঁরা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে দেশবাসীকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রশিল্পী ও কলাকুশলীরা নিঃস্বার্থভাবে দেশাত্মবোধক ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা সাধ্যানুযায়ী প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদান করেছেন।

এই আত্মদানের যজ্ঞ এখনও শেষ হয়নি। তাঁদের আরও দিতে হবে, আরও ত্যাগ করতে হবে। তাঁদের সকলের এই আত্মত্যাগ বিফল হবে না।

একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো

"আমার দেশ" ছবিতে উত্তমকুমার

একটি ছবির জন্ম

"আমার দেশ"

নবজাগ্রত জাতির উদ্দেশ্যে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের এক মহৎ উপহার—"আমার দেশ"। দুই হাজার ফুটের একটি ছবি। দেশাত্মবোধ এই ছবির মর্মবাণী। এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন বাংলা

মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ

"আমার দেশ" ছবিতে উদ্দীপক গানের দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও বসন্ত চৌধুরী
ফটো—দেশ

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো

"আমার দেশ" ছবিতে দেশাত্মবোধক গানের দৃশ্যে বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধামোহন ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী, নেপথ্য-গায়ক-গায়িকা, এবং স্টুডিয়ো ও ল্যাবরেটরির কর্মীরা।

গত ১৯শে নভেম্বর এই ছবির কাজ শুরু হয় ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। রবীন্দ্রনাথের দুটি উদ্দীপক গান—"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ" ও "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুনে জ্বালো"—সেদিন রেকর্ড করা হয়। গানে কণ্ঠদানের জন্য ল্যাবরেটরিতে এসে উপস্থিত হন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, মৃণাল চক্রবর্তী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, অরুন্ধতী দেবী, রুমা গুহ-ঠাকুরতা ও মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গানের রেকর্ডিং হল। গানের সঙ্গে বাজালেন যন্ত্রশিল্পীরা। তাঁরা বাজালেন ভি বালসারা ও অমর দত্তের পরিচালনায়।

সেদিন ল্যাবরেটরিতে অনুভব করলাম এক পবিত্র পরিবেশ। সবাই যেন এক পুণ্যব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ যেন সকলের কাজ, দেশের কাজ। কে কী-ভাবে এ কাজে নিজকে নিয়োজিত করবেন তা নিয়ে দেখা গেল এক নিঃস্বার্থ ব্যাকুল আগ্রহ। স্টুডিয়োর কর্মী ও কলাকুশলীদের মধ্যে দেখা গেল অপরি-সীম উৎসাহ। দেশের কাজে সবাই যেন নিজকে সার্থক করতে চান। শব্দযন্ত্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ নিবিষ্ট মনে আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর কাজে। শিল্পীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল—সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ। দেশপ্রেমের প্রেরণায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত স্তব্ধ হয়ে শুনলেন সকলে শিল্পীদের গান।

চিত্র পরিচালক তপন সিংহ নিবিড় নিষ্ঠার সঙ্গে এ ছবি তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে তাঁর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। পরের দিনের স্যুটিং-এর জন্য নিজকে তৈরি করে তুললেন উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরাও গানের রেকর্ডিং-এর সময় গুনগুন করে গেয়ে নিলেন গান দুটি।

পরের দিন স্টুডিয়ো সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিয়োতে সম্পন্ন হল "আমার দেশ"-এর স্যুটিং। সকাল বেলা সব শিল্পীরা এসে উপস্থিত হলেন স্টুডিয়োতে। গানের সঙ্গে অভিনয় করলেন ও ওষ্ঠ মেলালেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, রাধামোহন ভট্টাচার্য, সুনন্দা বন্দ্যো-পাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, দিলীপ রায়, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অরুন্ধতী দেবী ও ছায়া দেবী। গত শনিবার গানের সঙ্গে ছবিতে আত্মপ্রকাশ করার জন্য ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালেন সুচিত্রা সেন।

এই ছবিতে বিনা পারিশ্রমিকে অংশ গ্রহণ করে সব শিল্পী ও কলাকুশলীরাই যেন কী এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন। এই আত্ম-প্রসাদের ঔজ্জ্বল্য লক্ষ করেছি তাঁদের চোখে-মুখে। এই ছবি সত্যিই যেন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থার নয়—বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের। তা না হলে সানন্দে স্বেচ্ছায় চিত্র পরিচালক অজয় কর ও তাঁর ইউনিট এ ছবির কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন না। দুটি ফ্লোরে একই সঙ্গে ছবির স্যুটিং গৃহীত হয়। কোনটিতে কাজ করেছেন তপন সিংহ ও তাঁর ইউনিট,

কোনটিতে আবার অজয় কর ও তাঁর ইউনিট। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করেন বিমল মুখোপাধ্যায় ও কানাই দে।

গত শনিবার গড়ের মাঠে এন-সি-সি'র তরুণদের "মার্চ"-এর দৃশ্য গ্রহণ করেন তপন সিংহ। রবিবার ছবির আবহ-সংগীত রেকর্ড করা হয়। ছবির নেপথ্য-ভাষণ পাঠ করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে প্রযোজিত "আমার দেশ" (বাংলা সংস্করণ) ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পাবে।

জাতীয়তার উদ্বুদ্ধ
কলকাতার শিল্পলোক

গত ১৮ই নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিয়োতে সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স য়ুনিয়ন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আহূত এক সভায় য়ুনিয়নের সভাপতি শ্রীমধু বসু সংস্থার পক্ষ থেকে এক হাজার এক টাকার একটি চেক জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেন। চেকটি তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের হাতে তুলে দেন। এ বাদে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো ও ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ, কলাকুশলী ও কর্মীবৃন্দ এবং রাধা ফিল্ম স্টুডিয়ো ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরির কলাকুশলী ও কর্মীবৃন্দ এবং প্রোডাকশন গিল্ড ও বেঙ্গল মোশন পিকচার এমপ্লয়ীজ য়ুনিয়ন শ্রীকোলের হাতে তাঁদের দান তুলে দেন। জনৈক সাংবাদিকও তাঁর দান এই সঙ্গে যোগ করে দেন। মোট দু হাজার টাকা তাঁরা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেন। যতদিন ভারত শত্রুমুক্ত না হয় ততদিন বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরির কলাকুশলী ও কর্মীরা প্রতি মাসে প্রতিরক্ষা তহবিলে এক শো এক টাকা দান করে যাবেন বলে সভায় ঘোষণা করেন। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির কলাকুশলী ও কর্মীরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে আরও টাকা দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় ভাষণদানকালে শ্রীকোলে এই আশা ব্যক্ত করেন, শ্রীসত্যজিৎ রায় (সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন) এবং অন্যান্য প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালকরা জাতির সংকটমোচনে অগ্রণী হয়ে আসবেন। •

বহুরূপী সংস্থা আগামী পয়লা ডিসেম্বর বিশ্বরূপায় "রক্তকরবী" নাটকটি অভিনয় করবেন। নাটকের টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে।

দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেম জাগাবার উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহেও অভিনেতৃ সংঘ

এ-ভি-এম'এর 'মন-মৌজি' ছবির নায়িকা সাধনা

কলকাতার একাধিক পার্কে "ডাক" নাটকটি (বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পী অভিনীত) মঞ্চস্থ করেন। এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকবে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ইতিমধ্যে তিন শো টাকা দান করেছেন। তা ছাড়া সোসায়েটির সভ্যদের ব্যক্তিগত দানও সংগৃহীত হচ্ছে।

আর্টিস্টস ইন এড্ অব ডিফেন্স-এর উদ্যোগে কণ্ঠশিল্পীরা গত রবিবার দক্ষিণ কলকাতায় দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পথ-পরিক্রমা করেন। মেগাফোন হাউস (রাসবিহারী অ্যাভিনিউ) থেকে কণ্ঠশিল্পীদের গীতিমুখর পথ-পরিক্রমা শুরু হয়। কণ্ঠ-শিল্পীরা জনতার বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দেশপ্রিয় পার্কে এসে মিলিত হন।

দেশসেবায়
মাদ্রাজের চলচ্চিত্রলোক

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা এম জি রামচন্দ্রন জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রয়াসকে কেন্দ্র করে একটি অল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক তামিল ছবি তৈরি করছেন। এই ছবিতে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ আত্মপ্রকাশ করবেন। অর্থাৎ ছবির প্রারম্ভে তিনি

অগ্রদূত পরিচালিত "নবদিগন্ত" (শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ

রজতপটে আত্মপ্রকাশ করে দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কিছু বলবেন।

মাদ্রাজের জেমিনি স্টুডিয়োজ-এর এস এস ভাসান আর একটি অল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক ছবি তৈরি করছেন। এস ডি সুন্দরম ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। শিবাজী গণেশন, জেমিনি গণেশন, কল্যাণকুমার, মনোহর, রঙ্গরাও প্রমুখ শিল্পীরা এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। ছবিটি মাদ্রাজ সরকারের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের সর্বত্র দেখানো হবে।

সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করবেন বলে স্থির করেছেন। ইতিমধ্যে সংস্থা বিভিন্ন শিল্পী, কলাকুশলী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন। জেমিনি স্টুডিয়োজ-এর এস এস ভাসান এক লক্ষ টাকা এবং এ ভি মায়াপ্পন অর্ধ লক্ষাধিক টাকা এ পর্যন্ত দান করেছেন।

বোম্বাই চলচ্চিত্রশিল্পীদের পথ-পরিক্রমা

গত ১৪ই নভেম্বর বোম্বাই-এর **চলচ্চিত্র-শিল্পী, কলাকুশলী ও চিত্র ব্যবসায়ীরা** জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য পথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। শিল্পীরা সেদিন বোম্বাই-এর জনসাধারণের কাছ থেকে নগদ এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন।

এই অভূতপূর্ব শোভাযাত্রায় দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, মীনাকুমারী, মালা সিংহ, রাজ কাপুর, ওয়াহীদা রেহমান, রাজেন্দ্রকুমার, দেব আনন্দ, নন্দা, শ্যামা প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীরা পুরোভাগে ছিলেন। দিলীপকুমার ও রাজকাপুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের মাইকে জনতার কাছে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করতে দেখা যায়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা হাতে বাক্স নিয়ে জনতার সামনে এসে দাঁড়ান।

কোলে শিশু নিয়ে এক ভদ্রমহিলা **দেব আনন্দের** কাছে এগিয়ে আসেন। প্রথমে উনি শিল্পীর বাক্সে একটি টাকা ফেলেন। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা আরও একটি টাকা বাক্সে ফেলে দেন, তারপর একটি পাঁচ টাকার নোট, এর পর তাঁর কাছে যা ছিল সব টাকাই তিনি দান করেন। দেব আনন্দ তাঁকে বলেন, ভগবান আপনার ও আপনার সন্তানের কল্যাণ করুন।

শোভাযাত্রা যখন পারেলের ভেতর দিয়ে এগোতে থাকে তখন দুটি মিলিটারি ট্রাক শিল্পীদের এক লরীর পাশে এসে থেমে যায়। ওই লরীতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন দেব আনন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা। মিলিটারি ট্রাকে ছিলেন ভারতীয় জওয়ানের দল। তাঁদের উদ্দেশ্য করে দেব আনন্দ বলেন, সমস্ত জাতি এবং আমরা শিল্পীরা আপনাদের পেছনে আছি। জওয়ানরা এই কথা শুনে আনন্দে হর্ষধ্বনি করেন। তখন দেব আনন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা শ্লোগান দেন —**"হিন্দী জওয়ান জিন্দাবাদ"**। সমস্ত শোভাযাত্রা এই শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

শোভাযাত্রাকালে **জনি ওয়াকার** পনের মিনিটে পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করেন। এই পনের মিনিট তাঁর মুখে শুধু একটি কথাই ধ্বনিত হতে থাকে—"খিসা খালি করো, দেশ কী সেবা করো"।

পথের পাশের কোন এক বাড়ির তেতলার জানালা থেকে রাজ কাপুরের গাড়ির ওপর নোট বর্ষণ করা হয়। রাজ কাপুর নোটগুলি

অসীম পাল পরিচালিত "দুই বাড়ি" (চিত্রালয়) ছবির একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও অনুপকুমার

ধরে ফেলেন। কোন এক পথচারী রাজ কাপুরের হাতে একটি সোনার আংটি তুলে দেন। রাজ কাপুর আংটি পথের ধারের লোকদের দেখান। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, বোম্বাই-এর পথে স্মরণীয়কালের মধ্যে কোন শোভাযাত্রা এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি। সকলেই এই শোভাযাত্রাকে 'অভূতপূর্ব' বলে আখ্যা দেন।

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে একটি বাংলা ছবি ও একটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবিটি হল : **নবদিগন্ত** এবং হিন্দী ছবিটির নাম : **মন-মৌজি।**

অগ্রদূত পরিচালিত **"নবদিগন্ত"** (শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স) ছবিতে দুই নারী-হৃদয়ের বিপরীতমুখী মানসিকতার ভিত্তিতে একটি নাট্যসংঘাতপূর্ণ কাহিনী রূপ নিয়েছে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ ছবির চারটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। তা ছাড়া ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী ও গীতা দে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

এ-ভি-এম-এর **"মন-মৌজি"** ছবিটি আবেগধর্মী নাট্যকাহিনী ও আমোদ-উপকরণের ভিত্তিতে তৈরী বলে শোনা যাচ্ছে। কৃষ্ণান-পানজু পরিচালিত এ ছবির নায়ক-নায়িকা হলেন কিশোরকুমার ও সাধনা। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন প্রাণ, ওমপ্রকাশ, নাজ, আনোয়ার হোসেন ও ভারতী রায়। মদনমোহন ছবির সুরকার।

* ছবির পর ছবি *

ধূপছায়া

চিত্ত বসু পরিচালিত "ধূপছায়া" (এস এস চিত্রমন্দির) ছবিটি অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করবে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত। বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় ছবির নায়ক-নায়িকা। ছবির অন্য বিশেষ চরিত্রের শিল্পী হলেন ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বিশ্বনাথন, দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্তা ও অপর্ণা দেবী। অমল মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

ছায়াসূর্য

আর-ডি-বি অ্যান্ড কোং-এর "ছায়াসূর্য" ছবিটির চিত্র গ্রহণ এ মাসেই শুরু হচ্ছে। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা দুই বোনের গল্প এ ছবির আখ্যান-ভিত্তি। পার্থপ্রতিম চৌধুরী ছবির পরিচালক। শর্মিলা ঠাকুর, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্তা ও ছায়া দেবী ছবির প্রধান শিল্পী। ভি বালসারা ছবির সুরকার।

মৌনমুখর

বি অ্যান্ড বি প্রোডাকশন্স-এর "মৌন-মুখর" ছবির চিত্র গ্রহণ শুরু হয়েছে এ

মাসে। ত্রয়ী নামে এক অভিজ্ঞ কলাকুশলী গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করছেন। শেখর রায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবির চিত্রনাট্য রচিত। ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন নির্মলকুমার ও ভারতী রায়। বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ ছবির অন্য প্রধান শিল্পী।

শুকতারা

"যাত্রী"-খ্যাত সংচিদানন্দ সেন মজুমদার কেন্দ্রীয় সরকারের চিলড্রেন ফিল্মস সোসায়েটির হয়ে একটি ছবি তৈরির কাজ শুরু করেছেন। ছবিটির নাম "শুকতারা"।

নিশাচর

গুপ্তশ্রী প্রোডাকশন্স-এর "নিশাচর' ছবিটির কাজ রাধা ফিল্মস স্টুডিয়োতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। "বধূ"-খ্যাত ভূপেন রায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন শম্ভু মিত্র, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, দিলীপ রায় চৌধুরী, মণি শ্রীমানী, বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং আলোকচিত্রশিল্পী হেমেন মিত্র। কালীপদ সেন ছবির সুরকার।

পরলোকে নবদ্বীপ হালদার

বাংলা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা নবদ্বীপ হালদার গত

নবদ্বীপ হালদার

রবিবার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চৌষট্টি।

শ্রীহালদার কিছুকাল যাবৎ হাঁপানির অসুখে ভুগছিলেন। রবিবার তাঁর শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

দেবকী বসু পরিচালিত "পঞ্চশর" (নির্বাক) ছবিতে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর অভিনীত প্রথম সবাক ছবি "সোনার সংসার"। তিনি প্রায় এক শত বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। মানে না মানা, বন্দী, শহর থেকে দূরে, সাহেব বিবি গোলাম, দিগভ্রান্ত প্রভৃতি ছবিতে তিনি

"আমার দেশ"

(উপরে) "আমার দেশ" ছবির পরিচালক তপন সিংহ (ডাইনে) ছবির গানে কণ্ঠদান করছেন অরুন্ধতী দেবী, বন্দনা সিংহ, উৎপলা সেন, সুচিত্রা মিত্র ও রুমা গুহঠাকুরতা (মাঝখানে) গান গাইছেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী (ডাইনে) ছবির কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন আলোকচিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায় দীপক দাশ, পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্রপরিচালক অজয় কর (নীচে) ছবির গানের দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অরুন্ধতী দেবী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ফটো—[illegible]

উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। শিল্পী হিসাবে তিনি দর্শকের যেমনি প্রিয় ছিলেন, মানুষ হিসাবেও তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। আমরা তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

ভারতীয় শিল্পীর বিদেশ জয়

জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী ইতিপূর্বে কয়েকবার বিদেশে গিয়ে বাংলার লোকসংগীতের সমাদর বাড়িয়ে এসেছেন। ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি যে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ঘুরে এলেন তাঁদের মধ্যে শ্রী চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন : রাধিকামোহন মৈত্র, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, কেরামত খাঁ, জ্যোতিষমতী কৃষ্ণমূর্তি প্রভৃতি।

নির্মলেন্দু চৌধুরী

"দি সান" সংবাদপত্রের সমালোচক নর্মাল কেসেল বলেন, "বিশেষ করে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে শ্রীচৌধুরীর গানের অসামান্য স্বর-বৈচিত্র্য, ধ্বনি-কম্পন ও বিলম্বিত তান।"

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড-এর বহু পত্র-পত্রিকার অভিনন্দন অর্জন করে নির্মলেন্দু চৌধুরী কলকাতায় ফিরে এসেছেন। রাধিকামোহন মৈত্র এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীরাও ওই দুই দেশের রসিকজন ও সমালোচকদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পেয়েছেন।

* সাংস্কৃতিকী *

শিল্পী-গোষ্ঠী কর্তৃক সম্প্রতি রঙমহলে মহাদেব দাস রচিত "শেষ কোথায়" নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বিশিষ্ট ভূমিকায় যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেন হিমানী গাঙ্গুলী, অনিল ধর, শচীন চক্রবর্তী, ডলি মুখোপাধ্যায়, বুলা দে, শচীন্দ্র পণ্ডিত, শ্যামল দাস প্রভৃতি। পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যথাক্রমে কুমার চৌধুরী ও অজয় মিত্র। নাটকটি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি গত ২৫ ও ২৬শে নভেম্বর যথাক্রমে ম্যাজেস্টিক সিনেমা ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে দশটি বিদেশী অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখাবার আয়োজন করেন। প্রথম দিনে দেখানো হয় পাঁচটি ছবি, দ্বিতীয় দিনে পাঁচটি। কানাডা, আমেরিকা ও বৃটেনের ছবির সংখ্যাই ছিল বেশী।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ নাটক সম্পর্কিত একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করেছেন। এই সভায় জার্মান নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে চারটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বক্তা হলেন ডঃ স্টেম্যানস্। গত ১৭ই নভেম্বর তিনি প্রথম বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী বক্তৃতা আগামী ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯শে জানুয়ারী ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা আড়াই-টায় সময় অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশী নাট্য-আন্দোলন নিয়ে আলোচনা-চক্রের আয়োজন এই প্রথম।

থিয়েটার সেণ্টার-এর নাট্য বিদ্যালয়ের চতুর্থ কোর্সের জন্য ছাত্র ভর্তি শুরু হচ্ছে ১লা ডিসেম্বর। চতুর্থ কোর্সের অনুশীলন আরম্ভ হবে আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে। নাট্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষক-মণ্ডলীতে রয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, তাপস সেন, প্রবোধ ঘোষ, খালেদ চৌধুরী, তরুণ রায়, অজিত মিত্র ও ডঃ বিমান বিশ্বাস। বিদ্যালয়ের সফল ছাত্রদের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে এবং মুখোশ-এর নাটকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

আজ শুধু কাজের পালা

(উপরে) মহিলা শিল্পী মহল আহূত সাংবাদিক বৈঠকে কর্মব্যস্ত বনানী চৌধুরী, সরযূ দেবী, শুক্লা দাশ ও মঞ্জনা দেবী— সংস্থার অভিনেত্রীরা ৫ ও ৭ই ডিসেম্বর দুঃস্থ মহিলা শিল্পী ও জাতীয় প্রতিরক্ষার সাহায্যার্থে "মিশর কুমারী" নাটকটি মহাজাতি সদনে অভিনয় করবেন (নীচে) জাতীয় প্রতিরক্ষার কাজে কণ্ঠশিল্পীরা কীভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

✳ খেলার মাঠে ✳

একলব্য

ইস্টবেঙ্গল ও অন্ধ্র প্রদেশ পুলিসের মধ্যে রোভার্স কাপের ফাইন্যাল খেলা দুই দিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর দুই দলকেই যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দুই দিনই খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। প্রথম দিন অন্ধ্র পুলিস বিশ্রামের তের মিনিট আগে একটি গোল করে এগিয়ে থাকে। খেলা শেষ হবার চার মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল গোলটি শোধ করে দেয়। দ্বিতীয় দিন পাল্টা ফলাফল। বিরতির পাঁচ মিনিট আগে গোল করে ইস্টবেঙ্গল, খেলা শেষ হবার নয় মিনিট থাকতে গোল শোধ করে অন্ধ্র পুলিস। এর পর অতিরিক্ত দশ মিনিট সময় খেলান সত্ত্বেও আর কোন গোল হয় না।

যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হলে দুই পক্ষই ছয় মাস করে কাপটি দখলে রাখবার অধিকারী। কিন্তু প্রথমে কারা কাপ দখলে রাখবে, তার জন্য 'টসে'র প্রয়োজন। অন্ধ্র পুলিস টসে বিজয়ী হয়ে প্রথম ছয় মাস কাপ দখলে রাখবার অধিকারী হয়।

নক আউট প্রতিযোগিতায় এভাবের যুগ্মজয়ে মন যেন ঠিক সায় দেয় না। 'নক-আউট' কথাটির অর্থই হচ্ছে নক করে আউট করা। অর্থাৎ আঘাত করে বের করে দেওয়া। আঘাত খেয়ে খেয়ে সব দল বেরিয়ে যাবার পর যে দল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তারাই পাবে বিজয়ীর সম্মান, এটাই নক-আউট প্রতিযোগিতার প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু উপায় নেই। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনই বিধান দিয়েছেন, দু দিনেও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলে ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে হবে—অবশ্যই দ্বিতীয় দিন অতিরিক্ত পনের মিনিট সময় খেলার পর। কিন্তু রোভার্স কাপে অতিরিক্ত পনের মিনিট সময় খেলান হয়নি। খেলান হয়েছে মাত্র দশ মিনিট। যাই হোক, রোভার্স কাপের দীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে দুই দলকে যুগ্মভাবে বিজয়ী ঘোষণা করবার এটাই প্রথম ঘটনা।

আই এফ এ শীল্ড এবং ডুরান্ড কাপের খেলায় অবশ্য এর নজির আছে। গত বছর অর্থাৎ ১৯৬১ সালে মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা দুই দিন গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তার আগের বছর একই ঘটনা ঘটে ডুরান্ড কাপের খেলায়। তবে ফাইন্যাল এক দিন অমীমাংসিত থাকবার পর। এখানেও যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। আই এফ এ শীল্ড এবং ডুরান্ড কাপের মত রোভার্সেও এবার নজির সৃষ্টি হয়ে রইল।

• • •

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে রোভার্স কাপ লাভ কোনো নতুন সম্মান নয়। আর অন্ধ্র পুলিসের পক্ষে তো নয়ই। হায়দরাবাদ পুলিসেরই পরিবর্তিত নাম অন্ধ্র প্রদেশ পুলিস। হায়দরাবাদ পুলিসই একমাত্র টীম, যারা উপর্যুপরি পাঁচ বছর রোভার্স কাপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত একটানা পাঁচ বছর কাপ লাভ করা ছাড়াও ১৯৫৭ এবং ১৯৬১ সালে হায়দরাবাদ পুলিস রোভার্স কাপ ঘরে তুলে মোট সাতবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। শেষবার হায়দরাবাদ পুলিসের কাছেই ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হয়। হায়দরাবাদ পুলিসের কৃতিত্ব মোট সাতবারের ফাইন্যাল খেলার মধ্যে একবারও তারা পরাজয় স্বীকার করেনি। এবারও না। এর আগে ইস্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ লাভ করে ১৯৪৯ সালে মাত্র একবার। ১৯৫৯ সালেও ইস্টবেঙ্গল ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে হেরে যায়। রোভার্স ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের এটি ছিল চতুর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

বোম্বের শক্ত মাটিতে অন্ধ্র পুলিস দলের ক্রীড়াখ্যাতি সর্বজনবিদিত। শুধু বোম্বে কেন, যে হায়দরাবাদ কলকাতা থেকে কোনদিন আই এফ এ শীল্ড নিয়ে যেতে পারেনি, তারাও এবার শীল্ডের সেমি-ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলকে ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠেছিল। নামে পার্থক্য থাকলেও আই এফ এ শীল্ডের হায়দরাবাদ একাদশ এবং রোভার্সের অন্ধ্র প্রদেশ পুলিস মূলত একই টীম। তাই অনেকেই রোভার্স ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সরাসরি জয় অবশ্য ইস্টবেঙ্গল লাভ করতে পারেনি। আবার পরাজয়ও স্বীকার করেনি। প্রতিপক্ষের তুলনায় খারাপও খেলেনি। প্রথম দিন তো বটেই, দ্বিতীয় দিনের খেলাতেও ইস্ট-বেঙ্গলের আংশিক প্রাধান্য ছিল। এটাও ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে কৃতিত্বের কথা।

সহজ সুযোগের অপব্যবহার ইস্ট-বেঙ্গলের খেলার এক প্রধান দুর্বলতা। তাদের সামগ্রিক ক্রীড়াধারা গোল করার ক্ষমতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের আক্রমণ রচনার পদ্ধতি, প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা, বল দেওয়া-নেওয়া, গতিবেগ অনেক সময়ই দর্শক-চোখের তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু গোল করায় চরম ব্যর্থতা। অবশ্য শুধু ইস্টবেঙ্গল কেন, ভারতীয় ফুটবলই এই ব্যাধিগ্রস্ত। বহু বিদেশী সমালোচকও ভারতীয় ফুটবলের এই ব্যাধির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'ডাইরিয়া অফ চান্সেস, কনস্টিপেশন অফ গোল'-এর ব্যাধিতে ভারতীয় ফুটবল বহুদিন থেকেই ভুগছে। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু তুলনায় ইস্টবেঙ্গল-এর রোগটা একটু বেশী। এই রোগে না ভুগলে আজ তারা হয়তো সরাসরি জয়ের কৃতিত্বে রোভার্স কাপ নিয়ে কলকাতায় ফিরতে

ভারতের টেনিস অধিনায়ক রামনাথন কৃষ্ণন

মেক্সিকোর পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় র‍্যাফেল ওসুনা

পারত। কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানকেও কোয়ার্টার ফাইন্যালে টাটা স্পোর্টস ক্লাবের মত সাধারণ টীমের কাছে হার স্বীকার করতে হত না।

অবশ্য মোহনবাগান ক্লাবকে বেশ অসুবিধার মধ্যে রোভার্স কাপের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। তাদের পরম নির্ভরযোগ্য 'স্টপার' জারনেল সিংকে পাঞ্জাব সরকার খেলার অনুমতি দেননি। সেন্টার ফরোয়ার্ড মংগল পুরকায়স্থও চোট-লাগা পা নিয়ে খেলে মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। তবু প্রথম খেলায় ব্যাংগালোরের 'নামগোত্রহীন' ইন্সপেক্টরেট অফ ইলেকট্রনিকস ইকুইপমেন্ট দলের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করা অর্থহীন। পরের দিন ব্যাংগালোর দলের কাছে ১—০ গোলে পিছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ২—১ গোলে জয়ও কষ্টার্জিত সাফল্য। কোয়ার্টার ফাইন্যালে টাটা স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকারেও অর্থ খুঁজে পাওয়া ভার।

ইস্টবেংগল এবং মোহনবাগান দুটি দলই তৃতীয় রাউন্ড থেকে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছিল। ইস্টবেংগল প্রথম খেলায় ব্যাংগালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফটকে হারিয়েছিল ৪—০ গোলে। পরের খেলায় হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল পুলিস লাইনসকে ৪—১ গোলে; যে পুলিস লাইনস-এর কাছে আগের বছর ইস্টবেংগলকে ৬—১ গোলে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সেমি-ফাইন্যালে বি এন রেলকে ১—০ গোলে হারিয়ে ইস্টবেংগল ফাইন্যালে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিসের সম্মুখীন হয়েছিল।

মোহনবাগান এবং ইস্টবেংগল ছাড়া কলকাতা থেকে এবার আরও চারটি ক্লাব—রাজস্থান, মহমেডান স্পোর্টিং, জর্জ টেলিগ্রাফ এবং বি এন রেল রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে রাজস্থান ক্লাবকে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলাতেই হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল পুলিস লাইনস-এর কাছে ২—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়। মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম খেলায় আজমীরের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিসকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে পরের খেলায় বোম্বের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ৫—১ গোলে হার স্বীকার করে। জর্জ টেলিগ্রাফ দ্বিতীয় রাউণ্ডে বিহার মিলিটারী পুলিসকে ৪—০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে ওঠে। তৃতীয় রাউণ্ডে ২—০ গোলে হার স্বীকার করে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিসের কাছে। বি এন আর দলের খেলা প্রশংসার দাবি রাখে। তারা বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে ২—১ গোলে এবং ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইন্যালে ওঠে। সেমি-ফাইন্যালে পরাজিত হয় ইস্টবেংগল ক্লাবের কাছে ১—০ গোলে। শুধু তাই নয়, সেমি-ফাইন্যালের পরাজিত দুটি দলের খেলায় বি এন রেল ৩—০ গোলে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে হার্ডলাইন কাপ লাভ করে ফিরে এসেছে। হার্ডলাইন কাপ প্রতিযোগিতার তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের পুরস্কার। এই খেলাতে বি এন রেল দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালা-রাজু হ্যাটট্রিক করবারও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এবার রোভার্স কাপের খেলায় আর যাঁরা হ্যাটট্রিক করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারের কুপ্পুস্বামী উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে, জর্জ টেলিগ্রাফের এ ব্যানার্জি বিহার মিলিটারী পুলিসের বিরুদ্ধে এবং অন্ধ্র প্রদেশ পুলিসের ইউসুফ খাঁ মফৎলাল গ্রুপ অফ মিলসের বিরুদ্ধে। দেশের জরুরী পরিস্থিতির জন্য গতবারের রোভার্স কাপ বিজয়ী ই এম ই সেন্টার দলের এবারকার খেলা থেকে নাম প্রত্যাহারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

* * *

রোভার্স কাপের খেলা শেষ হবার সংগে সংগে ক্লাবভিত্তিক প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ ক্লাবে ক্লাবে প্রাধান্যের লড়াইয়ের উপর এক-রকম যবনিকা পড়েছে। রোভার্স কাপের পর ডুরান্ড কাপের খেলা আরম্ভ হবার কথা ছিল। কিন্তু দেশের জরুরী অবস্থার জন্য দিল্লির সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত ডুরান্ড কাপের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন ব্যাংগালোরে আরম্ভ হবে ফুটবলের প্রাধান্য নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে লড়াই। অর্থাৎ আন্তঃ রাজ্য বা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা।

তবে ক্লাবভিত্তিক প্রতিযোগিতার উপর এ বছরের মত যবনিকা পড়লেও প্রতিরক্ষা ভান্ডারে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীসোরেন ঘোষ এক চতুর্দলীয় ফুটবল খেলার পরিকল্পনা করেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় দিল্লিতে এই খেলার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, আই এফ এ শীল্ড,

রোভার্স কাপ এবং গতবারের ডুরাণ্ড কাপের ফাইন্যালিস্ট দলগুলি এই খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। তার মানে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং হায়দরাবাদ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। গতবারের ডুরাণ্ড কাপ এবং এ বছরের আই এফ এ শীল্ড ও রোভার্স কাপে ঘুরে-ফিরে এরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। চতুর্দলীয় ফুটবলের চতুর্থ দল হিসাবে আসছে দিল্লির সম্মিলিত দল।

চারটি দলের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলার ব্যবস্থা হলে মোট ছয়টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এশিয়ান গেমের বিজয়ী ভারতীয় দলের সংগে বাছাই দলের একটি প্রদর্শনী খেলার কথাও বলা হয়েছে। দিল্লি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলেছেন, সাতটি খেলা থেকে খরচখরচা বাদে হাজার তিরিশেক টাকা প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য সংগৃহীত হবে বলে আশা করা যায়।

যত সামান্য টাকাই হোক, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তার মূল্য অনেক। কিন্তু এই খেলার উদ্যোগ-আয়োজন এবং উদ্যমের তুলনায় ত্রিশ হাজার টাকা নিতান্তই কম। কলকাতায় এই খেলার ব্যবস্থা হলে কম করেও এক লাখ টাকা সংগৃহীত হত। বলা বাহুল্য, দিল্লিতে ফুটবল তেমন জনপ্রিয় নয়। কলকাতার মত ফুটবলের এমন জনপ্রিয়তাও ভারতের অন্য কোথাও নেই। তাই বলে আমার এ-কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, চতুর্দলীয় ফুটবলের ব্যবস্থা দিল্লির পরিবর্তে কলকাতাতেই করতে হবে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে খেলার মাধ্যমে যেখান থেকে যে টাকা আসে, তার মূল্য অনেক, এ-কথা আগেই বলেছি। তবে তার জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে এবং কতখানি উদ্যম ব্যয়িত হবে, সেটাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

* * *

মাদ্রাজে আয়োজিত ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও টেনিস-রসিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এই খেলায় মেক্সিকো ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। ডিসেম্বরের পয়লা থেকে তিন দিনব্যাপী খেলা আরম্ভ হচ্ছে। ভারতের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রামনাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল ও আখতার আলী। মেক্সিকোর প্রতিনিধি পাঞ্চো কনট্রেরাস, রাফেল ওসুনা, অ্যান্টোনিও প্যালাফক্স ও মেরিও লামাস। ডেভিস কাপের নিয়মানুযায়ী চারটি সিংগলস ও একটি ডাবলসের খেলার ফলাফলে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবে এবং যে দল জিতবে, তারাই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার সংগে খেলার অধিকার পাবে। এখানে বলা প্রয়োজন, ভারত বা মেক্সিকো এর আগে কোনবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার অধিকার পায়নি। সুতরাং সেদিক দিয়েও এ খেলার গুরুত্ব অনেকখানি। তাই কারা জিতবে, তা নিয়ে টেনিস পণ্ডিতদের গবেষণার অন্ত নেই।

এম সি সি ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলায় কেন ব্যারিংটনের ক্যাচ ধরছেন উইকেট কিপার ব্যারী জারম্যান। ব্যারিংটন ১০৪ রান করে আউট হন

দুই দেশের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রাফেল ওসুনা এবং রামনাথন কৃষ্ণনের উপরই সে দেশের জয়-পরাজয় নিষ্পত্তির প্রশ্ন অনেকখানি নির্ভর করছে— সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এর আগে কৃষ্ণনকে মেক্সিকোয় একবার ওসুনার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। কিছুদিন আগে ভারতের জয়দীপ মুখার্জিও ফরেস্ট হিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ওসুনার কাছে হেরে গেছেন।

রাফেল ওসুনা টেনিসের এক সুন্দর শিল্পী। সিংগলস ও ডাবলসে এ'র প্রায় সমান দক্ষতা। বিশ্ব টেনিসে এ'র কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে রালস্টনের সংগে খেলে উইম্বলডনের ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। তা ছাড়া, গত বছর ফরেস্ট হিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ইনি চূড়ান্ত বিজয়ী রয় এমার্সনের কাছে হার স্বীকার করেছেন। খেলোয়াড়ের অবয়ব এবং খেলার মেজাজের জন্য সর্বত্রই ইনি সমাদর পেয়েছেন। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের

অস্ট্রেলিয়ায় একটি খেলার সময় ছোট ছেলেমেয়েদের 'অটোগ্রাফ' দিচ্ছের এম সি সি'র খেলোয়াড় রেভারেণ্ড ডেভিড শেফার্ড

টেনিস পণ্ডিত এডওয়ার্ড পটার খেলোয়াড়দের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে বিশ্ব টেনিসের যে ক্রমপর্যায় তালিকা রচনা করেছেন, তাতে ও'সুনাকে কৃষ্ণনের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বেশী উপরে নয়। মাত্র এক ধাপ উপরে। ক্রমপর্যায় তালিকায় ও'সুনা পেয়েছেন অষ্টম স্থান, কৃষ্ণনের স্থান ও'সুনার কেবল নীচে। এডওয়ার্ড পটারের বিচারের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যও আসন্ন আন্ত আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলার আকর্ষণ কিছুটা বেড়ে গেছে।

তবে ভারতের সুবিধা—তারা নিজের মাটিতে খেলার সুযোগ পেয়েছে। পরিচিত পরিবেশ, নিজ দেশের দর্শক এবং অভ্যস্ত ক্রীড়াঙ্গনে খেলার সুবিধা অনেকখানি। তা ছাড়া, ভারতের দুই উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালের খেলার অনেক উন্নতি হয়েছে। ডাবলসের খেলায় মুখার্জি ও লালের সম্মিলিত সামর্থ্যের কথাও সর্বজনবিদিত। ডাবলসের খেলায় যদি মুখার্জি ও লাল জয়লাভ করতে পারেন, তবে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ভারতের জয়ী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

মেক্সিকোর অধিনায়ক পাঞ্চো কনট্রেরাস অবশ্য বলেছেন, তাঁরা সমস্ত রকমের আবহাওয়া এবং সমস্ত রকমের কোর্টের আবহাওয়ার সঙ্গেই পরিচিত হবার জন্য কিছুদিন আগেই তাঁরা ভারতে এসে পৌঁছেছেন। মাদ্রাজেও অনুশীলন করেছেন। ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে তাঁরা হারিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুগোশ্লাভিয়া ও সুইডেনকে। যুদ্ধোত্তর টেনিসে ছয়বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্রকে এবং সুইডেনের দুই খ্যাতিমান খেলোয়াড় উলফ স্মিড ও লাণ্ডকুইস্টকে হারিয়ে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে খেলার অধিকার অর্জন নিশ্চয়ই মেক্সিকোর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে আমরা সব সময়ই আশা করবো, ভারতে, বিশেষ করে মাদ্রাজে, কৃষ্ণনের নিজের মাটিতে তাঁকে দুটি খেলায় পরাজিত করা মেক্সিকোর পক্ষে সম্ভব হবে না। দেখা যাক, কি হয়।

* * *

নবেম্বরের ৩০ তারিখ থেকে ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সির এবারকার কোন খেলারই পর্যালোচনা করা হয় নি। প্রথম টেস্টের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

সফরে প্রথম শ্রেণীর প্রথম খেলায় এম সি সি ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াকে 'ফলো অন' করিয়ে ১০ উইকেটে বিজয়ী হলেও তাদের খেলা খুব ভাল হয়েছে, একথা বলা যায় না। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া মোটেই শক্তিশালী দল নয়। তবুও এদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এক টেড ডেক্সটারের ৭৬ এবং ফ্রেড টিটমাসের ৮৮ রান ছাড়া আর কারোই রান উল্লেখ করবার মত নয়। ফাস্ট বোলার লার্টার ও স্ট্যাথামের বোলিংয়ের জন্যই এ খেলায় এম সি সি সহজেই জয়লাভ করে। তবে বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার হোর এবং টনি লকও এম সি সিকে কম ঘায়েল করেন নি। লক অবশ্য ইংলণ্ডেরই খেলোয়াড়। এখন রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। খেলছেনও তাদের কাউন্টির পক্ষে।

প্রথম শ্রেণীর পরের খেলায় এম সি সিকে সফরের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অস্ট্রেলিয়ার সম্মিলিত দলের এ খেলায় ১০ উইকেটে জয়লাভের মূলে হোর ও ম্যাকেঞ্জির

মারাত্মক বোলিং এবং বার্ব সিম্পসনের ব্যাটিং বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। সিম্পসনই এম সি সির বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এম সি সির প্রথম ইনিংস ১৫৭ রানে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭০ রানে শেষ হয়ে যায়। সম্মিলিত দল প্রথম ইনিংসে করে ৩১৭ রান দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না হারিয়ে ১১৫। এম সি সির রেভারেন্ড ডেভিড সেফার্ড অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান এবং প্রাক্তন অধিনায়ক কলিন কাউড্রে পর পর তিনটি ইনিংসে শূন্য রানে আউট হবার পর এ খেলায় ৬০ রান করে তার পুরনো নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তবু এম সি সি শোচনীয় পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। সব চেয়ে বড় কথা এ খেলায় এম সি সি পাঁচটি সহজ ক্যাচের অপব্যবহার করেছে।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সফরের তৃতীয় খেলার ফলাফল এম সি সির কৃতিত্বের পরিচায়ক। সময়াভাবে এ খেলায় এম সি সি জিততে পারেনি। যখন জেতার জন্য তাদের মাত্র ১৬ রানের প্রয়োজন তখন অস্পষ্ট আলোর জন্য খেলাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখনো খেলা শেষ হবার ৯ মিনিট বাকি ছিল। তার আগেও বৃষ্টির জন্য দেড় ঘন্টা খেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৫ রানের ইনিংসের বিরুদ্ধে এম সি সি ৯ উইকেটে ৫০৮ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কেন ব্যারিংটন ১০৪ এবং ফ্রেড টিটমাস ১৩৭ রান করে ব্যাটিংয়ে উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন, টম গ্রেভনি মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বেশ বিপদের মধ্যেই পড়েছিল এবং ১৭৪ রান তুলতেই তৃতীয় দিনের শেষে হারিয়েছিল ৫টি উইকেট। কিন্তু পরের দিনের ভরসা হিসাবে উইকেটে টিকে ছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স। পরের দিন গ্রেভনির মত সোবার্সও মাত্র ১ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যক্রমে রান আউট হয়ে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভাল খেলার নিদর্শনই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায় সফরের পরের খেলায় অস্ট্রেলিয়ান একাদশের বিরুদ্ধে। প্রথম দিনেই ৫ উইকেটে ৪৫৮ রান তাও আবার টেস্ট পর্যায়ের বোলার মিশন মার্টিন ও সিম্পসনের বলের বিরুদ্ধে। টেড ডেক্সটার ও কেন ব্যারিংটনের সেঞ্চুরী, কলিন কাউড্রের ৮৮ রান। ব্যারিংটনের শুধু সেঞ্চুরীই নয়, পরের দিনের জন্য ডবল সেঞ্চুরীর আশা। করলেনও তাই। এম সি সি যখন ৭ উইকেটে ৬৩৩ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করল, তখন ব্যারিংটন ২১৯ রানের ঝুলি কাঁধে নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন। তখনো নট আউট। ব্যারী নাইটের ঝুলিতেও ১০৮ রান।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান একাদশও দমবার পাত্র নয়। যোগ্যের যোগ্য উত্তর দিয়ে তারাও করল ৪৫১ রান। তাদেরও দুজনের সেঞ্চুরী। সিম্পসনের ১৩০ আর শেফার্ডের ১১৪। জেতবার আশায় এম সি সি ৫ উইকেটে মাত্র ৬৮ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের দান ছেড়ে দিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও অস্ট্রেলিয়া উন্নত ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে খেলাটিকে অমীমাংসিতভাবে শেষ করল।

এখানে বলা দরকার, ১৯৩২-৩৩ সালের পর অস্ট্রেলিয়ায় এম সি সি দল এত বেশী রান করতে পারেনি। এবং অস্ট্রেলিয়ার বোলাররাও ইংলণ্ড ব্যাটসম্যানদের হাতে কোনদিন এমন মার খায়নি যেমন মার খেয়েছে এই খেলাটিতে।

নিউ সাউথ ওয়েলস কাউন্টি টীমের সঙ্গে এম সি সির পরবর্তী একদিনব্যাপী খেলায় এম সি সি-র জয় হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত নয়।

কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস দলের কাছে সফরের প্রথম শ্রেণীর পঞ্চম খেলায় এম সি সির এক ইনিংস ও ৮০ রানে পরাজয় অস্ট্রেলিয়া সফরের ইতিহাসে এম সি সির এক চরম ব্যর্থতার পরিচয়। টেস্ট খেলা ছাড়া ইংলণ্ডের টীমকে এমন শোচনীয়ভাবে খুব কমই হার স্বীকার করতে হয়েছে। তাছাড়া মাত্র পাঁচটি খেলার মধ্যে এম সি সিকে এভাবে দুটি খেলায় কোনবার হার স্বীকার করতে হয়নি। সামগ্রিক সফরেই টেস্টম্যাচের বাইরে দুটি খেলায় পরাজয়ের নজির কম। মাত্র দুবার এম সি সি অস্ট্রেলিয়া সফরে রাজ্য দলের কাছে দুটি করে খেলায় হার স্বীকার করেছে। শেষের ঘটনাটি ১৯৩৬-৩৭ সালের এলেনের টীম সেবার দুটি খেলাতেই নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে হার স্বীকার করেছিল।

যাই হোক নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে এম সি সির চারদিনব্যাপী খেলাকে টেস্ট রিহার্সেল বলা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট টীমেরই সাত-আটজন খেলোয়াড়ে নিউ সাউথ ওয়েলস সমৃদ্ধ। অধিনায়ক বেনো।

নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে এম সি সি প্রথম ইনিংসে অবশ্য ভালই রান তুলেছিল। তবে ৩৪৮ রানের মধ্যে জিওফ পুলার একাই করেছিলেন ১৩২ রান। কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস ৬ উইকেটে ৫৩২ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর দ্বিতীয় ইনিংসের ১০৪ রান করতেই এম সি সির সকলে আউট হয়ে যান। অধিনায়ক রিচি বেনোর মারাত্মক বোলিং এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। তিনি মাত্র ১৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টি উইকেট দখল করেন। সিম্পসন ও ওনীলের ব্যাটিং এবং বেনোর বোলিংই এম সি সির পরাজয়ের প্রধান কারণ। সিম্পসনের ১১০ এবং নরম্যান ওনীলের ১৪৩ রানের ইনিংস জলুসে ভরা ছিল।

নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের মনোবল অনেকখানি ভেঙ্গে গেছে। তবুও টেস্ট খেলা হচ্ছে টেস্ট খেলা। তার চেহারাই আলাদা, পরিবেশ পৃথক। বিশেষ করে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা হচ্ছে ক্রিকেট মাঠে বাঘ-সিংহের লড়াই। ৩০শে নবেম্বর থেকেই তার সূচনা।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 8th December, 1962

৩০ বর্ষ ॥ ৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

অঘটনকে আমরা স্বভাবতই ভয় পাই। আপাতদৃষ্টিতে যা চোখে পড়ে, তাৎক্ষণিক বোধে তাকে বিপদ বলে মনে হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিন্তু অঘটনের পরিণতি অনেক সময় অভাবিতরূপে আমাদের চোখের সামনে এক নতুন দৃশ্য উন্মোচন করে দেয়। অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের যে-পর্বে কৌরবকুলের দম্ভ অধর্ম অনাচার দেখে আমরা হায় হায় করেছি, সেই অধর্ম থেকেই সূচিত হয়েছিল মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ। যদি দুর্যোধন পাণ্ডুপুত্রদের রাজ্যাংশ দান করত, এই যুদ্ধ ঘটত কি না সন্দেহ।

চীনের ভারত আক্রমণকে এই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। পীতবর্ণ চৈনিকদের সমর-লালসা, তাদের পররাজ্য আক্রমণের গূঢ় অভিসন্ধি এবং নৃশংস কমিউনিজম মতবাদের বিস্তার বাসনা—এ সমস্তই ব্যাপকাকারে অকস্মাৎ আমাদের কাছে দেখা দিয়েছিল। ফলে সেই মুহূর্তে আমরা হয়ত বিচলিত হয়েছিলাম। এমন কথাও সত্য যে, সম্মুখ সমরে প্রাথমিক বিপর্যয় আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু জাতির অথবা দেশের দীর্ঘ ইতিহাসে এ-বিপর্যয়, ক্ষণিক বিচলিত অবস্থা কিছু নয়। গত মহাযুদ্ধে ফরাসী দেশ নাৎসি সমরশক্তির কাছে পদানত হলে দ্য গল বলেছিলেন, আমরা একটি সমরে হেরেছি—কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হই নি। ভারতের পক্ষেও এই কথাটি শতবার উচ্চারণ করতে হবে, আমরা প্রাথমিক একটি সমরে বিপর্যস্ত হয়েছি, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হই নি।

আমাদের যুদ্ধ শুধুমাত্র ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে নয়, সমগ্র মানবতার অধিকার নিয়ে। ভারত গণতন্ত্রের প্রতিটি মূল্যকে জীবিত দেখতে চায়—এই তার সংকল্প। তার আদর্শ সমগ্র মানবসমাজের রাজনৈতিক, আত্মিক মুক্তি। এই কারণে আমাদের যুদ্ধ যেমন সীমান্তে তেমনি অভ্যন্তরেও। সেদিক থেকে চীনের আক্রমণ আমাদের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ।

সংগ্রামের শুরু

গত সপ্তাহে নয়াদিল্লীতে ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ডঃ লুবকে-র এক নাগরিক সম্বর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছেন, "চীন আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।" কথাটা অতি সত্য। চীন আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি, মোহান্ধ ধারণাকে শুধরে দিয়েছে। নেহরুজী বলেছেন, যতক্ষণ আমাদের হৃদয় দুর্বল হয়ে না পড়ছে ততক্ষণ পৃথিবীর কোনো শক্তিরই সাধ্য নেই আমাদের পদানত করে।

তিনি আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই জাতীয় সংকটে প্রত্যেকটি ভারত-বাসীরই কর্তব্য আছে। সে-কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছি বলে আমরা যদি অলস হয়ে বসে থাকি তাহলে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। বন্ধুরাই আমাদের সব কাজ করে দেবে এই আশায় বন্ধুর গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকা অনুচিত।

নেহরুজীর কথাগুলি আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। যে জাতীয়-দায়িত্ব ও মানবিক দায়িত্ব আজ আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তা নতুন নয়। এই দায়িত্ব পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু আমরা অধিকাংশই সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না। কোনো কোনো সময়, আপদকালে রুগীকে নিজের প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয়েও সচেতন হতে হয়। চীনের আক্রমণ আমাদের সম্প্রতি সেইভাবে নিজ চেতনা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করেছে।

পূর্বেই বলেছি, আমাদের প্রস্তুতি শুধু রণাঙ্গনে সীমাবদ্ধ নয়; অভ্যন্তর ক্ষেত্রেও এর প্রস্তুতি চাই। এ যাবৎকাল আমরা বহু দায়িত্ব পালন করি নি, বহু ক্ষেত্রে গা বাঁচিয়ে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বাক্যসম্বল বুদ্ধিবাদী সেজেছি। কখনও এমন হয়েছে, তুচ্ছ কারণে হল্লা করেছি, শ্রমিক আর উদ্বাস্তুকে ক্ষেপিয়ে তার সম্বলে ইলেকশনে জিতেছি। দিনের পর দিন শুধু অভিযোগের নাম জপেছি। আর, সম্ভব হলে সুযোগ এলে দুর্নীতির পঙ্কে [illegible]ছি।

অমাদের ধারণা, প্রত্যেকটি ভারত-বাসীর এখন কয়েকটি প্রধান কর্তব্য রয়েছে। প্রথম কর্তব্য এই, যে যে-পেশায় নিযুক্ত তাকে সেই পেশায় নিযুক্ত [illegible] হবে এক প্রাণ হয়ে, যেমন চাষী চাষ করবে—শ্রমিক শ্রম দান করবে, কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলাকে সে স্থান দেবে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, আত্মচেষ্টা ছাড়া কখনও সাফল্য আসে না। আমাদের দেশ এবং স্বাধীনতাকে আমরাই রক্ষা করতে পারি—অন্যে নয়। অন্যে আমাদের কিছু পরিমাণ রসদ দিতে পারে—কিন্তু নৈতিক শক্তি নয়। নৈতিক শক্তি আমাদের নিজের কাছেই পেতে হবে, এবং তাকে ধ্রুব জ্ঞান করতে হবে। তৃতীয়ত, মানবতার দুর্লভ মূল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য সজ্ঞান হওয়া এখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। স্বার্থবোধে অথবা লোভে সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলে তার আর সংশোধন থাকবে না। আমরা হিতব্রতী হব, কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতির হিতার্থে এমন কিছুকে প্রশ্রয় দেব না যা আমাদের সর্বস্বান্ত করবে। এবং এ-ক্ষেত্রে সরল ভাষায় এ-কথা বলা প্রয়োজন, আমাদের গণতন্ত্রকে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে—সীমান্তে এবং দেশের অভ্যন্তরে যারা নিরন্তর আঘাত করে চলেছে তাদের আমরা বিশ্বাস করব না। বরং এই অনিষ্টকারীকে রাজপথ চেনানোই আমাদের কর্তব্য হবে। রাবণের ছদ্মবেশকে ভুল করে বিশ্বাস করলে তার পরিণামে সীতা হরণ ঘটতে পারে। আমরা এমন ভুল আজ আর করতে পারি না। বলা বাহুল্য, দীর্ঘকালব্যাপী এক সংগ্রামে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি এ-কথা যেন না ভুলি।

"ভারতবর্ষ ও চীন"

ভারতবর্ষের উপর চীনের ব্যাপক আক্রমণ সম্পর্কে প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিন্তাশীল তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধমালা 'দেশ' পত্রিকায় পক্ষকাল অন্তর প্রকাশিত হবে। প্রথম প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ ও চীন" আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে।

"ড্রাগনের দাঁতে বিষ"

নেফা সমরাঙ্গণে পরিভ্রমণরত সাংবাদিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী "ড্রাগনের দাঁতে বিষ" এই শিরোনামায় আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক

আয়ুবের
ভারতাতঙ্ক রোগ
উপস্থিত প্রশমিত।

Kutty

ভারতের
প্রতিরোধ
সংকল্প

মাও হিমালয়ের
তুষারশুভ্র কিরীট দেখেছে,
তার ধ্বস দেখেনি।

চীনা দস্যুর প্রতিরোধে ভারত

ইবন বতুতা

বাইশে নভেম্বর থেকে চীনারা যুদ্ধ বন্ধ করেছে। পয়লা ডিসেম্বর থেকে নেফাতে চীনাদের পিছনে সরে যাওয়ার কথা থাকলেও এখনও সরতে আরম্ভ করেনি। পাঁচই ডিসেম্বরে বমডিলায় আহত ভারতীয় জওয়ানদের ভারতীয় রেডক্রসের নিকট সমর্পণের কথা বলায় নেফার বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ এখনও চীনা-অধিকৃত এলাকায় ঢুকতে সাহস করছেন না। চীনাদের প্রস্তাব অনুসারে লাদাকে দখলীকৃত এলাকা চীনাদের হাতেই থাকবে। উত্তর প্রদেশের বড়াহোতি ও চীনাদের দখলে চলে যাবে। চীনাদের প্রস্তাবে রাজী হলে ভারতকেও লাদাকে আরও সাড়ে বারো মাইল সরে আসতে হবে। অর্থাৎ চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চুশুলে ঘাটিতে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা রাখা চলবে না। নেফা এলাকায় চীনারা যে নিরস্ত্রীকৃত সীমারেখার কথা বলেছে তা [illegible] লা ও য়াং [illegible] জংয়ের দক্ষিণ ও সেলার উত্তর, লংজুর আট-দশ মাইল দক্ষিণ, মিনুতাং, ওয়ালংয়ের দুই মাইল দক্ষিণ এবং দিফু গিরিপথের ঠিক দক্ষিণ দিয়ে চলে গিয়েছে। চীনাদের প্রস্তাবিত সীমারেখার দক্ষিণ থেকে চীনারা পিছনে সরে গেলেও নেফায় চীনা-পরিত্যক্ত সাড়ে বারো মাইল এলাকায় সামরিক বাহিনীর প্রবেশ নিষেধ। চীনারা পিছু হটলেও হিমালয়ের গিরিপথগুলি চীনাদের দখলে থাকবে। লাদাকের ৪৩টি ও নেফার ৪টি ভারতীয় ঘাটি ভারত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে চীনারা আবার আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। লাদাকের বর্তমান চীনা-অধিকৃত এলাকা ১৯৫৯ সনের দখলীকৃত এলাকা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। চীন যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করে প্রচার-কৌশলের আড়ালে একদিকে লাদাক ও হিমালয়ের গিরিপথগুলি নিজের দখলে এবং অপরদিকে সারা পৃথিবীর কাছে ভারতকে 'যুদ্ধবাজ' হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়।

থিমায়া

থোরাট

ভারত চীনের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। তবে সামরিক দিক থেকে অপ্রস্তুত থাকার জন্য ভারত পাল্টা আক্রমণও আরম্ভ করে নি। চীনারা পুনরায় আক্রমণ করলে, তা প্রতিরোধ করবার জন্য ভারতীয় বাহিনী এখন প্রস্তুত। নেফার কমান্ড থেকে লেঃ জেঃ কাউলকে বদলি করে সে-জায়গায় মেজর জেনারেল মানেকশকে নিয়োগ করা হয়েছে।

চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভারতকে কী ধরণের সাহায্য দেওয়ার দরকার, তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন থেকে যে দুটি মিশন এসেছিল, গত সপ্তাহে সেই মিশনের সদস্যেরা দেশে ফিরে গিয়েছেন। বৃটিশ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক স্যার রিচার্ড হাল ও মার্কিন সেনাবাহিনীর জেনারেল এল এডামস প্রায় দুইদিন নেফা রণাঙ্গন পরিদর্শন করে ভারতীয় জওয়ানদের মনোবল দেখে খুসী হন। এরা ভারতের

মেজর জেনারেল মানেকশ

৭৮° ৭৯° ৮০°
সি ন কি য়া ং
৩৬° ৩৫° ৩৪° ৩৩°
কারাকোরাম গিরিপথ
যাংসি লা
হাজি লাঙ্গার
আকসাই চীন
৭ নভেম্বর ১৯৫৯ চীনেরা এখানে ছিল
দৌলতবেগ ওলদি
কুইজিল জিল্লা
আমতো ঘর
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ চীনেরা এখানে ছিল
কিন্তু চীনেরা বলছে ৭ নভেম্বর ১৯৫৯ তারিখে তারা এখানে ছিল।
শমুল লুংপা
গলোয়ান
কংকা পাস
লা দ
চ্যাংচেনমো নং
লানক লা
লেহ
সিওক
হট স্প্রিং
চুমেসাং নং
খুর্নক ফোর্ট
চুসুল
স্পেঙ্গুর
প্যাংগং হ্রদ
রোদক
জম্মু ও কাশ্মীর
চ্যাং লা
হানলে
জারা লা
ইমিস লা
① চীনা অধিকৃত কয়েকটি বর্তমান ঘাঁটি
০ ৩০ মাইল
অর্ধেন্দু দত্ত

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন অনুসন্ধান ও কথাবার্তা বলতে এসেছিলেন। ভারত সরকার চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে ঘোষণা করলেও যুদ্ধের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আজও নাকি অনুপস্থিত। আমেরিকার 'লেন্ড-লীজ' নীতি অনুসরণে বৃটেনও ভারতকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার চুক্তি করেছে। কাজ শেষ হলে বৃটেনকে অস্ত্র ফেরৎ দিতে হবে এবং বৃটেনের অনুমতি ভিন্ন ঐ অস্ত্র হাতছাড়া করা যাবে না। কমনওয়েলথ সেক্রেটারী শ্রীডানকান সান্ডস ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের মধ্যে পত্র-বিনিময়ের দ্বারা এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। বৃটিশ সরকার অবশ্য ঐ চুক্তি বলে অস্ত্রের কী ধরনের ব্যবহার হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবেন। বন্ধুরাষ্ট্রগুলি আগের মতই ভারতকে অস্ত্রসাহায্য করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজে করে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া বারোটি হারকিউলিস-১৩০ বিমান মারফৎ হালকা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আসছে। বৃটেন অস্ত্র সরবরাহ করছে ১৫০ কোটি টন। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজে করে ১৮ লক্ষ ডলার অস্ত্রশস্ত্র আসছে। নিরপেক্ষ সুইডেন অস্ত্র বিক্রী করে না। তা সত্ত্বেও ভারতের দুর্দিনে বিমান বিধ্বংসী কামান দিয়ে সাহায্য করছে। ফ্রান্স ও পঃ জার্মানীও প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

রাজেন্দ্র সিংজী

সামরিকবাহিনীকে যখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চলেছে, তখন জনসাধারণও যাতে আক্রমণকারীকে রুখতে পারে, সে-দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। আপাততঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় সক্ষম ব্যক্তিদের সামরিক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসামে ইতিমধ্যেই সামরিক শিক্ষাদান আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আপাততঃ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় ব্যাপকভাবে হোমগার্ডদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। শহরের বে-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরণের। হোমগার্ড, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সামরিক শিক্ষাদান ছাড়া বিমান-আক্রমণ প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার। দিল্লির বে-সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৫৯ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দরকার হবে বলে স্থির হয়েছে। কলিকাতার বে-সামরিক প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণকর্তা শ্রী পি কে সেনের মতে বৃহত্তর কলিকাতার জন্য মোট ১ লক্ষ ২৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দরকার হবে। ২রা ডিসেম্বর থেকে প্রথম দলকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কলিকাতায় মোট ২৭টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। ২৬শে নভেম্বর থেকে গোটা উত্তরবঙ্গে নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

প্রতিরক্ষা তহবিলে জনসাধারণের সহযোগিতা আগের মতই অব্যাহত রয়েছে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিরক্ষা তহবিলে ১০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা এবং ২১,৮০০ তোলা সোনা পাওয়া গিয়েছে। প্রতিরক্ষাবণ্ড বিক্রীর ব্যাপারে সাড়া পাওয়া গেলেও স্বর্ণবণ্ডের ব্যাপারে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। বিদেশ থেকে অস্ত্র সাহায্যের মত অর্থ ও জিনিসপত্রের মারফৎ সাহায্য অব্যাহত রয়েছে ভারতে ভ্রমণরত পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হাইনরিশ লুবকে ভারতীয় রেডক্রসকে আশি হাজার টাকার জিনিসপত্র দান করেছেন। পশ্চিম জার্মানী সরকার একটি ডিভিসন ভারতীয় জওয়ানের জন্য ১২০টন উল, ২০ হাজার কম্বল, ১০ হাজার পোষাক, বুট প্রভৃতি ব্যবহার্য জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন। অস্ট্রীয়া থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ঔষধপত্রও পাওয়া গিয়েছে। সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে অর্থনৈতিক বনিয়াদটিকেও দৃঢ় করা দরকার। ভারত পি এল ৪৮০ আইন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে গম ও চাউল ছাড়া গত সপ্তাহে ২২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকায় তুলো পেয়েছে।

হ্যারিম্যান: 'কোনো রূপ শর্ত ছাড়াই আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র সাহায্য করছে এবং করবে।'

চীন-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজও তেমন উন্নত নয়। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিল খাদ্যশস্য আমদানি করে খাদ্য সংকট দূর করতে সচেষ্ট। অথচ খাদ্যের বণ্টন ব্যবস্থার ভার শ্রী পাতিলের হাতে নয়। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের কথা বলা হলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য সম্ভবত শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্ভবত সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। অর্থ-সংগ্রহ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সোনা-সংগ্রহের জন্য বাজারে স্বর্ণবণ্ড বিক্রীর ব্যবস্থা করেছেন এবং তুলো, তামা, দস্তা, সীসা ও টিনের ফাটকা-বাজার বন্ধ করেছেন। শেয়ার-মার্কেটেও অগ্রিম কেনা-বেচার লেন-দেন বন্ধ হয়েছে। ভারতের অর্থনীতিকে যুদ্ধ পরিস্থিতির উপযোগী করতে হলে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রী-দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া নীতি-গত ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি আর ফেলে রাখা ঠিক নয়। রাজ্য সরকারগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। অনেক মুখ্যমন্ত্রী তো একমাত্র টাকা ও সোনা সংগ্রহের ব্যাপারে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। রাজ্যপালের উপর এই ভার দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকে নজর দেন, তা হলেও তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারবেন। দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আরও কর-সংগ্রহ করতে হবে। উত্তর-প্রদেশ সরকার অতিরিক্ত করের বোঝার সমস্তটাই চাষীদের উপর চাপাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বিরোধী দলের অনেক সদস্যের মত, মহীশূর সরকারও মদ্যপান-নিরোধ আইন প্রত্যাহার করে রাজস্ব সংগ্রহের পক্ষপাতী। পশ্চিমবঙ্গে এ ব্যাপারে এখনও তেমন কোন প্রচেষ্টা চোখে পড়েনি। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা কাজে লাগাবার তেমন ব্যবস্থা আজও যে হয়নি, সে কথা দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে।

ডানকান স্যান্ডস

পশ্চিমবঙ্গে এতদিন পরে প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছে। সদস্য সংখ্যা ৩২। দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের ভুলত্রুটি বা সমালোচনা দেখে কিছু শিখতে পারেননি। কেন্দ্রে ৩৩জন সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠনে অনেকেই [illegible]

[illegible] । [illegible] না সাত্তজনের বেশী [illegible] কোন কমিটী [illegible] হলে সে [illegible] কাজ অপেক্ষা বিতর্কই বেশী হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিকে কাজে লাগাতে হলে কমিটীতে কম সদস্য রেখে ঐ কমিটীর অধীন অনেকগুলি সাব-কমিটী রাখা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য, এই সব কমিটীর উপর সরকার কতটা গুরুত্ব দেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রথম চীনা-আক্রমণের পরেই যে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, গত ২৫শে নবেম্বর তার প্রথম অধিবেশন বসে। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সভায় দুইটি কমিটী গঠন করেন। একটি দেশরক্ষার ব্যাপারে পরামর্শদান এবং অপরটি দেশের জনসাধারণকে প্রতিরক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করবার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের নেতৃত্বে সামরিক ব্যাপার সম্পর্কিত কমিটীতে রয়েছেন, সশস্ত্র-বাহিনীর তিনজন অধিনায়ক, অবসরপ্রাপ্ত তিন জেনারেল অর্থাৎ জে রাজেন্দ্র সিংজী, জেঃ কে এস থিমায়া ও লেঃ জেঃ এস পি পি থোরাট, ডাঃ ডি এস কোঠারী ও প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে অপর কমিটীতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বেতার ও প্রচারমন্ত্রী শ্রী বি গোপালা রেড্ডী কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়, শ্রীখান্ডুভাই দেশাই, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও বিরোধী দলের শ্রীঅশোক মেহতা।

মেনজিস: 'অস্ট্রেলিয়া অস্ত্র ও সামগ্রী দিয়ে ভারতকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক।'

চীনা-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চীনাদের নতুন দোস্ত পাকিস্তানও ভারতের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছিল। চীনা-আক্রমণের সময় থেকে জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীর পাকিস্তানী মাল্লাদের ধর্মঘট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধর্মঘটের ফলে আসাম ও ত্রিপুরার সঙ্গে মাল চলাচলের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। আসামের চা ও পাট কলিকাতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। আসামে ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সরবরাহ বন্ধ ছিল। এ ব্যাপারে ভারতের সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ভারত সরকার লরিযোগে আসাম ও কলিকাতার মধ্যে জিনিসপত্র পরিবহণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন। বৃটিশ মন্ত্রী শ্রীডানকান স্যান্ডস্ ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিরোধ-মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। ভারতে চীনা-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রচার আরম্ভ করেছিল, চীনের সঙ্গে কোন গোপন সাট না থাকলে তা অসম্ভব মনে হয়। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ কম্যুনিজম

ইন্দিরা: [illegible] বিপর্যয়ের দিনেও [illegible] ভারতের [illegible] সংকল্পের প্রতি [illegible] সমর্থন [illegible]।'

. . . .

কমিউনিজম-এর চিন্তাধারা ও আদর্শ একদা স্বর্ণযুগের মতন পৃথিবীর বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পীকে ভুলিয়ে তার নিজের গন্ডিতে নিয়ে গিয়েছিল। অনেকে এই প্রবঞ্চনার স্বরূপ বুঝে শেষাবধি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আবার প্রথমাবধি অনেকেই একে সন্দেহের চোখে দেখে সংযত ছিলেন। বাঙলা দেশেও কমিউনিজমের বন্যা এসেছে যথারীতি। এই নব্য চিন্তাধারা বা আদর্শ কেন যে অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিকের সাহিত্যাদর্শ বা জীবনাদর্শ হতে পারল না, তার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। 'দেশ' পত্রিকায় আগামী সপ্তাহ থেকে এ বিষয়ে একটি করে ক্ষুদ্র রচনা প্রকাশিত হবে। বাঙালী সাহিত্যিকদের স্ব-বিবৃতি। প্রথম লেখাটি লিখেছেন: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

. . . .

অপেক্ষা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ বেশী বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেন। চীন পাকিস্তানের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে চায়। এবং সেজন্য ইঙ্গ-মার্কিন সামরিকগোষ্ঠী ত্যাগ করতে হবে না বলে জানায়। পাকিস্তানের প্রেস ও রাষ্ট্রনেতারা প্রথম থেকেই ভারতকে আক্রমণকারী ও চীনকে শান্তিকামী হিসেবে প্রচার করেছে। কাজেই বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অস্ত্র সাহায্য দিলে তা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে বলে রটনা করা স্বাভাবিক। ভারতে ভ্রমণরত শ্রীহ্যারিমান ও শ্রীডানকান সান্ডস বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার জন্য অনুরোধ করেন এবং ভারত ভ্রমণের পর তাঁরা রাওয়ালপিন্ডিতে যান। ভারতের নিরাপত্তা নষ্ট হলে পাকিস্তান যে রেহাই পাবে না এ কথা তাঁরা পাকিস্তানী-কর্তাদের বোঝাতে সক্ষম হন। শ্রীডানকান স্যান্ডসের দৌত্যকর্মের ফলে ২৯শে নভেম্বর দিল্লি ও রাওয়ালপিন্ডি থেকে নেহরু-আয়ুব যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। দুই রাষ্ট্র প্রধান ঐ বিবৃতিতে কাশ্মীর ও অন্যান্য বিরোধ সম্পর্কে খুব শীঘ্রই আলাপ-আলোচনার জন্য মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে [illegible] 'পিন্ডি' থেকে তিনবার [illegible] হয়েছিল। শেষ দুবার অবশ্য শ্রীনেহরুর একটি 'বে-সামাল' উক্তির জন্য। শ্রীনেহরু পরে নিজের বক্তব্য সংশোধন করেন।

ভারত নিজের চেষ্টায় কোন চীনা সমর্থনকারীকে নিজের দলে আনতে পারে নি। সিংহল ভারত-চীন বিরোধ মীমাংসার জন্য কলম্বোতে ছয়টি তথাকথিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সম্মেলন আহ্বান করেছিল। এই দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশ চীনের ভয়ে ভীত। কম্বোডিয়া চীনের সাহায্য প্রার্থী, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ চীনা-সমর্থক কম্যুনিস্টদের উপর নির্ভরশীল, ঘানার কাছে চীনই আদর্শ। সিংহল নিজেই চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ভয়ে ভীত। একমাত্র মিশর ভারতকে সমর্থন করতে সক্ষম এবং বিরোধ-মীমাংসার জন্য প্রেসিডেন্ট নাসের মোটামুটি ভারতের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। অবস্থায় শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননকে ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলে এবং শ্রীঅশোক সেনকে কায়রো ও আক্রায় পাঠানোর খুব বেশী দরকার ছিল না। ঐ সব দেশে ভারতীয় দূতাবাস রয়েছে। ভারতীয় দূতেরা যদি ভারতের বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে তাদের বিদেশে রাখার কী প্রয়োজন। আবার যে-সব দেশ নানা কারণে ভারতকে সমর্থন করতে পারবে না, তাদের কাছে বক্তব্য বলবার জন্য লোক পাঠালে, ভারতের সমর্থনকারীদের নিকটও লোক পাঠানো দরকার। কোন দেশ কারও চিরকালের বন্ধু থাকে না। এ ব্যাপারে চীনের থেকে আমরা আজও অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

টিটো: ১৮ সেপ্টেম্বরের সীমারেখা পর্যন্ত চীনাদের হটে যাবার ভারতীয় দাবীকে যুগোস্লাভিয়া সমর্থন জানাচ্ছে।'

২-১২-৬২

সোনার চুড়ি

শ্রীদীপক গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন আমিই তোমাকে কত শখ করে
তোমারই মনোমত কিনে দিয়েছিলুম
দু' গাছা সোনার চুড়ি।
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত
কিছুই তোমাকে দিতে পারিনি।

তবু তুমি সত্যি করে বল তো
তোমার হাতে মানায় কি আজ
আমার দেওয়া ওই
সোনার চুড়ি দু' গাছা?

আমার সোনা বোন,
খুলে ফেল এক্ষুনি ওই সোনার চুড়ি
বেচে দাও দোকানে গিয়ে
কিনে আনো আজ পাউন্ড কয়েক উল।

যেখানে পাহাড়ের প্রচণ্ড শীতে
তোমার দাদার রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়,
সেখানে কি মানায় তোমার হাতে
তারই দেওয়া ওই
সোনার চুড়ি দু' গাছা?

তবে নিয়ে এসো আমার লক্ষ্মী বোন
পাউন্ড কয়েক উল আর দু' গাছা বোনার কাঁটা।
কলেজে আজ নাই বা গেলে,
শুরু করে দাও সোয়েটার আর
মাফলার বোনার কাজ'

দুপুরটা আজ গল্প করে কিংবা
ঘুমিয়ে না হয় বই-ই পড়ে পড়ে
মিছিমিছি নষ্ট করে দিও না, আমার বোন।

যারা ওই হাড় জমানো শীতে
হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল আর সঙ্গিন,
যারা এক ঘৃণ্য, নীচ, রক্তলোলুপ
পশুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে,
তাদের জন্যে
আজকের রাতটা তুমি না হয়
না-ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলে বোন—
সোয়েটার, আরো সোয়েটার তোমাকে বুনতে' হবে।

তোমার দাদারা যদি এই দারুণ শীতে
তোমার ভালবাসার একটু গরম ছোঁয়াও না পায়,
তবে আজ সত্যি করে বল তো দেখি বোন
তোমার হাতে কি মানায়
তারই দেওয়া ওই
সোনার চুড়ি দু' গাছা?

[কবি শ্রীদীপক গঙ্গোপাধ্যায় একজন সৈনিক। মাতৃভূমির আহ্বানে তিনি রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছেন। তাঁর এই কবিতাটি নেফা-রণাঙ্গন থেকে প্রেরিত]

লালের অধিক লাল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শুধু নগ্ন রেখা টানা মানচিত্রে, তারপরে বলা
কামানপ্রমাণ কণ্ঠে : এ আমার নিজস্ব এলাকা,
শুধু ভুক্তি, যুক্তিহীন, বকবৃত্তি, মিথ্যা সে নির্জলা,
পঞ্চশীলে পঞ্চশূল, বিষকুম্ভ দুধ দিয়ে ঢাকা।

দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষ, নাহি মানে মানবসভ্যতা,
একমাত্র স্ফীতি নীতি, একমাত্র খাবল-ছোবল,
কথা দিয়ে কথা রাখা সে আবার কোন্ দেশী কথা—
পরপিণ্ডলিপ্সু দস্যু, ওই এক জঙ্গলে দঙ্গল।

এদেরো সগোত্র আছে এ ভারতে, শাঠ্যশেঠ ক্রূর,
নিজের মায়েরে ভালোবাসতেও যাদের কিনা দ্বিধা—
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুব্ধ দাঁতে শনৈশ্চর ঘুরিছে ইঁদুর,
ফোকটে পকেট মারে খুঁজে ফেরে ছিদ্রের সুবিধা।

তুমি আছ আমি আছি অসহ্য এ সহ-অবস্থান,
তুমি নেই, আদিগন্ত আমি আছি এই শুধু মানি—
বেগতিকে ঐক্য জপে, শতধৌতে অঙ্গার অম্লান,
বিদেশের চাঁট ছোঁড়ে স্বদেশের খেয়ে দানাপানি।

প্রচ্ছন্নে-প্রকটে দীর্ঘে আঘাত করেছে হানাদার,
প্রতিরোধে দৃপ্তদণ্ড ভারতের কিষাণ-মজুর
ছাত্র কবি শিল্পী কর্মী—একরক্তে একত্র ঝঙ্কার,
পর্বত প্রান্তর নদী প্রস্তর তুষার তৃণাঙ্কুর।

এ আঘাত সুস্বাগত, জীবনেরে করেছে দুর্দম,
ভারতের দেহ-আত্মা জাগ্রত-উদ্যত কৃষ্ণার্জুন—
শান্তিতে বিশাল প্রাণ, ভয়াবহ সংগ্রামে নির্মম,
লালের অধিক লাল এই এক সংযুক্ত আগুন॥

চীন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ফুটুক অনেক ফুল—সে কি আগুনের ফুলঝুরি!
তুমি কি শাণাবে ছুরি
তোমাকে ডাকলে আমি ভাই?
হৃদয়ের কোনো ইতিহাসে লেখা নাই
এই নির্মমতা, অবিশ্বাস।
তুমি কলুষিত করে দিয়েছ বাতাস,
সেখানে কেবল ঘৃণা জন্ম নেয় সাপের মতন।
বসুধা কুটুম্ব ভেবে মন
ছিল ঘুমে, তুমি তাকে জাগালে ঘৃণায়,
সে মনোবীণায়
আজ শুধু বাজে রুদ্রতাল।
আমার আকাশ নীল, তোমার আকাশ থাক লাল॥

মোকাবিলা

মন্মথনাথ সান্যাল

ভেবেছ—এ হাত বড়ই কোমল হবে,
যে-হাত লালন করেছে চামেলি যূঁই,
কোমল মাটির বুকের ওপরে, টবে,
সে-হাত কাঁপবে কড়া হাতে যদি ছুঁই।

বর্বর তুমি শোভা-শান্তির কীট,
হাতিয়ার পূজা জীবনে করেছ সার,
জীবনে ভরেছ কাঁকর পাথর ইঁট
কাঁটা ও আগাছা, ফুলের ধার নি ধার।

জান না যে-হাত খুরোপি-কোদাল-ধরা
মাটিতে ফলায় সোনা লাঙলের ফালে
বৈরী-বুকের পাঁজর-ঝাঁঝর-করা
হাতিয়ারো চালে বজ্রের সমতালে।

এসেছ যখন ফিরতে দেব না আর
তোমার হাড়েই বাড়াব জমির সার॥

আমাদের নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন ছিলো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমাদের স্বপ্ন আপেলের গুচ্ছে গুচ্ছে মুলের মতো সোনালী ছিলো। তোমাদের সাম্রাজ্যবাদী
কেশর মোচন করো, হায় চীন! তোমাদের গাছের পাতার রঙ আমাদের
গাছের পাতার রঙেরই মতো। তোমাদের নারীদের মতোই আমাদের নারীদের
দেশপ্রেমিক দেহমন। তোমাদের সাহিত্যের মতো আমাদের সাহিত্যের সরাসরি
নির্বাচনহীন ভালোবাসা ছিলো। আজ তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা
নেই কামনা করবো, তোমাদের মতন মানুষের প্রতি ভালোবাসামূলক সাহিত্য
আজ থেকে আমরা আর লিখব না। আমরা ভালোবাসতে পারবো না, তোমাদের
দেশের কাঁচ কাঁচ ছেলেমেয়েদের মুখ। আমরা বাঘের শিশুরও মুখচুম্বন করতে
ভয় পাবো। আমরা সাপের মতো নোংরা ও অবিশ্বাসপ্রধান তোমাদের কাঁধে
কোনোদিন আর হাত দিয়ে দেখবো না তুষার।
আমরা এমন হিংস্রভাবে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়াবো
যেরকমভাবে মানুষ কখনো পৃথিবীতে দাঁড়ায়নি
কেননা পৃথিবীর এই অত্যুজ্জ্বল সুসময়ে তোমরা জানোয়ারের মতো
মানুষের আত্মা ও অস্তিত্ব ও মহত্ত্বের উপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছো!
তোমাদের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে এত বড় হিংস্রতা কোথায় লুকিয়ে ছিলো? তোমাদের
ভাবলেশহীন মুখে-চোখে এত বড় হিংস্রতা কোথায় লুকিয়ে ছিলো? তোমাদের
মহিলাদের রমণীদের মুখে এত বড় হিংস্রতা গোপন ছিলো কোথায়?
আমরা বুঝতে চাইনি কোনোদিন, কেননা, পৃথিবীর অত্যুজ্জ্বল সময় এখন
নোংরামি করার দিন নয় এখন, হিংসা করার দিন নয় এখন। আমাদের
নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন আপেলের গুচ্ছে গুচ্ছে মুলের মতো সোনালী ছিলো।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

দশের মুখ খুদার তবল

ইংরেজ খায় জব্বর এক খানা ব্রেকফাস্ট। শুধু তাই নয়, অনেক ইংরেজ ঘুম থেকে উঠেই বেড-টীর সঙ্গে খায় একটি কলা কিংবা আপেল এবং একখানা বিস্কুট।

তারপর ব্রেকফাস্ট। দীর্ঘ সে ভোজন; আমি সংক্ষেপে সারি। যদি সে ইংরেজ ঈষৎ মার্কিন-ঘেঁষা হয়, তবে সে আরম্ভ করবে গ্রেপ ফ্রুট দিয়ে। তার পর খাবে পরিজ কিংবা কর্নফ্লেক, মেশাবে এক জগ্ দুধের সঙ্গে, কেউ কেউ আবার তার সঙ্গে দেবে চাকতি চাকতি কলা, এবং চিনি। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যাবে তবলা বাদ্য, অর্থাৎ, সঙ্গে সঙ্গে টোস্ট-মাখন খাওয়া। শেষ সম পর্যন্ত এই তবলা বাদ্য বন্ধ হবে না। তার পর ভোজন-রসিক খাবেন কিপারস (মাছ) ভাজা—অনেকটা লোনা ইলিশের ফালির মত—তার পর খাবেন এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া দুটো আণ্ডা ফ্রাই (আকারে এ-দেশী চারটে ডিমের সাইজ) তৎসহযোগে বেকন—আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, টোস্ট-মাখনের তবলা কখনো বন্ধ হবে না—এবং এর পর টেনে আনবে মার্মলেডের বোতল। খাবে নিদেন আরো খানচারেক টোস্ট ঐ মার্মলেড সহ। এবং চা কিংবা কফি তো আছেই। বাপ্স্!

ফরাসী-জর্মন ব্রেকফাস্টে খায় যৎসামান্য রুটি-মাখন আর কফি। খানদানী ফরাসী মাখনও খায় না—বলে, ফরাসী-রুটির যে আপন উত্তম সোয়াদ আছে সেটা মাখনের স্পর্শে বরবাদ হয়ে যায়।

লাঞ্চের বেলা ইংরেজ খায় যৎকিঞ্চিৎ। ফরাসী-জর্মন করে গুরুভোজন।

রাত্রিবেলা ইংরেজ করে গুরুভোজন। জর্মন খায় অত্যল্প। রুটির সঙ্গে সসিজ, কিংবা চীজ এবং ফিকে পানসে চা। যা সব খাবে সাকুল্যে মালই ঠাণ্ডা, শুধু চা-টাই গরম।

এবারে গিয়ে দেখি হইহই রইরই কাণ্ড ডিনারের বেলায়ও। অবশ্য সব-কিছুই ঠাণ্ডা খাওয়ার ঐতিহ্য সে এখনো ছাড়েনি।

এবারে দেখি পাঁচ রকমের সসিজ তিন রকমের চীজ এবং ট্যুবের খাদ্যের ছড়াছড়ি। আমরা যেরকম ট্যুব থেকে টুথপেস্ট বের করি এরা তেমনি বের করতে থাকে কোনো [illegible] কোনোটা থেকে [illegible] পেস্ট। [illegible] ট্যুব থেকে মাস্টার্ড, কোনোটা থেকে টমাটো

দেখিনি, মাংসের পেস্ট ভর্তি ট্যুবও হয়। কোনো জিনিসের অভাব নেই। দামের রোয়া ক'রো না, যত পারো খাও।

রাস্তায়ও দেখি, আগে যে রাস্তায় ছিল একখানা খাদ্যদ্রব্যের দোকান (লেবেন্স্-মিটেল গেশেফ্ট্—কলোনিয়াল ভারেন) এখন সেখানে চারখানা। কারো বাড়িতে যাওয়া মাত্রই সে কোনো কথা না বলেই বের করে উত্তম রাইন মজেল (হক্ রেনিশ) তাজা বিয়ার—ইস্তেক স্কচ্ হুইস্কি, মার্কিন সিগারেট।

বড় আনন্দ হল এসব দেখে—থাক না বেচারীরা প্রাণভরে। এই যে সেভন ডেজ ওয়ান্ডার—তিন দিনের ভেল্কিবাজি—এ যে কখন বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। অতএব খাও-দাও ফুর্তি করো। হেসে নাও, দু' দিন বই তো নয়।

এ তত্ত্বটি জর্মনরাও বিলক্ষণ জানে।

হামবুর্গে আমি যে পাড়ায় থাকতুম সেটা শহরতলিতে। অন্যত্র যেমন, এখানেও পাড়ার 'পাবটি' ঐ অঞ্চলের সামাজিক কেন্দ্রভূমি। দেশের লোকে কি ভাবে, কি বলে, পাবে না গিয়ে জানার উপায় নেই। গুণীজ্ঞানীরা কি ভাবেন, সেটা জানা যায় অনায়াসে—বই, খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু পাবের গাহকরা গুণী-জ্ঞানী নয়; তারা বই লেখে না, লেকচার ঝাড়ে না। অথচ এরাই দেশের মেরুদণ্ড।

এখানে কায়দামাফিক একে অন্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। পাশের লোকটির সঙ্গে গালগল্প জুড়ে দিলুম।

বললুম, 'যুদ্ধের পর ঠিক এই যে প্রথম এলুম তা নয়। বছর দুই পূর্বে এসেছিলুম, মাত্র দু' দিনের তরে। কোনো একটা পাবে যাবার ফুরসত পর্যন্ত হয়নি। এবারে তার শোধ নেব।'

শুধোল, 'কিরকম লাগছে পরিবর্তনটা?'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য! এত ধন-দৌলত যে কোনো জাতের হতে পারে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

লোকটি হেসে বললে, 'তা তোমরাও তো এককালে খুব ধনী ছিলে। সেদিন আমি খবরের কাগজে একটা ব্যঙ্গ-চিত্র দেখছিলুম। তোমাদের তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে এক মার্কিন টুরিস্ট তার স্ত্রীকে বলছে, 'ন্যান্সি! এসব জিনিস তারা এমেরিকান 'এড্' ছাড়া তৈরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'রাজারাজড়ারা ধনী ছিলেন নিশ্চয়ই—আজ যেরকম সউদী আরব, কুয়েৎ বাহরেনে শেখরা জলের মত টাকা ওড়ায়, কিন্তু আর পাঁচজনের সচ্ছলতা কিরকম ছিল অতখানি আমি জানিনে।'

আমাদের কথায় বাধা পড়লো। দেখি এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে বিয়ারের গেলাস, পরনে মোটামুটি ভালো স্যুটই, তবে ফিটফাট বলা চলে না। ফিসফিস করে যেভাবে কথা আরম্ভ করলে তাতে মনে হল, এখনো বুঝি নাৎসি যুগের গেস্তাপো গোয়েন্দার বিভীষিকা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। নাঃ, আমারই ভুল। হামবুর্গে যখন ইংরেজ বেধড়ক বোমা ফেলে তখন কি জানি কি করে তার গলার সুর বদলে যায়। এ তত্ত্বটা জানা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ফিসফিসিনিতে বলা কথাগুলো কেমন যেন উচাটন মন্ত্রে উচ্চারিত নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে হচ্ছিল।

ডান হাত তুলে ধরে গেলাস দিয়ে জানলার দিকে নির্দেশ করে শুধোলে, 'কি দেখছ?'

আমি বললুম, 'এন্তের মোটর গাড়ি।'

আবার সেই ফিসফিস। বললে, 'এদের ক'জন সত্যি সত্যি মোটর পুষতে পারে জানো? শতেকে গোটেক। তোমার দেশের কথা বলছিলে না, রাজারাজড়ারা ধনী ছিলেন বাদবাকিদের কথা বলতে পারছো না। এখানেও তাই। এই যে মোটর দাবড়ে বেড়াচ্ছেন বাবুরা, এদের ক'জন মোটরের পুরো দাম শোধ করেছেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি, সব ইনস্টলমেন্টের ব্যাপার। জী লেবেন য়ুবার ঈরে ফেরহেল্ট-নিসে—দে আর লিভিং বিঅন্ড দেয়ার মীনস—আনে সিকি, ওড়ায় টাকা।'

আমি বললুম, 'সে-কথা বললে চলবে কেন? কট্টর অবজেকটিভ বিচারেও বলা যায়, তোমাদের ধনদৌলত বিস্তর বেড়েছে।'

বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'কে বলছে ধনদৌলত বাড়েনি! বেড়েছে নিশ্চয়ই। আলবৎ বেড়েছে। কিন্তু প্রথম কথা, যা বেড়েছে তার তুলনায় খরচ করছে অনেকে বেশী। এবং দ্বিতীয় কথা, এ ধনদৌলতের পাকা ভিত নেই। ১৯১২-১৯১৪-এ আমাদের যে ধনদৌলত ছিল তার ছিল পাকা বুনিয়াদ।'

আমি বললুম, 'তাতেই বা কি ফয়দা হল? ইনফ্লেশন এসে সে পাকা বুনিয়াদও তো ঝরঝরে করে দিয়ে চলে গেল।'

বুড়ো শুধু মাথা নাড়ে আর বার বার বলে, 'জী লেবেন য়ুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে, জী লেবেন য়ুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে—কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

বুড়ো আমাদের ছেড়ে বারের দিকে এগোলো খালি গেলাস পূর্ণ করার জন্য।

আমি যার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করে-ছিলুম, সে এতক্ষণ হাঁ না কিছুই বলেনি। এবারে নিচের গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুড়োর কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে তুমি যে এই ইনফ্লেশনের কথা তুললে না, সেইটেই হচ্ছে আসল ভয়। ইন-ফ্লেশনের বন্যা এসে একদিন সব-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, তারই ভয়ে সবাই টাকা খরচ করছে দু' হাতে। এমন কি, যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি সেটাও ওড়াচ্ছে।'

আমি বললুম, 'যে কড়ি এখনো কামানো হয়নি, সেটা ওড়াবে কি করে?' তারপর বললুম, 'ওঃ! বুঝেছি। ধার করে।'

বললে, 'ঠিক ধার করে নয়। কারণ, ধার করলে সে পয়সা একদিন না একদিন ফেরত দিতে হয়। না দিলে পাওনাদার বাড়ি ক্রোক করে। কিন্তু ইনস্টলমেন্টের কেনা জিনিসে সে ভয়ও নেই। বড় জোর যে জিনিসটা কিনেছে সেটা ফেরত নিয়ে যাবে।'

ইতিমধ্যে সেই ফিসফিস-গলা বুড়ো ফিরে এসেছে। বললে, 'টাকা ধার পর্যন্ত নেওয়া যায়। আমি রোক্কা টাকার কথা বলছি, ইনস-টলমেন্টের কথা হচ্ছে না। টাকা শোধ না দিলে যদি ক্রোক করতে আসে, তবে লাটে তুলবে কি? বাড়ির তাবৎ জিনিসই তো ইনস্টলমেন্টে কেনা। সেগুলো তো ক্রোক করা যায় না।'

আমি বুড়োকে বললুম, 'আপনি সব-কিছু বড্ড বেশী কালো চশমার ভিতর দিয়ে দেখছেন।'

বুড়ো বললে, 'আমি কি একা? আমাদের প্রধানমন্ত্রী আডেনওয়ারও তো ঐ পরশু দিন দেশের লোককে সাবধান করে দিয়েছেন, "এ সুদিন বেশী দিন থাকবেন না। হুঁশিয়ার, সাবধান!" পড়োনি কাগজে?'

আমি বললুম, 'অতশত বুঝিনে। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সবাই খাসা ফুর্তিতে আছে। ঐটেই হ'ল বড় কথা।' তারপর যার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করেছিলুম তাকে শুধালুম, 'তোমাদের শহরের মাঝখানে যে হাজারখানেক সেকেন্ডহ্যান্ড কার্ সেল্ দেখলুম, সেগুলো কি ইনস্টলমেন্টে কেনা ছিল, আর, কিস্তি খেলাপ করেছে বলে বাজেয়াপ্ত হয়ে ঐখানে গিয়ে পৌঁছেছে?'

বললে, 'নিশ্চয়ই তার একটা বড় অংশ।'

বুড়ো আবার মাথা দোলাতে দোলাতে বললে, 'তোমাকে বলিনি, জী লেবেন য়ুবার ঈরে ফেরহেল্টনিসে! কামায় সিকি, ওড়ায় টাকা।'

• • •

সুবুদ্ধিমান পাঠককে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি অর্থনীতি জানিনে, এসব মতামতের কতখানি ধোপে টেকে, বলতে পারবো না। আমি যা শুনেছি, সেইটেই রিপোর্ট করলুম। এবং আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এসব পাবে শুমপেটার, কেইনজ, শাখট্ আসেন না। আসে বেদো মেদো। কিন্তু ভুললে চলবে না, কথায় বলে, দশের মুখ খুদার তবলা।

গোদাবরী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণার বাঙালীরা রামকানাই-বাবুকে একঘরে করেছে, বারোয়ারি পুজোয় চাঁদা আদায় করা ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

বছর দশেক আগে প্রথম যখন আমি পুণায় আসি তখন রামকানাইবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমি নবাগত, তিনি একঘরে; দুজনেই বিকেলবেলা পেশোয়া পার্কে গিয়ে বসতাম। প্রথমে দূরে থেকে পরস্পরের পানে আড়চোখে তাকাতাম, ধুতি পরার ধরন থেকে দুজনেই দুজনকে বাঙালী বলে চিনতে পেরেছিলাম। তারপর আমিই যেচে আলাপ করলাম। তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেলেন।

তাঁর চেহারাটা মধ্যমাকৃতি এবং নিরেট গোছের, দেখে মারাঠী বলে মনে হয়। বয়স পঞ্চাশের নীচে; রঙ ফরসা, মুখে বসন্তের দাগ, চোয়ালের হাড় ভারী, মাথার কাঁচা-পাকা চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে টেরি কাটা যায় না। প্রথম আলাপের পর রোজই দেখা হতে লাগল। তারপর একদিন তিনি আমাকে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। বাড়িটি তাঁর নিজস্ব, নতুন তৈরি করিয়েছেন; ছোট-খাটো ছিমছাম বাড়ি, চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান, দেখে ভারি পছন্দ হয়েছিল। এবং বুঝেছিলাম যে রামকানাইবাবু পয়সাওয়ালা লোক।

দার্জিলিং চায়ের সহযোগে প্রচুর খাইয়ে-ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের মিষ্টি পেয়ে পুলকিত হয়েছিলাম; তখন জানতাম না যে মিষ্টান্নগুলি তাঁর বাড়িতে তৈরি। গোদাবরীকে তখনো দেখিনি। অর্থাৎ—দেখেছিলাম, কিন্তু—

একদিন তিনি আমাকে নৈশ ভোজনের নেমন্তন্ন করলেন। আহারের পর একটু নিষিদ্ধ অনুপানের ব্যবস্থা ছিল। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় রামকানাইবাবু দ্রব্যগুণে মুক্তকণ্ঠ হয়ে পড়লেন, সরলতার প্রবল বন্যায় তাঁর জীবনের কাহিনী বেরিয়ে এল। অসামান্য অভিনবত্ব হয়তো নেই তাঁর কাহিনীতে, কিন্তু শুনে বেশ আমোদ অনুভব করেছিলাম।

তাঁর কাহিনী নীচে লিখছি।—

যৌবনকালে রামকানাইবাবু বোম্বাই এসে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তীক্ষ্ণ বাণিজ্য-বুদ্ধির ফলে তিনি অল্পকালের মধ্যে গুজরাতী মহলে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, এই সময় মহাযুদ্ধ বেধে গেল। তিনি দু'হাতে টাকা লুটতে লাগলেন। মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল তাঁর ব্যাংক-ব্যালান্স ফুলে ফেঁপে লাল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ব্যাংক-ব্যালান্স যে-পরিমাণ ফাঁপলো, রামকানাইবাবুর শরীর সেই পরিমাণে চুপসে গেল। বোম্বাই-এর যাঁরা বহিরাগত বাসাড়ে তাঁরা জানেন, বম্বে স্টমাক নামক এক বিচিত্র রোগ আছে; এই রোগ যাকে ধরে তার খেয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে সুখ নেই, জেগে সুখ নেই; মনটা পাকস্থলীকে কেন্দ্র করে অহর্নিশ ঘুরপাক খেতে থাকে। ডাক্তারেরা তখন মাথা নেড়ে বলেন— যদি প্রাণত্যাগ করতে না চান তো স্থানত্যাগ করুন, এ রোগের ওষুধ নেই। বেশির ভাগ লোকই স্থানত্যাগ করেন।

মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন রামকানাই-বাবুর আয়ের রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন—দূর ছাই, টাকা তো অনেক রোজগার করেছি, আর বেশি রোজগার না করলেও বাকি জীবনটা সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। এখন প্রাণটা রক্ষা করা দরকার। তিনি এক জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় রামকানাইবাবুর কোষ্ঠী দেখে ভারী খুশী। বললেন—'আরে বাঃ! এ যে পদে পদে রাজযোগ! রোজগার অনেক করেছেন, আর বেশি হবে না। এখন জীবন উপভোগ করুন। শুক্রের মহাদশা আরম্ভ হচ্ছে, স্ত্রী-সুখ, ভোজন-সুখ, বিশ্রাম-সুখ, সবই আপনি পাবেন।'

রামকানাই জিগ্যেস করলেন—'আর শরীর-সুখ?'

জ্যোতিষী বললেন,—'আপনি কেতুর দশায় শরীর—কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু আর বেশি দিন নয়, শীঘ্রই শরীর নিরোগ হবে।'

রামকানাই জ্যোতিষীকে দক্ষিণা দিয়ে প্রফুল্লমুখে ফিরে এলেন।

তাঁর সংসার খুবই সংক্ষিপ্ত, ছেলেপুলে নেই; কেবল তিনি আর তাঁর স্ত্রী। বন্ধ্যা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক ভালবাসা ছিল। মনের দিক দিয়ে খুব যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল তা নয়, কিন্তু স্ত্রী খুব ভাল রাঁধতে পারতেন, এবং রামকানাই ছিলেন ভোজন-বিলাসী। তিনি স্ত্রীকে মাসে একখানি সোনার গহনা কিনে দিতেন। টাকার দাম যেখানে হুহু শব্দে নেমে যাচ্ছে, সেখানে সোনা একমাত্র অচলপ্রতিষ্ঠ বস্তু; রামকানাইবাবু এক ঢিলে দুই পাখি মারতেন, ঘরে সোনাও আসত, গিন্নীও খুশী থাকতেন। খুশী হয়ে গিন্নী তাঁকে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াতেন। দুজনেই দুজনের কদর বুঝতেন।

তারপর জ্যোতিষী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ওলট-পালট করে দিয়ে এক ব্যাপার ঘটল; রামকানাইবাবুর স্ত্রী মাত্র কয়েকদিন জ্বরে ভুগে মারা গেলেন। রামকানাইবাবুর স্ত্রী-সুখ এবং ভোজন-সুখ একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তিনি হৃদয়ে যত আঘাত পেলেন, তার চেয়ে বেশি আঘাত পেলেন হৃদয়ের নিকটবর্তী অন্য একটা স্থানে। গৃহিণীর রান্না খেয়ে তিনি কোনো মতে পাকস্থলীকে খাড়া রেখেছিলেন, এবার পাকস্থলী জবাব দিল। বম্বে-স্টমাক্ সংহার মূর্তি ধারণ করল।

রামকানাই গোয়ানীজ বাবুর্চি রাখলেন, কিন্তু তাতে পেটের যন্ত্রণা বেড়ে গেল; অত গরগরে রান্না রোগা পেটে সহ্য হবে কেন? গোয়ানীজকে বরখাস্ত করে তিনি বাংলা দেশ থেকে রাঁধুনি বামুন আনালেন; কিছুদিন মন্দ চলল না। কিন্তু ক্রমাগত থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় খেয়ে তাঁর অরুচি ধরল; দিনান্তে অন্ন মুখে দিতে পারেন না। বম্বে-স্টমাক আসর জাঁকিয়ে বসল। রামকানাইবাবু গৃহিণীর রান্না স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

ডাক্তার এলেন, মাথা নেড়ে বললেন—'যদি বাঁচতে চান বম্বে ছেড়ে পালান। এখানে থাকলে বাঁচবেন না।'

রামকানাইবাবু কাতরস্বরে বললেন, —'কিন্তু যাব কোথায়? বাংলা দেশে দুদিন থাকলেই আমার ম্যালেরিয়া ধরে।'

ডাক্তার বললেন,—'কেন, পুনায় যান না। পুনার স্বাস্থ্য খুব ভাল, আপনার বম্বে-স্টমাক সেরে যাবে।'

সুতরাং রামকানাইবাবু পাততাড়ি গুটিয়ে পুনায় এলেন। পুনায় তিনি পূর্বে কখনো আসেননি, তাঁর রেস খেলার নেশা নেই, ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধেও তাঁর মন সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু পুনায় এসেই জায়গাটা তাঁর ভাল লেগে গেল। তখন হেমন্ত কাল, শীত পড়ি-পড়ি করছে। শুকনো ঠান্ডা বাতাসে তাঁর শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল। তিনি একটি হোটেলে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ মশালা দোসা এবং দহি-বড়া হুকুম দিলেন। এখানকার খাদ্যদ্রব্যের স্বাদই যেন আলাদা; আরো সতেজ, আরো মুখরোচক। শুধু তাই নয়, মশালা দোসা এবং দহিবড়া অবিলম্বে হজম হয়ে গেল।

তিন দিন পুনায় থেকে রামকানাইবাবু বুঝলেন, পুনার মতন পুণ্যস্থান আর নেই; তিনি এখানেই ডেরাডান্ডা পাড়বেন; কাশী-বৃন্দাবনে যারা যেতে চায় যাক, তাঁর পরম তীর্থ পুনা। কিন্তু হোটেলে কতদিন থাকা যায়। হোটেলের খাবার প্রথম দু-চার দিন মন্দ লাগে না, ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে। হোটেলের একটি ঘরে আবদ্ধ থাকাও কারাবাসের সামিল। অতএব চটপট একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

রামকানাইবাবু কর্মতৎপর লোক, তিনি মহা উৎসাহে লেগে গেলেন। পুনার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে শঙ্কর শেঠ রোড নামে রাস্তা আছে, সেখানে একটু নিরিবিলি দেখে দুই বিঘা মাপের একখন্ড জমি কিনে ফেললেন। তারপর প্ল্যান তৈরি করিয়ে কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান স্যাংশন করিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এখানে আসার পর তাঁর যে দু-চারজন বন্ধু জুটেছিল, তারা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল—'পুনায় বাড়ি ফেঁদেছেন, পাক্কা তিনটি বছর লাগবে। এখানে তিন বছরের কমে বাড়ি হয় না।'

রামকানাইবাবু বললেন—'দেখা যাক।'

পাঁচ মাস পরে তিনি গৃহপ্রবেশ করলেন। চার-পাঁচখানা ঘর নিয়ে একতলা বাড়ি, তাকে ঘিরে প্রশস্ত বাগান। গৃহপ্রবেশের দিন রামকানাইবাবু নিজের জানা-শোনা বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে প্রচুর ভূরি-ভোজন করালেন। পুনায় তাঁর দ্বিতীয় সংসার-যাত্রা আরম্ভ হল।

একলা বাড়িতে থাকেন, সঙ্গী-সাথী নেই। বোম্বাই শহরে তিনি ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন, বাগান ছিল না; এখানে নিজের বাগান তৈরি করা নিয়ে বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগল। একদিন একটি বিলিতী পত্রিকায় দেখলেন, প্রাক্-কম্যুনিস্ট যুগের চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে—যদি একদিনের জন্যে সুখী হতে চাও, মদ খাও; যদি এক মাসের জন্যে সুখী হতে চাও, বিয়ে করো; আর যদি চিরদিনের জন্যে সুখী হতে চাও তো বাগান করো। প্রবাদটি রামকানাইবাবুর খুব ভাল লাগল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বাগান বানাতে শুরু করে দিলেন। কলকাতা থেকে চালতার চারা, পাতিনেবুর কলম আনালেন; দেওঘর থেকে গোলাপ, দার্জিলিঙ্ থেকে অর্কিড্। দিনের বেলাটা বাগানের চিন্তায় আনন্দে কেটে যায়। এটি তাঁর জীবনের অন্যতম বিলাস।

একটি বিলাসের কথা আগে বলেছি: তিনি সুরন্ধিত অন্নব্যঞ্জন খেতে ভালবাসতেন, আহারটি মনের মতন না হলে তাঁর জীবনটাই বিস্বাদ হয়ে যেত। যতদিন গিন্নী ছিলেন, ততদিন খাওয়া সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ছিল না, কিন্তু এখন তিনি নির্জনে বসে প্রায়ই গৃহিণীর কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেন। ডুমুরের ডালনা, পাব্দা মাছের ঝোল, মুর্গীর রোস্ট তেমন করে কে রাঁধবে?

রামকানাই হাতে-কলমে রন্ধন-বিদ্যা আয়ত্ত না করলেও থিওরিটা ভালরকম জানতেন। পুনায় এসে তিনি পাঁচটা রাঁধুনি বদল করেছেন, দাঁড়িয়ে থেকে তাদের রান্না শেখাবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কেউ কোনো কর্মের নয়, কেবল সম্বর দুধি-

জার্জি আর মশলা-ভাত রাঁধতে জানে; নতুন রান্না শেখালেও শেখে না।

রন্ধন-কর্মটি আসলে একটি শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিত্ব আর ল্যাজ টেনে বার করা যায় না। যার হবার, তার হয়। রন্ধন-পটুত্বও তাই। চন্দনং ন বনে বনে। রামকানাইবাবু একটি প্রতিভাবান রাঁধুনী খুঁজছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না।

রামকানাইবাবুর আর-একটি নেশার কথা এখনো বলা হয়নি, সেটি হচ্ছে তবলা। যদিও ওস্তাদ তবলচি নন, তবু মোটের ওপর তিনি ভালই বাজাতে পারেন। তাঁর একজোড়া ডুগি-তবলা আছে; কলকাতা থেকে বটতলার ছাপা তবলা শিক্ষার বইও আনিয়েছেন। রোজ সন্ধ্যের পর বাঁয়া-তবলা নিয়ে বসেন। তার শ্রোতা নেই, একলা বসে বসে বাজিয়ে যান আর অস্ফুটকণ্ঠে তবলার বোল আবৃত্তি করেন—

ধিনাগ্ ধা ধিনাগ্ ধা ধিনাগ্ ধিনাগ ধা ধা ধা—

এইভাবে পুনার নতুন বাড়িতে তাঁর দিন কাটছে। দু'জন মালী রেখেছেন, তাদের নিয়ে সকাল বিকেল বাগানের পরিচর্যা করেন। তাঁর বাড়ির দুই মাইলের মধ্যে কোনো বাঙালীর বাস নেই, তাই তাঁর বাড়িতে বন্ধু-সমাগম বড় একটা হয় না। সন্ধ্যের পর তিনি বাঁয়া-তবলা নিয়ে বসেন। কিন্তু তাঁর চিত্তে সুখ নেই; আহারের কথা মনে হলেই তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। ভাপা ইলিশ মাছ, ইঁচড়ের ডালনা, পুঁই-শাক আর কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি—স্মরণ হলেই তাঁর চক্ষু এবং রসনা যুগপৎ জল-পূর্ণ হয়ে ওঠে।

একদিন বিকেলবেলা বাগানের কাজকর্ম সেরে রামকানাইবাবু বাড়ির সামনের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন। আজ তাঁর মন বড় খারাপ; যে রাঁধুনি-চাকরটি সন্তোষজনক কাজ করছিল, সে আজ সকালে মাইনে পেয়ে দুপুরবেলা উধাও হয়েছে। আজকাল চাকর-বামুনদের পাখনা গজিয়েছে, সর্বদাই উড়ু-উড়ু করছে; বেশীদিন তাদের এক জায়গায় ধরে রাখা যায় না। আজ রাত্রিটা, রামকানাইবাবুকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে। কিম্বা—হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলে কেমন হয়? বাড়ির কাছাকাছি হোটেল নেই। লস্করে—অর্থাৎ ক্যাণ্টনমেণ্টে—গেলে ভাল আমিষ হোটেল পাওয়া যায়। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নিলে মন্দ হয় না—

ফটক দিয়ে একজন নিম্নশ্রেণীর বুড়ো গোছের লোক ঢুকল, তার সঙ্গে একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে। এ দেশে নিম্ন-শ্রেণীর লোক সাধারণত 'মারাঠা' নামে পরিচিত; এরা মহারাষ্ট্র দেশের 'মাটির সন্তান।' এরা চাষবাস করে, কুলি-কাবাড়ির কাজ করে সৈন্যদলে যোগ দেয়—এরাই দেশের মেরুদণ্ড। বৃদ্ধ লোকটি

রামকানাইবাবুর কাছে এসে প্রশ্ন করল—'ঘাটি মনুষ্য পাইজে?' অর্থাৎ চাকর চাই?

রামকানাইবাবু মারাঠা ভাষা বোঝেন ও বলতে পারেন। তিনি বৃদ্ধের পাকানো চেহারার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন,—'রাঁধতে পারিস?'

বৃদ্ধ বলল,—'আমার নাতনী গোদাবরী-বাঈ রাঁধতে জানে।' এই বলে পাশের মেয়েটার পানে চোখ নামালো।

মেয়েটাকে রামকানাইবাবু এতক্ষণ ভাল করে চেয়ে দেখেননি। নিতান্তই ছেলে-মানুষ মেয়েটা; কৈশোরে পদার্পণ করেছে কিনা সন্দেহ। কাছা দিয়ে কাপড় পরা অপরিণত শ্যামল দেহটিতে কিন্তু বেশ শ্রী আছে, 'যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা' জাতীয় অস্থির লাবণ্য নয়, সহজাত বলিষ্ঠ শ্রী। চোখে-মুখে উৎসুক বুদ্ধির ছাপ রয়েছে, মনে হয়, সে স্বভাবতই নিপুণ ও কর্মতৎপর।

রামকানাইবাবু তাকে জিগ্যেস করলেন,—'তুই কি কি রাঁধতে পারিস?'

গোদাবরীর চোখ দুটি চকচক করে উঠল, সে বলল,—'যা বলবে, সব রাঁধতে পারি।'

রামকানাই বললেন—মারাঠী রান্না ছাড়া আর-কিছু রাঁধতে জানিস?'

গোদাবরী বলল—'না। কিন্তু শিখিয়ে দিলে পারি।'

মেয়েটার আত্মপ্রত্যয় রামকানাইবাবুর ভাল লাগল। তিনি গোদাবরীর ঠাকুর্দা মারুতিকে বললেন—'বয়স কম, পারবে কিনা, জানি না; তবু চেষ্টা করে দেখব।' তারপর গোদাবরীর চাকরির শর্ত ঠিক হল: বারো টাকা মাইনে, দু'বেলা খেতে পাবে; হোলি আর দেয়ালির সময় কাপড় পাবে; রোজ সূর্যোদয়ের আগে আসবে, সারাদিন কাজ-কর্ম করবে, তারপর রাত্তিরের রান্নাবান্না সারা হলে নিজের খাবার নিয়ে ঘরে চলে যাবে।

শর্ত পাকা হলে রামকানাই গোদাবরীকে বললেন—'তবে আজ থেকেই কাজ শুরু করে দে। আজ বেশি কিছু রাঁধতে হবে না: জোয়ারের ভাকড়ি, আমটি, কথ্‌বেলের চাটনি আর মাটন। বেশি ঝাল দিবি না। কাল থেকে বাঙলা-রান্না শেখাব। —আয়, তোকে রান্নাঘর দেখিয়ে দিই।'

মারুতি সামনের বারান্দায় উপু হয়ে বসে রইল, রামকানাই গোদাবরীকে রান্না-ঘরে নিয়ে গেলেন। রান্নাঘরটি আকারে বেশ বড়, একাধারে রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘর; তার পাশে টেবিল-পাতা খাবার ঘর। গোদাবরী সব দেখে শুনে নিয়ে চটপট কাজ আরম্ভ করে দিল।

রামকানাই বসবার ঘরে গিয়ে মেঝেয় মাদুর পাতলেন, তার ওপর ডুগি-তবলা রাখলেন, একটা কাচের গেলাসে ফিকে হুইস্কি তৈরি করে ডুগি-তবলার সামনে বসলেন; একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে যন্ত্র বাঁধতে বাঁধতে ভাবলেন 'মেয়েটা চটপটে আছে, কিন্তু বয়স বড় কম। বাড়ির সব কাজ হয়তো পারবে না। যদি রান্নাটা শেখাতে পারি, তা হলে না-হয় অন্য কাজের জন্যে একটা চাকর রাখলেই চলবে।

গেলাসে একটি ছোট্ট চুমুক দিয়ে তিনি চক্ষু অর্ধমুদিত করে বাজাতে আরম্ভ করলেন,—

ধিনা ধিন্ তাক্ ধিনা ধিন্—

ঘণ্টাখানেক কেটেছে কি না কেটেছে, রামকানাইবাবু সবেমাত্র হুইস্কির গেলাসে শেষ চুমুক দিয়েছেন, গোদাবরী দোরের কাছে এসে দাঁড়ালো, বলল—'রাও, তোমার খাবার তৈরি।'

রামকানাইবাবু অবাক হয়ে চোখ তুললেন—'বলিস কিরে! এরি মধ্যে!

গোদাবরী বলল—'হো।'

রামকানাই গিয়ে টেবিলে খেতে বসলেন। গোদাবরী পরিবেশন করল। রামকানাই প্রত্যেকটি রান্না চেখে চেখে খেলেন। তাঁর মন খুশী হয়ে উঠল—বাঃ, মেয়েটার রান্নার হাত আছে, ওকে শেখালে শিখবে। তিনি আহার শেষ করে অনেকদিন পরে একটি পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন, বললেন—'বেশ রেঁধেছিস। তুই এবার তোর খাবার নিয়ে ঘরে যা, তোর ঠাকুর্দা বসে আছে।'

গোদাবরীর মুখে এক ঝলক সার্থকতার হাসি খেলে গেল। সে নিজের খাবার পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ঠাকুর্দার হাত ধরে চলে গেল। রামকানাই তাকে বলে দিলেন 'ভোর বেলা আসবি। -আমি সাড়ে ছটার সময় চা খাই।'

পরদিন সূর্যোদয়ের আগে রামকানাই বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, গোদাবরী এল। আজ আর তার সংগে মারুতি নেই, একাই এসেছে। সন্ধ্যেবেলা মারুতি আসবে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের ঘর বেশী দূরে নয়, আধ মাইল আন্দাজ হবে কিন্তু গোদাবরী অন্ধকারে একলা পথ চলতে ভয় পায়।

দশ মিনিটের মধ্যে গোদাবরী স্টোভে চা তৈরি করে রামকানাইবাবুকে ডাকল। চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি একটু হাসলেন; মারাঠী চা হয়েছে, কড়া পাঁচনে প্রচুর দুধ আর চিনি। তিনি বললেন 'চা ভাল হয়নি। বেজায় কড়া হয়েছে।'

গোদাবরী লজ্জা পেয়ে বলল—'তুমি কেমন চা খাও আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি করে দেব।'

'বিকেলবেলা চা তৈরি করার সময় শিখিয়ে দেব।'

চা খেয়ে রামকানাই বাজার করতে বেরুলেন। অন্যান্য শাকসব্জির সংগে তিনি একটি মোচা পেলেন। মোচা এ দেশে সুলভ সামগ্রী নয়, এদেশের লোক কি করে মোচা রাঁধতে হয় জানে না; তিনি স্থির করলেন মোচার ঘণ্ট দিয়েই গোদাবরীর রান্নার হাতে-খড়ি দেবেন। রোজ একটি করে বাংলা রান্না শেখাবেন।

সাতদিন কাটবার পর রামকানাই নিঃসংশয়ে বুঝলেন গোদাবরী একটি নারীরত্ন। রান্নার কথা তাকে একবারের বেশী দুবার বলতে হয় না, নুন ঝাল টক মিষ্টি যা যা দিতে হয় এবং যতখানি দিতে হয় একবারেই শিখে নেয়। তাছাড়া সারাদিন বাড়িময় যেন চরকি-পাক ঘুরে বেড়ায়। এটা ধুচ্ছে ওটা মুছছে, আসবাব ঝাড়ছে, মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছে; শরীরে ক্লান্তি নেই, মুখে হাসিটি লেগে আছে। এক হপ্তা পরে রামকানাইবাবুকে আর কিছু বলতে হয় না, ঘড়ির কাঁটার মতন বাড়ির কাজ চলতে থাকে।

একমাস পরে রামকানাইবাবু গোদাবরীর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, বারো টাকা থেকে পনরো টাকা। তিনি অবশ্য ব্যবসাদার লোক, মনে মনে যতটা খুশী হয়েছেন মুখে ততটা প্রকাশ করেন না। কিন্তু তাঁর অন্তরের সমস্ত বাৎসল্য স্নেহ গিয়ে পড়েছে এই ছোট্ট মেয়েটার ওপর। শুধু তাই নয়, গোদাবরীর অশেষ বুদ্ধি ও গুণপনার জন্যে তাকে মনে মনে সমীহ করেন। হোক বারো বছরের মেয়ে, এমন মেয়ে কোটিকে গুটিক মিলে।

এইভাবে, রামকানাইবাবুর জীবনে তৃপ্তি ও সন্তোষের ফল্গুধারা বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু একটি উদ্বেগ মাঝে মাঝে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি মারে, গোদাবরী যদি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়! এই রকম উদ্বেগের একটু কারণও ঘটেছিল। একদিন

সন্ধ্যেবেলা পরিচিত একটি বাঙালী ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। রামকানাইবাবু সমাদর করে তাঁকে হিঙের কচুরি আর রসবড়া খাওয়ালেন। সেই ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন 'এত চমৎকার বাংলা খাবার কোথায় পেলেন?' রামকানাইবাবু তখন সগর্বে গোদাবরীকে ডেকে দেখালেন, বললেন,—'এই মেয়েটা তৈরি করেছে।' ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে গোদাবরী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন, তিনিও সরলভাবে উত্তর দিলেন।

দু'তিনদিন পরে আর একটি পরিচিত ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। তিনি গোদাবরীর তৈরি নিমকি ও দরবেশ খেয়ে চমৎকৃত। গোদাবরী সম্বন্ধে তত্ত্বতল্লাস সুলুক সন্ধান নিলেন; সে কত মাইনে পায়, কোথায় থাকে, এই সব।

দিনে দিনে রামকানাইবাবুর অতিথির সংখ্যা বাড়তে লাগল। সকলেই গোদাবরীকে দেখতে চায়, তার তৈরি খাবার খেতে চায়, তার কথা জানতে চায়।—

রামকানাই বেশ আনন্দে আছেন; কারণ তিনি যেমন খেতে ভালবাসেন তেমনি খাওয়াতে ভালবাসেন। বুড়ো মারুতি রোজ সন্ধ্যের পর আসে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে উপু হয়ে বসে থাকে; গোদাবরীর কাজ সারা হলে তাকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। একদিন মারুতি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল 'রাও, একজন বাঙালীবাবু কুড়ি টাকা পগার দিয়ে গোদাকে রাখতে চায়।' এই বলে মারুতি মিটিমিটি চক্ষে রামকানাইবাবুর মুখ দেখতে লাগল।

রামকানাইবাবু চমকে গেলেন, হঠাৎ কথা খুঁজে পেলেন না। কি ভয়ানক ব্যাপার! ভিতরে ভিতরে গোদাবরীকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে! তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে নীরস কণ্ঠে বললেন 'গোদাবরী যদি যেতে চায় যাবে।' তিনি বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে তবলা বাজাতে বসলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন কোনো বাঙালী বন্ধুর আবির্ভাব হয়নি।

যথাসময় তিনি খেতে বসলেন, গোদাবরী পরিবেশন করল। তিনি মুখ গম্ভীর করে খাচ্ছেন, অন্যদিনের মতন রান্নার দোষগুণ আলোচনা করছেন না। গোদাবরী কয়েকবার তাঁর মুখের পানে তাকালো; তারপর তাঁর খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন সে সহজ গলায় বলল 'বুঢ়া বড় লোভী, বাবুরা বেশী পয়সা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে চায় তাই বুঢ়ার লোভ হয়েছে। আমি কিন্তু যাব না, যে যত টাকাই দিক আমি যাব নাই।'

রামকানাইবাবুর মুখে সহর্ষ হাসি ফুটে উঠল, তিনি গদগদ স্বরে বললেন—'যাবি না!' গোদাবরী বলল, 'না আমি আট বছর বয়স থেকে কাজ করছি, অনেক বাড়িতে কাজ করেছি। তোমার বাড়িতে কাজ করতে আমার ভাল লাগে।'

যেসব বন্ধুরা গোদাবরীকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা যখন তাকে ভাঙাতে পারলেন না তখন রামকানাই-বাবুর ওপর ভীষণ চটে গেলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগলেন, মেয়েটা দেখতে ছোটখাটো হলে কি হবে, মারাঠী মেয়ে তো, মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে।' নিশ্চয় রামকানাইবাবুর সঙ্গে ইত্যাদি।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের সন্দেহ আরো বেড়ে গিয়েছিল। মারুতি বুড়ো রোজ সন্ধ্যের পর গোদাবরীকে নিতে আসত, একদিন সে এল না। রামকানাইবাবু রাত্রির আহার সমাধা করে বাগানে বেড়াচ্ছিলেন, মারুতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেননি; তিনি দেখলেন গোদাবরী বারবার ঘর-বার করছে, কখনো ফটক পর্যন্ত গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখছে। তিনি জিগ্যেস করলেন 'কি রে, তুই এখনো ঘুরঘুর করছিস যে! ঘরে যাবি না?'

গোদাবরী উদ্বিগ্নস্বরে বলল—'বুঢ়া এখনো আসেনি রাও। সকালবেলা বলেছিল শরীর ভাল নয়, হয়তো বিছানা নিয়েছে।'

'তা কী হয়েছে, তুই একাই চলে যা না, তোর ঘর তো বেশী দূরে নয়।'

'না রাও, রাত্তিরে একলা পথ হাঁটতে আমার ভারি ভয় করে। আর একটু দেখি,

ঘুরো যদি না আসে তখন রান্নাঘরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেব।'

আরো আধঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু মারুতি এল না। গোদাবরী তখন রান্নাঘরের মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল।

তার পর থেকে রামকানাইবাবুর বাড়িতে গোদাবরীর রাত্রিবাস একরকম কায়েমী হয়ে গেল। বুড়ো রোজ আসে না, যেদিন আসে গোদাবরীকে নিয়ে যায়। বাকি রাত্রিগুলি গোদাবরী রামকানাইবাবুর বাড়িতেই ঘুমোয়।

গুজবের যিনি অধিষ্ঠাত্রী উপদেবতা তিনি চুপ করে থাকেন না। পুণায় বাঙালীদের ঘরে ঘরে উত্তেজিত জল্পনা শুরু হয়ে যায়; রামকানাইবাবু যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন এ বিষয়ে কারুর মনে সন্দেহ থাকে না। আশ্চর্য এই যে রামকানাইবাবু এই সব আলাপ-আলোচনার জল্পনা-কল্পনার কিছুই খবর রাখেন না। এমন কি সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে বাঙালী বন্ধুবান্ধবের পদার্পণ যে থেমে গেছে তা তিনি লক্ষ্য করেননি; তিনি তাঁর বাগান তবলা এবং রান্নাবান্নার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন।

এইভাবে প্রায় চার বছর কেটে গেল।

এখন, মানুষের জীবনের চার বছর খুব কম সময় নয়; যার প'য়তাল্লিশ বছর বয়স ছিল সে উনপঞ্চাশে পৌঁচেছে, বারো বছর বয়সের খুকী ষোল বছরে পদার্পণ করেছে; কারুর গোঁফ গজিয়েছে, কারুর গোঁফে পাক ধরেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে রামকানাইবাবু এই কাল-সঞ্চার কিছুই জানতে পারেননি। তাঁর শরীরে গুরুতর রোগ আর কিছু নেই, বম্বে স্টমাক বোম্বাই বর্ষার মত সহ্যাদ্রির ওপারে আটকে গিয়েছে; নানা রঙের দিন-গুলি তাঁর হৃদয়ের বাগানে বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতির মত মধুপান করে বেড়াচ্ছে। মনে হয় তাঁর জীবনের এই অকাল বসন্ত কোনো দিন শেষ হবে না।

গোদাবরী ষোল বছরে পা দিয়েছে। মেয়েদের পক্ষে ষোল বছরে পা দেওয়া সামান্য কথা নয়। কিন্তু গোদাবরী যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই ষোড়শী হয়ে উঠেছে। তার শরীর একটু লম্বা হয়েছে, একটু পরিণত হয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে একটু গভীরতা এসেছে। সে নিম্ন শ্রেণীর মেয়ে, কিন্তু তার মন প্রসারশীল; অবস্থান্তরের সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া সে যেমনটি ছিল এখনো ঠিক তেমনিটি আছে।—

হঠাৎ একদিন শান্ত রসাস্পদ তপোবনে বিঘ্নরাজের আবির্ভাব হল; নানা রঙের দিনগুলি চৈতালী ঘূর্ণির মুখে উড়ে যাবার উপক্রম করল।

একদিন দুপুরবেলা খেতে বসে রাম-কানাই লক্ষ করলেন গোদাবরীর মুখ ফোলা-ফুলো, চোখ ছলছল করছে। তার প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল; কিন্তু আজ তার

মুখে কথা নেই, হাসি নেই। রামকানাই জিগেস করলেন 'কিরে গোদা, তোর সর্দি হয়েছে নাকি?'

গোদা উত্তর দিল না, নিঃশব্দে পরিবেশন করে চলল। রামকানাই ভাবলেন, সর্দি হয়েছে, সেরে যাবে। তিনি আর কিছু বললেন না। গোদার যে সর্দি হয়নি, সে লুকিয়ে কে'দেছে, এ কথা তিনি তখন জানতে পারলেন না।

সেদিন সন্ধ্যের সময় মারুতি এসে উবি হয়ে বসল, কয়েকবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল 'গোদা আর কাজ করতে পারবে না, ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে।'

রামকানাই বজ্রাহতের মত ক্ষণকাল বসে রইলেন, তারপর চিড়িক মেরে বলে উঠলেন, —'কি বললি! কার বিয়ে? কি রকম বিয়ে?'

মারুতি তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করল যে পুণা থেকে বিশ কোশ দূরে একটি গ্রামে গোদাবরীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে, সামনের হপ্তায় বর বিয়ে করতে আসবে।

রামকানাই ভীষণ অস্থির হয়ে বললেন 'না না না, এ আবার কী হাঙ্গামা! এইটুকু মেয়ের বিয়ে! হতেই পারে না। যা তুই—পাজী—ভাগ!'

মারুতি ভাগলো না, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'রাও, গোদার ষোল বছর বয়স হয়েছে, এখন ওর বিয়ে না দিলে জাত থেকে কেটে দেবে। তা ছাড়া বরের বাপের কাছ থেকে আমি গোদার দাম নিয়েছি তিনশো টাকা। সে ছাড়বে কেন? আমার নামে মামলা করে দেবে।'

রামকানাই গুম হয়ে বসে রইলেন। মারুতি উঠে দাঁড়াল, বলল—'আজ আমি তোমাকে খবর দিতে এসেছিলাম, কাল বিকেলবেলা এসে গোদাকে নিয়ে যাব।'

মারুতি চলে গেল।

সে রাত্রে আর তবলা বাজানো হল না, রামকানাই উষ্ণ মস্তিষ্কে বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন।

রাত্রি ন'টা বেজে যাবার পরও যখন তিনি খেতে এলেন না তখন গোদাবরী বাইরে এসে তাঁকে ডাকল—'রাও, খেতে এস, খাবার দিয়েছি।'

রামকানাই হঠাৎ তেরিয়া হয়ে বললেন—'খাব না আমি, ক্ষিদে নেই।' বলে নিজের বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন।

গোদাবরী তার পায়ের কাছে এসে বসল, পায়ের ওপর হাত রেখে বলল—'খাবে চল, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

রামকানাই ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, আঙুল তুলে বললেন—'দ্যাখ গোদা, তুই যদি আমায় ছেড়ে চলে যাস তাহলে আমিও পুণা ছেড়ে চলে যাব।'

গোদাবরী ঝরঝর করে কে'দে ফেলল, বুজে-যাওয়া গলায় বলল—'আমি কি করব। আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না, বিয়ে করতে চাই না। কিন্তু জাতের লোকেরা নানা কথা বলছে—'

কথাটা রামকানাইএর কানে খোঁচা দিল, তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'কি বললি! নানা কথা বলছে! কী কথা বলছে?'

গোদাবরী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'সে তোমার শুনে কি হবে।' তার মুখের লজ্জা দেখে বোঝা যায় সে আর নেহাত ছেলে-মানুষ নয়, জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে।

রামকানাই সিংহবিক্রমে লাফিয়ে খাট থেকে নামলেন, হুংকার ছেড়ে বললেন—'কী! ছোট মুখে বড় কথা! আমার নামে—আমাদের নামে কলঙ্ক! কে বলেছে এ কথা? কচাং করে তার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

তিনি কিছুক্ষণ দাপাদাপি করলেন, শেষে ক্লান্ত হয়ে বললেন—'কিন্তু এখন উপায় কি গোদা?'

গোদাবরী বলল—'উপায় কিছু নেই, বিয়ে আমাকে করতেই হবে—'

রামকানাই আবার গরম হয়ে উঠলেন—'বিয়ে করতেই হবে! এ কি মগের মুল্লুক নাকি! তুই সাবালক হয়েছিস—'

এই পর্যন্ত বলে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। তাঁর মাথায় অ্যাটম বোমার মতন একটি প্রচণ্ড আইডিয়া বিস্ফুরিত হল। তিনি কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চেয়ে থেকে বললেন—'গোদা!' তাঁর গলার সব জোর যেন ফুরিয়ে গেছে।

শঙ্কাকম্পিত স্বরে গোদাবরী বলল—'কি?'

রামকানাই খুব খানিকটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন—'আমাকে বিয়ে করবি? আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো অনেক দিন বাঁচব। আমার টাকাও আছে অনেক। সব তুই পাবি। করবি আমাকে বিয়ে?'

গোদা খাটের পাশে যেমন বসেছিল তেমনই বসে রইল, তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। রামকানাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন—'আঁ—তাহলে—তুই তাহলে রাজী নয়!'

গোদা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো, ধরা—ধরা গলায় বলল—'আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি এ বাড়ি থেকে নড়ব না। এস।' সে রাম-কানাইকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলল।

রামকানাই মহানন্দে তার পিছু নিলেন, বলতে বলতে চললেন—'এ বাড়ি থেকে তোকে তাড়ায় কার সাধ্যি। বাস, তুই যখন রাজী তখন আর ভয় কাকে! কালই আমি সব ঠিক করে ফেলছি। আর দেরি নয়, বিলম্বে কার্যহানি।—খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে রে গোদা। এবেলা কি কি রে'ধেছিস বল দেখি?'

রামকানাই করিৎকর্মা লোক। পরদিন সকালে উঠেই তিনি উকিলের বাড়ি গেলেন। বিকেলবেলা মারুতি গোদাবরীকে নিতে এসে দেখল, পুরোহিত উকীল সাক্ষী সকলের সামনে রামকানাই ও গোদাবরীর বিয়ে হচ্ছে। মহারাষ্ট্র দেশে দিনের বেলা বিয়ে হয়।

বিবাহ ক্রিয়া শেষ হলে রামকানাই মারুতির হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বললেন—'এই নে গোদাবরীর কন্যা-পণ।' মারাঠী উকিল মহাশয় রসিদের ওপর মারুতির টিপ-সই নিলেন। মারুতি এক হাজার টাকা পেয়ে এমন বোকা বনে গেল যে, আপত্তির একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না—

রামকানাইবাবু সুখে আছেন, গোদাবরী তাঁকে সুখে রেখেছে। কবি গেয়েছেন—রমণীর মন, সহস্র বর্ষের সাধনার ধন। আবার না চাইলেও তাকে পাওয়া যায়। রামকানাই-বাবুর জীবনে প্রার্থনীয় আর কিছু নেই। এইভাবে যদি বাকি দিনগুলি কেটে যায়—

ডুগি-তবলা বাজাতে বাজাতে মাঝে মাঝে তাঁর সেই জ্যোতিষীর কথা মনে পড়ে। স্ত্রীসুখ ভোজনসুখ, বিশ্রামসুখ। জ্যোতিষীর কথা মিথ্যে হয়নি।

কেবল পুনার বাঙালীরা রামকানাইকে এক ঘরে করেছে, ক্রিয়া-কর্মে ডাকে না। কিন্তু বাৎসরিক বারোয়ারী চাঁদা তোলার সময় তাঁর কথা তাদের মনে পড়ে যায়।

* আলোচনা *

গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন

সবিনয় নিবেদন,

গত ১০ই কার্তিকের দেশ-এ প্রকাশিত শ্রীশান্তিপ্রিয় বসুর গ্রামীণ মূল্যবোধ ও কৃষি উন্নয়ন নামক প্রবন্ধটির সমালোচনা প্রসঙ্গে গত ২৪শে কার্তিকের দেশ-এ শ্রীনিলয় মজুমদার যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন সেই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

হিন্দু সমাজের ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক মূল্যবোধ যে কর্মকেন্দ্রিক (concept of karma) ধর্মবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত সে সম্বন্ধে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। ইহজন্মের কর্মরূপ পরজন্মের জীবনরূপ নির্ধারিত করবে। পার্থিব ব্যবহারিক লাভ আত্মিক উন্নতির সোপান নয়। কেবল জন্ম নির্ধারিত কর্ম অনুযায়ী নিষ্কাম কর্তব্য সাধনই আধ্যাত্মিক এবং পারলৌকিক উন্নতি লাভের উপায়। ট্যালকট পারসনের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে হিন্দু সমাজে ব্যক্তি বিশেষের জীবনরূপ অর্জিত (Achieved) নয়, আরোপিত (Ascribed)। গত জন্মের কর্মরূপ দ্বারাই ইহজন্মের জীবনরূপ আরোপিত হবে। ইহজন্মের পার্থিব ব্যবহারিক লাভের দ্বারা বর্ণনির্দিষ্ট জীবনরূপ পরিবর্তিত হবার এবং উন্নত বর্ণশ্রেণী অর্জন করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ইহলৌকিক জীবনের ব্যবহারিক লাভের প্রতি এই নেতিবাচক মূল্যায়ন যে বৃহত্তর পার্থিব জীবনের কারিগরি উন্নতি লাভের প্রধান অন্তরায় হবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ কারিগরি এবং ব্যবহারিক মূল্যায়নকে অবশ্যই প্রভাবিত করবে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন নৃপতির পররাজ্য গ্রাসের অভিলাষ কিংবা ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কয়েকজন পশ্চিমী মূল্যায়ন লালিত জমিদারের অর্থলোলুপতা কখনই বৃহত্তর জনমানসের চিন্তারূপ প্রতিফলিত করে না। "পার্থিব উন্নতি বিরোধী উক্তি হিন্দু সমাজ কোনদিনই পুরোপুরি গ্রহণ করে নাই", এ মন্তব্য কখনই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং চার্বাকের ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ রূপ জীবন-বেদ কখনই ভারতীয় জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে নি।

শ্রীনিলয় মজুমদার যদি রেডফিল্ডের "সোশ্যাল অর্গানাইজেশন অফ ট্রাডিশন" নামক নিবন্ধটি পড়ে দেখতেন তবে কখনই এ প্রশ্ন তুলতেন না যে, "অশিক্ষিত কৃষকগণ যাহারা ধর্মগ্রন্থ পাঠে অক্ষম তাহারা কিভাবে সেই মনোভাব (কর্মকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস)

দ্বারা পরিচালিত হইবেন?" কারণ ধর্ম-বিশ্বাসের সূত্র ধর্মগ্রন্থ নয়। ধর্মগ্রন্থের সূত্রই হলো ধর্ম বিশ্বাস।

লিট্‌ল ট্র্যাডিশন অথবা গ্রামীণ জীবনের ধর্মবিশ্বাস, পূজা পার্বণ, দোল মহোৎসব ইত্যাদি গ্রেট ট্র্যাডিশনের কেন্দ্রভূমিতে গিয়ে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত হয়ে ধর্ম-গ্রন্থের রূপে পরিগ্রহ করে। তারপর এই ধর্মগ্রন্থ যখন যাত্রাগান, পালাগান, গীতাপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হয়, গ্রামীণ জনমানব তখন আপন আপন ধর্মবিশ্বাস, পূজাপার্বণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ কিংবা গ্রেট ট্র্যাডিশনের রূপানুযায়ী পরিমার্জিত করে। এই রূপায়ণকে ম্যারিয়ট বলেছেন প্যারোকিয়ালাইজেশন। গ্রামীণ গোলাপূজা, ঘেঁটুপূজা কিংবা রান্নাপূজা তখন লক্ষ্মীপূজা কিংবা মনসাপূজায় রূপায়িত হয়। সুতরাং আক্ষরিক অজ্ঞতা ধর্মগ্রন্থ পাঠে অক্ষম কৃষকের ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টির পথে অন্তরায় নয়। এই ধর্মীয় ঐতিহ্য কিংবা ট্র্যাডিশন বংশ পরম্পরায় জনমানসে প্রবাহিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

শ্রী মজুমদার ভারতীয় কৃষকের পরিবর্তন বিরোধিতা এবং কর্মবিমুখতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা কখনও তত্ত্বভিত্তিক কিংবা সমর্থনযোগ্য নয়। "কৃত্রিম ধর্ম বিশ্বাস" সৃষ্টির জন্য যে যুক্তি-বোধ, ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং চিন্তাধারার প্রয়োজন ভারতীয় কৃষকের কোনও দিন তা ছিল না। কারণ তার কর্মকেন্দ্রিক ঐতিহ্য এবং ধর্মবিশ্বাস কোনও দিন তার এরূপ মানসিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করেনি। এবং শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় কৃষকের আশা-হীনতা কিংবা ব্যর্থতার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। "গোলাভরা ধান" এবং "গোয়াল-ভরা গরু" ইত্যাদি প্রবচনই তার তদানীন্তন সম্পদ প্রতুলতার এবং সাফল্যের সাক্ষ্য। অবশ্য এই সাফল্য এবং প্রতুলতার কারণ তার তদানীন্তন ব্যবহারিক উন্নতি নয়। বরং বর্তমানের তুলনায় তদানীন্তন সমাজের মূল্যবোধ, প্রয়োজনবোধ, অভাববোধের ভিন্নতা এবং জনসংখ্যার লঘুতাই এর মূল কারণ।

এখন প্রশ্ন হলো, তবে কি ভারতে কৃষি উন্নয়নের কোনও সম্ভাবনাই নেই? কৃষকের এই পরিবর্তন বিরোধিতার পরিবর্তন কি কোনক্রমেই সম্ভব নয়?

এই প্রশ্নের উত্তর সমাজবিজ্ঞানেই পাওয়া যাবে।

লোকাচার কিংবা দেশাচারের পরিবর্তন কখনও দ্রুত হয় না। শ্রীবিনয় ঘোষের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, "প্রথমে প্রচলিত সমাজ বিন্যাসে (Social Structure) ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ভাঙ্গন ধরে ও পরিবর্তনের সূচনা হয়। নতুন ব্যক্তির, নতুন গোষ্ঠীর, নতুন শ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে সমাজে। নতুন নতুন অভাব, চাহিদা, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আদর্শের উৎপত্তি হয় এবং পুরাতনের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। সমাজ ধীরে ধীরে সুস্থির ও আত্মস্থ হয়" ('বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ')। ভারতীয় কৃষকের মূল্যবোধ এবং অভাববোধের এবং ব্যবহারিক লাভের স্পৃহা বোধের পরি-বর্তনও এইভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকবে। সমাজবিজ্ঞানী রেডফিল্ডের Folk-Urban Continuum থিওরির আলোকে বলা যায় যে, প্রথমে ব্যবহারিক এবং নাগরিক মূল্যবোধসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় কৃষকগণ নতুন নতুন কারিগরী পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তারা উৎপাদন এবং জীবনমান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, যাদের মূল্যবোধ অপেক্ষাকৃত গ্রামীণ কিন্তু অন্যান্য অনগ্রসর কৃষকগণের চাইতে অধিকতর নাগরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন (Urban Valve) তারাও এগিয়ে আসবে। এবং অবশেষে অত্যন্ত মুষ্টিমেয় রক্ষণশীল এবং পরিবর্তন বিরোধী কয়েকজন কৃষক ছাড়া বাকী সবাই নতুন পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করবে। এই প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যারা, তারা শিক্ষিত, উচ্চ শ্রেণীর এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তাদের জমি বেশী এবং তাদের মূল্যবোধ নাগরিক মনোবৃত্তির অনুরূপ, টোয়েনীস-এর ভাষায় এদের মূল্য-বোধ Gesselschaft-like এবং সর্বশেষে যারা গ্রহণ করবে তারা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণের, ধার্মিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং ঐতিহ্যে আস্থাশীল। অর্থাৎ তাদের মানসিকতা গ্রামীণ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন (Folk Valve) অর্থাৎ Gemeinschaft-like। কিন্তু প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এবং প্রভাবে তাদের চিন্তা-ধারার পরিবর্তন সূচীত হবে। অধিক শিক্ষা বিস্তার, শহরের সঙ্গে সংযোগসাধন এবং সম্প্রসারণ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমেও তাদের মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন সাধন করা যাবে। নমস্কারান্তে। শতদল দাশগুপ্ত, কৃষি কলেজ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

নন্দকুমারের চিঠি

সম্পাদক 'দেশ'

এবারের (১-১২-৬২) দেশে একটি ভ্রম বা ত্রুটি দেখিলাম তাহা আপনার অবগতির জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

'নন্দকুমারের চিঠি' প্রবন্ধের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের ২৩ লাইনে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন এলাকায় পুরাতন টান্নার দুর্গের সংস্কার করেন'—টান্নার বদলে টানার দুর্গ হইবে—FORT TANA.
—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্বপত্র

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পূর্বপত্রের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আমাকে সব চেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিয়েছেন শৈলবালা। অস্থির করে তুলেছেন। ছুটিয়েছেন এখানে সেখানে—ছত্রিশ জায়গায়। আমি প্রথমে তাঁর শ্বশুরবাড়ি মেমারিতে চিঠি লিখলাম। উত্তর নেই। পরে খবর পেলাম শৈলবালা এখন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকেন না, তিনি থাকেন তাঁর দাদা মেজর এ কে নন্দীর বাড়িতে বর্ধমানে। সেই ঠিকানায় লিখলাম। এবারেও শৈলবালা নীরব।

এমন সময় শুনলাম, কোন আশা নেই শৈলবালার দেখা পাবার। তিনি কোথাও যান না, কারুর সামনে আসেন না, তাঁর

পরবর্তী সাক্ষাৎকার ৫ জানুয়ারী: শ্রীযুক্তা আশালতা সিংহ

অতীত সাহিত্য কীর্তি সম্পর্কে কোন আলোচনা শোনা যাবে না তাঁর মুখ থেকে। বৈষয়িক এবং মানসিক বিপর্যয়ে শৈলবালা এমনই বিচলিত যে, ইচ্ছে করেই তিনি এক লৌহ যবনিকা রচনা করেছেন। তাঁর দর্শন পাওয়া অসম্ভব।

অসম্ভবকে সম্ভব করবার একটা নিদারুণ জেদ যেন আমাকে পেয়ে বসল। লৌকিকতা তুচ্ছ করে একদিন বর্ধমানের ট্রেন ধরলাম। এই সেদিন—কালীপুজোর দিন। ঘোর অমাবস্যা। জেদের বশে তিথি-নক্ষত্রের কথাটা খেয়ালে আসে নি। ফলও ফলল। অর্থাৎ আমার যাওয়াই সার। কাজ হল না। খুঁজে খুঁজে বর্ধমানের পুরাতন চকে গিয়ে শুনলাম বহুদিন আগে মেজর এ কে নন্দী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর পুত্রবধূ জানালেন, "শৈলবালা এখানে ছিলেন বটে অনেকদিন কিন্তু এখন তিনি আর এখানে থাকেন না—"

"কোথায় থাকেন?"

"তাঁর শ্বশুরবাড়ি মেমারিতে।"

"সেখানে গেলে দেখা পাব?"

"হ্যাঁ, পাবেন। তবে শুনেছিলাম তিনি আশ্রমে চলে যাবেন—এর মধ্যে চলে গেছেন কি-না তা তো জানি না—"

বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করি, "কোন আশ্রম জানেন?"

[illegible]

সাইকেল রিকশায় ফিরে এলাম বর্ধমান স্টেশনে। আজই এখান থেকে সোজা মেমারি চলে যাব। কিন্তু কোন ট্রেন নেই এখন। মেমারির ট্রেন আসতে এক ঘণ্টা দেরি। আর হঠাৎ বৃষ্টি এল ঝমঝম করে। বৃষ্টিতে ভিজে অবেলায় বিনা খবরে কেমন করে যাই মেমারিতে! শৈলবালার লৌহ যবনিকা আরও কঠিন মনে হল। আমি

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া
ফটো: শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

যেতে পারলাম না। এবং কলকাতায় ফিরে বে-পরোয়া হয়ে তাঁকে আবার এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। লৌহ যবনিকা ভেদ করবার এই আমার শেষ চেষ্টা বলে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছিলাম, ব্যাপকভাবে বিচার করতে গেলে আমার সঙ্গে তাঁরও একটা আত্মীয়তা আছে এবং সেই দাবী নিয়েই আমি তাঁর দর্শন-প্রার্থী। এমন অনেক কথা লিখে অবশেষে ভয় দেখিয়েছিলাম, যদি সাত দিনের মধ্যে এই চিঠির উত্তর না পাই তাহলে এক রবিবার সকালের ট্রেনে আমি মেমারিতে চলে যাব। তাঁর দেখা আমাকে পেতেই হবে ইত্যাদি।

সাতদিন পরে নয়, হয় তো হুপ করে মেমারি গিয়ে উপস্থিত হতে পারি—এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে শৈলবালা এবার আমার চিঠি পেয়েই উত্তর দিলেন—

"অনুগ্রহ পত্র পেলাম। আপনার চিঠিতে সহজ আন্তরিকতার সুরে বড় ভাল লাগল। মেমারিতে আমি এমন আবেষ্টনের মধ্যে বাস করি, যেখানে কারুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। ক্ষমা করবেন। উপস্থিত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের আমন্ত্রণে রামচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে যাচ্ছি। আসানসোল-আদ্রা লাইনে মুরাডি স্টেশনে নেমে আধ মাইল দূরে আশ্রম। পূজ্যপাদ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী মহারাজ আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আজ নিজে এসেছিলেন। ৮ই নভেম্বর আমি যাচ্ছি। ১০ই ও ১১ই দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন। যদি সুবিধা হয়, ঐ সময় আশ্রমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। যত খুশি প্রশ্ন করবেন। অধিবেশনের বিবরণ সংগ্রহ করবেন। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যাবেন শুনেছি। ১০ই তারিখে হাওড়া থেকে তুফান এক্স-প্রেসে বেলা দশটায় তিনি যাবেন এইরূপ শুনেছি। আপনার যা সুবিধা হয় করবেন। প্রীতি নমস্কারান্তে। ইতি

বিনীতা
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।"

চিঠি পড়তে-পড়তে হতাশ হচ্ছিলাম। আসানসোল ছাড়িয়ে আরও দূরে একা-একা আশ্রমে যাওয়ার কথায় মনের যেন সায় ছিল না। কিন্তু চিঠির শেষের দিকে শ্রদ্ধাস্পদ শৈলজানন্দর নাম দেখে উৎফুল্ল হলাম। আর ভাবনা নেই। সঙ্গী পাওয়া গেছে। আমি শৈলজানন্দের আশ্রম যাত্রা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে শৈলবালার চিঠি হাতে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেলিফোন করলাম।

আমার নাম বলতেই শৈলজানন্দর দরদী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আরে, কী খবর? কেমন আছ? কতদিন যে—"

"শৈলজাদা, দেশ পত্রিকার পূর্বপত্রের ব্যাপারে এবার আপনার সাহায্যের দরকার?"

"আমার সাহায্যের দরকার?" চেহারা দেখা যাচ্ছিল না শৈলজানন্দর কিন্তু কল্পনা করে নিতে পারছিলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। স্বরে এখন আর দরদের লেশমাত্র নেই। স্বর কাঁপছে, "পূর্বপত্র? আমি? মানে, সে কী—"

বাধা দিয়ে বলি, "না না, আপনার ব্যাপার নয়। শৈলবালা ঘোষজায়ার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। বঙ্গ-সাহিত্য

সম্মেলনের আমন্ত্রণে আপনি কি রামচন্দ্র-পুরে যাচ্ছেন?"

শৈলজানন্দর গলার স্বর আবার সহজ, উত্তপ্ত হল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে, স্বামী অসীমানন্দ আমাদের খুব বন্ধু—"

কিন্তু স্বামী অসীমানন্দ সম্পর্কে তখন আমার কোন কৌতূহল থাকবার কথা নয়, আমি বললাম, "আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি? শৈলবালা আমাকে সে-আশ্রমে যেতে লিখেছেন—"

"তুমি যাবে সে তো সুখের কথা, আনন্দের কথা—নিশ্চয়ই যাবে।"

তারপর আশ্রম-পর্ব। মনে মনে অশ্রদ্ধা ছিল, ভীতি ছিল। কী দেখব? কী শুনব? নিষ্ঠা আচার প্রসাদ বিতরণ হরিগুণগান—ঘুমন্ত জীবনের অলস কল্পনা। পলায়নী মনোবৃত্তি লালন করে সারা জীবন শান্তির লালিত গীতি। তার ওপর কৃচ্ছ্রসাধন তো আছেই। আর একটি সাধারণ মানুষকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার ভেবে ঢিপ ঢিপ প্রণাম!

হায় পূর্বপক্ষের উদ্যম! কাকে যে কোথায় ঠেলে দেয়! আমার কপালে এ-ও ছিল—আশ্রম! অনেক ঘুরেছি। অনেক দেখেছি। নগর সমুদ্র অরণ্য পর্বত—প্রায় গোটা পৃথিবী। এই একটি কেন্দ্রই দেখা বাকি ছিল জীবনে, স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না। একা-একা চাপা স্বরে আপন মনে শুধু উচ্চারণ করলাম, "আশ্রম!"

আমার স্বগতোক্তি শুনতে পেয়ে স্বামী পরিহাস করলেন, "দেখো, আবার বরাবরের জন্যে আশ্রমে থেকে যেও না যেন।"

আমিও হালকা স্বরে উত্তর দিলাম, "তোমার লোহার খাঁচা আর স্বামীজীর কঠিন কবজ—তুলনা করে দেখব কার আকর্ষণ বেশি মধুর!"

তারপর সত্যিই একদিন আমি আসানসোল-আদ্রা লাইনের মুরাডি স্টেশনে নেমে প্রায় আধমাইল হেঁটে রামচন্দ্রপুরে এলাম এবং শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু তার আগে আর একটু আছে।

নভেম্বরের প্রথম দিক। প্রথম শীত। ছোট—খুব ছোট স্টেশন মুরাডি। ট্রেন বোধহয় মিনিট তিনেকের জন্যে দাঁড়ায়। অল্প অল্প ঠাণ্ডা লাগছে এখন। ট্রেন থেকে নেমে ছোট প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেলাম। ভিড়ে ভিড়! আমি জানতাম না এত লোক আমার সঙ্গে ছিল এই গাড়িতে—আমি জানতাম না এত সভ্য আছে বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের। কলকাতা জলপাইগুড়ি বর্ধমান রাঁচি পুরুলিয়া কুমারধুবি থেকে এসেছে লেখক সম্পাদক সাংবাদিক অধ্যাপক অধ্যাপিকা ফটোগ্রাফার এবং সাহিত্যে উৎসাহী অগণিত নরনারী। অনেকেই আমার চেনা। আর তখন আমার আশ্রম-ভীতি একেবারেই দূর হল।

হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হল, "স্বামীজি এসেছেন!" স্বামীজি! একটা উদ্ধত উচ্চারণ প্রচুর আয়াসে দমন করে নিলাম। মাত্র কয়েক হাত দূরে দেখলাম—কী দেখলাম? একটি মূর্তি, হ্যাঁ মানুষেরই মূর্তি। দীর্ঘ দেহ। প্রসন্ন মুখ। আয়ত নয়ন। দীর্ঘ কেশরাশি। গৈরিক বেশ। সরল—শিশুর মতো সরল। কে ইনি? স্বামীজি? স্বামী অসীমানন্দ?

প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষের ভিড়। আমি স্থির হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে আছি। কোন-দিকে যাব জানি না। প্রসন্নমুখে স্বামীজি এগিয়ে আসছেন বলিষ্ঠ বাহু। দ্রুত পদক্ষেপ। ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ওঁকে দেখলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়। কে ইনি? আমাকে বুকে টেনে নিয়ে স্বামীজি বললেন, "এসেছ!"

আমি বিমূঢ়—বিস্মিত। প্ল্যাটফর্মে দুশো লোক। আমার খেয়াল নেই। স্বামীজির চোখ, আশ্চর্য ক্ষমাসুন্দর দুই চোখ—কী আছে তাঁর চোখে! স্বামীজি কি আমাকে সম্মোহিত করলেন? আমার সব দম্ভ হঠাৎ যেন টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। আমি প্রণাম করলাম স্বামীজিকে।

আরও উত্তপ্ত মনে হল স্বামীজির আলিঙ্গন, "তোমার ব্যাগটা আমাকে দাও।"

"কেন?"

"তোমার নিয়ে যেতে কষ্ট হবে, দাও—"

"এ কী বলছেন, না না, সে কী হয়—"

জীপ আছে, গাড়ি আছে, গরুর গাড়ি আছে, কিসে যাবে?"

মাথা তুলে উত্তর দিলাম, "আমি হেঁটে যাব।"

স্বামীজি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "পারবে?"

"হ্যাঁ।"

আস্তে আস্তে পা ফেলে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলাম। কাঁচা রাস্তা। লালচে মাটি। রাস্তার দুপাশে কুঁড়ে ঘর, দু-একটা ছোট দোকান। তারপর ধান ক্ষেত। দূরে পাহাড়। আরও পাহাড়, আরও দূরে। আমি নাস্তিক, ঘোরতর নাস্তিক, চলতে-চলতে মন হাতড়ে-হাতড়ে এই কথাগুলো যেন খুঁজতে লাগলাম—কিন্তু নেই। আমার মন ওই কথাগুলো যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও মাত্র একবার আমি আর কিছুতেই সকলকে শুনিয়ে উচ্চারণ করতে পারছি না, দেব দ্বিজে আমার ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই।

এতক্ষণ আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমি কেন এসেছি এখানে। শৈলবালার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হই। আশ্চর্য, এত-ক্ষণ কাউকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করিনি, তিনি এসেছেন কি-না। চলতে-চলতে একটি অতি তরুণ ভলান্টিয়ারকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, "শৈলবালা দেবী কি এসেছেন?"

"হ্যাঁ, ঠাকরমা পরশুদিন এসেছেন?"

"তোমরা তাঁকে ঠাকুরমা বল?"

"হ্যাঁ, স্বামীজি ওঁকে মা বলে ডাকেন।"

"ওঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দেবে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আশ্রমে গেলেই দেখা হবে।"

আমার সামনে পাহাড়, ডান দিকে পাহাড়। একদিকে ছোট একটা পুকুর। সরু রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। আকাশে মেঘ। ঠান্ডা হাওয়া দিয়েছে। বৃষ্টি হলেই রাত্রে কাকনে ঠান্ডা পড়বে। আশ্রমের তোরণ দেখা যায়। জীপ আর গাড়ি স্টেশন থেকে অতিথিদের নিয়ে আসছে—আশ্রমে নামিয়ে দিয়ে আবার স্টেশনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এখন অল্প-অল্প অন্ধকার। আশ্রমে প্রবেশ করে যেন শান্তিনিকেতনের গন্ধ পেলাম। মাঝখানে সভামণ্ডপ। লম্বা লম্বা বারান্দা। অশ্বারোহী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরাট তৈল-চিত্র। পেট্রম্যাক্স জ্বলছে। প্রয়োজন ছিল না। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। আজ রাস-পূর্ণিমা।

কিন্তু কোথায় শৈলবালা! যেখানে আমার স্থান হয়েছে সে-ঘরে সার-সার অনেক তক্ত-পোষ। আশেপাশে আশ্রমের তৎপর কর্মীর দল। অতিথিদের দিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। একবার শৈলজানন্দর খোঁজ করলাম। নেই। শৈলজানন্দ কোথাও নেই। না থাকুন। এখনও তাঁকে অনুসন্ধান করার সময় হয় নি। আমি শৈলবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ব্যস্ত হলাম। কারণ সময় বড় কম। দেখতে-দেখতে সময় চলে যাবে।

একটু দূরে, পেট্রম্যাক্সের আলোয় দেখতে পেলাম, যূথিকা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। স্বামীজির শিষ্যা। এই আশ্রমে আসেন মাঝে মাঝে। আমরা সঙ্গে তাঁর ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। আমি এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে যূথিকা দেবীর শরণ নিলাম। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডপ পেরিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন আমাকে। আরও এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, এইদিকে ঠাকুরমার ঘর।"

একটা বিরাট প্রাচীন গাছের তলায়

দাঁড়িয়ে আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি এখানে অপেক্ষা করি, আপনি আগে দয়া করে তাঁকে খবর দিন—"

একটু পরে, খবর পেয়ে একটা লণ্ঠন হাতে আস্তে আস্তে পা ফেলে সেই গাছ-তলায় আমার সামনে এসে দাঁড়ান শৈলবালা। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। আমার মুখের সামনে লণ্ঠন তুলে ধরে অনেকক্ষণ দেখেন আমাকে। তারপর জোরে একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেন, "কী গো ডাকাত, এসেছ?"

আমিও কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করি, "আমার প্রথম চিঠির উত্তর দেন নি কেন? সে-চিঠি আপনি পান নি?"

নিজের দোষ খণ্ডন করবার জন্যে খুক খুক করে অনেকক্ষণ হাসেন শৈলবালা, "আরে দূর, কোথায় কী, হি-হি-হি, তা বাবা, কী চাও বল দেখি?"

"উঃ", একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি, "আপনি কম ভুগিয়েছেন আমাকে! আপনার জন্যে আমি, জানেন—"

"আরে, আমি কবে মরে ভূত হয়ে গেছি! এখন কবর খুঁড়ে কী পাবে তুমি? পাগল!"

"আপনিই পাগল করে তুলেছিলেন আমাকে!"

পাগলের কথায় হঠাৎ মুখের হাসি মিলিয়ে যায় শৈলবালার, "তা বাবা, বলি চা-টা কিছু খাওয়া হয়েছে?"

"না। আসানসোলে অনেক খেয়েছি। এখন কিছু দরকার নেই—" গলার স্বর যথাসম্ভব রূঢ় করবার চেষ্টায় বলি, "শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে—অনেক কথা। কোথায় কথা হবে? এখানে—এই গাছতলায়?"

"দেখ কাণ্ড! আরে বাপু, কথা না হয় হবে। বলি, এই এলে—একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করবে তো—হ্যাঁ গো ছেলে?"

"কোন দরকার নেই। আমার কথা ভেবে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। কোথায় বসবেন বলুন? আমার সময় বড় কম—"

গলা ছেড়ে শৈলবালা উক্তি করেন, "ভাল ডাকাতের পাল্লায় পড়লাম দেখি। তা চল স্বামীজির ঘরেই বসা যাক—"

"চলুন।"

শৈলবালা লণ্ঠন হাতে আগে-আগে যান। আমি তাঁকে অনুসরণ করি। স্বামীজির ঘরে ছোট একটি টেবিল। কাগজ কলম খাতা। মেঝেতে ফরাস পাতা। কিন্তু একটু দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অল্প-অল্প অন্ধকারে কে বসে আছেন? তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

"কে?"

শৈলজানন্দ মাথা তুলে বলেন, "আমি।"

"শৈলজাদা, আপনি এখানে?"

"আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বিশ্রামের এমন জায়গা পাব কোথায়? একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি।"

শৈলবালা শৈলজানন্দর কাছে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেন, "আপনার সঙ্গে কত বছর আগে থেকে চিঠিতে আলাপ—আজ দেখা হল!"

আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হেসে শৈলজানন্দ বলেন, "এ আপনাকে ঠিক পাকড়াও করেছে। সুধী, আমি থাকতে পারি এখানে? তুমি কেমন করে সব খবর সংগ্রহ কর একটু নিজের কানে শুনতে চাই?"

"আপনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন—আপনাকে থাকতে দেব না তা হতেই পারে না। কিন্তু শৈলজাদা, একটা শর্ত আছে।"

"শর্ত? কী শর্ত?"

"আমি যতক্ষণ এঁর সঙ্গে কথা বলব আর উনি আমার সঙ্গে যতক্ষণ গল্প করবেন ততক্ষণ আপনি একটি কথাও বলতে পারবেন না। আপনাকে একেবারে চুপ করে বসে থাকতে হবে। খুব কষ্টকর ব্যাপার—পারবেন?"

"পারব ভাই। তথাস্তু। তোমার শর্ত আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলাম। ব্যস! আর কোন কথা নয়। এই আমি চুপ করলাম।"

শৈলবালা ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ে বলেন, "নাও বাবা, এবার প্রশ্ন করতে শুরু কর?"

আমিও বসে পড়ি শৈলবালার মুখোমুখি। পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে লণ্ঠন উস্কে দিয়ে প্রশ্ন করি, "আপনার বাবার নাম?"

"কুঞ্জবিহারী নন্দী।"

"মায়ের নাম?"

"হেমাঙ্গিনী দেবী।"

"আপনার জন্ম কত সালে?"

"১৮৯৪, ২রা মার্চ। সে-বছর বঙ্কিমচন্দ্র মারা যান।"

"বাংলা সাল মনে আছে?"

"১৯শে ফাল্গুন, ১৩০০ সাল।"

"কোথায় আপনার জন্ম?"

"চট্টগ্রামের কক্সবাজারে।"

"সেখানে কেন?"

শৈলবালা উসখুস করেন। অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, "বাবা তখন সেখানে ছিলেন। উনি ডাক্তার—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন—হ্যাঁ বাবা সুধীরঞ্জন, তোমার প্রশ্ন আর কত আছে?"

"অনেক। হাজার হাজার। কেন বলুন তো?"

"ও বাবা, হাজার-হাজার? তা বাবা, ক'টি হল?"

"মোটে কয়েকটি। এখনও অনেক বাকি। কেন—কেন?"

এমন সময়—না, শৈলজানন্দ কথা বললেন না। শুধু একবার গলা ছেড়ে কাশলেন। আর শৈলবালার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে ফেলে বললাম, "আমি কি একবারও আপনাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছি? আপনিই তো প্রশ্ন-প্রশ্ন করছেন। চিঠিতেও আমাকে লিখেছিলেন, আপনার যত খুশি প্রশ্ন করবেন। আমি কি আপনার ভোট নিতে এসেছি, না কলেরা-বসন্তর টিকে দিতে এসেছি যে, শুধু আপনার নাম-ধাম, এই সব জেনে চলে যাব?"

শৈলবলালা এবার হেসে বলেন, "তা বাবা, তুমি যে কেন এসেছ, সেটাই তো এখনও আমার বোধগম্য হল না।"

সমর্থন পাবার জন্যে আমি চিৎকার করে উঠি, "শৈলজাদা, এ'কে একবার বলে দিন তো 'পূর্বপত্র' কেমন হয়?"

কিন্তু শৈলজানন্দ নিরুত্তর। মুখের কাছে হাত এনে একটা ভঙ্গি করে শুধু বুঝিয়ে দেন, সর্বান্তঃকরণে তিনি শর্ত মেনে নিয়েছেন। কথা বলতে পারবেন না। আমি তখন শৈলবালার দিকে ফিরে বলি, "আমার কোন প্রশ্ন নেই। আপনি বলে যান আপনার যা খুশি—আপনার জীবনের যত কথা জমা আছে, মনে আছে—সব কথা। এই কাগজ-কলম রেখে দিলাম। কিছু লেখবারও দরকার নেই। আপনি বলুন, আমি শুনি?"

"আমার জীবনের সব গল্প?" বিস্মিত শৈলবালা বলেন, "সে যে বড় করুণ বাবা, বড় ভয়ঙ্কর—সে যে একটা মহাভারত—শুনবে?"

"শুনব বলেই তো এসেছি—বলুন?"

"কিন্তু রাত যে ভোর হয়ে যাবে বাবা—"

"হয় হোক। আপনি বলুন?"

অনেকক্ষণ শৈলবালা কথা বলেন না। মুখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ও'র একটা ঠাণ্ডা হাত এসে পড়ে আমার কাঁধের ওপর। কথা সরে না আমার মুখ দিয়ে। প্রথম দর্শনেই আপনার করে নিতে পেরেছি শৈলবালাকে। ও'র 'ডাকাত' সম্বোধন আমার বুকের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে যেন নাড়া দিয়ে গেছে। নিজের বয়সের কথা ভুলেছি। ছোট ছেলের মতো ও'র কাছে জেদ করছি, আব্দার করছি, ও'কে শাসনও করছি মাঝে মাঝে। ছেলে-মেয়ে একটিও নেই শৈলবালার!

যেমন করুণ, তেমন ভয়ঙ্কর। আমার জীবন আর-এক মহাভারত। বলতে-বলতে রাত ভোর হয়ে যাবে। বলতে পারব তো? প্রেসার বড্ড বেশি। শরীর ভাল নয় বাবা। খুব কষ্ট হলে থেমে যাব। আবার কাল বলব—কেমন?

মাকে ভালবাসতাম। কিন্তু আরও বেশি ভালবাসতাম বাবাকে। বাবা বসে-বসে কাজ করতেন, প্রেসক্রিপশন লিখতেন, অ-দরকারী কাগজ ছিঁড়ে টেবিলের তলায় ঝুড়িতে ফেলে দিতেন—আমি তখন ছোট, খুব ছোট, অক্ষরও চিনতাম না। সেই সব ছেঁড়া কাগজের টুকরো ঝুড়ি থেকে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরতাম। যেন সব পড়তে পারছি, আর পড়ে-পড়ে কত বুঝছি!

আমার খুব ভাল লাগত এমন পড়বার ভান করতে। বাবা অবসর গ্রহণ করে বর্ধমানে এলেন। আমি ভর্তি হলাজ রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে। হ্যাঁ বাবা, ক্লাসে কিন্তু ফার্স্ট হতাম। তবে বেশিদূর আর পড়তে দিল কোথায়! তখন কি আর তার উপায় ছিল! এগারো-বারো বছর বয়সেই ইস্কুল ছাড়তে হল।

কিন্তু তখন আমি বাইরের বইও অনেক পড়ে ফেলেছি। বাবার শরীর ভাল না। তাঁকে পড়ে-পড়ে শোনাতে হত বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, হেমচন্দ্রের কবিতা আর রবীন্দ্রনাথ। আমার কিন্তু বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তেই সবচেয়ে ভাল লাগত।

তবে সে আর ক'দিন! তেরো বছর বয়সে চলে এলাম শ্বশুরবাড়ি। বাপের বাড়ির সঙ্গে কোনই মিল নেই। বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। বড় জমিদারের বাড়ি। এখানে ওসব সাহিত্য-টাহিত্য নেই। খুব কড়াকড়ি। শুধু বিষয়-সম্পত্তির ধান্দা। কত কাজ আমার! আমাকেই তো পাঁচ সের ময়দা মাখতে হত রোজ।

প্রথম-প্রথম কিছু বুঝতে পারিনি। সব কাজ চুকিয়ে, অনেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাপড়া করতাম। একটু-আধটু লেখবারও ইচ্ছে হত। আমার স্বামী একটু কেমন-কেমন, একটু অদ্ভুত, অন্যরকম মানুষ হলেও আমাকে উৎসাহ দিতেন—নানা সাহায্য করতেন।

তখন মযিহুর রহমানের বেগমবাহার তেলের খুব নাম ছিল। ও'দের এক গল্প প্রতিযোগিতায় আমার প্রথম গল্প 'বীণার সমাধি' দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। আমার বয়স তখন আঠারো। তারপর কুড়ি-একুশ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস লিখি, 'সেখ আন্দু'। আমার স্বামীই ওটা যত্ন করে কলকাতায় 'প্রবাসী' অফিসে দিয়ে আসেন। 'সেখ আন্দু' 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে।

আমি নামের পর ঘোষজায়া কেন লিখি জান? শ্বশুরবাড়ির লোকরা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে, আমিই ওদের নতুন বউ শৈলবালা ঘোষ। ওসব লেখা-টেখার ওরা ধার ধারত না, খবরও রাখত না। চার-পাঁচ বছর কেউ বুঝতেই পারল না, শৈলবালা ঘোষ আর শৈলবালা ঘোষজায়া একই লোক। কেউ কেউ যারা আমাকে স্নেহ করত, উৎসাহ দিত—আমার দু-একজন দেওর, কিম্বা ভাসুরপো, আমিই তাদের এই ঘোষজায়ার কথা বলেছিলাম। আমি তাদের বইও উৎসর্গ করেছি।

এখন একটু সাহস বেড়েছে। আরও বেশিক্ষণ লিখতে ইচ্ছে করে। দিনের বেলায়ও ফাঁক পেলে দরজায় খিল এ'টে কাগজ-কলম নিয়ে বসি। লিখতে-লিখতে বিভোর হয়ে যাই. কিছু খেয়াল থাকে না। দরজায় দমাদম ধাক্কা পড়ে, কানে যায় না। বই-এর চরিত্রগুলো মাথায় যেন বাসা বাঁধে। একদিন ছোট জাকেই বলে বসলাম, "সেখ আন্দু, রোদ আসছে, মাথার কাছের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও!"

আমি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে কখনও মিশি নি। সবই লিখছি বানিয়ে-বানিয়ে—কল্পনায়। আমার আর-একটা বই 'মিষ্টি সরবৎ' মুসলমান পরিবারের চিত্র। আমার 'অভিশপ্ত সাধনা'র নায়িকা মুসলমান—নাম রাবেয়া।

একটা গল্প বলি শোন। একবার এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম। তুমি আমাদের মেমারির বাড়িতে যাওনি, সেখানে একটা পুকুর আছে, আর কাছাকাছি আছে একটা কাঁঠাল গাছ। সেই পুকুরে আমরা স্নান করতাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম, স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ফিরছি, কাঁঠাল গাছতলায় তখন বসে আছে এক বৃদ্ধ মুসলমান ফকির। তার দুপাশে দুই সুদর্শন তরুণ। তারাও মুসলমান। আমি কাছে যেতেই বৃদ্ধ ফকির আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা স্বরে কী যেন বলল ওই দুই তরুণকে। আর তখনই মাথা তুলে এক-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা দুজন।

আমি লিখতাম 'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী'তে। গল্পের জন্যে কুড়ি-পঁচিশ টাকা পেতাম আর উপন্যাসের জন্যে পঞ্চাশ থেকে দেড়শো-দুশো টাকাও পেয়েছি। অনেকে ঠকিয়েছে। দুশো টাকা দেব বলে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তা-ও নিয়েছি। আমার প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু' 'প্রবাসী'তে বার হবার পরেও কোন প্রকাশক ছাপাতে চায়নি। বলেছিল, বেশির ভাগ ক্রেতা হিন্দু—এ-বই কে কিনবে! যা হোক, পরে গুরুদাস লাইব্রেরী থেকে 'সেখ আন্দু' প্রকাশিত হয়। আর খুব তাড়াতাড়ি প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ও-বইটা গুরুদাসের কাছে আর নেই। পাকিস্তান থেকে তৃতীয় সংস্করণ শিগগিরই প্রকাশিত হবে।

প্রায় পঞ্চাশটা বই লিখেছি। সব বই-এর নাম আমার মনেও নেই। এখন বাজারে পাওয়া যায় না। আমার কাছেও নেই। প্রথম জীবনে লেখা আমার দুটি উপন্যাস, 'জন্ম-অপরাধী' আর 'জন্ম-অভিশপ্তা' তিক্ত শ্বশুরে নির্যাতন সহ্য করার কাহিনী। খুব হই-চই হয়েছিল

তখন। অনেক পাঠক-পাঠিকার চিঠি পেয়েছিলাম। কেউ-কেউ আবার বেশি কৌতূহল প্রকাশ করে প্রশ্ন করেছিল, "আত্মজীবনী লিখেছেন নাকি?"

নিজের জীবনের ছায়া লেখায় তো কিছু-কিছু পড়বেই। নির্যাতন তো কম সহ্য করিনি। কিন্তু সে-কথা তখন বলি কাকে—বলি কেমন করে! আমার নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা—হারের কথা, ব্যর্থতার কথা। আমি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কৌশলে বলে হয়তো মনে-মনে একটা সান্ত্বনা পেতাম। আমার নায়িকা দুশ্চরিত্র লম্পট স্বামীর নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে ঠাকুরের পায়ে মাথা কোটেনি। হয় আত্মহত্যা করেছে, নয় সমাজ-সেবার বৃহত্তর ব্রত নিয়ে সংসার ছেড়ে গেছে। জোর করে একটা আদর্শ খাড়া করবার জন্যে আমি শেষ অবধি অসম্ভব মিলনের গান গেয়ে সতীত্বের জয় দেখাতে পারিনি। কেননা, আমি জ্বলেছি অশান্তির আগুনে, নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে আমার দেহ-মন। কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু কল্পনা, মিলিয়ে আমি লিখেছি, 'জন্ম-অপরাধী', 'জন্ম-অভিশপ্তা'। নায়িকার আত্মহত্যা আর নায়িকার সংসার ত্যাগ। মিলন হল না। আপোস নেই। যা অসহ্য, যা অসম্ভব, অভিজ্ঞতা ছিল বলেই আমি ফাঁকা আদর্শ-বাদের ছায়ায় মুক্তির চেষ্টা করতে পারিনি। নিরুপমা দেবীর লেখা মাঝে মাঝে মন্দ লাগত না, কিন্তু অনুরূপাকে কাঠ-কাঠ নীরস মনে হত। ও'র অভিজ্ঞতায় সন্দেহ জাগত। অনুরূপা দেবীকে আমি একবারই দেখি। ও'র সঙ্গে দেখা হয় অনেক পরে ১৩৬২ সালে পুরুলিয়ায় এক সাহিত্য সম্মেলনে। উনি ছিলেন সভানেত্রী। অনুরূপা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন সে-কথা থাক। জমিদারির ফাঁকা দম্ভ দেখে মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। যে মুচি আসত বাড়িতে, সরল গরিব—তাকে অনেক বেশি ভাল লাগত। আমার একটা ছোট-গল্পের বই-এর নাম, 'মুচি'। 'মুচি' গল্পে দীনের মহৎ রূপ দেখিয়েছিলাম আর তুলনায় এক পসারওয়ালা উকিলকে ছোট করেছিলাম—তার ছোট মনের কথা স্পষ্ট করে লিখেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ির উকিল আত্মীয় তো ক্ষেপে অস্থির। বলে "নতুন বউ ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করেছে!"

বলে বলুক। কত আর বলবে! আমি চুপ করে শুনে গেলাম। কোন কথা বললাম না। একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি ছেলেবেলায়, বিয়ের অনেক আগে থেকেই আমি যখন দেখতাম মা-বাবাকে, গাছ পাখি, আকাশ, নানা দৃশ্য, তখন শুধু এক ভাবনাই কাঁপত, মনে হত—থাকবে না, কিছুই থাকবে না, সবই যেন ছায়া, খুব অল্পক্ষণের জন্যে চোখের সামনে কাঁপছে—সরে যাবে, মিলিয়ে যাবে।

প্রতিকূল পরিবেশে অধীর হতাম না। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হলেও দিশা হারাতাম না। বাক্যবাণে যখন জর্জরিত, তখনও মনে হত, থাকবে না, কিছুই থাকবে না, সবই যেন ছায়া, খুব অল্পক্ষণের জন্যে চোখের সামনে কাঁপছে—সরে যাবে, মিলিয়ে যাবে।

আমার আর-একটা ছোট গল্পের বই-এর নাম, 'আড়াই চাল'। উপন্যাস অনেক আছে। আরও কতগুলো নাম মনে পড়ছে, 'নমিতা', 'মনীষা', 'শান্তি', 'মঙ্গল মঠ', 'ইমানদার', 'অবাক', 'বিভ্রাট', 'স্মৃতির সৌরভ', 'স্নিগ্ধা', 'রঙীন ফানুস'। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাসও লিখেছি, 'চৌকো চোয়াল'—'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিনীতাদি' নামে আর-একটা উপন্যাসও আছে। দুটি উপন্যাস আমার নিজের সবচেয়ে ভাল মনে হয়—'অভিশপ্ত সাধনা' আর 'বিপত্তি'। প্রায় শেষের দিকে লেখা 'বিপত্তি' থেকেই আমার চিন্তাধারা অন্য দিকে মোড় নিতে শুরু করে। কিন্তু তারপর আর বেশি লিখতে পারলাম কই! বড় যন্ত্রণায় দিন কেটেছে।

আমাকে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিলেন সদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এই প্রসঙ্গে আরও একটা মনে পড়ছে। আমার শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে গঙ্গাস্নান করবার নিয়ম নেই। কিন্তু আমার স্বামী সে-নিয়ম মানেন নি। বিয়ের ছ' মাস পর বোধহয় অর্ধোদয় যোগে লুকিয়ে-লুকিয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নান সেরে উঠেছেন, এমন সময় তাঁর সামনে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। এক গণ্ডূষ জল নিয়ে সেই সন্ন্যাসী আমার স্বামীকে বললেন, "পান কর!"

আমার স্বামী বিব্রত বোধ করলেন, "আমি—আমি যে মন্ত্র নিয়েছি—"

"এ তোমার জন্যে নয়, তোমার স্ত্রীর জন্যে—নাও, পান কর!"

আমি সব শুনলাম। মন টলে উঠল। পরে, অনেক পরে, স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছিলাম। আমার কথা সেই সন্ন্যাসী জানলেন কেমন করে! নিজেকে অনেকবার প্রশ্ন করে-করেও তার উত্তর পাইনি। না, আমার স্বামীকেও কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি সেই সন্ন্যাসী।

এবার আসল কথা শোন। আমার ভাইরা ডাক্তারি পড়ে দেখে স্বামীরও শখ হল তিনিও ডাক্তারি পড়বেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথী। উনি কলকাতায় এসে পড়া শুরু করলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার নানা চক্রান্ত চলেছে। আমার লেখার টাকায় ও'র পড়ার খরচ জোগাতে লাগলাম। বৈষয়িক জটিলতার প্যাঁচে আমিও তখন বিভ্রান্ত।

জান, আমার বাবা ডাক্তার, দাদা ডাক্তার, মেসো ডাক্তার, পিসে ডাক্তার—আমার চতুর্দিকে ডাক্তার, আমরা চিকিৎসকের বংশ। আর আমারই কপালে কি-না—অত বড় ডাক্তার হয়েও আমার বাবা ঘুণাক্ষরেও বিয়ের আগে বুঝতে পারেননি যে, আমার স্বামী পাগল। কিছুদিন বেশ ভাল থাকেন, তারপর হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন। তখন শুরু হয় আমার ওপর নানা অত্যাচার। আমাকে খুন করতে চান। চিৎকার করে বলেন, "আমার লেখা, সব আমার লেখা। তোমার নয়। তোমাকে আমি খুন করব—মেরে ফেলব—"

১৩২৭ সাল আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্বৎসর। স্বামী ঘোর উন্মাদ—দুর্দান্ত। সেই সুযোগে আত্মীয়রা সম্পত্তির ভাগ ঠকিয়ে নিচ্ছে। আমার ওপর চলেছে

অমানুষিক অত্যাচার। একবার একটা ভারী লোহা দিয়ে স্বামী মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে, মনে হল, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল। ক্ষীণ হয়ে গেল দৃষ্টিশক্তি। উঃ, মাথায় কী যন্ত্রণা!

এ-নির্যাতন আমি সহ্য করলেও, আমার দাদা মেজর অশ্বিনীকুমার সহ্য করতে পারলেন না। পুলিসের সাহায্য নিলেন দাদা। মেমারি থেকে আমাকে বর্ধমানে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। সেই সময়, সারা জীবনের মধ্যে সেই একবারই আমি ভেঙে পড়েছিলাম—ভগবানে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও, আশ্চর্য, তখনও আমার লিখতে ইচ্ছে করত। আমি শান্তির জন্যে, নিজেকে জয় করবার জন্যে সাহিত্য-চর্চা করতাম আর তখন আমি সব ভুলে যেতাম।

বর্ধমানে বছর তিন-চার থাকবার পর আমি আমার এক ভাসুরের বাড়ি সরবরিতে চলে যাই। সেখানে থাকি প্রায় দেড় বছর। তারপর আবার ফিরে আসি বর্ধমানে। শুনলাম আমার স্বামীর তখন বাড়াবাড়ি অসুখ। ১৩৩৩ সালে আমার শাশুড়ির মৃত্যুর পর আমি আবার মেমারিতে এলাম। তার তিন বছর পর ১৩৩৬ সালে আমার স্বামী মারা যান। আমার তখন চৌত্রিশ বছর বয়স।

তখন শ্বশুরবাড়িতে চক্রান্ত আরও জট পাকালো। শুধু আমাকে প্রতারণা করার চেষ্টা, বঞ্চিত করার চেষ্টা। স্বামী রেখে গিয়েছিলেন প্রচুর দেনা। শোধ করব কেমন করে! এই প্রতিকূল পরিবেশে, এই বিশৃঙ্খল মনের অবস্থায়, বুঝতেই তো পার, সাহিত্য-চর্চা করা কত কঠিন! বঞ্চনা-প্রতারণার জের আজও চলেছে—আজও নিষ্পত্তি হল না। কবে হবে কে জানে! পরিস্থিতি এমন জটিল, এমন প্রতিকূল না হলে হয়তো আমি আশ্রমে আসতাম না, সাহিত্য-চর্চা করেই তৃপ্তি পেতাম—শান্তি পেতাম—সুখী হতাম।

আমাকে হয়তো আর-একবার মেমারিতে যেতে হবে। তারপর বরাবরের জন্যে এখানে চলে আসব। মেমারির বাড়িতে আমার অংশ আমি বিক্রি করে দেব ঠিক করেছি। কিছুই তো পাই না। ও থাকাও যা, না থাকাও তাই।

এখানে কোন গোলমাল নেই। এই আশ্রমে আমার মুক্তি। এখানে আমি বড় সুখে আছি। স্বামীজির মতো মানুষ ক'জন হয়! কোন খরচ নেই আমার। কিন্তু আশ্রমের যে অনেক খরচ। আমার তো কিছু দেয়া উচিত। কিছুই নেই যে! টাকা কোথায় পাই! বড় অর্থকষ্টে আছি বাবা!

সত্যি, স্বামীজীর মতো মানুষ হয় না! একবার, জান বাবা, আমার বিয়ের অনেক পর কিছুদিনের জন্যে বর্ধমানে গিয়েছিলাম। তখন একদিন আমার ভাই-পো এসে বলল, "পিসি, আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে?"

"তোমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয়? বেশ তো তাকে নিয়ে এস—"

অন্নদাপ্রসাদ এল। ফুটফুটে লাজুক কিশোর। আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট। আমাকে প্রণাম করল। মা বলে সম্বোধন করল। সেই অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী—স্বামীজী।

কিন্তু আমার বাপের বাড়িতে অন্নদাপ্রসাদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন স্বদেশী আমল শুরু হয়েছে। আমার দাদা মেজর—সরকারের চাকুরে। অন্নদাপ্রসাদ মাঝে মাঝে বিপ্লবের কথা বলে, ইংরেজের বিরুদ্ধে কটূক্তি করে। চরকা কাটে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান গায়। আমার বাপের বাড়িতে ও'র আসা-যাওয়া বন্ধ তো হবেই। আমিও খুব বকে দিলাম ও'কে।

এই আশ্রম ছিল মহাশ্মশান। সন্ধ্যার পর এদিকে কেউ আসতে সাহস করত না। ১৯০৬ সাল থেকে শুধু বিপ্লবীরা এই পার্বত্য অঞ্চলে যাতায়াত করত। ১৯১৪ সালে তাদের সংস্পর্শে এসে অন্নদাপ্রসাদের বিপ্লবী মন গড়ে ওঠে। কয়েক বছর পর গ্রাম-সংগঠনের শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আশ্রমের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৮ সালে আশ্রম প্রাঙ্গণে এক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়, সভাপতিত্ব করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তারপর এই আশ্রম একটি বিরাট কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই সময় জনসাধারণের ওপর, বিশেষ করে এখানকার আদিম সাঁওতাল জাতির ওপর অন্নদাপ্রসাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, এই অঞ্চলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারুর ছিল না। অন্নদাপ্রসাদের ডাকে হাজার-হাজার লোক সাড়া দিত। আশ্রমে পুলিস ঢুকতেই সাহস পেত না।

অন্নদাপ্রসাদকে দমন করবার জন্যে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট টেলার আর চার্চার পাঠান বাহিনী নিয়ে আশ্রমে আসে। আশ্রম খানা-তল্লাসী করে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয়। লাইব্রেরী পুড়িয়ে দেয়। আর অন্নদাপ্রসাদকে উলঙ্গ করে চাবুক মারা হয়। তাকে গ্রেপ্তার করে ওরা নিয়ে যায়। টেলার, চার্চার আর পাঠান বাহিনী তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে।

অন্নদাপ্রসাদকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। কিন্তু সে রাজী না হওয়ায় গুনে গুনে তাকে পঞ্চাশবার বেত মারা হয়। অন্নদাপ্রসাদ অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হবার পর তাকে আবার ক্ষমা চাইতে বলা হয়। এবারেও অস্বীকার করলে তার গায়ে তীক্ষ্ণ সঙিনের খোঁচা দেয়া হয়। আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে অন্নদাপ্রসাদ। পরে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়। আর এবার তার দেহের ওপর ক্রমাগত বুটের আঘাত চলে। মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে অন্নদাপ্রসাদ। তখন তাকে একটা দড়িতে বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্ত ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা হয় আর প্রায় এক মাইল পথ তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। আশ্রমের কাঁচা পথ, কাটার-কাঁকরে তার দেহ কেটে-কেটে যায়। সে মরে গেছে ভেবে ওরা

তাকে একটা পুকুরে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

১৩৪৭ সালে দোলপূর্ণিমার দিন হঠাৎ অন্নদাপ্রসাদের মনের পরিবর্তন হয়। তিনি দীক্ষা নেন কিরণচাঁদ দরবেশজীর কাছে। এবং নতুন সংকল্প নিয়ে এই আশ্রম পরিচালনা শুরু করেন। এখন এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সবই আছে।

এই আশ্রমে আমি প্রথম এসেছিলাম সাত বছর আগে, ১৩৬২ সালে পুরুলিয়ার সাহিত্য সম্মেলন থেকে ফেরবার পথে। স্বামীজী আমাকে আসতে লিখেছিলেন। এত ভাল লেগেছিল এই আশ্রম যে, তখন থেকেই এখানে বসবাস করার ইচ্ছে ছিল। এতদিনে তা পূর্ণ হতে চলেছে।

এত কান্ড করে, এতদিন পর ভারতবর্ষ এই সেদিন স্বাধীন হল। কিন্তু কী শুনছি! যুদ্ধ। দেখ বাবা, যারা যুদ্ধে যায় তাদের সকলকে আমার নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। আমার দাদা অশ্বিনীকুমার ১৯১৭ সালে যখন যুদ্ধে যায় তখন মা কাঁদছিল, বাবা কাঁদছিল, আমি কিন্তু হাসতে হাসতে তাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। হোক না পরাধীন ভারতে ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ। যে যুদ্ধে যায় সে বীর বইকি! বীরের সম্মান দেব না? আত্মমোক্ষায়ঃ জগৎহিতায়ঃ।

ভারতবর্ষ আবার প্রতারিত হল। কিন্তু এ তো নতুন নয় বাবা। শাশ্বত সত্য প্রচারের মহিমায় ভারতবর্ষ চিরদিনই বরণ করে নিয়েছে বিদেশী বন্ধুকে। রাবণ এল ভিখারীর বেশে, বণিকের বেশে এল ইংরেজ আর বন্ধুর বেশে এল চৌ-এন-লাই।

যে দেশ থেকে একদিন এসেছিল হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়ান সেই দেশ থেকেই এল চৌ-এন-লাই। নগরীর রাজপথে—হ্যাঁ বাবা, আজ মনে আছে—হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই!

বন্ধুত্বের মুখোস খসে পড়ল। এখন আমাদের শিয়রে শত্রুর আস্ফালন। কিন্তু চিরদিনের মতো আবার ভারতবর্ষ বাধা দেবে অন্যায়কারীকে—দেশের জন্যে শক্তি দেবে, প্রাণ দেবে, দুর্জনকে হানবে আঘাত। একথা আমি বিশ্বাস করি বাবা—

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবায় মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।"

"বৃক্ষ তাহার যে সরস সতেজ শাখাগুলিকে নবীন যৌবনের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রাণবান করিয়া তুলিতেছিল, তুমি যদি নিষ্ঠুর আঘাতে সেগুলিকে তাহার বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লও, তবে তাহার ক্ষতস্থান শুষ্ক কঠিন গ্রন্থিময়ই হইয়া উঠিবে; যে-বৃক্ষ হাজার বাহু মেলিয়া ছায়ায় ধরণীকে শীতল করিতে পারিত, কঠিন আঘাতের ফলেই আজ সে একটা অদ্ভুত বিসদৃশ গুঁড়ি মাত্র......"

শৈলবালার 'স্মৃতির সৌরভে'র অংশ হলেও তাঁর বেলায় একথা বলতে আমার যেন বেধে যায়। আমার এক-একবার মনে হয়, লেখক-লেখিকা জন্মের পর-পর যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে তারই প্রভাবে গড়ে ওঠে তাদের মন—মানস। লেখকের প্রথম রচনাই বোধ হয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে তার জাত নির্ণয় করে দেয়। পরে বর্ণনাভঙ্গির পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু মন কি বদলায়? শৈলবালার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না তবুও বেদনা-ব্যর্থতা তাঁর মন আক্রোশে অন্ধ করেনি—জীবন বিমুখ করেনি। হয়তো যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিল বলেই তাঁর মানসসঞ্চরণ ব্যাপক হয়েছিল। এবং আমার মনে হয়, তিনিই একমাত্র হিন্দু লেখিকা যিনি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প 'বীণার সমাধি'র নায়ক অবাঙালী বীণাবাদক। ধনীর মেয়েকে বীণার পাঠ দেয় এবং লালিত করে গোপন প্রেম। তারপর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় নায়িকার। নায়ক ব্যর্থ—হতাশ। তার ছিঁড়ে যায়। বীণা যেন আর বাজতে চায় না।

সেখ আব্দুর মনও রোমান্টিক, কিন্তু যন্ত্রণায় দীর্ণ......"সে রুদ্ধদ্বার যজ্ঞাগারের নিভৃত নির্জন অঙ্কে বহির্জগতের কোলাহল তো দূরের কথা, বহিঃপ্রকৃতির তীব্র শৈত্য জড়তাময়ী বায়ু প্রবেশেরও পথ ছিল না। ছিল শুধু স্তব্ধ তন্ময় গভীরতা, ছিল কেবল হোমাগ্নির উজ্জ্বল দৃপ্ত শিখা, আর তাহারই অভিমুখে অপ্রতিহত স্রোতে প্রবাহিত হতভাগ্য প্রাণের প্রাণঘাতী উচ্ছ্বাস উন্মাদনা!......"

শৈলবালা বুঝেছিলেন, সুখী সংসারে পূর্ণতার স্বাদ গ্রহণ তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বার-রুদ্ধ করা যোগাসনের কল্পনাও তাঁর যুক্তিবাদী মনকে তৃপ্ত দিতে পারেনি। সংসার না সন্ন্যাস—প্রেম না সাধনা? এই কঠিন দ্বন্দ্বের পরিণত সৃষ্টি—'বিপত্তি'। কঠোর সন্ন্যাস যে জীবনের পূর্ণতার রূপ নয় এবং তা রুদ্ধ করে মানবিক বিকাশের বহু পথ—এই উত্তর, এই সমাধান অনুপম প্রসাদগুণে ও নিপুণ বর্ণনাভঙ্গিতে এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। তাই মানবিক বেদনায় কঠিন কঠোর সন্ন্যাসী তিলে তিলে রূপান্তরিত হয় রক্তমাংসের মানুষে—

"আজন্ম ভোগ বীতস্পৃহ চিত্তে এ সংসারের কোন কামনা কোন বাসনাকে তিনি স্থান দেন নাই......কিন্তু তবু এই বিরক্তি-বিতৃষ্ণার মাঝে কোথায় যেন কি একটা অদৃশ্য বাঁধন পড়িয়াছে......দৈহিক সুখ-দুঃখের মত মানসিক সুখ-দুঃখও উদাসীন থাকার অভ্যাসটা তাঁর যত দৃঢ় হউক, সে-ঔদাস্য এবার উন্মনা-ব্যাকুলতায় রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে......"

জীবনকেই চেয়েছিলেন শৈলবালা। কে না চায়! কিন্তু তিনি গোটা জীবনকে পাননি। তবুও তিনি জীবন-বিমুখ নন। প্রতিভাময়ী শৈলবালা জীবনশিল্পী। পরিবেশ তাঁর সৃষ্টির চ্ছেদ টানল বলে তিনি আজ নিখোঁজ।

পরদিন খুব ভোরে, ভোর না রাত, এখনও অন্ধকার আছে, এখন বোধ হয় চারটে বেজেছে—আমার ঘুম ভেঙে গেল। কাল রাতে টিপ টিপ বৃষ্টি হয়েছে অনেকক্ষণ।

এখন কনকনে শীত। আমি কম্বলটা আরও ভাল করে টেনে নি। যতক্ষণ শুয়ে থাকতে পারি ততই ভাল। কিন্তু ঘুম আর আসে না। মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সজাগ ইন্দ্রিয়। সভামণ্ডপ থেকে মধুর সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। ঘুমতে আর ইচ্ছে করে না। এই শীতেও আমার উঠে পড়তে ইচ্ছে করে।

আমার কাজ চুকে গেছে। এখানে আর

কোন প্রয়োজন নেই। আজ অনেকেই চলে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও চলে গেলে পারি। কিন্তু মন যেতে চায় না। মন যেন জুড়োতে চায়। এত অবসর, এত বিশ্রাম—এমন আর কোথায় পাব!

পাশের তক্তপোষে শুয়ে আছে আমার সাহিত্য-রসিক বন্ধু গোপাল বটব্যাল। ডেকে-ডেকে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলি, "আপনারা চলে যান, আমি আজ যাব না।"

হাই তুলে গোপাল বটব্যাল বলে, "কেন?"

"ভাল লাগছে, আর কিছুদিন থাকতে ইচ্ছে করছে।"

পাশ ফিরে হাল্কা স্বরে গোপাল বলে, "সাবধান, এমন করেই কিন্তু জগাই-মাধাই উদ্ধার হয়ে গিয়েছিল।"

তার কথা শুনে হেসে উঠি। এমন অট্টহাসি বহুদিন হাসি নি। এখনও অন্ধকার আছে। কিন্তু ঘুমতে পারি না। কিছুতেই না। আমার শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। দূরে কাঁচ কণ্ঠের সঙ্গে স্বামীজির কণ্ঠ মিলেছে, "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে—"

স্বামীজি আমার খোঁজ করলেন বেলা আটটা-সাড়ে আটটায়। এবার আমার আর কোন দ্বিধা নেই। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। মনে হল, আমি যেন শ্রদ্ধা জানালাম তাঁর অতীতকে।

এমন দেদীপ্যমান অতীত কজনের থাকে! তোমাকে প্রণাম করব না তো প্রণাম করব কাকে!

স্বামীজি আলিঙ্গন করে বললেন, "কেমন আছ?"

"স্বামীজি, আমি আজ ফিরব না—"

"তোমার যতদিন খুশি ততদিন থাক। আবার যখন খুশি এস। এ আশ্রম তো তোমাদের!"

অসহায়ের মতো স্বামীজির দিকে তাকিয়ে যেন বিস্ময়ের ঘোরে প্রশ্ন করি, "এতক্ষণ রইলাম এখানে, আপনি প্রসাদ বিতরণ করলেন না, অলৌকিক ক্রিয়ার কথাও শোনালেন না, ভগবানের নামও—"

প্রশান্ত হাসি হেসে স্বামীজি বললেন, "প্রাণ ভরে হাস। সকলকে ভালবাস। সকলকে বুকে তুলে নাও। সকলের মধ্যে এক ভগবানকে দর্শন করে সকলের চরণে প্রণত হও। নাম ও প্রণাম তোমাদের জীবনের সম্পদ হোক!"

সম্মোহন নয়, ঈষৎ অঙ্গুলি সঞ্চালনে যেন একটা সোজা পথ দেখিয়ে দেন স্বামীজি। সে-পথে কাঁটা নেই, কাঁকর নেই, সরল প্রশস্ত সে-রাজপথ। মন বলে, থাক থাক। পিছনে চেও না। জটিলতার জাল ছিন্ন হোক!

ঘুরে-ঘুরে দিনের আলোয় আশ্রম দেখছিলাম। পঞ্চবটী বন। অশ্বত্থের পাষাণ-বেদী। পুকুর। ফাঁকা মাঠ। পাহাড় আর সূর্যকে। ছুটতে ছুটতে আসে গোপাল বটব্যাল।

"এই যে, শিগগির আসুন! শৈলবালা আপনার ঘরে এসেছেন। আপনাকে খুঁজছেন, শিগগির—"

আমার তক্তপোষের ওপর বসে আছেন শৈলবালা। হাসিমুখে তাঁকে বলি, "কাজ গুছিয়ে নিয়েছি, আর কোন কথা নয়—"

শৈলবালা বলেন, "হ্যাঁ বাবা, বলি ঘুম-টুম হয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল ঘুম হয়েছিল।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শৈলবালা বলেন, "কিন্তু কী যে করলি বাবা তুই, আমি যে একেবারেই ঘুমুতে পারি নি—"

অবাক হয়ে বলি, "কেন?"

"কাল সারারাত পুরনো কথা মনে হয়েছে, লেখার কথা মনে হয়েছে—"

প্রচ্ছন্ন রসিকতার সুরে গোপাল বটব্যাল বলে ওঠে, "দেশ-এ ছাপাবার জন্যে সুধী-রঞ্জন আপনার জীবন নিচ্ছে—ওকে একটা উপন্যাস-টাসও দিয়ে দিন—"

জিব কেটে শৈলবালা বলেন, "জীবন নিচ্ছে না বাবা, জীবনী নিচ্ছে—ও আমাকে জীবন দিচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, দেব নাকি একটা উপন্যাস লিখে?"

মুখে বললাম, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

মনে মনে বললাম, না দেবেন না। যে কেন্দ্রবিন্দু থেকে একদিন যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে আর কি ফেরা যায়!

যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন শৈলবালা। এখানে অপমান নেই! ঈর্ষা নেই। নিন্দা-সমালোচনা নেই। এই শান্তিস্বর্গ থেকে তাঁকে কঠিন মৃত্তিকার ধুলো-কাদায় টেনে এনে কোন লাভ নেই আজ।

কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। আমার রয়েছে কর্ম। আমার রয়েছে বিশ্বলোক। এখনও 'মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই।'

তারপর একদিন? আজ শৈলজানন্দ পুরপত্রে নাম পড়বার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হন। কিন্তু পুরপত্রে কি একদিন পড়বে না আমাদের সকলের নাম? শৈলবালার ভাষায়, "থাকবে না, কিছুই থাকবে না, সবই যেন ছায়া, খুব অল্পক্ষণের জন্যে চোখের সামনে কাঁপছে—সরে যাবে, মিলিয়ে যাবে—" তখন?

তখন আমার জন্যে রইল এই আশ্রম—রইল মহাকালের বিরুদ্ধে স্বামীজির দৃঢ় উষ্ণ আলিঙ্গন—

"This way the pilgrimage
Of expiation
Round and round the circle
Completing the charm
So the knot be unknotted
The crossed be uncrossed
The crooked be made straight
And the curse be ended
By intercession
By pilgrimage
By those who depart
In several directions
For their own redemption
And that of the departed—
May they rest in peace."

অসমাপ্ত চটকল

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

২ ॥

এই ক-বছরে বিভূতিবাবু একটুও বদলান নি। যেমন মাটির মানুষ ছিলেন তেমনিই আছেন। লক্ষপতি বলে চেনাই যায় না। কারুর সঙ্গে, বিশেষ করে চটকলের কারুর সঙ্গে এক-ফোঁটা দুর্ব্যবহার করেন নি। অতি বিনীত ব্যবহার করেছেন। বরং হাতে কিছু ক্ষমতা থাকায় একে ওকে চাকরিও করে দিয়েছেন। চাকরি দেবার সুযোগ যখনই এসেছে তখনই তিনি 'ওয়ার্কার্স কমিটির' সভ্যদের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, হাতে একটা কাজ আছে, তাদের কোনো লোক থাকে তো দিতে। নিজের আশ্রিত পালিত বা আত্মীয়-স্বজনীয় বেকারদের দাবি এ ক্ষেত্রে তিনি মানেন নি। তার কারণও অবশ্য ছিল। বিভূতিবাবু মনে-মনে বুঝেছিলেন, তাঁর এই অভাবিত এবং আকস্মিক সৌভাগ্যসঞ্চারে অনেকেরই চোখ টাটাবে, অনেকেই তাঁকে ঘৃণা করবে, হিংসা করবে। এবং বিভূতিবাবু যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, কিছু সহানুভূতি, কিছু সম্প্রীতি, কিছু কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় না করে নেন, তাহলে অনেক থেকে আরো অনেকে, শেষে সকলেই তাঁকে অপ্রীতির চোখে দেখতে আরম্ভ করবে। এটা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়—একটা কিছু করা দরকার। এই জন্যেই তিনি ওয়ার্কার্স কমিটির লোকদের খুঁজে বার করতেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের বেঁধে ফেলতেন অনুগ্রহের বাঁধনে। কর্মীদের প্রতিনিধি নিয়ে এই ওয়ার্কার্স কমিটি। কোনো কোনো জাঁদরেল প্রতিনিধির পিছনে আছে দলে দলে মজুর আর চটকলের বাবুরা। এই সব প্রতিনিধিদের কিছু কিছু আত্মীয় বিভূতিবাবুর কৃপায় চাকরি পেয়ে গেল।

বিভূতিবাবুর কাছ থেকে কৃপা পেতে কারুর কোনো আপত্তি ছিল না, তা সে বিভাগীয় বাবু-ই হোন, বা মজুরই হোন অথবা বিবেক সম্পন্ন কোনো প্রতিনিধিই হোন। বিভূতিবাবু চটকলের ম্যানেজার নন, তিনি রেশনিং বিভাগের সামান্য কেরানী, সকলের কাছেই তিনি যেতেন বন্ধুভাবে। বন্ধুর মতো সকলের উপকার করতেন।

এইভাবে যখন বিভূতিবাবু এক দিকে পরোপকার অপর দিকে প্রভূত অর্থোপার্জন করে চলেছেন সেই সময় হঠাৎ মিল্-এর ম্যানেজার বদলি হলেন। পুরোনো ম্যানেজার বুড়ো হয়েছিলেন—তিনি দেশে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন ম্যানেজার।

পুরোনো ম্যানেজার খানিকটা বয়সের জন্যে এবং বেশীটাই চটকলের অভিজ্ঞতার জন্যে নিজের প্রত্যক্ষ কাজগুলি ছাড়া অন্য দিকে বিশেষ মন দিতেন না। তাঁর নিম্নতন সায়েব কর্মচারীরা কে কেমন ভাবে তাদের বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে সেদিকে নজর দেওয়া আবশ্যক মনে করতেন না। চটকল পুরোদমে চলেছে। মাইলের পর মাইল চট বোনা হচ্ছে, অভাবিত লাভ হচ্ছে, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন আপনিই হয়ে যাচ্ছে, কাজেই ম্যানেজারের আর করবার রইল কি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দিকে যে মন দিতে হবে এর কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাঁর।

নতুন ম্যানেজার এসে প্রথম থেকেই এটা ওটা দেখতে শুরু করলেন। মিল চালানোর চরম দায়িত্ব তাঁর। কারখানার ভালো-মন্দর জন্যে শেষ অবধি তাঁকেই জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই তিনি সব কিছু বুঝে শুনে দেখে [illegible] চান। এখানে ওখানে দু-চারটে গলদ ধরে ফেললেন। তবে সংশোধনের ব্যবস্থাও হল। তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললেন কারখানায় পাট আনার লরির কন্ট্রাক্ট মিল-এরই একজন সামান্য কেরানীর হাতে। ভারি আশ্চর্য লাগল। মনে নানারকম সন্দেহও হল। মোটের উপর জিনিসটা একেবারেই মনঃপুত হল না।

হারিচ সায়েবকে ডেকে ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলেন—এমনটা হল কি করে? এত টাকার কারবারের মধ্যে এতটুকু একজন কেরানী আসে কেমন করে?

হারিক সায়েব কাগজপত্র খুলে দেখিয়ে দিলেন পাঁচ জায়গা থেকে রীতিমত টেন্ডার নেওয়া হয়েছে। বিভূতিবাবুর টেন্ডার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। মিল-এর হেড-অাপিস কলকাতা—সেখানকার বড়সায়েবরা বিচার করেছেন, সুতরাং এর উপর আর কথা কি?

ম্যানেজার বুঝলেন কাগজে কলমে জিনিসটাকে বেশ পাকা করে গাঁথা হয়েছে;

একে ওল্টানো সহজ নয়। তা হলেও কারখানার সুস্থ আবহাওয়ার দিক থেকে জিনিসটা একেবারেই গ্রহণীয় নয়। তিনি ভাবতে শুরু করলেন।

লরি করে পাট আনার মরসুম সে বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বর্ষার আরম্ভের আর দেরি নেই। ম্যানেজার কিছুদিন চুপচাপ রইলেন। বিভূতিবাবুর কাজকর্ম গোপনে লক্ষ্য রেখে চললেন। তারপর যেদিন বিভূতিবাবুর শেষ লরি কারখানার প্রাঙ্গণ থেকে পাট খালাস করে দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার পরদিন সকালে জানা গেল বিভূতিবাবুর নামে ম্যানেজার চার্জ শীট করেছেন।

রেশনের বাঁটোয়ারিবাবু বিভূতিবাবু। তাঁর খাতাপত্রের হিসেবের মধ্যে বহু গলদ পাওয়া গেছে। ম্যানেজার সন্দেহ করছেন, রেশনের মাল সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, যার কোনো হিসেব নেই। সুতরাং বিভূতিবাবু এইবার সব কিছু বুঝিয়ে দিন। ব্যাখ্যা করুন। গলদ বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তা যদি গলদ নয় বলে বিভূতিবাবু দেখাতে পারেন তাহলে চুকলো। আর যদি না পারেন, তাহলে? সবাই বললে, তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল—বরখাস্ত!

আমিও জড়িয়ে পড়লুম এর মধ্যে। খাতাপত্র আমিই তো রাখতুম। প্রচুর গলদ ছিল তার মধ্যে জানতুম। বিভূতিবাবু কোনোদিন পরিষ্কার করে কিছু আমাকে বুঝিয়েও দেন নি, বলেনও নি। আমিও ধরে নিয়েছিলুম কারখানার গতিকই এই। এইভাবে চিরকাল চলে এসেছে, চিরকাল এইভাবেই চলবে। চটকলের লাভের কড়ির কি কিছু লেখা জোকা আছে? ছোট হোক, বড় হোক, ফিটফাট হোক, নোংরা ময়লা হোক নতুন হোক, পুরোনো হোক, চটের কল হলেই হল। চতুর্দিক থেকে বৃষ্টি জলের মতো টাকা এসে পড়বে। প্রধান এবং সবচেয়ে মোটা ভাগ পান মালিক, আর যা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে সেই সব এ'টোকাঁটা মুড়ি মুড়কি কুড়িয়ে খেয়ে কত হা-ভাতে ফুলে ফে'পে ওঠে। এর আবার হিসেব কি? আমি তাই বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ছিলুম। তাই হঠাৎ এই চার্জশীটের উদয়ে কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে মনে হল। ভাগিস আমার নামে কোনো প্রত্যক্ষ দোষারোপ ছিল না। তবে অনেকেই বললে—বিভূতিবাবুর যদি কিছু হয়, কোপ যদি লাগে, তাহলে আমিও একেবারে বাদ পড়ব না।

বিভূতিবাবু থমথমে মুখ করে সারাদিন কারখানার মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সায়েব চার্জশীটের একটা উত্তর দেবার কথা ছিল, তার কিছুই করলেন না।

তার পরদিন ম্যানেজার যখন বললেন—বেশ জবাবই যখন পাওয়া গেল না, এইবার তিনি বিভূতিবাবু সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করবেন, তখন এক অভূত-পূর্ব ঘটনা ঘটল। আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল ম্যানেজারের উক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে সমস্ত মিল স্ট্রাইক করে বসে আছে। তাঁতী তাঁত ছেড়ে দিয়েছে, স্পিনার তার ফ্রেম ছেড়ে দিয়েছে, কুলি-রমণীরা ছু'চ সুতো গুটিয়ে বসে আছে।

ম্যানেজার এর জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মহা চিন্তিত হয়ে তাঁর সহকর্মীদের এবং লেবার অফিসারকে নিয়ে বসলেন। বহু পরামর্শের পর ঠিক হল ব্যাপারটাকে বেশী দূর গড়াতে দেওয়া হবে না—মিটিয়ে ফেলা দরকার।

হারিচ্ সায়েব উপদেশ দিলেন—বিভূতিবাবুকে রেশনিং বিভাগ থেকে সরিয়ে 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড' বিভাগে বদলি করা হোক—যেখানে চুরির কোনো সুযোগই নেই। এতে ম্যানেজারেরও মান রক্ষা হবে, বিভূতিবাবুরও বোধহয় আপত্তি হবে না।

হারিচ্ সায়েবকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করা হল। হারিচ্ সায়েব প্রথমে বিভূতিবাবুর সঙ্গে এবং পরে কারখানার মজুরদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন। বিভূতিবাবুকে স্পষ্টই বললেন—তোমার লরির কনট্রাক্ট যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা আমি করব। বাকিটাতে তোমার কি এসে যায়? এ-বিভাগেই থাকো ও-বিভাগেই

থাকো, তোমার পক্ষে একই কথা।

বিভূতিবাবুর বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। লরির কনট্রাক্টই তাঁর আসল। রেশনিং বিভাগ থেকে তাঁর কি-ই বা হয়? যেটুকু হয়, সেটুকু খেয়ে যায় হারিচু সায়েবের দরোয়ান, বাবুর্চি, বেহারা মালীদের চাহিদা মেটাতে। ও ঝঞ্ঝাট যাওয়াই ভাল।

স্ট্রাইক মিটে গেল। বিভূতিবাবু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বিভাগে বদলি হলেন, সেই সঙ্গে আমিও। বিভূতিবাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার আর বেশীদিন কাজ করা হল না। বিভূতিবাবু নিজেই বললেন আমায় কথাটা। একদিন দুপুরে নিজের চেয়ারের পাশের টুলটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বললেন—বোসো।

বিভূতিবাবুর কাছে গিয়ে চিরদিন দাঁড়িয়েই থেকেছি। কোনদিন বসিনি। তাই ইতস্তত করছি দেখে আবার বললেন—বোসো হে, কথা আছে।

অগত্যা বসলুম। বিভূতিবাবু বললেন—আমাদের কারখানায় নতুন লেবার ডিপার্টমেণ্ট খুলছে, দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ দেখেছি। এই তো গত বছর থেকে চালু হল।

—হ্যাঁ, দাস সায়েব বলে একজন লেবার অফিসার এসেছেন। লোকটি ভাল। আমাদের উপেনকে বড়বাবু করা হয়েছে। প্রমথও আছে—বোধ হয় ছোটবাবু। আর দু-একজন নতুন ছোকরাকে নেওয়া হয়েছে। আমি বলি কি, তুমি ঐ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে পড়।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। বললুম—আজ্ঞে, আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছেন?

বিভূতিবাবু বললেন—তুমি দেখছি এখনও নেহাত ছেলেমানুষ আছ। তোমার উপর রাগ করবার আমার সুযোগ কোথায়? তোমার উপকার হবে বলেই ভাবছিলুম কথাটা। আমাদের এই সব ডিপার্টে উপর দিকে ওঠবার আশা ভরসা কিছু নেই, বুঝেছ? শুনলুম তুমি প্রাইভেটে বি-এ পাশ করবার চেষ্টা করছ। এ বছর পারো নি কিন্তু করবে তো একদিন? তোমার চেষ্টা আছে। লেবার ডিপার্টটা নতুন—ঐ দিকেই তোমার বরং উন্নতির আশা বেশী। আমাদের কোম্পানীর সব মিল্-এই একটা করে লেবার আপিস খুলছে। সব জুটে মিলেই খুলবে। তোমার বয়েস রয়েছে—কোনোদিন যদি কারো চোখে পড়ে যাও, পাশটা করা থাকলে চাই কি লেবার অফিসার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারো।

এমন ভাবে সোনার সিংহাসনে বিভূতিবাবু আমায় কোনোদিন বসান নি। মনে মনে খুশী হলুম। তবু ভয় গেল না। বললুম—এত বছর আপনার আন্ডারে কাজ করলুম, এখন আবার—

বিভূতিবাবু বাধা দিয়ে বললেন—আমাদের দিন হয়ে গেছে ভায়া। দেখলে তো নতুন ম্যানেজার এসে কী নাস্তানাবুদই করল।

তা ছাড়া বয়েসও তো হয়েছে। তারপর একটু থেমে বললেন—আর জুট-মিলে কাজ করারই বা আমার কি দরকার?

আমি কোনো জবাব দিলুম না।

বিভূতিবাবু বললেন—তবে বলি?

পরদিন তিনি বললেন—সামনের মাস থেকে তুমি লেবার ডিপার্ট-এ গিয়ে বসবে। মাইনে বাড়ল পাঁচ টাকা। আশীর্বাদ করি তোমার উত্তরোত্তর পদোন্নতি হোক।

লেবার দপ্তরটা ঘুরে একবার দেখে এলুম। নতুন টেবিল চেয়ার আলমারি পড়েছে। শুনলুম আমার জন্যে আলাদা কোনো টেবিলের ব্যবস্থা হবে না। সুজিত বলে যে ছেলেটি তার ছোট টেবিলটা সরিয়ে তাকে একটা বড় টেবিল দিয়ে তারই এক পাশে আমার জায়গা হবে। সুজিতের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় সুজিত। আইন পড়ছিল। চাকরিটা পেয়ে পড়াশুনো ছেড়ে চলে এসেছে পাটকল-এ। উপেনবাবুও পুরোনো লোক—তাঁকে আগেই চিনতুম। দাস সায়েব ঘরের এক প্রান্তে ফ্রেমে আঁটা ঘষা কাঁচের দরজার আড়ালে তাঁর নিজের কুঠরিতে বসে ছিলেন তাঁর স্টেনোটাইপিস্ট-এর সঙ্গে। তাঁদের দেখতে পেলুম না। আর ছিলেন প্রমথবাবু। উপেনবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও তিনি ছিলেন ছোট বাবু। প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতে এক মিনিটও লাগল না। ভারি গপ্পে লোক। বয়েসের তারতম্য মানেন না। সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা। জমিয়ে ফেলেন দেখতে দেখতে। বললেন—এসো ভায়া তাড়াতাড়ি। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি জীবনের রসকস বোঝো। কথা কয়ে আরাম পাবো। এই উপেন আর সুজিত দুটোই একেবারে হোপ্‌লেস্। প্রথম আলাপে প্রমথবাবুর উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্যে খানিকটা পুলকিত খানিকটা শিহরিত হয়ে উঠলুম আমি। পরে বুঝেছিলুম, সত্যি প্রমথবাবুর মত লোক হয় না।

সেদিন এক মনে বসে প্রভিডেন্ট ফান্ডের খাতা লিখছি, হঠাৎ ঝড়ের মতো লেবার-দপ্তরের উপেনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ও হে সুকুমার, আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে হবে। কালই চাই।

আমি বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেলুম। বললুম—আমার কাছে চাইছেন? কালই চাইছেন?

উপেনবাবু বললেন বিভূতির অ্যাসিস্‌টেন্টের কাছে চাইছি। এর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর আছে? বলে এমন ভাবে হেসে উঠলেন যে আমি যেমন অবাক হলুম তেমনি রাগে-ও গা শিরশির করে উঠল। উপেনবাবুর কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত সেটা এত সুস্পষ্ট, বিভূতিবাবুর অ্যাসিস্‌টেন্টের পক্ষে এক লহমায় পঞ্চাশ টাকা বার করে দেওয়া যে কেন এত সহজ সেটা এমন নির্লজ্জভাবে উচ্চারিত যে রাগ হওয়া সত্ত্বেও আমি যেন এক ঝটকায় উল্টে পড়ে গেলুম। মুখে কথা জোগালো না। পায়ের তলায় মাটিটাই খুঁজে পেলুম না, কথা কইব কি? বিভূতিবাবুর অ্যাসিস্‌টেন্ট—যত তার গদগোরব তেমনি তার গ্লানি?

রাগ প্রকাশ করা হলই না, আমতা আমতা করে বললুম—পঞ্চাশ টাকা? এত টাকা আমার পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব?

—হবে, হবে। কাল আসব আমি। বলে আমার পিঠ চাপড়ে উপেনবাবু চলে গেলেন।

আমি প্রমাদ গণলুম। উপেনবাবুকে চটানো—কারখানার উপেনবাবুর বেশ দবদবা, লোকে তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে চলে—তাঁর মত লোককে চটানো? তাঁর কথাই বা বলি কেন—আমার মত নগণ্য কেরানীর পক্ষে আমার থেকে ঊর্ধ্বতন কাউকেই চটানো বাতুলতা। অথচ টাকা আমি কোথা থেকে যোগাড় করি? ধার করে হোক, চুরি করে হোক, টাকা আমার যোগাড় করতেই হবে, কারণ টাকা না দিতে পারলে উপেনবাবু ধরে নেবেন যে, আমি ইচ্ছে করেই টাকাটা দিলুম না, আমার গুমোর হয়েছে। সুতরাং সে গুমোর তিনি ভাঙবেন।

সুজিতের শরণাপন্ন হলুম। উপেনবাবু যখন বাইরে, সেই সময় সুজিতদের আপিসে ঢুকে বললুম—সুজিত, কি করা যায়?

সুজিত শুনে গালে হাত দিয়ে পড়ল। এত লোক থাকতে উপেনবাবু হঠাৎ আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করে বসলেন কেন, কিছুতেই সে ভেবে উঠতে পারল না। আমি কি কোনো ক্ষতি করেছি তাঁর? কিছুই তো নয়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি? শুকনো মুখে আমরা

ফিস্‌ফাস্‌ করছি শুনে প্রমথবাবু উঠে এলেন সুজিতের টেবিলের কাছে। তাঁর কানে দু-একটা কথাও হয়তো গিয়ে থাকতে পারে।

প্রমথবাবু বললেন—কিসের এত পরামর্শ? খুব চিন্তিত দেখছি?

আমি প্রথমটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু প্রমথবাবু মনে হল খানিকটা যেন আঁচ করে ফেলেছেন। বললুম তখন। প্রমথবাবু শুনে শরীরটাকে টান করে সোজা করে নিয়ে বললেন—ও? টাকা চেয়েছে শালা? তা ভাবছ কেন সুকুমার? চেয়েছে তো বিভূতির কাছ থেকে। তোমার মুখ দিয়ে বলাতে চায়। যে-কোনো কারণেই হোক, বিভূতি টাকাটা দিতে ভুলে গেছে। তোমায় দিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তা, মনে করিয়ে দিয়ো তুমি। তোমার আর কি?

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বললুম—কিসের টাকা? বিভূতিবাবু কিসের টাকা দিতে ভুলে গেছেন?

প্রমথবাবু বললেন—একটা কিছুর টাকা নিশ্চয়ই। নিশ্চিত করে বলা শক্ত কিসের। তবে আন্দাজ করতে পারি। একটা ক্যাজুয়াল লেবারের ব্যাপার মনে হচ্ছে। একটা হিন্দুস্থানী লোককে আমাদের লেবার বিভাগ থেকে ক্যাজুয়াল খাটতে দেওয়া হয় মাঝে মাঝে। লোকটাকে বিভূতিই মাস চারেক আগে এনে দিয়েছিল। তার এক চেনা লরি-ড্রাইভারের গ্রাম-ভাই না কি বলছিল যেন। বিভূতির লোক বলে উপেন তাকে প্রায়ই ক্যাজুয়াল কাজ দিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ গত হপ্তার আগের হপ্তায় তার বদলির খাতায় নাম উঠেছে। বদলির খাতায় নাম ওঠানোর যদিও উপেনের কোনো হাত নেই, একমাত্র লেবার অফিসারই এটা করতে পারেন, কিন্তু বড়বাবু হিসেবে সে সব ক্ষেত্রেই নতুন বদলিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রণামী আদায় করে। এবারের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। প্রথমত, লোকটা যে বদলি-ওয়ালার পদে উন্নীত হবে, এ-কথা উপেন আগে থাকতে কিছুই জানতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, লোকটা উপেনের পাওনা প্রণামীর কথা জেনেও একটা পয়সা উপুড়-হস্ত হয়নি। কিন্তু আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ, বিভূতির এতে কোনো হাত ছিল—সে-ই দাস সাহেবকে বলে এটা করিয়েছে। যাই হোক, উপেন তার প্রাপ্য ছাড়বে কেন? উপেন লাগল সেই বেচারা হিন্দুস্থানী মজুরের পিছনে। কেবলই ঘুর ঘুর করে তার পিছু পিছু। বলে, বদলির খাতায় নাম উঠেছে, আমার পাওনা আমায় চুকিয়ে দে। লোকটা সরে সরে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ায়। বলে—আমি গরীব মানুষ, খেটে খাই, টাকা কোথায় পাবো? আর, বদলির চাকরি বাবু, এ-হপ্তায় খাটবো তো সামনের হপ্তায় বসে থাকবো। এতে কি পেট চলে? উপেন বলে—আরে, বদলি বদলি করছিস, তোর চাকরি তো পাকা হয়ে গেল। আজ বদলি, কাল পারমেণ্ট। তোর বউ-এর গয়না বাঁধা দে, দিয়ে এখন টাকা তোল্‌। তারপর সময় হলে সোনা দিয়ে মুড়ে দিস বউ-এর গা। এ সবেও কিন্তু কিছু হয় না। লোকটা পিছলিয়ে পিছলিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। এই চলছে দেখছি কয়েক হপ্তা। উপেন শেষে তার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ল। তাকে বলল—দেখ হে, ভালমানুষের পো। আমার পাওনা মেরে দিয়ে কেউ কোনোদিন পালাতে পারেনি। তোমার বদলির চাকরি কি করে খেতে হবে সে আমার জানা আছে। তারপর যেটুকু ঘটেছে, সেটুকু সামান্য। লোকটা টাকা দেয়নি, বরং কি-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। কথাটা কি, তা কেউ জানে না। তবে এইবার বুঝতে পারছি।

আমি বললুম—কি বুঝতে পারছেন?

প্রমথবাবু বললেন—এতদিন চটকলে কাজ করলে হে, এগুলোও ধরতে পারো না? চোরের উপর বাটপাড়ি—বুঝলে হে? চোরের উপর বাটপাড়ি। টাকাটা আদায় ঠিকই হয়েছে, তবে উপেনকে দিয়ে নয়—বিভূতিকে দিয়ে। লোকটা নিশ্চয় সেই কথাই গরম গরম ভাষায় শুনিয়ে দিয়েছে উপেনকে।

—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা? এত টাকা মজুররা দিতে পারে?

—হ্যাঁ, সেইখানেই একটু গোলমাল ঠেকছে। সাধারণত বদলিওয়ালারা পনের থেকে কুড়ি টাকা করে উপেনকে দেয়।

—এ-ব্যবস্থা উপেনবাবুর কতদিনের?

—উপেনবাবু আসবার অনেক আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। বেশ আট ঘাট বাঁধা বন্দোবস্ত। আরো দু-চারজন পাওনাদার আছে নিশ্চয়, তবে উপেনই তাদের মুখপাত্র হয়ে টাকাটা নেয়।

—বিভূতিবাবু এর মধ্যে নেই?

—না, এ তো বিভাগীয় ব্যাপার কি না। অন্য বিভাগের লোক থাকবে কেন? আর সেই কারণেই তো হয়েছে মুশকিল। বিভূতি টাকা মেরে বসে আছে। উপেন তাই রেগে আগুন। এখন টাকাটা বিভূতির কাছ থেকে আদায়ের চেষ্টা চলেছে।

এ-এক বিচিত্র নাট্য। চটকলের রঙ্গমঞ্চের নাটলীলা। চোখের সামনে অভিনীত হল এক দৃশ্যাংশ। এর পরের দৃশ্যে কি আছে কে জানে? এমনি হাসি-কান্না, সুখে-দুঃখে ভরা আরো কত নাটক, কত রঙ্গ দেখব, তাই বা কে জানে? আমি বললুম—আমি কি তবে বিভূতিবাবুকে গিয়ে বলব যে, উপেনবাবু টাকা ধার চাইছেন?

প্রমথবাবু বললেন—নিশ্চয় বলবে। তা নইলে তুমি ছাড়া পাবে ভাবছ নাকি?

আমি বললুম—কিন্তু কি আশ্চর্য! চেনা লরি-ড্রাইভারের ভাই, গরিব মানুষ, তার উপকার করে দিচ্ছেন, এর মধ্যে আবার টাকা চাওয়া যায় নাকি?

—পাওনা যে। প্রাপ্য টাকা চাইতে লজ্জা কিসের? তুমি চাইবে না। কিন্তু আরো অনেকেই চাইবেন এই কারখানার মধ্যে। চোখ খুলে চলো হে ভায়া, অনেক কিছু দেখবে, অনেক কিছু শিখবে।

আমি সেইদিনই বিভূতিবাবুকে বললুম—উপেনবাবু এসেছিলেন আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার চাইতে। দেখুন দেখি, আমাকে এইভাবে বিব্রত করা। উপেনবাবু কি আর জানেন না আমার অবস্থা? তবু দেখুন তো! আমার এখন মুখ দেখাতেই লজ্জা করছে।

বিভূতিবাবু গম্ভীর মুখে শুনলেন আমার সমস্ত কথা। খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর বললেন—কত টাকা চেয়েছে?

—পঞ্চাশ।

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তারপর বললেন—আমি গোটা কুড়ি টাকা তোমার হাতে দিচ্ছি। বোলো এর বেশী তুমি যোগাড় করতে পারোনি। আমার মনে হয়, উপেন পীড়াপীড়ি করবে না।

এই বলে আমায় কুড়িটা টাকা বের করে দিলেন।

কাজ হল ওতেই। পরদিন টাকাটা উপেনবাবুর হাতে দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে সবে বলতে আরম্ভ করেছি—আজ্ঞে, এর বেশী—কথা আর শেষ করতে হল না। উপেনবাবু বললেন—ওতেই হবে। ওতেই হবে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শোধ করে দেব। বলে, মনে হল খুশী হয়েই চলে গেলেন।

আমি বললুম—উপেনবাবু তাঁর প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় পেয়ে গেলেন। শোধ করবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না—ওটা শুধু মুখের কথা।

চোখের সামনেই দেখলুম, ক্যাজুয়াল মজুর বদলির পদে উন্নীত হলে তাকে কুড়িটি টাকা খসাতে হয়। এবার প্রশ্ন, বদলিওয়ালা যখন পারমানেন্ট হয়, তখনই বা তাকে কত দণ্ড দিতে হয়? প্রতি ধাপে ওঠার একটা মূল্য আছে তো? কত সেটা? খুব শক্ত হল না খবরটা সংগ্রহ করা। লেনদেন হয় যতদূর সম্ভব গোপনে, তাহলেও দেখলুম অনেকেই জানে। কানে কানে কথা ছড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে আলোচনা করে কথাটা। আশি, নব্বই, এক-শ টাকার কমে কোনো বদলি আজ অবধি পারমানেন্ট হতে পারেনি, এ-ধারণা প্রায় সকলেরই।

সুজিত বললে—অনেকে খায় তো। তাই বোধ করি, রেটটা একটু বেশী।

আমি হিসেব করে বললুম—সর্বনাশ সুজিত, পাট-কলে যে অন্তত দেড় লাখ পারমানেন্ট মজুর আছে। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এক-শ টাকা নিলে যে দেড় কোটি টাকা হয়। এই এতগুলো টাকা কুলি-সর্দার আর এই উপেনবাবুর মত রক্তশোষকরা মজুরদের কাছ থেকে আদায় করে বসে আছে?

সুজিত বললে—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ভাই, ও-টাকাটা ওদেরই পকেটকে স্ফীত করেছে। ব্যাপারটাকে আর-এক দিক থেকেও দেখতে পারো। এই দেড় লাখ মজুরের একটা অংশ তো প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। কেউ বুড়ো হয়ে পড়ছে, কেউ মারা যাচ্ছে, কেউ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এদের জায়গাগুলো বদলি থেকে হচ্ছে পূরিত। খুব কম করে ধরলেও বছরে ধরা যাক শতকরা পাঁচ ভাগ নতুন স্থায়ী মজুর দরকার। কত হল? সাড়ে সাত হাজার? এই সাড়ে সাত হাজার বদলি কুলি প্রতি বছর সাড়ে সাত লাখ টাকা সর্দারদের আর নানা দপ্তরের বাবুদের এবং দপ্তরের বাবুদের মাধ্যমে সায়েবদের পকেটে গুঁজে, তবে কাজে স্থায়ী হতে পারছে।

আমি বললুম—সাড়ে সাত লাখ টাকা দিয়ে অনেকগুলো মানুষকে যে বড়লোক করে দেওয়া যায় সুজিত।

সুজিত বললে—এবং তার প্রতিটি পয়সা গরিব বেচারাদের দেনা করে সংগ্রহ করতে হয়। নইলে কোথা থেকে হঠাৎ পাবে তারা এতগুলো টাকা? আর সেই দেনার যে সর্বনেশে সুদ, শুধু সেই সুদই অনেক মজুর সারা জীবনেও শোধ করে উঠতে পারে না—আসলের কথা ছেড়েই দিলুম।

আমি বললুম—সুজিত, তুমি যা বলছ, এক সময় হয়তো তাই ছিল। সর্দারী প্রথা, সর্দারদের অত্যাচার, ঘুষ নেওয়া, এ-সব আজ কাল উঠে গেছে বলেই তো শুনতে পাই। কেন, আমাদেরই কারখানায় যে লেবার আপিস হয়েছে, সেটা সর্দার প্রথা তুলে দিয়েই তো?

সুজিত বললে—চোখের সামনেই তো দেখলে ভাই। সর্দার প্রথায় আগের দিনে কি হতো? ঘুষ না দিয়ে কেউ কাজে বহাল হতে পারত না। এখনও তাই হচ্ছে। সর্দার না থাক, সর্দারী প্রথার ভূত এখনও আছে। ও কি সহজে যায়? বড় লোভের জায়গা। একজনকে হটিয়ে দিয়ে আর-একজন এসে ঢুকে পড়ে ফাঁকটায়। এখনও কতকাল এইভাবে চলবে জানি না।

(ক্রমশ)

ওয়াশিংটনের চিঠি

অন্তত আরো একটি "ওয়াশিংটনের চিঠি" রচনা করার সৌভাগ্য হল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইষ্টদেবতাকে নমস্কার।

মারটি নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে ফুল বিক্রি করে। টাইম স্কোয়ারের অহর্নিশ ব্যস্ততা তো ভুবনবিখ্যাত। বড় সহজে সে ঝিমোয় না, ঘুমোনো তো দূরের কথা। মারটি বলেছিল : এ অঞ্চল এরকম থমথমে আর নিঝুম হয়েছিল অনেক কাল আগে একবার, সেই উনিশ শ' একচল্লিশে। এই আবার হল বাষট্টির অক্টোবরে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে খানিকটা মাটি তর্জনীর মত সমুদ্রের বুকে নেমে এসেছে : ফ্লোরিডা। এখান থেকে কিউবা মাত্র নব্বুই মাইল। শোনা যায়, ক্রিস্টোফার কলম্বাসই প্রথম ইউরোপীয়, যিনি কিউবার মাটিতে পা দিয়েছিলেন। কলম্বাস কি আর জানতেন, এই ক্ষুদে দ্বীপ এককালে পৃথিবীর চোখে এত বড় হরফে ভাসবে?

কয়েকটা দিন কী থমথমের মধ্যে কাটল সারা দেশটার! প্রতি রাতে মনে হয়েছে : কাল ভোরে তেজস্ক্রিয় পাখিদের প্রলাপে ভস্ম হয়ে জাগব হয়ত। সকালে বেরুবার মুখে প্রশ্ন : আজ আর বাড়ি ফেরা হবে কি?

ফ্লোরিডার কীওয়েস্টে রণসজ্জা, সর্বত্র রণসজ্জা। এদিকে মাঠে-ময়দানে কিছু কিছু মানুষের মিছিল। নীরব মিছিল, মিছিল এ দেশে সাধারণত নীরবই হয়। যা কিছু বক্তব্য, তা হাতের প্ল্যাকার্ডে লিখিত। মিছিলে দু দলের মানুষ। একদল কেনেডির সপক্ষে, অন্য দল প্রতিবাদী। প্রথম দল নিঃসন্দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আজ কাল পরশু কাটল। না, পৃথিবীর আয়ু শেষ হয়নি। মারটির ব্যবসা আবার জমল। 'আমরা জিতেছি',– সবাই খুশী।

কিউবাকে নিয়ে উত্তেজনায় একটু ভাঁটা পড়তে না পড়তেই জাতীয় নির্বাচন হাজির। শেষও হয়ে গেল।– স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র সহায়, ফলাফল তো প্রায় রাতারাতি প্রকাশিত।

টেলিভিশন আমেরিকান জীবনকে ভাল-মন্দ অনেক দিকেই প্রভাবান্বিত করেছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রেও টেলিভিশনের ভূমিকা অসামান্য। নির্বাচনী প্রচারের ধারা টেলিভিশন একেবারে পাল্টে দিয়েছে বোধ হয়। প্রার্থীদের বক্তব্য শোনার জন্য মাঠে-ময়দানে ছুটে যাওয়ার দরকার প্রায়শ হয় না। ঘরের মধ্যে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে বসুন, টেলিভিশনের পর্দায় প্রার্থী সব আপনাকে বুঝিয়ে বলবেন।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে টেলিভিশনে বিতর্কও একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। ভোটদাতাদের উপর এ ধরনের বিতর্কের হয়। কোথায় যেন একজন শ্রমিক মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। ঝকঝকে স্যুট পরা সেনেটের পদপ্রার্থী মই বেয়ে উঠে করমর্দন করলেন। শ্রমিকটি রসিক। বললেন, 'আমার ভোটের জন্য অত উঁচুতে এর আগে আর কেউ ওঠেনি।'

মপু

কয়েকটি নাম নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। যথা, এডোয়ার্ড কেনেডি। অভিযোগ পুরানো হলেও প্রায়শ পুনরুচ্চারিত : টেড কেনেডি জিতেছেন প্রেসিডেন্ট কেনেডির জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে, নিজস্ব যোগ্যতা তাঁর তেমন কিছু

নিক্সন : 'রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাকে নিয়ে আর বিদ্রূপ করার সুযোগ আপনারা পাবেন না। এইটিই আমার শেষ সাংবাদিক-সাক্ষাৎকার।'

প্রভাব নিশ্চিত অপরিসীম। এ কথা তো বহুবার আলোচিত হয়েছে যে, কেনেডি ১৯৬০ সালে নিক্সনকে পরাজিত করেছিলেন বিতর্কের তরবারি দিয়ে। বিতর্কের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যাদের নেই, তাঁরা এইসব দেখে শুনে অধুনা সাবধান হয়েছেন। যথা, একটি স্টেটের গভর্নর পদের জন্য দুজন দাঁড়িয়েছিলেন, একজন রিপাব্লিকান, অন্যজন ডেমোক্রেট। দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে টেলিভিশন বিতর্কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রিপাব্লিকান ভদ্রলোক বিতর্কে নিস্পৃহ। তিনি যুক্তি দিয়েছেন : 'আমাদের স্টেটের দরকার একজন পরিচালকের, গভর্নরের; বিতার্কিকের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই।' কিন্তু গণদেবতা বিরূপ, ভদ্রলোক হেরেছেন।

অবশ্য টেলিভিশনই শেষ কথা নয়। প্রার্থীরা শ্রমিক, কেরানী প্রমুখ সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় হামেশাই হাজির। ভাবখানা: তোমাদেরই অতি দীন দাস, ভোটখানা দিও; তোমাদের রাজ-সিংহাসনে বসাব। আমাদের দেশে যেমন

নেই। আগামী কয়েক বছরে এসব জল্পনার মীমাংসা হবে।

আর-একটি নাম : নিক্সন। এককালের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিক্সন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদপ্রার্থী হয়ে পরাজিত হলেন। মর্মাহত নিক্সন বলেছেন, '১৯৬০-এর নির্বাচনে সাপের কামড় সহ্য করেছি, এ তো সামান্য মশার হুল।' এ পরাজয় বোধ হয় নিক্সনের কল্পনার অতীত। জয়লাভ নিশ্চিত, হোটেলে অনেক ঘর ভাড়া করা হয়েছে, আনন্দোৎসব হবে। নাচ-গান জলসা। সব গোলমাল হয়ে গেল। ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ নিক্সনকে চায় না' রাজনীতির আকাশে হতজ্যোতি নক্ষত্রের

অন্ধকারে একাকার হয়ে যেতে বসেছেন নিক্সন। এখন অনেকে বলছেন, গভর্নর পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোই নিক্সনের উচিত হয়নি।

এইসব বড় নামের গোলমালের মধ্যে আর এক জাতের বিচিত্র লোকের কথা চাপা পড়ে যায়। যারা নিতান্ত মজা করার জন্য ভোটপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ান ছোটখাটো অনেক পদের জন্য। ভোটদাতাও এ'দের নাম আগে শোনেননি। ব্যালট পেপার হাতে নিয়ে দেখলেন, পরিচিত নামের তলায় অজানা অচেনা কিছু নাম। থমকে যান, এ'রা কারা?

এ'রা অদ্ভুত সব মানুষ। একটি উদাহরণ স্পষ্ট করবে। বসটনে কী একটা পদের জন্য ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। 'আমি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি অর্থের প্রয়োজনে। অন্যান্য প্রার্থী-দের মত আমিও বেকার। একটা চাকরি হবে; ভাবতেও ভাল লাগে। নির্বাচিত হলে আমি সবচেয়ে প্রথমে বসটনের গাড়ি পার্ক করা সমস্যার সমাধানে মন দেব। আমার থিয়োরী খুবই সহজ। পথচারী রাস্তায় চলতে চলতে কাগজের টুকরো, সিগারেটের টুকরো এখানে সেখানে ফেলবেই। আমার আমলে নিয়ম হবে, এসব আবর্জনা রাস্তা থেকে কখনো সরাবে না। দু দিনে রাস্তাঘাট আবর্জনায় টইটম্বুর। কাজেই কেউ গাড়ি চালাতে পারবেন না। অতএব পার্কিং-এর সমস্যাও আর থাকবে না। তা ছাড়া গাড়ি চালাতে না পেরে সবাই সাবওয়েতে (মাটির তলার টিউব রেলওয়ে) যাতায়াত শুরু করবেন। সম্প্রতি সাবওয়ের ব্যবসায় যে ঘাটতি হচ্ছে, তারও সমাধান হবে।' এমন সহজ সরল মোক্ষম দাওয়াই আবিষ্কার করা সত্ত্বেও ভদ্রলোক কেন যে নির্বাচিত হলেন না, বোঝা শক্ত!

বারই নবেম্বর চলে গেল। একটি ছুটির দিন। বার তারিখ সোমবার। অর্থাৎ শনি-রবির নিয়মমাফিক ছুটির সঙ্গে সোম-বার মিশে একটা প্রকাণ্ড সপ্তাহান্তের ছুটি। সবাই হাঁপ ছেড়ে বেড়াতে গেছে কাছাকাছি কোথাও। রাস্তায় লোকজন কম। এগারই নবেম্বর, ভেটারেনস্ ডে। এ বছর এগার তারিখ রবিবার বলে বার তারিখ ছুটি ঘোষিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সকল বিভাগের সৈনিকদের সম্মানার্থে এ ছুটির আয়োজন স্বদেশকে মহিমান্বিত করেছে—'to recall their sacrifices during War and pay tribute to their contributions to peace.'

এগারই নভেম্বরকে প্রথম ছুটির দিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল উনিশ শ' উনিশ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-সমাপ্তির প্রতীক হিসাবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এগারই নভেম্বরকে আরো বিস্তৃত মর্যাদা দিয়েছেন: সমস্ত সৈনিকের নামে উৎসর্গিত এই দিন, বিশ্বশান্তির প্রেরণায় বিকশিত এই দিন।

ছুটির দিনের পিছনে যত কাহিনীই থাকুক না কেন, ছুটির দিন, ছুটির দিনই। সূর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুমছুট হতে হবে না, ধীরেসুস্থে চলাফেরা, একটু বেড়াতে বেরুনো। এইসবই তো ছুটির দিনের পরম পাওয়া, সাধারণ মানুষের কাছে। কেন এই ছুটি হল, এজন্য কী-ই বা করা দরকার—এত শত মাথা ঘামানো ধাতে সয় না। এ ব্যাপারে কলকাতা কিংবা ওয়াশিংটনে তফাত দেখি না।

আরো একটি ছুটির দিনের কথা মনে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রিয় দিন। জুলাইয়ের চার তারিখ। স্বাধীনতা দিবস। কলকাতায় বসে খবরের কাগজে জমকালো বর্ণনা পড়েছি। ভেবেছিলাম, তার কাছাকাছি একটা কিছু হবে অন্তত। হতাশ হতে হল বিকেলের দিকে বসটনের ময়দানে বক্তৃতা, সংগীত, বাজি পোড়ানো, প্রচুর ভিড়। কিন্তু ওই একটু সময়। সারাদিন হইচই চোখে পড়েনি। বোঝাই যায়নি, আজ একটা বিশেষ দিন। স্বাধীনতা দিবসের হুল্লোড়ের মধ্যে হাইওয়ের উপর দুর্ঘটনার সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যায় বলে প্রায়শ কথিত হয়। কথাটা খানিকটা সত্যি, পুরোটা নয়। ছুটি পেলেই প্রায়শ তরুণরা দূরপাল্লায় বেড়াতে বেরোয়। এবং তখন দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ে। স্বাধীনতা দিবস এই ছুটির দিনগুলিরই একটি।

আমেরিকান বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন দেখলে আমাদের স্বাধীনতা দিবস?

—যতটা জাঁকজমক আশা করেছিলাম, ততটা মিলল না।

—নিরাশ হয়েছ? আমি তো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম সারাদিন। আর জিম বেড়াতে গেছে নিউইয়র্ক।

এ থেকে যদি সিদ্ধান্ত হয়: স্বাধীনতার মূল্য এরা বোঝে না—তা হলে সিদ্ধান্ত-কারকে স্থূলভাষী বলে চুপ করতে হয়। এদের স্বাধীনতা বহু দিনের পুরোনো, অস্থিতে মজ্জায় মিশ্রিত। বাইরের অকস্মাৎ হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপে, কিন্তু মাটির তলার শিকড় তাতে সাড়া দেয় না।

এখানে সত্যিকারের উৎসবের সুর বাজে খ্রীস্টমাসে। সে কথা যথাসময়ে।

শনি-রবিবার কিংবা যে কোন ছুটির দিনে এই লোকটির দেখা মিলবেই। কেমব্রিজ স্ট্রীটের মোড়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। রোদ পুইয়ে পুইয়ে কি বিরক্তি ধরে না ওর?

—'তুমি আজ কেমন আছ?' এই এক প্রশ্ন সবাইকে করবেন। যতবার তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া, ততবার এই একই প্রশ্ন। চেনা অচেনা দুনিয়ার সব লোক কেমন আছে জেনে জেনে কি তাঁর বিরক্তি হয় না?

নিশ্চয়ই হয় না। হলে বাঁচবে কি নিয়ে? ও'র বাড়িতে আর কেউ নেই। স্ত্রী গত হয়েছেন। ছেলেরা নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বৃদ্ধ পিতার দায়িত্ব বহন এ সমাজের অবশ্যকর্তব্য নয়। বৃদ্ধের সময় আর কাটে না। সারা জীবনটা পিছনে পড়ল, কত কথা বলার আছে। কত কাহিনী জমেছে। শোনার লোক নেই।

তাই রাস্তার মানুষকে আপন করার আশা—আজ তুমি কেমন আছ? একটু আত্মীয়তার খোঁজ, একটু উষ্ণতা।

রাস্তার মানুষের সময় কোথায়? সে বলে, আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন? চলতে চলতে বলা। বৃদ্ধের উত্তরের পুরোটা কানে আসে না—আমি ভাল........

অনিমেষ চক্রবর্তী

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১৩ ॥

"পথ আমারে পথ দেখাবে।"

কিছুক্ষণ পরে পান্না ফিরে এসে বলল, তুমুল গণ্ডগোল ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সবাই কারণ জিজ্ঞাসা করছে কি ঘটেছে কেউ জানে না।

সিপাহীদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যই জানতে পারা যাবে, বলল জীবন।

সিপাহীদের অবস্থা দেখলে দয়াও হয়, হাসিও পায়। তারাই সবচেয়ে ভয় পেয়েছে, উত্তর দেওয়ার জন্যে দাঁড়াবার সময় নেই, মুখে একমাত্র রব গোরে আয়ে গোরে আয়ে।

তবে?

তবে আর কি রাতটা ঘুমোও, কাল সকালে খোঁজ নিলেই চলবে। সত্যি যদি কোম্পানির ফৌজ এসে থাকে, তবে তো ফাঁড়া কেটে গেল।

পর দিন বেলা আটটা নাগাদ পান্না ও তার দাদা এসে উপস্থিত হল জীবনের ঘরে। পান্নার দাদা মহাদেব মিছির চার হাত লম্বা—তদনুরূপ চওড়া বিরাট পুরুষ, বয়স বছর তিরিশ, বেশ গম্ভীর মুরুব্বি মুরুব্বি ভাব। পান্নাকে বলে খোকী, পান্না প্রবল আপত্তি করে, অবশেষে দুইপক্ষে অনেক বাদানুবাদের পরে এখন বলে খোকী ভাই। জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, তাকে বলে জীওনবাবু।

'গোরে আয়ে গোরে আয়ের' রহস্য ব্যাখ্যা করতে শুরু করে মহাদেও, বলে, কাল বখৎ খাঁ বেসালা, হাতী, ঘোড়া আর যত হীরা জহরত লুট করেছে সব নিয়ে দিল্লি রওনা হয়ে যায়, মতলব এই যে সেখানে গিয়ে বাদশাহকে ভেট দিয়ে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ বনবে। যাওয়ার সময়ে বেরিলি শহরে রেখে যায় এক পল্টন ফৌজ, কিছু ঘোড়া উট, আর একটা হাতী। বখৎ খাঁ বিদায় নিতেই কাল সন্ধ্যা বেলা থেকে সিপাহী লোক গাঁজা, গুলি, ভাঙ, চণ্ডু, চরস শুরু করে দিল, শেষে এমন হাল হল যে কেউ কাউকে চিনতে পারে না, কারো উঠে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। সন্ধ্যা বেলা উট আর ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, সেগুলো ছুটোছুটি আরম্ভ করতেই ওদের ধারণা হ'ল যে, কোম্পানির ফৌজের পায়ের শব্দ! তখন আর কি?

এই পর্যন্ত বলে সে থামে। মহাদেওর বোধ করি ধারণা মুরুব্বি লোকের একসঙ্গে অনেক কথা বলা উচিত নয়।

জীবন শুধোয় তার পরে কি হ'ল মহাদেওজী।

মহাদেও যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে ঘনীভূত করে একটি প্রবাদ উচ্চারণ করে হাথী ঘোড়ে বহে জাঁয়, গদহা কহে কিৎনা পানী। শালালোগ লড়বে কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে, নিজের ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে মুরছা যায়। মারাঠা গেল, শিখ গেল, এখন এরা লড়বে কোম্পানির সঙ্গে।

জীবন বলে, শুনেছি বখৎ খাঁ মস্ত বীর।

বুড়ী ঘোড়ীকে লাল লগাম! বখৎ খাঁ মস্ত বীর।

তবে দিল্লি রওনা হ'ল কেন?

অভী দিল্লি দূর হ্যায়, জীওনবাবু, অভী দিল্লি দূর হ্যায়। শালার মতলব বুঝছেন না। শালা ভাগ গয়া, তামাম হীরা জহরত নিয়ে ভাগ গয়া।

তবে ফৌজ নিল কেন সঙ্গে?

পাহারা দেবে কৌন?

আর এখানে যে ফৌজ রেখেছিল তার কি হ'ল?

শালালোগ এমন ভয় পেলো যে কাল

রাতেই যে-যার গাঁয়ে পালিয়ে গিয়ে জরুর আঁচলের তলে ঢুকেছে। গংগা গয়ে গংগারাম, যমুনা গয়ে যমুনাদাস। বুঝলেন না বাবু সাব।

তবে এখন বেরিলির অবস্থা কি?

তামাম শুধ! একটা সিপাহী নাই। হিন্দু লোগ গিয়েছে ধোপেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে, মুসলমান লোগ গিয়েছে দরগায় শিরনি চড়াতে।

আবার যদি ওরা ফিরে আসে!

কারা? বখৎ খাঁর সিপাহী। শালালোগ নিদমে গোরার লাল মুখ দেখে ফুকরে ওঠে। ছ' মাহিনার মধ্যে আর ফিরবে না ওরা।

মুক্তির উপায় চোখে পড়ে জীবনের, সে বলে তবে তো এবার আমি রওনা হ'তে পারি।

মহাদেও বলে যদি যাওয়া ঠিক ক'রে থাকেন, তবে এই সময়। কিন্তু যাবেন কোন দিকে?

দেরাদুনের দিকে যাবো বলেই বেরিয়েছিলাম, কর্নেল রিজম্যানের নামে ছিল চিঠি।

এখন যে কি করবো ঠিক বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণ পান্না নীরব ছিল, জীবন যাবে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল, বলল আর ক'দিন থেকে গেলে হয় না।

জীবন বলল, তখন আবার কি ঝামেলা হবে কে জানে।

মহাদেও তাকে সমর্থন করে বলে, হাঁ বাবু সা'ব এই সুযোগ।

কিন্তু যাবো কোন্ দিকে তাই ভাবছি।

আপনি দিল্লির দিকে রওনা হ'ন, মতলব এই যে পথে কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে দেখা মিলবে, তখন কর্নেল, ঐ শালার কি নাম।

জীবন বোঝে যে উক্ত অভিধা ব্যবহারে মহাদেও যেমন উদার তেমনি নিরপেক্ষ। নামটি মনে করিয়ে দেয়।

মহাদেও বলে—ঐ দিকেই কর্নেলের পাত্তা মিলবে।

কিন্তু ঐ পথে যে বখৎ খাঁও গিয়েছে, আমি ওর লোকের হাতে পড়তে চাই না।

ও শালা ডাকুর হাতে কেন পড়তে যাবেন! ওরা গিয়েছে বুলন্দশর, সিকান্দ্রাবাদের পথে—ঐ পথটাই সিধা। আপনি রামগঙ্গা পার হয়ে মোরাদাবাদ, মীরাটের পথে যান। তবে কোন বড় শহরে ঘুসবেন না, কি জানি কেমন হাল।

সেই কথাই ভালো, আজ বিকালেই রওনা হ'ব। মহাদেওজী আমাকে একটা ঘোড়া খরিদ ক'রে দেন, যা দাম লাগে দিচ্ছি!

মুরুব্বি লোক কম হাসে, কিন্তু যখন হাসে তা গভীর অর্থদ্যোতক। এ হেন একটি হাসি চমকে উঠল মহাদেওর ওষ্ঠাধারে। সে বলল, বাবুসাব, বেরিলিতে আজ গেহু, চাবল সব মাগ্গী, সস্তা ঘোড়া আর উট।

এ কেমন ক'রে হ'ল?

বুঝলেন জীওনবাবু, সিপাহী লোকের ঘোড়াগুলো যে পারে নিয়ে নিচ্ছে। আমি দুটো ধরে এনেছি, আপনি একটা নিয়ে যান।

মহাদেও চলে গেলে পান্না শুধোলো জীবন সত্যিই কি যাবে?

পান্না, এমন সুযোগ আর মিলবে না, আমাকে বাধা দিয়ো না।

পান্না বলে, বাধা দিলেই বা শুনবে কেন, আর আমি বাধা দেবারই বা কে?

এ তো রাগের কথা হ'ল!

হ'লই তো! বলে বেরিয়ে চলে গেল পান্না।

জীবন মনে মনে সংকল্প করে জীবন-স্রোতে ভাসতে শুরু ক'রে প্রথম ঘাটেই আটকে পড়বে না। ভাবে পান্নার চোখের জলে স্রোত যদি প্রবলতর হয় ভালই, ঘাটের থেকে ঠেলে দিয়ে দ্রুততর বেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে তার ফৌজী থলি, কোমর-বন্ধ, পিস্তল প্রভৃতি নিয়ে প্রবেশ করে পান্না।

নাও তোমার সব জিনিসপত্র বুঝে নাও।

বুঝে নেবার কোন উদ্যম প্রকাশ না ক'রে জীবন বলে থলিটা যেন এবারে বেশি ভারি মনে হচ্ছে।

খানকতক চাপাটি আর গুড় দিয়েছি, শুধু পান্নার চিন্তায় তো পেট ভরবে না।

কথাটা বলে পান্না হেসে ওঠে। জীবন বলে এই তো আমার চিরপরিচিত পান্না।

জীবন ঐ সের প্রমাণ হাসিটাকে নিঙড়াও, বেরিয়ে আসবে ছটাক পরিমাণ কান্না। অদৃষ্ট যে পান্নার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কান্না। মানুষের সাধ্য কি দুঃখের হাত থেকে আমায় বাঁচায়।

পান্না পথে নেমেই তোমার দেখা পেলাম। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে, এমনটি সম্ভব। তোমার তুলনা নাই।

কি ক'রে জানলে? এখনো তো পথের চোদ্দ আনাই বাকি।

এ হচ্ছে সাপের মাথার মণি। প্রথমেই চরম রত্ন তারপরে বাকি চোদ্দ আনাতে আর কিছু আছে কি?

না জীবন, ওসব অলীক কথা দিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না। ক্রমে পথের মোড়ে মোড়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রত্ন দেখতে পাবে, ফিকে হয়ে আসবে পান্নার স্মৃতি।

তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে, অনেক ঠকেছি, অনেক ঠেকেছি, বেশী কিছু আশা করবার সাহস আর নেই। কেবল একটি কথা বলে যাও যে, আবার দেখা হবে।

জীবনের মুখে আসে, তোমার সেই ছোট্ট বোনটি থাকলে নিশ্চয় দেখা হতো। কিন্তু সেটা আর চলে না। বলে দেখা হবে বই কি পান্না, নিশ্চয় দেখা হবে।

জীবন তোমার বয়স অল্প বলেই মনে করছ দুনিয়াটা ছোট। যেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি,

ফিরে এলেই হ'ল। না ভাই দুনিয়া মস্ত একবার ছাড়াছাড়ি হলে আর কাছাকাছি হ'তে চায় না।

হোক দুনিয়া বড় তবু এখান থেকে দিল্লি কতটুকু পথ।

ঐ তো শুনলে না এখনি দাদার মুখে— অভী দিল্লি দূর হ্যায়।

এ সব কথার কি আর শেষ আছে! চির-কাল চালানো যায়, যে-কোন জায়গায় থামানো যায়। সংসারে কাজের কথা শেষ আছে, অকাজের কথা অনন্ত।

তারপরে দুপুর বেলা পান্নার মাকে প্রণাম করে, মহাদেওকে নমস্কার জানিয়ে, পান্নাকে গলদশ্রুলোচনা করে, কোন রকমে নিজের চোখের জলটি চেপে রেখে ঘোড়ায় চড়ে বিদায় হয়ে গেল জীবন। পান্না ঘরে ফিরে এসে বালিশ বুকে গ'ুজে উপুড় হয়ে পড়লো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেল পথিক জীবনের মন থেকে। সমস্ত দুঃখের প্রতিষেধক ঐ পথ।

॥ ১৪ ॥

কড়ু হাতে দড়ি—

আবার পথ। যখন সে ঘরে ছিল, ভেবে-ছিল, ঘরটাই সত্য, পথটা সাময়িক; পথে বের হওয়ার পর থেকে বুঝতে পেরেছে পথটাই নিত্য, ঘর নৈমিত্তিক মাত্র। জীবনলাল যদি অনভিজ্ঞ যুবক না হয়ে প্রবীণ দার্শনিক হতো, তবে বুঝতো যে পথের সুতো দিয়ে ঘরের মালা গাঁথা চলছে সংসারে। কিন্তু ঐ সুতো আর ফুলের মধ্যে কোন্‌টা সত্য তার উত্তর তো এ পর্যন্ত কোন প্রবীণ দার্শনিক দিতে পারেনি। কিন্তু এত কথা ভাববার তার বয়স নয়। এখন সে অশ্বারোহী তাই অল্প সময়ের মধ্যেই রামগঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হ'ল, তার খেয়াতে পার হ'তেও কোন প্রতিবন্ধক ঘটলো না। খেয়াঘাটে লোক-জনের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল তাতে বুঝলো যে এতদিন খেয়াঘাটে সিপাহী পাহারা ছিল, পাস না দেখাতে পারলে কাউকে পার হতে দিত না। কিন্তু বাবা ধোপেশ্বরের দয়ায় ডাকলোক সব পালিয়েছে —এখন যে খুশি পার হয়ে যাও, মাঝিকে একটা পয়সা দিলেই হ'ল।

চাঁদনী রাত ছিল। সন্ধ্যা বেলাতে ঘণ্টা-খানেক বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলো। এই কয় ঘণ্টা পথ চলেই সে বুঝে নিয়েছে বড় বড় শহরে অশান্তি দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চল সম্পূর্ণ নিরাপদ, শহরের অশান্তির সামান্য ঢেউটা পর্যন্ত সেখানে পে'ৗছয়নি। এই তো সারা রাত সে একাকী পথ চললো, কই, কেউ তো বাধা দিল না। না দেখা গেল একটা সিপাহী, না শোনা গেল একটা বন্দুকের আওয়াজ। পর দিন দুপুরতক পে'ৗছালো মোরাদাবাদ শহরের কাছে। শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিল মহাদেও, তার নিজের অভিজ্ঞতারও সমর্থন পেয়েছে এই অল্প সময়ের মধ্যে। কাজেই মোরাদাবাদকে বাঁ দিকে রেখে সে এগিয়ে গেল। মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বসে পান্নার হাতের চাপাটি খেয়ে বিশ্রাম করে নিল। তারপর ঘোড়াটাকে জল খাইয়ে আবার রওনা হয়ে পড়লো। ভাগ্যিস পান্না অনেকগুলো চাপাটি দিয়ে-ছিল—গুণে দেখলো আরো দিন দুই চলবে। ঐ চাপাটি আর গুড় সঙ্গে না থাকলে বোধ করি অনাহারেই থাকতে হতো। এবারে সে চলেছে মীরাটের দিকে। ভোর বেলা গঙ্গা পার হ'ল নিরাপদে। কিন্তু এভাবে শহর এড়িয়ে এড়িয়ে চললে কর্নেল রিজম্যানের সন্ধান পাওয়া যাবে কি করে? দেহাতের লোক নিশ্চয় তার সন্ধান রাখে না। আবার জিজ্ঞাসা করার মধ্যে বিপদ থাকতে পারে। ওদের মধ্যে যদি কেউ সিপাহী থাকে কোম্পানির লোক মনে করে খুন করতে পারে জীবনকে। তাই সে স্থির করলো যে মীরাটের কাছে গিয়ে যদি শহরের অবস্থা শান্ত মনে হয়, তবে ব্যারাকে গিয়ে খোঁজ নেবে কর্নেল রিজম্যানের গতিবিধির।

মীরাটের কাছে পে'ৗছে দেখলো যে শহরের অবস্থা শান্ত, কিন্তু আর একটু এগোতেই মিলিটারি ব্যারাকের দগ্ধ ঘরগুলো দেখে বুঝলো এখানেও অশান্তি দেখা দিয়ে-ছিল। তবে এখন বোধ হয় আর ভয়ের কারণ নাই। আরো খানিকটা এগোতেই দেখতে পেলো জায়গায় জায়গায় গোরা সিপাহী সঙিন উ'চিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাতে দেখতে পাওয়া মাত্র একজন গর্জে উঠল—হুকুমদার। জীবন ততোধিক উচ্চস্বরে বলল—ফ্রেণ্ড। আর তখনই ঘোড়া থেকে নেমে দুই হাত উ'চু করে দেখালো যে সে নিরস্ত্র।

এডভান্স :

গোরা সিপাহীর কাছে গিয়ে ইংরাজীতে বলল, দেখো, আমি আসছি লখনৌ থেকে, সন্ধান করছি কর্নেল হ্রিজম্যানের, আমার কাছে পরিচয়পত্র আছে জেনারেল উট্রাম ও স্যার হেনরি লরেন্সের। দুইজন সুপরিচিত ব্যক্তির কথা শুনে গোরা সৈনিকটি বলল, তুমি আমাদের কর্নেলের সংগে দেখা করো, তিনি জানতে পারেন।

আমার সংগে একজন গাইড দাও, নইলে গুলি করে মেরে ফেলতে কতক্ষণ।

রাইট! একজনকে বলল, একে নিয়ে যাও কর্নেলের কাছে।

বাংলোর বারান্দায় বসে কর্নেল ও তার স্ত্রী আলাপ করছিল: অনেক দিন পরে পাহাড় থেকে ফিরেছে স্ত্রী, কাজেই সাহেবের মেজাজ বেশ সরিফ ছিল। জীবন গিয়ে স্যালুট করে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলো ব্যাপার কি? জীবন সব কথা বলে পরিচয়-পত্র দুখানা এগিয়ে দিল। কর্নেলের আর অবিশ্বাসের কারণ রইলো না, বলল, ইয়ংম্যান, আমি খুশী হলাম যে, তুমি কোম্পানির ফৌজে ঢুকতে চাও। তবে হ্রিজম্যান এখন ঠিক কোথায় বলতে পারি না। ক'দিন আগেও আম্বালায় ছিলেন। এতদিনে বোধ হয় কর্নালে এসে পৌঁছেছেন। তুমি এক কাজ করো, সোজা জমুনা পেরিয়ে গ্রান্ড ট্রাংক রোডে গিয়ে পড়—দু' দশ মাইল আগে পিছে নিশ্চয় তার দেখা পাবে।

জীবন স্যালুট করে বিদায় নিলে কর্নেল হুইটম্যান যতখানি সম্ভব বায়ু ফুসফুসে টেনে নিয়ে বিস্ফারিত বক্ষে পত্নীকে বলল, Dearie, India is again ours.

পত্নীর যে খুব একটা বিশ্বাস হ'ল তা মনে হয় না, এখনো সম্মুখে ভস্মীভূত পল্টন ছাউনি, বলল, বুঝলে কি করে?

দেখছ না ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে আমাদের কাছে!

কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে। ও তো একটি মাত্র লোক। One Swallo does not make the summer.

তুমি দেখছ একটি আমি দেখছি দুটি।

কোথায় দুটি দেখলে।

একজন ঐ যাচ্ছে, আর একজন এই আমার পাশে।

মীরাট থেকে যে পথে যমুনা পার হতে হয়েছে জীবনকে তাকে পথ বলা উচিত নয়, পোড়ো মাঠ আর চাষের জমি। একটা গোটা রাত লেগেছে যমুনার পশ্চিম তীরে পৌঁছতে। রাতে একবারও বিশ্রাম করেনি, পাছে হ্রিজম্যানের নাগাল না পায়। যমুনা থেকে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড প্রায় দশ মাইল। যখন সেখানে এসে পৌঁছলো আর এক পা চলবার শক্তি রইলো না, না আরোহীর না ঘোড়ার। পাশে একটা মস্ত বট গাছ ছিল। গাছের ডালে বাঁধলো ঘোড়াটাকে। তারপরে থলিটা পিঠ থেকে খুলে শেষ চাপাটি কখানা বের করলো, ঘামে গা আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছিল, জামার বোতাম খুলে দিল, চকচক করে উঠল সোনার তক্তিটা। তারপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে খান দুই চাপাটি খেল, খান চারেক পড়ে রইলো; জল নেই, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল; পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও গলা দিয়ে নামল না। ঘুমুবে না কেবল একটু গড়িয়ে নেবে মনে ক'রে থলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লো। অমনি প্রগাঢ় ঘুম। এমন ঘুম কেবল পথিকেই সম্ভব।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ পাঁজরে একটা গ'তো খেয়ে হকচকিয়ে চোখ মেলে দেখে যে তার নাকের আধ হাত উপরে একটা বন্দুকের চোঙ আর তার হাত দুই উপরে প্রকাণ্ড একটা লাল মুখ।

সে ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠতেই লাল মুখ প্রশ্ন করলো—Who are you?

জীবন বলে—I am a friend of the Government.

লাল মুখের শুষ্ক অধর ব্যংগে ঈষৎ বংকিম হয়ে শুধায়—Which Government eh? Badshah Government?

I mean the friend of the British Government.

Indeed?

জীবন দেখে লাল মুখে নিষ্ঠুরতাজাত বিদ্রূপের হাসি। তখন দুই পক্ষে ইংরাজীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে।

বিশ্বাস না হয় আমি জেনারেল উট্রাম ও স্যার হেনরি লরেন্সের পরিচয় পত্র দেখাতে পারি।

বেশ বের করো পত্র।

থলিটা কোথায়। ঘোড়াটা কোথায়? গলায় হাত দিয়ে দেখে তক্তিটা কোথায়? এক-মুহূর্তে সংকটের গুরুত্ব প্রকট হয় জীবনের কাছে। সে হতাশভাবে বলে ওঠে, যে থলির মধ্যে পরিচয়পত্র দুখানা ছিল, সেটা দেখছি না, ঘোড়াটা দেখছি না। আমি হৃতসর্বস্ব। I am lost.

Not before we blow you from that gun—এই বলে বাঁ হাতে বুড়ো আঙুল বেঁকিয়ে নির্দেশ করলো। জীবন

দেখলো অদূরে তিনটি কামান, দুটোর মুখে দুজন দেহাতী লোক শক্ত করে বাঁধা!

The Third one is for you.

তারপরে মন্তব্য করলো, উট্রাম ও লরেন্সের নাম করে বেশ একটি গল্প ফেঁদে-ছিলে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে না!

জীবন দেখলো এখন দমে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে বলল, দেখো অরাজকতার সময়ে মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ নিদ্রিত পথিক যে অপহৃত হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু তার চেয়েও স্বাভাবিক তোমার গল্পটা, প্রায় বিশ্বাস করিয়েছিলে আর কি। হলে কি হয় যথাকালে তোমার প্রমাণগুলো অলীক পাখির মতো উড়ে পালিয়েছে।

জীবন যেন কি বলতে উদ্যত হয়ে ছিল, বাধা দিয়ে সৈনিকটি বলল, তোমার পক্ষের প্রমাণ তো দেখাতে পারলে না আমার পক্ষের প্রমাণ দেখবে কি?

কি প্রমাণ?

ওগুলো কি? বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো ভুক্তাবশেষ চাপাটিগুলোর দিকে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন গোরা সৈনিক এসে উপস্থিত হ'ল। লাল মুখের ইঙ্গিতের অর্থ জীবন বুঝবার আগেই তারা বুঝলো, একসঙ্গে চমকে উঠল, সমস্বরে বলল,

Those infernal letters, সেই পৈশাচিক চিঠি।

কোথায় চিঠি, কেন পৈশাচিক কিছুই বুঝতে পারে না জীবন। কিন্তু ওরা ভাবে এটা অজ্ঞতা নয় অজ্ঞতার ভান মাত্র। লোকটা পাকা অভিনেতা, গ্যারিক বললেই চলে।

সবাই বলে তবে আর দেরি করে লাভ কি, তিনটে Pandyকেই একসঙ্গে সাবাড় করে দেওয়া যাক।

মঙ্গল পাণ্ডে, ঈশ্বর পাণ্ডে প্রথম বিদ্রোহী। পুরবিয়া ফৌজের অনেকেই পাণ্ডে—তারাই বিদ্রোহের অগ্রণী। সেই সুবাদে ইংরাজের কাছে বিদ্রোহীমাত্রেই পাণ্ডে বা Pandy!

জীবনকে নিয়ে গিয়ে তৃতীয় কামানের মুখে এমনভাবে বাঁধা হ'ল যে তার মাথাটা পড়লো কামানের চোঙের মুখে। মাঝখানে সে, দু'পাশে দুজন দেহাতী লোক। তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণ তাদের সুস্থ সবল দেহ। এমন বলবান ব্যক্তিরা বিদ্রোহী না হয়ে যায় না। গাছে লটকে ফাঁসি দেওয়াতে খরচ কম হলেও সবসময় হাতের কাছে তেমন মজবুত গাছ পাওয়া সম্ভব নয়। তখন কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পন্থাটা ঘোরতর পৈশাচিক হলেও ওতে নাকি যন্ত্রণা নাই, মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যায়। দয়ালু হত্যাকারী।

জীবন বুঝলো যে ঘটনাস্রোতের দ্বিতীয় ঘাটে এসেই তার এ জন্মের লীলা শেষ। প্রথম ঘাটটি ছিল যেমন মনোরম দ্বিতীয়টি তেমনি নিদারুণ, তৃতীয় বলে আর কিছু রইল না। ভয় অবশ্যই তার করছিল, মৃত্যুকে যে ভয় করে না সে হয় দেব নয় দৈত্য। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে এসে বুঝতে পারলো, দূর থেকে মৃত্যু যেমন ভীতিকর বস্তুত তেমন নয়। এই অভিজ্ঞতার যুক্তি অনুসরণ করে চললে তবে কি মৃত্যুর পরের অবস্থা আদৌ ভীতিকর নয়—হয়তো বা প্রীতিকর। এ সব কথা কুড়ি বৎসরের যুবকের মনে উদয় হওয়ার নয়—কিন্তু এখন যে সর্বাঙ্গে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে তার মনে তাই অনেক কিছু সে বুঝতে পারছে কয়েক মুহূর্ত আগেও যা ছিল দুর্বোধ্য। পাশের লোক দুটির ভরসার ভাব দেখে তার সাহস আরো বাড়লো। ওরা বেশ নির্বিকার। ঠোঁট দুটো দেখলে বোধ হয় যে কোন একটা নাম জপ করছে, যেমন হয় তো প্রত্যহ করে গঙ্গা-স্নানের সময়।

রেডি, ফায়ার।

একজন পলতেয় করে আগুন দিল, এক সঙ্গে গর্জে উঠলো দুটো কামান আর মুহূর্ত মধ্যে লোক দুটোর শতচ্ছিন্ন দেহ আকাশে উত্থিত হয়ে রক্ত মাংস ক্লেদের বৃষ্টিতে অজস্র ধারায় নেমে এলো। এই নারকীয় দৃশ্যের বীভৎসতা দেখবে না ভেবে চোখ বুজেছিল জীবন এমন সময় আবার শুনলো রেডি। এই তার শেষ মুহূর্ত। কুড়ি বৎসরের জীবনের ছবি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটে চলে গেল চোখের সম্মুখ দিয়ে, মা, বাবা, ভৈরব চাটুজ্জে, মোতি মহল, বিশ্বনাথের গলি, গোমতীর চর, দিলখুশা পার্ক, রমনা, চটি-দারের চাপাটি, পান্না, তুই কোম্পানীর গুলিতেই মরবি— হারানো তক্তির অজ্ঞাত রহস্য—

স্টপ!

ওদের মধ্যে একজন লেফটেনাণ্ট শ্রেণীর অফিসার ছিল, সে হুকুম করলো স্টপ।

লোকটাকে ঠিক Pandy বলে মনে হয় না, হয়তো সত্যিই ওর জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে সেই প্রশংসাপত্রগুলোও।

আর ঘোড়াটা? শুধায় একজন।

আমার বিশ্বাস তৃতীয় লোকটা ঘোড়ায় চেপে পালিয়েছে তাই ধরা পড়েনি।

তবে এখন কর্তব্য কি?

কর্নেলের জন্য অপেক্ষা করা যাক, তিনি এসে যা কর্তব্য বোধ করেন করবেন।

জীবন ভাবলো যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

প্রবাদটা সত্য নয়। মৃত্যুর সময়ও মানুষ আশা ছাড়ে না। সেই আশার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছে পরলোকের ধারণা।

ক্রমশ

পরিক্রমা

লালদীঘি

অজাতমিত্র

দুজন মানুষ একরকম নয়। আর যদি আলাদা দেশের হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাছাড়া দেশ তো কেবল ভূমিখণ্ড নয়। মানুষকে নিয়ে দেশ। আলাদা দেশের মানুষ আলাদা ধরনের। এক দেশ থেকে অন্য দেশকে যখন পৃথক বলে অনুভব করি তখন বিচার করে দেখিনে কী কারণে দুই দেশের পার্থক্য এত প্রকট। অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরনের বলেই কি দেশের চেহারা আলাদা? নাকি দেশের প্রকৃতি আলাদা বলেই অধিবাসীদেরও প্রকৃতি অন্য রকম?

বিভিন্ন দেশই বা শুধু কেন? একই দেশেও স্থানভেদের প্রভাব কম নয়। স্থান থেকে স্থানান্তরে একই মানুষের কত না রূপ। আদালতের উচ্চ আসনে বসে নিয়মিতভাবে যিনি আসামীর জবানবন্দী শোনেন গৃহে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে তিনিই হয়তো জেরার ভয়ে জবান বন্ধ করেন। গড়পারের যার উঁচু হিলের জুতো ছাত্রীদের মনে শংকা জাগায়, তারই কোমল হাতের স্পর্শ পাবার জন্যে হয়তো প্রতীক্ষা করে থাকে ঝামাপুকুরের কোনো রুগ্ন শিশু। অপিস পাড়ায় যার হাতে শোভা পায় শর্টহ্যাণ্ডের খাতা, গৃহে ফিরে তারই হাতে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার প্রদীপ।

বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ মানুষের প্রকৃতিকে যে প্রভাবিত করে তা জানবার জন্যে দেশদেশান্তরে যাবার দরকার হয় না। পথে পথে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা রাজপথের প্রকৃতি থেকেই সেখানকার মানুষের স্বরূপ আঁচ করতে পারে। বিশেষ করে কলকাতার রাজপথ। তাদের শুধু আকৃতিই নয়, প্রকৃতিও আলাদা। এক থেকে আরেক রাজপথের বৈষম্য অনেকটা এক দেশ থেকে আরেক দেশেরই মতো। উপচে-পড়া ডাস্টবিনের আবর্জনা নিয়ে ঝগড়া করবে না নেড়ি কুকুর এ-যেমন কল্পনাতীত পাঁচু খানসামা লেন-এ, তেমনি অভাবনীয় যে ক্যামাক স্ট্রীটের বাতায়নে ঝুলবে ভেজা শাড়ীর আঁচল, কিংবা পার্ক স্ট্রীটের বারান্দায় দেখা যাবে সদাজাগ্রত শিশুর সিক্ত তৈলবস্ত্র। রবীন্দ্র সরোবরে চাঁদ ও চামেলি নিয়ে কল্পনাবিলাস বেমানান নয়। কিন্তু লায়ন্স রেঞ্জে পেঁছলে চাঁদের আদর থাকে না। দর বাড়ে চাঁদির। মানুষের জীবনের উপরে রাজপথের প্রভাব যে কম নয়, তা বিভিন্ন রাজপথের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য থেকে অনেকটা অনুভব করা যায়। কালিদাস পাতিতুণ্ডী লেন থেকে যদি কেউ বাড়ি বদল করে রাসেল স্ট্রীটে বাসা বাঁধে তাহলে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে অচিরে শুধু বেশ-ভূষাই নয়, তার সামগ্রিক জীবনযাত্রারও অনেক পরিবর্তন ঘটবে। এই থেকেই বোঝা যায় রাজপথের বিভিন্ন স্বরূপ।

রাজপথের কুলপঞ্জীতে লালদিঘি নিকষ কুলীন তো বটেই, বোধ করি একে কলকাতার অন্যতম বনেদি বংশও বলা চলে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়ার দিকে ব্যবসায়িক ও শাসন কেন্দ্র হিসাবে লাল-

পরিক্রমা করছে লক্ষ লক্ষ লোক—অর্থ-ক্ষুধিতের বিরাট মিছিল

দিঘির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শোনা যায় ওয়ারেন হেস্টিংস জামাইষষ্ঠী করতে যেত বাগবাজারে, কিন্তু শাসনষষ্ঠী ধারণ করত লালদিঘির ধারে। প্রাচীন কলকাতার বিত্তবান ও জমিদারদের বাসস্থান সাধারণত ছিল সুতোনুটি বা গোবিন্দপুরে। কিন্তু লালদিঘির ধারেই নাকি ছিল তাদের কাচারি। সদর ও অন্দরের এই দীর্ঘ ব্যবধান দীর্ঘকাল থেকেই চলে আসছে। আজও তার পরিবর্তন ঘটেনি।

গোলদিঘি কোনোদিন গোল ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু লালদিঘি নাকি সত্যিই একদিন লাল ছিল। প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস নিয়ে অনেক ভাষ্য আছে। তারই একটির অনুসরণে জানা যায়, জমিদার সাবর্ন চৌধুরীরা যদিও কলকাতার কাছে থাকতেন না তবু লালদিঘি অঞ্চলেই ছিল তাদের কাচারি। তার ভার ছিল কালিঘাটের শ্যাম রায়ের হাতে। শ্যাম রায় খুব সমারোহ করে এই কাচারিতে দোলের উৎসব করতেন। সেই উপলক্ষে লালদিঘি অঞ্চলে নানারকম মেলা বসত। বসত অনেক হাটবাজার। আবির আর রঙের এত ছড়াছড়ি হ'ত যে হাটবাজার লালে লাল হয়ে যেত। রক্তিম হয়ে উঠত দিঘির কালো জল। এই থেকেই নাকি লালবাজার ও লালদিঘি নামের সূত্রপাত। পোষাকী নামকরণ ডালহৌসি

বেলা যে পড়ে এল জলকে চল বলে ডাকবার সম্ভাবনা লালদিঘির ধারে নেই। লালদিঘি সে রকম দিঘিও নয় যার কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলবে। বরং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কলকাতায় বোধ হয় এই একমাত্র স্কোয়্যার যার ভিতরে একটিও আলোকের স্তম্ভ ছিল না। আলোর রেখা পড়ল এই সেদিন যেদিন থেকে এর অভ্যন্তরে ট্রামের সমান্তরাল রেখার হল সূত্রপাত। নানা হস্তক্ষেপে লাল-দিঘি আজ লুপ্তপ্রায়। লাল রঙ যা ছিল তা পুলিসের পাগড়ি আর ফাইলের ফিতে রাঙাতে অনেকদিন আগেই নিঃশেষ হয়েছে। ঘরনীহীন ঘর বিরল নয়। জমিহীন আছে আজকাল অনেক জমিদার। কিন্তু পাগড়ি আর লালফিতে বাদ দিয়ে চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে লালদিঘির।

লালদিঘির চার ধারে সারি সারি উদ্ধত প্রাসাদ। গর্বিত তাদের আকার। শিখর তাদের আকাশ-স্পর্ধিত। কিন্তু এ যেন ইটের পর ইট। মাঝে মানুষ কীট। নাই কো ভালোবাসা, নাই কো খেলা। জীবন সম্বন্ধে সেখানে যেন নির্লিপ্ততা আর অবহেলা। লালদিঘির জীবন সকাল ন'টায় শুরু, বিকেল পাঁচটায় শেষ। এর আগে কিংবা পরে এখানে কোলাহল যায় থেমে। জনমানব হয় বিরল। প্রভাতের প্রথম আলোর জন্যে এখানকার অট্টালিকার বাতয়ান উন্মুক্ত হয় না। কোনো বাড়িতেই জ্বলে না সন্ধ্যার প্রদীপ। যদিও দিবসে মনের হরষে প্রায় প্রতি আপিসই বৈদ্যুতিক আলো জ্বালায়। রাত্রির অন্ধকারে হানাবাড়ির মতো নিস্তব্ধ ভয়ংকর মূর্তি ধরে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। এ যেন রূপকথার দৈত্যপুরী। সকাল ন'টায় সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দৈত্য জেগে ওঠে। নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটি এক নিমেষে মুখর হয়ে ওঠে। আবার সন্ধ্যায় রূপোর কাঠির স্পর্শ পেলেই দিবসের দৈত্য সুপ্তির কোলে আশ্রয় নেয়। থেমে যায় কলবর। জনমানব হয় অদৃশ্য। এমনি করে চলে দিনের পর দিন। শুধু ছুটির দিন ছাড়া। ছুটির দিনে লালদিঘির ঘুম ভাঙে না। দেয়ালপঞ্জীতে যে তারিখ লাল হরফে ছাপা তা এ-পাড়ার পক্ষে নিস্তব্ধতার দিন। একমাত্র শ্মশানের নিস্তব্ধতার সঙ্গেই তার তুলনা চলে।

অর্থকে যারা অনর্থের মূল বলে স্থির করেছেন লালদিঘি তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন। কারণ কলকাতার আর্থিক জগতে লালদিঘি এক মহাপীঠ স্থান—একে পরি-ক্রমা না করলে উপার্জনক্ষেত্রে মোক্ষ লাভের আশা নেই। লক্ষ্মীর এক নাম শ্রী। সেই হিসাবে লালদিঘিকে শ্রীক্ষেত্রও বলা যেতে পারে। শুধু যে ট্রামগাড়িই বার বার লালদিঘিকে ঘুরে আসছে তা নয়। একে পরিক্রমা করছে লক্ষ লক্ষ লোক লক্ষ লক্ষ বার—অর্থ-ক্ষুধিতের সে এক বিরাট মিছিল।

চারধারে সারি সারি উদ্ধত আর গর্বিত সব প্রাসাদ

ত্রিশ দিন পরিক্রমা করলে জোটে ত্রিশ দিনের আহার।

মাছের বাজারে মাছ দেখা যায়, চালের বাজারে চাল। কিন্তু টাকার বাজারে টাকা দেখা যায় না। যার জন্যে এত পরিশ্রম সেই রৌপ্যমুদ্রাই থাকে অদৃশ্য। টাকার চেয়ে চেকের প্রচলনই এখানে বেশি। লেন-দেন অধিকাংশই হয় খাতাপত্রে। শেয়ারের বাজারে আবার অনেক সময় খাতাপত্রও বাহুল্য বলে বিবেচিত হয়। সেখানে দেনা-পাওনা চলে মুখে মুখে। বেচা-কেনা অঙ্গুলি সংকেতে। লিয়া আর বেচা এই দুই সাংকেতিক শব্দে তেজী-মন্দীর বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকার আনাগোনা চলে। ফকির রাজা হয়, রাজা ফকির।

ব্যবসায়িক কেন্দ্র ও রাজ্যশাসনের কেন্দ্র দুই-ই অবস্থিত লালদিঘির ধারে। জ্যামিতির কোন আইন অনুসারে এই দুই কেন্দ্র একই বিন্দুতে এসে মিশেছে তা জানা নেই। তবে বণিকের মানদণ্ড ও শাসকের রাজদণ্ড অতীতে এক দণ্ডের জন্যেও আলাদা হয়নি বলেই হয়তো এতটা নৈকট্য অবধারিত হয়েছে। সে যাই হোক, আজও এই কেন্দ্রতেই লুকোনো আছে কলকাতার কলকাঠি। গঙ্গার বুকে ক'খানা জাহাজ ভাসবে, রানীগঞ্জে কত টন কয়লা উঠবে, বজবজের চটকল কতটা চট বুনবে সবকিছুই নির্ধারিত হয় লালদিঘির আপিসে। আপিসগুলি দেখলে সহজে বোঝবার উপায় নেই কী অসীম ওদের ক্ষমতা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে যে লোক সদাগরি আপিস চালায় পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে তার সাক্ষাত যোগাযোগ নেই। কিন্তু গণিতের শাসন মেনে সে যে-নির্দেশ দেয় তারই ফলে পণ্যদ্রব্যের চলে বেচা-কেনা। তারই বিচারশক্তির তারতম্যে স্ফীত হয় লাভ লোকসানের অংক। বাড়ে কমে অগণিত লোকের সুখ-দুঃখের ইতিহাস।

এ পাড়ার মানুষ হেঁটে চলে না। ছুটে চলে। সকলেরই ত্বরান্বিত ভাব। এখানকার আবহাওয়াই এমন যে স্বভাবত মন্থরগতি লোকও এখানে চঞ্চল হয়ে ওঠে। লালদিঘির জীবন অন্য রাজপথের মতো দীর্ঘ নয়—মোটে সাত-আট ঘণ্টা তার মেয়াদ। কাজেই সময়ের হ্রস্বতাকে সবাই গতির ক্ষিপ্রতা দিয়ে পুষিয়ে নিতে চায়। দরবারের ওস্তাদ যেমন গ্রামোফোন রেকর্ড করতে গিয়ে আলাপ সংক্ষিপ্ত করে জলদ শুরু করে—এও যেন সেইরকম। এখানে বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদ ধরে না পথচারীর পদযুগল।

সাত পাক ঘুরলেই দুটি নরনারীর সম্পর্ক পাকা হয়ে যায়। কিন্তু সহস্র পাক ঘুরেও এখানকার সদাগরি আপিসের সঙ্গে অনেকের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয় না। এক মাসের নোটিশের উদ্যত খড়্গ নিয়ত ঝুলছে মাথার উপরে। এই খড়্গের ভয়েই নাকি বজায় আছে সদাগরি আপিসের সুনিপুণ কর্মচপলতা। এরই জোরে সরকারী লাল-ফিতের মন্থরতাকে ব্যঙ্গ করে শ্বেতাঙ্গ বণিক। সদাগরি আপিসে স্থান অনেকেই পায়। স্থিতি সবাই পায় না। এই কারণে লালদিঘির কাঠামোতে সরকারী আপিসের স্থায়ী কর্মচারী আজও অনেকের ঈর্ষার পাত্র—ওরা হিন্দুমতে বিবাহিতা স্ত্রীর মতো। অপছন্দ হলেও সম্পর্কচ্ছেদের পথ নেই।

লালদিঘির আপিসে যারা কাজ করে পুরোনো দিনের রেলগাড়ির কামরার মতো তাদের চার ভাগে ভাগ করা চলে। পরিচালক, বিভাগীয় অধিনায়ক এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট, যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম-শ্রেণী। আর বাকি সব তৃতীয় শ্রেণী। পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি ও পারিশ্রমিক তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে প্রথমশ্রেণীর দিকে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে। এখানে জাতিভেদ খুব কঠোর। প্রথম ও দ্বিতীয়তে সামাজিকতা চলে। দ্বিতীয়-মধ্যমে আছে মেলামেশা। কিন্তু অবশিষ্ট যারা তারা অপাংক্তেয়। তাদের সঙ্গে আহার দূরের কথা, প্রতি আপিসেই তাদের জন্যে রয়েছে স্বতন্ত্র স্নানাগার। সামাজিক জীবনে

জাতিভেদের কুফল বিদ্যালয়ের বিতর্কসভা থেকে শুরু করে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক পর্যন্ত সর্বত্র আলোচনার উপযুক্ত বিষয় বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু কর্মজীবনের এই জাতিভেদের কথা ভেবে কারো নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে বলে জানা নেই।

লালদিঘির রঙ্গমঞ্চ স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নয়। কিন্তু এখানে যে-নারীরা অংশ গ্রহণ করে তাদের প্রকৃতিও আলাদা। এরা লবঙ্গ লতার মতো ললিতা নয়। পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তাল ফেলে এরা চলতে জানে। এদের হাতের ভাষা শর্টহ্যান্ড। পায়ের উঁচু হিলের জুতো টাইপরাইটারে অনুকরণে খট্ খট্ করে চল। দশটা থেকে পাঁচটা এরা অনবরত পত্র রচনা করে চলে। কিন্তু হায়, এদের কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে যে-লিপি রচিত হয় তার সঙ্গে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের কোনো যোগ নেই। তার শিরো-নামায় প্রিয়তমেষু লেখা নিষিদ্ধ। ডিয়ার সার দিয়ে তার শুরু! ইয়োর্স ফেথ্ফুলি দিয়ে ইতি।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

বাইশ

দুঃসাহসিক ডাকাতি। গাবতলির যে হাট দেখে এসেছি, তার অদূরে মাঝনদীর উপর। হাটবার, নদীর এপারে ওপারে হাজার হাজার হাট-ফিরতি মানুষ জড় হয়েছে। তারই মধ্যে সকলের চোখের উপর কাজ সমাধা করে সরে পড়ল—এত দক্ষতা আর এমন সাহস কাপ্তেন বেচারাম—নিতান্ত পক্ষে তার বাছাই শিষ্যসাগরেদ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যে না সে-ই বলবে এই কথা।

মুশকিল হল, গাবতলি জায়গাটা জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে না। ঝিনুক-পোতার এলাকায়—অনাদি সরকার যেখানকার বড়দারোগা। অনাদি উৎসাহ দেখাবে না, সেটা বেশ জানা আছে। ভয় করে বেচা মল্লিককে। তা ছাড়াও নানাবিধ গোপন কারণ আছে, অনুমান করা যায়।

গাঙের উপর জমিদারি-কাছারি। কাছারির ঘাটে ডিঙিনৌকো বেঁধে জন দশেকের একটা দল নেমে পড়ল। অনেক দূরে উত্তরের ডাঙাঅঞ্চলে ঘর তাদের, বাদাবনে চাক কাটতে গিয়েছিল। দুই ক্যানেস্তারা মধু পাইকারকে মেপে দিয়ে দেশে ফিরছে। নৌকোয় জলের কলসি একবারে খালি, জলের অভাবে দুপুরে রাঁধাবাড়া হয়নি। তেষ্টার জলও নেই। রাজ-কাছারিতে এসে অতিথ হল তাই।

বলে, আপনাদের কোন দায় ঠেকতে হবে না নায়েব মশায়। চাল-ডাল আনাজপত্তর সমস্ত নৌকোয় আছে। গাছতলায় শুকনো ডালপালা দু-চারখানা কুড়িয়ে নেব। কাছারির মাঠে জলের পুকুরের বড্ড নাম, ঐ জলের নামে উঠে পড়েছি। কোন একটু আচ্ছাদন দেখিয়ে দেন, খান আষ্টেক ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে নিই। চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়েই চলে যাচ্ছি আমরা।

এইটুকু প্রার্থনা না শোনার হেতু নেই। একেবারে গাঙের কিনারে চালাঘর, বাবুদের নিজস্ব হাঙরমুখো পাল্কিখানা থাকে যেখানে। সেই ঘরের এক প্রান্তে রান্না চাপিয়েছে। ভাত কেবল ফুটে উঠেছে—রান্না-বান্না ফেলে হুড়মুড়িয়ে সকলে ডিঙিতে উঠে পড়ল। চক্ষের পলকে ডিঙি খুলে দেয়। ইটের উনুনে ভাত ফুটতে লাগল টগবগ করে।

গাঙের উপর সেই সময়টা বড় এক সাঙড়-নৌকো। ধান-বোঝাই করে হাটে গিয়েছিল, ফিরে যাচ্ছে। এর অনেক পরে জগবন্ধু দারোগা নিজে কাছারিবাড়ি এসেছিলেন ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বকর্ণে শুনবার জন্য। আত্মপরিচয় দেননি, কে না কে এসে পড়েছে। দারোয়ান রামকৃপাল গল্পটা বলল—

রান্না উঠলে লোকটা আগুনের জন্য এসেছিল। চালাঘরে রান্না চাপিয়েছে, রামকৃপাল কলকের আগুন নিতে এসেছে তাদের উনুনে। সাঙড়-নৌকো দেখেই তড়াক করে উঠে সবসুদ্ধ ঘাটে ছুটেছে—

রামকৃপাল জিজ্ঞাসা করে, কি হল গো?

দলের কর্তাব্যক্তিটি জবাব দিল, ঐ নৌকোর ব্যাপারি যাচ্ছে, মানুষটা অত্যন্ত পাজি। এক গাদা টাকা কর্জ নিয়ে পলাপালি খেলছে। কাল রাত্তির থেকে তক্কে-তক্কে আছি। পালাচ্ছে কি রকম, চেয়ে দেখ না—

কথা এই ক'টি—তাও কি শেষ করে বলল! বলতে বলতে লম্ফ দিয়ে পড়ল ডিঙির উপর। ছয়খানা বোঠে ঝপঝপ করে পড়ে। আলগোছে জল ছুঁয়ে—কিম্বা জল একেবারে না ছুঁয়েই বাতাসে উড়ে চলেছে বুঝি ডিঙি।

জগবন্ধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই কর্তা মানুষের চেহারা জিজ্ঞাসা করেন। লম্বা দশাসই জোয়ানপুরুষ কিনা?—হ্যাঁ। উপর-ঠোঁটে শ্বেতি আছে কিনা? জবাবে রামকৃপাল একবার বলে হ্যাঁ, একবার বলে না। মোটের উপর প্রমাণ হয় না কিছুই। শ্বেতির

দাগ না থাকলেও বেচা মল্লিক হতে পারে। অনেক ছলাকলা ওদের, ঠোঁটের সাদার উপরে রং চাপিয়ে গাত্রবর্ণের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া দশাসই লম্বা মানুষ বেছে বেছে নিয়েই তো দল. বেচা মল্লিক ছাড়াও দশাসই জোয়ানপুরুষ বিস্তর আছে। তবে কাজকর্মের ধারা দেখে প্রত্যয় আসে, কাপ্তেন বেচা স্বয়ং হাজির ছিল সেদিন ঐ ডিঙিতে।

এপার-ওপার দু-পার দিয়েই হাটের ফেরত মানুষজন যাচ্ছে। হাজার দেড় হাজার মানুষ তো বটেই। চোখের সুমুখে এত বড় কান্ডটা চলেছে, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে সব। সাঙড়ের কাছাকাছি হয়েছে ডিঙি. মাঝে তবু হাত দশেক ফাঁক! সবুর না মেনে—সে এক তাজ্জব কান্ড!—ডিঙি থেকে তিড়িং তিড়িং করে এরা সাঙড়ের উপর পড়ছে। বানরে যেমন এগাছ থেকে ওগাছে লাফ দিয়ে পড়ে। কতক আগা-নৌকায়, কতক ছইয়ের উপরে, কতক বা পাছ-গলুয়ে। কী শিক্ষা গো বাবুমশায়! পলকের মধ্যে ঘটে গেল. পাড়ের উপর আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

ভর সন্ধ্যায় তোলপাড় পড়ে গেল। ফাঁকা নদীর উপর তখনো বেশ আলো, সুমুখ-জ্যোৎস্না বলে আলো বহুক্ষণ থাকবে। ডাঙার উপর থেকে সমস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। রাম-কৃপাল দেখছে, সেই হাজার মানুষ চোখ মেলে দেখছে। ডাইনে বাঁয়ে ধাক্কা মেরে সাঙড়-নৌকোর মাল্লাগুলো টপাটপ জলে ফেলে দিল। ডাঙের উপর উঠে এ-হাতে ও-হাতে যেমন পেয়ারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে সেইরকম। তারপরে আওয়াজ পাওয়া যায়, দমাদম কুড়াল মারছে ছইয়ের ভিতরে। ব্যাপারটা সঠিক বোঝা যায়নি গোড়ায়। কেউ ভাবছে, কুড়াল পড়ে নৌকোর কাঠে, নৌকো কেটে চেলা-চেলা করছে। কেউ ভাবে, মানুষের মাথায় পড়ছে—যে ক'জন আটকে পড়েছে, খুলি চুরমার করে দিচ্ছে তাদের। পরে আসল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। নৌকোর মধ্যে লোহার সিন্দুক—মোটা শিকলে গুড়োর সঙ্গে বাঁধা, ধানবিক্রির যাবতীয় টাকা সেই সিন্দুকে। লোহার উপর কুড়ুল মেরে মেরে শিকল কাটছে। সহজে কাটবার বস্তু নয়—গোটা দশ-বারো কোপ পড়ার পরে মূল-ব্যাপারি বলরাম সাঁই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। শিকল বুকে জড়িয়ে ধরে লম্বালম্বি হয়ে পড়ল তার উপর। পাড়ের মানুষ যা-ই ভাবুক, মানুষের মাথায় সত্যি সত্যি কুড়াল চালানো যায় না। বেচারাম লুঠেরা বটে, কিন্তু খুনি নয়। মানুষ খুন করা মহাপাপ ওদের নীতিশাস্ত্র মতে। কাজের মধ্যে দৈবাৎ খুন হয়ে গেলেও নিন্দে রটে যায় খুনি বলে, সমাজে সে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। টাকাকড়ি সোনারুপো মানুষের অর্জিত বস্তু, খোয়া গেলে কোন একদিন পূরণ হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রাণ ফেরত আসে না। যে বস্তু দেবার ক্ষমতা নেই, তাই তুমি হরণ করবে কোন বিবেচনায়?

বলরাম শিকল আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে তো কুড়াল ফেলে লাঠি ধরল এবার ওরা। পিঠের উপর দমাদম মারছে। তিলেক নড়া-চড়া নেই বলরামের— ধানের বস্তার উপর লাঠি পিটে ধুলো ঝাড়ছে যেন। এই ঘটনা পরে একদিন বেচারামই বলাধিকারীর কাছে বলেছিল। মার খেতে পারে বটে বলরাম লোকটা! নির্বিকারে মার খাওয়া দেখে মনে হয় কুম্ভকযোগ করে দেহের খোলে বাতাস পুরে ফেলেছে ফুটবলের মতো। এত বড় তাগদ তো ধান বওয়াবয়ি করে মরে কেন? শুধু এই গুণের জন্যই অনায়াসে তাকে কোন একটা দলে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। এইসব কথা মনে হয়েছিল তখন কাপ্তেন বেচা মল্লিকের।

নদীর উত্তর তীরে এদিকে রীতিমত সোর-গোল পড়ে গেছে। যত হাটুরে নৌকো এই মুখো বেয়ে আসছে। হাটখোলা অবধি খবর হয়ে গেছে—সে ঘাট থেকেও বিস্তর নৌকো খুলে দিয়েছে, দাঁড়-খোঠে বেয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটেছে, এসে ঘিরে ধরবে। এতক্ষণে সাহস পেয়ে এ-পার ও-পারের অনেক বীরপুরুষ ঝপাঝপ জলে পড়ে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। সময় নেই, মুহূর্ত আর দেরি সইবে না—

বেচারাম কোন দিকে ছিল—মারে কিছু হয় না তো ছুটে এসে খ্যাচ করে শড়কি বসিয়ে দিল বলরাম ব্যাপারির হাতের চেটোয়। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে, শিকলের

উপরের হাত আপনি আলগা হয়ে যায়। তখন আর কি! শিকল চুরমার হয়ে গেছে, মরদেরা ধরাধরি করে সিন্দুক ডিঙিতে নিয়ে ফেলে। নৌকোর উপরে নিয়ে বেড়ায় বলে সিন্দুক আয়তনে ছোট। তবু ডিঙি কাত হয়ে জল উঠে গেল খানিক। কাজ হাসিল করে মরদেরাও লাফিয়ে পড়েছে। হাতে হাতে বৈঠা,—ঝপাঝপ বৈঠা মেরে সকলের চোখের উপর ডিঙি ছুটে পালাচ্ছে।

পাড়ের মানুষ উদ্দাম হয়ে ধর্—ধর্—করে চেঁচায়। বোঠে-দাঁড়ের তাড়নায় আর সাঁতারু মানুষের দাপাদাপিতে জল তোলপাড়। বিশ-পঁচিশটা নৌকো এসে নানান দিকে ঘিরে ধরেছে। ফাঁকা নদী, আড়াল আবরু নেই। দুই তীরে মানুষ গিজগিজ করছে—ডাঙায় উঠতে হবে না যাদুমণিরা, যাবে কোন দিকে?

এমনি সময় দুড়ুম-দাড়াম বন্দুকের দেওড়। বন্দুকও রয়েছে সঙ্গে! থাকবে তো বটেই। হাটের জনতার মুখোমুখি এসে কাজে নেমেছে, আয়োজনে খুঁত রেখে আসেনি। দেশি কামারের লোহা-পেটা বন্দুক, বুলেটের বদল জালের কাঠি। রাইফেল অবধি কত সময় হার খেয়ে যায়। পুলিস ধুন্দুমার লাগিয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাঁটি অঞ্চলে এখনো এই বস্তু প্রচুর। মানুষ মারা নিয়ম নয়, তা বলে বিপদের মুখে হাত বাড়িয়ে এসে ধরা দেবে এমন অহিংস প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরোয় না কেউ বাড়ি থেকে! যত নৌকো তাড়া করে এসেছে, বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে দাঁড় তুলে থমকে দাঁড়াল। যারা সাঁতরে আসছিল, পাক খেয়ে উল্টো মুখো ঘুরল। পাড়ের মানুষ এত যে হুংকার দিচ্ছিল, নিঃশব্দ তারা এখন। যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে, বন্দুক তাদের দিকে তাক করে না বসে। এক ফালি চাঁদ কখন আকাশে উঠে গেছে, নদীজল ঝিলমিল করছে। জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ তুলে ডাকাতের ডিঙি পলকের মধ্যে অদৃশ্য।

ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো খাল-খাল। খালেরই বা কত শাখা-প্রশাখা—ধানক্ষেতের মধ্যে, পতিত জলা ও জঙ্গলের মধ্যে, মানুষের বসতির আনাচেকানাচে! তারই কোন একটায় ঢুকে পড়েছে, আবার কি! ধরা অসম্ভব। ধরতে যাওয়াও গোঁয়ার্তুমি। কোথায় কোন অন্তরালে ওত পেতে আছে—যেই না কাছে গিয়েছ, দিল ঘাড়ে লাঠির বাড়ি। কিম্বা শড়কির খোঁচা।

জগবন্ধু বলাধিকারী কাছারির দরোয়ান রামকৃপালের মুখ থেকে এই সমস্ত শুনে এসেছেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারো কাছে প্রকাশ করেন না। ক্ষুদিরামকে বাজিয়ে দেখছেন। কাছাকাছি এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, বহুদর্শী সুহৃদের পরামর্শ চাইছেন যেন তিনি : কী করা যায় বলুন ভটচাজ মশায়, আমাদের কি কর্তব্য?

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দেয় : একেবারে কিছু নয়—বেশ খানিকটা সর্ষের তেল নাকে ঢেলে ঘুমোনো। কী দরকার বলুন ব্রণ চুলকে ঘা করবার? বুঝেকেগে অনাদি দারোগা, যার এলাকায় ঘটেছে।

জগবন্ধু জেদ ধরে বলেন, কপালক্রমে সুযোগ এসে গেছে, এ আমি ছাড়ব না। দলসুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে দেব, অকথা-কুকথা রটানোর শোধ তুলব। যতই হোক, বিদেশি মানুষ আমি। আপনি অনেককাল ধরে আছেন, অঞ্চলের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানা। আপনাকে সহায় হতে হবে, সেইজন্যে বলছি। অনাদি সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, কেস গোলমাল করে দিতে পারে। নির্ঘাৎ সেই চেষ্টা করবে। যাতে না পারে, আমাদের দেখতে হবে সেটা।

ক্ষুদিরাম বলে, সেটা হবে কিন্তু বিড়াল কাঁধে নিয়ে ইঁদুর-শিকারের মতো। বিড়াল ঠেকাতেই জ্বালাতন হয়ে উঠবেন। দরকারটা কি, বুঝিনে। বেচা মল্লিক রেগে গিয়ে এটা-ওটা হয়তো বলছে, কিন্তু মানুষটা আসলে খারাপ নয়। মন বড় দরাজ। মেয়ের বিয়ের দিন তার কিছু পরিচয় দেখলেন। আমি গিয়ে শরণ নিলাম, লোকজন লাগিয়ে রাত্তির-বেলা দায় উদ্ধার করে গেল। রাজাবাদশার মেজাজ। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাও শুনুন তবে।

ক্ষুদিরাম তখন খুলনা শহরে। গ্রাম ছেড়ে শহরের উপর আস্তানা নিতে বাধ্য হয়েছে। বাপ চেষ্টাচরিত্র করে আদালতের সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। চাকরি করে, আর সকাল-সন্ধ্যা জ্যোতিষের চর্চা করে। নামও হয়েছে কিছু কিছু। শোনা গেল, কাপ্তেন বেচা মল্লিক কী একটা কাজে খুলনায় এসেছে।

ক্ষুদিরামেরই এক মক্কেল খবরটা এনে দিল। অনেক দিন থেকেই মল্লিকের কাছে যাবার ইচ্ছা। সুযোগ পেয়ে ক্ষুদিরাম বাসায় এসে পড়ল।

কপাল-ভরা চন্দন, নগ্ন দেহে ধবধবে সুস্পষ্ট উপবীত। একজনে পরিচয় বলে দিল, সামুদ্রিকাচার্যমশায়—

বেচা মল্লিক তাড়াতাড়ি পদধূলি নেয়। জিনের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ-করা নোট একখানা ক্ষুদিরামের হাতে দিল।

ক্ষুদিরাম তটস্থ হয়ে বলে, এ কী? টাকার জন্য আসিনি আপনার কাছে।

বেচা মল্লিক বলে, ব্রাহ্মণের পায়ে শুধো প্রণাম চলে না। নিয়ে নিন, ফেরত দেবেন না।

দেখছিয়ে ভক্তিমান, সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ কথাটুকু অনুনয় কি তর্জন বোঝা যায় না। নোটখানা ক্ষুদিরাম ভয়ে ভয়ে গাঁটে গুঁজে ফেলল।

বাড়ি ফিরে দেখে এক-শ টাকার নম্বরি নোট (একশ টাকার তখন অনেক দাম, এখনকার সঙ্গে তুলনা করবেন না)। ভুল করে দিয়েছে নিশ্চয়। হন্তদন্ত করে ক্ষুদিরাম আবার ছুটল।

বেচা মল্লিক দেখে বলে, কম হল এবারে, তা জানি। এর পরে এসে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো। হাতও দেখাব তখন।

কম কি বলছেন। নোট একশ টাকার।

তাই নাকি? দু-পকেটে দুই রকমের নোট। বড়খানা তবে আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।

অসুবিধা হবে খুব। কেনাকাটার গরজ ছিল, এবারে আর হবে না।

ক্ষুদিরাম বলে, ফেরত দিতে এসেছি। ছোট যা আছে তাই না হয় একটা দিন আমার।

আপনার অদৃষ্টে গেছে। একবার হাত থেকে বেরুলে মল্লিক সে জিনিস আর ছোঁয় না। বাড়ি চলে যান ঠাকুর, ভ্যানর-ভ্যানর করবেন না।

সেই উগ্র কণ্ঠ। ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

বলাধিকারীকে বলছে, মল্লিক লোকটার মনে যেন আলাদা আলাদা দুই কুঠুরি। ভালোয় মন্দয় মিশাল সাধারণ দশজনার মতো সে নয়। ভালো যখন, অতখানি ভালো কেউ হয় না। অশ্বত্থের মতো ছায়া দিয়ে রাখবে, গায়ে আঁচ পড়তে দেবে না। মন্দ হল তো আসল কালকেউটে। মেরে একেবারে সাবাড় করতে পারেন তো করুন। খুব ভাল সেটা, লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু খবরদার, ঘাঁটা দিয়ে রাখবেন না। আপনি আমায় ভালবাসেন বড়বাবু, মা-ঠাকরুনও বিশেষ খাতির করেন। সকলের মুখ চেয়ে মানা করছি।

কথাটা মনে ধরেনি, বলাধিকারীর মুখ দেখে বলা যায়। ক্ষুদিরাম নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনাকে আমি কি বুদ্ধি দিতে পারি? পূর্বাপর দেখুন সমস্ত ভেবে। যা করবেন সাথেসঙ্গে আছি, কেনা গোলাম বিবেচনা করবেন আমায়।

জগবন্ধু যত ভাবছেন, জেদ আরও চেপে যাচ্ছে। আর একটা খবর বলেননি ক্ষুদিরামের কাছে। কারো কাছে প্রকাশ করে বলবার নয়। এমন কি ভুবনেশ্বরীর কাছেও বলতে ইচ্ছে করে না। সদরে ডি এস পি ও এস পি-র কাছে বিস্তর বেনামি চিঠি গেছে তাঁর বিরুদ্ধে—এসব পুরানো কথা। এখন জানা গেল, কলকাতায় ইন্সপেক্টর জেনারেল অবধি চলে গেছে চিঠি। যদু-মধুর দ্বারা এত দূর হয় না, দস্তুরমত পাকা লোক পিছনে। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকারই সম্ভবত। এতকাল মনের আনন্দে এক-একটা থানা-সরোবরে হংস হয়ে মৃণাল তুলে খেয়ে এসেছে, দলের ভিতর একটা বক এসে পড়ে বাঁধা-নিয়মের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দিল। জগবন্ধু বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছেন, এনকোয়ারির তোড়জোড় হচ্ছে ঐসব চিঠির অভিযোগ সম্পর্কে। সেই অবধি যদি গড়ায় ফল যে রকমই হোক—মান প্রতিপত্তি আর ধর্মপথের অহংকার নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবেন না আর তিনি। উপরওয়ালার সন্দেহ অঙ্কুরে বিনাশ করবেন বেচা মল্লিককে জেলে পুরে। মেয়ের বিয়ের সময় যে ভুল করেছেন, সেই কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাবে। অদৃষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে এই সাঙ্ঘাতিক সময়টায়। এ সুযোগ নষ্ট হতে দেবেন না।

আরও একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল। গাবতলি জায়গাটা ঝিনুকপোতার বটে, কিন্তু বলরাম ব্যাপারির বাড়ি জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে। পথঘাটের খোঁজ নেওয়া হল। অতিশয় দুর্গম গ্রাম—দূরও বটে। গাঙ-খাল নেই যে নৌকো চেপে যাবেন। ডাঙার পথও নেই। ধান কেটে-নেওয়া দিকচিহ্নহীন ক্ষেত—ক্ষেতের সরু আলপথ, এবং খানিকটা বা গরু-চলাচলের পথ ধরে বিস্তর কষ্টে যেতে হয়।

বলরামের পাত্তা নেই সেই ঘটনার পর থেকে। ফেরারি। সাঙড়-নৌকো মাঝি বিহনে ভাসতে ভাসতে বাঁকের মুখে চড়ার উপর উঠে গেছে, পাটার উপর বলরাম আহত হাত চেপে ধরে আর্তনাদ করছে, এমনি সময় হাট-ফিরতি কোন এক আত্মীয়জন দেখতে পেয়ে টুক করে তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে চলে গেল। হাঙ্গামা চুকেবুকে যাওয়ার পর জমিদারি-কাছারির পাইক-বরকন্দাজ নৌকোর খোঁজ করে কাছারির নিচে এনে নোঙর করে রাখল। পরের দিন ঝিনুকমারির ছোটবাবু এবং সিপাহিরা তদন্তে এসে মাল্লা একটিকে পেয়ে গেল। কিন্তু আসল জন—বলরাম ব্যাপারিই গায়েব। ডাকাতি তার উপরে যেন হয়নি, সেই যেন ডাকাত।

তা-ও ঠিক নয়। ডাকাত এসে একদফা লুটেপুটে নিয়ে গেছে, তার উপরে আবার দ্বিতীয় দফা ডাকাতির আতঙ্ক। থানা-পুলিস অনেক বড় ডাকাত, বেচা মল্লিক কোথায় লাগে! ডাকাতির পদ্ধতিটা কিছু স্বতন্ত্র। যে মাল্লাটাকে পেয়ে গেছে খোদ অনাদি সরকার সমারোহে চলে গেলেন তার

বাড়ি। ঘোড়ার পিঠে গিয়েছিলেন। ঘোড়ার খোরাকি সহিসের খরচা সিপাহির বার-বরদারি এবং বড়বাবুর প্রণামি—একগন্ডা হাঁস বিক্রি করে দায় মেটাতে হল। একটা দিনেই শেষ হল না, চলবে তো এই এখন। ডিটেমাটি বন্ধক পড়বার গতিক। সামান্য এক মাল্লামানুষ নিয়ে এই, মূল-ব্যাপারিকে পেয়ে গেলে কী কান্ড করবে ভেবে হৃৎকম্প হয়। টাকাকড়ি গেছে—ব্যবসায়-বাণিজ্য করে সামলে উঠবে হয়তো একদিন। হাতখানা জখম করে গেছে, তাও সারবে। কিন্তু পুলিসের কবলে পড়লে যা-কিছু আছে সে তো যাবেই, তার উপরে কাজকর্ম ছেড়ে থানা-আদালত করে বেড়াও কমপক্ষে এখন দুটি বছর। একলা বলরাম ব্যাপারি নয় অঞ্চলের যাবতীয় মানুষের মোটামুটি মনোভাব এই। চাপাচাপি কর তো যমালয়ে যেতে রাজি আছে, থানার পথে কদাপি নয়।

জগবন্ধুরও জেদ চেপেছে। চুপিচুপি বলরামের গাঁয়ে চললেন। সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও দুটি কনেস্টবল। সামান্য সাধারণ লোক যেন, সাদা পোশাক সকলের। ঘোড়া নিলেন না—ঘোড়ায় চেপে দারোগাবাবু চলেছেন, সাড়া পড়ে যাবে। মড়ক লাগলে যেমন হয়, মুখে মুখে ছুটবে দুঃসংবাদ। বলরাম যেখানেই থাক, টের পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে।

কত কষ্টে যে পৌঁছলেন, সে জানেন জগবন্ধু দারোগা আর তাঁর অন্তর্যামী। কনেস্টবল দুটো দীঘির পাড়ে ঘাসের উপর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। ক্ষুদিরামের কাঁধে লাঠি। লাঠির মাথায় তালি-দেওয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আজেবাজে খাতা ও ছাপা কাগজপত্র সেই ব্যাগে। গ্রামে এসে বলরামের বাড়িরও খোঁজ হয়েছে। দুজনে ঢুকে পড়লেন।

বলরাম সাঁইয়ের বাড়ি এটা ?

একটি লোক ছুটে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। পরিচয় পাওয়া গেল, সম্পর্কে বলরামের মামা।

কিছুদিন আগে সেটেলমেন্টের মাপজোপ হয়ে গেছে। ক্ষুদিরামের কাঁধের ব্যাগ খুলে কিছু কাগজপত্র নেড়েচেড়ে জগবন্ধু বললেন, জরিপের লোক আমরা, বলরাম সাঁইয়ের খোঁজে এসেছি। তোমায় দিয়ে হবে না তো মাতুলমশায়, বলরামকে ডাকো। তার কাছে দরকার।

মামা বলে, কোথায় বলরাম, আমরা কেউ জানি নে। তাকে পাওয়া যাবে না।

একটা ছাপা কাগজ তুলে নিয়ে পেন্সিলের টানে জগবন্ধু খচখচ করে কয়েক ছত্র কাটলেন। লিখলেনও কি খানিকটা। মামা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জগবন্ধুই বলে দিলেন, পর্চা থেকে নাম কাটা গেল। কেউ তোমরা ক্ষেতখামারে যাবে না। ধান যা আছে, মলে ডলে জমিদারি-কাছারির গোলা-জাত হয়ে থাকুক। বুজরাতের আগে বোঝা-পড়া হবে না।

বাড়ির বাচ্চাগুলো অবধি ঘিরে এসে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রীলোকেরা অন্তরালে। মামা বলে, কেন, আমাদের ধান কাছারির গোলায় কি জন্য উঠবে ? জমির খাজনা-সেস হাল সন অবধি শোধ। ধারদেনা ভাগ্নে আমার বরদাস্ত করতে পারে না।

জগবন্ধু বলেন, সে বুঝলাম, কিন্তু ভাগ্নেই তো ফৌত। আমাদের অফিসে খবর হল, ডাকাতে কেটে দুই খন্ড করে গাঙের জলে ফেলে দিয়েছে। তদন্তে এসেও তাই দেখছি। পর্চার নাম না কেটে কি করি। জমির ধান আপাতত উপরের মালিকের জিম্মায় থাকবে। ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয়ে কাগজপত্রের সংশোধন হোক, তারপরে জমির দখল।

চাষা-মানুষের জমি তো দেহের অংগ। ভিতরে যারা উৎকর্ণ হয়ে আছে, ছটফটানি লেগে গেছে তাদের মধ্যেও। একবার সেদিক থেকে ঘুরে এসে মামা সকাতরে বলে, ভুল খবর পেয়ে এসেছেন বাবুমশায়রা। কাছারি থেকেই রটাচ্ছে হয়তো। ভাগ্নে আমার আছে।

জগবন্ধু গম্ভীর হয়ে বলেন, দেখাও তবে। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত রায় উল্টাতে পারি নে।

মামা ছুটোছুটি করে দুখানা জলচৌকি এনে দিল। বলে, যাবেন না হুজুরগণ, একটুখানি বসুন।

জগবন্ধু স্মিতদৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন, অষুধ ধরেছে কি বলেন ভটচাজ ?

ক্ষুদিরাম বলে, গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

শলাপরামর্শ হচ্ছে সকলের সংগে। বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। দেরি বলেই ভরসা। এক কথায় কেটে দেবার হলে তাড়াতাড়ি ফিরত।

ঠিক তাই। ফিরে এসে মামা লোকটা আমতা-আমতা করেঃ থানায় টের পাবে না তো হুজুর ?

জগবন্ধু সাহস দিচ্ছেন ঃ কী আশ্চর্য ! তোমরা ভাব, সরকারি লোক হলেই বুঝি এক-দেহ এক-দিল? ঠিক উল্টো। সরকারের হাজার-লাখো ডিপার্টমেন্ট— আদায়-কাঁচকলায় পরস্পর। ঘুস খেয়ে খেয়ে থানার ইঁদুরগুলোর অবধি ঐরাবতের সাইজ। ওদের উপর টেক্কা মারব বলেই তো এসেছি। আমাদের কাগজপত্র নির্ভুল হয়ে থাক, আর থানাওয়ালারা বেকুব হোক অপদার্থ বলে বদনাম রটুক, সেইটেই তো চাচ্ছি আমরা।

বিস্তর বলাবলি এবং বহু রকমের প্রতিশ্রুতির পর মামা বলে, আসুন তবে হুজুরগণ। এ বাড়ি নেই, খানিকটা দূরে হবে—

পাড়ার মধ্যেও নয়—ভিন্ন পাড়ায় একজনের গোয়ালঘরে কাঠকুটো রাখার মাচা, তার উপরে বলরাম গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। পাড়াগাঁয়ে চালিত পাতামুঠোর চিকিৎসা—নানা রকম পাতা ও শিকড়বাকড় বেটে ঘায়ের উপর লাগিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে রেখেছে। এ চিকিৎসায় সারে না যে এমন নয়—

জগবন্ধু অমায়িক সুরে প্রশ্ন করেন, কেমন আছ বলরাম ? হাত সারল ভাল করে ?

গায়ে জ্বর খুব। ন্যাকড়া খুলে ঘায়ের অবস্থাও দেখলেন। দেখে শিউরে ওঠেন ঃ কী সর্বনাশ! হাসপাতালে না গিয়ে বড় অন্যায় করেছ বলরাম। এক পয়সা তো খরচা নেই। সরকার হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছে লোকে যাতে মাংনা চিকিচ্ছে পায়।

ন্যাকড়া তুলতে গিয়ে কিছু আঘাত লেগে থাকবে। বলরাম উঃ-আঃ—করছে। জবাবটা মামাই দিয়ে দেয় ঃ ঘা চিকিচ্ছে হয়ে তারপরে কি বাড়ি ফিরতে দিত হুজুর ? থানা-পুলিস হাকিম-আদালত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলত। হাতের যন্ত্রণার চেয়ে ঢের ঢের বেশি যন্ত্রণা। গেরোর ফের—নয়তো ভাল মানুষে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড়দলের বন্দরে ফিরছে, পথের মাঝে এমনধারা হতে যাবে কেন ?

ক্ষুদিরাম ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। বন্দোবস্ত তাই। ক্লান্ত সেই দুই পাথিক দীঘির ধারে পুঁটলি মাথায় শুয়ে ছিল, তড়াক করে উঠে পুঁটলি খুলে পাগড়ি-পোশাক পরে দস্তুরমতো কনেস্টবল। ক্ষুদিরামের পিছন পিছন হুড়মুড় করে সেই গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল।

মামা বলছে, ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে এক অংগে জখম নিয়ে ফিরে এল, এর পর আবার যদি পুলিসের হাতে পড়ে, প্রাণটুকুও থাকবে না। পুলিসে না টের পায় সেইটে দয়া করবেন হুজুর।

জগবন্ধু এইবার আত্মপ্রকাশ করলেন ঃ আমিই পুলিস। প্রমাণস্বরূপ কনেস্টবল দুটিকে দেখিয়ে দিলেন। ভাগ্নে ও মামা যুগপৎ আর্তনাদ করে উঠল, নৌকোয় ডাকাত পড়বার সময় যেমনধারা করেছিল। দ্বিতীয় আক্রমণ এবার।

মামা সাঁ করে ছুটে বেরিয়েছে। বলরামও নেমে পড়ল মাচা থেকে। জখমি হাতটা অন্য হাতে চেপে ধরে জগবন্ধুর গায়ে মাথা কুটছে ঃ বড়বাবু, আমায় রক্ষে করুন। আপনি ধর্মবাপ।

জগবন্ধু কিছুতে শান্ত করতে পারেন না। এমনি সময় মামাও ঢুকে পড়ে পায়ের উপর দণ্ডবৎ। হকচকিয়ে গেলেন জগবন্ধু। উঠে পড়তে দেখা গেল পাঁচটা রুপোর টাকা পদতলে সাজানো রয়েছে।

জগবন্ধু ভ্রুকুটি করলেন ঃ কি এ সব ?

এই নিয়ে ক্ষমা দিয়ে যান। ভাগ্নে হাসপাতালে যাবে না বড়বাবু, এমনি এমনি ভাল হয়ে যাবে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগবন্ধু টাকা তুলে ছুঁড়ে দিলেন তার গায়ে। ব্যাকুল হয়ে মামা দিব্যিদিশেলা করেঃ এই পাঁচের উপর যদি আধেলা পয়সাও ঘরে থাকে তো বাপের হাড়। বাপের নাম নিয়ে দিব্যি করলাম বড়বাবু, বিশ্বাস করুন। কড়ার রইল, আরও পাঁচটা টাকা শ্রীচরণে নিবেদন করে আসব। এই মাসের ভিতরেই। কথার যদি খেলাপ হয়, মাস অন্তে শুধু ভাগ্নে কেন আমায় অবধি হাতে-দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবেন। ফাটকে হোক, হাসপাতালে হোক যেখানে খুশি পুরে দেবেন, কথাটি বলব না।

জগবন্ধু কঠিন হয়ে বলেন, লক্ষ টাকা

গণে দিলেও হবে না। শত্রুরা যাই রটাক, লোভ দেখিয়ে আমায় কেউ সত্যপথ থেকে টলাতে পারবে না। কথা দিচ্ছি, এতটুকু ঝামেলা পোহাতে হবে না তোমাদের, একটি পয়সা খরচ হবে না। সরকার সমস্ত দেবে; তার বাইরে যদি কিছু লাগে, আমি দেব নিজের পকেট থেকে। হাসপাতালের বড় ডাক্তার চিকিচ্ছে করবে, তাজা মানুষ হয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ফিরবে বলরাম। আর বেচা মল্লিকের কাপ্তেনি ঘুচিয়ে নাকে-খত দেওয়াব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। লোকের হাড় জুড়োবে। যা করবার, আমরাই সব করব সরকারের তরফ থেকে, তুমি শুধু সাক্ষি দিয়ে আসবে, বলরাম। প্রধান সাক্ষি বলরাম সাঁই। একটি কথাও মিথ্যে বলতে হবে না, গড়োপিঠে সাক্ষী বানাতে আমি দিইনে। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল, সেই কথা কটা বলে তুমি খালাস।

মাপ হল না কিছুতে। বাড়িতে মড়াকান্না পড়ে গেল। ডুলিতে তুলে দুই পাশে দুই সিপাহী দিয়ে বলরামকে খুলনা সদরের হাসপাতালে নিয়ে চলল।

(ক্রমশ)

তেজপুর ও তার পরে

অজিতকুমার দাশ

১৯৫৯ সালে প্রায় একমাস তেজপুরে কাটিয়ে গিয়েছিলাম। তখন তেজপুরের পথে দালাই লামা ভারতবর্ষের জনপদে প্রবেশ করেছিলেন। এসেছিলেন তোয়াং, বমডিলা-র পথে। ফুটহিলসে সাংবাদিকরা এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর হিমালয় অভিযানের শেষ পর্যায়ে. তেজপুরে স্পেশ্যাল ট্রেনে উঠে মুশৌরী যাত্রার পথে।

আবার তেজপুরে এসেছি। পেশাগতভাবে উদ্দেশ্য একই। সংবাদ সংগ্রহ। কিন্তু পট-ভূমি সম্পূর্ণ আলাদা। এবারে এসেছি যারা ভারতভূমিতে পাকাপাকিভাবে এসে অধিকার করতে চায় তাদের রুখবার জন্য ভারতীয় জওয়ানদের সংগ্রাম ও বিপক্ষের আক্রমণের খবর নিতে এবং পাঠাতে।

সত্যি কথা বলতে কি, এই দুটো বড় ঘটনার মধ্যে আরও একবার মন তেজপুরের দিকে চলে গিয়েছিল। সেদিন তেজপুর থেকে বাঙালীরা বিদায় নিচ্ছিলেন অতর্কিত আক্রমণ ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা থেকে প্রাণ নিয়ে বাঁচার জন্য। হয়তো একথা এখন না তুললেও চলত। কিন্তু যা মনে এল লিখতে গেলে এটা বাদ দেয়া যায় না।

এরপরে আরেকবার সেদিন তেজপুর ছাড়বার ঝড় উঠেছিল। এই ঝড়ে দুদিন বা তিনদিনের মধ্যে তেজপুর প্রায় সাফ হয়ে যায়। ২০শে নভেম্বরের থেকে শুরু করে সরকারী নির্দেশে ও সমর্থনে এবং অনেকটা সরকারী কর্মচারীদের "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" এই মনোবৃত্তির ফলে শহর ও তার উপকণ্ঠ এবং পার্শ্ববর্তী জনপদ যেভাবে বাস ও ব্যবসা ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে-ছিল তার কথা বলছি। এই সরকারী নির্দেশের জন্য কে দায়ী সে প্রশ্নের উত্তর সরকার খুঁজবেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সরকারী অপদার্থতা যে দেশবাসীকে বিপদের সময় কত বিমূঢ়, বীর্যহীন করে দিতে পারে তেজপুরে না এলে তার খবর পুরোটা জানা যেত না।

লন্ডন ডেইলী এক্সপ্রেসের সংবাদদাতার ভাষায় ২০শে থেকে ২২শে নবেম্বর তেজ-পুরে তিন জাতীয় লোক ছিল--"জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া কয়েদীরা, পাগলের দল আর কিছুসংখ্যক সাংবাদিক।" আমার মনে হয় মিঃ ইয়ংহাসবেন্ড দু-দল লোক লিখলেই পারতেন—"পাগল ও কয়েদী"। পাগলদের দলে সাংবাদিকদের ফেললে খুব ভুল হ'ত না। এই কারবারের কারবারি হয়েও একথা বলতে আমার বাধছে না। এই পাগলামীর নমুনা দুটো দেব। তেজপুর যখন খালি হয়ে গেল, গোহাটীর এরোড্রমে যখন তেজপুর থেকে পালানো শরণার্থীর ভিড়ের তুলনা নেই, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স যখন সাময়িকভাবে তেজপুরের সার্ভিস বন্ধ করে দিলেন তখন দিল্লী থেকে দুজন সাংবাদিক তেজপুরের অবস্থা জানবার জন্য ছুটে যেতে চাইলেন। দিল্লী থেকে কলকাতা হয়ে তেজপুর যাওয়ার পথই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কলকাতায় আসার প্লেনের টিকিট পাওয়া গেল না। তাই বলে কি বসে থাকা যায়? একজন দিল্লী থেকে করাচীর টিকিট কেটে করাচী গেলেন। করাচী থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্লেন ধরে কলকাতায় এলেন। অন্য জন করাচীর দিকে যাওয়ার চাইতে ব্যাংকক হয়ে কলকাতা আসা সহজ মনে করলেন এবং ক'রলেনও তাই।

যাক্। সত্যি, ২০শে নবেম্বর তেজপুরে শুধু পাগল, কয়েদী বা সাংবাদিকের গুটি-কয়েকই ছিলেন না। আমি অন্তত জানি ২১ জন যুবকও ছিলেন। এ'দের কথা কোথাও লেখা হয়নি। কিন্তু বলা দরকার। ২০শে তেজপুরের কোতোয়ালী থানা খালি হয়ে গেল। চারিদিকের পল্লীগ্রাম ফাঁকা। রাস্তাঘাট জনমানবহীন। শত্রু যত দূরেই থাক তাদের আসার সম্ভাবনা এমনি পরিবেশে খানিকটা বেশীরকমের বাস্তবের রূপই নেয়। এরই মধ্যে একটি যুব-নেতা বললেন, "আমরা শহর চালাবো।" তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আরও কয়েকজনকে ডেকে বললেন—"আমরা যাব না। চল, আমরাই রাতটার মত শহর প্রতিরক্ষার ভার নিই।" থানায় এরা এল। একজন থানার ভার নিল, কয়েকজন নগর প্রদক্ষিণের ভার নিল, আর কয়েকজন ছুটল দু-একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে ফিরিয়ে আনতে। ব্রহ্মপুত্র ঘাটে এই সরকারী বীর পুঙ্গবদের দু-একজনকে পলায়নরত অবস্থায় পাওয়া গেল। তেজ-পুরের কয়েকটি রক-বাজ ছেলে প্যান্টপরা এই বীরদের কাছা ধরে ঝুলে পড়ল—"যেতে নাহি দেব।" বরাবর এই লোকগুলিই শহরের ভবঘুরেদের শাসন করেছে। আজ ভবঘুরেরাই শাসনের ভার নিল। বলল, "ফিরে চলুন। আমাদের মত সমাজ-দ্রোহীদের আজ তেজপুরের রাস্তায় ঘাটে সামলাবে কে?"

মনপা শিশুরদল শরণার্থী হয়ে চলে এসেছে

রাস্তায় ঘাটে তখন স্বাধীন কয়েদীদের চলাফেরা একদম থামেনি, তবু কিন্তু চুরি-ডাকাতি মোটেই হয়নি। একটি দোকানের দরজার তালা ভাঙা হয়েছিল। কারণ সেটি ছিল রেস্টুরেন্ট। ছেলেরা বলল—"শালারা চলে গেছে আবার উনুন, চা-পাতা, চিনি তালা দিয়ে। ভাঙ্ তালা। একটু চা কর্ যেভাবে হয়।"

২১ জনের দল কিছুই নয়। তবু মনে হয় এ কয় সপ্তাহের অনেক সামরিক এবং বেসামরিক অফিসারদের চাইতে এদের কৃতিত্ব কম নয়। বেশী কিনা সেটা পাঠক বিচার করবেন।

২১শে সকাল নটায় কাছা ধরে হ্যাঁচকা টানের ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষের এবং সম্ভবত আসাম সরকার ও ভারত সরকারের দাবিতে ২০শে রাত ন'টা থেকে ২১শে সকাল ন'টা—১২ ঘণ্টা স্বেচ্ছাসেবকদের ঘাঁটি আগলাবার পর এক-আধজন লালপাগড়ী এবং বিভিন্ন বিভাগের দু-একজন বড়-কর্তার দেখা মিলল।

"এখন আপনারা কি করছেন?" এ প্রশ্ন করি ২৬শে নবেম্বর।

"আমরা এখন একটা দল গড়েছি। ভগবান না করুন, যদি শত্রু কোনওদিন আসেই—তেজপুরে থেকে যাব, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বাধা দেব। আর কি করছি জানেন? নেহাত-জানা দাগী আসামীদের খুঁজতে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি এবং বলছি—অনেক হয়েছে, এবার ফিরে চল তোমাদের জায়গায়।"

তেজপুরের এই ২১ জন যুবকের কথা বলতে গিয়ে আরও শত শত এই ধরনের তরুণ-তরুণীদের কথা মনে পড়ে। তেজপুর ছাড়বার নির্দেশ আসবার আগে তো খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এদের ছবি বেরিয়েছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে, বিশেষ করে নিজেদের শহরকে রক্ষা করবার জন্য এরা রাইফেল ছুড়তে শিখছে, ড্রিল করছে। কোথায় গেল এরা? কেন গেল? এর জন্য দায়িত্ব কতখানি এদের নিজেদের, কতখানি সমাজের? বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের? সামরিক কর্তৃপক্ষের?

বলা হয়েছে, এদের তেজপুর ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই ছেলেমেয়েরা বাপ-মা ও সরকারের একান্ত বাধ্য বশংবদ হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। কেন এদের বলা হ'ল? আর বললেও কি সবাই তক্ষুনি চলে যাবে? রাইফেল-হাতে মেয়েদের ছবিও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা কি শুধু লোক-দেখানো ব্যাপার?

এসব প্রশ্নের দরকার আছে। কারণ শ[illegible] শত তেজপুর [illegible] এবং শেষ মুহূর্তে তাদের [illegible] তেজের পরীক্ষা দিতে হবে। দুঃখের সঙ্গে এ-কথা বলতে হয় যে, তরুণ-তরুণী বা দেশের অন্যদের যত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও, অন্তর থেকে আমরা এই ব্যবস্থাকে সত্যিকারের জোরালো করতে পারিনি।

—কিন্তু সত্যিই কি তাই? একটা উদাহরণেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে। ছেলেমেয়েদের আমরা রাইফেল ধরতে, সম্ভবত চালাতেও শিখিয়েছি। কিন্তু রাইফেল দিইনি। রাইফেলের অভাব থাকলেও অন্তত বিপদের মুখে যাতে কিছু রাইফেল পেতে পারি, তার ব্যবস্থা করিনি। যখন সত্যিকারের দরকার হবে, তখন এদের জন্য কোনও যানবাহনের ব্যবস্থাই করিনি। যদি এই সব ছেলেমেয়েদের বলা হ'ত, যখন সবাই শহর ছেড়ে যেতে থাকবে, তোমরা অমুক জায়গায় একত্র হবে—তোমাদের জন্য এখানে অস্ত্রশস্ত্র থাকবে—দু-একটা জীপও থাকবে। কিন্তু তা হয়নি। পালাবার জন্য সব বে-সামরিক জীপকে ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি, এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের গাড়িটি 'চুরি' করেও কেউ পালিয়েছে। আর [illegible] [illegible] "[illegible] জন্য [illegible]" [illegible] শান্তির সময়ে আস্ফালন করেনি, [illegible]

দেয়নি, সস্তা প্রচারের প্রচেষ্টা করেনি, অথচ পরিত্যক্ত নগরীতে, নিজের মাতৃভূমিতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শেষ অবস্থাটা দেখে যেতে চেয়েছে, সাইকেল করে তাদের মাইলের পর মাইল ঘোরাফেরা করতে হয়েছে।

তেজপুর ছেড়ে এবার গৌহাটীর কথায় আসা যাক। গৌহাটী স্টেডিয়ামে গৌহাটী রাইফেল ক্লাব শহরের ছেলে-মেয়েদের রাইফেল চালনা শেখাচ্ছেন। শিক্ষক শিক্ষার্থী দু দলেরই অফুরন্ত উৎসাহ। কিন্তু সেখানোটা ব্যাহত হচ্ছে রাইফেল ও বুলেটের অভাবে। কোনওদিন রাইফেল ধরিনি, কলম ও ক্যামেরা চালাবার অপচেষ্টা করে চলেছি। তবু সেদিন গৌহাটীতে মনে হ'ল, রাইফেল চালানোটা শিখে নিই। রাইফেলে আমার প্রথম দীক্ষা হ'ল। দুটো বুলেট খরচ করলাম। দেহে মনে অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করলাম। আবার একটা অপরাধবোধও জাগল। আমি তো চূড়ান্ত দুঃসময়েই রাইফেল ধরতে পারব না। হয়তো টাইপরাইটারের দিকে ছুটতে হবে। ওই দুটো রাইফেলের বুলেটে আরেকজন শিখতে পারত। আমি দুটো বুলেটের গুলী নষ্ট করলাম।

অনেকে মন্তব্য করবেন যে, এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, কত বুলেট নষ্ট হয়। ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের জনসাধারণের প্রস্তুতি সম্পর্কে রসদের এমনি টানাটানিই দেখান হয়। অথচ তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র যখন আনা হয়, তখন বে-সামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য কেন আনা হয় না? কেন তেজপুরের প্রতিটি সং যুবক-যুবতীর বাড়িতে একটি করে রাইফেল বা হাত-বোমা রাখা হয় না, যাতে দরকারের সময় খুঁজে বেড়াতে না হয়? দেশে ইমার্জেন্সি চলছে। তবে তেমনি ব্যবস্থা হোক। শুধু রাইফেল ট্রেনিং সবাইকে নিতে হবে বললে হবে না—দেশের তরুণ-তরুণীকে আশ্বাস দিতে হবে, প্রয়োজনের সময় তুমি রাইফেল পাবে, হাতবোমা পাবে।

তেজপুরের সেই উড়নচণ্ডী দেশ-না-ছাড়া তথাকথিত দায়িত্বজ্ঞানহীন যে কয়টা ছোঁড়া সেদিন রাতে শহর চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রতিরোধের জন্য কি করছেন?" বললে "বিষ মাখানো তীর তৈরি করছি সার—!"

শুনে কষ্ট হ'ল এখনও ১৯৬২ সালের ২৬শে নভেম্বর আমাদের ছেলেদের তীর-ধনুকের দিকে হাত বাড়াতে হয়, কারণ তাদের হাতে আত্মরক্ষার জন্য, দেশরক্ষার জন্য আমরা অস্ত্রশস্ত্র দিতে পারি না।

এখানে তেজপুরে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের মেলা বসে গেছে। এ'দের মধ্যে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের বন্ধু আর্থার বনার আছেন। খাদি পরেন। বহুদিন এ দেশে থেকে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। আবার চীনা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিলেন। অনেকদিন আচার্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে ঘুরেছেন। ডাল, ভাত, তরকারি ভালবাসেন, এখানে এসেও জিজ্ঞাসা করেছেন, কোথায় বেশ বাঙালী খানা পাওয়া যাবে। ওঁর মেয়ের ডাল, দই ছাড়া ভাত মুখে ওঠে না। প্রথম

তেজপুরবাসী শহর ত্যাগ করে চলেছে নওগাঁর পথে।

আসামে রাইফেলচালনা শিক্ষারত নারী হোমগার্ড।

যেবার আমাদের নিরস্ত্র গোয়া অভিযান হয় এবং পর্তুগীজ সৈন্যরা ভারতীয় সত্যাগ্রহী-দের অনেককে গুলী করে মারে, তখন পর্তুগীজ এলাকায় গিয়ে দুজন আমেরিকান সাংবাদিক ভারতীয় আহত ও মৃত সত্যাগ্রহীদের হাতে পায়ে ধরে ঝুলিয়ে ভারতের সীমান্ত পার করে এনেছিলেন। তাঁদের একজন আমার বহুদিনের সহকর্মী ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের তখন-কার ভারতীয় ম্যানেজার ও দিল্লির সংবাদদাতা জন ল্যাভাচেক। অন্যজন আর্থার বনার। একেবারে খাঁটি ভারতবন্ধু।

আজ সকালে তেজপুরের "প্রান্তিক" হোটেলে চা খেতে বসেছি। সাড়ে সাতটায় বাংলা সংবাদ আরম্ভ হ'ল। প্রান্তিক বরাবরই খোলা রয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়নি, মাছের টুকরোর সাইজ ছোট করেনি। সত্যিকারের দেশ-সেবা করছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা যা সরকারী বাহবার তোয়াক্কা না রেখে।

প্রান্তিক হোটেলে ঢুকতেই তিনটি বড় বড় ছবি চোখে পড়ে। মাঝখানেরটি মহাত্মা গান্ধীর। ডান দিকেরটি সর্দার প্যাটেলের, বাঁ দিকেরটি নেতাজীর।

আর্থার ঢুকলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বই লিখবার জন্য অনেকদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, সাহিত্যিক, সমাজ-সেবী অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ঢুকেই বললেন— "এই যে বাংলা খবর হচ্ছে দেখছি। বাংলা মতেই আমি আজ ভোরে আমার দিনটি শুরু করব 'পুজো' করে।" বলেই তিনটি ছবির মধ্যে নেতাজীকে বেছে নিয়ে যুক্তকরে নমস্কার জানালেন।

যে-সব কথা এখানে লিখেছি খুব উত্তেজিত হয়ে সে-সব আলোচনাই করলাম। মাত্র কিছুক্ষণ আগে। আমাদের প্রস্তুতিতে সেই ছেলেবেলার "দোয়াত আছে কালি নাই" কথাটা বারবার মনে হ'ল। আর্থার বলে, ভারতের সমস্যা হ'ল—বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ, সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং জন-সাধারণ এদের তিন পক্ষই ঠিক আছে ধরে নিলেও একথা বলা চলে যে, এদের মধ্যে কোনও সত্যিকারের নাড়ির যোগ নেই। সেইজন্য তেজপুরের ডেপুটি কমিশনারকে সামরিক কর্তৃপক্ষ ২০শে নভেম্বর যখন খুঁজতে এলেন, তখন তিনি উধাও। তাঁর পরিকল্পনা ও সামরিক পরিকল্পনার কোনও মিল ছিল না। জনসাধারণের কাছে সামরিক কর্তৃপক্ষ কোথাও কখনও আসেন না—রীতিও নয়; বোধ হয় বাঞ্ছিতও নয়। সুতরাং বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ বিদায় নেবার পরই অল্প-প্রস্তুত জনসাধারণ অসহায় বোধ করে বেরিয়ে পড়ল যে যেদিকে পারে—যেমন করে হোক।

জাতির সংকট মুহূর্তে আজ তাই একটা বলিষ্ঠ আদর্শকে গ্রহণ করে সব শাসনগত, আদর্শগত এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির ফাঁককে ভরবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চীনা সৈন্যদের কাছ থেকে ৫০-এর কিছু বেশী মাইল দূরে বসে এই কথাই মনে হচ্ছে। মন যখন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন আর্থার বনার নেতাজীর ফটোর সামনে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানিয়ে পথের ইঙ্গিত এনে দিলেন আজ ভোরে এই পরিত্যক্ত তেজপুরের নতুন করে জেগে ওঠার এক প্রভাতে।

তেজপুর, ২৭শে নবেম্বর, ১৯৬২)

উদ্দীপনার অভিজ্ঞতায়

দেশরক্ষার আহ্বানে শিল্পিসমাজ থেকে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা আশাতীত। ভাব-প্রবণ শিল্পীরা জাতির হৃদয়ে উদ্দীপনার যে উত্তাপ ইতিমধ্যে সঞ্চার করেছেন, তাতে এই ধারনা আমাদের হয়েছে যে, তাঁরা ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি আবেগ সঞ্চারে সমর্থ হবেন। ভারতবর্ষ যখনই যে-কোনভাবে নিপীড়িত হয়েছে বাংলা দেশ থেকে তার প্রতিবাদ উঠেছে প্রবল কণ্ঠে আর সেই কণ্ঠের সঙ্গে যোগ দিয়েছে শিল্পীর কণ্ঠ, কবির কণ্ঠ দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, উত্তপ্ত গাথায় এবং গানে। আজও বাঙালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রয়োজনে স্বভাব কোমল বাঙালীশিল্পীর কণ্ঠ উদাত্ত ভৈরবমন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এখন তাঁদের এই কণ্ঠের সজীবতাকে রক্ষা করবার একটা বিরাট দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পড়েছে। সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে, তাঁদের গানের ভাণ্ডারকে সর্বদা নির্ভীক সংগীতে পূর্ণ রেখে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ কত গান রচনা করে প্রতিদিন কী প্রবল প্রেরণা জাতিকে দিয়ে গেছেন। আজও আমরা সে সব গান গাইছি। তার আগে আরও অনেকেই উদ্দীপনার জন্য নানাভাবে গান লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ গান দিয়ে দেশমাতৃকার উজ্জ্বল মূর্তি তুলে ধরলেন; রঙ্গলাল রচনা করছেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।

এই গান খাম্বাজ সুরে গাওয়া হোতো। গোবিন্দচন্দ্র রায় জাতিকে ধিক্কার দিয়ে গেয়েছিলেন—কতকাল পরে বল ভারতরে দুখ-সাগর সাঁতারি পারে হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল মহাষ্টমীতে গাইলেন—বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ। সে গানও আমরা আজ গাইছি। ঠিক আগের যুগে নজরুল ইসলাম গেয়েছেন কত উদ্দীপনায় পূর্ণ গান, দীপ্ত ঢঙে—ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান ঘনবজ্রে বিষাণ বাজে, জাগো দুস্তর পথের নবযাত্রী, বীরদল আগে চল—প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ছিলেন — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি। আগের যুগে অধিকাংশ রচয়িতা তাঁদের গান নিজের গলায়, নিজের সুরে গেয়ে প্রচার করেছেন: তাই সে মত গানের প্রভাব ছিল অসামান্য। এ যুগে এই ধরনের রচয়িতার একান্ত অভাব। এখন একজন গান বাঁধেন, একজন সুর দেন, আর একজন গান করেন—এর ফলে গানের মধ্যে ভাবা,

✻ গানের আসর ✻

শার্ঙ্গদেব

সুর এবং কণ্ঠের আশানুরূপ সমন্বয় ঘটে না। এই সমন্বয়টি ঘটান বিশেষ দরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে; এই কারণেই বলছিলাম আমাদের ওপর একটি বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। সর্বাগ্রে এমন গান চাই যা, মানুষের মনকে গভীরভাবে অভিভূত করবে, উত্তেজিত, উদ্বেলিত করবে ভাষায়, সুরে এবং কণ্ঠের ওজস্বিতায়। এই প্রয়োজন মেটাতে পারেন বেতার প্রতিষ্ঠান। যদিও তাঁরা যথেষ্ট ওজস্বী গান প্রচার করছেন, তথাপি নতুন গান প্রচার করা আরো অনেক বেশি দরকার। বর্তমানে যে সব গান প্রচার করা হচ্ছে তা পুরোতন কালের—তা বহুবার গাওয়া হয়েছে, বহুবার শোনা হয়েছে। এর ফলে অনেক সময় শ্রোতাদের ক্লান্তি আসে—ওঁরা আর শুনতে চান না। ফলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। একটি কথিকা হয়ত প্রচার করা হল, যার রচনা নতুন কিন্তু গানগুলি পুরোতন। যে মুহূর্তে এই অনেকবার গাওয়া গানগুলি প্রচার করা হল সেই মুহূর্তে শ্রোতার উৎসাহ খানিকটা শিথিল হয়ে গেল। আমরা যে পরিকল্পনায় অগ্রসর হচ্ছি, তাতে এমনটা কোনক্রমেই ঘটতে দেওয়া উচিৎ নয় —মনকে সব সময় নতুন রসে সঞ্জীবিত রাখতে হবে এবং তার জন্য অনেকাংশে পুরাতনকে পরিহার করতে হবে। এই কারণে গীতিকারদের উৎসাহ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আমরা আকাশবাণীকে অনুরোধ করব তাঁরা গীতিকারদের নতুন রচনায় উদ্বুদ্ধ করুন। এ ছাড়া কথিকা, সংগীতালেখ্য প্রভৃতি জনগণের কাছ থেকে আমন্ত্রণ করুন। আমাদের বিশ্বাস তাঁরা বাইরে থেকে অনেক ভাল জিনিস পেতে পারবেন। যাঁরা স্রষ্টা, শিল্পী, তাঁরা তাঁদের রচনা স্বরলিপি করেও পাঠাতে পারেন। আকাশবাণী একটি বোর্ড গঠন করে এই সব রচনা নির্বাচন এবং মনোনীত করতে পারেন। এই বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই অকাতরে সাহায্য করবেন। বর্তমানে খুব উঁচুদরের সংগীত-সৃষ্টির প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন সাধারণ ভাষায় এমন সংগীত প্রণয়ন যা মনকে মাতিয়ে দিতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি। কার রচনা জানি না, তবে শুনেছি মুকুন্দ দাসের যাত্রায় সমবেত কণ্ঠে:

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহ আগুয়ান।
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি
প্রাণে বাঁধিতে হবে প্রাণ
আলস্য জড়তা নিরাশবারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ।
তরুণ তপনে মধুর কিরণে
সদা কি হাসিবে প্রাণ?
সুখের কোলে ভাবেতে গলে
কে রবে কে রবে শয়ান?
সাধিতে বীরের কাজ পর হে বীরের সাজ
করে ধর সাহস কৃপাণ
জীবন ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান।

বাংলার সুদূর পল্লীতে এই সব অতিসাধারণ ভাষার উদ্দীপনাপূর্ণ গান অসামান্য উৎসাহ এবং প্রেরণা জাগ্রত করত। এটা সকলেই

স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে আসল উদ্দেশ্য উদ্দীপনা সঞ্চার; আর্টের প্রশ্নটা বড় নয়। তবে সঙ্গীত যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহলে মহৎ আর্টেরও সৃষ্টি হবে বৈকি। প্রতিভার পক্ষে সবই সম্ভব হয়। সুযোগ পেলে এই পরিস্থিতিতেই আমরা হয়ত একাধিক প্রতিভা-সম্পন্ন সুরস্রষ্টার পরিচয় পাব, যাঁরা সংগীতের একটি ওজস্বী ধারাকে নতুন স্রোতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হবেন। দেশের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল যে সংগীত রচনা করেছেন, তার চিরন্তন মূল্য স্বীকৃত হয়ে গেছে। আমাদের যাঁরা গীতিকার, তাঁদের প্রাণে যে স্পন্দন জেগেছে, তার পরিচয় তাঁরা প্রদান করুন, নতুন গানে, নতুন ছন্দে, নতুন গাথায়; গায়ক, গায়িকারা—তাঁদের ভূমিকায় কৃতিত্বের সংগে সফল হবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। এ ছাড়া নগরে গ্রামে উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন উপযোগী নাট্যালেখ্য, বীরগাথা প্রভৃতি। গত স্বদেশী যুগে এ রকম বহু নাটক রচিত হয়েছে যা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল। আমাদের বড় বড় শিল্পীদের কলকাতা ছেড়ে নিঃস্বার্থভাবে যেতে হবে সেই সব এলাকায়, গান, অভিনয় প্রভৃতির প্রয়োজনে। সরকার এদিকে অধিকতর সচেষ্ট হবেন আশা করি, কারণ শিল্পীরা স্বার্থ ত্যাগ করলে সরকারকে তাঁদের স্বার্থ দেখতে হবে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে গুণী ব্যক্তি আছেন স্বীকার করি, কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিদের দিয়ে সেই স্থানে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হবে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হবে অপর অঞ্চলের গুণীদের ব্যক্তিত্ব আরোপে। অর্থাৎ এক অঞ্চলের শিল্পীদের অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে এবং সেই স্থানে আনতে হবে অন্য অঞ্চলের শিল্পীদের। মানুষের মন পরিবর্তন চায়, পরিবর্তনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—কী উপায়ে এই উৎসাহকে নানা বৈচিত্র্যে জীইয়ে রাখতে পারা যায়—তার একটা পরিকল্পনা আশু প্রয়োজন। প্রচার জিনিসটা সবচেয়ে ফলপ্রদ হয়, যখন প্রয়োগের ক্ষেত্রটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে বিশেষ চিন্তাপূর্বক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। এদিকে এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি এটা মনে রাখতে হবে।

পরলোকে কৃষ্ণচন্দ্র দে

এই নিবন্ধ লেখার সময় খবর পেলাম উদাত্তকণ্ঠ সুরসাধক কৃষ্ণচন্দ্র দে আর ইহ জগতে নেই। কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের কালের গায়ক। ছেলেবেলা থেকে তাঁর গান শুনে এসেছি—অভিভূত হয়েছি। তাঁর গাওয়া 'দীন তারিণী তারা' যখন শুনি, তখন আমরা বালক, কিন্তু মালকোষের তানালাপে মুগ্ধ হয়েছিল আমাদের মন। সীতা, চন্দ্রগুপ্ত

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নাটকে এবং চণ্ডীদাস, দেবদাস, ভাগ্যচক্র, বিদ্যাপতি—এই সব চিত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা ভুলতে পারবেন না সেই আশ্চর্য কণ্ঠের সুরোচ্ছ্বাস। অনেক সময় স্টেজের ভিতর থেকে অকুতোভয়ে গান ধরতেন কৃষ্ণচন্দ্র, সেই গান অনায়াসে বিস্তৃত হত সারা প্রেক্ষাগৃহে। গান করবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। কলেজে পড়বার সময় দেখেছি তাঁকে নানা আসরে। তখন সংগীতের একটা উন্মাদনা এসেছে—শচীন দেববর্মণ উদিত হয়েছেন, সায়গল রয়েছেন, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ পূর্ণ প্রতিভায় অধিষ্ঠিত। ওদিকে নজরুল গানের পর গান রচনা করে যাচ্ছেন, সুরস্রষ্ঠা হিসাবে হিমাংশুকুমার সুপ্রতিষ্ঠিত; হেমেন্দ্রকুমার রায়, অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব রায়, শৈলেন রায় প্রভৃতি গীতিকারগণ বহু সংগীতে সার্থকতা লাভ করেছেন। সেই যুগের বহু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কৃষ্ণচন্দ্রের গান ছিল বিস্ময়ের বস্তু। সরস্বতী [illegible] দিন ধরে সন্ধ্যা থেকে রাত্রির শেষ প্রহর পর্যন্ত তিনি একটানা গান গেয়ে গেছেন—সাধারণত শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করেছেন। রেকর্ডসংগীতে তাঁর মত সাফল্য খুব কম ব্যক্তিই অর্জন করেছেন। সংগীতজ্ঞ হিসাবে তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর মত লয়জ্ঞান কম শিল্পীর মধ্যে দেখেছি। দাদ্রা, একতালা, তেতালায় সাধারণ গান তিনি কত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইতেন—তালের ওপর অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিতেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর কণ্ঠ—তা যেমনি খাদে নামত, তেমনি চড়ায় বিস্তৃত হত; যেমনি কোমল হত তেমনি বলিষ্ঠতায় দৃপ্ত হয়ে উঠতে পারত। বাঙলার কাব্যসংগীতকে যাঁরা নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। এখনও কানে বাজছে তাঁর গাওয়া গানের রেশ—"ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে" অথবা মৃদু কোমল গলায় গাওয়া "মনকুসুমের রঙভরা এই পিচকারিটি রাধে", "বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনো না আর চোখের টানে"। মীরার ভজনের বঙ্গানুবাদ—"মাতাল যেমন মদপিয়াসী, চিরমধুর সেই বঁধুকে তেমনি আমি ভালবাসি" ইত্যাদি।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৩০২ সালে কলকাতায়। তাঁর পিতার নাম শিবচন্দ্র দে। অল্পবয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। কিছুকাল খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু পরে ভাগ্যকে সাহসের সংগে মেনে নিয়েছিলেন। এই সাহস তিনি কখনও হারাননি। প্রথমে শশীভূষণ দে নামক এক সংগীতজ্ঞের কাছে পাঁচ বৎসরকাল খেয়াল শেখেন। টপ্পাগায়ক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও কয়েক বছর টপ্পা শিখেছিলেন। সরোদীয়া করমতুল্লার কাছেও বহুদিন সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। এছাড়া বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। বর্তমানে ধ্রুপদীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর শিক্ষক বলে দাবি করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বলতেন তিনি তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু পাননি। ধ্রুপদ, ধামার তাঁকে নিজে খেটে শিখতে হয়েছিল। কীর্তনেও তিনি দক্ষতা লাভ করেছিলেন। সাধারণ আসর থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি পদাবলী কীর্তন এবং ধ্রুপদ, ধামার গাইতেন। কীর্তনে তিনি সাধারণ প্রচলিত তালের পক্ষপাতী ছিলেন এবং লীলারসমাধুর্যের দিকেই অধিক মনোযোগ দিতেন।

তিনি অকৃতদার ছিলেন। পরিবারে ভ্রাতুষ্পুত্রদের গান শিখিয়েছেন। তিনি সদালাপী অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। পরিপূর্ণ সম্মান এবং গৌরব অর্জন করে পরিণত বয়সে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন। পরলোকগত আচার্যের প্রতি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

* চিত্র প্রদর্শনী *

বছরের এই সময়টা হচ্ছে চিত্র প্রদর্শনীর মরসুম। শিল্পীদের একক প্রদর্শনী ছাড়া তাদের বিভিন্ন জোটের বার্ষিক প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান হয় এই সময়ে। গত ২৮শে থেকে আর্টিস্ট্রী হাউসে চলছে সোসাইটি অফ কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্টের এবং একই স্থানে (ভিন্ন হলে) ২৩শে নভেম্বর থেকে ৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পেইণ্টার্স অ্যাণ্ড স্কাল্পটার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রদর্শনী। দুটি প্রদর্শনীরই ছবির বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ত্রিশ টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করার কথা উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছেন। দুটি প্রদর্শনীর আর এক বিষয়ে মিল হচ্ছে যেসব ছবি টাঙানো হয়েছে, তার অধিকাংশই ভাবে, অঙ্কনরীতিতে এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে এদেশের মাটি ও ধারা থেকে বিচ্যুত। রূপ লালিত্যে দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে দর্শকচিত্তে পুলক বা উদ্দীপনা সঞ্চারের মতো ছবি সংখ্যায় কম। আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা ভারতের নিজস্ব শিল্পৈতিহ্যের পরিচয় লাভে দেশের লোকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে।

সোসাইটি অফ কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্টের সদস্যদের সম্মিলিত বার্ষিক প্রদর্শনীতে মোট একচল্লিশখানি ছবি এবং কাঠ, ব্রোঞ্জ ও সিমেণ্টে পাঁচটি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এবারকার প্রদর্শনীতে উন্নততর কাজ অবশ্য দেখা গেল এবং সমগ্রভাবে প্রদর্শনীটি উজ্জ্বলতরও হয়েছে। মোট আঠারোজন শিল্পীর কাজ যা দেখা গেল তার মধ্যে নতুন কাজ বেশী নেই—অনেকেরই একক প্রদর্শনীতে ইতিপূর্বে দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে অরুণ বসুর 'হাতি' ও 'মাছধরা' সরল ও বৃত্তাকার রেখায় স্তিমিত রঙের প্রয়োগে আকর্ষণীয়। অনিলবরণ সাহার 'পবিত্র গির্জা' ছবিখানি তাঁর উন্নততর নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অরুন্ধতি রায় চৌধুরীর বিমূর্ত ধারায় আঁকা "মোক্ষ" ছবিখানি রঙের ব্যবহারে শিল্পীর দক্ষতার নিদর্শন। তাঁর অপর দুখানি ছবি 'মিছিল' ও "যাত্রাপথে"-র মধ্যেও একটা নিজস্বতার ছাপ দেবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। শৈলেন মিত্রের 'সবুজ পাহাড়' রঙের প্রয়োগে বৈচিত্র্যের আস্বাদ দেয়। শ্যামল দত্ত রায়ের 'তীর্থযাত্রী' এবং 'ঝুলন্ত সেতু' ছবি দুখানি শিল্পীর রেখায় ও রঙের প্রয়োগে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সনৎ করের তিনখানি ছবিই একই ধাঁচের। তবু ওরই মধ্যে 'লভানে' ছবিখানিতে কিছুটা শিল্পকৃতিত্বের আভাস পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুহাস রায়ের 'ঢেউ'—রুদ্র মূর্তির মধ্যেও ফেনিল ঢেউয়ের সৌন্দর্য তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। বেশ বড় ক্যানভাসে কিছুটা বিমূর্ত ধারার অনুগামী সুনীল দাসের 'ঘোড়ারা' ছবিখানিতে রেখা ও রঙের প্রয়োগের দিক থেকে বেশ একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুকুমার দত্তের 'ঘরমুখো' ও প্রদর্শনীর আর একটি বিশেষ আকর্ষণ। সুধীরঞ্জন ভূষণের 'অন্তরঙ্গ-আত্মা', 'শীতের প্রস্ফুটন' এবং 'সূর্যাস্তে উড্ডয়ন' ছবি তিনখানি শিল্পীর বিভিন্ন ধারায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পনৈপুণ্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শেষোক্ত ছবিখানি আপাতদৃষ্টিতে কিউবিস্ট ধারার অনুগামি প্রতিভাত হলেও ভাব ও রঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে।

পবিত্র গির্জা — শিল্পী : অনিলবরণ সাহা

বালক ও ঘুড়ি — শিল্পী : শ্যামল দত্তরায়

অন্যান্যদের মধ্যে শ্যামশ্রী ঘোষের 'প্রহেলিকা' ছবিখানি ললিতভঙ্গীর জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। স্থাপত্যের ভঙ্গীতে আঁকা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষ ও গৃহ' উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়ের 'বিরাম' বিশদভাবে খুটিনাটি সংযুক্ত না করেও ছবির বক্তব্যকে শিল্পছন্দে অভিব্যক্ত করায় কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে আঁকা সোমনাথ হোড়ের পাঁচখানি এচিং ও এনগ্রেভিং এই প্রদর্শনীর বিশেষ দ্রষ্টব্য। রঙীন এচিংয়ে 'সূর্যালোকিত তৃণভূমি', 'প্রাকৃতিক শোভা' ও 'তৃণভূমি' এবং এনগ্রেভিংয়ে 'ময়ূর' তাঁর বিশিষ্ট শিল্পদক্ষতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। ভাস্কর্যে অজিত চক্রবর্তীর কাঠে খোদাই 'মায়ের গরব' এবং ব্রোঞ্জে 'মা' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি। উমা সিদ্ধান্তের সিমেণ্টে তৈরি তিনটি কাজের মধ্যে 'নারী' মূর্তিটিই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

প্রদর্শনীটি আগামী ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে।

*

সাতাশখানি ছবি ও বারোটি ভাস্কর্য কাজের সমাবেশে উদ্বোধিত পেইণ্টার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস এসোসিয়েশনের বার্ষিক

প্রদর্শনীটি রকমারিতার দিক থেকে শিল্প-রসিকদের তুষ্ট করবে। ছবির ক্ষেত্রে তেল রঙ, টেম্পারা, রঙীন খড়ি ও জল রঙের কাজ যেমন আছে, তেমনি ভাস্কর্যের উপাদান হিসেবে মেহগনি ও সেগুন কাঠ, প্লাস্টার এবং পোড়ামাটির ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন শিল্পী। ভাব ও বিন্যাসে শিল্প দক্ষতার পরিচয়ে ভাস্বর ছবি বলতে তেল রঙে আঁকা লালুপ্রসাদ সাহার 'নীল নদী', দেবীপ্রসাদ সাহার 'পুণ্য নগরী' ও 'মুখোস বিক্রেতা' বিশেষভাবে দৃষ্টিতে পড়বে। বিমূর্ত ধারার অনুসরণে জ্যোতিষ ভট্টাচার্যের 'পদ্মের বিমূর্তন', 'শিখর দেশ' ও 'প্রাকৃতিক দৃশ্য' বলিষ্ঠ তুলির টান এবং বর্ণবৈচিত্র্যে দৃষ্টিতে চমক ধরিয়ে দেবার মতো কাজ। টেম্পারায় সুভাষ সিংহ রায়ের 'শান্তি' এবং অমরেন্দ্রলাল চক্রবর্তীর 'দিবাস্বপ্নদর্শী' প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। প্রদর্শনীটিতে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ইশা মহম্মদের জলরঙের ছখানি ছবি। তাঁর 'গলিপথ' এবং যাত্রীসহ ঘোড়ার গাড়ির একাংশ 'যাত্রাপথে' ছবি দুখানি এবং একটি প্রতিকৃতি চিত্ররসিক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে। গণেশ পাইনের আঁকা জলরঙে 'লোক' এবং তাঁর একখানি স্কেচ 'ঠাকুমা' প্রশংসাযোগ্য। রঙখড়িতে দেবদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের এবং বীথি ঘোষের প্রতিকৃতি দুটি লালিত্যপূর্ণ রেখায় শিল্পসৌন্দর্য বিকাশে দৃষ্টিবিমোহন সৃষ্টি। শেষোক্ত শিল্পীর তেলরঙে আঁকা 'সমুদ্রতীর' ছবি-খানি মাধ্যমের বৈচিত্র্যপ্রিয়তাই শুধু নয়, সেই সঙ্গে তাঁর প্রশংসনীয় দক্ষতারও পরিচায়ক।

ভাস্কর্যের দিক থেকে প্রদর্শনীটি বিশেষ সমৃদ্ধ। চিন্তামণি করের মেহগনি কাঠে তৈরি 'একশিলা স্তম্ভ', 'দ্বৈত' ও 'ওডালিস্ক' এবং মসৃণ করা পোড়ামাড়ির তৈরি 'বুদ্ধ' বৃত্তাকার রেখায় বিমূর্ত রূপে ফুটিয়ে তোলায় একটা বিশেষ শিল্প ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুন কাঠে তৈরি সুরজিৎ দাসের 'গোয়ালিনী' ও 'বিশ্রামরত মহিলা' এবং প্লাস্টারে তৈরি একটি প্রতি-কৃতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায়। সরল ও বৃত্তাকার রেখায় মসৃণ পোড়ামাটিতে দেবব্রত চক্রবর্তীর 'মা ও শিশু' আর একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি। প্লাস্টারে হারাণ-চন্দ্র ঘোষের একটি প্রতিকৃতিও প্রশংসা পাবার যোগ্য।

•

ইয়ং আর্টিস্ট সোসাইটির উদ্যোগে গত ২৫শে থেকে ৩০শে নভেম্বর আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে অনিমেষ নন্দীর বাইশখানি ছবির প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এই তরুণ শিল্পীর ছবি ইতিপূর্বে কলকাতার কতক প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে। ১৯৫৮ সালে সিকিমে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয় এবং এ বছর মহীশূরে দশহরা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত শিল্প-প্রদর্শনীতে তেল রঙের ছবির বিভাগে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

ওডালিস্ক শিল্পী: চিন্তামণি কর

মহিলা শিল্পী: অনিমেষ সিংহ

আলোচ্য প্রদর্শনীর বোলখানি তেল রঙের ছবিতে শিল্পী ভারতীয় শিল্প-ধারাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। রেখা ও রঙের প্রয়োগে পটের প্রভাব দেখা যায়। তবে ভাব ও বিষয়বস্তুর নির্বাচনের দিক থেকে ছবিগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের অভাবটা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মেটে লাল পটভূমিতে মহিষকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ায় রত মানুষের সিলহুট ধরণের ছবিখানির মতো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও খুঁটি-নাটি অঙ্গের পরিহার অধিকাংশ ছবিতে শিল্পশ্রীর অভাব ঘটিয়েছে। সবুজ রঙের প্রয়োগে স্বচ্ছতার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলা দুটি ছাগলের ছবিখানি, পটের রেখা অনুসরণে একটি নারী মূর্তি, একই দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি গবাক্ষে বিভিন্ন অভি-ব্যক্তিতে তিনটি নারী মূর্তি, ছবি ক'খানিই দ্রষ্টব্য। স্কেচ আঁকায় শিল্পীর হাত ভাল।

•

দেশের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা শিল্পধারা যা আমাদের শিল্পীদের অবজ্ঞার ফলে লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে সেই অতুল ও বিশিষ্ট শিল্পৈশ্বর্যের একটি মূল্যবান সংগ্রহ গত ২৫শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির উদ্যোগে তাদের দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ নিজস্ব গ্যালারীতে প্রদর্শিত হয়। কলকাতার আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শ্রীমুকুল দের সংগ্রহ থেকে অর্জিত এই চুয়াত্তরখানি ছবি সম্পূর্ণ মৌলিক একটি শিল্পধারার প্রবর্তনে কালিঘাটের পটুয়ারা যে অতুলনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল সে সম্পর্কে একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। ছন্দোবদ্ধ বলিষ্ঠ রেখায় লাল, হলদে, নীল, খয়েরী এবং সবুজ রঙের প্রয়োগে সমসাময়িক কালের পারি-বারিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু ও তৎকালের স্ত্রী পুরুষের রুচি প্রকৃতি এবং আচার ও আচরণ নিয়ে আঁকা ছবিগুলি ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বাঙলার পটুয়াদের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যই মূর্ত করে তোলে।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে নানারকমের পশু, পাখি, সাপ ও মাছের ছবি অন্তর্ভুক্ত এবং ছবিগুলির প্রত্যেকখানিই পটুয়াদের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয়। সামাজিক ও ধার্মিক অনুষ্ঠান, কৌতুক ও বিদ্রুপাত্মক ছবিও কতকগুলি দেখা গেল। চীনের আক্রমণের বর্তমান পটভূমিকায় দেশের এই বিশেষ শিল্পৈতিহ্যের প্রতি জনসাধারণকে অবহিত করে তোলায় রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির এই উদ্যমটি প্রশংসনীয়।

✻ বিশ্ববিচিত্রা ✻

আকাশ থেকে কুমীর শিকার

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের কুমীর শিকারী স্ট্যান অ্যাডামস তার শিকার ধরার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন।

উত্তর অস্ট্রেলিয়ার নদী, লবণাক্ত নদীর মোহানায় শিকার খ‍ুঁজতে প্রচুর সময় লেগে যায় দেখে "প্যারাকাইট" আখ্যা দিয়ে আকাশে উড়ে পর্যবেক্ষণ করার একটা উপায় তিনি উদ্ভাবন করেছেন।

এই যন্ত্রটিতে নিজেকে বেঁধে নিয়ে তিনি নদী, ছোট ছোট দ্বীপ এবং বাল‍ুকা চরের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে প্রচুর ভাল জাতের কুমীর কোথায় আছে দেখে নিতে পারেন।

ম‍ূলত প্যারাকাইট হচ্ছে আঠাশ ফিট ব্যাসের একটি ভাসমান প্যারাস‍ুট। বায়‍ু নির্গমন ব্যবস্থার ফলে এই আকাশচারীর পক্ষে যে দিকে ইচ্ছা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং ওপরে ওঠা ও নিচে নামার গতিও তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

স্ট্যানের সহযোগী নিকটতম তীরের উপর দিয়ে চলমান একটি ট্রাক থেকে তিন হাজার ফিট দীর্ঘ নাইলনের দড়িতে "প্যারাফাইট"টি বেঁধে গতির সঞ্চার করে। অত্যন্ত ঝোড়ো হাওয়ায় পড়লে এই কুমীর-সন্ধানীকে অস‍ুস্থ হয়ে পড়তে হয়।

স্ট্যানের হাতের টিপ সঠিক বলে প্রায় উড়ন্ত অবস্থা থেকেই তিনি কুমীর মারতে পারেন। তবে আকাশে তাঁর ওড়ার ম‍ুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে কুমীরের বিপ‍ুল সমাবেশ খ‍ুঁজে বের করা।

বহ‍ু সংখ্যক কুমীরের জোট চোখে পড়া মাত্রই স্ট্যান তাঁর সঙ্গীকে সংকেত করে দেন ট্রাকটি অন্তর্দেশে নিয়ে যেতে এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেও মাটিতে নেমে পড়েন।

ওরা দ‍ুজনে তখন ট্রাক থেকে শিকারের ভেলা বের করে জলে ঠেলে দেন এবং সতর্কতার সঙ্গে শিকারের দিকে এগিয়ে যান। ভাগ্য স‍ুপ্রসন্ন হলে ওরা দ‍ুজনে বেশ কিছ‍ু সংখ্যক কুমীর পেয়ে যান।

মাকড়সার জালে তৈরি কনে-সাজ

কিছ‍ুদিন আগে লণ্ডনের এক সদা-বিবাহিত কনে সম্বর্ধনা অন‍ুষ্ঠানে বিনয় সহকারে বসতে আপত্তি জানায়। মেয়েটি জানায় যে বসতে গেলে তার ছাব্বিশ শ' টাকার সাটিনের বিয়ের-সাজটি নষ্ট হয়ে যাবে।

আবার লণ্ডনের এক মডেল একটি কনের সাজ পরার পর ব‍ুঝতে পারে যে সেটি এত

ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সামগ্রী ও জোয়ানদের পৌঁছে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত সি-১৩০ হারকিউলিস বিমানের একটি। আমেরিকা বিমানগুলি ধার দিয়েছে এবং ওদেরই চালকরা ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবেন।

ভারি যে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাই সম্ভব নয়। গাউনটিতে সাড়ে সাতানব্বই হাজার টাকা দামের সোনা এমব্রয়ডারি করা ছিল। কিন্তু ভারি হওয়ার আসল কারণ এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মূল্যের মণিমুক্তা যা শোভা বর্ধনে লাগানো হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় চেস্টারশায়ারের মহিলারা প্যারাসুটের সিল্কের কাপড়ে কনের গাউন তৈরি করতো এবং সেগুলি সওয়া তিন টাকায় ভাড়া দিত।

এর চেয়েও অদ্ভুত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরের এক কনের পোশাক। মেয়েটি ডাক টিকিট প্রিয় ছিল বলে ত্রিশ হাজার ডাক টিকিট দিয়ে তার পোশাকটি তৈরি হয়। মসলিনের ওপর এলোপাথারি টিকিট মেরে দেওয়া হয়।

মাকড়সার জালের তৈরি পোশাক পরেছিল আমেরিকার দুই বোন একই দিনে এক সঙ্গে তাদের বিয়ের সময়ে। ওদের ধনী পিতা চীন থেকে প্রভূত সংখ্যক মাকড়সা আনিয়ে তার উদ্যানে ছেড়ে দেন গাছে গাছে জাল বুনতে।

পরে সেই জালের ওপর পাঁচশ' পাউণ্ডের বেশী ওজনের সোনা ও রূপার গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সুদক্ষ পোশাক নির্মাতা এই বিজাতীয় উপাদানে মেয়ে দুজনের কনের সাজ তৈরি করে দেয়।

করদাতা মার্জার

বিড়ালরা পশু বলেই তাদের কর দিতে হয় না বলে যে ধারণা প্রচলিত সেটা ঠিক নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনোইসের এটর্নি জেনারেল সম্প্রতি রায় দেন যে, শিকাগোর পাঁচটি বিড়াল তাদের মালিক মহিলার উইল অনুসারে উনষাট হাজার আটশ টাকা পাওয়ায় তাদের মোট এগারো শ' আঠারো টাকা উত্তরাধিকার কর দিতে হবে। পশু, বিশেষ করে বিড়াল-প্রিয় এই মহিলার মৃত্যু হয় গত বৎসর।

বিড়ালদের আয়ু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এক পশু চিকিৎসকের সঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনার পর করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

কর ধার্য করা হয় বিড়াল পাঁচটির প্রত্যেকে তাদের জীবদ্দশায় যে পরিমাণ অর্থ পাবে তার উপর।

এই নিয়েই একটা সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত পশু চিকিৎসক শিকাগোর বিড়ালের দশ বছর আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করেন। 'কিন্তু "উচ্চ আয় পর্যায়ের" এই পাঁচটি বিড়ালের আয়ুষ্কাল চোদ্দ বছর বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন।

ফলে চারটি বিড়াল খুশীতে গায়ের লোম ফুলিয়ে তোলে কারণ তাদের বয়স বারো বছর বলে ওদের মাথা পিছু সত্তর টাকা কুড়ি নয়া পয়সা কর ধার্য করা হয় এবং পঞ্চম বিড়ালটি মাত্র ন'বছর বয়সের হওয়ায় ওর ক্ষেত্রে ধার্য হয় আটশ সাতচল্লিশ টাকা ষাট নয়া পয়সা।

ক্যালিফোর্ণিয়ার বিড়াল মিৎসির ভাগ্য ছিল আরো ভাল। ১৯৩০ সালে এক মহিলার মৃত্যুর পর দেখা যায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মূল্য এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং উইলে তিনি উনচল্লিশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছেন মিৎসির নামে।

মিৎসির কোন উত্তরাধিকারি ছিল না বা কোন করও ধার্য করা হয়নি। কিন্তু ওর বয়স হয়ে গিয়েছিল আঠারো বছর এবং বাড়িটিতে ইঁদুর যতই থাক ওই বৃদ্ধ বয়সে তার পক্ষে উপভোগ করা সম্ভব ছিল না।

তত্রাপি "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী বিড়াল" পদবীটি ভোগ করার জন্য কিছুকাল সে জীবিত ছিল।

সংখ্যা নিয়ে দেখা গিয়েছে মালিকদের উইলে অন্যান্য পশুদের চেয়ে বিড়ালরাই সবচেয়ে লাভবান হয়।

নিজের সম্ভাব্য বিপদের কথা না ভাবিয়াই পাকিস্তান ভারতের এই সাময়িক বিপাকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"এ সম্বন্ধে বক্তব্য শুধু একটিই, অনেকবার বলেছি, আবার বলি—উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে নাচিছে রামছাগল!!"

চীনের প্রতি পাকিস্তানের প্রণয়পত্র লইয়া জনাব মহম্মদ আলি শুনিলাম চীন যাইতেছেন। —"প্রেমের অবশ্য কাল-অকাল নেই, তবু শীতটা শেষ করে বসন্তের দিনে গিয়ে—যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে (চীনে?)—গান ধরলেই হয়ত প্রেম জমত ভালো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

রাওয়ালপিন্ডিতে নেহরুজীর কুশ-পুত্তলিকা দাহ করা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম—"তোবা, তোবা, দাহ কেন, কবর দেওয়ার মতো মাটি কি সেখানে নেই!"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের কোন এক অঞ্চলে জনৈক শিক্ষক নাকি হাটের মধ্যে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ভারতই চীনাদের আক্রমণ করিয়াছে। পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। —"বিদ্যার হাঁড়িটি তিনি হাটেতেই বা ভাঙতে গেলেন কেন?" —প্রশ্ন করেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদে পড়িলাম, ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত ৪০০ কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। —"৪০০-এর সঙ্গে আর ২০ যোগ হলেই গ্রেপ্তার করা বন্ধ করা হবে কি না, তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলেন বিশু খুড়ো।

আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি বলিতেছেন—ট্রেড ইউনিয়নের জনৈক কর্মী নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের (কমিউনিস্টদের) আটক করার ফলে যদি জনসাধারণের আক্রোশ কমে, তবে এ গ্রেপ্তারে তাঁর আপত্তি নেই—। "হ্যাঁ, যা শত্রু পরে পরে!" —সংক্ষেপে বলে আমাদের শ্যামলাল।

আনন্দবাজার বলেন—'আসলে এক-তরফা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব একটি কূটনৈতিক সোনার পাথর বাটি।' —"উহা একটি কূটনৈতিক কাঁঠালের আমসত্ত্ব বললে আরো ভালো হতো"—বলেন এক সহযাত্রী।

* ট্রামে-বাসে *

শ্রীরাজগোপালাচারী বলিয়াছেন—সি, পি, আইকে বিশ্বাস করা গ্যাম্বল ছাড়া কিছু নয়। —"আমরা যে ফরম ঘোড়া ছেড়ে আপসেটে বাজিমাত করতে গিয়ে-ছিলাম"—মন্তব্য করেন জনৈক ঘোড়দৌড়-রসিক সহযাত্রী।

শ্রীরাজগোপালাচারী বলিয়াছেন,—দেয়ালের লিখন, চীনাদের হারিতেই হইবে। —"দেয়ালের লিখন পাছে চোখে পড়ে, সেই জন্যেই হয়ত অষ্টম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য সেই চীনের দেয়াল আর নেই" —মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

চীনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে আমরা যেন ঘুমাইয়া না পড়ি—বলিয়াছেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রী সঞ্জীবায়া। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা শুধু গেয়ে যাবো,—ঘুম ভাঙানিয়া, তোমায় Gun শোনাব!"

সংবাদে শুনিলাম, সোনার দর পড়িয়া গিয়াছে। —"মাছের দর কিন্তু পড়ি-পড়ি করেও পড়ে না—আই গো অনু ফর এভার হলো মাছের গান"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

নেহরুজী একটি শিশু সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—ভারত এখন একটি টেস্টিং টাইমের ভিতর দিয়া যাইতেছে। জনৈক শিশু নাকি তৎক্ষণাৎ বলে—"কিন্তু এ বৎসর তো ভারত কোন টেস্ট খেলছে না, এ বছর শুধু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের টেস্ট!" —মন্তব্যটা অবশ্য অসমর্থিত; আমাদের শুনাইয়াছে শ্যামলাল।

কোন শর্ত ছাড়া ভারতকে সামরিক সাহায্যদান প্রসঙ্গে মার্কিন মিশনের নেতা শ্রীহ্যারিম্যান বলিয়াছেন—ভারতের নিরাপত্তার অর্থ পাকিস্তানেরও নিরাপত্তা। —"কিন্তু যাঁদের দৌড় মসজেদ পর্যন্ত, তাঁরা শ্রীহ্যারিম্যানের সঙ্গে একমত নন" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়া প্রতিশ্রুত 'মিগ' বিমান সরবরাহ করিবেন না। —"আমরা তাই আঁচ করে-ছিলাম এবং বলেছিলাম, মিগও গন্ উইথ দি উইন্ড, 'মিগ' মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র" বলে শ্যামলাল।

লোকসভায় ভারতরক্ষা বিলের আলোচনার সময় শ্রীহীরেন মুখার্জী নাকি রামায়ণ হইতে সীতার পাতাল প্রবেশ সম্বন্ধে কিছু অংশ উধৃত করিয়া বলেন যে, বর্তমান যুগে অঘটন ঘটা সম্ভব হইলে কম্যুনিস্টদের নিখাদ দেশপ্রেম প্রমাণ করিতে ধরিত্রী দ্বিধা হইতেন। —"তা হয়ত হতেন। কিন্তু পীত-হরিণ ধরে এনে দেবার বায়নাক্কা ধরিত্রী শুনেছেন কি না তাই দ্বিধা হতে তাঁর এত দ্বিধা।"—বলেন বিশুখুড়ো।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬২-৬৩ সালে চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—"ভালো কথা, কিন্তু বজ্র আঁটুনির পর ফস্কা গেরোর সিদ্ধান্ত কারা করেছেন তা এখনো জানা যায়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মালয়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীটুঙ্কু আব্দুল নাকি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—চীনের চালে পা দিবেন না।—"কে জানে আবার হয়ত কাঠের জুতো পরিয়ে পা ছোট করে দেবে, মা লক্ষ্মীরা, সাবধান"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সাহিত্য সংবাদ

বাঙালী সাহিত্যিকদের সভা

বাঙালী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে নানা গুজব আছে। সবচেয়ে বড় গুজব, এ'দের মধ্যে ঐক্য নেই, পরস্পরের সংগে সৌহার্দ্য নেই। হয়ত এ-কথা কিছুটা সত্য। কিন্তু সর্বাংশে নয়। অন্তত, জাতীয় দুর্যোগে এ'রা যে সকলেই সমভাবে পীড়িত, এবং গ্লানি অনুভব করছেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। সম্প্রতি আমি তার প্রমাণ পেলাম।

গত শুক্রবার (৩০শে নভেম্বর) কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে কতিপয় উদ্যোগী সাহিত্যিকের প্রচেষ্টায় একটি সভা হয়—

বিদুর

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করা হয়।

প্রাচীন সাহিত্য থেকে এই ধরনের অংশ পাঠের মূলে কারণ—আমাদের সাহিত্য-ঐতিহ্য স্মরণ করা। কবে, কত বছর আগে রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়—',

সংযত ও নির্মোহ, অথচ ভারতীয় উদার ধারণার দ্বারা পরিস্রুত। তাঁর মানবতা-বোধ মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে যে-উচ্চমূল্য নির্ধারণ করেছে, তার সংগে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার স্থান নেই। যে স্বদেশাভিমান মানুষকে অকারণে অন্ধ অচেতন করে, তিনি তার বিরোধী ছিলেন। বাঙালী সাহিত্যিকরা এ-বিষয়ে আজ অতি সচেতন। তাঁরা অবশ্যই জানেন, আমরা নাৎসী অথবা ফ্যাসিস্ট-ধর্মে দীক্ষা নিতে পারি না। এই শুভ বোধের পরিচয় এই সভাতেও পাওয়া গেল। রবীন্দ্র-

মহাবোধি সোসাইটি হলে সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ সভা। প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের দেখা যাচ্ছে। ফটোঃ দেশ

সাহিত্য সভা—চীনের ভারত আক্রমণের প্রতিবাদই সে-সভার উদ্দেশ্য ছিল। আশ্চর্যের কথা, আনন্দের কথাও, এই সভায় বাঙলার প্রবীণ খ্যাতনামা প্রায় সকল সাহিত্যিকই উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠিত অর্ধ-প্রবীণরা, ছিলেন তরুণরা এবং নবীনের দলও। সাহিত্যানুরাগী সাধারণ লোকও সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বস্তুত এমন দৃশ্য কদাচ দেখা যায়, যেখানে বাঙলা দেশের প্রায় সকল সাহিত্যকর্মী একত্র সমবেত হয়েছেন, যেখানে জনসাধারণ সাহিত্যিকদের মুখের কথা শোনার জন্যে এমনভাবে এসে জোটেন। এখানে একটি সামান্য ত্রুটির অবশ্য উল্লেখ প্রয়োজন, সভাগৃহ ছোট হওয়ায় বহু সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষকে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

আলোচ্য সভার প্রধান বিষয় ছিল—স্বদেশাত্মক (প্রাচীন ও নবীন) সাহিত্য পাঠ। আজও সেই কাব্য যখন পাঠ করা হল, মনে হচ্ছিল—এই কটি কথার কী যাদু!

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের এই ঐতিহ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে চান নি। তাঁর সকল স্বদেশাত্মক রচনাই নাথ থেকে অংশ বিশেষ সর্বাধিক পঠিত হয়েছে এ যেমন সত্য, তেমনি খ্যাতনামা ও তরুণ কবিরা এমন কবিতা (স্বরচিত কবিতা) পাঠ করেছেন—যার মধ্যে অতি উগ্র, সংকীর্ণ, হিংসাত্মক জাতীয়তার নামগন্ধ ছিল না।

তবে কি ছিল?, ছিল, সভ্য বিবেকমান মানুষের কণ্ঠ; ছিল বেদনার স্বর। তাঁরা বারবোর এ-কথা বলতে চেয়েছেন, মানব-জীবনের মর্যাদাকে আমরা ক্ষুন্ন হতে দেব না। আত্ম-সম্মান ও স্বাধীনতাকে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না। তাঁরা বলেছেন, 'অবি-রোধী মানে নির্বীর্য নয়—'; আর নির্বীর্য নয় বলেই:

সভায় কল্লোলযুগের তিন নায়ক: বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ফটো: দেশ

'আমার চূর্ণ বিশ্বাসের প্রতিটি কণা থেকে
উৎক্ষিপ্ত হবে
তোমার যুদ্ধবাহন দম্ভের বিস্ফোরক
কালস্ফুলিঙ্গ।

এই সভায়, আগেই বলেছি, বাঙলা দেশের প্রায় সকল সাহিত্যিকই উপস্থিত ছিলেন। পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলি, প্রবীণদের মধ্যে—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু প্রভৃতি। খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত কবিরাও ছিলেন অধিকাংশই; ছিলেন তরুণ প্রতিভাবান কবিরাও।

এই সভায় আলোচনার অনুষ্ঠানটি অতি সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল। অন্তত সাধারণ শ্রোতারা তেমন অভিযোগ কেউ কেউ করেছেন। সুবোধ ঘোষ মহাশয় বর্তমান সংকটে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে যে কথা কটি বলে-ছিলেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ ও জাতির মর্যাদা রক্ষা সাহিত্যিকদের অন্যতম দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন। এবং এ-সময় মানবতার মহান চেতনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর মতে সাহিত্যিকদের দায়িত্ব।

এই সভায় সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবের মর্মার্থ এইরূপ:

চীন আজ ভারতকে আক্রমণ করেছে। তার আঘাত নগ্ন ও সশস্ত্র। ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিজমের দানবকে সে অধিষ্ঠান করাতে চায়। নিখিল এশিয়াকে গ্রাস করার মোহ তার। স্বদেশের গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার রক্ষা করাই ভারতীয়দের আদর্শ। আমরা ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সংস্কৃতির স্বাধীনতাকে মানবতার অমূল্য সম্পদ মনে করি। চীনের বর্বর আক্রমণে আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাস আহত হয়েছে। চীন আমাদের গণতন্ত্রকে আঘাত করতে চায়, শান্তি ও মৈত্রীর ধারণাকে উপহাস করতে চায়। আমরা মানুষের সর্ব-প্রকার সৎ মূল্যবোধে বিশ্বাসী। মানবতা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোনো প্রকার আঘাতই আমরা সহ্য করব না। এই সংকটে আমরা নিজ দায়িত্ব পালন করব, মানুষের মনের শুভ বোধ ও চেতনাকে অধিকতর জাগ্রত করব।

বাঙালী সাহিত্যিকদের উক্ত প্রস্তাব থেকে, আশা করি, তাঁদের বক্তব্য স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সভায় রবীন্দ্র-নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও কাজী নজরুলের রচিত স্বদেশাত্মক গান গেয়েছিলেন সুখ্যাত গায়করা। শ্রীরাজেশ্বর মিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের একটি পুরোনো অপ্রচালিত গান গেয়ে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছেন।

পুস্তক পরিচয়

কবিতা : তিনজন সাম্প্রতিক কবি

যে-কোনো নিঃশ্বাসে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। বসু-চৌধুরী, ৬৭-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দু' টাকা।

আঁধার গোলাপ। মানস রায়চৌধুরী। মানস প্রকাশনী, ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা—১। আড়াই টাকা।

নিমডালের ফুল। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ৩২, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা—২৬। দু' টাকা।

কবিতা নিয়ে ইদানীং খুব হৈ-চৈ হচ্ছে: এবং তা করছেন, বিশেষত, কয়েকজন তরুণ কবি। সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যেও আবার স্পষ্ট দুটি দল আছে। এক, যাঁরা বস্তুত শক্তিমান; কিন্তু ভীষণরকম একটা গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টায় শক্তির অপপ্রয়োগে ব্যস্ত। এ'দের প্রতিটি কবিতা নতুন বিস্ময় উন্মোচন করে; পক্ষান্তরে, এ'দের প্রতিটি কবিতা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত করে। আন্দোলনের মোহ কোনো-কোনো সময়ে ব্যর্থতা ডেকে আনে; বর্তমান সময়েও সে-রকম সন্দেহ পোষণ করা অহেতুক নয়। দুই, যাঁরা নিরপেক্ষ রচনায় বিশ্বাসী; যাঁদের মধ্যে সহজ প্রশংসা সংগ্রহের হাস্যকর প্রয়াস নেই। এবং যাঁরা যতোদূর সম্ভব শক্তির সদ্ব্যবহার করেন।

আলোচ্য তিনজন কবি দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যতীত বাকি দু'জন—মানস রায়চৌধুরী ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়—সাধারণভাবে গত দশ বছর কবিতা লিখছেন। সমরেন্দ্রর কবিতা-চর্চা বেশিদিনের নয়; গত পাঁচ বছরে নানা পত্রিকায় তাঁর কবিতা দেখা গেছে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও মানস রায়চৌধুরী এই প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। 'নিমডালের ফুল' শংকরানন্দের দ্বিতীয় গ্রন্থ।

সাম্প্রতিক কবিতার যে-কোনো আলোচনায় এখন পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব সন্ধান করা প্রায় নিয়ম হয়ে পড়েছে। সেইসব সমালোচকদের জন্য করুণা হয়, এখন পর্যন্ত মৃত অতীত যাঁদের একমাত্র সম্বল। স্পষ্টভাবে বলা যায়, বিশিষ্ট তরুণ কবিদের কবিতায় আজ পূর্ববর্তী কবিদের কোনো প্রভাবই নেই। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যতীত তিরিশের যুগের জীবিত বা মৃত আর কোনো কবিই নেই, যাঁদের উপর নির্ভর করা যায়, কিংবা, যাঁদের কবিতায় আশ্রয় নেওয়া যায়। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যতোটা সম্ভব, চল্লিশের কবিরাই বিচরণ করেছেন, এবং সার্থকভাবে; এবং শেষ পর্যন্ত চল্লিশের কবিদের পক্ষেও উল্লিখিত দু'জনের আকর্ষণ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। এই দশকের কবিদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙলা কবিতার ঐতিহ্যে বাস করেন ঠিকই, যেমন মানস রায়চৌধুরী; কিন্তু, তাঁদের কেউ-ই 'প্রভাবিত' বলতে পারি না। অবশ্য সেইসব গৌণ পদ্যকারদের কথা আলাদা, যাঁরা হজমপটু ও কিছু পরিমাণে চতুর—বোদলেয়ার বা রিলকের বহুপঠিত কবিতার বঙ্গানুবাদ ক'রেই তৃপ্ত।

আগে বলেছি, সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের আবির্ভাব বেশিদিনের নয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিস্ময়কর পরিণতি অর্জন করেছেন। তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও গঠন ইস্পাতের মতো কঠিন; ধ্বনিময় শব্দের নিপুণ নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলি, এইসব গুণাবলী তাঁর নিজস্ব, আর এখনকার কবিতায় প্রায় দুর্লভ। উপরন্তু, তাঁর প্রতিটি কবিতাই অদ্ভুত আবেগে সম্পূর্ণ।

বিলুপ্ত অতীতের/বিস্মৃতির ক্ষমাহীন

কখনো আধুনিক সভ্যতায় অন্তর্গত বিষাদ অতিক্রমের প্রয়াসে।—

"ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে
অজস্র ছবির ভ্রান্ত রেখাগুলি
তবু কি তোমার প্রেম রচনার যোগ্য
কোনো বিষাদ হবে না!"

কিংবা,

"......, কারা যেন খুব কুয়াশায়/শবাধার
কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
পৃথিবীর শুদ্ধতম বিশ্বাসের দিকে"—

ইত্যাদি পংক্তি সমরেন্দ্র সম্পর্কে আশান্বিত করে। নিজেকে অনুকরণ না করলে, নিকট ভবিষ্যতে তাঁর কবিতা যে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করবে, তা এক-রকম নিশ্চিত।

মানস রায়চৌধুরী সমরেন্দ্র'র বিপরীত মেরুর কবি। কবিতা: শব্দ ও চিত্রকল্প—তাঁর হাতের কৌশলে পুতুলের মতো নাচে। শব্দের ও চিত্রকল্পের গভীরতা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন; তিনি জানেন ঠিক কীভাবে প্রয়োগ করলে আকাঙ্ক্ষিত দূরত্ব স্পর্শ করা যায়। অযথা চতুর হবার চেষ্টা নেই; যে-নাটকীয় কৌশল আরোপ করলে কবিতা সহজেই, অন্তত ইদানীং জনপ্রিয় হ'তে পারে, মানস সহজেই এবং প্রখর বিশ্বাসে তা বর্জন করেন। ফলত, তাঁর কবিতায় এক ধরনের নিরাভরণ সারল্য যুক্ত হয়, যা আসলে গভীরতার ছদ্মরূপ। তাঁর কবিতা কেন দুঃখিত করে, কেন নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হ'তে হয়, তা ভাবতে সময়ের প্রয়োজন। স্মরণযোগ্য অসংখ্য পংক্তি ও স্তবকের মধ্যে থেকে একটি এখানে উল্লেখ করা যায়:

'ওই যে রক্তাক্ত সূর্য বাগান পেরোয় নতশির
তাকেও ভীষণ দুঃখী মনে হয় আজ,
অথচ কোথাও নেই কষ্ট
কিংবা অগোচরে লুণ্ঠিত মরণ
আমি অমাবস্যা রাত্রে বাড়ি ছেড়ে
চলে গেলে একা......' ইত্যাদি।

আলোচনার শেষ কবি শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি কবিতা-চর্চা করছেন। মানস রায়চৌধুরী সম্পর্কে যে-সব গুণের উল্লেখ করা হ'ল, শংকরানন্দের ক্ষেত্রেও তার অনেকগুলি প্রয়োগ করা যায়। স্বচ্ছ কবিতা শংকরানন্দ অনায়াসে রচনা করেন। তথাপি, 'অজ্ঞাত-বাস'এর পর তিনি বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর কিছু কিছু পংক্তি যেমন:

"আমি সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বড় ক্লান্ত
তৃষ্ণা সুগভীর,
আমার বুকের মধ্যে রুগন এক প্রাণী
বাসা বাঁধে......"

[illegible] নিজস্ব কবির সাফল্যে উত্তীর্ণ"।

রঙ্গজগৎ

সত্যজিৎ রায় নীরব কেন ?

জাতীয় জীবনের বর্তমান মহাসংকটে বাংলার চলচ্চিত্রলোক যেভাবে দেশ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই সংঘবদ্ধ কর্ম-প্রয়াসে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত ভূমিকার প্রশ্ন হয়ত অবান্তর। কিন্তু চলচ্চিত্র-জগতে এমন কোন ব্যক্তি যদি থাকেন যাঁকে আমরা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারি না এবং যিনি নেতৃস্থানীয়, গোষ্ঠীগত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও আমরা তখন তাঁকেই খুঁজে ফিরি।

সত্যজিৎ রায় বাংলার চলচ্চিত্রলোকের এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি। দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ বাংলার চলচ্চিত্রজগতের মহান কর্মযজ্ঞে তাঁকে আমরা পুরোধারূপে পাব এই আশাই পোষণ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কম্যুনিস্ট চীনের বর্বরোচিত ভারত-আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে যখন দেশবাসীর সংগে আমাদের চলচ্চিত্রলোকও দেশরক্ষার দুর্জয় পণ গ্রহণ করেছে, তখন সত্যজিৎ রায়কে যেন আমরা অনেকটা নীরব ও নিষ্ক্রিয় দেখতে পাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায় গুণী এবং একনিষ্ঠ শিল্পী। বাইরের কর্ম-কোলাহল থেকে দূরে থেকেও তিনি দেশাত্মবোধক ছবি তৈরি করে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন। স্বেচ্ছায় এই শুভকর্ম সম্পাদন করে তিনি দেশবাসীর সাধুবাদার্হ হতে পারতেন।

জানি না, ব্যক্তিগতভাবে হয়ত তিনি সাধ্যানুযায়ী জাতির প্রতিরক্ষার কাজে নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, তাঁকে আমরা বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের এক বিশেষ প্রতিনিধি এবং অন্যতম নেতা হিসাবেই দেখে এসেছি। আমরা ভেবেছিলাম, জাতীয় সংকটকালে তাঁর ভূমিকা স্পষ্টগোচর হয়ে উঠবে। আমাদের এই ধারণা এখনও সত্য হল না। দেশরক্ষার কাজে বাংলার চলচ্চিত্রলোকের গোষ্ঠীগত কর্মপ্রয়াসের পুরোভাগে তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু কেন?

দেশসেবায় যিনি আত্মনিয়োগ করতে চান তিনি আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন না। আমরা এখনও আশা করি, সত্যজিৎ রায় স্বেচ্ছায় বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের দেশসেবামূলক কাজে তাঁর যথানির্দিষ্ট স্থানটি এসে গ্রহণ করবেন।

স্টার-এ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যে মঞ্চস্থ "কারাগার" নাটকে ঝিলি চক্রবর্তী। ফটো—দেশ

দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ

কলকাতার শিল্পলোক

প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে স্টার থিয়েটার-এর কর্তৃপক্ষ গত ২৬শে নভেম্বর মন্মথ রায়ের "কারাগার" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে। অভিনয় অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী এবং শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের স্বতন্ত্র দান (মোট ৫৫২৯ টাকা) সেদিন প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়। তা ছাড়া সেদিন সোনা ও অলংকার দান করেন স্টারের স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিল মিত্রের সহধর্মিণী (আর্মলেট, কঙ্কন, হার, টিকলি,

স্টার-এ "কারাগার" নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলের হাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সাহায্যার্থে অলঙ্কার দান করছেন ঝিলি চক্রবর্তী ও অপর্ণা দেবী এবং অর্থদান করছেন কমল মিত্র ফটো—দেশ

বি আর পান্থালু পরিচালিত "দিল তেরা দিওয়ানা" (পদ্মিনী পিকচার্স) ছবিতে মালা সিংহ ও শাম্মি কাপুর

তাবিজ, কান, বোতাম এবং পাঁচটি গিনি ও চারটি হাফ-গিনি), গীতা দে (হার), **অপর্ণা দেবী** (নেকলেস), লিলি চক্রবর্তী (নেকলেস), দেবনারায়ণ গুপ্ত (সোনার কলম), অনিল বসু (বোতাম), শান্তিগোপাল ও প্রভাবতী জানা (আংটি), চন্দ্রশেখর ও তাপস চট্টোপাধ্যায় (মেডেল), অভিনেতা কমল মিত্র ও কাহিনীকার ("শেষাগ্নি") **শক্তিপদ রাজগুরু অর্থদান করেন।** নাট্যাভিনয়ের পর স্টার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন, রঙ্গালয়ে অনতিবিলম্বেই **মন্মথ** রায়ের "স্বর্ণকীট" (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) অভিনীত হবে।

অখিল ভারত সংগীত-কলা শিল্পী সংঘের সম্পাদিকা চৌধুরাম মেহদী বাই-এর একান্ত চেষ্টায় সংস্থার এক জরুরী অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যতদিন ভারত শত্রুমুক্ত না হচ্ছে ততদিন সংঘের সমস্ত সদস্য তথা স্থানীয় বাইগণ প্রতি মাসে নাচ-গান দ্বারা তাঁদের এক দিনের উপার্জন তাঁরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করে যাবেন।

দেশরক্ষা তহবিলে অর্থদানের উদ্দেশ্যে **রঙমহলের শিল্পীরা** ৮ই ডিসেম্বর "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নাটকের একটি বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

মলয় গীত বীথি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে ৫ই ডিসেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী বিচিত্রানুষ্ঠান নৃত্যনাট্য ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। সিংহী পার্কে (বালীগঞ্জ) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রীমঞ্চ সংস্থা জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থদানের জন্য আগামী ১৬ই ডিসেম্বর রঙমহলে গিরিশচন্দ্রের "জায়সা কা-তায়সা" ও মন্মথ রায়ের "মহাপ্রেম" নাটক দুটি মঞ্চস্থ করবেন।

হাওড়ার বিশিষ্ট দুটি নাট্য-সংস্থা **নট-নাট্যম ও ঋত্বিক সম্প্রদায়** দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের নিয়মিত অনুষ্ঠান বর্জন করে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দেশাত্মবোধক নাটক "আহ্বান" (জগমোহন মজুমদার রচিত) ব্যাপকভাবে অভিনয় করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানের বিনিময়ে এ নাটকের অভিনয় যে-কোন সভা-সমিতিতে পরিবেশন করার সিদ্ধান্তও তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

দেশসেবার পরাকাষ্ঠা

ভি শান্তারামের প্রস্তাব

দেশের বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে বোম্বাই-এর কয়েকজন চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক স্বেচ্ছায় ফিল্মস ডিভিশন-এর হয়ে অল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক ছবি তৈরী করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ভি শান্তারাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তর তাঁদের এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

পদ্মিনীর নৃত্যানুষ্ঠান

নৃত্যশিল্পী পদ্মিনী জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে একটি নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের

টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানে স্মারক-গ্রন্থের সমস্ত আয় (বিজ্ঞাপন মূল্য সমেত) তিনি দেশরক্ষা তহবিলে দান করেন।

প্রেমনাথের আগ্রহ

বোম্বাই-এর চিত্রাভিনেতা প্রেমনাথ সৈনিকরূপে চীনা দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার বাসনা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরীর নিকট পত্র দিয়েছেন। ইণ্ডিয়ান স্টেট মিলিটারী ট্রেনিং স্কুলে প্রেমনাথ অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেছিলেন।

জাতির সেবায়

বোম্বাই ও মাদ্রাজের চলচ্চিত্রলোক

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে মেহ্‌বুব-এর নতুন ছবি **"সন্ অব ইণ্ডিয়া"-র** একটি বিশেষ উদ্বোধনী প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রদর্শনের টিকিটের হার ১০০,৫০ ও ১০ টাকা।

মাদ্রাজে গত সপ্তাহে **প্রযোজক-পরিচালক এস এস ভাসানের** সহযোগিতায় নির্মিত ও এস ডি সুন্দরম পরিচালিত অল্পদৈর্ঘ্যের তামিল দেশাত্মবোধক ছবিটির ("জাগ্রত ভারত") এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই ছবিতে শিবাজী গণেশন, জেমিনী গণেশন, প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীরা আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বোম্বাইয়ে **মেহবুব স্টুডিয়োজ** প্রযোজিত এবং নাজার পরিচালিত অল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক ছবিটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। উদ্দীপক গানের সঙ্গে দিলীপ-কুমার, রাজেন্দ্রকুমার, রাজকুমার, সুনীল দত্ত, কমলজিৎ প্রমুখ শিল্পীরা এই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

প্রযোজক বি নাগি রেড্ডী জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে আরও ২৫,১১৬ টাকা দান করেছেন। সারা অন্ধ্রে তাঁর "গুনডাম্মা কথা" ছবিটি রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ অতিক্রম করেছে বলে তিনি আরও টাকা দান করলেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে বোম্বাইয়ে সম্প্রতি চিত্রভারতীর **"রামলীলা"** (ঈস্টম্যান কালার) ছবিটির এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রয়লব্ধ ২৬,৭৪২ টাকা দেশরক্ষা তহবিলে দান করা হয়।

* মুক্তিমুক্তি *

এ সপ্তাহে নতুন বাংলা ছবি একটিও নেই। একটি উল্লেখযোগ্য হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে বর্তমান সপ্তাহে। ছবিটির নাম **দিল তেরা দিওয়ানা** (পদ্মিনী পিকচার্স)।

"দিল তেরা দিওয়ানা" দক্ষিণ ভারতের উপহার। নৃত্য-গীতমুখর এই ছবির বিষয়বস্তু হল প্রেম। বি আর পানথালু ছবিটি পরিচালনা করেছেন। মালা সিংহ, শাম্মি কাপুর, মেহমুদ, প্রাণ, শুভা খোটে, মোহন চটি, মনোমোহন কৃষ্ণ ও ওমপ্রকাশ ছবির প্রধান শিল্পী। শংকর জয়কিষণ ছবির সংগীত পরিচালক।

আরও একটি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম **আঁখ মিচৌলি** (বর্মা প্রোডাকশন্স)। মালা সিংহ ও শেখ ছবির মুখ্য শিল্পী। রবীন্দ্র দাবে ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক।

এইচ জি প্রোডাকশন্স-এর "ত্রিধারা" (পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী ফটো—**দেশ**

* চিত্র-সমালোচনা *

অপরিণীতার মাতৃত্ব

বিপ্লবী মন আর অসংযমী মন যে এক নয় এবং অন্ধ অভিমান যে আত্মনাশেরই নামান্তর—এই দুটি বক্তব্যের ভিত্তিতেই "নবদিগন্ত"র (শিশির মল্লিক প্রোডাকশন্স) কাহিনী রচিত।

বলা নিষ্প্রয়োজন, কাহিনীর বক্তব্য (কাহিনীকার : ডঃ বিশ্বনাথ রায়) আধুনিক কালের তরুণ-তরুণীর প্রণয়-বাসনার পরিপ্রেক্ষিতেই উচ্চারিত।

চিত্রকাহিনীতে দুটি প্রেমোপাখ্যান রয়েছে। একটি উপাখ্যানে দেখানো হয়েছে অপরিণামদর্শী প্রণয় ও অপরিণীতার মাতৃত্ব। অবৈধ মাতৃত্বের বিড়ম্বনা সইল যে নারী, সে তার কন্যাকে নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার শিক্ষাই দিতে চেয়েছিল। এ নিয়েই নাট্যকাহিনীতে সংঘাত দেখা দেয় এবং পরিণামে অবিবাহিতা জননী বিশ বছর

পর তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হয়। এবং তার কন্যাও নিজ প্রণয়ীর বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে।

এই কাহিনীর মাধ্যমে দর্শকরা তরুণ-তরুণীর প্রণয়-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবেন কিনা, জানি না। তবে আজকাল অবিবাহিতার অবৈধ মাতৃত্ব নিয়ে গল্প লেখার শখ অনেক অপরিণত লেখককেই পেয়ে বসেছে। আলোচ্য চিত্রের কাহিনীকারও এই প্রলোভন জয় করতে পারেননি। স্বীকৃত, অবৈধ মাতৃত্ব বিষয়ক কাহিনীতে যেসব মামুলী নাট্যোপকরণ দেখা যায়, এ ছবিতে তার অনেক কিছুই বিদ্যমান। বাবার নাম বলতে না পেরে স্কুলের ছাত্রীদের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এসে মাকে ছোট মেয়ে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করছে—এই ঘটনা ত ছবিতে আছেই। তা ছাড়া আরও অনেক বহু-ব্যবহৃত নাট্য-উপাদানে এই চিত্রকাহিনী ভারাক্রান্ত। এবং ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ—বাস্তব জীবনে যা দুর্লভ এবং চলচ্চিত্রপটে যা অতিমাত্রায় সুলভ—এই চিত্রকাহিনীর গতি ও পরিণতির পথটি সুগম করেছে।

তবে ছবির চিত্রনাট্যটি (রচনা : বিনয় চট্টোপাধ্যায়) স্বচ্ছন্দগতি। অগ্রদূত-গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। অতি সাধারণ গল্পের চিত্ররূপও যে এই অভিজ্ঞ পরিচালকগোষ্ঠীর প্রয়োগ-কর্মের গুণে দর্শনীয় হয়ে উঠতে পারে "নবদিগন্ত" তারই প্রমাণ। তাঁদের পরিচালনা সর্বাংশে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, ঠিকই ' কিন্তু একাধিক নাট্য-মুহূর্ত রচনায় এবং সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিক সৌষ্ঠবে তাঁরা ছবিতে প্রয়োগ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং দুর্বল কাহিনী সত্ত্বেও ছবিটিকে তাঁরা উপভোগ্য করে তুলেছেন।

ছবির দুটি রোমাণ্টিক জুটির ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, এবং বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

বসন্ত চৌধুরী প্রণয়ী যুবকের বেশে ভাল অভিনয় করেছেন, না বিড়ম্বিত প্রৌঢ়ের রূপসজ্জায়—এ নিয়ে দর্শকমহলে আলোচনা হতে পারে। তবে জীবনের দুটি রূপই তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-প্রণয়ের মাধুর্যে, দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ও জননীর ব্যক্তিত্বে-মর্মস্পর্শী।

বিশ্বজিতের অভিনয়ে অধ্যাপকের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠেনি। অবশ্য তরুণ প্রেমিকরূপে তাঁর অভিনয় সপ্রাণ। প্রণয়িনীর মাকে অভিযোগ করার কালে তাঁর অভিনয় মনে দাগ কাটে। সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় এ ছবিতে আরও ভাল হতে পারত। তবে চিত্রনাট্যের দাবি ইনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

ছবির অন্য এক বিশেষ চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় মনোজ্ঞ। পার্শ্বচরিত্রে অপর্ণা দেবী, আরতি দাস, রাখী মজুমদার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনার কাজে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে দর্শকরা যা আশা করে থাকেন, এ ছবিতে তা পূর্ণ হয়নি। মন-মাতানো গান ছবিতে নেই। আবহ-সংগীত পরিবেশানুগ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে আলোকচিত্র গ্রহণ (বিভূতি লাহা), শব্দগ্রহণ (যতীন দত্ত), চিত্রসম্পাদনা (বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়) ও শিল্পনির্দেশনা (সত্যেন রায়চৌধুরী) অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

•

আমোদের পশরা

আমোদের মাদক রসে দর্শকের মন মজানোই "মন-মৌজী" (এ-ভি-এম) ছবিটির লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, ছবিটি এই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছে।

তবে চিত্রপরিচালক কৃষ্ণন পানজু ছবিতে আমোদের উপকরণ সম্বন্ধে পরিবেশন করতে

পিয়ে [illegible] নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়েছেন। [illegible]-উপকরণেই যাঁরা তুষ্ট, তাঁদের [illegible] এই ছবি অবশ্যই উপভোগ্য।

চিত্রকাহিনীর নায়ক জীবনে দু'বার মাত্র অপকর্ম করেছে। অর্থাৎ চৌর্যকর্মের আশ্রয় নিয়েছে। একবার মাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। আর একবার বড় হয়ে সহোদরার মনস্কামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। তার এই পদস্খলনের সূত্রেই চিত্রকাহিনীটি বাঁধা। এবং ছবির মেলোড্রামার যত কিছু আবেগ-উপাদান এই দুই ঘটনাকে ভিত্তি করেই দানা বেঁধে উঠেছে। ছায়াছবির কষ্টকল্পিত চরিত্রের সুখদুঃখ যাদের মনে দোলা দেয় তারা ছবির এই মেলোড্রামার বিস্তার ও বিন্যাসের বাঁকে বাঁকে অশ্রুবিসর্জন ও পুলক অনুভবের অবকাশ পাবেন। তবে যুক্তির কষ্টিপাথরে ছবির আবেগধর্মী ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গেলে দর্শকরা নিরাশ হবেন। কারণ গোড়াতেই দর্শকমনে একটি প্রশ্ন জাগে—নায়কের যে দুটি চৌর্যকর্মের ওপর ছবির মেলোড্রামাটি বিধৃত, তা কি অপরিহার্য ছিল?

ছবির অন্যতম উপাখ্যান প্রণয়ের। নায়ক ও তার প্রণয়িনীর প্রেমালাপ, নাচ-গান, মান-অভিমান এবং পরিণয় নিয়েই এই প্রেমোপাখ্যান গঠিত।

ছবিতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার ও সাধনা। নায়িকার রূপসজ্জায় সাধনার অভিনয় মরমী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ওম প্রকাশ, অসীমকুমার, প্রাণ, নাজ, ভারতী রায়, দুর্গা খোটে ও আনোয়ার।

মদনমোহন ছবির সংগীত পরিচালক। তাঁর সুরারোপিত ছবির একাধিক গান সুখ-শ্রাব্য। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উন্নত মানের পরিচায়ক।

* ছবির পর ছবি *

রূপ-সনাতন

শুভকল্প চিত্রমের ভক্তিমূলক ছবি "রূপ-সনাতন"-এর কাজ সমাপ্ত। ছবিটি মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। সুনীলবরন এই ছবির পরিচালক। এতে অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, মলিনা দেবী, শিপ্রা মিত্র, সবিতা বসু। রথীন ঘোষ ছবির সুরকার।

অবশেষে

অভ্যুদয় [illegible]-এর 'অবশেষে' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন মৃণাল সেন। আধুনিক দাম্পত্যজীবনের নানা সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই ছবির উপজীব্য। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরন, সুলতা চৌধুরী, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, তরুণ-কুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও শিশুশিল্পী কুনাল ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

হাসি শুধু হাসি নয়

ইন্দ্রাণী প্রোডাকশন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রের পরিচালনায় ছবির দুটি গান রেকর্ড করা হয়। জহর রায়, বিশ্বজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ ছবির তিন প্রধান শিল্পী।

পলাতক

যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে গত সপ্তাহে "পলাতক" (প্রযোজক ঃ ভি শান্তারাম) ছবির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য গৃহীত হয়। এই অন্তর্দৃশ্যের জন্য মনোরম সেট তৈরি করেন শিল্প-নির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত। অনুভা গুপ্ত, রুমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, ভারতী দেবী এবং অনুপকুমার (নায়ক) ও সন্ধ্যা রায় (নায়িকা) ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

মহাতীর্থ কালীঘাট

কালীঘাটের কাহিনী নিয়ে তৈরী হচ্ছে আনন্দময়ী চিত্রপীঠের প্রথম প্রয়াস "মহাতীর্থ কালীঘাট"। ভূপেন রায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবির কাহিনী সংগ্রহ করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সমরেশ দাস, অসিতবরন, মিহির ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, শ্যামল ঘোষ, বাবু গাঙ্গুলী, সিপ্রা মিত্র, কৃষ্ণা বসু, রাধারানী, শংকরনারায়ণ, উত্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শম্পা চক্রবর্তী ছবির প্রধান শিল্পী। ছবির কোন কোন দৃশ্য গেভাকলারে রঞ্জিত হবে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য,

রাজকমল কলামন্দিরের "পলাতক" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায়

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় অধিকারী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, শুক্লা ঘোষ, সুমিত্রা ঘোষ, মানস মুখোপাধ্যায় ও সমীরকুমার সাহানি ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন। রথীন ঘোষ ছবির সংগীত পরিচালক।

হাই-হিল

রাজীব পিকচার্স-এর "হাই-হিল" ছবিটির চিত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে। দিলীপ মিত্র পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, দীপক প্রমুখ শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

শিশু রংমহল-এর উৎসব

আগামী ২১শে ডিসেম্বর শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে শিশুরংমহলের একাদশ বাৎসরিক উৎসবের আসর বসবে। উদ্বোধন করবেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। দেশপ্রিয় পার্কের শিশু উদ্যানেই এই ১২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। ভারতের সঙ্কটকালে এ উৎসবের আয়োজন করা উচিত হয়েছে কিনা এ কথার উত্তরে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেন, "শিশুরা জাতির সম্পদ—তাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও আনন্দ উৎসব অব্যাহত রাখতে হবে।" তা সত্ত্বেও উৎসবের অঙ্গহানি না করে উদ্বৃত্ত অর্থের অনেকটা প্রতিরক্ষা তহবিলে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি শিশুরা ৫০১, টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতির হাতে দিয়েছে। এবারকার অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই সি এল টি তার নিজ-গৃহ করবার জায়গা গত ২০শে নবেম্বর দখল নিয়েছে। গৃহনির্মাণ কার্য যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করা হবে।

ফেস্টিভালে সি এল টির অবন পটুয়া, ভিজো, মিঠুয়া, আনন্দ, সাধু প্রভৃতি মঞ্চস্থ হবে এবং নতুনের মধ্যে থাকবে 'লালচে বুড়ো' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'কাঠঠোকরা' প্রভৃতি নানা বয়সের শিশুদের অপূর্ব অনুষ্ঠান।

পুতুল নাচ পরিবেশন করবেন সুরেশ দত্ত। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পুতুল নাচিয়ে হাতের কাজ দেখবার সুযোগ পাবে ছোট বড় সবাই। শান্তিনিকেতন ও উড়িষ্যার শিশুশিল্পীদের কর্মসূচীও উল্লেখযোগ্য।

মেলাতে থাকবে সারাভারতের শিশু শিল্পীদের চিত্রকলা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীদের জন্য স্বর্ণ পদক ও পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

শ্রীমতী লুবেকের দান

পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ডঃ হাইনরিখ লুবেকের পত্নী শ্রীমতী লুবেক কলকাতায় অবস্থানকালে গত ৩০শে নভেম্বর রাজভবনে সি-এল-টি'র শিশুশিল্পীদের ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠান দেখে খুবই প্রীতিলাভ করেন। অনুষ্ঠানের পর শ্রীমতী লুবেক শিশু হাসপাতাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান সোসায়েটি ফর দি প্রোটেকশন অব চিলড্রেন-এর (কলিকাতা শাখা) সভাপতি শ্রী জে পি মিত্রের হাতে দশ হাজার টাকার একটি চেক দান করেন। এবং সি-এল-টি'র শিশু-শিল্পীদের নানারকমের সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দেন।

জওলা প্রোডাকশন্স-এর "দুই নারী" (পরিচালনা : জীবন গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিতে বিকাশ রায়

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি "বিশ্বরূপা নাট্য বিদ্যালয়" (বিশ্বরূপা কলেজ অব ড্রামা) স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কালক্রমে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই বিদ্যালয়ের সফল ছাত্রদের বিশ্বরূপা ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতিতে রয়েছেন। শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার ও শ্রীরাসবিহারী সরকার এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম সম্পাদক।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কী ধরনের এবং মুখ্যত কোন্ রসের নাটক দর্শকেরা দেখতে চান সেই মর্মে নাট্যামোদীদের মতামত পত্রাকারে জানাবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন **থিয়েটার সেন্টার**-এর পক্ষ থেকে শ্রীতরুণ রায়। ১৯৬৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীরায় "সাজাহান" নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করছেন। এই নাটকে অভিনয়েচ্ছু পেশাদার ও শৌখিন শিল্পীরা যাতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন সে আবেদনও তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

বোম্বাই সমাচার

বোম্বাই-এর **ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি ডিফেন্স কমিটি** জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে এ পর্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেছেন। কমিটির সম্পাদক সম্প্রতি এই টাকা শ্রীচ্যবনের হাতে তুলে দেন।

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় আবার অসাধ্য সাধন করলেন। "সুজাতা" ছবিতে তিনি শচীন দেববর্মনকে দিয়ে গান করিয়েছিলেন। "বন্দিনী"তে আবার তিনি সংগীত-পরিচালক শ্রীদেববর্মনকে দিয়ে গান করালেন।

মডার্ন স্টুডিয়োজ-এ সম্প্রতি শর্মিলা ঠাকুর "কাশ্মীর কী কলি" ছবির সুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেন। শক্তি সামন্তর এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য শ্রীমতী ঠাকুর কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় চুক্তিবদ্ধা হন। হিন্দী ছবিতে এই তাঁর প্রথম অভিনয়। ছবিটি ইস্টম্যান কালারে তৈরী হচ্ছে।

গত সপ্তাহে গুরু দত্ত স্টুডিয়োতে উত্তম চিত্রের "বিন বাদল বরসাত" ছবির নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ

রাজপথে উদ্দীপক গানের পালা

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব, জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ।
তোদের মা ডেকেছে কব বারে বারে।

ছবিতে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অমল মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী, সুজাতা চক্রবর্তী, বন্দনা সিংহ, মিণ্টু দাসগুপ্ত, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কণ্ঠশিল্পীদের দেখা যাচ্ছে। ফটো: দেশ

মহাজাতি সোসাইটি হলে চীনের বর্বরোচিত ভারত-আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলার সাহিত্যিকদের প্রতিবাদ-সভায় দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছেন বন্দনা সিংহ, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

একটি রোমান্টিক গানের দৃশ্য গ্রহণে অংশ নেন। হেমন্তকুমার এই ছবির সুরকার। জ্যোতি স্বরূপ ছবিটি পরিচালনা করছেন।

প্রযোজক - সুরকার হেমন্তকুমারের "শর্মিলা" ছবির প্রথম স্যুটিং সম্পন্ন হবে রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে। নায়ক উত্তমকুমার ছবির এই বহির্দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করবেন। বিশ্বজিৎকে ছবিতে অল্পক্ষণের জন্য দেখা যাবে। অতিথি শিল্পী হিসাবেই তিনি ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। মঞ্জু দে ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল।

এস এম আহ্সানের পরিচালনায় হামরাহী ফিল্মস-এর "দায়াদ" ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিশ্বজিৎ এ-ছবির নায়ক; নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন অনীতা গুহ। কল্যাণজী আনন্দজী ছবির সংগীত পরিচালক।

জার্মান ছাত্রদের মঞ্চাভিনয়

সমসাময়িক জার্মান নাটকগুলির ওপর বিশেষ বিশেষ দর্শকদলের যথেষ্ট প্রভাব আছে। সরকারী আর্থিক সাহায্যের আনুকূল্যে এইসব মঞ্চ নাটকের সূক্ষ্ম দিকের প্রতি বিশেষ নজর দেয় না। আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, ছোট ছোট শহরেও বেশ নাম-করা অভিনেতারা অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ছাত্রদের মঞ্চ এইসব মঞ্চ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; তাদের বাঁধাধরা কোন দর্শক নেই, কোন আর্থিক সাহায্য নেই, কোন তারকা নেই, কোন সরকারী শাসন নেই, আছে কেবল শিল্পকলাসম্মত সুন্দর অভিনয়।

পেশাদারী মঞ্চগুলির মত ছাত্র-নাট্যমঞ্চগুলির যান্ত্রিক সংগঠন বা আর্থিক সংগতি নেই। অথচ অতি অল্প খরচে বুদ্ধি খাটিয়ে মঞ্চে তারা যে অদ্ভুত দৃশ্যসজ্জা ফুটিয়ে তোলে তা সত্যিই অপূর্ব! মজার কথা এই যে, কোন কোন দল হঠাৎ যেমন নাম করে, তেমনি হঠাৎ আবার মিলিয়ে যায়। তার কারন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়া সাঙ্গ হলেই ছাত্র অভিনেতার দল ভেঙ্গে গিয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ে কে জানে।

জার্মান ছাত্র নাট্যসংঘগুলি সরকার থেকে বিশেষ সহানুভূতি পায় না এবং সেই জন্যে তাদের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। একটি দুটি নাটকে পয়সা না আসলে লালবাতি জ্বলে। তা হলেও এরা পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে আপোস করতে রাজী নয়। কারণ, এই-সব দলের দর্শকবৃন্দ এত উন্নাসিক ও রুচিবাগীশ যে, তারা নিজেদের এইসব দলের সামান্য দোষত্রুটিপূর্ণ নাটক দেখবে কিন্তু মঞ্চসফল কোন বাজে নাটক কিংবা আধা-পেশাদারী নাটক দেখতে রাজী নয়।

ছাত্রদের মধ্যে আজকাল সম্পূর্ণ অবাস্তব পরীক্ষানিরীক্ষার ঝোঁক কমে আসছে। আজ-কাল এমন সব নাটক তারা করছে যেগুলি সমাজের সমস্যা তুলে ধরে। ছাত্রদের মঞ্চাভিনয়ের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু তাতে হয়তো উপকারই হয়েছে। কারণ, একটা নব রূপান্তরের সূচনা দেখা দিয়েছে। সে যাই হোক, পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-জীবনে ছাত্রদের মঞ্চাভিনয় যে একটি স্থায়ী আসন পেতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ক্লাউস পেজ্যান

টুডিওবিউনে ছাত্রবৃন্দ দল কর্তৃক অভিনীত 'চালবাজ সৈন্য' বা মাইহান্ গোরিওলাস নাটকের একটি দৃশ্য

* পাঠকের চোখে *

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকায় 'বাংলা ছায়াছবির সংকট' নিয়ে যেসব আলোচনা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি দুচারটা কথা বলতে চাই।

গত ৩রা নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় কাজল দেব মহাশয়ের পত্রের সমর্থন করে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আসামের এই প্রধান শহর গৌহাটিতে চারটা সিনেমা গৃহ থাকা সত্ত্বেও মাসের মধ্যে একটিও বাংলা ছবি দেখানো হয় না। প্রত্যেক সপ্তাহেই সস্তা দরের হিন্দী ছবি দেখানো হয় (যদিও কদাচিৎ দু-একটা পুরানো বাংলা ছবি দেখানো হয়ে থাকে) অথচ এখানে বাংলা ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আসামের বড় বড় শহরে উচ্চ স্তরের বাংলা ছবির দর্শক প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও এখানে কেন যে বাংলা ছবি দেখানো হচ্ছে না তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। একমাত্র আসামের সিনেমা গৃহগুলিতে যদি নিয়মিতভাবে বাংলা ছবি দেখানো হয়, তবে বাংলা সিনেমা শিল্পের সংকট বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিষয়ে সচেষ্ট হবার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

[illegible], গৌহাটি

খেলার মাঠে

একলব্য

খেলাধূলায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী রাজ্য। ক্রিকেটে অবশ্য বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু সমস্ত খেলাধূলায় পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী, এ কথা অনস্বীকার্য। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল, টেনিস, টেবল টেনিস, সাঁতার—সব খেলাধূলাতেই বাঙলার অধিবাসীর সমান আগ্রহ। আবার ভারোত্তলন এবং শরীর সংগঠনেও বাঙ্গালী সবার শীর্ষে, ইনডোর গেমসেও তারা পিছিয়ে নেই।

সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি খেলাধূলার ফলাফল থেকেও এর প্রমাণ মেলে। ফুটবলের কথাই আগে বলি। সর্বভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার বিজয়ী পুরস্কার আই এফ এ শীল্ড মোহনবাগানের দখলে রয়ে গেছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের যুগ্ম বিজয়ী হয়েছে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়। বোম্বাই থেকে রোভার্স কাপের যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। জাতীয় সাঁতারের পুরুষ, মহিলা ও জুনিয়র বিভাগে বাঙলা পর্যাপ্ত প্রাধান্য দেখিয়েই চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে।

নিখিল ভারত ব্রিজ প্রতিযোগিতাতেও বাঙলা বিজয়ী হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন-শিপ বাঙলাতেই রয়ে গেছে। ভারতকুমার অর্থাৎ দেহ-সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার তিনটি গ্রুপের ৯টি স্থানের মধ্যে বাঙালীরা দখল করেছে ৭টি স্থান। তাই বলছিলাম, খেলাধূলায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। ক্রিকেটের মত আর দু' একটি খেলা যেমন, টেনিস, টেবল টেনিস বা ব্যাডমিণ্টনে অবশ্য বাঙলার একক প্রাধান্যের পরিচয় নেই। তবু সংখ্যার দিক দিয়ে বাঙলা ভারতকে যত খেলোয়াড় উপহার দিতে পারে, অন্য কোন রাজ্যই তা পারে না। আমার বক্তব্য, বাঙলায় সমস্ত খেলাধূলার জনপ্রিয়তা যেমন বেশী, তেমন এখানে খেলোয়াড়ের সংখ্যাও অধিক।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেই বাঙালী খেলাধূলায় এই অগ্রগতির পরিচয় দিয়ে চলেছে। এখানে মাঠের অভাব, স্টেডিয়াম নেই বললেই চলে, সুইমিং পুল আজও গড়ে ওঠেনি। ব্যাডমিণ্টনের স্ট্যাণ্ডার্ড কোর্ট মাত্র একটি। তাও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি করা হয়নি।

দেশের জরুরী অবস্থার মধ্যে খেলাধূলার ব্যাপার নিয়ে রাজ্য সরকারকে কিছু বলা হয়তো ঠিক হবে না। কারণ, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই এখন তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত। তবু চিরদিন দেশের জরুরী অবস্থা থাকবে না। আর জরুরী অবস্থার জন্য কোন কিছু আটকেও থাকছে না। কংগ্রেসের নায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রীদের কাছ থেকে খেলোয়াড়রা আজ যেমন উৎসাহ পাচ্ছেন, এমন আগে কোনদিন পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। এই উৎসাহের মধ্যে আর একটু আন্তরিকতা থাকলে এতদিন ক্রিকেট বা ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণের স্থান খালি পড়ে থাকত না।

রোভার্স কাপের যুগ্ম-বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—অবনী বসু, বালু, বি দেবনাথ, প্রমোদ দাশগুপ্ত (ম্যানেজার), নীলেশ সরকার, সুজন ব্যানার্জী (ম্যানেজার), এস সমাজপতি ও চিত্ত চন্দ; বাঁদিক থেকে বসে—সি পাল, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, এস চ্যাটার্জী, রামবাহাদুর ও অরুণ ঘোষ

কলকাতার ফ্টবল স্টেডিয়ামের উপর হয়তো একটা 'অভিশাপ' আছে। কে জানে, স্টেডিয়ামে বসে কলকাতার দর্শকদের ফ্টবল খেলা দেখার স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবে পরিণত হবে কিনা।

যখনই স্টেডিয়াম প্রসঙ্গ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া আরম্ভ হয় তখনই 'অভিশাপের' মত এক একটি বিপদ সামনে এসে দাঁড়ায়। সন্তোষের পরলোকগত মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী আই এফ এ-র সভাপতি থাকা সময়ে প্রথম স্টেডিয়ামের এক পরিকল্পনা করেন দীর্ঘ সাতাশ-আটাশ বছর আগে। স্টেডিয়াম সম্পর্কে তিনি কিছুই করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটাও ধামাচাপা পড়ে। তারপর স্টেডিয়াম নিয়ে মেতে ওঠেন অবিভক্ত বাঙ্গলার অর্থমন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী: এখন যিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কলকাতার বুকে স্টেডিয়াম গড়ে তুলবেন বলে মহম্মদ আলী এক দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। কাজও খানিকটা এগিয়েছিল। তারপর দেশ ভাগ। স্টেডিয়াম পরিকল্পনারও ইতি।

স্বাধীনতা লাভের পর ফ্টবল স্টেডিয়াম সম্পর্কে জনমত যখন প্রবল তখন পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্য বিধানসভায় ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল প্যাস করিয়ে বিলের মধ্যেই স্টেডিয়াম নির্মাণের এক ধারা জুড়ে দিলেন। স্টেডিয়াম সম্পর্কীয় ব্যাপারের ভার পড়ল ক্রীড়ানুরাগী মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপর। কিভাবে স্টেডিয়াম নির্মাণ করলে, কোথায় স্টেডিয়াম গড়া হবে এই সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীদের সাক্ষীসাবুদ এবং পরামর্শ গ্রহণের পর শ্রী রায় স্টেডিয়ামের এক খসড়াও প্রস্তুত করলেন। ইতিমধ্যে ডাঃ রায় ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন স্টেডিয়ামের পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হল।

তারপর ডাঃ রায় নিজে উদ্যোগী হয়ে এলেনবরো কোর্সে স্টেডিয়ামের স্থান নির্বাচন করে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে এলেন। ইতালিয়ান স্থপতি ভিট্টেলোজিকে দিয়ে নকশা তৈরি করলেন। ইতালিয়ান স্থপতির পারিশ্রমিক বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তারও অনুমোদন পাওয়া গেল। মাটি পরীক্ষা, মাঠের জরিপ, সবই ঠিক হয়ে গেল। স্টেডিয়ামের কাজ আরম্ভ করার জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হবে, এমন সময় ডাঃ রায় ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

ডাঃ রায়ের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকার যখন উৎসাহী, কংগ্রেস সভাপতি এবং আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন উদগ্রীব তখন আরম্ভ হল ভারত সীমান্তে চীন দস্যুর হামলা। স্টেডিয়াম তো দূরে, সব কাজের উপরে এখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তাই বলছিলাম কলকাতার ফ্টবল স্টেডিয়ামের উপর হয়তো ভগবানের 'অভিশাপ' আছে।

* * *

ইডেন উদ্যানে সিকি সমাপ্ত ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উপর "অভিশাপ" নেই—এ কথাই বা বলি কি করে। ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে সিকি সমাপ্তও বলা যায় না। প্রস্তাবিত ছয়টি ব্লকের মধ্যে মাত্র একটি ব্লক শেষ হয়েছে। তার মাথার উপর আবার আচ্ছাদন নেই। ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ছয়টি ব্লক তৈরি করতে বহু অর্থের প্রয়োজন, সত্যি কথা। বছরে মাত্র একটি টেস্ট খেলার জন্য এই বিপুল অর্থের ব্যয় বাহুল্য বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে বিচার করলে এই অর্থব্যয়কে মোটেই বাহুল্য বলে মনে হবে না। একটি ব্লক

থেকেই। এখন ভাড়া বাবদ যে টাকা আসছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। ছয়টি ব্লক তৈরি হলে তা থেকে প্রচুর টাকা আসতে পারে। ক্রিকেট রসিকদের খেলা দেখারও সুযোগ ঘটে। উপরন্তু অস্থায়ী গ্যালারী নির্মাণ, আসনের ব্যবস্থাদি করার জন্য প্রতি বছর যে দেড় লাখ দু লাখ টাকা খরচ হয় তাও বেঁচে যায়। বছরে তো শুধু কয়েকদিন ক্রিকেট খেলা। স্টেডিয়ামটি স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠলে সভা-সমিতি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যও এটা কাজে লাগান যেতে পারে। এবং তা থেকে আয়ও হতে পারে যথেষ্ট।

একসঙ্গে পাঁচটি ব্লক করা হয়তো কষ্টকর কিন্তু বছর বছর কিংবা দু বছর অন্তর একটি একটি করে ব্লক তৈরি করলেও রঞ্জি স্টেডিয়ামটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এভাবে ব্লক তৈরি করার ক্ষেত্রেও বাধা আছে। ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট মাঠের প্রকৃত দখলদার ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবকে রাজ্য সরকার বেদখল করেছেন। আশার কথা, রাজ্য সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ রঞ্জি স্টেডিয়াম সম্পর্কীয় গোলমালের মীমাংসার জন্য আগ্রহী।

• • •

যদিও স্টেডিয়ামের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ তবু এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে রাজকোটের রাজকুমার কলেজ সংলগ্ন ক্রিকেট মাঠে ক্রিকেটের অমর শিল্পী দলিপ সিংজীর নামে প্যাভেলিয়ন নির্মাণ খুবই প্রশংসনীয় উদ্যম।

এই রাজকুমার কলেজ মাঠেই পরলোকগত ক্রিকেট শিল্পী দলিপ সিংজীর ক্রিকেটের হাতেখড়ি হয়েছিল। এখানে পাঁচ বছর পড়ার পর তিনি লণ্ডনের চেল্টেনহাম কলেজে ভর্তি হন। পরে তাঁর কাকা রণজিৎ সিংজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভর্তি হন কেম্ব্রিজের ক্লেয়ার কলেজে।

দলিপ সিংজী সাসেক্স দলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩০ সালে এই সাসেক্সের হয়ে নর্দাম্পটনস-এর বিরুদ্ধে তিনি যে ৩৩৩ রান করেছিলেন তা আজও রেকর্ড হিসাবে পরিগণিত। এই বছরই লর্ডসের টেস্ট খেলায় তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৭৩ রান করেন। স্বাস্থ্যের জন্য তিনি দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলতে পারেননি। মাত্র ৯ বছরের ক্রিকেট জীবনে তিনি ৩৩১টি ইনিংস খেলেছেন। এর মধ্যে নট আউট ছিলেন ২৩ বার। ৪৯ বার সেঞ্চুরী করেছেন। রানের অ্যাভারেজ ৪৯·৬৯। টেস্ট খেলার অ্যাভারেজ ৫৮·৫২। ১২টি টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরী সমেত তাঁর রানের সংখ্যা ৯৯৫।

রাজকুমার কলেজে দলিপ সিংজীর নামাঙ্কিত নবনির্মিত প্যাভেলিয়নে একটি ডাইনিং হল সমেত খেলোয়াড়দের দুটি সাজঘর আছে। প্যাভেলিয়ন নির্মাণের জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার এক ক্রিকেট রসিক যিনি দলিপের খেলা দেখে একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি দান করেছেন হাজার ডলার।

ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর দলিপ সিংজী অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে মৃত্যু-সময় পর্যন্ত তিনি সৌরাষ্ট্র ও পরে বোম্বাই পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

রোভার্স কাপের আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন এক বন্ধু রসিয়ে রসিয়ে বলছিলেন, পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে হাত পা বাঁচিয়ে কলকাতার খেলোয়াড়রা যে ফিরে আসতে পেরেছে এটাই সৌভাগ্য। বললাম, পুলিসের সঙ্গে লড়াই মানে কি?

"মানে"? মানে, আমরা আগে লক্ষ্য

কমনওয়েলথ গেমসে ৪৪০ গজ ফ্রি স্টাইল রিলে রেসে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার বব উইণ্ডল, মারে রোজ, এলান উড ও টনি স্ট্রাচান

পার্শ্বে কমনওয়েলথ গেমসের সাঁতার প্রতি যোগিতায় ইংলণ্ডের ১৫ বছর বয়স্কা স্কুল ছাত্রী লিণ্ডা লুডগ্রোভ ২২০ গজ ব্যাক স্ট্রোকে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করে জল থেকে উঠে আসছেন

করিনি। সেদিন দেশ পড়েই হিসাব করে দেখলাম, কলকাতার টীমগুলোকেই বেছে বেছে পুলিসের সংগে ফুটবল মাঠের লড়াইয়ে জুতে দেওয়া হয়েছে।

তারপর হিসাব দিয়ে বললেন। এই দেখ ইস্টবেঙ্গলকে এক দিন হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল পুলিস লাইনসের সংগে আর ফাইন্যালে দু দিন অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিসের সংগে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করবার পর যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান পেতে হয়েছে। রাজস্থানকেও হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল পুলিস লাইনস এবং মহমেডান স্পোর্টিংকে আজমীরের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস লাইনস-এর সংগে খেলতে হয়েছে। জর্জ টেলিগ্রাফ বিহার মিলিটারী পুলিসকে হারানোর পর নিজেরা হেরেছে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিসের কাছে। সুতরাং পুলিসের সংগে লড়াই ছাড়া কি?

এর পর বন্ধু পড়লেন সংবাদপত্রের বিবরণ নিয়ে। বললেন, এক এক কাগজে এক এক রকমের বিবরণ। গোল করার সময় আলাদা, গোলদাতার সংগে নামের মিল নেই। ইস্ট-**বেঙ্গলের পরিচিত খেলোয়াড় হিসাবে মোহনবাগান খেলোয়াড়ের নাম। প্রতি-যোগিতার ইতিহাসেও গরমিল।**

ত্রুটি স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। সাঁত্যই রোভার্স কাপের খেলার বিবরণে এবার নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গেছে। অধিকাংশ দিনই দুই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান পি টি আই ও ইউ এন আই দুই রকমের বিবরণ দিয়েছেন। গোল করার সময়ের গরমিল, গোলদাতার নামের পার্থক্য —কোন কিছুই বাদ যায়নি। ফাইন্যালে ইস্ট-বেঙ্গলের পরিচিত খেলোয়াড় হিসাবে ইউ এন আই মোহনবাগানের সরখেলের নাম ঘোষণা করেছেন কিন্তু খেলেছেন বি দেব-নাথ। রোভার্স কাপের ৭২ ও ৫১ বছরের ইতিহাসে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণার এটাই প্রথম ঘটনা বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে দুই প্রতিষ্ঠান দুই রকমে বছর গণনা করেছেন। এক প্রতিষ্ঠান রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভের বছর ১৮৯০ সাল থেকে হিসাব ধরেছেন, আর এক প্রতিষ্ঠান শুধু যে ক' বছর খেলা হয়েছে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খেলা বন্ধ থাকার হিসাব বাদ দিয়ে বছর গুনেছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কোন অসুবিধা ঘটেনি কিন্তু গোলদাতা ও খেলোয়াড়ের নামের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই তর্কাতর্কি ও বাজি ধরার প্ররোচনা যুগিয়েছে। অনেকের অভিযোগ, রোভার্স কাপে কে কেমন খেলেছে, তা বিবরণ থেকে বুঝতে পারেননি। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কেন এবার পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কেও অনেকের মনে বিরূপ ধারণা আছে। আর ব্যাঙ্গালোরের ইন্সপেক্টরেট অফ্ ইলেকট্রনিকস ইকুইপ-মেন্ট দলকে আই এল ই নামে অভিহিত করার অর্থও অস্পষ্ট। ইন্সপেক্টরেট অফ্ ইলেকট্রনিকস ইকুইপমেন্ট শব্দ তিনটির আদ্যাক্ষর নিলে দাঁড়ায় আই ই ই কিন্তু বার বার দুই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আই এল ই নামে ব্যাঙ্গালোর দলকে অভিহিত করেছেন।

কমনওয়েলথ গেমসে ৪৪০ গজ ফ্রি স্টাইল রিলে রেসে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধি-কারিণী অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজার, রোবিন থর্ন, রুথ এভারাস ও লীন বেল

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৬শে নবেম্বর—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ বলিয়াছেন যে, সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত থানায় তাহাদের স্ব স্ব এলাকায় বসবাসকারী, সকল সুস্থ ও সমর্থ ব্যক্তিকে রাইফেল চালনা শিক্ষা দিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকার সমগ্র দেশে কার্পাস তুলার ফাটকা কারবার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই নিষেধাদেশ অবিলম্বে বলবৎ হইবে এবং ২৬শে নবেম্বর সোমবার বাজার বন্ধের সময় যে দর ছিল, সেই দরে যাবতীয় বকেয়া লেনদেন নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

২৭শে নবেম্বর—চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বৃটেন ভারতকে ঋণ ইজারার ভিত্তিতেই অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ দিবে। ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে বৃটিশ সরকার এই সকল অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতেছেন। অনুরূপ শর্তেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও অস্ত্রশস্ত্র আসিতেছে।

চীনপন্থী নেতা ও সংগঠকদের বন্দিদশার সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতেই পরিষদ সভার গঙ্গাজল শুদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশীর্বাদসহ ডাঙ্গেপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্ব দখল করিয়া লইলেন।

২৮শে নবেম্বর—আজ পর্যন্ত জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের কেন্দ্রীয় হিসাবে মোট সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া ২১৬১২ তোলা সোনা ও সোনার গহনা পাওয়া গিয়াছে।

অদ্য বাঙলার যশস্বী গায়ক ও কীর্তনীয়া কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ট) তাঁহার সিমলা মদন ঘোষ লেনস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

২৯শে নবেম্বর—আজ রাত্রে নয়াদিল্লিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাঁহারা শীঘ্রই আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবেন। এই ঘোষণার ফলে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হইবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আজ নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার সমগ্র দেশে তামা, দস্তা, সীসা ও টিন কোম্পানীসমূহের শেয়ারের ফাটকা লেনদেন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হইবে। আজ বাজার বন্ধের সময় যে দর ছিল, সেই দরে সমস্ত বকেয়া চুক্তির লেনদেনের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৩০শে নবেম্বর—আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে ভারত কাশ্মীর সম্পর্কে এমন কোন মীমাংসায় রাজী হইবে না, যাহাতে তথায় "বর্তমান ব্যবস্থার ওলটপালট হইতে পারে।"

অদ্য কলিকাতায় পশ্চিম জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট ডঃ হাইনরিক লুবকে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য পশ্চিম জার্মানী তাঁহাদের বন্ধু ভারতীয় জনগণের সঙ্গেই থাকিবে।

১লা ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ বলেন যে, কাশ্মীর ও অন্যান্য অমীমাংসিত সমস্যা লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে আলোচনা হইবে তাহাতে কদাপি কোনরূপ 'পূর্ব শর্ত আরোপ করা হয় নাই অথবা আলোচনার গণ্ডি সীমিত' করার কোন কথাও হয় নাই। অবশ্য কাশ্মীর সমস্যা "জটিল ও কঠিন। তবে আমার স্থির বিশ্বাস উভয়পক্ষের সদিচ্ছায় ইহার ও অন্যান্য সমস্যার সম্মানজনক ন্যায্য মীমাংসার সূত্র বাহির করা সম্ভব হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর খণ্ডের জেলাগুলি বিশেষ করিয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিব্বতী ও ভুটানী সমেত অন্যান্য পাহাড়িয়া জাতির লোকদের সন্দেহজনক আনাগোনা ইদানীং বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনীর তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সরকারী মহলে সন্দেহ করা হইয়াছে।

২রা ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ সকলকে নির্ভয়ে কাঞ্চনপত্রে স্বর্ণ বিনিয়োগ করিতে বলেন। তিনি এই মর্মে ইঙ্গিত দেন যে, এখনও যাহারা সোনা আগলাইয়া রাখিবেন তাহারা পরে ঠকিবেন। সোনা সুবিধা দরে বিক্রয় করা যাইবে না, উপরন্তু সুদ পাওয়ার রাস্তাও তখন বন্ধ হইয়া যাইবে।

নেফা বা লাদক অঞ্চল হইতে চীনাদের পশ্চাদপসরণের কোন সংবাদ রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তেজপুরের সামরিক মহলে পৌঁছে নাই। ইউ এন আই এ সংবাদটি পরিবেশন করিয়া জানাইতেছেন যে, ওয়ালং খণ্ডে চীনারা এখনও তাহাদের পূর্ব ঘাটিতেই রহিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে নবেম্বর—ফরাসী জাতীয় পরিষদে দ্য গলপন্থীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া নির্বাচিত হওয়ায় জেনারেল দ্য গলই নূতন ফরাসী সরকারের নেতৃত্ব করিবেন।

পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলী ভুট্টো আজ জাতীয় পরিষদে বলেন যে, চীনের সহিত পাকিস্তানের বন্ধুত্ব শর্ত নিরপেক্ষ। তিনি আরও বলেন, "ইহা আমাদের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম মূল সূত্র।"

২৭শে নবেম্বর—লণ্ডন টাইমসের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে নবেম্বর কম্যুনিষ্ট উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রসংঘের একটি তদারকী ঘাটি আক্রমণ করে। ১৯৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির পর রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর উপর এই প্রথম আক্রমণ।

আজ ব্রাজিলের একটি বোয়িং—৭০৭ বিমান ৯৭ জন আরোহী লইয়া নিখোঁজ হয়। পরে বিমান চলাচল মন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, বিমানটি লিমার ২০ মাইল দক্ষিণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিমানের কোন আরোহী জীবিত নাই বলিয়া বিশ্বাস।

২৮শে নবেম্বর—প্রেসিডেণ্ট দ্য গল আজ ভূতপূর্ব জেনারেল এডমণ্ড জুহোর মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন। জুহো গোপন সেনা-বাহিনী সংস্থার নেতা হিসাবে সামরিক আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ভারতকে 'মিগ' বিমান দেওয়া হইবে না বলিয়া রাশিয়া সরকারীভাবে জানাইয়া দিয়াছে। প্রকাশ, মস্কোস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারী ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে রাশিয়া 'মিগ' জঙ্গী বিমানের পরিবর্তে হেলিকপ্টার ও এ এন—১২ পরিবহণ বিমান সরবরাহ করিতে ইচ্ছুক।

২৯শে নবেম্বর—এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনে তাহার সমস্ত বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিয়াছে। পিকিংয়ের সোভিয়েট দূতাবাসের মাধ্যমেও বাণিজ্য দূতাবাস সংক্রান্ত কোন কাজ করা হইতেছে না।

কায়রোর কর্তৃপক্ষ মহল হইতে আজ জানা গিয়াছে যে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে কলম্বোতে যে আফ্রো-এশীয় ছয় রাষ্ট্র সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা—সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের তাহাতে যোগদান করিবেন না।

৩০শে নবেম্বর—চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত এক পত্রে চীনা ও ভারতীয় সৈন্যগণকে ১৯৫৯ সালের ৭ই নবেম্বরের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন সীমারেখা হইতে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২½ মাইল) দূরে সরাইয়া লইবার প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। চু পত্রে আরও বলেন যে, ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিলে এমন কি এখনকার 'প্রকৃত সীমারেখা'ও পরিবর্তিত হইতে পারে।

১৯৬৪ সালে যে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার কথা আছে, তাহা হইতে কম্যুনিষ্ট চীনকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাবের পক্ষে ভারত গতকাল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভোট দিয়াছে। কিন্তু এতদিন এমন কি গত ৩০শে অক্টোবরও কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে সদস্যরূপে গ্রহণের প্রস্তাব ভারত সমর্থন করিয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর—আমেরিকার প্রাচ্য বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী শ্রীঅ্যাভেরেল হ্যারিম্যান আজ ওয়াশিংটনে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলার পক্ষে একটা ভাল সুযোগ আসিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস।

২রা ডিসেম্বর—প্রথমে পিকিং হইতে অবিরাম প্রচার করা হইতেছিল যে, ভারতের নেহরু সরকার পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র, তাহাদের সমর-লিপ্সা নেহরুর তথাকথিত নিরপেক্ষতা নীতির আড়ালে থাকিয়া হিমালয় সীমান্তে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখন মস্কো হইতে সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' গত শনিবার এই অভিযোগ করেন যে, "সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রজোট" ভারতবর্ষকে তাহার নিরপেক্ষতা নীতি ত্যাগ করিয়া "আগ্রাসী জোটে টানিয়া নিবার মতলবে ভারতে "যুদ্ধ-বিকার" জাগাইয়া তুলিতেছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

লিস্‌টারিন এ্যান্টিসেপ্‌টিক্‌

আপনাকে প্রতিদিনই রক্ষা করছে

মুখের ভেতরটা সব সময় আদ্র আর উষ্ণ বলে সহজেই সেখানে বীজাণু জন্মাতে পারে। দাঁতের ভেতর যদি খাবারের একটু কনাও আটকে থাকে বীজাণুর বাসা গড়ে উঠবার পক্ষে সেটিই যথেষ্ট। পচন নিবারক বা এ্যান্টিসেপ্‌টিক বীজাণুদের বংশ বিস্তার রোধ করে। লিস্‌টারিন—মুখের পচন নিবারক হিসাবে মুখের বীজাণু সহজেই সম্পূর্ণরূপে নাশ করে। আজও আগামীতেও প্রতিদিনই লিস্‌টারিন ব্যবহার করুন।

প্রতিবার আহারের পর লিস্‌টারিন দিয়ে কুলকুচা করলে মুখে এক সজীব সুগন্ধ আনে। পান তামাক খাবার পর খুব করে লিস্‌টারিন কুলকুচা করলে দাঁতে আটকানো কনাগুলিও পুরোপুরি দূর হয়ে যায়। আজও আগামীতেও প্রতিদিনই লিস্‌টারিন ব্যবহার করুন।

দেখা গেছে যাঁরা লিস্‌টারিন ব্যবহার করেন তাদের গলাব্যথা বা সর্দি কাশি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। কম করে হলেও দিনে দুবার যদি লিস্‌টারিন দিয়ে কুলকুচা করা যায় তবে তাতে প্রতিরক্ষার সম্ভাবনা আরও একটু হয়। আজও আগামীতেও প্রতিদিনই লিস্‌টারিন ব্যবহার করুন।

প্রতিদিন লিস্‌টারিন ব্যবহারের অভ্যেস গড়ে তুলুন নিজেকে বীজাণুর হাত থেকে রক্ষা করুন। লিস্‌টারিন সব কাজের উপযোগী একটি নিরাপদ এ্যান্টিসেপটিক, ব্যবহারে প্রতিরোধক হিসাবে রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা দূর করে।

পরিবারের সবাইকে বীজাণুর হাত থেকে বাঁচান—আজও আগামীতেও প্রতিদিনই তাঁদের লিস্‌টারিন দিন।

লিস্‌টারিন এ্যান্টিসেপটিক ৩, ৭ এবং ১৪ আউন্সের বোতলে পাওয়া যায়।

প্রতিদিন লিস্‌টারিন ব্যবহারের অভ্যেস গড়ে তুলুন......

ওয়ার্নার ল্যাম্বার্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী

(সীমিত দায়িত্বসহ যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)

WL.1368 BEN.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

চল চল চল সবে ভারতসন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান' —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

দেশ

আগামী সংখ্যা 'দেশ' একটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যাটি নবাগত ঋতুর বৈশিষ্ট্যপ্রকাশক বিভিন্ন বিষয়—যেমন, সংগীত সম্মেলন, চিত্রকলা প্রদর্শনী, ক্রিকেট, টেনিস, পোলো, রেস, সার্কাস, মরসুমী ফুলের প্রাচুর্য, সাজপোশাকের বৈচিত্র্য, বড়দিনের উৎসব, নাট্যালয় প্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কিত চিত্রবহুল ও আকর্ষণীয় রচনাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য ইডেন উদ্যানে ২২ ডিসেম্বর থেকে চার দিনব্যাপী প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার যে আয়োজন হয়েছে তাতে যোগদানকারী বিখ্যাত খেলোয়াড়দের সচিত্র পরিচিতি এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। উল্লিখিত প্রতিটি রচনাই অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত। এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য যথারীতি ৪০ নয়া পয়সাই থাকবে।

৬ সুটারকিন স্ট্রীট
কলিকাতা ১

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 15th December 1962

৩০ বর্ষ ॥ ৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়স
শনিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

সমুচিত জবাব

চৈনিক যুদ্ধবিরতি আর চৈনিক যুদ্ধপ্রস্তুতির মধ্যে তফাৎ কেবল টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। যুদ্ধবিরতিটা ভান, শান্তিপ্রস্তাব প্রতিপক্ষের মনোবল নষ্ট করে ফাঁদে ফেলার প্রলোভন। কম্যুনিস্ট শান্তি আন্দোলন। ছলাকলা যাঁদের সুপরিচিত তাঁরা চৈনিক কম্যুনিস্ট যুদ্ধবিরতির পালা-অভিনয়ে বিভ্রান্ত হন নি; ভারতের দেশপ্রেমী জনসাধারণও হয় নি। চৈনিক চাতুরীর উদ্দেশ্য সেদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। পিকিং-এর যুদ্ধবাজরা তাই আবার শান্তিদূতের মুখোশ খসিয়ে স্বমূর্তি ধারণ করেছে; হুমকী দিয়েছে যে, তাদের শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি ও শান্তিপ্রস্তাব ভারতবর্ষ মেনে না নিলে ফল ভাল হবে না। সে-ও ভাল, কারণ ফল কী হতে পারে তার অগ্রিম পরিচয় বিশ্বাসঘাতক চৈনিক সাম্রাজ্যবাদীরা অনেকবার দিয়েছে। চীনা কম্যুনিস্টদের কপট বন্ধুত্বের চেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ্য শত্রুতা স্বাধীন ভারতকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে।

পিকিং-এর কম্যুনিস্ট কর্তাদের নতুন করে চেনার প্রশ্ন ওঠে না। স্টালিন সম্পর্কে ভুক্তভোগীদের একটা সুপ্রচলিত উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। স্টালিনের ভ্রূকুটীর চেয়ে মারাত্মক, প্রাণান্তকর ছিল তাঁর অমায়িক হাসি। কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের শীর্ষদেশে স্টালিনের শূন্য গদীর দাবিদার মাও সে তুং সম্পর্কেও সেই কথা। মাও-চৌ-এর পঞ্চশীলমার্কা অমায়িক হাসির পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না চৈনিক যুদ্ধবিরতি ও শান্তিপ্রস্তাবের নিগূঢ় চরিত্রটা কী। কাজেই চৈনিক প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের ভালমন্দ বিচার চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নিরর্থক কালক্ষয় না করাই সমীচীন ছিল। হয়ত শ্রীনেহরুর অনেক মোহভংগকারী অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ক্ষীণ আশা ছিল পিকিং-এর কর্তাদের শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধির উদয় হলেও হতে পারে। কিন্তু তা হয় নি, হওয়ার কথাই নয়। অথবা হয়ত শ্রীনেহরু আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় চৈনিক অপপ্রচারের সুযোগ না দেওয়ার জন্য চৈনিক যুদ্ধবিরতি ও শান্তিপ্রস্তাব কিছুটা নাড়াচাড়া করা সঙ্গত মনে করেছিলেন। ভারতের সংগ্রামী সংকল্প যাতে স্বল্পকালের জন্যও সামান্যমাত্র শিথিল না হয় সে বিষয়ে শ্রীনেহরু আরও সজাগ থাকলে ভাল হত।

ভারতের সংগ্রামী সংকল্পই অবশ্য শ্রীনেহরুকে ঠিক পথে পরিচালিত করছে। চৈনিক যুদ্ধবাজরা তাদের মতলবমত যুদ্ধবিরতি ও শান্তিপ্রস্তাবের শর্তকণ্টকিত দাবিতে শ্রীনেহরুকে তথা ভারতবর্ষকে রাজী করাতে পারে নি। চীনাদের দাবি যেমন অপমানজনক তেমনি স্বাধীন ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সংহতির পক্ষে সর্বনাশা। শ্রীনেহরু যথার্থ বলেছেন, চৈনিক কম্যুনিস্ট-দাবি মেনে নেওয়া মানে আক্রমণকারীর কাছে নতিস্বীকার, চৈনিক কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের অবাধ সুযোগ দান। চীনাদের দাবি মেনে নেওয়া মানে কেবল ভারতভূমির কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা ছেড়ে দেওয়া নয়: পররাজ্যগ্রাসীর ক্ষুধা কোনকালে কোথায়ও অল্পে নিবৃত্ত হতে দেখা যায় নি: আজ যারা লাদকে, নেফায়, নেফা ছাড়িয়ে আসামে দাঁত বসিয়েছে তাদের লোলুপতার সমুচিত শিক্ষা না দিলে বিপদ কেবল ভারতের নয়, গোটা এশিয়ার, সারা পৃথিবীর।

চৈনিক হুমকী ও হামলার মদগর্বী অভিযান বিধ্বস্ত চূর্ণবিচূর্ণ করা ছাড়া ভারতবর্ষ তথা সারা এশিয়ার বিপদ-মুক্তির আর অন্য পথ নাই। জানি এ-পথ নির্বীর্য শান্তির নয়, এ-পথ ক্ষুরধার দুর্গম, স্বাধীনতার প্রহরী অগণিত দেশপ্রেমী পথযাত্রীর প্রস্তরকঠিন সংগ্রামী সংকল্পই এই পথের প্রধান প্রেরণা ও পাথেয়। চৈনিক কম্যুনিস্ট যুদ্ধবাজদের সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ ভারতের দেশপ্রেমী জনসাধারণের সংগ্রামীসংকল্প, প্রতিরোধ প্রচেষ্টা দৃঢ়তর, প্রচণ্ডতর করেছে সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ধূর্ত বিশ্বাসঘাতক চীনা কম্যুনিস্ট যুদ্ধবাজদের সঙ্গে আপস-আলোচনা কোনরকম প্রস্তাবে অথবা পরামর্শে আর কিছুতেই প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়। শ্রীনেহরু এই সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকুন, দেশবাসী তাই চায়।

আনন্দের বিষয়, চৈনিক চরমপত্রের ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। কম্যুনিস্ট চীন সরকার সাম্রাজ্যবাদী, চৈনিক কম্যুনিস্ট অধিকার বিস্তার-প্রয়াসী, শ্রীনেহরুর এই সুস্পষ্ট ঘোষণায় দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর আর কিছুমাত্র সংশয় রইল না ভারতবর্ষ কী ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। মদগর্বী সাম্রাজ্যবাদী কম্যুনিস্ট চীন সরকারের কোন কথার উপর নির্ভর করা যায় না, শ্রীনেহরুর এই স্পষ্টোক্তির তাৎপর্য ও গভীর, সুদূরপ্রসারী। চৈনিক কম্যুনিস্টদের শঠতা ও ক্রুরতার একটি মাত্র জবাবই সম্ভব। চীনাদের চরমপত্রের একটিমাত্র জবাবই ভারতবর্ষ দিতে প্রস্তুত। শ্রীনেহরু চৈনিক চরমপত্রের উদ্ধত, অপমানকর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কূটনৈতিক জবাব এখানেই শেষ।

বিশ্বাসঘাতক পররাজ্যগ্রাসী আক্রমণকারীর সঙ্গে আর কথা নয়, আর কূটনৈতিক বার্তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য বিনিময়ে কাল হরণ নয়। আক্রমণকারীর ঔদ্ধত্য ও লোভের সমুচিত জবাব দেওয়ার একমাত্র উপযুক্ত স্থান রণাঙ্গন।

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের প্রধান লাভ হচ্ছে পশ্চিমা শক্তিজোটের সঙ্গে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

অথ বানর-কীলক কথা

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ

তোমার দেশ

আমাকেই চায়!

হাঙর হইতে সাবধান!!

জয়প্রকাশ চেয়েছেন প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেন গঠিত হয়।

Kutty

✲ বৈদেশিকী ✲

দশই ডিসেম্বর কলম্বোতে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, ঘানা, বর্মা, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহলের রাষ্ট্রপ্রধানগণ অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন আরম্ভ হবে তার আগে এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে; আবার এটা ছেপে বেরুবার আগেই হয়ত সম্মেলন শেষ হয়ে যাবে, অন্ততপক্ষে সম্মেলনের গতি কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝা যাবে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলন ডেকেছেন। ভারত-চীন বিবাদের নিষ্পত্তি কীভাবে হতে পারে তার উপায় বার করা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সম্মেলনে যেসব রাষ্ট্র আমন্ত্রিত হয়েছে তাদের মধ্যে কেবল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নাসের এবং ঘানার প্রেসিডেন্ট নক্রুমার মনোভাবের কিছুটা আভাস ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে দুই পক্ষের যে অবস্থান ছিল তাতে ফিরে গিয়ে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট নাসের বোধ হয় সঙ্গত বলেই মনে করেন। প্রেসিডেন্ট নক্রুমার ভাবটা কিন্তু অন্যরকম। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন সেজন্য প্রেসিডেন্ট নক্রুমা বৃটিশ গভর্নমেন্টকে তিরস্কার করেছেন। এই থেকে মনে হয় যে, ঘানার প্রেসিডেন্টের মন ভারতের প্রতি বিশেষ অনুকূল নয়।

বাকী সকলে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিজেদের মতামত অব্যক্ত রেখেছেন অথবা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করে রয়েছেন। হয়ত এঁদের মধ্যে কারো কারো সহানুভূতি ভারতের প্রতি রয়েছে কিন্তু তা প্রকাশ করলে তাঁদের মধ্যস্থতা প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হবে এইজন্য তাঁরা চুপ করে আছেন। এই ধারণা কত দূর সত্য সেটা শীঘ্রই বুঝা যাবে।

কলম্বো কনফারেন্সে যাঁরা যোগ দিচ্ছেন তাঁদের ভারতের দিকটা বুঝবার জন্য দিল্লি থেকে মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন একজন পশ্চিমে এবং অন্যজন দক্ষিণ-পূর্বে গিয়েছিলেন, তাঁরা সঙ্গে বৈদেশিক দপ্তরের কর্মচারীও নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কম্যুনিস্ট চীনা সরকারের উদ্যোগের বহর ঢের বেশী। নিরপেক্ষ "অ্যাফ্রোশিয়ান" দেশগুলিতে চীনারা অনেকদিন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে যে কূটনৈতিক আক্রমণ • চালিয়ে এসেছে, অনেক জায়গাতেই যে তা প্রতিরোধ করতে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সমর্থ হননি তার অনেক প্রমাণ পূর্বেই পাওয়া গেছে। শ্রীঅশোক সেন ও শ্রীমতী মেননের দ্বারা কতটা মেরামতের কাজ হয়েছে অথবা কতটা কাজ তাঁদের দ্বারা এই সময়ে হওয়া সম্ভব ছিল তাও বলা কঠিন। কারণ, প্রশ্নটা কেবল দক্ষ বা অদক্ষ দূতীয়ালির ব্যাপার নয়।

ব্যাপারটা মূলত নীতি নিয়ে এবং সেখানে এমন সব জগাখিচুড়ি কান্ড করা আছে যে, ভারতবর্ষের বক্তব্যটা পৃথিবীর কাছে পরিষ্কার করে ধরতে পারা সহজ কেরামতির কাজ নয়। দশ বছর যাবৎ যাদের বন্ধু বলে ধরে নিয়ে একান্তভাবে নীতি পরিচালনা করা হয়েছে, আজ তাদের আগাগোড়া ব্যবহারের মধ্যে দুরভিসন্ধি খেলার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সে প্রমাণের সত্যতা আমরা যতো সহজে বুঝছি ততো সহজে তো অন্যদের বুঝানো যাবে না। আমাদেরই অতীতের অনেক কর্ম ও বাক্য থেকে চীনাদের কূটনৈতিক ঘানিতে তেল বার করা হচ্ছে। ভুলের মাশুল কিছু দিতেই হবে, কিন্তু ভুল শোধরাবার চেষ্টার সময়ে আবার নতুন ভুল না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

গুজবে

কান দেবেন না

গুজব

রটাবেন না

কলম্বো কনফারেন্সের গুরুত্ব আছে, কিন্তু সে গুরুত্ব কী ধরনের, সে সম্বন্ধে ভুল হবার আশংকাও যথেষ্ট আছে। এই কনফারেন্স ডাকার পিছনে চীনাদের প্ররোচনা থাক বা না থাক, চীনারা যে এ ব্যাপারে সিংহল সরকারকে উৎসাহিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং এই কনফারেন্সের ফলে তাদের কিছু স্বার্থসিদ্ধ হওয়ার আশা তারা রাখে এবং তার জন্য তারা ভীষণভাবে চেষ্টা করছে।

যুদ্ধ থামুক—এটা "নিরপেক্ষদের" কাম্য ছিল, কিন্তু যুদ্ধ থামানোর জন্য "নিরপেক্ষদের" সহায়তা চীনাদের পক্ষে—অন্তত এই পর্বে—প্রয়োজনীয় ছিল না। যুদ্ধও চীনারা আরম্ভ করেছিল এবং নিজেদের সুবিধা বুঝে অন্তত এখনকার মতো যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তও তারা করেছে। কলম্বোতে চীনাদের কূটনৈতিক আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে "নিরপেক্ষদের" মনে চীন-ভারত বিবাদের একটা বিশেষ সংজ্ঞা পাকাপোক্তভাবে এঁকে দেওয়া। চীন-ভারত বিবাদটা যে একটা সীমানার ঝগড়া মাত্র—এই ধারণাটাই যাতে সকলের মনে বদ্ধমূল হয় এবং সেই ধারণার ভিত্তিতেই যা কিছু আলোচনা হোক, কম্যুনিস্ট চীনা সরকার তাই চান। এই সীমানার ঝগড়াটাকে ভারত সরকার পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় ফাঁপিয়ে তুলে শান্তিকামী চীনের উপর হামলা শুরু করেছে—এই-ই হচ্ছে চীনা কূটনৈতিক যুদ্ধের ধ্বনি।

ভারতবর্ষ আজ বুঝেছে যে, এটা সীমানার ঝগড়া নয়। পণ্ডিতজী বলেছেন যে, চীনাদের আক্রমণে যে বিপদ সূচিত হয়েছে, সেটা কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল এশিয়ার নয়, সে বিপদ সারা পৃথিবীর। চীন-ভারত বিবাদের এই সংজ্ঞার বোধ "নিরপেক্ষদের" মনে কতটা সঞ্চারিত করতে আমরা সমর্থ হই তার উপর নির্ভর করছে কলম্বো কনফারেন্স ভারতবর্ষের পক্ষে কতটা লাভজনক বা কতটা ক্ষতিকর হবে। কোন্‌খানে কোন্‌ পক্ষে কত গজ সরে গেলে দু পক্ষের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে অথবা নেফার বা লাদাকের কোন লাইন বরাবর সীমানা স্থির হলে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ইত্যাদি রকমের প্রশ্নের গণ্ডীর মধ্যে যদি দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে এবং সেটাই চীনাদের চেষ্টা হবে, তবে ভারতের নীতি নিরপেক্ষদের হৃদয়ঙ্গম করানো এখন যতো কষ্টকর হচ্ছে ভবিষ্যতে তার চেয়েও অনেক বেশী কষ্টকর হবে।

কারণ সীমানার ঝগড়ার চেয়ে বিবাদটা যে আরো অনেক গুরুতর এবং সুদূরপ্রসারী, সেটা যদি "নিরপেক্ষদের" না বুঝানো যায়, তবে ভারতকে চীনা বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেগুলি "নিরপেক্ষদের" নিকট দুর্বোধ্য হবে। আপাতত যুদ্ধবিরতির ব্যাপারটার গুরুত্বের চেয়ে ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির প্রশ্নটার গুরুত্ব ভারতের পক্ষে অনেক বেশী। সশস্ত্র সমর বন্ধ থাকলেও তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং রাজনৈতিক সমর তো চালিয়ে যেতেই হবে। সেই রাজনৈতিক সমরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে "নিরপেক্ষদের" নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিয়ে স্বপক্ষে আনা। সেটা হবে যখন "নিরপেক্ষদের" এই বোধ হবে যে, বিবাদটা কেবল ভারতবর্ষের নয়, এশিয়ারও, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার "নিরপেক্ষ" দেশগুলির।

কেবল এই বোধ হলেই হবে না। সেটাকে স্বীকার করার সাহসও জন্মাতে হবে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নেতারা চীনা বিবাদ

সম্বন্ধে অচেতন, কিন্তু সেই বিপদের কথা স্বীকার করতেও তারা ভীত। তাঁদের আশংকা এই যে, বিপদকে স্বীকার করাটা আরো বিপজ্জনক হবে। এতোদিন ভারত সরকার কম্যুনিস্ট চীন সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করে এসেছেন তাতে চীনের সম্বন্ধে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ভয় বেড়েছে এবং সে ভয়কে স্বীকার করার বা সে ভয়কে জয় করার সাহস কমেছে।

এই অবস্থার যদি মোড় ঘোরাতে হয় তবে মিনমিন সুরে কোনো কাজ হবে না, স্পষ্ট ভাষায় চীনের নব সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ডাক দিতে হবে। ডাক দিলেই সকলে এগিয়ে আসবে এরূপ আশা যেন আমরা করি না। এই দুঃসাধ্য অভিযানের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার, বহু ধৈর্য ধারণ আবশ্যক হবে।

আপাতত চীনাদের হাতে জোর বেশী দেখা যাচ্ছে, সন্দেহ নেই। সামরিক ক্ষেত্রে তারা যে সুবিধা করে নিয়েছে, সেখান থেকে অনেক রকম কূটনৈতিক বাণনিক্ষেপ করার সুযোগও তারা পাবে। সুতরাং অচিরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হাওয়া চীনের প্রতিকূলে বইবে এরূপ আশা না করাই ভালো। কিন্তু ভারতের দিগ্‌ভ্রম যে আর হবে না, এ বিষয়ে যেন আর কোনো সংশয়ের অবকাশ না থাকে। ভারতের দৃষ্টিতে আর কোনো অস্বচ্ছতা নেই—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মনে যেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আর না থাকে। ভারতের ভাগ্যে আরো মার থাকতে পারে, কিন্তু হার সে কিছুতেই মানবে না—"নিরপেক্ষদের" এটা বোঝাতে হবে। সীমানার খুঁটিনাটি হিসাব বুঝুক না বুঝুক তাতে এখন আর বিশেষ কিছু আসে যাবে না। কারণ, ঐ সীমানার হিসাব দিয়ে চীনা বিপদের সীমানা নির্দেশ করা যাবে না। চীনা আক্রমণে যদি ভারতের তথা এশিয়ার এবং সারা পৃথিবীর বিপদ সূচিত হয়ে থাকে, তবে কেবল বর্তমান চীন-ভারত সীমানার দাগটা স্পষ্ট করে কাটতে পারলেই সেই বিপদের নিরাকরণ হবে না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার "নিরপেক্ষ" দেশগুলির মানসিক আনুকূল্য লাভ করতে হলে ভারতবর্ষকে নিজের মনের দৃঢ়তা ও ঋজুতার প্রমাণ দিতে হবে। অনাবশ্যক এবং অবান্তর বিতর্কে জাতির মানসিক এবং নৈতিক শক্তির অপচয় বন্ধ করতে হবে। দেশের নেতৃত্ব সম্পর্কে একটা সংশয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, এরূপ একটা ধারণা দেশের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ ছড়াচ্ছে। এটা অশুভ লক্ষণ। সম্প্রতি এ-আই-সি-সির একটি সার্কুলারে বলা হয় যে, পণ্ডিত নেহরুর যারা সমালোচনা করে তাদের দেশদ্রোহী বলে মনে করতে হবে। কোনো গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে এরূপ উক্তি যে কত অযৌক্তিক, তার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। এই নির্বোধ উক্তি পণ্ডিতজীর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছে।

এরূপ উক্তির দ্বারা যে ভয় প্রকাশ পেয়েছে সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, কিন্তু ভয়ের কারণটা কী তারও একটু খোঁজ নেওয়া আবশ্যক। নিশ্চয়ই কিছু লোক পণ্ডিতজীর কেবল সমালোচনা মাত্র করছে না, তাঁর আর প্রধানমন্ত্রী থাকা উচিত নয় এমন কথাও তারা বলছে। এরাও সমান নির্বোধ। এরা বোধ হয় ভাবে যে, পণ্ডিতজী প্রধানমন্ত্রী না থাকলে পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগটা আরো ঘনিষ্ঠতর হবে এবং তার ফলে ভারতবর্ষ অফুরন্ত সামরিক সাহায্য পাবে। এদের বোধ হয় ধারণা এই যে, আমেরিকা ভারতের সমস্ত ভার বহন করার জন্য হাত উঁচিয়ে বসে আছে, কেবল ভারতবর্ষের গদিতে আমেরিকার মনোমত একজন ব্যক্তি বসার অপেক্ষা।

এর মতো ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। আমেরিকা ভারতের সমস্ত ভার বহন করার জন্য মোটেই উদ্‌গ্রীব নয়। তা ছাড়া, কোল্ড ওয়ারের সুবিধার দিক থেকেও ভারতে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বের অবসান পশ্চিমাদের কাছে কাম্য হতে পারে না। পণ্ডিতজীর নেতৃত্বাধীনে থাকা অবস্থায় যদি ভারত পশ্চিমদের দিকে একটু হেলে, তা হলে তার নৈতিক মূল্য যা হবে তা কি পণ্ডিতজী ছাড়া অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে হবে? পণ্ডিতজীকে চীনারা হয়ত অচিরেই আমেরিকার "পাপেট" বলে গাল দিতে আরম্ভ করবে, কিন্তু পৃথিবীতে সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সুতরাং পণ্ডিতজীর বন্ধুত্বের মূল্য আমেরিকার কাছেও খুব বেশী। পণ্ডিতজীর জায়গায় আর কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে আমেরিকার সাহায্য দেওয়ার আগ্রহ বাড়বে এরূপ মনে করা বাতুলতা। তেমনি বাতুলতা হবে, যদি আমরা ভাবি যে, নেহরুজী বা তাঁর গভর্নমেণ্টের কাজকর্মের কোনো প্রকাব বিচার বা সমালোচনা না করলেই দেশের শক্তি এবং সংকল্পের একাগ্রতা বাড়বে।

চীনা দস্যুর প্রতিরোধে ভারত

ইবন বতুতা

বাইশে নভেম্বর থেকে চীনারা যুদ্ধ বন্ধ রেখেছে। ২১শে নভেম্বরের এক-তরফা চীনা-যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব অনুসারে পয়লা ডিসেম্বর থেকে চীনাদের পিছিয়ে যাওয়ার কথা। ভারত চীনের প্রস্তাব না মানলেও চীন নিজের প্রস্তাব কার্যকর করবার কথা ঘোষণা করেছিল। চীনারা লাদাকে এখনও সাড়ে বারো মাইল পিছিয়ে যায় নি। নেফা এলাকায় তারা চীনাদের-ম্যাকমেহন লাইনের উত্তরে সরে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিল। ঐ সীমারেখার উত্তরে সাড়ে বারো মাইল এলাকায় চীনারা নাকি কোন সামরিক বাহিনী রাখবে না। ঐ সীমারেখার দক্ষিণে সাড়ে বারো মাইল এলাকায় ভারতীয়দেরও কোন সামরিক বাহিনী রাখা চলবে না। ভারত এতদিন যে ম্যাকমেহন লাইন মেনে এসেছে, চীনারা ১৯৫৯ সাল থেকে সেটাকে বে-আইনী ম্যাকমেহন লাইন বলেও স্বীকার করে না। তাদের মতে আসল বে-আইনী ম্যাকমেহন লাইন ভারত-তিব্বত সীমারেখার চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ দিয়ে গিয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু রাজ্যসভায় জানান যে, চীনারা নেফা এলাকায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ম্যাকমেহন লাইনেরও উত্তরে যেতে রাজী হয়েছে। তবে তারা ঢোলা ও লংজু পরিত্যাগ করবে না। নেফা এলাকায় ১লা ডিসেম্বর পিছিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। গত ৫ই ডিসেম্বর বমডিলায় তারা ভারতীয় রেডক্রসের নিকট ৬৪জন আহত সৈনিককে প্রত্যার্পণ করেছে। একজন পথেই মারা যান। বাকী ৬৩জন অসুস্থ ও ভগ্ন দেহে ফেরেন। পরে আরও একজন মারা যান। এঁদের কারও কারও দেহে ৮টি গুলীর আঘাতও রয়েছে। ৮ই ডিসেম্বরের চীনা নিউজ এজেন্সীর ঘোষণা অনুযায়ী চীনারা আরও ১৪০জন আহত ও অসুস্থ জওয়ানকে ভারতের হাতে ফিরিয়ে দেবে। যে-সব আহত ও অসুস্থ জওয়ানকে নিয়ে চীনাদের মুশকিলে পড়তে হয়েছে, চীনারা একমাত্র সেই সব ভারতীয় জওয়ানকেই ভারতের হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে। প্রথম আক্রমণে চীনাদের হাতে বন্দী ৯২৭জন জওয়ান ছাড়া চীনারা মোট কতজন ভারতীয় জওয়ানকে বন্দী করেছে, তা এখনও জানা যায় নি। বন্দী ভারতীয় জওয়ানদের দিয়ে চীনারা রাস্তাঘাট তৈরি করাচ্ছে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। কোরিয়া যুদ্ধের মত কিছু ভারতীয় জওয়ানদের উপর চীনাদের মস্তিষ্ক ধোলাই নীতির প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যতেই বলা সম্ভব। চীনারা কিছুসংখ্যক ভারতীয় জওয়ানদের যখন নিজের দলে টানতে পারবে এবং ভারতে ফিরে আসার পর গোপনে চীনাদের হয়ে কাজ করতে রাজী হবে, সম্ভবতঃ একমাত্র তখনই চীনারা সুস্থ ভারতীয় জওয়ানদের ফিরিয়ে দিতে চাইবে।

চীন বাইশে নভেম্বর যুদ্ধ বন্ধ করে পয়লা ডিসেম্বর পিছিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল। চীনের কেবলমাত্র সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার ইচ্ছা থাকলে বাইশে নভেম্বরই ফিরে যেতো। পয়লা ডিসেম্বরের পরেও থাকত না। কিন্তু চীনারা তাদের প্রস্তাব অনুসারে পয়লা ডিসেম্বরেই ফিরে যায় নি, ১৩ই ডিসেম্বরে অসুস্থ ও আহত ভারতীয় জওয়ানদের প্রত্যার্পণের কথা বলেছে। দখলীকৃত এলাকায় এখনও রাস্তাঘাট তৈরির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। চীন প্রয়োজন হলে যাতে এক ধাক্কায় আবার অনেক অঞ্চল দখল করতে পারে, চীনারা সম্ভবতঃ সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত। দখলীকৃত এলাকার রাস্তাঘাট ভাল করে জানা ছাড়া পাহাড়ীদের ছদ্মবেশে কিছু লোক রেখে যাওয়াও বিচিত্র নয়। পরিত্যক্ত এলাকার খবরাখবর দেওয়ার জন্য নেফার অধিবাসীদের মধ্যেও একদল গুপ্তচর তৈরি করতেও চীনারা ব্যস্ত। মনে হয় চীনারা যত সহজে ঐ গুপ্তচর বাহিনী তৈরি করতে পারবে ভেবেছিল, কার্যতঃ তা সম্ভব হয় নি। চীনাদের ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য করার যে প্রস্তাব লোকসভায় গৃহীত হয়েছিল, মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সে প্রস্তাব

১। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে ভারতীয় ও চীনা সৈন্যবাহিনীর মধ্যবর্তী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা।

২। চীনাদের দ্বারা বর্ণিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার উভয় দিকে ২০ কিলোমিটার অঞ্চল। এই অঞ্চল হইতে উভয় পক্ষের সৈন্য সরাইয়া লওয়ার জন্য চীন প্রস্তাব করিয়াছে।

৩। খিজেমানে ও লংজু সম্পর্কে ম্যাকমেহন রেখার ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর বিদ্যমান।

অর্ধেন্দু দত্ত

থেকে দূরে সরে এসেছেন। বাইশে নভেম্বর থেকে চীনাদের লক্ষ্য করে কোন গুলী ছোড়া হয় নি। পয়লা ডিসেম্বরের পরেও নেফার চীনা-অধিকৃত এলাকা পুনরায় দখল করবার কোন চেষ্টা হয় নি। চীনা-পরিত্যক্ত এলাকায় চীন কোন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা চালু করবার পক্ষপাতী' ভারত সরকার চীনের কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিবৃতি দিয়েছেন।

চীনা-আক্রমণকারীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মনোভাব জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও, চীনা-আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কিন্তু ঢিলে পড়ে নি। গত ২রা ডিসেম্বর সিকিমের মহারাজা সিকিম জননিরাপত্তা বিধি(১৯৬২) প্রয়োগ করেছেন। অবশ্য গত মাসের ১৩ই সিকিমে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের দান আগের মতই অব্যাহত রয়েছে। প্রতিরক্ষা তহবিলে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ও ৩৬,৯৪০ তোলা সোনা পাওয়া গিয়েছে। স্বর্ণবণ্ডের ব্যাপারে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গত ২রা ডিসেম্বর স্বর্ণ-মজুতকারীদের সতর্ক করে দেন। স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় সোনা না দিলে সোনা মজুতকারীরা পরে মুশকিলে পড়বেন। ঐ একই দিনে ভারত সরকার শত্রুদেশের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও তাদের সঙ্গে কাজ কারবার নিষিদ্ধ করবার জন্য ভারতরক্ষা-বিধান (১৯৬২) সংশোধন করেন। শত্রুদেশের বা শত্রুদেশীয় লোকের হাতে যাতে টাকা পয়সা না পড়ে, সে-জন্য সরকার শত্রুদেশীয় নাগরিকদের ধনসম্পদ তদারকীর জন্য তত্ত্বিরকারকও নিয়োগ করতে পারবেন। ৩রা ডিসেম্বর ভারতের কোন অংশের উপর দিয়ে সর্বপ্রকার অসামরিক চীনা-বিমান অথবা চীনা-নাগরিক চালিত সর্বপ্রকার বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার লাসা ও সাংহাইয়ে ভারতীয় বাণিজ্যদূতাবাস দুটি ১৫ই ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য বর্তমানে একেবারে বন্ধ। তাছাড়া ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারীদের বাইরে চলাফেরা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। চীনারা গত ৯ই অক্টোবর থেকে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত লাসার ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের চীনা দূতাবাস দুটিও ১৫ই ডিসেম্বর থেকে বন্ধ হবে। অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই গত ৫ই ডিসেম্বর যুদ্ধ-কালীন বীমা চালু করবার জন্য লোকসভায় দুটি বিল উত্থাপন করেন। সারা দেশের কল-কারখানার বাড়ি-ঘরদোর, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী দামের মজুত পণ্যদ্রব্য এই বীমা আইন দুটির আওতায় আসবে। প্রয়োজনবোধে চা-বাগান ও আভ্যন্তরীন পরিবহণের ক্ষেত্রেও বীমা-আইন প্রয়োগ করা চলবে। এই ব্যবস্থার ফলে সীমান্ত-এলাকা থেকে মূলধনের পলায়ন বন্ধ হবে। ফলে অর্থনৈতিক জীবন অব্যাহত থাকা ছাড়া জরুরী অবস্থায় সীমান্ত এলাকায় জিনিস-পত্রের দামও কম রাখা সহজ হবে। আট সপ্তাহ পরে জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীর পাকিস্তানী মাল্লারা গত ৫ই ডিসেম্বর ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। পাকিস্তানে লোক-নিয়োগের অফিস খোলার দাবী অবশ্য কোম্পানী মেনে নেয় নি। এই ধর্মঘটের ফলে আসামে মজুত চা ও পাট অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে।

বিদেশ থেকে ভারতের সাহায্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বরের একটি সংবাদে প্রকাশ, পাঁচ হাজার মার্কিন সৈন্য বিমানযোগে দশ লক্ষ টন ওজনেরও বেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালাম বিমান ঘাটিতে অবতরণ করে। গত ২১শে নভেম্বর থেকে বিমানযোগে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র আমদানি আরম্ভ হয়। ২৬শে নভেম্বর থেকে পরবর্তী সাতদিনেই বেশি অস্ত্রশস্ত্র আসে। দরকার হলে উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ মার্কিন সৈন্যদের কাজে লাগানো হবে। শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ১৪ কোটি টাকার ঋণ পাওয়া যাবে। প্রচুর সংখ্যক লরি উৎপাদনের জন্য হিন্দুস্থান মোটর ও টাটা কোম্পানীকে ঐ ঋণ দেওয়া হবে। বিনা সুদের ঐ ঋণ চল্লিশ বছর মধ্যে পরিশোধ করতে এবং দশ বছর পরেই প্রথম কিস্তি পরিশোধের দরকার হবে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা যেভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান দিয়ে সাহায্য করেছে, তাতে ভারতকে প্রতিশ্রুত মিগ না দিলে বা মিগ কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে রাশিয়ার পক্ষে নিরপেক্ষতার ভানটুকু বজায় রাখা সম্ভব হত না। গত ২রা ডিসেম্বর মস্কো রেডিয়ো একটি আলোচনা-চক্রে চীনের শান্তি-প্রস্তাবকে তারিফ করে। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী নাকি চীন-ভারত বিরোধ জিইয়ে রাখতে চায় বলে মন্তব্য করে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা থেকে রাশিয়াকে নিরস্ত করবার জন্য ভারতের বর্তমান চীনা-নীতি নির্ধারিত হয়েছে কিনা তা আপাতত বলা সম্ভব নয়। রাশিয়া চীনা-আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ সমর্থন তো করেই নি, বরং চীনের দাবী মেনে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছে। ঐ সব সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তো দূরের কথা, রুশপন্থী কমিউনিস্টরা যাতে চীনা-দালালদের হাত থেকে পার্টির নেতৃত্ব দখল করতে পারে, তার জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন।

এত সব ব্যাপারের পরেও মিগ সম্পর্কিত রুশ প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাছাড়া রাশিয়া যখন চীনকে মিগ ও টুপলেভ বম্বার দিয়েছে, তখন মিগ চালনা শিক্ষার জন্য ভারতকে সাতটি মিগ দিলে চীনের কোনই ক্ষতি হবে না। অপরদিকে বৃটেন চীনকে বিমান বিক্রীর যে কথা দিয়েছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে না দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ভারতে বৃটিশ হাইকমিশনার স্যার পল গোরবুথ জানিয়েছেন।

৩রা ডিসেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ঐদিন প্রায় দশ হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা চীনা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গত ৯ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমিতির মহিলা শাখার উদ্যোগে কলিকাতা ময়দানে প্রায় এক লক্ষ মহিলার সমাবেশ হয়। এই ধরণের সমাবেশ আগে কখনও দেখা যায় নি। মহারাষ্ট্রে ছাত্রদের জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী দেশ-রক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। ৬ই ডিসেম্বর থেকে কলিকাতা হোমগার্ডের কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের জনসম্পদকে কাজে লাগাবার জন্য ভারত সরকার ৭ই ডিসেম্বর একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। কলিকাতার প্রতিরক্ষার জন্য রাজ্য সরকার মাস্টারপ্লান অনুমোদন করেছেন। অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হলেই কাজ আরম্ভ হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিনে অপচয় বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনাহীন 'গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার প্রকল্পটি' সম্প্রতি নাকি গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅশোক সেন ও শ্রী আর কে মেনন কায়রো, ঘানা ও লেগজ ঘুরে গত ৬ই ডিসেম্বর ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন কলম্বো থেকে ফিরে আবার পূর্ব আফ্রিকায় যাত্রা করেছেন। কলম্বো সম্মেলন ১০ই ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হচ্ছে। ভারতীয় মন্ত্রীদের প্রথম কূটনৈতিক সফর অপেক্ষা শ্রীমতী মেনন দার-এস-সালামে আফ্রিকার তাৎপর্যপূর্ণে। টাঙ্গানিকার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীমতী মেনন ডার-এস-সালামে গিয়েছেন। টাঙ্গানাইকার শান্তি প্রস্তাব অনেকটা মিশরের প্রস্তাবের মত। তবে আলাপ-আলোচনার মারফৎ সীমান্ত-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত্রীকৃত এলাকা শাসনের জন্য টাঙ্গানিকা তিন-দেশের একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছিল। শ্রীমতী মেনন দার-এস-সালামে আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলি ও পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার পরাধীন দেশের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

৯।১২।৬২

থামব না

বনফুল

১

আমরা সবাই এগিয়ে যাব
থামব না
উঠব গিয়ে বিজয়-চূড়ায়
নামব না।

বাঁচার মতন বাঁচতে হবে
আগিয়ে চ
ঘুমোয় যারা, তাদেরও ভাই
জাগিয়ে চ।
জাগ ওরে
জাগ ওরে—
শত্রু দ্বারে দিচ্ছে হানা
জবাব দে
মিথ্যা মোহে ঘুমিয়ে আছ
নবাব কে!

স্বাধীনতার মূল্য দিতে
ঘামছ কি?
অর্ধ পথে দ্বিধা ভরে
থামছ কি?
খবরদার!
আমরা সবাই এগিয়ে যাব
থামব না
উঠব গিয়ে বিজয়-চূড়ায়
নামব না।

মৃত্যু যদি আসেই আসুক
ভয়টা কি
প্রাণের চেয়ে মান যে বড়,
নয় তা কি?
নয় তা কি?
নয় তা কি?
নয় তা কি?
তুচ্ছ যারা করছে ন্যায়ের
শাসনকে
দলছে পায়ে সত্য শিবের
আসনকে
সে সব পাজি নাস্তিকে
শাস্তি দে শাস্তি দে শাস্তি দে।

এগিয়ে চল ঝাঁপিয়ে পড়
বাঘের মতো লাফিয়ে পড়
দিগ দিগন্ত কাঁপিয়ে বল
থামব না
থামব না
থামব না
উঠব গিয়ে বিজয়-চূড়ায়
নামব না।

কে‍ঁদো না

দিনেশ দাশ

মা, তুমি কে‍ঁদো না!
সীমান্ত-অরণ্যে নীল ঘাসের মখমলে
তোমার ক'জন ছেলে বিশ্রাম নেবার ছলে
শুধুই ঘুমিয়ে আছে,
মুখের কোথাও নেই এতটুকু ক্লান্তির বেদনা—
মা, তুমি কে‍ঁদো না।

অরণ্যে-পর্বতে যারা দিকে দিগ্বিদিকে
উস্‌কিয়ে জ্বালিয়ে দিল জীবনের নিবু-নিবু ম্লান সলতেটিকে,
তারা কেউ মৃত নয়—অমৃতের পুত্র সব
তোমার পবিত্র স্থির বুকের ওপরে,
ঘুমোয় অঘোরে।

তোমার নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যের আড়ালে
ছিল এক প্রাণের উত্তাল নীল আলোর স্পন্দন,
সে-আলো জ্বালাল আজ সন্তান তোমার—
মাটির আলো-কে তুমি কর মা চুম্বন॥

পাগলা কুকুর

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এই ওঠ্! কে তোকে এখন এই ঘোর অবেলায়
কফিনের সমান সটান,
মুণ্ডুহীন শুয়ে থাকতে বলেছে ফুটপাতে!
ভীষণ চীৎকার শুনে এখন জাগুক চাই ভিখারীরা সব।
ফুটপাতে বড় ভয়, হীনজ্যোতি উন্মাদ কুকুর, কুকুরেরা
মুগুর না পেলে ঘেউ ঘেউ ঘেউ করবে কিংবা হঠাৎ পেছন থেকে কামড়ে দেবে
সাবধান। কামড়ে দিলে জলাতঙ্ক হয়ে দেখাব আসমুদ্রহিমাচল লাল।

আমার কলম কেন দীর্ঘ হতে হতে হয় না নির্মম রাইফেল,
ঘরের পাগলা কুত্তা মেরে তবে সীমান্ত যেতাম হিমালয়ে,
শ্মশানযাত্রার আগে মেশিনগানের মুখে দুর্মদ সকাল
রক্তের প্রবল লালে প্রচণ্ড সাহসী এক সূর্য জ্বালাতাম।
আজ শত শত আত্মা আমার অস্তিত্ব তাড়া করে, আজ
দাঁড়াতে পারি না স্থির জননীর মুখে আর তাকাতে পারি না;
আমার স্বরাট সব ভাইগুলি কেন নটবালকের মতো
ভেসে যেতে দিয়েছি হেলায়?
এ আমার পাপ, এ তোমার, একি ভারতবর্ষেরও পাপ নয়!
কাল সারারাত আমি সারারাত ময়দানের বিশাল জ্যোৎস্নায়
শুভ্র সেই পারাবত আকুল খুঁজেছি, শান্তি কি তেমনি নয়, অসম্ভব ডানার প্রয়াস?
এখন অঘ্রাণ। ঘরে ঘরে ধানাসচ্ছলতা, চাষী
দিগন্তে দাঁড়িয়ে তবু দেখে না নীলিমা। শুধু ঘরে
অকারণ হেসে ওঠা তার শিশু ছেলেটির মতো ভবিষ্যৎ
অথবা অতীত যেন ফা হিয়েন, হিউএন-সাঙের
সমস্ত শ্রী-জ্ঞান ভূমা:
ভূমিহীন মাও সে তুং যে হাতে একদা কবিতায়
জ্যোৎস্না লিখেছেন তাকে হিংস্রতম ঘৃণা দিতে দিতে
এখনো শান্তিকে চাই, কেননা যে হাতে
এখনো ছন্দকে লিখি, সে হাত অনাদি মানুষের
ব্যর্থ হত্যাকারী হোক না, না, ঈশ্বর কখনো আমি চাইনি, চাই না।

পাগলা কুকুর মারতে কোনো ক্ষোভ নেই।

ভারতবর্ষ ও চীন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে।

ভারতের উত্তর সীমান্ত লঙ্ঘন করে চীনের সামরিক বাহিনী বারুদের ধোঁয়ায় কামান মর্টারের বিস্ফোরণ গর্জনে গুলী-গোলার আঘাতে পঞ্চশীল এবং সহাবস্থানের নীতির স্বপ্নসৌধকে ধূলিকণায় পরিণত করে শূন্যলোকে উড়িয়ে দিয়েছে। স্তম্ভিত ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে আকাশ আবৃত করে ভাসতেথাকা সেই ধূসর ধূলিজালের দিকে। আঘাতও সে পেয়েছে। তার সীমান্তের ঘাটিগুলি ভেঙে পড়েছে, তার মুষ্টিমেয় সীমান্তবাহিনীর সৈন্যদলের অধিকাংশই তাদের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে যুদ্ধ করে জীবনপাত করেছে। তাদের বীরত্ব শৌর্য ও আত্মত্যাগের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে। তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে চীনের যান্ত্রিকবাহিনী রক্তাক্ত চক্রচিহ্ন রেখা আঁকতে আঁকতে ভারতের নিজস্ব ভূমির উপর এগিয়ে এসেছে। হিমালয়ের চির শুভ্র তুষার রাশির উপর—গাঢ় লাল এই চাকার দাগ দিয়ে লিখছে সে তার নিজের বাণী। তার উপলব্ধির বাণী সে প্রমাণিত করে উল্লসিত।

"অবৈরীতার দ্বারা বৈরীতাকে রোধ করা যায় না। যায় নি।

অহিংসা একটি কল্পনা মাত্র, মিথ্যা। হিংসা বাস্তব—সুতরাং সত্য।

ক্ষুধা সত্য, লোভ সত্য, ক্ষুধা ও লোভ হিংসাকে করে জাগ্রত, হিংসা করে ক্রোধকে সক্রিয়; সক্রিয় ক্রোধ আগুনের মত জ্বলে উঠে শক্তিতে ঘটায় বিস্ফোরণ। এই তো প্রকৃতির নিয়ম, সমগ্র পশু জগত এই সত্যে পরিচালিত। মানুষও পশু। বুদ্ধিমান পশু। সে এই সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির চাতুর্য মিশিয়েছে। মানুষের ইতিহাসে এই সত্য শুধু নির্মম নয়—সেখানে এ-সত্য কুটিল ও জটিল।

সত্য অহিংসা অবৈরীতার কথা মিথ্যা কল্পনা। কল্পনাবিলাসী ভারতবর্ষ মিথ্যার উপাসক, মূর্খ।"

নবীন-চীনের এইটিই জীবন সত্য। সে তো শুধু সমাজতন্ত্রবাদী নয়—সে তার সঙ্গে সমরতন্ত্রবাদী। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগ তার অপরিহার্য। তার প্রতীক গাঢ় রক্তবর্ণ; মাটি রক্তাক্ত না-হলে তার উপর তার তন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। এই তার কাছে সুমহত্তম ন্যায় ও নীতি। এমন কি পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার পথে ও তার ন্যায়ে যুদ্ধের প্রয়োজন। শান্তির সঙ্গীত আক্রোশের রাগিণীতে সে গেয়ে থাকে। অস্ত্রের ঝনৎকার তার সঙ্গে বাদ্যসঙ্গীত রচনা করে।

এই যার জীবনসত্য—স্বাভাবিকভাবেই হিংসা ও বৈরীতাই তার জীবনের ধাতু। নবীন চীনেরও তাই। হিংসা ও বৈরীতার ধাতুতেই গঠিত তার প্রকৃতি ও চরিত্র। এই প্রকৃতির নিষ্ঠুর নির্দেশে নূতন চীন জন্ম-লাভের পরই তার আদর্শে অবিশ্বাসী বা আদর্শবিরোধী লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে হত্যা করেছে। সে হত্যা সে রক্তপাত আজও অব্যাহত। এই তো কয়েক বৎসর পূর্বে

Let hundred flowers blossom—এই ছলনাময় ঘোষণা করে হাজার হাজার অলাল ফুলের সন্ধান জেনে নিয়ে তাদের দ্বিধাহীন চিত্তে নির্মূল করে দিলে। তারপরও নিজেদের কাজ চলছে। চলেছে। প্রায় দু হাজার বছর পূর্বে চীন ভারতবর্ষ থেকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ভগবান বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম। মহাত্মা কনফুসিয়াস পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নূতন চীন এই অব্যাহত রক্ত স্রোতে দিয়ে মুছে দিয়েছে বুদ্ধের ধর্ম ও বাণীকে, কনফুসিয়াসের জ্ঞানকে। এ ইতিহাস। এই ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, নূতন চীনের জীবন ধাতু হিংসা ও বৈরীতা। মনেপ্রাণে সে সমরতন্ত্রবাদী। সমরতন্ত্রবাদের প্রকৃতি-পরিণতি বিস্তারে পররাজ্য গ্রাসে। জীবনের তৃপ্তি আনন্দ ও উল্লাস তার যুদ্ধের উত্তেজনায়। যুদ্ধের প্রেরণায় যে জাতির নায়কেরা সাধারণ মানুষকে সমরলোলুপ করে গড়ে তোলে সে জাতি বাহিরে যুদ্ধ না-পেলে ঘরে যুদ্ধ বাধায়। শেষ পর্যন্ত নায়কেরা তার তিক্ত ফল ভোগ করে। তাদেরই তারা হত্যা করে। সুতরাং যুদ্ধ তাদের দিতেই হয়। যুদ্ধ তাদের অপরিহার্য। নবীন চীনের অভ্যুদয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চৌদ্দ বছরের ইতিহাসে এই প্রকৃতির তাড়নায় সে অর্ধেক কোরিয়া গ্রাস করেছে। তিব্বতকে উদরস্থ করেছে। এবং মানব জাতির মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতার ভূমিকায় নিজেকে নিজেই অধিষ্ঠিত করে প্রশান্ত সাগরের সারা উপকূলে যুদ্ধ বিস্তারের চেষ্টা করেছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে কোথাও অপ্রত্যক্ষভাবে। এ তার holy war; ধর্ম যুদ্ধ। চীনের সর্বাধিনায়ক মাও সে-তুং নিজে বলেছেন—

The life of mankind is made up of three major eras—the era of Peace, the era of war and another era of peace. We are now at the Junction between the second and the Third eras. The era of war will be ended with our hand. If we do not hoist the banner of revolutionary war a greater part of the human race will face extinction.

শেষে বলছেন—
the most honoured career to save mankind from destruction.

সমরতন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে গঠিত চীনের আদর্শ ও জীবন-ধাতু এরই মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। এই আদর্শে সারা দেশে নিত্য প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পঁচিশ কোটি যুবক-যুবতী সামরিক পদ্ধতিতে কুচ-কাওয়াজ করে থাকে। এ আমি চীন ভ্রমণের সময় স্বচক্ষে দেখে এসেছি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি—তার আদর্শের সঙ্গে যে-দেশের আদর্শের একাত্মতা নেই আনুগত্য নেই তাদের উপর কি আক্রোশ তাদের! সেইসব স্লোগানে চীনের আকাশ বাতাস মুখর হয়ে থাকে। এর স্বাভাবিক পরিণাম বা পথ

দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের পথ। চীনের নায়কবৃন্দের তার দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধ দিতেই হবে। প্রতিশ্রুতি সবার সঙ্গে ভাঙা চলে—ভাঙা চলে না শুধু নিজের সৃষ্টির সঙ্গে। সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী ফল—স্রষ্টার ধ্বংস। ১৯৫৮ সালে কুয়েময়ে এই যুদ্ধ চীনের নায়কেরা দিতে চেয়েছিলেন—ফরমোজার অধিবাসী চীনাদের স্বর্গীয় ফলের আস্বাদ দেবার জন্য। কিন্তু সেখানে আমেরিকার নৌবহর উপস্থিত ছিল। তারা উত্তর দিয়েছিল—একটি কামান গর্জনের উত্তরে দুটি কামান গর্জনের দ্বারা। চীনকে হাত গুটিয়ে সরতে হয়েছিল। ব্যর্থতার রোষ তাকে করেছিল উন্মত্ত। সেই উন্মত্ততায় সে ভারতবর্ষকে ভাবলে সহজ শীকার। ভারতবর্ষ অহিংসাবাদে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষ মূর্খ। ভারতবর্ষ সমরচর্চা করে না, তার মত সুতরাং সে দুর্বল। পৃথিবীতে সে কোন সামরিকজোটে যোগ দেয় নি সুতরাং সে বন্ধুহীন। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে তার আদর্শে বিশ্বাসী ভারত ধর্মদ্রোহী একটি শক্তিশালী দল আছে সুতরাং এখানে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। সে স্বপ্ন দেখেছিল—পশ্চিমে আরব সাগর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ভূখণ্ড লাল হয়ে গেছে। রক্তপতাকা উড়ছে।

তার ভুল হয়েছিল মূলে। ভারতবর্ষের জীবনধাতুর শক্তি ও স্বরূপ সে নির্ণয় করতে পারেনি। ভারতবর্ষের জীবনধাতুর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ধরা যায় না অথচ যার অস্তিত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। যা কালের ক্ষয়ে ক্ষয়িত হয় না, জীর্ণ হয় না, যার বিচিত্র গুণ এই যে, কঠিনতম আঘাত মাত্রেই মুহূর্তে সঞ্জীবিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বিগত তিন থেকে পাঁচ হাজার বৎসরকালের মধ্যে দশ-পনেরটি সভ্যতা ও জীবনধর্ম নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছে। সে সব সভ্যতা ও জীবনধর্মের নিদর্শন আজ প্রত্নতত্ত্বের বস্তু; গবেষণার বিষয়।

সে সব সভ্যতার অবশিষ্ট বলতে তার মৃত্তিকার স্তর চাপাপড়া ইট-কাঠ-পাথরের নিদর্শন এবং ইতিহাসের পাতায় প্রাচীন তথ্য। মিশরের মামির মত। প্রাণহীন শব। কিন্তু ভারতবর্ষে তার এই বিচিত্র সভ্যতা ও সাধনার ধারা আজও অব্যাহত; তারও অনেক ইট-কাঠ-পাথরের নিদর্শন মাটির গর্ভে চলে গেছে কিন্তু বিচিত্র এই প্রাণশক্তি মহাকালের হাতের চাপা দেওয়া এই মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে উপরে উঠে বেঁচে আছে। কাল তাকে বারবার জীর্ণ করেছে, বৃদ্ধত্ব এসেছে তার কিন্তু বারবারই সে প্রাণধারা জরার নির্মোক পরিত্যাগ করে নবীনতায় সঞ্জীবিত হয়েছে। কতবার আঘাত এসেছে বহিরাগত জাতির অভিযানের মধ্যে। সে আঘাতে মুহ্যমান হয়েছে কিন্তু আবার সে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে বহিরাগতের শক্তির

অমৃতটুকু গ্রাস করে অভিযানকারী বহিরাগতকে দামোদরের মত গ্রাস করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তার বারবারের নবপ্রকাশ এক-একটি মহাপ্রকাশ। পৌরাণিক ভারতবর্ষের জরার নির্মোক ত্যাগ করে ঐতিহাসিক ভারতবর্ষরূপে নবপ্রকাশ পরম বুদ্ধের মহাপ্রকাশের মধ্যে। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট ধর্মাশোকের সময় ভারত মহিমায় অর্ধেক পৃথিবী মুগ্ধ হয়ে ভারতভূমিকে পরম তীর্থ বলে প্রণত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি হতে হতে আচার্য শংকরের অভ্যুদয় ভারতধর্মের আবার নব সঞ্জীবন। এইভাবেই বার বার সে আপনার অমৃতবলেই নবকলেবরে ও জীবনে সঞ্জীবিত হয়েছে। বারবার এসেছে বাইরে থেকে অভিযান, ভীমখড়্গের আঘাত সে সহ্য করেছে। অধিকাংশ আঘাতই পিছন দিক থেকে অতর্কিত আঘাত। মুহ্যমান হয়েছে যে, হতচেতন হয়েছে। বারবার তাকে মৃত বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সে মরেনি। এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, তার যুদ্ধনীতির মধ্যে কখনও সে তার জীবনাদর্শ বিরোধী কুটিল অধর্ম যুদ্ধ প্রশ্রয় পায়নি। তার দীর্ঘ আটশো বছরের যে ইতিহাসে সে বহিরাগত অভিযানকারী ও তাদের জীবনধর্মের সঙ্গে সংগ্রাম ও সমন্বয় করেছে তার মধ্যে ভারতবর্ষের জীবনধর্মের এই বিস্ময়কর প্রবণতা ক্ষীণ হলেও হীনবল হয়নি। দীর্ঘকাল পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে জীবনধর্ম নূতন করে নির্মোক ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। ইউরোপের ভোগবাদ ও বাস্তুবাদকে গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মিক শক্তিই প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল—প্রকৃতি নিয়মকে লঙ্ঘন করে। এই কালের যে মহাপ্রকাশ যাকে দেখে মনে হয় এ ভারতবর্ষ অতীতের ভারতবর্ষ ও তার সেই আদর্শের বিরোধী বা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাকে বলব এই ভারতের ধর্ম ও আত্মার প্রতীক সন্ধান করে দেখতে। আমাদের পুরাণে আছে স্রষ্টা চতুর্মুখ। চারটি মুখ আমার চোখের সামনেও ভেসে ওঠে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাণীমুখ, মহাত্মা গান্ধী—ভারতের ধ্যান মুখ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের শৌর্য মুখ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল—ভারতের কর্ম মুখ। চারটি মুখের ললাটেই ত্যাগের তিলক চিহ্নে উজ্জ্বল। প্রত্যেকের কাছেই সত্যের দ্বারা মিথ্যা পরাভূত; হিংসা মিথ্যা, প্রেম সত্য। মৃত্যু পরাভূত অমৃত করায়ত্ত। প্রতিষ্ঠা রাজাসনে নয় মানুষের মনোসিংহাসনে। সর্বশেষ—সত্য প্রেম অমৃত কর্ম সমস্ত কিছুর একমাত্র আধার মানবধর্ম।

এই ধর্মকে আশ্রয় করে ১৯৪৭ সালে যে নবীন ভারতবর্ষের অভ্যুদয় হয়েছে তার পতাকার প্রতীক ধর্মচক্র; তার আদর্শ বিশ্ব মৈত্রী তার নীতি অহিংসা এবং তার শীল পঞ্চশীল।

তার স্বপ্ন, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে

মানবচিত্ত এবং হৃদয়-বুদ্ধির সংগঠনে বা তপস্যায় এক শান্তিপূর্ণ অমৃত সন্ধানী জগৎ সংসার। এই কারণেই তার নব অভ্যুদয়ের পর সামরিক সংগঠনের দিকে ভারত ব্যগ্র হয়নি। তার মনের এই গঠনের জন্যই সেদিকে ব্যগ্র হওয়া অসম্ভব ছিল। নূতন ভারতবর্ষ স্বাভাবিক প্রেরণায় সকল উদ্যম নিয়োগ করেছিল—অন্নের উৎপাদনে, বস্ত্রের সংস্থানে, ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায়। অন্নে-বস্ত্রে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে ও মানবধর্মের তপস্যায় মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করাই ছিল লক্ষ্য। অস্ত্র উৎপাদন সে করেনি, সকল জাতিকে সে বিশ্বাস করেছিল। মনের এই গঠনের জন্যেই ১৯৪৯ সালে আজকের আক্রমণকারী এই নূতন চীনের জন্মলগ্নে ভারতবর্ষ তাকে অভিনন্দিত করে বলেছিল—জয়তু মহাচীন। নূতন অভ্যুদয়ে তুমি ভারতের চল্লিশ কোটি নর-নারীর শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন গ্রহণ কর।

পাকিস্তান তার জাতি শত্রু। তার সঙ্গে বিবাদ সে কোনদিন করেনি বা চায় নি। কিন্তু তাতে কি হবে? দুটি বিপরীত-ধর্মী শক্তির সম্মেলনে বা সংমিশ্রণে যা অনিবার্য তাই ঘটেছে। এ সংঘর্ষ অনিবার্যই ছিল, এ দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কেরা যে না-বুঝেছিলেন তা নয়; বুঝেও বোধ হয় বিশ্বাস করতে চাননি বলার চেয়ে সৎ ও শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস রাখতে চেয়েছিলেন। সংসারে অবিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ভাল এই পরম বুদ্ধিকেই বড় করে তুলেছিলেন। সীমান্ত নিয়ে বিরোধের প্রশ্নটি প্রথম চীন নায়ক তোলেন বোধ করি ১৯৫৬ সালে। আলোচনা পত্র-বিনিময় করতে করতে তাঁরা তাঁদের সমরবাদী নীতি অনুযায়ী হিমালয়ের উপরে সামরিক আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুললেন। আলোচনায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে তো তাঁদের বিশ্বাস থাকতে পারে না, নেই। তা ছাড়া প্রশ্নটি তো শুধু সীমান্তের নয়, সমস্ত কিছুর মূলে আছে তাঁদের সেই বিচিত্র কল্পনা—বন্দুকের নলের মুখে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার। আফ্রিকা এশিয়ার স্বরাংনিবদ্ধ মুক্তিদাতা চীন ঘোষণা করেছে:
"The era of war will be ended with our hands.... If we do not hoist the banner of revolutionary war a greater part of the human race will face extinction."
এবং ভারতবর্ষে এই মহাবিপ্লব যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য একদল দেশধর্মে অবিশ্বাসী চীন ধর্মে দীক্ষিত শিক্ষিত মানুষ চেষ্টা তো আজ থেকে করছে না, অনেককাল থেকে করছে। এ সত্য প্রমাণিত। সাহিত্যে, শিল্পে, নানান সংগঠনে এর প্রমাণ রয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে একটি কবিতা পড়েছিলাম। তার শেষ হয়েছিল—এই কথায়:

"ভেবেছ কি হে ভেবেছ কি?
দেখেছ কি?

ভারতীয় প্রহরীদলের অপমৃত্যুতে সেদিন মিঃ খ্রুশ্চভ মর্মাহত হয়েছিলেন এবং রক্তিম চীন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন লাদাখ এবং অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্যদলকে প্রত্যাহার করে নেন এবং নেহরুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। চীন কর্তৃপক্ষ খ্রুশ্চভের অনুরোধ রাখেননি। ড্রাগন তার ধারালো দংষ্ট্রায় লাদাখের পূর্বাংশ কামড় দিয়ে আজও ধরে রয়েছে! চিবোয়নি, গেলেনি, উদ্‌গীরণও করতে চায় না! শুধু তার দুর্বোধ্য হিংস্র চক্ষু শিকারের দিকে তাকিয়ে দপ দপ করে জ্বলছে। এ জন্তু প্রাগৈতিহাসিক আমলের, একালে এর জুড়ি মেলে না!

আসছে রক্তর নবেম্বরে
বাংলায় গড়ব লাল ফৌজ
বাংলাকে বানাবো লালচীন—।”

হয়তো কথার দু-একটা উল্টোপাল্টা হয়েছে কিন্তু কথাটা এই। ভারত-চীন মৈত্রী সংঘের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে এর ক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হয়েছে। শান্তি শিবির ও শান্তি সম্মেলনের নামে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের প্রচারে রচনায় এর প্রস্তুতি হয়েছে। সবের পিছনে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি।

ভারতবর্ষের মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণে পেষণে মৃতপ্রায় শুষ্ক দাহ্য পদার্থের মত, রাষ্ট্র অস্ত্রহীন নিষ্ক্রিয়, চীন মুক্তিধ্বজাবাহী আগুন ভারতের কাম্যুনিস্ট পার্টির এবং তাঁদের সহযাত্রীবৃন্দ অনুকূল বাতাস এই চারটি অংককে যোগ করে অংক কষে এই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চীন। ১৯৫৯ সালে চীনের প্রত্যক্ষ আক্রমণের পরও একে সামান্য সীমান্ত সংঘর্ষ বলে চীনকে শেষ বিশ্বাস করেছে। এই বিরাট অধ্যায়ে ভারতবর্ষ ন্যায়ের দিক থেকে নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে গ্লানিমুক্ত। কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে, বিচারের দিক থেকে, আপনার প্রতি কর্তব্যের দিক থেকে সে নিশ্চিতরূপে অপরাধ করেছে। এবং চীনের সংগে সমবিশ্বাসী—বলব—একধর্মী এবং তাদের সহযাত্রী তথাকথিত প্রগতিবাদী দলের কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়াও কম অপরাধ নয়।

আরও কিছু কিছু অপরাধ আছে। উদ্যোগে শৈথিল্যের অপরাধের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে এখন থাক। মধ্যে মধ্যে আজ মনে সন্দেহ হচ্ছে—হয়তো অপরাধ হয়নি। এক মহান সত্যের গৌরব সে ত্রুটিকে নূতন এক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত করছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সে দিন মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—“ভারতবর্ষ যে ষোল বৎসরের স্বাধীনতার মধ্যে সমরাস্ত্র নির্মাণ করেনি, তার অহিংসা-বিশ্বাস বাক্যের সংগে বাস্তবকর্মে পালন করেছে সকল বিপদাশংকাকে বরণ করে, এ-সত্য আজ সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।” এরই জন্য সমগ্র বিশ্বের এক মুহূর্তে চিনে নিতে বিলম্ব হয়নি আক্রমণকারী কে? এরই জন্য সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই অকুণ্ঠ সাহায্যদানে সম্ভ্রমের সংগে এগিয়ে এসেছে। আজ অস্ত্র আসছে এবং আসবে—সম্ভারে সম্ভারে।

সকলের থেকে বড় বিস্ময় ভারতবর্ষ নিজে। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই ষোল বৎসরের বহিরঙ্গের পরিচয় রাষ্ট্রনায়ক থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে চিন্তার এমনকি উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে উঠেছিল। নগরে নগরে সমাজে বিশেষ করে যুবক জীবনে যে উদগ্র বিলাস লালসা এবং সম্ভোগ তৃষ্ণা প্রকট হয়ে উঠেছে সকল প্রকার নীতি ও ন্যায়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা দেখা গিয়েছে—যার প্রতিচ্ছবিতে আজকের সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প (যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত) প্রতিফলিত হয়েছে—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ২০শে অক্টোবর চীন ব্যাপকভাবে আক্রমণ করলে ভারত সীমান্ত। কয়েকদিনের মধ্যে সমগ্র দেশ বিচিত্র রূপান্তরে রূপ গ্রহণ করলে। বিলাস, উল্লাস, বিশ্বাসহীনতার উচ্ছৃংখল পদক্ষেপ, কামনা উদগ্র দৃষ্টি, সব পাল্টে গেল। দেখতে দেখতে জাগল নূতনের মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ আছে বিশ্বকবির কাব্যে যে ভারতবর্ষ আছে মহাত্মাজীর ধ্যানে তপস্যায়—যে ভারতবর্ষ আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংগঠনে।

চীন থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

তার সম্মুখে, দেশদ্রোহীর নেতৃত্ব চালিত বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ কোথায়? এ কোন ভারতবর্ষ। এ সনাতন ভারতবর্ষ!

[পরবর্তী প্রবন্ধ আগামী ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হইবে]

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

"এই হুনেরা, চীনা হুনেরা, এদের একমাত্র তুলনা পঙ্গপাল। সংখ্যার দিক দিয়েই শুধু নয়, নাশকতা-স্বভাবেও ওরা পঙ্গপাল।" দিরং মঠের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তাওয়াং মঠের খেমপো লামার জনৈক পারিষদ ভারি আর নিচু গলায় আমাকে বললেন, "পঙ্গপালের মতই ওরা এক একটা অঞ্চলে অর্বুদ সংখ্যায় হানা মারে। সে অঞ্চল ছারখার করে দেয়। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ সর্বনাশের বীজও এই পীতপঙ্গোরা আক্রান্ত দেশের মাটিতে বুনে রেখে যায়। সেটা আরও মারাত্মক।"

এই প্রৌঢ় লামার মন্দ্রস্বরের "উও আউর ভি খতরনাক হ্যায়" এই সতর্কবাণী আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে গেল। আমার সামনে হিমালয়ের সহস্র ঢেউ সমাধিমগ্ন। অনেকখানি নিচে দিরং নদীর রুপালী ধারা। তার দুই তীরে দিরং মনপাদের গ্রাম। দিরং জঙ। মধ্য নবেম্বরের এই টনকো সকাল তার সুষমার পুঁজি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। মৃদু বাতাসের করুণা-শীতল স্পর্শে আমার অনাবৃত মুখ চোখ নাক ও চিবুক অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে।

আমি দিরং মঠের প্রাঙ্গণের প্রত্যন্ত সীমায় গ্রামের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। প্রৌঢ় লামা সংক্ষিপ্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই মুখ বন্ধ করেছেন। এখন তাঁর হাতে ছোট্ট একটি প্রার্থনা চক্র ঘুরেছে

হিমালয়ের স্তম্ভিত তরঙ্গে জমাট মৌন। গ্রামের অবয়বে নিরুপদ্রব শান্তি মাখানো। নদীর রুপালী স্রোতে অকলঙ্ক শুভ্রতা। এখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা শক্ত, এই শ্রেণীবদ্ধ পর্বতের মাত্র কয়েকটা ভাঁজ ওদিকে দুর্বার বেগে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাক্ষসী এক পীত ড্রাগন—তার নাম কম্যুনিস্ট চীন। ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড গ্রাসের লালসায় উন্মত্ত হয়ে ছোবলে ছোবলে বিষ দাঁত আর হিংস্র নখে হত্যা করে চলেছে অপ্রস্তুত ভারতীয় জওয়ানদের।

একথা বিশ্বাস করা আরও শক্ত, এই ড্রাগনের ঘৃণ্য চাতুরিকে আমরা আন্তরিক সৌহার্দ্য বলে কোল দিয়েছিলাম এতদিন, গুপ্তঘাতককে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলাম, ড্রাগনের উদ্যত ছোবলকে এক যুগ ধরে শান্তিবাদীর বরাভয় বলে মনকে চোখ ঠেরেছিলাম। ড্রাগনের হাসি যে ধারালো দাঁতের বিকট প্রকাশ, ড্রাগনের দাঁতে যে প্রাণঘাতী মারাত্মক বিষ, সেকথা অনেক জওয়ানের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে আমাদের বুঝতে হল, এ এক প্রচণ্ড আফসোস।

দিরাং গোম্পা

ফটো : বীরেন সিংহ

ডিবলি রিম্পোচে তাওয়াং ওয়াং মঠের খেম্পো লামা ফটো : বীরেন সিংহ

আশার কথা এই, কিছুটা বিলম্ব হলেও সিংহের ঘুম ভেঙেছে, দেরিতে হলেও প্রচণ্ড রোষে সিংহের কেশর ফুলতে শুরু করেছে — আসমুদ্র হিমাচল মোহনিদ্রা ত্যাগ করে, বহু দিনের সঞ্চিত অবসাদ কাটিয়ে উঠে বসছে—সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন ক্রমশ ধ্বনিত হচ্ছে, এখন অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া বাকি। আর বাকি ড্রাগনের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে সেই উষ্ণ রক্তমাংসে দেশের মাটি রক্ষায় যে-সব বীর সৈনিকেরা—জওয়ানেরা, অফিসারেরা—নেফায় লাদকে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা। তবে হবে ঋণশোধ।

"আমরা ভেবেছিলাম", লামার গম্ভীর স্বরে আমার অন্যমনস্কতা কেটে গেল, "আমরা ভেবেছিলাম, হিমালয়ের এই মৌন, এই পবিত্র নির্জনতা, এরই আশ্রয়ে আমাদের জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি টিঁকে থাকবে। হুনেদের লোভ আর হিংসা আমাদের আশাকে ভেঙে চুরে তচনচ করে দিয়েছে। ক্ষমতার, পরাক্রমের দম্ভ ছাড়া ওদের আর কোন সম্বল নেই। মানুষের, মনুষ্যত্বের মূল্য ওদের কাছে কানাকড়িও নয়। ওদের লোভ সীমাহীন, ওদের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী, ওদের দম্ভ আকাশ-ছোঁয়া। ওরা হিমালয়কে অবজ্ঞা করেছে, কামানে রাইফেলে শান্তিকে হত্যা করেছে, নদীর স্রোতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, বারুদের ধোঁয়ায় বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে।"

দিগন্তে আঙুল তুলে লামা বললেন, "এখানেও সেই কলঙ্কিত ধোঁয়া বাতাসকে বিষিয়ে দেবে, কামানের হিংস্র গর্জন এই মৌন বিনষ্ট করবে, দেখবে এই দিরং নদীর জলও ওরা রক্ত ঢেলে লাল করে দেবে। নামকা চু লাল হয়েছে, কামেং, দিরং, সিয়াং, লোহিত—সব নদী কলুষিত হয়ে উঠবে চীনা হুনেদের পৈশাচিক স্পর্শে।"

লামা চুপ করলেন। মুখে গভীর বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। রৌদ্রের আশ্চর্য স্বচ্ছতায় পাইন বনের হরিৎ আবরণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মঠের প্রাঙ্গণে কয়েকজন মনপা প্রাণপণ চেষ্টায় একটা বিশাল পাইনের গুঁড়ি খাড়া করে তুলছে। ঠিক যেন একটা মাস্তুল। অমঙ্গল নাশনের জন্য এই পতাকা ওড়ানো হবে। গোম্পার বারান্দায় বসে কয়েক জন লামা একমনে সলতে পাকিয়ে যাচ্ছেন। দেশী বিদেশী অনেক সাংবাদিক, ফটো-গ্রাফার, সিনেমা টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানরা তাঁদের সামনে দিয়ে ঘুরছে ফিরছে ফটো তুলছে। ও'দের ভ্রূক্ষেপ নেই।

গোম্পাটি দোতলা। নিচের তলের একটি প্রকোষ্ঠে তথাগতের এক বিরাট মূর্তি, উপরে মঠের গ্রন্থশালা। নিচের তলে দুটো হল। সামনের হলে লামারা বসে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। এখানে আজ (১৪ই নবেম্বর, ১৯৬২) বিশেষ প্রার্থনা হবে। তাওয়াং মঠের বাস্তুচ্যুত খেমপো লামা এই প্রার্থনা পরি-চালনা করবেন। তাঁর তত্ত্বধার হবেন লুম লা অঞ্চলের ডিবলি রিমপোচে।

আমরা খেমপো লামার দর্শন পাবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছি। এই প্রেস-পার্টির সঙ্গে একজন ব্রিগেডিয়ার এসেছেন আর আছেন একজন কর্নেল আর সেনা বিভাগের একজন সরকারী ফটোগ্রাফার, যিনি মেজর।

এই প্রেস-পার্টিতে সাংবাদিক, ফটো-গ্রাফারের সংখ্যা চল্লিশ। কলকাতার কাগজের মাত্র তিনজন। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আমি, হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ডের শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত আর আমাদের পর্বতারোহী ফটো-গ্রাফার শ্রীবীরেন সিংহ।

"ঐ যে যাকে খুঁজছিলে," লামার কথায় ফিরে চাইলাম, "ঐ যে আগে যিনি আসছেন, উনিই খেমপো লামা। ও'র বাঁ পাশে রিম-পোচে।"

খেমপো লামার বেশ বয়েস হয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। নেফার অফিসার সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলকে আশীর্বাদ করে ইঙ্গিতে বললেন, "চল"।

গোম্পায় তখন সমবেত কণ্ঠে লামারা মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করেছেন। খেমপো সাংবাদিকদের অনুরোধে ডিব্লি রিমপোচেকে সঙ্গে করে গোম্পার বারান্দায় বসলেন। মৃদু হেসে দোভাষীর সাহায্যে বললেন, "প্রার্থনার জন্য আমরা তৈরি হয়েছি। তথা-গতের পদপ্রান্তে লামারা সব বসে পড়েছেন। ভিতরে তাই তোমাদের নিয়ে বসতে পারি, এমন জায়গা নেই। তার চেয়ে এই ভাল, এই বাইরে বসাই ভাল।"

খেমপো আর ডিবলি রিমপোচে পাশা-

পাশি বসলেন। ওদের পিছনে কয়েকজন লামা। তারও পিছন থেকে গুনগুন স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকল। আমার মনে হল অজস্র মৌমাছির গুঞ্জন। মনে হতে লাগল, ক্রমে সেই শিলা-নির্মিত গোম্পাটি মন্ত্রের গুঞ্জনে টই টম্বুর হয়ে উঠল। তারপর স্রোতের মত বেরিয়ে আসতে লাগল ঘুলঘুলি দিয়ে, খোলা দরজা দিয়ে, ছড়িয়ে পড়তে লাগল আকাশে।

গোম্পার প্রাঙ্গণে বিরাট মাস্তুল ততক্ষণে আকাশে মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে। দিরং গ্রাম থেকে কয়েকটি শিশু আর বৃদ্ধা এসে সেই প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে। আমাদের দেখে ওরা অবাক হয়ে গিয়েছে। আর শিশুদের বিস্ফারিত চোখে আর বৃদ্ধাদের মুখের অসংখ্য বলিরেখায় বিস্মিত প্রশ্ন ফুটে উঠেছে: এরা কারা?

নেফার অফিসারটি ফিসফিস করে বললেন, "এরা সব মনপা। তাওয়াং থেকে বমডিলা পর্যন্ত মনপা উপজাতিদের সীমানা। নেফায় যত উপজাতি আছে, তার মধ্যে মনপা আর শেরডুকপেনরাই বৌদ্ধ। মনপারা কাষায়ধারী সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের পোশাক পরিচ্ছদ তিব্বতীদের মত। তবে ভাষা এবং লোকাচার আলাদা। খেমপোই এদের প্রধান ধর্মগুরু।"

শেরডুকপেনদের চাইতে মনপা উপজাতির সংখ্যা অনেক বেশি। নেফার কামেং ডিভিশনে মনপারা সংখ্যা গরিষ্ঠতায় দ্বিতীয়। এদের লোকসংখ্যা ৩৪ হাজার। মনপারা কামেং ডিভিশনের পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দা। এই ডিভিশনের পূর্বাঞ্চলে দুর্ধর্ষ দাফলাদের বাস। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ অঞ্চলে এরা বাঙনি নামে পরিচিত। এদের সংখ্যা ৫০ হাজার।

"এরা, এই মনপারা এখন ক্রমেই "থাক" চাষের দিকে মন দিয়েছে। এদের গরু আছে, ভেড়া আছে ঘোড়া আর খচ্চরও প্রচুর আছে।" নেফা অফিসারটি বললেন। "ঐ যে জমকালো সুন্দর পোশাক দেখছেন ওদের গায়ে, এ ওদের নিজের হাতে বোনা। তাঁতের কাজে, কাঠের কাজে ওরা সিদ্ধহস্ত। ওদের বাড়ি যদি কোনদিন যাবার সুযোগ পান, কাঠের তৈরি পানপাত্র দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। তাওয়াং-এ বদলি হয়ে আসা ইস্তক আমি মনপাদের কাঠের বাসনে ছাড়া আর কিছুতে খেতে পারিনে। মন ওঠে না। এদের পান পাত্র গ্রিশিয়ান আর্ন থেকে ঢের বেশি এক্‌সটিক্।"

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। "আফসোস, আপনারা এ যাত্রা, তাওয়াং দেখতে পেলেন না। আমি কাশ্মীরে ছিলাম। তাওয়াং-এর সৌন্দর্যের কাছে শ্রীনগর উপত্যকা লজ্জায় মুখ ঢাকবে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আর এদের তৈরি গালচে যদি দেখেন। তাবৎ বিশ্বে এর কদর বেড়ে

যেত, যদি কমার্সিয়াল স্কেলে বাজারে ছাড়া যেত। আমরা একটা পরিকল্পনাও নিয়েছিলাম। কিন্তু সব ভেস্তে গেল চীনাদের আক্রমণে। দোজ্ ব্যাস্টার্ড কম্যুনিস্টস্। তাওয়াং হাতছাড়া হওয়া আমাদের এক বড় রকমের ক্ষতি। আফসোস, আফসোস।”

“আচ্ছা, এই মনপাদের কিরকম মনে হয় আপনার?” আমার প্রশ্ন বুঝতে না পেরেই বোধ হয়, অফিসারটি মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। একটু খোলসা করেই বললাম, “ভারতের প্রতি আনুগত্য—”

বাধা দিয়ে অফিসারটি বললেন, “বুঝতে পেরেছি।” একটু থেমে কিঞ্চিৎ তিক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, “দিল্লিও এই সংশয়ে ভুগছে। মিস্টার রিপোর্টার, আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন, আপনি আমি যতটা পেট্রিয়ট, অধিকাংশ মনপাই তাই। স্পাই, ফিফ্‌থ্ কলম কোলাবরেটার আপনার আমার স্টেটে নেই? চীনা অধিকৃত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যায় যে ওরা পালিয়ে আসছে, তাতেই আমার কথার প্রমাণ পাবেন। আপনাকে আরেকটা সংবাদ দিই। এই স্বভাব শান্ত মনপারাও চীনা হামলায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তাওয়াং-এর পতনের পর, তিন-শ'টি মনপা যুবক শত্রুর অধিকারের মধ্যে থেকে রেজিস্ট্যানস্ গড়ে তুলতে চেয়েছিল। অস্ত্র চেয়েছিল, সরঞ্জাম চেয়েছিল—”

হঠাৎ তিনি কথায় ছেদ টেনে দিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, “তারপর কি হল?”

গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, “আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। প্লীজ! বরং ঐ হিমালয়কে জিজ্ঞেস করুন।”

গোম্পা থেকে ভেসে আসা বাদ্যভাণ্ডের বিচিত্র সংগীত আমাদের প্রসঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটাল।

অফিসারটি বললেন, “এরা খুব সংগীতপ্রিয়। তাওয়াং-এ লামাদের একটি সুন্দর নাট্যশালা ছিল। কতদিনের জমানো কত যে সুন্দর সুন্দর পোশাক আশাক ছিল, কত বিচিত্র মুখোশ ছিল! শিল্প হিসাবে অমূল্য। সাড়ে তিন-শ বছর হচ্ছে তাওয়াং মঠের বয়েস। সাড়ে তিন-শ বছরের কালেকশন ছিল সেখানে। আর কত যে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ছিল মঠের গ্রন্থাগারে, কি বলব। খেমপো আর অন্যান্য লামারা কিছু কিছু পুঁথি সঙ্গে করে এনেছেন। কিছু কিছু দুর্গম গুহায় লুকিয়েও রেখে এসেছেন। আর বাকি পুঁথিগুলোয় আগুন লাগিয়ে চীনা হুনেরা আগুন পুইয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ যা পেয়েছি, নাট্যশালাটি ভস্মসাৎ করেছে কম্যুনিস্ট ফিলিস্টাইনেরা। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ তার প্রতি কম্যুনিস্টদের প্রবল এক জাতক্রোধ। তিব্বতে সব ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করেছে। তাওয়াং-এও সেই সর্বগ্রাসী ধ্বংসকার্যের পুনরাবৃত্তি করছে। এর মধ্যেই সাত-শ পুঁথি তাওয়াং-এ পুড়িয়ে ফেলেছে বলে সংবাদ পেয়েছি।”

“পশু শক্তি যত বিক্রমই দেখাক, মঙ্গলকে, সত্যকে, শান্তিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তার নেই।” প্রার্থনা অন্তে খেমপো যে বাণী দিলেন, দোভাষী তার তর্জমা করতে লাগলেন: “আমি একথা বিশ্বাস করি। আততায়ীর হাত থেকে ন্যায়, ধর্ম, ঐতিহ্য, মনুষ্যত্ব রক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তিয়েছে। সেই দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। তাওয়াং মঠে আমরা আবার ফিরে যাব, এ বিশ্বাস আমি রাখি। আততায়ীর কলংকময় স্পর্শ থেকে ভারত সরকার আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে মুক্ত করবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। ভারত আমাদের মাতৃভূমি, এদেশ তথাগতেরও। তথাগত, তুমি আমাদের সহায় হবে। আমরা তোমারই শরণ নিচ্ছি।”

খেম্পো স্তব্ধ হলেন। গোম্পা উচ্চকিত হল, উদ্বেলিত হয়ে উঠল শত-কণ্ঠের সংগীত মন্ত্রে: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...

(ক্রমশ)

শিল্পীর স্বাধীনতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্যুনিজম—যে তত্ত্ব বলে—সকল মানুষের সমান অধিকার—সব মানুষ সম-মর্যাদার অধিকারী, যে তত্ত্বের মধ্যে কল্পনা এক স্বর্গরাজ্যের—যে রাজ্যে অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় স্বাস্থ্য-সুখে এক স্বর্গরাজ্যের, যে রাজ্যের মধ্যে অনাচার নেই, পীড়ন নেই, শাসকের রক্তচক্ষু নেই, ভয় নেই, যে রাজ্য অভয়ের রাজ্য, সেই কম্যুনিজিমের প্রতি ১৯১৮ সালের পর থেকে অন্তত বিশ বৎসর ধরে প্রায় প্রতিটি লেখকই আকৃষ্ট হয়েছেন। হওয়ারই কথা। রামায়ণে গুহকচন্ডাল, সুগ্রীব হনুমানের সংগে ভারতরাজপুত্র রামচন্দ্রের মিতালীর কল্পনার মধ্যে, মহাভারতে ব্যাধপুত্র একলব্যের প্রতি অবিচারের কাহিনীর মধ্যে মহর্ষি বেদব্যাসের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁদের কালে এই তত্ত্বটি আবিস্কৃত হলে—তাঁরাও প্রথম দৃষ্টিতে এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। পীড়নহীন ভয়হীন দুঃখহীন এক জগতের কল্পনা যে সকল কালে সকল মানুষের। কল্পনাজীবী লেখকদের এই তো চিরন্তন কল্পনা।

১৯১৮ সালে রুশ দেশে গণবিপ্লব হয়ে গেল, ১৯২১ সালে মহাত্মাজীর প্রথম গণ-আন্দোলন হয়ে গেল—সে আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তারই মধ্যে স্বপ্ন জাগল গণবিপ্লবের। তখন আমি রাজনৈতিক কর্মী। রহস্যাবৃত রাশিয়ার কথা—অপরূপ কথা শুনি—তার সংগে কল্পনা করি। বই পাইনে। দু-একখানা বই রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে পাই—তা সংক্ষিপ্ত। মার্ক্সের ক্যাপিটাল পেয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য—কিছুটা পড়ার পর বই-খানি ফেরত দিতে হয়েছিল এবং যে কিছুটা পড়েছিলাম তাও ইংরিজীতে স্বল্পজ্ঞানের জন্যে বুঝতে পারি নি। ১৯৩০/৩১ সালে জেলের মধ্যে বন্দীদের আলোচনা-আসরে কম্যুনিজিম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুনেও যা শিখলাম জানলাম তাও এক স্বপ্নরঙীন মোড়কে মোড়া আদর্শবাদ—তার ভিতরের আসল তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু জানি নি। নিজেই নিজের অদার্শবোধ অনুযায়ী কম্যুনিজিমের এক রূপকে তৈরী করে নিয়ে তাকেই তার স্বরূপ বলে ধরে নিয়ে-ছিলাম। ১৯৩১ সালে জেল থেকে বের হবার সময় বন্ধুদের বলে এসেছিলাম—সক্রিয় রাজনীতির পথে দেশসেবার কর্ম আমি ছেড়ে যাচ্ছি আজ, সাহিত্যের পথে দেশসেবার কর্মের সংকল্প নিয়ে জেল-গেটের বাইরে পা দেব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্য-সেবাকর্মে প্রথম ফল আমার "চৈতালী ঘূর্ণি"। কাঁচা রচনা কিন্তু তার বিষয়বস্তু আমার দেখা জিনিস; এক চাষী জমিদার ও মহাজনের শোষণে এবং অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে কলে শ্রমিক হল—তারপর মালিক-শ্রমিকের বিরোধের ফলে ওই লোকটির মৃত্যু হল। ভদ্রলোকের ছেলে পার্শ্ব-নায়ক সুরেন—সেও সত্য—সে আজও জীবিত—আজও সে দেশসেবায় নিযুক্ত রয়েছে বীরভূমে। তারপর কালিন্দী-গণদেবতা-পঞ্চদেবতা লিখেছি। তার মধ্যে আমার বিপ্লবের স্বরূপ কল্পনা আমার নিজস্ব। তার মধ্যে ন্যায়প্রধান, নীতিপ্রধান, সত্যপ্রধান এবং ঈশ্বরবিশ্বাস সুদৃঢ় অটল; যে ন্যায়, যে নীতি, যে সত্যের জন্য বিপ্লবের কামনা—আবাহন, তার উৎস ঈশ্বর বিশ্বাস। তারই মধ্যে মৃত্যু—অমৃত রাজ্যের সেতু। ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের নিমন্ত্রণে সম্মেলনের সভাপতিত্ব যখন গ্রহণ করি, তখনও এদের স্বরূপ সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। এই সংঘের প্রথম সভাপতি 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সভাপতি 'অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। সুতরাং সন্দেহ তখনও করবার কারণ ঘটেনি। এবং ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট দল তখন সদ্য প্রকাশ্য রাজপথে বের হয়েছে লাল ঝান্ডা ঘাড়ে নিয়ে। তাদের ঘোষণা, তারাও ভারতে সৃষ্টি করবে কল্পরাজ্যের। সম্মেলনের অধি-বেশনের পর দিন শুনলাম—কংগ্রেসের মত পূর্ণ একটি বৎসর আমাকে সভাপতি হিসাবে যুক্ত থাকতে হবে এদের সঙ্গে। এবার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লিখলাম 'মন্বন্তর'। মন্বন্তরের মধ্যে কম্যুনিস্টপন্থী কর্মীই নায়ক। কিন্তু সে কল্পনার কম্যুনিজমধর্মী নায়ক। "মহাত্মাজীর অনশনের সময়ে সে লিখছে—পৃথিবী যাই বলুক—ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে। বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নাই।........। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা, তুমি চিরায়ু লাভ কর। ভারতের সত্যধর্মের প্রতীক তুমি।...আমি বেঁচে থাকব মানুষের মুক্তি-প্রতীক্ষায়। মহাযজ্ঞ আবার হবে। যজ্ঞশেষে উঠবে মানুষের মুক্তিচক্র। সত্য-কারের সমাপ্তিতে আসবে নববিধান। সে নববিধানের প্রারম্ভে রচিত হবে বিশ্বমানবের মহাশাস্ত্র।...কতজন আনবে কত শাস্ত্র, কত বাণী। তার মধ্যে ভারত নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে, তার চিরন্তন বাণী। হে মহাত্মা, যা ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে, যা মূর্ত হয়েছে তোমার কর্মে সাধনায়। অন্তর বিজ্ঞান। জীবনের প্রতি প্রেম—জীবের প্রতি শ্রদ্ধা—সত্যের প্রতি আগ্রহ মোহমুক্ত কল্যাণ দৃষ্টি হিংসার প্রতিরোধে অহিংস অনমনীয় দৃঢ়তা...। অমৃতময় মানব সমাজ রচিত হবে।"

আমার কল্পনা আমার কাছে মিথ্যা নয়, ভারতবর্ষের পক্ষেও মিথ্যা নয়, স্বাধীন ভারতবর্ষের ষোল বৎসরের রাষ্ট্রনীতি, পঞ্চ-শীলের উপর নিষ্ঠা এবং সামরিক উপকরণ নির্মাণে অনাগ্রহ তার প্রমাণ। কিন্তু কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে আমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা এ-সত্য আমি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। কাছে আসার ফলে তাদের রঙীন আবরণ একে একে তাঁরাই উন্মোচিত করে নগ্ন স্বরূপে আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হতে লাগলেন। প্রথম আঘাতের কথা বলি—এই সঙ্ঘের আপিসে একদিন গিয়ে শুনলাম—একজন কম্যুনিস্ট সাহিত্যিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে গাল দিচ্ছেন—বিভীষণ কুইসলিং ব'লে। সেই-দিনই বিরোধ শুরু হল। চোখ খুলল। আমি জবাব দিয়ে বাড়ি এলাম। পরদিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি খ্যাতনামা অধ্যাপক সাহিত্যিক এসে সনির্বন্ধ অনুরোধে বিরোধ মিটিয়ে নিলেন। ঘোষণা করা হল—এই

ধরনের উক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কারণ সংঘ কম্যুনিস্ট দলের নিজস্ব নয়। কিন্তু সেও তো মিথ্যা। তারপর স্বরূপ দেখলাম যে, সত্য এদের মধ্যে নেই—যা সত্য তা দলীয় স্বার্থ। দলীয় স্বার্থে মিথ্যাও বরণীয়। ন্যায় নীতি সত্য সব তাই—সব তাই। এমন কি মানুষের কল্যাণ তাও তাই। কম্যুনিস্টের স্বর্গরাজ্য কম্যুনিস্ট দলের একাধিপত্য। সেখানে ব্যক্তি নেই। আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, অমৃত নেই। আছে আত্মাহীন প্রাণ। আছে মৃত্যু আছে হিংসা, আছে কৌশল; তাতেই বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি অন্ন বস্ত্র বস্তু জ্ঞানের। তাতে অবিশ্বাস অনানুগত্যে আছে দণ্ড; বন্ধন, মৃত্যু। আত্মজ্ঞান—আত্মা অমৃত — ঈশ্বর — তার অধিকারের গণ্ডী থেকে নির্বাসিত ও বিসর্জিতই নয়—ধ্বংসস্তূপের আবর্জনার মত অপসারিত করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অন্তর আর্তনাদ করে উঠল। আমি ভারতবর্ষের মানুষ—ভারতবর্ষের লেখক—আমার কণ্ঠ দিয়ে আমার লেখনী মুখে কি ক'রে উচ্চারিত হবে জীবনের শেষ মৃত্যুর নিঃসীম অন্ধকারে! সত্য ভ্রান্তি। অমৃত মিথ্যা, ঈশ্বর অলীক! পৌরাণিক ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ নাই করলাম, ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে পরম বন্ধ! বর্তমান যুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র? নির্বাণামৃতের প্রসাদ মিথ্যা? রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সাধনা বাণী আনন্দলোকে-মঙ্গলালোকে তাঁর বিরাজমানতা মিথ্যা? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাতৃসাধনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস মিথ্যা? আমার অন্তরের তৃষ্ণায় আমার যাত্রা ও উপলব্ধি মিথ্যা?—না।

অন্ন আমি চাই—কিন্তু তাই সব নয় আমার কাছে। আমি চাই অমৃত।

সম্পদ চাই জীবনে সমৃদ্ধ করতে, কিন্তু জীবন চাই অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত হবার জন্য।

বস্তু জ্ঞান আমি চাই—আত্মজ্ঞানে উপনীত হবার জন্য।

শুধু বিত্তের প্রতিশ্রুতিতে আমি নিজেকে বিক্রয় করতে পারি না। 'ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্য'। বিত্তের বিনিময়ে আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতা চিন্তার আকাশে পক্ষবিস্তারের জন্মগত অধিকার আমি বিসর্জন দিতে পারব না; পারি না।

১৯৪৪ সালে আমার স্থলে সংঘের সভাপতি হলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৪৫ সালের জানুআরীতে সভাপতি হলেন শ্রীশৈলজানন্দ। হ্যালিডে পার্কে বিপুল জনসমাবেশের সম্মুখে—প্রকাশ্যে তীব্র প্রতিবাদ করে বেরিয়ে এলাম।

ঈশ্বরকে, অমৃতকে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে যে তত্ত্ব—সে-তত্ত্বকে অন্ন, বস্ত্র, সম্পদের প্রলোভনে বা মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে —কোন কারণে গ্রহণ করতে পারি না। "যে নাহং নামৃতস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"

* চিত্র প্রদর্শনী *

একক হোক, সম্মিলিত হোক, এখনকার চিত্রপ্রদর্শনীগুলিতে টেকনিকের দিক থেকে শিল্পীদের রকমারিত্বার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়, অনেকরই কাজের মধ্যে একটা নিজস্ব শিল্পভঙ্গী উদ্ভাবনের চেষ্টারও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একটি ব্যাপারে প্রায় সব শিল্পীই পরস্পরের মধ্যে চিন্তার একটা মিল পাওয়া যায়—সেটা হচ্ছে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায়। আর তাই এই বিষয়ে একটা বৈচিত্র্য কারুর ক্ষেত্রে পাওয়া গেলে সেটা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গত ২৮শে নবেম্বর থেকে মহেঞ্জোদারোর উদ্যোগে আকাদমি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত মিলন মুখোপাধ্যায়ের ছবির একক প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে পাস করা একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হলেও শ্রীমুখোপাধ্যায় পেইন্টিংয়েও দক্ষতা অর্জন করেছেন। আলোচ্য তাঁর এই প্রদর্শনীভুক্ত সতেরখানি ছবির প্রায় সবকখানিরই চরিত্র হচ্ছে বারবণিতা। সমাজের এককোণে পড়ে থেকে অতি ঘৃণিত জীবনযাপন যারা করে তাদের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিক অবস্থাকে শিল্পী পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্তু, চরিত্র ও পরিবেশ নির্বাচনে শিল্পী দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলেও রুচি ও শালীনতার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

মোটা তুলির টানে মানসিক অবস্থার পার্থক্যকে পরিস্ফুট করে তুলতে ভিন্ন ভিন্ন রঙের সাহায্যে শিল্পী প্রতি ছবিতেই একটা ভাবময় পরিবেশ বিন্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। মুখ্যত ইম্প্রেসানিস্ট ধারার অনুগামী হলেও কয়েকখানি ছবি বিন্যাসে প্রায় বিমূর্ত ধারার পাশ ঘেঁষে গিয়েছে। শিল্পী বারবণিতাদের 'Gray' বা নীরস-জীবন সম্প্রদায় আখ্যা দিয়েছেন এবং প্রথম

কারখানাতে শিল্পী : মিলন মুখোপাধ্যায়

ছবিখানিতেই সমগ্রভাবে ঐ সম্প্রদায়টিকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। 'বিলাপ', 'একান্ত চিন্তা', 'বার্ধক্য', 'মৃত্যু-যন্ত্রণা', 'সুখের সংসারের কামনা', 'একমাত্র অবলম্বন' প্রভৃতি ছবি কখানিতে বারবণিতাদের মনের দ্বন্দ্বের দিকটা ফুটিয়ে তোলায় তিনি সক্ষম হয়েছেন।

*

গত ১লা ডিসেম্বর থেকে আকাদমি অফ আর্টস গ্যালারীর একটি ভিন্ন হলে ইন্ডো কন্টিনেন্টাল আর্টিস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি দেবীর ছবির একক প্রদর্শনী। প্রবীণা শিল্পী দীর্ঘদিন ধরে যে সব ছবি এ'কে এসেছেন, তারই মধ্যে আলোচ্য প্রদর্শনীতে ছত্রিশখানি ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। জলরঙে, তেলরঙে এবং স্কেচ—সবরকম মাধ্যমের ছবি আঁকাতেই তিনি চেষ্টা করেছেন। তবে বিষয়বস্তু, অঙ্কনরীতি বা রঙের প্রয়োগ—কোন বিষয়েই মৌলিক কিছু দেখা গেল না। 'পার্বতী', 'শিব', 'অশিব' ও 'মদন' ছবি কখানি অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রাচ্যধারার অনুসরণে অঙ্কিত এবং আঁকার হাত আছে শুধু সেটুকুই মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া 'ছন্দ' ও 'ধ্যানমগ্ন' ছবি দুখানি দৃষ্টিতে পড়ার মতো। তেলরঙের কাজে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় কোন ছবিতেই পাওয়া যায় না। আধুনিক শিল্পীদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টায় তেলরঙে তাঁর আঁকা বিমূর্ত ধারার 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে' ধরনের ছবি শিল্পীর মতির অস্থিরতাই ব্যক্ত করে।

*

দেশের প্রতিরক্ষায় সারা দেশের লোকের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে একেবারে বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও পিছিয়ে নেই। ছোটরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে, তারই একটি দৃষ্টান্ত আকাদমি অফ ফাইন আর্টস উদ্যোগিত একটি চিত্র প্রদর্শনী। পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি কর্তৃক গত ৬ই ডিসেম্বর উদ্বোধিত চারদিন-ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে চার থেকে পনের বছর বয়সের ছেলে ও মেয়েদের আঁকা দুশ পঁয়তাল্লিকখানি ছবি টাঙানো হয়। এই উদ্দেশ্যে আকাদমি যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন, তাতে যোগদানকারীদের ছবিই এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। চার থেকে সাত, আট থেকে বারো এবং তের থেকে পনের বছর বয়স ধরে প্রতিযোগীদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

ছোটদের আঁকা বলে একেবারে অবজ্ঞা করার মত ছবি নয়। বিশেষ করে তের থেকে পনের বছর বয়সের গ্রুপে ভবিষ্যতে ভাল শিল্পী হবার সম্ভাবনাপূর্ণ কৃতিত্ব বেশ কজনেরই মধ্যে দেখা গেল। প্রতিরক্ষার সাহায্যার্থে এই ধরনের প্রচেষ্টা অভিনব। ছোটদেরও অল্প বয়সেই দেশের কাজে অনুপ্রাণিত করে তোলায় বিশেষ সহায়ক আকাদমির এই উদ্যোগটি প্রশংসার্হ।

অসমাপ্ত চটাব্দ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

উপেনবাবুকে টাকাটা যোগাড় করে দেওয়ার পর থেকে আমি আর তাঁর চোখে একেবারে তুচ্ছ রইলুম না। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে এবার থেকে তিনিই একটু দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট আমার সঙ্গে কথা কয়ে যেতেন। এর ফলে কুলি-মজুরদের চোখে আমার কদরও যেন একটু বেড়ে গেল। সুজিত আর ফটকের দরোয়ান ছাড়া মিলের মধ্যে কেউ কোনোদিন আমার সঙ্গে এগিয়ে এসে কথা কইত না। কিন্তু আজকাল দু-চারটে চেনা-মুখ আগ-বাড়িয়ে মাঝে-মাঝে ভারি মিষ্টি হেসে আমার কুশল শুধোতে শুরু করলে। ফটকের দরোয়ান দেখে শুনে মন্তব্য করলে যে এইবার আপিসের একজন ছোটবাবু হয়ে পড়তে আমার আর খুব বেশী দেরি হবে না।

একদিন কারখানার ফটক পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পায়ের ধুলো নিয়ে একজন প্রণাম করে বসল। চেয়ে দেখি বিরাট চেহারার এক পুরুষ। গায়ের বসন মলিন, কিন্তু তার মাংস-পেশীগুলো দেখবার মতো। বলিষ্ঠ সুদৃঢ় দেহ অথচ কেমন যেন নিজের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। অমন বিরাট শরীর, কিন্তু চোখ দুটো একেবারে শিশুর মতো। তার উপর বুলি এমনই দেহাতী হিন্দী যে বোঝে কার সাধ্য! যাই হোক তবু বুঝলুম। চটকলে যারা কিছুদিন কাজ করেছে এ কথা বুঝতে তাদের ভাষার মাধ্যম লাগে না। হাবেভাবেই বোঝা যায়। একটা ময়লা ধুতি পরা মানুষের এগিয়ে আসার ভঙ্গী দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে সে চাকরির খোঁজে আসছে, আর কিছুর খোঁজে নয়। তার উপর এর কম্পমান হাতে ধরা একখানা পাঁচ টাকার নোট।

নোটটা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। এমন ধারা খোলা আকাশের নীচে সর্বচক্ষুর সামনে এমনভাবে ঘুষ, চট-কলী-ভাষায় যাকে বলা হয় কমিশন বা প্রণামী আমাকে কেউ দেয়নি। এটা ঐরকম একটা বিরাট সবলকায় হিন্দু-স্থানী শিশুর পক্ষেই সম্ভব। আমি লোকটাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম—তোর নাম কি রে?

—ফগুয়া।

—থাকিস কোথায়?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ঐ লাইনে।

—কতদিন এসেছিস্?

—চার মাহিনা। বদলির খাতায় নাম উঠেছে হুজুর—কিন্তু কাম এখনও পাইনি।

সিঁড়ির এক ধাপ উপরে উঠে বেচারা বসে আছে। বসে আছে তো বসেই আছে। এ যে কি যন্ত্রণা, যে তার মধ্যে না পড়েছে সে বুঝবে না। বেকারত্বের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একবার ঝিলিক দিয়েই আবার যে-কে সেই অন্ধকার। মনে হয় এর চেয়ে যেন ঝিলিক না-মারাই ছিল ভাল। এই এক ধাপ উঠতে নিশ্চয় তার গোটা কুড়ি টাকা খসেছে—ওটা তো উপেনবাবুর ন্যায্য প্রাপ্য। সে টাকা আকাশ থেকেও পড়েনি, ফগুয়ার ট্যাঁকশাল থেকেও আসেনি। এসেছে সোজা পথে মহাজনের ঘর থেকে। তার উপর ঐ রকম একটা বিশাল দেহকে টিঁকিয়ে রাখতে গেলেও দু-বেলা দু-মুঠো চালের দরকার। তার খরচ দেয় কে? তার খরচ দেশোয়ালী ভাইরা যুগিয়ে এসেছে এবং শোধের জন্যে তাগিদও দিয়ে আসছে। পুরুষ মানুষের পক্ষে এতগুলো দেনা মাথায় নিয়ে কতদিন আর চলে? ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে? বদলির কাম তাই চাই-ই চাই, আর বসে থাকা চলে না।

—ফগুয়া! টাকা রাখো! তা আমায় ধরেছ কেন?

—জানি হুজুর উপেনবাবুই আসল আদমি। কিন্তু উনি তো পাত্তাই দিতে চান

না। আপনার সঙেগ জানা-পছন্ আছে দেখেছি। একটু যদি দয়া করে বলে দেন। উপেনবাবুর টাকা আমি পুরো দেব। এই বলে আবার সে নোটখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরল।

আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। চারিদিকে চেনা চোখের ভিড়। যদি কেউ দেখে ফেলে। এবার ধমক লাগালুম। বললুম—ফগুয়া, ভাল হবে না বলছি। নোট ট্যাঁকে গোঁজ। শোনো। এক কাজ কর। কাল টিফিনের সময় আমার আপিস-ঘরে এসো একবার। প্রভিডেন্ড ডিপার্ট।

অত বড় জোয়ান লোকটা কাঁচু মাচু হয়ে চলে গেল। মনে মনে কি ভাবলে কে জানে? হয়তো ভাবলে উপেনবাবু যেমন পাত্তা দিতে চান না, ইনি হয়তো তার চেয়েও এক কাটি দড়। কে জানে কত টাকা দিলে তবে এ-সব বাবুদের মন পাওয়া যায়।

চটকলের আনাচে কানাচে এমনি কত ফগুয়া হন্যে কুকুরে মতো ঘুরে বেড়ায়, তাড়া খেয়ে খেয়ে ফেরে, জ্বল-জ্বল চোখে চেয়ে

দেখে ঐসব অজানা অচেনা কল-কব্জাগ্নলোর দিকে আর ভয় পেয়ে যায়। চটকলের এই অবুঝ সংসারের হাল-চাল নিয়ম কান্নগন্লো এরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। যত বোঝাবার চেষ্টা করে ততই গন্লিয়ে যায়। উপদেশ দেবার, সহান্নভূতি দেখিয়ে মন্ত্রণা দেবার প্রচুর লোক আশে পাশে। কিন্তু যে উপদেশ শ্ননলে নির্ভুল ভাবে চাকরি মিলে যায় সে উপদেশ কেউ-ই দিতে পারে না। ফগ্নয়ারা কেবল তাই ঘ্নরে মরে চটকলের গোলক ধাঁধার মধ্যে।

পরদিন স্নজিতকে সব বললন্ম। স্নজিত মন দিয়ে শ্ননে বললে—ফগ্নয়া? চিনতে তো পারলন্ম না। কত লোকেরই বদলির খাতায় নাম আছে। তবে শ্ননে মনে হয় লোকটা বড় সরল, নেহাত বোকা, একেবারে গ্রাম্য। নইলে এই তো ফাল্গ্নন মাসে বদলির মরস্নম পড়ল। এ সময় আমাদের কারখানায় তিন-শ চার-শ কোনো কোনো বছর ছ-সাত-শ পর্যন্ত বদলিকে কাজ দেওয়া হয়। এ সময় একটন্ তৎপর হইলেই তো কাজ পেয়ে যাওয়া যায়।

আমি বললন্ম—টাকা ট্যাঁকে গ্ন'জে ঘ্নরে বেড়াচ্ছে, একে ওকে ধরছে—এর থেকে তৎপরতা আর কি হতে পারে?

স্নজিত বললে—তবে বোধ হয় ভাগ্যই খারাপ। যাই হোক, লোকটাকে তো তুমি আসতে বলেছ। আস্নক না, দেখি একবার চেহারাটা।

ফাল্গ্নন মাস এল তো ছন্টির মরস্নম পড়ল। দেশে ফেরার এই হচ্ছে সময়। সারা বছর মন্খ বন্জে থেকে ঠিক এই ফাল্গ্নন মাসে কারখানার কুলিগন্লোর প্রাণে শখ জেগে ওঠে। গ্রামের আমোদ প্রমোদের কথা মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় বিয়ে করার কথা। দলে দলে যনুবক মজন্র ছোটে বিয়ে করতে। যে-সব জোয়ান একেবারে শ্নন্য হাত নিয়ে কারখানায় ঢনুকেছিল তাদের হাতে কিছন্ কড়ি জমলেই তাদের বিয়ে করার মতো অবস্থা হয়। তারা ট্যাঁকে পয়সা গ্ন'জে বেরিয়ে পড়ে বউ আনতে। সমাজের চোখে কেউ-কেটা হতে। আর যারা বউ-ছেলেপন্লে দেশে রেখে এসেছে তারা যায় হাত-পা ছড়িয়ে একটন্ জিরোতে, সংসার ধর্ম পালন করতে, মদ খেয়ে কিছন্ স্ফন্র্তিও করতে। ফাল্গ্নন-চৈত্র থেকে এদের যাওয়া হয় শ্নরন্; দন্-মাসের আগে কেউ ফেরে না। তিন-মাস, চার-মাস, পাঁচ-মাসও হয়। আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে প্রায় সবাই ফিরে আসে। বছরের এই চার-পাঁচ মাস প্রতি চটকলেই মজন্রের ঘাটতি। এই সময় পারমানেন্ট মজন্রের জায়গায় বদলি মজন্র নেওয়া হয় প্রচুর। উপেনবাবনুর মত করিৎকর্মা বাবনুরা এই সময় কিছন্ কামিয়েও নেন।

—কত করে পান উপেনবাবন্ এক-একটা মজন্রের কাছ থেকে?

স্নজিত খানিকটা ভেবে বললে—যতদন্র জানি উপেনবাবন্ যদি কোনো মজন্রকে দন্-মাসের কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারেন, সে তাঁকে ত্রিশটা টাকা দেবেই।

সর্বনাশ, এ যে অনেক টাকা। গরিব-গন্লোর তাহলে আর থাকে কি?

—থাকে একটা ভরসা। যদি কোনোরকমে দন্-মাসের বেশীও কাজটা টিকে যায়। যদি পারমানেন্ট হওয়া যায়। যদি ভবিষ্যতে আবার খন্চরো কিছন্ বদলি কাজ পাওয়া যায়।

দেশ থেকে হতভাগারা যখন আসে তখন কেউ ট্যাঁকে করে লাখ টাকা নিয়ে আসে না। পেটের ধান্দায় আসে সবাই—হাত সবারই শ্নন্য। শহরে আসছে রোজগার করতে, সঙ্গে আবার পয়সা নিয়ে আসবে কি? যার যা কিছন্ সামান্য পন্'জি ঘরেই রেখে দিয়ে আসে, ঘরের মান্নষগন্লোর জন্যে। এখানে আসে এক বস্ত্রে। প্রথম দিন থেকেই ধার করা শ্নরন্ করে। নির্ভয়ে বেপরোয়া ভাবে ধার করে যায়। ধার দেবার লোক অনেক আছে। কাবন্লিওয়ালা তো আছেই, তা ছাড়া লাইন সর্দার দরোয়ান আর বাজারের মহাজন। চড়া হারে সন্দ। বছর গেলে আসলের পাঁচ গ্নণ ছ গ্নণ মহাজনের ঘরে আসে। দন্-একটা দেনদার ছটকে পালিয়ে গেলেও গায়ে লাগে না। তবে মজন্ররা বেশীর ভাগই অতি সরল-বিশ্বাসী। মহাজনকে ফাঁকি দিয়েছে এমন ঘটনা অতি বিরল। এইভাবে চড়া সন্দে টাকা ধার নিয়ে মজন্ররা কিন্তু ডুবে যায়। বিশ বছর কারখানায় খেটেও মহাজনের টাকা শোধ হয়নি এমন দৃষ্টান্ত হাজারে হাজারে মিলবে। হাতে টাকা জমলে তবে একটা কিছন্ করব—দেশে জমি কিনব, ঘর তুলব, বউ আনব বা ছেলের বিয়ে দেব এ-ভাবে এখানকার জগত চলে না। এখানে দেখতে হবে কার চাকরির কত ভার, কত জোর। কে কত বেশী পারমানেন্ট। কার কত বেশী রোজগার। সেই অন্নসারে এখানে টাকা ধারের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। টাকার দরকার? ধার করো। তারপর শোধ করবার কথা পরে ভেবো। শোধ যদি না-ও করতে পারো সন্দটা গ্ন'জে দিও সময় মতো ঠিক মতো।

—আচ্ছা লোকটা যে বললে উপেনবাবন্ ওকে পাত্তা দিচ্ছেন না, তার আসল কারণটা কি?

—কারণ তো অতি স্পষ্ট। যার সঙ্গে যত বেশী দর কষাকষি চলে। লোকটা নিশ্চয় ভালোমান্নষ আর ভীতু।

এগিয়ে এসে নিজের জোর জানাবে দাবি জানাবে এটা পারে না। উপেনবাবু এবং তাঁর দালালরা এই সুযোগে যতটা পারে ওর কাছ থেকে আদায় করে তো নেবেই।

—বেশ বললে সুজিত। আমার তাহলে উপেনবাবুর দালাল ঠাউরেছে। উন্নতির পথে এগিয়ে চললুম তাহলে আমি।

এই সময়ে ফগুয়া এসে ভয়ে ভয়ে আমাদের ঘরে ঢুকল। কাঁধে কালকেরই সেই ময়লা গামছাটা, মাথার চুলেও তেল পড়েনি কিন্তু পরনের ধুতিটা আজ পরিষ্কার। তার কালো নিটোল দেহে পরিষ্কার ধুতিটা ভারি চমৎকার মানিয়েছিল। হয়তো ঐ টুকুর জন্যেই মনে হচ্ছিল একে ডেকে দুটো কথা বলি, দুটো কথা শুনি—ওর সুখ দুঃখের কথা, ঘর-সংসারের কথা।

কিন্তু সুজিত অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে শুরু করল—তোমার নাম ফগুয়া?

—হুজুর।

—বদলি?

—হুজুর।

—রোজ হাজিরা দিচ্ছ?

—হুজুর।

—তবে আর কি? জায়গা হলেই তোমায় নিয়ে নেওয়া হবে। তোমার টার্ন অবধি অপেক্ষা কর। এ বাবুকে ধরেছ কেন? এ বাবু কি লেবার ডিপার্ট-এ কাজ করেন?

ফগুয়া ওসব টার্ন ফার্ন বোঝে না। সে জানে চাকরি পেতে গেলে কিছু টাকা খসাতে হয়। উপেনবাবুকে ত্রিশ টাকা দিতে হবে, সেটা সে আলাদা রেখেছে। তবে আরো তো কেউ কেউ আছেন—কে তাঁরা এবং কতই বা তাঁদের রেট? এই বাবুর সঙ্গে তো উপেনবাবুর খুব জানা-পছন্দ লোকে বলছিল, তা চাকরি যদি হয়, এ বাবুকে সে পাঁচ টাকা কেন, আরও কিছু বেশীও দিতে রাজি আছে।

আমি মনে-মনে প্রমাদ গুনলুম। সুজিত [illegible] ধমক লাগিয়ে ফগুয়াকে বুঝিয়ে দিলে উপেনবাবুকে টাকা দিতে হয় সে ফগুয়া বুঝুক কিন্তু খবরদার এ-বাবু কিংবা অন্য কোনো বাবুর হাতে যদি সে টাকা দিতে যায় তাহলে ফগুয়া বিপদে পড়বে। বদলির খাতা থেকে তার নাম কাটা যাবে। যাই হোক, এখন সে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাক। সুজিত তার দু-মাসের চাকরির ব্যবস্থা করছে।

ফগুয়া খুশী মনে চলে গেল।

কারখানার কর্তারা লেবার দপ্তর খুলে নতুন লেবার অফিসার এনেছেন বটে কিন্তু লেবার অফিসারের আসল কাজ কি? আসল কাজ হচ্ছে মজুরদের সঙ্গে কোম্পানীর শ্রমিক-আইন ঘটিত কোনো বিরোধ ঘটলে তার ঝক্কি সামলানো। আইন-আদালত করা, হাকিমের এজলাসে যাওয়া, উকিলের পরামর্শ নেওয়া, শ্রমিক ইউনিয়নের মামলা

মিটমাটের ব্যবস্থা করা। আমাদের লেবার অফিসার বোঝেন যে কারখানার মধ্যে শ্রমিকদের কর্ম ব্যবস্থার কিছু উন্নতি করলে ঐসব ঝঞ্ঝাট অনেক কমে যাবে। সেই কারণে তিনি ধীরে ধীরে কিছু-কিছু সংস্কারের পথে এগচ্ছেন। তিনি পুরোনো সর্দারী প্রথার বদলে নাম রেজেস্ট্রি করে বদলি নেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেছেন বটে কিন্তু এখনও সর্দারী প্রথার ভূতকে কারখানার আনাচ কানাচ থেকে তাড়াতে পারেননি। তাদের তাড়ানো কি একদিনের কাজ? নিরীহ মজুরেরা নাম রেজিস্ট্রি বোঝে না, বিশ্বাসও করে না। খাতায় একজনের পর একজনের নাম লেখা হয়ে গেলেই যে ঠিক সেই একজনের পর একজনের নাম খাতা থেকে বেরিয়ে আসবে এ কখনও হয়? ওরই মধ্যে অনেক কারচুপি অনেক কারসাজি আছে নিশ্চয়। আগেকার দিনে তাদের গ্রামের সর্দার যখন তাদের চাকরির বিলি-ব্যবস্থা করে দিত, সে ছিল অনেক সহজ। ব্যাপারটা বোঝা যেত বেশ পরিস্কার। সর্দারের একটা প্রাপ্য ছিল। টাকা দিয়ে হোক, অন্য কোনো ভাবে হোক সর্দারকে যে যত খুশী করতে পারত, সর্দারের কৃপা সে পেত তত বেশী। এখনকার দিনে লেখাপড়া-জানা লেবার অফিসার এসেছেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। তার উপর একটা আপিস। এর মধ্যে কার যে কত খাই, কে যে কার দালাল, ঘুষ-ঘাষ গুলো গুঁজে দেবার যে-সব ভদ্র প্রথা আছে সেগুলিই বা কি এই নিয়ে বেকার মজুরদের চিন্তার আর গবেষণার অন্ত নেই। উপেনবাবুকে তবু বোঝা যায়—তাঁর প্রাপ্যের ন্যায্য একটা চাহিদা আছে। কিন্তু এ ছাড়া আরো কে-কে যে কোথায় আছেন তাদের খুঁজে বার করে কি করে বেচারারা? বড় গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিষয়টা। সর্দার ছিল একটা সবার-জানা মানুষ। সে লোকটাকে যার যেমন ক্ষমতা ঘুষ খাইয়ে খুশী করবার চেষ্টা করত। এখন হয়েছে আপিস। আপিসকে ঘুষ দেবার লুকোনো দরজাগুলো কোথায় রে বাবা?

সুজিতকে একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—আচ্ছা সুজিত, আমাদের লেবার অফিসার দাস সায়েব উপেনবাবুর ব্যাপার জানেন না?

সুজিত বলেছিল—দাস সায়েবের অবস্থাটা বোঝ। তিনি চাকরি করতে এসেছেন, ভদ্রভাবে চাকরি করে যেতে চান। খোলাখুলিভাবে সর্দাররা আজকাল কমিশন নিয়ে মজুর ভর্তি করছে না এইটে জেনেই তিনি সন্তুষ্ট। ঐ অবধিই তাঁর কর্তব্যের সীমানা। চোখের আড়ালে গোপনে কি কারবার চলেছে এসব খুঁটিয়ে বার করা দাস সায়েবের কাজ নয়। সে জন্যে তাকে চাকরিতে আনা হয়নি। তা ছাড়া তাঁর ভয় আছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি উপেনবাবুর ব্যাপার নিয়ে কেনই বা মাথা ঘামাবেন?

ফগুয়াকে ভর্তি করাতে কোন বেগ পেতে হয়নি। তার টার্ন প্রায় এসেই গিয়েছিল। খাতা সাজিয়ে লেবার অফিসারের সামনে ধরতেই তার দু-মাসের বদলি চাকরি হয়ে গেল। উপেনবাবু অবশ্যই তাঁর কমিশন পেলেন। তাঁর লোক গোপনে ফগুয়ার কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে চলে গেল।

তারপর শুনলুম ফগুয়ার ইতিহাস। উত্তর বিহারের এক গন্ডগ্রামের চাষীর ছেলে। বছরের পর বছর বন্যায় ভেসে যায় গ্রাম। এই বন্যা যদি ঠিক সময় আসে তাহলে উপযুক্ত পলিমাটি পড়ে গ্রামকে গ্রাম সোনার ফসলে ভরিয়ে দিয়ে যায়। গ্রামের চাষীরা হাসিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে নতুন কাপড় নতুন গহনা কেনার ধুম পড়ে যায়। ভাঙা ঘর সারানো হতে থাকে, ঘরের চালে নতুন খড় উঠতে থাকে। বুড়ো বাপ-মার হাতে পয়সা দিয়ে জোয়ান ছেলেরা তাদের তীর্থ করতে পাঠিয়ে দেয়। বোষ্টমসেবী খরচ করতে থাকে সবাই। এমনি সুখের স্রোত চলবে এইটেই সবাই ধরে নেয়। মনেই করতে পারে না যে দুঃখের দিনও আবার আসতে পারে। দিন এবং রাতের মতো সুখের পর দুঃখের বৎসর সত্যিই আসে। পরের বছরই বন্যার জল রুদ্র মূর্তি নিয়ে গ্রামে এসে ঢোকে। ঘরবাড়ি গরু ছাগল ক্ষেতের ফসল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হাহাকার ওঠে চারিদিকে। করাল মূর্তি নিয়ে হাজির হয় দারিদ্র্য, অভাব, অনশন, মহামারী মৃত্যু। এই চলছে ফগুয়াদের গ্রামে ফগুয়া যতদিন থেকে জন্মেছে ততদিন। সুখের বছরের চেয়ে দুঃখের বছরই বেশী। সুখের স্নেহস্পর্শের চেয়ে দুঃখের কাঁটা বেঁধে বেশী। ফগুয়ার যখন ছ বছর বয়েস একবার গভীর রাত্রে বন্যার জলে সে ভেসে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামে জল ঢুকতে আরম্ভ করে তখন তার বাপ-মা তাকে আর তার ছোট বোনকে খড়ের চালের উপর তুলে দিয়ে গ্রামের ধারে নদীর পারে ছুটে গিয়েছিল বাঁধের ফাটল মেরামত করতে। সারা গ্রামের মানুষ সেখানে ছুটে গেছে মাটি ফেলে বাঁধ উঁচু করতে। গ্রামের দুই সীমানার নদীর পাড় উঁচু, শুধু গ্রামের সামনেটাই নিচু —ঐখান দিয়েই জল ঢোকার ভয়। সবাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ঐ ফাঁকটুকু উঁচু করে সেবারকার মতো গ্রামটাকে বাঁচাতে। কিন্তু পারেনি। পাহাড় অঞ্চলে তখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। তার কোনো বিরাম নেই, কমতি নেই। ঝরনা বেয়ে, ফাটল দিয়ে, নালা দিয়ে সেই বারিস্রোত অবারিত এসে মিলছে নদীর জলে। তার গতি রুধবে কে? রাত বারোটার সময় গর্জন করতে করতে পাহাড়ী জলের ঢল নেমে এল। গ্রামের মুখে নদীর পাড়ে ফাটল ধরল। সবাই দৌড়ে গিয়ে উঠল উঁচু পাড়ের উপর আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল নদীর জল উপচে পড়ে পাড় ভেঙে দিয়ে পাক খেতে খেতে গ্রামের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। সেবার প্রায় সব ভেসে গিয়েছিল—গরু, ছাগল, বাড়ি, ঘর কিছু বাকি ছিল না। কাঁচ কাঁচা ছিল সব ঘরের চালার। তাদের মধ্যে যারা চালা ধরে ভাসতে পেরেছিল তারা গিয়েছিল টিঁকে। ফগুয়ার বোনটা জলের প্রায় প্রথম ধাক্কাতেই ছিটকে পড়েছিল খোলা জলে। কালির মত কালো অন্ধকারে প্রাণপণে চোখ মেলেও ফগুয়া তার টিকিটিও দেখতে পায়নি। সে নিজে খড় জাপটে বৃষ্টির ছাটে ভিজতে ভিজতে বারো মাইল ভেসে গিয়েছিল। পরের দিন দুপুরবেলায়

[illegible] এবং নানা গ্রামের আরো অনেক [illegible]কে পাওয়া যায় এক জলার ধারে। [illegible] খেতে জল জমে বিরাট এক জলার [illegible] হয়েছে। তারই মধ্যে এখানে ওখানে [illegible] চালার উপর মানুষের শিশু ভেসে [illegible]। বন্যার জল যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেছে। খড়ের চাল, কাঠ কুটো আর গরু-মোষের মৃতদেহ আটকা পড়েছে জলার।

সুবছর আর দুর্বৎসরের এমনি বেহি-সেবী দোলার মধ্যে পড়ে ফগুয়ার বাপ তার চার বিঘে জমির সম্বলটুকু একটু একটু করে বেচে দিতে বাধ্য হয়। যখন আর কিছুই রইল না, তখন বুড়ো তার ভাঙা মন নিয়ে পেটের জ্বালায় পরের জমিতে দিন-মজুরী শুরু করল আর তার জোয়ান ছেলে ফগুয়া বিহারের সুদূর গ্রামে বসে কলকাতা শহরের কারখানা জীবনের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সব গল্প শুনতে শুনতে একদিন স্বপ্ন-ভরা রঙিন মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চট-কল ফেরত এক দলের সঙ্গে। সে জানলে, শুধু মনে সাহস নিয়ে একবার যদি সেই অজানা ভয়ঙ্কর শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারা যায় তাহলে সব স্বপ্নই সফল হয়। পেটের ভাবনা ঘুচে যায়, হারানো জমি উদ্ধার হয়, নরম নরম ছোট্ট একটি বউ আনা যায় ঘরে। তাই সে বেরিয়ে পড়ল সাহস করে। কিন্তু দেশোয়ালী যারা তাকে ভরসা দিয়ে এনেছিল তারা তার কোনো চাহিদাই মেটাতে পারলে না। তারা শুধু তাকে কারখানা দেখিয়ে দিলে আর ধার ধোরের বন্দোবস্ত করে দিলে। এবার তাকে নিজেই চাকরি খুঁজে নিতে হবে। শহরে এসে প্রথমটা দিশেহারা হয়ে পড়লেও কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিলে। অনেকেই তাকে ভরসা দিলে চাকরি সে পাবেই, শুধু একটু অপেক্ষা করা, এই যা। ধার বেড়ে চললো ফগুয়ার। পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ল সে। প্রথম যেদিন ক্যাজুয়াল লেবারের কাজ পেল সে, সেদিন আনন্দের চোটে ভেবে বসেছিল, এইবার সে দেনা মিটিয়ে ফেলবে এবং একবার দেনা মিটিয়ে ফেলতে পারলে তারপর টাকা জমিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ? ক্যাজুয়াল কাজ শেষ হয়ে গেলে আনন্দের রেশ যখন মিলিয়ে গেল, তখন ফগুয়া বুঝলে যে যতক্ষণ না মোটামুটি পাকা কাজ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ দেনার দায় তার মিটবে না। তারপর সে ঘুষ দিয়ে বদলির খাতায় নাম ওঠালো। রোজ হাজিরা দিতে লাগল বদলির আপিসে। ছুট্‌কি ছাট্‌কা যা কাজ পেতে লাগল তাতে করে কিন্তু তার কোনো সমস্যাই মিটল না। শেষে এল ফাল্গুন মাস। প্রথম দক্ষিণ হাওয়ার পরশে জগদ্দলের বস্তির ধুলোমাখা রাস্তার ধারের ঘোড়ানিম গাছের নতুন কচি পাতাগুলির দিকে চেয়ে তার মন যখন তার উত্তর বিহারের গ্রামে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখনই লেগে গেল বদলির কাজের হিড়িক। বদলি-মজুর যারা, তারা সবাই একে একে কাজ পেয়ে যেতে লাগল। কেউ পেল দু-মাসের, কেউ তিন-মাসের, কেউ চার-মাসের। এখন কি আর এই প্রায়-পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়ে দেশে ফেরা চলে? মন যতই উতলা হোক না ঘরের জন্যে, এতদিন-পরের এই সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয়। ফগুয়া অধীর হয়ে, অস্থির অধৈর্য হয়ে, অশান্ত হৃদয় নিয়ে, ট্যাঁকে উপেন-বাবুর জন্যে ত্রিশটা টাকা গুঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগল—কখন তিনি চান, কখন তাঁর হাতে টাকা-কটা গুঁজে দিয়ে হবে তবে একটা নিশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু উপেন-বাবু টাকাও চান না, কিছু বলেনও না। চাকরিও যে কবে হবে বোঝা যায় না। এই সময় তার এক [illegible] বন্ধু আমাকে দেখিয়ে দেয়। বলে, একে খুশী কর আগে, তা হলেই একটা কিছু হয়ে যাবে। চাকরি কি অত সহজে মেলে? [illegible]

করছিল—মরিয়া তার অবস্থা—যত টাকা লাগে লাগুক, সে ধার করে আনবে—কিন্তু চাকরি তার চাই-ই—একখানা যা-হোক বদলির কাজ—দু-মাস কি তিন-মাস। অবশেষে চাকরি তার হল—দু-মাসের গ্যারাণ্টি দিলেন উপেনবাবু। পকেটে গুঁজলেন ত্রিশটি টাকা। দেশোয়ালিরা দেশে যাচ্ছে বলে তখন জগদ্দলের বস্তিতে বস্তিতে এমনই টাকার টানাটানি যে ঐ ত্রিশটি টাকার প্রতিটি টাকার জন্যে মাসে চার আনা সুদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে টাকাটা আদায় হল।

দেনা করা তখন ফগুয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে। বেপরোয়া টাকা ধার করতে এবং তা শোধ করবার কথা ভাবতে সে ভয়ও পায় না। সামনে অত বড় একটা কারখানা রয়েছে, কাজ ওখানে সে পাবেই, রোজকারও করবে ঢের। আজ না-হোক, কাল দেনা শোধ হবেই, আর তার পর উদ্ধার করবে সে তার বাপের হারানো জমি এবং সব শেষে ঘরে আনবে নরম নরম ছোট্ট একখানি বউ। তারপরে আর কারখানার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এখানে এই শহরতলিতে নোংরার মধ্যে পড়ে থাকতে কি আর কারো ভাল লাগে? এখনই তো হাঁপ ধরে গেছে। সন্ধের সময় বস্তির ধোঁয়া-ভরা লণ্ঠনগুলো যখন জ্বলে ওঠে আর চারিদিক তেল-পোড়া গন্ধে ভরে যায়, তখন বুকের মধ্যে থেকে তার কান্নার মতো কি যেন একটা বেরতে থাকে। যত শীঘ্র পারে সে গ্রামে ফিরে যাবেই। দেনা চুকিয়ে বাপের হারানো জমিটা উদ্ধার করে নরম ছোট্ট একখানা বউ ঘরে এনে আর সে কারখানায় ঢুকবে না। এই সমস্ত স্বপ্ন দেখতে দেখতে ফগুয়া দু-মাসের বদলির কাজে মনে প্রাণে লেগে গেল।

—হুজুর!

—কে? ফগুয়া? কি চাই?

গরাদের ধারে বসে খাতা লিখছিলুম ফগুয়া এসে উবু হয়ে আমার পায়ের কাছে বসল।

—আপনারা দু-জনে বহুত্ ভালো আদমি বাবু।

—কেন রে, আবার কি হল?

একটু উসুখুস্ করে ফগুয়া বললে—হুজুর, আমি মানত করেছিলুম, বদলি কাম হলে পীরের দরগায় সিন্নি বাতাসা দেব হুজুর, আপনার পাত্তা বলুন—আপনার বাড়িতে কিছু সিন্নি বাতাসা পেঁছে দেব।

—এর জন্যে বাড়ি যাবার দরকার কি? এখানেই নিয়ে আসিস্, নিয়ে যাবো।

—না, হুজুর তা হবে না। আপনার বাড়ি আমি পেঁছে দেব। কাল ফজিরে চলে যাব। আর সুজিতবাবুর পাত্তা ভি বলে দিন। এখানে ভি যাবো।

—বেশ তবে তাই আসিস্। সুজিত-বাবুর বাড়ি তোকে যেতেও হবে না। সে বাবু আমার বাড়িতে আসছে কাল সকালে। সারাদিন থাকবে।

এই বলে ফগুয়াকে আমার ঠিকানা দিয়ে দিলুম। পরের দিন ছিল রবিবার। সুজিতকে বলেছিলুম সারাদিনের জন্যে এসে আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে।

আমাদের কারখানার গলি পশ্চিম দিকে যেখানে কুলি-বস্তি পার হয়ে গঙ্গার ধারে এসে বেঁকে গেছে সেখানে বুড়ো বট-গাছ তলায় এক পীরের দরগা। জাগ্রত পীর। কারখানার মজুরদের মধ্যে প্রচুর তাঁর প্রতি-পত্তি। পীরের সুনজর না হলে কারুর চাকরি হয় না। কাঁচা চাকরি পাকা হয় না। এই পীরের কাছে সবাই মানত করে। অসুখ বিসুখ হলে তো করেই। সবচেয়ে বেশী করে চাকরির জন্যে। ফগুয়াও তাই করেছিল।

পরের দিন এল ফগুয়া। হাতে দুই চাঙাড়ি বাতাসা আর পীরের শুকনো সিন্নি। আমিও ছাড়লুম না ফগুয়াকে। বললুম—এয়েছিস, খেয়ে যা। অত বড় চেহারা হলে হবে কি? ভারি লাজুক। একেবারে মেয়েছেলের মত। রাজী হতে যেন মাথা কাটা যায়। শেষটা সুজিত আর আমি দু-জনে খুব পীড়াপীড়ি করায় থেকে গেল সারা বেলাটা, আর আমরাও দুপুর বেলা মাদুরে শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুনে নিলুম তার গ্রাম্য জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী—যা এইমাত্র বলেছি।

—ফগুয়া, চাকরি তো পেলি। কোথায় থাকবি তুই? ঘর-টর পেয়েছিস্? বউ আনতে হবে তো আজ বাদে কাল? ঘর না হলে বউ আনবি কি করে?

—হুজুর আপনাদের মতো বহুত্ ভালো একঠো আদমি বস্তিতে আছে। ওর ঘরে থাকতে দেবে। পয়সা নেবে না।

—সে কি রে? পয়সা নেবে না?

—না হুজুর। বলেছে এখন বিনি পয়সায় থাকবো। চাকরি পাকা হলে চার আনা কিরায়া নেবে।

—কি নাম রে?

—সমারু।

(ক্রমশ)

লণ্ডনের চিঠি

হেন্‌রি জেমস-এর "I am not at all Anglicised, but I am thoroughly Londonised." থেকে আরম্ভ করে অ্যান্‌থনি কার্‌সন্‌-এর "...this hub of the Universe" পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা লেখকই লণ্ডন মহানগরীর অসংখ্য বৈচিত্র্য সম্পর্কে অসংখ্য মতামত প্রকাশ করেছেন। এই রাজনগরীকে কেউ কেউ অসঙ্কোচে ভালোবেসেছেন, কেউ কেউ অকপটে ঘৃণা করেছেন, আবার কেউবা কৌতুকচ্ছলে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু নির্বিকারচিত্তে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এর কারণ, সম্ভবত লণ্ডনের বিরাট পরিসরে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অগণ্য "শক হূন দল পাঠান মোগল"-এর স্বীয় স্বীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা এই বিশাল নগরীর সর্বগ্রাসী আবহাওয়ায় একদেহে লীন হয়ে গেছে; অর্থাৎ কোনো এক রহস্যময় প্রক্রিয়া দ্বারা দেশী বা বিদেশী প্রতিটি ব্যক্তিই লণ্ডনে প্রথম পদক্ষেপের সাথে সাথে সচেতনে বা অবচেতনে নিজেকে লণ্ডনবাসী (Londoner) হিসাবে গণ্য করতে বাধ্য হয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম এই কেন্দ্রের এ অসাধারণ বৈশিষ্ট্যটি প্রায় সর্বজনবিদিত, কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরোত্তর লণ্ডনের আরও একটি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর সম্যক পরিচয় আছে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ এই বৈশিষ্ট্যের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করা শুধুমাত্র লণ্ডনের আশি লক্ষ বাসিন্দার পক্ষেই সম্ভব, যে-লণ্ডনবাসীদের জীবনাভ্যাস ও জীবনাচরণের সামগ্রিক রূপ এই যুদ্ধোত্তর মহানগরীর ক্রম পরিবর্তনশীল চেহারায় প্রতিফলিত। ভাষান্তরে হয়ত বলা যেতে পারে, পুরাতন ও নূতনের কোনো অপরিকল্পিত সংমিশ্রণে যে সাধারণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে একটি ছান্দিক সামঞ্জস্যে রূপান্তরিত করে লণ্ডন যে অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে এবং দিচ্ছে, সেই সামর্থ্যই এ মহানগরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যে বৈশিষ্ট্যের বহিরাকৃতি (লণ্ডনের বাহ্যিক রূপ) ও অন্তরাকৃতির (নাগরিকদের জীবনধারা) মাঝে কোনো প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের স্থান নেই। অর্থাৎ এ দুয়ের মাঝে পারম্পর্য ও প্রতিসম্য বিশিষ্টরূপে বর্তমান।

ফটো : রায়াত নেচার

ভাব ও বস্তু : ১৯৬২
সেন্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রাল-এর পটভূমিতে দৈত্যরূপী একটি ক্রেন

ফটো : রায়াত নেচার

শিল্প ও বিজ্ঞান : ১৯৬২
ভিকার্স টাওয়ার-এর পটভূমিকায় টেট্‌ গ্যালারি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে ক্রমপরিবর্তন-প্রণালী অনুসরণে লণ্ডনের রূপ আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করে, সে প্রণালীর এখনও সমাপ্তি ঘটেনি; ফলে নূতন ও পুরাতনের অপূর্ব সমন্বয়ে অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে বসন্তের অগণিত, শূন্যস্পর্শী শাখা-প্রশাখার মতই অসংখ্য আকাশস্পর্শী অট্টালিকার নবতম সমাবেশের নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে শত শত বৎসরের প্রাচীন যুগজীর্ণ ইমারত। এই অনন্যসাধারণ ও চমকপ্রদ বৈষম্যের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় টেমস্ নদীর সাউথ ব্যাংকে, যেখানে যুগ প্রাচীন টেট্ গ্যালারীর পট-ভূমিকা হচ্ছে আকাশচুম্বী ভিকার্স টাওয়ার-এর অকল্পনীয় দানবিক মূর্তি। নূতন ও পুরাতনের সমন্বয়ে গোটা দৃশ্যটির গাম্ভীর্যপূর্ণ বৈসাদৃশ্য সত্যই আশ্চর্যজনক।

লণ্ডনের শতাব্দী সঞ্চিত জীর্ণ ধূসর ঐতিহ্যিক রূপের যে দৈনন্দিন পরিবর্তন ঘটছে, তার সঙ্গে নাগরিকদের পরিচয় প্রায় রাস্তার মোড়ে মোড়েই যেখানে দৈত্যরূপী বিরাট বিরাট ক্রেন-এর যান্ত্রিক আকার আকাশচুম্বী স্কাইস্ক্রেপারদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। এবং যেখানেই ক্রেন, সেখানেই ভাঙাগড়া; সুতরাং যুগ-প্রাচীন বাসভবনের পুরাতন অস্থি নির্দয়ভাবে চূর্ণ করে ক্রেন ও তার সহকর্মীর দল সেখানে ইস্পাত ও কনক্রিটের নতুন হাড় তৈরী করছে—অর্থাৎ নতুন ও পুরাতনের সংগ্রামে নতুন পুরাতনকে আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করছে। কিন্তু এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ইঁট, সুরকি আর ইস্পাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

বেশবিন্যাস : ১৯৬২ ফটো : রায়াত নেচার

গত পনেরো বছরে লণ্ডনের সামাজিক জীবনধারায় যে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাগরিকদের বেশবিন্যাসে, আহারাভ্যাসে, আমোদ-প্রমোদে, শখের পেশায়, শিল্পে এবং অন্যান্য কর্মসক্রিয়তায়। তরুণ লণ্ডনবাসী এক ঘেয়ে ফ্ল্যানেল ও টুইড-এর নীরস গতানুগতিকতা বর্জন করে জীনস্, চেক শার্ট, ইটালীয়ান স্টাইল স্যুট, ছুঁচের মত সরু উইন্‌কিল্‌-পিকারস জুতো, কালো চামড়ার জ্যাকেট, কালো বুট জুতো এবং অন্যান্য বহু প্রকারের আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে। এবং লণ্ডনের তরুণী ইংরেজ রমণীর বেশভূষা ও প্রসাধনবোধের কথা তো প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর জানেন। এ হয়ত অত্যুক্তি নয় যে, প্যারিস ব্যতিরেকে আমেরিকা ও কন্‌টিনেণ্টের তুলনায় আধুনিক ইংরাজ মহিলার পোশাক ও প্রসাধনবোধ অধিকতর কল্পনাপ্রবণ।

আর আমোদ-প্রমোদ? নৃত্যশালা (বলরুম ডান্সিং), সিনেমা, থিয়েটার, মদ্যপানশালা (পাব বা পাবলিক হাউস), মিউজিক হল ব্যতিরেকে কয়েক বছর আগেও লণ্ডনের যুবক-যুবতীর জীবনে দৈনিক ও সাপ্তাহিক আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সে শোচনীয় অবস্থার মৃত্যু ঘটেছে। অগণ্য জ্যাজ্ ক্লাব, ইউথ্ ক্লাব ও কফি-হাউসের আবির্ভাব লণ্ডন ও মফস্বলের তরুণ-তরুণীর সান্ধ্য জীবনে এক রীতিমত বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছে। উপরন্তু নগদ পয়সা খরচের সামর্থ্য এই সব তরুণ-তরুণীর প্রতিদিন বাড়তে থাকায় মোটর বাইক, স্কুটার, বাব্‌লুকার ইত্যাদির দোকানের সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, আর প্রতিটি

জনপ্রিয় পপ্ সঙ্গীতের (Pop-music) রেকর্ডের সংখ্যাও বাড়ছে লাখের পর লাখ।

নবীন লণ্ডনবাসীর এই বিপ্লবময় জীবন-ধারা এ মহানগরীর প্রবীণ বাসিন্দাদের জীবনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, ফলে তাঁদের রুচিবোধ ও বিলাসিতার ক্ষেত্রও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। মিস্টার ও মিসেস লণ্ডনার ভিক্টোরিয়া যুগোচিত রুচি বিসর্জনে সমসাময়িক লণ্ডনে আধুনিকতাকে আস্তে আস্তে গ্রহণ করছেন। বর্ণহীন সেকেলে ভারী আসবাবপত্র আর বাড়ির ঘরদোরের অনুজ্জ্বলতার ধীরে ধীরে মৃত্যু হচ্ছে সম-সাময়িক শিল্পী পরি-কল্পিত গৃহ সামগ্রীর আমদানিতে। কিন্তু ঘর-আসবাবের সুন্দর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ছাদেরও এক অসুন্দর পরি-বর্তন তাঁরা অজ্ঞাতসারে আনতে বাধ্য হয়েছেন; সেটা হচ্ছে : টেলিভিশান এরিয়েলের সারি সারি কুৎসিত দৃশ্য। এবং এই কুৎসিত দৃশ্যের সঙ্গে ছন্দ বজায় রেখেছে আরও একটি কদাকার সামাজিক বিকার : জুয়াখেলার জন্য বৈধ বেটিং শপ্ এবং আইনসম্মত বিংগো হল্ (এক ধরনের লটারী : ভারতে ইংরেজ সৈনিকরা এ খেলাকে টম্বোল্যা বলত)।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের সমাজ জীবনে সব চাইতে আশ্চর্যকর ও অপ্রত্যাশিত সংঘটন হচ্ছে ইংরাজ জাতির খাদ্য-ভোজনের রক্ষণশীল স্বাদবোধের আমূল পরিবর্তন। সম্ভবত দুটি কারণে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। প্রথমত দ্বিতীয় মহাসমরকালে সৈন্য হিসাবে পৃথিবীর নানা দেশে সাময়িক অবস্থানে বাধ্য হওয়ায় সাধারণ ইংরাজ নাগরিক বিদেশী খাদ্যের প্রতি জাতি-গত বিদ্বেষটিও ক্রমশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, ফলে জিহ্বা ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্বে জিহ্বার জয়ই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, বিশেষত আলু ও স্বাদহীন মাছ ভাজা (fish & chips) আর নুনহীন সিদ্ধ বাঁধাকপির আস্বাদেই যে জিহ্বা প্রতিপালিত। এবং দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে : অর্জনেচ্ছু ইংরেজ সমাজের বর্তমান আর্থিক সচ্ছলতা, যে কারণে এই সমাজের প্রায় প্রতিটি সভ্যের পক্ষেই বৎসরান্তে অন্তত একবার বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব। সুতরাং যুদ্ধোত্তর ইংরাজ সমাজের রক্ষণশীল স্বাদবোধের আমূল পরি-বর্তনের ফলস্বরূপ লণ্ডনে ও মফঃস্বলে অগণিত বিদেশী রেস্তরাঁর আবির্ভাব মোটেই অস্বাভাবিক নয়—ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান, গ্রীক্, স্প্যানিশ্, চাইনিজ্, ইণ্ডিয়ান। এবং ভারতীয় ও চৈনিক রেস্তরাঁর জনপ্রিয়তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যাই অসম্ভব; আর সেজন্যই হয়ত এসব রেস্তরাঁর সংখ্যা ক্রমশই এত বেড়ে চলেছে। মাত্র দশ বছর আগেও ভারতীয় ও চীনা রেস্তরাঁর মোট সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা সম্ভব হত, কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ শুধুমাত্র লণ্ডনেই নয়, ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেকটি শহরেই ভারতীয় ও চৈনিক রেস্তরাঁ বর্তমান। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় রেস্তরাঁর মালিকদের শতকরা আশিজন বাঙ্গালী।

কমল কিংবা কামাল — ফটো : রাজাত লেভার

এ নামটির যথাযথ উচ্চারণ নির্ভর করে খাদকের ওপর

শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক অসাধারণ কর্মসক্রিয়তা লণ্ডন জীবনের বিশিষ্টতার পরিচয় দিচ্ছে। জনসাধারণের সাংস্কৃতিক রুচিবোধের সম্যক রূপান্তরের ফলে অপেরা, কনসার্ট, থিয়েটার, আর্ট গ্যালারি, পাবলিক লাইব্রেরী, সাময়িক পত্রিকা, ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং উপর্যুপরি তিনটি রক্ষণশীল টোরি গবর্নমেণ্টের পক্ষে বহু অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনসাধারণের এই স্বাস্থ্যকর মনোবৃত্তিকে উৎসাহ না দেওয়া সম্ভব হয়নি (এর মূলে গণতান্ত্রিক সমাজে ভোট সংগ্রহণ সংক্রান্ত গাণিতিক সত্যটি বর্তমান থাকলেও এ

নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে সুবিধাবাদী সমাজের প্রত্যক্ষ দাবি-দাওয়ার অযৌক্তিক অবহেলার চরম পরিণাম মাত্র একটাই ঃ সুবিধাবাদী সরকারের সিংহাসনচ্যুতি) ফলে শিক্ষার জন্য ১৯৫২ সালের আয়-ব্যয়কের সংখ্যাটি (৪১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড) ১৯৬১ সালে ১০৬১ মিলিয়ন পাউণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

যদিও লণ্ডনের বিশিষ্টতা সম্পর্কে উপ-নুক্ত বর্তমানগুলি মোটামুটিভাবে ইংলণ্ডের অন্যান্য শহরের প্রতিও প্রযোজ্য, তা সত্ত্বেও এই মহানগরী যে সমগ্র ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস-এর একমাত্র ব্যারোমিটার সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই পোষণ করা সম্ভব নয়, কারণ আজ লণ্ডনে যা ফ্যাশান, আগামী-কাল জন্-ও-গ্রোট্‌স্ থেকে ল্যাণ্ডস্-এণ্ড পর্যন্ত তার অনুকরণ অনিবার্য। এবং যদিও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে নতুন নতুন স্কাইস্ক্রেপার ও নতুন নতুন মোটর-ওয়েস্-এর কোন অভাবই নেই, তা সত্ত্বেও নূতন ও পুরাতনের এই অভিনব সমাবেশ, এই অসাধারণ ছান্দিক সামঞ্জস্য যেন কেবলমাত্র লণ্ডনেরই জন্মগত অধিকার।

—মিহিরকুমার গুপ্ত

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১৫ ॥

—কখনো চাঁদ

অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। লেঃ জেভার্স দূরবীন বাগিয়ে দেখে বলল কর্নেল ব্রিজম্যানই বটে। ব্রিজম্যান এসে পৌঁছতেই সকলে স্যালুট ক'রে দাঁড়ালো। ব্রিজম্যান বলল, লোকটা যেন Satyr। ঘোড়া আর সওয়ারকে এমন এক হ'য়ে ছুটতে আর দেখি নি, যেন দু'য়ে মিলে এক দেহ।

পালালো নাকি?

পালালো বইকি। তবে এই থলিটা ফেলে গিয়েছে, দেখ তো এর মধ্যে কী আছে।

এই বলে ঘোড়ার জিন থেকে খসিয়ে থলিটা ফেলে দিল। এই ঘটনা ঘটছিল কামান থেকে কিছু দূরে, তাই কর্নেল তাকে দেখতে পায় নি। আর, জীবন এমন শক্ত ক'রে বাঁধা যে নাক-বরাবর ছাড়া তাকাবার তার উপায় ছিল না।

লেঃ জেভার্স খানতিনেক চিঠি দিল কর্নেলের হাতে। খাম খুলতে খুলতে কর্নেল বলল এ দু'খানা প্রশংসাপত্র মনে হচ্ছে। আরে তৃতীয়খানা যে খাস আমার নামে।

অধীর আগ্রহে চিঠি তিনখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে শুধালো, পত্রবাহক কোথায়?

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতভাবে জেভার্স বলল বোধ করি ঐ সেই লোক।

করেছ কি। ওকে কামানে বেঁধেছ কেন?

আমরা তো উড়িয়ে দেবো ভেবেছিলাম, দুটো Pandy-কে এই কয়েক মিনিট আগে উড়িয়ে দিয়েছি।

কি সর্বনাশ? ও Pandy নয়। জেনারেল উট্রাম আর স্যার হেনরি লরেন্সের বিশ্বাস-ভাজন প্রিয়পাত্র। স্যার হেনরি ব্যক্তিগত পত্রে আমাকে জানিয়েছেন হাজার লোক যদি এক দিকে থাকে আর জীয়ন, গীবন I can't manage these Indian words,! Let us agree to say গীবন, that is easier। তিনি লিখেছেন হাজার লোক যদি এক দিকে থাকে আর গীবন একা এক দিকে থাকে তবে গীবনকে বিশ্বাস করবে। লোকটা আউধ সরকারে রেসালাদার মেজর ছিল। খুলে দাও, এখনি খুলে দাও।

সবাই দৌড়লো খুলে দিতে।

এখন আমাদের বিশ্বস্ত আর অভিজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব। আমি এই মুহূর্তে ওকে রেসালাদার মেজর নিযুক্ত করবো।

ইতিমধ্যে বন্ধনমুক্ত জীবন কর্নেলের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলো।

ভেরি সরি গীবন, রিয়ালি ভেরি সরি। কিন্তু বুঝতেই তো পারছ অরাজকতার সময়ে এমন হওয়া বিচিত্র নয়। তোমাকে বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করেছেন জেনারেল উট্রাম আর স্যার হেনরি লরেন্স। আমি এখনি তোমাকে রেসালাদার মেজর এপয়েণ্ট করলাম। তবে মনে রেখো দিল্লী পৌঁছবার আগে রেসালা পাবে না।

তারপর জেভার্সের দিকে তাকিয়ে বলল জেভার্স এর ঘোড়া আর সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা ক'রে দাও।

জীবন স্যালুট জানালো আর বুঝতে পারলো যে আয়ু-স্রোতের ঘাটের এখানেই শেষ নয়। ভাবলো, না জানি আবার কোন্ অভিজ্ঞতার আবর্ত তাকে নিয়ে ভিড়াবে নূতনতর কোন্ ঘাটে।

॥ ১৬ ॥

বাদলি-কি-সরাই

হিন্দুস্থানের সমতলভূমিতে গরম পড়তেই কর্নেল ব্রিজম্যান দেরাদুনে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে মুসৌরি যাবে ভাবছে এমন সময়ে জঙ্গীলাট জেনারেল এনসনের কাছ থেকে এলো জরুরী খবর। বিদ্রোহের খবর দিয়ে এনসন জানিয়েছে এই পত্র পাওয়ামাত্র তাকে আম্বালা রওনা হ'তে হবে। খুব সম্ভব তার আগেই এনসন সসৈন্যে দিল্লী রওনা হ'য়ে যাবে। দেখা হয় ভালই। দেখা না হ'লে আম্বালায় অপেক্ষা করতে হ'বে ব্রিজম্যানকে। আম্বালায় ছাউনি রক্ষার জন্যে যে সামান্য ফৌজ আছে তার উপরে হাত দেওয়া চলবে না, অবশ্য দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয়-ভাবে অপেক্ষা করতে হবে না আশ্বাস দিয়েছে এনসন। পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স ফৌজ পাঠাতে শুরু করেছে। দিল্লী যাওয়ার পথে নিত্য-নূতন ফৌজ এসে পৌঁছচ্ছে আম্বালায়। ঝিন্দ্, নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে। প্রথম যে ফৌজ এসে পড়বে দেশী এবং গোরা তাই নিয়ে যেন ব্রিজম্যান দিল্লীর দিকে রওনা হয়। জঙ্গীলাট আদেশ করেছে যে আম্বালা থেকে দিল্লী পর্যন্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নিরাপত্তা রক্ষার ভার ব্রিজম্যানের উপরে। তারপরে সান্ত্বনা দিয়ে জানিয়েছে সরাসরি যুদ্ধ করবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হ'ল বলে যেন দুঃখ না করে, কেন না, পাঞ্জাব থেকে দিল্লীর যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব যে-কোন যুদ্ধজয়ের গৌরব থেকে বেশি। তারপরে আরো জানিয়েছে আম্বালার নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'লে ব্রিজম্যান কর্নালে গিয়ে কয়েকদিন থাকবে।

সেখানে অশান্তির চিহ্ন দেখতে না পেলে সসৈন্য দিল্লী যাত্রা করবে। ব্রিটিশ ফৌজের সাক্ষাৎ পাবে সেখানে।

জ়ন মাসের প্রথম কয়দিন পর্যন্ত জঙ্গী-লাটের আদেশ অনুসারে কাজ করেছে ব্রিজম্যান, যদিচ ইতিমধ্যে দিল্লী পৌঁছবার অনেক আগেই কলেরায় মৃত্যু হ'য়েছে জেনারেল এনসনের। নূতন জঙ্গীলাট স্যার হেনরি বার্নার্ড পুরাতন আদেশকেই সমর্থন করেছে। কিন্তু এখন আর ব্রিজম্যানের আম্বালা বা কর্নালে থাকবার প্রয়োজন নাই, গোরা ফৌজ এসে পড়ায় প্রথম স্থানটি সুরক্ষিত, দ্বিতীয় স্থানটিও অরক্ষিত নয়। তাই এখন শ'তিনেক গোরা অশ্বারোহী, ঝিন্দের রাজা কর্তৃক প্রেরিত পঞ্চাশজন শিখ অশ্বারোহী আর তিনটি ঘোড়ায় টানা কামান নিয়ে ব্রিজম্যান কর্নাল থেকে দিল্লী রওনা হ'য়েছে। পথে জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জীবনলাল নূতন সামরিক পোশাকে, নূতন ঘোড়ায় আপাদমস্তক ঝকমক করছে, যদিচ মাঝে মাঝে পান্নার দেওয়া ঘোড়াটার জন্যে দুঃখ হয়—আর সর্বদাই দুঃখ হয় হারানো তক্তিটার জন্যে। কী রহস্য ছিল, কী নির্দেশ ছিল জানা হ'ল না। শিখ রেসালাদার সোহন সিং তাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে সঙ্গীদের বলে, নাঃ দাড়ি-গোঁফ উঠলে বেমানান হবে না, লম্বায়-চওড়ায় ঠিক আছে।

নিয়মিতভাবে শেষরাত্রে ব্রিজম্যান সসৈন্যে যাত্রা করেছে, তার ধারণা আজকে এই ৮ই তারিখেই দিল্লীতে পৌঁছানো যাবে। কর্নেলের মুখে কথাটা শুনে সকলেরই মনটা খুশী। সৈন্যদলে দেহ স্বতন্ত্র, মন একটি, সেটি সেনাপতির। একাধিক মন যে সৈনাদলে তার পরাজয় অনিবার্য।

সবে ভোরের আলো হ'য়েছে, সাড়ে তিনশ ঘোড়ার চোদ্দশ ক্ষুর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাথরে তাল ঠুকতে ঠুকতে চলেছে, এমন সময়ে ব্রিজম্যান চমকে উঠল।

কামানের শব্দ নয়, জেভার্স।

জেভার্স কান পেতে শুনে বলল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তবে কি সিপাহীদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে না কি?

হলে বিস্মিত হ'ব না, বলল জেভার্স

ঈষৎ পুবে-হেলা দক্ষিণ দিক থেকে ঘনঘন কামানের আওয়াজ আসতে শুরু করলো। তখন ব্রিজম্যানের আদেশে ছোট ফৌজটি অল্প সময়ের মধ্যে আলিপুরে এসে পৌঁছলো।

আলিপুরে এসে ব্রিজম্যান দেখল যে বৃটিশ ফৌজ মালপত্র গোলন্দাজবাহিনীর মেজর স্কটের জিম্মায় রেখে বাদলি-কি-সরাইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। মেজর স্কটের মুখে শুনতে পেলো আগের দিন ব্রিগেডিয়ার উইলসন সসৈন্যে মীরাট থেকে এসে পৌঁছেছে। তারপরে জঙ্গীলাট স্যার হেনরি বার্নার্ড ও উইল্‌সন শেষরাতে এগিয়ে গিয়েছে—অনেকক্ষণ লড়াই শুরু হ'য়ে গিয়েছে, তারই কামানের আওয়াজ। এইসব বিবরণ জানিয়ে স্কট বলল ব্রিজম্যান, তোমাকে দেখে খুশী হ'য়েছি। তুমি এক কাজ করো, এখানে পাহারায় থাকো, আমি এগিয়ে যাই।

ব্রিজম্যান বলল, স্কট সেটি হবে না। আজ একমাস ধ'রে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পাহারা দিয়ে

বেড়াচ্ছি, একটা সেপাই দূরে থাক একটা শেয়াল পর্যন্ত দেখতে পাই নি। অতএব গুড় বাই।

এই বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল।

অদৃষ্টের বিরূপতায় স্কট বলে উঠল nuts!

আলিপুর থেকে বাদলি-কি-সরাই-এর দূরত্ব দশ মাইল। বাদলি-কি-সরাইয়ের কাছে এসে পড়ে রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্রিজম্যান ও জেভার্স একটা টিলার উপরে উঠল, খালি চোখেই সব বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রিজম্যান দেখল গ্র্যান্ড ট্রাংক রোডের উপরে দিল্লীতে অগ্রসর হওয়ার পথরোধ করে সিপাহী ফৌজ থানা নিয়েছে। সিপাহী ফৌজের সম্মুখে একটা উঁচু টিলার উপরে দূর পাল্লার ভারি চারটা কামান। বাঁ দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে শালিমার বাগান। রাস্তার ডান দিকে অর্থাৎ পূবে এবং কামানগুলোর সমসূত্রে প্রাচীর ঘেরা একটা পুকুর। তার পিছনে রাস্তার বাঁ দিকে পিপল আলা গাঁয়ের মধ্যে বাদলি-কি-সরাই। আর পূবে ও পশ্চিমে সিপাহি ফৌজের দুই পাশে বিল আর জলাজমি। সেখান দিয়ে ঘোড়সওয়ার বা কামান নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। বেশ অবস্থান নির্বাচন করেছে সিপাহী ফৌজ। এ অঞ্চলটা ব্রিজম্যানের সুপরিচিত, তাই মাইল খানেক দূরে দাঁড়িয়েও তার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। সে আরও দেখতে পেলো ইংরাজ ফৌজ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে লড়ছে। মধ্যে অর্থাৎ সিপাহীদের ভারি কামানগুলোর মুখোমুখি একভাগ, আর দুই পাশে অর্থাৎ রাস্তার পূবে ও পশ্চিমে দুই ভাগ। কোন্ ভাগ কার অধীনে এত-দূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়। ব্রিজম্যান দেখলো যে তার সৈন্য সংখ্যায় অল্প, ভাগা-ভাগি করলে এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে কোন কাজে লাগবে না। সে স্থির করলো যে রিজার্ভ বাহিনীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, তারপরে যেখানে প্রয়োজন হবে সংকটের মুখে সেখানে গিয়ে পড়বে।

জীবনলাল শিখ অশ্বারোহীর অন্তর্গত হয়ে রাস্তার পূব দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিপূর্বে লড়াই করা দূরে থাক চোখেও দেখেনি ব্যাপারটা কি হয়। সে দেখল এ এমন এক ব্যাপার যার সঙ্গে গল্পের বা ছবির মিল নাই। গল্পে ও ছবিতে সমস্ত রণক্ষেত্র একটা সমগ্র অঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। দেখলো বাস্তবে আদৌ তেমন নয়। বাস্তব রণক্ষেত্রে সব কেমন এড়া-এড়া, ছাড়া-ছাড়া ভাব; কারণহীন কার্যের মতো কে কোথায় যাচ্ছে, এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, যেন সবটাই খাপছাড়া।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার ভাববার সময় হল না, হঠাৎ চমকিত হয়ে দেখলো কোম্পানীর

ফৌজের মধ্যভাগের. ঘোড়সওয়ার বাহিনী দ্রুত লয়ে ছুটে চলেছে. তাদের উপরে এসে পড়েছে সিপাহীর কামানের গোলা; ছিটকে পড়েছে সওয়ার, শুয়ে পড়ছে ঘোড়া, তবু চলেছে তারা এগিয়ে। সে দেখলো ঐ গিয়ে পড়েছে তারা কামানগুলোর উপরে, এবারে হাতাহাতি বেয়নেটে বেয়নেটে লড়াই। ঐ যে পালালো কামান ছেড়ে সিপাহী গোলন্দাজ।

এমন সময়ে সিপাহী পক্ষের ডাইনে ও বাঁয়ে কামানের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ব্রিজম্যান বুঝলো কোম্পানীর ফৌজের ডান হাত ও বাম হাত সিপাহী ফৌজকে ঘিরে ধরতে উদ্যত। মনে মনে কার্যক্রম স্থির করে ফেলল, রাস্তার পুব দিকে, সিপাহী সৈন্যের ডানদিকে কোম্পানীর ফৌজের বাঁয়ে সে আক্রমণ করবে।

Action left!

তখন সেই সাড়ে তিনশো ঘোড়সোয়ার দ্রুততালে চলতে শুরু করলো, গোরাদের হাতে তলোয়ার, শিখদের হাতে বর্শা। চলবার সঙ্গে সঙ্গে গতি দ্রুততর হতে থাকলো, অবশেষে সমস্ত ফৌজ বিকট চীৎকার করে উঠল, গোরার দল চীৎকার করে উঠল হুর্‌রা, হুর্‌রা, শিখের দল চীৎকার করে উঠল ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু, সিপাহীপক্ষকে আক্রমণ করলো।

জীবন দেখলো যুদ্ধের যা কিছু ভয় তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকার সময়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে আদৌ ভয় করে না। মৃত্যুভয় সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত হয়ে গেলে প্রত্যেকের ভাগে যা পড়ে তা না পড়বারই সামিল। মৃত্যুর কথা ভাববার তার অবকাশই ঘটলো না। বাঁ হাতে লাগাম ধরে, ডান হাতে বর্শা উঁচিয়ে ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু আওয়াজ করতে করতে সে ছুটেছে। তারপরে যে কী ঘটলো তার স্পষ্ট ধারণা নেই। যখন তার সংবিত হল, কতক্ষণ জানে না, এতক্ষণ যেন নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, দেখলো সিপাহী ছুটেছে দিল্লীর দিকে, তারা ধাওয়া করছে পিছু পিছু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কোম্পানীর ফৌজ এসে পৌঁছলো আজাদপুর নামে একটা গ্রামে। এখানে পথটা দুই ভাগ হয়ে পুবের শাখা চলে গিয়েছে ক্যান্টনমেণ্টের দিকে, আর পশ্চিমের শাখাটা সব্জিমণ্ডি হয়ে গিয়েছে দিল্লীতে। ব্রিগেডিয়ার উইলসন ও শাওয়ার্স গেল সব্জিমণ্ডির দিকে, বার্নাড, গ্রেভস সেই সঙ্গে ব্রিজম্যান চললো ক্যান্টনমেণ্টের দিকে।

একটু এগোবার পরেই জীবন দেখতে পেলো পূর্বদিকে খররৌদ্রে ঝকঝক করছে দিল্লীর লালপাথরের দেয়াল—আর ঐ আরো একটু দূরে পাহাড়টার শিরদাঁড়ার উপরে পর পর দেখা যাচ্ছে হিন্দুরাওকুঠি, অবজার্ভেটারি আর ফ্লাগ স্টাফ টাওয়ার। শুনতে পেয়েছে হিন্দুরাওকুঠি তাদের লক্ষ্য। ভাবতে লাগলো না জানি তার ইতিহাসের আবার কোন্ নূতন অঙ্কে পটোত্তলন ঘটবে ওখানে, ঐ হিন্দুরাওকুঠিতে, ঐ পাহাড়ে, ঐ দিল্লীতে!

॥ ১৭ ॥

"অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ"

১৮৫৭ সালে উত্তর ভারতে যে ব্যাপক অশান্তি ঘটেছিল সে ব্যাপারটা কি? যুদ্ধ না বিদ্রোহ না আর কিছু? ঐতিহাসিকগণ বলেন বিদ্রোহ। তাঁরা বলেন এমন সিপাহী বিদ্রোহ আগেও ঘটেছে; গোরা সিপাহী-বিদ্রোহ করেছে, দেশী সিপাহী বিদ্রোহ করেছে, তবে অবশ্য কোনটাই ১৮৫৭ সালের

ব্যাপকতা লাভ করে নি। রাজনীতিকগণ বলেন ব্যাপারটা কোম্পানী-শাসিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যার চূড়ান্ত উপসংহার ঘটেছে ১৯৪৭ সালে দেশের ইংরেজ শাসনমুক্তিতে। দুটো মতই হয়তো আংশিক সত্য। আংশিক সত্য মানেই অসত্য। তাই ব্যাপারটা যদি বিদ্রোহও না হয়, যুদ্ধও না হয় তবে কী? অবশ্যই আর কিছু। কিন্তু কী সেই আর কিছু? যতদূর বুঝি এ হচ্ছে ভারতের মধ্যযুগের খোলস পরিত্যাগ ক'রে নব্যযুগের দেহ গ্রহণ। কাজটা সহজসাধ্য নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই ব্যাপক অশান্তির ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তন ঘটেছে। বাইরে থেকে দেখতে ব্যাপারটাকে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ মনে হয়েছে, কিন্তু আসলে মধ্যযুগের খোলস পরিত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতেও সেই একই প্রক্রিয়া ঘটেছে—অনুরূপ অশান্তির মধ্য দিয়ে। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভারতের সর্বত্র এই প্রক্রিয়ার যুদ্ধ বা বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। সমগ্র দেশকে তিনটা অঞ্চলে ভাগ ক'রে বিচারে নামা যেতে পারে। বাংলাদেশ, উত্তরভারত অর্থাৎ বিহার থেকে পশ্চিমে দিল্লী আর দক্ষিণে চম্বল নদীর সীমান্ত অবধি, আর দেশের অবশিষ্ট অংশ। এই তিনের মধ্যে বাংলাদেশে (অর্থাৎ খাস বাংলাদেশে, মোগল আমলের সুবে বাংলা নয়, কিংবা কোম্পানীর আমলের বাংলা ও আসাম নয়) এই খোলস বদলের ব্যাপারটা ঘটেছে সর্বাগ্রে আর শান্তির পথে। অসির বদলে মসীতে অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষায় এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ। সেইসঙ্গে দেশী ও বিদেশী যুগোচিত নেতৃত্ব। রামমোহন, উইলিয়াম কেরী, হেয়ার, ডিরোজিয়ো, মেকলে, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই পরিবর্তন সাধনের নেতা। যদি যথাসময়ে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত না হ'তো, যদি যোগ্য নেতারা ঘটনার বল্গা ধারণ না করতো তবে হয়তো বাংলাদেশেও এই পরিবর্তন ঘটাতে অশান্তির আবশ্যক হ'তো। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ যে সিপাহী-বিদ্রোহকে একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা মনে করেছিল তার কারণ বাংলাদেশের পক্ষে অশান্তির প্রয়োজন আর ছিল না। ঔষধ প্রয়োগে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, ছুরির দরকার হয় নি। সেই ছুরির দরকার হ'ল উত্তর ভারতের পক্ষে। ইংরেজী শিক্ষার অভাব ও যুগ-নেতৃত্বের অভাব, (ঝাঁসির রানী, তাঁতিয়া টোপে, ফৈজাবাদের মৌলভী ও নানাসাহেব নেতৃস্থানীয় বটে কিন্তু তাঁরা বাস করছিলেন মধ্যযুগে, রামমোহন, হেয়ার প্রভৃতির মতো নব্যযুগে নয়) সমস্ত ঘটনা বল্গা তুলে দিল সিপাহীদের হাতে। তার যা পরিণাম তাকেই বলা হয় সিপাহী যুদ্ধ বা সিপাহীবিদ্রোহ। এবারে দেশের অবশিষ্টাংশ। নর্মদা নদীর দক্ষিণে আদৌ যে অশান্তি দেখা দেয় নি, এমন কি খাস পেশবার দেশ মহারাষ্ট্রেও দেখা দেয় নি, তার কারণ সে-সব অঞ্চলে তখনো মধ্যযুগের মধ্যরাত্রি চলছিল। যেখানে মধ্যযুগের মধ্যরাত্রি শেষ যামে উপস্থিত হ'য়েছে সেখানে সেই "রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে" মানুষ মরিয়া হ'য়ে উঠেছিল। নবাধিকৃত পাঞ্জাবেও এই একই কারণে অশান্তি ঘটে নি। ইতিহাসে ডবল প্রোমোশন বলে কিছু নেই। এক যুগের দাবি চুকিয়ে দিলে তবেই অন্য যুগে প্রবেশের অধিকার লাভ করা যায়। তবে দাবি চুকোবার পদ্ধতি আলাদা। কেউ বা সেই দাবি চুকোয় হেয়ারের পটলডাঙগার পাঠশালায় ঢুকে, কেউ বা সেই দাবি চুকোয় দিল্লীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ক'রে। কেউ বা অসিতে কেউ বা মসীতে। পন্থা ভিন্ন হ'লেও লক্ষ্য এক বই দুই নয়।

কোম্পানীর শাসন ভিতর থেকে পুরানো বাঁধনগুলোকে আলগা ক'রে দিচ্ছিল, কিন্তু সর্বত্র নূতন বাঁধন পরাতে পারে নি। বাংলাদেশে একদিকে যেমন পুরাতন সংস্কার খসে পড়ছিল তেমনি আবার নূতন সংস্কার সৃষ্টি হ'য়ে উঠে সমাজদেহকে শক্ত ক'রে বাঁধছিল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ভূদেব সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করলো; প্রকাণ্ড ধনী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতার আফিসের কাজ কামাই ক'রে গোপনে উপনিষদের পাঠ নিতে আরম্ভ করলো; ফার্সী-সাহিত্যে সুপণ্ডিত মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র মধুসূদন ইংরেজীতে কবিতা লিখতে শুরু করলো; রসিককৃষ্ণ দত্ত গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হ'লেও সরকারী চাকরির উপরে এতটুকু বিশ্বাস হারালো না; আর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিচলিত আস্থা স্থিতি পেলো গিয়ে খ্রীষ্টীয় বাইবেলের উপরে। আর সর্বোপরি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের সন্তান সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বেদান্তদর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন ঘোষণা করলেন, বললেন, টুলো-পণ্ডিত নয় ইংরাজী পড়া ছোকরার দলই দেশের ভবিষ্যৎ-ভরসা। এ সমস্তই পুরাতন সংস্কারের বদলে নূতন সংস্কার স্বীকারের দৃষ্টান্ত। বোঝা যায় মধ্যযুগের নিশান্ত দিগন্তে নবযুগের উষা পরিস্ফুটতর হ'য়ে উঠছে। এর অনুরূপ প্রক্রিয়া বিহারে ঘটে নি, আউধে ঘটে নি, কানপুরে ঘটে নি, দিল্লীতে ঘটে নি। এ সব অঞ্চলেও কোম্পানীর শাসন বা তার দৃষ্টান্ত ভিতরের বাঁধনগুলোকে ক্ষয় করে দিচ্ছিল, সামান্য যা ছিল তার সাধ্য রইলো না যে সমাজসৌধকে খাড়া ক'রে রাখে—তাই একদিন অতি অতর্কিতে সমস্ত হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। আউধ রাজ্য অধিকার, খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারের চেষ্টা বা চর্বি মাখানো কার্তুজ এদের কোনটাই সিপাহীবিদ্রোহের কারণ নয়, এসব সিপাহীবিদ্রোহের ফল, যে মূল প্রেরণার ফল সিপাহীবিদ্রোহ, এদেরও সৃষ্টি সেই মূল প্রেরণায়। সেই প্রেরণা ইতিহাসের অমোঘ, অপরিহার্য একটি অভিপ্রায়; মধ্যযুগের জরাগ্রস্ত কলেবর পরিত্যাগ ক'রে ইতিহাসের যুগোচিত নব কলেবর গ্রহণ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

পাক প্রেসিডেন্ট জনাব আয়ুব খাঁ রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘোষণা করিয়াছেন, আমার সঙ্গে শ্রীনেহরুর সাম্প্রতিক যে চুক্তি হইয়াছে তা স্বাক্ষর করিবার সময় শ্রীনেহরু ইহাকে একটা 'ঐতিহাসিক দলিল' বলিয়া উল্লেখ করেন এবং আমিও ঠিক এই কথাই অনুভব করিয়াছি। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ঐতিহাসিক দলিল নিয়ে আমরা আরো অনেকবার একমত হয়েছি, কিন্তু সব গোলমাল করে দেয় ঐ ভৌগোলিক দলিল।"

মার্কিন সিনেটার শ্রীইয়ারবোরো নাকি বলিয়াছেন—চীন যদি আসাম দখল করে তাহা হইলে পাকিস্তান পাকা কুলটির মতো ঝরিয়া পড়িবে। —"তা হলে যে এককূল—ওকূল দু-কূলই যাবে সেইটেই ভাইসাহেবরা ভাবছেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

আমি ইস্কুলের ছাত্রের মতো তাঁর (শ্রীস্যাণ্ডস-এর) বক্তৃতা শুনতে যেতে পারিনে"—বলিয়াছেন পাক জাতীয় পরিষদের বিরোধী পক্ষের নেতা সর্দার বাহাদুর খান। "বাহাদুরি আছে বলতেই হয়" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে যোগদানকারী জনৈক চীনা প্রতিনিধি বক্তৃতা প্রসঙ্গে চীনা ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন।—"আর স্বীকার না করলেও সবাই জানেন, কামলা রোগে সবাই আক্রান্ত হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রথমে সংবাদ পাওয়া গেল রাশিয়া ভারতকে মিগ বিমান দিবে। পরে শুনিলাম দিবে না। আরো পরে শুনিলাম দিবে, তবে দেরী হইতে পারে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ছেলে-ভোলান ছড়ার কথা মনে পড়ছে—হাত ঘুরোলে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব !!"

সংবাদে প্রকাশ, কোন্ কোন্ কাউন্সিলারগণের আত্মীয় কর্পোরেশনে কাজ করেনি, এই প্রশ্ন করায় সভার হাওয়া একটু (আশ্চর্য, একটু মাত্র।) উত্তপ্ত হইয়া উঠে। উত্তর-প্রত্যুত্তরে জানা গেল ২৭ হাজার পৌর কর্মীর মধ্যে মাত্র ২৭ জন কাউন্সিলারদের কুটুম। তখন জনৈক সদস্য বলেন, ২৭ হাজারের মধ্যে মাত্র ২৭ জন আত্মীয়-কর্মী হইলে কী ক্ষতি হইতেছে। —আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন,—"এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গোচোনা-ই যে যথেষ্ট !"

সংবাদদাতা বলিতেছেন—কলিকাতায় এবার শীত পৌঁছিতে অস্বাভাবিক দেরী হইতেছে। —"কী আর করা যায়, এতো আর ট্রেন নয় যে, লেট হলে স্টেশন মাস্টারের মাথায় থান ইট ফেলে, স্টেশন অফিসের মালপত্র তছনছ করে মনের ঝাল ঝাড়ব"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের কর্মচারীদের 'শপথ প্রতীক' ব্যাজ ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, বলিয়াছেন—অন্য সব সময় না হইলেও অফিসের কাজের সময় এই ব্যাজ অবশ্যই ব্যবহার করিতে হইবে। "ব্যাজ না দিয়ে উল্কির ব্যবস্থা করে দিলে আরো ভালো হয়, বাদুড়দের সহজেই চিনে ফেলা সম্ভব হয়"—বলেন এক সহযাত্রী।

শীতের প্রসঙ্গেই আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"শীত যদি চীনা আক্রমণের ভয়ে গাঢাকা দিয়ে থাকে তাহলে বলব, তার ফাঁপট যা-ই থাক, মনোবল কিছুই নেই। আমরা বলি, চলে এসো বাবা; এসে দেখবে কলকাতায় কমলালেবু, সার্কাস, রেস খেলার মধ্যেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে আমরা সহযোগিতা করছি।"

ব্রিটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ অস্ট্রেলিয়া ৩৮টি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। —"নিশ্চয়ই সেখানে সোনার ফটকা বাজার বন্ধ হয়নি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ড্র হইয়াছে। —অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস এর পর ইংলণ্ড ব্যাটিং-এ যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ক্রিকেট রসিক জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু মাত্র ১ রানের জন্য ডেক্সটার সেঞ্চুরি লাভে বঞ্চিত হলেন বলে আমরা খুবই দুঃখিত, তিনি যে কলকাতার জামাই !!"

সংবাদে শুনিলাম কলম্বো সরকার নাকি ঘোড়দৌড় বন্ধ করিয়া দিতেছেন।—"জ্ঞানী জন বলেন, ঘোড়া নোবল অ্যানিমেল। সে-ই যদি দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়, তাহলে মানুষ ধুয়ে কি জল খাব ?"—মন্তব্য করেন এক উগ্র ঘোড়দৌড় রসিক।

পরিষদের দুইজন কমিউনিস্ট সদস্যের সঙ্গে একাসনে বসিতে অন্যান্য সদস্যগণ আপত্তি করায় কোন এক বিদ্যালয়ের পরিচালক পরিষদের বৈঠক নাকি মুলতুবী হইয়া যায়। শ্যামলাল বলিল—"এই হয়, এ যে স্বখাত সলিল। নইলে আসন নিয়ে ঝগড়াটা তো ট্রামে-বাসেই সীমিত ছিল, সেটা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছুত না। কে জানে শেষকালে ছাদনা তলায় পিঁড়ি নিয়ে কোথায় কী হয় !!"

সিমেণ্ট (মান নিয়ন্ত্রণ) বিধি অনুযায়ী সরকার নিম্নমানের সিমেণ্ট উৎপাদন অথবা বিক্রয়ের জন্য মজুত, বিক্রয় অথবা বণ্টন নিষিদ্ধ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কতটা গঙ্গা মৃত্তিকা সংমিশ্রণে সিমেণ্টের মান উন্নীত হয় সে কথাটা এই সঙ্গে জানিয়ে দিলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই উপকৃত হতেন।"

সংবাদে শুনিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"বিয়ের শোভাযাত্রা এই আইনের আওতায় আসছে না, সুতরাং সংবাদ শুনে হবু-রা হাবার মতো তাকিয়ে থাকবেন না।"

নেফার কোন কোন অঞ্চলে চীনারা বেপরোয়া বন্য জন্তু হত্যা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। বিশু খুড়ো বলিলেন—"জ্ঞাতি-শত্রু নিধনে তাদের উন্মাদ-উল্লাসের খবর জানতে আর আমাদের বাকী নেই !!"

যুদ্ধের জন্য সকলেই প্রস্তুত হও। এখন দু-পক্ষের সেনাদল মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে; অথচ দু-পক্ষই নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঠিক তখনই যে কোন মুহূর্তে একপক্ষ শান্তি-ভঙ্গ ক'রে অন্যপক্ষের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত কে শান্তিভঙ্গ করবে সেজন্য সকলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

গতকাল দুপুরে আমরা এই সংবাদ শুনেছিলাম। সংবাদ শুনেছিলাম বাবার কাছ থেকে। বাবা এই কথাগুলো গাছের গাঢ় ছায়া-প্রান্তের মধ্যে বসে বসে পাড়াগাঁর কয়েক-জনকে শোনাচ্ছিলেন। কথা শুনতে শুনতে পাড়াগাঁর মানুষের মুখ ভয়ানক হ'য়ে উঠ-ছিল। তারপর সে-সংবাদ ব'লে বাবা অসুস্থ মায়ের ঘরের দিকে আর গেলেন না। কেন না মায়ের অসুখ করলে বাবা তাঁর কাছে আর ঘেঁষতেন না। সেই দুপুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে গাঢ় গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমরা গাছপালার মধ্যে বাতাসের শব্দ বাঁশির মত বাজছে শুনতে পেলাম। তখনও আমাদের হাতে একটা ক'রে কমলা-লেবু ছিল। আমরা সেটা না খেয়ে প্রতিটি সময় কমলালেবুর গন্ধ নিয়ে বাইরে চেয়ে-ছিলাম। তখন সেই পাড়াগাঁর দারুণ দুপুরে, রোদ্দুরের মধ্যে মাঠের ওপর সমান্তরাল-ভাবে একটি মালট্রেন চলে যাওয়া দেখছিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য বহু শব্দের কাছে ভয়ানক ভীরু শব্দ তুলে মনে হ'ল সে চ'লে যাচ্ছে। আমরা গাছের গাঢ় ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই ট্রেন যাওয়া দেখলাম। শব্দ ক'রে ক'রে ভীরুর মত সাদা দুপুরে সে চ'লে যাচ্ছে। আমি ভাবছিলাম আমার বাড়িতে অসুস্থ মা আছে। যদি কোন খাদ্যদ্রব্য এই মালট্রেনে আসত! কিন্তু সেই মালট্রেনে ক'রে গোলাবারুদ যাচ্ছে এটা শোনার পর আমরা অনেকেই অন্ধকার গাছের ছায়াপ্রান্ত ছেড়ে চ'লে এলাম।

আমরা অনেকেই সেই দৃশ্য দেখার পর ও সংবাদ শোনার পর অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছিলাম। যুদ্ধের কথা হয়ত থেমে গিয়ে-ছিল। আর কোন সংবাদ ধ্বনিত হ'য়ে পাড়া-গাঁর লোকের মুখের চেহারা বোকার মত ক'রে দেয়নি। বাবা বিদেশে ট্রেনে চ'ড়ে চাকরিতে চ'লে গেলেন। মা তেমনি অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় প'ড়ে রইলেন। বাবা বুঝিয়েছিলেন মায়ের অসুখের জন্য অর্থের দরকার। সেই অর্থের জন্য তিনি বিদেশ যাচ্ছেন। এটা যে বাবার এক অদ্ভুত ধরনের মনের অবস্থা এটা আমি বুঝেছিলাম। আমি তখন সে বয়সেই বুঝেছিলাম—যুদ্ধ চলতে থাকলে পয়সা রোজগারের ভাবনাটা ঠিক। কিন্তু বাড়িতে অসুখ চলতে থাকলে রোগীর

সৈন্যদলেরা এখন কোথায়

সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাছে থাকাটা ঠিক না! মায়ের কাছে কে ব'সে থাকবে। আমি সারাক্ষণ, রাত জেগে অসুস্থ মায়ের শরীরে রোগজীবাণু খুঁজছিলাম। মায়ের শরীরে এই রোগ-জীবাণু পাড়াগাঁর কোন পথ দিয়ে আসতে পারে আমি তাই চিন্তা করতে করতে পাড়া--গাঁর দিকে তাকিয়ে থাকছিলাম। তারপর সব শেষ হ'য়ে গেল। যুদ্ধের কোন পক্ষের জয়-পরাজয় হয়ত হয়নি। হয়ত সন্ধিস্থাপন হয়েছিল। দু-পক্ষই তখন শান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই আমি জানতাম সেই যুদ্ধ আবার একদিন গর্জন ক'রে উঠবে। একদিন অজস্র শত্রু সৈন্যদল হিমালয়ের প্রান্তে ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে হাজির হবে। আগেকার শর্তের সঙ্গে আরো কয়েকটা শর্ত জুড়ে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল দাঁড়াবে।

আমার মা বহুদিন পর সুস্থ হ'য়ে উঠে-ছিলেন। বহুদিন রোগ-ভোগের পর মায়ের চোয়াল ব'সে গিয়ে তলপেটে ব্যথা ধরে শরীর জখম হ'য়ে গিয়েছিল। মাথায় চিরুনি না-প'ড়ে কেমন ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছিল। আর আমিও সারা দিনরাত মায়ের ঘরে থেকে পৃথিবীর কোন খবর না নিতে পারায় বাবার কথাই স্মরণ করছিলাম। দু-পক্ষ সৈনিকের মধ্যে যে-কোন একপক্ষ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়বে—! তখনই আরম্ভ হবে যুদ্ধ। হয়ত যুদ্ধ ইতি-মধ্যে আরম্ভ হ'য়ে গেছে, কিংবা আরম্ভ হবে; এখনও শেষকথা কেউ-ই চিন্তা করতে পারছে না। আমার অনেকগুলো দিন পৃথিবীতে অজানা র'য়ে গেল। আমি কেবল মায়ের ঘরে থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেমন ক'রে সূর্যের আলো ঘোরাফেরা করে দেখেছি, মেঘ অবস্থায় ঘরের কোন্‌দিক উজ্জ্বল দেখায় বা মলিন দেখায় জেনেছি। গাঢ় ছায়া, গাছপালার ছবি, ঘরের মধ্যে আলোছায়া, মাঠ আর ট্রেন যাওয়া। মায়ের ঘরে অসুখের নিশ্বাস, ফলের গন্ধ, গাঢ় প্রকৃতির ছায়া, বাইরে মাঠের মধ্যে মালট্রেন যাওয়া—সব জড়িয়ে এই দিনগুলো একে একে ম'রে যেতে দিচ্ছিলাম। ঘরের আলোছায়া মাঠ আর ট্রেন যাওয়া আর কেয়া ফুলের ঝাড় থেকে বনের গন্ধ নিয়ে ভাবছিলাম বাবা কেন অসুস্থ মাকে রেখে চলে গেলেন বিদেশে। অন্য কোন কথা হয়ত বাবা চেপে গিয়ে-ছিলেন। সেই কথাটি কি হ'তে পারে আমি আমার পাঁচবোন ব'সে ব'সে ভাবছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম যে, বাবা মাকে শুধু সুস্থ অবস্থায় ভালবাসতে চান। মায়ের সন্তান জন্মাবার সময় বাবা মায়ের কোনরকম খোঁজ নিতেন না। এবং যতদিন মায়ের আঁতুড় চলত ততদিন ধরে বাবা বিদেশে থাকতেন, আরও দু-একমাস কাটিয়ে তবে বাড়ি আসতেন। ডাক্তার চিকিৎসাও কখনও

মায়ের নাম করতেন না। আর এই অসুখের সময়ও এমনি বাজে পোশাকে বাবার বেরিয়ে যাওয়া আমার কেমন যেন সেদিন খারাপ মনে হয়েছিল।

একদিন আমাদের মা সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। দিদিরা আমি—সব—সব আনন্দ করলুম। মা রোগমুক্ত হ'য়ে ঘর ছেড়ে দালানের চৌকিতে উঠে এসে বসলেন। জানালায় বসলেন। ডাক্তারবাবু বললেন,-শুধু বিশ্রাম দিতে হবে আর খাওয়া-দাওয়া। আর সকাল-বিকাল একটু একটু ক'রে হাঁটা দরকার। কথা বলার পর ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চ'ড়ে চ'লে গেলেন। আমি দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে অশ্বক্ষুরের শব্দ শুনলাম। জিন্-রেকাবের শব্দ শুনলাম।

অনেকদিন পর মায়ের চেহারা সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল। মা আমাদের সকলের নাম ধ'রে ধ'রে ডেকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমরা জানালাম—তুমি অজ্ঞান হ'য়ে থাকার সময় বাবা বিদেশ চ'লে গেছেন। তারপর মায়ের শরীর আরো ভাল হ'য়ে উঠতে থাকলে সুন্দরী মা পাড়াগাঁর সেই একতলা বাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে অসুস্থতাকে একেবারে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছিলেন।

আর আমি সারাক্ষণ মায়ের ঘোরাফেরা দেখে ভাবছিলাম মায়ের অসুস্থতা সেরে গিয়েছে। রোগজীবাণুরা পাড়াগাঁর কোন পথ দিয়ে চ'লে গেল। পাড়াগাঁর চারদিক চেয়ে চেয়ে রোদ্দুরে আর সুন্দর দুপুরে দেখতে দেখতে, বাতাস রোগজীবাণুমুক্ত ভেবে, দু-চোখ ভ'রে আলোছায়া নিচ্ছিলাম। আর সুন্দর সেই ট্রেন যাওয়া দেখছিলাম। মায়ের শরীরে কোন মাছি বসতে দেখছিলাম না, মনে হয় তারা এই দারুণ রোদ্দুরে কোথাও মারা গেছে। আর কোথাও মাছির জাত বড় হ'য়ে উঠতে পারবে না। আর কোনদিন মায়ের শরীর অসুস্থ হ'য়ে উঠবে না।

তখন যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং ট্রেনে ক'রে গোলাবারুদ কামান অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছিল না নিশ্চয়ই। সমস্ত সময় ধরে আমি ভাবছিলাম মানুষের খাদ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানী চলছে। কারণ তখন যুদ্ধ থেমে গেছে। কেবল দুজন বধির ও খোঁড়া লোককে আমি পাড়াগাঁয়ে ফিরে আসতে দেখলুম। সেই বধির ও খোঁড়া লোক পরবর্তী আর কোন যুদ্ধে যাবে না। সারা জীবনের মত তাদের যুদ্ধের শেষ—একথা ঘোষণা ক'রে তারা পাতার ঘরে পাঁচজনের খেয়ে দেয়ে মৃত্যুর জন্যে বসে থাকল।

২

এর পরবর্তীকালে আমরা বড় হ'য়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধের কথা আমাদের ছেলেবেলাকার মারামারি ও বাগ্দী-পাড়ার লাঠি সড়কি নিয়ে যুদ্ধের মত সকলের মনে ছড়িয়ে ছিল। বয়ঃকালে আর কোনদিন সেই যুদ্ধের ঘোষণা কানে আসে নি। বড়জোর আমরা জেনেছিলাম যুদ্ধ যদিও কোনদিন হয় তা যেন এমন দূরবর্তী কোন স্থানে,—আমরা যে যুদ্ধ কোনদিনই সামনে থেকে দেখতে পাব না।

সে যুদ্ধ আর কোনদিন আমাদের বিচলিত করে নি। আমরা পরবর্তী জীবনে স্নেহ ভালবাসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। রোগজীবাণু নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমরা দূরবর্তী কোন নভঃনক্ষত্রের গতিপথ ও তাদের রহস্য প্রভৃতি নিয়ে, নক্ষত্রের আলো কিভাবে পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে এবং তা কতদিন লাগে সে সব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমরা স্ব স্ব অবস্থায় একমাত্র ঘর গড়া বাসস্থান প্রেম প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এমন কি কোনদিন আমাদের বাসস্থানের পাশে কতকটা জায়গা কম পড়লেও আমরা তা নিয়ে কোন গণ্ডগোল করি না। আমরা দু-পক্ষই ত্যাগ ক'রে সমস্যা সমাধান করতে শিখে গেছি। আমাদের যুদ্ধ একমাত্র ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। কারণ, এ পর্যন্ত মানুষের যুদ্ধের ইতিহাস হ'ল স্বর্ণ মণি-মাণিক্য রাজ্য ও সুন্দরী রমণী। যেহেতু মানুষ এসব জিনিসের সঙ্গে বহুদিন কালযাপন করেছে সুতরাং মণিমাণিক্য স্বর্ণ ও রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোনদিনই ঘোষিত হ'তে পারে না। যদি তা হয় তবে এই যুদ্ধ অত্যন্ত নগ্ন ও কুৎসিত। আমাদের একমাত্র যুদ্ধ মৃত্যু ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন। আমাদের চোখের সামনে যা এখনও অজ্ঞাত সেই আততায়ীর মত মৃত্যু ও নভোমণ্ডলের রহস্য সন্ধান ইত্যাদি ছাড়া আর কোন্ কারণে যুদ্ধ বাঁধতে পারে!

এ-কথা ভেবেই আমরা অনেক বড় হ'য়ে উঠছিলাম। এবং সমস্ত বড় হওয়ার পিছনে আমার যুক্তি কাজ করছিল। ভাবছিলাম ভালবাসা ও মৃত্যুর জন্যেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। সকলের জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। যেহেতু মৃত্যুকে ভাবতে ভাবতে যুদ্ধ ক'রে তাকে জয়লাভ আমরা করতে পারি। কোন গ্রহনক্ষত্রকে পরাজিত ক'রে এই মাটি ছেড়ে সেখানে আজও আমরা চ'লে যেতে পারিনি, অতএব যতক্ষণ এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ততক্ষণ তার খাজনা দেওয়া ও মাঝে মাঝে অধিকার সম্পর্কের যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।

আমার একজন বন্ধু, আমার স্বভাবের সঙ্গে যার অনেকখানি মিল আছে, চিরদিন যার যুদ্ধের জন্য দূরবীক্ষণের মত চোখ ভয়ানক আশ্চর্যে ভরে ওঠে তারই এক নিঃসঙ্গ জীবনের কথা এখানে উল্লেখ করলাম। সে ছেলেবেলায় ঘরে বসে ট্রেন যাওয়া দেখত। বয়ঃকালে তাই হয়ত রেলওয়ে ইন্সপেক্টরের চাকরি পেয়েছিল। অথচ সেই বন্ধু-ভদ্রলোক সকল সময়ই ভাবত কোন্ কোন্ জিনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায়। সে বিষয়ে সেই ভদ্রলোক যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অনুপপুরে তার বাসা ছিল। সেই অনুপপুরের বাসায় নির্জনে সে আর তার স্ত্রী বসবাস করছিল। অথচ সেই ভদ্রলোক চোখ চেয়ে চেয়ে এতদিন ধরে ভাবছিল মানুষ এখন কি নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে, কি নিয়ে যুদ্ধ করবে। এ-কথা ভাবতে ভাবতে একদিন পথে বেরিয়ে সে দেখল সেই যুদ্ধের পোস্টার প'ড়ে গেছে। ট্রেনের গায়ে সেই পোস্টার সে বহুক্ষণ ধরে দেখল।

তখন বৃষ্টি ঝরছিল। আর বৃষ্টির জন্যেই সম্ভবত সামনের দৃশ্য ধোঁয়াটে করল। ইন্স-পেক্টর ভদ্রলোক বৃষ্টির মধ্যে ট্রলি চেপে বাড়ির পথে ফিরছিল। বৃষ্টির হাওয়া বৃষ্টির

গাছপালা রাস্তা ট্রেনের লাইন দেখতে দেখতে সে তিনজন ট্রলিম্যানের সংগে বাড়ির পথে ফিরছিল।

গাছপালার নিকটে জল, দূরে পাহাড়, রেল স্টেশন প্রভৃতি মিলিয়ে বৃষ্টির দৃশ্য-গুলি তাকে একধরনের উদাস আর ভাবুক ক'রে দিল। আজকে ট্রলি চেপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভদ্রলোক ভাবল আজ বৃষ্টি পড়ছে, তাই কাজ বন্ধ রইল। সময় এখন অগাধ—সারাদিনেও বৃষ্টি কমবে বলে মনে হয় না। এখনই বেলা প্রায় একটা বাজতে চলল। খাওয়া-দাওয়ার সময় হ'য়ে গেছে। খাওয়া মেটাবার পর যদি দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে রোদ্দুর বেরিয়েছে ঠিক তখনই না হয় কাজে বেরোনো যাবে।

যাক, এখন তাহলে নির্ভাবনায় যাওয়া যাক। চলি। সে কাশল শব্দ ক'রে। গলায় তার মোটা শব্দ হ'ল। সে শুধু অনুপপুর স্টেশনের দিকে যেতে লাগল। আর কিছু-ক্ষণ পরেই সেই ভদ্রলোক অনুপপুর স্টেশনের মধ্যে অন্য এক আলোয় তার দেহকে পেঁছে দিল।

ভদ্রলোক অনুপপুরে এসে ট্রলি থেকে নামল। কাশলো। তারপর একা, বৃষ্টিতে কাদায় পথ চলতে লাগল। সে জুতোর তলাকার শব্দ ছড়ালো। বৃষ্টির শব্দ শুনছে। বাতাস হা-হা-হা-হা-হা-হা ক'রে বয়ে যাচ্ছে। ঘাস আর জুতোর ওপর বৃষ্টি, তার চশমার কাঁচের ওপর বৃষ্টি প'ড়ে ঝাপসা। ওয়াটার-প্রুফের ওপর বৃষ্টির জল। তার নাক কান গলা থুতনি বৃষ্টিতে সি-সি-সি-সি-সি-ক'রে উঠছে। সে নিজেকে সৈনিকের মত ভাবল।

সে পথের বাঁক ঘুরলো, আবার কাশলো। রাস্তার বাঁক ঘুরেই আবার গান ধরল। তার-পর ভিজতে ভিজতে দেওয়ালের পোস্টার পড়ল।

তখন সেই ভদ্রলোক আবার আড়াল ক'রে কাগজ পড়ল—দু-পক্ষের সৈন্যদল হিমালয়ের নিকট বরফে দণ্ডায়মান। দু রাজ্যের সীমান্ত-রেখার উপর দুই রাজ্যের সৈনিক। সুতরাং এখন কে শান্তিভংগ ক'রে দেখা উচিত। অবশ্য দুই সৈন্যদলের মধ্যে সকলেই বরফের ওপর যুদ্ধ করতে পারে এমনি শিক্ষিত যোদ্ধা ছিল। তবে কোনপক্ষ যুদ্ধে কতখানি সাফল্য আনতে পারবে, সেজন্য সকলেই চিন্তিত হ'য়ে শান্তির সীমানা লঙ্ঘন না ক'রে দণ্ডায়মান ছিল। ভদ্রলোক কাগজ মুড়ে পকেটে রেখে হাঁটিতে আরম্ভ করল।

পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে গেলেই তার এই বাড়ি ফেরার কথা মনে হয়। ভালবাসার জন্যে প্রাণ কেঁদে ওঠে। ভদ্রলোক ভাবল, এই অন্ধকার সময় ভালবাসাকে যাচাই করাই যেন উপযুক্ত। দু-পক্ষের দিকে সহায়ক। তারা ভালবাসার জন্য এক শান্তিকামী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। ভদ্রলোক ভাবল, আমি আমার মনকে রোদ্দুরে বা জলে বা মন্দির-গাত্রের ভাস্কর্যে ফেলে দিতে পারি না। আমি ভালবাসার জন্য স্ত্রীর কাছে হাজির হ'লে তা অন্য কি বোঝায়? ভালবাসার শরীর পেঁছালো। কিন্তু মন ছুঁতে হয়ত পারলাম না তাই দুজনের সন্দেহ জাগল। ভদ্রলোক এই অন্ধকার গাছ-পালা পাহাড় বৃষ্টির গন্ধ সর্বস্ব তার সংগী ভেবে জুতো আর ওয়াটার-প্রুফের তলায় তার সুন্দরী মায়ের দেহের মত একখানি দেহ নিয়ে আর সেই দেহের অন্তর্গত একটি অদ্ভুত মন নিয়ে ফিরছিল। সে ভাবছিলঃ আহা-হা-হারে এই বৃষ্টিতে আমি আমার মনকে ভিজতে না দিয়ে পাঁজরের জানালায় বসিয়ে রেখেছি। আর তাতেই ত অস্থির হ'য়ে সে এই সীমানা লঙ্ঘন করতে চাইছে। এই সীমানা অতিক্রম ক'রে জলের মধ্যে রোদ্দুরের মধ্যে মিশে পড়তে চাইছে। তার আগ্রহের হাত মেলে চাইছে। কিন্তু সর্বদাই অনেকদূরে থাকছে। মনটা অনেকদূরে থাকছে।

অবিচ্ছিন্ন মেঘ বৃষ্টি ঝরায়। আর সেই বৃষ্টির তলায় ঝাপসা হ'য়ে থাকা দৃশ্যের মধ্যে ভদ্রলোক বাড়ির পথে চলতে থাকে। ওয়াটার-প্রুফ আর জুতোর মধ্যে জলের জাগল। ঃদ্রলোক এই অন্ধকার গাছ-

দান্ড ক'রে এগিয়ে যেতে লাগল। আর ভাবল মেঘের মধ্যে এই আলোটা যেন সারাক্ষণ থাকে। অন্তত বাড়ির পাশে আলোটুকু যেন না ক'মে যায়।

বাড়িতে আসার পর ভদ্রলোক দরজার কড়া নাড়তে লাগল। কিন্তু কোন মানুষের সাড়া নেই। যেন সবটুকু বাড়ি একেবারে নির্জনতার গ্রাস ক'রে ফেলেছে। বউ তো দরজা খুলে দেয়। এতখানি দেরী লাগে না কোনদিন। কড়া নাড়ার কিছুক্ষণ পরে দরজার পাশে আয়তক্ষেত্রের মত জানালার পাল্লা খুলে দেখে নেয় আগন্তুককে; তারপর দরজা খোলে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ দরজা খোলার জন্যে কড়া নেড়ে অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগল।

তাহলে কি আমায় পাঁচিল টপকিয়ে ঢুকতে হবে! পাঁচিল টপকাতে গেলে আমার হাত জখম হ'য়ে যেতে পারে! পাঁচিল ধরার জায়গা রয়েছে। পাঁচিলের ওপাশে একেবারে বড় চৌবাচ্চার ওপর গিয়ে পড়ব। এভাবে সে প্রথম শান্তিভঙ্গের সীমানা অতিক্রম করতে চাইল। কারণ তার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে কি তা দেখা দরকার।

বাড়ির মধ্যে পৌঁছে ভদ্রলোক যা দেখল তাতে কিছুটা আশ্চর্য ও ভাবিত হ'ল।

"তুমি বাড়িতে আছ তা বোঝার উপায় নেই। দরজা খুললে না কেন?"

কোন উত্তর নেই।

"যদি কথার উত্তর না দাও তবে আমি এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকব।"

তবুও নিরুত্তর। অর্থাৎ অপেক্ষা করতে দিল।

"দরজা খোলার গরজ কেন যে থাকে না। আমি কি তোমায় কিছু রাগের কথা বলেছি!"

স্ত্রী চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকল।

তারপর ভদ্রলোক বলল, "অথচ আজ আমি যে কী কষ্ট ক'রে পথে এসেছি তা যদি জানতে! সেই ধারওয়াসিন্ স্টেশন থেকে ট্রলি চেপে আসা!' বাকি কথাগুলো তার স্বগতোক্তির মত। 'আমি কেবল অফিস আর কাজকর্মের কথা শোনাই এজন্য কি তোমার রাগ। অফিসের কথা ছাড়া আমাদের এখানে আর কি থাকতে পারে!"

তারপর ভদ্রলোক জানালা খুলে দিল। বাইরের প্রচুর মেঘের আলো যে জানালায় ছিল তা ঘরের মধ্যে ঢুকে দুজনের মুখ স্পষ্ট ক'রে দিল। তারপর ভদ্রলোক কেবল কথা ছুঁড়তে লাগল। "আমি এতদিন যা বলেছি মিঃ এন এস রিহ্যাল ভাল লোক। ভাল বাংলা পড়তে পারেন। আর মাঝে মাঝে বলেছি বাওরিডাল্ড থেকে বিসরামপুর পর্যন্ত ৬০ মাইলের মত এক লম্বা রাস্তা তৈরী হচ্ছে। মোহারী, হ্যারাড, জাইরাতোলা এসব নতুন ক্রসিং স্টেশন তৈরী হচ্ছে।

অম্নুশাসনের শর্ট সারকিট্ আর রি-মডেলিং-এর কাজ—এতো ভাল কথা এর মধ্যে অফিস্ পলেটিক্স কোথায়!"

ভদ্রলোক আবার জ্নতোর শব্দ ক'রে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। তারপর বলল, "আমি একজন রেলওয়ে ইন্সপেক্টর. সে হিসাবে কাজের যোগ্যতার কথা মাঝে মাঝে বলি। আমি বলি যে, আমাদের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে একদিন কতখানি আনডেভেলাপড ছিল। আজ অনেক ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে এতে কি তুমি রাগ করো?"

ভদ্রলোক কাছে এল। বলল, "অন্ধকার হ'য়ে গেলেই আমার বাড়ির কথা মনে হয়। এই গোপন অন্ধকারে ভালবাসা আমায় ডাকে। কাজ হ'ল আমার দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল। আমার কিছ্ন একটা ভালবাসার আছে। আর সে ভালবাসা কেবল একটি—তোমাকেই। তোমাকে ভালবেসে যদি অন্ধ ক'রে দিতে না পারল্নম তবে আমার বাঁচার কি মানে হয়! আমি ভালবাসবই!"

ভদ্রলোক দেখল তার স্ত্রী পিছন ফিরে শ্নয়ে আছে। এবং এই দ্নরবর্তী জায়গায় স্ত্রী ছাড়া আর পরিচিত কেউ নেই। ভদ্রলোক বলল, "আহা, আমার বিয়ে করা বউ তো!

তারপর আবার খানিক পরে বলল, "আজ রান্না হয় নি!"

স্ত্রী প্রথম কথা বলল—"না"।

ভদ্রলোক বলল, "ঠিক আছে, দোকান থেকে কিছ্ন আনিয়ে নেব। তোমায় রান্না করতে হবে না। আহা, তোমাকে এখন মনে হচ্ছে বড্ড বন্দী, বড় একলা। তোমাকে ভালবাসার জন্যে শিবিরে এনে আমি কোথায় চ'লে গিয়েছিলাম বউ! শোন, কি ভাবছ এত!"

স্ত্রী বলল, "ভাবছি আমার বাবা মা ঠাকুমা পিসিমা মেসোমশাই দাদারা—আমার পাঁচ-ছ ভাই; কেউ তো কোন খবর নেয় না। এতদ্নরে এসে আছি কিন্তু কেউ তো কোনো খোঁজ নেয় না। হয়ত আমি তোমায় ভালবাসি বলেই তারা আলাদা ক'রে দিতে চাইছে।"

"না ছোট, তুমি অত ভেবো না।"

"ভাবনা যখন তখন ভাবতেই হয়।"

"না, ভেবে তোমার ম্নখ মলিন কোরো না। আমি আছি। আমায় মনে কর।"

"তুমি তো আমার বাবা মা ঠাকুমা পিসিমা পিসেমশাই দাদা হ'তে পার না!"

"আমি তোমাকে তো সেভাবেই ভালবাসছি।"

"তুমি ভালবাস সেটা হয়ত ঠিক. কিন্তু তুমি সব হ'তে পার না।"

"আমিই সব হব। ছোট দেখো, আমি তোমার সব হ'তে পারি। চারদিকের পাহাড় গাছপালা আকাশ তার কোলে শীতের মত আমি হ'য়ে গিয়ে সকলকে কাঁপাতে পারি। ঝাপসা ক'রে দিতে পারি।" (অর্থাৎ ভদ্রলোক বলতে চাইল, আমি প্রকৃতির কোলে শীত হ'য়ে যেতে পারি একান্তভাবে যা এখন য্নদ্ধের আবহাওয়া চলছে। আমি এই শীতের মধ্যে অন্ধকারে য্নদ্ধ চালাব, ভালবাসব।)

ছোট বলল, "চাকরি-জীবন যদি তোমার কোলাহল হয় তবে আমার বাড়িঘর ঠাকুমা পিসিমা বাবা মা দাদারা সকলেই আমার জীবনে কোলাহল ছিল। তুমি বিয়ে ক'রে এনেছ ভালবাসা দেবে ব'লে, শান্তি দেবে ব'লে। হঠাৎ এই নির্জনতার মাঝখানে তুমি ভালবাসলে। সারাদিন তবে আমি কি করব। মনে হ'চ্ছে দ্নরে পালিয়ে যাই। সারাদিন এ নির্জনে ভালবাসার জন্যে ব'সে না থেকে পালিয়ে যাই। এ শান্তির দরকার নেই।

এ-কথার পর ভদ্রলোক আর কিছ্ন না বলে পাশের ঘরে চ'লে গেল। তারপর এক বন্ধ্নর সংগে কথাবার্তা হ'ল। তার এক ডাক্তার বন্ধ্ন। বন্ধ্ন বলছিল, এ য্নদ্ধের বহ্ন আগেই আমি, আরো কয়েকজনের সংগে সীমান্তঅণ্ডলের দিকে গিয়েছিলাম। সরকারের নির্দেশ ছিল সীমান্তঅণ্ডলের নকশা তৈরী ক'রে আনতে হবে। যদি সেজন্য শত্রনপক্ষ কোনরকম উত্তর চায় তবে আমরা যেন তার কোন উত্তর না দি। সেখানে যাওয়ার পর দ্ন-একদিনের মধ্যে আমাদের ক্যাম্পে কয়েকজন চীনে সৈন্য ঢ্নকে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কাগজপত্র সর্বস্ব কেড়ে নিল। তারপর এক পাথরের ঘরে ৪৫ দিন

ধরে আটকে রাখল। আমাদের ডাক্তার বান্ধবী খাদ্য দিয়েছিল বহুসামান্য। ৪৫ দিন পরে আমরা সেখান থেকে নিরুদ্ধ অবস্থায় ফিরে এলাম। একথা ক'জন পর বন্ধু চিৎকার ক'রে উঠেছিল: শান্তিকামীরা চিরকাল এমনি বোকা ব'নে যাবে।"

বন্ধু বেরিয়ে যেতে ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে একবার বুদ্ধের ছবি পরিদর্শন করল। তারপর আবার আকাশ অন্ধকার দেখে ভালবাসা চাইল। আবার স্ত্রীর ঘরের চৌকাঠে ঢুকলো।

"কে এসেছিলো?" প্রশ্ন করল।

"আমাদের ডাক্তার বন্ধু।"

"কি বলল!"

"বলল, যুদ্ধ লাগছে। কাগজেও তাই লিখছে।"

স্ত্রী বলল, "তাহলে আবার সব ভেঙে যাবে! তোমাদের ডেভলাপমেন্টও আর হবে না। ড্রসিং স্টেশন, ইমার্জেন্সি রি-অর্ডারিং আর মার্শালিং ইয়ার্ড কিছুই না!" ছোট হাহা-হাহা ক'রে হেসে উঠল।

ভদ্রলোক বলেন, "না কিছুই আর নতুন হবে না। শান্তিভঙ্গ হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে। তোমাদের সর্বস্ব যাবে। সব শেষ।"

স্ত্রী বলল, "আজ কি করবে?"

"চল না টকিতে জেপে ধরবো। কাজের চাপ নেই। যুদ্ধের পোস্টার পড়ছে দেখবো।"

"না। টকিতে আমার ভাল লাগে না। কি বিচ্ছিরি। যুদ্ধের পোস্টারও নয়।"

ভদ্রলোক হাহা করে হাসল।

"চল না তবে ছবি দেখব।"

"কি ছবি?"

"যে কোনো ছবি।"

"যাব।"

অনেক বেলায় দুজনে ছবি দেখার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়ল। পথের দুপাশে বন, রাশিকৃত গাছ, ফুলের গন্ধ গাছের গন্ধ! ভদ্রলোক যুদ্ধের পোস্টার দেখাল। বলল, "শান্তির বাড়াই চলেছে।" স্ত্রী সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে? দিনকতক ছুটি নিয়ে আহিরিটোলায়!" ভদ্রলোক বলল, "কেন তোমার এখানে, আমার কাছে ভাল লাগে না?" স্ত্রী বলল, "ভাল লাগে, তবে খুব বেশী দিন নয়!"

"ভালবাসা পেলেও নয়?" ভদ্রলোক হাঁটিতে লাগল।

"না? খুব বেশী কিছুই নয়। আমার বাবা মা ঠাকুমা পিসিমা কেমন আছে। দাদার চাকরি নেই। বাবার এখনও আমার বিয়ের দেনা। বোনের বিয়ের কি হল। সে আমার থেকেও লম্বা হয়ে গেছে। বাবার মাথায় কী চিন্তা! তুমি কিছু বুঝবে না!"

ভদ্রলেকা বলল, "চিন্তা ত আমরাই সৃষ্টি করি বাঁচবো বলে। আবার চিন্তা মিটে গেলে সুখী হব।"

কথা বলতে বলতে তারা অনেকখানি রাস্তা এসে পড়ল। দুপাশে রাশিকৃত বন আর মাঝখানে সরু রাস্তা। যেন মনে হয়, গায়ের ওপর গাছ পড়ে যাবে। ভদ্রলোক বলল, "ছোট, তুমি আজ কত দূরে এসে গেছ! ছোট, এতদিন তোমার কাছে ভালবাসা হয়েছিলাম, এখন কি মনে হচ্ছে—" বলেই ভদ্রলোক এক আশ্চর্য ব্যাপার করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোটর বাহু ধরে চেঁচিয়ে উঠল। "ছোট, আমাকে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছ!"

"একি, থাম!" ছোট আশ্চর্য হয়ে তাকাল, "শিশির!"

"শোন আমাকে কি মনে হয়?"

"মনে হয়েছে ভাল লোক, ভালবাসার লোক, শান্ত লোক।"

"কিন্তু আমি এখানে তোমাকে একা রেখে চল্লাম।"

তারপর ছোটর খুব আশ্চর্য লাগল শিশিরকে। জোরে জোরে হাঁটতে লাগল শিশিরের দিকে। তখন শিশির অনেক দূরে থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আমি শান্তি পেতে চেয়েছিলুম, তুমি তা হতে দিলে না।"

শিশির ঠিক তেমনি করে চলতে লাগল। ছোট ঠিক তেমনি করে চেঁচিয়ে উঠল।

অনেকদিন পরে ছোট জেনেছিল আমাদের শরীরের জানালায় যে মনকে বসিয়ে রেখে দিয়েছি, সেটা যেন রোদ্দুরে জল বা ভালবাসার কাছ থেকে দূরে থাকছে। দূরে থাকছে বলেই হাজার ভালবাসার পর হাজার সন্দেহ।

বড়দি মেজদি জেনেছিল যে, বাবা মায়ের অসুখের সময় মাকে ফেলে চলে যেতেন আর আমি জেনেছিলাম শিশিরবাবুও ছোটকে ফেলে চলে গিয়েছিল। কেননা, তারা জেনেছিলেন হয়ত এটা ভালবাসার আবহাওয়া নয়। হয়ত এই আবহাওয়া কাটিয়ে দিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরবেন। মায়ের অসুখের সময়টাই বাবা সহ্য করতে পারতেন না। আমরা ক ভাইবোন সেই রোগশয্যার পাশে ঘিরে বসে থাকতাম। আর রোগজীবাণুর আক্রমণ অবরোধ করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতাম।

যুদ্ধ কবে থামবে, সে সম্বন্ধে কেউ আশা দিতে পারেনি। হয়ত আজ কিংবা কাল কিংবা ভবিষ্যতে কোন একদিন থামবে। আর আমরা ভেবেছিলাম আজ যুদ্ধ থামলেও অন্য একদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে। কেননা শান্তি ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে কি এ সন্দেহ মনে যেদিন জাগবে, ঠিক সেদিনই সন্দেহের মন নড়ে উঠবে। আর দুপক্ষের সৈন্যদল আমাদের দূরবীক্ষণ চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর সীমান্তরেখায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুপক্ষের সৈন্যদল দাঁড়িয়ে পড়বে।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

তেইশ

জগবন্ধুর জেদ চেপে গেছে। মামলার তদ্বির ষোলআনা নিজের হাতে রেখেছেন। আদালতের দেয়ালের টিকটিকিটা অবধি হাঁ করে আছে, যথোচিত বন্দোবস্তে হাঁ বন্ধ হয়ে গেলে মামলা ফাঁসাতে উঠে পড়ে লাগে। সে সুযোগ হতে দেবেন না বলাধিকারী। সরকার বাদী, সেজন্য পাবলিক প্রসিকিউটার আছেন। অধিক সতর্কতা হিসাবে ঝানু মোক্তার হারাধন হালদারকে বলরামের তরফে মোক্তারনামা দেওয়া হল। সে খরচা জগবন্ধু যোগাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন [illegible] অঞ্চল ছাড়া করবেনই এবার, [illegible] চিরকালের জন্য যাতে ইস্তফা দেয় [illegible] করে ছাড়বেন।

এই হারাধন মোক্তারের বাসায় কাজলী-বালাকে পেলেন। সে এক স্বতন্ত্র গল্প। ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে হারাধন বললেন, পুরানো ঝি ফিরে এসেছে—বাড়ীতে এটাকে কদ্দিন ঘাড়ে বইতে পারি বলুন। ছুড়ে ফেলে দিলে কে ঠেকায়—কিন্তু আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডাও তো সেই সঙ্গে বরবাদ। যাবেই বা কোথা, বয়সটা খারাপ হয়েই মুশকিল হয়েছে। হতভাগী ইচ্ছে করে নিজের, পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। এক একটা মানুষ থাকে এই রকম সৃষ্টি-ছাড়া।

গল্পটা এগুচ্ছে। আর জগবন্ধু একবার পান একবার জল একবার বা তামাক—এমনি সব ফরমাস করছেন। কাজলীবালা সামনে আসুক এই সমস্ত কাজে। আসছেও তাই। জগবন্ধু সেই সময় বারবার তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করেন। কুদর্শন নিরক্ষর এই মেয়ে কালোকোলো রোগা দেহটার মধ্যে এত তেজ কেমন করে ধরে রেখেছে, তাই যেন নিরিখ করে চোখে দেখতে চান। বাইরের চেহারায় চিহ্ন মেলে না, তাই এমন বারম্বার ডাকছেন।

মোক্তার মশায় বলছেন এক একটা মানুষ এই রকম, গোঁয়ার্তুমি করে আখের নষ্ট করে। নিজের হিত বোঝে না। এও বোধ হয় পাগলামির মধ্যে পড়ে। পাগলের ডাক্তার আছেন এ শহরে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করে দেখাতে হবে।

হারাধন চোখ তুলে এক একবার জগবন্ধুকে দেখছেন। তাঁকেও বুঝি ঐ পাগলের দলে ফেলতে চান। সেটা খুব মিথ্যা হবে না। কাজলীবালা পাগল হলে তিনিও তাই। এত কালে সত্যি সত্যি একটা দলের মানুষ পাওয়া গেল, মনে হচ্ছে।

কাজলীবালার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ঘরে নেয় না। একবার গিয়ে পড়ে ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছে। বাইরের এক মেয়েলোক সেই সংসারের কর্তা। কাজলীবালা থুতু ফেলতেও যাবে না আর সেখানে। খুলনায়, ঠিক শহরের উপরে নয়—পার্শ্ববর্তী গাঁয়ে বোন-ভগ্নিপতি থাকে, তাদের কাছে রয়েছে। ভগ্নিপতি ঘরামির কাজ করে। বোনও লোকের বাড়ি গাই দোয় ধান ভানে চিঁড়ে কোটে, যখন যেটা দরকার পড়ে করে., দেয়। কষ্টের সংসার চলে এমনি ভাবে। কাজলী-বালাও বসে থাকবার মেয়ে নয়—বোনের

ছেলেপেলেগ্লোর ভার নিয়েছে, আবার বোনের সঙ্গে জ্বড়িদার হয়ে বাইরের কাজেও যায়।

সেকালে বিস্তর নির্মাকির কারখানা ছিল ভাঁটি অঞ্চলে। ভৈরব নদের অসংখ্য বাঁক ঘ্রের ন্নের নৌকোর খ্লনায় পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। সেই জন্য, শোনা যায়, র্প সাহা নামে এক সওদাগর অনেক অর্থব্যয়ে খাল কেটে সোজাস্বজি ভৈরবে এনে মিশিয়ে দিলেন। কেটেছিলেন সর্ এক খাল—কিন্তু জলস্রোত সোজা পথ পেয়ে এই দিকে ধেয়ে চলল, ভৈরব এদিকটা মজে এল ক্রমশ। সেই খাল আজ বিশাল এক নদী, এপার-ওপার দেখা দ্বুষ্কর। কীর্তিমান র্প সাহার নামে র্পসা এ নদীর নাম।

র্পসা যেখানটা ভৈরবে এসে মিশল সেই সঙ্গমের উপর প্রাচীন প্রকাণ্ড বাগান একটা। বাগানের ভিতর লম্বা-চওড়ায় সমান মাপের চৌকো প্রকুর—প্রকুরের ঠিক মাঝখানটায় জলটর্ঙি অর্থাৎ পাকাদালান জলের উপরে। সাঁকো বেয়ে জলটর্ঙিতে যেতে হয়। সৌখিন বাগান ছিল, এখন কিছ্র নেই, গাছপালা কেটেকুটে নিয়ে গেছে—পরিত্যক্ত নির্জন জায়গা। পাড় ভেঙে ভেঙে প্রকুরও এখন র্পসার সঙ্গে এক হয়ে গেছে—জোয়ারের সময় টইটম্ব্র, ভাটায় কাদা বেরিয়ে পড়ে—এখানে ওখানে অল্পসল্প জল। বাসা থেকে সামান্য দ্রে জায়গাটা—প্রকুরের আটকা জলে কাজলীবালা মাছের সন্ধান পেয়েছে। ফ্যাসা-চাঁদা-কুচোচিংড়ি জাতীয় সামান্য মাছ। ভাটার শেষে বোনের ছেলেটাকে নিয়ে চলে যায় প্রকুরে। মাসি আর বোনপো কাদা ভেঙে ভেঙে গামছা ছাকনা দেয়।

এক সকালবেলা গিয়েছে অমনি। জলটর্ঙির সাঁকোর ধারে কী একটা বস্তু চকচক করছে—তুলে নিল ছোঁ মেরে। গয়না একটা গলায় পরবার। নেকলেশ এর নাম, পরে জানা গেল।

হাতের ম্বঠোয় নিয়ে চলেছে স্বুঁড়িপথ ধরে। এদিকে সেদিকে চালাঘরে ভাড়াটে পরিবার—খাস শহরের উপর থাকবার সঙ্গতি নেই. সেই সব লোক একটাকা দ্ব-টাকা ভাড়ায় এই অঞ্চলে থাকে। যাচ্ছে কাজলীবালা ও বোনপো—এক ঘরের গিন্নি ডাকলেন, কাজলী নাকি? শোন্, কাল তোরা এসে ঘরের ডোয়া গেঁথে দিয়ে যাবি, এলি না কেন রে?

কাজলী বলে, দিদি চিঁড়ে কুটতে গিয়েছিল রাহাবাব্দের বাড়ি। ধান ভিজিয়ে ফেলেছিল, চাকর পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

গিন্নি—ফ্বণ্টিঠাকর্বন বলে সবাই—করকর ওঠে ওঠেন: আমরা ব্বঝি মাংনা খাটাতাম রে! আজকে আসবি, অবিশ্যি করে কিন্তু আসবি। বলবি গিয়ে তোর বোনকে—। হাতের ম্বঠোয় কি রে কাজলী? দেখি, দেখি—বাঃ, দেখতে তো খাসা!

বস্তুটা দ্ব-হাতে ছড়িয়ে ধরে ফ্বণ্টি-ঠাকুরনের কণ্ঠ মধ্বর হল: রথের বাজারে দেখেছিলাম এই জিনিস। কিনব কিনব করে ভুলে এলাম। পিতলের জিনিস, কাচ বসানো। মেজেঘষে করে কিন্তু ভাল। তুই কি করবি কাজলী! আটআনার পয়সা দিচ্ছি, দিয়েদে। নাতনীটাকে পরাব।

প্বরো একটা আধ্বলি—আচমকা এমনি লম্বা ম্বনাফার কথায় কাজলীবালা দোমনা হল। দেবো কি দেবো না ভাবছে। বোনপো বলে, বাড়ি চল মাসি—

কাজলীবালা বলে, দিদিকে একবার দেখিয়ে এক্ষ্বনি দিয়ে যাব। থাক তুমি ঠাকর্ণ, এক ছ্বটে এসে দিয়ে যাচ্ছি।

ছ্বটেই হয়তো দিত। দেখে, ওদিককার

বেড়ার অন্তরাল থেকে নিরু-বউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ফিসফিস করে বলে, ও কাজলী, কি পড়ে পেলি? দেখি একবার জিনিসটা।

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে লুব্ধ কণ্ঠে বলে, পিতল হোক যাই হোক, বড় খাসা জিনিস। আমায় দে কাজলী, দুটো টাকা দিচ্ছি।

আঁচলে টাকা বাঁধা, নগদ টাকা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার হাঁ বললেই খুলে দিয়ে দেবে। কাজলীবালা ইতিমধ্যে মন ঠিক করে ফেলেছে, বোনকে না দেখিয়ে দেবে না।

নিরু-বউ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, তিন টাকাই দিচ্ছি। তাই আছে আমার কাছে। বড্ড পছন্দের জিনিসটা। সোনা তো কেউ দিল না জীবনে, পিতল হোক কেমিকেল হোক তাই পরে সাধ মেটাই। ও কি, চললি যে ফরফর করে! শোন, পাঁচটা টাকাই দেবো। আমার সর্বস্ব।

কাজলীবালা বলে, দিদিকে না জানিয়ে দিতে পারব না বউদি।

নিরু-বউ কাতর হয়ে বলে, আর নেই, সত্যি বলছি কাজলী। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে পারি। থাকলে দিয়ে দিতাম।

চোখ দুটো তার যেন জ্বলজ্বল করছে গয়নার দিকে তাকিয়ে।

একআনা দু-পয়সা করে জমিয়ে জমিয়ে এই দাঁড়িয়েছে। যে মানুষের ঘর করি, জানিস তো তোরা সব—ঐ একআনা দু-পয়সার জন্যেও একশ গণ্ডা কৈফিয়ৎ। জিনিসটা দিস আমায়। গলায় চিরকাল মাদুলির বোঝা বয়ে গেলাম। কবে কখন মরে যাই, তার আগে গয়না বলে পরে নিই কিছু। তা সে যেমন গয়নাই হোক।

কাজলীবালার মনটা বড় নরম, চোখ ছলছল করে আসে। বলে, তোমাকেই দিয়ে যাব বউদি। বোন-ভগ্নিপতির আশ্রয়ে থাকি, তাদের না বলে কিছু করলে রাগ করবে।

বোন তখন বাড়িতে নেই। রাহা-বাড়ির চিঁড়ে কোটা কাল শেষ হয়নি, সকালেই বোধ হয় ঢেঁকিশালে গিয়ে পড়েছে। অনেক বেলায় ফিরল। ফিরে এসেই প্রথম কথা : কোথায় নাকি পড়ে পেয়েছিস তুই—বেশ ভাল একটা গয়না?

ভাল জিনিস কি ফেলে কেউ কখনো? পিতলের ঝুটো গয়না—তবে দেখতে ভাল। তুমি কোথায় শুনলে দিদি?

গিয়েছিলাম ফুন্টিঠাকুরনের কাছে। ডোয়া গাঁথা আজও হবে না, সেই কথা বলতে। পাড়ার মধ্যে হৈ-রৈ পড়ে গেছে। বের কর তো, দেখি কেমন।

নেকলেশ এনে কাজলীবালা বোনের হাতে দিল। বোন বলে, ঝুটো বলে তো মনে হয় না। এত লোকের গরজ তবে কেন? এখন কিছু করে কাজ নেই। মানুষটা আসুক, সে-ই বা কি বলে শোনা যাক।

মানুষটা, অর্থাৎ ভগ্নিপতি শম্ভুরাম। সারাক্ষণ চালের উপর বসে কাজ করে দুপুরের পর ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি এল। বৃত্তান্ত শুনে খাওয়ার কথা মনে থাকে না, হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কাজলীর উপর খিঁচিয়ে ওঠে একবার : একটু যদি ঘটে বুদ্ধি থাকে! ফুন্টিঠাকরুনকে কেন দেখাতে যাস? তাকে বলা মানে তো খুলনা শহরে ঢোলসহরৎ করে জানান দেওয়া। দামি জিনিস যদি হয়, এ-কান সে-কান হতে হতে খাঁটি মালিকের কানে পৌঁছে যাবে। সে লোক তো হায়-হায় করছে, ছুটে এসে পড়বে তক্ষুনি। যার জিনিস সে নিয়ে যাবে, না দিলে পুলিস আনবে। কলা খেও তুমি তখন। এ-জিনিস হাত চিত করে নাচিয়ে আনে কেউ!

বকাবকি চলছে, কাজলীবালা তার মধ্যে চমক খেয়ে আর-একটা কথা ভাবে। গয়না হারিয়ে ফেলেছে, সেই অসাবধান মালিকটির কথা। সত্যি যদি দামি জিনিস হয়, সে তো পাগলিনী হয়ে বেড়াচ্ছে। আহা, টের পেয়ে যাক সেই মানুষ, গয়না

ফেরত নিয়ে যাবার পরুক। কাজলীবালা যদি খোঁজটা পেত, ছুটে গিয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে আসত।

গোটা খুলনা শহর না হোক, যা ছড়িয়েছে, সে-ও বড় কম নয়। সন্ধ্যাবেলা নীলু স্যাকরা চলে এসেছে। শম্ভুরামের সঙ্গে চেনা—অল্পই কিছুদিন আগে শম্ভুরাম তার বাড়ির ঘর ছেয়ে দিয়ে এসেছে। বলে, বাড়ি আছ শম্ভুরাম? দেখি একবার জিনিসটা।

শম্ভুরাম আকাশ থেকে পড়ে: কোন্ জিনিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারিনে তো।

নীলু হি-হি করে হাসে: বুঝতে ঠিকই পারছ বাপু। আজ সকালে যা কুড়িয়ে পেয়েছ। আমাকে দেখানোর গণ্ডগোল নেই। বলি, মাটিতে পুঁতে রাখবার জিনিস তো নয়। গয়না পরে বউও তোমার ডোয়া-মাটি লেপতে যাবে না। পরলে লোকে নানান রকম রটাবে। ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে—তা আমি লোকটা কি দোষ করলাম?

সোনার-পোর কাজ আমার—টিপিটাপে এমনি বন্দোবস্ত করব, কাক-পক্ষী জানতে পাবে না।

শম্ভুরাম ভেবেচিন্তে দেখছে। করতে হবে কিছু, তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। বাড়ি বয়ে এলেছে, কি বলে শোনা যাক।

নেকলেশ বের করে দেখাল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে নীলু স্যাকরা মিইয়ে যায় : রেখে দাও, দিনমানে এক সময় এসে ভাল করে দেখা যাবে।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শম্ভুরাম বলে, কি দেখলেন ?

সোনা যদি হয়, তবে মরা সোনা। না কষে সঠিক বলা যাচ্ছে না। পাথর নিয়ে এসে দেখব।

ঘণ্টা কয়েক পরে গভীর রাত্রেই দরজায় টোকা। শম্ভুরামের নাম ধরে ডাকছে। ঘুম ভেঙে শম্ভুরাম ধড়মড় করে উঠল। মুখ শুকিয়েছে। কিন্তু সে-ভাব না দেখিয়ে শান্তভাবে গিয়ে দরজা খোলে। শম্ভুরামের বউও উঠে পড়ে দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়ে। পিছনে গা-ঘেঁষে কাজলীবালা।

কে ডাকে ?

হরি, হরি—সে-ই নীলু স্যাকরা যে! আর-একদিন দেখবে বলে অবহেলা ভরে উঠে চলে গিয়েছিল, রাতটুকু পুইয়ে নতুন দিনও পড়তে দিল না।

সঙ্গে সুবেশ এক ভদ্রলোক। নীলু বলে, চেনো এ'কে ? গৌরীপতিবাবু। ও'কে ধরে নিয়ে এলাম।

জহুরী গৌরীপতি, মণি-রত্নের কারবারি। অত বড় মানুষটা নিশিরাত্রে শম্ভুরামের ঘরের দাওয়ায়। গয়নার কাচ ক'খানার ব্যাপারেই এসেছেন উনি। ঝুটো কাচ নয় তবে, গৌরীপতির এলাকার ভিতরের কিছু! শম্ভুরামেরও অতএব দেমাক দেখানোর সময় এইবার।

গৌরীপতি বলেন, বের কর একবার, দেখি।

জিনিস বাড়ি নেই বাবু। বিস্তর মানুষ আসছেন যাচ্ছেন, সেইজন্যে সরিয়ে দিলাম।

এই কষ্ট করে এলাম। দেখ দিকি—। গৌরীপতি গজর-গজর করছেন : নিজের কোট থেকে কোথায় আবার সরাতে গেলে?

শম্ভুরাম চুপচাপ আছে।

গৌরীপতি বলেন, তা-ও বটে, আমি কি জন্যে জিজ্ঞাসা করতে যাই, আমায় কেন বলতে যাবে? তবে একটা কথা—গৌরীপতি এই একজনই, ষোলআনা ন্যায্য দাম আমি ছাড়া কেউ দেবে না। যেখানে সরিয়ে থাকো, সম্ভব হলে একবারটি এনে দেখিয়ে দাও। বড়-রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছি, গাড়িতে গিয়ে বসছি আমরা। গাড়িতে নিয়ে দেখাতে পার, অথবা খবর দিলে আবার এখানে আসব।

হেলাফেলার গয়না নয়, এবারে সঠিক বোঝা গেল। গৌরীপতির মতো মানুষ এই রাত্রে তা হলে গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন না। কাচগুলো সম্ভবত হীরে। স্যাকরার পো ঘুঘুলোক—এখানে উদাসীন ভাব দেখিয়ে গৌরীপতির কাছে চলে গিয়েছে। বাড়িতে নেই, সেটা মিছে কথা। তবে বাক্স-পে'টরার ভিতরে নেই। চালের মধ্যে গ'ুজে রেখেছে ভিতর দিক দিয়ে। চোর-ডাকাত কিম্বা পুলিস অথবা গয়নার মালিক এসে যত খোঁজাখ'ুজি করুক, মই দিয়ে চালে উঠে, ছাউনির কুটো সরিয়ে দেখতে যাবে না।

গৌরীপতিকে ডেকে নিয়ে এল রাস্তার উপরের গাড়ি থেকে। টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি দেখলেন। কষ্টি-পাথর নীলুর হাতে, কিন্তু পাথর ঠুকতে গেলেন না তিনি। বললেন, জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। জিনিস ধরে রেখো না হে। ন্যায্য দাম যা হওয়া উচিত, তার উপর কিছু বেশি করেই বলছি আমি। দিয়ে দাও।

শম্ভুরাম তাকিয়ে আছে। হীরের দামের তো লেখাজোখা নেই। গৌরীপতি ফিস-ফিস করে নীলুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করেন। নীলু ঘাড় নাড়ল।

গলা খাঁকারি দিয়ে গৌরীপতি বললেন, তিন-শ' সাড়ে তিন-শ'র বেশি হওয়া উচিত নয়। আমি পাঁচ-শ' দেব। এক-শ' টাকার করকরে নোট পাঁচখানা। এক্ষুনি দেব—নগদ নগদ।

ঘরের চালের উপর সারাদিন খাটা-খাটনি করে শম্ভুরাম রোজ পায় একটাকা পাঁচ-সিকে। সেই মানুষ আপাতত একটি লাট-বেলাট। হীরের দাম শোনা যায় তো অঢেল। এমন হীরেও আছে, একখানার মূল্যে রাজার রাজত্ব বিকিয়ে যায়। শম্ভুরাম গম্ভীরভাবে গৌরীপতির কথা শুনে গেল।

নীলু স্যাকরা বলে, দিয়ে দিচ্ছ তা হলে?

উ'হু। শম্ভুরাম ঘাড় নাড়ল। আর-একজন এসে ছ-শ' টাকা দর দিয়ে গেছে।

কোন্ আহাম্মক আছে, ছ-শ' টাকা বলবে এই জিনিসের দাম? টাকা তো খোলামকুচি নয়।

নীলু বলে, আছে বাবু এক রকমের লোক, দর তুলে মাথা খারাপ করে দিয়ে যায়। সত্যি সত্যি কেনে না। চোখে দেখে গিয়ে সেই লোক আবার থানায় এজাহার দেয়, অমুক জিনিসটা আমার চুরি হয়ে গেছে। কত রকমের ছ্যাঁচড়া মানুষ আছে দুনিয়ার উপর।

আবার বলে, শম্ভু মানুষটা বড় ভাল। আমার বিশেষ চেনা। তারই উপকারের জন্যে টেনে এনে কষ্ট দিলাম বাবু। কদর বুঝল না। আর কি হবে, চলুন—

কিন্তু গৌরীপতির যাওয়ার তত মন নেই। এক-পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলেন, পছন্দের ব্যাপার তো—হতেও পারে। চোখে ধরলে তখন আর মানুষের হিসাব-জ্ঞান থাকে না। আমিও না-হয় দিচ্ছি সেই

ছ-শ' টাকা। এসেছি যখন, শুধু হাতে ফিরব না।

শম্ভুরামও মনস্থির করে ফেলছে। এক ধাপ্পায় যখন এক-শ' টাকা উঠে গেল, না-জানি কত এর দাম। আরও সে চটে গেছে নীলু স্যাকরার ভয়-দেখানো কথায়। কাঁচা-ছেলে কেউ নয় রে বাপু—পুলিসের বাবাও সন্ধান পাবে না, গয়না এমনি জায়গায় সেরেছে।

নিয়ে নাও টাকাটা—

শম্ভুরাম সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে না। যে-মানুষ আগে এসেছেন, তাঁর সংগে কথা হয়ে গেছে। এই দামেই দিতে হয় তো তাঁকেই দেব।

গৌরীপতি চটে উঠলেন এবার ঃ খুলনা শহরে আমার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে—নামটা কি শুনি?

নাম বলতে পারব না আজ্ঞে। সেই রকম কথা তাঁর সংগে। কথা ভাঙব না।

বেশ, আমি যদি তার উপরে আরও পঞ্চাশ ধরে দিই।

নীলু স্যাকরা চোখ বড়-বড় করে বলে, রাগের বশে এটা কি করলেন বাবু। জিনিস কেনা কি লোকসান দিয়ে মরবার জন্যে?

গৌরীপতি কানেও তুললেন না। বললেন, সাড়ে-ছয় পেয়ে যাচ্ছ। কি বল এবার?

শম্ভুরামের মাথার মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। আরও এখন চেপে থাকার দরকার। দাম নিশ্চয় অনেক বেশি। অনেক—অনেক—অনেক—

বলে, তা হলেও একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমি খবর দেব আপনাকে।

চলে যাবার মুখে গৌরীপতি বলেন, পুরো সাত-শ' যদি দিই?

তিনিও তো উঠতে পারেন—সেই আগের মানুষ? আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু—

দরজা বন্ধ করে এলো। এর পরে ঘুম আসে না চোখে, কেউ শুতে যায় না। শম্ভুরামের বউ হেসে মাথার উপরের ফুটো চালের দিকে চেয়ে বলে, যাক রে বাবা। দু-দুটো বর্ষা জলে ভাসছি, এবারে ছাওয়া-ঘরে শুয়ে বাঁচব।

ঘরামি মানুষ শম্ভুরাম—দশজনের ঘর মেরামত করে বেড়ায়, অথচ নিজের ঘরের চালে কুটো নেই। বউ বলে বলে হয়রান। জবাব দেয়: আগে খাওয়া, তারপরে তো শোওয়া। পরের চালে উঠে উঠে খোরাকির জোগাড়টা হয়, নিজের চালে উঠতে গেলে সেটা কিন্তু বাদ পড়ে যাবে। দু-দিকের দুই হাঙ্গামা একলা মানুষ সামলে দিই কেমন করে? বউয়ের আজ সকলের আগে সেই কথাটা মনে এলো, বর্ষার রাত্রে জল বাঁচানোর জন্যে বিছানাপত্র একবার এখানে একবার ওখানে টানাটানি করতে হবে না। হোক না বৃষ্টি ঝুপঝুপ করে, একঘুমে রাত কাবার।

বলছে তাই, নতুন ছাউনির ঘরে আরাম করে ঘুমিয়ে বাঁচব রে বাবা!

শম্ভুরাম বলে, ঘর ছাইতে কে যাচ্ছে?

তবে মাঠে থাকব? রুয়ো-আটন খসে খসে পড়ে যাবে এবারের বর্ষায়।

শম্ভু উল্লাস ভরে বলে, ঘর ভেঙে দালান হবে। সাত-শ' আট-শ'—সে যে একগাদা টাকা—

কাজলীবালা এদের মধ্যে একটি কথাও বলে না। সে-ও জেগে। সে ভাবছে, এই মূল্যবান জিনিসটা যে হারিয়ে ফেলেছে, তার অবস্থা। সকলে গঞ্জনা দিচ্ছে তাকে হয়তো। গল্প শুনেছে, কোন্ এক বউ জলে ঝাঁপ দিয়েছিল গয়না হারানোর দুঃখে।

পরের দিন শম্ভুরাম কাজে গেল না। ঘরামিগিরি করবে কি—বড়লোক এখন। দাম অর্ধেক হাজারের উপরে উঠে গেছে, পুরো হাজার ঠিক উঠবে। চাই কি বেশিও উঠতে পারে—কতদূর উঠবে, কিছুই এখন বলা যায় না। শম্ভুরামের এক পরম বন্ধু বেশ খানিকটা লেখাপড়া জানে—তার কাছে বুদ্ধি নিতে গেল। বাড়ি নিয়ে এসে চুপি-চুপি দেখাল তাকে জিনিসটা। সে একেবারে আকাশে তুলে দেয়। কলকাতার সাহেব-জুয়েলার্সের বানানো জিনিস, নাম খোদাই আছে সেই ফার্মের। ছ্যাচড়া কাজ করে না সে ফার্ম, বড়মানুষ ছাড়া সেখানে যায় না। ভাল রকম যাচাই করে দেখে তবে জিনিস ছেড়ো, এই এক জিনিসে কপাল ফিরবে। কলকাতায় চলে যাও না হে—শহরের রাজা কলকাতা। কালোবাজার, সাদাবাজার, সাচ্চা কারবারি, ঝুটো কারবারি—সর্ব রকম সেখানে।

সারাদিন ভাবনা-চিন্তা, শলা-পরামর্শে কেটেছে। কলকাতায় যাওয়াই ভাল। অসংখ্য খদ্দের—উচিত মূল্য মিলবে। বন্ধুটিও সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। তার আগে এ-জায়গার সবচেয়ে বড় দোকান স্বর্ণভবন—পায়ে পায়ে শম্ভুরাম সেখানে চলে গেল। তারাই বা কি বলে, শোনা যাক।

কি চাই?

মালিক মশায়ের সঙ্গে কথা বলব একটু।

কর্মচারীটি চকিত হয়ে আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে। এই ধরনের মানুষ—ছেঁড়া জামা, তালি-দেওয়া জুতো, তৈলহীন রুক্ষ চুল, নাপিতের পয়সার অভাবে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—কিন্তু মানুষটা ছেঁড়া জামার পকেটে হয়তো সাত রাজার ধন নিয়ে ঘুরছে। নগদ পাঁচ-দশ টাকা হলেই দিয়ে চলে যাবে।

সসম্ভ্রমে সে আহ্বান করল: এই যে—পাশের ঘর। চলে আসুন।

মালিক মশায় বৈষ্ণবদাস খুব খাতির করে বসালেন: জিনিস আছে বুঝি?

শম্ভুরাম বলে, কুড়িয়ে পেয়েছে বাড়ির একজন।

হেসে বৈষ্ণবদাস বলেন, কুড়িয়ে পেয়েছে কি অন্য কোন ভাবে এসেছে তাতে আমার গরজ কি? দামের সেজন্য ইতর বিশেষ হবে না। এনেছেন?

সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার জিনিস নয়—গর্বভরে শম্ভুরাম বলল। দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে হবে আমার বাড়ি। তাই সকলে দিচ্ছেন।

বটে! বাড়ি কোথায় আপনার? কারা সব গিয়েছে?

শহরের সেরা যাঁরা, তাঁদেরই দু-তিন জন। হেজিপেজিরা গিয়ে কি করবে?

বৈষ্ণবদাস গম্ভীর হয়ে বলেন, দর কি রকম বলে?

শম্ভুরাম বলে, বলুনগে যা খুশি। আমি দু-হাজারের নিচে নামতে পারব না মশায়।

সবিস্ময়ে বৈষ্ণবদাস চোখ তাকিয়ে পড়লেন: এমন জিনিস?

দেখতে পাবেন যদি যান দয়া করে। সাহেব-বাড়ির জিনিস—হীরেই তো আট-দশখানা।

রাত্রে ভাল ঠাহর হয় না। কাল ভোরবেলা আমি বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। কতটুকু আর পথ! তার আগে মাল যেন বেহাত না হয়। এই কথা রইল।

বুড়ো মানুষ বৈষ্ণবদাস ভাল করে সকাল না হতেই হন্তদন্ত হয়ে শম্ভুরামের বাড়ি হাজির হয়েছেন। কিন্তু নেকলেশ সরে গেছে, চালের কুটোর মধ্যে নেই সে জায়গায়। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে শম্ভুরাম, বউ কপাল চাপড়াচ্ছে।

কাজলীবালাও নেই।

আগের দিন শম্ভুরাম যখন স্বর্ণভবনে গেছে, এদিকে এক রহস্যময় ব্যাপার। কাজলীবালা বাড়ির গলিতে ঢুকছে, মুখের উপর ঘোমটা-ঢাকা অচেনা একজন হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তুমি কাজলীবালা তো? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, শুনে যাও।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, আমি তো জানি না আপনাকে—

ঘোমটা এখন কমেছে কিছু। অপরূপ সুন্দরী, কাজলীর দিদির বয়সি হবেন। বড়ঘরের বউ নিশ্চয়—ভালভাবে থাকেন, ভরভরন্ত গড়ন।

কাজলীবালা বলে, আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বউ বলে, গরজ বলেই চিনতে হয়েছে। নেকলেশ কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি তুমি, অনেকের মুখে তোমার নাম।

আরও একটি খদ্দের—সন্দেহ নেই। ভাগাড়ে মরা-গরু পড়লে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির করতে হয় না—কাক-শকুন-শিয়ালের মধ্যে আপনি খবর পড়ে যায়। তেমনি সব এসে খোঁজাখুঁজি করছে। কাজলীবালার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। বলে, বিক্রি করব না। গোড়ায় সামান্য জিনিস ভেবেছিলাম, তখন এত বুঝে দেখিনি। পরের জিনিস বিক্রি করে টাকা নেওয়া—সে তো চুরি। গরিব-দুঃখী আছি, চোর কেন হতে যাব? যার জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দেব।

বউ বলে, সে মানুষ পাবে কোথায় খুঁজে?

তারই বেশি গরজ। কানে পড়লে খুঁজে খুঁজে চলে আসবে—এই যেমন আপনি এসেছেন। খবরের কাগজে ছেপে দিলে নাকি অনেকের চোখে পড়ে। পয়সা থাকলে তাই করতাম।

বউ শিউরে উঠে বলে, ওসব করতে যেও না, কখনো না। যার জিনিস তাকে খুঁজে পাবে না। পণ্ডশ্রম। সে মানুষ ধরা দেবে না।

কেন?

কি জানি—। বউ ইতস্তত করে যেন এক মুহূর্ত। বলে, হয়তো প্রকাশ হতে দিতে চায় না ঐ জায়গায় গিয়েছিল। গয়না হারানোর অন্য কোন গল্প রটনা করে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখে তাকিয়ে কাজলী-বালা বলে, আপনি জানলেন কি করে?

অনুমান—

কাতর হয়ে বউ বলে উঠল, চারিদিকে বড্ড চাউর হয়ে যাচ্ছে. ওটা আমায় দিয়ে দাও। বিক্রি করতে চাও না, দামও আমি দেবো না। কাপড়-চোপড় কিনো। মিষ্টিমিঠাই খেও, সেইজন্য কিছু ধরে দিচ্ছি।

যা ভেবেছিল, খদ্দেরই ইনি। কিছুমাত্র আর সন্দেহ নেই। চালাক খদ্দের—সস্তায় নেবার জন্য কায়দা করে ভিন্ন ভাবে কথা বলছে।

কাজলীবালা বিরক্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলে,

কথা একই, বিক্রির রকমফের। আমি দেবো না।

তবে ফেলে দিয়ে এসো গাঙের জলে। আমায় না দাও, দু-জনে এক সঙ্গে গিয়ে জলে ফেলে আসি।

মহিলাকে অগ্রাহ্য করে কাজলীবালা ঘাড় ফিরিয়ে ফরফর করে সুঁড়িপথে ঢুকে পড়ল। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্দিকে খবরটা চাউর হয়ে যাচ্ছে, শম্ভুরামও সেজন্য বিচলিত। বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা রওনা হবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—সেটা কাল কিম্বা পরশু, তার ওদিকে নয়। রাত থাকতেই কাজলীবালা নেকলেশ চুপিসারে বের করে নিয়ে থানায় চলল। সকলের মাথার উপর সরকার বাহাদুর—তাঁদের জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত। খবরের কাগজে ছেপে কিম্বা যেভাবে হোক, মালিকের খোঁজ করে দিনগে তাঁরা। পরের জিনিস বাড়ি এনে কাজলীবালা মহাপাপ করেছিল, সেই পাপ মোচন হয়ে গেল।

সেটা হয়তো হল, কিন্তু কাজলীবালার ছাড় হয় না। এই চেহারা, এই পোশাক—তার মুঠোর ভিতরে এমন দামি জিনিসটা। থানাওয়ালারা তোলপাড় লাগিয়েছে : কোথায় পেয়েছিস, বল্ সত্যি কথা। এমন জিনিসটা হারিয়ে ফেলে মালিক লোকটা থানায় একটু জানান দিল না—বললেই অমনি বিশ্বাস করব? কোন মুলুক থেকে চুরি করে এনেছিল, তাই বল্। সাঁড়াশি দিয়ে পেটের ভিতরের কথা আমরা টেনে বের করতে জানি। নিজের ইচ্ছেয় কবুল কি বলিস, শুনে নিই আগে—সে পথ তারপরে তো আছেই। সরকার মাইনে দিয়ে এমনি-এমনি থানার উপর পোষে না আমাদের।

পুলিসের একটা দল কাজলীবালাকে নিয়ে শম্ভুরামের বাড়ি চলল। মজার গন্ধ পেয়ে পথের মানুষও জুটেছে। এমনিতরো আর কিছু জিনিস মেলে কিনা দেখবে তল্লাসি করে। কাজলীবালা আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে : ও দিদি, ও দাদাবাবু, আমায় আটকে রাখবে। মারধোর দেবে। জামিনের বন্দোবস্ত কর, জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আন। জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে জমা দিতে গিয়েছি—আমি তো মন্দ কিছু করিনি।

শম্ভুরাম শুনতে পায় না, কানে বোধ হয় ছিপি-আঁটা। শম্ভুরামের বউ বলছে, আমরা কিছু জানিনে হুজুরমশায়রা। বোন একরকম বটে, কিন্তু আমার সংসারের কেউ নয়। রীতচরিত্রের দোষে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে—না খেয়ে ভিখারির হাল হয়ে এসেছিল, দয়া করে ঠাঁই দিয়েছি। দেওয়া খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। দিন আনি দিন খাই, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় যেতে পারব না। যা ইচ্ছে আপনারা করুন গে।

আবার তাকে থানায় নিয়ে তুলল। যা গতিক বাড়ি রেখে গেলেও ঝেঁটিয়ে বের করে দিত। কাজলীবালা হাপুসনয়নে কাঁদছে। হারাধন মোক্তার কি কাজে এই সময়টা থানায় গিয়েছেন। কী ব্যাপার, মেয়েটা কাঁদে কেন? করুণা হল মোক্তারমশায়ের। বললেন, জামিন হয়ে আমি সইসাবুদ করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চল।

হারাধন তারপর নিজে শম্ভুরামকে বলে-কয়ে দেখেছেন। কাজলীর নাম শুনলেই বোন-ভগ্নিপতি মার-মার করে ওঠে। অত্যন্ত স্বাভাবিক। এত বড় মুনাফা ফসকে গেল মেয়েটার দুর্বুদ্ধির জন্য। ঘরামি শম্ভুরামের জীবনে তাহলে চালের উপর উঠতে হত না,

পায়ের উপর পা রেখে বাবুমানুষের মতো দিব্যি দিন কেটে যেত।

বলে যাচ্ছেন হারাধন হালদার—বলাধিকারী তন্ময় হয়ে শুনছেন। নানান ফরমাসে বারম্বার সামনে ডাকেন মেয়েটাকে। তালপাতার সেপাই—আঙুলের টোকায় বোধ করি মাটিতে লুটাবে। সেই মেয়ের মনের এমন বল, অত টাকার লোভ অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে দিল।

হারাধন মোক্তার বলেন, সাহেব-বাড়ির গয়নার শেষ গতিটা শুনবেন না? সেই নেকলেশ অনাদি সরকারের বউয়ের গলায়। সরকার মশায় তখন সদর থানায়। প্রোমোশান পেয়ে তারপরে আপনারই পাশে ঝিনুকপোতায় চলে গেলেন। ঝিনুকপোতার বড়বাবু। তাঁর বউয়ের গলায় উঁকি মেরে দেখবেন, হীরের নেকলেশ ঝিকঝিক করছে আপনার ছোট মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে তিনিও তো গিয়েছিলেন—আপনি না দেখে থাকেন—বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর ঠিক দেখেছেন।

সরকারি নিয়মানুযায়ী কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল—মূল্যবান নেকলেশ পাওয়া গিয়াছে, মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দর্শাইয়া লইয়া যাউন। নোটিশ লটকে দেওয়া হল সমস্ত সদর জায়গায়। মাসের পর মাস যায়। একটা মানুষ এসে হুঁ-হাঁ করল না।

কী করা যায়।

কোর্ট হুকুম দিল, নিলামে তোলা হোক বস্তুটা। বিক্রির টাকা সরকারে জমা হবে। এইবারে অনাদি সরকারের তদ্বির। সে যে কী ব্যাপার, বর্ণনায় বোঝানো যাবে না। সমুদ্র-মন্থনে জলের আলোড়ন হয়েছিল—অনাদি সরকার জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তদ্বিরের ব্যাপারে। যে তদ্বিরের শক্তিতে বি. এ.—এম. এ. পাশদের টপাটপ ডিঙিয়ে ঝিনুকপোতার মতো থানার বড়বাবু। অনাদি বলল, শখের জিনিসটা পায়ে হেঁটে একবার যখন থানায় উঠেছে, ফেরত যেতে দিচ্ছিনে।

যা বলল, ঠিক তাই। যথারীতি নিলাম হয়ে সর্বোচ্চ ডাক আড়াই-শ টাকায় শৈলবালা দেবী জিনিষটা পেলেন। শৈলবালা হলেন অনাদি সরকারের বাড়ির পুরানো রাঁধুনী—ভাল কাপড়চোপড় পরিয়ে টাকা হাতে দিয়ে তাকে নিলাম ডাকতে পাঠাল। এছাড়া আরও দুটি খদ্দের ছিলেন, ডাকাডাকি করে দর বাড়ালেন। দুজনেই মহিলা। মহিলা ছাড়া এই বাজারে নগদ টাকা বের করে গয়না কিনতে যাবে কে? তাঁরা হলেন উমাশশী ভড় আর বীণা চক্রবর্তী। উমাশশী অনাদির বাড়ির চাকরানি, আর বীণা চক্রবর্তী হলেন অনাদির পরম অনুগত জমাদার হেমন্ত চক্রবর্তীর বউ। বীণা ডাক পেলেও বস্তুটা অনাদির বাসার আসত।

কেস তো কিছুই নয়—কাজলীবালা জামিনে মুক্ত ছিল, এইবারে সম্পূর্ণ ছাড় হয়ে গেল। অধিকন্তু সদাশয় হাকিম নেকলেশের মূল্য থেকে দশ টাকা তাকে দিতে বললেন। হারাধন মোক্তারের উপর কৃতজ্ঞতার অবধি নেই—জামিন হওয়া থেকে শেষ অবধি মামলা চালানো তিনিই করেছেন। টাকা এনে কাজলীবালা তাঁর হাতে দিল। কিন্তু মোক্তারি ফী এবং আনুষঙ্গিক খরচখরচায় পাওনা তো বিস্তর—দশটা টাকায় কি হবে? পুরানো ঝি দেশে চলে যাওয়ায় কাজলীবালা তার জায়গায় কাজ করেছে—সেই কয়েক মাসের মাইনে যোগ দিয়েও অনেক বাকি থেকে যায়। পুরানো ঝি এসে গেছে, কাজলীবালাকে দরকার নেই—কিন্তু পাওনা আদায়ের কি হবে, তাই ভেবে হারাধন ইতস্তত করছেন।

ছোট মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে জগবন্ধুর বাসা ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি তবু কাজকর্মে বাইরে বাইরে থাকেন, ভুবনেশ্বরীর একলা ঘরে মন টেঁকে না। কথাটা হারাধন মোক্তারের কানে গেছে। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন, দরকার থাকে তো আপনি নিয়ে যান বলাধিকারী মশায়। মেয়েটা এমনি ভাল, ঝিয়ের কাজ ভালই করবে। আমার প্রাপ্যটা দিয়ে যান, মাইনে থেকে মাসে মাসে শোধ করে নেবেন।

না—। বলে জগবন্ধু সজোরে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, ঐ জাতের মেয়েকে ঝি করে রাখব এত বড় শক্তি আমার নেই, বড় বউয়েরও নেই— ।

পরক্ষণে বলে উঠলেন, রাখব, রাখব। ঝি মানে তো মেয়ে। মেয়ে ক'টার বিয়ে হয়ে গেল—কাছোপিঠে আর এক মেয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াবে। বোঁচকাবিড়ে বেঁধে নে কাজলীবালা, নিজের বাসায় যেতে হবে।

(ক্রমশ)

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

হিটলার

এই গত রবিবারের 'আনন্দবাজারেই' দেখি, আমাদের শিবুদা হিটলারকে নিয়ে একখানা 'পান্' ছেড়েছেন। 'হের হিটলার নাকি নিজের গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে বহাল তবিয়তে আর্জেনটিনায় বিরাজ করছেন।' এর উপর শিবুদার 'পান্'—'তার গোঁ গেছে, এখন গোঁফও গেল।' (১)

আমি কিন্তু পান্‌টার দিকে নজর দিচ্ছি না। আমার নজর ঐ তত্ত্ব কথাটির দিকে যে হিটলার এখনো বেঁচে আছেন।

সত্য নাকি?

আমি এবার জর্মানীতে বেশী লোককে এ প্রশ্ন শুধোইনি। তার কারণ আমি নিজে যখন নিঃসংশয় যে হিটলার বেঁচে নেই তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আমার লাভ কি? যে দু'একজনকে শুধিয়েছিলুম তারাও নিঃসংশয়—বেঁচে নেই।

তা হলে প্রশ্ন, তিনি যে বেঁচে আছেন এ-গুজোবের উৎপত্তি কোথায়?

হিটলার মারা যাওয়ার মাস তিনেক পর বার্লিনের কাছের শহর পৎসদামে মিত্রশক্তির এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নাকি স্তালিন বলেন, তাঁর বিশ্বাস, হিটলার মারা যাননি, গা ঢাকা দিয়ে আছেন। এর কিছুদিন পর রাশান এনসাইক্লোপীডিয়ার নূতন সংস্করণের প্রকাশ হয় এবং তাতে বলা হয়, হিটলার অদৃশ্য হয়েছেন—তিনি যে মারা গেছেন এ-কথা রুশ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে দুনিয়ার সর্বত্র কত রকমের যে গুজোব রটল তার ইয়ত্তা নেই। আর্জেণ্টাইন, সউদী আরব কোনো জায়গাই বাদ পড়লো না, যেখানে হিটলার নেই। এমন কি এক কাষ্ঠরসিক প্রকাশ করলেন, তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদী-দের মাঝখানে বিরাজ করছেন! সে যুগে স্পুটনিক জাতীয় কোনো কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। না হলে হয়তো বলা হত, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করছেন। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চন্দ্রের লাতিন নাম লুনারিস—যার থেকে লুনাটিক—উন্মাদ—শব্দটা এসেছে এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন যে পরাজয়ের চরম অবস্থায় হিটলার নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তবে বদ্ধ উন্মাদ নয়, মুক্ত উন্মাদ। তাই আপন আদি বাসভূমে চলে গেছেন।

তা সে যাই হোক, ইংরেজ ভাবলে, হিটলারকে নিয়ে পৃথিবীতে না এক নূতন লীজেণ্ড সৃষ্ট হয়—১৯১৮ সালে জর্মানীতে যে-রকম এক লীজেণ্ড চালু হয় যে জর্মন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে হারেনি, ঘর শত্রু বিভীষণ (অর্থাৎ ইহুদি, সোশাল ডেমোক্রেট, কম্যুনিস্ট—যার যাকে অপছন্দ) যদি তার 'পিছন থেকে পিঠে ছোরা' না মারতো। হিটলার স্বয়ং এ লীজেণ্ডের প্রচুরতম 'সদ্ব্যবহার' করেন। ইংরেজের তাই ভয় হল, হিটলারকে কেন্দ্র করে নয়া এক লীজেণ্ড যেন, সৃষ্ট না হয় যার জোরে এক নব-নাৎসি-

---

হিটলার গোঁফ কামালেই যে তাঁর পক্ষে সেই-টেই সব শ্রেষ্ঠ ছদ্মবেশ এই নিয়ে ১৯৩৩ চৌত্রিশেই একটি কাঁচা রসিকতা চালু ছিল। একদা (হিটলার গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস ও রোম ছদ্মবেশে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠাহর করার জন্য বেরুলেন। হিটলার গোঁফ কামালেন, গ্যোরিঙ সিভিল ড্রেস পরলেন, গ্যোবেলস কথা বলা বন্ধ করে দিলেন ও রোম একটি প্রিদর্শন তরুণ সঙ্গে নিলেন। এ স্থলে বলে দেওয়া প্রয়োজন গ্যোরিঙ বড্ড বেশী য়ুনিফর্ম ভালো-বাসতেন, গ্যোবেলস প্রপাগাণ্ডা চীফ বলে সমস্ত-ক্ষণ বকর বকর করতেন আর রোম সমরতি-গামী অর্থাৎ হোমোসেকসুয়েল ছিলেন।

আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। অতএব উত্তমরূপে তদন্ত করা হোক, হিটলার বেঁচে আছে কি নেই।

এ কাজের ভার এক অতিশয় যোগ্য ব্যক্তির উপর পড়ে। ট্রেভার রোপার সাহেব খুব সম্ভব অক্সফোর্ডের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেনস্ ব্রাঞ্চ বা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন।

দীর্ঘ দিন ধরে অতি খ্‌ুটিয়ে খ্‌ুটিয়ে তিনি তাঁর তদন্ত চালান। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাঠক পাবেন তাঁর লেখা 'লাস্ট ডেজ অব হিটলার' পুস্তকে। অতি উপাদেয় সে পুস্তক। এক দিক দিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিকের মত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি সাক্ষীর বক্তব্য তিনি যাচাই করেছেন অতিশয় সন্তর্পণে, অন্য দিক দিয়ে তিনি সে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের মত সরস ভাষায়, মনোরম শৈলীতে। পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাকে কি করে উৎকণ্ঠিত উদগ্রীব

অবস্থায় পৌঁছিয়ে সর্বশেষে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাপ্তিতে রসসৃষ্টি করতে হয়. ঐতিহাসিক হয়েও ট্রেভার-রোপার এই কৌশলটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বস্তুত এরকম রোমাঞ্চকর পুস্তক আমি আমার জীবনে অল্পই পড়েছি।

কোনো কোনো অরসিক অবশ্য বলেছেন, বইখানা লুরিড, 'অর্থাৎ রগরগে, কিংবা বলতে পারেন, পুস্তকে বীভৎস রসের প্রাধান্য। এটা অবশ্য রুচির কথা; তবে আমার বিশ্বাস, বিষয়বস্তু নিজের থেকেই তার রসরূপ নির্ণয় করে। প্রকৃত ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট সে-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। সে যেন নিতান্ত মিডিয়াম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রানী চন্দ যেভাবে ঘরোয়া লিখেছেন। এস্থলে অবশ্য অবন ঠাকুরের স্থলে ঘটনা-প্রবাহই তার রসরূপ নির্ণয় করে দিয়েছে।

তৎসত্ত্বেও বহুতর লোক বিশ্বাস করতে নারাজ হলেন যে, হিটলার গত হয়েছেন; এরা যেসব আপত্তি তুললেন, ট্রেভার-রোপার তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলোকে দফে দফে হালুয়া করে ছেড়েছেন। ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করতেও জানেন। তাঁর বক্তব্য অনেকটা এই: শীতকালে যখন য়ুরোপের লোক গরম জায়গায় যেতে চায় তখন দেখা গেল যাঁরা—এঁদের অধিকাংশই খবরের কাগজের রিপোর্টার—ট্রেভার রোপারের রায়ে সায় দিচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন হিটলারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আর্জেনটিনায়, এবং গ্রীষ্ম-কালে বলেন, তাঁর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (গ্রীষ্মে শীতল, মনোরম) সুইজারল্যান্ডে। ট্রেভার-রোপার বলেননি, কিন্তু ইঙ্গিত করেছেন, অতএব পত্রিকার পয়সায় শীতে গরম জায়গা এবং গরমে শীতল জায়গায় দিব্য কয়েকটা দিন পরমানন্দে কেটে গেল।

তবে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, বই-খানাকে কেউ সিরিয়াসলি চ্যালেঞ্জ করেননি। এবং ট্রেভার রোপার তাঁর সর্বশেষ শিরোপা পেলেন রাশার কাছ থেকে। হালে রাশান এনসাইক্লোপীডিয়ার যে নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে বলা হয়েছে হিটলার মৃত।

শুধু এই বই নয়, হিটলারের সঙ্গে যাঁরা তাঁর 'বুঙ্কারে' (বোমারু বিমানের বোমা থেকে আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ভূগর্ভস্থ আশ্রয়-গৃহ) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তাঁদের জীবিতজন মাত্রই পরবর্তী কালে বই লিখে-ছেন, বিবৃতি দিয়েছেন অথবা খবরের কাগজে মাসিকে প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এঁদের সকলে মিলে একজোট হয়ে হিটলারের মৃত্যুর একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে নানা ঘড়েল পুলিস, রিপোর্টার ইত্যাদির ক্রস এগজামিনেশনে পাস করে এখনো সেটা আঁকড়ে ধরে আছেন, এটা অবিশ্বাস্য। আরো নানাবিধ কারণ আছে এবং ট্রেভার-রোপার সেগুলো সবিস্তর আলোচনা করেছেন। হালে শায়রার (Shirer) নামক একজন মার্কিন কর্তৃক লিখিত হিটলারের রাজত্ব সম্বন্ধে বিরাট একখানা বই বেরিয়েছে এবং ইতিমধ্যে তার জর্মন অনুবাদও হয়ে গিয়েছে। বইখানা মোটের উপর ভালোই কিন্তু ওভার সিমপ্লিফিকেশনের দোষে দুষ্ট। শায়রার ও হিটলারের অন্যান্য জীবনী-লেখকগণও ঐকনাদে স্বীকার করেন, হিটলার মৃত।

কিন্তু হিটলার জীবিত না মৃত সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই, জর্মন জনগণ হিটলার সম্বন্ধে কি ভাবে, আবার যদি অন্য রঙ ধরে আরেক হিটলার দেখা দেন তবে সে তার অধুনালব্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বর্জন করে পুনরায় গড্ডলিকাস্রোত বওয়াবে কিনা? এবং ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সে যে এক বিরাট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেল সে সম্বন্ধে তার মতামত কি?

যাদের বয়েস পঁচিশ ত্রিশের চেয়ে কম তাদের জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, কারণ যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের কারো কারো কিছুটা মনে আছে বটে, কিন্তু হিটলারের চিন্তা ধারা কর্মপদ্ধতি আপন বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার মত বয়েস তাদের তখনো হয়নি। যাদের বয়েস তার চেয়ে বেশী তারা একদম চুপ; কোনো কিছু বলতে চায় না। এরা যে ভয়ে মুখ খুলে না তা নয়, কারণ আমি যাদের চিনি তাদের অধিকাংশই ছিলেন সোশাল ডিমক্রেট, কিংবা ক্যাথলিক সেণ্টার (আজ আডেনাওয়ার যার দলপতি) এবং হিটলার-বৈরী। ১৯৩৭।৩৮-এ বরঞ্চ এঁরা ফিসফিস করে আমার কানে কানে হিটলার রাজ্যের তীব্রতম নিন্দা করেছেন। কিন্তু আজ আর কোনো জর্মনই অতীত নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। এ যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে, এটাকে নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ কি?

আমার কোনো পাঁড় নাৎসি বন্ধু ছিল না, একজন মোলায়েম নাৎসির সঙ্গে বেশ কিছুটা হৃদ্যতা হয়েছিল। তার সন্ধান পেলুম না। তার আমার, দুজনার, অন্য এক বন্ধু বললে, খুব সম্ভব মারা গিয়েছে।

তবু আমি প্রাচীন পরিচয়ের একাধিক জর্মন মিলিত হলে কথার মোড় ঐ দিকে ঘোরাতুম। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হত না। পাঁচ মিনিটের ভিতর সবাই যুদ্ধ বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করত। তাতে করে আর যা হোক, হিটলার-দর্শনের উপর নূতন কোনো আলোকপাত হত না।

একদা যারা কট্টর নাৎসি ছিল তাদের বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই নাৎসিবাদ ত্যাগ করেছে কিন্তু বেশ কিছু নাৎসি এখনো গোপনে ঘাপটি মেরে বসে আছে—চিন্তার জগতে; বাইরে অবশ্য আর পাঁচজনের মত তারাও দরকার হলে হিটলারের নিন্দা করে, কারণ নাৎসি-উইচ-হান্টিং, অর্থাৎ ডিনাৎসিফিকেশন এখনো শেষ হয়নি (এই তো মাস তিনেক পূর্বে ইয়োরোপ-বিখ্যাত এক শহর-প্ল্যানার জর্মনকে ধরা হয়েছে—সে নাকি ১৯৪৫ সালে প্রায় ত্রিশজন ইটালিয়ান মজুরকে গুলী করে মারার আদেশ দেয়)। (২) এরা পুনরায় এক নূতন হিটলারের পিছনে জড়ো হবে সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, গুরুবাদ জিনিসটা একবার শিকড় গাড়লে সমূলে সম্পূর্ণ বিনাশ পায় না—হিটলারকে জর্মনি যেভাবে পুজা করেছে আমাদের চরম কর্তাভজারাও এতখানি কখনো করেনি।

উপস্থিত এদের কথাও কেউ শুনবে না—অবশ্য সে সাহস তাদের এখনো হয়নি, হতে হলে বেশ কিছুদিন লাগবে। কারণ জর্মনী এখনো অবসন্ন। রাজনৈতিক উত্তেজনা তার যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।

---

(২) ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে জর্মনিতে একটি কেন্দ্রীয় বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একমাত্র কাজ পাঁড় নাৎসিদের ধরে ধরে সাজা দেওয়া। এর পূর্বে জর্মানীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেখানকার সাধারণ বিচারালয়ে এদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলতো। এদের প্রধান অসুবিধা: যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পূর্ব থেকেই ঘড়েল নাৎসিরা খাঁটি, অকৃত্রিম সরকারী পাসপোর্ট জাল নামে তৈরী করিয়ে নেয়। এবং এখন আপন বাসভূমি থেকে—জর্মনিতেই—গা ঢাকা দিয়ে বসবাস করছে। দ্বিতীয় অসুবিধা: একাধিক পরদেশী রাষ্ট্র তাদের দেশে আশ্রয়-প্রাপ্ত নাৎসিদের ধরে জর্মনিকে ফেরৎ দেয় না।

হালে জর্মনির বেতার কেন্দ্রের প্রশ্নে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চীফ জাস্টিস বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান কবে গুটনো হবে তার স্থিরতা নেই।'

ছাঁট-কাট সাহিত্য

জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু সেদিন একটা মজার কথা বললেন। চীনের ভারত আক্রমণ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, কাজেই তাঁর কথাটাও উঠেছিল ওই প্রসংগ থেকে। উনি বললেন, 'আজকাল চীনে কিরকম বইটই লেখা হয় মশাই, জানেন?' আমি মাথা নাড়লাম। জানি না। সাহিত্যিক বন্ধু হেসে বললেন, 'আমিও কিছু জানি না। শুনেছিলাম, ওরা সাহিত্য-টাহিত্য নাকি বেশ সরল করে ফেলেছে। ছে'টেকেটে সাফ করে নিয়েছে নাকি!'

বন্ধুর কথায় আমার আর-এক কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা কথা পড়েছিলাম কোথায় যেন। তাতে বলা হয়েছিল, কমিউনিজম সাহিত্যের ব্যাপারটা বেশ সরল করে দর্জির হাত দিয়ে ছে'টে নিয়েছে। তার কাছে দুটো মাত্র বিষয়, নির্লজ্জের মত পার্টির গরিমা প্রকাশ আর আত্মতৃপ্তির ভুয়ো উদ্গার।

কথাটা নিশ্চয় ঠাট্টা করে বলা। কিন্তু একেবারে অহেতুক ঠাট্টা যে তা নয়। বলতে বাধা নেই, কমিউনিস্টদের কাছে সাহিত্য বাস্তবিকই খুব ছাঁটাকাটা। কোনো কোনো সাহিত্যিককে বিশেষ করে না ধরলে, কমিউনিস্ট-সাহিত্য থেকে আমরা সচরাচর যা পাই তার দাম বড় কম। একেবারে হালে রাশিয়ায় কি হচ্ছে সেদিকে চোখ রেখেও অস্বীকার করা মুশকিল, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সাম্য-সাহিত্যে জীবনের চেহারাটা একেবারে সরল। কে কতটা গম বুনছে, কার কতটা ধান কাটা হল, লোহার কারখানায় কাজ করার সময় শ্রমিক কী অপরিসীম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছে—ইত্যাদির ফিরিস্তি ছাড়া বড় একটা কিছু পাওয়া মুশকিল।

জীবনকে এভাবে সরল করে নেওয়ার নির্দেশ আসে ওপরঅলার কাছ থেকে। ব্যক্তিজীবনকে যেহেতু এই সমাজ মূল্য দেয় না—তার সবকিছু সমষ্টিগত-অর্থে এবং রাষ্ট্রের জন্য সেহেতু লেখককে ব্যক্তির বিবিধ সমস্যায় ডুব দিতে হয় না, গমক্ষেতের ফলন নিয়ে সাহিত্য করতে হয়। এমন নয় যে, গমক্ষেত নিয়ে সাহিত্য করা নিষিদ্ধ। বস্তুত প্রশ্নটা আদপেই এখানে নয়। প্রশ্ন হচ্ছেঃ যেখানে সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না পাচ্ছেন সেখানে তাঁর পক্ষে একটি ব্যক্তির চরিত্রের ও মানসিকতার সর্ব-প্রকার বিষয় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মানুষের জীবন ও চরিত্র বেশীর ভাগ সময়ই সরল ধারাপাত নয়। শুধু মাত্র খেয়ে, কাজ করে, আর ঘুমিয়ে মানুষের দিন কাটে না। তার মাথায় আর পাঁচটা পোকা নড়ে, তার শরীরের তলায় আর পাঁচটা প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়, তার মাথার ঘিলুর আশে-পাশে একটি কল্পনা বলে পদার্থ কাজ করে। অনেক কিছু কখনও একসংগে, কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করে বলেই আমাদের জীবন জটিল। কোনো এক য়ুরোপীয় সাহিত্যিক আর-এক কমিউনিস্ট রুশ সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি ডস্টয়ভস্কির লেখা চরিত্রের সঙ্গে কখনও মিশতে পেরেছেন?' জবাবে রুশ সাহিত্যিক বলেছিলেন, 'না, আমি পাগলদের সংগে মেশা পছন্দ করি না। পাগলদের অন্য জায়গায় রাখা উচিত, কাছাকাছি রাখা বিপজ্জনক।'

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

চীনের বর্তমান সাহিত্য বিষয়ে আমার অজ্ঞতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এ-বিষয়েও আমার সন্দেহ নেই, তার মধ্যে যা আছে তা একেবারে ছাঁটকাট করা। সাহিত্য সেখানেই জটিল, এবং জীবনের আশ্চর্য আশ্চর্য অনুভূতির প্রকাশ হতে পারে যেখানে ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণ স্বীকার করা হয়। যে ঘোড়াকে লাগাম টেনে বাঁধা পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সে-ঘোড়ার সুবিধে এই যে, সে সোজা বাঁধা-ধরা পথে কদম ফেলে, আশে-পাশে তাকে যেতে হয় না। লাল চীনের সাহিত্য তার সামরিক বাহিনীর মতন যথা-নিয়মে ড্রিল অভ্যাস করছে, কর্তার হুকুমে কদম ফেলছে এ-কথা বিশ্বাস করতে বাধবে কেন তবে!

আমি এমন কথা বলব না, চীনে যে-লেখকগুলি কবিতা গল্প বা উপন্যাস লিখছে তারা জন্মাবধি জড়। এ-রকম সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে মানুষ তার দ্বিধা সংশয় সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ পায় না, যেখানে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকেও শক্ত হাতে দমন করার অভ্যাস প্রচলিত সেখানে কোনো লেখকের পক্ষেই আত্মপ্রশ্ন তোলা সম্ভব নয়। কেননা প্রশ্ন তুললেই মগজ ধোলাই অবশ্যম্ভাবী।

আশা করি অচিরে এ-সাহিত্যের কিছু নমুনা পরিবেশন করতে পারব।

একটি চিঠি

'বিদুর' সমীপেষু,

অনেকদিন আগে শুনেছিলুম বহু লেখক, এবং নামী লেখকেরাও পুজোর আগে একটা মস্ত উপন্যাস লিখে নেন—তারপর পাণ্ডু-লিপির গোছাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পৃথক পৃথক পত্রিকায় এক একটি ভাগ পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ 'ভাগার মাছ', 'ভাগার লংকা', 'ভাগার গল্প'।

কিন্তু এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ এই প্রথম দেখলুম। শারদ বসুধারায় 'দ্বিতীয় অংক' ('উপন্যাস' বলে চিহ্নিত)। তারপর দেখি পুজোর নবকল্লোলে এই লেখকের 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' "জোনাকির দীপ"। এটি যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকে 'দ্বিতীয় অংক' আরম্ভ। সেই এক পাত্রপাত্রী নিয়ে।

দ্বিতীয় অংক পড়েছি, ভাগটা উৎরে গেছে, পড়লে মনে হয় না 'ভাগ'। 'জোনাকির দীপ' পড়িনি কিন্তু শুনলুম ওটি তা হয়নি, শেষে মনে হয় "এ কি হল?" এর উত্তর পাওয়া যায় 'দ্বিতীয় অংক' পড়লে—আর এইবার সন্দেহ হচ্ছে এই উপন্যাসের আরও আছে, অন্য কোথাও। শারদীয়া '......' হাতের কাছে নেই (বৌদি পড়তে নিয়েছেন!) ওতে হয়ত বাকিটা আছে।

এই 'ভাগার সাহিত্য' নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবেন 'সাহিত্য সংবাদে?' যদি অবশ্য আগে না করে থাকেন। ভবদীয়—

দীপংকর বসু।

পুস্তক পরিচয়

কিশোর সাহিত্য : কয়েকটি মনোরম গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

অচিন্ত্যকুমারের কিশোর সঞ্চয়ন। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর কিশোর সঞ্চয়ন। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে "কিশোর সাহিত্য" শব্দটি কম ব্যবহৃত। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, বাংলায় কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য আদৌ নেই, বা কয়েক-দশক আগেও ছিল না; কিংবা এর প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভূত হয়নি। আসলে এতাবৎকাল ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্য "শিশু সাহিত্য" নামেই পরিচিত ছিল—তা, সে সাহিত্য শিশুদের উপযোগীই হোক, আর বালক বা কিশোরদের উপযোগীই হোক। কিন্তু তা হলেও কিশোরদের জন্য রচিত সাহিত্য আর শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য যে এক 'নয়', এবং এদের জন্য রচিত সাহিত্য যে অপরকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারে না—এটাও বোঝা গিয়েছিল। এবং এই বোধই যে "কিশোর সাহিত্য" শব্দটির উদ্ভবের কারণ, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শব্দটির উদ্ভব হলেও, শব্দটি যে বস্তুর অভিধা, সে বস্তুটির অস্তিত্ব বাংলায় খুবই ক্ষীণ। খ্যাতনামা কয়েকজন সাহিত্যিকের বিচ্ছিন্ন এবং আংশিক প্রচেষ্টা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের এ বিভাগটির গর্ব করার যথেষ্ট সম্পদ ছিল না।

আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের প্রকাশক সেই গর্বের বস্তুগুলিকেই কিশোরদের হাতে পৌঁছে দেবার এক পরিকল্পনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলির পরিকল্পনাকে অভিনব বলছি এই কারণে যে, এর আগে একটিমাত্র খণ্ডে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা প্রভৃতি সব রকমের রচনা (এর মধ্যে আবার এমন রচনাও আছে যেগুলি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, সুতরাং দুর্লভ) সংকলিত করে সেইসব সাহিত্যিকদের সামগ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে জানা নেই।

"অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন" গ্রন্থখানিতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খাতাঞ্চির খাতা" নামে একটি উপন্যাস, দুটি নাটক, ন'টি গল্প, পাঁচটি কবিতা এবং তিনটি প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে "খাতাঞ্চির খাতা" দীর্ঘকাল আগে প্রথম প্রকাশিক হলেও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য; এবং "গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত" এবং "টুকরির বাড়ি" গল্প দুটি ও কবিতা, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা রচনার সবগুলিই এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হল।

"অচিন্ত্যকুমারের কিশোর সঞ্চয়ন" গ্রন্থখানিতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "উঁচু-নিচু" নামে একটি উপন্যাস, ছ'টি গল্প, দশটি কবিতা এবং তিনটি প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা সংকলিত হয়েছে। আর "বুদ্ধদেব বসুর কিশোর সঞ্চয়ন" গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ হয়েছে "দস্যুর দলে ভোমরা" শীর্ষক একটি উপন্যাস, দুটি নাটিকা, চারটি গল্প, চারটি কবিতা এবং তিনটি প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা রচনায়।

বর্তমানে, কিশোর সাহিত্য বলতে যখন সস্তা আর বিকৃত রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাস বোঝায়, সেই সময়ে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিকদের রচিত সুসাহিত্যাবলী—যা কিশোরদের অপরিণত মনগুলিকে শুধু ক্ষণিক উত্তেজনার খোরাক যোগাবে না, বরঞ্চ তাদের চিত্তে একটি স্থায়ী রসলাবণ্যের স্পর্শ দেবে, তাদের চেতনাকে পরিস্ফুট করে তুলবে, তাদের মানসিক পুষ্টির কারণ হবে—বাংলার কিশোরদের হাতে তুলে দিয়ে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির যেভাবে সংপ্রকাশকের দায়িত্ব পালন করলেন, তার জন্য সকলের অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য। (২৮৭, ২৮৮, ২৮৯।৬১)

বর্তমান চীনের প্রকৃত চিত্র

আজকের চীনে—লেখক ডঃ এস চন্দ্রশেখর, অনুবাদক—অধ্যাপক নিরঞ্জন হালদার। পরিচয় পাবলিশার্স, ৩।১, নফর কোলে রোড, কলিকাতা—১৫। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ১৯৫৮ সালে কমিউনিস্ট চীন পরিদর্শন করিতে যান। এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়বস্তু প্রবন্ধাকারে ভারতের এবং ভারতের বাহিরের কয়েকখানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধ সমষ্টি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তাহারই বঙ্গানুবাদ। কমিউনিস্ট চীনের প্রায় সব ব্যাপার সম্পর্কেই গ্রন্থকারের প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। তন্মধ্যে তথাকার কৃষিব্যবস্থা, কমিউন, শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার প্রথা, জনসংখ্যা ও তাহার সমস্যা বিশেষভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসহকারে গ্রন্থকার কোন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই তিনি যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ফলে সমগ্র পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ অধ্যুষিত কমিউনিস্ট চীনের অবস্থা যাহারা জানিতে উৎসুক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা লাভবান হইবেন। ১৯৫৯ সালের তিব্বত বিদ্রোহ এবং কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে তিব্বতের লড়াই সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানী প্রকৃত প্রস্তাবে অনুবাদ সাহিত্য হইলেও ভাষান্তরজনিত কোনপ্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা ইহাতে প্রকাশ পায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থে অনুবাদকের লিপিচাতুর্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ৩২২।৬২

প্রাপ্তি সংবাদ

The Lyric in Indian Poetry—Alokeranjan Das Gupta.

আমার ঘরের আশেপাশে—ডঃ তারকমোহন দাশ।

তবলার ব্যাকরণ (প্রথম আবৃত্তি)—শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাল মাকড়শা—মণিলাল অধিকারী।

বৃত্তান্ত—স্যাঁ জন প্যার্স—অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আরো একজন—রমাপদ চৌধুরী।

সমুদ্র অনেক দূর—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

ছবি ও গল্পে যীশুর জীবন—সুবোধ বিকাশ দত্ত।

টুই-টুই—শৈলেন ঘোষ।

করুণা কোরো না—জগমোহন মজুমদার।

গল্পের জন্ত—অন্নপূর্ণা সান্যাল।

গীতার প্রবেশিকা—বি বটব্যাল।

রঙ্গজগৎ

অভিনয়-শিল্পীদের আত্মদান

জাতির সংকট-মুহূর্তে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে **অভিনেতৃ সংঘ কলকাতার** পার্কে পার্কে অল্পকালব্যাপী যে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন তা অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য। জাতীয় সংকট শুরু হওয়ার সংগে সংগেই অভিনেতৃ সংঘ এই মহৎ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনেতৃ সংঘ এই সত্যটি হৃদয়ংগম করেছেন যে, জাতীয় প্রতিরক্ষার কাজে অস্ত্রের চেয়েও বড় হল আত্মবিশ্বাস, অর্থের চেয়েও বড় হল দেশপ্রেম। তাই তাঁরা জনমনে আত্ম-বিশ্বাস ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছেন।

কলকাতার বিভিন্ন পার্কে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে দেশাত্মবোধক নাট্যাভিনয়ে যে শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত শিল্পী-জীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু দিনের পর দিন নিঃস্বার্থভাবে জনসাধারণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করছেন না। এই পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁরা পারিশ্রমিক চান না, সুনামও তাঁদের কাম্য নয়।

অপর দিকে, **মহিলা শিল্পী মহল**-এর আহবানে কলকাতার চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অভিনেত্রীরা দুর্গত মহিলা শিল্পীদের সেবায় ও জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রশংসা করে, ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের ছোট করতে চাই না। দেশপ্রেমের প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। অভিনয়-শিল্পীদের এই আত্মদান জাতি চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

"মিশরকুমারী"র অপর একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় (মাহাবিন) মলিনা দেবী (আবন) ও বনানী চৌধুরী (রামেশস)। ফটো—দেশ

মহাজাতি সদনে মহিলা শিল্পী মহল কর্তৃক অভিনীত "মিশরকুমারী" নাটকে জিনোর ভূমিকায় কানন দেবী। ফটো—দেশ

দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ

কলকাতার শিল্পলোক

স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রীন কো-অর্ডিনেটিং কমিটির উদ্যোগে **অভিনেতৃ সংঘ** কলকাতার বিভিন্ন পার্কে যে নতুন দেশাত্মবোধক নাটকটি নিবেদন করে চলেছেন তার নাম "এগিয়ে চলার ছন্দ"। এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাশ প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। নাটকটি রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন সুচিত্রা মিত্র।

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় **শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ** গত **৫ই** ডিসেম্বর লোকমান্য তিলক সভাগৃহে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে টাকা তোলার উদ্দেশ্যে **ইস্টার্ন রেলওয়ে সেন্ট্রাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন** গত **৮ই** ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখো

পথ-অভিনয়

কলকাতার পার্কে অভিনেতৃ সংঘের দেশাত্মবোধক নাটক "এগিয়ে চলার ছন্দ-"র দুটি দৃশ্যে (উপরে) অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, জহর রায় ও শিপ্রা মিত্র (নীচে) নাটকের সঙ্গে উদ্দীপক গান গাইছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (ডাইনে) জনতার সঙ্গে নাটকের শিল্পী দীপিকা দাশ। ফটো—দেশ

পাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পী।

এ ডব্লিউ ফিগজ স্টাফ লাইব্রেরী (নাট্য শাখা) গত ৭ই ডিসেম্বর স্টার-এ তারাশংকরের "দুই পুরুষ" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীবিজয় সিং নাহারের হাতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে ২৫০০ টাকা তুলে দেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে **সংগঠনী** সংস্থা গত ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর সংঘের নিজস্ব প্রাঙ্গণে "মহাপ্রেম" (রচনা : মন্মথ রায়) নাটকটি অভিনয় করেন।

গুঞ্জন সাংস্কৃতিক সংস্থা জাতির এই সংকট-মুহূর্তে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষার্থীদের দেশাত্মবোধক গান শেখাবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সংস্থা-সম্পাদক শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায় এ কাজে শিল্পীদের সহযোগিতা কামনা করে এক বিবৃতি দিয়েছেন এবং সংস্থা কার্যালয়ে (১বি, শশীভূষণ দে স্ট্রীট) সকলকে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

দশরূপক নাট্যসংস্থা ইতিমধ্যেই জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে তাঁদের দান পাঠিয়েছেন এবং আগামী মাসে তাঁরা "মহাপ্রেম" (মন্মথ রায় রচিত) নাটকটি অভিনয় করে আরও টাকা উক্ত তহবিলে পাঠাবেন। তা ছাড়া, দেশে আপৎকালীন অবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন তাঁরা প্রতি মাসে কিছু টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন।

"রক্তের ডাক" (পরিচালনা : সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়) নামক একটি নাটকের অভিনয় সহযোগে গত রবিবার উত্তরপাড়ায় একটি অভূতপূর্ব শোভাযাত্রার আয়োজন করেন সেখানকার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি। পথ-পরিক্রমার সময় শোভাযাত্রীরা নগরবাসীর কাছ থেকে অর্থ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাণ্ডেজের জন্য পুরনো কাপড় সংগ্রহ করেন। এবং রক্তদানের জন্য পথচারীদের কাছে তাঁরা আবেদন জানান। শোভাযাত্রায় ও নাট্যাভিনয়ে উত্তরপাড়ার বহু পুরনো ও নতুন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

রঙমহল-এর দান

গত ৮ই ডিসেম্বর রঙমহল-এ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নাটকের এক বিশেষ প্রদর্শনীর সমুদয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (মোট ১,৭২০ টাকা) পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তা ছাড়া, ওইদিন রঙমহল-এর কর্মীরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ২৭০ টাকা দান করেন। অনুষ্ঠানে অভিনেতা জহর রায় ব্যক্তিগত ১০১ টাকা দান করেন এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা রায় সাত ভরি সোনা দান করেন। অনুষ্ঠানের

উল্লেখযোগ্য দান হল তিনটি সোনার আংটি। দিয়েছে তিন শিশু—সর্বাণী, ইন্দ্রাণী ও সব্যসাচী। এরা জহর রায়ের পুত্র-কন্যা। সরযূ দেবী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোনার অলংকার দান করেন। নাট্যকার সলিল সেন একটি সোনার আংটি দান করেন।

"আমার দেশ"

দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের উপহার "আমার দেশ" (ই-আই-এম-পি-এ প্রযোজিত) ছবিটি গত সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। ছবির ইংরেজী ও হিন্দী সংস্করণ অনতিবিলম্বেই সারা ভারতে মুক্তি পাবে। ই-আই-এম-পি-এ'এর এই সংপ্রয়াস দেশবাসীর সাধুবাদ অর্জন করেছে।

"আমার দেশ" ছবিটিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় শিল্পীরা। কণ্ঠদান করেছেন বাংলা ছবির প্রখ্যাত নেপথ্যশিল্পীরা। তপন সিংহ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্যকারও তিনি। বিশিষ্ট কলাকুশলী যাঁরা ছবিতে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিমল মুখোপাধ্যায়, বিশু চক্রবর্তী ও কানাই দে (আলোকচিত্র-শিল্প) এবং শ্যামসুন্দর ঘোষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রপরিচালক অজয় কর ছবির কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন।

যে উদ্দেশ্যে ছবিটি তৈরী তা সার্থক হয়েছে। প্রায় বিশ মিনিটব্যাপী এই ছবি দেখার কালে দর্শকেরা স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। দেশের ডাকে দেশবাসীর সঙ্গে চলচ্চিত্রলোকের শিল্পী ও কলা-কুশলীরাও যে আজ একাত্ম হয়ে উঠেছেন, ছবিটি দেখার সময় মনে এই অনুভূতি জাগে। এদিক থেকেও ছবিটি সার্থকতা অর্জন করেছে।

সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করার ছবি এটা নয়। ছবি দেখার কালে এই বোধই দর্শকের মনে জেগে ওঠে যে, ছবিটি তাঁর নিজের, দশের ও দেশের। বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের তথা ই-আই-এম-পি-এ-র এক বিশেষ সুকৃতি হিসাবেই "আমার দেশ" অভিনন্দিত হবে।

আর একটি দেশাত্মবোধক চিত্র

"সত্যজিৎ রায় নীরব কেন?" শিরোনামায় গত সপ্তাহে এই বিভাগে যে মন্তব্য করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে সংস্থার কর্মসচিব শ্রীদীপেন্দ্র প্রামাণিক পত্রযোগে জানিয়েছেন যে, শ্রীসত্যজিৎ রায় ই-আই-এম-পি-এ'র আহ্বানে সম্প্রতি একটি অল্পদৈর্ঘ্যের দেশাত্মবোধক ছবি তৈরির প্রস্তুতি-পর্বে হাত দিয়েছেন।

এস এস চিত্রমন্দিরের "ধূপছায়া" (পরিচালনাঃ চিত্ত বসু) ছবিতে বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বনাথন

মহিলা শিল্পী মহল-এর অভিনব নাট্যোপহার

মহাজাতি সদনে মহিলা শিল্পী মহল গত ৫ ও ৭ই ডিসেম্বর "মিশরকুমারী" নাটকটি অভিনয় করেন। কলকাতার নাট্যামোদীরা এমন অভূতপূর্ব নাট্যাভিনয় বুঝি এর আগে আর কখনও দেখেননি। এই নাটকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেত্রীরা। পাদপ্রদীপের আলোয় ইতিপূর্বে যাঁদের কখনও অভিনয় করতে দেখা যায়নি তাঁরাও এই নাটকে অভিনয় করেছেন। নাটকের পুরুষ চরিত্রে মহিলা শিল্পীরা যে যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন তার তুলনাও বিরল। কিন্তু বিরলতর হল সেই শুভপ্রেরণা যা কলকাতার সব মহিলা শিল্পীদের সংঘবদ্ধ করে তুলেছে। মহিলা শিল্পীদের এই সংস্থা এবং তাঁদের প্রথম মঞ্চাভিনয় ঐক্য ও আত্মত্যাগের এক মহৎ নিদর্শন। বার্ধক্যে যেসব মহিলা শিল্পী কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন এবং যাঁরা দুঃস্থ তাঁদের জন্য একটি "বার্ধক্য-আশ্রম" (ওল্ড এজ হোম)—যেখানে জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁরা নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবেন—গড়ে তোলাই মহিলা শিল্পী মহলের লক্ষ্য। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য চাই অর্থ। অর্থসংগ্রহের জন্যই মহিলা শিল্পী মহল "মিশরকুমারী" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকের দ্বিতীয় দিনের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়। এই টাকা (মোট সাত হাজার) দ্বিতীয় দিনের নাট্যাভিনয়ের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রচারমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ

মৃণাল সেন পরিচালিত "অবশেষে" (অভ্যুদয় ফিল্মস) ছবির একটি দৃশ্যে অসিতবরণ ও পাহাড়ী সান্যাল

কোলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে অলংকার ও সোনা দান করেন রেণুকা রায় ও মিত্রা চট্টোপাধ্যায়।

মহিলা শিল্পী মহলের নাট্যাভিনয় উপভোগ্য হয়ে ওঠে শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্যের গুণে। নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিতে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (সামন্দেশ), চন্দ্রাবতী (হারেমহেব), বনানী চৌধুরী (রামেসিস), কানন ভট্টাচার্য (জিনো), মলিনা দেবী (আবন), অনুভা গুপ্তা (খারেব), মঞ্জু দে (কাকাতুয়া) এবং সরযূ দেবী (নগরপাল)। প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় (মাহরিন), সুলতা চৌধুরী (সায়া), বাসবী নন্দী (বুলা), নমিতা সিংহ (পরিচারিকা)।

নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সরযূ দেবী ও মলিনা দেবী। নাটকের আবহ-সংগীত ছিল মনোরম। সংগীতাংশ ছিল নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। সংগীত পরিচালনার জন্য দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন বাঁশরী লাহিড়ী ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়। আলোক-সম্পাতে তাপস সেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

জাতির সেবায়

বোম্বাই ও মাদ্রাজের চলচ্চিত্রলোক

বোম্বাই-এর **চিত্রপ্রদর্শকরা** ১লা ডিসেম্বর হতে তাঁদের সাপ্তাহিক লভ্যাংশের এক ভাগ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি মাসে তাঁরা দেশরক্ষা তহবিলে ৩০,০০০ টাকা দান করতে পারবেন বলে মনে করেন।

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা **এম জি রামচন্দ্রকে** তাঁর গুণগ্রাহীরা সোনা ও রুপোর একটি তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য এই তরবারি নীলামে বিক্রয় করা হয়। তরবারিটি ১৩,০০০ টাকায় বিক্রি হয়।

বোম্বাই-এর সিনে-মিউজিক ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ১৫ই ডিসেম্বর একটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে। শচীন দেব বর্মন, নৌশাদ, শঙ্কর জয়কিষণ, সি রামচন্দ্র প্রমুখ সংগীত পরিচালকদের তত্ত্বাবধানে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে গান করবেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে এ সপ্তাহে মেহবুব-এর নতুন ছবি **"সন অব ইণ্ডিয়া"**-র এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে একটি বাংলা ছবি ও একটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে।

বাংলা ছবিটির নাম **ধূপছায়া** (এস এস চিত্রমন্দির)। প্রণয় ও সামাজিক সমস্যার ভিত্তিতে রচিত ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী এই ছবির আখ্যান-অবলম্বন। চিত্ত বসু ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত।

বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায় ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্ত, এন বিশ্বনাথন ও ছবি বিশ্বাস। অমল মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত-পরিচালক।

আপনা বানাকে দেখো (চিত্র সংগম) এ সপ্তাহের নতুন হিন্দী ছবি। প্রণয়ই এ-ছবির মূল উপজীব্য। আশা পারেখ ও মনোজকুমার ছবির নায়ক-নায়িকা। জগদীশ, নিরুলা ও রবি যথাক্রমে চিত্র-পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক।

* চিত্র-সমালোচনা *

ছদ্মপরিচয়ে প্রেম ও কৌতুক

হিন্দী ছবির সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের রুচি ও চাহিদার প্রতি পুরোপুরি নজর

রেখে "দিল তেরা দিওয়ানা" (পদ্মিনী পিকচার্স) ছবিটি তৈরি করেছেন বি আর পানথালু। হিন্দী ছবি যাঁরা নিয়মিত দেখেন এবং হাল্কা আমোদ যাঁদের কাম্য, তাঁরা যে এ-ছবি দেখে খুবই তৃপ্তি পাবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

ছবির বিষয়বস্তু প্রেম। আনুষঙ্গিক উপাদানের মধ্যে প্রধান হল রঙ্গরস। ছদ্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে এ-ছবির রঙ্গরসের উপকরণ বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে। দুই ব্যক্তির চেহারার অবিকল সাদৃশ্যও চিত্র-কাহিনীতে কৌতুকের সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া বড়লোকের ছেলের গরীবের ছদ্ম-পরিচয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম, প্রেমিকের আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় প্রেমিকার অভিমান ও উভয়ের মধ্যে সাময়িক ভুল-বোঝাবুঝি, নায়িকার প্রতি লোভদৃষ্টিসম্পন্ন এক কুচক্রীর খলতা, কাহিনীর শেষ মুহূর্তে খল-চরিত্রের বিরুদ্ধে নায়কের অসমসাহসিক অভিযান ও রোমাঞ্চকর সংঘর্ষে দুর্বৃত্তের বিনাশ এবং পরিশেষে নায়ক-নায়িকার ঈপ্সিত মিলন—এই ছকে-বাঁধা পথে চিত্রকাহিনীর বিস্তার ও বিন্যাস।

প্রযোজক-পরিচালক বি আর পানথালু ছবিতে প্রমোদের উপকরণ অপর্যাপ্তভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন। তবে যুক্তি ও সংগতির অস্তিত্ব যাঁরা এই ছবিতে খুঁজতে যাবেন, তাঁরা ঠকবেন।

ছবির প্রধান চরিত্রে চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়ে প্রাণোচ্ছল অভিনয় করেছেন শাম্মী কাপুর, মালা সিংহ ও মাহমুদ। মাহমুদের অভিনয়ই হয়ত দর্শকদের বেশী আনন্দ দেবে। ওমপ্রকাশ, শুভা খোটে, মনোমোহন কৃষ্ণ, প্রাণ, মোহন চটি ও লীলা চিটনিস অন্যান্য প্রধান চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন।

সংগীত-পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ ছবির গানের সুরারোপে তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উঁচুদরের।

* ছবির পর ছবি *

এক টুকরো আগুন

আর ডি বনশল প্রযোজিত 'এক টুকরো আগুন' (পরিচালনাঃ বিনু বর্ধন) ছবিটি অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বজিৎ, তন্দ্রা বর্মন, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুভা গুপ্ত ছবির প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

অগ্রগামীর আগামী নিবেদন "নিশীথে" ছবির একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তম কুমার

অভিজ্ঞান

সুগায়ক ও সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রের প্রযোজনায় যে-ছবিটি তৈরি হচ্ছে, সাময়িকভাবে তার নাম রাখা হয়েছে 'অভিজ্ঞান'। বিধায়ক ভট্টাচার্য এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যের রচয়িতা। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর ছবির দুটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে জানা গেল। প্রযোজক শ্যামল মিত্র নিজেই সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

নতুন প্রয়াস

আলোকচিত্রশিল্পী হেমেন মিত্র এস এম প্রোডাকশনস-এর হয়ে সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে একটি ছবি তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন অজয় কর। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর। সুর রচনার দায়িত্ব হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

জ্যোতি-তে "দি স্লিপিং বিউটি"

ওয়াল্ট ডিজনে-এর একটি অসাধারণ ছবি 'দি স্লিপিং বিউটি'। ৭০ মিলিমিটারে তোলা এই কার্টুন ছবিতে রূপকথার কাহিনী চিত্রায়িত। একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-মূলক ছবির রস এই চিত্রে পরিবেশিত। ভারতীয় দর্শকদের কাছে এ-ছবির একটি বিশেষ সময়োপযোগী আবেদন রয়েছে। একটি নৃশংস ড্রাগনের ছলাকলা ও ক্রুরতা

আর ডি বি অ্যান্ড কোং-এর "এক টুকরো আগুন" (পরিচালনা বিনু বর্ধন) ছবির একটি দৃশ্যে তন্দ্রা বর্মন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল

কেমন করে সুন্দরকে বিনাশ করতে চায় এবং নিজেই পরিণামে কীভাবে ধ্বংস হয় সে উপাখ্যান রয়েছে এ-ছবিতে। ছবির কলা-কৌশল ও নয়নাভিরাম আঙ্গিক গঠন বিস্ময়কর।

"সেতু"র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা

গত ২রা ডিসেম্বর বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকটি একাদিক্রমে ৭৫০ অভিনয়-রজনী অতিক্রম করে নাট্যজগতে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। নাটকটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আজও অব্যাহত।

* পাঠকের চোখে *

ধন্যবাদ জানাই

মহাশয়,

'শিল্পীদের প্রতি' আপনারা যে সময়োচিত আবেদন জানিয়েছেন তাতে শিল্পী-মহলের অভূতপূর্ব সাড়া আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছি। আমাদের প্রিয় শিল্পীরাও যে দেশপ্রেমে পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আপনাদের সময়োচিত আবেদনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এই সঙ্গে একটি প্রস্তাব সরকার ও জনসাধারণের বিবেচনার জন্য পাঠালাম। সিনেমা দেখতে প্রমোদকর ছাড়াও যদি আমরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য টিকিট প্রতি ৫ নয়া পয়সা দিই তবে তাতে জনসাধারণের উপরে খুব চাপ পড়ে না অথচ দেশের উপকার হয়।

মণীন্দ্র রায়চৌধুরী
দার্জিলিং

বাংলার বাইরে বাংলা ছবি

মহাশয়,

'বাংলা ছায়াছবি'র সংকটে বাঙালীর কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেকখানি—এ কথা আজ অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আমিও দুই চার কথা বলবার চেষ্টা করছি। আমি জোড়হাট (আসামের) শহরের একজন নাগরিক হিসাবে এখানকার কথাই জানাচ্ছি। এখানে তিনটি প্রেক্ষাগৃহ আছে। বাংলা ছবি মাসে একটি বা দুটি আসে। ভিড়ও যথেষ্ট হয়। কিন্তু চাহিদার অনুপাতে যোগান নেই। আমি নিজে এমন অনেককেই জানি, যাঁরা প্রায়ই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বাংলা ছবির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাইরের চিত্রের কার্টন দেখে জিজ্ঞাসা করি, 'এ ছবি কবে পর্যন্ত আসছে; উত্তর পাই, দেরি আছে। আমার ন্যায় অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন। মোটামুটি কথা হলো—এ শহরে ভালো বাংলা ছবি এক সপ্তাহ ও ততোধিক চলে, কিন্তু প্রয়োজন অনুপাতে ছবি আমদানী হয় না। তা ছাড়া, আর একটা দিক এখানকার প্রেক্ষাগৃহতে দেখতে পাই। সাধারণতঃ এখানকার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বাংলা ছবি প্রথম শো-তে চলে এবং দ্বিতীয় শো-তে হিন্দী ছবি চলে। আমার মতে, যে-সমস্ত জায়গায় বাংলা ছবি ভালো চলে না, সেইসব জায়গাতে অনুরূপভাবে ছবি চালালে বাংলা ছবির সংকটমোচনের পথ অনেকটা সহজ হবে।

মনোরঞ্জন মৌলিক
জোড়হাট

রঙমহল-এর শিল্পী ও কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রচারমন্ত্রী জগন্নাথ কোলের হাতে প্রতিরক্ষা তহবিলে রঙ্গালয়ের দান তুলে দিচ্ছেন জহর রায়, পাশে সরযূ দেবীকে দেখা যাচ্ছে। ফটো-দেশ

বোম্বাই সমাচার

বৈজয়ন্তীমালা ও তাঁর সম্প্রদায় বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করছেন আগামী ২২শে ডিসেম্বর। এই নৃত্যনাট্যের সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবিশঙ্কর।

বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যার্থে

মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তির আসরে অংশ গ্রহণ করেন (মাঝখানে) শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র, সুবিনয় রায়, সুসীমা মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী; (উপরে ও নীচে) সংঘের যন্ত্রীশিল্পী ও কণ্ঠশিল্পীদের দেখা যাচ্ছে

ফটো-দেশ

সুরঞ্জন চিত্র'র "দেখা হল" (পরিচালনাঃ নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়) ছবির নায়ক-নায়িকা অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যা য় ফটো-দেশ

বোম্বাইয়ে অনতিবিলম্বে একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন।

চিত্রপরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় মডার্ন স্টুডিয়োজ-এ "সাঁঝ ঔর সবেরা"র কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করেন। দৃশ্যে অভিনয় করেন মামুদ, মনোমোহন কৃষ্ণ ও প্রীতিবালা। গুরু দত্ত ও মীনাকুমারী ছবির নায়ক-নায়িকা। শংকর-জয়কিষণ ছবির সুরকার।

প্রদীপকুমার, সয়ীদা খান, আগা ও ভগবান সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া পিকচার্স-এর "সিনবাদ, আলীবাবা ও আলাদিন" ছবির কয়েকটি দৃশ্যে অভিনয় করেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন পি এন অরোরা। রবি ছবির সংগীত পরিচালক।

চিত্রপরিচালক নীতীন বসু সম্প্রতি "দুজে কা চাঁদ" ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করেন। মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলায় বারো দিন ধরে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়। ভারতভূষণ ছবির প্রযোজক এবং নায়ক। বি সরোজা দেবী ছবির নায়িকা।

দিলীপকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা সম্প্রতি ফিল্মালয়-এর "মিঃ লীডার" ছবির দশ দিনব্যাপী চিত্রগ্রহণে অংশ নেন। রাম মুখার্জি ছবিটি পরিচালনা করছেন। কিছুকাল আগে আগ্রার তাজমহলের পটভূমিতে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। নৌশাদ ছবির সংগীত পরিচালক।

সোভেক্সপোর্টফিল্ম ও প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী বিমল রায়ের **সুজাতা** ছবিটি সোভিয়েট-রাশিয়ায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে। এবং বিমল রায় সোভিয়েট চিত্র **হোয়াইট নাইটস** ছবিটি পূর্বাঞ্চলে পরিবেশন করবেন।

বোম্বাই-এর চলচ্চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আরও যাঁরা প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদান করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন **মালা সিংহ** (১০,০০০ টাকা), **মাহমুদ** (১০,০০০ টাকা), **জয় মুখার্জি** (১০,০০০ টাকা), **শেখ মুখতার** (৫,০০০ টাকা) এবং **অজিতা** (১,০০০ টাকা)।

বিন বাদল বরসাত ছবির দশদিনব্যাপী অন্তর্দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ সম্প্রতি অংশগ্রহণ করেন। তা-ছাড়া ছবির দুটি গান'ও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকার, মহম্মদ রফি ও আশা ভোঁসলে।

তারা স্টুডিয়োজ-এ **"জাহান আরা"** ছবিটির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটি তৈরী হচ্ছে ইস্টম্যান কালারে। পৃথ্বীরাজ কাপুর, মালা সিংহ, ভারতভূষণ, শশীকলা, মিনু মমতাজ, ইন্দিরা ও প্রযোজক ওম প্রকাশ ছবির প্রধান শিল্পী। বিনোদকুমার ছবিটি পরিচালনা করছেন। মদনমোহন ছবির সংগীত পরিচালক।

শশী কাপুর, রাগিণী, আগা, জয়শ্রী, জীবন ও আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে সম্প্রতি মোহন স্টুডিয়োজ-এ **"ইয়ে দিল্ কিসকো দু"** ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। কে মিশ্র ছবিটি পরিচালনা করছেন।

আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর, সি এইচ আত্মা ও সুবীর সেন **"তারো ভরি রাত"** ছবির জন্য কয়েকটি গান গেয়েছেন। ভল আমারি ছবিটির পরিচালক। নিরুপা রায় ও জয়রাজ ছবির দুই প্রধান শিল্পী।

শিল্পভারতী প্রোডাকশনস-এর "বর্ণচোরা" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। ফটো-দেশ

খেলার মাঠে

একলব্য

ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এসে এবার প্রথম শ্রেণীর পাঁচটি খেলার মধ্যে দুটি খেলায় এম সি সির হার স্বীকার, বিশেষ করে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর কাছে তাঁদের শোচনীয় পরাজয়ের পর অনেকেই আশংকা করেছিলেন, প্রথম টেস্টেও ইংলণ্ডকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। ইংলণ্ড সম্বন্ধে এই ধারণা করার আরও কারণ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে ৪ বার ইংলণ্ড ব্রিসবেনে টেস্ট খেলেছে, সেই ৪ বারই অস্ট্রেলিয়ার কাছে তারা হার স্বীকার করেছে। অপর দিকে শুধু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং ১৯৬০-৬১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার 'টাই টেস্টের' আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ব্রিসবেনে পর পর ৭টি টেস্টে বিজয়ী হয়েছে। 'টাই'-এর পর এই প্রথম 'ড্র'। সুতরাং ইংলণ্ডের সূচনা ভাল বলতে হবে। তা ছাড়া, ১৯৬০-৬১ সালের স্মরণীয় 'টাই-টেস্টের' পর ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া যেভাবে ব্রিসবেন মাঠে খেলেছে সেটাও ক্রিকেটের পক্ষে কম আনন্দের কথা নয়। সবচেয়ে বেশী আনন্দের কথা ইংলণ্ড অধিনায়ক টেড ডেক্সটারের পক্ষে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে মাঠে ইংলণ্ডের ধুরন্ধর অধিনায়ক ক্রিকেটের পঞ্চ বরপুত্রের অন্যতম ওয়্যালী হ্যামণ্ড শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করেছেন, ফ্রেডি ব্রাউন-এর হেনস্থা হয়েছে, লেন হাটন সমালোচকদের কটু মন্তব্যের মধ্যে পরাজয়কে স্বীকার করে নিয়েছেন, পিটার মে পরাজয়ের পর নির্বাক হয়েছেন, সেই মাঠ থেকে টেড ডেক্সটার বেরিয়ে এসেছেন ব্যাট উঁচু করে দর্শকদের বিপুল আনন্দের মধ্যে। সুতরাং আবার বলব, ইংলণ্ডের সূচনা ভাল।

খেলাটিতে একজনের বেশী ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করতে পারেননি এবং একমাত্র সেঞ্চুরীর অধিকারী হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান বুথ। যাঁর দল থেকেই বাদ পড়ার কথা ছিল। খেলার দিন বি শেফার্ডের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞ অধিনায়ক রিচি বেনো বুথকে দলভুক্ত করেন এবং বুথও তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেন। টেস্ট খেলায় জীবনের শুধু প্রথম সেঞ্চুরীই নয়—অস্ট্রেলিয়ার পতনমুখে বুথই ইংলণ্ডের পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ান।

বুথ ছাড়া অনেকেই এ টেস্টে ভাল রান করেছেন। এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতি ঘেরে পড়ে ইংলণ্ড অধিনায়ক টেড ডেক্সটার ও অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরীর উপর। ডেক্সটার দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র এক রানের জন্য, আর বিল লরী দুই রানের জন্য সেঞ্চুরী লাভ করতে পারেননি। একই কারণে কেন ম্যাকের জন্যও দুঃখ হয়। যদিও সেঞ্চুরী পূরতে তাঁর ১৪ রান বাকী ছিল, কিন্তু তিনি সে ১৪ রান করার সুযোগ পাননি, নট আউট থেকেই প্যাভেলিয়নে ফিরে এসেছেন।

ইংলণ্ড অধিনায়ক টেড ডেক্সটার দুই ইনিংসে করেছেন ১৬৭ রান, দ্বিতীয় ইনিংসের বোলিং অ্যাভারেজেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। প্রথম ইনিংসেও পেয়েছেন একটি উইকেট। তাঁর খেলা ছিল জলুস-ভরা। সমভাবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোও ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে নিজ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। দলের নবম ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর ৫১ রান যেমন বলিষ্ঠ ব্যাটিংয়ের পরিচায়ক তেমন ১১৫ রানে ৬টি উইকেট দখল উন্নত বোলিং-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য।

এখন খেলাটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

ভাগ্যের ব্যাপারে ডেক্সটার মোটেই ভাগ্যবান নন। ইংলণ্ডের অধিনায়ক হিসাবে তিনি যে ১২ বার 'টস' করেছেন তার মধ্যে মাত্র ৩ বার বিজয়ী হয়েছেন, ৯ বার হয়েছেন পরাজিত। ব্রিসবেনের এই টেস্টের হিসাব নিয়ে ১৩টি টেস্ট খেলার মধ্যে তাঁর 'টসে' পরাজয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান। কিন্তু তাঁদের সূচনা মোটেই ভাল বলা যায় না। ফ্রেডি ট্রুম্যানের প্রশংসনীয় বোলিং এবং ফিল্ডিং-এর ফলে ১৪০ রানের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রায় সবাই আউট হয়ে যান। ব্রায়ান বুথ যখন খেলায় যোগ দেন তখন অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ১৯৪ রান। কিন্তু সপ্তম উইকেটে বুথ ও ম্যাকের সহযোগিতায় ১০৩ রান যোগের ফলে প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ৩২১ রান সংগ্রহ করে।

১৭৩ মিনিট ব্যাট করে ব্রায়ান বুথ জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করেন আর সবসমেত ব্যাট করেন ২১৭ মিনিট। ১৪ বার তাঁর বল মাঠ পেরিয়ে যায়। শুধু ২১ রানের মাথায় তিনি একবার ভুল করেছিলেন। এগিয়ে গিয়ে স্টাম্পিংয়ের চান্স দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের উইকেট কিপার অ্যালান স্মিথ সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ৪০৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ড ৪ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে।

৬২ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের দুটি উইকেট পড়ে গেছে। দুটি উইকেটই পেয়েছেন

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো ব্যারী নাইটের বলে শক্ত ক্যাচ তুললে উইকেট-কিপার এলান স্মিথ মাটিতে শুয়ে পড়ে ক্যাচটি ধরে বেনোকে আউট করছেন

প্রথম টেস্টের শেষ দিনে রিচি বেনোর বলে ক্যাচ তুলে কলিন কাউড্রে বেনোর হাতেই আউট হচ্ছেন

লেগ স্পিন বোলার বেনো। ডেক্সটার বেনোর বলের স্পিন দেখে দেখে ব্যাট চালাচ্ছেন। কিছু পরে তিনি একটু একটু করে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে বল পেটাতে আরম্ভ করলেন। বাঁক নিয়ে উইকেটে বিষ ফোটাবার আগেই বলের বিষ ভেঙে দিচ্ছেন। বেনোর দুই ওভারে ডেক্সটার সংগ্রহ করলেন ২২ রান। কিন্তু বেনো কি এই মার হজম করবেন? তিনিও লোফফা বলে লোভ দেখিয়ে ডেক্সটারকে বোল্ড করলেন। ৭০ রান করে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন ইংলণ্ড অধিনায়ক টেড ডেক্সটার।

এক দিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের সূচনায় ইংলণ্ডের সুনিশ্চিত প্রাধান্য। দুই নট আউট খেলোয়াড় কেন ব্যারিংটন ও পিটার পারফিট আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ব্যাট চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও ব্যারিংটনের ব্যাটিংয়ে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের ছায়াও ছিল না, তবু তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রশংসনীয়। যাই হোক, ব্যারিংটন প্রায় ৪ ঘণ্টায় ৭৮ রান এবং পারফিট ৪ ঘণ্টা ৮ মিনিটে ৮০ রান করে আউট হবার পর ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ৩৬১ রান হয়। বাকী ৩টি উইকেটে। অনেকেরই আশা ছিল, ইংলণ্ড প্রতিপক্ষের রান অতিক্রম করতে পারবে; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পরের তিনটি উইকেটে ইংলণ্ড ২৮ রানের বেশী যোগ করতে পারেনি। মাত্র ১ রানের মধ্যে অষ্টম ও নবম উইকেট পড়ে যায়। ৩৮৯ রানে শেষ হয় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ৯টি ইনিংসের মধ্যে এটাই ইংলণ্ডের বড় ইনিংস।

ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেড ট্রুম্যানকে অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান বুথের বিরুদ্ধে বোলিং করতে দেখা যাচ্ছে

৩৮৯ রানে ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া ২৫ মিনিট ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কোন উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১৬ রান তোলে।

চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরী ও ববি সিম্পসনের যোগসাজসে প্রথম উইকেটে ১৩৬ রান সংগৃহীত হবার পর সিম্পসন আউট হন। তাঁর সংগ্রহ তখন ৭১। সেঞ্চুরীর দুই রান কম থাকতে লরী আউট হবার পর ও'নীল নীল হার্ভে ও বার্জের সন্তোষজনক রান সংগ্রহের ফলে অস্ট্রেলিয়া দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৩৬২ রান সংগ্রহ করে।

পিচের অবস্থা দ্রুত রান করার পক্ষে অসহায়ক থাকায় এবং ইংলণ্ডের রক্ষণমূলক ফিল্ডিংয়ের জন্যই চেষ্টা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া এর চেয়ে দ্রুত রান তুলতে পারেনি।

ইংলণ্ডকে ৩৬০ মিনিটে ৩৭৮ রান করে জয়লাভের ঝুঁকি দিয়ে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন পঞ্চম ও শেষ দিনের সকাল বেলায়।

ইংলণ্ড বেশ সতর্ক হয়েই ব্যাটিং আরম্ভ করলো। উইকেটের যে অবস্থা তাতে জয়ের আশা করা যায় না। তবে ব্যাটসম্যানরা টিঁকে থাকলে শেষের দিকে জয়ের ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে এই ছিল ইংলণ্ডের খেলার ধারা। পুলার ও রেভাঃ শেপার্ডের সহযোগিতায় প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত হল ১১৪ রান। পুলার ৫৬ ও শেপার্ড ৫৩ রান করে আউট হবার পর ডেক্সটার ইংলণ্ড সমর্থকদের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেন জলুস-ভরা ব্যাটিং-নৈপুণ্যে। খেলাটি শেষ হতে যখন মাত্র ৪০ মিনিট বাকী তখনও ইংলণ্ডের ৩ উইকেটে ২৫৭ রান। বাকী ৭টি উইকেটে ৪০ মিনিটে ১২১ রান করে টেস্টে জয়ের ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব। তবু ইংলণ্ড পিটিয়ে খেললে ভাল রানই করতে পারবে আশা করেছিল। কিন্তু মারতে গিয়েই ২১ রানের মধ্যে পর পর তিনটি উইকেট পড়ে গেল। শেষ দিকে পরাজয়ের আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ব্যারী নাইট ও ফ্রেড টিটমাস শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে প্যাভেলিয়নে ফিরে আসেন। ৬ উইকেটে ইংলণ্ডের ২৭৮ রান উঠলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হচ্ছে আগামী ২৯শে ডিসেম্বর মেলবোর্ন মাঠে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো এই খেলায় রে লিণ্ডওয়ালের টেস্ট খেলায় ২২৮টি উইকেট লাভের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কিনা তা লক্ষ করবার বিষয়। নীচে প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড এবং দুই দলে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম দেওয়া হল।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৪০৪ (ব্রায়ান বুথ ১১২, কেন ম্যাকে ৮৬, রিচি বেনো ৫১, ববি সিম্পসন ৫০, নীল হার্ভে ৩৯; ব্যারী নাইট ৬৫ রানে ৩ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৭৬ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৮৯ (পিটার পারফিট ৮০, কেন ব্যারিংটন ৭৮, টেড ডেক্সটার ৭০, জিওফ পুলার ৩৩, রেভাঃ ডেভিড শেপার্ড ৩১; রিচি বেনো ১১৫ রানে ৬ উইকেট, ম্যাকেঞ্জি ৭৮ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(৪ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩৬২ (বিল লরী ৯৮, ববি সিম্পসন ৭১, নীল হার্ভে ৫৭, নর্ম্যান ও'নীল ৫৬, পিটার বার্জ নট আউট ৪৭; টেড ডেক্সটার ৭৮ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—(৬ উইকেট) ২৭৮ (টেড ডেক্সটার ৯৯, জিওফ পুলার ৫৬, রেভাঃ ডেভিড শেপার্ড ৫৩; অ্যালান ডেভিডসন ৪৩ রানে ৩ উইকেট, ম্যাকেঞ্জি ৬১ রানে ২ উইকেট)।

(খেলা অমীমাংসিত)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেন—বিল লরী, ববি সিম্পসন, নর্ম্যান ও'নীল, নীল হার্ভে, পিটার বার্জ, ব্রায়ান বুথ, অ্যালান ডেভিডসন, কেন ম্যাকে রিচি বেনো (অধিনায়ক), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ও ব্যারী জারম্যান।

ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেন—জিওফ পুলার, রেভারেণ্ড ডেভিড শেপার্ড, টেড ডেক্সটার, (অধিনায়ক), কলিন কাউড্রে, কেন ব্যারিংটন, অ্যালান স্মিথ, পিটার পারফিট, ফ্রেড টিটমাস, ব্যারী নাইট, ফ্রেড ট্রুম্যান ও ব্রায়ান স্ট্যাথাম।

খেলার তারিখ—৩০শে নভেম্বর এবং ১লা, ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর '৬২।

খেলাধূলায় মহিলা

মুকুল

স্বপ্না দে

ছোট বেলা থেকেই খেলাধূলোর প্রতি অসম্ভব অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়বার সময় দৌড়-লাফ-ঝাঁপের কিছু কিছু প্রাইজও ঘরে এসেছিল। আনন্দমেলা স্পোর্টসেও প্রাইজ না জুটেছে এমন নয়। ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসেও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু স্পোর্টসের যে এক বিশেষ প্রক্রিয়া তার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বপ্না দের নিজেরও সেটা জানা ছিল।

১৯৫৩ সালে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সবে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছে। দলে দলে মেয়েরা এসে কলেজ মাঠে স্পোর্টস-এর প্র্যাক্টিস করছে। স্বপ্নাও তাদের এক দলে ঢুকে পড়ল। হাই-জাম্প পীটে এসে স্বপ্না লাফ দিতেই তার কাছে দৌড়ে ছুটে এলেন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শান্তি অধিকারী, তখনকার ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসে যিনি হাইজাম্পে রেকর্ডের অধিকারিণী। বললেন—'আবার লাফাও তো'।

স্বপ্না একই ভঙ্গিতে লাফিয়ে হাইজাম্পের উচ্চতা অতিক্রম করে গেল।

শান্তি অধিকারী বললেন—এভাবে লাফ দিতে তোমাকে কে শেখালে?

'কেউ শেখায়নি তো'—স্বপ্নার সহজ উত্তর।

শান্তি অধিকারী বললেন—'না শেখালে লাফ দেবার সময় এমনভাবে তুমি ঘুরে যাবে কেন? কই আর কেউ তো তোমার মত ঘুরে লাফ দিচ্ছে না। সোজা দৌড়ে এসে সোজা লাফ দিয়ে 'বার' পেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। তুমি জান না তুমি যেভাবে লাফ দিচ্ছ ওকে বলে 'ওয়েস্টার্ন রোল'। হাইজাম্পের প্রতিযোগীর পক্ষে ও-বিদ্যা আয়ত্ত করা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। তুমি যদি ঠিকভাবে এটা আয়ত্ত করতে পার তবে হাইজাম্পে রেকর্ড অনিবার্য'।

ওখান থেকেই অজ্ঞানের দিব্যজ্ঞান লাভ হল। কলেজ কম্পাউণ্ড থেকে অনুশীলন আরম্ভ হলো স্কটিশ চার্চ কলেজের বাগমারীর বড় মাঠে। কিন্তু তবুও প্রথম বছরের কলেজ স্পোর্টসে হাতে প্রাইজ এল না। না আসার অবশ্য কারণও ছিল। সিংহলের পদ্মা দেবাসায়গম, আসামের আর্লিং লিয়ং স্কটিশ চার্চে তখন হাইজাম্পের দুই নামকরা মেয়ে। ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের হাই-জাম্পের রেকর্ডের পাশে এখনো পদ্মা দেবাসায়গমের নাম লেখা রয়েছে। তবু স্বপ্না দে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় স্থানের জন্য না ছিল কোন প্রাইজ না ছিল কোন সার্টিফিকেট। ১৯৫৪ সালে আই এ পরীক্ষার পড়াশুনোর চাপে প্র্যাক্টিসের তেমন সুযোগ ঘটল না। অপ্রধান প্রতিযোগিতার দুই একটি প্রাইজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল স্বপ্না দেকে।

কিন্তু ১৯৫৫, ৫৬ ও ৫৭ সাল, পর পর তিন বছর ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের হাই-জাম্পে স্বপ্না এক নম্বর মেয়ে। প্রথম বছর ফার্স্ট, দ্বিতীয় বছর প্রথম স্থানাধিকারিণী সুনন্দা মুখার্জির সঙ্গে সমান উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান, তৃতীয় বছর আবার প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী জয়ন্তী স্পোর্টসেও একই স্থান। এ ছাড়া দৌড়েরও একাধিক পুরস্কার। ১৯৫৭ সালে হাইজাম্পে দুবার ফার্স্ট হবার আনন্দের চেয়েও নাকি স্বপ্না বেশী আনন্দ পেয়েছিল রিলে রেসে স্কটিশ চার্চ কলেজের বিজয়িনী টিমের অন্যতমা হিসাবে। ক'বছর ধরেই ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের রিলে রেসে লরেটোর প্রথম স্থান বাঁধা ছিল। কিন্তু সেবার স্কটিশের কাছেই লরেটোকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল এবং স্বপ্নার কৃতিত্ব, প্রথম প্রতিযোগিণী হিসাবে স্বপ্না কলেজ টিমকে যে লীড দিয়ে দিয়েছিল লরেটো সে লীড আর ভাঙ্গতে পারেনি।

খেলাধূলোর চর্চা পড়াশুনোর প্রতিবন্ধক অনেক মা-বাবার এমন একটা ধারণা আছে। কিন্তু ছেলেমেয়েকে ঠিক পথে চালিত

স্বপ্না দে

করতে পারলে শুধু পড়াশুনা আর খেলাধূলা কেন, অনেক বিদ্যায় যে তারা পারঙ্গম হতে পারে, স্বপ্না দে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্পোর্টসে যেমন স্বপ্না ক্রমোন্নতির পরিচয় দিয়েছে অ্যাথলেটিকসের সঙ্গে সমান তালে ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, টেনিকোয়েট প্রভৃতি খেলেছে; তেমন পড়াশুনায়ও এগিয়ে গেছে ধাপে ধাপে। ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সেকেণ্ড ডিভিশনে, আই এ ফার্স্ট ডিভিশনে, বি এতে ফিলজফিতে অনার্স পেয়েছিল, আর এম-এর সাইকোলজিতে ফার্স্ট ক্লাশ। এখন সায়েন্স কলেজে সাইকোলজির গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত।

খেলাধুলো ও পড়াশুনার ক্ষেত্রে দুটি ঘটনা স্বপ্নার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়বার সময় যখন ইণ্টার স্কুল স্পোর্টসে অংশ গ্রহণের সুযোগ ঘটে তখন দেখে চটপটে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই দু'হাত ভরে প্রাইজ নিয়ে যাচ্ছে, বাঙালী মেয়েরা ফিরছে প্রায় খালি হাতে। খেলাধুলোর সাফল্য অর্জনের জন্য সেখান থেকেই একটা সংকল্প নিয়ে ঘরে ফেরে স্বপ্না দে। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বার সময় দেখে খেলাপ্রিয় অধ্যাপক এস পি বিশ্বাস সেই সব মেয়েকেই বেশী স্নেহ করেন যারা খেলাধুলো এবং পড়াশুনায় ভাল। ফিলজফির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এস পি বিশ্বাসের প্রিয় ছাত্রী হবার জন্য স্বপ্নাও পড়াশুনার সংগে খেলাধুলোকে আঁকড়ে ধরে এবং অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক বিশ্বাসের স্নেহের পাত্রী হয়ে ওঠে।

পড়াশুনো ও খেলাধুলো ছাড়া শিল্পকলায় স্বপ্নার অসম্ভব অনুরাগ। সাফল্যও আশাতীত। কণ্ঠে অবশ্য কোনদিন সুর ভাল খোলেনি, কিন্তু শিল্পের সাধনায় হাত বেশী বিরাম পায়নি। ১৯৫২ সালে 'ওভারটুন' হলে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের নৃত্য প্রতিযোগিতায় মডার্ন, মণিপুরী, কথকলি, জিপসী ও ফোক ড্যান্স নাচের পাঁচটি প্রতিযোগিতাই প্রথম স্থান দখল করেছে। ঐ বছর সেনী সংগীত সম্মিলনীর নৃত্য প্রতিযোগিতায় মডার্নে পেয়েছে তৃতীয় এবং ফোক ড্যান্সে প্রথম স্থান।

১৯৫৫ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ইণ্টার কলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে তবলা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী মাত্র একটি মেয়ে হিসাবে স্বপ্না প্রথম পুরস্কার পেলে অনেকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন—'ক্লাসের একজনের মধ্যে ফার্স্ট'। কিন্তু পরের বছর শোভাবাজার রাজবাড়িতে ভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে তবলা লহরায় স্বপ্না প্রথম স্থান দখল করায় অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

প্রশংসাপত্র ও সার্টিফিকেটের বাণ্ডিল ঘাটতে ঘাটতে যখন আবৃত্তির প্রশংসাপত্রের বাণ্ডিল হাতে এল তখন সংখ্যাধিক্যের জন্য তা আর ভাল করে দেখার প্রয়াস পেলাম না। আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকারের একগাদা সার্টিফিকেট। একখানা শুধু তৃতীয় স্থান দখলের।

বললাম এ অবনতি কেন? স্বভাব হাসি হেসে স্বপ্না দে বলল—অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফল। আবৃত্তিতে প্রথম স্থান দখল করতে করতে এমনই আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছিল যে, ভালভাবে প্রস্তুত না হয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম আর মাঝখানে ভুলে গিয়েছিলাম কয়েকটি লাইন।

১৫১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটস্থ মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দের মেয়ে। স্বপ্না দে নিজেও মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছে ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজে, সে কথা আগেই বলেছি। স্পোর্টস জীবনে সাফল্যের ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ছাত্রীর কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা আছে।

কলেজ স্পোর্টসে বা আর আর স্পোর্টসের ব্যালান্স রেসে স্বপ্না দে কোনদিন ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয়নি। আর ছোট বেলায় অরেঞ্জ রেসেও ওর প্রথম স্থান প্রায় বাঁধা ছিল।

এর কারণ স্বরূপে বলল—"আমি দেখতাম কলেজের মেয়েরা ব্যালান্স রেসের প্র্যাক্টিসের সময় একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ব্যালান্স হারিয়ে ফেলত। অর্থাৎ ২৫ বা ৩০ গজের একটা সীমা নির্দিষ্ট ছিল যার মধ্যে তারা চমৎকারভাবে ব্যালান্স রেখে ছুটে যেতে পারত; কিন্তু দৌড়ের দূরত্ব একটু বাড়লেই মাথার হাঁড়ি মাটিতে পড়ে ভেঙে যেত। ব্যালান্স ঠিক রেখে আমি ছুটতাম অপেক্ষাকৃত আস্তে, কারণ আমার জানা ছিল জোরে ছোটার দৌড় বেশী দূর পর্যন্ত নয়। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে এইভাবে দৌড়েই ব্যালান্স রেসে আমি বিজয়িনী হয়েছি।"

"ছোটবেলায় যখন অরেঞ্জ রেস করতাম তখন আমার লক্ষ্য থাকতো সবচেয়ে ছোট সুতোয় ঝোলানো ছোট লেবুটির দিকে। ছোট সুতো দোলে কম, আর ছোট লেবু দাঁতে ধরতেও সুবিধে। অরেঞ্জ রেসে বারবার ফার্স্ট হতাম দেখে সহপাঠিনীরা ঠাট্টা করে বলত ওর 'হা-টা' অনেক বড় তাই সহজেই ও লেবু মুখে নিয়ে নিতে পারে।"

স্পোর্টসের সাফল্যের ক্ষেত্রে গতিবেগ এবং শক্তির প্রয়োজন নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছু কিছু ট্রিকসেরও প্রয়োজন, বিশেষ করে ফ্যান্সী ইভেণ্টে। স্বপ্নার গতিবেগ তো ছিলই, তা ছাড়া ট্রিকসও ছিল যার ফলে স্পোর্টস অঙ্গন থেকে বহু প্রাইজ পেয়েছে। আর ছাত্রী জীবনের নানা দিকের কাঙ্ক্ষিত সাধনার সাফল্যের ফলে প্রশংসাপত্র ও সার্টিফিকেটে আলমারি ভরে উঠেছে।

দেশী সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর—চীনা আক্রমণ জনিত পরিস্থিতির ফলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় রাজ্য সরকার এক্ষণে কর বৃদ্ধির কথা গভীরভাবে বিবেচনা করিতেছেন। স্ট্যাম্প, মোটর-যান এবং সিনেমা-থিয়েটারের উপর প্রমোদকর বৃদ্ধি করা প্রায় নিশ্চিত বলিয়া জানা যায়।

আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু বলেন যে, পশ্চাদ্দিকে চীনারা সৈন্য অপসারণ আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া কিছুটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। সম্মুখভাগে সৈন্য সংখ্যা কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে, কিন্তু কার্যত অপসারণ করা হয় নাই।

৪ঠা ডিসেম্বর—নেফা ও লাদকের যুদ্ধে কি পরিমাণ চীনা হতাহত হইয়াছে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হিসাব হইতে জানা গিয়াছে যে, একমাত্র নেফার যুদ্ধেই প্রায় ১৮ হাজার চীনা নিহত হইয়াছে। লাদকের চুশুল অঞ্চলে মাত্র একটি যুদ্ধেই চীনাদের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিহত হইয়াছে।

ভারত সরকার আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত-পাক সীমান্তে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যকে সরাইয়া নিয়া চীনা আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখন স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈনা পাক-ভারত যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা পাহারা দিতেছে।

৫ই ডিসেম্বর—শত্রু বিতারণে দৃঢ়-সংকল্প দেশের চুয়াল্লিশ কোটি অধিবাসীর অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ তেজপুরে কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় বলেন—অধিকৃত মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই।

অর্থ-উপমন্ত্রী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ আজ লোকসভায় বলেন যে, দেশে প্রচুর সোনা লুকানো রহিয়াছে। ঐ সোনাকে বাহির করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতেছেন।

৬ই ডিসেম্বর—আজ দুপুরে বড়িষায় একটি ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার দুইটি শ্রমিক ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। উহাতে অন্যূন দশজন আহত হয়—চারজনের অবস্থা গুরুতর।

আজ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে লাসা ও সাংহাইয়ের বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৭ই ডিসেম্বর—গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জনশক্তি ও সম্পদ দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আজ একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুসারে সারা দেশে গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করা হইবে।

বার বছর ধরিয়া প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও বিপুল ক্ষতির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার গভীর সমুদ্রে মাছ-ধরা পরিকল্পনা পরিচালনার ভার অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। গভীর সমুদ্রে মাছ-ধরা বোর্ডটি গুটাইয়া ফেলার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ বলেন যে, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট এই মর্মে কড়া নির্দেশ পাঠান হইয়াছে যে, বিপদের সময়ও অসামরিক জনসাধারণকে স্থানান্তরে অপসারণ উচিত নয়। লোকের স্থান ত্যাগে কিছুতেই উৎসাহ দেওয়া চলিবে না।

আজ রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানান যে, চীন সরকার তাহাদের সর্বশেষ পত্রে জানাইয়াছে—তাহারা সশস্ত্রবাহিনীকে পূর্বাঞ্চলে ম্যাকমেহন লাইন হইতে পিছনে সরাইয়া লইবে, কিন্তু ঢোলা ও লংজুতে অসামরিক ঘাটি রাখিবে।

৯ই ডিসেম্বর—ভারতের উদ্দেশে চীনের চরম পত্রে তথাকথিত শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট জবাব দাবি করা হইয়াছে। স্বীয় শর্ত ছাড়া চীন অন্য কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে রাজী নহে—যদি কোন মীমাংসা করিতে হয়, তবে ১৯৫৯ সালের ৭ই নবেম্বরের নিয়ন্ত্রণ রেখার ভিত্তিতেই করিতে হইবে।

চীনারা বমডি-লার প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণে টাঙ্গা উপত্যকায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। চীনা দস্যুরা গত ১৯শে নবেম্বর বমডি-লা দখল করিয়া লয়।

বিদেশী সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর—মস্কো রেডিয়ো কাল একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করিয়াছিলেন। চক্রে ভারত সম্পর্কে চীনের শান্তি প্রস্তাবের তারিফ করিয়া পরিশেষে সখেদে এই সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, ভারত তাহার নিরপেক্ষতার নীতি হইতে বিচ্যুত হইতেছে।

"বিশ্বাসযোগ্য মহলের" উক্তি উল্লেখ করিয়া আজ কলম্বোয় সংবাদপত্রগুলিতে বলা হয় যে, পৃথিবীর অন্যতম জোট বহির্ভূত দেশ সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ইতিপূর্বেই ভারতের নিকট সমরাস্ত্র বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছে।

৪ঠা ডিসেম্বর—এ পি-র এক খবরে প্রকাশ যে, সরকারীভাবে বলা হইয়াছে, আজ অদ্রো ফর্বিডলে ঘাটি হইতে দুইশত মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞ দিল্লি অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। এই লোকদের মধ্যে রেডিও, নৌ ও বিমান বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন।

আজ ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডী বলিয়াছেন, ভারতের উপর চীনা আক্রমণ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিবে এবং এই জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিকে দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য দিতে হইবে।

৫ই ডিসেম্বর—পিকিং-এ নির্ভরযোগ্য মহল হইতে বলা হইয়াছে, চীন-ভারত সংঘর্ষের মীমাংসার জন্য আহূত আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের উদ্যোগ পর্বেই চীনা সরকারী মহলে কিছু নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। আগামী সোমবার কলম্বোতে এই সম্মেলন উদ্বোধনের কথা আছে।

পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, পূর্বপাকিস্তানের কয়েকটি মহল পূর্বপাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। করাচীর ডন পত্রিকা মনে করেন পূর্বপাকিস্তানকে স্বতন্ত্র করার যে আন্দোলন চলিতেছে, পাশ্চাত্যের কূটনীতিবিদগণ উহার পিছনে আছেন।

৬ই ডিসেম্বর—পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে জানান হয় যে, পশ্চিমী মিত্ররাষ্ট্রবর্গের নিকট হইতে তাঁহারা যে ধরনের সমর্থন পাইয়াছেন তাহাতে কিছুটা নিরাশ হইলেও আপাতত তাঁহাদের 'সেণ্টো' অথবা 'সিয়াটো' ত্যাগের অভিপ্রায় নাই।

জেনেভার খবরে প্রকাশ—আগামী ১লা জানুয়ারীর মধ্যে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ অন্তর্বর্তিকালীন আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির প্রস্তাব করেন।

৭ই ডিসেম্বর—চীন-ভারত সংঘর্ষে কে দোষী এবং কে নির্দোষ, এ সম্পর্কে সিংহল পূর্বে হইতে কোন অভিমত পোষণ করে নাই। শুধু বিরোধের নিষ্পত্তিসাধনই তাহার অভিপ্রায়। প্রতিনিধি সভার নেতা শ্রী সি পি ডি সিলভা বৈদেশিক দপ্তরের উপর বিতর্কের দাবির উত্তরে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

নেপালের রাজা মহেন্দ্র আজ কাঠমাণ্ডুর নিকটে একটি উদ্যানরক্ষণ বিদ্যা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এই কেন্দ্রের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ভারতের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য ভারত যে প্রস্তাব করিয়াছে, চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের "নির্লজ্জ দাবি" একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ওয়াশিংটনের সরকারী কর্মচারী মহল আজ জানাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় এক কোটি ডলার মূল্যের জরুরী সামরিক সরঞ্জাম বিমানযোগে ভারতে প্রেরণ করিয়াছে। ভারত যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে মিগ—২১ বিমান সংগ্রহ করে তাহাতেও মার্কিন সমর সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যাহত হইবে না বলিয়াও জানান হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ ব্রুনি টাউনে বলেন যে, সরকারী সৈন্যগণ পুনরায় ব্রুনি রাজ্যের প্রধান তৈল শহর সিরিয়া অধিকার করিয়াছে। সরকারী সৈন্যগণ কর্তৃক বহু বিদ্রোহী নিহত এবং ৫০০ বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছে।

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি আজ জানায় যে, চীনা সৈন্যরা একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ারের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়াছে। সমাধিতে তাহার নাম ও পদমর্যাদা উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া ঐ রিপোর্টে জানান হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড

অমৃত

* প্রধান কার্য্যালয়

১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৩
ফোন :— ৫৫-৫২৩১

বিভিন্ন কার্য্যালয়

* মধ্য কলিকাতা

ভারত ভবন, ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩
ফোন :— ২৩-২০৫৮

বোম্বাই

শ্রীচারুব্রত দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটন ইনসুরেন্স হাউস,
দাদাভাই নওরোজি রোড,
বোম্বাই—১
ফোন :—২৬-২৮৫৩

* দিল্লী

শ্রীশংকর চক্রবর্তী
আই. ই. এন. এস বিল্ডিং
রফি মার্গ, নিউদিল্লী—১
ফোন—৩১৪৬৯

মাদ্রাজ

শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ
২৪, চন্দ্রবাগ এভেনিউ
মাদ্রাজ—৪

* বাঙ্গালোর

শ্রী এস. কে. শেষাদ্রি
২৪৩/১, সুইমিং পুল এক্সটেনশন,
৬, ক্রস, বাঙ্গালোর—৩
ফোন :—৭৪২৫৪